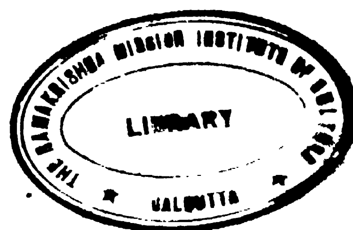
204653


LIBRARY
CALCUTTA

১০৩তম বর্ষ

কার্যালয় • কলকাতা



উদ্বোধন

॥১০৩॥



রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ

পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া-৭১১ ২০২, ফোন ঃ ৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২

সারদাপীঠ থেকে প্রকাশিত অডিও ক্যাসেটসমূহ

মূল্য ❑ SP-1 ও SP-31–34 ঃ ৩৫ টাকা, অন্যান্য ঃ ৩০ টাকা

SP-1	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্	(সংস্কৃত ও বাঙলা)
SP2, SP-7, SP-8, SP-10 হইতে 12	কথামৃতের গান (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড)	(বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি)
SP-3	শ্রীরামনামসংকীর্তন	(সংস্কৃত ও হিন্দি)
SP-4	বক্তৃতা—যুগপুরুষ	(বাঙলা) (শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত)
SP-5	শ্রীশ্রীচণ্ডীস্তব	বাঙলা, সংস্কৃত)
SP-6	শিবমহিমা	(বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি)
SP-9	শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা	(সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি)
SP-13	শ্রীসারদাবন্দনা	(সংস্কৃত, বাঙলা)
SP-20	বিবেকানন্দবন্দনা	(সংস্কৃত, বাঙলা)
SP-24	শ্রীকৃষ্ণবন্দনা	(সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি)
SP-14 হইতে SP-16	কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)	(বাঙলা)
SP-17	বীরবাণী	(সংস্কৃত, বাঙলা, ইংরেজী ও হিন্দি)
SP-18	গীতিবন্দনা	(হিন্দি)
SP-19	বক্তৃতা—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান	(বাংলা) (শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত)
SP-21 ও SP-22	সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড)	(হিন্দি)
SP-23	ওঠো জাগো	(হিন্দি)
SP-25	শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি	(হিন্দি)
SP-26	বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি	(হিন্দি)
SP-27	বেদমন্ত্র	(সংস্কৃত) (উপনিষদের মন্ত্রসমূহ)
SP-28	সরস্বতী বন্দনা	(বাঙলা, সংস্কৃত)
SP-29	**Ramakrishna Movement**	(Lecture by Revered Srimat Swami Bhuteshanandaji Maharaj)
SP-30	**Religion in Practice**	(do)
SP-31 হইতে SP-34	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (আবৃত্তি) (১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড)	(সংস্কৃত)
SP-35	আগমনী	(বাঙলা)
SP-36	ভজন সুধা	(হিন্দি)

শীঘ্র শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্, শ্রীরামনামসংকীর্তন ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার C. D. প্রকাশিত হবে।

স্বামী সর্বগানন্দ, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ, স্বামী দিব্যব্রতানন্দ, শ্রীমহেশরঞ্জন সোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য দক্ষ শিল্পিগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন।

Video Cassette :
Centenary Celebration of the Ramakrishna Mission at Belur Math in 1998.
Duration—80 minutes
Rs. 250.00

প্রাপ্তিস্থান ঃ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি (কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) ও সিমফনি (ধর্মতলা মেট্রো সিনেমার পাশে)

ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে M.O. অথবা Bank draft মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে।

উদ্বোধন ॥১০২॥

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

২৭৭৭৬

সূচীপত্র

১০৩তম বর্ষ ১ম সংখ্যা মাঘ ১৪০৭ জানুয়ারি ২০০১



ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ



সম্পাদক ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'
প্রচ্ছদ ❑ মুদ্রণ ঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ ❑ আলোকচিত্র ঃ বেলুড় মঠের জনৈক সন্ন্যাসী

website : www.udbodhan.org ◆ e-mail : udbodhan@vsnl.com

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৬৫ টাকা; সডাক ঃ ৭৫ টাকা
আলাদাভাবে কিনলে বর্তমান সংখ্যার মূল্য ঃ ৮ টাকা ❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ❑ ৩০০০ টাকা
[একবছরের মধ্যে পরিশোধ্য কমপক্ষে ৫০০ টাকা প্রতি কিস্তি হিসাবে ৬টি কিস্তিতেও প্রদেয়]

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা বাঙালীর ঘরে ঘরে সুলভে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিগত দুবছরের মতো 'উদ্বোধন'-এর বর্তমান বর্ষের গ্রাহকমূল্যও অপরিবর্তিত রয়েছে। এই নিয়ে পর পর তিন বছর 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য একই থাকল।



'উদ্বোধন' ঃ ১০৩তম বর্ষ (২০০১ খ্রীস্টাব্দ) ❑ গ্রাহকভুক্তি, নবীকরণ

❑ 'উদ্বোধন'-এর বর্তমান বর্ষ বা ১০৩তম বর্ষের (মাঘ ১৪০৭—পৌষ ১৪০৮/জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০১) গ্রাহকমূল্য বিগত বর্ষের মতোই থাকছে অর্থাৎ—ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৬৫ টাকা; ডাকযোগে ঃ ৭৫ টাকা; বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ঃ ৭২০ টাকা (বিমানডাক) ❑ ৩৬০ টাকা (সমুদ্রডাক); বাংলাদেশ ঃ ১৪০ টাকা।

❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য) ঃ ৩০০০ টাকা। এই টাকা কিস্তিতেও দেওয়া যায়। প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৫০০ টাকা দিয়ে বাকি ২৫০০ টাকা পরবর্তী ১১ মাসের মধ্যে প্রতি কিস্তিতে ন্যূনপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে প্রদেয়।

❑ গত দুবছর (১৯৯৯/১৪০৫-১৪০৬ এবং ২০০০/১৪০৬-১৪০৭) প্রথম বা মাঘ সংখ্যা প্রথম মুদ্রণের পর নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, পরে আবার তার পুনর্মুদ্রণ করতে হয়। সেজন্য বছরের প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা থেকে বছরের প্রতিটি সংখ্যার প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি/ নবীকরণ করা অবশ্যই প্রয়োজন। কার্যালয়ে অথবা আমাদের গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রগুলিতে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন। প্রসঙ্গত, গ্রাহকমূল্য দেরিতে এলে ২/৩টি সংখ্যা একসঙ্গে পাঠাতে হয়। তখন সেগুলি সাধারণ ডাকে না পাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। সেজন্য কলকাতা বা কাছাকাছি যাঁরা থাকেন, তাঁরা আমাদের কার্যালয়ে এসে বা লোক মারফত সরাসরি গ্রাহকমূল্য জমা দিলে সুবিধা। M. O.-তে টাকা পাঠালে তা আমাদের কার্যালয়ে পৌঁছাতে অনেক দেরি হয় এবং ততদিনে প্রথম সংখ্যাটি নিঃশেষিত হয়ে গেলে গ্রাহকেরা সময়মতো গ্রাহকমূল্য পাঠালেও ঐ সংখ্যাটি থেকে বঞ্চিত হবেন। সে-কারণে সম্ভব হলে M. O. না করে গ্রাহকমূল্য সরাসরি আমাদের কার্যালয়ে এসে জমা দেওয়াই ভাল।

❑ সরাসরি জমা দেওয়া সম্ভব না হলে 'A/c Payee' ব্যাঙ্ক ড্রাফটে/পোস্টাল অর্ডারে গ্রাহকমূল্য 'Udbodhan Office, Calcutta'—এই নামে কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন। চেক পাঠাবেন না। বিদেশের গ্রাহকদের জন্য চেক গ্রাহ্য। তবে সেই চেক কলকাতাস্থ কোন ভারতীয় ব্যাঙ্কের ওপর এবং 'Udbodhan Office'-এর অনুকূলে 'A/c Payee' হতে হবে।

❑ যাঁদের M. O. করে গ্রাহকমূল্য পাঠাতেই হবে, তাঁদের কাছে অনুরোধ, অবিলম্বে M. O. পাঠান। নভেম্বর-ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে পাঠানো M. O. কার্যালয়ে এসে পৌঁছাতে ২/৩ মাস লেগে যাচ্ছে। পুরনো গ্রাহক হলে M. O. কুপনে অবশ্যই আপনার গ্রাহকসংখ্যা, নাম ও ঠিকানা (পিনকোড-সহ) পরিষ্কার করে লিখে দেবেন। নতুন গ্রাহক হতে চাইলে নাম ও পিনকোড-সহ ঠিকানার সঙ্গে 'নতুন গ্রাহক হতে চাই'—এই কথাটি লিখে দেবেন।

❑ অনেক সময় M. O. কুপন আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় না। সেজন্য M. O. কুপনে উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে একটি পোস্টকার্ড দিয়েও M. O. মাধ্যমে যে গ্রাহকমূল্য পাঠাচ্ছেন তা পুরনো গ্রাহকরা নাম ও গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখ-সহ জানালে আমাদের সুবিধা হয়। নতুন গ্রাহকদের নাম ও পিনকোড-সহ ঠিকানা জানাতে হবে।

❑ পত্রোত্তর এবং প্রেরিত গ্রাহকমূল্যের প্রাপ্তিসংবাদের জন্য দেশ ও বিদেশের গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় ডাকখরচ পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

❑ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।

❑ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।

সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইন্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯

RMIC LIBRARY
204653
Acc No 204653
205
UD?
01.07.02

উদ্বোধন
॥১০৩॥

মাঘ ১৪০৭

জানুয়ারি ২০০১

দিব্য বাণী

3 FEB 2001
LIBRARY



আজ আমাদের শুভ দিন—'উদ্বোধন'-এর নববর্ষারম্ভ। আজ আশীর্বাদ করুন, নূতন উদ্যমের সহিত যেন ইহাকে চালাইতে পারি; 'উদ্বোধন' যেন নববর্ষে নবানুরাগের ভরে অধিকতর বেগে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে থাকে। আজ একটু মঙ্গলকামনা করুন, যেন সকলে নব উৎসাহে, নব উদ্যমে স্ব স্ব কার্যে রত হইতে থাকেন; নব প্রেমে নব অনুরাগে যেন সকলে নির্মল আনন্দময় মূর্তি হইয়া বিচরণ করিতে থাকেন। আজ একটু শুভেচ্ছা করুন, যেন ঘরে ঘরে দীপমালা জ্বলিয়া উঠে; অন্তরে অন্তরে, প্রতি অন্তরে প্রতি হৃদয়ে যেন আজ তড়িৎ-তন্ত উদ্দীপিত হইয়া উঠে—নবানুরাগে সকলে যেন মত্ত হইতে থাকেন; ইন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি দেবগণ, মুনি ঋষি রাজা প্রজা প্রভৃতি মনুষ্যগণ, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণিগণ, যিনি যেখানে আছেন সকলে যেন আজ একতানে নবানুরাগে গাইতে থাকেন—"জয় বঙ্গের জয়, জয় ভারতের জয়, জয় সকলের জয়।"...

আজ শুভদিনে আশীর্বাদ করুন, আমরা যেন সেই নবানুরাগে রঞ্জিত হইতে পারি; সেই রঙে যেন সকলকে রাঙ্গাইতে পারি; সকলের শরীর মন প্রাণ যেন লালে লাল হইয়া যায়। আজ আমাদের নববর্ষের শুভ দিনে আশীর্বাদ করুন, নবানুরাগের পিচকারি লইয়া, মন খুলিয়া সকলে যেন পরস্পর পরস্পরের সহিত সে অমিয়-খেলা খেলিতে পারি, সুপ্তোত্থিত হইয়া দেখিতে পাই—দেশ যেন নবানুরাগের হোরি-ময় হইয়া গিয়াছে।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ

('উদ্বোধন', ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩০৭)

'উদ্বোধন' ১০৩ এবং স্বামী বিবেকানন্দ

'উদ্বোধন'-এর ১০৩তম বর্ষে পদার্পণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের ১৩৯তম আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষ্যে নিবেদিত বিশেষ সম্পাদকীয়।

দেখিতে দেখিতে 'উদ্বোধন' ১০৩তম বর্ষে পদার্পণ করিল। 'উদ্বোধন' তাহার এই পথচলায় যেন সূর্যের পরিক্রমাকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। সূর্য সেই কবে, কত সহস্র কোটি বছর আগে তাহার পরিক্রমা শুরু করিয়াছিল, কিন্তু আজও তাহার চলায় কোন ক্ষান্তি নাই। একদিনের জন্যও সে চলিতে চলিতে থামে নাই। সূর্যের এই নিরবচ্ছিন্ন পথচলার দৃষ্টান্ত হইতেই 'উদ্বোধন' যেন অনুপ্রাণিত হইয়াছে। সেও তাহার জন্মলগ্ন হইতে যে-যাত্রা শুরু করিয়াছিল আজ পর্যন্ত একদিনের জন্যও তাহাতে কোন ছেদ পড়ে নাই। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র ও সাময়িক-পত্রের ইতিহাসে এমন নজির আর একটিও নাই।



'উদ্বোধন'-এর এই অনন্য নজিরের মূলে রহিয়াছে তাহার উপর তাহার মহান প্রবর্তক স্বামী বিবেকানন্দের প্রেরণার অগ্নি এবং আশীর্বাদের শক্তি। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন এক নিরন্তর পরিব্রাজক। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আক্ষরিকভাবেই তিনি পথ হাঁটিয়াছেন। তিনি থামিতে জানিতেন না। চলাই ছিল তাঁহার জীবনের মন্ত্র। গতিই ছিল তাঁহার জীবনের বাণী। আলস্যকে তিনি ঘৃণা করিতেন। ক্লান্তিকে তিনি অস্বীকার করেন নাই। কারণ, ক্লান্তি তো শরীর ও মনের ধর্ম। কিন্তু ক্লান্তিকে তিনি পৌরুষের সঙ্গে উপেক্ষা করিতেন। সেজন্য ক্ষান্তিকে তিনি মানিতেন না। কাজ—কাজ, মরণের মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ—ইহাই ছিল তাঁহার বাণী। শিষ্য, গুরুভাই, অনুরাগী, দেশবাসী—সকলের কাছেই তাঁহার বাণী ছিল—"Onward! Onward!"—"অগ্রসর হও, অগ্রসর হও। সম্মুখে—সম্মুখে!" তাঁহার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে তিনি এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছিলেন। 'কথামৃত'-এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে কাঠুরিয়াকে ব্রহ্মচারীর "এগিয়ে পড়" উপদেশ এবং সেই উপদেশের ফলশ্রুতিতে কাঠুরিয়ার প্রচুর সম্পদের অধিকারী হওয়ার উপাখ্যান আমরা সকলেই পড়িয়াছি। 'উদ্বোধন'-এর ধমনীতে, স্নায়ুতন্ত্রীতে এবং রক্তকণিকায় স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ উপদেশকে অগ্নিতরঙ্গরূপে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারই ফলে 'উদ্বোধন' তাহার নিরন্তর পথযাত্রায় একনিষ্ঠ রহিয়াছে এবং চিরকাল থাকিবে।

বস্তুত, নিরন্তর গতির আদর্শই ভারতবর্ষের চিরায়ত আদর্শ। সেই আদর্শ যুগ যুগ ধরিয়া ভারতবর্ষকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে। কে জানে কত হাজার বছর আগে বৈদিক ঋষির সেই অমৃতবাণী ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭।৩।১৫) উচ্চারিত হইয়াছিল! ঋষি সেখানে বলিয়াছেন ঃ

"চরণ্ বৈ মধু বিন্দতি
চরণ্ স্বাদুমুদুম্বরম্।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং
যৌন তন্দ্রায়তে চরণ্।
চরৈবেতি, চরৈবেতি।"

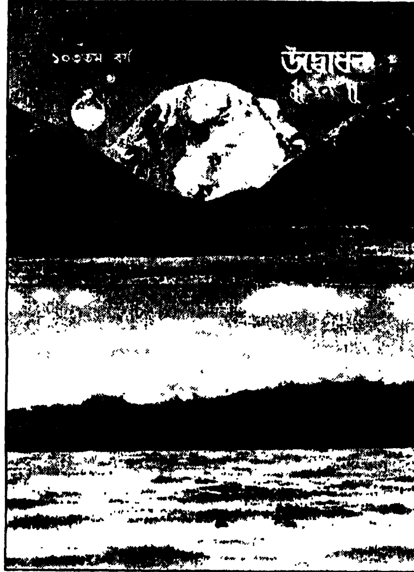
—চলার মধ্যেই রহিয়াছে অমৃতত্ব। চলাই হইল অমৃতের স্বাদু ফল। ঐ দেখ, সূর্যের আলোক সম্পদ, যে-সূর্য চলিতে চলিতে কখনো একদিনের জন্যও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয় নাই। অতএব চল, চল।

ভারতবর্ষের উপর দিয়া কত বিপর্যয়ের তরঙ্গ বহিয়া গিয়াছে। কত আগ্রাসন, আক্রমণ ও সঙ্কটের মধ্য দিয়া তাহাকে পথ চলিতে হইয়াছে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ তাহার ঐতিহ্য এবং আদর্শ-চেতনার মূল প্রবাহ হইতে কখনোই বিচ্যুত হয় নাই। কখনো কখনো মনে হইয়াছে, আমরা বুঝি এক মহা সর্বনাশের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি; যেভাবে চলিতেছি তাহাতে হয়তো একসময় আমরা আমাদের ধ্রুবপথ হইতে দূরে ছিটকাইয়া যাইব। কিন্তু তাহা কখনোই হয় নাই। যুগে যুগে আচার্যরা আসিয়াছেন, আধিকারিক পুরুষরা



আসিয়াছেন, সন্তপুরুষ ও মহীয়সী সাধিকারা আসিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের পথের দিশা দেখাইয়া দিয়াছেন। ভারতবর্ষ আবার চলিতে শুরু করিয়াছে তাহার মূল ঐতিহ্যকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াই। স্বামীজী দেশ ও জাতিকে সেকথা শোনাইবার জন্যই 'উদ্বোধন'-এর প্রবর্তন করিয়াছিলেন। বিগত ১০২ বছর ধরিয়া 'উদ্বোধন' তাহার মহান প্রবর্তকের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারেই পথ হাঁটিয়াছে। সে যে সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইয়াছে, এই দাবি আমরা করিতেছি না। কিন্তু তাহার যাত্রাকে ফলপ্রসূ করিতে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে—একথা অবশ্যই আমরা জোরের সঙ্গে বলিতে পারি। এই চেষ্টার মধ্যেই রহিয়াছে 'উদ্বোধন'-এর ১০২ বছর ব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন বলিষ্ঠ অস্তিত্বের সার্থকতা।

'উদ্বোধন' তাহার জন্মলগ্ন হইতেই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মুখপত্র। এই পরিচয়-লিপি স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ 'উদ্বোধন'-এর ললাটে তাহার জন্মমুহূর্তেই আঁকিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের কথা, তাহার আরাধ্য দেবতার কথা, তাঁহার জীবন ও বাণী প্রচার করিবার জন্য 'উদ্বোধন' আনুষ্ঠানিকভাবেই দায়-বদ্ধ। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মুখপত্ররূপে 'উদ্বোধন'-এর কাছে সঙ্ঘের ভক্ত, আশ্রিত এবং অনুরাগীদের ইহা স্বাভাবিক প্রত্যাশা। কিন্তু 'উদ্বোধন'কে তেমন মুখপত্ররূপে পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্য, ইচ্ছা অথবা আকাঙ্ক্ষা কোনটিই স্বামী বিবেকানন্দের ছিল না। তিনি কখনোই সঙ্ঘের মুখপত্রকে সঙ্ঘ-দেবতার ব্যক্তিরূপকে—ব্যক্তি-সত্তাকে প্রচার করিবার মাধ্যম করিতে চাহেন নাই। ব্যক্তি-শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্যই তাঁহার জীবনসর্বস্ব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চিন্তা ও চেতনায় ব্যক্তি-শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা ভাব-শ্রীরামকৃষ্ণের স্থান ছিল অনেক উচ্চে। একথা সত্য, ভাব একটি নৈর্ব্যক্তিক (impersonal) বিষয় এবং উহা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠা সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের নেতিবাচকতা হইতে মানুষকে রক্ষা করে। কি ধর্মীয় ক্ষেত্রে, কি সামাজিক ক্ষেত্রে, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে—সর্বত্রই ব্যক্তিপূজার মোহ মানুষকে গ্রাস করিয়া রাখে এবং মানুষের স্থিরবুদ্ধিকে বিনষ্ট করে। নেতা বা নেত্রীরা যেসব ভাব ও আদর্শের কথা বলিয়া মানুষকে অনুপ্রাণিত করেন, যেসব ভাব ও আদর্শের কথা তাঁহারা প্রচার করেন, সেগুলি অনিবার্যভাবেই তাঁহাদের অনুরাগী ও অনুগামীদের দৃষ্টির আড়ালে চলিয়া যায়। তাহাদের কাছে নেতা ও নেত্রীদের ব্যক্তিরূপ বা ব্যক্তিসত্তাই প্রধান হইয়া দাঁড়ায়। যেকোন মহান ভাব ও আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে ইহা এক বিপজ্জনক প্রতিবন্ধক। আবার একথাও সঙ্গে সঙ্গে সত্য যে, ভাব বা আদর্শ শূন্যে গঠিত হয় না। উহার একটি আশ্রয় প্রয়োজন এবং সেই আশ্রয়কে অবশ্যই মানবিক আধারে প্রকটিত হইতে হয়। ভাব ও আদর্শের সঙ্গে ব্যক্তিরূপ ও ব্যক্তি-সত্তার এই সম্পর্কের বিষয়টি অপরিহার্য। সেজন্য পৃথিবীর মহত্তম আচার্য এবং সন্ত-পুরুষেরা তাঁহাদের অনুরাগী এবং অনুগামীদের এবিষয়ে সতর্ক করিয়া দেন এবং তাঁহাদের ব্যক্তিরূপকে ছাড়িয়া ভাবরূপকে আশ্রয় করিতে পরামর্শ দান করেন। কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীস্ট, চৈতন্য, রামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীতে উহার দৃষ্টান্ত আমরা পাইয়া থাকি।



স্বামী বিবেকানন্দ এসম্পর্কে বারবার তাঁহার গুরুভাই এবং শিষ্য ও অনুগামীদের সচেতন ও সতর্ক করিয়াছেন। আমেরিকা হইতে শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমলকে ১২ জানুয়ারি ১৮৯৫ তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ "Know once and for all that I do not care for name or fame, or any humbug of that type. I want to preach my ideas for the good of the world. You have done a great work; but so far as it goes, it has only given *me* name and fame. My life is more precious than spending it in getting the admiration of the world. I have no time for such foolery. What work have you done in the way of advancing the ideas and organizing in India? *None, none, none!*... My name should not be made prominent; it is my ideas that I want to see realized. The disciples of all the prophets have always inextricably mixed up the ideas of the Master with the *person*, and at last killed the ideas for the *person*. The disciples of Sri Ramakrishna must guard against doing the same thing. Work for the *idea*, not the person." (তোমরা চিরদিনের জন্য জানিয়া রাখ যে, আমি নাম-যশ বা



ঐরূপ বাজে জিনিস একদম গ্রাহ্য করি না। আমি জগতের কল্যাণের জন্য আমার ভাবগুলি প্রচার করিতে চাই। তোমরা খুব বড় বড় কাজ করিয়াছ বটে, কিন্তু কাজ যতদূর হইয়াছে, তাহাতে শুধু *আমার* নাম-যশই হইয়াছে। কেবল জগতের বাহবা লইবার জনাই জীবন ব্যয় করা অপেক্ষা আমার জীবন আরো বেশি মূল্যবান। ঐসব আহাম্মকির জন্য আমার মোটেই সময় নাই। তোমরা ভারতবর্ষে [আমার] ভাবগুলির প্রচার এবং সংগঠিত রূপদানের জন্য কোন কাজ করিয়াছ কি? *একেবারেই না, একেবারেই না, একেবারেই না!...* আমার নামকে বড় করিতে হইবে না। আমি দেখিতে চাই যে, আমার ভাবগুলি কাজে পরিণত হইয়াছে। সকল মহাপুরুষের শিষ্যরা চিরকাল গুরুর উপদেশগুলির সঙ্গে *গুরুকে* অচ্ছেদ্যভাবে জড়াইয়া ফেলে এবং অবশেষে *ব্যক্তির* জন্য ভাবগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলে। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণকে এইরূপ করার বিষয়ে সাবধান থাকিতে হইবে। *ভাবের* জন্য কাজ কর, ব্যক্তির জন্য নয়।)

এখানে লক্ষণীয় যে, স্বামীজী এই চিঠিটি লিখিয়াছিলেন তাঁহার জন্মদিনে—১২ জানুয়ারি। তাঁহার আবির্ভাব-দিবসেই তিনি যেন তাঁহার নিজের ব্যক্তিরূপকে নিজেই ধ্বংস করিয়া তাঁহার ভাবরূপকে আশ্রয় করিবার জন্য তাঁহার শিষ্যদের কাছে প্রতীকী নির্দেশ রাখিলেন। মাস দুয়েক পর আলাসিঙ্গাকে ৬ মার্চ ১৮৯৫ স্বামীজী আবার লিখিলেন ঃ "You need not insist upon preaching Sri Ramakrishna. Propagate His ideas first, though I know the world always wants the Man first, then the idea." (রামকৃষ্ণের নাম প্রচার করিবার জন্য জোর করিও না। আগে তাঁহার ভাব প্রচার কর—যদিও আমি জানি, জগৎ চিরকালই আগে মানুষটিকে মানে, তাহার পর তাহার ভাবটি লয়।)

শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তিরূপকে নয়, তাঁহার ব্যক্তিরূপের ভিতরে যে অসাধারণ ভাবরূপ মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল, যে অসাধারণ ও সুমহান ভাবরাশি তিনি প্রচার করিয়াছিলেন—তাহাকেই 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের সামনে উপস্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘকে শ্রীরামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত করিলেও উহাকে কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংগঠনে পরিণত করিবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। তিনি চাহিয়াছিলেন, যে সুমহান অসাম্প্রদায়িক ভাব ও আদর্শের সাকার বিগ্রহ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ হইবে সেই ভাব ও আদর্শের বস্তুরূপ। সঙ্ঘের একটি বস্তুগত আকার থাকিবে অবশ্যই, কিন্তু উহা আসলে হইবে তাহার ভাবরূপেরই আকার।

বিগত ১০২ বছর ধরিয়া 'উদ্বোধন' তাহার মহান প্রবর্তকের নির্দিষ্ট ধারাপ্রবাহেই অগ্রসর হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণীতে যে ভাব ও আদর্শ মূর্ত হইয়াছিল তাহা হইল ত্যাগ, সমন্বয়, শান্তি এবং প্রত্যক্ষ অনুভূতি। আধ্যাত্মিকতার প্রাণরসে এই ভাব ও আদর্শ ছিল সর্বতোভাবে সঞ্জীবিত। জীবন ও কর্মের সকল অঙ্গেই সেই আধ্যাত্মিকতার রসসিক্ত ত্যাগ, সমন্বয়, শান্তি ও অনুভূতিকে ফলিত রূপদান করিয়াছিলেন তিনি। বস্তুত, এই আদর্শই ভারতের অনন্য সম্পদ বেদান্তের আদর্শ। স্বামীজী উহাকেই শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে জীবন্তরূপে জাগ্রত দেখিয়াছিলেন। সেজন্য 'উদ্বোধন' একটি ধর্মীয় সঙ্ঘের মুখপত্র হইয়াও শুধু ধর্ম ও দর্শনকেই তাহার উপজীব্য করে নাই; সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, শিল্প, জাতীয়তা—এমনকি ক্রীড়া, সব-কিছুকেই সে তাহার আলোচনার বৃত্তে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে। ধর্ম ও জীবন—আধ্যাত্মিকতা ও ঐহিকতা, উভয়ের মিলন এবং সমন্বয়ের আদর্শকে স্বামী বিবেকানন্দ 'ব্যবহারিক বেদান্ত' বা 'প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত' বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছিলেন। 'উদ্বোধন' বিগত ১০২ বছর ধরিয়া সাধ্যমতো তাহার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বেদান্তকেই কার্যকরী করিতে প্রয়াস করিয়াছে।

বেদান্তের মূলবাণী—আধ্যাত্মিক রূপান্তর, মানুষের মধ্য হইতে দেবতার বিবর্তন। ভারতীয় দর্শন বিবর্তনের যে মীমাংসা করিয়াছে তাহাই বিবর্তনের তত্ত্ব সম্বন্ধে শেষকথা। ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদের 'অস্তিত্বের সংগ্রাম' ('struggle for existence'), 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন' ('survival of the fittest') ইত্যাদি নিয়ম ভারতীয় দর্শন সমর্থন করে না। এসমস্ত নিয়ম মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে সত্য হইতে পারে, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে উহা কখনো সত্য হইতে পারে না। এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জীববিজ্ঞানী জুলিয়ান হাক্সলীও এই কথা বলিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন ঃ "হাজার জীবনকে ধ্বংস করে যদি একটা জীবের ক্রমোন্নতি হয়—যা পাশ্চাত্য দর্শন সমর্থন করে, তাহলে বলতে হয়, এই 'evolution' (ক্রমবিকাশ) দ্বারা সংসারের বিশেষ কোন উন্নতিই হচ্ছে না।... আমাদের দেশীয় দার্শনিকগণের অভিপ্রায়—জীব মাত্রই পূর্ণ আত্মা। আত্মার বিকাশের তারতম্যেই বিচিত্রভাবে প্রকৃতির অভিব্যক্তি ও বিকাশ। প্রকৃতির অভিব্যক্তি ও বিকাশের প্রতিবন্ধকগুলি সর্বতোভাবে সরে দাঁড়ালে পূর্ণভাবে [জীবের] আত্মপ্রকাশ।... মানুষের 'struggle' (সংগ্রাম) হচ্ছে মনে। মনকে যে যত 'control' (আয়ত্ত) করতে পেরেছে, সে তত বড় হয়েছে। মনের সম্পূর্ণ বৃত্তিহীনতায় আত্মার [পূর্ণ] বিকাশ হয়।... 'Human plane of existence' (মানবজীবন)-এ মনের ওপর আধিপত্যলাভের জন্য বা সত্ত্ব (গুণ) বৃত্তিসম্পন্ন হওয়ার জন্য সেই 'struggle' চলেছে।" (বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ১২০-১২২)

মনের উপর চূড়ান্ত প্রভুত্বস্থাপনের মাধ্যমে মানুষ দেবতা হইয়া যায়—ঈশ্বর হইয়া যায়। উহাই মানুষের জীবনের পরম সার্থকতা। সেই সার্থকতার ভূমিতে উপনীত হইবার জন্য 'উদ্বোধন'-এর বিশ্রুতকীর্তি প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ সকলকে আহ্বান জানাইয়াছিলেন। ❑

স্বামীজীর কথা

স্বামী অভেদানন্দ

য়ার কাছে বরাবর পাহাড়ে হঠযোগীর কাছে যাই। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একদিন কাশীপুরের বাগানে সন্ন্যাসি-বেশে অর্থাৎ মুণ্ডিতমস্তকে ও কমণ্ডলুহস্তে এসে আমাদের বলেন যে, গয়াধামের কাছে বরাবর পাহাড়ের একটি গুহায় একজন সিদ্ধ হঠযোগীকে দেখে এলাম। শুনে তখনি আমার একান্ত ইচ্ছা হলো সেই হঠযোগীকে দেখবার। সুতরাং গেলাম বরাবর পাহাড়ে।

সকলকে জিজ্ঞাসা করতে করতে খালিপায়ে জঙ্গলাকীর্ণ রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলাম বরাবর পাহাড়ের দিকে। অবশেষে হাজির হলাম একটি ছোট্ট গ্রামে। গ্রামটি ছিল পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। ঐ গ্রামের শিবমন্দিরে একটি



ধর্মশালা ছিল। আমি হঠযোগী সাধুর কাছ থেকে ফেরার সময়ে ঐ ধর্মশালায় রাত্রিযাপন করলাম।

সৌভাগ্যের বিষয় যে, সেখানে তখন একজন 'পুরী' নামা দশনামী সন্ন্যাসী আমার মতো রাত্রিযাপন করার জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন। দুজনে একসঙ্গে থাকায় রাত্রে তাঁর সঙ্গে বেশ পরিচয় হলো। পরিচয়ে জানলাম তাঁর কাছে সন্ন্যাসপদ্ধতি ও বিরজাহোমের একটি পুঁথি ছিল। আমি তাঁকে অনুরোধ করলাম তাঁর পুঁথি থেকে সন্ন্যাসের পদ্ধতি ও বিরজাহোমের মন্ত্র লিখে নেব। তিনি সম্মত হলেন। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে পুঁথিটি সংগ্রহ করে আমার কাছে যে-খাতা ছিল তাতে সেই পুঁথি থেকে বিরজাহোমের মন্ত্রগুলি, প্রেষমন্ত্র, মঠ, মড়ি, যোগপট্ট যাবতীয় বিষয় লিখে নিলাম। তারপর ভোর হলে 'পুরী' নামা সাধুকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলাম। এসমস্তই শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা ও আশীর্বাদ। ঐ বিরজাহোমের খাতার মন্ত্র ও নির্দেশগুলিই বরানগর মঠে যখন সন্ন্যাসের অনুষ্ঠান হয় তখন কাজে লাগে। বরানগর মঠে সন্ন্যাস অনুষ্ঠানের সময়ে আমিই তন্ত্রধারকের কাজ করেছিলাম স্বামীজীর আদেশে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের এগারজনকে সন্ন্যাস বহুপূর্বেই দিয়েছিলেন। মুরুব্বি গোপাল-দাদা (স্বামী অদ্বৈতানন্দ) স্বেচ্ছায় গঙ্গাসাগরযাত্রী সাধুদের গেরুয়াবস্ত্র দান করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। অন্তর্যামী শ্রীশ্রীঠাকুর তা জানতে পেরে গোপাল-দাদাকে ডেকে বলেন : "গেরুয়া কাপড় কিসের জন্য করা হচ্ছে?" গোপাল-দাদা বললেন : "জগন্নাথঘাটে গঙ্গাসাগরমেলায় যাওয়ার জন্য যে সাধুরা এসেছেন তাঁদের দেব স্থির করেছি।" শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন : "তুই আমার সন্তানদের দে, এরা এক-একজন হাজারী সাধু, এদের দিলে তোর হাজারগুণ ফল হবে।" গোপাল-দাদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় সম্মত হয়েছিলেন।



তখন এগারটি রুদ্রাক্ষের মালা ও এগারখানি গেরুয়া কাপড় ঠাকুরের এগারজন সন্তানকে তিনি দান করেন। রুদ্রাক্ষের মালা ও গেরুয়া কাপড় পেয়ে আমরা তখনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করে এসে গৈরিকবস্ত্র ও মালা পরলাম। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের আশীর্বাদ করলেন।

স্বামীজী আমায় কী ভালই না বাসতেন! স্বামীজীর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও তাঁর পাশ্চাত্যে সাফল্যময় কর্মপদ্ধতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যই তো আমার 'বিবেকানন্দ অ্যান্ড হিজ ওয়ার্ক' বইটি লেখা। স্বামীজী যে কত বড় ছিলেন, কত মহান ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল যে কী নিবিড় ও কত মধুর---তা আর অপরে কি করে বুঝবে! শুধু বাইরের আড়ম্বরই সবকিছু নয়, প্রাণে প্রাণে সম্বন্ধটাই আসল।

স্বামীজীকে আমি অন্তর দিয়ে যেমনটি দেখেছি ও বুঝেছি, তেমনটি গ্রন্থে প্রকাশ করেছি। শ্রীশ্রীঠাকুর

আমাদের সকলের ভার স্বামীজীকে দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন : "নরেন, এদের তুই দেখবি।" তাই স্বামীজী ছিলেন আমাদের কেন্দ্রাধিপতি।

তিনি [স্বামীজী] আমায় ডেকে পাঠালেন লন্ডনে। শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) তার পূর্বেই উপস্থিত হয়েছিলেন লন্ডনে। আমি লন্ডনে পৌঁছালে ব্লুমসবেরী স্কোয়ারে খ্রীস্ট-থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির হল-এ স্বামীজী একদিন আমার লেকচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। আসলে ঠিক ছিল স্বামীজী নিজেই বক্তৃতা দেবেন, কিন্তু তাঁর মনে মনে সঙ্কল্প ছিল অন্যরকম। ২৭ অক্টোবর ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দ। সেদিন আগে থেকে ডেকে আমায় বললেন : "তোমাকে সোসাইটি হল-এ আজ বক্তৃতা দিতে হবে।" আমি তো শুনে অবাক। সোজাসুজি বক্তৃতা দিতে অস্বীকার করেই বসলাম। বললাম : "জান তো, পাবলিকের সামনে বক্তৃতা আমি কোনদিনই করিনি।" স্বামীজী বললেন : "তা আমি জানি, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরকে স্মরণ করে তৈরি হও।" তবুও আমি ঘোর আপত্তি জানালাম। কিন্তু তখন আর আমার আপত্তি শোনে কে? তিনি আমার কোন কথায়ই কান দিলেন না। আমি তখন যে কী বিপদে পড়েছিলাম তা এক শ্রীশ্রীঠাকুরই জানেন! আমার অসহায় অবস্থা দেখে স্বামীজী বললেন : "যাঁর নাম সম্বল করে আমরা ঘরবাড়ি ছেড়েছি, তাঁকে স্মরণ করে যা মনে আসবে তাই দু-চার কথা বলবে। চিন্তার কি কারণ আছে?" আমি বললাম : "সে তো তোমার কাছে অতি সহজ কথা। আমি কিন্তু তা পারব না।" স্বামীজী কিন্তু শোনবার পাত্র ছিলেন না। তিনি দৃঢ়ভাবে অথচ স্নেহপূর্ণ হাস্যে বললেন : "তা হয় না। আমি তোমার নাম অ্যানাউন্স [ঘোষণা] করে দেব, এখন থেকে তৈরি হও।" এই বলে তিনি চলে গেলেন।

পাশ্চাত্যদেশে আমায় বক্তৃতা দিতে হবে তা আমি জানতাম, কিন্তু এত শীঘ্র যে সম্মুখসমরে দাঁড়াতে হবে, তার জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। তাই অনবরত একদিকে চিন্তা করতে লাগলাম স্বামীজীর অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানার কথা, আর অন্যদিকে করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা। গত্যন্তর কিছু না দেখে অবশেষে মোটামুটি একটা সাবজেক্ট ঠিক করে রাখাই শ্রেয় মনে করলাম। জানতাম যে, স্বামীজী যখন বলেছেন, তখন তাঁর কথার নড়চড় কখনই হবে না। অগত্যা বৈকালে হাজির হলাম খ্রীস্ট-থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির হল-এ। তখনো পর্যন্ত লোকে জানত যে, স্বামীজীই বক্তৃতা দেবেন। বহু বিশিষ্ট শ্রোতাদের সমাগম হয়েছিল। বক্তৃতার নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্বে স্বামীজী তাঁর সঙ্কল্প কাজে পরিণত করলেন। তিনি উঠে শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে বললেন : "মাননীয় শ্রোতৃবৃন্দ; আমার প্রিয় ও সুপণ্ডিত গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ সবে মাত্র এসেছেন ভারতবর্ষ থেকে আপনাদের জন্য শুভেচ্ছা নিয়ে, তিনিই আজ আপনাদের বেদান্ত সম্বন্ধে কিছু বলবেন।" শোনামাত্র আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ যেন সমগ্র শরীরে আলোড়ন সৃষ্টি করল। স্বামীজীর অ্যানাউন্সমেন্ট [ঘোষণা] শুনে শ্রোতৃবর্গ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ঘন ঘন করতালি দিতে লাগলেন। অগত্যা উঠে দাঁড়ালাম ডায়াসে। শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্যোতির্ময় ও কল্যাণময় প্রসন্নমূর্তি যেন অকস্মাৎ আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ঠিক করেছিলাম 'পঞ্চদশী' ('পঞ্চদশী'র দার্শনিক মতবাদ) সম্বন্ধে কিছু বলব। শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীকে স্মরণ করে 'পঞ্চদশী' গ্রন্থের দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে অনর্গল বলে যেতে লাগলাম, নিজে বুঝতে পারছিলাম না যে, কি আমি বলছি। তবে মনে হচ্ছিল, শ্রীশ্রীঠাকুরই যেন আমার মুখ দিয়ে বলে যাচ্ছিলেন অনর্গল অবিশ্রান্তভাবে। করুণাময় শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রেজেন্স [উপস্থিতি] তখন প্রত্যক্ষভাবে আমি অনুভব করেছিলাম। সমগ্র হলটা তখন নিঃস্তব্ধতায় ভরে উঠেছিল।

ঘণ্টাখানেক বলার পর যখন আমি বক্তৃতা শেষ করলাম, তখন হল-এর একদিক থেকে অন্যদিক পর্যন্ত শ্রোতাদের মুহুর্মুহু করতালি-ধ্বনি যেন উত্তাল সমুদ্রের এক তরঙ্গ সৃষ্টি করেছিল। স্বামীজীকেও বিপুল আনন্দে করতালি দিতে দেখেছিলাম। তিনি এগিয়ে এসে সস্নেহে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। গোড়ার দিকে একবার স্বামীজীকে হঠাৎ ঘাড় নাড়তে দেখে ভেবেছিলাম বুঝি বক্তৃতায় আমার কোন ত্রুটি হচ্ছে, কিন্তু পরে বুঝলাম তা নয়। তিনি ওভাবে আমার বক্তৃতা উপভোগ করেছিলেন। সমবেত শ্রোতারা আমার বক্তৃতা ভালভাবে অ্যাপ্রিসিয়েট [সমাদর] করেছিলেন।

তখন মনে হলো শ্রীশ্রীঠাকুরের অনন্ত কৃপা ও অফুরন্ত করুণার কথা! প্রত্যক্ষ করলাম স্বামীজীর অহেতুক একান্ত ভালবাসার নিদর্শন! সত্যই দেখেছিলাম সেদিন গুরু-ভাইয়ের কৃতকার্যতায় গুরুভাইয়ের কী গৌরব, ভালবাসা ও আত্মগরিমার ভাব!

স্বামীজীকে যেমন ভালবাসতাম ও শ্রদ্ধা করতাম, তেমনি যুক্তির দিক থেকে আবার তাঁর সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করতেও ছাড়তাম না। মতের অমিলও হতো কোন কোন সময়ে কোন কোন বিষয় নিয়ে, কিন্তু সেই অমিলের পিছনে থাকত না আত্মগরিমা ও প্রশংসালাভের বিন্দুমাত্র প্রবৃত্তি, থাকত ভালবাসার ও শ্রদ্ধাবনতির ভাব। ❑

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ প্রকাশিত স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের 'মন ও মানুষ' গ্রন্থের ১ম ভাগের ২য় সংস্করণ (১৯৮১, পৃঃ ১৬৩-১৭৪) থেকে সঙ্কলিত। ◆ সঙ্কলন : নারায়ণচন্দ্র গুহরায় ◆

স্বামীজী প্রসঙ্গ

শ্রীম



ইংরেজকে দেখলে আমরা ভয়ে কাঁপতাম, স্বামীজী সে-ভয় দূর করলেন। সেই ইংরেজ এসে আবার তাঁর পায়ে জুতো বেঁধে দিল। গঙ্গায় নাইতে গেছেন, ওরা এসে তাঁর গা গামছা দিয়ে রগড়ে দিচ্ছে। আবার ইংরেজ মহিলা তামাক সেজে দিতেন।

আমেরিকার থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্কে কেউ কেউ তাঁকে দর্শন করতে গিয়েছিল। তারা বলেছিল ঃ "We have come to you with the same regards with which we would have gone to Christ if he would be living today." (ক্রাইস্ট আজ জীবিত থাকলে তাঁর কাছে যে-শ্রদ্ধা নিয়ে যেতাম, সেই শ্রদ্ধা নিয়েই আপনার কাছে এসেছি।) অর্থাৎ আপনিই আমাদের ক্রাইস্ট —"You are the Christ to us!" তিনি আর তখন কোন আপত্তি করতে পারলেন না। কী গভীর শ্রদ্ধা!...

একসময়ে ভারতের লোক মনে করত, ইংরেজদের সবই ভাল। "What Shakespeare says"—শেক্সপীয়র কি বলছেন? মিল, জেমস—এঁদের সব দোহাই পাড়ত। স্বামীজী সেটা ভেঙে দিয়েছেন। জেমসই বুঝি বলেছিলেন শেষে—life-এর problem solved (জীবনের সমস্যা সমাধান) করেছে একমাত্র বেদান্ত, আর কেউ নয়। আহা, কী শক্তিশালী ভাষা স্বামীজীর! প্রাণসঞ্চার করে দেয় মৃতশরীরে। কারলাইলের ভাষাও তার কাছে দাঁড়ায় না। ভারতের দৃষ্টিশক্তিকে নিজের অতুল আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের দিকে আকৃষ্ট করে গেছেন স্বামীজী—এই তাঁর অবদান। (৩য় ভাগ, পৃঃ ২০০-২০১)

ঠাকুর এই একটা class-এর (শ্রেণীর) সৃষ্টি করেছেন — যেমন স্বামীজী। কিছুরই বশ নয়। সারাটা জগৎ পায়ে পড়ল, কিন্তু কিছুই চাই না নিজের জন্য! আমেরিকা থেকে দিগ্বিজয় করে এলেন—শুধু কৌপীন পরে আছেন—কী ত্যাগ! কাপড় ভক্তদের কাছে চেয়ে পাঠাতেন, আর নৌকাভাড়া—কলকাতায় এলে। হাতে একটি কপর্দকও নেই! এই একটি থাক আলাদা। (১ম ভাগ, পৃঃ ১৯৪-১৯৫)

শুধু শাস্ত্রে কি হবে? ওতে তো আর ভগবান নেই! প্রথম প্রথম একটু দেখে নিতে হয়, তারপর সাধন। সাধনশিক্ষা দিতে অবতার আসেন। আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে শাস্ত্রের ভাব সাধন কর—এসে এই কথা বলেন। আর যারা লোকশিক্ষা দেবে তাদের বিভিন্ন শাস্ত্র জানা দরকার। বিবেকানন্দ ওদেশে (পাশ্চাত্যে) শুধু quote (উল্লেখ) করতেন authority (মহাজন-বাক্য)—কান্ট এই বলেছেন, হেগেল এই বলেছেন। তা নইলে লোক কথা নেয় না যে! (২য় ভাগ, পৃঃ ৪২)

সংসার-ত্যাগ বড় কঠিন। সংসার-ত্যাগ মানে ঈশ্বরকে গ্রহণ। ঘরে থেকেও তা হতে পারে। কেউ কেউ বাইরেও ত্যাগ করেন। কিন্তু বড় কঠিন। তাঁর কৃপা ছাড়া হয় না। ঘরে থেকে খুবই কঠিন। ঠাকুর নরেন্দ্রের বুকে হাত দিলেন, অমনি সমাধি। সে-অবস্থায় বলেছেন ঃ "ও ঠাকুর, করলে কি? আমার যে বাপ মা রয়েছে!" রাখাল [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] বলতেন ঃ "আমার পরিবারের কি হবে?" এঁরা হলেন best (উত্তম) অধিকারী। এঁদেরই এই অবস্থা, অন্যের কথা কি! শরীরধারণ করলে এসব হয়। জ্ঞান থাকলে অজ্ঞানও থাকবে। ঠাকুর বলতেন ঃ "বিদ্যার চাইতে অবিদ্যার জোর বেশি। অবিদ্যার কাছে গুরুও হেরে যায়।" এমন কাণ্ড! (ঐ, পৃঃ ১৭৭)

ঠাকুরের মতো স্বামীজীরও সারা জীবন গেছে কষ্টে। আজকাল কলেজের ছেলেরা বলে, আমরা স্বামীজীর কথানুসারে চলছি। অনুসরণ করতে যায় তাঁকে। কিন্তু তাঁকে যদি নাও, তবে in toto (সম্পূর্ণরূপেই) নাও। তিনি কি পরিশ্রমটাই করেছেন! কত তপস্যা! না খেয়েই হয়তো তিনদিন কাটিয়ে দিচ্ছেন। এই পরিশ্রম করে করে অকালে শরীরটা গেল। তাঁর এদিকটা নেবে না—দেখতেও চায় না। সুবিধামত একটু নেবে। তাহলে কি করে হয়?

ঠাকুর কি—না স্বামীজীর ideal (আদর্শ)—সকলেরই ideal। তাই তো স্বামীজী অত করে শরীরটা দিলেন।... স্বামীজীর তপস্যা কত—এদিকে দেখবে না। কত কষ্ট করে ঠাকুর স্বামীজীকে শিখিয়েছেন। তবে নিজেও সব করেছেন। (১৬শ ভাগ, পৃঃ ৬৩-৬৪)

[ঠাকুর বলতেন ঃ] "নরেন্দ্র সহস্রদল পদ্ম। বৃহৎ জলাশয়। রাঙাচক্ষু বড় রুই। নিরাকারের উপাসক। পুরুষসিংহ। জিতেন্দ্রিয়।" নরেন্দ্রকে ঠাকুর পঞ্চবটীতে বলেছিলেন ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে, সকালবেলা—"মানুষজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর-দর্শন। নির্জনে গোপনে তাঁর ধ্যান-চিন্তা করতে হয়; কেঁদে কেঁদে বলতে হয়—'ঈশ্বর আমায় দেখা দিয়ে কৃতার্থ কর।' ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার। এই উভয় রূপ দর্শন করে তাঁর আদেশলাভ করে লোকশিক্ষা দেওয়া যায়। একদিন কাশীপুরে ঠাকুর কাগজে লিখেছিলেন—"নরেন্দ্র শিক্ষে দিবে।" দক্ষিণেশ্বরে আরেকদিন বলেছিলেন ঃ "নরেন্দ্র নিত্যসিদ্ধের থাক। অখণ্ডের ঘর। হোমাপাখির জাত। সংসারে আবদ্ধ হবে না।" (৯ম ভাগ, পৃঃ ৯)

স্বামীজী কি কেবল কাজের কথাই বলেছেন? জ্ঞানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগের কথাও বলেছেন। সব কথাই বলেছেন। যার যা পেটে সয় সে তাই নেবে! যার কর্মযোগে রুচি, সে তাই নিক। ঠাকুরের এক কথা—কিসে ভগবানলাভ হয় তাই করা। গুরূপদিষ্ট কর্ম নিষ্কামভাবে করলে তাতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ চিত্তে তাঁর দর্শন হয়। ব্যাপকভাবে জ্ঞান, যোগ, ভক্তি, কর্ম—এসবই কর্ম। সবই নিষ্কামভাবে করতে হয়। গীতায় (১৮।৪৮) আছে—"সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি না ত্যজেৎ।" 'সহজং কর্ম' মানে প্রকৃতিগত কর্ম। যার প্রকৃতিতে যা আছে, সে তদনুসারে কর্ম করবে। আরেকটা আছে প্রত্যাদিষ্ট কর্ম। সেটি করে ঈশ্বরদর্শনের পর লোকশিক্ষার জন্য। যেমন, স্বামীজীর কর্ম। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ "আমি শুকদেবের মতো সমাধিস্থ হয়ে থাকতে চাই।" এটা তাঁর নিজস্ব প্রকৃতি। কিন্তু ঠাকুরের আদেশে করেছেন কর্ম, অন্য সব লোকশিক্ষার জন্য। (১০ম ভাগ, পৃঃ ১৪৮-১৪৯)

স্বামী বিবেকানন্দের তখন বাইশ-তেইশ বছর বয়স। তখনো সন্ন্যাস নেননি। ঠাকুর তাঁকে একদিন বেদান্ত শিখিয়েছিলেন। বললেন, দশটা সরাতে জল আছে। তাতে পড়েছে সূর্যের প্রতিবিম্ব। একে একে সবগুলি ভাঙ। সবগুলি ভেঙে গেলে কি রইল? কিছুই রইল না। প্রতিবিম্ব সূর্য দশটাই গেল—যেগুলি সরার জলে ছিল। কে বলবে কটা রইল? যে বলবে সেও যে চলে গেল—দশটা সরাই যখন ভেঙে গেল। জীব যে শিব হয়ে গেল। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন এই কথা ঃ "একটা সূর্য রইল।" ঠাকুর বললেন ঃ "না। যা রইল তা মুখে বলা যায় না।"

তাই বেদ বলেছেন ঃ "একমেবাদ্বিতীয়ম্"। এক দুই—আমরা যা বলি, সেই এক নয়। যে একের দুই নেই, সেই এক রইল। কিন্তু তা মুখে বলা যায় না। সবগুলি উপাধি যে ভেঙে গেল, এখন কি রইল তা কে বলবে? যে বলবে সে যে নেই। (১৬শ ভাগ, পৃঃ ১৪৭-১৪৮)

স্বামীজী সবে শিখেছেন এই গানটি—'কেমন করে পরের ঘরে ছিলে উমা বল মা তাই'। ঠাকুর জানতে পেরে বলেছিলেন ঃ "তুই নাকি আগমনী শিখেছিস, গা না।" স্বামীজী গাইছেন, আর ঠাকুর পোস্তার ওপর দাঁড়িয়ে সমাধিস্থ। ডানদিকে নহবত, বাঁদিকে গঙ্গা। মাকে বাৎসল্যভাবে দেখে এই সমাধি। দেবীপক্ষ—সন্ধ্যা হয় হয়। (২য় ভাগ, পৃঃ ২৫১)

স্বামীজী ঠাকুর ছাড়া কিছু জানতেন না। তাঁর লিখিত স্তবে বলেছেন ঃ "মর্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্মিনাশং/ তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো।" অর্থাৎ যে তাঁর শরণ নেবে, তাকে আর জন্মমরণরূপ চক্রে পতিত হতে হয় না। তার মৃত্যুভয় দূর হয়। (১ম, পৃঃ ৯) ❑

স্বামী নিত্যাত্মানন্দের 'শ্রীম-দর্শন'-এর ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৯ম, ১০ম ও ১৬শ ভাগের ১ম সংস্করণ থেকে সঙ্কলিত।

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার

সম্পাদনা ❑ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০১৩

বিঃ দ্রঃ এই বিভাগে ইতিপূর্বে প্রকাশিত এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে সঙ্কলিত ও সম্পাদিত রচনাগুলি পুনর্মুদ্রণ করতে চাইলে জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ এবং 'উদ্বোধন'-সম্পাদকের অনুমতি আবশ্যিক।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

ভ্রম-সংশোধন

গত পৌষ ১৪০৭ সংখ্যার ৮৩১ পৃষ্ঠায় ১নং পাদটীকার ৭ম পঙ্‌ক্তিতে **১৯২২**-এর পরিবর্তে **১৯১২** এবং ৮৫৪ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ৩০তম পঙ্‌ক্তিতে **একশ**-র পরিবর্তে **একশ দুই** হবে। ৮৫৫ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ৩৪তম পঙ্‌ক্তির শেষে **পার্থক্য নাই।**-র পরিবর্তে **পার্থক্য নাই।"**, ৩৬তম পঙ্‌ক্তিতে **'বহুরূপে সম্মুখে তোমার**-এর পরিবর্তে **"বহুরূপে সম্মুখে তোমার** এবং পরের পঙ্‌ক্তিতে **সেবিছে ঈশ্বর।' "**-এর পরিবর্তে **সেবিছে ঈশ্বর।"** হবে।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

গীতার শক্তি ও মনোহারিত্ব

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

এই আলোচনাটি প্রধানত দুর্গাপদ ঘোষ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরম পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজজীর ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিতব্য বর্তমান রচনাটি কলকাতার অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত মহারাজজীর 'Universal Message of the Bhagavad Gita' শীর্ষক ইংরেজী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের (১ম সংস্করণ, ২০০০) অন্তর্গত অসামান্য 'ভূমিকা'র বাঙলা অনুবাদ। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, মহারাজজীর প্রত্যেকটি ভাষণ, রচনা এবং আলোচনা অসাধারণ বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিঋদ্ধতায় সমৃদ্ধ এবং একাধারে বিশ্লেষণমূলক, ভক্তিরসাশ্রিত ও আধুনিক মানুষের প্রশ্ন ও সংশয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনিবার্যভাবে গ্রহণযোগ্য। ভারতের অতুলনীয় শাস্ত্রগ্রন্থ 'গীতা' সম্পর্কে পূজ্যপাদ মহারাজজীর বর্তমান আলোচনাটিও তাঁর নিজস্ব শৈলী ও ভঙ্গিতে সমুজ্জ্বল। পাঠকরা প্রতিক্ষণেই তার প্রমাণ পাবেন এবং প্রতিক্ষণেই মহারাজজীর অনবদ্য যুক্তি ও বিশ্লেষণে আলোকিত হবেন।

ভাষান্তর ঃ অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

কঠ উপনিষদের একটি শান্তিপাঠ দিয়ে আমরা প্রসঙ্গের সূচনা করব ঃ

"ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌভুনক্তু,
সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বি নাবধীতমস্তু,
মা বিদ্বিষাবহৈ।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

—ওঁ (পরমাত্মা) আমাদের উভয়কে (গুরু-শিষ্যকে) সমভাবে রক্ষা করুন। আমরা যেন সমভাবে বিদ্যাফল ভোগ করি। আমরা যেন সমভাবে সামর্থ্য অর্জন করতে পারি। অধীগত বিদ্যা যেন আমাদের সমভাবে আলোকিত ও তেজস্বী করে। আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি। ওঁ শান্তি, শান্তি, শান্তি।

প্রারম্ভিক মন্তব্য ঃ

ভারত কিন্তু এককালে গীতাকে ভুল বুঝেছিল

গীতার প্রথম তিনটি অধ্যায়ে যোগদর্শন তথা আধ্যাত্মিকতার মূল ভাবটি তুলে ধরা হয়েছে; যেটির উল্লেখ শ্রীকৃষ্ণ চতুর্থ অধ্যায়ের সূচনাতে করেছেন। বাকি চোদ্দটি অধ্যায়ে সেই দর্শনের পুষ্টিসাধন করা হয়েছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের আদি বাণীর সারটি প্রদত্ত হয়েছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে। গীতার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে এইটি উপলব্ধি করতে সাহায্য করা যে, সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে রয়েছে এক শাশ্বত আধ্যাত্মিক সত্য; সেইসঙ্গে বুঝতে সাহায্য করা সেইসব মানবীয় লক্ষ্যকে, যেগুলির কথা আমাদের সংবিধানে বলা হয়েছে কিংবা আধুনিক যুগের মানবতা যেগুলির সন্ধান করছে। এই কারণেই আজ গীতার বাণী সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। আর আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রে আধুনিক যুগে গীতাকে বুঝতে হবে এমন এক দৃষ্টিকোণ থেকে, যা আমাদের চিরাচরিত দৃষ্টিকোণ থেকে আলাদা। অতীতে বেশির ভাগ মানুষই গীতা পড়তেন পুণ্যের আকাঙ্ক্ষায় এবং একটু মানসিক শান্তির আশায়। আমরা কখনো বুঝিনি যে, গীতা হলো তীব্র বাস্তবমুখিনতার এক মহাগ্রন্থ; বুঝিনি যে, এটি ফলিত বেদান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ—যা আমাদের পূর্ণ-বিকশিত মানুষের সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করার ক্ষমতা ধারণ করে। আমরা কখনো গীতার শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগের দিকটি বুঝতে পারিনি। যদি তা পারতাম, তাহলে আর আমাদের একহাজার বছর ধরে বৈদেশিক আগ্রাসন, আভ্যন্তরীণ জাতিদ্বন্দ্ব, সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও গণ-দারিদ্র্য সহ্য করতে হতো না। আমরা কখনো গীতাকে গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করিনি; কিন্তু এখন তা করতে হবে।

আমাদের দরকার এমন এক দর্শন যা মানুষের আত্মমর্যাদা, স্বাধীনতা ও সাম্যের ভিত্তিতে এক নতুন জনকল্যাণকামী সমাজ গড়ে তুলতে সাহায্য করতে পারে। আধুনিক ভারতবর্ষে আমরা আমাদের সামনে এই লক্ষ্য স্থাপন করেছি এবং এই ভাব সারা পৃথিবীর মানুষকেও অনুপ্রাণিত করছে। গীতায় রয়েছে এমনই এক দর্শন, যা মানুষের হৃদয়-মনকে সেই লক্ষ্যের উদ্দেশে পরিচালিত

করবে, নিয়ন্ত্রিত করবে। আধুনিক যুগে গীতাকে প্রথম এইরকম এক দিশা—বাস্তবমুখী এক দিশা—প্রদান করলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বহু হাজার বছর আগে শ্রীকৃষ্ণ এটিকে এক বাস্তবমুখী দর্শনরূপে উপস্থাপন করলেও আমরা কিন্তু তাকে একটি পুণ্যফলদায়ী গ্রন্থমাত্রে পরিণত করে ফেলেছিলাম। 'গীতা-ধ্যান শ্লোক' নামে পরিচিত তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোকগুলিতে এই ভাব রয়েছে। সেখানে গীতাকে তুলনা করা হয়েছে দুধের সঙ্গে; সেই দুধ গাভী অর্থাৎ বেদসমূহ থেকে দোহন করেছেন যে-গোয়ালা বা দোগ্ধা, তিনি শ্রীকৃষ্ণ। সেই দুধ কী কাজে লাগবে? সে-দুধ পূজায় ব্যবহারের জন্য নয়; সে-দুধ পান করে পুষ্ট হওয়ার জন্য। কেবল তবেই শক্তিলাভ করা যাবে। কিন্তু শত শত বছর ধরে আমরা সেই দুধভর্তি পাত্র ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করেছি, প্রণাম করেছি, কিন্তু কখনো সে-দুধ পান করিনি। তাই আমরা দুর্বল। দুর্বল শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিকভাবে। এই অবস্থার পরিবর্তন হবে যদি আমরা এখন সে-দুধ পান করতে ও হজম করতে—আত্তীকরণ করতে—আরম্ভ করি। তাতে আমাদের সুবিধা হবে চারিত্রশক্তি গড়ে তুলতে, কর্মে দক্ষতা আনতে, সেবাভাব জাগিয়ে তুলতে এবং জাতির ভাগ্য নতুন করে রচনা করতে।

ভারতের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেছি, আমাদের দেশের লোকের মধ্যে ব্যাপকভাবে গীতা সম্বন্ধে এই ভুল ধারণা রয়েছে। তবে, ব্যাপারটা আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল হায়দ্রাবাদের একটি ঘটনা। আমি তখন দিল্লির রামকৃষ্ণ মিশনের দায়িত্ব নিতে চলেছি। অন্ধ্রপ্রদেশ হয়ে যাচ্ছিলাম। ঐ রাজ্যে বিস্তারিত সফরসূচীর মধ্যে হায়দ্রাবাদের জন্য ছিল পাঁচটি দিন। ১৯৪৯-এর পুলিসি তৎপরতার ঠিক পরেই। এক বন্ধু পরামর্শ দিল, রাজ্যের সামরিক শাসক জেনারেল জে. এন. চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে যেতে। আমি বন্ধুটির বাড়িতে উঠেছিলাম। ওঁর সঙ্গেই গিয়ে জেনারেল চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম।

আমরা যেতে জেনারেল চৌধুরী আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। প্রথম আধঘণ্টা উনিই কথা বললেন। আমি শুনলাম। রাজ্যের কিছু কিছু অঞ্চলে তখন কম্যুনিস্ট গণ-অভ্যুত্থান হচ্ছিল; ওঁকে ঘন ঘন ফোন ধরতে হচ্ছিল, তবে আমাদের কথাবার্তা চলছিল। দেখলাম, ওঁর টেবিলের ওপর একখানি গীতা। আমার সুযোগ এসে গেল কথা বলার। জিজ্ঞেস করলাম: "জেনারেল চৌধুরী, আপনি গীতা পড়েন নাকি? আপনার টেবিলে গীতা দেখছি।" উলটোদিক থেকে রীতিমতো অবসন্ন গলায় জবাব এল: "হ্যাঁ, অবশ্যই; যখন খুব ক্লান্ত লাগে আর একটু মানসিক শান্তি পেতে চাই, তখন গীতা থেকে কয়েক লাইন পড়ি।" আমি দৃঢ়ভাবে বললাম: "উদ্দেশ্য কিন্তু সেটা নয়।" একথায় অবাক হয়ে উনি জিজ্ঞেস করলেন: "আপনি কি বলতে চান যে, আমাদের কেবল একটু মানসিক শান্তি দেওয়া ছাড়া গীতার অন্য কোন মূল্য আছে?" আমি বললাম: "হ্যাঁ, গীতা কেবল মানসিক শান্তি দেওয়ার জন্য নয়, গীতার উদ্দেশ্য আপনাকে জনগণের সেবা করতে পারার শক্তি দেওয়া, আপনাকে একজন দায়িত্বশীল নাগরিক করে তোলা। গীতায় রয়েছে জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে এক সার্বিক স্বয়ংসম্পূর্ণ দর্শন।"

জেনারেল চৌধুরী একেবারে অবাক হয়ে গিয়ে আমাকে বারবার জিজ্ঞেস করতে লাগলেন: "আপনি বলতে চাইছেন, এই রাজ্যের মিলিটারি গভর্নর হিসেবে আমার কাছে গীতার কোন প্রাসঙ্গিকতা আছে?" আমি বললাম: "ঠিক তা-ই। আমাদের এটা উপলব্ধি করতেই হবে যে, যেসব নারীপুরুষকে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হয় এবং দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়, তাঁদের কিন্তু জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে একটা 'দর্শন' থাকা দরকার। গীতা আমাদের দেয় সেই দর্শন, যাকে সে 'যোগ'—এই সহজ-সরল নামে অভিহিত করে। এতদিন পর্যন্ত আমরা এটিকে ঠিক বুঝতে পারিনি। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকটির কথা ধরুন। সেখানে শ্রীকৃষ্ণ আমাদের বলছেন, 'দায়িত্বশীল মানুষকে আমি এই যোগদর্শন প্রদান করেছি, যাতে তারা এর মাধ্যমে মানুষকে সেবা করার, সুরক্ষা দেওয়ার ও পুষ্ট করার সামর্থ্য অর্জন করতে পারে।' এই মহান গ্রন্থের এটিই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য।" আমি এই কথাগুলির ওপর বারবার জোর দিলাম, আর উনি বারবার জিজ্ঞেস করলেন: "আমি—এই রাজ্যের গভর্নর যে-আমি—সেই আমি কি এই গ্রন্থ থেকে কোন শিক্ষা নিয়ে আরো দক্ষ ব্যক্তি হয়ে উঠতে পারি?" উত্তরে বললাম: "হ্যাঁ, সেটিই এর উদ্দেশ্য; সমস্ত দায়িত্বশীল নরনারীকে আপামর জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য কাজ করতে অনুপ্রাণিত করা। সেটিই এর যথার্থ স্বরূপ। এ-গ্রন্থ আপনাকে ঘুম পাড়ানোর জন্য নয়—আপনাকে জাগানোর জন্য। এটি কেবল আপনাকে মানসিক শান্তি দেওয়ার জন্য নয়—এটি আপনাকে সেই প্রচণ্ড মানবিক প্রেরণা ও দৃঢ়সঙ্কল্প দেওয়ার জন্য, যার সহায়ে আপনি সমাজের সকলের কল্যাণের জন্য কাজ করায় ব্রতী হবেন।"

জেনারেল চৌধুরী খুব খুশি হলেন। কথায় কথায় একঘণ্টা কেটে গেল। জিজ্ঞেস করলাম: "আপনি কি স্বামী

বিবেকানন্দের কোন বই পড়েছেন?" উনি বললেন ঃ "হ্যাঁ, আমি তাঁর উক্তি-সঞ্চয়নের ছোট ছোট কিছু বই পড়েছি।" আমি বললাম ঃ "তাতে হবে না কিন্তু! আমি চাই, আপনি বিশেষ করে একটি বই পড়ুন—'লেকচার্স ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়া' ('ভারতে বিবেকানন্দ')—যাতে তাঁর ভারতে প্রদত্ত বক্তৃতা রয়েছে। এইসব বক্তৃতা আমাদের জাতিকে জাগিয়ে দিয়েছিল; এইসব বক্তৃতার প্রভাবে জ্বলে উঠেছিলেন মহান সব দেশপ্রেমিক বীর, যাঁরা আমাদের জাতির স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। এই গ্রন্থের ভাব হলো মানুষ ও জাতি গঠন। আমি দিল্লি থেকে আপনাকে একটি পাঠিয়ে দেব, আমার স্বাক্ষর-সহ—অবশ্য যদি আপনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, সেটি পড়বেন। আমি এমন একটা গ্রন্থ অকারণ নষ্ট করতে চাই না।" উনি বললেন ঃ "হ্যাঁ, পড়ব।" ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দিল্লি পৌঁছে সেখান থেকে 'লেকচার্স ফ্রম কলম্বো টু আলমোড়া' বইটি ওঁকে পাঠালাম। তিনি আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে সুন্দর একটি চিঠি লিখেছিলেন। পরবর্তী কালে যখন উনি কানাডায় আমাদের হাই কমিশনার হয়েছিলেন, তখন সেদেশে বসবাসকারী ফরাসী নাগরিকদের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানের বিস্তারের উদ্দেশ্যে উনি আমার লেখা 'Eternal Values for a Changing Society' গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডের প্রথম বক্তৃতা—'Essense of Indian Culture'—ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্য আমার অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন।

এই অভিজ্ঞতা থেকে আমি বুঝেছিলাম, যেভাবে আমরা নিছক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মতো করে রোজ সকালে বিভিন্ন স্তোত্র আবৃত্তি করি, সেভাবেই ভারতের লক্ষ লক্ষ মানুষ গীতাকে দেখে ও বুঝে থাকে। ভারতবর্ষে আজ আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ সঠিক লক্ষ্যে পরিচালিত করার জন্য প্রয়োজন যথার্থ একটি দর্শনের, যাতে আমরা এদেশের বিপুল পুরুষ-শক্তি ও স্ত্রী-শক্তি জাগরণ ও উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারি। গীতায় আমরা সেই দর্শন ও সেই আধ্যাত্মিকতারই সন্ধান পাই। কয়েক হাজার বছর আগে কুরুক্ষেত্রের ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্রে গীতার বাণী প্রদত্ত হয়েছিল। কেবল গীতাতেই আছে এইরকম এক দর্শন। অন্য সব শিক্ষাই প্রদত্ত হয়েছিল মন্দিরে, গুহায় বা অরণ্যে। এখানে ছাত্র ও শিক্ষক—অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ—দুজনেই ছিলেন চোখে-পড়ার মতো ব্যক্তিত্ব, দুজনেই যোদ্ধা। আর যিনি শিক্ষক—শ্রীকৃষ্ণ, তিনি ছিলেন এমন একজন মানুষ, যাঁর অন্তর সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ; যাঁর সম্পদ তাঁর বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি। গীতা তাই বীর ছাত্রের প্রতি এক বীর আচার্যের মুখনিঃসৃত বীরবাণী। গীতার বাণী সর্বজনীন; তাই সেটি পৃথিবীর যেকোন জায়গায় যেকোন মানুষের সম্বন্ধে প্রযোজ্য, যাতে সেই মানুষ তার অন্তর্নিহিত পূর্ণাঙ্গ মানবীয় সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে পারে। হাজার বছর আগে উপনিষদ্ বা বেদান্তসমূহ মানবীয় সম্ভাবনার বিজ্ঞান গড়ে দিয়েছে, আর গীতা রচনা করে দিয়েছে সেই বিজ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ-পদ্ধতি। তাই স্বামী বিবেকানন্দ গীতাকে ফলিত বা প্রায়োগিক বেদান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে মনে করতেন।

গীতার প্রথম ইংরেজী অনুবাদ

গীতার প্রথম ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন স্যার চার্লস উইলকিন্স। এটির প্রকাশক ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। এর শুরুতে ওয়ারেন হেস্টিংস (ভারতে প্রথম ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল)-এর লেখা একটি ভূমিকা আছে, যাতে পাওয়া যায় এই প্রফেটিক ভবিষ্যদ্বাণীটি ঃ "ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসানের তথা সেই সাম্রাজ্যের শক্তি ও সম্পদের উৎসগুলির বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়ার দীর্ঘকাল পরেও ভারতীয় দর্শনের রচয়িতারা বেঁচে থাকবেন।"

এর একশ বছর পরে 'The Song Celestial' নামে গীতার আরেকটি সুন্দর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। লেখক স্যার এডউইন আর্নল্ড (১৮৩২-১৯০৪ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি ভারতবর্ষের পুণে ও অন্যত্র কর্মরত থাকাকালীন সংস্কৃত শিখেছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মেছিল। ইংল্যান্ডে গিয়ে তিনি এই অনন্য গ্রন্থখানি ছাড়াও বুদ্ধের ওপর 'The Light of Asia' নামে একইরকম উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দুটি গ্রন্থেরই পঞ্চাশ-ষাটটির বেশি সংস্করণ হয়েছে। দুটিই সোজাসুজি পাঠকের হৃদয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়।

ভগবদ্‌গীতা মানুষের সমস্যাকে মানুষের মতো করে দেখে, বিশ্লেষণ করে। এই কারণেই এর দারুণ একটি আবেদন আছে। ভারতবর্ষের মানুষের মনকে এই গ্রন্থ শত শত বছর ধরে অনুপ্রাণিত করেছে এবং আজ এটি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করছে। লক্ষ্য করার ব্যাপার হলো, এই সমস্ত দেশের মানুষ দেখছেন, গীতা অধ্যয়নের পর তাঁদের পুরো দৃষ্টিভঙ্গিটাই বদলে যাচ্ছে। আমেরিকার এমার্সন, ওয়াল্ট হুইটম্যান, থোরো এবং ইংল্যান্ডের কার্লাইলের মতো চিন্তাবিদ্-লেখকরা গীতা অধ্যয়নের পর তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই প্রসারতা ও গভীরতা এসে যাওয়াটা অনুভব করেছেন। আর তখন থেকেই তাঁদের রচনার মধ্যেও ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছে নতুন ভাব, নতুন বাণী। [ক্রমশ]

মাঘ ১৩০৭/ফেব্রুয়ারি ১৯০১



[নিমন্ত্রণ-পত্র]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

আগামী ১২ই ফাল্গুন [১৩০৭] রবিবারে, কলিকাতার অপর পার, ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে, বেলুড় মঠ ঠাকুরবাটীতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মোৎসব হইবে। তদুপলক্ষে তথায় উক্ত দিবসে সকল দেশের সকল ধর্ম্মাবলম্বী মহাশয়কেই এবং সকল জাতির সকল শ্রেণীর সকল লোককেই আমরা নিমন্ত্রণ করিতেছি, যেন সকলে আসিয়া পরস্পরের আনন্দ বর্দ্ধন করেন। ইতি বিনীত

ব্রহ্মানন্দ—মঠাধ্যক্ষ।

উক্ত দিবসে কলিকাতা আহিরীটোলা ঘাট হইতে হোরমিলার কোম্পানীর বড় বড় জাহাজ সমস্ত দিবস এক-ঘণ্টা অন্তর উক্ত মঠে যাত্রিগণকে লইয়া যাতায়াত করিবে।

নিমন্ত্রণ-পত্র

উদ্বোধন-গ্রাহক মহাশয়েষু—

সবিনয় নিবেদন,—১২ই ফাল্গুন [১৩০৭], রবিবার, গঙ্গাতীরস্থ বেলুড় মঠ ঠাকুরবাটীতে ভগবান শ্রীমৎ রামকৃষ্ণদেবের অষ্টষষ্ঠিতম জন্মোৎসব হইবে। গ্রাহক মহাশয়গণ, আপনারা সবান্ধবে যোগদান করিয়া আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। ইতি।

মঠাধ্যক্ষ।

কলিকাতা আহিরীটোলার ঘাট হইতে, হোরমিলার কোম্পানীর বড় বড় জাহাজ সমস্ত দিন এক ঘণ্টা অন্তর উক্ত মঠে যাত্রিগণকে লইয়া যাতায়াত করিবে।

পরমহংসদেবের উপদেশ

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত)

১। যেমন ভিজে দেশলাই হাজারবার ঘষলেও জ্বলে না, ঘষতে ঘষতে কেবল একটু ধোঁয়া ওঠে, কিন্তু শুকনো দেশলাই একবার একটু ঘষলেই অমনি দপ্ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি ভক্ত যারা, তারা শুকনো দেশলাইয়ের মত, হরি-কথা হওয়া মাত্র তাদের অমনি প্রেমাগ্নি জ্বলে ওঠে; কিন্তু যারা কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত জীব, তারা ভিজে দেশলাইয়ের মত, তাদের কাছে যতই হরিকথা কও না কেন, তারা তাতে তাতে না।

২। ভক্তের ভাব ফুরোয় না কেন জান? যেমন মহাজনের গোলাতে ধান চাল মাপে, তখন মাগীরা পেছন দিক থেকে ধামা ধামা করে মাল এগিয়ে দেয়, তেমনি ভগবান ভক্তের ভাব যুগিয়ে দেন, এজন্য ভক্তের ভাব ফুরোয় না, কিন্তু বইপড়া জ্ঞানীর জ্ঞান দুদিনে ফুরিয়ে যায়।

৩। প্রদীপের স্বভাব আলো দেয়; কেউ বা তাতে ভাত রাঁধছে, কেউ জাল করছে, কেউ তাতে ভাগবত পাঠ করছে; সে কি আলোর দোষ অর্থাৎ কেউ ভগবানের নামে মুক্তির চেষ্টা করছে, কেউ চুরি করতে চেষ্টা করছে, সে কি ভগবানের দোষ?

৪। কাগজে তেল লাগলে তাতে আর লেখা চলে না; তেমনি জীবে কামিনী-কাঞ্চন রূপ তেল লাগলে তাতে আর সাধন চলে না। সে তেলমাখা কাগজ খড়ি দিয়ে ঘষে নিলে, তাতে লেখা যায়; তেমনি জীবে কামিনী-কাঞ্চন রূপ তেল লাগলে ত্যাগ রূপ খড়ি দিয়ে ঘষে নিলে তবে সাধন চলে।

৫। যার যেমন ভাব, তার তেমনি লাভ। ভগবান কল্পতরু, তাঁর কাছে যে যা চায়, সে তাই পায়। গরীবের ছেলে লেখাপড়া শিখে, হাইকোর্টের জজ হয়ে মনে করে, "আমি বেশ আছি"—ভগবানও তখন বলেন, "তুমি বেশ থাক"। তারপর যখন সে পেন্সন নিয়ে ঘরে বসে, তখন সে বুঝতে পারে, "এ জীবনে কল্লুম কি"—ভগবানও তখন বলবেন, "তাইত, তুমি কল্লে কি"?

পাঁচকথা

(লেখক—স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ?)

খোয়া ফেলব না ত কি? রাস্তাটা ত মোটা হ'ক। রাস্তায় না জল দাঁড়ালেই হ'ল; লোকের উঠোন নীচু হবে, লোকের ঘরে জল সেঁধুবে, শোবার ঘরের তক্তাপোষ ভেসে উঠবে, তা আমি ক'রব কি? যাও যাও—রাস্তায় না জল দাঁড়ালেই হ'ল। ফেলরে ফেল, রাস্তার ওপরেই ফেল—গাড়ি গাড়ি ফেল! আর, পারিস ত এই নেড়া বোষ্টুমটার...।

মরে যায় যাক, আব্রু ত রক্ষে হবে। বলি, অত ঘেরাটোপের দরকারটা কি? একে পাল্কিতে যাচ্ছে, তার ওপর দুপাশে দুই-লাঠি-হাতে দারোয়ান; তার ওপর আবার ঘেরাটোপের দরকার কি? একটু দরজাটা ফাঁক ক'রে রাখলে, পালকির খড়খড়িটা একটু খুলে রাখলে,—হাওয়া খেলতে পায়; তা নইলে যখন হাঁপিয়ে পেট ফুলে অসুখ ক'রবে, ডাক্তার এসে এগজামিন করবে, তখন আব্রুটা কোথায় থাকবে? পোয়াতীর হাঁপিয়ে ওঠার দরুন যখন পেটের ছেলেটার হাঁপানির ব্যারাম হবে, তখন কুলে বাতি জ্বালবে কে? ❑

নিত্য প্রাসঙ্গিক বিবেকানন্দ

দিলীপকুমার ভারতী

এই নিবন্ধটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'



"Iron nerves and a well-intelligent brain and the whole world is at your feet."—**Swami Vivekananda**

বেদের ঋষি বলেছিলেন : "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি" (ঋগ্বেদ, ১।১৬৪।৪৬), "এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ" (ঐ, ৮।৫৯।২)। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন : "মত—পথ।" মত মানেই পথ। সেই 'এক'-এর কাছে পৌঁছাবার পথ। বিবেকানন্দ বললেন : সেই 'এক'ই 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার', তুমি সকল নামরূপী 'এক'কে ভালবাস, তাতে 'এক'-এরই সেবা করা হবে। অন্যত্র তাঁর সন্ধান করার দরকার নেই। বেদে যা বীজাকারে, সেগুলি পুরাণে বিস্তৃত আকারে ব্যাখ্যাত হয়েছে। সেগুলিই আবার বিস্তৃততর হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিরচিত 'উত্তরপুরাণে'—ক্রিয়াকাণ্ড সমেত যা আজ পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত, পল্লবিত। এগুলিকে বিবেকানন্দ বলতেন—'Practical Vedanta'। এইসব মহাবাণী কোন বিশেষ ধর্ম বা কালের নয়—চিরকালের। বেদ তাই হিন্দুধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হলেও তাতে রয়েছে সকল ধর্মেরই মূল কথা।

১৮৯৩ সালের শিকাগো ধর্মমহাসভার 'লিবার্টি বেল'-এর গায়ে উৎকীর্ণ ছিল—"A new commandment I give unto you that you love one another." এই বাণী পৃথিবীতে নতুন ছিল না। পাশ্চাত্যের মানুষের বুঝি উপলব্ধি ছিল না সেই 'Love'-এর; জানা ছিল না তার স্বরূপ। বিবেকানন্দ সেই স্বরূপ উন্মোচন করলেন—তা হলো সৌভ্রাতৃত্ব, বিশ্বভ্রাতৃত্ব। ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ ধর্মমহাসভায় অভ্যর্থনার উত্তর দিতে গিয়ে তিনি এভাবে শুরু করলেন : "Sisters and Brothers of America." সভা হলো বিদ্যুৎস্পৃষ্ট! উল্লাসে সবাই আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। 'ডিসিপ্লিন', 'এটিকেট', সভ্যতা-ভব্যতা সব কোথায় গেল ভেসে! হাততালি আর হাততালি। কর্ণপটবিদারী মহাশব্দ। সব মিলিয়ে এক মহাবিস্ফোরণ! আমেরিকা সেদিন মঞ্চের ওপর কোন বিশেষ ধর্মের প্রচারককে দেখেনি, দেখেছিল গৈরিক বেশ পরিহিত তাঁদের খ্রীস্টকে।

স্বামীজী সেদিন নিজেকে পরিচিত করলেন কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর প্রতিনিধিরূপে এবং হিন্দুধর্মের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন, তা আসলে সনাতন ধর্মেরই। বললেন : "সর্বধর্মের যিনি প্রসূতিস্বরূপ, তাঁর নামে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোটি কোটি হিন্দু নরনারীর হয়ে আমি আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি।... যে-ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়ে আসছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি। আমরা শুধু সকল ধর্মকে সহ্য করি না, সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলে বিশ্বাস করি।"

১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ স্বামীজী 'হিন্দুধর্ম' নামে এক লিখিত ভাষণ পাঠ করলেন। আসলে 'হিন্দু' একটি স্থানিক শব্দ—'সিন্ধু'র অপভ্রংশ। সনাতন ধর্মের যেন এক 'ট্রেড নেম'। 'সিলিকা' আর 'নাইট্রোগ্লিসারিন' মিলে যে রাসায়নিক যৌগটি সৃষ্ট হয়, তার 'ট্রেড নেম'—'ডিনামাইট', যেটি সমধিক পরিচিত। 'হিন্দু' শব্দটিও যেন সেরকম। যখন পৃথিবীতে অপর কোন ধর্ম ছিল না, তখন এই সনাতন ধর্মই ছিল। পরে মানুষের মতাদর্শ ভিন্ন হয়েছে, অপরাপর ধর্ম এসেছে। তখন অপর ধর্মমতাবলম্বীদের সাপেক্ষে সনাতন ধর্মমতাবলম্বীরা কিছু বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। ঐ বৈশিষ্ট্যই স্থান দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে—'সিন্ধু' বা 'হিন্দু' নামে। এরকম হয়ই। যেমন নির্জোটেরাও এক বিশেষ জোট। নির্দলও হয় কোন বিশেষ দলের নির্দল। কিংবা বিশুদ্ধ নাস্তিকও হতে পারে পরম ধার্মিক, যেহেতু সেও এক বিশ্বাসী—'না-ঈশ্বরে'।

সনাতন ধর্মের প্রচারক বিবেকানন্দও যেন সনাতন। 'সনাতন' শব্দের অর্থ 'নিত্য'। নিত্য তাকেই বলা হয়, যার প্রাসঙ্গিকতা কোনকালেই হারায় না। বিবেকানন্দের বাণী ও কর্মোদ্যোগ মানুষের নিত্যকালের প্রেরণার উৎস। এই বিষয়টি আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে এখানে আলোচনা করে নিতে চাই। বলতে চাই, উত্তরকালে পৃথিবীতে যত নতুন নতুন মতাবলম্বী আসুন না কেন, বিবেকানন্দ তাঁদের কাছেও প্রেরণাস্বরূপ হয়ে থাকবেন। সেই মহাজীবনের শুরু আছে, কিন্তু শেষ নেই। প্রতিপাদ্যের গভীরে যাওয়ার আগে আমরা দেখে নিই মহাজীবনের শুরুর পর্যায়গুলি।

(১) শুরুর সূচনাপর্ব (Beginning of the beginning) : ১৬ আগস্ট ১৮৮৬ শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর অক্টোবরে বিবেকানন্দ বরানগরে তাঁর কয়েকজন শ্রীরামকৃষ্ণ-নিবেদিতপ্রাণ গুরুভাইকে নিয়ে সূচনা করলেন এক মঠের, যা ছিল রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন নামক মহামহীরুহের বীজস্বরূপ। তারপর তাঁর পর্যায়ক্রমে ভারতভ্রমণ এবং শেষে ১৮৯২ সালের ২৪-২৬ ডিসেম্বর কন্যাকুমারিকার শিলাদ্বীপে ধ্যানকাল পর্যন্ত এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত।

(২) শুরুর মধ্যপর্ব (Middle of beginning) : কন্যাকুমারিকার শিলাসনে তিনদিন গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে আত্মমুক্তিকামী সন্ন্যাসী রূপান্তরিত হলেন দেশপ্রেমিকে। দেশপ্রেমিক ঋষিতে। ঋষি রূপান্তরিত হলেন সংস্কারক ও

সংগঠকে। তারপর দেশনায়কে এবং আরো পরে প্রত্যাদিষ্ট বিশ্বাচার্যে। এই রূপান্তরগুলির মধ্যেই তিনি ১৮৯৩ সালের ৩১ মে পেনিনসুলার জাহাজে চড়ে ধর্মমহাসভার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। এই পর্বের climax হলো ১৮৯৩-এর সেপ্টেম্বরে শিকাগো ধর্মমহাসভায়। যেসময় থেকে পাশ্চাত্যে তিনি পরিচিত হলেন 'Cyclonic Monk' বা 'ঝটিকা সন্ন্যাসী'-রূপে। এই পর্বের শেষ হলো ১৮৯৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি, যেদিন তিনি পাশ্চাত্য জয় করে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

(৩) **শুরুর শেষপর্ব (End of the beginning) :** উপরি উক্ত কাল থেকে ১৯০২ সালের ২ জুলাই মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত কালকে এই পর্বের মধ্যে ধরা যায়। মনে রাখতে হবে, দেশে তখনো স্বদেশী আন্দোলন শুরু হতে তিন বছর বাকি, কিন্তু বিবেকানন্দই তৈরি করে গিয়েছিলেন তার এবং পরবর্তী সব আন্দোলনের পটভূমি। উত্তরসুরীদের কাছে তখন তাঁর বাণীগুলি কিরকম প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা ব্যক্ত হয়েছে রোমাঁ রোলাঁর অনবদ্য ভাষায় : "He replied to the frenzied expectancy of the people by his Message to India, a conch sounding the resurrection of the land of Rama, of Shiva, of Krishna, and calling the heroic Spirit, the immortal Atman, to march to war. He was a General, explaining his *Plan of Campaign*, and calling his people to rise en masse. 'My India, arise! Where is your vital force? In your Immortal Soul.' " "The storm passed; it scattered its cataracts of water and fire over the plain, and its formidable appeal to the Force of the Soul, to the God sleeping in man and His illimitable possibilities! I can see the Mage erect, his arm raised, like Jesus above the tomb of Lazarus in Rembrandt's engraving—with energy flowing from his gesture of command to raise the dead and bring him to life."[১] সেই থেকে বিবেকানন্দ শুধু এদেশে বা প্রাচ্যেই নয়, সমগ্র বিশ্বেই সকল চলমান এবং আগত ও অনাগত মহৎ বিপ্লবের উৎসস্থল। তাই বিবেকানন্দের শেষপর্ব নেই, অথবা রয়েছে—পৃথিবীর শেষপর্ব রচনার ইতিবৃত্তে। আমাদের আলোচনা নিতান্তই প্রতিনিধিত্বমূলক (typical), কারণ এই আলোচনার কোন শেষ নেই।

*

১৮৯০ সালের আগস্টে বারাণসীতে প্রমদাদাস মিত্রকে বিবেকানন্দ বলেছিলেন : "আমি চললাম। আবার যখন এখানে ফিরব, তখন আমি সমাজের ওপর একটা বোমার মতো ফেটে পড়ব, আর সমাজ আমাকে কুকুরের মতো অনুসরণ করবে।" ১৮৯১-এর নভেম্বরে তিনি গুরুভ্রাতা স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন : "ঠাকুর আমাকে যেসব কথা বলতেন, তা আমি চপলতাবশে হেসে উড়িয়ে দিতাম। এখন সেগুলির সত্যতা ক্রমে অনুভব করছি। আমার মনে হয়, আমার ভিতর যে-শক্তি আছে, তা দিয়ে আমি জগৎ ওলট-পালট করে দিতে পারব।" ১৮৯২-এর এপ্রিলের শেষে মহাবালেশ্বরে তিনি গুরুভ্রাতা অভেদানন্দজীকে বলেন : "আমি এক দুর্বার শক্তি অনুভব করি, মনে হয় আমি বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়ব। আমার মধ্যে এত শক্তি আছে যে, আমার মনে হয়, আমি সমগ্র পৃথিবীকে আমূল বদলাতে পারব।"

সেই বিস্ফোরণ তিনি সত্যসত্যই ঘটালেন একবছর পরে—১৮৯৩-এর সেপ্টেম্বরে আমেরিকার ধর্মমহাসভায়। ২০ সেপ্টেম্বরের ভাষণে তিনি খ্রীস্টানদের উদ্দেশে বললেন : "প্রাচ্যের প্রচুর ধর্ম আছে, কিন্তু তারা নিরন্ন। তাদের অন্ন দরকার। আর তোমরা সেখানে গির্জা বানাচ্ছ। ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মশিক্ষা দেওয়ার অর্থ তাকে অপমান করা।"

সেই শুরু, তারপর ঝড়ের মতো আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে তিনি ভারতের—প্রাচ্যের মর্মবাণী প্রচার করে চললেন অকুতোভয়ে। পৃথিবীতে যেন এক মহাজাগরণ শুরু হলো।

এর কয়েক মাস পরে ২৩ ফাল্গুন ১৩০০ (ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪) রবীন্দ্রনাথ লিখলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'এবার ফিরাও মোরে'। কবি লিখলেন—

"ওরে তুই ওঠ আজি, আগুন লেগেছে কোথা?
কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি জাগাতে জগৎজনে।...
এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা—এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা—ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে ভীত তুমি সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে।...
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্যমাঝারে, কবি
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।"

এই অসাধারণ কবিতাটি কবি যদি তখন আমেরিকায় সফররত বিবেকানন্দকে স্মরণ করে লিখে থাকেন, তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমেরিকা যাওয়ার আগে, শিকাগোর ধর্মমহাসভায় এবং তার অব্যবহিত পরে স্বামীজী যাকিছু করেছেন বা বলেছেন, সবকিছু কবির ভাবনায় যেন স্পষ্ট। 'অভীঃ' মন্ত্রের বাণীমূর্তিকেই যেন কবিতায় চিত্রিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

১৮৯৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি মাদ্রাজে সংবর্ধনার উত্তরে স্বামীজী যুবকদের, বিশেষ করে ছাত্রদের উদ্দেশে বললেন : "মানুষ—মানুষ চাই। তাহলেই বাকি সবকিছু তৈরি হয়ে যাবে। চাই বলিষ্ঠ, ওজস্বী, বিশ্বাসী যুবকের দল—মেরুদণ্ড পর্যন্ত সাচ্চা—তাই চাই। এইরকম একশ জন হলেই পৃথিবীতে বিপ্লব আসবে।" ঐবছর পাঞ্জাবের সভায় ছাত্রদের কাছে তিনি ঘোষণা করলেন : "কোটি কোটি মানুষ অনশনে আছে। দর্শনের কচকচি খেয়ে তারা বাঁচবে না। তাদের রুটি চাই।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ লিখেছেন : "স্বামী বিবেকানন্দ

রাজনীতিতে সেবা ও মানবতা প্রচার করিয়াছেন, আর তাহা কার্যে পরিণত করিয়াছেন অশ্বিনীকুমার [দত্ত]।"[২] ১৮৯৭ সালের মাঝামাঝি স্বামীজী এলেন আলমোড়ায়। সেখানে তাঁর সাথে দেখা করতে এলেন প্রসিদ্ধ কংগ্রেস কর্মী অশ্বিনীকুমার দত্ত। কংগ্রেস সম্বন্ধে স্বামীজীর মত জানতে চাইলেন তিনি। স্বামীজী অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, নিছক কয়েকটা প্রস্তাব পাশ করালে স্বাধীনতা আসবে না। জনগণকে জাগাতে হবে। তাদের অন্ন চাই। সেই উদ্দেশ্যে কংগ্রেস কিছু করলে কংগ্রেসের প্রতি তাঁর সহানুভূতি আছে। আর ধর্ম সম্বন্ধে বললেনঃ "যে-ধর্ম শক্তি দেয় না, তা ধর্মই নয়।" তারপর অশ্বিনীকুমার উচিত কর্তব্য সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। এবার আসল চেহারা বেরিয়ে এল বিবেকানন্দের। তিনি বললেনঃ "শুনেছি আপনি শিক্ষামূলক কাজ করেন। ওটাই আসল কাজ। আপনার মধ্যে মহাশক্তির খেলা চলছে। জানবেন, জ্ঞানদান মহাদান। তবে মানুষ তৈরির শিক্ষাই যেন জনগণকে দেওয়া হয়। চরিত্রগঠন চাই। আপনার ছাত্রদের বজ্রের মতো গড়ে তুলুন। বাঙালী যুবকদের হাড় থেকেই বজ্র তৈরি হয়ে ভারতবর্ষের দাসত্বকে চূর্ণ করবে। আর আপনারা চলে যান অচ্ছুৎদের কাছে—মুচি, মেথর, ঝাড়ুদারদের কাছে। তাদের বলুন, তোমরাই জাতির প্রাণ; তোমাদের মধ্যে আছে বিপ্লব ঘটাবার শক্তি। তোমরা উঠে দাঁড়াও, শিকল ছিঁড়ে ফেল। পৃথিবী অবাক হয়ে তোমাদের দিকে চেয়ে থাকবে।"

অবাক হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছিল সেদিন। অশ্বিনীকুমার ও তাঁর সহকর্মীরা পূর্ববঙ্গে সেদিন যে-বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিলেন, তাতে খুন-জখমের সংস্রব ছিল না। বিবেকানন্দের বাণীতে উদ্বুদ্ধ অশ্বিনীকুমার হয়েছিলেন হিন্দু, মুসলমান, হাড়ি, মুচি, মেথর সকলের হৃদয়ের রাজা। সবাই একতাবদ্ধ হয়ে সেদিন সমগ্র প্রশাসনকে অচল করে দিয়েছিল। তারা বিদেশী শাসকদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। ১৯২১ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তার বীজ পোঁতা হয়েছিল ২৪ বছর আগে বরিশালে।

গান্ধীজীর জীবনেও বিবেকানন্দের প্রভাব অসামান্য। কেবল দেশপ্রেমের নয়, মানবপ্রেমের ক্ষেত্রেও বিবেকানন্দ ছিলেন গান্ধীজীর আদর্শপুরুষ। তাঁর 'কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত' হয়ে স্বদেশবাসীর মধ্যে বিচরণ, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলন, অস্পৃশ্যদের মধ্যে গিয়ে বাস ইত্যাদির মধ্যে যেন আমরা বিবেকানন্দেরই দৃপ্ত আহ্বানকেই দেখতে পাই। তাঁর 'স্বদেশমন্ত্র'—"হে বীর সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই।" এই মন্ত্রে স্বামীজী আরো স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেনঃ "তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত,... ভুলিও না, নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই।"

বিনোবা ভাবে জানিয়েছেন, 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দটি গান্ধীজী নিয়েছিলেন বিবেকানন্দের কাছ থেকে। আর গান্ধীজীর অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলনের পশ্চাতে যে বিবেকানন্দের ছুঁৎমার্গ-বিরোধী প্রেরণাই ছিল সক্রিয়, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

স্বামীজী যে-বছর শিকাগো গেলেন সেই ১৮৯৩ সালেই তরুণ ব্যারিস্টার মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী গেলেন দক্ষিণ আফ্রিকায়, যা ছিল অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ সরকারের অধীন। সেখানে তিনি ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ছিলেন, যদিও মাঝে তিনি অন্তত তিনবার দেশে এসে কিছুকাল ওকালতি করে গেছেন। তিনি টলস্টয় এবং রাস্কিন-প্রভাবিত ছিলেন। গোখলেকে তাঁর রাজনৈতিক গুরু বলে তিনি স্বীকার করেছেন, কিন্তু তিনি তিলকের পথে যাননি। তিলক রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে অধ্যাত্মচিন্তাকে মেশাতে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু গান্ধী তাই করেছিলেন। এক্ষেত্রে বিবেকানন্দ অবশ্যই ছিলেন তাঁর পূর্বসূরী। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করেন ১৯০৭ সালে 'এশিয়াটিক ল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট' (ট্রান্সভালে আইনটি পাশ হয় ১৯০৬-এ)-এর বিরুদ্ধে। সেই সত্যাগ্রহ ছিল অহিংস অসহযোগ এবং আইন অমান্যতে সীমাবদ্ধ। দীর্ঘ সাত বছর সংগ্রামের পর ১৯১৪ সালে তিনি জয়ী হন। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার আইনটি প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। তারপর তিনি পাকাপাকিভাবে দেশে ফেরেন।

দেশে ফিরে গান্ধীজী কিন্তু ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতার পথ নিয়েছিলেন, কারণ ব্রিটিশ ন্যায়নীতির ওপর তাঁর আস্থা ছিল প্রবল এবং এ-বিশ্বাসও ছিল যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ভারতবাসীকে ব্রিটিশদের সমপর্যায়ভুক্ত করা হবে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ (১৯১৮) হওয়ার পরের বছরই পাশ হলো 'রাওলাট অ্যাক্ট', যাতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করা হলো। ভারতবাসীকে দেশ থেকে নির্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থাও থাকল আইনে। ভারতবাসীরা এর প্রতিবাদসভা করতে গিয়ে ঘটল সেই বিখ্যাত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (১৩ এপ্রিল ১৯১৯)। প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'নাইটহুড' ত্যাগ করলেন এবং গান্ধীজী ইংরেজ সরকারকে 'শয়তান' আখ্যা দিয়ে দেশবাসীকে সরকারের সাথে সর্বপ্রকারে অসহযোগিতার আহ্বান জানালেন। এদেশে এটা নতুন কিছু ছিল না, কারণ তার আগে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে (১৯০৫-১৯১১) এমন ঘটনা ঘটেছে। গান্ধীজী নিজেও দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ চালিয়ে জয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু এবার তিনি যে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সূচনা করলেন তা চরিত্রে অনেকখানি পৃথক এবং বিশাল মাত্রার। এই অসহযোগ ছিল কোন বিশেষ আইনের বিরুদ্ধে নয়—গোটা ভারতে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ধাপে ধাপে, যা পরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছে। গান্ধীজীর সেই ঘোষণায় দেশে বিপুল সাড়া পড়ে গেল। ১৯২০ সালের ৮ সেপ্টেম্বর কলকাতায় বসল বিশেষ অধিবেশন, তাতে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করার প্রস্তাব গৃহীত হলো।

ঐবছর (১৯২০) নাগপুরে হলো কংগ্রেসের ৩৬তম অধিবেশন। সেখানে সর্বাত্মক অসহযোগিতার প্রস্তাব পাশ হলো—সরকারি চাকরি, স্কুল-কলেজ, আইনসভা, বিচারালয় সবকিছু ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব গৃহীত হলো। ১৯২১ থেকে দেশে সেই ব্যাপক সত্যাগ্রহ শুরু হয়ে গেল।

১৯২০ সালের নাগপুরের এই অধিবেশনে গান্ধীজী ঘোষণা করেন, ১৯২১-এর ডিসেম্বরের মধ্যে তিনি স্বরাজ এনে দেবেন। প্রশ্ন হলো, এই দুর্জয় সাহস ১৯১৯-এর জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর গান্ধীজী কোথায় পেলেন? এবং কি করেই বা ভেবে নিলেন, তিনি তাঁর দুর্জয় ইচ্ছাশক্তিকে দেশের মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারবেন? স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্ব এভাবে, বলতে গেলে এই ১৯১৯-এই—তিনি কি করে শুরু করতে পারলেন? অথচ তখন ভয়ের—সর্বাত্মক ভয়ের কী পরিবেশই না ছিল!

বস্তুত, গান্ধীজী স্পষ্টই বুঝেছিলেন, ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে আরো দীর্ঘদিন শোষণ করতে এবং পরাধীন রাখতে চায়। তাদের সেই উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করতে হলে প্রবলতম সংগ্রাম অনিবার্য। সেই পথ হিসাবে তিনি সত্যাগ্রহকে বেছে নিলেন। কিন্তু এখানেই আমাদের আরো প্রশ্ন—সেই সত্যাগ্রহে তিনি আধ্যাত্মিক শক্তির মাত্রা যুক্ত করার কথা ভাবলেন কি করে? গান্ধীজীর এই সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে ব্যাখ্যাটি হলো—মূলত সত্যাগ্রহ নৈতিক ও মানসিক বলে বলীয়ানের পদ্ধতি, কোন দুর্বলচেতা লোকের পক্ষে এই পদ্ধতি অবলম্বন সম্ভব নয়। ভারতের স্বাধীনতা শুধু এই পদ্ধতিতেই এসেছে বললে সত্যের অপলাপ হবে। কিন্তু এটি তো আজ বিশ্বে এক পরীক্ষিত, গ্রাহ্য পথ। গান্ধীজী এই প্রবল 'অভীঃ' মনোভাবটি পেলেন কোথা থেকে? দুর্বল, ভীত ভারতবাসীকে নিয়ে তিনি সেদিন প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশের পশুশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার কথা ভাবলেন কি করে? তাঁর সামনে কি বিবেকানন্দের বাণী এবং কর্মের প্রেরণা ছিল না?

স্বামীজী বহুদিন আগেই অশ্বিনীকুমার দত্তকে বলেছিলেন: "কংগ্রেস স্বাধীনতা ঘোষণা করুক।" সুভাষচন্দ্রেরও ছিল সেই আকাঙ্ক্ষা। সেই স্বাধীনতা ঘোষণা করতে কংগ্রেসের লেগেছে আরো বহু বছর। ১৯২৭ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসে মতভেদ সত্ত্বেও পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতবাসীর লক্ষ্য—এই প্রস্তাব পাশ হয়। পরের বছর কলকাতা অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র প্রস্তাব রাখলেন পূর্ণ স্বাধীনতার, অর্থাৎ ব্রিটিশের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদের, কিন্তু গান্ধীজীর বিরোধিতায় তা অগ্রাহ্য হয়। তবে তার পরের বছর (১৯২৯) ডিসেম্বরে লাহোর কংগ্রেসে সেই প্রস্তাবটিই আনলেন গান্ধীজী, যা সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়।

স্বামীজী বিশ্ববিজয় করে মাদ্রাজে প্রত্যাবর্তন করেন ৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭। এখানে তাঁর চতুর্থ এবং শেষ বক্তৃতাটি দেন ১৪ ফেব্রুয়ারি—'ভারতের ভবিষ্যৎ'। এই বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন: "সঙ্কল্পই জগতে অমোঘ শক্তি। দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি-সম্পন্ন পুরুষের শরীর থেকে যেন একপ্রকার তেজ নির্গত হতে থাকে; আর তাঁর নিজের মন ভাবের যে-স্তরে অবস্থিত, তা অন্যের মনে ঠিক সেই স্তরের ভাব উৎপন্ন করে; এরূপ প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন পুরুষ মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয়ে থাকেন। যখনি আমাদের মধ্যে একজন শক্তিমান পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁর শক্তিতে অনেকের ভিতর তদনুরূপ ভাবের উদয় হয়, তখনি আমরা শক্তিশালী হয়ে উঠি। একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখ—চার কোটি ইংরেজ ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর ওপর কিরূপ প্রভুত্ব করছে। সংহতিই শক্তির মূল—একথা বললে তোমরা হয়তো বলবে, এ তো জড়শক্তি বলে সাধিত হয়; আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন তবে কোথায় রইল? আধ্যাত্মিক শক্তির প্রয়োজন আছে বৈকি। এই চার কোটি ইংরেজ তাদের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি একযোগে প্রয়োগ করতে পারে এবং তার দ্বারা তাদের অসীম শক্তিলাভ হয়ে থাকে; তোমাদের ত্রিশ কোটি লোকের প্রত্যেকেরই ভাব ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে হলে তার মূল রহস্যই এই সংহতি—শক্তিসংগ্রহ, বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তির একত্র মিলন।"

সেদিন সমগ্র দেশের পশ্চাতে আত্মিক শক্তি নিয়ে যদি গান্ধীজী দাঁড়িয়ে থাকেন, তবে গান্ধীজীর পিছনে অবশ্যই দাঁড়িয়েছিলেন বিদেহী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ অহিংস আন্দোলনের ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক ছিলেন। আজও পরিবর্তিত বিশ্বে এই আত্মশক্তি ও সঙ্ঘশক্তি প্রবল শক্তিকে পরাভূত বা নমিত করছে। তাই বিবেকানন্দ আজও একইভাবে প্রাসঙ্গিক।

প্যারেলালের রচনাতে পাই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ওপর বিবেকানন্দের প্রভাবের কথা। তিনি লিখেছেন: "প্রাণকাড়া প্রবচন রচনায় সিদ্ধপুরুষ বিবেকানন্দের 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দটি প্রথম দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ গ্রহণ করেন কলকাতা কর্পোরেশনে স্বরাজ্য দলের সেবাকর্ম-নীতির ঘোষণায়।"[৩] শুধু তাই নয়, বিবেকানন্দের ভাবশিষ্য দেশবন্ধু ছিলেন সত্যসত্যই অসাম্প্রদায়িক। মুসলমানেরা তাঁকে অন্তর থেকেই গ্রহণ করেছিল। স্বরাজ্য দল গঠনের পর তিনি মাত্র তিনবছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে দেশে, বিশেষ করে বাংলায় তিনি যে অসাম্প্রদায়িক বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিলেন, তা তুলনারহিত। তাঁর অকালমৃত্যুতে সমগ্র দেশবাসীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং দেশভাগের বীজ উপ্ত হয়েছিল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর 'India Wins Freedom' গ্রন্থে লিখেছেন: "I am convinced, if he had not died a premature death, he would have created a new atmosphere in the country. It is a matter for regret that after he died, some of his followers assailed his position and his declaration was repudiated. The result was that the Muslim of Bengal moved away from Congress and the first seeds of partition was sown."[৪]

এথেকে বোঝা যায় যায়, দেশবন্ধুর ওপর বিবেকানন্দের সমন্বয়-প্রভাব কতখানি ছিল। এবং আজও দেশ যখন নানা দ্বন্দ্ববিভেদে দীর্ণ থেকে দীর্ণতর হয়ে চলেছে, তখন বিবেকানন্দ

আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন, যিনি শতবর্ষ পূর্বে শিকাগো ধর্মমহাসভার সমাপ্তি দিবসে ঘোষণা করেছিলেন ঃ "বিবাদ নয় সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।"

এরপর বলতে হয় সুভাষচন্দ্রের ওপর বিবেকানন্দের প্রভাবের কথা। সুভাষ ছিলেন যুবসমাজের প্রাণের রাজা। নিজেকে তিনি বিবেকানন্দের ভাবসন্তান বলে মনে করতেন। আমরা দেখি সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবনই তাঁর আদর্শপুরুষের মতোই dynamic। আমেরিকা বিবেকানন্দের নাম দিয়েছিল 'Cyclonic Monk'। সুভাষচন্দ্র ছিলেন 'Cyclonic Patriot'। ৩০ মার্চ ১৯২৯-এ রংপুর ভাষণে সুভাষ বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সর্বতোমুখী প্রভাবের কথা বলে স্বামীজীর বিখ্যাত উক্তিটি উদ্ধৃত করেন—"নতুন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে।" এরপর নিজের মন্তব্য যোগ করলেন সুভাষচন্দ্র—"এই তো বাংলার সোস্যালিজম। এই সোস্যালিজমের জন্ম কার্ল মার্কসের পুঁথিতে নয়, এর জন্ম ভারতের চিন্তা এবং সংস্কৃতি থেকে।... স্বাধীনতার অখণ্ড রূপের আভাস রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মধ্যে পাওয়া যায়। 'Freedom, freedom is the song of the soul'—এই বাণী যখন স্বামীজীর রুদ্ধ দুয়ার ভেদ করিয়া নির্গত হয়, তখন সমগ্র দেশবাসীকে মুগ্ধ ও উন্মত্তপ্রায় করিয়া তোলে।"[৫] সুভাষচন্দ্র বিবেকানন্দ সম্বন্ধে যখন এই অসাধারণ কথাগুলি উচ্চারণ করেন, তখন তাঁর বয়স ৩৩ বছর। কিন্তু স্কুল-কলেজ জীবন থেকেই তিনি বিবেকানন্দকে তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা করেছিলেন। আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, স্কুলজীবনেই স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী তাঁর হাতে আসে। আদ্যন্ত পড়ার পর তাঁর অনুভূতির কথা লেখেন ১৯৩৭-এ, তাঁর ৪০ বছর বয়সে ঃ "মজ্জাবধি আমার শিহরণ খেলে গেল। প্রধানশিক্ষক মহাশয়... আমার জীবনে নতুন এক শক্তি এনে দিয়েছিলেন, কিন্তু এমন কোন আদর্শ তাঁর কাছ থেকে লাভ করিনি, যার জন্য সমগ্র সত্তাকে আমি উৎসর্গ করতে পারি। বিবেকানন্দ আমাকে তাই এনে দিলেন।... তারপর আমার মধ্যে হলো এক বিপ্লব এবং সমস্ত কিছু ওলট-পালট হয়ে গেল।"[৬] "বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণের মধ্যে যে দর্শন খুঁজে পেয়েছিলাম... তাকে ভিত্তি করে আমার নৈতিক ও বাস্তব জীবন গড়ে তুলতে আমি পেরেছিলাম। এর সাহায্যে কয়েকটি মূলনীতি আমি শিখেছিলাম যার দ্বারা আমার সামনে যখনই কোন সমস্যা বা সঙ্কট দেখা দিত তখনি আমার আচরণ কিংবা কার্যধারা নির্ণয় করা সম্ভব হত।"[৭] এথেকে বোঝা যায়, সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবনই ছিল বিবেকানন্দময়।

সুভাষচন্দ্রের ঐ রংপুর ভাষণের ১৫ বছর আগে—১৯১৪ সালে আদি ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী'-তে 'লোকহিতের নূতন আদর্শ' নামে অজিতকুমার চক্রবর্তী লেখেন ঃ "দেশময় বিবেকানন্দের লেখার যত প্রভাব, এমন বোধ হয় বঙ্কিমের উপন্যাসেও নয়। [স্মর্তব্য ঃ বঙ্কিমচন্দ্র তখন সর্বাধিক পঠিত ঔপন্যাসিক।] ঘরে ঘরে বিবেকানন্দের ছবি। তাছাড়া বিবেকানন্দের সেবক সম্প্রদায় দেশের নানা জায়গায় পীড়িতদের শুশ্রূষা ও দরিদ্রের ভরণ করিতেছে—এ তো প্রত্যক্ষ। যেকোন কলেজপড়ুয়া ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর [শুনিবে যে,] বিবেকানন্দের প্রভাব তাহার উপর যেমন, এমন আর কোন মানুষের নয়। বাংলাদেশে এখন বিবেকানন্দ পর্ব চলিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"[৮]

স্বদেশী আন্দোলনের মনোভূমি নির্মাণে বিবেকানন্দের অনস্বীকার্য প্রেরণার কথা সমসাময়িক তথ্যসূত্রে সমর্থিত। আন্দোলনের সব কয়টি ধারাতে—নরম, মধ্য, চরম ও বিপ্লবপন্থী সকলেই তাঁর কাছে ঋণস্বীকার করেছেন। অ্যানী বেসান্ত তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন ঃ "[Vivekananda] roused the strongest feeling of Nationality." স্বদেশী যুগের তাত্ত্বিক নেতা এবং অগ্ন্যুদগারী বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল মাদ্রাজের 'কমন উইল' পত্রিকায় ১৩ আগস্ট এবং ১ সেপ্টেম্বর ১৯১৬ তারিখে লিখেছিলেন ঃ "কতকগুলি দিক দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অবশ্যই দাবি করা যাবে—তিনি আমাদের জাতীয়তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক ও প্রফেট। তিনিই প্রথম আমাদের দেশ ও সংস্কৃতির পক্ষে জ্বলন্ত বাসনার সুর তুলেছিলেন। তীব্র অনুভূতিময় সেই দেশপ্রেম, যা গত দশকের জাতীয়তাবাদী প্রচারের মধ্যে প্রধান আশ্রয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।"

এর চার বছর আগে বালগঙ্গাধর তিলক 'মারাঠা' পত্রিকায় লেখেন ঃ "Swami Vivekananda is the real father of Indian nationalism. He wanted to develop a modern India. Every Indian is proud of his father of modern India."[৯]

বৈপ্লবিক আন্দোলনের ওপর বিবেকানন্দের প্রভাবের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বিবেকানন্দ-শিষ্যা নিবেদিতার কথা বলতে হয়, যিনি স্বামীজীর বৈপ্লবিক চেতনার প্রচারকে নিজের জীবনব্রত করেছিলেন। গুরুর প্রতি আত্যন্তিক শ্রদ্ধায় এই আইরিশ কন্যা নিজ দেশ ছেড়ে ভারতবর্ষকেই নিজের দেশরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাই ব্রিটিশ-পদানত ভারতের মুক্তি ছিল তাঁর একান্ত কাঙ্ক্ষিত। ওদিকে গুরুর প্রতিষ্ঠিত মিশন ও তার সেবাকর্মের মধ্যেও তিনি নিজেকে জড়িয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। দীর্ঘ হয়েছিল তাঁর অন্তঃসংঘাত। বিবেকানন্দ তাঁকে ভারতের বৈপ্লবিক মুক্তিসংগ্রামের পথে যেতে নিষেধ করেননি, কিন্তু বলেছিলেন তাঁকে দুটোর যেকোন একটিকে বেছে নিতে হবে, কারণ স্বামীজী-নির্দেশিত মঠ ও মিশনের আদর্শের মধ্যে রাজনীতির স্থান ছিল না, ছিল শুধু মানব-কল্যাণ আর অধ্যাত্মবাদ। মিশন হবে সকল ধর্মের মিলনক্ষেত্র। শেষ পর্যন্ত বিবেকানন্দের বৈপ্লবিক ভাবমূর্তিই এই অগ্নিকন্যার হৃদয় অধিকার করল। মিশনের সঙ্গে তাঁর আনুষ্ঠানিক সম্পর্কচ্ছেদ হলো।

204653
THE RAMAKRISHNA MISSION INSTITUTE OF CULTURE LIBRARY

অরবিন্দের ওপরও স্বামী বিবেকানন্দের বিপুল প্রভাব পড়েছিল। বস্তুত, বিবেকানন্দ যুবশক্তিকে জাগরিত করে অরবিন্দের ক্ষেত্রটিকে প্রস্তুত করেই রেখেছিলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হলে তিনি বরোদার সাতশ টাকা মাইনের চাকরি ছেড়ে নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করলেন মাত্র দেড়শ টাকায়। ১৯০৬ সালে তিনি বিখ্যাত দৈনিক 'বন্দে মাতরম্' প্রকাশ করেন। এই কাগজে তাঁর লেখাগুলি জাতির ধমনীতে রক্তস্রোত বইয়ে দিতে শুরু করে। তাঁর পরিচালনায় 'যুগান্তর পত্রিকা'ও প্রতিষ্ঠিত হয়। অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ছিলেন এর প্রধান লেখক। একইসঙ্গে অরবিন্দের সহযোগী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ও, যিনি ছিলেন বিবেকানন্দের বাল্যবন্ধু, 'সন্ধ্যা' পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। এইসব পত্রিকায় বিপ্লবের কথাই লেখা হতো, যেগুলি ছিল বিবেকানন্দের আদর্শে পূর্ণ, এমনকি তাঁর ব্যবহৃত শব্দ, বাক্যগুলি পর্যন্ত। ১৯১৩ সালের ১ এপ্রিল 'ইংলিশম্যান'-এর সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল ঃ "He [Vivekananda] was using phrases and expressions which were later repeated in the Jugantar with most mischievous results." অরবিন্দের 'কর্মযোগিন'-এর লেখাগুলিতে বিবেকানন্দের প্রভাব ভূরি ভূরি মিলবে। তাঁর 'ভবানী-মন্দির' পুস্তিকায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে আদর্শ পুরুষ হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং তা গোয়েন্দা রিপোর্টে ক্রূর উল্লেখের কারণও হয়েছে।

সশস্ত্র বিপ্লবীরা এবং চরমপন্থীরা তো বিবেকানন্দের 'অভীঃ' ও 'স্বদেশমন্ত্র'কে ('তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত') তাঁদের জীবনের মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। ডাঃ লাডলীমোহন রায়চৌধুরী সরকারি কর্মচারি সি. টিন্ড্যালের একটি রিপোর্ট বাঙলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছেন ('শিলাদিত্য', মার্চ ১৯৮৩), যার বড় অংশ জুড়ে রয়েছে একটি বিষয়—বিবেকানন্দের বই পড়ে কিভাবে যুবকদের বুদ্ধি বিকৃতি ঘটত। অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে টিন্ড্যাল লিখেছিলেন ঃ "বিপ্লব ও নরহত্যায় উসকানিদাতা 'দ্য লিবার্টি' নামক প্রচারপত্রগুলির শিরোদেশে বিবেকানন্দের বাণী উদ্ধৃত করা হতো।" রাউলাট রিপোর্ট তো আরো চমৎকার ঃ বিপ্লবী সমাজে বিবেকানন্দের এমনই জনপ্রিয়তা যে, তাঁর নাম ও রচনার চার ফেলে বিপ্লবীদের দলে ঢোকানো যায়। এই কারণে নাকি পূর্ববঙ্গে ব্যাঙের ছাতার মতো প্রাইভেট রামকৃষ্ণ আশ্রম গজিয়ে উঠেছিল। স্টিফেনসন একটি অদ্ভুত শব্দ ব্যবহার করেছিলেন—"রামকৃষ্ণ মিশন আবহাওয়া", যার আওতায় বিপ্লবীরা ছিল। অ্যানী বেসান্তের 'কমন উইল' পত্রিকার ১৩ আগস্ট ১৯১৫ সংখ্যায় একটি সংবাদ ছিল, রাওয়ালপিণ্ডিতে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল কয়েকটি বিচিত্র অপরাধে, যথা—(১) তার কাছে একটি পোস্টকার্ড পাওয়া গিয়েছিল যাতে পত্রদাতা লিখেছিলেন যে, তিনি দেশের জন্য মরতে প্রস্তুত, (২) তার বাড়ি তল্লাশি করে বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী পাওয়া গেছে, ইত্যাদি।[১০]

সশস্ত্র সংগ্রামে স্বামীজীর প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে তাই কোন মতভেদ নেই, কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লব সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধারণাটি কি ছিল? প্রশ্নটি এজন্যই আরো ওঠে যে, তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত মঠ ও মিশনের কার্যাবলী এবং অনুশাসন থেকে রাজনীতিকে সম্পূর্ণরূপে দূরে রেখেছিলেন, অথচ নিবেদিতাকে তিনি তাঁর অভীষ্ট পথে যেতে নিষেধও করেননি। ব্যাপারটি তাহলে কী? এর উত্তরে বলতে হয়, তিনি ঐ পথের বিরোধী ছিলেন না, কাউকে ঐ পথ গ্রহণ করতেও নিষেধ করেননি, কিন্তু তাঁর আপত্তি ছিল দুটি জায়গায়—(১) সেই সংগ্রাম মানুষের অসংগঠিত অবস্থায় করা চলবে না এবং (২) তা হবে একান্তই আত্মশক্তির ওপর নির্ভর করে, কোনরূপ বৈদেশিক বা বাইরের সাহায্য নেওয়া চলবে না। ১৯০২ সালের গোড়ার দিকে বালগঙ্গাধর তিলক বেলুড় মঠে তাঁর সাথে দেখা করলে তিনি বলেন ঃ "বিদেশী শাসনাধীন আমরা। আমাদের রাজনীতিকে আত্মশক্তির ওপর নির্ভরশীল হতে হবে। আমাদের পদ্ধতি অবশ্যই হবে সঙ্ঘাতশীল ও প্রতিরোধাত্মক। তা এমন রূপ ধরুক যার ফলে আমাদের শাসকরা নতিস্বীকারে বাধ্য হয়।"[১১]

স্বামীজী তাঁর মিশনে সেই আত্মশক্তির বিকাশ ঘটাতে চেয়েছিলেন। তিনি সর্বদা তাই বলতেন—খাঁটি মানুষ তৈরি করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য—"Man making is my mission." এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, চিরবিদ্রোহী বিবেকানন্দ সশস্ত্র বিপ্লবের প্রথম ধাপের কষ্টকর এবং সিংহভাগ কাজটিই হাতেকলমে শুরু করেছিলেন এবং অপর অংশের অর্থাৎ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রেরণা দিয়ে গেছেন। প্রখর ও পরিণত রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় স্বামীজী বুঝেছিলেন, যদি প্রস্তুতিবিহীন অবস্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে এসে যায়, তাহলে মুষ্টিমেয় কিছু লোক তা আয়ত্ত করবে এবং জনগণ যে-তিমিরে, সেই তিমিরেই থেকে যাবে। অর্থাৎ শুধু কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর মাত্রই হবে—দেশের, দশের, মানুষের কোন উপকার হবে না। পাশ্চাত্য রাজনীতির ভয়াল রূপ দেখে স্বামীজী গণতন্ত্রেরও সমালোচনা করেছিলেন ঃ "Democracy is the devil's dance in man" বলে।

'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে স্বামীজী এবিষয়ে আরো সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন ঃ "মূর্খ ক্ষত্রিয় রাজা সহায় হইলে ব্রাহ্মণেরা যে শূদ্রদের জিহ্বাচ্ছেদ, শরীরভেদাদি পুনরায় করিবার চেষ্টা করিবে না, তাহা কে বলিতে পারে?" সেজন্যই তিনি জনগণের প্রস্তুত অবস্থার কথা, অর্থাৎ স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সাথে মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির কথাও এত জোর দিয়ে বলতেন। স্বামীজী অখণ্ড বা সার্বিক মুক্তিতেই বিশ্বাসী ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা এসেছে যখন দেশ প্রকৃতপক্ষে প্রস্তুত ছিল না। বলা ভাল, বিয়াল্লিশের আন্দোলনে পূর্বের সব প্রস্তুতি ভেঙে পড়েছিল। নতুন করে প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই স্বামীজী-কথিত 'ক্ষত্রিয় রাজারা' বড় চটজলদি ক্ষমতা দখল করে নিলেন। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির ৫৩ বছর পরে দেশের অবস্থা দেখলে স্বামীজীর উপরি উক্ত কথাগুলিকে আর্ষবাক্য বলেই মনে হয়।

স্বামীজী দেশের মুক্তি আন্দোলনে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করতে নিষেধ করতেনই শুধু নয়, অযাচিত সাহায্যকেও অপছন্দ করতেন। নিবেদিতাকে তিনি ওকাকুরার কথামতো এদেশে আন্দোলন চালাতে নিষেধ ও সতর্ক করে দিয়েছিলেন, যদিও ওকাকুরাকে তিনি ভালবাসতেন। বহুবিধ গুণসমন্বিত ওকাকুরা যে নিবেদিতাকে একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে [তাঁর কথায় 'ওকাকুরা স্পেল'] কিছুকাল রাখতে পেরেছিলেন, একথা তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু স্বামীজীর দেহত্যাগের ৬ বছর পরে গুরুর সতর্কতার কারণ তাঁর কাছে আর অবোধ্য ছিল না।

ওকাকুরা ছিলেন বিবেকানন্দেরই বয়সী, জন্ম ১৮৬৩ সালে। তিনি 'নিপ্পন বিজিৎসু' বা 'হল অফ ফাইন আর্টস' স্থাপন করেন এবং জাপানের সরকারি প্রতিষ্ঠান—'ইম্পিরিয়াল আরকিয়লজিক্যাল কমিশন'-এর প্রধান সংগঠক ছিলেন। ১৯০১ সালে জাপানে থাকাকালে ওকাকুরার সাথে মিস ম্যাকলাউডের বন্ধুত্ব হয়। মিস ম্যাকলাউড বলতেন, তিনিই ওকাকুরাকে ভারতে আনেন। সাময়িক পত্র-পত্রিকাতে দেখা যায়, তিনি ভারতে এসেছিলেন স্বামীজীকে একটি ধর্মমহাসভায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। ১৯০২-এর জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে তিনি কলকাতায় আসেন। এখানে থাকাকালে নিবেদিতার সূত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথ এবং ঠাকুর পরিবারের সাথে, বিশেষত সুরেন্দ্রনাথ ও সরলাদেবীর সাথে পরিচিত হন। রবীন্দ্রনাথ ওকাকুরার ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

স্বামীজীর শরীরের অবস্থা তখন ভাল ছিল না। তাই জাপানে তিনি আর যাননি। তাঁর না যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে অন্য কারণ থাকাও অস্বাভাবিক নয়। কারণ, ১৯০২ সালের শেষে ওকাকুরা এদেশে রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েন। নিবেদিতার সহায়তায় বা নিবেদিতাকে সহায়তা দানের জন্য সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মেও তিনি নিজেকে জড়ান। যদি স্বামীজীকে নিয়ে যাওয়া তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হতো, তাহলে ভারতে আসার অল্পদিন পরে তিনি বৈপ্লবিক কাজকর্মে জড়াতেন না। কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া তা সম্ভবপরও ছিল না। তাই ওকাকুরা-সূত্রে ভারতে বৈদেশিক অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা সম্বন্ধে স্বামীজী সন্দিগ্ধ না হয়ে পারেননি। নিবেদিতাকে তিনি তাই সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তাতে নিবেদিতা তাঁর বৈপ্লবিক কাজকর্ম ছাড়লেন না, কিন্তু ছাড়লেন রাতারাতি সবকিছু সেরে ফেলার মনোভাব —যা ওকাকুরা চাইছিলেন। দেহত্যাগের মাত্র ৫ দিন আগে (২৯ জুন ১৯০২) স্বামীজী নিবেদিতাকে বলেছিলেন: "আগে তোমার ব্রাহ্ম বিশ্বাস ছিল, টেগোর বিশ্বাস ছিল, বর্তমান তোমার এই এই সকল (ওকাকুরা-কেন্দ্রিক) বিশ্বাস। এগুলিও যাবে, যেমন গেছে অন্যগুলি।" মাত্র ৬ মাস পরেই নিবেদিতা বুঝতে পেরেছিলেন—ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশের মুক্তি কয়েকটি খুচরো সন্ত্রাসমূলক কাজের দ্বারা ঘটানো সম্ভব নয়।

স্বামীজীর দেহত্যাগের কিছু পরে ওকাকুরা জাপানে ফিরে যান। জাপানে কিন্তু সেই ধর্মমহাসভা কোনদিন হয়নি। ওকাকুরা-গবেষক হোরিওকা জানিয়েছেন যে, স্বামীজী তাঁর জীবনের শেষ পর্বে 'মহাযান' মতকে 'হীনযান'-এর তুলনায় প্রাচীনতর বিবেচনা করেছিলেন। ওকাকুরা নিজে ছিলেন মহাযানী মতের পক্ষপাতী। ভেবেছিলেন, মহাযানীর মত খাঁটি বৌদ্ধ মত নয় বলে জাপানে একশ্রেণীর পণ্ডিতের মধ্যে যে-ধারণা বলবৎ আছে, তার মোকাবিলায় সুবিধা হবে স্বামীজীর সাহায্য পেলে। আমাদের মনে হয়, ওকাকুরা-প্রকল্পিত ধর্মমহাসভার আয়োজনের পিছনে জাপান সরকারের আনুকূল্য ছিল। শিকাগো ধর্মমহাসভার পর প্যারিসে এক ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শিকাগোতে স্বামীজী আত্মসন্তুষ্ট অহঙ্কৃত মিশনারিদের বিজয়বাসনাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিলেন। তাই প্যারিস ধর্মমহাসভার পরিকল্পনা বাতিল হয়। জাপান সরকার সেই শূন্যস্থান পূরণ করে নিজেদের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করতে চেয়েছিলেন।

ওকাকুরা যে জাপান সরকারের 'এজেন্ট' হিসাবে এসেছিলেন, সেটি নিবেদিতা বুঝতে পারেন স্বামীজীর দেহত্যাগের পর ওকাকুরার 'আইডিয়াল অফ দ্য ইস্ট' গ্রন্থখানি ১৯০৪ (১৯০৩?)-এ নিবেদিতারই ভূমিকা-সহ প্রকাশিত হলে। এই গ্রন্থের প্রথম বাক্য ছিল—"Asia is one", আর শেষ বাক্য—"Victory from within or death from without"। এই বাণীগুলি বাংলা থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত মুখে মুখে প্রচারিত হলো। এমনকি লাজপত রায় প্রমুখ দেশভক্তদের কলমেও প্রতিফলিত হতে লাগল। কিন্তু তারপর কোরিয়াতে জাপানের নগ্ন আগ্রাসন ও সাম্রাজ্যবাদের বীভৎস মূর্তির প্রকাশ ঘটল। 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় নিবেদিতা ব্যঙ্গ করে লিখলেন: "এখানেই তো দেখতে পাচ্ছি এশিয়ার দেশগুলির জন্য জাপানের হৃদয়ের চেহারা।" এই লেখা নিবেদিতার আত্মব্যঙ্গও বটে, কারণ গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি নিজেই লিখেছিলেন: "Asia, the Great Mother is for ever One." আর ১ মে ১৯০৮ অনুতপ্ত হৃদয়ে নিবেদিতা লিখলেন: "যদি আমি গ্রন্থটির আসল তাৎপর্য কি বুঝতে বা ভাবতে পারতাম, যা এখন আমি পারছি, তাহলে আমার সাহায্যের দান কদাপি প্রদত্ত হতো না।" উদ্দেশ্যটা কিন্তু স্বামীজী বহুদিন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। দিব্যদর্শী আর কাকে বলে! বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ না করতে তাঁর নির্দেশ যে কতখানি অভ্রান্ত ছিল তা এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। প্রসঙ্গত, নেতাজী বৈদেশিক সাহায্য নিয়েছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশ রাজশক্তিকে আঘাত করেছিলেন বাইরে থেকেই। দেশের মধ্যে ডেকে এনে বিপদ ঘটাতে যাননি। তিনি রণে পরাজিত হলেও তাঁরই ধাক্কায় ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে মৃত্যুঘণ্টা শুনতে পেয়েছিল এবং তাদের প্রস্থান ত্বরান্বিত হয়েছিল। মনে রাখতে হবে, নেতাজী নিজেকে স্বামীজীর ভাবশিষ্য বলতেন।

আজ দেশে দেশে সন্ত্রাসবাদ জাঁকিয়ে বসেছে, যার রূপ কার্যত বিচ্ছিন্নতাবাদের। সন্দেহ নেই, খুচরো সন্ত্রাসবাদের দিন শেষ। শ্রীলঙ্কায় এল. টি. টি. ই.-রা তো সমান্তরাল সরকার চালাচ্ছে। তারা শ্রীলঙ্কার দাসত্ব থেকে মুক্তি চায়। ভারতে

কাশ্মীর বা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উগ্রপন্থীরা সে-তুলনায় খুচরো, কিন্তু বিদেশী সাহায্যপুষ্ট হওয়ায় যথেষ্ট শক্তিশালী। সেসব জায়গার উগ্রপন্থীরাও ভারতের দাসত্ব থেকে মুক্তি চায়। ধরা যাক, তাদের প্রস্তাবিত অঞ্চলকে তারা মুক্ত করতে পারল, কিন্তু তাতে কি সেইসব নতুন ভূখণ্ডের মানুষেরা স্বাধীনতার স্বাদ পাবে? উদাহরণটা বাংলাদেশ থেকে নেওয়া যেতে পারে। পাকিস্তান থেকে তারা মুক্ত হয়েছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক এবং সামাজিক মুক্তি সেখানে আজো দূর অস্ত। যদিও মিলিটারী শাসনের পরে সেখানে গণতান্ত্রিক সরকার হয়েছে, কিন্তু বিরোধী সব দল সেই সরকারকে বর্জন করেছে। এসবই খণ্ড মুক্তি। তাই বিবেকানন্দ আজও এরকম ক্ষেত্রগুলিতে প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

অগ্নিযুগের যেসব বিপ্লবী পরবর্তী জীবনে মার্ক্সবাদ গ্রহণ করেছেন তাঁরাও—যথা গণেশ ঘোষ, সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার তাঁদের মনোগঠন পর্বে বিবেকানন্দের ভাব ও ভূমিকার কথা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন। আর আজ তো দেখছি, এদেশে মার্ক্সবাদীরা প্রায়শই বিবেকানন্দকে স্মরণ করছেন। সেইসঙ্গে সুভাষচন্দ্রকেও।

নারীমুক্তি ও নারী-অধিকার আন্দোলনের দিকে তাকালে আমরা বিবেকানন্দকেই পুরোধা হিসাবে পাই। এক শিষ্যকে তিনি বলেছিলেন ঃ "স্মৃতি-ফৃতি লিখে নিয়ম-নীতিকে বদ্ধ করে এদেশের পুরুষেরা মেয়েদের একেবারে manufacturing machine করে তুলেছে। মহামায়ার সাক্ষাৎ প্রতিমা এইসব মেয়েদের তাই না তুললে বুঝি তোদের আর উপায়ান্তর আছে?" আরো বলেছিলেন ঃ "যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের পুজো নেই, সে-জাত কখনো বড় হতে পারেনি, কস্মিনকালেও পারবে না।... গৃহলক্ষ্মীগণের পূজাকল্পে—তাদের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা বিকাশকল্পে মেয়েদের মঠ করে যাব।... এই যে বিদেশী মেয়েরা আমার চেলী হয়েছে, এরাই এ-কাজে জীবনপাত করে যাবে।"

অবশ্য স্বামীজীর অদ্বৈত দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষে কোন ভেদ ছিল না। বৈদিক যুগে নারীদের অধ্যাত্মজ্ঞানের অধিকার ছিল। তা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি চাইতেন তা ফিরে আসুক, নারী ও পুরুষের সর্বপ্রকার অধিকারগত ভেদ দূর হোক। শতাধিক বর্ষ পরে অনুষ্ঠিত বেজিঙের বিশ্বনারী সম্মেলনে নারী-পুরুষের সমানাধিকার দাবিই ঘোষিত হলো। আমেরিকার 'ফার্স্ট লেডি' হিলারী ক্লিন্টনের কণ্ঠে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারিত হলো ঃ বিশ্বনারী সম্মেলনের এই বার্তাই হওয়া উচিত—নারী-অধিকার বলে আলাদা অধিকার কিছু নয়, 'নারী-অধিকারই মানবাধিকার, মানবাধিকারই নারী-অধিকার'। বিবেকানন্দ এক্ষেত্রেও কত প্রাসঙ্গিক!

কিন্তু অধিকার চাই বলে দাবি করে অধিকার আদায় সম্ভব হলেও তা বজায় রাখা খুবই কঠিন। এদেশেও এখন একশ্রেণীর উগ্র নারীবাদীর আবির্ভাব হয়েছে। পুরুষের সমান অধিকার দাবি করতে গিয়ে তারা পারলে পুরুষকেই জীবন থেকে বাদ দিতে চায়! তা তো আর হয় না। পক্ষান্তরে তাঁরা নিজেরা কোন স্বাধীন ব্যবস্থাতন্ত্র গড়ে তুলতে পারেননি। সারা পৃথিবীর ক্ষেত্রেই একথা কমবেশি আজও সত্য, এদেশে তো কথা নেই। বিবেকানন্দ এর সমাধানের কথাও চিন্তা করেছিলেন এবং করেছিলেন তাঁর অদ্বৈত দৃষ্টিতেই—নারী ও পুরুষকে সমপর্যায়ে বসিয়ে।

শুধু নারীদের জাগরণের কথাই ভাবেননি স্বামীজী, 'পিছড়ে' বর্গদের কথাও ভেবেছেন। বারংবার বলেছেন শূদ্রজাগরণের কথা। বলেছেন—শূদ্রশাসন আসবেই, কেউ তাকে রোধ করতে পারবে না। 'শূদ্র' বলতে তিনি যে বর্ণাশ্রমের চতুর্থ বর্ণকেই সর্বদা বুঝিয়েছেন এমন নয়, মনুষ্যসমাজের পিছনের সারির মানুষদের কথাই বলেছেন—তা মালিক সাপেক্ষে শ্রমিক বা ধনী সাপেক্ষে দরিদ্র বা ব্রাহ্মণ সাপেক্ষে শূদ্রও হতে পারে। অর্থাৎ স্বামীজী 'শূদ্র' বলতে বর্ণ-শূদ্র এবং জাতি (সম্প্রদায়)-শূদ্র উভয়কেই বুঝিয়েছেন এবং তা শুধু ভারতবর্ষেরই নয়, সমগ্র পৃথিবীর।

জাতি-শূদ্রের জাগরণ সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য ছিল—এটি হবে কালের নিয়মে। 'বর্তমান ভারত'-এ তিনি লিখেছেন ঃ "কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণও শূদ্রের নিম্নাসনে সমানীত হইতেছে এবং শূদ্রজাতিও উত্তোলিত হইতেছে। শূদ্রপূর্ণ রোমকদাস ইওরোপ ক্ষত্রবীর্যে পরিপূর্ণ। মহাবল চীন আমাদের সমক্ষেই দ্রুতপদসঞ্চারে শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইতেছে। নগণ্য জাপান খধূপতেজে শূদ্রত্ব দূরে ফেলিয়া ক্রমশ উচ্চবর্ণাধিকার আক্রমণ করিতেছে। আধুনিক গ্রিস ও ইতালির ক্ষত্রতাপত্তি ও তুরস্ক-স্পেনাদির নিম্নাভিমুখ পতনও এস্থলে বিবেচ্য। তথাপি এমন সময় আসিবে, যখন শূদ্রত্বসহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যেপ্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্মকর্মসহিত সর্বদেশের শূদ্রেরা একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোস্যালিজম (সমাজতন্ত্রবাদ), এনার্কিজম (নৈরাজ্যবাদ), নাইহিলিজম (নাস্তিবাদ) প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।"

শতাধিক বর্ষ আগের স্বামীজীর বিশ্বব্যবস্থার এই সমীক্ষা-চিত্র এখন নিশ্চয়ই অন্যরকম। দু-দুটি বিশ্বযুদ্ধ, পরমাণু বোমা আবিষ্কার, শীতল যুদ্ধ, শীতল যুদ্ধের অবসান, দুই মেরু-বিশ্ব থেকে এক মেরু-বিশ্ব ইত্যাদি নানা কারণে বিশ্বের চিত্র এখন অন্যরকম। স্বামীজী 'চণ্ডুখোর' চীনকে শূদ্রত্বপ্রাপ্ত দেখেছিলেন, কিন্তু চীন এখন মহাশক্তিধর দেশ। চীন রাষ্ট্রসঙ্ঘের সিকিউরিটি কাউন্সিলের পাঁচ সদস্য দেশের অন্যতম। কিন্তু স্বামীজীর মূল বক্তব্য ঠিকই আছে। কালক্রমে হীনও উচ্চ হচ্ছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি জোটবদ্ধ। তারা একক বা সম্মিলিতভাবে ওপরে উঠে আসতে চাইছে। ভারত সেজন্য সিকিউরিটি কাউন্সিলের সদস্যপদের দাবিদার। ভারত না হয় বৃহৎ দেশ, কিন্তু ক্ষুদ্র দেশ কিউবা? কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল কাস্ত্রো কলম্বিয়ার

কারতাহেনায় ২০ অক্টোবর ১৯৯৫ নির্জোট শীর্ষ বৈঠকে ('ন্যাম') বললেনঃ "অনেক হয়েছে, রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদে মাত্র ৫টি দেশ (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন) বসে গোটা দুনিয়ায় ছড়ি ঘোরাবে, এটা বরাবর চলতে পারে না।" কাস্ত্রো দাবি করেছেন—নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যসংখ্যা বাড়িয়ে ১১ করা হোক। তাঁর আরো সাফ কথা—এশিয়া, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা থেকে দুজন করে নতুন সদস্য নেওয়া হোক। আমেরিকা যদি ব্রাহ্মণ হয়, তবে লাতিন আমেরিকা কি বৈশ্য এবং আফ্রিকা শূদ্র নয়? এই শূদ্রজাগরণ হচ্ছে কি করে? অবশ্যই কালক্রমে। বিবেকানন্দ তাহলে কি আজো প্রাসঙ্গিক নন?

'শূদ্র' অর্থে সাধারণ মানুষও। এব্যাপারে দার্শনিক কার্ল মার্ক্সও চিন্তা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের শ্রেণীচরিত্র বিচার করে নীচুতলার মানুষদের জাগরণ বা অগ্রগতি। এজন্য তিনি চেয়েছিলেন সাম্যবাদ বা Communism প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব স্থাপন। বিবেকানন্দ মনে করতেন, এভাবে অন্য শ্রেণীর মানুষের ওপর প্রভুত্ব ও অধিকার সৃষ্টি মানবিক অবক্ষয়েরই সূচনা করবে। শাশ্বত অদ্বৈতভাব এবং বৈদান্তিক চেতনায় তিনি এক্ষেত্রে সমন্বয়ের কথাই চিন্তা করতেন, অর্থাৎ উঁচুকে টেনে নামানোর প্রয়োজন নেই, নিচুকে উঁচু করাই দরকার। চীনে বাজার অর্থনীতি, সোভিয়েত রাশিয়ার অবলুপ্তি ইত্যাদি ঘটনার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে স্বামীজীর দৃষ্টিভঙ্গির কথা। চীন অবক্ষয় রোধ করতে চাইছে, কিছুটা পেরেছে বলে মনে হয়। রাশিয়ার ভবিষ্যৎ এখনো স্পষ্ট নয়। তবে সেখানে কালক্রমে যা হবে, তা স্বামীজীর এই সমাধানের বাইরে হবে বলে মনে হয় না।

ভারতে জাতিভেদ (বর্ণভেদ) একটা সমস্যা। এখানে বর্ণশূদ্রের জাগরণ বিপুলভাবে ঘটেছে। তাদের জন্য নানা সংরক্ষণব্যবস্থা ও সাংবিধানিক রক্ষাকবচ রয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উচ্চবর্ণের মানুষকে টেনে নামানোর একটা প্রয়াস নিম্নবর্ণের লোকদের মধ্যে দেখাও যাচ্ছে। এখানেও স্বামীজীর কথা আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে হচ্ছে। তিনি মাদ্রাজে বলেছিলেনঃ "জাতিভেদের একমাত্র যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা মহাভারতেই পাওয়া যায়। মহাভারতে লিখিত আছে, সত্যযুগের প্রারম্ভে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি ছিল। তাঁরা বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করে ক্রমশ বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হলেন। জাতিভেদ সমস্যার যতরকম ব্যাখ্যা শোনা যায়, তন্মধ্যে এটাই একমাত্র সত্য ও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা। আগামী সত্যযুগে আবার ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই ব্রাহ্মণে পরিণত হবেন। সুতরাং ভারতের জাতিভেদ সমস্যার মীমাংসা এরূপ দাঁড়াচ্ছে—উচ্চবর্ণগুলিকে হীনতর করতে হবে না, ব্রাহ্মণজাতিকে ধ্বংস করতে হবে না। ভারতে ব্রাহ্মণই মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ—শঙ্করাচার্য তাঁর গীতাভাষ্যের ভূমিকায় এটি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণের অবতরণের কারণ বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করবার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন।... এই ব্রাহ্মণ, এই দিব্য মানব ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ। এই আদর্শ ও পূর্ণমানবের প্রয়োজন আছে, তাঁর লোপ হলে চলবে না। আধুনিক জাতিভেদ প্রথার যতই দোষ থাকুক, আমরা জানি—ব্রাহ্মণজাতির পক্ষ হয়ে এটুকু বলতেই হবে যে, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা তাঁদের মধ্যেই অধিকতর সংখ্যায় প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব-সম্পন্ন মানুষের জন্ম হয়েছে—একথা সত্য। অন্যান্য জাতির কাছে ব্রাহ্মণদের এ গৌরবটুকু প্রাপ্য। যথেষ্ট সাহস অবলম্বন করে আমাদের তাঁদের দোষ দেখাতে হবে, কিন্তু যেটুকু প্রশংসা—যেটুকু গৌরব তাঁদের প্রাপ্য, সেটুকু তাঁদের দিতে হবে। 'প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার ন্যায্য প্রাপ্য দাও'—এই ইংরেজী প্রবাদবাক্যটি মনে রেখো।"

স্বামীজীর এই ব্যাখ্যায় সত্যযুগ কোন কালবদ্ধ যুগ নয়—যে-যুগে আদর্শ মানুষের সংখ্যা অধিক, সেটিই সত্যযুগ। আদর্শ মানুষরাই ছিল ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণেতরেরাও আদর্শ মানুষ হতে পারেন, সুতরাং সত্যযুগ আবার আসবে। সেটাই হবে শূদ্রজাগরণ। সুতরাং কি দরকার তাও বললেন স্বামীজীঃ "উচ্চতর বর্ণকে নিচে নামিয়ে এ-সমস্যার মীমাংসা হবে না, নিম্নজাতিকে উন্নত করতে হবে।" এখানে একটা কথা, অনুন্নতকে উন্নত করা তখনি সম্ভব বা দ্রুত করা সম্ভব যখন অনুন্নতরাও উন্নতিকামী। কিছু সুযোগ-সুবিধা, অধিকার বিতরণ করলেই সমাজের পিছড়ে বর্গের সত্যিকারের উন্নতি হবে না। কারণ, সেক্ষেত্রে তারা কষ্ট করে উন্নত হতে চাইবে না, শুধু আরো বেশি অধিকার চাইবে এবং উন্নতদের টেনে নামাতে চাইবে। প্রায় এরকম অবস্থাই আজ ভারতবর্ষের, বিশেষ করে হিন্দুসমাজের। স্বামীজী ব্রাহ্মণেতরদের যে-প্রশ্নটি করেছিলেন, সেটি তাই আজ এত বেশি প্রাসঙ্গিক। তিনি প্রশ্ন করেছিলেনঃ "ব্রাহ্মণ যে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছিল এতে তাঁর অপরাধ কি? অন্য জাতিরা কেন জ্ঞানলাভ করল না?... কেন তারা প্রথমে অলসভাবে চুপ করে বসে থেকে ব্রাহ্মণদের জয়লাভের সুযোগ দিয়েছিল?" এরপর আরো স্পষ্ট করে তিনি বললেনঃ "ব্রাহ্মণেতর জাতিকে আমি বলছি—অপেক্ষা কর, ব্যস্ত হয়ো না। সুবিধা পেলেই ব্রাহ্মণজাতিকে আক্রমণ করতে যেও না।... এতদিন তোমরা কি করছিলে? কেন তোমরা এতদিন উদাসীন ছিলে?... ব্রাহ্মণ যে-শিক্ষাবলে এত গৌরবের অধিকারী হয়েছেন, তা অর্জন করার জন্য চেষ্টা কর, তবেই তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।... যখনি এগুলি করবে, তখনি ব্রাহ্মণের তুল্য হবে। ভারতের শক্তিলাভের এটাই রহস্য।"

প্রশ্নটি সঙ্গত একারণে যে, মহাভারতেই পুনঃপুনঃ একথাও বলা হয়েছে, যে ব্রাহ্মণ হয়েও আচারে ব্রাহ্মণ নয়, সে শূদ্রতুল্য এবং যে শূদ্র হয়েও ব্রাহ্মণের মতো আচারী, সে ব্রাহ্মণতুল্য। মহাভারতেই ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের কাহিনী রয়েছে, যিনি ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। আবার এক ধর্মব্যাধের (শূদ্র) কাহিনী রয়েছে যাঁর কাছে ব্রাহ্মণেরাও ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা করতে যেতেন। জাতিভেদ যে ধর্মে (হিন্দু) নেই, আছে সামাজিক ব্যবস্থায়—এই মীমাংসা চমৎকারভাবে করেছিলেন স্বামীজী তাঁর শিকাগো ধর্মমহাসভার

ষোড়শ দিবসের (২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩) ভাষণে ঃ "হিন্দুধর্ম দুই ভাগে বিভক্ত—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড; সন্ন্যাসীরাই জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা করে থাকেন, এতে জাতিভেদ নেই। ভারতের উচ্চতম বর্ণের মানুষও সন্ন্যাসী হতে পারে, নিম্নতন বর্ণের মানুষও সন্ন্যাসী হতে পারে, তখন উভয় জাতিই সমান। ধর্মে জাতিভেদ নেই; জাতিভেদ কেবল সামাজিক ব্যবস্থায়। শাক্যমুনি স্বয়ং সন্ন্যাসী ছিলেন এবং তাঁর হৃদয় এত উদার ছিল যে, লুকানো বেদের মধ্য থেকে সত্যকে বের করে সেগুলি সমগ্র পৃথিবীর লোকের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন—এটাই তাঁর গৌরব।"

কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থা আজ আর সমাজপতিদের দ্বারা পরিচালিত হয় না। একদা ব্রাহ্মণদের দ্বারা পরিচালিত হতো। এখন তাঁদেব স্থান অধিকার করেছেন রাজনীতিকেরা। তাঁরা সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছেন। সুতরাং সমস্যাটা থেকেই গেছে। তাই বিবেকানন্দ আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতার কি কোন শেষ আছে? ব্যষ্টির, সমাজের, রাষ্ট্রের, বিশ্বের, সমগ্র মানবের সকল সঙ্কটেই তাঁর প্রাসঙ্গিকতা অনুভূত হচ্ছে—দিনের পর দিন আরো বেশি করে। কারণ, তিনি মানুষকে, দেশকে, জগৎকে ভালবেসেছিলেন অন্তর থেকে। সেখানে কোন স্বার্থ বা কপটতা ছিল না, তা ছিল অগ্নির মতোই শুদ্ধ, পবিত্র। কিন্তু পরাধীন মাতৃভূমির প্রতি তাঁর টান ছিল সর্বাধিক। তাঁর দেশপ্রেম, শিবজ্ঞানে জীবসেবা, দরিদ্র-নারায়ণ সেবা, শূদ্রজাগরণের আকাঙ্ক্ষা—সবই সমার্থক। প্রেম যদি নিষ্কাম হয় তবে প্রেমাস্পদের জন্য প্রেমিকের ঐকান্তিক টান থাকে—প্রেমের আগুনে প্রেমিকের হৃদয় নিরন্তর জ্বলে। দেশের গরিব-দুঃখী মানুষের জন্য স্বামীজীর ছিল এমন গভীর ভালবাসা। শুধু কি তাই? তিনি তাদের নিজের সমান মনে করতেন, তাদের জন্য গর্ববোধ করতেন। এপ্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়।

১৮৯৭ সালে সেভিয়ার দম্পতি এবং গুডউইন-সহ স্বামীজী জাহাজে চড়ে দেশে ফিরছেন। স্বামীজীর বক্তৃতার সব কিছু তিনি শর্টহ্যান্ডে লিখে রাখতেন। স্বামীজীর ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন 'মূর্তিমান আজ্ঞাবহতা এবং সেবা'। তাহলেও শাসক সম্প্রদায়ের মানুষ হিসাবে ভারতের সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর ছিল একপ্রকার অবজ্ঞা আর সর্বোপরি শাসকজাতি-সুলভ এক অহঙ্কৃত মনোভাব। জাহাজ এডেন বন্দরে এসে ভিড়লে স্বামীজী সকলকে নিয়ে নৌকা চড়ে এডেন বন্দর দেখতে গেলেন। এডেনে অধিকাংশই ভারতবর্ষের লোক। সামান্য দোকানপাট চালায় তারা। ঘুরতে ঘুরতে স্বামীজী তাদের একজনকে তামাক খেতে দেখলেন। তাঁরও ইচ্ছা হলো তামাক খেতে। তিনি দোকানদারের হাত থেকে কলকে নিয়ে তামাক খেতে লাগলেন। স্বামীজী ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় খুব সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁকে এই অর্ধোলঙ্গ ভারতবাসীর সাথে এভাবে মিশতে দেখে গুডউইনের মুখে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পেল। স্বামীজী তা দেখে সঙ্গে সঙ্গে অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। গম্ভীর মুখে বললেন ঃ "এই গরিব-দুঃখী নেংটা লোকরাই আমার জাতভাই। আমি যখন রমতা সাধু হয়ে ঘুরতাম, তখন এই গরিব-দুঃখীরাই আমার জীবনরক্ষা করেছিল। সহস্ররূপে আমি এদের কাছে কৃতজ্ঞ। তুমি যদি এদের ঘৃণা বা অবজ্ঞা কর, তাহলে আমার সঙ্গে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। আমার গরিব জাতভাইকে যে ঘৃণা করে, তাকে আমি পছন্দ করি না। ইচ্ছে হয়, তুমি জাহাজে করে নিজের দেশে চলে যাও। আমি একা ফিরব। আমি গরিব, গরিবদের সঙ্গে থাকব।" গুডউইন এবং সেভিয়ার দম্পতি বুঝলেন স্বামীজীর দেশপ্রীতি কী চরিত্রের।

স্বামীজী দেশে ফেরার পর মিস ম্যাকলাউড তাঁকে লিখলেন ঃ "আমি কি ভারতে যেতে পারি?" স্বামীজী লিখে পাঠালেন ঃ "হ্যাঁ আসতে পার, যদি ক্লেদ, পতন ও দারিদ্র্য দেখতে চাও, সেইসঙ্গে কটিমাত্রবস্ত্র-পরা মানুষ ধর্মকথা বলছে—এই দৃশ্য। যদি অন্য কিছু আশা কর, কদাপি এসো না। একটি বাড়তি সমালোচনাও সহ্য হবে না।" জীবনের শেষ পর্বে এসে স্বামীজী আদিবাসী কেষ্টাকে তৃপ্তিভরে খাইয়ে বলেছিলেন ঃ "ওরে, আজ আমার নারায়ণসেবা হলো।" স্বামীজীর কাছে জীবসেবা নারায়ণসেবায় রূপান্তরিত হয়েছিল। তাঁর সকল কান্না-যন্ত্রণা ছিল এদেরই জন্য। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বলেছিলেন ঃ "দেশের জন্য ব্যথা কি কখনো শরীরিণী হয়? যদি হয় তো বিবেকানন্দকে বুঝা যাইতে পারে।"[১২]

বিবেকানন্দ ১৮৯৩ সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৯৬-এর শেষভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ তিনবছর পাশ্চাত্যবিজয় করে কলম্বো, মাদ্রাজ হয়ে কলকাতায় ফিরলেন ১৮৯৭-এর ফেব্রুয়ারিতে। প্রতিটি জায়গাতে তিনি যে বিজয়-সংবর্ধনা লাভ করলেন, তা কোন রাজচক্রবর্তীর কপালেও জোটেনি। কলকাতায় বসে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করে আবার সেই বিজয়ী বীর যেন বিজয়রথে চড়ে পাশ্চাত্যে যাত্রা করলেন তাঁর আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করতে। মধ্যবর্তী কালে ১৩০৫-এর ৩০ চৈত্র রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন তাঁর অতি বিখ্যাত কবিতা 'বর্ষশেষ'। কবি এই কবিতা রচনার ইতিহাস ও তাৎপর্য সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ "১৩০৫ সালের বর্ষশেষের ও দিনশেষের মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড ঝড় দেখেছি।... এই ঝড়ে আমার কাছে রুদ্রের আহ্বান এসেছিল। যাকিছু পুরাতন ও জীর্ণ তার আসক্তি ত্যাগ করতে হবে। ঝড় এসে শুকনো পাতা উড়িয়ে সেই ডাক দিয়ে গেল। এমনিভাবে চিরনবীন যিনি, তিনি প্রলয়কে পাঠিয়েছিলেন মোহের আবরণ উড়িয়ে দেবার জন্য।... ঝড় থামল। বললুম, অভ্যস্ত কর্ম নিয়ে এই যে এতদিন কাটালুম এতে তো চিত্ত প্রসন্ন হলো না।... আমি বুঝলাম বেরিয়ে আসতে হবে।"[১৩]

মহাকবির ভাবনায় কখন কি ভাব ওঠে তা বলা যায় না, তিনি যে বিবেকানন্দকে লক্ষ্য করে এই কবিতা লিখেছিলেন—এমন কথা আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না। কিন্তু ঝড় তো কবি সেই প্রথম দেখেননি, সেবারই বা তাঁর কাছে এই আহ্বান এল কেন? তাঁর ভাবলোকের পারে কি তখন রুদ্ররূপী বিবেকানন্দই দাঁড়িয়েছিলেন? তাঁর কবিতার এই পঙ্‌ক্তিগুলি কি সেই বার্তা বহন করে না?—

"এবার আসনি তুমি বসন্তের আবেশহিল্লোলে
পুষ্পদল চুমি,
এবার আসনি তুমি মর্মরিত কুঞ্জনে গুঞ্জনে
ধন্য ধন্য তুমি।
রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ীরাজ সম
গর্বিত নির্ভয়—
বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম, নাহি বুঝিলাম
জয় তব জয়!"

লক্ষণীয়, বিবেকানন্দের সব কথা, সব কর্মোদ্যোগকে তখন এদেশে, বিশেষ করে ঠাকুর পরিবারের লোকেরা বুঝে উঠতে পারেননি। কিন্তু এমনই তাঁর আবির্ভাব যে, তাঁর মন্ত্র আহ্বানে জয়ধ্বনি দিতেই হয়। তাঁর সেই প্রভাব আজও বিদ্যমান, তাই তিনি আজও প্রাসঙ্গিক।

'প্রাসঙ্গিকতা'র অপর অর্থ প্রভাব। বিবেকানন্দের কালে সকলেই তাঁর প্রভাবের মধ্যে ছিলেন, শতবর্ষ পরেও রয়েছেন। এই প্রভাব আমরা সর্বদা সচেতনভাবে অনুভব করতে পারি বা নাও পারি। প্রভাব যেন অনেকটা চৌম্বকক্ষেত্রের মতো। পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে আমরা রয়েছি, আমরা তা অনুভব করি না। বিবেকানন্দের প্রভাব এমনই একটা ব্যাপার। আর এই প্রাসঙ্গিকতা সর্বব্যাপী—সকল সংশয়ের, সঙ্কটের ক্ষেত্রে আমরা তাঁর দ্বারস্থ হতে পারি এবং হচ্ছিও। এটাই বা কি করে হয়? এব্যাপারে মিস ম্যাকলাউডের বিবেকানন্দ-উপলব্ধিটি এরকম: "Vivekananda is everything to everyone. Each one could take what suited him best. From him I took mainly energy and manifested this most."

এপ্রসঙ্গে ম্যাকলাউডের সঙ্গে নিবেদিতার কথোপকথনটিও বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে—

মিস ম্যাকলাউড: "He is all energy."

নিবেদিতা: "He is all tenderness."

মিস ম্যাকলাউড: "But I never felt it."

নিবেদিতা: "That was not meant for you."

মিস ম্যাকলাউড: "Because he could give to each one according to his or her nature and according to the way that would lead him to the divine."[১৪]

এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথাটি চমৎকার। রোমাঁ রোলাঁকে তিনি বলেছিলেন: "আপনি যদি ভারতবর্ষকে বুঝতে চান তাহলে বিবেকানন্দকে বোঝার চেষ্টা করুন। তাঁর মধ্যে সবকিছু ইতিবাচক, নেতিবাচক কিছুই নেই।" কল্যাণের জন্য চিরদিন 'নেতি'কে 'ইতি'র দ্বারস্থ হতে হয়। আমাদের ত্রুটিগুলিই নেতিবাচক। অতএব বারেবারেই আমাদের বিবেকানন্দের দ্বারস্থ হতে হবে। তাঁর প্রাসঙ্গিকতা তাই নিত্যকালের।

মনীষী রোমাঁ রোলাঁ বিবেকানন্দের বক্তৃতা ও ভাষণগুলি সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেছিলেন: "His words are great music, phrases in the style of Beethoven, stirring rhythms like the march of Handel Choruses. I cannot touch these sayings of his, scattered as they are through the pages of books at thirty years' distance. Without receiving a thrill through my body like an electric shock."[১৫] রোমাঁ রোলাঁ বলছেন—ত্রিশ বছর পূর্বে বিবেকানন্দ যা বলে গেছেন সেগুলো পড়তে পড়তে আমি রোমাঞ্চিত হই, এক বৈদ্যুতিক শিহরণ অনুভব করি!

আমাদেরও শতাব্দী পরে একই প্রতিক্রিয়া—সেই রোমাঞ্চ, সেই বৈদ্যুতিক শিহরণ—যখন আমরা বিবেকানন্দের বাণীগুলি পড়ি। আমাদের বিশ্বাস, সহস্র বছর পরেও প্রতিটি মানুষ এমনই রোমাঞ্চ, এমনই শিহরণ অনুভব করবে। বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা তাই নিত্যবস্তু—তা থাকবে 'যাবচ্চন্দ্রসবিতারৌ'। ❑

পাদটীকা

১ The Life of Vivekananda and the Universal Gospel—Romain Rolland, 1970, pp. 107, 113

২ 'বিবেকানন্দ ও যুব আন্দোলন'—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, 'দেশ', ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, পৃঃ ২৮

৩ ঐ, পৃঃ ৩২

৪ 'দেশবন্ধু-নেতাজী-নেহরু-গান্ধী'—পান্নালাল দাশগুপ্ত, 'দেশ', জাতীয় কংগ্রেস শতবার্ষিকী সংখ্যা (১৯৮৫), পৃঃ ৪৯

৫ 'বিবেকানন্দ ও যুব আন্দোলন', 'দেশ', ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, পৃঃ ৩০

৬ সুভাষচন্দ্র বসুর রচনাবলী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯-২০

৭ ঐ, পৃঃ ২৯-৩০

৮ 'বিবেকানন্দ ও যুব আন্দোলন', 'দেশ', ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, পৃঃ ৩১

৯ ঐ, পৃঃ ২৮

১০ 'বিবেকানন্দ ও যুব আন্দোলন', 'দেশ', ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, পৃঃ ২৮-২৯

১১ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩৮

১২ বিশ্ববিবেক, বাক্-সাহিত্য, ১৯৬৩, পৃঃ ৯৪

১৩ রবিরশ্মি—চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড, ৫ম সং, পৃঃ ৪৯১-৪৯২

১৪ উদ্ধৃত: 'স্বামী বিবেকানন্দ: শতবর্ষ পরে'—হোসেনুর রহমান, 'দেশ', ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৯৩

১৫ The Life of Vivekananda and the Universal Gospel, p.146

বীর সন্ন্যাসী

শৈলেন্দ্র হালদার

বন্ধু, আমরা পাষাণ করেছি বক্ষ
বধ্যভূমিতে টেনে নিয়ে গেছি ভাইকে,
নেতাদের মুখে চিনেছি শত্রুপক্ষ
ত্যাগের মহিমা ভোলার জন্য দায়ী কে?

স্বদেশপ্রেমের মন্ত্র ভুলেছি আমরা
জন্মভূমিতে জ্বালিয়েছি লোভ-চিতা,
কেন পুরু হলো পিঠেরই সব চামড়া?
অন্ধ গলিতে কাঁদছে যে নিবেদিতা।

আমরাও তো মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে
তোমার শরণে পেয়েছি যে কত কথা,
জীবে প্রেম দিলে সন্ন্যাসী তব সখ্যে,
এদেশে নামুক শান্তির সরসতা।।



হে প্রিয় সন্ন্যাসি

সতীশ বিশ্বাস

তোমাকে দেখি না তাই, চোখ মেলে থাকি,
দাও না যে ধরা তাই তোমাকেই খুঁজি,
তোমাকে জানি না তাই দীপ জ্বেলে রাখি,
তোমাকে বুঝি না—শুধু এইটুকু বুঝি।

তুমি আছ বৃত্তের পরিধির ওপারে,
জিজ্ঞাসার উত্তরে বল না তো 'হ্যাঁ' 'হুঁ'!
যদিও নদীর তুমি রয়েছ দু-পাড়ে—
তোমাকে পারে না ছুঁতে প্রসারিত বাহু।

যখন দুঃখে কাঁদি, মুছে দাও জল।
সকল প্রাণীরই তুমি বন্ধু-প্রতিম।
হীনবল মানুষের একান্ত সম্বল;
রূপেতে অরূপ তুমি, সীমায় অসীম।

তুমি চেয়ে থাক তাই নভে এত আলো,
মাটির সবুজে, ফুলে তোমারই তো হাসি।
বৃষ্টিধারায় তুমি ভালবাসা ঢাল।
মায়ায় রয়েছ বাঁধা, হে প্রিয় সন্ন্যাসি!

বিবেকানন্দ, প্রাণের মাঝে

বিজয়কুমার দাস

একটি মানুষ
অন্ধকারের বৃত্ত ছিঁড়ে
আলোর দিকে বাড়িয়েছিলেন পা।

একটি জীবন
সব জড়তা তুচ্ছ করে
যান এগিয়ে, কোথাও থামেন না।

এখনও তিনি
বুকের ভিতর বিরাজ করেন
দুঃখ-শোকে, সকল কাজে...

এখনও তিনি
অন্ধকারে এ হাত ধরেন
বিবেকানন্দ, প্রাণের মাঝে...

একটি হৃদয়
দীন-দরিদ্র-মুচি-মেথর
সব মানুষে বেসেছিলেন ভাল।

একটি প্রদীপ
হয়ে তিনি মনের ভিতর
জ্বেলেছিলেন ভালবাসার আলো।



সৈনিক সন্ন্যাসী

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

শুধু কিছু শব্দের লৈখিক সমাহারে
তোমার বর্ণনা দেওয়া ভার,
অখণ্ড সত্তায় তুমি ব্যাপ্ত নীলাকাশ
সীমাহীন অনন্ত অপার.
সৈনিক সন্ন্যাসী তুমি, বীর্য-আয়ুধ হেনে
পরাভূত করেছ বাধায়,
নতমস্তকে তুমি কখনো পশ্চাৎপদ
হওনি তো কর্তব্য সাধায়।
প্রতীচীর অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করে গেছ
প্রাচ্যের সাধনার আলো,
উভয় মেরুর মাঝে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে
মানুষকে বেসেছিলে ভাল।
'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত'—এ যে চিরন্তনী বাণী,
ভারত আত্মার আহ্বান,
বিবেকের স্বরলিপি মেনে যেন গেয়ে যাই
আনন্দের প্রাণবন্ত গান।

বিবেক-আহ্বান

শান্তি সিংহ

'ওয়াই-টু-কে' আর 'মিলেনিয়াম'-এর আলোয়
বিশ শতক আর একুশ শতকের মাঝে
কী কী প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি
তার হিসেবনিকেশ চলছে দেশ জুড়ে।
কৃষি-শিল্প-শিক্ষা-প্রযুক্তি-অর্থনীতি নিয়ে
গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-নর্মদা-গোদাবরী দিয়ে
স্বাধীনতার তিপান্ন বছর ধরে
বয়ে যাচ্ছে বিস্তর জলধারা
চলছে বিস্তর চাপান-উতোর।
তখনই 'দেহহীন ধ্বনি' থেকে বিবেক-আহ্বান জাগে—
হে অমৃতের পুত্রকন্যারা,
অবক্ষয়ের আঁধারস্রোত পেরিয়ে
চৈতন্যের আলোর ধারায় নতুন প্রাণে জাগ,
সেবা-ভালবাসায় শ্রাবণের জলধারার মতন মনে রেখো—
"দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।"

হোক এ উচ্চারণ

মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়

অবক্ষয়ের অশুভ লগনে বিবেকী 'উদ্বোধন'
জাগিয়া উঠুক তোমারি কণ্ঠে আজি এ উচ্চারণ—
"হে ভারত, তব এ স্বাধীনতায় সারে কি ক্ষতস্থান?
ঝরে প্রহসনে পুঁজ ও রক্ত করিয়া তোমারে ম্লান!
চালায়ে অস্ত্র আজো যারা করে তব বক্ষরক্ত পান—
তুমি কি তাদের ভুলি কুকীর্তি গাবে জোরে জয়গান?
যাহারা তোমার মুক্তির লাগি অর্ঘ্য দিয়াছে পরাণ তেয়াগি,
তাদের ভুলিয়া তোমার অঙ্কে এ কাদের সংস্থান!
তোমার বক্ষে এ কোন্ নারকী পাতিয়াছে সংসার
ঘরে ঘরে লোকে দানবের দাপে করিতেছে হাহাকার!
ভীতিজর্জর আপন আত্মা বলিদানে তিলে তিলে
অঙ্গ তোমার হতেছে ভঙ্গ প্রতিদিন পলে পলে।
নিজেদের ঘরে নিজেদের লোক তারাই প্রকৃত অরি—
করিও না ক্ষমা হে ভারত, কভু কুচক্রী ব্যাভিচারী।
তোমারি আত্মা স্বামীজী-নেতাজী বাড়ায়েছে তব মান—
তোমার রুদ্র বজ্রবীণায় আজি বাজাও তাঁদের গান।"

বিবেক-রশ্মি

গোপেন্দু মুখোপাধ্যায়

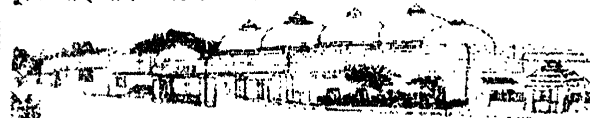


হে বিপশ্চিৎ!
তুমি ছিলে ধ্রুবতারা বোধির আলোকে
দীপ্ত যেন অজস্র সে প্রজ্ঞার উদ্ভাসে
অযুত নক্ষত্র মাঝে অস্তিত্ব তোমার
যথাযথ হয়ে থাকে নীরব প্রত্যয়ে।

হে কবিক্রতু!
দিশাহারা ম্লানমুখে অমিয়-সেচনে
সুস্নাত তাই তারা অনাবিল আশ্বাসে
নীরস এ পৃথ্বী যেন রসসিক্তা হয়ে
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বিনম্র নয়নে।

হে আচার্য!
প্রেরণার মূর্তরূপে তুমি আছ
অসহায় জিজ্ঞাসুর পাশে
জ্ঞানের প্রদীপ্ত শিখায় আলো করে
সবাকার মন
ঋদ্ধিমান হে তপস্বি! হে অকৃপণ!
তুমি আছ শাশ্বত সত্যের রূপে ধরার বলয়ে।





ধর্মের কথা বলেছিলে

চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ

ধর্মের কথা বলেছিলে—
যে-ধর্ম হামেশাই বেঁকেচুরে যাওয়া
মেরুদণ্ডটাকে টানটান রাখে।
পাঁকে দাঁড়িয়ে মেলে ধরে শতদল পদ্মের কোরক
কিংবা হাজারো কাঁটার মাঝে খুশির গোলাপ
হাজার বছর পথ হেঁটে হেঁটে এসেছি আমরা
নতুন সহস্রাব্দের দ্বারে;
ভোগের ভোগান্তিতে জেরবার,
ত্যাগের মন্ত্রে বাঁধিনি তন্ত্রী,
চলেছি মাড়িয়ে মূল্যবোধের
এ জ্যান্ত কবরে।
যুগন্ধর, তোমার জীবনই বাণী,
যে-বাণী জীবন নিতি গড়ে—
পথের নিশানা তুমি, যুগসঙ্কটের ঝড়ে।

ভাগলপুরে স্বামী বিবেকানন্দ

অজিত সরকার

কলকাতা থেকে দুশ সাতাশ মাইল
পবিত্র গঙ্গার দক্ষিণ পার
অতীতের সুজানগঞ্জ
ভগবান বিষ্ণুর পদধূলি পড়েছিল একদিন,
দৈত্য মধুকৈটভের মুণ্ডচ্ছেদন তাও
এখানেই।
কাছেই মন্দার পর্বত
অপূর্ব স্বর্গীয় ভূমি। পাথর আর
নির্মল ঝরনার বারি—
নাম আকাশগঙ্গা।
স্বামীজী এসেছিলেন এখানে
আঠারশ নব্বই-এর মাঝামাঝি
সঙ্গী হিমালয়-সাথী অখণ্ডানন্দ।
প্রাচীন শাস্ত্রে গঙ্গার মাহাত্ম্য
লেখা আছে;
গঙ্গা পবিত্র অতি—আর্য সভ্যতার পীঠস্থান।
গঙ্গাতীরের শান্ত মনোরম পরিবেশে
ধ্যান ও তপস্যার উপযুক্ত ভূমি
স্বামী বিবেকানন্দের সময় লাগেনি
আসন বিছাতে এখানে।
ধন্য ভাগলপুর
অতীতের তুমি এক মৌন সাক্ষী।

204653

স্মৃতির সরণি বেয়ে

চন্দ্রমোহন সিংহ

তোমার নিজস্ব কোন
সুখ-দুঃখ ছিল না—
তাই, তুমি অনায়াসে
অন্যের দুঃখে
চোখের জলে বুক ভাসাতে।

তোমার স্মৃতির সরণি বেয়ে
আজও কিছু মানুষ
মানুষ গড়ায় ব্রতী।
তবু, সেই স্বপ্নের ভারত
দুঃস্বপ্নের বুক বেয়ে বাস্তবের আলো খুঁজছে।

রাষ্ট্রীয় শাসনের পালা বদলে
যুগ ধর্ম বদলায়।
ঋষির দেশ ভারতবর্ষে
বাজার দরে স্রষ্টার অস্তিত্ব হারায়—
কৃষ্টির তলানি সেঁচে
জড় সভ্যতাকে উজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা বৃথা।

বিধ্বস্ত বন্দরে দাঁড়িয়ে
যে নাবিক ও যাত্রীরা খুঁজছে পথ
নিঃস্ব সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তোমার বার্তা
তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সময় এখন।।



বিবেকানন্দ

নিমাই মুখোপাধ্যায়

তোমার চোখের জলের স্বাদ নোনতা ছিল।
এত মানুষের জন্য তুমি কেঁদেছ
তোমার চোখের জলে সমুদ্র তৈরি হয়েছে
তবু মানুষের ঘুম ভাঙেনি।
এ যেন কুম্ভকর্ণের ঘুম।
শতাব্দী শেষ হয়ে এল
এবার জাগবে বলে মনে হচ্ছে।

বিবেকানন্দ-শিলায় আমরা

মন্দিরা মহাপাত্র

স্তব্ধ চেতনায় আঘাত করে
অজস্র অশান্ত ঢেউ শান্ত হয়ে ফিরে যায়।
যাওয়া আর আসা—
জনমহাসমুদ্রে আমরা অশান্ত ঢেউ।
চিরন্তন সত্য এক হোক সঞ্চয়,
আমাদের উদ্ধত যৌবন
হোক অবনত শির।
স্বর্গীয় আনন্দময় হোক বিবেক,
কোন এক সূর্যোদয় অথবা সূর্যাস্তে
বিবেকানন্দ-শিলায়।

খেলার মাঠেও পথপ্রদর্শক স্বামী বিবেকানন্দ

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়



ইনি সেই বিবেকানন্দ নন, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের বিছানার তলায় টাকা রেখে তাঁকে পরীক্ষা করছেন। ইনি সেই বিবেকানন্দ নন, যিনি দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর কাছে প্রার্থনা করছেন—"মা, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, বৈরাগ্য দাও।" ইনি সেই বিবেকানন্দও নন, যিনি শিকাগোর ধর্মমহাসম্মেলনে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে বক্তৃতা করতে উঠে বলে ওঠেনঃ "হে আমার আমেরিকাবাসী ভগিনী ও ভ্রাতাগণ।" আমরা যে-বিবেকানন্দের কথা জানি, তিনি গৈরিক বস্ত্রপরিহিত দিব্যজ্ঞানী মহাপুরুষ। কিন্তু তাঁর মধ্যেই লুকিয়ে আছে অন্য এক বিবেকানন্দ—যিনি ক্রীড়ানুরাগী এবং স্বয়ং ক্রীড়াবিদ্। ইনি সেই বিবেকানন্দ—যিনি ফুটবল, সাঁতার, ক্রিকেট, কুস্তি, জিমন্যাস্টিক্স, লাঠিচালনা, এমনকি গলফের স্টিক পর্যন্ত হাতে নিয়েছেন। বস্তুত, বিবেকানন্দ আজন্ম ছিলেন শক্তির পূজারী। যেখানে শক্তির স্ফুরণ, যেখানে ক্ষাত্রবীর্যের বিকাশ—সেখানেই বিবেকানন্দের অনিবার্য উপস্থিতি। তাই তিনিই প্রথম সন্ন্যাসী, যিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পেরেছিলেনঃ "You will be nearer to Heaven through football than through the study of the Gita."

বিবেকানন্দ যখন পূর্ণপ্রভায় বিশ্বজগৎকে আলোকিত ও আন্দোলিত করছেন, তখন ইউরোপে শুরু হয়ে গেছে অলিম্পিক আন্দোলন—যার চিরন্তন 'মিশন' বা 'ইজম'টি দাঁড়িয়ে আছে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, মূল্যবোধ, সততার ওপর। এর সঙ্গে বিবেকানন্দের ভাব ও বাণীর কী অদ্ভুত মিল! "Sound mind and intellect on healthy body" অর্থাৎ সুগঠিত শরীর এবং সুগভীর মননশীল প্রজ্ঞা—এই ছিল প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা তথা অলিম্পিকের জীবনবেদ। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যেও আমরা পাই এই হারকিউলিয়ান শক্তি, ক্ষমতা ও তেজস্বিতার সঙ্গে সক্রেটিস, প্লেটো কিংবা দিওদিনাসীয় বোধি ও প্রজ্ঞার অপূর্ব সমন্বয়। তাই অলিম্পিকের শাশ্বত রূপটিই যেন আধুনিক সভ্যতার প্রাণপুরুষ বিবেকানন্দের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল।

আজকের ভারতীয় ক্রীড়াজগতে বিবেকানন্দের বাণীই প্রেরণার আলোকস্তম্ভ হতে পারে বলে মনে হয়। ফুটবলের কথাই ধরা যাক। অতীতের দিকে ফিরে তাকালে দেখি, পরাধীন ভারতে মোহনবাগান, এরিয়ান, কুমোরটুলি প্রভৃতি ক্লাবগুলি শত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও ব্রিটিশ সামরিক ও আধা-সামরিক দলগুলির সঙ্গে সমানে সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বাংলা তথা ভারতবর্ষের ফুটবলকে সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বিপ্লবী ও স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের অনুপ্রেরণার হাতিয়ার ছিল ফুটবল মাঠে বাংলার যুবকদের শৌর্যমণ্ডিত বিক্রম। তারপর তিরিশের দশকে মহামেডান স্পোর্টিঙের কাছে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল ইংরেজ দলগুলিকে। খালি পায়ে বাঙালী ফুটবলারদের দাপটে ব্রিটিশ ফুটবলারদের অসহায় অবস্থা দেখে একথা মনে হওয়াই স্বাভাবিক, তখন যদি ভারতবর্ষ বিশ্বকাপ ও অলিম্পিক ফুটবলে খেলার অধিকার পেত, তাহলে হয়তো ভারতীয় ফুটবলকে বিশ্ব ফুটবল সমাজ অন্যভাবে জানত, বুঝত।

আর এখন সরকারি, বেসরকারি স্তরে এত সুযোগ-সুবিধা, পৃষ্ঠপোষণা সত্ত্বেও ভারতীয় ফুটবল অলিম্পিক দূর অস্ত, এশিয়ার মূল স্রোত থেকেই বিচ্ছিন্ন। এই ঘোর সঙ্কটে বিবেকানন্দের জীবনদর্শনই পারে এদেশের ফুটবলকে রাহুমুক্ত করতে। দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধের অগ্নিমন্ত্র তো বিবেকানন্দের অন্তরাত্মারই প্রতিফলন। তিনিই তো বলেছেন দেহ, মন, আত্মায় সম্পূর্ণ মানুষ তৈরির কথা। এই সম্পূর্ণ মানবসত্তাই আত্মিক, বৌদ্ধিক, শারীরিক ও মানসিক উন্নতির সাপেক্ষে দেশ ও জাতির চালিকাশক্তি। এখন আমাদের দরকার এই ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ, যারা ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে নিখাদ দেশপ্রেমে অভিষিক্ত হয়ে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করবে।

খেলাধূলার প্রতি বিবেকানন্দের আশৈশব প্রীতি ছিল। *লেখাপড়ার জন্য তাঁকে খুব একটা বেশি সময় দিতে হতো না*, তাঁর প্রতিভার পক্ষে দৈনিক দু-এক ঘণ্টা পড়াই যথেষ্ট ছিল। বাকি সময় তিনি নতুন নতুন ক্রীড়া-কৌতুক আবিষ্কারে ব্যস্ত থাকতেন এবং খেলার সাথী পেলেই সব ভুলে তাতে মেতে উঠতেন।

ক্রিকেটে তাঁর বেশ দক্ষতা ছিল। ছোটবেলা থেকেই তিনি ক্রিকেট খেলতেন। পরে কলকাতার বিখ্যাত টাউন ক্লাবের হয়ে একবার ইংরেজ খেলোয়াড়পুষ্ট ক্যালকাটা ক্লাবের বিপক্ষে সাত উইকেট নিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছিলেন।

ছাত্রাবস্থায় বিখ্যাত মল্লবীর গোবর গুহের আখড়ায় যেতেন শরীরচর্চা করতে। হিন্দুমেলার প্রবর্তক নবগোপাল মিত্রের ব্যায়াম ও জিমনাস্টিক্সের আখড়ায় তিনি নিয়মিত যেতেন। আখড়ার সভ্যরূপে বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্রনাথ) লাঠিখেলা, অসিচালনা, নৌবাইচ, সাঁতার, কুস্তি ও অন্যান্য ব্যায়ামে পারদর্শিতা লাভ করেন। একবার মুষ্টিযুদ্ধে প্রথম পুরস্কারস্বরূপ তিনি একটি রূপোর প্রজাপতি পেয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণকালে একবার গলফের স্টিক হাতে দেখিয়েছিলেন বিস্ময়কর দক্ষতা। তাই দেখে এক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক বলেছিলেন—এটা খেলার গুণ নয়, ভারতীয় যোগবিভূতি। কথাটা শুনে স্বামীজী হেসেছিলেন, মজা করে বলেছিলেনঃ "এই সমস্ত সামান্য ব্যাপারে ভারতীয়রা যোগবিদ্যার প্রয়োগ ঘটায় না। ভারতীয়দের যোগ অনেক উচ্চমার্গের ব্যাপার, যার সন্ধান কিংবা প্রয়োগ ইংরেজ, আমেরিকানদের পক্ষে সম্ভব নয়।"

শক্তিমন্ত্রে বিশ্বাসী মানবধর্মের পূজারী স্বামী বিবেকানন্দ জানতেন, শক্তি বিনা এগনো সম্ভব নয়। আজকের ভারতবর্ষের খেলাধূলায় এই শক্তিমন্ত্রেরই বড় অভাব। না হলে এত বড় দেশ ভারতবর্ষ কেন সিডনি অলিম্পিক থেকে নামমাত্র একটি ব্রোঞ্জ নিয়ে ফিরবে? যে-হকিতে ভারতবর্ষ টানা পঞ্চাশ বছর একাধিপত্য দেখিয়েছে, অলিম্পিকের আসরে নয়টি সোনা জিতেছে—সেই রাষ্ট্র কেন কুড়ি বছর ধরে পদকের ধারেকাছে পৌঁছাতে পারছে না! প্রতিভাবান খেলোয়াড় থাকা সত্ত্বেও ভারত কেন একটা পর্যায়ে এসে আটকে যাচ্ছে? ঠিক এখানেই দরকার সেই শক্তিমন্ত্রের—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"। অর্থাৎ ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে পৌঁছানো না পর্যন্ত হাল ছেড়ো না। আমাদের খেলোয়াড়দের স্কিল বেশ ভাল, আধুনিক টেকনিকও অনেকটা আয়ত্তে, শুধু পিছিয়ে গতি, শক্তি ও মানসিকতায়। গতি, শক্তির ব্যাপারটা অনেকটা প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর নির্ভর করে। ইউরোপীয়দের সঙ্গে এই দুটো ব্যাপারে ভারতীয়রা এঁটে উঠতে পারছে না। কিন্তু গতি, শক্তির অভাব ঢেকে ফেলা যায় 'টেম্পারামেন্ট' অর্থাৎ মানসিক দৃঢ়তা ও আত্মিক অনুপ্রেরণার মাধ্যমে। এই মানসিক দৃঢ়তা অর্জন ও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হতে বিবেকানন্দ-অনুসৃত জীবনদর্শন আমাদের খেলোয়াড়দের অনুসরণ করা উচিত। ভারতীয় হকি ফেডারেশনের কর্তাব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞদের উচিত খেলোয়াড়দের বিবেকানন্দের চিন্তা ও চেতনায় অনুপ্রাণিত করা। তবেই ভারত আবার হকিতে তার অপহৃত আসন ফিরে পাবে।

শুধু হকি নয়, অ্যাথলেটিক্স, ভারোত্তোলন, কুস্তি, বক্সিং, শুটিং, তিরন্দাজি, কবাডি, টেনিস—যেসমস্ত খেলায় কোন না কোন সময়ে ভারতীয়রা পারদর্শিতা দেখিয়েছে—সেইসব খেলায় আবার সাফল্যের সম্ভাবনা আছে। ভারতীয়দের সব আছে, অভাব শুধু সাহস, লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য হার না মানার মানসিকতার। এই মানসিকতা বা আধুনিক খেলাধূলার পরিভাষায় 'কিলার ইনস্টিংক্ট' গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক সেই বিবেকানন্দ—যিনি ঘৃণা করতেন শক্তিহীনতা ও কাপুরুষতাকে। বেদান্তদর্শনের আলোতে দীপ্যমান মহাদার্শনিক বিবেকানন্দ তাই আসমুদ্রহিমাচল ভারতবাসীকে বীরধর্মে দীক্ষিত করেছেন। নিজে খেলেছেন, খেলতে শিখিয়েছেন অন্যদের। তাই আজকের ভারতবর্ষের ক্রীড়াজগতে সার্বিক অবক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেকানন্দকে বেশি করে মনে পড়ে—যিনি শক্তি, বুদ্ধি, সাহস, উদ্যম ও জাতীয়তাবোধের মেলবন্ধনে আরো উন্নত ক্রীড়াবিদে পরিণত হওয়ার স্বপ্ন দেখাবেন আমাদের, যিনি দেশের স্বার্থে আত্মত্যাগের আগুন জ্বালিয়ে এদেশের ক্রীড়াবিদ্‌দের বিশ্বমঞ্চে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার প্রেরণা দান করবেন। ❑

অনুষ্ঠান-সূচী (ফাল্গুন-চৈত্র ১৪০৭)

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

জন্মতিথি-কৃত্য

শ্রীরামকৃষ্ণদেব	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	১৩ ফাল্গুন	রবিবার	২৫ ফেব্রুয়ারি	২০০১
(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব)		২০ ফাল্গুন	রবিবার	৪ মার্চ	২০০১
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	দোল পূর্ণিমা	২৫ ফাল্গুন	শুক্রবার	৯ মার্চ	২০০১
স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী	২৯ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	১৩ মার্চ	২০০১
শ্রীরামনবমী	চৈত্র শুক্লা নবমী	১৯ চৈত্র	সোমবার	২ এপ্রিল	২০০১

পূজাতিথি-কৃত্য

শ্রীশ্রীশিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	৯ ফাল্গুন	বুধবার	২১ ফেব্রুয়ারি	২০০১
শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা	চৈত্র শুক্লা অষ্টমী	১৮ চৈত্র	রবিবার	১ এপ্রিল	২০০১

একাদশী-তিথি (রামনাম-সঙ্কীর্তন)

৬, ২২ ফাল্গুন	রবিবার,	মঙ্গলবার	১৮ ফেব্রুয়ারি,	৬ মার্চ	২০০১
৬, ২১ চৈত্র	মঙ্গলবার,	বুধবার	২০ মার্চ,	৪ এপ্রিল	২০০১

চিরন্তনী

রাজা হরিশচন্দ্র (১২)

এই বিভাগটি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য

কথা ঃ শুভ্রা দাশগুপ্ত □ চিত্র ঃ তথাগত দাশগুপ্ত



রোহিতাশ্বের সঙ্গী বালকেরা ছুটতে ছুটতে ব্রাহ্মণের বাড়িতে এসে খবর দিল—জঙ্গলের মধ্যে রোহিতাশ্বকে সাপে কামড়েছে। সে অজ্ঞান হয়ে জঙ্গলে পড়ে আছে। শৈব্যা কাছেই ছিলেন। তাঁর কানে সে-কথা গেল। তিনি যেন পাগলের মতো হয়ে গেলেন!



ব্যাকুল হয়ে তিনি তখনি ছেলের কাছে ছুটে যেতে চাইলেন। তাঁর প্রাণের নিধি, জীবনের একমাত্র সম্বল কিভাবে পড়ে আছে কে জানে! ব্রাহ্মণ তাঁকে ভর্ৎসনা করে বললেন ঃ "কাজকর্ম ফেলে কোথায় যাচ্ছ তুমি? অনেক মূল্য দিয়ে কিনেছি তোমাকে। সংসারের সব কাজ শেষ হলে তবেই তুমি ছেলের কাছে যাবে। এখন যাও নিজের কাজ কর গিয়ে।"



গভীর দুঃখ বুকে চেপে রেখে শৈব্যা বাসন মাজা, ঘর-দোর ঝাঁট দেওয়া, পুকুর থেকে জল আনা ইত্যাদি একটি একটি করে সংসারের কাজ করে যেতে লাগলেন। দাসী তিনি, প্রভুর আদেশ অমান্য করলে যে ধর্মরক্ষা হবে না! চোখের জল কিন্তু কিছুতেই বাধা মানে না। অবিরত চোখের জল পড়তেই লাগল। [ক্রমশ]

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

প্রসঙ্গ 'স্বামীজীর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত'

'উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ ১৪০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত শচীন্দ্রনাথ দরিপার লেখা 'স্বামীজীর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত' প্রবন্ধটি সুলিখিত এবং লেখকের মননশীলতার পরিচায়ক। বহু আকরগ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে লেখক আমাদের একটি মূল্যবান প্রবন্ধ উপহার দিয়েছেন। কিন্তু মনে হয়, অনবধানতাবশত প্রবন্ধটিতে দু-একটি ভুল তথ্য স্থান পেয়েছে। আমি এগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

প্রথমত, লেখক বলেছেন ঃ "রবীন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেন ১৮৮০ সালের ২ মে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে। সেদিন উপাসনার সঙ্গীত পরিচালনা করেন রবীন্দ্রনাথ।... শ্রীমও সেদিন ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন।" (পৃঃ ৩৪৩) শেষোক্ত তথ্যটি অবশ্যই ভুল, কারণ শ্রীম ঠাকুরকে প্রথম দেখেন ১৮৮২ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি—একথা সর্বজনবিদিত। লেখক অন্যত্র লিখেছেন ঃ "স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যযাত্রা শেষে ফেরার পর ১৮৯৯ সালের ২৭ জানুয়ারি নিবেদিতা তাঁর ১৬নং... বোসপাড়া লেন...-এর গৃহে স্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথকে চা-পানের আমন্ত্রণ করেন।" (পৃঃ ৩৪৫-৩৪৬) এই তথ্যটিতেও ভুল আছে। স্বামীজীর দ্বিতীয়বারের পাশ্চাত্যভ্রমণ ছিল উল্লিখিত তারিখের বেশ কিছুদিন পরে, আগে নয়। তাঁর দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যভ্রমণ আরম্ভ হয় ২০ জুন ১৮৯৯, সঙ্গী ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতা। এবারে প্রথম যান ইংল্যান্ডে (দ্রঃ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ২য় সং, পৃঃ ২৩৫), পরে আমেরিকার নানা জায়গায়, বিশেষত ক্যালিফোর্নিয়ায় বেদান্ত প্রচার শেষ করে ২৬ জুলাই ১৯০০ প্যারিসের উদ্দেশে আমেরিকা ত্যাগ করেন (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩১২) এবং ইউরোপ ও আফ্রিকার কয়েকটি দেশ ভ্রমণান্তে মুম্বাই হয়ে ৯ ডিসেম্বর ১৯০০ রাত্রে বেলুড় মঠে এসে উপস্থিত হন (দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩৫৭)।

প্রবন্ধটির শেষ অনুচ্ছেদে লেখক তাঁর একরকমের বিশ্বাস এই বলে ব্যক্ত করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি দিয়ে বিবেকানন্দেরই 'অনুপম বন্দনা' করেছেন। গানটির কিছু কথার মধ্যে এই বিশ্বাসের ইঙ্গিত লেখক দেখতে পেয়েছেন। আমার মতে, এই ধারণার সমর্থনে হ্যাঁ বা না—কোনটাই স্পষ্ট করে বলা খুব কঠিন। এই গানের মধ্যে কয়েকটি শব্দ এবং তার ভাব স্বামীজীর প্রতি অবশ্যই প্রযোজ্য হতে পারে। কিন্তু শুধু এইজন্যই গানটি বিবেকানন্দ-বন্দনার স্মারকরূপে নির্দিষ্ট করা ঠিক হবে না। গানটির রচনাকাল ১৩১৮ সালের শেষ (১৯১২ সালের আরম্ভ)। (দ্রঃ সূচীপত্র, 'সঞ্চয়িতা') স্বামীজীর মহাসমাধির পরে তখন প্রায় সাড়ে নয় বছর অতিক্রান্ত। প্রায় সেই সময়েই ইংল্যান্ডেশ্বর পঞ্চম জর্জের অভিষেক উপলক্ষ্যে সারা ভারতব্যাপী একটা উৎসবের আবহাওয়া তৈরি হয়েছিল, নানা কারণে ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ ভারতে এইসব ঘটনার গুরুত্ব খুব বেশি ছিল এবং দেশবাসীর জীবনেও এর ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছিল। ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণেই কবির দেশমাতৃকার বন্দনায় 'জনগণমন অধিনায়ক'-এর মতো এক বিস্ময়কর রচনাটি নিবেদিত হয়। ঘটনাগুলি যুগপৎ ঘটায় রবীন্দ্র-নিন্দুক কিছু তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বিভিন্ন সময়ে প্রচার করেছে যে, কবির এই গান ইংল্যান্ডেশ্বরের বন্দনার জন্যই রচিত হয়েছিল। তারা অবশ্য দেশবাসীর কাছে ধিক্কারই লাভ করেছে।

'জনগণমন' সঙ্গীতটি কবি কোন বিশেষ ব্যক্তির বন্দনার জন্য রচনা করেছেন—একথা মনে করার কোন কারণ নেই, ইংল্যান্ডেশ্বরের বন্দনায় তো নয়ই। স্বামী বিবেকানন্দও তখন নয় বছরের অধিককাল লোকান্তরিত। বরং গানটি যে কবিকণ্ঠে মহান মাতৃভূমির স্বতঃস্ফূর্ত বন্দনা, সেকথা ভাববার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। 'জনগণমন' গানটি রচনার প্রায় দেড় বছর আগেই (আষাঢ় ১৩১৭) কবি রচনা করেছেন 'ভারততীর্থ'-র মতো দেশমাতৃকার কালজয়ী বন্দনাগীতি। বেদ-উপনিষদে বিধৃত ভারতের শাশ্বত মহান সভ্যতা-সংস্কৃতি, বহুর মধ্যে একত্বের সাধনা, জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে বিতাড়িত-উৎপীড়িত-নিগৃহীত সকল মানুষকে যুগে যুগে আশ্রয় দিয়ে আপন করে নেওয়ার যে সাধনা ভারতবাসীর জীবনে পরিপুষ্ট হয়েছে, কবি তাঁর নানা রচনায় সেই শাশ্বত ভারতের বন্দনা গেয়েছেন। আমার মনে হয়, 'ভারততীর্থ' এবং 'জনগণমন' এই উভয়ই কবিকণ্ঠে কালজয়ী ভারত সভ্যতার স্বতঃস্ফূর্ত স্তবগীতি। এগুলি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ এবং কোন বিশেষ ঘটনার সাক্ষী নয়। প্রথমটিতে ভারতাত্মার স্বর্ণোজ্জ্বল মূর্তি বিধৃত, দ্বিতীয়টিতে মহান ভারতভূমির গৌরবগাথা বর্ণিত।

অন্যদিকে, কালপরম্পরা এবং সমসাময়িক ঘটনাবলী বিবেচনা করে আমরা বরং ভাবতে পারি যে, কবি কর্তৃক বিবেকানন্দের বন্দনা বিধৃত রয়েছে তাঁর 'বর্ষশেষ' কবিতার মধ্যে। এই কবিতাটির রচনাকাল ১৮৯৯ সালের এপ্রিলের মাঝামাঝি (৩০ চৈত্র ১৩০৫)। পাশ্চাত্য বিজয়ের পর স্বামীজী ভারতে ফিরে এসেছেন কিঞ্চিদধিক দুবছর আগে। বিবেকানন্দ-কণ্ঠের বজ্রনির্ঘোষ তখন ভারতের আকাশে-বাতাসে আছড়ে পড়ছে, "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" নানা কর্মযজ্ঞের সূত্রপাত করে চলেছেন তিনি, প্রচণ্ড শক্তিতে নাড়া দিয়ে বহু শতাব্দীর তমসাবিজড়িত ঘুমন্ত ভারতকে জাগিয়ে তুলেছেন। শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজীর সিংহনাদ, পরবর্তী তিনবছরের অক্লান্ত সাধনায় ভারতবর্ষকে জগৎসভায় মহাগৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠা করা এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করে কলম্বো থেকে আলমোড়ায় ঝড়ের বেগে বক্তৃতায় গোটা জাতির মেরুদণ্ডের ভিতরে বিদ্যুৎ শিহরণ বইয়ে দিয়ে স্বামীজী তখন মধ্যাহ্নসূর্যের মতো

ভারতগগনে ভাস্বর। আমেরিকার 'সাইক্লোনিক হিন্দু' তখন প্রচণ্ড ঝড়ের শক্তিতে ভারতের জাতীয় জীবনে আবির্ভূত হয়ে সব ওলটপালট করে দিয়েছেন। তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাকৃতিক ঝড়কে উপলক্ষ্য করে কবি যদি বিবেকানন্দের উদ্দেশে বলেন—

"বিজয়গর্জনস্বনে অভ্রভেদ করিয়া উঠুক
মঙ্গলনির্ঘোষ—
জাগায়ে জাগ্রত চিত্তে মুনিসম উলঙ্গ নির্মল
কঠিন সন্তোষ।।"

অথবা,

"রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ীরাজসম
গর্বিত নির্ভয়—
বজ্রমন্ত্রে কী ঘোষিলে বুঝিলাম নাই বুঝিলাম,
জয় তব জয়।।"

এর চেয়ে উত্তম বিবেকানন্দ-বন্দনাগীতি আর কী হতে পারে!

ডঃ বৈদ্যনাথ বসু
সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট, বিড়লা ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোনমি
প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক, অ্যাপ্লায়েড ম্যাথেমেটিক্স বিভাগ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

'উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ ১৪০৭ সংখ্যায় শচীন্দ্রনাথ দরিপা 'স্বামীজীর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত' নিবন্ধে লিখেছেন ঃ "রবীন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখেন ১৮৮০ সালের ২ মে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে। সেদিন উপাসনার সঙ্গীত পরিচালনা করেন রবীন্দ্রনাথ। এখবর সেসময় সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল। তবে সেদিন কি কি গান হয় তার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। তিনি কি এই গানটিও ('তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা') গেয়েছিলেন? শ্রীমও সেদিন ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন।" এ-তথ্য তখন যে সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল তার সত্যতা কি লেখক যাচাই করে দেখেছেন? কারণ, 'কথামৃত'-এর পঞ্চম ভাগের (ষষ্ঠ সংস্করণ) দশম পৃষ্ঠার পাদটীকায় আছে—শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৮০ সালের ৩ মার্চ থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত আটমাস কামারপুকুরে ছিলেন। সুতরাং উক্ত বিবরণ মনে হয় সঠিক নয়। তাছাড়া শ্রীম ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন ১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। অতএব তিনি সেদিন ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন—এ-তথ্যও ঠিক নয়।

উপসংহারে লেখক অনুমান করেছেন, রবীন্দ্রনাথ 'জনগণমন অধিনায়ক' গানে বিবেকানন্দেরই বন্দনা করেছেন। লেখকের এই অনুমান সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। উক্ত গান সম্বন্ধে সাম্প্রতিক 'দেশ' পত্রিকার ২৪ জুন (২০০০) সংখ্যায় প্রকাশিত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের নিম্নলিখিত স্মৃতিচারণ থেকে সঠিক তথ্য পাওয়া যায়—"মনে পড়ছে ৭ই পৌষ উৎসবের কাছাকাছি কোন একটা দিন। 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটি তখন নতুন লেখা হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা কবির কাছে বসে আছি। কবি বললেন ঃ 'শুনলে গানটা? কিরকম কাণ্ড দ্যাখ দেখি। সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভ্যর্থনার জন্য গান লেখবার ফরমায়েশ এল। মোটেই উৎসাহ ছিল না। কিন্তু বারেবারে অনুরোধ আসাতে বললুম আচ্ছা দেখি। কয়েকদিন গেল, কিছুই হয় না। তারপর একদিন বসলুম—কিন্তু যেই লিখতে আরম্ভ করেছি, কোথায় ভেসে গেল পঞ্চম জর্জ—সেকথা মনেও রইল না—গান চলল আরো অনেক বড় সম্রাটের অভিমুখে।' এই বলে কবি অল্প অল্প হাসতে লাগলেন।" প্রবোধচন্দ্র সেন এই গানটিকে যুগপৎ জাতীয় সঙ্গীত এবং ভগবৎ সঙ্গীত বলেছেন। এ-গানের মূল প্রেরণা দেশাত্মবোধ অথচ এর লক্ষ্য বিধাতা।

রনজিৎকুমার দত্ত
গোরালাইন, শিলং-৭৯৩০০৩

বসুমতী-মা

'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪০৬ সংখ্যায় এবং তারপরে দু-একটি সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী'তে 'বসুমতী-মা'র কথা পড়ে প্রথমেই আমার মনে এল 'কাব্যের উপেক্ষিতা' কথাটি। রামায়ণে উর্মিলা, শকুন্তলা নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা এবং কাদম্বরী কাহিনীতে পত্রলেখাকে রবীন্দ্রনাথ 'কাব্যের উপেক্ষিতা' বলে সহানুভূতি ও দরদের সঙ্গে স্মরণ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন নিয়ে যে সমুদ্রের মতো বিশাল সাহিত্য বা কাব্য সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে এতদিন 'উপেক্ষিতা' ছিলেন ভবতারিণী দেবী—'বসুমতী-মা'! অথচ তিনি ছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের 'মানসকন্যা'। গায়ের রং কালো বলে তাঁর মা তাঁর ভাল নাম রাখেননি, শ্রীশ্রীঠাকুরই তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'ভবতারিণী'। কত সৌভাগ্য তাঁর! ঠাকুর নিজের ইষ্টদেবীর নাম দিলেন যাঁকে, তাঁর কি কম সৌভাগ্য? কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ বা শ্রীমায়ের জীবনীতে কোথাও তাঁর উল্লেখ নেই। আমার সুদীর্ঘ জীবনে যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামীজীর অনেক বই ও পত্রিকা পড়বার সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু এই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে এতদিন কিছুই জানতে পারিনি। সম্প্রতি কিছুকাল ধরে 'উদ্বোধন'-এ তাঁর সম্বন্ধে চিঠি বা টুকরো টুকরো খবর পড়ছি, তাই এই মহাজীবন সম্বন্ধে ঔৎসুক্য জাগ্রত হয়েছে।

স্বামীর মৃত্যুর পর বসুমতী-মা সুদীর্ঘ জীবন কলকাতায় ও কাশীতে যে অসাধারণ কৃচ্ছ্রসাধন করে কাটিয়েছেন, তাতে মনে হয় গৃহে থেকেও চরম বৈরাগীর জীবন ছিল তাঁর। ঠাকুরের কথা ছাড়া তাঁর মুখে আর কোন কথা ছিল না। সাংসারিক জীবনে তিনি কত আঘাত পেয়েছেন, তবুও একশ বছর বয়সেও তাঁর মুখের হাসিটি অক্ষুণ্ণ ছিল অন্তরের কোন্ আলোর উদ্ভাসে?

স্বামী বিবেকানন্দেরও স্নেহধন্যা তিনি! যাঁর 'কালো কালো হাতের' রান্না ছোলার ডাল আর মোটা মোটা রুটি খাওয়ার জন্য স্বামীজী তাঁর কাছে গিয়ে সারাটা দিন কাটালেন, তিনি কি সাধারণ মানবী? পরশমণির স্পর্শে সোনা হয়ে যাওয়া এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে বিস্মৃতির গর্ভ থেকে উদ্ধার করে এনেছেন বলে 'উদ্বোধন'-এর সম্পাদক মহারাজকে অন্তরের অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

কল্যাণী কর
চিত্তরঞ্জন পার্ক
নিউ দিল্লি-১১০০১৯

মনের স্বাস্থ্য

আমরা শিক্ষিত সমাজ দেহের স্বাস্থ্য ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন। সামান্য দৈহিক অসুবিধা হলেই আমরা চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে, এমনকি অনেকসময় চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়েই নানা ধরনের ওষুধ খেয়ে থাকি। কিন্তু দেহের মতো মনেরও যে স্বাস্থ্য রয়েছে—একথা চিন্তাও করি না। দেহের স্বাস্থ্যের হানি হলে যেমন দৈহিক অসুবিধা বা অসুখ হয়, তেমনি মনের স্বাস্থ্যের হানি হলেও মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। কিন্তু আমরা অনেক জেনে এবং বেশির ভাগ না জেনে অবহেলা করে থাকি। এর ফলে আমাদের সমাজে মানসিক দিক থেকে অসুস্থ ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। বিভিন্ন পরীক্ষায় একথা প্রমাণিত যে, আমাদের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগই মানসিক দিক থেকে মারাত্মক ধরনের অসুস্থ।

মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আমাদের ধারণা শুরু হয় বিগত ১৯০০ সাল থেকে। আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ক্লিফোর্ড বিয়ার্স ১৯০০ সালের জানুয়ারি মাসের কোন এক দিনে তাঁর বাড়ির জানালা থেকে আত্মহত্যার উদ্দেশে ঝাঁপ দেন। এতে তাঁর মৃত্যু তো হলোই না, বরং আত্মহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে আমেরিকার বিভিন্ন হাসপাতালে মানসিক রোগীদের সঙ্গে কাটাতে হয় দীর্ঘ তিন বছর। দীর্ঘদিন ধরে মানসিক রোগীদের মধ্যে কাটানোর অভিজ্ঞতা তিনি একটি আত্মজীবনীতে প্রকাশ করেন। এই বইটির নাম 'A Mind that Found Itself'। বইটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার শিক্ষিত মহলে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মনোবিজ্ঞানী এডলফ মেয়ার বইটি পড়েন। তিনিই সর্বপ্রথম এই পুস্তকের বিষয়বস্তুর নাম দেন —'মেন্টাল হাইজিন' (Mental Hygine)। এরপর ১৯০৮ সালে আমেরিকার কানেকটিকাট শহরে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে একটি প্রাদেশিক কমিটি স্থাপিত হয়। এর পরের বছরই আমেরিকায় মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় একটি জাতীয় কমিটি (National Committee for Mental Hygiene) এবং সেইসঙ্গে বেশ কয়েকটি শহরে প্রাদেশিক কমিটি তৈরি হয়।

প্রথমদিকে এই কমিটিগুলির কাজ ছিল গণচেতনা তৈরি করা। এরা সাধারণ চিকিৎসক এবং নানা ধরনের সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিকে এর অন্তর্ভুক্ত করে কাজ শুরু করে। ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে আমেরিকায় জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আইন (National Mental Hygine Act) পাশ হয়। এই আইনে তিনটি ধারার কথা বলা হয়—(১) যাঁরা মানসিক দিক থেকে অসুস্থ, তাঁদের প্রতি যত্ন নিতে হবে। এঁদের প্রতি অমানবিক ব্যবহার আইনগ্রাহ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। (২) মানসিক রোগগুলিকে দেহের রোগগুলির মতো প্রতিরোধ করা সম্ভব। মানসিক রোগের চিকিৎসা করলে তা পুরোপুরি সেরে যায়। (৩) মানসিক রোগ সম্পর্কে গবেষণা ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা এবং একইসঙ্গে মানসিক রোগ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে গণচেতনা তৈরি করতে হবে।

এরপর ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে ইউনেস্কো বার্ষিক প্রতিবেদনে মানসিক রোগগুলির ব্যাপকতা সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করে। ১৯৫৭ সালে কোপেনহেগেন শহরে বত্রিশটি দেশের প্রায় সাড়ে পাঁচশ মানসিক চিকিৎসক এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে 'বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য সংস্থা' (World Federation for Mental Health) তৈরি করেন। বর্তমানে বিশ্বের প্রায় সমস্ত দেশেই এর শাখা রয়েছে এবং তাদের সহযোগিতাতেই মানসিক রোগের কারণ, রোগলক্ষণ এবং প্রতিরোধ সম্বন্ধে নিরন্তর গবেষণা চলছে।

মানসিক স্বাস্থ্যের একটি সর্বজনস্বীকৃত পূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া খুবই কঠিন। তবে সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, যে-ব্যক্তি নিজের পরিবারে এবং প্রতিবেশীদের নিয়ে শান্তিতে বসবাস করছে সেই ব্যক্তিই মানসিক দিক দিয়ে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। মানসিক দিক থেকে সুস্থ ব্যক্তির পথেই নিজের সন্তানদের সুস্থভাবে গড়ে তোলা এবং সমাজের সকলের মঙ্গলের জন্য কিছু কাজ করা সম্ভব। তবে মানসিক দিক থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তি কেউই নন। অধ্যাপক হ্যাডফিল্ড মানসিক স্বাস্থ্যের একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে, সমগ্র ব্যক্তিত্বের একটি পূর্ণ ও সুসমন্বিত ক্রিয়াই হলো মানসিক স্বাস্থ্য। তাঁর মতে মানসিক স্বাস্থ্যের তিনটি বৈশিষ্ট্য—(১) ব্যক্তির সহজাত ও অর্জিত ক্ষমতাগুলির পূর্ণ বিকাশসাধন, (২) সহজাত ক্ষমতাগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং (৩) সমাজের উন্নতির জন্য সহজাত ও অর্জিত ক্ষমতাগুলিকে একটি সাধারণ লক্ষ্যের দিকে পরিচালন।

ব্যক্তির অর্জিত ও সহজাত ক্ষমতাগুলি স্বাভাবিকভাবে বিকাশলাভ করলে ব্যক্তি স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারে। অপরপক্ষে সেগুলি অবদমিত হলে ব্যক্তি দুর্বল মানসিকতাসম্পন্ন এবং হীন চরিত্রসম্পন্ন হয়ে ওঠে। অর্জিত ও সহজাত ক্ষমতাগুলির মধ্যে সার্থক সমন্বয় সাধিত না হলে ব্যক্তি সমস্ত বিষয়েই হীনম্মন্যতায় ভোগে। অর্জিত ও সহজাত ক্ষমতা-গুলিকে সমাজের কল্যাণকারী দিকে পরিচালিত করা দরকার। তা না হলে সমাজে বিশৃঙ্খলা, হানাহানি, অস্থিরতা প্রকাশ পাবে।

উক্ত তিনটি শর্ত পূরণ হলেই ব্যক্তি সুন্দর মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারে। জীবনকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারে।

ডঃ উদয়াদিত্য ভট্টাচার্য, রীডার, এডুকেশন বিভাগ
নিউ ব্যারাকপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা-৭৪৩২৭৬

ছত্রপতি শিবাজী

'উদ্বোধন'-এর গত অগ্রহায়ণ ১৪০৭ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী'তে (পৃঃ ৭৯৩) বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রসঙ্গ ছত্রপতি শিবাজী' শীর্ষক পত্রে গত আশ্বিন মাসে প্রকাশিত আমার 'ছত্রপতি শিবাজী' প্রবন্ধে উল্লিখিত শিবাজীর জন্ম, রাজ্যাভিষেক ও মৃত্যুর তারিখগুলির উৎস জানতে চেয়েছেন। মারাঠী ভাষায় লেখা পুণের বলবন্ত মোরেশ্বর পুরন্দরের 'রাজা শিবছত্রপতি' শীর্ষক ১০ খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে তারিখগুলি গৃহীত হয়েছে। গ্রন্থটির প্রকাশন সম্পর্কিত তথ্য—১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১, রাজহংস প্রকাশন, ১০১৫ সদাশিব, পুণে-২।

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
গোরাচাঁদ বসু রোড, কলকাতা-৭০০০০৬

সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ ঃ বিজ্ঞানমতে ও বেদান্তদৃষ্টিতে

জলধিকুমার সরকার

কোন চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক—এত বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরনের প্রাণী-সমেত জগতের সৃষ্টি হলো কিভাবে? কোন কোন জাতির বা প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে আকারে বা শারীরিক গঠনে সাদৃশ্যই বা এল কি করে? এইসব প্রশ্ন নিয়ে প্রাচীন কাল থেকেই মুনি-ঋষি ও বহু মনীষী চিন্তা করেছেন এবং তাঁদের চিন্তাধারা বিভিন্ন ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরাও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি বিবেচনা করেছেন। আলোচ্য নিবন্ধে উভয় দিকই, অর্থাৎ জগৎ ও প্রাণীর সৃষ্টিতত্ত্ব এবং প্রাণীর ক্রমবিকাশ (evolution)—বিজ্ঞানমতে ও বেদান্তদৃষ্টিতে আলোচনা করা হবে।

সৃষ্টিতত্ত্ব

বিজ্ঞানমতে ঃ

প্রাণীর সৃষ্টি ঃ প্রাণিজগৎ কিভাবে সৃষ্ট হয়েছিল তা নিয়ে বহু মত আছে। অ্যারিস্টটলের (খ্রীস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) মতে যেকোন জীব অবশ্যই অনুরূপ জীব থেকে সৃষ্ট হয়েছে, তবে সেইসঙ্গে এটাও ঠিক যে, কোন কোন জীব—যেমন পোকামাকড়, বোলতা, মাছি, জোনাকি প্রভৃতি শিশির, ময়লা আবর্জনা, মাংস, ঘাম ইত্যাদি থেকেও জন্মায়। এমনকি সপ্তদশ শতাব্দীতেও ভ্যান হেলমন্ট (১৫৭৭-১৬৪৪) বলেছেন যে, যদি একটা পাত্রে গম ও ঘর্মাক্ত জামা ২১ দিন ধরে রেখে দেওয়া যায়, তা থেকে পচে গিয়ে ইঁদুর জন্মায়। ইটালির চিকিৎসক ফ্রান্সেস্কো রেডিই (১৬২১-১৬৯৭) প্রথম বললেন যে, প্রাণীর জন্ম নিষ্প্রাণ কিছু থেকে হওয়া সম্ভব নয়। তাঁকে সমর্থন করলেন স্প্যালানজেনি (১৭২৯-১৭৯৯)। লুই পাস্তুর (১৮২২-১৮৯৫) গবেষণার দ্বারা হাতেনাতে দেখালেন যে, পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় প্রাণের সৃষ্টি নিষ্প্রাণ কিছু থেকে হতে পারে না। তবে পৃথিবীর আদিযুগীয় অবস্থায় প্রথম 'প্রাণী' (অর্থাৎ যা থেকে অনুরূপ প্রাণী জন্মায়) প্রকৃতিতে ছড়িয়ে থাকা রাসায়নিক দ্রব্য থেকে জন্মেছিল। বর্তমান কালে হেক, হ্যাল্ডেন, রাশিয়ার বায়োকেমিস্ট ওপারিন (১৯২২) প্রমুখ মনে করেন যে, অজৈব পদার্থের ওপর ইলেকট্রিক কারেন্ট ও আলট্রাভায়োলেট রশ্মির ক্রিয়ার ফলে প্রথম প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাণিসৃষ্টির আগে অবশ্য অ্যামাইনো অ্যাসিড, প্রোটিন, নিউক্লিয়োপ্রোটিন তৈরি হয়েছিল। সম্প্রতি ল্যাবরেটরি-গবেষণায় এইভাবে প্রাণিসৃষ্টি হওয়ার সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। ভাইরাস আবিষ্কার হওয়ায় এই দাবি আরো জোরদার হয়েছে, কারণ, ভাইরাস হচ্ছে প্রাণী ও নিষ্প্রাণ দ্রব্যের মাঝামাঝি অবস্থা। কেউ কেউ মনে করেন যে, প্রথম প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছিল সমুদ্রে। কারো কারো মতে, মহাবিশ্বে যে $১০^{২০}$টি নক্ষত্র আছে, তার ৫ শতাংশে প্রাণসৃষ্টির উপাদান (হাইড্রোজেন, কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার ও ফসফরাস) বর্তমান। এই ৫ শতাংশের কোন একটি থেকে ছিটকে আসা উল্কাপিণ্ড পৃথিবীতে পড়ে তা থেকেই এখানে প্রথম প্রাণী সৃষ্ট হয়েছে। ক্রীকেরও (১৯৮২) ধারণা এই ধরনেরই।

পৃথিবীর সৃষ্টি ঃ বিজ্ঞানমতে ধরে নেওয়া হয় যে, আজ থেকে ৪-৬ হাজার কোটি বছর আগে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল। হয়তো সূর্যের গলিত অবস্থায় তার খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে, অথবা সৌরজগতে ছড়িয়ে থাকা ধূলিকণা জমাট বেঁধে পৃথিবীর জন্ম হয়েছে। এমনও হতে পারে যে, সমগ্র সৌরজগৎই এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে। আদিতে পৃথিবী ছিল ঘূর্ণায়মান উত্তপ্ত বাষ্পপিণ্ড, যার মধ্যে নানাধরনের উপাদান (elements) নিহিত ছিল। কোটি কোটি বছরে সেই বাষ্প ঘনীভূত হয়ে তরল পদার্থের রূপ নেয়। ঘূর্ণায়মান অবস্থায় উপাদানগুলি তাদের ঘনত্ব অনুসারে নির্মীয়মাণ পৃথিবীর নানা স্তরে স্থান করে নিল। সবচেয়ে ভারী ধাতুগুলি—যেমন লোহা, নিকেল পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল তৈরি করল, অপেক্ষাকৃত হালকা উপাদানগুলি—যেমন সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম মধ্যস্তরে রইল এবং আরো হালকা উপাদান হিলিয়াম, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ওপরের বাষ্পীয় পরিমণ্ডল তৈরি করল। পৃথিবীর তাপমাত্রা আদিতে ছিল ৫,০০০-৬,০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। কোন কোন ভূবিজ্ঞানী মনে করেন যে, পৃথিবীর তাপমাত্রা ৯০০ ডিগ্রির বেশি কখনো ছিল না। সে যাই হোক, ধীরে ধীরে পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে লাগল। বাষ্প তরল পদার্থে পরিণত হলো এবং কিছু অংশ শক্ত হয়ে গেল। জলীয় বাষ্প জলে পরিণত হয়ে বৃষ্টি হতে লাগল, যা আবার বাষ্পাকার ধারণ করে ওপরে চলে গেল। লক্ষ লক্ষ বছরে সাগরের সৃষ্টি হলো।

বাইবেল-মতে ঃ

পৃথিবী ও স্বর্গ সৃষ্টি হয়েছিল প্রথম দিনে, দ্বিতীয় দিনে আকাশ, তৃতীয় দিনে গাছপালা ও জীবজন্তুর পূর্বপুরুষ, চতুর্থ দিনে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি, পঞ্চম দিনে পাখি ও মাছ এবং ষষ্ঠ দিনে পুরুষ ও অন্যান্য জন্তু। সপ্তম দিনের শেষে পুরুষের দ্বাদশতম পাঁজরা থেকে স্ত্রীলোকের সৃষ্টি হয়েছিল।

বেদান্তমতে ঃ

বেদান্তমতে সৃষ্টির সুন্দর বর্ণনা রেখে গেছেন স্বামী সারদানন্দ 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (পুনঃপ্রকাশ ৬৮তম বর্ষ, পৃঃ ৮)। তিনি বলেছেন ঃ "সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায় আকাশ, পদার্থের সূক্ষ্ম অংশ, ইংরেজীতে যাহাকে matter বলে—ইহা জড়ের সূক্ষ্ম অংশ এবং প্রাণ অর্থে সমস্ত শক্তির মূল শক্তি। জড়জগতের যতকিছু শক্তি—যেমন

গতিশক্তি, শারীরিক শক্তি, অন্নপরিপাক শক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তি—সমস্তই সেই প্রাণের বিকার; সেইরূপ আমাদের নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসশক্তিও সেই প্রাণের বিকার এবং নিঃশ্বাসশক্তি বর্তমান থাকাতেই মানুষ জীবিত থাকে বলিয়া ইহাকে প্রাণ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাণ বলিতে এক মূল শক্তিকেই বুঝিতে হইবে, আর সকল শক্তিই ইহার বিকার। সেইরূপ আকাশ বলিলে বুঝিতে হইবে, মূল জড় বস্তু—আর সমস্ত জড় বস্তুই যাহার বিকারমাত্র।...

"সৃষ্টির প্রারম্ভে এই আকাশের ওপর শক্তির অর্থাৎ প্রাণের কার্য আরম্ভ হয় এবং ইহার প্রথম ফল বায়ু বা কম্পন। আকাশের পরমাণুসকলের কম্পন আরম্ভ হয়। বায়ু বা ধাতু—কম্পন অর্থ। আকাশ হইতে এই বায়ুর বা কম্পনের উৎপত্তি হয়। কম্পন হতে তেজ জন্মায়; বিজ্ঞানও আজকাল ইহা প্রমাণ করিতেছে। কোন বস্তুর গতি রোধ করিলে উহা উত্তপ্ত হইয়া ওঠে। বাতাস অত্যন্ত জোরে বহিলে উত্তাপ উৎপন্ন করে। বিজ্ঞান বলেন, গ্রহনক্ষত্রাদি ও সমুদয় পৃথিবী প্রথমে উত্তাপ অবস্থায় ছিল, ক্রমশ শীতল হইয়া উহা বাসোপযোগী হইয়াছে। এখনো সূর্যালোক অত্যন্ত উত্তপ্ত; তথায় পৃথিবীর যাবতীয় কঠিন বস্তু বাষ্পরূপে বর্তমান রহিয়াছে। এই তেজ শীতল হইয়া অপ্ বা জল হয় ও কঠিন হইয়া পৃথিবী বা কঠিন মৃত্তিকারূপে পরিণত হয়। এই পঞ্চভূত প্রথমে সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে, ক্রমে ইহাদের পরস্পরের মিশ্রণে এই মূল জগৎ নির্মিত হয়।"

উপরি উক্ত মতের পূর্ণাঙ্গ ছবি পাই স্বামী বিবেকানন্দের বর্ণনা থেকে। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে লাহোরে প্রদত্ত 'বেদান্ত' বক্তৃতায় তিনি বলেছেনঃ "জগৎপ্রপঞ্চের বিকাশকে আমাদের শাস্ত্রে সৃষ্টি বলে। 'সৃষ্টি' আর ইংরেজী 'creation' শব্দ-দুইটি একার্থক নয়। 'সৃষ্টি' শব্দের ঠিক অর্থ—প্রকাশ হওয়া, বাহির হওয়া। জগৎপ্রপঞ্চ প্রলয়ের সময় সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে যা থেকে উৎপন্ন হয়েছিল—সেই প্রাথমিক অবস্থায় পরিণত হয়, কিছুকালের জন্য ঐ অবস্থায় শান্তভাবে থাকে, আবার ক্রমশ প্রকাশোন্মুখ হয়। এটাই সৃষ্টি। আর এই শক্তিগুলির—প্রাণশক্তির কি হয়? তারা আদি-প্রাণে পরিণত হয়।... আর তখন ভূতের বা জড়পদার্থের কি অবস্থা হয়? শক্তি সর্বভূতে ওতপ্রোত রয়েছে। সেইসময় সকলই আকাশে লীন হয়—আবার আকাশ থেকে প্রকাশিত হয়। এই আকাশই আদিভূত। এই আকাশ প্রাণের শক্তিতে স্পন্দিত হতে থাকে, আর যখন নতুন সৃষ্টি হতে থাকে, তখন যেমন যেমন স্পন্দন দ্রুত হয়, অমনি এই আকাশ তরঙ্গায়িত হয়ে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রাদির আকার ধারণ করে।" ঐ বক্তৃতাতেই স্বামীজী অন্যত্র বলেছেনঃ "কারণে ফিরে যাওয়া, তারপর বের হয়ে আসা এবং রূপ পরিগ্রহ করাকেই সংস্কৃতে বলে 'সঙ্কোচ' ও 'বিকাশ'।... আধুনিক বিজ্ঞানের প্রচলিত ভাষায় বলতে গেলে সবকিছুই ক্রমসঙ্কুচিত ও ক্রমবিকশিত হয়।... সৃষ্টি বলে কিছু নেই। বরং বলা চলে, সবকিছুরই বিকাশ বা অভিব্যক্তি হচ্ছে, আর ঈশ্বর হচ্ছেন বিশ্বের বিকাশকর্তা। আর এই বিশ্ব যেন নিঃশ্বাসের মতো আসছে, আবার তাঁতেই সঙ্কুচিত হয়ে মিশে যাচ্ছে; আবার তিনি তাকে বাইরে নিঃক্ষেপ করছেন। সৃষ্টির অনাদিত্ব মত সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ঐ মত কেবল হিন্দুধর্মের নয়, বৌদ্ধধর্মের ও জৈনধর্মেরও প্রধান ভিত্তি। Creation বলতে ইংরেজীতে 'কিছু না' থেকে 'কিছু হওয়া', অসৎ থেকে সতের উদ্ভব—এই অপরিণত মতবাদ বুঝিয়ে থাকে।... সৃষ্টির আরম্ভ বা শেষ সম্বন্ধে কোন কথাই উঠতে পারে না।... কে এই সৃষ্টি করছেন?—ঈশ্বর। ইংরেজীতে সাধারণত 'God' শব্দে যা বোঝায়, আমার অভিপ্রায় তা নয়। সংস্কৃত 'ব্রহ্ম' শব্দ ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। তিনিই এই জগৎপ্রপঞ্চের কারণস্বরূপ।"

স্বামীজী অদ্বৈতবেদান্তে বিশ্বাসী হলেও তাঁর কাছ থেকে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে ধারণা পাই, উপনিষদে ঠিক সেইরকম বর্ণনা পাই না। মনে হয়, তাঁর বর্ণনাতে তাঁর নিজস্ব মতও খানিকটা যুক্ত হয়ে আছে। হয়তো এই সত্যদ্রষ্টা ঋষি বেদান্তের চিন্তাধারাকে আধুনিক বিজ্ঞানের পটভূমিতে বাস্তব ও সহজবোধ্য রূপ দেওয়ার জন্য এরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, প্রকৃতিতে দুটি বস্তু আছে—একটি 'আকাশ', যেটি উপাদান পদার্থ ও অতি সূক্ষ্ম; অপরটি 'প্রাণ' বা শক্তি। আকাশ ও প্রাণ উভয়ই মহৎ বা ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন। একটি নতুন কল্পের আদিতে এই অব্যক্ত স্পন্দিত হতে থাকে আর আকাশের ওপর ক্রমাগত আঘাতের ওপর আঘাত করে; আকাশ ঘনীভূত হতে থাকে আর ক্রমে ক্রমে আকর্ষণ-বিকর্ষণ শক্তিদুটির ফলে পরমাণুর সৃষ্টি হয় এবং অবশেষে প্রাকৃতিক পদার্থ যে যে উপাদানে নির্মিত, সেইসকল স্থূলভূতে পরিণত হয়। বায়ু, মৃত্তিকা বা সমস্ত দৃষ্ট বা শ্রুত বস্তুই জড়বস্তু এবং তারা আকাশ থেকে উৎপন্ন।

কাশীপুরে স্বামীজীর নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল। সমাধিকালের সেই অনুভূতির কথাই 'প্রলয়' বা 'গভীর সমাধি' গানে তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করে গেছেন। তারই বিপরীতক্রমে যেভাবে সৃষ্টি হয় এবং যা সমাধি থেকে ব্যুত্থানের সময় তাঁর অনুভূতি হয়েছিল, তার বর্ণনা করেছেন 'সৃষ্টি' সঙ্গীতে। 'প্রলয়'-এর শেষ দুই পঙ্‌ক্তি ও 'সৃষ্টি'র প্রথম দুই পঙ্‌ক্তি একই অবস্থার বর্ণনা। প্রথমে দেশকালের অতীত, সর্বাতীত অনির্দেশ্য এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বস্তু, যিনি কখনো 'উচ্ছিষ্ট' হননি, অর্থাৎ কোন বিশেষণ দিয়েই যাঁকে বোঝানো যায় না। তাঁর থেকেই জগতের কারণধারা প্রবাহিত—সেই কারণধারার 'ইচ্ছা'র কথা তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে—"সোঽকাময়ত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি" (২।৬)—এক তিনি বহু হওয়ার ইচ্ছা করলেন। তা থেকেই অহং-এর উৎপত্তি বা 'অহমহং' সেই কারণধারাই প্রকাশ। সেই অপার ইচ্ছাসাগর থেকে কোটি কোটি সূর্যের উৎপত্তি। এইভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি—তাতে অবস্থিত সর্ববিধ জড়-চেতন পদার্থ, জীবের সুখ-দুঃখ-জরা-মৃত্যু। একভাবে দেখলে জীব সেই সূর্যরূপী ব্রহ্মবস্তুর কিরণ,

অন্যদিকে (অদ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে) সূর্য ও তার কিরণ অভিন্ন, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। জীবের সৃষ্টি হয় না; জীব নিত্য স্বপ্রকাশ চৈতন্য, তার আবার সৃষ্টি কি! বড় জোর বলা যায়, উপাধিকৃত সৃষ্টি—ঘটের জলে যেমন ঘটাকাশের সৃষ্টি।

'উদ্বোধন'-এর প্রাক্তন সংযুক্ত-সম্পাদক পণ্ডিত সন্ন্যাসী স্বামী ধ্যানানন্দের কাছে শুনেছি যে, শঙ্কর, রামানুজ প্রমুখ আচার্যগণ উপনিষদ্ অনুসারে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা নিজেদের অনুভূতির কথা জানাচ্ছেন বলে কোথাও ব্যক্ত করেননি। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, স্বামীজীর অনুভূতির কথা তাঁর নিজস্ব রচনাতেই পাচ্ছি।

ক্রমবিকাশবাদ

বিজ্ঞানমতে :

প্রাণীর সৃষ্টি : প্রথম প্রাণীর সৃষ্টি যে অজৈব পদার্থ থেকে হয়েছে তা আগেই বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—পৃথিবীতে এত বিভিন্ন ধরনের প্রাণী কিভাবে সৃষ্টি হলো?

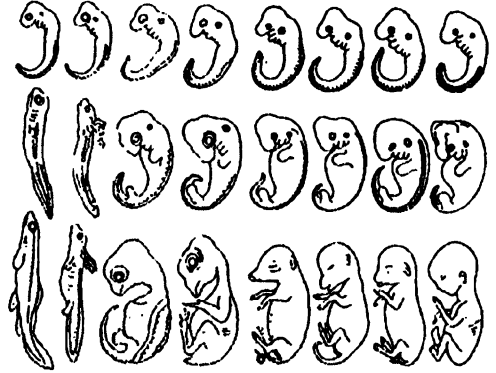
এক প্রজাতির প্রত্যেক প্রাণীর জীবকোষে সমসংখ্যক জিন (Gene—বংশগতির নিয়ন্ত্রক উপাদান) থাকে, যা প্রাণীর শারীরিক গঠন ও কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে। বংশ-পরম্পরায় জিনের সংখ্যা একই থাকে, তবে মাঝে মাঝে আলট্রাভায়োলেট রশ্মি, কোন রাসায়নিক দ্রব্য বা অন্য কিছুর প্রভাবে কোন কোন জিনে হঠাৎ এলোপাতাড়িভাবে স্থায়ী পরিবর্তন আসে, যাকে বলে 'মিউটেশন' (mutation)। মিউটেশন হওয়া জিনের কার্যাবলীও পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই ধরনের পরিবর্তন চিরকাল হয়ে আসছে ও হতে থাকবে। জিনের এই ক্রমপরিবর্তনের ফলে হয় 'বিবর্তন' বা 'ক্রমবিকাশ' (evolution)। কোন জিনে মিউটেশন হলে তার পরের প্রজন্মেরও শারীরিক গঠন বা কার্যকলাপ পরিবর্তিত হয়। নতুন প্রজন্মকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে বাঁচতে হয়, না পারলে তার ধ্বংস হয়। কোটি কোটি বছর ধরে মিউটেশন হতে হতে বহু প্রজাতির প্রাণীর বিলুপ্তি ঘটেছে, আবার নতুন গুণাবলী যোগ হতে হতে অনেক নতুন ধরনের প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীতে যতরকমের গাছ ও প্রাণী রয়েছে তা এই ক্রমবিকাশের ফলেই যে হয়েছে তা ধরে নেওয়া হয়, যদিও এই অভিমতের কোন নিশ্চিত প্রমাণ দেওয়া সম্ভব নয়। যে-তথ্যগুলি প্রামাণ্য বলে ধরা হয়, সেগুলি হলো :

(১) বিভিন্ন প্রাণীর শরীরের গঠন (Morphology) ও তাদের শারীরস্থান (Comparative Anatomy)—

(ক) বাদুড়ের ডানা, ছুঁচোর সামনের পা, ঘোড়ার সামনের পা এবং মানুষের বাহু ভিন্ন ভিন্ন কাজ করে, কিন্তু তাদের হাড়ের গঠনপ্রণালী একই ধরনের। মাছ থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণী পর্যন্ত প্রাণীর হৃৎপিণ্ড অনেকটা একধরনের, যদিও সেগুলি যথাক্রমে দুই, তিন ও চার কক্ষবিশিষ্ট।

(খ) শরীরাংশ আগে যেমন ছিল তার চিহ্ন হিসাবে কিছুটা বর্তমান (Vestigeal organs)—মানুষের পূর্বপুরুষ প্রাণীর যেসব দেহাংশ প্রয়োজনে আগে বড় ছিল, সেগুলি মানুষের দেহে চিহ্ন হিসাবে বর্তমান থাকে। যেমন—মানুষের অ্যাপেনডিক্স (appendix) তৃণভোজীর বড় বৃহদন্ত্রের নির্দেশক। মাতৃগর্ভে মানুষের ভ্রূণের শিরদাঁড়ার নিচে লেজের মতো অংশ দেখা যায়। মানুষের কান নাড়াবার জন্য মাংসপেশীও আছে, যা তার পূর্বেকার পশুজন্মে প্রয়োজনীয় ছিল, কিন্তু মনুষ্যজন্মে অকেজো হয়ে আছে।

(গ) মানুষের ভ্রূণ এবং অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণ দেখতে অনেকটা একরকম।



(১) মাছ (২) টিকটিকি (৩) কচ্ছপ (৪) মুরগি
(৫) শূকর (৬) গরু (৭) খরগোস (৮) মানুষ

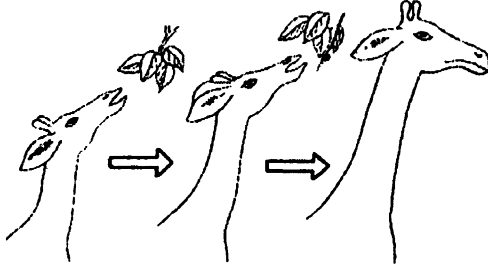
(ঘ) ঘোড়া, উট, হাতি প্রভৃতি প্রাণীর 'জীবাশ্ম' (fossil) বা প্রস্তরীভূত দেহ থেকে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য : পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন বর্গের (genus) ফসিল পাওয়া গিয়েছে— একেবারে নিচের স্তরে আদিম প্রাণীর এবং ওপরের স্তরে ক্রমশ জটিল প্রাণীর। জলচর থেকে উভচর, উভচর থেকে সরীসৃপ, সরীসৃপ থেকে মাছ ও স্তন্যপায়ী এবং এদের পরিবর্তনকালীন (transitional) প্রাণীর ফসিল পাওয়া গেছে।

(ঙ) জীবসংক্রান্ত রসায়নবিদ্যাজাত (biochemical) ও শারীরবৃত্তীয় (physiological) সাক্ষ্য—বিভিন্ন প্রাণীর ক্রোমোজোম (chromosome) ও প্রোটোপ্লাজম (proto-plasm) পরীক্ষা করলে অনেক সাদৃশ্য পাওয়া যায়। সব প্রাণীর প্রোটোপ্লাজমেই কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও চর্বি আছে। রক্তের হিমোগ্লোবিনে অ্যামাইনো অ্যাসিডের সংখ্যা থেকে বলা হয়, মানুষের নিকটতম জীবিত পূর্বপুরুষ গোরিলা।

(চ) প্রাণী ও নিষ্প্রাণ বস্তুর যোগসূত্র-প্রাণী (connec-ting link)—যেমন ভাইরাস, যার নিজের কোন উৎসেচন নেই ও যারা আকারে বাড়ে না।

লামার্কের ক্রমবিকাশবাদ (১৮০৯) : যুগ যুগ ধরে প্রয়োজনের তাগিদে প্রাণীর কোন শরীরাংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বা নতুন শরীরাংশ সৃষ্টি হতে পারে; ঐ শারীরিক পরিবর্তন

বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হয় (Inheritance of aquired characters in organisms)। আবার কোন অঙ্গ যুগ যুগ ধরে ব্যবহারে না এলে তা ক্রমে ক্রমে ছোট হয়ে যায়। উদাহরণ—লম্বা গাছের পাতা খাওয়ার চেষ্টায় লক্ষ লক্ষ বছরে জিরাফের ঘাড় লম্বা হয়ে গিয়েছে। লামার্কের মতের বিরুদ্ধে অবশ্য বহু অভিমত গড়ে উঠেছে।



জিরাফের গলার ক্রমপরিবর্তন

ডারউইনের ক্রমবিকাশবাদ : চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) বিভিন্ন দ্বীপের জীবজন্তু ও গাছ পরীক্ষা করে তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। ম্যালথাসের মতবাদ—প্রাণীর সংখ্যা যত বাড়ে, খাদ্যদ্রব্য সেই অনুপাতে বাড়ে না—ডারউইনকে সাহায্য করেছিল। লামার্কের মতবাদকেও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। একটি স্ত্রী ট্যাংরা মাছ এক ঋতুতে ২ কোটি ৮০ লক্ষ ডিম পাড়ে। একটি খরগোসের একসঙ্গে ৬টি বাচ্ছা হয় এবং বছরে চারবার বাচ্ছা হয়। এরকম অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীতে যেকোন প্রজাতির প্রাণীর সংখ্যা মোটামুটি একই থাকে, কারণ প্রাণীদের বিভিন্ন বিরুদ্ধ অবস্থার—বিশেষত খাদ্য ও বাসস্থান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কাজেই বাঁচার লড়াইয়ের জন্য তাদের অভ্যাস ও কিছু কিছু শারীরিক পরিবর্তন করতে হয়। এই শারীরিক পরিবর্তনের কিছু কিছু সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এইভাবেই ঘটে বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ। 'যোগ্যতমের টিকে থাকা' (survival of the fittest) বা 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (natural selection)—ডারউইনের এই মত অনুসারে যেসব প্রাণী নিজেকে পরিবর্তন করতে পারে তারাই টিকে থাকে, অন্যরা ধ্বংস হয় এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে লক্ষ লক্ষ বছরে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয় (Origin of species by natural selection)।

ডারউইনের মতবাদের বিরুদ্ধে বলা হয় :

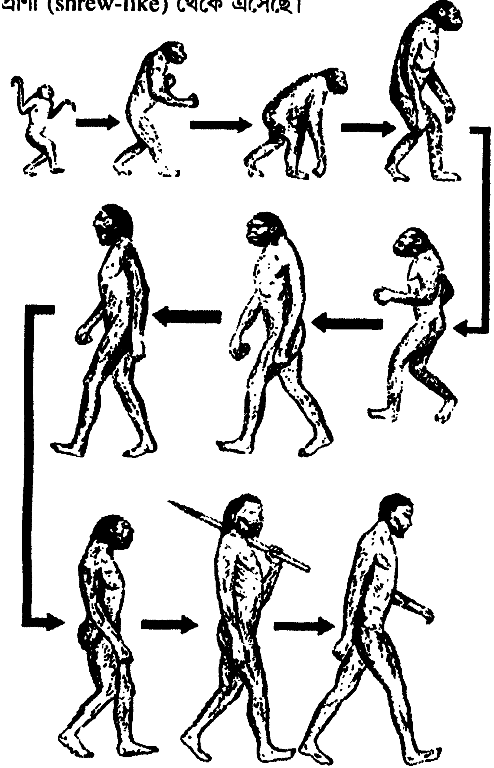
(১) ছোট ছোট অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ক্রমবিকাশ হতে পারে না।

(২) ব্যবহারে না এলে শরীরাংশ ছোট (vestigial organ) কিভাবে হয়, ডারউইন তা বলেননি।

(৩) এই মতবাদ দেহাংশের পরিবর্তন ও জৈবিক (germinal) পরিবর্তন—এই দুইয়ের মধ্যে কোন তফাৎ করে না।

এসব সত্ত্বেও ডারউইনের মতবাদ বর্তমানে ক্রমবিকাশবাদে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

মানুষের পূর্বপুরুষ : এখানে একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মানুষের পূর্বপুরুষ কে ছিল এবং মানুষ সৃষ্ট হয়েছে কবে—এনিয়ে অনেক মতভেদ আছে। ফসিল পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বানর (ape) ও মানুষ ছয় কোটি বছর আগেকার এক বৃক্ষবাসী (arboreal) পতঙ্গভুক প্রাণী (shrew-like) থেকে এসেছে।



আদি মানব থেকে বর্তমান মানবে ক্রমবিকাশ

বেদান্তমতে :

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সৃষ্টি সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছেঃ "সোঽকাময়ত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।... তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।"—সেই পরমাত্মা কামনা (অর্থাৎ চিন্তা) করলেন : 'আমি বহু হব, আমি উৎপন্ন হব।...' সৃষ্টি করে তিনি তাতে প্রবেশ করলেন। এধরনের কথা শ্রীরামকৃষ্ণ 'কথামৃত'-এ বলেছেন : "যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজসকল কুড়িয়ে রাখে। গিন্নির কাছে যেমন ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নি পাঁচরকম জিনিস তুলে রাখে।... ভিতরে সমুদ্রের ফেনা, নীলবড়ি, ছোট ছোট পুঁটলি-বাঁধা শশাবিচি, কুমড়োবিচি. লাউবিচি—এইসব রাখে, দরকার হলে বার

করে।" ('কথামৃত', ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৯৬) 'দরকার হলে বার করে'—একথা থেকে মনে হয় যে, একসঙ্গে সব সৃষ্টি হয়নি। আবার এও হতে পারে যে, সৃষ্টির প্রয়োজন হলে একসঙ্গেই জগৎ ও সকল প্রাণী সৃষ্ট হয়েছে। এবিষয়ে শ্রীশ্রীমার কথাটি পরিষ্কার। তিনি বলেছিলেন : "চিত্রকর যেমন তুলি দিয়ে চোখটি, মুখটি, নাকটি—এমনি একটু একটু করে পুতুলটি তয়ের করে, ভগবান কি অমনি একটু একটু করে সৃষ্টি করেছেন? না, তাঁর একটা নিজস্ব শক্তি আছে। তাঁর 'হ্যাঁ'তে জগতের সব হচ্ছে, 'না'তে লোপ পাচ্ছে। যা হয়েছে তা এককালে হয়েছে। একটি একটি করে হয়নি।" ('মায়ের কথা', ৮ম সং, পৃঃ ১৮৩)

ওপরের মতগুলি ক্রমবিকাশবাদকে সমর্থন করে না বলেই মনে হয়। স্বামীজীর এবিষয়ে অভিমত অভিনব, সুদূরপ্রসারী এবং মনে হয় পূর্ণাঙ্গ। তিনি মোটামুটিভাবে ক্রমবিকাশবাদকেই সমর্থন করেছেন। তবে তিনি একে আরো পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে বলেছেন : "বিচারসম্পন্ন কোন মানুষই সম্ভবত এই ক্রমবিকাশবাদীদের সঙ্গে বিবাদ করবেন না। কিন্তু আমাদের আরো একটি বিষয় জানতে হবে—তা এই যে, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্বেই একটি ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়া বর্তমান। বীজ বৃক্ষের জনক বটে, কিন্তু অপর এক বৃক্ষ আবার ঐ বীজের জনক।... যে ক্ষুদ্র জীবাণুটি পরে মহাপুরুষ হলো, প্রকৃতপক্ষে তা সেই মহাপুরুষেরই ক্রম-সঙ্কুচিত ভাব, সেটাই পরে 'মহাপুরুষ'-রূপে ক্রমবিকশিত হয়। যদি এটাই সত্য হয়, তবে ক্রমবিকাশবাদীদের সঙ্গে আমাদের কোন বিবাদ নেই, কারণ আমরা ক্রমশ দেখব, যদি তাঁরা এই ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়াটি স্বীকার করেন, তবে তাঁরা ধর্মের বিনাশক না হয়ে সহায়ক হবেন।" ('বাণী ও রচনা', ২য় খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ১১৪-১১৫) অন্যত্র বলেছেন : "আমরা যদি পশুগণের উন্নত অবস্থামাত্র হই, তবে যে-বিচারে ঐ সিদ্ধান্ত হলো, তা থেকে এই সিদ্ধান্তও হতে পারে যে, পশুগণ মানুষের অবনত অবস্থা মাত্র।... ক্রমবিকাশবাদের প্রমাণ কেবল এই—নিম্নতম থেকে উচ্চতম প্রাণী পর্যন্ত সকল দেহই পরস্পরসদৃশ; কিন্তু তা থেকে তুমি কি করে সিদ্ধান্ত কর যে, নিম্নতম প্রাণী থেকে ক্রমশ উচ্চতর প্রাণী জন্মেছে এবং উচ্চতম থেকে ক্রমশ নিম্নতর মানুষ জন্মেনি? দুদিকেই যুক্তি সমান। আর যদি এই মতবাদে বাস্তবিক কিছু সত্য থাকে, তবে আমার বিশ্বাস এই যে, একবার নিম্ন থেকে উচ্চে, আবার উচ্চ থেকে নিম্নে যাচ্ছে—ক্রমাগত এই দেহশ্রেণীর আবর্তন হচ্ছে। ক্রমসঙ্কোচবাদ স্বীকার না করলে ক্রমবিকাশবাদ কিভাবে সত্য হতে পারে?" (ঐ, পৃঃ ২০১)

এই বিষয়ে তিনি আরো বলেছেন : "শূন্য থেকে কখনো কিছুর ক্রমবিকাশ হয় না; তবে কোথা থেকে হয়? অবশ্য এর পূর্বে ক্রমসঙ্কোচ প্রক্রিয়া হয়ে থাকবে।... এখন এই সমস্যা যেন কিছুটা সরল হয়ে আসছে। এখন এই তত্ত্বের সঙ্গে পূর্বকথিত সমুদয় জীবনের অখণ্ডত্বের বিষয়টি জুড়ে দাও। ক্ষুদ্রতম জীবাণু থেকে পূর্ণতম মানব পর্যন্ত বাস্তবিক একটি সত্তা—একটি জীবনই বর্তমান।" (ঐ, পৃঃ ১৩৮)

আলিপুর পশুশালার তৎকালীন সুপারিটেন্ডেন্ট রামব্রহ্মবাবুর সঙ্গে ডারউইন-মতের আলোচনা করতে গিয়ে স্বামীজীর এবিষয়ে পূর্ণাঙ্গ অভিমত প্রকাশ পায়। স্বামীজী বলেছিলেন : "ডারউইনের কথা সঙ্গত হলেও evolution-এর কারণ সম্বন্ধে উহা যে চূড়ান্ত মীমাংসা, একথা আমি স্বীকার করতে পারি না।... প্রকৃতির অভিব্যক্তির নিম্নস্তরে যাই হোক, উচ্চস্তরে কিন্তু প্রতিবন্ধকগুলির সঙ্গে দিনরাত যুদ্ধ করেই যে ওদের অতিক্রম করা যায়, তা নয়; দেখা যায়, সেখানে শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণা ও প্রধানত ত্যাগের দ্বারাই প্রতিবন্ধকগুলি সরে যায়।... এখন দেখুন পাশ্চাত্য struggle theory (প্রাণীদের পরস্পর সংগ্রাম ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা দ্বারা উন্নতিলাভ রূপ মত)-টা যে কতদূর horrible (ভীষণ) হয়ে দাঁড়াচ্ছে!" (ঐ, ৯ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ১১৯-১২০) তাঁর এই কথা থেকে মনে হয়, স্বামীজী নিম্নপ্রাণী থেকে মানবসৃষ্টি পর্যন্ত ডারউইনের মতবাদ মেনে নিয়েছেন, তবে উচ্চতর মানব সৃষ্টি করতে ঐ মতবাদ কার্যকরী নয় বলেছেন।

সারসংক্ষেপ

আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার কোটি বছর আগে সূর্যের গলিত অবস্থায় তার খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে অথবা সেই সময়কার প্রকৃতিতে ছড়িয়ে থাকা ধূলিকণা জমাট বেঁধে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল। পরে কোনসময় অজৈব পদার্থের ওপর তড়িৎপ্রবাহ ও আলট্রাভায়োলেট রশ্মির প্রভাবে প্রথম প্রাণীর সৃষ্টি হয়। সেই প্রাণী খাদ্য ও বাসস্থান সমস্যায় পড়ে বাঁচার লড়াইয়ে দেহে পরিবর্তন এনে কোটি কোটি বছরে ঐ প্রাণী থেকে বিভিন্ন প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে।

বেদান্তমতে বিভিন্ন প্রাণি-সহ জগৎ সৃষ্টি বা বিকাশ হয়েছে ব্রহ্মের ইচ্ছায় এবং তাঁরই দেহ থেকে। প্রলয়কালে তাঁরই দেহে জগৎ বিলীন হয়। এরূপ ক্রমবিকাশ ও ক্রমসঙ্কোচ চলছে অনাদি কাল থেকে এবং চলবে।

মন্তব্য

বিজ্ঞানমতে যে পৃথিবী বা প্রাণিসৃষ্টির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, ঐ মতের স্বপক্ষে ফসিল প্রভৃতি অনেক বিশ্বাসযোগ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। অজৈব পদার্থ থেকে প্রাণসৃষ্টির ব্যাপারেও যা বলা হয়েছে, সেই মতের সমর্থনে ল্যাবরেটরিতে প্রাণের অঙ্গ যে নিউক্লিক অ্যাসিড, তাও তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। ক্রমবিকাশবাদ সকলেই মোটামুটি মেনে নিয়েছে।

বেদান্তের দিক থেকে স্বামীজী সৃষ্টির যে-বর্ণনা দিয়েছেন, তা খুবই যুক্তিপূর্ণ। বিজ্ঞানমতে, সূর্যের গলিত অবস্থা থেকে সৃষ্টি বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু সূর্য কোথা থেকে এল, তা বলা নেই। স্বামীজীর মতে, ব্রহ্ম থেকে সূর্য প্রভৃতি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বা বিকাশ (ক্রমবিকাশ) এবং তাতে সব লয় (ক্রমসঙ্কোচ)। এই প্রক্রিয়া আদি-অন্তবিহীন। স্বামীজীর এই মতবাদ পূর্ণাঙ্গ, যদিও ল্যাবরেটরিতে তা প্রমাণ করা সম্ভব নয়। ❑

বিচিত্ররূপা সরস্বতী

সুখময় সরকার



বর্তমানে 'সরস্বতী' বললেই এমন এক দেবীমূর্তি আমাদের কল্পনানেত্রে উদ্ভাসিত হন—যিনি শুভ্রবর্ণা, দ্বিভুজা, বীণাপুস্তকধারিণী, শুক্লবসনা, শ্বেতপদ্মাসনা এবং হংসবাহনা। সরস্বতীকে আমরা বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলেই জানি। কিন্তু চিরকাল সরস্বতী-মূর্তি এমন ছিল না। তিনি শুধুই বিদ্যার দেবী ছিলেন না। যুগে যুগে সরস্বতীর রূপের পরিবর্তন হয়েছে। একদা তিনি ধনদাত্রী, শক্তিদাত্রীরূপেও কল্পিত হতেন; এখন তিনি শুধু বিদ্যাদাত্রী। অর্থাৎ আমাদের দেশে সরস্বতী-ভাবনায় রীতিমতো একটা বিবর্তন ঘটে গেছে ইতিহাসের স্রোতোধারার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে।

সরস্বতী মূলত বৈদিক দেবী। বেদে কিন্তু সরস্বতী প্রধানত নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। 'সরস্' শব্দের অর্থ জল। সরস্বতী = সরস্ (জল)+মতুপ্ (অস্ত্যর্থে)+ঙীন্ (স্ত্রী)। অতএব 'সরস্বতী' শব্দের আদি অর্থ জলবতী অর্থাৎ নদী। বৈদিক যুগে সরস্বতী নামে একটি নদী ছিল। এই নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল বহু তপোবন। তপোবনগুলি ছিল সেকালের বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। সম্ভবত এই কারণেই কালক্রমে সরস্বতী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসাবে কল্পিত হয়েছিলেন।

কিন্তু মনোযোগ দিয়ে বেদ পাঠ করলে দেখা যায়, ঋষিগণ দুটি সরস্বতীর কথা বলেছেন। একটি স্বর্গে, অপরটি মর্তে। স্বর্গের সরস্বতী আলোর নদী। সংস্কৃত ভাষায় 'সরস্' শব্দের আরেক অর্থ 'আলোক'। ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে আছে —"মহো অর্ণঃ সরস্বতী" (১।৩।১২) এবং "বাজেভির্বাজিনীবতী" (১।৩।১০)। 'মহো অর্ণঃ' শব্দের অর্থ আলোর নদী। এই আলোর নদী সরস্বতী দ্যুলোকের দুগ্ধধবল নদীরূপ ছায়াপথ (milky way) ছাড়া আর কিছুই নয়। 'বাজিনীবতী' শব্দের অর্থ ধনদাত্রী। সরস্বতীকে ধনদাত্রী মনে করার কারণ কি? দুটি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, সরস্বতী নদীর তীরে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হতো, ঋষিকবি তাই তাঁকে ধনদাত্রী কল্পনা করেছেন। দ্বিতীয় কারণটি গূঢ়তর। উত্তরায়ণের সময় পূর্বদিগন্তে স্বর্গের সরস্বতী অর্থাৎ ছায়াপথের উদয় দেখে সেকালের ঋষিরা জানতে পারতেন, এবারে শীতের জড়তা কেটে যাচ্ছে—বসন্ত আসছে। এই কারণেই পরবর্তী কালে সরস্বতী 'জাড্যাপহা' বিশেষণে বিশেষিতা হয়েছেন। তখন বসন্তকালে শস্যসম্পদের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠত। এইজন্যই বেদের ঋষি সরস্বতীকে 'বাজিনীবতী' অর্থাৎ ধনদাত্রীরূপে কল্পনা করেছেন। ঋগ্বেদে লক্ষ্মী থাকলেও সরস্বতীর মধ্যেই লক্ষ্মীর গুণ ও চরিত্রমহিমা কল্পিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে পুরাণে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী পৃথক দেবী হিসাবে কল্পিত হয়েছেন। কিন্তু একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য, 'শ্রী' শব্দে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী উভয়কেই বোঝায়। বেদের ঋষি সরস্বতীকে "নদিতমে, দেবিতমে, অম্বিতমে, সরস্বতী" ইত্যাদি মন্ত্রে স্তুতি করেছেন। অর্থাৎ সরস্বতী শ্রেষ্ঠা নদী, শ্রেষ্ঠা দেবী এবং শ্রেষ্ঠা মাতা। বৈদিক সাহিত্যে সরস্বতী জ্ঞানদাত্রী—একথা কিন্তু নেই।[১]

পুরাণে সরস্বতীর বিচিত্র রূপ। লোকপ্রচলিত ধারণা, সরস্বতী দুর্গার কন্যা। আরেকটি বিশ্বাস লোকসমাজে প্রচলিত আছে—সরস্বতী নাকি চিরকুমারী। কিন্তু এই সমস্ত ধারণা ভ্রান্ত। পুরাণে কোথাও এমন কথা নেই। মার্কণ্ডেয়পুরাণের দেবীমাহাত্ম্যে মহাশক্তি দুর্গার তিনটি রূপ—মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী। মহাকালী রূপে তিনি বিষ্ণুকে মধুকৈটভ বধে সহায়তা করেন। মহালক্ষ্মী রূপে তিনি মহিষাসুরকে বধ করেন। আর মহাসরস্বতী রূপে তিনি শুম্ভ-নিশুম্ভঘাতিনী। অর্থাৎ মহাসরস্বতী দুর্গার রূপান্তর মাত্র। তিনি দুর্গার কন্যা নন। অবশ্য কন্যাকে যদি মাতার রূপান্তর কল্পনা করা হয়, তবে সেকথা পৃথক। মার্কণ্ডেয়পুরাণে মহাসরস্বতী অষ্টাদশভুজা। প্রতি ভুজে ভয়ঙ্কর প্রহরণ। তিনি মহাশক্তিরূপা, দৈত্যদলনী। সরস্বতী চিরকুমারী—এধারণা কেমন করে এসেছে বলা শক্ত। কিন্তু সরস্বতীর স্তুতিমন্ত্রে বলা হয়েছেঃ "মুরারিবল্লভা দেবী সর্বশুক্লা সরস্বতী"। অতএব পুরাণে সরস্বতী বিষ্ণুপত্নী। আবার কোন কোন পুরাণে সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নী। মোটকথা, সরস্বতী কুমারী নন।

তন্ত্রে সরস্বতীর নানা রূপ ও নাম দেখা যায়। যেমন—ভদ্রকালী, বিশালাক্ষী, বাগীশ্বরী, নীল সরস্বতী, পারিজাত সরস্বতী ইত্যাদি। "ভদ্রকালৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ"—ব্রহ্মপুরাণের এই মন্ত্রেই তো আমরা দেবীকে অর্চনা করি। ভদ্রকালীর বর্ণ 'অতসী-কুসুম-শ্যাম'। মৎস্যপুরাণে পার্বতীও অতসীকুসুম-বর্ণা। অতসী পুষ্প তিসির ফুল। অপরাজিতার মতো নীল। নীল সরস্বতী বৌদ্ধতন্ত্রের দেবী। তিনি নীলবর্ণা এবং হিন্দুতন্ত্রের মতোই তিনিও প্রজ্ঞার

১ ঋগ্বেদে (১।৩।১২) সরস্বতী প্রসঙ্গে কিন্তু এই কথাগুলি রয়েছেঃ "ধিয়ো বিশ্বা বিরাজতি"—তিনি সকল জ্ঞান উদ্দীপন করেন।
—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

অধিষ্ঠাত্রী। বাগীশ্বরী বাক্‌শক্তির দেবতা। তিনি শুভ্রকান্তি, কুচভরণমিতাঙ্গী, শুভ্রকমলাসনা। তাঁর করকমলে পুস্তক এবং লেখনী। তিনি সর্বপ্রকার বৈভব এবং সিদ্ধিদাত্রী। ইনি দ্বিভুজা, কিন্তু বীণাপাণি নন। পুস্তক এবং লেখনী বিদ্যার দ্যোতক; কিন্তু তিনি যুগপৎ বৈভব অর্থাৎ ধনসম্পদও দান করেন।

তন্ত্রসারে সরস্বতীর ধ্যানমন্ত্রে তাঁর যে-রূপটি কল্পিত হয়েছে তার বাঙলা অনুবাদ করলে এইরকম দাঁড়ায় ঃ দেবী শুভ্রবর্ণা, শ্বেতবস্ত্রাবৃতা, শ্বেতচন্দনচর্চিতা এবং শ্বেতপুষ্পের মাল্যভূষিতা। তাঁর শিরে উজ্জ্বল শশিকলা, তাঁর করে ব্যাখ্যা (জ্ঞানমুদ্রা), অক্ষমালা, সুধাপূর্ণ কলস এবং বিদ্যা। অর্থাৎ তিনি চতুর্ভুজা। তিনি ত্রিনয়না, সদাহাস্যমুখী, স্তনভারাবনত-দেহা, বাগ্‌বিভবদাত্রী এবং সৌভাগ্য-সম্পদের অধীশ্বরী। এখানেও সরস্বতীর হস্তে বীণা নেই, কিন্তু অক্ষমালা আছে। অক্ষমালা গণিতের প্রতীক। সুধাপূর্ণ কলসের সুধা নিশ্চয় জ্ঞানসুধা। লক্ষণীয়, সরস্বতী ত্রিনয়না। তিনি সৌভাগ্য-সম্পদদাত্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী তাঁর সঙ্গে ওতপ্রোত। কিন্তু ইদানীং কেউ সরস্বতীর এই মূর্তি নির্মাণ করে না।

তন্ত্রসারে অপর একটি ধ্যানমন্ত্রে দেবী হংসারূঢ়া, চন্দ্র ও কুন্দপুষ্পের কান্তিযুক্তা, স্মিতবদনা, শ্বেতকমলাসনা এবং চন্দ্রকলাশোভিত মুকুট পরিহিতা। তাঁর চার হাতে বিদ্যা, বীণা, অমৃতপূর্ণ ঘট এবং অক্ষমালা। সরস্বতীর হস্তে বীণা এই প্রথম দেখা যাচ্ছে। এর পরবর্তী কালে তিনি 'বীণাপুস্তক-রঞ্জিতহস্তা' রূপে কল্পিত হয়েছেন।

এপর্যন্ত বুঝতে অসুবিধা নেই। কিন্তু সরস্বতীর অপর নাম কেন 'ভদ্রকালী' এবং 'বিশালাক্ষী', তা দুর্বোধ্য। ভদ্রকালীর ধ্যানমন্ত্রে তিনি ক্ষুৎক্ষামা, কোটরাক্ষী, মসীমলিনমুখী, মুক্তকেশী, রোরুদ্যমানা। তিনি বলেছেন ঃ সমগ্র বিশ্বকে গ্রাস করেও আমি তৃপ্ত নই। তাঁর দুই হস্তে জ্বলন্ত অগ্নিশিক্ষাযুক্ত পাশ; তাঁর দন্তপঙ্‌ক্তি জম্বুফলের ন্যায় উজ্জ্বল কৃষ্ণাভ রক্তবর্ণ। এই ভদ্রকালী যদি সরস্বতীর নামান্তর হয়, তবে তো তিনি অতি ভয়ঙ্করী শক্তিরূপা। আবার বিশালাক্ষীরূপা সরস্বতী এতটা ভয়ঙ্করী না হলেও তিনি তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণা, দ্বিভুজা চণ্ডী (অর্থাৎ ক্রোধান্বিতা), খড়্গখেটকধারিণী, রক্তাম্বরা, নানা অলঙ্কারভূষিতা, ষোড়শী, প্রসন্নবদনা, ত্রিলোচনা। তিনি মুণ্ডমালাধারিণী, পীনোন্নত পয়োধরা, শবোপরি সংস্থিতা, জটামুকুটমণ্ডিতা, শত্রুক্ষয়কারিণী, সাধকের অভীষ্টদায়িকা, মহাসম্পৎপ্রদা, সর্বসৌভাগ্যদায়িনী। এই বিশালাক্ষী যদি সরস্বতীর রূপান্তর হয় তবে তো তাঁকে কিছুতেই বিদ্যা বা জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলা চলে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বেদের সরস্বতী নদী এবং ধনের দেবী ছিলেন। পুরাণে এবং তন্ত্রে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শক্তি। একালে আমরা সরস্বতীর ধনদাত্রী এবং সুখদাত্রী রূপ বর্জন করে কেবল তাঁর বিদ্যাদাত্রী মূর্তির অর্চনা করি। যদিও প্রণামমন্ত্রে আমরা তাঁকে বিশ্বরূপা অর্থাৎ বহুরূপা বা বিচিত্ররূপা রূপে কল্পনা করি ঃ "বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে।" ❑

উদ্বোধন কার্যালয় পরিবেশিত

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী শিবানন্দ সম্পর্কিত

অবশ্য-সংগ্রহযোগ্য একটি অমূল্য গ্রন্থ

যাঁদের স্মৃতিকথা গ্রন্থটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাঁদের কয়েকজন ঃ
স্বামী বিশুদ্ধানন্দ
স্বামী নিখিলানন্দ
স্বামী শান্তানন্দ
স্বামী কৈলাসানন্দ
স্বামী গম্ভীরানন্দ
স্বামী ভূতেশানন্দ
স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

শিবানন্দ · স্মৃতি সংগ্রহ

শিবানন্দ-স্মৃতি সংগ্রহ (২খণ্ড)

মূল্য ঃ ৮০.০০ (প্রতি খণ্ড ৪০.০০)

[রেজিস্ট্রি ডাকে নিলে অতিরিক্ত ২০.০০]

উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এবং মঠ ও মিশনের অছি ও পরিচালন পর্ষদের অন্যতম সদস্য প্রাচীন সন্ন্যাসী

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের

দুটি চিন্তা-আলোড়নকারী মৌলিক গ্রন্থ

সাধ্য ও সাধনা

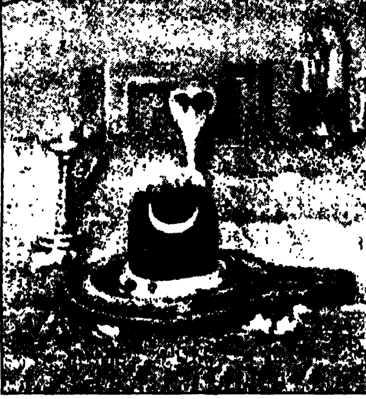
THE NEW HORIZON

সাধ্য ও সাধনা — মূল্য ঃ ২০ টাকা

New Horizon — Price : Rs. 25

জ্যোতির্লিঙ্গ ঘৃষ্ণেশ্বর

স্বামী অচ্যুতানন্দ



ইতিপূর্বে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে বিশ্বনাথ, কেদারনাথ, সোমনাথ ও নাগেশ্বর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবারে পঞ্চম পর্বে জ্যোতির্লিঙ্গ ঘৃষ্ণেশ্বর।
—লেখক

হু হু করে গাড়ি ছুটে চলেছে। সবুজ গাছপালা আর দূরে পাহাড়ের শ্রেণী দুধারে সরে সরে যাচ্ছে। একজন সাধু ও একজন ভক্তের সঙ্গে চলেছি দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম ঘৃষ্ণেশ্বরের উদ্দেশে।

ঔরঙ্গাবাদ থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার দূরে 'বেরুল' গ্রামই বর্তমানে শৈবতীর্থ। এর প্রাচীন নাম 'ইলুপুর'। সুন্দর মসৃণ রাস্তা ধরে প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যেই এসে পৌঁছালাম শিবমন্দিরের সামনে। বিখ্যাত ইলোরা গুহা এখান থেকে মাত্র এক কিলোমিটার।

শীতের দুপুর। গাড়ি থেকে নেমে ডানদিকে বিরাট চত্বরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম প্রাচীন এই শৈবতীর্থকে। চত্বরের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে সামনেই একটি বেশ বড় কুণ্ড। জল খুব পরিষ্কার নয়। তবুও এটি তীর্থবারি বলে স্পর্শ করলাম। কুণ্ডটির চারধার বাঁধানো। চারদিকে চারটি ছোট ছোট শিবের মন্দির। খোঁজ নিয়ে জানলাম, অন্যদিন এসময় মন্দির বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আজ বিশেষ পর্ব উপলক্ষ্যে বন্ধ হতে একটু দেরি হচ্ছে। শোনামাত্র তাড়াতাড়ি মূল মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলাম। পথে জামা খুলে খালি গায়ে যেতে হলো। নানা দেবদেবীর মূর্তিতে অলঙ্কৃত বিশাল বড় বড় পাথরের থাম ছাদকে ধরে রেখেছে। এটিই নাটমন্দির। নাটমন্দির পার হয়ে গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করলাম। বাইরের অন্য কিছু দেখার সময় তখন ছিল না।

খুবই ছোট গর্ভমন্দির। কোন ইলেকট্রিক আলো ভিতরে নেই। বড় বড় দুটি প্রদীপ দুই কুলুঙ্গিতে জ্বলছে। তারই তেলকালিতে ভিতরের দেওয়াল কালো। দরজা খুব উঁচু। আমরা ধীর পদক্ষেপে লিঙ্গমূর্তির কাছে এসে দাঁড়ালাম। ছোট্ট লিঙ্গ সোনার খাপে ঢাকা। লিঙ্গের বামদিকের দেওয়ালের গায়ে দণ্ডায়মানা দেবী পার্বতীর কষ্টি ও শ্বেত পাথরের দুটি বিগ্রহে লাল পট্টবস্ত্র ও ফুলের মালা দিয়ে সাজানো। মিনিট দশেক ঐভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পরে পুরোহিতরা গৌরীপট্টের কাছে বসতে দিলেন। চারদিকে জল, বেলপাতা পড়ে আছে। তারই মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসলাম। পূজা শেষ হতে সোনার খাপটি সরিয়ে নিয়ে পাণ্ডারা মূল লিঙ্গকে স্পর্শ করতে দিলেন। তবে খুব অল্প সময়ের জন্য। ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই সঙ্গে নিয়ে আসা গঙ্গাজল, বেলপাতা শিবের মাথায় দিয়ে প্রণাম জানালাম—"ইলাপুরে রম্যবিশালকেঽস্মিন্, সমুল্লসন্তঞ্চ জগৎবরেণ্যম্।/ বন্দেমহোদারতরস্বভাবং, ঘৃষ্ণেশ্বরাখ্যং শরণং প্রপদ্যে।।"—ইলাপুরের এই বিশাল রমণীয় তীর্থে জগৎপূজ্য আনন্দময় মহান উদারস্বভাব দেবদেব ঘৃষ্ণেশ্বরের চরণে শরণ নিলাম। দুহাত দিয়ে ছোট্ট শিবলিঙ্গকে জড়িয়ে ধরে প্রণাম জানালাম। দেবী পার্বতীর উদ্দেশেও প্রণাম জানালাম। তারপর পুরোহিতরা আমাদের সঙ্গে নিয়ে আসা কর্পূর ও ধূপ দিয়ে মহাদেবের আরতি করলেন।

এরপরে এক অদ্ভুত অভিষেক শুরু হলো। এরকম আগে কখনো দেখিনি। গামলায় করে আতপচালের ভাত নিয়ে এসে গৌরীপট্টের পাশে রাখা হলো। প্রথমে শিবের স্নানমন্ত্রে দুধ ও পঞ্চামৃত দিয়ে ভাল করে স্নান করানো হলো। তারপরে সব মুছিয়ে দিয়ে এক এক তাল করে ঐ গামলা থেকে ভাত নিয়ে শিবের মাথায় মন্ত্র পড়ে চাপানো হতে লাগল। দুজন পুরোহিত ঘণ্টা বাজিয়ে এত তাড়াতাড়ি মন্ত্র উচ্চারণ করছিলেন যে, সবটা বুঝতে পারলাম না। শুধু শেষটুকু ধরতে পারলাম—"অন্নং সমর্পয়ামি"। এর নাম 'অন্নাভিষেক'। প্রায় ২০-২৫ মিনিট ধরে এই অভিষেক চলল। ভিড় খুব একটা ছিল না। তাই নির্বিবাদেই এই বিশেষ পূজা দর্শন করতে পারলাম। পূজা শেষে আবার ঐ অন্ন সব তুলে নিয়ে গামলাতেই রাখা হলো। তারপরে আবার স্নান করিয়ে চন্দন ও ভস্মলেপনের পর ফুল, বেলপাতা ও মালা দিয়ে শৃঙ্গার করে আরতি করা হলো।

শেষে আমাদের শালপাতায় ঐ প্রসাদ দেওয়া হলো। প্রসাদ মুখে দিয়ে দেখলাম, এ শুধু ভাত নয়—খোয়া ক্ষীর, কাজুবাদাম, কিসমিস, কর্পূর, কেশর মিশ্রিত জমাটবাঁধা

পায়েসের মতো এক বস্তু। পরম তৃপ্তির সঙ্গে প্রসাদ পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। এতক্ষণে চারিদিক দেখার অবকাশ পেলাম। গর্ভমন্দিরের দ্বার বন্ধ হলো। এবার কিছুক্ষণের জন্য দেবতার বিশ্রাম।

আমরা বাইরে আসতেই সম্ভবত পুরোহিতদেরই একজন চরণামৃত ও নির্মাল্য হাতে এগিয়ে এলেন। আমরা সেগুলি গ্রহণ করে তাঁকে সামান্য দক্ষিণা দিয়ে মন্দিরের বিষয়ে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি খুব আগ্রহের সঙ্গে ভাঙা হিন্দিতে আমরা মারাঠী ভাষা জানি কিনা জানতে চাইলেন। আমরা বাঙালী বলায় তিনি আমাদের অবাক করে দিয়ে বাঙলাতেই কথা বলতে শুরু করলেন। উনি কাশীতে দক্ষিণামূর্তি আশ্রমে পাঠকালীন বাঙালী বিদ্যার্থীদের কাছে বাঙলা শিখেছেন। নাটমন্দিরের একপাশে বসে তিনি এখানকার আদি কাহিনী শোনাতে লাগলেন।

নাটমন্দিরের সামনে যে বিশাল চত্বর, সেটি লম্বায় ২৪০ ফুট এবং চওড়ায় ১৮৫ ফুট। আর এর মাঝখানে যে মূল মন্দির ও নাটমন্দির তা ৮৪×৮১ বর্গফুট। বর্তমান মন্দিরটি বেশ কয়েকবার সংস্কার করা হয়েছে। প্রাচীন মন্দির তৈরি হয়েছিল রাষ্ট্রকূট বংশের দন্তিদুর্গ রাজার ইচ্ছানুসারে তাঁর খুড়তুতো ভাই রাজকুমার কৃষ্ণরাজের অর্থে। ভক্তিমান রাজা এই সময়েই ইলোরাতে বিখ্যাত গুহামন্দির 'কৈলাসগুহা'টিও তৈরি করে দেন। ঘৃষ্ণেশ্বর-মন্দিরের মূল গঠনটি সেই সময়কার হলেও কালক্রমে জীর্ণ হয়ে যাওয়ায় কোন একসময় বেরুল অঞ্চলের প্রধান প্যাটেল ভোঁসলেও এই মন্দিরের সংস্কার করেন। এই বংশের প্রতি মহাদেবের বিশেষ করুণার কথাও শোনা যায়।

আরো পরে গৌতমীবাঈ বা বায়জাবাঈ ও হোলকারের রানী অহল্যাবাঈ মন্দিরের এই শেষতম সংস্কার বিশেষভাবে করিয়ে দেন। আজকের এই সুন্দর ভাস্কর্যের মূল রূপটি তাঁদেরই অবদান। মন্দিরের বেশ কিছুটা লালপাথরের তৈরি, তাতে অপূর্ব নৈপুণ্যে দশাবতার ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা আছে। মন্দিরের চূড়ার তাম্রকলসটি সোনার জলে মোড়া। ২৪টি পাথরের অনবদ্য থাম দিয়ে নাটমণ্ডপটিও সেইসময় তৈরি হয়। মূল গর্ভগৃহটি লম্বা-চওড়ায় ১৭×১৭ বর্গফুট। সামনে নন্দিকেশ্বরের নাতিবৃহৎ বিগ্রহ মন্দিরের দিকে মুখ করে আছে। লিঙ্গমূর্তি এখানে পূর্বাভিমুখী।

এই দেবস্থানের নিত্যকার্য পরিচালনার জন্য একটি কমিটি আছে। তাঁরাই সব ব্যবস্থা করেন। দিনে দুবার আরতির সময় নহবতে নাকাড়া বাজানো হয়। এখানে মন্দিরের বাইরে নাটমন্দিরে একবিংশ গণেশপীঠের অন্তর্গত লক্ষবিনায়ক বিরাজ করছেন।

আগে এই অঞ্চলে আদিবাসী নাগ সম্প্রদায়ের লোকেদের বাস ছিল। তাদের মাটির টিবির মতো ঘরকে মারাঠী ভাষায় 'বারুল' বলা হতো। ক্রমে সেই নাম বদলে 'বেরুল' হয়। পাশ দিয়ে 'ইয়েল' নদী বা 'ইয়েল গঙ্গা' প্রবাহিত বলে এই গ্রামকে 'ইয়েলুর' বলা হতো। এই প্রদেশে আগে 'ইয়েল' নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন, সেই থেকেই রাজ্যের নাম 'ইয়েলাপুর' বা 'ইলুপুর'—এমন ধারণাও প্রচলিত আছে। একবার ইয়েলরাজা বনে শিকার করতে গিয়ে তপোবনে ঋষিদের আশ্রমে পোষ্য জীবজন্তুদের ধরে মারতে লাগলেন। তাতে ঋষিরা কষ্ট পেয়ে রাজাকে অভিশাপ দিলেন—তাঁর সর্বাঙ্গে পোকা হবে। সেই শাপে সারা দেহে কীটের তীব্র দংশনে জর্জরিত রাজা বনে ঘুরতে ঘুরতে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে শেষে গরুর ক্ষুরের চাপে তৈরি এক গর্তে কিছু জল দেখে তাই আকণ্ঠ পান করলেন। তারপরেই অদ্ভুত কাণ্ড! দেখা গেল তাঁর সারা শরীর থেকে পোকা বেরিয়ে গিয়েছে, তিনি সম্পূর্ণ নিরোগ ও সুস্থদেহ লাভ করেছেন। মনে এক অপূর্ব আনন্দ লাভ করে রাজা সেইখানেই তপস্যা করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে স্বয়ং ব্রহ্মা সেখানে আবির্ভূত হলে রাজা বর প্রার্থনা করেন—এই স্থান আরো বহু মানুষের রোগজ্বালা মুক্তির ক্ষেত্র হোক। তখন ব্রহ্মার বরে সেই গোষ্পদের ক্ষুদ্র জল এক বিরাট সরোবর ও অষ্টতীর্থের জলে পরিপূর্ণ হয়। নাম হয় 'ব্রহ্ম সরোবর'। পরে এই তীর্থেরই নাম হয় 'শিবালয়'।

এই শিবালয় নিয়ে অন্য কাহিনীও আছে—একবার দেবী পার্বতী সিঁথিতে কুমকুম ও কেশর লাগানোর জন্য হাতে শিবালয় তীর্থের জল নিয়ে ডলতে থাকেন। তখন এক অদ্ভুত কাণ্ড হয়! দুই হাতের পেষণে সেই কেশর কুমকুম একটি ছোট শিবলিঙ্গের আকার নেয়। আর সেই লিঙ্গ থেকে এক দিব্য জ্যোতি প্রকাশ হতে থাকে। এই অদ্ভুত ঘটনা দেখে দেবী পার্বতী অবাক হয়ে গেলে স্বয়ং মহাদেব বলেন, এই লিঙ্গ অগাধ জলের নিচে পাতালে ছিল, ত্রিশূলের খোঁচায় শিবালয় সরোবরে সেটি এসেছিল। এখন হাতে জলের সঙ্গে সেটি ওপরে উঠে এল। দেবী পার্বতী সেই দিব্যজ্যোতিকে কুমকুমের লিঙ্গের ওপর রেখে এখানে প্রতিষ্ঠা করলেন এবং এর নাম দিলেন 'কুমকুমেশ্বর'। কিন্তু দেবী দাক্ষায়ণীর হাতের ঘর্ষণে এই লিঙ্গের উদ্ভব বলে এর নাম প্রচারিত হলো 'ঘৃষ্ণেশ্বর'।

লিঙ্গের আরেক নাম 'ঘৃশ্মেশ্বর'। এই নাম প্রসঙ্গে একটি আবির্ভাব-কাহিনী লিঙ্গপুরাণে পাওয়া যায়। কোন এক সময়ে এক পাহাড়ী অঞ্চলে সুধর্মা নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। প্রথমা স্ত্রী সুদেহার কোন সন্তান না হওয়ায় তাঁরই অনুরোধে ব্রাহ্মণ দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। দ্বিতীয় পত্নী ছিলেন সুদেহার এক ভাইঝি ঘুশ্মা। বিবাহের পর ব্রাহ্মণ তাঁকে বললেন, প্রতিদিন ১০১টি পার্থিব শিবলিঙ্গ তৈরি করে পূজা করতে এবং পূজাশেষে পাশের পুষ্করিণীতে সেগুলি বিসর্জন দিতে। ঘুশ্মা সেই নির্দেশমতো নিত্য শিবপূজা করে সেই পুষ্করিণীতে পূজিত শিবলিঙ্গ বিসর্জন দিতে লাগলেন। অবশেষে যখন

সেখানে এক লক্ষ শিবলিঙ্গ জমা হলো, তখন শিবের কৃপায় তাঁর গর্ভে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করল। সেই পুত্র অপরূপ রূপবান, গুণবান ও ভক্তিমান। ক্রমে ক্রমে সে যৌবনে পদার্পণ করল। যথাসময়ে তার বিয়েও হয়ে গেল। কিন্তু সুদেহা সতীনের এই সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়লেন। একদিন নিজেকে আর সামলাতে না পেরে তিনি গভীর রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থাতে পুত্রকে হত্যা করে তার শবদেহ পুষ্করিণীতে ফেলে দিলেন। পরদিন সকালে এমন মর্মান্তিক কাণ্ড দেখে কান্নাকাটি পড়ে গেল। কিন্তু সেসময় ঘুশ্মা এবং সুধর্মা পূজার আসনে থাকায় সবকিছু শুনেও উঠলেন না। পরে পূজাশেষে উঠে বললেন ঃ ভগবান নিজের ইচ্ছামত জীবের কখনো সংযোগ কখনো বিয়োগ করেন। তাই এ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। এই বলে পূজিত লিঙ্গ বিসর্জন দেওয়ার জন্য ঘুশ্মা সেই পুষ্করিণীতে গেলেন। তখন তাঁর মৃত পুত্র জীবন্ত হয়ে পুষ্করিণী থেকে উঠে এল। পুত্রের পুনর্জীবন প্রাপ্তিতেও ঘুশ্মা অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন না। তিনি অচঞ্চল রইলেন। তখন স্বয়ং মহাদেব সেখানে আবির্ভূত হয়ে বললেন ঃ তোমার প্রতি আমি সন্তুষ্ট। তুমি বর নাও। আর ঐ দুষ্টা সুদেহাকে আমি এখনি বিনাশ করব। এই কথা শুনে ঘুশ্মা বললেন ঃ হে মহাদেব, তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও। আর লোককল্যাণের জন্য কৃপা করে এইখানে তুমি দীর্ঘকাল অবস্থান কর—এই আমার প্রার্থনা। শিব সেই প্রার্থনায় 'তথাস্তু' বললেন। আরো বললেন, ঃ হে কন্যা, তোমার নাম থেকেই এখানে আমি 'ঘুশ্মেশ' নামে প্রসিদ্ধ হব। আর এই লক্ষাধিক শিবলিঙ্গের বিসর্জন দেওয়া স্থানটির নাম হবে 'শিবালয়'।

এই দীর্ঘ কাহিনী শুনিয়ে ঘৃষ্ণেশ্বর-মন্দিরের সেই পূজারী ব্রাহ্মণ হাতজোড় করে আমাদেরও তাঁর সঙ্গে মহাদেবের প্রণামমন্ত্র উচ্চারণ করতে বললেন ঃ "করচরণকৃতং বাক্ কায়জং কর্মজং বা।/ শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাহ্‌পরাধম্।/ বিহিতমবিহিতং বা সর্বমেতৎ ক্ষমস্ব।/ জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো।।"

দূর থেকে ঘৃষ্ণেশ্বর ও শিবালয়কে প্রণাম জানিয়ে আমরা গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। ❑



সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন

আমাদের ভগ্নপ্রায় একটি School Building পুনর্নির্মাণের জন্য 'উদ্বোধন' পত্রিকার মাধ্যমে আবেদন রেখেছিলাম। এই আবেদনে অভাবনীয় সাড়া আমাদের মুগ্ধ ও উৎসাহিত করেছে। ঐ ভগ্নগৃহটির একতলার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন আমরা পুরনো স্কুলবাড়ি সংস্কারেও হাত দিতে চলেছি। তার অবস্থাও মোটেই সুবিধার নয়। প্রকৃতপক্ষে সংস্কার করতে গিয়ে পুরনো ঘরগুলি পুনর্নির্মিতই হয়ে যাবে। এই প্রকল্পের জন্য এবং তৎসহ আরো কিছু জরুরী প্রকল্পের জন্য আবার আপনাদের সাহায্য চাইছি। নিচে তার একটা আনুমানিক হিসাব দিলাম।

১।	পুরনো School Building-এর সংস্কার তথা পুনর্নির্মাণ প্রকল্প	ঃ	২০,০০,০০০ টাকা
২।	আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প	ঃ	১০,০০,০০০ টাকা
৩।	শিক্ষা-বিষয়ক যন্ত্রপাতি	ঃ	১,০০,০০০ টাকা
৪।	একখানা Ambulance গাড়ি	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
			৩৬,০০,০০০ টাকা

চেক/ড্রাফট 'Ramakrishna Mission Ashrama, Ramharipur'—এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফট পাঠাবার ঠিকানা—রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা—বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ ঃ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন নং ৫৯২৩৫।

রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি

বিনীত

স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ

সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম

রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া

সুস্বাস্থ্য

> শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।
> —কালিদাস (কুমারসম্ভব, ৫।৩৩)

স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়

অধ্যাপক ডাঃ সত্যানন্দ চক্রবর্তী

খ্যাতনামা প্রবীণ হোমিও চিকিৎসক



বহুমূত্র ও উপবাস

❑ বর্তমান বিশ্বের এক গুরুতর সমস্যা বহুমূত্র ব্যাধি। বিভিন্ন চিকিৎসাপদ্ধতি বিভিন্ন উপায় অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছে। সেসব পন্থা যথাযথ স্থানে ও রোগীবিশেষে অবশ্যই কার্যকরী। একটি সহজ উপায় এখানে উল্লেখ করা হলো, যা কোন চিকিৎসাপদ্ধতিতেই বাধা সৃষ্টি করবে না। বহুমূত্র রোগে উপবাস একটি বিশেষভাবে উপকারী অবলম্বন। বহুমূত্র ব্যাধি থেকে যাঁরা নিজেদের মুক্ত রাখতে চান তাঁরা এই উপায় অবলম্বন করে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে পারেন। যাঁরা দুর্বল, ক্ষীণকায় তাঁরা যেন উপবাস না করেন। সম্ভবমত তাঁরা সাতদিনে একরাত্রি উপবাস করতে পারেন। রাত্রে শয়নকালে উপবাসে দেহের ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। দেহ ক্লান্তও হয় না। উপরন্তু তা বহুমূত্র রোগ নিরাময়ে বিশেষ সহায়ক হয়। যাঁদের দেহে অধিক চর্বি তাঁরা সাতদিনে একদিন পূর্ণ উপবাস করলে চর্বি হ্রাস করানোর অন্য কোন উপায় গ্রহণের প্রয়োজন হবে না। ক্ষুধার উদ্রেক হলেই অধিক পরিমাণে জল, সম্ভব বা সহ্য হলে মুসম্বিলেবুর রস, কমলালেবুর রস, পাতিলেবুর রস, ডাবের জল, ডালের জল, তরিতরকারির ঝোল পান করে ক্ষুধা নিবারণ করে নিতে পারেন। রাসায়নিক পানীয়, সোডাওয়াটার, কফি, চা পান সর্বাবস্থাতে ক্ষতিকর।



উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত
স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী

ভক্তিযোগ মূল্য ঃ ১০ টাকা	**বর্তমান ভারত** মূল্য ঃ ৬ টাকা	**দেববাণী** মূল্য ঃ ১৮ টাকা
কর্মযোগ মূল্য ঃ ১৭ টাকা	**পরিব্রাজক** মূল্য ঃ ১২ টাকা	**ভারতে বিবেকানন্দ** মূল্য ঃ ৩৫ টাকা
রাজযোগ মূল্য ঃ ২৭ টাকা	**প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য** মূল্য ঃ ১২ টাকা	**স্বামি-শিষ্য-সংবাদ** মূল্য ঃ ৪০ টাকা
জ্ঞানযোগ মূল্য ঃ ৩৫ টাকা	**স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা** সাধারণ বাঁধাই সেট ঃ ৪০০ টাকা রেক্সিন বাঁধাই সেট ঃ ৫০০ টাকা	**পত্রাবলী** মূল্য ঃ ১৬৫ টাকা

পথের ধর্ম, ধর্মের পথ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

যদি এমন একটি দৃশ্য-কল্পনা মনে আনা যায়—এক বন্ধু আরেক বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে পথ হাঁটছেন। দুই বন্ধুর বয়সের ব্যবধান অনেক। একজন তরুণ, আরেকজনের বয়সের গাছপাথর নেই। অতিপ্রবীণ। তিনি এই পৃথিবীতে অনেক আগে এসেছেন। এই পৃথিবীর গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পরিবেশ, প্রাণিজীবন, চাল-চলন, ধরন-ধারণ সবই জানেন। ইতিহাস জানেন, বিজ্ঞান জানেন—পরাবিজ্ঞান, অপরা-বিজ্ঞান। তিনি ত্রিকালজ্ঞ। তিনি তরুণটির কাঁধে হাত রেখে পথ হাঁটছেন। এই পথচলার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁর হাতটি কাঁধে রাখবেন। কানে কানে বলবেন ঃ জীবনের পথ ধরে হাঁট বন্ধু। আমি তোমার পাশে আছি। আমি তোমাকে ঘিরে আছি। আমি তোমার বাইরে আছি, আমি তোমার ভিতরে আছি। কখনো আমি আর তুমি এক। "সন্নাপি অসন্নাপি, ভিন্নাপি অভিন্নাপি"। (বিবেকচূড়ামণি, ১০৯)

এই প্রবীণ বন্ধু কল্যাণপথের নির্দেশ দিতে পারেন, দিচ্ছেনও। সে-নির্দেশ পালিত হবে কি হবে না—সেই জানে, যাকে এই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। সেই নির্দেশ না শুনে, না মেনে যারা বিপথে গিয়ে বিপদে পড়ে, তাকে তার এই প্রবীণ বন্ধু বলেন ঃ দেখলে তো, শুনলে না! তাই তোমার এই বিপদ হলো! আচ্ছা, যা হয়েছে, হয়েছে। ওঠ, আবার চল। আমি আছি। তোমার সঙ্গেই আছি।

একদিন হয়তো লজ্জা আসবে। আমার বেচালে আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বন্ধুটির কী দশা! কেন আমি তাঁর নির্দেশ, তাঁর পরামর্শ মানছি না! এই লজ্জার নাম 'বিবেক'। ভগবান জীবের অন্তরে বিবেক হয়ে জেগে ওঠেন।

সাধুর ভগবান, জ্ঞানীর ভগবান, সাধারণ মানুষের ভগবান কি রকম রকম? অবশ্যই নয়। সাধু জগৎ থেকে সরে গিয়ে ঈশ্বরলাভের চেষ্টা করেন। যদি তাঁকে প্রশ্ন করা হয়—কিসের সন্ধানে চলেছেন আপনি? তিনি হয়তো বলবেন ঃ আমি অপূর্ণ। পূর্ণ হতে চাই। অপূর্ণ কোন্ অর্থে? জ্ঞান। আমি অজ্ঞান। আমি আমার ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব করছি। তারা যেদিকে ছোটায় সেইদিকে ছুটি। প্রচুর আকাঙ্ক্ষা, প্রবল বাসনা। নিজেকে বড় হীন মনে হয়। আমি আমার গৌরবের স্থলটি খুঁজে পেতে চাই। আতঙ্কের জগতে বসে আমি আনন্দের জগতের অনুসন্ধান করছি। আর শুনেছি—সেই জগৎটি ভগবানের। সংসার যেন 'বিশালাক্ষীর দ'। ঘুরপাক খাইয়ে গভীরে টেনে নিয়ে যায়। এটুকু বুঝেছি—সংসারে সারবস্তু কিছু নেই, "আমড়া—আঁটি আর চামড়া।" সেই কারণে—

"আর কেন মন—এ সংসারে, যাই চল সেই নগরে।
সেথা দিবানিশি পূর্ণশশী আনন্দে বিরাজ করে।।
পক্ষ ভেদে ক্ষয় উদয় নাইকো চাঁদের সে পুরে।
নাই ক্ষুধা তৃষ্ণা ভোগ পিপাসা, পূর্ণানন্দ বিহরে।।"

জ্ঞানীকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনার ঈশ্বর? তিনি তুলবেন অনন্ত তর্ক ও বিতর্ক। বলবেন বহুরকমের জটিল শব্দ—সাকার, নিরাকার। তিনি দেহের আত্মা, না আত্মার দেহ? তাঁকে লাভ করতে হলে সংসার ছেড়ে গুহাবাসী হতে হবে? কোন্ নিয়মে সাধন করতে হবে? শিষ্য এইরকম প্রশ্ন করতে পারেন গুরুকে—

"কৃপয়া শ্রূয়তাং স্বামিন্ প্রশ্নোঽয়ং ক্রিয়তে ময়া।
যদুত্তরমহং শ্রুত্বা কৃতার্থঃ স্যাং ভবন্মুখাৎ।।
কো নাম বন্ধঃ কথমেষ আগতঃ কথং প্রতিষ্ঠাঽস্য কথং বিমোক্ষঃ।
কোঽসাবনাত্মা পরমঃ ক আত্মা তয়োর্বিবেকঃ কথমেতদুচ্যতাম্।।"
(ঐ, ৪৮-৪৯)

—প্রভু! আমি যে-প্রশ্ন করছি, কৃপা করে শুনুন। বন্ধন কাকে বলে? বন্ধন আসে কিভাবে? কিভাবে বেঁধে রাখে? কিভাবে বন্ধনমুক্ত হওয়া যায়? অনাত্মা কার নাম, পরমাত্মাই বা কি? আত্মা আর অনাত্মার বিচারই বা কিরূপ?

শঙ্করাচার্য উত্তর দিচ্ছেন। তিনি সেই বন্ধু আমাদের। বলছেন, অবিদ্যাবন্ধন উন্মোচন বা বিমোচন কর। শোন, পিতৃঋণ বিমোচনের জন্য পুত্রাদিরা আছে। শ্রাদ্ধাদি করে মুক্তির পথ করে দেবে; কিন্তু নিজের বন্ধন নিজেকেই খুলতে হবে। তারপর ধর তোমার মাথায় বোঝা, বইতে পারছ না; কেউ এসে তোমাকে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু ধর, তোমার খিদে পেয়েছে, জল তেষ্টা পেয়েছে; তখন তোমাকেই খেতে হবে, পান করতে হবে। অন্য কেউ খেলে হবে কি? যে-রোগী পথ্য ও ঔষধ খায়, তার পীড়া-আরোগ্যরূপ সিদ্ধিলাভ হয়। যে তার বিপরীত আচরণ করে তার আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা নেই। এইবার শঙ্করাচার্য যা বললেন সেটি ধর্মপথের অতি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত—

"বস্তুস্বরূপং স্ফুটবোধচক্ষুষা স্বেনৈব বেদ্যং ন তু পণ্ডিতেন।
চন্দ্রস্বরূপং নিজচক্ষুষৈব, জ্ঞাতমন্যৈরবগম্যতে কিম্।।"
(ঐ, ৫৪)

—নিজের চোখ দিয়ে যেমন চাঁদের স্বরূপ দর্শন হয়, অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা হতে পারে না, সেইরকম জ্ঞানচক্ষু দ্বারাই ব্রহ্মপদার্থের স্বরূপ দর্শন হয়, অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হতে পারে না। একমাত্র জ্ঞান, শুধু শাস্ত্র চটকালে হয় না।

এরপর যদি জিজ্ঞাসা করা হয়—ভগবান সম্পর্কে কি ধারণা? অধিকাংশ মানুষ বলবেন, অতশত জানি না, বিপদে পড়লে ডাক্তারকেও ডাকি, ভগবানকেও ডাকি। অভাবে পড়লে মন্দিরে গিয়ে পুজো চড়াই। যখন দুঃখ আসে, প্রতারিত হই, যখন মৃত্যু এসে প্রিয়জনকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, যখন অপমানিত হই, বিতাড়িত হই—তখন বুঝতে পারি, "যার কেহ নাই, তুমি আছ তার"।

কে এই 'তুমি'? সঠিকভাবে বলা যাবে না। একটা কথাই বলা যাবে—আমি নই। যেখানে 'আমি' হালে পানি পাবে না, সেইখানেই 'তুমি'র আবির্ভাব।

বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্, চণ্ডী, অজস্র টীকা ও ভাষ্যে ধর্মের জ্ঞানভাণ্ডার উপচে পড়ছে। মানুষ সম্ভ্রমে তার সামনে নত। গ্রহণের চেষ্টা আছে, কিন্তু জীবনে ফলিত করার চেষ্টায় অনেক বাধা। তার কারণ, বেঁচে থাকার বহুতর সমস্যার সরাসরি সমাধান পাওয়া যাবে না। যেসব সমাধান আছে সেখানে তা আয়ত্ত করা সহজ কাজ নয়। আমি বেঁচে থাকব, কিন্তু আমার 'আমি'টা 'তুমি' হয়ে যাবে। ওষুধ নয়, অস্ত্রোপচার নয়, ঐকান্তিক ভাবনায় অলৌকিক এক 'ট্রান্সপ্ল্যান্ট'! বরং একথা সহজেই বোঝা যাবে—পথ দুটি—'প্রবৃত্তি' আর 'নিবৃত্তি'। প্রবৃত্তির পথ ধরে গেলে সংসার। ধর্মের কারণে সংসার তো শ্মশান হয়ে যেতে পারে না। 'মায়া', 'মায়া' বলে ঢাকঢোল বাজালে জগৎজোড়া সংসারের যত আয়োজন সব উবে যাবে—এমনও নয়। মায়া এখন ঘোর মায়া। কত আলো! কত বৈচিত্র্য! কত ভোগের উপকরণ!

সংসার থেকে শ্মশান একটি পথ। শ্মশান শ্মশানই থাকবে। সংসার সংসার। সংসারকে শ্মশান করলে মানুষ আসবে কোথায়! রাজা যুধিষ্ঠিরের সংসার ছিল, শ্রীকৃষ্ণের ছিল, রামচন্দ্রের ছিল, মহাপ্রভুর ছিল, শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল। রঘুবীর কোথায় এসে আসন পাতবেন? কোন্ মন্দির আলো করবেন মা ভবতারিণী? মন্দিরনির্মাণের অর্থ আসবে কোথা থেকে? শঙ্করাচার্যের চারটি ধাম নির্মাণের সহযোগিতা তো সংসারীকেই করতে হবে।

সংসারকে করতে হবে ধর্মের সংসার, শিবের সংসার। গৃহ আর গৃহীকে বাদ দিলে ধর্মের ভিত টলে যাবে। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে দাঁড়াতে হবে সকলকেই। সেই স্থানটি বড় পবিত্র, বড় গৌরবের। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যোদ্ধা পাঠাবে সংসার। শ্রীকৃষ্ণ সংসার থেকে শ্মশানে টেনে নিয়ে গিয়ে অর্জুনকে জীবনের মন্ত্র দিলেন না। এমন এক পরিবেশে নিয়ে গেলেন, যেখানে দাঁড়িয়ে তিনটি কালের প্রবাহকে মানসপটে প্রত্যক্ষ করা যায়। থাকা আর না-থাকা, অস্তিত্ব আর অনস্তিত্বের সংযোগস্থল। ধর্মকে ধারণ করতে হলে মৃত্যুর আগেই মৃত্যুকে এগিয়ে আনতে হবে। আর তখনি 'আমি'টা 'তুমি' হয়ে যাবে। অর্জুন ভয় পেয়েছেন। সামনে ত্রিকাল। বর্তমানে দাঁড়িয়ে আছেন। অতীত পড়ে আছে মহাসমারোহে ঘটনার জাল বুনে। অতীত রচনা করেছে বর্তমান। বর্তমানে রয়েছে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। এ কেমন—বর্তমান একটা থালা, অতীত হলো রান্নাঘর, পরিবেশিত হচ্ছে ভবিষ্যৎ। ইংরেজী একটি প্রবাদ—"He that would know what shall be, must consider what has been."

অর্জুন বর্তমানটিকে সমর্পণ করে দিলেন ভগবানের হাতে। পরিস্থিতি অর্জুনকে শেখাতে চাইছে সেই অমোঘ সত্য—

"আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিং তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ।।"
(কঠ উপনিষদ্, ১।৩।৩)

—জীবাত্মাকে রথের রথী আর শরীরকে রথ বলে জেনো, বুদ্ধি হলো সারথি আর মন হলো বলগা।

উপনিষদের কাছে প্রার্থনা করি। গিরিশচন্দ্রের প্রশ্নটি তুলে ধরি—"কে খেলায় আমি খেলি বা কেন"? বুদ্ধদেব এই প্রশ্নের সমাধান দিচ্ছেন গিরিশ-নাটকে—

"নিত্য আমি
নাহি জন্ম নাহিক মরণ
নাহি নাম-ধাম, উপাধিরহিত।"

উপনিষদ্ এই সিদ্ধান্তেই এনে ফেলবেন কয়েক ধাপ বিশ্লেষণের পথে। প্রথমে বলবেন ঃ

"ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।।"
(ঐ, ১।৩।৪)

—আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ হলো অশ্ব, শরীর হলো রথ। রূপ, রস, শব্দ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের বিষয় যেন সেই অশ্বগুলির রাজপথ। দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়যুক্ত আত্মাই স্বয়ং ভোক্তা।

স্বাভাবিক প্রশ্ন—তাহলে কর্তা কে? দেহ, মন অথবা ইন্দ্রিয়? উপনিষদের উত্তর—দেহ, মন আর ইন্দ্রিয়যুক্ত আত্মাই কর্তা। ইনি আবার কোন্ আত্মা? 'জীব' বা 'জীবাত্মা'? প্রকৃত আত্মা হলেন 'পরমাত্মা' অথবা 'শুদ্ধ চৈতন্য'। অতঃপর উপনিষদের কাছে প্রশ্ন—পথের শেষ কোথাও আছে কি? না, রবীন্দ্রনাথের মতো বলব—

"শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?
আঘাত হয়ে দেখা দিল, আগুন হয়ে জ্বলবে।।
সাঙ্গ হলে মেঘের পালা শুরু হবে বৃষ্টি ঢালা,
বরফ-জমা সারা হলে নদী হয়ে গলবে।।
ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে,
অন্ধকারের পেরিয়ে দুয়ার যায় চলে আলোকে।
পুরাতনের হৃদয় টুটে আপনি নূতন উঠবে ফুটে,
জীবনে ফুল ফোটা হলে মরণে ফল ফলবে।।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যিক সুষমায় উপনিষদকেই প্রকাশ করছেন—"ফুরায় যা তা ফুরায় শুধু চোখে"। উপনিষদ্ পথের নির্দেশ দিচ্ছেন—পথের পরিচয়ও দিচ্ছেন—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।।"
(ঐ, ১।৩।১৪)

—উপযুক্ত আচার্যের শরণ নিতে হবে। তাঁরা পথের নির্দেশ দেবেন। পথ অতি দুর্গম। ক্ষুরের তীক্ষ্ণ ধারের ওপর দিয়ে চলা। আচার্য কৃপা করে সেই পথ দিয়েই নিয়ে যান আত্মস্বরূপে।

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।।"
(ঐ, ১।৩।১৫)

—মানুষের জীবনের লক্ষ্য আত্মজ্ঞান লাভ করা। সঘোষে জানায় না—আমি শব্দহীন, স্পর্শহীন, রূপহীন, গন্ধহীন, শাশ্বত, অবিনাশী, অনাদি, অনন্ত, হিরণ্যগর্ভের চেয়েও শ্রেষ্ঠ, নিত্যবস্তু আত্মাকে জানতে চাই, প্রতিষ্ঠিত হতে চাই; কিন্তু প্রতি পদে তার স্বগতোক্তি থেকে বোঝা যায়—তার অন্বেষণ হলো এমন কিছু যা সুন্দর, প্রেমময়, উজ্জ্বল, শান্ত, দান্ত, সৌম্য, শিব। মানুষ সঙ্কীর্ণতা থেকে উদারতায় যেতে চায়, অন্ধকার থেকে আলোতে। উপনিষদ্ আরো এক কদম এগিয়ে দিতে চায়—বাইরে নয় ভিতরে—

"অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি।
ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।
এতদ্বৈ তৎ।।" (ঐ, ২।১।১২)

—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষ (ব্রহ্ম) দেহের অভ্যন্তরে বাস করেন। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সাধক যখন ব্রহ্মকে জানতে পারেন, তখন তিনি নিজেকে আর গোপন করেন না। জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন। ধূমহীন এক অগ্নিশিখা জীবের হৃদয়ে। তিনি পুরুষ। এই পুরুষ কালাধীশ। তিনি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের নিয়ামক। ইনি সতত বিদ্যমান। সর্বত্র বিদ্যমান।

নচিকেতা যদি স্বামী বিবেকানন্দকে জিজ্ঞেস করতেন—জীবন ভাসতে ভাসতে যায় কোথায়, তাহলে অপূর্ব এই উত্তরটি পেতেন—

"একখানা মেঘ চাঁদের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাতে এই ভ্রমের উৎপত্তি হচ্ছে যে, চাঁদটাই চলেছে। তেমনি প্রকৃতি, দেহ, জড়বস্তু—এইগুলি সচল, গতিশীল; এদের গতিতেই এই ভ্রম উৎপন্ন হচ্ছে যে, আত্মা গতিশীল। সুতরাং অবশেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যে সহজাত জ্ঞান দ্বারা সর্বজাতির উচ্চনীচ সবরকমের লোক, মৃত ব্যক্তিদের অস্তিত্ব নিজেদের কাছেই অনুভব করে এসেছে, যুক্তির দৃষ্টিতেও তা সত্য।

"প্রত্যেক জীবাত্মাই এক-একটা নক্ষত্রস্বরূপ, আর ঈশ্বররূপ সেই অনন্ত নির্মল নীল আকাশে এই নক্ষত্ররাজি বিন্যস্ত রয়েছে। সেই ঈশ্বরই প্রত্যেক জীবাত্মার মূল স্বরূপ, তিনি প্রত্যেকের যথার্থ স্বরূপ, প্রত্যেকের প্রকৃত ব্যক্তিত্বই তিনি। কতকগুলি জীবাত্মারূপ তারকা—যাঁরা আমাদের দিগন্তের বাইরে চলে গেছেন, তাঁদের সন্ধানেই ধর্ম জিনিসটার আরম্ভ; আর এই অনুসন্ধান সমাপ্ত হলো—যখন তাঁদের সকলকেই ভগবানের মধ্যে পাওয়া গেল এবং আমরা আমাদের নিজেদেরও যখন তাঁর মধ্যে পেলাম।"

পথের শেষ কোথায়? আপাত সহজ দৃষ্টিতে—মৃত্যুতে। থাকতে থাকতে না থাকায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি প্রত্যক্ষ দর্শন উল্লেখের প্রয়োজন আছে। স্বয়ং অবতার মথুরবাবুর হাত ধরেছিলেন। তাঁকে চালাচ্ছিলেন। মথুরবাবু যেদিন নশ্বর দেহ ত্যাগ করবেন, সেদিন ঠাকুর হৃদয়কেও দেখতে পাঠালেন না। কালীঘাটে তাঁর দেহত্যাগের কয়েক ঘণ্টা আগে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে গভীর ধ্যানমগ্ন হলেন। জ্যোতির্ময় বর্ত্মে দিব্য শরীরে ভক্ত মথুরের শয্যাপার্শ্বে গিয়ে দাঁড়ালেন। তখন বিকেল পাঁচটা! ঠাকুরের কী অপূর্ব দর্শন! আত্মার এক লোক থেকে আরেক লোকে গমনের কী আয়োজন! দিব্যরথ এসেছে। ঠাকুর দেখছেন—"শ্রীশ্রীজগদম্বার সখীগণ মথুরকে সাদরে দিব্যরথে তুলে নিলেন—তার তেজ শ্রীশ্রীদেবীলোকে গমন করল।" পরে ঠাকুর ভক্তদের বলছিলেন, পুণ্যলোকে গেলেও ওকে আবার আসতে হবে। ভোগবাসনার সম্পূর্ণ ক্ষয় হয়নি।

বৃদ্ধ মণিমোহন পুত্রশোকাতুর। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন ঃ "আহা! পুত্রশোকের মতো কি আর জ্বালা আছে? খোলটা (দেহ) থেকে বেরয় কিনা! খোলটার সঙ্গে সম্বন্ধ—যতদিন খোলটা থাকে ততদিন থাকে।" ঠাকুর নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুর কথা তাঁকে বলছেন। নিজে তখন বিমর্ষ গম্ভীর। "অক্ষয় মলো—তখন কিছু হলো না। কেমন করে মানুষ মরে, বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। দেখলুম—যেন খাপের ভেতর তলোয়ারখানা ছিল, সেটাকে খাপ থেকে বার করে নিলে; তলোয়ারের কিছু হলো না—যেমন তেমনি থাকল, খাপটা পড়ে রইল! দেখে খুব আনন্দ হলো, খুব গান করলুম, নাচলুম, হাসলুম। তার শরীরটাকে তো পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে এল! তারপর এল শোক।"

প্রশ্ন হলো, জীবন-পথ কি দুটো? ধর্মের পথ, অধর্মের পথ? অবশ্যই নয়। তাহলে পথিক কে? স্বয়ং ভগবান। শৈশবের একটি দৃশ্য মনে আসছে। এক ফেরিওলা। মাথায় তার ঝুড়ি, হাঁকতে হাঁকতে যাচ্ছে—পুতুল নেবে, পুতুল? সেই ঝুড়ি থেকে মুখ বের করে আছে শ্রীরামচন্দ্র, সঙ্কীর্তনানন্দে মহাপ্রভু, গোরা সৈন্য, পেটমোটা ব্রাহ্মণ, লাঠিধারী সিপাই, বাঁদর, ভাল্লুক।

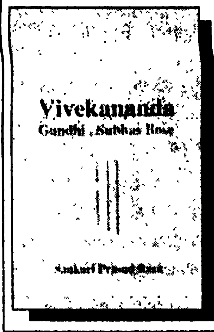
ভগবান মাথায় ঝুড়ি নিয়ে সৃষ্টির পথ ধরে হাঁটছেন। মাথায় ঝুড়ি। এই নাও, গাছে ছেড়ে দিলুম বাঁদর, চিরকাল ঝুলে থাক বানর-বংশ। বনে ঢুকিয়ে দিলুম বাঘ, ছুটিয়ে দিলুম সুন্দরী হরিণ। আর সমস্যাটা তৈরি করে দিলুম চৈতন্যময় মানুষের বিভাগে—এই নাও রাম, রাবণও দিলুম। শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে জগাই-মাধাই। পাণ্ডবদের বিপক্ষে হাজির কৌরব। আবার শ্রীকৃষ্ণ উভয় কূলের সখা।

স্বামীজী ঠাকুরের সঙ্গে প্রথম মিলনের দিনে অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর যে-গানটি গেয়েছিলেন, সেইটিতে এই পথের অতুলনীয় প্রকাশ আছে। মনে হয়, সব কথার শেষকথা—

"সত্যপথে মন কর আরোহণ
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্যধন, গোপনে অতি যতনে,
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ পথিকের করে সর্বস্ব হরণ
পরম যতনে রাখরে প্রহরী শম দম দুইজনে।" ❑

ভারতীয় অর্থনীতি ও রাজনীতির জনক স্বামী বিবেকানন্দ

সুনীলবিহারী ঘোষ



Economic & Political Ideas : Vivekananda • Gandhi • Subhas Bose
Sankari Prasad Basu
Publisher :
Sterling Publishers Pvt. Ltd.
L-10, Green Park Extension
New Delhi-110016
Pages : 10+154
***Price :* Rs. 375**

খ্যাত বিবেকানন্দ-গবেষক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর নয়াদিল্লিতে প্রদত্ত ভিলওয়ারা স্মারক বক্তৃতার ভিত্তিতে প্রণীত **'Economic & Political Ideas : Vivekananda • Gandhi • Subhas Bose'** শীর্ষক আলোচ্য গ্রন্থ সম্পর্কে ২৮ অক্টোবর ২০০০-এ সুপ্রচারিত 'হিন্দু' পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছে ঃ "Perhaps the first book to compare the philosophies of Swami Vivekananda, Gandhi and Subhas." স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা তথা ভারতচিন্তা নিয়ে লেখা গ্রন্থের সংখ্যা অল্প নয়। কিন্তু স্বামীজীর অর্থনৈতিক ভাবনা? বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ডঃ ভবতোষ দত্ত তাঁর 'Evolution of Economic Thinking in India' (১৯৬২) গ্রন্থে বলেছেন, উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের নায়কদের মধ্যে একমাত্র রামমোহনেরই কিছু অর্থনৈতিক চেতনা ছিল। ডঃ ভবতোষ দত্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, দাদাভাই নওরোজী এবং মহাদেব গোবিন্দ রানাডের কথা বলেছেন। আমরা জানি, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে যে অভূতপূর্ব জাতীয় চেতনার সঞ্চার হয়েছিল, তা প্রধানত বিবেকানন্দের সৃষ্টি। তিনি রাজনৈতিক চেতনা ঘটালেন, অথচ তাঁর নিজের অর্থনৈতিক চেতনা ছিল না? একথা ভাবা যায় না। কারণ, এই দুটি চিন্তার যোগ অঙ্গাঙ্গী, অবিচ্ছেদ্য। তৎকালীন ভারতের ঘোর অর্থনৈতিক সঙ্কট ও সমস্যাদি নিয়ে স্বামীজী চিন্তা করতেন। দুঃখের কথা, স্বামী অশোকানন্দ, সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন ছাড়া স্বামীজীর চিন্তার এই দিকটি নিয়ে কেউই ভাবেননি। এটা আনন্দ ও আশ্চর্যের বিষয়, প্রখ্যাত বিবেকানন্দ-গবেষক, লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রাবন্ধিক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির তথাকথিত ছাত্র না হয়েও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্বামীজীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মতবাদ বিষয়ে সুগভীর আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার গণ্ডির মধ্যে যে তিনজন ব্যক্তিত্বকে এনেছেন, চিন্তা-ভাবনা-বিশ্বাসে তাঁদের সর্বদা সুর না মিললেও ভারতপ্রেমে তাঁরা এক এবং অভিন্ন। এই ভিন্নপথযাত্রীদের একটা ক্ষেত্রে নিয়ে আসা দুরূহ কাজ এবং সেই কাজে অধ্যাপক বসু পুরোপুরি সফল।

গ্রন্থটির তিনটি পর্ব। প্রথম পর্বে গ্রন্থটির প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে বিবেকানন্দের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা বিস্তৃতভাবে আলোচিত। প্রারম্ভেই চমৎকৃত করে একটি উক্তি ঃ "Vivekananda—the Father of Modern Materialism in India." উক্তিটি বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের। তিনি স্বামীজীকে "আধুনিক বস্তুতন্ত্রের প্রথম বার্তাবহ"-রূপে অভিহিত করেছেন। 'ক্যালকাটা রিভিউ'তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে তিনি লেখেন ঃ "Kant is the Father of Modern Materialism for the West, Vivekananda is the Father of Modern Materialism for India." অধ্যাপক বসু স্বামীজীর এই অভিধার প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তৎকালীন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা, দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষের পুনরাবৃত্তি তথ্যসহ আলোচনা করেছেন। স্বামীজীর সময়ে ভারতে ১৬ বার দুর্ভিক্ষ হয় এবং প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ মারা যায়। এই বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার একমাত্র পথ, স্বামীজীর মতে, কৃষি ও শিল্পের যথার্থ সমন্বয়। দেশে কৃষিবিদ্যার আধুনিকতা, শিল্প-কারীগরী বিদ্যালয় স্থাপন, বিদ্যুতের প্রসার ও ব্যবহার, সর্বোপরি বিজ্ঞানচেতনার উন্মেষ—এসব বিষয়ে স্বামীজীর ভাবনার কথা গ্রন্থমধ্যে বলা হয়েছে। স্বামীজী চাইতেন, বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার নানা উপকরণ, এমনকি বিলাসদ্রব্য দেশে প্রস্তুত হলে গরিবদের উপকার হবে। স্বামীজীর চিন্তায় কৃষি, উৎপাদনী শিল্প, ব্যবসা ও বাণিজ্য—সকলই জড়িত। বিদেশের সঙ্গে ব্যবসার উৎসাহ নিয়ে লেখা স্বামীজীর ১৭ জানুয়ারি ১৮৯৬ তারিখের একটি পত্রাংশ অধ্যাপক বসু উদ্ধৃত করেছেন ঃ "মুগের ডাল, অড়র ডাল প্রভৃতিতে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার একটা খুব ব্যবসা চলিতে পারে। ডাল—soup will have a go if properly introduced। যদি ছোট ছোট প্যাকেট করে তার গায়ে রাঁধবার direction দিয়ে বাড়িতে বাড়িতে পাঠানো যায়—আর একটা ডিপো করে কতকগুলো মাল পাঠানো যায় তো খুব চলতে পারে। ঐপ্রকার বড়িও খুব চলবে। উদ্যম চাই—ঘরে বসে ঘোড়ার ডিম হয়।" শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে বিদেশে ব্যবসা, বিশেষ করে বেনারসী শাড়ি ও অন্যান্য বস্ত্র নিয়ে স্বামীজীর উদ্দীপ্ত আলোচনাও এখানে পাওয়া যাবে। এদেশে মার্কিন পুঁজিবিনিয়োগ এবং 'ট্রেড সিক্রেট' বিষয়ে স্বামীজীর চিন্তা আমাদের চমৎকৃত করবে।

গ্রন্থের প্রথম পর্বের একটি প্রাণবন্ত আলোচনা—বিবেকানন্দ এবং জামসেদজী টাটা। কিভাবে এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী তদানীন্তন 'ভারতীয় শিল্পের নায়ক' জামসেদজী টাটাকে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিল্পোৎপাদনে প্রভাবিত করেছিলেন, তার চিত্তাকর্ষক কাহিনী আছে এখানে। ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য টাটার দান, লর্ড কার্জনের প্রবল বাধা এবং ভগিনী

নিবেদিতার টাটাকে সমর্থন করে সংগ্রামী মনোভাব তথ্যনিষ্ঠভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর সমর্থন চেয়ে টাটার ঐতিহাসিক চিঠি (২৩ নভেম্বর ১৮৯৮) উদ্ধৃত করে গ্রন্থকার আমাদের কৌতূহলকে বাড়িয়ে দিয়েছেন।

স্বামীজীর রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ, তার পীড়ন এবং প্রতিবাদী বিপ্লববাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিপ্লববাদীদের ওপর স্বামীজীর অপরিসীম প্রভাবের কথা সরকারি নথিপত্র এবং বিপ্লবীদের স্মৃতিকথায় ভূরিভূরি মেলে। বহু বরেণ্য মানুষই স্বামীজীর রচনা ও ভাষণ পড়ে দেশমাতৃকার সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছিলেন, সুভাষচন্দ্র তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে মহারাষ্ট্র যখন প্লেগে জর্জরিত, ব্রিটিশের অত্যাচার তখন সীমাহীন। বাড়ি পরিষ্কারের ছুতোয় ঘরের দেবমূর্তি রাস্তায় ফেলে দেওয়া, মহিলাদের প্রকাশ্যে লাঞ্ছনা করা ইত্যাদি নানা অত্যাচারের প্রতিশোধ নিলেন চাপেকর ভ্রাতৃদ্বয়—দামোদর ও বালকৃষ্ণ প্লেগ-অফিসার Rand ও Lt. Aiyarst-কে হত্যা করে। চাপেকর ভাইদের ফাঁসি হয়। স্বামীজী চাপেকরদের শৌর্য দেখে অভিভূত হয়ে বললেনঃ "যাক। ভারতীয় পৌরুষ পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়নি।" প্লেগ বিষয়ে প্রশাসনবিরোধী রচনার জন্য তিলকের জেল হলে স্বামীজী কী নিদারুণ যন্ত্রণা পেয়েছিলেন, গ্রন্থের দ্বিতীয় পর্বে তা পাওয়া যাবে। বিবেকানন্দ ও তিলক প্রসঙ্গে গ্রন্থকার দুজনের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চিন্তা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনার শেষভাগে একটি সুন্দর ছবি পাই—বেলুড় মঠে স্বামীজীর সামনে তিলক করজোড়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন।

বিবেকানন্দ ও গান্ধী প্রসঙ্গটি বহু নতুন তথ্যে সমৃদ্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন গান্ধীজী স্বামীজীর নাম ও কার্য বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় অবহিত ছিলেন। ঐ দেশে প্রচারক পাঠাতে এস. এস. সেতলুর স্বামীজীকে আবেদন জানান। দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসকারী ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে স্বামীজীর স্পষ্ট ধারণা ছিল এবং তিনি স্বামী শিবানন্দকে ঐ দেশে যেতে অনুরোধ করেন। গান্ধীজী স্বামীজীকে দক্ষিণ আফ্রিকায় নিয়ে যাওয়ার বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে বি. এন. ভজেকরকে ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৮-তে লিখেছিলেনঃ "Could not Swami [Vivekananda] himself be induced to pay us a visit?... I take if he moves freely among the Indians, the highest as well as the lowest. ... He will electrify the Europeans by his eloquence and possibly hypnotise them into liking the 'coolies'." ভজেকর গান্ধীজীর এই চিঠি কাশ্মীরে স্বামীজীর কাছে পাঠিয়ে দেন। এই তথ্যটি আমাদের অনেকেরই অজানা ছিল।

গ্রন্থকার গান্ধীজীর আত্মজীবনী থেকে দেখিয়েছেন যে, সেই সময় গান্ধীজী কী প্রচণ্ড ব্রিটিশ-অনুরাগী অনুগত সেবক ছিলেন। পরে তাঁর পরিবর্তন ঘটে। বেলুড় মঠে এসে তিনি স্বীকার করেছিলেন, বিবেকানন্দের রচনাপাঠে তাঁর দেশপ্রেম 'সহস্রগুণ' বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতির চরম দুঃখের দিনে, ১৯৩৩ সালে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সময় গান্ধীজী শ্রদ্ধাচিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে স্মরণ করেন। বিনোবা ভাবের মতে, বিবেকানন্দের সেবাদর্শন গান্ধীজী গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা-সংগ্রামের পদ্ধতি নিয়ে দুজনের আসমান-জমিন ফারাক ছিল। স্বামীজী বলতেন, অহিংসা সাধুদের জন্য, গৃহীদের জন্য নয়। গৃহীর ধর্ম—একটা অন্যায় আঘাতের বদলে দশটা আঘাত করা। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক চিন্তাস্রোত দুটি ধারায় বহমান ছিল—বিবেকানন্দ থেকে উৎসারিত ধারায় ছিলেন তিলক, অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র ও অন্যান্য বিপ্লবীরা এবং অপর ধারায় ছিলেন গান্ধীজী ও তাঁর অনুগামীরা। অর্থনৈতিক চিন্তাতেও তাঁরা ভিন্নগামী ছিলেন। গ্রন্থটির দ্বিতীয় পর্বে এই বিষয়ে তথ্যনির্ভর আলোচনা আছে।

দ্বিতীয় পর্বের অতীব আকর্ষক আলোচনা গান্ধীজীর চরকাদর্শনকে স্বামী অশোকানন্দের 'চ্যালেঞ্জ'। ভারতে বড় এবং ছোট দুধরনের শিল্পায়ন স্বামীজী চাইতেন। গান্ধীজীর অস্ত্র ছিল কুটিরশিল্প—চরকা-দর্শন। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর চরকা-দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন না। ১৯২৯-এ ভারতবর্ষে গান্ধীজীর প্রভাব ছিল অপরিসীম। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য স্বামী অশোকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের ইংরেজী মুখপত্র 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকায় ঐ সময় নয়টি প্রবন্ধ লেখেন চরকা-দর্শনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে। স্বভাবতই তাঁর চিন্তাধারার উৎস স্বামীজীর চিন্তা-ভাবনা। গান্ধীজী প্রবন্ধগুলি পড়ে খুবই বিরক্ত হন এবং অত ব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় দু-দুবার স্বামী অশোকানন্দের যুক্তি খণ্ডন করতে প্রয়াসী হন। স্বামী অশোকানন্দের প্রবন্ধগুলিকে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছিলেন গান্ধীজী। গ্রন্থের এই অংশটি যেমন তথ্যবহুল, তেমনি উপভোগ্য।

তৃতীয় পর্বেও শিল্পায়নচিন্তার রেশ বহমান। এবার নায়ক সুভাষচন্দ্র, যাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা স্বামীজীর অনুসারী। কৃষি-শিল্পে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্বন্ধে একই চিন্তা দুজনের। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, এঞ্জিনিয়ারিং-প্রতিভা বিশ্বেশ্বরায়া, এমনকি রবীন্দ্রনাথও একই মত পোষণ করতেন। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র 'ন্যাশনাল প্ল্যানিং'-এর রূপায়ণ করলেন। পাশ্চাত্য-মতে ভারতকে শিল্পসমৃদ্ধ করে তোলা ছিল সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন। গান্ধীজী তাঁর চরকা-দর্শনের পরিণতি দেখে রুষ্ট হয়েছিলেন। তার ফলশ্রুতিতে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হতে হয়। ভারতীয় ইতিহাসের সেই দিনগুলির তথ্যনির্ভর ছবি পাওয়া যাবে এই গ্রন্থে। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক সত্তার সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক সত্তার পরিচয়ও এতে পাওয়া যাবে।

স্বামীজীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা নিয়ে নিরপেক্ষ আবেগরহিত আলোচনার জন্য এই গ্রন্থ কেবল বিদগ্ধ মহল নয়, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছেও আকর্ষক হবে। সর্বোপরি, স্বামীজী যে মহান মানবপ্রেমিক ছিলেন, তাঁর সব চিন্তার মূল উৎস যে মানবপ্রেম—এটা গ্রন্থকার দেখিয়েছেন। স্বামীজী ছিলেন সনাতন চিন্তা ও আধুনিকতার মধ্যে সেতুস্বরূপ, মানবমুক্তির কথা তাঁর মতো তাঁর আগে কেউ বলেননি। ভগিনী নিবেদিতার কথায়ঃ "He preached Mukti, instead of Heaven, Enlightenment instead of Salvation."

এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটির জন্য অধ্যাপক বসুর নিকট আমরা কৃতজ্ঞ ও ঋণী থাকলাম। ❑

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

আবির্ভাব-উৎসব

গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ বেলুড় মঠে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বিকাল ৩.৩০ মিনিটে মঠ-প্রাঙ্গণে আয়োজিত ধর্মসভার সূচনায় মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক ভাষণ প্রদান করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন মঠ ও মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। সারাদিনে মঠে বিপুল ভক্তসমাগম হয়। দুপুরে ২৩,০০০ নরনারী বসে প্রসাদ পান।

রামকৃষ্ণ মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ১০ ডিসেম্বর ২০০০ রবিবার, বিকাল সাড়ে তিনটায় বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের ৯১তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ তাঁর ভাষণে বলেন ঃ

আলোচ্য বর্ষে বিশিষ্ট ঘটনাবলীর মধ্যে ইন্দোরে রামকৃষ্ণ মিশনের নতুন কেন্দ্রের উদ্বোধন, আসানসোলে একটি নতুন শিক্ষায়তন ও সারগাছিতে একটি নতুন বিদ্যালয়ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং রামহরিপুরে একটি নতুন বিদ্যালয়গৃহ, নারায়ণপুরে একটি অডিটোরিয়াম ও দেওঘর বিদ্যালয়ের উচ্চ-মাধ্যমিক বিভাগের নতুন ভবনের উদ্বোধন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গত বছরে রামকৃষ্ণ মঠের চেন্নাই এবং লখনৌ কেন্দ্রে নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের শুভপ্রতিষ্ঠাকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়েছে। হায়দ্রাবাদে 'বিবেকানন্দ ইনস্টিটিউট অফ হিউম্যান এক্সেলেন্স'-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে এবং চেন্নাইয়ের বিবেকানন্দ ইল্লমে 'বিবেকানন্দ ও ভারতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার' বিষয়ক একটি প্রদর্শনীর প্রথম পর্বের উদ্বোধন করা হয়েছে। বাইতিল্লায় (এর্নাকুলাম) একটি নতুন শাখাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

গত বছরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মোট ৫ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মিশনের ব্যাপক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী পরিচালিত হয়েছে, যার দ্বারা ৮০০টির বেশি গ্রামের প্রায় ৪ লক্ষ বিপন্ন মানুষ উপকৃত হয়েছে। ওড়িশায় দুটি ঘুর্ণিঝড়-বিধ্বস্ত অঞ্চলে পুনর্বাসনের বৃহৎ কর্মসূচী রূপায়ণের কাজ আরম্ভ হয়েছে। দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি এবং বৃদ্ধ, অসুস্থ ও দুঃস্থ মানুষের আর্থিক সহায়তার জন্য ২ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে।

মিশনের ৯টি হাসপাতাল এবং ১০৮টি ডিসপেন্সারি-সহ ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৫১ লক্ষ রোগীর চিকিৎসার জন্য ২৩ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

শিশুবিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যে ১ লক্ষ ৭ হাজার ছাত্রছাত্রী শিক্ষালাভ করেছে, তার মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা হলো ৩১ হাজার। গত বছরে শিক্ষাখাতে মোট খরচের পরিমাণ ৬৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা।

মিশন ৮ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কয়েকটি গ্রামীণ ও উপজাতি উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়ণ করেছে।

উৎসব-অনুষ্ঠান

কাশী সেবাশ্রমে (উত্তর প্রদেশ) গত ১০-১৪ নভেম্বর ২০০০ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেবাশ্রম **প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ পূর্তি উৎসব** উদ্‌যাপিত হয়। ১০ নভেম্বর বিকাল সাড়ে ৫টায় বৈদিক স্তোত্রপাঠের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শতবার্ষিকী উৎসবের উদ্বোধন করেন উত্তর প্রদেশের তদানীন্তন রাজ্যপাল সুরজ ভান। স্বাগত-ভাষণ দান করেন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শুদ্ধব্রতানন্দ। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য এবং শতবর্ষ-স্মরণিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, দিল্লি কেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী গোকুলানন্দ, রায়পুর কেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী সত্যরূপানন্দ এবং 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন 'বেদান্ত কেশরী'র সম্পাদক স্বামী ব্রহ্মেশানন্দ। সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী অনিমেষানন্দ। এদিন সকালে সেবাশ্রম হাসপাতালের রোগীদের বিশেষভাবে সম্মানিত করে 'নারায়ণ-পূজা' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শতবর্ষ অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেন পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজ। এই অনুষ্ঠানের পরে তিনি সেবাশ্রমের নতুন ও.পি.ডি. (O.P.D.) বা বহির্বিভাগ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫০ জন সাধু ও ১৫০০ ভক্ত যোগদান করেন। পরদিন ২২৫জন দুঃস্থ বিধবাকে কম্বল ও খাদ্যসামগ্রী প্রদান, পাঠ ও আলোচনা, ভজন ও সরোদবাদন অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় দিন নারায়ণ-সেবা ও নাটক, চতুর্থ দিন ধর্মসভা ও যাত্রা এবং পঞ্চম দিন যাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠে (পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৬ নভেম্বর ২০০০ উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ।

সেবাব্রত

চক্ষু চিকিৎসা-শিবির

পুরী মঠ (ওড়িশা) গত ৬-৯ নভেম্বর ২০০০ একটি চক্ষু চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ২৬ জনের চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

পোরবন্দর আশ্রম (গুজরাট) গত ১৬ নভেম্বর ২০০০ একটি চক্ষু চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ২৬০ জনের চিকিৎসা ও তন্মধ্যে ৩৪ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়।

আলসূর আশ্রম (কর্ণাটক) গত ১৮ নভেম্বর ২০০০ একটি চক্ষু চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। এতে ৮৩ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়।

ত্রাণ

পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ

বেলুড় মঠ এবং তার ১৮টি শাখাকেন্দ্র বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে খিচুড়ি, শুকনো খাবার, ওষুধপত্র বিতরণের পর ৯টি জেলায় আঁটপুর, আসানসোল, বারাসত, বরানগর, বেলঘরিয়া, ইছাপুর ও রহড়া আশ্রম বন্যার্ত মানুষের মধ্যে কম্বল ও কাপড় বিতরণ শুরু করেছে।

পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিত্রাণ

বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠ গত ডিসেম্বর মাসে বাগবাজার খালপাড়ে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ২৪৫টি পরিবারের মধ্যে চারদিন ধরে খিচুড়ি বিতরণ ছাড়াও বাঁশ ও কম্বল দান করেছে।

ওড়িষা ঝঞ্ঝাত্রাণ

পুরী মিশন গত জুলাই থেকে নভেম্বরে ঝঞ্ঝায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩৮৮টি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৫,২৪০টি নোটবুক, ২৫,৫৯১টি বল পেন, ৩,৫৮,৮১০টি পেনসিল, ১,৬৯,২১০টি ইরেজার, ৬৯,৬২৭টি পেনসিল কাটা যন্ত্র, ২৩০০ জ্যামিতি বাক্স ও ৯৪২টি স্বামীজী-বিষয়ক পুস্তিকা বিতরণ করেছে।

বহির্ভারত

ত্রাণ

ঢাকা মঠের (বাংলাদেশ) মাধ্যমে গত ২০-২৩ অক্টোবর যশোর ও সাতখিরা জেলার ২৭টি গ্রামের ১৩,৪৭৪ বন্যাকবলিত মানুষের মধ্যে ৫৫১৭ কিলো চাল, ১০৬৫ কিলো ডাল, ১০০০ কিলো লবণ, ১৭২১ কিলো আলু, ২০৬৪টি সাবান, ২০৮৪ প্যাকেট বিস্কুট এবং ১০০০টি শাড়ি ও ১০০১টি লুঙ্গি বিতরণ করা হয়েছে।

পূজ্যপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজের বাংলাদেশ পর্যটন

গত ২০-২৮ নভেম্বর রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ বাংলাদেশের **ঢাকা** ও **নারায়ণগঞ্জে** অবস্থান করেন। গত ২৫ নভেম্বর **ঢাকা মঠে** সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাবেশে পূজ্যপাদ মহারাজ ভাষণ দান করেন। ভাষণ দান করেন বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আজাদ। [পূজ্যপাদ মহারাজের বাংলাদেশ-পর্যটন সম্পর্কে বিস্তারিত প্রতিবেদন পরবর্তী সংখ্যায় (ফাল্গুন ১৪০৭) প্রকাশিত হবে।]

অস্ট্রেলিয়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের নতুন কেন্দ্র

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার **সিডনিতে** শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের একটি নতুন শাখাকেন্দ্রের পত্তন হয়েছে। নতুন কেন্দ্রের ঠিকানা—বেদান্ত সেন্টার অফ সিডনি, ২১ মীরনা রোড, স্ট্র্যাটফিল্ড, এন.এস.ডব্লিউ.-২১৩৫, অস্ট্রেলিয়া (ফোন : ৬১-২-৮৭৪৬-০২৭২)। এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন লখনৌ কেন্দ্রের প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বামী শ্রীধরানন্দজী।

স্মারক ভাষণ

গত ৯ ডিসেম্বর ২০০০ বিকাল সাড়ে পাঁচটায় **রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের** (গোলপার্ক, কলকাতা-৭০০ ০২৯) 'বিবেকানন্দ হল'-এ 'শহীদ যতীন দাশ স্মারক বক্তৃতা' দান করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। 'শহীদ যতীন দাশ স্মৃতিরক্ষা সমিতি'র অর্থানুকূল্যে এবছর থেকেই ইনস্টিটিউট অফ কালচার এই স্মারক ভাষণের আয়োজন করে। স্মারক ভাষণের বিষয় ছিল—'বাংলার বিপ্লবীদের ওপর স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব'। সভায় পৌরোহিত্য করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কলাসচিব ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় বিপুল শ্রোতৃসমাগম হয়।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-উৎসব পালন

গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে মহাসমারোহে **শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি** পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ভোরে মঙ্গলারতি, সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ৯টায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। এরপর রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিবৃন্দ কালীকীর্তন পরিবেশন করেন। বিকালে 'নদের নিমাই' যাত্রাভিনয় করে সালকিয়ার 'রূপ ও রঙ্গ যাত্রা ইউনিট'। সন্ধ্যায় পরিবেশিত হয় সুবলচন্দ্র দাসের রামায়ণ গান। সারাদিনব্যাপী উৎসবে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়েছিল। দুপুরে ১২,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়।

গত ৫ ডিসেম্বর ২০০০ **শ্রীমৎ স্বামী** প্রেমানন্দজী **মহারাজ** এবং ২১ ডিসেম্বর ২০০০ **শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের** জন্মতিথি পালন করা হয়। তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ ও স্বামী বিনির্মলানন্দ।

গত ২৪ ডিসেম্বর ২০০০ **যীশুখ্রীস্টের জন্মের প্রাক্‌সন্ধ্যা** পালন করা হয়। শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে সন্ধ্যারতির পর এই উপলক্ষ্যে যীশুখ্রীস্টের পূজারতি ও খ্রীস্টসঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী পূর্ণব্রহ্মানন্দ এবং 'বাইবেল'-এর 'সারমন অন দ্য মাউন্ট' থেকে পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

গত ১ জানুয়ারি ২০০১ সারাদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে **শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের** জন্মতিথি পালন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে ভোরে মঙ্গলারতি, ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, ভজন, আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। ভজন পরিবেশন করে 'কদমতলা বৈষ্ণোমাতা ভজনমণ্ডলী' গোষ্ঠী। উদ্বোধন কার্যালয়ের সারদানন্দ হল-এ সকাল ১০টায় 'স্বামী সারদানন্দ প্রসঙ্গ' আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। তারপর যথাক্রমে শিবপুর প্রফুল্লতীর্থের 'সাধককবি কমলাকান্ত' গীতি-আলেখ্য, সতী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের 'নরনারায়ণ' যাত্রাপালা এবং ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ শীলের সরোদবাদন পরিবেশিত হয়। উৎসবে প্রচুর সাধু ও ভক্ত সমাগম হয়েছিল। দুপুরে ৬,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি-প্রসাদ দেওয়া হয়।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের (দুর্গাপুর, জেলা—বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ) উদ্যোগে গত ২৯ আগস্ট ২০০০ একটি ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। প্রায় ৭২০ জন ভক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনে পূজ্যপাদ মহারাজ ভিন্ন স্বামী ধৃতাত্মানন্দ, স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ প্রমুখ ভাষণ দান করেন।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমে (ডোমজুড়, জেলা—হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ) প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ্যে গত ৩ সেপ্টেম্বর ২০০০ বিশেষ পূজা, হোম, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, সানাইবাদন, ভক্তিগীতি এবং নামসঙ্কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সুবীর চ্যাটার্জী, দ্বারিকানাথ চন্দ্র এবং গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ। দুপুরে প্রায় ২০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বিকালে নামসঙ্কীর্তন পরিবেশন করেন বিশ্বনাথ মাল, ভদ্রেশ্বর দাস প্রমুখ। মাকড়দহ মাতৃ আশ্রম শ্মশানভূমি এবং নরেন্দ্রনাথ পণ্ডিত ও সম্প্রদায় ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন।

মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের ষাণ্মাসিক সম্মেলন গত ৯-১০ সেপ্টেম্বর ২০০০ **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে (খড়ার, জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ)** অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব এবং সম্মেলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দ। অনুষ্ঠানে 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ', 'কথামৃত' এবং 'বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন চণ্ডীপুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শরণ্যানন্দ, মেদিনীপুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রভানন্দ এবং তমলুক রামকৃষ্ণ মঠের স্বামী কালাতীতানন্দ। বক্তব্য রাখেন পরিষদের আহ্বায়ক বিমলকুমার মান্না ও বীরেন্দ্র পট্টনায়ক। সম্মেলনে বিভিন্ন আশ্রমের ৪৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি (ডিব্রুগড়, আসাম) গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০০০ একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। সম্মেলনে প্রায় ৩০০ ভক্ত যোগদান করেন। সম্মেলনে ধর্মপ্রসঙ্গ করেন ইটানগর আশ্রমের সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ ও নরোত্তমনগর আশ্রমের সম্পাদক স্বামী ঈশাত্মানন্দ। বিশেষ উল্লেখ্য, গত ৩-১২ সেপ্টেম্বর পূজ্যপাদ মহারাজ সমিতিতে অবস্থান করে বহু ভক্তকে দীক্ষাদান করেন।

দক্ষিণ বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০০০ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। পাঠ, গুরুবন্দনা এবং ভক্তিমূলক সঙ্গীত ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। 'কথামৃত' থেকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন সরিষা আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বামী শিবনাথানন্দ এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন বলরাম পাল। সমাগত সকল ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কৃষ্ণগোপাল নস্কর ও অলোককুমার দাস।

মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয় (জেলা—হাওড়া) গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০০০ সারাদিনব্যাপী একটি আধ্যাত্মিক অনুধ্যান শিবিরের আয়োজন করে। শিবিরে উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করে শিশুবিকাশ কেন্দ্রের সদস্যরা। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী অচ্যুতানন্দ।

স্যান্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০০০ একটি বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলনের আয়োজন করে। আলোচ্য বিষয় ছিল—'স্বামী বিবেকানন্দকে কেন আজ প্রয়োজন'। সম্মেলনে পৌরোহিত্য করেন স্বামী বলভদ্রানন্দ। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর মণ্ডল, ভগীরথ হালদার এবং ১৩ জন যুবপ্রতিনিধি। সম্মেলনে ৩২৫ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০০ এই আশ্রম আয়োজিত এক সম্মেলনে বেলুড় মঠ অনুমোদিত 'সুন্দরবন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ' গঠিত হয়। হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি ও হাসনাবাদ ব্লকের ১৮টি সংস্থার ৪০ জন প্রতিনিধি এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সম্মেলনে ভাষণ দেন কেন্দ্রীয় ভাবপ্রচার পরিষদের আহ্বায়ক এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দ, স্বামী যতীন্দ্রানন্দ, স্বামী অঘোরাত্মানন্দ, স্বামী মোক্ষপ্রিয়ানন্দ, সন্তোষকুমার ঘোষ, দীপককুমার রায় প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী দেবব্রতানন্দ।

সারদা-রামকৃষ্ণ চাইল্ড অ্যান্ড ওম্যান সেবা কেন্দ্র (চেতলা, কলকাতা-৭০০০২৭) গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০০০ ঘোলায় (সোদপুর) ডাঃ সুকুমার সূত্রধরের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের পট স্থাপন করে একটি উপাসনাগৃহ ও সাধুনিবাসের উদ্বোধন করে। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ, বস্ত্র-বিতরণ, আলোচনা-সভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী ব্রহ্মাপদানন্দ ও স্বামী দেবস্বরূপানন্দ। 'কথামৃত' পাঠ করেন কেন্দ্রের সম্পাদক মহাদেব ঘোষ। দুপুরে প্রায় শতাধিক ভক্ত প্রসাদ পান।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিলন মন্দির (এগরা, জেলা—মেদিনীপুর) গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০০ বিশেষ পূজা, হোম, সাধুনিবাসের ভিত্তিস্থাপন, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা প্রভৃতির মাধ্যমে রজতজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করে। বিকালে আয়োজিত ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন কাঁথি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী অক্ষতানন্দ, মেদিনীপুর মঠের স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দ, অধ্যাপক ত্রৈলোক্যনাথ মিশ্র, উৎসব কমিটির সভাপতি ডাঃ পুণ্ডরীকাক্ষ মিশ্র প্রমুখ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অনিলকুমার ভট্টাচার্য। 'মায়ের কথা' থেকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দ এবং ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সন্ধ্যা মাইতি ও দিলীপ মান্না।

বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ সমন্বয় পরিষদ (কলকাতা-৭০০০২৭) গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০০ স্বামীজীর ঐতিহাসিক শিকাগো-বক্তৃতা স্মরণে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এবং একটি যুবসমাবেশের আয়োজন করে। সকালে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের নিকটস্থ ময়দানে স্বামীজীর মর্মরমূর্তির পাদদেশে আয়োজিত সমাবেশে ভাষণ দেন স্বামী সর্বলোকানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এবং প্রণবেশ চক্রবর্তী। তারপর পাঁচশতাধিক যুবক-যুবতী স্বামীজীর প্রতিকৃতি, ট্যাবলো, ব্যানার ইত্যাদি নিয়ে সাইকেল, মোটরসাইকেল এবং ম্যাটাডোরে শোভাযাত্রা সহকারে স্বামীজীর পৈতৃক ভিটা, মায়ের বাড়ী, কাশীপুর উদ্যানবাটী প্রভৃতি স্থান ঘুরে আদ্যাপীঠ মন্দির-প্রাঙ্গণে পৌঁছায়। সেখানে অনুষ্ঠিত এক সভায় বক্তব্য রাখেন ব্রহ্মচারী মুরালভাই, ব্রহ্মচারিণী বেলাদেবী এবং প্রণবেশ চক্রবর্তী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ (নামখানা, জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০০ একটি রক্তদান শিবির এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী সম্মেলনের আয়োজন করে। রক্তদান শিবিরে ১০২ জন রক্তদান করেন। সম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ ও প্রণবেশ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে প্রায় ১৫০ জন শ্রোতার সমাগম হয়। সকলকে একটি করে 'যুবনায়ক বিবেকানন্দ' বই উপহার দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (হামিরপুর, রাউরকেলা, ওড়িষা) গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০০ সন্ধ্যায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ' আলোচনা করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। পরদিন তিনি দিবসব্যাপী এক ভক্তসম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সঙ্ঘের সহ-সভাপতি ভরতভূষণ মোহান্তি স্বাগত ভাষণ দেন। পাঠে অংশগ্রহণ করেন বিজনকুমার মজুমদার, অনুশীলা সান্যাল ও নিবেদিতা পাঠক। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন ছবি দাস, সঞ্চিতা সরকার, মালা রায়, দেবযানী সেনগুপ্ত, অজন্তা ঘোষ, জয়িতা চৌধুরী, গোপেন চক্রবর্তী এবং জ্যোতির্ময় আচার্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অরুণকুমার রায়চৌধুরী। সমাপ্তি অধিবেশনে ভক্তদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। সম্মেলনে ১৬৫ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন।

শ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ (বারাকপুর, জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০০ মহালয়া উপলক্ষ্যে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করে। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। সঙ্ঘের পক্ষ থেকে তাঁর হাতে বন্যাত্রাণে ১০০১ টাকা দান করা হয়।

বালিভাড়া বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল (নবনগর, জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০০ দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ৫১ জন দুঃস্থ মানুষকে বস্ত্র দান করে।

মধ্যবঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের (বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া) উদ্যোগে গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০০ **আকালীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রমে** একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বেদপাঠ, ভক্তিগীতি, পাঠ, আলোচনা, বস্ত্র-বিতরণ প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ। সম্মেলনটি পরিচালনা করেন আকালীপুর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বাগীশানন্দ।

বহির্ভারত

বিবেকানন্দ যুব সঙ্ঘ (ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ) গত ১১-১২ সেপ্টেম্বর ২০০০ ময়মনসিংহ রামকৃষ্ণ আশ্রমে অষ্টম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করে। প্রথম দিন বিচিত্রানুষ্ঠান ও আলোচনাসভা আয়োজিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সর্বেশ্বরানন্দ। বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ডঃ পরেশচন্দ্র মণ্ডল, ফাদার শিমন হাচ্ছা প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রদীপকুমার সরকার, কিরীটিভূষণ অধিকারী, অজয় ভট্টাচার্য প্রমুখ। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় 'নরেনের ঈশ্বরবিশ্বাস' নাট্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **সুশীলা ঘোষ** গত ১১ আগস্ট ২০০০ সকাল ৮টা ২০ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তাঁর এক পুত্র রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী সুপ্রকাশানন্দ।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, আসামের ধুবড়ি-নিবাসী **অসিতকুমার সরকার** গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০০০ রাত্রি ২টায় ৬৯ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। সুমিষ্ট ব্যবহার ও ক্ষমাগুণ ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত **লালমোহন ভৌমিক** গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০০ বেলা ২টা ৫ মিনিটে ৯৮ বছর বয়সে নিজ বাসভবনে ইষ্টমন্ত্র জপরত অবস্থায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি কৃষ্ণনগর রামকৃষ্ণ আশ্রমের সভাপতি ছিলেন এবং বহু প্রাচীন সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। সেবাপরায়ণতা, অমায়িক ব্যবহার ও চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য সকলে তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি 'উদ্বোধন'-এর দীর্ঘদিনের গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **অহিভূষণ বসু** গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০০, ৮২ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ, শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ প্রমুখের সঙ্গলাভ করেছিলেন। তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেবা-মূলক কাজে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি বেহালার বৈশালী পার্কে দুঃস্থ ছেলেদের জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **নমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়** গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০০ সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। সহজ-সরল ব্যবহার, দানশীলতা ও উদারতার জন্য তিনি পরিচিতজনের কাছে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্রী ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **সুলেখা রায়চৌধুরী** ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০০০ সকাল ৭টা ২০ মিনিটে ৭৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি পর্ণশ্রী সারদা সঙ্ঘের সঙ্গে বহুদিন যুক্ত ছিলেন। সহজ, সরল ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ❑

কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ এক কামড়েই বাজিমাৎ

ঋষি পাঁপড়



শ্রীযুত শ্রীমধু নির্মাতার তৈরী

JUST RELEASED

NETAJI vs GANDHIJI

60.00

*Two diametrically opposite personalities having different views in respect of the struggle for Indian Independence. Posterity has the right to know, who was right and who was responsible for the partition of India. This well-documented compilation by **P. R. Kundu** will help them to understand the same.*

প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডুর উচ্চপ্রশংসিত তিনটি বই

কবিতা সমগ্র ৩০.

স্বাধীনতা সৈনিকের ডায়েরী ৪০.

হিন্দুর শত্রু হিন্দু ৬০.

প্রাপ্তিস্থান

দাশগুপ্ত এন্ড কোং, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
গ্রন্থরশ্মি, ২০৬ বিধান সরণি (শ্রীমানী মার্কেট), কলকাতা-৬

Arise, awake and stop not till the goal is reached.

Swami Vivekananda

With Best Compliments From :



DYE-O-CHEM ENTERPRISE

MFG & Supplier of
Ferric Allum, Non-Ferric Allum, Paper Sizing Adhesive & Liquid Rosin
All Types of Paper Chemicals

128/1, Beharilal Ghosh Road
Calcutta-700057
Phone : 553-3178

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা উর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

With Best Compliments From :

DIAMOND METAL PRODUCTS

Mfg. All Types of
Aluminium Pilfer Proof Caps

APOLO ELECTRIC BULB PVT. LTD.
27B/H/13/1, Chaulpatty Road
Calcutta-700010
Tele. : (O) 350-3901/353-1445
Fax : 350-6297
Mfg. G.L.S. Lamps & Night Lamps

GRAM : CHEMLIME (CAL.)



238-2850
239-0134
232-0502

CHOUDHURY & CO.

DEALERS IN:
QUICK LIME, CHEMICAL LIME, HYDRATED LIME, BUILDING LIME, LIMESTONE, DOLOMITE, SAND, BAUXITE, NIRU LIME ETC.

67/45, STRAND ROAD
CALCUTTA-700 007

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ফোন : ৪৭৪-২৩৩৫
৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো
কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত
শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহের বহু প্রশংসিত পুস্তকাবলী

গীতাতত্ত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ ৮০৲
পূর্ণতার সাধন ১৬৲
ভগবৎ প্রসঙ্গ ২৪৲
গল্পে ভগবৎ প্রসঙ্গ ২৪৲
শরণাগতের আদর্শ ও সাধনা ৩০৲
ঈশ্বর-সান্নিধ্য বোধের সাধনা ৮৲

শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহের জন্মশতবার্ষিকী গ্রন্থ :
প্রেমিক পুরুষ ১৫৲
অন্যান্য বই : স্তোত্রমালিকা ৪৲

✤ প্রাপ্তিস্থান ✤
সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ), উদ্বোধন,
রত্না বুক হাউস, মহেশ লাইব্রেরী,
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোলপার্ক)

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পতিতপাবন শ্রীরামকৃষ্ণ ৪০.০০
অহেতুকী কৃপাসিন্ধুর অপার কৃপা, পতিতপাবনের অপার দয়া। সেইজন্য আমায় আশ্রয় দিয়াছেন। আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার করুণা, আমার কোন চিন্তার কারণ নাই। —গিরিশচন্দ্র

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গুহা মন্দিরের দেবী ২৮.০০
বৈষ্ণোদেবী দর্শন ও ভ্রমণের গাইড বই। পৌরাণিক উপাখ্যান সহ। অনেক ছবি ও ম্যাপ বইটির বাড়তি আকর্ষণ।

সোমনাথের
শিবঠাকুরের বাড়ি ৩৫.০০
দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও পঞ্চকেদার ভ্রমণ-কাহিনী। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও পঞ্চকেদার যেতে হলে সচিত্র এই বইটি নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাবে। কিভাবে যাবেন, কোথায় থাকবেন—সবই পাবেন বইটিতে।

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিঃ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?
স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments From :

AUTO REXINE AGENCY

House of Car Decoration
Specialist in Car-Air Conditioner

Office & Show Room :
31/A, Lenin Sarani, Calcutta-700 013
163, Lenin Sarani, Calcutta-700 013

Branch :
71A, Park Street, Calcutta-700 013
Phone : 244-1764/2184, 237-5435



Ramakrishna Mission Vidyapith

A Residential Senior Secondary School

Ramakrishna Nagar, P.O.—Vidyapith
Dt.—Deoghar, Jharkhand, Pin : 814112
Rly. Station : Baidyanathdham, E. Rly.
Phone : (06432) 22413 & 20442 E-mail : rkmvidya@dtc.vsnl.net.in

একটি আবেদন

পুণ্যতীর্থ বৈদ্যনাথধাম—শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পদরজঃস্পর্শে পূত। স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিবিজড়িত দেওঘরে ১৯২২ সালে শুরু হয় **রামকৃষ্ণ মিশন** পরিচালিত প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—**রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ**। **শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ্ শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর** অনুপ্রেরণায় প্রায় ৮০ বছর পূর্বে যে বিদ্যাপীঠের যাত্রা শুরু হয়, আজ সেই বিদ্যাপীঠ এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। **রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ** বলেছিলেনঃ "এই বিদ্যাপীঠের মাধ্যমে কালে অনেক বড় কাজ হবে—এর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।"

এই বিদ্যাপীঠ তার বহুমুখী কর্মধারার অঙ্গ হিসাবে **উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স চালু করেছে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে।**

স্বামীজী চেয়েছিলেনঃ "নূতন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।" এই উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রদের মধ্যে অনেকে আছে—যারা আদিবাসী, অনুন্নত সম্প্রদায় এবং সর্বোপরি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ সেইসব কিশোরদের শিক্ষিত করতে বিনম্র প্রয়াস করে যাচ্ছে।

উচ্চ মাধ্যমিকের এইসব ছেলেদের জন্য একটি পৃথক কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছে, যাতে আছে ছেলেদের অভিভাবক ও পরিদর্শক-শিক্ষকদের জন্য অতিথিভবন, প্রার্থনাগৃহ, গ্রন্থাগার, ভোজনগৃহ এবং একাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস। **দ্বাদশ শ্রেণী শুরু হবে ২০০১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে। কিন্তু অর্থাভাব হেতু নির্মীয়মাণ দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রাবাসটি সম্পূর্ণ করা যায়নি। ভবনটি নির্মাণ করতে সর্বসাকুল্যে ১৪ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।**

তাই সকলের নিকট বিনীত আবেদন—এই মহান প্রকল্পকে রূপায়িত করতে আপনারা এগিয়ে আসুন।

স্বামী সুবীরানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড

- অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক/ড্রাফট রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর—এই নামে অনুগ্রহ করে পাঠাবেন।
- রামকৃষ্ণ মিশনের যেকোন শাখায় প্রদত্ত যেকোন আর্থিক দান ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত।
- ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বা তার বেশি দান করলে দাতার ইচ্ছানুসারে স্মারক-প্রস্তর লাগানো হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম

রামকৃষ্ণ মিশন সড়ক

আনোয়ারা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ

চট্টগ্রাম জেলার আনোয়ারা থানা সদরে অবস্থিত **শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রমে** নবনির্মিত **শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দিরের শুভ উদ্বোধন** উপলক্ষ্যে আগামী ৭ মার্চ ২০০১ হতে ১০ মার্চ ২০০১ (২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬ ফাল্গুন ১৪০৭) পর্যন্ত **সেবাশ্রম-অঙ্গনে** উৎসব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

৯ মার্চ **ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী অক্ষরানন্দজী মহারাজ নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি স্থাপন করবেন। চারদিনব্যাপী** আয়োজিত **অনুষ্ঠানসূচীতে** রয়েছে সাধুসম্মেলন, ভক্তসম্মেলন, মাতৃসম্মেলন, যুবসমাবেশ, দুঃস্থদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান ও শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ, স্বেচ্ছায় রক্তদান অনুষ্ঠান এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন বিষয়ে আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উৎসব উপলক্ষ্যে প্রতিদিন দুপুরে এবং রাত্রে অন্নপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চারদিনব্যাপী অনুষ্ঠান আয়োজনের লক্ষ্যে সেবাশ্রমের পক্ষ থেকে শিল্পপতি **প্রিয়তোষ তালুকদারকে** 'আহ্বায়ক' এবং অবসরপ্রাপ্ত আয়কর কর্মকর্তা **বিমলকান্তি লোধকে** 'সদস্য-সচিব' করে ১০১ সদস্য-বিশিষ্ট **'উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদ'** গঠন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে **বাংলাদেশে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সকল শাখাকেন্দ্রের সাধু ও ব্রহ্মচারীকে** আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

মিলনকান্তি সেন

১০ জানুয়ারি ২০০১ **সাধারণ সম্পাদক**

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা উর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ



বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ না করলে চৈতন্যই হয় না—ভগবানলাভ হয় না। বিষয়বুদ্ধি থাকলেই কপটতা হয়। সরল না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। **শ্রীরামকৃষ্ণ**

❋

যার ওপর যেমন কর্তব্য করে যাবে, কিন্তু ভাল এক ভগবান ছাড়া আর কাউকে বেসো না। **শ্রীমা সারদাদেবী**

❋

পবিত্র আর নিঃস্বার্থ হতে চেষ্টা কর—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম। **স্বামী বিবেকানন্দ**

With Best Compliments From :

UTILITY INDUSTRIES & CHEMICAL WORKS

19Y, Raja Manindra Road, Calcutta-700037
Phone : 556-5543/6459

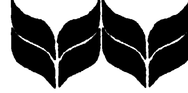
&

A S I M C O

22, Amalangsu Sen Road, Calcutta-700048
Phone : 556-5351/5543

Manufacturers of Phenyle. I.S.I., Lysol. I.P., Soaps, Antiseptic Lotions & Purified Water. I.P.

Dealers in all sorts of Medicines, Pharmaceuticals & Laboratory Chemicals.



"QUALITY UPPER ASSAM TEAS FOR COLOUR, STRENGTH & BRISKNESS."

With Best Compliments From :

WARREN TEA LIMITED

31, CHOWRINGHEE ROAD
CALCUTTA-700 016

TELEPHONE NOS. :
226-6611/13/14/18/49; 245-8190/8191

TELEGRAMS : WARRANTY

FAX NO. : 249-5980; 226-6716

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত
শ্রীম-কথিত

পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত ঃ প্রতি সেট ঃ ২০৮ টাকা
[কেবল রেক্সিন বাঁধাই পাওয়া যায়]

শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যরা এবং কথামৃতকার শ্রীম নিজেও এই মহাগ্রন্থটি যেমনটি দেখিয়া গিয়াছেন এবং রাখিয়া গিয়াছেন (খণ্ড খণ্ড হিসাবে পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এবং দিনলিপি অনুসারে না সাজাইয়া) ঠিক তেমনটিই সংরক্ষণ করার পুণ্য দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর হইয়া আছেন 'কথামৃতের' আশি বছরেরও অধিক প্রাচীন প্রকাশক শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী (কথামৃত ভবন)। ফলে এই মহাগ্রন্থের Originality এবং সুমহান ঐতিহাসিক পবিত্র ঐতিহ্য সম্পূর্ণভাবে বহাল রহিয়াছে এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত 'কথামৃতে'।

প্রকাশক ঃ শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী
(কথামৃত ভবন)
১৩।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬
ফোন ঃ ৩৫০-১৭৫১

সেরা ফলন দেদার লাভ

লালন সুপার ফসফেট সার



প্রস্তুতকারক ঃ

সারদা ফার্টিলাইজার্স লিঃ

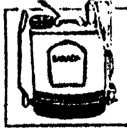
২, ক্লাইভঘাট স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০১

ফোন নং
অফিস ঃ ২২০-৫৪৩৫
রেসি. ঃ ৩৩৭-৭৩৬৫
মোবাইল ঃ ৯৮৩১০-১৯২৬৬

ডীলারের সুবিধার্থে—অভাবনীয় কম দামে

সকলপ্রকার স্প্রেয়ার, থ্রেসার, প্যাডি উইডার ও উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য জেলাভিত্তিক ডীলার ও স্টকিস্ট চাই


ধান ঝাড়াই মেসিন


স্প্রেয়ার


প্যাডি উইডার

সারদা ইন্ডাষ্ট্রীজ

৩৬নং স্ট্র্যান্ড রোড, ২য় তল, রুম নং—১৫
কলকাতা-৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন ঃ ২৪৩-৩১৪১

With Best Compliments From :

DOBSON DISTRIBUTORS

88, DR. ABANI DUTTA ROAD
HOWRAH-711 101
PHONE : 666-1722
TELEFAX : 666-9969

Stockist

Serum Institute, Tablets India Ltd., Wallace Pharmaceuticals Ltd., Eli Lilly Ranbaxy, Pharmacia & Upjohn, Orchid, Caplet, Smith Kline Beecham (Vaccine), Sunny Industries Pvt. Ltd., *Midas Care, Arvind (S.K.K.L. Ltd.),* Neon Laboratories, Mayer, Trio Pharma

আনন্দ পাবলিশার্সের বিনম্র নিবেদন

রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ-নিবেদিতা প্রসঙ্গ

অমলেশ ত্রিপাঠী
ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ ৪০.০০



অরুণকুমার বিশ্বাস
সরস্বতী সারদার অনুধ্যানে ৩৫.০০



কমলকুমার মজুমদার, দয়াময়ী মজুমদার
অমৃতকথা ২৫.০০

কিশলয় ঠাকুর
মা সারদা ২৫.০০

কৃষ্ণা দত্ত (সংকলিত)
চিরন্তনী ১৫.০০

জ্যোতির্ময় বসুরায়
শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ বিজ্ঞানানন্দ ৫০.০০

মৃগেন্দ্রচন্দ্র দাস
মহীয়সী নিবেদিতা ৫০.০০

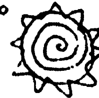
দয়াময়ী মজুমদার
গীতা ও রামকৃষ্ণের কথা ৩০.০০

মহাজীবন কথা: শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ ৫০.০০

নিমাইসাধন বসু
উইম্বলডনের মার্গারেট ৪০.০০

শাশ্বত বিবেকানন্দ (সম্পা.) ৮০.০০

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ
তব কথামৃতম্ ৭৫.০০



শঙ্করীপ্রসাদ বসু
নিবেদিতা লোকমাতা ১ম খণ্ড (১ম পর্ব) ১২০.০০
১ম খণ্ড (২য় পর্ব) ৭৫.০০
নিবেদিতা লোকমাতা ২য় খণ্ড ৫০.০০
নিবেদিতা লোকমাতা ৩য় খণ্ড ৪০.০০
নিবেদিতা লোকমাতা ৪র্থ খণ্ড ৭৫.০০
রামকৃষ্ণ-সারদা: জীবন ও প্রসঙ্গ ১০০.০০

শিশির কর
শিকাগোয় বিবেকানন্দ শতবর্ষ পরে ২০.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
ফোন : ২৪১-৪৩৫২, ২৪১-৩৪১৭
E-mail : ananda@cal3.vsnl.net.in

শ্রীশ্রী সারদামায়ের

মন্ত্রশিষ্য

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

প্রণীত

❖ স্মৃতিমূলক জীবনীগ্রন্থ ❖

- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
- শ্রীশ্রী সারদাদেবী
- স্বামী সারদানন্দের জীবনী
- শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ
- ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা
- প্রেমানন্দ-প্রেমকথা
- জীবন পরিক্রমা

আমাদের প্রকাশিত আরও বিভিন্ন স্মৃতিমূলক জীবনীগ্রন্থ

ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী

- মেঘনাদ বধ কাব্যে চিত্রকল্প

বিশ্বনাথ দে

- রবীন্দ্রস্মৃতি

ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

- বিবেকানন্দ স্মৃতি
- বঙ্কিম স্মৃতি
- রামমোহন স্মৃতি
- মধুসূদন স্মৃতি
- বিদ্যাসাগর স্মৃতি
- নজরুল স্মৃতি
- শরৎ স্মৃতি
- মা টেরেসা
- বায়রণ
- শেলী

শ্রী মোহিত কুমার বসাক

- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্মৃতি
- অরবিন্দ স্মৃতি
- নিবেদিতা স্মৃতি
- কিশোর শহীদ স্মৃতি
- সুভাষ স্মৃতি

সুবোধ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

- সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন
- The Early life of Netaji

সমর গুহ

- নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা
- Netaji Dead or Alive

ক্যালকাটা বুক হাউস

১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

☎ ২৪১-০৯৬৫/২৪১-৯৪০৪

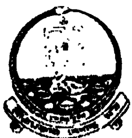
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রকাশিত বাঙলা গ্রন্থরাজি

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)	১০০.০০	মনের বিচিত্র রূপ	১২.০০
আত্মজ্ঞান	২২.০০	মানুষের দিব্যস্বরূপ	২৫.০০
আত্মবিকাশ	২০.০০	মুক্তির উপায়	১৫.০০
আমার জীবনকথা (২ খণ্ডে)	৮৫.০০	যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ	৫.০০
ঈশ্বরদর্শনের উপায়	৩৫.০০	যুগে যুগে যাঁদের আগমন	২৮.০০
কর্মবিজ্ঞান	১০.০০	যোগদর্শন ও যোগসাধনা	৫০.০০
তরুণ বাংলার আদর্শ	৫.০০	যোগশিক্ষা	৪০.০০
দেবী দুর্গা	৬.০০	শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম	২০.০০
পত্র-সংকলন	১৬.০০	সর্বজনীন ধর্ম ও বেদান্ত	৩০.০০
পঞ্চদশী-দর্শনের পরিচয়	৫.০০	সাংখ্য, বৌদ্ধ ও বেদান্তদর্শন	৩০.০০
পুনর্জন্মবাদ	৩০.০০	স্বামী বিবেকানন্দ	২.০০
বিংশ-শতাব্দীর ধর্ম	৫.০০	স্তোত্ররত্নাকর ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি	১২.০০
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	২০.০০	হিন্দুনারী	১২.০০
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	৩০.০০	হিন্দুরা যীশুখ্রীস্টের প্রতি শ্রদ্ধাশীল,	
মরণের পারে	৪০.০০	কিন্তু গীর্জা-ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ কেন?	৫.০০

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত

অধ্যাত্মসাধনায় দেবতা ও দেবীভাবনা	৪.০০	ভারতীয়-সঙ্গীত—ঐতিহাসিক ও	
অভেদানন্দ-দর্শন (২ খণ্ডে)	১৪০.০০	সাংস্কৃতিক রূপরেখা	৩৪.০০
কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব	১৮.০০	মন ও মানুষ (৩ খণ্ডে)	১০৩.০০
তীর্থরেণু	২৬.০০	মহিষাসুরমর্দিনী-দুর্গা	৩০০.০০
তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা	৪০.০০	মন্ত্রভাবনা ও সঙ্গীত	১৪.০০
তন্ত্রতত্ত্বপ্রবেশিকা	৬০.০০	রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা	২০.০০
নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৪৫.০০	রাগ ও রূপ (২ খণ্ডে)	২২০.০০
পদাবলী-কীর্তনের ইতিহাস	৩৫.০০	সঙ্গীতপ্রতিভায় স্বামী বিবেকানন্দ	৮.০০
বাণী ও বিচার (৮ খণ্ডে)	৪০০.০০	সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান	৫০.০০
বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তায় মন্ত্রতত্ত্ব ও মন্ত্রসাধনা	২০.০০	সঙ্গীতে সাহিত্য, রসভাবনা ও সুন্দর	২৫০.০০
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (৩ খণ্ডে)	২২০.০০	স্বামী অভেদানন্দ	৫.০০
শ্রীরামকৃষ্ণচন্দ্রিকা	৪০.০০	স্বামী অভেদানন্দের জীবন ও দর্শন	৩৬.০০



শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

(পুস্তক প্রচার বিভাগ)

১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

SRI RAMAKRISHNA SEVASHRAM



"SERVICE TO MAN IS SERVICE TO GOD"

Regd. No. S/15226 Dated 21.10.74

P.O. Ramakrishnapur ❑ Dist. South 24 Parganas ❑ Pin : 743610. W.B.

A member-ashrama of South 24 Parganas District Ramakrishna-Vivekananda Bhava Prachar Parishad (advised by Ramakrishna Math, Belur Math, W. B.)

Calcutta Office :

6 Baroda Thakur Lane, Calcutta-700 007 ☎ : 218-1285

একটি আবেদন

প্রিয় ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ,

কলিকাতার অদূরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার দক্ষিণ দুর্গাপুর রেলস্টেশনের সন্নিকটে **রামকৃষ্ণপুরে অনাথ বালকাশ্রমকে** কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একটি সেবাপ্রতিষ্ঠান। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন **স্বামী রমানন্দজী মহারাজ**, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ। **শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি** একটি অস্থায়ী প্রার্থনাঘরে প্রতিষ্ঠিত। বালকাশ্রমে থাকে ৫০ জন অনাথ দুঃস্থ বালক। **সুন্দরবনের** অনগ্রসর দরিদ্র অধিবাসী ও তফসিলী অঞ্চলে ষোলটি **বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু বিদ্যালয়** খোলা হয়েছে। আরো প্রসারিত হবে। ইতিমধ্যেই পূর্ব-পরিকল্পিত অতিথিভবন, সাধুভবন, বৃদ্ধাশ্রম সম্পূর্ণ হয়েছে আপনাদেরই দানে। আমাদের প্রেরণা স্বামীজী। আমাদের আদর্শ ও ধর্ম—ত্যাগ ও সেবা। লক্ষ্য—মানুষ তৈরি। মানুষই আমাদের ভগবান।

আমাদের আগামী পরিকল্পনা ঃ—

১) বালকাশ্রমের অসম্পূর্ণ আবাসন ও দাতব্য চিকিৎসালয় সম্পূর্ণ করা।

২) জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে পাঁচশ ভক্তের একসঙ্গে প্রার্থনা-উপযোগী উপাসনাকক্ষ-সহ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নির্মাণ। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের স্পর্শপূত মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর গত ৬ মে ২০০০ অক্ষয় তৃতীয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩) অধিক সংখ্যক বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু বিদ্যালয় স্থাপন।

বহুজনহিতায় এই মহৎ কর্মযজ্ঞটিকে আরো ব্যাপক করার জনচাহিদা মেটাতে আমাদের প্রয়োজন আনুমানিক এক কোটি টাকা। যা আমাদের নেই।

প্রিয় ভগিনী ও ভ্রাতৃগণের নিকট আন্তরিক আবেদন, এই মহৎ কল্যাণ প্রচেষ্টায় অনুগ্রহ করে সাধ্যমত আর্থিক দাক্ষিণ্যের হাত প্রসারিত করুন। আমাদের ভিত্তি প্রস্তুত, আপনাদের সানুগ্রহ সহযোগিতায় হবে এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

স্মৃতিফলকের ব্যবস্থা আছে। আশ্রমে দেওয়া অর্থ **M.O.** অথবা **A/c. Payee Cheque/Draft**-এর মাধ্যমে পাঠানোর ঠিকানা—**Sri Ramakrishna Sevashram, 6 Baroda Thakur Lane, Calcutta-700 007। A/c. Payee** চেক/ড্রাফট পাঠালে **'Sri Ramakrishna Sevashram'**-এর অনুকূলে পাঠাতে হবে। **সেবাশ্রমে যেকোন আর্থিক দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।** কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সকল দানের প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে।

নমস্কারান্তে

স্বামী শুদ্ধানন্দ
অধ্যক্ষ

সুধাংশু বিশ্বাস
সম্পাদক



কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৩

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

বাংলাদেশ ❑ **রামকৃষ্ণ মিশন**, ঢাকা-৩

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ❑ **সত্যনারায়ণ রায়**, ৮২৫ ডেটন কোর্ট, কনকর্ড, সি. এ.-৯৪৫১৮, ই. মেল ঃ raysatya@cs.com

দিল্লি

- **রামকৃষ্ণ মিশন**, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নিউ দিল্লি-১১০০৫৫
- **পারমিতা ঘোষাল**, ৪০/১৮, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯
- **মঞ্জুলা ঘোষ**, সি-৫৩৬, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯

আন্দামান

- **রামকৃষ্ণ মিশন**, পোর্ট ব্লেয়ার, পিন ঃ ৭৪৪১০৪
  ফোন ঃ (০৩১৯২) ৩২৪৩২

আসাম

- **রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম**, শিলচর
- **রামকৃষ্ণ মঠ**, করিমগঞ্জ
- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, রামকৃষ্ণ মিশন রোড
  উলুবাড়ি, গুয়াহাটি, জেলা ঃ কামরূপ-৭৮১০০৭
- **রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, বনগাইগাঁও
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, তিনসুকিয়া-৭৮৬১২৫
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, মহাত্মা গান্ধী রোড, নগাঁও-৭৮২০০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, পোঃ হোজাই, নগাঁও-৭৮২৪৩৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, জি. এন. বি. রোড
  পোঃ দুম দুমা, জেলা ঃ তিনসুকিয়া-৭৮৬১৫১
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**
  গোসাইগাঁও, জেলা ঃ কোকড়াঝাড় (বি. এ. সি.)-৭৮৩৩৬০
- **পরিমলকৃষ্ণ পাল**
  প্রযত্নে মেসার্স মা কালী স্টোর্স, বি. জি. রেলওয়ে গেট
  পোঃ + জেলা ঃ কোকড়াঝাড়-৭৮৩৩৭০
- এম. কে. **বুক সেলার্স**, পো ঃ বি. চারালী, জেলা ঃ শোণিতপুর
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, পূর্ণানন্দ রোড, ডিব্রুগড়-৭৮৬০০১
- **শান্তিকুমার রায়**
  শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (তেজপুর), জেলা ঃ শান্তিপুর

ত্রিপুরা

- **রামকৃষ্ণ মিশন**, আগরতলা
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  পোঃ খোয়াই, লালচড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা-৭৯৯২০১
- **সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, উদয়পুর,
  দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১২০
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম**
  পোঃ বিলোনিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১৫৫
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি রোড
  ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা-৭৯৯২৫০

নাগাল্যান্ড

- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, ডিমাপুর-৭৯৭১১২

ওড়িশা

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, চক্রতীর্থ, পুরী
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার সমিতি**
  খটবিন সাহী, কটক-৭৫৩০০৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**, হামিরপুর, পোঃ রাউরকেল্লা-৭৬৯০০৩

অরুণাচল প্রদেশ

- **শ্যামল সিনহা রায়**
  সম্পাদক, বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল, নাহারলগন, ইটানগর

বিহার

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, রামকৃষ্ণ অ্যাভেনিউ, পাটনা-৮০০০০৪

ঝাড়খণ্ড

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**
  ১১, ১২ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ রোড, মোরাবাদি, রাঁচি-৮৩৪০০৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**
  সেক্টর-১বি, বোকারো স্টীল সিটি
- **রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি**
  বিষ্টুপুর, জামশেদপুর-৮৩১০০১
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**, ব্যাঙ্ক রোড, ধানবাদ
- **রীতা ভট্টাচার্য**, 'অনুভব', এইচ. ই. স্কুল রোড, হীরাপুর,
  ধানবাদ-৮২৩৬৮৮

উত্তরপ্রদেশ

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, পোঃ নিরালানগর, লখনৌ-২২৬০২০

মধ্যপ্রদেশ

- **রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**
  কোয়ার্টার নং ৫০৭, (এস. এস.)/২, বাচেলি, জেলা ঃ বস্তার

অন্ধ্রপ্রদেশ

- **এম. কে. পাল**, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)
  ও. এন. জি. সি., কে. জি. পি
  ডি. নাম্বার ঃ ৪৬-৭-৩৫, দানাভাইপেটা, রাজমুন্দ্রি-৫৩৩১০৩

মহারাষ্ট্র

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, রামকৃষ্ণ মিশন মার্গ, খার, মুম্বাই-৪০০ ০৫২
- **প্রদীপচন্দ্র পাল**, 'গুরুধাম', ই-২৮, আর. এইচ.-১, সেক্টর-৮
  বাসী, নবী, মুম্বাই-৪০০৭০৩
- **মহুয়া দাশগুপ্তা**
  ৮-এ/১১ বৃন্দাবন সোসাইটি, থানে-৪০০৬০১

গুজরাট

- **সলিলচন্দ্র ঘোষ**, সি-৩-৫০১, ও. এন. জি. সি. কলোনী
  আমেদাবাদ-৩৮০০০৫
- **মীরা মিত্র**, প্রযত্নে জি. সি. মিত্র
  ৩/৮২, জি. আর. টাউনশিপ, জওহরনগর, বরোদা-৩৯১৩২০
- **মোহিতরঞ্জন দাস**
  ৫০৩, নর্মদা টাওয়ার্স, ও. এন. জি. সি. কলোনী
  পোঃ আঙ্কলেশ্বর-৩৯৩০১০
- **পি. কে. মুখার্জী**, সাইকৃপা অ্যাপার্টমেন্ট
  সিভিল হাসপাতাল রোড, নানকওয়াদা, ভালসাদা-৩৯৬০০১
  ফোন ঃ ০২৬৩২১/৪২৩৭৩, ই. মেল ঃ dr.pulak@vsnl.net.in

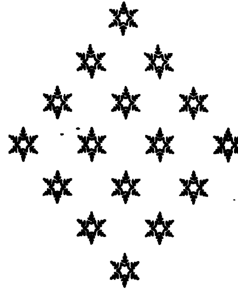
সৌজন্যে
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ
৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯



All Great Undertakings are achieved through mighty obstacles.

Swami Vivekananda

Courtesy



DATTA FOOTWEAR INDUSTRIES PVT. LTD.

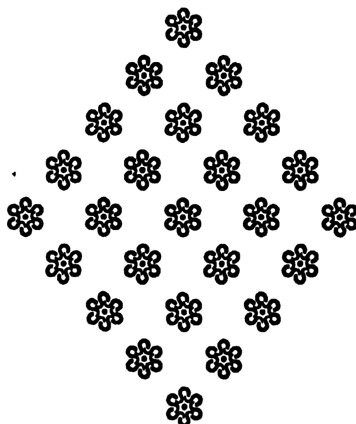
1, BIDHAN SARANI, CALCUTTA-700 073

PHONE : 241-5248

With Best Compliments From:

H. K. GHOSE & CO.

Paper Merchants & Exercise Book Makers



WARDLEY HOUSE
25A, SWALLOW LANE, CALCUTTA-700 001
PHONE : 220-5209



রামকৃষ্ণ মিশন

আগরতলা, ত্রিপুরা (পশ্চিম) ৭৯৯ ১০১

ফোন ঃ (০৩৮১) ২২-৪০২৪

সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন

পঞ্চাশ বৎসরের অধিক সময় ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর ভাবধারা প্রচারসহ বিভিন্ন জনসেবামূলক কাজ সঙ্ঘটিত হয়ে আসছে। শিক্ষাবিস্তার, বিশেষত অনগ্রসর মানুষের মধ্যে, এই কাজের অন্যতম প্রধান। **আগরতলার গাঙ্গাইল রোড, ধলেশ্বর** এবং **বিবেকনগরের** কেন্দ্রগুলি **রামকৃষ্ণ মিশনের** পরিচালনাধীনে আসার পর সেবাব্রতের পরিধি বিপুলভাবে প্রসারিত হয়েছে।

ভক্তবৃন্দের সহায়তায় ইতিমধ্যেই **রামকৃষ্ণ মিশন অনুমোদিত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান** জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কর্মশিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং একটি ছাত্রাবাস প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ উপজাতি সম্প্রদায়ের যুবকদের কাছে একটা বিরাট আত্মনির্ভরতার সুযোগ এনে দিয়েছে। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্রের মাধ্যমে আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা মানুষের চিকিৎসার সুযোগ হয়েছে।

শ্রীশ্রীমায়ের অন্যতম সন্তান পরম পূজ্যপাদ স্বামী সারদেশানন্দজী প্রায় এক বৎসর কাল এখানে অবস্থান করে ভক্তদের কৃপা ও অনুপ্রেরণা দান করেছেন। তাঁর স্বল্প উপস্থিতি উক্ত কাজগুলিতে অশেষ গতিবেগ সঞ্চার করেছিল।

সময়ের সঙ্গে কাজের বিস্তৃতি ঘটেছে। প্রয়োজন হয়েছে একটি ব্যাপক এবং বিস্তৃত পরিকল্পনার। আমরা তাই প্রথম স্তরে নিম্নোক্ত পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছি।

(১) ধলেশ্বরে স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রের জন্য একটি স্থায়ী গৃহ নির্মাণ।

(২) আধুনিক সুবিধাযুক্ত একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার নির্মাণ।

(৩) সন্ন্যাসী কর্মীদের জন্য একটি স্থায়ী বাসস্থান।

(৪) একটি উন্নয়ন তহবিল গঠন।

উপরি উক্ত পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রায় দেড় কোটির মতো অর্থের প্রয়োজন। আমরা তাই সমস্ত দেশভক্ত সহৃদয় মানুষের কাছে অর্থভিক্ষা চাইছি।

রামকৃষ্ণ মিশনকে দেয় যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী আয়করমুক্ত। চেক/ড্রাফট/মনি অর্ডার **"রামকৃষ্ণ মিশন, আগরতলা"**—এই নামে/ঠিকানায় পাঠাতে হবে। ইতি

বিনীত

স্বামী দিব্যানন্দ

সম্পাদক

রামকৃষ্ণ মিশন

আগরতলা, ত্রিপুরা

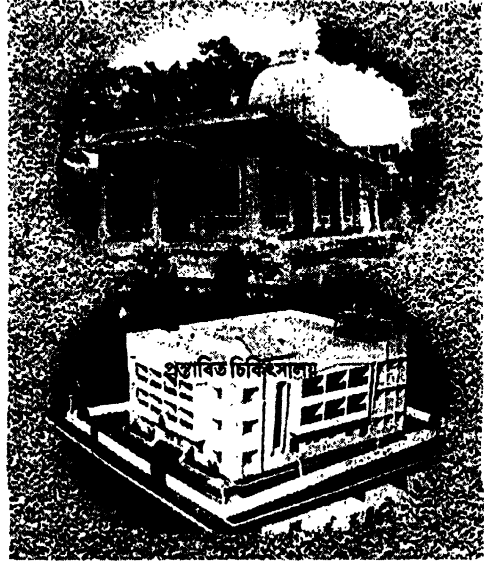




রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত

পোঃ বারাসত, উত্তর চব্বিশ পরগনা
পিন-৭৪৩২০১

আবেদন



জীবন-সায়াহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজীকে 'বারাসত' সম্বন্ধে কখনো কখনো বলতে শোনা যেত ঃ "ও স্থান কি কম গা! (নিজের বুকে হাত দিয়ে) এ-শরীরের জন্ম হয়েছে। কালে ও-স্থান খুব জেগে উঠবে।" এই উক্তির ফলশ্রুতিরূপে বারাসত আজ উত্তর ২৪ পরগনার এক প্রধান গুরুত্বপূর্ণ এবং জনবহুল জেলাশহর হিসাবে পরিগণিত এবং তাঁরই পবিত্র জন্মভিটায় প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মঠ (বেলুড় মঠের শাখাকেন্দ্র)। একদিকে যেমন এই মঠ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী ও বহু স্থানীয় মানুষের অধ্যাত্মজীবনের অনুপ্রেরণা, উন্নতি ও শান্তি লাভের আশ্রয়স্থলরূপে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে, তেমনি আবার অপরদিকে "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"—এই মহাভাব রূপায়ণে মঠ-পরিচালিত একটি ক্ষুদ্র দাতব্য চিকিৎসালয় এক দশকেরও বেশি সময় যাবৎ স্থানীয় অসংখ্য মানুষের সেবায় নিরত রয়েছে। এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার জন্য আরো সুসংবদ্ধভাবে তার বিশেষ পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এর সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য সংগৃহীত জমিতে একটি ত্রিতল ভবনের নকসা বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি আংশিক রূপায়ণে আনুমানিক ৪৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। যথা—

গৃহনির্মাণের জন্য	২৫ লক্ষ টাকা
যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য	১৫ লক্ষ টাকা
আসবাবপত্রাদি ক্রয়ের জন্য	৫ লক্ষ টাকা

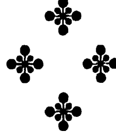
আমরা সহৃদয় জনসাধারণ, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী ব্যক্তিগণ ও দানশীল সংস্থাগুলির কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তাঁরা যেন মুক্তহস্তে দান করে এই মহৎ পরিকল্পনাকে সফল ও সার্থক করে তোলেন।

'রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত'-এ প্রদত্ত দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারানুসারে আয়করমুক্ত। চেক বা ড্রাফট **'Ramakrishna Math, Barasat'**—এই নামে পাঠাবেন।

স্বামী মুক্তিকামানন্দ
অধ্যক্ষ

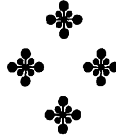
যাদের সঙ্কীর্ণ ভাব, তারাই অন্যের ধর্মকে নিন্দা করে ও আপনার ধর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে দল পাকায়; আর যারা ঈশ্বরানুরাগী—কেবল সাধন-ভজন করতে থাকে, তাদের ভিতর দলাদলি থাকে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ



যতক্ষণ 'আমি' রয়েছে ততক্ষণ বাসনা তো থাকবেই। ওসব বাসনায় তোমাদের কিছু হবে না। তিনিই রক্ষা করবেন। তাঁর ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। তবে ভাল কাজটি করে যেতে হয় আর তাও তিনি যেমন শক্তি দেন।

শ্রীমা সারদাদেবী



মানবাত্মা অথবা মানবদেহই একমাত্র উপাস্য ঈশ্বর। অবশ্য অন্য জীবজন্তুরাও ভগবানের মন্দির বটে, কিন্তু মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির—মন্দিরের মধ্যে তাজমহল। যদি মানুষের মধ্যে তাঁহার উপাসনা করিতে না পারিলাম, তবে কোন মন্দিরেই কিছু উপকার হইবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ

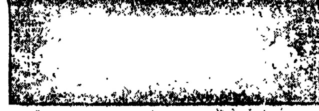






RAMAKRISHNA MISSION

VIVEKNAGAR : ALONG
ARUNACHAL PRADESH-791001
STD CODE : 03783 • TEL : 22-455/22-249/23-395 • FAX : 22-716



মাতৃভূমি ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অরুণাচল প্রদেশ। এই পার্বত্য রাজ্যে আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখার অনতিদূরে অন্যতম জেলা শহর আলং এবং সমীপবর্তী বিবেকনগরে বিগত ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের এই বৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি বহুবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে অনগ্রসর জনজাতি সমাজে শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যসেবা, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাব্যবস্থা, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন প্রভৃতি বিবিধ সেবাকার্যে নিরলস উদ্যমের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। নয়া দিল্লির কেন্দ্রীয় স্কুল বোর্ডে সংযুক্ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আনুমানিক ২,০০০ ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে ৩০০ জনজাতি ছাত্রের জন্য ২টি ছাত্রাবাস এবং অনাবাসিক জনজাতি ছাত্রের জন্য [illegible] সুবিধা এবং প্রাত্যহিক প্রাতরাশ অথবা মধ্যাহ্নাহারের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ৭৫ একর পার্বত্য টিলা জমিতে বিগত তিন দশক ধরে গড়ে ওঠা এই বৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রশস্ত বিদ্যালয় ভবন, ছাত্রাবাস, চিকিৎসাকেন্দ্র, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, [illegible] ও [illegible] খেলার মাঠ, গোশালা, কৃষিক্ষেত্র, [illegible], কারিগরী প্রশিক্ষণ [illegible], অতিথিভবন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগগুলির [illegible] অপ্রতুলতাজনিত অর্থাভাব হেতু [illegible] প্রাপ্ত হয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে ভারতীয় সনাতন কৃষ্টি ও ঐতিহ্য রক্ষা তথা সম্প্রসারণের স্বার্থে আমাদের নিম্নবর্ণিত প্রকল্পগুলিতে সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য সহৃদয় দেশবাসীর কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ [illegible]।

(১)	গৃহাদি নির্মাণ ও মেরামতি কার্য	:	১৫,০০,০০০ টাকা
(২)	আবাসিক ছাত্রবৃন্দের ভরণপোষণ	:	১৫,০০,০০০ টাকা
(৩)	পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত	:	৫,০০,০০০ টাকা
(৪)	সাধারণ কল্যাণনিধি গঠন	:	১৫,০০,০০০ টাকা
		মোট	৫০,০০,০০০ টাকা

ভারতীয় আয়কর আইনের ৮০-জি ধারায় করমুক্ত এই দান **'Ramakrishna Mission, Along'** নামে **crossed cheque** অথবা **State Bank of India, Along**-এ প্রাপ্য ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠাতে পারবেন।

স্বামী সুমেধানন্দ
সম্পাদক

বিবেকনগর, আলং

সৌজন্যে

পিয়ারলেস



সঞ্চয়ের সহজ পথ

* *

আস্থার প্রতীক

UDBODHAN
Phone : 554-2248, 554-2403
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com

Vol. 103 ❑ No. 1
❑ JANUARY 2001 ❑

Licensed to Post
Without Prepayment
Licence No.
TECH/WB/RNP-15/LPWP-01/2001

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Regn. No.
TECH/WB/RNP-15/2001

উদ্বোধন

১০৩তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র



❑ গত ১লা মাঘ ১৪০৭ (১৫ জানুয়ারি ২০০১) **উদ্বোধন ১০৩তম বর্ষে** পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় **নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব** নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের **১০২ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম** ❑

❑ **বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন** একটি ধর্মীয় সংগঠনের **মুখপত্র** মাত্র নয়, **উদ্বোধন** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। **ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের** সঙ্গে এবং **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের** সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত** রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তে হবে।

❑ স্বামী বিবেকানন্দের **ইচ্ছা ও নির্দেশ** অনুসারে **উদ্বোধন** নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, **সর্ব অর্থেই উদ্বোধন** একটি **সার্থক পারিবারিক পত্রিকা**। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন**-এ প্রকাশিত হয়।

❑ **উদ্বোধন** শুধু **বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা** নয়, **উদ্বোধন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ পত্রিকা** এবং **বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক পত্রিকা**।

❑ ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র হয়েও **উদ্বোধন** তার মহান প্রবর্তকের নির্দেশ অনুসারে **কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আদর্শের মুখপত্র নয়। উদ্বোধন** তার **সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বিগত ১০২ বছর** ধরে অটুট রেখেছে।

❑ **উদ্বোধন**-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি **মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের** সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

❑ **উদ্বোধন** একটি পত্রিকা মাত্র নয়, **উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী** এবং **স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর**।

❑ **স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে। উদ্বোধন-এর প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে গ্রাহক করলেই** এখনি **উদ্বোধন-এর গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার** হয়ে যায়। তাই আপনার নিজের **গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট** নয়, অন্যদের **গ্রাহক করাও** আপনার কাছে **স্বামীজীর প্রত্যাশা**। স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের **গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের**। অবশ্য **ইন্টারনেট সংস্করণের** মাধ্যমে **উদ্বোধন** আজ **ভারত ও বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ঘরে ঘরে** পৌঁছে গিয়েছে।

❑ **স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।** সেকথা স্মরণ করে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে অনুরাগী ও ভক্তগণ **উদ্বোধন**-এর প্রতি নিশ্চয়ই তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

❑ **উদ্বোধন-এর শারদীয়া** সংখ্যাটির জন্য **গ্রাহকদের থেকে আলাদা মূল্য নেওয়া হয় না**। এই সংখ্যাটি গ্রাহকদের জন্য আমাদের **শারদ উপহার**। প্রসঙ্গত সকলের অবগতির জন্য জানাই যে, **শারদীয় সংখ্যাটি** আকারে সাধারণ সংখ্যার **তিনগুণ** এবং **বিশেষ সংখ্যা** হওয়ায় অলঙ্করণের জন্য খরচও হয় যথেষ্ট। **গত কয়েক মাসে কাগজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং অন্যান্য ব্যয়বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শারদীয়া সংখ্যা সহ গ্রাহক-পিছু আমাদের বার্ষিক খরচ দাঁড়িয়েছে মুদ্রিত গ্রাহকমূল্যের সওয়া তিন গুণ**। বিশাল অঙ্কের এই অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য আমরা নির্ভর করি সহৃদয় বিজ্ঞাপনদাতাদের সক্রিয় সহযোগিতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক বদান্যতার ওপর।

❑ **পত্রিকা প্রকাশ সংক্রান্ত ব্যয় প্রতি বছর বেড়ে গেলেও তিন বছর (১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০১) 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত** রাখা হয়েছে। **এত সুলভ মূল্যে এমন সম্পূর্ণ পত্রিকা বাঙলা** ভাষায় **আর একটিও নেই**।

❑ **উদ্বোধন**-এর সেবায় তিনটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি **'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল'**, অন্য দুটি যথাক্রমে **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** এবং **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'**। **উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 'Ramakrishna Math, Baghbazar'—এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা : সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।** দাতার চিঠিতে বা M.O. কুপনে **'উদ্বোধন পত্রিকার সেবায়'** অথবা **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** অথবা **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'**-এর জন্য যেন লেখা থাকে।

❑ **উদ্বোধন-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে** মতিলাল-তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাঁদের পুত্রকন্যাদের পক্ষে **স্থায়ী ভিত্তিতে 'উদ্বোধন মেধা সম্মান' (একবছরের জন্য উদ্বোধন-এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি)** নিবেদিত হয়েছে। **পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায়** প্রথম **২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের** যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। **২০০১ সালের** জন্য অনুরূপ **সম্মান** সুকুমার-বিভারানী পাড়ুই-এর স্মৃতিতে তাঁদের পুত্র অমর পাড়ুই নিবেদন করেছেন। এই সম্মানপ্রাপকদের নির্বাচনের **ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্ষদ পরিচালিত ২০০০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় 'সম্মান'-এর জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বোধন-সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ** করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
সম্পাদক

সৌজন্যে

পি. বি. সরকার অ্যান্ড সন্স

(কোন ব্রাঞ্চ নেই)

জুয়েলার্স

সন অ্যান্ড গ্র্যান্ড সন্স অব লেট বি. সরকার

৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০ ❑ ফোন : ২২৩-৮৭১৩, ২২৩-৭৫৭৮

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ **সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ**

১০৩তম বর্ষ

উদ্বোধন

।। ।।







"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

আনন্দবাজার পত্রিকা

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

খুলে দিন আপনার স্বপ্নের তোরণদ্বার
এলআইসি তার চাবি দিচ্ছে উপহার !



মানি ব্যাক পলিসিসমূহ

পুরোপুরি বীমার সুরক্ষায় থাকাকালীন আপনার বিবিধ আর্থিক চাহিদাপূরণের জন্যে সময়ে-সময়ে ফেরতলাভ অর্জন করতে থাকুন। এলআইসি-'র মানি ব্যাক পলিসিগুলির ব্যাপক সম্ভার থেকে বেছে নিন, আর আপনার ও আপনার পরিবারের সবার সুখস্বাচ্ছন্দ্যময় ভবিষ্যতের পূর্ণ আশ্বাস লাভ করুন।

প্ল্যান	টেবিল নং.	বয়স	ন্যূনতম আশ্বাসিত অর্থপরিমাণ	মেয়াদ	প্রিমিয়াম প্রদানের প্রকৃতি ([illegible])	আর্থিক সুবিধে (সব মানিব্যাক পলিসিগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য)
20 বছরের মানি ব্যাক প্ল্যান	75	13-50 বছর	টা. 40,000/-	20 বছর	বার্ষিক, অর্ধবার্ষিক, ত্রৈমাসিক, মাসিক এবং বেতনবদ্ধ যোজনা	পলিসির মেয়াদের ওপর নির্ভর ক'রে 4 থেকে 5 বছরের মধ্যে ধার্য সমব্যবধানে কিস্তিতে অর্থপ্রদান। মেয়াদপূর্তিতে বাদবাকি আশ্বাসিত অর্থপরিমাণের সঙ্গে বোনাস অথবা পুরো আশ্বাসিত অর্থাঙ্কের ওপর ধার্য গ্যারান্টীসহ সংযোজন মিলিতভাবে প্রদেয়।
25 বছরের মানি ব্যাক প্ল্যান	93	13-45 বছর	টা. 40,000/-	25 বছর	- ঐ -	
জীবন সঙ্গম	123 124 125 126	14-58 বছর 13-55 বছর 14-50 বছর 14-45 বছর	টা. 40,000/-	12 15 20 25	- ঐ -	মৃত্যু ঘটলে, পুরো আশ্বাসিত অর্থপরিমাণ এবং বোনাস অথবা গ্যারান্টীসহ সংযোজন প্রদেয়, তা' সে আগে কোনো কিস্তি প্রদান করা হোক বা না হোক।
জীবন সুরভি	106 107 108	14-55 বছর 14-50 বছর 14-45 বছর	টা.40,000/-	15 20 25	- ঐ -	দুর্ঘটনাকালীন সুবিধে পাওয়া যাবে যদি প্রতি বছর আশ্বাসিত অর্থাঙ্কের প্রতি হাজার টাকায় 1/- টাকার বাড়তি প্রিমিয়াম প্রদান করা হয়।

বিশেষ সুবিধে :
- প্রিমিয়াম প্রদানের সীমিত মেয়াদ।
- পলিসির মেয়াদ বাড়লে লাইফ কভারও বাড়ে।

বিশদ বিবরণের জন্য আপনার নিকটবর্তী এলআইসি শাখায় যোগাযোগ করুন।



লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

- Visit us at www.licindia.com



রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ

পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া-৭১১ ২০২, ফোন ঃ ৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২

সারদাপীঠ থেকে প্রকাশিত অডিও ক্যাসেটসমূহ

মূল্য ❑ SP-1 ও SP-31–34 ঃ ৩৫ টাকা, অন্যান্য ঃ ৩০ টাকা

SP-1	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্	(সংস্কৃত ও বাঙলা)
SP2, SP-7, SP-8, SP-10 হইতে 12	কথামৃতের গান (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড)	(বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি)
SP-3	শ্রীরামনামসংকীর্তন	(সংস্কৃত ও হিন্দি)
SP-4	বক্তৃতা—যুগপুরুষ	(বাঙলা) (শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত)
SP-5	শ্রীশ্রীচণ্ডীস্তব	বাঙলা, সংস্কৃত)
SP-6	শিবমহিমা	(বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি)
SP-9	শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা	(সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি)
SP-13	শ্রীসারদাবন্দনা	(সংস্কৃত, বাঙলা)
SP-20	বিবেকানন্দবন্দনা	(সংস্কৃত, বাঙলা)
SP-24	শ্রীকৃষ্ণবন্দনা	(সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি)
SP-14 হইতে SP-16	কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)	(বাঙলা)
SP-17	বীরবাণী	(সংস্কৃত, বাঙলা, ইংরেজী ও হিন্দি)
SP-18	গীতিবন্দনা	(হিন্দি)
SP-19	বক্তৃতা—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান	(বাংলা) (শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত)
SP-21 ও SP-22	সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড)	(হিন্দি)
SP-23	ওঠো জাগো	(হিন্দি)
SP-25	শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি	(হিন্দি)
SP-26	বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি	(হিন্দি)
SP-27	বেদমন্ত্র	(সংস্কৃত) (উপনিষদের মন্ত্রসমূহ)
SP-28	সরস্বতী বন্দনা	(বাঙলা, সংস্কৃত)
SP-29	Ramakrishna Movement	(Lecture by Revered Srimat Swami Bhuteshanandaji Maharaj)
SP-30	Religion in Practice	(do)
SP-31 হইতে SP-34	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (আবৃত্তি) (১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড)	(সংস্কৃত)
SP-35	আগমনী	(বাঙলা)
SP-36	ভজন সুধা	(হিন্দি)

শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্, শ্রীরামনামসংকীর্তন ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার C. D. প্রকাশিত হয়েছে।

স্বামী সর্বগানন্দ, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ, স্বামী দিব্যব্রতানন্দ, শ্রীমহেশরঞ্জন সোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য দক্ষ শিল্পিগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন।

Video Cassette :
Centenary Celebration of the Ramakrishna Mission at Belur Math in 1998.
Duration—80 minutes
Rs. 250.00

প্রাপ্তিস্থান ঃ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি (কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) ও সিমফনি (ধর্মতলা মেট্রো সিনেমার পাশে)

ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে M.O. অথবা Bank draft মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে।

3 MAR 2001
LIBRARY
CALCUTTA

উদ্বোধন ।।১০৩।।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র

১০৩তম বর্ষ ২য় সংখ্যা ফাল্গুন ১৪০৭ ফেব্রুয়ারি ২০০১

প্রচ্ছদ ❑ ওপরে কৈলাস, নিচে মানস সরোবর। নিচে মানস সরোবর থেকে দৃশ্যমান কৈলাস।
মানস সরোবরে সন্তরণরত হংসযুগল—লোকবিশ্বাসে, হর-পার্বতী।

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ



সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'
প্রচ্ছদ ❑ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ ❑ আলোকচিত্র : বেলুড় মঠের জনৈক সন্ন্যাসী
website : www.udbodhan.org ◆ e-mail : udbodhan@vsnl.com
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ : ৬৫ টাকা; সডাক : ৭৫ টাকা
আলাদাভাবে কিনলে বর্তমান সংখ্যার মূল্য : ৮ টাকা ❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ❑ ৩০০০ টাকা
[একবছরের মধ্যে পরিশোধ্য কমপক্ষে ৫০০ টাকা প্রতি কিস্তি হিসাবে ৬টি কিস্তিতেও প্রদেয়]

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা বাঙালীর ঘরে ঘরে সুলভে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিগত দুবছরের মতো 'উদ্বোধন'-এর বর্তমান বর্ষের গ্রাহকমূল্যও অপরিবর্তিত রয়েছে। এই নিয়ে পর পর তিন বছর 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য একই থাকল।



'উদ্বোধন' ঃ ১০৩তম বর্ষ (২০০১ খ্রীস্টাব্দ) ❑ গ্রাহকভুক্তি, নবীকরণ

❑ 'উদ্বোধন'-এর বর্তমান বর্ষ বা ১০৩তম বর্ষের (মাঘ ১৪০৭—পৌষ ১৪০৮/জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০১) গ্রাহকমূল্য বিগত বর্ষের মতোই থাকছে অর্থাৎ—ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৬৫ টাকা; ডাকযোগে ঃ ৭৫ টাকা; বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ঃ ৭২০ টাকা (বিমানডাক) ❑ ৩৬০ টাকা (সমুদ্রডাক); বাংলাদেশ ঃ ১৪০ টাকা।

❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (কেবলমাত্র ভারতবর্ষে প্রযোজ্য) ঃ ৩০০০ টাকা। এই টাকা কিস্তিতেও দেওয়া যায়। প্রথম কিস্তিতে কমপক্ষে ৫০০ টাকা দিয়ে বাকি ২৫০০ টাকা পরবর্তী ১১ মাসের মধ্যে প্রতি কিস্তিতে ন্যূনপক্ষে ৫০০ টাকা হিসাবে প্রদেয়।

❑ গত দুবছর (১৯৯৯/১৪০৫-১৪০৬ এবং ২০০০/১৪০৬-১৪০৭) প্রথম বা মাঘ সংখ্যা প্রথম মুদ্রণের পর নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, পরে আবার তার পুনর্মুদ্রণ করতে হয়। সেজন্য বছরের প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ মাঘ সংখ্যা থেকে বছরের প্রতিটি সংখ্যার প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করতে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি/ নবীকরণ করা অবশ্যই প্রয়োজন। কার্যালয়ে অথবা আমাদের গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রগুলিতে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন। প্রসঙ্গত, গ্রাহকমূল্য দেরিতে এলে ২/৩টি সংখ্যা একসঙ্গে পাঠাতে হয়। তখন সেগুলি সাধারণ ডাকে না পাওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। সেজন্য কলকাতা বা কাছাকাছি যাঁরা থাকেন, তাঁরা আমাদের কার্যালয়ে এসে বা লোক মারফত সরাসরি গ্রাহকমূল্য জমা দিলে সুবিধা। M. O.-তে টাকা পাঠালে তা আমাদের কার্যালয়ে পৌঁছাতে অনেক দেরি হয় এবং ততদিনে প্রথম সংখ্যাটি নিঃশেষিত হয়ে গেলে গ্রাহকেরা সময়মতো গ্রাহকমূল্য পাঠালেও ঐ সংখ্যাটি থেকে বঞ্চিত হবেন। সে-কারণে সম্ভব হলে M. O. না করে গ্রাহকমূল্য সরাসরি আমাদের কার্যালয়ে এসে জমা দেওয়াই ভাল।

❑ সরাসরি জমা দেওয়া সম্ভব না হলে 'A/c Payee' ব্যাঙ্ক ড্রাফটে/পোস্টাল অর্ডারে গ্রাহকমূল্য 'Udbodhan Office, Calcutta'—এই নামে কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাবেন। চেক পাঠাবেন না। বিদেশের গ্রাহকদের জন্য চেক গ্রাহ্য। তবে সেই চেক কলকাতাস্থ কোন ভারতীয় ব্যাঙ্কের ওপর এবং 'Udbodhan Office'-এর অনুকূলে 'A/c Payee' হতে হবে।

❑ যাঁদের M. O. করে গ্রাহকমূল্য পাঠাতেই হবে, তাঁদের কাছে অনুরোধ, অবিলম্বে M. O. পাঠান। নভেম্বর-ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে পাঠানো M. O. কার্যালয়ে এসে পৌঁছাতে ২/৩ মাস লেগে যাচ্ছে। পুরনো গ্রাহক হলে M. O. কুপনে অবশ্যই আপনার গ্রাহকসংখ্যা, নাম ও ঠিকানা (পিনকোড-সহ) পরিষ্কার করে লিখে দেবেন। নতুন গ্রাহক হতে চাইলে নাম ও পিনকোড-সহ ঠিকানার সঙ্গে 'নতুন গ্রাহক হতে চাই'—এই কথাটি লিখে দেবেন।

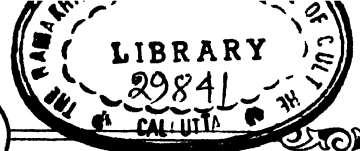
❑ অনেক সময় M. O. কুপন আমাদের কাছে এসে পৌঁছায় না। সেজন্য M. O. কুপনে উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে একটি পোস্টকার্ড দিয়েও M. O. মাধ্যমে যে গ্রাহকমূল্য পাঠাচ্ছেন তা পুরনো গ্রাহকরা নাম ও গ্রাহকসংখ্যা উল্লেখ-সহ জানালে আমাদের সুবিধা হয়। নতুন গ্রাহকদের নাম ও পিনকোড-সহ ঠিকানা জানাতে হবে।

❑ পত্রোত্তর এবং প্রেরিত গ্রাহকমূল্যের প্রাপ্তিসংবাদের জন্য দেশ ও বিদেশের গ্রাহকদের প্রয়োজনীয় ডাকখরচ পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

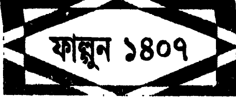
❑ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।

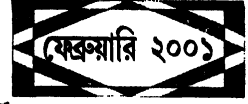
❑ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।

সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইন্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯









3 MAR 2001



শ্রীরামকৃষ্ণ—মা, একি হীনবুদ্ধি, এখানে এসে মালা নিয়ে জপ কচ্ছে! যে এখানে আসবে তার একেবারে চৈতন্য হবে। তার মালা জপা অত করতে হবে না।

*



দেখলাম—খোলটি (দেহটি) ছেড়ে সচ্চিদানন্দ বাহিরে এল, এসে বললে, আমি যুগে যুগে অবতার!... দেখলাম, পূর্ণ আবির্ভাব। তবে সত্ত্বগুণের ঐশ্বর্য।

*

মণি—লীলার মধ্যে নরলীলা বেশ ভাল লাগে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তাহলেই হলো; আর আমাকে দেখছ!

*

(গিরিশের দিকে তাকাইয়া)—অনেক ঈশ্বরীয় রূপ দেখছি! তার মধ্যে এই রূপটিও (নিজের মূর্তি) দেখছি!

*

দেখলাম, তিনি (ঈশ্বর) আর (আমার) হৃদয়-মধ্যে যিনি আছেন—এক ব্যক্তি।

নরেন্দ্র—হাঁ, হাঁ, সোঽহম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ—তবে একটি রেখামাত্র আছে—('ভক্তের আমি') সম্ভোগের জন্য।

*

শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদি ভক্তদিগকে)—দেখছি এর (নিজের) ভিতর থেকেই যাকিছু।

নরেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন ঃ "কি বুঝলি?"

নরেন্দ্র—("যাকিছু" অর্থাৎ) যত সৃষ্ট পদার্থ সব আপনার ভিতর থেকে!

*

শ্রীরামকৃষ্ণ—যে রাম, যে কৃষ্ণ, ইদানীং সে-ই রামকৃষ্ণরূপে ভক্তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে!

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

চৈতন্য-কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৬৬তম আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষ্যে নিবেদিত বিশেষ সম্পাদকীয়।

১ জানুয়ারি ১৮৮৬ শ্রীরামকৃষ্ণ কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে 'কল্পতরু' হইয়াছিলেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি বছর এই দিনটিতে সমবেত হন সেই পবিত্র তীর্থভূমিতে—যেখানে দেবমানব অকাতরে কৃপা বিতরণ করিয়াছিলেন, সকলের উদ্দেশে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অভয়-আশীর্বাদ উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন উপস্থিত ভক্তদের বলিয়াছিলেন: "তোমাদের চৈতন্য হোক।" কথাটির তাৎপর্য কী? শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ ও বার্তা অনুসারে মানুষ মাত্রই স্বরূপত চৈতন্য। বেদান্তের মতেও তাহাই। কিন্তু মানুষ তাহার এই স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত নহে। অজ্ঞানের আবরণে তাহার সেই বোধ থাকে আবৃত। যে-মানুষ যত এই আবরণকে 'উন্মোচন' করিতে পারে, সে ততই 'আবিষ্কার' করে তাহার স্বরূপের মহিমা। আর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মধ্যে সে প্রকটিত করে তাহার যথার্থ ঐশ্বর্য। এই ঐশ্বর্য আত্মার ঐশ্বর্য। এই ঐশ্বর্য চেতনার ঐশ্বর্য। এই ঐশ্বর্য ভূমার ঐশ্বর্য। এই ঐশ্বর্য মনুষ্যত্বের ঐশ্বর্য। একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের পার্থক্য এই ঐশ্বর্যের বিকাশের তারতম্যে। যে-মানুষের মধ্যে তাহার ঐ সহজাত পরম ঐশ্বর্যের চরম প্রকাশ ঘটে, তাহাকে আমরা তখন আর 'মানুষ' বলি না, বলি 'ভগবান'। মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত প্রকাশকে যিনি আপন জীবনে প্রকটিত করেন, তিনিই ভগবান। আমরা বলি—ভগবান রামচন্দ্র, ভগবান কৃষ্ণ, ভগবান বুদ্ধ, ভগবান খ্রীস্ট, ভগবান চৈতন্য, ভগবান রামকৃষ্ণ। এই ভগবদ্ সত্তা তাঁহাদের মধ্যেই ছিল। শুধু তাঁহারা তাঁহাদের আপন আপন জীবনে তাহার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটাইয়াছিলেন। তাঁহারা যে চৈতন্যস্বরূপ—সেই চৈতন্য বা চেতনা (awareness) তাঁহাদের মধ্যে জাগ্রত হইয়াছিল। অন্তর্নিহিত চৈতন্যকে (Consciousness) নিজ নিজ জীবনে প্রকট করিতে তাঁহারা সাধনা করিয়াছিলেন, সংগ্রাম করিয়াছিলেন।

কর্ণের কবচ-কুণ্ডলের মতো মানুষ যেমন তাহার দেবত্বকে লইয়াই জন্মগ্রহণ করে, তেমনই সঙ্গে লইয়া আসে দেবত্বের আবরণ অজ্ঞানকেও। এই অজ্ঞানকে আমরা পশুত্বও বলিতে পারি। অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের মধ্যেই পাশাপাশি থাকে দেবত্ব ও পশুত্ব। স্বামীজীর ভাষায়—'Brute-man' এবং 'Buddha-man'—পশুমানব এবং বুদ্ধমানব। যে-কৌশল বা যে-প্রক্রিয়ায় মানুষের পশুমানব হইতে বুদ্ধমানবে উত্তরণ ঘটে, তাহার নাম 'ধর্ম'। কেহ ইচ্ছা করিলে ধর্মের পরিবর্তে অন্য শব্দও ব্যবহার করিতে পারেন। তাহাতে কিছু আসে যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অবশ্য 'ধর্ম' কথাটিই ব্যবহার করিয়াছেন। তবে তাঁহারা কখনই 'ধর্ম' বলিতে কোন আনুষ্ঠানিক ধর্মকে, কোন প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মকে, কোন সম্প্রদায়গত ধর্মকে বোঝান নাই। সেই ধর্ম মানুষের অন্তর্নিহিত চৈতন্যসত্তার বিকাশের 'বিজ্ঞান'। সেই ধর্মই যথার্থ ধর্ম। উহার অনুশীলনেই মানুষের মধ্যে মহতের, বৃহতের, ভূমার চেতনা বা চৈতন্য জাগ্রত হয়—শ্রীরামকৃষ্ণের সহজ-সরল ভাষায়, 'হুঁশ' জাগ্রত হয়। ভূমা হইল মানুষের 'মান'-এর অর্থাৎ 'মহিমা'র স্বরূপ, তাহার 'মর্যাদা'র পরাকাষ্ঠা। যাহার সেই 'মান' সম্পর্কে 'হুঁশ' আছে, সে-ই মানুষ। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বলিতেছেন—"তোমাদের চৈতন্য হোক", তখন তিনি চাহিতেছেন আমরা যেন সত্যিকারের মানুষ হই। ইহার চাহিতে বড় আশীর্বাদ আর কী হইতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, ঈশ্বরলাভই মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য। আমরা বুঝি, পণ্ডিত হওয়া, ধনী হওয়া, সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করা জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সুস্পষ্টভাবে বলিলেন—না, ঈশ্বরলাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। তিনি সেদিন বলিতে চাহিয়াছিলেন, পার্থিব যাহা কিছু পাওয়া তাহা সাধারণ বিচারে যত বড় পাওয়া বলিয়া মনে হউক না কেন, সে-পাওয়া ঐ পরম প্রাপ্তির নিকট তুচ্ছাতিতুচ্ছ। একের পিঠে শূন্য বসাইয়া এক-কে মুছিয়া দিলে শূন্যের যে-মূল্য, ঈশ্বর-বিচ্যুত সকল পার্থিব প্রাপ্তির মূল্যও তাহাই। পূর্ণতার প্রাপ্তিতেই জীবনের চরিতার্থতা। ঈশ্বরলাভেই জীবনের পূর্ণতা। সেই আস্বাদ যে পাইয়াছে শুধু সেই জানে কোন্ ধনে সে ধনী হইয়াছে! গীতায় ভগবান কৃষ্ণ বলিয়াছেন ঃ "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।" (৬।২২)—যাহা লাভ করিলে তাহার অধিক আর কিছু লাভ করিবার সিদ্ধ সাধকের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। কারণ, সেই প্রাপ্তির সুখ, আচার্য শ্রীধর স্বামীর মতে—"নিরতিশয়সুখ"। আচার্য শঙ্করের মতে, ঐ প্রাপ্তিই "আত্মলাভ"। রামপ্রসাদ বলিতেছেন, তখন "ইন্দ্রাদি সম্পদপদ তুচ্ছ হয়।" বস্তুত, ঈশ্বরকে লাভ করিলে আর কিছুই লাভ করিবার থাকে না। জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য পাইয়াও ঈশ্বরকে না পাইলে সব পাওয়াই নিরর্থক হইয়া যায়। জার্মান দার্শনিক একহার্ট বলিতেছেন ঃ "To be full of God is to be empty of things, while to be full of things is to be empty of God." ঈশ্বর যাহার হৃদয় জুড়িয়া আছেন, পার্থিব সম্পদে সে নিঃস্ব হইলেও আত্মিক ঐশ্বর্যে সে পূর্ণ হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে, পার্থিব সম্পদের চূড়ান্ত শিখরে বসিয়া থাকিলেও ঈশ্বরপ্রাণতা যদি না থাকে, তাহা হইলে সে দুর্ভাগা সর্বতোভাবেই নিঃস্ব হইয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ আশীর্বাদ করিলেন, ঈশ্বরলাভই যে জীবনের পরম লক্ষ্য—এই বোধ, এই চেতনা, এই চৈতন্য যেন আমাদের জাগ্রত হয়।

একজন প্রাচীন সন্ন্যাসীর কাছে শ্রীরামকৃষ্ণ-উচ্চারিত "তোমাদের চৈতন্য হোক"—এই আশীর্বাদের আরেকটি ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ আশীর্বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাঁহার সম্পর্কে গিরিশচন্দ্র ঘোষের একটি মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে। সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্যানে নামিয়া অকস্মাৎ গিরিশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ঃ "গিরিশ, তুমি যে সকলের কাছে এত কথা [আমার ঐশী স্বরূপ সম্বন্ধে] বলে বেড়াও, তুমি [আমার সম্বন্ধে] কি দেখেছ ও বুঝেছ?" উত্তরে গিরিশচন্দ্র নতজানু হইয়া করজোড়ে গদগদ স্বরে বলিলেন ঃ "ব্যাস-বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেননি, আমি তাঁর সম্বন্ধে বেশি কি আর বলতে পারি?" গিরিশচন্দ্রের এই উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। ভক্তদের প্রতি 'প্রেম ও করুণায় আত্মহারা' হইয়া তিনি উচ্চারণ করিলেন ঃ "তোমাদের কি আর বলব, আশীর্বাদ করি তোমাদের চৈতন্য হোক।" গিরিশচন্দ্রের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণ এই আশীর্বাণী উচ্চারণ করিয়া প্রকারান্তরে তাঁহার আত্মস্বরূপ স্বীকার করিলেন। যেন বলিলেন ঃ আমি স্বয়ং ঈশ্বর—তোমাদের সামনে দাঁড়াইয়া আছি। বাল্মীকি এবং ব্যাস রামায়ণ এবং মহাভারত ও ভাগবতাদি গ্রন্থে যাঁহাদের মহিমা কীর্তন করিয়াছিলেন, সর্বভূতান্তর্যামী সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের মর্যাদাপুরুষ ও লীলাপুরুষ-রূপে অবতীর্ণ সেই রাম এবং কৃষ্ণ ইদানীং এই দেহে রামকৃষ্ণ-রূপে তোমাদের সামনে আবির্ভূত। তোমরা ইহা ধারণা এবং বিশ্বাস কর। আশীর্বাদ করি, আমি যে সেই তিনিই—আমার সেই স্বরূপ সম্পর্কে তোমাদের চৈতন্য হউক, জ্ঞান হউক।

প্রাচীন সন্ন্যাসী আরো বলিয়াছিলেন, তাঁহার কৃপা ভিন্ন তাঁহাকে জানা যায় না। কারণ, অবিশ্বাস মানুষের সহজাত। মানুষকে ভগবান বলিয়া বিশ্বাস—যে-মানুষ আবার অসুস্থ হইয়াছেন, দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত, তিনি কি করিয়া সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হইতে পারেন? এই সংশয়, এই অবিশ্বাসের দোলায় দোদুল্যমান হইতেছিল কোন কোন ভক্তের মন। ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্রের 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' বিশ্বাসে অভিভূত শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন বাধ্য হইয়াছিলেন নির্মোক খসাইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে। এই আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেদিন এই অমোঘ অভয়বার্তাও শুনাইয়াছিলেন যে, তিনি আসিয়াছেন মানুষকে উদ্ধার করিতে, মানুষের দুঃখভার মোচন করিতে। যীশু খ্রীস্ট বলিয়াছিলেন ঃ "Come unto me, all ye that labour and are heavy-laden, and I will give you rest." তাঁহার মতো শ্রীরামকৃষ্ণও সেদিন বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, সকল দুঃখী অসহায় মানুষের পরিত্রাতা হইয়া তিনি পৃথিবীতে আসিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-ভাষ্যকার স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন ঃ "স্বার্থগন্ধহীন তাঁহার সেই গভীর আশীর্বাণী প্রত্যেকের অন্তরে প্রবল আঘাত প্রদানপূর্বক আনন্দ-স্পন্দনে উদ্বেল করিয়া তুলিল... এবং সাক্ষাৎ অনুভব করিতে লাগিল যেন তাহাদের দুঃখে ব্যথিত হইয়া কোন এক অপূর্ব দেবতা হৃদয়ে অনন্ত যাতনা ও করুণা পোষণ-পূর্বক বিন্দুমাত্র নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও মাতার ন্যায় তাহাদিগের স্নেহাঞ্চলে আশ্রয় প্রদান করিতে ত্রিদিব হইতে সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে সস্নেহে আহ্বান করিতেছেন।"

১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি এই কারণে ভক্তদের কাছে

'কল্পতরু দিবস' নামে প্রসিদ্ধ। রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ সেদিন উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সেইভাবেই দিনটিকে নির্দেশিত করিয়াছিলেন। তখন হইতে এই বিশেষ দিনটিতে শ্রীরামকৃষ্ণের 'কল্পতরু' রূপটিকে ভাবিতে ভক্তরা ভালবাসেন।

কিন্তু শুধু ঐ একটি দিন তিনি 'কল্পতরু' হইয়াছিলেন—একথা ভাবিলে বা বলিলে তাঁহার মহিমাকে কি খর্ব করা হয় না? কারণ, তিনি তো একদিনের জন্য কল্পতরু নহেন, সর্বকালেই তিনি কল্পতরু। ঐদিনটিতে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহার করুণা উজাড় করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল গৃহিভক্ত তো সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। আবার আশ্চর্যের বিষয়, যাঁহারা পরবর্তী কালে তাঁহার ত্যাগী সন্তানরূপে পরিচিত হইয়াছিলেন, সেই নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ একজনও সেদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না। এমনকি উদ্যানবাটীতে উপস্থিত থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যেমন শরৎ এবং লাটু সবকিছু জানিয়া শুনিয়াও শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ছুটিয়া আসেন নাই, বরং ঐ অবসরে তাঁহার শয্যা, ব্যবহৃত জিনিসপত্রগুলি সযত্নে গুছাইয়া রাখিতেই নিজেদের নিয়োজিত রাখিয়াছিলেন। কে জানে, তাঁহাদের এই আচরণে পরবর্তী কালের সন্ন্যাসীদের প্রতি এই ইঙ্গিতটি ছিল কিনা যে, আত্মমুক্তি অপেক্ষা সেবার আকুতিই তাঁহাদের কাছে প্রত্যাশিত? সে যাহা হউক, সেদিন সেখানে অনুপস্থিত গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্তদের কাছে কি তিনি কল্পতরু ছিলেন না? কিন্তু তাহা তো নহে। তিনি সবসময় সকলের নিকটই কল্পতরু, শুধু ঐ একদিনই এবং ঐ কয়েকজনের কাছেই নহে। করুণার হরির লুঠ তিনি ইহার পূর্বেও বহুবার বিলাইয়াছেন, পরেও বিলাইয়াছেন। অপ্রকট হইয়াও আজও বিলাইতেছেন, ভবিষ্যতেও বিলাইয়া চলিবেন। ভক্তির শেষকথা চৈতন্য, জ্ঞানের শেষকথা চৈতন্য, কর্মের শেষকথা চৈতন্য, যোগের শেষকথা চৈতন্য। সর্বকালে সেই চৈতন্য সকলকে দান করিতেই তিনি কল্পতরু। তিনি নিত্য-কল্পতরু।

কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ নিশ্চয়ই। কিন্তু তিনি পুরাণপ্রসিদ্ধ কল্পতরু নহেন। পুরাণপ্রসিদ্ধ কল্পবৃক্ষের কাছে ভাল বা মন্দ যে যাহা চায় তাহাই পায়। সে-কল্পতরু রূপকথার তাল-বেতালেরই অপর সংস্করণ। ভুল বা কৌতুকবশত যদি সেই কল্পতরুর কাছে কেহ নিজের ধ্বংস চাহিয়া বসে তো তৎক্ষণাৎ ধ্বংসই নামিয়া আসিবে তাহার জীবনে। সমৃদ্ধি চাহিলে তৎক্ষণাৎ সমৃদ্ধি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ কি সেরকম কল্পতরু? কখনোই নহে। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে মানুষ শুধু মঙ্গলই পায়। শুধু শ্রেয়, শুধু কল্যাণ, শুধু অভয়। নির্বিচারে তিনি মানুষকে চৈতন্যের রাজ্যের সন্ধান দিয়াছেন, করিয়াছেন অকুণ্ঠ অভয়াশ্রয় প্রদান। সেজন্য স্বামী সারদানন্দ ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারির ঘটনাকে শ্রীরামকৃষ্ণের "কল্পতরু" হওয়া না বলিয়া তাঁহার "অভয়প্রকাশ অথবা আত্মপ্রকাশপূর্বক সকলকে অভয়প্রদান" আখ্যা দিয়াছেন। এখানে 'সকলকে' কথাটি লক্ষণীয়। সকলকে অর্থাৎ শুধু সেদিনের গুটিকয় ভক্তকে নহে, সর্বকালে সর্বদেশের মানুষকে। সে-কারণেই কি শ্রীরামকৃষ্ণ আন্তর্জাতিক বর্ষের প্রথম দিনটিকে বাছিয়া লইয়াছিলেন তাঁহার বিশিষ্ট বার্তাটিকে প্রচার করিবার জন্য?

"চৈতন্য হোক"—শুধু সেদিনেরই নহে, সমগ্র রামকৃষ্ণ-জীবনের সর্বাংশে ধ্বনিত একটি প্রধান বার্তা। শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র জীবন ও লীলাই হইল চৈতন্যের সন্ধান ও তাহার প্রাপ্তির সত্য ইতিবৃত্ত। বর্তমান কালের মানুষের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ সেই বহু-প্রতীক্ষিত পুরুষ—যিনি তাহাদের চৈতন্যদানের জন্য আবির্ভূত। পৃথিবীর মানুষকে তিনি চৈতন্যসত্তায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আবির্ভূত। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি যে-ঘটনা কাশীপুর উদ্যানবাটীতে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল তাহার প্রধান পুরুষ নিশ্চয়ই শ্রীরামকৃষ্ণ, কিন্তু তাহার প্রধান পার্শ্বচরিত্র গিরিশচন্দ্র—যিনি গহনতম অন্ধকারের মধ্যে আলোক-চৈতন্যের জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন—তিনি তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস ও প্রত্যয় লইয়া সগর্বে ঘোষণা করিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ কে, কী তাঁহার পরিচয়। মহাসংগ্রামের পর তিনি লাভ করিয়াছিলেন আলোক-চৈতন্যের উৎসমুখে যিনি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন সেই পরমপুরুষকে। সেই চৈতন্য-পুরুষের আলোকে গিরিশচন্দ্রের অভাবনীয় রূপান্তর ঘটিয়াছিল। নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র—স্খলিত জীবনের পথে অবিমৃশ্য যাত্রী গিরিশচন্দ্র উত্তরণ করিয়াছিলেন সাধক গিরিশচন্দ্রে, সন্তপুরুষ গিরিশচন্দ্রে, মহাত্মা গিরিশচন্দ্রে। জীবনের শেষলগ্নে তাঁহাকে যে দেখিয়াছে সে-ই অবাক হইয়া গিয়াছে তাঁহার বিরাট বিবর্তনের আকার দেখিয়া। বজ্রানলে পাঁজর জ্বালাইয়া লইয়া বৃদ্ধ গিরিশচন্দ্র বলিতেন: "শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান কিনা আমাকে দেখে তোমরা বোঝ। কী ছিলাম, আর তিনি কী করে দিয়েছেন!"

ইহারই নাম সত্যিকারের বিপ্লব। একজন প্রখ্যাত মুক্তিসংগ্রামী এই বিপ্লবকে চিহ্নিত করিতে চাহিয়াছেন 'রামকৃষ্ণ বিপ্লব' বলিয়া। তাঁহার ভাষায়: "মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্যকে উন্মোচিত করে, মানুষের চিন্তায় ক্রমবিকাশ ঘটিয়ে মানুষকে মনুষ্যত্বে পৌঁছে দেওয়াই হলো এই বিপ্লবের প্রকৃতি।" 'মনুষ্যত্বে পৌঁছে দেওয়া' মানে তাহার মধ্যে চৈতন্যকে জাগ্রত করা, সে যে চৈতন্যস্বরূপ সেই বোধে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং 'চৈতন্য'ই করিয়া দেওয়া। পৃথিবীতে সেই মহাদানের মহা অঙ্গীকার লইয়াই আবির্ভূত হইয়াছিলেন চৈতন্য-কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ। ❑

কথামৃতে না-বলা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

শ্রীম



তিনটি বিষয়ে ঠাকুর আমাদের warn (সাবধান) করে দিয়েছিলেন। First (প্রথমত)—allowance (উপেক্ষার দৃষ্টি) দিবে, second (দ্বিতীয়ত)—ফোঁস করবে আর third (তৃতীয়ত)—দূরে থাকবে। প্রথমটি হলো—charitable view (উদার দৃষ্টি) নিতে হয়। দোষেগুণে মানুষ—এটা স্মরণ রাখতে হয়। দ্বিতীয়টি—একটু তেজ দেখাতে হয়। সংসারে থাকতে গেলে একটু ধমক দিতে হয়, নচেৎ এখানে থাকা কঠিন। ওটি চাই। তবে বিষ ঢালতে নেই। তাই ফোঁস করতে হয়। ধরা যাক, একজনের একটা firm (কারবার) আছে। ওটা রাখতে হলে লোকের সঙ্গে deal (ব্যবসাপত্র) করতে হবে, তখন ফোঁসের খুব প্রয়োজন। হাবা সাজলে, ভেড়া সাজলে চলবে না। ফোঁস করতে হবে, ধমক দিতে হবে। না করতে চাও তবে গাছতলায় যাও আর বসে বসে হরিনাম জপ কর। কিন্তু সংসারে থাকলে ফোঁসের দরকার।

একজন ভক্ত ঠাকুরকে বলেছে : "আমার কেমন স্বভাব, বিড়াল পাত থেকে আহারের সময় মাছ নিয়ে যায়, আর আমি কিছু বলতে পারি না।" শুনে ঠাকুর অমনি protest (আপত্তি) করলেন আর দৃঢ়কণ্ঠে বললেন : "কেন এমন হবে? মারলেই বা এক ঘা, এতে তো আর বিড়াল মরে যাবে না।" ভক্তটি ভেবেছিল, ঠাকুর তার কথা শুনে appreciate (প্রশংসা) করবেন। কিন্তু তিনি বললেন ঠিক উলটো কথা। এর নাম অহিংসা নয়—মহাতমোগুণ, আলস্য।

তৃতীয়—কারো ভিতর বেশি দোষ দেখতে পেলে দূর থেকে নমস্কার করবে। যেমন বাঘ-নারায়ণকে নমস্কার করে লোক। কিন্তু নারায়ণ জেনে নমস্কার করবে। তোমাকে খপ করে খেয়ে ফেলতে না পারে, এরূপভাবে দূর থেকে নমস্কার করবে।...

এই যে তিনটি বিষয় ঠাকুর সাবধান করে দিয়েছেন—allowance, ফোঁস করা আর দূর থেকে নমস্কার করা—এ মন্ত্রবিশেষ। কেউ পালন করলে সিদ্ধ হয়ে যায়। আহা! ভক্তদের জন্য কত ভাবতেন!—কিসে তাদের ভগবানে মন যায়। এসব কেন বলে দিয়েছিলেন? না, তাহলে সংসারে শান্তিতে থাকতে পারবে আর ঈশ্বরকে ডাকতে পারবে। সংসারে tact (কৌশল)-এর দরকার কিনা, এগুলি tact। তাও শিখিয়েছেন। তাই তো গুরুর ঋণ শোধ হয় না বলেই [তাঁকে] 'অহেতুক কৃপাসিন্ধু' বলে। অমনটি আর দেখব না! কী যে ছিলেন তিনি! নিজের পরনের কাপড়ের ঠিক নেই, কিন্তু কতদিকে দৃষ্টি। ভক্তদের কল্যাণের জন্য। (পৃঃ ৯৭-৯৮)

ঈশান মুখুজ্যে এসেছেন, হাতে একটি সোনার আংটি। তাঁর বয়স পঞ্চাশ। ঠাকুরের দৃষ্টি এড়াবার যো নেই। দেখে হেসে বললেন : "দেখ বুড়ো বেশ্যা, সব গেছে, তবুও কানে মাকড়িটা চাই।" (পৃঃ ২৪১)

ঠাকুর বলেছিলেন : "আমার আদর্শ ছিল—একটি কুটীর থাকবে—শাক-ভাত খাব, আর তাঁর নাম করব দিনরাত।" (পৃঃ ৩০৪)

সুরথ রাজা বসন্তকালে মার পুজো করেছিলেন। রাবণ-বধের পূর্বে রামচন্দ্র মার পুজো করেছিলেন—অসময়ে, শরৎকালে। ব্রহ্মশক্তির পুজো। ঠাকুর এই ব্রহ্মশক্তিকে 'মা, মা' বলে ডাকতেন। শুধু ডাকতেন না, সর্বদা দেখতেন। বেদে যাঁকে বলেছেন 'নিগূঢ়া'—অর্থাৎ খুব কঠিন তাঁকে জানা। ভোগবাসনা থাকলে জানতে পারে না। তবে তাঁর কৃপায় সহজ হয়ে যায়।

এসময় ঠাকুর না এলে এসব কথা কেউ বিশ্বাসই করত না। তিনি দেখলেন, কথা কইলেন, আবার অন্যদের দেখালেন। ম্যাক্সমূলার বুঝি বলেছিলেন এই কথা : "রামকৃষ্ণ না এলে বেদাদি শাস্ত্র বর্তমান যুগে অপ্রমাণ হয়ে যেত।" শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য সন্তান বলে তিনি তাই স্বামীজীকে কত আদর, কত সম্মান করলেন।

"মা প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও"—এই বলে পুজো করতে হয়। ফুলচন্দন ছাড়াও তাঁর পুজো হয় তাঁর শরণাগত হয়ে। প্রার্থনাও তাঁর পুজো। শুধু নমস্কার করলেও তাঁর পুজো। নমস্কারের মানেই এই—মা আমি তোমার শরণাগত, শরণাগত।

তাঁর মায়াতে জগৎ 'সম্মোহিত'। কার সাধ্য এ মায়া ভেদ করে! দেবতারাও পারেননি। তাই সর্বদা প্রার্থনা। শরণাগত না হলে এ মায়া ভেদ হয় না। গীতাও তাই বলেছেন। মায়া ভেদ হলেই চিরশান্তি।

জগতের সমস্ত স্ত্রীলোক, তাও তিনি—দেবতারা বলছেন এ-কথা। (দ্রঃ 'চণ্ডী', ১১।৬) তাই স্ত্রীলোকদের পুজো করতে হয় 'মা' বলে, জগন্মাতার অংশসম্ভূতা বলে। কামটাম কোথায় যায় তখন।

ঠাকুর এই মা বৈ কিছুই জানতেন না, সব কথাতেই মা! তোতাপুরী জিজ্ঞেস করলেন, বেদান্ত সাধন করবে? "আচ্ছা মাকে জিজ্ঞেস করে আসি।"—এই বলেই মন্দিরে গেলেন। সহাস্য বদনে এসে বললেন : "হ্যাঁ, মা বলেছেন।" তোতাপুরী তো অবাক, কোথায় এর মা? উনি মনে করেছিলেন গর্ভধারিণীর অনুমতির জন্য গেছেন। ঠাকুর বললেন : "কেন, ঐ মন্দিরে মা রয়েছেন।" মা বৈ কিছু জানতেন না। মায়ের ছেলে—Child of the universe—the Eternal Babe—বিশ্বের সনাতন শিশু।

ঐ স্তবে দেবতারা বলেছেন, যাঁরা জগন্মাতার আশ্রিত, তাঁরা জগতের আশ্রয়। (দ্রঃ ঐ, ১১।২৯) এর দৃষ্টান্ত ঠাকুর। এদিকে

মায়ের ছেলে, শিশু। আবার সমস্ত জগৎ তাঁকে পুজো করছে—সকলের আশ্রয়। অতুলনীয় পুরুষ। (পৃঃ ১৩০-১৩৯)

ঠাকুরের গানও মনোমুগ্ধকর। যে শুনত অন্যদিকে মন ফেরাতে পারত না। যদু মল্লিক অত বিষয়ী, কিন্তু তাঁর গান শুনে স্থির হয়ে যেত, আর প্রেমাশ্রু বিসর্জন করত। তোতাপুরী অত বড় জ্ঞানী—ঠাকুরের গান শুনে কাঁদতেন, ভাষা বুঝতেন না, তবুও।

শিব ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণীতে ঐ ব্রহ্মভাব প্রকাশ করেছিলেন।

কথায়ও প্রকাশ হয়—যেমন 'কথামৃত'। ঠাকুরের কথা পড়লে বা শুনলে অন্য সব ভুল হয়ে যায়। মহেন্দ্র সরকার অত বড়লোক—ডাক্তার, ঠাকুরের কথা শুনতে শুনতে তাঁর সব ভুল হয়ে যেত। চার-পাঁচ ঘণ্টা বসে ক্রমাগত কথাই শুনছেন। বলতেন ঃ "ওখানে গেলে আমি অন্য সব ভুলে যাই!"

ভারতীয় সকল art-ই (শিল্পই) তাঁকে প্রকাশ করার চেষ্টা করে। এদেশের নৃত্যগীত, চিত্র ও কাব্য, গদ্য-পদ্য, ভাস্কর্য—সবই তাঁকে নিয়ে। ঈশ্বরীয় ভাব এগুলিতে যে যত অধিক ফুটিয়ে তুলতে পারবেন, তিনি তত successful (কৃতকার্য) হবেন। তাই এদেশের শিল্পকলাকে idealistic (তত্ত্ব-প্রকাশক) বলা হয়। মানে এটা ঈশ্বরীয় ভাব বিকাশে বিশেষ প্রযত্নশীল।... ঠাকুরের চলন-বলন, গান ও নৃত্য সবই তাই মনোমুগ্ধকর। ভক্তেরা কেউ কেউ বলেছেন—"মথুরাধিপতেঃ" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের, অবতারের—"অখিলং মধুরম্"। তাঁর সবই সুন্দর—অবতারপুরুষের। (পৃঃ ২৩৯-২৪০)

ভগবান ভক্তদের জন্য ভাবিত হয়ে পড়েন। ঠাকুর বলেছিলেন কাশীপুরে ঃ "তোমাদের জন্যই তো শরীরটা যাচ্ছে না—রাস্তায় রাস্তায় কেঁদে কেঁদে বেড়াবে।" শেষের দিকে ভক্তদের একা একা ডেকে উপদেশ দিতেন। কিরকম করে থাকবে সংসারে, কি করবে—এসব কথা বলে গেছেন। একজন গালে হাত দিয়ে বিষণ্ণ হয়ে বসেছিলেন, অমনি ধমক দিয়ে বললেন ঃ "ও কি, অমন করতে নেই—কোমর বাঁধ।" (পৃঃ ২৬৮)

দীক্ষা তো অনেকে নেয়। নিলেই কি আর হলো! তা, ঠাকুর কাউকে কাউকে মন্ত্র নিতে বলেছেন। কাউকে আবার বলেছেন ঃ "দরকার নাই। এখানে আনাগোনা করলেই হবে।" কারণ, মন্ত্র তো ঈশ্বরদর্শনের জন্য। ঈশ্বরকে যে নিজে সম্মুখে দেখেছে তার মন্ত্রের দরকার কি? যারা অপেক্ষাকৃত সংশয়াত্মক অর্থাৎ যাদের বিশ্বাস প্রবল নয়, তাদের বলতেন নিতে। আর ঐ কথা বলতেন ঃ "মা জানে কখন ডিম ফোটাতে হবে। ডিমের অত ভাবনা কেন?"

গুরু যেমনই হোক, তাঁকে মানুষ-জ্ঞান করলে চলবে না। ঠাকুর বলতেন ঃ "গুরুকে মানুষ-জ্ঞান করলে ছাই হবে। সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ-জ্ঞান করতে হবে।" (পৃঃ ২৮০)

এইসব বলে গেছেন ঠাকুর। সব problem solved (সমস্যা সমাধান) করে দিয়ে গেছেন। কত foresee (দূরদর্শন) করেছেন। Life and soul-এর (মনুষ্যজীবনের) যতপ্রকার problem আছে সব solve করে গেছেন পূর্ব থেকে। কখন, কোথায়, কেমন হবে—সব আগে থেকে বলে গেছেন। (পৃঃ ২৮২)

ঠাকুর বলেছিলেন 'ঠাকুরদাদা'কে (নারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) ঃ "দাঁতে দাঁত পড়ছে না, মাঝে মাঝে এসো এখানে। একটু ঘষে লাগিয়ে দেব।" মানে ধ্যান-ভজন ঠিক ঠিক হচ্ছে না। ঠাকুরের কাছে এলেগেলে তিনি সব ঠিক করে দেবেন। কামার যেমন যন্ত্রপাতি ঠিক করে দেয়।

কখনো বলতেন—"কোদলানো"। বলতেন ঃ "কে যায় কোদলাতে অত মাটি! সোনা কারো অল্প মাটির নিচে আছে, কারো অনেক নিচে। অল্প নিচে থাকলে গুরু শ্রমিকের ন্যায় একটু কোদলিয়ে সোনা বের করে দেন।" 'সোনা' মানে ঈশ্বর, 'মাটি' বাসনা। (পৃঃ ৩২১)

এক এক দল আসত ঠাকুরের সেবা করতে, আবার চলে যেত। ঠাকুর বলতেন ঃ "আমি কি কারুকে ডেকে আনি, না যেতে বলি? মা-ই সব করেন ও করান।" এদের কিন্তু এতেই হয়ে গেল।

তিনি যে সেবা নিতেন, সে কি তাঁর অভাবের জন্য, না ভক্তদের মঙ্গলের জন্য? ভক্তদের মঙ্গলের জন্যই। তাঁর আবার অভাব কি, যিনি সকলের সকল অভাব পূরণ করেন?

একবার একটি ভক্তকে একটা কোট আনতে বললেন। তিনি তিনটি নিয়ে এলেন। একটি রেখে বাকিগুলি ঠাকুর ফিরিয়ে দিলেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বললেন ঃ "আর রাখলেনই বা! ওরা না দিলে আসবে কোত্থেকে?" অমনি খপ্ করে ঠাকুর উত্তর করলেন ঃ "না। সঞ্চয় করতে নেই, মা-ই সব দেন।" ভক্তটি বুঝলেন, তাঁর কল্যাণের জন্যই একটি কোট গ্রহণ করলেন। (পৃঃ ৩৩৮) ❑

স্বামী নিত্যাত্মানন্দের 'শ্রীম-দর্শন'-এর ১ম ভাগের ১ম সংস্করণ থেকে সঙ্কলিত।

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার

সম্পাদনা ❑ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০১৩

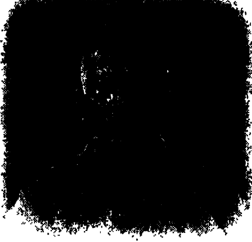
বিঃ দ্রঃ এই বিভাগে ইতিপূর্বে প্রকাশিত এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে সঙ্কলিত ও সম্পাদিত রচনাগুলি পুনর্মুদ্রণ করতে চাইলে জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ এবং 'উদ্বোধন'-সম্পাদকের অনুমতি আবশ্যিক।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

গীতার শক্তি ও মনোহারিত্ব

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

এই আলোচনাটি প্রধানত দুর্গাপদ ঘোষ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরম পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজজীর বর্তমান রচনাটি কলকাতার অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত মহারাজজীর 'Universal Message of the Bhagavad Gita' শীর্ষক ইংরেজী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের (১ম সংস্করণ, ২০০০) অন্তর্গত অসামান্য 'ভূমিকা'র বাঙলা অনুবাদ। রচনাটি 'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪০৭ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, মহারাজজীর প্রত্যেকটি ভাষণ, রচনা এবং আলোচনা অসাধারণ বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিস্বচ্ছতায় সমৃদ্ধ এবং একাধারে বিশ্লেষণমূলক, ভক্তিরসাশ্রিত ও আধুনিক মানুষের প্রশ্ন ও সংশয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনিবার্যভাবে গ্রহণযোগ্য। ভারতের অতুলনীয় শাস্ত্রগ্রন্থ 'গীতা' সম্পর্কে পূজ্যপাদ মহারাজজীর বর্তমান আলোচনাটিও তাঁর নিজস্ব শৈলী ও ভঙ্গিতে সমুজ্জ্বল। পাঠকরা প্রতিক্ষণেই তার প্রমাণ পাবেন এবং প্রতিক্ষণেই মহারাজজীর অনবদ্য যুক্তি ও বিশ্লেষণে আলোকিত হবেন।

ভাষান্তর ঃ অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

আদি শঙ্করাচার্য কর্তৃক গীতার মহত্ত্ব উন্মোচন

বর্তমান যুগে সমগ্র পৃথিবী জুড়ে গীতার সাম্রাজ্য বিস্তৃত। প্রথমে গীতা কেবল ভারতেই প্রচলিত ছিল; তাও সমগ্র ভারতে নয়—ভারতের মাত্র কয়েকজন সংস্কৃত পণ্ডিতের মধ্যে। গীতার ওপর মহান ভাষ্য রচনা করে তাকে 'মহাভারত' নামক শক্তিধর মহাকাব্য থেকে বের করে এনে খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আপামর জনসাধারণের কাছে সর্বপ্রথম উপস্থাপন করলেন আদি শঙ্করাচার্য। তার আগে পর্যন্ত এটি সেই বিশাল মহাকাব্যের ভীষ্মপর্বের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। শঙ্করাচার্যের এই মহান কীর্তির বিশেষ সমাদর করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর নিজের কথায় ঃ "শঙ্করাচার্যের মহান গৌরব তাঁর গীতা-প্রচারকার্য। গীতা-প্রচার এবং গীতার ওপর সুন্দরতম ভাষ্য রচনা এই মহান মানুষটির সৎ জীবনের অনেক মহৎ কীর্তির অন্যতম শ্রেষ্ঠ। ভারতে যত রক্ষণশীল সম্প্রদায় হয়েছে, তাদের সবগুলির প্রতিষ্ঠাতাই তাঁকে অনুসরণ করেছেন এবং প্রত্যেকেই গীতার ওপর রচনা করেছেন আপন আপন ভাষ্য।" (দ্রঃ 'Vedanta in All Its Phases' শীর্ষক বক্তৃতা)

এসব সত্ত্বেও গীতা সীমাবদ্ধ ছিল মাত্র কয়েকজন পণ্ডিত ও সাধুসন্তের মধ্যেই। পরে অন্যান্যরা এর ওপর ভাষ্য রচনা করেন এবং গ্রন্থটি ধীরে ধীরে আমাদের জাতীয় ও আঞ্চলিক ভাষাগুলিতে প্রবেশ করে। শঙ্করাচার্যের কয়েক শতক পরে মারাঠী ভাষায় সাধু জ্ঞানেশ্বর রচনা করেন 'জ্ঞানেশ্বরী'। আধুনিক কালে লোকমান্য তিলক (দুই খণ্ডে) রচনা করেছেন 'গীতারহস্য' নামে অসাধারণ এক গ্রন্থ। ইংরেজ সরকার তাঁকে যেসময়ে কয়েক বছরের জন্য বর্মার (বর্তমান মায়ানমার) মান্দালয় কারাগারে বন্দী করে রেখেছিল, সেসময়ে গ্রন্থটি রচিত। সাহায্য নেওয়ার মতো কোন বই তখন তাঁর হাতে ছিল না; সবটা তিনি স্মৃতি থেকে লিখেছিলেন। গ্রন্থটি অসাধারণ। তার পর থেকে আজ পর্যন্ত গীতার ওপর বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গীতা আজ সমগ্র ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর বহু অংশে অত্যন্ত জনপ্রিয়। পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে এ-গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে এবং প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। অতএব, আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, নিশ্চিতভাবে যার রূপচরিত্র ধীরে ধীরে নির্মাণ করে দিচ্ছে এই একটি মহান গ্রন্থ। গীতার বাণী বিশ্বজনীন, বাস্তবমুখী, শক্তিদায়ী এবং পবিত্রকারী। মহান উপনিষদ্‌সমূহে মানবসম্পদের এবং মানবিক সম্ভাবনার যে অসামান্য বিজ্ঞান গড়ে তোলা হয়েছে, তা গীতার মধ্যে লাভ করেছে বাস্তব প্রয়োগমুখী তাৎপর্য ও লক্ষ্যনির্দেশ। গীতাকে আমাদের সেই দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যয়ন করতে হবে; একে উপলব্ধি করতে হবে মানবীয় বিকাশ ও পরিপূর্ণতা লাভের একটি বিজ্ঞানরূপে। এর সাতশ শ্লোকের ছন্দও খুব সরল—এক পঙ্‌ক্তিতে আটটি বর্ণের প্রচলিত 'অনুষ্টুপ্' ছন্দ; যদিও মাঝেমধ্যে কিছু দীর্ঘতর ছন্দও আছে।

গীতা-ধ্যান-শ্লোক

গীতা খুব সহজ এবং এর অনেক ভাব মহাভারতের বাকি অংশেও দেখতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, শান্তিপর্বের সঙ্গে গীতার অনেক মিল আছে। বৈদিক যুগের পর থেকে ঔপনিষদিক দর্শনের বাস্তববাদী তাৎপর্য নিরূপণ করে তাকে

মানব-সমস্যা সমাধানে নিয়োগ করার এইরকম প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই উদ্দেশ্যেই এলেন মহান আচার্য শ্রীকৃষ্ণ, যিনি নিজে অত্যন্ত বাস্তববাদী ছিলেন। তিনি যাপন করলেন প্রবল কর্মময় একটি জীবন; সেইসঙ্গে তাঁর ছিল এমন এক হৃদয়-মন, যা সর্বার্থে বিশ্বজনীন। ভগবদ্গীতার মধ্য দিয়ে বেদান্তদর্শনকে এক প্রয়োগ-উপযোগী রূপে উপস্থাপন করলেন তিনি। এই গ্রন্থের আঠারটি অধ্যায় জুড়ে সাতশ শ্লোকের মধ্যে ধরা আছে সুন্দর সুন্দর সব ভাব—যা আমাদের কাছে বর্তমান কালে রীতিমতো প্রাসঙ্গিক। গীতা আপনার ওপর এমন কিছু ফতোয়া চাপিয়ে দেয় না, যা নিয়ে আপনার কোন প্রশ্ন করবার অধিকার নেই। গীতা সকলকে আহ্বান জানায়—তার শিক্ষাকে প্রশ্ন করার এবং কেবল তার পরেই সে-শিক্ষাকে অনুসরণ করার। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মৌলিক জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠা ও ব্যাখ্যা করছেন সেইসব মানুষের জন্য, যারা কাজ করে। সাধারণত আমরা গীতাপাঠ শুরু করার আগে 'গীতা-ধ্যান-শ্লোক' নামে পরিচিত ৯টি শ্লোক পাঠ করে থাকি। এটি সারা ভারতে প্রচলিত এবং এখন প্রচলিত বিদেশেও। আমরা জানি না, কে এগুলি রচনা করেছিলেন। কারো কারো বিশ্বাস, গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীধর স্বামী তিন-চারশ বছর আগে এগুলি রচনা করেছিলেন। শ্লোকগুলিতে গীতা, মহাভারতের রচয়িতা ব্যাসদেব এবং শ্রীকৃষ্ণের উল্লেখ রয়েছে।

প্রথমেই রয়েছে গীতা সম্বন্ধে একটি উক্তি ঃ

"ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ম্
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যেমহাভারতম্।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনীম্
অম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্।।"

—হে জননী ভগবদ্গীতা, আপনার মাধ্যমে স্বয়ং ভগবান নারায়ণ কর্তৃক পার্থ (অর্জুন) উপদিষ্ট হয়েছিলেন; আপনি প্রাচীন মহর্ষি ব্যাসদেব কর্তৃক মহাভারতে গ্রথিতা, অষ্টাদশ অধ্যায়রূপিণী, অদ্বৈততত্ত্বরূপ অমৃতবর্ষিণী ও সংসারনাশিনী ভগবতী; আমি আপনার ধ্যান করি।

এই প্রথম শ্লোকে গীতাকে 'জননী' বলে সম্বোধন করা হলো। মহাত্মা গান্ধী বলেছেন ঃ "গীতা আমার মায়ের স্থান গ্রহণ করেছে। অল্পবয়সে আমি মাকে হারিয়েছিলাম, কিন্তু জীবনে কখনো মায়ের অভাব বুঝিনি, কারণ গীতা আমার সঙ্গে ছিল।" ধ্যানের দ্বিতীয় শ্লোকটি হলো ঃ

"নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ।।"

—হে ব্যাসদেব, আপনার চোখদুটি প্রস্ফুটিত পদ্মপত্রের মতো বিশাল, আপনি মহাভারতরূপ তৈলে পূর্ণ জ্ঞানময় প্রদীপ প্রজ্বলিত করেছেন; বিশালবুদ্ধি আপনাকে প্রণাম করি।

"প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ।।"

—শরণাগতের কল্পবৃক্ষতুল্য, গোচালনার জন্য একহাতে বেত ও লাগামধারী, গীতারূপ অমৃতদোহনকারী ও (দক্ষিণ হস্তে) জ্ঞানমুদ্রাযুক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি।

জ্ঞানমুদ্রার তাৎপর্য

উল্লিখিত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনায় তাঁর (ডান) হাত জ্ঞানমুদ্রায় স্থিত—এইরকম উল্লেখ রয়েছে। ভারতীয় বৈদান্তিক দর্শন ও আধ্যাত্মিকতায় এটি একটি লক্ষণীয় ধারণা তথা বিশেষত্ব। সেখানে এই মুদ্রার সুগভীর তাৎপর্য আছে বলে মনে করা হয়। এই মুদ্রায় ডান হাতের বুড়ো আঙুলটি তর্জনীর মুখোমুখি চেপে অন্য আঙুলগুলিকে বাইরের দিকে টান করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আমাদের দেহভঙ্গিমা ও মানসগঠনের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আছে; মন যেমন,



জ্ঞানমুদ্রা

দেহ তেমনটি হয়। আপনি যে-ভঙ্গিতে শুয়ে আছেন, তা দেখলে আপনার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। আপনি বিশেষ একটি ভঙ্গিতে বসুন; দেখবেন সেই অবস্থায় আপনার মানসিকতাও বিশেষ এক রূপে প্রকাশ পাবে। ধরুন, কেউ বসে বসে একনাগাড়ে পা নাচাচ্ছেন—তার মানে তাঁর মন একটা অস্থির, এলোমেলো অবস্থায় রয়েছে। এইসব ব্যাপারে আমাদের দেহ আমাদের মনের প্রভাবকেই প্রকাশ

করে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানমুদ্রা হলো কোন গভীর মানসিক অভিব্যক্তির গুরুত্বপূর্ণ বাহ্য প্রকাশ বা চিহ্ন। নামেই প্রকাশ—মুদ্রাটি জ্ঞানের প্রতীক। 'জ্ঞান' বলতে সর্বপ্রকার জ্ঞানকেই বোঝায়; সাধারণ বা লৌকিক[১] জ্ঞান থেকে আরম্ভ করে উচ্চতম আধ্যাত্মিক জ্ঞান পর্যন্ত। ভারতবর্ষে আমরা কখনো লৌকিক জ্ঞান এবং পবিত্র জ্ঞানের মধ্যে বড়রকমের কোন তফাত করিনি। আমাদের কাছে সব জ্ঞানই পবিত্র। মনে রাখবেন, জ্ঞানের কেবল একজনই দেবী আছেন—সরস্বতী—যিনি সকল জ্ঞান ও কলাকৌশলের অধিষ্ঠাত্রী। ভারতীয় ঐতিহ্যের এক অতিসমৃদ্ধ দিক হলো সকল জ্ঞানের ঐক্যভাবনা। চর্চার সুবিধার জন্য জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বা কেন্দ্র সৃষ্টি করা যেতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা জ্ঞানের এই ঐক্যভাবনাকে ভেঙে ফেললে চলবে না। ভারতের এ-ই হলো শিক্ষা। তাই আমাদের ভাব এই যে, জীবনে যেসব বস্তুর অন্বেষণ করা প্রয়োজন, তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলো জ্ঞান—"বিদ্যাধনং সর্বধনপ্রধানম্"—সকল ধনের সেরা বিদ্যাধন। পৃথিবীতে জ্ঞানের তুল্য পবিত্রকারী আর কিছুই নেই, বলছে গীতা ঃ "ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।" (৪।৩৮) এটি আবার আমাদের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের (মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়) প্রাতিষ্ঠানিক আদর্শ বা motto-ও বটে।

একজন মানুষ এই কারণেই মানুষ যে, তার জ্ঞান-অনুসন্ধানের জৈব ক্ষমতা আছে। জন্তু-জানোয়ার কিন্তু জ্ঞানের সন্ধান করতে পারে না। তাদের ভিতরে থাকে কেবল প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার একটা যন্ত্র এবং তাদের জিনেটিক ব্যবস্থাই তাদের সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষকে কিন্তু স্থাপন করা হয়েছে জ্ঞান-জগৎ অনুসন্ধানের রাজপথে। জ্ঞানের সে-জগৎ হতে পারে লৌকিক কিংবা আধ্যাত্মিক। অবশ্য ভারতবর্ষে আমাদের কাছে সব জ্ঞানই পবিত্র। লৌকিক চর্চা দিয়ে আমরা আরম্ভ করি এবং সে-চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাই লোকোত্তর আধ্যাত্মিক সন্ধান ও সাধনায়।

এখন কথা হলো, কিভাবে এই জ্ঞান-অনুসন্ধানকে বিশিষ্ট একটি ভঙ্গিমায় প্রকাশ করা যাবে? আমাদের প্রাচীন ঋষিরা আবিষ্কার করেছিলেন অসাধারণ এই 'মুদ্রা'টিকে, যার মধ্য দিয়ে জ্ঞানানুসন্ধানের স্বরূপটি তার সার্বিক ব্যঞ্জনায় অভিব্যক্ত হতে পারে। ব্যাপারটি অনবদ্য। আগে আমি বিষয়টি নিয়ে ভেবেছি, অবাক হয়েছি। পরবর্তী কালে, কয়েক বছর আগে জীববিজ্ঞান, স্নায়ুবিদ্যা ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বিষয় পড়তে গিয়ে দারুণ একটা সত্যের সন্ধান পেলাম। সেটি এই যে, জীবজগতে মানুষ ছাড়া অন্য কোন প্রাণী তার তর্জনীকে (অর্থাৎ বুড়ো আঙুলের পাশের আঙুলটিকে) বুড়ো আঙুলের মুখোমুখি চেপে ধরতে পারে না; এমনকি শিম্পাঞ্জিও নয়। পারে একমাত্র মানবশিশু। হল্যান্ডে থাকাকালে শিম্পাঞ্জির আচারব্যবহার নিয়ে একটা ছবি দেখেছিলাম। তাতে দেখাচ্ছে, একটা শিম্পাঞ্জি হাতের তালু ও আঙুলগুলোর সাহায্যে গাছের একটা ডালকে ধরে মাটিতে ঠুকে ঠুকে শত্রু তাড়াচ্ছে। কিন্তু ডালটাকে ঐভাবে ধরলে সে-মুষ্টিতে কোন জোর থাকে না। ডালটির ব্যবহারে ততক্ষণ কোন শক্তিসঞ্চার করা যায় না—যতক্ষণ না বুড়ো আঙুলটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারে আনা যায়। মানুষ ছাড়া অন্য সমস্ত প্রাণীতে দেখা যায়, বুড়ো আঙুল জানে না কিভাবে অন্য সব আঙুলের, বিশেষ করে তর্জনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে হয়।

বিবর্তনের ধারায় মানুষই হলো সেই প্রাণী, যে সর্বপ্রথম শিখল কী করে বুড়ো আঙুলকে তর্জনীর বিপরীতে স্থাপন করতে হয়। সেটিই হলো সূত্রপাত। সূত্রপাত মানুষের প্রযুক্তি-ক্ষমতার; যন্ত্রপাতির ব্যবহার-কুশলতার, চারপাশের জগৎকে ব্যবহার করতে পারার এবং জ্ঞান অর্জন করতে পারার সক্ষমতার। মানুষ তার এই প্রাথমিক দৈহিক ক্ষমতার সহায়ে প্রবেশ করল 'জ্ঞান'-এর জগতে। এই কারণেই তর্জনীর বিপরীতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে স্থাপন করাটা হলো মানুষের জ্ঞানানুসন্ধানের এক মস্ত বড় প্রতীক; তা সে-জ্ঞান একেবারে সাধারণ থেকে অতি অসাধারণ—যা-ই হোক না কেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটিকে আমার সম্পূর্ণরূপে যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে। এটাও লক্ষ্য করলাম যে, এই দুটি আঙুলকে ঠিকভাবে চালানোর জন্য মস্তিষ্কে যতগুলি কোষের প্রয়োজন হয় তা-ও সর্বোচ্চ সংখ্যক, অর্থাৎ অন্য সব আঙুলের তুলনায় বেশি। বুড়ো আঙুল কেটে ফেলা হলে স্বাভাবিকভাবেই হাতের কর্মদক্ষতা কমে যাবে। মহাভারতে আমরা ধনুর্বিদ্যার আচার্য দ্রোণের কথা পড়ি, যিনি একলব্যকে আদেশ করেছিলেন নিজের বুড়ো আঙুলটি কেটে তাঁকে গুরুদক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করতে, যাতে সে কোনদিন তাঁর প্রিয় শিষ্য অর্জুনের সঙ্গে সফলভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না পারে। একলব্য, যিনি দ্রোণকে নিজের আচার্যের মতো সম্মান করতেন, সে-আদেশের প্রতিপালনও করেছিলেন। শোনা যায়, ভারতের ইংরেজ শাসকেরা ঢাকার তাঁতশিল্পীদের বুড়ো আঙুল কেটে দিয়েছিল, যাতে তারা তাদের নিজস্ব অতি সূক্ষ্ম ঢাকাই মসলিন তৈরি করে ল্যাঙ্কাশায়ারের তাঁতিদের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারে।

---

১ মূল ইংরেজী শব্দটি হলো 'secular'—অর্থাৎ এমন কিছু, যার সঙ্গে আপাতভাবে ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার কোন সম্পর্ক নেই। লক্ষণীয় যে, বর্তমান আলোচনায় পরবর্তী প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ মহারাজজী ঐ ধারণার সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে বলেছেন যে, 'secular' ও 'spiritual' (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক) -এর মধ্যে ঐরকম কোন বিভেদ-কল্পনা ভিত্তিহীন। 'Secular'-এর নিকট-প্রতিশব্দ হিসাবে বর্তমান অনুবাদে 'লৌকিক' শব্দটি ব্যবহৃত হলো।
—অনুবাদক

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের গুরুত্ব এবং তাকে তর্জনীর বিপরীতে স্থাপন করতে পারার সক্ষমতা অর্জন হলো জ্ঞানের উদ্দেশে মানুষের অভিযাত্রার সূচনাকাল; তা সে-জ্ঞান লৌকিক বা আধ্যাত্মিক যা-ই হোক না কেন। জ্ঞানের ক্ষেত্রে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই—সব জ্ঞানই পবিত্র। সরস্বতীপূজার দিন জ্ঞানের সর্বপ্রকার 'যন্ত্র' দেবীর সম্মুখে স্থাপন করা হয়। ছোটবেলায় আমি প্রত্যেক বছর বাড়ির সরস্বতীপূজায় অংশগ্রহণ করতাম। দেখতাম, সূত্রধরের যন্ত্রপাতি, চিকিৎসকের ডাক্তারি সাজসরঞ্জাম এবং সর্বপ্রকার পবিত্র গ্রন্থ সরস্বতীর সামনে স্থাপন করা হতো। সরস্বতীর অপর নাম 'বাণী'। সকল জ্ঞানের অন্তর্নিহিত যে-ঐক্য, তার প্রতীক তিনি। অসামান্য, অনাড়ম্বর এই দেবী মানব-মনে বিপুল প্রেরণার সঞ্চার করেন। যতদিন পর্যন্ত আমরা নিষ্ঠা-ভরে সরস্বতীর পূজা করেছি, ততদিন আমাদের দেশ জ্ঞানের সাধনায় ব্যাপৃত ছিল। কিন্তু যেদিন আমরা সরস্বতীকে ছেড়ে লক্ষ্মীর পিছনে ছুটেছি, সেদিন থেকে লক্ষ্মী-সরস্বতী দুজনেই অন্তর্ধান করেছেন; ঐশ্বর্য ও জ্ঞান দুই-ই চলে গেছে ভারত থেকে। আজ আমাদের এই দুই দেবীকেই ভারতভূমিতে ফিরিয়ে আনতে হবে; প্রথমে সরস্বতীকে ও তারপর লক্ষ্মীকে। লক্ষ্মী হলেন সরস্বতীরই ফল-পরিণাম।

জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাবে, ততই বেশি সম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। জ্ঞানের দ্বারা উজ্জীবিত সুদক্ষ কর্ম-সম্পাদন ছাড়া সম্পদলাভের আর কোন পথ নেই। যাদু দিয়ে বা কোনরকম রহস্য করে সম্পদ সৃষ্টি করা যায় না। সেই শিক্ষা আজ আমাদের পেতে হবে। সরস্বতী হলেন প্রথম; লক্ষ্মী তাঁরই by-product। ভারত থেকে দারিদ্র্য দূর করার জন্য এই জ্ঞান আমাদের আনতেই হবে। বিশুদ্ধ বিজ্ঞান হলো সরস্বতী এবং ফলিত বা প্রায়োগিক বিজ্ঞান হলো লক্ষ্মী। জ্ঞানকে যখন কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, তখন তাতে দেশের সম্পদ উন্নত হয়; শিল্পও বাড়ে। সর্বত্রই এই দুই অনাড়ম্বর দেবীর অধিষ্ঠান; তবে ভারতবর্ষে আমাদের নতুন করে শিক্ষালাভ করতে হবে, কিভাবে তাঁদের যথার্থ উপাসনা করা যায় সেবিষয়ে। কেবল আরতি করলেই তাঁদের পূজা করা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে হয়, নানা বইপত্র পড়তে হয়, নিজের মনে চিন্তাভাবনা করতে হয়—তবে সরস্বতীর শিষ্য হওয়া যায়। আর কঠোর পরিশ্রম, দলবদ্ধ কর্ম, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা—এইভাবে আমাদের লক্ষ্মীর উপাসনা করতে হবে। বছরে একবার আমরা আরতি করতে পারি, কিন্তু প্রত্যেক দিন কেবল এইরকম কঠোর শ্রমের মধ্য দিয়ে আমাদের লক্ষ্মীপূজা করতে হবে। কেবল তবেই আমরা লক্ষ্মীর 'কটাক্ষ' বা কৃপাদৃষ্টি লাভ করতে পারব।

অতএব বর্তমান যুগের আদর্শটি হলো 'জ্ঞান' এবং প্রত্যেককে সেই জ্ঞানপথের পথিক হতে হবে। প্রকৃতি মানুষকে তার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি আপন তর্জনীর বিপরীতে স্থাপনের ক্ষমতাদান করেছে, যাতে সে তার চারপাশের জগৎকে ব্যবহার করে জ্ঞান ও শক্তি অর্জন করতে পারে। মানব-বিবর্তনের এ-ই হলো সূচনা। শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনায় তাই এই অসাধারণ উক্তিটি রয়েছেঃ "জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায়"। ভারতে সব মহান সাধুসন্ত, অবতার ও দেবীমাতৃকার মূর্তিতে—বস্তুত, আমাদের সমগ্র পটশিল্পে—জ্ঞানমুদ্রার এই বিশেষ ভঙ্গিটি লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত শিবকে দক্ষিণামূর্তিরূপে প্রকাশের সময় এটি দেখা যায়। এই জ্ঞানমুদ্রার দ্বারা তিনি তাঁর চতুষ্পার্শ্বে সমাগত শিষ্যদের মনের সংশয় দূর করতে সমর্থ। এই ঐতিহ্য আমাদের মধ্যে চলে এসেছে অতি প্রাচীন কাল থেকে এবং আমাদের উচিত এই ঐতিহ্যের সারসত্যটিকে নিজেদের ক্ষেত্রে বর্তমান কালের সমস্যার সমাধানে প্রয়োগ করা। সমগ্র দেশকে তার মনপ্রাণ নিবেদন করতেই হবে জ্ঞানের স্বার্থে, জ্ঞানান্বেষণের আদর্শে। [ক্রমশ]

অনুষ্ঠান-সূচী (চৈত্র ১৪০৭)

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

জন্মতিথি-কৃত্য

শ্রীরামনবমী	চৈত্র শুক্লা নবমী	১৯ চৈত্র	সোমবার	২ এপ্রিল	২০০১

পূজাতিথি-কৃত্য

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাপূজা	চৈত্র শুক্লা অষ্টমী	১৮ চৈত্র	রবিবার	১ এপ্রিল	২০০১

একাদশী-তিথি (রামনাম-সঙ্কীর্তন)

৬, ২১ চৈত্র	মঙ্গলবার, বুধবার	২০ মার্চ,	৪ এপ্রিল	২০০১

অবতার শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের তাৎপর্য

স্বামী ভূতেশানন্দ



ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের যত রকমের বিভ্রান্তি আছে, এত বোধহয় অন্য কিছুতে নেই। কারণ, অন্য বিষয়গুলি আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করি, পরখ করে দেখে নিতে পারি। কিন্তু ধর্ম ইন্দ্রিয়ের অতীত, ফলে অনুভবগম্য হয় না। কাজেই যে-বিষয়টি আমরা অনুভব করতে পারিনি, কল্পনার সাহায্যে যখন তাকে ভাবি—কল্পনা তার ডানা বিস্তার করে যেন শূন্যে উড়তে থাকে। তার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয় না। তাছাড়া এক একজনের ধারণা এক একরকম হওয়ায় কোন্ ধারণা ঠিক তা বুঝতে পারি না। ধর্ম যেমন ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষগম্য নয়, ধর্মগ্রন্থ পড়েও তেমনি তা বোঝা যায় না। কারণ, বিভিন্ন ব্যক্তির বুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন রকম, তাতে বস্তু ভিন্ন ভিন্ন রকমে প্রতীত হয়। তাই ধর্ম সম্বন্ধে এত বিভ্রান্তি। "ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্" —ধর্মের তত্ত্ব গহ্বরে নিহিত হয়ে আছে, আমরা তাকে ধারণা করতে পারি না। যদি শাস্ত্রের সাহায্যে জানতে চাই, সে-শাস্ত্রের ব্যাখ্যাও কত রকম! তার ফলে শাস্ত্রও নিঃসন্দিগ্ধভাবে তত্ত্বকে সামনে ধরতে পারে না। তাই সেই প্রাচীন কালের কথা আজও সত্য—"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ঃ বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।/ ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতো স পন্থাঃ।।" (মহাভারত, বনপর্ব, ২৬৭।৮৪) অর্থাৎ বেদ ভিন্ন ভিন্ন, স্মৃতি—যার দ্বারা আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হবে, তাও ভিন্ন ভিন্ন। এমন ব্যক্তি নেই যার মত ভিন্ন নয়। বাঙলায় আছে —"নানা মুনির নানা মত"। কাজেই ধর্মের তত্ত্ব অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে, তাকে আমরা জানতে পারি না।

তাহলে উপায় কি? উত্তরে যুধিষ্ঠির বলছেনঃ "মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ।" অসাধারণ লোকোত্তর পুরুষরা যে-পথ দিয়ে যান সেই পথই হলো আসল পথ। কিন্তু মহাজন যে-পথে যান বলছি, তা মহাজন কে সেটা কি করে স্থির করব? এক একজন এক একরকম বলেন। কাকে মহাজন বলব, আর কাকে অভাজন বলব তাও বুঝতে পারি না। কাজেই সংশয় দূর হয় না। শুধু তাই নয়, শাস্ত্র বলছেন—যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই তত্ত্বকে অনুভব বা সাক্ষাৎকার করা হয়, কিংবা পারিভাষিক ভাষায় যাকে বলে 'অপরোক্ষ' করা হয়, ততক্ষণ সংশয় থাকে। অর্থাৎ যেমন প্রত্যক্ষ জিনিস দেখলে মন নিঃসন্দিগ্ধ হয়, সেইরকম যদি প্রত্যক্ষের মতো ধর্মের তত্ত্ব স্পষ্ট দেখা যায়, তবে সন্দেহ দূর হয়। শাস্ত্রের এই সিদ্ধান্ত।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"
(মুণ্ডক উপনিষদ্, ২।২।৮)

—সেই পরম তত্ত্ব, যা সূক্ষ্ম বা তারও অতীত, সেই কার্যকারণরূপ পরমেশ্বরকে যদি প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহলে আমাদের হৃদয়ের সমস্ত গ্রন্থি অর্থাৎ বাসনা দূর হয়ে যায়, সমস্ত সংশয় নাশ হয়ে যায়। যাবতীয় কর্ম অর্থাৎ যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আমরা জন্ম থেকে জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি—সেই কর্ম সব ক্ষয় হয়ে যায়।

সেই পরম তত্ত্বকে আমরা দেখব কি করে? বুঝলাম, পরম তত্ত্বকে জানলে সব সন্দেহ মিটে যায়। তাকে জানবার উপায় সম্পর্কে শাস্ত্র নির্দেশও দেন, মহাজনরাও বলেন। তবু সন্দেহ থেকেই যায়। কারণ, অনুভূতি না হওয়া পর্যন্ত সন্দেহ যায় না। সুতরাং সেই অনুভূতির পথ যাঁরা বলে দেন—তাঁদের অনুসরণ করতে হয়। আবার সেসম্বন্ধেও মতভেদ রয়েছে। এই বিবাদ-বিসংবাদের মধ্যে পড়ে আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। কারণ, কোনটাই সিদ্ধান্ত বলে ধরতে পারছি না।

একজন খুব বড় পণ্ডিত ছিলেন, তিনি সুবক্তাও। তাঁর বক্তৃতায় সকলে আকৃষ্ট হতো। একদিন তিনি বলছেনঃ আমি ধর্মবক্তা হিসাবে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছি; অনেকেই আমার প্রশংসা করে বলে, আমি সুন্দর ভাষণ দিই। কিন্তু আমার নিজের সন্দেহ জাগে কেন? কারণ, অনুভূতি নেই। যতই পাণ্ডিত্য দেখাই বা শাস্ত্রচর্চা করি না কেন, অনুভূতি না থাকলে সন্দেহ যায় না। আমি বলি, লোকে বুঝুক আর না বুঝুক, বলে 'বাঃ, ইনি বেশ বলেন'! কিন্তু তাতে বক্তা এবং শ্রোতা কারও লাভ হয় না। কারণ, এটা শুধু শোনার বিষয় নয়। বলা হচ্ছে,

তত্ত্ব অনেকেই শোনেন, অনেকে শুনতেও পান না। যাঁরা শোনেন, তাঁদের ভিতরেও অনেকে বুঝতে পারেন না। যাঁরা বোঝেন, তাঁদের কদাচিৎ কেউ তত্ত্বকে আস্বাদন করে ধন্য হন। এই হলো ধর্ম সম্বন্ধে এক দারুণ কুহেলিকা।

এখন, এই সন্দেহ-সাগরে ভাসতে ভাসতে কোথায় গিয়ে পৌঁছাব জানি না। আমাদের এই হাবুডুবু খাওয়া অবস্থা দেখে, আমাদের সন্দেহ থেকে উদ্ধার করবার জন্য পরমেশ্বর কখনো কখনো দেহধারণ করে আবির্ভূত হন। তখন তাঁর বাণী, তাঁর ভাষার এত শক্তি যে, আমাদের সকল সন্দেহের নিরসন হয়। কিন্তু যুগের পর যুগ কেটে গেলে আবার নানা সংশয় মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে। এইজন্য ভগবানকে বারবার এসে আমাদের থেই ধরিয়ে দিতে হয়। যাকে বলে—হাতেনাতে বুঝিয়ে দেওয়া, তিনি সেইভাবে বুঝিয়ে দেন, দৃষ্টিকে মোহমুক্ত করে দেন। তাঁর কৃপা থাকলে তবে তত্ত্বজ্ঞান হয়।

শাস্ত্র বলছেন, গুরুবাক্যে বিশ্বাস রাখতে হবে। কিন্তু কাকে 'গুরু' বলে ধরব? আর ভগবান যদি আদৌ থাকেন, তবে তো ধরতে পারব। এই অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা, 'আমি সব বুঝি'—এই পাণ্ডিত্যাভিমানের কারণে সিদ্ধান্ত পরিষ্কার হয় না। অবতার এসে সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদের হাত থেকে আমাদের মুক্ত করে সত্যকে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। তখন অন্তত যাঁদের মন অপেক্ষাকৃত শুদ্ধ, তাঁরা সত্যের সন্ধান পান। এই সত্যের প্রবাহ, এই সিদ্ধান্তের ধারা—সেই অবতারপুরুষ থেকে আরম্ভ করে দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে। মানুষ এর থেকেই আলোকের সন্ধান পায়। মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কাছে তা প্রকাশিত হয়ে ক্রমশ বিস্তারলাভ করে। এইভাবেই বারেবারে ম্লান হয়ে আসা জ্ঞানের জ্যোতি আবার উদ্ভাসিত হয়েছে, জগৎকে আলোকিত করেছে। তিনি এলে তন্দ্রাচ্ছন্ন মানুষের একটু ঘুম ভাঙে। বিরল কয়েকজনের স্পষ্ট অনুভব হয়, তাঁরা মুক্ত হন। আবার জাগতিক নিয়মেই সবাই ঝিমিয়ে পড়ে। কাজেই ভগবানকে বারেবারে আসতে হয়।

ভাগবত বলেছেন : "অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ" (১।৩। ২৬)—অবতার অসংখ্য। অনন্তকাল ধরে অসংখ্যবার তিনি দেহধারণ করে আসেন। মানুষের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন কি তার লক্ষ্য, কোন্ পথে চললে সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবে। তাতে আমাদের একটু তন্দ্রা ভাঙে। ধর্মজগতের ইতিহাস এইভাবেই গড়ে উঠেছে। আমাদের মনে হবে, ভগবানের এ কী অদ্ভুত লীলা! কারণ, তাঁর লীলা বোঝা যায় না। প্রকৃতির ধারা এইভাবে চলতেই থাকবে।

কিছুকাল আগে অবতাররূপে শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁর আগমনের ঠিক পূর্ববর্তী অবস্থা একটুখানি যদি ভাবি, তাহলে বোঝা যাবে মানুষ কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিল। তখন নানান রকমের ধর্মের সংঘাত এসেছে। বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিসংবাদ ভারতবর্ষকে যেন কুরুক্ষেত্রে পরিণত করেছে। ফলে আমাদের সমস্ত জীবন সর্বক্ষেত্রে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমরা একেবারে দিশাহারা হয়ে গেছি। ঠিক তখনি দিশারিরূপে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। তিনি এলেন এটা বোঝাবার জন্য যে, ধর্ম অনুভবের বিষয়। আর অনুভব করবার পথ হচ্ছে আন্তরিক আগ্রহ, ব্যাকুলতা। লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্য অন্তরের ব্যাকুলতা থাকলে লক্ষ্য একদিন না একদিন স্পষ্ট হবেই। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবন ও সাধনা দিয়ে তাই দেখালেন। আশৈশব ভগবদ্-অনুভবের জন্য তাঁর তীব্র আকাঙ্ক্ষা। কোন অনুষ্ঠান বা নিয়ম-কানুনের ভিতর দিয়ে তিনি চলেননি। সাধনার শুরুতে নিজের ইচ্ছামত যা মনে উঠেছে করেছেন। সম্বল একটিই ছিল—ভগবানকে প্রত্যক্ষ করার জন্য আন্তরিক আগ্রহ, ব্যাকুলতা। শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা নয়—এই চোখে তাঁকে দেখতে হবে, এই মন দিয়ে জানতে হবে, এই বুদ্ধি দিয়ে অনুভব করতে হবে। প্রবল এই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তিনি সাধনা করেছেন। কিন্তু কোন নিয়মিত সাধনার আগেই তাঁর দিব্যদর্শন হলো। দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে জ্যোতির সমুদ্ররূপে ঈশ্বরকে অনুভব করলেন। বলছেন : "সেই জ্যোতি জড় জ্যোতি নয়, চৈতন্যময়।" তাঁর অনুভবকে তিনি ব্যাখ্যা করে বলতে চেষ্টা করেননি। বলছেন : "এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃসমুদ্র! যেদিকে যতদূর দেখি, চারিদিক হইতে তাহার উজ্জ্বল উর্মিমালা তর্জন-গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপর নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া দিল! হাঁপাইয়া হাবুডুবু খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম!" ('লীলাপ্রসঙ্গ', সাধকভাব, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃঃ ৬৬) এই যে আবরণের পর আবরণ উন্মোচিত হলো, তাতে তাঁর দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল।

আগেই বলেছি, একে কোন বিশেষ সাধনার পরিণাম বলা যায় না। সাধনা আরম্ভ হলো পরে। কেন পরে আরম্ভ করলেন, এখন আমাদের ভাববার বিষয়। তিনি তত্ত্বকে অনুভব করার জন্য আসেননি, তত্ত্ব তাঁর সহজাত। শৈশবেই কতবার তাঁর সমাধির অনুভূতি হয়েছে। কিন্তু তবু সাধনা কেন? না, বিভ্রান্ত জগৎকে দেখাবার জন্য যে কিভাবে তত্ত্বে পৌঁছাতে হয়। তারপর বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রেরিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রসম্মত সাধনা আরম্ভ করলেন। একের পর এক অনুভব হতে লাগল। ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁকে চৌষট্টিখানি তন্ত্রের সাধনা করিয়েছেন। এতগুলি কেন?

যেকোন একটি পথের অনুসরণেই জীবনে সার্থকতা এসে যায়। কিন্তু তিনি জগতের সকলের কাছে তত্ত্ব প্রকাশ করবার জন্য এসেছেন, তাই বিভিন্ন পথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় দরকার। সন্দেহ, অবিশ্বাস নিরসনের জন্য তাঁকে এত প্রকারের কঠোর সাধনা করে দেখাতে হলো। তারপর বেদান্তের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, সমস্ত জগতের যে এক ব্রহ্মে পরিসমাপ্তি—তা দেখলেন।

তারপরে ভগবানের লীলাও তিনি নানাভাবে আস্বাদন করলেন। কোন অবতার এইরকম সাধনা করেছেন বলে শাস্ত্রে উল্লেখ নেই। শাস্ত্র অবতারদের লীলার কথা বলছেন, কিন্তু তাঁদের সাধনার কথা বিশেষ কিছু বলেননি। দু-এক জায়গায় যা উল্লেখ আছে, সেগুলি সাধারণ মানুষের প্রায় দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কারণ, মানুষ যাঁকে 'অবতার' বলে, 'ভগবান' বলে বিশ্বাস করে, তিনি আবার কার সাধনা, কার উপাসনা করবেন? যদিও শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের দিনচর্যার উল্লেখ আছে। প্রাতঃস্নান করে তিনি ব্রহ্মধ্যান করতেন। লোকে বিস্মিত হবে, ব্রহ্ম আবার ব্রহ্মধ্যান করছেন? কিন্তু না করলে যে তাঁর অবতার হয়ে আসার সার্থকতা থাকে না। তিনি যদি করে না দেখান, তাহলে সাধারণ মানুষ কি করে বিশ্বাস করবে? ভগবান সর্বত্র বিদ্যমান জেনেও মন কি তাঁর নাগাল পায়? পায় না। এইজন্য তাঁকে মানবদেহধারী হয়ে এসে সত্যের দরজা খুলে দিতে হয়। না হলে মানুষ তাঁকে ধরতে পারে না। এই কারণে বারবার তিনি এসেছেন।

ইদানীংকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে তাঁর আবির্ভাব বলে তাঁর সাধনপথগুলির বিবরণ এত পরিষ্কারভাবে জানতে পারছি। এতে তত্ত্বকে বোঝার খুব সুবিধা হয়েছে। তার চেয়ে বড় কথা, তাঁর সমস্ত জীবন যেন শাস্ত্রের সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। তাঁর জীবনের ভিতর দিয়ে দেখলে তবে শাস্ত্রের মর্মকথা বোঝা যায়। নচেৎ শাস্ত্র আমাদের বিভ্রান্ত করে। যেমন, নানা পুরাণে নানা রকমের গল্প, কতরকমের কথা রয়েছে। দেবতাদের মধ্যে কলহ-বিবাদ, কেউ হেরে যাচ্ছেন, কেউ জিতে যাচ্ছেন! এইসব নানা রকমের গল্প। এগুলি তত্ত্বকে জানিয়ে তো দেয়ই না, বরং বিভ্রান্তিকে বাড়িয়ে দেয়। আমরা ভাবি—কোন্ দেবতা বড়? ইন্দ্রকে 'দেবরাজ' বলা হয়। পুরাণ তাঁকে বিপর্যস্ত করে ছেড়েছে। বিষ্ণু, শক্তি বা শিব—প্রত্যেকের সম্বন্ধে আলাদা আলাদা বহু পুরাণ আছে। যে-পুরাণে যে-দেবতার কথা আছে, তাতে তাঁকে শ্রেষ্ঠ বলেছে। কাজেই বিবাদের শেষ নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি গল্প বলতেন। পদ্মলোচন বড় পণ্ডিত, বর্ধমানের রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। সেই সভায় একদিন পণ্ডিতদের তর্ক হচ্ছে—শিব বড়, না বিষ্ণু বড়। কোন মীমাংসা হচ্ছে না। তখন পদ্মলোচনের কাছে গিয়ে পণ্ডিতেরা উপস্থিত হয়ে বললেন ঃ "আপনি এর সিদ্ধান্ত করে দিন।" পদ্মলোচন শুধু পণ্ডিত নন, সাধক ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এইজন্য তাঁর খুব প্রশংসা করতেন। পদ্মলোচন বললেন ঃ "আমার চৌদ্দপুরুষে কেউ শিবকেও কখনো দেখেনি, বিষ্ণুকেও কখনো দেখেনি; অতএব কে বড় কে ছোট, তা কেমন করে বলব? তবে শাস্ত্রের কথা শুনতে চাও তো এই বলতে হয় যে, শৈবশাস্ত্রে শিবকে বড় করেছে ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে বিষ্ণুকে বাড়িয়েছে।" (ঐ, গুরুভাব, দ্বিতীয়ার্ধ, ২য় অধ্যায়, পৃঃ ৫০) শক্তিতন্ত্রে শক্তিকে বড় করেছে। অন্য সিদ্ধান্ত কিছু নেই। পণ্ডিতেরা শান্ত হলেন কিনা জানি না, অন্তত বোঝা গেল—শাস্ত্র দিয়েও সিদ্ধান্ত করা গেল না। তত্ত্ব কি, তার চাবিকাঠি যে অন্য জায়গায় আছে—সেটা আমরা বুঝি না।

বেদের সারতত্ত্ব উপনিষদে আছে। একজায়গায় তর্ক হচ্ছে—কয়টি দেবতা? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিচ্ছেন ঃ তিন শত তিন ও তিন হাজার তিন। বাঙলায় বলে—তেত্রিশ কোটি দেবতা। অর্থাৎ অনন্ত, অসংখ্য দেবতা। যাজ্ঞবল্ক্যকে আবার প্রশ্ন করা হচ্ছে—কটি দেবতা? তিনি বললেন ঃ তেত্রিশ। হঠাৎ এতগুলি দেবতা কোথায় মিলিয়ে গেলেন যে, তেত্রিশটি দেবতাতে ঠেকল? এরকম করে কমতে কমতে ছয়টি, তিনটি, দুটি, দেড়টি, শেষকালে একটি। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৩।৯।১) এর তাৎপর্য কি?—তিনি এক, তাঁর বিভূতি অসংখ্য, প্রকাশ বিভিন্ন রকম। এক-একটি শক্তির প্রকাশকে আমরা বলি এক-একটি দেবতা। এরকম অসংখ্য দেবতা। এই দেবতাদের মধ্যে উচ্চ-নীচ, অল্প শক্তিশালী, অধিক শক্তিশালী—এইসব হিসেব করতে গেলে খেই হারিয়ে যায়, আমরা একেবারে অতল গহ্বরে পড়ে যাই। তবে একটি কথা যদি বুঝতে পারি, তাহলে ঠিক সমাধান হয়। তা হলো, পুরাণেও যেমন বলা হয়েছে যে, এই সমস্ত দেবতা তাঁরই বিভূতি, বিভিন্ন প্রকাশ। অতগুলি পুরাণের তাৎপর্য এইখানে। পুরাণ শুধু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তা নয়, তার পারে যাওয়ার হদিশও দেয়। সব দেবতা একটি দেবতারই বিভিন্ন প্রকাশ। সেই দেবতা কে? তিনি তোমারই মধ্যে রয়েছেন। অন্তর্যামিরূপে তিনি চালাচ্ছেন। তিনি সকলেরই অন্তর্যামী।

উপনিষদে 'অন্তর্যামী ব্রাহ্মণ' নামে একটি অংশে এই কথাটি বোঝানো হয়েছে। "যঃ সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্বাণি ভূতানি ন বিদুর্যস্য সর্বাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়তি।" (ঐ, ৩।৭।১৫)—ইনি সর্বভূতে অধিষ্ঠিত আছেন, সর্বভূত থেকে তিনি পৃথক। তিনি তাতে সীমিত নন এবং 'সর্বাণি ভূতানি নঃ বিদুঃ'—মানুষ প্রভৃতি জীবরা তাঁকে জানে না। 'যস্য সর্বাণি ভূতানি শরীরম্'—সমস্ত ভূতবর্গ যাঁর দেহ,

যাঁকে আশ্রয় করে তারা রয়েছে। 'যঃ সর্বাণি ভূতানি অন্তরো যময়তি'—সকল ভূতের অন্তরে থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণ করছেন, তিনিই সেই অমরণধর্মী পরমেশ্বর। আর তিনি তোমারও অন্তরাত্মা। তিনি অমৃতস্বরূপ, অমরণধর্মী। এইভাবে তাঁকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এখন, আমরা এটি ভুলে গিয়ে পুরাণের তেত্রিশ কোটি দেবতা নিয়ে বিবাদ করছি। বিবাদ-বিসংবাদ থেকে উদ্ধার করবার জন্য ইদানীংকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে তাঁর আবির্ভাব। তিনি দেখালেন সেই এক তিনি, বিভিন্ন রূপে তাঁকেই আমরা দেখছি। ঠাকুর বলছেন, যেমন বালিশগুলো ভিন্ন আকারের, কিন্তু ভিতরে একই তুলো। জগৎটা বিচিত্র দেখাচ্ছে, কিন্তু ভিতরে সেই এক তত্ত্ব। বলছেন ঃ "যেমন মোমের গাছ—ডাল, পালা, ফল, সব মোমের।" ('কথামৃত', ৪।৮।৪) এক মোমরূপ তত্ত্ব দিয়ে সমস্ত জগৎ গঠিত। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬।৮।৭) উপনিষদে বলছেন—এইসমস্ত জগৎ তাঁরই স্বরূপ। শাস্ত্র, উপনিষদের কথা আমরা বুঝতে পারি না। তাই ঠাকুর বলছেন, সমস্ত প্রাণীতে সেই এক তিনিই বিরাজ করছেন। এ আমাদের ভাষায় বলা, আমরা বুঝতে পারি এমন দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা।

শ্রীরামকৃষ্ণ যেন এই ধর্মবিরোধ মেটাবার জন্য দেহধারণ করে এসেছেন। আর এই বিরোধ মিটলে জীবনের সর্বপ্রকার বিরোধ যে মিটে যাচ্ছে তা একটু বিচার করলে বুঝতে পারা যায়। সর্বভূতে তাঁকেই যখন ভাবতে পারি, তখন আর পরস্পরের সঙ্গে কলহ-বিরোধ কি করে সম্ভব? আমি কি আমার নিজের সঙ্গে লড়াই করি? নিজের কোন ক্ষতি করতে পারি? এই বিশ্বে সকলের ভিতরে তিনি রয়েছেন। যত মানুষ, তারা আমারই অংশ, আমারই স্বরূপ। সুতরাং সেখানে আর বিরোধ চলে না, সকল বিরোধের মীমাংসা হয়ে যায়। এই সিদ্ধান্ত যে কি করে ব্যবহারিক জগতে কাজে লাগাতে পারব তা বিচার করে দেখতে হবে। আন্তরিকভাবে এই সিদ্ধান্তকে যদি আমরা জীবনে প্রয়োগ করতে পারি, তাহলে সব সমস্যার নিঃশেষে সম্পূর্ণ সমাধান হবে।

এই সমস্যার সমাধানের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে যে তাঁর আবির্ভাব—একথা তখনি ঠিক ঠিক বুঝতে পারব। তখন আমাদের জীবনেও সার্থকতা আসবে। সর্বভূতে তাঁকে দেখে আমাদের সমস্ত অসম্পূর্ণতা দূর হবে, সব দ্বন্দ্ব মিটে যাবে। জীবনকে সার্থক করতে পারব। এই বিষয়টিকে ধারণা করতে চেষ্টা করতে হবে। 'শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি করি' বললেই হবে না, তাঁর সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করে তা জীবনে কাজে লাগাতে হবে। তিনি সর্বভূতে রয়েছেন তা জানতে হবে এবং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাঁকে জীবনের কেন্দ্রে রেখে সেইমতো আচরণ করতে হবে। ঠাকুরের কথায়—"একহাতে ভগবানকে ধরে আরেক হাতে সংসার কর।" সংসার ত্যাগ করে চলে গেলেই শান্তি, তা নয়। সংসার আমাদের ভিতরে রয়েছে। সেই সংসারকে শান্ত করতে হলে ভগবানকে ধরে থাকতে হবে, তাছাড়া অন্য উপায় নেই। তাঁকে ধরে থাকলে নিশ্চিন্ত। মরবার, পড়বার ভয় নেই। খেলার সময় খুঁটি ধরে ঘুরলে ছেলেরা পড়ে না। জাঁতায় কড়াই পিষবার সময় মাঝখানে, জাঁতার নায়ের কাছে যেগুলো থাকে—সেগুলো পেষা যায় না। তাঁকে না ধরে থাকলে সব পিষে যাব, রক্ষা পাওয়ার আর কোন উপায় নেই। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন ঃ "আমি ভগবান বৈ আর কিছু জানি না।" অর্থাৎ তোমরাও এমনভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ কর যেন ঈশ্বর বৈ আর কিছু না জান। তাঁকে অন্তরে গ্রহণ কর, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। আর যত তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকবে, তত এই সংসার-জাঁতায় নিষ্পেষিত হয়ে যেতে হবে। একথা তিনি পরিষ্কার করে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। তাঁর জীবন দিয়ে বোঝালেন, বাণী দিয়ে বোঝালেন। শুধু তাই নয়, তাঁর একদল পরিকরকে তৈরি করে গেলেন, যাঁরা এই বাণী জীবনে বহন করে সর্বত্র নিয়ে যাবেন, সমগ্র জগতের দরজায় দরজায় পৌঁছে দেবেন।

এইজন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং তাঁর লীলা সমগ্র জগতে বিস্তৃত হচ্ছে, চারিদিকে ছড়াচ্ছে। আমরা যদি কেবল একটু চোখ খুলি, একটু হৃদয়-কপাট উন্মুক্ত করে রাখি, তাহলে আমাদের ভিতরেও সেই আলোক এসে পৌঁছাবে। আমরাও বুঝতে পারব যে, আমাদের জীবনকে সার্থক করবার জন্য কিভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং পূর্ণ হয়েও অপূর্ণ মানবদেহ ধরে আমাদের জন্য অশেষ কষ্টবরণ করেছেন। তাঁর সে আসা সার্থক হবে যখন জীবনে তাঁকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারব এবং তাঁর আলোকে সমস্ত জীবন আলোকিত করে তাঁর প্রদর্শিত পথে চলতে পারব। অবতার যখন আসেন, সকলের কল্যাণের জন্য আসেন। এই কল্যাণময় স্বরূপকে তিনি নিয়ে আসেন একটি দেহের ভিতর দিয়ে। সেই দেহটি যেন পরমেশ্বরের মঙ্গলকারিণী শক্তির একটি ঘনীভূত মূর্তি। তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আমাদের সকলের ওপরে তাঁর আশীর্বাদ বর্ষণ করেন, যাতে আমরা তাঁর স্বরূপ ধারণা করতে পেরে, তাঁর প্রদর্শিত পথে চলে আমাদের জীবনকে সার্থক করতে পারি।* ❑

* পূজ্যপাদ মহারাজজীর সচিব স্বামী নিত্যমুক্তানন্দের সূত্রে এই ভাষণটি পাওয়া গিয়েছে। ভাষণটির স্থান ও তারিখ জানা যায়নি।
—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

'কথামৃত'র বাইরে 'কথামৃত'র 'উত্তর বিভাগ'

শ্রীম

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-র বাইরে শ্রীম-কথিত আরো কিছু শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। অধুনালুপ্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক পত্র 'নব্যভারত'-এর ২২শ খণ্ডের ২য় ও ৩য় সংখ্যার (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩১১ যুগ্মসংখ্যার) ১২২-১৩১ পৃষ্ঠায় তা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ ১৬.৮.১৮৮৬ কাশীপুর উদ্যানবাটীতে মহাসমাধিতে নরলীলা সংবরণ করেন। সেইসময় যেসকল যুবক তাঁর সেবায় নিরত ছিলেন, তাঁরা অবর্ণনীয় শোকে মুহ্যমান হন। শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর সেইসব ত্যাগী যুবক ভক্তগণের খোঁজ নিতেন এবং তাঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশতেন। তখনকার ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ বিবরণ শ্রীম তাঁর তদানীন্তন দিনলিপিতে রক্ষা করতেন। সেই সময়কার মাত্র তেরদিনের দিনলিপি অবলম্বনে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'র 'উত্তর বিভাগ' তৎকালীন একাধিক সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আবার শ্রীম যখন পুস্তকাকারে 'কথামৃত' প্রকাশ করেন, তখন তা থেকে মাত্র নয়দিনের বিবরণ 'কথামৃত'-এর ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ ভাগে স্থান পায়। অবশিষ্ট চারদিনের বিবরণ 'কথামৃত'-এ অগ্রথিত থেকে যায়। হয়তো ঐগুলিকে তিনি 'কথামৃত'-এর ৫ম ভাগে গ্রথিত করতেন। কিন্তু ৫ম ভাগ প্রকাশের পূর্বেই তাঁর দেহত্যাগ হয়। ৫ম ভাগ যখন যন্ত্রস্থ, তখন তিনি কেবল কয়েক ফর্মা প্রুফ দেখে যেতে পেরেছিলেন।

প্রসঙ্গত, বৈরাগ্য ও সাধন অবস্থায় নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর গুরুভাইদের প্রথম আশ্রয়স্থল ছিল বরাহনগরের প্রামাণিক ঘাট রোডে মুনশিদের পোড়ো বাড়ি—যার স্থিতিকাল অক্টোবর ১৮৮৬ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৮৯২ পর্যন্ত।

'কথামৃত'-এ যে নয়দিনের দিনলিপি প্রকাশিত হয়েছিল, তা নিম্নরূপ ঃ—

ভাগ	প্রথম প্রকাশ	গ্রথিত দিনলিপি
১ম	১৯০২	১০.৫.১৮৮৭, ৯.৫.১৮৮৭
২য়	১৯০৪	৮.৫.১৮৮৭, ৭.৫.১৮৮৭
৩য়	১৯০৮	৯.৪.১৮৮৭, ৮.৪.১৮৮৭, ২৫.৩.১৮৮৭
৪র্থ	১৯১০	২২.২.১৮৮৭, ২১.২.১৮৮৭

কিন্তু 'কথামৃত'-এর ৫ম ভাগের পরিশিষ্টে বরাহনগর মঠের কোন দিনলিপির বিবরণ নেই। মনে হয়, শ্রীম-র অবর্তমান হেতু ১৭.২.১৮৮৭, [১২.]১০.১৮৮৬, ২.৯.১৮৮৬ এবং ২৫.৮.১৮৮৬ তারিখের দিনলিপিগুলির সন্ধান না পাওয়ায় ৫ম ভাগে গ্রথিত হয়নি। নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর গুরুভাইদের বৈরাগ্য ও সাধনাবস্থার কথা শ্রীম শেষেরটি আগে এবং আগেরটি পরে উপহার দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের স্বধামে গমনের পর তাঁর ত্যাগী যুবক ভক্তগোষ্ঠীর অবর্ণনীয় শোকগাথা এগুলিতে পাই। দ্বিতীয়ত, এতে পাই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ—বরাহনগর মঠে ত্যাগী যুবক ভক্তবৃন্দের জীবনচর্যার কথা। তৃতীয়ত, ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১২ অক্টোবর বরাহনগর মঠ প্রবর্তনের প্রথম বিবরণও এতে পাই। বাঙলা তারিখ ছিল ২৭ আশ্বিন ১২৯৩, মঙ্গলবার। সেদিন ছিল কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা।

১২ অক্টোবর ১৮৮৬-এর বিবরণ 'উদ্বোধন'-এর গত কার্তিক ১৪০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭ তারিখের বিবরণ 'নব্যভারত'-এর ২২শ খণ্ডের ২য় ও ৩য় সংখ্যার (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩১১ যুগ্মসংখ্যার) ১২৭-১৩১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেখান থেকে বিবরণটি এই সংখ্যায় উপস্থাপিত হলো। এই দুইদিনের বিবরণ বরাহনগর মঠ পর্বের। বাকি দুদিনের বিবরণ প্রাক্-বরাহনগর মঠ পর্বের। ঐ দুদিনের বিবরণও ভবিষ্যতে 'উদ্বোধন'-পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করার বাসনা রইল। 'নব্যভারত' পত্রিকা থেকে 'কথামৃত'র উত্তর বিভাগ'-এর বিবরণগুলি সংগ্রহ করেছেন সন্তোষকুমার দত্ত।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

শ্রীম-কথিত

উত্তর বিভাগ—দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র ও গীতোক্ত কর্ম

বরাহনগরের মঠ। আজ শুক্রবার ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭। বেলা প্রায় ১২।। টা হইবে। নরেন্দ্র ও অন্যান্য মঠের ভাইরা আছেন। হরমোহন ও মাস্টার আসিয়াছেন। শশী ঠাকুরসেবা লইয়া আছেন।

নরেন্দ্র গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন।

নরেন্দ্র। গীতাতে জপতপাদির কথাই বলেছেন।

মণি। কেন? তাহলে অর্জুনকে উপদেশ দেওয়া কেন?

নরেন্দ্র। সংসারের কর্ম বলে নাই।

মণি। অর্জুনকে যে কালে যুদ্ধ করতে বলা হলো, আর অর্জুন যে কালে সংসারে ছিলেন, তা হলে সংসারের কর্ম অনাসক্ত হয়ে করতে বলা হয়েছে।

নরেন্দ্র কর্ম সম্বন্ধে তাঁহার এই মত পরে পরিবর্তন করিয়াছিলেন। আমেরিকাতে যে কর্মযোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাতে সংসারের কর্ম অনাসক্ত হইয়া করিতে বলিয়াছেন। যখন প্রথম সন্ন্যাস করেন, তখন সংসারের কর্ম সম্বন্ধে যারপরনাই বীতরাগ হইয়াছিলেন। তাই গীতার উদ্দেশ্য জপতপাদি কর্ম বলিয়াছিলেন।

একটি গৃহস্থ ভক্ত একজন মঠের ভাইয়ের সহিত কথা কহিতেছেন। তাঁর ইচ্ছা মঠে থেকে যান। মঠের বিশুদ্ধ ভাব দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছেন, সংসার আর ভাল লাগে না। তাঁহারা রান্নাঘরের দক্ষিণের বারান্দায় বসিয়া কথা কহিতেছেন। এদিকে নিরঞ্জন রান্নাঘরে আছেন।

গৃহস্থ ভক্ত। যদি মঠে থেকে যাই তাহলে পরিবারদের maintenance-এর জন্য কি নালিশ চলে?

মঠের ভাই। না, তা কেন চলিবে? সে আপনি যদি চাকরী করেন, তাহলে চলতে পারে।

নিরঞ্জন (রান্নাঘর হইতে)। ওরে ছোঁড়া, কি কচ্ছিস? কি মন্ত্রণা দিচ্ছিস? কি করিস? (সকলের হাস্য)

নরেন্দ্র গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। কালী তপস্বীও গঙ্গাস্নান করিয়া আসিলেন। কালী[১] তখন সর্বদা বেদান্ত বিচার করেন। তখন তাঁহার 'আমি ভক্ত তুমি ভগবান' এ-ভাব নাই। সর্বদা বিচার করেন 'আমি' সেই; আমার নাম-রূপ নাই। তাই স্নানের পর ঘরে আসিয়া বেদান্তবাক্য উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

"নামরূপব্যতীতমব্যয়ম্। অহম্ অহম্।
নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং তুভ্যং মহ্যং নমো নমঃ।।"

ভক্তেরা প্রসাদ পাইতে বসিবেন।

মঠে কেবল একটি পাচক ব্রাহ্মণ আছেন। চাকর নাই; আহারান্তে প্রত্যেকে উচ্ছিষ্ট পত্র হাতে করিয়া ফেলিয়া দিলেন। মাস্টারের উচ্ছিষ্ট পত্র নরেন্দ্র হাতে করিয়া ফেলিয়া দিলেন। মাস্টার অনেক আপত্তি করিলেন। নরেন্দ্র বলিলেন ঃ "এখানে republic।"

দানাদের ঘরে (বৈঠকখানায়) ভক্তেরা বসিয়াছেন। পান ও তামাক খাইতেছেন।

রাখাল (শ্রীম-র প্রতি)। আপনার কাছে একদিন যাব। পরমহংস মহাশয়ের বিষয় কি লিখেছেন, শুনতে যাব।

শ্রীম। সে মনে করেছি জীবন না বদলালে কারুকে বলব না। তাঁর কথা মন্ত্রের স্বরূপ—জীবনে করতে চেষ্টা করা ভাল নয় কি?

রাখাল। তা বটে। আচ্ছা আপনার সংসার কেমন লাগে?

শশী। ওরে, রাখাল lecture দিচ্ছে।

রাখাল (সহাস্যে শ্রীম-র প্রতি)। এখানে আমার আগে আসতে ইচ্ছা যায় নাই। এখন দেখছি এদের সঙ্গ বড় ভাল।[২]

এইবার নরেন্দ্র তামাক খাইতে খাইতে কথা কহিতেছেন।

নরেন্দ্র। কোন্ মানুষের ভিতর পদার্থ আছে? সব হেয়—একজন ছাড়া। আর সব পা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে ঘৃণা হয়। নিজের শক্তি কার আছে? সব অবস্থার অধীন। অবস্থার দাস।

"তবে একথা বলছি যে আমারই মতো সকলেই দাস—sport of circumstances।"

রাখাল হাসিতে হাসিতে ফিসফিস করিয়া হরমোহনকে শিখাইয়া দিলেন, অমুক দাদা কিরকম জিজ্ঞাসা কর। হরমোহন নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অমুক দাদা কেমন?

নরেন্দ্র। তবে বলব কুত্তা—হেয়! যদি সাধু হবে, তবে টাকা রেখেছে কেন? সাধুর আবার টাকা কি?

একজন মঠের ভাই। সব্বাই কুত্তা, উনি একজন যা আছেন। উনি বোধ হয় mediator। (সকলের হাস্য)

নরেন্দ্র। তা বলছি। আমার মতো কুত্তা। যে circumstance (অবস্থা)-এর দাস, সে কুত্তা নয় তো কি? নিজের কিছু শক্তি আছে?

---

১ স্বামী অভেদানন্দ। এখন New York-এ আছেন।

২ শশী—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ Madras মঠের প্রধান। ইনি কলেজে B. A. পড়িয়াছিলেন।

মাস্টার (স্বগত)। Circumstance, না ঈশ্বর? ঠাকুর রামকৃষ্ণ কি বলতেন? 'রামের ইচ্ছা'।

নরেন্দ্র। টাকা যার রয়েছে সে আবার সাধু কি? তার উপর আবার lecture (লোককে শিক্ষা দেওয়া)? Preaching কিরে! লজ্জা করে না?

নরেন্দ্র ও বুদ্ধ

হরমোহন। আচ্ছা যদি কারুর ভাব কি সমাধি হয়, তাহলে সে তো মহৎ।

নরেন্দ্র। আরে বুদ্ধ পড় গিয়ে যা! গীতাই বল আর শঙ্করাচার্যই বল, শঙ্করের শেষ কথা নির্বিকল্প সমাধি বুদ্ধের প্রথম অবস্থা।

একজন ভক্ত। নির্বিকল্প সমাধি যদি প্রথম অবস্থা হয়, তাহলে ওর পরে সব stage তো আছে? দু-একটা বল না। অবশ্য বুদ্ধ তাহলে কিছু বলে গেছেন?

নরেন্দ্র। কি জানি।

ভক্ত। নির্বিকল্প সমাধি যদি বুদ্ধের প্রথম অবস্থা হয়, তাহলে 'অহিংসা পরম ধর্ম'—এ মত পরে রাখলেন কেন?

নরেন্দ্র। ওটা বোঝা যায় না। তবে বৈষ্ণবরা শিখেছে বুদ্ধের কাছে।

ভক্ত। বুদ্ধের কাছে অহিংসা শিখতে হবে, এমন কি কথা! এমন তো অনেক শোনা যায়, কারুর কাছে উপদেশ না পেয়েও লোক আপনা-আপনি মাছ ত্যাগ করেছে। তাই বৈষ্ণবরা যে বুদ্ধের কাছে শুনেই জীবহিংসা ত্যাগ করেছে, তা না হতে পারে।

নরেন্দ্র। যদি না শুনে না উপদেশ পেয়ে কেউ ত্যাগ করে, তবে বলতে হবে hereditary transmission—অর্থাৎ পিতা পিতামহের কাছ থেকে সেই সংস্কার লাভ করেছে।

ভক্ত। তা যদি বল তাহলে ইউরোপে অনেকে যে জীবহিংসা ত্যাগ করে, তার অর্থ কি? তারা তো গরুখেকো জাত। তারা তো আর বুদ্ধের কাছে শিখে নাই।

নরেন্দ্র। বুদ্ধ কিন্তু ঐটা discover করেছিলেন।

মাস্টার (স্বগত)। বাহ্! ভক্তেরা সকলেই এক এক জন বীর। Independent thinker শুধু নরেন্দ্র নয়! তা হবে না? কার শিষ্য! তিনি যে সকলকে হাতে গড়ে তয়ের করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র গীতা পড়িতেছেন ও ভাইদের বুঝাইয়া দিতেছেন। নিম্নলিখিত এই দুটি শ্লোক বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন ও ভক্তদের সহিত উহা সম্বন্ধে বিচার করিতে লাগিলেন।

১ম শ্লোক—"...কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে"। (গীতা, ৫।৭)

২য় শ্লোক—"ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু..."। (ঐ, ৫।৯)

গীতা কিয়ৎক্ষণ পাঠের পর বলিলেন, "আমি চললাম, তোমরা মাস্টার মশায়কে নিয়ে আনন্দ কর।" নরেন্দ্রর কিন্তু যাওয়া হইল না। বাবুরাম বলিলেন, "আমি অত গীতা ফিতা বুঝি না। গুরু মহারাজ বেশ বলেছেন 'ত্যাগী ত্যাগী'।"

শশী। ত্যাগী ত্যাগী মানে কি জানিস? আমি যেন কল, একটি যন্ত্র—এইটি মনে করে থাকা।

প্রসন্ন নির্জনে কালী তপস্বীর ঘরে গীতা পড়িতে চলিলেন। শরৎ সেই ঘরে নির্জনে ইংরাজী দর্শনশাস্ত্র পড়িতেছেন—Luwi's History of Philosophy। আরেকটি মঠের ভাই ঠাকুরের ঘরে ধ্যান করিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্র ও ঈশ্বরের রূপদর্শন

এইবার ঈশ্বরের রূপদর্শন সম্বন্ধে কথা হইতেছে।

নরেন্দ্র। ওসব ভুল।

রাখাল। কেন তোমারও তো হয়?

নরেন্দ্র। সেসব brain-এর বিকৃত অবস্থার দরুন হয়; যেমন hallucination। (সকলের ঈষৎ হাস্য)

মণি। তুমি যাই বল ভাই, তাঁর যেকালে রূপদর্শন হতো, সেকালে মস্তিষ্কের বিকার কেমন করে বলা যায়? শিবনাথ বলেছিল, বেহেড হয়, তখন ঠাকুর বলেছিলেন মনে আছে তো, "চৈতন্যকে চিন্তা করে কেউ কি অচৈতন্য হয়?"

***

নরেন্দ্রাদি মঠের ভাইরা পান খাবার ঘরে একত্রিত হইয়াছেন, কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া, কেহ পান খাইতেছেন, কেহ তামাক খাইতেছেন। বসন্তকাল—প্রকৃতি আনন্দময়ী। মঠের ভাইরাও যেন সদানন্দ পুরুষ। একে কৌমার বৈরাগ্য, তাহাতে অহর্নিশ ঈশ্বরচিন্তা, আবার সম্মুখে মহৎ আদর্শ শ্রীগুরুদেব ঠাকুর রামকৃষ্ণ। আনন্দে ভাইরা মাঝে মাঝে—

'বা গুরু জি কি ফতে'

অর্থাৎ 'শ্রীগুরুদেবের জয়' শিখ ভক্তদের এই মহামন্ত্র মাঝে মাঝে সমস্বরে ওঁকারের সহিত উচ্চারণ করিতেছেন। নরেন্দ্র তাঁহাদের এই জয়ধ্বনি শিখাইয়াছেন।

মাস্টার শরৎকে ধরিলেন। ঐ জয়ধ্বনি একক্রমে একশতবার বলিতে হইবে। তাঁহার শুনিয়া বড় আনন্দ হইয়াছে।

নরেন্দ্র। ফরমাশে কি ওসব হয়? নিজে ধরিয়ে দিতে হয়।

বলরাম তাঁহার বোসপাড়ার বাড়ি হইতে মিষ্টান্ন পাঠাইয়াছেন। কচুরীগুলি বড় উপাদেয় হইয়াছে। ভক্তেরা একসঙ্গে বসিয়া ঐসকল জলযোগ করিতেছেন। একজন ভক্ত বেশি খাবার চেষ্টা করিতেছেন।

নরেন্দ্র (ভক্তের প্রতি)। যা, শালা লোভী! বেশি খাবার চেষ্টা!

মঠে নরেন্দ্রাদি ভক্তদের ঠাকুরসেবা

সন্ধ্যা হইল। শশী ঠাকুরের ঘরে ধুনা দিলেন ও সুমধুর নাম করিতে করিতে ঠাকুর প্রণাম করিলেন। পরে যত ঘরে যত ঠাকুরদের পট ছিল, সম্মুখে আসিয়া নামোচ্চারণ করিয়া প্রণাম করিলেন ও ধুনা দিলেন। মধুর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—শ্রীগুরুদেবায় নমঃ; (কালিপটের কাছে আসিয়া) শ্রীকালিকায় নমঃ; (ষড়্‌ভুজ মহাপ্রভুর কাছে আসিয়া) শ্রীষড়্‌ভুজায় নমঃ; (রাধাকৃষ্ণের পটের কাছে আসিয়া) শ্রীরাধাবল্লভায় নমঃ; (নিত্যানন্দাদি ভক্তদের পটের কাছে আসিয়া) শ্রীঅদ্বৈতায় নমঃ, ভক্তেভ্য নমঃ; (যশোদার কাছে গোপাল—এই পটের কাছে আসিয়া) শ্রীগোপালায় নমঃ, শ্রীযশোদায়ৈ নমঃ; (বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম লক্ষ্মণ—এই পটের কাছে আসিয়া) শ্রীরাম লক্ষ্মণাভ্যাম্‌ নমঃ, শ্রীবিশ্বামিত্রায় নমঃ।

বুড়ো গোপাল আরতি করিতেছেন। ভক্তেরা সকলে আরতি দেখিতেছেন। দালানের ঘরে নরেন্দ্র, মাস্টার ইত্যাদি আছেন। মাস্টার বলিলেন, "নরেন্দ্রবাবু, এস আরতি দেখি গিয়ে।" নরেন্দ্র বলিলেন, "হাঁ চলুন।" নরেন্দ্রের কিন্তু কার্যগতিকে আরতি দেখিতে যাওয়া হইল না।

ভক্তেরা আরতি করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন—

জয় শিব ওঁকার
ভজ শিব ওঁকার

রাত্রে ভক্তেরা একসঙ্গে বসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতেছেন। প্রত্যেকে কয়েকখানা করিয়া আটার রুটি, একটা তরকারি ও একটু গুড় পাইয়াছেন। মাস্টারও সঙ্গে বসিয়া খাইতেছেন। বাবুরাম পরিবেশন করিতেছেন। মাস্টার নরেন্দ্রের পার্শ্বে বসিয়াছেন। তাঁহার পাতে দু-একখানা পোড়া রুটি পড়িয়াছে দেখিয়া নরেন্দ্র ভাল রুটি তুলিয়া তুলিয়া দিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রের সকল দিকে দৃষ্টি।

ভক্তেরা রাত্রে একসঙ্গে বসিয়া আছেন। মঠের একজন ভাই মাস্টারকে বলিতেছেন, "আজকাল মার গান বড় একটা হয় না। আপনি একটি গান না। [কমলাকান্ত রচিত] গুরু মহারাজের সেই গানটি—"

গান

কখন কি রঙ্গে থাক মা, শ্যামা সুধাতরঙ্গিনী।
তুমি রঙ্গে ভঙ্গে অপাঙ্গে অনঙ্গে ভঙ্গ দাও জননী।।
লম্ফে-ঝম্পে কম্পে ধরা, অসিধরা কপালিনী,
তুমি ত্রিগুণা ত্রিপুরা তারা ভয়ঙ্করা কালকামিনী।।
সাধকের বাঞ্ছা পূর্ণ কর নানা রূপধারিণী।
কভু কমলের কমলে থাক মা, পূর্ণব্রহ্মসনাতনী।।

রাখাল মাস্টারের সহিত গল্প করিতে করিতে বলিতেছেন, "কাশীতে এক একবার যাবার ইচ্ছা হয়। এক একবার একলা একলা বেড়াতে ইচ্ছা হয়।"

রাখালের গৃহে পিতা, পরিবার ও একটি ছেলে। সমস্ত ত্যাগ করে এসেছেন ভগবানের জন্য। এখন তাঁহার তীব্র বৈরাগ্য। মন সর্বদা ভগবানের জন্য ব্যাকুল। তাই একলা বেড়াতে ইচ্ছা হয়। ❑

ভ্রম-সংশোধন

গত কার্তিক ১৪০৭ সংখ্যার ৬৯০ পৃষ্ঠায় 'নতুন আবিষ্কার' বিভাগে **'কথামৃত'র বাইরে 'কথামৃত'র 'উত্তর বিভাগ'**-এর ৩য় পঙ্‌ক্তিতে **'১২৪-১২৭ পৃষ্ঠায়'**-এর পরিবর্তে **'১২২-১৩১ পৃষ্ঠায়'** হবে।

ফাল্গুন ১৩০৭/ফেব্রুয়ারি ১৯০১

পরমহংসদেবের উপদেশ

(স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রদত্ত)

১। আমি ছেলেদের এত ভালবাসি কেন জান? ছেলেবেলায় তাদের মন ষোল আনা নিজের কাছে থাকে, ক্রমে ভাগ হয়ে পড়ে। বে হলে আট আনা স্ত্রীর উপর যায়, ছেলে হলে আবার চার আনা তাদের প্রতি যায়, বাকী চার আনা মা, বাপ, মান সম্ভ্রম, বেশভূষা ইত্যাদিতে চলে যায়; এই জন্য ছেলেবেলায় যারা ঈশ্বরলাভের চেষ্টা করে, তারা সহজে তাঁকে লাভ করতে পারবে। বুড়োদের হওয়া বড় কঠিন।

২। যেমন টিয়া পাখির গলায় কাঁটি উঠলে আর পড়ে না, ছানাবেলায় শেখালে শীঘ্র পড়ে, তেমনি বুড়ো হলে সহজে ঈশ্বরে মন যায় না, ছেলেবেলায় তাদের মন অল্পেতেই স্থির হয়।

৩। যেমন কচি বাঁশ অতি সহজেই নোয়ান যায়, পাকা বাঁশ নোয়াতে গেলে ভেঙ্গে যায়, তেমনি ছেলেদের মন সহজে ঈশ্বরে নিয়ে যাওয়া যায়; কিন্তু বুড়োদের মন ঈশ্বরের দিকে টানতে গেলে ছেড়ে পালায়।

৪। এক সের দুধে এক ছটাক জল থাকলে, সহজে অল্প জ্বাল দিয়ে ক্ষীর করা যায়, কিন্তু এক সের দুধে তিন পোয়া জল থাকলে সহজে ক্ষীর হয় না, অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে জ্বাল দিতে হয়, তবে হয়; সেই রকম বালকের মনে বিষয়-বাসনা খুব কম, এইজন্য একটুতে ঈশ্বরের দিকে যায়, কিন্তু বুড়োদের মনে বিষয়-বাসনা গজ গজ করে, তাইতে তাদের মন সহজে তাঁর দিকে যায় না।

৫। মানুষের মন যেন সরষের পুঁটলি। সরষের পুঁটলি একবার ছড়িয়ে গেলে যেমন কুড়ান ভার হয়ে ওঠে, তেমনি মানুষের মন একবার সংসারে ছড়িয়ে গেলে, তখন স্থির করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। বালকের মন ছড়ায়নি, অল্পেতেই স্থির হয়, কিন্তু বুড়োদের ষোল আনা মন সংসারে ছড়িয়ে রয়েছে, সংসার থেকে মন তুলে ঈশ্বরে স্থির হওয়া বড় শক্ত।

পাঁচকথা

(সম্পাদক—স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ)

দেখ লিখবে, একটু তলিয়ে বুঝে সুঝে লিখো; সমালোচনা ক'রবে—খুব সমঝে ক'রো। সমালোচনা অতি পবিত্র জিনিষ। পবিত্র কাজ পবিত্র মনে, পবিত্র হাত দিয়ে ক'রবে। সমালোচনা, বিচার প্রভৃতি অতি পবিত্র হ'য়ে ক'রতে হয়; ঈশ্বরকে স্মরণ ক'রে ক'রতে হয়। দ্বেষ, হিংসাবশতঃ অমন ধারা কটু-কাটব্য বের ক'রতে নেই। ছি, ছি! ভদ্রলোকের ছেলে, লেখাপড়া শিখেছো—কোথায়, ধীর হবে, নম্র হবে, নিজের মর্য্যাদা রেখে কাজ করবে, পরের মান্য রেখে কথা কইবে, পরের যাতে মঙ্গল হয় তাই ক'রবে; তা না হয়ে, কার সঙ্গে লাগবো, কার ওপর পুরোণো রাগ ঝাড়বো, কার মন্দ ক'রবো, কোথায় দু'পয়সা পাব—পেয়ে দু'কলম লিখে কার সর্ব্বনাশ ক'রবো, এরূপ ক'রে বেড়ালে কি বাপু নিজের মঙ্গল হয়, না—দেশের হিত হয়? উচিত কথা ব'লবে—বল না, খুব ব'লবে বই কি; কিন্তু মিষ্টি করে ব'লবে,—যাতে কাজ হয়, যাতে ফল হয়, হিতে বিপরীত যাতে না হয়, দলাদলি যাতে না হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*

প্রথম পরিচ্ছেদ।

[নরেন্দ্র ও ভবনাথের মাষ্টারের সহিত মিলন।]

মাষ্টার তখন বরাহনগরে দিদির বাড়ীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করা অবধি সর্ব্বক্ষণ তাঁহারই চিন্তা করেন। সর্ব্বদাই যেন সেই আনন্দময় মূর্ত্তি দেখিতেছেন ও তাঁহার সেই অমৃতময়ী কথা শুনিতেছেন। ভাবিতে লাগিলেন, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিরূপে এই সব গভীর তত্ত্ব অনুসন্ধান করিলেন ও জানিলেন? আর এত সহজে এই সকল কথা বুঝাইতে মাষ্টার এ পর্য্যন্ত কাহাকেও কখনও দেখেন নাই। কখন তাঁহার কাছে যাইবেন ও আবার তাঁহাকে দর্শন করিবেন, এই কথা রাত্র দিন ভাবিতেছেন। দেখিতে দেখিতে রবিবার আসিয়া পড়িল। বরাহনগরের নেপালবাবুর সঙ্গে বেলা ৩টা ৪টার সময় দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আসিয়া পঁহুছিলেন। দেখিলেন, সেই পূর্ব্বপরিচিত ঘরের মধ্যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছোট তক্তপোষের উপর বসিয়া আছেন। ঘরে একঘর লোক। রবিবারে অবসর হইয়াছে, তাই ভক্তেরা দর্শন করিতে আসিয়াছেন। এখনও মাষ্টারের সঙ্গে কাহারও আলাপ হয় নাই। মাষ্টারও সভামধ্যে এক পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। দেখিলেন, ভক্তদের সঙ্গে সহাস্যবদনে ঠাকুর কথা কহিতেছেন।

একটি উনবিংশতিবর্ষবয়স্ক ছোকরাকে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁহার দিকে তাকাইয়া অনেক কথা যেন কত আনন্দিত হইয়া বলিতেছিলেন। ছেলেটির নাম নরেন্দ্র, কলেজে পড়েন ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করেন। কথাগুলি তেজঃপরিপূর্ণ; চক্ষু দুটি সাতিশয় উজ্জ্বল। ভক্তের চেহারা।

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (শ্রীম-কথিত) প্রথম ভাগ ছাপা হইতেছে।

প্রসঙ্গ ঃ "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

১

আধুনিক ভারতবর্ষে স্বামী বিবেকানন্দ সেবাধর্মের প্রবর্তক—এই প্রসিদ্ধি আছে। 'সেবাধর্ম' কথাটাকে বিশেষ অর্থে গ্রহণ করতে হবে, কেননা 'সেবা' বিভিন্ন ধর্ম বা সম্প্রদায়েরও কৃত্য। খ্রীস্টান মিশনারিদের সেবাকর্মের কথা সকলেরই জানা আছে। ব্রাহ্মসমাজ ও আর্যসমাজ তাঁদের বিকাশপর্বে সেবাকার্য করেছেন। ঐতিহাসিকভাবে বৌদ্ধরাই সেবাকর্মের প্রবর্তন করেন। বৈষ্ণব সমাজেও সেবাপ্রয়াস দেখা গেছে। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারীদের সাধনায় 'সেবা' সন্ন্যাসের অন্যতম আদর্শরূপে স্বীকৃত। ইদানীং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে হিন্দুসমাজের কোন কোন ধারার বা গোষ্ঠীর মধ্যেও সেবাপ্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে বিচার্য, স্বামীজীর সেবাধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্ম বা সম্প্রদায়ের সেবা-কার্যের পার্থক্য আছে কিনা, থাকলে তার প্রকৃতি কি?

প্রথমেই বলে নেওয়া উচিত—সেবা যখন কার্যরূপে উপস্থিত হয় তখন বিভিন্ন সম্প্রদায়কৃত সেবার বাইরের আকারগুলির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। পার্থক্য যদি থাকে তা প্রধানত উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেই। অর্থাৎ সেবা-রূপ কার্যের কারণের ক্ষেত্রেই পার্থক্য। সে-পার্থক্য কী?

এখানে অল্পাকারে বিষয়টি উত্থাপন করা যায়। বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সেবাধর্মের উৎস-বাণী শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবস্থ অবস্থার কিছু উচ্চারণ—একথা বহুকথিত। স্বামী সারদানন্দ-রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এর পঞ্চম খণ্ডের নবম অধ্যায়ে ('ঠাকুরের ভক্তসঙ্গ ও নরেন্দ্রনাথ') এবিষয়ে কিছু বিস্তারিত তথ্য আছে।

১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দের কোন সময়ে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তবৃন্দ-পরিবৃত অবস্থায় ধর্মপ্রসঙ্গ করছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বৈষ্ণবধর্মের প্রসঙ্গ উঠলে শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণভাবে ঐ মতের সারমর্ম বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন ঃ "তিনটি বিষয় পালন করিতে নিরন্তর যত্নবান থাকিতে ঐ মতে উপদেশ করে—নামে রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব-পূজন। যেই নাম সেই ঈশ্বর—নাম-নামী অভেদ জানিয়া সর্বদা অনুরাগের সহিত নাম করিবে; ভক্ত ও ভগবান, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব অভেদ জানিয়া সর্বদা সাধু-ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা, পূজা ও বন্দনা করিবে এবং কৃষ্ণেরই জগৎসংসার—একথা হৃদয়ে ধারণা করিয়া সর্বজীবে দয়া (প্রকাশ করিবে)।"

সাধারণ অবস্থার এই কথাবার্তার পরে শ্রীরামকৃষ্ণ মুহূর্তে অসাধারণ অবস্থায় চলে গিয়েছিলেন এবং উচ্চারিত হয়েছিল কিছু আশ্চর্য শব্দ যা নরেন্দ্রনাথের চিন্তাজগতে বিপ্লব ঘটিয়েছিল। স্বামী সারদানন্দ লিখেছেন ঃ

"'সর্বজীবে দয়া' পর্যন্ত বলিয়াই তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) সহসা সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। কতক্ষণ পরে অর্ধবাহ্যদশায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'জীবে দয়া—জীবে দয়া? দূর শালা। কীটাণুকীট তুই জীবকে দয়া করবি? দয়া করবার তুই কে? না না—জীবে দয়া নয়—শিবজ্ঞানে জীবসেবা'।"

শ্রোতাদের মধ্যে মাত্র একজনই ছিলেন, যিনি আলোককে আলোক বলে চিনতে পেরেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ "কী অদ্ভুত আলোকই আজ ঠাকুরের কথায় দেখিতে পাইলাম।"

কী আলোক নরেন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছিলেন, তা স্বামী সারদানন্দ নরেন্দ্রনাথের জবানিতে উপস্থিত করেছেন। প্রথমত, তিনি পেয়েছিলেন সংসারে বেদান্তকে কর্মপরিণত করার ইঙ্গিত। বেদান্ত-সাধনা শুষ্ক, কঠোর ও নির্মম বলে তদবধি কথিত। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ এক ঝলকে সেই ধারণার সীমাবন্ধন চূর্ণ করে দেন।

"অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করিতে হইলে (নরেন্দ্রনাথ বলে দিলেন) সংসার ও লোকসঙ্গ সর্বতোভাবে বর্জন করিয়া বনে যাইতে হইবে এবং ভক্তি, ভালবাসা প্রভৃতি কোমল ভাব-সমূহকে হৃদয় হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া চিরকালের মতো দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে—এই কথাই এতকাল শুনিয়া আসিয়াছি।... কিন্তু ঠাকুর আজ ভাবাবেশে যাহা বলিলেন, তাহাতে বুঝা গেল—বনের বেদান্তকে ঘরে আনা যায়, সংসারের সকল কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পারা যায়।"

জীবকে শিবজ্ঞান করার বিষয়টি স্বামীজী আরো ব্যাখ্যা করেন ঃ "মানব যাহা করিতেছে, সে-সকলই করুক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কেবল প্রাণের সহিত এই কথা সর্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা করিলেই হইল—ঈশ্বরই জীব ও জগৎ-রূপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রহিয়াছেন। জীবনের প্রতি মুহূর্তে সে যাহাদিগের সংস্পর্শে আসিতেছে, যাহাদিগকে ভাল-বাসিতেছে, যাহাদিগকে শ্রদ্ধা, সম্মান ও দয়া করিতেছে, তাহারা সকলেই তাঁহার অংশ—তিনি। সংসারের সকল ব্যক্তিকে যদি সে ঐরূপে শিবজ্ঞান করিতে পারে, তাহা হইলে আপনাকে বড় ভাবিয়া তাহাদিগের প্রতি রাগ, দ্বেষ, দম্ভ অথবা দয়া করিবার অবসর কোথায়? ঐরূপে 'শিবজ্ঞানে জীবের সেবা' করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইয়া সে স্বল্পকালের মধ্যে আপনাকেও চিদানন্দময় ঈশ্বরের অংশ, শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব বলিয়া ধারণা করিতে পারিবে।"

স্বামীজী বলেছিলেন, পূর্বোক্ত মনোভাবে সেবা করলে ভক্তিপথেও অগ্রসর হওয়া যায়, কেননা যথার্থ ভক্তিলাভের পক্ষে সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন প্রয়োজন এবং সেবাকালে জীবকে নারায়ণজ্ঞান করতে পারলে পরম ভক্তিলাভ সহজসাধ্য হয়ে উঠতে পারে। কর্মযোগ সম্বন্ধেও একই কথা। জীব কর্ম ছাড়া থাকতে পারে না, সেই কর্ম যদি শিবজ্ঞানে জীবসেবা হয়,

তাহলে কর্মযোগী সত্বর লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবেন। রাজযোগীও তন্নিষ্ঠ সেবার মধ্যে আত্মসমাহিত হওয়ার সহজ শক্তি অর্জন করবেন।

স্বামীজী সবশেষে ভাবোদ্দীপ্ত হয়ে বলেন : "ভগবান যদি কখনো দিন দেন তো আজি যাহা শুনিলাম, এই অদ্ভুত সত্য সংসারে সর্বত্র প্রচার করিব—পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলকে শুনাইয়া মোহিত করিব।"

শ্রীভগবান স্বামীজীকে 'দিন' দিয়েছিলেন কিংবা প্রচণ্ড আত্মশক্তিতে স্বামীজী ভগবানের কাছ থেকে সেই 'দিন' আদায় করে নিয়েছিলেন। তাঁর এক মুখ সহস্র মুখ হয়ে এই বার্তা ঘোষণা করেছে শঙ্খকণ্ঠে। ভারতীয় ধর্ম-দর্শনশাস্ত্রে তাঁর বিশেষ দানরূপে স্বীকৃত 'কর্মপরিণত বেদান্ত' ('Practical Vedanta') বিষয়ক ধারাবাহিক বক্তৃতাগুলির কথা এই সূত্রে স্মরণ করতে পারি। নিজ ভোগস্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট বৈদান্তিকরা পারমার্থিক ও ব্যবহারিকের মধ্যে যে ভেদরেখা টেনে রেখেছিলেন, স্বামীজী নিজ প্রতিভায় তা মুছে দিয়ে বেদান্তকে সর্বোচ্চ নীতিধর্ম ও কর্মপদ্ধতিরূপে উপস্থাপন করেন। এদেশীয় সমাজ-সংস্কারক এবং তাঁদের আদর্শ বিদেশীয় ধর্মধারিগণ বেদান্তকে জগৎ-বিমুখ বলে যে ধারাবাহিক প্রচার চালিয়ে গেছেন—তার বিরুদ্ধে স্বামীজী উপযুক্ত উত্তর দিয়েছেন এই বক্তৃতাবলীতে এবং প্রাসঙ্গিক নানা উক্তিতে। এইখানেই প্রমাণিত হয়েছে—ধর্ম কেবল উপাসনাগৃহে নয়—কলকারখানা, কৃষিক্ষেত্র, গৃহাঙ্গন-সহ সর্বত্র উপলব্ধির পথ-রূপে বর্তমান। প্রমাণিত হয়েছে, ঐহিক ও আধ্যাত্মিকে মূলগত পার্থক্য নেই। প্রমাণিত হয়েছে, 'জীবনই ধর্ম'—'Life is itself religion'—যেকথা ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর ইংরেজী রচনাবলীর ভূমিকায় অনবদ্য ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করেছেন। নিবেদিতা যে নিজের মতো করে স্বামীজীর ব্যাখ্যা করেননি (যেমন সমালোচনা কোথাও কোথাও শোনা যায়), তা দেখা যাবে 'প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত' সম্বন্ধীয় স্বামীজীর প্রথম বক্তৃতাটির (লন্ডনে প্রদত্ত, ১০ নভেম্বর ১৮৯৬) একেবারে প্রথম অনুচ্ছেদের কিছু অংশ পাঠ করলে : "If it be absolutely impracticable, no theory is of any value whatever, except an intellectual gymnastics. The Vedanta, therefore, as a religion, must be intensely practical. We must be able to carry it out in every part of our lives. And not only this, the fictitious differentiation between religion and the life of the world must vanish, for the Vedanta teaches oneness—one life throughout. The ideals of religion must cover the whole field of life, they must enter into all our thoughts, and more and more into practice."



ভাবস্থ অবস্থায় কথিত শ্রীরামকৃষ্ণের সেই অসামান্য উক্তি প্রসঙ্গে ফেরা যাক। আপাতভাবে মনে হবে, শ্রীরামকৃষ্ণ বৈষ্ণবদের 'জীবে দয়া' তত্ত্বটিকে ধিক্কার দিয়েছেন। এর ফলে নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবদের মনে আঘাত লাগতে পারে। দ্বিতীয়ত, শ্রীরামকৃষ্ণ সাধারণভাবে বৈষ্ণবদের পালনীয় আদর্শ বিষয়ে যে-কথা বলেছিলেন—নাম-নামী, ভক্ত-ভগবান, কৃষ্ণ-বৈষ্ণবকে অভেদ-জ্ঞান করে বৈষ্ণবরা ভক্তদিগকে শ্রদ্ধা-পূজা-বন্দনাদি করবেন—তাঁর সেই কথাগুলিও কি নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবদের কাছে গ্রাহ্য হবে? তাঁরা তো ভক্ত-ভগবানকে কদাপি অভেদজ্ঞান করতে প্রস্তুত নন।

তৃতীয়ত, শ্রীরামকৃষ্ণের একটি উক্তিতে অবশ্য আপত্তি উঠবে না বলেই মনে হয়। অনেক সময়ে দয়া করা হয় সামাজিক বা আর্থিক উচ্চাসনে বসে। সেখান থেকে কৃপাবর্ষণতুল্য দয়া ব্যাপারটি সঙ্গতভাবেই ধিক্কারযোগ্য—'তুই কীটাণুকীট' ইত্যাদি।

চতুর্থত, 'কথামৃত'-এর অন্যত্র দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ 'দয়া'-কে খুবই উচ্চাসনে দিয়েছেন। যথা—বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি। বিদ্যাসাগর যদিও ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল নন, কিন্তু দয়া করেন মানুষকে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন : "ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যেরূপ কাজ করছে, সে খুব ভাল। দয়া খুব ভাল। দয়া আর মায়া অনেক তফাত। দয়া ভাল, মায়া ভাল নয়। মায়া আত্মীয়ের ওপর ভালবাসা—স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগিনী, ভাইপো, ভাগনে, বাপ, মা—এদেরই ওপর। **দয়া সর্বভূতে সমান ভালবাসা।**" (স্থূলাক্ষর লেখক-কৃত)

শ্রীম যখন প্রশ্ন করেছিলেন : "আচ্ছা, দয়াও কি একটা বন্ধন?" তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তীক্ষ্ণভাবে বলেন : "সে অনেক দূরের কথা। দয়া সত্ত্বগুণ থেকে হয়। সত্ত্বগুণে পালন, রজোগুণে সৃষ্টি, তমোগুণে সংহার। কিন্তু ব্রহ্ম সত্ত্বরজস্তমঃ—তিন গুণের পার। প্রকৃতির পার।"[১] অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের ঠিক নিচের স্তরেই শ্রীরামকৃষ্ণ সত্ত্বগুণাত্মক দয়াকে স্থাপন করলেন।

এখানে 'দয়া' প্রসঙ্গে বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ কটাক্ষ করেছেন কিনা সেই সূত্রে বলে নেওয়া যায়, 'কথামৃত' অনুসারে শ্রীরামকৃষ্ণ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বরাবতার বলে বারবার ঘোষণা করেছেন, তিনি গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা থাকতেন, বৈষ্ণব-ভাবাশ্রিত ভক্তিযোগকে জ্ঞান বা কর্মযোগ অপেক্ষা গৃহীদের অবলম্বনীয় পন্থা বলে নির্দেশ করেছিলেন এবং তাঁর বৈষ্ণব-ভাবমগ্ন অবস্থার বর্ণনা 'কথামৃত'-এর বড় অংশ জুড়ে আছে।

১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম খণ্ড, উদ্বোধন সং, ১৪০২, পৃঃ ২৮২

তবু "শিবজ্ঞানে জীবসেবা" প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি থেকে বৈষ্ণববিরোধী ভাবের কথাটা যায় না। স্বয়ং স্বামীজী, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মগত উচ্চারণ থেকে ঐ মহাবাণী আহরণ করেছিলেন, তিনি একইসঙ্গে বুঝেছিলেন—এক্ষেত্রে বিতর্ক উঠতে পারে। তাই ব্যাপারটির মীমাংসা করেছেন একটি চিঠিতে, যাতে স্পষ্টভাবে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর মতবাদের উল্লেখ আছে। তাঁকে আরো সতর্ক হতে হয়েছিল এইজন্য যে, ভবিষ্যতে "শিবজ্ঞানে জীবসেবা" কথাগুলি ব্যবহৃত হতে হতে চলতি বুলি হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং অনেকের পক্ষেই সামান্য পরোপকার কর্ম করে "শিবজ্ঞানে জীবসেবা" করছি—এই আত্মপ্রসাদে বুঁদ হয়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। পৃথিবীতে বহু মহাবাণীর এই দুর্দশা ঘটেছে।

স্বামীজী আলমোড়া থেকে ৩ জুলাই ১৮৯৭ তারিখে 'শিষ্য' শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে সংস্কৃতে একটি চিঠি লেখেন, তার মধ্যে এই প্রসঙ্গটি আছে। তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত দয়া-তত্ত্বের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত সেবা/প্রেম-তত্ত্বের পার্থক্য বুঝিয়েছিলেন। সেই পত্রের কিছু অংশের বঙ্গানুবাদ এখানে উপস্থিত করা যেতে পারে ঃ

"সর্বেশ্বর যিনি, তিনি ব্যক্তিবিশেষ হইতে পারেন না, তিনি সকলের সমষ্টিস্বরূপ।... তিনি সমষ্টিরূপে সকলের প্রত্যক্ষ। অতএব যখন জীব ও ঈশ্বর স্বরূপত অভিন্ন, তখন জীবের সেবা ও ঈশ্বরে প্রেম—দুই একই। বিশেষ এই, জীবকে জীববুদ্ধিতে **যে সেবা করা হয় তাহা দয়া—প্রেম নহে; আর আত্মবুদ্ধিতে যে** জীবের সেবা করা হয় তাহা প্রেম। আত্মা যে সকলেরই প্রেমাস্পদ তাহা শ্রুতি, স্মৃতি, প্রত্যক্ষ—সর্বপ্রকার প্রমাণ দ্বারাই জানা যাইতেছে। **এইজন্যই ভগবান শ্রীচৈতন্য যে ঈশ্বরে প্রেম ও জীবে দয়া করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্ত। দ্বৈতবাদী ছিলেন বলিয়া তাঁহার এই সিদ্ধান্ত—যাহা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সূচনা করে, তাহা সমীচীনই হইয়াছে।** (স্থূলাক্ষর লেখক-কৃত) অদ্বৈতনিষ্ঠ আমাদের কিন্তু জীববুদ্ধি বন্ধনের কারণ। অতএব আমাদের অবলম্বন প্রেম—দয়া নহে। জীবে প্রযুক্ত 'দয়া' শব্দও আমাদের বোধহয় জোর করিয়া বলা মাত্র। আমরা দয়া করি না, সেবা করি। কাহাকেও দয়া করিতেছি, এ অনুভব আমাদের নাই। তৎপরিবর্তে আমরা সকলের মধ্যে প্রেমানুভূতি ও আত্মানুভব করিয়া থাকি।" (দ্রঃ পত্রাবলী, ৪র্থ সং, ১৯৭৭, পৃঃ ৫৬৪-৫৬৫) [ক্রমশ]



আবেদন ঃ রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম

অনেকেই জানেন যে, বিশ্ব জুড়ে রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের পথিকৃৎগণের পুণ্য স্মৃতিচিহ্নসমূহ সংরক্ষণের জন্য ১৯৯৪-এর ১৩ মে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দ্বাদশ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠে **'রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম'**-এর উদ্বোধন করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের ব্যবহৃত জিনিসপত্র, বস্ত্র, পাদুকা, পত্রাবলী, তাঁদের লিখিত বা পঠিত গ্রন্থ এই মিউজিয়ামে প্রদর্শিত হচ্ছে। একটি অত্যাধুনিক সংরক্ষণশালা এই মিউজিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সংগৃহীত প্রত্যেকটি জিনিসকে সংরক্ষণের জন্য সর্বাধুনিক সংরক্ষণ-প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। গত ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ বেলুড় মঠে আধুনিক প্রযুক্তিকৌশল-প্রকল্পিত একটি প্রশস্ত মিউজিয়াম ও সংগ্রহশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। এপর্যন্ত অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান তাঁদের নিকট রক্ষিত উপরি উল্লিখিত স্মৃতিচিহ্নাদি আমাদের অর্পণ করেছেন। আমরা পুনরায় ভক্তবৃন্দ, জনসাধারণ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট আবেদন জানাচ্ছি যে, উক্ত প্রকারের কোন স্মৃতিচিহ্ন তাঁদের নিকট থাকলে তাঁরা যেন সেইসব স্মৃতিচিহ্ন বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছিগণের নিকট অথবা দাতার পক্ষে যোগাযোগ করা সহজ বেলুড় মঠের এমন কোন শাখাকেন্দ্রে অর্পণ করেন। উল্লেখ্য যে, যদি এইসব স্মৃতিচিহ্ন বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংরক্ষণ করা না হয় তাহলে সেগুলি কালের করালগ্রাসে নিশ্চিতভাবে চিরকালের জন্য ধ্বংস হয়ে যাবে। এবিষয়ে দাতাগণের সহযোগিতা আমরা প্রার্থনা করি এবং সবিনয়ে জানাই যে, তাঁদের নিকট প্রাপ্ত বস্তু কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত হবে।

অধিকন্তু মিউজিয়ামে সংরক্ষণের জন্য একটি মাঝারি মাপের ঝাড়লণ্ঠন (chandeliers), কয়েকটি দেওয়ালগিরি ও অন্য দীপাধার আমরা সংগ্রহ করতে চাই। সহৃদয় ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দের সানুগ্রহ ও সক্রিয় সহযোগিতা পেলে আমাদের এই ইচ্ছাটি পূর্ণ হয়।

অনিবার্য কারণে ২০০০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে শ্রীমা সারদাদেবীর পুণ্য আবির্ভাবতিথিতে নতুন মিউজিয়াম ও সংগ্রহশালার দ্বারোদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়নি। আশা করা যাচ্ছে, ২০০১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসের মধ্যে নতুন মিউজিয়াম ও সংগ্রহশালাটি দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। কাজটি সম্পূর্ণ করতে এখনো ২৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। এবিষয়ে আপনাদের সকলের সহযোগিতা ও আনুকূল্য কামনা করি। মিউজিয়ামের নির্মাণকল্পে ভক্ত ও অনুরাগীদের যেকোন দান **'Ramakrishna Math'**-এর অনুকূলে চেক/ড্রাফট বা মানি অর্ডার মাধ্যমে **'রামকৃষ্ণ মিউজিয়াম-এর জন্য'** উল্লেখ করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠালে ধন্যবাদের সঙ্গে গৃহীত হবে।

স্বামী স্মরণানন্দ
সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ

বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১২০২

১৩ অক্টোবর ১৯৪০ বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ৩৯তম বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য এবং সমকালের প্রখ্যাত জাতীয় নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন দার্শনিক ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ। 'উদ্বোধন'-এর ৪২তম বর্ষের ১১শ সংখ্যার (অগ্রহায়ণ ১৩৪৭, নভেম্বর ১৯৪০) ৬৮৪-৬৮৫ পৃষ্ঠায় তাঁদের ভাষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং রামকৃষ্ণ মিশন

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

একসময় ছিল যখন পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ভারতবর্ষকে প্রায় বিপর্যস্ত করে ফেলছিল। তখন ভারতের বিভিন্ন অংশে অনেক বীরপুরুষের জন্ম হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। স্বামীজীর বাণী এখনো ভারতবাসীর অন্তরে ঝঙ্কার দিচ্ছে। তাঁর নির্ধারিত পথে ভারতের সম্পূর্ণ জাতীয় পুনরুত্থান সম্ভব। ভগবান বুদ্ধের উদার আদর্শসমূহের পূর্ণতা যেমন সম্রাট অশোকের প্রজারঞ্জনে সাফল্যলাভ করেছিল, তেমনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অধ্যাত্মভাবসমূহ স্বামী বিবেকানন্দের কর্মজীবনে আত্মপ্রকাশ করেছে। অশোকের শান্তিদূতগণের পশ্চাতে ছিল বিরাট রাজশক্তি, পরন্তু স্বামী বিবেকানন্দের প্রবর্তিত কর্মের পশ্চাতে ত্যাগ ও প্রেম ব্যতীত আর কোন সহায় ছিল না। আমাদের আধ্যাত্মিক মুক্তি রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ভারতবর্ষে উভয়ই একসঙ্গে অগ্রসর হয়। পাশ্চাত্য জগৎ পার্থিব সম্পদে বলীয়ান বটে, কিন্তু তাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টির একান্ত অভাব। তজ্জন্যই তারা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত। যতদিন না আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করতে পারব, ততদিন পাশ্চাত্য আমাদের অধ্যাত্মবাণী প্রচারে কর্ণপাত করবে না। অতীতে যে আমরা অধ্যাত্মবাণীর প্রচার-কার্যে সফল হইনি, আমাদের ক্ষাত্রতেজের অভাবই তার কারণ। সেইজন্যই আমরা প্রবঞ্চিত ও পরাধীন। অতএব আমাদের দরিদ্র ও অসহায়কে কেবলমাত্র সাহায্য করলেই চলবে না, পরন্তু তারা যাতে আত্মপ্রতারিত না হয়, সেজন্য তাদের হৃদয়ে আত্মবিশ্বাস উজ্জীবিত করতে হবে।

এই কাজটিই বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে করে চলেছে। অধিকন্তু ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে আরেকটি বিরাট কাজ করে যাচ্ছেন, তা হলো তাঁদের অসাম্প্রদায়িক আদর্শ এবং কর্মধারা। বাংলার বাইরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রামকৃষ্ণ মিশন তাঁদের সেবা এবং শিক্ষার কর্মসূচীকে প্রসারিত করেছেন এবং উল্লেখযোগ্য সাফল্যের সঙ্গে তা পরিচালনা করছেন। প্রাদেশিকতা এবং সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডিকে ভেঙে দিয়ে তাঁরা কাজ করে যাচ্ছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের এই অসাম্প্রদায়িক মনোভাব এবং সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার উর্ধ্বে অবস্থান দেখে আমাদের সাতিশয় আনন্দ ও গর্ব অনুভব হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রত

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

রামকৃষ্ণ মিশনের কার্যাবলী পৃথিবীময় প্রসারিত এবং সর্বক্ষেত্রে তার উপযোগিতা প্রমাণিত। একমাত্র রাজা অশোকের দাতব্য প্রতিষ্ঠান ব্যতীত কোন পুরাতন সভ্য যুগে রামকৃষ্ণ মিশনের মতো সঙ্ঘবদ্ধভাবে সেবাধর্মের অনুষ্ঠান হয়নি, এমনকি হিন্দু শাস্ত্রেও সেবাকার্যের এমন উচ্চ মর্যাদা দেখা যায় না। বর্ণাশ্রম ধর্ম ও মহাভারতের সাধারণ ধর্মসমূহের বিচারে আমরা বর্তমানে আপদ্ধর্ম পালন করছি। বর্তমান যুগে শাস্ত্রমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে সময়ের উপযোগী করে সমুদয় সাধারণ ধর্মের স্থানে সেবাধর্ম-মূলে আমাদিগকে শাস্ত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে হবে। রামকৃষ্ণ মিশন তা-ই সম্পাদন করছেন। তাঁদের সেবাধর্ম এবং তাঁদের ত্যাগ ও প্রেম মানবে মানবে ভেদ মুছে দিচ্ছে এবং উচ্চ-নীচ সকলকে পরস্পর প্রীতির দ্বারা তাঁরা নিকটতর করছেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা

প্রমথনাথ তর্কভূষণ

প্রায় তিরিশ বৎসর পূর্বে আমার প্রথম কাশীধাম দর্শনের সময় বারাণসী সেবাশ্রমের ক্ষুদ্র আরম্ভ এবং তার প্রথম উদ্যোক্তাগণের প্রেমপূর্ণ ব্যবহার দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল। হিন্দুরা যে সন্ন্যাসিগণকে নারায়ণ-জ্ঞানে শ্রদ্ধা করেন, সেই সন্ন্যাসিগণ এখানে দরিদ্র অসহায়গণকে নিজ হস্তে সেবা এবং নিরাশ্রয়, দুঃস্থ, পীড়িতগণকে শুশ্রূষা করছেন। এই মহৎ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হতে হয়। এই সন্ন্যাসিগণ ভারতের নবযুগের অগ্রদূত। এই সেবাধর্মরূপ স্রোতস্বিনীতে অর্থের প্রবাহ অতি মৃদু, এই প্রতিষ্ঠানের মূলধন যৎসামান্য। প্রতি শহরে দিন দিন অনেক সিনেমা-প্রাসাদ গজিয়ে উঠছে এবং অতি দরিদ্রেরাও সেখানে কষ্টে অর্জিত অর্থ নষ্ট করছে। আমাদের প্রত্যেকের অর্থ সৎকার্যে ব্যয় করা কর্তব্য। এই প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের কাছ থেকে অধিকতর অর্থ সাহায্য পাবার যোগ্য।

মনের সাথে কথা

বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

"দেখাতে কি পার মোরে
কোথায় সেই মানব-ঈশ্বর?
কোথায় শুনিতে পাব তাঁর কণ্ঠস্বর?"—
মন আমারে প্রশ্ন করে।
উত্তরে বলি তারে ঃ "আছে এক ধাম
যেখানে বিরাজ করেন সেই ঈশ্বর
যেখানে শ্রুত হয় তাঁর কণ্ঠস্বর।"
"কি সেই ধাম?"
"শোননি সে-ধামের নাম—দক্ষিণেশ্বর?"

মনেরে এখন দেখাই সেই ধাম
যে-ধামে নিত্য অধিষ্ঠান করেন
ত্রিতাপ দুঃখহারী
কলির ঈশ্বর।

"এই ধামে এখন তুমি—
প্রতিটি ধূলিকণা সেই ঈশ্বরের পাদস্পর্শে
এখানে নিত্য পবিত্র হয়
গঙ্গা তাঁরে বন্দনা করে সকাল-সন্ধ্যায়
সেই বন্দনাগীতে মুখরিত হয় এই দেবের নিবাস।

কোন্ সুদূর এক অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রা[illegible]
নিরক্ষর এক ব্রাহ্মণ তনয়
এক আশ্চর্য লীলায় একদিন এসেছিল এ[illegible]
তখন কে জানিত এই ঘটনা[illegible]
একদিন লেখা হবে [illegible]
সমগ্র জগৎ বিস্ময়ে[illegible]
তিনি হবেন মানবকুলে[illegible]
নতুন যুগের [illegible]

ঐ শোন, গঙ্গা[illegible]
এই মৃত্তিকায় [illegible]
এই মৃত্তিকা এখ[illegible]
ঘ্রাণ নাও, বাতাসে প্রবাহিত [illegible]
প্রতিটি বৃক্ষ আমোদিত [illegible]
স্বর্গের ঋষিরা ধ্যানলোকে [illegible]
[illegible]
[illegible]
মনের দিকে তাকাই [illegible]
কী আনন্দে উদ্বেলিত শ্রোতা [illegible]



তোমায় ভুলে না যাই কভু

আভা গুহ

যারা আমায় বলছে ভাল
তারাই আমার বন্ধু কি?
মন্দ যারা বলছে আমায়
তারা সবাই শত্রু কি?

ভাল করে দেখছি ভেবে
নিন্দা জ্বালা যতই পাব,
ততই আরো শুদ্ধ হয়ে
নতুন করে মানুষ হব।

আলোর পাশেই অন্ধকার
সাদার পাশেই কালো,
মন্দ-ভাল যাহাই থাকুক
সবারে বাসব ভাল।

পরকে যেন আপন করি
কেউই তো নয় পর,
ঘর আছে, তাই বাহির আছে
বাহির টানেই ঘর।

যেজন চেনে মনের রতন
মণি-মানিক তুচ্ছ তার,
হৃদয়ে যার জ্ঞানের আলো
ঢাকবে তারে কোন্ আঁধার!

এ তনুমন যে দিয়েছে
দয়ার তুলনা নেইকো তার,
এ-জগতের পিতা তিনি
তিনিই চালান এ-সংসার।

যে যা থাকুক মন্দ[illegible]
সবারে দিয়ে স[illegible]
সবার প্রাণে জ্বালব আলো
[illegible]

[illegible]
[illegible] তোমায় না ভুলি কভু।

ফিরায়ো না মুখ

দীপালি রায়

নিস্তব্ধতা জ্যোতিঃপূর্ণ—ধ্যানের আকাশ
স্বচ্ছ আবরণ নীল আকাশের পটে
পট আলোকিত চেতনাপ্রকাশে
ঈশ্বরই পট—
আমার ঈশ্বর তুমি
শান্ত স্থির অচঞ্চল—দিব্য জ্যোতিষ্মান।

"যত মত তত পথ"—তোমার দর্শন
একা একা ধুলা-পায়ে পঞ্চবটী তলে
আমার শৈশব নিয়ে কত খেলা খেলেছ লুকায়ে
কখনো হেসেছ—তীব্র অভিমানে ফিরায়েছ মুখ
বলেছি কাতরকণ্ঠে : "প্রভু, ক্ষমা কর
তোমাকে ভুলেছি এই অপরাধে শাস্তি দিও বহুবার
তবু ফিরায়ো না মুখ, আমি একা, অসহায়।"

বিপথে ফিরেছি বারবার, নর্দমায় ভ্রষ্ট পদতল
কুষ্ঠরোগ ধমনীর প্রবাহেতে
দৈন্য-অবসাদে ধুলাসিক্ত, তবু গেছি কাছে
বজ্র ও অশনি জ্বলে ওঠে তোমার ত্রিশূলে
আর্তনাদ করে উঠি—
"দয়াময়, ক্ষমা কর, ফিরায়ো না মুখ।"

শ্রীচরণেষু

সবিতা দাস

'চৈতন্যের চিরজাগরণ হোক'—
অভয়-আশিস দিয়েছ কল্পতরু,
মূঢ় প্রাণের অজ্ঞান তমোলোক
চেতনা-বিভায় আলোকিত কর গুরু।
প্রতি দিবসের সুখ দুখ মন্থনে,
[illegible]
[illegible] অমৃত পানে
পঙ্কেতে মোর পঙ্কজ যেন ফোটে।
অযোগ্য আমি, আমার চেয়ে কেবা আর তা জানে,
[illegible] জনে তুচ্ছ করনি কভু,
ক্ষুদ্র আধার, তবু এই দীন প্রাণে
ঐশ্বর্যের বারতা এনেছ প্রভু।
[illegible] এ বিশ্বচরাচরে
[illegible] আছ জানি [illegible] ভূলোক ভরি,
তব শ্রীচরণ হেরি সদা অন্তরে,
দেব, নরদেব, তোমাকে প্রণাম করি।

প্রার্থনা

পারমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমায় তুমি নতুন করে
নতুন ভাবে গড়
আমার মনের আঁধার যত
আলোকধারায় ভর।

কণ্ঠ আমার নতুন করে
তোমার গানে ভরাও
আমায় দিয়ে তোমার ছবি
নতুন করে আঁকাও।

আমার হাতে যুদ্ধ জয়ে
ন্যায়ের অস্ত্র দিও
আমার যত ভুলত্রুটি সব
ক্ষমার চোখে নিও।

হৃদয়তরী প্রেমের ঘাটে
সদাই বাঁধা রেখ
আমার সকল দুঃখে সুখে
তুমিই পাশে থেক।

'কথামৃত' সাগরের তীরে

সঞ্জীব ব্যানার্জী

বহু পথ ঘুরে ঘুরে
আজকে ঘোরার শেষ
'কথামৃত' সাগরের তীরে।
অন্তহীন শান্তি-ঢেউ
অবিরাম ছুঁয়ে যায়
মরুধূসর হৃদয়ের বেলা।
সাধ জাগে ডুব দিয়ে সেথা—
[illegible] আনি অমৃত[illegible]
সাধ আছে—সাধ্য নাই জানি।
তাই আজ তীরে বসে
ডুবুরির আশে।
যে আমায় নিয়ে যাবে
অতল জলধি-গভীরে।
খুঁজে দেবে অমৃতকলস।
জানি সে [illegible] একদিন
এখন শুধু প্রতীক্ষায় থাকা
সেই ডুবুরির—
'কথামৃত' সাগরের তীরে।

শ্রীরামকৃষ্ণের আরাত্রিক ভজন ঃ শব্দার্থ ও তাৎপর্য

স্বামী সর্বগানন্দ

ভূমিকা

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাস বড় বিচিত্র। অসংখ্য ঘটনা-বহুল এই ইতিহাসের একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঘটনা—স্বামী বিবেকানন্দের সন্ধ্যা-আরাত্রিক ভজন 'খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন...' রচনা। সঙ্গীতের বন্দিশ (বাণী) রচনা করে তাতে সুরারোপ করেছেন অনেকেই, কিন্তু এই আরাত্রিক ভজনটির সৃষ্টি মনে হয় কোন এক দিব্যলোকবাসী-চিত্ত ব্যতীত কখনোই সম্ভব হতো না। কি সাহিত্যের দিক দিয়ে, কি সঙ্গীতের দিক দিয়ে, কি তত্ত্বের দিক দিয়ে—যেদিক থেকেই দেখা যাক না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণের বন্দনাগীতি এই দিব্য স্তবটি সংক্ষেপে—'অনবদ্য'।



শুধু বেলুড় মঠে নয়, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সকল শাখাকেন্দ্রে এবং যেখানে যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ গড়ে উঠেছে—সর্বত্র সন্ধ্যা সমাগমে এই গীত পরিবেশিত হয়। বলা উচিত, ঠাকুরকে শোনানো হয়। মানুষের অশান্ত চিত্তে শান্তির প্রলেপ দিতে অথবা শান্ত চিত্তকে ধ্যানমগ্ন করে তুলতে এই সঙ্গীত অব্যর্থ। কেউ হয়তো এই সঙ্গীতের তত্ত্বভাবনায় আনন্দলাভ করেন। কেউবা সঙ্গীতের নান্দনিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। তবে একথা ঠিক যে, স্বামী বিবেকানন্দ একদিকে যেমন শ্রীরামকৃষ্ণের স্বরূপ ব্যাখ্যার ছলে বেদান্তের সুগম্ভীর তত্ত্বকে সহজ করে সূত্ররূপে এই গানের বন্দিশে তুলে ধরেছেন, তেমনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের সনাতনী ও সুপরিণত গায়কী এবং ব্যাকরণও প্রয়োগ করেছেন এতে। এমনকি তাঁর পাশ্চাত্য সঙ্গীতের জ্ঞানও গভীরভাবে এই সঙ্গীতের ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত। তাছাড়া ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতিতে সঙ্গীতের মহিমান্বিত উদ্ভাস উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছে এই গীতটিতে।

ফ্রান্সে থাকাকালীন স্বামীজী পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ওজস্বিতার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ইংরেজীতে আমরা বলি 'cadence' বা 'vigour'। পৌরুষদৃপ্ত কণ্ঠে ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের ধারায় একটি অভিনব গুরুবন্দনা বিশাল মন্দিরের প্রশস্ত কক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মরমূর্তির সম্মুখে প্রত্যহ গীত হবে—এমনতর একটি বাসনা সম্ভবত স্বামীজী মনে মনে দীর্ঘদিন পোষণ করেছিলেন। সেইসঙ্গে ধ্রুপদী গানে স্বামীজীর অসাধারণ দক্ষতাও তাঁকে এক অদ্ভুত গুরুস্তব রচনার প্রতি প্ররোচিত করেছিল হয়তো। চৌতালে তিনি আগেও গান রচনা করেছেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমাকে কাব্যে, ছন্দে, তালে বিধৃত করতে গেলে চৌতালের চেয়ে আর তাল হয় না—সেকথা স্বামীজী ছাড়া ভাল আর কে বুঝবে? মার্গসঙ্গীত পরিবেশনের ধাঁচটা হলো—প্রথমে বিলম্বিতে শুরু; আলাপ, বিস্তার, ক্রমশ তালের দ্রুতিতে তান, বোলতান, সরগম, ঠাট দিয়ে শেষ। যেন সমাধিমুখী মন সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠেছে। ধ্রুপদী সঙ্গীতে আরো একটু আছে। পুনরায় ঠায় বন্দিশ গেয়ে শেষ হয়। এই আরাত্রিক ভজনেও মোট তিনটি অংশ। চৌতালে প্রথমাংশ শেষ হলে ত্রিতালে মধ্যমাংশ এবং শেষে একতালে শেষাংশ গেয়ে ফিরে এসে ফের চৌতালে ঠায় বন্দিশ গেয়ে শেষ হবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তর্দশার পর যখন তিনি অর্ধবাহ্যদশায় আসতেন তখন নৃত্য করতেন। অর্থাৎ ভক্তির উচ্চতম নিরুদ্ধ দশার পর যখন ব্যুত্থান প্রসঙ্গ আসে তখন নৃত্যের উচ্ছ্বাসেই তার স্বাভাবিক নান্দনিক অভিপ্রকাশ। তৌর্যত্রিক অর্থাৎ গীত, বাদ্য, নৃত্য—এই তিন নিয়েই সঙ্গীত। স্বামীজীও তাই নিজেই নৃত্যের প্রসঙ্গ অবতারণা করলেন—"ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ..." ইত্যাদি। একজন প্রবীণ সন্ন্যাসীর ভাষায়—"এ যেন বিবেকানন্দে রামকৃষ্ণের ছন্দ প্রকাশ।"[১] অথচ কী গভীর। কী মধুর। এই অনবদ্য, অতুলনীয় সঙ্গীত মনে হয় বিবেকানন্দের পক্ষেই রচনা করা সম্ভব। আজ পর্যন্ত এমন একটি 'complete' (সম্পূর্ণ) নিবদ্ধ সঙ্গীত রচিত হয়েছে কিনা জানা নেই। বেদান্ত-নিষ্ণাত ভারতীয় আধ্যাত্মিকতাকে মন্থন করে সঙ্গীতের মাধ্যমে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার তাগিদেই স্বামীজী যেন সাক্ষাৎ সারদা-সরস্বতীর লেখনী আর বীণার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে লিখেছিলেন এই স্তবগীতি।

স্তবগীতিটি সম্বন্ধে অপূর্ব এক স্মৃতিচিত্র পাওয়া যায় স্বামী শিবানন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালদাদার কথোপকথনে। দিনটি ছিল ৬ মার্চ ১৯২৮। স্বামী অপূর্বানন্দ 'শিবানন্দ বাণী'তে লিখছেন :

"এবার আরাত্রিক আরম্ভ হইয়াছে। সাধুভক্তেরা সমস্বরে 'খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়' ইত্যাদি গাহিতেছেন।

"[রামলাল] দাদা—'এই স্তোত্রটি শুনতে বড় ভাল লাগে। আমি যখনই শুনি, মনে হয় যেন ঠাকুর গভীর সমাধিস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আর তাঁর ভক্তেরা তাঁকে ঘিরে এ-স্তোত্র পাঠ করছে। যাই, ঠাকুরঘরে যাই।'

"এই বলিয়া রামলালদাদা ঠাকুরঘরে গেলেন। মহাপুরুষ মহারাজ এ-স্তোত্র সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন—'আগে মঠে আরতির সময় এ-স্তোত্র গাওয়া হতো না। তখন "জয় শিব ওঙ্কার, ভজ শিব ওঙ্কার" ইত্যাদি বারংবার গাওয়া হতো। তারপর স্বামীজী নিজে "খণ্ডন ভববন্ধন" এই স্তবটি রচনা করলেন, তাতে সুর দিলেন এবং সকলকে নিয়ে গাইতে শুরু করলেন। তিনি নিজেই পাখোয়াজ বাজিয়ে গাইতেন। সে কী অদ্ভুত দৃশ্য! একে তো তাঁর ভৈরবের মতো দিব্যকান্তি শরীর; তার ওপর ভাবে মাতোয়ারা হয়ে পাখোয়াজ বাজিয়ে যখন গাইতেন, সে যে কী এক গম্ভীর ভাবের সৃষ্টি হতো, তা আর কী বলব!' "

শব্দার্থ ও তাৎপর্য

খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন নররূপধর নির্গুণ গুণময়।। (১)

ভববন্ধন যিনি **খণ্ডন** (অর্থাৎ ছিন্ন) করেন—**জগবন্দন**—জগতের বন্দনীয় সেই মহাপুরুষকে আমি বন্দনা করি। তিনি কেমন? তিনি **নিরঞ্জন** অর্থাৎ অঞ্জন বা কাজল বা কালিমা বিরহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। অবিদ্যা-অজ্ঞানরূপ কালিমা তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। কার্য-কারণ সম্পর্কের অতীত সেই দিব্যসত্তাই কার্যকারণের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। জগতের মূল উপাদান-কারণ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ যাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, সেই তিনি **গুণময়** (গুণাধীন) হয়ে **নররূপে** অবতীর্ণ হয়েছেন। কেন? কেন তিনি জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি সম্বলিত ধূলিমলিন এই জগতে অশেষ দুঃখভাক্ হয়ে অবতীর্ণ হতে গেলেন?

মোচন অঘদূষণ জগভূষণ চিদ্‌ঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন বিমলনয়ন বীক্ষণে মোহ যায়।। (২)

অঘ অর্থাৎ পাপ-সম্পৃক্ত এই পৃথিবীতে অসচ্চরিত্র ধর্মহীন মানুষের ক্রমবৃদ্ধি সৃষ্টির সাম্যাবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে চাইছিল। যদি কেউ মনে করেন, জগতে কেবল মঙ্গলই থাকুক, কেবল পুণ্যবান মানুষই থাকুক, তিনি ভুল করবেন। এই সৃষ্টিতে পাপ-পুণ্য, অমঙ্গল-মঙ্গলের একটি সাম্যাবস্থা বজায় থাকলেই 'সব ঠিক আছে'—বলা যায়। পাপ ও অধর্মের অনুপাত বৃদ্ধির কারণে পৃথিবী তথা সৃষ্টি কোন এক অচিন্ত্যনীয় ধ্বংসের দিকে তখন ধাবমান। ধর্মকে রক্ষা করার জন্য, বিশ্বচরাচরকে রক্ষার করার জন্য অঘদুষ্ট সেই পৃথিবীতে **চিদ্‌ঘনকায়** (জ্ঞানঘন আকার নিয়ে) শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন। তাঁকে দেখলেই—**বীক্ষণ** মাত্র সমস্ত পাপচিন্তা, মোহান্ধকার মোচন হয় (ঘুচে যায়)। ভক্তের হৃদয়ে জ্ঞানের আলো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এ যেন তার চোখে **জ্ঞানাঞ্জন** (জ্ঞানের কাজল) পরিয়ে দৃষ্টিকে **স্বচ্ছ, বিমল** (মলহীন) করে তোলা হলো। জ্ঞানাঞ্জনে ভক্তের নয়ন পরিণত হলো **বিমল নয়নে**। এবং সেই স্বচ্ছ দিব্যদৃষ্টি নিয়ে যখন মানব শ্রীরামকৃষ্ণের অপরূপ মূর্তির দিকে তাকাবে, গর্বে ভরে উঠবে তার হৃদয়। দুটি কারণে—জগতের সমস্ত পাপরাশি, অন্ধকারকে পদদলিত করে শিবরূপী শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ মহিমায় বিরাজমান। বিশ্বচরাচর, বিশ্বপ্রকৃতি তাঁর সামনে নতজানু হয়ে আজ্ঞাবাহকরূপে অধিষ্ঠিত। জগতের ভূষণস্বরূপ অর্থাৎ **জগভূষণ** সেই শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের মতো মানুষ, আমাদের আপনজন—এই ভেবে গর্বে ভরে উঠবে হৃদয়। দ্বিতীয়ত, আমিও তাঁর প্রিয়জন, আমি তাঁকে দেখি, তিনি আমায় দেখেন, আমি যে-সে নই—এই ভেবেও গর্বে বুক ভরে উঠবে ভক্তের।

কিন্তু 'তাঁর' বুকের মধ্যে কি ঘটে চলেছে? স্বামীজী দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন—

ভাস্বর ভাবসাগর চির উন্মদ প্রেমপাথার।
ভক্তার্জন যুগলচরণ তারণ ভব পার।। (৩)

উত্তাল বীচি-সঙ্কুল মহার্ণবে যেমন প্রচণ্ড আলোড়ন হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তর ঐরকম উত্তাল—**উন্মদ**। কিন্তু ক্ষণিকের জন্য নয়—**চির উন্মদ**। কিসের উন্মাদনা? "অরূপ সায়রে লীলা লহরী উঠিল মৃদুল করুণা বায়"—জীব-দুঃখে কাতর-প্রাণ কি এক অহৈতুকী করুণায় চির উদ্বেল হয়ে আছে। অন্তরে ভাবের সাগর—**ভাবসাগর**। বুক ফেটে কি চৌচির হবে? অব্যক্ত ভাব কি ব্যক্ত হয়ে উঠতে চাইছে? তাই শ্রীরামকৃষ্ণের সেই ভাবসাগর হয়ে উঠেছে **ভাস্বর** (উজ্জ্বল)। আর তাঁর **প্রেমপাথার** (প্রেম-সমুদ্র) থেকে বিশালাকৃতি তরঙ্গ যেন পৃথিবীকে ভাসিয়ে দিতে ধেয়ে আসছে প্রচণ্ড গতিতে। কিন্তু সকলেই কি তা দেখতে পায়? সকলে দেখতে পায় না। অবিশ্বাসী মন কেমন করে দেখবে সেই দিব্য কাণ্ড-কারখানা? তিনি যে **ভক্তার্জন**—ভক্তের অর্জন অর্থাৎ ভক্তির দ্বারা অর্জিত অথবা ভক্তকে যিনি অর্জন করেন। ভক্তির উপাদানে গড়া **বিমল নয়নে** ভক্ত দেখতে পান সেই দিব্যলীলা। প্রভুর **যুগল চরণ ভক্তার্জন** শুধু নয়, আরো কিছু। **তারণ ভব** পার অর্থাৎ তিনি জন্মমৃত্যুর 'ভব' অর্থাৎ সংসারচক্র থেকে পার করেন। তাঁর আগমন আর্তের

উদ্ধারণে; তাঁর কৃপা উৎসারিত নিষ্প্রাণে প্রাণ সঞ্চালনে, অজ্ঞানক্লিষ্টে জ্ঞান বিতরণে। রাশি রাশি অমঙ্গলের স্তূপের আড়ালে রয়েছে তাঁর দখিন হাত, তিনিই কেবল মঙ্গলমুরতি তারণ ভব পার।

জৃম্ভিত যুগ-ঈশ্বর জগদীশ্বর যোগসহায়।
নিরোধন সমাহিত মন নিরখি তব কৃপায়।। (৪)

যুগ-ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁকে **জগদীশ্বর** (অর্থাৎ জগতের ঈশ্বর) বললেই তো হতো। তা ঠিক। তবে সেই জগদীশ্বর অনাদি অনন্তকাল জগতের অধীশ্বররূপে বিরাজমান হয়েও বিশেষ বিশেষ যুগে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যসাধনের জন্য বিশেষ বিশেষ বিভূতি সমন্বিত হয়ে নররূপ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। তাই তিনি **যুগ-ঈশ্বর**। শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপে এই যুগে **জৃম্ভিত**—প্রকাশিত।

সমাজে দুটি শক্তির খেলা সর্বদাই চলে—একটি আসুরী (কু) শক্তি, অপরটি দৈবী (সু) শক্তি। ব্যষ্টি এবং সমষ্টি উভয় স্তরেতেই এই দুই শক্তির অবিশ্রান্ত লীলা চলেছে। আসুরী শক্তি আমাদের স্ব-স্বরূপ আত্মচৈতন্যকে ভুলিয়ে দেয়। আমাদের যেন ঈশ্বর থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তার কি পরিণাম? ভাল নয় মোটেই। জঘন্য স্বার্থপরতা, হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপ, নীচতা, মূঢ়তা, অজ্ঞানান্ধকারে ক্রমশ নিমজ্জমানতা। অপর শক্তিটি (সু) আমাদের চৈতন্যময় স্বরূপকে স্মরণ করিয়ে দিতে সদা তৎপর। 'গুরুশক্তি' তার একটি বিশেষ প্রকাশ। যখনি আমরা স্ব-স্বরূপকে স্মরণ করি, তখনি আমরা যুক্ত অর্থাৎ যোগস্থ। শ্রীরামকৃষ্ণ মর্তবাসীকে যুক্ত করানোর কাজে সদাব্রতী। তাই তিনি **যোগসহায়**; অন্যদিকে সত্ত্বগুণান্বিত দিব্য যোগাবস্থ শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যানই সাধককে উচ্চতম যোগভূমিতে আরূঢ় করায় বলেও তিনি **যোগসহায়**। সেই উচ্চ যোগাবস্থায় সাধকের মন থাকে নিরুদ্ধ, **সমাহিত**। তাঁরই কৃপায়। তাই স্বামীজী বললেন—**নিরোধন সমাহিত মন নিরখি তব কৃপায়।**

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের অখণ্ড সচ্চিদানন্দঘন নিরুপাধিক সত্তাকে গোপন করে আমাদের মতো অতি সাধারণ মানুষের চোখের সামনে রক্ত-মাংসের শরীর ধারণ করে এসেছেন নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য নিয়ে। কি তাঁর সেই উদ্দেশ্য?

ভঞ্জন দুঃখগঞ্জন করুণাঘন কর্মকঠোর।
প্রাণার্পণ জগততারণ কৃন্তন কলিডোর।। (৫)

কলিডোর—কলির বন্ধন। সেটা কি? শাস্ত্রে অবিশ্বাস, অবজ্ঞা, গুরুতে শ্রদ্ধাহীনতা, জঘন্য স্বার্থপরতা, তীব্র ইন্দ্রিয়াসক্তি বস্তুজগৎকে ধ্রুব সত্য জেনে চৈতন্য-স্বরূপ আত্মাকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করা—এককথায় কাম ও কাঞ্চনকেই কলির বন্ধন বলা যায়। মানুষ ঐ বন্ধনে পশুপদবাচ্য। মাতৃপিতৃহন্তা সন্তানকে পশু ছাড়া আর কি বলা যায়? সহধর্মিণীকে যে হত্যা করে সে কি মানুষ? অথচ এরাই আজকের সমাজে সমধিক। মাদকাসক্তি, অর্থ-পৈশাচিকতা, মাতৃত্বের অবমাননার বাহুল্যই কলিযুগের সূচক।

শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন এই কঠিন কাজটি করার জন্য। **কৃন্তন কলিডোর**। কলিযুগে মানুষের এই স্বভাবটিকে পরিবর্তন করার জন্যই তাঁর আগমন। জগৎকে ত্রাণ করার জন্য **জগততারণ**—জগতের ত্রাণকর্তা—আসেন। কিভাবে তিনি ত্রাণ করেন? স্বামীজী বললেন—**প্রাণার্পণ**—প্রাণ অর্পণ করে। প্রাণ কাকে অর্পণ করা যায়? নিষ্প্রাণ জড় ইঁট, কাঠ, মাটিকে? অবশ্যই না। বরং যার অল্প একটু প্রাণ ধুকধুক করছে, তাকেই প্রাণ অর্পণ করা সম্ভব। ভারতবর্ষে মানুষের দুর্দশা স্বামীজী নিজের চোখে দেখেছেন। প্রাণহীন, মেরুদণ্ডহীন, হীনবীর্য, হাজার হাজার বছরের দাসত্বজনিত হীনম্মন্যতায় আচ্ছন্ন এই জাতির মধ্যে প্রাণসঞ্চার একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণই করতে পারেন। ভেড়ার পালে ব্যাঘ্র-শাবককে কে দেখিয়ে দেবে তার স্বরূপ? ঐজন্যই তাঁর আসা। **ভঞ্জন দুঃখগঞ্জন**—দুঃখের গঞ্জনা যিনি নিবৃত্ত করেন। ব্যক্তিগত জীবনে, জাতিগতভাবেও তাই। জাতির হারানো অস্তিত্বকে ফিরিয়ে দেওয়া তাঁরই স্বেচ্ছাবৃত দায়। তিনি যে **করুণাঘন মূর্তি**। করুণার জমাট-বাঁধা বিগ্রহ, অথচ **কর্মকঠোর**। কর্মে কোন আলস্য, জড়তা বা তামসিকতা সেখানে ছিল না। এগুলি তাঁর কাছে অসহ্য। তিনি নিজেও ছিলেন কর্মকঠোর, আর তিনি চাইতেন সকলেই কর্মকঠোর হয়ে উঠুক। পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, ধৈর্যশীল, কর্মদক্ষ হয়েই তো অধ্যাত্মসাধনার সূচনা। বস্তুত, কর্মদক্ষ, সচ্চরিত্র, পরিশ্রমী না হতে পারলে জাতি কখনো জাগতিক উন্নতির আলো দেখতে পাবে না—সেকথা স্বামীজী নিজেই বলেছেন বহুবার। আর জাগতিক অভ্যুদয় বিনা ধর্মের রক্ষণ সম্ভব নয়। কারণ "খালি পেটে ধর্ম হয় না"। সুতরাং নিজের জীবন দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়ে গেলেন, জাতির সামগ্রিক উন্নতির জন্য সকলকেই **কর্মকঠোর** হয়ে উঠতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ আরো দেখিয়ে গেলেন—"যে চুল বাঁধে সে রান্নাও করে" অর্থাৎ সমাধিবান হয়েও ব্যবহারিক জীবনে কর্মদক্ষ, পরিশ্রমী হওয়া সম্ভব।

বঞ্চন কামকাঞ্চন অতি নিন্দিত ইন্দ্রিয়রাগ।
ত্যাগীশ্বর হে নরবর দেহ পদে অনুরাগ।। (৬)

শ্রীভগবান কৃপার বন্যা বইয়ে দিলেও আমাদের তৈরি হওয়ার একটা ব্যাপার আছে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা যদি থাকে তবেই তো সৌভাগ্যমুরতি শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা আমাদের জীবনে অনুভূত ও ফলপ্রসূ হবে। স্বামীজী তাঁর গুরুর শিক্ষার অনুধ্বনি করে বললেন—পবিত্রতার কোন বিকল্প নেই। ধর্মজীবনে সাধককে কায়মনোবাক্যে পবিত্র হতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তির পূজা গ্রহণ করতে পারতেন না। তাঁর ঐ নির্মল, কামগন্ধহীন, সুপবিত্র মূর্তির ধ্যান মানুষের অন্তঃকরণকেও পবিত্র, নির্মল করে তোলে। টাকাও ছুঁতে পারতেন না তিনি। তাই তিনি **বঞ্চন**

কামকাঞ্চন। তাঁর জীবনলীলা স্মরণ-মনন করলে ভক্তেরও কামকাঞ্চন-হীন নির্মল জীবন লাভ হয়। অজস্র বিষয়চিন্তা আমাদের মনকে ঈশ্বরবিমুখ করে তোলে। ইচ্ছা থাকলেও মনকে ঈশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ এই **অতি নিন্দিত ইন্দ্রিয়রাগ** (ঘৃণ্য ইন্দ্রিয়াসক্তি) যেন এক তীব্র পিছুটান। কিছুতেই এগোতে দেয় না। তাই তাঁর কৃপাই ভরসা। আমাদের সকলের হয়ে স্বামীজী নিজেই তাঁর কৃপা ভিক্ষা করে বললেন—হে **ত্যাগীশ্বর** ('ত্যাগীর বাদশা'), হে **নরবর** (নরশ্রেষ্ঠ), **দেহ পদে অনুরাগ**—তোমার চরণে ভক্তি দাও। নরশ্রেষ্ঠ কে? যে-নরের মধ্যে স্বয়ং নারায়ণ পূর্ণশক্তিতে আবির্ভূত, তিনিই নরশ্রেষ্ঠ। তিনি **বঞ্চন কামকাঞ্চন**। ইন্দ্রিয়-সুখ এবং জাগতিক ভোগ—দুটোরই ঊর্ধ্বে তাঁর অবস্থান।

নির্ভয় গতসংশয় দৃঢ়নিশ্চয় মানসবান।
নিষ্কারণ ভকতশরণ ত্যাজি জাতিকুলমান।। (৭)

ভয় বস্তুটা শ্রীশ্রীঠাকুরের কম ছিল। ভূতপ্রেতের সঙ্গে তিনি দিব্যি কাটাতেন কামারপুকুরে। রানী রাসমণির গালে চড় মারতে তাঁর ভয় লাগেনি। ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে তিরস্কার করতে তাঁর বুক কাঁপেনি। "টাকা মাটি মাটি টাকা" বলে গঙ্গায় মুদ্রা ছুঁড়ে ফেলতে তাঁর সঙ্কোচ হয়নি। নিজের সহধর্মিণীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করতেও তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হননি। যখন যেটা উচিত বলে মনে হয়েছে, অবিলম্বে তা কার্যে পরিণত করতে তিনি কখনো ভীত হতেন না। তাই তিনি ছিলেন **নির্ভয়**। অবশ্য ঈশ্বরবিমুখী করে দেয় এমন কাজ বা বস্তু তিনি সভয়ে এড়িয়ে চলতেন। বিষয়ী লোক দেখলে ঘরের কোণে লুকিয়ে থাকতেন। কিন্তু ঈশ্বরকে ঘনিষ্ঠ করে তোলার অনুকূল ব্যাপারে তিনি সবসময়ে নির্ভয়। কারণ, অন্তরে সংশয় ছিল না তাঁর। **গতসংশয়**। নরেন্দ্রনাথ যখন জিজ্ঞেস করলেন : "মাকে কি আপনি দেখেছেন?" উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন : "হ্যাঁরে, তোর সঙ্গে যেমন কথা কইছি, মায়ের সাথেও তেমনি কথা কই। তোর চেয়ে আমি আট গুণ বেশি স্পষ্ট তাঁকে দেখি।" কী অদ্ভুত উক্তি! তিনি মহেশহৃদয়বাসিনী শ্রীশ্রীজগদম্বা কালীর সঙ্গে কথা বলেন—এব্যাপারে তাঁর কোন সংশয় নেই। তিনি নিঃসংশয়। যে তাঁর ভক্ত, সেও নিঃসংশয়। সেও বলতে পারে—"আমি কালী ব্রহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।" আর, নিঃসংশয় চিত্তের স্বভাবই হলো—**দৃঢ়নিশ্চয় মানসবান**। কর্মক্ষেত্রে তিনি দৃঢ়নিশ্চয়। যা ভাববেন, করে তবে ছাড়বেন। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি **দৃঢ়নিশ্চয় মানসবান**। অনুভূতির ক্ষেত্রেও তাই। সত্যের ব্যাপারেও কোন আপস নেই। যদি একবার বোধ হয়েছে—'ভগবান আমার ভরসা' তো সেখানে টাকা, ক্ষমতা, ওপরওয়ালা, স্বাস্থ্য, অনুরাগী, লোকমত ইত্যাদির কোন স্থান নেই। ভরসার নিক্তি ঐ এক জায়গায় আটকে গেছে।

নিষ্কারণ ভকতশরণ অর্থাৎ অকারণেই তিনি ভক্তকে রক্ষা করে থাকেন। ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ককে যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা মুশকিল। আসলে এই অধ্যাত্মরাজ্যে যুক্তি বা বুদ্ধির দৌড় বহির্দ্বার পর্যন্ত। যদি ভক্ত জাতি-কুল-মান বিচার করে তো সে ভক্ত নয়। কারণ, ঈশ্বরের কাছে সেসব নিরর্থক। **ত্যাজি (ত্যাগ করে) জাতিকুলমান** তিনি ভক্তেরই ভগবান। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী এবং ভারতবর্ষের সকল সাধক, আচার্য ও অবতারপুরুষের জীবনে এর অজস্র দৃষ্টান্ত আছে। তাহলে প্রশ্ন হলো—ঠিক ঠিক ভক্তের লক্ষণ কেমন হবে?

সম্পদ তব শ্রীপদ ভব গোষ্পদ বারি যথায়।
প্রেমার্পণ সমদরশন জগজন দুঃখ যায়।। (৮)

গোষ্পদ অর্থাৎ গরুর খুরের চাপে ভূমিতে যে-গর্ত হয়, সেখানে বর্ষায় যেটুকু জল জমে—তাই **গোষ্পদ বারি**। শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীপদ, চরণযুগলকে আপন **সম্পদ জ্ঞানে** যিনি হৃদয়ে ধারণ করেন—তাঁর কাছে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সম্পদ কেমন? অনন্ত সমুদ্রের তুলনায় ঐ গোষ্পদবারি যেমন তুচ্ছ, তেমনি। শ্রীভগবানের চরণযুগল নিজের বক্ষে ধারণ করে ভক্ত অপর সকলের দুঃখমোচনে প্রয়াসী হন। তাই তো **জগজন দুঃখ যায়**। মানুষের মধ্যে ইষ্টদর্শন করে, যেমন শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনে ঘটেছিল, যথার্থ ভক্ত পরম প্রেমবিগলিত চিত্তে তাঁর সেবায় ব্রতী হন। শুরু হয় প্রেম-অর্পণ প্রক্রিয়া। তাই **প্রেমার্পণ** অর্থাৎ প্রেমবিতরণ। শ্রীচৈতন্যদেব করেছিলেন, যীশুখ্রীস্ট করেছিলেন, বুদ্ধদেব করেছিলেন। এই যুগে **প্রেমার্পণ** সম্ভটিত হয়েছে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যলীলায়। মানুষ আজ ভালবাসতে ক্রমশ ভুলে যাচ্ছে। ভালবাসাহীন যান্ত্রিক এই সভ্যতাকে পদদলিত করে প্রেম বিতরণের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাবির্ভাব—একথাই স্বামীজী বললেন। বাছবিচার করে নয়—সকলকে, আচণ্ডালে সমানভাবেই তিনি প্রেম বিতরণ করছেন। কারণ, তিনি যে **সমদর্শন**। যে তাঁর চিন্তা করে সেও সমদর্শন, খাঁটি সাম্যবাদী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্থিতপ্রজ্ঞ যোগীর বিশেষণ দিতে গিয়ে শ্রীভগবান বলেছেন, সেই যোগী ঈশ্বরকে জেনেছেন বলেই তো তিনি 'সমদর্শন'—সকলকে সমান চোখে দেখেন।[২]

নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত মনোবচনৈকাধার।
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর তুমি তমোভঞ্জন হার।
ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ আরতি তোমার—
জয় জয় আরতি তোমার
হর হর আরতি তোমার
শিব শিব আরতি তোমার।।

শ্রীরামকৃষ্ণ **বাক্যমনাতীত** অর্থাৎ বাক্য ও মনের অতীত। অথচ ইন্দ্রিয়াতীত সেই চিদানন্দঘন দিব্য সত্তাই আবার মনো-

বচনৈকাধার অর্থাৎ মন ও বচনের (বাক্যের) 'এক' আধার বা ভূমি। সূর্য, নক্ষত্র, মহাকাশ, বিশ্বচরাচর সেই 'এক' ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা যেমন পৃথিবীর ওপর রয়েছি, তেমনি। দিবাকর পৃথিবীকে আলো বিতরণ করেন। তিনি সেই আলো পেয়েছেন কোথায়?—অতীন্দ্রিয় চিদ্‌ঘন শ্রীরামকৃষ্ণরূপী সেই দিব্য সত্তার কাছ থেকে। তিনি যে **জ্যোতির জ্যোতি**। "জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে"—গীতায় (১৩।১৮) শ্রীভগবান বলেছেন। হৃদয়ের সমস্ত তমস্ অর্থাৎ অন্ধকার একমাত্র তিনিই দূর করেন। জ্ঞানঘন মুরতি শ্রীরামকৃষ্ণকে স্বামীজী তাই বন্দনা করে বললেন— **তুমি তমোভঞ্জন হার। উজল হৃদিকন্দর**—হৃদয়কন্দর আলো করেন তিনি।

অতঃপর নৃত্যের বোল। **ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ...**। ভক্তবৃন্দ যেন নেচে নেচে শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে ঘিরে আনন্দে আরতি-গানে মত্ত। **জয়** দুবার দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সশক্তিক শ্রীরামকৃষ্ণের জয়। **হর** দুবার বলা হয়েছে। ঠাকুর বলতেন—বিদ্যা কাঁটা দিয়ে অবিদ্যা কাঁটা তুলে ফেলতে হয়। তারপর দুটোই ফেলে দিতে হয়। বিদ্যা-অবিদ্যার পারে নিরঞ্জন সেই সত্তা। অতএব হর হর। আবার **শিব** দুবার বলা হয়েছে। শিব অর্থ মঙ্গল। অস্মদ্-যুষ্মদ্ উভয় প্রত্যয়ের মঙ্গল। অর্থাৎ আমার মঙ্গল হোক। অস্মদ্ অর্থাৎ আমি ব্যতিরিক্ত (subject-কে বাদ দিলে) সবই তো যুষ্মদ্ অর্থাৎ 'তুমি' (বাকি সবটাই object)। তোমারও মঙ্গল হোক। এটি প্রার্থনা। অর্থাৎ মঙ্গলময় শ্রীরামকৃষ্ণ আমার ও সকলের মঙ্গল করুন—নিরন্তর, সকল স্থানে, সকল সময়ে; জগতের প্রাণিকুল হোক অভিসিঞ্চিত। দিগ্-দিগন্ত নিনাদিত হোক 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে, দেবতারা করুন অভিবন্দনা! ❑

নির্দেশিকা

১ ঠাকুরের নরেন, নরেনের ঠাকুর—স্বামী বুধানন্দ, ১৪০৪, পৃঃ ২১

২ সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ।। (৬।২৯)

—ব্রহ্মদর্শনকারী যোগী নিজ আত্মাকে সর্বভূতে অবস্থিত আর ভূতসকলকে স্বীয় আত্মাতে অভিন্নরূপে দর্শন করেন বলে তিনি সমদৃষ্টি গুণসম্পন্ন হন।

৩ অন্যান্য আকরগ্রন্থ—

(ক) উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়

(খ) সঙ্গীত প্রতিভায় স্বামী বিবেকানন্দ—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, বেদান্ত মঠ, কলকাতা।

(গ) শ্রীরামকৃষ্ণের আরাত্রিক ভজন : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অভিনব সংমিশ্রণ—স্বামী সর্বগানন্দ, 'বিশ্ববাণী', শারদীয়া সংখ্যা ১৪০৬।

সুস্বাস্থ্য

> শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।
> —কালিদাস (কুমারসম্ভব, ৫।৩৩)

স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়

অধ্যাপক ডাঃ সত্যানন্দ চক্রবর্তী

খ্যাতনামা প্রবীণ হোমিও চিকিৎসক



❑ যেকোন প্রকারের বাতজ বেদনাতে যাঁরা কষ্ট পাচ্ছেন—তাঁরা অবিলম্বে পরিমিত আহারের অভ্যাস করুন। যাঁদের বয়স চল্লিশ/পঁয়তাল্লিশ বছরের অধিক, তাঁরা অতি আহার বন্ধ করুন। যাঁরা প্রাতঃরাশ, দ্বিপ্রাহরিক আহার ও রাত্রের আহার দেরিতে গ্রহণ করেন, তাঁদের ফিক ব্যথা ও গাউট ব্যথা অধিক হওয়ার সম্ভাবনা। প্রাতঃরাশ সকাল সাড়ে সাতটা, দ্বিপ্রাহরিক আহার বেলা সাড়ে বারটা এবং রাত্রির আহার সাড়ে আটটার মধ্যে গ্রহণ করা উচিত।

❑ সপ্তাহে অন্তত একদিন উপবাস বাতজ বেদনাতে উপকারী। সম্ভবমত দৈনিক দুই-তিন কিলোমিটার প্রাতঃভ্রমণ আবশ্যক। উপবাসের দিন ভ্রমণ বন্ধ রাখা উচিত। হালকা ব্যায়াম করা যেতে পারে। কিন্তু ব্যায়াম-বিশারদের পরামর্শ ছাড়া ব্যায়াম করা উচিত নয়। ব্যায়াম শুরু করে বন্ধ করা ঠিক নয়। ব্যায়াম বন্ধ করে দিলে দেহে মেদবৃদ্ধি হতে পারে। তাই ভ্রমণই ত্রুটিমুক্ত ব্যায়াম। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশী তিথিতে শুকনো ফল ও খাদ্য গ্রহণ ভাল। যেমন—খৈ, চিঁড়া, মুড়ি, রুটি, ছাতু, পানিফল, ফল, শটি, সাবু ইত্যাদি। ভাত, আমিষ, লুচি, পরটা, তেলেভাজা, মশলা-প্রধান আহার বাদ দেওয়া দরকার। প্রয়োজনে জল পান এবং লেবুর রসযুক্ত জল পান করা যেতে পারে। পেট খাদ্যপূর্ণ থাকলে দেহের রক্তসঞ্চালন বাধা পায়। ব্যথাদিও বৃদ্ধি হয়।

চিরন্তনী

রাজা হরিশচন্দ্র ১৩

❑ এই বিভাগটি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য ❑

কথা : শুভ্রা দাশগুপ্ত ❑ চিত্র : তথাগত দাশগুপ্ত



সংসারের সমস্ত কাজ শেষ হলে ব্রাহ্মণের অনুমতি নিয়ে রানী শৈব্যা যখন ছেলের কাছে যাওয়ার জন্য বের হলেন, তখন প্রায় মধ্যরাত্রি। পাগলিনীর মতো তিনি একাকী রাস্তা দিয়ে ছুটতে লাগলেন। কোথায় তাঁর প্রাণপ্রতিম একমাত্র পুত্র? স্বামী, সংসার, স্বজন, রাজ্যপাট সব হারিয়ে এই পুত্রটিকে বুকে করেই তো তিনি এতদিন জীবনধারণ করে আছেন কোনরকমে।



জঙ্গলের মধ্যে এসে তিনি দেখলেন, উইঢিপির পাশে বালক রোহিতাশ্বের প্রাণহীন শরীর পড়ে আছে। হাহাকার করে তিনি ছেলেকে কোলে তুলে নিলেন। গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে তিনি চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। কেউ তাঁকে সান্ত্বনা দিতে অথবা সাহায্য করতে এল না। অনেকক্ষণ কান্নাকাটির পর আস্তে আস্তে তাঁর হুঁশ হলো। মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা তো করতে হবে।



বালক পুত্রের মৃতদেহ বুকে করে তিনি শ্মশানভূমিতে এসে পৌঁছালেন। পুত্রকে কোলে করে তিনি উচ্চস্বরে বিলাপ করে কাঁদতে লাগলেন। লজ্জা, ভয় তাঁর আর নেই। "কোথায় মহারাজ হরিশ্চন্দ্র, এসে দেখ একবার কী সর্বনাশ হয়েছে! রোহিতাশ্ব, তোমার পরমপ্রিয় পুত্র আমাদের ছেড়ে চলে গেছে!" [ক্রমশ]

শ্রীমদ্ভাগবত-সমীক্ষা

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

এই নিবন্ধটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'



॥১॥

শাস্ত্রই ভারতবর্ষের মূল সম্পদ। এই বিশাল হিন্দু-শাস্ত্ররূপ অতলান্ত সাগরে অবগাহন করলে কত মণিমাণিক্যই না আমরা লাভ করতে পারি। ভাগবত বলছেন—'ভারতাজিরে' অর্থাৎ ভারতবর্ষের অঙ্গনে যাঁদের জন্ম, 'ধন্যাস্তে'—তাঁরা ধন্য। কিন্তু এই ভারতবর্ষে জন্মেও আমরা বড়ই দুর্ভাগা। আমাদের কী সম্পদ ছিল বা এখনো আছে, তা আমরা ভুলে গিয়েছি। সেটি হলো সনাতন ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক সম্পদ। উপনিষদের উপমায়—"যথা হিরণ্যনিধিম্ অক্ষেত্রজ্ঞা উপরি উপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দন্তি"। মাটির তলায় পূর্বপুরুষেরা 'হিরণ্যনিধি' অর্থাৎ সুবর্ণের ভাণ্ডার রেখে গিয়েছেন। সেই মাটির ওপর আমরা অহর্নিশ বিচরণ করছি। অথচ 'অক্ষেত্রজ্ঞা' অর্থাৎ ক্ষেত্রের জ্ঞান নেই আমাদের। এই ক্ষেত্র, এই ভূমি, এই মাটির তলায় কী আছে—তা আমরা ভুলে গিয়েছি। দারিদ্র্য, দুঃখ ভোগ করছি, অথচ পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া আধ্যাত্মিক সম্পদের কথা ভুলে গিয়েছি আমরা। এক আশ্চর্য অজ্ঞানের অন্ধকার আমাদের ছেয়ে আছে। 'অনৃতেন হি প্রত্যূঢ়াঃ'—এক মিথ্যার আবরণে সব আবৃত হয়ে আছে। সেই মহাসম্পদের কথা আমাদের স্মরণ করালেন স্বামী বিবেকানন্দ। প্রায় একশ বছর আগে শিকাগোর ধর্মমহাসভায় দাঁড়িয়ে তিনি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সেই বাণী পৃথিবীর মানুষকে শোনালেন—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।" (২।৫)

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।।" (৩।৮)

যে-জ্ঞানবলে ভারতবর্ষের ঋষিদের অন্ধকারের পারে অমৃতপুরুষের এই দর্শন, সেই জ্ঞানই আমাদের শাস্ত্র। এই শাস্ত্রের তিনটি প্রস্থান ঃ শ্রুতি-প্রস্থান—যা হলো বেদ বা উপনিষদ্, স্মৃতি-প্রস্থান—যা হলো শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং যুক্তি বা তর্ক-প্রস্থান—যেটি হলো ব্রহ্মসূত্র। এই তিন প্রস্থান হিন্দুধর্মের ভিত্তি।

এখন 'হিন্দুধর্ম' বললেই অনেকে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পান, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা হিন্দুধর্মে কোনদিন ছিল না, আজও নেই, ভবিষ্যতেও থাকবে না। এখন 'হিন্দুধর্ম' নামে যে-ধর্ম পরিচিত, আসলে তা ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম। মানব-সভ্যতার আদি লগ্ন থেকে এই ভারতভূমিতে ঋষিরা সনাতন সত্যের দর্শন পেয়েছিলেন। এই সাক্ষাৎ দর্শন তাঁরা মানুষের গোচরে এনেছিলেন। তা থেকেই এই সনাতন ধর্ম। এইভাবেই বেদ বা শ্রুতির সৃষ্টি। 'বেদ' কথাটির অর্থ বিশুদ্ধ জ্ঞান। এই বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের ধর্মের মূল।

এই ধর্মের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো—এই ধর্ম অপৌরুষেয়। এই ধর্মের মূলে কোন পুরুষ নেই। আছে শুধু বিশুদ্ধ জ্ঞান। এই ধর্ম কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা প্রবর্তিত নয়। পৃথিবীর কোথাও এইরকম ধর্ম আর আছে কিনা আমাদের জানা নেই। সব জায়গায় এক-একজন মহাপুরুষ তাঁর অসাধারণ অনুভব দিয়ে এক-একটি ধর্মের প্রবর্তন করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন 'person' নয়, 'principle'। এই মূল 'principle' বা তত্ত্ব এখানে সবার ওপরে স্থান পেয়েছে—কোন 'person' নয়। তারই নাম 'বেদ' এবং তার আরেক নাম 'শ্রুতি'। "শ্রূয়তে এব, ন কেনচিৎ ক্রিয়তে।" ঋষিরা এখানে মন্ত্রের শ্রোতা বা দ্রষ্টা, কর্তা নন। 'ঋষিদর্শনাৎ'। ইংরেজী অনুবাদে তাই বলা হয় 'seer'। তাঁদের দর্শনে যে-সত্য উদ্ভাসিত হয়েছিল সেগুলিই মন্ত্ররূপে শিষ্য-পরম্পরায় রক্ষিত হয়েছে এবং পরবর্তী সময়ে সেগুলিই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সেখানে ব্যক্তিগত বা পুরুষকৃত কোন সংযোজন নেই। যেমন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' শ্রীম-র কোন মৌলিক রচনা নয়। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে যা শুনেছেন তাই লিপিবদ্ধ করেছেন মাত্র। দ্রষ্টারা যা দেখেন তাই শোনান, তাই সে-শাস্ত্রের নাম 'শ্রুতি'।

আমাদের সমস্ত ধর্মের মূল বেদ—'বেদোঽখিলো ধর্মমূলম্'। (মনুসংহিতা, ২।৬)

"প্রত্যক্ষেণ অনুমিত্যা বা যস্তুপায়ো ন বুধ্যতে।
এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা।।"

প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা জ্ঞান অর্জন করি। প্রত্যক্ষকে

ভিত্তি করে অনুমান দ্বারা আমরা জ্ঞানকে বিস্তার করে থাকি। এসব দিয়ে যাকিছু জানা যায় না, তাকে 'বেদ'-এর মাধ্যমে জানা যায়। সেইজন্য তার নাম 'বেদ'। বেদ কোন কল্পনা নয়, কোন অনুমান নয়, সাক্ষাৎ অপরোক্ষ। ইন্দ্রিয় দিয়ে জানা আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সীমাবদ্ধ। বেদ সীমায়িত জ্ঞান নয়, পরোক্ষ জ্ঞানও নয়। অনুভূত সত্যই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ। সাক্ষাৎ বিশেষণটি জানিয়ে দিচ্ছে, সে-জ্ঞান অনুমাননির্ভর নয়। ঠিক যেমন স্বামীজীর চ্যালেঞ্জের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বললেন : "তোকে যেমন দেখছি, তার চেয়েও প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে দেখেছি।" 'তাঁকে দেখা' ইন্দ্রিয়নির্ভর নয়, তার চেয়েও প্রত্যক্ষ। তাই তাকে বলা হচ্ছে সাক্ষাৎ অপরোক্ষ। সেই সাক্ষাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানকে ভাণ্ডার করে রেখে গেছেন ঋষিরা।

বেদ চারটি—ঋক্, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব। অথর্ববেদে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের আলোচনা আছে। নানা ওষুধ, রোগ আরোগ্যের উপায়ও আছে। তাই পাশ্চাত্য গবেষকরা অনেক সময় এর নাম দিয়ে থাকেন 'popular religion'—জনপ্রিয় ধর্ম অর্থাৎ সর্বসাধারণের ধর্ম। অন্য বেদগুলি 'priestly religion'—পৌরোহিত্যের ধর্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। কিন্তু বেদকে আমরা প্রাচ্যবাসীরা অখণ্ড বলেই জানি। এই অখণ্ড বেদ 'ত্রয়ী' নামে প্রচলিত। বেদে তিনধরনের মন্ত্র আছে—(১) পদ্যাত্মক, (২) গদ্যাত্মক ও (৩) গানাত্মক। ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি পদ্যাত্মক। 'ঋক্' শব্দটিকে ইংরেজীতে বলা হয় 'verse' বা মন্ত্র। এই পদ্যাত্মক মন্ত্রগুলি দশটি মণ্ডলে ভাগ করা হয়েছে। এই দশটি বিভাগে নানা মন্ত্রে নানা দেবতার কথা বলা হয়েছে। ঋগ্বেদের মূল মন্ত্রগুলিই প্রধানত যখন সুরে গান করা হয়, তাকেই বলে 'সাম'। এছাড়াও সামবেদের নিজস্ব কিছু মন্ত্র আছে। যজ্ঞের গদ্যাত্মক বিবরণ যজুর্বেদ। যজুর্বেদের আবার দুটি ভাগ—শুক্ল যজুর্বেদ এবং কৃষ্ণ যজুর্বেদ। অথর্ববেদও এর সঙ্গে যুক্ত। কারণ, তাও পদ্য-গদ্যাত্মক। শুধু তুক্‌তাক বা ওষুধ-বিষুধ নয়, ব্রহ্মতত্ত্ব তথা উপনিষদ্ সবচেয়ে গভীরভাবে আলোচিত হয়েছে এই অথর্ববেদে। বেদের অনেক মন্ত্র বা তার উৎস অনেক সময় পাওয়া যেত না। সংস্কৃত কলেজের স্বর্গত অধ্যাপক দুর্গামোহন ভট্টাচার্য একবার ওড়িশায় বেড়াতে গিয়ে অথর্ববেদের পৈপ্পলাদ শাখার সন্ধান পান। 'পৈপ্পলাদ' নামটি কেবল শোনা যেত, কেউ তার সন্ধান পায়নি এতদিন। সেটি উদ্ধার হলে দেখা গেল, উপনিষদের যে-মন্ত্রগুলি এতদিন পাওয়া যেত না, সেসবই আছে অথর্ববেদে। অথর্ববেদ সেহিসাবে 'ব্রহ্মবেদ'।

প্রাচীনকালে যে যজ্ঞ হতো, সেই যজ্ঞে চারবেদের প্রতিনিধিরাই থাকতেন। ঋগ্বেদের প্রতিনিধিকে বলা হতো যজ্ঞের 'হোতা'। তিনি মন্ত্র পাঠ করে করে দেবতাকে 'আহ্বান' করতেন। সামবেদের প্রতিনিধি মন্ত্রগান করতেন। তাঁকে বলা হতো 'উদ্গাতা'। তারপরে যজুর্বেদের পুরোহিত যজ্ঞ রচনা করতেন। তাঁকে বলা হতো 'অধ্বর্যু'। অথর্ববেদের পুরোহিত থাকতেন সব শেষে। তাঁর কাজ ছিল ঐ তিন পুরোহিতেরই ভুলভ্রান্তি সংশোধন। অথর্ববেদের পুরোহিত 'ব্রহ্মা' নামে অভিহিত হতেন। তাঁর স্থান ছিল সবার ওপরে।

শ্রুতির তত্ত্বকে জীবনে প্রয়োগের জন্য যে বিধিবিধান রচিত, তারই নাম 'স্মৃতিশাস্ত্র'। একে ধর্মশাস্ত্রও বলা হয়। তেমনি সংক্ষেপে সূত্রাকারে রচিত সেই শ্রুতির তত্ত্বকে যুক্তি বা তর্ক দিয়ে বোঝার জন্য 'তর্ক-প্রস্থান' বা ব্রহ্মসূত্রের উদ্ভব। এই হলো সনাতন ধর্মের তিনটি প্রস্থান।

চার বেদের পরে আছে ইতিহাস-পুরাণ। একে 'পঞ্চম বেদ' বলা হয়। বেদবিহিত যজ্ঞকর্মের অনেক জটিলতা আছে। তার জন্য নানা প্রস্তুতি লাগে, উপকরণ লাগে। সেই কর্মের ভার ন্যস্ত ছিল ব্রাহ্মণদের ওপর। স্ত্রী বা অব্রাহ্মণদের সেই যজ্ঞকর্মে অধিকার দেওয়া হয়নি। কারণ, সকলের পক্ষে নিখুঁতভাবে বেদবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান বা মন্ত্র উচ্চারণ সম্ভব নয়। কিন্তু শাস্ত্র কাউকেই বঞ্চিত করেনি। বেদের সেই পরমতত্ত্বকে আপামর জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার জন্যই এই পঞ্চম বেদের সৃষ্টি। বেদে যে-তত্ত্ব ছিল বিমূর্ত বা 'abstract', ইতিহাস-পুরাণে সেই তত্ত্বই মূর্ত বা 'concrete' হয়ে শরীরধারণ করেছে। সত্যস্বরূপ যিনি, তিনি দেহধারণ করে রামরূপে, কৃষ্ণরূপে আমাদের মধ্যে কেমন করে অবতীর্ণ হন, ইতিহাস-পুরাণে তা বর্ণিত হয়েছে। সেই ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'মহাভারত'। 'মহত্ত্বাৎ ভারবত্ত্বাৎ চ'। মহাভারতের ব্যাপ্তিও যত, গভীরতাও তত। সেই ইতিহাসের বা পঞ্চম বেদের সঙ্গে যুক্ত এই 'ভাগবত' মহাপুরাণ। মহাভারতের যেখানে শেষ, ভাগবতের সেখানে শুরু।

ভাগবতের রচয়িতারূপে যাঁর নাম প্রচলিত, তাঁর নাম বেদব্যাস। বেদ, অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত—এসমস্ত গ্রন্থই তাঁর নামে প্রচলিত। 'ব্যাস' একটি নাম। এই ব্যাস কে? ব্যক্তি ব্যাসের কথা কিছুই জানা যায় না, 'ব্যাস' কথাটির অর্থ বিস্তার। ব্যাসের বিপরীত কথা 'সমাস' অর্থাৎ সংক্ষেপ। সংক্ষিপ্তকে যিনি বিস্তার করে বলেন, তার নাম ব্যাস। এই অর্থে ব্যাস একটি সাধারণ সংজ্ঞা। বেদব্যাস বেদকেই বিস্তার করেছেন। এত রচনা করেও তাঁর তৃপ্তি হয়নি। তাই তিনি ভাগবত রচনা করেছেন। ভাগবতের সঙ্গে তাঁর পুত্র মহর্ষি শুকদেবও জড়িত।

এই ব্যাসের আবির্ভাবকাল‌ও কেউ জানে না। বেদ



সর্বপ্রথম কবে লিপিবদ্ধ হয়েছিল তা আজও সঠিকভাবে জানা যায় না। অতীত ভারতবর্ষ কোনদিনই সন-তারিখের ইতিহাসে আগ্রহী ছিল না। নানা উপায়ে গবেষণা করে এই সময়কাল নির্ধারণ করার চেষ্টা হয়েছে। বালগঙ্গাধর তিলক, বিদেশী গবেষক জ্যাকোবি প্রমুখ অনেকে এ নিয়ে গবেষণা করেছেন। কিন্তু তাঁদের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে হাজার হাজার বছরের ব্যবধান।

মহাভারতের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষে ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রধান দুটি কুল নির্মূল হয়ে গেল। কুরুপাণ্ডব বংশের একটি মাত্র শিখা বা সলতে তখন জ্বলছে, তিনি মহারাজ পরীক্ষিৎ—যাঁকে উত্তরার গর্ভে স্বয়ং শ্রীভগবান রক্ষা করেছিলেন। সেই মহারাজ পরীক্ষিৎ জীবিত আছেন, কিন্তু তাঁর নামেও মৃত্যুর পরোয়ানা এসে গেছে। আর মাত্র সাতটি দিন তাঁর জীবনে অবশিষ্ট আছে। সাতদিন পরেই তক্ষকের দংশনে তাঁর মৃত্যু হবে। মৃত্যুভয় পরীক্ষিতকে ঘিরে ফেলেছে। এমন সময় তাঁর শিয়রে এসে দাঁড়ালেন ব্রহ্মর্ষি শুকদেব। সাতদিন ধরে ভাগবত শোনালেন তাঁকে। তাই এখনো ক্রমান্বয়ে সাতদিন ভাগবত শোনার নিয়ম। 'ভাগবত-সপ্তাহ' কথাটি এথেকেই প্রচলিত হয়েছে।

চারিদিকে মৃত্যু ঘিরে আছে—'সর্বতো মৃত্যুঃ'। অথচ আমরা তাঁকে ভুলে আছি। গীতায় শ্রীভগবান বলছেন ঃ "অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।" (৯।৩৩) —অনিত্য দুঃখময় এই সংসারে এসে আমাকেই ভজনা কর। কিন্তু তবু আমরা তাঁকে ভজনা করি না। ভাগবতেও বড় সুন্দরভাবে বলা হয়েছে—'সর্বতো মৃত্যুঃ'। (১১।২।২) মৃত্যু চতুর্দিকে ঘিরে আছে। "কো নু রাজন্ ইন্দ্রিয়বান্ মুকুন্দচরণাম্বুজং ন ভজেৎ।" (ঐ)—হে রাজন, বোধবুদ্ধি-সম্পন্ন এমন কে আছেন, যিনি শ্রেষ্ঠ দেবগণেরও উপাস্য সেই মুকুন্দচরণকে ভজনা না করে থাকতে পারেন? পরীক্ষিত শুকদেবকে আকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করছেন ঃ সাতদিন পরেই তো আমার মৃত্যু নিশ্চিত, আমার সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। এখন এই মৃত্যুভয় থেকে আমি কি করে মুক্তি পাব? শুকদেব উত্তরে বললেন ঃ "শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়্।" (ঐ, ২।১।৫)—যদি অভয় চাও এই ভাগবত-কথা শ্রবণ কর, কীর্তন কর, স্মরণ কর। বেদান্তেও ব্রহ্মোপলব্ধি সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেটি বেদান্তের মূল কথা—"শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২।৪।৫) ব্রহ্মোপলব্ধির চরম ফল অভয়। "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" (ঐ, ৪।২।৪)—যাজ্ঞবল্ক্য বারবার বলছেন। উপনিষদ্ বলছেন ঃ "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচন।।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২।৪) "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কুতশ্চন।।" (ঐ, ২।৯) যাঁর পরমপ্রাপ্তি হয়েছে, কোনকিছু থেকে বা কারো কাছে থেকে কখনো তাঁর কোন ভয় নেই। ভারতবর্ষে সন্ন্যাসের মন্ত্রেও এই অভয়ের কথা আছে। সন্ন্যাসীরা সর্বলোককে অভয় দিতে পারেন। তাঁদের কাছ থেকে কারো কোন ভয় নেই, ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। শুকদেবও তাই পরীক্ষিৎকে বললেন ঃ যদি অভয় চাও শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ কর। শ্রুতিতেও বলা হচ্ছে—"শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"—শোনা, মনন করা এবং তাঁতে ডুবে যাওয়া। সমস্ত বেদে—চতুর্বেদ এবং এই পঞ্চম বেদে সেই একই সুর ঝঙ্কৃত হয়েছে। ভাগবতে মননের স্থলে 'কীর্তন' কথাটি এসেছে। নিদিধ্যাসন এখানে নিরন্তর স্মরণের রূপ নিয়েছে।

পরীক্ষিৎ গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনে বসে ভাগবত শুনছেন। নিরম্বু উপবাসে আছেন সাতদিন ধরে। জল পর্যন্ত তিনি ত্যাগ করেছেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালা বড় জ্বালা। দেহধারী জীব মাত্রই তা জানে। কিন্তু পরীক্ষিৎ শুকদেবকে বলছেন ঃ "নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।/ পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং হরিকথামৃতম্।।" (১০।১।১৩) —দুঃসহ ক্ষুধা-তৃষ্ণার কোন বোধ আমার নেই। জল পর্যন্ত ত্যাগ করেছি, তার জন্যও এতটুকু কষ্টবোধ আমার নেই। আপনার শ্রীমুখ থেকে ঝরে পড়া হরিকথামৃত পান করে আমি পূর্ণতৃপ্ত হয়ে আছি। এই পূর্ণতৃপ্তি নিয়ে সেদিন হরিকথা শুনেছিলেন পরীক্ষিৎ। মৃত্যুভয় থেকে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি শ্রীহরির পরম শান্তিময় অভয় চরণ লাভ করেছিলেন।

কার সেই চরণ? ঋগ্বেদে তাঁর সমন্ধে বলা হয়েছে—"একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।" (১।১৬৪।৪৬) পরমতত্ত্ব সেই একই। সেই একই 'সৎ', বিভিন্ন নামে তাঁকে বলা হয়। কখনো তিনি 'অগ্নি' নামে, কখনো 'বায়ু' নামে, কখনো 'যম' ইত্যাদি নামে তিনিই অভিহিত হন। "একং বা ইদং বিবভূব সর্বম্।" সেই একই তিনি বহু হয়েছেন। এগুলি ঋগ্বেদের উদ্‌ঘোষণ। ভাগবতেও সেই একই সত্যের অনুসন্ধান। "সত্যং পরং ধীমহি।" সেই পরম সত্যকেই আমরা খুঁজছি। তাঁরই ধ্যান করছি। ভাগবতের প্রথম শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ "জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতঃ"—এই জগতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় যাঁর থেকে হচ্ছে, যিনি জগতে সমস্ত কিছুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছেন, যাঁর থেকে ব্যতিরিক্ত রূপে আর কিছুই থাকে না। 'অন্বয়' এবং 'ব্যতিরেক'—এই দুই ভাবেই খুঁজতে হয় তাঁকে। তাঁরই স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলা হচ্ছে ঃ "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।/ ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।" (ভাগবত, ১।২।১১) অদ্বয়জ্ঞানই হচ্ছে একমাত্র তত্ত্ব। কোন জায়গায় তিনি

'ব্রহ্ম', কোন জায়গায় 'পরমাত্মা', আবার কোথাও তিনি 'ভগবান্'। এই তিন শব্দে তিনি শব্দিত বা কথিত হয়েছেন। কিন্তু তত্ত্ব হলো সর্বত্রই 'জ্ঞানম্ অদ্বয়ম্'। বেদে, পঞ্চম বেদে সেই একই তত্ত্ব উৎকীর্ণ হয়ে আছে।

অনেকে মনে করেন, ভাগবত শুধু ভক্তিরই শাস্ত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। তাই বলা হয়—"সর্ববেদান্ত সারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।" (১২।১৩।১৫)—ভাগবত সর্ব-বেদান্তের সারতত্ত্বের পরমপাবনী ধারা। ভাগবত পড়লেই সর্ববেদান্তের সার লাভ করা যায়। এরই আলোচনা দ্বারা আমরা পবিত্র হতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বলেছেন—ভক্তি, ভক্ত, ভগবান, তাঁরই আলোচনা। কলিযুগে এই হলো ধর্ম। শ্রুতির যে কঠিন কঠোর তত্ত্ব, ভাগবতে (১।১।৩) তাঁরই পাবনী ধারার প্রবাহ বয়ে যাচ্ছে।

"নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।।"

'নিগম' অর্থাৎ বেদ। বেদকে 'কল্পতরু' বলা হচ্ছে, কারণ বেদ সবকিছু দিতে পারে। যিনি যেমন চাইবেন—পুত্রার্থীর জন্য পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, স্বর্গকামনা যিনি করবেন তাঁর জন্য নানা যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি সবকিছুরই বিধান আছে বেদে। আবার মোক্ষার্থীর জন্য পরমতত্ত্ব লাভের নির্দেশ আছে বেদে। ভাগবত সেই বেদকল্প তরুর গলিত অর্থাৎ প্রবহমান সুপক্ক ফল। এই ফল আবার শুকপাখি ঠুকরে দিয়েছে, সুতরাং অমৃতরস নিঃসৃত হচ্ছে।

সকলেই সেই রস আস্বাদন করতে পারেন। সেই রসামৃত প্রবাহের অংশীদার সকলেই হতে পারেন। তবে ভাবের স্রোতে একেবারে ভেসে গেলে হবে না, তার তাৎপর্য অনুভব করতে হবে। ভাগবত দুটি শব্দে অধিকারী নির্দিষ্ট করেছেন—'রসিক' এবং 'ভাবুক'। "রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।" শুধু রসগ্রহণ করলেই হবে না, ভাবুক হতে হবে। তবেই এই রসের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব অনুধাবন করা যাবে। পঞ্চম বেদ সেই পরমতত্ত্বকে সমস্ত লোকের কাছে ছড়িয়ে দিয়েছে। কোথাও এতটুকু কার্পণ্য, কমতি বা ঘাটতি হয়নি। 'জ্ঞানম্ অদ্বয়ম্'—সেই তত্ত্বকেই রসের দ্বারা জারিত করে, স্বাদু করে পরিবেশন করেছে ভাগবত। তাই "স্বাদু স্বাদু পদে পদে"। সংসারের এই মরুতে বিরসের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে আমাদের জিহ্বা কলুষিত হয়ে গেছে। কোন জিনিসের আমরা স্বাদ গ্রহণ করতে পারি না। ভাগবত আমাদের সকলকে আহ্বান করছেন ভক্তিরসে জারিত এই সুস্বাদু ফলের আস্বাদ নেওয়ার জন্য। আমরা যেন সেই স্বাদ গ্রহণের অধিকারী হই। ভগবান আমাদের যেন সেই অমৃতরস গ্রহণের অধিকারী করেন। কারণ, তাহলেই যাগযজ্ঞাদি কোন জটিল ক্রিয়াকলাপ না করেই আমরা সেই পরম অদ্বয়তত্ত্ব লাভ করতে পারব। ভাগবত বলছেন ঃ "যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।/ মুকুন্দসেবয়া যদ্বৎ তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি।।" (১।৬।৩৬) যাগযজ্ঞ ইত্যাদির বহু বিধি-নিষেধ। একটু ত্রুটি হলেই সর্বনাশ। যোগে যম-নিয়ম-প্রাণায়াম ইত্যাদির কঠিন সাধনা। কাম-লোভ-হত জীব আমরা যদি মুকুন্দ ভজনা করতে পারি, তাঁর সেবা করতে পারি—তাহলেই চিত্তে এমন পরম প্রশান্তি লাভ করব। যা অন্য কোন সাধনার দ্বারা লাভ করা যায় না। ভগবানের নির্দিষ্ট 'ভাগবত পথ' এটি। অন্য কোন অনুষ্ঠানের এখানে প্রয়োজন নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন—কলিযুগে ভক্তিপথই রাজপথ। ভাগবতের একটি শ্লোকেও বড় সুন্দরভাবে বলা হয়েছে—"ধাবন্ নিমীল্য বা নেত্রে ন স্খলেৎ ন পতেদিহ।" (১১।২।৩৫) ভগবানের নির্দিষ্ট এই পথে স্খলন বা পতনের কোন ভয় নেই। চোখ বুজেও যেকেউ চলে যেতে পারে।

ভগবান শ্রীহরির নির্দিষ্ট এই ভাগবত পথ শুকদেব এবং পরীক্ষিতের মাধ্যমে তিনি স্বয়ং নিখিল জগৎকে জানিয়েছেন। যাকে বেদান্তে অধিষ্ঠান-রূপে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনিই এখানে শ্রীকৃষ্ণ—"কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"। (ঐ, ১।৩।২৮) উদ্ধবকে শ্রীভগবান স্বয়ং অপ্রকট হওয়ার কালে বলেছিলেন—'পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ' (ঐ, ১।৩।৪৪)—এখন পুরাণ-সূর্য উদিত হয়েছে। সেই পুরাণই শ্রীমদ্ভাগবত-রূপ মহাপুরাণ, যাকে বেদান্তের অধিষ্ঠান-রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ভাগবতের দশম স্কন্ধটিকেই বৈষ্ণবরা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেন। কারণ, 'দশমে দশমাশ্রয়ঃ'। এই 'আশ্রয়'-তত্ত্বই চরম তত্ত্ব। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা সমস্ত বর্ণনা করা হয়েছে এই দশম স্কন্ধে। আর একাদশ স্কন্ধে সমস্ত বেদ-বেদান্তের জ্ঞান যেন একত্রিত করে তার নির্যাস দেওয়া হয়েছে।

যেমন জীবনের শাস্ত্র হলো শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, যেখানে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে কিভাবে চলতে হবে জীবনে, তাঁর নির্দেশ দিয়েছেন শ্রীভগবান; তেমনি অন্তিমের বা মরণের শাস্ত্র হলো শ্রীমদ্ভাগবত। এখানে মৃত্যুসংসারসাগর কিভাবে পার হওয়া যায় তার পথ বলে দিয়েছেন শ্রীভগবান। এছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই। কারণ, নিজেই বলেছেন গীতায় ঃ "তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।" (১২।৭) তাই মৃত্যুভয় থেকে ত্রাণ পেতে হলে, অভয় লাভ করতে হলে প্রয়োজন তাঁর চরণে শরণ গ্রহণ। [ক্রমশ]

• অনুলিখন ঃ শুভ্রা দাশগুপ্ত •

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর ভবনাথ

'উদ্বোধন'-এর গত কার্তিক ১৪০৭ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী'তে গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর ভবনাথ' শীর্ষক চিঠিটি পড়লাম। এতে বেশ কিছু তথ্য তিনি সন্নিবিষ্ট করেছেন এবং ভক্ত ভবনাথ বিষয়ে আরো কিছু জানার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর 'ব্যক্তিপরিচয়' অধ্যায়ে (২য় সং, পৃঃ ১৩৩৪) ভবনাথ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবরণ আছে, যা থেকে ভবনাথ সম্বন্ধে সাধারণের অজানা কিছু তথ্য পাওয়া যায়। সেটি এখানে উদ্ধৃত করছি।

"ভবনাথ [ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়] (১৮৬৩-১৮৯৬)—ঠাকুরের গৃহী ভক্ত ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বরাহনগরে বর্তমান অতুলকৃষ্ণ ব্যানার্জী লেনে জন্ম। পিতা রামদাস ও মাতা ইচ্ছাময়ী দেবী। পিতামাতার একমাত্র সন্তান ভবনাথ যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই নানা জনহিতকর কার্যে নিযুক্ত থাকিতেন। ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত, নরেন্দ্রনাথের সহিত বন্ধুত্ব, শিক্ষকতা করা এবং সর্বোপরি ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যলাভ তাঁহার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার আন্তরিকতা দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাদিগকে 'হরিহরাত্মা' বলিতেন। ইহা ব্যতীত ঠাকুর কখনো নরেনকে 'পুরুষ' ও ভবনাথকে 'প্রকৃতি' বলিতেন। তিনি উভয়কেই 'নিত্যসিদ্ধ' ও 'অরূপের ঘর' বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। ঠাকুরের দেহরক্ষার পর বরাহনগরে মঠের জন্য মুনশিদের ভুতুড়ে বাড়ি মাসিক ১০ টাকা ভাড়ায় ভবনাথ যোগাড় করিয়া দেন। তিনি সুগায়ক ছিলেন, বহুবার ঠাকুরকে গান শুনাইয়াছিলেন। 'নীতিকুসুম' ও 'আদর্শ নারী' তাঁহার রচিত দুইখানি গ্রন্থ। তাঁহারই আহ্বানে বরাহনগরের অবিনাশ দাঁ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাঁহার ক্যামেরায় বিষ্ণুমন্দিরের দালানে সমাধিস্থ অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বহুলপ্রচারিত ছবি তোলেন। তিনি ঠাকুরকে ধ্রুবর একটি ফটো উপহার দিয়াছিলেন, সেটি বর্তমানে দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ঠাকুরের ঘরের শোভাবর্ধন করিতেছে। বরাহনগর মঠ প্রতিষ্ঠার সময় আর্থিক সাহায্য না করিলেও অন্যদিক দিয়া তিনি অনেক সাহায্য করিয়া-ছিলেন। ঠাকুরের তিরোধানের পর তিনি বি. এ. পাশ করেন। পরে বিদ্যালয় পরিদর্শনের চাকুরি লইয়া কলকাতার বাহিরে চলিয়া যান। ফলে বরাহনগর মঠের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ক্ষীণ হইতে থাকে। তিনি ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে ভবানীপুরে বিহারী ডাক্তার রোডে বসবাস করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার একমাত্র কন্যা প্রতিভার জন্ম হয়। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে কালাজ্বরে আক্রান্ত হইয়া তিনি রামকৃষ্ণ দাস লেনের ভাড়াবাড়িতে দেহত্যাগ করেন।"

আশা করি, উপরি উক্ত তথ্যে গণেশবাবুর এবং অন্যান্য জিজ্ঞাসুরাও উপকৃত হবেন।

এপ্রসঙ্গে আরেকটি তথ্য নিবেদন করি। শ্রীশ্রীঠাকুরকে একবারই ভবনাথের প্রতি ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বিরূপ মন্তব্য করতে দেখা যায়। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ এর প্রমাণ আছে। সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করেই এই পত্র শেষ করব।

ঘটনার স্থান কাশীপুর উদ্যানবাটী। ২৩ ডিসেম্বর ১৮৮৫। ঠাকুর শ্রীমকে বলছেন ঃ

"লোক বাছা যা বলছ, তা ঠিক। এই অসুখ হওয়াতে কে অন্তরঙ্গ, কে বহিরঙ্গ—বোঝা যাচ্ছে। যারা সংসার ছেড়ে এখানে আছে, তারা অন্তরঙ্গ। আর যারা একবার এসে 'কেমন আছেন মশাই' জিজ্ঞাসা করে, তারা বহিরঙ্গ।

"ভবনাথকে দেখলে না? শ্যামপুকুরে বরটি সেজে এল। জিজ্ঞাসা করলে, 'কেমন আছেন?' তারপর আর দেখা নাই। নরেন্দ্রের খাতিরে ঐরকম তাকে করি, কিন্তু মন নাই।" (ঐ, পৃঃ ১১১৪)

বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
কল্যাণপুর হাউজিং এস্টেট, আসানসোল, বর্ধমান-৭১৩৩০৪

'উদ্বোধন'-এর গত কার্তিক ১৪০৭ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী'তে গণেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিকর ভবনাথ' সম্বন্ধে আরো কিছু সংবাদ জানার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

১৯৮৫ সালে জ্যোতির্ময় বসু রায় 'উদ্বোধন'-এ (৮৭তম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৯২, পৃঃ ৬২২-৬৩১) ভবনাথের বিষয়ে এক মনোজ্ঞ রচনা লিখেছিলেন। তার কিছু অংশ আমার মনে আছে—"ভবনাথ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর শেষ আট বছর বিদ্যালয় পরিদর্শকের সরকারি কর্ম করেন। সেই কর্ম উপলক্ষ্যে তাঁকে কিছুকাল কলকাতার বাইরে থাকতে হয়। কলকাতায় যখন তিনি থাকতেন তখন গুরুভাইদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা করতেন।... কলকাতার বাইরে, বিশেষত পূর্ববঙ্গে থাকার সময়ে তিনি নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ক্রমে হীনস্বাস্থ্য হয়ে পড়েন। ভবনাথের দুই কন্যার মধ্যে একটি—সম্ভবত বড়টি—আড়াই বছর বয়সে মারা যায়। অপর কন্যা শ্রীমতী প্রতিভার বয়স যখন আনুমানিক ছয় বছর, ভবনাথের তখন দেহত্যাগ হয়—দক্ষিণ কলকাতার একটি ভাড়াবাড়িতে। ঘটনার কাল ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দ (সম্ভবত ঐ খ্রীস্টাব্দের প্রথমার্ধের কোন সময়)। আজ থেকে প্রায় দুই দশক আগে শ্রীমতী প্রতিভা (মুখোপাধ্যায়) এক সাক্ষাৎকারে ভবনাথ-স্বামীজীর সৌহার্দ্য উল্লেখ করে বলেন ঃ 'বাবার অবর্তমানে আমার বিয়েতে বেলুড় মঠ থেকে টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল।' ('শ্রীরামকৃষ্ণ-পরিজন ভবনাথ'—সতীশচন্দ্র নাথ, 'উদ্বোধন', ৭২তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৭৭, পৃঃ ৫৮২-৫৮৪)"

স্বামী রামানন্দ
রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম
পোঃ কনখল, হরিদ্বার, উত্তরপ্রদেশ-২৪৯৪০৮

'জ্যোতির্লিঙ্গ ত্র্যম্বকেশ্বর'

'উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ ১৪০৭ সংখ্যায় সম্ভবত একটি তথ্যগত ভ্রান্তি হয়েছে। স্বামী অচ্যুতানন্দ রচিত 'জ্যোতির্লিঙ্গ

ত্র্যম্বকেশ্বর' রচনাটির ৩৩৫ পৃষ্ঠায় মন্দিরটির বর্ণনায় আছে '৭১১.৪ মিটার উঁচু এই মন্দির'। এটি বাস্তবে কিরূপে সম্ভব? আমার মতে অসম্ভাব্যতার কারণগুলি—প্রথমত, ছবিটি দেখে এই অত্যুচ্চতা অনুমিত হয় না। দ্বিতীয়ত, মন্দির-নির্মাণকাল অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে এত উঁচু মন্দির নির্মাণের তথ্যপ্রযুক্তি অনাবিষ্কৃত ছিল এবং তৃতীয়ত, বর্তমানে পৃথিবীর উচ্চতম সৌধ কুয়ালালামপুরের 'Patrons Twin Tower'-এর উচ্চতা ৪৫২ মিটার। এসম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় লেখক মহারাজ কিঞ্চিৎ আলোকপাত করলে পাঠকবর্গের সন্দেহের নিরসন হয়।

সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায়
এস. বি. গড়াই রোড বাই লেন, রাসডাঙা
আসানসোল-৭১৩৩০১

লেখকের উত্তর

সুধীরকুমার চট্টোপাধ্যায় ত্র্যম্বকেশ্বর-মন্দিরের উচ্চতার মাপ সম্পর্কে আমার লেখা '৭১১.৪ মিটার'-এর বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কোন তীর্থ দর্শন করার সময় বা ফিরে এসে আমি এইসব উচ্চতা, দৈর্ঘ্য ইত্যাদি বিষয় স্থানীয় পাণ্ডার মুখে শুনে অথবা ভ্রমণ-সংক্রান্ত পুস্তক পড়ে লিখে রাখি। আমার ডায়েরিতে ঐ কথাই লেখা আছে দেখলাম। তবে আমার এখন মনে হচ্ছে, এটি ৭১১.৪ ফুটই হবে। কারণ, আমি ১৯৮৮ সালে ত্র্যম্বকেশ্বরে গিয়েছিলাম। সেই সময়ের ছোট ডায়েরিতে পেনসিলে লেখাটা একটু অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। ওটা '৭১১.৪ ফিঃ' না '৭১১.৪ মিঃ' সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। 'ভ্রমণসঙ্গী' বইতে দেখলাম উচ্চতা লেখা নেই। কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলাম তাও মনে নেই। তবে মনে হয় এটি 'ফিট'ই হবে।

স্বামী অচ্যুতানন্দ
রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ, হাওড়া-৭১১ ২০২

'ডিজাইনার বেবি' কখনো সম্ভব নয়

'উদ্বোধন'-এর গত শারদীয়া ১৪০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত 'হিউম্যান জেনোম প্রকল্প : জীবন-পুঁথির সহজপাঠ' শীর্ষক প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। আমার মতে, লেখক 'ডিজাইনার বেবি' বলতে যা বুঝিয়েছেন, তা কখনোই সম্ভব নয়। 'সন্তান হবে রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী, তার থাকবে আইনস্টাইনের বুদ্ধি, শেক্সপীয়রের কাব্যচেতনা এবং ব্র্যাডম্যানের ক্রীড়া-কুশলতা'—এগুলি আগামীদিনের পিতামাতাদের নিকট বেশ শ্রুতিমধুর। কিন্তু এটি মেনে নিলে কর্ম এবং কর্মফলের তত্ত্ব ম্লান হয়ে যায় না কি? তাছাড়া আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, একমাত্র অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান ব্যতীত সমস্ত বিজ্ঞানই জড়বস্তুর বিশ্লেষণ করে। শরীর এবং চৈতন্য পরস্পর পৃথক। আমাদের বংশগতি-বিজ্ঞান কেবল চৈতন্যালোকে আলোকিত জড়শরীরের বিজ্ঞান। মানসিক ক্রিয়ার কোন ব্যাখ্যা এই বিজ্ঞানের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। লেখকও সেকথা স্বীকার করেছেন। যাইহোক, জিনলিপির কল্যাণে এই রক্তমাংসের শরীর যে 'রূপে লক্ষ্মী' হয়ে উঠবে— এমন আশা করা যেতেই পারে। বার্ধক্যকেও এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। কারণ, 'রূপ' এবং 'বার্ধক্য' উভয়ই শরীরের বিষয়। কিন্তু ব্র্যাডম্যানের মতো ক্রীড়াকুশলী বা আইনস্টাইনের মতো বুদ্ধিমান হতে গেলে যে-ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন, তা বিজ্ঞানীরা অনাগত শিশুর মধ্যে সংক্রমণ করবেন কিভাবে? ইচ্ছাশক্তি তো সম্পূর্ণ মানসিক বিষয়। ইচ্ছাশক্তি বা ঐজাতীয় কোন কিছুর কথা ছেড়ে দিলেও বলা যেতে পারে, জিনলিপির মাধ্যমে অনাগত শিশুকে শরীরাতীত কোন গুণের অধিকারী করা সম্ভব নয়। সম্ভব হতে পারত যদি মানসিক বিষয়গুলির (যেমন ইচ্ছাশক্তি) 'কারণ' শরীরে বিদ্যমান থাকত। সুতরাং অনাগত সন্তানকে 'রূপে লক্ষ্মী' করা গেলেও 'গুণে সরস্বতী' করা অসম্ভব বলেই আমার ধারণা।

এখন বিজ্ঞানীরা যদি দাবি করেন যে, জিনের মাধ্যমেই এটি সম্ভব, তাহলে কিভাবে সম্ভব তা তাঁদের ব্যাখ্যা দিতে হবে অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে বলতে হবে আনুবীক্ষণিক ডি. এন. এ.-অণুর মধ্যে শরীরাতীত গুণাবলী কিভাবে লুকিয়ে থাকে? এই প্রশ্ন শুধু আমার নয়; স্বামী বিবেকানন্দও বিজ্ঞানীদের কাছে এই প্রশ্ন রেখেছিলেন : "মানসিক সংস্কার শরীরে বাস করে—ইহার প্রমাণ কি?" ('বাণী ও রচনা', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০০)

অভিজিৎ বৈদ্য
কৃষ্ণরামপুর, আগুতি
দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা-৭৪৩৩৫২

'ছত্রপতি শিবাজী'

'উদ্বোধন'-এর গত শারদীয়া (আশ্বিন ১৪০৭) সংখ্যায় জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তথ্যবহুল 'ছত্রপতি শিবাজী' পড়ে যারপরনাই আনন্দিত হলাম। দেশসেবকরা এই লেখাটি পড়ে কিছু জ্ঞান আহরণ করতে পারেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, স্বাধীনতার অর্ধ-শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, কিন্তু জড়, ভ্রান্ত নেতৃত্বের অন্ধ অনুশাসন ও উৎপীড়নে দেশের মানুষ আজ মূল্যবোধ, ধর্মবোধ, নীতিবোধ ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে। ফলে সর্বত্র রাজনীতির নামে চরম নীতিহীনতার ঘটনা ঘটছে। দলীয় স্বার্থের জন্য আজ দেশব্যাপী মারণযজ্ঞের ছড়াছড়ি। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, দেশের নেতৃবৃন্দ যেন শ্রীরামকৃষ্ণদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ মহাপুরুষদের কর্মধারা, বাণী ও আদর্শ অনুসরণ করেন। তবেই ভারত জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে, নতুবা সম্ভব নয়।

ডাঃ মুচিরাম দাশ মহান্ত
শ্যামনগর, পায়রাচালী, পুরুলিয়া-৭২৩১৩১

অলিম্পিকের আগুন

মানুষ 'চরৈবেতি'র মন্ত্রকে হৃদয়ে ধারণ করে যুগ যুগ ধরে এগিয়ে চলেছে। অলিম্পিকও এগোচ্ছে একই ছন্দে। "Citius, Altius, Fortius"-এর মন্ত্র নিয়ে খেলোয়াড়রাও সামনে এগিয়ে চলেছে। বিশ্বযুদ্ধও এর গতি স্তব্ধ করে দিতে পারেনি। মিউনিখের রক্তস্নানেও মানুষের পা হোঁচট খায়নি।

মানুষের বুদ্ধি 'এক'-এ পৌঁছেছে। শারীরিক সক্ষমতা কি সেই 'এক'কে খুঁজে পাবে? মানুষ তার প্রচণ্ড অপ্রতিরোধ্য গতিবেগ নিয়ে ছুটেছে চৈতন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। ঘাসের বুকে

দাঁড়িয়ে অসীমকে ছুঁতে চেয়েছে। মানুষ অনন্তের অন্ত দেখবে—শূন্য জুড়ে মালা গেঁথে মিলিয়ে দেবে ব্রহ্মের রূপ।

খেলাও ধর্ম। খেলোয়াড় ছুটছে এই ধর্ম পালন করার জন্য। তার শরীরী অস্তিত্ব চলছে ক্ষমতার বাহক হয়ে। রূপকে বাদ দিয়ে অরূপকে ভাবা কি সহজ? রক্তমাংসের মানুষ তার বাস্তব শক্তি দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পূজা করছে। ক্রীড়াক্ষেত্র—যুদ্ধক্ষেত্র, অবতীর্ণ হলে "ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি।"

খেলা দ্রুততর হচ্ছে। 'ফাস্টার'। ব্যাডমিন্টন, টেবিলটেনিস, টেনিস কী অসম্ভব 'ফাস্ট' হয়ে গেছে! টেনিসের 'Ace'-এর পর কি আছে? টমসন, লিলির পরে সোয়েব আখতারের বলের গতিবেগে পরিমাপযন্ত্র কাঁপছে। এ-গতির লক্ষ্যসীমা কোথায়? কোন্ দিগন্তের টেপ-এ গিয়ে বক্ষ স্পর্শ করবে?

Faster, Higher, Stronger-এর 'more' comparative degree-তে রয়েছে আবহমান কাল, superlative হচ্ছে না। অথচ মানুষ superlative-এর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সময় অতিক্রান্ত হয়ে ব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করে ফেলেছে; নিরস্ত হচ্ছে না।

অলিম্পিক ক্রমাগত ভেঙে চলেছে আগের রেকর্ড। গতি তীব্র হতে হতে শেষপর্যন্ত কোন্ বিন্দুতে পৌঁছাবে? সেই বিন্দুই কি 'এক'? Infinite?

'ম্যান' যদি 'সুপারম্যান' হয় তো রক্ষে নেই। মন চায় সেই শেষবিন্দুটি—দৈহিক ক্ষমতা তাকে নিজের সমতলে আনতে চায়। গতি আর শক্তি—এগিয়ে চলার সাধনা—ঈশ্বরসাধনা। তাই জলে স্থলে অন্তরীক্ষে খেলোয়াড়রা তপস্যা করছে।

আদিম ক্রীড়ার সূচনা হয়েছিল খ্রীস্টপূর্ব ৭৪৮-এ। সেযুগের টর্চ নিয়ে সেদিনের দৌড়ানিয়া শতাব্দী পার হয়ে আজো ছুটে চলেছে ক্রীড়াধর্মের নীতি পালন করার জন্য। এ ধর্মপতাকায় জাত, কুল, দেশ-বিদেশের দাগ নেই। অলিম্পিয়া সেই আদি যজ্ঞভূমি। একদিন জিউসের মন্দিরের কুঞ্জবনে সূর্যরশ্মি থেকে আতসকাচের সাহায্যে যে বীরপূজার অগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল, সেই মশাল আজো জ্বলছে 'Citius, Altius, Fortius'-এর মন্ত্র বহন করে।

অ্যান্টওয়ার্প অলিম্পিকের 'ফ্লাইং ফিন' পাভো নুরমি তিনবার অলিম্পিক বিজয়ী; জেসি ওয়েন্স বার্লিন অলিম্পিকের বিস্ময়। লন্ডন অলিম্পিকের ফ্যানি ব্ল্যাঙ্কার্স কোয়েন, মেলবোর্নের বেটি কুথবার্টের মতো মেয়েরা রেকর্ড গড়তে গড়তে চলেছে। রোম অলিম্পিকের একশ মিটারে আমেরিকার নিগ্রো মেয়ে উইলমা রুডলফের পায়ের তলায় ঘটেছিল আলোর নাচন। কুড়ি বছর ধরে অক্ষুণ্ণ ছিল সেই রেকর্ড। লস এঞ্জেলসে এলো ইভলিন অ্যাশফোর্ড; উইলমার রেকর্ড নিশ্চিহ্ন। ইথিওপিয়ার আবেবে বিকিলা খালি পায়েই ম্যারাথনে দৌড়েছে। হাইজাম্পের বার একটু একটু করে উর্ধ্বে উঠছে। এসে গেছে বিতর্কিত সোতোমেয়ার। জলও উত্তাল। অস্ট্রেলিয়ার ডন ফ্রেজার তিনবার অলিম্পিক-বিজয়ী; শেন গোল্ড 'গোল্ডেন গার্ল' হয়ে অবিস্মরণীয় আদর্শ। মার্ক স্পিৎজ অতিমানবের শক্তিতে সাতটি সোনা অবলীলায় তুলে নিয়ে আগামী দিনের প্রেরণা দিচ্ছে।

মানুষ স্থূল থেকে সূক্ষ্মে ছুটবে—বাস্তব থেকে অবাস্তবে—ইন্দ্রিয় থেকে অতীন্দ্রিয় লোকে। ইন্দ্রিয়লোকের উর্ধ্বে দার্শনিকরা চিন্তার সংস্কার করছে—সেই এক ব্রহ্মকে খুঁজছে। দার্শনিক ব্রাডলি বলেন—এই পরমসত্তা ছন্দোবদ্ধ অদ্বিতীয়। মানুষ তার ছন্দোময় পায়ে, ছন্দোবদ্ধ শক্তি দিয়েই বলতে চায়—'আমি সেই'—কালজয়ী অমৃতের সন্তান।

কিন্তু শারীরিক শক্তির বোধহয় সীমা আছে। তাই তো 'ডোপ'—তাই তো শরীরের ভিতরের শক্তিকে আরো জোরাল করবার জন্য ড্রাগের প্রয়োজন। আইন বাঁচিয়ে গোপন সতর্কতা। তাই কি পুরস্কার ফেরত দিতে হচ্ছে? রেকর্ড অস্বীকৃত হচ্ছে? সিডনি অলিম্পিকের প্রারম্ভে সংবাদমাধ্যমে হৈচৈ লেগেছিল—'Performance enhancing drug'-এর তথ্য উন্মোচিত হচ্ছে। ড্রাগের প্রভাবে দৈহিক ক্ষমতা বাড়ছে দশ থেকে পনের শতাংশ। আর এইসব ড্রাগের পরিণাম যে মৃত্যু—তাও বিশ্বাস করতে হয়। এই ড্রাগের বিষে গত কুড়ি বছরে অসংখ্য সাইক্লিস্টের মৃত্যু হয়েছে। অলিম্পিকের ড্রাগ ব্যবহারকারীরা শাস্তি পেয়েছে। অথচ সিডনি অলিম্পিকের আগে এই অপরাধ থেকে মুক্তি পেয়েছে অনেকেই। সোতোমেয়ার অন্যতম। তবে কি ধরে নিতে হবে এখন বিজ্ঞানীরা নানাবিধ শক্তিবৃদ্ধিকারী ড্রাগ আবিষ্কার করবে এবং খেলোয়াড় তৈরি হবে ল্যাবরেটরিতে? শোনা গেছে—Alice Spring হসপিটাল থেকে একহাজার Vial EPO চুরি হয়েছে। স্পেকুলেশনে বলেছে—এই চুরি সিডনি অলিম্পিকের সঙ্গে জড়িত। EPO মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্ল্যাকমার্কেট করতে পারে। কারণ, EPO ইঞ্জেকশন শরীরে এমনভাবে মিলিয়ে যায়—যা নাকি ডোপিং টেস্টে ধরা পড়ে না!

তবুও অলিম্পিক চলবে—প্রীতির গান গেয়ে—বিশ্বশান্তির মোহনার দিকে। অলিম্পিক ছুটবে—এক শতাব্দী থেকে আরেক শতাব্দীতে; খেলোয়াড় বলবে—"The important thing is not the triumph but the struggle." বুকে মশাল জ্বালিয়ে গাইবে—"You, the shining torch of Olympia, ... Lead us to harbour, world peace—with your flame so exalted...."

নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়
রিচি রোড, কলকাতা-৭০০০১৯

বাঙালীর সংস্কৃত উচ্চারণ : ভ্রান্তি ও প্রতিকার

আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে বাঙলা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর ও অনেকাংশে সংস্কৃত-অনুসারী হলেও বাঙালীরা যে সংস্কৃত ভাষাটিকে বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করেন না—একথা অনেকেরই জানা। আমরা যে সে-উচ্চারণ করতে পারি না, তা নয়; আসলে ভুলটা হয় উচ্চারণবিধি সম্বন্ধে ধারণার অভাববশত। আর অশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ শুধু যে শাস্ত্র পঠন-পাঠন ব্যাপারেই বিগর্হিত, তা-ই নয়, ভারতের বিভিন্ন অংশের অনেক মানুষের কতকটা উপহাসের বিষয়ও। অন্যদিকে, স্বামীজী-অনুরাগীমাত্রেই জানেন, স্বামীজী সংস্কৃত ভাষা ও তার স্বকীয় সৌন্দর্যের কত বড় অনুরাগী ছিলেন এবং সঠিকভাবে সে-ভাষাকে উচ্চারণের ওপর কতটা গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি বলেছেন, সংস্কৃত ভাষাকে অবলম্বন করেই ভারতের পুনর্জাগরণ ও বিশ্বদরবারে তার অগ্রণীর স্থান অধিকার করা সম্ভব। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিতাপের বিষয় হলো, বাঙালীর অশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ শুদ্ধ করার কোন লিখিত প্রয়াস বিশেষ

নজরে পড়ে না। সংস্কৃত শাস্ত্রালোচনার ইংরেজী বইতে উচ্চারণবিধি সচরাচর যেমন বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা থাকে, সেভাবে বাঙলাতেও হতে পারে—বিশেষত রামকৃষ্ণ মিশন-প্রকাশিত বইগুলিতে। এবিষয়ে চিন্তাভাবনা বোধহয় কমই হয়েছে; যার একটি দৃষ্টান্ত—সংস্কৃত 'য' অক্ষরটির সঠিক উচ্চারণ হতে পারে বাঙলা লিপিতে 'য়' ব্যবহার করলে; অথচ আমরা সংস্কৃত শ্লোকে 'যেনাহং' লিখি, যেখানে লেখা যেতেই পারত 'য়েনাহং'। (অথচ লিখে থাকি 'ময়া'—না হলে 'মযা'র ব্যাপার হয়ে যেত।)

রামকৃষ্ণ মঠের অত্যুচ্চ ঐতিহ্যে প্রথম থেকেই সংস্কৃত শাস্ত্রচর্চা ও উচ্চারণ তাদের পূর্ণ গৌরবসহ অনুসৃত হয়ে আসছে। সঙ্ঘের 'উদ্বোধন'-এর মতো বহুল-প্রচারিত মুখপত্রে এবিষয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে তা নিশ্চিতভাবেই বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সেই অনুরোধ জানাতেই বর্তমান পত্রের অবতারণা। প্রসঙ্গত অনস্বীকার্য যে, শুদ্ধ উচ্চারণবিদ্যা মূলত গুরুমুখী; তাই উক্ত প্রবন্ধের মাধ্যমে বাঙলা ভাষাভাষী মানুষ তাঁদের উচ্চারণের ত্রুটি সম্বন্ধে অবগত ও শুদ্ধ উচ্চারণ-সৌকর্যের প্রতি কিছুমাত্রও আকৃষ্ট হলে তারপর উপযুক্ত আচার্যের কাছে সম্পূর্ণতর শিক্ষালাভে প্রয়াসী হবেন—এমন আশা করা যায়।

সোমনাথ ভট্টাচার্য
টি. এন. বিশ্বাস রোড, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৭০০০৩৫

'উদ্বোধন পাঠক-সঙ্ঘ' গঠন

'উদ্বোধন'-এর গত পৌষ ১৪০৭ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে আমার 'উদ্বোধন পাঠক-সঙ্ঘ' গঠনের প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আমি কয়েকটি চিঠি পেয়েছি। 'উদ্বোধন'-সম্পাদকের কাছেও অনুরূপ চিঠি এসেছে বলে শুনেছি। বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের (উঃ চব্বিশ পরগনা) সহযোগিতায় ইতিমধ্যেই 'পাঠক-সঙ্ঘ' গঠিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এতে আমি খুব আনন্দিতই হয়েছি। 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রগুলি (অথবা কোন পাঠকগোষ্ঠী) এইরূপ সঙ্ঘ গঠন ও চালু করলে তা সত্যিই খুব আনন্দের বিষয় হবে। এতে অংশগ্রহণকারী সকলেরই উপকার হবে বলে মনে করি। ভবিষ্যতে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য সঙ্ঘগুলির নাম পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখলে ভাল লাগবে।

জলধিকুমার সরকার
গলফ ক্লাব রোড, কলকাতা-৭০০ ০৩৩

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতীক

আমি 'উদ্বোধন' পত্রিকার একজন গ্রাহক। 'উদ্বোধন' পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে বহু অজানা তথ্য জানতে পারি। আমি লক্ষ্য করেছি, এক এক বছর 'উদ্বোধন'-এর প্রচ্ছদ এক এক ধরনের হয় এবং সূচীপত্রে তার ইঙ্গিতও থাকে। কিন্তু প্রচ্ছদে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের যে প্রতীকচিহ্নটি থাকে তার কি অর্থ, সেসম্বন্ধে কিছু উল্লেখ থাকে না। এবিষয়ে 'উদ্বোধন'-সম্পাদক যদি কিছু আলোকপাত করেন তবে উপকৃত হব।

পবিত্রমোহন রায়
দ্বারিকামারী, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতীকচিহ্ন সম্পর্কে ইতিপূর্বে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল জ্যৈষ্ঠ ১৪০১ (মে ১৯৯৪) সংখ্যার ২২৮ পৃষ্ঠায়। তবুও পবিত্রমোহন রায়ের পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে এবিষয়ে সংক্ষেপে কিছু জানাচ্ছি। স্বামী গম্ভীরানন্দ 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে (৯ম পুনর্মুদ্রণ, পৃঃ ২৭৫) এই প্রতীকচিহ্নটি তৈরির ইতিহাস জানিয়েছেন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে আমেরিকার ডেট্রয়েট থেকে নিউ ইয়র্কে ফিরে স্বামী বিবেকানন্দ একদিন প্রাতরাশে বসেছেন। এমন সময় মুদ্রাকর হেনরি ভন হ্যাগেন তাঁর কাছে এসে বলেন: "বেদান্ত সমিতির একটি সার্কুলার ছাপা হচ্ছে; তাতে কোন প্রতীক থাকলে বেশ হয়। এবিষয়ে আপনার কোন পরিকল্পনা আছে কি?" স্বামীজী তখন একটি চিঠির খাম ছিঁড়ে নিয়ে তার মধ্যে সঙ্ঘের প্রচলিত প্রতীকটি এঁকে তাঁকে দিয়ে বলেন: "এটা মাপ মতো এঁকে নিন।" এর কিছুদিন পর ২৪ জুলাই শ্রীমতী ম্যাকলাউডকে এক চিঠিতে স্বামীজী লেখেন: "সূর্য=জ্ঞান, তরঙ্গায়িত জল=কর্ম, পদ্ম=প্রেম, সর্প=যোগ, হংস=আত্মা, উক্তিটি=হংস (অর্থাৎ পরমাত্মা) আমাদিগকে উহা প্রেরণ করুন (তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াৎ)। এটি হৃৎ-সরোবর।" ১৯০১ সালে বেলুড় মঠে কলকাতার জুবিলি আর্ট অ্যাকাডেমির অধ্যাপক ও প্রতিষ্ঠাতা রণদাপ্রসাদ দাশ-গুপ্তকে প্রতীক প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছিলেন: "চিত্রস্থ তরঙ্গায়িত সলিলরাশি কর্মের, কমলগুলি ভক্তির এবং উদীয়মান সূর্যটি জ্ঞানের প্রকাশক। চিত্রগত সর্পবেষ্টনটি যোগ এবং জাগ্রত কুল-কুণ্ডলিনী শক্তির পরিচায়ক। আর চিত্রমধ্যস্থ হংসপ্রতিকৃতিটির অর্থ পরমাত্মা। অতএব কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞান যোগের সহিত সম্মিলিত হইলেই পরমাত্মার সন্দর্শনলাভ হয়। চিত্রের ইহাই অর্থ।" (দ্রঃ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ১৩৬৯, পৃঃ ১৯০)

সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতীকের সারকথা কবিতার আকারে লিখেছি। 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

সার্থক প্রতীক

তরঙ্গায়িত ঢেউ তাতে ফুটন্ত পদ্ম
তার মাঝে স্বর্ণগোলক, সকালবেলার সূর্য।
পদ্ম শেখায় ভক্তি, ঢেউ কর্ম-প্রতীক,
জবাকুসুম সূর্য জেন জ্ঞানের সূর্যদীপ।
পরিবৃত সর্প বিলায় যোগের সুষমা
জাগাইতে অন্তরের সুপ্ত মহিমা।
বিরাজিছে রাজহংস পরমাত্মা রূপে
ভক্তি, কর্ম, জ্ঞান, যোগে তারেই লভিবে।
রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রতীকের সার
বুঝ প্রাণে, আন কর্মে, হইবে উদ্ধার।

জয়শ্রী চক্রবর্তী
ঝিল রোড, নিউল্যান্ড, কলকাতা-৭০০ ০৭৫

মমতাময়ী মা

বিন্দুবাসিনী দেবী

জয়রামবাটীর সন্নিকটস্থ জিবটা গ্রামের জমিদার শম্ভুচন্দ্র রায় ছিলেন শ্রীশ্রীমার মন্ত্রশিষ্য। তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বিন্দুবাসিনী দেবীর উল্লেখ আছে স্বামী গম্ভীরানন্দের 'শ্রীমা সারদা দেবী' (৪র্থ সং, ১৩৭৫, পৃঃ ৪১৭) গ্রন্থে। বিন্দুবাসিনী দেবী ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে ৮৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁর পৌত্র কৃষ্ণচরণ রায়ের সৌজন্যে অধ্যাপক ডঃ তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০ ডিসেম্বর ১৯৯৮ বিন্দুবাসিনী দেবীর এই স্মৃতিকথাটি সংগ্রহ করেন।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

মা ছিলেন মমতাময়ী। তাঁর যে কত বড় অন্তর, তা কথায় কি করে বলব? কথাতে কী তা বোঝানো যায়? বুঝতে হয় মনে। তবু সবাই যখন ধরে, দু-একটা কথা না বলে থাকতে পারি না। কী ভালই না বাসতেন! মা আমায় ডাকতেন 'বৌমা' বলে। মায়ের কথা বলার আগে সেসময়ের কথা একটু বলি—কেমন করে আমরা (জিবটার রায় পরিবার) মায়ের শ্রীচরণে আশ্রয় পেলাম।

আমি পাড়াগাঁয়ের সেকেলে মানুষ, তার ওপর জমিদারবাড়ির বৌ! তখন জমিদারবাড়ির বৌদের বাইরে বেরনোর কোন অনুমতিই ছিল না। বাপের বাড়ি যাওয়াই ছিল বিরাট ঘটনা! বাপের বাড়ি থেকে লোক এসে শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে কথা বলে দিন ঠিক করে যেত; তারপর সেই নির্দিষ্ট দিনে পাঁজি দেখে সময়-ক্ষণ মিলিয়ে শুভমুহূর্তে পালকিতে চেপে বাপের বাড়ি যাত্রা করা হতো। সঙ্গে থাকত পাইক ও বরকন্দাজ।

তখন ঠাকুরতলায় যাত্রা, কীর্তন, কবিগান, বাউল, রামায়ণ ও ভাগবত পাঠ—আরো কত সব হতো; আমাদের জন্য অর্থাৎ জমিদারবাড়ির মেয়েদের জন্য থাকত দালানের এক-পাশে সরু বাখারির জালের পর্দা দিয়ে ঘেরা জায়গা। ঐ ঘেরা জায়গায় বসে নানা অনুষ্ঠান দেখাই ছিল আমাদের নিয়ম। তাতে ভাল দেখতে পেতাম না সব অনুষ্ঠান। কিন্তু কিছু বলারও উপায় ছিল না। তবে জমিদারবাড়ির পুরুষ-মানুষদের ব্যাপার আলাদা। জিবটার জমিদারদের মহাল ছিল নারায়ণপুর, সাতবেড়ে, হলদি, জয়রামবাটী, দেশড়া—এমন বহু মৌজায়। সব গ্রামেই বারোয়ারি পূজা হতো। সেই পূজায় মেলা, গান, যাত্রা লেগেই থাকত। রাত্রে ১০-১১টার সময় যাত্রাপালা শুরু হতো। তাতে নিয়ম ছিল—জমিদারবাবুর পালকি না আসা পর্যন্ত গান আরম্ভ করা যাবে না; যদি কোন গাঁয়ের মোড়ল জমিদারের মত না নিয়ে বা জমিদারের হাজির হওয়ার আগেই গান শুরু করত, তাহলে জমিদারের নায়েব সে-গান মাঝপথে থামিয়ে দিত। জমিদারের পাইক-লেঠেলরা গান ভণ্ডুলও করেছে অনেক সময়। ভিন গাঁয়ে অনুষ্ঠান দেখতে যাওয়ার অনুমতি ছিল না আমাদের।

জিবটা জয়রামবাটীর খুবই কাছের গ্রাম। জয়রামবাটী গ্রামের নানা ঝামেলাতেও যেমন জমিদারদের হাজির হতে হতো, তেমনই ঐ গ্রামের কোন উৎসব-অনুষ্ঠান ঘটলে রায়বাবুদের উপস্থিতি ব্যতীত তা শুরুই হতো না। আমি জয়রামবাটীর কাউকেই চিনতাম না, পরে যখন মায়ের দর্শন হলো, তখন সবাইকে চিনতে লাগলাম।

আমার শ্বশুরমশাই খুব রাশভারি লোক ছিলেন; যেমন চেহারা, তেমনই মেজাজ। তিনি নানা গ্রামে সালিশি করতে যেতেন। গ্রামের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসা করতে যেতেন। শুনেছি, আমার স্বামী (শম্ভুচন্দ্র রায়) প্রথম প্রথম মায়ের ব্যাপারে অত আগ্রহী ছিলেন না; প্রথম স্ত্রী মারা গেলে ওঁর খুব ভাবান্তর এসেছিল। কোন কাজে মন দিতে পারছিলেন না। সদাই যেন মনমরা—আপনভোলা। এর ওপর তাঁর স্ত্রী এক শিশুকন্যা রেখে গিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, যদি না শ্রীশ্রীমার সঙ্গে সেইসময় তাঁর সাক্ষাৎ হতো, তিনি হয়তো সংসার ছেড়ে বাইরে চলে যেতেন।

শুনেছি সেসময়ই তাঁর সঙ্গে পূজনীয়া গৌরী-মার সাক্ষাৎ হয়। তিনি জিবটার শিবমন্দিরে এসেছিলেন। তখন জিবটার রায়পুকুরে খুব পদ্মফুল হতো। গৌরী-মা মায়ের বাড়ির পূজার জন্য রায়পুকুর থেকে পদ্মফুল নিতে এসেছিলেন জিবটায়। তখনি আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। গৌরী-মার কাছেই তিনি মায়ের মহিমা বিশেষ করে শুনেছিলেন। গৌরী-মাই তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনি যদি শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে দেখা করেন তাহলে তাঁর মনের সব অশান্তি দূর হবে এবং তিনি এক নতুন মানুষে পরিণত হতে পারবেন। জমিদারবাড়ির রক্তে অত বিনয় নেই; কিন্তু কেন জানি না, আমার স্বামী গৌরী-মার কথা বিশ্বাস করেই মার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন; পরে আমি যখন ওঁকে দেখেছি, তখন ওঁর মুখে মা ছাড়া কোন কথাই নেই! সব কথাতেই মায়ের প্রসঙ্গ, মায়ের উপদেশ ও নির্দেশ!

জিবটার জমিদারির শরিক ছিল অনেক। তারা সবাই যে মায়ের ভক্ত ছিল তা নয়; উলটে তারা অনেকসময় মাকে কষ্টও দিয়েছে। মায়ের কাছে জাতপাত কিছু ছিল না। হাড়ি, ডোম, বাগদী, মুচি, মুসলমান সবাই আসত। একবার জগদ্ধাত্রীপূজায় লোক খাওয়ানোর সময় ব্রাহ্মণদের দিয়ে পরিবেশন না করানোয় জমিদার ও গ্রামের গোঁড়া ব্রাহ্মণরা খুব অশান্তি করেছিল। মাকে কয়েকবার তার জন্য জরিমানা দিতে হয়েছে। অবশ্য পরে আমার স্বামী যখন জমিদারির দায়িত্বে এলেন, তখন মা যা বলতেন, তাই করতেন।

আমার বিয়ের কিছুদিন পরই উনি আমাকে মায়ের কাছে

নিয়ে গেলেন। জমিদারবাড়ির বৌ পালকি করে মাকে দেখতে গেছি, তা দেখতে গ্রামের বহু লোক এসে জুটেছিল। তাতে আমার খুব লজ্জা হয়েছিল। মাকে দেখতে যাব, তা আবার পালকি করে! আমি আমার স্বামীকে বললাম যে, আমি হেঁটে মাকে দেখতে যাব। উনি তখন বললেন ঃ "তা কি করে হবে? জমিদারবাড়ির মেয়েরা কেউ কখনো হেঁটে অন্য গ্রামে যায় না। যদি একান্তই হেঁটে মাকে দর্শন করতে চাও, তাহলে তোমাকে কলকাতা যেতে হবে।" তাই মায়ের সঙ্গে আমার বেশির ভাগ সময়ই সাক্ষাৎ হয়েছে উদ্বোধনে মায়ের বাড়ীতে। মা জয়রামবাটীতে আছেন জেনেও তাঁর কাছে বেশি যাওয়ার সুযোগ পাইনি। সে-দুঃখ মনে আছেই।

আমার বিয়ের আগেই আমার স্বামী মায়ের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। বিয়ের পরে স্বামীর সঙ্গে মায়ের কাছে কয়েকবার যাতায়াত করেছি; একদিন আমার স্বামী বললেন ঃ "এবার দীক্ষা নেওয়ার সময় হয়েছে। যত তাড়াতাড়ি পার দীক্ষা নিয়ে নাও।" তারপরই মায়ের কাছে দীক্ষা নিলাম; খুব সখ হলো মাকে সোনার অঙ্গুরী দিয়ে প্রণাম করব। দীক্ষার দিন মাকে বললাম ঃ "মা, একটা আবদার করব, আপনাকে সে-দাবি মেটাতে হবে।"

মা শান্ত স্বরে বললেন ঃ "কী বৌমা?" বললাম ঃ "মা, আপনার জন্য এই আংটিটা করিয়েছি। এটা আপনাকে পরে থাকতে হবে। এটা আমার সখ।" মা বললেন ঃ "আচ্ছা বৌমা তাই হবে! তা এসব করতে গেলে কেন?" আমি বললাম ঃ "না মা, আপনি অমত করলে আমরা দুজনেই খুব কষ্ট পাব। আমাদের অনেকদিনের বাসনা।"

আরেকটি বিশেষ ঘটনা আমার মনে আছে। আমার বিয়ের অনেকদিন পরেও সন্তান হয়নি। জ্ঞাতিরা সমালোচনা করত। বাড়ির দোল-দুর্গোৎসবে কোন কাজ করতে দিত না আমায়। বলাবলি করত—আমার সন্তান হয়নি, তাই ঠাকুর-দেবতার কাজ আমি করতে পারব না! এই কথাটা যখন নিজের কানে শুনলাম তখন যে কী কষ্ট হয়েছিল তা আর কী বলব! স্বামীকে বললাম আমায় একবার কলকাতায় নিয়ে যেতে।

মা তখন বাগবাজারে—উদ্বোধনে। আমি বাগবাজার গেলাম মাকে দর্শন করতে। প্রথমদিন কিছু বলতে পারলাম না। দ্বিতীয়দিন গিয়ে মাকে একা পেয়ে আমার মনের দুঃখ সব জানালাম। মা আমাকে শান্ত করে ঘরের ভিতর থেকে একটি গোপালের মূর্তি এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন ঃ "বৌমা, তোমাকে এই গোপালকে দিলাম, তুমি পূজা করো।" মায়ের হাত থেকে গোপাল পেয়ে কী আনন্দই না হয়েছিল! এর পরেই আমাদের পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়।

আগেই বলেছি, আমার স্বামীর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর এক কন্যা ছিল। তার নাম সরোজবাসিনী। আমরা 'সরোজ' বলে ডাকতাম। তার বিয়ে হয়েছিল কোয়ালপাড়ার নফরচন্দ্র কোলের পুত্র ভূতনাথ কোলের সঙ্গে। তার শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বড় ব্যবসায়ী ও ধনী ছিল। কলকাতার বেলেঘাটায় তাদের ব্যবসা ছিল, আবার বাড়িও ছিল। সংসারের ঝামেলায় একসময় সরোজের মন অশান্তিতে ভরে গিয়েছিল। জিবটায় এসে আমাকে জানালে আমি তাকে মায়ের কাছে নিয়ে যাই। মা তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। সেও মায়ের খুব স্নেহের পাত্রী ছিল। প্রায়ই সে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে বাগবাজারে হাজির হতো।

তখনকার জমিদারবাড়ি মানেই লোকলস্কর, পাইক-বরকন্দাজ, লেঠেল-দারোয়ান, দাঙ্গা-মামলা—এসব নিয়েই জমিদাররা মশগুল থাকত। জিবটার জমিদাররাও তার থেকে ভিন্ন নয়। তবে সৌভাগ্য এই যে, এদের মধ্যে কেউ কেউ মায়ের কৃপালাভ করে ধন্য হয়েছে। আমরা নিজেরাই তার প্রমাণ। আমার স্বামীর এক ভাইপো সজনীকান্ত রায়ও (উমেশচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় পুত্র) মায়ের দীক্ষিত সন্তান ছিলেন। তিনি জয়রামবাটীতে ওষুধ দিতেন। হোমিওপ্যাথি ডাক্তার হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি মারা গেলে তাঁর বড় ভাই রজনীকান্ত রায় মায়ের বাড়ির দাতব্য চিকিৎসার দায়িত্ব নেন। তিনি স্বপ্নে মায়ের কাছ থেকে মন্ত্র পেয়েছিলেন।

পরবর্তী কালে মায়ের কোন প্রয়োজন থাকলে তিনি লোক দিয়ে আমার স্বামীকে ডেকে পাঠাতেন। উনি মায়ের ডাক পেলে সব কাজ ফেলে মায়ের কাছে ছুটতেন। তখন রায়বাড়ির জমিদারি সেরেস্তায় গোমস্তা ছিলেন প্রমথ কোঙার। তিনি শিক্ষিত ও ধীরস্থির প্রকৃতির ছিলেন। মায়ের কাছে যখন কোন ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী সন্তান থাকতেন না, অথচ কোন চিঠিপত্র এসেছে তার জবাব দিতে হবে, মা সেকথা আমার স্বামীকে জানালে তিনি আমাদের গোমস্তাবাবুকে নির্দেশ দিয়েছিলেন দু-একদিন অন্তর মায়ের বাড়ি গিয়ে কোন কাজ আছে কিনা খোঁজ করতে। গোমস্তা-বাবু যতদিন জমিদারিতে কাজ করেছেন, ততদিন ঐ দায়িত্বও পালন করেছিলেন। তিনিও মায়ের বিশেষ অনুগত সন্তান ছিলেন।

জিবটার রায়বাড়িতে ও আমাদের জীবনে মায়ের ভূমিকা কথায় বলে শেষ করা যাবে না। শুনেছি, বহু আগে ঠাকুর এ-পথ দিয়ে শিহড় যেতে আমাদের শিবমন্দির-চত্বরে বসেছিলেন। অন্যান্য মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি দর্শন করেছিলেন। তাঁকে দর্শনের সৌভাগ্য আমাদের হয়নি, কিন্তু ঐভাবে তাঁর আশীর্বাদ আমাদের পরিবারে এসেছে বলে আমি বিশ্বাস করি। সেই আশীর্বাদের জোরেই মা আমাদের কোলে ঠাঁই দিয়ে কৃতার্থ করেছেন। মায়ের স্পর্শ পেয়েছি, অফুরন্ত ভালবাসা পেয়েছি। মা সব ভুলত্রুটি ক্ষমা করে সবসময়ই আমাদের তাঁর কোলে তুলে নিতে ব্যস্ত হতেন। তা না হলে আমাদের মতো বদ্ধজীবেরা কী করে তাঁর পাদপদ্ম ছোঁয়ার অধিকারী হই। জয় মা! ❑

শ্রীরামকৃষ্ণ-সূর্যালোক

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

কত হলো?

আজ্ঞে, ছয়ের ঘরে ঢুকে গেছি।

কি করলে? কিভাবে খরচ করলে দিন?

ঠাকুর! জীবনটা শুধুই ভুলে ভরা। ভুলের পর ভুল। এক ভুল থেকে আরেক ভুল।

কিরকম?

এই যেমন, জন্ম! আচ্ছা, জন্ম আমার নিয়ন্ত্রণে নেই। আমার বড় হওয়া! সে তো প্রকৃতির কাজ। বিজ্ঞান বলছে, 'গ্রোথ ফ্যাকটার'। শিক্ষা! সে হলো পরিবারের পরিকল্পনা।

তাহলে? এর কোনটাই তো তোমার হাতে ছিল না।

ঠাকুর! এর পরের সবচেয়ে বড় ভুলটা আমার—সেটা হলো সংসারে প্রবেশ। বলেই মনে হলো, কথাটা ঠিক বলা হলো না। সংসারেই তো মানুষ আসে। এই জগৎটাই তো মানুষের সংসার। শতরকম বৈচিত্র্যের মাঝে মানুষের বিচরণ। পৃথিবীতে প্রবেশ মানেই মানুষের সংসারে প্রবেশ। তাহলে? ভুলটা কোথায়।

বুঝেছি ঠাকুর! ভুল হলো সেইটাই। আসক্তি। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরার অধিকার দেওয়া। আপনি বলেছিলেন ঃ মুক্ত মনে করলেই মুক্ত, বদ্ধ মনে করলেই বদ্ধ। একের পর এক, একের পর এক শৃঙ্খল, সে তো মনেরই রচনা। রচয়িতা কে? অহঙ্কার। অহঙ্কারের নাম 'আমি'। এই 'আমি'-র আসক্তি, 'আমি'-র প্রত্যাশা। 'আশা'। সে একরকম ভাল। মেঘের আশায় আকাশ। চাষার আশা বৃষ্টি। চাতকের আশা স্বাতি নক্ষত্রের জল। মানুষ আশা করে অদৃশ্য কোন শক্তির কাছে। কেউ বলেন 'ঈশ্বর', কেউ বলেন 'ভাগ্য'। প্রত্যাশাই যত হতাশার উৎস। মানুষের প্রত্যাশা ব্যক্তি-মানুষের কাছে, সমাজের কাছে, প্রতিষ্ঠানের কাছে, সরকারের কাছে।

সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক—এক 'আমি'র কাছে আরেক 'আমি'র পারস্পরিক প্রত্যাশা। আমাকে কেউ কিছু দেবে না। আমি কিছু চাই না। চাওয়াটা কমাতে কমাতে শূন্য করে ফেলতে হবে। সে কি সম্ভব? ঠাকুর বলছেন ঃ অবশ্যই সম্ভব। সেই পথটি হলো সমর্পণের পথ। আন্তরিক সমর্পণ। এর জন্যে আলাদা ধরনের একটা সাহস চাই। অথবা শিশুর মতো সরল হতে হবে। বলতে হবে—মা, আমি তোমার সন্তান। আমি কাঁদতে পারি, চাইতে পারি না। আমার প্রয়োজন তুমি জান।

এর মানে কি এই হলো, বেকার ছেলে বাপের হোটেলে?

না। এ তো তামস সমর্পণ নয়! জ্ঞানীর সমর্পণ। উজ্জ্বল আধ্যাত্মিকতা। আমার প্রয়াস থাকবে, আকাঙ্ক্ষা থাকবে না। আমার মায়ের কাজে আমি সাহায্য করব। তাঁর আদেশ, নির্দেশ আমি পালন করব। মা আমাকে বলে বলে দেবেন—এখন এইটা কর, এখন ঐটা কর। কান পেতে মায়ের আদেশ শোনার চেষ্টা কর। পৃথিবীর কলকোলাহলে কান খাড়া রাখ। শুনতে পাবে, শোনা যায়। সেইটাই নিবিষ্টতা, তন্ময়তা।

ঠাকুর নিজেকে অবতারপুরুষ বলতেন। তিনি কিন্তু মায়ের অনুমতি ছাড়া কোন কাজ করতেন না। মানুষের কথায় সংশয় হলে মায়ের কাছে ছুটে গিয়ে সত্য জেনে আসতেন।

আমরা আমাদের পাকামির ঠেলায় অস্থির। না জানা হলো জীবন, না জানা হলো জীবনাতীত। ঠাকুর বলছেন ঃ কিচ্ছু না, অকপট হওয়ার চেষ্টা কর না। আমরা এমন উজবুক, ঈশ্বরের সঙ্গেও কপটতা! আসলে আমাদের কোন কিছুতেই বিশ্বাস নেই। সংসারেও নেই, ঈশ্বরেও নেই। গোলেমালে গেঁজে আছি। 'ট্যাঁ' করে সানাই বাজিয়ে প্রবেশ, 'হরিবোল'-এ প্রস্থান। মাঝের অবস্থানটুকুতে অহঙ্কারের হাপরের ফোঁসফোঁস। ঈশ্বর কৃপা করে সামনে যদি এসে দাঁড়ানও, ভাবব সেলসম্যান! গুঁড়ো সাবান, কি দাঁতের মাজন বিক্রি করতে এসেছে। বিশ্রী ব্যবহার করে ভাগিয়ে দেব।

ঠাকুর জানতেন, পৃথিবীটি 'গোলেমালে' ভরা। কাম-কাঞ্চনের পীঠস্থান। মানুষ ভগবান হলেও পৃথিবীতে প্রবেশ মাত্রই বিস্মৃতি ঘিরে আসে। কে আমি, এলাম কোথা থেকে—ভুলে যাই। ঠাকুর বলছেন ঃ গোলেমালে মাল আছে, গোলটি ছেড়ে মালটি নাও। সেই মালটি হলো নিজের শনাক্তকরণ। তোমার 'আমি'টাকে আগে শনাক্ত কর। অহং কার? ঠাকুর পদ্ধতি বলছেন ঃ "বেদান্ত মতে স্ব-স্বরূপকে চিনতে হয়। কিন্তু অহং ত্যাগ না করলে হয় না। অহং একটি লাঠির স্বরূপ—যেন জলকে দুভাগ করছে। আমি আলাদা, তুমি আলাদা। সমাধিস্থ হয়ে এই অহং চলে গেলে ব্রহ্মকে বোধে বোধ হয়।"

ঠাকুর কথা বলছেন তাঁরই এক ভক্ত মহিমা চক্রবর্তীর সঙ্গে। বলছেন ঃ 'আমি' মহিম চক্রবর্তী, বিদ্বান—এই 'আমি' ত্যাগ করতে হবে। তবে বিদ্যার 'আমি'তে দোষ নাই। শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষার জন্য 'বিদ্যার আমি' রেখেছিলেন।

ঠাকুর পথ বলে দিচ্ছেন, প্রথমে 'আমি'টাকে হটাও। হটালে একটা দরজা খুলে যাবে, এপাশে সসীম ওপাশে অসীম। এপাশে জগৎ, ওপাশে জগৎকারণ ব্রহ্ম। ব্রহ্মই ঈশ্বর। এই জ্ঞানটি আঁচলে বাঁধ। সঙ্গে সঙ্গে অহং নিজের বশে এসে গেল। ব্রহ্মজ্ঞান না হলে অহংকে বশ করা যায় না। নিজের ছায়াকে ধরা শক্ত।

অপূর্ব! অপূর্ব উদাহরণ। আমি আর আমার ছায়া! দেওয়ালে, মেঝেতে, সিলিঙে। আলো অর্থাৎ জ্ঞান যখন দূরে তখন আমার ছায়া বিশাল এবং তরল। ছায়া ধরা যায় না। 'আমি' আর 'আমি'র ছায়াকে এক করা যায়। যত আমি জ্ঞানালোকের দিকে সরব ততই আমার ছায়া ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হবে। ঠাকুর বলছেন ঃ "সূর্য মাথার ওপর এলে ছায়া আধহাতের মধ্যে থাকে।"

সরবতে চিনি গোলার মতো 'আমি'টাকে গুলে দেওয়া। আমি নেই। কে আছে? সব আছে। সবেতেই আমি আছি। ভেদবুদ্ধি চলে গেছে। ভেদ গেলে প্রেম আসে। প্রেম এলে মানুষ ঈশ্বর হয়ে যায়।

কাশীপুরে স্বামীজীর একদিন হঠাৎ এই 'আমি-নাশের' অভিজ্ঞতা হয়েছিল। বলছেন ঃ "সেই অবস্থায় বোধ হলো যে, আমার শরীর নেই। শুধু মুখটি দেখতে পাচ্ছি। ঠাকুর ওপরের ঘরে ছিলেন। আমার নিচে ঐ অবস্থাটি হলো।" তিনি ধ্যান করছিলেন। হঠাৎ বোধ হলো, তাঁর মাথার পিছন দিকে জ্বলছে উজ্জ্বল আলো। দেখতে দেখতে সেই আলোর ক্রমবর্ধমান জ্যোতি যেন চন্দ্র, সূর্য, আকাশ প্রভৃতিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। তখন বিশ্বসংসার স্থিতিস্থাপকতা হারিয়ে টলতে শুরু করেছে। তাঁর মন বাহ্যজগৎ ছেড়ে এক অখণ্ড জ্যোতিঃসমুদ্রে নিমজ্জিত হতে চলেছে। দেশ-কাল-পাত্রের বোধ আর রইল না। রইল শুধু অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মসত্তা। নরেন্দ্রনাথ সেই অভিজ্ঞতাই বলছেন ঃ "সেদিন দেহবোধ একেবারে চলে গিয়েছিল। প্রায় লীন হয়ে গিয়েছিলুম, আর কি? একটু অহং ছিল, তাই সেই সমাধি থেকে ফিরেছিলুম। ঐরকম সমাধিতেই আমি আর ব্রহ্মের ভেদ চলে যায়, সব এক হয়ে যায়—যেন মহাসমুদ্রে জল, আর কিছুই নেই। ভাব আর ভাষা সব ফুরিয়ে যায়।" সমাধি থেকে ফিরে আসার পর নরেন্দ্রনাথের মনে হলো, তাঁর শরীরের মাথাটা কেবল আছে, বাকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একেবারে শূন্যে মিশে গেছে। এই ঘটনা যখন ঘটছে, তখন ঘরে ছিলেন বুড়ো গোপাল [স্বামী অদ্বৈতানন্দ]। সমাধি ভঙ্গের পর নরেন্দ্রনাথের কাতর চিৎকারে তিনি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালেন। স্বামীজী বলছেন ঃ "গোপালদা, গোপালদা, আমার শরীর কোথায় গেল?" গোপালদা তাঁর দেহের বিভিন্ন স্থান টিপছেন আর বলছেন ঃ "কেন নরেন, এই যে, এই যে।" তবু নরেন্দ্রনাথের মনে হতে লাগল, শুধু মুখখানি আছে, আর কিছু নেই। তখন গোপালদা ভয় পেয়ে সকলকে ডেকে আনলেন; কিন্তু কেউ কিছুই বুঝতে না পেরে ওপরে ঠাকুরকে গিয়ে বললেন। ঠাকুর ঈষৎ ভ্রূভঙ্গি করে বললেন ঃ "বেশ হয়েছে, থাক খানিকক্ষণ ঐরকম হয়ে। ওরই জন্যে যে আমায় জ্বালাতন করে তুলেছিল।"

ঠাকুর, স্বামীজী এবং ঠাকুরের অন্যান্য পার্ষদবৃন্দের ত্যাগ, সাধনা, আমাদের জন্য। এমন আবির্ভাব, যোগাযোগ, সংযোগ যুগ-যুগান্তরে একবারই হয়। কিন্তু কেন হয়? ঠাকুর এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ঃ আমি সব করে করে রেখে গেলাম, উদাহরণের মতো। নরেন্দ্রনাথকে দিয়ে একটি মহাসত্য মহাপ্রশ্নের মহাসমাধান করে দিয়ে গেলাম। সেটি আজ একটি 'সিম্বল'—আমার সমাধির ভঙ্গি—যা আজ ঘরে ঘরে ছবি। এটি ইচ্ছাকৃত নয়। ঈশ্বরের স্বতঃস্ফূর্ত ইঙ্গিত। যেমন খ্রীস্টের ক্রশ। আমার ডানহাত আকাশের দিকে উঠে যেত। আমার মুখমণ্ডল সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হতো। অলৌকিক হাসির সঙ্গে যুক্ত হতো অলৌকিক এক দ্যুতি। সেই ইঙ্গিতের অর্থ হলো—এক এবং অদ্বিতীয়। আমার বুকের কাছে আঙুলের মুদ্রায় যা পদ্মের মতো প্রস্ফুটিত, সেই বিশ্ববৈচিত্র্য ঐ এক-এরই প্রকাশ।

বিজ্ঞান তো ঐ একই কথা বলছে—"At some point something must have come from nothing." অর্থাৎ সময়ের শুরু। স্টিফেন হকিঙের 'হিস্ট্রি অফ টাইম'। কোন এক সময়ে 'কোন কিছু নয়' থেকে 'কিছু একটা'র উদ্ভব। "Nothing to something."

সত্যকে জানা হলো। ঠাকুর জানালেন। সকলেই শুনলেন। উপলব্ধি করলেন একজন। তিনি নরেন্দ্রনাথ। এটি একটি পর্যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ এখানেই 'চ্যাপটার ক্লোজ' করলেন না। কারণ, তিনি উত্তম গুরু। তিনি অবতার। নরেন্দ্রনাথের হলো, তাঁর পার্ষদদের হলো, তিনি ফিরে চলে গেলেন। এমন হলে তিনি কি সর্বকালের সকলের হতে পারতেন।

তোতাপুরীর যা আয়ত্ত করতে চল্লিশ বছর লেগেছিল, ঠাকুর মাত্র তিনদিনে সেই নির্বিকল্পে চলে যাওয়ায় তোতাপুরী মহাবিস্ময়ে বলেছিলেন ঃ "ক্যা দৈবী মায়া!" ঠাকুর কিন্তু নরেন্দ্রনাথের নির্বিকল্পে সে-কথা বললেন না। বললেন ঃ "বড় জ্বালাতন করছিল।"

এই অনুভূতির পর উদ্যানবাটীর নিচের ঘরে নরেন্দ্রনাথ কাঁদছেন। তাঁর নিজের বর্ণনা—"বুড়ো গোপাল ওপরে গিয়ে ঠাকুরকে বললেন, 'নরেন্দ্র কাঁদছে।' তাঁর সঙ্গে দেখা হলে তিনি বললেন, 'এখন টের পেলি, চাবি আমার কাছে রইল।' আমি বললাম, 'আমার কি হলো!' তিনি অন্য ভক্তদের দিকে চেয়ে বললেন, 'ও আপনাকে জানতে পারলে দেহ রাখবে না; আমি ভুলিয়ে রেখেছি।' "

কেন রেখেছিলেন? "নরেন শিক্ষে দিবে।"

কী শিক্ষা দেবেন? শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মের দর্শন। সে-দর্শন কী? পলায়ন নয়, প্রবেশ। ঈশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে জীবনে প্রবেশ। ভিতরে এসে পরিবর্তন। জীবনের ধাঁচটা বদলে দেওয়া। বেঁচে থাকায় আলো আনা। স্বামীজী এই পথ ধরে এগোতে এগোতে বলবেন ঃ আলো—আলো নিয়ে এস। প্রত্যেকের কাছে জ্ঞানের আলো নিয়ে এস; যতদিন না সকলেই ভগবানলাভ করে।

আন্টিসথেনেস গ্রীক দার্শনিক। তাঁর বিখ্যাত ছাত্র ডায়োজেনেস। তিনি বাস করতেন একটি ব্যারেলের ভিতর। গোল একটা বস্তু—ডাস্টবিনের মতো। সম্বলের মধ্যে একটি জোব্বা, একটি লাঠি আর রুটি রাখার একটি ব্যাগ। যাঁর কিছুই নেই, তাঁর চোরেরও ভয় নেই। কেউ তাঁর এই সুখ হরণ করতে পারবে না। একদিন তিনি তাঁর ব্যারেলের পাশে বসে আছেন। রোদ পোহাচ্ছেন। এমন সময় তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন স্বয়ং আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট। সম্রাট জিজ্ঞেস করলেন ঃ "আমি কী আপনার জন্যে কিছু করতে পারি? কোন প্রয়োজন?"

ডায়োজেনেস বললেন ঃ "হ্যাঁ, পারেন। একপাশে সরে দাঁড়ান। আপনি আমার রোদ আটকেছেন।" সূর্যের উত্তাপ! সূর্যের আলো!

শ্রীরামকৃষ্ণ-সূর্যালোকে আমরা ভেসে যাই। ❑

আদর্শ মৃত্যু

রিচার্ড স্মিথ

বাঁচার মতো বাঁচার এবং মরার মতো মরার কৌশল এক ও অভিন্ন।
—এপিকিউরাস

জন্মের সঙ্গে মৃত্যুও তোমার অংশ হিসাবে এসেছে, মৃত্যু তোমার অঙ্গবিশেষ। জীবনভোর তুমি মৃত্যুকে গড়ে তুলেছ।
—মন্টেন

আপনি কি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত আছেন? যদি না থাকেন, তাহলে এখনি কিছুটা প্রস্তুতি আরম্ভ করুন। 'ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল'-এর* সকল পাঠকই এই শতাব্দীতে মারা যাবেন। মন্টেন বলেছেন : "মৃত্যু সবসময়ই আমাদের পাশে পাশে আছে। প্রত্যেককে বারেবারে জোর দিয়ে বলতে হবে—সবসময়েই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা কল্যাণকর।" কিন্তু গত ৫০ বছরে এমনটি করা হয়নি এবং আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের ঔদ্ধত্য এতটা যে, সে খোলাখুলি না বললেও হাবভাবে বলে—সে মৃত্যুকে জয় করবে। যদি মৃত্যুকে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসাবে না বলে ব্যর্থতা হিসাবে বলা হয়, তাহলে চিকিৎসাশাস্ত্রের যা করা উচিত অর্থাৎ ভালভাবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করা, তা সে করার চেষ্টা করছে না। মৃত্যুকে আজ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে হবে এবং ১৯৯৯ সালে লন্ডনে বৃদ্ধদের বয়স নিয়ে যে বিতর্কসভা বসেছিল, সেখানে ঘোষণা করা হয়েছে—"আমরা বিশ্বাস করি যে, মৃত্যু সম্বন্ধে চিরাচরিত ধারণার পরিবর্তনের সময় এসে গেছে। মৃত্যু বিষয়টি আজ এতদূর চিকিৎসা-নির্ভরতা, পেশাদারিত্ব এবং সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করেছে যে, তা অধিকাংশ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের উদ্বেগ কমিয়ে দিয়েছে। আজ আমাদের এই বিষয়টির ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে।"

মৃত্যুকে জীবনের কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনা নতুন ঘটনা নয়। প্যারিসের কবরগাত্রে ১৯২৪ সালে মৃতের নৃত্য নিয়ে যেসব ছবি আঁকা হয়েছিল তাতে দেখানো হয়েছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি তার মৃত্যুর সঙ্গে সারাজীবন নৃত্য করছে। ইংল্যান্ডের প্রথম মুদ্রাকর উইলিয়াম ক্যাক্সটনের প্রথম বইটি ছিল কিভাবে মারা যাওয়া যায় সেবিষয়ে। দু-শতাব্দী ধরে এই বই 'বেস্ট সেলার' ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে যে পোপবিরোধী খ্রীস্টীয় ধর্মবিপ্লব হয়েছিল, তার পরেই ইউরোপে মৃত্যুকে ভয়ের চোখে দেখা হতে লাগল এবং তখনি ফ্রান্সিস বেকন প্রথম বললেন যে, চিকিৎসকরা মৃত্যুকে দূরে রাখতে পারেন। এর পূর্বে আরবীয় ও ইহুদীরা মৃত্যুকে বাধা দেওয়ার চেষ্টাকে ঈশ্বরের অনভিপ্রেত কাজ বলে বিশ্বাস করত। সে যাই হোক, মৃত্যু ব্যাপারটা এখন চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে এবং স্পেনের ডিক্টেটর জেনারেল ফ্রাঙ্কোর মৃত্যু দীর্ঘদিন ঠেকিয়ে রাখাকে মহিমান্বিত করে বিস্তারিত বিবরণ-সহ সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে। ব্রিটেনের অধিকাংশ লোক যদিও নিজের বাড়িতেই মরতে চায়, কিন্তু তারা মারা যায় আত্মীয়-স্বজনহীন 'ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট'-এ।

এলিজাবেথ রস, সিসেলি সন্ডার্স প্রমুখ উপশম চিকিৎসার (Palliative medicine) কর্ণধাররা গত ৩০ বছর ধরে বলে আসছেন যে, মুমূর্ষুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকা উচিত। তবে একথা ঠিক যে, যা অবশ্যম্ভাবী (অর্থাৎ মৃত্যু) তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা আমাদের কাছে আত্মবিরোধী মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বর্তমানে উপশম-চিকিৎসকদের কথা মেনে নেওয়ার একটা প্রবণতা জনসাধারণের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর প্রমাণ—মৃত্যুর বিস্তারিত বিবরণ টেলিভিশনের মাধ্যমে মুমূর্ষুকে দেখানো হচ্ছে এবং ভালভাবে মৃত্যু সম্বন্ধে ছোট ছোট বই বের হচ্ছে।

বর্তমানে আয়ুষ্কাল, মৃত্যুর স্থান, কারণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে নির্ভরযোগ্য ও বিস্তৃত পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়, কিন্তু মৃত্যুর অভিজ্ঞতা বিষয়ে আমরা কেউ কিছু জানি না। হাসপাতালে মৃত্যু বিষয়ে ১৯৯৪ সালে 'ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল' পত্রিকায় যে সমীক্ষা-ফল প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে দেখা যায় যে, যে-অবস্থায় হাসপাতালে মৃত্যু হয় তা খুবই খারাপ। অবশ্য ভালভাবে বা খারাপভাবে মৃত্যু বলতে গেলেই আগে ঐদুটির সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে হবে। পূর্বোল্লিখিত বিতর্কসভার চূড়ান্ত রিপোর্টে 'আদর্শ মৃত্যু'র (good death) ১২টি শর্তের কথা বলা হয়েছে। সেগুলি হলো : (১) কখন মৃত্যু হবে তা জানা এবং তখন কি অবস্থা হতে পারে তা বোঝা; (২) মৃত্যুকালে যাই ঘটুক না কেন, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকা; (৩) মৃত্যু যেন মর্যাদাপূর্ণ হয় ও গোপনীয়তা বজায় থাকে; (৪) মৃত্যুকালে রোগযন্ত্রণা ও অন্যান্য উপসর্গ যেন না থাকে; (৫) নিজ গৃহে অথবা যেকোন পছন্দমত স্থানে যেন মৃত্যু হয়; (৬) শারীরিক অবস্থা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এবং সেই সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ জানার সুযোগ থাকা; (৭) আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক সাহায্যলাভের সুবিধা থাকা; (৮) আধিদৈবিক সাহায্যের সুবিধাও যেন থাকে—যেকোন স্থানে; (৯) মৃত্যুকালে কাছে কে থাকবে এবং কে শবানুগমন করবে, সে-সম্পর্কে ব্যক্তিগত ইচ্ছা বলবতী হওয়া; (১০) মৃত্যুর পর ইচ্ছাকে মর্যাদা দেওয়া হবে—এমন স্থানে ইচ্ছাগুলি ব্যক্ত করতে পারা; (১১) মৃত্যুর আগে সকলের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া ইত্যাদির জন্য যথেষ্ট সময় পাওয়া; (১২) অর্থহীনভাবে কৃত্রিম উপায়ে জীবনকে প্রলম্বিত যেন না করে সময়মতো মৃত্যুবরণ করা।

কিভাবে মৃত্যু হবে শুধু তার ওপর জোর দিলেই হবে না, জীবনের মধ্যে মৃত্যুচেতনাকে আরো বেশি করে আনতে হবে। কিভাবে তা করা হবে, তা বিতর্কের রিপোর্টে বলা হয়েছে। যেমন—বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে বিষয়টির অন্তর্ভুক্তি এবং অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার মানোন্নয়ন ও তাকে প্রাসঙ্গিক করা। ন্যাশন্যাল ফিউন্যার্যাল কলেজ আধুনিক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকে বলেছে "ভণ্ড, আমলাতান্ত্রিক, বিষণ্ণ, নৈর্ব্যক্তিক এবং তাড়াহুড়ো করা"। ভাল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হবে জীবনোদ্দীপক এবং আমি বলি যে, আপনারা আপনাদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার কথা ভাবুন। মন্টেন বলেছেন : "অন্যেরা যেমন তোমাদের জায়গা ছেড়ে দিয়েছে, তুমি অন্যদের জায়গা ছেড়ে দাও। ভেবে দেখ, যদি চিরকাল বেঁচে থাক, তা কতদূর যন্ত্রণাদায়ক হবে!" ❑

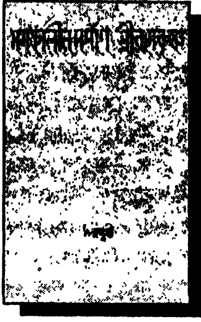
[দ্রঃ British Medical Journal, 15 January 2000, pp. 129-130]

ভাষান্তর : জলধিকুমার সরকার

* লেখক এই পত্রিকার সম্পাদক।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

জানা কথার বৈঠকী পরিবেশন

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়



সমকালীন দর্পণে শ্রীরামকৃষ্ণ
চিত্রগুপ্ত
প্রকাশক :
সুখেন্দুবিকাশ মজুমদার
শ্রীগুরু লাইব্রেরী
২০৪ বিধান সরণি
কলকাতা-৭০০ ০০৬
পৃষ্ঠা : ৮+১৩০
মূল্য : ৩০ টাকা

'সমকালীন দর্পণে শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থটির লেখক চিত্রগুপ্ত প্রস্তাবনায় বলেছেন : "তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) সর্বজন-শ্রদ্ধেয় অসাধারণ মানুষ ছিলেন। ভক্তির রঙে নিজেকে রাঙিয়ে পরমপুরুষ কোনদিন ভগবান হতে চাননি। তাঁর সহজ ভাব ভাবনার প্রকাশ তিনি সেকালের বিজ্ঞান-শাসিত সমাজের চোখে তুলে ধরেছিলেন।... ভক্তের ভালবাসা মানুষ-রামকৃষ্ণকে মুছে দিয়ে ভগবান রামকৃষ্ণের ছবি এঁকেছে। কিন্তু রামকৃষ্ণ তো তা চাননি। তিনি তো মানুষের মাঝে মানুষ হয়েই বাঁচতে চেয়েছিলেন। সাধনার সোপান বেয়ে তিনি সাধারণ মানুষের অনেক ওপরে উঠেছিলেন। তাই তাঁকে বলব মহামানব। সমসাময়িক কাল তাঁকে যেমন দেখেছে, তেমনই তাঁর রূপারোপ করার সীমিত চেষ্টা করেছি মাত্র।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে সমকালীন পত্র-পত্রিকায় বা 'কথামৃত'-এ প্রকাশিত কিছু তথ্য, সমকালের বিদগ্ধ ও বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তির অভিমত—বলা যেতে পারে, তাঁদের অন্তরের কথাটি—গ্রন্থকার সংগ্রহ করেছেন সযত্নে। তবে সন-তারিখের পরম্পরাটি ঠিকভাবে বিন্যস্ত হয়নি। কিছুটা অগোছালভাবেই বিন্যস্ত হয়েছে। তবে এই ত্রুটিটুকুকে না ধরে বলা যায়, এই সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে একটি নিবেদিত প্রয়াস।

এই গ্রন্থের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে রয়েছেন কেশবচন্দ্র সেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্র সেনের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে ১৮৭৫ সালের ১৫ মার্চ উত্তর কলকাতার বেলঘরিয়ার গোপাল সেনের পুকুরঘেরা বাগানবাড়িতে। এই বাড়িতেই শ্রীরামকৃষ্ণ একখানি রামপ্রসাদী গান গাইতে গাইতে সমাধিস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কেশবচন্দ্র ও তাঁর সতীর্থরা শ্রীরামকৃষ্ণের এই সমাধিস্থ ভাবকে প্রথমে ভান বা মাথার বিকার বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হয়ে গভীর আধ্যাত্মিক বিষয় টুকরো টুকরো উদাহরণ দিয়ে এমন সহজ সরল প্রাঞ্জলভাবে বোঝাতে লাগলেন যে, সকলে তখন বিস্মিত ও মুগ্ধ না হয়ে পারলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন : গরুর পালে অন্য কোন পশু এলে তারা তাকে গুঁতোতে যায়। কিন্তু গরু এলে গা চাটাচাটি করে, আদর করে। আমাদের আজ সেরকম হয়েছে।

তারপর কেশব সেনের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক কথা হলো। লেখকের বর্ণনা এখানে সুলিখিত। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন : কেশবের ল্যাজ খসেছে। কেশব সেনের শিষ্যরা এই কথায় মর্মাহত হলেন। এ কেমন স্পর্ধা দক্ষিণেশ্বরের পূজারী ব্রাহ্মণের! শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন : দেখ, ব্যাঙাচির যতদিন ল্যাজ থাকে ততদিন সে জলেই থাকে, ডাঙায় উঠতে পারে না। কিন্তু ল্যাজ যখন খসে যায় তখন জলেও থাকতে পারে, ডাঙায়ও থাকতে পারে। সাধকের 'ল্যাজ' খসে গেলে সংসার এবং সচ্চিদানন্দ দুজায়গাতেই সে ইচ্ছামত অবগাহন করতে পারে। সে-মন সংসারেও থাকতে পারে, সচ্চিদানন্দেও যেতে পারে।

শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জীবনের পূর্ণ রাজ্যে এসেছেন অনেকেই। এই গ্রন্থে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র, রামচন্দ্র দত্ত, শিবনাথ শাস্ত্রী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, রানী রাসমণি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনা ও সান্নিধ্য কিভাবে তাঁদের নিজেদের জীবনকে প্রভাবিত করেছে তার একটি প্রামাণ্য রূপরেখা তিনি দিতে চেষ্টা করেছেন। সংক্ষিপ্ত হলেও এর প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য কম নয়। ❑

প্রাপ্তি-সংবাদ

- **শতবর্ষ স্মরণে দিলীপকুমার রায়ের পত্রাবলী** (তপন বসুকে লিখিত)—সম্পাদিকা ও প্রকাশিকা : নমিতা বসু। ১২৩সি, সাউথ সিঁথি রোড, দমদম জংশন, কলকাতা-৭০০০৩০। পৃষ্ঠা : ১২+২৬। মূল্য : ১২ টাকা।
- **শ্রীশ্রীসারদা-কথামৃত**—সঙ্কলক : সুভাষ দে সরকার। প্রকাশক : শ্যামলকুমার সরকার। মকদুমপুর, বি. জি. রোড, মালদা-৭৩২১০৩। পৃষ্ঠা : ৫+৬১। মূল্য : ২০ টাকা।
- **যা দেখেছি দু চোখ ভরে**—পুলককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক : মৈনাক প্রকাশন, ১৮১ আন্দুল রোড, হাওড়া-৭১১১০৩ পৃষ্ঠা : ১০+১১২। মূল্য : ২০ টাকা।
- **স্বামী বিবেকানন্দ**—শশাঙ্কশেখর সেনগুপ্ত। প্রকাশিকা : নিবেদিতা সেনগুপ্ত। প্রফুল্ল নিলয়, নতুন পল্লী, বর্ধমান। পৃষ্ঠা : ১৬+১৮৮। মূল্য : ২৫ টাকা।
- **রূপে রূপান্তরে মা সারদা**—নারায়ণ সেনগুপ্ত। প্রকাশক : রমেন দত্ত। ৭৩৮ নেপিয়ার টাউন, জব্বলপুর, মধ্যপ্রদেশ-৪৮২০০১। পৃষ্ঠা : ৬৪। মূল্য : ৩০ টাকা।
- **ছন্দে ছড়ায় যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ**—রবীন্দ্রনাথ হাজরা। প্রকাশক : সুকুমার মণ্ডল। বুকল্যান্ড, ৫০ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ পৃষ্ঠা : ২৭০। মূল্য : ৭৫ টাকা।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

● **ধাম ধর্ম ধারা—ডাঃ বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য।** প্রকাশক : রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য, বিডি-২৭৭, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০ ০৬৪। পৃঃ ১২+২৪২। মূল্য : ৫০ টাকা।

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্যের লেখা 'ধাম ধর্ম ধারা' নতুন ধরনের একটি ভ্রমণ-উপন্যাস। হিমালয়ের বুকে ও পাদদেশে রয়েছে হিন্দুদের প্রিয় তীর্থ গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদার-বদ্রী, হরিদ্বার, হৃষীকেশ প্রভৃতি। সহস্র সহস্র বছর ধরে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের ধর্মবিশ্বাসী হিন্দুদের এই তীর্থগুলি আকর্ষণ করে চলেছে। গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ পরিক্রমা করে পুণ্যপিপাসু হিন্দুরা যুগ যুগ ধরে 'চারধাম পরিক্রমা' করে আসছে। এইসব তীর্থগুলির সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত পুরাণ ও লোক-কাহিনী। আজকের সংশয়ী অবিশ্বাসী এবং তথাকথিত 'যুক্তিবাদী' মানুষরা এই সমস্ত কাহিনীকে 'রাবিশ' বলে উপেক্ষা করে। কিন্তু সত্যিই কি এইসব কাহিনী ভিত্তিহীন এবং কল্পিত অলৌকিক কাহিনী মাত্র? অথবা, এগুলির সত্য সত্যই কি কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে? আছে কোন রূপকধর্মী এবং নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসের সুগভীর তাৎপর্য?

'ধাম ধর্ম ধারা' গ্রন্থটির লেখক বৃত্তিতে একজন প্রাক্তন পশু-চিকিৎসক এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশুবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন যুগ্ম-অধিকর্তা। সুতরাং বিজ্ঞানের একটি দিকের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় রয়েছে। সেইসঙ্গে তিনি একজন ধর্মবিশ্বাসী এবং ভাবুক মনের মানুষও। আবার তাঁর রয়েছে একটি কবি ও সাহিত্যিক মন। বিজ্ঞানী-মনের সহায়ে তিনি আলোচ্য গ্রন্থটিতে ভ্রমণ-উপন্যাসের অন্তরালে একদিকে ভারতবর্ষের ধর্ম ও অধ্যাত্ম-সত্য এবং অপরদিকে বিজ্ঞান, যুক্তি, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও সাহিত্যের একটি মেলবন্ধন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। গ্রন্থের শেষে লেখক ভ্রমণপথের স্থানগুলির দূরত্ব, উচ্চতা ও যানবাহনের বিবরণ এবং পরিক্রমা-পথে প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির একটি তালিকা দিয়েছেন। ❑

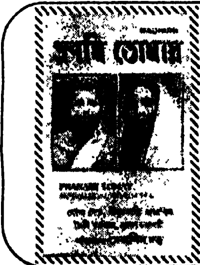
শ্রীনিবাস চট্টোপাধ্যায়

ক্যাসেট সমালোচনা



অধ্যাত্মরসে জারিত সঙ্গীতাঞ্জলি

রঞ্জনা দাস



প্রণমি তোমায়
প্রকাশক : মাধুরী মিউজিক্যালস
৬৪বি, বি. কে. পাল অ্যাভিনিউ
কলকাতা-৭০০ ০০৫
কণ্ঠে : গোপা সোম, পীযূষকান্তি প্রামাণিক, চৈতী কর্মকার, সুহাস চক্রবর্তী
পরিচালনা : দেবাশিস দত্ত
মূল্য : ৩০ টাকা

বাংলার সঙ্গীতের ইতিহাস 'চর্যাপদ' থেকে শুরু। এক হাজার বছরের সঙ্গীতের ইতিহাসে যেমন আমরা চর্যাপদ, গীতগোবিন্দ, চণ্ডীদাস, পদাবলী-কীর্তনকে পাই, তেমনই রামপ্রসাদ, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, কমলাকান্ত, রঘুনাথ রায়, কালী মির্জা, গিরিশচন্দ্র ছাড়াও আঠারশ শতকে মঙ্গলকাব্য, পাঁচালী, যাত্রা, কবিগান, তরজা, শ্যামাসঙ্গীত, টপ্পা প্রভৃতি আরো বহুপ্রকার গানের সঙ্গে পরিচিত হই।

এই শতকেই শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে সঙ্গীতেও এল নবজাগরণ। গড়ে উঠল শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গীতধারা। বেশ কিছুকাল ধরেই শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কিত অনেক ক্যাসেট প্রকাশিত হচ্ছে। ভক্তিরসে পরিপূর্ণ এইসব গান বা ক্যাসেট শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারায় আপ্লুত শ্রোতাদের মধ্যে যেমন, তেমনি সাধারণ্যেও সমান জনপ্রিয়।

সম্প্রতি মাধুরী মিউজিক্যালস কোম্পানী থেকে 'প্রণমি তোমায়' নামে ভক্তিগীতির এমনই একটি ক্যাসেট প্রকাশিত হয়েছে। ক্যাসেটটি মোট ১১টি গানের সঙ্কলন। গীতিকারদের মধ্যে রয়েছেন স্বামী চণ্ডিকানন্দ, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, কুবীর গোঁসাই, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী এবং দেবাশিস দত্ত। কণ্ঠে সহযোগিতা করেছেন সুহাস চক্রবর্তী, চৈতী কর্মকার, গোপা সোম এবং পীযূষকান্তি প্রামাণিক। শিল্পীরা প্রত্যেকেই নবীন। তাই গায়কীতে কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে গেলেও দেবাশিস দত্তের পরিচালনার গুণে গানের নিহিত ভাব অক্ষুণ্ণ আছে। ক্যাসেটটি প্রথম পর্বে মালকোষ রাগে সাত মাত্রায় আধারিত চৈতী কর্মকারের কণ্ঠে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের 'রূপ ঢেকে অয়ি' কথায় ও সুরের আমেজে একটি অন্য মাত্রা পায়। ভাল লাগে 'তোড়ী'র সুরের মূর্চ্ছনায় 'শিশির ভেজা ঘাসের বুকে তোমার ছোঁয়া পাই'। দ্বিতীয় পর্বে সুহাস চক্রবর্তীর 'শৌর্য দাও' ও পীযূষকান্তি প্রামাণিকের 'আজি কামারপুকুরে চল' ভাবাশ্রিত গায়কীর গুণে ভাল লাগে। শিল্পী গোপা সোমের গাওয়া তিনটি গানে আবেগের অনুভূতি থাকলেও গানের সুর থেকে গলা সরে গেছে। 'দেহি পদ্ম তারিণী' গানটির সুর ক্যাসেটে প্রচলিত লেখা থাকলেও পুরাতনী শিল্পীরা ভৈরবী ও যৎ তালে গানটি গেয়ে থাকেন, যা এই ক্যাসেটে ব্যবহার করা হয়নি।

যন্ত্রানুসঙ্গ যথাযথ। বিশেষত, স্বামী চণ্ডিকানন্দ রচিত 'শৌর্য দাও' গানটিতে যন্ত্রের সঠিক ব্যবহার গানের উদ্দীপ্ত ভাব প্রকাশ করেছে। পরিশেষে বলা যায়, ক্যাসেটের গানগুলি বাস্তবিকই অধ্যাত্মরসে জারিত। ❑

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

বেলুড় মঠে গত ১৫ জানুয়ারি ২০০১ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের ১৩৯তম জন্মতিথি-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবে হাজার হাজার ভক্তের সমাগম হয়েছিল। বৈকালিক ধর্মসভার সূচনায় পরম পূজ্যপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ আশীর্বাণী প্রদান করেন। সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দজী। স্বামীজীর বিষয়ে ভাষণ দান করেন স্বামী শিবময়ানন্দজী (বাঙলা) ও ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী (ইংরেজী)। উৎসবে প্রায় ১২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

রামকৃষ্ণ মঠ, কাশীপুরে (উদ্যানবাটী) গত ১-৩ জানুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 'কল্পতরু' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে বৈদিক প্রার্থনা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'লীলা-প্রসঙ্গ', 'ভাগবত' ও 'রামচরিতমানস' থেকে পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনদিনব্যাপী উৎসবে প্রায় লক্ষাধিক ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

প্রথম দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। 'তোমাদের চৈতন্য হোক' প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই আশীর্বাদে নিহিত ছিল ভক্তদের আন্তর জীবনের রূপান্তর ঘটিয়ে চৈতন্যে তথা স্ব-স্বরূপে উত্তরণের চিরন্তন আহ্বান। অপর বক্তা ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর বলেন, ঠাকুর শুধু ঐ বিশেষ দিনটিতেই নয়, অন্য সময়েও তাঁর কৃপাবর্ষণে ভক্তদের চৈতন্যের পথে এগিয়ে দিয়েছেন। সভাপতির ভাষণে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী বলেন, ঐ বিশেষ দিনটিতে ত্যাগী সন্তানগণের অনেকে উদ্যানবাটীতে উপস্থিত থাকলেও তাঁরা ঠাকুরের সেবার কাজ ঐ অবসরে নিষ্পন্ন করে আত্মমুক্তি অপেক্ষা সেবাকেই অধিকতর গুরুত্ব দান করেছিলেন এবং সন্ন্যাসীদের কাছে একটি আদর্শ স্থাপন করেছিলেন।

দ্বিতীয় দিনের ধর্মসভায় অধ্যাপক দীপক গুপ্ত ঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবন আলোচনা করে বিভিন্ন সময়ে ঠাকুর কিভাবে ভক্তদের নিকট কল্পতরু হয়েছিলেন তার উল্লেখ করেন। অপর বক্তা বরানগর আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সনাতনানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের সর্বধর্মসমন্বয় সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সভাপতির ভাষণে বেলুড় সারদাপীঠের সম্পাদক স্বামী রমানন্দ 'গীতা' ও 'ভাগবত'-এর আলোকে ঠাকুরের স্বরূপ উদ্ঘাটন ও কৃপাবর্ষণের বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ করেন।

তৃতীয় দিনের ধর্মসভায় বরানগর আশ্রমের প্রধান শিক্ষক স্বামী বিধানানন্দ বলেন, বেদান্ত দর্শনের বিভিন্ন পথ যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের একই লক্ষ্যে উপনীত, ঠাকুর তাঁর জীবন ও বাণীতে তাই উদ্ঘাটন করেছেন এবং স্বামীজী তা-ই প্রচার করেছেন। স্বামী শুদ্ধরূপানন্দ হিন্দিতে শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃভাব ও আপামর জনসাধারণের প্রতি তাঁর অশেষ কৃপার বিষয়ে আলোচনা করেন। সভাপতির ভাষণে রহড়া আশ্রমের সম্পাদক স্বামী জয়ানন্দ বলেন, এখনো ঠাকুর কল্পতরু হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষকে কৃপাবর্ষণে অভয়দান করছেন। এছাড়া বিভিন্ন দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, বিভিন্ন শিল্পী ও সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করেন।

রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর (জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৫ ডিসেম্বর ২০০০ বিশেষ পূজা, হোম, কীর্তন, জীবনী পাঠ ও আলোচনা এবং ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীমৎ স্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজের আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। সকালে মহারাজের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বাদ্যানন্দ। অপরাহ্ণের ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী পূর্ণানন্দ ও বক্তব্য রাখেন স্বামী অজরানন্দ। দুপুরে প্রায় ৬০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান এবং ৩২৪ জন দুঃস্থকে কম্বল দেওয়া হয়।

গত ১৭ ডিসেম্বর শ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাব-তিথিতে বিশেষ পূজা, হোম, ভজন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী বিশ্বাদ্যানন্দ। দুপুরে প্রায় ৭০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

গত ২৪-২৬ ডিসেম্বর মহাসমারোহে 'ত্যাগব্রত সঙ্কল্প দিবস' অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, ভজন, কীর্তন, ধর্মসভা, রক্তদান শিবির, যাত্রাভিনয়, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, বাইবেল পাঠ প্রভৃতি ছিল উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ। এই উপলক্ষ্যে একটি মেলাও বসে। ২৪ ডিসেম্বর বৈকালিক ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন সারগাছি আশ্রমের সম্পাদক স্বামী বিশ্বনাথানন্দ এবং ভাষণ দান করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কলাসচিব ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাইবেল পাঠ করেন স্বামী ঋতানন্দ, ধুনি প্রজ্বলন করেন স্বামী শান্তাত্মানন্দ। দুপুরে প্রায় ৭৫০ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ২৫ ডিসেম্বর 'কথায় ও গানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' পরিবেশন করেন স্বামী দেবদেবানন্দ এবং কীর্তন পরিবেশন করেন অখিলবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়। দুপুরে প্রায় ৭০০ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ২৬ ডিসেম্বর 'নারায়ণসেবা দিবস' উপলক্ষ্যে সকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। দুপুরে প্রায় ১৪,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় তরজা গান পরিবেশন করেন নারায়ণ চক্রবর্তী ও সম্প্রদায়।

পোরবন্দর আশ্রম (গুজরাট) গত ৪ ডিসেম্বর ২০০০ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শহরের ৬৫ জন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করে। অনুষ্ঠানে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ও গুজরাট সরকারের মৎস্যমন্ত্রী বাবুভাই বখিরিয়া।

রামকৃষ্ণ মিশন, পোর্টব্লেয়ার (আন্দামান) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করে। মঙ্গলারতি, বৈদিক



বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের শতবর্ষপূর্তি উৎসবের উদ্বোধন-দিবসের (১০.১১.২০০০) কয়েকটি অনুষ্ঠান ঃ ওপরে (বাঁদিকে) উত্তরপ্রদেশের তদানীন্তন রাজ্যপাল সূরজ ভান শতবর্ষ উৎসবের উদ্বোধন করছেন। ওপরে (ডানদিকে) রোগী-নারায়ণ পূজায় অন্যতম পুরোহিত স্বামী প্রমেয়ানন্দ। (মাঝখানে) সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শুভানন্দজী মহারাজের মূর্তিতে মাল্যদান করছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। নিচে (বাঁদিকে) শতবর্ষ উৎসবের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে শতবর্ষ-স্মরণিকা প্রকাশ করছেন পূজ্যপাদ সহাধ্যক্ষ মহারাজ; মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন (বাঁদিক থেকে) স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ('উদ্বোধন'-সম্পাদক), স্বামী শুদ্ধব্রতানন্দজী (সেবাশ্রম-সম্পাদক), সূরজ ভান, স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ (মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক), স্বামী গোকুলানন্দজী (নয়া দিল্লি রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ)। নিচে (ডানদিকে) প্রথমদিন সকালে মঞ্চে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ। [উৎসব-সম্পর্কিত সংবাদ গত মাঘ ১৪০৭ সংখ্যায় (পৃঃ ৫৩) প্রকাশিত হয়েছে।]

স্তোত্রপাঠ, ভক্তিগীতি, বিশেষ পূজা ও প্রসাদ-বিতরণ ছিল অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ। ব্রহ্মচারী অনিন্দ্যচৈতন্যের পরিচালনায় বৈদিক স্তোত্রপাঠ করে আশ্রম ছাত্রাবাসের ছাত্রবৃন্দ। ভজন পরিবেশন করেন দুলাল মজুমদার। এরপর ভক্তগণ সম্মিলিত-ভাবে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন। দুপুরে প্রায় ৬০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে গত ২৩ ডিসেম্বর ২০০০ আয়োজিত এক ধর্মসভায় শ্রীশ্রীমায়ের বাণীপাঠ করেন ব্রহ্মচারী রবীন্দ্র ও ব্রহ্মচারী সৌমেন এবং শ্রীশ্রীমায়ের প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ব্রহ্মচারী অনিন্দ্যচৈতন্য, স্বামী হরিদেবানন্দ এবং আশ্রম-সম্পাদক স্বামী অমৃতরূপানন্দ।

গত ২১ ডিসেম্বর ২০০০ চেন্নাই সারদা বিদ্যালয়ের হীরক-জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় সভাপতিত্ব ও একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেন তামিলনাড়ু সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ডঃ কে. আনবাঝাগন।

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ (বেলুড়) গত ২৩-৩১ ডিসেম্বর ২০০০ নয়দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দ।

গ্রন্থাগার উদ্বোধন

গত ৯ ডিসেম্বর ২০০০ বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের (উত্তরপ্রদেশ) একটি ফ্রি রিডিং রুম ও লাইব্রেরি এবং একটি পুস্তকবিক্রয় কেন্দ্র উদ্বোধন করেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি পলক বোস। অনুষ্ঠানে জেলা-জজ সহ বিভিন্ন আদালতের প্রায় ২০ জন বিচারক, বৃন্দাবন পুরসভার চেয়ারম্যান এবং ৩৫০ জন বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, গত ১৭ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বৃন্দাবনের ৫০০ জন বৃদ্ধা বিধবাকে একটি করে কাপড় এবং ১০০ গ্রাম করে সরষের তেল দেওয়া হয়। তাঁরা সকলে এবং ১,৫০০ জন দরিদ্রনারায়ণ বসে প্রসাদ পান।

বহির্ভারত

বিশেষ প্রতিবেদন

শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের বাংলাদেশ সফর

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ গত ২০-২৮ নভেম্বর ২০০০ বাংলাদেশ সফর করেন। ঐসময়ে তিনি সেখানকার কয়েকটি দর্শনীয় স্থান ও আশ্রম-কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং অগণিত ভক্ত-অনুরাগী ও বিদ্বজ্জন সমাবেশে ভাষণ প্রদান করেন।

২১ নভেম্বর অপরাহ্নে পূজ্যপাদ মহারাজজী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল-এ কয়েক বছর আগে প্রতিষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি দর্শনে যান। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রোভস্ট' এবং তদানীন্তন উপাচার্যের পৃষ্ঠ-পোষকতায় মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কয়েকশ ছাত্রছাত্রী ও বহু

শিক্ষকের সমাবেশে পূজ্যপাদ মহারাজজী স্বামীজী-প্রদর্শিত পথে আদর্শ জীবন গঠন করে জনকল্যাণ-কর্মে আত্মোৎসর্গ করার আহ্বান জানান। তাঁর বক্তৃতায় সকলে প্রভূত আনন্দ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেন। এরপর তিনি ঢাকেশ্বরী-মন্দির দর্শনে যান। সেখানেও সমাগত প্রবীণ নাগরিক ও ভক্তবৃন্দের সমাবেশে তিনি ভাষণ দান করেন।

২৩ নভেম্বর সকালে পূজ্যপাদ মহারাজ দেওভোগে সাধু নাগমহাশয়ের ভিটা দর্শন করেন এবং নারায়ণগঞ্জে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে যান। ২২, ২৪, ২৬ ও ২৭ নভেম্বর ছিল দীক্ষার দিন। ৪৯৪ জন ভক্ত পূজনীয় মহারাজের কাছে দীক্ষালাভ করেন। ২৫ নভেম্বর অপরাহ্ণে ঢাকা মঠ আয়োজিত বিশেষ সভায় উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রদূত, অধ্যাপক, বণিকসভার সদস্য, শিল্পী, উপাচার্য, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সুধীগণ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ। ঐ অনুষ্ঠানে পূজনীয় মহারাজকে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধাসহকারে সংবর্ধনা জানান বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ। তিনি তাঁর ভাষণে স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের দুর্গত মানুষদের আন্তরিক সেবায় এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপন্ন মানুষের সাহায্যার্থে রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিকার সপ্রশংস উল্লেখ করেন। পূজ্যপাদ মহারাজ তাঁর ভাষণে বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে যেভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাব্রত চলছে তাতে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি আশা করেন যে, নিকট ভবিষ্যতে বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরো অনেক উন্নতি করবে। সমগ্র দেশবাসীর প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বিভিন্ন ধর্মের মানুষের পারস্পরিক একাত্মতাবোধের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, এইরকম একত্ববোধ ও তার অনুশীলনের দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনে। মহারাজজী বলেন, এর আগে তিনি বাংলাদেশে এসেছেন ১৯৪২ এবং ১৯৪৯-এ। এবার এসে বাংলাদেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি দেখে তিনি অত্যন্ত খুশি। ২৫ তারিখের ঐ অনুষ্ঠানে তিনশ সম্মানিত ব্যক্তিকে আহ্বান জানানো হয়েছিল, কিন্তু প্রচুর মানুষের সোৎসাহ সমাগমে সংখ্যাটিকে বাড়িয়ে শেষপর্যন্ত পাঁচশ করতে হয়।

২৬ তারিখে পূজ্যপাদ মহারাজ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সমাগত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন, ঈশ্বরের প্রতি সত্যবদ্ধ থাকতে হবে, কারণ বিভিন্ন মত ও পথের সকল মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজ করছেন। সেই বোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই মানুষকে ভালবাসতে হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সঈদ তাঁর ভাষণে বলেন, বর্তমান কালের এক মহান ব্যক্তিত্ব স্বামী রঙ্গনাথানন্দ মহারাজ শুধু কোন দেশবিশেষের নন, তিনি সর্বদেশের সম্পদ। এই অনুষ্ঠানে এমন একজন মহাত্মার সংস্পর্শে আসতে পেরে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করছেন।

২৮ নভেম্বর ২০০০ পূজ্যপাদ মহারাজজী ভারতবর্ষের উদ্দেশে রওনা হন। বাংলাদেশে তাঁর প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ তাঁর উপদেশ ও বাণীতে সমৃদ্ধ হয়েছেন, আনন্দলাভ করেছেন। মহারাজজীর বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ও রেডিও-টিভিতে প্রচারিত হয়। এছাড়া 'স্টার টিভি' (বাঙলা) এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনও মহারাজজীর সাক্ষাৎকার রেকর্ড করেছে।

দেহত্যাগ

স্বামী কমলেশ্বরানন্দ (বাসুদেব) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ সকাল ১১.৫০ মিনিটে কর্ণাটকের আলসূর আশ্রমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। গত ৭ বছর ধরে তিনি ক্যান্সারে ভুগছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করে ১৯৬৬ সালে কলকাতার অদ্বৈত আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৭৬ সালে তিনি নিজ গুরুর কাছ থেকে সন্ন্যাসলাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি শিলং, তিরুবনন্তপুরম, চেন্নাই মঠ ও মহীশূর কেন্দ্রে বিভিন্ন সময়ে কর্মী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। নিয়মানুবর্তিতা এবং খুঁটিনাটি বিষয়ে সতর্কতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কঠিন অসুস্থতা সত্ত্বেও তিনি আশ্রমের যেকোন সেবাকাজে নিয়োজিত থাকার জন্য সর্বদা ব্যগ্রতা প্রকাশ করতেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ৮ জানুয়ারি ২০০১ শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে তাঁর জীবনী পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ। গত ১৫ জানুয়ারি ২০০১ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিতে ষোড়শোপচারে পূজা। হোম, প্রসাদ-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সন্ধ্যারতির পর 'স্বামী বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ' আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। গত ২৬ জানুয়ারি ও ২৮ জানুয়ারি ২০০১ যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণব্রহ্মানন্দ এবং স্বামী বিনির্মলানন্দ।

জাতীয় যুবদিবস পালন : গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে 'জাতীয় যুবদিবস' পালন করা হয়। বৈদিক স্তোত্র ও 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠ, সঙ্গীত, ভাষণ, প্রশ্নোত্তর-পর্ব এবং বক্তৃতা, আবৃত্তি, প্রবন্ধ ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা ছিল অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ। 'ভারতীয় সংস্কৃতির রূপরেখা' বিষয়ে স্বামী বিনির্মলানন্দ এবং 'মহাজীবন অনুধ্যান' বিষয়ে অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য ভাষণ দেন। প্রশ্নোত্তর-পর্বে যুবক-যুবতীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান করেন স্বামী প্রাণারামানন্দ ও ডঃ কমল নন্দী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী পূর্ণব্রহ্মানন্দ, অলোক ঘোষ, স্বপন চট্টোপাধ্যায় এবং অমিত দে। সমাপ্তি-ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের তিনি পুরস্কার ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক শঙ্কর রায়। অনুষ্ঠানে প্রায় ২০০ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

পাড়াতল অঞ্চল স্বামী বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (পাড়াতল, জেলা—বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১ অক্টোবর ২০০০ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বার্ষিক বস্ত্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এদিন সকালে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ২০০০ ভক্ত ও দরিদ্র মানুষকে বসিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী সর্বগানন্দ। ভাষণ দান করেন বর্ধমান শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বাত্মানন্দ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শিবাত্মানন্দ এবং স্বামী পূর্ণলোকানন্দ। সভাশেষে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ৫৫টি ধুতি ও শাড়ি বিতরণ এবং বন্যাত্রাণের জন্য বেলুড় মঠে অর্থ ও বস্ত্র দান করা হয়।

হিজলডিহা বিবেকানন্দ সেবা সমিতি (জেলা—বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৪ অক্টোবর ২০০০ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, পাঠ, ধর্মসভা, প্রসাদ বিতরণ এবং ৬০ জন দুঃস্থ প্রতিবন্ধীর মধ্যে বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন গোপিকারঞ্জন রায় বক্সী প্রমুখ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ (সিভিক সেন্টার, কল্যাণী, জেলা—নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১১ অক্টোবর ২০০০ বিকালে এক বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন আলপনা রায় ও মালা চট্টোপাধ্যায় এবং বহু ভক্তের সমাবেশে ভাষণ দেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ (জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২২ অক্টোবর ২০০০ একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করে। বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি এবং ধর্মপ্রসঙ্গ ছিল সম্মেলনের মূল বিষয়। সম্মেলনে স্বাগত-ভাষণ দেন সঙ্ঘ-সম্পাদক স্বপন মুখোপাধ্যায়। ধর্মপ্রসঙ্গ করেন নয়া দিল্লি রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী গোকুলানন্দ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন তাপস মুখোপাধ্যায় ও সঙ্ঘের সভ্যগণ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অজয় দাশ। সম্মেলনে স্থানীয় সাংসদ আকবর আলি খোন্দকার-সহ বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

শ্যামপুকুরবাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৭০০০০৪) গত ২৬ অক্টোবর ২০০০ শ্রীরামকৃষ্ণের 'বরাভয়-লীলা' স্মরণোৎসব পালন করে। অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ ছিল পূজা এবং 'সুরপীঠ' সংস্থার অরুণকৃষ্ণ ঘোষের পরিচালনায় 'কথামৃতের গান'। এরপর 'কথামৃত' পাঠ করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি (লামডিং, আসাম) গত ২৮ অক্টোবর ২০০০ এক ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও সম্মেলনে প্রায় ১৮০ জন ভক্ত যোগদান করেন। অনুষ্ঠানের সূচনায় স্বাগত-ভাষণ দেন মণীন্দ্র চক্রবর্তী। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। এছাড়া তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর-মা-স্বামীজী প্রসঙ্গে ভাষণ ও ভক্তদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বসন্ত দাস, শিখা ভট্টাচার্য, তন্দ্রা আচার্য ও উমা রায়।

নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ (কলকাতা-৭০০০৯৫) গত ২৮ অক্টোবর ২০০০ বাগবাজারের ভগিনী নিবেদিতা উদ্যানে বৈদিক মন্ত্রপাঠ, বন্দনাগান, ভাষণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে ভগিনী নিবেদিতার জন্মজয়ন্তী পালন করে। ভাষণ দান করেন প্রব্রাজিকা মহেশপ্রাণা, প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণা, সঙ্ঘের সভানেত্রী নিবেদিতা মজুমদার এবং স্থানীয় পৌরপিতা সলিল চট্টোপাধ্যায়। এরপর পথশিশুদের মধ্যে পোশাক ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

ভগিনী নিবেদিতা সেবাকেন্দ্রের ডানকুনি শাখায় (জেলা—হুগলী) গত ২৮ অক্টোবর ২০০০ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা। এই উপলক্ষ্যে পূজা, পাঠ, ভজন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন বিকালে উত্তর কলকাতার গ্যালিফ স্ট্রীটে একটি অনুষ্ঠানে বস্তির ছেলেমেয়ে ও পথশিশুরা আবৃত্তি ও গান পরিবেশন করে। তাদের মধ্যে নতুন জামাকাপড় বিতরণ করেন স্বামী প্রাণারামানন্দ। প্রায় ২০০ বস্তিবাসীকে বসিয়ে খিচুড়ি খাওয়ানো হয়। অনুষ্ঠানের সমাপ্তি পর্বে কাঁকুলিয়া রোডের বস্তির ছেলেমেয়েদের একটি অনুষ্ঠানেও গান ও আবৃত্তি পরিবেশিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী বলভদ্রানন্দ।

হিন্দমোটর লোকমাতা নিবেদিতা সেবা সঙ্ঘ (জেলা—হুগলী) গত ৫ নভেম্বর ২০০০ স্থানীয় কোতরং ভূপেন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে ভগিনী নিবেদিতার জন্মোৎসব পালন করে। অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা, অধ্যাপক বুদ্ধদেব চক্রবর্তী এবং কথাসাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। এই উপলক্ষ্যে কয়েকটি বিদ্যালয়ের প্রায় ১০০ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে নতুন পোশাক এবং দুঃস্থ মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। এছাড়া বন্যাত্রাণে বেলুড় মঠে ৫০০১ টাকার চেক প্রদান করা হয়।

বাগমোড় বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের (কাঁচড়াপাড়া, জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) উদ্যোগে গত ৫ নভেম্বর ২০০০ সারাদিনব্যাপী একটি যুবশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ১১৩ জন অংশগ্রহণ করেন। বক্তব্য রাখেন প্রণব রায়, রবি ভট্টাচার্য ও অলোক দাস। যুবকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ও ভাষণ দান করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সহ-সম্পাদক বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী। বিকালে ভাষণ দান করেন স্বামী সত্যস্থানন্দ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশ্বনাথ ঘোষাল।

পুতুণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (শক্তিগড়, জেলা—বর্ধমান) গত ৫ নভেম্বর ২০০০ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে পূজা, চণ্ডীপাঠ, প্রসাদ বিতরণ, অখিলবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়ের লীলাগীতি, দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) উদ্যোগে গত ১১ নভেম্বর ২০০০ পাঠ, সমবেত জপধ্যান, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মাধ্যমে ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ২০০ ভক্ত

অংশগ্রহণ করেন। পরদিন শিক্ষাসম্মেলনে ভাষণ, আলোচনা, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ৩২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ৪টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থেকে ১২৭ জন প্রতিনিধি ও ৩০ জন স্বেচ্ছাসেবক যোগদান করেন। উভয় সম্মেলনের বিভিন্ন পর্বে আলোচনা করেন মনসাদ্বীপ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী শান্তিদানন্দ, সারগাছি আশ্রমের সম্পাদক স্বামী বিশ্বনাথানন্দ এবং বুলবুল গাঙ্গুলী।

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (কলকাতা-৭০০০৪৭) গত ১২ নভেম্বর ২০০০ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় সারাদিনব্যাপী একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করে। সূচনায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন তমাল বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাগত-ভাষণ দেন সেবাশ্রমের সম্পাদক সলিলকুমার বিশ্বাস। সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী বিশ্বময়ানন্দ, ভাষণ দেন স্বামী পুরাতনানন্দ। দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বামী বিধানানন্দ। বক্তা ছিলেন ডঃ কমল নন্দী ও গোপেন চৌধুরী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন তমাল ভট্টাচার্য ও কৌশিক দাস। স্বামীজীর বাণী এবং নেতাজীর রচনা থেকে পাঠ করেন কয়েকজন যুবপ্রতিনিধি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সেবাশ্রম-সভাপতি সুবোধ দাশগুপ্ত। প্রায় দুই শতাধিক যুবপ্রতিনিধি ও পরিদর্শক সম্মেলনে যোগ দেন।

স্বামীজী সর্বোদয় সঙ্ঘ (বিরুলিয়া, জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১২ নভেম্বর ২০০০ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে ৪৩৭ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। বক্তব্য রাখেন স্বামী বলভদ্রানন্দ ও স্বামী সদ্গুণানন্দ। তাঁরা ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান করেন।

বৃহত্তর কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের (কলকাতা-৭০০০০৩) ১৭তম অধিবেশন গত ১৮ ও ১৯ নভেম্বর ২০০০ বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন স্বামী বোধসারানন্দের বেদপাঠের পর উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করেন ধ্রুব চৌধুরী। কেন্দ্রের সম্পাদক অধ্যাপক ডঃ পশুপতি মাহাতোর স্বাগত-ভাষণান্তে 'ভাবপ্রচার পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্য ও পন্থা' বিষয়ে আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দ। পরিষদের সংবিধান ও দশ দফা নির্দেশাবলী পাঠ করেন ডাঃ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য ও দয়াময় উপাধ্যায়। ভাষণ দান করেন পরিষদের সভাপতি স্বামী পূতানন্দ, সহ-সভাপতিদ্বয় স্বামী ঋদ্ধানন্দ ও স্বামী বোধসারানন্দ এবং স্বামী সনাতনানন্দ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দয়াময় উপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে ১৫টি প্রতিষ্ঠান থেকে ৬০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় দিন প্রায় ২০০ ভক্তের সমাবেশে অনুষ্ঠিত হয় ভক্তিমূলক সঙ্গীত, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও ধর্মসভা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন ধ্রুব চৌধুরী, স্বপন চট্টোপাধ্যায় ও অলোক ঘোষ এবং লীলাগীতি পরিবেশন করেন স্বামী সর্বময়ানন্দ। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ঋদ্ধানন্দ, স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ ও স্বামী প্রাণারামানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ (বোকারো স্টীল সিটি, ঝাড়খণ্ড) গত ১৮-২০ নভেম্বর ২০০০ **বিহার-ঝাড়খণ্ড রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের** অধিবেশন এবং সঙ্ঘের সাধুনিবাসের দশম বর্ষ প্রতিষ্ঠা উৎসব উদ্‌যাপন করে। আলোচনা, সঙ্গীত, নৃত্য, গীতিনাট্য এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতা ছিল এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ। অনুষ্ঠানে স্বামী চন্দ্রানন্দ, স্বামী অধ্যাত্মানন্দ, স্বামী শশাঙ্কানন্দ, স্বামী সুবীরানন্দ, স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দ-সহ কয়েকজন সাধু উপস্থিত ছিলেন। বিহার ও ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ২৫০ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

ফুলিয়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র (জেলা—নদীয়া) গত ১৯ নভেম্বর ২০০০ একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করে। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী সত্যবোধানন্দ, রঞ্জিতকুমার ঘোষ ও অমিতকুমার দত্ত। উদ্বোধন ও সমাপ্তি-ভাষণ দেন যথাক্রমে মিঠুন বসাক ও রঞ্জন বসাক। আলোচনাচক্রে ১৮৬ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল।

রামপুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্রে (জেলা—বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৫ নভেম্বর ২০০০ কামারপুকুর মঠের অধ্যক্ষ স্বামী দেবদেবানন্দের পরিচালনায় একটি আধ্যাত্মিক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সমবেত জপ-ধ্যান, ভক্তিগীতি ও আলোচনা ছিল শিবিরের প্রধান অঙ্গ। স্বাগত-ভাষণ দেন পাঠচক্রের সম্পাদক বিশ্বেশ্বর রায় এবং সমাপ্তি-ভাষণ দেন জয়শঙ্কর হালদার। প্রসঙ্গত, বেলুড় মঠের অর্থানুকূল্যে নিকটবর্তী অঞ্চলের বন্যার্তদের মধ্যে পাঠচক্র ১৩,৫০০ টাকার নতুন বস্ত্র ও ৮ কুইন্টাল চাল বিতরণ করেছে। এছাড়াও পাঠচক্রের সদস্য-সদস্যারা তাঁদের পুরনো বস্ত্র বন্যাত্রাণে দান করেছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘে (বেনাচিতি, দুর্গাপুর, জেলা—বর্ধমান) গত ২৫ নভেম্বর ২০০০ প্রায় সহস্রাধিক ভক্তের উপস্থিতিতে শ্রীশ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম ও ভক্তিগীতি ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। পরদিন আয়োজিত ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন ডাঃ সত্যানন্দ চক্রবর্তী, সিরাজ খান, আলো ঘোষ প্রমুখ। সভাশেষে অনুষ্ঠিত হয় ভক্তিগীতি ও গীতি-আলেখ্য। অনুষ্ঠানে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে কম্বল ও বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

সেবাব্রত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (ইড়পালা, জেলা—মেদিনীপুর) গত ১৪ অক্টোবর ২০০০ গ্রামীণ দুঃস্থ রোগীদের জন্য সারাদিনব্যাপী বিনাব্যয়ে একটি চিকিৎসা-শিবিরের আয়োজন করে। শিবিরে ১২৯ জন বয়স্ক, ১৬০ জন শিশু ও ২৬ জন রোগীর ব্লাডসুগার পরীক্ষা করা হয় এবং বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়। এছাড়া এই সেবাশ্রম মেদিনীপুরের ৭৪৩টি পরিবারের প্রায় ২০০০ বন্যার্ত মানুষের মধ্যে মাথাপিছু ২ কিলো করে চিঁড়ে এবং ৫০০ করে গুড় বিতরণ করে। উল্লেখ্য, গত ২২ অক্টোবর এই সেবাশ্রমে ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় আয়োজিত এক যুবসম্মেলনে ১৬-১৭টি গ্রামের প্রায় ৪০০ যুবপ্রতিনিধি যোগদান করে। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী বলভদ্রানন্দ। বক্তব্য রাখেন স্বামী গুড়াকেশানন্দ,

অধ্যাপক কমল মান্না, ডাঃ সুকুমার গোস্বামী প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন গীত বিতানের শিল্পিবৃন্দ। স্বাগত-ভাষণ দেন ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী। এরপর গত ৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সেবাশ্রম-সম্পাদক সরোজ কয়ড়ী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (আমবাসা, ধলাই, ত্রিপুরা) গত ২৮ অক্টোবর ২০০০ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে আশ্রমের অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্রের ৩৫ জন ছাত্রছাত্রী এবং এলাকার ২৮ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করে। অনুষ্ঠানে জেলাশাসক ও জেলা নামখানা পুলিস আধিকারিক বক্তব্য রাখেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ (মহারাজগঞ্জ, নামখানা, জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৭ ও ১৮ নভেম্বর ২০০০ ইন্ডিয়ান পাবলিক হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় নামখানা ব্লকের সাত মাইল বাজারে একটি স্বাস্থ্যমেলা ও স্বাস্থ্য-সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করে। এতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ নানা রোগ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। মরণোত্তর চক্ষুদান ও দেহদান অঙ্গীকার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের চক্ষু-বিভাগীয় প্রধান ডাঃ জ্যোতির্ময় দত্ত। এতে ১০৭ জন মরণোত্তর চক্ষুদান ও ১০ জন মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকার করেন। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ এবং দ্বিতীয় দিন স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ বক্তব্য রাখেন।

ত্রাণ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বনগ্রাম (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০০০ থেকে বনগাঁ মহকুমার ১০,০০০ বন্যাদুর্গত মানুষকে প্রথম ১৫ দিন রান্না করা খাবার ও পরবর্তী ১১ দিন চিঁড়া, গুড় বিতরণ করেছে। এছাড়া ঔষধপত্র ও জলশোধন বটিকা এবং ৩,০০০ বন্যার্তকে নতুন ও পুরনো বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে।

দত্তপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) বারাসত রামকৃষ্ণ মঠের সহযোগিতায় বনগাঁ, চাঁদপাড়া, গোবরডাঙা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বন্যাপীড়িত মানুষের মধ্যে গত ২২ অক্টোবর থেকে ১০০০ নতুন ও পুরনো জামাকাপড়, কম্বল, গরম পোশাক ও ৩ প্যাকেট ওষুধ বিতরণ করেছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, সেবাকেন্দ্র পরিচালিত রামকৃষ্ণ-সারদা বিদ্যামন্দিরের শিশু ছাত্রছাত্রীরা তাদের টিফিন খরচ বাঁচিয়ে ১২৮ টাকা বন্যাদুর্গতদের জন্য দান করেছে। তাছাড়া দত্তপুকুরের বিভিন্ন ত্রাণশিবিরে আশ্রয়গ্রহণকারী ২০০০ বন্যাপীড়িত মানুষের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বণ্টন করা হয়েছে।

গত ১২ নভেম্বর সেবাকেন্দ্র পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসা বিভাগের উদ্বোধন করেছেন ডাঃ মানস পারিয়া।

বনগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) বনগাঁ ও বাগদহ ব্লকের দুটি গ্রামে প্রায় ২,৫০০ বন্যাগ্রস্ত মানুষের মধ্যে শুকনো খাবার ও ওষুধ বিতরণ করেছে।

উত্তর চব্বিশ পরগনা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের (বারাকপুর, জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) উদ্যোগে বনগ্রাম, গোবরডাঙা, মেদিয়া ও হাবড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা-পীড়িত মানুষের মধ্যে প্রায় ৯৮,১৬৯ টাকার চাল, ডাল, চিঁড়ে, গুড়, বেবিফুড, ঔষধ ও পোশাক-পরিচ্ছদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি (ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা) পশ্চিমবঙ্গের বন্যাত্রাণে রামকৃষ্ণ মিশনকে ২,০০০ টাকা দান করেছে।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **ডাঃ দীপা গাঙ্গুলী** গত ২৮ জুন ২০০০ সজ্ঞানে সল্টলেকস্থ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। মৃত্যুর সপ্তাহ তিনেক আগে তিনি স্বামী ও একমাত্র কন্যার সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণ শেষ করে ফিরে আসেন। তিনি কয়েক বছর ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন, কিন্তু গভীরভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আদর্শে বিশ্বাসী ডাঃ গাঙ্গুলী ছিলেন প্রভূত মানসিক প্রফুল্লতা ও প্রাণবন্ত ভাবের অধিকারিণী। ব্যাধিকে উপেক্ষা করে নানা সেবামূলক কাজের সঙ্গে তিনি নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। নিজের বৃত্তি চিকিৎসাক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি 'উদ্বোধন'-এর আজীবন সদস্যা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, কলকাতার বহুবাজার-নিবাসী **তুহিন বসুমল্লিক** গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০০ মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। তিনি গত সাড়ে তিনবছর যাবৎ 'উদ্বোধন'-এ স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজ করছিলেন। 'উদ্বোধন'-অন্তপ্রাণ তুহিনবাবু গত ১৪ সেপ্টেম্বর রাত্রিতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ধীরে ধীরে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যেতে থাকেন। অবশেষে 'শ্রীরামকৃষ্ণ'-নাম উচ্চারণ করতে করতে অচৈতন্য হয়ে যান। তাঁকে মধ্য কলকাতার 'সেভিয়ার' নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয় এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি নিজে 'উদ্বোধন' নিয়মিত পাঠ করতেন এবং বহুজনকে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকও করেছেন। তাঁর মতো সহজ-সরল, নিরহঙ্কারী মানুষ বাস্তবিকই দুর্লভ।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **সুষমারানী পালিত** গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০০ বেলা ১.২০ মিনিটে মধ্য কলকাতার নিজ বাসভবনে ৮৮ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি স্বামী নির্বাণানন্দজী, স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী, স্বামী অভয়ানন্দজী (ভরত মহারাজ) প্রমুখ বেলুড় মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী-গণের স্নেহধন্যা ছিলেন। প্রায় ১০ বছর তিনি শয্যাশায়ী ছিলেন। বাঁকুড়া জেলার বিশিষ্ট স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও সমাজসেবী সুধীরকুমার পালিতের স্ত্রী সুষমাদেবীও ছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত। সেজন্য একাধিকবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। তিনি মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ এবং লবণ আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। সহজ, সরল ব্যবহার ও উদারতার জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা-ভালবাসা লাভ করেছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **হরিপদ ঘোষ** গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০০ সকাল ৯টায় জপরত অবস্থায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। অনাড়ম্বর জীবনযাপন ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ❑

জয়তারা পাবলিশার্সের সশ্রদ্ধ নিবেদন

মাতৃসাধক ও মনীষী শ্রীবিপুলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি—

মহাপীঠ তারাপীঠ

[পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত। ১ম, ২য়, ৩য় প্রতি খণ্ড : মূল্য—৭৫ টাকা, ৪র্থ—৭০ টাকা, ৫ম—১৫০ টাকা। ধর্মজগতে সর্বাধিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণ্য মহাগ্রন্থে রয়েছে তারাপীঠ তথা ১০৮ সতীপীঠের বিস্ময়কর বিবরণ, শিবাবতার শ্রীশ্রীবামাক্ষ্যাপার মহাজীবনী, শতাধিক সিদ্ধ সাধক-সাধিকার সাধনকাহিনী, কুম্ভমেলা, রথযাত্রা, গঙ্গাসাগর তথা বিভিন্ন ভারততীর্থের বিস্তৃত বিবরণ ও সর্বোপরি যীশুখ্রীস্টের ভারতে আগমন, মহাসাধনা ও মহাসিদ্ধির মহাবিস্ময়কর কাহিনী প্রভৃতি। "এই গ্রন্থ পাঠ করলে চতুর্দশীযুক্ত অমাবস্যায় সারারাত কালীপূজার ফললাভ হয়।"—লিখেছেন মহামণ্ডলেশ্বর শিবানন্দ গিরি মহারাজ]

মনীষী শ্রীবিপুলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের আরেক ক্ল্যাসিক সৃষ্টি—

সাধু সান্নিধ্যে সাধু মনীষী মূল্য—৭৫ টাকা

[ভারতের অধ্যাত্ম-সাহিত্যে সর্বপ্রথম শতাধিক মহাসাধক ও মহাসাধিকার পরস্পর সান্নিধ্য ও সংপ্রসঙ্গের অনবদ্য বিবরণ, ভারত তথা বিশ্বের বিশিষ্ট সাধুসন্ত, মনীষী ও সংবাদপত্র কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।]

সাধক শ্রীবিপুলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের আরেকটি চিরন্তন সৃষ্টি—

সাধু সান্নিধ্যে রবীন্দ্রনাথ মূল্য—৬০ টাকা

[ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অধ্যাত্মজীবনের এক অপ্রকাশিত ও চাঞ্চল্যকর অধ্যায়। কবিগুরুর জীবনে ও লেখায় সাধুসঙ্গের অসামান্য প্রভাবের তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ।]

সাধক সাহিত্যিক ও ক্রিয়াযোগী তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের যুগান্তকারী সৃষ্টি—

মহাসিন্ধুর ওপার থেকে মূল্য—৫০ টাকা

[দেহ থেকে দেহাতীতে গিয়ে এক সিদ্ধ ক্রিয়াযোগীর পরলোকের বিভিন্ন স্তরদর্শন ও দিব্যদেহধারী মহাত্মাদের সাথে কথোপকথনের এক চমকপ্রদ বিবরণ। দেশবিদেশের সাধুসমাজ ও সংবাদপত্র কর্তৃক বিরাটভাবে অভিনন্দিত।]

পরিব্রাজক তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের আরেকটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি—

দেবলোকের অমৃতসন্ধানে মূল্য—৬০ টাকা

[হিমালয়ের গহন কন্দরে যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী, গোমুখ, কালিন্দী খাল, বদ্রীনাথ ও পঞ্চকেদার পরিভ্রমণের পথে এখনো যে কত অলৌকিক দিব্যলীলা ঘটে সেই অভিজ্ঞতার ওপর ভর করে রচিত। হিমালয়ের জানা-অজানা তীর্থের মাহাত্ম্য তথা ঐসব স্থানে বিভিন্ন উচ্চকোটির মহাত্মাদের অলৌকিক লীলা এবং হিমালয়ের অলৌকিকত্বের ওপর রসাস্বাদিত ভ্রমণ-কাহিনী।]

প্রাপ্তিস্থান ঃ

মহেশ লাইব্রেরী (২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩), নাথ ব্রাদার্স (৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩), দে বুক স্টোর (২৪১-৯২৬৬), শৈব্যা ও বুক ফ্রেন্ডস (কলেজ স্ট্রীট), ফার্মা কে. এল. এম. (২০৭বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২), জিজ্ঞাসা (৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা-২৯) এবং সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার (৩৮, বিধান সরণি, কলকাতা-৬, ফোন ঃ ২৪১-১২০৮)

e-mail : Tarashis ganguly@Sanjay on line.com

কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ এক কামড়েই বাজিমাৎ

ঝিঙ্গি পাঁপড়



শ্রীযুক্ত শ্রীমধু নির্মাতার তৈরী

ঘৃণার শক্তির চেয়ে প্রেমের শক্তি অনন্ত গুণে বেশি শক্তিমান।

স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments From :

M/S. BHARAT ENGINEERING STORES

36, Strand Road
2nd Floor, Room No. 13/A
Calcutta-700 001
Phone : 243-3576
Fax : 91-33-2209309

Approved/Reg. Govt. Supplier of Indian Ordnance Factories, Reputed Supplier of All Types of Induction Coils, Lamination Cores, Autotransformers and various Elec. items.



সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন

আমাদের ভগ্নপ্রায় একটি School Building পুনর্নির্মাণের জন্য 'উদ্বোধন' পত্রিকার মাধ্যমে আবেদন রেখেছিলাম। এই আবেদনে অভাবনীয় সাড়া আমাদের মুগ্ধ ও উৎসাহিত করেছে। ঐ ভগ্নগৃহটির একতলার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এখন আমরা পুরনো স্কুলবাড়ি সংস্কারেও হাত দিতে চলেছি। তার অবস্থাও মোটেই সুবিধার নয়। প্রকৃতপক্ষে সংস্কার করতে গিয়ে পুরনো ঘরগুলি পুনর্নির্মিতই হয়ে যাবে। এই প্রকল্পের জন্য এবং তৎসহ আরো কিছু জরুরী প্রকল্পের জন্য আবার আপনাদের সাহায্য চাইছি। নিচে তার একটা আনুমানিক হিসাব দিলাম।

১।	পুরনো School Building-এর সংস্কার তথা পুনর্নির্মাণ প্রকল্প	:	২০,০০,০০০ টাকা
২।	আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প	:	১০,০০,০০০ টাকা
৩।	শিক্ষা-বিষয়ক যন্ত্রপাতি	:	১,০০,০০০ টাকা
৪।	একখানা Ambulance গাড়ি	:	৫,০০,০০০ টাকা
			৩৬,০০,০০০ টাকা

চেক/ড্রাফট 'Ramakrishna Mission Ashrama, Ramharipur'—এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফট পাঠাবার ঠিকানা—রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা—বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ ঃ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন নং ৫৯২৩৫।

রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি

বিনীত
স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ
সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া



Ramakrishna Mission Vidyapith

A Residential Senior Secondary School

Ramakrishna Nagar, P.O.—Vidyapith
Dt.—Deoghar, Jharkhand, Pin : 814112
Rly. Station : Baidyanathdham, E. Rly.
Phone : (06432) 22413 & 20442 E-mail : rkmvidya@dtc.vsnl.net.in

একটি আবেদন

পুণ্যতীর্থ বৈদ্যনাথধাম—শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পদরজঃস্পর্শে পূত। স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিবিজড়িত দেওঘরে ১৯২২ সালে শুরু হয় রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ্ শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর অনুপ্রেরণায় প্রায় ৮০ বছর পূর্বে যে বিদ্যাপীঠের যাত্রা শুরু হয়, আজ সেই বিদ্যাপীঠ এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ বলেছিলেন ঃ "এই বিদ্যাপীঠের মাধ্যমে কালে অনেক বড় কাজ হবে—এর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।"

এই বিদ্যাপীঠ তার বহুমুখী কর্মধারার অঙ্গ হিসাবে উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স চালু করেছে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে।

স্বামীজী চেয়েছিলেন ঃ "নূতন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।" এই উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রদের মধ্যে অনেকে আছে—যারা আদিবাসী, অনুন্নত সম্প্রদায় এবং সর্বোপরি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ সেইসব কিশোরদের শিক্ষিত করতে বিনম্র প্রয়াস করে যাচ্ছে।

উচ্চ মাধ্যমিকের এইসব ছেলেদের জন্য একটি পৃথক কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছে, যাতে আছে ছেলেদের অভিভাবক ও পরিদর্শক-শিক্ষকদের জন্য অতিথিভবন, প্রার্থনাগৃহ, গ্রন্থাগার, ভোজনগৃহ এবং একাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস। দ্বাদশ শ্রেণী শুরু হবে ২০০১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে। কিন্তু অর্থাভাব হেতু নির্মীয়মাণ দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রাবাসটি সম্পূর্ণ করা যায়নি। ভবনটি নির্মাণ করতে সর্বসাকুল্যে ১৪ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

তাই সকলের নিকট বিনীত আবেদন—এই মহান প্রকল্পকে রূপায়িত করতে আপনারা এগিয়ে আসুন।

স্বামী সুবীরানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড

- অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক/ড্রাফট রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর—এই নামে অনুগ্রহ করে পাঠাবেন।
- রামকৃষ্ণ মিশনের যেকোন শাখায় প্রদত্ত যেকোন আর্থিক দান ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত।
- ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বা তার বেশি দান করলে দাতার ইচ্ছানুসারে স্মারক-প্রস্তর লাগানো হবে।

উদ্বোধন কার্যালয় পরিবেশিত

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী শিবানন্দ সম্পর্কিত

অবশ্য-সংগ্রহযোগ্য একটি অমূল্য গ্রন্থ





শিবানন্দ-স্মৃতি সংগ্রহ (২খণ্ড)

মূল্য : ৮০.০০ (প্রতি খণ্ড ৪০.০০)

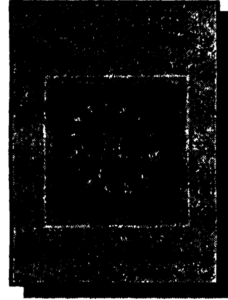
[রেজিস্ট্রি ডাকে নিলে অতিরিক্ত ২০.০০]

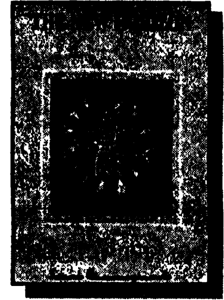
উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এবং মঠ ও মিশনের অছি ও পরিচালন পর্ষদের অন্যতম সদস্য প্রাচীন সন্ন্যাসী

স্বামী হিরন্ময়ানন্দের

দুটি চিন্তা-আলোড়নকারী মৌলিক গ্রন্থ





সাধ্য ও সাধনা

মূল্য : ২০ টাকা

New Horizon

Price : Rs. 25



উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত
সাম্প্রতিক গ্রন্থাবলী

নারদীয় ভক্তিসূত্র স্বামী ভূতেশানন্দ মূল্য : [illegible]	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত মহানির্দেশিকা ডঃ জলধিকুমার সরকার মূল্য : ১০০.০০	সাংখ্যকারিকা স্বামী ভাবঘনানন্দ (অনূদিত) মূল্য : ১৫.০০
[illegible]	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাঙ্করভাষ্য ও তার ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা ও অনুবাদ : স্বামী বাসুদেবানন্দ মূল্য : ২০০.০০	মহীয়সী ভারতীয় নারী সম্পাদনা : স্বামী মাধবানন্দ ও ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মূল্য : ১৫০.০০
[illegible]	[illegible]	চরিত্র গঠনের উপায় স্বামী বুধানন্দ মূল্য : [illegible]

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ



বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ না করলে চৈতন্যই হয় না—ভগবানলাভ হয় না। বিষয়বুদ্ধি থাকলেই কপটতা হয়। সরল না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ

❁

যার ওপর যেমন কর্তব্য করে যাবে, কিন্তু ভাল এক ভগবান ছাড়া আর কাউকে বেসো না।

শ্রীমা সারদাদেবী

❁

পবিত্র আর নিঃস্বার্থ হতে চেষ্টা কর—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম।

স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments From :

UTILITY INDUSTRIES & CHEMICAL WORKS

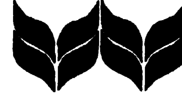
19Y, Raja Manindra Road, Kolkata-700037
Phone : 556-5543/6459
&

A S I M C O

22, Amalangsu Sen Road, Kolkata-700048
Phone : 556-5351/5543

Manufacturers of Phenyle. I.S.I., Lysol. I.P., Soaps, Antiseptic Lotions & Purified Water. I.P.

Dealers in all sorts of Medicines, Pharmaceuticals & Laboratory Chemicals.



"QUALITY UPPER ASSAM TEAS FOR COLOUR, STRENGTH & BRISKNESS."

With Best Compliments From :

WARREN TEA LIMITED

31, CHOWRINGHEE ROAD
KOLKATA-700 016

TELEPHONE NOS. :
226-6611/13/14/18/49; 245-8190/8191

TELEGRAMS : WARRANTY

FAX NO. : 249-5980; 226-6716

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

With Best Compliments From :

DIAMOND METAL PRODUCTS

Mfg. All Types of Aluminium Pilfer Proof Caps

APOLO ELECTRIC BULB PVT. LTD.
27B/H/13/1, Chaulpatty Road
Kolkata-700010
Tele. : (O) 350-3901/353-1445
Fax : 350-6297

Mfg. G.L.S. Lamps & Night Lamps

সেরা ফলন দেদার লাভ

লালন সুপার ফসফেট সার



প্রস্তুতকারক ঃ

সারদা ফার্টিলাইজার্স লিঃ
২, ক্লাইভঘাট স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০১

ফোন নং
অফিস ঃ ২২০-৫৪৩৫
রেসি. ঃ ৩৩৭-৭৩৬৫
মোবাইল ঃ ৯৮৩১০-১৯২৬৬

রামকৃষ্ণ সাহিত্য

শ্রীম-কথিত
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত দাম : ১৫০ টাকা মাত্র
নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ দাম : ৪০ টাকা মাত্র
নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও রেণুকা চট্টোপাধ্যায়ের
শ্রীশ্রীমা সারদা দাম : ৩৬ টাকা মাত্র
তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শ্রীশ্রীমা ও ডাকাতবাবা দাম : ৩০ টাকা মাত্র
নির্মলকুমার রায়ের
চরণ চিহ্ন ধরে দাম : ৬০ টাকা মাত্র
রবিদাস সাহারায়ের
যুগাবতার রামকৃষ্ণ দাম : ২০ টাকা মাত্র
আমাদের শ্রীমা সারদামণি দাম : ২০ টাকা মাত্র
ভগিনী নিবেদিতা দাম : ২০ টাকা মাত্র
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ দাম : ২০ টাকা মাত্র
দেব সাহিত্য কুটীরের শ্রদ্ধার্ঘ্য
তোমারি হউক জয় দাম : ১৫ টাকা মাত্র
His Divine Footsteps Rs. 12.00 only
(Edited by Dev Sahitya Kutir)
Dr. Mamata Kundu's
A Critical Study of Universal Religion of Ramakrishna Paramahansa Rs. 50 only

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড ❑ ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

With Best Compliments From:

DOBSON DISTRIBUTORS

88, DR. ABANI DUTTA ROAD
HOWRAH-711 101
PHONE : 666-1722
TELEFAX : 666-9969

Stockist

Serum Institute, Tablets India Ltd., Wallace Pharmaceuticals Ltd., Eli Lilly Ranbaxy, Pharmacia & Upjohn, Orchid, Caplet, Smith Kline Beecham (Vaccine), Sunny Industries Pvt. Ltd., Midas Care, Arvind (S.K.K.L. Ltd.), Neon Laboratories, Mayer, Trio Pharma

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments From:

AUTO REXINE AGENCY

House of Car Decoration
Specialist in Car-Air Conditioner

Office & Show Room:
31/A, Lenin Sarani, Kolkata-700 013
163, Lenin Sarani, Kolkata-700 013

Branch:
71A, Park Street, Kolkata-700 013
Phone : 244-1764/2184, 237-5435

GRAM : CHEMLIME (CAL.)


238-2850
239-0134
232-0502

CHOUDHURY & CO.

DEALERS IN:
QUICK LIME, CHEMICAL LIME, HYDRATED LIME, BUILDING LIME, LIMESTONE, DOLOMITE, SAND, BAUXITE, NIRU LIME ETC.

67/45, STRAND ROAD
KOLKATA-700 007

CAN YOU SURVIVE
THE DANGERS OF
CONTAMINATED BLOOD?



BLOOD. A unique gift of God.
Saviour of life when it is pure. Killer when it is impure or contaminated.
The onus is on us, as responsible citizens, to do our utmost to bring a change in the dismal scenario... to ensure that a Blood Bank supplies and receives only HEALTHY, SAFE AND CONTAMINATION-FREE BLOOD.

It is our right

Some alarming realities...
- In India, there are only 400 licensed Blood Banks supplying only 25% of the total needs.
- A vast majority of blood donors are *'professionals'* who donate 5-6 times in a month. They are mostly alcoholics and drug addicts, representing high risk groups for AIDS, hepatitis, etc.

Need of the hour...
- *Supply of contamination-free blood from licensed, quality-conscious Blood Banks.*
- *Motivate more and more voluntary, safe blood donors to replace 'professional' donors.*

ACTIONS

WHO

WHO Global Blood Safety initiative involving development of Integrated Blood Transfusion Services with selection of the *RIGHT DONORS AND PRESCREENING OF BLOOD TO ENSURE SAFE AND SECURE BLOOD TRANSFUSION.*

Government

- Established Blood Transfusion Councils at the National as well as State level.
- Strengthened Drug Control Administration in States for licensing and effective monitoring of Blood Banks in terms of adequacy of testing and storage facilities.

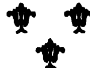
BLOOD SAVES ONLY WHEN IT IS SAFE...

Haran Chandra Banerjee & Sons.

7C, CLIVE ROW, CALCUTTA-700 001

PAPER MERCHANTS, STATIONERS AND GOVT. SUPPLIERS

Phones : Office : 220-1700
Resi. : 665-9075



Distributors for :

TITAGHUR PAPER MILLS CO. LTD.
BENGAL PAPER MILLS CO. LTD.
SUPREME PAPER MILLS CO. LTD.
SIMPLEX MILLS CO. LTD.



দেবভূমি পণ্ডিচেরীতে শতাব্দীর অনন্য আবিষ্কার (স্পিরুলিনা-২০০০) SPi 2K

এক প্রাকৃতিক খাদ্যবিকল্প—ভারতে প্রথমবার শাকাহারী ক্যাপসুলের মধ্যে

প্রত্যহ ✱ যেকোন বয়সের ✱ সকলের জন্য

✓ সুস্থ ও সবল দেহ গঠনের জন্য অত্যাবশ্যক ভিটামিন, খনিজ দ্রব্য ও ভেষজের সমন্বয়ে প্রাকৃতিক গুণে ভরা—স্পিরুলিনা-২০০০ (Spi 2k)
✓ সুষম খাদ্যের বিকল্প—Spi 2k।
✓ Spi 2k-এর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।
✓ শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই নিশ্চিন্তে এর ব্যবহার করতে পারেন।
✓ Spi 2k শরীরে আনে বাড়তি উদ্যম, স্বাস্থ্য ও শক্তি।
✓ Spi 2k-এর মধ্যে আছে সমস্তপ্রকার রোগের প্রতিরোধকারী শক্তি।
✓ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি এই Spi 2k দূর করে সমস্ত দুশ্চিন্তা, দেয় সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, কর্মঠ জীবন।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য লিখুন :

হেড অফিস : পণ্ডিচেরী
পারফেক্ট হেলথ কেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড
৫২, ভারতী স্ট্রীট, টি. ভি. নগর
(আনন্দ ইন সন্নিকটে), পণ্ডিচেরী-৬০৫০০৩
E-mail : perfecthealth@india.com
Cell : 98430-63415/63416
Fax : 0413-330057 Phone : (0413) 221411

কলকাতায় প্রাপ্তিস্থান :
অরোসার্ভিস
শ্রীঅরবিন্দ ভবন
৮, সেক্সপীয়ার সরণি
কলকাতা-৭০০ ০৭১
Phone : 282-7790
E-mail : aurocal@vsnl.net

প্রাপ্তিস্থান :
শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি
প্রতাপবাগান
বাঁকুড়া
পিন : ৭২২১০১

With the Compliments of :



TATA TEA LIMITED

Making a difference ... differently.

1, Bishop Lefroy Road
Kolkata-700 020

ডীলারের সুবিধার্থে—অভাবনীয় কম দামে

সকলপ্রকার স্প্রেয়ার, গ্রেসার, প্যাডি উইডার ও উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য জেলাভিত্তিক ডীলার ও স্টকিস্ট চাই



ধান ঝাড়াই মেসিন



স্প্রেয়ার



প্যাডি উইডার

সারদা ইন্ডাস্ট্রীজ

৩৬নং স্ট্র্যান্ড রোড, ২য় তল, রুম নং—১৫
কলকাতা-৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন : ২৪৩-৩১৪১

SRI RAMAKRISHNA SEVASHRAM



"SERVICE TO MAN IS SERVICE TO GOD"

Regd. No. S/15226 Dated 21.10.74

P.O. Ramakrishnapur ❑ Dist. South 24 Parganas ❑ Pin : 743610. W.B.

A member-ashrama of South 24 Parganas District Ramakrishna-Vivekananda Bhava Prachar Parishad (advised by Ramakrishna Math, Belur Math, W. B.)

Kolkata Office :

6 Baroda Thakur Lane, Kolkata-700 007 ☎ : 218-1285

একটি আবেদন

প্রিয় ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ,

কলিকাতার অদূরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার দক্ষিণ দুর্গাপুর রেলস্টেশনের সন্নিকটে রামকৃষ্ণপুরে অনাথ বালকাশ্রমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একটি সেবাপ্রতিষ্ঠান। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বামী রমানন্দজী মহারাজ, সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি একটি অস্থায়ী প্রার্থনাঘরে প্রতিষ্ঠিত। বালকাশ্রমে থাকে ৫০ জন অনাথ দুঃস্থ বালক। সুন্দরবনের অনগ্রসর দরিদ্র অধিবাসী ও তফসিলী অঞ্চলে যোলটি বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। আরো প্রসারিত হবে। ইতিমধ্যেই পূর্ব-পরিকল্পিত অতিথিভবন, সাধুভবন, বৃদ্ধাশ্রম সম্পূর্ণ হয়েছে আপনাদেরই দানে। আমাদের প্রেরণা স্বামীজী। আমাদের আদর্শ ও ধর্ম—ত্যাগ ও সেবা। লক্ষ্য—মানুষ তৈরি। মানুষই আমাদের ভগবান।

আমাদের আগামী পরিকল্পনা ঃ—

১) বালকাশ্রমের অসম্পূর্ণ আবাসন ও দাতব্য চিকিৎসালয় সম্পূর্ণ করা।
২) জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে পাঁচশ ভক্তের একসঙ্গে প্রার্থনা-উপযোগী উপাসনাকক্ষ-সহ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নির্মাণ। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের স্পর্শপূত মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর গত ৬ মে ২০০০ অক্ষয় তৃতীয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
৩) অধিক সংখ্যক বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু বিদ্যালয় স্থাপন।

বহুজনহিতায় এই মহৎ কর্মযজ্ঞটিকে আরো ব্যাপক করার জনচাহিদা মেটাতে আমাদের প্রয়োজন আনুমানিক এক কোটি টাকা। যা আমাদের নেই।

প্রিয় ভগিনী ও ভ্রাতৃগণের নিকট আন্তরিক আবেদন, এই মহৎ কল্যাণ প্রচেষ্টায় অনুগ্রহ করে সাধ্যমত আর্থিক দাক্ষিণ্যের হাত প্রসারিত করুন। আমাদের ভিত্তি প্রস্তুত, আপনাদের সানুগ্রহ সহযোগিতায় হবে এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

স্মৃতিফলকের ব্যবস্থা আছে। আশ্রমে দেওয়া অর্থ M.O. অথবা A/c. Payee Cheque/Draft-এর মাধ্যমে পাঠানোর ঠিকানা—Sri Ramakrishna Sevashram, 6 Baroda Thakur Lane, Kolkata-700 007। A/c. Payee চেক/ড্রাফট পাঠালে 'Sri Ramakrishna Sevashram'-এর অনুকূলে পাঠাতে হবে। সেবাশ্রমে যেকোন আর্থিক দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সকল দানের প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে।

নমস্কারান্তে

স্বামী শুদ্ধানন্দ
অধ্যক্ষ

সুধাংশু বিশ্বাস
সম্পাদক



কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৪

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

জেলা : হুগলী

- রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর
- শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, ৭০ প্রফুল্ল চাকী রোড, কোতরং
- শ্রীরামকৃষ্ণ মনন সভা
১৫৬ এস. সি. চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোন্নগর, পিন : ৭১২২৩৫
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ, গ্রাম+পোঃ পুইনান, পিন : ৭১২৩০৫
- স্বামী উমেশানন্দ
অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম, কুণ্ডুঘাট, বাঁশবেড়িয়া-৭১২৫০২
- মোহিতকুমার বর্মণ, সম্পাদক, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
বিদ্যুৎপল্লী, সিঙ্গুর, পিন : ৭১২৪০৯, ফোন : ৬৩০-০৪৩৯
- ডঃ চিন্ময়ী নন্দী
(স্টেট ব্যাঙ্কের পিছনে), পোঃ ডানকুনি, পিন : ৭১১২২৪
- মনীষা নন্দী, প্রযত্নে দেবজিৎ নন্দী
স্টেশন রোড, পোঃ ডানকুনি, পিন : ৭১১২২৪
- সুশান্ত মাইতি
প্রযত্নে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালিকা আশ্রম (কামাক্ষাতলা)
মির্জাপুর পশ্চিমপাড়া, সিঙ্গুর, পিন : ৭১২৪০৯, ফোন : ৬৩০-০৭০৯
- হরনারায়ণ বিশ্বাস
৫ রাজেন্দ্র অ্যাভেনিউ প্রথম লেন, উত্তরপাড়া, পিন : ৭১২২৫৮
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার
প্রযত্নে অজিতকুমার মুখার্জী, ৬৪/জি ডঃ সরোজ মুখার্জী স্ট্রীট
উত্তরপাড়া, পিন : ৭১২ ২৫৮, ফোন : ৬৬৩-৮৫২৬
- মহীতোষ মণ্ডল, রাজলক্ষ্মী নিবাস
৩৭ জয়কৃষ্ণ স্ট্রীট, উত্তরপাড়া, ফোন : ৬৬৪-৪১১৫
- বরুণকুমার চক্রবর্তী, সম্পাদক, শ্রীবিবেকানন্দ সঙ্ঘ
ত্রিবেণী কেন্দ্র, গ্রাঃ বৈকুণ্ঠপুর, পোঃ ত্রিবেণী
পিন : ৭১২৫০৩, ফোন : ৮৪৬২৮৪
- অশোক ব্যানার্জী (দেবু)
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠচক্র, পীরতলা, শিয়াখালা।
- দীপশিখা ঘোষ, সম্পাদিকা, মাঙ্গলিক মহিলা মহল
জনাই, পিন : ৭১২৩০৪, ফোন : ৯১১২-৪৪১১৪
- গরলগাছা বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র, গ্রাম+পোঃ গরলগাছা, মান্নাপাড়া
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, গ্রাম+পোঃ ভাঙ্গামোড়া, পিন : ৭১২৪১০
- স্বপন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক, শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ
১৩বি, সান্যাল লেন, পোঃ শ্রীরামপুর
পিন : ৭১২২০১, ফোন : ৬৬২-৬৬৭৮
- কল্পতরু বিবেকানন্দ যুব উন্নয়ন কেন্দ্র
তারকেশ্বর, পিন-৭১২৪১০

নদীয়া

- রামকৃষ্ণ আশ্রম, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বঙ্কিমনগর, হালালপুর-৭৪১২০১
- রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, চাকদহ-৭৪১২২২
- বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, চাকদহ-৭৪১২২২
- রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, ব্লক-বি, সিভিক সেন্টার, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি, এ-৮/৪৫৬, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- ছায়া ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ নিকেতন, বি-৪/৪৬৬, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- বন্ধুর, মিউনিসিপ্যালিটি মোড়, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র, প্রযত্নে স্বপনকুমার ভৌমিক
৩৫ বেঁজেখালি লেন, নূতন পল্লী, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০৯
- শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাসঙ্ঘ, রানাঘাট-৭৪১২০১
- সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ
পোঃ বগুলা, পিন-৭৪১৫০২

বীরভূম

- বোলপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্দ্র
পৌর বাণিজ্যিক সদন (বাস স্ট্যান্ড), স্টল নং ৫, পিন-৭৩১২০৪
- আকালীপুর রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, ভদ্রপুর-৭৩১২০৩
- মিলন দাস, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ, চৈতালি মার্কেট, সিউড়ি-৭৩১১০১
- ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী, প্রযত্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
সাঁইথিয়া (কলেজ রোড), সাঁইথিয়া-৭৩১২৩৪

মুর্শিদাবাদ

- শান্তশ্রী, বেলডাঙ্গা সারদা রামকৃষ্ণ পাঠচক্র
আশ্রমপাড়া, বেলডাঙ্গা, পিন-৭৪২১৩৩

বাঁকুড়া

- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, পিন-৭২২২০৩
- শ্রীমা সারদা পাঠচক্র, কোতুলপুর-৭২২১৪১
- উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়
'অঙ্কন', স্টল নং-২, মোহনবাগান মার্কেট, পিন-৭২২১০১
- বিষ্ণুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
প্রযত্নে নিমাই মুখোপাধ্যায়, বৈলাপাড়া, কলেজ রোড
- ডঃ সুনির্মল বেরা, প্রযত্নে সারেঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি
সারেঙ্গা, পিন-৭২২১৫০

বর্ধমান

- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসানসোল-৭১৩৩০১
- শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, শ্যামসায়র (পূর্ব), বর্ধমান-৭১৩১০১
- নরহরি পুস্তকালয়, ৮১ বি. সি. রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১
- রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম
রামমোহন অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৪
- আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়, ডি/২০, গ্রীসন স্ট্রীট
বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২
- নিমানন্দ নায়ক, ৬৩, কবিগুরু সরণি
সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, ফোন : ৫৬৮৮২৩
- সাধুডাঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, ডি. ভি. সি. কলোনী, দুর্গাপুর-৭১৩২০১
- স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি
বিদ্যাসাগর অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫
- রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি, এ. বি. এল. টাউনশিপ
দুর্গাপুর-৭১৩২০৬
- গুসকরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টার
পিন-৭১৩১২৮
- অঞ্জনকুমার পাল, প্রযত্নে বিবেকানন্দ পাঠচক্র
কুমোরপাড়া (নারায়ণ ভবন), কাটোয়া-৭১৩১৩০
- শীতল ব্যানার্জী, প্রযত্নে শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি
শ্রীখণ্ড-৭১৩১৫০
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র, আমলাদহি, চিত্তরঞ্জন-৭১৩৩৩১
- পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম
দার্জিলিং মোড়, পানাগড় বাজার-৭১৩১৪৮
- স্বামী অসীমানন্দ, সম্পাদক
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবামৃত সঙ্ঘ সেবাশ্রম, গ্রাম—বুদবুদ
পোঃ বুদবুদ-৭১৩৪০৩, ফোন : ৫১২৬৫০

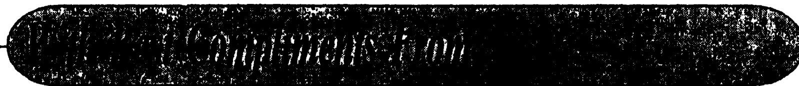
সৌজন্যে
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ
৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯



All the secret of success is there : to pay as much attention to the means as to the end.

Swami Vivekananda





DATTA FOOTWEAR INDUSTRIES PVT. LTD.

Regd. Office & Factory :

1, BIDHAN SARANI, KOLKATA-700 073

PHONE : 241-5248 ❑ FAX : (033) 241-7541

Unit-II

180, EAST SINTHI ROAD, KOLKATA-700 030

PHONE : 548-4500

শ্রীশ্রী সারদামায়ের
মন্ত্রশিষ্য
ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য
প্রণীত

❖ স্মৃতিমূলক জীবনীগ্রন্থ ❖

- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
- শ্রীশ্রী সারদাদেবী
- স্বামী সারদানন্দের জীবনী
- শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ
- ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা
- প্রেমানন্দ-প্রেমকথা
- জীবন পরিক্রমা

আমাদের প্রকাশিত আরও বিভিন্ন
স্মৃতিমূলক জীবনীগ্রন্থ-

ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী
- মেঘনাদ বধ কাব্যে চিত্রকল্প

বিশ্বনাথ দে
- রবীন্দ্রস্মৃতি

ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত
- বিবেকানন্দ স্মৃতি
- বঙ্কিম স্মৃতি
- রামমোহন স্মৃতি
- মধুসূদন স্মৃতি
- বিদ্যাসাগর স্মৃতি
- নজরুল স্মৃতি
- শরৎ স্মৃতি
- মা টেরেসা
- বায়রণ
- শেলী

শ্রী মোহিত কুমার বসাক
- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্মৃতি
- অরবিন্দ স্মৃতি
- নিবেদিতা স্মৃতি
- কিশোর শহীদ স্মৃতি
- সুভাষ স্মৃতি

সুবোধ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
- সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন
- The Early life of Netaji

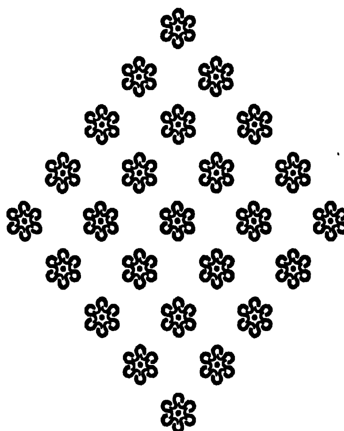
সমর গুহ
- নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা
- Netaji Dead or Alive

ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩
☎ ২৪১-০৯৬৫/২৪১-৯৪০৪

With Best Compliments From :

H. K. GHOSE & CO.

Paper Merchants & Exercise Book Makers



WARDLEY HOUSE
25A, SWALLOW LANE, KOLKATA-700 001
PHONE : 220-5209



রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম

বৃন্দাবন, মথুরা, উত্তর প্রদেশ-২৮১১২১



রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন



সেবাশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে (১৯৬২) জওহরলাল নেহরু এবং স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ

একটি আবেদন

যুগপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে তীর্থস্থানের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে জীবনের শেষদিনগুলি অতিবাহিত করবার সঙ্কল্প করেছিলেন, শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের তপস্যাপূত সেই অতি প্রাচীন ও সনাতন ঐতিহ্যমণ্ডিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনধামে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র বাস্তব ও প্রত্যক্ষ রূপায়ণের জন্য ১৯০৭ সালে সূচনা হয়েছিল এক ক্ষুদ্র কর্মযজ্ঞের। যার ফলশ্রুতি আজ প্রায় ১৫১ শয্যাবিশিষ্ট 'মানুষের সেবাই ঈশ্বরের পূজা'-রূপ এক বৃহৎ মানবসেবা কেন্দ্র বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম।

সেবাশ্রমের সেবাকার্যের মধ্যে ১৫০টি শয্যাবিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসপাতালের ইন্ডোর ও আউটডোর বিভাগ ছাড়াও একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাবিভাগ, বিনা খরচে গরিব মেয়েদের ৩ বছরের নার্সিং ট্রেনিং, কুষ্ঠরোগী, দুঃস্থ ছাত্র, গরিব বিধবাদের নিয়মিত নানাপ্রকার সাহায্য করা হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবাশ্রমটি বৃন্দাবন তীর্থধামের অসহায় যাত্রিসাধারণ, ব্রজমণ্ডল ও দূর-দূরান্তের গ্রামবাসী এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সমস্ত রোগী-নারায়ণের একমাত্র ১০০% নিঃশুল্ক চিকিৎসাস্থান যা কোনরকম সরকারি সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র ভক্তদের দান দ্বারাই চলে।

মা ও শিশুদের ভালভাবে দেখাশুনা ও নার্সদের এব্যাপারে ভালভাবে প্রশিক্ষণের জন্য ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের নির্দেশে ৩০ শয্যার স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ম্যাটারনিটি ওয়ার্ড তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এব্যাপারে সমাজের সহৃদয় সর্বস্তরের মানুষ ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগীদের কাছে এই নিঃশুল্ক সেবাকার্য অব্যাহত ও সুসম্পন্ন করার জন্য আর্থিক সহযোগিতার আবেদন করছি।

৩০ আসনবিশিষ্ট নতুন প্রসূতিসদন নির্মাণব্যয়	৬০ লাখ
যন্ত্রপাতি	২০ লাখ
অপারেশন থিয়েটারের সংযোজন ও পুনর্নির্মাণ	১০ লাখ

আমাদের বিশ্বাস সর্বস্তরের মানুষের সহানুভূতি, সহযোগিতা ও বদান্যতায় মিশনের এই নিঃশুল্ক সেবাকার্য কালে মহীরুহ হয়ে উঠবে। সেবাশ্রমে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত।

নার্সিং স্কুলের প্রসপেক্টাস ১ এপ্রিল থেকে দেওয়া হয়। এছাড়া কোন সহৃদয় অবসরপ্রাপ্ত/প্রাক্তন Army Doctor এই সুন্দর পরিবেশে থেকে স্বেচ্ছাসেবিরূপে অথবা কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমাদের সেবাব্রতে অংশগ্রহণ করতে চাইলে তাঁর/তাঁদের উদ্দেশে আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

আর্থিক দান চেক বা ড্রাফটে পাঠালে 'Ramakrishna Mission Sevashram, Vrindaban'—এই নামে পাঠাতে হবে।

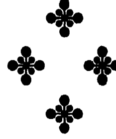
বিনীত নমস্কারান্তে

স্বামী সুপ্রকাশানন্দ

অধ্যক্ষ

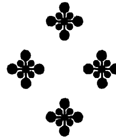
রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে যায়। অবতারেরাও সেইরকম সহস্র সহস্র লোকেদের ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ



মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার দিকে এগোতে চায় না। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আন্তরিক খুব যত্ন ও রোখ চাই।

শ্রীমা সারদাদেবী



যে-দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয়, সে-দেশ ক্রমশ ধর্মহীন হইয়া দাঁড়ায়। ভারতে কখনো এরূপ চেষ্টা হয় নাই। সেইজন্য এখানে প্রকৃত ধর্মভাব এখনো জাগ্রত।

স্বামী বিবেকানন্দ





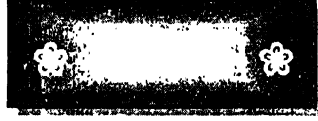


RAMAKRISHNA MISSION

VIVEKNAGAR : ALONG

ARUNACHAL PRADESH-791001

STD CODE : 03783 • TEL : 22-455/22-249/23-395 • FAX : 22-716



মাতৃভূমি ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে **অরুণাচল প্রদেশ**। এই পার্বত্য রাজ্যে আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখার অনতিদূরে অন্যতম জেলা শহর **আলং-এর সমীপবর্তী বিবেকনগরে** বিগত ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ **মিশনের** এই বৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি বহুবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে অনগ্রসর জনজাতি সমাজে শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যসেবা, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাব্যবস্থা, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন প্রভৃতি বিবিধ সেবাকার্যে নিরলস উদ্যমের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। **নয়া দিল্লির কেন্দ্রীয় স্কুল বোর্ডে সংযুক্ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে** আনুমানিক ২,০০০ ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে ৩০০ জনজাতি ছাত্রের জন্য ২টি ছাত্রাবাস এবং সহস্রাধিক জনজাতি ছাত্রের জন্য স্কুলবাসের সুবিধা এবং প্রাত্যহিক প্রাতরাশ অথবা মধ্যাহ্নাহারের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ৭৫ একর পার্বত্য টিলা জমিতে বিগত তিন দশক ধরে গড়ে ওঠা এই বৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রশস্ত বিদ্যালয় ভবন, ছাত্রাবাস, চিকিৎসাকেন্দ্র, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, রন্ধনশালা ও প্রার্থনাগৃহ ব্যতীত ৪টি প্রশস্ত খেলার মাঠ, গোশালা, কৃষিক্ষেত্র, ছাপাখানা, কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অতিথিভবন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগগুলি সরকারি অনুদানের অপ্রতুলতাজনিত অর্থাভাব হেতু অশোভন জীর্ণদশা প্রাপ্ত হয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে ভারতীয় সনাতন কৃষ্টি ও ঐতিহ্য রক্ষা তথা সম্প্রসারণের স্বার্থে আমাদের **নিম্নবর্ণিত প্রকল্পগুলিতে** সাধ্যমত অর্থসাহায্যের জন্য সহৃদয় দেশবাসীর কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি ঃ

(১)	গৃহাদি নির্মাণ ও মেরামতি কার্য	ঃ	১৫,০০,০০০ টাকা
(২)	আবাসিক ছাত্রবৃন্দের ভরণপোষণ	ঃ	১৫,০০,০০০ টাকা
(৩)	পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
(৪)	সাধারণ কল্যাণনিধি গঠন	ঃ	১৫,০০,০০০ টাকা
		মোট	৫০,০০,০০০ টাকা

ভারতীয় আয়কর আইনের ৮০-জি ধারায় করমুক্ত এই দান 'Ramakrishna Mission, Along' নামে **crossed cheque অথবা State Bank of India, Along**-এ প্রাপ্য ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠাতে পারবেন।

স্বামী সুমেধানন্দ
সম্পাদক

বিবেকনগর, আলং

সৌজন্যে



পিয়ারলেস

সঞ্চয়ের সহজ পথ

* *

আস্থার প্রতীক

UDBODHAN
Phone : 554-2248, 554-2403 □ FEBRUARY 2001 □
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com

Vol. 103 □ No. 2

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No. TECH/WB/RNP-15/LPWP-01/2001

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Regn. No. TECH/WB/RNP-15/2001

উদ্বোধন

১০৩তম বর্ষ



স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

□ গত ১লা মাঘ ১৪০৭ (১৫ জানুয়ারি ২০০১) **উদ্বোধন ১০৩তম বর্ষে** পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় **নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব** নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের **১০২ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম** □

□ বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা **উদ্বোধন** একটি ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র মাত্র নয়, **উদ্বোধন** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তে হবে।

□ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে **উদ্বোধন** নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন** একটি সার্থক **পারিবারিক পত্রিকা**। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন** এ প্রকাশিত হয়।

□ উদ্বোধন শুধু **বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা** নয়, উদ্বোধন **বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ পত্রিকা** এবং **বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক পত্রিকা**।

□ ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র হয়েও **উদ্বোধন** তার মহান প্রবর্তকের নির্দেশ অনুসারে **কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আদর্শের মুখপত্র নয়। উদ্বোধন** তার **সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বিগত ১০২ বছর** ধরে অটুট রেখেছে।

□ **উদ্বোধন-এর** গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি **মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের** সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

□ **উদ্বোধন** একটি পত্রিকা মাত্র নয়, **উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী** এবং **স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর।**

□ **স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন** যেন থাকে। **উদ্বোধন**-এর **প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে গ্রাহক করলেই** এখনি **উদ্বোধন** এর **গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি** হাজার হয়ে যায়। তাই আপনার **নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করাও** আপনার কাছে **স্বামীজীর প্রত্যাশা**। স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের গর্বিত **দায়িত্ব আমাদের সকলের**। অবশ্য **ইন্টারনেট সংস্করণের** মাধ্যমে **উদ্বোধন** আজ **ভারত ও বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ঘরে ঘরে** পৌঁছে গিয়েছে।

□ স্বামীজী বলেছেন, **উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা**। সেকথা স্মরণ করে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে অনুরাগী ও ভক্তগণ **উদ্বোধন-এর** প্রতি নিশ্চয়ই তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

□ **উদ্বোধন-এর শারদীয়া সংখ্যাটির** জন্য **গ্রাহকদের** থেকে **আলাদা মূল্য নেওয়া হয় না**। এই সংখ্যাটি গ্রাহকদের জন্য আমাদের **শারদ উপহার**। প্রসঙ্গত সকলের অবগতির জন্য জানাই যে, **শারদীয় সংখ্যাটি** আকারে সাধারণ সংখ্যার **তিনগুণ** এবং **বিশেষ সংখ্যা** হওয়ায় অলঙ্করণের জন্য খরচও হয় যথেষ্ট। **গত কয়েক মাসে কাগজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং অন্যান্য ব্যয়বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে** শারদীয়া সংখ্যা সহ গ্রাহক **পিছু আমাদের বার্ষিক খরচ দাঁড়িয়েছে মুদ্রিত গ্রাহকমূল্যের সওয়া তিন গুণ**। বিশাল অঙ্কের এই অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য আমরা নির্ভর করি সহৃদয় বিজ্ঞাপনদাতাদের সক্রিয় সহযোগিতা এবং শুভানুধ্যায়িদের আর্থিক বদান্যতার উপর।

□ **পত্রিকা প্রকাশ সংক্রান্ত** ব্যয় প্রতি বছর বেড়ে গেলেও তিন বছর (১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০১) 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। **এত সুলভ মূল্যে এমন সম্পূর্ণ পত্রিকা বাঙলা ভাষায় আর একটিও নেই।**

□ **উদ্বোধন**-এর সেবায় তিনটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি **'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল'**, অন্য দুটি যথাক্রমে 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল' এবং **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'**। **উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের** ৮০জি ধারা অনুসারে **আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে** পাঠালে **অনুগ্রহ করে 'Ramakrishna Math, Baghbazar'**—এই নামে পাঠাবেন। **ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন** লেন, বাগবাজার, **কলকাতা-৭০০ ০০৩**। দাতার চিঠিতে বা M.O কুপনে **'উদ্বোধন পত্রিকার** সেবায়' অথবা **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** অথবা **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'**-এর জন্য যেন লেখা থাকে।

□ **উদ্বোধন-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে** মতিলাল-তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাঁদের **পুত্রকন্যাদের** পক্ষে **স্থায়ী ভিত্তিতে 'উদ্বোধন মেধা সম্মান'** (**একবছরের জন্য উদ্বোধন-এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি**) নিবেদিত হয়েছে। **পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের** যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। **২০০১ সালের** জন্য **অনুরূপ সম্মান** সুকুমার-নিহারানী পাড়ুই-এর স্মৃতিতে তাঁদের **পুত্র** অমর **পাড়ুই** নিবেদন করেছেন। এই **সম্মানপ্রাপকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্ষদ পরিচালিত** ২০০০ **সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় 'সম্মান'-এর জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বোধন সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ** করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
সম্পাদক

সৌজন্যে

পি. বি. সরকার অ্যান্ড সন্স

(কোন ব্রাঞ্চ নেই)

জুয়েলার্স

সন অ্যান্ড গ্র্যান্ড সন্স অব লেট বি. সরকার

৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০ □ ফোন ঃ ২২৩-৮৭১৩, ২২৩-৭৫৭৮

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ   সম্পাদক ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

১০৩তম বর্ষ

উদ্বোধন

॥ ॥







"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

আনন্দবাজার পত্রিকা

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১



The best gift you can give your child - tomorrow's security.

LIC'S POLICIES FOR CHILDREN

Give you child a gift that will be cherished for a lifetime. Select from any of our Policies for Children to provide the right kind of support to your child at the right time.

Plan	Age of the child (yrs.)	Min. S.A.	Frequency of Premium Payment	Special Benefits	Common Benefits to all the Plans
Children's Deferred Endowment (with profit) (T. No. 41) (T. No. 50)	0 - 17 0 - 14	20,000/-	Yly., Hly., Qly., monthly	Risk commences at age 21 yrs. Risk commences at age 18 yrs.	• Payment of full Sum Assured plus Bonus (for With Profit policies) on maturity or on death after the commencement of risk. • Premium waiver benefit available on death of the proposer on payment of extra premium. • If the child dies during the deferment period, return of premium excluding the premium for waiver benefit. **Accident Benefit:** Available after the commencement of risk.
Jeevan Balya (with profit) (T. No. 101)	0 - 17	25,000/-	-do-	Risk commences from vesting date viz. child attaining age of 21yrs. A regular income benefit is available quarterly during the childhood, in case of the unfortunate death of the proposer, if the premium waiver benefit is opted for.	
Jeevan Kishore (with profit) (T. No. 102)	1 - 12	20,000/-	-do-	Risk commences 2 years after Date of Commencement or after completion of 7 years of age whichever is later. Accident benefit up to Rs. 1 Lakh is available without any extra premium after commencement of risk and after Life assured attains age 25 yrs.	
Jeevan Sukanya (Only for the girl child) (with profit) (T. No. 109)	1 - 12	20,000/-	-do-	Risk commences two years after Date of Commencement or after completion of 7 years of age. After marriage, free risk coverage will be extended to husband, thus making it a Joint Life policy. Premium payment ceases on the girl attaining age 20 years. Immediate payment of sum Assured on surviving the premium paying term. Policy will continue to participate in Profit and risk coverage till date of maturity.	
Children's Money Back Policy (without profit) (T. No. 123)	0 - 10	40,000/-	Yly., Hly., Qly., SSS	Lumpsum payment available at ages 18, 20, 22, 24 yrs. Guaranteed addition at the rate of Rs. 80/- per thousand Sum Assured per annum at age of 26 yrs. Likelihood of loyalty addition. Optional insurance cover to the extent of 20% of Basic Sum Assured to proposer on payment of extra premium. In case of death of life assured after the commencement of risk, full Sum Assured will be payable irrespective of the lumpsum payment made earlier.	
Bal Vidya (without profit) (T. No. 135)	0 - 12	25,000/-	Single premium.	Monthly income starts two years after the Date of Commencement of the policy or on child attaining the age of 5 yrs whichever is later. Payment of survival benefit equal to Sum Assured on the child attaining age 18 yrs. On attaining 23 years of age again payment of Sum Assured Plus Guaranteed addition at the rate of Rs. 70/- per thousand Sum Assured per annum. On death during the term of policy, Sum Assured plus guaranteed addition will be paid	

For further details, contact your nearest LIC branch.



Life Insurance Corporation of India

Please visit www.licindia.com



রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ

পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া-৭১১ ২০২, ফোন ঃ ৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২

সারদাপীঠ থেকে প্রকাশিত অডিও ক্যাসেটসমূহ

মূল্য ❑ SP-1 ও SP-31–34 ঃ ৩৫ টাকা, অন্যান্য ঃ ৩০ টাকা

SP-1	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্	(সংস্কৃত ও বাঙলা)
SP2, SP-7, SP-8, SP-10 হইতে 12	কথামৃতের গান (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড)	(বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি)
SP-3	শ্রীরামনামসংকীর্তন	(সংস্কৃত ও হিন্দি)
SP-4	বক্তৃতা—যুগপুরুষ	(বাঙলা) (শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত)
SP-5	শ্রীশ্রীচণ্ডীস্তব	বাঙলা, সংস্কৃত)
SP-6	শিবমহিমা	(বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি)
SP-9	শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা	(সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি)
SP-13	শ্রীসারদাবন্দনা	(সংস্কৃত, বাঙলা)
SP-20	বিবেকানন্দবন্দনা	(সংস্কৃত, বাঙলা)
SP-24	শ্রীকৃষ্ণবন্দনা	(সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি)
SP-14 হইতে SP-16	কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)	(বাঙলা)
SP-17	বীরবাণী	(সংস্কৃত, বাঙলা, ইংরেজী ও হিন্দি)
SP-18	গীতিবন্দনা	(হিন্দি)
SP-19	বক্তৃতা—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান	(বাংলা) (শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত)
SP-21 ও SP-22	সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড)	(হিন্দি)
SP-23	ওঠো জাগো	(হিন্দি)
SP-25	শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি	(হিন্দি)
SP-26	বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি	(হিন্দি)
SP-27	বেদমন্ত্র	(সংস্কৃত) (উপনিষদের মন্ত্রসমূহ)
SP-28	সরস্বতী বন্দনা	(বাঙলা, সংস্কৃত)
SP-29	**Ramakrishna Movement**	(Lecture by Revered Srimat Swami Bhuteshanandaji Maharaj)
SP-30	**Religion in Practice**	(do)
SP-31 হইতে SP-34	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (আবৃত্তি) (১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড)	(সংস্কৃত)
SP-35	আগমনী	(বাঙলা)
SP-36	ভজন সুধা	(হিন্দি)

শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্, শ্রীরামনামসংকীর্তন ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার C. D. প্রকাশিত হয়েছে।

স্বামী সর্বগানন্দ, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ, স্বামী দিব্যব্রতানন্দ, শ্রীমহেশরঞ্জন সোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য দক্ষ শিল্পিগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন।

Video Cassette :
Centenary Celebration of the Ramakrishna Mission at Belur Math in 1998.
Duration—80 minutes
Rs. 250.00

প্রাপ্তিস্থান ঃ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি (কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) ও সিমফনি (ধর্মতলা মেট্রো সিনেমার পাশে)

ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে M.O. অথবা Bank draft মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে।



30 MAR 2001

উদ্বোধন ।।১০৩।।

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র | ১০৩তম বর্ষ | ৩য় সংখ্যা | চৈত্র ১৪০৭ | মার্চ ২০০১

প্রচ্ছদ ❑ ওপরে কৈলাস, নিচে মানস সরোবর। নিচে মানস সরোবর থেকে দৃশ্যমান কৈলাস।
মানস সরোবরে সন্তরণরত হংসযুগল—লোকবিশ্বাসে, হর-পার্বতী।

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ  সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'
প্রচ্ছদ ❑ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ ❑ আলোকচিত্র : বেলুড় মঠের জনৈক সন্ন্যাসী

website : www.udbodhan.org ◆ e-mail : udbodhan@vsnl.com

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ : ৬৫ টাকা; সডাক : ৭৫ টাকা
আলাদাভাবে কিনলে বর্তমান সংখ্যার মূল্য : ৮ টাকা ❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ❑ ৩০০০ টাকা
[একবছরের মধ্যে পরিশোধ্য কমপক্ষে ৫০০ টাকা প্রতি কিস্তি হিসাবে ৬টি কিস্তিতেও প্রদেয়]

Statement about Ownership and Other Particulars of

UDBODHAN

FORM IV

Place of Publication :	1, Udbodhan Lane, Baghbazar Kolkata-700 003
Periodicity of its Publication :	Monthly
Printer's Name	Swami Satyavratananda
Whether citizen of India	Yes
Address	1, Udbodhan Lane, Kolkata-700 003
Publisher's Name	Swami Satyavratananda
Whether citizen of India	Yes
Address	1, Udbodhan Lane, Kolkata-700 003
Editor's Name	Swami Purnatmananda
Whether citizen of India	Yes
Address	1, Udbodhan Lane, Kolkata-700 003
Name & Address of Individuals who own the Newspaper and partners or shareholders holding more than 1% of the capital	Trustees of the Ramakrishna Math, Belur Math, Howrah-711 202 West Bengal

Swami Ranganathananda	*President*	do
Swami Gahanananda	*Vice-President*	do
Swami Atmasthananda	*Vice-President*	do
Swami Smaranananda	*General Secretary*	do
Swami Shivamayananda	*Asstt. Secretary*	do
Swami Suhitananda	,, ,,	do
Swami Bhajanananda	,, ,,	do
Swami Srikarananda	,, ,,	do
Swami Prameyananda	*Treasurer*	do
Swami Atmaramananda	Trustee	do
Swami Gautamananda	,,	do
Swami Gitananda	,,	do
Swami Hiranmayananda	,,	do
Swami Mumukshananda	,,	do
Swami Prabhananda	,,	do
Swami Tattwabodhananda	,,	do
Swami Vagishananda	,,	do
Swami Vandanananda	,,	do

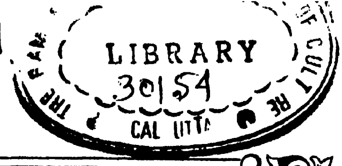
I, Swami Satyavratananda, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. SWAMI SATYAVRATANANDA
Signature of Publisher

Date : 1. 3. 2001

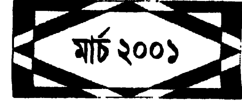
Printed in compliance with the Rule 8 of the Registration of Newspapers (Central) Rules 1956

30 MAR 2001











"ধারণাদ্ ধর্মমিত্যাহুর্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।।" (মহাভারত)

—মনীষিগণ বলেন, 'ধারণ করা' থেকে 'ধর্ম' কথাটির উদ্ভব। ধর্ম মানুষকে ধারণ করে। সুতরাং যা ধারণ-কর্মের সঙ্গে সংযুক্ত, তাই নিশ্চিতভাবে ধর্ম।

*

"অহিংসা সত্যবচনং সর্বভূতহিতং পরম্।
অহিংসা পরমো ধর্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ।।
সত্যে কৃত্বা প্রতিষ্ঠাস্তু প্রবর্তন্তে প্রবৃত্তয়ঃ।।" (মহাভারত)

—অহিংসা এবং সত্য সকল প্রাণীর পক্ষেই পরম কল্যাণকর। অহিংসাই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম, পরন্তু অহিংসা সত্যে প্রতিষ্ঠিত। সত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেই যথার্থ মহৎ ব্যক্তির প্রবৃত্তিগুলি প্রবর্তিত হয়।

*

"অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্।।
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত।।" (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

—হে অর্জুন, অহিংসা, সত্য, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, শান্তি, দোষদৃষ্টি বর্জন, জীবে দয়া, লোভশূন্যতা, নম্রতা, অসৎ চিন্তা ও কর্মে লজ্জা, বাক্‌সংযম, তেজস্বিতা, ক্ষমা, ধৈর্য, পবিত্রতা, জিঘাংসাশূন্যতা, অনভিমান—এসকল গুণই হলো শ্রেষ্ঠ মানুষদের দ্বারা অনুশীলিত দৈবী সম্পদ।

*

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।।" (মনুসংহিতা)

—ধৈর্য, ক্ষমা, অন্তরিন্দ্রিয় সংযম, অচৌর্য, পবিত্রতা, বহিরিন্দ্রিয় সংযম, অন্তর্দৃষ্টি, প্রজ্ঞা, সত্যবাদিতা এবং অক্রোধ—এই দশটি গুণ হলো ধর্ম।

ধর্ম ও সংস্কৃতি

অনেকে বলেন, ধর্ম এবং সংস্কৃতি—এই দুইটি আলাদা বিষয়। আবার অনেকে বলেন, সংস্কৃতি একটি বড় বিষয়, ধর্ম তাহার অন্তর্ভুক্ত। আবার একথাও কেহ কেহ বলেন, ধর্ম একটি বড় বিষয়, সংস্কৃতি তাহার অন্তর্ভুক্ত। ধর্ম এবং সংস্কৃতির সংজ্ঞা এবং সম্পর্ক ও বিরোধ বিষয়ে কোন বিতর্কে আমরা যাইতে চাহি না। তবে আমরা মনে করি, সংস্কৃতি ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃতি ধর্ম হইতেই উঠিয়া আসে। সংস্কৃতির উৎস ধর্ম। সংস্কৃতির প্রেরণা ধর্ম। সংস্কৃতির প্রাণরস ধর্ম। একজন আমাকে একটি কথা বলিয়াছিলেন। কথাটি তাঁহার নহে, ভারতের বিখ্যাত দার্শনিক-রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের। রাধাকৃষ্ণন বলিতেন: "It takes centuries of traditions to build up a civilization and it takes centuries of civilizations to build up a culture, and the force or strength that unites and protects centuries of cultures is religion." রাধাকৃষ্ণন বলিলেন, শত শত শতাব্দীর ঐতিহ্য একটি সভ্যতাকে গঠন করে এবং শত শত শতাব্দীর সভ্যতা গড়িয়া তোলে একটি সংস্কৃতি। আর ধর্ম হইল সেই শক্তি যাহা শত শত শতাব্দীর সংস্কৃতিকে সংযুক্ত করে এবং রক্ষা করে। বস্তুত, সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলই হইল ধর্ম। ধর্ম যথার্থই এমনই এক শক্তি যাহা শত শত শতাব্দীর সংস্কৃতিকে সমন্বিত করে, সংযুক্ত করে এবং রক্ষা করে। ধর্মকে বাদ দিলে সংস্কৃতি দাঁড়ায় না। কারণ, ধর্ম হইল সংস্কৃতির হৃৎস্পন্দন। ধর্ম হইল সংস্কৃতির প্রাণ। ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, এখানে সংস্কৃতিকে রক্ষা করিয়াছে ধর্ম। সুতরাং ভারতবর্ষে ধর্মকে বাদ দিয়া সংস্কৃতির কথা আমরা চিন্তা করিতে পারি না।

আমরা তাহাকেই সংস্কৃতিবান মানুষ বলি, যে-মানুষের মধ্যে মনুষত্বের বিকাশ হইয়াছে, যে-মানুষের মধ্যে আত্মচৈতন্য জাগ্রত হইয়াছে। মানুষের এই সংজ্ঞা দিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলিয়াছিলেন, যে 'মানহুঁশ' সেই 'মানুষ'। 'মান' অর্থাৎ 'মর্যাদা'—'মহিমা'। 'হুঁশ' অর্থাৎ 'জ্ঞান'—'সচেতনতা'। যে নিজের মর্যাদা বা মহিমা সম্বন্ধে অবহিত বা সচেতন, সেই মানুষ। মানুষের মর্যাদা বা মহিমা কি? ভারতবর্ষের প্রাচীনতম এবং প্রধানতম শাস্ত্র 'শ্রুতি' বলিতেছেন—মানুষ স্বরূপত ব্রহ্ম। পূর্ণতাই মানুষের স্বরূপ। দেবত্বই মানুষের মহিমা। যে-মানুষ তাহার এই স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন নহে, সে আকৃতিতে মানুষ হইতে পারে—কিন্তু প্রকৃত বিচারে সে মানুষ নহে। নিজের মহিমা সম্বন্ধে এই চেতনার উন্মেষই মনুষ্যত্ব বিকাশের প্রথম সোপান। এই চেতনাই মানুষকে বিবেকের দর্পণের সম্মুখে দাঁড় করায়। তখন সে নিজেই নিজেকে বলে—'আমি যে মানুষ, আমার কি এমন কর্ম মানায়?' শ্রীরামকৃষ্ণ একদা কাশীপুর উদ্যানবাটীতে তাঁহার অনুরাগী ও ভক্তবৃন্দকে বলিয়াছিলেন—"তোমাদের চৈতন্য হোক।" শাস্ত্র বলেন, চৈতন্যের জাগরণ এবং চৈতন্যের বিকাশই হইল ধর্মের লক্ষণ এবং লক্ষ্য। যে-মানুষের মধ্যে এই চৈতন্যের বিকাশ আমরা যত পরিমাণে দেখিতে পাই—সেই মানুষকে আমরা বলি তত সংস্কৃতিবান মানুষ। 'সংস্কৃত' অর্থাৎ 'মার্জিত'। আমাদের অন্তরস্থ আবর্জনা, মালিন্য, গ্লানি প্রভৃতি হইতে যত আমরা মুক্ত হই তত আমরা 'মার্জিত' হই অর্থাৎ 'সংস্কৃত' হই। আমাদের অন্তরস্থ মগ্নচৈতন্য যতই ধ্বংস হয় ততই আমরা আত্মচৈতন্যের আলোয় আলোকিত হই। মগ্নচৈতন্যের নিঃশেষ বিনাশের পরই আমাদের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসে পূর্ণসংস্কৃত অশেষ মানুষ। সেই মানুষই পূর্ণ মানুষ। ধর্মের প্রেরণা এবং চেতনা এই পূর্ণ মনুষ্যত্ব বিকাশের উৎস। অর্থাৎ সংস্কৃতির কেন্দ্রে, সংস্কৃতির মূলে রহিয়াছে ধর্ম। ধর্মের প্রাণদায়ী শক্তি, সঞ্জীবনী শক্তি সংস্কৃতিকে পুষ্ট করে, সংস্কৃতিকে বাঁচাইয়া রাখে। বুদ্ধের মতো সংস্কৃতিবান পুরুষ পৃথিবীতে কয়জনকে আমরা পাইয়াছি? খ্রীস্টের মতো সংস্কৃতিবান পুরুষ পৃথিবীতে কয়জন জন্মিয়াছেন? শঙ্করের মতো, রামানুজের মতো, চৈতন্যের মতো, নানক, কবীর, তুলসীদাস, তুকারাম, একনাথ, নামদেব, রমন মহর্ষির মতো সংস্কৃতিবান পুরুষ পৃথিবীর যেকোন দেশের সম্পদ। রামকৃষ্ণের মতো, বিবেকানন্দের মতো, রবীন্দ্রনাথের মতো, গান্ধীর মতো সংস্কৃতিবান ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর ইতিহাসের চিরকালের গৌরব। এইসব শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জীবনের প্রেরণা কি? শক্তি কোথায়? সকলেই জানে, তাঁহাদের প্রেরণা ও শক্তির উৎস অবশ্যই 'ধর্ম'।

কিন্তু 'ধর্ম' বলিতে আমরা যেন হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খ্রীস্টানধর্ম, ইসলামধর্ম ইত্যাদি না বুঝি। কারণ, এগুলি ধর্ম নহে, এগুলি ধর্মমত মাত্র। এগুলি এক-একটি সম্প্রদায় বিশেষের অনুবর্তীদের ধর্মবিশ্বাস এবং অনুষ্ঠান ও অনুশাসন বিধান। ধর্মমতগুলির একটির সঙ্গে অপরটির বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান, অনুশাসন, তীর্থস্থান প্রভৃতিতে অনেক পার্থক্য। কিন্তু ধর্ম কোন সম্প্রদায় বিশেষের সম্পত্তি

নহে। ধর্ম সকলের এবং সর্বকালের। ধর্ম হইল মানুষের অন্তরের ঐশ্বর্য। ধর্ম হইল মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব। ধর্ম কর্ণের কবচ-কুণ্ডলের মতো মানুষের সহজাত সম্পদ। ধর্ম এক এবং শাশ্বত ও চিরন্তন। ধর্মমতের স্রষ্টা মানুষ। মানুষের ইচ্ছায় ধর্মমতের পরিবর্তন হয়, সঙ্কোচন হয়, সম্প্রসারণ হয়। কিন্তু ধর্ম অপৌরুষেয়। ধর্মের কোন স্রষ্টা নাই। ধর্ম স্বয়ম্ভু। যুগে যুগে, দেশে দেশে ধর্মের কখনো কোন পরিবর্তন হয় না। ধর্ম হইল নিত্য-মানুষের নিত্য-আকাঙ্ক্ষা। সে-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার, অনন্ত হইবার, মহৎ হইবার, সুন্দর হইবার। শুধু আকাঙ্ক্ষা নহে, উহা মানুষের চিরন্তন ক্ষুধা। ক্ষুধা মানুষের সহজাত। আহার পাইলে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়। কিন্তু মানুষের নিত্য-বুভুক্ষা তখনই প্রশমিত হয়, মানুষের নিত্য-আকাঙ্ক্ষা তখনই শান্ত হয় যখন মানুষ পূর্ণ হয়, যখন তাহার অনন্ত ঐশ্বর্যকে উপলব্ধি করে, যখন সে মহত্তম হয়, সুন্দরতম হয়। এই পূর্ণতা, এই অনন্ত ঐশ্বর্য, এই মহত্ত্ব, এই সৌন্দর্য বাহিরের মাপকাঠিতে নহে। উহার মানদণ্ড মানুষের অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্যের বিকাশ। পৃথিবীর সর্বদেশে, সর্বকালে ইহাই ধর্মের যথার্থ স্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মমতগুলির মধ্যে নানা বিষয়ে অনৈক্য থাকিতে পারে, কিন্তু এই বিষয়ে সব ধর্মমতই একমত যে, মানুষকে পূর্ণ হইতে হইবে। সুতরাং ধর্মমত ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম সর্বদা সর্বদেশে এক। সেজন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন ঃ "Religion is one, but religions are many."—ধর্ম এক, ধর্মমত বহু।

শ্রীরামকৃষ্ণের মানুষের সংজ্ঞার সহিত আমরা পরিচিত হইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন, 'মানহুঁশ' হওয়াই মানুষের লক্ষণ—মনুষ্যত্বের লক্ষণ। ধর্ম হইল মানুষের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব বিকাশের বিজ্ঞান। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন ঃ "Religion is the manifestation of the divinity already in man."—মানুষের অন্তরস্থিত সহজাত দেবত্বের বিকাশই হইল ধর্ম। তিনি বলিতেন, ধর্ম হইল সেই বস্তু যাহা মানুষের মধ্যস্থিত পশুকে নাশ করিয়া মানুষকে বাহির করিয়া আনে এবং অবশেষে মানুষকেও নাশ করিয়া তাহার অন্তরস্থিত দেবতাকে বাহির করিয়া আনে। অর্থাৎ মানুষ যখন দেবতা হয়, তখনই ধর্মের ভূমিকা শেষ। তাহা না 'হওয়া' পর্যন্ত ধর্ম মানুষকে থামিতে দেয় না। ঐ 'হওয়া'ই হইল ধর্মের মর্মবাণী। স্বামীজী বলিতেছেন ঃ "Religion is the science of being and becoming."— ধর্ম হইল 'হইতে থাকা'র এবং অবশেষে 'হইয়া যাওয়া' বা 'হওয়া'র বিজ্ঞান। এই 'হইতে থাকা' এবং 'হওয়া'র সাধনাই মানুষকে সত্যকারের সংস্কৃত করে এবং তাহাকে সত্যকারের সংস্কৃতিবান করে। কি হইতে থাকা এবং কি হওয়া? দেবতা—ঈশ্বর। 'হওয়া' যখন সম্পূর্ণ হয়, তখনই ধর্মের যাত্রার পরিসমাপ্তি। সেই পরিসমাপ্তিতেই সংস্কৃতির সর্বোচ্চ শিখরে মানুষের আরোহণ। তখনই সংস্কৃতির পরিপূর্ণতা ও পরাকাষ্ঠা।

'দেবতা' অথবা 'ঈশ্বর'—এই শব্দ-দুটিতে কাহারো কাহারো আপত্তি থাকিতে পারে। শব্দ-দুটি কাহারো কাহারো অপছন্দ হইতে পারে। সেজন্য স্বামী বিবেকানন্দ 'দেবতা' অথবা 'ঈশ্বর'-এর দুটি বিকল্প শব্দ দিয়াছেন। বুদ্ধ এবং খ্রীস্ট। বুদ্ধ এবং খ্রীস্ট, স্বামী বিবেকানন্দের মতে, পূর্ণ মানবের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। মনুষ্যত্বের বিকাশ কতদূর হইতে পারে, কোন্ শিখরকে তাহা স্পর্শ করিতে পারে—বুদ্ধ এবং খ্রীস্টের জীবন তাহা জগৎকে দেখাইয়াছে। সেই অর্থে বুদ্ধ এবং খ্রীস্টকে মানব-বিকাশের সর্বোত্তম প্রতীক বলা হইয়া থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, বুদ্ধ এবং খ্রীস্ট এক অর্থে ব্যক্তি নহেন। তাঁহারা মানব-বিকাশের সর্বোচ্চ অবস্থার দুটি নাম। রবীন্দ্রনাথও একই কথা বলিয়াছেন। ধর্মের প্রবাহ-পথেই বুদ্ধ এবং খ্রীস্টকে আমরা পাইয়াছি। পাইয়াছি সংস্কৃতির বিকাশ কোন্ মহিমায় প্রকাশিত হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্তও। সুতরাং ধর্ম এবং সংস্কৃতি প্রকৃত অর্থে দুটি আলাদা বিষয় নহে। ধর্মের উৎস হইতেই সংস্কৃতির উন্মেষ। আবার সংস্কৃতি এক অর্থে ধর্মের পরিপূরকও।

ধর্মকে ভিত্তি করিয়া ধর্মমতের সৃষ্টি হয়, হইয়াছে এবং হইবে। ধর্মকে কেন্দ্র করিয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, হইয়াছে এবং হইবে। কিন্তু ধর্ম কখনো কোন মতবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ হইতে পারে না। ধর্মকে কখনো কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমিত করিয়া রাখা যায় না। ধর্মের মর্মবাণী আকাশের মতো উদার, সমুদ্রের মতো অতলান্ত। ধর্মমতকে কেন্দ্র করিয়া, সম্প্রদায়কে ভিত্তি করিয়া যুগে যুগে, দেশে দেশে সৃষ্টি হইয়াছে মতান্ধতা, ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা। অতি সম্প্রতি ভারতবর্ষের একটি প্রতিবেশী দেশে এই মতান্ধতা ও ধর্মান্ধতার নগ্ন প্রকাশ দেখিয়া সমগ্র বিশ্ব স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। সংশ্লিষ্ট মৌলবাদীরা সদম্ভে ঘোষণা করিয়াছে, তাহারা তাহাদের ধর্মের অনুশাসন অনুসারেই উহা করিয়াছে। যে-ধর্মের নামে এই ধিকৃত, জঘন্য বর্বরতা চলিয়াছে, পৃথিবীর সর্বত্র সেই ধর্মের মানুষেরা উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন, এমন কর্ম সংশ্লিষ্ট ধর্মের বিরোধী। সুতরাং ধর্মের নাম লইয়া ধর্মকেই ধর্মোন্মাদরা কলঙ্কিত করিতেছে। সমগ্র বিশ্বেই এই বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার উঠিয়াছে। এই ধিক্কার-ধ্বনির মধ্যেই উচ্চারিত হইয়াছে সংস্কৃতির মূল বার্তা। উচ্চারিত হইয়াছে ধর্মের মূল বার্তাটিও। সংস্কৃতি

মানুষকে সাম্প্রদায়িকতা শেখায় না। সাম্প্রদায়িক মানুষ কখনো সংস্কৃতিবান হইতে পারে না। সংস্কৃতির উৎস যে ধর্ম, সেই ধর্মে মতান্ধতা, ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতার কোন স্থান নাই। বর্বরতা হইতে মানুষকে সংস্কৃত করিয়াছিল ধর্মের চেতনা। এই বর্বরতা যেমন বাহিরে, তেমনই অন্তরে। অন্তরের ধর্মচেতনা তাহার অন্তরকে মার্জিত করার পাশাপাশি তাহার বাহিরকেও মার্জিত করিয়াছিল। ধর্মের প্রভাবেই মানুষ বুঝিয়াছিল নিজের মতকে, নিজের পছন্দ-অপছন্দকে, নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে অপরের উপর চাপাইয়া দেওয়া বর্বরতা। অপরের একান্ত বিশ্বাস, ধারণা ও ভাবাবেগে আঘাত ও তাহাতে উল্লাস বর্বরতা। সেই বর্বরতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হইতেই সংস্কৃতির সূচনা। বর্বরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়াই মানুষ সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত হইয়াছিল। তখন হইতেই মানুষের আহার-পদ্ধতি পশুর আহার-পদ্ধতি হইতে পৃথক হইতে শুরু করিয়াছিল। মানুষ বুঝিতে শুরু করিয়াছিল পশুর সংস্কৃতি বর্বর সংস্কৃতি, অধার্মিক সংস্কৃতি, আসুরিক সংস্কৃতি। পশু-মানবের স্তর হইতে মানুষ তখনই বাহির হইতে চেষ্টা করিয়াছিল যখন সে পশুসংস্কৃতির মধ্যে বর্বরতার গন্ধকে চিহ্নিত করিতে শিখিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি কথা স্মরণে আসিতেছে। তাঁহার একবার ইচ্ছা হইয়াছিল, তিনি সমাজের একটি বিশেষ জাতের রান্না খাইবেন। তাঁহার যখন যে-ইচ্ছাটি হইত, সেটি তখনই পূরণ করিবার জন্য তিনি বালকের ন্যায় ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। সুতরাং সেই জাতের রান্না তিনি খাইলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল—কেমন লাগিল? তিনি বলিলেন—'গন্ধ'টা একটু অন্যরকম।

এই 'গন্ধ'ই হইল সংস্কৃতির লক্ষণ। সুগন্ধ হইল সংস্কৃতি, দুর্গন্ধ হইল অপসংস্কৃতি। আমার জীবনচর্যায় যদি সুগন্ধ না আসে তাহা হইলে আমার জীবনচর্যাটি সংস্কৃতির মাত্রা লাভ করিতে পারে না। জীবনের সুগন্ধ আসে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে জীবন গঠন করিলে জীবনের সর্বোত্তম লক্ষ্যটি স্থির করা যায়। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটি বেদ-বেদান্ত, পুরাণ-মহাকাব্য হইতে গ্রহণ করিলে আমরা সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত হইতে পারিব। এই ঐতিহ্য আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য আপাদমস্তক ধর্মের দ্বারা নির্মিত।

ধর্ম হইল ঐতিহ্যের মূল। ঐতিহ্য একটি বিশেষ মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করিয়া দেয়। সেই মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটে সভ্যতায়। সভ্যতার মানদণ্ড সংস্কৃতি। বস্তুত, সভ্যতার গুণগত উৎকর্ষে নিরূপিত হয় সংস্কৃতির ভূমিকা। বর্তমানে কোথাও কোথাও মৌলবাদী বর্বরতার তাণ্ডব দেখা যাইলেও সারা পৃথিবী কিন্তু সাধারণভাবে আলোচনা ও মূল্যবোধের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইবার একটি প্রয়াস করিতেছে। এই প্রয়াসের প্রেরণাশক্তি অবশ্যই ধর্ম। ধর্মই পৃথিবীর এক প্রান্তের মানুষের সঙ্গে অপর প্রান্তের মানুষের সেতুবন্ধনের বার্তা দান করে। ধর্মই মানুষের সঙ্গে মানুষের বৈষম্যকে নাশ করিতে প্রেরণা দেয়। ধর্মই সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের ব্যবধানের প্রাচীরকে ভাঙিয়া ফেলিতে প্রতিনিয়ত আমাদের উদ্বুদ্ধ করে। ধর্ম বলে ঃ তোমার লৌকিক জীবনের সঙ্গে তোমার পারমার্থিক জীবনের একটি সেতু রচনা কর। একটি বিশ্বাসকে আশ্রয় কর এবং স্থিরভাবে তাহাকে অনুসরণ কর। একটি জীবনযাত্রাকে নির্বাচন কর, একটি জীবনপদ্ধতিকে গড়িয়া তোল। নিজেকে পরিচ্ছন্ন কর, মার্জিত কর, সংস্কৃত কর। সমস্ত তুচ্ছতা, সীমাবদ্ধতা ও সঙ্কীর্ণতা হইতে নিজেকে মুক্ত কর। ক্রমে এই প্রয়াসের মাধ্যমে, এই সাধনার মাধ্যমে, এই অন্তর্স্নানের মাধ্যমে তুমি উপনীত হইবে অখণ্ড সংস্কৃতি, অখণ্ড জীবন, অখণ্ড শান্তি, অখণ্ড আনন্দ, অখণ্ড মানবতা এবং অখণ্ড ধর্মের মহামিলনভূমিতে।

বস্তুত, এই যাত্রাই ধর্মের বৈশিষ্ট্য। এই যাত্রাপথেই আমরা গড়িয়া তুলি আমাদের সংস্কৃতি। ধর্মের প্রেরণায় প্রতিদিন সেই সংস্কৃতি পুষ্ট হয়, সঞ্জীবিত হয়। অবশেষে আমরা উত্তীর্ণ হই মহাসমুদ্রের বুকে এক স্থির প্রস্তরভূমিতে—যেখানে সঙ্কীর্ণতাকে ধ্বংস করিয়া, মালিন্যকে দগ্ধ করিয়া, সীমাবদ্ধতাকে চূর্ণ করিয়া আমরা পাই এক নিত্য-নিরাপদ ও ধ্রুব আশ্রয়। আলো এবং অন্ধকার যেমন কখনো একসঙ্গে থাকিতে পারে না, তেমনি ধর্ম এবং অপসংস্কৃতির পাশাপাশি অবস্থান অসম্ভব। সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, অসহিষ্ণুতাই অপসংস্কৃতি। সততা, প্রেম, শান্তি, সম্প্রীতি, উদারতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং ঐক্যচেতনা যথার্থ সংস্কৃতি। পুরস্কারেব প্রলোভনে নহে, শাস্তির ভয়ে নহে—আমি সৎ হইব সততার প্রেরণায়। কোনকিছুর বিনিময়ে নহে, আমি উদার হইব উদারতার প্রেরণায়। আমি ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হইব অখণ্ড অদ্বৈত চেতনার প্রেরণায়। এই প্রেরণা ধর্ম দান করে। সংস্কৃতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে মার্জিত করে, মানুষের আচরণকে পরিশুদ্ধ করে। ধর্ম মানুষের চরিত্রকে মার্জিত করে, মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে। সংস্কৃতি আসে ধর্মের প্রেরণায়, আর ধর্ম আসে চৈতন্যের প্রেরণায়। এই সংস্কৃতিই মনুষ্যত্বের সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতির বিকাশের শক্তিকেন্দ্র ধর্ম। এই ধর্ম মনুষ্যত্বের ধর্ম, মনুষ্যত্ব বিকাশের ধর্ম। এই ধর্ম চৈতন্যের ধর্ম। এই ধর্মই সংস্কৃতির জননী। □

কথামৃতে না-বলা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

শ্রীম

ঠাকুর বলতেন, তিন থাকের লোক করেছেন ঈশ্বর। প্রথম যোগী। তাঁরা সর্বদাই ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন, আর কিছু চায় না। যেমন শুকদেব, নারদ। আবার যোগ-ভোগ। এও একটি থাক, এও ভাল। দুই দিকই আছে। তাঁকেও চায়, আবার এদিকও চায়। যেমন পাণ্ডবরা। এঁরা যেমন ভোগ করেছেন, তেমনি ভক্ত। ঈশ্বর এঁদের সঙ্গে সঙ্গে। আর শুধু ভোগ। এও একটি থাক আছে, এরা খালি ভোগ নিয়ে ব্যস্ত। এঁদের দ্বারা creation (সৃষ্টি) রক্ষা করছেন। নাক সিঁটকাবার উপায় নেই—কাউকে ঘৃণা করা চলবে না। তিনি ভ্রান্তিরূপে এদের ভিতর থেকে এসব করাচ্ছেন। তাঁর মায়াতেই এসব ভাগ ভাগ হয়েছে। সকলেরই দরকার। (২য় ভাগ, পৃঃ ৮৬)

মিহিজামে কয় মাস থেকে দেখে এলাম, জানোয়ার-গুলোর ভেতর শুধু এই ভোগভাব রয়েছে। গরু, মোষ, কুকুর, বিড়াল—এরা শুধু আহার নিয়ে ব্যস্ত দিনরাত। আহার, বিশ্রাম আর সন্তান উৎপাদনের চেষ্টা—এই এদের কাজ। এ-ক্লাসের মানুষে আর পশুতে প্রায় তফাৎ নেই। মানুষ ইচ্ছা করলে ঈশ্বরচিন্তা করতে পারে, এইটুকু তফাৎ। (ঐ, পৃঃ ৬)

সমাধি কি চারটিখানি কথা! কত জন্ম জন্ম খেটে তবে হয়। সমাধিলাভকেই ঈশ্বরদর্শন বলে। একেই সিদ্ধাবস্থা, আত্মদর্শন, ভগবানদর্শন, ব্রহ্মদর্শন বলে। সমাধি সাধারণত দুরকম—সবিকল্প আর নির্বিকল্প, অথবা সাকার বা নিরাকার। সমাধি মানে তাঁতে ডুবে যাওয়া। Time and Space—দেশ-কালের পারে যাওয়া, perfect detachment from the sense world (ইন্দ্রিয়জগৎ থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি)। সমাধিলাভই জীবের উদ্দেশ্য। ভোগবাসনার নিবৃত্তি হলে এ-অবস্থা লাভ হয়। প্রথম দিন যখন [দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে] যাই, দাঁড়িয়ে শুনছি। একঘর লোক বসা। ঠাকুর বলছেন ঃ "যার ঈশ্বরের কথা মনে হলে কিংবা কথা শুনে চোখে জল আসে, আর পুলক হয়—বুঝতে হবে তার কর্ম ত্যাগ হয়ে এল, বেশি বাকি নাই। কর্মত্যাগ হয়ে গেলেই সমাধি।" সমাধিতে কি হয় কে জানে? যার হয়েছে কেবল সে-ই বুঝতে পারে—মুখে বলা যায় না। অবতারাদির হয় এ-অবস্থা। দূর থেকে 'হো হো' শব্দ শোনা যাচ্ছে, কিন্তু হাটে ঢুকলে তখন বোঝা যায় কোন্‌টা কি—কোন্‌টা আলুর দোকান, কোন্‌টা পটলের দোকান।

আমরা fortunate (ভাগ্যবান)—যাঁর সর্বদা সমাধি হতো এমন একজনের সঙ্গে ছিলাম। তাই তাঁর কৃপায় কিছু কিছু বোঝা যাচ্ছে। এসব বলবার কথা নয়—অন্তরে বোধে বোধ হয়। ঠাকুর কৃপা করে তাঁর স্পর্শদ্বারা কিংবা ইচ্ছামাত্র এ-অবস্থা করে দিতে পারতেন। তাঁর ভক্তদের তিনি এ-অবস্থা লাভ করিয়ে দিয়েছেন। শাস্ত্রে সমাধির কথা আছে—সে যেন বাজনার বোল মুখস্থ করা, কিন্তু হাতে আনতে পারেনি। হাতে আনতে হলে জন্ম জন্ম তপস্যা করলে তাঁর কৃপায় লাভ হয়। সমাধি একবার লাভ করতেই অত কষ্ট, আর ঠাকুরের নিত্য মুহুর্মুহু এ-অবস্থা হচ্ছে—যেন ভূতে পেয়ে বসেছে! সমাধি থেকে নামবার সময় বলতেন ঃ "এখন শুধু পণ্ডিতগুলোকে খড়কুটোর মতো মনে হচ্ছে।" অর্থাৎ তুচ্ছ, কিছুই নয়। আমরা ভাগ্যবান, তাঁর কৃপায় এসব কথার glimpse (আভাস) পাওয়া গেছে—কিছু কিছু বোঝা যাচ্ছে। (২য় ভাগ, পৃঃ ৮৭-৮৮)

কোথাও কিছু নেই, [ঠাকুর] একা বসে হাসছেন। Individual case (ব্যষ্টিগতভাবে) যখন দেখতেন, তখন মুচকি হাসতেন। আবার জগতের ব্যাপার যখন collective way-তে (সমষ্টিগতভাবে) দেখতেন, তখন হাততালি দিয়ে নাচতেন—মহামায়ার কাণ্ড দেখে! এতসব করার পর, অত কথা বলবার পরও লোকের চৈতন্য হয় কৈ? তিনদিন করলেও হয়, বলেছিলেন। করবে কি করে, সংস্কার থাকলে তো হয়। একটা version (মত) আছে—জন্মমাত্রই শুকদেব তপস্যা করতে চলে গিয়েছিলেন। এসব সংস্কার থাকলে হয়। পূর্বজন্মের কিছু সঞ্চিত থাকা চাই। তবে হয়, নইলে মনই যায় না ঐদিকে। কী অজ্ঞান আমাদের! যাদের 'ম্লেচ্ছ' বলা হয়, তারা পর্যন্ত ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে। বলছে, ভারতই problem of life (জীবনসমস্যা) solve (সমাধান) করেছে। কিন্তু আমাদের চৈতন্য হচ্ছে না! Plain living and high thinking—সরল জীবনযাত্রা আর ভগবৎ চিন্তা—এটাই ভারতের সনাতন বাণী—ঋষিদের আবিষ্কার, কিন্তু আমরা তা ভুলে রয়েছি। (ঐ, পৃঃ ১৩৭)

[ঠাকুর] এদিকে বলছেন, গিরিশের কী বিশ্বাস! কিন্তু নরেন্দ্রকে বারণ করছেন বেশি যেতে। রসুনের বাটি গন্ধ ছাড়তে চায় না। নরেন্দ্রকে দিয়ে একটি আলাদা থাকের সৃষ্টি করাবেন কিনা, তাই অত সাবধান করছেন। এ-থাকের শুধু যোগ, আর ঐ থাকের যোগ-ভোগ। নৈকষ্য- কুলীন। যেমন মৌমাছি ফুল বৈ বসবে না। যেমন চাতক শুধু বৃষ্টির জল খাবে। (১ম ভাগ, পৃঃ ২৩৩)

কখনো রূপ-চিন্তা, কখনো লীলা-চিন্তা, কখনো তাঁর মহাবাক্য-চিন্তা, কখনো অরূপের চিন্তা। সবই ধ্যান।

তাই ঠাকুর বলেছিলেন : "আমাকে ধ্যান করলেই হবে।" তিনি অরূপের ধ্যানও ভক্তদের শিখিয়েছিলেন। মতি শীলের ঝিলে নিয়ে গিয়েছিলেন বড় বড় রুই মাছ জলে ভেসে বেড়াচ্ছে দেখাতে। সচ্চিদানন্দ সাগরে মীন আনন্দে বিহার করে কিংবা অনন্ত আকাশে পক্ষী স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছে—অরূপের ধ্যানের এইসব ভাব কি করে আরোপ করতে হয় তাই দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ঠাকুরকে ধ্যান করলেও, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ যিনি বাক্যমনের অতীত—তাঁকেই ধ্যান করা হয়। (ঐ, পৃঃ ২৩১)

হাজরা নরেন্দ্রকে বলেছিলেন, পুজোটুজোতে কিছু হয় না। ঠাকুর বলতেন : "নরেন্দ্র এই কথা শুনে দশ হাত নেমে গেল। আমি তখন হাজরাকে বলি, 'তুমি তো বড় পাজি। এদের এসব কথা বললে এরা দাঁড়ায় কোথায়?' "

কিন্তু কি করে চিনবে তাঁকে বল—হৃদয়ই বল, আর হাজরাই বল। তাঁর মহামায়াতে সব ঢেকে রেখে দেন। অবতারকে বোঝবার জো নেই। চৌদ্দপোয়া মানুষ হয়ে কি করে আসতে পারেন—এ-সংশয় থেকে যায়। তবে তাঁর কৃপায় সংশয় যায়।

অবতার হয়ে আসেন তখন বড্ড chance (সুযোগ)। এসময় না হলে দেরি হয়ে যায়। অবতার এসে বলেন—ঈশ্বর আছেন, তাঁকে দেখা যায়, আমি দেখেছি। "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৩। ৮)—সেই মহান পুরুষকে আমি জেনেছি।

আর তিনি এলে ব্যাকুলতা আসে সঙ্গে সঙ্গে। তখন লোক উঠেপড়ে লাগে। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ২।৪। ৫)... এই পরমাত্মা, সত্য বস্তু, জ্যোতির্ময় পুরুষ—যাঁর থেকে জগৎ উৎপন্ন হয়েছে এবং যিনি জগৎ জুড়ে রয়েছেন, তিনি সাড়ে তিন হাত মানুষ হয়ে দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন—এই প্রহেলিকা কি করে বোঝে লোক! (ঐ, পৃঃ ২০২-২০৩)

ভক্তকে ভগবান ছাড়তে পারেন না। ভক্ত এমন জিনিস। ঠাকুর কত ভাবতেন ভক্তদের জন্য। কেউ না গেলে চিঠি লিখতেন, কিংবা কাউকে পাঠিয়ে দিতেন সংবাদ নিতে। কারো হয়তো কর্ম নেই, অন্য ভক্তদের বলতেন কর্ম করে দিতে। একদিন বললেন : "নারাণ বলেছে কিশোরীর একটা কর্ম করে দেবে।" নারাণ ছেলেমানুষ, কি করে কর্ম করে দিবে? এর অর্থ—যাকে একথা বলছেন তার কাছে recommend (প্রস্তাব) করেছেন। তাঁর way of presentation (বলবার ভঙ্গি) অদ্ভুত। (ঐ, পৃঃ ৩৪৪)

তাঁর কী কৃপা! ভক্তরা যারা সেবা জানত না, তাদের দ্বারা জোর করিয়ে সেবা করিয়ে নিতেন। "গামছাটা ভিজিয়ে আনতো", "জলের ঘটিটা এগিয়ে দাও তো", "জামাটা রৌদ্রে দাও", "একটু বস, খাওয়া হলে হাতে জল ঢেলে দিবে"—এইরকম করে বলে বলে।

অহেতুক কৃপাসিন্ধু! স্বয়ং ঈশ্বর মানুষ-শরীর ধারণ করে এসেছেন। ভক্তরা তাঁকে জানে না, কিন্তু তিনি তো নিজেকে জানেন! তাই জোর করে সব করিয়ে নিতেন। এই মনে করে—তারা তো বোঝে না আমায়, এখন জোর করে করিয়ে নি। পরে যখন বুঝবে তখন এক একটা বিষয় ভাবতে ভাবতে জীবন অতীত হয়ে যাবে—মধুময় হবে। (ঐ, পৃঃ ৩৪৩)

অবতার যা শিক্ষা দেন তা কি আর ঠিকঠাক থাকে? গ্লানি আসবেই। ঠাকুর বলতেন : "চৈতন্যদেব সবেমাত্র চারশ বছর হলো এসেছিলেন। এর মধ্যেই কি হলো দেখ। যে চৈতন্যদেব স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা কয়েছিলেন বলে হরিদাসকে ত্যাগ করেছিলেন—সেই চৈতন্যদেবের অনুবর্তীরা কিনা এখন নেড়ানেড়ীতে পরিণত হয়ে পড়েছে। চৈতন্যদেব নিজে অবতার—তাঁর শিক্ষাই রইল না।"

ঠাকুরের কাছে 'প্যালা' ছিল না। কিসে ভক্তদের কল্যাণ হয়, তাদের কর্মত্যাগ হয়, আর তাঁকে ডাকবার অবসর হয়—তাই সর্বদা চিন্তা করতেন। টাকাকড়ির নামটিও নিতেন না। খালি কিসে তাদের চৈতন্য হয়, সেই চেষ্টা ছিল। তিনি এমন ছিলেন, দেখলেই চৈতন্য হয়ে যেত! অবতারের ঠিক ভাব থাকে না—শেষে গ্লানি আসবেই। (২য় ভাগ, পৃঃ ৮১)

অনেকদিন হয়ে গেছে ঠাকুর চলে গেছেন। এর ভিতরই শুনতে পাই, [দক্ষিণেশ্বরে] নানা রকম সব হয়ে গেছে। তাঁর সম্বন্ধে নানান কথা বলে। ওখানে [পঞ্চবটীতে] এই ঘরই [ধ্যানঘর] ছিল না—পরে হয়েছে। তাঁর সময়ে শুধু একটা মাটির ঘরমাত্র ছিল। (ঐ, পৃঃ ৮০) ❑

স্বামী নিত্যাত্মানন্দের 'শ্রীম-দর্শন'-এর ১ম ও ২য় ভাগের ১ম সংস্করণ থেকে সঙ্কলিত।

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার

সম্পাদনা ❑ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০১৩

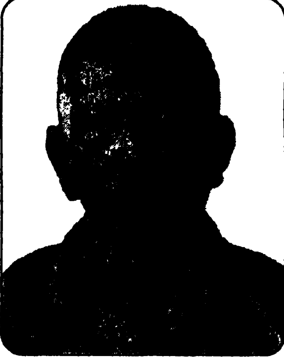
বিঃ দ্রঃ এই বিভাগে ইতিপূর্বে প্রকাশিত এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে সঙ্কলিত ও সম্পাদিত রচনাগুলি পুনর্মুদ্রণ করতে চাইলে জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ এবং 'উদ্বোধন'-সম্পাদকের অনুমতি আবশ্যিক।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

গীতার শক্তি ও মনোহারিত্ব

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

এই আলোচনাটি প্রধানত দুর্গাপদ ঘোষ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরম পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজজীর বর্তমান রচনাটি কলকাতার অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত মহারাজজীর 'Universal Message of the Bhagavad Gita' শীর্ষক ইংরেজী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের (১ম সংস্করণ, ২০০০) অন্তর্গত অসামান্য 'ভূমিকা'র বাঙলা অনুবাদ। রচনাটি 'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪০৭ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, মহারাজজীর প্রত্যেকটি ভাষণ, রচনা এবং আলোচনা অসাধারণ বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিঋদ্ধতায় সমৃদ্ধ এবং একাধারে বিশ্লেষণমূলক, ভক্তিরসাশ্রিত ও আধুনিক মানুষের প্রশ্ন ও সংশয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনিবার্যভাবে গ্রহণযোগ্য। ভারতের অতুলনীয় শাস্ত্রগ্রন্থ 'গীতা' সম্পর্কে পূজ্যপাদ মহারাজজীর বর্তমান আলোচনাটিও তাঁর নিজস্ব শৈলী ও ভঙ্গিতে সমুজ্জ্বল। পাঠকরা প্রতিক্ষণেই তার প্রমাণ পাবেন এবং প্রতিক্ষণেই মহারাজজীর অনবদ্য যুক্তি ও বিশ্লেষণে আলোকিত হবেন।

ভাষান্তর : অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

'তপস্যা'র অর্থ ও তাৎপর্য

পাশ্চাত্যের মানুষ জ্ঞানের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা দেখিয়েছেন এবং তার সহায়ে গড়ে তুলেছেন আধুনিক এক সভ্যতা। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গবেষণা; ক্লাবে যাওয়ার সময় নেই, এমনকি রোজকার খাওয়াদাওয়ার সময়টুকু পর্যন্ত নেই—এইভাবে মানুষ কাজ করেছেন দু-শতক ধরে। আর তাতেই এসেছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, প্রযুক্তি ও সম্পদ-ভাণ্ডার। বহুযুগ আগে ভারতেও একই প্রবণতা ছিল। ছিল জ্ঞানের প্রতি অনিঃশেষ প্রেম। দক্ষিণ ভারতের কেউ হয়তো শুনলেন সুদূর বারাণসীতে একজন শিক্ষক আছেন; 'আমাকে সেই আচার্যের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করতেই হবে'—এই চিন্তা নিয়ে তিনি হাঁটতে আরম্ভ করলেন বারাণসীর উদ্দেশে। পশ্চিম পাঞ্জাবের তক্ষশীলায় (বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত) চরক, সুশ্রুতের মতো খ্যাতনামা শিক্ষকের কাছে চিকিৎসাশাস্ত্র ও শল্যবিদ্যা শিখতে ভারতের অন্যান্য অঞ্চল থেকে ছাত্ররা হেঁটে হেঁটে আসতেন। যেখানেই জ্ঞানের প্রতি সত্যিকার ভালবাসা থাকে, সেখানেই দেখা যায়, ছোটখাট অসুবিধা নিয়ে কেউ মাথা ঘামান না। জ্ঞান-অনুসন্ধান হলো তপস্যা—কৃচ্ছ্রসাধন। তপস্যা ছাড়া কোন জ্ঞানলাভ হতে পারে না। তপস্যা ও জ্ঞান-এর অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। পরে দেখা যাবে, শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে বলছেন : 'বহবো জ্ঞানতপসা পূতাঃ' (৪।১০)—অনেকে জ্ঞান-তপস্যায় পরিশুদ্ধ হয়ে (ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়েছেন)। যদি আমাদের গোটা জাতি এই 'জ্ঞান-তপস্যা'র ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে, তবে আমাদের জাতীয় জীবনে নানা ক্ষেত্রে আসবে অসাধারণ অগ্রগতি। তপস্যা ছাড়া, আরামকেদারায় বসে বসে কোন জ্ঞানার্জন হয় না। উদ্যমী হয়ে, সংগ্রাম করে তার মূল্য দিতে হয়—আর তারই নাম তপস্যা। আমাদের সংস্কৃতিতে এই এক মহান শব্দ—'তপস্যা'। উপনিষদ্ ও গীতাতে শব্দটিকে প্রায়ই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে : "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব" (৩।২)—ব্রহ্মকে তপস্যার মাধ্যমে অবগত হও। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যে 'যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি' থেকে একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়ে 'তপস্যা' শব্দটির সংজ্ঞা দিয়েছেন : "মনসশ্চ ইন্দ্রিয়াণাং চ ঐকাগ্র্যং তপ উচ্যতে"—মন এবং ইন্দ্রিয়-সমূহের শক্তি একত্র সংহত করাকে 'তপস্' বলা হয়। জগতে জ্ঞানের যেকোন অনুসন্ধানের প্রতিই এই সংজ্ঞা প্রযুক্ত হতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা এটিই করেন—তাঁরা তাঁদের মনকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সহায়ে শিক্ষিত করে তুলে সেই মনের সাহায্যে প্রকৃতিকে ভেদ করে তার অন্তস্তলে পৌঁছান এবং সেইসব সত্যের আবরণ উন্মোচন করে দেন—যাদের যুগ যুগ ধরে ঈর্ষাময়ী প্রকৃতি সযত্নে পাহারা দিয়ে রেখেছে। একইভাবে, আত্মা লুক্কায়িত আছেন এই মায়ার জগতে। আমাদের বৈদিক ঋষিগণ এই মায়াকে ভেদ করে আবিষ্কার করেছিলেন নিয়ত-পরিবর্তনশীল মায়া-জগতের অন্তরালস্থিত সেই অনন্ত শাশ্বত সত্তাকে; সেই আত্মাকে।

স্কুল-কলেজে প্রবেশের আগে সব ছাত্রছাত্রীর উচিত

'তপস্' বা তপস্যার এই সংজ্ঞাটিকে তাদের সামনে রাখা। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে যথেষ্ট পরিশ্রম না করলে জ্ঞান অর্জন করা যায় না। তপস্যাকে সরিয়ে নিলে জ্ঞানানুসন্ধান লঘু বা সস্তা হয়ে দাঁড়ায়; আর আমাদের শিক্ষায় বর্তমানে সেটাই হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কোন জ্ঞানার্জন-কেন্দ্রে গেলে সেখানে তপস্যার কোন মনোভাব বা পরিবেশ দেখতে পাওয়া যাবে না; দেখা যাবে, সবকিছুই দিব্যি স্বচ্ছন্দে চলে যাচ্ছে, কেবল ব্যতিক্রমী কয়েকজনই এখনো তপস্যার অগ্নিকে নিরন্তর প্রজ্বলিত করে রেখেছেন। আমাদের সংস্কৃতিতে তপস্যা ও স্বাধ্যায় পরস্পর-সংযুক্ত ধারণা। 'স্বাধ্যায়' মানে অধ্যয়ন। বাল্মীকি-রামায়ণ শুরু হচ্ছে এই কথাগুলি দিয়েঃ "তপঃ স্বাধ্যায়নিরতং... নারদম্" (১।১)—নারদ, যিনি কিনা নিয়ত তপস্যা ও স্বাধ্যায়ে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব এটিই হলো জ্ঞানমুদ্রার ধারণা, যার পিছনে আছে তপস্যা ও স্বাধ্যায়। তাই গীতাধ্যানে বলা হয়েছে—"জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায়"—(আমরা প্রণাম করি) কৃষ্ণকে যিনি এই জ্ঞানমুদ্রা ধারণ করে রয়েছেন। শ্লোকটিতে আরো বলা হচ্ছেঃ "গীতামৃতদুহে" (৩)—যিনি (উপনিষদ্রূপী গাভী থেকে) গীতারূপ অমৃতদুগ্ধ দোহন করেছেন। দ্বিতীয়াংশের বর্ণনাটি পূর্ণরূপে আসবে পরবর্তী শ্লোকে। সংস্কৃতে 'দুহ্' শব্দের অর্থ—যিনি গাভীকে দোহন করেন; 'দুগ্ধম্' অর্থ দুধ; 'দুহিতা' মানে কন্যা—যিনি প্রাচীন আর্যগৃহের গরুগুলিকে দোহন করতেন। ঐ সংস্কৃত শব্দটি থেকেই এসেছে রাশিয়ান বা স্লাভ শব্দ 'doch', জার্মান শব্দ 'tochter' এবং ইংলিশ শব্দ 'daughter'—যাদের সবগুলির অর্থ 'কন্যা'।

"সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ।।" (৪)

—উপনিষদ্গুলি হলো গাভী, দোগ্ধা হলেন গোপালক-পুত্র (শ্রীকৃষ্ণ); পার্থ বা অর্জুন বৎস; শুদ্ধবুদ্ধি নারীপুরুষ পানকর্তা এবং অমৃতময়ী গীতা হলো দুগ্ধ।

এই বিখ্যাত শ্লোকটি সমগ্র ভারতে জনপ্রিয়। গীতা বর্ণিত হয়েছে উপনিষদের সাররূপে। পরবর্তী শ্লোকে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি একটি শ্রদ্ধা-উক্তি:

"বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্।।" (৫)

—কংস ও চাণূর (অসুর প্রবৃত্তির দুই পাষণ্ড)-বিনাশী, (জননী) দেবকীর পরমানন্দদায়ক, বসুদেবপুত্র জগদ্গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি।

শ্রীকৃষ্ণ জগতে কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে বা কোন দেশকে বা কোন জাতিকে শিক্ষাপ্রদান করতে আসেননি, তিনি এসেছিলেন সমগ্র মানবতার জন্য। সেটিই বলা হয়েছে এই শ্লোকেঃ 'কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্।' পরবর্তী শ্লোকটি বেশ বড়; রূপকল্পে ভরা:

"ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্যোধনাবর্তিনী
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্তকঃ কেশবঃ।।" (৬)

—যুদ্ধরূপ যে-নদীতে ভীষ্ম ও দ্রোণ-রূপ দুই তীর, জয়দ্রথরূপ জল, গান্ধাররাজরূপ নীলপদ্ম, শল্যরূপ হাঙর, কৃপরূপ খরস্রোত, কর্ণরূপ তীরপ্লাবী তরঙ্গ, অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ-রূপ ভয়ঙ্কর দুই কুমীর এবং দুর্যোধনরূপ ঘূর্ণাবর্ত ছিল; কেশব (শ্রীকৃষ্ণ) কর্ণধার হওয়ায় পাণ্ডবরা সেই রণনদী নিশ্চিতরূপে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

পরবর্তী শ্লোকটি হলো:

"পারাশর্যবচঃসরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানককেশরং হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা
ভূয়াদ্ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসিনঃ শ্রেয়সে।। (৭)

—যে-পদ্ম পরাশরপুত্রের (অর্থাৎ ব্যাসদেবের) বাক্যরূপ সরোবরজাত, হরি (অর্থাৎ পরম দেবসত্তা) বিষয়ক কথাপ্রসঙ্গ দ্বারা পূর্ণ বিকশিত, নানা আখ্যানরূপ কেশরযুক্ত; যার মধু এই জগতের সজ্জনরূপ ভ্রমরগণ নিত্য পান করেন; গীতারূপ তীব্রসুগন্ধযুক্ত অমল মহাভারতরূপ সেই পদ্ম তাঁদের সর্বোত্তম কল্যাণ করুক, যাঁরা কলিযুগের কলুষ নাশ করতে সম্যগ্রূপে ব্যগ্র।

পরবর্তী শ্লোকটি শ্রীকৃষ্ণের কৃপা বিষয়ক। এটিও একটি বিখ্যাত শ্লোক:

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।।" (৮)

—যাঁর কৃপা মূককে বাগ্মী করে এবং পঙ্গুকে গিরিলঙ্ঘন করায়, সেই পরমানন্দস্বরূপ মাধবকে (শ্রীকৃষ্ণকে) বন্দনা করি।

দৈবকৃপার শক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে ভারতবর্ষের বহু মুনিঋষি বারেবারে এই শ্লোকটি ব্যবহার করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, দৈব কৃপা হলো সেই বাতাস যা সবসময়ই বইছে; তবে তোমার নৌকা সামনে এগোচ্ছে না, কারণ তুমি পাল তুলে দাওনি। পাল তুলে দাও; তাহলে বাতাস লাগবে এবং তুমি সামনে এগোবে। কৃপা অনুভব করতে হলে আমাদের শুধু ঐটুকু কাজ করতে হবে।

তারপরে আছে শেষ শ্লোকটি, যা আমাদের দেশের লোক প্রায়ই পাঠ করে থাকেন:

"যং ব্রহ্মাবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।।" (৯)

—ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুৎগণ দিব্য স্তব দ্বারা যাঁর বন্দনা করেন, সামগায়কগণ অঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষদ্-সহ বেদ দ্বারা যাঁর মহিমা গান করেন, যোগীরা ধ্যানে তদ্গতচিত্ত

হয়ে যাঁকে দর্শন করেন এবং দেবাসুরগণও যাঁর চরম তত্ত্ব অবগত নন, সেই পরম দেবতাকে প্রণাম করি।

আদি শঙ্করাচার্যের গীতাভাষ্যের ভূমিকা

আগেই বলা হয়েছে, শঙ্করাচার্যই প্রথম গীতার গুরুত্ব আবিষ্কার করেন এবং তার ওপর একটি ভাষ্য রচনা করে মানুষের কাছে গ্রন্থটি প্রচার করেন। ৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর আবির্ভাব এবং ৮২০ খ্রীস্টাব্দে ঘটে তাঁর মহাপ্রয়াণ। তিনি ছিলেন অসামান্য এক সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব, যিনি তাঁর নিজের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার বিশিষ্টতাকে সামগ্রিকভাবে মূর্ত করে তুলেছিলেন। ভারতবর্ষের দক্ষিণ থেকে উত্তর এবং পশ্চিম থেকে পূর্বপ্রান্ত তিনি পায়ে হেঁটে পরিভ্রমণ করেছিলেন। রচনা করেছিলেন বেদান্তের ওপর অনেকগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও জনপ্রিয় গ্রন্থ। ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের ওপর শঙ্করাচার্য নিজের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। আর এসবই তিনি করেছেন তাঁর বত্রিশ বছরের স্বল্প জীবনকালে।

গীতাভাষ্যের ওপর শঙ্করাচার্যের যে দু-পৃষ্ঠা ভূমিকা আছে, তার প্রধান অংশ আমরা আলোচনা করব। এখানে রয়েছে মানব-প্রগতি সম্বন্ধে এক সার্বিক ভাবনার বিস্তার। আমি চাই, গীতাপ্রেমিক প্রত্যেকেই এই দু-পৃষ্ঠা ভূমিকা অধ্যয়ন করুন; এর সার্বজনীনতা উপলব্ধি ও উপভোগ করুন; তার দ্বারা আন্তরিকভাবে প্রভাবিত হোন। গীতা মানুষের জীবনকে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক—এ দুভাগে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে না, বরং মানবজীবন ও তার ভবিতব্য সম্পর্কে এক সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি দান করে। তাই আমরা উক্ত ভূমিকার অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অংশ আলোচনা করব।

শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্যের ভূমিকায় প্রথমে একটি পৌরাণিক শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, যার আংশিক প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় আধুনিক পাশ্চাত্য সৃষ্টিতত্ত্বে (cosmology)। শ্লোকটিতে দৈবসত্তার স্বরূপ প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে ঃ

"ওঁ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্।
অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী।।"

—নারায়ণ (পরম দৈবসত্তা) হলেন অব্যক্তের অর্থাৎ অবিভাজিত বা মূলা প্রকৃতির পারে, ব্রহ্মাণ্ড এসেছে অব্যক্ত থেকে; ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত রয়েছে সপ্তদ্বীপ-মহাদেশযুক্ত পৃথিবী-সহ এই লোকসমূহ।

ভারতীয় সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে আধুনিক পাশ্চাত্য সৃষ্টিতত্ত্বের যে কেবল কতকগুলো দিক দিয়ে দারুণ মিল আছে, তা-ই নয়; এটি পাশ্চাত্য তত্ত্বের তুলনায় সমৃদ্ধও বটে। আলোচ্য শ্লোকে এই ভারতীয় সৃষ্টিতত্ত্বের প্রকাশ রয়েছে। এবিষয়ে উভয় দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য হলো, ভারতবর্ষের বিচারে জগৎ-কারণ পবিত্র ও আধ্যাত্মিক; আর আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ঐ-উৎসটি জড়বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য ইংল্যান্ডের ফ্রেড হয়েলের মতো কিছু পাশ্চাত্য সৃষ্টিতত্ত্ববিদ্ চেষ্টা করছেন ঐ উৎসকে আধ্যাত্মিকে রূপান্তরিত করার। চল্লিশ বছরেরও আগে ফ্রেড হয়েল সৃষ্টিতত্ত্বের ওপর একটি বই লিখেছিলেন, যেটি ছিল সম্পূর্ণরূপে বস্তুবাদী। এখন তিনি নতুন একটি বই লিখেছেন, যার শিরোনামটিতেই রয়েছে এক আধ্যাত্মিক মাত্রা—'The Intelligent Universe' (বুদ্ধিমান মহাবিশ্ব)। মহাবিশ্ব বুদ্ধিমান; এবং বেদান্তও এ-বিশ্বকে এমনটিই বলে থাকে ঃ অনন্ত, অদ্বৈত, চৈতন্যসত্তা।

এই প্রথম শ্লোকটিতে আমরা পাচ্ছি 'নারায়ণ'-এর উল্লেখ, যার সঙ্গে তুলনীয় কোন ধারণা বা ভাব পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানে নেই। কিন্তু পরবর্তী পর্বে 'অব্যক্ত' বা অবিভাজিত অবস্থার কথা আসছে; যা আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানের 'state of singularity'-র সঙ্গে তুলনীয়। পরম দৈবসত্তা নারায়ণকে আবাহন করা হয়েছে এই বলে যে, তিনি অবিভাজিত প্রকৃতির পশ্চাতে অবস্থিত। বেদান্ত-মতে, প্রকৃতির দুটি মাত্রা—বিভাজিত ও অবিভাজিত। 'বিভাজিত' হলো তা-ই, যাকে এই ব্যক্ত বিশ্বরূপে প্রকাশিত দেখতে পাওয়া যায়। তার পিছনে আছে 'অব্যক্ত', অর্থাৎ অবিভাজিত প্রকৃতি; যা হলো পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞান-কথিত 'মহা-বিস্ফোরণ' ('Big Bang')-এর ঠিক আগের অবস্থা। 'অব্যক্ত' থেকে আসে 'ব্যক্ত' বা প্রকাশিত রূপ—যাকে বর্তমান শ্লোকে বলা হয়েছে 'ব্রহ্মাণ্ড' এবং যার মধ্যে রয়েছে সপ্তমহাদেশযুক্ত এই পৃথিবী-সহ লক্ষ কোটি জগৎ। বেদান্তে ঈশ্বর বা আদি ও পরম সত্যকে 'অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড নায়ক' বলা হয়েছে। ভারতবর্ষের চিন্তায় ছিল অসীম দেশকালের ধারণা, যার সঙ্গে সেমিটিক চিন্তার অতি সীমাবদ্ধ দেশকাল-ভাবনার সাদৃশ্য নেই, কিন্তু সাদৃশ্য আছে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিজ্ঞান-ভাবনার। বেদান্ত বলে, গোটা ব্রহ্মাণ্ড এসেছে ব্রহ্ম থেকে, ব্রহ্মেই তা অবস্থান করছে এবং একটি সৃষ্টিচক্রের অন্তে আবার তা ব্রহ্মেই লীন হয়ে যায়। বেদান্ত আরো বলে, ব্রহ্ম থেকে জগৎ সৃষ্ট হয়েছে এক চমৎকার সুশৃঙ্খল পরম্পরাক্রমে; এসেছে অবিভাজিত অবস্থা থেকে বিভাজিত অবস্থায়, এবং এই বিভাজন সঙ্ঘটিত হয় একটি নির্দিষ্ট বিবর্তন-ক্রম অনুসারে, যথা—মহাজাগতিক বিবর্তন, জৈব বিবর্তন, মানবীয় (নৈতিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক) বিবর্তন। বৈদান্তিক সৃষ্টিতত্ত্বে এই ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে। বিষ্ণুসহস্রনামে (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব) গীত হয়েছে ঃ

"যতঃ সর্বাণি ভূতানি ভবন্তি আদি যুগাগমে।
যস্মিনশ্চ প্রলয়ং যান্তি পুনরেব যুগক্ষয়ে।।"

—যাঁর হতে একটি যুগ বা সৃষ্টিচক্রের প্রারম্ভে বস্তুসকল উৎপন্ন হয় এবং যুগান্তে যাঁর মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয়—তিনিই নারায়ণ।

দৈবী নারায়ণ হলেন সগুণ-নির্গুণ ব্রহ্মের ব্যক্তিসত্তা। এই ব্রহ্ম অনন্ত বিশুদ্ধ চৈতন্য; এক এবং অদ্বিতীয় স্বরূপসম্পন্ন।

[ক্রমশ]

সৎপ্রসঙ্গে স্বামী ভূতেশানন্দ

প্রশ্ন : আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রগতি হচ্ছে কিনা কেমন করে জানব?

স্বামী ভূতেশানন্দ : আমাদের লক্ষ্য কি, উদ্দেশ্য কি, আমরা কি পেতে চাই—এর উত্তরের দ্বারাই বিচার করা চলে আমরা সঠিক পথে চলছি কিনা। আমাদের উদ্দেশ্য কি সেটাই আগে স্পষ্ট করে জানতে হবে, তারপর ঠিক পথের প্রশ্ন। ঠিক পথে চলার অর্থ—আমরা যতই অগ্রসর হব, দেখব আমাদের লক্ষ্য ক্রমশ আরো নিকটবর্তী হচ্ছে এবং শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে উপনীত হব। সুতরাং যা আমাদের উদ্দেশ্য লাভের অনুকূল সেটাই ঠিক পথ।

সমস্ত অজ্ঞানতার সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তিই আধ্যাত্মিক জীবনের লক্ষ্য। এখন লক্ষ্যের দিকে যত অগ্রসর হব ততই আমরা বুঝতে পারব যে, লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যেসব গুণের প্রয়োজন সেগুলি ধীরে ধীরে উন্মেষিত হয়ে উঠছে। এই লক্ষ্য বা ঈশ্বর কি? ঈশ্বর হলেন শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ পরম সত্তা। এখন আমাদের বিচার করে দেখতে হবে আমরা ক্রমশ শুদ্ধ হচ্ছি কিনা, স্বার্থবুদ্ধি ও দেহ-মনের প্রতি আসক্তি কমছে কিনা। এগুলি হলো সঠিক লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছি কিনা তা পরীক্ষা করার কষ্টিপাথর।

আন্তরিকভাবে নিজেদের বিচার-বিশ্লেষণ বা আত্মসমীক্ষা করে দেখতে হবে আমরা পবিত্র কিনা, একেবারে নিঃস্বার্থ, দেহ-মনের প্রতি অনাসক্ত কিনা। অগ্রগতির এইগুলিই প্রমাণ। এই প্রসঙ্গে 'ভাগবত'-এর একটি শ্লোক স্মরণীয়—

"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্।।"

(১১।২।৪২)

—আমরা ভগবানের দিকে যত এগিয়ে যাব ততই তিনটি বিষয়ের অনুভব আমাদের হতে থাকবে এবং তিনটিই একসঙ্গে হবে। সে তিনটি হলো 'ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র'। এই হলো কষ্টিপাথর।

মানুষ যখন ক্ষুধায় কাতর হয় তখন তার মধ্যে অসন্তোষ বা অতৃপ্তি থাকে, আর সে দুর্বলতা অনুভব করে। সেসময় তাকে আহার্য বস্তু দিলে দেখা যাবে প্রতিটি গ্রাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষুন্নিবৃত্তি হচ্ছে, অতৃপ্তি দূর হচ্ছে এবং সে নিজেকে সুস্থ সবল মনে করছে। তেমনই ঈশ্বরের প্রতি, ইষ্টের প্রতি যত মন যাবে—তাঁর প্রতি অনুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে, তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে ধারণা স্বচ্ছতর হবে এবং ঈশ্বর ব্যতীত অন্য বস্তুতে আসক্তি হ্রাস পেতে থাকবে। ভক্তি বা অনুরাগ, 'পরেশানুভব' অর্থাৎ ঈশ্বরসান্নিধ্যের অনুভূতি এবং বিরক্তি অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোন বিষয় বা প্রসঙ্গে তীব্র অনীহা—এই তিনটি হচ্ছে ভক্তিমার্গে অগ্রগতির যথার্থ প্রমাণ। নিজের জীবনে এই প্রমাণগুলির সত্যতা নিজেকেই নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখতে হয়, যেন আত্মপ্রবঞ্চনা না থাকে।

প্রশ্ন : ইচ্ছাশক্তি কি? 'বুদ্ধি' শব্দেরই বা অর্থ কি?

স্বামী ভূতেশানন্দ : কোন কাজ সম্পন্ন করার বা কোন কিছু পাওয়ার সামর্থ্য সম্বন্ধে নিজের ওপর দৃঢ় আস্থা পোষণ করে অগ্রসর হওয়ার নামই ইচ্ছাশক্তি। আর কোন বস্তুকে যথাযথভাবে জানার জন্য যে স্বচ্ছ ধারণাশক্তি, তাই হচ্ছে বুদ্ধি। এই দুটি বিষয়—ইচ্ছাশক্তি ও বুদ্ধি পরস্পর থেকে ভিন্ন, সুতরাং এদের মধ্যে কোন্‌টি ভাল, সে-বিচার চলে না। এখন যদি বলি টক আর মিষ্টি, অম্ল বা মধুর—এই দুই বিপরীত বস্তুর মধ্যে কোন্‌টি ভাল? কি উত্তর দেবে? অন্ধ্রবাসীর কাছে টক ভাল, আর বাঙালীর রসনায় মিষ্টি। আসলে কে কি চাইছে, তার ওপরেই ভাল-মন্দের বিচার নির্ভর করে।

প্রশ্ন : সকলের প্রতি সমদৃষ্টি কেমন করে হয়?

স্বামী ভূতেশানন্দ : সঙ্কীর্ণ মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির চিন্তাভাবনা নিজের এবং নিজের ছোট পরিবারটিকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। অন্য কারো সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু যিনি উদারচেতা, যাঁর হৃদয় প্রেমপূর্ণ—তিনি কেবল নিজের পরিবার-পরিজন নিয়েই ভাবেন না। অপরাপর সকলেই তাঁর আপনজন, প্রিয়জন। তাঁর হৃদয় সকলের প্রতি ভালবাসাতেই পূর্ণ। সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে,—

"অয়ং নিজঃ পরো বেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাং তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।।"

(হিতোপদেশ, মিত্রলাভ, ৭০)

—নিজের পরিবারের লোকজনকেই আপন ভাবা আর অপরের সম্বন্ধে উদাসীনতা, এই বোধ মনের ক্ষুদ্রতার পরিচায়ক। কিন্তু যিনি প্রশস্তহৃদয়, সর্বব্যাপক যাঁর দৃষ্টি—তিনি সকলকেই আপন বলে মনে করেন। মহৎ ব্যক্তির আত্মপর ভেদ থাকে না, বিশ্বজনই তাঁর আপন। আর সাধারণ সঙ্কীর্ণচিত্ত ব্যক্তির কেবলমাত্র নিজের আর নিজের সঙ্গে একান্তভাবে যুক্ত আত্মীয়দের সঙ্গেই সম্বন্ধ।

শ্রীশ্রীমায়ের দৃষ্টান্ত দেখ। তিনি কি ভাবতেন? তাঁর কাছে পর বলে, অপরিচিত বলে কেউ ছিল না। তাঁর জয়রামবাটী থেকে কলকাতা আসার সময় সেই ঘটনাটি ভেবে দেখ। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, মা সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে অত দ্রুতগতিতে যেতে পারছেন না। ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছেন। ক্রমে রাত্রি হয়ে এল। সেই জনমানবহীন প্রান্তরে মা অন্ধকারে একা চলেছেন। সেইসময় হঠাৎই লাঠি-হাতে এক দীর্ঘকায় মানুষ তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হলো। সে একজন ডাকাত ছিল। কিন্তু শ্রীশ্রীমা তাকে অনায়াসেই পিতৃ সম্বোধন করে বললেন : "বাবা, আজ আমাদের তারকেশ্বরে রাতটা বিশ্রাম করার কথা। আমার সঙ্গীরা এগিয়ে যাওয়ায় আমি একা হয়ে পড়ে

ভাবছিলাম কি করি। কিন্তু আমার কি ভাগ্য, তুমি ঠিক এই সময়ে এসে পড়েছ। তা না হলে এইভাবে একলা যে কি করতাম।" এমন অকপট সরলতায় তিনি কথাগুলো বললেন যে, দস্যুর পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হলো। পিছনেই আসছিল ডাকাতের স্ত্রী। মা তার হাতটি ধরে বললেন: "মা, আমার কি সৌভাগ্য যে, তোমরা দুজনেই এস পড়েছ, আর আমার ভাবনা নেই। তোমরা না এলে কি যে করতাম জানি না।" এই কাতরতায় ডাকাত-বৌয়ের মনটাও গলে গেল। দুজনেরই তাঁর প্রতি এমন কন্যাস্নেহ হলো যে, তাঁকে তারা একলা ছাড়ল না। নিকটবর্তী গ্রামের একটি দোকানে রাত্রিটা কাটাবার, সেখান থেকে মুড়ি-মুড়কি কিনে রাত্রিতে খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল এবং মা ঘুমোলে ডাকাত নিজে ঘরের বাইরে সারারাত লাঠিহাতে পাহারা দিল। পরের দিন সকালবেলা তারা নিজেরাই মাকে তাঁর সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে দিয়ে এল।

শ্রীশ্রীমার এমনই ছিল স্বভাব। তাঁর কাছে যেকোন ব্যাপারে যে-ই আসুক না কেন, তিনি তাঁকে নিজের লোকের মতোই দেখতেন। একটি ভক্ত তাঁর কাছে আসত। সে অতিরিক্ত পানাসক্ত ছিল, তার চরিত্রদোষও ছিল। অন্যান্য যেসব ভক্ত মায়ের কাছে আসতেন তাঁরা এই নিয়ে অনুযোগ করতেন যে, বাইরের লোক তাঁদের সম্বন্ধে মন্দ ভাবতে পারে। সুতরাং সে যাতে তাঁদের সঙ্গে না মিশতে পারে, এইজন্য তাকে মায়ের কাছে আসতে নিষেধ করা হোক। মা সব শুনে উত্তর দিয়েছিলেন: "হতে পারে সে মন্দ লোক কিন্তু আমি যখন তার মা, তাকে শুদ্ধ করে গ্রহণ করাই কি আমার কর্তব্য নয়? শিশু ধুলোবালি ঘেঁটে ময়লা মাখলে মা কি করেন? ধুলো মুছে পরিষ্কার করে তাকে কোলে তুলে নেন না? আমি তার মা। তার যত মলিনতা দূর করে তাকে সন্তান বলে গ্রহণ করাই কি আমার উচিত নয়?"

এমন অপূর্ব তাঁর মাতৃহৃদয়। ডাকাত আমজাদের কাহিনীও সবাই জানে। মা তাকে নিজের সন্তানের মতোই দেখতেন, সেইরকমই ব্যবহার করতেন। একদিন মায়ের এক ভ্রাতুষ্পুত্রী নলিনীদি তাকে পরিবেশন করছিলেন। আমজাদ মুসলমান, আর নলিনীদি সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ বংশীয়া। সুতরাং স্পর্শদোষ বা ছোঁয়াছুয়ি বাঁচাবার জন্য তিনি সব খাবারই দূর থেকে ছুঁড়ে দিচ্ছিলেন। শ্রীশ্রীমা তাতে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন: "ঐভাবে পরিবেশন করলে কেউ খেতে পারে? তুমি সর, আমি পরিবেশন করছি।" তারপর তিনি স্বয়ং তাকে যত্ন করে খাওয়ালেন। শুধু তাই নয়। খাওয়া হয়ে গেলে নিজে সেই উচ্ছিষ্ট স্থান পরিষ্কার করলেন। তখনকার দিনে গ্রামদেশে কোন ব্রাহ্মণের মেয়ের পক্ষে এ-কাজ ভাবাই যায় না। এই হলেন আমাদের মা। সেই তিনি, যিনি বলতেন: "আমার শরৎ যেমন ছেলে, আমজাদও তেমনি।" এই শরৎ হলেন স্বামী সারদানন্দ—মায়ের পরম ভক্ত, সেবক, তাঁর 'ভারী', শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সম্পাদক। সেই শরৎ মহারাজের সঙ্গে আমজাদেরও নাম নিয়ে তিনি বললেন: শরৎ-আমজাদ দুজনেই যে আমার সন্তান। এমনই তাঁর মাতৃমহিমা। তাই তো তাঁর কাছে 'পর' বলে কেউ ছিল না।

প্রশ্ন: শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামীজী দুজনেই বলেছেন, বহু এবং এক—এ দুটিই সত্য, একই বস্তুর এপিঠ ওপিঠ। কিন্তু মায়াবাদের সঙ্গে কি এটির বিরোধ হচ্ছে না?

স্বামী ভূতেশানন্দ: মায়াবাদ বলেই কিছু নেই। বাদ হচ্ছে নির্যাস। যে-তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে তার সারভাগ। যেমন অদ্বৈতবাদ অদ্বৈত তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করছে, অস্বীকার করছে আপাত প্রতীয়মান দ্বৈতসত্তাকে। তেমনি দ্বৈতবাদ আবার চরম সত্যকে 'দুই' বলে স্বীকার করেছে। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ অদ্বৈতকে স্বীকার করেও তার মধ্যে একটি বিশেষত্ব যুক্ত করেছে। এই হলো 'বাদ' শব্দের অর্থ। কিন্তু 'মায়া' কোন বাদ নয়। মায়াকে কোন সম্প্রদায়ই প্রতিষ্ঠা করেনি। আচার্য শঙ্কর তো নয়ই। তিনি মায়াবাদী নন, তিনি ব্রহ্মবাদী। তাঁকে বুঝতে না পেরে ভুলক্রমে 'মায়াবাদী' বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই মায়ার জন্যই এক অদ্বৈত সৎ বহুরূপে প্রতিভাত হন—এই কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন। মায়া না থাকলে এক-এর এই বহুত্বকে বোঝানো যায় না বলেই তিনি 'মায়া' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। মায়ার অর্থ ইন্দ্রজাল নয়। এটি অনির্বচনীয়, অপ্রত্যক্ষ, আমাদের বুদ্ধির অগম্য। এটি আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে বলেই একে 'মায়া' বা 'অবিদ্যা' বলা হয়। অথচ এটি কোন সৎ বস্তু না হয়েও তার আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির দ্বারা আমাদের ভ্রান্তির কারণ ঘটায়। মায়ার সাহায্যে অদ্বৈত তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেছেন বলেই শঙ্করাচার্যকে কেউ কেউ 'মায়াবাদী' বললেও তা ভুল। তিনি অদ্বৈতবাদী, তিনি ব্রহ্মবাদী।

প্রশ্ন: জীবন ও মৃত্যু বলতে কি বোঝায়? এই মহাবিশ্বের তথা মানবজাতির অস্তিত্ব কিসের জন্য?

স্বামী ভূতেশানন্দ: প্রশ্নের দ্বিতীয়ার্ধটি অতি চমৎকার। কেন যে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, মানুষের আবির্ভাব ও অস্তিত্বের কি কারণ তা আমরা জানি না। আমরা সাধারণ মানুষ, কি করে জানব কেন আমরা এসেছি, আছি? তবু এটা ঠিক, সামনে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে বলেই আমাদের বেঁচে থাকা। এই বিশ্বজগৎটা যে আছে তারও অস্তিত্বের একটা উদ্দেশ্য আছে। কি সেই উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য হচ্ছে এই মায়িক জগতে বাস করে নিজের স্বরূপকে চেনা, নিজেকে মহীয়ান রূপে বিকশিত করে তোলা। এই মহাবিশ্বের আশ্রয়ে বাস করে স্বস্বরূপানুসন্ধান ও স্বস্বরূপোপলব্ধিই জীবনের পরম লক্ষ্য, আর সেইজন্যই আমাদের জীবনধারণ।

প্রথম প্রশ্নটি জীবন-মৃত্যু বিষয়ে। এ তো অতি সোজা কথা। তুমি যে প্রাণবন্ত, তুমি যে আছ—এসম্বন্ধে তোমার

সচেতনতাই জীবন। যখন এই অস্তিত্বের বোধ থাকে না, সেটাই মৃত্যু। মৃত্যুর পর কি—সেটা আরেকটা প্রশ্ন। জীবনের অর্থ হচ্ছে এই ঘটনাবহুল বিশ্বে সক্রিয়ভাবে, সচেতনভাবে নিজের অংশগ্রহণ। আর মৃত্যু হচ্ছে এই সক্রিয় অংশগ্রহণকারী যে ব্যক্তিত্ব, তার লয় বা অবসান। সহজ ভাষায় এরই নাম জীবন-মরণ। এই জীবন-মৃত্যু, অন্তত জীবন তো আমাদের সকলেরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। সুতরাং জীবন কি—এই প্রশ্নের অর্থই হয় না। আমি যে জীবিত—একথা অপরের বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে জীবনের অর্থ কি, প্রয়োজন কি সেটাই ভাববার। অন্ধ পরিবেশের কাছে আত্মসমর্পণ জীবনের উদ্দেশ্য নয়। বিশেষ একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সাধনা, লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা—এই-ই হলো জীবন।

প্রশ্ন ঃ কর্ম ও কর্মযোগ সম্বন্ধে শঙ্করাচার্য ও স্বামীজীর ধারণার মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে?

স্বামী ভূতেশানন্দ ঃ দুজনের মতের মধ্যে সামান্য একটু তফাৎ আছে। যাকিছুই করা হয় তাই-ই কর্ম অর্থাৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা তাৎক্ষণিক কৃত, তাই হলো কর্ম। আর যা আমাদের বন্ধনমুক্তির কারণ, সেইভাবে ভেবেচিন্তে যা করা হয় তার নাম 'কর্মযোগ'। অর্থাৎ কর্মযোগ হচ্ছে কর্মসাধনের এক বিশেষ পন্থা যা আমাদের মোক্ষের সহায়ক। 'যোগঃ কর্মসু কৌশলম্'। (গীতা, ২।৫০) কর্মযোগ হচ্ছে সেই রহস্য, যার ফলে কর্ম করেও কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করা যায়। শঙ্করাচার্য আর স্বামীজী দুজনেই কর্মযোগের কথা বলেছেন। শঙ্করাচার্যের মতে জ্ঞান কর্মের সমুচ্চয় হতে পারে না, কারণ দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। এখানে 'কর্ম' শব্দের অর্থ যেকোন ধরনের কর্ম। তিনি বলতে চাইছেন, সমস্ত কর্মের পিছনেই একটা স্বার্থ থাকে এবং স্বার্থপ্রণোদিত সমস্ত কর্মই জ্ঞানের বিরোধী। কারণ, শুদ্ধজ্ঞানে স্বার্থপরতা থাকতে পারে না। এখানে স্বার্থপরতার অর্থ হচ্ছে দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মনের সঙ্গে আত্মার একত্ববোধ। জ্ঞানী ব্যক্তি কিন্তু দেহাত্মবোধের অতীত। মনের সঙ্গেও তাঁর একাত্মবোধ নেই। তিনি জানেন, তিনি আত্মস্বরূপ। অথচ কর্মমাত্রেরই পটভূমিকায় দেহমনের স্বীকৃতি থাকে। অপরদিকে স্বার্থপ্রচোদনা ভিন্ন যে কর্ম, তারই নাম কর্মযোগ। তাই আত্মজ্ঞান ব্যতীত কর্মযোগ সম্ভব নয়। শঙ্কর যখন জ্ঞান থেকে কর্মকে পৃথক করেছেন, তাদের পরস্পরবিরোধী বলেছেন, তখন তিনি এই সকাম কর্মকেই লক্ষ্য করেছেন।

স্বামীজীও কর্মযোগের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, নিষ্কাম কর্ম বা নিঃস্বার্থ কর্মই হচ্ছে কর্মযোগ। অবশ্য গীতাতেও তত্ত্ব হিসাবে এই নিষ্কাম কর্মযোগের প্রশস্তি করা হয়েছে। শঙ্করের সঙ্গে স্বামীজীর মতের আরেকটি পার্থক্যও লক্ষণীয়। শঙ্কর বলছেন, কর্ম মোক্ষের কারণ হতে পারে না। কর্মের দ্বারা আমরা শুদ্ধ হতে পারি, মন পবিত্র থেকে পবিত্রতর হতে পারে, কিন্তু তা অজ্ঞান বা অবিদ্যা দূর করতে পারে না। একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞান দূরীভূত হয়। জ্ঞান ও অজ্ঞান দুটো বিপরীত বস্তু, একটি অপরটির অভাব। সুতরাং কর্মের দ্বারা কোন প্রকারেই জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। তবে কর্ম জ্ঞানের সহায়ক। নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হতে থাকে। চিত্তশুদ্ধির পরেই জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হওয়া এবং সেই জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞাননাশ বা মোক্ষলাভ সম্ভব। কর্ম ও মোক্ষলাভের মধ্যে জ্ঞানই যোগসূত্র। স্বামীজী এখানেই ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, জ্ঞানের দ্বারা যেমন মোক্ষলাভ হয়, কর্মের দ্বারাও তেমনই মুক্তি হয়। জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পরবিরুদ্ধ—এই তত্ত্বটির সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যই শঙ্কর অজ্ঞান দূরীকরণে জ্ঞানের আবশ্যকতার কথা বলেছেন এবং সেই কারণেই কর্মকে জ্ঞানের সহায়ক মাত্র বলেছেন। তাই তাঁর মতে কর্ম প্রত্যক্ষভাবে অজ্ঞান দূর করাতে পারে না, পারে না পরম সত্যকে প্রকাশ করে স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে। স্বামীজী কিন্তু কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়—এই স্বতঃসিদ্ধান্তটি অবলম্বন করেই বলতে চেয়েছেন, কর্মের দ্বারা চিত্ত যদি সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয় তখন পরম সত্যের প্রকাশে আর বাধা থাকতে পারে না। পরম সত্য কি? সবরকম অধ্যাস বা এক বস্তুতে অপর বস্তুর ভ্রান্তি এবং সমস্ত ধর্মাধর্মের সংস্কার বা কর্মের যাবতীয় মালিন্য থেকে মুক্তি—এই-ই তো মুক্তি। চিত্ত বা অন্তঃকরণ যখন কর্মপ্রভাবে এই অবস্থায় উপনীত হয় তখন তো তা মুক্তিরই স্বরূপতাপ্রাপ্ত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ সেজন্য বলেছেন, শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা এক। চিত্ত শুদ্ধ হলে বুদ্ধিও শুদ্ধ হবে। কারণ, বুদ্ধিও অন্তঃকরণের একটা বিভাগ। আর বুদ্ধি নির্মল হওয়ার অর্থই হচ্ছে—সেই স্বচ্ছ বুদ্ধিতে সত্যের অবাধ প্রকাশ। সেখানে আর অজ্ঞান থাকে না, থাকে না অধ্যাস বা অবিদ্যার লেশ।

প্রশ্ন ঃ আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি কিভাবে সম্ভব?

স্বামী ভূতেশানন্দ ঃ আধ্যাত্মিক বা ধর্মজীবন সম্বন্ধে আলোচনার ক্ষেত্র অনেক ব্যাপক। কেননা একে কেন্দ্র করেই আমাদের সমস্ত জীবন। সোজা ভাষায় এর মানে এই যে—যদি আমরা আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে চাই তবে আমাদের প্রতিটি কর্মই তদনুযায়ী হতে হবে। সুতরাং ঠিক কোন্ বিষয়টি, কোন্ কাজটি যে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠনে সাহায্য করবে তা বলা অতি কঠিন। তবে সাধারণভাবে একটা কথা বলা যায় যে, আমি যে এই দেহটা নই, আমি আত্মস্বরূপ—এই উপলব্ধির সহায়ক যেসব ক্রিয়া বা জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই এই দৃষ্টিভঙ্গি জাগ্রত রাখার প্রয়াসই আধ্যাত্মিক জীবন গড়ে তুলতে পারে। সাধারণত সকলেই এই শরীরটাকে 'আমি' ভাবে অর্থাৎ এই শরীরের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান, শারীরিক নানা বিষয়ের চিন্তা নিয়েই আমরা ব্যাপৃত থাকি। আমি যুবক, আমি বৃদ্ধ, আমি সুস্থ বা

অসুস্থ—এসবই আমাদের দেহকেন্দ্রিক চিন্তা। আবার কখনো মনের সুখদুঃখের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজেদের সুখী বা দুঃখী ভাবি। মোটের ওপর দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ইত্যাদির যে সমষ্টি—শাস্ত্রের ভাষায় যাকে 'দেহেন্দ্রিয়-সঙ্ঘাত' বলা হয়ে থাকে—তাকেই আমরা সাধারণত 'আমি' বলে ভাবি।

কিন্তু আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি কি হবে? এই দেহাত্মৈক্য বোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করা এবং আমাদের প্রকৃত স্বরূপ যে এসবের অতীত কোন বস্তু—তা উপলব্ধি করা। আমাদের প্রকৃত সত্তা যে কেবলমাত্র এই দেহ, মন, ইন্দ্রিয়ের অতীত তা নয়, যাকিছু পরিবর্তনশীল সবেরই ঊর্ধ্বে তা অবস্থিত। এ তো আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি যে, আমাদের শরীর ও মন নিত্য পরিবর্তিত হলেও এ-বোধ সবসময় জাগ্রত থাকে যে, আমি সেই একই আছি, একই থাকব। মুহূর্তে মুহূর্তে আমার শরীর ও মনের কতই পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু কখনো আমাদের মনে হয় না যে, আমি পরিবর্তিত হচ্ছি। যে-আমি যুবক ছিলাম, সুখী ছিলাম—সেই আমিই বৃদ্ধ ও দুঃখী, এই আমাদের বোধ হয়। অর্থাৎ সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে একটা অপরিবর্তনীয় 'আমি' থেকে যায়। এই যে অপরিবর্তনীয় নিত্য আমি—এটিকেই জানতে হবে আমার প্রকৃত সত্তারূপে, স্বরূপরূপে। এই স্বরূপকে বলা হয় 'আত্মা' এবং আত্মা সম্বন্ধে যিনি চিন্তা করেন, তাঁকেই বলা হয় আধ্যাত্মিক।

সুতরাং যখন আধ্যাত্মিক জীবনের কথা বলা হয় তখন এমন একটি জীবনের কথা ভাবতে হয়, যে-জীবন কোন জড়বস্তু, পরিবর্তনশীল বস্তু বা আরোপিত বস্তুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে না; কিন্তু নিত্য সনাতন আত্মবস্তুর চিন্তায় রত। আত্মা নিত্য বর্তমান সৎ বস্তু। পরিবর্তন যাকিছু হচ্ছে সেসব সেই আত্মার ওপর অধ্যস্ত বিষয়ের বা আগন্তুক ধর্মের। যখন বুঝতে পারি যে, আমিই সেই আত্মা এবং এই পরিবর্তনশীল দেহ-মন প্রভৃতির সঙ্গে বা তাদের ধর্মের সঙ্গে এই 'আমি'র কোন সম্বন্ধ নেই, তখনি আমরা নিজেদের আধ্যাত্মিক বলতে পারি।

কিন্তু এসমস্ত হচ্ছে দর্শনশাস্ত্রের বিষয়। প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে হলে তার একটা কার্যকরী দিক আছে। প্রারম্ভিক সাধন আছে। যিনি আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করতে চান তিনি ঈশ্বরানুরাগী হবেন, নিজের জীবনে এবং অপরের সঙ্গে আচরণে সর্বদাই সৎ থাকবেন। জিতেন্দ্রিয়, উদারচিত্ত ও সত্যাশ্রয়ী হবেন, কায়মনোবাক্যে কখনো অপরের অমঙ্গল করবেন না। দেহেন্দ্রিয় থেকে নিজেকে বিবিক্ত করে নেওয়ার অনলস প্রয়াসের এই আচরণবিধি অনুসরণ করলে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নতি সম্ভব।

উদারচিত্ততা, অপরের প্রতি সহানুভূতি, সর্বদাই সকলের জন্য সাহায্যের হাত প্রসারিত করে রাখা, শ্রদ্ধা, সত্যবাদিতা, ইন্দ্রিয়সংযম এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপন—এসমস্তই এই আচরণবিধির অন্তর্গত। এইসব গুণই আমাদের জীবন গঠনে সহায়তা করে। অন্যভাবে একথাও বলতে পারি যে, যদি আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁর স্মরণ-মনন করি, সাধুসজ্জন ধার্মিক ব্যক্তির সঙ্গ করি—তাহলেও ক্রমশ আমাদের ধর্মজীবন গড়ে উঠবে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাটি খুব সহজভাবে বুঝিয়েছেন একটি উপমার সাহায্যে। প্রথমে তিনি বদ্ধজীবের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। যেসব লোক সর্বতোভাবে ইন্দ্রিয়পরবশ, তারাই হচ্ছে বদ্ধজীব। কেননা সে নিজেকে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত কিছু ভাবতে পারে না। তার যে একটা আধ্যাত্মিক সত্তা আছে, সে যে দেহাতিরিক্ত আত্মা—এসম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যা তার মনোমত, যা তার ইন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করে—একমাত্র সেইসব কাজই সে করে থাকে। তাই স্বভাবতই তার আচরণ হয় অতি স্বার্থপরের মতো। জড়বস্তুকে কেন্দ্র করেই তার সত্তা আবর্তিত। তাই তাকে 'বদ্ধজীব' বলা হয়। এই জড়ত্বের আবরণ সম্বন্ধে তার সচেতনতাই নেই। জালে আবদ্ধ মাছ পাঁকের মধ্যে মুখ গুঁজে থেকে নিজেদের বেশ নিরাপদ মনে করে আনন্দে থাকে। সে জানতেও পারে না যে, পরমুহূর্তেই জেলেরা এসে তাদের ধরে টেনে তুলবে ও মৃত্যু হবে। বদ্ধজীবও তেমনি ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হয়ে আনন্দ অনুভব করে। সে যে বদ্ধ—এ-ধারণাও তার নেই।

যদি তাকে সেই পরিস্থিতি থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হয় তবে সে ভীত হয়। ভালর জন্য হলেও কোন পরিবর্তন সে চায় না। একজন ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন: এদের কি তাহলে কোন আশাই নেই? এই যে প্রবাহ, এই যে ভাবনা—এর থেকে মুক্তি নেই কোনভাবেই? শ্রীরামকৃষ্ণ জোরের সঙ্গে বললেন: "কেন থাকবে না? এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় অবশ্যই আছে।" কি সেই উপায়? ভগবানের নামগুণগান, সাধুসঙ্গ, মাঝে মাঝে পরিবার-পরিজনদের থেকে দূরে গিয়ে কোন নির্জন স্থানে বসে ঈশ্বরের, একমাত্র ঈশ্বরের চিন্তা করাই হলো উপায়। এরই দ্বারা আমরা আমাদের দেহবোধের ঊর্ধ্বে উঠতে পারি, নিজেদের বদ্ধ দশা থেকে মুক্ত হতে পারি। কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জনই বা তা করতে সত্যই আগ্রহী? উপায় তো আছেই, কিন্তু আমরাই যে এর থেকে বেরিয়ে আসতে উৎসুক নই। অনেকেই মাঝে মাঝে বলে: আমরা বদ্ধ হয়েই রইলাম, আমাদের কোন আশা নেই। কিন্তু ঐ বলা পর্যন্তই। মুক্তির উপায় যদি থাকেই, আমরা তা অনুসরণ করতে রাজি নই। এই-ই তো মুশকিল। আমরা আমাদের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই বটে, কিন্তু সে এই পার্থিব অস্তিত্ব। এর থেকে মুক্তির পথ শ্রীরামকৃষ্ণ বলে দিচ্ছেন এবং তা অতি সহজ পথ। কোন জটিলতা, কোন কঠিন প্রয়াসের ব্যাপার নয়। অতি সুগম সরল পথের কথা তিনি বলছেন—ভগবানের নাম কর, তাঁতে বিশ্বাস রাখ, সৎ জীবন যাপন কর, সাধুসঙ্গ কর। স্মরণ-মনন-প্রার্থনা, নিভৃতে ঈশ্বরচিন্তার মধ্য দিয়ে একটি অন্তর্মুখী জীবন যাপন কর।

এই-ই সাধন। এর মধ্যে কোন সংশয় নেই, জটিলতা নেই। অতি সরল পন্থা। কিন্তু একটিমাত্র বস্তুর প্রয়োজন—সেটি আমাদের ঐকান্তিকতা—মুক্তির আস্বাদনের জন্য, মোক্ষ উপলব্ধির জন্য প্রকৃত আগ্রহ।

প্রশ্ন ঃ কি কারণে শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতারবরিষ্ঠ' বলা হয়?

স্বামী ভূতেশানন্দ ঃ প্রথমে বুঝতে হবে 'অবতার' কাকে বলে? অবতার মানে কি? গীতায় ভগবান বলছেন ঃ

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।" (৪।৭-৮)

কালপ্রভাবে জগতে যখন ধর্মের গ্লানি হয়, অধর্ম প্রবল হয়, সর্বশক্তিমান ভগবান তখন জীবকল্যাণের জন্য স্বয়ং মানবদেহ ধারণ করে আবির্ভূত হন। তিনি সাধারণ এক মানুষের মতো সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে মেশেন, সকলের কাছেই তিনি সহজলভ্য। নিজ জীবন ও আচরণে তিনি বিবেক-বৈরাগ্য, শুভকর্ম ও ত্যাগ-তপস্যার আদর্শ দেখান। এইভাবে ভগবান ধর্মের পুনরুজ্জীবন করেন।

কিন্তু অবতার ছাড়া অবতারকে চিনবে কে? আমরা সাধারণ মানুষরা তাঁকে কাছে পেলেও ভগবান বলে বুঝব না, চিনতেও পারব না। গীতায় ভগবান বলছেন ঃ

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।।" (৯।১১)

—অজ্ঞান ব্যক্তিরা আমাকে দেহধারী মানব বলে অবজ্ঞা করে। আমার পরমতত্ত্ব, ঈশ্বরীয় স্বরূপ তারা জানে না।

এই হলো সাধারণ মানুষের অবস্থা। এমনকি বিরল কোন কোন ব্যক্তি, যাঁরা জ্ঞানী তত্ত্বান্বেষী তাঁরাও অবতারকে জানতে গিয়ে দেখেন—বিরাটত্বে, মহত্ত্বে, শুদ্ধতায় তিনি তাঁদের ধারণার অতীত, সীমিত বুদ্ধির অগোচর। তাঁদের বিচারবুদ্ধির মাপকাঠিতে তাঁকে ধরাছোঁয়া বা চেনা যায় না। বুদ্ধি যতটুকু শুদ্ধ হবে ততটুকুই তাঁকে জানা যাবে। চরম শুদ্ধতা থাকলে তবে তাঁর কতকটা আভাস পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ঃ "তিনি শুদ্ধ মনের গোচর।"

এইরকম অবস্থায় যখন অবতারকেই আমরা জানতে বুঝতে পারি না, তখন কে বড় কে ছোট—এ বিচার কেমন করে করব? তাঁরা তো আমাদের বুদ্ধির অগম্য বা নাগালের বাইরে। তাহলে স্বামীজী কেন শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতারবরিষ্ঠ' বলেছেন? এখানে বিচারটা জাগতিক তথা লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। লৌকিক দৃষ্টিতে বিভিন্ন অবতারের জীবনের তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। অবতার তাঁর কার্যের দ্বারা, আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা কত মানুষের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করতে পারলেন, কতজন তাঁর দিব্যভাবে ভাবিত হয়েছেন—সেটা দেখেই তাঁদের তুলনা করা যায়। অতীতে যেসব অবতারেরা এসেছেন তাঁরা মানুষকে কল্যাণের পথে আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের প্রভাব একটা বিশেষ কালে বিশেষ মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সীমিত ছিল। ইতিহাস ও পুরাণ-কাহিনীর মধ্য দিয়ে তাঁদের যে জীবনচরিত আমরা পেয়েছি, তার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীর তুলনা করলে কি দেখছি? দেখছি, পূর্ব পূর্ব অবতারদের তুলনায় তিনি অধিক সংখ্যক লোককে প্রভাবিত করেছেন। যত দিন যাচ্ছে ততই তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ছে এবং বিস্তৃতি শুধু দেশের মধ্যেই নয়, বিদেশে বহু জ্ঞানী, গুণী, চিন্তাশীল মানুষ তাঁর জীবন ও আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। তিরোধানের দশ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ, আমেরিকা ও ইউরোপে তাঁর জীবন ও বাণী প্রচারিত হয়েছে। এত কম সময়ে আর কোন অবতারের জীবন ও বাণী এত মানুষকে আকৃষ্ট করেনি।

সমাজের যেগুলি সমস্যা, সংশ্লিষ্ট যুগে ভগবানের অবতারের মধ্য দিয়ে সেগুলির সমাধান হয়। সমস্যা মানুষের চিরকালই কঠিন, কিন্তু বর্তমানে যেরকম জটিল সমস্যা আমরা দেখতে পাচ্ছি তার তুলনায় প্রাচীনকালের সমস্যাগুলির সমাধান সহজেই হতো। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে বর্তমানের জটিলতম সমস্যাগুলির যেমন সুষ্ঠু সমাধান পাওয়া যায়, প্রাচীনকালের অবতারদের জীবনের সঙ্গে তার তুলনা হয় না। এই দৃষ্টিতেও তাঁকে 'অবতারবরিষ্ঠ' বলা যায়। মনে রাখতে হবে, এই তুলনা লৌকিক দৃষ্টিকোণ থেকে। আমাদের সীমিত দৃষ্টিতে যতটুকু তাঁর ধারণা করতে পারি তাতে বুঝি, অবতার ভিন্ন অন্য মানুষের পক্ষে এত পবিত্র, এত শুদ্ধ নির্মল হওয়া সম্ভব নয়।

অবতাররাও নরদেহ ধারণ করলে মানুষের মতো জরা-মৃত্যুর অধীন হয়ে সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করেন। দিব্য দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে অবতারে অবতারে কোন প্রভেদ নেই। ঈশ্বরত্বে তাঁরা সকলেই সমান। তবে শক্তির প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন বলেই লৌকিক দিক থেকে তাঁদের সম্পর্কে একটা তুলনামূলক আলোচনা করা হয়। কিন্তু এই তুলনার দ্বারা কোন অবতারকেই ছোট করা হয় না। তাঁরা একই অখণ্ড পরম সত্তার প্রকাশ—'কলা' বা 'অংশ' বা 'পূর্ণ'। সুতরাং দিব্যভাবে সকলেই সমান। লৌকিক দৃষ্টিতে বিচার করেই স্বামীজী তাঁকে 'অবতারবরিষ্ঠ' বলেছেন। ইতিহাসের বিচারে প্রভাবের ব্যাপকতার দৃষ্টিতে দেখলে শ্রীরামকৃষ্ণ যে অপরাপর অবতারদের অতিক্রম করে গিয়েছেন সেবিষয়ে তো কোন সন্দেহ নেই।* ❑

---

* গত ২৮-২৯ নভেম্বর ১৯৮৭ বিশাখাপত্তনম রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ভক্তসঙ্গে পূজ্যপাদ মহারাজজীর ইংরেজীতে আলোচিত সৎপ্রসঙ্গের বাঙলায় অনূদিত নির্বাচিত অংশ।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

'কথামৃত'র বাইরে 'কথামৃত'র 'উত্তর বিভাগ'

শ্রীম

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-র বাইরে শ্রীম-কথিত আরো কিছু শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। অধুনালুপ্ত দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক পত্র 'নব্যভারত'-এর ২২শ খণ্ডের ২য় ও ৩য় সংখ্যার (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩১১ যুগ্মসংখ্যার) ১২২-১৩১ পৃষ্ঠায় তা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ ১৬.৮.১৮৮৬ কাশীপুর উদ্যানবাটীতে মহাসমাধিতে নরলীলা সংবরণ করেন। সেইসময় যেসকল যুবক তাঁর সেবায় নিরত ছিলেন, তাঁরা অবর্ণনীয় শোকে মুহ্যমান হন। শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর সেইসব ত্যাগী যুবক ভক্তগণের খোঁজ নিতেন এবং তাঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশতেন। তখনকার ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ বিবরণ শ্রীম তাঁর তদানীন্তন দিনলিপিতে রক্ষা করতেন। সেই সময়কার মাত্র তেরদিনের দিনলিপি অবলম্বনে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'র 'উত্তর বিভাগ' তৎকালীন একাধিক সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আবার শ্রীম যখন পুস্তকাকারে 'কথামৃত' প্রকাশ করেন, তখন তা থেকে মাত্র নয়দিনের বিবরণ 'কথামৃত'-এর ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ ভাগে স্থান পায়। অবশিষ্ট চারদিনের বিবরণ 'কথামৃত'-এ অগ্রথিত থেকে যায়। হয়তো ঐগুলিকে তিনি 'কথামৃত'-এর ৫ম ভাগে গ্রথিত করতেন। কিন্তু ৫ম ভাগ প্রকাশের পূর্বেই তাঁর দেহত্যাগ হয়। ৫ম ভাগ যখন যন্ত্রস্থ, তখন তিনি কেবল কয়েক ফর্মা প্রুফ দেখে যেতে পেরেছিলেন।

প্রসঙ্গত, বৈরাগ্য ও সাধন অবস্থায় নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর গুরুভাইদের প্রথম আশ্রয়স্থল ছিল বরাহনগরের প্রামাণিক ঘাট রোডে মুনশিদের পোড়ো বাড়ি—যার স্থিতিকাল অক্টোবর ১৮৮৬ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৮৯২ পর্যন্ত।

'কথামৃত'-এ যে নয়দিনের দিনলিপি প্রকাশিত হয়েছিল, তা নিম্নরূপ ঃ—

ভাগ	প্রথম প্রকাশ	গ্রথিত দিনলিপি
১ম	১৯০২	১০.৫.১৮৮৭, ৯.৫.১৮৮৭
২য়	১৯০৪	৮.৫.১৮৮৭, ৭.৫.১৮৮৭
৩য়	১৯০৮	৯.৪.১৮৮৭, ৮.৪.১৮৮৭, ২৫.৩.১৮৮৭
৪র্থ	১৯১০	২২.২.১৮৮৭, ২১.২.১৮৮৭

কিন্তু 'কথামৃত'-এর ৫ম ভাগের পরিশিষ্টে বরাহনগর মঠের কোন দিনলিপির বিবরণ নেই। মনে হয়, শ্রীম-র অবর্তমান হেতু ১৭.২.১৮৮৭, [১২.]১০.১৮৮৬, ২.৯.১৮৮৬ এবং ২৫.৮.১৮৮৬ তারিখের দিনলিপিগুলির সন্ধান না পাওয়ায় ৫ম ভাগে গ্রথিত হয়নি। নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর গুরুভাইদের বৈরাগ্য ও সাধনাবস্থার কথা শ্রীম শেষেরটি আগে এবং আগেরটি পরে উপহার দিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের স্বধামে গমনের পর তাঁর ত্যাগী যুবক ভক্তগোষ্ঠীর অবর্ণনীয় শোকগাথা এগুলিতে পাই। দ্বিতীয়ত, এতে পাই প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ—বরাহনগর মঠে ত্যাগী যুবক ভক্তবৃন্দের জীবনচর্যার কথা। তৃতীয়ত, ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১২ অক্টোবর বরাহনগর মঠ প্রবর্তনের প্রথম বিবরণও এতে পাই। বাঙলা তারিখ ছিল ২৭ আশ্বিন ১২৯৩, মঙ্গলবার। সেদিন ছিল কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা।

১২ অক্টোবর ১৮৮৬ এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭-এর বিবরণ 'উদ্বোধন'-এর গত কার্তিক ও ফাল্গুন ১৪০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এবার (চৈত্র ১৪০৭ সংখ্যায়) অবশিষ্ট ২৫ আগস্ট এবং ২ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬ তারিখের বিবরণ [যা 'নব্যভারত'-এর ২২শ খণ্ডের ২য় ও ৩য় সংখ্যার (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩১১ যুগ্মসংখ্যার) ১২২-১২৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল] উপস্থাপিত হলো। এই দুদিনের বিবরণ প্রাক্-বরাহনগর মঠ পর্বের। 'নব্যভারত' পত্রিকা থেকে 'কথামৃত'র 'উত্তর বিভাগ'-এর বিবরণগুলি সংগ্রহ করেছেন সন্তোষকুমার দত্ত।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

শ্রীম-কথিত

উত্তর বিভাগ—প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) ও তাঁহার গুরুভাইদের বৈরাগ্য ও সাধনাবস্থা

আজ ২৫শে আগস্ট, ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সবে দশদিন ভক্তদের রাখিয়া স্বধামে গমন করিয়াছেন।

কলিকাতা বসুপাড়ায় বলরামের বাড়ির বৈঠকখানায় নরেন্দ্রাদি ভক্তেরা আসিয়াছেন। যেন মাতৃহীন বালকেরা। তাঁহাদের দেখিলে ঠাকুরের অদর্শনজনিত শোকসাগর যেন উথলিয়া উঠে। সকলে ভাবিতেছেন, ঠাকুর স্বধামে

গেলেন, আমরা এখন কি করি? ভক্তদের এমন কোন স্থান নাই যে, কয়টি একসঙ্গে থাকেন। রোজ নিজের নিজের বাড়িতে যাইতে হইতেছে। ছোড়ভঙ্গ হইবার উপক্রম হইয়াছেন। কেননা মণির হারের সূত্র খুলিয়া গিয়াছে। সবে দশদিন তিনি অদর্শন হইয়াছেন। আমরা কোথায় যাই, কি করি—তাঁহারা সর্বদা এই ভাবিতেছেন। আর বিরলে বসিয়া তাঁহার চিন্তা আর অশ্রুবিসর্জন।

নরেন্দ্র, রাখাল, কালী, শরৎ, শশী, তারক, গোপাল, ভবনাথ, মাস্টার আসিয়াছেন। পরে নিরঞ্জনও আসিলেন।

সকলেই নরেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া আছেন। নরেন্দ্র কয়েকটি ভাইকে বৃন্দাবনে পাঠাইবেন। ভক্তদের কাছে টাকা জোগাড় করিতেছেন।

*

[নরেন্দ্র ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের আদেশ—কামিনীকাঞ্চন-ত্যাগ।]

নরেন্দ্র এইবার কয়েকটি ভাই সঙ্গে করিয়া নিকটবর্তী গিরিশের বাড়ি যাইতেছেন। পথে মাস্টারের সহিত কথা কহিতে কহিতে যাইতেছেন।

নরেন্দ্র। মাস্টার মহাশয়, আপনি বাবুরামের এক পিঠের ভাড়া দিন।

মাস্টার। আচ্ছা।

নরেন্দ্র। এক্ষণই।

মাস্টার। এক্ষণই?

যে-কয়টি ভাইকে বৃন্দাবনে পাঠাইবেন স্থির করিয়াছেন, বাবুরাম তাঁহাদের ভিতর একজন। ভক্তেরা গিরিশের বৈঠকখানায় আসিয়া পৌঁছিলেন। গিরিশকেও টাকার কথা বলিলেন।

গিরিশ। আমার কাছে এখন তত নাই। যদি চাও ১০। ১১ টাকা দিতে পারি। এরা বৃন্দাবনে যাচ্ছে কেন?

নরেন্দ্র (গম্ভীরভাবে)। তিনি বলে গেছেন, কামিনী-কাঞ্চনত্যাগ করতে।

একজন ভক্ত। তুমিও কি যাবে?

নরেন্দ্র। সকলেই বেরিয়ে পড়া যাক। আমার একটু বাড়ির কাজ আছে বটে। মকদ্দমাটা এখনও চোকে নাই। (ঈষৎ চিন্তা করিয়া) আর মকদ্দমা যা হয় হউক। কিছুই তো বোঝা গেল না। কেন আর ওসব মিছে করা।

রাখাল। আর এখানে থাকলেই সংসার টানে।

নরেন্দ্রের পিতার কাল হইয়াছে ও ছোট ছোট ভাই-ভগিনীরা আছে—অভিভাবক আর কেহ নাই, আর ভরণ-পোষণের কোন উপায় নাই। নরেন্দ্র বি. এ. পাশ করিয়াছেন। তিনি মনে করিলে তাহাদের ভরণ-পোষণ করিতে পারেন। রাখালের বাড়িতে পিতা, পরিবার ও শিশু সন্তান আছে।

কাঁকুড়গাছির বাগানের কথা হইতে লাগিল, বাগানের trustee নিযুক্ত হইবে।

রাখাল। নরেন্দ্রকে trustee করলে আমরা সকলে সন্তুষ্ট হই।

নরেন্দ্র। না না; কি হবে?

সকলে নরেন্দ্রকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি গিরিশকে বলিলেন, "আচ্ছা তবে তাই করবেন।" নরেন্দ্র কিন্তু নিযুক্ত হন নাই।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের অদর্শনে ভক্তদের শোক।

গিরিশের ঘরে মণি আর একটি ভক্তের কথা হইতেছে।

ভক্তটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন, "তাঁর কাছে আর কিছু প্রার্থনা করব না।"

মণি। কোন বিষয়ে না?

ভক্ত। না, কোন বিষয়ে আর প্রার্থনা করব না। ভক্তির জন্যও না; সংসারের জন্যও না।

এই বলিয়া ভক্তটি আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন।

ভক্ত। তিনি বলেছিলেন, এত দুধ কেন? তারা সংসারী; পারবে কেন? এ কষ্ট কখনো মন থেকে যাবে না।

কাশীপুরের বাগানে গৃহস্থ ভক্তরা ঠাকুরের সেবার্থ খরচ দিতেন। ঠাকুর সর্বদা দেখতেন, যাতে তাদের বেশি খরচ না হয়।

ভক্ত। ইচ্ছা ছিল, একটি ডাক্তার সর্বদা [তাঁর] কাছে রাখবার বন্দোবস্ত হয়। তা তো পারলাম না।

ভক্তটি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। আবার বলিতেছেন—"আচ্ছা তাঁর নাম করে আমি কি সংসারের উন্নতির চেষ্টা করি? আমি কি চাচ্ছি যে, লোকে আমায় ভাল বলবে, ধার্মিক বলবে?"

*

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৃহস্পতিবার, ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ।

শশী মাস্টারের কাছে আসিয়াছেন। মাস্টার কলিকাতায় গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেনে একটি বাসার ঘরে পড়িবার আড্ডা করিয়াছেন। সেই ঘরে তক্তপোশের উপর দুইজনে বসিয়া আছেন। শশী ও শরৎ তাঁহাদের পটলডাঙ্গার বাড়িতে থাকেন। আজ শশী খুব ফরসা কাপড়, জামা ও চাদর পরিয়া আসিয়াছেন। হাতে একটি নূতন ছাতি। দুইজনে ঠাকুরের গল্প করিতে লাগিলেন।

মাস্টার। ঠাকুর আমাকেও বলেছিলেন, এখানকার মধ্যে নরেন্দ্র প্রধান।

শশী। নরেন্দ্র আমাদের leader হবে—একথা গুরু মহারাজ বলেছেন, আমার বেশ মনে আছে।

মাস্টার। আর লেখাপড়ার কথা কি বলেছিলেন, মনে আছে?

শশী (সহাস্যে)। বেশ মনে আছে। একদিন নরেন্দ্রকে বলেছিলেন, এদের লেখাপড়া করতে দিসনে।

মাস্টার। আর কালীকে?

শশী। হাঁ, বকেছিলেন। বলেছিলেন, তুই তো এখানে লেখাপড়া ঢোকালি।

আমি পারসী পড়তে আরম্ভ করেছিলাম। পারসী পড়াতে আমাকে বকেছিলেন।

পরে শরতের সঙ্গে কথা হইতে লাগিল। ঠাকুর রামকৃষ্ণের নাম কবে প্রচার হইবে? কে প্রথম প্রচার করিবে?

মাস্টার। তাঁর ভাব কে বুঝেছে! আচ্ছা বৈষ্ণবচরণের পুঁথির কথা তিনি কি বলতেন মনে পড়ে?

শরৎ। হাঁ মনে পড়ছে, তিনি বলেছিলেন—"বৈষ্ণবচরণ আমার সব অবস্থা জানত।" মনে করেছিলাম, সেই প্রথম প্রচার করবে।

নরেন্দ্র। ...আমায় তিনি বলেছেন—"ব্রহ্মজ্ঞানই ঠিক। এই [বৈষ্ণবচরণ] প্রথম প্রচার করবে।" তা হলো না। কেশব সেন প্রথম প্রচার করলে। ❑

PHONES PBX 654-1144/1180 654-9581/9681 654-5391/8494 654-5700/5701 654-5702/5703
FAX : 654-4346
E-Mail : rkmhqbm@cal.vsnl.net.in



রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক
গুজরাট ভূকম্প-ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্য
একটি আবেদন

RAMAKRISHNA MISSION
P.O. BELUR MATH
DIST. HOWRAH
WEST BENGAL : 711 202

বিগত ২৬ জানুয়ারি ২০০১-এ গুজরাটে বিধ্বংসী ভূকম্পে যে ধ্বংস, ক্ষয়ক্ষতি ও জীবনহানি ঘটেছে তা অবর্ণনীয়। এই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষদের মধ্যে রামকৃষ্ণ মিশন প্রথম দিন থেকেই বৃহদাকারে প্রাথমিক ত্রাণকার্য শুরু করেছে।

রামকৃষ্ণ মিশনের রাজকোট, পোরবন্দর ও লিমডি কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে কচ্ছ, রাজকোট, জামনগর, পোরবন্দর ও সুরেন্দ্রনগর জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামের হাজার হাজার ভূকম্প-ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের মধ্যে রান্নাকরা খাবার, খাবারের প্যাকেট, খাদ্যশস্য, পানীয় জল, তাপলিন, কম্বল, কাপড়, রক্তের বোতল, জ্বালানি কাঠ ইত্যাদি বিতরণ করা হচ্ছে। ভুজে একটি চিকিৎসাকেন্দ্রও খোলা হয়েছে।

প্রাথমিক ত্রাণকার্যের জন্য ইতিমধ্যেই এক কোটি টাকারও বেশি খরচ করা হয়েছে।

একটি পুনর্বাসন প্রকল্প শুরু করার প্রচেষ্টা চলেছে। প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য প্রাপ্তির ওপর নির্ভর করে কচ্ছ, রাজকোট ও পোরবন্দর জেলার সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলিতে ছয়টি উপনগরী তৈরির কথা ভাবা হচ্ছে। এই প্রকল্পের জন্য মোট খরচ দশ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে।

আমাদের গুজরাট ভূকম্প ত্রাণকার্যের সর্বশেষ খবর জানার জন্য নিম্নের ওয়েবসাইট দেখুন—

<http://www.sriramakrishna.org/gujarat.htm>

কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশিত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০১ তারিখের সরকারি ইস্তাহার (Gazette)-এর অধিসূচনা অনুযায়ী আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০১ পর্যন্ত গুজরাট ভূকম্প ত্রাণকার্যের জন্য 'রামকৃষ্ণ মিশনকে' প্রদত্ত সকল অনুদান ভারতীয় আয়কর আইনের ৮০জি(২) ধারা অনুযায়ী ১০০ শতাংশে আয়করমুক্ত থাকবে।

আমরা সর্বস্তরের মানুষের নিকট উদারহস্তে অনুদানের জন্য আবেদন জানাই। নগদ, মানি অর্ডার, চেক বা ড্রাফটের মাধ্যমে অনুদান **'RAMAKRISHNA MISSION'** এই নামে গুজরাট ভূকম্পের জন্য উল্লেখপূর্বক এই ঠিকানায় পাঠাতে পারেন—সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া, পিন ঃ ৭১১২০২।

তারিখ ঃ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০১
বেলুড় মঠ, হাওড়া

স্বামী স্মরণানন্দ
সাধারণ সম্পাদক

চৈত্র ১৩০৭/মার্চ ১৯০১

শ্রীরামকৃষ্ণ মহোৎসব

প্রেরিত পত্র

মান্দ্রাজ

মান্দ্রাজ মহোৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তিথিপূজার দিন সমস্ত দিন ধরিয়া পূজা হয়; পরে রাত্রি বারটার সময় হোম সমাপন করিয়া কর্ম্ম সাঙ্গ করা হয়। সে দিবস প্রায় তিনশত ভদ্রলোক প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রবিবার মহোৎসবের দিন পঞ্চাশ মনেরও অধিক চাল রন্ধন করা হয় এবং ছয় সহস্রেরও অধিক কাঙ্গালি প্রসাদ পায়। অপরাহ্নের সময় এত অধিক ভিড় হইয়াছিল যে আর বসিয়া খাওয়ানো সুবিধা হইল না। তখন ভাত, ডাল, কড়ম্বু প্রভৃতি একসঙ্গে মাখিয়া তাল তাল করিয়া দেওয়া হইতে লাগিল। মান্দ্রাজের অনেক ভদ্রলোক সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পরিবেশন করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এদিকে ভদ্রলোকদের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। প্রায় ৫০০ ভদ্রলোক প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। জলখাবারের মধ্যে ফলই সমস্ত, আর মিছিরি। শ্রীশ্রীপরমহংস মহারাজের শ্রীবিগ্রহ একটি বিমানের মধ্যে বিরাজ করিতেছিলেন। নানাবিধ কুসুমমালায় ও কদলীবৃক্ষে সুসজ্জিত হইয়া বিমানটি পরম রমণীয় হইয়াছিল। তাহারই সম্মুখে সঙ্কীর্ত্তন হইতে লাগিল। সঙ্কীর্ত্তনের পর প্রসাদ গ্রহণ, পরে অপরাহ্ণ চারিটার পর, মহাত্মা আত্মারাম স্বামী (জনৈক পরমত্যাগী) তামিল ভাষায় ভক্তি সম্বন্ধে প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করিয়া সকলকে সাতিশয় প্রীতি দিয়াছিলেন। পরে শ্রীশ্রীপরমহংস মহারাজ কিসের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই সম্বন্ধে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কিছু বলিয়াছিলেন। তাহার পর Mr. Drew রামকৃষ্ণ মিশনের উপর বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কিছুক্ষণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। পরে এখানকার হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত সুন্দররাম আয়ার কিছুক্ষণ বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন যে যদিও ভারতবর্ষ অন্য সকল বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইহা যে জগতের শিক্ষক, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। হিন্দুধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক এবং সনাতন। তাঁহার পরে গৃহস্বামী মহাত্মা বিলিগিরি আয়েঙ্গার সকলকে ধন্যবাদ দিয়া সভার কার্য্য শেষ করিলেন।

চেঙ্গটীয়া

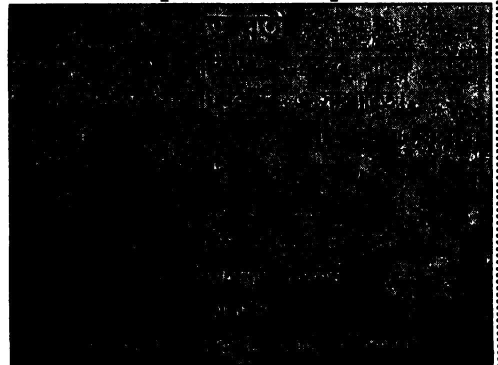
বিগত ২১শে ফাল্গুন, মঙ্গলবার, ১৩০৭, যশোহরের অন্তর্গত চেঙ্গটীয়া ধর্ম্মাশ্রমে ষষ্ঠবার্ষিক রামকৃষ্ণোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ উপলক্ষে তথায় কীর্ত্তন বক্তৃতা ও প্রসাদ বিতরণ হইয়াছিল। প্রায় ৪০০ লোক সমাগত হইয়াছিলেন।

পাঁচকথা

[সম্পাদক—স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ]

"চোর" "চোর"। আমি, আমার কয়েকটি বন্ধু ও একজন হিন্দুস্থানী চাকর উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বেড়াবার কালে এক রাত আম্বালায় কোনও ভদ্রলোকের বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম। গরম কাল; রাত প্রায় ১টা; আমি এক ঘরে শুয়ে আছি ও পাশের ঘরে আমার বন্ধু কয়জন এবং বারাণ্ডায় হিন্দুস্থানী চাকরটি শুইয়া আছে। গরমে আমার ঘুম হচ্ছে না; আর সকলেই নিদ্রিত। এক বুড়ো কুলী, আমার ঘরে একখানা টানা পাখা ছিল, সেখানা আস্তে আস্তে টানছে। বুড়ো মানুষ, পাখা টানতে টানতে ঘুমের ঘোরে একবারে দুম্ করে বারাণ্ডার উপর পড়ে গেছে। যেই দুম্ করে পড়ে গেল, আর বাড়ির মধ্যে এক মহা কোলাহল উঠলো। যাঁরা ঘুমুচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন "চোর, চোর" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। অমনি আর একজন আরও উচ্চৈঃস্বরে "চোর, চোর" বলে চীৎকারে যোগ দিলেন। হিন্দুস্থানী চাকরটি একেবারে বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে, লাঠি ঘোরাতে ঘোরাতে বাড়ির চারদিকে "চোর, চোর" বলে চক্কর দিতে লাগলো। আমি তাড়াতাড়ি উঠে বোঝাতে গেলাম, "ওরে, ভয় নেই, পাখাওয়ালা পড়ে গেছে।" পাখাওয়ালা বলতে লাগলো, "বাবু, ভয় নেই, ভয় নেই, আমি, আমি।" কে কার কথা শোনে? "চোর, চোর"—মহা হুলস্থূল উঠলো। শেষে, আলো জ্বেলে, হিন্দুস্থানী চাকরটিকে কান ধরে বসাই, তবে সব ঠাণ্ডা হয়। ভগবান সম্বন্ধে যত তর্কবিচার বাক্‌বিতণ্ডা দলাদলি হয়, সে সব অন্ধকারে এইরকম "চোর চোর" বলে চেঁচানো নয় কি?

[একটি বিজ্ঞাপন]



মাতৃবন্দনা

রাসবিহারী গোস্বামী

এই স্মৃতিকথাটি মায়ের শিষ্য ও ভক্ত আরামবাগ-নিবাসী ডাক্তার প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ের বন্ধু রাসবিহারী গোস্বামীর। তাঁর নিবাস আরামবাগের নিকটবর্তী বসন্তপুর গ্রামে। তিনি আরামবাগ উচ্চ বিদ্যালয়ের সংস্কৃতের শিক্ষক ছিলেন। শ্রীশ্রীমার দর্শনধন্য এবং স্বামী সারদানন্দজীর দীক্ষিত রাসবিহারী গোস্বামী ১৯৩৮ সালে ৩৯ বছর বয়সে প্রয়াত হন। তাঁর মৃত্যুর ৬০ বছর পর তাঁর অপ্রকাশিত মাতৃস্মৃতিটি গত ৮ জুন ১৯৯৮ উদ্ধার করেছেন অধ্যাপক তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

পরমারাধ্যা মাতাঠাকুরানীকে প্রথম দর্শনলাভের সুযোগ হয়েছিল বাগবাজারে। তখন আমি কলকাতায় থাকি। সংস্কৃত কলেজে পড়ি। আমার বন্ধু প্রভাকর মুখোপাধ্যায়ও তখন কলকাতায় ডাক্তারি পড়ছিল। তার কাছেই প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুর ও মাতাঠাকুরানীর কথা শুনি। তার সঙ্গেই বাগবাজারে মাতাঠাকুরানীকে প্রথম দর্শন করার সৌভাগ্য হয়। দ্বিতীয়বার, ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে, তাঁকে দর্শনলাভের সুযোগ হয়েছিল জয়রামবাটীতে এবং সেই দর্শনেও আমার ডাক্তার-বন্ধু প্রভাকর মুখোপাধ্যায় আমার সঙ্গী, সহযোগী ও পথপ্রদর্শক হিসাবে ছিল। সে-দর্শনের সঙ্গে একটি বিশেষ ঘটনা জড়িয়ে আছে এবং সেটি আমার জীবনে ঠাকুর ও মাতাঠাকুরানীর বিশেষ কৃপা বলেই মনে করি।

সেবার দর্শন দুর্গাপূজার সময়। সাধারণত পূজার সময় বাইরে কোথাও থাকি না; বাইরে থাকতে ইচ্ছাও হয় না। পূজার কয়দিন সকালে গ্রামের দুর্গামণ্ডপে চণ্ডীপাঠে ব্যস্ত থাকতে হয়। গ্রাম ষোলআনার যেমন এতে আগ্রহ, আমি নিজেও এই কাজে ব্রতী হতে পেরে খুব খুশি হই। সেবছরও যথারীতি পূজার ষষ্ঠী ও সপ্তমীর দিন পূজামণ্ডপে চণ্ডীপাঠ করি। সপ্তমী পূজার দিন সর্বক্ষণ পূজামণ্ডপে অতি ব্যস্ততায় থাকি। পূজা সারা হলে ঘরে ফিরি। সেই রাত্রে এক বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখি। দেখি যে, গ্রামের দেবীপ্রতিমায় সন্ধিক্ষণের পূজায় পুরোহিতের আসনে বসে দেবীবন্দনায় নিয়োজিত হয়েছি। পূজা সেরে দেবীকে আরতি করতে উঠলাম। একে একে সমস্ত উপচার দিয়ে দেবীকে আরতি করলাম। সেই আরতির মুহূর্তে আমার সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ-শিহরণ হচ্ছিল। শেষে চামর দিয়ে দেবীকে আরতি করলাম; তখনো চামরব্যজনে রত, হঠাৎ কানে এক ক্ষীণ শব্দ ভেসে এল; দর্শকদের মধ্যে কে যেন বলছেঃ "ও পণ্ডিতমশাই, দেবীকে বস্ত্র দিয়ে আরতি করলেন না? এ কী কাণ্ড!" আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। ভাবলাম, এ কী মহাভ্রান্তি ঘটেছে! আমি আর স্মরণ করতে পারলাম না যে, বস্ত্র দিয়ে আরতি করেছিলাম কিনা; অস্থির যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলাম। এমন সময় ঘুম ভেঙে গেল। সে-রাত্রে আর ঘুমোতে পারলাম না। মনে মনে ভাবলাম, চণ্ডীপাঠে কি কিছু ত্রুটি হয়েছে? নইলে এমন স্বপ্নই বা কেন দেখলাম? এমন সময় মনে পড়ল বন্ধুবর প্রভাকরের কথা। কয়েকদিন আগে কথাপ্রসঙ্গে সে বলেছিল যে, সে জয়রামবাটী গিয়েছিল মাতাঠাকুরানীর সঙ্গে দেখা করতে। সে বলেছিল, শরীর ভাল না থাকায় মা এবছর কলকাতা যাননি। পূজায় জয়রামবাটীতেই আছেন। আমার মনে হলো, আগামীকাল শুভ সন্ধিক্ষণের মহাপূজা। ঐ বিশেষ মুহূর্তে মাতাঠাকুরানীকে দর্শন করে যদি প্রণাম নিবেদন করি, তাহলে অনিচ্ছাকৃত কিছু ভ্রান্তি ঘটলেও তার মাফ হয়ে যাবে। সন্ধিপূজায় মৃন্ময়ীমূর্তি দর্শন অপেক্ষা চিন্ময়ীমূর্তি দর্শনই শ্রেষ্ঠ বলে মনে হতে লাগল।

সকালে উঠেই আরামবাগ যাত্রা করলাম। আমাদের বাড়ি আরামবাগের নিকটেই। প্রভাকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে স্বপ্নবৃত্তান্ত জানালাম। সেইসঙ্গে আমার মাতৃদর্শনের অভিলাষও ব্যক্ত করলাম। মাতৃদর্শনে জয়রামবাটী যাত্রায় তাকে সঙ্গী হতে অনুরোধ জানালাম। সে তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানাল। কিছুক্ষণ পর আমি আরামবাগ থেকে মাতাঠাকুরানীর জন্য একটি লালপাড় শাড়ি, কিছু ফল ও মিষ্টি কিনে প্রভাকরের নিকট হাজির হলাম। তারপর দুজনে ঝুমঝুমি (দ্বারকেশ্বর) নদী পেরিয়ে কালীপুরে এসে একটি গরুর গাড়ি ভাড়া করে জয়রামবাটী অভিমুখে রওনা দিলাম। আমরা দুপুর দেড়টা-দুটো নাগাদ জয়রামবাটী পৌঁছালাম। জয়রামবাটীতে আমাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল বরদা মহারাজের (স্বামী ঈশানানন্দ)। তিনি প্রভাকরের খুব পরিচিত। আমাদের হাতে নতুন কাপড়, ফল, মিষ্টি দেখে তিনি খুব খুশি হলেন এবং বললেনঃ "ভায়া, ভালই করেছ! আজ খুব ভাল দিন। শুভক্ষণেই এসেছ! সন্ধিপূজায় জীবন্ত মহামায়াকেই আরাধনা করবে।" এই বলেই তিনি আমাদের কাছ থেকে কাপড়, ফল ইত্যাদি নিয়ে রেখে এলেন। ফিরে এসে বললেনঃ "একটু ধৈর্য ধর। সন্ধিপূজার আরো একটু বাকি। আমরা ঠিক সময় মায়ের চরণ বন্দনা করব।"

বরদা মহারাজের কথায় যারপরনাই খুশিতে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলাম। পরে মহারাজের কাছে জানতে পারলাম যে, জয়রামবাটীতে তখন কোন দুর্গাপূজা হয় না। দুর্গাপূজা হয় জিবটা, শিহর, কামারপুকুর, আনুড়, কোতুলপুরে। সেবছর জয়রামবাটীতে মায়ের সেবায় নিযুক্ত মহারাজদের ইচ্ছা হয়েছিল দুর্গাপূজার দিনগুলিতে মাকে দেবীজ্ঞানে পূজা করার। কিশোরী মহারাজ (স্বামী পরমেশ্বরানন্দ) তাঁদের নিষেধ করেছিলেন, কারণ মায়ের শরীর তখন ভাল যাচ্ছিল না। সকলের অনুরোধে তিনি বলেছিলেন, সন্ধিপূজার মুহূর্তে মার পায়ে পদ্মফুল দিয়ে প্রণাম জানাতে। বরদা মহারাজের

খুব সখ ছিল নানা উপচারে সন্ধিপূজার সময় মায়ের পূজা করার। সেইমত তিনি পূজার সমস্ত আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু মাকে সে-ব্যাপারে কিছু জানাননি।

সে-বছর সন্ধিক্ষণের মুহূর্ত ছিল বিকাল তিন ঘটিকায়। সেবকগণ সুযোগ খুঁজছিলেন, কিভাবে তাঁরা মাকে ফাঁকা পাবেন। আয়োজন সম্পূর্ণ। সারা দুপুর ধরে তাঁরা লাল ও সাদা পদ্ম তুলে এনে জমা করে রেখেছেন। কামারপুকুর থেকে মার পছন্দমতো মিষ্টি আনানো হয়েছে। চন্দন, বেলপাতা—সবই যোগাড় করা হয়েছে। আমের শাখা ও কলসও মহারাজ আনিয়েছেন। ছিল না কেবল একটি নতুন বস্ত্র। যাঁকে সে-দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তিনি তখনো এসে পৌঁছাননি। কাপড়টি ঠিক সময়ে এসে না পৌঁছানোর জন্য তিনি খুবই চিন্তান্বিত ছিলেন। সেই কারণে আমাদের আগমন ও হাতে নতুন বস্ত্র দেখে তিনি খুবই উৎফুল্ল হলেন।

যাই হোক, সমস্ত ব্যাপার জেনে ভাবলাম, মাতাঠাকুরানী কৃপা করেই মহামুহূর্তে নিজের কাছে টেনে এনেছেন। সেই মহামুহূর্ত এসে গেল। মাতাঠাকুরানীর সেবকবৃন্দ ও আমরা মিলে সাত-আটজনের মতো ছিলাম। মাতাঠাকুরানী তাঁর ঘরের তক্তপোশে পা ঝুলিয়ে বসেছিলেন। বরদা মহারাজ ফুলের ঝুড়ি নিয়ে আগে ঢুকলেন। পিছনে পিছনে কিশোরী মহারাজ ও অন্যান্যরা। আমি শেষে ঢুকলাম। বরদা মহারাজ মাতাঠাকুরানীর সামনে ফুল, চন্দন, বেলপাতা, কাপড়, ফল, মিষ্টি দুটি থালায় সাজালেন। এক ব্রহ্মচারী প্রদীপ জ্বালালেন ও ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো সব দেখতে লাগলাম। মার ঘরটি মুহূর্তে যেন পূজামণ্ডপের রূপ নিল, আর তাঁর তক্তপোশ হয়ে উঠল দেবীর পূজাবেদি। সেখানে বসে রয়েছেন সাক্ষাৎ জগজ্জননী মহামায়া। আমার কাপড়খানি নৈবেদ্যের থালায় দেখতে পেয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে হলো। এরপর বরদা মহারাজ কিশোরী মহারাজকে অনুরোধ করলেন মার চরণবন্দনা শুরু করতে। শুরু হলো লাল পদ্মফুল দিয়ে। একে একে আমরা সকলে মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে প্রণাম করলাম। মাতাঠাকুরানী সহাস্যবদনে আমাদের পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করে আশীর্বাদ জানালেন। তখন তাঁর যে-মূর্তি দেখেছিলাম তা ভোলার নয়। তাঁকে তখন আর মানবী বলে মনে হচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল সাক্ষাৎ দেবী মহামায়া ভাবসমাহিতা হয়ে বসে রয়েছেন। তাঁর মহাভাব প্রত্যক্ষ করে ধন্য হলাম। মনে হলো, বহু জন্মের সুকৃতির ফলে এ-দৃশ্য দর্শনের সুযোগ পেলাম। মাতাঠাকুরানীর মহাভাবের সেই স্মরণীয় মুহূর্তে সকল সেবক ও অন্যান্য ভক্তগণ দেবীবন্দনা শুরু করলেন।

স্তব ও প্রণাম সম্পূর্ণ হলে জগজ্জননী চোখ খুললেন এবং বললেন ঃ "আরো ফুল আন; রাখাল, তারক, শরৎ, খোকা, হরিপ্রসন্ন, গঙ্গাধর, কালী, মাস্টারমশায়, যোগেন, গোলাপ—এদের নাম করে করে ফুল দাও। আমার জানা-অজানা সকল ছেলেমেয়েরা যে যেখানে আছে, সকলের হয়ে ফুল দাও।"

তখন বরদা মহারাজ দুহাত দিয়ে অঞ্জলি ভরে ফুল দিতে থাকলেন মাতাঠাকুরানীর শ্রীচরণে। তিনি হাতজোড় করে ঠাকুরের দিকে চেয়ে বললেন ঃ "ঠাকুর, সকলের ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল হোক। তুমি সকলকে দেখো।"

সেদিনের স্মৃতি এবং মাতাঠাকুরানীর সেই মূর্তি আমার মনে এখনো অমলিন। তাঁর কথাগুলি আমার কানে এখনো বাজছে। ❑

অনুষ্ঠান-সূচী (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮)

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

জন্মতিথি-কৃত্য

শ্রীশঙ্করাচার্য	বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী	১৫ বৈশাখ	শনিবার	২৮ এপ্রিল	২০০১
শ্রীবুদ্ধদেব	বৈশাখ পূর্ণিমা	২৪ বৈশাখ	সোমবার	৭ মে	২০০১

পূজাতিথি-কৃত্য

শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা	বৈশাখ অমাবস্যা	৮ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	২২ মে	২০০১
স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	২৩ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	৬ জুন	২০০১

একাদশী-তিথি (রামনাম-সঙ্কীর্তন)

৬, ২০ বৈশাখ	বৃহস্পতিবার,	বৃহস্পতিবার	১৯ এপ্রিল,	৩ মে	২০০১
৫, ১৯ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার,	শনিবার	১৯ মে,	২ জুন	২০০১

চিরন্তনী

রাজা হরিশ্চন্দ্র (১৪)

কিশোর-কিশোরীদের জন্য

চিত্র ঃ দাশগুপ্ত

শৈব্যার কান্না শুনে হরিশ্চন্দ্র চমকে উঠলেন। এ কণ্ঠস্বর যে তাঁর অতি পরিচিত! এই অন্ধকার রাত্রে তাঁর নাম ধরে ডাকছে, কে এই রমণী? চণ্ডালবেশী হরিশ্চন্দ্র তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলেন ঃ "কে তুমি? তোমার কোন সঙ্গী-সাথী নেই? একা কেন এসেছ এই মৃত বালককে সঙ্গে করে? বালকটি কি তোমার পুত্র?" হরিশ্চন্দ্রের কণ্ঠস্বর চিনতে রানীর দেরি হলো না। তিনি স্থান-কাল ভুলে, কান্না ভুলে চোখ তুলে তাকালেন। সামনে দাঁড়িয়ে চণ্ডালবেশী রাজা হরিশ্চন্দ্র।



দুজনে দুজনকে চিনতে পারলেন। আর কোন প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দরকার হলো না। হরিশ্চন্দ্র বুঝলেন তাঁদের কোন্ সর্বনাশ উপস্থিত হয়েছে। তাঁদের সর্বস্ব, তাঁদের একমাত্র পুত্র চিরকালের মতো পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে। হাহাকার করে তিনি সেখানেই বসে পড়লেন। দুজনে পাগলের মতো কাঁদতে লাগলেন।





রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। আস্তে আস্তে হরিশ্চন্দ্রের মনে বাস্তব চিন্তা এল। মৃতদেহ সৎকার করতে হবে। মনে হলো—আর বেঁচে থেকে লাভ কি? চিতা রচনা করি, পুত্রের চিতাতেই আমরা দুজনে প্রাণ বিসর্জন দেব। আবার মনে হলো—চণ্ডালের দাস আমি। চণ্ডালের অনুমতি ছাড়া মরতেও তো পারব না। মনে মনে নানা কথা ভাবছেন, আর একটি একটি করে কাঠ নিয়ে তিনি পুত্রের চিতা রচনা করছেন। [ক্রমশ]

প্রসঙ্গ ঃ "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্বানুবৃত্তি]



সেবা-'ধর্মে'র উৎস-চরিত্রদের জীবন থেকে কিছু দৃষ্টান্ত আহরণ করা যাক। প্রথমেই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ।

কাশীপুরের বাগানবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের তখন বাড়াবাড়ি অসুখ। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি তাঁকে দেখতে এসে বললেন, ঠাকুরের ন্যায় সিদ্ধসঙ্কল্প পুরুষ ইচ্ছা করলেই শারীরিক ব্যাধি দূর করতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরে বলেছিলেন ঃ "তুমি পণ্ডিত হয়ে একথা কি করে বললে গো? যে-মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তাকে সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙা হাড়-মাসের খাঁচাটার ওপর দিতে কি আর প্রবৃত্তি হয়?"

শ্রীরামকৃষ্ণ শশধরকে এড়িয়েছিলেন, কিন্তু নরেন্দ্রনাথকে পারেননি। নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ "মাকে বলুন সারিয়ে দিতে, তিনি আপনার কথা শুনবেনই শুনবেন।" এখন, 'নরেন্দর'-এর তাগিদ, ধরা না দিয়ে উপায় নেই। পরবর্তী ঘটনা 'লীলাপ্রসঙ্গ'তে এইপ্রকার ঃ

"কয়েক ঘণ্টা পরে শ্রীযুক্ত স্বামীজী পুনরায় ঠাকুরের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মশায়, বলেছিলেন? মা কি বললেন?'

"ঠাকুর—মাকে বললুম (গলার ক্ষত দেখাইয়া), 'এইটের দরুন কিছু খেতে পারি না। যাতে দুটি খেতে পারি করে দে।' তা মা বললেন—তোদের সকলকে দেখিয়ে, 'কেন? এই যে এত মুখে খাচ্চিস।' আমি আর লজ্জায় কথাটি কইতে পারলুম না।"[২]

স্বামী সারদানন্দ সঙ্গতভাবে ব্যাপারটিকে শ্রীরামকৃষ্ণের 'দেহবুদ্ধির অভাব' এবং 'অপূর্ব অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থান' বলে নির্ণয় করেছেন। ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত সিদ্ধান্ত করেছেন—ঐ অদ্বৈতজ্ঞানই স্বামীজীর সাম্যবাদের উৎস। অবশ্যই সেকথা সত্য। ততোধিক বলা যায়, সেবাধর্মের দিক দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধি দেখিয়ে দিয়েছিল, অদ্বৈতভাবাবিষ্ট তিনি সর্বতোমুখ—সেজন্য সমষ্টির সেবাতেই আত্মসেবা হয়।

শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনে এই সেবা নিরন্তর বহমান, তারই মধ্য থেকে একটি কাহিনী উপস্থিত করা যাক। জয়রামবাটীর কয়েক ক্রোশ ব্যবধানে ময়নাপুর গ্রামে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'র রচয়িতা অক্ষয়কুমার সেনের বাস। সেখান থেকে তিনি এক বয়স্কা বাগদী নারীকে দিয়ে কিছু জিনিস পাঠিয়েছেন মায়ের কাছে। বৃদ্ধা দুপুরে হাজির হয়েছিল। স্নানাহার সারতে তার বেলা হয়ে যায়। মা তাকে রাত্রে থেকে যেতে বললেন। মায়ের শয়নঘরের দরজার সামনে বারান্দায় তার শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তারপর—

"[মেয়েটি] ম্যালেরিয়ার রোগী, অনেক দূর হাঁটিয়া বোঝা বহিয়া আসিয়াছে, বিশেষ ক্লান্ত—রাত্রে আবার একটু জ্বরও হইয়াছে। বেহুঁশের মতো পড়িয়া রহিল। মা ভোররাত্রেই উঠেন—বরাবরের অভ্যাস। আজ দরজা খুলিয়াই বুঝিলেন, মেয়েটি অসাড়ে বিছানা নোংরা করিয়া ফেলিয়াছে। কি উপায়! প্রাতে উঠিয়া অন্যেরা টের পাইলেই তাঁহার দুঃখিনী মেয়ের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার একশেষ হইবে। ভাবিয়া মায়ের চিত্ত ব্যাকুল হইল। মেয়েটি তখনো ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন, মা ধীরে ধীরে তাহাকে জাগাইলেন। মিষ্ট কথায় প্রবোধ দিয়া, চুপি চুপি জলপানির জন্য মুড়ি-গুড় হাতে দিয়া বলিলেন, 'মা, তুমি সকাল সকাল বেরিয়ে গেলে রোদে কষ্ট হবে না।' সে সন্তুষ্টচিত্তে প্রণামান্তর বিদায় নিলে মা স্বহস্তে সব পরিষ্কার করিলেন। গোবর-মাটি দিয়া বারান্দা লেপিলেন, চাটাইখানি ভাল করিয়া ধুইয়া পুকুরের পাড়ে মেলিয়া দিলেন। কেহই কিছু টের পাইল না।"[৩]

না, সকলের চোখ এড়ানো সম্ভব হয়নি। জনৈক প্রৌঢ়া ভক্ত মহিলা পরদিন বারান্দায় কে ন্যাতা দিয়েছে, সন্ধান করে সব জানতে পেরেছিলেন।

ব্রাহ্মণঘরের নিষ্ঠাবতী বিধবা নারী সারদাদেবী জাতিভেদে বিশ্বাসী কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক গ্রাম্য পরিবেশে বাস করছেন, তিনি এক বাগদী নারীর মলমূত্রমাখা বিছানা স্বহস্তে পরিষ্কার করছেন—পরমাশ্চর্য বটে। কিন্তু তার পিছনে কোন্ শক্তি ছিল? অবশ্যই তিনি মাতা এবং উক্ত বাগদিনী তাঁর কন্যা। তদুপরি অসীম প্রেমপারাবার তিনি—যে-প্রেম স্বামীজী-কথিত অদ্বৈতবুদ্ধি থেকেই আসতে পারে। তিনি কি অনুভব করেননি, উক্ত নারী তিনিই—অন্যরূপে!

স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে কার্যরত সাঁওতাল মিতা কেষ্টা ও তাঁর সঙ্গীদের একদিন ভূরিভোজ করিয়ে বলেছিলেন ঃ "তোরা যে নারায়ণ; আজ আমার নারায়ণের ভোজ দেওয়া হলো।"[৪]

স্বামী অখণ্ডানন্দ তখন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ, তবু বহরমপুরের সারগাছি আশ্রম ছেড়ে বেলুড় মঠে আসতে চাইতেন না। তাঁর এক অপূর্ব উক্তি—"এবার প্রভুর আগমন পর্ণকুটীরে।" ঐ অঞ্চলের মহুলা গ্রামেই তাঁর উদ্যোগে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম সংগঠিত সেবাকাজের সূচনা। তিনি মনে করতেন, স্বামীজী তাঁকে সাধারণ মানুষের সেবা করতেই গ্রামে পাঠিয়েছেন।

"অখণ্ডানন্দের মনের অবস্থা এমনই হইয়াছিল যে,

তিনি পথে অন্নবস্ত্রহীন মলিন বালক দেখিলেই তাহাকে সস্নেহে আশ্রমে লইয়া আসিতেন। তাহার গায়ের ধুলা ঝাড়িয়া, তেল মাখাইয়া, সাবান দিয়া গরম জলে স্নান করাইতে করাইতে গভীর ভাবের সহিত নারায়ণের স্নানমন্ত্র 'পুরুষসূক্ত' উচ্চারণ করিতেন :

'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্বতঃ স্পৃষ্ট্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।।' "[৫]

৪

কিন্তু কী কঠিন জীবে সত্যকার ঈশ্বরজ্ঞান। বিদ্যাসাগরের মতো মহাপ্রাণ মানুষকেও জ্বলে-পুড়ে বলতে হয়েছিল—কি বললে, লোকটি আমার নিন্দা করছিল? কৈ, আমি তো তার উপকার করেছি বলে মনে পড়ছে না। বাস্তব জগতে স্বামীজী স্বয়ং কি মানুষের কদর্য চেহারাটা দেখেননি? অবশ্যই দেখেছিলেন এবং তার বিকট রূপ তিনি তুলে ধরেছেন অন্য কোথাও নয়, একেবারে সেই কবিতাটির মধ্যে, যার শেষাংশে আছে সেবাধর্মের গায়ত্রী মন্ত্র—"ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়" ইত্যাদি। ঐ 'সখার প্রতি' কবিতার প্রথমাংশে তিনি 'জীবে প্রেম'-বোধের পরিপন্থী বাস্তব সংসারের চেহারাটা খুলে ধরেছেন। বলেছেন—এই পৃথিবী স্বার্থময়, সে-স্বার্থের রূপ এমনই যে—

"দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলে অনিবার, পিতা পুত্রে নাহি দেয় স্থান।
স্বার্থ স্বার্থ—সদা এই রব, হেথা কোথা শান্তির আকার?"

এহেন সংসারে স্থান পেতে হলে—

"হও জড়প্রায়, অতি নীচ, মুখে মধু, অন্তরে গরল,
সত্যহীন, স্বার্থপরায়ণ—"

পৃথিবীতে উচ্চমনা মানুষের ভাগ্যে কেবল দুঃখ—

"যত উচ্চ তোমার হৃদয়, তত দুঃখ জানিবে নিশ্চয়,
হৃদিবান্ নিঃস্বার্থ প্রেমিক! এ জগতে নাহি তব স্থান।"

দারুণ আঘাতের সম্মুখীন হয়েও মানুষ যদি একটি বিশেষ সত্যকে জীবনময় করে তুলতে পারে, তবেই সে সত্যকার সুখলাভ করতে পারে—

"মন্ত্র-তন্ত্র, প্রাণ-নিয়মন, মতামত, দর্শন-বিজ্ঞান,
ত্যাগ-ভোগ—বুদ্ধির বিভ্রম; প্রেম প্রেম—এইমাত্র ধন।"

সেই বিশেষ সত্য প্রেম আছে বলেই মা ছেলের জন্য প্রাণ দেয়, দস্যু স্ত্রী-পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজনে হরণ বা হনন করে এবং ভয়ার্ত মানুষ 'মৃত্যুরূপা কালী'কে 'মাতৃরূপা' বলে আবাহন করে আনে।

সুতরাং স্বীকার কর সর্বাত্মক জীবনকে, পালিও না, বাস্তবের মুখোমুখি হও একটি পরম অস্ত্র সম্বল করে—যার নাম প্রেম—

"পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার,
বারবার পাইছ আঘাত, কেন কর বৃথায় উদ্যম?
ছাড় বিদ্যা জপ যজ্ঞ বল, স্বার্থহীন প্রেম যে সম্বল,
দেখ শিক্ষা দেয় পতঙ্গম—অগ্নিশিখা করি আলিঙ্গন।"

স্বামীজীর কাছে প্রেমের জন্যই প্রেম। তার চরম রূপ—পতঙ্গের অগ্নিপ্রেম—মৃত্যুই যার পরিণতি।

এরপরেই এসে গেছে মহামন্ত্রবাণী—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার" ইত্যাদি।

৫

নিঃস্বার্থ প্রেমময় সেবার রূপ স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা'র সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। নিঃস্বার্থ বলেই ঐ সেবা অসাম্প্রদায়িক। আকাশের স্বর্গরাজ্য বা মর্তের স্বর্গরাজ্য—কোন প্রলোভনের হাতছানি যুক্ত নয় এই সেবার সঙ্গে। সেই কারণে সেবাধর্মী রামকৃষ্ণ মিশন সেবার সূত্রে ধর্মান্তর-করণের বিরোধী। স্বামী অখণ্ডানন্দ দুর্ভিক্ষের জন্য অনাথ মুসলমান বালককে অনাথ আশ্রমে নেওয়া হবে কিনা প্রশ্ন করে পাঠালে স্বামীজী ১০ অক্টোবর ১৮৯৭ তারিখ লিখে পাঠিয়েছিলেন—"মুসলমান বালকও লইতে হইবে বৈকি এবং তাহাদের ধর্ম নষ্ট করিবে না। তাহাদের খাওয়া-দাওয়া আলগ করিয়া দিলেই হইল এবং যাহাতে তাহারা নীতি-পরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতরত হয়, এইপ্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম—জটিল দার্শনিক তত্ত্ব এখন শিকেয় তুলে রাখ।"

সেবার সঙ্গে ধর্মান্তরকরণকে যুক্ত করে যে ব্যাপক প্রয়াস বিশেষ বিশেষ ধর্মের পক্ষ থেকে এখন ভারতবর্ষে চলছে এবং তার ফলে যেসকল সামাজিক ও রাজনৈতিক সঙ্ঘাত ক্রমেই প্রবলাকার ধারণ করছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে, রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ হিসাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দ অনেক আগেই ১৯১০-এর মার্চ মাসে মাদ্রাজের 'ইন্ডিয়ান রিভিউ' পত্রিকায় যে-বিবৃতি দিয়েছিলেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তার মধ্যে আছে—"It [The Ramakrishna Mission] lays the greatest emphasis upon the practice of religion.... It exhorts every man to stick to his religion in which he is born.... **Hence proselytism is what it altogether denounces.**" (স্থূলাক্ষর লেখক-কৃত)

বলা বাহুল্য, এখানে স্বামী ব্রহ্মানন্দ স্বামীজী-নির্ধারিত নীতির পুনর্ঘোষণাই করেছেন। অধিকন্তু বলা যায়, স্বামীজী একইসঙ্গে প্ররোচনার বশবর্তী হয়ে যে-মানুষ ধর্মান্তরিত হয়েছে, সে জন্মগত ধর্মে প্রত্যাবর্তন করতে চাইলে তাকে পুনর্গ্রহণের বিরোধী ছিলেন না।



বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত সেবাধর্মের বিস্তৃত পরিধির কথাও এই সূত্রে এসে যায়। সেবা সাময়িক ও স্থায়ী—দুই-ই। আপৎকালে সাময়িক সেবা—প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদির সময়ে যা করা হয়, যথা তাৎক্ষণিক অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসার ব্যবস্থাদি। গৃহহীনদের জন্য গৃহনির্মাণ কিংবা রোগাক্রান্তদের জন্য হাসপাতাল স্থাপনাদি স্থায়ী সেবাপ্রকল্পের মধ্যে পড়ে।

সর্বোপরি আছে উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থাপনা। ক্ষুধিতকে মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে গেলে অন্নসমস্যার সমাধান হয় না। স্বামীজী বলেছিলেন, সারা পৃথিবীর ধনরাশি একটি গ্রামে ঢেলে দিলেও তার দারিদ্র্য দূর হবে না। কাউকে অবিরাম ভিক্ষা দিয়ে গেলে সে স্থায়ী ভিক্ষুকে পরিণত হবে। মানুষকে অর্জন করবার উপযোগী অবস্থায় পৌঁছে দেওয়াই সত্যকার শিক্ষা। দারিদ্র্য কেবল শরীরের নয়, মনেরও। সেইজন্য স্বামীজীর সেবাদর্শে মনোনিরাময়ের বিধানও আছে। তাকে তিনি আত্মচেতনার বিকাশ বলেছেন, যা জীবনসংগ্রামের উপযোগী করে তুলবে মানুষকে। সেইজন্য যখন তিনি প্রথম আমেরিকায় পাড়ি দেন তখন তাঁর উদ্দেশ্যের অন্যতম ছিল ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক দুর্দশা দূরীকরণের জন্য শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের উপযোগী অর্থসংগ্রহ। শিক্ষাকে স্বামীজী কর্মসংস্থানের উপায়ের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন।

স্বামীজীর সেবাদর্শ কিভাবে 'মানুষ তৈরি'র সাধনার রূপ ধরেছিল, সেই বিস্তৃত প্রসঙ্গের মধ্যে প্রবেশের স্থান এখানে নেই।

অসাধারণ কয়েকটি শব্দের আলোক ফেলেছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ সেবাধর্মের মহিমার ওপরে। কাশীর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম সম্বন্ধে তিনি যেকথা বলেছিলেন, তা রামকৃষ্ণ মিশনের সেবা সম্পর্কে সমগ্রত ব্যবহার্য। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেছিলেন ঃ "সেবাশ্রম বিরাটের উপাসনামন্দির।"

শব্দটি 'বিরাট'। সেবার দ্বারা অর্চনা করা হয় সেই বিরাটের। সেই বিরাট কী? স্বামী বিবেকানন্দ তার রূপনির্ণয় করেছেন নানা স্থানে—

"বিরাট রূপ এই জগৎ—তার পূজা মানে তার সেবা। এর নাম কর্ম।" ('বাণী ও রচনা', ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮)

"প্রেম সমগ্র বিশ্বকে আপনার গৃহসদৃশ করে নেয়।" (ঐ, পৃঃ ১০৯)

"আমাদের মহা জগন্নাথপুরী—যথায় পাপী-অপাপী, সাধু-অসাধু, আবালবৃদ্ধবনিতা নরনারী সকলের সমান অধিকার।" (ঐ, পৃঃ ২৭৫)

"যাঁর জীবন বিশ্বব্যাপী, তিনিই জীবিত। জীবনকে যত সীমাবদ্ধ করা যায় ততই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয় মানুষ। জগতে কোন একজনও জীবিত থাকলে তার মধ্যে জীবিত আছি আমি।" (ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩২)

"আমরা জীবন্ত ঈশ্বরকে পূজা করতে চাই। ঈশ্বরের সন্ধানে কোথায় ধাবিত তোমরা? যদি তাঁর সন্ধান না পাও নিজের হৃদয়ে এবং প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে, যদি তাঁকে দেখতে না পাও ঐ লোকটির মধ্যে মাথায় মোট নিয়ে গলদ্ঘর্ম হয়ে যে চলেছে পথে, তাহলে কোথায় পাবে তাঁকে?... নিশ্চয় জেনো, সৃষ্টির সবকিছু মন্দির, আর শ্রেষ্ঠ মন্দির এই মানব-দেহ—মন্দির-মধ্যে তাজমহল।" (ঐ, পৃঃ ২৪৯-২৫১)

"আমাদের সামনে রয়েছে আলোকিত বিশ্বজগৎ—তার প্রতিটি বস্তু আমাদের। বাহু প্রসারিত করে আলিঙ্গন কর প্রতিটি বস্তুকে। ঐশ্বরিক অনুভূতি ঐ চেষ্টারই সাফল্য ছাড়া আর কিছু নয়।" (ঐ, পৃঃ ২৫৩)

এই 'বিরাট' শব্দটির সূত্রে স্বামীজীর একটি চমকপ্রদ ভবিষ্যদ্বাণীর কথা এসে যায়, যেটি আক্ষরিকভাবে সফল হয়েছে এবং তার জন্য অনুরাগীরা উল্লসিত এবং বিরোধীরা 'ওরকম কত কথা মিলে যায়, তা নিয়ে বেশি উৎসাহ ভাল নয়'—ইত্যাদি জল-ঢেলে-দেওয়া কথাবার্তা বলে থাকেন। ভবিষ্যদ্বাণীটি সুপরিচিত। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাজে 'ভারতের ভবিষ্যৎ' বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন ঃ "আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের একমাত্র দেবতা হউন—অন্যান্য অকেজো দেবতাকে এই কয়েক বৎসর ভুলিলে ক্ষতি নাই।" সত্যই পঞ্চাশ বৎসর পরে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল। সুতরাং ঘটনাটিতে বিস্ময়বোধ করার স্বাভাবিক উপাদান আছেই। স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা মরণপণ আন্দোলনকালে আশা-সঞ্জীবনী হিসাবে স্বামীজীর ঐ কথাগুলিকে উচ্চারণ করতেন।

কিন্তু খণ্ডিত উচ্চারণের বিপদ আছে। সেই বিপদ ঘটেছে স্বাধীনতালাভকালে—ভারতবর্ষ খণ্ডিত হওয়ায় এবং স্বাধীন ভারতেও পুনরায় খণ্ডিত হওয়ার আশঙ্কা ঘনাচ্ছে স্বামীজীর পরবর্তী কথাগুলি অনুধাবন না করায় অথবা সেগুলিতে গুরুত্ব না দেওয়ায়।

স্বামীজী কেবল ভারতবর্ষকে ভূমিরূপা মাতা বলে অর্চনা করতে বলেননি—তিনি ভারতবর্ষকে মনুষ্যসন্তান-সমন্বিতা মাতৃরূপে অর্চনা করতে বলেছিলেন। ভারতবর্ষের উপাসনা মানে ভারতবাসীর সেবা। বিরাট শব্দটি অতঃপর এসে গিয়েছিল।

ওপরে উদ্ধৃত কথাগুলির পরে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ

"অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন। তোমার স্বজাতি এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত। **সর্বত্র তাঁহার হস্ত, সর্বত্র তাঁহার কর্ণ, তিনি সকল ব্যাপিয়া আছেন। কোন্ অকেজো দেবতার অন্বেষণে তুমি ধাবিত হইতেছ—আর তোমার সম্মুখে, তোমার চতুর্দিকে যে-দেবতাকে দেখিতেছ—সেই**

বিরাটের উপাসনা করিতে পারিতেছ না? যখন তুমি এই দেবতার উপাসনায় সমর্থ হইবে তখনই অন্যান্য দেবতাকে পূজা করিবার ক্ষমতা তোমার হইবে।...

"প্রথম পূজা—বিরাটের পূজা—তোমার সম্মুখে, তোমার চারিদিকে যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহাদের পূজা।" (স্থূলাক্ষর লেখক-কৃত)

রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশেষভাবে জড়িত যাঁরা, তাঁদের উদ্দেশেও তিনি একই কথা বলেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা, যিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে গ্রামবাসীকে দেশকর্মে উদ্বোধিত করতে পেরেছিলেন, সেই সুবিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ অশ্বিনীকুমার দত্তের সঙ্গে স্বামীজীর এই বিষয়ক কথাবার্তা মনে রাখার মতো। ১৮৯৭ সালে আলমোড়ায় অবস্থানকালে অশ্বিনীকুমার জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপ সম্বন্ধে স্বামীজীর মত জানতে চেয়েছিলেন। সেকালের কংগ্রেস ব্রিটিশ প্রভুদের কাছে আবেদন-নিবেদনের ফিরিস্তি পেশ করার মধ্যেই কার্যাবলীকে আবদ্ধ রেখেছিল। স্বামীজী অশ্বিনীকুমারকে বলেন : "আপনি কি মনে করেন, গোটা কয়েক প্রস্তাব পাস করালেই স্বাধীনতা এসে যাবে?... আগে তারা পেটভরে খেতে পাক, তারপর নিজেরাই নিজেদের মুক্তির পথ খুঁজে নেবে।... জনসাধারণ যেন মানুষ গড়ার শিক্ষা পায়।... আর অচ্ছুত, মুচি, মেথর ও তাদের মতো সকলের কাছে গিয়ে বলুন, 'তোমরাই তো জাতির প্রাণ, তোমাদের মধ্যে এমন অসীম শক্তি আছে যা দুনিয়াকে উলটে দিতে পারবে।' "

অর্থাৎ সেবার উদ্দেশ্য—সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব সৃষ্টি।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'বিবেকানন্দের সাধনফল' রচনায় রামকৃষ্ণ মিশনের তরুণ সন্ন্যাসীদের সেবাসাধনার দ্বারা যে সাম্প্রদায়িক ভেদরেখা বিলুপ্ত হতে পারে, তা বিশেষভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন—"যেসকল শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজের নেতাস্বরূপ হইয়া ভারতবর্ষে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপনার্থ নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, সেই মহৎ কার্য এইসকল বালকের [অর্থাৎ তরুণ সেবকদের] দ্বারাই সুসম্পন্ন হওয়া একমাত্র সম্ভব। মুসলমান, ক্রিশ্চিয়ান, পারসি, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ ধর্মাবলম্বী বিবিধ জাতি ইহাদের অদ্ভুত সেবা-দৃষ্টে পরস্পর জাতীয় বিদ্বেষ ত্যাগ করিতে নিশ্চয় বাধ্য হইবে। 'সেবাশ্রম'-ভুক্ত সেবাগ্রাহিগণ যে-জাতিই হউক, সেবাশ্রমে আসিয়া বুঝিবেন যে, এইসকল বালকের তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব নাই। কারণ, সেব্য ও সেবকদিগের ভিতরে বর্ণগত, জাতিগত এবং ধর্মগত প্রভেদ থাকিলেও ইহারা তাঁহাদিগকে সমভাবে সেবা করে।... প্রেমের অদ্ভুত প্রভাবে প্রেমদৃষ্টে প্রেমলাভ হয়। এই অদ্ভুত সেবায় সেবকের প্রেমদৃষ্টে যিনি সেবা পাইয়াছেন, তাঁহারও হৃদয়ে ঐরূপে প্রেমের উদ্দীপনা হইয়া নিশ্চয়ই তাঁহার জাতিগত, ধর্মগত বিদ্বেষ—উচ্চ দৃষ্টান্তে মলিন হইবে।"[৭]

৭

সেবার মধ্যে যোগসমন্বয় ঘটেছে। সেবা প্রত্যক্ষে কর্মযোগ। কিন্তু ভক্তি না থাকলে কি কেউ ঈশ্বরে সর্ব কর্মফল অর্পণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়? জ্ঞান না থাকলে কি কেউ সর্বভূতে ঈশ্বরদর্শন করে কর্মে প্রবৃত্ত হয়? কেউ কি কর্মসাধন করতে পারবে যদি না সে যোগের একাগ্রতা লাভ করে?

স্বামীজীর গুরুভাইদের মধ্যে স্বামী অখণ্ডানন্দ এই সেবাধর্মকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শপ্রাপ্ত—তাঁর সিদ্ধির সম্বন্ধে তাই সন্দেহের অবকাশ নেই। স্বামীজীর শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে নিবেদিতা, ক্রিস্টিন সেবাকে জীবনধর্ম করেছিলেন। সদানন্দ, শুভানন্দ, কল্যাণানন্দ, নিশ্চয়ানন্দ প্রমুখরাও তাই। ত্যাগে, তপস্যায় জ্বলন্ত এঁদের জীবন যে বাঞ্ছিত ভূমিতে উত্তীর্ণ হয়েছিল, তা আমরা ধরে নিতে পারি। সমগ্র রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পক্ষে একজনের ক্ষেত্রে তা লিখিতভাবে স্বীকৃত হয়েছিল। স্বামীজীর মারাঠী সৈনিক-শিষ্য নিশ্চয়ানন্দ তাঁর গুরুভাই কল্যাণানন্দের সঙ্গে কনখলে দীর্ঘকাল সেবাকাজ করেন। স্তম্ভিত করার মতো তাঁদের সেবাকাহিনী। কনখল থেকে হৃষীকেশের দূরত্ব ১৮ মাইল। নিশ্চয়ানন্দ প্রতিদিন ভোরে কনখল থেকে পায়ে হেঁটে হৃষীকেশ যেতেন চিকিৎসাদি করবার জন্য। দুপুরে একবার ধর্মশালায় ভিক্ষা নিতেন, তারপর পায়ে হেঁটে ঘনরাত্রিতে কনখলের আশ্রমে ফিরতেন। প্রতিদিন ৩৬ মাইল হেঁটে তাঁর এই সেবাকাজ চলেছিল বছরের পর বছর। তাঁর দেহত্যাগের পরে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের মুখপত্র 'উদ্বোধন'-এ লেখা হয় :

"স্বামীজী-প্রচারিত নরনারায়ণের সেবা দ্বারা তিনি সেই পদ লাভ করিয়াছেন, যে-পদ জ্ঞানীরা বিচারের দ্বারা, ভক্তেরা ভজনা দ্বারা এবং যোগীরা ধ্যান দ্বারা লাভ করেন।" (স্থূলাক্ষর লেখক-কৃত)

কেবল নিশ্চয়ানন্দ নন—নিশ্চয়ানন্দেরা নির্মাণ করেছিলেন সঙ্ঘশরীর। প্রত্যক্ষদর্শী মনস্বিপুরুষ মহেন্দ্রনাথ দত্ত সেই কথাই লিখেছেন : "কথিত আছে, পুরাকালে দধীচি মুনি নিজের অস্থি দিয়া দেবতাদিগের হিতসাধন করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের এইসকল কর্মীও ইষ্টকের পরিবর্তে নিজেদের অস্থি-কঙ্কাল দিয়া, চুন-সুরকির পরিবর্তে মজ্জা দিয়া এবং জলের পরিবর্তে হৃদয় ও গাত্রের তপ্ত শোণিত দিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের হর্ম্য নির্মাণ করিয়াছিলেন। যদি নিরপেক্ষ হইয়া সমালোচনা করা যায়,

তাহা হইলে স্বামীজী-প্রণোদিত এইসকল কর্মী পুরাকালের দধীচি মুনি হইতে কোন অংশেই ন্যূন হইবেন না।"[৭]

অপমান, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা এবং দারুণ বিপদের মধ্য দিয়া সেবাকাজ রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীরা করে গেছেন। তা করেছেন কিন্তু পরম আনন্দে। স্বামীজী যা চেয়েছিলেন—তাই হয়েছিল। ক্রুশকাঠ কাঁধে নিয়ে রক্তাক্ত দেহে তাঁরা আনন্দেই পথ চলেছিলেন। জার্মান দার্শনিক কাউন্ট কাইজারলিং কাশীতে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের কর্মরত কর্মীদের দেখে লিখেছিলেন: "আমি কদাপি কোন হাসপাতালে এমন উৎফুল্ল পরিবেশ দেখিনি।... [কর্মীরা] সত্যই ঈশ্বর-উদ্দীপিত রামকৃষ্ণের যথার্থ অনুগামী। ভালবাসায় পূর্ণ তাঁরা, অথচ সহজ বুদ্ধিসম্পন্ন—মোটেই ধর্মান্ধ অথবা জেদী নন। মানববন্ধুর যা হওয়া উচিত তাঁরা ঠিক তাই।"[৮]

আনন্দে ছিলেন তাঁরা—কারণ তাঁরা ছিলেন সেবা-মহোৎসবে। 'সেবা-মহোৎসব' কথাটি কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের। "জগন্নাথের রথ চলিল—উঠেছে জয়রব,/ উদ্বোধিত চিত্ত, আজি সেবা-মহোৎসব।"—কবি লিখেছিলেন।

প্রেরণার মুহূর্তে কবিরা সত্যের স্পর্শ পান। [সমাপ্ত] ❑

তথ্যসূত্র

২ ১ম ভাগ—গুরুভাব: পূর্বার্ধ, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৪০০, পৃ: ৪০-৪১

৩ শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা—স্বামী সারদেশানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ৩য় সং, ১৩৯৫, পৃ: ৫০

৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, ৩য় সং, ১৩৮০, পৃ: ২৩৫

৫ স্বামী অখণ্ডানন্দ—স্বামী অন্নদানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ২য় সং, ১৩৮৯, পৃ: ১৪১

৬ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু ও বিমলকুমার ঘোষ সম্পাদিত, মণ্ডল বুক হাউস, ২য় সং, ১৩৮৯, পৃ: ১০০

৭ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান—মহেন্দ্রনাথ দত্ত, ২য় সং, ১৩৬২, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি, 'প্রাণবাণী'

৮ বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ—শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৫৪



সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন

সহৃদয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ অর্থানুকূল্যে আমাদের ভগ্নপ্রায় স্কুলগৃহটি পুনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি।

১।	১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ	:	১,২০,০০০ টাকা
২।	দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ	:	৫,০০,০০০ টাকা
৩।	পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার	:	৫,০০,০০০ টাকা
৪।	আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প	:	১০,০০,০০০ টাকা
৫।	একখানা অ্যাম্বুল্যান্স (Ambulance)	:	৫,০০,০০০ টাকা
			২৬,২০,০০০ টাকা

A/c Payee চেক/ড্রাফট **'Ramakrishna Mission Ashrama, Ramharipur'**—এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফট পাঠাবার ঠিকানা—সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পো: রামহরিপুর, জেলা—বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ: এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি

স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
রামহরিপুর, জেলা: বাঁকুড়া

প্রসঙ্গ ঃ মাতৃভাব*

স্বামী প্রভানন্দ

এই ভাষণটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

মাতৃভাব ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলাদেশের—অবিভক্ত বাংলাদেশের—একটা বিশেষ সম্পদ। এই মাতৃভাব নিয়ে গত কয়েক শতাব্দী ধরে অনেক আলোচনা, মনন ও পরীক্ষা হয়েছে। এই ভাব আশ্রয় করে অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের অগ্রগতি লক্ষ্য করার মতো। এই ভাব পুষ্পিত হয়ে উঠেছে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর জীবনে এবং এ-ভাবের তাৎপর্য ও তার ব্যাখ্যা শোনা গিয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠে। স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়েছি যে, সাধারণত মাতৃভাবকে যে সীমিত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়ে থাকে সেই গণ্ডি অতিক্রম করে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করা দরকার। অবশ্য মাতৃভাব আমরা দেখার চেষ্টা করব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনসাধনার সূত্র ধরে, যা বিশেষভাবে শ্রীমা সারদাদেবীর জীবন-অঙ্গনে বিচিত্র আলোকে উদ্ভাসিত। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবী—এ-দুটি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যেই মাতৃভাব বিষয়টি আমরা আলোচনা করব। বর্তমান সমাজ একটা চোখধাঁধানো শতাব্দী অতিক্রম করে অনেক আশঙ্কা ও প্রত্যাশা নিয়ে নতুন এক শতাব্দীতে প্রবেশ করেছে। এই সন্ধিক্ষণে মানুষের সামনে যে অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দিয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবার চেষ্টা করব।

সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করে থাকেন, আমাদের যে পার্থিব মা—তাঁর থেকেই উদ্ভূত হয়েছে দেবী, মহাদেবী, জগজ্জননী ইত্যাদি চিন্তাভাবনা। অপরপক্ষে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, গত কয়েক শতাব্দী ধরে সমাজে জগজ্জননীর যে ধ্যানধারণা, আরাধনা ও উপাসনার প্রচলন দেখা দিয়েছে তা দিয়ে পার্থিব মা মহিমান্বিতা হয়েছেন, নানা ভাব-ঐশ্বর্য দ্বারা বিমণ্ডিতা হয়েছেন। পরিণতিতে দেখি, এই মহৎ ভাবনার প্রচ্ছায়া প্রলম্বিত হয়েছে পারিবারিক ও সমাজ-জীবনে। এদেশে মেয়েদের প্রতি সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ সম্বোধন 'মা'। অচেনা মহিলাকে আমরা 'মা' বলে ডাকি। গুরু শিষ্যাকে 'মা' বলেন। শিশুকন্যাটিকে মা-বাবা ডাকেন 'মামণি'। পরিবারের মহিলারা 'কাকীমা', 'জেঠীমা', 'মাসীমা', 'পিসীমা', 'বৌমা' ইত্যাদি ডাকে অভ্যস্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে মাতৃভাবনা ভারতীয় সমাজের ভিতরে-বাইরে সর্বত্র প্রসারিত। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এবিষয়ে আমরা সচেতন নই—বিশেষত গত কয়েক দশক ধরে। বিষয়টি একটু তলিয়ে দেখা যাক। যেকেউ সন্তানের জন্ম দিলেই 'জননী' হতে পারেন, কিন্তু তার মানেই তিনি 'মা' হন না। জননীত্ব ও মাতৃত্বের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধান।

১৯০২ খ্রীস্টাব্দে একটি চাঞ্চল্যকর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। Evolution Theory নিয়ে যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক Grammand তাঁর বই 'Ascent of Man'-এ দেখিয়েছিলেন যে, জননীত্ব থেকে মাতৃত্বে উত্তরিত হতে মানবসমাজের সময় লেগেছিল কয়েক লক্ষ বছর। তিনি বহু প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছেন যে, সুদূর অতীতে প্রাণী মাত্রই সন্তান প্রসবের পর সন্তানকে মনে করত শত্রু। হয় তাকে খেয়ে ফেলত, নয় তার প্রাণনাশ করত। এই ভাবনা দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল। কয়েক লক্ষ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর সেই পশু-জননীর মধ্যে ক্রমশ মাতৃত্বের স্ফুরণ হয়েছিল। Grammand সুন্দর একটি মন্তব্য করেছেন, তিনি বলেছেন ঃ "When the first mother awoke to her first tenderness and warmed her loneliness at her infant love, a touch of a new creative hand was felt upon the world."—একটা বিরাট বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল যেদিন এই মাতৃভাব প্রথম অঙ্কুরিত হতেশুরু করেছিল। সেদিন থেকে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টিতে একটি নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছিল।

মনে হতে পারে, এসব কী আজগুবি কল্পনা! কিন্তু এভাবনা আমাদের অপরিচিত নয়। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশের মাতৃভাবের অন্যতম সাধক রামপ্রসাদের গানে আছে—"জন্ম দিলেই হয় না মাতা, যদি না বোঝে সন্তানের ব্যথা।" দেখা যাচ্ছে, রামপ্রসাদের ধ্যান-ধারণাতেও জননীত্ব ও মাতৃত্বের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য। আমাদের দৃষ্টি মাতৃত্বের দিকে। মাতৃত্বের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত যে-সমস্ত মানবিক দিক, যেগুলিকে অনেক সময় ভাগবত, গীতাদি শাস্ত্রে দৈবীসম্পদ বলা হয়েছে, সেদিকেই আমরা দৃষ্টি দেব। বেদান্ত-মতে অভাব থেকে কোন ভাবের উৎপত্তি হয় না। এই মাতৃভাব যদি মানুষের ব্যক্তিসত্তায় অন্তর্নিহিত না থাকে, তবে সেটা বিকশিত হতে পারে না। যখন অনুকূল পরিমণ্ডল এবং ব্যক্তিসাধকের প্রচেষ্টায় ঐ মাতৃভাব বিকশিত হয়ে ওঠে তখনি মাতৃভাবের সুগন্ধে মানবচরিত্র সমৃদ্ধ হয়।

---

* গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে ২১ এপ্রিল ১৯৯৯ তারিখে প্রদত্ত 'সতী রায় স্মারক বক্তৃতা'।

তত্ত্বত এই মাতৃভাব প্রকৃতিগত হলেও নানান বিপরীতমুখী সংস্কারের প্রাবল্যে, এসকল বাধা অতিক্রম করবার জন্য প্রয়োজনীয় ইচ্ছাশক্তি ও প্রচেষ্টার অভাবে এবং অননুকূল পরিমণ্ডলে তা অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই বিকশিত হতে পারে না। আমরা জানি, সামাজিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন সঙ্ঘাত একে নিয়ন্ত্রণ করে বা অবদমন করে রাখবার চেষ্টা করে। আমরা জানি, সমস্ত মানবচেতনা ব্যক্তিচেতনার আশ্রয় নিচ্ছে, আর ব্যক্তিচেতনা বিকীর্ণ হচ্ছে গোষ্ঠীচেতনার মধ্যে এবং তা থেকে ক্রমে ক্রমে বৃহত্তর সর্বকালীন চেতনার মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ বা শ্রীমায়ের মতো কোন ব্যক্তিতে যখন মাতৃভাব কুসুমিত হয়ে ওঠে এবং তাঁদের জীবনকে অভিসিঞ্চিত করে, তখন সেই ভাব বৃহত্তর গোষ্ঠীচেতনার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং ক্রমে সর্বকালীন চেতনার মধ্যে তার স্থান করে নেয়। এভাবে ব্যক্তিচেতনা ও সমষ্টিচেতনা এই দুই স্তরেই মাতৃভাব অন্যান্য মানবভাবের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, এই দ্বিস্তর দর্পণে মাতৃভাব প্রতিফলিত হতে থাকলেও ভারতীয় সমাজের সর্বস্তরে সর্বকালে এর বিস্তার ঘটেনি। সীমিত সংখ্যক মানুষের মধ্যে এবং সমাজের নির্দিষ্ট অংশের মধ্যে এই ভাবের বিকাশ হয়েছিল। ফলে বেদ-উপনিষদের যুগে এই নারীদের মধ্য থেকে ব্রহ্মবাদিনী সৃষ্টি হতে পেরেছিল, কিন্তু নানা কারণে স্মৃতিপুরাণের যুগে সেই মহৎ আদর্শ ধূলিসাৎ হয়ে গিয়েছিল। সমাজে নারীজাতির ক্রম-অবনতি তাদের অতল গহ্বরে নিয়ে গিয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়, সমাজ তাদের ভারবাহী গর্দভ এবং সন্তানধারণের যন্ত্রস্বরূপা করে ফেলেছিল। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকা স্মরণ করে আমরা মাতৃভাবের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বুঝতে চেষ্টা করব। পারিভাষিক অর্থে মাতৃভাবের মূল কথা হচ্ছে মাতৃজ্ঞানে ঈশ্বরের উপাসনা। এই ভাবনা পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে থাকলেও একমাত্র ভারতবর্ষে অবিচ্ছিন্ন ধারায় হাজার হাজার বছর ধরে সঞ্চারিত ছিল। আর এই ভাবনার বিশেষ প্রকাশ অর্থাৎ সুন্দর পরিণতি ঘটেছিল সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলার জমিতে। কৃষ্ণানন্দ, পূর্ণানন্দ, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, রাজা রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রমুখের ভক্তিতে মহাদেবী স্বর্গের ঐশ্বর্য ছেড়ে মর্তধামে নেমে এসেছেন। কিন্তু বোধকরি শ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাবেই বাঙালী হৃদয়ের আকুতি এই বিষয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। স্বয়ং ঈশ্বরী রক্তমাংসের দেহ ধারণ করে শ্রীমা সারদাদেবী-রূপে মাতৃত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এই সাধনার পরিণতি এই যুগে সহজভাবে প্রকটিত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রীমা সারদাদেবীর মধ্যে এবং বিচিত্রভাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে।

মাতৃভাবের সাধনার মাধ্যমে শাক্তধর্ম বাংলার জনমানসে একটা সর্বজনীন উদার ধর্মরূপে বিবর্তনলাভ করেছিল। পরিণতিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধান্ত করেছিলেন : "যত মত তত পথ।" এ-ভাবনা উদারতার এক চরম আদর্শ। জাতপাতের অনুশাসন ডিঙিয়ে সাধকের আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতার ওপর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাধান্য দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় কথা, এই ভাবের সাধনা যেমন উদার তেমনি গভীর। মূর্তি উপাসনা, জপ-ধ্যান শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার মধ্যে গুরুত্বলাভ করেছিল। রামপ্রসাদের উক্তি—"প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে"—এর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন—রামপ্রসাদ মনকে বলেছেন "ঠারে-ঠোরে" বুঝতে। একথা বুঝতে বলছেন যে, বেদে যাঁকে 'ব্রহ্ম' বলছে, তাঁকেই তিনি 'মা' বলে ডাকছেন। তৃতীয়ত, এ-ভাবের সাধনায় পুরুষ ও নারী সকলেরই সমান অধিকার। চতুর্থত, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবীর আবির্ভাবের পূর্বেই মাতৃভাবের সাধনায় সাড়া দিয়ে কৈলাসবাসিনী মা ভবানী স্নেহের দুলালী সেজে প্রতিবছর বাঙালীর কুটিরে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি রামপ্রসাদের মেয়ে সেজে তাঁর বাড়ির বেড়া বেঁধে দিয়েছেন। এবার দেখা গেল, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মা সেজে তাঁর সঙ্গে ঘুরছেন, ফিরছেন। পঞ্চমত, শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃভাবের গভীর তাৎপর্যটি উপলব্ধি করে সারা বিশ্বে তা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বেদান্তের ভাষায়। এই বিষয়ে অনেকের আপত্তি অগ্রাহ্য করে পণ্ডিত শশিভূষণ দাশগুপ্ত সুন্দরভাবে প্রমাণ করেছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের এই উত্তরণ—এটা একটা স্বাভাবিক পরিণতি। যেহেতু ধর্মের ক্ষেত্রে বেদান্তই মহামানবের মিলনক্ষেত্র, তাই মাতৃবুদ্ধিতে ঈশ্বরের উপাসনার পরিণতিতে সকল নারীতেই সেই জগন্মাতার দর্শন একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল। নিপীড়িত নারীজাতির উদ্ধারের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রীগুরু গ্রহণ, নারীভাবসাধন এবং মাতৃভাব প্রচার লক্ষ্য করে স্বামী বিবেকানন্দ মাতৃভাবকে বেদান্তের ভাষায় প্রচার করেছেন।

গণধর্মে বিধৃত মূর্তিপূজা তখনকার ব্রাহ্ম আন্দোলনে কতকটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল এবং খ্রীস্টানদের প্রচারে নিন্দিত হয়ে উঠেছিল, সে-মূর্তিপূজাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করে শ্রীরামকৃষ্ণ গণধর্মকে প্রাণবন্ত করে তুলেছিলেন। বেদান্তের অধিকারী কালীপূজা করতে পারে, তাঁর মূর্তিপূজা করাতে দোষ নেই—এই দুটি ভাবনার মধ্যে প্রচলিত বিরোধ মিটিয়ে দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃভাবের উপাসনার পথ প্রশস্ত করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-অঙ্গন মাতৃভাবের

আলোকে উজ্জ্বল। তিনি বলতেন, মাতৃভাব অতি শুদ্ধভাব। মাতৃভাব যেন নির্জলা একাদশী। এই মাতৃভাব—তুমি মা, আমি তোমার ছেলে—এটা সাধনার শেষকথা।

এই সাধনায় সিদ্ধ হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ মাতৃভাব অধিকতর বিকাশের জন্য বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীমা সারদাদেবীকে এবং কালক্রমে তাঁর মধ্যেই বিস্ফুরিত হয়েছিল মাতৃভাবের পরম উৎকর্ষ। স্বাভাবিক কারণেই তিনি মাতৃভাবের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মর্যাদায় আজ প্রতিষ্ঠিত। উঁচুমাত্রার মাতৃভাব ছিল তাঁর সারা জীবনের প্রধান রাগিণী, তাঁর আবেগের মুখ্য উৎস এবং জীবনদর্শনের বনিয়াদ। মাতৃভাবের অন্তর্নিহিত স্বার্থলেশহীন আত্মবিলুপ্তির মহিমা এবং জাতি, ভাষা, অঞ্চল ইত্যাদির সঙ্কীর্ণতা-অতিক্রান্ত বিশুদ্ধ মাতৃস্নেহ আর কোন চরিত্রে এমন বিচিত্র সুন্দরভাবে বিকশিত হতে দেখা যায়নি।

মাতৃভাবের দুটি দিক। একটি মুদ্রার যেমন এপিঠ ওপিঠ আছে, ঠিক তেমনি মাতৃভাবের রয়েছে দুটি দিক। একটি দিক বাৎসল্য, আরেকটি দিক প্রতি-বাৎসল্য। মায়ের সন্তানের প্রতি যে-আকর্ষণ, তাকে আমরা বলি 'বাৎসল্য'। আর মায়ের প্রতি সন্তানের যে-আকর্ষণ, তাকে বলি 'প্রতি-বাৎসল্য'। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আমরা দেখতে পাই প্রতি-বাৎসল্য ভাবের প্রাধান্য, আর শ্রীমায়ের মধ্যে দেখতে পাই বাৎসল্য ভাবের গুরুত্ব। দুটি ভাবই মাতৃভাবের এপিঠ আর ওপিঠ। প্রতি-বাৎসল্যে সন্তানের আকুতি দেখা যায় সুখে-দুঃখে, আশায়-নৈরাশ্যে, সর্বাবস্থায় 'মা মা' ডাকা এবং বিড়ালছানার মতো জগন্মাতার ওপর নির্ভর করে থাকার মধ্যে। মাতৃভাবের এই দিকটি সবচেয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে। অপরদিকে যেভাবে বাৎসল্য ভাবের অপার মহিমা শ্রীমায়ের জীবনে বিকশিত ও বিস্তারিত হয়ে উঠেছিল তার তুলনা মেলে না।

শ্রীমায়ের জীবন-বৃক্ষে মাতৃভাবের বিকাশের ধারা আলোচনা করলে তার কয়েকটা সুস্পষ্ট পদচিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন, ঠাকুরের আদেশ পেয়ে স্বামী যোগানন্দকে মন্ত্রদীক্ষা দেওয়ার সময় থেকে শ্রীমায়ের মধ্যে মাতৃভাব প্রকাশিত হয়েছিল। আবার কেউ বলেন, যখন তিনি তাঁর দীক্ষিত সন্তানদের এবং জগতের অন্যান্য সবাইকে সন্তানরূপে গ্রহণ করেছিলেন, তখনি তাঁর মাতৃভাব পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছিল। কিন্তু মুক্ত দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখতে পাব, কুঁড়ি থেকে যেমন ক্রমে ফুল ফোটে, তেমনি অল্প বয়স থেকেই তাঁর মাতৃভাবের কুঁড়িটির আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল এবং তার পরম পর্যায়ে দেখতে পাই, তাঁর দৃষ্টিতে সংসারে সবাই তাঁর সন্তান—সমস্ত মানুষ, এমনকি তাঁর স্বামীও তার অন্তর্ভুক্ত। যাঁকে তিনি স্বামী-রূপে পেয়েছিলেন বলে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করতেন, তাঁকেও তিনি সময় সময় সন্তান বলে মনে করতেন। প্রকৃতপক্ষে জগতের যাবতীয় প্রাণীকে তিনি নিজের সন্তান বলে মনে করতেন। স্বভাবতই মনে হয়, জগন্মাতা যেন তাঁর স্বরূপসত্তা গোপন করে এই ধুলোর মাটিতে আমাদের মধ্যে নেমে এসেছিলেন বিশুদ্ধ মাতৃস্নেহের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ প্রদর্শন করবার জন্য। মজার কথা এই যে, তিনি কখনো কখনো বিশেষ একটি সন্তানের যেন একান্ত মা—এই বলে পরিচয় দিয়েছেন, আবার কখনো কখনো তিনি নিজেকে সমস্ত প্রাণীর মা বলে অনুভব করেছেন। তাঁর মধ্যে বিচ্ছিন্ন মাতৃত্ব এবং অখণ্ড মাতৃত্ব চমৎকারভাবে সমন্বিত হয়েছিল। জাগতিক মাতৃত্ব পরিবারের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। পার্থিব মায়ের স্নেহ, আদরযত্ন, সন্তানের কল্যাণের জন্য আকুতি সেই সেই পরিবারের গণ্ডির মধ্যে সীমিত থাকে। কিন্তু শ্রীমায়ের অনুপম মাতৃত্বের যে আকুতি, তার কোন গণ্ডি ছিল না। তিনি সত্যসত্যই 'গণ্ডিছাড়া মা'। তাঁর মধ্যে কখনো কখনো পার্থিব মাতৃত্বের প্রাবল্য দেখা যেত, আবার কখনো জগন্মাতৃত্বের। কখনো-বা এই দুই ভাবের সহাবস্থান। সন্দিগ্ধ ভক্তকে কখনো তিনি ভরসা দিয়ে বলতেন : "তোমার আপন মা বৈকি।" জোর দিয়ে বলতেন যে, তিনি সত্যিকারের মা। তিনি গুরুপত্নী নন, কথার কথা মা নন, তিনি খাঁটি মা। কিন্তু জগন্মাতৃত্বের আধিপত্য যখন প্রবল হয়ে উঠেছে, তখন তিনি ভরসা দিয়ে বলেছেন : "মনে ভাববে আর কেউ না থাক, আমার একজন মা আছেন।" বলেছেন : "আমাকে স্মরণ করলেই হবে।"

একদিনের ঘটনা। ১৩১৯ সালের অক্ষয় তৃতীয়া। সেদিন মা উদ্বোধনে রয়েছেন। তাঁর সামনে রয়েছেন সরযূবালা এবং কয়েকজন ভক্ত। করুণার্দ্র শ্রীমা তাঁদের আশীর্বাদ করে বলছেন : "আজকের দিনে আমি তোমাদের আশীর্বাদ করছি; তোমাদের মুক্তিলাভ হোক। জন্ম-মৃত্যু যন্ত্রণা যেন তোমাদের আর ভুগতে না হয়।" এরূপ ভাবের উচ্ছ্বাস যে একদিনই ঘটেছিল তা নয়। কিন্তু শ্রীমায়ের সর্বগ্রাসী স্নেহের এমন এক যাদু ছিল যে, তাঁর জগন্মাতৃত্বের ভাবনা নিয়ে কোন সন্তান বেশিক্ষণ ভাববার সুযোগ পেত না। তাকে আদর-যত্ন, স্নেহ দিয়ে শ্রীমা ভুলিয়ে দিতেন। এ এক অদ্ভুত লীলা! শ্রীমায়ের জীবন-অঙ্গনে জাগতিক মাতৃত্ব ও জগন্মাতৃত্ব প্রায় সমান্তরালভাবে প্রবাহিত হলেও তিনি চাইতেন, তাঁর সন্তানেরা তাঁকে পূজার আসনে বসিয়ে যেন দূরে সরিয়ে না রাখে। এবিষয়ে তিনি সর্বদাই সচেতন ছিলেন। সেজন্য তিনি পার্থিব মায়ের মতো ব্যবহার করে প্রত্যেক সন্তানকে তাঁর কাছে টেনে আনার চেষ্টা করেছেন। যদিও বহু ভাগ্যবান সন্তান—তাঁরা সবাই যে তাঁর দীক্ষিত সন্তান তা নয়—বিভিন্ন

সময়ে তাঁর দৈবীরূপের পরিচয় পেয়েছেন। কিন্তু তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া তিনি পছন্দ করতেন না।

প্রতি-বাৎসল্য ভাবের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে শ্রীরামকৃষ্ণ নারীমাত্রকেই মাতৃবুদ্ধিতে দেখতে শিখেছিলেন। নারীমাত্রেই জগন্মাতার প্রতিফলন দেখতে পেয়েছিলেন। এই ভাব সম্প্রসারিত হওয়াতে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, জগন্মাতা সবার মধ্যে রয়েছেন। তিনিই সবকিছু হয়ে রয়েছেন। কাশীপুরে থাকাকালীন তিনি একদিন বলেছেন ঃ "ঠিক ঠিক দেখতে পাইরে, মা যেন নানান রকমের চাদর মুড়ি দিয়ে নানান রকম সেজে ভেতর থেকে উঁকি মারছেন।" অপরদিকে পূর্ণবিকশিত মাতৃত্বের ভাবে ভরপুর শ্রীমা সবাইকে সন্তানজ্ঞানে দেখেছেন এবং প্রত্যেকের সঙ্গে সেভাবে ব্যবহার করছেন। এ-ভাবের মাধুর্যে অভিভূত সন্তান শ্রীমায়ের মাহাত্ম্য স্মরণ করে প্রায়ই গেয়ে উঠেছে ঃ "মা নাম শেখাতে সবে, মা হয়ে এসেছ ভবে।"

এই মাতৃভাব শুদ্ধভাব। তার প্রবল পরাক্রম। মাতৃভাবরূপ বৃক্ষে ফোটে পবিত্রতা, ক্ষমা, দয়া, সহিষ্ণুতা, সমদর্শিতা, বাঁধনহারা অপত্যস্নেহ ইত্যাদি সমস্ত ফুল। আরো কথা, শ্রীমায়ের মাতৃভাবের লক্ষ্য পার্থিব মাতৃভাবের চেয়ে ভিন্ন। মাতৃভাব আশ্রয় করে সাধনা করলে সাধক ক্রমে দ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈত ভাব অতিক্রম করে অদ্বৈততত্ত্বে পৌঁছে যায়। শ্রীমায়ের কথা থেকে জানি, তখন সাধক উপলব্ধি করেন ঃ "আমার মাঝে যিনি, তোমার মাঝেও তিনি, দুলে বাগদী ডোমের মাঝেও তিনি।" স্বতঃস্ফূর্ত বেগে সাধনার চরম শীর্ষে তিনি সহজেই পৌঁছে যান। সঠিকভাবে মাতৃভাবের সাধন করে সাধক অনায়াসে পৌঁছে যান পরিতৃপ্তির পৈঠাতে।

আমরা বলেছি, শ্রীমায়ের মধ্যে পূর্ণবিকশিত মাতৃত্বের যে অপূর্ব প্রকাশ দেখতে পেয়েছি, তা অতীতে কখনো দেখতে পাইনি। এর তাৎপর্য বুঝবার জন্য আমরা কয়েকটি কথা স্মরণ করব। মায়ের মধ্যে মাতৃভাবের অপূর্ব বিকাশের ফলে তাঁর ব্যক্তিত্বের বর্ণালী হয়েছিল ভাবৈশ্বর্যমণ্ডিত। যাঁরা তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন, তাঁদের ব্যক্তিগত উপলব্ধির প্রতি আমরা দৃষ্টি দেব।

শ্রীমায়ের দীর্ঘকালের ঘনিষ্ঠ সেবক স্বামী সারদানন্দ তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বলেছিলেন ঃ "এত বড় মন আর দেখিনি।" গ্রামের প্রবীণদের অনেকের কাছে তিনি ছিলেন 'সারু বামনী'। তাঁরা অনেকে তাঁকে পাত্তা দিতেন না। আবার অনেকে তাঁকে 'পিসী', 'মাসী', 'ঠাকুরঝি' বলতেন। কিন্তু সেদিকে তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তিনি জানতেন, তিনি সবার মা। মা যেমন সন্তানের দোষ ধরেন না, শ্রীমাও অপরের এধরনের আচার-আচরণ নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। তাঁর চরিত্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল নিরাসক্তি। নিরাসক্তি যেন ছিল তাঁর মজ্জাগত। নির্বাসনা ছিল তাঁর হাতের মুঠোয়। একদিন তিনি তাঁর সেবক স্বামী অরূপানন্দকে বলেছিলেন ঃ "বাসনা থেকে তো সব। এই যে আমি এসব নিয়ে আছি, কৈ আমার তো কোন বাসনা হয় না।" মায়ের এই জীবন-সাধনা স্মরণ করিয়ে দেয় ঈশ উপনিষদের বাণী—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" অর্থাৎ ত্যাগের দ্বারাই ভোগের সাধন করতে হবে। এই সংসারে সত্যকে আশ্রয় করে ভোগ করতে হবে, সংসার করতে হবে। সত্য হচ্ছে এই—'ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্'। এই সত্যকে ধরে সংসার করলে ভোগের বাসনা দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করতে পারে না। এই বাণীর তাৎপর্য উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত মায়ের ব্যবহারিক জীবনে। মায়ের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য বুঝতে না পেরে অনেকেই তাঁকে ভুল বুঝেছেন, অপ্রীতিকর আচরণ করেছেন। এমনকি যোগীন-মা, গোলাপ-মা পর্যন্ত শ্রীমা সম্বন্ধে ভুল ধারণা করেছেন, একাধিকবার। নিবেদিতা প্রতিভাশালিনী, তিনি মাকে কতকটা বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি মা সম্বন্ধে বলেছেন ঃ "অনাড়ম্বর, সহজতম সাজে পরম শক্তিময়ী মহত্তমা এক নারী।" লাটু মহারাজ ঘনিষ্ঠভাবে মাকে দেখে বলছেন—মায়ের সহ্যগুণের তুলনা নেই। স্বামী তুরীয়ানন্দ কখনো মায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেননি, কিন্তু বরাবরই মায়ের প্রতি দৃষ্টি ছিল তাঁর। তিনি বলেছেন ঃ "আশ্চর্য ব্যাপার, মায়ের মধ্যে কখনো বেজার ভাব দেখতে পাইনি।" ঠাকুর তাঁকে বলতেন—আনন্দময়ী। সত্যি সত্যি মা সদানন্দময়ী। বলরাম বসু বলতেন, মা ক্ষমারূপা তপস্বিনী। বিভিন্ন জনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শ্রীমায়ের মধ্যে দুর্লভ গুণাবলীর সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর মধ্যে মৃদুতা, পবিত্রতা, মাধুর্য, জ্ঞান—এসব গুণ বিকশিত হয়েছিল, অথচ 'ছাইচাপা বেড়ালে'র মতো মা সেসব চাপা দিয়ে রেখেছিলেন, যার ফলে অনেকেই তাঁকে বুঝতে পারেনি। এসব গুণে সমন্বিত শ্রীমায়ের চরিত্র ছিল সত্যিই অনন্য, অতুলনীয়। একটি চমৎকার ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। একদিন স্বামীজী মার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, বলছেন ঃ "মা, এইটুকু জানি তোমার আশীর্বাদে আমার মতো অনেক নরেনের উদ্ভব হবে, শত শত বিবেকানন্দ হবে; কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও জানি, তোমার মতো মা জগতে একটিই, আর দ্বিতীয় নেই।"

কখনো কখনো অসম্ভব ঘটনা ঘটে। এত চাপা যে মা, তিনি একদিন ফস করে কথাপ্রসঙ্গে বলে ফেলেছিলেন ঃ "তুমি এরকম কোথায় পাবে?" নিজেকে দেখিয়ে বলছেন ঃ "আমার মতো?" কী ভীষণ কথা! তাঁর নিজ মুখের কথা! সত্যি, মায়ের তুলনা নেই—ভাবতেও অবাক লাগে।

[ক্রমশ]

পাতঞ্জল-যোগসূত্র

ব্যাখ্যাতা ঃ স্বামী প্রেমেশানন্দ

শ্রীমা সারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য লোকান্তরিত বহুমানিত সন্ন্যাসী স্বামী প্রেমেশানন্দ যখন অসুস্থ ও বার্ধক্যে উপনীত, তখনো তিনি প্রভুত মনোযোগের সঙ্গে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য এবং গীতা, পাতঞ্জল-যোগসূত্র প্রভৃতি শাস্ত্রাদির পাঠ নিত্য শ্রবণ করতেন। আবশ্যকস্থলে পঠিতাংশের মর্মার্থ ব্যাখ্যাও করতেন। ১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রেমেশানন্দ মহারাজ বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। সবসময় পালাক্রমে তাঁর মাথায় বাতাস করতে হতো। তখন সারগাছি আশ্রমে (প্রেমেশানন্দজী সেখানেই থাকতেন) বিজলীবাতি ছিল না। সেই অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি সেবক ব্রহ্মচারী সনাতনের (অধুনা রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দ) আবেদনে তাঁকে আলাদাভাবে পাতঞ্জল-যোগসূত্র পড়াতে সম্মত হন। সূত্রগুলি বোঝাবার জন্য তিনি যা বলতেন সেবক সেসমস্ত লিখে রাখতেন এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লিখিত আলোচনা প্রেমেশানন্দজীকে শুনিয়ে নিতেন। বহুদিন লেখাগুলি সীমিত গণ্ডির মধ্যে প্রচারিত ছিল—মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করলে অনেকেই উপকৃত হতে পারেন এই ভেবে আমরা স্বামী সুহিতানন্দ (তখন ব্রহ্মচারী সনাতন) লিখিত এবং স্বামী প্রেমেশানন্দ কথিত পাতঞ্জল-যোগসূত্রের ব্যাখ্যান ধারাবাহিকভাবে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশ করছি। বিশেষ করে তত্ত্বজিজ্ঞাসু, সাধনভজনে আগ্রহশীল পাঠকগণ যে এই আলোচনায় তাঁদের অনেক প্রশ্নের উত্তর পাবেন, সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। অবশ্য পূজ্যপাদ প্রেমেশানন্দ মহারাজ যেহেতু অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় এই আলোচনা করেছিলেন, সেজন্য এতে কিছু ভুলত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। তবে যেহেতু তাঁকে শ্রুতলিখিত আলোচনাগুলি প্রায় সর্বক্ষেত্রেই শুনিয়ে নেওয়া হয়েছিল সেহেতু এই ব্যাখ্যান, আমাদের বিশ্বাস, প্রমাদবর্জিত হয়েছে। তবে আমরা পাঠকদের পরামর্শ দিই যে, তাঁরা 'রাজযোগ' গ্রন্থে স্বামী বিবেকানন্দ কৃত ব্যাখ্যার সঙ্গে মিলিয়ে এই ব্যাখ্যানটি পাঠ করলে অধিক লাভবান হবেন।

পূজ্যপাদ প্রেমেশানন্দ মহারাজের সাবলীল পাতঞ্জল-যোগসূত্র ব্যাখ্যান ধারাবাহিকভাবে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য আমরা স্বামী সুহিতানন্দের কাছে কৃতজ্ঞ। স্বামী শরণ্যানন্দও আমাদের এবিষয়ে সাহায্য করেছেন। অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মুমুক্ষানন্দ এই মূল্যবান আলোচনা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের ব্যাপারে আমাদের বিশেষ করে পরামর্শ দান করেছিলেন।

—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

ভূমিকা

১

শত শত বৎসর আত্মোন্নতি সম্বন্ধে ভারতীয় চিন্তাশীলগণ গবেষণা করিয়া এই বিষয়ের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। যাহা জানিলে জানিবার আর কিছুই বাকি থাকে না, সেই বস্তুকে তাঁহারা জানিয়াছিলেন।

সেই জ্ঞানটি সকল মানুষের কাজে লাগাইবার জন্য তাঁহারা যে প্রবল উদ্যম করিয়াছিলেন, তাহাকেই 'বৈদিক সংস্কৃতি' বা 'হিন্দু সংস্কৃতি' বলা হইয়া থাকে। সাধারণত ইহাকে 'ধর্ম' বলা হয়। আজকাল যেমন জড়বিজ্ঞানের গবেষকরা কোন তত্ত্ব আবিষ্কার করিলে তাহা সকল মানুষের কাজে লাগাইবার চেষ্টা করেন, এই ঘটনাটি অবিকল সেইরূপই বটে।

মানুষের মনকে অন্তর্মুখী করিবার প্রথম উদ্যম হইল দেহ-মনের উৎকর্ষসাধন। ঐ সাধনের জন্যই আয়ুর্বেদাদি বিদ্যা আবিষ্কৃত হয়। তারপর মানসিক উন্নতির জন্য উপাসনা-প্রণালী প্রবর্তিত হয়। ঐ প্রণালী উন্নত হইতে হইতে প্রতীক উপাসনায় পর্যবসিত হয়। উপাসনা করিতে হইলে যে-কল্পনার সহায়তা লইতে হয় তাহা খুব বিকশিত না হইলে জগৎ-কারণ ব্রহ্মের কথা মানুষের পক্ষে বুঝা সম্ভব হয় না। উপাসনা করিতে করিতে মানুষের মনে যখন স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, কৈলাস প্রভৃতি আনন্দময় ধামের কল্পনা প্রবল হইয়া ঐসকল স্থানে বাস করিবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠে, তখন মানুষের বুদ্ধিতে ধ্যানপ্রবণতা উপস্থিত হয়।

মায়াবৃত চিৎ-শক্তি ব্যক্তিগত জীবনলীলা আরম্ভ করেন তৃণ, গুল্ম প্রভৃতি জীব হইতে। তারপর লক্ষ লক্ষ বৎসর ভোগের চেষ্টায় ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি মানবজীবন লাভ করেন। তারপর বিকশিত পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে পঞ্চভূতে

নির্মিত বহির্জগৎ ভোগ করিতে করিতে যখন দারুণ অতৃপ্তি উপস্থিত হয়, তখন নিত্যকৃষ্ণ নিত্যবৃন্দাবন প্রভৃতির কথা শুনিলে অভ্যুদয়ার্থীর মন ঐদিকে ধাবিত হয়। এইজন্য যে-মানবসমাজে অভ্যুদয়লাভের সুব্যবস্থা থাকে, তৎসঙ্গে অন্তর্জগতে অভ্যুদয়ের সংবাদও প্রচারিত হয়—সেই সমাজে অন্তর্জগতে যাইতে ইচ্ছুক লোক দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমানে পশ্চিমে বহির্জগতে অভ্যুদয়লাভের সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই আছে এবং ভারতবর্ষে অন্তর্জগতের সম্ভোগের সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু উভয়স্থলেই অভ্যুদয়ের দুইদিক না থাকায়, কেবল একদিকেই লোকের দৃষ্টি থাকায়, অন্তর্জগতে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা কাহারও ভিতরে দেখা যায় না। পশ্চিমদেশীরা অধ্যাত্মবিদ্যাকে জগতের উন্নতির কার্যে ব্যবহার করেন, আর ভারতে অন্তর্জগতের সন্ধান করিতে গিয়া ইহকাল পরকাল হইতে সাধক ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন।

প্রাকৃতিক নিয়ম পালন না করিলে কোন ব্যক্তির উন্নতি সম্ভব নয়। সেই নিয়ম পালন করিবার সুব্যবস্থা সমাজে না থাকিলে মানুষের পশুত্ব দূর করা অসম্ভব। এইজন্যই স্বামীজী যোগসাধনার কেন্দ্ররূপে বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাকে একটি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট-এ পরিণত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন।

২

অভ্যুদয়ের চরম সীমায় উপস্থিত হইলে মানব-মনে যখন 'ততঃ কিম্'—এই প্রশ্ন উঠে, তখন পুরোহিতরা যজ্ঞাদি কর্ম অর্থাৎ দেবোপাসনা শিক্ষা দেন। উপাসনার ফলে সত্ত্বগুণের বিকাশ হইলে ভক্তগণের নিকট হইতে প্রেমভক্তির সংবাদ পাওয়া যায়। ভগবানের উপর আকর্ষণ অনুভব করিতে করিতে যখন সত্যসত্যই তাঁহাকে নিকটে পাইবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠে তখন মানুষ যোগাভ্যাসের উপযোগী হইয়া থাকে। সংসার দেখা শেষ হইয়াছে, সংসারের অতীত নিত্যবৃন্দাবন সম্বন্ধে সংশয় দূর হইয়াছে এবং নিত্য নিরঞ্জনকে না পাইলে যখন আর চলে না তখন হয় যোগাভ্যাসের যোগ্যতা।

'ইহামুত্রফলভোগবিরাগঃ।' (বেদান্তসারঃ, ১৭) এবং সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ আমার স্বরূপপ্রাপ্তির প্রবল ইচ্ছা না হইলে যদি কেহ যোগপথে চলে, তাহা হইলে পথের দুধারে যে নানারূপ ঐশ্বর্য রহিয়াছে, তাহার আকর্ষণে যোগী যোগপথ ছাড়িয়া ভোগপথে চলিতে থাকেন। এইজন্য উপযুক্ত অধিকারীর অভাবে পতঞ্জলি প্রমুখ যোগিগণের প্রবর্তিত যোগি-সম্প্রদায় ধীরে ধীরে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তারই ফলে স্বামীজী মানবাত্মার সকল অংশকে অন্তর্মুখীন করিয়া জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করিবার নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই পথ অবলম্বন করিলে চারিযোগের যেসব বিঘ্ন আছে তাহা মানুষের অনিষ্ট করিতে পারে না। ইহা সম্যক্‌রূপে প্রণিধান করিয়া রাজযোগসাধনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

(২ক)

মানবজীবনের বিবর্তনের শেষ সীমায় তাহার চিত্তে বিবেক নামক বুদ্ধির বিকাশ হয়; তখন সে অন্তর্জগতের তত্ত্ব জানিবার জন্য কৌতূহল অনুভব করে। সৌভাগ্যবশত কেহ কেহ বৈদিক ধর্মের আত্মবিজ্ঞানের কথা জানিতে পারে। তাহার ফলে ক্রমেই তাহার বুদ্ধিতে সৃষ্টির সমস্ত রহস্য ধরা পড়ে। কিন্তু এই সম্বন্ধে সকল কথা জানিতে ও বুঝিতে পারিলেও এই জগৎ হইতে নিজেকে সরাইয়া পূর্ণত্বলাভ করা সম্ভব হয় না। প্রায়শ দেখা যায়, যাঁহারা ব্রহ্মবিজ্ঞানের বিষয় সব কথা জানেন, তাঁহারা দেহমনের বন্ধন হইতে মুক্ত নহেন। যাঁহারা নিদিধ্যাসন করিয়া "আমি যে নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত" তাহা বোধে বোধ করেন, তাঁহারাই জন্মমরণের হাত হইতে মুক্তিলাভ করেন। নিদিধ্যাসনই মুক্তিলাভের সাক্ষাৎ উপায়, জ্ঞানবিচার নহে। তাই যোগের পথ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে সচেতন না হইলে জ্ঞান ব্যর্থ হয়।

আমরা দেখিয়াছি, সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ে ধীমান মহৎ তত্ত্ব-জ্ঞানীরাও ব্যবহারে বিজ্ঞানীর মতো চরিত্রবল প্রায়ই দেখাইতে পারেন না। অনেকের বিচার করিতে করিতে মাথা খারাপ হইয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা নিদিধ্যাসন অর্থাৎ যোগাভ্যাস করিয়া চিত্তকে ব্রহ্মাভিমুখী করেন, তাঁহারা পূর্ণজ্ঞানলাভ না করিলেও তাঁহাদের জীবনে অপূর্ব মাধুর্যের বিকাশ হইয়া থাকে।

(২খ)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, বহুজন্ম পুণ্যকার্য করিলে মানুষের চিত্ত শুদ্ধ হয়। তাহার ফলে শেষ জন্মে সাধকের মনে ভগবানলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হয়। "যেষামন্তগতং পাপম্।" (৭।২৮)

ভগবানের উপর মনের টান থাকিলেও ভগবানেব সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত দেহ-মনের প্রবৃত্তি নিরোধ করিতে পারা যায় না। সাক্ষাৎকার করিতে হইলে ভগবানের সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং ঐশ্বর্য লইয়া মাতিয়া থাকিলে মন 'প্রত্যক্‌চেতনাভিমুখী' নাও হইতে পারে; সাধারণত দেখা যায়, ভক্তরা ভগবানের সেবাপূজা, মহিমাকীর্তন ও ঘোষণা লইয়া মাতিয়া থাকায় মন অন্তরের দিকে বেশিদূর অগ্রসর হয় না। কখন কখন অভিমানবশে অভক্তকে অবহেলা, অবজ্ঞা করা, অন্য মতাবলম্বীদিগকে ঘৃণা করা প্রভৃতি দুষ্কার্যে ভক্তের চিত্ত অতি নিম্নগামী হইয়া পড়ে। এইরূপে আরো নানাপ্রকার অসংখ্য বাধা ভক্তকে ভগবান লাভের পথে বাধা দিয়া থাকে। তাই ভগবানের চিন্তায় তন্ময় হইতে না পারিলে

ভক্তিসাধনার সিদ্ধি সম্ভব নহে। ভক্তিসাধনার পথেও নিদিধ্যাসনই শেষ ধাপ। 'ঈশ্বর প্রণিধান' ব্যতীত ভক্তিপথে মুক্তিলাভ সম্ভব নহে।

(৩)

মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মকেও যোগের সহায়করূপে পরিণত করা যায়। তাহা করিতে হইলে কর্মের ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও মনকে কর্মমুক্তির দিকে টানিয়া রাখিতে হয়। যদি তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে মুক্তি যে আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাহা বুঝিতে পারি এবং সর্বদা ঐ মুক্তিরূপ আদর্শের দিকে মনকে টানিয়া রাখিতে পারি, তাহা হইলে কর্মের মধ্যেও মনে মৃদু নিদিধ্যাসনের ভাব থাকিতে পারে। 'মৃদু' বলিবার কারণ এই যে, কর্ম সুসম্পন্ন করিতে হইলে মনের অনেকখানি কর্মের দিকে দিতেই হইবে, তখন মনের একটি অংশে মাত্র মুক্তির চিন্তা অবস্থান করিবে।

কর্মযোগের একটি সুপ্রসিদ্ধ উদাহরণ আছে—'বড়মানুষের বাড়ির ঝি'! ঝিটি নিজ সংসার পরিচালনে অক্ষম বলিয়া বাধ্য হইয়াই বড়মানুষের বাড়িতে ঝিগিরি করিতে আসে। সে নিশ্চিতরূপে জানে, তাহার একটি স্বগৃহ ও কয়েকটি স্বজন আছে—যাহাদের জন্য সে খাটিতেছে এবং বাবুর বিন্দুমাত্র অসুবিধা হইলেই তাহাকে তাড়াইয়া দিবে। অবশ্য আমরাও সত্যসত্যই নিজ নিকেতন পরিত্যাগ করিয়া দেহ-মনের 'ঝিগিরি' করিতেছি, বাধ্য হইয়া। কিন্তু আমরা তো তাহা জানি না, জানিলেও বুঝি না, বুঝিলেও স্বগৃহে প্রত্যাগমনের আকাঙ্ক্ষা মনে আনিতে পারি না।

সুতরাং বড়মানুষের বাড়ির ঝি হইতে যাওয়া আমাদের পক্ষে একটি ভাঁওতামাত্র। জ্ঞানবিচার করিয়া আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত জানিলাম, ভগবানের সৌন্দর্য-মাধুর্যে মুগ্ধ হইলাম, তথাপি দীর্ঘকাল নিরন্তর পরম শ্রদ্ধার সহিত নিদিধ্যাসন না করিলে ঐপথে বেশিদূর অগ্রসর হওয়া যায় না। আর কর্মের মধ্যে মনকে ছড়াইয়া দিয়া মুক্তিপথে অগ্রসর হওয়া কী যে দুরূহ ব্যাপার তাহা কি আর বলিতে হয়!

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন, বজ্রদৃঢ় দেহ ও মন যাহাদের ছিল, সেই ক্ষত্রিয় রাজগণ ঐ কর্মযোগ সাধন করিতেন। সুতরাং কর্মযোগ অত্যন্ত কঠিন সাধনা। "ইমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।" (৪।২)

তবে অনন্ত জীবনের কর্মের অভ্যাস সহসা পরিত্যাগ করা একান্ত অসম্ভব বলিয়া সকল যোগসাধনারই আদিতে নিষ্কাম ভাব অভ্যাস করিবার জন্য কর্ম করা অপরিহার্য। সেইজন্যই আমাদের মতন অনধিকারীদিগকে স্বামীজী এত কর্মের প্রেরণা দিয়াছেন। কিন্তু নিষ্কাম কর্ম করিতে হইলেই কর্মের উদ্দেশ্য মুক্তির নিদিধ্যাসনা সম্বন্ধে সতত সচেতন থাকিতেই হইবে। কর্ম করিতে করিতে মনের টান ঐদিকে তো থাকিবেই এবং 'ফুরসত' পাইলেই নিদিধ্যাসনে মনকে তুলিয়া রাখিতে হইবে—যেমন ছুটি পাইলেই ঝিটি বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হয়।

তাহা হইলে কর্মযোগেরও শেষ সোপান ধ্যানযোগ।

(৪)

অসাধারণ ধীমান, ভাবুক ও পরার্থপর ব্যক্তিরা জ্ঞান বা ভক্তি বা কর্মের সহায়ে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। কিন্তু এরূপ অধিকারী জগতে অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। আমাদের মতন সাধারণ লোকের পক্ষে অনেকসময়ই খুব ফলপ্রদ হয় না। কুস্তিগীরেরা ব্যায়াম করিয়া খুব আনন্দ পায়, ঠিক তেমনি বুদ্ধিমান লোকেরা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় সম্বন্ধে বিচার করিয়া বুদ্ধিচর্চায় আমোদলাভ করেন। ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য সব দেশেই কত দার্শনিক পণ্ডিত রহিয়াছেন, যাঁহাদের চিন্তাপ্রণালী অত্যন্তই চিত্তাকর্ষক। আমরা উপন্যাস পড়িয়া যে আনন্দ পাই, মানসিক কসরতকারীরা ঐসব গ্রন্থপাঠে ঠিক তেমনই আনন্দ পাইয়া থাকেন। তবে অবশ্য ঠিক বেদান্তমতে চিন্তা করিলে মন বহু ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায়, কিন্তু মনকে স্বস্বরূপে তন্ময় না করিতে পারিলে মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনাই নাই।

ভক্তিশাস্ত্রে যে প্রেমপ্রীতির কথা আলোচিত হইয়াছে, তাহা তো উপন্যাসে লিখিত মানুষের প্রীতি মিলন বিরহের আকর্ষণেরই একটি উচ্চতর রূপ। একটি সুন্দর মূর্তির প্রতি ভালবাসায় হাসা-কাঁদা-নাচা-গাওয়াতে খুব সুখলাভ হয়। অনেক স্থলে ভগবানের সৌন্দর্য-মাধুর্য কীর্তন করিতে করিতে বহু ভক্তের সমাধি (ভাব) হইতে দেখা যায়। ইহাও একপ্রকার মানসিক কসরত।

যথারীতি সাধনসহায়ে দেহাত্মবুদ্ধি দূর না করিলে মুক্তি অসম্ভব। যুগাবতার পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণাশ্রিত ভবনাথ, ছোট নরেন প্রভৃতি অনেকের ভাব হইত; কিন্তু তাহাদিগকে পরে যথারীতি সংসার করিতে হইয়াছিল।

মোটকথা, যথারীতি যোগাভ্যাস করিয়া ধাপে ধাপে মনকে উপরে তুলিয়া চিদাকাশে না গেলে বিষয়বাসনা দূর হয় না। গীতা "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ..." (৩।৪২) দুই শ্লোকে এই কথা স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন—তাহার সারমর্ম এই যে, নিজের বোধশক্তিকে দেহ-মন হইতে ঊর্ধ্বে তুলিয়া স্বস্বরূপ বোধ না হওয়া পর্যন্ত শান্তিলাভ অসম্ভব। জ্ঞানবিচারে মুক্তির স্বরূপ বোঝা যায়, ভক্তিতে মুক্তির স্বরূপ ঈশ্বরের চিন্তায় রুচি হয়, নিষ্কাম কর্ম বুদ্ধিকে মার্জিত করিয়া দেয়; কিন্তু ধ্যানযোগই সর্বশেষে জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করিতে পারে। ধ্যানযোগের সহায়তা না নিলে পূর্বোক্ত যোগত্রয়ের ফললাভ সুদূরপরাহত। সকল যোগেরই তো এক সুর—জীবকে ঈশ্বরের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া; সুতরাং মুমুক্ষুর প্রথম হইতেই ধ্যানাভ্যাস একান্ত আবশ্যক। [ক্রমশ]

দোল, দোল, দোল

সুতপা চট্টোপাধ্যায়

দোল, দোল, দোল!
মনের মাঝে প্রাণের দোল
ফাগুন রাঙা আগুন ঝরা
ধরার পরে ঝরল রে
মাতল পরাণ, মাতল রে।

দোল এসেছে ধরার পরে
রাঙিয়ে ধরা, সাজিয়ে তারে
উৎসবেতে মাতল ভূমি
সবাই সুখে ভাসল রে
মাতল পরাণ, মাতল রে।

লাল পলাশের রঙটি দেখে
শিমূল-গাঁদার রঙটি মেখে
চারিদিক যে রঙিন হলো
হৃদয় সবার সাজল রে
মাতল পরাণ, মাতল রে।

নবদ্বীপে গোরাচাঁদের
উদয় হলো দোলের দিন
গৌড়ভূমি উঠল জেগে
বাজল হৃদে কিসের বীণ?
সাজিয়ে তাঁরে নররূপে
রাঙিয়ে তাঁরে আবীর ফাগে
ধন্য হলো ধরার জীবন
ভরল সুখে ভরল রে
মাতল পরাণ, মাতল রে।

দোলের আবীর, রঙ আর জলে
বুকের মাঝে তুফান তোলে
আঁখির সুধা চোখের জলে
হৃদয় সবার ভাসল রে
মাতল পরাণ, মাতল রে।

সন্ন্যাসী

সন্তোষকুমার মাজী

অহেতুক কজন বা ভালবাসে বল,
এখন সন্ন্যাসী ছাড়া কারা বা দাক্ষিণ্য দেবে?

তাদের মনের মধ্যে সংসারের হ্যারিকিরি নাই
তাদের মনের মধ্যে অহেতুক কুটিলতা নাই
তারা আছে শিক্ষা নিয়ে, সেবা নিয়ে, পরিচর্যা নিয়ে।

অহেতুকী কজন বা ভালবাসে বল,
এখন সন্ন্যাসী ছাড়া কারা বা দাক্ষিণ্য দেবে?

ফাল্গুন

শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়

চল যাই আজ দূর গ্রাম-পথে ফাগুনের আহ্বান,
দোয়েল ডাকিছে সুমধুর সুরে করিয়া আমন্ত্রণ।
তটিনীর সুরে শুনেছ কি আজ অবাক একটি গান
চল যাই আজ হাতছানি দিয়ে ডাক দিল শালবন।

নদীতীরে ঐ শঙ্খ-ধবল কুর্চিফুলের বনে
একটা কোকিল আপনার মনে লুটোপুটি খায় শুধু
আহা দ্যাখো ওর কাজল ডানায় কিসের স্বপ্ন আঁকা
ফাগুনের ডাকে দূর নীলিমায় উড়ে চলে ক্ষণে ক্ষণে।

চল যাই আজ বহুদূরে ঐ সাঁওতাল-গ্রাম ডাকে
মিঠে মিঠে এক মাদলের সুরে হৃদয়ের সঙ্গীতে
এনে দেবে মনে আরেক জীবন কখন অকস্মাৎ,
চল যাই আজ ফাগুন এসেছে অপরূপ ভঙ্গিতে।

ফাগুন এসেছে প্রকৃতির তীরে সুরে সুরে গান গেয়ে—
জেগেছে বনানী আজিকে হঠাৎ কোকিলের ডাক পেয়ে!

বাউল

জয়নাল আবেদীন

অনেক কষ্টে একতারা সাজিয়েছি
গান শোন আর নাই শোন
ভিক্ষের ঝুলি ভরে দাও।

অনেকদিন তোমাদের সাথে থেকে বড় হয়েছি
সেই বড়কে ঘুমিয়ে রাখতেই বদলে গেছি কিছুটা
তবু আমি তোমাদের লোক
বাউল হয়েছি বলে ভালবাসার গিঁট বেঁধে গেছে
আরো বেশি করে।

কখন যে কী হয়

মোহন সিংহ

কেউ কেউ প্রায় সারারাত শুকতারা দেখার আশায় জেগে থাকে...
অথচ আশ্চর্য, পুবাকাশে যখন সে তারা দীপ্যমান,
তখন সে ক্লান্ত হয়ে ঘুমের জগতে চলে যায়!

কেউ কেউ ঘর থেকে পথে নামবে বলে
একা একা মধ্যরাতে দূরের আকাশে কালপুরুষ খোঁজে...

অথচ আশ্চর্য, কালপুরুষের পরিবর্তে
সে চাঁদের পাশে রোহিনীকে দেখে ফেলে...

সুদূরের পথ তার ঘরের চৌকাঠে মাথা ঠোকে!

এখনি সময়

বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সারাদিন কোমরে গামছা বেঁধে
সাগরের তীরে তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ।
জলে নাম
সূর্য যে মাঝ আকাশে—খেয়াল করনি?
আরো দেরি হলে
পশ্চিমে ঢলবে সূর্য
স্নান তুমি করবে কখন?
ঢেউ বন্ধ হলে পরে?
সাগরের ঢেউ শেষ হয়?

জীবন সমুদ্রতীরে
ঢেউ শেষ হওয়ার আশায়
দাঁড়িয়ে থাকলে আর স্নানই হবে না।
ঢেউ দেখ—মুগ্ধ হও
প্রয়োজনে ভয়ও পেতে পার মাঝে মাঝে।
কিন্তু স্নান করতে হলে
ঢেউয়ের মধ্যেই তোমাকে নামতে হবে
একথা ভুলো না।
তা নাহলে স্নানই হবে না।
যাও—ঢেউয়ের মাথায় চেপে
ঢেউ ভেঙে ভেঙে
স্নাত হয়ে ফিরে এস—এখনি সময়।

কোন্ কারিগর

অতীন দাশ

কেমনে বিলাও এত প্রেম
কেমনে উজাড়ো নিঃশেষে
হৃদয়ে সাগর অফুরাণ।
আবেগে উত্তাল বান ভেসে!

নিজেতে নিজেই হও হারা
অন্তহীন বিধাতার খুশি
ঢেউয়ে ঢেউয়ে মরাল ডাগর
ঋতুভেদে ছেদ নেই—ফুলেল বাহার।

আমি অকিঞ্চন
বিপুল প্রত্যাশা বুকে পুষি
বিন্দুতে সিন্ধুর ছায়া খুঁজি...

কী নিপুণ কারিগর
যে গড়েছে তোমার প্রতিমা!

উলটো পুরাণ

তারাশঙ্কর পাণিগ্রাহী

উপত্যকায় লাল হলুদের মেলা...
পাগলাঝোরা সুপ্ত বুকের খাঁজে,
নিঃশ্বাসে প্রাণ নিখাদ খাঁটি সোনা
উলটো পুরাণ লাল হলুদের মাঝে।
শুনতে কী পাস "হেঁইও রশির টান?"
ফেলবে ভেঙে প্রাচীন অট্টালিকা,
দুর্গে প্রচুর সাপের উপদ্রব—
কপালে চাই রক্ততিলক টিকা।
শ্যামলা মায়ের আঁচলে মুখ ঢেকে
রাত্রি ঘুমায় ক্লান্তিনাশের আশে,
রাতজাগা কোন পাখির হঠাৎ ডাকে
ঘুম ভেঙে যায় কাজলা নদীর পাশে।
মাঝ দরিয়ায় তুফান এবং ঝড়ে
মাল্লা-মাঝির পালছেঁড়া নৌকায়,
ডুবন্ত প্রাণ, তবু বুকের মাঝে
বেঁচে থাকার ইচ্ছেটা চমকায়।
ইচ্ছামৃত্যু বর পায়নি বলে
ভীষ্ম হতে চায় না তো কেউ আজ,
উলটো পুরাণ শূন্যে শেকড় খোঁজে
সময় তো নেই, সারতে হবে কাজ।

ফুলকে প্রশ্ন

প্রভাকর মাঝি

দেবপূজায়, রোগে-শোকে, জন্মদিনে—ফুল, তুমি অনিবার্য।
মাঙ্গলিক কোন অনুষ্ঠানে তো কথাই নেই
তুমি বরের চেয়ে বরণীয়।
সম্মানের লেন-দেনদার।
তোমাকে নমস্কার।

মগ্ন কুঁড়ি থেকে চোখ খুলতেই দু-পাশাড়ি বিস্ময়।
পাখি ও আকাশ-পরী তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছে...
ভূমণ্ডলে তোমার মতো নিঃশত্রু কেউ আছে নাকি?
ক্ষীণায়ু জীবনেই একটা অকলঙ্ক কালের পিঠে দাগ কেটে যাও।

সুন্দর ও সফলের পূজক, তোমাকে প্রীতি জানিয়ে
সবিনয়ে
একটা মৃদু প্রশ্ন করি :
মানুষ যাদের ব্রাত্য করে রেখেছে
সেই জীবনযুদ্ধে দিশেহারা লক্ষ্মীছাড়াদের
কাউকে কখনো কি সম্মানিত করেছ?

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

চিকিৎসকের নৈতিক সততা ও মানবিকতা

"God and the doctor we alike adore
But only when in danger, not before;
The danger o'er, both are alike requited.
God is forgotten, and the doctor slighted."

—John Owen (1560-1622)

সুপ্রাচীন কাল থেকে চিকিৎসকের বৃত্তিকে সবচেয়ে মহান বৃত্তি (noblest profession) বলে মনে করা হয়েছে। আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার জনক গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটিস (আনুমানিক ৪৬০-৩৭৭ খ্রীস্ট পূর্বাব্দ) প্রবর্তিত শপথবাক্য Hippocrates' Oath-এ প্রতিটি চিকিৎসকের অবশ্যমান্য নৈতিকতা উচ্চারিত। মনে করা হতো—চিকিৎসকের সেবাই মুখ্য, পারিশ্রমিক গৌণ। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে চিকিৎসকের অবশ্যমান্য এই নৈতিকতারও কিছু কিছু পরিবর্তন করতে হয়েছে, কিন্তু চিকিৎসা পরিষেবা কখনো নীতিবর্জিত হয়নি। দুঃখের বিষয়, বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থায় বিশেষ বা মহান সেবার পেশার স্বীকৃতি হারিয়ে চিকিৎসা পরিষেবাও একটি পণ্য মাত্র। যুক্তিতর্কে বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়নি, আদালত পর্যন্ত যেতে হয় ও মহামান্য আদালতের রায়ে চিকিৎসাও ক্রেতা-সুরক্ষা আইনে এখন অন্য যেকোন ব্যবসায়ের মতো ব্যবসা-মাত্র। এই পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির সুফল ও কুফল দুইই দেখা যাচ্ছে। এনিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনাও চলছে, কিন্তু পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। বিত্তশালীরা 'ভ্রান্ত' চিকিৎসার বিরুদ্ধে আদালতে যাচ্ছেন। চিকিৎসকরাও সাবধানী। সাধারণ মাথাধরায় 'ব্রেন স্ক্যান' করতে বলছেন, কি জানি যদি পরে ব্রেন টিউমার ধরে পড়ে! কোন্ চিকিৎসার ত্রুটি ইচ্ছাকৃত অবহেলার কারণে, আর কোন্‌টি পেশাগত নৈপুণ্যের স্বাভাবিক ব্যক্তিগত স্তরভেদজনিত—তা নির্ধারণ করা প্রায় দুঃসাধ্য। দুপক্ষেরই সংগঠন আছে, আদালত আছে, সরকারি উপদেষ্টা পরিষদও (Medical Council) আছে। কিন্তু কোন অভিযোগের আশু সুরাহা হতে দেখা যায় না।

বিস্ময়কর এই যে, ভারতের প্রায় একশ কোটি জনগণের শিশু ও হতদরিদ্র নিরক্ষরদের বাদ দিলে প্রায় সবাই ডাক্তার! পত্র-পত্রিকায় স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রোগ ও তার চিকিৎসা) আলোচনা খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। এর সুফল কুফল আরেক তর্কের বিষয়। রোগীরা নিজেরাই ডাক্তারদের নানা পরামর্শ দিচ্ছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এমনকি চিকিৎসাও বাতলাচ্ছেন। সাধারণ অর্থনীতি অনুসারে কোন পণ্যের গুণমান উচ্চ হলে ও তার চাহিদা বাড়লেই মূল্যবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী নয়, কারণ মূল্যবৃদ্ধি একস্তরে জনপ্রিয়তা কমিয়ে দিতে পারে ও পণ্যটা বাজার হারাতে পারে। বিশেষজ্ঞ ও অতি-বিশেষজ্ঞ (super specialist) চিকিৎসকদের পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে এটির বিপরীত দেখা যায়। জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে 'ফি' অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে চলে। বলা হয়, রোগীর চাপ কমাতে এটা করতেই হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলে। যাই হোক, স্বচ্ছল এমনকি অপেক্ষাকৃত স্বল্প-আয় ব্যক্তিও বড় চিকিৎসকের মাপ করেন তাঁর 'ফি'-র উচ্চতা দিয়ে। চিকিৎসায় সুফল পাওয়া যাক আর নাই যাক, বেশি 'ফি' দিয়ে অনেকেই বেশ তৃপ্তি পান ও আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে সগর্বে বলে থাকেন। ডাক্তারবাবুরাও অনেকেই লজ্জাশরম ত্যাগ করে পুরোপুরি ব্যবসায়ে নেমে পড়েছেন। চিকিৎসা পরিষেবায় ন্যায়নীতি, মানবিকতার আর কোন ঠাঁই থাকছে না। কেবলই আর্থিক লেনদেন। পরীক্ষাগারগুলির রমরমা ব্যবসা।

কিন্তু তবু কথা থাকে। চিকিৎসা পরিষেবা এমন একটি জীবিকা, যেখানে মানবিকতা ও নৈতিকতা অপরিহার্য। আজকাল উচ্চবিত্ত পরিবারের অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী স্বাভাবিকভাবেই পেশাগত চরম উৎকর্ষতায় যেতে চান ও পারেন। কিন্তু পরীক্ষায় পাশ করে কিছু বিশেষজ্ঞ ছাপ নিয়েই পড়াশুনা প্রায় বিসর্জন দিয়ে যেকোন সৎ বা অসৎ উপায়ে তাড়াতাড়ি বাড়িগাড়ির ব্যবস্থা করা অন্য কিছু কিছু পেশায় সম্ভব ও সকলের কাছে অশালীন মনে না হলেও ডাক্তারীতে সেটা উচিত নয়। চিকিৎসা মহান বৃত্তি, এখানে মানবিকতার স্থান খুবই উচ্চ—এসব যুক্তি আজকে অনেকেই অচল বলে মনে করেন। ক্রেতা-সুরক্ষা আইন তাঁদের এই চিন্তাধারাকে পুষ্ট করেছে। আইনগতভাবেই যখন চিকিৎসা পরিষেবা একটি পণ্য, তখন আসল প্রশ্নটি এসে যায়। চিকিৎসা যদি একটি পণ্যই হয়, তবে এই ব্যবসায়ের ব্যবসায়ীদের খেয়াল রাখতে হবে, পণ্যের গুণমান মূল্যের সঙ্গে যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। চিকিৎসা ব্যবসায়ে গুণমান বজায় রাখতে পারে জীবনব্যাপী জ্ঞানচর্চা ও তার যথাযথ প্রয়োগ। ক্রমবর্ধিত পারিশ্রমিক ও পরিষেবার জাঁকজমক নয়। আর এই প্রয়োগের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত নৈতিকতা ও মানবিকতা। এগুলিও পণ্য। চিকিৎসকমাত্রেই স্বীকার করেন যে, তিনি কিছু রোগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করতে পারেন আর কিছু রোগীকে রোগযন্ত্রণা থেকে কিছুটা উপশম দিতে পারেন। কিন্তু সকলকেই দিতে পারেন সান্ত্বনা। প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায়—বড় ডাক্তারবাবুরা রোগী বা তাদের আত্মীয়-স্বজনদের রোগের বিষয়ে যথেষ্ট বুঝিয়ে বলেন না। তাঁদের মধ্যে সহানুভূতিরও অভাব দেখা যায়। অনেকেই অচিকিৎসক সহকারীর মাধ্যমে কথা বলতে বলেন।

একদিকে চিকিৎসা পরিষেবায় দ্রুত ও আশ্চর্যজনক কারিগরি উন্নতি, আর অন্যদিকে তার প্রয়োগে প্রয়োজনীয় জ্ঞানচর্চা ও মানবিকতার অভাব এবং সর্বোপরি এক অকল্পনীয়

অর্থলোলুপতা। চিকিৎসা পরিষেবার এই ভয়াবহ বর্তমান অবস্থা চিকিৎসক, রোগী ও সমাজ—কারো পক্ষেই কল্যাণকর নয়।

ডাঃ অমিয়কুমার ভট্টাচার্য
মানিকতলা মেন রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫৪

বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরীর অবদান

সাহিত্য হচ্ছে জনজীবনের দর্পণ। এর মধ্যে ফুটে ওঠে অতীতের অস্বচ্ছ চিত্র, বর্তমানের বাস্তব পরিস্থিতি আর ভাবিকালের জীবনযাত্রার রূপরেখা। তাই মানবজীবনে সাহিত্য একটি অপরিহার্য বিষয়।

সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রাখার মূলে গ্রন্থাগারগুলির দায়িত্ব তাই অনেকখানি। বাঙলা সাহিত্যে উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরীর অবদান অসামান্য। ১৮৫৯ সালে প্রতিষ্ঠাতা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এর নাম দিয়েছিলেন 'উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী'। পরবর্তী কালে প্রতিষ্ঠাতার নামটি সংযোজিত হয়েছে।



জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী, উত্তরপাড়া। মূল প্রবেশদ্বারে স্তম্ভশ্রেণীর মাঝে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের আবক্ষ মর্মরমূর্তি।
সৌজন্যে : দ্য নিউ রূপশ্রী স্টুডিও, উত্তরপাড়া

গঙ্গাতীরে বিশাল খিলানের ওপর নির্মিত এই পাঠাগারটি বাংলা তথা সারা ভারতের গৌরবের প্রতীক। কলাপাতা-তালপাতা-তুলোট কাগজে লিখিত বহু দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য পুঁথি-দলিল-নথিপত্র, বিভিন্ন স্বাদের প্রাচীন ও আধুনিক পত্র-পত্রিকা ও পুস্তকে পরিপূর্ণ এই রত্নখনিতে সাহিত্যপ্রেমী ও গ্রন্থপ্রেমী বহু বিশিষ্ট গবেষক এবং ঐতিহাসিক এসে পরিপুষ্ট করেছেন তাঁদের জ্ঞানভাণ্ডার, মূর্ত করেছেন তাঁদের লেখনী, মুখর করেছেন তাঁদের সৃষ্টির কর্মশালা। সাহিত্যক্ষেত্রে পুস্তকসরণি একটি দিগ্দর্শন-যন্ত্রবিশেষ। কারণ, এইসব তালিকা মারফত আমরা সমকালীন শিক্ষা, সাহিত্য ও ধর্ম ইত্যাদি বিষয় অনুসারে বহু প্রয়োজনীয় তথ্যের বিশদ বিবরণ আহরণ করতে পারি।

এপ্রসঙ্গে আজকের বাঙলা সাহিত্যের প্রসারে ইংরেজ পাদ্রী স্যার জেমস লঙের নাম সর্বাগ্রে আসে। তিনি উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলার প্রচলিত প্রবাদসঙ্কলন তো করেইছিলেন, তাছাড়া একাধিক পুস্তকতালিকাও রচনা করে সঙ্কলক হিসাবে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। ১৮৫৫ সালে জেমস লঙের সঙ্কলিত একটি ক্যাটালগের অন্তর্ভুক্ত ১৪০০ বাঙলা পুস্তকের অধিকাংশই এই পাঠাগারে পাওয়া যায় বলে তিনি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকাতে স্বীকার করেছেন। সেই বছরই তিনি মোট ৯৪৪টি বাঙলা পুস্তক সঙ্কলিত ৫৬ পৃষ্ঠার আরো একটি তালিকা প্রণয়ন করেন এবং এর প্রতিটি বইই এই পাঠাগারের প্রতিষ্ঠাতা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রদত্ত।

সাহিত্যজগতে মূল উপাদান হলো অভিধান। এই প্রসঙ্গে নগেন্দ্র বসু সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ' উল্লেখযোগ্য। বাঙলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিধান বিশ্বকোষের সঙ্কলনের শুরুতে নগেন্দ্র বসু এই পাঠাগারের সাহায্য পেয়েছিলেন বলে তিনি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকাতে উল্লেখ করেছেন। সাহিত্যজগতে উপন্যাস অন্যতম সম্পদ। ১৮৫২ সালে প্রথম উপন্যাস হিসাবে 'আলালের ঘরের দুলাল' পরিচিতিলাভ করেছিল, কিন্তু পরে এ নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। কারণ, ন্যাশনাল লাইব্রেরীর ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণায় ঐ একই বছরে প্রকাশিত মিসেস মুলেন্স প্রণীত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' বাঙলার প্রথম উপন্যাস হিসাবে ধরা হয়েছে। পরবর্তী কালে উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরীতে আবিষ্কৃত অন্য এক তথ্যের ভিত্তিতে অধ্যাপিকা সবিতা দাস মিসেস মুলেন্সের উক্ত রচনাটিকে একটি ইংরেজী গ্রন্থের অনুবাদ হিসাবে ধার্য করায় 'আলালের ঘরের দুলাল'কেই বাঙলার প্রথম মৌলিক উপন্যাস বলে ধরে নেওয়া হয়। তবে আজো এই বিতর্কের পরিসমাপ্তি হয়নি।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকারের ছাত্রাবস্থা থেকেই এই পাঠাগারে যাতায়াত। পরবর্তী কালে তাঁর মূল্যবান খেতাব লাভের ব্যাপারে তিনি এই পাঠাগারের ঋণকে অস্বীকার করেননি। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের একসময়ের উপাচার্য ডঃ সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্যকে রামপ্রসাদের জীবনীর উপাদান সংগ্রহ করতে এই পাঠাগারের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল। পুরীর জগন্নাথের ইতিহাস রচয়িতা পি. এন. ব্যানার্জীও তাঁর গ্রন্থের মুখবন্ধে এই পাঠাগারের ঋণ স্বীকার করেছেন। এই ধরনের আরো অনেক উদাহরণই দেওয়া যায়। অন্যদিকে তৎকালীন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে স্যার জেমস লং ছাড়াও স্যার অ্যাসলে ইডেন, মিস কার্পেন্টার, স্যার এডুইন আর্নল্ড, স্যার রিভার্স টমসন এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নবজাগরণের এক-একজন দিকপাল—যেমন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, কেশবচন্দ্র সেন, ঋষি অরবিন্দ, মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রমুখ এই পাঠাগারে আগমন করেছেন। পরবর্তী কালে সজনীকান্ত দাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সুকুমার সেন, বিনয় ঘোষ প্রমুখ প্রথিতযশা পণ্ডিত-সাহিত্যিকদের আগমন ঘটেছে এই

সাহিত্যতীর্থে এবং তাঁরা এখানকার মূল্যবান গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হয়েছেন—একথা বলাই বাহুল্য।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের এই পাঠমন্দিরে আগমন একটি স্মরণীয় ঘটনা। কবি এখানে তাঁর পুত্র-কন্যাদের ফরাসী ভাষা শিক্ষার আসরে যোগ দিতেন তো বটেই, উপরন্তু কথাপ্রসঙ্গে গ্রীক, রোমান, ইংরেজী ও ইটালীয় কবিদের আলোচনায় সে-আসর মুখর করে তুলতেন। এই পাঠাগারে বসেই তিনি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র সমালোচনা করেছেন, কবি কালিদাসের 'মেঘদূত' আবৃত্তি করে সংস্কৃত ভাষার ধ্বনি-গৌরব বাঙলায় কিভাবে প্রকাশ করা যায় তা বুঝিয়েছেন। এই পাঠাগারেই কবি একদা বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এভাবে অনেকেই কবির সান্নিধ্যলাভ করে সাহিত্যরসের স্বাদ গ্রহণ করেন। সাহিত্যের প্রসারতার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে এই পাঠাগারটি পাঠকদের কাছে বাস্তবিক একটি পীঠস্থান।

বর্তমানে আমাদের দেশের অন্যতম জাতীয় সম্পদ এই পাঠাগারটির গৌরবময় ইতিহাস ও সাহিত্যজগতে তার অসামান্য ভূমিকার কথা অনেক বাঙালীরই অজানা। তাই 'উদ্বোধন'-এর মতো জনপ্রিয় এবং বাংলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রে আমার এই পত্রের অবতারণা।

ফুল্লরা মুখোপাধ্যায়
রাজমোহন রোড, উত্তরপাড়া
হুগলী-৭১২২৫৮

প্রসঙ্গ 'বিচিত্ররূপা সরস্বতী'

'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪০৭ সংখ্যায় সুখময় সরকারের 'বিচিত্ররূপা সরস্বতী' নিবন্ধটি পড়ে আনন্দ পেলাম। এই প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি তথ্য আমি সংযোজন করতে চাই।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ মতে, সৃষ্টিকালে প্রধানা শক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত হন—রাধা, লক্ষ্মী, সাবিত্রী, দুর্গা ও সরস্বতী। শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠ থেকে আবির্ভূত হয়ে দেবী সরস্বতী তাঁকেই কামনা করলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নারায়ণ-ভজনা করতে বলেন। লক্ষ্মী এবং সরস্বতী দুজনেই নারায়ণের স্ত্রী। দেবীকে শ্রীকৃষ্ণ প্রথম পূজা করেন। সেই থেকে দেবীর পূজার প্রচলন হয়। দেবী-ভাগবতে সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী।

শৈবাগমতন্ত্রে দেবী সরস্বতীকে 'সিদ্ধবিদ্যা' ও 'ষোড়শী বিদ্যা' বলা হয়। তিনি 'বীনাপাণি', 'বাগ্‌দেবী', 'শুভ্রা হংসবাসনা' প্রভৃতি নামেও পরিচিতা। ষোড়শী বিদ্যাদেবীর ষোলটি নাম, ষোলরকম রূপ। প্রত্যেকেরই ধ্যান, মন্ত্র ও যন্ত্র পৃথক পৃথক। সকলেরই মাথার ওপর মন্দিরের মতো উঁচু মুকুট। সকলেই ললিত মুদ্রাসনে আসীনা, একটি পা নিচু করে রেখেছেন, অপর পা আসনের দিকে গোটানো। দক্ষিণ হস্ত বক্ষোপরি বরমুদ্রায় স্থাপিত, বাম হস্ত মোড়া এবং উঁচুতে তোলা। দেবীর ষোলটি রূপ এইরকম—

(১) রোহিনী : দেবীর অপর নাম 'অজিতবলা'। তিনি জলচৌকিতে উপবিষ্টা। দেবী চতুর্ভুজা। অস্ত্র—চক্র।

(২) প্রজ্ঞাপ্তী : দেবীর অপর নাম 'দুরিতারী'। বাহন—হংস। দেবী ষষ্ঠভুজা। হস্তে অসি, কুঠার, চন্দ্রহাস এবং দর্পণ।

(৩) বজ্রশৃঙ্খলা : দেবী দ্বিভুজা। বাহন—হংস। অস্ত্র—পরিখা ও বৈষ্ণবাস্ত্র।

(৪) কুলিশাঙ্কুশা : দেবীর অপর নামগুলি 'মনোবেগা', 'মনোগুপ্তি' এবং 'শ্যামা'। বাহন—অশ্ব। দেবী চতুর্ভুজা। অস্ত্র—অসি এবং ভূষণ্ডী।

(৫) চক্রেশ্বরী : বাহন—গরুড়। দেবী ষোড়শভুজা। অস্ত্র—শতঘ্নী।

(৬) পুরুষদত্তা ভারতী : দেবীর মুখমণ্ডল চতুষ্কোণবিশিষ্ট, পুরুষাকৃতি। দেহের গঠন সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ। দ্বিভুজা। বাহন—হস্তী। অস্ত্র—চক্র এবং শতঘ্নী।

(৭) কালী (ইনি দশমহাবিদ্যার কালী নন) : দেবীর অপর নাম 'শান্তি'। দেবী চতুর্ভুজা। বাহন—বৃষ। অস্ত্র—ত্রিশূল ও শতঘ্নী।

(৮) মহাকালী (ইনিও দশমহাবিদ্যার কালী নন) : দেবীর অপর নাম 'অজিতা' এবং 'সুরতারকা'। দেবীর কোন বাহন নেই। তিনি চতুর্ভুজা। অস্ত্র—যষ্টি এবং শতঘ্নী।

(৯) গৌরী : দেবীর অপর নাম 'মানসী' ও 'অশোকা'। বাহন—বৃষ। দেবী চতুর্ভুজা। তাঁর দক্ষিণ হস্তে মঙ্গলঘট এবং মস্তকের মন্দিরাকৃতি মুকুটের বামপার্শ্বে চন্দ্র। অস্ত্র—যষ্টি।

(১০) গান্ধারী : দেবীর অপর নাম 'চণ্ডা'। দেবীর বাহন নেই। দেবী চতুর্ভুজা। অস্ত্র—পরিখ এবং সীর (লাঙ্গলাস্ত্র)।

(১১) সর্বাস্ত্রমহাজ্বালা : দেবীর অপর নাম 'জ্বালামালিনী' ও 'ভৃকুটি'। বাহন—বৃষ। দেবী অষ্টভুজা। অস্ত্র—অসি, ত্রিশূল, ভল্ল, বৈষ্ণবাস্ত্র, ব্রহ্মশির অস্ত্র, তীর ও পাশ। কার্য—নিক্ষেপ-ছেদন, নিপাতন ও শায়িতকরণ।

(১২) মানবী : দেবীর অপর নাম 'অশোকা'। বাহন—সাপ। দেবী চতুর্ভুজা। হস্তে দর্পণ ও যষ্টি।

(১৩) বৈরাট্যা : দেবীর অপর নাম 'বৈরোটি'। বাহন-—সাপ। দেবী চতুর্ভুজা। অস্ত্র—বৈষ্ণবাস্ত্র ও ভল্ল।

(১৪) অচ্ছুপ্তা : দেবীর অপর নাম 'অনন্তযতী' ও 'অঙ্কশা'। বাহন—হংস। দেবী চতুর্ভুজা। অস্ত্র—ভল্ল ও বিজয়ধনু।

(১৫) মানসী : দেবীর অপর নাম 'কন্দর্পা'। বাহন—সিংহ। দেবী চতুর্ভুজা। অস্ত্র—ভল্ল ও কুঠার। বামহস্তে দর্পণ।

(১৬) মহামানবী : দেবীর অপর নাম 'নির্বাসী'। বাহন—ময়ূর। অস্ত্র—ভল্ল ও চক্র।

বলা বাহুল্য, দেবীর নাম ও রূপের ইয়ত্তা করা যায় না। কারণ, তিনি অবাঙ্‌মনসোগোচর। পুরাণ তাঁর অল্পই ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হয়েছে।

নির্মল মালাকার
সোদপুর ব্রিকফিল্ড রোড, হরিদেবপুর, কলকাতা-৭০০ ০৮২

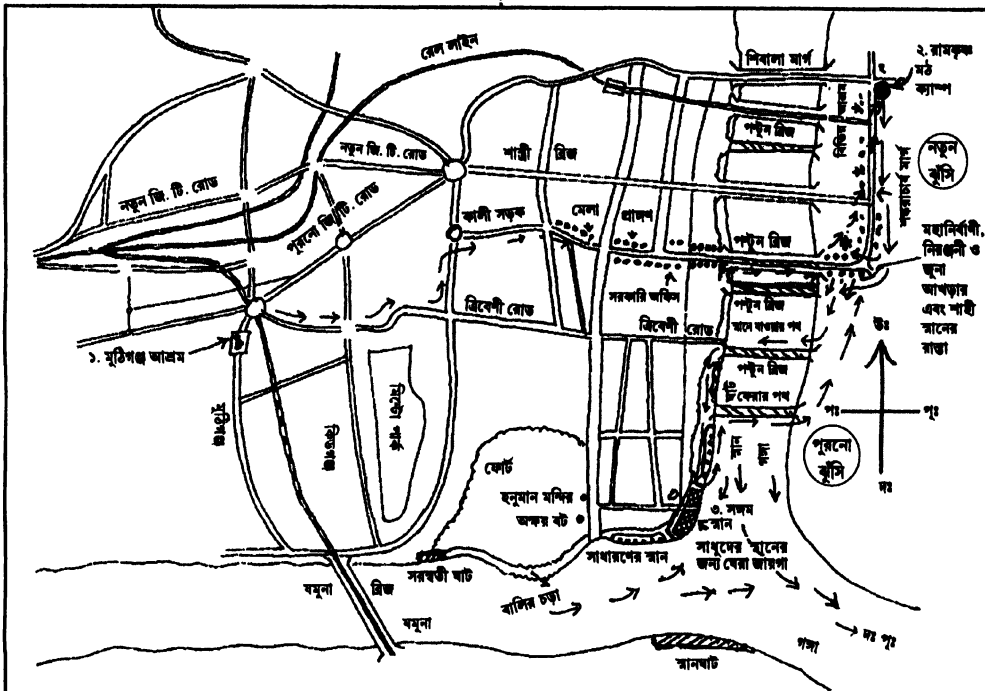
প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ

স্বামী অচ্যুতানন্দ

"সুরমুনিদিতিজেন্দ্রৈঃ সেব্যতে যোঽস্তন্তন্দ্রৈর্গুরুতর দুরিতানাং কা কথা মানবানাম্।/ স ভুবি সুকৃত-কর্তুর্বাঞ্ছিতাবাপ্তিহেতুর্জয়তি বিজিতযাগস্তীর্থরাজঃ প্রয়াগঃ।।"

ঘুম ভেঙে গেল গুনগুন শব্দে। পাশে তাকিয়ে দেখি, আমাদের গাড়ির মৈথিলী ব্রাহ্মণ ড্রাইভার স্টিয়ারিঙের ওপর দুটি হাত জোড় করে স্তবপাঠ করছে। বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম থেকে শেষ রাত্রে রওনা হয়েছি। পথে প্রচণ্ড কুয়াশায় খুব আস্তে আস্তে গাড়ি এসেছে। জি. টি. রোড খুব মসৃণ, কোন ঝাঁকুনি লাগেনি, তাই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এখন চোখ খুলে দেখি সারা রাস্তাজুড়ে মাথার ওপর একটা হোর্ডিং। তাতে লেখা—"তীর্থরাজপ্রয়াগ আপকো হার্দিক স্বাগত করতা হ্যায়"। বুঝলাম এলাহাবাদ পৌঁছে গেছি, আর তাতেই আমাদের ভক্ত ড্রাইভার 'প্রয়াগষ্টক' আবৃত্তি শুরু করেছে। আমিও গাড়ি থেকে নেমে একটু তীর্থরাজ প্রয়াগের মাটি স্পর্শ করে প্রণাম করলাম—"শ্রুতিঃ প্রমাণং স্মৃতয়ঃ প্রমাণং পুরাণমপ্যত্র পরং প্রমাণম্।/ যত্রাস্তি গঙ্গা যমুনা প্রমাণং স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ।।" গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, কারণ সামনে কিছু গাড়িতে পুলিস চেকিং করছে। সব গাড়িই একবার দেখে নিয়ে তারপর ছাড়ছে। উগ্রপন্থীদের সম্ভাব্য হামলা রুখতে এই সতর্কতা। আমাদের গাড়ি অবশ্য একবার উঁকি মেরে দেখেই তারা ছেড়েছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এলাহাবাদে পৌঁছে গেলাম। পথের দুপাশ দিয়ে অগণিত যাত্রী পোঁটলা-বস্তা মাথায়-ঘাড়ে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে শহরের দিকে। পথের দুপাশেই নানা নির্দেশ, কোন্ পথে গেলে কোথায় যাওয়া যাবে। সঙ্গমের রাস্তা এখনো গাড়ি চলাচলের জন্য খোলা আছে। আজ ১২ জানুয়ারি, প্রয়াগে স্নান করব ১৪ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তিতে। তারপর মৌনী অমাবস্যা ২৪ জানুয়ারি। কাল থেকে সব গাড়ি যাওয়া-আসা বন্ধ হবে সঙ্গমপথে। শহরেও চলাচল সীমাবদ্ধ হবে।



প্রয়াগ কুম্ভমেলার মানচিত্র

আমরা এসে পৌঁছালাম মুঠিগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম পার্ষদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রম। দীর্ঘদিন তিনি এখানে কাটিয়েছেন কঠোর তপশ্চর্যায়। তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য, সাধুতা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-আদর্শে অনুপ্রাণিত জীবন সকলের কাছেই ছিল আদর্শ। এলাহাবাদ আশ্রমের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

অনেক কর্মপ্রসারও হয়েছে। বিজ্ঞান মহারাজের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি নিয়ে তাঁর কক্ষটি এখন সযত্নে সংরক্ষিত হচ্ছে।

আশ্রমে পৌঁছে বিজ্ঞান মহারাজের ঘরে তাঁকে প্রণাম জানিয়ে দোতলায় ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠাকুরকে প্রণাম করলাম। তারপর কয়েকটি জামাকাপড় একটা ব্যাগে নিয়ে আবার গাড়িতে উঠলাম। এবার লক্ষ্য ঝুঁসিতে আমাদের কুম্ভপর্বের জন্য ৬ নম্বর সেক্টরে অস্থায়ী ক্যাম্প। কুম্ভস্নানের জন্য আগত সাধু এবং স্নানার্থী ও কল্পবাসী ভক্তদের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম সঙ্গমের পূর্বপাড়ে গঙ্গার চড়ায় বিরাট বিরাট অস্থায়ী ক্যাম্প তৈরি করেছে। ঐ পাড়েই সন্ন্যাসীদের তেরটি আখড়া ও বহু ছোট-বড় আশ্রম অস্থায়ী ছাউনী গড়ে তুলেছে। গড়ে উঠেছে ছয় হাজার একর জায়গা জুড়ে বিশাল কুম্ভনগর। টিনের বিরাট চালা, ত্রিপল কাঠ ও বাঁশ দিয়ে তৈরি আলাদা আলাদা আশ্রয়গৃহ।

আমাদের গাড়ি অতি কষ্টে আস্তে আস্তে দুপাশের জনস্রোতের মধ্য দিয়ে ত্রিবেণী রোড ধরে কিছুটা পূর্বদিকে যাওয়ার পর উত্তরদিকে কালী সড়কের মোড় ঘুরে আবার পূর্বদিকে এগোতে লাগল। এ-রাস্তাটি মহাকুম্ভ উপলক্ষ্যে চওড়া করা হয়েছে। বাঁদিকে গঙ্গার ওপরে শাস্ত্রী ব্রিজ, তার ওপর দিয়ে জি. টি. রোড ওপাড়ে ঝুঁসি পর্যন্ত চলে গিয়েছে। তারও সামান্য উত্তরে রেলওয়ে ব্রিজ। এলাহাবাদের সঙ্গে কুম্ভ নগরের প্রধান যোগাযোগের রাস্তা কালী সড়ক। এছাড়াও দক্ষিণদিকে সামান্য দূরে পুরনো ত্রিবেণী রোডটি শঙ্করাচার্য-মন্দির ও হনুমান-মন্দিরকে ডানদিকে রেখে গঙ্গার ওপর একটি পন্টুন ব্রিজের সঙ্গে মিশেছে। তারই কিছুটা দক্ষিণে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম।

কালী সড়কের প্রতিটি ক্রশিঙেই পুলিসের কড়া পাহারা। রাস্তার বাঁদিকে মেলাপ্রাঙ্গণে উত্তরপ্রদেশ-সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের হস্তশিল্প ইত্যাদির প্রদর্শনী, সার্কাস, নাগরদোলা ও আরো নানা প্রমোদের আয়োজন। আর ডানদিকে সরকারি অফিসের অস্থায়ী ক্যাম্প, পুলিস প্রশাসন ও ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস এবং আরো নানান অফিসের ছাউনী। তারপরেই ত্রিবেণী রোডের পাশে বিখ্যাত এলাহাবাদ দুর্গ। এখানেই আছে সেই অতি প্রাচীন পৌরাণিক যুগের অক্ষয় বটবৃক্ষ। আছে ঐতিহাসিক যুগের অশোকের লিপি খোদিত প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভ।

কালী সড়ক ধরে অতি ধীরে এগোতে এগোতে আমরা পনের মিনিটের রাস্তা চল্লিশ মিনিটে এসে পৌঁছালাম গঙ্গার চড়ায়—দুপাশে লোহার বড় বড় পাত পেতে দেওয়া অস্থায়ী রাস্তায়। দুধারে বাঁশের ব্যারিকেড। তারই মধ্য দিয়ে এসে উঠলাম ছয় নম্বর পন্টুন ব্রিজে। এখানে গঙ্গা খুব চওড়া নয়, গভীরও নয়। বড় বড় ড্রামজাতীয় জিনিস ফেলে তার ওপর কাঠ, লোহার বীম দিয়ে রাস্তা করা হয়েছে। ভারি লরি তার ওপর দিয়ে যেতে পারবে না, কিন্তু হাল্কা বাস, ট্যাক্সি, মিনিবাস যেতে পারে। চওড়া ৩০।৪০ হাতের বেশি নয়। দুপাশে বাঁশের দু-থাক রেলিং। খুব আস্তে আস্তে পন্টুন ব্রিজ পার হয়ে গঙ্গার চড়ার বুকে ঝুঁসিতে জনসমুদ্রের মাঝে এসে পৌঁছালাম। এখানেও বালির ওপর ঐরকম লোহার পাত ফেলে যাতায়াতের রাস্তা করা হয়েছে। এই ঝুঁসি প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাণের 'প্রতিষ্ঠানপুর'। বহু সাধু-মহাত্মার তপস্যার স্থান। প্রাচীন কাল থেকেই সাধুরা গঙ্গার পূর্বপ্রান্তে ছোট ছোট কুঠিয়ায় তপস্যায় নিরত থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদদের মধ্যে অনেকেই এখানে তপস্যা করে গেছেন। এখন কিছু কিছু পাকা মঠ-মন্দির ও সাধুদের স্থায়ী আস্তানা এখানে হয়েছে।

যাই হোক, আমাদের গাড়ি এবারে পূর্বমুখে এগোতে লাগল। চওড়া রাস্তার দুধারে বিশাল বিশাল তোরণ, তাতে নানা ধরনের অলঙ্করণ ও বিখ্যাত আখড়া এবং মহানির্বাণী, নিরঞ্জনী এবং জুনার মহামণ্ডলেশ্বরদের নাম লেখা আশ্রম। টিন-ঘেরা সেইসব আখড়ার মধ্যে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সাধু ও ভক্তদের থাকবার তাঁবু, তাঁদের খাওয়ার জায়গা ও অন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। এই পথেই দেখা গেল শ্রীপঞ্চায়তী নির্বাণী, জুনা আখড়া, অগ্নি আখড়া, আবাহন আখড়া। অন্যদিকে শ্রীপঞ্চায়তী-নিরঞ্জনী আখড়া। আমাদের গাড়ি ক্রমশ উত্তরদিকে গিয়ে শঙ্করাচার্য মার্গে পড়ল। এরাস্তাও সমান চওড়া, লোহার পাত দেওয়া। এখানেও দুদিকে বড় বড় আশ্রম অস্থায়ী কেন্দ্র খুলেছে। এই পথেই বাঁদিকে আমাদের পরিচিত শ্রীপঞ্চায়তী মহানির্বাণী আখড়ার আরেকটা তোরণ। আমাদের স্নান হবে এঁদের সঙ্গে। পথে আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম-ক্যাম্প, তান্ত্রিক সাধুদের ক্যাম্প ও আরো ছোট-বড় ক্যাম্প পার হয়ে শাস্ত্রী ব্রিজের তলা দিয়ে, তারপর রেলওয়ে ব্রিজের নিচ দিয়ে কিছুটা যেতেই দূর থেকে আমাদের ক্যাম্প দেখতে পেলাম। সাদা কাপড়ের আস্তরণে কাঠ ও থার্মোকল দিয়ে বেলুড় মঠের আদলে তৈরি সুদৃশ্য সুবিশাল মন্দির। দূর থেকে ক্যাসেটে স্বামী প্রেমেশানন্দজী রচিত বিখ্যাত গান শোনা যাচ্ছিল—"বঙ্গহৃদয় গোমুখী হইতে করুণাগঙ্গা বহিয়া যায়/ এস ছুটে এস কে আছ মানব শুষ্ক কণ্ঠ পিপাসায়।"

আমরা ঈপ্সিত স্থানে এসে নামলাম। মন্দিরের একপাশে অস্থায়ী নিঃশুল্ক দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র এবং অন্যপাশে অভ্যর্থনাকেন্দ্র, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য বিক্রয়কেন্দ্র এবং মিশনের নানা কর্মধারা ও সংস্কৃতির চিত্রপ্রদর্শনী।

অফিসে যেতেই মুঠিগঞ্জ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলাত্মানন্দ সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। আগে থেকেই আমার আসার কথা জানানো ছিল। তাই তিনি নিজেই আমাকে নিয়ে গেলেন একটা আলাদা ছোট তাঁবুতে—যেখানে কয়েকজন প্রাচীন সাধুর পৃথক থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। কাশী সেবাশ্রমের প্রবীণ সাধু স্বামী তপনানন্দজী, আমি ও আরো দুজন বয়স্ক সাধু এই পৃথক তাঁবুতে স্থান পেলাম। সুন্দর ব্যবস্থা। নিচে পুরু করে খড় পাতা, তার ওপর মোটা শতরঞ্চি, সঙ্গে দুটো করে কম্বল ও একটি করে নতুন লেপ। পাশে আরো দুটি লম্বা করোগেট টিনের শেড—সেখানেও এইরকম ব্যবস্থা। পাশেই করোগেট

টিনের আলাদা আলাদা ছোট ছোট স্যানিটারী টয়লেট। সামনেই কলের জল, বালতি, মগ ইত্যাদি। গঙ্গার বালির চড়ার মধ্যে এ এক আশাতীত আয়োজন। হাতমুখ ধুয়ে আমরা প্রাতরাশের জন্য গেলাম। সেও সুন্দর বন্দোবস্ত। এই বালির রাজ্যে চেয়ার-টেবিল পেতে গরম গরম পরোটা, তরকারি। স্থানীয় এক পরিবেশক সংস্থার ওপর রান্না ও পরিবেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আর সেসব দেখাশোনার জন্য একজন অভিজ্ঞ সন্ন্যাসী আছেন।

প্রাতরাশ সেরে আশপাশে একটু ঘুরে দেখবার জন্য বাইরে এলাম। প্রথমে গেলাম বেলুড় মঠের আদলে তৈরি আমাদের প্যান্ডেলে। প্যান্ডেলের ভিতরে ঠাকুর, মা, স্বামীজী ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর বড় বড় পট সুন্দর করে সাজিয়ে বেদিতে রাখা। ওপরে সুন্দর ঝাড়বাতি। বেশ বড় হলঘরে হাজার খানেক লোক বসতে পারে। ঠাকুরকে প্রণাম করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। উলটোদিকেই উদাসী সম্প্রদায়ের সন্তবাবাজীর বিরাট মন্দির, সেখানে নামগান হচ্ছে। আমাদের ক্যাম্পের অন্যদিকে মথুরার শ্রীজী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদের মঠ। খুব সুন্দর কীর্তন হচ্ছে সেখানে। একটু এগিয়ে যেতেই দেখি, শ্মশ্রুমণ্ডিত এক দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী হাসিমুখে করজোড়ে "ওঁ নমো নারায়ণায়" বলে দাঁড়ালেন। প্রথমে ঠিক চিনতে না পারলেও পরে পরিচয় দিতে মনে পড়ল, ইনি আমার পূর্বপরিচিত। নাম—শঙ্করগিরি। তাঁকে পেয়ে আমার সুবিধাই হলো। তাঁর কাছে প্রয়াগ ও কুম্ভ-বৃত্তান্ত জানতে চাইলাম। শঙ্করগিরি প্রায় আমারই বয়সী, ওড়িয়া শরীর, সুন্দর বাঙলা বলেন। পরম আনন্দে আমার কথা স্বীকার করে নিয়ে কোথায় বসবেন তাই ভাবতে লাগলেন। চারিদিকে স্রোতের মতো যাত্রী চলেছে—প্রচণ্ড ধুলো উড়ছে। এর মধ্যে একটু নিরিবিলি জায়গা করে নেওয়া কঠিন। অবশেষে ঠিক হলো, দুপুরের খাওয়ার পরে তিনি আমাকে নিয়ে যাবেন গঙ্গার চড়ায়—যেখানে নিরিবিলি না হলেও বসবার জায়গা পাওয়া যাবে, আর মা গঙ্গার কোলে বসেই তাঁর মহিমা শোনা যাবে। সেদিন দুপুরে নিরঞ্জনী আখড়ায় সাধুভাণ্ডারায় আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল। সেখান থেকে ফিরে সামান্য বিশ্রাম করে বাইরে আসতেই শঙ্করগিরিকে দেখতে পেলাম। তাঁর সঙ্গে বেরিয়ে সাতনম্বর পন্টুন ব্রিজের পাশে বালির চড়ার ওপর কিছুটা হেঁটে একটু খোলা জায়গা পেয়ে বসে পড়লাম। চারিধারে চড়ার ওপর ছোটবড় অসংখ্য তাঁবুর সারি। এগুলি কল্পবাসীদের এলাকা। গোটা মাঘ মাস এঁরা গঙ্গাতীরে বাস করবেন এবং গঙ্গাজল পান, স্বপাক ভোজন আর ভজন করে কাটাবেন।

শঙ্করগিরিকে বললাম: "কুম্ভের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য বিষয়ে কিছু বলুন।" তিনি পরম শ্রদ্ধাভরে প্রথমে প্রয়াগতীর্থের বন্দনা করলেন—"গ্রহাণাং চ যথা সূর্যো নক্ষত্রাণাং যথা শশী/ তীর্থানামুত্তমমতীর্থঃ প্রয়াগাখ্যমনুত্তমম্।।/ যত্রাপ্লুতানাং ন যমো নিয়ন্তা যত্রাস্থিতানাং সুগতিপ্রদাতা।/ যত্রাশ্রিতানামমৃতপ্রদাতা স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ।।"—



কুম্ভমেলায় রামকৃষ্ণ মিশনের ক্যাম্পে বেলুড় মঠের মন্দিরের আদলে শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

সূর্য যেমন গ্রহের শ্রেষ্ঠ, চন্দ্র যেমন তারকাপ্রধান, তীর্থের মধ্যেও তেমনি প্রয়াগ। এখানে স্নানকারী যমের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পড়ে না। যিনি এই স্থানে কল্পবাসীদের মুক্তিদান করেন, এই তীর্থের আশ্রয়প্রার্থীদের যিনি অমৃতত্ব প্রদান করেন—সেই তীর্থরাজ প্রয়াগকে বন্দনা করি।

শঙ্করগিরি এবার কুম্ভের উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন। বহু প্রাচীন শাস্ত্রে এই প্রয়াগের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদ, শুক্লযজুর্বেদ ও সামবেদে এই প্রয়াগকুম্ভের কথা আছে। অথর্ববেদেও বলা হয়েছে—"পূর্ণঃ কুম্ভোঽধি কাল আহিতস্তং বৈ পশ্যামো বহুধানু সন্তঃ।/ স ইমা বিদ্যা ভুবনানি প্রত্যঙ্কালং তমাহুঃ পরমে ব্যোমন্।"—হে সন্তগণ! পূর্ণকুম্ভ বারবছর পর আসে। তখন আমরা প্রয়াগাদি তীর্থে দর্শন করতে যাই। তাকেই কুম্ভ বলে যখন মহান আকাশে নির্দিষ্ট গ্রহরাশির যোগাযোগ হয়।

আবার ঐ বেদেই বলা হচ্ছে—"চতুরঃ কুম্ভাংশ্চতুর্ধা দদামি।" ব্রহ্মা বলছেন: "হে মানব, আমি তোমাদের জাগতিক ও পারমার্থিক সুখ দেওয়ার জন্য কুম্ভপর্ব সৃষ্টি করে পৃথিবীর চার স্থানে তা নির্দিষ্ট করেছি। এছাড়া এই এলাহাবাদে প্রাচীন প্রয়াগতীর্থে ঋষি ভরদ্বাজের আশ্রম ছিল। সেখানে বনগমনের পথে শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষ্মণ এসে রাত্রিবাস

করেন। তাঁদের আশীর্বাদ নিয়ে এই সঙ্গমে স্নান করে তাঁরা চিত্রকূট যান। নিরাপদে ফিরে আসার জন্য এখানে গঙ্গার কাছে সীতা মানত করেছিলেন। প্রবাদ, বনবাসকালে পঞ্চপাণ্ডবও এখানে আসেন। এছাড়া দক্ষযজ্ঞে দেহত্যাগ করার পর শিবের কাঁধে সতীর দেহ বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হতে হতে শেষ অংশটুকু



কুম্ভমেলায় রামকৃষ্ণ মিশনের নিঃশুল্ক চিকিৎসা-শিবির

এখানেই পড়ে। এখানকার অলোপীবাগে দেবীর সেই দেহাংশ একটি বেদির মধ্যে ছোট্ট কুণ্ডে জলের আকারে বিরাজমান। একান্ন পীঠের অন্যতম এই পীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম অলোপী দেবী—লোপ হয়েও তিনি নিত্যবিরাজিতা। শাস্ত্রমতে নাম 'ললিতা'। আর সর্বোপরি এই তীর্থ 'ত্রিবেণী'। গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গমক্ষেত্র। ভারতের সর্বাপেক্ষা পবিত্রতম নদী-তিনটির মিলনস্থান। গৈরিকবর্ণা গঙ্গা উত্তরদিক থেকে খরস্রোতে নেমে আসছেন। পশ্চিমদিক থেকে শান্তস্রোতে নীলবর্ণা কালিন্দী—সূর্যতনয়া যমুনা এসে গঙ্গার বুকে মিশে যাচ্ছেন। দুটি স্রোতোধারা অনেক দূর পর্যন্ত পাশাপাশি এগিয়ে এসে এক হয়ে গিয়েছে বেশ বোঝা যায়। আর সরস্বতী অন্তঃসলিলা—এদের দুজনের মাঝখানে প্রচ্ছন্নভাবে মিশে রয়েছে। এই ত্রিবেণীতীর্থ ভারতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নদীতীর্থ। আর এই ত্রিবেণী সঙ্গমেই বিশেষ গ্রহের যোগাযোগে বিশেষ মুহূর্তে পূর্ণকুম্ভ স্নান হয় বারবছর অন্তর।

একসময় লক্ষ্মী দুর্বাসার শাপে স্বর্গচ্যুতা হলে দেবতারা সমুদ্র-মন্থন করে তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনার প্রয়াসী হলে নারায়ণের নির্দেশে তাঁরা হিমালয়ের কাছে ক্ষীরোদসাগর মন্থন করতে আরম্ভ করেন। এই মন্থনকালে কূর্মাবতারকে সমুদ্রের নিচে পাদপীঠ হিসাবে রেখে তার ওপর মন্থনদণ্ড হিসাবে মন্দর পর্বতকে রাখা হয়। বাসুকী নাগ হন মন্থনরজ্জু। দেবতাগণ বাসুকীরজ্জুর লেজের দিক ধরলেন আর দানবেরা বীরত্ব দেখিয়ে মুখের দিক ধরলেন। নারায়ণ মন্থনদণ্ড মন্দর পর্বতকে ধরে রাখলেন। মন্থন শুরু হলো। তীব্র মন্থনের ফলে প্রথমে যে হলাহল উত্থিত হলো, স্বয়ং মহাদেব সকলের বিপদরক্ষার জন্য তা পান করে নীলকণ্ঠ হলেন। মন্থন তীব্র হতে হতে ক্রমে সমুদ্রগর্ভ থেকে একে একে নানা রত্ন, পুষ্পক বিমান, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া, পারিজাত পুষ্প, অপ্সরা রম্ভা, বালচন্দ্র, সুরভি গাভী, দেবী মহালক্ষ্মী—এইরকম চোদ্দটি দিব্যবস্তু উত্থিত হলো। সবশেষে ধন্বন্তরি উঠলেন অমৃতপূর্ণ একখানি কলস নিয়ে। এই দিব্য অমৃতপূর্ণ কুম্ভ পেয়েই দেবতাদের ইশারায় ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত সেটি নিয়ে আকাশপথে পালিয়ে গেলেন। দানবেরা তখন মন্থনের সময় বাসুকীরজ্জুর মুখ থেকে নির্গত বিষের সংস্পর্শে মৃতপ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকায় বুঝতে পারল না কি হয়ে গেল! তাদের গুরু শুক্রাচার্য ব্যাপারটা বুঝতে পেরে দৈত্যদের জানিয়ে দিতেই তারা সদলবলে হুঙ্কার দিয়ে জয়ন্তের পিছনে ছুটল। উন্মত্ত দৈত্যদের তাড়ায় জয়ন্ত ভয় পেয়ে দিবারাত্র দশদিকে বারদিন ধরে ছুটোছুটি করেছিলেন। মাঝে দৈত্যদের সঙ্গে হাতাহাতির সময় জয়ন্তের হাত থেকে কুম্ভ মাটিতে পড়ে যেতে থাকলে দেবগুরু বৃহস্পতি, চন্দ্র, সূর্য ও সূর্যপুত্র শনি জয়ন্তের সঙ্গে থেকে তা রক্ষা করতে লাগলেন। এইভাবে বারদিন (মানুষের হিসাবে বারবছর) দেব-দানবের যুদ্ধ চলেছিল ঐ অমৃতকুম্ভকে আয়ত্তে রাখার জন্য। চন্দ্র লক্ষ্য রাখছিলেন কুম্ভ থেকে যাতে অমৃত চলকে পড়ে না যায়, সূর্য দেখছিলেন যাতে পাত্রটি ভেঙে না যায়, বৃহস্পতি দৈত্যদের দিকে লক্ষ্য রাখছিলেন যাতে তারা ছিনিয়ে নিতে না পারে এবং শনি চেষ্টা করছিলেন জয়ন্তের মনে যাতে ভয় না আসে, তাকে সাহস দিয়ে উদ্দীপ্ত করতে। এইভাবে এই অমৃতকুম্ভ বারদিনের মধ্যে চারদিন ভারতের চারটি জায়গায় রাখা হয়েছিল। এই অমৃতকুম্ভ মর্তলোকের যেখানে যেখানে রাখা হয়েছিল, সেখানেই অমৃত একটু-আধটু লেগে গিয়েছিল হয়তো অথবা অমৃতপাত্র স্থাপনের মাহাত্ম্যেই বারবছর অন্তর ঐসব তিথির যোগাযোগ হয়। সূর্য-চন্দ্র-বৃহস্পতি ঐসময় যে যে রাশিতে এইসব ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হয়েছিল, সেইসব রাশিও ঐসময় যুক্ত হয় এবং তখনি ঐসব তীর্থে কুম্ভযোগ হয়। সেই চারটি বিখ্যাত পবিত্র স্থান হচ্ছে—গঙ্গাদ্বার হরিদ্বার, প্রয়াগ, উজ্জয়িনী ও নাসিক। এই চারটি স্থানে সুধাকলস রাখা হয়েছিল বলে কুম্ভযোগও তিনবছর অন্তর এদের এক-একটিতে হয়ে থাকে।

[ক্রমশ]

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি : সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠানাদি ও পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য উৎসব-অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির কিংবা পরলোকপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের দপ্তরে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

মরে গিয়ে বেঁচে ওঠা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ব্রহ্ম আর শক্তি। নিরাকার, নির্গুণ থেকে সাকার, সগুণ। শূন্য, মহাশূন্য থেকে রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ-সহ জগতের আবির্ভাব। জীব নানারকমের, কীটাণুকীট থেকে বুদ্ধি ও চৈতন্য-সমৃদ্ধ মানবের বিকাশ। সর্বত্র শক্তির বিস্ফোরণ। বিজ্ঞান এটিকে একভাবে বুঝতে চায়, ধর্ম এটিকে আরেকভাবে বুঝতে চায়। বিজ্ঞানীর পথ—বুদ্ধি, পরীক্ষা, আবিষ্কার, গণিত। বিজ্ঞানীর অহঙ্কার—আমি জানব, আমি বুঝব। আমার মেধা, আমার ক্ষমতা যে-পর্যন্ত যেতে পারে যাবে, তারপর আসবেন পরবর্তী জন—প্রবাহের মতো, স্রোতের মতো। একটু একটু করে খুলে যাবে রহস্যের যবনিকা। ধীরে ধীরে উন্মোচিত হবে সৃষ্টির রহস্য।

ধর্মের কথা হলো, সৃষ্টির রহস্য বুদ্ধি অথবা মেধা-গ্রাহ্য নয়, ধ্যানগ্রাহ্য। যখনি 'সৃষ্টি' বলছি, তখনি একজন স্রষ্টাকেও স্বীকার করতে হয়। মানুষেরই ব্যাকরণ বলছে—কর্তা ছাড়া কর্ম হয় না।

এই কর্তা কে? হিন্দু বলবেন 'ভগবান', খ্রীস্টান বলবেন 'গড', মুসলমান বলবেন 'আল্লা', বিজ্ঞানী বলবেন 'এনার্জি'—'শক্তি'। বিশ্বপ্রপঞ্চের উল্লাসের পিছনে মহাশক্তির খেলা। 'এনার্জি', 'ভাইব্রেসান'। শক্তি ও তরঙ্গ। তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন—কার শক্তি? কে সেই মহামহিম? রবীন্দ্রনাথ যেমন বলছেন—"মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ, হে বিশ্বপিত, তোমারি রচিত ছন্দে মহান বিশ্বের গীত।" এই যে 'ছন্দ', 'ভাইব্রেসান', 'রিদম', 'হারমনি'—এইটিই হলো সৃষ্টির উৎস। এরই নাম 'ব্রহ্ম'। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব উপলব্ধিতে ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। বলেই বলছেন ঃ ব্রহ্মের শক্তি, শক্তি ব্রহ্ম নয়। এই সিদ্ধান্ত একালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদেরও। হিন্দু দর্শন ও বিজ্ঞান এখন এক হয়ে গেছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ বড় অদ্ভুত একটি তত্ত্ব জানালেন—সেটি হলো 'মৃত্যু'। সৃষ্টির আগে কি কিছুই ছিল না? ছিল, অবশ্যই ছিল। যা ছিল সবই আবৃত ছিল মৃত্যুর দ্বারা। উপনিষদ্ এই মৃত্যুর অসাধারণ এক সংজ্ঞা দিলেন—"অশনায়য়াঽশনায়া হি মৃত্যুঃ...।" (১।২।১) সেই আদি মৃত্যুর রূপটি কি? 'অশনায়া' রূপ মৃত্যু। 'অশনায়া' হলো ভোগের ইচ্ছা—বুভুক্ষা, ক্ষুধার দাহ। ভোগেচ্ছাই হলো—মৃত্যু।

মরণ বলল ঃ আমি খাব। কি খাব? "তন্মনোঽকুরুতাত্মন্বী স্যামিতি।" (ঐ) মৃত্যু সঙ্কল্প করলেন ঃ আমি আত্মন্বী হব। শরীরধারণ করব। সৃষ্টি, জীবজগৎ আমারই কারণে—আমি খাব। আমি মৃত্যু, ক্ষুধার্ত মৃত্যু। জীব! তুমি মৃত্যুর কোলে বসে আনন্দ কর।

তন্ত্রের প্রবেশ। ব্রহ্মলাভ করে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মের দিক থেকে দেখছেন—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। সে অতি উচ্চ দর্শন। জীবের দিক থেকে দেখলে শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন—"ব্রহ্মও সত্য, জগৎও সত্য।" এইখানে গীতার প্রবেশ—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি।।" (২।১৩)

দেহী! তোমার কৌমার, যৌবন ও জরা—কালের অমোঘ নিয়তি। পরিশেষে মৃত্যু। সে তো তোমার ইন্দ্রিয়ের খাঁচার। মৃত্যু তো দেহের বিকার। জেনে রাখ—দেহ হলো আত্মার পরিচ্ছদ মাত্র। আত্মার দেহ, দেহের আত্মা নয়।

জীব তুমি শিবস্বরূপ। ইন্দ্রিয়ের মুখ ঘুরিয়ে দাও। দমন নয়, মোড় ফেরানো। আনন্দাসনে বসে আয়ত্ত কর—'রমণীর সঙ্গে থাকে, না করে রমণ।' আরো এগোও, দেখ—"স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।" (চণ্ডী, ১১।৬) সর্বত্র মা। মা! তুমি মৃত্যুরূপা কালী। অষ্টপাশে বেঁধেছ আমায়। হে শিব! তুমি যে মোক্ষদাতা। মোক্ষ হলো জ্ঞান। জ্ঞানই নির্বাণ। জয় মা!

ঠাকুর বলছেন, জ্ঞান তিন ধরনের। শুনেছে, দেখেছে, স্পর্শ করে গ্রহণ করেছে। ঠাকুর দুধের উপমা দিয়ে বোঝাতেন। দুধ কেমন? না, ধোব ধোব। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না।

এ বেদান্তের কথা। বেদান্তদর্শন ধৈর্যহীন, ছটফটে মানুষের অগম্য। আমাদের পূর্বপুরুষ গোবিন্দ ভগবৎপাদ, গৌড়পাদ, জৈমিনি, শঙ্করাচার্য প্রমুখ মহাজ্ঞানীদের নাম আমরা শুনেছি কি? যদি শুনেও থাকি, তাঁদের জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের যুগের জ্ঞানে অস্পৃশ্য। পালিয়ে আয়। পালাবে কোথায় ভ্রাতৃগণ! দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর ক্যাঁক করে ধরবেন! ভবের হাটে এলে বাছা, কত রকমের নাচ দেখবে, দেখাবে—ধেইধেই নাচ! তারপর তো কাঁদতে বসবে। সে আবার কত রকমের কান্না! গুমরে গুমরে, ডুকরে ডুকরে। অবশেষে একটি জড়পদার্থ। ঠাকুরের কালে এক-আধটা 'ব্যাঙের আধুলি' ছিল। একালে অনেক ব্যাঙের অনেক আধুলি! গরবে সব ফেটে চৌচির! আরেক সর্বনাশ, একালের উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আর মরতেই চাইছে না। ঘর আগলে, ঘাঁটি আগলে হাপরের মতো পড়ে আছে। প্রত্যেকের হাতের কাছে সেলোফেনের ঝুলিতে জপের মালা নয়, পাতাপাতা ওষুধ। সকালে খালি পেটে টকাস। ব্রেকফাস্টের পর টকাস! লাঞ্চের পর টকাস! বিকেলে টকাস। রাতে শয়নে প্রবেশের পূর্বে টকাস, টকাস! এক ট্যাবলেট নিদ্রা। শরীর নয় তো 'ফ্যাকট্রি'! শ্বাসে

কামারের হাপর। রক্তে সুগারের 'ফ্যাকট্রি'! হার্ট চলছে পাম্পে। হজম হবে না, তবু লোভ! চোখে কাঁচ বসানো! ঘরে ঘরে অমৃতের বৃদ্ধ পুত্রকন্যারা বিছানার চাদর খামচে পড়ে আছে। সৃষ্টির আদিতে "অমৃতস্য পুত্রাঃ" একবার বলে ফেলে ঋষিরা লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে রেখেছেন। অপেক্ষা করছেন কল্পান্তরের জন্য।

'মানুষ' নামক জীবটিকে ঈশ্বর নানাভাবে খতিয়ে দেখেছিলেন। প্রয়োজনে তাদের মুখের ওপর চোটপাট বলে দিতেন তার খামতির কথা। জানিয়ে দিতেন, মানুষ হলেও মানুষ থেকে তুমি বাছা কতটা দূরে আছ। কাউকে রেয়াত করতেন না। সে তুমি যেই হও। তুমি তকমাধারী ডেপুটি হতে পার। প্রতাপশালী জমিদার হতে পার। ধর্মগুরু হতে পার। শিক্ষাবিদ হতে পার। কারো রেহাই নেই। তাঁর অস্বস্তি হলো, মানুষের মতো দেখতে তুমি। শিক্ষিত ভদ্রলোক, অর্থ, বিত্ত, ক্ষমতার অধিকারী। কেন তুমি মানুষ হবে না? আত্মবিস্মৃত হয়ে কেন তুমি তোমার মহৎ উত্তরাধিকারের অমর্যাদা করবে?

যে-জীবনদর্শন সর্বকালের মানুষে ছায়া ফেলবে, যার নাম মানুষের অন্বেষণ—তার শুরু দুদিক থেকে হতে পারে। চলতে হলে যেকোন একদিকে পা ফেলতেই হবে। ঈশ্বর থেকে দূরেই যেতে চাই, আর তাঁর দিকেই যেতে চাই। প্রশ্ন হলো, ঈশ্বর থেকে দূরে যাওয়া যায় কি? ঠাকুর বললেন, সবই তো ঈশ্বরের চৈতন্যে জরে আছে। যেন আচারের বয়ামে ফালি ফালি আম। মিছরির রুটি—আড় করে খাও আর সোজা করেই খাও, মিষ্টি লাগবেই।

'জার্নি' শব্দটা ভারি সুন্দর। আমার যাত্রা হলো শুরু। "পন্থ বিজন অতি ঘোর/ একলি যাওব তুঝ অভিসারে/ তুঁহুঁ মম প্রিয়তম, কি ফল বিচারে—/ ভয় বাধা সব অভয় মুরতি ধরি পন্থ দেখায়ব মোর।" রবীন্দ্রনাথের এই কবিতার নাম 'মরণ'। ধর্মের পথ তো মরণের পথ। ভয়ঙ্কর এক মরণের নাম 'ধর্ম'। ভগবান এসে আমার 'আমি'টার গলা টিপে ধরবেন। চতুর্দিকে দহন। যত আবর্জনা তুলে গোলা ভরেছি। মন-মন্দিরে ছটা শকুন। অবিরাম ছেঁড়াছিঁড়ি। পণ্ডিতই হই আর মূর্খই হই, নামের যে বাহারই থাক—রাম, রাঘব, নারায়ণ, শঙ্কর, গৌতম, বুদ্ধ; স্বভাব অনুযায়ী আমার প্রকৃত নাম—শকুন। নিজের শাস্ত্রীয় সম্মান বাড়াবার জন্যে বলতে পারি—গৃধ্র। আমার একটিই বিশেষণ—আমি গৃধ্নু। লুব্ধ, লোলুপ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞানের উচ্চশিখর থেকে বললেন, জগতের সবাই শোন—জ্ঞানী শকুনি হওয়ার চেয়ে সরল বিশ্বাসী মূর্খ হওয়াই ভাল। জগতের অধিকাংশ জ্ঞানই হলো কুজ্ঞা। কেবল 'কু' বোঝাবে। রাইয়ের পক্ষে একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর একটিই কথা—"আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।" কাঁচা আমিকে পাকাও। ❑

সুস্বাস্থ্য

> শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।
> —কালিদাস (কুমারসম্ভব, ৫।৩৩)

স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়

অধ্যাপক ডাঃ সত্যানন্দ চক্রবর্তী

খ্যাতনামা প্রবীণ হোমিও চিকিৎসক



❑ ৩১ মে 'বিশ্ব ধূমপান বর্জন দিবস'। ধূমপানকে অন্য ভাষায় 'বিষপান'ও বলা হয়ে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা এবিষয়ে ধূমপায়ীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তামাকজাতীয় নেশার উপকরণের উৎপাদন ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ফলস্বরূপ জনগণনার হিসাবমতো পৃথিবীতে প্রতি দশ সেকেন্ডে একজন ধূমপায়ীর মৃত্যু হয়। বলা বাহুল্য, 'চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী'! পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি ধূমপান স্থগিত করার দিকে ক্রমশ পদক্ষেপ দৃঢ় করে চলেছে। ভারত সরকারও ধূমপান নিষেধ করার ব্যাপারে কঠোর মনোভাব নিচ্ছেন। ভারতে পঁচিশ কোটির অধিক মানুষ ধূমপানে আসক্ত।

❑ ধূমপায়ীদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাক, ধূমপানের সঙ্গে অনেক প্রকারের রাসায়নিক দ্রবণ—বিশেষভাবে নিকোটিন, কার্বন-মনোক্সাইড, টার ইত্যাদি দেহ ও মস্তিষ্কে প্রবেশ করে মনে ও দেহে একপ্রকারের আমেজ আনে। এই সামান্য আমেজটুকুর জন্য দেহে জটিল ব্যাধির আহ্বান করে তাঁরা ব্রেন টিউমার, অন্ধত্ব, গ্যাস্ট্রিক আলসার, হাঁপানি, ক্ষয়রোগ, মুখ-গলা-বুক-ফুসফুস-জরায়ুতে ক্যান্সার ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। ধূমপায়ীদের স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন ইত্যাদি সকলেই পরিবেশ-দূষণ হেতু ধূমপানের বিষক্রিয়ার প্রভাবমুক্ত থাকতে পারেন না।

❑ পাশ্চাত্যদেশে ধূমপানের আকর্ষণ কমাবার জন্য নিকোটিন প্যাচ বা নিকোটিন চুইনগাম ব্যবহার করা হয়। সবথেকে ভাল উপায়—লবঙ্গ, দারুচিনি, কিসমিস, আমলকি, হরীতকী বা জোয়ান মুখে রাখা। কিন্তু মনকে দৃঢ় না করলে কোন উপায়ই ফলদায়ী হবে না।

জীবাণুযুদ্ধের মোকাবিলা কিভাবে সম্ভব?

মানুষ চিরকাল অসুখের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে। ইতিহাসই বলে দেয়, ব্যাকটিরিয়া-জীবাণু ও ভাইরাস-জীবাণু চিরকাল মানুষ, জন্তু ও গাছগাছড়াকে আক্রমণ করে আসছে এবং এর ফলও কখনো কখনো সাঙ্ঘাতিক হয়েছে। যেন এটাই যথেষ্ট নয়; বর্তমানে যুদ্ধের সময় বা সন্ত্রাসবাদের অঙ্গ হিসাবে জীবাণু দ্বারা ব্যাধি সৃষ্টি করার (biological warfare) সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই সম্ভাবনাকে বাধা দিতে হলে দরকার আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন, আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং সেই চুক্তি যথাযথভাবে মানা হচ্ছে কিনা, তা যাচাই করে দেখার বন্দোবস্ত করা।

অনেকের ধারণা—প্লেগ, বসন্ত বা অ্যানথ্রাক্স (পশুদের মারাত্মক রোগ, যা মানুষের দেহে দুষ্ট ব্রণ সৃষ্টি করে জীবননাশ করতে পারে) রোগের জীবাণু যুদ্ধের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা সামান্য; কিন্তু সেটা ঠিক নয়। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন জীবাণুযুদ্ধের অস্ত্র তৈরি করতে বিরাট কর্মসূচী নিয়েছিল। দূরক্ষেপণকারী ব্যালিস্টিক মিশাইলে অ্যানথ্রাক্স জীবাণু সঞ্চিত রেখে তা পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে প্রয়োগের জন্য প্রস্তুত রেখেছিল। গত উপসাগরীয় যুদ্ধের (Gulf War) পরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের পর্যবেক্ষকরা ইরাকে গিয়ে দেখতে পেলেন, বিমানবাহিত বোমায় এবং দূর-ক্ষেপণাস্ত্রে জীবাণু ব্যবহারের কর্মসূচী বেশ অগ্রসর অবস্থায় রয়েছে। আরো ছোটখাট কয়েকটি দেশে জীবাণুযুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরি করা রয়েছে বলে মনে হয়। তাছাড়া কয়েকটি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী এব্যাপারে বেশ কৌতূহলী। ১৯০৫ সালে যে জাপানী গোষ্ঠী টোকিওর ভূগর্ভপথে বিষাক্ত গ্যাস ছেড়েছিল, তারাও জীবাণু-যুদ্ধাস্ত্র তৈরি করেছিল। তাছাড়া আধুনিক জৈব-প্রযুক্তিবিদ্যায় (bio-technology) বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তাতে আরো নতুন ধরনের জীবাণু-যুদ্ধাস্ত্র তৈরি হবে এবং জিন-সংক্রান্ত এমন অস্ত্র তৈরি হবে যা কেবল সমাজের কোন একটি গোষ্ঠীর ওপরই প্রযুক্ত হতে পারবে।

পারমাণবিক অস্ত্রের মতোই বিধ্বংসী অথচ সহজে ও সস্তায় তৈরি হতে পারে বলে পারমাণবিক বা প্রচলিত যুদ্ধাস্ত্রে শক্তিশালী পাশ্চাত্য দেশগুলিকে রুখতে বিরোধী দেশগুলির কাছে জীবাণু-যুদ্ধাস্ত্র লোভনীয় হয়ে উঠেছে। এথেকে সহজেই বোঝা যায় যে, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে জীবাণু-যুদ্ধাস্ত্র কেন মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিপুল গণহত্যা নিবারণের জন্য বহু আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়েছে। ১৯৭৫ সালে যে 'বায়োলজিক্যাল অ্যান্ড টক্সিন ওয়েপন্স কনভেনশন' হয়েছিল, তাতেই জীবাণু-যুদ্ধাস্ত্র নিষিদ্ধ হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত ঐ চুক্তিতে এমন কোন শর্ত ছিল না যার দ্বারা কোন দেশ চুক্তিভঙ্গ করছে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখা যায়।

১৯৯৩ সালে 'কেমিক্যাল ওয়েপন্স কনভেনশন'-এ রাসায়নিক যুদ্ধাস্ত্র তৈরি হওয়া বে-আইনী বলে ঘোষিত হয়েছিল। রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি হচ্ছে কিনা, তা যাচাই করে দেখার অনেকরকম ব্যবস্থা সেই আইনের মধ্যে ছিল। জেনেভার 'বায়োলজিক্যাল অ্যান্ড টক্সিন ওয়েপন্স কনভেনশন'-এ উপরি উক্ত ধরনের জীবাণু-যুদ্ধাস্ত্র তৈরি হচ্ছে কিনা তা যাচাই করে দেখার শর্ত যোগ করা হয়েছে এবং এর জন্য আইনমাফিক খসড়াও তৈরি হয়েছে। এই খসড়া অনুযায়ী প্রতিটি দেশকে জীবাণু-যুদ্ধাস্ত্র তৈরি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং তাদের প্রদত্ত তথ্যগুলি কতটা সত্য তা যাচাই করে দেখা হবে। সন্দেহ হলে অল্প সময়ের মধ্যে সে-দেশে গিয়ে অবস্থা খতিয়ে দেখা হবে। এই খসড়া মেনে নেওয়ার জন্য ছোট দেশগুলিকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে যে, আধুনিক জৈব-প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে এই দেশগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করা হবে। অবশ্য যাচাই করে দেখার ব্যাপারে বর্তমানে যথেষ্ট মতভেদ রয়ে গেছে।

এটা ঠিক যে, এইভাবে খসড়া পাঠিয়েই জীবাণু-যুদ্ধাস্ত্র বন্ধ করা সম্ভব হবে না। কোন দেশ যে মিথ্যা বলে ঠকাচ্ছে না, তা শতকরা ১০০ ভাগ জোর দিয়ে বলা যাবে না।

এই ব্যাপারে অনেক বাধাও রয়েছে। সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে—কোন দেশ যা ঘোষণা করেছে, মাঝে মাঝে সে-দেশে গিয়ে তার সত্যতা যাচাই করা। আমেরিকা মনে করে যে, এতে সেদেশের শিল্প ও সামরিক কর্তৃপক্ষের ওপর শুধু শুধু চাপ পড়বে এবং অনেক গোপন তথ্য বেরিয়ে পড়বে। সুতরাং তাদের প্রদত্ত তথ্যে অবিশ্বাস হলে একমাত্র তখনি গিয়ে যাচাই করা উচিত। ইউরোপীয়রা কিন্তু মনে করে, কোন দেশের ঘোষণার যাথার্থ্য নির্দিষ্ট হওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় তাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য কিছু করার কথাই ওঠে না। [দ্রঃ **British Medical Journal, 22 April 2000, pp. 1089-1090**] ❑

ভাষান্তর ঃ জলধিকুমার সরকার

স্বামী তথাগতানন্দের 'মহাভারত-কথা'

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

	মহাভারত-কথা স্বামী তথাগতানন্দ প্রকাশক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ উদ্বোধন কার্যালয় ১ উদ্বোধন লেন কলকাতা-৭০০ ০০৩ পৃষ্ঠা ২৪+২৭৬ মূল্য ঃ ২০ টাকা

আমাদের মতো সপ্ততি-উত্তীর্ণ বাঙালী মোটামুটি মহাভারত জানি না—এমন হতে পারে না। সে-মহাভারত কাশীরাম দাস কিংবা কালীপ্রসন্ন সিংহ কিংবা রাজশেখর বসু—যাঁরই হোক। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মহাকায় মহাভারতকে অবশ্য নমস্কার করে সরে গেছি, কিন্তু সুখময় ভট্টাচার্যের 'মহাভারতের সমাজ' আনন্দের সঙ্গে পড়েছি। পড়েছি আরো কিছু কিছু বই। তবু মহাভারত এমনি বিরাট ব্যাপার যে, অনেক বিষয়েই ধারণা স্পষ্ট ছিল না। কিছু কথা জেনেই সন্তুষ্ট থেকেছি। কিন্তু স্বামী তথাগতানন্দের **'মহাভারত-কথা'** বইটি নিঃসন্দেহে মহাভারতের বহুতর বিষয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণাসৃষ্টির সহায়ক। তিনি আমাদের গহন অরণ্যে বিচরণের পথনির্দেশ দিয়েছেন।

স্বামী তথাগতানন্দ দীর্ঘদিন ধরে রামায়ণ-মহাভারত চর্চা করছেন। তিনি সুপণ্ডিত গবেষক এবং দীর্ঘদিন ধরে পাশ্চাত্যে বেদান্তপ্রচারক। স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় প্রথম যে বেদান্ত কেন্দ্র স্থাপন করেন, সেই নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ তিনি—পাশ্চাত্যভূমে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বেদান্তকে প্রতিষ্ঠিত করার সাধনায় ব্যাপৃত। কিন্তু আর্ত তিনি (আমার অনুমান তাই), কেননা তাঁর নিজ দেশে হারিয়ে যাচ্ছে বেদান্ত—যে বেদান্ত-ভাবনার ধাত্রী মহাভারত। স্বামীজীর কথাগুলি অবশ্যই তাঁর মনে ছিল—'উদ্বোধন'-এর প্রস্তাবনায় স্বামীজী যা বলেছিলেন ঃ "ভয় আছে যে, এই পাশ্চাত্যবীর্যতরঙ্গে আমাদের বহুকালার্জিত রত্নরাজি বা ভাসিয়া যায়; ভয় হয়, পাছে প্রবল আবর্তে পড়িয়া ভারতভূমিও ঐহিক ভোগলাভের রণভূমিতে আত্ম-হারা হইয়া যায়; ভয় হয়, পাছে অসাধ্য, অসম্ভব এবং মূলোচ্ছেদকারী বিজাতীয় ঢঙের অনুকরণ করিতে যাইয়া আমরা 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্টঃ' হইয়া যাই। **এইজন্য ঘরের সম্পত্তি সর্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে, যাহাতে আসাধারণ সকলে তাহাদের পিতৃধন সর্বদা জানিতে ও দেখিতে পারে। তাহার প্রযত্ন করিতে হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে নির্ভীক হইয়া সর্বদ্বার উন্মুক্ত করিতে হইবে।**" (স্থূলাক্ষর লেখক-কৃত)

বাঙলায় **'মহাভারত-কথা'** রচনার দ্বারা স্বামী তথাগতানন্দ বাঙালীর সামনে 'পিতৃধন' উপস্থিত করেছেন তাদের চিত্তের সুস্থিরতা সম্পাদনের জন্য।

বইটির অনেক গুণ। স্বামী তথাগতানন্দের মহাভারতীয় চরিত্রচিত্রণগুলি যেকোন বিচারেই সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। অর্জুন, ভীম, যুধিষ্ঠির, কর্ণ, ভীষ্ম, বিদুর, গান্ধারী, কুন্তী, দ্রৌপদী প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে সুন্দরভাবে নানা দিক থেকে বিশ্লেষণ করেছেন প্রাজ্ঞ সন্ন্যাসী। সে-আলোচনা যেমন বিশ্লেষণধর্মী, তেমনি আকর্ষণীয়। গ্রন্থটির 'পরিশিষ্ট' অংশটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পরিশিষ্টের সংখ্যা ৯টি। সেগুলিতে 'মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্রের নাম-পরিচিতি', 'কয়েকটি বিখ্যাত স্থান-পরিচিতি', 'অতি সংক্ষিপ্ত ও অতি প্রয়োজনীয় বংশতালিকা', 'সিদ্ধান্তবাগীশ, আঠার পর্বের সূচীপত্র', 'অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যের হিসাব', 'যুধিষ্ঠিরের বয়স', 'গীতা ব্যতীত মহাভারতের কয়েকটি বিখ্যাত শ্লোক', 'যুদ্ধের নিয়মবন্ধন' ইত্যাদি। মহাভারতের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণাসৃষ্টির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এই পরিশিষ্টগুলি। লেখক যথাকালে মূল সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন—সেগুলির অনুবাদ বা ভাবানুবাদের উৎস-নির্দেশ সহ—যাতে তাঁর বক্তব্য, যা প্রশ্নাধীন মনে হতে পারে, তা প্রমাণীকৃত হয়েছে। বিভিন্ন চরিত্রের নামের অর্থ, গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর সময়ে তাঁদের বয়সের হিসাব, ঘটনাসমূহের সময়ের উল্লেখ, কৌরব ও পাণ্ডবদের রাজত্বকালের সময় নির্ধারণ—এসকলই তিনি করেছেন। মহাভারত যে মানবকাহিনী, তা গ্রন্থসূচনাতেই তিনি বলে নিয়েছেন, মানুষ অপেক্ষা বড় কিছু নেই—"ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ"; সেজন্য তিনি এই গ্রন্থে ধারাবাহিক কাহিনী না বলে বিভিন্ন চরিত্রের পর্যালোচনা করেছেন। তার ফলে উক্ত মানবচরিত্রগুলি আমাদের কাছে সজীব অবয়ববিশিষ্ট বলে প্রতীয়মান হয়েছে এবং পৌরাণিক কাহিনীর অনেক পোশাকী চুমকি ঝরে গেছে। তিনি স্মরণ করিয়েছেন—"মহাভারত মানুষকে আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতেই দেখেছে। এখানে মানুষের জীবনের সমস্ত আবেগই প্রকাশিত।... সেইজন্যই মহাভারত কালজয়ী

গ্রন্থ।" লেখক জানিয়েছেন ঃ "মহাভারত মানুষকে দিয়েছে এক বিশেষ বলিষ্ঠ জীবনবাদ।... মহাভারতের এই বলিষ্ঠ জীবনবাদ নিঃসন্দেহে গীতার মর্মবাণী।"

স্বামী তথাগতানন্দ দেখাতে চেষ্টা করেছেন, মহাভারতের চরিত্রগুলি জীবন্ত মানুষ—নীতিকথামালার দৃষ্টান্তচরিত্র নন। মহাভারত—রামায়ণ নয়। রামায়ণ গৃহস্থাশ্রমের আদর্শ কাব্য—একথা সর্বজনস্বীকৃত। সুমহান সুমঙ্গল সুপবিত্র সেই সৃষ্টি। মহাভারত সেখানে বিক্ষুব্ধ মহাসাগর, নীতিহীনতায় আবর্তিত, সামাজিক দূষণে কলুষিত—তারই ভিতর থেকে ধর্মপথে উত্থিত হওয়ার জন্য নিয়ত সংগ্রামরত। এখানে অধিকাংশ চরিত্র আকারে বিশাল, কোনটি আদ্যন্ত কদর্য, ক্লেদাক্ত। কোনটি আবার মহিমার উজ্জ্বলতার মধ্যে নানা আত্ম-পরাজয়ে কালিমাঙ্কিত। ব্যাসদেব কিছুই গোপন করেননি। নির্বিকার নিরাসক্ত তাঁর বস্তুজ্ঞান এবং সত্যবোধ। যিনি নিজ জন্মের কলঙ্ককথা অবিচলিতভাবে বলে যেতে পারেন, তিনি কি কোন তথ্য উদ্ঘাটনে কুণ্ঠিত হতে পারেন? সবই তিনি জানিয়েছেন—সর্বোপরি শুনিয়েছেন এক বিশাল নিয়তি-নির্ঘোষ—সাবধান! সাবধান! ধর্মই শ্রেয়, ধর্মই রক্ষক। অধর্ম বিনষ্টি আনে। ধর্মই মহাকাল। ধর্মই করাল কৃষ্ণ। স্খলন, পতন, উত্থান এবং পুনঃপতন—সবকিছুকে ধারণ করে আছে বলে মহাভারত পৃথিবীতে অতুলনীয় সৃষ্টি—মহাপ্রস্থানের চরণচিহ্নিত দুর্ধর্ষ জীবনের মহাকাব্য। স্বামী তথাগতানন্দ সেই মহাকাব্যের মূল বক্তব্যকে বিভিন্ন চরিত্রের আলোচনার মাধ্যমে আমাদের সামনে নতুন করে উপস্থাপন করেছেন। তাঁকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। ❑

সংক্ষিপ্ত পরিচয়

● **ভারতীয় সংস্কৃতিতে আচার্য গোপীনাথ কবিরাজের অবদান**—পরিতোষ দাস। প্রকাশিকা ঃ অনিমা দাস। ১০ ঘোষপাড়া লেন, ভদ্রকালী, হুগলী। পিন-৭১২২৩২। পৃষ্ঠা ঃ ৪৮+৬৬৩। মূল্য ঃ ২৫০ টাকা।

ভারতের শাশ্বত বৈশিষ্ট্য তার আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞা ও দর্শনের ঐশ্বর্য। আচার্য গোপীনাথ কবিরাজ তাঁর অসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞান ও সাধনালব্ধ উপলব্ধির আলোকে ভারতের মর্মবাণীর ব্যাখ্যা করেছিলেন। তাঁর সেই ব্যাখ্যার অনন্যতার পরিচয় রয়েছে এই গ্রন্থটিতে।

● **মহাজীবন ও মহানুভূতি**—ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক ঃ জগদীশ্বর পাল। ১০ গ্যালিফ স্ট্রীট, স্যুইট নং ৬৩, ব্লক নং ৫, কলকাতা-৭০০ ০০৩। পৃষ্ঠা ঃ ৮+১২৬। মূল্য ঃ ২৫ টাকা।

গ্রন্থটি আচার্য গোপীনাথ কবিরাজের নিছক জীবনী নয়, এটি তাঁর আন্তর্জীবনের নির্ভরযোগ্য ভাষ্য। আচার্যের স্নেহধন্য প্রজ্ঞাবান লেখকের আলোচনায় পাঠকরা এক মহাজীবন অনুধ্যানের সুযোগ পাবেন। সেইসঙ্গে পাবেন আনন্দ ও প্রেরণা।

● **পরমার্থ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ (৬ষ্ঠ খণ্ড)**—বাণী সঞ্চয়ন ও সঙ্কলন ঃ জগদীশ্বর পাল। প্রকাশক ঃ জগদীশ্বর পাল। ১০ গ্যালিফ স্ট্রীট, স্যুইট নং ৬৩, ব্লক নং ১, কলকাতা-৭০০ ০০৩। পৃষ্ঠা ঃ ৮+১০৬। মূল্য ঃ ১৬ টাকা; **(৭ম খণ্ড)**—পৃষ্ঠা ঃ ৮+১১২। মূল্য ঃ ২০ টাকা; **(৮ম খণ্ড)**—পৃষ্ঠা ঃ ৮+১৭৯। মূল্য ঃ ৩০ টাকা।

সাধনজীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কথা বই তিনটিতে পাঠকরা পাবেন এবং বলা বাহুল্য, উপকৃত হবেন।

● **রবীন্দ্রনাথের বলাকা প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ**—সঙ্কলক ও প্রকাশক ঃ জগদীশ্বর পাল। ১০ গ্যালিফ স্ট্রীট, স্যুইট নং ৬৩, ব্লক নং ১, কলকাতা-৭০০ ০০৩। পৃষ্ঠা ঃ ১৬। মূল্য ঃ ৫ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কাব্যে বারবার এসেছে 'আমি' ও 'তুমি'র প্রসঙ্গ। তাতে রবীন্দ্রনাথের দ্বৈতবাদী ভাবনা বা অদ্বৈতবাদী ভাবনা—কোন্‌টি ব্যক্ত হয়েছে? সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আচার্য গোপীনাথ কবিরাজ তাঁর এই পুস্তিকাটিতে। আলোচনাটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু খুব মূল্যবান।

● **তান্ত্রিক সাহিত্যে শাক্তসৃষ্টি প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ**—সঙ্কলক ঃ বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক ঃ জগদীশ্বর পাল। ১০ গ্যালিফ স্ট্রীট, স্যুইট নং ৬৩, ব্লক নং ৫, কলকাতা-৭০০ ০০৩। পৃষ্ঠা ঃ ৪+৬৭। মূল্য ঃ ২৫ টাকা।

নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অধিকারী আচার্য গোপীনাথ কবিরাজ তান্ত্রিক ও শাক্ত দর্শন ও সাধনায় তাঁর নিজস্ব মৌলিক চিন্তা ও ভাবনার পরিচয় রেখেছিলেন তাঁর নানা গ্রন্থে। বর্তমান ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে বীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় কবিরাজ মহাশয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে লিখিত মত সঙ্কলন করে দিয়েছেন। অধ্যাত্মজিজ্ঞাসু এবং শাক্ত সাধকগণ এই সঙ্কলন পুস্তিকাটি থেকে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

● **শ্রীশ্রীআনন্দময়ী মায়ের স্বরূপ ও উপদেশ**—সম্পাদনা ঃ জগদীশ্বর পাল। প্রকাশক ঃ জগদীশ্বর পাল। ১০ গ্যালিফ স্ট্রীট, স্যুইট নং ৬৩, ব্লক নং ৫, কলকাতা-৭০০ ০০৩। পৃষ্ঠা ঃ ৮+৮৮। মূল্য ঃ ২০ টাকা।

এই ছোট সঙ্কলন-পুস্তিকাটিতে রয়েছে একালের এক মহীয়সী বহুমানিতা সাধিকা আনন্দময়ী মায়ের জন্মশতবর্ষে (১৯৯৬) তাঁর সম্পর্কে মহাজনদের উক্তি এবং তাঁর নিজের কিছু উপদেশ। অধ্যাত্মপথের যাঁরা আন্তরিক পথিক তাঁদের কাছে এই পুস্তিকাটি অপরিহার্য।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব অনুষ্ঠান

বেলুড় মঠে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬৬তম জন্মতিথি-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে ভাষণ দান করেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী অসক্তানন্দ এবং বেলঘরিয়া স্টুডেন্টস হোমের সম্পাদক স্বামী অন্নপূর্ণানন্দ। উৎসবে প্রায় ২৪,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ **কাটিহার আশ্রম বিদ্যালয়ের (বিহার)** সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানে বিহার সরকারের মধ্যশিক্ষা মন্ত্রী রামপ্রকাশ মাহাতো-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ণকুম্ভ মেলা উপলক্ষ্যে **এলাহাবাদ আশ্রম (উত্তরপ্রদেশ)** গত ৮-৩১ জানুয়ারি ২০০১ একটি শিবির পরিচালনা করে। এতে ২,১৩৩ জন তীর্থযাত্রী ও ৩৭৮ জন সাধুর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি আধ্যাত্মিক শিবির, যুবশিবির, ভক্তশিবির ও বেদান্ত-শিবিরে সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু ও ভক্ত-সম্মেলন এবং এক আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্যামল সেন। এছাড়া একটি প্রদর্শনী ও চিকিৎসা-শিবির (শিবিরে ৩০,৩৫১ জনের চিকিৎসা করা হয়) আয়োজিত হয় এবং একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন (পোর্টব্লেয়ার, আন্দামান) গত ১৫ জানুয়ারি ২০০১ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মঙ্গলারতি, বৈদিক স্তোত্রপাঠ, ভক্তিগীতি, বিশেষ পূজা ও প্রসাদ বিতরণ ছিল এই উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দুলাল মজুমদার। দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে গত ২১ জানুয়ারি স্বামী হরিদেবানন্দের পরিচালনায় এক বক্তৃতা-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। পুরস্কার বিতরণ করেন আশ্রম-সম্পাদক স্বামী অমৃতরূপানন্দ। ভাষণ দেন দিলীপকুমার পাল।

রামকৃষ্ণ মঠ, মঠ-চণ্ডীপুর (জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১১ ফেব্রুয়ারি এক ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করে। ১২২ জন ভক্তের উপস্থিতিতে ধর্মপ্রসঙ্গ এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান করেন স্বামী আত্মপ্রভানন্দ ও স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ। 'সঙ্গীতে কথামৃত' পরিবেশন করেন স্বামী মায়াধীশানন্দ।

জাতীয় যুবদিবস

বেলুড় মঠ গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ স্বামীজীর জন্মদিন তথা জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, বক্তৃতা, সঙ্গীত ও যোগাসন প্রদর্শনীর আয়োজন করে।

শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির (জয়রামবাটী, জেলা—বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বক্তৃতা, সঙ্গীত, কবিতা, ক্যুইজ প্রভৃতি প্রতিযোগিতা এবং ধর্মসভার মাধ্যমে জাতীয় যুবদিবস পালন করে। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় প্রায় ৬০০ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। দুপুরে প্রায় ৫,০০০ ছাত্রছাত্রী ও নরনারী বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকালের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব এবং সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করেন স্বামী গোপেশানন্দ। ভাষণ দান করেন স্বামী গিরিধরানন্দ ও মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী অমেয়ানন্দ। সভার প্রারম্ভে 'আশ্রম স্মরণিকা' প্রকাশ করা হয়। সন্ধ্যারতির পর স্বামী আনন্দময়ানন্দের পরিচালনায় জলপাইগুড়ি ভক্তগোষ্ঠী লীলাগীতি পরিবেশন করে।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (মনসাদ্বীপ, জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ গঙ্গাসাগর মেলা ক্যাম্পে জাতীয় যুবদিবসের আয়োজন করে। এতে সাগরদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলের ৩০টি ক্লাব, ১৬টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ১টি মহাবিদ্যালয় থেকে প্রায় ১,৩০০ ছাত্রছাত্রী যোগদান করে। এদিন সঙ্গীত, আবৃত্তি, বক্তৃতা এবং শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, এবছর এই আশ্রম মেলা ক্যাম্পে ৮৫৫ জন তীর্থযাত্রীর থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে।

রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম, কলকাতা-৭০০০২৫) গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ জাতীয় যুবদিবস পালন করেছে। সকালে ১৮টি বিদ্যালয় ও অন্যান্য সংস্থার প্রায় ২,২৩৯ জন ছাত্রছাত্রী ও ভক্তের এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পথ-পরিক্রমা করে। হরিশ পার্কে আয়োজিত এক জনসভায় আবৃত্তি, গান, একাঙ্ক নাটক, বক্তৃতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (রামহরিপুর, জেলা—বাঁকুড়া) গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষ্যে একটি যুবশিবিরের আয়োজন করে। শিবিরে ৮৫ জন যুবপ্রতিনিধি যোগদান করে। শিবিরে সভাপতিত্ব করেন এবং স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ। ভাষণ দেন স্বামী সুপ্রভানন্দ, স্বামী বেদজ্ঞানন্দ, স্বামী কৃত্তিবাসানন্দ, অরুণকুমার সিংহ, মোহন সিংহ প্রমুখ। এছাড়া সঙ্গীত, আবৃত্তি ও 'বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, গত ১৭ জানুয়ারি আশ্রমের নবনির্মিত বিদ্যালয়ভবনের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ।

সেবাব্রত

ত্রাণ

গুজরাটের বিধ্বংসী ভূমিকম্পে **রাজকোট আশ্রম** গত জানুয়ারি মাসে তাঙ্কারা, মরভি, ভাচাউ, ভুজ, ধানেতি প্রভৃতি অঞ্চলের হাজার হাজার নিঃস্ব মানুষের মধ্যে ১,০৯,৮৮৫টি ফুড প্যাকেট, ১,০০,০৮০টি বিস্কুট, ১১,০০০ কিলোগ্রাম গাঠিয়া,

৫৫,৩৫০ পাউচ পানীয় জল, ৫৪০ বোতল মিনারেল ওয়াটার, ১,০০০ কিলোগ্রাম চাল, ৬০০ কিলোগ্রাম গম, ১,৪০০ কিলোগ্রাম ময়দা, ১,০৫০ কিলোগ্রাম ডাল, ৭৬৫ কিলোলিটার তেল, ১,১০০ কিলোগ্রাম খিচুড়ি, ১,৬৫০ কিলোগ্রাম সবজি, ১,৫০০ কিলোগ্রাম আলু, ১,৫০০ কিলোগ্রাম পেঁয়াজ, ৬০ কিলোগ্রাম লবণ, ১০০ কিলোগ্রাম গুঁড়ো দুধ, ৮০০ কিলোগ্রাম চিনি, ১৬০ কিলোগ্রাম চা, ২৮০টি পরিবার-পিছু একটি করে প্যাকেট (কাপড়, কম্বল ও মুদিখানার দ্রব্য-সম্বলিত), ৩,১০০টি পোশাক, ১১,০০০ কম্বল, ১,২৯০ টিচাদর, ২৫০টি বিছানার চাদর, ১০০ তোয়ালে, ১,৮৪৫ টি প্লাসটিক শীট, ১,৬৫০ টি সোয়েটার, ১৭,৮১২ দেশলাই-বাক্স, ৬৪,০২৫টি মোমবাতি ও মুমূর্ষু রোগীর জন্য ২০০ বোতল রক্ত বিতরণ করেছে। এছাড়া শবদাহের জন্য ১১,০০০ কিলোগ্রাম জ্বালানি কাঠ এবং ১,০০০ মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পোরবন্দর আশ্রম ভরওয়াদা, কেশব, মোরালা, গড়িয়াধর, জাম্বু প্রভৃতি গ্রামের ভূমিকম্প-কবলিত ৩৫০ জন মানুষকে প্রত্যহ খিচুড়ি দেওয়া হয় এবং ১,২০০ কিলোগ্রাম বজরা, ১,২০০ কিলোগ্রাম গম, ৩০০ কিলোগ্রাম চাল, ৩০০ কিলোগ্রাম ডাল, ১২০টি প্লাস্টিক তাঁবু, ১৭৪টি কম্বল, ১৭৩টি সোয়েটার, ১৩টি লেপ ও ৬৭টি বিছানার চাদর বিতরণ করে।

লিমডি আশ্রম আমেদাবাদের বোরানা, বাস্তারি, সিমলা, লিয়াত প্রভৃতি অঞ্চলের ৭০০ মানুষের মধ্যে ৪,০০০ ফুড প্যাকেট বিতরণ করেছে। এছাড়া গান্ধীধামে একটি চিকিৎসা-শিবির খোলা হয়েছে। এই ত্রাণের জন্য বেলুড় মঠ ২০,০০০ কম্বল প্রেরণ করেছে।

দেহত্যাগ

স্বামী তীর্থানন্দজী (গুণমণি মহারাজ) অকস্মাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১৬ জানুয়ারি ২০০১ সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে দেহত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। তিনি উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবিটিস রোগে ভুগছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করে তিনি ১৯৪৮ সালে রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠে (বেলুড়) যোগদান করেন। ১৯৫৬ সালে শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি বেলুড় মঠ ও ভুবনেশ্বর মঠে বিভিন্ন সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে পাটনা ও বরানগর কেন্দ্রের সম্পাদক এবং বেলুড় মঠের ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আচার্য ছিলেন। দীর্ঘ ২০ বছর ধরে তিনি বেলুড় মঠ ও বারাণসীতে অবসর জীবন যাপন করছিলেন। স্বামী তীর্থানন্দজী ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ, স্নেহপ্রবণ ও নম্রস্বভাব।

স্বামী জগন্ময়ানন্দজী (গৌর মহারাজ) মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে গত ২২ জানুয়ারি ২০০১ সকাল ৫টা ১৫ মিনিটে বারাণসী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। গত কয়েক বছর ধরে তিনি ডায়াবিটিস, হৃদ্‌রোগ ও বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করে ১৯৩৫ সালে ফরিদপুর (বাংলাদেশ) আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি বিভিন্ন সময়ে বেলুড় মঠ, বরিশাল, দিল্লি, শ্রীনগর, কাটিহার, এলাহাবাদ, মুম্বাই, রাঁচি স্যানাটোরিয়াম ও বারাণসীতে বিভিন্ন সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ৭ বছর স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের ব্যক্তিগত সেবক ছিলেন। দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে তিনি বারাণসীতে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। তিনি ছিলেন স্বভাব-তপস্বী, পরিশ্রমী এবং স্নেহপ্রবণ স্বভাব।

স্বামী স্থিতাত্মানন্দজী (বেঙ্কটকৃষ্ণ মহারাজ) হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২৫ জানুয়ারি ২০০১ রাত ১০টা ৪৫ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি কয়েক বছর ধরে ডায়াবিটিস ও কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৪০ সালে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন এবং ১৯৪৯ সালে নিজ গুরুর কাছ থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। বেলুড় মঠ ছাড়া তিনি বিভিন্ন সময়ে করাচি (পাকিস্তান), চেন্নাই মঠ, সেবাপ্রতিষ্ঠান, রাঁচি স্যানাটোরিয়াম, পাটনা, চেন্নাই স্টুডেন্টস হোম, মুম্বাই, সালেম, বৃন্দাবন, রামহরিপুর ও ভুবনেশ্বর মঠে বিভিন্ন সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ প্রথমে আলসূর আশ্রম এবং পরে বেলুড় মঠে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। সহৃদয়তা, পরিশ্রমী স্বভাব ও অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলেই তাঁকে ভালবাসত।

স্বামী শুক্লানন্দ (কালিদাস) গত ৩১ জানুয়ারি ২০০১ সন্ধ্যা ৭টা ৫ মিনিটে কাশী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি কয়েক বছর ধরে হৃদ্‌রোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবিটিস এবং বার্ধক্যজনিত অন্যান্য রোগে ভুগছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করে ১৯৫১ সালে বৃন্দাবন আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৫৯ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি বিভিন্ন সময়ে বেলুড় মঠ, জলপাইগুড়ি, সেবাপ্রতিষ্ঠান, বারাণসী সেবাশ্রম, ভুবনেশ্বর, রাঁচি স্যানাটোরিয়াম ও দেওঘর কেন্দ্রে বিভিন্ন সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ৭ বছর পুরী মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন। দীর্ঘ ১০ বছর যাবৎ তিনি প্রথমে দেওঘর এবং পরে কাশীতে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। অমায়িকতা ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন: গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ এবং আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যারতির পর সারদানন্দ হল-এ 'শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ' আলোচনা করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দজী মহারাজের জন্মতিথিতে তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী বিনির্মলানন্দ।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

সারেঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি (জেলা—বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ)-র পরিচালনায় এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় গত ১৮ ও ১৯ নভেম্বর ২০০০ স্বামী বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী ভক্ত ও যুব-সম্মেলন সুন্দর গ্রামীণ পরিবেশে নির্মিত মন্দির-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ নভেম্বর বিকাল ৪টায় ভক্ত-সম্মেলনের উদ্বোধন করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। স্বাগত-ভাষণ দেন সোসাইটির সভাপতি ডাঃ সুনির্মল বেরা। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন জয়দেব ঘোষাল ও সঙ্ঘমিত্রা চ্যাটার্জী। সম্মেলনে প্রায় ৩০০ ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় দিন সকালে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আয়োজিত হয়। এতে সহস্রাধিক মানুষ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে বিভিন্ন বিদ্যালয়, কলেজ, ক্লাব, নাট্যগোষ্ঠী ও যুবসংগঠন থেকে প্রায় ৭০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। দুপুরে তাঁদের সকলকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। সভায় স্বাগত-ভাষণ দেন ডাঃ সুনির্মল বেরা। পাঠে অংশগ্রহণ করেন চন্দন দত্ত ও তনুশ্রী গোস্বামী। স্বামীজীর 'স্বদেশমন্ত্র' অলচিকি (সাঁওতালী) ভাষায় অনুবাদ করে শোনান অনামিকা মুর্মু ও নিপুণিকা মুর্মু। যুবসম্মেলনের উদ্বোধন করেন মেদিনীপুর আশ্রমের সম্পাদক স্বামী আত্মপ্রভানন্দ। সম্মেলনের প্রতিনিধিদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ এবং স্বামী আত্মপ্রভানন্দ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্যামলকুমার দত্ত। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ঘাটাল (জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৬ নভেম্বর ২০০০ যতীশচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি সদনে (টাউন হল-এ) একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনের উদ্বোধন ও ভাষণ দান করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। তিনি 'কথামৃত' পাঠ এবং সমাপ্তি অধিবেশনে ভক্তদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান করেন। ভাষণ দান ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী গুড়াকেশানন্দ। স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রম-সম্পাদক অজিতকুমার সাঁতরা। আলোচনা করেন অধ্যাপক কমলকুমার মান্না ও বাদলচন্দ্র গুছাইত। মন্দিরা দত্তের পরিচালনায় ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। সম্মেলনে প্রায় ৪৮০ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

সারদা রামকৃষ্ণ চাইল্ড অ্যান্ড ওম্যান সেবা কেন্দ্রের ঘোলা (সোদপুর, জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) শাখায় গত ২৬ নভেম্বর ২০০০ একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন এবং বস্ত্র-বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন ও বস্ত্র বিতরণ করেন স্বামী অঘোরানন্দ। অনুষ্ঠানে মহাদেব ঘোষের উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশনের পর স্বাগত-ভাষণ দেন সন্ধ্যা সূত্রধর। ভাষণ দান করেন স্বামী অঘোরানন্দ এবং দীঘা সারদা-রামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী নিত্যবোধানন্দ। ভজন পরিবেশন করেন বাণী চক্রবর্তী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী বিবেকানন্দ গিরি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন লক্ষ্মীনারায়ণ চ্যাটার্জী। অনুষ্ঠানে সমাগত প্রায় ১০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (হামিরপুর, রাউরকেল্লা, ওড়িশা) গত ২ ও ৩ ডিসেম্বর ২০০০ ধর্মসভা ও ভক্তসম্মেলনের মাধ্যমে বাৎসরিক উৎসব উদ্‌যাপন করে। ২ ডিসেম্বর সান্ধ্য ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন ভুবনেশ্বর মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শিবেশ্বরানন্দ এবং 'গীতা'র ওপর ভাষণ দেন স্বামী ত্যাগরূপানন্দ। সঙ্ঘের বার্ষিক বিবরণ পাঠ করেন সঙ্ঘ-সম্পাদক রমেন ঘোষ। স্থানীয় স্কুল-কলেজের সফল ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। পরদিন ভক্তসম্মেলনের উদ্বোধন করেন স্বামী শিবেশ্বরানন্দ। স্বাগত-ভাষণ দেন রমেন ঘোষ। ভাষণ দান করেন স্বামী শিবেশ্বরানন্দ ও স্বামী ত্যাগরূপানন্দ। পাঠে অংশগ্রহণ করেন বিজনকুমার মজুমদার, অনুশীলা সান্যাল ও নিবেদিতা পাঠক। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন এল. ধর্মরাজন, মালা দাশগুপ্ত প্রমুখ। দুপুরে প্রায় ১৫০ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

রামকৃষ্ণ কুটিরে (বিরাটী, কলকাতা-৭০০ ০৫১) গত ৩ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বাৎসরিক জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, ভজন, পাঠ ও আলোচনা ছিল উৎসবের অঙ্গ। সকালে 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ। বিকালে ভাষণ দেন স্বামী দেবস্বরূপানন্দ। দুপুরে প্রায় ৩০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

বিবেকানন্দ অবৈতনিক পাঠদান কেন্দ্র (টালিগঞ্জ, কলকাতা-৭০০ ০৩৩) গত ৮ ডিসেম্বর ২০০০ পঞ্চম প্রতিষ্ঠা-দিবস উদ্‌যাপন করে। এই উপলক্ষ্যে সকালে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী স্বাগতানন্দ, মদনমোহন মণ্ডল, লক্ষ্মীকান্ত জানা প্রমুখ এবং সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রের সভাপতি ক্ষুদিরাম মান্না। কেন্দ্রের ছাত্ররা ভক্তিগীতি পরিবেশন করে।

গুসকরা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টার (জেলা—বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ) ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর আদর্শে ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে গত ৯ ডিসেম্বর ২০০০ বিবেক পরিচিতি পরীক্ষা পরিচালনা করে। পরীক্ষায় বর্ধমান জেলার ২৫টি এবং বীরভূম জেলার ১৮টি বিদ্যালয়ের পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণীর ২,৪৩২ জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিল।

শ্রীমা কে. জি. স্কুলের (কাজিয়ালপাড়া, রাজারহাট, জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) রজতজয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে গত ১০ ডিসেম্বর ২০০০ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এবং ১৪ ডিসেম্বর মঙ্গলারতি, শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ

প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিকালে 'সতীশ স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার মুক্ত মঞ্চে' প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের সূচনা করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। এদিন তিনি বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার বিতরণ এবং ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন। ভাষণ দেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ সুধীরকুমার রাহা এবং উৎসব কমিটির সভাপতি কৃষ্ণকান্ত দত্ত। সভান্তে বিদ্যালয়ের শিশুরা নৃত্য, সঙ্গীত ও নাটক পরিবেশন করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, গোপালপুর (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) গত ১০ ডিসেম্বর ২০০০ একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে প্লাবন নাট্যসংস্থা 'ভক্তের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' নাটক পরিবেশন করে। ভাষণ দান এবং ভজন পরিবেশন করেন স্বামী পরিপূর্ণানন্দ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করে আশ্রম ছাত্রাবাসের ছাত্ররা ও প্রদীপ রায়চৌধুরী। দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। আলোচনা এবং ভক্তদের প্রশ্নের উত্তর দান করেন রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের (বেলুড়) সম্পাদক স্বামী রমানন্দ। সম্মেলনে স্বাগত-ভাষণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী নিষ্ঠানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবক সঙ্ঘ (ভদ্রকালী, জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৫ ও ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ বিশেষ পূজা, সঙ্গীত ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উৎসব পালন করে। প্রথমদিন শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ এবং দ্বিতীয়দিন অরুণাচল মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী শুদ্ধানন্দ পুরী ভাষণ দান করেন। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন বিমল গোস্বামী।

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (কৃষ্ণনগর, জেলা—নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, চণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। পাঠে অংশগ্রহণ করেন অমল দে ও জয়ন্তীকা ঘোষ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শ্বেতা মিত্র, সুনীল ঘোষ প্রমুখ। আলোচনা করেন খোকন চক্রবর্তী। উৎসবে প্রায় ১,২০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ, সম্বলপুর (ওড়িশা) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ, ভজন প্রভৃতির আয়োজন করে। নারায়ণসেবায় ২৫২ জন ভক্ত ও ছাত্রছাত্রী বসে প্রসাদ পায়। প্রসঙ্গত, গত ৪-৫ নভেম্বর এই কেন্দ্রে ওড়িশা ভাবপ্রচার পরিষদের নবম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সারদা সেবা সঙ্ঘ (শিবপুর, জেলা—হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করে। মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, পূজা, হোম ও শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। সঙ্ঘের সদস্যারা ও অবৈতনিক কোচিং সেন্টারের ছাত্রছাত্রীরা ভক্তিগীতি পরিবেশন করে। এদিন দুপুরে প্রায় ১,০০০ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বৈকালিক অনুষ্ঠানে 'সবার মা সারদা' গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়। এই উপলক্ষ্যে ২৩ ডিসেম্বর সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দিলীপ ঘোষ, মনীষা মজুমদার ও সঙ্ঘের সদস্যারা। সভাশেষে ১০০ জন দুঃস্থ গ্রামবাসীর মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়।

শ্রীমা মঠ (সরকারপাড়া, গোবরডাঙা, জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, পাঠ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করে। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী অন্নদানন্দ এবং ভাষণ দেন মনোরঞ্জন মৈত্র, দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন অধ্যাপক রবীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সত্যরূপানন্দ। এই উপলক্ষ্যে দুঃস্থ নরনারীদের মধ্যে ৫০টি কম্বল বিতরণ করা হয়। দুপুরে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

সাঁত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (উত্তর বাকসাড়া, জেলা—হাওড়া) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তি-গীতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করে। দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী পাঠ করেন অন্নপূর্ণা সাহা। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সীমা চ্যাটার্জী, ঝুমুর বিশ্বাস প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সঙ্ঘাধ্যক্ষা দীপালি ভৌমিক।

রামপুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র (জেলা—বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি বিশেষ পূজা, পাঠ, ভজন, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে উদ্‌যাপন করে। পূজা ও পাঠে অংশগ্রহণ করেন স্বামী দেবাত্মানন্দ ও মিলনকুমার মুখার্জী। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান। বিকালের ধর্মসভায় স্বাগত-ভাষণ দেন পাঠচক্রের সম্পাদক বিশ্বেশ্বর রায় এবং 'উদ্বোধন'-এর গত পৌষ ১৪০৭ সংখ্যা থেকে 'মায়ের কথা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন পার্বতী হাজরা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পাঠচক্রের কার্যকরী সভাপতি অর্ধেন্দু চৌধুরী। সন্ধ্যায় ভজন ও ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দীপিকা রায়, অশোক চ্যাটার্জী এবং প্রদীপ গুপ্ত। এদিন কয়েকজন বন্যার্ত মানুষকে শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়।

বরুণা রামকৃষ্ণ জনকল্যাণ সেবাশ্রমে (ভুতা, দাসপুর, জেলা—মেদিনীপুর) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, পাঠ, হোম, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ২০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকালের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী সংবিদানন্দ সরস্বতী এবং ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বরূপানন্দ ও সুশীলচন্দ্র বেরা। স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী ভাস্বরানন্দ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন তনয় মান্না ও সহশিল্পিবৃন্দ। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে ৬৬ জন রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানে ১৫০ জন দুঃস্থ ছেলেমেয়ের মধ্যে পোশাক বিতরণ করা হয়।

গরলগাছা বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্র (জেলা—হুগলী) গত ১৭ ডিসেম্বর রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলনের আয়োজন

করে। সম্মেলনের উদ্বোধন এবং ভাষণ দান করেন স্বামী সত্যদেবানন্দ। স্বাগত-ভাষণ দেন কেন্দ্রের সভাপতি সুবোধচন্দ্র দত্তচৌধুরী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন অশোকবরণ মিত্র, আদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌসুমী ব্যানার্জী প্রমুখ। স্বামীজীর বাণী থেকে পাঠ করেন অমিত চৌধুরী। ভাষণ দেন স্বামী অজরানন্দ, অধ্যাপক অরবিন্দ ভট্টাচার্য ও ডঃ সোমনাথ মিত্র। অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০ জন যুবপ্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। অনুষ্ঠান-শেষে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কেন্দ্রের সহ-সভাপতি সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ অনুধ্যান গেহ (জেলা—পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করে। বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। পরদিন নবকৃষ্ণ দাস কীর্তন পরিবেশন করেন।

রামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ, মালকানগিরি (ওড়িশা) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ বিশেষ পূজা, মঙ্গলারতি, চণ্ডীপাঠ, কালীকীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করে। দুপুরে প্রায় ৩০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন (জেলা—মেদিনীপুর) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করে। দুপুরে প্রায় ২০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শর্বরী দে।

মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয় (জেলা—হাওড়া) গত ১৭ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, পাঠ, বিশেষ পূজা প্রভৃতির আয়োজন করে। দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (রাধাকান্তপুর, জেলা—নদীয়া) ঃ গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথিতে সেবাশ্রমের নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, সঙ্গীত, 'মায়ের কথা' পাঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৩০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

দক্ষিণ বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, হোম এবং ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করে। সঙ্গীত, বক্তৃতা এবং সমবেত ধ্যানজপ ছিল সম্মেলনের অঙ্গ। সম্মেলনে কয়েকশ ভক্তের সমাগম হয়। তাঁদের সকলকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। সম্মেলনে পাঠ ও সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন অচিন্ত্য হালদার, শতদল সাধুখাঁ, বলরাম পাল, শ্যামাশ্রী পাল, রাখী হালদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন পাঠচক্রের সম্পাদক শঙ্করচন্দ্র মণ্ডল ও জ্যোতির্ময় নস্কর।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **ডাঃ সুকুমার সূত্রধর** গত ২ অক্টোবর ২০০০ পরলোকগমন করেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্য ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি ঘোলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ত্রিপর্ণ রামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র, সারদা রামকৃষ্ণ শিশু ও নারী সেবাকেন্দ্র ও দীঘা সারদা রামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। অক্লান্তকর্মী এই মানুষটি আমৃত্যু বিভিন্ন সেবাকাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি ছিল তাঁর ব্রতবিশেষ।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **নরেন্দ্রচন্দ্র তালুকদার** গত ৬ অক্টোবর ২০০০ সকাল ৭টা ৩২ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

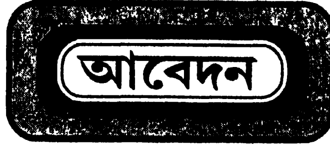
শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **বিভূভূষণ নন্দী** গত ১৩ অক্টোবর ২০০০ রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি 'উদ্বোধন'-এর অনুরাগী পাঠক ছিলেন এবং নিজ উদ্যোগে তিনি বহু মানুষকে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক করেছিলেন। কর্তব্যপরায়ণতা ও সুমধুর ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধালাভ করেছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, কলকাতার মেডিকেল কলেজের শারীরবিদ্যা বিভাগের শিক্ষিকা **ডাঃ প্রতিমা রায়চৌধুরী** গত ২৩ অক্টোবর ২০০০ কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৪ বছর। তিনি মরণোত্তর চক্ষুদান করে গেছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন ও বহু সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছিলেন। ১৯৯৬ সালে জাপানের নোবেলজয়ী চিকিৎসাবিজ্ঞানী নিশিজুকা তাঁকে কোব বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ জানিয়ে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেন। তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস, ফিজিও-লজিক্যাল সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। প্রয়াতা ডাঃ রায়চৌধুরী ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাক্তন সম্পাদক প্রয়াত ডাঃ চন্দন রায়চৌধুরীর সহধর্মিণী।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, বর্ধমান জেলার ভাতার থানার কুলাচণ্ডী গ্রামের **মনোরমা কোনার** গত ২৪ অক্টোবর ২০০০ সকাল ৮টা ১০ মিনিটে ৯০ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বহু প্রাচীন সন্ন্যাসীর স্নেহধন্যা প্রয়াতা মনোরমা কোনার ভাতার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী এবং বিভিন্ন জনহিতকর কাজে জড়িত ছিলেন। তিনি বিগত ৪৫ বছর ধরে 'উদ্বোধন' পত্রিকার একনিষ্ঠ পাঠিকা ছিলেন। তাঁর এক পুত্র স্বামী শিবাত্মানন্দ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসী।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, সল্ট লেক-নিবাসিনী **পূরবী দাশগুপ্ত** গত ২৭ অক্টোবর ২০০০ রাত ২টায় ৭০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহিকা ছিলেন। কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান মঠের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। শান্ত স্বভাব, সেবাপরায়ণতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ❑





রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম)-এর সম্প্রসারণ

রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম) বেলুড় মঠের একটি শাখাকেন্দ্র। এই আশ্রমটি ১৯২০ সালের ১৭ নভেম্বর বর্তমান বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। যথোচিত পূজানুষ্ঠানের পর স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের পট সিংহাসনে বসিয়ে প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পাদন করেছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজের কাছে দাতার প্রার্থনা ছিল—"আমার পুত্র গদাধরের স্মৃতিরক্ষার্থে এটিকে 'গদাধর আশ্রম' নাম দিলে আমার প্রাণের একান্ত ইচ্ছা পূর্ণ হবে।" মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন ঃ "তোমার ছেলের নাম গদাধর হলেও তুমি মনে করবে, এই আশ্রম ঠাকুরের বাল্যকালের নামে নামকরণ হয়েছে।" এখানে মহাপুরুষ মহারাজ ছাড়া স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ ও মাস্টারমশাই (শ্রীম) এসেছিলেন। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা যখন চলছে শ্রীশ্রীমা তখন উদ্বোধনে অন্তিমশয্যায় শায়িতা। এই আশ্রম স্থাপনের সংবাদে তিনি আনন্দ প্রকাশ করে বলেছিলেন ঃ "কালীক্ষেত্রে আদিগঙ্গার তীরে ঠাকুরের আশ্রম হবে—বেশ হবে। সেরে উঠে ওখানে গিয়ে কিছুকাল থাকব।" শ্রীশ্রীমা স্থূলশরীরে গদাধর আশ্রমে আসেননি, কিন্তু এই আশ্রমটি নিঃসন্দেহে তাঁর আশীর্বাদপূত।

এই আশ্রমটির প্রধান সমস্যা স্থানাভাব। ঠাকুরমন্দির ও নাটমন্দির একটি গৃহকেই দু-ভাগ করে করা হয়েছে। নাটমন্দিরে বড়জোর ৩০ জন বসতে পারে। তিথি উৎসবের সময় ৩½ ফুট বারান্দা দিয়ে আসা-যাওয়া করা যায় না। সেজন্য আরো স্থান বাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। পিলার দিয়ে ছাদ করার প্রয়োজন হতে পারে। তাতে প্রায় ৩০,০০,০০০ (ত্রিশ লক্ষ) টাকার প্রয়োজন। কিভাবে জায়গা বাড়ানো হবে তা ইঞ্জিনিয়ার, কর্পোরেশন ও মঠ কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্থিরীকৃত হবে। এই মহৎ কার্য সম্পন্ন করার জন্য আমরা সহৃদয় জনসাধারণের কাছে মুক্তহস্তে দান করার জন্য আন্তরিকভাবে আবেদন জানাই।

অনুগ্রহ করে আপনার আর্থিক দান নগদে বা চেক/ড্রাফট-এর মাধ্যমে **'Ramakrishna Math (Gadadhar Ashrama)'**—এই নামে পাঠাবেন। এই কার্যে দেয় সমুদয় আর্থিক দান আয়কর বিভাগের ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের আইনের **৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত।** সকলের সহযোগিতা একান্ত প্রার্থনীয়।

রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম)
৮৬এ, হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০২৫
দূরভাষ ঃ ৪৫৫-৪৬৬০

বিনীত
স্বামী ঋদ্ধানন্দ
অধ্যক্ষ



CROMPTON GREAVES LIMITED
ENGINEERING PROJECTS DIVISION
Please Visit Us at www.cromptongreaves.com

CAN YOU SURVIVE THE DANGERS OF CONTAMINATED BLOOD?



BLOOD. A unique gift of God.
Saviour of life when it is pure. Killer when it is impure or contaminated.
The onus is on us, as responsible citizens, to do our utmost to bring a change in the dismal scenario... to ensure that a Blood Bank supplies and receives only HEALTHY, SAFE AND CONTAMINATION-FREE BLOOD.

It is our right

Some alarming realities...
- In India, there are only 400 licensed Blood Banks supplying only 25% of the total needs.
- A vast majority of blood donors are *'professionals'* who donate 5-6 times in a month. They are mostly alcoholics and drug addicts, representing high risk groups for AIDS, hepatitis, etc.

Need of the hour...
- *Supply of contamination-free blood from licensed, quality-conscious Blood Banks.*
- *Motivate more and more voluntary, safe blood donors to replace 'professional' donors.*

ACTIONS

WHO

WHO Global Blood Safety initiative involving development of Integrated Blood Transfusion Services with selection of the *RIGHT DONORS AND PRESCREENING OF BLOOD TO ENSURE SAFE AND SECURE BLOOD TRANSFUSION.*

Government
- Established Blood Transfusion Councils at the National as well as State level.
- Strengthened Drug Control Administration in States for licensing and effective monitoring of Blood Banks in terms of adequacy of testing and storage facilities.

BLOOD SAVES ONLY WHEN IT IS SAFE...



GARIA SRI RAMAKRISHNA SEVA SANGHA

P-1 S. E. RAILWAY EMPLOYEES CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
KAMDAHARI, GARIA, KOLKATA-700 084
Regd. No. : S73082

একটি আবেদন

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের আদর্শ গ্রহণ করে গড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ ১৯৮৯ সাল থেকে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী প্রচারে ব্রতী একটি রেজিস্টার্ড সংস্থা এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের লোকশিক্ষা পরিষদের অনুমোদিত। সঙ্ঘের বিভিন্ন কার্যাবলী— দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়, প্রতি নতুন পাঠ্যবর্ষে স্থানীয় কয়েকটি বিদ্যালয়ের দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক প্রদান, কোচিং ক্লাশ, নিয়মিত পাঠচক্র, গ্রন্থাগার ইত্যাদির পরিচালনা বর্তমানে দুই ভক্তের বাড়িতে অস্থায়িভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দের সহায়তায় কোনরকমে এক খণ্ড জমি ক্রয় করা হয়েছে এবং ঐ জমিতে গৃহ-নির্মাণের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এর আনুমানিক ব্যয় প্রায় ৮ লক্ষ টাকা।

এই প্রকল্প সম্পূর্ণ করার কাজে সকলের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য সেবাসঙ্ঘের পক্ষ থেকে আন্তরিক আবেদন জানাই।

এই প্রকল্পে যেকোন আর্থিক দান **'GARIA SRI RAMAKRISHNA SEVA SANGHA'**-এর অনুকূলে A/c Payee চেক বা ড্রাফট ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হবে ও প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে।

ভারতীয় আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী এই দান আয়করমুক্ত।

যোগাযোগের ঠিকানা :
P-1 S. E. RAILWAY EMPLOYEES CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
KAMDAHARI, GARIA, KOLKATA-700 084
Ph. No. : 410-3190

বিনীত নমস্কারান্তে
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক



Ramakrishna Mission Vidyapith

A Residential Senior Secondary School

Ramakrishna Nagar, P.O.—Vidyapith

Dt.—Deoghar, Jharkhand, Pin : 814112

Rly. Station : Baidyanathdham, E. Rly.

Phone : (06432) 22413 & 20442 E-mail : rkmvidya@dtc.vsnl.net.in

একটি আবেদন

পুণ্যতীর্থ বৈদ্যনাথধাম—শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পদরজঃস্পর্শে পূত। স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিবিজড়িত দেওঘরে ১৯২২ সালে শুরু হয় রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান—রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ। শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যতম পার্ষদ্ শ্রীমৎ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর অনুপ্রেরণায় প্রায় ৮০ বছর পূর্বে যে বিদ্যাপীঠের যাত্রা শুরু হয়, আজ সেই বিদ্যাপীঠ এক আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ বলেছিলেন ঃ "এই বিদ্যাপীঠের মাধ্যমে কালে অনেক বড় কাজ হবে—এর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।"

এই বিদ্যাপীঠ তার বহুমুখী কর্মধারার অঙ্গ হিসাবে উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স চালু করেছে বর্তমান শিক্ষাবর্ষে।

স্বামীজী চেয়েছিলেন ঃ "নূতন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে। বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।" এই উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রদের মধ্যে অনেকে আছে—যারা আদিবাসী, অনুন্নত সম্প্রদায় এবং সর্বোপরি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসেছে।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ সেইসব কিশোরদের শিক্ষিত করতে বিনম্র প্রয়াস করে যাচ্ছে।

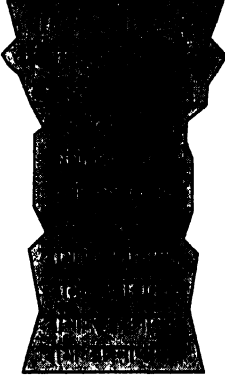
উচ্চ মাধ্যমিকের এইসব ছেলেদের জন্য একটি পৃথক কমপ্লেক্স তৈরি করা হয়েছে, যাতে আছে ছেলেদের অভিভাবক ও পরিদর্শক-শিক্ষকদের জন্য অতিথিভবন, প্রার্থনাগৃহ, গ্রন্থাগার, ভোজনগৃহ এবং একাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস। দ্বাদশ শ্রেণী শুরু হবে ২০০১ সালের জানুয়ারি মাস থেকে। কিন্তু অর্থাভাব হেতু নির্মীয়মাণ দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রাবাসটি সম্পূর্ণ করা যায়নি। ভবনটি নির্মাণ করতে সর্বসাকুল্যে ১৪ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

তাই সকলের নিকট বিনীত আবেদন—এই মহান প্রকল্পকে রূপায়িত করতে আপনারা এগিয়ে আসুন।

স্বামী সুবীরানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর, ঝাড়খণ্ড

- ❑ অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক/ড্রাফট রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, দেওঘর—এই নামে অনুগ্রহ করে পাঠাবেন।
- ❑ রামকৃষ্ণ মিশনের যেকোন শাখায় প্রদত্ত যেকোন আর্থিক দান ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত।
- ❑ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা বা তার বেশি দান করলে দাতার ইচ্ছানুসারে স্মারক-প্রস্তর লাগানো হবে।

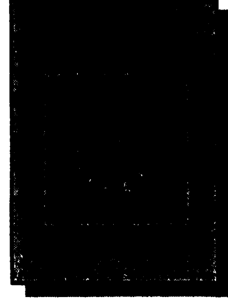
উদ্বোধন কার্যালয় পরিবেশিত
শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী শিবানন্দ সম্পর্কিত
অবশ্য-সংগ্রহযোগ্য একটি অমূল্য গ্রন্থ

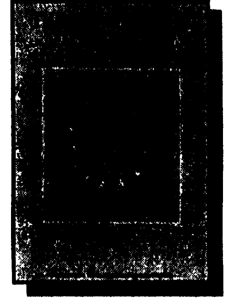




শিবানন্দ-স্মৃতি সংগ্রহ (২খণ্ড)
মূল্য : ৮০.০০ (প্রতি খণ্ড ৪০.০০)
[রেজিস্ট্রি ডাকে নিলে অতিরিক্ত ২০.০০]

উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এবং মঠ ও মিশনের অছি ও পরিচালন পর্ষদের অন্যতম সদস্য প্রাচীন সন্ন্যাসী
স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের
দুটি চিন্তা-আলোড়নকারী মৌলিক গ্রন্থ





সাধ্য ও সাধনা
মূল্য : ২০ টাকা

New Horizon
Price : Rs. 25



উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত শ্রীশ্রীমায়ের গ্রন্থাবলী

শ্রীমা সারদা দেবী
স্বামী গম্ভীরানন্দ
মূল্য : ৭৫.০০

জননী শ্রীসারদাদেবী
স্বামী অপূর্বানন্দ
মূল্য : ৩৫.০০

মাতৃসান্নিধ্যে
স্বামী ঈশানানন্দ
মূল্য : ২৫.০০

শ্রীশ্রীমা ও সপ্তসাধিকা
স্বামী তেজসানন্দ
মূল্য : ২০.০০

শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে
সম্পাদনা : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
মূল্য : (তিন খণ্ডে) ৯০.০০

যুগজননী সারদা
সম্পাদনা : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
মূল্য : ৫০.০০

চিরন্তনী সারদা
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
মূল্য : ৩০.০০

আমাদের মা
স্বামী অরূপানন্দ
মূল্য : ৪.০০

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা
স্বামী সারদেশানন্দ
মূল্য : ২২.০০

মায়ের মহিমায় উদ্ভাসিত দক্ষিণাপথ
স্বামী প্রভানন্দ
মূল্য : ২০.০০

শ্রীরামকৃষ্ণ-সহায়িকা মা সারদা
স্বামী প্রভানন্দ
মূল্য : ১৫.০০

শান্তিরূপিণী সারদা
স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ
মূল্য : ১৭.০০

বাংলার নারীমুক্তি-আন্দোলন এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী
সুস্মিতা ঘোষ
মূল্য : ২০.০০

শ্রীশ্রীমায়ের কথা
মূল্য : (অখণ্ড) ৬৫.০০

মমতাপ্রতিমা সারদা
স্বামী আত্মস্থানন্দ
মূল্য : ৭.০০

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা
স্বামী বুধানন্দ
মূল্য : ১২.০০

শ্রীশ্রীসারদামহিমা
স্বামী প্রভানন্দ
মূল্য : ১৫.০০

মাতৃদর্শন
সঙ্কলন : স্বামী চেতনানন্দ
মূল্য : ৪০.০০

দেবী-মানবী সারদা
স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ
মূল্য : ১৬.০০

শ্রীমা সারদা পুঁথি (সমগ্র লীলামৃত)
ব্রজেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়
মূল্য : ১০০.০০

শ্রীমা সারদাদেবী (আলোকচিত্রে জীবনকথা)
মূল্য : ১৪০.০০

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা উর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ



বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ না করলে চৈতন্যই হয় না—ভগবানলাভ হয় না। বিষয়বুদ্ধি থাকলেই কপটতা হয়। সরল না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ

যার ওপর যেমন কর্তব্য করে যাবে, কিন্তু ভাল এক ভগবান ছাড়া আর কাউকে বেসো না।

শ্রীমা সারদাদেবী

পবিত্র আর নিঃস্বার্থ হতে চেষ্টা কর—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম।

স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments From :

UTILITY INDUSTRIES & CHEMICAL WORKS

19Y, Raja Manindra Road, Kolkata-700037
Phone : 556-5543/6459

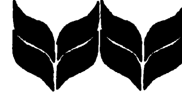
&

ASIMCO

22, Amalangsu Sen Road, Kolkata-700048
Phone : 556-5351/5543

Manufacturers of Phenyle. I.S.I., Lysol. I.P., Soaps, Antiseptic Lotions & Purified Water. I.P.

Dealers in all sorts of Medicines, Pharmaceuticals & Laboratory Chemicals.



"QUALITY UPPER ASSAM TEAS FOR COLOUR, STRENGTH & BRISKNESS."

With Best Compliments From :

WARREN TEA LIMITED

31, CHOWRINGHEE ROAD
KOLKATA-700 016

TELEPHONE NOS. :
226-6611/13/14/18/49; 245-8190/8191

TELEGRAMS : WARRANTY

FAX NO. : 249-5980; 226-6716

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments From :

AUTO REXINE AGENCY

House of Car Decoration
Specialist in Car-Air Conditioner

Office & Show Room :
31/A, Lenin Sarani, Kolkata-700 013
163, Lenin Sarani, Kolkata-700 013

Branch :
71A, Park Street, Kolkata-700 013
Phone : 244-1764/2184, 237-5435

সেরা ফলন দেবার লাভ

লালন সুপার ফসফেট সার



প্রস্তুতকারক ঃ

সারদা ফার্টিলাইজার্স লিঃ

২, ক্লাইভঘাট স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০১

ফোন নং
অফিস ঃ ২২০-৫৪৩৫
রেসি. ঃ ৩৩৭-৭৩৬৫
মোবাইল ঃ ৯৮৩১০-১৯২৬৬

আনন্দ পাবলিশার্সের বিনম্র নিবেদন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত



শ্রীম-কথিত সমগ্র সংস্করণ দাম ৭৫.০০

এই সেই পুণ্যগ্রন্থ, শ্রীমা যার সম্পর্কে বলেছিলেন, "কলিযুগ ধন্য। ঠাকুরের অবিকল ফটোটা তুলে নিলেগা।"
শ্রীম-কথিত কালজয়ী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের পাঁচটি খণ্ডকে এক মলাটের মধ্যে এনে প্রকাশিত হয়েছে এই পরম কাঙ্ক্ষিত সমগ্র সংস্করণ। নানা দিক থেকে এ-বইকে মূল্যবান করে তোলা হয়েছে। মূল গ্রন্থের প্রতিটি অক্ষর এখানে অক্ষুণ্ণ, অফসেটে মুদ্রিত, বহু ছবি সহ টেকসই বোর্ড-বাঁধাই। সবই নিখুঁত এবং আকর্ষণীয়। সবসময়ের সঙ্গী হওয়ার মতো বইয়ের মাপ। সব মিলিয়ে এক সশ্রদ্ধ নিবেদন।

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ

রথীন্দ্রনাথ মজুমদার
গল্পকার বিবেকানন্দ ২০.০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
বন্ধু বিবেকানন্দ ৫০.০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
বিবেকানন্দ চরিত ৬০.০০

রামায়ণ চর্চা • মহাভারত চর্চা

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী
কৃষ্ণা কুন্তী এবং কৌন্তেয় ২০০.০০



বাল্মীকির রাম ও রামায়ণ ৩৫.০০
মহাভারতের



ভারত যুদ্ধ এবং কৃষ্ণ ৫০.০০

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী
মহাভারত ৩৫.০০
রামায়ণ ১০০.০০

সুখময় ভট্টাচার্য
মহাভারতের চরিতাবলী ৮০.০০
রামায়ণের চরিতাবলী ৬৫.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
ফোন : ২৪১-৪৩৫২, ২৪১-৩৪১৭
E-mail : ananda@cal3.vsnl.net.in

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত
শ্রীম-কথিত

পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত ঃ প্রতি সেট ঃ ২০৮ টাকা
[কেবল রেক্সিন বাঁধাই পাওয়া যায়]

শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যরা এবং কথামৃতকার শ্রীম নিজেও এই মহাগ্রন্থটি যেমনটি দেখিয়া গিয়াছেন এবং রাখিয়া গিয়াছেন (খণ্ড খণ্ড হিসাবে পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এবং দিনলিপি অনুসারে না সাজাইয়া) ঠিক তেমনটিই সংরক্ষণ করার পুণ্য দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর হইয়া আছেন 'কথামৃতের' আশি বছরেরও অধিক প্রাচীন প্রকাশক শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী (কথামৃত ভবন)। ফলে এই মহাগ্রন্থের Originality এবং সুমহান ঐতিহাসিক পবিত্র ঐতিহ্য সম্পূর্ণ-ভাবে বহাল রহিয়াছে এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত 'কথামৃতে'।

প্রকাশক ঃ শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী
(কথামৃত ভবন)
১৩।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬
ফোন ঃ ৩৫০-১৭৫১

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির
ফোন ঃ ৪৭৪-২৩৩৫
৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো
কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত
শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহের বহু প্রশংসিত পুস্তকাবলী

গীতাতত্ত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ	৮০৲
পূর্ণতার সাধন	১৬৲
ভগবৎ প্রসঙ্গ	২৪৲
গল্পে ভগবৎ প্রসঙ্গ	২৪৲
শরণাগতের আদর্শ ও সাধনা	৩০৲
ঈশ্বর-সান্নিধ্য বোধের সাধনা	৮৲

শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহের জন্মশতবার্ষিকী গ্রন্থ ঃ
প্রেমিক পুরুষ ১৫৲
অন্যান্য বই ঃ স্তোত্রমালিকা ৪৲

✤ প্রাপ্তিস্থান ✤
সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ), উদ্বোধন,
রত্না বুক হাউস, মহেশ লাইব্রেরী,
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোলপার্ক)

With the Compliments of :



TATA TEA LIMITED

Making a difference ... differently.

1, Bishop Lefroy Road
Kolkata-700 020

With Best Compliments From :

DOBSON DISTRIBUTORS

88, DR. ABANI DUTTA ROAD
HOWRAH-711 101
PHONE : 666-1722
TELEFAX : 666-9969

Stockist

Serum Institute, Tablets India Ltd., Wallace Pharmaceuticals Ltd., Eli Lilly Ranbaxy, Pharmacia & Upjohn, Orchid, Caplet, Smith Kline Beecham (Vaccine), Sunny Industries Pvt. Ltd., Midas Care, Arvind (S.K.K.L. Ltd.), Neon Laboratories, Mayer, Trio Pharma

নির্মল কুমার রায়ের

চরণ চিহ্ন ধরে ৬০.০০

(শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র লীলাস্থল)

শ্রীরামকৃষ্ণের চরণস্পর্শপূত স্থানের বিবরণ এবং পথনির্দেশ। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী, ভক্তবৃন্দ এবং গবেষকদের কাছে বইটি অনেক দিনের একটি বড় অভাব পূর্ণ করেছে। শ্রীম-র ভাষায়—সবই মহাতীর্থ। তাঁর চরণরজে সবই জীবন্ত।

HIS DIVINE FOOTSTEPS 12.00

(Complete account of the holy places)

Short descriptions and route indications of the places visited by Sri Ramakrishna. This book will serve as a guide book to the followers, tourists and the research workers on Sri Ramakrishna.

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিঃ

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা উর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

With Best Compliments From :

DIAMOND METAL PRODUCTS

Mfg. All Types of Aluminium Pilfer Proof Caps

APOLO ELECTRIC BULB PVT. LTD.
27B/H/13/1, Chaulpatty Road
Kolkata-700010
Tele. : (O) 350-3901/353-1445
Fax : 350-6297

Mfg. *G.L.S. Lamps & Night Lamps*

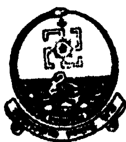
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রকাশিত বাঙলা গ্রন্থরাজি

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)	১০০.০০
স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)	১০০.০০
আত্মজ্ঞান	২২.০০
আত্মবিকাশ	২০.০০
আমার জীবনকথা (২ খণ্ডে)	৮৫.০০
ঈশ্বরদর্শনের উপায়	৩৫.০০
কর্মবিজ্ঞান	১০.০০
তরুণ বাংলার আদর্শ	৫.০০
দেবী দুর্গা	৬.০০
পত্র-সংকলন	১৬.০০
পঞ্চদশী-দর্শনের পরিচয়	৫.০০
পুনর্জন্মবাদ	৩০.০০
বিংশ-শতাব্দীর ধর্ম	৫.০০
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	২০.০০
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	৩০.০০
মরণের পারে	৫০.০০
মনের বিচিত্র রূপ	১২.০০
মানুষের দিব্যস্বরূপ	২৫.০০
মুক্তির উপায়	১৫.০০
যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ	৫.০০
যুগে যুগে যাঁদের আগমন	২৮.০০
যোগদর্শন ও যোগসাধনা	৫০.০০
যোগশিক্ষা	৪০.০০
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম	২০.০০
সর্বজনীন ধর্ম ও বেদান্ত	৩০.০০
সাংখ্য, বৌদ্ধ ও বেদান্তদর্শন	৩০.০০
স্বামী বিবেকানন্দ	২.০০
স্তোত্ররত্নাকর ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি	১২.০০
হিন্দুনারী	১২.০০
হিন্দুরা যীশুখ্রীস্টের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু গীর্জা-ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ কেন?	৫.০০

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত

অধ্যাত্মসাধনায় দেবতা ও দেবীভাবনা	৪.০০
অভেদানন্দ-দর্শন (২ খণ্ডে)	১৪০.০০
কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব	১৮.০০
তীর্থরেণু	২৬.০০
তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা	৪০.০০
তন্ত্রতত্ত্বপ্রবেশিকা	৬০.০০
নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৪৫.০০
পদাবলী-কীর্তনের ইতিহাস	৩৫.০০
বাণী ও বিচার (৮ খণ্ডে)	৪০০.০০
বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তায় মন্ত্রতত্ত্ব ও মন্ত্রসাধনা	২০.০০
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (৩ খণ্ডে)	২২০.০০
শ্রীরামকৃষ্ণচন্দ্রিকা	৪০.০০
ভারতীয়-সঙ্গীত—ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক রূপরেখা	৩৪.০০
মন ও মানুষ (৩ খণ্ডে)	১০৩.০০
মহিষাসুরমর্দিনী-দুর্গা	৩০০.০০
মন্ত্রভাবনা ও সঙ্গীত	১৪.০০
রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা	২০.০০
রাগ ও রূপ (২ খণ্ডে)	২২০.০০
সঙ্গীতপ্রতিভায় স্বামী বিবেকানন্দ	৮.০০
সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান	৫০.০০
সঙ্গীতে সাহিত্য, রসভাবনা ও সুন্দর	২৫০.০০
স্বামী অভেদানন্দ	৫.০০
স্বামী অভেদানন্দের জীবন ও দর্শন	৩৬.০০



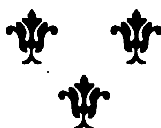
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ
(পুস্তক প্রচার বিভাগ)
১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

Haran Chandra Banerjee & Sons.

7C, CLIVE ROW, CALCUTTA-700 001

PAPER MERCHANTS, STATIONERS AND GOVT. SUPPLIERS

Phones : Office : 220-1700
Resi. : 665-9075



Distributors for :

TITAGHUR PAPER MILLS CO. LTD.
BENGAL PAPER MILLS CO. LTD.
SUPREME PAPER MILLS CO. LTD.
SIMPLEX MILLS CO. LTD.



"SERVICE TO MAN IS
SERVICE TO GOD"

SRI RAMAKRISHNA SEVASHRAM

Regd. No. S/15226 Dated 21.10.74

P.O. Ramakrishnapur ❑ Dist. South 24 Parganas ❑ Pin : 743610. W.B.

A member-ashrama of South 24 Parganas District Ramakrishna-Vivekananda Bhava Prachar Parishad (advised by Ramakrishna Math, Belur Math, W. B.)

Kolkata Office :

6 Baroda Thakur Lane, Kolkata-700 007 ☎ : 218-1285

একটি আবেদন

প্রিয় ভগিনী ও ভ্রাতৃগণ,

কলিকাতার অদূরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার দক্ষিণ দুর্গাপুর রেলস্টেশনের সন্নিকটে রামকৃষ্ণপুরে অনাথ **বালকাশ্রমকে** কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একটি সেবাপ্রতিষ্ঠান। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন **স্বামী রমানন্দজী মহারাজ,** সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ। **শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি** একটি অস্থায়ী প্রার্থনাঘরে প্রতিষ্ঠিত। বালকাশ্রমে থাকে ৫০ জন অনাথ দুঃস্থ বালক। **সুন্দরবনের** অনগ্রসর দরিদ্র অধিবাসী ও তফসিলী অঞ্চলে যোলটি **বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু বিদ্যালয়** খোলা হয়েছে। আরো প্রসারিত হবে। ইতিমধ্যেই পূর্ব-পরিকল্পিত অতিথিভবন, সাধুভবন, বৃদ্ধাশ্রম সম্পূর্ণ হয়েছে আপনাদেরই দানে। আমাদের প্রেরণা স্বামীজী। আমাদের আদর্শ ও ধর্ম—ত্যাগ ও সেবা। লক্ষ্য—মানুষ তৈরি। মানুষই আমাদের ভগবান।

আমাদের আগামী পরিকল্পনা ঃ—

১) বালকাশ্রমের অসম্পূর্ণ আবাসন ও দাতব্য চিকিৎসালয় সম্পূর্ণ করা।

২) জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে পাঁচশ ভক্তের একসঙ্গে প্রার্থনা-উপযোগী উপাসনাকক্ষ-সহ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নির্মাণ। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের স্পর্শপূত মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর গত ৬ মে ২০০০ অক্ষয় তৃতীয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৩) অধিক সংখ্যক বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু বিদ্যালয় স্থাপন।

বহুজনহিতায় এই মহৎ কর্মযজ্ঞটিকে আরো ব্যাপক করার জনচাহিদা মেটাতে আমাদের প্রয়োজন আনুমানিক এক কোটি টাকা। যা আমাদের নেই।

প্রিয় ভগিনী ও ভ্রাতৃগণের নিকট আন্তরিক আবেদন, এই মহৎ কল্যাণ প্রচেষ্টায় অনুগ্রহ করে সাধ্যমত আর্থিক দাক্ষিণ্যের হাত প্রসারিত করুন। আমাদের ভিত্তি প্রস্তুত, আপনাদের সানুগ্রহ সহযোগিতায় হবে এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

স্মৃতিফলকের ব্যবস্থা আছে। আশ্রমে দেওয়া অর্থ **M.O.** অথবা **A/c. Payee Cheque/Draft**-এর মাধ্যমে পাঠানোর ঠিকানা—**Sri Ramakrishna Sevashram, 6 Baroda Thakur Lane, Kolkata-700 007। A/c. Payee** চেক/ড্রাফ্‌ট পাঠালে **'Sri Ramakrishna Sevashram'**-এর অনুকূলে পাঠাতে হবে। সেবাশ্রমে যেকোন আর্থিক দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সকল দানের প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে।

নমস্কারান্তে

স্বামী শুদ্ধানন্দ
অধ্যক্ষ

সুধাংশু বিশ্বাস
সম্পাদক

শ্রীশ্রী সারদামায়ের
মন্ত্রশিষ্য
ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য
প্রণীত

❖ স্মৃতিমূলক জীবনীগ্রন্থ ❖

- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
- শ্রীশ্রী সারদাদেবী
- স্বামী সারদানন্দের জীবনী
- শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ
- ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা
- প্রেমানন্দ-প্রেমকথা
- জীবন পরিক্রমা

আমাদের প্রকাশিত আরও বিভিন্ন স্মৃতিমূলক জীবনীগ্রন্থ

ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী
- মেঘনাদ বধ কাব্যে চিত্রকল্প

বিশ্বনাথ দে
- রবীন্দ্রস্মৃতি

ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত
- বিবেকানন্দ স্মৃতি
- বঙ্কিম স্মৃতি
- রামমোহন স্মৃতি
- মধুসূদন স্মৃতি
- বিদ্যাসাগর স্মৃতি
- নজরুল স্মৃতি
- শরৎ স্মৃতি
- মা টেরেসা
- বায়রণ
- শেলী

শ্রী মোহিত কুমার বসাক
- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্মৃতি
- অরবিন্দ স্মৃতি
- নিবেদিতা স্মৃতি
- কিশোর শহীদ স্মৃতি
- সুভাষ স্মৃতি

সুবোধ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
- সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন
- The Early life of Netaji

সমর গুহ
- নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা
- Netaji Dead or Alive

ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩
☎ ২৪১-০৯৬৫/২৪১-৯৪০৪



All the secret of success is there : to pay as much attention to the means as to the end.

Swami Vivekananda



With Best Compliments From

DATTA FOOTWEAR INDUSTRIES PVT. LTD.

Regd. Office & Factory :

1, BIDHAN SARANI, KOLKATA-700 073

PHONE : 241-5248 ❑ FAX : (033) 241-7541

Unit-II

180, EAST SINTHI ROAD, KOLKATA-700 030

PHONE : 548-4500



কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৫

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

জেলা ঃ উত্তর চব্বিশ পরগনা

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, বারাসত
- **শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম**
  পোঃ রাজারহাট-বিষ্ণুপুর, পিন ঃ ৭৪৩ ৫১০
- **রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম**, রহড়া
- **বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
- **গোবরডাঙ্গা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘ**, খাঁটুরা
- **বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ**, নববারাকপুর
- **অলক পাল চৌধুরী**, সঙ্কটাপল্লী, ঘোলা, সোদপুর
- **ঘোলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, বি-৭, বি পার্ক, সোদপুর
- **বিবেকানন্দ আলোচনা-চক্র**, নিমতলা
- **ইছাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
- **মানিক ঘোষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**
  শ্রীমা সারদা সরণি, গঙ্গাপুর, দত্তপুকুর, পিন ঃ ৭৪৩ ২৪৮
- **বীজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ**
  শহীদনগর, কাঁচড়াপাড়া
- **স্যান্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**
  পোঃ স্যান্ডেলেরবিল, হিঙ্গলগঞ্জ, পিন ঃ ৭৪৩ ৪৩৫
- **হালিশহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ**
  প্রযত্নে রামকৃষ্ণ চিলড্রেন্স হোম
  গ্রাম+পোঃ মালঞ্চ, ভায়া ঃ হাজিনগর, থানা ঃ বীজপুর
- **পান্নালাল ব্যানার্জী**, প্রযত্নে তারা আলয়
  ২৯ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড (স্টেশনের সম্মুখে)
  পোঃ নৈহাটী, পিন ঃ ৭৪৩ ১৬৫
- **কথাশিল্প**, প্রযত্নে গোপালচন্দ্র ঘোষ
  শক্তিগড়, চাকদা রোড, বনগ্রাম, ফোন ঃ ৫৫-৬৯৪/৭২৫
- **বিবেকানন্দ বুক সেন্টার**, প্রযত্নে বাসুদেব সাধুখাঁ
  'ট' বাজার, বনগ্রাম, ফোন ঃ (৯৫৩২১৫) ৫৯৩৯৭
- **সুজিত ঘোষ**, ৩ এফ. রোড, আনন্দপুরী
  পোঃ নোনা চন্দনপুকুর, ব্যারাকপুর, ফোন ঃ ৫৬০-১২৩০
- **রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (পাঠচক্র)**
  ৪৭/৭ টেগোর টেম্পল রোড
  পোঃ শ্যামনগর, পিন ঃ ৭৪৩ ১২৭
- **শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**, বনগ্রাম, পিন ঃ ৭৪৩ ২৩৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  রামকৃষ্ণপল্লী, বনগ্রাম, পিন ঃ ৭৪৩ ২৩৫
- **নিমতলা বিবেকানন্দ আলোচনাচক্র**
  শরৎ পাঠাগার, নিমতলা, পোঃ পূর্ব বিষ্ণুপুর
- **শ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ**, ৪৭ কে. এন. মুখার্জী রোড
  তালপুকুর, বারাকপুর, পিন ঃ ৭৪৩ ১৮৭
- **স্বপন চক্রবর্তী, সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ দেবালয় (বেড়াচাঁপা অঞ্চল), পিন ঃ ৭৪৩ ৪২৪
- **ন'পাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**
  কৃষ্ণনগর রোড, পোঃ ন'পাড়া, বারাসত
  পিন ঃ ৭৪৩ ৭০৭, ফোন ঃ ৫৪২-৩৭৩৯/৬৭০২

জেলা ঃ দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

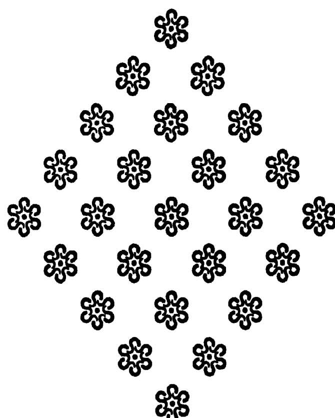
- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সরিষা**
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ**, ভাঙড়
- **হৃদয়ভূষণ নস্কর, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ কন্যানগর, আমতলা, পিন ঃ ৭৪৩ ৩৯৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, পোঃ বি-রামকৃষ্ণপুর, পিন ঃ ৭৪৩ ৬১০
- **রামকৃষ্ণ পাঠমন্দির**
  গ্রাম ঃ চকমানিক, পোঃ বাওয়ালি, পিন ঃ ৭৪৩ ৩৮৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বাটানগর)**, পোঃ মহেশতলা, পিন ঃ ৭৪৩ ৩৫২
- **বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য**
  সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র
  উকিলপাড়া, বারুইপুর, পিন ঃ ৭৪৩ ৩০২
- **জীবনকৃষ্ণ দাস**, প্রযত্নে মহেশ্বর স্টোর্স
  কাছারী বাজার, বারুইপুর, পিন ঃ ৭৪৩ ৩০২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ স্টোর্স**, প্রযত্নে অনন্তকুমার দাস
  পোঃ চাম্পাহাটী, চাম্পাহাটী বাজার
  পিন ঃ ৭৪৩ ৩৩০, ফোন ঃ ৯১১৮-৬০৪৫০
- **শঙ্করচন্দ্র মণ্ডল**, প্রযত্নে কৃষ্ণগোপাল নস্কর
  গ্রাম ঃ বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ দক্ষিণ বারাসত, পিন ঃ ৭৪৩ ৩৭২
- **শতদল সাধুখাঁ**
  প্রযত্নে 'গৃহশ্রী', হরিধন চক্রবর্তী সরণি, সোনারপুর
- **বিভূতিভূষণ ঘরামি, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ কৌতলা, পিন ঃ ৭৪৩ ৬০৩, ফোন ঃ ৯১৭৪-৭৪৩১৫
- **কাশীনগর বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র**
  গ্রাম+পোঃ কাশীনগর, পিন ঃ ৭৪৩ ৩৪৯
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
  ১০ মাইল বাজার, পোঃ মহারাজগঞ্জ
  থানা ঃ নামখানা, পিন ঃ ৭৪৩ ৩৫৭
- **ডাঃ হরেকৃষ্ণ সিংহ, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ** চেতনা
  ২৩৩ জেমস লং সরণি, জোকা
  পিন ঃ ৭৪৩ ৫১২, ফোন ঃ ৪৬৭-১১৫২
- **রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম**
  গ্রাম+পোঃ বিবেকানন্দনগর, পিন ঃ ৭৪৩ ৩৫২

সৌজন্যে
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ
৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯

With Best Compliments From :

H. K. GHOSE & CO.

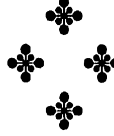
Paper Merchants & Exercise Book Makers



WARDLEY HOUSE
25A, SWALLOW LANE, KOLKATA-700 001
PHONE : 220-5209

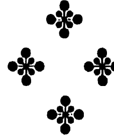
রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে যায়। অবতারেরাও সেইরকম সহস্র সহস্র লোকেদের ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ



মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার দিকে এগোতে চায় না। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আন্তরিক খুব যত্ন ও রোখ চাই।

শ্রীমা সারদাদেবী



যে-দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয়, সে-দেশ ক্রমশ ধর্মহীন হইয়া দাঁড়ায়। ভারতে কখনো এরূপ চেষ্টা হয় নাই। সেইজন্য এখানে প্রকৃত ধর্মভাব এখনো জাগ্রত।

স্বামী বিবেকানন্দ

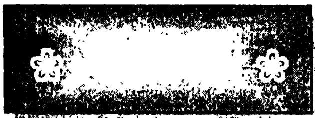






RAMAKRISHNA MISSION

VIVEKNAGAR : ALONG
ARUNACHAL PRADESH-791001
STD CODE : 03783 • TEL : 22-455/22-249/23-395 • FAX : 22-716



মাতৃভূমি ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে **অরুণাচল প্রদেশ**। এই পার্বত্য রাজ্যে আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখার অনতিদূরে অন্যতম জেলা শহর **আলং-এর সমীপবর্তী বিবেকনগরে** বিগত ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত **রামকৃষ্ণ মিশনের** এই বৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি বহুবিধ প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে অনগ্রসর জনজাতি সমাজে শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যসেবা, ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাব্যবস্থা, শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন প্রভৃতি বিবিধ সেবাকার্যে নিরলস উদ্যমের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। **নয়া দিল্লির কেন্দ্রীয় স্কুল বোর্ডে সংযুক্ত উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে** আনুমানিক ২,০০০ ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে ৩০০ জনজাতি ছাত্রের জন্য ২টি ছাত্রাবাস এবং সহস্রাধিক জনজাতি ছাত্রের জন্য স্কুলবাসের সুবিধা এবং প্রাত্যহিক প্রাতরাশ অথবা মধ্যাহ্নাহারের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ৭৫ একর পার্বত্য টিলা জমিতে বিগত তিন দশক ধরে গড়ে ওঠা এই বৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রশস্ত বিদ্যালয় ভবন, ছাত্রাবাস, চিকিৎসাকেন্দ্র, কেন্দ্রীয় কার্যালয়, রন্ধনশালা ও প্রার্থনাগৃহ ব্যতীত ৪টি প্রশস্ত খেলার মাঠ, গোশালা, কৃষিক্ষেত্র, ছাপাখানা, কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, অতিথিভবন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগগুলি সরকারি অনুদানের অপ্রতুলতাজনিত অর্থাভাব হেতু অশোভন জীর্ণদশা প্রাপ্ত হয়েছে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে ভারতীয় সনাতন কৃষ্টি ও ঐতিহ্য রক্ষা তথা সম্প্রসারণের স্বার্থে আমাদের **নিম্নবর্ণিত প্রকল্পগুলিতে** সাধ্যমত অর্থসাহায্যের জন্য সহৃদয় দেশবাসীর কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি :

(১)	গৃহাদি নির্মাণ ও মেরামতি কার্য	:	১৫,০০,০০০ টাকা
(২)	আবাসিক ছাত্রবৃন্দের ভরণপোষণ	:	১৫,০০,০০০ টাকা
(৩)	পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত	:	৫,০০,০০০ টাকা
(৪)	সাধারণ কল্যাণনিধি গঠন	:	১৫,০০,০০০ টাকা
		মোট	৫০,০০,০০০ টাকা

ভারতীয় আয়কর আইনের ৮০-জি ধারায় করমুক্ত এই দান 'Ramakrishna Mission, Along' নামে crossed cheque অথবা State Bank of India, Along-এ প্রাপ্য ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠাতে পারবেন।

স্বামী সুমেধানন্দ
সম্পাদক

বিবেকনগর, আলং

সৌজন্যে



পিয়ারলেস

সঞ্চয়ের সহজ পথ

* *

আস্থার প্রতীক

UDBODHAN
Phone : 554-2248, 554-2403
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com

Vol. 103 ❑ No. 3
❑ MARCH 2001 ❑

Licensed to Post
Without Prepayment
Licence No.
TECH/WB/RNP-15/LPWP-01/2001

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Regn. No.
TECH/WB/RNP-15/2001

উদ্বোধন

১০৩তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র



❑ গত ১লা মাঘ ১৪০৭ (১৫ জানুয়ারি ২০০১) **উদ্বোধন ১০৩তম বর্ষে** পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় **নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব** নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের **১০২ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম** ❑

❑ **বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন** একটি ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র মাত্র নয়, **উদ্বোধন** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। **ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের** সঙ্গে এবং **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের** সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত** রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তে হবে।

❑ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে উদ্বোধন নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন একটি সার্থক পারিবারিক পত্রিকা**। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন**-এ প্রকাশিত হয়।

❑ **উদ্বোধন** শুধু **বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা নয়, উদ্বোধন** বাংলার **সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ পত্রিকা** এবং **বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক পত্রিকা**।

❑ ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র হয়েও **উদ্বোধন** তার মহান প্রবর্তকের নির্দেশ অনুসারে কোন **সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আদর্শের মুখপত্র নয়। উদ্বোধন** তার **সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র** বিগত **১০২ বছর** ধরে অটুট রেখেছে।

❑ **উদ্বোধন-এর** গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার **গ্রাহক** হওয়া নয়, একটি **মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের** সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

❑ **উদ্বোধন** একটি পত্রিকা মাত্র নয়, **উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী** এবং **স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর**।

❑ **স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে। উদ্বোধন**-এর প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে গ্রাহক করলেই এখনি **উদ্বোধন-এর গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার** হয়ে যায়। তাই আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করাও আপনার কাছে **স্বামীজীর প্রত্যাশা**। স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের **গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের**। অবশ্য ইন্টারনেট সংস্করণের মাধ্যমে **উদ্বোধন** আজ **ভারত ও বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ঘরে ঘরে** পৌঁছে গিয়েছে।

❑ **স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা**। সেকথা স্মরণ করে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে অনুরাগী ও শুভার্থীগণ উদ্বোধন এর প্রতি নিশ্চয়ই তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

❑ **উদ্বোধন-এর শারদীয়া** সংখ্যাটির জন্য **গ্রাহকদের** থেকে **আলাদা মূল্য নেওয়া হয় না**। এই সংখ্যাটি গ্রাহকদের জন্য আমাদের **শারদ উপহার**। প্রসঙ্গত সকলের অবগতির জন্য জানাই যে, **শারদীয় সংখ্যাটি** আকারে সাধারণ সংখ্যার তিনগুণ এবং বিশেষ **সংখ্যা** হওয়ায় অন্যবছরের জন্য খরচও হয় যথেষ্ট। **গত কয়েক মাসে কাগজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং অন্যান্য ব্যয়বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শারদীয়া সংখ্যা** সহ গ্রাহক-**পিছু আমাদের বার্ষিক খরচ দাঁড়িয়েছে মুদ্রিত গ্রাহকমূল্যের সওয়া তিন গুণ**। বিশাল অঙ্কের এই অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য আমরা নির্ভর করি সহৃদয় বিজ্ঞাপনদাতাদের সক্রিয় সহযোগিতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক বদান্যতার ওপর।

❑ **পত্রিকা প্রকাশ সংক্রান্ত ব্যয় প্রতি বছর** বেড়ে গেলেও **তিন বছর (১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০১)** 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। **এত সুলভ মূল্যে এমন সম্পূর্ণ পত্রিকা বাঙলা ভাষায় আর একটিও** নেই।

❑ **উদ্বোধন**-এর সেবায় তিনটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি **'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল'**, অন্য দুটি যথাক্রমে **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** এবং **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'**। **উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা** অনুসারে **আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 'Ramakrishna Math, Baghbazar'**—এই নামে পাঠাবেন। **ঠিকানা : সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩**। দাতার চিঠিতে বা M.O. কুপনে **'উদ্বোধন পত্রিকার সেবায়'** অথবা **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** অথবা **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'**-এর জন্য যেন লেখা থাকে।

❑ **উদ্বোধন-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে** মতিলাল-তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাঁদের পুত্রকন্যাদের পক্ষে **স্থায়ী ভিত্তিতে 'উদ্বোধন মেধা সম্মান' (একবছরের জন্য উদ্বোধন-এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি)** নিবেদিত হয়েছে। **পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের** যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। **২০০১ সালের** জন্য অনুরূপ **সম্মান** সুকুমার-বিভারানী পাড়ুই-এর স্মৃতিতে তাঁদের পুত্র অমর পাড়ুই নিবেদন করেছেন। **এই সম্মানপ্রাপকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্ষদ পরিচালিত ২০০০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় 'সম্মান'-এর জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বোধন-সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ** করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
সম্পাদক

সৌজন্যে

পি. বি. সরকার অ্যান্ড সন্স

(কোন ব্রাঞ্চ নেই)

জুয়েলার্স

সন অ্যান্ড গ্র্যান্ড সন্স অব লেট বি. সরকার

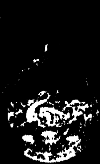
৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০ ❑ ফোন : ২২৩-৮৭১৩, ২২৩-৭৫৭৮

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

১০৩তম বর্ষ

উদ্বোধন







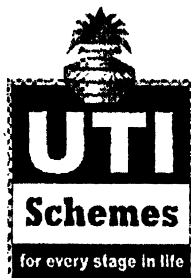
"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

আনন্দবাজার পত্রিকা

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

Investments in UTI
Treasured by almost every Indian Family



Savings, invested rightly to match your needs, can secure your future financially. UTI offers a range of schemes to suit every need of yours at every stage in your life.

Currently, as per Finance Act 1999, income received from investments in units of any scheme / plan of UTI is tax-free in the hands of all categories of investors under section 10(33) of the Income Tax Act, 1961.

BALANCED FUNDS
Unit Scheme 1964 (US-64)
Unit Scheme 1995 (US-95)

REGULAR INCOME PLAN
Monthly Income Plans (MIP)

SCHEME FOR CHILDREN
Children's Career Plan (CCP)

SCHEME FOR WOMEN
Grihalakshmi Unit Plan (GUP)

POST-RETIREMENT SCHEME
Retirement Benefit Plan (RBP)

EQUITY FUNDS
Masterplus, Mastergrain, PEF, Grandmaster & Mastergrowth.

TAX SAVING SCHEMES
Unit Linked Insurance Plan (ULIP)
UTI Equity Tax Savings Plan (ETSP)

SECTORAL FUNDS
UTI Growth Sectors Fund (Brand Value, Pharma and Healthcare, Software, Petro and Services)
UGS 10000 (MNC Fund)

INDEX FUNDS
Master Index Fund (MIF)
Nifty Index Fund (NIF)
Index Select Equity Fund (ISEF)

LIQUID FUNDS
UTI-Bond Fund (UBF)
UTI Money Market Fund (MMF)

GILT FUND
UTI G-Sec Fund

FUND FOR TRUSTS AND SOCIETIES
Unit Scheme for Charitable & Religious Trusts & Registered Societies (CRTS-81)



UNIT TRUST OF INDIA
INDIA'S LARGEST MUTUAL FUND

13, Sir Vithaldas Thackersey Marg, New Marine Lines, Mumbai 400020
Western Zonal Office : Mumbai : 6525686. • Eastern Zonal Office : Kolkata : 2436571.
• Northern Zonal Office : New Delhi : 3731401 • Southern Zonal Office : Chennai : 5210347.
Website : www.unittrustofindia.com

NET ASSET VALUE Daily NAVs, sales & repurchase prices under US'95, Masterplus, Mastergain, Mastergrowth, Grandmaster, PEF, UTI-ETSP, UGS 10000, Growth Sectors Fund, Master Index Fund, Nifty Index Fund, Index Select Equity Fund, Money Market Fund, Bond Fund and G-Sec Fund. • Weekly NAVs, sales and repurchase prices under CRTS, CCP, RBP, ULIP and all MIPs launched after 1st July 1999. • Monthly sales and repurchase price for US'64 and all MIPs launched prior to 1st July 1999 i.e. up to MIP'99.

Constitution : UTI functions under provisions of UTI Act, 1963. **Risk Factors :** All Investments in Mutual Funds and securities are subject to market risks and the NAV of the schemes may go up or down depending upon the factors and forces affecting the securities market. There can be no assurance that a scheme's investment objectives will be achieved. The past performance of the mutual funds is not necessarily indicative of future performance of the schemes. Please read the offer document of the schemes before investing.



রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ

পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া-৭১১ ২০২, ফোন ঃ ৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২

সারদাপীঠ থেকে প্রকাশিত অডিও ক্যাসেটসমূহ

মূল্য ❑ SP-1 ও SP-31–34 ঃ ৩৫ টাকা, অন্যান্য ঃ ৩০ টাকা

SP-1	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্	(সংস্কৃত ও বাঙলা)
SP2, SP-7, SP-8, SP-10 হইতে 12	কথামৃতের গান (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড)	(বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি)
SP-3	শ্রীরামনামসংকীর্তন	(সংস্কৃত ও হিন্দি)
SP-4	বক্তৃতা—যুগপুরুষ	(বাঙলা) (শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত)
SP-5	শ্রীশ্রীচণ্ডীস্তব	বাঙলা, সংস্কৃত)
SP-6	শিবমহিমা	(বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি)
SP-9	শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা	(সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি)
SP-13	শ্রীসারদাবন্দনা	(সংস্কৃত, বাঙলা)
SP-20	বিবেকানন্দবন্দনা	(সংস্কৃত, বাঙলা)
SP-24	শ্রীকৃষ্ণবন্দনা	(সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি)
SP-14 হইতে SP-16	কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)	(বাঙলা)
SP-17	বীরবাণী	(সংস্কৃত, বাঙলা, ইংরেজী ও হিন্দি)
SP-18	গীতিবন্দনা	(হিন্দি)
SP-19	বক্তৃতা—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান	(বাংলা) (শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত)
SP-21 ও SP-22	সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড)	(হিন্দি)
SP-23	ওঠো জাগো	(হিন্দি)
SP-25	শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি	(হিন্দি)
SP-26	বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি	(হিন্দি)
SP-27	বেদমন্ত্র	(সংস্কৃত) (উপনিষদের মন্ত্রসমূহ)
SP-28	সরস্বতী বন্দনা	(বাঙলা, সংস্কৃত)
SP-29	Ramakrishna Movement	(Lecture by Revered Srimat Swami Bhuteshanandaji Maharaj)
SP-30	Religion in Practice	(do)
SP-31 হইতে SP-34	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (আবৃত্তি) (১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড)	(সংস্কৃত)
SP-35	আগমনী	(বাঙলা)
SP-36	ভজন সুধা	(হিন্দি)

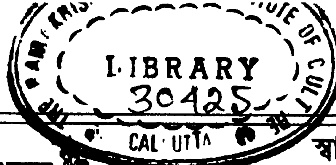
শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্, শ্রীরামনামসংকীর্তন ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার C. D. প্রকাশিত হয়েছে।

স্বামী সর্বগানন্দ, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ, স্বামী দিব্যব্রতানন্দ, শ্রীমহেশরঞ্জন সোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য দক্ষ শিল্পিগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন।

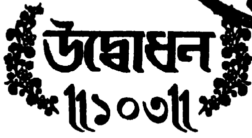
Video Cassette :
Centenary Celebration of the Ramakrishna Mission at Belur Math in 1998.
Duration—80 minutes
Rs. 250.00

প্রাপ্তিস্থান ঃ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি (কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) ও সিমফনি (ধর্মতলা মেট্রো সিনেমার পাশে)

ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে M.O. অথবা Bank draft মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে।



30 APR 2001



স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র

১০৩তম বর্ষ | ৪র্থ সংখ্যা | বৈশাখ ১৪০৮ | এপ্রিল ২০০১

প্রচ্ছদ ❑ ওপরে কৈলাস, নিচে মানস সরোবর। নিচে মানস সরোবর থেকে দৃশ্যমান কৈলাস। মানস সরোবরে সন্তরণরত হংসযুগল—লোকবিশ্বাসে, হর-পার্বতী।

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ



সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'
প্রচ্ছদ ❑ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ ❑ আলোকচিত্র : বেলুড় মঠের জনৈক সন্ন্যাসী
website : www.udbodhan.org ◆ e-mail : udbodhan@vsnl.com
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ : ৬৫ টাকা; সডাক : ৭৫ টাকা
আলাদাভাবে কিনলে বর্তমান সংখ্যার মূল্য : ৮ টাকা ❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ❑ ৩০০০ টাকা
[একবছরের মধ্যে পরিশোধ্য কমপক্ষে ৫০০ টাকা প্রতি কিস্তি হিসাবে ৬টি কিস্তিতেও প্রদেয়]



রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়

অনুষ্ঠান-সূচী (বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে) ❑ ১৪০৮ বঙ্গাব্দ / ২০০১-২০০২ খ্রীস্টাব্দ

তিথি-কৃত্য

শ্রীশঙ্করাচার্য	বৈশাখ শুক্লা পঞ্চমী	১৫ বৈশাখ	শনিবার	২৮ এপ্রিল	২০০১
শ্রীবুদ্ধদেব	বৈশাখ পূর্ণিমা	২৪ বৈশাখ	সোমবার	৭ মে	„
গুরুপূর্ণিমা (ব্যাসপূর্ণিমা)	আষাঢ় পূর্ণিমা	২০ আষাঢ়	বৃহস্পতিবার	৫ জুলাই	„
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী	৩ শ্রাবণ	বৃহস্পতিবার	১৯ জুলাই	„
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	১৯ শ্রাবণ	শনিবার	৪ আগস্ট	„
শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী	শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	২৭ শ্রাবণ	রবিবার	১২ আগস্ট	„
স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী	২ ভাদ্র	শনিবার	১৮ আগস্ট	„
স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	২৭ ভাদ্র	বুধবার	১২ সেপ্টেম্বর	„
স্বামী অখণ্ডানন্দ	ভাদ্র অমাবস্যা	১ আশ্বিন	সোমবার	১৭ সেপ্টেম্বর	„
স্বামী সুবোধানন্দ	কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী	১১ অগ্রহায়ণ	মঙ্গলবার	২৭ নভেম্বর	„
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ	কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী	১৩ অগ্রহায়ণ	বৃহস্পতিবার	২৯ নভেম্বর	„
স্বামী প্রেমানন্দ	অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী	৮ পৌষ	সোমবার	২৪ ডিসেম্বর	„
যীশুখ্রীস্ট		৮ পৌষ	সোমবার	২৪ ডিসেম্বর	„
শ্রীমা সারদাদেবী	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী	২০ পৌষ	শনিবার	৫ জানুয়ারি	২০০২
স্বামী শিবানন্দ	অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী	২৪ পৌষ	বুধবার	৯ জানুয়ারি	„
স্বামী সারদানন্দ	পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী	৫ মাঘ	শনিবার	১৯ জানুয়ারি	„
স্বামী তুরীয়ানন্দ	পৌষ শুক্লা চতুর্দশী	১৪ মাঘ	সোমবার	২৮ জানুয়ারি	„
স্বামী বিবেকানন্দ	পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী	২১ মাঘ	সোমবার	৪ ফেব্রুয়ারি	„
স্বামী ব্রহ্মানন্দ	মাঘ শুক্লা দ্বিতীয়া	১ ফাল্গুন	বৃহস্পতিবার	১৪ ফেব্রুয়ারি	„
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ	মাঘ শুক্লা চতুর্থী	৩ ফাল্গুন	শনিবার	১৬ ফেব্রুয়ারি	„
স্বামী অদ্ভুতানন্দ	মাঘ পূর্ণিমা	১৪ ফাল্গুন	বুধবার	২৭ ফেব্রুয়ারি	„
শ্রীরামকৃষ্ণদেব	ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া	২ চৈত্র	শনিবার	১৬ মার্চ	„
(শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব মহোৎসব)		১০ চৈত্র	রবিবার	২৪ মার্চ	„
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	দোল পূর্ণিমা	১৪ চৈত্র	বৃহস্পতিবার	২৮ মার্চ	„
স্বামী যোগানন্দ	ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী	১৮ চৈত্র	সোমবার	১ এপ্রিল	„

পূজা-কৃত্য

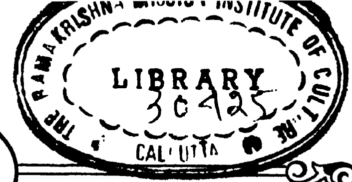
শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা	বৈশাখ অমাবস্যা	৮ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	২২ মে	২০০১
স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	২৩ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	৬ জুন	„
রথযাত্রা	আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া	৮ আষাঢ়	শনিবার	২৩ জুন	„
মহালয়া	ভাদ্র অমাবস্যা	১ আশ্বিন	সোমবার	১৭ সেপ্টেম্বর	„
শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা	আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী	৬ কার্তিক	মঙ্গলবার	২৩ অক্টোবর	„
শ্রীশ্রীকালীপূজা	দীপান্বিতা অমাবস্যা	২৮ কার্তিক	বুধবার	১৪ নভেম্বর	„
শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা	কার্তিক শুক্লা নবমী	৮ অগ্রহায়ণ	শনিবার	২৪ নভেম্বর	„
শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা	কার্তিক পূর্ণিমা	১৪ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	৩০ নভেম্বর	„
শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা	মাঘ শুক্লা পঞ্চমী	৪ ফাল্গুন	রবিবার	১৭ ফেব্রুয়ারি	২০০২
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি	মাঘ কৃষ্ণা চতুর্দশী	২৭ ফাল্গুন	মঙ্গলবার	১২ মার্চ	„

একাদশী-তিথি (রামনাম-সঙ্কীর্তন)

বৈশাখ—	৬, ২০ (এপ্রিল ১৯, মে ৩)	কার্তিক—	১০, ২৫ (অক্টোবর ২৭, নভেম্বর ১১)
জ্যৈষ্ঠ—	৫, ১৯ (মে ১৯, জুন ২)	অগ্রহায়ণ—	১০, ২৫ (নভেম্বর ২৬, ডিসেম্বর ১১)
আষাঢ়—	২, ১৬ (জুন ১৭, জুলাই ১)	পৌষ—	১০, ২৪ (ডিসেম্বর ২৬, জানুয়ারি ৯)
শ্রাবণ—	১, ১৪, ৩০ (জুলাই ১৭, ৩০, আগস্ট ১৫)	মাঘ—	১১, ২৫ (জানুয়ারি ২৫, ফেব্রুয়ারি ৮)
ভাদ্র—	১৩, ২৯ (আগস্ট ২৯, সেপ্টেম্বর ১৪)	ফাল্গুন—	১০, ২৪ (ফেব্রুয়ারি ২৩, মার্চ ৯)
আশ্বিন—	১২, ২৭ (সেপ্টেম্বর ২৮, অক্টোবর ১৩)	চৈত্র—	১১, ২৫ (মার্চ ২৫, এপ্রিল ৮)

সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইন্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০১

30 APR 2001



উদ্বোধন ॥১০৩॥

বৈশাখ ১৪০৮ এপ্রিল ২০০১

দিব্য বাণী

নত্থি রাগসমো অগ্‌গি নত্থি দোসসমো কলি।
নত্থি খন্ধসমা দুক্‌খা নত্থি সন্তিপরং সুখং।।

—আসক্তির সমান অগ্নি নেই, কামনার সমান দোষ নেই, বিদ্বেষের সমান দুঃখ নেই, শান্তির সমান সুখ নেই।

*

আরোগ্য পরমা লাভা সন্তুট্‌ঠি পরমং ধনং।
বিস্‌সাস পরমা ঞাতী নিব্‌বানং পরমং সুখং।।

—আরোগ্যই পরম লাভ, সন্তোষ পরম সম্পদ, বিশ্বাস পরম আত্মীয় এবং নির্বাণই পরম সুখ।

*

অক্‌কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং।।

—অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে, সাধুতার দ্বারা অসাধুতাকে জয় করবে, দানের দ্বারা কার্পণ্যকে জয় করবে এবং সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে জয় করবে।

*

মনোপকোপং রক্‌খেয্য মনসা সংবুতো সিয়া।
মনোদুচ্চরিতং হিত্বা মনসা সুচরিতং চরে।।

—মনের প্রকোপ দমন করবে, সংযতমনা হবে। মানসিক দুশ্চরিত্রতা ত্যাগ করে মনে সুচরিত হবে।

*

কায়েন সংবুতা ধীরা অথো বাচায় সংবুতা।
মনসা সংবুতা ধীরা তে বে সুপরিসংবুতা।।

—এই সংসারে যেসব ধীর ব্যক্তি কায়ে সংযত, বাক্যে সংযত এবং মনে সংযত—তারা যথার্থ সুসংযত।

ভগবান বুদ্ধ

ভারতবর্ষের ধর্মবিহার

ধর্মের উদ্ভব আমাদের অন্তরের প্রেরণায়। সেই প্রেরণা আমাদের সকলের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক চেতনা। সেই চেতনা বা চৈতন্যের অগ্নি মানুষকে কখনো একজায়গায় স্থির থাকিতে দেয় না। তাহা সবসময় মানুষকে ছুটাইয়া লইয়া চলে, তাড়াইয়া লইয়া চলে সীমা হইতে অসীমের পথে, ক্ষুদ্র হইতে ভূমার পথে। আমাদের উপনিষদে বলা হইয়াছে: "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৭।২৩।১) যাহা ভূমা অর্থাৎ যাহা বিরাট, তাহাই সুখ, তাহাই আনন্দ। অল্পে সুখ নাই, আনন্দ নাই। বস্তুত, আনন্দের সন্ধানই মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের লক্ষ্য। আনন্দেই মানুষ থাকিতে চাহে, আনন্দকে লইয়াই সে বাঁচিতে চাহে। কথায় বলে—"যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।" যতক্ষণ মানুষ প্রাণবায়ুর দ্বারা যুক্ত, ততক্ষণই মানুষের জীবন। যে-মুহূর্তে প্রাণবায়ু মানুষকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়, সেই মুহূর্তেই মানুষের জীবনান্ত ঘটে। সেই মুহূর্তেই মানুষ মৃত্যু-কবলিত হয়। শুধু মানুষ কেন, সমস্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে ইহাই চিরন্তন নিয়ম। 'প্রাণ' আছে বলিয়াই তো 'প্রাণী'। প্রাণের অস্তিত্বের উপরেই প্রাণীর অস্তিত্ব নির্ভর করে। যতক্ষণ প্রাণ থাকে, ততক্ষণ সবাই আনন্দের আশায় ব্যাকুল হইয়া থাকে। বস্তুত, সকলেই আনন্দে থাকিতে চাহে—সে মানুষই হোক অথবা অন্য কোন প্রাণীই হোক। সকল প্রাণীর আকাঙ্ক্ষা আনন্দে অবস্থান এবং অবশ্যই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে অবস্থান। দুঃখ কে চাহে? নিরানন্দ কে আকাঙ্ক্ষা করে? তবে সকল প্রাণীর মধ্যে একমাত্র মানুষই আনন্দের স্তর এবং তারতম্য বিচার করিতে পারে।

ভারতবর্ষের বেদ-উপনিষদ্, গীতা-ভাগবত, রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের মানুষের কাছে আনন্দের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। সেই সীমা হইল ঈশ্বরদর্শনের আনন্দ। তবে ঈশ্বরদর্শনের আনন্দ অনির্বচনীয়। সেই আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। ভাষা সেই আনন্দের অনুভূতিকে বর্ণনা করিতে সমর্থ নহে। 'ভক্তিসূত্র'-এ আচার্য নারদ বলিয়াছেন, সেই আনন্দের অনুভূতি "মূকাস্বাদনবৎ" (৫২)। মূক বা বোবা মিষ্টান্নের আস্বাদ শব্দে প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু অনুভব করিতে পারে। ঈশ্বরপ্রাপ্তির আনন্দ তেমনি ঈশ্বরদ্রষ্টা সাধক অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন, তাঁহার সর্বাঙ্গে সে-আনন্দ বিচ্ছুরিত হয়। কিন্তু তাঁহার স্বীয় অনুভূতি তিনি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন না। শুধু বলেন: "হা ৩ বু, হা ৩ বু, হা ৩ বু।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ৩।১০।৫) ইহা স্বরধ্বনি মাত্র—অর্থবোধক নহে, শুধুই ভাব-প্রকাশক। ভাবটি হইল—আহা, কী আনন্দ! আহা, কী অসীম আনন্দ! শুধু ঐ প্লুতির মাধ্যমে সাধক তাঁহার অপরিমেয় আনন্দানুভূতির আভাসমাত্র দান করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার অনুভূতিকে প্রকাশ করিতে না পারিলেও ব্রহ্মানন্দের সুখ যে সর্বোচ্চ সুখ, ইহা তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন। সেজন্য বিষয়ানন্দ অথবা পার্থিব সকল আনন্দ তাঁহার কাছে তুচ্ছ হইয়া যায়। কারণ, পৃথিবীর সকল আনন্দ ব্রহ্মানন্দের তুলনায়, ঈশ্বরীয় আনন্দের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। যিনি ব্রহ্মানন্দের অধিকারী হইয়াছেন, পার্থিব এবং মানবীয় সর্বোচ্চ আনন্দেও তাঁহার 'আলুনী' লাগে। ব্রহ্মানন্দই ভূমানন্দ। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন: "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।" (৬।২২)—যে-আনন্দ লাভ করিয়া সাধক মনে করেন উহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ আর থাকিতে পারে না। ভক্তির আচার্য নারদও একই কথা বলিয়াছেন: "য লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি।।/ যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি, ন শোচতি, ন দ্বেষ্টি, ন রমতে, নোৎসাহী ভবতি।।/ যৎ জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি, স্তব্ধো ভবতি, আত্মারামো ভবতি।।" (ভক্তিসূত্র, ৪-৬)—যাহা লাভ করিয়া সাধক সিদ্ধ হন, অমৃত হন, তৃপ্ত হন। যাহা লাভ করিয়া তিনি আর কোনকিছু প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না, অপ্রাপ্তিজনিত কোন খেদ তাঁহার থাকে না, কাহারও প্রতি তিনি বিদ্বেষভাব পোষণ করেন না, আনন্দে উদ্বেল হন না, অপর কোন কিছু প্রাপ্তি বিষয়ে তাঁহার কোন আগ্রহ থাকে না। যাহা পাইয়া সাধক আনন্দে মত্ত হইয়া যান, স্তব্ধ হইয়া যান এবং আত্মারাম বা আত্মানন্দে পূর্ণ হইয়া যান।

ধর্মের পথেই মানুষ সেই পরম আনন্দকে লাভ করিতে পারে। ধর্মই মানুষকে ভূমানন্দের অধিকারী করে। সেজন্য ধর্মই মানুষের একমাত্র সুহৃদ—একমাত্র বন্ধু। "এক এব সুহৃদ্ধর্মঃ"। (হিতোপদেশ—মিত্রলাভ, ৬৬) বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য এবং মৈত্রেয়ীর উপাখ্যানে মৈত্রেয়ী অবলীলায় যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন: "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্?" (২।৪।৩, ৪।৫।৪)—যাহার দ্বারা আমি অমৃত হইব না অর্থাৎ অমৃতত্বকে লাভ করিতে পারিব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? ঈশ্বরলাভের দ্বারাই মানুষ অমৃতত্ব লাভ করে। মরমানুষ অমরতা প্রাপ্ত হয়। মানুষের শরীর যে ঈশ্বরলাভের পর মৃত্যু-কবলিত হইবে না, তাহা বলা হইতেছে না। অমৃতত্ব লাভের অর্থ হইল—যে-মৃত্যুর ভয়ে সকল প্রাণী প্রতিনিয়ত আতঙ্কিত, ঈশ্বরকে লাভ

করিলে মানুষ সেই মৃত্যুকে আর ভয় করে না। মানুষ তখন মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করে। তাহার কাছে মৃত্যু তখন একটি অত্যন্ত অবহেলার বস্তু। এই মৃত্যু-ভীতি নাশই প্রকৃত মৃত্যু-জয়। ইহাই আসল অমরতা। ইহাই মরপৃথিবীতে অমৃতত্বলাভের কৌশল। মৈত্রেয়ী জানিতেন, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ। আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি অমৃতত্বের অধিকারী হইয়াছেন। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে সেই প্রার্থনাই ব্যক্ত করিয়াছিলেন, যাহাতে তিনিও আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া অমৃত হইতে পারেন—অমৃতত্ব লাভ করিতে পারেন। যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে তিনি শুনিয়াছিলেন অর্থ, বিত্ত, ঐশ্বর্য—কোনকিছুর দ্বারাই আত্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় না। একমাত্র ঈশ্বরলাভ বা আত্মজ্ঞানলাভের মাধ্যমেই মানুষ অমৃতত্বের অধিকারী হয়। মৈত্রেয়ী সেই অমৃতত্বলাভের সাধন শিক্ষা দিবার জন্য স্বামী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট তাঁহার ব্যাকুল আর্তি নিবেদন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সহস্র সহস্র বৎসরের ঐতিহ্যই হইল এই অমৃতত্ব সন্ধানের ঐতিহ্য। ইহাই ভারতের চিরায়ত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য ও আকাঙ্ক্ষা। যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ী ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-উপলব্ধি এবং অধ্যাত্ম-আকাঙ্ক্ষার দুই প্রতীক।

ভারতবর্ষ ঈশ্বরকেই আনন্দস্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করে। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যে আনন্দের প্রতিশব্দ 'রস'। প্রতিটি জীবের অন্তরে অবস্থিত ঈশ্বর হইলেন রসস্বরূপ। উপনিষদ্ সেকথা শোনাইয়াছেন: "রসো বৈ সঃ"। (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ২।৭) সুতরাং আনন্দই আমাদের সকলের স্বরূপ। আনন্দই আমাদের সকলের উৎসমূল। আনন্দেই আমাদের অবস্থান। আনন্দেই আমাদের পর্যবসান। আনন্দের উপলব্ধি মানুষকে অভয়ত্বে প্রতিষ্ঠিত করে। দুই বা নানা জ্ঞানই ভয়ের কারণ। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া মানুষ 'একমেব অদ্বৈতম্'—এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে লাভ করে। উপনিষদ্ বলিয়াছেন: "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। আনন্দেন জাতানি জীবন্তি। আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।" (ঐ, ৩।৬)—আনন্দই ব্রহ্ম—একথা [বরুণপুত্র ভৃগু পিতার নির্দেশে তপস্যানুষ্ঠান করিয়া] জানিলেন। কারণ, আনন্দ হইতেই এই সমস্ত প্রাণিবর্গ জাত হয়। আনন্দের দ্বারাই তাহারা জীবনধারণ করে। অবশেষে আনন্দের অভিমুখেই তাহারা গমন করিয়া আনন্দেই বিলীন হয়।

ভারতের অধ্যাত্মসাধনা সেজন্য দিব্যানন্দে অবস্থানের লক্ষ্যে প্রতিনিয়ত পরিচালিত। বিষাদ বা নিরানন্দ অধ্যাত্মসাধনার লক্ষণ নহে। বিষাদ বা নিরানন্দ হইতে আনন্দে উত্তরণই সাধনার লক্ষ্য। সেজন্যই 'গীতা'র প্রথমে 'বিষাদযোগ' এবং পরিশেষে 'মোক্ষযোগ' বা 'প্রসাদযোগ'। বিষাদের মধ্য দিয়া ভয়ের যাত্রাপথে অর্জুনের সাধনসমর শুরু হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপদর্শনের পর উহার সমাপ্তি হইয়াছিল অভয়ে প্রতিষ্ঠায় এবং দিব্যানন্দের পূর্ণ-প্রাপ্তিতে। অর্জুনের দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতিতে সেকথা আমরা শুনি:

"নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা তৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব।।"
(গীতা, ১৮।৭৩)

অর্জুনের এই যে পরমা স্থিতির অবস্থা, ইহাকেই শ্রীকৃষ্ণ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন 'প্রসাদ'। (দ্রঃ ২।৬৪-৬৫) 'প্রসাদ'কে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন 'সন্তোষ'। (দ্রঃ যোগসূত্র, সাধনপাদ, ৪২) বুদ্ধদেব বলিয়াছেন 'সন্তুষ্টি'। (পালি—'সন্তুট্‌ঠি', দ্রঃ ধম্মপদ, সুখবগ্‌গো, ৮) বুদ্ধদেব বলিয়াছেন: "সন্তুট্‌ঠি পরমং ধনং।"। সন্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন, সন্তোষের কাছে জগতের যাবতীয় ধন-ঐশ্বর্য ধূলার তুল্য:

"গোধন গজধন বাজীধন আওর রতন ধন খান।
যব আওত সন্তোষধন সব ধন ধূরি সমান।।"

—যে-মুহূর্তে আমরা সন্তোষ-ধনের অধিকারী হই, সেই মুহূর্তে গো, গজ, অশ্ব এবং ধনরত্নখনি সমস্ত কিছু ধূলার মতো তুচ্ছ বোধ হয়।

সন্তোষ বা আনন্দই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী বলিতেন: "সন্তোষের সমান ধন নাই।" ধর্মের চেতনা এবং ধর্মের প্রেরণা মানুষকে এই সন্তোষ বা আনন্দ দান করিতে পারে। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ যখন গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার মনে ছিল এই প্রেরণা এবং এই আবেগ যে, পৃথিবীর সর্ব মানবকে সর্বোচ্চ আনন্দের সন্ধান দিতে হইবে। জগৎ দুঃখময় ঠিকই, কিন্তু সেই দুঃখের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহার পর সেই কারণকে দূর করিতে হইবে। সিদ্ধার্থ যেদিন কঠোর তপস্যার পর বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রিতে বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন, সেদিন তিনি উপলব্ধি করিলেন, জগতের সমস্ত দুঃখের মূল হইল 'তণ্হা'—তৃষ্ণা বা বাসনা। নির্বাণলাভ করিলে তণ্হার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয়। তখনি মানুষ পরম সুখের অধিকারী হয়। জগৎকে ভোগ করিবার লোভ, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির লোভ অহর্নিশ মানুষকে তাড়াইয়া লইয়া চলে। এই লোভের সহযোগী হইল রাগ-দ্বেষাদি সংস্কার। তাহারা মানুষকে কখনো স্থির থাকিতে দেয় না। বুদ্ধ বলিলেন, সাধনার দ্বারা, আত্মবিশ্লেষণের দ্বারা মানুষ তাহার এই শত্রুগুলিকে চিহ্নিত করিতে পারে এবং সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্পাদি অষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বনে নির্বাণলাভ করিয়া আত্মজয়ী হইতে পারে। নির্বাণই হইল মহত্তম সুখ। তাহাতেই সর্বোত্তম সন্তোষ। তিনি ঘোষণা করিলেন:

"জিঘচ্ছা পরমা রোগা সঙ্খারা পরমা দুখা।
এতং ঞত্বা যথাভূতং নিব্বানং পরমং সুখং।।"
(ধম্মপদ, সুখবগ্‌গো, ৭)

—জিঘচ্ছা বা লোভ হইল মহাব্যাধি। রাগ বা আসক্তি ও দ্বেষাদি সংস্কার পরম দুঃখদায়ক। যাহারা ইহা ঠিক ঠিক জানিয়াছে, তাহারা পরম সুখ নির্বাণের অধিকারী হয়।

মানুষ যখন সত্যসত্যই নির্বাণের অধিকারী হয় তখন সে কাহাকেও শত্রু ভাবিতে পারে না। সে কখনোই সদাচার হইতে বিচ্যুত হয় না। তাহার মনে কখনোই কোন নীচতা, সঙ্কীর্ণতা স্থান পায় না। অহিংসা, করুণা, মৈত্রী ও মুদিতা (অপরের সুখে সুখের অনুভূতি এবং অপরের দুঃখে দুঃখের অনুভূতি) ভাবনার দ্বারা তাহার অন্তঃকরণ সর্বদা পূর্ণ হইয়া থাকে। এই পূর্ণতাপ্রাপ্তির সহজ কৌশল বুদ্ধদেব মানুষকে দান করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—

"অক্‌কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে।
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং।।"
(ধম্মপদ, কোধবগ্‌গো, ৩)

—অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে, সাধুতার দ্বারা অসাধুতাকে জয় করিবে, দানের দ্বারা কার্পণ্যকে জয় করিবে এবং সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবে।

শুধু বুদ্ধ কেন, বুদ্ধের পূর্বেও এই সত্যনীতির কথা ভারতের আচার্যরা মানুষকে শিখাইয়াছেন। বুদ্ধ তাঁহাদের নিকট হইতে ইহা উত্তরাধিকাররূপে লাভ করিয়াছিলেন। মহাভারতের মধ্যে ঠিক এই কথাগুলিই আমরা পাই। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে ধর্মবিগ্রহ বিদুর ধৃতরাষ্ট্রকে ঠিক এই কথাগুলিই বলিয়াছিলেন। পার্থক্য শুধু এই যে, বুদ্ধ বলিয়াছেন পালিতে, বিদুর বলিয়াছেন সংস্কৃতে। বিদুর বলিয়াছিলেন ঃ

"অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধমসাধুং সাধুনা জয়েৎ।
জয়েৎ কদর্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্।।"
(৩৯।৭২)

ধর্মব্রত বিদুর এবং তথাগত বুদ্ধের এই কথাগুলির মধ্যে রহিয়াছে উপনিষদের 'সোঽহম্' বা 'তত্ত্বমসি' তত্ত্বের সারনির্যাস। অর্থাৎ বুদ্ধের মৈত্রী, করুণা, অহিংসা ও মুদিতার বার্তা আসলে উপনিষদের আত্মবাদ—যাহা মানুষের হৃদয়স্থ ঘৃণা, হিংসা ও সঙ্কীর্ণতাকে নাশ করিতে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। উপনিষদের আত্মবাদ হইল নিরবচ্ছিন্ন প্রেমবাদ—মৈত্রীবাদ—ভূমানন্দবাদ। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মানুষের ধর্ম'-এ লিখিয়াছেন, ইহাই বুদ্ধদেবের 'ব্রহ্মবিহার' তত্ত্ব। কেহ পছন্দ করুক অথবা না করুক, মানুক অথবা না মানুক, ইহাই সর্বদেশে সর্বকালে ধর্মের মর্মবাণী। এই বাণী মানুষকে জীবনের সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বভৌমিকতায়—ভূমির সীমা হইতে ভূমার নিঃসীমতায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য পরিচালিত করে। মধ্যযুগের মরমিয়া সাধক-কবি রজ্জবের একটি বাণী রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় ছিল। সেই বাণীটি হইল এই ঃ

"সব সাঁচ মিলৈ সো সাঁচ হৈ না মিলৈ সো ঝুঁঠ।
জন রজ্জব সাঁচী কহী ভাবই রিঝি ভাবই রূঠ।।"

রবীন্দ্রনাথ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন ঃ "সব সত্যের সঙ্গে যা মেলে তাই সত্য, যা মিলল না তা মিথ্যে; রজ্জব বলছে, এই কথাই খাঁটি, এতে তুমি খুশিই হও আর রাগই কর।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, ২০শ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৭৬, পৃঃ ৪১০)

এই সত্যসাধনাই ভারতবর্ষের ধর্মবিহার।❑

'উদ্বোধন'-এর ইন্টারনেট সংস্করণ

এখন থেকে রঙিন

ইন্টারনেটে যাঁরা 'উদ্বোধন' দেখেন তাঁদের জন্য একটি সুখবর—তাঁরা এবার ইন্টারনেট সংস্করণে 'উদ্বোধন'কে রঙিন চেহারায় দেখতে পাবেন। অবশ্য গত চৈত্র ১৪০৭ সংখ্যা থেকেই পরীক্ষামূলকভাবে আমরা ইন্টারনেটে 'রঙিন' 'উদ্বোধন' উপস্থাপন করতে আরম্ভ করেছি। আশা করি, ইতিমধ্যেই অনেকের চোখে তা পড়েছে। বৈশাখ ১৪০৮ বা বর্তমান সংখ্যা থেকে বোঝা যাবে, পরীক্ষামূলক প্রয়াস আমাদের সফল হয়েছে।

প্রসঙ্গত 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক এবং পাঠকবর্গকে আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকসংখ্যা এখন ৫৫,০০০ হয়ে গিয়েছে। আমরা আশা করছি, বর্তমান বছরের শেষে (পৌষ/ডিসেম্বর) এই সংখ্যাটি গিয়ে দাঁড়াবে অন্তত ৫৮,০০০-এ। এখন যাঁরা গ্রাহক হচ্ছেন বা পরে হবেন তাঁরা যথারীতি বছরের প্রথম সংখ্যা থেকেই সব সংখ্যা পাবেন।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক সত্যনারায়ণ রায় আমাদের জানিয়েছেন—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় যাঁরা 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক হতে চাইবেন অথবা নবীকরণ করতে চাইবেন, তাঁরা তাঁর এই ই-মেল ঠিকানায় তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন—**satya_ray@yahoo.com**

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের পত্রাবলী



পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশের) শ্রীহট্ট জেলার বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী বরদামোহন দাশগুপ্তের দ্বিতীয়া কন্যা জ্যোৎস্না দাশগুপ্তকে (ডাকনাম 'পাখি') লেখা শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের ২৭খানি পত্র (২৬টি পোস্টকার্ডে লেখা, একটি খামে) শ্রীমতী দাশগুপ্তের সহোদরা (বরদামোহন দাশগুপ্তের চতুর্থ কন্যা) কল্যাণীর গায়ত্রী দাশের সৌজন্যে আমরা পেয়েছি। গায়ত্রী দাশ শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা। তাঁদের বাবা-মা—বরদামোহন দাশগুপ্ত এবং অবলাবালা দাশগুপ্তও বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের কাছে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেছিলেন। শ্রীহট্ট জেলার দুলালী গ্রামে ছিল বরদামোহনের বাড়ি। ঐ গ্রামেই ছিল রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এক বহুমানিত সন্ন্যাসী স্বামী প্রেমেশানন্দের পূর্বাশ্রম। বরদামোহন দাশগুপ্তের সহোদর মোক্ষদামোহন দাশগুপ্ত ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। জ্যোৎস্না দাশগুপ্তের কনিষ্ঠা সহোদরা পরলোকগতা কল্যাণী দাশগুপ্তের কাছে চিঠিগুলি সংরক্ষিত ছিল। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা।

শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা জ্যোৎস্না দাশগুপ্ত প্রথমে নিবেদিতা বিদ্যালয়ে পড়তেন। তারপর সপ্তম শ্রেণী থেকে উত্তর কলকাতার ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি ম্যাট্রিক পাস করেন। ডঃ রমা চৌধুরীর দিদি উমা গুহ ছিলেন তাঁর সহপাঠিনী। এরপর তিনি বেথুন কলেজ থেকে আই. এ. পাস করে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন। ডঃ রমা চৌধুরী স্কটিশচার্চ কলেজে তাঁর সহপাঠিনী ছিলেন। স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি. এ. পাস করার পর তিনি নিবেদিতা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি শিলঙের সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অবিবাহিতা। কর্ম থেকে অবসরের পর তিনি শিলঙেই বাস করতেন। ১৯৮৫ সালের জুন মাসে তিনি কল্যাণীতে নিজেদের বাড়িতে চলে আসেন। ১৯৮৯ সালের ৮ জুলাই কল্যাণীর গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

জ্যোৎস্না দাশগুপ্তকে লেখা শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের ২৭খানি পত্রের মধ্যে যেগুলি পূজ্যপাদ মহারাজের স্বহস্তলিখিত (সংখ্যায় ৫), সেগুলিই আমরা এখানে প্রকাশ করলাম।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

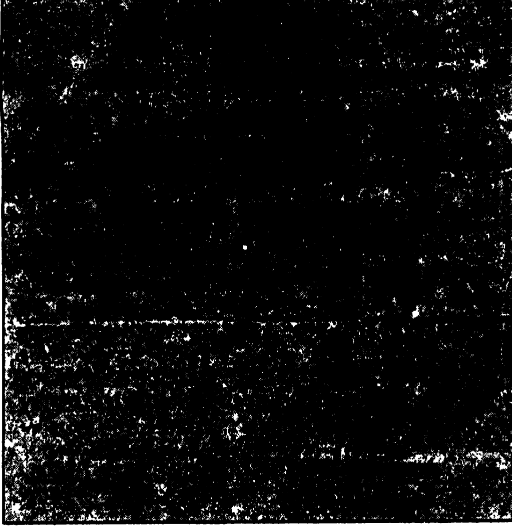
॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

কাশীধাম
লাক্ষা
২২শে মাঘ ১৩২৯
[লাক্ষা ডাকঘরের ডেটস্ট্যাম্প ঃ ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৩]

পরম কল্যাণীয়া মা,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। সতত আমার আশীর্বাদ জানিবে। যোগীন-মা এখানে আসিয়া প্রায় পূর্বের মতোই আছেন। সামান্য বল পাইয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। উহা ক্রমশ বাড়িলে এবং স্থায়ী হইলে তবেই বুঝা যাইবে। তাঁহার আশীর্বাদ জানিবে।



আমার শরীর এখানে আসিয়া ভালই আছে। কলিকাতা হইতে আসিবার কালে পায়ে যে বাতের ব্যথা ছিল তাহা এখন সারিয়াছে। তবে সাবধানে আছি। অধিক চলাফেরা করি না।

তোমাদের বড়দি ও চামেলি-দি ভাল আছেন। প্রায়ই দেখা হয়। তাঁরা নিত্য আমাদিগের জন্য কত রকমের তরকারি রাঁধিয়া পাঠাইয়া দিতেছেন। মীনু ও তাহার দিদিমা ভাল আছে ও আছেন। তাহার দিদিমার আশীর্বাদ ও তাহার ভালবাসা জেনো।

তোমার ভাবনা নাই মা। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় তোমার লেখাপড়াও খুব হইবে এবং তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তি ভালবাসাও খুব হইবে। তিনি সর্বদা তোমাকে রক্ষা করিবেন। অধিক আর কি লিখিব।

মধ্যে মধ্যে পত্র দিয়া সুখী করিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসারদানন্দ

॥ ২ ॥

শ্রীশ্রীদুর্গা

কলিকাতা
বাগবাজার
৮।৮।(১৯)২৩

পরম কল্যাণীয়াসু,

তোমার পত্র যথাকালে পাইয়া সুখী হইয়াছি। আমার আশীর্বাদ ও ভালবাসা সতত জানিবে। পরীক্ষার অন্তে এখানে যখন আসিবে তখন ফলাফল জানিব। যোগীন-মার শরীর খুবই খারাপ যাইতেছে। তাঁহার আশীর্বাদ জানিবে। গোলাপ-মার শরীর পূর্বের মতো। মধ্যে মধ্যে বুকের কষ্ট হয়। তাঁহারও আশীর্বাদ জানিবে। বাণীর[১] ও অন্য কয়েকজনের অসুখ হইয়াছিল। এখন সারিয়াছে। বোর্ডিংবাটীতে দুইটি সুন্দর গরু আসিয়াছে। তোমার কুশল মাঝে মাঝে লিখিয়া সুখী করিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসারদানন্দ

॥ ৩ ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ
ভুবনেশ্বর, পুরী
১০ই অগ্রহায়ণ (১৩৩১)
[ভুবনেশ্বর ডাকঘরের ডেটস্ট্যাম্প ঃ ২৫ নভেম্বর ১৯২৪]

পরম কল্যাণীয়া পাখী,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমার শরীর একপ্রকার মন্দ নাই। এই অঞ্চলেই কিছুদিন থাকিবার ইচ্ছা। তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের যাহা ইচ্ছা তাহাই হয় ও হইবে। তোমার পরীক্ষার কথা জানিলাম। ভয় কি মা? শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমার কৃপায় তুমি ও বাণী ভালরকমে উত্তীর্ণা হইয়া যাইবে। সাবধানে থাকিবে। যেন আবার জ্বর না হয়। আমার আশীর্বাদ সতত জানিবে এবং বাণীকে জানাইবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসারদানন্দ

---

১ বাণী ঘোষ। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ (দেবব্রত বসু) ও সুধীরা বসুর মেজ বোনের মেয়ে।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

॥ ৪ ॥

শ্রীশ্রীগুরুদেব ভরসা

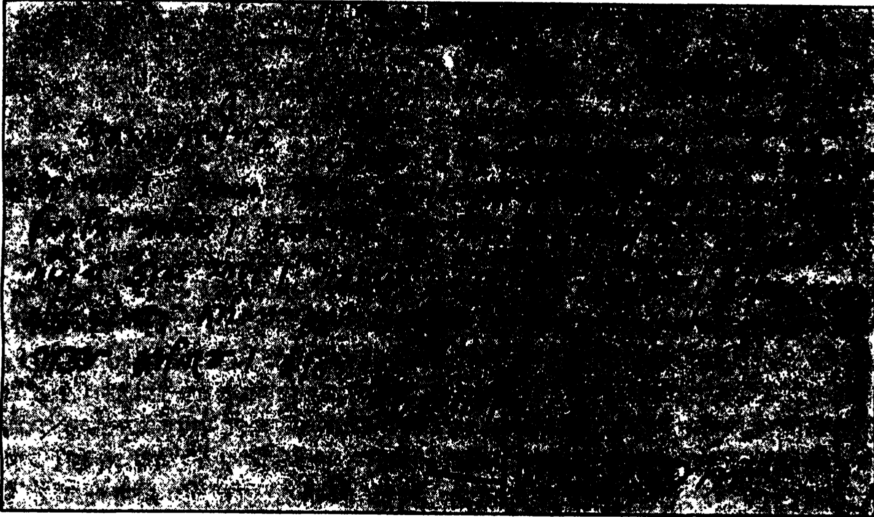
পরম কল্যাণীয়াসু,

তোমার ২খানা পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। তোমাদের বাড়িতে বিপদের কথা জানিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। জন্ম-মৃত্যুর সংসারে এইরূপ ঘটনা চারিদিকে নিয়তই হইতেছে। কিন্তু আমাদের কোন বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়ের সম্বন্ধে হইলেই মনে বিশেষ ধাক্কা লাগে। কারণ, নিজের স্বার্থটুকুই আমরা দেখিতে শিখিয়াছি ও বুঝি। শ্রীভগবানে নির্ভর করিয়া থাকাই এই সংসারে একমাত্র শান্তির পথ। আমার শরীর পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছে। আগামী ২০শে চৈত্র এখান হইতে কলিকাতা রওয়ানা হইব। চামেলীর পরীক্ষা আগামী ১৩ই মার্চ হইতে আরম্ভ হইবে। বাণী পরীক্ষা দিতে পারিয়াছে জানিয়া সুখী হইয়াছি। সে পাশ হইয়া যাইবে। সরলা[২] প্রভৃতি ভাল আছে। আমার আশীর্বাদ সতত জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীসারদানন্দ*

॥ ৫ ॥



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

শশীনিকেতন, পুরী

৩০।৩।(১৯)৩১

পরম কল্যাণীয়াসু,

তোমার ২৭শে আষাঢ়ের পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমার শরীর এখানে আসিয়া ভালই আছে—সেজন্য কিছুদিন থাকিব। সরলা এবং অন্যান্য যাহারা সঙ্গে আসিয়াছে—সকলে ভাল আছে। সরলার আশীর্বাদ জানিবে। বাণী কলেজে ভর্তি হইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। আমার আশীর্বাদ তুমি সতত জানিবে। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীসারদানন্দ

---

২ সরলা দেবী—পরবর্তী কালে প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

* এই পত্রটিতে স্থান ও তারিখের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু ডাকঘরের ডেটস্ট্যাম্পে 'কাশী' ও '১০ মার্চ (১৯)২৫' উল্লিখিত হওয়ায় বোঝা যাচ্ছে, স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ ঐসময়ে কাশী সেবাশ্রমে ছিলেন। তিনি পত্রে লেখেন—"আগামী ২০শে চৈত্র [৩ এপ্রিল ১৯২৫] এখান হইতে কলিকাতা রওয়ানা হইব।" সুতরাং পত্রখানি কাশী সেবাশ্রম থেকে ১০ মার্চ বা তার আগের দিন লেখা হয়েছে বলে অনুমিত হয়।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

কথামৃতে না-বলা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

শ্রীম

আমরা কি নিয়ে রয়েছি! যাতে পশুজীবন বাড়ে তার চেষ্টাই সর্বদা করছি। আহার-নিদ্রা-সন্তানোৎপাদন-মৃত্যু—এই তো জীবন। ঈশ্বরের জন্য কী করেছি আমরা? নিজেরাও এই করছি, পরিজনবর্গকেও এই শেখাচ্ছি। ছেলেমেয়েদের বিয়ে দাও, সংসার বৃদ্ধি হোক—এই কাজ। কিন্তু বেদ বলছেনঃ "ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ" (কেন উপনিষদ্, ২।৫)—এ-শরীরে ভগবানকে না জানতে পারলে মহাবিনাশ। তার কী করলাম? তাই ঠাকুর বলতেন মাঝে মাঝে নির্জনে চলে যেতে। নির্জনে যদি এসব কথা স্মরণ হয়—জীবনের উদ্দেশ্য কি, আর করছি কি? পরিবারের লোক যদি পশুজীবন যাপন করে, তাহলে তো তাদের ছাড়া খুব সোজা। ভক্ত হলে বরং ছাড়া কষ্টকর। ভক্তকে তো ছাড়া যায় না কিনা! সঙ্গে থাকতে গেলেও আসক্তির ভয়। আমরা কি সব নিয়ে আছি! [ঠাকুর] এক-একবার বসে বসে ভাবতেন আর বলতেনঃ "মা, আমি কি করব? কে শুনছে কথা? সব দেখছি কড়াইয়ের ডালের খদ্দের।" অর্থাৎ কামিনী-কাঞ্চনের। ঘরে বেয়ান, বেয়াই, জামাই এলে কত আয়োজন খাবার-দাবারের—যেন উৎসব লেগে গেল! গুরু, সাধুভক্ত এলে ডালভাত! কুটুম্বস্নেহে মন নিচু হয়ে যায়। সাধুভক্তের জন্য স্নেহে ভগবানলাভ হয়। যে যার সেবা করে, সে তার সত্তা পায়। (পৃঃ ১২৭)

[ঠাকুর] কুঠিতে ছিলেন ষোলবছর—১৮৫৫-১৯৭১ পর্যন্ত। গঙ্গার দিকের ঘরটায়, সামনে বারান্দা, তারপর সিঁড়ি। ঠাকুরের মাও ঐ ঘরে থাকতেন। অক্ষয়ের শরীর গেলে ঐ ঘর ছাড়েন। ১৮৭১-১৮৮৫ পর্যন্ত চোদ্দবছর এখন যেখানে তাঁর বিছানা—সেই ঘরে ছিলেন। ১৮৮৫-তে অসুস্থ হয়ে প্রথম একটা ভাড়াটে বাড়িতে, তারপর বলরামবাবুর বাড়িতে কয়েকদিন থেকে শ্যামপুকুরের বাড়িতে যান। ১৮৮৬-তে কাশীপুর বাগানে। এখানে প্রায় দশমাস ছিলেন। এখানেই দেহ যায়। (পৃঃ ১০৫)

একবার পঞ্চবটীতে কয়েকজন সাধু এসেছেন। তাঁরা ঠাকুরের ঘরে গিয়েছেন। ঠাকুর বলছেনঃ "আচ্ছা জী, আপনারা জপ-ধ্যান নিষ্কাম হয়ে করেন, না?" সাধুরা বললেনঃ "হাঁ জী।" "যা করেন সব নারায়ণে অর্পণ করেন, না?" আবার জিজ্ঞাসা করায় তাঁরাও বললেনঃ "হাঁ জী।" গীতায়ও তাই আছে—"তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্" (৯।২৭)—আহার, যজ্ঞ, দান, তপস্যা—সবের ফল আমাতে সমর্পণ করে কর, তাহলেই খালাস। বন্ধন হবে না আর। এর পরই ছোট খাটটিতে গিয়ে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসলেন আর মুচকি হাসছেন। সাধুরা দেখে বলাবলি করছেন—"ইসকী পরমহংস অবস্থা বোলতা হ্যায়।" (পৃঃ ৯০-৯১)

ঠাকুরের শিক্ষাপ্রণালীই অন্যরূপ। সাধুদের কেমন করে শেখালেন। ওঁরা বুঝতেই পারলেন না যে, তিনি শেখাচ্ছেন। এতে কেউ দোষ ধরতে পারে না। আরেকটি—যে যাকে মানে, তার নাম করে বলতেন। ব্রাহ্মদের সঙ্গে কথা হলে বিজয়ের নাম করতেন—"বিজয় এই বলে"। এতে দু-কাজ হতো। বিজয়ের ওপর এদের শ্রদ্ধা বাড়ত, আর ওদেরও শিক্ষা হয়ে যেত। ঠাকুরের কথা হয়তো ওরা নিত না। (পৃঃ ৯০-৯১)

চৈতন্যের জন্য [ঠাকুর] কত কথাই বলেছেন। শোনে কৈ লোক! মৃত্যুচিন্তা ভাল, মৃত্যুভয় ভাল না। এই মৃত্যুর কথা কত করে বুঝিয়েছেন, মনে থাকে কৈ আমাদের! দেখতেন কিনা চোখের সামনে! বলতেনঃ "সব জিনিসে মৃত্যুর ছাপ লেগে রয়েছে।" বকধার্মিকের গল্প বলেছিলেন একদিন। "বক জলে বসে আছে। লক্ষ্য মাছের ওপর। মাছ নড়ছে, সেও এগোচ্ছে। আর ব্যাধ তীরে বসা, সেও এগোচ্ছে। যেই মাছে ছোঁ মারা, অমনি পিছন থেকে ব্যাধের তীর বিদ্ধ হলো আর প্রাণ গেল। এই জীবের অবস্থা!" এসব কথা কেন বলতেন? যদি চৈতন্য হয়! মৃত্যু যে সম্মুখে দণ্ডায়মান! লোক কি বললেই শোনে? কেবল ঐসব নিয়ে ডুবে আছে সংসারে। শুধু পেট আর পেট। আর সন্তানোৎপাদন, সন্তানপালন। ওরাও (পশুগণ) তাই নিয়ে আছে। সারাদিন এমন করে (মাথা নিচু করে) খাচ্ছেই খাচ্ছে। আর এরই মাঝে দেহসুখ। আহা, গৃহীদের জন্য [ঠাকুর] কত সহজ করে দিয়েছেন! একবারে ত্যাগের কথা বললে ভয় পাবে, তাই নির্জনবাসের কথা বলতেন। তিনদিন, সাতদিন কি দশদিন থাকলেও হয়। এ যেন কলার ভিতর কুইনাইন। তেতো বলে ছেলে খাচ্ছে না, মা কলার ভিতর ঢুকিয়ে দিল। এত সোজা করে দিয়েছেন পথ—তবুও করে কৈ লোক? কাজ আর কাজ। সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করছে। অবসর কৈ তাঁকে ডাকবার? কতবার বলেছেনঃ "তাড়াতাড়ি সেরে নাও।" "খাওয়াপরার ব্যবস্থা করে বের হয়ে পড়।" কে শুনছে তাঁর কথা? (পৃঃ ১৩৪-১৩৫)

[ঠাকুর] একদিন কেশব সেনের হাত ধরে এই গানটি গেয়েছিলেন—'মজলো আমার মন-ভ্রমরা'। আরেকদিন ১৮৮২-র অক্টোবর, ঠাকুর কেশব সেনের বাড়ি গেছেন। উনি কাপড় পরে বের হচ্ছিলেন দীন মল্লিকের বাড়িতে যাবেন বলে। আর যাওয়া হলো না। 'লিলি কটেজ'-এ ওপরের হলঘরে কী নৃত্য! একচল্লিশ বছর হয়ে গেছে, মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র হলো। চোখের ওপর জ্বলজ্বল করে ভাসছে। কেশববাবুর আর যাওয়া হলো না। মানে, তাঁকে দর্শন করলে

সব কর্ম কমে যায়—"ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।" (মুণ্ডক উপনিষদ্, ২।২।৮) চাদর কাঁধে মত্ত হয়ে গান শুনছেন কেশববাবু। [ঠাকুর] আরেকদিন গেয়েছিলেন—"কথা বলতে ডরাই; না বললেও ডরাই।/ মনের সন্দ হয়; পাছে তোমা ধনে হারাই হারাই।।/ আমরা জানি যে মন-তোর; দিলাম তোরে সেই মন্তোর।/ এখন মন তোর; যে-মন্ত্রে বিপদেতে তরী তরাই।।" কেশববাবুকে লক্ষ্য করে গেয়েছিলেন এটি। আহা, কেশব সেনই বুঝেছিলেন তাঁকে। তা নইলে কি মুখ দিয়ে এমন গান বের হয়? "দিলাম তোরে সেই মন্তোর"। মন্ত্র মানে "ঈশ্বর সত্য সংসার অনিত্য"—তাঁর এই মহাবাক্য। কেশববাবুর শিষ্যরা সব unsympathetic (সহানুভূতিহীন) ছিল, তাই 'কথা বলতে ডরাই'। এক কেশব সেনই ঠাকুরকে বুঝেছিলেন।

ঠাকুর আমাদের বলেছিলেনঃ "একদিন একজনের বাড়ি গেছি। সে আমায় ঠাকুরঘরে যাওয়ার জন্য বললে। বললে, 'ঐ ঘরে ঈশ্বরের পূজা হয়। একবার এসে স্থানটি পবিত্র করে দিন।' ঘরে যেই ঢুকলুম, অমনি কবাট বন্ধ করে দিল। আর ফুল-চন্দন দিয়ে আমার পা পূজা করতে লাগল। আবার বলছে, 'আপনি কাউকে একথা বলবেন না।' কেন নিষেধ করল? গুরুগিরি আছে কিনা! শিষ্যরা পাছে গোল বাঁধায়।" (পৃঃ ১৫২-১৫৩)

অধ্যাত্মরামায়ণে আছে, শরভঙ্গ ঋষি ও সিদ্ধ শবরী শ্রমণার কথা। রামের সম্মুখে এঁরা দেহত্যাগ করেছিলেন। দুজনে দুই কুটিরে বসে দিবানিশি 'রাম রাম' জপ করছেন। শবরী ঋষিদের সেবা করেছিলেন, তাই তাঁর ওপর ঋষিদের কৃপা হয়েছে। তাই 'রাম রাম'—এই মহামন্ত্র জপ করছেন। বনবাসকালে রাম ঐ আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত। রামকে উভয়ে পূজা করলেন। চলে আসছেন, তখন শরভঙ্গ বললেনঃ "রাম, একটু অপেক্ষা কর। তোমার সামনেই এই বৃদ্ধদেহ ত্যাগ করি।" শ্রমণা ব্যাধকন্যা।... তিনিও শেষে রামের সামনে দেহ রাখলেন।... শুনতে পাই, ঈশ্বরের জন্য অনশনে প্রাণত্যাগ করে কেউ কেউ। মহেশ বীণকার তাই করেছিলেন। ইনি বীণাযন্ত্রে ঠাকুরকে গান শুনিয়েছিলেন। আমরা তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। কাশীতে থাকতেন। বীণার দাম দুহাজার টাকা। সেই বীণাতে ঠাকুরকে যে-গান শুনিয়েছিলেন, সেই রাগিণী আমাদের শোনালেন—কানাড়া। (পৃঃ ১৯৯)

ঠাকুর বলতেন, ঝিনুক স্বাতী নক্ষত্রের জলের জন্য সমুদ্রের surface-এ (জলের ওপর) ভাসতে থাকে। যেই জল পড়ল অমনি আর ওপরে নেই। পেটে pearl (মুক্তো) হবে, তাই গভীর জলে ডুবে গেল। কাশীতে শোনা যায় এইরূপ একটি ঘটনা হয়েছিল। একজন অপর একজনকে মহাপুরুষ বলে জানতেন। নিত্য গঙ্গাস্নান করেন দুজনেই। একদিন মহাপুরুষ একটি নাম করতে করতে ঘাট থেকে উঠছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি ঐ নাম শুনে নিয়ে একেবারে নির্জনে পলায়ন। ঐ নাম জপ, আর ঐ বস্তু ধ্যান করতে লাগলেন। গভীর তপস্যায় মগ্ন হলেন। এমন বিশ্বাস, আর এমন মনের জোর! দীক্ষা-ফিক্ষার দরকার কি? এই আগ্রহ চাই—একবার শুনে একেবারে দৌড়। তাই ঠাকুর বলতেনঃ "যে খেলে, সে কানা কড়িতে খেলে।" (পৃঃ ২০১)

নানা জনে নানা কথা বলে, শুনে ঠাকুর মাকে বললেন সব কথা। বললেনঃ "মা শিবনাথ বলে, এই কর; ইংলিশম্যান বলে, যা যুক্তিযুক্ত তা কর; আবার এক এক শাস্ত্র বলছে এক এক কথা—কার কথা শুনব? কারো কথা শুনব না—খালি তোমার কথা শুনব।" 'তোমার কথা' মানে revelation (বেদ)—ঈশ্বরের কথা। তাই বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়। (পৃঃ ২১৬)

ঠাকুর বলেছিলেনঃ "মা আমার এমন একটি অবস্থায় রেখেছিলেন, তখন পাঁচজনে আমায় পূজা না করলে অশান্তি হতো।" ভিতরে মাকে দেখতেন কিনা, তাই ঐ অবস্থা হতো। আবার বলতেনঃ "কখনো এমন অবস্থায় রাখতেন, তখন হয়তো পায়খানা পরিষ্কার করতেই লেগে গেলাম।" (পৃঃ ২৩০)

ঠাকুর বলছেনঃ "আমি কে আর তোরা কে—এ জানতে পারলেই হলো। আর কিছুর দরকার হবে না।" অর্থাৎ তিনি ঈশ্বর, অবতার হয়ে এসেছেন—এ জানলে, ভক্তরা তাঁর অংশ, পার্ষদ হবে—একথা জানতে পারলে তারা আর মায়ায় পড়বে না। ঠাকুর নিজের শরীর দেখিয়ে বলেছিলেনঃ "এর ভিতর দুটি আছে—একটি ভক্ত আরেকটি 'মা'।" ভক্তেরই ক্যান্সার হয়েছে। দুটি পক্ষী—একটি সাক্ষীস্বরূপ, অপরটি সুখ-দুঃখ ভোগ করছে। ন্যাংটাকে (তোতাপুরীকে) বলেছিলেনঃ "এটি যতদিন না বোধ হচ্ছে, তোমার যাওয়ার যো নাই।" (পৃঃ ২৩৩) ❑

স্বামী নিত্যাত্মানন্দের 'শ্রীম-দর্শন'-এর ২য় ভাগের ২য় সংস্করণ থেকে সঙ্কলিত।

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার

সম্পাদনা ❑ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০১৩

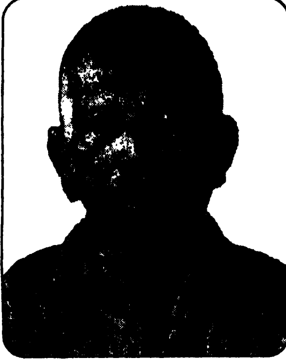
বিঃ দ্রঃ এই বিভাগে ইতিপূর্বে প্রকাশিত এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে সঙ্কলিত ও সম্পাদিত রচনাগুলি পুনর্মুদ্রণ করতে চাইলে জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ এবং 'উদ্বোধন'-সম্পাদকের অনুমতি আবশ্যিক।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

গীতার শক্তি ও মনোহারিত্ব

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

এই আলোচনাটি প্রধানত দুর্গাপদ ঘোষ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরম পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজজীর বর্তমান রচনাটি কলকাতার অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত মহারাজজীর 'Universal Message of the Bhagavad Gita' শীর্ষক ইংরেজী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের (১ম সংস্করণ, ২০০০) অন্তর্গত অসামান্য 'ভূমিকা'র বাঙলা অনুবাদ। রচনাটি 'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪০৭ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, মহারাজজীর প্রত্যেকটি ভাষণ, রচনা এবং আলোচনা অসাধারণ বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিঋদ্ধতায় সমৃদ্ধ এবং একাধারে বিশ্লেষণমূলক, ভক্তিরসাশ্রিত ও আধুনিক মানুষের প্রশ্ন ও সংশয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনিবার্যভাবে গ্রহণযোগ্য। ভারতের অতুলনীয় শাস্ত্রগ্রন্থ 'গীতা' সম্পর্কে পূজ্যপাদ মহারাজজীর বর্তমান আলোচনাটিও তাঁর নিজস্ব শৈলী ও ভঙ্গিতে সমুজ্জ্বল। পাঠকরা প্রতিক্ষণেই তার প্রমাণ পাবেন এবং প্রতিক্ষণেই মহারাজজীর অনবদ্য যুক্তি ও বিশ্লেষণে আলোকিত হবেন।

ভাষান্তর : অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

মানবজীবনের দুটি মার্গ : প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

এরপর শঙ্কর বিবর্তনের পথে মানবীয় স্তরে প্রদান করছেন এমন এক সর্বাঙ্গীণ জীবনদর্শন, যার সহায়ে মানবসমাজ সুন্দরভাবে সমতা রক্ষা করে তার আপন পথে এগিয়ে চলতে পারে :

"স ভগবান্ সৃষ্ট্বেদং জগৎ তস্য চ স্থিতিং চিকীর্ষুঃ মরীচ্যাদীন্ অগ্রে সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ প্রবৃত্তিলক্ষণং ধর্মং গ্রাহয়ামাস বেদোক্তম্।।"—সেই ভগবান এই জগৎকে (নিজের ভিতর থেকে) সৃষ্টি করে তাকে সুস্থিতিতে রক্ষা করার মানসে প্রথমে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিগণকে সৃষ্টি করে তাদের বেদোক্ত প্রবৃত্তি (বা কর্ম) লক্ষণ ধর্ম গ্রহণ করিয়েছিলেন।

"ততোঽন্যাংশ্চ সনকসনন্দনাদীনুৎপাদ্য নিবৃত্তিধর্মং জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং গ্রাহয়ামাস।।"—তারপর সনক, সনন্দন (এবং সনাতন ও সনৎকুমার)-কে সৃষ্টি করে তাদের জ্ঞান-বৈরাগ্যরূপ নিবৃত্তি (বা অন্তর্মুখী ধ্যান) লক্ষণ ধর্ম পরিগ্রহ করিয়েছিলেন।

সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎকুমারকে চার 'কুমার'—বিশ্বাত্মার শাশ্বত সন্তান—বলা হয়; ভারতীয় সাহিত্যে তাঁদের পরম দৈবসত্তার সাংসারিক মালিন্যমুক্ত সন্তানরূপে সম্মান প্রদান করা হয়।

"দ্বিবিধো হি বেদোক্ত ধর্মঃ, প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তি-লক্ষণশ্চ।। জগতঃ স্থিতিকারণং প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সহেতুঃ।"—অর্থাৎ, বেদোক্ত ধর্মের বা দর্শনের দুটি লক্ষণ—প্রবৃত্তি (বা বহিরঙ্গের কাজকর্ম) এবং নিবৃত্তি (বা অন্তর্মুখী ধ্যান)। এরা জগৎকে সুষম সাম্যে রক্ষা করে। সকল জীবের জন্য এরা দুটি বস্তু নিশ্চিত করে—প্রকৃত অভ্যুদয় বা সামাজিক-অর্থনৈতিক কল্যাণ এবং নিঃশ্রেয়স বা আধ্যাত্মিক মুক্তি।

মানুষের কল্যাণের জন্য কর্ম ও ধ্যান—দুইয়েরই প্রয়োজন। যদি এদের দুটির যেকোন একটিমাত্র থাকে, তবে ব্যক্তির মঙ্গল বা সমাজের মঙ্গল—কোনটিই হতে পারে না। দেখুন প্রাচীন ভারতীয় ঋষিদের কী অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ও সার্বিক প্রজ্ঞা ছিল! প্রবৃত্তির মাধ্যমে আর্থিক অবস্থা ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করে গড়ে তোলা যায় একটি জনকল্যাণমুখী সমাজ। কিন্তু যাকে আজ আমরা মূল্যবোধকেন্দ্রিক জীবন বলি, তা অর্জন করা যায় নিবৃত্তির মাধ্যমে। এরকম জীবন তৈরি হয় মানবতার অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিকতা থেকে। প্রবৃত্তির মধ্য দিয়ে প্রচুর অর্থ, ক্ষমতা এবং অন্যান্য নানা কিছু আসতে পারে; কিন্তু কেবল ঐ প্রবৃত্তিটি থাকলে এবং নিবৃত্তি কিছুমাত্র না থাকলে সমাজ অল্প কয়দিনের জন্য ঠিকঠাক চললেও শেষপর্যন্ত সমস্যায় পড়ে যাবে। সমগ্র আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ সমস্যাদীর্ণ, কারণ সেখানে নিবৃত্তির ওপর কোন গুরুত্ব না দিয়ে কেবল জোর দেওয়া হয়েছে প্রবৃত্তির

ওপর—কাজ, কাজ, আরো কাজ কর; আরো আরো অর্থ উপার্জন কর; কিন্তু ভিতরে ভিতরে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর থেকে যাও—যতক্ষণ না মানসিকভাবে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছ! আধুনিক পৃথিবীতে বহু মানুষ এইভাবে ভুগছেন। আমি প্রায়ই জার্মান দার্শনিক শোপেনহাওয়ারের 'The World as Will and Idea' গ্রন্থটি থেকে উদ্ধৃতি দিই; তিনি একথাগুলি বলেছেন প্রায় ১৪০ বছর আগে এবং তখন তিনি যা বলেছেন তা আজ সম্পূর্ণরূপে সত্য। তিনি বলেছেন: "নিরাপত্তা ও জনকল্যাণ অর্জন করলে মানুষ প্রকৃতপক্ষে অন্য সব সমস্যারই সমাধান করে ফেলে এবং তখন নিজেরাই নিজেদের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।"

এই আধুনিক যুগের নারীপুরুষের কাছে কথাগুলি কী আক্ষরিকভাবে সত্য! এমনকি আমাদের নিজেদের দেশেও রয়েছে অর্থ, ক্ষমতা ও ভোগসুখ লাভের অশেষ প্রযত্ন; ফলে এসেছে মূল্যবোধের ব্যাপক অবলম্বন এবং ক্রমবর্ধমান হিংসা। সুস্থ মানবসমাজকে রক্ষা করার উপায় এটা নয়। আসলে, দ্বিতীয় যে উপাদান—নিবৃত্তি, তার অভাব রয়েছে। তাই শঙ্কর বলছেন: "প্রাণিনাং সাক্ষাৎ অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সহেতুঃ"—এমন এক জীবনদর্শন, যা (কর্ম ও ধ্যানের মাধ্যমে) সামাজিক কল্যাণ ও আধ্যাত্মিক মুক্তিকে সমন্বিত করে। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। 'অভি'-র পরে 'উদয়' মানে হলো কল্যাণ; বিশেষ শব্দটির পূর্বে ব্যবহৃত 'অভি' একটি গুরুত্বপূর্ণ উপসর্গ, যার তাৎপর্য হলো—সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া কোন আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটতে পারে না; সুস্থ-সবল সমাজ গড়তে গেলে সমন্বিত কার্যপ্রণালী ও সঙ্ঘবদ্ধতা বা সমবায়ী মনোবৃত্তির প্রয়োজন আছে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের বিরুদ্ধে লড়াই করলে কোন সমৃদ্ধি আসবে না। সামাজিক শান্তির একান্ত প্রয়োজন; প্রয়োজন সমন্বয়ের, প্রয়োজন সঙ্ঘবদ্ধ কার্যধারার এবং এসবেরই ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ঐ একটি শব্দ 'অভি'তে। এটি এমন একটি মূল্যবোধ, যাকে ভারতীয় সমাজে সাম্প্রতিক শতকগুলিতে আমরা যথেষ্টরূপে আত্মস্থ করে উঠতে পারিনি। আমাদের আজ সেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে; গড়ে তুলতে হবে সঙ্ঘবদ্ধ মানসিকতা। আমাদের দেশের মানুষ কিভাবে একসঙ্গে কাজ করতে হয়, সেটা জানলে আমাদের গ্রামগুলি কালই স্বর্গে পরিণত হয়ে যেত। আমরা এটা এখনো শিখিনি, আর তাই আমাদের 'কো-অপারেটিভ সোসাইটি' বা সমবায় সমিতিগুলি প্রায়ই বন্ধ হয়ে যায়। সমবায়ী কোন মানসিকতাই না থাকলে আর কী করে সমবায় আন্দোলনকে সফল করে তোলা যাবে?

এই দুই মার্গের ফল: অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স

অতএব, 'উদয়'-এর সঙ্গে যুক্ত 'অভি' শব্দটি গুরুত্বপূর্ণ; এতে সমষ্টিবদ্ধতার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। আমাদের শিখতে হবে, কী করে গ্রামে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। তাদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করে সবাই মিলে গ্রামগুলিকে উন্নত করে তোলা যায়। পয়ঃপ্রণালীর উন্নয়ন, ভাল ভাল রাস্তাঘাট, ভাল ঘরবাড়ি, সকলের জন্য যথেষ্ট খাদ্য ও শিক্ষা—এসবই আমরা অর্জন করতে পারি কেবল সকলে একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করলে। এভাবেই আমাদের পঞ্চায়েত ও পুরসভাগুলিকে সুস্থ-সবল করে তোলা যায়। এইভাবেই গড়ে তোলা যায় নতুন এক সুস্থ-সবল, প্রাণবন্ত ভারতবর্ষ। তাই এই 'অভ্যুদয়'-এর দর্শন একান্ত প্রয়োজন। পাশ্চাত্য এটিকে অনেকটাই আয়ত্ত করে ফেলেছে। আমরা তাদের কাছ থেকে শিখতে পারি, কিভাবে এই দর্শনকে আমাদের দেশে প্রয়োগ করা যায়। আমাদের জীবন ও কর্মে তিনটি মূল্যবোধ নিয়ে আসতে হবে: প্রচুর কাজ, দক্ষ কাজ এবং সম্মিলিত কাজ। শঙ্করাচার্য বলছেন, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নামক যৌথ আদর্শ-সমন্বিত এই বৈদিক দর্শন একদিকে নারী-পুরুষের অভ্যুদয় এবং অপরদিকে তাদের নিঃশ্রেয়স ঘটায়। সম্পূর্ণরূপে জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্র বলতে আজ আমরা এইরকমই বুঝি। এটা মোটেও আকাশকুসুম কল্পনা নয়। বহু সমাজ আজ অভ্যুদয় অর্জন করেছে এবং ভারতে আমরাও তা অর্জন করতে পারি, যদি আমরা যাকে চারিত্রিক দক্ষতা বলি, সেটি গড়ে তুলতে পারি। যীশুখ্রীস্ট যেমন বলেছেন: "যে-আমাকে তোমরা দেখেছ—তাকেই যদি ভাল না বাসতে পার, তবে যে-ঈশ্বরকে তোমরা দেখনি—তাকে কী করে ভালবাসবে?" এই একটি মহান শিক্ষা আমাদের দেশের মানুষকে লাভ করতেই হবে। বহুদূরে অবস্থিত কোন ঈশ্বরের সঙ্গে বা মন্দিরে অবস্থিত ঈশ্বরের কোন মূর্তির সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে আমাদের যে দারুণ আগ্রহ দেখা গেছে, তার তুলনায় নিকট প্রতিবেশী কোন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আমাদের আগ্রহ কিছুই নয়; কাছের সেই মানুষটির সঙ্গে প্রায়ই আমরা ঝগড়াঝাঁটি বাঁধিয়ে বসি। এটা বদলাতে হবে এবং এই পরিবর্তনই আনে অভ্যুদয়। তারপর আসে নিঃশ্রেয়স। আপনি অর্জন করতে পারেন জীবনের সবরকম স্বাচ্ছন্দ্য—বাসস্থান, শিক্ষা, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, আর্থিক ক্ষমতা এবং নানারকম সুখভোগ। তবু মনে শান্তি থাকবে না; জীবন হবে উদ্বেগ-অশান্তিতে ভরা। কেন? কারণ, আপনি একটি জিনিস পাননি—আপনার প্রকৃত সত্তাকে আপনি জানতে পারেননি, চেনেননি আপনার অন্তরস্থিত দৈব স্ফুলিঙ্গটিকে।

আপনার ভারকেন্দ্রটি সবসময়ই আপনার বাইরে রয়ে গেছে। আপনি আপনার সত্যকার আত্মমর্যাদা উপলব্ধি করতে না পেরে এবং থেকে গেছেন জড়বস্তুর দাস হয়ে। এর থেকেই আসে অন্তরের উদ্বেগ; বাড়ে সামাজিক অপরাধ ও ভ্রষ্টাচার এবং ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে সামাজিক অবক্ষয়।

এটাকে এড়ানো যায় তখন, যখন আমরা মানবজীবনে নিয়ে আসি দ্বিতীয় সেই মূল্যবোধ—নিবৃত্তি—ধ্যান, যার মাধ্যমে মানুষ তার অন্তরে সদাজাগ্রত দৈবসত্তার সংস্পর্শে আসে। এটা কোন চাপিয়ে দেওয়া উক্তি বা বিশ্বাসমাত্র নয়; এ হলো অধ্যাত্মবিজ্ঞানের পথে ঔপনিষদিক ঋষিদের অনুভূত সত্য; যে-সত্যকে আমাদের প্রত্যেকের কেবল বিশ্বাস করলেই চলবে না, অন্তরে উপলব্ধিও করতে হবে। আর আপনি যতই ভিতরে ঢুকবেন, ততই আপনার ক্ষমতা জাগবে অন্য মানুষেরও অন্তরে প্রবেশ করার, তাদের সঙ্গে সুখী পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার। নিজের অন্তঃপ্রকৃতির গভীরে প্রবেশ করলে আপনি আপনার জিনেটিক ব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্র অহং-এর পারে চলে গিয়ে পৌঁছে যাবেন বৃহত্তর সেই আত্মসত্তার সংস্পর্শে, যিনি সকল জীবেরই আন্তর সত্তা।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স-এর এই সমন্বয়ই গীতার মহৎ শিক্ষা। এতে আছে এমন এক দর্শন, যার মাধ্যমে আসে সর্বাঙ্গীণ মানবীয় প্রগতি। এই মহান গ্রন্থের এটি বিশেষত্ব। তাই শঙ্করাচার্য বলেছেন ঃ "প্রাণিনাং সাক্ষাৎ অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সহেতুঃ।" তিনি বলেননি যে, এটি কেবল হিন্দুদের জন্য বা ভারতের মানুষের জন্য। বলেছেন—'প্রাণিনাম্'—অর্থাৎ সকল মানুষের জন্য। এটিই এর সর্বজনীনতা। অভ্যুদয়-এর সঙ্গে নিঃশ্রেয়সকে যুক্ত করে গীতা মানুষকে যন্ত্রমাত্রে পরিণত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় ঐ প্রবণতা রয়েছে। বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর 'Impact of Science on Society' গ্রন্থে বলেছেন, নারী-পুরুষকে যন্ত্রে পরিণত করার এই ব্যাপারটা যদি খুব বেশিদূর গড়ায়, তাহলে এমন একটা সময় আসবে যখন একজন শ্রমিক একটা ফুল হাতে কারখানায় ঢুকে অতিকায় একটা যন্ত্রের সামনে ফুলটা রেখে প্রার্থনা করবে ঃ "হে যন্ত্র, আমাকে তোমার কলকব্জার মধ্যে ভাল একটা নাট-বলটু করে নাও।" এরই নাম মানুষের যন্ত্রায়ন। দ্বিতীয় যে-মূল্যবোধটির ওপর শঙ্করাচার্য জোর দিয়েছেন, অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স—তার প্রতি যদি যথাযথ মনোযোগ দেওয়া হয়, তবে আধ্যাত্মিক মূল্যবোধগুলির বিকাশ হবে এবং এইরকম একটি সমস্যা কোনদিনই দেখা দেবে না। অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স—এ-দুটি মিশে জগতের সাম্য ও সুস্থিতি বজায় রাখার উপায় করে দেয়। একটির ওপর জোর দিয়ে অন্যটিকে অবহেলা করলেই সমগ্র ব্যবস্থাটা কোন একদিকে কাত হয়ে পড়বে—নৌকার মতো। সাম্প্রতিক শতকগুলিতে ভারতবর্ষ নিঃশ্রেয়স-এর দিকে হেলে পড়েছিল; তাও যথাযথভাবে নয় এবং অভ্যুদয়-এর দিকটিকে অবহেলা করেছিল। ফলে এসেছিল স্থবিরতা, যা থেকে দেশকে আধুনিক কালে উদ্ধার করছেন স্বামী বিবেকানন্দের মতো আচার্যগণ। অপরপক্ষে আধুনিক পাশ্চাত্য ঝুঁকেছিল অভ্যুদয়-এর দিকে, যা থেকে বাঁচার জন্য এখন সে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। পাশ্চাত্যের নিবৃত্তির অভিজ্ঞতা ছিল খ্রীস্টীয় ধ্যানধারণার মাধ্যমে এবং সেই ভাবনা উৎপাদন করেছিল মহান ভাববাদী সাধক ও সাধুসন্তেরও; কিন্তু আধুনিক যুগে সেসবই অপ্রচলিত হয়ে গেছে; আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে প্রবৃত্তি-র ভিত্তিতেই গঠিত। কিন্তু আজকের পাশ্চাত্যে জীবন সম্বন্ধে এই একপেশে মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এই প্রতিক্রিয়া আসছে কিছু চিন্তাবিদ, মনোবিজ্ঞানী এবং নিউক্লীয় বিজ্ঞানীর কাছ থেকে, যখন তাঁরা দেখছেন—এই একপেশে মনোভাব জন্ম দিচ্ছে একপেশে মানুষদের এবং একটি একপেশে সভ্যতার। আরো কিছু একটা দরকার—অনুভবটা দেখা দিতে আরম্ভ করেছে আমেরিকায় বিগত ২০০ বছর ধরে নানা সাংস্কৃতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর। কিছু কিছু চিন্তাবিদ এখন এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, নিবৃত্তির ওপরেও জোর দেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। এই ভাব আমেরিকার চিন্তায় কিভাবে, কি ভাষায় আত্মপ্রকাশ করছে?

জ্ঞানের (cognition) যে বিভিন্ন স্তর আছে, তাদের মধ্যে চেতন, প্রাক্-চেতন, অবচেতন এবং অ-চেতন ছাড়াও বেদান্ত আরো একটি স্তরকে স্বীকার করে—সেটি অতি-চেতন। মানুষের সৃজনশীলতা প্রসঙ্গে নিবৃত্তি সেই অতি-চেতন স্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত। মানুষের সৃজনশীলতায় 'জ্ঞান'-এর ভূমিকা প্রসঙ্গে অনেক পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানীর সাম্প্রতিক গবেষণাতেও এই ইঙ্গিত রয়েছে।

১৯৭১-৭২-এ আমেরিকায় আটমাসের বক্তৃতা-সফরকালে ওয়াশিংটন ডি. সি.-তে থাকাকালে আমার হাতে একটা অতি স্থূলকায় গ্রন্থ এসেছিল—'American Handbook of Psychiatry' (Vol. III)। গ্রন্থটি অনেকের লেখার সঙ্কলন। সৃজনশীলতা বাড়াতে আমেরিকার যুবসম্প্রদায় একসময় নানাধরনের ড্রাগ নিতে ও তার অপপ্রয়োগ করতে আরম্ভ করে; গ্রন্থটিতে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সহ সুস্থ উপায়ের কথা রয়েছে। [ক্রমশ]

প্রসঙ্গ ঃ মাতৃভাব

স্বামী প্রভানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

এই ভাষণটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'



মায়ের সবার জন্য অফুরন্ত স্নেহ ছিল, সে-মাতৃস্নেহ পার্থিব মায়ের স্নেহ থেকে ভিন্ন। শ্রীমায়ের স্নেহ কোন বন্ধন আনেনি, মুক্তির পথ উন্মোচিত করেছে। ঠাকুরের ভাষায় বলতে হয়—এর মধ্যে মায়া ছিল না, ছিল দয়া। সেখানে আবেগ ছিল, কিন্তু মায়ার দ্বারা এই আবেগ কলুষিত ছিল না। এই ভাবের আবেগ দয়ার দ্বারা পরিশুদ্ধ বলে স্নেহের পাত্রকে মুক্তির পথে নিয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয়ত, মায়ের ছিল একটি অসাধারণ গুণ—তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে, প্রত্যেক বস্তুকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেন। আজকের দিনে এবিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন পত্র-পত্রিকায় মানুষের ওপর, বিশেষত নারীদের ওপর আমরা নির্যাতন, লাঞ্ছনা, অবমাননার ঘটনার কথা পড়ি; উপরন্তু যেসব জিনিসপত্র বা যেসব মানুষের সাহায্যের ওপর আমরা নির্ভর করে থাকি—তাদের প্রতি আমাদের উপেক্ষা, অনুদারতা, অসৌজন্যতা যেন বেড়েই চলেছে। এই পরি-প্রেক্ষিতে মায়ের ঐ অসাধারণ গুণটি বিশেষ মননযোগ্য।

একদিন শ্রীমা দেখলেন, কাজ হয়ে যেতেই একজন ঝাঁটাটি ছুঁড়ে ফেলল। তিনি ঐ ব্যক্তিকে বললেন, ঝাঁটাকেও তার যথাযোগ্য মান্য দিতে হয়। তারপর তিনি নিজেই ঝাঁটাটিকে ঠিক জায়গায় তুলে রাখলেন। শ্রীমা পরিবারের প্রত্যেককে কিছু কিছু অধিকার দিয়ে নিজে ছোট হয়ে থাকতেন। একদিনের ঘটনা। নলিনীদি একটু অভিমানী ছিলেন। রাধুর শ্বশুরবাড়িতে তত্ত্ব যাবে, তাতে যদি নলিনীদির হিংসা কিংবা ঈর্ষা হয়, তাই মা হঠাৎ নলিনীদিকে বলছেন ঃ "দ্যাখ তো, এই যে তত্ত্ব পাঠাব ঠিক হলো কিনা?" লিস্টটা দেখেই মুরব্বির মতো নলিনীদি সাগ্রহে বললেন ঃ "একি হচ্ছে, এইটুকু কি? আরো এই এই দিতে হবে।" মা চুপ করে থাকলেন। নলিনীদি যা বললেন, মা তা মেনে নিয়ে কয়েকটি জিনিস তালিকায় জুড়ে দিলেন। আরেকটি ঘটনা। একদিন এক ব্রাহ্ম মহিলা ডাক্তার এসেছেন। অন্য সবাইকে মা প্রসাদ দিলেন, কিন্তু ব্রাহ্ম বলে হয়তো প্রসাদ অপছন্দ করবেন ভেবে মা তাঁকে দিলেন না। পরে সেই মহিলা যখন নিজে চাইলেন, তখন মা তাঁকে প্রসাদ দিলেন। সবদিকে তাঁর লক্ষ্য। শ্যামাদাস কবিরাজ এসেছেন। তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ ব্যাপারে সবাই সচেতন। মা রাধুকে বললেন কবিরাজ মশায়কে প্রণাম করতে। মায়ের সঙ্গিনীদের কারো কারো এ-সিদ্ধান্ত পছন্দ হয়নি, কিন্তু মা গুণী ব্যক্তিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিলেন। প্রত্যেককে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের মধ্যে রয়েছে। ভাগবতের মধ্যে রয়েছে। সেগুলি আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি। কিন্তু মাতৃভাবের পরাকাষ্ঠা শ্রীমা প্রত্যেককে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছেন, প্রত্যেক ব্যবহার্য বস্তুকেও মর্যাদা দিয়েছেন।

মা ছিলেন নম্রতার প্রতিমূর্তি। যখন সবাই তাঁকে বড় করে দেখবার চেষ্টা করছে, তিনি সেসময় তাদের বাধা দিয়ে বলছেন—ঠাকুর দয়া করে আমাকে তাঁর পায়ে আশ্রয় দিয়েছিলেন। ঠাকুরের চেয়ে তাঁকে বড় করে দেখাবার প্রত্যেক প্রচেষ্টার তিনি বারবার প্রতিবাদ করেছেন, বিনয়ের সঙ্গে তাঁর নিজের সামান্য ভূমিকা সবার সামনে তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়। পুরীতে তিনি জগন্নাথ মন্দিরে যাবেন, পাণ্ডা গোবিন্দ সিঙ্গারী নিয়ে যাবেন। ব্যবস্থা করা হয়েছিল, মা পালকি করে যাবেন। কিন্তু মা আপত্তি করলেন, বললেন—না, আমি কাঙালিনীর মতো পায়ে হেঁটে যাব। এসব বিচিত্র সুন্দর আচরণের মোড়কে বিভূষিত মায়ের চরিত্রখানি চিরদিনের জন্য আদর্শ হয়ে থাকবে।

শ্রীমায়ের চরিত্রের আরেকটি ভূষণ তাঁর অদোষদর্শিতা। তিনি কারো দোষ দেখতে পারতেন না। স্বামী অভেদানন্দ মাতৃস্তুতিতে বলেছেন ঃ "দোষানশেষান্ সগুণীকরোষি।" তাঁর সন্তানদের মধ্যে কোন দোষ থাকলে তিনি তার মধ্যেও গুণ দেখতেন এবং সন্তানের সেই দোষের মোড় ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন।

আশ্চর্যের বিষয়, মা গ্রামে বড় হয়েছেন, কোন স্কুল-কলেজে পড়েননি; কিন্তু তাঁর মন ছিল কুসংস্কারমুক্ত, তাঁর আচরণ ছিল যুক্তিনিষ্ঠার ওপর প্রতিষ্ঠিত। নিবেদিতা একদিন নিজে রান্না করে ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে প্রসাদ নিয়ে এসেছেন। মা তা গ্রহণ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি উঠেছে—নিবেদিতা ব্রাহ্মণ নন, হিন্দু নন। মা শান্তভাবে

প্রতিবাদ করে বলছেন ঃ "নিবেদিতা আমার মেয়ে, সে ঠাকুরের পুজো করেছে, সেই প্রসাদ আমি গ্রহণ করছি। তাতে যদি কারুর আপত্তি থাকে তা আমি কি করতে পারি?" কী ভীষণ কথা, ভাবলে অবাক হই! আরেকটি ঘটনা। যোগীন-মা কোন কারণে এক ব্রহ্মচারীর ওপরে খুব চটে গেছেন। তিনি গঙ্গাস্নান সেরে এসে উদ্বোধন বাড়ির নিচে পা ধুচ্ছেন। সেসময়ে যোগীন-মা চিৎকার করে মাকে বলছেন ঃ মা, ওকে তুমি বের করে দাও। ও যদি থাকে তবে আমি এ-বাড়িতে থাকব না। মা বার দুই-তিন শুনে যোগীন-মাকে ওপরে যেতে অনুরোধ করলেন। যোগীন-মা ওপরে গিয়েও হম্বিতম্বি করছেন। মা তাঁকে নানাভাবে শান্ত করার চেষ্টা করছেন। সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন ঃ এই ছেলে বাড়িঘর ছেড়ে এখানে এসেছে, আমাকে মা বলে জেনেছে। যোগীন, তোমাকে এত করে বলছি ওকে ক্ষমা করো, ওর হয়ে আমি ক্ষমা চাইছি, ক্ষমা কর। কি আর বলব, ওকে আমি ত্যাগ করতে পারব না। তুমি যা করবার কর। মায়ের এরূপ কঠোর মনোভাব ভাবাই যায় না! এ-ঘটনার উল্লেখ রয়েছে স্বামী নির্লেপানন্দের (যোগীন-মার নাতির) স্মৃতিকথাতে। মাতৃ-ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত শ্রীমায়ের ছিল স্বচ্ছ দৃষ্টি, যুক্তিনিষ্ঠার দ্বারা পরিশীলিত সংস্কারমুক্ত মন। অসাধারণ!

দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণের সময় মা ব্যাঙ্গালোরে মাত্র তিনদিন ছিলেন। একদিন তিনি দেখছেন, তাঁর ঘরের জানালা দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছে একটি ছেলে। তিনি হাত নেড়ে ডাকলেন। ছেলেটির খালি গা, মাথার চুল উস্কখুস্ক। তিনি তাকে কাছে বসালেন, তার মাথায় খানিকটা তেল মাখিয়ে দিলেন, চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়ে দিলেন। একজনকে বললেন ঃ এই ছেলেটিকে কেউ একটি জামাও দিলে না! শুনে একজন ভক্ত দৌড়ে গেলেন জামাকাপড় কিনতে। মা ছেলেটিকে খাওয়ালেন। পরের দিন তাকে মন্ত্রদীক্ষা দিলেন। সবাই অবাক হয়ে গেল। ছেলেটির নাম আদিমুলম। নিচু জাতের। তার ভাষা মা বুঝতে পারেন না, সেও মায়ের কথা বুঝতে পারছে না। এদিকে ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে তখন ব্রাহ্মণদের আধিপত্য। আর সেখানকার মানুষের মধ্যে জাতপাতের প্রবল কুসংস্কার। মা সবকিছু অগ্রাহ্য করে তাকে দীক্ষা দিয়েছেন। পরবর্তী কালে এই ছেলেটিকে ভক্তরূপে ব্যাঙ্গালোর আশ্রমে আসতে দেখা গিয়েছিল। মা যেটা উচিত মনে করতেন, সেটা নির্দ্বিধায় করতেন। কিন্তু এমনভাবে বিনয়ের সঙ্গে করতেন যে, কারো মনে আঘাত লাগত না। তাঁর নিত্যকার আচার-আচরণ থেকে বোঝা যেত, জাতপাতের কুসংস্কার কখনোই তাঁকে বিচলিত করতে পারেনি।

শ্রীমায়ের দিব্যজীবনে দেখতে পাই দেহলী দীপের আলো। তুলসীদাস রামনামরূপ দেহলী দীপের কথা বলেছেন। দীপ ঘরের দরজার কাঠের ওপর রাখলে ঘরের ভিতরে আলো হয়, বাইরেও আলো হয়। দেহলী দীপের মতো জ্বলছিল তাঁর মাতৃত্বের অনির্বাণ দীপটি। তার স্নিগ্ধ আলোকে আলোকিত মায়ের জীবন। অন্তরে ছিল চিরকালের শান্তি। অশান্তি কাকে বলে তিনি জানতেন না। আর বাইরে বিকীর্ণ মাতৃত্বের আলো ছিল কতকটা যাদুর মতো; তার আকর্ষণে সবাই তাঁর কাছে ছুটে আসত। তিনি সকলের জন্য, তাঁর সন্তানদের কল্যাণের জন্য সবকিছু করতে প্রস্তুত ছিলেন। সন্তানের কল্যাণের জন্য লৌকিক দৃষ্টিতে তিনি যা যা করেছিলেন, তার তালিকা দেখলে অবাক হতে হয়। এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার।

তাঁর অসাধারণ মাতৃভাবের আলোতে বুঝতে হবে তাঁর বাণীর তাৎপর্য। তাঁর একটি বাণী ঃ "যদি শান্তি চাও মা কারো দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো, কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।" মাতৃভাবের পূর্ণ বিকশিত আলোকে উদ্ভাসিত তাঁর এই বাণী তাঁর সার্বিক অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত।

আমাদের আশপাশের ও বৃহত্তর পরিমণ্ডলে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি, আমাদের ভারতবর্ষে শতকোটির বেশি মানুষের বাস। তাদের মধ্যে বিরাট এক অংশ ন্যূনতম প্রয়োজনীয় অর্থাৎ খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত; নিরক্ষরতার অন্ধকারে ও অপুষ্টিজনিত ব্যাধির কবলে পর্যুদস্ত। এদিকে 'মাস মিডিয়া' বা গণমাধ্যমের দৌলতে লোভনীয় পণ্যের রকমারি ভোগ্যের রঙিন চিত্র তাদের চোখের সামনে ঝুলছে। পশ্চিমী ভাবনা গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা আমদানী করে এদেশের মানুষের মধ্যে এতদিনকার প্রচলিত মূল্যবোধগুলি তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে। ভারতবাসীর বিভিন্ন অংশে পরস্পরের মধ্যে ভোগাধিকারের তারতম্য বেড়েই চলেছে। পৃথিবীর আর্থ-সামাজিক মানদণ্ডে উন্নত দেশগুলি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিদ্যার ঝাণ্ডা উঁচিয়ে সাজগোজ করে তাদের দেশবাসীর পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, দুঃখ, অশান্তিকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। বিশ্বায়নের প্রাঙ্গণে সাম্যের বাণী জোর গলায় উচ্চারণ করলেও দুনিয়ার সু-উচ্চ মাত্রায় সম্পদ-ভোগকারী এসব 'উন্নত' দেশ বঞ্চিতদের মধ্যে সম্পদ বিতরণ করতে নারাজ। বঞ্চিতদের দাবিয়ে রাখার জন্য যুদ্ধ-ব্যবসার রমরমা চলেছে, অথচ স্থিরমস্তিষ্কের মানুষ বুঝতে পারছে যে, যুদ্ধসঙ্ঘর্ষের জন্য নির্ধারিত সম্পদ দিয়ে বঞ্চিত মানুষদের দুঃখকষ্ট দূর করা মানুষের সাধ্যাতীত নয়। সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করলে স্পষ্টতই

মনে হয়, মানবসমাজ যেন একটা হালভাঙা নৌকার মতো লক্ষ্যচ্যুত হয়ে ভেসে ভেসে চলেছে। অবস্থা বাস্তবিকই সঙ্কটজনক এই কারণে যে, অধিকাংশ মানুষ প্রকৃত পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন নয়। মাতৃভাবের মধ্যে সহজাত যে দরদ, পরহিতৈষণা, অদোষদর্শিতা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি বর্তমান, তার সাহায্যেই এই জটিল সমস্যার মোকাবিলা করা সম্ভব।

আরো কথা, ইদানীং কি উন্নত দেশ, কি উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশ—সর্বত্রই মানুষ সচেতন হয়ে উঠেছে পুরুষের নির্লজ্জ প্রাধান্য সম্বন্ধে। ১৯৭৭ থেকে প্রতি বছর ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারীদিবস উদযাপিত হচ্ছে। ঘোষিত উদ্দেশ্য-সকলের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি নারীকে তার স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ দিতে হবে—এ-ভাবনা। নারী-আন্দোলনের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই পুরুষের সঙ্গে নারীর টেক্কা দেওয়া প্রাধান্য পেয়েছে। ভারতবর্ষে পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা হ্রাস চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পাশাপাশি মাতৃভাব—যা অনেক সময়েই ভুল করে মনে করা হয় শুধুমাত্র নারীদের মধ্যেই সীমিত, তার শক্তি ও বিরাট সম্ভাবনা সত্ত্বেও প্রায় অনাদৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। মাতৃভাবের প্রধান মূল্যগুলি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলে এবং বৃহত্তর সমাজে তা সঞ্চারিত করে দিতে পারলে, তাহলে নারী-সমস্যার সহজ ও সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব।

এখন প্রশ্ন, মাতৃভাব কি শুধু মেয়েদের মধ্যেই প্রযোজ্য? এর উত্তর—মোটেও না। শ্রীশ্রীচণ্ডী বলছেন ঃ "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা"। সেখানে বলা হয়নি যে, জগন্মাতা শুধু নারীদের মধ্যেই রয়েছেন। কেউ কেউ এই ভাবনার প্রতিবাদ করেছেন, নানা জনে নানানভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন। স্বামী সারদানন্দকে একদিন তাঁর এক শিষ্য প্রশ্ন করেন শ্রীশ্রীচণ্ডীর এই বাক্যটি সম্বন্ধে। মহারাজ তখন কাশীতে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন ঃ "কেন, গীতাতে তো পরিষ্কার সুন্দরভাবে সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীভগবান বলছেন—

'অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।।' "

সেখানে দেখা যাচ্ছে যে, সেই ঈশ্বরই একমাত্র পুরুষ আর বাকি সবকিছু প্রকৃতি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বলা যায়, মাতৃভাব পুরুষ-নারী সবার মধ্যেই বর্তমান।

বলা বাহুল্য, এই মাতৃভাব একটা ভাব বা ধারণা। এই ভাবনা প্রত্যেকের মধ্যে নিহিত রয়েছে, একে বিকশিত করতে হবে। এ-ভাব বিকশিত করতে পারলে আমাদের ব্যক্তিজীবন কুসুমিত হয়ে উঠবে। ব্যক্তিজীবনের কর্কশতা দূর হবে। ব্যক্তিজীবনে এখানে-সেখানে যেসমস্ত খোঁচ রয়েছে, সেসব চলে যাবে। অপরের সঙ্গে সম্পর্ক মধুর হয়ে উঠবে। স্বাভাবিক গতিতে বৃহত্তর সমস্যাগুলির সমাধান সহজে হয়ে যাবে। এই ভাব বা আদর্শ অনুসরণ করার জন্য প্রয়োজন এক বা একাধিক আকর্ষণীয় চরিত্র—সে চরিত্র হচ্ছেন রামকৃষ্ণ-সারদা জুটি। তাঁদের মধ্যে, বিশেষত শ্রীসারদাদেবীর মধ্যে, পরিপূর্ণভাবে বিকশিত মাতৃভাবের গ্রহণ ও প্রচারের মধ্যেই রয়েছে আমাদের সকল সমস্যার সমাধান। [সমাপ্ত] ❑

অনুষ্ঠান-সূচী (জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৪০৮)

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

জন্মতিথি-কৃত্য

গুরুপূর্ণিমা (ব্যাসপূর্ণিমা)	আষাঢ় পূর্ণিমা	২০ আষাঢ়	বৃহস্পতিবার	৫ জুলাই	২০০১

পূজাতিথি-কৃত্য

শ্রীশ্রীফলহারিণী কালীপূজা	বৈশাখ অমাবস্যা	৮ জ্যৈষ্ঠ	মঙ্গলবার	২২ মে	২০০১
স্নানযাত্রা	জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা	২৩ জ্যৈষ্ঠ	বুধবার	৬ জুন	২০০১
রথযাত্রা	আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া	৮ আষাঢ়	শনিবার	২৩ জুন	২০০১

একাদশী-তিথি (রামনাম-সঙ্কীর্তন)

৫, ১৯ জ্যৈষ্ঠ	শনিবার,	শনিবার	১৯ মে,	২ জুন	২০০১
২, ১৬ আষাঢ়	রবিবার,	রবিবার	১৭ জুন,	১ জুলাই	২০০১

মহাত্মা রামকৃষ্ণ

[redacted]হন বনে কত সুগন্ধ পুষ্প ফুটিয়া থাকে তাহা লোকসমাজ কিরূপে জানিবে? তাহারা বনজ, বনের শোভাবর্ধন করিয়াই বিজনে বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিয়াই বনের ফুল বনে মিশাইয়া যায়। ফুল যাঁহার শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয়, ফুল তাঁহারই সহিত হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইয়া দেয়। মহাত্মা রামকৃষ্ণ ভগবৎ সাধন-কালের [কাননের] একটি সুগন্ধি পুষ্প। পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য, কীর্তি আদি যেসকল উপায় দ্বারা লোকসকলকে সাধারণত পৃথিবীতে বিখ্যাত ও পরিচিত করিয়া দেয়, রামকৃষ্ণ ছন্দাংশেও তাহার ছায়া স্পর্শ করেন নাই। ইনি বনের ফুল, বনে ফুটিয়াই বনদেবতার ক্রোড়ে ক্রীড়া করিতেছেন। সৌভাগ্যবান পুরুষেরাই তাঁহার সঙ্গ-সৌগন্ধ লাভে আনন্দিত হইয়া আসিতেন। তিনি সঙ্গীতবিদ্যায় তানসান কলাবৎ না হইলেও বর্ধমানের রাজপুরবাসিগণ তাঁহাকে একজন ভক্ত গায়ক বলিয়া জানিত। পণ্ডিতদিগকে মহারাজা সৎকার করিতেন বলিয়া দূরাদ্দূরতর দেশ হইতেও রাজবাটীতে সময় সময় অনেক পণ্ডিতের সমাগম হইত। ঘটনাক্রমে একজন পশ্চিমোত্তর দেশবাসী বহুল শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত [তোতাপুরী?] তথায় আসিয়াছিলেন; তিনি লোকের মুখেই রামকৃষ্ণের বিবরণ বিদিত হইয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে বিচক্ষণ পণ্ডিত ভক্তিরসের প্রায় ধার ধারেন না; সুতরাং ভক্তের ভাব, চেষ্টা ও চরিত্র সহজে বুঝিতেও অক্ষম। পণ্ডিতজী একদিন বাসায় নিদ্রিত আছেন, রামকৃষ্ণ সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া আপনার ভাবে আপনার তালে করতালি দিয়া আনন্দময়ীর গুণকীর্তন করিতে লাগিলেন। করতালির পটপট শব্দে পণ্ডিতের নিদ্রাভঙ্গ হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পণ্ডিতের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিল না। তিনি বিরক্ত হইয়া



বারাণসী থেকে প্রকাশিত 'ধর্মপ্রচারক' মাসিক পত্রিকার প্রচ্ছদ। পত্রিকাটি প্রত্যেক বাঙলা মাসের পূর্ণিমায় প্রকাশিত হতো। 'উদ্বোধন'-এ পুনর্মুদ্রিত রচনাদুটির বানান আধুনিক করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম রচনাটিতে অবশ্য কিছু তথ্যভ্রান্তি ও তথ্যবিচ্যুতি আছে।

থাকেন। এই মহাত্মা জেলা বর্ধমানের অন্তর্গত একটি পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃক্রম উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনের গতি ও উন্নতির বেগ সাধারণ লোকের পশ্চাতে পশ্চাতে যায় নাই। লোকে যেসময়ে ভবিষ্যজ্জীবনের সাংসারিক উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ে যত্নপূর্বক অধ্যয়ন করিতে থাকে, সেসময়ে রামকৃষ্ণ আনন্দময়ীর আনন্দলাভের জন্য আপনার মনে আপনি ভাবিতেন, আপনি গান করিতেন, আপনি নাচিতেন, আপনার ভাবে আপনি মাতিয়া আপনি বিগলিত হইতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি স্বেচ্ছাক্রমে বর্ধমান রাজবাটীতে [?] রামকৃষ্ণকে তিরস্কারপূর্বক বলিলেন: "তুম্ ক্যা পটপট আওয়াজ করতে হো? য়হ ক্যা ভক্তিকা লক্ষণ হ্যায়? য়হ তো রোটী বনানে কী খেল হ্যায়।" রামকৃষ্ণ চিরজীবনের জন্য যে খোরাক প্রস্তুত করিতেছিলেন, তাহা কঠোরহৃদয় তার্কিক কোথা হইতে বুঝিবেন? রামকৃষ্ণ কিছুই না বলিয়া আপনার আনন্দে তথা হইতে হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন। ক্রমে সাধকের মন আনন্দময়ীর রত্নবেদিকাদর্শনে অধিকতর অগ্রসর হইতে লাগিল। ভক্তিমতী রানী রাসমণি জাহ্নবী-তটে কলকাতার সমীপবর্তী দক্ষিণেশ্বরে কালিকা-মূর্তি স্থাপন করিলে ঘটনাক্রমে মহাত্মা রামকৃষ্ণ তাঁহার

পূজা-পরিচর্যায় নিযুক্ত হইলেন; ভগবতী স্বয়ং যেন তাঁহাকে নিজ নিকটে ডাকিয়া লইলেন। রামকৃষ্ণ ভক্তি-সহ এই অপূর্ব চিন্ময়ী মূর্তির পূজা করিতে লাগিলেন। সাধক কেবল চন্দন, জবা, গঙ্গাজল, নৈবেদ্য দিয়াই মায়ের পূজা করিতেন না, [উপরন্তু?] মন খুলিয়া প্রত্যেক জলবিন্দুর সহিত, প্রত্যেক পুষ্পের সহিত, বিল্বদলের সহিত অকপট ভক্তি মাখাইয়া চরণে দান করিতেন। রাঙ্গা চরণে রাঙ্গা জবার শোভা হইত। ভক্তবৎসলা ভক্তের মনোমন্দিরে নিজের স্থান করিলেন, লীলাময়ী সাধুর পবিত্র হৃদয়ে নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহামায়ার চরণস্পর্শে ভক্তের হৃদয় আর কি স্থির থাকিতে পারে! আর কি সাধক বাহ্য জগতের বাহ্য ব্যাপার লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন! রিপুমদ-মর্দিনী রণরঙ্গিনী রুদ্রাণীর নৃত্যতরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণের প্রাণমন নাচিয়া উঠিল। রামকৃষ্ণ সত্বরই দক্ষিণেশ্বরের নিকটবর্তী পঞ্চবটীতে বসিয়া নির্জনে ভাবময়ীর উপাসনা করিতে লাগিলেন। অধ্যবসায় ও একত্রতার [একাগ্রতার] সহিত ভক্ত নিজ মহামন্ত্র সাধনে শরীর, মন, প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। বাধা, বিঘ্ন, ক্লেশ, বিপত্তি আদি সকলে একে একে সাধকের সহিত ঘোর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল; ভক্তকে অস্ত্রধারণ করিতে হইল না, কিন্তু মহাকালীর কালনিবারণী তরবারি দর্শনে ভীত হইয়া সকলেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। সাধক নিজ পদ্মাসনে বসিয়া নিজ হৃদ্‌পদ্মাসনে জগজ্জননীকে বসাইয়া মনে-প্রাণে ঐক্য করিয়া ভাবসমুদ্রে ভাসিতে লাগিলেন। সংসারের কোন বাধাই ভক্তকে বিচলিত করিতে পারিল না। মহামায়ার ভক্তিসোপানের স্বাভাবিক লক্ষণ আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সাধক রামকৃষ্ণ পাগলের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। বাহিরে পাগল হইলেন সত্য, জগতের চক্ষে তাঁহার কার্য বিশৃঙ্খল হইল সত্য, তিনি বিষ্ঠা-মূত্র মাখিয়া উলঙ্গ হইয়া নাচিতে লাগিলেন সত্য, কখন হাস্য, কখন রোদন, কখন স্তম্ভন, কখন উলম্ফন আদি পাগলের চিহ্ন প্রকাশিত হইতে লাগিল সত্য, কিন্তু মহাত্মার হৃদয় হইতে যোগমায়া তিলার্ধও অন্তরালে লুকাইতে পারিলেন না। ভক্ত বাহিরে পাগল হইলেন, অন্তরে অটল অচল হইয়া মহামায়ার মহানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বহুদিন পর্যন্ত তাঁহাকে লোকে পাগল বলিয়া জানিল, বহুদিন ধরিয়া তাঁহার এই রোগের বাহ্য চিকিৎসা ও শুশ্রূষা হইল, শৃঙ্খল দ্বারা তাঁহার বাহ্য শরীর আবদ্ধ রহিল; সাধনার গুণে মহাত্মার সকল বন্ধন একে একে কাটিয়া গেল। মূঢ়জগৎ তাঁহাকে আবার বন্ধন করিল। সাধকের মন আর কি কোন বন্ধন মানে? আর কি কোন হেতু দ্বারা তাঁহার মন বিচলিত হয়? যাঁহার বাবা (শ্মশান-বাসী শিব) পাগল, মা (কালী) যাঁহার পাগলিনী—তিনি পাগল না হইয়া কিরূপে থাকিবেন? যেখানে পাগলের মেলা, পাগলের হাটবাজার, পাগলের বাণিজ্য, সেখানে যেকোন গ্রাহক যাউক না কেন, সে পাগল হইয়া যায়। মহাত্মা রামকৃষ্ণ সেই বাজারের পাগল। তাঁহার পাগলামিতে অন্য জগতের ছায়া দৃষ্ট হইতে লাগিল; ক্রমে রসের পরিপাকের ন্যায় মহাত্মার ভাব ঘনীভূত ও স্তম্ভিত হইয়া আসিল। তিনি মা বলিয়া জগন্মাতাকে ডাকিতে গিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। ভক্তির ভিখারী হইয়া সাধনায় নিমগ্ন হইলেন। এক এক দিন তিনি প্রাণের পিপাসা সহ্য করিতে না পারিয়া ভক্তির জন্য মায়ের নিকট কাঁদিতেন ও সাশ্রুলোচনে জাহ্নবী তটের বালুকারাশিতে আপনার মুখ ঘর্ষণ করিতেন আর বলিতেন ঃ "মা! আমাকে ভক্তি দেও? আমি ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই চাহি না।" কখন কখন তিনি ভক্তির জন্য প্রস্তরে মাথা কুটিতেন। ভক্ত! তুমি ধন্য! ভক্তির প্রকৃত মাহাত্ম্য তুমিই বুঝিয়াছ। তোমার নিকট ইন্দ্রত্ব, ব্রহ্মত্ব আদি ঐশ্বর্য তুচ্ছ হইতেও তুচ্ছ। জগৎ এ-ভক্তির মূল্য বোঝে না, জগতের চক্ষু এ-ভক্তির সৌন্দর্য দেখিতে জানে না। ভক্তির মাধুরী, ভক্ত! তুমিই যথার্থ অনুভব করিয়াছ, তাই তোমার নিকটে গেলে লোকের মনে ভক্তির উদয় হয়, তোমার নিকটে বসিলে পাষণ্ডের হৃদয়েও ভক্তির উচ্ছ্বাস বহিতে থাকে।

মহাত্মা রামকৃষ্ণ এক্ষণে 'রামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে এপ্রদেশে প্রসিদ্ধ। পাঠক! ইনি গৈরিক কৌপীনধারী নহেন, ইঁহার মস্তক মুণ্ডিত নহে, তথাচ ইঁহাকে কেন লোকে পরমহংস বলে বুঝিয়াছেন? ইনি পরিচ্ছদে পরমহংস নহেন, কিন্তু কার্যে পরমহংস। আশ্চর্য ইঁহার ভাব, আশ্চর্য ইঁহার প্রকৃতি; যদি কেহ তাঁহার নিকটে ভগবানের গুণগান করেন, তাহা হইলে দেখিতে দেখিতে তাঁহার সংজ্ঞার বিলোপ হইয়া যায়। শরীর নিস্পন্দ, শ্বাস বন্ধ, ধমনীতে রক্ত-চলাচল শক্তিরুদ্ধ হইয়া যায়। আবার তাঁহার কর্ণে ঘন ঘন প্রণবধ্বনি শুনাইলে পুনশ্চেতনা লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার কথাগুলি এত সরল, এত মধুর ও এত হৃদয়গ্রাহী যে, তৎশ্রবণে পাষাণহৃদয়েও ভক্তির বেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। তিনি সাধনা দ্বারা কামিনী ও কাঞ্চনকে বস্তুতই "কায়েন মনসা বাচা" পরিত্যাগ করিয়াছেন, এতদ্দ্বয় তাঁহার শরীরের সহিত সংস্পৃষ্ট হইলে তাঁহার হস্তপদাদি বাঁকিয়া যায়, শরীর সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে। এমনকি যদি কোন বেশ্যাগামী অপরিচিত পুরুষ তাঁহাকে দৈবাৎ স্পর্শ করে, তবে তাঁহার শরীরের মধ্যে একটি আশ্চর্য সংবেগ উদয় হয় এবং ইহা দ্বারা তাহার দূষিত প্রকৃতি অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন। একটু প্রণিধান করিলেই তিনি অনায়াসে লোকের মনোভাব বুঝিতে পারেন। তাঁহার প্রকৃতি এত উদার ও সরল যে, তাঁহাকে কেহই কখন শত্রু বলিয়া ভাবিতে অবকাশ পায় না। বস্তুত, তিনি অজাত-শত্রু; তাঁহার নিকটে কিয়ৎক্ষণ বসিলে কথায় কথায় এত উচ্চ ও হৃদয়ভেদী উপদেশ পাওয়া যায় যে, বহুদিন

শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও তত্ত্বাবৎ সহজে লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার জীবন একখানি জীবন্ত গ্রন্থ বিশেষ, কল্যাণপ্রার্থী মাত্রেরই অধ্যয়নের উপযোগী।

তাঁহার বিষয় অনেক বলিবার আছে। অদ্য স্থানাভাবে তাহা আর প্রকটিত করিতে পারিলাম না। সময়ে সময়ে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।* ❑

* 'ধর্মপ্রচারক', ৭ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৮০৬ শকাব্দ, শ্রাবণ পূর্ণিমা (৬ আগস্ট ১৮৮৪, ২৩ শ্রাবণ ১২৯১), পৃঃ ৫৮-৬০। পত্রিকাটি বারাণসীর মিসির পোখরা-স্থিত ধর্মপ্রচারক কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হতো। উপস্থাপিত রচনাটি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনকালে প্রকাশিত।

পরমহংস রামকৃষ্ণের উক্তি

সমুদ্রের জল পান না করিয়া তন্মধ্যে লবণের অস্তিত্ব যেমন বলিতে পারা যায়, এই ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া ব্রহ্মাণ্ডপতির অস্তিত্বও সেইরূপ নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে।

অপরকে বধ করিতে হইলে বিবিধ অস্ত্রের আবশ্যক হয়, কিন্তু আত্মহত্যা সামান্য একখানি নরুনের দ্বারা সাধিত হইতে পারে। লোকশিক্ষা দিতে হইলে অনেক শাস্ত্র পাঠ আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু আপনার ধর্মলাভ সামান্য জ্ঞান দ্বারা হইতে পারে।

অল্প জলবিশিষ্ট সরোবরের উপরিভাগে আস্তে আস্তে জল পান করিও, কেননা তাহা পরিষ্কার; কিন্তু আলোড়িত করিও না, তাহা হইলে ভিতর হইতে ময়লা নির্গত হইয়া জল ঘোলা করিয়া ফেলিবে। হে অল্পজ্ঞান-বিশিষ্ট মানব! পবিত্রতা লাভ করিতে যদি চাও, তবে তুমি বিশ্বাসের সহিত সাধনায় প্রবৃত্ত থাক, শাস্ত্রীয় বিচারে কভু নিযুক্ত হইও না।

যেমন সমুদ্রগর্ভে লুক্কায়িত চুম্বকপ্রস্তর অকস্মাৎ জাহাজের সমুদায় লৌহনির্মিত পেরেক প্রভৃতি টানিয়া লইয়া জাহাজখানিকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ডুবাইয়া দেয়, সেইরূপ জ্ঞানচৈতন্যের উদয় হইলে অহঙ্কার, স্বার্থপরতা-পূর্ণ জীবনতরী মুহূর্তের মধ্যে খণ্ড বিখণ্ড হইয়া ঈশ্বরের প্রেমসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়।

যেমন সামান্য বালককে সুরাপানের সুখ বুঝানো অসম্ভব, সেইরূপ বিষয়াসক্ত, মায়ামুগ্ধ সংসারী মানবকে ধর্মের স্বর্গীয় সুখ বুঝানো অসম্ভব হইয়া পড়ে।

ময়লা আয়নাতে সূর্যালোক প্রতিফলিত হয় না, কিন্তু স্বচ্ছতে হয়। মায়ামুগ্ধ ময়লা অপবিত্র হৃদয় ঈশ্বরের আভা দেখিতে পায় না, কিন্তু বিশুদ্ধ আত্মা পায়; অতএব বিশুদ্ধ হইবার চেষ্টা কর।

মেঘেতে যেমন সূর্যকে আবরণ করিয়া রাখে, মায়াতে সেইরূপ ঈশ্বরকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। মেঘ চলিয়া গেলে যেমন সূর্যকে দেখা যায়, মায়া দুর হইলে সেইরূপ ঈশ্বরকে দেখা যায়।

মায়াকে চিনিতে পারিলে সে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করে। যেমন কোন গ্রামে এক গুরু শিষ্য-বাড়ি যাইতেছিলেন। সঙ্গে ভৃত্য নাই। পথিমধ্যে এক মুচিকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন ঃ 'ওরে আমার সঙ্গে যাবি? উত্তমরূপে আহার করতে পাবি এবং অতি আদরে থাকবি, চল না।' মুচি বলিল ঃ 'ঠাকুর মহাশয়, আমি অতি নীচ জাতি, আমি কিরূপে আপনকার দাস হইয়া যাইব?' গুরু বলিলেন ঃ 'তাহাতে তোর কোন চিন্তা নাই, তুই কাহাকেও আপনার পরিচয় দিস না এবং কাহারো সঙ্গে আলাপ করিস না।' মুচি সম্মত হইল। অপরাহ্নে শিষ্য-বাড়িতে গুরু সন্ধ্যা করিতেছেন, এমন সময় অপর একটি ব্রাহ্মণ আসিয়া সেই ভৃত্যকে বলিতেছে ঃ 'অমুক স্থল হইতে আমার জুতা জোড়াটা আনিয়া দাও।' ভৃত্য কথা কহিল না। ব্রাহ্মণ আবার বলিল, ভৃত্য তথাপি নীরব। ব্রাহ্মণ তিন-চারিবার বলিল, ভৃত্য তথাপি নড়িল না। অবশেষে ব্রাহ্মণ বিরক্ত হইয়া বলিল ঃ 'আরে ব্যাটা, ব্রাহ্মণের কথা শুনিস না, তুই কি জাত, তুই মুচি নাকি?' ভৃত্য ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে সেই গুরুর দিকে তাকাইয়া বলিল ঃ 'ঠাকুর মহাশয় গো, ঠাকুর মহাশয় গো, আমায় চিনেছে। আমি পালাই।' এবং সে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল।

বিবেক ও বৈরাগ্য ব্যতীত শাস্ত্রপাঠ বৃথা। বিবেক ও বৈরাগ্য ব্যতীত ধর্মলাভ অসম্ভব।

হস্তিকে ছাড়িয়া দিলে চতুর্দিকের বৃক্ষসকলকে ভাঙ্গিতে যায় এবং তাহার মস্তকে ডাঙ্গস মারিলে সে নিরস্ত হয়। মনকে ছাড়িয়া দিলে সে নানা প্রকার চিন্তায় প্রবৃত্ত হয় এবং বিবেক-রূপ ডাঙ্গস না মারিলে সে নিরস্ত হইবে না।

ধ্যান করিবে কোণে, বনে আর মনে।

উপাসনা ততক্ষণ আবশ্যক, যতক্ষণ না নামে অশ্রুপাত হয়। হরিনাম শুনিলেই যাহার চক্ষে আপনা-আপনি জল আসে তাঁহার আর উপাসনা করিবার আবশ্যক হয় না।

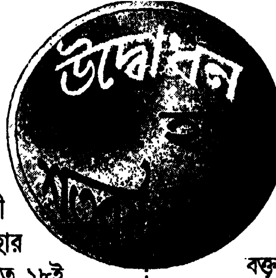
সকল জল নারায়ণ বটে, কিন্তু সকল জল পান করিবার যোগ্য নহে। সকল স্থলে ঈশ্বর বর্তমান বটে, কিন্তু সকল স্থলে যাওয়া উচিত নয়।

যেসকল লোক উপাসনা করিলে উপহাস করে, ধর্ম ও ধার্মিকের কুৎসা করে, সাধনার অবস্থায় সর্বতোভাবে তাহাদের নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিবে।* ❑

* 'ধর্মপ্রচারক', ১১শ ভাগ, ১০ম সংখ্যা, ১৮১০ শকাব্দ, মাঘী পূর্ণিমা (১৭ জানুয়ারি ১৮৮৯, ৫ মাঘ ১২৯৫), পৃঃ ১১৮-১১৯

সংগ্রহ ঃ সন্তোষকুমার দত্ত

বৈশাখ ১৩০৮/এপ্রিল ১৯০১



স্বামী বিবেকানন্দ

(ঢাকা)

উদ্বোধনের পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার কয়েকজন সন্ন্যাসী শিষ্য সমভিব্যাহারে বিগত ১৮ই মার্চ [১৯০১] ঢাকা যাত্রা করিয়া তৎপরদিন তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। নারায়ণগঞ্জে গোয়ালন্দের স্টীমার পৌঁছিবামাত্র ঢাকানিবাসী কতকগুলি ভদ্রলোক আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ঢাকায় অপরাহ্ণে ট্রেন পৌঁছিবামাত্র স্থানীয় বিখ্যাত উকিল বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ ও গগনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়দ্বয় সমগ্র ঢাকাবাসীর নামে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করিয়া ভূতপূর্ব জমিদার ৺মোহিনীমোহন দাস মহাশয়ের বাটীতে লইয়া গেলেন। স্টেশনে অনেক ভদ্রলোক ও ছাত্রাদি আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে আনন্দে 'জয় রামকৃষ্ণদেবকী জয়' ধ্বনিতে গগন পরিপূরিত করিতে লাগিলেন। ছাত্রগণ স্বামীজীর গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইয়া যাইতে লাগিলেন। মোহিনীবাবুর বাটীতে অনেক ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বামীজীর সন্দর্শনে আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করিতে লাগিলেন।

স্বামীজীর নিকট সদা সর্বদাই ভদ্রলোকগণ তাঁহার উপদেশামৃত পান করিতে আসিতে লাগিলেন। অপরাহ্ণে তিনদিন প্রায় দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া জ্ঞান, ভক্তি, বিশ্বাস, ত্যাগ, বিবেক, বৈরাগ্য, কর্ম প্রভৃতি নানাবিধ আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা হয়। প্রায় শতাবধি লোকের সমাগম হইত। সকলেই তাঁহার বিশ্বাসভক্তি ও তেজঃপূর্ণ উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছিলেন। গত বুধাষ্টমী উপলক্ষ্যে ব্রহ্মপুত্রস্নানের মানসে স্বামীজী সশিষ্য নৌকাযোগে লাঙ্গলবাঁধ নামক স্থানে যাত্রা করেন। নারায়ণগঞ্জের নিকট শীতলাক্ষ নদীর দৃশ্য বড় মনোহর। তথা হইতে ধলেশ্বরীতে পড়িয়া পরে ব্রহ্মপুত্রে প্রবেশ করিতে হয়। এই স্থানে ব্রহ্মপুত্র খুব সরু। শুনা যায় নাকি ভগবান পরশুরাম এই তীর্থে স্নান করিয়া মাতৃহত্যা পাপ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। তাই দলে দলে এখানে আবালবৃদ্ধবনিতা পাপক্ষয়ের জন্য আগমন করিয়া থাকে। এই মেলায় খুব জনতা হইয়াছিল। যাত্রিগণের নৌকা হইতে অবিরাম আনন্দসূচক হুলুধ্বনি উত্থিত হইতেছে—কোথাও হরিনামের মধুর ধ্বনি কর্ণকুহর পবিত্র করিতেছে। স্নানান্তে স্বামীজী ব্রহ্মপুত্র হইতে ধলেশ্বরী—তথা হইতে বুড়িগঙ্গায় প্রবেশ করিয়া ঢাকানগরে পুনঃ প্রবেশ করিলেন।

ঢাকাবাসিগণের অত্যন্ত অনুরোধে স্বামীজী গতকল্য [৩০ মার্চ ১৯০১] এখানকার জগন্নাথ কলেজ গৃহে প্রায় দুই সহস্র শ্রোতার সমক্ষে 'আমি কি শিখিয়াছি?' এই সম্বন্ধে ইংরাজি ভাষায় প্রায় এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা প্রদান করেন। এখানকার বিখ্যাত উকিল রমাকান্ত নন্দী মহাশয় সভাপতি হইয়াছিলেন।

বক্তৃতার সারমর্ম এই—আমি নানা দেশ বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু আমি কখন নিজের জন্মভূমি বাংলাদেশের সবিশেষ দর্শন করি নাই। জানিতাম না, এদেশের জলে স্থলে সর্বত্র এত সৌন্দর্য। কিন্তু নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া আমার এই লাভ হইয়াছে যে, আমি ইহার সৌন্দর্য বিশেষরূপে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। এইরূপই, আমি প্রথমে ধর্মের জন্য নানা সম্প্রদায়—বৈদেশিক ভাববহুল বহুবিধ সম্প্রদায়ে ভ্রমণ করিতেছিলাম, অপরের দ্বারে ভিক্ষা করিতেছিলাম—জানিতাম না যে, আমার দেশের ধর্মে, আমার জাতীয় ধর্মে এত সৌন্দর্য আছে। আজকাল একদল আছেন, তাঁহারা ধর্মের ভিতর বৈদেশিক ভাব চালাইবার বিশেষ পক্ষপাতী—ইঁহারা 'পৌত্তলিকতা' বলিয়া একটি কথা রচনা করিয়াছেন, ইঁহারা বলেন, হিন্দুধর্ম সত্য নয়, কারণ উহা পৌত্তলিক। পৌত্তলিকতা কি, উহা ভাল কি মন্দ, তাহা কেহ অনুসন্ধান করেন না, কেবল ঐ শব্দেরই প্রভাবে তাঁহারা হিন্দুধর্মকে ভুল বলিতে সাহস করেন। আর এক দল আছেন, তাঁহারা হাঁচি টিকটিকির পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বাহির করেন। তাঁহারা কোন্ দিন ভগবানকেই তড়িতের পরিণামবিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিবেন! যাহা হউক, মা ইঁহাদিগকেও আশীর্বাদ করুন। তিনিই ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির দ্বারা আপন কার্য সাধন করিয়া লইতেছেন। ইঁহাদের অতিরিক্ত দল—প্রাচীন সম্প্রদায়—যাঁহারা বলেন—আমি তোমার অত শত বুঝি না—বুঝিতে চাহিও না, আমি চাই ঈশ্বরকে, আমি চাই আত্মাকে, চাই জগৎকে ছাড়িয়া সুখ দুঃখকে ছাড়িয়া ইহার অতীত প্রদেশে যাইতে—যাঁহারা বলেন বিশ্বাস সহকারে গঙ্গাস্নানে মুক্তি হয়—যাঁহারা বলেন, শিব রাম প্রভৃতি যাঁহার প্রতিই হউক না কেন, ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া উপাসনা করিলে মুক্তি হইয়া থাকে। আমি এই প্রাচীন সম্প্রদায়ভুক্ত। আজকালকার এক সম্প্রদায় বলেন, ঈশ্বর ও সংসার একসঙ্গে কর। ইঁহাদের মনমুখ এক নহে। "যাঁহা রাম তাঁহা কাম নহি, যাঁহা কাম তাঁহা নহি রাম,/ রব রজনী কভি দোনো নহি এক ঠাম।" যেখানে ভগবান সেখানে কখন সংসার থাকিতে পারে না। অন্ধকার ও আলোক কি কখন একসঙ্গে থাকিতে পারে?... ❑

পাতঞ্জল-যোগসূত্র

ব্যাখ্যাতা ঃ স্বামী প্রেমেশানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

গত চৈত্র ১৪০৭ সংখ্যা থেকে আমরা স্বামী প্রেমেশানন্দের 'পাতঞ্জল-যোগসূত্র'-এর ব্যাখ্যা 'উদ্বোধন'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করতে শুরু করেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কঠ উপনিষদ্ (২।৩।১১, ১৮), বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ (২।৪।৫), শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ (২।৮), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (৬ষ্ঠ অধ্যায়) ও ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য প্রণীত ব্রহ্মসূত্রভাষ্য (২।১।৩) প্রভৃতি হিন্দুধর্মের প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থে ব্রহ্ম, আত্মা, আত্মা-ব্রহ্ম ঐক্যানুভূতি প্রভৃতি বেদান্তপ্রসিদ্ধ চরমতত্ত্বকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হয়েছে এবং ঐসব তত্ত্বের আলোকেই স্বামী প্রেমেশানন্দ মহর্ষি পতঞ্জলি কথিত আসন-ধ্যান-ধারণাদি প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছেন। সাংখ্য-পাতঞ্জল দর্শনের বহু-পুরুষবাদ বেদান্তে স্বীকৃত হয়নি। অনুসন্ধিৎসু পাঠক লক্ষ্য করবেন, প্রেমেশানন্দজীর মর্মার্থ-ব্যাখ্যান বৈদান্তিক চিন্তাধারারই অনুবর্তন করেছে।

পাঠকের সুবিধার জন্য স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ'-এর অন্তর্গত সূত্রানুবাদের অনুসরণে স্বামী শরণ্যানন্দ সূত্রগুলির সরল বঙ্গানুবাদ সংযুক্ত করেছেন এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সমগ্র রচনাটি সাধারণভাবে সম্পাদনা করেছেন। প্রেমেশানন্দজী তাঁর আলোচনা সাধুভাষাতেই করেছেন। আমরা তাঁর ভাষা অপরিবর্তিত রেখেছি। প্রেমেশানন্দজীর অনুসরণে সূত্রগুলির বঙ্গানুবাদও সাধুভাষাতেই করা হয়েছে।—সম্পাদক, **'উদ্বোধন'**

।।৫।।

হিন্দুদের নিয়ম ছিল, প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা জ্যোতির্ময় সূর্যকে ধ্যান করিবে। ৭-৮ বৎসর হইতেই তাহা শিখানো হইত; এখন অবশ্য ব্রাহ্মণদের মধ্যে ক্বচিৎ কেহ প্রত্যহ গায়িত্রী জপ করিয়া থাকেন, সেই জাপকদের মধ্যে ক্বচিৎ কেহ এক-আধটু ধ্যানও করিয়া থাকেন। ধ্যানকেই হিন্দুরা অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভের প্রধান উপায় বলিয়া জানিতেন। মনঃসংযোগ অভ্যাস না থাকিলে সংসারের সামান্য কাজই সুসম্পন্ন হয় না; বড় বড় সকল কাজেই বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন দেখা যায়।

ধ্যানযোগের অভ্যাস উঠিয়া যাওয়ার পর ঈশ্বরের নামজপ প্রবর্তন করা হইয়াছিল; তাহাও ধ্যানেরই একটি নিম্নস্তর। জপেও সিদ্ধিলাভ করা যায়। ("স্বাধ্যায়াদিষ্ট-দেবতাসম্প্রয়োগঃ।"—যোগসূত্র, ২।৪৪)

কিছুদিন পূর্বে আধুনিক তথাকথিত শিক্ষিতগণ কোন কাজ করিবার পূর্বে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার রীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। হয়তো তাঁহাদের অজ্ঞাত-সারেই তাহা যোগেরই ঈষৎ আভাস।

যোগাভ্যাস তিরোহিত হওয়ায় হিন্দুজাতির সবদিকে অবনতি হইয়াছে। **যে-ব্যক্তি দিনে অন্তত তিনবার মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া জগতের ঊর্ধ্বে তুলিয়া রাখিতে পারে, তাহার জীবনে আত্মার অনন্ত মহিমার একটু না একটু প্রকাশ হওয়াই স্বাভাবিক।** আমার পিছনে যে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে তাহার সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞানবিশ্বাস না থাকিলে মানবজীবনের ঊর্ধ্বগতি হইবার তো কোন উপায় নাই।

জগতের সব রহস্য, ব্রহ্মের সব তত্ত্ব জানিলেও মানুষ তো দেহমনের 'খোঁয়াড়' হইতে মুক্তি পাইবে না। তাই তো হিন্দুরা শিশুকাল হইতে ঊর্ধ্বে উঠিবার একমাত্র পথ—ধ্যান বা নিদিধ্যাসন শিক্ষা দিতেন।

।।৬।।

নিষ্কামভাবে কর্ম করিতে করিতে সংসারে বিরক্তি হইলে, জ্ঞানবিচার করিতে করিতে সর্বপ্রকার উপাধিবর্জিত আমিই সত্য—জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতৃত্বরূপ মিথ্যা জানিলাম, ব্রহ্মের অনন্ত সৌন্দর্য মাধুর্যের আকর্ষণে মুগ্ধ হইলাম; কিন্তু দেহমনের দাসত্ব ঘুচাইতে না পারার পূর্ণশান্তি তো পাইলাম না। তখন মহর্ষি পতঞ্জলি আসিয়া একটি অত্যাশ্চর্য সরল সোজা রাস্তা দেখাইয়া দিলেন—যে-রাস্তা ধরিয়া চলিতে চলিতে পূর্ণ শান্তিলাভ নিশ্চিত। তিনি বলিলেন, শরীর-মনকে যম-নিয়মের দ্বারা ধুইয়া মুছিয়া নির্মল কর; তাহার পর বাহিরের সকল কর্ম বন্ধ করিয়া আসন করিয়া বস। উপবিষ্ট থাকিয়া প্রাণশক্তির সাহায্যে মনকে নিষ্ক্রিয় কর। অতঃপর বুদ্ধির মধ্যে যে সত্ত্বগুণের প্রকাশ আছে, তাহা 'বোধ' করিয়া বসিয়া থাক। এইরূপ থাকিতে থাকিতে সৃষ্টির সমস্ত রহস্য তোমার নিকট প্রকাশিত হইবে। সৃষ্টির সৌন্দর্য মাধুর্য এবং ঐশ্বর্য সম্বন্ধে যখন সম্পূর্ণ উদাসীন হইবে, তখন সৃষ্টির অতীত গুণাতীত 'চিৎ' বস্তুকে অনুভব করিয়া তুমি পূর্ণত্বলাভ করিতে পারিবে।

ইহাই অধ্যাত্মবিদ্যা লাভের শেষ ধাপ। দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া বসিয়া গেলে শান্তিলাভ সুনিশ্চিত; বুদ্ধদেবের জীবন ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

।।৭।।

উপসংহার

ধ্যানযোগের বিঘ্ন বিষয়ে বুদ্ধ, যীশু প্রমুখ মহাপুরুষদের জীবনে বহু ঘটনার উল্লেখ আছে। যেমন সংসারে দেখা যায়—যে যত শিক্ষিত হয়, ভাল ভাল ভোগ সম্বন্ধে সে তত সচেতন হয়। একটি খাটিয়া-খাওয়া মানুষ পরম তৃপ্তির সহিত ডালভাত খায়, কিন্তু শিক্ষিত ভদ্রলোকদের বহু উপকরণ না হইলে তৃপ্তি হয় না। অধ্যাত্ম-সাধনায়ও মানুষের রুচি বাড়িয়া থাকে এবং রুচি অনুযায়ী অনুভবও আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইসব সাধকদের মধ্যে যাঁহারা নিষ্কামকর্ম করিয়া দেখিয়াছেন যে, কর্ম কখনো শেষ হয় না; উপাসনা করিয়া দেখিয়াছেন, ভগবানের উপর তীব্র ভালবাসা না থাকিলে মনকে জগৎ হইতে ঊর্ধ্বপথে চালাইতে সবসময় ইচ্ছা প্রবল থাকে না; জ্ঞানবিচার করিয়া দেখিয়াছেন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুর তত্ত্ব জানিতে পারিলেও প্রাণে শান্তি আসে না; ধ্যানযোগ অভ্যাস করিয়া দেখিয়াছেন, আন্তরিকতা না থাকিলে একাগ্রতা আসে না;

তাঁহারা সাধনপথের কোন বিঘ্নতেই বিচলিত হন না এবং পরমানন্দে উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে করিতে পূর্ণশান্তি লাভ করিয়া থাকেন।

মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত 'যোগসূত্র'-এ আমরা অন্তরায়ের কথাও পাইব, পাইব সেগুলিকে অতিক্রম করিবার পথ-নির্দেশও। যোগশাস্ত্রের মূল কথাগুলি বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। কিছুকাল একটু অভ্যাস করিলেই কথাগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠে। কিন্তু সূত্রে যেসব সূক্ষ্ম বিষয়ের পর্যবেক্ষণ এবং বিচার আছে; অনেকদিন চিন্তা না করিলে তা বোঝা যায় না। আমাদের মতো সাধারণ লোকের পক্ষে ঐসব সূক্ষ্ম আলোচনা চিত্তাকর্ষক হয় না। বিশেষত প্রাচীন ধরনে রচিত সূত্রগুলি বুঝিতে প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে কষ্টকর হয়।

সূত্রগুলির অনেক টীকা-টিপ্পনী আছে, কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহার মর্ম বুঝিতে কষ্ট হয়। স্বামী বিবেকানন্দের অত্যন্ত প্রাঞ্জল ব্যাখ্যাগুলি আমাদের নিকট অতি বিস্তৃত ও হৃদয়গ্রাহী বলিয়া মনে হয়।

প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে সব বিষয়ের একটু সারমর্ম আগে জানিলে সুবিধা হয়। কাব্য ও সাহিত্য-বিষয়ক selection (সঙ্কলন) যেমন প্রথম শিক্ষার্থীর রুচি উৎপাদনে সাহায্য করে, এই টিপ্পনীগুলি ও মর্মার্থবোধক-ব্যাখ্যান সেই উদ্দেশ্যেই রচিত হইয়াছে।

এই টিপ্পনীতে জটিল সূত্রগুলির কেবল সারমর্মটুকুরই উল্লেখ করা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে নানা কারণে একটু নতুন রকমের ব্যাখ্যাও করা হইয়াছে। এই সমগ্র লেখাটির সর্বত্র কেবল প্রথম শিক্ষার্থীর মন যাহাতে যোগের মূল বিষয়টিতে আকৃষ্ট হয় তাহারই চেষ্টা করা হইয়াছে।

সমাধিপাদ

অথ যোগানুশাসনম্। ।।১।।

এখন যোগের বিষয় আলোচনা করা হইতেছে।

মন্তব্য : যাঁহারা সুশিক্ষিত অর্থাৎ যাঁহাদের শরীর-মন নিজের কর্তৃত্বাধীনে আছে এবং অন্তর্জগতে প্রবেশ করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক, শুধু তাঁহারাই ধ্যানযোগ সাধন করিবার অধিকারী। সেইসব অধিকারী ব্যক্তি যদি এই কথা বুঝিতে পারেন যে, ব্রহ্মই মুমুক্ষুদের সাধ্য, এবং সাধন হইল মনকে সংসার হইতে সরাইয়া সাধ্য-ব্রহ্মে নিয়োগ করা, তবেই তাঁহারা যোগসাধনার উপযোগী হন।

এইরূপে যাঁহারা সাধ্য-সাধন সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া মহর্ষি পতঞ্জলি উপদেশ দিতেছেন। যোগসূত্রের প্রথম সূত্রে 'অথ' শব্দের ইহাই তাৎপর্য।

যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। ।।২।।

চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ।

তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্। ।।৩।।

তখন সাধক স্বরূপে অবস্থান করেন।

বৃত্তি সারূপ্যমিতরত্র। ।।৪।।

অন্যসময়ে সাধক চিত্তবৃত্তির সহিত এক হইয়া থাকেন।

মন্তব্য : আমাদের মন জন্ম-জন্মান্তর হইতে কেবল বাহ্যবিষয় লইয়া ব্যস্ত ছিল। এখন আত্মজ্ঞানলাভ করিবার জন্য মনের সমস্ত ক্রিয়াকে রুদ্ধ করিতে হইবে। মনের চিন্তা বন্ধ হইলেও 'আমি যে আছি' তাহা আমরা বুঝিতে পারি। এই 'আমি-বুদ্ধি'টিকে মাত্র অবলম্বন করিয়া আমাকে এখন স্থির হইয়া দীর্ঘকাল বসিয়া থাকিতে হইবে। ইহাই যোগসাধনার প্রথম উপদেশ।

বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাঽক্লিষ্টাঃ। ।।৫।।

ক্লেশযুক্ত ও ক্লেশশূন্যভেদে বৃত্তি পাঁচপ্রকার।

প্রমাণ-বিপর্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ। ।।৬।।

যথা—প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি।

প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি। ।।৭।।

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম (তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির বাক্য)—এইগুলি প্রমাণ।

বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্। ।।৮।।

বিপর্যয়ের অর্থ মিথ্যাজ্ঞান—যা সেই বস্তুর যথার্থ স্বরূপের ধারণায় প্রতিষ্ঠিত নয়।

শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ। ।।৯।।

কেবলমাত্র শব্দ হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, অথচ সংশ্লিষ্ট শব্দের প্রতিপাদ্য বস্তুর অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহাই বিকল্প।

অভাব-প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা। ।।১০।।

যে-বৃত্তি শূন্যভাবকে অবলম্বন করিয়া থাকে তাহা নিদ্রা।

অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ। ।।১১।।

অনুভূত বিষয়গুলি যখন মনে থাকিয়া যায় তখন তাহাকে স্মৃতি বলে।

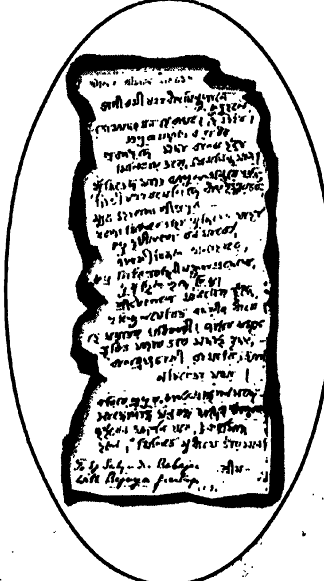
মন্তব্য : সাধারণত আমরা মনের গতি লক্ষ্য করি না। কিন্তু মনকে নিষ্ক্রিয় করিতে হইলে সে কি কি রূপে চলিয়া থাকে তাহা লক্ষ্য করা একান্ত প্রয়োজন। আমরা সারাদিন যে চিন্তা করি, তাহা মোটামুটি পাঁচপ্রকারের হইয়া থাকে। প্রত্যেক চিন্তাতেই কখনো সুখ, কখনো দুঃখ হয়। সাধারণত আমরা যে যে অবস্থায় থাকি, সেইখানকার দৈনন্দিন কাজকর্মের চিন্তা করিয়া থাকি। কখনো কখনো অশিক্ষা কুশিক্ষার ফলে নানাপ্রকার উদ্ভট কল্পনাও মনে ওঠে। এন-লেসকারের 'ডে-ড্রীম'-এর কথা সবাই জানে। আমরা সর্বদাই অতীত জীবনের সুখ-দুঃখের কথা ভাবি আর যখন ক্লান্ত হইয়া পড়ি, তখন মন যেন কুণ্ডলী পাকাইয়া নিশ্চল হইয়া পড়িয়া থাকে। মনের এই বিচিত্র লীলাই তো আমাদের জীবন। [ক্রমশ]

মায়াবতী

শ্রীম



স্বামী মুমুক্ষানন্দজী প্রেরিত এই কবিতাটি 'Vijaya Greetings'-রূপে শ্রীম 'শ্রী সত্যেন বাবাজী' অর্থাৎ স্বামী আত্মবোধানন্দজীকে লিখেছিলেন। আত্মবোধানন্দজী [সত্যেন মহারাজ—পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার (শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী) ও উদ্বোধন কার্যালয়ের অধ্যক্ষ] তখন মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের সেবক-কর্মী ছিলেন। কবিতাটির রচনাকালের উল্লেখ নেই। তবে এর চতুর্থ স্তবকে "শ্রীমাধব শ্রীরাঘব আর ভক্তগণ" ছত্রে স্বামী মাধবানন্দজী (মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ, ১৯১৮-১৯২৭)-কে এবং স্বামী রাঘবানন্দজী [সীতাপতি মহারাজ—তখন 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার সম্পাদক (১৯১৮-১৯২১)]-কে বোঝানো হয়েছে। এই উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, কবিতাটির রচনাকাল ১৯১৮ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে। কবিতাটির প্রথম তিনটি স্তবকের হস্তাক্ষর শ্রীম-র নয়। তবে পরবর্তী স্তবকগুলি তাঁরই লেখা।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'



।।১।।

নমি তব পদে মায়াবতী, এই নবযুগে
আশ্রমে তোমার, শ্রীনরেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত
সদা হইতেছে পূজা, ধ্যান, সেবা—
চিদানন্দ মায়াতীত, পরম ব্রহ্মের
দ্বৈতাদ্বৈত বিবর্জিত।
হেথা শ্বেতদ্বীপ ভক্ত আসি, নরেন্দ্র আশ্রিত,
সাধনান্তে করিলেন; ধন্য ভক্তবর!
সাধুমাঝে নশ্বর এ-দেহ বিসর্জন।

।।২।।

পবিত্র এ আশ্রম বদরিকাশ্রম সম
শ্রীনারদ উদ্ধব সেবিত,
দ্বৈপায়ন ঋষি যথা করিতেন তপঃ
মুরারি চরণচ্যুত জাহ্নবীর কূলে,
পড়িতেন বেদ, রচিতেন ব্রহ্মগাথা,
করিতেন সম্ভাষণ ব্রহ্মাদি দেবতা,
হয়ে সমাধিমগন, অন্তর্মুখ আর
বাহ্যশূন্য করিতেন ব্রহ্মদরশন।

।।৩।।

হিমগিরি দেবতাত্মা, তপস্যার ভূমি
তোমার আলয় মায়াবতী।
সন্তান তোমার সব, শ্রীরামকৃষ্ণদাস
তপঃ সাঙ্গ হলে করিবেন বিচরণ
ধরা মাঝে, হয়ে নির্মাণ নির্মোহ
করি জয় সঙ্গদোষ, চলি নিবৃত্তির পথ,
সাধিবারে প্রভুকার্য সর্বভূতের মঙ্গল।

।।৪।।

শ্রীরাঘব শ্রীমাধব আর ভক্তগণ
ভাগীরথী যথা ধায় সিন্ধুপানে কুতূহলে।
তোমাদের মন হে রাঘব! হে মাধব!
প্রভু রামকৃষ্ণ বংশধর
প্রবাহিছে সদা বাল্য হতে
মিলিবার তরে প্রেমসিন্ধু সনে।
খুঁজিতেছে যাহা ব্যাকুল অন্তরে অতি,
গাভী যথা বৎস পিছে ধায় হাম্বারবে।

।।৫।।

স্মর মহাবাক্য শ্রীপ্রভুর
অবশ্য মিলিবে তাহা খুঁজিতেছ যাহা
কভু হৃষীকেশে বনমাঝে,
একাকী বিজনে অনাহারে,
কভু গিরি তরঙ্গিণী সঙ্কুল প্রদেশে
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে কিংবা
শ্রীকৈলাসে মানসের হ্রদে,
ঋষিকুলসেবিত বদরীর ধামে।

।।৬।।

হে অমৃতের অধিকারী! পাইবে অমৃত
তৃষিত যাহার তরে সদাই হৃদয়—
বালব্রহ্মচারী রামাবিত্তত্যাগী নচিকেতা যথা।
করিবে প্রভুর কার্য ভ্রাতৃগণ সঙ্গে
সাঙ্গোপাঙ্গ অন্তরঙ্গ আছেন যাঁহারা
হইবেন অদর্শন যবে, কর্মসাঙ্গ হলে।
মিলিতে স্বধামে তাঁর সনে।

অজপা

ফুল্লরা মুখোপাধ্যায়

মাটি শুকোলেই জল দিতে হয়
সবাই জানে
ঝারি নিয়ে জল ঢালার আগেই
বৃষ্টির গান শুনি বাতাসে
ঝিরঝির একতারা বাউলের
যখনই ধূপ জ্বালতে যাই ঠাকুরের
কোথা থেকে গন্ধ ভাসে চন্দনের
ভরে ওঠে দেবালয় গৃহপ্রাঙ্গণ

জ্বালানির কাঠি হাতেই থাকে
প্রয়োজন হয় না জ্বালানোর।
যখনি ভাবি তোমাকে
দুচোখে ভরে যায় জ্যোৎস্নার মায়া
মাখামাখি করে হৃদয়ের কূল
তবে কি ডাকব না তোমাকে?
অজপার মন্ত্র হয়ে রইবে
আকাশে বাতাসে!

প্রলয়নৃত্য

কল্যাণী কর

গত ২৬ জানুয়ারি ২০০০ গুজরাটের ভূমিকম্পের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত

কত কাল ধরে গড়ে তোলা এ নগর,
কত স্বপ্ন ছিল প্রতি কাজে!
মানুষের অহমিকা বিজ্ঞানের বৈজয়ন্তী লেখা
মুছে গেল নিমেষের মাঝে!

ধনীর প্রাসাদ আর পর্ণকুটীর—
ভেদাভেদ ঘুচে গেল, লুটাল ধূলায়,
সবারই শয্যা আজ পথের প্রস্তরে
ভূকম্পনের এই ধ্বংসলীলায়!

চূর্ণ বিচূর্ণ অট্টালিকা শোনায় তাদের
দীর্ঘশ্বাস আর ক্রন্দনের রবে,
'নিমেষে প্রলয়নৃত্য এ কি নটরাজ!
তোমার অমোঘ দণ্ড গর্বিত মানবে?'

তোমাকেই ভালবাসব

অনিলকুমার চক্রবর্তী

তোমাকে ভালবাসলে আকাশে অসংখ্য চন্দ্র তারার
পবিত্র আলোর উদ্ভাস জাগে।
সে আমার হৃদয়-আকাশ।

তোমাকে ভালবাসলে সহস্র সুগন্ধি ফুলের
স্নিগ্ধ সুবাসে উদ্যান ভরে যায়।
সে আমার হৃদয়-উদ্যান।

তোমাকে ভালবাসলে কোটি বসন্তের বাতাসে
মধুময় প্রেমতরঙ্গ জাগে শান্ত মানস সরসে।
সে আমার হৃদয়-সরসী।

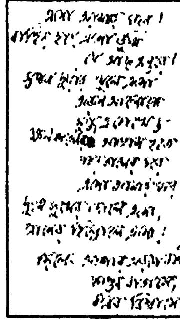
তোমাকে ভালবাসলে শত বৃন্দাবনে জাগে রাসরসবিহারীর
বিরহ বেদনার পরমানন্দ।
সে আমার হৃদি-বৃন্দাবন।

তোমাকে ভালবাসলে নামরূপাতীত কোন এক দেশের
রাজা এসে সব ভুলিয়ে ডেকে নিয়ে যায়।
সে তুমি, আমার হৃদয়রাজ।
তাই তোমাকেই ভালবাসব।

সহস্রাংশু দিবাকর

পিনাকীরঞ্জন কর্মকার

কী হবে হিসাব করে কত আলো আছে ঐ
সূর্যের ভাণ্ডারে!
কত দূর ঘিরে ব্যাপ্তি তার?
যে আলোর ছটা
অপসৃত করে সমস্ত আঁধার,
সেই আলো মেখে নিয়ে সারা দেহে মনে
স্নাত হই অমৃতধারায়।
সূর্যস্নাত পবিত্র অন্তরে
যুক্ত করে প্রণাম জানাই
সহস্রাংশু দিবাকর—তোমাকে প্রণাম!





রবীন্দ্রনাথ

শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়

একটি প্রভাত এত উন্মুখর হয়েছে পৃথিবী
সোনালী রোদ্দুর হাসে সময়ের নীড়ে—
ছন্দে ছন্দে সুরে সুরে এল ভাষা আমাদের মনে
জীবন কবিতা হয় অজানিতে প্রকৃতির তীরে!

একশ বছর আজ পার হয়ে অবাক আশ্বাসে
দিল যে আশ্চর্য সুর সাগরের পার চুঁয়ে চুঁয়ে
একশ বছর শুধু সেই সুরে গাওয়া হলো গান!

প্রাত্যহিক জীবনের সেইটুকু পরম নির্ভর!
প্রতিভা-প্রদীপ্ত প্রাণ যুগে যুগে আপন আবেগে
সুরে সুরে চলে শুধু অবিরাম নদীর মতন
যেখানে জীবন হয় সুপবিত্র ফুলের আশ্রয়ে
সেখানে তাহার সুর পরিব্যাপ্ত আছে সারাক্ষণ!

একটি প্রভাত এল পৃথিবীর পূর্ণ মনস্কাম,
শতাব্দীর সূর্য ওঠে হে কবি, প্রণাম!

প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ

স্বামী অচ্যুতানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

পুরাকালে অমৃতকুম্ভ নিয়ে দেবাসুরের যুদ্ধে বারদিন (মানুষের বারবছর) ধরে কলস রক্ষা করার সময় সূর্য 'চর' রাশিগুলিতে (মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর) ও বৃহস্পতি 'স্থির' রাশিগুলিতে (বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক ও কুম্ভ) ছিল। সেইজন্য সূর্য 'চর' রাশিগত ও বৃহস্পতি 'স্থির' রাশিগত হলে কুম্ভযোগ হয়। সূর্য-চন্দ্রের যোগ প্রতি বছর মকর রাশিতে হয় বলে প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তিতে প্রয়াগে মকর-স্নান হয়। এদের সঙ্গে প্রতি বারবছর অন্তর বৃহস্পতি সংযুক্ত হলে প্রয়াগে কুম্ভস্নান হয়। আবার মকরস্থ সূর্য, চন্দ্র এবং বৃষস্থ বৃহস্পতি ও শনির সংযোগ ঘটে ৩৬০ বছর পর—যা এবারে হয়েছে। এবছর তাই মহাপূর্ণকুম্ভযোগ।

প্রয়াগে কুম্ভযোগ বিষয়ে শাস্ত্রবচন হচ্ছে—"মকরে চ দিননাথে বৃষতো চ বৃহস্পতৌ।/ কুম্ভযোগো ভবেত্তত্র প্রয়াগে হি অতিদুর্লভঃ।।" আবার বলা হচ্ছে ঃ "মাঘে বৃষগতে জীবে মকরে চন্দ্রভাস্করৌ।/ অমাবস্যা ততো যোগো কুম্ভাখ্যঃ তীর্থনায়কে।।" অর্থাৎ মাঘ মাসে বৃষরাশিস্থ বৃহস্পতি ও মকর রাশিস্থ চন্দ্র ও সূর্য যেদিন একত্র হবে, সেইদিন অমাবস্যা থাকলে সেটি মৌনী অমাবস্যা হিসাবে তীর্থরাজ প্রয়াগে শ্রেষ্ঠ কুম্ভযোগ বলে নির্দিষ্ট হবে।

এবার পূর্ণকুম্ভযোগ প্রয়াগে হওয়ায় তিনবছর অন্তর উজ্জয়িনী, হরিদ্বার ও নাসিকে পূর্ণকুম্ভ হবে। প্রয়াগ ও হরিদ্বারে ছয়বছর অন্তর হবে অর্ধকুম্ভ। তাই কুম্ভস্নান মহাপুণ্যফলপ্রদ। বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থে বারবার কুম্ভস্নানের মাহাত্ম্য ঘোষিত হয়েছে।

শুধু শাস্ত্রের দিক থেকেই নয়, এই কুম্ভস্নানের একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বও আছে। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং তাঁর বিবরণীতে লিখেছেন ঃ বছরের এই সময়ে যখন গঙ্গায় জল কম থাকত, তখন রাজা হর্ষবর্ধন এই প্রয়াগে এসে কিছুদিন তীর্থবাস করতেন ও প্রচুর দান-ধ্যান করতেন। প্রবাদ, তিনি মাঘ মাসে প্রয়াগে কল্পবাস করে সাধু ও ব্রাহ্মণদের সেবা করেছিলেন—যথাসর্বস্ব অর্থ, এমনকি নিজের পরিধেয় বস্ত্রটিও দান করে বোন রাজ্যশ্রীর কাছ থেকে একখানি বস্ত্র চেয়ে নিয়ে তাই পরেছিলেন। পরবর্তী কালে ধনী ব্যক্তিরা সেই 'ট্র্যাডিশন' কিছুটা রক্ষা করতে বছরের এইসময় এখানে সমবেত হয়ে সাধু-দরিদ্রদের দান করতেন। সেই উপলক্ষ্যে প্রচুর জনসমাগম হতো। ক্রমে সেটাই মেলার রূপ নেয়। আজও ধনী ব্যক্তিরা অকৃপণ হস্তে এখানে দান করেন।

এছাড়া আরো একটা মত আছে—বৈদিক ধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বৌদ্ধধর্ম যখন প্রাধান্যলাভ করে, তখন তাঁরা এখানে ধর্মপরিষদ-এর অনুষ্ঠান অর্থাৎ সাধুসম্মেলন জাতীয় কিছু করতেন। পরবর্তী কালে আচার্য শঙ্কর হিন্দু সনাতনধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে তাঁর প্রবর্তিত দশনামী সাধু সম্প্রদায়কে ভারতের প্রধান চারটি তীর্থে সময়ে সময়ে সমবেত করে ভাবের আদানপ্রদান ও ধর্মপ্রচারে ব্রতী করেছিলেন। হিন্দুধর্মের সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রসারের জন্য এই সাধুসম্মেলন চারটি তীর্থে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করত। সেই থেকেই অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাধু ও ভক্তরাও এই তীর্থ-চতুষ্টয়ে স্নান করে পবিত্র হওয়ার জন্য একত্র মিলিত হয়। আরো শোনা যায়, পুরাকালে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এখানে ঋষি ভরদ্বাজের আশ্রমে এসেছিলেন। তখন তাঁকে অবলম্বন করে এখানে সাধুদের ব্রহ্মযজ্ঞ অর্থাৎ প্রশ্ন-উত্তরের আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আজও বিভিন্ন



কুম্ভনগরের শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের অভ্যন্তর — আলোকচিত্র ঃ ঋদ্ধীন্দ্রনাথ ঘোষ

আখড়া-মন্দির-আশ্রম ক্যাম্পে সেই ধারায় ধর্মপ্রসঙ্গ, ভজন-কীর্তন সমানে অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে।

গঙ্গার ধারে বালির চড়ার ওপর বসে কথা হচ্ছিল শঙ্কর গিরির সঙ্গে। তাঁর কাছেই শুনছিলাম কুম্ভস্নানের শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এল। আমাদের ক্যাম্পে আরতির সময় হয়েছে। অস্থায়ী মণ্ডপ হলেও সেখানে যথারীতি সন্ধ্যায় ঠাকুরের আরতি,



শাহী স্নানের জন্য মণ্ডলেশ্বরদের যাত্রা

ভজন ও অন্যান্য সময় পাঠ-প্রসঙ্গাদি সমানে চলেছে। ভক্তসমাগমও যথেষ্ট। ভক্তদের থাকার ব্যবস্থা আমাদের মতো আলাদা ক্যাম্পে, তবে স্ত্রী-পুরুষদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আলাদা।

১৩ জানুয়ারি ২০০১ রাত্রে খাওয়ার সময়েই আমাদের জানিয়ে দেওয়া হলো—পরদিন মকর সংক্রান্তির শেষরাত্রে আমাদের সাধুদের একসঙ্গে এখানকার মহানির্বাণী আখড়াতে হাজির হতে হবে। এখানে নির্বাণী সম্প্রদায় প্রথমে স্নান করে। আমরা ঐ সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত, তাই তাঁদের সঙ্গে আমাদের স্নানে যেতে হবে। প্রত্যেক সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে কোন না কোন আখড়ার সঙ্গে স্নানে যেতে হয়, না হলে তাঁদের স্নানসঙ্গমে যাওয়া যাবে না। এখানে পরবর্তী দল নিরঞ্জনী, তারপর জুনা আখড়া। আনন্দ, অটল, অগ্নি, আবাহন—এঁরাও কোন না কোনটার সঙ্গে সংযুক্ত। আমরা প্রায় সাড়ে চারটা নাগাদ নির্বাণী আখড়ার লাইনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তাঁদের শাহী স্নানযাত্রার প্রথমেই ছিল ৫০-৬০ জন হলদে কাপড়-জামা ও পাগড়ি পরা বিদ্যার্থীর দল, তাদের হাতে রঙ-বেরঙের পতাকা। এরপরে ব্যান্ডপার্টি এবং তার পিছনে ঘোড়ার পিঠে দুজন নাগা সন্ন্যাসী আখড়ার চিহ্নযুক্ত পতাকা ও ঢোল-জাতীয় বাজনা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চলেছেন। তারপরে বিরাট বিরাট চারটি ধ্বজ নিয়ে পদব্রজে চলেছেন চারজন বিশালদেহী নাগা সাধু। এই ধ্বজ পূজা করে নাগারা শোভাযাত্রায় বেরোয়। এটি খুব পবিত্র, একেও স্নান করানো হয়। প্রতি আখড়াতেই আলাদা আলাদা ধ্বজ থাকে। এর পরে দুটি সারিতে সর্বাঙ্গ ভস্মবিভূষিত, গাঁদার মালা গলায় প্রায় ২০০-২৫০ নাগা সন্ন্যাসী 'হর হর মহাদেব' বলে ছুটতে ছুটতে চলেছেন। কোন সঙ্কোচ নেই তাঁদের, পরমানন্দে ছোট শিশুর মতো তাঁরা মেলাপ্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়ান। এঁদের প্রতাপও খুব। স্বভাবত শান্ত, আনন্দময় হলেও কোন কারণে উত্তেজিত হলে এঁরা দারুণ রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন। তাই সবাই এঁদের ভয়মিশ্রিত ভক্তিতে দূরেই রাখেন। পুলিসও এঁদের ভয় করে দেখলাম। এই নাগা সাধুরা ইতিহাসের এক বিশেষ সন্ধিক্ষণে বৈদেশিক যাবনিক অত্যাচার থেকে নিরীহ ধর্মাত্মাদের রক্ষা করার প্রয়োজনে গঠিত হয়েছিলেন। এঁরা সামরিক বাহিনীর মতো ত্রিশূল, কুঠার, তরোয়াল, লাঠি ও নানা অস্ত্রাদি নিয়ে শোভাযাত্রায় বেরোন। এঁরা এইসব অস্ত্রচালনায় দক্ষতাও দেখান। আমাদের নির্বাণী আখড়ার নাগারা কিন্তু নিরস্ত্র ছিলেন। এই নাগাদের পরে আবার ব্যান্ডপার্টি এবং তারপরে নির্বাণী সম্প্রদায়ের দেবতা কপিলমুনির রূপার মূর্তি একটি ট্রেলারের ওপর রূপার সিংহাসনে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এরপরে আরেকটি ট্রেলারে এলেন নির্বাণী আখড়ার আচার্য মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী বিশ্বদেবানন্দ পুরীজী। তিনি একটি স্বর্ণমণ্ডিত সিংহাসনে বসে। তাঁর মাথায় একজন রূপার ছাতা ধরে, দুপাশে দুজন চামর ব্যজন করছে, আর তাঁর গাড়ির সামনে একজন কোতোয়াল সাধু জরির বেশভূষা পরে কাঁধে প্রায় ৪-৫ ফুট লম্বা একটি তরোয়াল নিয়ে চলেছেন। এরপরেই রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। তারপরে এই আখড়ারই অন্তর্গত অটল আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর মঙ্গলানন্দ গিরিজী এবং এঁদের অন্তর্গত আরো নানা আশ্রমের মণ্ডলেশ্বররা বেশ কয়েকটি রথে এলেন। প্রত্যেক দলের সঙ্গেই তাঁদের সাধু ও ভক্তেরা চলেছেন।

শিঙ্গা বাজিয়ে যাত্রা শুরু হলো। ধীরে ধীরে শোভাযাত্রা সঙ্গমের দিকে এগোতে লাগল। প্রায় একমাইল লম্বা এই শোভাযাত্রা ক্রমে ত্রিবেণী রোড ও তিন নম্বর পন্টুন ব্রিজ পেরিয়ে গঙ্গার ওপারে বালির চড়ার ওপর অস্থায়ী চওড়া পথ দিয়ে সঙ্গমের দিকে এগিয়ে চলল। পথের দুধারে ব্যারিকেড। তার ওপাশে শত শত ভক্ত সারা রাত জেগে অপেক্ষা করছেন। তাঁরাও 'হর হর মহাদেব' ধ্বনি দিয়ে সাধুদের প্রণাম জানাচ্ছেন। দুধারে চলেছে পদাতিক ও ঘোড়সওয়ার পুলিস। মাঝে মাঝে উঁচু মঞ্চ থেকে টেলিভিশন ক্যামেরা 'লাইভ' ব্রডকাস্ট করছে।



নির্বাণী আখড়ায় এক আশ্রমের মণ্ডলেশ্বর ও অন্যান্য সাধুবৃন্দ

ক্রমে আমরা সঙ্গমের পাড়ে এসে পড়লাম। প্রথমেই নাগারা জলে নেমে দাপাদাপি শুরু করল। এই সঙ্গম অঞ্চলটি বেড়া দিয়ে সাধুদের স্নানের জন্য ঘেরা ছিল, তাই আমাদের স্নানে কোন কষ্ট হয়নি। বেড়ার ওপারে ভক্তদের স্নানের ব্যবস্থা। আমরা যেদিন জলে নামলাম, সেদিন তাপমাত্রা ছিল ৩.৫ ডিগ্রি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জলে নামতে গিয়ে মনে হলো, পা অসাড় হয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য, একটু এগিয়ে যেতেই আর ঠাণ্ডা মনে হলো না। সঙ্গমে জল বেশি নেই, হাঁটু পর্যন্ত। তারই মধ্যে মা ত্রিবেণীকে স্মরণ করে ঠাকুর-মায়ের নাম নিয়ে সঙ্গমে ডুব দিলাম। স্নান সেরে পাড়ে উঠতেই দেখলাম, নির্বাণীয় অন্যান্য সাধুদের দল নামছে। সেই মকর সংক্রান্তির দিন শুভযোগ ছিল শেষ রাত্রি ৫টা ১৪ মিনিটে। আমরা সেই পুণ্যযোগেই মকর স্নান শেষ করে ঐ শোভাযাত্রার সঙ্গে ঘাট পেরিয়ে একপাশ দিয়ে বেরিয়ে এলাম। যখন ক্যাম্পে ফিরলাম তখন বেলা ৭টা বেজে গিয়েছে।

আমাদের পরে ক্রমে ক্রমে নিরঞ্জনী আখড়ার আচার্য মণ্ডলেশ্বর পুণ্যানন্দ গিরিজী, আনন্দ আখড়ার দেবানন্দ সরস্বতীজী হাতি-উট এবং প্রায় ২৫০ নাগা ও অন্যান্য সাধুদের নিয়ে স্নান করতে এলেন। তাঁদের স্নান করে ওঠার পর জুনা আখড়ার আচার্য মহামণ্ডলেশ্বর অবধেশানন্দ গিরিজী, আবাহন আখড়ার শিবেন্দ্র পুরীজী, অগ্নি আখড়ার রমানন্দজী রথে চড়ে শোভাযাত্রা সহকারে স্নানে এলেন। এঁদের প্রায় ১,০০০ নাগা সাধু নানা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে নাচতে নাচতে 'হর হর মহাদেব' ধ্বনি দিতে দিতে জলে নামলেন। বেলা তখন প্রায় ১০টা।

এঁদের পর একে একে স্নান করতে এলেন জ্যোতির্মঠের শঙ্করাচার্য বাসুদেবানন্দজী ও দ্বারকাপীঠের শঙ্করাচার্য স্বামী স্বরূপানন্দজী। এঁদের সঙ্গেও প্রচুর ভক্ত স্নান করতে এলেন। দুপুরের দিকে এলেন উদাসীন বড়া আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর মোহান্ত শঙ্করদাসজী, নির্মল আখড়ার মোহান্ত হরিহরানন্দ প্রমুখ। এঁরা নানকজীর ছেলে শ্রীচাঁদের উদাসীন সম্প্রদায়ের পাঞ্জাবী সাধু। তারপরে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বড় তিনটি দল—নির্বাণী, নির্মোহী ও দিগম্বর আখড়ার মণ্ডলেশ্বর শ্রীরামচন্দ্র দাস এলেন। এঁরা রামাইৎ সাধু। তারপরে অন্য সব সম্প্রদায়ের সাধুরা স্নান করলেন। শেষ হতে হতে বিকাল ৪টা বেজে গেল।

কত সম্প্রদায়ের সাধু! তাঁদের কতরকম বেশভূষা, কণ্ঠে ভগবানের নাম, ঝাণ্ডাতে কত রকমারি প্রতীকের শোভা! আর তারপরেই আরো আটটি ঘাটে পুরুষ-স্ত্রী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে স্নান একটা দেখবার জিনিস। যেন সমস্ত ভারতবর্ষ তার অনন্ত বৈচিত্র্য নিয়ে এখানে একত্রে সম্মিলিত! এ এক অতুলনীয় মহামানব-সঙ্গম। ত্রিবেণী তীর্থ শুধু তিনটি পবিত্র নদীরই সঙ্গম নয়, এই নদীত্রয়ের সঙ্গম আজ সারা ভারতকে টেনে এনে একত্রিত করেছে। ধনী-দরিদ্র, নর-নারী, সৎ-অসৎ, অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী থেকে অতি নিম্নশ্রেণীর মানুষ—সকলে ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সঙ্গমের জলে। সকলের মনের স্রোত আজ একমুখী। 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে' ডুব দিয়ে আমিও কৃতার্থ হলাম। এ মহামানবের সঙ্গম না দেখলে জীবনের একটা পরম প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত থেকে যেতাম। আর এই দেখা শুধু চোখের দেখা নয়, তার থেকে

অনেক বেশি মন দিয়ে অনুভব করা। তীর্থপ্রাণ মানুষের আবেগকে দেখা।

সেদিনের মতো ক্যাম্পে ফিরে এলাম। এরপরে অপেক্ষা পরের স্নান মৌনী অমাবস্যার জন্য। ধীরে ধীরে কুম্ভনগরে পুণ্যার্থী সাধু ও ভক্তের সংখ্যা বাড়তে লাগল। শহরে পা ফেলার জায়গা নেই। শুধু মানুষ আর মানুষ! মেলাতে দারুণ ধুলো উড়ছে—মাঝে মাঝে জলের গাড়ি এসে রাস্তায় জল দিয়ে যাচ্ছে। তাতে কোন কোন জায়গায় ধুলো জমে কাদা হচ্ছে। কিন্তু তাতে লক্ষ লক্ষ যাত্রীর কোন অসুবিধে নেই। একটু উঁচুতে দাঁড়ালে দুপাশে শুধু মানুষের কালো মাথার স্রোতই দেখা যায়।

দিন শেষে দেখি, এ যেন এক আলোর পুরী! চারিদিকে হ্যালোজেন আলোর বন্যা—সব আখড়া-আশ্রমেই প্রচুর আলোর ব্যবস্থা। শাস্ত্রী ব্রিজ থেকে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি এক অপূর্ব দৃশ্য। আলো আর অগণিত মানুষের এমন সহাবস্থান আমার কল্পনার অতীত ছিল। তার সঙ্গে প্রতিটি আশ্রমে চলছে কীর্তন-ভজন-প্রবচন। মাঝে মাঝে সরকারি অনুসন্ধানকেন্দ্র থেকে হারিয়ে যাওয়া মানুষের ঘোষণা। এও এক শোনার জিনিস! কত জায়গার মানুষের কত নাম—কত ধাম!

যাই হোক, ২৩ জানুয়ারি ২০০১ রাত্রের খাওয়ার সময় জানিয়ে দেওয়া হলো, আগামীকাল মৌনী অমাবস্যার পুণ্যলগ্নে শেষরাত্র ৪টার মধ্যে আমাদের নির্বাণী আখড়ায় গিয়ে হাজির হতে হবে। রাত তিনটেয় উঠে আমরা নির্বাণী আখড়ায় পৌঁছালাম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই। সেখানে তখন শোভাযাত্রার বিরাট প্রস্তুতি চলছে। সবকিছুই সেই মকর সংক্রান্তির শাহী স্নানের মতো। বেড়েছে শুধু সাধুদের সংখ্যা আর জাঁকজমক। আমরা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট পথ দিয়ে যথাসময়ে যাত্রা করলাম। এবারে আমাদের সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশনের একটা ব্যানার ছিল। কনকনে হাওয়া বইছে ৭৫ কিলোমিটার বেগে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, তাপমাত্রা ৩ ডিগ্রিতে—কিন্তু তাতে কারো কোনরকম উৎসাহে ভাঁটা নেই! পুণ্য মৌনী অমাবস্যা লেগে গিয়েছিল আগের দিন সন্ধ্যায়। অনেকে ভিড় এড়াতে তখনি কুম্ভস্নান সেরে নিয়েছিল।

আগের দিনের মতোই 'হর হর মহাদেব' ধ্বনি দিতে দিতে আমাদের নির্বাণী আখড়ার শোভাযাত্রা সঙ্গমঘাটে এসে পৌঁছাল। এবারে আমরা পন্টুন ব্রিজ দিয়ে এলাম—সঙ্গম কাছে হবে বলে। প্রচুর পুলিস দুধারে পাহারা দিচ্ছে—তারাও সাধুদের নমস্কার করছে। ব্যারিকেডের ওপার থেকে দর্শক ভক্তেরা ফুল ছুঁড়ছে—এই মহাযাত্রা পথে সর্বত্র শুধু আনন্দ! আজ এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ স্নানোৎসব। ৩৬০ বছর পরে চারটি গ্রহের সমাবেশে এই তীর্থরাজ প্রয়াগের ত্রিবেণীসঙ্গমে আজ বিশ্বের সবচেয়ে বড় নদী-উৎসব। আমরাও সেই সলিল সমারোহে ভাগীদার।

সঙ্গমের কাছে এসে যখন দাঁড়ালাম, তখন দুপাশে শুধুই মানুষ—লক্ষ না কোটি? জানি না, তবে এই মহামানবতীর্থ দর্শনে রোমাঞ্চিত কলেবরে যখন মা ত্রিবেণীর জল স্পর্শ করলাম, সেই মুহূর্তে বোধহয় আমি ভুলে গিয়েছিলাম, আমি একজন প্রৌঢ় সন্ন্যাসী। একেবারে শিশুর মতোই সঙ্গমের জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। হাঁটু পর্যন্ত মাত্র জল খেয়াল হয়নি। প্রচণ্ড কনকনে ঠাণ্ডা জল—তাও বোধ হয়নি। পরমানন্দে জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুহূর্তকে উপভোগ করে ঐ জলেই যখন উঠে দাঁড়ালাম, তখন আমার মনে পড়ল—এই ত্রিবেণীতীর্থে স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের দর্শন হয়েছিল তিনটি বেণী ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কুমারী দেবী ত্রিবেণী মায়ের। আমি মনে মনে সেই দৃশ্যের স্মরণ করে মাকে আর বিজ্ঞানানন্দজীকে প্রণাম জানিয়ে তীরে উঠে এলাম। আমার জীবনের প্রথম কুম্ভস্নান এভাবেই সম্পন্ন হলো। এবারে ফিরে যাওয়ার পালা।



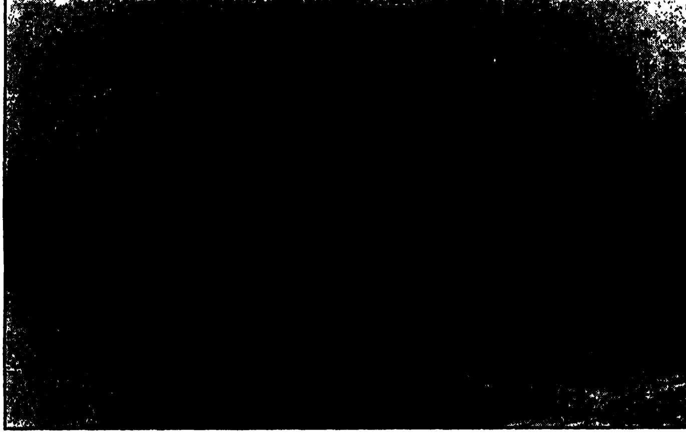
প্রয়াগ-সঙ্গমে পূর্ণকুম্ভস্নানের অপেক্ষায় পুণ্যার্থী সমাবেশ   আলোকচিত্র ঃ ঋদ্ধীন্দ্রনাথ ঘোষ

সরকারি সংবাদ প্রচারমাধ্যমের অফিস থেকে জানলাম, কুম্ভস্নান শুরু হয়েছিল ৯ জানুয়ারি ২০০১ পৌষ পূর্ণিমায়। সেদিন তেমন ভিড় হয়নি, তবুও লোকসমাগম হয়েছিল ৩০-৪০ লক্ষ এবং মকর সংক্রান্তিতে হয়েছিল ৭০ লক্ষ। এবারে মৌনী অমাবস্যায় ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ লোক স্নান

করেছে। এপর্যন্ত তিনটি স্নানে প্রায় ৫ কোটি পুণ্যার্থী স্নান করেছেন। সৌভাগ্যের কথা, এই মহামেলায় কোন বড় দুর্ঘটনা ঘটেনি। দু-একজন ভিড়ের চাপে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন মাত্র। জল-আলো সব ব্যবস্থাই ছিল পর্যাপ্ত। স্নানের জন্য তিনজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, দুজন রাজ্যপাল ও কয়েকজন রাজ্য-মন্ত্রী এসেছিলেন, তবে তাঁদের স্নানের জন্য পৃথক কোন ব্যবস্থা করতে হয়নি। সকলের সঙ্গেই তাঁরা স্নান করেছেন। গঙ্গা পারাপারের জন্য গঙ্গার বুকে ১২টি অস্থায়ী পন্টুন ব্রিজ নির্মিত হয়েছিল। সমস্ত মেলা ১০টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল। বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আগের রাত্রিতে শহরে আগত যাত্রীদের রান্নাকরা খাবার ও জল দিয়েছে। মেলাক্ষেত্রেও বহু আশ্রম ও সংস্থা লঙ্গরখানা খুলেছিলেন যাত্রীদের খাওয়ানোর জন্য। কুম্ভমেলায় ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে ২৫ লক্ষ লোক হয়। ক্রমশই তা বাড়তে থাকে। ১৯৬২-তে ৬০ লক্ষ, ১৯৭৭-এ ২ কোটি ৯০ লক্ষ, আর এই ২০০১-এ ৫টি স্নানে প্রায় ৭ কোটি লোক স্নান করেছেন। তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে কোন কর নেওয়া হয়নি।

আমার মেলা দেখা, কুম্ভস্নান শেষ। এবার ফেরার পালা। এখনো আরো দুটি স্নান বাকি আছে—বসন্ত পঞ্চমী আর মাঘী পূর্ণিমায়। কিন্তু তার আগেই আমায় ফিরে যেতে হবে। তাই তীর্থরাজ প্রয়াগ এবং মা যমুনা-গঙ্গা-সরস্বতীকে প্রাণভরে প্রণাম জানালাম।

পন্টুন ব্রীজ হেঁটে পার হওয়ার সময় দেখলাম, দূরে নীল কালিন্দীর জলের ঢেউ ধীরে ধীরে গৈরিক গঙ্গার বুকে মিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে, আর সেই সঙ্গমের পারে অগণিত মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রণাম-প্রার্থনা সব এক হয়ে মহাতীর্থ-ক্ষেত্রকে আরো মহিমান্বিত করছে। প্রণাম ত্রিবেণী-সঙ্গমকে, প্রণাম জাগ্রত নারায়ণের এই মহাসঙ্গমকে। [সমাপ্ত] ❑



গঙ্গার ওপর ১২টি সেতুর একাংশ   আলোকচিত্র : ঋদ্বীন্দ্রনাথ ঘোষ

বিজ্ঞপ্তি : রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন

(জেনারেল নার্সিং ও মিডওয়াইফারির ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন)

Ramakrishna Mission Sevashrama, Vrindaban invites applications from unmarried girls between 17 and 25 years of age as on 1st September 2001 having passed 10+2 preferably with science subjects for 3 years Diploma Course in General Nursing and Midwifery recognised by I. N. C. Obtain prospectus by sending Rs. 50/- by DD/Postal Order to "SECRETARY, RAMAKRISHNA MISSION SEVASHRAMA, VRINDABAN, MATHURA DT., U. P.-281121" by 15 of June 2001. Medium of instruction is English.

রবীন্দ্রনাথের ভূমানন্দ-বিহার

রোমি সাহা

[২৫শে বৈশাখ স্মরণে নিবেদিত]



অলৌকিক মনীষাসম্পন্ন আর্য পিতামহদের মতোই সত্য, শিব ও সুন্দরের উপাসক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আশৈশব তিনি উপনিষদের বাণীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি যে তার মধ্যে আরো গভীরভাবে প্রবেশ করেছেন, তার প্রমাণ আমরা পাই তাঁর কবিতায়, সঙ্গীতে, ভাষণে, চিঠিপত্রে ও কথোপকথনে। উপনিষদের বিশেষ কয়েকটি মন্ত্রের নিজস্ব ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন।

উষালগ্নে পূর্বাস্য হয়ে বসতেন রবীন্দ্রনাথ। প্রথম আলোর আবির্ভাবটি দেখার জন্য, তার চরণধ্বনিটি শোনার জন্য তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতেন। তাঁর তনুমন ব্যাপ্ত করে সূর্যের উদয় হতো। তিনি মনের শ্রবণে শুনতে পেতেন ফুটে ওঠা আলোর সুবর্ণ-মঞ্জীরের ধ্বনি। সেই দিব্য অনুভূতিতে মগ্ন হয়ে যেতেন ঋষি-কবি।

রবীন্দ্রনাথের এই ধ্যানমগ্ন মূর্তিটি প্রথম দেখা গেছে তাঁর পিতৃদেবের মধ্যে। তখন রবীন্দ্রনাথ বালক মাত্র। উপনয়নের পর তিনি পিতার সঙ্গে গিয়েছেন হিমালয়ে। রবীন্দ্রনাথের বাল্যস্মৃতিতে পিতৃসান্নিধ্যের একটি চমৎকার ছবি ফুটে উঠেছে—

"তীব্র শীতের প্রত্যূষে, প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্তে তাঁকে দেখতুম বাতি হাতে।... দেখতুম, আকাশে তারা আর পর্বতের ওপর প্রত্যূষের আবছা অন্ধকারে তাঁর পূর্বাস্য ধ্যানমূর্তি, তিনি যেন সেই শান্ত স্তব্ধ আবেষ্টনের সঙ্গে একাঙ্গীভূত। এই কদিন তাঁর নিবিড় সান্নিধ্য সত্ত্বেও এটা আমার বুঝতে দেরি হতো না যে, কাছে থেকেও তাঁকে নাগাল পাওয়া যায় না।

"আমাদের সকল আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে তিনি ছিলেন তেমনি একা যেমন একা সৌরপরিবারে সূর্য—স্বীয় উপলব্ধির জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে তিনি আত্মসমাহিত থাকতেন।... উপনিষদের মন্ত্র-উপলব্ধির আনন্দ তাঁর অন্তরে নিহিত ছিল।"

বলা যেতে পারে, পিতা-পুত্রের মধ্যে এই দিব্যভাবের প্রবাহই রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনার পটভূমি।

হিমালয়-যাত্রার পথে পিতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম যাত্রাবিরতি ঘটে শান্তিনিকেতনে। বালক রবীন্দ্রনাথ সেই প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে তাঁর সদ্য-পাওয়া গায়ত্রীমন্ত্রটি জপ করতেন। মন্ত্রজপের সময় তিনি গ্রহমণ্ডল-সহ আকাশের বিরাট রূপকে মনে আনবার চেষ্টা করতেন। তাঁর বিশ্বানুভূতির চেষ্টা এইভাবে বালক বয়সেই শুরু হয়েছিল। পরবর্তী কালে পরিণত জীবনে রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বানুভূতি এবং ঈশ্বরানুভূতির সাযুজ্যের কথা তাঁর একটি গানে বলেছেন—

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও।।" ('পূজা')

রবীন্দ্রনাথের ওপর উপনিষদের মন্ত্রের, বিশেষ করে গায়ত্রীমন্ত্রের প্রভাব অতীব গভীর ছিল।

শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রথম অনুভূতির কথা তাঁরই লেখা থেকে জানতে পারি : "শান্তিনিকেতনে এসেই আমার জীবনে ছাড়া পেয়েছি প্রথম বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। উপনয়নের পরেই আমি এখানে এসেছি।... আমার জীবন নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকত, প্রথম বয়সেই এই সুযোগ যদি আমার না ঘটত।... সেই বালক বয়সে এখানকার প্রকৃতির কাছ থেকে যে আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম, এখানকার অনবরুদ্ধ আকাশ ও মাঠ, দূর হতে প্রতিভাত নীলাভ শাল ও তাল-শ্রেণীর সমুচ্চ শাখাপুঞ্জের শ্যামলা শান্তি স্মৃতির সম্পদরূপে চিরকাল আমার স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। তারপরে এই আকাশে এই আলোকে দেখেছি সকালে-বিকালে পিতৃদেবের পূজার নিঃশব্দ নিবেদন, তার গভীর গাম্ভীর্য।"

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বারেবারে গায়ত্রীমন্ত্র জপ করতেন এবং পুত্রকে সেই মন্ত্রজপের প্রেরণা দিতেন। ঋষি বিশ্বামিত্রের জগদ্বিখ্যাত গায়ত্রীমন্ত্রের প্রথম দুটি ছত্র এই প্রসঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি—

"তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি
ধীয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।"

—যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন আমরা সেই সবিতাদেবের বরণীয় তেজ ধ্যান করি।

পরবর্তী কালে আমরা দেখতে পাই বেদ ও উপনিষদ্ রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় যেন সাকারমূর্তি ধারণ করেছে।

'সুদূরের পিয়াসী' রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গানের ভিতর শোনা যায় কবিহৃদয়ের আকুল আর্তি। বিপুল সুদূর বাজিয়ে চলেছে তার 'ব্যাকুল বাঁশরি'। সেই বাঁশিওয়ালার পরশ পাওয়ার জন্য সুর-সাধক মরমী কবি উন্মুখ। তাঁর যে পাখা নেই, উড়ে চলার শক্তি নেই—সেকথা ভুলে যান তিনি। এ যেন অনন্ত অমৃত পথযাত্রার স্বপ্নে বিভোর বিহঙ্গের আর্তস্বর।

এই আকুল ক্রন্দন, এই না পাওয়ার বিরহ-ব্যাকুলতাই কবির সৃষ্টির উৎসমুখ খুলে দিচ্ছে। আর সেই অনন্ত লোকনিবাসী সুরসাধক, কবি-সার্বভৌম তাঁর সুরের সুরধুনীতে ধুইয়ে দিচ্ছেন কবির হৃদয়। অমনি বেদের ব্রহ্মকমল ফুটে উঠছে কবির মানসলোকে।

বেদের ঋষি-কবিরা সামমন্ত্রে সেই সুরের গুরুর, সেই অদৃশ্য বাঁশিওয়ালার স্তবগান করেছেন, কীর্তন করেছেন তাঁর মহিমার। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও সেই ত্রিলোকের সুরসম্রাটের কাছে তাঁর প্রার্থনা জানিয়ে বলছেন ঃ "আমারে কর তোমার বীণা, লহ গো লহ তুলে।"—তোমার মোহন অঙ্গুলির ছোঁয়ায় বেজে উঠবে বীণার তন্ত্রীরাজি। আনন্দের অমৃতবার্তা পৌঁছে যাবে অনন্তের কূলে।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন এই সুরসাধনারই সার্থক রূপ। 'ছিন্নপত্রাবলী'র এক স্থানে তাঁর এই ভাবনারই প্রতিধ্বনি শুনি ঃ "সমস্ত শরীর এবং সমস্ত মন আগাগোড়া একটা বাজনার যন্ত্রের মতো কম্পিত এবং গুঞ্জরিত হয়ে উঠতে থাকে। সেই সুরের স্পন্দন আমার শরীর মন থেকে সমস্ত বাইরের জগতে সঞ্চারিত এবং ব্যাপ্ত হয়ে বিশ্বের সঙ্গে আমার একটা স্বর-সম্মিলন স্থাপিত হয়ে যায়।"

পার্থিব জগতের সম্পদ আমাদের শ্রেয়োলাভের পথে বাধাস্বরূপ—এই সত্য রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন উপনিষদের একটি ছোট্ট কাহিনীর মধ্যে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধাবলীর মধ্যে 'প্রার্থনা' রচনাটির কথা স্মরণ করতে পারি—"উপনিষদ ভারতবর্ষের ব্রহ্মজ্ঞানের বনস্পতি।... এর মধ্যে যে কেবল সিদ্ধির প্রাচুর্য পল্লবিত তা নয়, এতে তপস্যার কঠোরতা উর্ধ্বগামী হয়ে রয়েছে। সেই অভ্রভেদী সুদৃঢ় অটলতার মধ্যে একটি মধুর ফুল ফুটে আছে—তার গন্ধে আমাদের ব্যাকুল করে তুলেছে। সেটি ঐ মৈত্রেয়ীর প্রার্থনামন্ত্রটি।

"যাজ্ঞবল্ক্য যখন গৃহত্যাগ করবার সময় তাঁর পত্নীদুটিকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করে যেতে উদ্যত হলেন তখন মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আচ্ছা, বল তো এসব নিয়ে কি আমি অমর হব? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন ঃ না, তা হবে না, তবে কিনা উপকরণবন্তের যেমনতর জীবন, তোমার জীবন সেইরকম হবে।...

"মৈত্রেয়ী তখন এক মুহূর্তে বলে উঠলেন ঃ 'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্!'—যার দ্বারা আমি অমৃতা না হব তা নিয়ে আমি কী করব? এ তো কঠোর জ্ঞানের কথা নয়—তিনি তো চিন্তার দ্বারা, ধ্যানের দ্বারা, কোন্‌টা নিত্য কোন্‌টা অনিত্য তার বিবেক লাভ করে একথা বলেননি। তাঁর মনের মধ্যে একটি কষ্টিপাথর ছিল, যার ওপরে সমস্ত উপকরণকে একবার ঘষে নিয়েই তিনি বলে উঠলেন ঃ আমি যা চাই এ তো তা নয়।

"হে তপস্বিনী মৈত্রেয়ী, এস, সংসারের উপকরণ-পীড়িতের হৃদয়ের মধ্যে তোমার পবিত্র চরণদুটি আজ স্থাপন কর। তোমার সেই অমৃতের প্রার্থনাটি তোমার মৃত্যুহীন মধুর কণ্ঠে আমার হৃদয়ে উচ্চারণ করে যাও। নিত্যকাল যে কেমন করে রক্ষা পেতে হবে, আমার মনে তার যেন লেশমাত্র সন্দেহ না থাকে।"

অন্তর যদি পবিত্র হয়, বিকশিত হয় তাহলে সংসার জীবনের সর্বকর্মের মধ্যে শুদ্ধ আলো এসে পড়ে। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলছেন—

"অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে—
নির্মল কর, উজ্জ্বল কর, সুন্দর কর হে।" (ঐ)

বৃহতের হস্ত সর্বত্র প্রসারিত। কী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ, কী ইন্দ্রিয়াতীত জগৎ! সর্বত্রই বৃহতের সুষমা। চেতনায়, সাধনায়, অনুভবে রবীন্দ্রনাথ লৌকিক, অলৌকিক বা অতীন্দ্রিয় জগতের সেই শুভকে নিয়ে এসেছেন। ঈশ উপনিষদের প্রথম শ্লোকটিই হলো—

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।।"

এখানে স্পষ্টভাবে তিনি নিজের মনোমত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নির্মলকুমারী মহলানবিশের 'বাইশে শ্রাবণ' গ্রন্থে তার পরিচয় মেলে—

"হঠাৎ শুনেই শ্লোকটা কিরকম খাপছাড়া ঠেকে—ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত জগৎকে আচ্ছাদিত কর, ত্যাগের দ্বারা ভোগ কর, কারো ধনে লোভ করো না—এটা কি যথেষ্ট পরিষ্কার হলো? প্রথম লাইনটা তো বুঝলুম, কিন্তু দ্বিতীয়টা? ত্যাগের দ্বারা ভোগ কি করে করব, ত্যাগ এবং ভোগ একই সঙ্গে কি করে সম্ভব? কিন্তু যদি একটু ভেবে দেখ, দেখবে মানেটা খুবই পরিষ্কার। যেই ঈশ্বরের দ্বারা সমস্ত জগৎসংসারকে আচ্ছাদিত দেখা সম্ভব হবে, অমনি আর ছোট জিনিসের মধ্যে মন আবদ্ধ থাকতে চাইবে না। মন তখন আপনিই সব বিষয়ে নিরাসক্ত হয়ে উঠবে। তাই ভোগ যখন করব, তখনো ভোগের বস্তু সম্বন্ধে আসক্ত হয়ে পড়ব না। ত্যাগের দ্বারা ভোগ করার মানেই হলো তাই। আসক্তি যদি

না থাকে, তাহলে যেকোন মুহূর্তে যেকোন বস্তু ত্যাগ করা সম্ভব। তাই বলেছে, 'মা গৃধঃ'। এইটাই হলো সবচেয়ে বড় উপদেশ যে, লোভ করো না। এই পরের ধনে লোভ এবং নিজের ধনেই আসক্তি নিয়েই তো যত অশান্তি, যত হানাহানি। কিন্তু সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে প্রথমেই 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্' বলে। আগে সেইটে অভ্যাস করতে হবে। তারপরে সবটাই সহজ, কারণ যার জীবনে সমস্ত জগৎসংসারকে, প্রতি তুচ্ছ বস্তুকেও ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত দেখা সম্ভব হয়েছে, তার আর ভাবনা কি? সে সবকিছুর মধ্যে থেকেও সবকিছুকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। তখন মনে কোন আসক্তি থাকে না, লোভ থাকে না, একেবারে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। এই লোভ এবং আসক্তিই তো মানুষকে পরাধীন করেছে। তাই মানুষ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে চায়। কিন্তু উপনিষদ্ তো সন্ন্যাসী হতে বলেননি। সবকিছুর মধ্যেই নিরাসক্তভাবে বাস করতে বলেছেন, লোভকে একেবারে সম্পূর্ণ বর্জন করে। আসক্তি এবং লোভকে কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়ে যায়, যদি গোড়াকার উপদেশটা জীবনে সাধনা করি—'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্ যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।' নইলে সংসার ত্যাগ করলেও আসক্তি আমাকে ত্যাগ করে না। সে গুরু হয়ে বসে, নিজের শিষ্যের সংখ্যা বাড়াবার দিকে মন দেয়, ধর্মকে নিয়ে কেনাবেচা শুরু করে, আরো কত কি! সে আসক্তি কি গৃহীর আসক্তির চেয়ে কম? 'মা গৃধঃ' তখন তার কানে পৌঁছায় না। এইজন্যে বুদ্ধদেবও এই লোভকেই একেবারে জড়সুদ্ধ নষ্ট করতে বলেছেন। মনকে একেবারে আসক্তিমুক্ত করা বড় সহজ কথা নয়, তবে একেবারে যে অসম্ভব তাও নয়—এটা আমি নিজের জীবনে দেখেছি। কিন্তু প্রতিনিয়ত এর জন্যে চেষ্টা করতে হয়। নিজের ছোট-আমিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সেই বড়-আমির মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারলে সে ভারি আরাম। তখন আর কিছুই মনকে বিচলিত করতে পারে না। তাই আমি প্রতিদিন শেষ রাত্রে উঠে চুপ করে বসে নিজের কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করি। এক-একদিন পারিনে, শক্ত হয়। কিন্তু আবার কোন কোন দিন দেখি ফস্ করে বাঁধন আলগা হয়ে গেছে। যেন স্পষ্ট দেখতে পাই, আমার ছোট-আমিটা ঐ দূরে আলাদা হয়ে বসে রয়েছে, যাকে তোমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলো সেই মানুষটা। সেই লোকটা অতি তুচ্ছ। তার রাগ আছে, ক্ষোভ আছে, আরো কত ক্ষুদ্রতা আছে, সে অতি সাধারণ একটা মানুষ, সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে সে চঞ্চল হয়; কিন্তু তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি তার চেয়ে অনেক বড়। আমাকে ছোট সুখ-দুঃখ, নিন্দা-প্রশংসা স্পর্শ করে না, আমার মনের গভীর শান্তির ব্যাঘাত কেউ করতে পারে না, আমি যেন নিজেকে সেই বিরাটের মধ্যে বিলীন দেখতে পাই। এটার জন্য কি কম চেষ্টা করতে হয়—প্রতিদিন ক্রমাগত চেষ্টা করতে করতে তবে সহজ হয়ে আসে।"

এই 'আমি' সত্তার অপার বিস্ময়স্তব্ধ অতীন্দ্রিয় কণ্ঠস্বর বারেবারে ধ্বনিত হয়েছে 'গীতাঞ্জলি'তে—

"আমার মিলন লাগি তুমি আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায় রাখবে কোথায় ঢেকে।।"
(ঐ)

'গীতাঞ্জলি'র গানগুলির মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বড়-আমিকে প্রকাশ করেছেন, যার সঙ্গে 'প্রতিদিনের আমি'-র অনেক তফাৎ—

"সীমার মাঝে অসীম, তুমি বাজাও আপন সুর—
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।।" (ঐ)

রবীন্দ্রনাথ যে কেবল উপনিষদের আলোতেই অবগাহন করেছিলেন তা নয়। তাঁর আত্মচেতনা সমৃদ্ধ হয়েছিল সুফী সম্প্রদায়ের ভাবনা এবং বাউলের অপূর্ব দেহতত্ত্ব, আত্মতত্ত্বমূলক সঙ্গীতের রসস্পর্শে। তাঁর নানা ধরনের রচনায় সেসবের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। দেবালয়ই যে দেবতার একমাত্র আবাস নয়, নিছক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে দেবতাকে পাওয়া যায় না—বাউল সম্প্রদায়ের এই বিশ্বাসের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—

"কাজ কী আমার মন্দিরেতে আনাগোনায়—
পাতব আসন আপন মনের একটি কোণায়।" (ঐ)

যে-ঈশ্বরের অধিষ্ঠান আপন হৃদয়ে, সে-ঈশ্বরের আরাধনার জন্য মন্দিরে যাওয়া অর্থহীন। যেখানে তথাকথিত 'স্তবের বাণীর আড়াল' দিয়ে আমরা দেবতাকে ঢেকে রাখি, তাঁর পূজার ছলে তাঁকেই ভুলে থাকি।

বাউল আরেকটি তত্ত্বে বিশ্বাসী—'যাহা আছে ভাণ্ডে তা আছে ব্রহ্মাণ্ডে'। সেরকম রবীন্দ্রনাথও গেয়ে উঠেছেন—

"আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তায় সকলখানে।"

'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধাবলীর মধ্যে 'প্রভাতে' শীর্ষক রচনাটিতে আমরা রবীন্দ্রনাথের আরেক গভীর ভাবানুভূতির পরিচয় পাই—"প্রভাতের এই পবিত্র প্রশান্ত মুহূর্তে নিজের আত্মাকে পরমাত্মার মধ্যে একবার সম্পূর্ণ সমাবৃত করে দেখ, সমস্ত ব্যবধান দূর হয়ে যাক। নিমগ্ন হয়ে যাই, নিবিষ্ট হয়ে যাই, তিনি নিবিড়ভাবে আমাদের আত্মাকে গ্রহণ করেছেন—এই উপলব্ধি দ্বারা একান্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠি।

"নইলে আমাদের আপনার সত্য পরিচয় হয় না। ভূমার সঙ্গে যোগযুক্ত করে না দেখলে নিজেকে ক্ষুদ্র বলে ভ্রম হয়, নিজেকে দুর্বল বলে মিথ্যা ধারণা হয়।"

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।।" (ঐ)

এখানে ঈশ্বরের কাছে আত্মশুদ্ধির প্রার্থনা করছেন রবীন্দ্রনাথ। মানুষ সংসারের খ্যাতি, ঐশ্বর্যের পিছনে নিজেকে সারাক্ষণ নিয়োজিত রাখতে চায়। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে তাঁর প্রার্থনা, তিনি যেন সাংসারিক তুচ্ছ বস্তুর কাছে আত্মসমর্পণ না করেন।

রবীন্দ্রনাথ আবাল্য ঠাকুরবাড়ির সুরের পরিমণ্ডলে অবস্থান করেছেন। ব্রহ্মসঙ্গীতের কথা ও সুর তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করত। সঙ্গীতগুরু যদুভট্টের সুরের প্রভাব ঠাকুরবাড়ির সঙ্গীত-শিক্ষার্থীদের ওপর গভীরভাবে পড়েছিল। এই সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডলে কিশোর রবীন্দ্রনাথের মানসকমলটি সুরের স্পর্শে তার দল মেলছিল ধীরে ধীরে। একদিন খুলে গেল সমস্ত পাপড়ি। 'পূজা' পর্বের সহস্রদল পদ্ম নিবেদিত হলো ঈশ্বরের উদ্দেশে। ব্রহ্মানন্দপিপাসু মানুষ তার থেকে পান করতে লাগল দিব্য আনন্দরস। স্তব্ধ হয়ে ধ্যানযোগে অনুভব করল অনন্তের সঙ্গে আত্মার অভিন্ন যোগ। কবির 'পূজা' পর্বের গান যথার্থই এযুগের সামবেদ।

রবীন্দ্রনাথ জীবনদেবতার পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন ঃ "অনাদিকাল হইতে বিচিত্র, বিস্মৃত অবস্থার মধ্য দিয়া তিনি আমাকে আমার এই বর্তমান প্রকাশের মধ্যে উপনীত করিয়াছেন—সেই বিশ্বের মধ্য দিয়া প্রবাহিত অস্তিত্বধারার বৃহৎ স্মৃতি তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া আমার অগোচরে আমার মধ্যে রহিয়াছে।"

'মানুষের ধর্ম'-এ রবীন্দ্রনাথ মানুষের অন্তরে অধিষ্ঠিত সত্তাকে বলেছেন "সর্বজনীন সর্বকালীন মানব"। সক্রেটিস যাকে বলেছেন 'Daemon', প্লেটো যাকে বলেছেন 'Idea', খ্রীস্টানদের কোয়েকার সম্প্রদায় যাকে বলে 'অন্তরের আলো', দার্শনিক ফেকনার যাকে বলেছেন 'ব্যক্তি-চৈতন্যাতীত মহাচৈতন্য', যা জীবনের পরিচালনী শক্তি—তাকেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় বলেছেন 'অন্তর্যামী' বা 'জীবনদেবতা'।

"আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব—
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব।।" (ঐ)

জীবনদেবতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি—আমি শুধু দেবতার জন্য কাঙাল নই, তিনিও যে আমার প্রেমের জন্য কাঙাল। সংহিতা বলেন, দেবতা 'উশন্', 'অস্ময়ু'—ব্যাকুল, অধীর, কাঙাল আমার জন্য। ভক্তের জন্য ভগবানের এই ব্যাকুল অধীরতার স্পর্শ বারবার পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ।

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নিচে—
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হতো যে মিছে।।" (ঐ)

ভক্তই যে কেবল ভগবানকে লাভ করার জন্য অধীর হয়, তা নয়। ভক্তের জন্য ভগবানও অধীর হয়ে ওঠেন। কারণ, ঈশ্বরের সমস্ত লীলাই ভক্তকে নিয়ে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের সান্নিধ্যলাভ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতেন। ২ এপ্রিল ১৮৮২, কমলকুটিরে উপস্থিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্র সেনকে বলেছিলেন ঃ "তোমার অনেক কাজ, আবার খপরের কাগজে লিখতে হয়; সেখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যাবার অবসর নাই; তাই আমিই তোমায় দেখতে এসেছি।"

রবীন্দ্রনাথ প্রতি মুহূর্তে স্পর্শ করেছিলেন তাঁর জীবন-দেবতাকে। তাঁর কাছে নানা প্রার্থনা তাঁর—

"চরণপদ্মে মম চিত নিস্পন্দিত করো হে...।"

এ যেন সেই দিব্যজ্যোতির চরণপদ্ম। কবিচিত্ত তাকে স্পর্শ করে আছে মুগ্ধ মধুকরের মতো—

"সঞ্চার করো সকল কর্মে শান্ত তোমার ছন্দ।"

অর্থাৎ সমস্ত সাংসারিক কর্মের মধ্যে যেন ঈশ্বরের মঙ্গলহস্ত নিয়োজিত হয়ে আছে। যাকিছু কর্ম করি না কেন, তা যেন স্থিরচিত্তে গ্রহণ ও সম্পন্ন করতে পারি।

"যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে
মুক্ত করো হে বন্ধ।"

এইটিই হলো রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ। তাঁর সমগ্র সাংসারিক জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অজস্র বেদনাকে তিনি নীলকণ্ঠের মতো পান করেছেন। কোথাও হা-হুতাশ করেননি, কোথাও বেদনার অশ্রুজলে সিক্ত হয়নি তাঁর নয়ন। তিনি সংসারী ছিলেন সত্য, কিন্তু অন্তরে ছিলেন সন্ন্যাসী।

যে সত্যস্বরূপকে এত কাল কবি অন্বেষণ করেছেন নানা রূপে, নানা রসে—তাঁকে অবশেষে পেলেন নিবিড় এক প্রশান্তির মধ্যে। সেই জীবনসখাকে দেখে তিনি বলে উঠলেন—

"জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে,
বন্ধু হে আমার, রয়েছ দাঁড়ায়ে।।"

'মৃত্যু ও অমৃত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন ঃ "ভগবান এই সংসারের মাঝখানে থেকে নিজেকে কেবলই দিচ্ছেন, তিনি নিজের জন্য কিছুই নিচ্ছেন না। আমাদের আত্মাও যদি ভগবানের সেই প্রকৃতিকে পায় তবে সত্যকে লাভ করে। সেও সংসারের মাঝখানে ভগবানের পাশে তাঁর সখারূপে দাঁড়িয়ে নিজেকে সংসারের জন্য উৎসর্গ করবে, নিজের ভোগের জন্য লালায়িত হয়ে সমস্তই নিজের দিকে টানবে না। এই দেবার দিকেই অমৃত, নেবার দিকেই মৃত্যু।"

কবি উপনিষদকে বলতেন—"আমার সখা"। বলতেন ঃ "উপনিষদের সঙ্গে আমার নিরাসক্ত সম্বন্ধ ক্রমশ নিবিড় হয়ে আসছে।" তাঁর সমস্ত ধর্মচেতনার শেষে একটি প্রশান্ত নির্জনতা কবিকে ঘিরে থাকতে দেখি। সেই নির্জনতার ভিতর থেকে কবির জীবনে উদিত হয় সেই ভাস্বর সত্যস্বরূপ—যেখানে সব বাণীর অবসান, সমস্ত চিন্তার বিলয়। ❑

চিরন্তনী

রাজা হরিশ্চন্দ্র (১৫)

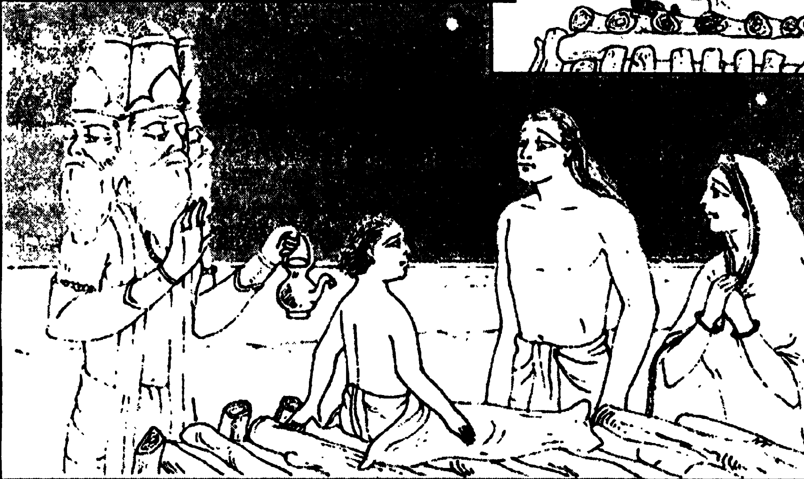
□ এই বিভাগটি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য □

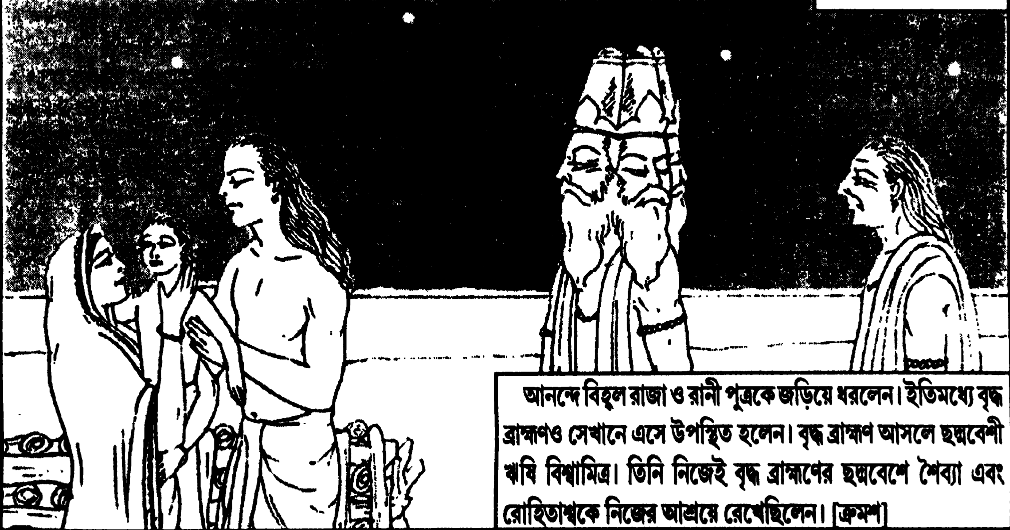
কথা : শুভ্রা দাশগুপ্ত □ চিত্র : তথাগত দাশগুপ্ত

চিতা রচনা করে প্রিয় পুত্রের দেহ তার ওপরে শুইয়ে দিয়ে হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যা আকুল হয়ে ভাবতে লাগলেন : কিভাবে বেঁচে থাকব পুত্রহারা হয়ে? আবার মরতেও যে পারব না! আমরা যে দাস-দাসী, প্রভুদের আদেশ ছাড়া কোন কাজই করতে পারি না, এমনকি স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন করলেও দাসের অধর্ম হয়। অসহায় নিরুপায় তাঁরা অবশেষে একমনে ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করে স্তব করতে লাগলেন—এই ঘোর বিপদে, হে প্রভু, তুমিই আমাদের একমাত্র ভরসা।



এমন সময় সেই শ্মশানে স্বয়ং ব্রহ্মার আবির্ভাব হলো। তিনি তাঁর কমণ্ডলু থেকে রোহিতাশ্বের প্রাণহীন শরীরে অমৃতবর্ষণ করলেন। বালক রোহিতাশ্বের শরীরে প্রাণের লক্ষণ ফিরে এল। আস্তে আস্তে সে চিতার ওপরে উঠে বসল।





আনন্দে বিহ্বল রাজা ও রানী পুত্রকে জড়িয়ে ধরলেন। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসলে ছদ্মবেশী ঋষি বিশ্বামিত্র। তিনি নিজেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে শৈব্যা এবং রোহিতাশ্বকে নিজের আশ্রয়ে রেখেছিলেন। [ক্রমশ]

স্মৃতিকথা

শ্রীশ্রীমায়ের কথাকণিকা

স্বামী পুরুষাত্মানন্দ

স্বামী পুরুষাত্মানন্দ (জন্ম ১৮৯৫) ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। পূর্বাশ্রম অধুনা বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ তাঁর সন্ন্যাসগুরু। হবিগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং শিলচর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের প্রথম অধ্যক্ষ। ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের ২১ ডিসেম্বর তিনি কলকাতার কারনানি হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। 'উদ্বোধন'-এ তাঁর দেহত্যাগ-সংবাদে লেখা হয়েছিল : "তাঁহার দেহত্যাগের ঘটনা উদ্দীপনাপূর্ণ। যদিও তিনি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু দেহত্যাগের কয়েক মিনিট পূর্বে [তাঁর দেহত্যাগ হয় ভোর ৪টা ৩৫ মিনিটে] হঠাৎ উঠিয়া শয্যার উপর বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য নাম উচ্চারণ করিতে থাকেন। কিছু পরেই বলেন, 'ও মা, তুমি এসেছ, একটু অপেক্ষা কর, আমি যাচ্ছি।' এই কথা বলিয়া তিনি নিকটের রোগীদিগকে বলেন, 'ভাই, তোমরা কি জেগে আছ? আমার সময় হয়েছে, আমি যাচ্ছি।' ইহার পর তিনি শুইয়া পড়েন আর ওঠেন নাই।" (৬৫তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৬৩)—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

আমি তখন ছাত্র। ছাত্রাবস্থায় শ্রীশ্রীমায়ের কথা শুনেছিলাম। শোনার পর থেকেই মাকে দেখার খুব আগ্রহ জাগে। বেলুড় মঠে আসি। মা তখন জয়রামবাটীতে। জয়রামবাটী গিয়ে মায়ের পুরনো বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। পরে বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখলাম একজন বৃদ্ধা মহিলা বারান্দায় বসে আছেন। একজন বলল, উনিই মা। মাকে দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। ভাবলাম, যে-মাকে দেখব বলে হবিগঞ্জ থেকে ছুটে এলাম, তাঁর চেহারা তো অতি সাধারণ! গায়ের রঙ মলিন, দেখতেও এমন কিছু নয়। মনের মধ্যে এইসব কথা উঠছে। হঠাৎ শুনলাম মা আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন : "আমার রঙ এমন মলিন ছিল না বাবা। ঠাকুরের শরীর যাওয়ার কিছুদিন পর পঞ্চতপা করে আমার গায়ের রঙ পুড়ে কালো হয়ে গেছে।" কথাগুলি বলে মা চুপ করে গেলেন। আমি তো শুনে একেবারে স্তম্ভিত। মনে খুব ভয়ও হলো। মনে মনে মায়ের কাছে বারবার ক্ষমাপ্রার্থনা করতে লাগলাম। বললাম : "মা, আমি তোমার সম্বন্ধে এসব ভেবেছি! আমাকে ক্ষমা করো।"

সেবারই মা আমাকে দীক্ষাদান করলেন। দীক্ষার পরে প্রসাদ পেতে বসেছি। আরো অনেকে বসেছেন। সকলের পাতে ভাত, ডাল, তরকারি দেওয়া হয়েছে। আমি ভাবছি : "এত অল্প ভাতে আমার পেটের একটা কোণাও ভরবে না। তাছাড়া খিদেও পেয়েছে প্রচণ্ড।" এই কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখি, মা সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। সকলের খাওয়া দেখছেন। আমার সামনে এসে পরিবেশনকারীকে বললেন : "ছেলেকে এত কম ভাত-তরকারি দিয়েছ কেন? ওরা বেশি ভাত খায়, ওকে আরো ভাত-তরকারি দাও। এতে ছেলের পেট ভরবে না।" এবারও আমি অবাক হয়ে গেলাম। বুঝতে পারলাম, মা অন্তর্যামিনী। আমার মনের কোণে যা উঠছে, যা মনের মধ্যে ভাবনা-চিন্তা করছি সব তিনি স্পষ্ট দেখতে পান। শুধু এদুটি ঘটনায় নয়, সেবার জয়রামবাটীতে আরো কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল, যা থেকে মায়ের অন্তর্যামিত্বের প্রমাণ পেয়েছিলাম। ❑

সৌজন্য : নরেশচন্দ্র চৌধুরী (শিলচর)। প্রয়াত নরেশবাবুর কন্যা শিবানী ব্রহ্মচারী (শিলচর) এই স্মৃতিকণিকাটি আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন।

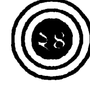
সুস্বাস্থ্য

> শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্।
> —কালিদাস (কুমারসম্ভব, ৫।৩৩)

স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়

অধ্যাপক ডাঃ সত্যানন্দ চক্রবর্তী

খ্যাতনামা প্রবীণ হোমিও চিকিৎসক



চোখের যত্ন

❑ চোখ দেহের অন্যতম প্রয়োজনীয় অঙ্গ। চোখ ভাল রাখার উপায় হলো—নিদ্রাকালে কোন আলো না জ্বালানো, দিনে বা রাত্রে নিদ্রাভঙ্গের পর তীব্র আলোর সামনে না তাকানো এবং চোখ ঘষা, চুলকানো বা রগড়ানো, নখ দিয়ে পিঁচুটি খোঁটা ও চোখে যেকোন বাহ্য চাপ থেকে বিরত থাকা। সকালে ঘুম ভাঙার পর মুখের মধ্যে জলভর্তি করে চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিলে চোখ ভাল থাকে। চোখ মোছার জন্য অপরিচ্ছন্ন রুমাল, গামছা, তোয়ালে, ধুতি বা শাড়ি ব্যবহার না করে পরিষ্কার নরম রুমাল ব্যবহার করা উচিত। বাইরে থেকে ফিরেই হাত ধুয়ে ফেলা উচিত যাতে অপরিষ্কার হাত চোখে না লাগে।

❑ চোখে ফোড়া, আঞ্জনি, যেকোন অস্বস্তি, ফোলা, ব্যথা, জ্বালা ইত্যাদিতে কোনপ্রকার ওষুধ বা লোশন চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতিরেকে ব্যবহার করা উচিত নয়। শিশুদের চোখে কাজল না লাগানোই ভাল।

❑ বইপত্র দিনের আলোয় চোখের ন্যূনতম ১৪ ইঞ্চি দূরে রেখে সোজা হয়ে বসে পড়া উচিত। পড়ার জন্য টেবিল-চেয়ার ব্যবহার করাই ভাল। রাত্রে পড়লে ২৫ বা ৪০ ওয়াটের বাল্বের টেবিলল্যাম্প ব্যবহার করা উচিত। সোজাসুজি রোদের আলো, অতি জোরালো আলো, নিয়ন আলো, ফ্লুরোসেন্ট আলো, ক্ষীণ আলো এবং শুয়ে শুয়ে পড়া চোখের ক্ষতি করে।

❑ যাঁদের দৃষ্টিশক্তি কম তাঁরা খালি পায়ে শিশিরভেজা ঘাসে হাঁটবেন। সকালে গাছের পাতা বা ঘাসে যখন রৌদ্রকিরণ পড়ে, সেইদিকে যত বেশি সময় সম্ভব তাকিয়ে থাকবেন। সবুজ পরিবেশে থাকা, সবুজ শাকসবজি, হলুদ ফল, শুকনো ফল, বাঁধাকপি, গাজর, শালগম, অর্ধসিদ্ধ ডিম, ছোট মাছের মাথা, দুধ ইত্যাদি আহার, ঘরের দরজা-জানালাতে সবুজ পর্দা ব্যবহার এবং জল টেনে নাক পরিষ্কার রাখা চোখের জন্য উপকারী। চোখজ্বালা, ক্লান্তি বা অস্বচ্ছ দৃষ্টি হলে মাথার পিছনের অংশ আঙুল দিয়ে ধীরে ধীরে মর্দন করা, হাতের চেটো দিয়ে ২-৩ মিনিট চোখদুটি ঢেকে রাখা এবং টেলিভিশন কম দেখা উচিত।

ভয়ঙ্কর ঠাকুর

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর, আপনাকে ভীষণ ভয় করে, আপনি ভয়ঙ্কর। কেন শুনবেন? কারণটা আপনার 'কেদার চাটুজ্যে এপিসোড'। কেদারবাবুর ঘটনা ভবিষ্যকালের সামনে আপনার একটি উত্থিত আঙুল—যে-আঙুলের নাম শ্রীরামকৃষ্ণ-তর্জনিসঙ্কেত। সাবধান, সাবধান, সাবধান!

'কথামৃত'-এ পাই, কেদার চাটুজ্যের বাড়ি হালিসহরে। সরকারি অ্যাকাউন্ট্যান্টের কাজ করতেন। অনেকদিন ঢাকায় ছিলেন। সেইসময়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁর সঙ্গে সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে আলাপ করতেন। ঈশ্বরের কথা শুনলেই তাঁর চোখে জল আসত। তিনি একসময় ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত ছিলেন। সব ছেড়ে ঠাকুরের শরণাগত হলেন।

শ্রীম লিখছেন—"কেদার আজ (১৩ আগস্ট ১৮৮২) উৎসব করিয়াছেন। সমস্ত দিন আনন্দে অতিবাহিত হইতেছে। রাম একটি ওস্তাদ আনিয়াছিলেন, তিনি গান গাহিয়াছেন। গানের সময় ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া ঘরের ছোট খাটটিতে বসিয়াছিলেন। মাস্টার ও অন্যান্য ভক্তেরা তাঁহার পাদমূলে বসিয়াছিলেন।"

এই হলো চিত্র। ওস্তাদের গানে ঠাকুর প্রসন্ন। তাঁকে বলছেন ঃ "যে-মানুষে একটি বড় গুণ আছে, যেমন সঙ্গীতবিদ্যা, তাতে ঈশ্বরের শক্তি আছে বিশেষরূপে।" ওস্তাদ একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন করছেন ঃ "মহাশয়, কি উপায়ে তাঁকে পাওয়া যায়?" ঠাকুর বলছেন ঃ "**ভক্তিই সার, ঈশ্বর** তো সর্বভূতে আছেন; তবে ভক্ত কাকে বলি? যার মন সর্বদা ঈশ্বরেতে আছে। আর অহঙ্কার, অভিমান থাকলে হয় না। 'আমি'-রূপ টিপিতে ঈশ্বরের কৃপারূপ জল জমে না, গড়িয়ে যায়। আমি যন্ত্র।"

এই কথোপকথন সকলেই শুনছেন। ঠাকুর তাঁদের সকলকেই বলছেন ঃ "সব পথ দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। সব ধর্মই সত্য। ছাদে ওঠা নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার; কাঠের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার; বাঁশের সিঁড়ি দিয়েও উঠতে পার; আর দড়ি দিয়েও উঠতে পার। আবার একটি আছোলা বাঁশ দিয়েও উঠতে পার।"

ঠাকুর প্রসঙ্গটিকে আরো একটু বিস্তৃত করছেন ঃ "যদি বল, ওদের ধর্মে অনেক ভুল, কুসংস্কার আছে; আমি বলি, তা থাকলেই বা, সকল ধর্মেই ভুল আছে। সব্বাই মনে করে আমার ঘড়িই ঠিক যাচ্ছে। ব্যাকুলতা থাকলেই হলো; তাঁর ওপর ভালবাসা, টান থাকলেই হলো। তিনি যে অন্তর্যামী। অন্তরের টান, ব্যাকুলতা দেখতে পান। মনে কর, এক বাপের অনেকগুলি ছেলে, বড় ছেলেরা কেউ বাবা, কেউ পাপা— এইসব স্পষ্ট বলে তাঁকে ডাকে। আবার অতি শিশু ছোট ছেলে হদ্দ 'বা' কি 'পা'—এই বলে ডাকে। যারা 'বা' কি 'পা' পর্যন্ত বলতে পারে—বাবা কি তাদের ওপর রাগ করবেন? বাবা জানেন যে, ওরা আমাকেই ডাকছে, তবে ভাল উচ্চারণ করতে পারে না। বাপের কাছে সব ছেলেই সমান।"

ঠাকুর নিজের মনেই বসে রইলেন কিছুক্ষণ ভাবস্থ হয়ে। এই কাছে, তো এই দূরে। অনন্ত থেকে আরো কিছু ভাব নিয়ে ফিরে এলেন, ভক্তদের হৃদয়-ঘট ভরে দেবেন। অনতিদূরে শ্রাবণের ভরা গঙ্গা। জলের রঙ সন্ন্যাসীর গেরুয়ার মতো, বৈরাগ্যের স্রোত। ঠাকুর বলছেন ঃ "আবার ভক্তেরা তাঁকেই নানা নামে ডাকছে; এক ব্যক্তিকেই ডাকছে। এক পুকুরের চারটি ঘাট। হিন্দুরা জল খাচ্ছে এক ঘাটে, বলছে 'জল'; মুসলমানরা আরেক ঘাটে খাচ্ছে, বলছে 'পানি'; ইংরেজরা আরেক ঘাটে খাচ্ছে, বলছে 'ওয়াটার'; আবার অন্য লোক এক ঘাটে, বলছে 'অ্যাকোয়া'। **এক ঈশ্বর তাঁর নানা নাম।**"

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামল। দূরের ভক্তরা একে একে চলে গেলেন। কাল সরে গেল অতীতে। ১৮৮২ চলে এল ১৮৮৩-তে। জানুয়ারি মাসের পয়লা। ইংরেজদের নববর্ষ। সকাল সাড়ে নটা। একজন বৈরাগী এসেছেন। গোপীযন্ত্র বাজিয়ে ঠাকুরকে গান শোনাচ্ছেন—

"নিত্যানন্দের জাহাজ এসেছে।
তোরা পারে যাবি তো ধর এসে।।
ছয় মানোয়ারি গোরা, তারা দেয় সদা পারা,
বুক পিঠে তার ঢাল খাঁড়া ঘেরা।
তারা সদর দুয়ার আলগা করে রত্নমাণিক বিলোচ্ছে।"

ঠাকুর গান শুনছেন। তেমন ভাবের গান হলে এখনি নিজেই গান ধরবেন। ঘরে ঢুকছেন কেদার চাটুজ্যে। ফিটফাট সাজগোজ। চাপকান, ঘড়ি, ঘড়ির চেন। ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। কেদারবাবু প্রেমিক মানুষ। ভিতরে তাঁর গোপীর ভাব। এতক্ষণ গান শুনে ঠাকুরের যা হয়নি, কেদারবাবুকে দেখে তাই হলো। শ্রীবৃন্দাবনলীলার ভাবোদ্দীপন হলো। দাঁড়িয়ে উঠলেন। প্রেমে মাতোয়ারা। কেদারবাবুকে সম্বোধন করে ঠাকুর গাইছেন—

"সখি, সে বন কতদূর।
(যথা আমার শ্যামসুন্দর) (আর চলিতে যে নারি)।"

শ্রীরাধার ভাবে গান গাইতে গাইতে ঠাকুর সমাধিতে চলে গেলেন। যেন একটি ছবি! ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন স্থির। চোখে পলক নেই। দুকোণ দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়াচ্ছে, দুগাল বেয়ে। আকাশের মতো পবিত্র, তুষারের মতো স্নিগ্ধ একটি দৃশ্য।

কেদারবাবু আবার ভূমিষ্ঠ। ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করে স্তব করছেন—"হৃদয়কমলমধ্যে নির্বিশেষং নিরীহম্।/ হরিহর-বিধিবেদ্যং যোগিভির্ধ্যানগম্যম্।।"

একসময় ঠাকুর সমাধি থেকে অবতরণ করলেন। কেদারবাবুর বাড়ি হালিসহরে। তিনি যাবেন কলকাতায়।

ঠাকুরকে দর্শন করে যাচ্ছেন। একটু বিশ্রাম করে বিদায় নিলেন।

দেখতে দেখতে দুপ্রহর বেলা হলো। রামলাল থালায় করে মা কালীর প্রসাদ নিয়ে এলেন ঠাকুরের জন্য। ঠাকুর দক্ষিণাস্য হয়ে আসনে বসলেন। তাঁর আহার বালকের আহার। একটু একটু সবই চেখে দেখলেন।

সময়ের পথ ধরে এগোতে এগোতে এসে গেল ১৮৮৩-র ১১ মার্চ। ভক্তরা দক্ষিণেশ্বরে আজ ঠাকুরের জন্মদিন পালন করছেন। বহু ভক্তসমাগম। এঁদের মধ্যে কেদারবাবুও আছেন। কেদারবাবুর বয়স হলো পঞ্চাশ। ঠাকুরের চেয়ে প্রায় তিন বছরের বড়।

ঠাকুরের শরীর আজ বিশেষ ভাল নেই। গঙ্গাস্নান বন্ধ। কলসীতে করে জল এনে পূর্বদিকের বারান্দায় রাখা হয়েছে। থইথই রোদ। নতুন পাতায় পাতায় বৃক্ষাদি সেজেছে। ঠাকুরের জন্মোৎসব যে আজ! ঠাকুর স্নান করবেন। ঠাকুর বলছেন ঃ "এক ঘটি জল আলাদা করে রেখে দে।" স্নানের ব্যাপারে ঠাকুর আজ খুব সাবধান। শেষে ঐ ঘটির জল মাথায় দিলেন। ঐ এক ঘটি, তার বেশি নয়।

কত কথা, কত গান। ঠাকুর পীতাম্বর পরিধান করে দাঁড়িয়ে আছেন। গলায় দুলছে মালা। উত্তর-পূর্বের বারান্দায় খোল-করতালের মশগুল শব্দ। কোন্নগরের দল কীর্তন করছেন। ঠাকুর ছুটে গেছেন সেখানে। তিনিও সঙ্কীর্তনে মেতেছেন। দুহাত তুলে মহাভাবে নাচছেন। বুকের ওপর দুলছে মালা। যেন স্বয়ং মহাপ্রভু! রূপসাগরে এ কোন্ অরূপরতন!

ঠাকুর মন্দিরে গিয়েছিলেন। নিজের মতো করে পূজা করেছেন। পঞ্চবটীতে সঙ্কীর্তন হয়ে গেছে। দেখতে দেখতে অপরাহ্ণ এসে গেছে। প্রায় ছটা বাজল। দিন এইবার রাতের শয়নশয্যা প্রস্তুত করছে। আলো নিভল বলে।

নিজের ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় ঠাকুর বসে আছেন ভক্তসঙ্গে। সেখানে কেদারও আছেন। ঠাকুর বলছেন ঃ **"সংসারত্যাগী সাধু—সে তো হরিনাম করবেই। তার তো আর কোন কাজ নাই। সে যদি ঈশ্বরচিন্তা করে তো আশ্চর্যের বিষয় নয়। সে যদি ঈশ্বরচিন্তা না করে, সে যদি হরিনাম না করে তাহলে বরং সকলে নিন্দা করবে।**

"সংসারী লোক যদি হরিনাম করে, তাহলে বাহাদুরি আছে। দেখ, জনক রাজা খুব বাহাদুর। সে দুখানি তরবার ঘুরাত। একখানা জ্ঞান ও একখানা কর্ম। এদিকে পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান, আরেকদিকে সংসারের কর্ম করছে। নষ্ট মেয়ে সংসারের সব কাজ খুঁটিয়ে করে, কিন্তু সর্বদাই উপপতিকে চিন্তা করে।

"সাধুসঙ্গ সর্বদা দরকার, সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন।" কেদারবাবু ঠাকুরকে সমর্থন করে বললেন ঃ "আজ্ঞে হাঁ! মহাপুরুষ জীবের উদ্ধারের জন্য আসেন। যেমন রেলের ইঞ্জিন, পেছনে কত গাড়ি বাঁধা থাকে, টেনে নিয়ে যায়। অথবা যেমন নদী বা তড়াগ, কত জীবের পিপাসা শান্তি করে।" কেদারবাবু এখানে অবশ্য ঠাকুরের কাছে শোনা কথাটিরই প্রতিধ্বনি করলেন।

আসর শেষ হলো। আলো-অন্ধকারের পথ ধরে একে একে সবাই চলেছেন গেটের দিকে। ঠাকুরের আদেশে রয়ে গেলেন ভবনাথ। ঠাকুর তাঁকে সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখেন।

বর্ষা আসবে আর কয়েকদিন পরেই। মৌসুমী মেঘের বিচ্ছিন্ন টুকরো এসে গেছে আকাশে। কদিন খুব গরম পড়েছে। জুন মাসের আজ ৮ তারিখ, ১৮৮৩ সাল। সন্ধ্যারতি শেষ হয়েছে সবে। ঠাকুর মন্দিরে। দেবীপ্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। চামর নিয়ে মাকে কিছুক্ষণ ব্যজন করলেন।

কলকাতা থেকে ভক্ত এসেছেন কয়েকজন—রামবাবু, কেদারবাবু, তারক। তাঁরা ঠাকুরের জন্য ফুল, মিষ্টান্ন এনেছেন। তাঁরা অপেক্ষা করছেন। ঠাকুর কালীঘর থেকে বেরলেন। চাতালে ভূমিষ্ঠ হয়ে মাকে প্রণাম করলেন। প্রণাম শেষ করে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছেন, ভক্তরা সব দাঁড়িয়ে আছেন স্থির হয়ে। ঠাকুর তারকের চিবুক ধরে আদর করছেন। তাঁকে দেখে ঠাকুরের খুব আনন্দ হয়েছে। ঠাকুর সদলে নিজের ঘরে এসে মেঝেতে বসলেন। রামবাবু আর কেদারবাবু যত ফুল আর মালা এনেছিলেন সব দিয়ে ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম সাজিয়েছেন। ঠাকুর সমাধিস্থ।

কেদারবাবু ঠাকুরের শ্রীচরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধরে আছেন। তাঁর ধারণা, এটি করলে ঠাকুরের শক্তি তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হবে। ঠাকুর একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে নিজের মনেই বলছেন ভাবের কথা ঃ "মা, আঙুল ধরে আমার কি করতে পারবে!"

কেদারবাবু আঙুল ছেড়ে দিয়ে বিনীতভাবে হাতজোড় করে আছেন। ঠাকুর ভাবাবেশে এইবার সরাসরি কেদারকে বলছেন ঃ "কামিনী-কাঞ্চনে মন টানে (তোমার)—মুখে বললে কি হবে যে আমার ওতে মন নাই।

"এগিয়ে পড়। চন্দনকাঠের পর আরো আছে—রূপার খনি—সোনার খনি—হীরে-মানিক। একটু উদ্দীপন হয়েছে বলে মনে করো না যে, সব হয়ে গেছে।"

সবাই নিস্তব্ধ—বাক্যহারা। ঘরে হঠাৎ যেন বজ্রপাত হলো এইবার। ঠাকুর আবার মায়ের সঙ্গে কথা বলছেন। বলছেন ঃ "মা, একে সরিয়ে দাও।"

কেদারবাবুর মুখ শুকিয়ে গেছে। তিনি শুষ্ক কণ্ঠে রামচন্দ্র দত্তকে প্রশ্ন করছেন ঃ "ঠাকুর একি বলছেন?"

ঠাকুরের শ্রীমুখ দিয়ে ভাবাবস্থায় যা বেরিয়ে এল, তা হয়তো পরে আর স্মরণে রইল না। কথায় কথায় কেদারের প্রসঙ্গ অবশ্যই করেন। কোজাগরী লক্ষ্মীপূর্ণিমা, ১৬ অক্টোবর ১৮৮৩। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে অনেকে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট একজন—বলরামবাবুর পিতা। পরম বৈষ্ণব। হাতে হরিনামের মালা। সর্বদা জপ করেন। আর আছেন বেণী পাল, মাস্টারমশাই, মণি মল্লিক প্রমুখ।

নানা প্রসঙ্গ হতে হতে ঠাকুর বলছেন ঃ "এই 'আমি'

জ্ঞানই আবরণ করে রেখেছে। নরেন্দ্র বলেছিল, 'এ আমি যত যাবে, তাঁর আমি তত আসবে।' কেদার বলে, কুম্ভের ভিতরের মাটি যতখানি থাকবে, ততখানি এদিকে জল কমবে।"

অমন একটি কথা সেদিন বললেও ঠাকুর কেদারের প্রসঙ্গ করছেন, আবার কেদারও আসছেন—যখনি সময় পাচ্ছেন। ২৯ ডিসেম্বর ১৮৮৩। কলকাতা থেকে এসেছেন রামবাবু, কেদারবাবু ও অন্যান্য ভক্তরা। শীতকাল, রবিবার। বেলা প্রায় তিনটে। এর আগে ঠাকুর যেদিন রামবাবুর বাগান দেখতে যান, সেদিন পাশের বাগানের গাছতলায় জনৈক সাধুকে একা খাটিয়ায় বসে থাকতে দেখেছিলেন। সেদিন উপযাচক হয়ে অনেক কথা বলেছিলেন সাধুর সঙ্গে। ঠাকুরের আদেশে রামবাবু আজ সেই সাধুটিকে নিয়ে এসেছেন।

ঠাকুর সাধুর সঙ্গে অনেক প্রসঙ্গ করলেন। কেদারবাবুর সঙ্গে কোন কথা হলো না। বছর ঘুরে গেল। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪। দুর্গাসপ্তমী। ঠাকুর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এসেছেন। চেয়েছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। শাস্ত্রীমশাই বাড়িতে নেই। ব্রাহ্মভক্তরা ঠাকুরকে সমাজমন্দিরে এনে বসিয়েছেন। কথায় কথায় ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণকে বলছেন ঃ "কেন শিবনাথকে চাই? যে অনেকদিন ঈশ্বরচিন্তা করে, তার ভিতর সার আছে। তার ভিতর ঈশ্বরের শক্তি আছে। আবার যে ভাল গায়, ভাল বাজায়, কোন একটা বিদ্যা খুব ভালরকম জানে, তার ভিতরেও সার আছে। ঈশ্বরের শক্তি আছে। এটি গীতার মত। চণ্ডীতে আছে, যে খুব সুন্দর, তার ভিতরও সার আছে, ঈশ্বরের শক্তি আছে।"

এইবার বিজয়কৃষ্ণকে কেদারবাবুর কথা বলছেন ঃ "আহা! কেদারের কি স্বভাব হয়েছে। এসেই কাঁদে। চোখ-দুটি সর্বদাই যেন ছানাবড়া হয়ে আছে।"

বিজয়কৃষ্ণ বলছেন ঃ "সেখানে (ঢাকায়) কেবল আপনার কথা, আর তিনি আপনার কাছে আসবার জন্য ব্যাকুল।"

ব্রাহ্মসমাজ থেকে ঠাকুরের গাড়ি চলল অধরবাবুর বাড়ির দিকে। ঠাকুর প্রতিমা দর্শন করবেন।

অষ্টমীর দিন ঠাকুর রামবাবুর বাড়িতে এসেছেন। সন্ধ্যা হয় হয়। ভক্তরা সব ঘিরে আছেন। কেদারও আছেন। তিনি একান্তে ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন ঃ "মাথাঘোরাটা কিসে সেরে যাবে?"

ঠাকুর সস্নেহে বলছেন ঃ "ও হয়, আমার হয়েছিল। একটু একটু বাদামের তেল দিবেন। শুনেছি দিলে সারে।"

ঠাকুরের আজ বড় প্রেমময় ভাব। ঠাকুর আসার অনেক পরে রামবাবু পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন ঃ "রাম, তুমি কোথায় ছিলে?"

রামবাবু বললেন ঃ "আজ্ঞে, ওপরে ছিলাম।"

ঠাকুর আর ভক্তদের সেবার জন্য রামবাবু ওপরে আয়োজন করছিলেন।

ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন ঃ "ওপরে থাকার চাইতে নিচে থাকা কি ভাল নয়? নিচু জমিতে জল জমে, উঁচু জমি থেকে জল গড়িয়ে চলে আসে।"

অধরবাবুর বাড়ি। কেদারবাবু হঠাৎ সিদ্ধান্ত করলেন, তিনি আহারাদি না করেই চলে যাবেন। একটু স্ব-সচেতন। ঠাকুরকে প্রণাম করে বলছেন ঃ "আজ্ঞে! তবে আসি।"

ঠাকুর বলছেন, ঃ "তুমি অধরকে না বলে যাবে? অভদ্রতা হয় না?"

ঠাকুরের কী অপূর্ব সামাজিক ভদ্রতাবোধ। ইংরেজরা যাকে বলে 'এটিকেট', 'ম্যানার্স'। কেদারবাবু বলছেন ঃ "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্। আপনি যেকালে রইলেন, সকলেরই থাকা হলো।"

এমন সময় অধরবাবু এসে ভিতরে আসার জন্য আহ্বান জানালেন। তিনি বিজয়কৃষ্ণ ও কেদারবাবুকে সম্বোধন করে বললেন ঃ "এস গো আমার সঙ্গে।"

কেদারবাবু বাধ্য হলেন ভিতরে যেতে। আহারান্তে আবার বৈঠকখানায়। কেদারের ভিতর একটা অস্বস্তি। বুঝতে পেরেছেন, অহঙ্কারের শিকার হয়েছিলেন। ভাবছেন, তিনি কি ঠাকুরের চেয়ে বড়? ঠাকুরকে হাতজোড় করে বিনীতভাবে বলছেন ঃ "মাফ করুন, যা ইতস্তত করেছিলাম!" শ্রীম 'কথামৃত'-এ লিখছেন, কেদারবাবু মনে মনে ভাবছেন—"ঠাকুর যেখানে আহার করিয়াছেন সেখানে আমি কোন্ ছার।"

কেদারবাবুর কর্মস্থল তখন ঢাকায়। সেখানে অনেক ভক্ত তাঁর কাছে আসে। সন্দেশাদি নানা খাদ্য আনে। কেদারবাবু বিনীতভাবে সেই প্রসঙ্গেই ঠাকুরকে প্রশ্ন করছেন ঃ "লোকে অনেকে খাওয়াতে আসে। কি করব প্রভু, হুকুম করুন।"

ঠাকুর চিরকালের শাশ্বত কথাটি বললেন ঃ "ভক্ত হলে চণ্ডালের অন্ন খাওয়া যায়। সাত বৎসর উন্মাদের পর ওদেশে গেলুম। তখন কি অবস্থাই গেছে! খানকী পর্যন্ত খাইয়ে দিলে! এখন কিন্তু পারি না।"

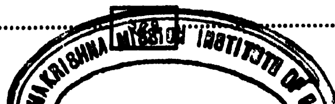
কেদারবাবু বিদায় নেওয়ার আগে প্রার্থনা করছেন ঃ "প্রভু, আপনি শক্তিসঞ্চার করুন। অনেক লোক আসে। আমি কি জানি!"

২৭ ডিসেম্বর ১৮৮৪, দক্ষিণেশ্বর। কেদারবাবু আবার সেই একই প্রসঙ্গ তুললেন—"তাদের জিনিস কি খাব?"

ঠাকুর বললেন ঃ "যদি ঈশ্বরে ভক্তি করে দেয়, তাহলে দোষ নাই। কামনা করে দিলে সে-জিনিস ভাল নয়।"

কেদারবাবু বললেন ঃ "আমি তাদের বলেছি, আমি নিশ্চিন্ত। আমি বলেছি, যিনি আমায় কৃপা করেছেন, তিনি সব জানেন।"

না, ঠাকুর তাঁকে কৃপা করতে পারেননি। ১৫ জুলাই ১৮৮৫। রথযাত্রার দিন। ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বলরাম-মন্দিরে। সমাধির কথা বলছেন ঃ "সমাধি মোটামুটি দুইরকম। জ্ঞানের পথে, বিচার করতে করতে অহংনাশের পর যে-সমাধি, তাকে স্থিতসমাধি বা জড়সমাধি (নির্বিকল্প সমাধি) বলে। ভক্তিপথের সমাধিকে ভাবসমাধি বলে। এতে সম্ভোগের



জন্য, আস্বাদনের জন্য রেখার মতো একটু অহং থাকে। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থাকলে এসব ধারণা হয় না।"

এইবার ঠাকুর সেই ভয়ঙ্কর কথাটি বলছেন ঃ "কেদারকে বললুম, কামিনী-কাঞ্চনে মন থাকলে হবে না। ইচ্ছে হলো, একবার তার বুকে হাত বুলিয়ে দিই, কিন্তু পারলাম না। ভিতরে অঙ্কট-বঙ্কট। ঘরে বিষ্ঠার গন্ধ। ঢুকতে পারলাম না। যেমন স্বয়ম্ভুলিঙ্গ কাশী পর্যন্ত জড়। সংসারে আসক্তি, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থাকলে হবে না।"

ভয়ঙ্কর! ঠাকুর অতি ভয়ঙ্কর! নো কম্প্রোমাইস! বলছেন, ঈশ্বরের কথায় যার চোখে জল আসে, সে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। ঈশ্বরের দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে। কেদারবাবুর চোখে জল আসত। হলো না। হলো না। ঠাকুরের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ হলো না। সেখানেও খুঁত। ঈশ্বরের পথের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী কাম-কাঞ্চন। ঠাকুর কোন রফার মধ্যে যেতে চান না। সাবধান! তুমি যদি ঠাকুরকে চাও, সম্পূর্ণ পরিশ্রুত হও। ভোগের সামান্য বিন্দু ত্যাগের জগতে বাধার সিন্ধু। ❑

'উদ্বোধন' ঃ লেখক-লেখিকাদের এবং গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রগুলির জ্ঞাতব্য

❑ ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজদর্শন, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প, ক্রীড়া ইত্যাদি বিষয়ে সুখপাঠ্য, ইতিবাচক, বিশ্লেষণমূলক এবং তথ্যভিত্তিক বাঙলা রচনা বিবেচিত হয়। রচনাটিকে অবশ্যই 'উদ্বোধন'-এর আদর্শ ও ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। উপরি উক্ত যেকোন বিষয়ে রচনাটি কমপক্ষে ২৫০০ শব্দের মধ্যে হওয়া প্রয়োজন। ছদ্মনামে পাঠানো রচনা বিবেচিত হয় না।

❑ আক্রমণাত্মক রচনা বিবেচিত হয় না।

❑ কবিতা, সংবাদ, চিঠিপত্র নাতিদীর্ঘ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

❑ শারদীয়া সংখ্যার (আশ্বিন/সেপ্টেম্বর) জন্য রচনা পাঠালে তা ১৫ চৈত্র/৩১ মার্চ-এর মধ্যে আমাদের দপ্তরে পৌঁছানো প্রয়োজন।

❑ ভ্রমণ সংক্রান্ত রচনায় আলোকচিত্র (গ্লসি প্রিন্ট) পাঠানো আবশ্যিক।

❑ যেকোন তথ্যভিত্তিক রচনা এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনার সঙ্গে প্রয়োজনীয় ছবি (গ্লসি প্রিন্ট), রেখাচিত্র ইত্যাদি পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

❑ গ্রন্থ বা পত্র-পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দিলে বা সাহায্য নিলে যথাযথ সূত্রনির্দেশ (গ্রন্থের/পত্রিকার নাম, লেখকের নাম, প্রকাশকের নাম-ঠিকানা, প্রকাশকাল, সংস্করণ এবং পৃষ্ঠা) আবশ্যিক।

❑ ফুলস্ক্যাপ কাগজের একপিঠে যথেষ্ট মার্জিন দিয়ে স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখিত পাণ্ডুলিপি না পাঠালে বিবেচিত হবে না। বাঙলায় টাইপ করা পাণ্ডুলিপি পাঠানো যেতে পারে।

❑ রচনার কার্বন বা জেরক্স কপি গ্রহণযোগ্য নয়।

❑ অন্যত্র প্রকাশিত কোন রচনা 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হয় না। এর ব্যতিক্রম হয় শুধু 'মাধুকরী' বিভাগের রচনাগুলির ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রেও রচনাটিকে 'উদ্বোধন'-এর আদর্শ এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

❑ উপন্যাস বিবেচিত হবে না।

❑ অমনোনীত রচনা ফেরতযোগ্য নয়। রচনার সঙ্গে প্রেরিত নথিপত্র বা ছবি সম্পর্কেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। সুতরাং রচনা/নথিপত্র/ছবির কপি রেখে পাঠানো বাঞ্ছনীয়।

❑ সাধারণত কোন রচনা পাঠানোর একবছরের মধ্যে এবং কোন গ্রন্থের সমালোচনা গ্রন্থ পাঠানোর দুবছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে বুঝতে হবে, সংশ্লিষ্ট রচনাটি অথবা গ্রন্থটি মনোনীত হয়নি।

❑ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য পাঠানো রচনা অন্তত একবছরের মধ্যে যেন অন্যত্র প্রকাশের জন্য প্রেরিত না হয়। 'উদ্বোধন'-এ কোন রচনা একবছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে অন্যত্র প্রকাশের জন্য পাঠাতে পারেন, তবে পাঠানোর আগে 'উদ্বোধন'-সম্পাদককে অবহিত করা বাঞ্ছনীয়।

❑ 'গ্রন্থ-পরিচয়' বিভাগে আলোচনার জন্য 'উদ্বোধন'-এর আদর্শ এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ গ্রন্থই বিবেচ্য। আলোচনার জন্য প্রতি গ্রন্থের দুখানি কপি জমা দেওয়া আবশ্যিক।

❑ পরলোক-সংবাদ ও অনুষ্ঠান-সংবাদ পরলোকপ্রাপ্তি বা অনুষ্ঠানের ১৫ দিনের মধ্যে অবশ্যই আমাদের দপ্তরে পৌঁছানো প্রয়োজন। অন্যথায় সে-সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

❑ লেখক-লেখিকাদের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা আমরা স্বীকার করি। তবে তাঁদের মতামত আমাদের অনুমোদিত—এটা ভাবা ভুল। মতামতের যথার্থতা প্রতিষ্ঠা ও প্রমাণের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট লেখক-লেখিকাদের।

❑ রচনাদি নির্বাচন ও প্রকাশের ব্যাপারে সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

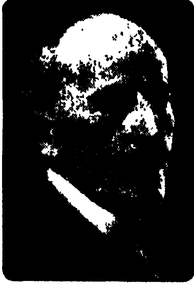
❑ পত্রোত্তরের জন্য প্রয়োজনীয় ডাকটিকিট/পোস্টকার্ড/ইনল্যান্ড/ খাম পাঠাতে হবে।

❑ ব্যক্তিগত উদ্যোগে অথবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাঁরা আমাদের অনুমোদিত গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্ররূপে গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চান তাঁদের লিখিতভাবে সম্পাদকের কাছে আবেদন করতে হবে। কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগৃহীত হলে 'উদ্বোধন'-এ ব্যক্তির/ কেন্দ্রের নাম-ঠিকানা প্রকাশিত হবে।

❑ ব্যক্তিগত উদ্যোগে যাঁরা গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চান তাঁদের আবেদন-পত্র স্থানীয় মঠ-মিশন বা ভাবপ্রচার পরিষদের অধীন প্রাইভেট কেন্দ্রের প্রধানের অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক/সভাপতিকে আবেদন করতে হবে।

১৪ এপ্রিল ২০০১ — সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'





মাদাম কালভেকে লেখা রোমাঁ রোলাঁর চিঠি

মাদাম কালভেকে লেখা রোমাঁ রোলাঁর একটি ইংরেজী চিঠি আজ থেকে ঠিক ২৩ বছর আগে 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার এপ্রিল ১৯৭৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্য সেটি বঙ্গানুবাদ-সহ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের আশায় পাঠালাম। প্রকাশিত হলে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগীদের বৃহত্তর অংশ রোমাঁ রোলাঁর চিঠিটি পড়তে পারবেন।

রোমাঁ রোলাঁ লিখিত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী ও বিবেকানন্দ-জীবনী শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দকে পাশ্চাত্যের মানুষের কাছে পরিচয় করিয়ে দেয়। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্যের সুপরিচিত অপেরা-গায়িকা মাদাম এমা কালভে অবিলম্বে গ্রন্থ-দুটি পাঠ করে ফেলেছিলেন। স্বামীজীকে ঘনিষ্ঠভাবে তিনি জানতেন এবং তাঁর কথা রোলাঁর 'বিবেকানন্দ-জীবনী'তে উল্লিখিতও হয়েছে। গ্রন্থ-দুটি পাঠ করে তিনি যে আনন্দলাভ করেছিলেন তা প্রকাশ করে তিনি রোমাঁ রোলাঁকে চিঠি লেখেন। রোলাঁ তার উত্তরে ফরাসী ভাষায় যে-চিঠিটি তাঁকে লিখেছিলেন, সেটি ফ্রান্সের মিলানে মাদাম কালভের জিনিসপত্রের মধ্যে স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ আবিষ্কার করেছিলেন। চিঠিটি এবং তার বাঙলা অনুবাদ নিচে দেওয়া হলো।

সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত
গভঃ হাউসিং এস্টেট, পোঃ সোদপুর
উত্তর চব্বিশ পরগনা

(ফরাসীতে লেখা রোমাঁ রোলাঁর চিঠির ইংরেজী অনুবাদ)

Villa Olga
Villeneuve (Vaud)
Switzerland
4 April 1930

Dear Madame,

I am deeply touched by your letter. How happy I am that my book did not in any way disappoint the eyes which had the good fortune to see the great Swami and to retain devotedly his image. But it now seems to me that my eyes too have seen him. I lived so intimately with him and with Paramhansa in these latter years that it is as though I was seated day after day in the little room at Dakshineswar on the bank of Ganga.

I hope that the good effect of that great thought may enter into the soul of the West, wounded but still hard and contracted. It is a serious moment for the West, which has learnt nothing from the troubles it has already had. If it doesn't do something to gain possession of itself, the spell will be cast. It certainly won't be the first great Empire in the world that will have crumbled. The flame of the spirit will find—will even create—other places to dwell. It is never extinguished.

Please be assured, dear Madame, of my respectful fellow-feeling.

Romain Rolland

(বঙ্গানুবাদ)

ভিলা ওলগা
ভিলেনিউভ (ভদ)
সুইজারল্যান্ড
৪ এপ্রিল ১৯৩০

প্রিয় মাদাম,

আপনার পত্রখানি আমাকে গভীরভাবে অভিভূত করেছে। সেই মহান স্বামীকে—একদিন যাঁর নয়নদুটি প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল এবং যিনি তাঁর ভাবমূর্তিকে সর্বদা ভক্তিভরে ধারণ করে আছেন—আমার গ্রন্থখানি যে তাঁকে কোনভাবেই নিরাশ করেনি, তাতে আমি কতই না সুখী। তবে এখন আমার মনে হচ্ছে যে, আমার দুটি চোখও তাঁকে দেখেছে। ইদানীংকালের এই কয়েকটা বছর আমি তাঁর ও পরমহংসদেবের এত নিবিড় সাহচর্যে বাস করেছি যে, আমার বোধ হয়েছে আমি যেন দিনের পর দিন দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাতীরের সেই ছোট ঘরটিতে বসে আছি।

আমার প্রত্যাশা এই যে, সেই মহান চিন্তার মঙ্গলকর প্রভাব প্রতীচ্যের হৃদয়ে হয়তো বা প্রবেশ করবে—যে-হৃদয় আঘাতে আঘাতে ক্লিষ্ট, তথাপি আজও কঠিন ও সঙ্কুচিত। পাশ্চাত্যের কাছে এটি একটি উদ্বেগজনক মুহূর্ত—যে পূর্বের দুঃখদুর্বিপাক থেকে কিছুই শিক্ষা গ্রহণ করেনি। যদি সে নিজের ওপর প্রভুত্ব লাভ করার জন্য কোন প্রয়াস না করে তবে ঘোর দুর্যোগ ঘনিয়ে আসবে। পৃথিবীর ইতিহাসে ধ্বংস হওয়ার ক্ষেত্রে এটি নিশ্চয় প্রথম সাম্রাজ্যরূপে গণ্য হবে না। আত্মার শিখা অন্যত্র বাসযোগ্য স্থান খুঁজে নেবে, এমনকি সৃষ্টি করবে। তা কখনো নির্বাপিত হয় না।

প্রিয় মাদাম, একজন সমভাবাপন্ন মানুষের প্রতি আমার সশ্রদ্ধ অনুভূতি সম্পর্কে আপনি আশ্বস্ত হতে পারেন।

রোমাঁ রোলাঁ

একটি অলৌকিক দর্শন

পরম পূজনীয় স্বামী বিজয়ানন্দ (পশুপতি মহারাজ) ছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের (রাজা মহারাজের) মন্ত্রশিষ্য (১৮৯৮-১৯৭৩)। তিনি মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজেরও স্নেহধন্য ছিলেন। এপ্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছিলেন: "একদিন তিনি (মহাপুরুষ মহারাজ) তাঁর ঘরে চেয়ারে বসে আছেন। আমি তাঁর পদপ্রান্তে বসে। ঠাকুরঘরের দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'উনিই মালিক, আমি তাঁর কুকুর, আর তুমি হচ্ছ আমার কুকুর।'" সঙ্ঘে যোগদান করার পূর্বে স্বামী বিজয়ানন্দ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করেছিলেন। ইংরেজী ভাষা ছাড়াও তিনি আরো পাঁচটি বিদেশী ভাষা জানতেন। তিনি অসাধারণ কর্মশক্তিসম্পন্ন ও তেজস্বী সন্ন্যাসী ছিলেন। তিনি অতি চিত্তাকর্ষক বক্তৃতা দিতেন এবং শ্রোতারা তাঁর ভাষণ শুনে মুগ্ধ হতো। মঠ ও মিশন কর্তৃপক্ষ যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, লাতিন আমেরিকায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর বাণী প্রচারের জন্য একটি নিজস্ব শাখাকেন্দ্র স্থাপন করবেন, তখন কর্তৃপক্ষ স্বামী বিজয়ানন্দকে ঐ কাজের গুরুদায়িত্ব দিয়ে ১৯৩৪ সালে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েন্স এয়ার্স-এ পাঠিয়ে দেন। ফলে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে দক্ষিণ আমেরিকায়। একারণে এদেশে তাঁকে দেখার, তাঁর সঙ্গে আলাপ করার বা তাঁর মনোমুগ্ধকর ভাষণ শোনার সৌভাগ্য কম লোকেরই হয়েছে। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিজয়ানন্দ মহারাজ নয়া দিল্লিতে এসেছিলেন। নয়া দিল্লি আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারী ও স্থানীয় ভক্তদের অনুরোধে ২১।২। ১৯৬৮ বেলা ১০টায় আশ্রম-মন্দিরের নিচের তলায় তিনি এক ঘরোয়া পরিবেশে মিলিত হন। প্রথমে তিনি তাঁর পূর্বাশ্রমের কিছু ঘটনা বলেন, তারপর মঠে যোগদান করার পরের কিছু অভিজ্ঞতার কথা বলেন এবং সর্বশেষে তিনি সাশ্রু নয়নে তাঁর নিজের জীবনের একটি অলৌকিক দর্শনের কথা ভক্তদের জানান। তাঁর মুখে শোনা তাঁর সেই অলৌকিক দর্শনটি 'উদ্বোধন'-এর পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিচ্ছি।

একবার স্বামী বিজয়ানন্দ শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমা তখন তাঁকে বলেছিলেন যে, কাশীতে গেলে তিনি যেন লাটু মহারাজকে (শ্রীমৎ স্বামী অদ্ভুতানন্দ মহারাজ) দর্শন করেন। কিছুকাল পরে বিজয়ানন্দ মহারাজের কাশী যাওয়ার সুযোগ আসে। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নির্দেশমতো একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নেহধন্য সেবক ও পার্ষদ লাটু মহারাজকে দর্শন করতে যান। সেসময়ে তিনি কাশীতে হাজারবাগ অঞ্চলে একটা পুরনো বাড়ির দোতলায় থাকতেন। স্বামী বিজয়ানন্দের সঙ্গে কথাবার্তার শেষে লাটু মহারাজ তাঁকে প্রশ্ন করেন: "কিরে, কাশীতে এসেছিস, রোজ গোঙ্গায় চান করছিস তো? বিশ্বনাথের মাথায় জল ঢালছিস তো?" (পশুপতি মহারাজ হাসতে হাসতে এভাবে প্রশ্নদুটির উল্লেখ করেছিলেন।) লাটু মহারাজের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন: "মহারাজ, কাশীর গঙ্গার জল বড্ড নোংরা, তাই গঙ্গায় স্নান করি না। আর আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে নিবেদন করছি যে, শৈশবে আমি বাবা ও মাকে হারাই। মামা ও মামীমার স্নেহ ও যত্নে বড় হয়েছি এবং লেখাপড়া শিখেছি। পিতৃমাতৃসম মামা-মামীকে ছেড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে নিবেদন করেছি। মঠে যোগ দেওয়ার পরে অনেকবার পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে বলেছেন, 'ঠাকুরকে ধরে থাক, ভক্তি মুক্তি সব হয়ে যাবে।' সেজন্য একমাত্র শ্রীশ্রীঠাকুরকে ছাড়া আর কাউকে চিন্তাই করতে পারি না। ফলে ঐ পাথরের নুড়িতে জল ঢালতে যাই না।" একথা শুনে লাটু মহারাজ পশুপতি মহারাজের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেন: "হাসপাতালের নলের (সেবাশ্রমের কলের জলের ইঙ্গিত করেছিলেন) জলে বুঝি চান করিস? আচ্ছা।"

এঘটনার কদিন বাদে এক বিকালে স্বামী বিজয়ানন্দ আরেকজন মহারাজের সঙ্গে দশাশ্বমেধ ঘাটে বেড়াতে যান এবং দুজনে সিঁড়ির ওপর বসে গঙ্গার দৃশ্য দেখতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ পশুপতি মহারাজের গোটা শরীর ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করে। তাঁর এই অবস্থা দেখে সঙ্গী মহারাজ বিচলিত হয়ে পড়েন এবং পাছে তিনি পড়ে যান তাই তাঁকে জাপটে ধরে থাকেন। পশুপতি মহারাজ অদূরে দেখতে পান, গঙ্গা থেকে শুভ্রবর্ণ বিরাট এক সুদর্শন মূর্তি (মহারাজ বলেছিলেন, দুধের মতো সাদা নয়, বরফের মতোও নয়—অদ্ভুত একটা রঙ) আস্তে আস্তে আকাশের দিকে উঠছে। মূর্তিটির বড় বড় চোখ, সুন্দর নাক, দু-কানের পাশ দিয়ে বিরাট জটা ঝুলছে—সেই সৌন্দর্য বর্ণনা করা যায় না। সঙ্গী মহারাজ কিছুই দেখতে পেলেন না—তিনি শুধু মহারাজের কম্পিত দেহটি জড়িয়ে ধরে রইলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরাট মূর্তিটি আকাশে মিলিয়ে যায়। পশুপতি মহারাজের কম্পমান দেহও আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে যায়। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকেন। তারপর সঙ্গীকে সেবাশ্রমে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে তিনি লাটু মহারাজের আস্তানার দিকে রওনা হন। তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। রাস্তার দুপাশের দোকানপাটে আলো জ্বলে উঠেছে এবং বিভিন্ন মন্দিরে সন্ধ্যারতির ঘণ্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তিনি লাটু মহারাজের আস্তানায় পৌঁছে যখন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছিলেন (তখন তিনি অর্ধেক সিঁড়িও অতিক্রম করেননি), সেইসময় ঘরের ভিতর থেকে একটা গুরুগম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল: "কি রে, আজ কি দেখলি?" বিজয়ানন্দ মহারাজ ঘরের

মধ্যে ঢুকেই লাটু মহারাজের পা দুখানা জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো কাঁদতে থাকেন ও বলেন : "মহারাজ, আমি মহা অপরাধ করেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আপনাকে কথা দিচ্ছি, যতদিন কাশীতে থাকব প্রতিদিন গঙ্গায় স্নান করব আর স্নানের শেষে এক কমণ্ডলু পবিত্র গঙ্গার জল ভক্তিভরে বাবা বিশ্বনাথের মাথায় ঢালব।"

পীযূষকান্তি রায়
চিত্তরঞ্জন পার্ক
নিউ দিল্লি-১১০০১৯

প্রসঙ্গ 'ডায়াবিটিস রোগে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রগতি'

'উদ্বোধন'-এর গত আশ্বিন ১৪০৭ সংখ্যায় সমীরকুমার দাসের 'ডায়াবিটিস রোগে আয়ুর্বেদ চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রগতি' শীর্ষক পত্র মারফৎ ডায়াবিটিস রোগে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ভূমিকা এবং অবদান সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানলাভ করলাম। এজন্য শ্রীদাসকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তাঁর লেখা চারটি ওষুধের মধ্যে আমি কোজেন্ট ডিবি (Cogent DB) সম্পর্কে আরো কিছু জানতে চাই। বিশেষত আমেরিকার মিনেসোটার মেয়ো ক্লিনিকে ডায়াবিটিস বিষয়ে গবেষণারত কেরলীয় ডাঃ কুমারন নায়ারের কোজেন্ট ডিবি সম্পর্কে সর্বশেষ গবেষণার ফলাফল আমার জানতে বিশেষ আগ্রহ। এব্যাপারে 'উদ্বোধন'-এর সহযোগিতা প্রার্থনা করি। এই বিষয়ে কোন প্রবন্ধ প্রকাশ করলে খুবই ভাল হয়। কারণ, এতে আমার মতো অনেক ডায়াবিটিক রোগীই সবিশেষ উপকৃত হবেন।

কমলকুমার দে
জি. আই. পি. কলোনী
হাওড়া-৭১১৩২১

প্রসঙ্গ 'স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়'

'উদ্বোধন'-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত ডাঃ সত্যানন্দ চক্রবর্তীর 'স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়' অতীব মূল্যবান রচনা। এই প্রবন্ধগুলি আমাদের নানা প্রশ্নের সমাধান দিয়েছে। এই ক্রমিকের ২১তম কিস্তিতে (মাঘ ১৪০৭ সংখ্যায়) তিনি উপবাস দ্বারা বহুমূত্ররোগ নিরাময়ের কথা লিখেছেন। আমার ধারণা ছিল, বহুমূত্র রোগীর কখনোই উপবাস করা উচিত নয়, তাতে রক্তে শর্করার মাত্রা কমে গিয়ে বিপত্তি হতে পারে। তাছাড়া অনেক ঘন্টা না খাওয়ার পর পরিমাণে আহার করলে অগ্ন্যাশয় থেকে হঠাৎই অধিক মাত্রায় ইনসুলিন ক্ষরণের সম্ভাবনা থাকে, যাতে হাইপোগ্লাইসিমিয়ার মতো ভয়াবহ উপসর্গ দেখা দিতে পারে। আমার মনে হয়, কোন যৌবনোত্তর সুস্থ ব্যক্তি—যাঁর বহুমূত্র নেই—সপ্তাহে একবেলা উপবাস করলে ভবিষ্যতে বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমাতে পারেন। এব্যাপারে ডাঃ চক্রবর্তী আলোকপাত করলে বাধিত হব।

আলোককুমার চৌধুরী
অধ্যাপক, ভূতত্ত্ব বিভাগ, আই. আই. টি.
খড়্গপুর-৭২১৩০২, মেদিনীপুর

একটি গানের কথাগুলি জানতে চাই

আমি খুব ছোটবেলায় একটি গান শিখেছিলাম। তারপর সেটি হারিয়ে ফেলেছি শৈশবের দিনগুলির মতো। আজ জীবনের অপরাহ্ণবেলায় অধ্যাত্মরসসমৃদ্ধ গানগুলি গাইতে গাইতে, খুঁজতে খুঁজতে এসে দাঁড়িয়েছি ঐ গানটির প্রথম পঙ্ক্তিতে। তারপর থেকে কথা খুঁজে বেড়াচ্ছি। কোন সহৃদয় ব্যক্তি যদি আমার বাকি কথাগুলি খুঁজে দেন (সম্ভব হলে স্বরলিপি-সহ) এবং জানিয়ে দেন গানটি কার লেখা, তাহলে আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব। গানটির আরম্ভ এই কথাগুলি দিয়ে—"তোর পূজা তুই শিখিয়ে দে মা শিখিয়ে দে তোর আরাধনা।"

ফুল্লরা মল্লিক
সুরেন সরকার রোড
কলকাতা-৭০০ ০১০

বসুমতী-মা : এক অবিস্মরণীয় সান্নিধ্য

'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১০৪৭ সংখ্যায় নয়া দিল্লি থেকে শ্রীমতী কল্যাণী করের 'বসুমতী-মা'কে নিয়ে লেখা চিঠিখানি পড়ে অনেকদিন আগে তাঁর পুণ্য সান্নিধ্যে কয়েকটি দিন কাটানোর সৌভাগ্যস্মৃতি মনে পড়ে গেল। আর সেই অসাধারণ অভিজ্ঞতার কথা জানাতেই এই সামান্য চেষ্টা।

তিন দশকেরও বেশি হলো তাঁর দর্শন পেয়েছিলাম। এই অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বময়ীর কাছে বসে, তাঁর মুখে ঠাকুরের কথা শোনার কৃপালাভ করে ধন্য হয়েছি, পরিপূর্ণ হয়েছি—যা আজো মনের স্মৃতিকোঠায় সযত্নে রক্ষিত। এই মহাযোগিনী নীরবে সকলের অন্তরালে নিজের জগতে রামকৃষ্ণ-নাম জপে এবং রামকৃষ্ণময় হয়ে বাস করতেন। মঠ-মিশনের সন্ন্যাসীরা ছাড়াও ভক্তজনেরা তাঁর কথা শুনে মাঝে মধ্যে তাঁকে দর্শন করতে যেতেন। তিনি আমাদের কাছে 'ঠাকুমা' ছিলেন। ঐ নামেই আমরা তাঁকে ডাকতাম। তাই হয়তো তাঁর অত কাছে যেতে পেরেছিলাম, আর তিনিও আমাদের কাছে বেশ স্বচ্ছন্দ ছিলেন। আসলে বসুমতী-মায়ের ছোট নাতনী প্রণতি মুখোপাধ্যায় আমার ও আমার স্বামীর (অধ্যাপক অসীম চৌধুরী) বন্ধু। বসুমতী-মা এবং তাঁর স্বামী 'বসুমতী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা রামকৃষ্ণ-অন্তপ্রাণ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। সতীশচন্দ্রের পাঁচ

কন্যা ও একটিমাত্র পুত্র। সতীশচন্দ্রের বড় মেয়ে দীপ্তি। তারপর একমাত্র পুত্র রামচন্দ্র। তারপর চার কন্যা—প্রীতি, ভক্তি, আরতি ও প্রণতি। প্রীতি উনিশ বছর বয়সে টাইফয়েডে মারা যায়। দুবছর পর রামচন্দ্র মারা যায় মাত্র ২৩ বছর বয়সে ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৪ (১৬ ফাল্গুন ১৩৫০)। সতীশচন্দ্রের মৃত্যু হয় ২৬ এপ্রিল ১৯৪৪ (১৩ বৈশাখ ১৩৫১)।

যাই হোক, একবার কাশীতে কিছুদিন ছুটি কাটানোর ইচ্ছা হলো। আমরা স্বামী-স্ত্রী, আমাদের ছোট ছোট দুই ছেলে আর আমার ছোট ভাই প্রশান্ত (বল)—এই পাঁচজন মিলে প্রণতির ব্যবস্থাপনায় কাশীতে গিয়ে বসুমতী-মায়ের বাড়িতে উঠেছিলাম। বাড়ির নাম 'রামাবাস' হলেও স্থানীয় লোক 'বসুমতী মাঈর বাড়ি' বলত। বসুমতী-মায়ের সম্বন্ধে তখনো আমরা কিছুই জানতাম না। প্রণতিও কখনো কিছু বলেনি। ছোটবেলা থেকে মহালয়ার দিন বেলুড় মঠে যেতাম বাবা-মার হাত ধরে তাঁদের গুরুদেব স্বামী অখণ্ডানন্দজীর জন্মতিথির দিন। ছোটবেলা থেকেই ঠাকুর-মা সম্পর্কে কিছু কিছু শুনেছিলাম, কিন্তু তাঁদের এই 'স্নেহধন্যা'র কথা জানা ছিল না।

আমরা যে কাশীতে বসুমতী-মায়ের বাড়িতে যাচ্ছি—এখবর দেওয়াই ছিল। আমরা পৌঁছাতে আমাদের নিচের ঘর খুলে দেওয়া হলো। পাঁচিল-ঘেরা দোতলা বাড়ি, সামনে বাগান। বাড়িটি ও বসুমতী-মাকে দেখাশোনা করত ২-৩ জন গোয়ালা। তাদের মধ্যে একজন ছিল বুদ্ধরাম—ডাকনাম বুদ্ধ। সে বসুমতী-মাকে দেখাশোনা করত। বাগান দেখাশোনার জন্যও মালী ছিল একজন। আর এসবই হতো কাশীর রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ মহারাজের তত্ত্বাবধানে। বসুমতী-মায়ের নাতনীরা (সতীশচন্দ্রের মেয়ে—দীপ্তি, ভক্তি, আরতি ও প্রণতি) মাঝে মাঝে গিয়ে ওখানে কাটিয়ে আসতেন। প্রণতির বড়দিদিই বেশি যেতেন। বুদ্ধর কাছেই শুনলাম, 'বুড়ি মাঈ' দোতলার একটা ঘরে থাকেন। তিনি চট করে কারো সাথে দেখা করতে বা কথা বলতে চান না। তাই অপেক্ষা করতে হলো। প্রথম দিন তাঁর অনুমতি পাওয়া গেল না বলে দর্শন হলো না। দ্বিতীয় দিন দর্শনের জন্য আবার প্রার্থনা জানালাম বুদ্ধর মারফৎ। জানালাম, আমরা তাঁর নাতনী প্রণতির বন্ধু, কলকাতা থেকে এসেছি এবং প্রণতি বলে দিয়েছে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য। তখন অনুমতি পাওয়া গেল।

তৃতীয় দিন সকাল দশটা-সাড়ে দশটা নাগাদ আমরা ওপরে উঠলাম। দোতলায় উঠে বারান্দা পেরিয়ে সোজা যে-ঘরটি চোখে পড়ে, সেই ঘরে উনি থাকতেন। সারা বাড়িতে অতি সাধারণ আসবাবপত্র। যে-ঘরটিতে উনি থাকতেন, সেই ঘরের একটি ছাড়া বাকি জানালাগুলি বন্ধ থাকত। সেই জানালার পাশে তিনি মেঝেতে ফরাসের ওপর পাতা সাদা চাদরে বসেছিলেন। জানালা দিয়ে তির্যকভাবে একটুকরো রোদ এসে ঘরে পড়েছে। তিনি চেয়ে বসেছিলেন সেদিকে। সেই প্রথম দর্শন 'তাপসী যোগিনী' বসুমতী-মাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের কোলেপিঠে চড়েছেন তিনি। ঠাকুরের ও মায়ের স্নেহে, প্রশ্রয়ে, আদরে পালিতা। তাঁর 'ভবতারিণী' নামটি স্বয়ং ঠাকুরের দেওয়া। ছোট করে ছাঁটা চুল, ক্ষীণতণু, শ্যামাঙ্গিনী বসুমতী-মা। অঙ্গে কাপড়টি কোনমতে জড়িয়ে রাখা। প্রণাম করতে গেলাম, বললেন : "দূর থেকে প্রণাম কর, ছুঁয়ো না।" তিনি কাউকে ছুঁতে দিতেন না—একমাত্র বুদ্ধ ছাড়া। কানে তিনি কম শুনতেন, তাই আমাদের বেশ জোরে কথা বলতে হতো। সংসারের সব মায়া থেকে মুক্ত হয়ে এক ভাবের রসে নিজেকে জারিয়ে নিয়ে তিনি ঐ ঘরটিতে স্বেচ্ছাবন্দিনী হয়েছিলেন। আর সেই ভাব-রস হলো পরম অমৃত—রামকৃষ্ণময় আনন্দরস। সেই রসে মজে তিনি সদা আত্মস্থা থাকতেন। যে রুদ্রাক্ষের মালাটি সদা তাঁর কাছে থাকত, সেটি ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরেরই দেওয়া। বসুমতী-মা সেটি তাঁর কাছ থেকে 'আদায়' করেছিলেন। ঠাকুরই বসুমতী-মায়ের সম্বন্ধ করে বিয়ে দেন। পাত্র উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ঠাকুরের পরম ভক্ত। বসুমতী-মার যখন বিয়ে হয় তখন তাঁর বয়স অল্প, তাই বাপের বাড়ি চলে এসে আর ফিরতে চাইতেন না। ঠাকুর অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁকে শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। একবার এমনটি ঘটতে বসুমতী-মা ঠাকুরকে বললেন : "যেতে পারি যদি তোমার গলার ঐ জপের মালাটি আমায় দাও।" ঠাকুর যত তাঁকে বোঝান যে, এটি তোকে দিই কি করে, তুই অন্য কিছু চেয়ে নে; কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। অগত্যা ঠাকুরকে রাজি হতে হলো। জপের মালাটি হস্তগত করে বসুমতী-মা সে-যাত্রায় শ্বশুরবাড়ি যান। অবতারবরিষ্ঠের নিজ হাতে দেওয়া তাঁর গলার সেই রুদ্রাক্ষের মালাটি দেখার পরম সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমা—দুদিক থেকেই আত্মীয়তা ছিল বসুমতী-মায়ের। ছোটবেলায় তিনি কত দুষ্টুমি করেছেন ঠাকুর ও মায়ের সাথে তা রসিয়ে বর্ণনা করতেন। আস্তে আস্তে হাত নেড়ে অনেকটা কথকতার ভঙ্গিতে বলতেন। আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম সেই কথা, আর মনে হতো যেন আমাদের সামনেই ঘটে চলেছে একের পর এক দিব্যলীলা। মেজাজ ভাল থাকলে যেমন স্বেচ্ছায় ডেকে এনে তিনি কথা বলতেন, শুনতেন, তেমনি মাঝেমধ্যে কোন কারণে রেগে চেঁচামেচিও করতেন। তখন কাছে যাওয়ার সাধ্য ছিল না কারো—যতক্ষণ না শান্ত হন।

তাঁর কাছেই শুনেছি, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর তাঁর ঘরে একদিন বসে আছেন। হঠাৎ ভবতারিণী দেখেন, ঠাকুরের শরীর ঘিরে হাজার জ্যোৎস্নার আলো। ক্রমশ সেই আশ্চর্য সুন্দর আলো বাড়তে বাড়তে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরকে ডুবিয়ে দিয়ে যেন বিশ্বচরাচরকে ঢেকে দিল স্বর্গীয় মহিমায়। ভবতারিণীর চোখ ধাঁধিয়ে গেল, জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন ঠাকুরের কোলে। এইরকম দর্শন তাঁর দু-তিনবার হয়েছিল। এই দর্শনের কথা তিনি যখন তাঁর সঙ্গীসাথীদের বলতে লাগলেন, তখন শ্রীশ্রীমা তাঁর ঘোমটার মধ্যে ভবতারিণীর মুখটি টেনে নিয়ে বলতেন : "চুপ, কাউকে কিছু বলবিনি। ওসব কথা বলতে নেই।" সুযোগ পেলেই ভবতারিণী ঠাকুরকে কেবল ধরতেন ঐ 'আলো'

দেখাবার জন্য। বলতেন : "দ্যাখাও, তোমার ঐ আলো দ্যাখাও।" ঠাকুর কেবল তাঁকে ভোলাতেন নানা কথায়।

এমনি করে তাঁর কাছে ঠাকুরের কথা, শ্রীশ্রীমায়ের কথা, স্বামীজীর সাথে যে নানা খুনসুটি হতো—সেইসব কথা শুনতাম। শুনতাম তাঁর স্বামীর কথা, শ্বশুরবাড়ির কথা। শুনেছিলাম, ঠাকুরের মহাসমাধির পর শ্মশানযাত্রার সময় উপেন্দ্রনাথকে সাপে কাটার কথা এবং অন্তরীক্ষ থেকে ঠাকুরের অভয়বাণীতে সে-বিষ নির্বিষ হয়েছিল—সে-কথাও। শুনতাম আর মন ভরে উঠত কানায় কানায়। সেই ভাল লাগার মুহূর্তগুলি আজো অম্লান—ভাস্বর।

আমার ছোটভাই প্রশান্তকে বসুমতী-মা খুব পছন্দ করতেন। প্রশান্ত মজা করে তাঁর পিছনে লাগত। বলত : "ঠাকুমা তোমাকে ছুঁয়ে দিই? এই দিলাম ছুঁয়ে।" আর উনি কপট রাগের ভান করে বলতেন : "খবরদার, আমায় ছুঁবি না, কাছে আসবি না। দূর থেকে কথা বলবি।" এইসব স্মৃতি কি ভোলা যায়? প্রশান্ত আগেই কলকাতা চলে এসেছিল। আসার আগে ঠাকুমাকে বলল : "ঠাকুমা, আমি তো ফিরে যাচ্ছি; তুমি নিজের হাতে একটা কবিতা আমায় লিখে দাও।" বসুমতী-মা কবিতা লিখতেন মন চাইলে। প্রথমে রাজি হচ্ছিলেন না। পরে প্রশান্ত বারবার অনুরোধ করলে রাজি হন। একটি খাগের কলম ছিল তাঁর, সেটি দিয়ে লিখতেন। সেই খাগের কলমে কাগজের ওপর শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের চরণবন্দনা করে প্রশান্তকে লেখা তাঁর আশীর্বাণীটি হলো—"জয় গুরুদেব/ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ জয়তি/ নমো নমস্তে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব/ প্রভু নমো নমস্তে/ প্রণমি ব্রহ্মময়ী শ্রীশ্রীসারদামণি শ্রীমাতঃ/ শ্রীমান প্রশান্তকুমার/ তুমি যে আনন্দ মম প্রাণে করিয়াছ দান/ তার সমুচিত বিনিময় আমি তোমায় কি করিব প্রদান/ ওরে ভাই প্রশান্তকুমার, আমি কি করি বিধান/ সচ্চিদানন্দময় ইষ্ট শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম তুমি সর্বদাই বন্দনা করিবে/ তোমার মনের বাসনা যত সব পূর্ণ হবে।/ অসাধ্য সাধন হয় কৃপা হলে তাঁর।/ মনে রেখো সার বাণী তব ঠাকুরমার।

করুণাময় কৃপাসিন্ধু ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রভুর কৃপায় নিরবধি সবল সুস্থ শরীরে তুমি দীর্ঘজীবী হও।"

পরে কলকাতায় ফিরে প্রণতির কাছে বসুমতী-মার জীবনের অনেক অজানা তথ্য জেনেছিলাম। জানতে পারি, এই সর্বত্যাগিনী তাপসীকে জীবনে অনেক শোক-দুঃখ সহ্য করতে হয়েছে। তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয় ৩১ মার্চ ১৯১৯। সে আঘাত তিনি কাটিয়ে ওঠেন। তারপর নাতনী প্রীতির মৃত্যু এবং বছর দুয়েক পর দুমাসের ব্যবধানে প্রথমে একমাত্র পৌত্র রামচন্দ্রের এবং পরে একমাত্র পুত্র সতীশচন্দ্রের মৃত্যুতে তিনি ভয়ানক শোক পান। এই আঘাত সহ্য করতে না পেরে কাউকে কিছু না জানিয়ে সেদিনই কলকাতার বাড়ি থেকে একবস্ত্রে তিনি বেরিয়ে যান। তাঁকে বাড়ি থেকে একা বেরিয়ে যেতে দেখে একজন কর্মচারী ওঁর পিছনে যান। তাঁকে হরিদ্বারের ট্রেনে উঠতে দেখে কর্মচারীটি বাড়িতে এসে খবরটি দেন। তখন সতীশচন্দ্রের স্ত্রী (তিনিও খুব অসুস্থ ছিলেন) ও বড়মেয়ে দীপ্তি রামকৃষ্ণ মিশনকে বিষয়টি জানান। মিশনের সন্ন্যাসীরা হরিদ্বারে অনেক খুঁজে শ্মশানের ধারে এক ঝুপড়ি থেকে তাঁকে উদ্ধার করে এনে কাশীর 'রামাবাস'-এ রাখেন। ('রামাবাস' নামটি পৌত্র রামচন্দ্রের নামে।) বাকি জীবন তিনি এখানেই কাটান।

তাঁর খাওয়া ছিল অতি সামান্য। সারাদিনের পর রাতে মোষের কাঁচা দুধে কলা মেখে খেতেন। একাদশী পড়লে তো কথাই ছিল না। আগের রাতে দুধ-কলা খাওয়া, পরদিন একাদশীর নির্জলা উপবাস। কিন্তু একাদশীর উপবাসের জন্য যে পরদিন সকালেই উপবাস ভেঙে কিছু মুখে দিতেন তা নয়। প্রকৃত উপবাস ভঙ্গ হতো রাত্রিবেলা—সেই দুধ-কলা গ্রহণ করে। অথচ তার জন্য তাঁর মধ্যে কোন দুর্বলতা লক্ষ্য করা যেত না। অফুরন্ত আত্মশক্তি ও অসাধারণ ইচ্ছাশক্তির অধিকারিণী ছিলেন বসুমতী-মা!

ছোটবেলা থেকেই তিনি বহু তীর্থভ্রমণ করেছিলেন। স্বামীর সঙ্গে তো গিয়েছিলেনই, পরবর্তী জীবনে মিশনের সাধুদের সঙ্গে এবং অন্যান্য সঙ্গীসাথী পেলেই তিনি তীর্থ করতে বেরিয়ে পড়তেন। কৈলাস ও মানস সরোবর, কেদার-বদরী (একাধিক-বার) এবং আরো বহু তীর্থেই তিনি গিয়েছিলেন। এলাহাবাদ ও হরিদ্বারে কোন 'কুম্ভ'ই তাঁর বাদ যেত না। এই সময়টা উনি কল্পবাস করতেন। কাশীতে থাকাকালীন যতদিন পেরেছেন 'নবরাত্রি'তে পায়ে হেঁটে কাশী পরিক্রমা করেছেন। এছাড়াও পায়ে হেঁটে কাশীর মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বেড়াতেন। শুনেছি, মিশনের সাধুদের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে গিয়ে তিনি ভক্তসমাবেশে শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলামাহাত্ম্যও বর্ণনা করেছেন। আমরা যখন ওঁকে দেখেছি, তখন অবশ্য বয়সের জন্য উনি আর বেরতেন না। তবে কামারপুকুর ও জয়রামবাটীতে একবার এসেছিলেন, কিন্তু কলকাতায় আর আসেননি। বলেছিলেন : "আর গঙ্গা পার হব না।"

এদিকে আমাদের ফেরার সময় হয়ে গেল। তাঁর সান্নিধ্য আর পাব না মনে হতে মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কয়টা দিন কোথা দিয়ে কিভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। জানতাম, আর হয়তো আমাদের তাঁকে দর্শন হবে না। আসার সময়ে বিদায় নিতে গিয়ে সেই সর্বত্যাগিনীকে প্রণাম করলাম। তিনি আশীর্বাদ করে ঠাকুর ও মায়ের ছোট দুটি ফটো তুলে দিলেন আমার হাতে। বললেন : "লকেট করে বাঁধিয়ে নিয়ে গলায় পরো, সব বালাই কেটে যাবে।" লকেট করা হয়নি, কিন্তু আজো সযত্নে আমার কাছে রক্ষিত আছে ছবি-দুটি। সেই প্রথম ও শেষ আমাদের বসুমতী-মায়ের সান্নিধ্যে আসা। ৯৬ বছর বয়সে ৫ মার্চ ১৯৭৩ তিনি তাঁর পরমারাধ্য শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে লীন হন।

ছবি চৌধুরী
গ্রোভ লেন, কলকাতা-৭০০০২৬

পৃথিবীব্যাপী ধূমপান সম্পর্কিত মামলা

ধূমপান ব্যাপারে মামলা হতে থাকায় ধূমপান বন্ধ হওয়ার আশা জাগছে। প্রথমে মামলা হয়েছিল আমেরিকায়, তারপরে হচ্ছে পৃথিবীর বহু স্থানে। এর ফলে সিগারেট কোম্পানিগুলি ধূমপান বন্ধ করতে তৎপর সংস্থাগুলির সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য হচ্ছে এবং আমেরিকার প্রদেশগুলি ধূমপান-জনিত অসুখবিসুখের খরচবাবদ প্রতি বছর ১০ বিলিয়ন ডলার খেসারত দিতে রাজি হয়েছে। কোম্পানিগুলি এখন রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে প্রতিবাদী। মিনেসোটা স্টেট মামলা দায়ের করার ফলে মিনিয়েপোলিস, মিনেসোটা, গিল্ডফোর্ড (ইংল্যান্ড) সিগারেট কোম্পানিগুলির গোপন কাগজপত্র বা দলিল জনসাধারণের গোচরে আসছে। তাও তো দলিলগুলির অংশমাত্র এখনো পর্যন্ত প্রকাশ পেয়েছে!

আমেরিকায় ধূমপান সম্পর্কিত মামলা সহজে ও সবসময় সমান ফলপ্রসূ হয়নি। মামলা দায়ের করার প্রথম ৪২ বছর, অর্থাৎ ১৯৫৪ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কোম্পানিগুলি গর্বের সঙ্গে বলত যে, তাদের তখনো পর্যন্ত ধূমপানজনিত ক্ষতিগ্রস্তদের এক পেনিও খেসারত দিতে হয়নি। এই অবস্থা তারা তৈরি করতে পেরেছিল তাদের মামলা করার কৌশলের ফলে, যার জন্য বাদীপক্ষ ও অ্যাটর্নিকে মামলা চালাতে প্রচুর খরচের ধাক্কায় পড়তে হতো। আর. জে. রেনল্ডস টোব্যাকো কোম্পানির নিজস্ব কাগজপত্রের মধ্যে একটি স্মারকলিপিতে লেখা রয়েছে : "যেভাবে আমরা এইসব মামলা জিতেছি, তা আমাদের অর্থ নষ্ট করে নয়, তা পাওয়া গেছে বাদীপক্ষকে সর্বস্বান্ত করে।" যদিও সিগারেট কোম্পানিগুলি ধূমপানের ফলে অসুখ হয়—একথা বরাবর অস্বীকার করে আসছে, কিন্তু তারা আশ্চর্যজনকভাবে জজ ও জুরিদের দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিয়ে আসছে যে, ধূমপানকারী নিজেই এই অভ্যাসের জন্য দায়ী, কারণ ধূমপানের কুফল সকলেই জানে এবং সিগারেট বাক্সে সরকারের দেওয়া বাধ্যতামূলক সতর্কবাণী দেওয়া হয়েই থাকে।

কোম্পানিগুলির এই ধরনের দুর্ভেদ্য ব্যূহ প্রথমে ভেদ হয়েছিল ১৯৯৬ সালে, যখন ব্রুক গ্রুপ লিমিটেড কয়েকটি মামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের টাকা দিয়ে মিটমাট করেছিল। আমেরিকার অন্য কোম্পানিগুলি তখন তাড়াতাড়ি বিভিন্ন প্রদেশের অ্যাটর্নিদের সঙ্গে মিটমাট করতে লাগল। যেসব মামলা বহুদিন ঝুলেছিল, সেগুলিতেও বাদীপক্ষ জিতে গেল। কয়েকজন মিলে অন্য সকলের হয়েও (classaction) মামলা শুরু করল; বিমানে অধূমপায়ী কর্মচারীরা ঐধরনের সকল কর্মীর জন্য মামলা করে জিতে গেল। পরিবেশ দূষিত হয়ে অধূমপায়ীর অসুখ হওয়ার (disease due to enviornmental tobaco smoke) মামলাও চালু হলো। তৃতীয় পার্টির দাবির (third party reimbursement) মামলাও (যেমন সিগারেট কারখানার আশপাশে থাকা লোকরাও তাদের অসুখের জন্য মামলা করা) আরম্ভ হলো। আমেরিকার বাইরে বহু দেশে—অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, জাপান, আয়ার্ল্যান্ড, নরওয়ে, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, তুরস্ক প্রভৃতি দেশে এই ধরনের মামলা রুজু হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার সমস্ত ক্লাব ইত্যাদিতে অধূমপায়ী সদস্যদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে হয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, ব্রিটেনে এধরনের মামলা বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। [দ্রঃ **British Medical Journal, 8 January 2000, pp. 111-112**] ❑

স্বগোত্রভোজী প্রাণী

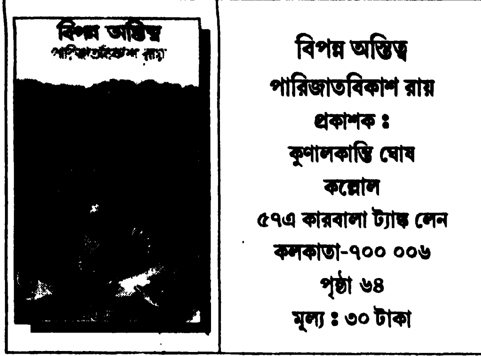
কোন কোন প্রাণী স্বগোত্রভোজী (cannibal) হয়; যদিও এর ফলে ঐ প্রাণী থেকে সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। সাম্প্রতিক এক অনুসন্ধানে জানা গেছে যে, শুঁয়োপোকা তা করে থাকে শিকারী শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে স্বগোত্র প্রাণীকে খেয়ে ফেলার কোন সঠিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন—মধ্য আমেরিকার ভুট্টায় থাকে একধরনের শুঁয়োপোকা (Spodoptera frugiperada), যারা খাবার থাকা সত্ত্বেও স্বজাতিকে খেয়ে ফেলে। সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জেসন চ্যাপম্যান ও ডাভে গুলসন গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, স্বজাতিকে খেয়ে তারা সংক্রমণের ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ে; তাছাড়া আক্রান্ত প্রাণী তাদের দেহে আঘাতও হানে। তাহলে তারা স্বজাতিকে খায় কেন? চ্যাপম্যান সন্দেহ করেন যে, স্বগোত্রভোজী প্রাণী স্বজাতিদের খেয়ে নিজেদের সংখ্যা কমায়, যাতে তারা শিকারী শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সুযোগ কমাতে পারে।* [দ্রঃ **New Scientist, 22 July 2000, p. 12**] ❑

* এই প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানাই, কলকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এ ভাইরাস বিভাগে অধ্যাপক থাকাকালে ঐ বিভাগে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে প্রায় ২,৫০০ সাদা ইঁদুর পুষতে হতো (mouse colony)। কোন রোগীর অসুখের কারণ কোন্ ভাইরাস তা নিরূপণের জন্য দুদিন বয়স্ক ইঁদুরের বাচ্চার মস্তিষ্কে রোগীর রক্তের সিরাম ইঞ্জেকশন দিয়ে তাকে প্রতিদিন পরীক্ষা করতে হতো। এক-একটি খাঁচায় একটি মায়ের সঙ্গে ৬টি বাচ্চা ইঁদুর রাখা হতো। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, খাঁচায় মা-ইঁদুরের নবজাতকের সংখ্যা কম হলে অন্য খাঁচা থেকে নবজাত ইঁদুর আনা হতো। মা-ইঁদুর নিজের বাচ্চা বলেই তাদের পালন করত, তফাৎ করতে পারত না। বাচ্চা অসুস্থ হলে তার মস্তিষ্ক নানা ধরনের পরীক্ষার মাধ্যমে ভাইরাস নিরূপণ করা হতো। মা-ইঁদুর খুবই স্নেহপ্রবণ। ইঞ্জেকশন দিয়ে কোন বাচ্চাকে খাঁচায় দেওয়া মাত্রই মা এসে বাচ্চার গায়ে ইঞ্জেকশনের জায়গা চেটে মুখে করে ধরে তাকে খাঁচার এক কোণে রেখে আসত। আবার দু-তিনদিনের ইঞ্জেকশন-দেওয়া কোন বাচ্চা অসুস্থ হয়ে পড়লে মা-ইঁদুর তাকে খাঁচার এককোণে সরিয়ে রাখত—বোধহয় অন্যান্য বাচ্চাগুলিকে অসুস্থতা থেকে রক্ষা করার জন্য। তবে কখনো কখনো দেখা যেত, অসুস্থ বাচ্চাকে মা খেয়ে ফেলেছে, কারণটা হয়তো একই। সেক্ষেত্রে প্রতি খাঁচার জন্য নির্দিষ্ট কার্ডে লিখে রাখা হতো—'eaten'। আবার অন্য ক্ষেত্রে 'মাউস কলোনি'তে বাচ্চা হওয়ার পরই অজ্ঞাত কারণে মা-ইঁদুর একটি-দুটি বাচ্চাকে খেয়ে ফেলত। উপরি উক্ত সকল ক্ষেত্রেই খাঁচায় যথেষ্ট খাবার থাকা সত্ত্বেও ঐরূপ ঘটনা ঘটত।—জ. কু. স.

ভাষান্তর : জলধিকুমার সরকার

কবির অনুভূতি

শশাঙ্কশেখর মণ্ডল



বিপন্ন অস্তিত্ব
পারিজাতবিকাশ রায়
প্রকাশক :
কুণালকান্তি ঘোষ
কল্লোল
৫৭এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৬
পৃষ্ঠা ৬৪
মূল্য : ৩০ টাকা

কবি পারিজাতবিকাশ রায়ের 'বিপন্ন অস্তিত্ব' নামক কাব্যমালঞ্চে নানা জাতের নানা বর্ণের ৬০টি কবিতা-কুসুম শোভমান। কোথাও আছে রজনীগন্ধার শুভ্রতা ও শুচিতা ('তোমার সান্নিধ্যে'), কোথাও রক্তজবার উল্লাস ('সংগ্রাম'), কোথাও ঝরা শিউলির সুগন্ধ ('অবসন্ন দিন'), কোথাও অশোকের লালিমা ('আশা')। কবিতাগুলি ১৯৭৮ থেকে ১৯৯৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রচিত এবং ৮টি ভাগে বিন্যস্ত।

'প্রণাম' কবিতায় নিবেদিত হয়েছে স্রষ্টা ও সৃষ্টির প্রতি কবির গভীর বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধা। 'চির আমি হারা' কবিতায় আছে পরমকারুণিক এক অদৃশ্য সত্তার প্রতি শরণাগতি। 'তোমারি অপেক্ষায়' কবিতায় অভিব্যক্ত হয়েছে এক মহত্তর শ্রেয়োলাভের আকুতি—গীতার ভাষায়—"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ"। 'দেখা হয়নি আজও' কবিতায় আছে আত্মসাক্ষাৎকারের অভীপ্সা—'আত্মানং বিদ্ধি' মন্ত্রের সাধনার ইঙ্গিত। 'ইচ্ছাহীন' কবিতার মর্মবাণী—'তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র'।

'স্মরণের সরণি বেয়ে', 'ধূসর ঝরাপাতা', 'বন্ধু তোমাকে', 'তোমার সান্নিধ্যে' প্রভৃতি প্রকৃতির ললিত বিতানে ফুটে ওঠা প্রেমের কবিতা-কুসুম। কোথাও আছে পরিতৃপ্তির প্রশান্তি ('তোমার সান্নিধ্যে'), কোথাও আছে অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ('বন্ধু তোমাকে')। সর্বত্র আছে গভীর আবেগানুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত উৎসার—যা সার্থক গীতি-কবিতার প্রাণ।

'সংগ্রাম' পর্বে উন্মোচিত হয়েছে জীবনচেতনার নতুন দিগন্ত। সমাজবাস্তবতা-ঋদ্ধ কয়েকটি অনবদ্য কবিতায় আছে সাধারণ মানুষের জীবনসংগ্রামের রক্তাক্ত প্রতিচ্ছবির পাশাপাশি ভবিষ্যৎ আশা ও স্বপ্নের সোনালী আলোকরেখা।

'অবসন্ন দিন'-এর পটে অঙ্কিত হয়েছে যন্ত্রণাকাতর কবির মানস মানচিত্র। 'বিপন্ন অস্তিত্বের সঙ্কট' হতাশার কুয়াশাঘেরা আবেষ্টনী। আধুনিক যন্ত্রনির্ভর, জড়বাদী, ভোগবাদী, আত্মকেন্দ্রিক, নিঃসঙ্গ, যন্ত্রণাতপ্ত জীবনমরুতে শান্তির মরূদ্যান খুঁজতে গিয়ে মানুষ অশান্তির মরীচিকায় বিভ্রান্ত হয়। তবে বেদনা-বিহুল কবিকণ্ঠে মাঝে মাঝে ধ্বনিত হয়েছে আশাবরী রাগিনীর সুর। আশ্বাস ও বিশ্বাসের ফল্গুধারা এদের মর্মবাণী। সার্থকতার মানদণ্ডে 'রাতের রেলগাড়ি' ও 'চিকিৎসক জীবন' কিছুটা নিষ্প্রভ।

'রাজনীতির আলো-অন্ধকারে' পর্যায়ের কবিতাগুলি কবির বাস্তবনিষ্ঠ সমাজচেতনার ফলশ্রুতি। ভাষা-আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে 'আমার মায়ের ভাষা'। রাজনৈতিক দলের গালভরা প্রতিশ্রুতি, কথার সঙ্গে কাজের অমিল কিভাবে শূন্যতার মরুবালুকায় গুমরে মরেছে—তার চিত্র পাই 'স্বপ্নভঙ্গ' কবিতায়। চীনের তিয়েন আ মেন স্কোয়ারে সহস্র তরুণের আত্মবলিদান হয়ে আছে 'বেদনার্ত স্মৃতি'। 'গড়ো নতুন প্রতিমা' কবিতায় আছে স্বামী বিবেকানন্দের 'জাগ্রত দেবতা' ('The Living God') কবিতার প্রতিধ্বনি।

'বিচিত্রা' পর্বের কবিতাগুলির বৈচিত্র্য মনে দোলা দেয়। প্রতিটি কবিতাই সুখপাঠ্য ও সুনির্দিষ্ট বক্তব্যবাহী। কবি পেশায় চিকিৎসক। নর-নারীর ব্যাধি নিরাময়ে তিনি ব্রতী। কিন্তু সমাজ-মনের ব্যাধি নিয়েও তিনি চিন্তিত, উদ্বিগ্ন। 'এসো নতুন চিকিৎসক' কবিতাটি তাই বিশেষ তাৎপর্যবাহী। বর্তমান পচনশীল সমাজের ক্ষত-নিরাময়ে প্রয়োজন কোন 'ভবরোগ-বৈদ্য' মহাত্মার। কবি কি তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন? 'মানুষের দেখা মেলে না' কবিতাটি পড়লে মনে পড়ে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী—"মানুষ চাই, মানুষ চাই। আর সব হয়ে যাবে।"

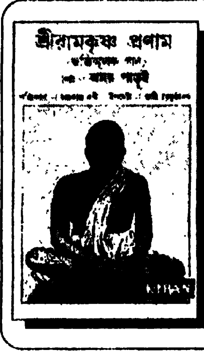
কোথাও কোথাও ব্যক্ত হয়েছে অভিমানক্ষুব্ধ কবিচিত্তের হতাশা ও বিষণ্ণতা। বাল্মীকির শোকার্ত হৃদয় থেকে যেমন শ্লোকের উদ্ভব হয়েছিল, এখানে তেমনি কবির ব্যথিত হৃদয় থেকে জন্ম নিয়েছে 'চলে যাব', 'তোমাদের পৃথিবী থেকে', 'ঘৃণা করো আমায়', 'ক্ষতবিক্ষত হয়ে', 'শিল্পী নয়', 'হাসিটুকু দেখতে দিও' প্রভৃতি কবিতা। 'মৃত্যু তোমাকে ভালবাসতে চাই' কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে কবির মৃত্যুচেতনা—যা তাঁর কাছে মুক্তির নামান্তর।

কবিতাগুলির ভাব ও ভাষা সহজ, সরল, সজীব ও সাবলীল। চিন্তা ও অনুভূতির স্বচ্ছতা এদের সহজাত বৈশিষ্ট্য। প্রচলিত পদ্যছন্দের পরিবর্তে গদ্যছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। দু-একটি কবিতায় আছে অন্ত্যমিল। উপমা ও চিত্রকল্প ব্যবহারে কবি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বানান ভুলের সংখ্যা নগণ্য। কাগজ, মুদ্রণ ও প্রচ্ছদ উচ্চ মানের, মূল্য যথাযথ।

ব্যাকরণের ছুরি-কাঁচিতে কবিতাসুন্দরীর দেহ-ব্যবচ্ছেদ করে তার সৌন্দর্য আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। কবিতা অনুভূতির বিষয়, উপভোগের সামগ্রী, "সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী"। জাতীয় ঐতিহ্যপুষ্ট, সমাজচেতনা-সমৃদ্ধ ও ব্যক্তিগত আবেগে আতপ্ত এই কাব্যের ব্যঞ্জনাধর্মী কবিতাগুলি সুরসিক, বোদ্ধা ও হৃদয়বান পাঠক-পাঠিকার কাছে সমাদৃত হবে বলে আশা করি। ❑

আবেগ আছে, ভাবও আছে আছে প্রশিক্ষণের অভাবও

দেবাশিস দত্ত



শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণাম
পরিবেশক : কিরণ
কথা :
স্বামী চণ্ডিকানন্দ, অমর পাড়ুই, নটরাজ চ্যাটার্জী
কণ্ঠে :
অমর পাড়ুই
পরিচালনা :
চন্দ্রকান্ত নন্দী
মূল্য : ৩০ টাকা

একটা সময় ছিল যখন রেকর্ডে গান গাইতে গেলে শিল্পীকে নিতে হতো যথাযথ প্রশিক্ষণ। কমল দাশগুপ্ত, সুবল দাশগুপ্তর মতো প্রশিক্ষকরা যতক্ষণ না একটা গান সঠিকভাবে শিল্পী গাইতে পারতেন ততক্ষণ সেই গান শিল্পীকে রেকর্ড করার অনুমতি দিতেন না। রেকর্ডের যুগ শেষ হয়েছে। এসেছে ক্যাসেটের যুগ। যেকোন শিল্পীর ক্যাসেটে গান গাওয়ার অধিকার এসেছে, গাইছেনও বহু শিল্পী। দেখা যাচ্ছে, কোন কোন ক্যাসেটের সঙ্গীতায়োজন অত্যন্ত ভাল হচ্ছে কিন্তু শিল্পীর গান সেই মাপের হচ্ছে না। অথচ Track-এ রেকর্ডিং করার সুবিধা থাকায় শিল্পী সহজেই ভুল সংশোধন করে নিতে পারেন। আর তারপরেও যখন কিছু ভুল থেকে যায় তখন তার দায় শিল্পী এবং সঙ্গীত পরিচালকের ওপর বর্তায়।

অমর পাড়ুইয়ের গাওয়া 'শ্রীরামকৃষ্ণ প্রণাম' ক্যাসেটটিতে প্রণাম জানানো হয়েছে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজী—সকলকেই। ক্যাসেটটির গীতিকারদের তালিকায় আছেন স্বামী চণ্ডিকানন্দ, নটরাজ চ্যাটার্জী ও শিল্পী স্বয়ং। কিন্তু কোন্ গান কার রচনা তা ক্যাসেটের ইনলে কার্ড-এ স্পষ্ট করে পাওয়া যায় না। গানের কথা সহজ সরল, 'প্রণাম'-এর উপযুক্ত এবং মনে রাখার মতো। সুরকার শিল্পী নিজেই। যদিও স্বামী চণ্ডিকানন্দ তাঁর 'ডাক দেখি রামকৃষ্ণ বলে' গানটি 'প্রসাদী' সুরেই বেঁধে গিয়েছিলেন, তাই তাতে নতুন করে সুর সংযোজনার প্রশ্ন ওঠে না। এক্ষেত্রে প্রসাদী সুরের সঙ্গে কীর্তনের ভাব মিশিয়ে গাওয়া হয়েছে বলে গানটি শুনতে ভালই লাগে। কিছু কিছু গানে বহুল প্রচলিত সুর খেলা করেছে, যেমন 'এস ভাই নাম গাই' গানটির ক্ষেত্রে। তবু কথার সঙ্গে সুর গানকে কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। সঙ্গীতায়োজন করেছেন সঙ্গীতজগতের অতি-পরিচিত ব্যক্তিত্ব চন্দ্রকান্ত নন্দী। বাঁশী, বেহালা, সেতার প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রিলুড, ইন্টারলুডের চলন গানকে সঠিকভাবে বেঁধে রেখেছে। এককথায় গানের নির্বাচন, সুর এবং সঙ্গীতায়োজন ভালই হয়েছে।

এবার আসি গানের বিষয়ে। শিল্পীর কণ্ঠ শ্রুতিমধুর। বাউলাঙ্গের গান বা লোকগান গাওয়ার উপযুক্ত কণ্ঠ। তুলনায় শাস্ত্রীয় অঙ্গের গানে কণ্ঠের সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করা যায়। শিল্পীর মধ্যে ভাব আছে, বহিঃপ্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় আবেগ আছে, কিন্তু কোথায় যেন একটা ঘাটতি রয়েছে। বাঙলা গান গাইতে গেলে মূল যে দুটি বিষয়ে নজর দিতে হয়, সেগুলি হলো উচ্চারণ এবং গায়নরীতি। এই দুটিই প্রশিক্ষণ-নির্ভর। শিল্পীর উচ্চারণ অনেকক্ষেত্রে বিচ্যুত হয়েছে। যেমন স্বামী চণ্ডিকানন্দের 'ডাক দেখি রামকৃষ্ণ বলে' গানটিতে 'বারেক তারে ডাকলে পরে'-কে বলা হয়েছে—'বারেগ তারে ডাগলে পরে', অর্থাৎ 'ক'-এর উচ্চারণ 'গ'-এর মতো শুনিয়েছে। 'শরণাগতের তুমি মা' গানটিতে 'একদিকে তুমি সতেরও মা'-কে বলা হয়েছে 'এগদিকে তুমি...'। এই গানেরই এক জায়গায় 'ব্রহ্মজ্ঞানী শরৎ' শুনতে লেগেছে 'ব্রহ্মজ্ঞানী শর', 'ৎ'-এর উচ্চারণ অস্পষ্ট। কিছু কিছু জায়গায় গলায় সুর কমও হয়েছে। যেমন—'ডাক দেখি রামকৃষ্ণ বলে' গানটির 'বিষয় লোভে কেন রে মন' অংশে দ্বিতীয়বারে সুর কিছুটা কম লেগেছে। ঐ গানেরই 'এমন দয়াল ঠাকুর' অংশেও সুরের ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। তুলনায় গায়নরীতি প্রতিটা গানের ক্ষেত্রেই ভাল লাগে। শিল্পীকে ভবিষ্যতে উচ্চারণ সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। তবু একথা স্বীকার্য, কোন গানেরই ভাবের খুব একটা বিচ্যুতি হয়নি। অন্তরের অনুভূতি থেকেই গানগুলি গাওয়া, তাই শুনতে ভালই লাগে। ক্যাসেটটির প্রচ্ছদ সুন্দর এবং শব্দগ্রহণও উচ্চমানের। এককথায় এটি সংগ্রহ করে রাখা যায় এবং বারবার শোনা যায়। শ্রোতারা নিশ্চয়ই ক্যাসেটটি শোনার পর গীতিকার, সুরকার, শিল্পী এবং প্রকাশককে ধন্যবাদ জানাবেন। ❑

প্রাপ্তিস্বীকার

শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে
পরিবেশক : সুরপীঠ
কথা :
কাজী নজরুল ইসলাম, স্বামী জীবানন্দ, স্বামী চণ্ডিকানন্দ, অরুণকৃষ্ণ ঘোষ, শচীন্দ্রনাথ বসু, প্রচলিত
কণ্ঠে :
অরুণকৃষ্ণ ঘোষ, চণ্ডীদাস মাল, সুশান্ত দত্ত, সঙ্গীতা দত্ত
সুর : অরুণকৃষ্ণ ঘোষ
আবহ সঙ্গীত : দিলীপ রায়
গ্রন্থনা-ভাষ্যকার : দীপক শীল প্রযোজনা : পার্থ ব্যানার্জী
মূল্য : ৩০ টাকা

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম ও সন্নিহিত অঞ্চলে স্বামী বিবেকানন্দের পদার্পণের শতবর্ষপূর্তি

স্বামী বিবেকানন্দ মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে পদার্পণ ও অবস্থান করেছিলেন ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারিতে। যাতায়াতের পথে ঐ অঞ্চলের কয়েকটি গ্রাম ও শহর তাঁর পাদস্পর্শে ধন্য হয়েছিল। কয়েকটি স্থানে তিনি স্বল্পকালীন বিশ্রামও করেছিলেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনার শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান স্থানীয় ভক্ত, লোহাঘাট রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবা-সমিতির সেবকবৃন্দ, কয়েকটি মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয়ের পরিচালকবৃন্দ, বেলঘরিয়া (কলকাতা) রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থী ভবনের কয়েকজন বিদ্যার্থী, ভক্ত ও সাধুব্রহ্মচারিবৃন্দের সহযোগিতায় সম্প্রতি মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শতবর্ষ পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সদানন্দ প্রমুখ সঙ্গী-সহ ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর কাঠগোদামে ট্রেন থেকে অবতরণ করেছিলেন। সেখানে একরাত বিশ্রামের পর পরদিন ৩০ ডিসেম্বর মায়াবতীর উদ্দেশে রওনা হন এবং ৩ জানুয়ারি ১৯০১ মধ্যাহ্নে মায়াবতীতে পদার্পণ করেন। তাঁর সেই যাত্রাপথের অনুসরণে স্বামী বরদাত্মানন্দ ও স্বামী সত্যবোধানন্দের পরিচালনায় ২২ জন সাধু, ভক্ত ও যুবক গত ২৭ ডিসেম্বর ২০০০ হাওড়া থেকে ট্রেনযাত্রা করে ৩ জানুয়ারি ২০০১ মধ্যাহ্নে মায়াবতীতে উপস্থিত হন। সেখানে তাঁদের স্বাগত জানান সাধু-ব্রহ্মচারী এবং স্থানীয় যুবক ও ভক্তবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে ৪ জানুয়ারি ২০০১ মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে একটি আধ্যাত্মিক শিবির পরিচালিত হয়। প্রায় ৭০ জন ভক্ত শিবিরে যোগদান করেন।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে ১৫ জানুয়ারি ২০০১ স্বামীজীর জন্মতিথিতে অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মুমুক্ষানন্দজীর পরিচালনায় একটি আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক যুবশিবির অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৫০ জন যুবপ্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে।

অনুষ্ঠানের চতুর্থ পর্বে স্বামীজীর যাত্রাপথের অনুসরণে তীর্থযাত্রিদল পদযাত্রা করে ১৮ জানুয়ারি ২০০১ চম্পাবতে উপস্থিত হন। পরদিন তাঁরা টনকপুরে পৌঁছান। স্বামীজীর অবস্থানধন্য কয়েকটি শহরে এই উপলক্ষ্যে সভা অনুষ্ঠিত হয়। চম্পাবতে জেলা পঞ্চায়েত হল (১৮ জানুয়ারি), টনকপুরে রাধেহরি সরকারি মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয় ও সরকারি বালিকা মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয় (১৯ জানুয়ারি), খাটিমাতে খারু সরকারি মাধ্যমিক মহাবিদ্যালয় (২০ জানুয়ারি) এবং পিলিভিতে রাজাসাহেব বাগিচার অট্টালিকায় স্বামী বিবেকানন্দের পদার্পণের শতবর্ষপূর্তি স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানগুলিতে স্বামী মুমুক্ষানন্দজী, স্বামী মুক্তিনাথানন্দ, স্বামী সত্যবোধানন্দ, স্বামী চন্দ্রশেখরানন্দ, স্বামী সোমদেবানন্দ, স্বামী অনুভবানন্দ, স্বামী গৌরীকান্তানন্দ, স্বামী সুনির্মলানন্দ এবং ব্রহ্মচারী স্বাত্মচৈতন্য অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের পঞ্চম পর্বে আশ্রমের পক্ষ থেকে মায়াবতীর পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির দরিদ্র মানুষের মধ্যে কম্বল, সোয়েটার প্রভৃতি শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।



স্বামী বিবেকানন্দের পথ ধরে মায়াবতীতে উপস্থিত পদযাত্রী দল

উৎসব অনুষ্ঠান

রামকৃষ্ণ মঠ, ভুবনেশ্বর (ওড়িশা) গত ১২ জানুয়ারি থেকে ২৮ জানুয়ারি ২০০১-এর মধ্যে বিভিন্ন দিনে যুব ও ভক্ত-সম্মেলন এবং বিভিন্ন উৎসবাদির আয়োজন করে। ১২ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে আয়োজিত যুব-সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ওড়িশা সরকারের মুখ্যসচিব দেবীপ্রসাদ বাগচী। স্বাগত-ভাষণ দান করেন মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শিবেশ্বরানন্দ। বক্তৃতা, ভজন ও সঙ্গীত ছিল সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থা থেকে প্রায় ১০০ যুবক-যুবতী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। ২৩-২৫ জানুয়ারি প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। ২৬ জানুয়ারি শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, রামনাম-সঙ্কীর্তন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন নবনির্মিত 'বিবেকানন্দ হল'-এর দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। বিভিন্ন ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন রাজকোট রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী জিতাত্মানন্দ, পুরী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী দীনেশানন্দ, দেবীপ্রসাদ বাগচী, পুরীর রাজা গজপতি মহারাজ দিব্যসিং দেও প্রমুখ। সভায় স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী শিবেশ্বরানন্দ। ২৮ জানুয়ারি ধ্যান, জপ, পাঠ, সঙ্গীত ও আলোচনাদির মাধ্যমে ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ওড়িশার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ৪০০ ভক্ত যোগদান করেন। এদিন সভাপতিত্ব করেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ।

রামকৃষ্ণ-ব্রহ্মানন্দ আশ্রমে (শিকড়া কুলীনগ্রাম, জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে গত ২৪-২৬ ও ২৮ জানুয়ারি ২০০১ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। প্রথম দিন স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত যুবসম্মেলনে ১৪টি বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় থেকে প্রায় ৩,০০০ ছাত্রছাত্রী যোগদান করে। প্রবন্ধ পাঠ, বক্তৃতা, সঙ্গীত, গীতি-আলেখ্য ও আলোচনাসভা ছিল সম্মেলনের অঙ্গ। আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী সুপর্ণানন্দ এবং বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর মণ্ডল, অধ্যাপক বাসুদেব বর্মন ও অধ্যাপক প্রশান্ত গিরি। সন্ধ্যায় দ্বিজরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'শবরীর প্রতীক্ষা' পালাগান এবং নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়। দ্বিতীয় দিন শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমার জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় বাউল গান, যাত্রানুষ্ঠান, ধর্মসভা, শিবপুর প্রফুল্লতীর্থের গীতি-আলেখ্য এবং সুজিতকুমার দে-র যাদুবিদ্যা প্রদর্শন। বৈকালিক ধর্মসভায় বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মুক্তিকামানন্দের সভাপতিত্বে ভাষণ দেন অধ্যাপক শ্যামল সরদার। সন্ধ্যায় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা 'ধর্মযুদ্ধ' যাত্রাপালা পরিবেশন করে। তৃতীয় দিন বিশেষ পূজা, হোম, ভক্তিগীতি, পথ-পরিক্রমা, যন্ত্রসঙ্গীত, লোকগীতি, কালীকীর্তন এবং ধর্মসভার মাধ্যমে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়। লোকগীতিতে বিষ্ণুপদ দাস, যন্ত্রসঙ্গীতে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের অন্ধ বালকেরা এবং কালীকীর্তনে সিদ্ধেশ্বরী কালীকীর্তন সমিতি অংশগ্রহণ করে। দুপুরে প্রায় ১২,০০০ ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণকে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালের ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী সৎপ্রভানন্দ এবং প্রধান অতিথির ভাষণ দান করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। সন্ধ্যায় ব্রহ্মানন্দ নাট্যসংস্থা 'দ্বারকায় এলেন শ্রীকৃষ্ণ' যাত্রাপালা পরিবেশন করে। ২৮ জানুয়ারি আয়োজিত হয় শিক্ষক-সম্মেলন। বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ১৮২ জন শিক্ষকের উপস্থিতিতে সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের (বেলুড় মঠ) অধ্যক্ষ স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ এবং আলোচনা করেন অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর মণ্ডল প্রমুখ।

রাঁচি মোরাবাদি আশ্রম (ঝাড়খণ্ড) গত ১-৩ ফেব্রুয়ারি ২০০১ ২৩তম কেন্দ্রীয় কিষাণমেলার আয়োজন করে। মেলার উদ্বোধন করেন ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী বাবুলাল মারাণ্ডি। ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল প্রভাতকুমার মেলাটি পরিদর্শন এবং উদ্যান-পালনবিদ্যার জন্য নবনির্মিত 'সবুজ ঘর'-এর উদ্বোধন করেন।

বিজয়ওয়াড়া আশ্রম (অন্ধ্রপ্রদেশ) : গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০১ আশ্রম-সহ একটি বিদ্যালয় রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক জনসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ।

রাজমুন্দ্রি আশ্রম (অন্ধ্রপ্রদেশ) গত ৮-১১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করে। উৎসবের উদ্বোধন এবং স্মরণিকা প্রকাশ করেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানে প্রায় ১,০০০ ভক্ত যোগদান করেছিলেন।

গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ **মুম্বাই আশ্রমের প্লাটিনাম জুবিলি** উপলক্ষ্যে নবনির্মিত অফিস-সহ অন্যান্য কক্ষ এবং একটি সাধুনিবাসের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের (সাগরদ্বীপ, জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) পরিচালনায় গত ২৫-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন আশ্রমে মঙ্গলারতি, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, গীতি-আলেখ্য, শ্রীশ্রীচণ্ডী, 'পুঁথি', 'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে ৩,৫০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় সুশীল প্রধান ও সম্প্রদায় গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। ধর্মসভায় ৫০০ ভক্তের সমাবেশে বক্তব্য রাখেন স্বামী অবধূতানন্দ, স্বামী শেখরানন্দ, ডঃ তাপস বসু ও ধীরেন্দ্রনাথ দাস। দ্বিতীয় দিন আশ্রমের পরিচালনায় রুদ্রনগর

বিশালাক্ষী পল্লী উন্নয়ন সমিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী অবধূতানন্দ ও ডঃ তাপস বসু। তৃতীয় দিন কৃষ্ণনগর গান্ধীস্মৃতি সঙ্ঘে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী ব্রজেশানন্দ ও ডঃ তাপস বসু। আশ্রমে এই দুদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। দুদিনের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী শান্তিদানন্দ।

স্মারক ভাষণ

গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০১ গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের (কলকাতা-৭০০০২৯) বিবেকানন্দ হল-এ এবছরের 'কমলা মিত্র স্মারক বক্তৃতা' প্রদান করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। স্মারক বক্তৃতার বিষয় ছিল—'আধুনিকতার বিচারে শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী'। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ তাঁর আলোচনায় তথ্য ও যুক্তি-সহযোগে দেখান, শ্রীশ্রীমা তাঁর জীবন ও বাণীতে কিভাবে অতীতের ইতিবাচক ঐতিহ্য, বর্তমানের বা আধুনিকতার শ্রেষ্ঠ কৌললক্ষণ এবং ভাবিকালের কাম্য প্রতিশ্রুতিকে সার্থকভাবে সমন্বিত করে একদিকে আধুনিকতার সার্থক প্রতিমা রূপে, অপরদিকে নারীর চিরন্তনী কল্যাণময়ী ভূমিকায় পৃথিবীর বুকে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাঙলা সাহিত্যের প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় বিপুলসংখ্যক শ্রোতৃ-সমাগম বিবেকানন্দ হল ছাড়িয়ে যায়।

সেবাব্রত

পুনর্বাসন

ওড়িশা ঝঞ্ঝা পুনর্বাসন

বেলুড় মঠের মাধ্যমে ঝঞ্ঝায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনের জন্য পরিকল্পিত ৩২৪টি বাড়ি ও ৩২৪টি পায়খানার মধ্যে ২৫০টি বাড়ি ও ২৫০টি পায়খানা নির্মিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১৯০টি বাড়ি ও ১৯০টি পায়খানা হস্তান্তর করা হয়েছে।

চিকিৎসা-শিবির

পুরী মঠ (ওড়িশা) গত ৩১ জানুয়ারি ২০০১ চন্দ্রভাগা নদীতীরে অনুষ্ঠিত মেলায় বিনামূল্যে একটি চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ৩০০ জনের চিকিৎসা করা হয়।

আলং আশ্রম (অরুণাচল প্রদেশ) গত ১৪-১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় থ্যালাসেমিয়া রোগের একটি চিকিৎসাশিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ১৭০ জনের চিকিৎসা করা হয়।

দেহত্যাগ

স্বামী দীপ্তানন্দজী (দীনেশ মহারাজ) গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০০১ সকাল সাড়ে ৬টায় বারাণসী সেবাশ্রম হাসপাতালে দেহত্যাগ করেন। দেহান্তকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি গত কয়েক বছর ধরে হৃদ্‌রোগ ও উচ্চ রক্তচাপে ভুগছিলেন। শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করে তিনি ১৯৪০ সালে সিলেট আশ্রমে (বাংলাদেশ) যোগদান করেন। ১৯৫২ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি বিভিন্ন সময়ে বেলুড় মঠ, সারগাছি, শিলং, রাজকোট, আলমোড়া, মুম্বাই, জামশেদপুর, দেওঘর, পাটনা ও বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে বিভিন্ন সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। অধিকন্তু, তিনি ১৯৭৬-৭৭ সালে ত্রিপুরায় বন্যাত্রাণে সেবা করেছেন। প্রয়াত মহারাজ প্রায় দুদশক কাল বারাণসীতে অবসরজীবন যাপন করছিলেন।

স্বামী বিশ্বপ্রাণানন্দজী (সুমন্ত মহারাজ) গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ রাত সাড়ে ১১টায় কলকাতা রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে প্রয়াণ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি কয়েক বছর ধরে মূত্রগ্রন্থির স্ফীতি ও মানসিক দুর্বলতায় ভুগছিলেন। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৩৫ সালে তিনি সারগাছি আশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৪৪ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি বিভিন্ন সময়ে বেলুড় মঠ, মালদা ও গড়বেতা আশ্রমে বিভিন্ন সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। দীর্ঘ ১১ বছর ১৯৮২ সাল পর্যন্ত তিনি গড়বেতা আশ্রমের প্রধান ছিলেন। এরপর থেকে বেলুড় মঠে অবসরজীবন যাপন করছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা : ইংরেজী মাসের প্রথম শুক্রবার 'ভক্তিপ্রসঙ্গে' করছেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। প্রথম ও তৃতীয় রবিবার 'গীতা' পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ রবিবার 'কঠোপনিষদ্' পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন যথাক্রমে স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ ও স্বামী বিনির্মলানন্দ। ❑

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি : সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠানাদি ও পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য উৎসব-অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির কিংবা পরলোকপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের দপ্তরে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

[redacted]ত ৮ ডিসেম্বর ২০০০ সন্ধ্যা ৬টায় কলকাতার [redacted] ফেডারেশন হল সোসাইটি বা মিলনমন্দিরের (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৯) সভাকক্ষে এক বিশেষ আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনাসভার বিষয়বস্তু ছিল 'নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর কর্মময় জীবনে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব'। আলোচক ছিলেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঐতিহাসিক অধ্যাপক ডঃ হোসেনুর রহমান। সভায় স্বাগত-ভাষণ দান করেন কলকাতা পৌরসভার প্রাক্তন মেয়র এবং সোসাইটির সভাপতি কমলকুমার বসু। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সোসাইটির সম্পাদক বিমলচন্দ্র রায়। সভায় বিপুল শ্রোতৃসমাগম হয়েছিল।

শ্যামপুকুরবাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ (কলকাতা-৭০০০০৪) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথিতে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও আলোচনার আয়োজন করে। শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন কেয়া ঘোষ। ডঃ জলজ ভাদুড়ীর পরিচালনায় 'মায়ের কথা ও গান' পরিবেশিত হয়।

রামকৃষ্ণ আশ্রম (রামকৃষ্ণপুরী, গোয়ালিয়র, মধ্যপ্রদেশ) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বৈদিক মন্ত্র পাঠ, সানাইবাদন, চণ্ডীপাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, দরিদ্রনারায়ণসেবা এবং ধর্মসভার আয়োজন করে। এদিন প্রায় ৭০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন গোয়ালিয়র সারদা সঙ্ঘের সদস্যাবৃন্দ এবং আশ্রমের সন্ন্যাসী কর্মী। এই উপলক্ষ্যে আশ্রমের উদ্যোগে সারদাবাল গ্রামে ৫০০ অনাথ বালকের জন্য রান্নাঘর-সহ 'স্বামী প্রেমানন্দ ভবন' নামে একটি ভোজনগৃহের উদ্বোধন করেন মধ্যপ্রদেশ সরকারের যুবকল্যাণ মন্ত্রী শ্রবণকুমার প্যাটেল। অনুষ্ঠানে সহস্রাধিক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। সভায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রম-সম্পাদক স্বামী স্বরূপানন্দ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাসঙ্ঘে (উমেরকোট, ওড়িশা) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ মঙ্গলারতি, বেদ ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী পাঠ, পূজা, হোম ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এই উপলক্ষ্যে নারায়ণপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পরিচালনায় ও ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের সহযোগিতায় একটি চক্ষু-চিকিৎসা শিবিরে ১৩৬ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।

নাগেরবাজার রামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ (কবি ভারতচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০০২৮) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা ইত্যাদির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উদ্‌যাপন করে। দুপুরে প্রায় ১৫০ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান। বিকালে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

মাঙ্গলিক গীতি সংস্থা (বারুইপুর, জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ গুরুবন্দনা, সঙ্গীত ও আলোচনার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করে। শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন বিমলচন্দ্র পাল ও সন্তোষকুমার দত্ত। শ্রুতিনাটক পরিবেশন করেন সংস্থার শিল্পিবৃন্দ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ২০০ ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ (সাঁকরাইল, জেলা—হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৭ ডিসেম্বর ২০০০ বিশেষ পূজা, পাঠ ও ভক্তিগীতির মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি পালন করে। পাঠে অংশগ্রহণ করেন সুচিত্রা চক্রবর্তী, মায়া রায় ও মুক্তি মিত্র। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুচিত্রা চক্রবর্তী ও শ্যামল রায়। দুপুরে প্রায় ১০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নারায়ণচন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র (সাঁইথিয়া, জেলা—বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম, গীতি-আলেখ্য, ভক্তিগীতি এবং ধর্মসভার আয়োজন করে। পাঠে অংশগ্রহণ করেন কমলাপতি মুখার্জী, বরুণ দাস, জগবন্ধু মণ্ডল। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। পরদিন বিকালে আয়োজিত ধর্মসভায় স্বাগত-ভাষণ দেন পাঠচক্রের সম্পাদক উমাপতি রায়। স্বামী বাগীশানন্দের সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন ভবানীমোহন মুখোপাধ্যায়, তপনজ্যোতি ভট্টাচার্য প্রমুখ। ভাস্কর কয়ড়ীর পরিচালনায় গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

ইছাপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ (জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২১ ডিসেম্বর ২০০০ একটি চক্ষু-চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করে। শিবিরের উদ্বোধন করেন স্বামী শুকদেবানন্দ। শিবিরে ৩২ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়।

ত্রিপুরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের (ধলেশ্বর, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা) গত ২৩-২৫ ডিসেম্বর ২০০০ উষাবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে ১৯তম ষাণ্মাষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সহ-সভাপতি স্বামী দিব্যানন্দ। ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তের ৩৭টি আশ্রমের প্রায় ২০০ জন প্রতিনিধি এবং উষাবাজার অঞ্চলের প্রায় ৩০০ ভক্ত ও অনুরাগী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনে পরিষদের দুটি প্রতিনিধি-সভা ব্যতীত ভক্তসম্মেলন, যুবসম্মেলন, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, নগর পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বরানগর মঠ সংরক্ষণ সমিতি (প্রামাণিক ঘাট রোড, কলকাতা-৭০০০৩৬) গত ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর ২০০০ বিভিন্ন

অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করে। প্রথম দিন কুইজ, আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রভৃতি প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের (বেলুড়) সম্পাদক স্বামী রমানন্দ এবং বক্তব্য রাখেন বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের প্রধান শিক্ষক স্বামী বিধানানন্দ। দ্বিতীয় দিন মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, স্তোত্রপাঠ, কালীকীর্তন, বাউলগান, রামায়ণ গান, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দ। বক্তব্য রাখেন বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সনাতনানন্দ। এদিন ৪,০০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয় এবং ১০০ দুঃস্থ মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, ১৭ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের তিথিপূজা উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, হোম, সঙ্গীত ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা হয়। ঐদিন প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

চন্দননগর বারাসত গেট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দ নিলয় (জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৪ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালন করে। এদিন 'রেণুকাদেবী স্মৃতি স্মারক বক্তৃতা'য় 'শিল্পীর চোখে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী' বিষয়ে আলোচনা করেন রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তাঁকে 'রেণুকাদেবী স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হয়। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন পাপড়ি দাশশর্মা ও গীতা ভট্টাচার্য এবং পাঠে অংশগ্রহণ করেন সুকুমার কুণ্ডু ও সনজিৎ নাথ।

বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ (নব বারাকপুর, জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) গত ২৫-২৭ ডিসেম্বর ২০০০ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, ভজন, শোভাযাত্রা, পূজা, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, প্রদর্শনী, নাটক, রক্তদান-শিবির, বস্ত্রবিতরণ, যুবসম্মেলন ও ধর্মসভার আয়োজন করে। দুপুরে প্রায় ৮০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন স্বামী অম্বিকেশানন্দ। রক্তদান-শিবিরে ৩৪ জন রক্তদান করেন। দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ১৫০টি কম্বল বিতরণ করেন পৌরপ্রধান মৃণালেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন তিমিরবরণ চক্রবর্তী, বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ ও নববারাকপুর সারদা সঙ্ঘের সদস্যাবৃন্দ। শিক্ষা, শিক্ষানুরাগী ও যুব সম্মেলনে শিক্ষক-সহ ১৭৯ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন স্বামী বলভদ্রানন্দ ও স্বামী ত্যাগরূপানন্দ। বিভিন্ন দিনে ধর্মসভায় ভাষণ দেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক স্বামী বন্দনানন্দজী, স্বামী অচ্যুতানন্দ, স্বামী মুক্তিকামানন্দ, প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা, প্রব্রাজিকা বীতভয়প্রাণা এবং সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

গাঁতী, বামুনিয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম (দেউলী, ক্যানিং, জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০০ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহ-যোগিতায় একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে ৩৫০ জন যুবপ্রতিনিধি এবং কয়েকজন পরিদর্শক উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলনে 'ভারত গঠনে যুবসমাজের ভূমিকা' বিষয়ে আলোচনা করেন সুধাংশু বিশ্বাস, মহম্মদ নাসিরুদ্দিন ও বুলবুল গাঙ্গুলী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন মোহন ভট্টাচার্য। যুব-প্রতিনিধিদের প্রশ্নের উত্তর ও প্রধান অতিথির ভাষণ দেন স্বামী পুরাতনানন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সুতনু মণ্ডল।

সোনামুখী শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিবেকানন্দ আশ্রমে (জেলা—বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৮ ডিসেম্বর ২০০০ একটি ভক্ত-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ভাষণ দেন রামহরিপুর মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী তত্ত্বজ্ঞানন্দ, স্বামী অচ্যুতানন্দ, স্বামী জ্যোতির্ঘনানন্দ ও স্বামী অচ্যুতাত্মানন্দ। বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে ৩৫০ জন ভক্ত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ভাবপ্রচার পরিষদের (বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া) কো-অর্ডিনেটর সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রমের সম্পাদক মৃন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রমের প্রাক্তন সভাপতি রাধাগোপাল মুখোপাধ্যায়।

গড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ (কামডহরি, কলকাতা-৭০০০৮৪) গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০০ সারাদিনব্যাপী এক ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদের সভাকক্ষে। সম্মেলনে প্রায় ৭০ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। প্রারম্ভিক ভাষণ দেন স্বামী সৎপ্রভানন্দ। শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন ডঃ প্রসিত রায়চৌধুরী। এছাড়া পরিবেশিত হয় গীতি-আলেখ্য ও ভক্তিগীতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাকেন্দ্র (গড়ফা, কলকাতা-৭০০০৭৮) গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০০ তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষ্যে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ও মাধ্যমিক পরীক্ষায় সফল ছাত্রদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী মথুরেশানন্দ।

কুঠিঘাট (গোপীবল্লভপুর) রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘে (ঝাড়গ্রাম, জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১ জানুয়ারি ২০০১ কল্পতরু উৎসব উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, 'গীতা', 'বেদ' ও 'কথামৃত' পাঠ, পূজা, হোম এবং ভক্তিগীতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ১৬০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী ভবানন্দ, স্বামী ইষ্টানন্দ, আশিসকুমার দাশ প্রমুখ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, ভাঙড় (জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) কল্পতরু উৎসব উপলক্ষ্যে গত ১ জানুয়ারি ২০০১ মঙ্গলারতি, সানাইবাদন, চণ্ডীপাঠ, নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা ও হোম, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা, পদাবলী কীর্তন প্রভৃতির আয়োজন করে। দুপুরে কয়েক হাজার ভক্ত নরনারী প্রসাদ পান। বিকালের ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ, স্বামী ঋতানন্দ, স্বামী মোক্ষপ্রিয়ানন্দ ও অধ্যাপক বিষ্ণুপদ সাউ। সভাপতিত্ব করেন স্বামী বন্দনানন্দজী।

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, হামিরপুর (রাউরকেলা, ওড়িশা) গত ১ জানুয়ারি ২০০১ কল্পতরু উৎসব ও শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি উৎসব পালন করে। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ

পূজা, ভজন, কীর্তন, আলোচনাসভা এবং স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের জীবনী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে পাঁচ শতাধিক ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবামন্দির (অরবিন্দপল্লী, সিউড়ি, জেলা—বীরভূম) গত ১ জানুয়ারি ২০০১ কল্পতরু উৎসব উপলক্ষ্যে পূজা, হোম, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, বাউলগান এবং ধর্মসভার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী দেবরাজানন্দ, স্বামী গোপেশ্বরানন্দ, স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দ, স্বামী মহানন্দ, স্বামী নীলানন্দ (সিউড়ি), বীরভূমের জেলা জজ এস. পি. সরকার প্রমুখ। দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শিবাজী পাল। বক্তব্য রাখেন সঙ্ঘের সম্পাদক মিলন দাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের (শিলচর, অসম) পরিচালনায় গত ১ জানুয়ারি ২০০১ পূজা, হোম, ভজন, পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে কল্পতরু উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। পাঠে অংশগ্রহণ করেন স্বামী নরেশানন্দ, অজিত রায়, অর্চনা চক্রবর্তী প্রমুখ। প্রায় ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তনে (জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) কল্পতরু উৎসব উপলক্ষ্যে গত ১ জানুয়ারি ২০০১ বিশেষ পূজা, হোম, পাঠ, ভক্তিগীতি ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সভায় ভাষণ দেন চণ্ডীপুর মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শরণ্যানন্দ, স্বামী সুরেন্দ্রানন্দ, স্বামী পরব্রহ্মানন্দ, স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ ও অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু। স্বাগত-ভাষণ দেন সেবায়তনের সভাপতি কমলকৃষ্ণ দত্ত। দুপুরে প্রায় ৪,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকালে ১০০ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে কম্বল, ধুতি ও শাড়ি বিতরণ করা হয়। ২ জানুয়ারি যুবসম্মেলনে বক্তব্য রাখেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দ ও স্বামী পরব্রহ্মানন্দ। দুদিনের সভায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সেবায়তনের সম্পাদক দেবপ্রসাদ মণ্ডল।

কল্পতরু কালীকীর্তন সম্প্রদায় (বাগবাজার, কলকাতা-৭০০০০৩) গত ১ জানুয়ারি ২০০১ কল্পতরু উৎসব উপলক্ষ্যে ভক্তিগীতি, গীতিনাট্য ও ধর্মসভার আয়োজন করে। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী কেশবানন্দ ও ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। গত ৭ জানুয়ারি একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা পথ-পরিক্রমা করে।

মোহনপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের (জেলা—মেদিনীপুর) বার্ষিক উৎসব গত ৫ জানুয়ারি ২০০১ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, ক্যুইজ, 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৯০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালের ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী পরব্রহ্মানন্দ। সভান্তে ৫৫ জন দুঃস্থ বালক-বালিকার মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **সুকুমারী সাহা** গত ২ নভেম্বর ২০০০ ভোর ৫টা ৫০ মিনিটে পরলোকগমন করেন। তিনি ছিলেন অসমের লখীমপুর জেলার বিহপুরীয়া রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘের একনিষ্ঠ সেবিকা। সরল ও অমায়িক ব্যবহার ছিল সুকুমারী দেবীর বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **গোষ্ঠবিহারী সাহা** গত ৭ নভেম্বর ২০০০ সকাল ১১টায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। চাকরি জীবনে তিনি উত্তরপাড়া রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে এবং অবসর গ্রহণের পর নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। এছাড়া রামকৃষ্ণ মিশন ব্রহ্মচারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রেও তিনি শিক্ষকতা করেছেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বালী-নিবাসী **নিখিলচন্দ্র সেনগুপ্ত** গত ১২ নভেম্বর ২০০০ বেলা ২টা ১৫ মিনিটে পরলোকেগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন। মঠ-মিশনের বহুবিধ স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে তিনি ব্রতী ছিলেন। বালী গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্রের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সঙ্গেও তিনি দীর্ঘকাল যুক্ত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, হোজাই (অসম)-নিবাসী **শচীন্দ্রচন্দ্র ভাওয়াল** গত ১৬ নভেম্বর ২০০০ রাত্রি ৯.৩০ মিনিটে নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু প্রাচীন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল এবং তাঁদের সঙ্গে ত্রাণকার্যে সহযোগিতাও করেছেন। তিনি হোজাই রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, রাজস্থান-নিবাসী **অঞ্জলি ভট্টাচার্য** গত ১৮ নভেম্বর ২০০০ পরলোক-গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৬৭ বছর। অঞ্জলি দেবী নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী তথাগতানন্দের সহোদর ডাঃ দেবনারায়ণ ভট্টাচার্যের পত্নী।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **দুলালচন্দ্র সোম** গত ২০ নভেম্বর ২০০০ হালিসহরের বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। তাঁর পিতা প্রয়াত ধীরেন্দ্রচন্দ্র সোম শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং কৈশোরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের সঙ্গ করেছেন। প্রয়াত দুলালচন্দ্র সোম হালিসহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘের সহ-সভাপতি ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **মলিনাপ্রভা বসু** গত ২৬ নভেম্বর ২০০০ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বিধাননগর-নিবাসী **ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ সরকার (গঙ্গোপাধ্যায়)** গত ২৯ নভেম্বর ২০০০ সকাল ৬টা ১৫ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন হৃদয়বান কৃতী চিকিৎসক। তিনি বিধাননগর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং একসময় কেন্দ্রের সভাপতি ছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু সন্ন্যাসীর স্নেহলাভ করেছেন। ❑

With Best Compliments from:



ICI INDIA LIMITED

ICI HOUSE
34, CHOWRINGHEE ROAD
CALCUTTA-700 071

TELEPHONES : +91-33-226 6842
+91-33-245 7433
+91-33-245 7436

FAX : +91-33-245 7593



সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন

সহৃদয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ অর্থানুকূল্যে আমাদের ভগ্নপ্রায় স্কুলগৃহটি পুনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

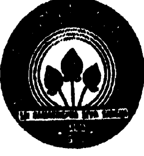
আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি।

১।	১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ	ঃ	১,২০,০০০ টাকা
২।	দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
৩।	পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
৪।	আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প	ঃ	১০,০০,০০০ টাকা
৫।	একখানা অ্যাম্বুল্যান্স (Ambulance)	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
			২৬,২০,০০০ টাকা

A/c Payee চেক/ড্রাফট 'Ramakrishna Mission Ashrama, Ramharipur'—এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফট পাঠাবার ঠিকানা—সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা—বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ ঃ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি

স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া



GARIA SRI RAMAKRISHNA SEVA SANGHA

P-1 S. E. RAILWAY EMPLOYEES CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.

KAMDAHARI, GARIA, KOLKATA-700 084

Regd. No.: S73082

একটি আবেদন

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের আদর্শ গ্রহণ করে গড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ ১৯৮৯ সাল থেকে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী প্রচারে ব্রতী একটি রেজিস্টার্ড সংস্থা এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের লোকশিক্ষা পরিষদের অনুমোদিত। সঙ্ঘের বিভিন্ন কার্যাবলী— দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়, প্রতি নতুন পাঠ্যবর্ষে স্থানীয় কয়েকটি বিদ্যালয়ের দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক প্রদান, কোচিং ক্লাশ, নিয়মিত পাঠচক্র, গ্রন্থাগার ইত্যাদির পরিচালনা বর্তমানে দুই ভক্তের বাড়িতে অস্থায়িভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দের সহায়তায় কোনরকমে এক খণ্ড জমি ক্রয় করা হয়েছে এবং ঐ জমিতে গৃহ-নির্মাণের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এর আনুমানিক ব্যয় প্রায় ৮ লক্ষ টাকা।

এই প্রকল্প সম্পূর্ণ করার কাজে সকলের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য সেবাসঙ্ঘের পক্ষ থেকে আন্তরিক আবেদন জানাই।

এই প্রকল্পে যেকোন আর্থিক দান **'GARIA SRI RAMAKRISHNA SEVA SANGHA'**-এর অনুকূলে A/c Payee চেক বা ড্রাফট ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হবে ও প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে।

ভারতীয় আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী এই দান আয়করমুক্ত।

যোগাযোগের ঠিকানা :
P-1 S. E. RAILWAY EMPLOYEES CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
KAMDAHARI, GARIA, KOLKATA-700 084
Ph. No.: 410-3190

বিনীত নমস্কারান্তে
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ৪০.০০

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বঙ্গ নাট্য-সমাজের নেপথ্য কাহিনী। শ্রীরামকৃষ্ণ থিয়েটার দেখতে এসে বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেছিলেন। তারপর থেকে পেশাদারী মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাঁকে রঙ্গমঞ্চের গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁকে প্রণাম না করে আজও কোন শিল্পী কোন কাজ করেন না।

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রীশ্রীমা ও ডাকাত বাবা ৩০.০০

তেলো-ভেলোর ভয়ঙ্কর মাঠে ডাকাত-দম্পতির সামনে ঘটেছিল শ্রীমা সারদাদেবীর চিন্ময়ী রূপের আত্মপ্রকাশ। তেলো-ভেলো শ্রীশ্রীমায়ের লীলাপ্রকটভূমি। তারই পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। সঙ্গে সেই মহাতীর্থ দর্শনের পথনির্দেশ।

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিঃ
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

রাধানগর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বাত্মানন্দ মঠ



স্থাপিত—১৩৭১ বঙ্গাব্দ
প্রতাপেশ্বর শিবতলা লেন, রাধানগর
বর্ধমান-৭১৩১০১
ফোন : ৬৮১৬৩

একটি আবেদন

পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের ত্যাগী সন্তান স্বামী স্বাত্মানন্দ মহারাজের অনুপ্রেরণায় বর্ধমান শহরের কেন্দ্রস্থলে "রাধানগর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বাত্মানন্দ মঠ"টি প্রতিষ্ঠিত। এই মঠ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের রেজিস্ট্রিভুক্ত। প্রায় ২৫ বছর ধরে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবাদর্শে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা' এই মঠের অন্যতম সেবাব্রত। বর্তমানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় (হোমিও ও অ্যালোপ্যাথি), ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র চালু আছে। দুঃস্থ মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। তার জন্য একটি পৃথক ঘরের একান্ত প্রয়োজন। এই মহান প্রকল্পকে রূপায়িত করতে আপনাদের অকুণ্ঠ সাহায্যের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি। যেকোন সাহায্যই শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের দানস্বরূপ পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা হবে। চেক/ড্রাফট 'রাধানগর শ্রীরামকৃষ্ণ স্বাত্মানন্দ মঠ, বর্ধমান'-এর নামে গৃহীত হবে।

বিনীত
স্বামী শিবাত্মানন্দ
অধ্যক্ষ



আবেদন

রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম)-এর সম্প্রসারণ

রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম) বেলুড় মঠের একটি শাখাকেন্দ্র। এই আশ্রমটি ১৯২০ সালের ১৭ নভেম্বর বর্তমান বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। যথোচিত পূজানুষ্ঠানের পর স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের পট সিংহাসনে বসিয়ে প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পাদন করেছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজের কাছে দাতার প্রার্থনা ছিল—"আমার পুত্র গদাধরের স্মৃতিরক্ষার্থে এটিকে 'গদাধর আশ্রম' নাম দিলে আমার প্রাণের একান্ত ইচ্ছা পূর্ণ হবে।" মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন ঃ "তোমার ছেলের নাম গদাধর হলেও তুমি মনে করবে, এই আশ্রম ঠাকুরের বাল্যকালের নামে নামকরণ হয়েছে।" এখানে মহাপুরুষ মহারাজ ছাড়া স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ ও মাস্টারমশাই (শ্রীম) এসেছিলেন। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা যখন চলছে শ্রীশ্রীমা তখন উদ্বোধনে অন্তিমশয্যায় শায়িতা। এই আশ্রম স্থাপনের সংবাদে তিনি আনন্দ প্রকাশ করে বলেছিলেন ঃ "কালীক্ষেত্রে আদিগঙ্গার তীরে ঠাকুরের আশ্রম হবে—বেশ হবে। সেরে উঠে ওখানে গিয়ে কিছুকাল থাকব।" শ্রীশ্রীমা স্থূলশরীরে গদাধর আশ্রমে আসেননি, কিন্তু এই আশ্রমটি নিঃসন্দেহে তাঁর আশীর্বাদপূত।

এই আশ্রমটির প্রধান সমস্যা স্থানাভাব। ঠাকুরমন্দির ও নাটমন্দির একটি গৃহকেই দু-ভাগ করে করা হয়েছে। নাটমন্দিরে বড়জোর ৩০ জন বসতে পারে। তিথি উৎসবের সময় ৩½ ফুট বারান্দা দিয়ে আসা-যাওয়া করা যায় না। সেজন্য আরো স্থান বাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। পিলার দিয়ে ছাদ করার প্রয়োজন হতে পারে। তাতে প্রায় ৩০,০০,০০০ (ত্রিশ লক্ষ) টাকার প্রয়োজন। কিভাবে জায়গা বাড়ানো হবে তা ইঞ্জিনিয়ার, কর্পোরেশন ও মঠ কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্থিরীকৃত হবে। এই মহৎ কার্য সম্পন্ন করার জন্য আমরা সহৃদয় জনসাধারণের কাছে মুক্তহস্তে দান করার জন্য আন্তরিকভাবে আবেদন জানাই।

অনুগ্রহ করে আপনার আর্থিক দান নগদে বা চেক/ড্রাফট-এর মাধ্যমে **'Ramakrishna Math (Gadadhar Ashrama)'**—এই নামে পাঠাবেন। এই কার্যে দেয় সমুদয় আর্থিক দান আয়কর বিভাগের ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের আইনের **৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত**। সকলের সহযোগিতা একান্ত প্রার্থনীয়।

রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম)
৮৬এ, হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০২৫
দূরভাষ ঃ ৪৫৫-৪৬৬০

বিনীত
স্বামী ঋদ্ধানন্দ
অধ্যক্ষ

With Best Compliments From :
CROMPTON GREAVES LIMITED
ENGINEERING PROJECTS DIVISION
Please Visit Us at www.cromptongreaves.com



উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দ-সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী

যুগনায়ক বিবেকানন্দ
স্বামী গম্ভীরানন্দ
মূল্য : (৩ খণ্ডে) ১৬৫.০০

স্বামী বিবেকানন্দ
প্রমথনাথ বসু
মূল্য : (২ ভাগে) ১৩০.০০

স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি
ভগিনী নিবেদিতা
মূল্য : ৪০.০০

স্বামীজী ও তাঁর বাণী
ভগিনী নিবেদিতা
মূল্য : ৯.০০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ
শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী
মূল্য : ৪০.০০

পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ
(নতুন তথ্যাবলী)
মেরি লুইজ বার্ক
মূল্য : (২ খণ্ডে) ২০০.০০

স্বামী বিবেকানন্দ : তাঁর মানবতাবাদ
স্বামী রঙ্গনাথানন্দ
মূল্য : ১০.০০

যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ
স্বামী অপূর্বানন্দ
মূল্য : ৪০.০০

স্বামীজীর শ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা
স্বামী বুধানন্দ
মূল্য : ১২.০০

ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর
স্বামী বুধানন্দ
মূল্য : ৮.০০

স্মৃতির আলোয় স্বামীজী
সম্পাদনা : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
মূল্য : ৩০.০০

স্বামী বিবেকানন্দ
(আলোকচিত্রে জীবনকথা)
মূল্য : ১৬৫.০০

বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ
সম্পাদনা : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
মূল্য : ২০০.০০

যুগদিশারী বিবেকানন্দ
সম্পাদনা : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
মূল্য : ৪০.০০

শতবর্ষের আলোয় স্বামী বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাবর্তন
সম্পাদনা : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
মূল্য : ১০.০০

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
মূল্য : ১৫.০০

এবার কেন্দ্র বিবেকানন্দ
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
মূল্য : ১৮.০০

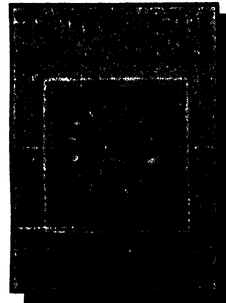
উদ্বোধন কার্যালয় পরিবেশিত
শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী শিবানন্দ সম্পর্কিত
অবশ্য-সংগ্রহযোগ্য একটি অমূল্য গ্রন্থ

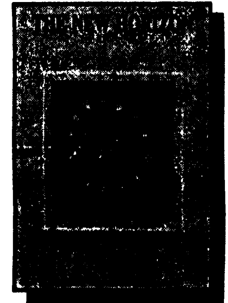




শিবানন্দ-স্মৃতি সংগ্রহ (২খণ্ড)
মূল্য : ৮০.০০ (প্রতি খণ্ড ৪০.০০)
[রেজিস্ট্রি ডাকে নিলে অতিরিক্ত ২০.০০]

উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এবং মঠ ও মিশনের অছি ও পরিচালন পর্ষদের অন্যতম সদস্য প্রাচীন সন্ন্যাসী
স্বামী হিরণ্ময়ানন্দের
দুটি চিন্তা-আলোড়নকারী মৌলিক গ্রন্থ





সাধ্য ও সাধনা
মূল্য : ২০ টাকা

New Horizon
Price : Rs. 25

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ



সেরা ফলন দেদার লাভ

লালন সুপার
ফসফেট সার



প্রস্তুতকারক ঃ

সারদা ফার্টিলাইজার্স লিঃ
২, ক্লাইভঘাট স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০১

ফোন নং
অফিস ঃ ২২০-৫৪৩৫
রেসি. ঃ ৩৩৭-৭৩৬৫
মোবাইল ঃ ৯৮৩১০-১৯২৬৬

With Best Compliments From :

DOBSON
DISTRIBUTORS

88, DR. ABANI DUTTA ROAD
HOWRAH-711 101
PHONE : 666-1722
TELEFAX : 666-9969

Stockist

Serum Institute, Tablets India Ltd.,
Wallace Pharmaceuticals Ltd.,
Eli Lilly Ranbaxy, Pharmacia & Upjohn,
Orchid, Caplet,
Smith Kline Beecham (Vaccine),
Sunny Industries Pvt. Ltd.,
Midas Care, Arvind (S.K.K.L. Ltd.),
Neon Laboratories, Mayer,
Trio Pharma

নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের ওপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

❋

হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

❋

মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে, তার বিকাশই ধর্ম।

স্বামী বিবেকানন্দ

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

With Best Compliments From :

UTILITY INDUSTRIES
& CHEMICAL WORKS

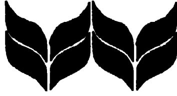
19Y, Raja Manindra Road, Kolkata-700037
Phone : 556-5543/6459
&
ASIMCO
22, Amalangsu Sen Road, Kolkata-700048
Phone : 556-5351/5543
Manufacturers of Phenyle. I.S.I., Lysol. I.P.,
Soaps, Antiseptic Lotions & Purified Water. I.P.
Dealers in all sorts of Medicines,
Pharmaceuticals & Laboratory Chemicals.

With Best Compliments From :

DIAMOND
METAL
PRODUCTS

Mfg. All Types of
Aluminium Pilfer Proof Caps

APOLO ELECTRIC BULB PVT. LTD.
27B/H/13/1, Chaulpatty Road
Kolkata-700010
Tele. : (O) 350-3901/353-1445
Fax : 350-6297
Mfg. *G.L.S. Lamps & Night Lamps*



"QUALITY UPPER ASSAM TEAS FOR COLOUR, STRENGTH & BRISKNESS."

With Best Compliments From :

WARREN TEA LIMITED

31, CHOWRINGHEE ROAD
KOLKATA-700 016
TELEPHONE NOS. :
226-6611/13/14/18/49; 245-8190/8191
TELEGRAMS : WARRANTY
FAX NO. : 249-5980; 226-6716

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments From :

AUTO REXINE AGENCY

House of Car Decoration
Specialist in Car-Air Conditioner
Office & Show Room :
31/A, Lenin Sarani, Kolkata-700 013
163, Lenin Sarani, Kolkata-700 013
Branch :
71A, Park Street, Kolkata-700 013
Phone : 244-1764/2184, 237-5435

ঘৃণার শক্তির চেয়ে প্রেমের শক্তি অনন্ত গুণে বেশি শক্তিমান।

স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments From :

M/S. BHARAT ENGINEERING STORES

36, Strand Road
2nd Floor, Room No. 13/A
Calcutta-700 001
Phone : 243-3576
Fax : 91-33-2209309

Approved/Reg. Govt. Supplier of Indian Ordnance Factories, Reputed Supplier of All Types of Induction Coils, Lamination Cores, Autotransformers and various Elec. items.

With the Compliments of :



TATA TEA LIMITED

Making a difference ... differently.

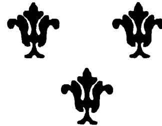
1, Bishop Lefroy Road
Kolkata-700 020

Haran Chandra Banerjee & Sons.

7C, CLIVE ROW, CALCUTTA-700 001

PAPER MERCHANTS, STATIONERS AND GOVT. SUPPLIERS

Phones : Office : 220-1700
Resi. : 665-9075



Distributors for :

TITAGHUR PAPER MILLS CO. LTD.
BENGAL PAPER MILLS CO. LTD.
SUPREME PAPER MILLS CO. LTD.
SIMPLEX MILLS CO. LTD.

CAN YOU SURVIVE THE DANGERS OF CONTAMINATED BLOOD?



BLOOD. A unique gift of God.
Saviour of life when it is pure. Killer when it is impure or contaminated.
The onus is on us, as responsible citizens, to do our utmost to bring a change in the dismal scenario... to ensure that a Blood Bank supplies and receives only HEALTHY, SAFE AND CONTAMINATION-FREE BLOOD.

It is our right

Some alarming realities...

- In India, there are only 400 licensed Blood Banks supplying only 25% of the total needs.
- A vast majority of blood donors are *'professionals'* who donate 5-6 times in a month. They are mostly alcoholics and drug addicts, representing high risk groups for AIDS, hepatitis, etc.

Need of the hour...

- *Supply of contamination-free blood from licensed, quality-conscious Blood Banks.*
- *Motivate more and more voluntary, safe blood donors to replace 'professional' donors.*

ACTIONS

WHO

WHO Global Blood Safety Initiative involving development of Integrated Blood Transfusion Services with selection of the *RIGHT DONORS AND PRESCREENING OF BLOOD TO ENSURE SAFE AND SECURE BLOOD TRANSFUSION.*

Government

- Established Blood Transfusion Councils at the National as well as State level.
- Strengthened Drug Control Administration in States for licensing and effective monitoring of Blood Banks in terms of adequacy of testing and storage facilities.

BLOOD SAVES ONLY WHEN IT IS SAFE...

GLOSTER

AN ISO 9002 COMPANY

FIRST TO INTRODUCE

CONTINUOUS VULCANISING PROCESS FOR RUBBER INSULATED CABLE
INFRARED CURING PROCESS FOR SILICONE CABLE
RADIANT CURING PROCESS FOR XLPE CABLE
66 KV XLPE CABLE, 110 KV XLPE CABLE
AND
132 KV XLPE CABLE

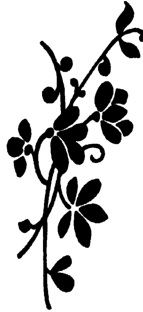


FORT GLOSTER INDUSTRIES LIMITED

31 CHOWRINGHEE ROAD, KOLKATA-700 016

Phone Nos : 216 6271-78 (8 lines) hunting
Fax No : (91) 033-249-5665
E-mail Address : fgiho@vsnl.net
Website URL : www.glostercable.com

With Best Compliments From :



B. S. SUNDARIYA & SONS

146/2, OLD CHINA BAZAR STREET
CALCUTTA-700 001

PHONE : 242-4867



কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৬

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

বর্ধমান

- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আসানসোল-৭১৩৩০১
- শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, শ্যামসায়র (পূর্ব)
  বর্ধমান-৭১৩১০১
- নরহরি পুস্তকালয়
  ৮১ বি. সি. রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১
- রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম
  রামমোহন অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৪
- আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
  ডি/২০, গ্রীসন স্ট্রীট, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২
- স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি
  বিদ্যাসাগর অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫
- নিমানন্দ নায়ক, ৬৩ কবিগুরু সরণি
  সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, ফোন : ৫৬৮৮২৩
- সাধুডাঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
  ডি. ভি. সি. কলোনী, দুর্গাপুর-৭১৩২০১
- রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি
  এ. বি. এল. টাউনশিপ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৬
- গুসকরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টার
  পিন-৭১৩১২৮
- অঞ্জনকুমার পাল
  প্রযত্নে বিবেকানন্দ পাঠচক্র
  কুমোরপাড়া (নারায়ণ ভবন), কাটোয়া-৭১৩১৩০
- শীতল ব্যানার্জী
  প্রযত্নে শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি, শ্রীখণ্ড-৭১৩১৫০
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র
  আমলাদহি, চিত্তরঞ্জন-৭১৩৩৩১
- পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম
  দার্জিলিং মোড়, পানাগড় বাজার-৭১৩১৪৮
- স্বামী অসীমানন্দ, সম্পাদক
  শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবামৃত সঙ্ঘ সেবাশ্রম
  গ্রাম—বুদবুদ, পোঃ বুদবুদ-৭১৩৪০৩, ফোন : ৫১২৬৫০
- রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র
  ৫৫/১ ভীমাচরণ রোড, কুমার বাজার
  রানীগঞ্জ, পিন : ৭১৩৩৪৭
- শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (মহীতোষ সামন্ত)
  বাঁকোলা এরিয়া কমপ্লেক্স, পোঃ উখড়া, পিন-৭১৩৩৬৩

উত্তরবঙ্গ

- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
  জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১
- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
  মালদা-৭৩২১০১
- বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
  রামকৃষ্ণ টিম্বার ডিপো
  নিউ মার্কেট, বালুরঘাট
  দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১
- স্বপনকুমার আইচ
  প্রযত্নে তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
  বিধানপল্লী, তুফানগঞ্জ
  কুচবিহার-৭৩৬১৬০
- অজয়কুমার গাঙ্গুলী
  রাজবাড়ি গভঃ হাউসিং, ব্লক সি-১/৯
  কুচবিহার-৭৩৬১০১, ফোন : ২৮৬৮৮

বিপণন-কেন্দ্র : কলকাতা-হাওড়া

- শ্যামবাজার বুক স্টল
  ২২০, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৪
- পাতিরাম বুক স্টল
  কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
- অদ্বৈত আশ্রম স্টল
  শিয়ালদহ স্টেশন, ৩নং প্ল্যাটফর্ম
- অদ্বৈত আশ্রম স্টল
  হাওড়া স্টেশন (মেন এবং নিউ কমপ্লেক্স)
- রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম
  বেলুড় মঠ
- সর্বোদয় বুক স্টল
  হাওড়া রেলস্টেশন

সৌজন্যে
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ
৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯

শ্রীশ্রী সারদামায়ের

মন্ত্রশিষ্য

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

প্রণীত

❖ স্মৃতিমূলক জীবনীগ্রন্থ ❖

- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
- শ্রীশ্রী সারদাদেবী
- স্বামী সারদানন্দের জীবনী
- শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ
- ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা
- প্রেমানন্দ-প্রেমকথা
- জীবন পরিক্রমা

আমাদের প্রকাশিত আরও বিভিন্ন স্মৃতিমূলক জীবনীগ্রন্থ

ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী

- মেঘনাদ বধ কাব্যে চিত্রকল্প

বিশ্বনাথ দে

- রবীন্দ্রস্মৃতি

ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

- বিবেকানন্দ স্মৃতি
- বঙ্কিম স্মৃতি
- রামমোহন স্মৃতি
- মধুসূদন স্মৃতি
- বিদ্যাসাগর স্মৃতি
- নজরুল স্মৃতি
- শরৎ স্মৃতি
- মা টেরেসা
- বায়রণ
- শেলী

শ্রী মোহিত কুমার বসাক

- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্মৃতি
- অরবিন্দ স্মৃতি
- নিবেদিতা স্মৃতি
- কিশোর শহীদ স্মৃতি
- সুভাষ স্মৃতি

সুবোধ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

- সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন
- The Early life of Netaji

সমর গুহ

- নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা
- Netaji Dead or Alive

ক্যালকাটা বুক হাউস

১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

☎ ২৪১-০৯৬৫/২৪১-৯৪০৪



All the secret of success is there : to pay as much attention to the means as to the end.

Swami Vivekananda



With Best Compliments From

DATTA FOOTWEAR INDUSTRIES PVT. LTD.

Regd. Office & Factory :

1, BIDHAN SARANI, KOLKATA-700 073

PHONE : 241-5248 ❑ FAX : (033) 241-7541

Unit-II

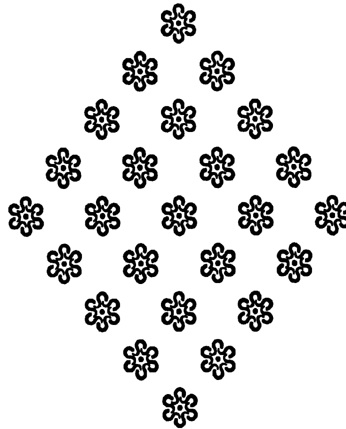
180, EAST SINTHI ROAD, KOLKATA-700 030

PHONE : 548-4500

With Best Compliments From :

H. K. GHOSE & CO.

Paper Merchants & Exercise Book Makers



WARDLEY HOUSE
25A, SWALLOW LANE, KOLKATA-700 001
PHONE : 220-5209



রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম

বৃন্দাবন, মথুরা, উত্তর প্রদেশ-২৮১১২১



রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন



সেবাশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে (১৯৬২) জওহরলাল নেহরু এবং স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ

একটি আবেদন

যুগপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে তীর্থস্থানের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে জীবনের শেষদিনগুলি অতিবাহিত করবার সঙ্কল্প করেছিলেন, শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের তপস্যাপূত সেই অতি প্রাচীন ও সনাতন ঐতিহ্যমণ্ডিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনধামে **'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র বাস্তব ও প্রত্যক্ষ রূপায়ণের জন্য ১৯০৭** সালে সূচনা হয়েছিল এক ক্ষুদ্র কর্মযজ্ঞের। **যার ফলশ্রুতি আজ প্রায় ১৫১ শয্যাবিশিষ্ট 'মানুষের সেবাই ঈশ্বরের পূজা'-রূপ এক বৃহৎ মানবসেবা কেন্দ্র বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম।**

সেবাশ্রমের সেবাকার্যের মধ্যে **১৫০টি শয্যাবিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ** হাসপাতালের ইন্ডোর ও আউটডোর বিভাগ ছাড়াও একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাবিভাগ, বিনা খরচে গরিব মেয়েদের ৩ বছরের নার্সিং ট্রেনিং, কুষ্ঠরোগী, দুঃস্থ ছাত্র, গরিব বিধবাদের নিয়মিত নানাপ্রকার সাহায্য করা হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবাশ্রমটি বৃন্দাবন তীর্থধামের অসহায় যাত্রিসাধারণ, ব্রজমণ্ডল ও দূর-দূরান্তের গ্রামবাসী **এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সমস্ত রোগী-নারায়ণের একমাত্র ১০০% নিঃশুল্ক চিকিৎসাস্থান** যা কোনরকম সরকারি সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র ভক্তদের দান দ্বারাই চলে।

মা ও শিশুদের ভালভাবে দেখাশুনা ও নার্সদের এব্যাপারে ভালভাবে প্রশিক্ষণের জন্য **ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের** নির্দেশে ৩০ শয্যার স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি **ম্যাটারনিটি ওয়ার্ড** তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এব্যাপারে **সমাজের সহৃদয় সর্বস্তরের মানুষ ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগীদের কাছে এই নিঃশুল্ক সেবাকার্য অব্যাহত ও সুসম্পন্ন করার জন্য আর্থিক সহযোগিতার আবেদন করছি।**

৩০ আসনবিশিষ্ট নতুন প্রসূতিসদন নির্মাণব্যয়	**৬০ লাখ**
যন্ত্রপাতি	**২০ লাখ**
অপারেশন থিয়েটারের সংযোজন ও পুনর্নির্মাণ	**১০ লাখ**

আমাদের বিশ্বাস সর্বস্তরের মানুষের সহানুভূতি, সহযোগিতা ও বদান্যতায় মিশনের এই নিঃশুল্ক সেবাকার্য কালে মহীরুহ হয়ে উঠবে। **সেবাশ্রমে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত।**

নার্সিং স্কুলের প্রসপেক্টাস ১ এপ্রিল থেকে দেওয়া হয়। এছাড়া কোন সহৃদয় **অবসরপ্রাপ্ত/প্রাক্তন Army Doctor** এই সুন্দর পরিবেশে থেকে স্বেচ্ছাসেবিরূপে অথবা কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমাদের সেবাব্রতে অংশগ্রহণ করতে চাইলে তাঁর/তাঁদের উদ্দেশে আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

আর্থিক দান চেক বা ড্রাফটে পাঠালে 'Ramakrishna Mission Sevashram, Vrindaban'—এই নামে পাঠাতে হবে।

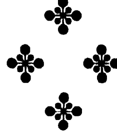
বিনীত নমস্কারান্তে

স্বামী সুপ্রকাশানন্দ

অধ্যক্ষ

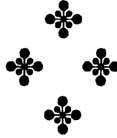
রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে যায়। অবতারেরাও সেইরকম সহস্র সহস্র লোকেদের ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ



মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার দিকে এগোতে চায় না। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আন্তরিক খুব যত্ন ও রোখ চাই।

শ্রীমা সারদাদেবী



যে-দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয়, সে-দেশ ক্রমশ ধর্মহীন হইয়া দাঁড়ায়। ভারতে কখনো এরূপ চেষ্টা হয় নাই। সেইজন্য এখানে প্রকৃত ধর্মভাব এখনো জাগ্রত।

স্বামী বিবেকানন্দ







উপভোগ করুন নিরাপত্তাপূর্ণ সুখী জীবনের পরম আনন্দ

পিয়ারলেস এম.আই.এস : ২০০০



মেয়াদ	সুনিশ্চিত প্রাপ্তি (প্রতিমাসে)	জমারাশি
১ বৎসর	৬৪৩ টাকা : প্রথম বর্ষে	১,০০,০০০ টাকা
২ বৎসর	৭৪০ টাকা : দ্বিতীয় বর্ষে	(ন্যূনতম ১০,০০০ টাকা
২½ বৎসর	৮৩৫ টাকা : দ্বিতীয় বর্ষের পরে	ও ৫,০০০ টাকার গুণিতকে
২½ বৎসরে	মোট ২১,৬০৬ টাকা	যেকোন উচ্চরাশি)

মূল বৈশিষ্ট্যগুলি :

- গ্যারান্টিযুক্ত প্রাপ্তি
- অগ্রীম পোস্টডেটেড চেক—পুরো আর্থিক বৎসরের
- উচ্চ লিকুইডিটি
- বাজারে তুলনামূলকভাবে স্বল্প মেয়াদি প্রকল্পগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ প্রাপ্তি
- তিনমাস পরে জমারাশির ৭৫% পর্যন্ত ঋণ পাওয়ার সুবিধা

ম্যাচিওরিটি দাবীপূরণের মোট পরিমাণ :
২৫০০ কোটি টাকারও বেশি



Estd 1932

® পিয়ারলেস
সঞ্চয়ের সহজ পথ
★
আস্থার প্রতীক

Website-http://www.peerless-in-india.com

ARUN SIGN/PGT/392

UDBODHAN
Phone : 554-2248, 554-2403
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com

Vol. 103 ❑ No. 4
❑ APRIL 2001 ❑

Licensed to Post
Without Prepayment
Licence No.
TECH/WB/RNP-15/LPWP-01/2001

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Regn. No.
TECH/WB/RNP-15/2001

উদ্বোধন

১০৩তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র



❑ গত ১লা মাঘ ১৪০৭ (১৫ জানুয়ারি ২০০১) **উদ্বোধন ১০৩তম বর্ষে** পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় **নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব** নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের **১০২ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম** ❑

- ❑ **বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন** একটি ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র মাত্র নয়, **উদ্বোধন** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। **ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের** সঙ্গে এবং **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন** ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত** রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র উদ্বোধন আপনাকে পড়তে হবে।
- ❑ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে **উদ্বোধন** নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন** একটি **সার্থক পারিবারিক পত্রিকা**। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন**-এ প্রকাশিত হয়।
- ❑ **উদ্বোধন** শুধু বাংলার **সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা** নয়, উদ্বোধন বাংলার **সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ পত্রিকা** এবং বাংলার **সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক পত্রিকা**।
- ❑ ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র হয়েও **উদ্বোধন** তার মহান প্রবর্তকের নির্দেশ অনুসারে **কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আদর্শের মুখপত্র নয়**। উদ্বোধন তার **সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র** বিগত ১০২ বছর ধরে অটুট রেখেছে।
- ❑ **উদ্বোধন**-এর গ্রাহক হওয়ার **অর্থ একটি পত্রিকার** গ্রাহক হওয়া নয়, একটি **মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের** সঙ্গে যুক্ত হওয়া।
- ❑ **উদ্বোধন** একটি পত্রিকা মাত্র নয়, **উদ্বোধন** শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর।
- ❑ **স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল** প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে। উদ্বোধন-এর প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে গ্রাহক করলেই এখনি **উদ্বোধন-এর গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার** হয়ে যায়। তাই আপনার নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করাও আপনার কাছে **স্বামীজীর প্রত্যাশা**। স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের **গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের**। অবশ্য ইন্টারনেট সংস্করণের মাধ্যমে **উদ্বোধন** আজ **ভারত ও বিশ্বজুড়ে** লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে।
- ❑ **স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।** সেকথা স্মরণ করে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে অনুরাগী ও ভক্তগণ উদ্বোধন-এর প্রতি নিশ্চয়ই তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।
- ❑ **উদ্বোধন-এর শারদীয়া** সংখ্যাটির জন্য **গ্রাহকদের থেকে আলাদা মূল্য নেওয়া হয় না**। এই সংখ্যাটি গ্রাহকদের জন্য আমাদের **শারদ উপহার**। প্রসঙ্গত সকলের অবগতির জন্য জানাই যে, **শারদীয় সংখ্যাটি** আমাদের সাধারণ সংখ্যার **তিনগুণ** এবং বিশেষ সংখ্যা হওয়ায় অলঙ্করণের জন্য খরচও হয় যথেষ্ট। গত কয়েক মাসে **কাগজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং অন্যান্য ব্যয়বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শারদীয়া সংখ্যা সহ গ্রাহক পিছু আমাদের বার্ষিক খরচ দাঁড়িয়েছে মুদ্রিত গ্রাহকমূল্যের সওয়া তিন গুণ**। বিশাল অঙ্কের এই অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য আমরা নির্ভর করি সহৃদয় বিজ্ঞাপনদাতাদের **সক্রিয়** সহযোগিতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক বদান্যতার ওপর।
- ❑ **পত্রিকা প্রকাশ সংক্রান্ত ব্যয় প্রতি বছর** বেড়ে গেলেও তিন বছর (১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০১) 'উদ্বোধন' এর **গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত** রাখা হয়েছে। এত **সুলভ মূল্যে এমন সম্পূর্ণ পত্রিকা বাঙলা** ভাষায় আর একটিও নেই।
- ❑ **উদ্বোধন**-এর সেবায় তিনটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি **'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল'**, অন্য দুটি যথাক্রমে 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল' এবং 'স্বামী **বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি** তহবিল'। উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে **আয়করমুক্ত**। **আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 'Ramakrishna Math, Baghbazar'**— এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা : **সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩**। দাতার চিঠিতে বা M.O. কুপনে 'উদ্বোধন পত্রিকার সেবায়' অথবা **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** অথবা **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ** স্মৃতি তহবিল'-এর জন্য যেন লেখা থাকে।
- ❑ **উদ্বোধন-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে** মতিলাল-তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাঁদের পুত্রকন্যাদের পক্ষে স্থায়ী ভিত্তিতে 'উদ্বোধন মেধা সম্মান' (একবছরের জন্য **উদ্বোধন-এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি**) নির্দেশিত হয়েছে। **পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের** যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। **২০০১ সালের** জন্য অনুরূপ সম্মান সুকুমার নিভারাণী পাড়ুই-এর স্মৃতিতে তাঁদের পুত্র অমর পাড়ুই নিবেদন **করেছেন**। **এই সম্মানপ্রাপকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্ষদ পরিচালিত ২০০০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় 'সম্মান'**-এর জন্য **সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বোধন-সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ** করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
সম্পাদক

সৌজন্যে

পি. বি. সরকার অ্যান্ড সন্স

(কোন ব্রাঞ্চ নেই)

জুয়েলার্স

সন অ্যান্ড গ্র্যান্ড সন্স অব লেট বি. সরকার

৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০ ❑ ফোন : ২২৩-৮৭১৩, ২২৩-৭৫৭৮

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

উদ্বোধন











"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

আনন্দবাজার পত্রিকা

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১



আবেদন

রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম)-এর সম্প্রসারণ

রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম) বেলুড় মঠের একটি শাখাকেন্দ্র। এই আশ্রমটি ১৯২০ সালের ১৭ নভেম্বর বর্তমান বাড়িতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। যথোচিত পূজানুষ্ঠানের পর স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরের পট সিংহাসনে বসিয়ে প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পাদন করেছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজের কাছে দাতার প্রার্থনা ছিল—"আমার পুত্র গদাধরের স্মৃতিরক্ষার্থে এটিকে 'গদাধর আশ্রম' নাম দিলে আমার প্রাণের একান্ত ইচ্ছা পূর্ণ হবে।" মহাপুরুষ মহারাজ বলেছিলেন ঃ "তোমার ছেলের নাম গদাধর হলেও তুমি মনে করবে, এই আশ্রম ঠাকুরের বাল্যকালের নামে নামকরণ হয়েছে।" এখানে মহাপুরুষ মহারাজ ছাড়া স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ ও মাস্টারমশাই (শ্রীম) এসেছিলেন। এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার কথা যখন চলছে শ্রীশ্রীমা তখন উদ্বোধনে অন্তিমশয্যায় শায়িতা। এই আশ্রম স্থাপনের সংবাদে তিনি আনন্দ প্রকাশ করে বলেছিলেন ঃ "কালীক্ষেত্রে আদিগঙ্গার তীরে ঠাকুরের আশ্রম হবে—বেশ হবে। সেরে উঠে ওখানে গিয়ে কিছুকাল থাকব।" শ্রীশ্রীমা স্থূলশরীরে গদাধর আশ্রমে আসেননি, কিন্তু এই আশ্রমটি নিঃসন্দেহে তাঁর আশীর্বাদপূত।

এই আশ্রমটির প্রধান সমস্যা স্থানাভাব। ঠাকুরমন্দির ও নাটমন্দির একটি গৃহকেই দু-ভাগ করে করা হয়েছে। নাটমন্দিরে বড়জোর ৩০ জন বসতে পারে। তিথি উৎসবের সময় ৩½ ফুট বারান্দা দিয়ে আসা-যাওয়া করা যায় না। সেজন্য আরো স্থান বাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। পিলার দিয়ে ছাদ করার প্রয়োজন হতে পারে। তাতে প্রায় ৩০,০০,০০০ (ত্রিশ লক্ষ) টাকার প্রয়োজন। কিভাবে জায়গা বাড়ানো হবে তা ইঞ্জিনিয়ার, কর্পোরেশন ও মঠ কর্তৃপক্ষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্থিরীকৃত হবে। এই মহৎ কার্য সম্পন্ন করার জন্য আমরা সহৃদয় জনসাধারণের কাছে মুক্তহস্তে দান করার জন্য আন্তরিকভাবে আবেদন জানাই।

অনুগ্রহ করে আপনার আর্থিক দান নগদে বা চেক/ড্রাফট-এর মাধ্যমে **'Ramakrishna Math (Gadadhar Ashrama)'**—এই নামে পাঠাবেন। এই কার্যে দেয় সমুদয় আর্থিক দান আয়কর বিভাগের ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। সকলের সহযোগিতা একান্ত প্রার্থনীয়।

রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম)
৮৬এ, হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০২৫
দূরভাষ ঃ ৪৫৫-৪৬৬০

বিনীত
স্বামী ঋদ্ধানন্দ
অধ্যক্ষ

With Best Compliments From:
CROMPTON GREAVES LIMITED
ENGINEERING PROJECTS DIVISION
Please Visit Us at www.cromptongreaves.com



রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ

পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া-৭১১ ২০২, ফোন ঃ ৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২

সারদাপীঠ থেকে প্রকাশিত অডিও ক্যাসেটসমূহ

মূল্য ❑ SP-1 ও SP-31–34 ঃ ৩৫ টাকা, অন্যান্য ঃ ৩০ টাকা

SP-1	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্	(সংস্কৃত ও বাঙলা)
SP2, SP-7, SP-8, SP-10 হইতে 12	কথামৃতের গান (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড)	(বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি)
SP-3	শ্রীরামনামসংকীর্তন	(সংস্কৃত ও হিন্দি)
SP-4	বক্তৃতা—যুগপুরুষ	(বাঙলা) (শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত)
SP-5	শ্রীশ্রীচণ্ডীস্তব	বাঙলা, সংস্কৃত)
SP-6	শিবমহিমা	(বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি)
SP-9	শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা	(সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি)
SP-13	শ্রীসারদাবন্দনা	(সংস্কৃত, বাঙলা)
SP-20	বিবেকানন্দবন্দনা	(সংস্কৃত, বাঙলা)
SP-24	শ্রীকৃষ্ণবন্দনা	(সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি)
SP-14 হইতে SP-16	কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)	(বাঙলা)
SP-17	বীরবাণী	(সংস্কৃত, বাঙলা, ইংরেজী ও হিন্দি)
SP-18	গীতিবন্দনা	(হিন্দি)
SP-19	বক্তৃতা—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান	(বাংলা) (শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত)
SP-21 ও SP-22	সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড)	(হিন্দি)
SP-23	ওঠো জাগো	(হিন্দি)
SP-25	শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি	(হিন্দি)
SP-26	বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি	(হিন্দি)
SP-27	বেদমন্ত্র	(সংস্কৃত) (উপনিষদের মন্ত্রসমূহ)
SP-28	সরস্বতী বন্দনা	(বাঙলা, সংস্কৃত)
SP-29	Ramakrishna Movement	(Lecture by Revered Srimat Swami Bhuteshanandaji Maharaj)
SP-30	Religion in Practice	(do)
SP-31 হইতে SP-34	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (আবৃত্তি) (১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড)	(সংস্কৃত)
SP-35	আগমনী	(বাঙলা)
SP-36	ভজন সুধা	(হিন্দি)

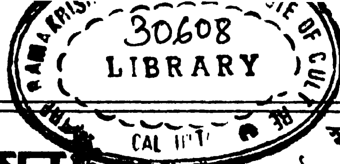
শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্, শ্রীরামনামসংকীর্তন ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার C. D. প্রকাশিত হয়েছে।

স্বামী সর্বগানন্দ, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ, স্বামী দিব্যব্রতানন্দ, শ্রীমহেশরঞ্জন সোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য দক্ষ শিল্পিগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন।

Video Cassette :
Centenary Celebration of the Ramakrishna Mission at Belur Math in 1998.
Duration—80 minutes
Rs. 250.00

প্রাপ্তিস্থান ঃ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি (কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক) ও সিমফনি (ধর্মতলা মেট্রো সিনেমার পাশে)

ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে M.O. অথবা Bank draft মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে।


30608 LIBRARY CAL

2 6 MAY 2001

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
উদ্বোধন ॥১০৩॥
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র | ১০৩তম বর্ষ | ৫ম সংখ্যা | জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ | মে ২০০১

প্রচ্ছদ ❑ ওপরে কৈলাস, নিচে মানস সরোবর। নিচে মানস সরোবর থেকে দৃশ্যমান কৈলাস।
মানস সরোবরে সন্তরণরত হংসযুগল—লোকবিশ্বাসে, হর-পার্বতী।

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'
প্রচ্ছদ ❑ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ ❑ আলোকচিত্র : বেলুড় মঠের জনৈক সন্ন্যাসী
website : www.udbodhan.org ◆ **e-mail :** udbodhan@vsnl.com
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ : ৬৫ টাকা; সডাক : ৭৫ টাকা
আলাদাভাবে কিনলে বর্তমান সংখ্যার মূল্য : ৮ টাকা ❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ❑ ৩০০০ টাকা
[একবছরের মধ্যে পরিশোধ্য কমপক্ষে ৫০০ টাকা প্রতি কিস্তি হিসাবে ৬টি কিস্তিতেও প্রদেয়]



'উদ্বোধন'ঃ আশ্বিন (শারদীয়া) ১৪০৮ সংখ্যা

গ্রাহকদের জন্য জরুরী বিজ্ঞপ্তি

- যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও 'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন/সেপ্টেম্বর (শারদীয়া) সংখ্যা প্রকাশিত হবে। সংখ্যাটির মূল্য ঃ ৪০ টাকা।
- 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না। গ্রাহকরা ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে অগ্রিম টাকা জমা দিলে অতিরিক্ত প্রতি কপি ৩০ টাকায় পাবেন। অতিরিক্ত কপি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিলে পাঠানোর খরচ বাবদ অতিরিক্ত ২২ টাকা (প্রতি কপির জন্য) জমা দিতে হবে। কপিটি অগ্রিম জমার ক্যাশমেমো দেখিয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে ৫ অক্টোবর ২০০১ পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে।
- আকারে সাধারণ সংখ্যার তিনগুণ শারদীয়া সংখ্যাটি সাধারণ ডাকে না পেলে আমাদের পক্ষে সংখ্যাটির ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়।
- ডাকযোগে (By Post) যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে সেই সংবাদ কার্যালয়ে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে তাঁদের পত্রিকা ডাকযোগেই (By Post) যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহের সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।
- যাঁরা আমাদের গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সডাক গ্রাহক হয়েছেন/নবীকরণ করেছেন, তাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি ঐ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সংগ্রহ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রগুলিতে ২০ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে সেই সংবাদ জানাতে হবে, যাতে তারা আমাদের কাছে ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে সংবাদটি দিতে পারে।
- অনুগ্রহ করে স্মরণ রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ করার সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক। উল্লেখ না থাকলে অথবা কোন একটিমাত্র উল্লেখ করলে সংবাদটি গ্রাহ্য হবে না।
- যাঁরা ডাকযোগে (By Post) পত্রিকা নেন, তাঁরা চাইলে শারদীয়া সংখ্যাটি রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে পারেন। সেজন্য তাঁদের প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ২২ টাকা পাঠাতে হবে। তবে ঐ সংক্রান্ত সংবাদ এবং ২২ টাকা গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে অবশ্যই কার্যালয়ে এসে পৌঁছানো প্রয়োজন।
- প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্ত্বেও অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে জানান এবং তাঁদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহকদের সহৃদয় সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।
- কিছু অসৎ ব্যক্তি কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের শারদীয়া সংখ্যা সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা যাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ করবেন, তাঁদের বিশেষভাবে জানানো হচ্ছে যে, শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় তাঁদের নবীকরণ/গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/M.O. প্রাপ্তি-কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে (যদি ক্যাশমেমো/রসিদ/M.O. প্রাপ্তি-কুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে সেই মর্মে সম্পাদকের কাছে তা লিখিতভাবে জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে) নতুবা আমাদের পক্ষে তাঁদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।
- যাঁরা প্রতি মাসে পত্রিকা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করেন এবং যাঁরা শুধুমাত্র শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করবেন তাঁরা ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর ২০০১ পর্যন্ত শারদীয়া সংখ্যাটি কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন এই সময়ের মধ্যে তাঁদের সংখ্যাটি সংগ্রহ করে নেন। বিশেষ কারণে ঐ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে ২০ অক্টোবরের (২০০১) মধ্যে অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে। কার্যালয়ে স্থানাভাবের জন্য তারপর সংখ্যাটি রাখা সম্ভব হবে না। সেজন্য সংখ্যাটির প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না। আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকবর্গের পূর্ণ সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।
- কার্যালয় কাজের দিন (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ পর্যন্ত এবং শনিবার বেলা ১-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা, রবিবার বন্ধ থাকে। ১৭ সেপ্টেম্বর মহালয়া এবং ২৩ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর ২০০১ পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে। পূজাবকাশের পর ২ নভেম্বর ২০০১ শুক্রবার কার্যালয় খুলবে।

সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইন্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯

2 6 MAY 2001
LIBRARY
CAL

উদ্বোধন
১০৩
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮
মে ২০০১

দিব্য বাণী



মতবাদ ও সম্প্রদায় প্রভৃতির প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু সেসব শিশুদের জন্য। উহাদের প্রয়োজন সাময়িক। শাস্ত্র কখনো আধ্যাত্মিকতার জন্ম দেয় নাই, বরং আধ্যাত্মিকতাই শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছে—একথা যেন আমরা না ভুলি।... [তাই] আমি বলিতে চাই যে, কোন সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করা ভাল, কিন্তু উহারই গণ্ডির মধ্যে মরা ভাল নয়। শিশু হইয়া জন্মগ্রহণ করা ভাল বটে, কিন্তু আমরণ শিশু থাকিয়া যাওয়া ভাল নয়।... শিশু যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইবে, তখন তাহাকে ঐ গণ্ডিসমূহের বা নিজের শিশুত্বের সম্পূর্ণ বাহিরে চলিয়া যাইতে হইবে।

ধর্ম গ্রন্থে নাই, মত-মতান্তরে নাই, বচনে নাই, যুক্তি-তর্ক-বিচারের মধ্যেও নাই। ধর্ম হইল হইতে থাকা এবং অবশেষে হইয়া যাওয়া।

সেই এক বিরাজিত অন্তরে বাহিরে,
সব হাতে তাঁরই কাজ,
সব পায়ে তাঁরই চলা,
তাঁরই দেহ তোমরা সবাই,
কর তাঁর উপাসনা,
ভেঙে ফেল আর সব পুতুল প্রতিমা।

*

ওরে মূর্খদল!
জীবন্ত দেবতা ঠেলি,
অবহেলা করি
অনন্ত প্রকাশ তাঁর এ ভুবনময়,
চলেছিস মিথ্যা মায়ার পিছনে
বৃথা দ্বন্দ্ব কলহের পানে—
কর তাঁর উপাসনা, একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা
ভেঙে ফেল আর সব পুতুল প্রতিমা।

স্বামী বিবেকানন্দ

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভারতধর্ম

ভারতবর্ষের প্রধান ধর্ম হিন্দুধর্ম। হিন্দুধর্ম শুধু ভারতবর্ষের প্রধান ধর্মই নহে, হিন্দুধর্ম ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ধর্মও। এই ধর্ম যেমন আর্যধর্ম, তেমনি আবার দ্রাবিড়ধর্ম। হিন্দুধর্ম আবার আর্য ও দ্রাবিড় জাতির সীমার বাহিরে বহু আদিবাসীরও ধর্ম। ভারতবর্ষের দুই প্রাচীন ধর্ম জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক-পুরুষদের ধর্মও হিন্দুধর্ম। কিন্তু 'হিন্দুধর্ম' নামে কোন ধর্মের উল্লেখ আমাদের বেদ-বেদান্তে অথবা প্রাচীন শাস্ত্র বা ধর্মগ্রন্থে নাই। এই অভিধাটি পরবর্তী কালের। হিন্দুর ধর্মকে 'হিন্দুধর্ম' বলা যাইতে পারে, তবে বেদ-বেদান্তে যে-ধর্মের বিস্তার, সেই ধর্মের সুপরিচিত সুপ্রাচীন নাম 'সনাতন ধর্ম'। শঙ্করাচার্যের সময় (৭৮৮-৮২০) পর্যন্ত ঐ নামেই ছিল হিন্দুধর্মের পরিচিতি। হিন্দুধর্মের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ আচার্যগণের অন্যতম শঙ্কর তাঁহার রচনায় ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রাচীন ধর্ম বলিতে 'সনাতন ধর্ম' অভিধাটিই ব্যবহার করিয়াছেন।

বস্তুত, 'সনাতন ধর্ম'ই ছিল হিন্দুধর্মের আদি অভিধা। আমাদের ধর্মকে 'সনাতন ধর্ম' কেন বলা হইত? কারণ, ভারতবর্ষে উদ্ভূত এই প্রাচীন ধর্ম কোন সাম্প্রদায়িক ভাবকে আশ্রয় করে নাই, কোন সঙ্কীর্ণ ভাবকে প্রশ্রয় দেয় নাই। এই ধর্মের কবে সূচনা হইয়াছিল এবং কে অথবা কাহারা উহার সূচনা করিয়াছিলেন, তাহাও কেহ জানে না। ইতিহাসের কোন সন্ধানী আলোক সেই সুদূর অন্ধকারে এখনো প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় নাই। পৃথিবীর অন্যান্য প্রধান ধর্মগুলির সূচনাকাল ঐতিহাসিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং উহাদের প্রবর্তকগণও জগদ্বিখ্যাত। কিন্তু ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ও প্রধানতম ধর্ম হিন্দুধর্মের সুনির্দিষ্ট সূচনাকাল নিরূপণ করিতে ইতিহাস ব্যর্থ হইয়াছে। আবার ইহাও সর্বসম্মত যে, ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ও প্রধানতম ধর্মের কোন প্রবর্তক নাই। সেজন্য এই ধর্মকে বলা হয় 'অপৌরুষেয়'। 'সনাতন ধর্ম'-এর মূল ও প্রধান ধর্মগ্রন্থ 'বেদ' অথবা 'শ্রুতি'। ইহারও কোন রচয়িতা নাই। কয়েকজন ঋষির নাম জানা যায়, যাঁহারা বেদ বা শ্রুতির মধ্যে বিধৃত কয়েকটি মন্ত্রের 'দ্রষ্টা'। তাঁহারা মন্ত্রনিবদ্ধ সত্যকে 'দর্শন' বা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অর্থাৎ তাঁহাদের হৃদয়ে ঐ মন্ত্রগুলিতে বিধৃত সত্যের উদ্ভাসন হইয়াছিল। কিন্তু বিশাল শ্রুতি বা বেদ-এর মধ্যে বিধৃত মন্ত্রগুলির দ্রষ্টাদের অধিকাংশেরই নাম জানা যায় না। সেজন্য ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ও প্রধানতম ধর্মগ্রন্থকেও বলা হয় 'অপৌরুষেয়'। আবার শ্রুতি বা বেদকে হিন্দুরা কখনোই ধর্মগ্রন্থ-রূপে দেখেন নাই। উহা হইল ঋষিদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত সত্য বা জ্ঞানরাশির ভাণ্ডার, যে-সত্য অথবা যে-জ্ঞান অশেষ, অনন্ত, শাশ্বত এবং নিত্যপ্রাসঙ্গিক। সেজন্যই হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যগত অভিধা হইল 'সনাতন ধর্ম'। 'সনাতন' শব্দের অর্থ নিত্য, চিরবর্তমান, শাশ্বত। নিত্যবস্তুর উপর কোন মানুষের কর্তৃত্ব থাকিতে পারে না। কেহ উহাকে নিজস্ব বলিয়া দাবি করিতে পারে না। হিন্দুধর্ম সেজন্যও 'সনাতন ধর্ম'।

'সনাতন ধর্ম' যে-অভিধায় বর্তমানে দেশ ও দেশান্তরে পরিচিত, কালের বিচারে সেই 'হিন্দুধর্ম' শব্দটির প্রাচীনত্ব বড়জোর কয়েক শতাব্দীর। প্রাচীনকালে পারসিকরা যখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপথ দিয়া ভারত আক্রমণ করে এবং সেই সূত্রে যখন ভারতের সঙ্গে তাহাদের সংযোগ শুরু হয়, তখনই 'হিন্দু' শব্দটির জন্ম। পারসিকরা 'শ', 'ষ', 'স' উচ্চারণ করিতে পারিত না, তাহারা উচ্চারণ করিত 'হ'। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রবাহিত 'সিন্ধু' সেজন্য তাহাদের উচ্চারণে হইয়াছিল 'হিন্দু'। সিন্ধুনদের পূর্বতীরের বা অপর তীরের লোকেদেরও তাহারা 'হিন্দু' বলিত। তাহাদের উচ্চারণ-বিকৃতিতে এইভাবে প্রাচীন পারসিকদের কাছে 'হিন্দু' শব্দটি হইয়া উঠিয়াছিল সিন্ধুনদের পূর্বতীরের অধিবাসীদের পরিচায়ক। কালক্রমে শুধু পারসিকরাই নহে, ভারত-আক্রমণের সূত্রে আগত গ্রীকরাও সিন্ধুনদের অপর পারের মানুষদের 'হিন্দু' বলিত। এইভাবে সিন্ধুনদের পূর্বতীরবর্তী ভূখণ্ডের অধিবাসীদের বহির্বিশ্বে 'হিন্দু' নামে পরিচিতি শুরু হইয়াছিল। কিন্তু এই পরিচিতি বহুকাল শুধুমাত্র জাতিবাচক ও স্থানবাচক পরিচিতিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই পরিচিতি ধর্ম ও সংস্কৃতি-বাচক ছিল না। এদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে 'হিন্দু' অভিধার সংযুক্তি বহু পরবর্তী কালের ঘটনা। পারসিক ও গ্রীক আগ্রাসন সিন্ধু অতিক্রম করিয়া ভারত ভূখণ্ডে অগ্রসর হইতে পারে নাই। ফলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে উহার কিছুটা প্রভাব পড়িলেও হিন্দু ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উহা কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। কিন্তু দশম শতাব্দীর শেষে ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণের পর হইতে ছবিটি পালটাইতে শুরু করে। ধীরে ধীরে দুই শতাব্দীর মধ্যেই ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনের সূচনা হয় এবং ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ মোগল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমান শাসনের সূচনা হইতেই মুসলমানরা এদেশীয়দের হইতে নিজেদের পৃথক জাতিসত্তা ও ধর্মসত্তা সূচিত করিতে এদেশীয়দের 'হিন্দু' এবং তাহাদের ধর্মকে 'হিন্দুধর্ম' বলিতে শুরু করে। প্রথমদিকে ইহার ব্যাপ্তি সামান্যই ছিল, কিন্তু মোগল শাসনকালে এদেশীয়দের 'হিন্দু' নামে এবং তাহাদের ধর্মের 'হিন্দুধর্ম' নামে পরিচিতি ক্রমশ ব্যাপকতা লাভ করিতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ আমলের প্রবর্তন হইলে বহির্বিশ্বে 'হিন্দু' এবং 'হিন্দুধর্ম'

অভিধা-দুটি সুপ্রচারিত হয়। তবে অন্তত বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেও বহির্বিশ্বে 'হিন্দু' বলিতে শুধু হিন্দুদেরই বুঝাইত না—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান সকলকেই অর্থাৎ ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের অধিবাসীকেই বুঝাইত এবং বহির্বিশ্বে ভারতবর্ষ পরিচিত ছিল 'হিন্দুস্থান' নামে। এখন অবশ্য দেশে-দেশান্তরে 'হিন্দু' ও 'হিন্দুধর্ম' বলিতে ভারতবর্ষের প্রধানতম ধর্মসম্প্রদায় এবং উহার অনুবর্তীদের বুঝাইয়া থাকে।

'হিন্দু' ও 'হিন্দুধর্ম'-এর এই সাম্প্রদায়িক পরিচয়ের জন্য হিন্দুরা কোনভাবেই দায়ী নহে। এই পরিচয় হিন্দুরা নিজেদের জাতি অথবা ধর্মকে কখনো প্রদান করে নাই। এই পরিচয় নিছকই আকস্মিক এবং উহা প্রথমে ছিল বিরাট ভারতবর্ষের অধিবাসীদের একটি আঞ্চলিক পরিচয়। 'হিন্দু' অভিধাটি আঞ্চলিক অভিধা হইতে ক্রমে যে জাতীয় অভিধায় পর্যবসিত হইয়াছিল—ইহা আমাদের জীবনে নিতান্তই একটি আকস্মিক ঘটনা এবং ইহার সহিত আমাদের জাতিসত্তা, ধর্মসত্তা এবং সংস্কৃতিসত্তার মূলগত এবং বৈশিষ্ট্যগত কোন সম্পর্কই নাই। 'হিন্দু' এবং 'হিন্দুধর্ম' এখন আমাদের শুধুমাত্র একটি সম্প্রদায়গত পরিচয় প্রদান করে; কিন্তু আমাদের যে মূল পরিচয়—আমরা 'সনাতন ধর্ম'-এর অনুসারী ও অনুবর্তী—সেই পরিচয় কোন সাম্প্রদায়িক গণ্ডির দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। 'হিন্দু' ও 'হিন্দুধর্ম' অভিধা-দুটির মধ্যে আমাদের আত্ম-পরিচয়ের মূল তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত। কিন্তু খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ হইলেও 'হিন্দু' এবং 'হিন্দুধর্ম' আজ শুধু জাতীয় পরিচিতি নহে, বিশ্ব-পরিচিতিও লাভ করিয়াছে। এই পরিচিতি আজ ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ও প্রধানতম ধর্ম 'সনাতন ধর্ম'-এর এই পরিণতি প্রত্যাশিত না হইলেও এই পরিচিতির পরিধি হইতে আমাদের বাহির হইবার এখন আর কোন উপায় নাই। এই সত্য যেমন অনস্বীকার্য তেমনি ইহাও অনস্বীকার্য যে, বর্তমানের 'হিন্দুধর্ম' যেভাবেই আজ উপস্থাপিত হউক না কেন, যে-অবস্থার মাধ্যমেই এই পরিণতি সম্ভবায়িত হউক না কেন—ইহা কিন্তু 'সনাতন ধর্ম'-এরই কাল-পরিণত প্রকাশ। সুতরাং 'হিন্দুধর্ম' অভিধাটি 'সনাতন ধর্ম'-এর পূর্ণ-পরিচয়বাহী না হইলেও 'হিন্দুধর্ম' বলিতে আমরা এখন 'সনাতন ধর্ম'কেই বুঝি এবং উহার মূল গৌরব ও কুল-মহিমাকেই স্মরণ করিতে চাহি।

'হিন্দুধর্ম' শব্দটির মধ্যে যে 'সনাতন ধর্ম'-এর মূল তাৎপর্য এবং মূল সার্থকতা অনুপস্থিত, সেবিষয়ে সম্ভবত আমাদের সর্বপ্রথম সচেতন করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সেজন্য 'হিন্দুধর্ম'-এর পরিবর্তে 'সনাতন ধর্ম' অভিধাটির এবং 'হিন্দু' শব্দের পরিবর্তে 'বৈদিক' বা 'বৈদান্তিক' শব্দ ব্যবহারের তিনি ছিলেন পক্ষপাতী। কিন্তু তিনিও জানিতেন, 'হিন্দু' এবং 'হিন্দুধর্ম' শব্দ-দুটি এমনই জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে যে, অন্য যেকোন নামে ঐ জনপ্রিয়তা অর্জন অসম্ভব। সেজন্য 'হিন্দু' এবং 'হিন্দুধর্ম' শব্দ-দুটির বহুল ব্যবহার তিনি স্বয়ং করিয়াছেন। কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি বারংবার আমাদের অবহিত করিতে চাহিয়াছেন যে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষা আপাতত অধিকতর উপযুক্ত কোন শব্দ না পাইয়াই আমরা ইহার ব্যবহার করিতেছি, তবে এই দুটি শব্দের মধ্যে আমাদের জাতির, আমাদের ধর্মের, আমাদের ঐতিহ্যের এবং আমাদের সংস্কৃতির সমস্ত গৌরব ও মহিমাকে যেন আমরা উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করি। ভারতবর্ষে যখন 'হিন্দুধর্ম'-এর (অর্থাৎ 'সনাতন ধর্ম'-এর) সূচনা হইয়াছিল, তখন পৃথিবীতে আর কোন ধর্মের প্রচলন হয় নাই। তবুও অসাধারণ প্রজ্ঞাদৃষ্টির শক্তিতে ভারতবর্ষের মহান ঋষিরা আগামী দিনের ধর্মভিত্তিক সমস্ত সঙ্কীর্ণতা ও গোষ্ঠীচেতনার ঊর্ধ্বে তাঁহাদের ধর্মের ধারণা ও ভাবনাকে উপস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উপলব্ধ ও প্রাপ্ত এই ধর্মের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক ব্যবধান-রেখা ছিল না। তাঁহাদের ধর্ম ছিল বস্তুতপক্ষে বিশ্বজনীন ধর্ম। আকাশের মতো উদার তাহার বিস্তার এবং সমুদ্রের মতো গভীর তাহার মর্মবাণী। গোষ্ঠীর ধর্ম, সম্প্রদায়ের ধর্ম উহা নহে—উহা সকলের, সর্বদেশের, সর্বকালের ধর্ম। উহা 'মানবধর্ম'।

স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার শিকাগো ধর্মমহাসভায় ভারতবর্ষের এই মহান ঐতিহ্যময় 'হিন্দুধর্ম'-এর গৌরব ও মহিমাকে পৃথিবীর সম্মুখে উপস্থাপন করিয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক মঞ্চভূমিতে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে নিজের উপলব্ধিকে প্রকাশ করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, সর্বকালের সব মানুষকে একদিন এই ধর্মের আশ্রয়ে আসিতে হইবে। মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচিতে পারে না, মানবসভ্যতাও সেইরকম এই ধর্মের অনুশীলন ব্যতীত বর্বরের সভ্যতায় পরিণত হইবে। বিকাশের সর্বোত্তম অবস্থায় মানুষের যে মানব-রূপ—সেইটিই এই ধর্মের ফলিত রূপ। স্বামীজী বলিয়াছিলেন, মন্দির, তীর্থ, ধর্মগ্রন্থ নয়; বিগ্রহ, উপগ্রহ নয়; এই ধর্মের অবস্থান মানুষের হৃদয়মন্দিরে। এই ধর্ম বলে, বিচার আর আন্তরিক অন্বেষণে মানুষ অনিত্যের জগতে নিত্যকে খুঁজিয়া পায়। সত্যের আলোকে নিজেকে আবিষ্কার করে। সঙ্কীর্ণতা হইতে উদারতায়, সঙ্ঘাত হইতে সহনীয়তায়, অপ্রেম হইতে প্রেমে উপনীত হয়। তখন তাহার দৃষ্টির উদ্ভাসে ধ্বনিত হয়—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।"

ধর্ম-ব্যবসায়ীরা এই 'সনাতন ধর্ম'কে মানববিকাশে ব্যবহার না করিয়া করিয়া তুলিয়াছিল শোষণের হাতিয়ার। কুসংস্কারের মোড়কে মুড়িয়া তাহারা যে-ধর্মকে ধর্ম বলিয়া উপস্থিত করিয়াছিল—তাহাতে প্রেম, মুক্তি, বিকাশ, আরোহণ, চৈতন্য—এসব কিছুই ছিল না, ছিল শুধু স্বার্থপরতা, লোভ, ঘৃণা আর ভয়। মনুষ্যত্বের বিকাশ নহে, ধর্মের নামে মনুষ্যত্বের অসম্মান করা হইতেছিল পদে পদে। বেদের সনাতন ধর্মের উপর খাড়া হইয়াছিল কুসংস্কারের বিগ্রহ। স্বামী বিবেকানন্দের

সেই শ্লেষাত্মক গল্পটি মনে পড়িতেছে। বিশাল মন্দিরের দূর গর্ভগৃহের নির্জনতায় একা দেবতা পড়িয়া আছেন অবহেলায়। প্রবেশ-তোরণের একপাশে শতপদ, শতমস্তক, শত-উদর বিশিষ্ট বিশাল বিকৃত একটি মূর্তি স্থাপিত। সকলে সেই মূর্তিটিরই পূজায় ব্যস্ত। এটি লোকাচারের, কুসংস্কারের বিগ্রহ। ইঁহাকে সন্তুষ্ট না করিতে পারিলে দেবতা কী করিবেন! সমুদ্র পরিণত হইল কূপে। ধর্ম নিক্ষিপ্ত হইল অর্থহীন, প্রাণহীন, হৃদয়হীন আচারের আবর্জনায়।

একটি বিস্ফোরণের অপেক্ষায় ছিল সনাতন ধর্ম। বিজ্ঞান এবং বস্তুবাদের আঘাতে সেই বিস্ফোরণ নয়। এই বিস্ফোরণ আসলে একটি উন্মেষ, একটি উদ্বোধন, একটি উত্তোলন, একটি উত্তরণ। এটি ঘটিয়া গেল উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। শ্রীরামকৃষ্ণ-নরেন্দ্রনাথ মহামিলনে প্রকাশিত হইল সনাতন ধর্মের ফলিত রূপ। নরেন্দ্রনাথের ভাষায়—বনের বেদান্তকে ঘরে তুলিয়া আনা। এই কাজটি খুব সহজে হয় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অভিনব সাধনায় সর্বাগ্রে 'শাস্ত্র-সত্য' অভ্রান্ত বলিয়া বুঝিয়া লইলেন। দৃঢ়প্রত্যয় হইলেন—সব পথই গিয়াছে সেই এক ঈশ্বরে, যাঁহার বহু নাম। এবার ধর্ম ও সমাজের মিলনে যে-ধর্ম তৈরি হইল, তাহাকে বলা যাইতে পারে 'ভারতধর্ম'। ইহার মধ্যে নরেন্দ্রনাথ পাইলেন শঙ্করের মেধা, বুদ্ধের হৃদয়, চৈতন্যের প্রেম। যে-ধর্মের মূলকথা হইল—সঙ্কোচনই মৃত্যু, সম্প্রসারণই জীবন। যে-ধর্মের মূলকথা হইল—বিভেদ নয়, মিলন; যে-ধর্ম বিশ্বাস করে—কর্মভেদ থাকিতে পারে, জাতিভেদ নয়। একমাত্র এই ধর্মই বলিতে পারিয়াছে ঃ

"রুচিনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং।
নৃণামেকোগম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।।"

—সব মানুষেরই নিজের নিজের রুচি আছে। বৈচিত্র্যই মানবধর্ম। কেহ ধরিবেন সরল পথ, কেউ বক্র; তথাপি নদীসমূহের যেমন সমুদ্রই একমাত্র গতি, তেমনই সব মানুষেরই গতি সেই এক ঈশ্বর। এই ধর্মেরই উদার প্রার্থনা—

"সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।।"

—তোমাদের সঙ্কল্প সমান হউক, তোমাদের হৃদয়সমূহ সমান হউক এবং তোমাদের অন্তঃকরণসমূহ সমান হউক। যাহাতে তোমাদের পরম ঐক্য হয় তাহাই হউক।

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়াছিলেন চৈতন্যকে। চৈতন্যই মানব-বিকাশের উৎস-গোমুখী। নরেন্দ্রনাথকে তিনি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন মানব-বিজ্ঞানী রূপে। তিনি তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন—স্বকীয় উচ্চতম অনুভূতি, মোক্ষ, সমাধির চাহিতে অনেক বড় বহুরূপে বিচরণশীল মানবসমাজ। মানুষেই প্রত্যক্ষ কর তোমার অন্বেষিতকে—"এষ সর্বেশ্বর, এষ সর্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সর্বস্য।" ইহাই তোমার উপনিষদ্। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ঈশ্বরের সন্ধানে আসিয়া ফিরিয়া গেলেন মানুষকে লইয়া। সেই মুহূর্তে হিন্দুধর্ম রূপান্তরিত হইল ভারতধর্মে। স্বামীজী পাশ্চাত্যে উপস্থিত করিলেন প্রাচ্যকে, যেখানে ধরা আছে বিশ্বমানবের বিকাশ অনুশীলনের যাবতীয় মন্ত্র ও পদ্ধতি। সংঘর্ষ, সন্তাপ নয়—শান্তি ও সমন্বয়। সর্বপ্রকারের মুক্তি। দেবসমাজ গঠনের উদার আহ্বান। এই রূপান্তরের পশ্চাতে যে অদৃশ্য শক্তি ছিল, তাহারই নাম ঈশ্বর। তাঁহার অবয়বই হইল ধর্ম। এই নরেন্দ্রনাথের অনুসরণে আমরা যাইব বিশ্বধর্মসভায়, দেখিব ভারতধর্মের প্রতিষ্ঠা, দেখিব বিশ্ববিবেক বিবেকানন্দকে। বেদ হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ হইতে স্বামী বিবেকানন্দ—কালের এই দীর্ঘ প্রবাহপথে সনাতন ধর্মের কী অপূর্ব যুগোত্তরণ। বেদ বলিলেন ঃ "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন ঃ "যত মত তত পথ"। স্বামী বিবেকানন্দ বলিলেন ঃ "উপলব্ধি"।

স্বামী বিবেকানন্দ একটি শব্দে যাহা বলিলেন, উহা আসলে বটবৃক্ষের বীজ। উহার মধ্যে নিহিত ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ঋষিদের গভীরতম উপলব্ধির নির্যাস। উহার মধ্যে নিহিত ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগ হইতে মধ্য যুগ পর্যন্ত সকল ঋষি, আচার্য, সন্ত-সাধকদের অনুভূতির ফল। উহার মধ্যে নিহিত তাঁহার আচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র সাধনসিদ্ধি, যিনি তাঁহার একক জীবনে ভারতবর্ষের সহস্র সহস্র বৎসরের অধ্যাত্মসাধনার ঐতিহ্যকে ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, মানুষই ঈশ্বর, এমনকি মানুষ ঈশ্বরের চাহিতেও বড়। তিনি বলিতেন, এমন মানুষ আছেন যিনি শালগ্রামের চাহিতেও বড়। 'শালগ্রাম' হিন্দুর কাছে ঈশ্বরপ্রতীক। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, মানুষ তাঁহার অন্তরের দেবত্বকে প্রকাশ করিতে করিতে এমন একটি অবস্থানে আসিয়া পৌঁছাইতে পারে, যেখানে মানুষ ও ঈশ্বরের ব্যবধান মুছিয়া যায়। মানুষ ঈশ্বর হইয়া যায়। শুধু তাহাই নহে, মানুষের মহিমার প্রকাশ এমন তুঙ্গশিখরকে স্পর্শ করিতে পারে, যখন মনে হইবে মানুষ যেন ঈশ্বরকেও অতিক্রম করিয়াছে তাহার ঐশ্বর্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ পৃথিবীকে একটি আশ্চর্য সমীকরণ উপহার দিয়াছিলেন—জীব = শিব। শ্রীরামকৃষ্ণের এই আশ্চর্য সমীকরণটি আজ বিজ্ঞানজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ সমীকরণকে পিছনে ফেলিয়া দিয়াছে। ইহাই পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সমীকরণ। ইহার মধ্যে যেমন শিবের কথা রহিয়াছে, ঈশ্বরের কথা রহিয়াছে, তেমনি রহিয়াছে অথবা ততোধিক রহিয়াছে মানুষের কথা। ভারতবর্ষের সনাতন ধর্মে এই মানুষেরই জয়গান। ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম সেজন্য নিছক একটি ধর্ম নহে, ইহা মানবধর্ম। এই মানবধর্মই ভারতধর্ম। রামকৃষ্ণ তাঁহার উপলব্ধ সেই ভারতধর্মের ঐশ্বর্যকে অর্পণ করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দকে। স্বামী বিবেকানন্দ সেই ভারতধর্মের কথা ভারতবর্ষের মানুষকে শোনাইয়াছিলেন এবং পৃথিবীতে সেই ভারতধর্মকেই তিনি প্রচার করিয়াছিলেন। ❑

কথামৃতে না-বলা শ্রীরামকৃষ্ণ-কথা

শ্রীম

অনেকের এমনি শুভ সংস্কার যে, ঠাকুরকে অবতার বলে ফস্ করে চিনে ফেলল, অনেকে তা পারল না। কেন তাদের হলো? না, পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা করা ছিল। গুরুবাক্যে বিশ্বাস না হলেই বলে—'কিন্তু'। তপস্যা ছিল বলেই তারাও চিনল আর ঠাকুরও ভালবাসলেন। (২য় ভাগ, পৃঃ ২৩৫)

একটি ভক্ত তপস্যার কথা বলায় ঠাকুর বললেনঃ "অমৃত বেশ বলে। একজন অতি কষ্ট করে কাঠখড় যোগাড় করে আগুন জ্বালিয়েছে। তখন অনেকেই সে-আগুন পোয়াতে পারে কিনা বল?" অর্থাৎ তিনি আগুন করে রেখেছেন। যারা তাঁকে বিশ্বাস করবে তাদের কিছু করতে হবে না। তারা গুরুর তপস্যার benefit (সহায়তা) পাবে। ভক্তটির ইচ্ছা, তপস্যা করে। ঠাকুর কেমন সুন্দরভাবে অমৃতের নাম করে জবাব দিলেন, two sides meet করে (দুদিক মিলিয়ে) দিলেন। (ঐ, পৃঃ ২৩৬)

যাঁকে জগন্মাতা ধরে রেখেছেন, তাঁকে অন্য লোক ডেকে আনতে হয় না। কত লোক নিজেই আসে। কোথায় দক্ষিণেশ্বরের বাগান—ঠিক ঠিক ভক্তরা সবাই গিয়ে সেখানে জুটল। ঠাকুর বলতেনঃ "ফুল দূর বনে ফুটলেও মৌমাছিরা সব আসে ভনভন করে খুঁজতে খুঁজতে। তাদের আনতে হয় না গিয়ে নেমন্তন্ন করে।"

টাউন হল-এ লেকচার দেয়, পাঁচহাজার লোক হাততালি দেয়—এমন সব লোকও দেখেছি ওখানে গিয়ে ঠাকুরের কাছে চুপটি করে বসে আছে। এখানে চালাকি চলে না, সব ধরা পড়ে যায়!

আমি যখন প্রথম যাই, কী অদ্ভুত কাণ্ড! বাড়িতে বনিবনা হলো না বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে। মনে হলো—কি, যাদের জন্য এত করলাম তাদের এই ব্যবহার! এ-যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছে না। এ-বাড়িতে আর থাকা হবে না—suicide (আত্মহত্যা) করে সব যন্ত্রণা দূর করব। একদিন রাত দশটার সময় বের হয়ে পড়লাম। গাড়ি করে বরানগরে বোনের বাড়িতে যাচ্ছি, মাঝ রাস্তায় চাকা ভেঙে গেল। নিকটে একজন আলাপী লোকের বাড়ি ছিল, সেখানে ওঠা গেল। তারা মনে করল, আপদ জুটেছে—হয়তো রাত্রে থাকবে। তারপর অন্য গাড়ি ডাকিয়ে বরানগর যাই।

পরদিন বিকালে এ-বাগান ও-বাগান বেড়িয়ে বেড়িয়ে সময় কাটাচ্ছি, সঙ্গে সিধু (সিদ্ধেশ্বর মজুমদার)। দেহ ও মন উভয়ে অবসন্ন হয়ে এক বাগানে মাটিতেই বসে পড়লাম। সিধু বললঃ "চল যাই আরেকটি বাগান আছে রাসমণির। ওখানে একটি সাধু থাকেন।" আসা গেল মেন গেট দিয়ে। তখন সন্ধ্যা হওয়ার আধঘণ্টা বাকি।

বাগান দেখে মুগ্ধ হলাম। ফুল দেখছি, ফুল তুলছি, ফুল শুঁকছি। আর ফুলের সৌন্দর্যের কথা ভাবছি। আমি একটু poet (কাব্যরসিক) ছিলাম কিনা! শেষে ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ।

ঠাকুর ছোট খাটটিতে উপবিষ্ট—ভক্তরা সব নিচে বসে। আমি কাউকে চিনি না। প্রথম কথা শুনলাম ঠাকুর বলছেনঃ যখন ঈশ্বরের নামে দুনয়নে ধারা বইবে, অঙ্গে পুলক হবে—তখন বোঝা যাবে কর্মত্যাগ হয়েছে।

এর সাত-আট দিন পর উঠোন দিয়ে যাচ্ছেন ঠাকুর। মণি (শ্রীম) বলছেন ঠাকুরকেঃ "এসব যন্ত্রণা থেকে আত্মহত্যা করাই ভাল।" ঠাকুর শুনেই উত্তর করলেনঃ "ওকথা কেন? তোমার যে গুরুলাভ হয়েছে। তোমার আবার ভাবনা কি?" বললেনঃ "গুরু যে তোমার পিছু পিছু রয়েছেন। যাকে কষ্ট ভাবছ, তা যে তিনি ইচ্ছে করলেই দূর করে দিতে পারেন, সহজ করে দেন। অনেক গাঁটওয়ালা একটা দড়ি বাজিকর কয়েক হাজার লোকের সামনে ফেলে দিল। কেউ একটা গাঁটও খুলতে পারলে না। কিন্তু বাজিকর হড়হড় করে হাত ঝাঁকুনি দিয়ে সবগুলি খুলে ফেলবে। ভাবনা কি? গুরু সব মোড় ফিরিয়ে দিবেন।"

এই তো এত যন্ত্রণা, আর কিনা তাঁকে পেলাম! কিভাবে নিয়ে যান তিনি! তারপর বাপ এলেন—কত আদরযত্ন, শেষে খোশামোদ করে বাড়ি নিয়ে যান। (১ম ভাগ, পৃঃ ৩৩৯-৩৪১)

আহা তিনি (ঠাকুর) যে কী জিনিস ছিলেন গা—আপনারা তো দেখেননি। অমনটি আর হয় না। অমন 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্'। যোগেন স্বামী (স্বামী যোগানন্দ) একটা ফল এনে দিলেন ঠাকুরকে—তিনি সেটা খেতে পারলেন না। পরে জানা গেল, না বলে অপরের বাগান* থেকে এই ফলটা আনা হয়েছিল। তিনি 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্'—আবার কপালমোচন। (ঐ, পৃঃ ৩৪১)

শাস্ত্র গুরুমুখে শুনলে রক্ষা, নচেৎ "শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণম্"। (বিবেকচূড়ামণি, ৬০) অজ্ঞাত গভীর বনে প্রবেশ করলে যেমন প্রাণ সঙ্কটাপন্ন হয়, সেইরূপ শব্দারণ্য। গুরুর সহায়তা ছাড়া এতে প্রবেশ করলেও জীবন

* এই বাগান স্বামী যোগানন্দের কোন আত্মীয়ের ছিল। তিনি সর্বদা এখান হইতে ফল (লেবু) আনিয়া ঠাকুরের সেবায় দিতেন। ঠাকুর তাহা গ্রহণ করিতেন। কিন্তু এই ঘটনার কয়েকদিন পূর্বে ঐ বাগান বিক্রি হইয়া যায়। স্বামী যোগানন্দ তাহা জানিতেন না। ঠাকুর অন্তর্যামী, তিনি সব জানিতে পারিয়াছিলেন। তাই ঐ ফল আহার করিতে পারিলেন না।—স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

সংশয়াপন্ন হয়। শান্তির পরিবর্তে অশান্তির বোঝা বহন করতে করতে প্রাণ যায়। গুরুমুখে শোনা সম্ভব না হলে অবতারের কথার সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া alternative (অন্য উপায়)।

বই তো অনেকে পড়ে, অর্থ বোঝে কৈ? ফলে উলটো উৎপত্তি হয়। ঠাকুর বলতেন ঃ " 'যদি বা ছিল রোগী বসে, বদ্যি তারে শোওয়ালে এসে।'—এই দশা হয়। গুচ্ছের পড়লেই হয় না। পড়তে হয়—অবতারের মহাবাক্যের সঙ্গে মিলিয়ে পড়। তারপর নির্জনে চিন্তা আর প্রার্থনা কর।" (ঐ, পৃঃ ৩৬৭)

তাঁর সব কথা ভরসার কথা, সব message of hope (আশার বাণী)। তিনি বলেছিলেন ঃ "তোদের বেশি কিছু করতে হবে না, আমি কে আর তোরা কে শুধু এ জানলেই হবে।" কতবার বলেছেন অন্তরঙ্গদের ঃ "আমার চিন্তা যে করবে সে আমার ঐশ্বর্যলাভ করবে—যেমন পিতার ঐশ্বর্য পুত্র লাভ করে।"

এর চেয়ে আশার বাণী আর কি আছে? এখন বড্ড chance (সুযোগ)—ডাঙায়ও এক বাঁশ জল। (ঐ, পৃঃ ১৬১)

ঠাকুরের এক-একটি কথা মহামন্ত্র। এর একটি জপ করলে সিদ্ধ হয়ে যায়। যেমন—'ভক্ত ভাগবত ভগবান', 'ব্রহ্মশক্তি, শক্তিব্রহ্ম', 'গুরু গঙ্গা গায়ত্রী', 'বেদ পুরাণ তন্ত্র', 'সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ, সচ্চিদানন্দ শিব'।

তাঁর প্রার্থনাও মন্ত্র। মন্ত্র কি শুধু সংস্কৃত হলেই হলো, বাঙলায়ও হয়। ঠাকুর প্রার্থনা করেছিলেন ঃ "মা, এই নাও তোমার পাপ, এই নাও তোমার পুণ্য, তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও। এই নাও তোমার সুখ, এই নাও তোমার দুঃখ, তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও। এই নাও তোমার ধর্ম, এই নাও তোমার অধর্ম, তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও। মা, এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও।"

ঠাকুরের প্রত্যেকটি কথা বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রের সঙ্গে মিলে যায়, তাই মন্ত্র। যদি কেউ বিশ্বাস করে সারাজীবন ঠাকুরের একটি কথা নিয়ে পড়ে থাকে—ঐটি জপ, ঐটি ধ্যান করে, তার সব হয়ে যাবে—ঈশ্বরদর্শন হবে। এই যে লোক দীক্ষা নেয়, এর অর্থ কি? না, গুরু একটি মন্ত্র বলে দিয়েছেন—সারাজীবন ঐটি নিয়ে পড়ে থাক, জপধ্যান কর। তবে ভাল গুরুর কাছ থেকে নিলে তেজীয়ান মন্ত্র পাওয়া যায়—সিদ্ধমন্ত্র। (ঐ, পৃঃ ১৯৯-২০০)

ঠাকুর বলতেন ঃ "ক্ষোভ, দুঃখ গেলেই আনন্দ।" "বাসনা থাকতে ক্ষোভ, দুঃখ যায় না। তাই বাসনাত্যাগই যথার্থ ত্যাগ। এ তাঁর কৃপায়, তাঁর দর্শন হলে যায়। না খেয়ে শরীর শুকিয়ে রাখ, এতে বাসনা শুকোবে না। এতে কোন লাভ হবে না। বাসনা গেলে তবে শান্তি।

কি করে মানুষের পতন হয়, তার steps (সোপানগুলি) ভগবান গীতায় দেখিয়েছেন। ঠাকুর বলতেন, পতনের রাস্তা কলমবাড়া—sloping, জানতে দেয় না যে নিচে যাচ্ছে। ঠাকুর ফোর্ট উইলিয়ামের ভিতর গিয়েছিলেন। বলতেন ঃ "প্রথমটা বুঝতে পারি নাই যে, অত নিচে চলে এসেছি। ওমা! চেয়ে দেখি, সেখানে তিন-চারতলা বাড়ি। তেমনি মন বিষয়চিন্তা করে করে অজ্ঞাতসারে বহু নিম্নে পড়ে যায়।"

বিষয়চিন্তা করতে করতে বিষয়ের প্রতি প্রীতি হয়। তারপর কাম অর্থাৎ ঐ বিষয়লাভ করবার ইচ্ছা হয়। পেতে প্রতিবন্ধক হলেই ক্রোধ হয়। ক্রোধ হলে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয়, তাকে 'সম্মোহ' বলা হয়েছে। এথেকে গুরুবাক্য, শাস্ত্রবাক্য ভুল হয়ে যায়, তাই স্মৃতিভ্রংশ। এর কুফল অসৎ বুদ্ধি—তা থেকে পতন হয়। (ঐ, পৃঃ ২৭৪)

ভক্তদের কারো কারো ঠাকুরের নিকট আসতে দেরি হয়ে গেলে তার সব কারণ জিজ্ঞেস করতেন। কখনো-বা বাড়িতে খবর পাঠাতেন কিংবা চিঠি লিখতেন। এমন ভালবাসতেন, এমন স্নেহময় ছিলেন! তিনি তো জানতেন—ওরা অজ্ঞান, আমাকে জানে না। কিন্তু আমি তো এদের সব জানি। তাই এত ভালবাসতেন, এত ক্ষমা করতেন।

ভক্তদের দোষ নিতেন না। মার কাছে plead (ওকালতি) করতেন ঃ "মা, ওদের নানা কাজ সংসারের, কি করে আসে!" পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে গেল—ভাবে যাচ্ছিলেন। তা বলছেন ঃ "মা, ওর [রাখালের] তো অতদূর যাওয়ার কথা ছিল না [পাছে রাখালের ওপর দোষ আসে]।" ঠাকুর ঝাউতলায় বাহ্যে যেতেন। রাখাল (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) গাড়ু হাতে নিয়ে পঞ্চবটী পর্যন্ত পৌঁছে দিতেন। একদিন বাহ্যে করে ফিরবার সময় পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে যায়। বার (bar) বেঁধে অনেক কষ্ট পেয়ে ভাল হন।

ভক্তরা বিচার করে, জগন্মাতাকে তাই বলছেন ঃ "মা, কি করে ওরা—এক-একবার বিচার না করে?" (ঐ, পৃঃ ২৮৪-২৮৫) [সমাপ্ত] ❑

স্বামী নিত্যাত্মানন্দের 'শ্রীম-দর্শন'-এর ১ম, ২য় ভাগের ২য় সংস্করণ থেকে সঙ্কলিত।

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার

সম্পাদনা ❑ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০১৩

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এই বিভাগে ('সঙ্কলন') 'উদ্বোধন'-এ ইতিপূর্বে এবং বর্তমান সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮) প্রকাশিত রচনাগুলির সামগ্রিক অথবা আংশিক পুনর্মুদ্রণের জন্য জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ এবং সঙ্কলন-সম্পাদকের অনুমতি আবশ্যিক।

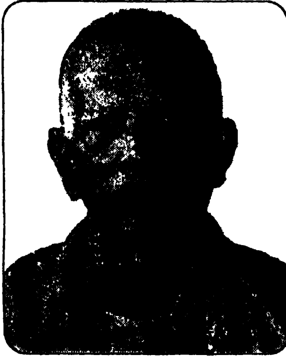
—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

গীতার শক্তি ও মনোহারিত্ব

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

পূর্বানুবৃত্তি

এই আলোচনাটি প্রধানত দুর্গাপদ ঘোষ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরম পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজজীর বর্তমান রচনাটি কলকাতার অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত মহারাজজীর 'Universal Message of the Bhagavad Gita' শীর্ষক ইংরেজী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের (১ম সংস্করণ, ২০০০) অন্তর্গত অসামান্য 'ভূমিকা'র বাঙলা অনুবাদ। রচনাটি 'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪০৭ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, মহারাজজীর প্রত্যেকটি ভাষণ, রচনা এবং আলোচনাই অসাধারণ বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিঋদ্ধতায় উজ্জ্বল এবং একাধারে ভক্তিরসাশ্রিত, অন্যদিকে বিশ্লেষণমূলক এবং আধুনিক মানুষের প্রশ্ন ও সংশয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনিবার্য-ভাবে গ্রহণযোগ্য। বর্তমান আলোচনাটিও ভারতের অতুলনীয় শাস্ত্রগ্রন্থ 'গীতা' সম্পর্কে পূজ্যপাদ মহারাজজীর নিজস্ব শৈলী ও ভঙ্গির পূর্ণ পরিচয়বাহী। পাঠকরা প্রতিক্ষণেই তার প্রমাণ পাবেন এবং প্রতিক্ষণেই মহারাজজীর অনবদ্য যুক্তি ও বিশ্লেষণে আলোকিত হবেন।

ভাষান্তর : অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

সৃজনশীলতা ও তার অনুশীলন (Creativity and Its Cultivation) সম্বন্ধে সিলভানো আরিয়েতি তাঁর গবেষণায় বলছেন :

"নেশাভাঙের রাস্তা অবলম্বন করার বদলে আমাদের যে পথগুলি সম্বন্ধে অবশ্যই ভাবা এবং সম্ভবত অনুমোদন করা উচিত, সেগুলি হলো—বিশেষ কিছু মনোভাব বা মানসিকতা, অভ্যাস এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের অবস্থা। প্রথম যে-অবস্থাটির কথা ভাবতে হবে, সেটি হলো একাকীত্ব। একাকীত্বকে আংশিক ইন্দ্রিয়-বঞ্চনা বলে ভাবা যেতে পারে।... তার পক্ষে আরো বেশি সম্ভব তার আন্তর সত্তার প্রতি কান পাতা, আন্তর সম্পদের সংস্পর্শে আসা এবং প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলির কিছু কিছু বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। (আধুনিক পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান প্রাক্-চেতন স্তর থেকে আহৃত জ্ঞান বা বিচার-বিরহিত [non-logical] জ্ঞানকে 'প্রাথমিক জ্ঞান' এবং চেতন অবস্থা থেকে আহৃত জ্ঞান বা বিচারসম্মত জ্ঞানকে 'গৌণ জ্ঞান' বলে।) দুর্ভাগ্যের বিষয়, বয়ঃসন্ধির ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রে আমাদের আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাগুলিতে একাকীত্বের সমর্থনে কিছু বলা হয়নি। বিপরীতপক্ষে, দলবদ্ধভাবে চলার প্রবণতা এবং জনপ্রিয়তাকে উচ্চ শ্রদ্ধার আসন দেওয়া হয়েছে।

"একাকীত্বকে একা থাকার বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা অথবা প্রত্যাহার কিংবা নিরন্তর একা হয়ে থাকার সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে হবে না।... দ্বিতীয় একটি বিশেষত্ব, যা সম্ভবত সৃজনশীলতাকে পুষ্ট করে, হলো এমন কিছু যা আমেরিকার বর্তমান সাংস্কৃতিক মেজাজের পরিপন্থী—সেটি নৈষ্কর্ম্য।

"তৃতীয় বিশেষত্বটি হলো দিবাস্বপ্ন।... দিবাস্বপ্নের জগতেই মানুষ নিজেকে স্বাধীনতা দেয় অভ্যস্ত রাস্তা ছেড়ে অন্য পথ ধরার এবং যুক্তিবিরোধী জগতে ছোটখাট অভিযান করার।

"সৃজনশীল মানুষের আরেকটি বিশেষত্ব থাকার প্রয়োজন। এটিকে মেনে নিতে বোধহয় আরো অসুবিধা হবে। সেটি হলো—সহজে 'প্রতারিত' হতে পারার ক্ষমতা। এখানে কথাটির তাৎপর্য হলো—আমাদের বাইরের এবং আমাদের ভিতরের সব ব্যাপারে যে কতকগুলো অন্তর্নিহিত সুনির্দিষ্ট শৃঙ্খলাবদ্ধ বিন্যাস আছে, তা মেনে নিতে সম্মত থাকা—অন্তত সাময়িকভাবে বা যতক্ষণ না সেগুলি মিথ্যা প্রমাণিত

হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত। সৃজনশীলতা বলতে যত না নতুন নতুন বস্তু আবিষ্কার করাকে বোঝায়, প্রায়ই তার থেকেও বেশি বোঝায় এই অন্তর্নিহিত বিন্যাস বা সজ্জা আবিষ্কার করাকে।...

"অন্যান্য গুণের মধ্যে আছে সজাগ থাকা এবং শৃঙ্খলাবদ্ধতা। যেকোন রকম উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে এগুলি প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হলেও সৃজনশীলতার প্রসঙ্গে এরা বিশেষ মাত্রা লাভ করে।" (পৃঃ ৭৩৭-৭৪০)

এই হলো সিলভানো আরিয়েতির দেওয়া কতকগুলো পরামর্শ বা 'প্রেসক্রিপশন'। এদের মধ্যে একটি চূড়ান্ত বৈপ্লবিকঃ তোমাকে 'প্রতারিত' হওয়ার ক্ষমতা গড়ে তুলতেই হবে—লোকে যা বলছে তা বিশ্বাস কর; অবিশ্বাস করো না। লেখকরা জানাচ্ছেন, আজকাল সবকিছুকে অবিশ্বাস করার একটা প্রবণতা দেখা যায় এবং এটা অনেক দূর চলে গেছে। যতক্ষণ না কোন কিছু মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে, ততক্ষণ তাকে বিশ্বাস করার জন্যও একটা ক্ষমতা থাকা দরকার। ছোট শিশুরা সৃজনশীল থাকে, কারণ তারা বিশ্বাস করে; কিন্তু বয়স্করা বিশ্বাস করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। সাধারণত দেখা যায়, একপেশেভাবে গড়ে ওঠার ফলে বিশ্বাসের এই ক্ষমতা চলে যায়। আর যখন সেটা চলে যায়, তখন আস্তে আস্তে একটা সন্দেহবাতিক ভাব চলে আসে। বর্তমানে সারা বিশ্ব জুড়ে বহু মানুষের মানসিক অসুখই হলো সবকিছুকে অবিশ্বাস করা। একদিকের চূড়ান্ত হলো সন্দেহবাতিক মনোভাব, তার মোকাবিলা করতে হবে আরেকটি চূড়ান্ত প্রবণতা দিয়ে; সেটি—'প্রতারিত' হওয়ার ক্ষমতা। তখন একটা সুসমঞ্জস মানসিকতা গড়ে উঠবে—জানাচ্ছে উল্লিখিত বইটি।

সন্দেহবাতিক মনোভাব সমস্ত সৃজনশীলতাকে ধ্বংস করে। মনে হয় ব্রিটিশ কবি বায়রন বলেছিলেন, সমগ্র ইংল্যান্ডে মাত্র দুজন ছাড়া আর কোন সতীনারী নেই। তাঁদের একজন রানী ভিক্টোরিয়া এবং অন্যজন তাঁর আপন মা। তারপর তিনি আরো বলছেন, রানী ভিক্টোরিয়াকে তিনি সতীনারী বলেছেন, কারণ তা না বললে তাঁর শাস্তি হবে; আর নিজের মায়ের কথা বলেছেন, কারণ তা না হলে প্রমাণিত হবে যে তিনি নিজে একজন অবৈধ সন্তান!

মনের মধ্যে প্রোথিত গভীর নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই ধরনের বিচার আসে। বর্তমান ভারতের বহু বুদ্ধিজীবীর মধ্যে আমরা এইরকম সন্দেহবাতিক মনোভাব দেখি। আমাদের সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের লোকজনের কারো কারোর মধ্যেও এটি বেশ ভালরকম আছে। সত্যের প্রতি, মানুষের প্রতি, তার ভবিতব্যের প্রতি সেই সনাতন বিশ্বাসটাই ক্ষয়িত হয়ে গেছে। অধ্যাত্মবিজ্ঞান যখন মানুষকে ধীরস্থিরভাবে বসে ধ্যান করতে বলে, তখন সে আসলে বলে একা থাকতে এবং অন্যদের সঙ্গে সংসর্গ বন্ধ করতে। অন্যদের সঙ্গে মেশামিশি করতে গেলে স্নায়ুগুলোও পিষ্ট ও অবসন্ন হয়। মাঝে মাঝে একা থাকাটা উপভোগ করতে শিখুন। এই সমস্ত ধারণাই 'নিবৃত্তি' নামক প্রাচীন বৈদিক উপদেশটির মধ্যে ধরা আছে। প্রবৃত্তিকে আলাদাভাবে শেখাতে হয় না, কারণ আমরা স্বাভাবিকভাবেই প্রবৃত্তিপরায়ণ। শিশু লাফায়-ঝাঁপায়, ছুটে বেড়ায়, এটা ঠেলে, ওটা টানে। অতএব প্রবৃত্তিটা স্বাভাবিক। কিন্তু নিবৃত্তি শিক্ষার অপেক্ষা রাখে। মানবতা আজ সেটাই চাইছে। এর মধ্যে রয়েছে মানসিক প্রজ্ঞার কী গভীর উন্মোচন!

এই বাণী, 'নিবৃত্তি' নামক এই আশীর্বাদ ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য মানসিকতায় প্রবেশ করছে ও পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। সেটা যে শুধু ভারত থেকে যাওয়া প্রভাবের বশে হচ্ছে, তা নয়; হচ্ছে চীন ও জাপানের প্রভাবেও এবং হচ্ছে তাদের নিজেদের সেইসব লেখক, চিন্তাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীর দ্বারা—যাঁরা তাঁদের একপেশে সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রতি নিজেদের প্রতিক্রিয়ায় গভীর প্রজ্ঞার পরিচয় রাখছেন। প্রবৃত্তির সহায়ে অর্জন করা যায় সামাজিক কল্যাণ—সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর, প্রচুর খাদ্য-পানীয়, ভাল সাজপোশাক, শিক্ষা, আলোকিত রাস্তাঘাট, ভাল ভাল জনপথ; কিন্তু এসবেরই বাড়াবাড়িকে আজকাল ভোগবাদিতা বা 'কনজ্যুমারিজম' বলা হয়। শান্ত, সমন্বয়ী, সন্তুষ্ট হতে হলে, ভালবাসার শক্তি গড়ে তুলতে হলে এবং শান্তিতে বসবাস করতে চাইলে আমাদের প্রয়োজন নিবৃত্তির আশীর্বাদ, যা কিনা সকলের অন্তর্নিহিত দৈব স্ফুলিঙ্গরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি বিকাশের সহায়ক। এবং সেই নিবৃত্তি আবার আমাদের সকল প্রবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করতেও পারে। এটিই গীতায় উপদেশ দেওয়া হয়েছেঃ নিবৃত্তি প্রবৃত্তির প্রেরণা জোগায়। ভারতে আমাদের প্রচুর প্রবৃত্তি আছে। নির্বাচনের সময় কী পরিমাণ প্রবৃত্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি—সর্বত্র হিংসাত্মক চিন্তাভাবনা, হিংসাত্মক কাজকর্ম; কেউ ব্যালট বাক্স ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এইরকম কত কিছু! কেন

আমরা এমন করি? কারণ, আমাদের চিন্তাভাবনাকে সুস্থিত ও পরিশুদ্ধ করার জন্য যে-নিবৃত্তি প্রয়োজন, তা আজ বড়ই কম। আমাদের এটা নিয়ে ভাবতে হবে; নিজেদের জিজ্ঞাসা করতে হবেঃ 'কেন আমরা এটা করব? এটা কি আমাদের গণতন্ত্রের পক্ষে ভাল?' দেশের মানুষকে তাদের ইচ্ছানুযায়ী ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা দিতে হবে। কেন রাজনৈতিক দলগুলি সেই স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করবে বা সে-ব্যাপারে নাক গলাবে? আমাদের রাজনীতিতে এইসব বিচ্যুতি আছে এবং সেইসঙ্গে আছে প্রচুর দুর্নীতিও। কিন্তু একটু নিবৃত্তির স্পর্শ এসমস্তই বদলে দিতে পারে।

গীতা আমাদের সেই ধরনের জীবনের কথা বলতে চলেছে—যেখানে থাকবে প্রচণ্ড কর্মকুশলতা, বিশাল উৎপাদনশীলতা এবং উৎকৃষ্টতর আন্তর-মানবিক সম্পর্কসমূহ। মানুষের জীবন এবং তার ভবিতব্য সম্বন্ধে গীতার দৃষ্টিভঙ্গির এই সর্বাঙ্গীণতার দিকটি লক্ষ্য করুন! গীতার এই সর্বাঙ্গীণ আধ্যাত্মিকতাকে শঙ্করাচার্য সার-সংক্ষিপ্তরূপে প্রদান করছেন। এটি বলছে—প্রত্যেক মানুষই আধ্যাত্মিক, এমনকি যখন সে জীবনের প্রবৃত্তিক্ষেত্রে অবস্থিত, তখনো। মানুষ কখনো আধ্যাত্মিকতার বাইরে নয়। চমৎকার চিন্তা এটি! আধ্যাত্মিকতা গোটা জীবনকে পরিবেষ্টন করে থাকে; মানুষ কখনো আধ্যাত্মিকতার বাইরে অবস্থান করে না। এটিই হলো গীতা ও বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গি। এই কারণেই আমি ভাষ্যের দ্বিতীয় বাক্যটি পছন্দ করি, যেখানে শঙ্কর শুরুতে বলছেনঃ "দ্বিবিধো হি বেদোক্তো ধর্মঃ।" বিগত বহু শতক ধরে আমরা কখনো এর সত্যতা বুঝতে পারিনি; আমরা আমাদের ধর্ম ও দর্শনকে তরল করতে করতে এমন একটা অবস্থা করে ফেলেছিলাম যে, গত শতকে আমাদের ধর্মের অবস্থা দাঁড়িয়েছিল বাজারের দুধের মতো—৯০% জল আর ১০% দুধ!

আমাদের সমগ্র জাতিকে এই মহান ও সুগভীর সমন্বয়ী দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হবে। এই কারণেই স্বামী বিবেকানন্দ স্মরণীয় হয়ে আছেন এমন একজন মানুষ হিসেবে, যিনি আধুনিক কালে বেদান্তের এই সর্বাঙ্গীণ দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার নিশানকে অতি উচ্চে তুলে ধরেছিলেন। এটি যুক্তিগ্রাহ্য, বাস্তবসিদ্ধ, সর্বজনীন এবং মানবতামুখী। সেই নিশানকে আবার তুলে ধরুন। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ লাহোরে বেদান্তের ওপর বক্তৃতায় জাতির প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেনঃ

"অতএব, লাহোরের নবীন যুবকেরা, আরেকবার অদ্বৈতের সেই পরাক্রমী নিশানকে ঊর্ধ্বে তুলে ধর, কারণ আর কোন ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে তোমরা পাবে না অদ্ভুত সেই প্রেম, যতক্ষণ না সর্বভূতে উপস্থিত দেখতে পাও সেই একই প্রভুকে। খুলে দাও প্রেমের সেই পতাকা। ওঠ, জাগ, এবং লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না। ওঠ, ওঠ, আরেকবার, কারণ ত্যাগ ছাড়া কিছুই হওয়ার নয়। অন্যকে যদি সাহায্য করতে চাও, তবে তোমার ক্ষুদ্র অহংকে বিদায় নিতেই হবে।... জাতি ডুবছে; অসংখ্য লক্ষকোটি মানুষের অভিশাপ রয়েছে আমাদের মাথার ওপর—রয়েছে তাদের অভিশাপ, যাদের আমরা নর্দমার জল খেতে দিয়ে চলেছি তখন, যখন তারা তৃষ্ণায় মরে গেছে অথচ পাশ দিয়ে বয়ে গেছে জলে ভরা শাশ্বত স্রোতস্বিনী; অভিশাপ রয়েছে সেই লক্ষকোটি মানুষের—যাদের আমরা প্রাচুর্যের দিকে চেয়ে চেয়ে অনাহারে মরে যেতে দিয়েছি; যাদের কাছে আমরা অদ্বৈতের কথা বলেছি, আর অন্তরে সর্বশক্তি দিয়ে যাদের শুধুই ঘৃণা করে চলেছি।... মুছে ফেল এই কলঙ্ক।... ওঠ, জাগ এবং সম্পূর্ণরূপে নিষ্ঠাবান হও। ভারতে আমাদের নিষ্ঠার অভাব মর্মান্তিক। আমাদের যা চাই তা হলো চরিত্র; চাই সেই প্রত্যয়ী অচঞ্চলতা এবং সেই চরিত্রবল, যাতে মানুষ বিষণ্ণ মৃত্যুর মতো কোনকিছুকে শেষপর্যন্ত আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকতে পারে।"

বেদান্তের সেই সিংহগর্জনকে আজ আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-স্বামী বিবেকানন্দ প্রদত্ত প্রায়োগিক বেদান্তের শিক্ষায় পাচ্ছি—তার অসামান্য আধুনিক প্রাসঙ্গিকতা-সহ।

"প্রাণিনাং সাক্ষাৎ অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স-হেতুঃ"—এই কথা বলে শঙ্কর জোর দিয়ে বোঝালেন যে, বেদান্ত বা সনাতন ধর্ম প্রাণিকুল-সহ সমস্ত জীবের সুখ ও মঙ্গলের জন্য কাজ করে; কোন কোন ধর্ম ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেমন কেবল নিজেদের অনুগামীদেরই ভালমন্দ দেখে—তেমনভাবে নয়।

তারপর শঙ্কর বলছেনঃ "যঃ স ধর্মো ব্রাহ্মণাদ্যৈঃ বর্ণিভিঃ আশ্রমিভিঃ চ শ্রেয়োঽর্থিভিঃ অনুষ্ঠীয়মানঃ দীর্ঘেণ কালেন।"—এই দ্বিমুখী ধর্ম শ্রেয়োভিলাষী বর্ণাশ্রমসেবী ব্রাহ্মণাদির দ্বারা দীর্ঘকাল ধরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। [ক্রমশ]

স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক সঙ্গীত

স্বামী হর্ষানন্দ

সংস্কৃত থেকে বঙ্গানুবাদ : স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ

ব্যাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ প্রবীণ ও শাস্ত্রজ্ঞ সন্ন্যাসী স্বামী হর্ষানন্দজী স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক সঙ্গীত' ও স্তোত্রাদির সংস্কৃত ব্যাখ্যা করেছেন। বেলুড় মঠস্থ বিবেকানন্দ বেদ বিদ্যালয়ের আচার্য স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ সেগুলির প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ করেছেন।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

[redacted]র্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারটিকে বলা হয় 'পুরুষার্থ'। এর মধ্যে মোক্ষ হলো পরম পুরুষার্থ। এই চতুর্বিধ পুরুষার্থ সিদ্ধি এবং পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষলাভের পথে ভক্তিসাধনা সাধকের পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত, সমর্থ ও সুলভ বলে প্রসিদ্ধ। এই ভক্তি নয়প্রকার :

"শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।"

(শ্রীমদ্ভাগবত, ৭।৫।২৩)

এই নববিধ ভক্তি অর্থাৎ ভক্তিসাধনার মধ্যে কীর্তনই হলো সকলের প্রিয়; কেননা কীর্তন মানেই হলো সঙ্গীত—ভগবানের নামগান; আর গান সকল জীবেরই প্রিয়। গানের ছয়টি অঙ্গ—সাহিত্য, শ্রুতি, রাগ, লয়, তাল এবং ভাবনা। এই ষড়ঙ্গযুক্ত গান মধুর কণ্ঠে গীত হলে ক্ষুদ্র প্রাণীর মনও আকর্ষিত হয়। যখন এটা লোকপ্রসিদ্ধ, তখন মুমুক্ষু ভক্তগণের মনে এর প্রভাব যে কতদূর তা বলাই বাহুল্য।

উষাকালে ও সন্ধ্যায় এরূপ গানের অর্থাৎ কীর্তনের প্রভাব অবর্ণনীয়। তাই উষাকালে প্রভাতী ভজনসঙ্গীত এবং সায়ংকালে আরাত্রিক ভজন সকল দেবালয়েই গীত হয়ে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ স্থাপনের পর সঙ্ঘের অন্তর্গত মঠসমূহে, পূজাগৃহে ও উপাসনা-মন্দিরে সন্ধ্যায় ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অর্চনা এবং অর্চনান্তে সঙ্গীত-সহ আরাত্রিকের প্রবর্তন করেন। স্বয়ং আরাত্রিক স্তোত্র ও সঙ্গীত বাঙলা ভাষায় রচনা করে স্বামীজী তাতে সুর-তালাদি সংযোজন করেন। এইজন্য 'খণ্ডন ভববন্ধন' স্তোত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তদের মধ্যে সুপ্রচলিত। পাতঞ্জল যোগসূত্রে বা যোগদর্শনে (১।২৮) ঋষি পতঞ্জলি বলেছেন : "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্"—'জপ' শব্দের মানে হলো তাঁর নামের সঙ্গে অর্থেরও (নাম, রূপ, গুণেরও) চিন্তন। আরাত্রিক গান গাওয়ার সময় যদি অর্থানুসন্ধান হয়, তবে সেই গান ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ হৃদয়কমলে অঙ্কিত করে ক্রমে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির দ্বারা তাঁর সাক্ষাৎকারের সহায়ক হবে। এইজন্যই আরাত্রিক গানের ব্যাখ্যা লেখার সামান্য চেষ্টা করা হলো।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে 'অবতারবরিষ্ঠ' বলে অভিহিত করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। "ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনচরিত আপনি লিখছেন না কেন?"—এ-প্রশ্ন কেউ করলে স্বামীজী উত্তর দিতেন : "শ্রীরামকৃষ্ণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আমি অল্পই জানি। যদি তাঁর জীবনচরিত লিখতে চেষ্টা করি, তাহলে শ্রীহরির মূর্তি নির্মাণ করতে গিয়ে শেষে দেখা যাবে হনুমানের মূর্তি গড়েছি।" তাহলে অপ্রতিম মহিমাময় শ্রীরামকৃষ্ণরূপী ভগবানকে অবলম্বন করে তাঁর শিষ্যাগ্রগণ্য স্বামী বিবেকানন্দ ভববন্ধন খণ্ডন-শক্তিযুক্ত যে-স্তোত্র রচনা করেছেন, সেই স্তোত্রের ব্যাখ্যা লেখার প্রয়াসের যে কি পরিণতি হবে তা পরমেশ্বরই জানেন! কিন্তু এটা সত্য যে, 'কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনো নয়' এবং শিশুর মুখে উচ্চারিত নিজ নাম দোষপূর্ণভাবে উচ্চারিত হলেও পিতা তার প্রতিধ্বনি করে প্রীতিলাভই করেন—এসকল যুক্তি ভরসা করে এই ব্যাখ্যা লেখার প্রয়াসকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বীকৃতি দেবেন—এই বিশ্বাস দৃঢ় রেখে বাঙ্ময় পূজাস্বরূপ এই ব্যাখ্যা আরম্ভ করা হলো।

"খণ্ডন ভববন্ধন জগবন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন নররূপধর নির্গুণ গুণময়।" ।।১।।

শব্দার্থ : খণ্ডন ভববন্ধন—ভববন্ধনের খণ্ডয়িতা; জগবন্দনীয়; বন্দি তোমায়—তোমাকে বন্দনা করি; নিরঞ্জন—নিষ্কলঙ্ক; নররূপধর—নররূপ ধারণকারী; নির্গুণ—ত্রিগুণহীন; গুণময়—সর্বসদ্‌গুণভূষিত।

ভাষ্য : ভববন্ধনের খণ্ডয়িতা। অজ্ঞান জীবের স্বরূপ অজত্ব অজরত্ব অমরত্বাদিকে বিস্মরণ করিয়ে দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারের সমষ্টিরূপ অনাত্ম বস্তুতে জীবকে (জীবাত্মাকে) বন্ধন করে। অজ্ঞানই বন্ধন। কারণ, অজ্ঞানই সকল বন্ধনের মূল। এখানে 'কারণ' অজ্ঞান, 'কার্য' বন্ধন-এ রূঢ়ার্থে প্রয়োগ হয়েছে, কেননা কার্যার্থেও কারণ শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। [এজন্য এখানে 'অজ্ঞান' শব্দটি অজ্ঞানের কার্য 'বন্ধন' অর্থে প্রয়োগ হয়েছে বুঝতে হবে।] 'ভব' বলতে বোঝায় গর্ভবাস—জন্ম, জরা, রোগ, মৃত্যু ও পুনর্জন্মের অব্যাহত ধারা। এই ভবরূপ বন্ধনই হলো ভববন্ধন। এই ভববন্ধনের খণ্ডনকারী অর্থাৎ

বিনাশকারী হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপী ভগবান। তিনি কিভাবে বন্ধন নাশ করেন?—অজ্ঞাননাশসমর্থ জ্ঞানদান দ্বারা অথবা নির্বিকল্প সমাধিদানের দ্বারা। এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত নরেন্দ্রনাথ (পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ) স্বয়ং। অথবা জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ ভক্তিপ্রদান করেও তিনি ভক্তের অজ্ঞান দূর করেন। এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তাছাড়া পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব, মহাপুরুষের আশ্রয়—এগুলি দান করেও তিনি মানুষের অজ্ঞান দূর করতে পারেন। যেমন, সাধারণ সাধকদের অজ্ঞান তিনি এভাবেই দূর করে থাকেন। অথবা সঙ্কল্পমাত্রেই যেকোন ব্যক্তির ভববন্ধন নাশ করতে পারেন। কারণ, তিনি পরমেশ্বর, যিনি সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি সকল গুণের অধিকারী। তিনি ইচ্ছা করলেই যেকোন মানুষকে মুক্তি দিতে পারেন। এবিষয়ে শ্রুতিবাক্যও আছে; কঠ উপনিষদ্ বলেছেন ঃ যাঁর প্রতি এই পরমাত্মা (পরমেশ্বর) অনুগ্রহ করেন, তিনিই তাঁকে লাভ করেন; কারণ, সেই অনুগৃহীত ব্যক্তির প্রতিই পরমাত্মা স্বীয় রূপ প্রকাশ করেন। (১।২।২৩)

জগবন্দন—নিখিল জগতের নিবাসী ব্রহ্মা থেকে কীট পর্যন্ত সকল প্রাণীরই তিনি পিতা; এবং জগৎস্রষ্টা চতুর্মুখ ব্রহ্মাকে বেদজ্ঞান প্রদান করায় তিনি সকলের গুরুস্বরূপ; এজন্য তিনি জগবন্দন বা জগদ্বন্দ্য অর্থাৎ জগতের বন্দনীয়।

নিরঞ্জন—অঞ্জন মানে মসি, মল, পাপ। এই অঞ্জন-রহিত বলে তিনি নিরঞ্জন, পরম নির্মল, পবিত্রতাস্বরূপ এবং পরম পবিত্রতাদায়ী। শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপী ভগবান ষড়্রিপুবর্জিত বলে তিনি সমগ্র জীবনে কোন পাপ করেননি; এজন্য তিনি নিরঞ্জন। অথবা কামকাঞ্চন-রূপ মায়াধীন যারা তারাই পাপাধীন হয়—একথা জগতে প্রসিদ্ধ। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ হলেন মায়াধীশ, 'বঞ্চনকামকাঞ্চন'; সেহেতু তিনি নিত্যনিরঞ্জন।

নররূপধর—স্বয়ং নারায়ণই উন্মার্গগামী মানুষকে যথার্থ পথে পরিচালনা করতে স্বেচ্ছায় নররূপ ধারণ করেছেন। এবিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের পূর্বে তাঁর পিতা ক্ষুদিরাম এবং মাতা চন্দ্রমণিদেবীর অলৌকিক অতীন্দ্রিয় দর্শনসমূহ স্মরণীয়।

"ত্রেতাযুগে রামরূপে, কৃষ্ণরূপে যিনি দ্বাপরে।
এ-যুগে সে-ঈশ্বর জাত হলেন, রামকৃষ্ণ-কলেবরে।।"

শ্রীরামকৃষ্ণের স্বয়ংঘোষিত বচনও এবিষয়ে স্মরণীয়। নরজন্মেই মোক্ষলাভ সম্ভব; কিন্তু পুণ্য না করে পাপ করার দিকে প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়। পরমকৃপালু ঈশ্বর যুগে যুগে নররূপ ধারণ করে মানুষকে উদ্ধার করেন—এই অবতাররহস্য আস্তিক্য বুদ্ধিসম্পন্ন সকলের কাছেই প্রসিদ্ধ। নররূপ ধারণ করেও তিনি তাঁর নারায়ণ-স্বরূপত্ব বিস্মৃত হননি—একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

নির্গুণ—গুণ মানে রজ্জু, যার দ্বারা পশ্বাদি বন্ধন করা হয়। যেহেতু তিনি নিজেই পশুপতি, সেজন্য তিনি নির্গুণ—বন্ধনহীন। অথবা তিনি সত্ত্বগুণাদি তিন গুণের অতীত। অথবা তিনি শুক্লত্ব, মনোহরত্ব, সুগন্ধত্ব, মধুরত্ব, মৃদুত্ব প্রভৃতি বস্তুধর্মী গুণবর্জিত; কারণ তিনি ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা। তিনি যে ইন্দ্রিয়াতীত—একথা শ্রুতি ও স্মৃতি-প্রসিদ্ধ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।৪, ৯) আছে, তাঁকে (আত্মাকে, পরমেশ্বরকে) বিষয় করতে না পেরে বাক্য মনের সঙ্গে তাঁর থেকে ফিরে আসে। এক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিও উল্লেখ করা যায়। বিদ্যাসাগরকে তিনি বলেছিলেন ঃ "সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে।... কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই, সে-জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যন্ত কেহ মুখে বলতে পারে নাই।" ('কথামৃত', ৩।১।৩) প্রশ্ন আসে, তিনি যদি সকল গুণবর্জিত হন, তাহলে কি তিনি রসহীন শুষ্ক কাষ্ঠবৎ? না, তিনি গুণময়। তিনি রসপূর্ণ, আনন্দপূর্ণ। তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ বলেছেন ঃ "রসো বৈ সঃ।" (২।৭)—তিনি আনন্দপ্রদ বস্তুস্বরূপ। তিনি সকল সদ্গুণের নিদান অর্থাৎ আশ্রয়। অতএব তিনি গুণময়। এরূপ গুণবিশিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণকে সায়ংকালে আমি বন্দনা করি। [ক্রমশ]

ভ্রম-সংশোধন

গত চৈত্র ১৪০৭ সংখ্যার ১৬৪ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভে ২য় পরিচ্ছেদের ১ম পঙ্ক্তিতে **'১৮৮৫'**-এর পরিবর্তে **'১৮৮৬'** এবং ১৭১ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ৬ষ্ঠ পঙ্ক্তিতে **'সহস্রাক্ষঃ'**-এর পরিবর্তে **'সহস্রাক্ষঃ'** হবে।

গত বৈশাখ ১৪০৮ সংখ্যার ২৩১ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ১৬শ পঙ্ক্তিতে **'অবলম্বন'**-এর পরিবর্তে **'অবনয়ন'** হবে।—**সম্পাদক, 'উদ্বোধন'**

অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ

স্বামী নির্বাণানন্দ

স্বামীজী একটা উচ্চতর 'স্ফিয়ার' (স্তর) থেকে কথা বলতেন। সাধারণ কথাও—রঙ্গরসও—আমাদের মতো সাধারণ স্তর থেকে তাঁর বা তাঁদের হতো না। তাঁর এবং তাঁদের সব কথা, সব কাজই আমাদের থেকে আলাদা একটি স্তরের। আমরা সেটা বুঝতে পারি না। সেজন্য আমরা বলি, স্বামীজীর কথায় অনেক 'কন্ট্রাডিক্সন' (বৈপরীত্য) রয়েছে। বাস্তবিক স্বামীজীর কথায় কখনো কোন 'কন্ট্রাডিক্সন' নেই। আমরা তাঁর স্তরে আমাদের মনকে ওঠাতে পারি না বলে তাঁর কথা বুঝতে পারি না। আমাদের অক্ষমতার জন্য আমরা তাঁর কথায় 'কন্ট্রাডিক্সন' দেখি। বস্তুত, স্বামীজীর মন যে 'টিউন'-এ বাঁধা থাকত, সেই 'টিউন'-এ আমাদের মনকে ওঠাতে না পারলে আমরা কি করে তাঁর কথা বুঝব? যেমন আমরা যদি কলকাতায় বসে রেডিওতে দিল্লির অনুষ্ঠান শুনতে চাই, তাহলে আমাদের রেডিওতে দিল্লি কেন্দ্রকে 'টিউন' করে নিতে হবে। 'টিউনিং' ঠিকমতো না হলে নানারকম শব্দ হবে, দিল্লি কেন্দ্র ধরা যাবে না। ফলে দিল্লির অনুষ্ঠানও শোনা যাবে না। স্বামীজীর কথা ও ভাব সম্পর্কে এই মূল কথাটি মনে রাখতে হবে।

এখন দেখি ঠাকুরের কথার, স্বামীজীর কথার নানা ভুল ব্যাখ্যা এবং অপব্যাখ্যা হচ্ছে। কত লোক যে যার মতো ব্যাখ্যা করে চলেছে! যা কখনো শুনিনি, এমন কত ঘটনাই তাঁদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে বলা হচ্ছে। ঠাকুর, মা, স্বামীজীর জীবনের বহু ঘটনাই তো প্রামাণ্য গ্রন্থগুলিতে বেরিয়েছে। তাঁদের সম্পর্কে কল্পনাবিলাসের তো কোন অবকাশ নেই। তবু এখন কত ঘটনাই শুনি—যেগুলির সঙ্গে সত্যের কোন সম্পর্কই নেই। আবার তাঁদের কথা ও কাজের ব্যাখ্যা ঠিকমতো না হলে মুশকিল। ভক্তরা অনেকেই ১লা জানুয়ারি দিনটিকে ঠাকুরের 'কল্পতরু দিবস' বলে থাকেন এবং এই দিনটিকে তাঁরা তাঁর 'কল্পতরু' হওয়ার দিন বলে বিশ্বাস করেন। এখানে একটি কথা বলার এবং বোঝার রয়েছে। তা হলো—ঠাকুর কোন্ দিন 'কল্পতরু' ছিলেন না অথবা তিনি কোন্ দিন 'কল্পতরু' নন? তিনি তো 'কল্পতরু' চিরকালই—প্রতিদিন—প্রতিমুহূর্ত। কাশীপুরে ১লা জানুয়ারি যা করেছিলেন, সে তো তাঁর জীবনের মাত্র একটি দিনের ঘটনা। অমন কৃপাবিতরণ তো তিনি নিত্যই করতেন। ১লা জানুয়ারি কজনই বা সেখানে উপস্থিত ছিলেন? তাছাড়া সেদিন সেখানে তাঁর ত্যাগী ছেলেদের কাউকেই তো দেখা যায়নি। তাহলে তিনি কি শুধু ঐ জনা তিরিশেক গৃহী ভক্তের জন্যই 'কল্পতরু' হয়েছিলেন? যেসব গৃহী ভক্ত সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, তাঁদের কাছে কি তিনি 'কল্পতরু' নন? আবার তাঁর প্রিয় ত্যাগী ভক্তদের কাছে কি তিনি 'কল্পতরু' ছিলেন না? সেদিন তো সেখানে কোন মহিলা ছিলেন না। তাহলে নারীদের জন্য তিনি 'কল্পতরু' নন? তা তো নয়। তিনি শুধুমাত্র একদিনের জন্য—কয়েক ঘণ্টার জন্য—কয়েকজনের জন্য 'কল্পতরু' নন। তিনি নিত্য-কল্পতরু। তিনি সর্বকল্পতরু। তিনি চিরকালের কল্পতরু এবং সকলের কল্পতরু। সুতরাং যারা মনে করে, ঠাকুর শুধু ঐ একদিনই কল্পতরু হয়েছিলেন, তারা ভুল করে। ঠাকুরের সন্তানদের কাছে শুনেছি, সর্বদা সকলের জন্য তাঁর করুণা, তাঁর ভালবাসা উপচে পড়ত। ১লা জানুয়ারি যেমন তিনি কয়েকজনকে কৃপা করেছিলেন, অমন কৃপা তিনি নিত্যদিনই বিতরণ করতেন—দক্ষিণেশ্বরে, শ্যামপুকুরে, কাশীপুরে—সর্বত্র।

আসলে তিনি মানুষকে তার চৈতন্যসত্তা সম্পর্কে সচেতন করে দিতে এসেছিলেন। মানুষকে 'মান হুঁশ' করে দিতে এসেছিলেন। মানুষের 'মান' অর্থাৎ মহিমা হলো এই যে, মানুষ সহজাত চৈতন্যসত্তার অধিকারী। মানুষ হলো 'অমৃতের সন্তান'। কিন্তু মানুষ তার এই মহিমা সম্পর্কে সচেতন থাকে না। মানুষকে সে-সম্পর্কে 'হুঁশ' করে দিতে—'চৈতন্য' দান করতে তিনি এসেছিলেন। ঠাকুর বলতেন, সাপের মাথায় মহা মূল্যবান মণি থাকে, কিন্তু সাপ তা জানে না। সে ব্যাঙ খেয়ে মরে! যুগে যুগে লোকগুরুরা এসে মানুষকে তার স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন করে দেন। ঠাকুর বলছেন—

" 'যে ভাব লাগি পরম যোগী, যোগ করে যুগ-যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে।'

"... মানুষ মনে করলে ঈশ্বরলাভ করতে পারে। কিন্তু কামিনী-কাঞ্চন ভোগ করতেই মত্ত। মাথায় মাণিক রয়েছে তবু সাপ ব্যাঙ খেয়ে মরে।"[১]

মানুষ এতবড় ঐশ্বর্যের অধিকারী, অথচ সেই মানুষ কিনা পশুর মতো শুধুই আহার-নিদ্রা, আর ইন্দ্রিয়সুখ নিয়ে মেতে রয়েছে! সেজন্য ঠাকুর ব্যাকুল হতেন। মানুষের দ্বারে দ্বারে, মানুষের ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষের ঘুম ভাঙানোর জন্য তাঁর নিজের ঘুম ত্যাগ করেছিলেন। এই ব্যাকুলতাই তো 'কল্পতরু-ব্যাকুলতা'। সেই ব্যাকুলতা তাঁকে অস্থির করে রাখত। যাঁরাই তাঁর কাছে যেতেন, যাঁদের মধ্যে এতটুকু আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা বা আধ্যাত্মিক প্রবণতা দেখতেন, তাঁদের তিনি সবসময় ঈশ্বরদর্শনের কথা, আধ্যাত্মিক সত্যকে উপলব্ধি করার কথা বারবার মনে করিয়ে দিতেন। নিরঞ্জন মহারাজ (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ) ঠাকুরের কাছে তখন সবে আসছেন। প্রথম দর্শনের দু-তিনদিন পর দ্বিতীয়বার যখন তিনি ঠাকুরের কাছে এলেন, তখন ঠাকুর তাঁকে দেখামাত্র দৌড়ে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং ব্যাকুলভাবে বললেন : "ওরে নিরঞ্জন, দিন যে যায় রে—তুই ভগবানলাভ করবি কবে? দিন যে চলে যায়, ভগবানকে লাভ না করলে সবই যে বৃথা হবে। তুই কবে তাঁকে

১ দ্রঃ 'কথামৃত', উদ্বোধন সং, ১৯৮৬, পৃঃ ১২৩

লাভ করবি বল, কবে তাঁর পাদপদ্মে মন দিবি বল? আমি যে তাই ভেবে আকুল!" নিরঞ্জন মহারাজ তো ঠাকুরের কথা শুনে এবং ভাব দেখে অবাক। তিনি ভাবলেন : 'আমার ভগবানলাভ হচ্ছে না বলে, দিন চলে যাচ্ছে বলে এঁর এত ব্যাকুলতা কেন?" কারো ভগবানলাভ হচ্ছে না বলে অন্য কারোর এমন আর্তি কি কখনো দেখা যায়? সেদিন নিরঞ্জন মহারাজ এ-রহস্যের সমাধান করতে পারেননি। কিন্তু ক্রমে তিনি দেখলেন যে, শুধু তাঁর জন্যই নয়, যাঁরাই ভগবানকে ভালবাসে, ধর্মজীবন যাপন করতে চায়—তাঁদের ধর্মপথে, ঈশ্বরলাভের পথে পরিচালিত করার জন্য ঠাকুর ঐভাবেই ব্যাকুল হতেন।

ঠাকুরের সন্তানদেরও দেখেছি, তাঁরাও সকলের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনাকে উদ্দীপিত করে দেওয়ার খুব চেষ্টা করতেন। একদিন একজন সাধু সকালে ঠাকুরঘরে ধ্যান করতে আসেননি। মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) চোখ কিন্তু তা এড়াল না। তিনি তাঁকে পরে ডেকে পাঠালেন। বললেন : "তোকে আজকে ঠাকুরঘরে দেখলাম না তো? ঘুমোচ্ছিলি?" তিনি বললেন : "শরীরটা ভাল ছিল না। সেজন্য শুয়ে ছিলাম।" মহারাজ বললেন : "শরীর ভাল না থাকলে ঠিক আছে, কিন্তু দেখিস যেন নিজেকে ঠকাসনি। সবসময় মনের মধ্যে একটা 'বার্নিং ডিসকনটেন্ট' (জ্বলন্ত অতৃপ্তি) জাগিয়ে রাখতে হবে। সবসময় মনে রাখবি—'আমি কি জন্য এখানে এসেছি, আর কি করছি?' যখন বাড়ি ছেড়ে এসেছিলি তখন তো এই বোধ নিয়েই এসেছিলি যে, এই জীবনেই ভগবানলাভ করতে হবে? এটা সবসময় মনে রাখবি। সবসময় মনের ভিতরে ভগবানলাভ হলো না—এই তীব্র অভাববোধটা জাগ্রত রাখতে হবে।"

আমাদের কতরকম কাজ করতে হয়। ঠাকুরপূজা, পূজার যোগাড়, রান্নাঘরের কাজ, সবজিবাগানে কাজ, বাথরুম-নর্দমা পরিষ্কার, অফিসের কাজ, রিলিফের কাজ। কিন্তু পাশাপাশি নিয়মিত জপধ্যানের অভ্যাসটা ঠিক ঠিক রাখতে হবে। 'ইজি গোয়িং লাইফ' (আলস্যে-আরামে জীবন কাটানো) যেন কখনো না হয়। সাধুই হোক, আর ভক্তই হোক—একটা দিন, একটি মুহূর্তও যেন বৃথা না যায়। আলস্য, আড্ডা, পরনিন্দা, পরচর্চা, নিদ্রা, গল্প-উপন্যাস-সংবাদপত্র পাঠ ইত্যাদি করে জীবনের মহামূল্যবান মুহূর্ত ও দিনগুলি যেন বৃথা ক্ষয় হয়ে না যায়। "তাঁর কথাই কথা, আর সব কথাই বৃথা।"—মহারাজ বলতেন।

জপ-ধ্যান, স্বাধ্যায়, বিচার কিসের জন্য? জপ-ধ্যান, বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের বিষয়বাসনা ও অভিমান দূর হয়। স্বাধ্যায়ের মাধ্যমে বিচার-বিশ্লেষণ সূক্ষ্ম হয়। মনে রাখতে হবে, আমাদের মনে যেন হিংসা, ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণা না থাকে। জপ-ধ্যান, বিচার-বিশ্লেষণ ও স্বাধ্যায়ের মাধ্যমে এগুলিকে দূর করা যায়। কখনো যেন কারো মনে আঘাত না করি। কায়মনোবাক্যে এই ভাবটি অনুশীলন করতে হবে। রূঢ় কথা বলতে বলতে স্বভাবটাই রূঢ় হয়ে যায়, অহেতুক অপরকে কথায় ও আচরণে আঘাতের অভ্যাস হয়ে যায়। সাধনজীবনে এটি একটি বড় প্রতিবন্ধক। কারো মনে আঘাত দিলে সাধনজীবনে উন্নতি অসম্ভব। আরেকটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা কর্ম করব, কিন্তু কর্ম যেন আমাদের নেশা না হয়ে যায়। কর্মনেশা যেন আমাদের পেয়ে না বসে। তাহলে কর্মনেশা আমাদের কর্মনাশা করে ছাড়বে। এখানে 'কর্মনাশা' মানে সাধনের পথ থেকে ভ্রষ্ট হওয়া। আমাদের কর্ম হলো নিষ্কাম কর্ম। আমাদের কর্ম হলো কর্মযোগ। আমাদের সব কর্মই 'ঈশ্বরার্থম্'—তা ঠাকুরঘরের কর্মই হোক বা সাধনভজন-রূপ কর্মই হোক বা রান্নাঘর, অফিস বা বাগান অথবা রিলিফের কর্মই হোক।

মনে রাখতে হবে, ঠাকুর-স্বামীজীর আদর্শ হলো ভগবানলাভের আদর্শ। আমরা অফিসে, হাসপাতালে, রান্নাঘরে, বাগানে কাজ বা খরা-বন্যা-দুর্ভিক্ষ-ভূমিকম্পে রিলিফ করি ঠিকই, কিন্তু ঐ কাজ করার জন্য আমরা ঘরবাড়ি ছাড়িনি। ওসব তো ঘরে থেকেই করা যেত। আমরা এসেছি—ঘরবাড়ি ছেড়েছি ভগবানলাভের জন্য। শুধুই ভগবানলাভের জন্য। ভগবানলাভই আমাদের উদ্দেশ্য। ওগুলি স্বামীজী করলেন কেন? চিত্তশুদ্ধির জন্য। নিষ্কামভাবে ঈশ্বরার্থে ঐগুলি করলে চিত্তশুদ্ধি হবে—আত্মশুদ্ধি হবে। চিত্তশুদ্ধি হলে তার দ্বারা ভগবানলাভ হবে। সেজন্য আমাদের কর্ম কর্মযোগ। সাধারণ অধিকারীদের জন্য এবার স্বামীজী এভাবে ভগবানলাভের একটি নতুন পথ করে দিয়ে গেলেন। আমাদের কর্ম ঠিক ঠিক কর্মযোগ হচ্ছে কিনা তার একটি লক্ষণ হচ্ছে—কর্মের মাধ্যমে অনাবিল আনন্দ লাভ। যদি অনাবিল আনন্দ আমাদের হৃদয়-মনকে সবসময় পূর্ণ করে রাখে, তাহলে বোঝা যাবে যে আমাদের কর্মটি ঠিক ঠিক নিষ্কাম কর্ম হচ্ছে।

ঠাকুর, মা, স্বামীজী, মহারাজ প্রমুখ সকলের জীবনই অমানুষী। তাঁদের জীবন, তাঁদের সাধনা, তাঁদের ভালবাসা সবই অমানুষী। ঠাকুরের জীবনে যে-সাধনা এবং যে-উপলব্ধি এবার জগৎ প্রত্যক্ষ করেছে, তা কি এর আগে আর কখনো দেখা গেছে? এমন সাধনা, এমন আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ কি সাধারণ মানুষের জীবনে সম্ভব? ঠাকুরের জীবনের তুলনা কারোর সঙ্গে হয় না। মায়ের জীবনের সঙ্গেও কারোর তুলনা হয় না। ঠাকুরের ছেলেরাও যে-জীবন ও যে-সাধনা দেখিয়েছেন তা ঠাকুরের অনুসরণেই তাঁরা দেখিয়েছেন। ঠাকুর এসেছিলেন জগৎকে শিক্ষাদানের জন্য। তিনি জানতেন, তিনি যে-জীবন দেখাচ্ছেন তাকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। তবুও তিনি দেখিয়েছেন যাতে তা দেখে মানুষ উৎসাহিত হয়, অনুপ্রাণিত হয়। ভগবানলাভ করার জন্য আগ্রহী হয়। তাঁর সন্তানদের জীবনও তাই। তাঁদের জীবনও জগতের কাছে দৃষ্টান্ত।* ❑

* ২৩ এপ্রিল ১৯৬৮ বেলুড় মঠে সাধু-ভক্তদের কাছে পূজ্যপাদ মহারাজজীর অধ্যাত্মপ্রসঙ্গ।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

মায়ের কথা

অনুকূলচন্দ্র মণ্ডল

জয়রামবাটীতে জগদ্ধাত্রীপূজায় অনুকূল মণ্ডলের যাত্রাগানের প্রসঙ্গ স্বামী পরমেশ্বরানন্দ রচিত 'শ্রীশ্রীমা ও জয়রামবাটী' গ্রন্থে (১৩৭৯ সং, পৃঃ ৭৯) উল্লেখ আছে। তাঁর এই স্মৃতিবিবরণটি তাঁর মধ্যম পুত্র গুণসিন্ধু মণ্ডল (বয়স—৬৫ বছর) ও কনিষ্ঠ পুত্র দেশবন্ধু মণ্ডল (বয়স—৬০ বছর) গত ৮ জুন ১৯৯৭ অধ্যাপক তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়েছেন।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

আমাদের গ্রাম হুগলী জেলার সন্তোষপুরে। জয়রামবাটী-কামারপুকুর থেকে বেশি দূরে নয়; ঐ অঞ্চলে গ্রামটির পরিচিতি 'বেজো-সন্তোষপুর' বলে। জয়রামবাটীতে জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষ্যে বেজো-সন্তোষপুরের যাত্রাদল ভাড়া করতে এসেছিলেন শ্রীশ্রীমার এক ভাই (মেজভাই কালীকুমারবাবু)। তিনি দুরাত্রির জন্য যাত্রাদল বায়না করে গেলেন। ঘটনাটি সম্ভবত ১৩০১ বা ১৩০২ সালের।

আমি নির্দিষ্ট দিনে যাত্রাদল নিয়ে হাজির হলাম। মোড়লদের খামারে হ্যাজাক টাঙিয়ে যাত্রা শুরু হলো। প্রথম দিনের পালা ছিল 'সীতাহরণ' এবং দ্বিতীয় দিনে 'চণ্ডীদাস'। প্রথম দিনের ঘটনা স্মরণীয়। যাত্রাপালায় আমার ভূমিকা ছিল রাবণের। অভিনয়ে লক্ষ্মণের দেওয়া গণ্ডির বাইরে সীতাদেবীকে আসতে হবে এবং ভিক্ষুক বেশে সেই ভিক্ষা গ্রহণ করতে যাবে রাবণ; তারপরই সীতাহরণ পর্ব! এই দৃশ্যের জন্য বেশ কিছু সময় থাকত যাত্রাপালায়। ঘটনাগুলো পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন দৃশ্যে হাজির হয়েছিল। আমার 'রোল' আসতে ভিক্ষুকবেশে হাজির হলাম আসরে। চারদিক তাকিয়ে দেখলাম, লোকে লোকারণ্য। চারদিকে কেবল দর্শকের মাথা; সবাই টানটান উত্তেজনায়! হঠাৎ আমার চোখ পড়ল একটি মুখের দিকে, মনে হলো যেন সেখানে একটা বড় হ্যাজাক জ্বালা আছে। মাথায় ঘোমটা দেওয়া অথচ মুখমণ্ডলের সমস্তটাই আমার চোখে স্পষ্ট! আমি দেখতে পেলাম, সেই মুখ আর ছবিতে সীতাদেবীর যে মুখ দেখি, সেই মুখ যেন একই। অভিনয়ের মধ্যেই দেখে নিয়েছিলাম সেখানে কোন আলো আছে কিনা; দেখলাম কোন আলো নেই। চারপাশে আধো অন্ধকার। অনেক স্ত্রীলোকের মধ্যে হঠাৎ ঐ বিশেষ মুখটিই সে-রাত্রেই আমার দৃষ্টিকে কেড়ে নিয়েছিল।

পালা শেষ হলো। দর্শকরা সবাই চলে গেল। আমরাও খাওয়া-দাওয়া সেরে শুতে গেলাম। আমার কিন্তু ঘুম হলো না। রাত্রে আবার বাইরে এলাম। খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে বারবার ভাবতে লাগলাম, এতদিনের অভিনয়-অভিজ্ঞতায় এমন তো কখনো দেখিনি? একি মনের ভ্রম?

জানতাম, উনি শ্রীরামকৃষ্ণের স্ত্রী। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত-শিষ্যরা তাঁকে মা-জ্ঞানে ভক্তি করেন—এই পর্যন্তই। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের বিষয়েও তখন বিশেষ কিছুই জানতাম না। শুনেছিলাম—কামারপুকুরের গদাধর চাটুজ্জে দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির কালীমন্দিরে পুরোহিত হয়ে ঢুকেছিলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যায়; তখন মন্দিরের খাজাঞ্চী ও অন্যান্য পরিচালকরা তাঁকে সরিয়ে অন্য পুরোহিত নিয়োগ করে। তবে শ্রীরামকৃষ্ণ কালীসাধনা করেছিলেন। আমাদের কুলপুরোহিতের (নকুল ঘটক) বাড়ি কামারপুকুরের লাগোয়া শ্রীপুর গ্রামের ঘটকপাড়ায়। তাঁদের মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে ঐরকম তাচ্ছিল্য ভাবের কথাই শুনেছিলাম। কিন্তু যাত্রাভিনয়কালে যে-দৃশ্য দেখলাম তা আমার পূর্ব ধারণাকে ঝড়ের মতো এলোমেলো করে দিল। আমি ব্যাকুল হয়ে রাত জেগে অপেক্ষা করতে লাগলাম, কখন সকাল হবে।

সবে সকাল হয়েছে পাড়ার ইতস্তত দু-একজন লোক মাঠে প্রাতঃকৃত্য সারতে যাচ্ছে; আমি সোজা দৌড় দিলাম শ্রীশ্রীমার বাড়ির দিকে। সেখানে কেউ ওঠেনি তখন। কাছেই একজন ব্রহ্মচারীকে দেখতে পেয়ে মায়ের সংবাদ জানতে চাইলাম। তিনি বললেনঃ "মা উঠেছেন, তবে এত সকালে কি দর্শন হবে?"

আমি তবু অনুরোধ করলামঃ "একটু দেখুন না, আমি কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি। একবার তাঁকে দর্শন না করলে আমি কিছুতেই স্থির হতে পারছি না।"

আমাদের এই কথোপকথনকালেই হঠাৎ সেখানে মা এসে উপস্থিত। ব্রহ্মচারী মহারাজ মাকে দেখেই বললেনঃ "মা, ইনি অনুকূল মণ্ডল। এঁরই যাত্রাদল। উনি কাল সারারাত ঘুমোতে পারেননি। তাই ভোর হতে না হতেই ছুটে এসেছেন আপনাকে দর্শন করতে।"

হঠাৎ যেন দেবলোকের কণ্ঠস্বর শুনলামঃ "এস বাবা!"

এই কণ্ঠস্বর আমি জীবনে শুনিনি। আমার হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হলো। আমি সাষ্টাঙ্গে মাকে প্রণাম জানালাম। মা আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। বললেনঃ "বাবা, খুব ভাল পালা হয়েছে কাল! আজো যাব তোমার পালা দেখতে।"

আমি বললামঃ "হ্যাঁ মা, অবশ্যই যাবেন।"

সেদিন মা বললেনঃ "বাবা, ঠাকুরের প্রসাদ নিয়ে যেও।"

মায়ের হাত থেকে ঠাকুরের মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেছিলাম। কী মধুর তার স্বাদ! আজো স্মরণে আছে।

এরপরই শুরু হলো আমার মায়ের বাড়িতে যাতায়াত! ক্রমে মায়ের সান্নিধ্যলাভ ও দীক্ষাগ্রহণ। আমি আগে আমাদের কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলাম। তথাপি ব্যাকুলতা জাগল ভীষণ—মায়ের কাছে ছুটলাম দীক্ষা নিতে। মা বললেনঃ "বাবা, কুলগুরুর কাছে তো দীক্ষা নিয়েছ;

এবার ঠাকুরের কথা পড়; তাঁর কথা ভাব, তাহলেই হবে।"

আমি পুনরায় মাকে নিবেদন জানালাম : "মা, আপনি দীক্ষা না দিলে আমি মনের দিক থেকে স্থির হতে পারছি না।"

মা তখন বললেন : "আচ্ছা বাবা, তুমি কুলগুরুর কাছে অনুমতি নিয়ে এসো; তিনি যদি নিষেধ না করেন তাহলে তোমার দীক্ষা হবে।"

আমি আর বিলম্ব না করে পরদিনই আমাদের কুলগুরুর কাছে অনুমতি নিয়ে মায়ের কাছে দীক্ষা নিলাম।

তারপর আমার জীবনে আরেকটি বিশেষ ঘটনা ঘটে। তখন যাত্রাপালার পোশাক-পরিচ্ছদে এত উজ্জ্বলতা ছিল না। গ্রামাঞ্চলে এত ব্যবস্থারও সুযোগ ছিল না। 'ঘড়াসুর' পালার কাজ ধরেছি। কলকাতা গেলাম পোশাক কিনতে। বয়স কম। কলকাতার এক যাত্রাদলে আমাদের দেশের একজন কাজ করত। কলকাতায় তার কাছে উঠেছিলাম পোশাক কিনব বলে। সেখানে গিয়ে দেখি, তাদের দলেও 'ঘড়াসুর' পালার মহড়া চলছে। তাদের দলে যে ঘড়াসুরের অভিনয় করছিল তার অভিনয় ঠিকমত হচ্ছিল না। আমি থাকতে না পেরে বলে ফেললাম—ঘড়াসুরের অভিনয় ঠিক হচ্ছে না। যাত্রাপার্টির গদিতে এক ব্যক্তি বসেছিলেন, তিনি তখন বলে উঠলেন : "ওহে ছোকরা, ঘড়াসুরের অভিনয় যে হচ্ছে না, তুমি বুঝলে কি করে? তুমি এসবের কিছু বোঝ?"

আমি মাথা নিচু করে বললাম : "যদি অনুমতি দেন, তাহলে আমি ঘড়াসুরের একটু অভিনয় করে দেখাতে পারি।" "দেখাও দেখি"—সেই ভদ্রলোক বললেন।

ঘড়াসুরের পোশাক পরে ঘড়াসুরের অভিনয় করে দেখালাম। গদিতে বসা ভদ্রলোক নেমে এসে আমার পিঠ চাপড়ে বললেন : "বাঃ সুন্দর হয়েছে! ছোকরা, তোমার নাম কি?"

বললাম : "অনুকূলচন্দ্র মণ্ডল। বাড়ি আরামবাগের কাছে বেজো-সন্তোষপুরে।" তিনি তখন বললেন : "ম্যানেজারবাবু, ওর গা থেকে আর ঘড়াসুরের পোশাকটা খুলে নিতে হবে না। ওটা ওকে দিয়ে দিন!" আমি যতই বললাম—না, না, তিনি তখন বললেন : "ছোকরা, তুমি আমায় চেনো না। আমার নাম দানীবাবু। (দানীবাবু হলেন গিরিশচন্দ্রের পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ। পিতার সমতুল্য না হলেও দানীবাবুও অসাধারণ অভিনেতা ছিলেন।) যা একবার বলি, তা ফেরাই না।" এই বলেই তিনি গটগট করে চলে গেলেন।

সেদিন আমার মন আনন্দে ভরে গিয়েছিল। মনে হলো অভিনয়-জীবনের বড় পুরস্কার পেলাম। তখন বারবার মনে হতে লাগল—শ্রীশ্রীমার আশীর্বাদেই এটি সম্ভব হলো।

ঘড়াসুর পালার পোশাক কিনে গ্রামে ফিরে প্রথমেই গেলাম মায়ের সঙ্গে দেখা করতে জয়রামবাটী। সেখানে মাকে সমস্ত জানালাম। মা খুশি হয়ে আশীর্বাদ করলেন।

ঘড়াসুর পালায় খুবই সাফল্যলাভ করেছিলাম। জয়রামবাটীতে মাকেও দেখিয়েছিলাম ঐ পালা। মায়ের কাছে প্রায় প্রতিবছরই জগদ্ধাত্রীপূজায় আমার আসর বাঁধা থাকত। সেখানে সীতাহরণ, চণ্ডীদাস, প্রহ্লাদ, সপ্তরথী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মণবর্জন, ভক্ত হরিদাস, রামপ্রসাদ, জরাসন্ধ—এমন অনেক পালা করেছি; কখনো একরাত্রি, কখনো-বা দুরাত্রি। আমার ভাইপো শীতল মণ্ডল (নানু) আমার দলে বাঁশি বাজাত। ঐ অঞ্চলে তার জুড়ি মেলা ভার। কনসার্ট বাজাত মৃত্যুঞ্জয় পাল। দলে অভিনয় করতেন দক্ষ অভিনয়কুশলীরা। তাঁদের মধ্যে অবিনাশ মুখার্জী, দেবেন ব্যানার্জী, রামশশী ঘোষাল, টুরো ঘোষাল, শচী মণ্ডল, অশ্বিনী ব্যানার্জী, নগেন ডোম, কানাই মল্লিক, জানকী মেদ্দা, মানিক অধিকারী, মদন অধিকারী, কালীপদ ঘোষ প্রমুখ পরে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁরা এক-একটা দলের প্রধান শিল্পীর মর্যাদা পেয়েছেন। বলা বাহুল্য, এঁরা সবাই ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের ভক্ত ও আশীর্বাদধন্য।

আমার অভিনয়জগতে আসার সার্থকতা হলো মাতৃদর্শন। আমাদের জমিজমা ছিল ভালই। উচালনের এক বড় মহল আমার বাবা পেয়েছিলেন বর্ধমানের মহারাজার কাছ থেকে। তিনি বর্ধমান রাজ এস্টেটে কাজ করতেন। আমাদের ঘোড়া, পালকি সবই ছিল। তবু তাতে মন ভরেনি। অভিনয়জগৎ আমাকে ডেকেছিল। এর জন্য বাড়ির লোকের কাছে কম ভর্ৎসনা শুনতে হয়নি; তখন কী জানতাম যে, এই পথেই পৌঁছে যাব বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীর কাছে! অভিনয়ের সুবাদেই মাকে পেয়েছিলাম। আমি খুব ছোটবেলায় গর্ভধারিণী মাকে হারিয়েছিলাম। সে-দুঃখ ভিতরে জ্বলন্তই ছিল। যেদিন শ্রীশ্রীমার দর্শন হলো, সেদিন থেকে যেন আমার হারানো মাকে আবার ফিরে পেলাম।

মায়ের কাছে এসেই ঠাকুরকে চিনতে শিখেছি, ভাবতে পেরেছি। মায়ের ছোঁয়ায় জীবন ধন্য হয়েছে। মা দীক্ষা দিয়ে অন্তরের তীব্র দহনকে শীতল করেছেন। স্ত্রী-পুত্র সকলেই মায়ের আশীর্বাদ লাভ করে ধন্য হয়েছে।

ঠাকুর ও মায়ের চিন্তা ছাড়া আমার জীবনে আর কোন চিন্তা নেই। কামারপুকুরে ঠাকুরের ঘরের উঠোন দিয়ে হাঁটতে পারতাম না; মনে হতো এখানে ঠাকুরের পায়ের চিহ্ন ছড়ানো আছে। সেই কারণে ঐ ঘর-দুটির (ঠাকুরের পৈতৃক বাড়ি-দুটি) ছাঁচা দিয়ে হেঁটে ঠাকুরঘরে প্রণাম করতে যেতাম। কামারপুকুর-জয়রামবাটী থেকে কোন লোক যদি আমাদের গ্রামে আসতেন—তা সে ভিখারি হলেও আমি তাঁকে প্রণাম করতাম; কারণ তিনি যে ঠাকুর-মায়ের গ্রামের লোক। বলতাম : "আপনারা ভাগ্যবান, পুণ্যবান ও কৃতার্থ! শত যুগের তপস্যার ফলেই আপনারা অমন ভাগ্য লাভ করেছেন!" মার চরণে প্রার্থনা, তিনি যেমন জয়রামবাটীতে চরণে ঠাঁই দিয়েছেন, পরকালেও যেন ঠাঁই দেন এই অধম সন্তানকে। ❑

দিব্যস্মৃতি

॥১॥

আলাউদ্দিন খাঁ

এখনকার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী ও যন্ত্রশিল্পীরা সাধনার রস পাওয়ার চেষ্টা ঠিক ঠিকভাবে করে না। একনিষ্ঠ সাধনের যে কী রস ও আনন্দ তা মুখে বলা যায় না। এখনো (এপ্রিল ১৯৫৫) রোজ রাত তিনটেয় উঠে রেওয়াজ করি ভোর পর্যন্ত। এরপর অন্নপূর্ণার মায়ের (পত্নী মদিনা খাতুন) দেওয়া জলখাবার খেয়ে বাড়ির বাগানে যাই। দুটো সাপ আসে—তাদের দুধ খাওয়াই, অন্যান্য পশুপাখিদের খাওয়াই। ঠিক ঠিক সাধন তখনি হয় যখন নিজেকে সম্পূর্ণ বিস্মরণ হয়, যখন আমার 'আমি' থাকে না। এই অবস্থায় কে হিংস্র আর কে অহিংস্র, তার ফারাক থাকে না। সবই তো আল্লার জীব।

ঠাকুরকে দেখে তাই বুঝেছি। আহা, সে-অভিজ্ঞতার কথা কী বলব! তিনি আমাকে কত আশীর্বাদ করেছিলেন! ঐ আশীর্বাদের জোরেই তো আজ এতদূর আসতে পেরেছি। বাড়ি থেকে পালিয়ে কলকাতায় এসে ঘুরতে ঘুরতে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলাম। তখন আমার বয়স ১০-১২ বছর। তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি, ঠাকুর ছোট খাটটির ওপর বসে আছেন। সে কী রূপ! একেবারে যেন সোনার মূর্তি! বাহুতে একটি সোনার তাবিজ ছিল। গায়ের রং সেই তাবিজের রঙের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তাঁর দিব্য কান্তি দেখে চোখ ফেরানো যেত না। আমার দারিদ্র্যের কথা শুনে দুপুরে মা কালীর প্রসাদের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। কী যে দয়াল ঠাকুর, তা কী করে বোঝাই! তাঁর কৃপাতেই তো বেঁচে আছি।[১] ❑

॥২॥

অজ্ঞাত

বিষ্ণুপুরে থাকতাম। লোকমুখে মায়ের কত কথা জেনেছিলাম। তা থেকে মাকে দেখার কৌতূহল বাড়তে থাকে। কিন্তু আমার তখন বয়স কম। একা কেমন করে যাব জয়রামবাটী! একদিন সুযোগ এল। এক আত্মীয়ের সঙ্গে ভোরবেলা পদব্রজে রওনা হলাম। যখন জয়রামবাটী পৌঁছালাম তখন বেলা বেশ গড়িয়ে গেছে। দেখলাম, মা [পুরনো বাড়ির] বারান্দায় বসে আছেন। যেন আমার জন্যেই অপেক্ষা করছেন। দেখামাত্রই বললেনঃ "বাবা, তোমাদের খুব খিদে পেয়েছে। তোমরা সামনের পুকুর থেকে স্নান সেরে এস।" স্নান করতে যাওয়ার সময় শুনতে পেলাম, মা একজনকে ভাত বসিয়ে দিতে বললেন। স্নান সেরে এসে দেখি, থালায় গরম ভাত ও তরকারি রেখে মা পাখা হাতে খাবার ঠাণ্ডা করছেন। খেতে বসলাম। হাওয়া করতে করতে মা বললেনঃ "পেট ভরে খাও বাবা।" মুখে গ্রাস তুলেছি, অমনি এক অপূর্ব সুগন্ধে প্রাণ, মন ও রসনা ভরে গেল।

সেবার জয়রামবাটী থেকে অফুরন্ত তৃপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য, একবারও মনে আসেনি তাঁর কাছে কৃপা প্রার্থনা করার কথা। আজ যখন তাঁর সেই করুণার কথা ভাবি, তখন চোখ জলে ভরে আসে।[২] ❑

॥৩॥

বীরেন্দ্রকুমার মজুমদার

১৯০১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল কি মে মাস। শিলং-এ আছেন স্বামীজী। সেখানে একটি সভায় বক্তৃতা করছেন। তখন মাইকের প্রচলন হয়নি। সেদিন স্বামীজী ইংরেজীতে অসাধারণ বক্তৃতা করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতা বুঝতে এবং শুনতে কারো এতটুকু অসুবিধা হয়নি। হল-এ পেট্রো-ম্যাক্সের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। বক্তৃতা চলাকালীন হঠাৎ আলো নিভে যায়। অন্ধকারে ভরে যায় সারা হল। পাশাপাশি পরস্পরকে দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ দেখা গেল, ঐ গভীর অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে স্বামীজীর মূর্তি। স্পষ্ট দেখলাম—সবাই দেখল, যেখানে স্বামীজী দাঁড়িয়ে আছেন সেই অংশটি আলোয় আলোময়। এ কোন 'ইলিউশন' (ভ্রম) নয়, সুস্পষ্ট দর্শন। শ্রোতারা সকলেই ঐ দিব্যদর্শন লাভ করে সেদিন ধন্য হয়েছিল। স্বামীজীর পাণ্ডিত্য ও কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে শ্রোতারা সকলেই মুগ্ধ হয়েছিল। বক্তৃতার পর সবাই বলাবলি করছিলেন—"স্বামীজী দিব্য অধিকারপ্রাপ্ত বাগ্মী, আর জ্ঞানের সমুদ্র!"[৩] ❑

---

১ স্থানঃ দিল্লিতে পণ্ডিত রবিশঙ্করের অশোকা রোডের সরকারি বাংলো। কালঃ এপ্রিলের এক রবিবার, ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দ। অনুলিখনঃ ভবরঞ্জন ঘোষ (সোদপুর), উত্তর ২৪ পরগনা। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর জন্ম সম্ভবত ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে, মৃত্যু ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

২ স্থানঃ জয়রামবাটী। কালঃ ৮ এপ্রিল ১৯৫৪। উপলক্ষ্যঃ মন্দিরে শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তিপ্রতিষ্ঠা। অনুলিখনঃ ভবরঞ্জন ঘোষ। কথকের নাম অনুলেখক স্মরণ করতে পারেন না। শুধু মনে আছে, কথকের বয়স ৬০-৬৫, শরীর শক্ত-সামর্থ্য, গায়ের রং তামাটে।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

৩ বীরেন্দ্রকুমার মজুমদারের মুখে তাঁর আত্মীয় ভবরঞ্জন ঘোষ স্বামীজীর এই স্মৃতিচারণটি শুনেছিলেন। বীরেন্দ্রকুমার মজুমদার তখন রাঁচিতে কর্মরত ছিলেন। রাঁচির ডোরান্ডা অঞ্চলে তিনি থাকতেন। কালঃ ১৯৫১।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

সংগ্রহ ❑ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

পাতঞ্জল-যোগসূত্র

ব্যাখ্যাতা ঃ স্বামী প্রেমেশানন্দ

সূত্রানুবাদ ঃ স্বামী শরণ্যানন্দ

সম্পাদনা ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

সমাধিপাদ

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ। ।।১২।।

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা এই বৃত্তিগুলিকে নিরোধ করিতে হয়।

তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ। ।।১৩।।

বৃত্তিগুলিকে বশীভূত করার চেষ্টার নাম অভ্যাস।

স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ। ।।১৪।।

দীর্ঘকাল ধরিয়া অবিরাম যত্নের সহিত চেষ্টা করিলে অভ্যাস সুদৃঢ় হয়।

দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্। ।।১৫।।

দৃষ্ট অথবা শ্রুত সমস্ত বিষয়ের কামনা যিনি ত্যাগ করিয়াছেন তাঁহারই 'বশীকার' নামক বৈরাগ্যলাভ হয়।

মন্তব্য ঃ আমাদের জীবন বলিতে স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের ক্রিয়া বুঝায়। এই দুইটিই অবিদ্যাধাতু দ্বারা গঠিত। এইসবই ইঁট-পাটকেলের মতো জড়বস্তু। ইহাদের ক্রিয়া বন্ধ করিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন—ঐ খেলা যাহা আমাদের কোন কাজে লাগে না, তাহা বুঝিয়া তাহার দিকে মনের টান বন্ধ করিবার চেষ্টা। দ্বিতীয় কাজ, ঐ ক্রিয়া বন্ধ রাখিবার জন্য বলপ্রয়োগ।

সামান্য পান-তামাকের নেশা ছাড়া আমাদের পক্ষে একটি দুরূহ ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। এই নেশা ছাড়িতে হইলে, ইহাতে আমাদের যে কিছুমাত্র উপকার হয় না, বৃথা শক্তিক্ষয়, অর্থব্যয় এবং নেশার দাসত্ব করিতে হয়—ইহা বিচার করা প্রয়োজন। তারপর মাঝে মাঝে উহা ছাড়িয়া থাকিয়া দেখিতে হয়, ইহা ব্যবহার না করিলে আমার কিছু ক্ষতি হয় কিনা।

এই সংসারভোগের নেশা ছাড়িতে হইলে এইরূপ বুদ্ধি-বিকাশের দরকার যে, অনন্তকাল ধরিয়া এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের ও মনের কত ভোগ জোগাইলাম, তৃপ্তি তো একটুও হইল না, বরং তাহা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। অতএব এইদিকে আর অগ্রসর হওয়া উচিত নহে। এইরূপ বিচারে কথাটা স্পষ্ট হইয়া উঠিলে মাঝে মাঝে মন বুদ্ধির এই খেলা বন্ধ করিয়া দেখিতে হয় যে, আমার নিজের মধ্যে এত আনন্দ আছে যে, বাহিরের বস্তু লইয়া খেলা করা আমার পক্ষে ক্ষতিকর।

এইরূপ অভ্যাসের সহায়ে বৈরাগ্য যখন পরিপক্ব হইয়া উঠিবে তখন ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার বন্ধন সম্পূর্ণ শিথিল হইয়া যাইবে এবং স্বস্বরূপের ধারণা স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

এই সংসারভোগের উর্ধ্বে যে অনন্ত জীবন, অনন্ত জ্ঞান ও অসীম আনন্দ আছে, তাহা আপ্তপুরুষের নিকট হইতে শুনিয়া অথবা শাস্ত্র পড়িয়া বারবার আলোচনা করিতে হয়। আপ্তপুরুষগণ যে কি আনন্দে জীবনযাপন করেন, তাহা তাঁহাদের লীলায় প্রকাশ পায় এবং তাঁহাদিগের মূর্তি ও তত্ত্ব চিন্তা করিলে সংসারের উর্ধ্বে উঠিবার একটা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া ওঠে। ইহা যোগাভ্যাস করিবার পূর্বে বিশেষভাবে প্রণিধান করিবার বিষয়।

মনের দারুণ চঞ্চলতা নিবারণ করিবার জন্য বিচার করিয়া বুঝিতে হইবে যে, কত জন্ম ধরিয়া আমি মনের এই খেলা লইয়া মাতিয়া আছি—তাহাতে তো আমার কিছুমাত্র লাভ হয় নাই। সুতরাং শান্তিলাভ করিতে হইলে মনের এই চঞ্চলতা বন্ধ করিতে হইবে। ইহাতে নানাপ্রকার চিন্তা করিবার অভ্যাসের উপর বিরক্তি আসিবে। তখন পূর্বোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া মনকে নিরস্ত করিতে হইবে।

এই অভ্যাস আবার এক-দুইদিনে যাইবার নয়। অনন্ত জন্মের এই অভ্যাসকে বন্ধ করিতে হইলে অনেকদিন ধরিয়া অবিরাম মনের চিন্তা বন্ধ রাখিতে হইবে। মনের চিন্তা বন্ধ রাখিলে আমি স্বরূপের সন্ধান পাইব। ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র ক্ষতি হইবে না। বরং ইহাতে যে দুঃখের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিব—ইহা স্থির নিশ্চয় ধারণা করিতে হইবে।

কখনো কখনো বিশেষ কোন কষ্ট পাইয়া লোকের মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে দেখা যায়। তাহাতে কোন স্থায়ী ফল হয় না। কিন্তু যাঁহারা সূক্ষ্ম দৃষ্টিসহায়ে বা বিবেকবুদ্ধির দ্বারা যত সুখলাভের বস্তু সম্বন্ধে জানিয়াছেন এবং অন্যের নিকট হইতে শুনিয়াছেন—তাহাদের একটিও আমার উপকারক নহে এবং ভোগের বাসনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিলে আমার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হইবে না—ইহা সম্পূর্ণরূপে যাঁহারা বুঝিয়াছেন, তাঁহাদেরই ঠিক ঠিক বৈরাগ্য হইয়া থাকে। 'বশীকারসংজ্ঞা'র (সংজ্ঞা = জ্ঞান) অর্থ—ভোগের বস্তু সম্পূর্ণরূপে হেয় বলিয়া ধারণা—ভোগের বস্তু আমাকে কখনো প্রলুব্ধ করিতে পারিবে না—এই জ্ঞান।

তৎপরং পুরুষখ্যাতের্গুণবৈতৃষ্ণ্যম্। ।।১৬।।

যে তীব্র বৈরাগ্যের দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের প্রতিও বিতৃষ্ণা জন্মে, তাহাই জীবের স্বরূপ প্রকাশ করে।

মন্তব্য : এইরূপে অনেকদিন মনকে নিরুদ্ধ রাখিলে মনে অপূর্ব স্বস্তি অনুভূত হয় এবং চিত্ত প্রসন্ন হইয়া উঠে। তখন নিশ্চিতরূপে বুঝা যায় যে, সুখ-শান্তি যাহা কিছু—সব আমার ভিতরেই আছে। আমার স্বরূপ ব্যতীত অন্য বস্তুর কোন প্রয়োজন আমার নাই। এই অবস্থাকে বলে 'পরবৈরাগ্য' এবং এই অবস্থা লাভ হইলে সৃষ্টির কোনদিকে মনের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ থাকে না।

বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ। ।।১৭।।

যে-সমাধিতে বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা অনুগত থাকে, তাহা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি।

বিরাম-প্রত্যয়াভ্যাসপূর্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ। ।।১৮।।

অন্য সমাধিতে চিত্তবৃত্তি সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হয়, কিন্তু চিত্তের গূঢ় সংস্কারগুলি অবশিষ্ট থাকে। [ইহা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।]

মন্তব্য : আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রথম সাধনা মনকে একাগ্র করা। সেইজন্য হিন্দুদিগের ধর্মের আরম্ভেই ছিল গায়ত্রী উপাসনা। তাহাতে একটি জ্যোতির উপর মন স্থির করিতে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। যাহারা ধ্যানযোগ সাধন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগের প্রথম সাধনা মনকে নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলা এবং ঐ অবস্থায় স্থির থাকিয়া 'আমি আছি'—এইটি বোধ করা। ইহাতে সফলকাম হওয়ার পর কয়েকটি সাধনার কথা বলা হইয়াছে। প্রথম, কোন একটি স্থূল বস্তু সম্বন্ধে চিন্তা করা। তাহাতে যখন মন সম্পূর্ণ স্থির হইয়া যাইবে তখন বুঝিতে হইবে, মনের একাগ্রতা শক্তির বিকাশ হইয়াছে। তারপর দ্বিতীয় স্তরে, কোন একটি সূক্ষ্ম বিষয়কে অবলম্বন করিয়া মন স্থির করিতে হইবে। এইরূপে মন সম্পূর্ণ স্থির হইয়া গেলে একপ্রকার অবস্থা হয়, যাহাকে 'সমাধি' বলে। এই অবস্থায় কখনো কখনো প্রশান্তবুদ্ধিতে স্বস্বরূপের একটু আভাস পাওয়া যায়, তাহাকে 'সানন্দ সমাধি' বলে। আরেকপ্রকার অবস্থায় ঐ 'আমি'তেই একপ্রকার নিশ্চলা বুদ্ধি হয়, তাহার নাম 'সাস্মিতা সমাধি'। এইসব সমাধি হইতে মন ব্যুত্থিত হইলে দেখা যায়, আমার পূর্বসংস্কারসমূহ পূর্বের ন্যায়ই আছে, তবে সংস্কারের অধীন হইয়া প্রাকৃত লোক যেমন অবিরাম চঞ্চলচিত্তে ঘুরিয়া বেড়ায়, যোগীরা তাহা সম্পূর্ণরূপে সংযত করিতে পারেন।

ভব-প্রত্যয়ো বিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাম্। ।।১৯।।

এই সমাধি [পরবৈরাগ্যের সহিত অনুষ্ঠিত না হইলে] দেবতা ও প্রকৃতিলীন পুরুষদের উৎপত্তির কারণ।

মন্তব্য : ধ্যান অভ্যাস করিতে হইলে যোগ্যতালাভের জন্য যেসব সাধনা করিতে হয়, তাহা না করিয়া যাঁহারা কেবল মনের জোরে নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকার অভ্যাস করেন তাঁহাদের মুক্তি হয় না। সম্ভবত বৌদ্ধধর্মের নির্বাণবাদ প্রচারের ফলে অনেক লোক ভ্রান্ত মত অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকার সাধনা করিত। তাহারা সগুণ বা নির্গুণ ব্রহ্মের কথা জানিত না, এমনকি ব্রহ্ম বলিয়া কোন বস্তু আছে তা স্বীকার করিত না। তাহাদের মধ্যে অনেকে ছিল নাস্তিক, শূন্যবাদী। তাহাদের এই ধারণা ছিল—জীবাত্মা বলিয়া কোন জিনিস নাই। তাই তাহারা ভেকের বা সাপের মতো কুম্ভক করিয়া সুষুপ্তিসুখই জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করিত। আমরা সুষুপ্তিকালে ঠিক মৃতের ন্যায় হইয়া যাই। জাগিয়া উঠিলে নিদ্রার পূর্বে যেরূপ ছিলাম, ঠিক সেইরূপই নিজেকে অনুভব করি। পূর্বোক্ত নিরীশ্বরবাদী ও শূন্য-বাদিগণ সমাধি অবস্থায় থাকিতে থাকিতে মরিয়া গেলে ঠিক সুষুপ্তির অবস্থায় কল্পান্ত পর্যন্ত প্রকৃতিলীন হইয়া থাকেন। কল্পান্তে যখন নূতন সৃষ্টি আরম্ভ হয়, তখন পূর্বে তাঁহারা যেরূপ ছিলেন, ঠিক সেই সংস্কার লইয়া আবার জন্মগ্রহণ করেন।

কর্মযোগ অভ্যাসের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি না করিয়া এবং উপাসনার দ্বারা মনের একাগ্রতা সাধন না করিয়া যাঁহারা যোগে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের নানাপ্রকার সিদ্ধিলাভ হইলে তদ্দ্বারা প্রলুব্ধ হন এবং তাহার ফলে তাঁহাদের পতন ঘটে। আর শূন্যচিন্তায়, নিষ্ক্রিয় সমাহিত অবস্থায় দেহত্যাগ হইলে তাঁহাদের চিত্তে অবিদ্যার আবরণ থাকে। তাই তাঁহারা কল্পান্তে পুনর্জন্মলাভ করেন।

যাঁহারা ধ্যানযোগে প্রকৃতি অর্থাৎ অবিদ্যাতে মন লীন করিতে পারেন, তাঁহারা ব্যুত্থিত অবস্থায় যদি দেহত্যাগ করেন তবে তাঁহাদের মনে তখন মূল অবিদ্যার ভাব ছাড়া অন্য ভাবও থাকিতে পারে। তাহা হইলে তাঁহাদের মৃত্যুকালের চিন্তা অনুসারেই তো পরজন্ম হইবে। আর যদি বিদেহকালেও প্রকৃতিলীন অবস্থা থাকে, তাহা হইলে কল্পান্ত পর্যন্ত সেই অবস্থায় থাকিতে হইবে।

বেদান্তশাস্ত্রে বিদেহমুক্তি ও জীবন্মুক্তি—এই দুই অবস্থার কথা প্রসিদ্ধ আছে। বিদেহমুক্তি বলিতে জীবনান্তে মুক্তির কথাই বুঝায়। তাই আমরা বিদেহলয়কে সেইরূপ দেহহীন অবস্থায় প্রকৃতিলীন—এই অর্থও করিতে পারি। আর মৃত্যুর প্রাক্কালে মনের যে-অবস্থা থাকে, পুনর্জন্মে সেই অবস্থাই প্রাপ্ত হয়—ইহা তো সর্বজনবিদিত সত্য।

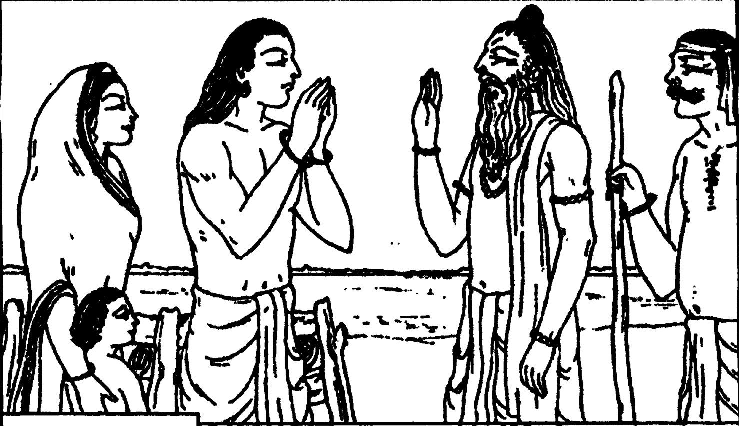
টীকাকারগণ 'বিদেহ' বলিতে 'দেবতা' বুঝিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দও ঐ একই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। [ক্রমশ]

চিরন্তনী

রাজা হরিশ্চন্দ্র ১৬

❑ এই বিভাগটি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য ❑

কথা : শুভ্রা দাশগুপ্ত ❑ চিত্র : তথাগত দাশগুপ্ত



ঋষি বিশ্বামিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রকে বললেন : "হে রাজা, তোমার অপূর্ব ত্যাগ ও তিতিক্ষা এবং ধর্মের প্রতি অবিচল নিষ্ঠায় আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট। আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। আমি তোমার রাজ্যপাট সমস্ত নিঃশর্তে ফিরিয়ে দিচ্ছি। তোমার স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে তুমি তোমার রাজ্যে ফিরে যাও।"

রাজা হরিশ্চন্দ্র তখনো মনে মনে ভাবছেন : রাজত্ব তো ফিরে পেলাম, কিন্তু আমি তো চণ্ডালের দাস! চণ্ডালের অনুমতি ছাড়া এই শ্মশানভূমি ত্যাগ করে যাব কি করে? এমন সময় চণ্ডাল প্রবীর এসে সেখানে উপস্থিত হলো।

চণ্ডাল প্রবীর আসলে স্বয়ং ধর্ম। তিনিও চণ্ডালের বেশে রাজা হরিশ্চন্দ্রকে পরীক্ষা করছিলেন। চণ্ডালের ছদ্মবেশ ত্যাগ করে তিনি রাজাকে নিজের পরিচয় দিলেন এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সম্মুখে সযত্নে দাসত্বের চিহ্ন রাজার হাত থেকে খুলে দিলেন।





মহাপরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ মহারাজ হরিশ্চন্দ্র রানী শৈব্যা এবং পুত্র রোহিতাশ্বকে সঙ্গে নিয়ে দৈববলে তৎক্ষণাৎ রাজধানী অযোধ্যায় এসে উপস্থিত হলেন। প্রজারা তাঁদের প্রিয় রাজা ও রানী এবং আদরের রাজপুত্রকে ফিরে পেয়ে আনন্দে জয়ধ্বনি করতে লাগল। রাজধানী আনন্দে মুখর হয়ে উঠল [ক্রমশ]

অনিত্য নিত্য শাশ্বত

সমরেশকুমার নিয়োগী

মহানগরীর বিস্তৃত ময়দান,
তার এক কোণে সম্রাজ্ঞীর বিশাল স্মৃতিসৌধ।
সূর্যকে বেঁধেছিলেন যিনি
আপন রাজ্যের সীমানায়।

অনতিদূরে, অনাড়ম্বর পরিবেশে প্রাঞ্জল মূর্তি এক।
একাকী দাঁড়িয়ে সেথা ভিক্ষু সন্ন্যাসী।
আঠারটি সূর্য যাঁর
শুধু ভালে আঁকা।

দাঁড়িয়েছিলাম দোঁহের মাঝখানে।
বুঝি বা শ্রান্ত-ক্লান্ত বৃদ্ধ পৃথিবীটাও
থমকে দাঁড়িয়ে আজ
এ-দুয়ের টানে।

বহিরঙ্গে তার বাস্তবতার রঙিন ফানুস।
অন্তরের মণিকোঠায় মুক্তির ব্যাকুলতা।
নিত্য আর অনিত্য সদা লীলারত
তারই প্রতীকচিত্র বিদ্যমান হেথা।

কোথা সে-সাম্রাজ্য আজ? কোথা সে-সম্রাজ্ঞী?
ইতিহাসের ছিন্নপত্রে পেয়েছে সে ঠাঁই।
সৌধের প্রতিটি প্রস্তর কহে ক্ষীণ স্বরে,
প্রেমহীন আস্ফালন অনিত্য সদাই।

নিতান্ত নিঃসম্বল ভিক্ষু কী করিল দান?
কোন্ মন্ত্রে নিল হরি' পৃথিবীর প্রাণ?
কোন্ ডোরে বাঁধি নিল সবার হৃদয়!
প্রত্যেকের হৃদয়ে গড়া স্মৃতিসৌধ তাঁর।

ঐ শোন, ডাকে ঐ ভিক্ষুর হৃদয়
যে-হৃদয়ের উত্থিত কম্পন
ফাটল ধরিয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে
ভারতকে শিখিয়েছিল স্বাধীনতার স্বাদ।

অখণ্ড রাজ্যস্থিত বিশ্বমনাধিপতি
শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ আত্মাতেই স্থিতি।
অতি সূক্ষ্ম কীটাণুকীটেও দিতে মুক্তিদান
হাস্যমুখে দূর্বাদলে তাঁর অবস্থান।

উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন, ভূপতি-ভিখারি
ম্লেচ্ছ আর অচ্ছুৎ যত—
সবারে চেনাতে তাদের দৈবী স্বরূপ
প্রেরণাস্বরূপ তিনি, নীরবে নিভৃতে।।



প্রাণ

শুভ্রকান্তি দে

তিল তিল করে গড়ে ওঠা একটা প্রাণ
কত সহজেই না জীবন-পথটা পার হয়ে যায়।
বোধহীনতায় যার যাত্রা শুরু
সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার
ঝড়-ঝাপটা সামলে
একদিন ফিরে আসে
সেই বোধহীনতাতেই।

যেন এক চাকা ঘোরার খেলা—
শুধু, ঘোরার পথটাই থাকে অনাবিষ্কৃত।
ভাঙা আর জোড়া
হাজারো স্মৃতির ভাঁড়ার থেকে
জীবনের পাঁচালী পড়া,
তারপর মিশে যাওয়া অসীমের মাঝে।

তিল তিল করে গড়ে ওঠা একটা প্রাণ
কত সহজেই না জীবন-পথটা পার হয়ে যায়।

রেখো না দূরে

মধুশ্রী গুপ্ত

আমার বীণা বাজাও প্রভু,
বাজাও তোমার সুরে।
সুখের খেলায় ভুলিয়ে আমায়
রাখলে কেন দূরে?

আঁধার রাতে ঝড়ের সাথে,
আসবে যেদিন আমার ঘরে,
অশ্রু হয়ে পড়বে সেদিন
পরশ তোমার ঝরে।

পঞ্চমে সুর উঠবে বেজে
হৃদয়-বীণার তারে
সুখের খেলায় ভুলিয়ে আমায়
রাখবে না আর দূরে।

উপলব্ধি

মঞ্জুলা ঘোষ

হেথা আছ তুমি, হোথা আছ তুমি,
তুমি তো বিশ্বময়!
তবু কেন আমি ঘুরে ঘুরে মরি
মনে লয়ে সংশয়?
গির্জায় তুমি? মসজিদে তুমি?
তুমি আছ মন্দিরে?
মূঢ় মন মোর তবু বোঝে নাকো
আছ তুমি অন্তরে।
ডেকে ডেকে মরি, ছুটে ছুটে যাই
কভু সাড়া নাহি মেলে,
তোমারে বুকেতে বহিয়া বেড়াই
তোমারেই অবহেলে।
তব কৃপা বিনা, তব দয়া বিনা
জগতে নাহিকো সুখ,
'আমি' 'আমি' করে ঘুরিয়া আঁধারে
পাই মোরা শত দুখ।
তাই মনে ভাবি, সবকিছু ছাড়ি
ডুবে যাব অন্তরে,
সেখানেই খুঁজে পাব হে তোমারে
সব চাওয়া যাবে দূরে।

অমৃতের দ্বারে

উমা দে শীল

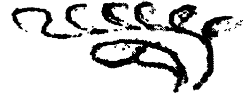
আমি তাই ভালবাসি যে রয়েছে মৃত,
জীবনের খড়কুটো
মরণের পারে এসে হয়েছে অমৃত।
ঐ ফুল, এই মালা
এই ধূপদীপ জ্বালা
তারি তরে এনেছি সাজায়ে,
দেখো না বাজায়ে
ওর বীণা পরে বেহাগ কালেংড়া কি কাফী বা কানাড়া
ছন্দহীন বেসুরের পালা আজি থাক দূরে,
স্মৃতির দুয়ার থেকে দুয়ারেতে ঘুরে
তীর্থ কর সারা।
শত হস্তে শত অস্ত্র কর সংবরণ,
আজি যে শুধুই স্মরণ—
নম্র স্বরে, নত মুখে
আভূমি লুটায়ে
মন্ত্র সেই একই সুরে ঘেরা—
'ভালবাসি, বাসিয়াছি, বাসিব যে ভাল'।
তারপর—
দু-ফোঁটা অশ্রুজল,
নিজ হাতে গাঁথা মালা
চন্দনের গন্ধটুকু রেখে
ধীরে ধীরে
দায়হীন দাবিহীন বিস্মরণে ফেরা।
মৃতদের নেই কোন কাল বা অকাল
সব দোষ ক্ষমা তার
সব রাত সূর্যসকাল।



আসা-যাওয়া

সুমিতা ভাদুড়ি

সবকিছুই অনিত্য অস্থির যেখানে—
সে-ধরাতে বেঁচে থাকার কি মানে?
প্রিয়জন যারা স্নেহপ্রীতি ভরে
দিয়েছিল জীবন মধুময় করে
কোথায় চকিতে মিলাল তারা,
হাজার ডেকেও পাই নাকো সাড়া।
তবে এ-জগতে থেকে কিবা প্রয়োজন?
কেনই বা বৃথা এত তুচ্ছ আয়োজন?
জমিজমা নিয়ে কত মারামারি,
বিষয়-আশয়, কত দরাদরি।
কিছুই তো নেব না, সব রবে পড়ে
এসেছি এ-ভবে দুদিনের তরে।
এ-জগতে আসা কাজেতে যাঁহার,
তিনি ডেকে নেন কাজ ফুরালে তাঁহার।
কেন আগমন, কেই বা পাঠায়—
এই সারকথা মোরা ভুলে যাই।
মূল সেই কথা যদি থাকে মনে,
সুখদুঃখ কিছু পশে না জীবনে।



পথচলা

সুধাংশু দাম

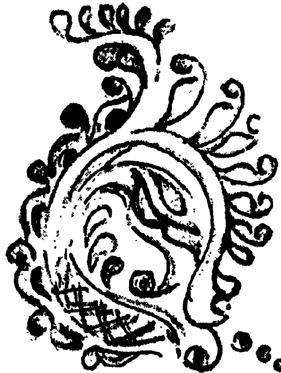
যে-পথিক আজ হেঁটে যায় ঐ
সাগর কিনারে বালিতে
পায়ের চিহ্ন পড়িতেছে তার
বালুকাবেলায় চলিতে।
কিন্তু সে-রেখা মিলায় পলকে
রহে না তো ক্ষণকাল
মুছে দিয়ে যায় সব পথচলা
ঢেউ আসি উত্তাল।

হবে পাঠোদ্ধার

শান্তিকুমার ঘোষ

এক-একটা দিন যেন স্বাদু ফল
পাহাড়ের সমুদ্রের নবজাগরণ
দ্বীপ জ্বলে সন্ধ্যারামে—
কে বাঁধবে সময়কে—দেবতাও নিদ্রাহীন।
ফোঁটা ফোঁটা গলে মোম... যায় ঝরে আয়ু।

পুঁথি পড়ে কাটে যদি কাটুক জীবন,
যে-পুঁথিতে প্রেমের সুখের স্বপ্ন
রয়েছে স্তম্ভিত
বীর্য দিয়ে, জ্ঞান দিয়ে, ভক্তি দিয়ে
হবে তার পাঠোদ্ধার।।



বানভাসী মানুষ

শ্যামল বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখের নাগালে
সাপ আর মানুষ গাছকে
জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে
ভুলে গেছে শত্রুতার কথা।
বাঁধভাঙা জল ঘরের পটে ছুঁয়ে দিলে
মার চোখে দেখতে পেয়েছি
পশ্চিম আকাশের মেঘ
পাঁকের মধ্যে গরুগুলো রাখালের
দিকে চেয়ে ডেকে উঠেছে
কয়েকটি শকুন উদাসী বাতাসে
পাখা মেলে উড়ে গেল
গর্তে প্রতিশ্রুতি লুকিয়ে রেখে,
আর বানভাসী মানুষের ভেসে গেল
প্রেমঘর, গোছানো সংসার।

মাগো, বড় তৃষ্ণা

মারুফী খান*

আকালের শুকনো মাটি ফেটে চৌচির। তীব্র দাহে অন্তঃ-রাজ্যে চলে খরা। বড় তৃষ্ণা, বড় আকিঞ্চন, বড় দাহের কষ্ট। ঘুরে ঘুরে ফিরি; খুঁজি একটি ছায়াশীতল স্পর্শ। প্রকৃতি আপন নিয়মে কখনো উষ্ণ কখনো শীতল, কখনো উর্বর কখনো বন্ধ্যা। আমাদের চাতক মন কেবলই ব্যাকুল, কেবলই ছোটা এবং ছোটা।

'ভয় কি? এই তো আমি।' অনন্ত অম্বর থেকে, দিগন্তবিস্তৃত লোকালয় থেকে, অরণ্য-বিশালতা থেকে এ কোন্ স্নিগ্ধ স্বর? কলকল স্রোতোধারায় এ কোন্ নুড়িপাথরের রিনিঝিনি শব্দ? কোথায়, কোথায় তুমি মঙ্গলময়ী কল্যাণরূপিণী?

অজস্র পোকামাকড়ের কুরে খাওয়া হৃদয় দাঁড়ায় যাচনার পাত্র হাতে। কৃশ, দুঃখী, সময়ের গ্রাসে ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাক্ত মানবসন্তান ঊর্ধ্বমুখী। দাও ভরে দাও তোমার করুণার বারি, তোমার ঐ মায়াভরা দুটি চোখের স্নেহসুধা মাখিয়ে দাও সর্বাঙ্গে। শীতল হই, স্নাত হই। মাগো, বড় তৃষ্ণা!

লোকারণ্যের ভিড়, যন্ত্রের বিচিত্র ধ্বনি, দীনতা, নীচতা, শোষণের অভাবনীয় আগ্রাসন। হাঁটার পথে নিশ্চিত চোরাবালির গহ্বর। দিগ্‌ভ্রান্ত, পরিশ্রান্ত মানবতার কী দারুণ অবক্ষয়! আমাদের বিশ্বাসের ঘরে সিঁদেল চোরের উৎপাত, সত্য প্রকাশের দরজায় ওঁৎপাতা কালো এক চোখা দৈত্যের পাহারা, মনের রাজ্যে হিংসা, লোভ, কলুষতার মহোৎসব, আমাদের আশপাশে মহামারী। আমাদের রক্তের রঙ এক হয়েও আমরা পরস্পরকে ধর্মের জগাখিচুড়ি গলাধঃকরণ করিয়ে নাভিশ্বাস তুলে দিই। আমরা পথভোলা, পথভ্রষ্ট!

মাগো, বড় দুঃসময়। বড় কঠিন চলার পথ। তুমি এসে স্থান নাও এই খরা, মহামারী, দুর্বিপাকের ঘোর সময় থেকে উদ্ধারের নিমিত্ত। জায়গা করে নাও হৃদয়মাঝে। আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা আর কতদূর শোনাবে অহিংসার কথা, কতদূর পৌঁছাবে গুটিকয় মানব-সন্তানের আপ্রাণ রক্ত-ওঠা কণ্ঠধ্বনি?

"হিন্দু না ওরা মুসলিম ঐ জিজ্ঞাসে কোন্ জন?" এ-প্রশ্ন আজও, এ-প্রশ্ন কালের গর্ভাধারে বিষাক্ত কীটের মতো ঢুকে থাকে। কুরে খায় বিবেক, কুরে খায় সভ্যতা। জলাভূমির জল শুকিয়ে যায়, ফসলের খেতে মাথা তোলা কচি নধর ফসল আকস্মিক আঘাতে পুড়ে যায়, নুয়ে যায় ভূমিশয্যায়! হায় মানবতা, হায় ধর্মের নামে অধর্মের আস্ফালন।

মাগো, কণ্ঠের সপ্তগ্রাম থেকে উচ্চারিত তোমার একটানা মিলনের কথা—"শরৎ যেমন আমার ছেলে, আমজাদও তেমনি আমার ছেলে।" সেই উদাত্ত উচ্চারণে তুমি এক দুঃসাহসী নারী, তুমি মাতৃত্বের চিরন্তনী গণ্ডিভাঙা সুধাময়ী। তাই তোমার জন্য এক বুক প্রত্যাশা। গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে, গৃহে-প্রান্তরে হাতে নিয়ে চলেছি সময়ের কর্পূর-পুঁটলী, হৃদয়ে তোমার নাম-পুঁজি। বড় দ্রুত নিঃশেষ প্রথম পুঁটলীর সম্বল। ছুটছি, ছুটছি। "আর কেউ না জানুক, জানবে তোমার একজন মা আছেন।" বিশ্বাসের রথটাকে প্রচণ্ড গতিতে ছুটিয়ে শুধুই জানাতে চাইছি, একটুকু হলেও সবাইকে শোনাতে চাইছি এই অভয়বাণীর মহামন্ত্র। হা জগৎ, হা বিষবাণে অন্ধকার মানবের অন্তর-বাহির। ওদের কানে বিষয়ের ঝনঝন, ওদের চোখে বৈভবের ঠুলি, ওদের কণ্ঠে জগতের গরল।

বাতাসে বাতাসে বারুদের গন্ধ। পোড়া দেহের বিবর্ণতা যত্র তত্র। আমাদের পাথেয় কোথায়? ভুলে গেছি ধ্রুপদী, ভুলে গেছি কবিতার শরীর। ভুলে গেছি মায়ের আশীর্বাদবাণী!

মাগো, বড় জটিল সময় এখন। ভাইয়ে ভাইয়ে রেষারেষি, মানুষে মানুষে খুনোখুনি, বিজ্ঞানে বিজ্ঞানে সে কী ঠোকাঠুকি! নিঃশ্বাসে এলোমেলো কষ্ট, বড় কষ্ট। গুটিকয় মানুষ আর কত পায়ের পাতায় রক্ত ঝরিয়ে পার হবে আগাছায় ছাওয়া সমাজ-প্রান্তর? তৈরি করে দাও আরো অসংখ্যজন, যাদের বুকে তোমার অভয় খেলা করবে বসন্ত বাতাসের মুগ্ধতা নিয়ে। তোমার জন্য প্রাণের মাঝে কাঙাল এক নীলকণ্ঠ পাখি কাতর হয়ে উঠুক জনে জনে। ওদের জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও, শক্তি দাও মাগো। ওদের হৃদয়টা একটা স্বচ্ছ আধার করে দাও।

এ-প্রার্থনা তোমার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা থেকে জাত। যা-কিছু শ্রেয়, যাকিছু উত্তম—তাই-ই তো চাই অন্যের কাছে পৌঁছে দিতে। করতে চাই অংশীদার। তাই কি এভাবে নিরন্তর বদ্ধ দরজা খোলার প্রাণান্তকর চেষ্টা? একচোখা দৈত্যকে হটাবার তাগিদ? ওদের বিশ্বাস দাও, ওদের ঘুম জাগানো ভোরের গান শোনাও, ওদের ধৈর্য দাও, ওদের ভালবাসবার মন্ত্র দাও। মাগো, আমাদের বাঁচার শক্তি, দগ্ধ অন্তরে সান্ত্বনা-শান্তির প্রলেপ দাও।

আমরা হাঁটছি, দৌড়াচ্ছি, আমাদের কর্পূর সময় ফুরিয়ে চলেছে দ্রুত। তুমি নতুন সন্তান তৈরি করে দাও, যারা মাথায় আর হৃদয়ে তোমার অমৃতকুম্ভ বয়ে নিয়ে চলবে—যে-অমৃতকুম্ভ থেকে বিতরণ হবে সুধা। পথের দুধারে লোকালয়, যাচনায় যারা ভরে পাবে সঞ্জীবনী রসমাধুরী 'মা' নামের ছায়াময় আশ্রয়।

গৃহ থেকে গৃহান্তর, বন থেকে বনান্তর, মন থেকে মনান্তর, হৃদয় থেকে হৃদয়ান্তর তোমার আশীর্বাদ প্রকাশিত হোক, প্রসারিত হোক। যে দুঃসময়ের ঘেরাটোপে সাধ্যের মধ্যেই অসাধ্যের কথা বলতে চাইলাম, চাইলাম মায়াকুহক কাটিয়ে কানে কানে তোমার সুবচন শুনিয়ে দিতে—তাদের তুমি মুক্তি দাও। মুক্তি দাও অনাগত অগণন মানব-সন্তানকে।

তোমার মুখে পূর্ণিমার প্রসন্নতা, তোমার নয়নে সন্তানের জন্য কাতরতা, তোমার চিন্তায় শুধু মানুষের কল্যাণ-কামনা. এ-বোধটুকু তুমি সঞ্চারিত হতে দাও চিত্তে, বুদ্ধিতে, মননে। ওদের জানতে দাও তোমার লৌকিকতায় তুমি কত কাছে সবার, এবং তোমার অলৌকিকতায় তুমি শস্যে, ফুলে, ফলে, আকাশে, বাতাসে উপস্থিত শুধু তোমার মঙ্গলস্পর্শে, মঙ্গল-ইচ্ছায়।

"দাঁড়াও আমার আঁখির আগে।" মাগো, তুমি দাঁড়াও আমাদের রুগ্ন চেতনার রাজ্যে, দাঁড়াও আমাদের কষ্ট, তাপ-জর্জরিত জীবনের চৌহদ্দিতে। অমঙ্গলকে অপসারিত করে তুমি উচ্চারণ কর—যারা আছ এবং যারা এখনো পৃথিবীতে আসেনি, তাদের সকলের জন্য রইল আমার আশীর্বাদ। এত বড় সঙ্কটে স্নেহের পরশ কি রৌদ্রদগ্ধ, ফেটে চৌচির উত্তপ্ত সভ্যতায় শুচিশীতল ঝরনা হয়ে বয়ে যাবে না, মাগো? ❑

* লেখিকা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ডিরেক্টর।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

ইংল্যান্ড, কানাডা ও আমেরিকায় কয়েকদিন

স্বামী গোকুলানন্দ

এই পরিক্রমাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

বেশির ভাগ মানুষেরই স্মরণশক্তি কম, বিস্মৃতিই অধিক। বিস্মৃতির অর্থ কিন্তু বিনাশ নয়—রাতের সব তারাই থাকে দিনের আলোর গভীরে। স্মৃতি-বিস্মৃতি একই জাতি, মনুষ্য-মনে একই সাথে সহবাস করে। এরা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। জীবনের দিনগুলো চলে যায়, হারিয়ে যায়, স্মৃতিগুলো থেকে যায়। অলস ক্ষণে, কাজের অবসরে, স্মৃতির মণিকোঠা হাতড়াতেই খুঁজে পেলাম মধুর কিছু স্মৃতির সন্ধান—আমার ১৯৯৮ সালের বিদেশ ভ্রমণের দিনগুলি।

১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ লন্ডনের 'Ramakrishna Mission Alumni & Associates'-এর পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ এল এই মর্মে যে, ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে বক্তৃতা দিতে জুন মাসে আমাকে সেখানে যেতে হবে। সেইসঙ্গে তাঁরা এও জানালেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনের আলোকে তাঁরা যে আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করছেন, তা আরো গভীর করতে, সমৃদ্ধশালী করতে তাঁরা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একজন সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য স্বল্পদিনের জন্য হলেও চাইছেন। এই সুবাদে তাঁরা বিভিন্ন স্থানে প্রাক্তন ছাত্রদের কয়েকটা প্রীতি-সম্মেলনেরও আয়োজন করতে ইচ্ছুক। তাঁরা এও লিখলেন যে, আমার আসা-যাওয়া, থাকা-খাওয়া এবং ওখানে থাকাকালীন আনুষঙ্গিক যাবতীয় ব্যয়ভার তাঁরাই বহন করবেন। অনুরোধকারীদের মধ্যে আমার পুরনো কর্মক্ষেত্র বেলুড় বিদ্যামন্দিরের কিছু প্রাক্তন ছাত্রও ছিল। এদের সঙ্গে একমত হয়ে লন্ডনের বোর্ন-এন্ড বেদান্ত সেন্টারের অধ্যক্ষ স্বামী দয়াত্মানন্দও আমাকে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। প্রায় একই সময় কানাডার বেদান্ত সোসাইটি অফ টরন্টোর অধ্যক্ষ স্বামী প্রমথানন্দের কাছ থেকেও আগস্ট মাসে এক আধ্যাত্মিক শিবিরে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রণপত্র পেলাম। জুন ও আগস্ট মাসের এই স্বল্প ব্যবধানে আমার পক্ষে দুবার যাওয়া অসম্ভব ভেবে তাঁকে অনুরোধ জানালাম যে, আগস্ট মাসের পরিবর্তে যদি তিনি উৎসবের দিন এগিয়ে জুলাই মাসে করতে পারেন তাহলে আমার লন্ডন ভ্রমণের সঙ্গে কানাডা ভ্রমণ যুক্ত করা যেতে পারে। আমার আগ্রহে বেলুড় মঠের অনুমতি নিয়ে তিনি কর্মসূচীর সময় পরিবর্তন করে জুলাই মাসে করলেন। দুই জায়গা থেকে আমার আমন্ত্রণ পাওয়ার কথা জেনে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ আমায় উপদেশ দিলেন যে, যদি টরন্টো যাওয়া স্থির হয়, তাহলে যেন অতি অবশ্যই স্বামীজীর স্মৃতি-বিজড়িত সহস্র-দ্বীপোদ্যান দর্শন করে আসি। সঙ্ঘের নিয়মানুযায়ী ইংল্যান্ড, কানাডা এবং সহস্র-দ্বীপোদ্যানে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে বেলুড় মঠের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলাম। আবেদন মঞ্জুর হয়ে এল।

১৪ জুন ১৯৯৮, রবিবার দিল্লি আশ্রমের কয়েকজন সাধু ও শুভানুধ্যায়ীর সঙ্গে দিল্লি ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমান-বন্দরে এলাম। সকলকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে এয়ার ইণ্ডিয়ার বিমানে উঠলাম। বিমানে একটা ভাল আসনও পাওয়া গেল। আসনে বসে জানালার কাঁচের মধ্য দিয়ে বাইরে তাকালাম।

একসময় মাটির সংশ্রব ত্যাগ করে হঠাৎই যেন অনেক উঁচুতে উঠে গেলাম। ধরণীর সাথে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যোগ সঙ্কীর্ণ হয়ে একটামাত্র ইন্দ্রিয়ে এসে ঠেকল—কেবল দর্শন-ইন্দ্রিয়, তাও ঘনিষ্ঠভাবে নয়। নানা সাক্ষ্য মিলিয়ে যে ধরণীকে নিশ্চিতরূপে জানতাম, সে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এল। নিচে-ওপরে, সামনে-পিছনে শুধুই অতল নীলিমা। যাত্রীদের মধ্যে অনেক বিদেশী বন্ধুও ছিলেন। ভারতীয়দের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে তাঁরা গল্পে, কথায় মেতে উঠেছেন, যেন কতকালের চেনা। রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতার সেই অংশটুকুর কথা মনে এল—"হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন/ শক-হূন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হলো লীন/ পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার/ দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে/ এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"

মনে পড়ল বিমান আমাদের যে গন্তব্যস্থানে নিয়ে যাচ্ছে, সেই লন্ডনে জনৈকা ইংরেজ মহিলা স্বামীজীকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "আপনারা হিন্দুরা কি করেছেন? আপনারা কখনো একটা জাতিকেও জয় করেননি?" বীর, সাহসী, ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি ইংরেজ জাতির পক্ষে একথা শোভা পায়, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এটাই সত্য। কিন্তু ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক তার বিপরীত। স্বামীজী নিজের মনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কি?" উত্তর পেয়েছিলেন: "আমরা কখনো অপর জাতিকে জয় করিনি।" এই আমাদের গৌরব। আমরা ভারতীয়রা বরাবর দিগ্বিজয়ী। আমাদের দিগ্বিজয়ের কাহিনী সম্রাট অশোক ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার দিগ্বিজয়রূপে বর্ণনা করেছেন। ভারতকে আবার নতুন করে পৃথিবী জয় করার উদ্দেশ্য নিয়েই যেন ভারতমাতা জোর করে স্বামীজীকে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় ধর্মপ্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরবর্তী কালে আরো কত পুণ্যাত্মা সাধু বিদেশে গেছেন। বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচারের উদ্দেশ্যে কত সাধু দেশ-ছাড়া হয়ে বিদেশের মাটিতেই পড়ে আছেন। আবার আমার মতো কতজন যাবেন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য—যাঁরা যেতে পারেননি তাঁদের জন্য কত না-জানা তথ্য বয়ে আনতে।

একসময়ে বিমানসেবিকা ঘোষণা করলেন, বিমান নির্বিঘ্নে লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে অবতরণ করছে। হিথরো বিমানবন্দরে আমায় সাদর স্বাগত জানালেন বোর্ন-এন্ড রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টারের প্রধান স্বামী দয়াত্মানন্দ এবং তাঁর সহকর্মী স্বামী শিবরূপানন্দ। গৃহী ভক্তদের মধ্যে ছিলেন বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন ছাত্র ডাঃ নবগোপাল সামন্ত, সস্ত্রীক ডাঃ প্রহ্লাদ বসু, দিলীপ মুখার্জী প্রমুখ। সেন্টারের গাড়িতে আশ্রমে এলাম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট। রাস্তার দুধারে ভিলা বা বাড়িগুলি দেখতে একইরকম, একই রঙে রঙ করা—যেন কেউ তুলি দিয়ে ছবি এঁকে রেখেছে! দোকানপাট সুন্দরভাবে সাজানো, কোথাও কোন ময়লা নেই, নোংরা কাগজ বা ফলের খোসা পড়ে নেই। লন্ডন শহর থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আমাদের এই আশ্রম। এই আশ্রমের স্থাপনা



বোর্ন-এন্ড (ইংল্যান্ড) রামকৃষ্ণ বেদান্ত কেন্দ্র

১৯৪৮ সালে। প্রায় দশ একর জমির ওপর গড়ে ওঠা এই আশ্রমের শান্ত, নির্জন পরিবেশ মনকে স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে দিল। তুষারাবৃত, মৌনী, ধ্যানগম্ভীর হিমালয়ের কোলে মায়াবতী আশ্রমে যে নীরবতা বিরাজ করে, এখানে তারই আভাস। গভীর অধ্যাত্ম পরিবেশ, অতি সুন্দর মন্দিরগৃহ, বিশাল লন, মন-কাড়া পুষ্পোদ্যান, বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে ঘন সবুজের সমারোহ আর অদ্ভুত এক নীরবতা আশ্রমকে ঘিরে আছে।

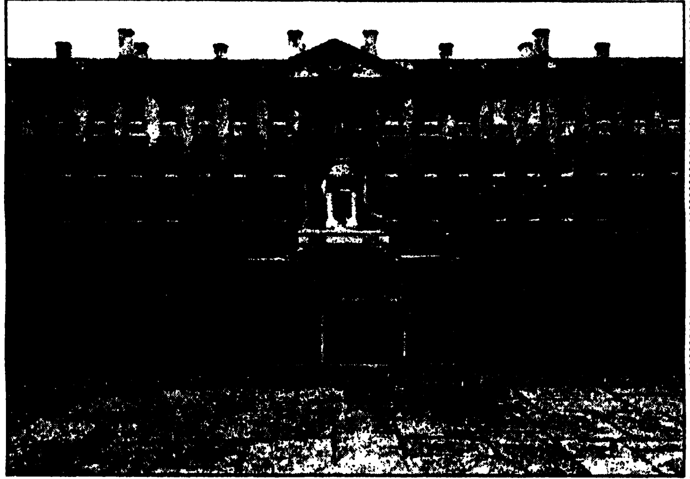
স্বামী দয়াত্মানন্দ এবং আমি দীর্ঘকাল একসাথে চেরাপুঞ্জি আশ্রমে কাজ করেছিলাম। তাঁর কাছে শুনলাম যে, এই আশ্রমটি বাকিংহামশায়ারের অন্তর্গত। ১৯৫১ সাল থেকে এই সেন্টার 'বেদান্ত' নামে এক দ্বিমাসিক পুস্তিকা বা জার্নাল প্রকাশ করছে। বর্তমানে এর সম্পাদক স্বামী দয়াত্মানন্দ, সহ-সম্পাদক স্বামী ত্রিপুরানন্দ এবং স্বামী শিবরূপানন্দ। এই কেন্দ্রে বছরে দুবার, কখনো তিনবার আধ্যাত্মিক শিবির বা spiritual retreat অনুষ্ঠিত হয়। আক্ষরিক অর্থে 'শিবির' কথার অর্থ রোজকার একঘেয়ে কাজ থেকে সাময়িকভাবে অবসরগ্রহণ। আশ্রমে এই ধরনের শিবির যখন হয়, তখন জীবন-সংগ্রামে ক্লান্ত মানুষ কিছু সময়ের জন্য এখানে একত্রিত হন। ঠাকুর, মা, স্বামীজী ও বেদান্তের আলোচনার মধ্য দিয়ে এঁদের মধ্যে প্রায় ভুলে-থাকা অধ্যাত্মজীবন এবং অধ্যাত্ম-চেতনার জাগরণ হয় এবং তখন এক উচ্চ আদর্শসম্পন্ন জীবন অবলম্বন করার বাসনা জাগে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতি বছর ঈশ্বর-অনুসন্ধিৎসু বহু মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। আশ্রমের সাধুরা শুধু নিজেদের কেন্দ্রেই বেদান্ত প্রচার করেন না। দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে তাঁরা বক্তৃতা দেন এবং দীক্ষিত ও অ-দীক্ষিত সবরকম মানুষকেই আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষে সহায়তা করেন। আশ্রমের ভিতরে একটা পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র আছে—দর্শনের বই, ভক্তিমূলক বই এবং ঠাকুর, মা, স্বামীজী ও অন্যান্য ধর্মাত্মাদের জীবন ও বাণীর ভিত্তিতে লিখিত পুস্তকের সমাবেশে তা অতি সমৃদ্ধ। ভক্তবৃন্দ আশ্রমের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন। স্বেচ্ছাসেবা দেওয়ার জন্য অনেকে এগিয়ে আসেন। সাধুজীবন যাপনে আগ্রহীদের আশ্রম সাময়িকভাবে থাকার অনুমতি দেন। এদের 'শিক্ষানবিশ' বা 'নবিশ' (novice) বলা হয়। কঠিন পর্যবেক্ষণকালে এঁদের চালচলন এবং মনের প্রবণতা ইত্যাদি বিষয়ে যদি কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হন, তখন এঁদের আশ্রমে গ্রহণ করা হয় এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে এঁদের জীবনের স্রোতকে মিলিয়ে দেওয়া হয়। অতীতে 'Philo Trust' নামে একটি সংস্থা এই আশ্রমকে বিশেষভাবে অর্থসাহায্য করেছিল। রবিবার ছাড়া অন্য দিনেও এই আশ্রমে নানারকম ধর্মীয় আলোচনা হয়। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি-উৎসব মহাসমারোহে বিশেষ পূজাদির মাধ্যমে পালন করা হয়। এছাড়াও দুর্গাপূজা এবং ক্রিসমাস ঈভ বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

মধ্যাহ্নে সামান্য বিশ্রামের পর সস্ত্রীক দিলীপ, সস্ত্রীক নবগোপাল এবং অন্যান্যদের সঙ্গে নারায়ণস্বামী-মন্দির দর্শন করলাম। আশ্রমে ফিরে নৈশাহার শেষ করে আমার জন্য সংরক্ষিত কক্ষে বিশ্রামের জন্য এলাম। রাত্রে 'ডায়েরি' লিখতে লিখতে ভাবছিলাম, স্বামীজীর কত স্মৃতি এই লন্ডন শহরে জড়িয়ে আছে! হেনরিয়েটা মুলার এবং ই. টি. স্টার্ডির আমন্ত্রণে তিনি ১৮৯৫ সালে লন্ডন আসেন। উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের মধ্যে বেদান্তের ভাব প্রচার করা। ১৮৯৫ সালের ১০ সেপ্টেম্বর স্বামীজী প্যারিস থেকে লন্ডনে এসে মিস মুলারের কেমব্রিজের রিজেন্ট স্ট্রীটের বাড়িতে ওঠেন। সেখান থেকে স্টার্ডির রেডিং-এর বাড়িতে যান। ভারত তখন ব্রিটিশ শাসনাধীনে। ইংরেজরা ভারতীয়দের খুব হেয় করত। এজন্য স্বামীজীর মন ইংরেজদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল না। তাঁর নিজেরও মনে একটা সন্দেহ ছিল যে, নিজেকে তিনি ভারতের

আধ্যাত্মিকতার প্রতিনিধি হিসেবে ইংল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন কিনা। কিন্তু দেখা গেল, মাত্র তিন মাসের মধ্যেই তাঁর নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এবং বিভিন্ন ক্লাব ও সোসাইটি তাঁকে বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ জানাতে লাগল। লন্ডনের শিক্ষিত সমাজ, অভিজাত শ্রেণী এবং ধর্মযাজকদেরও একটা অংশ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠলেন। ইংল্যান্ডে দ্বিতীয়বার তিনি আসেন ১৮৯৬ সালে। এখানে স্বামীজীর বেদান্ত প্রচার যে কতটা সফল হয়েছিল তার সাক্ষ্য হিসেবে দেখি, স্বামীজীর আহ্বানে কয়েকজন ইংরেজ নিজেদের পেশা ও গৃহ ত্যাগ করে তাঁর কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ভারতের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন। এঁরা হলেন জে. জে. গুডউইন, ক্যাপ্টেন ও মিসেস সেভিয়ার ও মিস মার্গারেট নোবল। এঁরা স্বামীজীর চরণে নিজেদের ভাগ্য সঁপে দিয়েছিলেন।

১৫ জুন, সোমবার। অভ্যাসমত সকাল পৌনে পাঁচটায় শয্যাত্যাগ করে স্নানাদি সেরে মন্দিরে গেলাম সাড়ে ছটার সময়। দেবমন্দির সবসময়ই পুণ্যস্থান, তবুও প্রভাতের নির্জনতায় ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মবোধ যেন অনেক গাঢ় প্রতীত হয়। ধ্যানে অনিচ্ছুক ব্যক্তিও যদি এই সময়টাতে মন্দিরে আসেন, তার মনে আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা জাগবেই।সাধু হলেও সমাজের একজন সদস্য হিসাবে আমাদেরও নানান ধরনের কাজ করতে হয়, কত দায়-দায়িত্ব পালন করতে হয়। এই কারণেই স্বামীজী বলেছিলেনঃ "প্রথম কাজ হলো কোথাও শান্তভাবে চুপ করে কিছুক্ষণের জন্য বসে মনকে আপন বেগে চলতে দেওয়া।" এই উদ্দেশ্যেই দিনের কিছুটা সময় নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে এবং কোন পরিস্থিতিতেই এই সময়টুকুর ওপর হস্তক্ষেপ করা চলবে না। শ্রীশ্রীমাও বলতেনঃ "প্রথমে দেহ স্থির করে বস, দেহ স্থির হলেই আস্তে আস্তে মনও স্থির হয়ে যাবে।" তাঁদের নির্দেশানুসারে আমার দিনের মধ্যে সকালের কিছুটা সময় এই উদ্দেশ্যেই রাখা থাকে। যাইহোক, সকালে দিলীপ এসে আমায় সাদরে তার গৃহে নিয়ে গেল। মধ্যাহ্নভোজনের পর অজয় সেনের গাড়িতে আমরা সবাই কেমব্রিজ শহর দেখার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে করতে বিকাল প্রায় চারটা নাগাদ গন্তব্যস্থানে পৌঁছালাম।

ভিক্টোরিয়া কোচ স্টেশন থেকে রোজ চোদ্দটি বাস দুই ঘণ্টারও কম সময়ে কেমব্রিজে আসে। এছাড়া লিভারপুল স্ট্রীট স্টেশন এবং কিংস ক্রস স্টেশন থেকে প্রতি আধ ঘণ্টায় ট্রেন আসে এখানে। লন্ডন ও কেমব্রিজের মধ্যে প্রধান রাজপথ বা highway হলো M 11। লন্ডন শহর থেকে সাতাশি কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত কেমব্রিজ ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় প্রধান প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র। খ্রীস্টান monastery-র কিছু পাদরী বা ধর্মযাজক ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিদ্যাচর্চার উদ্দেশ্যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী কালে যখন আরো অনেক শাখার বিদ্যাচর্চা শুরু হতে লাগল, তখন কিছু পাদরী কেমব্রিজ শহরে চলে যান এবং ১২৮১ সালে Peterhouse College-এর স্থাপনা করেন Bishop of Ely-এর অধীনে। কলেজগুলোর মধ্যে এই কলেজটিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বত্রিশটা কলেজ আছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য King's College, Trinity College, St. John's College, Magdalene College, Queen's College, Pembroke College, Emmanuel College ইত্যাদি। প্রত্যেক কলেজের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং নিয়মাবলী আছে। প্রায় প্রত্যেক কলেজের সামনেই ভবন-পরিবেষ্টিত একটা চতুর্ভুজ প্রাঙ্গণ বা ক্ষেত্র আছে। এগুলো ছাত্রাবাস হলেও অধ্যাপক বা যাঁদের 'fellow' বলা হয়, তাঁরাও এখানে বসবাস করেন। উপাসনালয়, হল এবং কিছু কিছু গ্রন্থাগার পর্যটকদের দর্শন করতে দেওয়া হয়। কোথাও কোথাও একটি নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। তবে কলেজের ভিতর পর্যটকদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত ব্রিটিশ নাগরিকরা বিনামূল্যে কলেজে লেখাপড়া করতে পারে।



কিংস কলেজ আলোকচিত্র ঃ অজয় সেন

এই শহরের সবচেয়ে উঁচু জায়গা King's College-এর chapel বা কলেজ-সংলগ্ন উপাসনালয়। ষষ্ঠ হেনরীর সময়ে নির্মিত এই উপাসনালয় গথিক-পরবর্তী স্থাপত্যকলার এক অতি সুন্দর নিদর্শন হিসাবে আজও বিদ্যমান। গির্জায় উপাসনাবেদির পিছনে টাঙানো আছে অমর চিত্রশিল্পী রুবেনের অতি প্রসিদ্ধ চিত্রাঙ্কন—'Adoration of the Magi'। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ই. এম. ফর্স্টার (যাঁর রচিত 'A Passage to



ট্রিনিটি কলেজের চ্যাপেল টাওয়ার আলোকচিত্র : অজয় সেন

India' এবং 'Howards End' বিশ্ববিখ্যাত) এবং কবি রুপার্ট ব্রুক (যিনি 'যুদ্ধ-কবি' নামে খ্যাত) এই কলেজের ছাত্র ছিলেন।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যত কলেজ আছে, Trinity College তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। স্নাতক স্তরে কলেজের বিদ্যার্থী সংখ্যা সাতশ-র বেশি। ১৫৪৬ সালে অষ্টম হেনরী এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত এক বিশাল চত্বর (Great Court) কলেজের ভিতর আছে, যাকে চারদিক থেকে ঘিরে আছে হলঘর, চ্যাপেল (উপাসনালয়), কয়েকটা দ্বার বা gate এবং ক্রিস্টোফার রেন নির্মিত অতি সুন্দর এক গ্রন্থাগার। প্রসিদ্ধ 'Great Tom' ঘড়িটা প্রতি ঘণ্টায় শব্দ করে সময়ের জানান দিয়ে যাচ্ছে। Trinity College পৃথিবীর অনেক মনীষীর জন্মদাতা। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানী নিউটন, কবি বায়রন, টেনিসন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, দার্শনিক বার্টান্ড রাসেল প্রমুখ।

কলেজ থেকে বেরিয়ে এসে নিকটবর্তী একটা ক্যাফেটেরিয়া থেকে চা খেলাম। শুনলাম, স্থানীয় একটি সংস্থা 'The Cambridge Tourist Information Centre' পদব্রজে পর্যটকদের কেমব্রিজ ভ্রমণে সহায়তা করে। 'Guide Friday' নামে ছাদ-খোলা বাসও আছে, যাতে চেপে শহরের বিভিন্ন কলেজ ঘোরা যায়। ভালভাবে সব দেখে আশ্রমে ফিরে এলাম। [ক্রমশ]

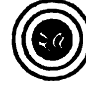
সুস্বাস্থ্য

> শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্‌।
>
> —কালিদাস (কুমারসম্ভব, ৫।৩৩)

স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়

অধ্যাপক ডাঃ সত্যানন্দ চক্রবর্তী

খ্যাতনামা প্রবীণ হোমিও চিকিৎসক



কোন্ কোন্ রোগে কি কি খাবেন না

অনিদ্রা—চা, কফি, তামাক, মদ।

অন্ননালীর ঘা—ঐ, মশলা, লঙ্কা।

অন্ত্রে ঘা—ঐ, মাখন, ঘি, পনীর, সুজি, ময়দাজাত খাবার, মাংস, রসাল ফল।

উচ্চ রক্তচাপ—মাংস, ডিম, ঘি, মাখন, মধু।

কোষ্ঠকাঠিন্য—মাংস, ডিম, ভাজা ও ময়দাজাত খাবার।

বহুমূত্র—মাটির নিচের সবজি, রাসায়নিক খাদ্য ও পানীয়।

হৃদ্‌রোগ—ঘি, মাখন, তেল, পেস্ট্রি, কেক।

স্নায়বিক অসুখ—উত্তেজক খাদ্য, চর্বিজাতীয় খাদ্য, তেলে ভাজা, ঘিয়ে ভাজা খাবার, চা, কফি, তামাক, মদ।

❑ যাঁরা মানসিক অস্থিরতা, উত্তেজনা, মৃত্যুভয়, অবসাদ ইত্যাদিতে এবং যাঁরা উচ্চ রক্তচাপ, মাথা ঘোরা, মেদবৃদ্ধি ইত্যাদিতে ভুগছেন তাঁরা দিবানিদ্রা বর্জন করবেন। রাত্রে তাঁদের ৫-৬ ঘণ্টা নিদ্রা একান্ত প্রয়োজন। প্রাতর্ভ্রমণ, সহ্যমতো কায়িক শ্রম, সময়মতো সহজপাচ্য আহার, সৎ চিন্তা, মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস খুব উপকারী। [সমাপ্ত] ❑

বাল্মীকির সীতাচরিত্র

পলাশ মিত্র



অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী সীতা শ্বশুরগৃহে সকলের আদরে ও স্নেহে পরম সুখে আছেন। রামের অভিষেকের কথা তিনি শুনেছেন। রামের যৌবরাজ্যে অভিষেক হবে—মনের এই উল্লাসেই মগ্ন হয়ে আছেন তিনি। রাজধর্মনিপুণা রাজনন্দিনী প্রসন্নচিত্তে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে দেবার্চনা করে রামের জন্য প্রতীক্ষা করছিলেন। বনবাস-বৃত্তান্ত তাঁর কিছুই জানা নেই। শুধুই আনন্দিত প্রতীক্ষা এবং রামের আগমনের অপেক্ষা।

অবশেষে রাম এলেন। কিন্তু কিঞ্চিৎ অধোমুখ হয়ে। রামের মুখমণ্ডল বিবর্ণ, দেহ ঘর্মাক্ত। রামের সমস্ত চেহারায় শোকের ছায়া। চোখেমুখে চিন্তার কালো মেঘ। এই দৃশ্য দেখবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না সীতা।

ক্রমে ক্রমে রাম সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করলেন এবং সীতাকে কিভাবে ব্রত-উপবাস-দেবার্চনা প্রভৃতি কাজে আত্মনিয়োগ করে চোদ্দটি বছর অযোধ্যায় থাকতে হবে—সেইসব বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগলেন। এই সময়ে রাম ও সীতার মধ্যে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল এবং সীতা কত প্রবল যুক্তি ও গভীর প্রত্যয় নিয়ে রামের সঙ্গে বনগমনের পক্ষে আপন মতামত ব্যক্ত করেছিলেন, তা আমরা পরে দেখব। এখানে শুধু এইটুকু বলার, স্বামীর রাজা হওয়ার সংবাদের জন্য যে-স্ত্রী পরম প্রত্যাশা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন, এখন সেই স্বামীই চলেছেন বনবাসে। এই মুহূর্তে কারো প্রতি কোন ক্রোধ নয়, নয় কারো প্রতি কোন অসন্তোষ বা উষ্মা। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যে-সীতা ছিলেন সহনশীলতার প্রতিমূর্তি, সেই সহনশীলতার প্রথম পরীক্ষায় আজ তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণা হলেন। কী অপরিসীম ধৈর্য, কী মহান ত্যাগ, পতির সঙ্গে বনবাসের জন্য কী অদম্য আকুতি এবং স্বামীর প্রতি কী গভীর ভালবাসা, তা স্মরণ করলে বিস্মিত হতে হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ যে-সীতাকে সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি, সর্বংসহা, সদা পতিপরায়ণা বলে বারবার শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, এখন থেকেই যেন তা প্রকটিত হতে লাগল। ছয় বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় (তখন রামের বয়স তের)। শ্বশুরবাড়িতে ঘর করলেন বার বছর। এখন এই আঠার বছর বয়সেই বিনা মেঘে বজ্রপাত! জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়টুকু[১] জনকনন্দিনী বনবাসে কাটাবেন। কিন্তু বিন্দুমাত্র অশান্ত বা ধৈর্যহারা নন তিনি। তাঁর এখন একমাত্র উদ্দেশ্য—স্বামীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যেভাবেই হোক স্বামীর অরণ্যযাত্রায় সঙ্গী হওয়া। যাঁদের জন্য এই আঠার বছর বয়সেই সীতার এই বিপর্যয়, তাঁদের প্রতি কোন কটুবাক্য উচ্চারণ করলেন না তিনি, বরং স্বামীর সঙ্গে বনে যাওয়ার জন্য তাঁকে নানাভাবে উদ্বোধিত করেছেন। স্বামীর সঙ্গে বনবাসযাত্রা ভিন্ন এই মুহূর্তে তাঁর আর কোন প্রত্যাশা নেই। রামকে তিনি বললেনঃ "পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র প্রভৃতি সকলেই আপন কর্মফল ভোগ করে থাকেন, কিন্তু নারী সর্বতোভাবে পতির কর্মফলই ভোগ করেন। তোমার বনবাসের আদেশে আমিও বনবাসের আদেশপ্রাপ্ত হয়েছি। অতএব আমাকেও বনে বাস করতে হবে।" (অযোধ্যাকাণ্ড, ২৭।৪-৫) অত্যন্ত সহজ-সরল প্রত্যয়নিষ্ঠ যুক্তি।

অতঃপর সীতার যে পথচলা তথা জীবন-পরিক্রমা শুরু হলো, তা ত্যাগ, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতার ইতিহাস। নিষ্ঠুর অবহেলায় জর্জরিতা এক হতভাগিনীর বেদনামথিত কাহিনী। স্বামীজী যথার্থই বলেছেনঃ "সীতা সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত।"[২]

*

সীতা হলেন মিথিলার প্রসিদ্ধ জনকবংশীয় রাজার[৩] পালিতা কন্যা। 'সীতা' শব্দের অর্থ লাঙলের রেখা। তাঁর উৎপত্তি সম্পর্কে রাজর্ষি নিজেই বলেছেনঃ

"অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ।।
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।
ভূতলাদুত্থিতা সা তু ব্যবর্ধত মমাত্মজা।।"

(আদিকাণ্ড, ৬৬।১৩-১৪)

—একদিন ক্ষেত্রকর্ষণ করবার সময় লাঙলের রেখা থেকে একটি কন্যাকে পাই। ক্ষেত্রশোধনকালে প্রাপ্ত বলে লোকে তাকে 'সীতা' বলে। ভূতল থেকে উত্থিত হলেও সে আমার কন্যারূপেই প্রতিপালিত হচ্ছে।

১ আঠার বছর বয়সে বনযাত্রা। বনবাসে চোদ্দ বছর কাটিয়ে পরে আবার বাল্মীকির আশ্রমে বার বছরের অবস্থান।

২ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ১৩৮০, পৃঃ ২০৬

৩ 'জনক' মিথিলা রাজগণের কৌলিক উপাধি। আসল নাম নয়। রামায়ণের আদিকাণ্ডের একাত্তর সর্গে রাজা জনক নিজের কুলপরিচয় দিয়েছেন। রাজশেখর বসু বলেছেন, সীতার পিতা জনকের প্রকৃত নাম 'মীরধ্বজ'। সুখময় ভট্টাচার্যের মতে 'ধর্মধ্বজ'।

সীতাকে তিনি 'বীর্যশুল্কা' (বীরত্ব প্রকাশরূপ পণ দিয়ে যে-কন্যাকে লাভ করতে হবে।) বলেও স্থির করেছিলেন এবং রাম যদি হরধনুতে জ্যা আরোপণ করতে পারেন, তাহলে এই দশরথনন্দনের হাতেই সীতাকে সম্প্রদান করবেন বলে জানালেন। রাম অবলীলায় ধনুর মধ্যভাগ গ্রহণ করলেন এবং সহস্র দর্শকের সামনে ঐ ধনুতে গুণযোজনা করলেন। শুধু তাই নয়, ধনুর মধ্যস্থল একেবারে ভেঙে ফেললেন। তারপর অগ্নিসাক্ষী করে রামের হাতে সীতাকে অর্পণ করলেন রাজা জনক। উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে এই বিবাহসংস্কার সম্পন্ন হয়েছিল। (প্রসঙ্গত, ঐদিনে একই সঙ্গে আরো তিনটি শুভপরিণয় সম্পন্ন হয়েছিল। পাত্রীরা হলেন জনকের কনিষ্ঠা কন্যা উর্মিলা এবং জনকের ভাই কুশধ্বজের কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তি। আর পাত্ররা হলেন রামের তিন ভাই—লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন।)

অগ্নিকে সাক্ষী রেখে রাজা জনক সর্বাভরণবিভূষিতা রামকে বললেন ঃ "এই আমার কন্যা সীতা তোমার সহধর্মিণী। তুমি একে গ্রহণ কর। তোমার মঙ্গল হোক। এই অশেষগুণশালিনী কন্যা পতিব্রতা হোক এবং সবসময় ছায়ার মতো তোমার অনুগামিনী হোক।"

বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়, ছয় বছর বয়সে সীতা তাঁর পিতার কাছ থেকে যে-আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন, জীবিত অবস্থায় একটি দিনের জন্যও তিনি তা বিস্মৃত হননি। সীতা কিভাবে এই উপদেশ শিরোধার্য করেছিলেন এবং আপন আচরণের মধ্যে কিভাবে তা প্রকাশ করেছিলেন, তার মধ্যেই বিধৃত হয়ে আছে সীতাচরিত্র।

জনকের কন্যা বলে সীতাকে 'জানকী' এবং বিদেহ দেশের রাজকন্যা বলে তাঁকে বলা হতো 'বৈদেহী'।

সীতার রূপ ও সৌন্দর্যের বর্ণনা রামায়ণের নানা জায়গায় আছে। একজায়গায় বলা হয়েছে—সীতার নয়নযুগল সুদীর্ঘ, মুখমণ্ডল চন্দ্রতুল্য। তাঁর কেশ ও নাসিকা অতি সুন্দর। তিনি তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। তাঁর নখ উন্নত ও রক্তবর্ণ। তিনি সুশীলা এবং দেব, গন্ধর্ব, যক্ষ, কিন্নর বা মানবলোকে তাঁর মতো রূপবতী আর কেউ নেই। (অরণ্যকাণ্ড, ৩৪।১৫-১৮)

শ্বশুরবাড়িতে সীতা পরম আনন্দেই ছিলেন। মহর্ষি বাল্মীকি লিখেছেন ঃ মনস্বী রাম জানকীগত প্রাণ ছিলেন, জানকীও একক্ষণের জন্যও তাঁকে বিস্মৃত হতে পারতেন না। তাঁর পিতা রাজর্ষি জনক ব্রাহ্মবিধানের অনুরূপ করেই তাঁকে রামের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। এই কারণে এবং তাঁর রমণীয় রূপ ও কমনীয় গুণে রাম তাঁর প্রতি সবিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করতে লাগলেন। জানকীর মনেও রামের প্রতি দ্বিগুণতর প্রীতির আবেশ প্রকাশিত হলো। রাম জানকীর অভিপ্রায় স্পষ্টই জানতেন এবং সুরকন্যার মতো, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর মতো সুরূপা জানকীও রামের অভিপ্রায় অপেক্ষাকৃত বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন। সুরেশ্বর বিষ্ণু যেমন কমলাকে প্রাপ্ত হয়ে আনন্দিত হয়েছিলেন, সেইরকম প্রিয়দর্শন রাম এই মনোহারিণী জনকনন্দিনীকে পেয়ে হৃষ্ট ও সুশোভিত হলেন। (আদিকাণ্ড, ৭৭।২৬-২৯)

সীতার এই আনন্দ ও সুখের বর্ণনার মধ্য দিয়েই শেষ হয়েছে 'আদিকাণ্ড'। কিন্তু চির-অভাগিনী সীতার জীবনে সুখ বোধহয় পদ্মপাতায় জলের মতো। এর পরে যা ঘটল, সেকথা প্রথমেই আমরা জেনেছি।

মন্থরার পরামর্শ অনুসারে কৃত্রিম রোষভরে কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে গমন ও নিরাভরণা হয়ে ভূতলে শয্যাগ্রহণ এবং তারপরে চিন্তিত ও বিস্মিত দশরথের ক্রোধাগারে প্রবেশ। এর পরের ঘটনা এগিয়েছে অতি দ্রুত এবং রাম তথা সীতার বনগমনের পথই হয়েছে পরিষ্কার।

পিতৃভবন থেকে প্রত্যাগত রামকে শোকসন্তপ্ত ও চিন্তান্বিত দেখে সীতা প্রথমদিকে অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠলেন এবং তারপরে রামের কাছ থেকে সব ঘটনা শুনলেন। রাম যখন সীতাকে "অহং গমিষ্যামি মহাবনং প্রিয়ে" (অযোধ্যাকাণ্ড, ২৬।৩৮)—"প্রিয়ে, আমি মহারণ্যে গমন করছি"—বলে তাঁর সঙ্কল্পের কথা জানালেন, তখন বনবাসে সঙ্গিনী হওয়ার জন্য সীতার প্রার্থনা এবং পরে রামচন্দ্রের প্রতি তাঁর নানা উক্তি তাঁর চরিত্রে এক অনন্য মর্যাদা আরোপ করেছে।

সীতাকে এইসময়ে প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পাদনের জন্য নানা উপদেশ দিয়ে রাম বললেন ঃ "কল্যাণি, তুমি ব্রত-উপবাসে নিরত থাকবে, আমার শোকার্তা বৃদ্ধা মাতা কৌশল্যার সেবা করবে, অন্য মাতৃগণকেও নিত্য বন্দনা করবে।" আরো বললেন ঃ "ভরত-শত্রুঘ্ন আমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়, তাদের ভাই ও ছেলের মতো দেখো।"

উপদেশগুলি খুবই ভাল। অন্যসময় হলে এইসব উপদেশ সীতার কানে নিশ্চয়ই মধুবর্ষণ করত। কিন্তু এই মুহূর্তে সীতার মনে হলো, এসব কথা একান্তই অপ্রাসঙ্গিক। কেননা পতিপ্রেমের আদর্শস্বরূপা, ভারতীয় নারীসমাজে অননুকরণীয় গুণরাশির জন্য যিনি অগ্রগণ্যা—তিনি তো মনে মনে স্থির করেই ফেলেছিলেন, স্বামীর সঙ্গে তিনিও বনবাসে যাবেন। বনবাসের সম্ভাবিত ক্লেশসমূহের বিস্তৃত বর্ণনা করে সীতাকে নিবৃত্ত করার জন্য রাম কত প্রয়াস করলেন, কিন্তু সীতা অটল। রামায়ণের এই পর্বে সীতার প্রেম, কর্তব্য, সাহসিকতা, দৃঢ়তা এবং যুক্তিজাল ও বুদ্ধির প্রয়োগ রামায়ণপাঠককে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে। [ক্রমশ]

মা জানেন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

জীবনে কি করলে? কি পেলে? সফল মানুষ কাদের বলে জান? ইওরোপ, আমেরিকা। পদমর্যাদা। 'সেমিনার'। ফাটাফাটি নাম। খেতাবের পর খেতাব। হৈহৈ, রৈরৈ। তুমি কি করলে?

ঠাকুর। ওরা যে এইসব বলছে ঠাকুর।

আমার কাছে পালিয়ে এস। তোমার ভিতরে বুকের কাছটিতে আমাদের দুজনকে বসিয়ে রাখ। যেন কোন ফাঁকফোকর না থাকে। তোমাদের মা বলেছেন না—'আমি আর তোমাদের ঠাকুর অভেদ?' যে যা বলছে বলুক। দেখে যাও, আর শুনে যাও। "শুনিস নে তুই ভবের কথা/ সে যে বন্ধ্যার প্রসব-ব্যথা।" তুমি চল—এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। আমরা তোমার সঙ্গে আছি।

ঠাকুর। ওদের একটু বিজ্ঞানের কথা দিয়ে গর্ব হরণ করব। ঐ উন্নাসিক, সবজান্তাদের। পৃথিবীর জায়গিরদার।

পারবে?

আপনিও শুনুন না। পৃথিবীর এক বিখ্যাত বিজ্ঞানী—আমেরিকান—মানুষের কত দাম খতিয়ে বের করেছেন। মানবদেহের মূল্য মাত্র দশ ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় শ-পাঁচেক টাকার বেশি নয়।

কি হিসেবে?

একটা মানুষের দেহ কি, কি উপাদানে তৈরি। আমাদের দেহের বেশির ভাগটাই হলো জল। পৃথিবীতে জলের কোন দাম নেই। দ্বিতীয় উপাদান কার্বন। কার্বন আর কয়লা মোটামুটি একই বস্তু। কয়লার দাম খুব বেশি নয়। মনখানেক কয়লার দাম বড় জোর পঞ্চাশ টাকা। এইবার হাড়ের কাঠামোটা। হাড় হলো চক বা খড়ি। তারই বা কত দাম? এরপর আছে নাইট্রোজেন—শরীরের প্রোটিন বস্তুতে। নাইট্রোজেনও সস্তা, এমন কিছু দামী বস্তু নয়। এরপর খানিকটা লোহা চাই রক্তের জন্যে। গোটাকতক মরচে ধরা পেরেক হলেই হবে। অতএব বৎস! কিসের তোমার এত হম্বিতম্বি। তোমাকে 'মানুষ' না বলে যদি 'মাল' বলি, সেই মালের দাম চারশ কি পাঁচশ। বড় কোম্পানির এক জোড়া জুতোর দাম তোমার চেয়ে বেশি। কেমন হলো?

বেশ হলো। এইবার উদ্ধার কর। এদিকের হিসেব হলো, এইবার ওদিকের। হ্যাঁ, ওদিকের। একজন বিজ্ঞানীকে এইসব উপাদান দিলে তিনি কি মানুষ তৈরি করতে পারবেন? যাঁরা রাসায়নিক পদার্থ বিক্রি করেন, তাঁদের কাছে গিয়ে বলা হলো, মানুষ তৈরির উপাদান দিন। অণুর আকারে। জল, কার্বন, নাইট্রোজেন, আয়রন আর ক্যালসিয়াম। কত দাম পড়বে? দশ মিলিয়ন ডলার। সে কি? মানুষের ছাইয়ের দাম পাঁচশ টাকা, আর সেই উপাদান পৃথিবীর দোকানে কিনতে গেলে পাঁচ কোটি টাকা!

যাক, মানুষের দেহ-গৌরব অনেকটাই বাড়ল!

আরো বাড়বে। এইবার একটা কাঁচের জারে পরিমাণ-মতো ঐ উপাদানগুলি ঢালা হলো। এইবার যন্ত্রের সাহায্যে আচ্ছা করে মেশানো হলো। এইবার অপেক্ষা। দিন যায়, মাস যায়। বছর ঘুরে ঘুরে আসে, কৈ জার থেকে একটা মানুষ তো বেরিয়ে আসে না। কোনদিনই আসবে না।

অনন্ত, অনন্ত, অনন্ত সমুদ্রের তটভাগ যেন এই ছোট্ট পৃথিবী।

"The surface of the earth is the share of the Cosmic Ocean." আজ আমরা আমাদের সম্পর্কে যতটুকু জেনেছি, তা এইখান থেকেই জেনেছি। হেঁটে হেঁটে ঐ সীমাহীন সমুদ্রের কিনারা পেরিয়ে সাহস করে যতটুকু গেছি, তাতে আমাদের পায়ের গোড়ালিটুকু ভিজেছে মাত্র। ঐ অনন্তের বড় মায়া। অবিরত তার আহ্বান—'আয়, আয়, চলে আয়। দেখবি আয়, কোথা থেকে গেছিস কোথায়? তুই কোন্ কাননের ফুল!' "The ocean calls. Some part of our being knows this is from where we came. We long to return." "মন, চলো নিজ নিকেতনে।"

মহাবিশ্বে, মহাকাশে "We float like a mote of dust in the morning sky." ভোরের আকাশে তুচ্ছ এক ধূলিকণা আমাদের এই রঙদার পৃথিবী। আমাদের যত কলরব, যত হুঙ্কার, জ্ঞানের বড়াই, অহঙ্কার—সব তুচ্ছ। অনন্ত এর কোন খবরই রাখে না। আমাদের পৃথিবীর মাপ, সময়, ঘড়ি সেখানে অচল। একমাত্র মাপ 'আলোকবর্ষ'। আলোর গতি সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসতে আলোর সময় লাগে আট মিনিট। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব আট আলোক মিনিট। এইবার এই আলো একবছরে যতদূর যেতে পারে, সেইটাই আমাদের মাপক। আলোকবর্ষ—ছয় ট্রিলিয়ান মাইল। এই হলো অনন্তকে মাপার বিজ্ঞানীদের ফিতে।

"(ও) তুই যেদিক যাবি দেখতে পাবি জলে জলাকার/ (ও তার) নাহি অন্ত দিগ্‌দিগন্ত অপার পাথার।" তাহলে! "We are like butterflies who flutter for a day and think it is forever." হায় প্রজাপতি! তোমার একটা দিনকেই চিরদিন ভাবলে। গতকাল, সে কতকাল? আগামী-কাল, সেই বা কত কাল! সাত কোটি বছর পার হয়ে গেছে।

প্রাচীন, প্রাচীন, কত প্রাচীন!

মাথা ঘুরে যায়! 'কোথা হতে আসি! কোথা ভেসে যাই?' পনের থেকে কুড়ি বিলিয়ন বছর। বিলিয়নের আভিধানিক বাঙলা হলো—মহাপদ্ম গণিতে ১,০০০,০০০,০০০,০০০। আপনি ঠাকুর কী অসাধারণ একটি সত্য বললেন, যা

বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান—ঐ ১-কে সরিয়ে নাও, সব শূন্য।

সেই 'এক'-এর সন্ধান! "নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ।" কেউ নেই, কিছু নেই। নিস্তরঙ্গ সমাধি। ঘোষ, বোস, মিত্তির, টম, ডিক, হ্যারি, কেঁচো, ব্যাঙ, বনমানুষ, হাতি, ছুঁচো, পণ্ডিত, মূর্খ, তোলাবাজ, মামলাবাজ—কেউ নেই, কিছু নেই। আছেন শুধু absolute—স্বয়মাত্মা। আছেন সেই এক। এক না থাকলে দুই আসে কোথা থেকে। আবার দুই আছে বলেই না এককে নিয়ে টানাটানি! প্রথম আদি।

নেই, নেই হঠাৎ আছে, আছে। এই যে ক্ষণ—একটি চমক, একটি ঝলক, একটি বিস্ফোরণ, একটি শব্দ—অ উ ম—ওম্। বিজ্ঞানীরা বললেন ঃ "A remarkable explosive event called the 'Big Bang'." "প্রথম আদি তব শক্তি।" বিশাল, বিশাল, বিপুল এক অগ্নিগোলক।

সর্বকালের মানবগোষ্ঠীর ভাবুক অংশ নিজেদের মতো করে ভেবেছে—বিশ্ব এল কোথা থেকে? নরওয়ের রূপকথার একটি সঙ্কলনের নাম—'Younger Edda'। প্রাচীন একটি গ্রন্থ প্রায় নয়শ বছর আগে ১২২০ সাল নাগাদ সঙ্কলিত। তৎকালীন আইসল্যান্ডের এক মহৎ ব্যক্তি স্নরি স্টারলেসন কর্তৃক সঙ্কলিত। 'এডডা' বলছেন—শুরুতে কিছুই ছিল না। পৃথিবী নেই, মাথার ওপর স্বর্গও নেই। বিশাল এক শূন্যতা। কোথাও ঘাস নেই। উত্তরে হিমাঞ্চল, তার নাম 'নিফ্লহেইম', আর দক্ষিণে অগ্নির অঞ্চল, তার নাম 'মাসপেলহেইম'। দক্ষিণের অগ্নিবলয়ের উত্তাপে উত্তরের হিমমণ্ডলের বরফের কিছুটা গলে জল তৈরি হলো। সেই জলবিন্দুতে জন্মাল এক দৈত্য, তার নাম 'ওয়াইমের'। এই দৈত্য কি খেয়ে বাঁচবে? তাহলে একটা গরুও ছিল, তার নাম 'আউধুমলা'। এখন সেই গরু কি খাবে? তাহলে কিছু লবণও ছিল। সৃষ্টিতত্ত্বের এই সরল গতি।

ষোড়শ আর সপ্তদশ শতকে এল আধুনিক বিজ্ঞান। পদার্থবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান। ১৯৫০ সাল অবধি বিজ্ঞানীরা ভাবতেন বিশ্ব নিয়ে; সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা খুব সম্মানজনক নয়। হাতে কোন তথ্য নেই, পরীক্ষা করে দেখার মতো উপাদান নেই, যন্ত্র নেই। এই এক দশকে বিজ্ঞানে হঠাৎ এসে গেল বিপ্লব। এখন মহাকাশ-গবেষণা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হে আকাশ, খোল তব স্তব্ধ নীল যবনিকা। মানুষের সামর্থ্যে যতদূর যাওয়া যায় ততদূর গিয়ে দেখা যাচ্ছে—গভীর ঘন অন্ধকারে ঘুরপাক খাচ্ছে মহামায়ীর টায়রা থেকে খসে পড়া শত শত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। কোনটা অতি উজ্জ্বল শুভ্র আলোকসম্পন্ন তরুণ নক্ষত্র, কোনটা নীল, কোনটা প্রবীণ লাল—জ্বলতে জ্বলতে আলো দিতে দিতে যার দিন শেষ হতে চলেছে। ছুটে আসছে অপ্সরার মতো ঝিলমিল আলোর রোশনি তুলে কোন অ-ঘন তারকা। একে অপরের গা ঘেঁষে চলে যাচ্ছে, যাওয়ার সময় নিজেদের পারস্পরিক আকর্ষণ-ক্ষমতায় নিজেদের শরীর থেকে আকাশের আঙিনায় ছড়িয়ে দিচ্ছে ছিন্ন টুকরো অংশ। সেই অংশ ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে মহাবিশ্বের সেই মহাফেজ-খানায়, যেখানে জমা হয় যত ধূমকেতুর মশলা। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে হঠাৎ চমকে উঠতে হয়—এ কে? এই তামসী বস্তুপিণ্ড। আকাশ জুড়ে পড়ে আছে বিধাতার মৃত্যুলিপির মতো। বিজ্ঞানী বলবেন—ভয়ঙ্কর এক মৃত নক্ষত্র, 'ব্ল্যাকহোল', ঘনীভূত মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে গিলে ফেলতে পারে কোটি বিশ্ব। এক-একটি 'মৃত্যুরূপা কালী'। যার বলয়ে সময় ঘুরছে বিপরীত সঙ্কেতে। যদি কোন মানব নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন না করে এর কিনারায় বার সাতেক প্রদক্ষিণ করে সময়ের পৃথিবীতে ফিরে আসে, সে দেখবে পাহাড়ী উপত্যকায় মোজেস বসে আছেন। যে-সভ্যতা ভূপৃষ্ঠ থেকে মুছে গেছে, সেই সভ্যতায় হাজির হবে। ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যানে গোলাপের গন্ধ নেবে। শুনতে পাবে নিরোর বেহালাবাদন।

মায়া সভ্যতার মায়ানদের ধর্মগ্রন্থের নাম 'পোপোল ভু'। সেখানে আছে কে ঐ আদিমানব, যাদুকর মরণ-হাসি হাসছ! তুমি মহানিশার গুনিন, অমাবস্যা। বাতাসে তোমার পোশাক তোমার জটাজাল উৎক্ষিপ্ত! তুমি মারণ, উচাটনের দূত। পৃথিবীটাকে ভরে ফেললে! তোমাদেরই নাম হলো 'মানুষ'। স্রষ্টা তোমাদের দিলেন বুদ্ধি আর চাতুর্য। এই জগতের যাবতীয় রহস্য তোমরা একদিন জেনে যাবে। তাই তো হলো। তাকানো মাত্রই বুঝে গেলে—ঐ তো স্বর্গের বলয়, এই তো আমাদের বর্তুলাকার পৃথিবী। স্রষ্টা সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হলেন—'এরা যে সব জেনে যাচ্ছে, এদের নিয়ে আমি এখন কি করি! তবে তাই হোক, অহঙ্কার খর্ব করে দিই। শোন মনুষ্যকুল! তোমাদের ইন্দ্রিয় যতটুকু জানাবে ততটুকুই জানবে। চোখ যতদূর যায় ততদূরই তোমাদের সীমা। নিকট নিয়ে থাক, পৃথিবীর মুখমায়ার সামান্যতম দর্শনে মোহিত হও। তোমরা মানুষ আমার সৃষ্টি। তোমরা ভগবান হবে? এ কেমন স্পর্ধা!

এই পর্যন্ত এসে রবীন্দ্রনাথে যেতে ইচ্ছে করছে। এমনটি কে আবার লিখবেন কোন কালে?—

"জগতেরে জড়াইয়া শত পাকে যামিনী-নাগিনী
আকাশ পাতাল জুড়ি ছিল পড়ে নিদ্রায় মগনা,
আপনার হিম দেহে আপনি বিলীনা একাকিনী।
মিটিমিটি তারকায় জ্বলে তার অন্ধকার ফণা।
উষা আসি মন্ত্র পড়ি বাজাইল ললিতরাগিণী।
রাঙা আঁখি পাকালিয়া সাপিনী উঠিল তাই জাগি—
একে একে খুলে পাক, আঁকি বাঁকি কোথা যায় ভাগি!
পশ্চিমসাগরতলে আছে বুঝি বিরাট গহ্বর,
সেথায় ঘুমাবে বলে ডুবিতেছে বাসুকিভগিনী
মাথায় বহিয়া তার শত লক্ষ রতনের কণা।
শিয়রেতে সারাদিন জেগে রবে বিপুল সাগর।
নিভৃতে স্তিমিতদীপে চুপি চুপি কহিয়া কাহিনী
মিলি কত নাগবালা স্বপ্নমালা করিবে রচনা।"

ঠাকুর!

বল।

এইবার আপনি বলুন ঠাকুর।

শোন তবে তন্ত্রের কথা। আঁধারে ধ্যান, এইটি তন্ত্রের মতো। তখন সূর্যের আলো কোথায়? তন্ত্রসাধনের সময় আমি ব্রহ্মযোনি দর্শন করেছি। প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করছে দেখলাম। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পৃথক পৃথক ধ্বনি একত্রীভূত হয়ে এক বিরাট প্রণবধ্বনি প্রতি মুহূর্তে জগতের সর্বত্র স্বত উদিত হচ্ছে। কুলাগারে আমার দেবীদর্শন হয়েছে। স্ত্রীযোনির মধ্যে আমি শ্রীশ্রীজগদম্বাকে সাক্ষাৎ অধিষ্ঠিতা দেখেছি। আদ্যাশক্তি লীলাময়ী, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম 'কালী'। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়—সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোন কাজ করছেন না—এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে 'ব্রহ্ম' বলে কই। যখন তিনি এইসব কাজ করেন তখন তাঁকে 'কালী' বলি, 'শক্তি' বলি। তিনি একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা। বেদান্তে কি আছে? ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।

ঠাকুর! ব্রহ্ম হলো অনন্ত। অবশ্যই সত্য। আর এই অনন্তের সীমাহীন সীমায় পৃথিবী আছে কি নেই! মহাকাশের একপাশে ছায়াপথের ধারে এইটুকু একটা বিন্দু! সে থাকাও যা, না থাকাও তা!

শোন, শোন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেখানে আছে থাক। আমার কথা শোন, 'আমি'টা তো আছে! সেইটাই যে বাপু বিশ্ব-দর্পণ। 'ভক্তের আমি' আর 'ভগবানের লীলা'। 'আমি' যখন তিনি পুঁছে ফেলবেন, তখন যা আছে তাই আছে।

ঐ যে 'জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র' বলছেন ঃ

"অব্যক্তাচ্চ ভবেৎ সৃষ্টিরব্যক্তাচ্চ বিলীয়তে।
অব্যক্তং ব্রহ্মণো জ্ঞানং সৃষ্টিঃ সংহারবর্জিতম্।।"

অব্যক্ত মহাব্যোম থেকে ব্যক্ত বিশ্বের আবির্ভাব। আবার অব্যক্তেই লয়। "ওঠে ভাসে ডুবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর।"

বিশ্বের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে 'আমি'র আবির্ভাবের কথাটি স্মরণে রাখতে হবে। প্রকাশ। 'যতক্ষণ আমি' রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ সবই নিতে হবে। কলাগাছের খোল ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে মাজ পাওয়া যায়। কিন্তু খোল থাকলেই মাজ আছে, মাজ থাকলেই খোল আছে। খোলেরই মাজ, মাজেরই খোল। নিত্য বললেই লীলা আছে বোঝায়। লীলা বললেই নিত্য আছে বোঝায়। তিনি জীবজগৎ হয়েছেন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁকে 'ব্রহ্ম' বলি। যখন সৃষ্টি করছেন, পালন করছেন, সংহার করছেন —তখন তাঁকে 'শক্তি' বলি। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। ভক্তেরা—বিজ্ঞানীরা—নিরাকার-সাকার দুই-ই লয়—অরূপ-রূপ দুই-ই গ্রহণ করে।

যতক্ষণ মনের দ্বারা বিচার, ততক্ষণ নিত্যতে পৌছানো যায় না। মনের দ্বারা বিচার করতে গেলেই জগৎকে ছাড়বার জো নেই; রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ—ইন্দ্রিয়ের এইসকল বিষয়কে ছাড়বার জো নাই। দেখ না, একটা জিনিস দেখতেই কতগুলো দরকার—চক্ষু দরকার, আলো দরকার, আবার মনের দরকার। এই তিনটির মধ্যে একটি বাদ দিলে তার দর্শন হয় না।

তাহলে কি জানব? কতটা জানব? কারণ, "Nature does not reveal her mysteries once and for all (Seneca)." বিশ্বচরাচর অবিরত প্রসারিত হচ্ছে। Expanding Universe. এতকাল আমরা আকর্ষণের কথা শুনেছি, এইবার বিকর্ষণের পালা। Gravity আর anti-gravity। আইনস্টাইন এই anti-gravity-র ধারণা এনেছিলেন। কেমন করে কোয়ান্টাম তত্ত্ব আর এতকালের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বকে একত্র করে 'ইউনিফায়েড ফিল্ড থিয়োরি'তে আসা যায়! 'অ্যান্টিগ্র্যাভিটি'কে তিনি করতে চেয়েছিলেন 'কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট'। প্রমাণাভাবে এই তত্ত্ব নিয়ে তিনি আর অগ্রসর হননি। সম্প্রতি মানবের উন্নত প্রযুক্তি আইনস্টাইনের সেই তত্ত্বের সত্যতার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে—"A kind of anti-gravity that repels objects from each other." হাবল টেলিস্কোপের এ এক যুগান্তকারী দর্শন। Dark energy অর্থাৎ negative gravity-তে বিশ্ব আচ্ছন্ন।

অনেক ছুটলে, এইবার তোমাদের মায়ের কাছে গিয়ে শুনে নাও। তোমাদের মা কি বলছেন—"মায়ার রাজ্যে সর্বজ্ঞ হওয়া একমাত্র ঈশ্বরেই সম্ভবে। চিত্রকর যেমন তুলি দিয়ে চোখটি, মুখটি, নাকটি—এমনি একটু একটু করে পুতুলটি তয়ের করে, ভগবান কি অমনি একটি একটি করে সৃষ্টি করেছেন? না, তাঁর একটা শক্তি আছে। তাঁর 'হাঁ'তে জগতের সব হচ্ছে, 'না'তে লোপ পাচ্ছে। যা হয়েছে সব এককালে হয়েছে। একটি একটি করে হয়নি।"

একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হবে। বিশিষ্ট কেউ শঙ্খধ্বনিতে পর্দাটি সরাবেন। ভিতরে উজ্জ্বল আলো। কত বিচিত্র সব বস্তু থরে থরে প্রদর্শিত। উন্মোচন। কে এই উন্মোচক! বোধ, আর বুদ্ধিযুক্ত মন। আমি দেখছি, আমি বুঝছি, তাই সব আছে। নয় তো নেই। "It remains ever illumined by its own radiance." (Rig Veda)। একটি 'তাও' কবিতায় ইতি হোক এই আলোচনার—

"Clay is moulded into vessels,
And because of the space where nothing exists
We are able to use them as vessels,
Doors and windows are cut in the walls of a house
And because they are empty spaces
We are able to use them.
Therefore on the one hand we have
The benefit of existence
And on the other we make use of non-existence." ❑

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

এই গানটি আমার রচনা

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে আমার লেখা একটি গান অনেক জায়গায় গাওয়া হয়। কিছুদিন আগে একজন আমাকে বললেন, গানটি একজন সঙ্গীতশিল্পীর ক্যাসেটে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সেখানে নাকি ইনলে কার্ডে গানের রচয়িতা হিসাবে ঐ সঙ্গীতশিল্পীর নাম রয়েছে। এটি শোনার পরে এবিষয়ে কি করণীয় ভাবছিলাম। আমাকে কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন, গানটি যে আমার রচনা, তা উল্লেখ করে পুরো গানটি 'উদ্বোধন'-এর 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে জানিয়ে দিতে। তাঁদের পরামর্শ অনুসারে আমি এখানে আমার রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কিত গানটি সম্পূর্ণ তুলে দিচ্ছি—

জয় জয় রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ বল বদনে,
এমন মধুর নাম আর পাবিনে।।
এমন প্রেমের ঠাকুর আর পাবিনে,
এমন দয়াল ঠাকুর আর পাবিনে।।
কামারপুকুর ধন্য হলো তোমার জনমে,
দক্ষিণেশ্বর পুণ্য হলো তোমার সাধনে।।
এমন কল্পতরু আর পাবিনে,
এমন জগদ্‌গুরু আর পাবিনে।।
'গদাধর' নামে তুমি এলে ভুবনে,
(কত) পাপী-তাপী উদ্ধারিলে তোমার নামগুণে।।
এমন পতিতপাবন আর পাবিনে,
এমন কাঙালের ধন আর পাবিনে।।
'যত মত তত পথ' সাধন জীবনে,
'অবতারবরিষ্ঠায়' প্রণাম চরণে।।

স্বামী দেবদেবানন্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, কামারপুকুর
জেলা—হুগলী, পিন-৭১২৬১২

প্রেসিডেন্ট মহারাজের অসাধারণ আলোচনা

একটা সময় ছিল যখন দীক্ষাগ্রহণের পর শিষ্যশিষ্যাদের গুরুসান্নিধ্য এবং উপদেশ গ্রহণের অনেক সুযোগসুবিধা থাকত, কিন্তু বর্তমানে তা সহজসাধ্য নয়। অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও দূরত্ব ও নানা প্রতিকূল অবস্থায় তা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আমার এবং আমার মতো আরো অনেকের সৌভাগ্য যে, 'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪০৬ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের 'ধর্ম-দর্শন : তত্ত্বে ও জীবনে' শীর্ষক অসাধারণ আলোচনাটি পড়তে পেরেছি। এর পরেও গত মাঘ ১৪০৭ সংখ্যা থেকে মহারাজজীর অপূর্ব আলোচনা 'গীতার শক্তি ও মনোহারিত্ব' ধারাবাহিকভাবে 'উদ্বোধন'-এ পাচ্ছি। এমন সহজ-সরল ভাষা যে, বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। মনে হয় যেন সামনে বসে পূজ্যপাদ মহারাজের মুখ থেকেই শুনছি।

গীতা ভট্টাচার্য
কুঞ্জ প্লাজা, রাজমহল রোড, বরোদা, গুজরাট-৩৯০০০১

সেই গানটির কথাগুলি

'উদ্বোধন'-এর বৈশাখ ১৪০৮ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী'তে ফুল্লরা মল্লিক একটি ভক্তিগীতি 'ওমা তোর পূজা তুই শিখিয়ে দে মা' প্রসঙ্গে জানতে চেয়েছেন। গানটি রেকর্ড করেছিলেন পদ্মরানী গঙ্গোপাধ্যায়, 'Twin' রেকর্ডে। রেকর্ড নম্বর—FT4828। গানটি প্রখ্যাত গীতিকার প্রণব রায়ের লেখা। সম্ভবত গানটি '৪০-এর দশকে রেকর্ড করা হয়। রেকর্ডে এই গানটির উলটো দিকে 'ওমা দিন গেল মা হেলায় ফেলায়' গানটি রয়েছে। যাই হোক, সম্পূর্ণ গানটি এইরকম—

স্থায়ী : ওমা তোর পূজা তুই শিখিয়ে দে মা
শিখিয়ে দে তোর আরাধনা
তুই আমারে যা শিখাবি
সহজ হবে সেই সাধনা।
অন্তরা : বনের জবা আপনি ফুটে
তোর চরণে পড়ে লুটে (মাগো যেমন)
তেমনি করে অঞ্জলি গো
আমার প্রাণের সব কামনা।
সঞ্চারী : মন্ত্র আমার নেই মা জানা
জানি না তোর সাধন-রীতি
আমি শুধু কেঁদে কেঁদে
'মা' বলে যে ডাকি নিতি।
আভোগ : ডাকার মতো ডাকলে পরে
পাষাণেরও অশ্রু ঝরে
আমার চেয়েও বেশি বাজে
মায়ের বুকে মোর বেদনা।

গানটির সুর খুবই সহজ-সরল, ভগবৎ আরাধনার অনুকূল। ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করলে আমার সংগ্রহ থেকে মূল সুরটাও শিখিয়ে দেওয়া যাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, প্রণব রায়কে আমরা মূলত রোমান্টিক গানের গীতিকার হিসাবেই জানি। আলোচ্য গানটি এবং বেশ কিছু ভক্তিসঙ্গীত আমার সংগ্রহে আছে যা থেকে বোঝা যায়, তিনি ভক্তিগীতি রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

দেবাশিস দত্ত
রাজকিশোর দে লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৫

'মরে গিয়ে বেঁচে ওঠা' এবং প্রসঙ্গত

'উদ্বোধন'-এর চৈত্র ১৪০৭ সংখ্যায় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'মরে গিয়ে বেঁচে ওঠা' শীর্ষক রচনাটির কয়েকটি কথা বেশ মজার—"একালের উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আর

মরতেই চাইছে না। ঘর আগলে, ঘাঁটি আগলে হাপরের মতো পড়ে আছে। প্রত্যেকের হাতের কাছে সেলোফেনের ঝুলিতে জপের মালা নয়, পাতাপাতা ওষুধ। সকালে খালি পেটে টকাস। ব্রেকফাস্টের পর টকাস! লাঞ্চের পর টকাস! বিকেলে টকাস! রাতে শয়নে প্রবেশের পূর্বে টকাস, টকাস!" তা বটে। তবে যতই দিনরাত টকাস টকাস ওষুধ খাই, 'এক ট্যাবলেটে নিদ্রা' যাই আর 'বিছানা খামচে' পড়েই থাকি, একদিন তো আমাদের পটাশ করে পটল তুলতেই হবে! তাই ভাবছিলাম, শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলেছেন তাই-ই তো সত্যি। তিনি ব্রাহ্মভক্তদের বলছেন: "সংসার অনিত্য, আর সর্বদা মৃত্যু স্মরণ করা উচিত।" ঠাকুর গান গাইছেন:

"ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয়, মিছে ভ্রম ভূমণ্ডলে।
ভুলো না দক্ষিণাকালী বদ্ধ হয়ে মায়াজালে।।
দিন দুই-তিনের জন্য ভবে কর্তা বলে সবাই মানে।
সেই কর্তারে দেবে ফেলে, কালাকালের কর্তা এলে।।"

তিনি আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, 'আমি' ও 'আমার'—এই দুটি অজ্ঞান আমাদের যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আমাদের নিস্তার নেই। 'আমার বাড়ি', 'আমার টাকা', 'আমার বিদ্যা', 'আমার এইসব ঐশ্বর্য'—এই করেই মরব। কিছুতেই বুঝব না যে, মরবার পর কিছুই থাকবে না। 'ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু।" এ-সংসারে 'আমি' কিছুই নই, 'আমার' কিছুই নয়—এই জ্ঞান করে ঈশ্বরের দিকে মন দিতে হয়। সঞ্জীববাবুও এই কথাটিই তাঁর বিশেষ ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর 'টকাস টকাস' ওষুধ খাওয়ার কথায় একটি কথা আমার মনে পড়ল। ওষুধ আমরা খাই না, ওষুধই আমাদের খায়। যতদূর মনে পড়ে, এই কথাই আমাদের বলেছেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ। কে বলতে পারে, এই ওষুধ খাওয়াই আমাদের কতরকমে ক্ষতি করছে কিনা!

কতদিন আগের কথা, সেসময় চিকিৎসার এমন সুব্যবস্থা ছিল না। নিউমোনিয়া, কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগে মানুষ মরে গ্রাম খালি হয়ে যেতে দেখেছি, আবার তারই মধ্যে একটি মানুষকে বেঁচে থাকতে দেখেছি নব্বই বছর পর্যন্ত। কোনদিন তার তেমন অসুখ-বিসুখও হতে দেখিনি। আবার এর উলটো আরেক রকমের একটি ঘটনার উল্লেখ করি—শরীরটা একটু খারাপ করায় একদিন আমার পরিচিত এক বিশিষ্ট ডাক্তারের কাছে গেলাম। তিনি পরীক্ষা করে দেখে একটা ট্যাবলেটের নাম লিখে দিলেন দিনে দুবার খাওয়ার নির্দেশ দিয়ে। আমি বললাম: "ওষুধ খেতে যে ভয় করে ডাক্তারবাবু।" কিছু না বলে তিনি তাঁর ব্রীফকেস খুলে দেখালেন। ভিতরে অনেক ওষুধ। ডাক্তারবাবু বললেন: "আমি নিজেই এসব ওষুধ খাই, ওষুধ খেতে ভয় পেলে চলে?" কয়েক বছরের মধ্যেই সেই ডাক্তারবাবু হঠাৎ মারা গেলেন। শত সাবধানে থেকেও ওষুধ খেয়েও তিনি নিজেকে বাঁচাতে পারলেন না। তেমন বয়সও হয়নি তাঁর। তাই ভাবি, এরকম সব ঘটনা কার ইচ্ছায় ও কেমন করে ঘটে? মানুষ আমরা এর কিছুই বুঝতে পারি না। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সব হয়।

ঐ একই সংখ্যার (চৈত্র ১৪০৭ সংখ্যা) 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে প্রকাশিত ডাঃ অমিয়কুমার ভট্টাচার্যের লেখা 'চিকিৎসকের নৈতিক সততা ও মানবিকতা' শীর্ষক চিঠিটিতে চিকিৎসক ও চিকিৎসা পরিষেবা সম্পর্কে যে-আলোচনা করা হয়েছে তাতে "চিকিৎসা পরিষেবা এমন একটি জীবিকা, যেখানে মানবিকতা ও নৈতিকতা অপরিহার্য"—এই কথাটি পড়ে 'ডাক্তারী কর্ম' সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিটি মনে পড়ল। তিনি বলেছেন: "ডাক্তারী কর্ম খুব উঁচু কর্ম বলে অনেকের বোধ আছে। যদি টাকা না লয়ে পরের দুঃখ দেখে দয়া করে কেউ চিকিৎসা করে, তবে সে মহৎ, কাজটিও মহৎ। কিন্তু টাকা লয়ে এসব কাজ করতে করতে মানুষ নির্দয় হয়ে যায়। ব্যবসার ভাবে টাকার জন্য হাগা, বাহ্যের রঙ—এইসব দেখা নীচের কাজ।" যে-অর্থে ডাক্তার ও ডাক্তারী কর্মটিকে মহৎ বলেছেন ঠাকুর, সেই অর্থে ডাক্তারী করেন—এমন ডাক্তার আজকের দিনে পাওয়া কঠিন। দুঃখ সেটাই।

অজিতেন্দ্র সিংহ
চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯

প্রসঙ্গ 'স্বামীজীর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত'

'উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ ১৪০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত শচীন্দ্রনাথ দরিপা রচিত 'স্বামীজীর কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত' শিরোনামে সুলিখিত প্রবন্ধটি পাঠ করে খুশি হয়েছিলাম, যদিও এতে অল্পস্বল্প ত্রুটি তখনি চোখে পড়েছিল, কিন্তু তখন তা নিয়ে চিঠি লেখার তাগিদ বোধ করিনি। 'উদ্বোধন'-এর মাঘ ১৪০৭ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে এই বিষয়ে দুটি পত্র দেখে কিছু লেখার প্রয়োজন বোধ করছি।

দুজন পত্রলেখকই উল্লেখ করেছেন যে, "শ্রীরামকৃষ্ণ রবীন্দ্রনাথকে ১৮৮০ সালের ২ মে তারিখে ব্রাহ্মসমাজে দেখেছিলেন এবং শ্রীমও সেদিন ঠাকুরের সঙ্গে ছিলেন"—শ্রীদরিপার এই উক্তি সঠিক নয়, কারণ শ্রীম ঠাকুরকে দর্শন করেন ১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এবং ১৮৮০ সালের মে মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন কামারপুকুরে। পত্রলেখকদের এই উক্তিগুলি যথার্থ, তবে এখানে প্রবন্ধলেখক শুধু সালটি ঠিকভাবে উল্লেখ করতে ভুল করেছেন, কিংবা এটি মুদ্রণ-প্রমাদও হওয়া অসম্ভব নয়। বস্তুত, ১৮৮৩ সালের ২ মে স্বর্গত কাশীশ্বর মিত্রের নন্দনবাগানের বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীম, রাখাল প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন শ্রীনাথ মিত্র এবং তাঁর ভ্রাতাদের আমন্ত্রণে। ঐ উৎসবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ ঠাকুরবংশের ভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন—এই তথ্য শ্রীম তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থের চতুর্থ ভাগের চতুর্থ খণ্ডে (৭ম সং, পৃঃ ২৩) জানিয়েছেন। দুজন পত্রলেখকই প্রবন্ধলেখকের এই বিষয়ে ভুল ধরলেও কেউই সঠিক সালটি জানাননি, মূলত তাই এই পত্র। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত'-এ শ্রীরামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথের একই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার ঐটুকু সংবাদই আছে। স্বামী নিত্যাত্মানন্দের 'শ্রীম-দর্শন' গ্রন্থের ত্রয়োদশ ভাগেও ('উদ্বোধন' পত্রিকার চৈত্র ১৪০৬ সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত) ঘটনাটির উল্লেখ এভাবে পাওয়া

যায় ঃ "হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও দর্শন করেছিলেন ঠাকুরকে নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজে। তখন তাঁর বয়স বছর বিশেক। তাঁর রচিত একটি গান ঠাকুর শুনেছিলেন—'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'। গানটির সুখ্যাতি করেছিলেন ঠাকুর।" শুধু এই তথ্য থেকে একথা স্পষ্টভাবে বলা যায় না যে, শ্রীরামকৃষ্ণ সেদিন রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে তাঁর রচিত সেই গানটি শুনেছিলেন; কারণ, তিনি নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠেও এই গানটি শুনেছেন এবং তখনি এর সুখ্যাতি করে থাকতে পারেন। তবে ঐ উৎসবের দিনে যে রবীন্দ্রনাথ সমবেত সঙ্গীতে নেতৃত্বদান করেছিলেন, সে-সংবাদ ১৮৮৩-র ৫ মে 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল। শ্রীদরিপা তাঁর প্রবন্ধে জানিয়েছেন, ঐ অনুষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতির কথা সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল। তাই দ্বিতীয় পত্রলেখক রনজিৎকুমার দত্ত প্রশ্ন তুলেছেন, এই সংবাদ যে সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল তার সত্যতা প্রবন্ধলেখক নিজে যাচাই করেছেন কিনা। এপ্রসঙ্গে একথা বলতে পারি যে, শ্রীদরিপা নিজে সংবাদপত্র সন্ধান করেছেন কিনা জানি না, তবে প্রখ্যাত বিবেকানন্দ-গবেষক শঙ্করীপ্রসাদ বসু তা করেছেন এবং 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' নামে তাঁর গবেষণাগ্রন্থের সপ্তম খণ্ডের ৫২৪ পৃষ্ঠায় ৫ মে ১৮৮৩-র স্টেটসম্যান থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি সঙ্কলন করেছেন ঃ "THE SHAMBAZAR BRAHMO SOMAJ —This somaj celebrated its 20th anniversary at the residence of Baboo Srinath Mitra and brothers in North Circular Road on Wednesday last. The prayer-hall was modestly and tastefully decorated with flowers and evergreens. From early morning hymns were sung till 7 when divine service commenced. In the afternoon Ramkisto Prankrishna (?), the sage of Dakshineswar, discovered on morality and religion. The evening service commenced at 7.30, the Pundit Sivanath Sastri, M.A., and Baboo B. C. Banerjee officiating. The choir was led by Baboo Rabindra Nath Tagore."

আরেকটি তথ্যগত ভুলের কথাও পত্রলেখক ডঃ বৈদ্যনাথ বসু যথার্থই উল্লেখ করেছেন। শ্রীদরিপা লিখেছেন ঃ "স্বামীজী দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যযাত্রা শেষে ফেরার পর ১৮৯৯-এর ২৭ জানুয়ারি নিবেদিতা তাঁর ১৬নং বোসপাড়া লেন-এর বাড়িতে স্বামীজী ও রবীন্দ্রনাথকে চা পানের আমন্ত্রণ করেন।" ঐ প্রায়-অজানা চা-সভাটির কথা শঙ্করীপ্রসাদ বসুই তাঁর পূর্বোক্ত গবেষণাগ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে আবিষ্কৃত তথ্য-সহ সবিস্তারে পেশ করেছেন এবং ঐ সভার তারিখটিও শ্রীদরিপা ঠিকই লিখেছেন, কিন্তু স্বামীজী তখন দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যযাত্রা থেকে ফিরে এসেছেন—তাঁর এই তথ্য সম্পূর্ণ ভুল। ডঃ বসু ঠিকই লিখেছেন যে, স্বামীজী ১৮৯৯-এর ২০ জুন দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যযাত্রা করেছিলেন এবং বেলুড় মঠে ফিরে এসেছিলেন ১৯০০ সালের ৯ ডিসেম্বর। শ্রীদরিপার গবেষণামূলক প্রবন্ধে এই ভ্রমটুকু না থাকাই সমীচীন ছিল।

উক্ত প্রবন্ধে আরেকটি সামান্য ভুলের কথা জানাচ্ছি। তা হলো, লেখক 'সঙ্গীত কল্পতরু' থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলি সঙ্কলন করার সময় 'জাতীয় সঙ্গীত' পর্যায়ে ৫নং সঙ্গীতটি 'এবার তোরা মা বলিয়া ডাক' বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু 'গীতবিতান' অনুযায়ী পদটি হবে—'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক'।

শ্রীদরিপা তাঁর রচনায় যেসকল সূত্রের উল্লেখ করেছেন, সেগুলি হলো—(১) স্বামী উমানন্দের প্রযোজনায় ও শৈলজারঞ্জন মজুমদারের পরিচালনায় প্রকাশিত একটি ক্যাসেট, যাতে স্বামীজীর গাওয়া বারটি রবীন্দ্রসঙ্গীত স্থান পেয়েছে; (২) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—যাতে স্বামীজীর গাওয়া সাতটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের উল্লেখ পাওয়া যায়; (৩) স্বামী অপূর্বানন্দের রচিত 'দিব্যগীতি'; (৪) স্বামীজীর গানের খাতা; (৫) নরেন্দ্রনাথ দত্ত, বি. এ. ও বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'সঙ্গীত কল্পতরু'—যাতে দশটি রবীন্দ্রসঙ্গীত স্থান পেয়েছে; (৬) ডঃ কালিদাস নাগের 'বিবেকানন্দ জীবনীর উপাদান সংগ্রহ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ, (৭) ক্ষিতিমোহন সেনের একটি নিবন্ধ; (৮) স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের প্রবন্ধ 'স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীতভাবনা'। কিন্তু তিনি প্রখ্যাত রবীন্দ্র-গবেষক ও রবিজীবনীকার প্রশান্তকুমার পালের নাম উল্লেখ করেননি। লেখকের অবগতির জন্য জানাই যে, প্রশান্তকুমার পাল তাঁর রবিজীবনীতে এবিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। বিষয়টি নিয়ে শঙ্করীপ্রসাদ বসুও তাঁর 'বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, কিন্তু শ্রীদরিপা তাঁর নাম একবারই উল্লেখ করেছেন, তাও রবীন্দ্রনাথ চা-সভায় কোন্ গানটি গেয়েছিলেন তার অনুমান প্রসঙ্গে।

সুশীলরঞ্জন দাশগুপ্ত
গভঃ হাউসিং এস্টেট, সোদপুর
জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা, পিন-৭৪৩১৭৮

'প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ' ঃ দুটি প্রশ্ন

'উদ্বোধন'-এর গত চৈত্র ১৪০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী অচ্যুতানন্দের 'প্রয়াগে পূর্ণকুম্ভ' পড়লাম। হঠাৎ মনে হলো—আমার এক দাদা আমার কাছে দুটি প্রশ্ন রেখেছিলেন, কিন্তু আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি। প্রশ্ন-দুটি 'উদ্বোধন'-এ রাখলাম সদুত্তরের আশায়—

(১) সম্রাট আকবর ও পরবর্তী মোগল সম্রাটদের রাজত্বকালে প্রয়াগের তীর্থমহিমা কি কিছু ম্লান হয়েছিল?

(২) ঐসময়ে কুম্ভমেলায় মহামোক্ষ পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতো কি? রাজা হর্ষবর্ধন প্রবর্তিত ও আদি শঙ্করাচার্য অনুমোদিত সাধুসমাজের এই পরিষদের অধিবেশন সেইসময়ে প্রয়াগতীর্থে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় কি?

স্বামী অচ্যুতানন্দজী অথবা অন্য কেউ যদি এবিষয়ে কিছু আলোকপাত করেন তাহলে কৃতজ্ঞ থাকব।

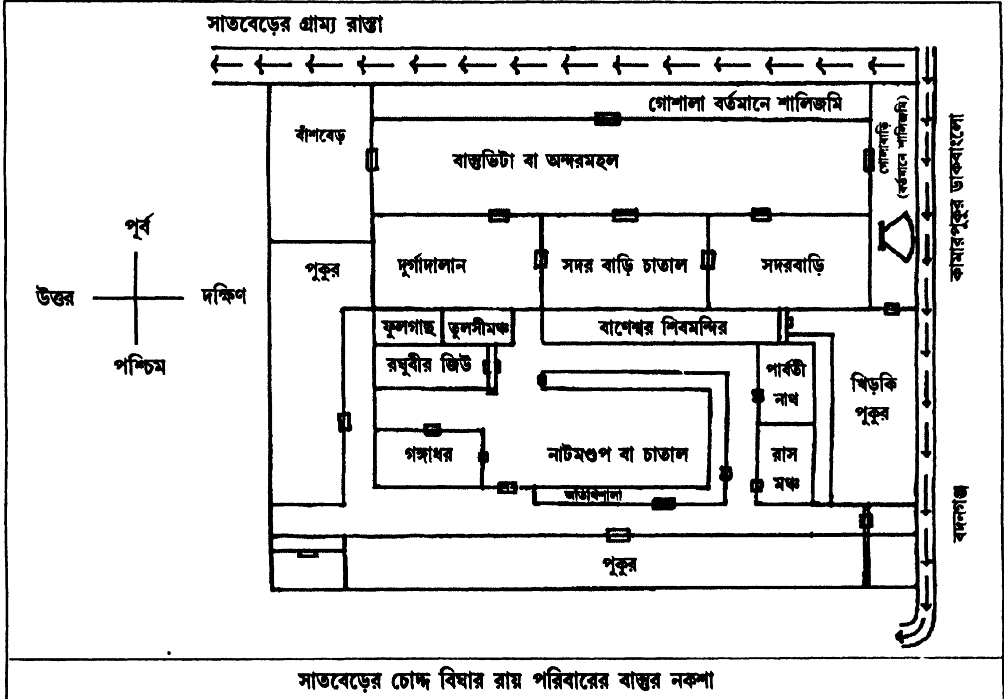
অমিয় দে
চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১

শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃপুরুষের নিবাস—দেরে বা দেরেপুর

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দেরে বা দেরেপুরের সরকারি নাম 'দ্বারিয়াপুর'। হুগলী জেলার গোঘাট থানার অন্তর্গত ঐ মৌজা অতীতে বর্ধমানের জমিদারের অধীন জাহানাবাদ (বর্তমান আরামবাগ) পরগনাভুক্ত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরামের জন্মভূমি এই দেরেপুর গ্রামে। এই গ্রামেই ছিল তাঁর বাস্তুভিটা, বসতবাটী, রন্ধনশালা, গোয়ালঘর ও ঠাকুরবাড়ি। এই বাস্তুগৃহেই শ্রীরামকৃষ্ণ-জননী চন্দ্রমণিদেবী নববধূ বেশে প্রবেশ করেছিলেন প্রতিবেশীদের উলুধ্বনি ও শঙ্খনাদের মধ্য দিয়ে। এখানেই জন্মগ্রহণ করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী কাত্যায়নী।

ক্ষুদিরাম যখন রীতিমত সংসারী এবং আত্মীয়-পরিজন পরিব্যাপ্ত হয়ে সংসারজীবনের মধ্য গগনে, এ হেন সময় বিনামেঘে বজ্রপাতের ন্যায় তাঁর সামনে হাজির হয়েছিল সাতবেড়িয়া বা সাতবেড়ের (দ্বারিয়াপুর সংলগ্ন গ্রাম) জমিদার রামানন্দ রায়ের কুটিল ষড়যন্ত্রের ফাঁদ। সে-ঘটনা 'লীলাপ্রসঙ্গ'-পাঠকেরা অবগত আছেন। ঘটনা যেমন নাটকীয় তেমনি ঐতিহাসিক। ঘটনার গভীরে প্রবেশ করলে পাঠক অবলীলাক্রমে সমকালীন সমাজমানস ও শাসনতন্ত্রের স্বরূপ উপলব্ধির সুযোগ পাবেন; সেইসঙ্গে তাঁদের সুযোগ হবে কঠোর সত্যনিষ্ঠা ও অমিত সহ্যশক্তির পরাকাষ্ঠা শ্রীরামকৃষ্ণ-জনকের সম্যক পরিচয়ের। ঘটনার সময়কাল ১৮১৪ সাল। তার কিছুদিন আগেই (১৭৯৩) বঙ্গদেশে লর্ড কর্নওয়ালিশ প্রবর্তিত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' চালু হয়েছে—যাতে প্রজা উচ্ছেদ ক্ষমতায় বিশেষ বলবান হয়েছেন জমিদাররা। ইতিহাস-কুখ্যাত এই নীতির ফলে কী যন্ত্রণা-কাতর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল সেকালের সাধারণ মানুষকে, ক্ষুদিরামের দেরেপুর পরিত্যাগের ঘটনা সে-সত্যেরই এক ঐতিহাসিক নজির। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে 'দেরেপুরের ইতিহাস' মোটেই লঘু নয়; সমাজের নিঃস্ব, রিক্ত ও বাস্তুহারা ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের অস্তিত্ব অনুভব করতেন প্রতি মুহূর্তে এবং প্রতিনিয়ত তিনি তাদের সহমর্মী হয়েছেন। এ নমুনা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন জুড়েই। দেরেপুর তাঁর জন্মভূমি না হলেও পিতা, মাতা ও ভ্রাতার



সাতবেড়ের চোদ্দ বিঘার রায় পরিবারের বাস্তুর নকশা

নিকট সে-সম্পর্কিত ঘটনা তিনি শুনেছেন ও জেনেছেন এবং সেই ঘটনার জেরে যে দারিদ্র্যযন্ত্রণার শিকার তাঁর পরিবারবর্গকে হতে হয়েছে তা তিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছেন।

।।১।।

সাতবেড়ে ও রামানন্দ রায়

কামারপুকুরের অনতিদূরেই সাতবেড়ে গ্রাম। সেকালে ঐ গ্রামের জমিদার ছিলেন রামানন্দ রায়। এই সাতবেড়ে গ্রাম দেরেপুরের পাশেই। শ্রীরামকৃষ্ণ-জনক ক্ষুদিরামের দেরেপুর ত্যাগের ঘটনার জন্যই রামানন্দ রায় ও তাঁর জমিদারির প্রসঙ্গ আজ পাঠককুলের কৌতূহলের বিষয়। রামানন্দ রায় নিজে তাঁর জমিদারি বা ভূসম্পত্তি গড়ে তোলেননি। এটি তাঁর পূর্বপুরুষের অর্জিত সম্পদ, বরং তাঁর অনুদারতা ও নিষ্ঠুরতা সেই বিরাট বৈভবকে বিনষ্টির পথে ঠেলে দিয়েছিলেন। সাতবেড়ের জমিদারি প্রসঙ্গে স্থানীয় পাঁচালিকার দুর্লভ বড়ালের 'রাঢ়ের পাঁচালি'র কয়েক পঙ্ক্তি বিশেষ স্মর্তব্য ঃ

"শোন শোন মা ভগিনী
করি নিবেদন।
কলিকালেও কংসরাজা
কেমনে নিধন হন।।
তার কথা বলব পরে
আগে বলি কিছু।
কেমন করে হলো সে গো
লাটের বেটা বিচ্ছু।।
অনেক কালের কথা সে তো
শোনা যেমন বলি।
মুগলসেনার যোদ্ধা ছিল
রামকিরণ পতি।।
বঙ্গদেশে যবে রাজা
মানসিংহ আসে।
সঙ্গে লয়েন বঙ্গপুত্তুর
সেনা পাশে পাশে।।
নালাখন্দ জলাজঙ্গল
বঙ্গভূমি গেলে।
সবই জানা ছিল রায়ের
এদেশেরই ছেলে।।
পাঠান-মুগল লড়াই সেরে
রাজা গেলে দিল্লি।
দিয়েছিল খুশি হয়ে
রায়ে কয়েক তৌজী।।
সেইমত ধীরে রায়
গড়ে বিরাট পুরী।
তেজারথী লোকলস্কর
হয় ভুরি-ভুরি।।



সাতবেড়ের রায় জমিদারদের চোদ্দ বিঘা কোঠাবাড়ির ভগ্নাংশ

এ তল্লাটে এমন পুরী
কে দেখেছে আর।
চোদ্দ বিঘের ওপর কুঠি
জুড়ি মেলা ভার।।"

পাঁচালিতে উল্লিখিত রামকিরণ ছিলেন রামানন্দ রায়ের পূর্বপুরুষ। ভাগ্যান্বেষণে পায়ে হেঁটেই তিনি হাজির হয়েছিলেন দিল্লি। তখন মুঘল বাদশা আকবরের অধীনে বহু হিন্দুই সেনাবিভাগে কর্মরত ছিলেন। রামকিরণ আকবরের সেনাবাহিনীতে অন্যতম সৈনিক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ষোড়শ শতকের শেষের দিকে আকবরের সেনাপতি মানসিংহ পাঠান দমনে বঙ্গদেশের অভিমুখে রওনা হন। সেসময় উড়িষ্যা ছিল পাঠানদের করতলগত। ১৫৮৭ সালে মানসিংহ ফৌজ নিয়ে বঙ্গদেশে আসেন উড়িষ্যাধিপতি কোতুল খাঁকে দমন করতে। তিনি যখন বর্ধমান পৌঁছান, তখন বর্ষা আসন্নপ্রায়। তখন বাংলার সুবেদার সৈয়দ খাঁ তাঁকে এই অভিযান স্থগিত রাখার অনুরোধ জানান। কিন্তু মানসিংহ অভিযান স্থগিত রাখলেন না। তিনি বর্ধমান থেকে হাজির হলেন জাহানাবাদে। পরে সেখান থেকে মান্দারণ। ১৫৯০ সালে কোতুল খাঁ মারা যান। কোতুল খাঁর উজির খাঁ মিঞা ইশা ও পুত্র নাসির খাঁ মানসিংহের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করেন। এই সন্ধি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এরপর পাঠানরা মুঘলের আশ্রিত বন্ধু-রাজ্য বিষ্ণুপুর আক্রমণ করে। তখন মানসিংহ ১৫৯১ সালের ৫ নভেম্বর পুনরায় বাংলা অভিযান করেন এবং সমূলে পাঠানবাহিনীকে বিপর্যস্ত করেন। কথিত আছে—মানসিংহের এই দ্বিতীয়বার বঙ্গ অভিযানে সাতবেড়ের রামকিরণ রায় তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেন। জাহানাবাদ-মান্দারণ হয়ে উড়িষ্যা অভিমুখে যাত্রা করলে পথে চন্দ্রকোণা নামে এক প্রসিদ্ধ স্থান পড়ে। ঐ স্থানটি খুব প্রাচীন। সেখানে এক স্বাধীন হিন্দুরাজার রাজত্ব ছিল। মানসিংহের এই অভিযানে চন্দ্রকোণাধিপতি মুঘল সেনাপতির বশ্যতা স্বীকার করেন। মানসিংহ এই অভিযানে সফল হলে তিনি রামকিরণ রায়কে সাতবেড়ে সংলগ্ন কয়েকটি মৌজার প্রায় দেড়হাজার বিঘা সম্পত্তি দেন।

সেইসঙ্গে তিনি চন্দ্রকোণার রাধাশ্যাম জিউ ও রঘুবীর শিলা চেয়ে নেন মানসিংহের কাছ থেকে। পরে রামকিরণ রায় সাতবেড়ে গ্রামে মন্দির নির্মাণ করে সেখানে রাধাশ্যাম জিউ ও রঘুবীর শিলাকে স্থাপন করেন।[১]

রায়বাড়ির চোদ্দ বিঘার কুঠি

কালক্রমে রামকিরণ রায় সাতবেড়েতে এক বিশাল অট্টালিকা নির্মাণ করান। চোদ্দ বিঘা জমির ওপর ছিল জমিদার রামকিরণের অট্টালিকা। তার অন্দরমহল সাতটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। সাতটি প্রাচীরের সাতটি দ্বার বা দরজা পার হয়ে তবে অন্দরমহলে প্রবেশ করা যেত। 'সাত বেড়া' অপভ্রংশ হয়ে মৌজার নাম 'সাতবেড়ে' হয়েছে বলে স্থানীয় প্রবীণদের অভিমত। পূর্বে ঐ অঞ্চল মান্দারণ সরকার বলেই খ্যাত ছিল। পরবর্তী কালে ঐ বিশাল প্রাসাদের জন্য সাতবেড়ের রায়পরিবার 'চোদ্দ বিঘের রায়েরা' বলে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে পরিচিত ছিল। ঐ বৃহদায়তন অট্টালিকা বেষ্টন করে দক্ষিণদিকে বদনগঞ্জগামী রাস্তা আর পূর্বদিকে সাতবেড়ে গ্রামের ভিতরে যাওয়ার রাস্তা। অট্টালিকার উত্তরদিকে বাঁশবন ও একটি বৃহৎ পুকুর ছিল (এখনো সেটি বর্তমান)। পশ্চিমদিকে আরেকটি দীর্ঘ পুকুর। দক্ষিণদিকে গোলাবাড়ি ও খিড়কি পুকুর ছিল; বর্তমানে গোলাবাড়ি শালিজমি হয়ে গেছে এবং খিড়কি পুকুর মজে গেছে। পূর্বদিকে গ্রাম্য রাস্তার পরই ছিল রায় পরিবারের গোশালা। তারপর প্রশস্ত অন্দরমহল। অন্দরমহল পেরিয়ে এলে দুর্গাদালান, সদরবাড়ি চাতাল ও সদরবাড়ি। সদর-বাড়ির সোজা পশ্চিমদিকে নাটমণ্ডপ; নাটমণ্ডপের পশ্চিমে অতিথিশালা, উত্তরে রঘুবীর জিউ ও গঙ্গাধর শিবের মন্দির এবং দক্ষিণে পার্বতীনাথ শিবের মন্দির ও রাসমঞ্চ।[২] [ক্রমশ]



সাতবেড়ের চোদ্দ বিঘার রায়বাড়ির পতিত বাস্তুভিটা

১ সাতবেড়িয়ার চোদ্দ বিঘার রায়েদের কথা—শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়, পারিজাত পত্রিকা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

২ ঐ

অনুষ্ঠান-সূচী (আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪০৮)

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

জন্মতিথি-কৃত্য

গুরুপূর্ণিমা (ব্যাসপূর্ণিমা)	আষাঢ় পূর্ণিমা	২০ আষাঢ়	বৃহস্পতিবার	৫ জুলাই	২০০১
স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী	৩ শ্রাবণ	বৃস্পতিবার	১৯ জুলাই	২০০১
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	১৯ শ্রাবণ	শনিবার	৪ আগস্ট	২০০১
শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী	শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	২৭ শ্রাবণ	রবিবার	১২ আগস্ট	২০০১

পূজাতিথি-কৃত্য

রথযাত্রা	আষাঢ় শুক্লা দ্বিতীয়া	৮ আষাঢ়	শনিবার	২৩ জুন	২০০১

একাদশী-তিথি (রামনাম-সঙ্কীর্তন)

২, ১৬ আষাঢ়	রবিবার, রবিবার	১৭ জুন, ১ জুলাই	২০০১
১, ১৪, ৩০ শ্রাবণ	মঙ্গলবার, সোমবার, বুধবার	১৭, ৩০ জুলাই, ১৫ আগস্ট	২০০১

শ্রীরামকৃষ্ণ, কুবীর গোঁসাই ও তাঁর জনপ্রিয় একটি গান

দেবাশিস দত্ত

এই নিবন্ধটি 'অধ্যাপক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।
—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

"ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্নধন।
খুঁজ খুঁজ খুঁজ খুঁজলে পাবি হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন
দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি জ্বলবে হৃদে অনুক্ষণ।।
ড্যাং ড্যাং ড্যাং ডাঙায় ডিঙে চালায় আবার সে কোনজন।
কুবীর বলে শোন শোন শোন ভাব গুরুর শ্রীচরণ।।"

'কথামৃত'-এর বর্ণনা অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণ এই গানটি মোট আটবার গেয়েছিলেন। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, 'ঈশ্বরের মাধুর্যরসে ডুব দাও'—এই কথাটি বোঝাতে ঠাকুর গানটি গাইছেন। গানটি ঠাকুরের খুবই প্রিয় ছিল, না হলে ঠাকুর এতবার গাইতেন না। গানটি কুবীরের রচনা।

এখন প্রশ্ন, কে এই কুবীর? বাংলার লোকগানে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের গান একটি সম্পদ। এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব নদীয়া জেলার দোগাছিয়া শালগ্রাম অঞ্চলে। আঠার শতকের গোড়ায় এই লোকধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। নদীয়া, যশোহর, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী জেলায় আঠার শতক অথবা তারপরে যে বিভিন্ন লোকধর্ম সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব পাওয়া যায়—তাদের আদর্শ ছিল বৈষ্ণব ধর্ম, আচার ছিল বাউলের মতো এবং সাধনায় ছিল মুসলিম সুফিতত্ত্বের প্রভাব। নদীয়া জেলার চাপরা থানার অন্তর্গত বৃত্তিহুদা গ্রামে এই সাহেবধনী সম্প্রদায়ের একটি পরিবারে ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে কুবীর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে।

চণ্ডীদাস বলেছিলেনঃ "শুনরে মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।" অর্থাৎ ঈশ্বরের যথার্থ আরাধনা করতে গেলে মানুষের স্বরূপ জানতে হবে। মানুষকে ভালবাসতে হবে। সাহেবধনীরা এই মত বিশ্বাস করেন এবং সেই বিশ্বাসের কথা তাদের গানে পাওয়া যায়। সুতরাং চণ্ডীদাসের ভাবনার সঙ্গে সাহেবধনীদের ভাবনার মিল পাওয়া যায় কুবীরের গানে—

"ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি নাকো রত্নধন।"

অর্থাৎ, পাতালের গভীরে রত্নধন নেই, আছে মানুষের মধ্যে। মানুষের মধ্যেই ঈশ্বরের সন্ধান পাওয়া যায়। মানুষের মধ্যেই সেই পরম রত্নধন খুঁজে পাওয়া যায়। বৃত্তিহুদা গ্রামের রামলাল ঘোষের লেখা থেকে গানটির যে আকার পাওয়া গিয়েছে তা এরকম—

"ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আবার মন
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি নাকো রত্নধন।
চুপ চুপ চুপ চুপে চাপে হয়ে যাক সচেতন
আবার দুপ দুপ দুপ জ্ঞানের বাতি হৃদয় জ্বলবে সদক্ষণ
খোঁজ খোঁজ খোঁজ হৃদয় মাঝে দেখতে পাবি বৃন্দাবন
আবার বোজ বোজ বোজ বুজলে হবে সহজ মানুষের করণ
ডেঙ ডেঙ ডেঙ ডেঙায় ডিঙে চালায় আবার সে কোন্ জন।
শোন শোন শোন একমনেতে ধর গুরুর শ্রীচরণ।"[১]

মানুষকে ধরে সাধনাই সাহেবধনী সম্প্রদায়ের মূল পথ। মানুষকে যথাযথ জানার চেষ্টা করলে তবেই নিজেকে জানার আকাঙ্ক্ষা হবে আর তখনি সেই পরম ব্রহ্মের সন্ধান পাওয়া যাবে। সুতরাং মানুষের হৃদয়েই রয়েছে সেই বৃন্দাবনের অস্তিত্ব, যেখানে ঈশ্বর বিরাজ করছেন সর্বদা। মানুষই একমাত্র রত্নধন, যার রূপে অবগাহন করে স্বরূপের খোঁজ করতে হবে। কুবীরের আরেকটা গানে পাওয়া যায়—

"রূপে নয়ন ডুবল নারে।
স্বরূপ-সিন্ধু মাঝে কি ধন আছে
তলিয়ে খুঁজে দেখলি নারে।।"

অর্থাৎ অরূপ রতন পেতে গেলে সেই স্বরূপসাগরেই ডুব দিতে হবে।

এই গানই যখন শ্রীরামকৃষ্ণ গাইছেন তখন দেখা গেল, মূল গানের কথা থেকে তাঁর পরিবেশিত গানে কথার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে, আপাতদৃষ্টিতে ভাবেরও পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু মূল বিষয়বস্তুর কোন পরিবর্তন হয়নি। কথার পরিবর্তন করে আসলে তিনি মানুষের মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজে পাওয়ার তত্ত্বকে সহজ-সরল করে বোঝাতে চাইলেন। তিনি বললেনঃ "তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবিরে প্রেম রত্নধন।" কুবীর বলেছিলেনঃ "তলাতল

১ সাহেবধনী সম্প্রদায় ও তাহাদের গান—সুধীর চক্রবর্তী, পুস্তক বিপণি, ১৯৮৫, পৃঃ ১৬, ৫২

পাতাল খুঁজলে পাবি নাকো রত্নধন।" আগেই বলা হয়েছে, কুবীরের বলার উদ্দেশ্য ছিল—সমুদ্রের অতলে ডুব দিয়ে লাভ নেই, মানুষকে যথাযথভাবে জানলে তথা নিজেকে জানলেই ঈশ্বরলাভ করা হয়। ঠাকুর ১৮৮৪ সালের ১৯ অক্টোবর শরৎ-মহোৎসব উপলক্ষ্যে সিঁথির ব্রাহ্মসমাজে এসেছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিজয়, ত্রৈলোক্য প্রমুখ ব্রাহ্ম-ভক্তরা। তাঁদেরকে ঠাকুর বলছেন : "একটার ওপর দৃঢ় হতে হবে। ডুব দাও, না দিলে সমুদ্রের ভিতর রত্ন পাওয়া যায় না, জলের ওপর কেবল ভাসলে পাওয়া যায় না।" এই কথা বলে তিনি গানটি গাইলেন।[২] আবার ১৮৮২ সালের ২৮ অক্টোবর সিঁথির ব্রাহ্মসমাজের ষাণ্মাসিক উৎসবে ঠাকুর শিবনাথ শাস্ত্রীকে কথাপ্রসঙ্গে বলছেন : "হ্যাঁগা, তোমরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য এত বর্ণনা কর কেন? ঈশ্বরের মাধুর্যরসে ডুব দাও, তাঁর অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত ঐশ্বর্য—অত খবরে আমাদের দরকার কি?" বলে গানটা গাইলেন। অর্থাৎ সাকার রূপের মাধুর্যরসে ডুব দিলে, তাঁর শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে সঁপে দিলেই তাঁকে লাভ করা যায়।[৩]

এপ্রসঙ্গে একটি বিষয়ে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। আঠার শতকের দ্বিতীয়ার্ধে একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় আউলচাঁদ ও আরো ২২ জনের হাত ধরে। এই সম্প্রদায়ের নাম 'কর্তাভজা সম্প্রদায়'। এই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের উপশাখাই সাহেবধনী সম্প্রদায়। দুই ধর্মের সাধনরীতি প্রায় এক—নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, বেদান্তের বিরোধী হওয়া অর্থাৎ চিরায়ত ভারতীয় ধর্মের বিরোধিতা করা। অনেকেই একে ভাল চোখে দেখেননি। অনেকে এটাকে হিন্দুধর্মের বিরোধী বলে মনে করতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কর্তাভজাদের সাধনার পথকে খুব একটা পছন্দ করতেন না। স্বামী সারদানন্দ রচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এ দেখি, ঠাকুর বলছেন : "ওরে দ্বেষবুদ্ধি করবি কেন? জানবি ওটাও একটা পথ, তবে অশুদ্ধ পথ। বাড়িতে ঢোকবার যেমন নানা দরজা থাকে—সদর ফটক থাকে, খিড়কির দরজা থাকে, আবার বাড়ির ময়লা সাফ করবার জন্য বাড়ির ভিতর মেথর ঢোকবারও একটা দরজা থাকে—এও জানবি (কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধনার পথ) তেমনি একটা পথ।"[৪] কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধন প্রসঙ্গে ঠাকুর বলতেন : "ইহারা ঈশ্বরের অরূপ রূপের ভজন করেন।" এই সম্প্রদায় ঈশ্বরকে 'আলেকলতা' বলে থাকেন। সংস্কৃত 'অলক্ষ্য' শব্দ থেকে 'আলেক' শব্দের উৎপত্তি। যিনি অলক্ষ্যে থাকেন, যাঁকে দেখা যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায়—তিনিই ঈশ্বর। এই আলেক (ঈশ্বর) মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে গুরু বা কর্তা-রূপে আবির্ভূত হন। এইরূপ মানুষকে 'সহজ' উপাধি দেওয়া হয়। এই 'সহজ' রমণীর সঙ্গে থেকেও সাধনপথ থেকে বিচ্যুত হন না। "রমণীর সঙ্গে থাকে, না করে রমণ।"[৫] "এই গুরুকে উপাসনা করে ভজনাদিতে নিবিষ্ট থাকা—ইহাই তাঁহাদের প্রধান সাধন।"[৬] তবুও কামকাঞ্চনের কাছে থেকে অনাসক্ত হওয়া খুবই কঠিন। বৈষ্ণবচরণ সে-সাধনায় সফল হয়েছিলেন এবং ঠাকুর তাঁকে খুবই ভালবাসতেন। কিন্তু এ-পথের সাধনায় যেকোন মুহূর্তে সাধকের অধঃপতন হতে পারে বলে ঠাকুর এই পথকে অপছন্দ করতেন।

অক্ষয়কুমার সেনের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'তে পাই : "সমকালে প্রচলিত কর্তাভজা মত/ ভগবানে যাইবার এও এক পথ,/ পথটি বড়ই নোংরা উপমা তাহার/ যেমন বাড়ির থাকে নানান দুয়ার।"

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ দেখি, শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : "হরিপদ একটা ঘোষপাড়ার মাগীর পাল্লায় পড়েছে। সে বাৎসল্যভাব করে। হরিপদ ছেলেমানুষ, কিছু বোঝে না। ওরা ছোকরা দেখলে ঐরকম করে। শুনলাম হরিপদ নাকি ওর কোলে শোয়। আর সে হাতে করে তাকে খাবার খাইয়ে দেয়। আমি ওকে বলে দিব—ওসব ভাল নয়। ঐ বাৎসল্যভাব থেকেই আবার তাচ্ছল্যভাব হয়।... সেদিন সে মাগী এসেছিল। তার চাহনির রকম দেখলাম, বড় ভাল নয়। তারই ভাবে বললাম, 'হরিপদকে নিয়ে যেমন কচ্চো কর, কিন্তু অন্যায় ভাব এনো না।' "[৭] কর্তাভজাদের প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন : "ওরা অনেকে রাধাতন্ত্রের মতে চলে। পঞ্চতত্ত্ব নিয়ে সাধনা করে পৃথিবীতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব—মল, মূত্র, রজ, বীজ—এইসব তত্ত্ব! এসব সাধন বড় নোংরা সাধন; যেন পায়খানার ভিতর দিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢোকা! ওদের বর্তমানের সাধন—মানুষ নিয়ে সাধন। মানুষকে মনে করে শ্রীকৃষ্ণ। ওরা বলে রাগকৃষ্ণ।"[৮]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কর্তাভজাদের সাধনরীতি শ্রীরামকৃষ্ণ পছন্দ করতেন না। স্বাভাবিকভাবেই কর্তাভজা সম্প্রদায়ের উপশাখা এই সাহেবধনী সম্প্রদায়ের

---

২ দ্রঃ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, ১৯৯১, পৃঃ ৫৬

৩ ঐ, পৃঃ ৫৫

৪ উদ্বোধন সং, ১৩৮৩, পৃঃ ২০   ৫ ঐ, পৃঃ ২৮   ৬ ঐ, পৃঃ ২৯

৭ উদ্বোধন সং, ১৯৯৬, পৃঃ ৬৫৭-৬৫৮   ৮ ঐ, পৃঃ ৬২৭, ৬৫৮

সাধনরীতিও তাঁর পছন্দ হয়নি। মূল গানটি তাঁর না গাওয়ার এটি একটি কারণ হতে পারে।

তবে এটা ঠিক, শ্রীরামকৃষ্ণের হাত ধরে বৃত্তিহুদার এই লোকসম্প্রদায়ের গান পরবর্তী কালে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌঁছেছিল। যদি মনে করি, ঠাকুর লোকমুখে গানটির ঐ রূপ পেয়েছিলেন, তাহলে কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু সাধনার পথের দিকটা দেখলে দেখা যাবে, সাহেবধনীরা যেখানে মানুষকে অবলম্বন করে ঈশ্বর-আরাধনায় বিশ্বাস করতেন, সেখানে ঠাকুর মানুষের উপাসনার সঙ্গে সাকার ব্রহ্মের উপাসনাতেও বিশ্বাস করতেন এবং তার ওপরে ভিত্তি করেই তিনি প্রবর্তন করেছিলেন আধুনিক সমন্বয়-বাদের। তাই মানুষের স্বরূপসাগরে ডুব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাকার ঈশ্বরের মাধুর্যরসে ডুব দিয়ে তাঁকে লাভ করার ওপর তিনি জোর দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে ঠাকুরের কণ্ঠে যেন শাক্ত কবি রামপ্রসাদের ভাবনারই প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। রামপ্রসাদ লিখেছিলেন—

"ডুব দে রে মন কালী বলে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখনো দুচার ডুবে ধন না পেলে
তুমি দম সামর্থ্যে এক ডুব দাও কুলকুণ্ডলিনীর কূলে।"

অর্থাৎ এক মাতৃসাধক তথা সাকার ব্রহ্মসাধকের ভাবনা আর ঠাকুরের ভাবনা একই। রামপ্রসাদের মতে, মাতৃরূপা ব্রহ্মের (কালী) সন্ধান পেতে হলে ঈশ্বরের মাধুর্যরসে ডুব দিতে হবে এবং সাধনার মাধ্যমে কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করতে হবে। কিন্তু সাহেবধনীরা মাতৃবন্দনা করে না, তাহলে মাতৃসাধক ঠাকুর কেন এই গানটি গেয়েছিলেন? এর দুটো কারণ হতে পারে। প্রথমত, সুদূর গ্রামবাংলা থেকে এই গানটি যাঁর মাধ্যমে ঠাকুরের কাছে পৌঁছেছিল—তিনি গানটির কথা ঐভাবেই ঠাকুরকে শুনিয়েছিলেন। প্রশ্ন জাগে, একটি গানের কথা লোকমুখে পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু ভাবের কি এত পরিবর্তন হতে পারে? দ্বিতীয়ত, গানটির সুর এবং ছন্দ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, তাই আপন সাধনরীতি অনুযায়ী গানটির পরিবর্তন করে নিয়েছিলেন। ঠাকুরের গাওয়া অনেক গানেই দেখা যায়, মূল গানের থেকে কথার কিছু পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু বিষয়বস্তু থেকে গানগুলি কখনো বিচ্যুত হয়নি। যেমন রামপ্রসাদ সেনের একটি গান—

"আমি কি আটাশে ছেলে
(আমি নই আটাশে ছেলে)
ভয়ে ভুলব নাকো চোখ রাঙালে।"

ঠাকুর যখন গানটি গাইছেন তখন কথা পালটে যাচ্ছে—

"মা আমি কি আটাশে ছেলে
আমি ভয় করিনে চোখ রাঙালে।"

এক্ষেত্রে গানটি শাক্ত সাধনরীতি ও ভাবের দিক দিয়ে ঠিকই আছে, শুধু কথার পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু কথার আমূল পরিবর্তন বোধহয় ঠাকুরের গাওয়া কুবীর গোঁসাইয়ের ঐ একটি গানেই পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে তাঁর আধুনিক মনন এবং ভাবনার গভীরতা আমাদের মুগ্ধ করে। লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি গানটির যে এত সুন্দর রূপ দিয়েছেন তা ভাবলে অবাক হতে হয়। ভাষার পরিবর্তন হলেও কুবীর এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপথের পার্থক্য থাকলেও উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল ঈশ্বরলাভ। শ্রীরামকৃষ্ণই বলেছেন, অসংখ্য নদী একই উৎস থেকে সৃষ্টি হয়ে বিভিন্ন পথে ঘুরে সাগরেই এসে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। সেইরকম সকল সাধনার লক্ষ্য সেই একই ঈশ্বরকে লাভ করা। সেদিক থেকে সাহেবধনী সম্প্রদায় এবং 'সর্বধর্মসমন্বয়' তথা 'যত মত তত পথ' নীতিতে বিশ্বাসী সাধকের কাছে গানটি যে সমান গুরুত্বপূর্ণ, সেবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। ❑



'উদ্বোধন' পত্রিকার জন্মলগ্নের প্রাথমিক পর্বে প্রচলিত নিয়মাবলীর একটি ছিল এরূপ : "বৎসরের মধ্যে যেকোনও সময়ই হউক এক মাস 'উদ্বোধন' বন্ধ থাকিবে।" সেই নিয়মানুযায়ী ১৩০৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'উদ্বোধন' পত্রিকা বিভাগে 'ছুটি' থাকায় ১৩০৮ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হয়নি। সেজন্য এবার (১৪০৮) জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় এই বিভাগে কোন রচনা প্রকাশিত হলো না।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

রক্তের উচ্চচাপ বা 'হাইপারটেনশন'

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

লেখক আমেরিকার নিউ ইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর অফ মেডিসিন এবং নিউ ইয়র্কের সিরাকিউজস্থ ভেটার‍্যান অ্যাফেয়ার্স মেডিক্যাল সেন্টারের কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধান।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

রক্তের উচ্চচাপ বা 'ব্লাডপ্রেসার' সমস্যা 'নিঃশব্দে প্রাণঘাতক'-এর পর্যায়ে পড়ে। কারণ, প্রথম প্রথম এমনকি বহুদিন পর্যন্ত উচ্চ রক্তচাপের জন্য কোন লক্ষণ নাও থাকতে পারে, কেবল উচ্চচাপ ছাড়া যেটি না মাপলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে না। ইতিমধ্যে হয়তো শরীরের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেছে এই 'হাইপারটেনশন'। যখন মাথার যন্ত্রণা, হার্টের অসুখের লক্ষণ বা দৃষ্টিক্ষীণতা অথবা পক্ষাঘাত বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো আঘাত হানে, তখন সত্যিই বেশ দেরি হয়ে গেছে এই রোগের চিকিৎসার। অথচ সময়মতো রোগনির্ণয় ও সুচিকিৎসায় হাইপারটেনশনের জন্য যেসমস্ত জটিল ও মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়, তার বেশির ভাগই আজ আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়েছে।

● ব্লাডপ্রেসার সমস্যাটি কত গভীর?

আমেরিকায় জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশের (বয়স্কদের মধ্যে) হাইপারটেনশন অসুখ আছে বলে ধরা হয়। গত ৩০ বছরে অনেক লোক এবিষয়ে সচেতন হয়েছেন এবং সময়মতো চিকিৎসার দ্বারা সমস্যাটি আয়ত্তে আনার সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল হয়েছে। সেক্ষেত্রে অভূতপূর্বভাবে ব্লাডপ্রেসারের জন্য মৃত্যুর হার ও শারীরিক অকর্মণ্যতার প্রকোপ অনেকাংশেই অবদমিত হয়েছে। বিগত তিন দশকে 'স্ট্রোক' বা 'সন্ন্যাস' রোগে মৃত্যুর হারও প্রায় ৬০ শতাংশ এবং 'করোনারী' অসুখে মৃত্যুর হার প্রায় ৪০-৫০ শতাংশ কমেছে। কিন্তু দুঃখের কথা, সম্প্রতি কয়েক বছর হলো দেখা যাচ্ছে—ঐ উৎসাহব্যঞ্জক অবস্থা আজ ব্যাহত হতে চলেছে। ক্রমোন্নতির বদলে ক্রমাবনতির সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। যাঁরা ব্লাডপ্রেসারে ভুগছেন, তাঁদের মধ্যে মাত্র এক-চতুর্থাংশের ব্লাডপ্রেসার এখন ঠিকমত আয়ত্তে আছে এবং তার প্রতিফলনও দেখা যাচ্ছে স্ট্রোক ও হার্টের অসুখে মৃত্যুহারের ওপর। যেমনভাবে সেই হার কমের দিকে চলেছিল, এখন দেখা যাচ্ছে তাতে কেমন যেন ভাটা পড়েছে। ঠিক কি জন্য এই উদ্বেগ, তা আরো পরিষ্কার করে বলার জন্য একটি পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো। এদেশে জাতীয় স্বাস্থ্য ও খাদ্যশিক্ষা সংস্থা (National Health and Nutrition Education Survey—NHANES) কয়েক বছর অন্তর তাঁদের পর্যবেক্ষণের পরিসংখ্যান প্রকাশ করে। এঁদের প্রকাশিত গত কয়েক বছরের বিবরণী দেওয়া হলো—

সমীক্ষা	সাল ১৯৭৬-১৯৮০	সাল ১৯৮৮-১৯৯১	সাল ১৯৯১-১৯৯৪
(১) ব্লাডপ্রেসার রোগীদের কত শতাংশ জানেন যে, তাঁদের এই সমস্যা আছে?	৫১%	৭৩%	৬৮%
(২) এঁদের মধ্যে কত শতাংশ চিকিৎসাধীনে আছেন?	৩১%	৫৫%	৫৪%
(৩) যাঁদের চিকিৎসা চলছে, তাঁদের কত শতাংশের ব্লাডপ্রেসার সন্তোষজনকভাবে আয়ত্তে আছে?	১০%	২৯%	২৭%

ওপরের তথ্যগুলি অবশ্যই উদ্বেগের কারণ, সন্দেহ নেই। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, অবস্থার ক্রমোন্নতিতে বাধা পড়ছে। সতর্কতার অভাব বা আত্মপ্রসাদ বা 'কমপ্ল্যাসেন্সি'ই (complacency) হয়তো এর জন্য দায়ী। তাই সজাগ থেকে ব্লাডপ্রেসার সমস্যার সমাধান না করলে অবস্থা 'পুনর্মূষিক ভব' হয়ে দাঁড়াতে বিশেষ দেরি হবে না। এখন সেই বিষয় নিয়ে আলোচনার আশু প্রয়োজন, সন্দেহ নেই।

অনেকের অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে—যেমন, রোজ ওষুধ খেলেই তো হলো, ব্লাডপ্রেসার আয়ত্তে থাকছে কিনা বা কতখানি নেমেছে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার দরকার নেই। সকলেরই আজ জানা দরকার যে, যাঁদের এই সমস্যা আছে কেবল তাঁদেরই নয়, তাঁদের রক্তসম্পর্কের আত্মীয়দেরও ওয়াকিবহাল হতে হবে—এই অসুখটি কতজনের আছে এবং সুষ্ঠুভাবে আয়ত্তাধীনে থাকছে কিনা।

● রক্তের চাপ কখন উচ্চচাপ বা 'হাইপারটেনশন' হয়ে দাঁড়ায় এবং কখন বলা যাবে, সেটি আয়ত্তে এসেছে?

'হাইপারটেনশন' বলা হয় তখনি, যখন ব্লাডপ্রেসারের ওপরের সংখ্যাটি (সিস্টোলিক—Systolic Pressure) ১৪০ মিলিমিটার্স অফ মার্কারি (mm Hg) বা তার বেশি থাকে অথবা নিচের সংখ্যাটি (ডায়াস্টোলিক—Diastolic Pressure) ৯০ মিলিমিটার্স অফ মার্কারি বা তার বেশি থাকে। অবশ্যই যাঁদের ব্লাডপ্রেসার চিকিৎসার সাহায্যে কমিয়ে ১৪০/৯০ মিলিমিটার্সের নিচে নামানো হয়েছে, তাঁরা হাইপারটেনশনের রোগীই থাকছেন সন্দেহ নেই। হাইপারটেনশন তখনি আয়ত্তে এসেছে বলা যাবে, যখন সিস্টোলিক

ব্লাডপ্রেসারের মান ১৪০ মিলিমিটার্সের নিচে নামবে ও সেই মান বজায় থাকবে এবং ডায়াস্টোলিক প্রেসারের মানও ৯০ মিলিমিটার্সের নিচে বেশির ভাগ সময়েই ধরা থাকবে। আবার যাঁদের হার্ট ফেলিওর (হার্টের সঙ্কোচন বা প্রসারণ ক্ষমতার অবনতির ফলে হাঁফধরা, শরীরে জলজমা ইত্যাদি লক্ষণ), ডায়াবিটিস (বহুমূত্ররোগ) এবং কিডনীর অসুখ (ব্লাডপ্রেসার বেশি থাকার জন্য কিডনী ক্রমশ অকেজো হয়ে পড়ে এবং শরীর থেকে দূষিত পদার্থ নিষ্ক্রান্ত হতে অসুবিধা হয়) ধরা পড়েছে—তাঁদের ক্ষেত্রে সম্ভব হলে সিস্টোলিক ব্লাডপ্রেসারের মান আরো নিচে রাখার জন্য অভিমত দেওয়া হয়েছে।

● ব্লাডপ্রেসারের বিভিন্ন ধাপগুলি কি?

ব্লাডপ্রেসারের গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্য তার শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। জাতীয় যুগ্মসভা (The Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure)—যাঁদের ওপর রক্তের উচ্চচাপের প্রতিনিরোধ, রোগনির্ণয় ও তার মূল্যায়ন এবং সুষ্ঠু চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ অভিমত দেওয়ার ভার ন্যস্ত আছে, কয়েক বছর আগে তাঁদের ষষ্ঠ বৈঠকে (JNC-VI) যেভাবে হাইপারটেনশনের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে, তার তালিকা নিচে দেওয়া হলো—

ব্লাডপ্রেসারের ধরন	সিস্টোলিক ব্লাডপ্রেসার (mm Hg)		ডায়াস্টোলিক ব্লাডপ্রেসার (mm Hg)
(১) সবচেয়ে অনুকূল বা অপটিম্যাল (Optimal) ব্লাডপ্রেসার (অবশ্য বাঞ্ছনীয়)	< ১২০	এবং	< ৮০
(২) স্বাভাবিক বা নর্ম্যাল (Normal) ব্লাডপ্রেসার	< ১৩০	এবং	< ৮৫
(৩) ব্লাডপ্রেসারের উচ্চ-স্বাভাবিক বা হাই-নর্ম্যাল (High Normal Blood Pressure) সীমা	১৩০-১৩৯	অথবা	৮৫-৮৯
(৪) রক্তের উচ্চচাপ বা হাইপারটেনশনের প্রথম ধাপ (Stage I Hypertension)	১৪০-১৫৯	অথবা	৯০-৯৯
(৫) হাইপারটেনশনের দ্বিতীয় ধাপ (Stage II Hypertension)	১৬০-১৭৯	অথবা	১০০-১০৯
(৩) হাইপারটেনশনের তৃতীয় ধাপ বা আরো গুরুতর অবস্থা (Stage III Hypertension or very high Blood Pressure)	≥ ১৮০	অথবা	≥ ১১০

ব্লাডপ্রেসার বেড়ে থাকলে হার্ট, ধমনীসমূহ ও কিডনীর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। আগেই বলা হয়েছে, হার্ট ফেলিওর, স্ট্রোক ও মারাত্মক কিডনীর অসুখ যথাসময়ে হাইপারটেনশনের রোগীকে পঙ্গু করে ফেলতে পারে। ডায়াবিটিস যাঁদের আছে, তাঁদের প্রায় ৫০ শতাংশের হাইপারটেনশন দেখা দেয়। যাঁরা মদ্যপায়ী, তাঁদেরও প্রায় এক-তৃতীয়াংশের এই ব্লাডপ্রেসার ধরা পড়ে। আগে চিকিৎসার জন্য কেবল ডায়াস্টোলিক ব্লাডপ্রেসারের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করে চিকিৎসা শুরু করা হতো। এখন সেই ধারণার পরিবর্তন হচ্ছে। আজ আমরা জানি যে, ব্লাডপ্রেসারের অসুখে যেসমস্ত জটিলতা দেখা দেয়, তাদের জন্য ডায়াস্টোলিক প্রেসারের চেয়ে সিস্টোলিক প্রেসারই বেশি দায়ী এবং ক্ষতিকারক। তাই সিস্টোলিক ব্লাডপ্রেসারকে আয়ত্তে রাখার গুরুত্ব উপলব্ধি করার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

● সিস্টোলিক হাইপারটেশনে কি করণীয়?

আগে ধারণা ছিল যে, বার্ধক্যের সঙ্গে সিস্টোলিক ব্লাডপ্রেসার স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায় এবং তার জন্য কোন ক্ষতি হয় না (a benign consequence of ageing)। কথাটা অবশ্যই ঠিক নয়। বৃদ্ধদের (বয়স ৬৫ বা তার বেশি) যখন সিস্টোলিক ব্লাডপ্রেসার বাড়ে এবং তার সঙ্গে ডায়াস্টোলিক ব্লাডপ্রেসার কমে যায়, তখন তাকে বলা হয় 'সিস্টোলিক হাইপারটেনশন' (Systolic Hypertension) এবং তার সংখ্যামূলক সংজ্ঞা হলো সিস্টোলিক প্রেসার ≥ ১৬০ মিলিমিটার্স অফ মার্কারি এবং সঙ্গে ডায়াস্টোলিক প্রেসার ≤ ৯০ মিলিমিটার্স অফ মার্কারি। যেমন একজন ৭০ বছর বয়স্ক ব্যক্তির ব্লাডপ্রেসার মেপে যদি দেখা যায় যে, তা দিনের বেশির ভাগ সময়েই ১৬৫/৮০ মিলিমিটার্স অফ মার্কারি থাকছে, তাহলে অবশ্যই তাঁর সিস্টোলিক হাইপারটেনশন আছে এবং তার জন্য চিকিৎসারও বিশেষ প্রয়োজন। সিস্টোলিক ব্লাডপ্রেসার আরো বাড়লে তো কথাই নেই! বৃদ্ধদের ধমনীর দেওয়ালের নমনীয়তা কমে যায়, ধমনীগুলি শক্ত ভাব ধারণ করে এবং তার জন্য এঁদের অনেকেরই সিস্টোলিক হাইপারটেনশন দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে আশার কথা হলো যে, গত কয়েক বছরে আমেরিকা, কানাডা এবং ইউরোপে প্রায় ১০,০০০ বৃদ্ধের ওপর গবেষণা করে দেখা গেছে এঁদের ক্ষেত্রে সিস্টোলিক হাইপারটেনশন চিকিৎসার দ্বারা আয়ত্তে আনা ও রাখা খুবই সম্ভব এবং তার ফলে যেসব জটিলতার কথা আগেই বলা হয়েছে, সেগুলিও—বিশেষ করে স্ট্রোক ও হার্ট ফেলিওর, এমনকি হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনাও সুষ্ঠুভাবে কমিয়ে ফেলা গেছে। গড়ে মৃত্যুর হারও তার জন্য কমেছে। তাই বৃদ্ধদের সিস্টোলিক হাইপারটেনশন সুচিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসার অবশ্য প্রয়োজন—বিশেষ করে স্ট্রোকের ফলে পক্ষাঘাত যাতে না হয়, তারই প্রচেষ্টায়। সিস্টোলিক ব্লাডপ্রেসারটিকে যতদূর সম্ভব রোগীর সহ্যসীমার কথা বিবেচনা করে ১৪০ মিলিমিটার্স অফ মার্কারির নিচে রাখা বাঞ্ছনীয়।

● হাইপারটেশন আয়ত্তে আনার জন্য জাতীয় যুগ্মসভার ষষ্ঠ বৈঠকের সুপারিশগুলি কি?

মোটামুটিভাবে সব বয়সের হাইপারটেনশন রোগীদের জন্য যেসমস্ত সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলির তালিকা দেওয়া হলো। রক্তের উচ্চচাপ কোন্ ধাপে আছে এবং তার সঙ্গে অন্য কোন সম্ভাব্য বিপদসঙ্কেত বা ঝুঁকি (risk factor) জড়িত আছে কিনা তার পর্যালোচনা করে ব্লাডপ্রেসারের জন্য কি করণীয় তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তালিকাটি নিম্নরূপ—

ব্লাডপ্রেসারের ধাপ	আনুষঙ্গিক সম্ভাব্য বিপদসঙ্কেত নেই (ক)	আনুষঙ্গিক সম্ভাব্য বিপদসঙ্কেত আছে কিছু কম (খ)	আনুষঙ্গিক সম্ভাব্য বিপদসঙ্কেত বেশ আছে (গ)
(১) উচ্চ স্বাভাবিক (High (Normal) মান : $\frac{১৩০\text{-}১৩৯}{৮৫\text{-}৮৯}$ mm Hg	জীবনযাত্রার অদল-বদল প্রয়োজন।	জীবনযাত্রার অদল-বদল প্রয়োজন।	জীবনযাত্রার অদল-বদলের সঙ্গে ওষুধ সেবন প্রয়োজন।
(২) হাইপারটেনশনের প্রথম ধাপ (Stage I Hyper-tension) মান : $\frac{১৪০\text{-}১৫৯}{৯০\text{-}৯৯}$ mm Hg	একবছর ধরে জীবন-যাত্রার অদলবদল করেও ব্লাডপ্রেসার সুনিয়ন্ত্রিত না হলে তার সঙ্গে ওষুধ সেবন প্রয়োজন।	ছয়মাস পর্যন্ত জীবন-যাত্রার অদলবদল করে ব্লাডপ্রেসার না আয়ত্তে এলে ওষুধ সেবন প্রয়োজন।	ওষুধের ব্যবহার ও তার সঙ্গে জীবন-যাত্রার অদলবদল করা দরকার।
(৩) হাইপারটেনশনের দ্বিতীয় বা তৃতীয় ধাপ কিংবা আরো বেশি জটিল অবস্থা (Stage II or III Hyper-tension or with complications) মান : $\frac{১৬০+}{১১০+}$ mm Hg	ওষুধ সেবন ও তার সঙ্গে জীবনযাত্রার অদলবদল প্রয়োজন।	ওষুধ সেবন ও তার সঙ্গে জীবনযাত্রার অদলবদল দরকার।	ওষুধ সেবন ও জীবন-যাত্রার অদলবদল প্রয়োজন।

● আনুষঙ্গিক সম্ভাব্য বিপদসঙ্কেত বা 'রিস্ক ফ্যাক্টর' কি?

(ক) যদি হাইপারটেনশন ছাড়া আর অন্য কোন আনুষঙ্গিক বিপদসঙ্কেত, যেমন—ডায়াবিটিস, কোলেস্টেরল সমস্যা, হার্ট অ্যাটাক ইত্যাদি না থাকে এবং কোন স্ট্রোক, চোখের রেটিনার ধমনীর দুরবস্থা বা কিডনীর অসুখ না হয়ে থাকে তাহলে সেই রোগীদের এই পর্যায়ে ফেলা হচ্ছে এবং তাঁদের জন্য ওষুধের ব্যবস্থা দেওয়া হচ্ছে কেবল ২ এবং ৩ ধাপের হাইপারটেনশন থাকলে।

(খ) ব্লাডপ্রেসার রোগীর যদি ডায়াবিটিস ভিন্ন কোন সম্ভাব্য বিপদসঙ্কেত বা 'রিস্ক ফ্যাক্টর' থাকে, যেমন কোলেস্টেরল সমস্যা, পারিবারিক হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ইতিহাস এবং তা সত্ত্বেও যদি দেখা যায় যে, হার্ট, ধমনী বা কিডনী এখনো আক্রান্ত নয়, তাহলে এই দ্বিতীয় ধাপেও প্রথমে ব্লাডপ্রেসারের ওষুধ দেওয়া হয় না। ডায়াবিটিস রোগীদের ক্ষেত্রে অবশ্য আলাদা ব্যবস্থা।

(গ) ব্লাডপ্রেসারের যেকোন ধাপে যদি ডায়াবিটিস থাকে অথবা যদি হার্ট, ধমনী বা কিডনীর আক্রান্ত হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যায়, তাহলে ওষুধ সেবন করতেই হবে।

● জীবনযাত্রার অদলবদল বলতে কি বোঝানো হচ্ছে?

দৈহিক স্থূলতা থাকলে খাদ্যনিয়ন্ত্রণ এবং সহ্যসীমার মধ্যে যতদূর সম্ভব ব্যায়াম করা এবং ওজন কমানো অবশ্য প্রয়োজনীয়। সকলের পক্ষেই প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০ মিনিট জোরে হাঁটা—অন্তত সপ্তাহে ৫-৬ দিন এবং সম্ভব হলে ৭ দিনই করা দরকার। বাত থাকলে সাঁতার কাটা খুবই ভাল ব্যায়াম এবং সুস্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। এছাড়া লবণ খাওয়া কমানো দরকার। খাদ্যতালিকায় জান্তব প্রোটিনের পরিমাণ ও তার সঙ্গে স্নেহজাতীয় পদার্থ ও ভাজা খাদ্যের আধিক্য রাখা উচিত নয়। অর্থাৎ মাংস, হ্যাম-বার্গার, হটডগ, মাখন বা মার্জারীন, পনীর ও দুগ্ধজাত খাদ্য পরিহার করা ভাল। মাছ, চর্ম-বিহীন (skinless) মুরগীর মাংস পরিমাণমত খাওয়া এবং টাটকা শাকসবজি, ফলমূল ও নানাজাতীয় বাদাম খাওয়া (অবশ্যই নিয়মিতভাবে এবং পরিমাণমত) খুবই স্বাস্থ্যপ্রদ এবং ব্লাডপ্রেসার কমানোর পক্ষে অনুকূল। চিনিযুক্ত বা রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট-যুক্ত খাদ্য, যেমন নানা ধরনের মিষ্টি খাবার, মিষ্টি বিস্কুট বা চকোলেট ইত্যাদি যতদূর সম্ভব বর্জন করা ভাল। দেহের ওজন ঠিক রাখার জন্য আজকাল 'বডি মাস ইনডেক্স' (Body Mass Index বা BMI) ব্যবহার করা হচ্ছে। এই মাপটি হলো—প্রথমে দেহের বসনভূষণ-মুক্ত ওজন কিলোগ্রামে মাপা হয় (১ কিলোগ্রাম = ২.২ পাউন্ড); তারপর দেহের উচ্চতাকে মিটারে প্রকাশ করে তার বর্গ করা হয় (১ মিটার = প্রায় ৩৯.৪ ইঞ্চি)। এরপর কিলোগ্রামে প্রকাশিত ওজনকে মিটারে প্রকাশিত উচ্চতার বর্গ দিয়ে ভাগ করা হয়। নিজেরা গণনা

না করে অনেকে নানা ধরনের চার্ট ব্যবহার করে থাকেন। স্বাভাবিক অবস্থার জন্য বি. এম. আই. হলো ১৮.৫ থেকে ২৫ কিলোগ্রাম প্রতি বর্গমিটার উচ্চতায়। এরপর ২৫ থেকে ২৭ একটু ভারিক্কি অবস্থা, তবে খারাপ নয়; ২৭ থেকে ২৯ ভারী ওজনের দেহ, আর প্রতি বর্গমিটার দৈহিক উচ্চতায় ৩০ কিলোগ্রাম বা তার বেশি ওজন হলে প্রকৃত স্থূলদেহী বা অস্বাভাবিক রকম মোটা (obese) শরীর বলা হয়। তার জন্য ব্লাডপ্রেসার ছাড়াও আরো অনেকরকম সাঙ্ঘাতিক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হতে দেখা যায়। 'বডি মাস ইনডেক্স' ২৭-এর নিচে রাখা স্বাস্থ্যপ্রদ, সন্দেহ নেই।

● ওষুধের ব্যবস্থা কি ধরনের?

এবিষয়ে সুচিকিৎসকের পরামর্শমতো অবশ্যই চলা প্রয়োজন। মোটামুটিভাবে হাইপারটেনশনের জন্য যেসমস্ত ওষুধ আজকাল ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলি সম্বন্ধে কিছুটা ওয়াকিবহাল থাকা ভাল।

সাধারণত ডায়ুরেটিক (Diuretic) জাতীয় ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা শুরু করা হয়। রোজ অল্প ডোজে (১২.৫ মিলিগ্রাম) ক্লোরথ্যালিডোন (chlorthalidone) বা হাইড্রো-ক্লোরোথায়াজাইড (hydrochlorothiazide) ও তার সঙ্গে টম্যাটো, কমলালেবু বা বাতাবীলেবু জাতীয় ফল খাওয়া দরকার। চিকিৎসকগণ ক্রমশ বিটা ব্লকার্স (যেমন অ্যাটেনলল, মেটোপ্রোলল, এস ইনহিবিটার্স জাতীয় উৎকৃষ্ট ওষুধ ও অন্যান্য নানা ধরনের ভাল ভাল ওষুধ প্রয়োজনমত যোগ করে থাকেন। আসল কথা হলো, ঠিকমত ব্লাডপ্রেসার কমেছে কিনা এবং তা সেই নির্দিষ্ট মাপের মধ্যে আয়ত্তে থাকছে কিনা তার জন্য যথেষ্ট খেয়াল রাখা দরকার। রোগী ও চিকিৎসক উভয়েরই তার জন্য সতর্কতার প্রয়োজন। অনেক সময় ব্লাডপ্রেসার আয়ত্তে এলে রোগী নিজেই ওষুধ খাওয়া কমিয়ে দেন, এমনকি বন্ধ করে দেন এবং অনেক চিকিৎসকও আছেন, যাঁরা ঠিক এই ধরনের ভুল করে থাকেন। যদি ওষুধের পার্শ্বফল (side effects) রোগীকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে, তাহলে অবশ্য আলাদা কথা; তবে তার জন্য ওষুধ পরিবর্তন করে অন্য ওষুধের ব্যবস্থা করা দরকার, চিকিৎসা বন্ধ করার দরকার নেই। কারণ, যেসব মারাত্মক জটিল অবস্থা প্রতিরোধের জন্য চিকিৎসার কথা বলা হচ্ছে, সেগুলি আবার যথারীতি 'নখদন্ত' বিস্তার করে পঙ্গুদশা ঘটানো বা অকালমৃত্যুর জন্য সচেষ্ট হবে। ব্লাডপ্রেসারের সঙ্গে আরো যেসমস্ত অসুখ থাকতে পারে—যেমন ডায়াবিটিস, কোলেস্টেরল সমস্যা, করোনারী অসুখ ইত্যাদি সবকিছুর চিকিৎসাও তার সঙ্গে চালিয়ে যেতে হবে চিকিৎসকের নির্দেশমত। এমনকি ব্লাডপ্রেসার কতদূর পর্যন্ত নামানো দরকার তাও নির্ভর করবে আনুষঙ্গিক রোগটির ওপর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ডায়াবিটিসের রোগীর পক্ষে সিস্টোলিক ব্লাডপ্রেসার যতদূর সম্ভব ১৩০ মিলিমিটার্সের নিচে রাখার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। কিডনীর অসুখের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই ধরনের নির্দেশ আছে। তবে সকলের পক্ষে একই নির্দেশ দেওয়া যায় না। অনেক কিছু চিন্তা করে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিচক্ষণ চিকিৎসকেরা বিশেষজ্ঞের পরামর্শমত কাজ করে থাকেন। প্রতিটি মানুষ আলাদা, তাই তার চিকিৎসাব্যবস্থাতেও তারতম্য হবে।

এই প্রসঙ্গে আরো মনে রাখা দরকার, অম্বলের অসুখ, পাকস্থলীর ঘা বা অসুখ না থাকলে এবং অ্যাসপিরিনে অ্যালার্জি না হলে প্রতিদিন ১টি করে অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট (৮০ থেকে ৩২৫ মিলিগ্রাম এনটেরিক কোটেড) খাওয়া প্রয়োজন। ফলে হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা কম থাকবে এবং স্ট্রোকের অত্যাচারও কিছু কমবে। এটা সকলের পক্ষেই প্রশস্ত নির্দেশ।

● যৌগিক ব্যায়াম কি দরকার?

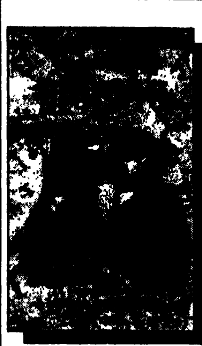
যৌগিক ব্যায়াম সকলের পক্ষেই ভাল। তবে ব্লাডপ্রেসারের রোগীদের জন্য শীর্ষাসন জাতীয় ব্যায়াম না করাই ভাল। মানসিক দুর্ভাবনা, পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক প্রতিকূল অবস্থা দেহ-মনে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে হাইপারটেনশন চিকিৎসায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। এসবের জন্য যৌগিক ব্যায়াম ও সাধন-ভজন অনেক ক্ষেত্রে খুবই উপকারে আসে।

● উপসংহার

যে যুগ্মসভার কথা আগে বলা হয়েছে, তাঁরা জনসাধারণকে ব্লাডপ্রেসার আয়ত্তে রাখার জন্য বিশেষ আবেদন জানিয়েছেন। রক্তের উচ্চচাপ বা হাইপারটেনশন ক্যান্সার বা এইডস (AIDS) জাতীয় অসুখের মতো 'আকর্ষক' ধরনের ব্যাধি না হলেও তার জন্য জটিলতা-প্রসূত সাঙ্ঘাতিক অবস্থাগুলি প্রতি বছর ওদের চেয়েও অনেক গুণ বেশি মানুষের অকালমৃত্যুর কারণ। তার জন্য শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক ক্ষতিও সীমাহীন। অথচ আজ নিঃসন্দেহে এটিও প্রমাণিত হয়েছে যে, সুচিকিৎসার দ্বারা ব্লাডপ্রেসার আয়ত্তে রাখলে উচ্চচাপের জন্য সংঘটিত হার্টের বা শরীরের অন্যান্য স্থানের (মস্তিষ্ক, কিডনী ইত্যাদি) ধমনী ও মহাধমনীর অসুখ দূরে রাখা খুবই সম্ভব। দুঃখের কথা হলো, এসব জানা সত্ত্বেও অনেকেই (এর মধ্যে বহু চিকিৎসকও আছেন) এবিষয়ে মাথা ঘামাতে চান না। ফলে অসংখ্য মানুষ এখনো হাইপারটেনশনের শিকার হচ্ছেন। বহুক্ষেত্রে ব্লাডপ্রেসার মাপাই হয় না বা রোগ ধরা পড়লেও কমসংখ্যক রোগীরই চিকিৎসা হচ্ছে এবং যাঁদের চিকিৎসা হচ্ছে, তাঁদের মধ্যেও বেশির ভাগেরই সুচিকিৎসা ও তত্ত্বাবধানের অভাবে ব্লাডপ্রেসার আয়ত্তে থাকছে না। তাই আর দেরি না করে সকলকে আজ এগিয়ে আসতে হবে মানুষের আপাতনীরব এই মহাশত্রুকে দমন করার লক্ষ্যে। ❑

বাল্মীকি রামায়ণের বঙ্গানুবাদ

লোকনাথ চক্রবর্তী



রামায়ণম্ (২ খণ্ডে)
অনুবাদ, আলোচনা ও সম্পাদনা :
ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী
প্রকাশক : চন্দন মাইতি
নিউলাইট
১০/২বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯
পৃষ্ঠা :
১ম খণ্ড—৮৪+৮৪৪
২য় খণ্ড—৮৮+৯২৪
মূল্য : প্রতি খণ্ড ৩০০ টাকা

রামায়ণের বঙ্গানুবাদ এখন সুলভ, তবে বঙ্গবাসী সংস্করণের যে অগ্রণী ভূমিকা মূলত পঞ্চানন তর্করত্নের আনুকূল্যে হয়েছিল, আজো তার মহিমা অক্ষুণ্ণই আছে। ভাষা জানা মানুষের পক্ষে কোন অনুবাদকর্ম পছন্দ হওয়া খুব শক্ত, কারণ সব ভাষারই নিজস্ব প্রাণস্পন্দন আছে। শুধু ব্যাকরণ ভেঙে তাই ভাষার মর্ম স্পর্শ করা যায় না। একই শব্দের নানা ব্যবহার, যতি, স্বরবিন্যাস এবং সর্বোপরি বক্তার অভিপ্রায়ের অলিগলিতে সাবলীল সঞ্চরণ করতে না পারলে নিজের বোধেই ভুল থেকে যাবে। আমরা তখন অন্যদের কাছে সেই কথা ঠিকমত পৌঁছে দেব কি করে? এই সমস্যা জটিলতর হয় যদি মূল বিষয়টি হয় প্রাচীন কোন ভাষা এবং তার অনুবাদ হয় আধুনিক ভাষায়। বাঙলা ভাষা তার গতিময়তায় নিত্য বিবর্তিত হচ্ছে। নিজের অনুভবকে সঠিক শব্দে ব্যক্ত করে অপরের পৌঁছে দেওয়ার যে মসৃণ শক্তি আজ তার রয়েছে, তার হাত ধরেই কিন্তু এখন বাঙালী জীবনযাপন করে। সে-অর্থে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে বাঙালীর পরিচয়ের সুযোগ প্রায় নেই। তাই যাঁরা কোন উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ অনুবাদে ব্রতী হন, তাঁদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। যেমন মূল সংস্কৃতের সঠিক ভাবকে বজায় রেখে সমকালীন পাঠকের কাছে সাবলীল গ্রহণযোগ্যতা তাঁকে অর্জন করতে হয়। রাজশেখর বসু ও উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এব্যাপারে দিগ্‌দর্শন করেছেন। বাঙলায় রামায়ণের যথাযথ অনুবাদ মূল-সহ বাঙালীকে উপহার দিয়েছিলেন শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ তাঁর 'আর্যশাস্ত্র' পত্রিকার মাধ্যমে। সেটা ১৩৭০ বঙ্গাব্দে মহামহোপাধ্যায় কালীপদ তর্কাচার্য ও শ্রীজীব ন্যায়তীর্থের সম্পাদনায় মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে হলেও রামায়ণের একটি প্রামাণিক বঙ্গানুবাদ আমাদের হাতে এসেছিল।

বলা বাহুল্য, দুজন দিকপাল সংস্কৃতজ্ঞের পরিবেশন সংস্কৃতের প্রতিবেশী বাঙলায় হয়েছিল। তার সুফল হলো এই যে, একটু প্রাচীন বাঙলা জানা লোকের কাছে বাল্মীকির ঠিক কথাটা পৌঁছে যাওয়ার একটা রাস্তা খোলা রইল। কিন্তু আজকের বামাচারিণী বাঙলার ভরসায় এগোলে 'আর্যশাস্ত্র'-এ প্রকাশিত রামায়ণের অনেক স্থলেই আমাদের গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে। এই অবস্থায় হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য মূল বাদ দিয়ে শুধু বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। এরও একটা পাঠক-সমাজ আছে। গভীর ও খুঁটিনাটি সব জানায় তাঁদের কোন দায়বদ্ধতা বা রুচি কোনটাই নেই। এঁদের চাহিদা নারায়ণচন্দ্র চন্দ্রও তাঁর রামায়ণের অনুবাদে পূরণ করেছেন।

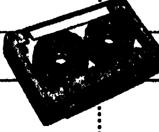
সম্প্রতি ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী কৃত রামায়ণের বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ধ্যানেশবাবু কথ্য বাঙলায় অনুবাদ করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন গ্রন্থের সূত্রে রামায়ণ বিষয়ে অনেক তথ্য আহরণ করে একত্রে পরিবেশন করেছেন। ডঃ চক্রবর্তী গ্রন্থের দীর্ঘ ও ঋদ্ধ 'ভূমিকা'য় ভারতে ও বহির্ভারতে বিভিন্ন ভাষায় যে রামপ্রসঙ্গ চর্চিত হয়েছে, তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উপহার দিয়েছেন এবং শ্রীওঙ্কারনাথদেব রচিত 'শ্রীশ্রীরামনামমাহাত্ম্য' গ্রন্থটির নির্যাস উপস্থাপন করেছেন। তার ফলে রামায়ণ পড়ার আগেই অনেক শাস্ত্রের সূত্রে রামমহিমা আমাদের জানা হয়ে যাচ্ছে।

ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী তাঁর গ্রন্থে মূল সংস্কৃতটি বজায় রাখায় এর গাম্ভীর্য ও গুরুত্ব অনেক বেড়েছে। দুই খণ্ডে প্রকাশিত এই বিশালাকার অনুবাদকর্মের পাশাপাশি তিনি রামায়ণের কিছু ব্যতিক্রমী আলোচনা উপস্থিত করেছেন। যেমন বহির্ভারতে রামকথা, রামায়ণে নদী, রামায়ণের যুদ্ধাস্ত্র। ডঃ চক্রবর্তী পৌরাণিক স্থাননির্দেশিকা সংযোজিত করে জিজ্ঞাসু পাঠকের আগ্রহ বৃদ্ধি করেছেন।

আমরা জানি, সুখময় ভট্টাচার্য শাস্ত্রী 'রামায়ণের চরিতাভিধান' রচনা করেছিলেন। সেই আদর্শে এখানেও প্রাপ্তি হয়েছে 'রামায়ণী চরিতাভিধান' শীর্ষক অধ্যায়। ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত হয় অমলেশ ভট্টাচার্যের 'রামায়ণ কথা'। সেখানে আমরা প্রথম প্রাচীন আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যের একটি মানচিত্র পাই। ধ্যানেশবাবুর পরিবেশনায় 'পৌরাণিক মানচিত্র' পাওয়া

গেল। সব মিলে এ এক অসম্ভবকে সম্ভব করার দুরূহ ব্রতে অনুবাদক উত্তীর্ণ হয়েছেন। গ্রন্থের বাঁধাই এবং কাগজ ভাল। রামায়ণের একটি সমকালীন বাঙলা সংস্করণের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও প্রকাশক সকলেই এবিষয়ে উদাসীন ছিলেন। বিদ্যাব্রতী ধ্যানেশবাবু একক চেষ্টায় এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য যে শ্রমের স্বাক্ষর রেখেছেন, ইতিহাস তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান নিশ্চয়ই দেবে। আরেকটি কথা, পাঠকের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে আগামী সংস্করণে মুদ্রণপ্রমাদ কমাতে পারলে গ্রন্থটির প্রামাণিকতা আরো বাড়বে। ❑

ক্যাসেট সমালোচনা



'মা নামে কি জাদু আছে'

তপনকান্তি ঘোষ



শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে
পরিবেশক : সুরপীঠ
কথা : কাজী নজরুল ইসলাম, স্বামী জীবানন্দ, স্বামী চণ্ডিকানন্দ, অরুণকৃষ্ণ ঘোষ, শচীন্দ্রনাথ বসু, প্রচলিত
কণ্ঠে : অরুণকৃষ্ণ ঘোষ, চণ্ডীদাস মাল, সুশান্ত দত্ত, সঙ্গীতা দত্ত
সুর : অরুণকৃষ্ণ ঘোষ
আবহ সঙ্গীত : দিলীপ রায়
গ্রন্থনা-ভাষ্যকার : দীপক শীল
প্রযোজনা : পার্থ ব্যানার্জী
মূল্য : ৩০ টাকা

বেহালার 'অডিও সেন্টার' স্টুডিও প্রকাশিত 'সুরপীঠ'-এর শ্রদ্ধাঞ্জলি 'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে' অডিও ক্যাসেটটির প্রতি ভাগে পাঁচখানি করে মোট দশটি গান আছে। ক্যাসেটটি শুরু হয়েছে স্বামী জীবানন্দ রচিত এবং সুশান্ত দত্ত ও সঙ্গীতা দত্তের দ্বৈতকণ্ঠে গীত 'বিশ্বকল্যাণ মূর্তিং' গানটি দিয়ে। ক্যাসেটের শেষ গানটিও মিলিত কণ্ঠে। প্রথম ভাগের অন্যান্য গানগুলির মধ্যে আছে স্বামী চণ্ডিকানন্দ রচিত 'সবারই মা হয়ে' এবং অরুণকৃষ্ণ ঘোষ রচিত 'শ্রীমাকে তো বোঝা যায় না', 'আমার আনন্দময়ী মা', 'মা নামে কি যাদু আছে' এবং 'তুমি ছাড়া মা গো'। দ্বিতীয় ভাগে আছে কাজী নজরুল ইসলাম রচিত 'আমায় কর কর পার', শচীন্দ্রনাথ বসুর 'নমো নমো নমো জননী সারদা' এবং অরুণকৃষ্ণ ঘোষের 'আমার কতদিন তো'। এছাড়া 'ওমা এসেছি নিকটে' ও 'বল রে দুর্গানাম' গান-দুটি প্রচলিত।

প্রথিতযশা প্রবীণ শিল্পী অরুণকৃষ্ণ ঘোষের বলিষ্ঠ, সুরেলা ও মার্জিত কণ্ঠে নিবেদিত পাঁচখানি গান পরিপূর্ণতায় অনবদ্য। টপ্পা ও পুরাতনী সঙ্গীত-বিশারদ চণ্ডীদাস মালের গাওয়া 'তুমি ছাড়া মাগো' এবং 'সবারই মা হয়ে' অত্যন্ত রসোত্তীর্ণ হয়েছে। সুকণ্ঠের অধিকারী সুশান্ত দত্তের গাওয়া 'আমার আনন্দময়ী মা' গানটিতে অপরূপ সমর্পণ ফুটে উঠেছে। সঙ্গীতা দত্তের কণ্ঠে কাজী নজরুল ইসলামের স্বল্প-পরিচিত 'আমায় কর কর পার' গানটি ভাল লাগবে।

প্রতিটি গানের সুন্দর কথা, সুর ও শিল্পীর দরদী কণ্ঠে উপস্থাপনের ছন্দোময় মেলবন্ধন মন কাড়বে। ভাষ্যকার দীপক শীলের উপস্থাপনা পরিচ্ছন্ন ও উপভোগ্য। দিলীপ রায়ের যন্ত্রানুষঙ্গ পরিবেশনা গানগুলির ভাবানুগ ও প্রশংসনীয়। শব্দগ্রহণ উচ্চ মানের। এটি সংগ্রহে রাখার মতো ক্যাসেট। ক্যাসেটটির নাম 'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে'। এই নামকরণ নিশ্চয় স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সম্পাদিত ঐ নামে জনপ্রিয় সুপরিচিত গ্রন্থের অনুসরণেই। ❑

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি : সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠানাদি ও পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য উৎসব-অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির কিংবা পরলোকপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের দপ্তরে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব অনুষ্ঠান

বেলুড় মঠে গত ৪ মার্চ ২০০১ মহাসমারোহে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথির সাধারণ উৎসব পালন করা হয়। সারাদিনে প্রায় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়েছিল। দুপুরে প্রায় ৩২,০০০ ভক্তকে হাতে হাতে খিচুড়ি প্রসাদ দেওয়া হয়।

স্বামীজীর পৈতৃক বাটীতে (কলকাতা-৭০০০০৬) গত ১০ মার্চ ২০০১ পরিকল্পিত সংস্কৃতিকেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। সভায় ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ ও ভারতের তৎকালীন বিদেশ প্রতিমন্ত্রী অজিতকুমার পাঁজা। স্বাগত-ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। উদ্বোধন ও সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন যথাক্রমে স্বামী অনিমেষানন্দ ও স্বামী সর্বগানন্দ। সভাশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী বিশোকানন্দ। অনুষ্ঠানে বহু সাধু-ব্রহ্মচারী, উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

রামকৃষ্ণ মঠ, বৃন্দাবন (মথুরা, উত্তরপ্রদেশ) গত ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ মার্চ ২০০১ বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ৬ ফেব্রুয়ারি বিশেষ পূজার মাধ্যমে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারি শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামীজীর জীবনী ও বাণীর ওপর সংস্কৃত, হিন্দি ও ইংরেজী ভাষায় আবৃত্তি ও বক্তৃতা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে প্রায় ৮০০ ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। ২৫ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, বেদ ও চণ্ডী পাঠ, ভজন-কীর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব-তিথি উদ্‌যাপিত হয়। এদিন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম হাসপাতালে 'রোগীনারায়ণ' পূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় ৩০০ সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণবদের বস্ত্র ও সদক্ষিণা ভাণ্ডারা দেওয়া হয় এবং প্রায় ১,০০০ ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। ২৬-২৮ ফেব্রুয়ারি স্বামী রাজেশ্বরানন্দ সরস্বতী 'রামচরিতমানস'-এর ওপর আলোচনা করেন। ৪ মার্চ চণ্ডীগড় রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী পীতাম্বরানন্দের পৌরোহিত্যে একটি ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। সভাশেষে ১৮ ফেব্রুয়ারি আয়োজিত প্রতিযোগিতার বিজয়ী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ৫-৭ মার্চ মঠের সভাগৃহে রাসলীলা প্রদর্শিত হয়। পরিবেশন করেন বৃন্দাবনের নিকুঞ্জবিহারী রাসলীলা মণ্ডল।

রামকৃষ্ণ মিশন (পোর্টব্লেয়ার, আন্দামান) গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বৈদিক স্তোত্রপাঠ, ভক্তিগীতি, বিশেষ পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ভোরে দুলাল মজুমদারের পরিচালনায় বৈদিক স্তোত্রপাঠ করে আশ্রম-ছাত্রাবাসের ছাত্রবৃন্দ। সকালে ভজন পরিবেশন করেন দুলাল মজুমদার। দুপুরে প্রায় ৬০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। স্থানীয় উপ-রাজ্যপাল ও পুলিস মহানিরীক্ষক সস্ত্রীক মন্দিরে উপস্থিত হয়ে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন এবং বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষ্যে গত ৪ মার্চ সাধারণ উৎসবে 'কথামৃত' থেকে বাঙলা ও হিন্দিতে পাঠ করেন যথাক্রমে ব্রহ্মচারী সৌমেন এবং ব্রহ্মচারী রবীন্দ্র। পরে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী হরিদেবানন্দ ও আশ্রম-সম্পাদক স্বামী অমৃতরূপানন্দ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন দুলাল মজুমদার।

রামহরিপুর আশ্রম (জেলা—বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৩-২৬ মার্চ ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬৬তম জন্মতিথি উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের বার্ষিক আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপন করে। ২৩ মার্চ বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও শঙ্খধ্বনি সহযোগে প্রদীপ জ্বালিয়ে তিনদিনব্যাপী উৎসবের উদ্বোধন করেন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় প্রায় সহস্রাধিক ভক্ত নরনারী, যুবক ও বালক-বালিকা অংশগ্রহণ করে। এদিনের সভায় উদ্বোধনী-সঙ্গীত পরিবেশন করে আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র সম্রাট খান। প্রথম দিন ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দ ও স্বামী বলভদ্রানন্দ। ধর্মসভার পর 'গানে গানে কথামৃত'-এ অংশগ্রহণ করেন সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও সঙ্গীতশিল্পী সুব্রত ভট্টাচার্য। পদাবলী কীর্তন পরিবেশন করেন সাধন অধিকারী ও সম্প্রদায়। রাত্রে কলকাতার 'সতী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন' 'নরনারায়ণ' যাত্রাপালা পরিবেশন করে।

দ্বিতীয় দিনের ধর্মসভায় উদ্বোধন-সঙ্গীত পরিবেশন করে আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্র সম্রাট সরকার। সভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দ, স্বামী বলভদ্রানন্দ এবং সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। সভান্তে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত ভট্টাচার্য ও রেবতীভূষণ মণ্ডল। রাত্রে আশ্রম-ছাত্রাবাসের ছাত্রবৃন্দ 'ভক্ত ধ্রুব' এবং 'সতী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন' 'ভক্ত গিরিশচন্দ্র' নাটক পরিবেশন করে।

তৃতীয় দিন সকালে পদাবলী কীর্তন পরিবেশন করেন অখিলবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়। এদিন প্রায় ১৮,০০০ ভক্ত নরনারী বসে খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। এদিনের ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দ, স্বামী বলভদ্রানন্দ ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। সভাশেষে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী বলভদ্রানন্দ ও রেবতীভূষণ মণ্ডল। রাত্রে 'বিড়রা ইউনাইটেড যুব সঙ্ঘ' 'পৃথিবী স্বর্গ নরক' যাত্রাপালা পরিবেশন করে। প্রতিদিনের ধর্মসভায় স্বাগত-ভাষণ দান এবং সভাপতিত্ব করেন আশ্রম-সম্পাদক স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ। প্রসঙ্গত, এই উৎসবকে কেন্দ্র করে আশ্রম-প্রাঙ্গণের বাইরে একটি মেলাও আয়োজিত হয়।

তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ (জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৫-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১৬৬তম জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। উৎসবে প্রায় ১২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। প্রত্যহ সন্ধ্যারতির পর স্বামী সত্যস্থানন্দ, স্বামী পরব্রহ্মানন্দ, স্বামী গোবিন্দানন্দ, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ, স্বামী দুর্গাত্মানন্দ, স্বামী সর্বলোকানন্দ এবং অধ্যাপক সুভাষ মান্না শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া ভক্তিগীতি, বাউলগান, রামায়ণ গান ও পালাকীর্তন পরিবেশিত হয়।

রামকৃষ্ণ মিশন শিল্পমন্দির (সারদাপীঠ, বেলুড়) গত ২০ মার্চ ২০০১ 'নতুন সহস্রাব্দে শিল্প ও যন্ত্রবিদ্যা শিক্ষার পরিবর্তিত প্রত্যক্ষ রূপ' বিষয়ে এক আলোচনাসভায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ এবং কয়েকজন বিশেষজ্ঞ ভাষণ দান করেন।

ছাত্র-কৃতিত্ব

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ২০০০ সালের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় **বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের (চেন্নাই বিদ্যাপীঠ)** ছাত্ররা বি.এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে ১ম স্থান এবং বি. এসসি.-তে পদার্থবিদ্যায় ৩য় স্থান অধিকার করেছে। এছাড়া এম. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান; দর্শনে ৩য় স্থান; অর্থনীতিতে ৭ম স্থান এবং এম. এসসি. পরীক্ষায় পদার্থবিদ্যায় ৭ম ও ১০ম স্থান; উদ্ভিদবিজ্ঞানে ১ম, ২য় ও ৮ম স্থান অধিকার করেছে।

সেবাব্রত

চক্ষু-চিকিৎসা শিবির

আগরতলা আশ্রম (পশ্চিম ত্রিপুরা) গত ২২-২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০১ একটি চক্ষু-চিকিৎসা শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ১০০ জনের চোখ পরীক্ষা করে ওষুধ দেওয়া হয় এবং ২৩ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়।

পোরবন্দর আশ্রম (গুজরাট) গত ১৫ মার্চ ২০০১ একটি চক্ষু-চিকিৎসা শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ২৬০ জনের চোখ পরীক্ষা করা হয় এবং ১৭ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়।

আলসুর আশ্রমের (কর্ণাটক) পরিচালনায় গত ১৭ মার্চ ২০০১ একটি চক্ষু-চিকিৎসা শিবির আয়োজিত হয়। শিবিরে ১৬৪ জনের চিকিৎসা করা হয় এবং ৪৪ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়।

গুজরাট ভূমিকম্প ত্রাণ

রাজকোট, পোরবন্দর ও লিমডি আশ্রমের মাধ্যমে কচ্ছ, রাজকোট, জামনগর, পোরবন্দর ও সুরেন্দ্রনগর জেলার ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হাজার হাজার মানুষের মধ্যে রান্না-করা খাবার, শুকনো খাবার, পানীয় জল, তার্পোলিন, কম্বল, পোশাক-পরিচ্ছদ, রক্ত, জ্বালানি কাঠ প্রভৃতি বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ভুজে একটি চিকিৎসা-শিবিরও খোলা হয়েছে।

প্রাথমিক ত্রাণের পর রামকৃষ্ণ মিশন রাজকোট, পোরবন্দর ও লিমডি জেলায় ২৫০টি বাড়ি, ৫টি বিদ্যালয়ভবন, ১টি হলঘর, ১টি প্রার্থনাগৃহ ও ৩০০ বাড়ি (নিজের বাড়ি নিজে তৈরি কর প্রকল্পে) নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

পুনর্বাসন

ওড়িশা ঝঞ্ঝা পুনর্বাসন

বেলুড় মঠ জগদীশপুর জেলার কানাগুলি গ্রামের ঝঞ্ঝায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য ইতিপূর্বে বহু বাড়ি নির্মাণ করে দিয়েছে। গত ৬ মার্চ ২০০১ আরো ৬৬টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

বহির্ভারত

মন্দির-প্রতিষ্ঠা

গত ২৭-৩০ মার্চ ২০০১ চারদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে **বাগেরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (বাংলাদেশ)** নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের উদ্বোধন-উৎসর্গ উৎসব এবং আশ্রমের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসব সম্পন্ন হয়। উৎসবের প্রথম দিন সন্ধ্যা ৮টায় ৭৫টি প্রদীপ প্রজ্বলন এবং আশীর্বচন দানের মাধ্যমে উৎসবের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। তার আগে সন্ধ্যা ৭টায় প্রেমানন্দ ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথির ভাষণ দান করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাগেরহাট পৌরসভার সভাপতি আতাহার হোসেন। উদ্বোধন অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল—'মানবজীবনে ধর্মের প্রয়োজন'। মুখ্য আলোচক ছিলেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। সভায় পৌরোহিত্য করেন ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী অক্ষরানন্দজী।



বাগেরহাটে নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির

দ্বিতীয় দিন (২৮ মার্চ ২০০১) পূর্বাহ্নে বাস্তুযাগ পরিচালনা করেন ডঃ হরিপদ আচার্য। সকাল ১০টায় আশ্রম ছাত্রাবাসের প্রাক্তন ছাত্রসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে বাংলাদেশ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ দুর্গাদাস ভট্টাচার্য এবং বাগেরহাটের অন্যতম সাংসদ মীর সাখাওয়াত আলী দারু। অন্যান্য অতিথি-বক্তাদের

মধ্যে ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহকারী সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দজী, বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী স্বামী শুদ্ধরূপানন্দ প্রমুখ।

এদিন সান্ধ্য অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল—'শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবন ও বাণী'। সভায় পৌরোহিত্য করেন সিলেট উমেশচন্দ্র নির্মলাবালা ছাত্রাবাসের পরিচালিকা সুহাসিনী দাস। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। মুখ্য আলোচক ছিলেন কলকাতার লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের বাঙলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ডিরেক্টর ডঃ মারুফী খান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন দিনাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অমৃতত্বানন্দ, জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী অমেয়ানন্দ, ময়মনসিংহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সর্বেশ্বরানন্দ, বাগেরহাট সরকারি প্রফুল্লচন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের প্রভাষিকা অধ্যাপিকা বিষ্ণুপ্রিয়া সাহা, বাগেরহাট সরকারি মহিলা মহাবিদ্যালয়ের প্রভাষিকা অধ্যাপিকা ফতেমা হেরেন মালা।

২৯ মার্চ ২০০১ সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে নতুন মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। প্রতিষ্ঠার পর পূজাপর্ব পরিচালনা করেন স্বামী বৈদ্যনাথানন্দ। সান্ধ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল—'শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির'। প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। মুখ্য আলোচক ছিলেন স্বামী প্রমেয়ানন্দজী। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী অক্ষরানন্দজী, মনসাদ্বীপ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শান্তিদানন্দ, সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বিশ্বনাথানন্দ, সমাজসেবী মহম্মদ সেলিম প্রমুখ।

৩০ মার্চ ২০০১ সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে এক বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অগণিত মানুষ অংশগ্রহণ করেন। এদিন সকাল ১০টায় আয়োজিত অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল—'রামকৃষ্ণ মিশনের লক্ষ্য'। সভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। মুখ্য আলোচক ছিলেন স্বামী সুহিতানন্দজী। এদিনের সান্ধ্য অধিবেশন তথা সমাপ্তি অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল—'সমন্বয় ও শান্তি'। সভায় আশীর্বচন দান করেন শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। পৌরোহিত্য করেন স্বামী অক্ষরানন্দজী। প্রধান অতিথির ভাষণ দান করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ এস. এ. মালেক। বিভিন্ন ধর্মের পক্ষ থেকে ভাষণ দান করেন কুমিল্লা কনকস্তূপ বৌদ্ধবিহারের অধ্যক্ষ ধর্মরক্ষিত মহাথেরো, খুলনা সেন্ট জোশেফ ক্যাথিড্রাল চার্চের ফাদার রেভারেন্ড মার্টিন মণ্ডল, স্থানীয় একটি মাদ্রাসার শিক্ষক মৌলানা ইদ্রিশ আলী খান, দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী সুবীরানন্দ এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

বিভিন্ন দিন বিভিন্ন শিল্পীরা সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। উৎসবে ভারত ও বাংলাদেশ থেকে ৩৩ জন সাধু-ব্রহ্মচারী এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে হাজার হাজার ভক্ত নরনারী অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উৎসব উপলক্ষ্যে একটি শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিলেন। অনুষ্ঠানের অধিবেশনগুলিতে স্বাগত-ভাষণ প্রদান করেন বাগেরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পরদেবানন্দ।

ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম গত ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ২ মার্চ ২০০১ পর্যন্ত ছয়দিনব্যাপী বার্ষিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করেন। উৎসবের বিভিন্ন দিনে বাংলাদেশের জলসম্পদ মন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক, রাষ্ট্রমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া এবং ভারতবর্ষ, ভ্যাটিকান ও নেপালের রাষ্ট্রদূতগণ অংশগ্রহণ করেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বহু নরনারী উৎসবে অংশগ্রহণ করেন।

অস্ট্রেলিয়ায় রামকৃষ্ণ মঠের সিডনি কেন্দ্রের ঠিকানা পরিবর্তিত হয়েছে। নতুন ঠিকানা : Vedanta Centre of Sydney, 62 Redmyre Road, Strathfield, NSW 2135, Australia.

বেদান্ত সোসাইটি অফ সেন্ট লুইস (আমেরিকা) : গত এপ্রিল মাসের পাঁচটি রবিবার বিভিন্ন ধর্মীয় বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তিনটি মঙ্গলবার বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ এবং চারটি বৃহস্পতিবার স্বামীজীর 'ভক্তিযোগ' পাঠ ও আলোচনা করেন সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দ।

দেহত্যাগ

স্বামী জনার্দনানন্দজী (যজ্ঞেশ্বর মহারাজ) গত ১১ মার্চ ২০০১ রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে প্রয়াণ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ব্রঙ্কিয়াল হাঁপানিতে ভুগছিলেন। এজন্য তাঁকে ২ বছর শয্যাশায়ী থাকতে হয়। তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৩৮ সালে তিনি শিলচর আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৪৮ সালে শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদান-কেন্দ্র ভিন্ন তিনি বৃন্দাবন, কনখল ও গড়বেতা কেন্দ্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ প্রথমে বেলুড় মঠ, তারপর পুরী মঠ এবং অবশেষে বারাণসী অদ্বৈত আশ্রমে অবসরজীবন যাপন করছিলেন। অনাড়ম্বর ও মধুর স্বভাবের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব তিথি পালন : গত ২৮ এপ্রিল ২০০১ শঙ্করাচার্যের জন্মতিথিতে তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দ।

গত ৭ মে ২০০১ বুদ্ধপূর্ণিমায় 'ভগবান বুদ্ধ প্রসঙ্গ' আলোচনা করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা : যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

চৌধুরীহাট বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের (জেলা—কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ) সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গত ৪-১১ জানুয়ারি ২০০১ বর্ষব্যাপী উৎসবের শেষ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে। নাটক, সঙ্গীত, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, যাত্রা, কৃষিপ্রশিক্ষণ শিবির, বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা, নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন, স্মরণিকা প্রকাশ প্রভৃতি ছিল এই পর্বের প্রধান অঙ্গ। উৎসবের উদ্বোধন এবং ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দ। বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ শ্রীকুমার মুখার্জী। পতাকা উত্তোলন করেন বিদ্যামন্দিরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সুধীরকুমার ব্যানার্জী।

রসুলপুর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (জেলা—বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৬-৭ জানুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করে। এই উপলক্ষ্যে প্রথমদিন প্রভাতফেরি, ভক্তিগীতি, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। বিকালের ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন স্বামী সনাতনানন্দ, ভাষণ দেন স্বামী ব্রহ্মাপদানন্দ। সন্ধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলারতি, 'গীতা' ও 'চণ্ডী' পাঠ, বিশেষ পূজা, হোম। দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মোক্ষপ্রিয়ানন্দ, স্বামী শান্তানন্দ ও ডঃ জয় ভট্টাচার্য। সভান্তে বর্ধমান নাট্যগোষ্ঠী শ্রুতিনাটক পরিবেশন করে।

বিবেক চেতনা (কেয়াতলা রোড, কলকাতা-৭০০০২৯) এবং 'দ্বিজপদ স্মৃতি সঙ্ঘ' (কুন্তিয়া, জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ)-এর যৌথ উদ্যোগে গত ৬-৮ জানুয়ারি ২০০১ কুন্তিয়ায় 'বিবেকানন্দ মেলা' আয়োজিত হয়। মেলার উদ্বোধন করেন প্রব্রাজিকা ভক্তিপ্রাণা। বক্তব্য রাখেন প্রব্রাজিকা সচ্চিৎপ্রাণা, ডঃ শিবশঙ্কর চক্রবর্তী ও শীলা সেন। শোভাযাত্রা, ব্রতচারী নৃত্য, নাটক প্রভৃতি ছিল মেলার অঙ্গ। কুন্তিয়ার 'অঞ্জলি' শিল্পগোষ্ঠী 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য প্রদর্শন করে।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র (আদ্রা, জেলা—পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৭ জানুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে আলোচনা করেন বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিবেকাত্মানন্দ ও আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী গিরিশানন্দ। ভক্তিমূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন সমীরণ মাকড়, নারায়ণ দেওঘরিয়া প্রমুখ। 'গীতা', 'কথামৃত' এবং 'মায়ের কথা' থেকে পাঠ করেন যথাক্রমে এন. কে. সুর, কার্তিকচন্দ্র কোলে ও পারুল কোনার। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্যামল কুণ্ডু।

গোবরডাঙা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘের (খাঁটুরা, জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ) পরিচালনায় এবং রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় গত ৭ জানুয়ারি ২০০১ বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে দুটি অধিবেশনে পৌরোহিত্য করেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দ ও স্বামী বলভদ্রানন্দ। ভাষণ দেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, সুনীলবিহারী ঘোষ এবং সঙ্ঘ-সম্পাদক ভুবন রায় সরস্বতী। এদিন সঙ্ঘের মুখপত্র 'দধীচি' প্রকাশিত হয়। এই উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সহযোগিতায় বন্যাপীড়িত ৫০টি পরিবারের মধ্যে শীতবস্ত্র ও কম্বল বিতরণ করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত প্রায় ৯০০ যুব-প্রতিনিধিকে দুপুরে প্রসাদ দেওয়া হয় এবং ইনস্টিটিউট অফ কালচারের তরফে প্রত্যেক প্রতিনিধিকে বই ও ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ছবি দেওয়া হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির, রায়বাড়ি (অশ্বিনীনগর, কলকাতা-৭০০০৫৯)-এর উদ্যোগে গত ৭ জানুয়ারি ২০০১ একটি ভক্তসম্মেলন আয়োজিত হয়। সম্মেলনের সূচনায় মাতৃসঙ্ঘের সদস্যাবৃন্দ বেদমন্ত্র পাঠ ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এরপর সারদা মিশন বিবেকানন্দ পাঠভবনের সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণা ভক্তসম্মেলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। তারপর শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী থেকে পাঠ করা হয়। ভজন পরিবেশন করেন পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী, নিমাই প্রামাণিক ও স্মিতা প্রামাণিক। ভজনান্তে জপ-ধ্যান অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় অধিবেশনে 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ করা হয়। এরপর 'উপনিষদের বার্তা' বিষয়ে আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক স্বামী বন্দনানন্দজী মহারাজ এবং বারাসত রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মুক্তিকামানন্দ। তাঁরা ভক্তদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান করেন। সম্মেলনে ১৬৫ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ সঙ্ঘ (ঘোষপাড়া, বালি, জেলা—হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৭ জানুয়ারি ২০০১ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করে। এই উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, হোম, 'কথামৃত' পাঠ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী সত্যস্থানন্দ। সভাশেষে দরিদ্র মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয় এবং সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ (বারাকপুর, জেলা—উত্তর চব্বিশ পরগনা) গত ৭ জানুয়ারি ২০০১ মঙ্গলারতি, নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভজন, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব পালন করে। সকালের অধিবেশনে ভাষণ দান করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। বিকালের অধিবেশনে অখিল ভারত বিবেকানন্দ শিক্ষা

পরিষদের সম্পাদক শম্ভু মণ্ডল ও অরিন্দম চট্টোপাধ্যায় আলোচনা করেন।

ভক্ত সঙ্ঘ (চাম্পাহাটী, জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) গত ৭ জানুয়ারি ২০০১ শ্রীশ্রীমায়ের আবির্ভাব উৎসব পালন করে। এই উপলক্ষ্যে 'কথামৃত', 'ভাগবত' পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সকালে শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। বিকালের ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন নরেন্দ্রপুর আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ স্বামী সুপর্ণানন্দ। সভান্তে নরেন্দ্রপুর আবাসিক ছাত্রেরা মাতৃসঙ্গীত পরিবেশন করে। প্রায় ৩৫০ জন ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মানবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

বিবেকানন্দ পাঠচক্র (মধু রায় লেন, কলকাতা-৭০০০০৬) গত ১১ জানুয়ারি ২০০১ সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে কলকাতার মহাজাতি সদনের সেমিনার হল-এ (অ্যানেক্স বিল্ডিং) 'অমিয়কুমার মজুমদার স্মারক বক্তৃতা'র আয়োজন করে। স্মারক-বক্তৃতা প্রদান করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। সভাপতিত্ব করেন ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা। বক্তৃতার বিষয় ছিলঃ 'বিবেকানন্দ ও ধর্ম'। অনুষ্ঠানে সংযোজিকার ভূমিকা পালন করেন অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত। সভায় বিপুল শ্রোতৃসমাগম হয়। পাঠচক্র স্বামী বিবেকানন্দের ১৩৯তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে এই স্মারক-ভাষণ ভিন্ন ৭, ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৬ জানুয়ারি বিভিন্ন স্থানে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ১৩ জানুয়ারি আদ্যাপীঠ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক ব্রহ্মচারী মুরালভাই এবং ১৪ জানুয়ারি স্বামী পূর্ণানন্দ (কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ যোগোদ্যান মঠ) প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন।

বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি (সাহিত্য পরিষদ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৬) এবং **বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের (আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৬)** যৌথ উদ্যোগে 'সাহিত্য পরিষদ ভবন'-এ গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ বেলা সাড়ে চারটায় স্বামী বিবেকানন্দের ১৩৯তম জন্মজয়ন্তী ও 'জাতীয় যুবদিবস' উপলক্ষ্যে এক সাধারণসভা আয়োজিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সভার উদ্বোধন করেন অধ্যাপক ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্তী। প্রধান অতিথির ভাষণ দান করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। স্বাগত-ভাষণ, শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, রচনা পাঠ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক কল্যাণকুমার রায়, জন্মোৎসব সমিতির সাধারণ সম্পাদক ধীরাজ বসু, মঞ্জুলা মুখোপাধ্যায় এবং ডঃ বিমল চট্টোপাধ্যায়। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন অরুণকৃষ্ণ ঘোষ।

বিবেকানন্দ অবৈতনিক পাঠদান কেন্দ্র (দেশপ্রাণ শাসমল রোড, কলকাতা-৭০০০৩৩) গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ প্রভাতফেরি, পূজা ও আলোচনাসভার মাধ্যমে 'জাতীয় যুবদিবস' উদ্‌যাপন করে। আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন পাঠদান কেন্দ্রের সভাপতি ক্ষুদিরাম মান্না। ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা জিতাত্মপ্রাণা, লক্ষ্মীকান্ত জানা ও অমিতাভ সেন। অনুষ্ঠানে বহু ছাত্র ও শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ (ভাঙড়, জেলা—দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ 'জাতীয় যুবদিবস' পালন করে। এতে ক্যুইজ, আবৃত্তি, যেমন খুশি তেমন সাজো প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রায় ২৫০ ছাত্রছাত্রী যোগদান করে।

সাঁতরাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ (উত্তর বাকসাড়া, জেলা—হাওড়া) গত ১২ জানুয়ারি 'জাতীয় যুবদিবস' উপলক্ষ্যে একটি বর্ণাঢ্য পথ-পরিক্রমার আয়োজন করে। এতে প্রায় ৩৫০ জন ছাত্রছাত্রী ও যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে।

দীঘলগ্রাম বিবেকানন্দ সেবাসমিতি (জেলা—নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ 'জাতীয় যুবদিবস' উপলক্ষ্যে পূজা, প্রসাদ বিতরণ, বস্ত্র বিতরণ ও ধর্মসভার আয়োজন করে। সভায় ভাষণ দেন দেবাশিস গাঙ্গুলী, বিশ্বজিৎ ঘোষ ও দুলালচন্দ্র ঘোষ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি আশ্রম (খেপুত, জেলা—মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ বার্ষিক উৎসব এবং 'জাতীয় যুবদিবস' উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বেদ ও চণ্ডী পাঠ, বিশেষ পূজা, হোম, শোভাযাত্রা, বস্ত্র-বিতরণ, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ধর্মসভার আয়োজন করে। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন সুশীলচন্দ্র বেরা এবং ভাষণ দেন রঞ্জু ঘোষ পোড়িয়া, সুকুমার সামন্ত ও অশোক মান্না। কীর্তন পরিবেশন করেন বিষ্ণুপদ মাইতি ও সম্প্রদায়। অনুষ্ঠানে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। দুপুরে প্রায় ৭,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন মধুমিতা অধিকারী ও সম্প্রদায়। পরে তরজা গান পরিবেশন করেন বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী ও সম্প্রদায়। স্বাগত-ভাষণ ও সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আশ্রম-সম্পাদক ব্রহ্মচারী শিশির।

বিধাননগর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্রের (সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০০৬৪) উদ্যোগে গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ 'জাতীয় যুবদিবস' উপলক্ষ্যে প্রবন্ধ রচনা, বসে আঁকো, ক্যুইজ, বক্তৃতা ও আবৃত্তি প্রভৃতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সফল ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন কেন্দ্রের সভাপতি সত্যকৃষ্ণ দাশশর্মা।

সারদা সেবা সঙ্ঘ (শিবপুর, জেলা—হাওড়া) গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ 'জাতীয় যুবদিবস' উপলক্ষ্যে পথ-পরিক্রমা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এতে ৯টি বিদ্যালয়ের প্রায় ২৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়গুলিকে ২৫টি করে 'ভারতের নিবেদিতা' পুস্তক ও স্মারক প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন স্বামী পরিপূর্ণানন্দ।

তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (জেলা—কোচবিহার) গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ 'জাতীয় যুবদিবস' উপলক্ষ্যে অঙ্কন, প্রবন্ধ, শিকাগো-ভাষণ পাঠ, সঙ্গীত, ক্যুইজ, ভক্তিগীতি, যোগব্যায়াম প্রদর্শন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সেবাশ্রমের

মুখপত্র 'ওঠো জাগো' প্রকাশিত হয়। গত ১৫ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, পাঠ ও ভজন অনুষ্ঠিত হয়।

টালিগঞ্জ বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র (প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা-৭০০০৩৩) গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ 'জাতীয় যুবদিবস' উপলক্ষ্যে স্বামীজীর ছবিতে মাল্যদান ও পতাকা উত্তোলনের পর বাঙ্গুর হাসপাতালে ৮৪ জন দুঃস্থ রোগীর মধ্যে ফল, বিস্কুট ইত্যাদি বিতরণ করে। গত ১৫ জানুয়ারি এই কেন্দ্র স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে স্থানীয় কলাবাগান প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী এবং বক্তব্য রাখেন মাধবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও গৌতম দাস। সঙ্গীত পরিবেশন করেন রত্না ঘোষ।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **ডঃ তরুণ সাহা** গত ৭ ডিসেম্বর ২০০০ সকাল ৬টা ০৫ মিনিটে ৪৮ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান মঠের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি 'উদ্বোধন' পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন। তাঁর মধুর ও সৎ স্বভাবের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **স্বপ্না মুখোপাধ্যায়** গত ১৩ ডিসেম্বর ২০০০, ৫৩ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। বেলুড় মঠে তাঁর নিয়মিত যাতায়াত ছিল। ধর্মনিষ্ঠা ও সদাশয়তা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, বেহালা-নিবাসী **মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** গত ১৪ ডিসেম্বর ২০০০ বিকাল ৪টা ৩৫ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি 'উদ্বোধন'-এর বহুদিনের গ্রাহক ও অনুরাগী পাঠক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা, তিনসুকিয়া (আসাম)-নিবাসিনী **রেণুকাবালা চৌধুরী** গত ১৮ ডিসেম্বর ২০০০ ভোর ৪টা ৩০ মিনিটে ৮৩ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। অমায়িকতা ও আতিথ্যবাৎসল্য ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **মিনতি মজুমদার** গত ২১ ডিসেম্বর ২০০০, ৬০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি কাটোয়ার কুর্চি চঞ্চলা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা এবং 'উদ্বোধন'-এর দীর্ঘদিনের গ্রাহিকা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **অঞ্জলি সেন** গত ২৫ ডিসেম্বর ২০০০, ৬৭ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। বেলুড় মঠ, গদাধর আশ্রম, ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি বহু প্রাচীন সাধুর স্নেহলাভ করেছেন। তিনি 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত পাঠিকা ছিলেন। স্বনির্ভরতা, তেজস্বিতা, অমায়িক ব্যবহার ও পরোপকারিতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ❑

শিক্ষা-সংস্কৃতি সংবাদ

রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে গবেষণায় প্রথম ডক্টরেট অফ লিটারেচার (ডি. লিট.)

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা বিষয়ে গবেষণা করে নানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিপূর্বে ডক্টরেট অফ ফিলজফি (পিএইচ. ডি.) পেয়েছেন বিভিন্ন গবেষক-গবেষিকা। স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে উচ্চতর গবেষণা করে এপর্যন্ত ডক্টর অফ লিটারেচার (ডি. লিট.) পেয়েছেন মাত্র দুজন। প্রথম—প্রয়াত অধ্যাপক প্রণবরঞ্জন ঘোষ, দ্বিতীয়—অধ্যাপক তাপস বসু। সম্প্রতি রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে উচ্চতর গবেষণা করে তাঁর দ্বিতীয় ডি. লিট.-টি পেলেন ডঃ তাপস বসু। রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে এটিই প্রথম ডি. লিট.। ডঃ বসুর দ্বিতীয় ডি. লিট.-এর গবেষণার বিষয় ছিল—'দ্য কনট্রিবিউশন অফ রামকৃষ্ণ মিশন ইন ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনশিপ অ্যান্ড কালচার ওভার হানড্রেড ইয়ার্স' (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ মিশনের অবদানঃ শতবর্ষের আলোয়)। তাঁর গবেষণাপত্রের পরীক্ষক ছিলেন—মেলবোর্ন, মস্কো, দিল্লি এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদগ্ধ অধ্যাপকেরা।

গত ২০ মার্চ ২০০১ ভারতবর্ষের নবগঠিত রাজ্য ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপাচার্য অধ্যাপক শীন আখতার ডি. লিট. ডিগ্রির স্মারক-সম্মান ও প্রশংসাপত্র অধ্যাপক তাপস বসুর হাতে তুলে দেন। অধ্যাপক বসু জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট গবেষণা-কর্মে তিনি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছেন প্রয়াত স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী, স্বামী বিমলাত্মানন্দ এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দের কাছে।

প্রসঙ্গত, অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু 'মধ্যযুগের কৃষি-অর্থনীতি ও বাঙলা সাহিত্য' বিষয়ে গবেষণা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯০ খ্রীস্টাব্দে পিএইচ. ডি. ডিগ্রি পান। ১৯৯৬-এ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বিবেকানন্দের ভারতবর্ষঃ সাহিত্যে, চিন্তায় ও চেতনায়' বিষয়ে উচ্চতর গবেষণা করে ডি. লিট. পান। (দ্রঃ 'উদ্বোধন', জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩, পৃঃ ২৬০) ডঃ বসু এবছর (২০০১) আবার ডি. লিট. পেলেন রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে তাঁর গবেষণার জন্য।

ডঃ তাপস বসু অধ্যাপনার সূত্রে বঙ্গবাসী কলেজ এবং কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত। শুভানুধ্যায়ী, আগ্রহী পাঠক এবং লেখক হিসাবে 'উদ্বোধন'-এর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের নিবিড় সম্পর্ক। তাঁর অগ্রজ প্রয়াত সুকুমার বসু ছিলেন 'উদ্বোধন'-এর একজন আজীবন গ্রাহক এবং মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ডঃ বসুও মঠ-মিশনের নানা কেন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন বিষয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর ভাষণ এবং পত্র-পত্রিকায় তাঁর আলোচনার জন্য ইতিমধ্যেই তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ-রূপে পরিগণিত হয়েছেন। ❑



শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

রিজার্ভ লাইন, নিউ নাথাম রোড, মাদুরাই-৬২৫০১৪

ফোন: ০৪৫২-৬৮০২২৪ e-mail : rkmath@vsnl.com

সেবাব্রতের আবেদন

মা মীনাক্ষীর দৈবী কৃপাধন্য মন্দির-শহর মাদুরাই। স্মরণাতীত কাল থেকে পবিত্র তীর্থস্থান হিসাবে সুপরিচিত **এই শহরটির তামিলনাড়ুর সাংস্কৃতিক রাজধানীরূপে উজ্জ্বল অবস্থান। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমবার মাদুরাই আসেন। ১৮৯৭-তে এখানে দ্বিতীয়বার অবস্থানকালে** তিনি এক প্রেরণাদায়ী ভাষণ দান করেন, যার শিরোনাম—**'What We Ought to Know?' শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীও মাদুরাইতে** শুভাগমন করেছেন। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, **শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসি-**শিষ্যদের অনেকেই—স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী প্রেমানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী সুবোধানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ—মাদুরাই দর্শন করেছেন। **বর্তমান শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মাদুরাই ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠের শাখাকেন্দ্ররূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।**

মঠের বিভিন্ন সেবাপ্রকল্প :

(১) **নিত্যপূজা প্রকল্প :** নিত্যপূজা, বিভিন্ন উৎসব পালন এবং মন্দির ও তৎসংলগ্ন স্থান রক্ষণাবেক্ষণের জন্য তহবিল গঠন প্রয়োজন।

(২) **শিক্ষামূলক সেবা :** মঠ-সংলগ্ন জমি ক্রয় করে সেখানে শিক্ষামূলক কাজকর্ম শুরু করার প্রস্তাব রয়েছে।

(ক) প্রাথমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অবৈতনিক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হবে। এটি রোজ বিকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খোলা থাকবে।

(খ) দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের পোশাক, খাতাপত্র ও বৃত্তি প্রদান করা হবে।

(গ) যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে সংস্কৃতির প্রসারের ও তাদের ব্যক্তিত্ববিকাশের উদ্দেশ্যে 'Vivekananda Youth Association' গঠন করা হবে।

(ঘ) সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সঞ্চার করতে এবং মানুষ হওয়ার ও চরিত্রগঠনের উপযোগী শিক্ষাদান করার উদ্দেশ্যে 'বিবেকানন্দ বালক সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করা হবে।

(৩) **দাতব্য চিকিৎসালয় :** সুযোগ-সুবিধা-বঞ্চিত মানুষদের কল্যাণার্থ জমি ক্রয় করে সেখানে আধুনিক ব্যবস্থাসম্মত ডিস্পেনসারি স্থাপনের জন্য অর্থের প্রয়োজন।

(৪) **সাধারণ গ্রন্থাগার :** ২০০ পাঠকের ব্যবস্থা-সম্বলিত একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। এই প্রকল্পের জন্য জমি-বাড়ি প্রয়োজন; গ্রন্থাগারে মূল্যবান গ্রন্থ ক্রয়ের জন্যও প্রয়োজন আর্থিক তহবিলের।

(৫) সাধুনিবাস, মঠ অফিস, পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র ও কর্মী-আবাসনও নির্মাণ করা হবে।

দরিদ্র, অবহেলিত ও নিপীড়িতদের সেবায় এইসব আশু প্রয়োজনীয় সেবামূলক প্রকল্প সম্পূর্ণ করতে আমাদের ৩ কোটি টাকার প্রয়োজন।

দক্ষিণ তামিলনাড়ুর জেলাগুলিতে, যেখানে এখনো জাতপাতের কারণে ভয়ানক ভেদভাব রয়েছে, সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেম ও শান্তির সর্বজনীন বাণী এবং স্বামী বিবেকানন্দের নররূপী ঈশ্বরের সেবাধর্ম রূপ ফলিত বেদান্ত-বাণীর অত্যন্ত প্রয়োজন রয়েছে।

এই মহান কার্যে অগ্রণী হয়ে উদার হস্তে দান করার জন্য আমরা সর্বসাধারণ, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, সেবামূলক ট্রাস্ট ও বিভিন্ন সংস্থার কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আমাদের উদ্দেশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আপনাদের সকলের প্রতিই আবেদন রাখা হচ্ছে। **ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র** জলকণা দিয়ে তৈরি হয় মহাসমুদ্র। দয়া করে আপনার সাধ্যমতো দান করুন।

আপনার যেকোন প্রিয়জনের স্মৃতিনামাঙ্কিত অনুদান উল্লিখিত সেবাপ্রকল্পগুলির যেকোনটির জন্য প্রদান করা যেতে পারে। ছোট-বড় সকল দান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করা হবে। **উক্ত প্রকল্পগুলি বাবদ সব দানই ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।**

A/c Payee চেক বা ডিম্যান্ড ড্রাফট অথবা মানি অর্ডার দয়া করে **'RAMAKRISHNA MATH, MADURAI'**-এর নামে পাঠাবেন। পাঠানোর ঠিকানা—**'The President, Sri Ramakrishna Math, Reserve Line, Madurai 625014'**।

স্বামী কমলাত্মানন্দ

অধ্যক্ষ

উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত
শ্রীম-কথিত
মূল্য : (অখণ্ড) ১৮০.০০
(২ খণ্ডে) ১৯৫.০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (রঙিন)
শ্রীম-কথিত
মূল্য : ১ম খণ্ড—১২৫.০০
২য় খণ্ড—১০০.০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ
স্বামী ব্রহ্মানন্দ
মূল্য : ১০.০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ
স্বামী সারদানন্দ
মূল্য : (২ খণ্ডে) ১৬০.০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি
অক্ষয়কুমার সেন
মূল্য : ১২৫.০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মহিমা
অক্ষয়কুমার সেন
মূল্য : ১৬.০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত
রামচন্দ্র দত্ত
মূল্য : ২৫.০০

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী
স্বামী তেজসানন্দ
মূল্য : ১৮.০০

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ
স্বামী ভূতেশানন্দ
মূল্য : (৭ ভাগে) ২৭৫.০০

শ্রীরামকৃষ্ণ ও যুগধর্ম
স্বামী ভূতেশানন্দ
মূল্য : ২০.০০

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ
স্বামী ভূতেশানন্দ
মূল্য : ৪০.০০



এক নতুন মানুষ
স্বামী আত্মস্থানন্দ
মূল্য : ১০.০০

বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ
সম্পাদনা : স্বামী প্রমেয়ানন্দ, নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, স্বামী চৈতন্যানন্দ
মূল্য : ২২৫.০০

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা
স্বামী প্রভানন্দ
মূল্য : (২ খণ্ডে) ৭০.০০

অমৃতরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ
স্বামী প্রভানন্দ
মূল্য : ৭৫.০০

আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ
স্বামী প্রভানন্দ
মূল্য : ৫০.০০

শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে
সম্পাদনা : স্বামী চেতনানন্দ
মূল্য : ৩৫.০০

শ্রীরামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিয়াছি
সম্পাদনা : স্বামী চেতনানন্দ
মূল্য : ৭০.০০

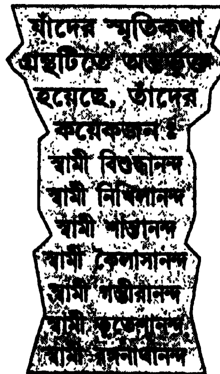
শ্রীরামকৃষ্ণের 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
মূল্য : ১৫.০০

যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ
সম্পাদনা : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
মূল্য : ৭০.০০

পরমপদকমলে
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
মূল্য : ৫০.০০

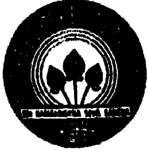
শ্রীরামকৃষ্ণ আলোকচিত্রে জীবনকথা
মূল্য : ১২০.০০

উদ্বোধন কার্যালয় পরিবেশিত
শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী শিবানন্দ সম্পর্কিত
অবশ্য-সংগ্রহযোগ্য একটি অমূল্য গ্রন্থ





শিবানন্দ-স্মৃতি সংগ্রহ (২খণ্ড)
মূল্য : ৮০.০০ (প্রতি খণ্ড ৪০.০০) [রেজিস্ট্রি ডাকে নিলে অতিরিক্ত ২০.০০]



GARIA SRI RAMAKRISHNA SEVA SANGHA

P-1 S. E. RAILWAY EMPLOYEES CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.

KAMDAHARI, GARIA, KOLKATA-700 084

Regd. No.: S73082

একটি আবেদন

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের আদর্শ গ্রহণ করে গড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ ১৯৮৯ সাল থেকে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী প্রচারে ব্রতী একটি রেজিস্টার্ড সংস্থা এবং নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের লোকশিক্ষা পরিষদের অনুমোদিত। সঙ্ঘের বিভিন্ন কার্যাবলী— দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়, প্রতি নতুন পাঠ্যবর্ষে স্থানীয় কয়েকটি বিদ্যালয়ের দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক প্রদান, কোচিং ক্লাশ, নিয়মিত পাঠচক্র, গ্রন্থাগার ইত্যাদির পরিচালনা বর্তমানে দুই ভক্তের বাড়িতে অস্থায়িভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সঙ্ঘের সভ্যবৃন্দের সহায়তায় কোনরকমে এক খণ্ড জমি ক্রয় করা হয়েছে এবং ঐ জমিতে গৃহ-নির্মাণের একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে এর আনুমানিক ব্যয় প্রায় ৮ লক্ষ টাকা।

এই প্রকল্প সম্পূর্ণ করার কাজে সকলের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য সেবাসঙ্ঘের পক্ষ থেকে আন্তরিক আবেদন জানাই।

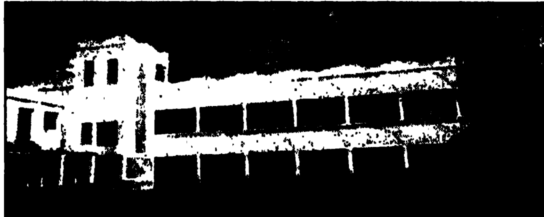
এই প্রকল্পে যেকোন আর্থিক দান **'GARIA SRI RAMAKRISHNA SEVA SANGHA'**-এর অনুকূলে A/c Payee চেক বা ড্রাফট ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হবে ও প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে।

ভারতীয় আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী এই দান আয়করমুক্ত।

যোগাযোগের ঠিকানা :
P-1 S. E. RAILWAY EMPLOYEES CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.
KAMDAHARI, GARIA, KOLKATA-700 084
Ph. No.: 410-3190

বিনীত নমস্কারান্তে
ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক





সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন

সহৃদয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ অর্থানুকূল্যে আমাদের ভগ্নপ্রায় স্কুলগৃহটি পুনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি।

১।	১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ	:	১,২০,০০০ টাকা
২।	দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ	:	৫,০০,০০০ টাকা
৩।	পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার	:	৫,০০,০০০ টাকা
৪।	আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প	:	১০,০০,০০০ টাকা
৫।	একখানা অ্যাম্বুল্যান্স (Ambulance)	:	৫,০০,০০০ টাকা
			২৬,২০,০০০ টাকা

A/c Payee চেক/ড্রাফট 'Ramakrishna Mission Ashrama, Ramharipur'—এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফট পাঠাবার ঠিকানা—সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা—বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ : এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি

স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
রামহরিপুর, জেলা : বাঁকুড়া

With Best Compliments From :

DOBSON DISTRIBUTORS

88, DR. ABANI DUTTA ROAD
HOWRAH-711 101

PHONE : 666-1722
TELEFAX : 666-9969

Stockist

Serum Institute, Tablets India Ltd.,
Wallace Pharmaceuticals Ltd.,
Eli Lilly Ranbaxy, Pharmacia & Upjohn,
Orchid, Caplet,
Smith Kline Beecham (Vaccine),
Sunny Industries Pvt. Ltd.,
Midas Care, Arvind (S.K.K.L. Ltd.),
Neon Laboratories, Mayer,
Trio Pharma

শ্রীম-কথিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১৫০.০০

(অখণ্ড দিনানুক্রমিক সংস্করণ)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এক অবতারপুরুষের জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রকাশ। স্বয়মপ্রকাশ সূর্যের মতো শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি নিজেই নিজের প্রমাণ, নিজের আলোকে সেই পুণ্যকথা দীপ্যমান।

তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন : "শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিগুলি আসলে বেদ ও উপনিষদের জীবন্ত ভাষ্য।"

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও রেণুকা চট্টোপাধ্যায়ের

শ্রীশ্রীমা সারদা ৩৬.০০

(কালানুক্রমিক জীবনী ও কথামৃত)

"শ্রীরামকৃষ্ণের যদি কিছু অবদান থাকে, সে সবই শ্রীশ্রীমায়েরও অবদান। আমরা বলি, মা আর ঠাকুর আলাদা নন। ঠাকুর বলতে মা, মা বলতে ঠাকুর।"

স্বামী ভূতেশানন্দ

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিঃ
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

With Best Compliments From :



TATA TEA LIMITED

Making a difference ... differently.

1, Bishop Lefroy Road
Kolkata-700 020

With Best Compliments From :

DIAMOND METAL PRODUCTS

Mfg. All Types of
Aluminium Pilfer Proof Caps

APOLO ELECTRIC BULB PVT. LTD.
27B/H/13/1, Chaulpatty Road
Kolkata-700010
Tele. : (O) 350-3901/353-1445
Fax : 350-6297
Mfg. *G.L.S. Lamps & Night Lamps*

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

সৌজন্যে



বিষয়বুদ্ধি ত্যাগ না করলে চৈতন্যই হয় না—ভগবানলাভ হয় না। বিষয়বুদ্ধি থাকলেই কপটতা হয়। সরল না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না।
শ্রীরামকৃষ্ণ

যার ওপর যেমন কর্তব্য করে যাবে, কিন্তু ভাল এক ভগবান ছাড়া আর কাউকে বেসো না।
শ্রীমা সারদাদেবী

পবিত্র আর নিঃস্বার্থ হতে চেষ্টা কর—তার মধ্যেই সমস্ত ধর্ম।
স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments From :

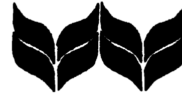
UTILITY INDUSTRIES & CHEMICAL WORKS

19Y, Raja Manindra Road, Kolkata-700037
Phone : 556-5543/6459

&

ASIMCO

22, Amalangsu Sen Road, Kolkata-700048
Phone : 556-5351/5543
Manufacturers of Phenyle. I.S.I., Lysol. I.P., Soaps, Antiseptic Lotions & Purified Water. I.P.
Dealers in all sorts of Medicines, Pharmaceuticals & Laboratory Chemicals.



"QUALITY UPPER ASSAM TEAS FOR COLOUR, STRENGTH & BRISKNESS."

With Best Compliments From :

WARREN TEA LIMITED

31, CHOWRINGHEE ROAD
KOLKATA-700 016
TELEPHONE NOS. :
226-6611/13/14/18/49; 245-8190/8191
TELEGRAMS : WARRANTY
FAX NO. : 249-5980; 226-6716

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?
স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments From :

AUTO REXINE AGENCY

House of Car Decoration
Specialist in Car-Air Conditioner
Office & Show Room :
31/A, Lenin Sarani, Kolkata-700 013
163, Lenin Sarani, Kolkata-700 013
Branch :
71A, Park Street, Kolkata-700 013
Phone : 244-1764/2184, 237-5435

সেরা ফলন দেদার লাভ

লালন সুপার ফসফেট সার



প্রস্তুতকারক ঃ

সারদা ফার্টিলাইজার্স লিঃ

২, ক্লাইভঘাট স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০১

ফোন নং
অফিস ঃ ২২০-৫৪৩৫
রেসি. ঃ ৩৩৭-৭৩৬৫
মোবাইল ঃ ৯৮৩১০-১৯২৬৬

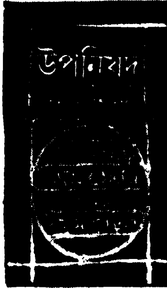
আনন্দ পাবলিশার্সের বিনম্র নিবেদন

ধর্ম ও পুণ্যপ্রসঙ্গ

তারাপদ ভট্টাচার্য
শাশ্বতী কথা
১০০.০০

তারাপদ মুখোপাধ্যায়
নিজ প্রিয় স্থান আমার মথুরা বৃন্দাবন ২৫.০০





দুলেন্দ্র ভৌমিক
জগন্নাথ কাহিনী
৫০.০০

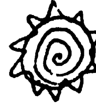
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
চৈতন্যচর্চার পাঁচশো বছর
৩০.০০

ভগীরথ বন্ধু
চৈতন্য সঙ্গীতা
২০.০০

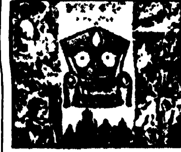
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ
উপনিষদ ২০০.০০



সুকুমার সেন
চৈতন্যাবদান
১২.০০







সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.)
চৈতন্য চরিতামৃত
১২০.০০

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শক্তিরঙ্গ বঙ্গভূমি
৫০.০০



আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
ফোন: ২৪১-৪৩৫২, ২৪১-৩৪১৭
E-mail : ananda@cal3.vsnl.net.in

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত
শ্রীম-কথিত

পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত ঃ প্রতি সেট ঃ ২০৮ টাকা
[কেবল রেক্সিন বাঁধাই পাওয়া যায়]

শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যরা এবং কথামৃতকার শ্রীম নিজেও এই মহাগ্রন্থটি যেমনটি দেখিয়া গিয়াছেন এবং রাখিয়া গিয়াছেন (খণ্ড খণ্ড হিসাবে পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এবং দিনলিপি অনুসারে না সাজাইয়া) ঠিক তেমনটিই সংরক্ষণ করার পুণ্য দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর হইয়া আছেন 'কথামৃতের' আশি বছরেরও অধিক প্রাচীন প্রকাশক শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী (কথামৃত ভবন)। ফলে এই মহাগ্রন্থের Originality এবং সুমহান ঐতিহাসিক পবিত্র ঐতিহ্য সম্পূর্ণভাবে বহাল রহিয়াছে এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত 'কথামৃতে'।

প্রকাশক ঃ শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী
(কথামৃত ভবন)
১৩।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬
ফোন ঃ ৩৫০-১৭৫১

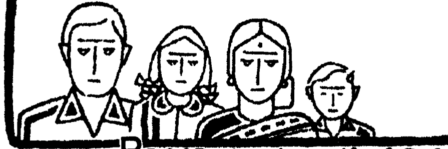
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ফোন ঃ ৪৭৪-২৩৩৫
৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো
কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত
শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহের বহু প্রশংসিত পুস্তকাবলী

গীতাতত্ত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ	৮০৲
পূর্ণতার সাধন	১৬৲
ভগবৎ প্রসঙ্গ	২৪৲
গল্পে ভগবৎ প্রসঙ্গ	২৪৲
শরণাগতের আদর্শ ও সাধনা	৩০৲
ঈশ্বর-সান্নিধ্য বোধের সাধনা	৮৲

শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহের জন্মশতবার্ষিকী গ্রন্থ ঃ
প্রেমিক পুরুষ ১৫৲
অন্যান্য বই ঃ স্তোত্রমালিকা ৪

✤ প্রাপ্তিস্থান ✤
সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ), উদ্বোধন,
রত্না বুক হাউস, মহেশ লাইব্রেরী,
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোলপার্ক)

CAN YOU SURVIVE THE DANGERS OF CONTAMINATED BLOOD?



BLOOD. A unique gift of God.
Saviour of life when it is pure. Killer when it is impure or contaminated.
The onus is on us, as responsible citizens, to do our utmost to bring a change in the dismal scenario... to ensure that a Blood Bank supplies and receives only HEALTHY, SAFE AND CONTAMINATION-FREE BLOOD.

It is our right

Some alarming realities...

- In India, there are only 400 licensed Blood Banks supplying only 25% of the total needs.
- A vast majority of blood donors are *'professionals'* who donate 5-6 times in a month. They are mostly alcoholics and drug addicts, representing high risk groups for AIDS, hepatitis, etc.

Need of the hour...

- *Supply of contamination-free blood from licensed, quality-conscious Blood Banks.*
- *Motivate more and more voluntary, safe blood donors to replace 'professional' donors.*

ACTIONS

WHO

WHO Global Blood Safety initiative involving development of Integrated Blood Transfusion Services with selection of the *RIGHT DONORS AND PRESCREENING OF BLOOD TO ENSURE SAFE AND SECURE BLOOD TRANSFUSION.*

Government

- Established Blood Transfusion Councils at the National as well as State level.
- Strengthened Drug Control Administration in States for licensing and effective monitoring of Blood Banks in terms of adequacy of testing and storage facilities.

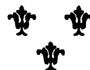
BLOOD SAVES ONLY WHEN IT IS SAFE...

Haran Chandra Banerjee & Sons.

7C, CLIVE ROW, CALCUTTA-700 001

PAPER MERCHANTS, STATIONERS AND GOVT. SUPPLIERS

Phones : Office : 220-1700
Resi. : 665-9075



Distributors for :

TITAGHUR PAPER MILLS CO. LTD.
BENGAL PAPER MILLS CO. LTD.
SUPREME PAPER MILLS CO. LTD.
SIMPLEX MILLS CO. LTD.

SRI RAMAKRISHNA SEVASHRAM



"SERVICE TO MAN IS SERVICE TO GOD"

Regd. No. S/15226 Dated 21.10.74

P.O. Ramakrishnapur ❑ Dist. South 24 Parganas ❑ Pin : 743610. W.B.

A member-ashrama of South 24 Parganas District Ramakrishna-Vivekananda Bhava Prachar Parishad (advised by Ramakrishna Math, Belur Math, W. B.)

Kolkata Office :

6 Baroda Thakur Lane, Kolkata-700 007 ☎ : 218-1285

কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন ও একটি আবেদন

প্রিয় ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ,

আপনাদের অকুণ্ঠ সাহায্যে ইতিমধ্যেই পূর্বপরিকল্পিত অতিথিভবন, বৃদ্ধ সাধুভবন ও চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বৃদ্ধাশ্রম গড়ে উঠেছে। ৪০ বিঘা জমির ওপর ডায়মন্ডহারবার রেললাইনের ধারে দক্ষিণ দুর্গাপুরে ৫০ জন অনাথ বালকের (অনূর্ধ্ব ১৮ বছর) ভরণপোষণ ও শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে একটি বালকাশ্রমকে ঘিরে আমাদের এই সেবাপ্রচেষ্টা। ১৯৭৩ সালে স্বামী রমানন্দজী মহারাজ কর্তৃক (বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ-এর সম্পাদক) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ১৯৭৪ সালে রেজিস্ট্রিকৃত হয় এই প্রতিষ্ঠান। আমাদের প্রেরণা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও ধর্ম—ত্যাগ ও সেবা। লক্ষ্য ব্যাপক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তৈরি। মানুষই আমাদের ভগবান।

এই উদ্দেশ্যে সুন্দরবনের অনগ্রসর দরিদ্র গ্রামে ও তপশিলী অঞ্চলে ১৮টি 'বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু-বিদ্যালয়' খোলা হয়েছে। আপনাদের সহৃদয়তায় আশা করি ১০০টি বিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব হবে।

আমাদের আগামী পরিকল্পনা ঃ—	প্রয়োজনীয় দান
১) বালকাশ্রমের অসম্পূর্ণ আবাসন ও দাতব্য চিকিৎসালয় সম্পূর্ণ করা	৭ লক্ষ টাকা
২) মোট ১০০টি বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশুবিদ্যালয় স্থাপন ও স্থায়ী পরিচালনার লক্ষ্যে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করে মাসিক সুদের মাধ্যমে ব্যয়নির্বাহ করা	৪০ লক্ষ টাকা
৩) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের স্পর্শপূত ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ৫০০ ভক্তের একসঙ্গে বসার উপযোগী প্রার্থনাগৃহ-সহ সর্বজনীন উপাসনালয় শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নির্মাণ	২০ লক্ষ টাকা

আশ্রমে দেওয়া অর্থ **M.O.** অথবা **A/c. Payee Cheque/Draft**-এর মাধ্যমে পাঠানোর ঠিকানা— **Sri Ramakrishna Sevashram, 6 Baroda Thakur Lane, Kolkata-700 007। A/c. Payee** চেক/ড্রাফট পাঠালে **'Sri Ramakrishna Sevashram'**-এর অনুকূলে পাঠাতে হবে। সেবাশ্রমে যেকোন আর্থিক দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সকল দানের প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে।

নমস্কারান্তে

স্বামী শুদ্ধানন্দ
অধ্যক্ষ

সুধাংশু বিশ্বাস
সম্পাদক

শ্রীশ্রী সারদামায়ের
মন্ত্রশিষ্য
ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য
প্রণীত

❖ স্মৃতিমূলক জীবনীগ্রন্থ ❖

- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
- শ্রীশ্রী সারদাদেবী
- স্বামী সারদানন্দের জীবনী
- শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ
- ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা
- প্রেমানন্দ-প্রেমকথা
- জীবন পরিক্রমা

আমাদের প্রকাশিত আরও বিভিন্ন
স্মৃতিমূলক জীবনীগ্রন্থ

ডঃ জগন্নাথ চক্রবর্তী
- মেঘনাদ বধ কাব্যে চিত্রকল্প

বিশ্বনাথ দে
- রবীন্দ্রস্মৃতি

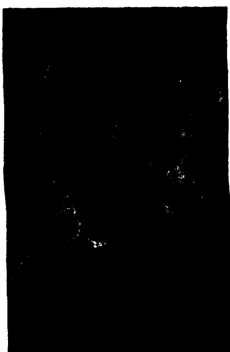
ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত
- বিবেকানন্দ স্মৃতি
- বঙ্কিম স্মৃতি
- রামমোহন স্মৃতি
- মধুসূদন স্মৃতি
- বিদ্যাসাগর স্মৃতি
- নজরুল স্মৃতি
- শরৎ স্মৃতি
- মা টেরেসা
- বায়রণ
- শেলী

শ্রী মোহিত কুমার বসাক
- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্মৃতি
- অরবিন্দ স্মৃতি
- নিবেদিতা স্মৃতি
- কিশোর শহীদ স্মৃতি
- সুভাষ স্মৃতি

সুবোধ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
- সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন
- The Early life of Netaji

সমর গুহ
- নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা
- Netaji Dead or Alive

ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩
☎ ২৪১-০৯৬৫/২৪১-৯৪০৪



All the secret of success is there : to pay as much attention to the means as to the end.

Swami Vivekananda



With Best Compliments From

DATTA FOOTWEAR INDUSTRIES PVT. LTD.

Regd. Office & Factory :

1, BIDHAN SARANI, KOLKATA-700 073

PHONE : 241-5248 ❑ FAX : (033) 241-7541

Unit-II

180, EAST SINTHI ROAD, KOLKATA-700 030

PHONE : 548-4500



কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ১

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

কলকাতা

- রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যান)
  কাঁকুড়গাছি, ফোন ঃ ৩৩৪-৬০০০
- রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম)
  হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, ভবানীপুর, ফোন ঃ ৪৫৫-৪৬৬০
- সেঞ্চুরি বোর্ডস, ২৮বি গড়িয়াহাট রোড
  কলকাতা-২৯, ফোন ঃ ৪৪০-৬২৮৭/৭৬৭৯
- কথামৃত সঙ্ঘ ❑ ৩৬ রসা রোড সাউথ থার্ড লেন
  ফোন ঃ ৪২২-০৩৩২
- **সলিলা সরকার** ❑ এ-ই ৬৫৫, সল্ট লেক
- বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র
  ডি ডি ৪৪, সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪
- রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম, ৫/৩৬ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ ও প্রার্থনা-মন্দির
  ৭৩ ডায়মন্ডহারবার রোড, বড়িশা (সখের বাজার)
  ফোন ঃ ৪৪৬-০৬৮৮/৪৪৭-১৩৭১
- দেবাশিস পেপার সাপ্লায়ার্স
  ১৩/৫/৩ রামকান্ত বোস স্ট্রীট, বাগবাজার
- রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনালোক ❑ সেলিমপুর
- বিবেকানন্দ যুবকল্যাণ কেন্দ্র ❑ চেতলা
- শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ❑ টেম্পল লেন, ঢাকুরিয়া
- **শোভনা ভৌমিক** ❑ ৯ আর. এন. টেগোর রোড
  নবপল্লী, কলকাতা-৬৩, ফোন ঃ ৪৬৭-১১২২
- রামকৃষ্ণ কুটীর, এইচ-২৯এ নবাদর্শ, বিরাটী
- ত্রিপর্ণ রামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র
  বি/৬/৪, ৩৯এ গোবিন্দ আড্ডি রোড, কলকাতা-২৭
- আদ্য ব্রাদার্স
  ১২/১বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দ পাঠচক্র
  শরৎ কলোনী, কলকাতা-৮১
- বিবেক-বাণী স্টাডি সার্কেল
  ১৩১ মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউসিং
  সেক্টর-এ, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা-৩৯
- **মলয় ভৌমিক** ❑ ৪/১ বেনেপাড়া লেন, কলকাতা-১৪
- আর. ভি. ব্রিগস অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ
  ৯ বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলকাতা-১
- শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনসঙ্ঘ, সঙ্ঘমন্দির
  ১১ তারামণি ঘাট রোড, পশ্চিম পুটিয়ারি, কলকাতা-৪১
- 'সারদা ভবন', **জীবনকুমার ভট্টাচার্য**
  ৩৪ প্রিয়নাথ ঘোষ স্ট্রীট, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬
- পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
  ৪/১৮-বি বিদ্যাসাগর উপনিবেশ, কলকাতা-৪৭
- হ্লাদিনী ❑ স্বত্বাধিকারিণী ঃ সুচিত্রা চ্যাটার্জী
  ৮০এ যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেনিউ কলকাতা-৫
  ফোন ঃ ৫৩০-২৫৮০ (দুপুর ১২টা—সন্ধ্যা ৭টা)
- **স্বপন দাস**
  ৯ সাউথ কুলিয়া রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা-১০
- **দাসানুদাস সাহা** ❑ ১এ কুমারটুলী স্ট্রীট
  কলকাতা-৫, ফোন ঃ ৫৫৪-৬২৯৯
- **ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়** ❑ ১/২ডি সেন্টার সিঁথি রোড
  কলকাতা-৫০, ফোন ঃ ৫৫৬-৯৫৭২
- **রবি হাজরা**, ১৩/৬/৩ রামকান্ত বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৩
- **সুধাংশু বিশ্বাস**
  শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ৬ বরদা ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭
- **বিজনকৃষ্ণ অধিকারী**, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবা কেন্দ্র
  ১৫৩ বিবেকানন্দ সরণি, গরফা, কলকাতা-৭৮
- শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, বিরাটি, কলকাতা-৫১
- শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবায়তন, ২৪/৬১ যশোর রোড
  এয়ারপোর্ট, গেট নং-১, কলকাতা-২৮, ফোন ঃ ৫১১-৭০৬৪
- দক্ষিণ দুর্গানগর বিবেকানন্দ মন্দির
  ৪৮ বিবেকানন্দ সরণি, কলকাতা-৬৫
- দমদম শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা পরিষদ
  ২নং এয়ার পোর্ট গেট, পোঃ রাজবাটী, কলকাতা-৮১
  ফোন ঃ ৫১১-৮২৪১
- **পার্থ ভট্টাচার্য**
  সম্পাদক, শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ সেবাসংসদ
  ২ মতিলাল কলোনী, কলকাতা-৮১
  ফোন ঃ ৫১২-৬৮৮৫/৬৬১৫
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ
  ২৪৯ শকুন্তলা পার্ক, কলকাতা-৬১
- **অমরানন্দ ভট্টাচার্য**, ডলফিন স্টুডিও
  ৩/১ ভুপেন রায় রোড, বেহালা, কলকাতা-৩৪
  ফোন ঃ ৪৫৮-৯৪২৭, ৪৪৬-০৩৮১
- **কালীমোহন সাহা**, ৭/২ ব্রজমোহন মণ্ডল রোড
  সন্তোষপুর, যাদবপুর, কলকাতা-৭৫, ফোন ঃ ৪১৬-৬২১৩
- তিলজলা বিবেকানন্দ সেবাসংসদ
  ১৪৩/২০, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৩৯

বিপণন-কেন্দ্র ঃ কলকাতা

- মিডিয়া সেন্টার
  ১/১০ বেহালা কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স (দ্বিতীয় তল)
  ৬২০ ডায়মণ্ডহারবার রোড, কলকাতা-৩৪
- উজ্জ্বল বুক স্টোর্স
  ৬এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট (দোতলায়), কলকাতা-৭৩
- রূপসী বাংলা, ২৬১ এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৬
- উজ্জ্বল বুকস, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

সৌজন্যে
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ
৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯

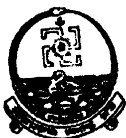
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রকাশিত বাঙলা গ্রন্থরাজি

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)	১০০.০০
স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)	১০০.০০
আত্মজ্ঞান	২২.০০
আত্মবিকাশ	২০.০০
আমার জীবনকথা (২ খণ্ডে)	৮৫.০০
ঈশ্বরদর্শনের উপায়	৩৫.০০
কর্মবিজ্ঞান	১০.০০
তরুণ বাংলার আদর্শ	৫.০০
দেবী দুর্গা	৬.০০
পত্র-সংকলন	১৬.০০
পঞ্চদশী-দর্শনের পরিচয়	৫.০০
পুনর্জন্মবাদ	৩০.০০
বিংশ-শতাব্দীর ধর্ম	৫.০০
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	২০.০০
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	৩০.০০
মরণের পারে	৫০.০০
মনের বিচিত্র রূপ	১২.০০
মানুষের দিব্যস্বরূপ	২৫.০০
মুক্তির উপায়	১৫.০০
যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ	৫.০০
যুগে যুগে যাঁদের আগমন	২৮.০০
যোগদর্শন ও যোগসাধনা	৫০.০০
যোগশিক্ষা	৪০.০০
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম	২০.০০
সর্বজনীন ধর্ম ও বেদান্ত	৩০.০০
সাংখ্য, বৌদ্ধ ও বেদান্তদর্শন	৩০.০০
স্বামী বিবেকানন্দ	২.০০
স্তোত্ররত্নাকর ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি	১২.০০
হিন্দুনারী	১২.০০
হিন্দুরা যীশুখ্রীস্টের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু গীর্জা-ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ কেন?	৫.০০

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত

অধ্যাত্মসাধনায় দেবতা ও দেবীভাবনা	৪.০০
অভেদানন্দ-দর্শন (২ খণ্ডে)	১৪০.০০
কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব	১৮.০০
তীর্থরেণু	২৬.০০
তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা	৪০.০০
তন্ত্রতত্ত্বপ্রবেশিকা	৬০.০০
নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৪৫.০০
পদাবলী-কীর্তনের ইতিহাস	৩৫.০০
বাণী ও বিচার (৮ খণ্ডে)	৪০০.০০
বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তায় মন্ত্রতত্ত্ব ও মন্ত্রসাধনা	২০.০০
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (৩ খণ্ডে)	২২০.০০
শ্রীরামকৃষ্ণচন্দ্রিকা	৪০.০০
ভারতীয়-সঙ্গীত—ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক রূপরেখা	৩৪.০০
মন ও মানুষ (৩ খণ্ডে)	১৫৪.০০
মহিষাসুরমর্দিনী-দুর্গা	৩০০.০০
মন্ত্রভাবনা ও সঙ্গীত	১৪.০০
রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা	২০.০০
রাগ ও রূপ (২ খণ্ডে)	২২০.০০
সঙ্গীতপ্রতিভায় স্বামী বিবেকানন্দ	৮.০০
সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান	৫০.০০
সঙ্গীতে সাহিত্য, রসভাবনা ও সুন্দর	২৫০.০০
স্বামী অভেদানন্দ	৫.০০
স্বামী অভেদানন্দের জীবন ও দর্শন	৩৬.০০



শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

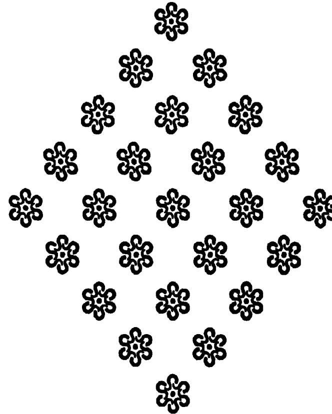
(পুস্তক প্রচার বিভাগ)

১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

With Best Compliments From :

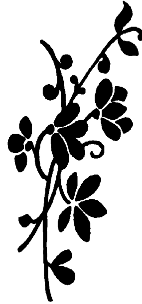
H. K. GHOSE & CO.

Paper Merchants & Exercise Book Makers



WARDLEY HOUSE
25A, SWALLOW LANE, KOLKATA-700 001
PHONE : 220-5209

With Best Compliments From :



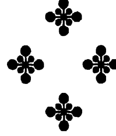
B. S. SUNDARIYA & SONS

146/2, OLD CHINA BAZAR STREET
CALCUTTA-700 001

PHONE : 242-4867

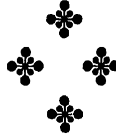
রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে যায়। অবতারেরাও সেইরকম সহস্র সহস্র লোকেদের ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ



মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার দিকে এগোতে চায় না। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আন্তরিক খুব যত্ন ও রোখ চাই।

শ্রীমা সারদাদেবী



যে-দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয়, সে-দেশ ক্রমশ ধর্মহীন হইয়া দাঁড়ায়। ভারতে কখনো এরূপ চেষ্টা হয় নাই। সেইজন্য এখানে প্রকৃত ধর্মভাব এখনো জাগ্রত।

স্বামী বিবেকানন্দ







উপভোগ করুন নিরাপত্তাপূর্ণ সুখী জীবনের পরম আনন্দ

পিয়ারলেস এম.আই.এস : ২000



মেয়াদ	সুনিশ্চিত প্রাপ্তি (প্রতিমাসে)	জমারাশি
১ বৎসর ২ বৎসর ২½ বৎসর ২½ বৎসরে	৬৪৩ টাকা : প্রথম বর্ষে ৭৪০ টাকা : দ্বিতীয় বর্ষে ৮৩৫ টাকা : দ্বিতীয় বর্ষের পরে মোট ২১,৬০৬ টাকা	১,০০,০০০ টাকা (ন্যূনতম ১০,০০০ টাকা ও ৫,০০০ টাকার গুণিতকে যেকোন উচ্চরাশি)

মূল বৈশিষ্ট্যগুলি :

- গ্যারান্টিযুক্ত প্রাপ্তি
- অগ্রীম পোস্টডেটেড চেক—পুরো আর্থিক বৎসরের
- উচ্চ লিকুইডিটি
- বাজারে তুলনামূলকভাবে স্বল্প মেয়াদি প্রকল্পগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ প্রাপ্তি
- তিনমাস পরে জমারাশির ৭৫% পর্যন্ত ঋণ পাওয়ার সুবিধা

ম্যাচিওরিটি দাবীপূরণের মোট পরিমাণ :
২৫০০ কোটি টাকারও বেশি



Estd 1932

পিয়ারলেস®
সঞ্চয়ের সহজ পথ
*
আস্থার প্রতীক

Website-http://www.peerless-in-india.com

ARUN SIGN PGF1392

UDBODHAN
Phone : 554-2248, 554-2403
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com

Vol. 103 ❑ No. 5
❑ MAY 2001 ❑

Licensed to Post
Without Prepayment
Licence No.
TECH/WB/RNP-15/LPWP-01/2001

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Regn. No.
TECH/WB/RNP-15/2001

উদ্বোধন

১০৩তম বর্ষ



স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

❑ গত ১লা মাঘ ১৪০৭ (১৫ জানুয়ারি ২০০১) **উদ্বোধন ১০৩তম বর্ষে** পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় **নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব** নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের **১০২ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম** ❑

❑ বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা **উদ্বোধন** একটি ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র মাত্র নয়, **উদ্বোধন** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। **ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের** সঙ্গে এবং **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের** সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের** একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তে হবে।

❑ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে **উদ্বোধন** নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন একটি সার্থক পারিবারিক পত্রিকা**। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন** এ প্রকাশিত হয়।

❑ **উদ্বোধন** শুধু **বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা** নয়, **উদ্বোধন** বাংলার **সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ পত্রিকা** এবং বাংলার **সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক পত্রিকা**।

❑ ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র হয়েও **উদ্বোধন** তার মহান প্রবর্তকের নির্দেশ অনুসারে **কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আদর্শের মুখপত্র নয়। উদ্বোধন** তার **সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র** বিগত ১০২ বছর ধরে অটুট রেখেছে।

❑ **উদ্বোধন**-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি **মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের** সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

❑ **উদ্বোধন** একটি পত্রিকা মাত্র নয়, **উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী** এবং **স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর**।

❑ **স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে। উদ্বোধন**-এর প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে গ্রাহক করলেই এখনি **উদ্বোধন**-এর **গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার** হয়ে যায়। তাই আপনার **নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করাও** আপনার কাছে **স্বামীজীর প্রত্যাশা**। স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের **গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের**। অবশ্য **ইন্টারনেট সংস্করণের** মাধ্যমে **উদ্বোধন** আজ **ভারত ও বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ঘরে ঘরে** পৌঁছে গিয়েছে।

❑ স্বামীজী বলেছেন, **উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা**। সেকথা স্মরণ করে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে **অনুরাগী** ও ভক্তগণ **উদ্বোধন**-এর প্রতি নিশ্চয়ই তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

❑ **উদ্বোধন-এর শারদীয়া** সংখ্যাটির **জন্য গ্রাহকদের** থেকে আলাদা মূল্য নেওয়া হয় না। এই সংখ্যাটি গ্রাহকদের জন্য আমাদের **শারদ উপহার**। প্রসঙ্গত সকলের অবগতির জন্য জানাই যে, **শারদীয় সংখ্যাটি** আকারে সাধারণ সংখ্যার **তিনগুণ** এবং **বিশেষ সংখ্যা** হওয়ায় অলঙ্করণের জন্য খরচও হয় যথেষ্ট। **গত কয়েক মাসে কাগজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং অন্যান্য ব্যয়বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শারদীয়া সংখ্যা** সহ গ্রাহক-**পিছু আমাদের বার্ষিক খরচ দাঁড়িয়েছে মুদ্রিত গ্রাহকমূল্যের** সওয়া **তিন গুণ**। বিশাল অঙ্কের এই অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য আমরা নির্ভর করি সহৃদয় বিজ্ঞাপনদাতাদের সক্রিয় সহযোগিতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক বদান্যতার ওপর।

❑ **পত্রিকা প্রকাশ সংক্রান্ত** ব্যয় প্রতি বছর বেড়ে গেলেও **তিন বছর** (১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০১) 'উদ্বোধন'-এর **গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত** রাখা হয়েছে। **এত সুলভ মূল্যে এমন সম্পূর্ণ পত্রিকা বাঙলা ভাষায় আর একটিও** নেই।

❑ **উদ্বোধন** এর সেবায় তিনটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি **'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল'**, অন্য দুটি যথাক্রমে **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** এবং **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'**। **উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 'Ramakrishna Math, Baghbazar'—এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।** দাতার চিঠিতে বা M.O. কুপনে **'উদ্বোধন পত্রিকার সেবায়'** অথবা **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** অথবা **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'**-এর জন্য যেন লেখা থাকে।

❑ **উদ্বোধন-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে** মতিলাল-তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাঁদের পুত্রকন্যাদের পক্ষে **স্থায়ী ভিত্তিতে 'উদ্বোধন মেধা সম্মান'** **(একবছরের জন্য উদ্বোধন-এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি)** নিবেদিত হয়েছে। **পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের** যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। **২০০১ সালের** জন্য অনুরূপ **সম্মান** সুকুমার-বিভারানী **পাড়ুই**-এর স্মৃতিতে তাঁদের পুত্র অমর পাড়ুই নিবেদন করেছেন। এই **সম্মানপ্রাপকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্ষদ পরিচালিত ২০০০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় 'সম্মান'-এর জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বোধন-সম্পাদকের** সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
সম্পাদক

সৌজন্যে

পি. বি. সরকার অ্যান্ড সন্স

(কোন ব্রাঞ্চ নেই)

জুয়েলার্স

সন অ্যান্ড গ্র্যান্ড সন্স অব লেট বি. সরকার

৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০ ❑ ফোন ঃ ২২৩-৮৭১৩, ২২৩-৭৫৭৮

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

उत्थान







"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

আনন্দবাজার পত্রিকা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতি

কোঠার, ভদ্রক, ওড়িশা

পি ৭৪৪, শহিদনগর, পোঃ শহিদনগর

ভুবনেশ্বর-৭৫১০০৭

[রেজিস্ট্রেশন নং ৪৯৮-১৭১/২০০০-২০০১]

ফোন ঃ ০৬৭৪-৫১৩৩১৯



বাঁদিকে নবসংস্কৃত রাধাশ্যামচাঁদজীর মন্দির, ডানদিকে নবসংস্কৃত শ্রীশ্রীমায়ের ঘর (বর্তমানে শ্রীশ্রীমা সারদা স্মৃতিমন্দির)

একটি আবেদন

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জীবনীপাঠক মাত্রই অবগত আছেন, তিনি ভক্তপ্রবর বলরাম বসু মহাশয়ের বসতবাটী ওড়িশার ভদ্রক শহরের নিকটবর্তী কোঠারে ছয়মাসেরও অধিক সময় বাস করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের নরলীলা সমাপ্ত হলে বিরহকাতরা শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী কোঠারে আসেন এবং বলরাম বসুর গৃহদেবতা রাধাশ্যামচাঁদজীর সেবায় মগ্ন থাকেন। সেই রাধাশ্যামচাঁদজী আজও সেখানে পূজা পেয়ে আসছেন। কোঠারে অবস্থানকালে বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃভাবে দৈবীশক্তির যে অভূতপূর্ব স্ফুরণ পরিলক্ষিত হয়, তেমনটি খুব কম স্থানেই হয়েছে। [দ্রঃ শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে, ২য় ভাগ] প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী বন্দনানন্দজীর মতে, কোঠারের এই দেবালয় শ্রীশ্রীমায়ের চতুর্থ পীঠস্থান। বলরাম বসুর কলকাতার ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বহস্তে যে-রথ টেনেছিলেন, সেই রথের বিগ্রহ জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা সেখানে সুরক্ষিত আছেন। বসু পরিবারের নিত্যপূজিত শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর প্রতিকৃতি, নারায়ণশিলা, গোপালমূর্তি, সে-আমলের কাঠের রথ, শ্রীশ্রীমায়ের ব্যবহৃত পুষ্করিণী, স্নানঘাট এবং শয়নকক্ষ আজও তাঁর সাক্ষাৎ উপস্থিতি অনুভব করিয়ে দিচ্ছে। বিশদ বিবরণের জন্য 'উদ্বোধন' পত্রিকার অগ্রহায়ণ ১৪০৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীমা ছাড়া স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ ও শ্রীশ্রীঠাকুরের অনেক পার্ষদ ও ত্যাগী সন্তান কোঠারে বাস করে গেছেন। অনেক ভাগ্যবান ব্যক্তি এই স্থানে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে মন্ত্রদীক্ষালাভে ধন্য হয়েছেন।

আমাদের সমিতি এই জরাজীর্ণ, ভগ্ন ও প্রায় ভূতলশায়ী স্মৃতিসৌধের মধ্যে শ্রীশ্রীমায়ের শয়নকক্ষ, গর্ভমন্দির ও নাটমন্দির, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী অখণ্ডানন্দজীর স্মৃতিবিজড়িত কক্ষদুটির সম্পূর্ণ সংস্কার করেছে, এখন নিয়মিত পূজা-পাঠের ব্যবস্থা হয়েছে।

এই শান্ত গ্রাম্য পরিবেশে শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিবিজড়িত স্থানে স্মরণ-মনন, ধ্যান-জপে নিরত থেকে নির্জনবাস করবার জন্য অনেক সাধু ও ভক্তদের কাছ থেকে অনুরোধ আমরা পেয়ে থাকি। কিন্তু অতিথিশালার অভাবে আমরা শুধু আমাদের অসহায় অবস্থা নিবেদন করতে বাধ্য হই।

বলরাম বসুর এই গৃহ-মন্দিরের অবশিষ্ট ১২টি ঘর মেরামত করে সেখানে (১) অতিথিশালা, (২) সাধুনিবাস, (৩) পূজারীর ঘর, (৪) দাতব্য চিকিৎসালয়, (৫) আদিবাসী ছাত্রাবাস ও (৬) অনাথ আশ্রম খোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তার জন্য আরো ২০ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের অনুরাগী সন্তানদের কাছে অকুণ্ঠ সাহায্যের জন্য আন্তরিক আবেদন জানাই। ১০ হাজার টাকা বা ততোধিক অনুদান দাতাদের নাম শ্বেতপাথরে লেখা থাকবে। অনুদান পাঠাবার [চেক বা ড্রাফট মারফত] ঠিকানা— জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ দাস, রিটায়ার্ড চিফ ইঞ্জিনিয়ার (সমিতির কোষাধ্যক্ষ), প্লট নং ৭৪৪, শহিদনগর, ভুবনেশ্বর, পিন-৭৫১০০৭।

নিবেদক

কিশোরীমোহন দাস	**কলকাতার ঠিকানা ঃ**	**সমরেশকুমার নিয়োগী**
আই. এ. এস. (অবসরপ্রাপ্ত)	**এইচ-সি/৩ রামকৃষ্ণ সরণি, অশ্বিনীনগর**	**সাধারণ সম্পাদক**
সভাপতি	**বাগুইআটি, কলকাতা-৭০০ ০৫৯**	**কলকাতার ফোন-৫৭১-৫৪৫৫**



রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ

পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া-৭১১ ২০২, ফোন ঃ ৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২

সারদাপীঠ থেকে প্রকাশিত অডিও ক্যাসেটসমূহ

মূল্য ❑ SP-1 ও SP-31–34 ঃ ৩৫ টাকা, অন্যান্য ঃ ৩০ টাকা

SP-1	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্	সংস্কৃত ও বাঙলা
SP2, SP-7, SP-8, SP-10 হইতে 12	কথামৃতের গান (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড)	বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি
SP-3	শ্রীরামনামসংকীর্তন	সংস্কৃত ও হিন্দি
SP-4	বক্তৃতা—যুগপুরুষ	বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত
SP-5	শ্রীশ্রীচণ্ডীস্তব (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ)	বাঙলা, সংস্কৃত
SP-6	শিবমহিমা	বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি
SP-9	শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি
SP-13	শ্রীসারদাবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা
SP-20	বিবেকানন্দবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা
SP-24	শ্রীকৃষ্ণবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি
SP-14 হইতে SP-16	কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)	বাঙলা
SP-17	বীরবাণী	সংস্কৃত, বাঙলা, ইংরেজী ও হিন্দি
SP-18	গীতিবন্দনা	হিন্দি
SP-19	বক্তৃতা—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান	বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত
SP-21 ও SP-22	সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড)	হিন্দি
SP-23	ওঠো জাগো	হিন্দি
SP-25	শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি	হিন্দি
SP-26	বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি	হিন্দি
SP-27	বেদমন্ত্র	সংস্কৃত উপনিষদের মন্ত্রসমূহ
SP-28	সরস্বতী বন্দনা	বাঙলা, সংস্কৃত
SP-29	**Ramakrishna Movement**	Lecture by Revered Srimat Swami Bhuteshanandaji Maharaj
SP-30	**Religion in Practice**	do
SP-31 হইতে SP-34	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ) (১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড)	মূল সংস্কৃত এবং প্রতি অধ্যায়ের মুখবন্ধ
SP-35	আগমনী	বাঙলা
SP-36	ভজন সুধা	হিন্দি

শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্, শ্রীরামনামসংকীর্তন ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার C. D. প্রকাশিত হয়েছে।

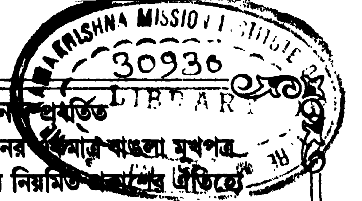
স্বামী সর্বগানন্দ, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ, স্বামী দিব্যব্রতানন্দ, শ্রীমহেশরঞ্জন সোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য দক্ষ শিল্পিগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন।

Video Cassette:
Centenary Celebration of the Ramakrishna Mission at Belur Math in 1998.
Duration—80 minutes
Rs. 250.00

প্রাপ্তিস্থান ঃ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি (কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক)

ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে M.O. অথবা Bank draft মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে।

3 JUL 2001



উদ্বোধন ।।১০৩।।

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাংলা মুখপত্র
১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র

১০৩তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা আষাঢ় ১৪০৮ জুন ২০০১

প্রচ্ছদ ❑ ওপরে কৈলাস, নিচে মানস সরোবর। নিচে মানস সরোবর থেকে দৃশ্যমান কৈলাস।
মানস সরোবরে সন্তরণরত হংসযুগল—লোকবিশ্বাসে, হর-পার্বতী।

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্য[illegible]



সম্পাদক : স্বামী [illegible]

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'
প্রচ্ছদ ❑ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ ❑ আলোকচিত্র : বেলুড় মঠের জনৈক সন্ন্যাসী
website : www.udbodhan.org ◆ e-mail : udbodhan@vsnl.com
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ : ৬৫ টাকা; সডাক : ৭৫ টাকা
আলাদাভাবে কিনলে বর্তমান সংখ্যার মূল্য : ৮ টাকা ❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ❑ ৩০০০ টাকা
[একবছরের মধ্যে পরিশোধ্য কমপক্ষে ৫০০ টাকা প্রতি কিস্তি হিসাবে ৬টি কিস্তিতেও প্রদেয়]



'উদ্বোধন' ঃ আশ্বিন (শারদীয়া) ১৪০৮ সংখ্যা

গ্রাহকদের জন্য জরুরী বিজ্ঞপ্তি

- যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও 'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন/সেপ্টেম্বর (শারদীয়া) সংখ্যা প্রকাশিত হবে। সংখ্যাটির মূল্য ঃ ৪০ টাকা।
- 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না। গ্রাহকরা ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে অগ্রিম টাকা জমা দিলে অতিরিক্ত প্রতি কপি ৩০ টাকায় পাবেন। অতিরিক্ত কপি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিলে পাঠানোর খরচ বাবদ অতিরিক্ত ২২ টাকা (প্রতি কপির জন্য) জমা দিতে হবে। কপিটি অগ্রিম জমার ক্যাশমেমো দেখিয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে ৫ অক্টোবর ২০০১ পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে।
- আকারে সাধারণ সংখ্যার তিনগুণ শারদীয়া সংখ্যাটি সাধারণ ডাকে না পেলে আমাদের পক্ষে সংখ্যাটির ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়।
- ডাকযোগে (By Post) যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে সেই সংবাদ কার্যালয়ে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে তাঁদের পত্রিকা ডাকযোগেই (By Post) যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহের সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।
- যাঁরা আমাদের গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সডাক গ্রাহক হয়েছেন/নবীকরণ করেছেন, তাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি ঐ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সংগ্রহ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রগুলিতে ২০ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে সেই সংবাদ জানাতে হবে, যাতে তারা আমাদের কাছে ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে সংবাদটি দিতে পারে।
- অনুগ্রহ করে স্মরণ রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ করার সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক। উল্লেখ না থাকলে অথবা কোন একটিমাত্র উল্লেখ করলে সংবাদটি গ্রাহ্য হবে না।
- যাঁরা ডাকযোগে (By Post) পত্রিকা নেন, তাঁরা চাইলে শারদীয়া সংখ্যাটি রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে পারেন। সেজন্য তাঁদের প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ২২ টাকা পাঠাতে হবে। তবে ঐ সংক্রান্ত সংবাদ এবং ২২ টাকা গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে অবশ্যই কার্যালয়ে এসে পৌঁছানো প্রয়োজন।
- প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্ত্বেও অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে জানান এবং তাঁদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহকদের সহৃদয় সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।
- কিছু অসৎ ব্যক্তি কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের শারদীয়া সংখ্যা সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা যাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ করবেন, তাঁদের বিশেষভাবে জানানো হচ্ছে যে, শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় তাঁদের নবীকরণ/গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/M.O. প্রাপ্তি-কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে (যদি ক্যাশমেমো/রসিদ/M.O. প্রাপ্তি-কুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে সেই মর্মে সম্পাদকের কাছে তা লিখিতভাবে জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে) নতুবা আমাদের পক্ষে তাঁদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।
- যাঁরা প্রতি মাসে পত্রিকা ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করেন এবং যাঁরা শুধুমাত্র শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করবেন তাঁরা ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর ২০০১ পর্যন্ত শারদীয়া সংখ্যাটি কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন এই সময়ের মধ্যে তাঁদের সংখ্যাটি সংগ্রহ করে নেন। বিশেষ কারণে ঐ তারিখের মধ্যে সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে ২০ অক্টোবরের (২০০১) মধ্যে অবশ্যই সংগ্রহ করতে হবে। কার্যালয়ে স্থানাভাবের জন্য তারপর সংখ্যাটি রাখা সম্ভব হবে না। সেজন্য সংখ্যাটির প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না। আশা করি, সহৃদয় গ্রাহকবর্গের পূর্ণ সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।
- কার্যালয় কাজের দিন (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ পর্যন্ত এবং শনিবার বেলা ১-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা, রবিবার বন্ধ থাকে। ১৭ সেপ্টেম্বর মহালয়া এবং ২৩ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর ২০০১ পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে। পূজাবকাশের পর ২ নভেম্বর ২০০১ শুক্রবার কার্যালয় খুলবে।

সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইন্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯

উদ্বোধন ॥১০৩॥

আষাঢ় ১৪০৮

জুন ২০০১



দিব্য বাণী



গুরুবন্দনা

বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং
পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া।
যঃ সাক্ষীকুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাত্মানমেবাদ্বয়ং
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে।। [শ্রীশঙ্করাচার্য]

—নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখার সময়ে যেমন নিজের অন্তর্গত বস্তু বহিরাগত বস্তুরূপে প্রতীত হয়, তেমনি 'অবিদ্যা' বা 'মায়া'র কারণে এই বিশ্বচরাচর আসলে দর্পণ বা আয়নায় প্রতিবিম্বিত বস্তুর মতোই আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়। কিন্তু সমাধি অবস্থায় এক অদ্বিতীয় স্বরূপ (চৈতন্য) মাত্রই থাকে (এই সৃষ্টি সেখানে থাকে না)। তিনিই আমার শ্রীগুরুরূপধারী শ্রীদক্ষিণামূর্তি (পরমগুরুর কৃপাময় অভিব্যক্তি)। তাঁকে আমি নমস্কার করি।

*

....সঞ্জিবনী শক্তি গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায় না। একটি আত্মা কেবল অপর এক আত্মা হইতে এই শক্তি লাভ করিতে পারে; আর কিছু হইতেই নয়। আমরা সারাজীবন পুস্তক পাঠ করিতে পারি, খুব বুদ্ধিমান হইয়া উঠিতে পারি, কিন্তু শেষে দেখিব—আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই হয় নাই।

...যে ব্যক্তি-আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে 'গুরু' বলে; এবং যে ব্যক্তির আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয় তাঁহাকে 'শিষ্য' বলে।

...যিনি বিদ্বান (সত্যদ্রষ্টা), নিষ্পাপ (স্বার্থলেশশূন্য) ও কামগন্ধহীন, যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ (শ্রোত্রিয়ঃ, অবৃজিনঃ, অকামহতঃ, যো ব্রহ্মবিত্তমঃ—বিবেকচূড়ামণি) তিনিই প্রকৃত সদ্গুরু। [স্বামী বিবেকানন্দ]

*

চিদ্রূপেণ পরিব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। [বিশ্বসারতন্ত্র]

—এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, পৃথিবী, আকাশ, নদী, পর্বত, প্রকৃতি, প্রাণিকুল সবই 'জ্ঞান' বা 'চিদ্' স্বরূপের দ্বারা পরিব্যাপ্ত—এই বোধ যাঁর হয়েছে, সত্যদ্রষ্টা, তত্ত্বদ্রষ্টা সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার করি।

*

গিরিশ—হ্যাঁগা, গুরু আর ইষ্ট; গুরু-রূপটি বেশ লাগে—ভয় হয় না—কেন গা? ভাব দেখলে দশ হাত তফাতে যাই। ভয় হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—যিনি ইষ্ট, তিনিই গুরু-রূপ হয়ে আসেন। শবসাধনের পর যখন ইষ্ট দর্শন হয়, গুরুই এসে শিষ্যকে বলেন—এ (শিষ্য) ঐ (তোর ইষ্ট)। এই কথা বলেই ইষ্ট-রূপেতে লীন হয়ে যান। শিষ্য আর গুরুকে দেখতে পায় না। যখন পূর্ণ জ্ঞান হয়, তখন কে বা গুরু, কে বা শিষ্য। "সে বড় কঠিন ঠাঁই। গুরুশিষ্যে দেখা নাই।"

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত]

[redacted]

ধর্মসঙ্কট ও শ্রীরামকৃষ্ণ

সত্যদ্রষ্টা ঋষি শাস্ত্রমুখে বলিয়াছেন—ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়া জীব বা প্রাণী সৃষ্টি করিতে করিতে যখন 'মানুষ' সৃষ্টি করিলেন, তাঁহার যথার্থ আনন্দ হইল। ইহার পূর্বে তাঁহার তৃপ্তি হইতেছিল না। মানুষের মধ্যে তিনি আত্ম-প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করিলেন। মানুষের মধ্যে অসীম, অনন্তের প্রকাশ সম্ভাবনা তাঁহাকে আমোদিত করিল। বৃক্ষলতাদি, পশু, যক্ষ, কিন্নর, গন্ধর্ব, দেবতাদি প্রাণীর মধ্যে কর্ম করিবার ক্ষমতা থাকিলেও কর্মফল সৃষ্টির ক্ষমতা নাই বলিয়া ঐসকল যোনিতে ভোগসর্বস্ব জীবনই তাহারা উপভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু একমাত্র মনুষ্যেরই কর্মে অধিকার। অর্থাৎ শুভ কর্ম করিয়া শুভ ফলপ্রাপ্তি অথবা অশুভ কর্ম করিয়া অশুভ ফলপ্রাপ্তির ক্ষমতা কেবলমাত্র মানুষেই বিদ্যমান। 'কর্তুম্, অকর্তুম্, অন্যথা কর্তুম্' (করিতে পারি, নাও করিতে পারি, অন্যপ্রকার করিতে পারি)—এ মানুষের অধিকার। অতএব 'ধর্মসঙ্কট' এই মনুষ্যলোকেই হইয়া থাকে, অন্য লোকে নহে। আর অনিবার্য কারণেই শ্রীভগবানকে এই মর্ত্যলোকেই অবতীর্ণ হইতে হয়—ধর্মসঙ্কট অপনোদনের নিমিত্ত। দেব-দানব যুদ্ধ বস্তুত অধিকারপ্রাপ্তির সংগ্রাম। আধুনিক পরিভাষায়—'প্রলেতারিয়েত' এবং বুর্জোয়া সংগ্রাম। কিন্তু 'ধর্মসঙ্কট'-এর তাৎপর্য আরো গভীর এবং ব্যাপক। দর্শনশাস্ত্রের প্রেক্ষিতে দেব-দানবের যুদ্ধ মানুষের অন্তরের সু-মানুষ ও কু-মানুষের সঙ্ঘাত। একদিকে মনের গভীরে কাম-ক্রোধাদির অধিকার হারাইবার ভয়, অপরদিকে অন্তর্নিহিত একটি দিব্য জীবনের প্রতি মানুষের সহজাত আকর্ষণ তাহাকে সদা সতর্ক করিতে থাকে—'ও পথে যাইও না, ও যে মৃত্যুর পথ।' বস্তুত, এখানেও অধিকার রক্ষারই প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।

মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার বিশ্লেষণ আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ যেভাবে করিয়াছিলেন, অবিশ্বাসের সুরে সেই বিশ্লেষণকে অবজ্ঞা করিবার প্রয়াস কেহ কেহ অতীতে করিয়াছেন, বর্তমানেও কেহ কেহ করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সহায়ে যুক্তি ও তর্ক করিয়া বিশ্বের নামীদামী চিন্তাবিদ্‌গণও এই বিশ্লেষণকে বাতিল করিবার সাহস পান নাই। পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। ইহাদের সহিত শরীরের যোগ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। অর্থাৎ নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক এবং কর্ণের মাধ্যমে। ইহার পশ্চাতে প্রাণের অবস্থিতি। প্রাণ 'মন'-এর অনুগত। মানুষের মন একটি শক্তিশালী যন্ত্র। মনের পশ্চাতে বুদ্ধি। বুদ্ধির অধিষ্ঠান 'আমি' বা 'অহং'। বিশ্বচরাচরে এই 'আমি' ওতঃপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। সুচিন্তা, কুচিন্তা অথবা সু-বুদ্ধি, কু-বুদ্ধি লইয়াই সু-মানুষ কিংবা কু-মানুষ নির্দ্ধারিত হয়। অতএব কু-মানুষ এবং সু-মানুষের অধিষ্ঠান যে 'আমি' বা 'অহং', সেই 'আমি'র কি গতি হইবে? নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, ধর্মসঙ্কট ঐ 'আমি'কে লইয়াই এবং সেই সঙ্কটের নাট্যমঞ্চে নিমজ্জমান 'কাঁচা আমি'কে উদ্ধার করিবার জন্যই 'পাকা আমি'র আগমন। "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত..." ইত্যাদি।

ধর্মসঙ্কটকে কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করিলে, দৈনন্দিন জীবনে তাহাকে টানিয়া আনিলে অথবা মহাকালের নৃত্যের ছন্দে ছন্দে তাহার হ্রাস-বৃদ্ধির হিসাব-নিকাশ করিতে চাহিলে অনিবার্যভাবে অবতারপুরুষ এবং যুগাচার্য মহাপুরুষগণের দিকে আমাদিগকে তাকাইতে হইবে। কারণ, আমাদের 'যুক্তিবাদী' মন বুঝিতে না চাহিলেও, বুদ্ধির অগম্য অনেক কিছুই আছে যাহা হয়তো ঐতিহাসিকগণ সহজে স্বীকার করিবেন না, বৈজ্ঞানিকগণ উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিবেন এবং যাহার প্রতি বস্তুবাদী ও রাজনীতিবিদ্‌গণ অবহেলার হাসি হানিয়া যাইবেন। আজি হইতে দশ বৎসর পূর্বেও এই সৃষ্টির পশ্চাতে সৃষ্টিকর্তা এবং জাগতিক অস্তিত্বের পশ্চাতে একটি দিব্য চৈতন্যসত্তার কথা অস্বীকার করিতে যেসব তাবড় তাবড় বিজ্ঞানী বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না, বিগত দশ বৎসরে ইন্‌ফরমেশন টেকনোলজির সহিত তাল রাখিয়া তাঁহাদেরই বিশ্বাসের

সূচকটি ক্রমশ এক অদ্ভুত দিঙ্‌নির্দেশ করিতেছে, যাহার সন্তোষজনক ব্যাখ্যার জন্য তাঁহারা শেষমেশ সনাতন বেদান্তধর্মের শরণাপন্ন হইতেছেন। বিস্তারিত বলিবার অবসর নাই, তবে এইটুকু বলিয়া রাখি, সাম্প্রতিককালে একদিকে যেমন 'স্ট্রিং থিয়োরী', অপরদিকে তেমনি 'জিনোম তত্ত্ব' আমাদিগকে সেই ইঙ্গিতই যেন প্রদান করিয়াছে।

একই সঙ্গে আরো একটি কথা বিশেষভাবে অনুধাবনীয়। বেদান্তের সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং স্ব-স্বরূপ উপলব্ধির পূর্বে ধাপে ধাপে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। যাহা বলিতে চাহি তাহা স্পষ্ট। আশা করি পাঠক বুঝিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণরূপ বেদান্তমূর্তিই একান্তভাবে অবলম্বনীয়—একথাই কহিতেছি। নিশ্চয়ই কোন সম্প্রদায় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নহে অথবা কোন মানুষকে ধর্মান্তরিত করিবার উদ্দেশ্যেও নহে, পরন্তু আমাদিগের ন্যায় সাধারণ-বুদ্ধিসম্পন্ন নরনারীর কল্যাণের জন্য আশার বাণী, প্রেমের বাণী, ভরসার বাণী এই যুগে যাঁহার শ্রীমুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, যিনি ত্যাগিশ্রেষ্ঠ বলিয়াই সাহসভরে বলিতে পারিয়াছিলেন—"যত মত তত পথ", যিনি শুধু কথায় নহে, নিজ জীবনে আচরণ করিয়া দেখাইয়া গেলেন—'সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ' [স্মরণ করিতে পারি তাঁহার উপলব্ধির কথা—"মা দেখাইয়া দিলেন, এত মুখে খাচ্ছিস আর এই এক মুখে না খেলেই নয়?"] সেই অসাম্প্রদায়িক শিবচরিত্রের অনুধ্যান করিয়া আমরা বুঝিব ধর্মসঙ্কট কাহাকে বলে, এ-সঙ্কট অপসারণের পন্থাই বা কি?

ভারতবর্ষে ধর্মই জীবনবীণার মূল সুর

প্রথমেই একটি গূঢ় তত্ত্ব বুঝিয়া লইলে পরে কোনপ্রকার গোল থাকে না। বিবেকানন্দ প্রদত্ত এই তত্ত্বটি হইল—ধর্মেই ভারতবর্ষের প্রাণ লুক্কায়িত। ধর্মের সংজ্ঞাটি উত্তমরূপে বুঝা দরকার। এই দেশে ধর্ম লইয়া জন্ম, ধর্ম লইয়া জীবন, ধর্ম লইয়া সাধনা, ধর্মেই বিবাহ, ধর্মেই মৃত্যু। অন্যান্য যাবতীয় সঙ্কট, যথা—প্রাকৃতিক বিপর্যয়, অর্থনৈতিক সঙ্কট, রাজনৈতিক সঙ্কট অথবা ভয়াবহ খাদ্যসঙ্কট, এমনকি বিশ্বব্যাপী সভ্যতার সঙ্কটও ভারতবর্ষকে টলাইতে পারে নাই। কিন্তু ভ্রমরার প্রাণ ধর্মে। তাই এই একবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও ধর্মসঙ্কট ভারতবর্ষের গভীরতম সঙ্কট—একথা অনুধাবন করিতে হইবে।

ধর্মসঙ্কটের প্রাথমিক লক্ষণ মূল্যবোধের সঙ্কট। আপাতদৃষ্টিতে এই মূল্যবোধের সঙ্কট ধর্মনিরপেক্ষ বলিয়াই মনে হয়। বস্তুত তাহা নহে। মূল্যবোধ ধর্মবোধের উপর দাঁড়াইয়া আছে। আরেকটু গভীরে প্রবেশ করিলে দেখা যাইবে, 'তত্ত্বমসি', 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-আদি সনাতন বেদান্ত-সিদ্ধান্তের অনুভবেই মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা। মূল্যবোধ যে ধর্মবোধের উপর দাঁড়াইয়া আছে, একথা কেহ বুঝিতে না চাহিলে আমাদিগের কিছু করিবার নাই। কারণ, অগ্নির দহনে জ্বলিয়াও যদি কেহ বলে—'কৈ কিছু তো হয় নাই', তাহা হইলে দ্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। ধর্মের প্রচলিত সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে না দেখিয়া বিশ্বজনীন মানবধর্মের নিরিখে মূল্যবোধের বিচার করিলে সহজেই স্বামীজীর বাণীর যাথার্থ্য অনুধাবন করা সম্ভব।

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ

শ্রীরামকৃষ্ণ যখন কহিলেন—"মত পথ, পথ কিছু ঈশ্বর নয়", তখন কেশবচন্দ্র সেনের ন্যায় বিখ্যাত ও বিদগ্ধ মানুষও অবাক হইয়া ভাবিয়াছিলেন—"সত্যই কি এই মানুষটি নিরক্ষর?" পূর্বেই বলিয়াছি, সীমার মাঝে অসীমকে প্রকাশ করিবার অদ্ভুত দিব্যশক্তি শ্রীভগবান কেবলমাত্র মানবকেই দান করিয়াছেন। সুতরাং স্বীয় অনন্ত স্ব-স্বরূপকে উপলব্ধি করিয়া দৈনন্দিন জীবনে সেই অনন্তত্বের বিকাশসাধন এবং অপরকে তাহার অনন্ত চৈতন্যের বিকাশসাধনে সহায়তা করাই যথার্থ মানবধর্ম, সেব্যাপারে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। এক দিব্য প্রেরণায় স্বামী বিবেকানন্দ একদিন বলিয়াছিলেন ঃ "ঈশ্বর যদি দিন দেন, এই কথা ("দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা"—শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি) আমি জগৎকে শোনাব"—সেই দিব্য অনুভূতিই তাঁহাকে নিযুক্ত করিয়াছিল একটি দিব্য সঙ্ঘ নির্মাণ করিবার জন্য। ক্ষুদ্র-বুদ্ধি আমরা আমাদের ক্ষুদ্র-দৃষ্টি সহায়ে যেটুকু বুঝিতে বা দেখিতে পারি, তাহার

বাহিরেও যে ঢের রহিয়াছে সেকথা বলাই বাহুল্য। সুতরাং ধর্মসঙ্কট বিমোচনের নিমিত্ত স্বামী বিবেকানন্দ জগৎকে যেন একটি 'মডেল' উপহার দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘই এই মডেল। এই সঙ্ঘের আদর্শ প্রসঙ্গে স্বামীজী পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশসাধন শিক্ষা করিবার জন্যই এই সঙ্ঘের স্থাপনা। এবং আদর্শ সমাজ বা আদর্শ জাতি বা আদর্শ দেশ নির্মাণের জন্য মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব বা পূর্ণত্বের বিকাশ সাধন যে একান্তই জরুরী সেকথাও ইদানীং শিক্ষিত সমাজ ক্রমে স্বীকার করিয়া লইতেছেন। অতএব, 'বুদ্ধিমান বুঝিয়া লহ' এই মডেলের তাৎপর্য কী হইতে পারে।

মন লইয়া সাধন

যতই দার্শনিক তত্ত্ব বা তথ্য বিধৃত হউক না কেন, বাস্তব জীবনের বহুবিধ সমস্যা ও তার সমাধানে প্রয়াসী মানুষের প্রসঙ্গ আসিয়াই পড়ে। একজন প্রবীণ সাধক অপর এক নবীন ধর্মপিপাসুকে বুঝাইতেছিলেন: 'দেখো বাবা, তুমি ধর্ম করতে এসেছ। ধর্মটা সম্পূর্ণ মনেরই ব্যাপার। মনেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। মনটিকে তৈরি কর।' শুনিয়া ভাবিলাম, শুধু ধর্মজীবন কেন, জীবনে চলিবার পথ তো সর্বক্ষেত্রে মনেরই ব্যাপার। ছাত্রজীবনে, গৃহস্থ জীবনে, স্বদেশে, বিদেশে, বার্ধক্যে, সুস্থ বা অসুস্থ দেহে, বিজ্ঞানচর্চায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে, প্রশাসনে এবং অন্যান্য সর্বক্ষেত্রে মনেরই নাচনকোদন। মনেরই তৃপ্তির জন্য আমাদের সকল প্রয়াস। এমনকি আহার-নিদ্রাদি আনুষঙ্গিক সমস্ত ক্রিয়াও মনের তৃপ্তিসাধনে নিয়োজিত। ভারতবর্ষে ক্রমশ বাড়িতেছে, এবং বিদেশে ভয়াবহরূপে যে-সমস্যায় মানবজীবন বিপর্যস্ত—তাহা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। বিজ্ঞানের চরম অগ্রগতি তো পারে নাই প্রেমাশ্রুজলে সমাজকে সিক্ত করিতে; অর্থনৈতিক বিপ্লব তো পারে নাই মানুষের মুখে শাশ্বত তৃপ্তির হাসি ফোটাইতে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতি তো পারে নাই মৃত্যুভয়ের কালিমারেখা ললাট হইতে মুছিয়া ফেলিতে!

যন্ত্রের যন্ত্রণা

যখনি যন্ত্রনির্ভর হইয়া মানুষ সুখের সন্ধান করিয়াছে, তখনি অধিকতর দুঃখ তাহাকে গ্রাস করিয়াছে। পিতা তাঁহার নাবালক পুত্রকে কম্পিউটার কিনিয়া দিয়াছেন। পুত্রও পরম আহ্লাদিত। ক্রমে যন্ত্রটির প্রতি সে অতিশয় আসক্ত হইল। তাহার দামী দামী গাড়ি না থাকিলেও সে কম্পিউটারের পর্দায় দামী গাড়ি চালাইয়া মনের বাসনা চরিতার্থ করে। দিনের সিংহভাগ সে কম্পিউটারের সামনে বসিয়া কাটায়। তাহার শিক্ষণীয় বিষয় ব্যতীত আরো কত কিছু সে কম্পিউটারে জানিতেছে, শিখিতেছে। উচিত বা অনুচিতের বালাই নাই। ফলত নিশ্চিতভাবেই মনকে বহির্মুখী করিবার রাস্তাও তাহার সম্মুখে খুলিয়া গিয়াছে। সহসা কম্পিউটারে কিছু গোলযোগ দেখা দিল। উহার 'মাদার বোর্ড' পুড়িয়াছে। সারাইতে চারদিন সময় লাগিবে। কেবল সময় নহে, অনেক লোকবলও লাগিবে। পিতার অবসর নাই। মাতা সাধারণ গৃহবধূ। পুত্রের জনসংযোগ নাই। তাহার মন অশান্ত হইতে অশান্ততর হইল। গৃহে অশান্তি বাড়িল। কেবল তাহাই নহে, সুযোগ বুঝিয়া বিভিন্ন সফ্টওয়ার কোম্পানি বিচিত্র ও আধুনিকতম সফ্টওয়ার আনিয়া পুত্রকে প্রলোভন দেখাইল। ছাপোষা পিতার সঞ্চিত অর্থের সিংহভাগ পুত্রকে তুষ্ট করিবার জন্য ব্যয়িত হইল। কিন্তু আখেরে চাহিদা ও অশান্তি আরো বৃদ্ধি পাইল। ইহার শেষ কোথায় জানি না। যন্ত্রের সভ্যতা অযান্ত্রিক (চিৎ-স্বরূপ) মানবকে যান্ত্রিক করিয়া তুলিল। মন হইল গৌণ, যন্ত্র হইল মুখ্য—ইহাই আধুনিক সভ্যতার চিত্র।

আজি হইতে শতাধিক বর্ষ পূর্বে স্বামীজীর সাবধান-বাণী উচ্চারিত হইয়াছিল—"যন্ত্র কখনো মানবকে সুখী করে নাই, কখনো করিবেও না।... সুখ চিরকালই মনে বর্তমান।" ('মদীয় আচার্যদেব', ১৩৭৯ সং, পৃঃ ৩৫৯) যখনি মনের সুকুমার বৃত্তিসকল যান্ত্রিকতার ভারে পিষ্ট হইয়া জীবনকে যন্ত্রমুখী করিয়াছে, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির সঙ্কট অনিবার্যভাবেই সমাজে উপস্থিত হইয়া সূক্ষ্ম রসবোধ, সূক্ষ্ম চেতনা, বিশুদ্ধ নান্দনিক অনুভব এবং সর্বোপরি 'শ্রদ্ধা'-কে খর্ব করিয়াছে। ইতিহাস ইহার সাক্ষী। দেবসঙ্গীত আসুরী সঙ্গীতে, দেবনৃত্য বা দানবনৃত্যে পরিণত হইয়াছে। সম্প্রতি দেখিতে

পাইতেছি—সঙ্গীত, সাহিত্য, শিক্ষা, ক্রীড়া ইত্যাদি, এমনকি পিতা-পুত্র অথবা শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কও রুচিসম্মত না হইয়া শ্রদ্ধাবিরহিত ও বিকৃতরুচিপূর্ণ হইয়া পড়িতেছে।

বুদ্ধিজীবীর ব্যাভিচার

'দুখের কথা কওয়া' এখনো তো শেষ হইল না। যখন দেখিতেছি 'ধর্ম'কে বিকৃত করিয়া কিছু বুদ্ধিজীবী সাধারণ সরল মানুষকে বিপথগামী করিয়া তাহাদিগকে সর্বনাশের পথে ঠেলিয়া দিতেছে, তখনো কি মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হইবে না? যে জনশিক্ষা ও নারীশিক্ষার কথা স্বামীজী গলা ফাটাইয়া আসমুদ্রহিমাচল অসংখ্যবার তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়া গিয়াছেন, তাহা তো এখনো পর্যন্ত কৈ রূপায়িত হইল না? কৈ, এখনো পর্যন্ত শিক্ষার আলো দেশের প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জে তো পৌঁছাইল না? কৈ, এখনো পর্যন্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন রাজনীতিকগণ মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থপর রাজনীতিকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করিয়া এমন কোন শিক্ষানীতি তো বলবতী করিতে পারিলেন না, যাহা ইংরাজের 'কেরানী-গড়া' শিক্ষানীতির প্রভাব হইতে মুক্ত? অথচ ইহাও অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া মনীষিগণ মানিয়াছেন যে, সুশিক্ষার বিস্তার হইলে ধর্মীয় বা অন্য যেকোন কুসংস্কার ও গোঁড়ামী আপনি পলায়ন করিবে। বাঘের রূপ ধরিয়া হরি ভয় দেখাইতে আসিয়াছিল। একজন চিনিয়া ফেলিল—'ওগো, এ যে আমাদের হরে!' হরি দেখিল, চিনিয়াছে। একটু হাসিয়া চলিয়া গেল অন্যত্র, অন্যকে ভয় দেখাইতে। সুশিক্ষার আলোয় যখন ছদ্মবেশধারী কুসংস্কাররূপী শয়তানকে মানুষ চিনিতে পারিবে, উহা আপনি পলায়ন করিবে।

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে

এই সুশিক্ষার বিদ্যামন্দির স্বগৃহে আমাদেরই নির্মাণ করিতে হইবে। সমাজে প্রত্যেক পরিবারের মধ্যেই মনের স্বাস্থ্যকর পরিমণ্ডল গড়িয়া তুলিতে হইবে। সেখানে প্রাচ্যের সনাতন সত্যধর্ম ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সমন্বয় সঙ্গীত বাজিয়া উঠিবে—স্বামী বিবেকানন্দের ইহাই বিশেষ ইচ্ছা ছিল বলিয়া আমরা বুঝিয়াছি। সভ্যতা-সঙ্কট, সংস্কৃতি-সঙ্কট বা মূল্যবোধের সঙ্কট—যাহাই বলি না কেন, আজ যে ধর্মীয়-সামাজিক জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে, যে অশান্তির অগ্নি পৃথিবীব্যাপী প্রজ্বলিত হইয়াছে, তাহার পশ্চাতে আরো কিছু দুর্নিরীক্ষ্য কারণ বিদ্যমান বলিয়া অনুমিত হয়। বর্তমানের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা রাজনীতিকে প্রভাবিত করিতেছে কিংবা রাজনীতি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে প্রভাবিত করিতেছে তাহা বিচার করা শক্ত। আধুনিক পৃথিবীর নিরপেক্ষ ইতিহাস ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পাইবে কিনা জানি না। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে ইতিহাসকে যতই বিশ্লেষণ করা হউক না কেন, পৃথিবীর ইতিহাস ধর্মের ইতিহাস। ভগবান বুদ্ধ, ভগবান যীশু অথবা মহামানব মুশার তুল্য মহাশক্তিধর ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর ইতিহাসকে নির্দিষ্ট গতিময়তা প্রদান করিয়াছেন—একথা অস্বীকার করিবে কে? বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, যখনি মনুষ্যত্বের অবমাননা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাইয়াছে, এক দিব্যশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে মানুষকে সেই 'ধর্মসঙ্কট' হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত। শ্রীভগবানের দুর্লঙ্ঘ্য প্রেম তাঁহাকে বারংবার অশেষ মানবকল্যাণচিকীর্ষায় যেন টানিয়া আনিয়াছে মর্ত্যলোকে, যেন আজিও দক্ষিণেশ্বরের ঐ কুঠিবাড়ির ছাদ হইতে কেহ ব্যাকুল হৃদয়ে বারংবার ডাকিতেছে—"ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়।" আমরা কি ঐ ডাক শুনিয়াও শুনিতেছি না? শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপী শ্রীভগবানের পবিত্র সোহাগের উষ্ণতা অপেক্ষা অনন্ত দুঃখের জননীস্বরূপ কাম-কাঞ্চনাসক্তি কি আমাদের অধিকার করিয়া রাখিয়াছে? আমরা স্বীয় মনের উপর প্রভুত্ব হারাইয়া নিজেরাই কি মনের কৃতদাস হইয়া পড়িয়াছি?

ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই এক কথা, মন লইয়া ব্যাপার। মনের রোগ এবং তাহার ঔষধ! বাস্তবিক সমস্যাসঙ্কুল জীবনে, ক্ষত-বিক্ষত চিত্তের অসহ্য জ্বালা আরাম করিবার জন্য ঐ দিব্যমূর্তিরূপ ঔষধির কি তুলনা আছে? যত সঙ্কট আসিতে পারে আসুক, আমাদেরও অনন্ত-ভরসা সঙ্কটমোচনহার শ্রীরামকৃষ্ণ বিরাজমান—আপন মহিমায়, আপন ঔজ্জ্বল্যে, আপন অধ্যাত্মবিভায়, প্রেমকিরণমালায় বিভূষিত ভক্তমোহন রূপে! □

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে যেসকল তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৩৫৯ সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। আশা করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

দ্য ইন্ডিয়ান মিরর, ২৮ মার্চ ১৮৭৫

একজন হিন্দু সন্ন্যাসী—বেশিদিন আগে নয়, আমরা একজন (নিষ্ঠাবান হিন্দু ভক্ত)-কে দেখে তাঁর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের গভীরতা ও তাঁর সরলতা দেখে অভিভূত হয়েছি। তিনি কথাবার্তায় যে অফুরন্ত রূপক ও উপমাগুলি ব্যবহার করছিলেন, তাদের অধিকাংশ যেমন ছিল যথোপযোগী তেমনি ছিল শ্রুতিমধুর। তাঁর মানসিকতা পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর মানসিকতার বিপরীত; কারণ তাঁর মন ছিল যেমন কোমল, তেমনি চিন্তাশীল। কিন্তু পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতীর মন ছিল কঠোর ও পুরুষোচিত এবং তিনি ছিলেন তর্কপ্রিয়। হিন্দুধর্মের মধ্যে যথেষ্ট মাধুর্য ও সদ্গুণ আছে বলেই এই ধর্ম থেকে এই ধরনের মানুষ উদ্ভূত হয়েছে। (ইংরেজী থেকে অনূদিত)

*

ধর্মতত্ত্ব, ১ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৭ শক; ১৪ মে ১৮৭৫

রামকৃষ্ণ পরমহংস।—জাহানাবাদের নিকট কোন পল্লীতে ব্রাহ্মণকুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃক্রম যখন দশ কিংবা একাদশ তখন হইতে ইঁহার মনে অসাধারণ ধর্মানুরাগের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। যেখানে অতিথি ফকির সন্ন্যাসী দেখিতে পাইতেন, সেইখানে গিয়া ইনি বসিয়া থাকিতেন। রামকৃষ্ণের পিতাও একজন সাধক ছিলেন। তিনি পুত্রকে পরিধানের জন্য বস্ত্র দিতেন, পুত্র তাহা ছিন্ন করিয়া কৌপিন প্রস্তুত করিতেন।... যৎকালে রানী রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে অতি সমারোহের সহিত দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন, তখন রামকৃষ্ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠের সঙ্গে তথায় নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান অষ্টাদশ বর্ষ হইবে। রাসমণির জামাতা মথুরবাবু রামকৃষ্ণের ঔদাস্যভাব দেখিয়া তাঁহাকে কিছু ভালবাসিতে লাগিলেন এবং কিছুদিন পরে কালীদেবীর মন্দিরে তাঁহাকে পরিচারকের কার্যে নিযুক্ত করিলেন।... এই যুবা পরমহংস রিপুদমন ও যোগসাধনে নিযুক্ত হইয়া অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরবাটীর পার্শ্বে গঙ্গাতীরে একটি রমণীয় স্থান আছে, তথায় তিনি দিবা রাত্রি বসিয়া থাকিতেন। রিপুদমনের জন্য ভৈরবী পূজা করিয়াছিলেন এবং কিছুদিন স্ত্রীলোকের বেশ-ভূষা পরিধান করিয়া থাকিতেন। আপনাকে প্রকৃতি বোধ না হইলে রিপু জয় করা যায় না, এই জ্ঞানে তিনি কখনো সখীভাবে কখনো বা দাসীভাবে সাধন করিতেন। তাঁহার এক শিষ্য বলেন, দশ বৎসর কাল তিনি নিদ্রা যান নাই, আর শারীরিক সুখের প্রতি একেবারে উদাসীন হইয়াছিলেন। কালী হইতে আরম্ভ করিয়া আল্লা পর্যন্ত জপ করিয়াছেন।... রামকৃষ্ণের ধর্মানুরাগ অত্যন্ত প্রবল। সাধনের বলে এমনি হইয়াছে যে, টাকা অথবা শাল স্পর্শ করিলে তাঁহার হস্ত অসাড় হইয়া যায়। সংসারবাসনাশূন্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া এখন সর্বদা ধর্মভাবেতেই তিনি অবস্থিতি করিতেছেন। উৎসাহ কিঞ্চিৎ অধিক হইলে একেবারে অচেতন হইয়া পড়েন। এতদিন পর্যন্ত স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তাঁহাকে আপনার নিকট রাখিয়াছেন। যদিও এখন তিনি পরিবারের মধ্যে থাকেন, কিন্তু সাংসারিক ভাবে নহে, জিতেন্দ্রিয় যোগীর ন্যায় অবস্থিতি করেন। এখন বয়ঃক্রম প্রায় চল্লিশ হইয়াছে। শরীর অতি শীর্ণ, দুর্বলতার গতিকে মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা হয়। অনেক ভাল ভাল গভীর ধর্মকথা তাঁহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, কোন কোন দৃষ্টান্তকথা যদিও আমাদের কর্ণে অতি অশ্লীল এবং কুৎসিত ভাবব্যঞ্জক বোধ হয়, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে কোন মন্দ ভাব না থাকায় সেসকল তিনি অম্লানবদনে বলিয়া থাকেন। তিনি বলেন শরীরের সকল অঙ্গই সমান, তাহার মধ্যে মন্দ কি আছে? সঙ্গীত ও সঙ্কীর্তনে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা আছে, স্বর অতি সুমিষ্ট। ব্যবহারে কোনপ্রকার বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। সরলভাবে সকল কথা বলেন। আবশ্যক হইলে দুই-একটি গালাগালিও দিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা শুনিতে তত কটু বোধ হয় না।... তাঁহাকে দেখিলে ঘোর সাংসারিকের মনও টলিয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তিনি বলেন, সাধনের অবস্থাতে আমার এত যন্ত্রণা হইত যে তাহা আর বলিতে পারি না। শীতকালে গায়ে মাখন মাখিয়া বাতাস করিতে হইত—এত উত্তাপ। কিন্তু তাহার সহিত কিছু কিছু সুখও ছিল। এখন আর আমি ধ্যান করিতে পারি না, ধ্যান করিতে গেলেই মূর্চ্ছা হয়। তিনি যেমন সাধন করিয়াছেন, তেমনি তাঁহার যথেষ্ট লাভও হইয়াছে।...

একজন লোক লেখাপড়া না জানিয়াও কেবল অনুরাগের বলে কতদূর ধার্মিক হইতে পারে, রামকৃষ্ণ তাহার দৃষ্টান্তস্থল। ভাবের ভাবুক পাইলে তিনি মন খুলিয়া অনেক নূতন কথা বলেন। দক্ষিণেশ্বর দেবালয়ে তাঁহার থাকিবার স্থান, তাঁহার সহিত আলাপ করিলে অনেক আনন্দ পাওয়া যায়। এই স্বার্থপর সংসারে তাঁহার মতো একজন বৈরাগী সাধক অতি বিরলদৃশ্য সন্দেহ নাই। ❑

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার

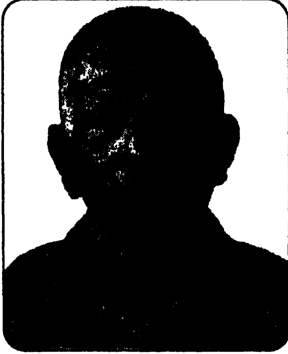
সম্পাদনা ❑ স্বামী সর্বগানন্দ

গীতার শক্তি ও মনোহারিত্ব

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

পূর্বানুবৃত্তি

এই আলোচনাটি দুর্গাপদ ঘোষ প্রমুখ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'



রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরম পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজজীর বর্তমান রচনাটি কলকাতার অদ্বৈত আশ্রম প্রকাশিত মহারাজজীর 'Universal Message of the Bhagavad Gita' শীর্ষক ইংরেজী গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের (১ম সংস্করণ, ২০০০) অন্তর্গত অসামান্য 'ভূমিকা'র বাঙলা অনুবাদ। রচনাটি 'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪০৭ সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। বিশেষভাবে উল্লেখ্য, মহারাজজীর প্রত্যেকটি ভাষণ, রচনা এবং আলোচনাই অসাধারণ বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিঋদ্ধতায় উজ্জ্বল এবং একাধারে ভক্তিরসাশ্রিত, অন্যদিকে বিশ্লেষণমূলক এবং আধুনিক মানুষের প্রশ্ন ও সংশয়ের পরিপ্রেক্ষিতে অনিবার্য-ভাবে গ্রহণযোগ্য। বর্তমান আলোচনাটিও ভারতের অতুলনীয় শাস্ত্রগ্রন্থ 'গীতা' সম্পর্কে পূজ্যপাদ মহারাজজীর নিজস্ব শৈলী ও ভঙ্গির পূর্ণ পরিচয়বাহী। পাঠকরা প্রতিক্ষণেই তার প্রমাণ পাবেন এবং প্রতিক্ষণেই মহারাজজীর অনবদ্য যুক্তি ও বিশ্লেষণে আলোকিত হবেন।

ভাষান্তর : অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য।

—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

ইন্দ্রিয়পরায়ণতার আধিপত্য এবং উদ্ভূত অশুভ প্রভাব

দীর্ঘদিন ধরে সবকিছু ঠিকমতই চলছিল; কিন্তু তারপর কী ঘটল? শঙ্কর বলে চললেন :

"অনুষ্ঠাতৃণাং কামোদ্ভবাৎ হীয়মান-বিবেক-বিজ্ঞান-হেতুকেন অধর্মেণ অভিভূয়মানে ধর্মে, প্রবর্দ্ধমানে চ অধর্মে..."—এই ধর্মপালনেচ্ছু সাধকগণের ইন্দ্রিয়াসক্তির বৃদ্ধি হওয়ায় বিবেক-বিজ্ঞান হ্রাস পায়; তখন ধর্মবোধ বা মূল্যবোধ হ্রাসপ্রাপ্ত হয় এবং অধর্ম বা অশুভ প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

এইরকম অবস্থা যখন দেখা যায়, তখন সংশ্লিষ্ট সমাজ একটা অবক্ষয়ের অবস্থায় পৌঁছায়। এতদিন ধরে যেসব গুণ ও চারিত্রিক মাধুর্যের সহায়ে মানুষে মানুষে একটা সুস্থ বন্ধন রচিত হয়েছিল, সেগুলি অন্তর্ধান করে। তার বদলে বাড়ে লোভ-লালসা, হিংসা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা। মানুষ কাম ও ক্রোধের দ্বারা পরাভূত হলে প্রথমেই বিবেক অর্থাৎ বিচারক্ষমতা এবং বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান তাকে ছেড়ে চলে যায়। ভাল-মন্দের বোধটা ক্রমে অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে যায়। ইন্দ্রিয়সুখ থেকে কখন নিজেকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে, তার বিচার যায় হারিয়ে। তখন কী ঘটে? ধর্মের ওপর আধিপত্য করে অধর্ম, এবং নৈতিক সংযমকে একেবারে বিদায় দিয়ে দেওয়া হয়। যার যা খুশি, সে তা-ই করে—যেমন আজ ঘটছে ভারতীয় জীবনধারার বহু ক্ষেত্রে। ধর্মকে যখন কাটিয়ে ওঠা হয়, তখন সেই নঞর্থক অবস্থা জন্ম দেয় আরেক সদর্থক অবস্থার—অধর্মের বৃদ্ধির। অশুভ কর্ম ক্রমাগত বাড়ে; সৎকর্ম ক্রমাগত কমে। ইতিহাসে আমরা বিভিন্ন সভ্যতার জন্ম ও প্রসার, তাদের ক্ষয় ও মৃত্যুর কথা পড়ি, বিশ্লেষণ করি। শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হলো একদা শক্তিশালী রোম সভ্যতা, যার ইতিহাস সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে এডওয়ার্ড গিবনের 'ডিক্লাইন্ অ্যান্ড ফল অফ দ্য রোমান্ এম্পায়ার' গ্রন্থটিতে। শঙ্করাচার্য এখানে যা বলছেন, তার উত্তম দৃষ্টান্ত আছে গ্রন্থটিতে। গিবন পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছেন কিভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রোম সাম্রাজ্যে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধগুলির ক্রমিক অবক্ষয় হলো এবং শেষপর্যন্ত এক অসভ্য বহিরাগত আক্রমণে কিভাবে সে-সাম্রাজ্য চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেল।

ভারতবর্ষও তার পাঁচহাজার বছরের ইতিহাসে এমন অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করেছে; কিন্তু ভারতবর্ষের অভিজ্ঞতায় আসেনি সেই শেষ পর্যায়টি অর্থাৎ মৃত্যু। প্রত্যেক অব-ক্ষয়ের পরেই এসেছে এক প্রাণচঞ্চল পুনর্গঠন। শঙ্করাচার্য তাঁর ভূমিকার পরবর্তী অংশে সেই কথাই বলেছেন :

"জগতঃ স্থিতিং পরিপিপালয়িষুঃ স আদিকর্তা নারায়ণাখ্যো বিষ্ণুর্ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থং দেবক্যাং বসুদেবাৎ অংশেন কৃষ্ণঃ কিল সংবভূব। ব্রাহ্মণত্বস্য হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যাৎ বৈদিকোধর্মঃ, তদধীনত্বাৎ বর্ণাশ্রমভেদানাম্।"

—জগতের কল্যাণ ইচ্ছা করে সেই আদিকর্তা, জগৎ-স্রষ্টা নারায়ণ নামে খ্যাত বিষ্ণু জগতের আধ্যাত্মিকতা ও ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা করতে বসুদেব ও দেবকীর সন্তান-রূপে আবির্ভূত হলেন। ব্রাহ্মণত্ব রক্ষা হলে বৈদিক ন্যায়ধর্মও রক্ষা পাবে। কারণ, চতুর্বিধ কর্মভেদে এবং চতুর্বিধ আশ্রমভেদে সমাজের যে-বিভাজন ও রূপধারণ, তা বৈদিক ধর্মের ওপর নির্ভর করে।

যেভাবে কুম্ভকার কাদার তাল থেকে কুম্ভ 'সৃষ্টি' করেন সেইভাবে বেদান্ত এই জগৎ 'সৃষ্টি'র কথা বলে না। বেদান্ত বলে জগতের 'ব্যক্ত' বা 'প্রকাশিত' হওয়ার কথা—যেমন জ্বলন্ত অগ্নি থেকে ছিটকে আসে স্ফুলিঙ্গ কিংবা মাকড়সার দেহ থেকে তৈরি হয়ে যায় তার জালিকা। একের মধ্যে থেকেই ব্যক্ত হয় বহু; পরে তারাই আবার মিশে যায় সেই একের মধ্যে।

ব্রাহ্মণত্ব ঃ যা মানব বিবর্তনের লক্ষ্য

সামাজিক পুনর্গঠনের কাজটি কোন রাজনীতিবিদ্ বা বুদ্ধিজীবী বা পুরোহিতের দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়; কেবল যিনি ঈশ্বর-উপলব্ধি করেছেন, তেমন কোন মানুষই সেটি করতে পারেন। ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসে এমন দৈব ব্যক্তিত্ব আবির্ভূত হয়েছেন বারবার এবং এখানে আমরা বলছি তিনহাজার বছরেরও আগে ঘটে যাওয়া এমনই একটি পর্বের কথা। আমরা বলছি শ্রীকৃষ্ণের জন্মের কথা। ভারতবর্ষে আমাদের একটি মৌলিক ভাবনা হলো এই যে—মানবীয় বিবর্তন বলে একটি জিনিস আছে; সেই বিবর্তন হলো তমঃ থেকে রজঃ-তে এবং রজঃ থেকে সত্ত্বতে ঘটা মানবীয় উত্তরণ। আদ্যন্ত সত্ত্বভাবাপন্ন পুরুষ বা নারী একজন অসামান্য মানুষ; তিনি প্রকৃষ্টরূপে বিকশিত; তিনি অন্তরের দেবত্বের বিকাশসাধন করেছেন। ভারতবর্ষে আমরা বুঝেছি যে, এটিই মানবীয় বিবর্তনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। সমাজে কিভাবে আরো আরো বেশি সংখ্যায় এই ধরনের মানুষ উৎপাদন করা যায়? সমাজের প্রত্যেক সদস্যের কাছে এই লক্ষ্য স্থাপন করা হয়েছে। তাঁকে এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর বা অন্তত জীবনটাকে সেই উদ্দেশে পরিচালিত করার চেষ্টা করতে হবে। তোমার নিজের গতিতে এগোও, কিন্তু এগোও সেই লক্ষ্যের উদ্দেশে—বলছে বেদান্ত। আধুনিক চিন্তায় যাকে 'সমাজতত্ত্ব' বলা হয়, তা আসলে সামাজিক পরিসংখ্যান-মাত্র; ওতে হবে না। বেদান্ত দেখিয়ে দেয় যে, সমাজতত্ত্বের মধ্যে মানুষকে একটা সামাজিক লক্ষ্য ধরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে বটে, কিন্তু মানবতাকে অতি অবশ্যই সেই মানবীয় বিবর্তনের পথে উন্নতির লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। সেই লক্ষ্য বা আদর্শস্থলটি হতে হবে একজন সাত্ত্বিক মানুষ—যাঁর কোন ঘৃণা বা হিংসা নেই, যিনি চিরপ্রেমময়, দয়ালু। কোন সমাজে এমন সব মানুষ থাকলে সেখানে পুলিসেরও আর দরকার লাগবে না, এমনকি রাজনৈতিক রাষ্ট্রেরও প্রয়োজন থাকবে না। আর আইনকানুন, বিধি-নিষেধের তো কথাই নেই। কারণ, সেই সমাজে থাকবেন এমন সব মানুষ, যাঁরা স্ব-নিয়ন্ত্রিত ও সংযত; যাঁরা সকলের সঙ্গে নিজেদের আধ্যাত্মিক একত্ব উপলব্ধি করেছেন। ভারতবর্ষ বিশ্বাস করে যে, সেই সমাজই সবচেয়ে উন্নত ও অগ্রসর, যে-সমাজে সাত্ত্বিক মানুষের সংখ্যা সর্বোচ্চ, যাঁরা আধ্যাত্মিক ও বিকশিত-সত্তা, অর্থাৎ যাঁরা তাঁদের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশসাধন করেছেন। এইরকম মানুষকেই 'ব্রাহ্মণ' বলা হয়েছে—শব্দটির আদি বৈদান্তিক তাৎপর্যে, জাতপাতের অশুভ প্রসঙ্গে নয়।

চারহাজার বছরের প্রাচীন বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রথম 'ব্রাহ্মণ' শব্দটির সংজ্ঞা প্রদান করে বলা হয়েছে ঃ

"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।" (৩।৮।১০)

—গার্গি, যে এই অক্ষরকে (সত্যস্বরূপকে) না জেনে ইহলোক ত্যাগ করে, সে কৃপণ। কিন্তু গার্গি, যিনি এই অক্ষরকে (সত্যস্বরূপকে) জেনে ইহলোক ত্যাগ করেন, তিনি ব্রাহ্মণ।

এই অংশের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য 'কৃপণ'-এর সংজ্ঞা প্রদান করে বলেছেন—"পণক্রীত ইব দাসাদিঃ" অর্থাৎ পণের দ্বারা ক্রীত দাসের মতো দুঃখী।

ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ সম্বন্ধে ভগবান বুদ্ধ

সপ্তম খ্রীস্টপূর্বাব্দে ভগবান বুদ্ধ ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়ে প্রেম ও করুণার মহান বাণী প্রচার করলেন এবং স্থাপন করলেন এমন এক সন্ন্যাসি-সঙ্ঘ যা শ্রেণী ও সম্প্রদায়গত সর্বপ্রকার বিভাজন উপেক্ষা করে সব শ্রেণীর, সব সম্প্রদায়ের মানুষকে গ্রহণ করল। কিন্তু তিনি ব্রাহ্মণত্বের আদর্শ সম্বন্ধে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সম্মান ব্যক্ত করলেন। বৌদ্ধগ্রন্থ 'সুত্ত পিটক'-এর খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত ধম্মপদের 'ব্রাহ্মণ বগ্গো' নামক ছাব্বিশতম তথা শেষ অধ্যায়ের পুরোটা জুড়ে ব্রহ্মণ্য আদর্শের গুণ-বিচার ও প্রশংসা করা হয়েছে। সেই অধ্যায় থেকে নির্বাচিত কতকগুলি শ্লোক নিচে উদ্ধৃত হলো ঃ

"যস্‌স পারং অপারং বা পারাপারং ন বিজ্জতি,
বীতদ্দরং বিসংযুত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণম্।" (৩)

—তাঁকে বলি ব্রাহ্মণ, যাঁর এ-কূল ও-কূল দুটি কূলই নেই, যিনি ভয় থেকে মুক্ত, যিনি বন্ধন থেকে মুক্ত।

"ঝায়িং বিরজমাসীনং কতকিচ্চম্ অনাসবং,
উত্তমত্থং অনুপ্পত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণম্।" (৪)

—তাঁকে বলি ব্রাহ্মণ, যিনি ধ্যানপরায়ণ, আবেগমুক্ত, স্থিতধী, যাঁর কর্ম সমাপ্ত, যিনি কলুষমুক্ত এবং যিনি (সাধুত্বের) সর্বোচ্চ লক্ষ্যে উপনীত হয়েছেন।

"বাহিতপাপোতি ব্রাহ্মণো সমচরিয়া সমণোতি বুচ্চতি
পব্বাজয়মত্তনো মলং তস্মা পব্বজিতোতি বুচ্চতি।" (৬)

—যেহেতু তিনি সব অশুভ ত্যাগ করেছেন, সেহেতু তিনি 'ব্রাহ্মণ'; প্রশান্তিতে বাস করেন বলে তিনি 'সমণ' (শ্রমণ); আপন অশুদ্ধি পরিহার করেন বলে তিনি 'পব্বজিত' (প্রব্রজিত)।

"যস্‌স কায়েন বাচায় মনসা নত্থি দুক্কতং,
সংবুতং তীহি ঠানেহি তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণম্।" (৯)

—তাঁকে বলি ব্রাহ্মণ, যিনি দেহ, বাক্য বা মনের দ্বারা আঘাত করেন না; এই তিন বিষয়ে যিনি সংযত।

"ন জটাহি ন গোত্তেন ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো
যম্‌হি সচ্চঞ্চ ধম্মো চ সো সুচী সো চ ব্রাহ্মণো।" (১১)

—ব্রাহ্মণ হওয়া যায় জটা ও গোত্রের সহায়ে নয়, বংশপরিচয়ে নয়, জাতির দ্বারা নয়; তিনিই ব্রাহ্মণ যাঁর মধ্যে আছে সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা।

"গম্ভীরপঞ্‌ঞং মেধাবিং মগ্‌গামগ্‌গস্‌স কোবিদং
উত্তমত্থং অনুপ্পত্তং তমহং ব্রূমি ব্রাহ্মণম্।" (২১)

—তাঁকে বলি ব্রাহ্মণ, যাঁর জ্ঞান গভীর, যিনি বহুজ্ঞাত, যিনি ন্যায় ও অন্যায় পথ সনাক্ত করেন এবং যিনি উচ্চতম আদর্শে উপনীত হয়েছেন। (দ্রঃ The Dhammapada, English translation by Dr. S. Radhakrishnan, Oxford University Press, 10th Impression, Ch. XXVI)

এবং এই আধুনিক যুগে স্বামী বিবেকানন্দ সবরকম জাতপাতের বিচার ও অস্পৃশ্যতার ভয়ানক সমালোচনা করে মানবীয় বিবর্তনের পথে এই ব্রাহ্মণত্বের আদর্শকে সবার ওপরে তুলে ধরেছেন। 'ভারতের ভবিষ্যৎ' সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতায় তিনি বলেছেন: "ভারতবর্ষে মানবতার আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব; যেটিকে শঙ্করাচার্য চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন তাঁর গীতাভাষ্যের সূচনায়, যেখানে তিনি ধর্মপ্রচারকরূপে কৃষ্ণের আবির্ভাবের কারণ যে ব্রাহ্মণত্ব-রক্ষা, সেকথার আলোচনা করেছেন। সেটিই ছিল তাঁর অবতরণের মহান উদ্দেশ্য। এই যে ব্রাহ্মণ, যিনি ঈশ্বরের পুরুষ, যিনি ব্রহ্মকে জ্ঞাত হয়েছেন, যিনি আদর্শ এবং পূর্ণাঙ্গরূপে নিখুঁত মানুষ—তাঁকে থাকতেই হবে, তাঁর চলে যাওয়া কোনমতেই চলবে না।"

সেইসঙ্গে জাতপাতের অশুভ প্রভাব, বিশেষত উচ্চবর্ণের বিশেষাধিকারের দাবির প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন: "এইসব বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং বিশেষ একচেটিয়া অধিকারের দিন চলে গেছে। *প্রত্যেক অভিজাত শ্রেণীর কর্তব্য হচ্ছে নিজের কবরটি নিজে খুঁড়ে ফেলা, এবং যত দ্রুত সে সেটা সেরে ফেলে, ততই মঙ্গল। আর এতে যত দেরি সে করবে, ততই ক্রমশ বিষাক্ত হয়ে উঠে সে আরো জঘন্য মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাবে।*"

আধুনিক শতকগুলিতে ব্রাহ্মণ নামক সেই মহান শব্দটিকে আমরা নষ্ট করে ফেলেছি। এখন এর মানে এসে দাঁড়িয়েছে জাতপাতে আবদ্ধ উন্নাসিক একজন মানুষ—যে রজঃ ও তমঃ-তে পূর্ণ, যার মধ্যে সত্ত্বের লেশমাত্র নেই, এবং যে অন্য সব জাতের মানুষকে নিচু চোখে দেখে। বিগত একহাজার বছর ধরে এমন একটি মহান শব্দের অবনয়ন ঘটিয়ে চলেছে ব্রাহ্মণেরা। স্বল্প-সুবিধাপ্রাপ্ত বা সর্বসুবিধাবঞ্চিত বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে তারা নিজেদের জন্য বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দাবি করে এসেছে। আধুনিক ভারতীয় বিবেক এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে এবং ভারতীয় সমাজকে এই অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত করতে শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। [ক্রমশ] (ছয়)

'উদ্বোধন'-এর প্রাক্তন অধ্যক্ষ স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজীর জীবনাবসান

স্বামী হিরণ্ময়ানন্দজী মহারাজ (বিজয়ানন্দজী) ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে গত ১৮ মে ২০০১ রাত ১০টা ৫৫ মিনিটে বেলুড় মঠে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। প্রয়াণের প্রায় এক বছর আগে থেকে ক্যান্সার ছাড়াও তিনি বার্ধক্যজনিত অন্যান্য রোগে ভুগছিলেন।

পূজনীয় মহারাজ ১৯২৯ সালে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। ১৯৩৩ সালে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছি এবং অছি পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৫ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৮৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদকের পদে বৃত ছিলেন।

পূজ্যপাদ মহারাজ বিভিন্ন সময়ে রেঙ্গুন (বর্তমান মায়ানমার), দেওঘর, বৃন্দাবন, বাগবাজার (উদ্বোধন), বোম্বে (মুম্বাই) ও দিল্লি কেন্দ্রের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তাছাড়া ভুবনেশ্বর, মাদ্রাজ (চেন্নাই), ইনস্টিটিউট অফ কালচার ও মহীশূর কেন্দ্রে কর্মী হিসাবে তিনি বিভিন্ন সেবাকাজ করেছেন। বাঙলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় তাঁর বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। বাঙলা ও ইংরেজীতে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থও তিনি প্রণয়ন করেছেন। হৃদয়বত্তা এবং সরল উদার মনের জন্য তাঁর বিশেষ পরিচিতি ছিল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল।

উদ্বোধনে মায়ের বাড়ীতে তিনি ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত অধ্যক্ষ পদে বৃত ছিলেন। তাঁর অবস্থানকালে উদ্বোধন কার্যালয় এবং মায়ের বাড়ীর বিভিন্ন উন্নতি সাধিত হয়। সকলেই এখনো সেকথা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত



ব্যাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ প্রবীণ ও শাস্ত্রজ্ঞ সন্ন্যাসী স্বামী হর্ষানন্দজী স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক সঙ্গীত' ও স্তোত্রাদির সংস্কৃত ব্যাখ্যা করেছেন। বেলুড় মঠস্থ বিবেকানন্দ বেদ বিদ্যালয়ের আচার্য স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ সেগুলির প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ করছেন।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

"মোচন অঘদূষণ জগভূষণ চিদ্ঘনকায়
জ্ঞানাঞ্জন বিমলনয়ন বীক্ষণে মোহ যায়।" ।।২।।

শব্দার্থ ঃ মোচন অঘদূষণ—দূষণযোগ্য অঘ (পাপ) থেকে মোচনকারী। জগভূষণ—জগতের ভূষণ, অলঙ্কার। চিদ্ঘনকায়—ঘনীভূত চৈতন্যই যাঁর কায় অর্থাৎ দেহ, তিনি চিদ্ঘনকায়। জ্ঞানাঞ্জন বিমলনয়ন—জ্ঞানরূপ অঞ্জন অর্থাৎ কাজলযুক্ত বলে যার নয়নদ্বয় বিমল অর্থাৎ নির্মল। বীক্ষণে মোহ যায়—নির্মল নয়নবিশিষ্ট বলে তোমার দৃষ্টিমাত্রেই আমাদের মোহ দূর হয়।

ভাষ্য ঃ মোচন **অঘদূষণ** (দূষণযোগ্য অঘ থেকে মোচনকারী)—দান প্রভৃতি সৎকর্মের দ্বারা যা চলে যায় তা অঘ (অঘতে গচ্ছতি ইতি অঘম্) উপপাতক। আর, ব্রহ্ম-হত্যাদি মহাপাতক। এই মহাপাতক ও উপপাতক উভয়েই অঘ। মহাপাতকসমূহ ভগবৎকৃপা ব্যতীত প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা বিনষ্ট হয় না। এজন্য 'অঘদূষণ' শব্দ প্রয়োগ করা হলো। দূষণযোগ্য পাপ (বিনাশযোগ্য) থেকে তো বটেই, এমনকি মহাপাতক থেকেও মোচনকারী হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি লোকদৃষ্টিতে মহাপাতকী হয়েও আজন্মশুদ্ধ স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে একাসনে বসে তাঁর শিষ্যদের শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শোনাতে সমর্থ হয়েছিলেন। স্পর্শমণির স্পর্শে যেমন লোহা সোনায় পরিণত হয়, তেমনি গিরিশচন্দ্রও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় সৎপুরুষে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। তাছাড়া 'কল্পতরু'র দিন শ্রীরামকৃষ্ণ যেসকল ভক্তকে অনুগ্রহ করেছিলেন, তাঁদের দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

জগভূষণ—ভূষণ হলো কেয়ূর-কুণ্ডল প্রভৃতি আভরণ (অলঙ্কার)। আভরণ দৈহিক সৌন্দর্য বাড়ায়—একথা বালকদের কাছেও সুবিদিত। কিন্তু বিচার করলে দেখা যায়, কেয়ূর (বাজু) প্রভৃতি যথার্থ ভূষণ নয়; সদাচরণ ও সুস্বভাবই হলো নিজের যথার্থ ভূষণ। কেননা 'এরূপ ব্যক্তির দ্বারা কুল পবিত্র হয়, জননী কৃতার্থা হন এবং বসুন্ধরা পুণ্যবতী হন' (সূতসংহিতা, ২।১০।৪৫) ইত্যাদি প্রসিদ্ধ বাক্যসকল উক্ত সুশীলের পক্ষে প্রযোজ্য। অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ সুশীলগণের চূড়ামণি, অতএব তিনি জগতের ভূষণ।

চিদ্ঘনকায়—পরব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ। মায়া ব্যতীত এই চৈতন্যময় সত্তা ঘনীভূত হয়ে নররূপ ধারণ করতে পারে না। পরমেশ্বরের অবতাররূপে দেহধারণ বিষয়টি হলো চৈতন্যের ঘনীভবন। কায়ে (দেহে) বাস করেও স্বরূপ-জ্ঞান সদা বিদ্যমান থাকে, এজন্য অবতার চিদ্ঘনকায়।

জ্ঞানাঞ্জন(যুক্ত) বিমলনয়ন—যে-অঞ্জন নয়নে লাগানো থাকে, সেই অঞ্জনের বর্ণেই সমস্ত জগৎ রঞ্জিত দেখায়—একথা প্রসিদ্ধ আছে। জ্ঞান হলো সর্বভূতের হৃদয়ে স্থিত পরমাত্মার দর্শন। সেই জ্ঞানই অঞ্জন। এই জ্ঞানাঞ্জনযুক্ত নয়ন বিমলই হয়। গীতায় (৪।৩৮) আছে—জ্ঞানের মতো পবিত্র এই জগতে আর কিছু নেই। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব হলেন জ্ঞানাঞ্জনযুক্ত বিমলনয়ন। এখানে স্মরণীয়, তিনি যখন মা কালীকে সাক্ষাৎ করেছিলেন তখন সমস্ত জগৎ শক্তিময় দেখতেন। সমাধি ও ব্যুত্থান অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থায় ভাবমুখে থেকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 'এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্মস্বরূপ' (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৩।১৪।১), 'এই ব্রহ্মাণ্ডের সমস্তই পরমেশ্বরের দ্বারা আবরণীয়' (ঈশ উপনিষদ্, ১) দর্শন করতেন। এরূপ নয়ন দ্বারা তিনি যখন আমাদের মতো ভক্তদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তখন আমাদের মোহ সদ্যই তিরোহিত হয়। 'নিজের কল্যাণেচ্ছু ব্যক্তি আত্মজ্ঞেরই সেবা করবেন' (মুণ্ডক উপনিষদ্, ৩।১।১০)—এই শ্রুতিবাক্য অনুসরণ করে আমরা যদি নিজের কল্যাণ- ইচ্ছায় আত্মজ্ঞ পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণকে অর্চনা করি, তাহলে তিনি তাঁর জ্ঞানাঞ্জনলিপ্ত বিমলনয়ন দুটি দিয়ে আমাদের দিকে তাকাবেন। সূর্য উঠলে বরফকণা যেমন স্বাভাবিকভাবেই তিরোহিত হয়, তেমনি আমাদের মোহও স্বতই পলায়ন করবে। স্বামীজী বললেন, **বীক্ষণে মোহ যায়।** মোহ হলো আমাদের; আর আত্মা হলো তাঁর (অংশ)। অতএব তিনি যখন আমাদের অন্তঃস্থ আত্মাকে দেখতে ইচ্ছা করবেন, অর্থাৎ তিনি যখন আমাদের মধ্যে নিজেকেই দেখতে ইচ্ছা করবেন, তখন আমাদের মোহ আত্মাকে আবরিত করে রাখবে কিভাবে?

**"ভাস্বর ভাবসাগর চির উন্মদ প্রেমপাথার
ভক্তার্জন যুগলচরণ তারণ ভবপার।"** ।।৩।।

শব্দার্থ ঃ ভাস্বর ভাবসাগর—ভাস্বর, উজ্জ্বল ভাব-সমূহের সাগর। চির উন্মদ—চির উন্মত্ত। প্রেমপাথার—

প্রেমের সাগর। ভক্তার্জন যুগলচরণ—ভক্তের অর্জিত চরণদ্বয়। তারণ ভবপার—ভবপারের তারয়িতা।

ভাষ্য ঃ ভাস্বর ভাবসাগর—মনের মধ্যে অনুভূত রাগ প্রভৃতি বিকারই হলো ভাব। এই ভাবসমূহ ভাস্বর ও তামস-ভেদে দুই প্রকার। কামাদি ষড়্‌রিপু হলো তামস ভাব। কারণ, এগুলি আত্মহননাদি দ্বারা তামসাবৃত লোকে প্রেরণ করে। (ঈশ উপনিষদ্‌, ৩) ভগবদ্‌ অনুরাগ, প্রাণিগণের প্রতি অনুকম্পা প্রভৃতি ভাব ভাস্বর; কারণ, এগুলি চিত্তশুদ্ধি দ্বারা ভাস্বর অর্থাৎ উজ্জ্বল আত্মজ্যোতি-র্যুক্ত বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করায়। এসকল ভাস্বর ভাব-সমূহ—জ্ঞান, ভক্তি, বৈরাগ্য, সত্য, প্রেম প্রভৃতি হলো ভাবের সাগর অর্থাৎ সাগরের মতো কূলকিনারাহীন। শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ সাধনকালে বিবেক-বৈরাগ্য, শমাদি ষট্‌সম্পত্তি, মুমুক্ষুত্ব, শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, মধুর, সবিকল্প, নির্বিকল্প প্রভৃতি বহু ভাব প্রদর্শন করেছিলেন। সিদ্ধিলাভের পর তিনি তাঁর শিষ্যের মধ্যে যে যেরূপ ভাবের সাধক, তাঁদের সম্মুখে তিনি সেই সেই বিবিধ ভাব প্রকাশ করতেন। ভজন-কীর্তনাদি শ্রবণকালে তিনি গানের মূল ভাব উপলব্ধি করে তদনুযায়ী আচরণ করতেন। অতএব তিনি হলেন ভাস্বর ভাবসাগর। বিভিন্ন প্রবৃত্তির ভক্ত এই ভাবসাগর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে নিজ নিজ হৃদয়-কুম্ভ পূরণ করে নিজ প্রয়োজনীয় ভাব নিয়ে থাকেন।

চির উন্মদ—ভগবৎপ্রেমে সদা উন্মত্ত। জগতে দেখা যায় কাম-কাঞ্চনাসক্ত লোকেরা কাম-কাঞ্চন লাভের জন্য উন্মত্ত—পাগল; অথবা এগুলি পাওয়ার পর তা নিয়ে মত্ত থাকে। কিন্তু ভববন্ধনখণ্ডনকারী, মহাপাতকমোচনকারী, জ্ঞানাঞ্জন বিমলনয়নযুক্ত, ভাস্বর ভাবসাগর শ্রীরামকৃষ্ণদেব সদা নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত এবং আত্মপ্রেমে সদাযুক্ত বলে তিনি ভগবৎপ্রেমেই উন্মত্ত থাকতেন, অন্য কিছুতে নয়। বাল্যকাল থেকে আরম্ভ করে মহাসমাধি পর্যন্ত এই ভগবদুন্মত্ততা তাঁর মধ্যে বারবার দেখা গেছে। এজন্যই তিনি প্রেমপাথার। প্রথম দর্শনেই তিনি যেকোন ব্যক্তিকে তাঁর সেই প্রেমের দ্বারা আকর্ষণ করতেন। এবিষয়ে 'কথামৃত'-এ শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত মাদকাসক্ত ময়ূরের কথা যথোচিত দৃষ্টান্ত।

ভক্তার্জন যুগলচরণ তারণ ভবপার—ভবসাগর যাঁরা উত্তীর্ণ হতে চান, তাঁরা ভক্ত। তাঁরা ভবসাগর থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ভগবানকে ভক্তিসহকারে উপাসনা করে তাঁর চরণারবিন্দে শরণ নিয়ে তাঁর চরণযুগলকেই সর্বদা হৃদয়ে ধারণ করেন। সেই ভক্তিবলেই তাঁরা অপার ভবসাগরের পারে গমন করেন। এজন্য ভগবৎ চরণযুগলই হলো ভবসাগরতারয়িতৃ অথবা ভগবৎ চরণযুগল ভক্তগণ সর্বদা প্রার্থনা করেন বলে সেই চরণযুগল হলো ভক্তার্জনযোগ্য। সেই ভক্তার্জনযোগ্য যুগলচরণ যাঁর আছে, তিনিই হলেন ভক্তার্জন যুগলচরণ এবং তিনিই হলেন ভবসাগর-তারয়িতা—এরূপও ব্যাখ্যা করা যায়।

"জৃম্ভিত যুগ-ঈশ্বর জগদীশ্বর যোগসহায়
নিরোধন সমাহিত মন নিরখি তব কৃপায়।" ।।৪।।

শব্দার্থ ঃ জৃম্ভিত যুগ-ঈশ্বর—এই যুগের ঈশ্বররূপে—অবতাররূপে যিনি জৃম্ভিত, প্রকটিত। জগদীশ্বর—জগতের ঈশ্বর। যোগসহায়—যোগের সহায়ক। নিরোধন—নিরুদ্ধ-চিত্ত। সমাহিত মন—একাগ্রমনা, যাঁর মন সমাধিতে স্থিত। নিরখি—দেখি। তব কৃপায়—তোমার কৃপার বলে।

ভাষ্য ঃ জৃম্ভিত যুগ-ঈশ্বর জগদীশ্বর—নিখিল ভুবনে বসবাসকারী যত প্রাণী আছে, সকলের তুমি ঈশ্বর—স্বামী; অব্যাহত শক্তিমান তুমি সদা সর্বপ্রকারে তাদের রক্ষক। শ্রীকৃষ্ণ অবতারে তুমি নিজেই বলেছিলে, যখন ধর্ম অধর্মের দ্বারা অভিভূত হয়, তখন তুমি তোমার পরমস্বরূপ থেকে অবতীর্ণ হয়ে দুষ্টদমন ও শিষ্টপালন করে পুনরায় ধর্মের প্রতিষ্ঠা কর এবং যুগে যুগে যেখানে যেখানে এরূপ ধর্মের গ্লানি হয় সেখানে সেখানেই তোমার অবতারত্ব প্রদর্শন কর। এযুগেও তুমি অবতীর্ণ হয়ে তোমার ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করেছ। কিন্তু এই অবতারে একটি বিশেষত্ব আছে। এযুগে শুধু দুষ্টদমন শিষ্টপালন নয়, পরমপুরুষার্থ লাভের জন্য যোগমার্গে প্রবৃত্ত মুমুক্ষু-গণকে তাঁদের নিজ নিজ যোগমার্গে যথোচিত সাহায্য করতেও অবতীর্ণ হয়েছ। এজন্য তোমার শিষ্যাগ্রগণ্য স্বামী বিবেকানন্দ রাজন্যবর্গকে সন্মার্গে পরিচালিত করেছিলেন।

যোগসহায়—দক্ষিণেশ্বরবাসী শ্রীরামকৃষ্ণরূপী ঈশ্বর সাধন ও সিদ্ধির দ্বারা যোগে সাহায্য করতেন। তাঁর পদাশ্রিত সকলপ্রকার সাধককে তাঁদের যথোচিত সাধনপথ প্রদর্শন করিয়ে যোগের অন্তরায় বিষয়ে জ্ঞান ও সিদ্ধিরূপ বিজ্ঞান উপদেশ করে তাঁদেরকে যোগে (সাধনায়) সাহায্য করতেন। এজন্যই তিনি যোগসহায়। শরীরত্যাগের পরেও তিনি আজও তাঁর কথা অধ্যয়ন ও তাঁর নামগ্রহণের মধ্য দিয়ে মুমুক্ষুদের যোগপথে সাহায্য করে চলেছেন।

নিরোধন সমাহিত মন—চিত্তনিরোধে তিনি কৃতকৃত্য হয়েছিলেন এবং স্বাভাবিকভাবেই তিনি মুহূর্ত-মধ্যে সমাধিতে নিমজ্জিত হতেন; এজন্য তিনি সমাহিতমনা।

নিরখি তব কৃপায়—তোমার কৃপায় দেখি। কি দেখি? দেখি—তুমি ঈশ্বর; যোগমার্গে যাঁরা প্রবৃত্ত, তাঁদের সহায়তা দান করতে তুমি অবতীর্ণ। এই দর্শন তোমার কৃপাতেই সম্ভব। অথবা, তোমার কৃপাতেই আমি চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে সমাহিতমনা হয়ে হৃদয়কমলে তোমাকে দর্শন করি—এরূপ ব্যাখ্যাও করা যায়। [ক্রমশ] (দুই)

পাতঞ্জল-যোগসূত্র

ব্যাখ্যাতা ঃ স্বামী প্রেমেশানন্দ

সূত্রানুবাদ ঃ স্বামী শরণ্যানন্দ

সম্পাদনা ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

সমাধিপাদ



শ্রদ্ধাবীর্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্বক ইতরেষাম্।।২০।।

শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি বা একাগ্রতা ও প্রজ্ঞা হইতে কাহারো কাহারো সমাধিলাভ হয়।

তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ।।২১।।

যাঁহারা পরম উৎসাহে সাধনা করেন, তাঁহারা শীঘ্র কৃতকার্য হন।

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোঽপি বিশেষঃ।।২২।।

মৃদু, মধ্য বা অধিক চেষ্টা অনুসারে যোগীদিগের সিদ্ধির পার্থক্য দেখা যায়।

মন্তব্য ঃ যাঁহারা যোগাভ্যাসের যোগ্য হইবার জন্য যাহা যাহা প্রয়োজন তদ্বিষয়ে যত্নশীল থাকেন, স্বভাবত তাঁহাদের শাস্ত্রোক্ত বিধানে সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা থাকে। প্রাণ ও মনের পূর্ণবিকাশেই বীর্যের ও স্মৃতি বা ধৃতির বিকাশ সম্ভব। তাঁহারা মনকে একাগ্র করিবার শক্তি তো পূর্বেই অর্জন করেন। তাহার ফলে তাঁহাদের বিচারশক্তি অর্থাৎ প্রজ্ঞা বিকশিত হয়। এইসব সামর্থ্যযুক্ত সাধকের প্রারব্ধ কর্মের প্রতিকূল ও অনুকূল অবস্থার ফলে কাহারো মনে সিদ্ধিলাভের তীব্র ইচ্ছা জাগে, কাহারো তাহা বিকশিত হইতে বিলম্ব হয়।

যাহাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই, সুতরাং কোনরূপ উপাসনায় অভ্যস্ত নহে—তাহারা ধ্যানযোগের সহায়তায়ও এই জগতের রহস্য জানিতে পারে। যাহারা ঈশ্বর সম্বন্ধে অভিজ্ঞ, তাহাদের সাধনপ্রণালী এইবার বলা হইতেছে।

ঈশ্বর-উপাসকদের মধ্যে তিনটি বিভাগ আছে। প্রথম—শিব, বিষ্ণু, কালী, দুর্গা প্রভৃতি কল্পিত ঈশ্বর-প্রতীকের সহায়তায় ঈশ্বরচিন্তা। দ্বিতীয়—মুসলমান প্রভৃতি অবৈদিকদের মধ্যে নিরাকার ঈশ্বরচিন্তা। তৃতীয় অবতার-চিন্তা। ঈশ্বরের তত্ত্ব যে যত ভালরূপে জানিবার সুযোগ পায়, তাহার উপাসনাই সর্বাপেক্ষা উত্তম অর্থাৎ সে সহজে জ্ঞানলাভ করিতে পারে। ঈশ্বর সম্বন্ধে উপাসকদের কয়েকটি কথা জানা একান্ত দরকার—(১) ঈশ্বর এই সংসারের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দের সঙ্গে সম্পর্কহীন। "ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।" (গীতা, ৯।২৯) ইত্যাদি। (২) ঈশ্বর সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। (৩) মানুষের যত জ্ঞান সবই তিনি দিয়াছেন। অধ্যাত্মজ্ঞানের অভাবে মানুষ যখন অতি হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তিনি অবতার-রূপে মানবকে ধর্মশিক্ষা দিয়া থাকেন। (৪) মানবজাতির নিকট ভগবানের বাচকরূপে প্রথমে 'ওঙ্কার' শব্দ প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই ওঙ্কার শব্দে মন একাগ্র করিলে মন জগতের ঊর্ধ্বে উঠিয়া যায় এবং জগৎকারণ ঈশ্বরকে অনুভব করা যায়। পরবর্তী ঋষিগণ ঈশ্বরের নানাভাবের প্রতীকরূপে কতকগুলি বীজ আবিষ্কার করিয়াছেন। যথা—হ্রীং (শক্তিবীজ), রং (অগ্নিবীজ), ক্লীং (ভগবানের প্রেমভাব প্রকাশক বীজ), ঐং (গুরুবীজ)। (৫) কোন প্রিয়জনকে যখন আমরা নাম ধরিয়া ডাকি তখন মনে মনে তাহার সত্তার ধারণাও রহিয়াছে। ঠিক এইরূপ ভগবানের গুরুদত্ত নাম ও বীজ জপ করিতে করিতে—ইহা ইষ্টদেবতার নাম এবং এই নামে ডাকিলে তিনি আসিবেন, এই ধারণাও মনের মধ্যে থাকে। সেইজন্য গুরুদত্ত মন্ত্রজপ করিলে ইষ্টদর্শন হয়। (৬) যখন ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হয়, তখন আমরা দেহমনের বন্ধন হইতে সরিয়া দাঁড়াই অর্থাৎ মুক্তিলাভ করি; সেই মুক্তি পুনর্মুক্তি না হইলেও সাধনাবস্থায় সাধকের যেসব বাধা পূর্বে উপস্থিত হইত তাহা সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া যায়।

ঈশ্বরের কোন একটি রূপ চিন্তা করিতে করিতে মন তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া গেলে বোধ হয় "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহু... বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ" (গীতা, ৩।৪২)—ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ আমি সেই ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতেছি। ইহা অস্মিতারই একটি প্রকার, যে-অস্মিতা পিছনে থাকায় আমরা জীবনের সব কর্ম ও চিন্তা বোধ করিয়া থাকি। সাধক যে গাহিয়াছেন ঃ "শ্যামা, মন ছাঁচে তোমারে ফেলে, মনোময়ী মূর্তি আজ লব তুলে।"

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা।।২৩।।

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি দ্বারাও সমাধিলাভ হয়।

ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।।২৪।।

দুঃখ, কর্ম, কর্মফল বা বাসনার দ্বারা অস্পৃষ্ট পুরুষবিশেষ—ঈশ্বর।

তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞত্ববীজম্।।২৫।।

তাঁহার মধ্যে অনন্ত সর্বজ্ঞত্বের বীজ বর্তমান থাকে।

স পূর্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।।২৬।।

তিনি প্রাচীন গুরুদিগেরও গুরু, কারণ তিনি কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ নন।

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।।২৭।।

ওঙ্কার তাঁহার প্রকাশক শব্দ।

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।।২৮।।

এই ওঙ্কার জপ ও উহার অর্থ ধ্যান করিলে সমাধিলাভ হয়।

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।।২৯।।

উহা হইতে অন্তর্দৃষ্টিলাভ হয় এবং যোগবিঘ্ন দূর হয়।

মন্তব্য ঃ যোগিসম্প্রদায়ের প্রবর্তক কপিল বহুপুরুষবাদী ছিলেন। কিন্তু 'যোগসূত্র' রচয়িতা পতঞ্জলি একেশ্বর মত স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, নিত্যমুক্ত এবং মানবজাতির আদিগুরু ঈশ্বরের চিন্তা করিতে করিতেও মানুষের সমাধি হইতে পারে। তাঁহার চিন্তা করিতে হইলে এইরূপ এক পুরুষের কথা ভাবিয়া 'ওঙ্কার' জপ করিতে হইবে। দীর্ঘকাল এইরূপ করিলে জীবাত্মা বা ক্ষেত্রজ্ঞ বা ক্ষরপুরুষের জ্ঞান হয়। তাহার ফলে নির্বাণের পথে অগ্রসর হইবার আর কোন বাধা থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কালীরূপে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করাই 'প্রত্যক্‌চেতনাধিগমঃ'। তোতাপুরীর উপদেশে মনকে কালী হইতে ঊর্ধ্বে তুলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ অনায়াসে কৈবল্যলাভ করিয়াছিলেন।

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধ-ভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ।।৩০।।

ব্যাধি, জড়তা, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, বিষয়তৃষ্ণা, মিথ্যা অনুভব, একাগ্রতার অভাব অথবা একাগ্রতা লাভ করিয়াও উহা হইতে বিচ্যুতি—এইগুলি চিত্তবিক্ষেপকর অন্তরায়।

দুঃখদৌর্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসবিক্ষেপসহভুবঃ।।৩১।।

দুঃখ, মানসিক অবসাদ, শারীরিক অস্থিরতা, অনিয়মিত শ্বাসপ্রশ্বাস—এইগুলি একাগ্রতার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয়।

তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ।।৩২।।

এইগুলি নিবারণের জন্য একতত্ত্ব অভ্যাস করা আবশ্যক।

মৈত্রী-করুণা-মুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যা-পুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্। ।।৩৩।।

সুখ, দুঃখ, পুণ্য ও পাপ—এই ভাবগুলির প্রতি যথাক্রমে বন্ধুত্ব, দয়া, আনন্দ ও উপেক্ষার ভাব অবলম্বন করিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়।

প্রচ্ছর্দন-বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।।৩৪।।

যথানিয়মে রেচক ও কুম্ভক করিলে চিত্ত স্থির হয়।

মন্তব্য ঃ এই সৃষ্টি একটি জড়সমুদ্র। তাহাতে আমাদের অর্থাৎ সর্বজীবের শরীর-মন এক-একটি ঘূর্ণি মাত্র। দেহ-মনে বহির্জগতের সংস্রব সর্বদাই রহিয়াছে, তাহার ফলে সর্বদাই সাধনে বিঘ্নের আশঙ্কাও আছে। দেহ থাকিতে ত্রিতাপের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভ অসম্ভব। তাই মহর্ষি পতঞ্জলি সাধক-দিগকে ঐবিষয়ে সচেতন থাকিতে উপদেশ দিতেছেন। এইসকল বাধা নিবারণের জন্য একটি ইষ্টবস্তুতে মনকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত রাখাই নিবৃত্তির উপায়।

আবার পূর্বস্বভাববশত বাহ্যজগতের আঘাতে মনে নানাপ্রকার চিন্তা উঠিয়া মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিলে তদ্বিপরীত চিন্তার দ্বারা তাহার নিরোধ করিতে হইবে। যদি তাহাতেও মন নিষ্ক্রিয় না হয়, তবে প্রাণের ক্রিয়া সংযত করিয়া মনের চাঞ্চল্য দূর করিতে হইবে।

বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধিনী।।৩৫।।

যেসকল সমাধিতে অলৌকিক ইন্দ্রিয়ানুভূতি হয়, সেগুলিও মনের স্থিতির কারণ।

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী।।৩৬।।

দুঃখশূন্য জ্যোতিষ্মান পদার্থের ধ্যানের দ্বারা চিত্ত স্থির হয়।

মন্তব্য ঃ অনেকদিন যোগাভ্যাস করিতে করিতে নিজের ভিতরে একটা বিশেষ শক্তির প্রকাশ হয়। তাহার ফলে কখনো কখনো অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হয়। তখন মনে খুব উৎসাহ আসে এবং ধ্যান করিবার আগ্রহ বাড়ে। মন একাগ্র থাকিলে কখনো কখনো নানাপ্রকার জ্যোতি দর্শন হয়। তাহাতে খুব উৎসাহ বৃদ্ধি হয়, কারণ স্বামীজীর ভাষায় ইহা 'Milestone of progress' (অগ্রগতির সূচক)।

বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তম্।।৩৭।।

অথবা যে-পুরুষের হৃদয় ইন্দ্রিয়াসক্তি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়াছে, তাহার ধ্যানের দ্বারাও চিত্ত স্থির হয়।

স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানালম্বনং বা।।৩৮।।

স্বপ্নাবস্থায় বা নিদ্রাকালে যে অপূর্ব জ্ঞানলাভ হয়, তাহার ধ্যানের দ্বারা চিত্ত স্থির হয়।

যথাভিমতধ্যানাদ্বা।।৩৯।।

অথবা যে-বস্তু উত্তম বলিয়া মনে হয়, তাহার ধ্যানের দ্বারাও চিত্ত স্থির হয়।

মন্তব্য ঃ মনকে একাগ্র করিবার সর্বপ্রকার উপায়ই মহর্ষি বলিতেছেন। কোন সর্বত্যাগী সিদ্ধপুরুষের চিত্তের অবস্থা চিন্তা করিলে সহজেই মন স্থির হয়। কখনো কখনো আমরা স্বপ্নে দেবদেবী অথবা কোন মহাপুরুষকে দেখিয়া থাকি। তাহা চিন্তা করিলেও মন স্থির হইয়া যায়। সুষুপ্তিকালে আমাদের দৃশ্যজগৎ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমরা তখন যেন মায়ামোহ হইতে মুক্ত হইয়া যাই। এই অবস্থা চিন্তা করিলেও মনের চঞ্চলতা দূর হয়। কেহ কেহ কোন বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির উপর খুব আকর্ষণ অনুভব করে। সেই বস্তু বা ব্যক্তির উপর মন স্থির করিলে সহজেই সমাধি হইয়া থাকে।

মণি মল্লিকের কন্যা নন্দিনী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের চিন্তা করিয়া ভাবসমাধিস্থ হইয়াছিলেন। বিল্বমঙ্গল এক ভ্রষ্টানারীর চিন্তা করিতে করিতে প্রায় সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। একটি প্রবাদ আছে যে, এক গুরু শিষ্যকে 'গাড়োল' মন্ত্র দিয়াছিলেন। শিষ্য ভেড়ার ধ্যান করিয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। [ক্রমশ] (চার)

আষাঢ় ১৩০৮/জুন ১৯০১

রামকৃষ্ণ মিশন

স্বামী বিবেকানন্দ।—ঢাকা হইতে স্বামীজি [স্বামীজী] ৺চন্দ্রনাথ ও শ্রীশ্রীকামাখ্যা দর্শন করিতে যান। কামাখ্যায় গৌহাটী সহরে [শহরে] তিনটী [তিনটি] অতি সুন্দর বক্তৃতা করেন। গৌহাটীবাসিগণ আশাতীত সন্তোষলাভ করিয়াছিলেন। শরীর আরও বেশী [বেশি] অসুস্থ হওয়াতে স্বামীজি [স্বামীজী] কয়েক দিবসের জন্য শীলঙে [শিলঙে] আসেন; সংবাদ পাইয়াই তথায় স্বয়ং শ্রীযুক্ত কটন সাহেব স্বামীজিকে [স্বামীজীকে] যাহার পর নাই [যারপরনাই] খাতির যত্ন ও অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন; সেখানেও স্বামীজির [স্বামীজীর] একটী [একটি] বক্তৃতা হয়। প্রায় যাবতীয় ইংরাজ কর্ম্মচারী [কর্মচারী] উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা শুনিয়া শ্রীযুক্ত কটন সাহেব অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। সকলকারই নিকট শতমুখে প্রশংসা করিতেছেন। প্রজারঞ্জক কটন সাহেবের অসাধারণ নম্রতা ভদ্রতা এবং গুণগ্রাহিতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। স্বামীজি [স্বামীজী] এক্ষণে মঠে প্রত্যাগমন করিয়াছেন; শরীর তত সুস্থ নয়।

সিস্টার নিবেদিতা।—ইংলণ্ডে [ইংল্যান্ডে] রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচারকার্য্য [প্রচারকার্য] খুবই হইতেছে। ইংলণ্ডের [ইংল্যান্ডের] বড় বড় সভায় এবং সম্প্রদায়ে ব্রহ্মচারিণী নিবেদিতা অতি সাদরে ও সাগ্রহে আহূত হইতেছেন। তথায় তিনি ভারতের সমাজচিত্র এবং গার্হস্থ্য ও পারিবারিক চিত্র আশ্চর্য্য [আশ্চর্য] ক্ষমতার সহিত অঙ্কিত করিয়া সকল নরনারীর সমক্ষে দেখাইতেছেন যে, ভারতের গৌরব কত উজ্জ্বল, কত মহিমান্বিত এবং কত অনুকরণীয়। ভারতের নিন্দুকগণ ব্রহ্মচারিণীর নিকট নির্ব্বাক্ [নির্বাক] হইয়া যাইতেছেন। ক্রমশঃ [ক্রমশ] সকলেই ভারতের গুণ গ্রহণ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত রমেশবাবু একস্থলে শ্রীমতী নিবেদিতার সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি ও বলিবার-কহিবার ক্ষমতা অলোকসামান্য। এরূপ ব্যক্তি আর কিছু দিন ইংলণ্ডে [ইংল্যান্ডে] থাকিলে ভারতের প্রভূত মঙ্গল সন্দেহ নাই। শুনিলাম, সিস্টার [সিস্টার] বর্ত্তমান [বর্তমান] ভারত সম্বন্ধে এমন একখানি সুন্দর পুস্তক প্রণয়ন করিতেছেন যে, তাহার দ্বারা ইংরাজগণ প্রচুর উপকৃত হইবেন এবং ভারতেরও যথেষ্ট গৌরব বৃদ্ধি হইবে। এরূপ উচ্চধরণের [উচ্চধরনের] বহি [বই] নাকি আর এ পর্য্যন্ত [পর্যন্ত] কেহ বাহির করিতে পারেন নাই। প্রার্থনা করি, তিনি শীঘ্রই কৃতকার্য্য [কৃতকার্য] হউন।

উদ্বোধনের

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে [সর্বসাধারণকে] জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উদ্বোধনের কোনও প্রবন্ধ বা তদংশ, উদ্বোধনের স্বত্বাধিকারীর বিনা অনুমতিতে কোনও সংবাদ-পত্র, সাময়িক পত্র বা অন্য কেহ যদ্যপি উদ্ধৃত, অনুবাদিত বা প্রকাশিত করেন, তাহা হইলে তিনি আইনানুযায়ী দণ্ডনীয় হইবেন। উদ্বোধনের কাপীরাইট [কপিরাইট] সর্ব্বতোভাবে [সর্বতোভাবে] রিসার্ভ (রিজার্ভ্) করা। ইতি

উদ্বোধন-স্বত্বাধিকারী।

[একটি বিজ্ঞাপন]

সেখ ফসিউল্লার কৃত



মসজিদ মার্কা
রেজেষ্টারী করা

গোলাপের নির্য্যাস [নির্যাস]

খাঁটি গোলাপের প্রকৃতই অভাব, যাঁহারা গোলাপ ব্যবহার করেন তাঁহারাই জানেন প্রকৃত গোলাপ কেহই পান না, কেবল বাজে জল সামান্য খাঁটি গোলাপে মিশাইয়া বাজারে তাহাই সস্তাদরে বোতল [বোতলে] বিক্রয় হয়। তজ্জন্য অনেক ধনী, রাজা, মহারাজার অভাব দূরীকরণ মানসে গোলাপের নির্য্যাস [নির্যাস] চুয়াইয়া বিক্রয় করিতেছি। ২ আউন্স নির্য্যাসে [নির্যাসে] ১ বোতল ।।০ আনা দামের গোলাপ প্রস্তুত হইবে। ইহা চক্ষু ও শিররোগে [শিরোরোগে] নির্ব্বিঘ্নে [নির্বিঘ্নে] ব্যবহার করিতে পারেন।

প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিশির সঙ্গে থাকিবেক।

ভি. পি. তে মাল পাঠান যায়। মাশুল ইত্যাদি স্বতন্ত্র দিতে হইবেক।

এজেন্টগণ—শ্রীবটকৃষ্ণ পাল, কলিকাতা। শ্রীলালমোহন সাহা, ঢাকা, বাগবাজার। শ্রীপ্রাণনাথ বণিক, বরিশাল।

সঙ্কলন ঃ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

রাজা হরিশ্চন্দ্র (১৭)

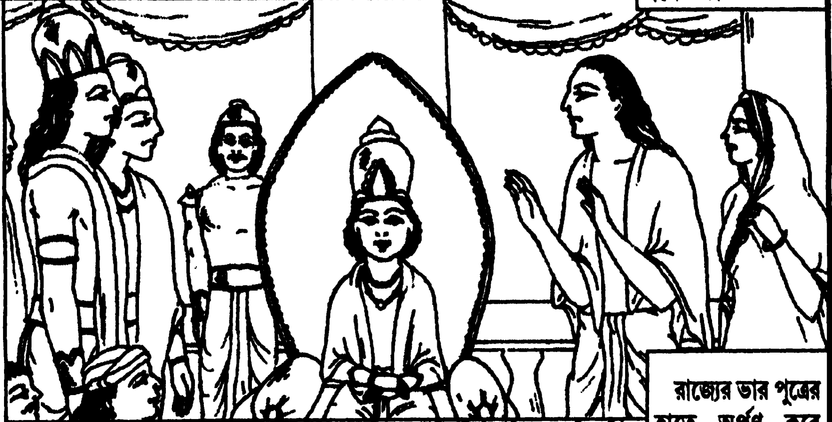
শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের জন্য ❑

চিত্র : তথাগত দাশগুপ্ত



দেবরাজ ইন্দ্র একদিন অন্যান্য দেবতাদের নিয়ে হরিশ্চন্দ্রের রাজসভায় এসে উপস্থিত হলেন। রাজাকে তিনি বললেন : "মানবজীবনে যা অতি দুর্লভ, তুমি তোমার কর্মের ফলে সেই অধিকার লাভ করেছ। তুমি স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে সশরীরে আমাদের সঙ্গে স্বর্গে চল।"

মহারাজ হরিশ্চন্দ্র এই দুর্লভ সৌভাগ্যে পরম আনন্দ লাভ করলেন। ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতাদের উপস্থিতিতে তিনি পুত্র রোহিতাশ্বকে সাড়ম্বরে সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন।



রাজ্যের ভার পুত্রের হাতে অর্পণ করে নিশ্চিন্ত বোধ করলেন হরিশ্চন্দ্র। তিনি সকল আভরণ ত্যাগ করে স্ত্রী শৈব্যাকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গে চললেন ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ। বিস্মিত নয়নে এই মহাযাত্রা লক্ষ্য করতে লাগলেন তাঁর প্রজাবৃন্দ। [সমাপ্ত] ❑



বাল্মীকির সীতাচরিত্র

পলাশ মিত্র

[পূর্বানুবৃত্তি]



বনগমনের বিপক্ষে রাম যেসব কথা বললেন, তা শুনে সীতা বললেন ঃ "তোমার কথা শুনে আমি আর হাসি চেপে রাখতে পারছি না। তুমি যা বললে, তা একজন শাস্ত্রজ্ঞ মহাবীর রাজকুমারের পক্ষে নিতান্ত অযোগ্য।" পরে আরো বললেন ঃ "তুমি যদি আজই বনে গমন কর, আমি পদতলে পথের কুশকন্টক দলন করে তোমার আগে আগে যাব। আমাকে তোমার সঙ্গী করে নাও। আমি তোমার কাছে এমন অপরাধ করিনি যে, আমায় রেখে যাবে। আমি ত্রিলোকের ঐশ্বর্য চাই না। পাতিব্রত্য-ধর্মের কথা ভেবে আমি তোমার সঙ্গে অতিসুখে বনে বাস করব। তোমায় ছেড়ে স্বর্গের সুখও আমার কাম্য নয়।"

বনবাসে তাঁর কষ্টের কথা ভেবে রাম যাতে চিন্তিত না হন, তাই সীতা বললেন ঃ "আমি প্রত্যহ ফলমূল খেয়ে থাকব। আমি তোমার আগে আগে হাঁটব এবং তোমার ভোজনের পরে আমি ভোজন করব।"—

"ফল-মূলাশনা নিত্যং ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ।
ন তে দুঃখং করিষ্যামি নিবসন্তী ত্বয়া সহ।।
অগ্রতস্তে গমিষ্যামি ভোক্ষ্যে ভুক্তবতি ত্বয়ি।"

(অযোধ্যাকাণ্ড, ২৮।১৬-১৭)

সুরম্য অযোধ্যার সমৃদ্ধ সৌধমালার চেয়ে প্রিয়তম স্বামীর পাদচ্ছায়াই যে সীতার সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য—দৃঢ়ভাবে একথা বোঝাবার পরেও যখন রামচন্দ্র বনবাসের অশেষ কষ্ট এবং অরণ্যের ভীতিপ্রদ চিত্র সীতার সামনে উপস্থিত করলেন, তখন প্রখর তেজ আর সঙ্কল্পের প্রতিমূর্তি শুচিস্মিতা সীতা শেষ অস্ত্র রূপে রামের পৌরুষে আঘাত দিয়ে তাঁকে উত্তেজিত করতে চাইলেন। বললেন ঃ "তুমি পুরুষের আকৃতিবিশিষ্ট স্ত্রীলোক, এই জেনেই কি আমার বাবা মিথিলাপতি জনক তোমাকে জামাতা হওয়ার যোগ্য মনে করেছিলেন? দেখ, তুমি যদি আমাকে সঙ্গে না নিয়ে যাও, তাহলে সাধারণ মানুষ প্রকৃত ঘটনা না জেনে তোমার নামে মিথ্যা অপবাদ রটাবে।" (ঐ, ৩০।৩-৪)

তাঁর মতো 'অনুরাগবতী পতিব্রতা'কে বনবাসে নিয়ে যেতে রামের ভয়ের কোন কারণ আছে বলে মনে করেন না সীতা। নিজেকে সত্যবান-পত্নী সাবিত্রীর মতো পতির অনুগামিনী সাধ্বী নারী বলে সীতা জানালেন ঃ "আমি বালিকা বয়সেই তোমার স্ত্রী হয়েছি। যারা নিজের স্ত্রীকে অন্যের কাছে রেখে জীবিকানির্বাহ করে, তাদের মতো তুমি আমাকে অপরের কাছে রাখতে চাইছ?"—

"স্বয়ং তু ভার্য্যাং কৌমারীং চিরমধ্যুষিতাং সতীম্।
শৈলূষ ইব মাং রাম পরেভ্যো দাতুমিচ্ছসি।।"

(ঐ, ৩০।৮)

পরে দৃঢ়ভাবে তিনি বললেন ঃ "আমাকে সঙ্গে না নিয়ে কখনোই তুমি বনে যেতে পারবে না। তপস্যা, অরণ্যবাস কিংবা স্বর্গলাভ—যা আমার হোক না কেন—তা তোমার সঙ্গেই হবে, তোমাকে বাদ দিয়ে নয়।—

"স মামনাদায় বনং ন ত্বং প্রস্থাতুমর্হসি।
তপো বা যদি বাঽরণ্যং স্বর্গো বা স্যাত্ত্বয়া সহ।।"

(ঐ, ৩০।১০)

প্রচণ্ড মানসিক শক্তি, চারিত্রিক দৃঢ়তা, অবস্থা অনুযায়ী যথার্থ ও অব্যর্থ বাক্যপ্রয়োগ, তেজ-সঙ্কল্প ও স্ত্রীজনসুলভ কমনীয়তার সমাহারে এই পর্যায়ে সীতাচরিত্র এক নতুন মহিমায় উজ্জ্বল হয়েছে। সীতার এই আচরণের সঙ্গে রামের পরিচয় এই প্রথম। এর পরে বিস্মিত সীতাপতি দেখলেন, তাঁর প্রিয়তমা পত্নী অঝোরে ক্রন্দন করছেন। অপূর্ব উপমায় বাল্মীকি সীতার এই অবস্থার বর্ণনা করেছেন ঃ "তিনি [সীতা] বনগমন-নিবর্তক বহুতর বাক্যবাণে আহত হয়ে বিষলিপ্ত বাণের দ্বারা বিদ্ধ হস্তিনীর মতো কাতর হয়ে পড়লেন। অরণিকাষ্ঠ যেমন অগ্নি উদ্গিরণ করে, সেইরূপ তিনি বহুক্ষণ যাবৎ নিরুদ্ধ অশ্রুধারা মোচন করলেন। জল থেকে তোলা পদ্মদ্বয় থেকে যেমন জলবিন্দু নিঃসৃত হয়, রামপ্রিয়ার নয়নদ্বয় থেকে সেইরূপ স্ফটিকতুল্য শুভ্র সন্তাপজাত অশ্রুবিন্দু নিঃসৃত হতে লাগল। নির্মল পূর্ণচন্দ্র-তুল্য বিশাল নয়নসমন্বিত তাঁর মুখমণ্ডল বহুক্ষণ পূর্বে জল থেকে তোলা পদ্মের মতো শুষ্ক হয়ে গেল।" (ঐ, ৩০।২৩-২৫)

অবশেষে রাম সম্মত হলেন। সীতার ভালবাসা ও দৃঢ় সঙ্কল্পের জয় সূচিত হলো। সীতার সঙ্কল্পের শক্তি ও দৃঢ়তার জন্য রামচন্দ্র যে তাঁর পূর্বসিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন, সীতার উদ্দেশে রামের উক্তি থেকেই তা প্রমাণিত হয় ঃ "তুমি যখন 'আমি বনবাস করব' বলে আমার অনুগমনে দৃঢ়সঙ্কল্প করেছ, তখন তোমাকে দণ্ডকারণ্যে নিয়ে যেতে আমার অনিচ্ছা পরিত্যাগ করলাম। শুভাঙ্গি! সুলোচনে! আমি বনে যেতে তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি, তুমি আমার অনুগমন কর এবং সহধর্মচারিণী হও।" (ঐ, ৩০।৩৯-৪০)

এযাবৎ সীতার কথোপকথন ও আচরণ থেকে সীতার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি পাঠকের সামনে সহজেই স্পষ্ট হতে থাকে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হয়, কৈকেয়ীর ইচ্ছাপূরণে পিতাকে সত্যপালনের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য যুবরাজের পদ প্রত্যাখ্যান করে চোদ্দ বছরের জন্য রাম যখন বনবাসের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন, তখন কিন্তু সীতা তার কোন প্রতিবাদ করেননি। সত্যপালন যে রামের কর্তব্য—এবিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন সীতা। শুধু তাই নয়, অভিষেকের নন্দিত মুহূর্তে বনবাসের এই অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়কর ঘটনার জন্য কারো প্রতি কোন দোষারোপ করেননি তিনি। যিনি রাজমহিষী হতে যাচ্ছেন, চক্রান্তের শিকারে তিনি হচ্ছেন বনবাসিনী—এসব জেনেও তিনি ভেঙে পড়লেন না, এমনকি বিন্দুমাত্র দুঃখিতও হলেন না। অভিযোগের তর্জনীও তুলে ধরলেন না কারো দিকে। অষ্টাদশবর্ষীয়া এক নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টি অরণ্যবাসে কাটানোর জন্য ব্যথা-বেদনায় কিছুমাত্র ম্লান না হয়ে জীবনের এই প্রথম ও অকল্পনীয় মহা দুর্যোগ শান্ত ও স্থিরচিত্তে গ্রহণ করে শুধুমাত্র স্বামীর অনুগামিনী হতে চাইলেন—এ বুঝি শুধু সীতার পক্ষেই সম্ভব।

অবশেষে রাজনন্দিনী, রাজপত্নী রূপময়ী সীতার অরণ্যগমন। তার আগে পতির নির্দেশে ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র, ভিক্ষুকদের ভোজ্য প্রভৃতি প্রদান করলেন তিনি। মহামূল্য অলঙ্কার, উৎকৃষ্ট বস্ত্র, শয্যা, যান এবং অন্যান্য যাকিছু রাম ও সীতার আছে, তা সবই ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যদের দান করলেন তিনি। ঐশ্বর্যের প্রতি সীতার যে কোন লোভ ছিল না, তা তাঁর এই দানের পরিমাণ দেখেই বোঝা যায়। আসলে রামের প্রতি তাঁর ছিল একনিষ্ঠ গভীর প্রেম। আর এই প্রেমই তাঁকে রামের ছায়ার মতো অনুগামিনী হওয়ার প্রেরণা দিয়েছিল।

বনবাসে যাওয়ার সময় গঙ্গা উত্তরণকালে পতির ব্রতপালনের সাফল্য কামনা করে ত্রিপথগামিনী দেবী গঙ্গার কাছে সীতা যে-প্রার্থনা জানালেন, সেখানে ভারতের চিরকালীন কল্যাণময়ী গৃহবধূকেই আমরা দেখতে পাই। স্বামীর মঙ্গল কামনায় সীতা কৃতাঞ্জলি হয়ে মা গঙ্গাকে বললেন ঃ "নরশ্রেষ্ঠ রাম কুশলে ফিরে এসে রাজ্যলাভ করলে তোমার প্রীতির জন্য ব্রাহ্মণগণকে শত-সহস্র ধেনু, বিবিধ বস্ত্র ও প্রভূত অন্ন প্রদান করব। সৌভাগ্যদায়িনী দেবী গঙ্গে! তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। তোমার তীরে যেসব দেবতা বাস করেন এবং যেসব তীর্থ ও পুণ্যক্ষেত্র আছে, আমি তাদের সকলের পূজা করব।" (ঐ, ৫২।৮৮-৯০)

এখানে সীতা আর সেই মহাতেজস্বিনী ক্ষত্রিয়া নারী নন। এখন তিনি স্বামীর কল্যাণকামী সাধারণ এক মমতাময়ী ভারতীয় নারী। এই পতিপ্রাণা নারী যমুনা পারাপারের পরেও বটবৃক্ষের কাছে স্বামীর ব্রতপালনের সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করেছেন। লোকাচারের প্রতি সুগভীর আগ্রহ ও শ্রদ্ধা নিয়ে সীতা বারবার যেসব কৃত্য সম্পাদন করেছেন এবং তাতে তাঁর নারীমহিমা ভারতের আপামর মানুষের মনে যে-স্থান করে নিয়েছে, আজও তা বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি। স্বামীজী যথার্থই বলেছেন ঃ "আমাদের সব পুরাণ নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, এমনকি আমাদের বেদ পর্যন্ত লোপ পাইতে পারে, আমাদের সংস্কৃত ভাষা পর্যন্ত চিরদিনের জন্য কালস্রোতে বিলুপ্ত হইতে পারে; কিন্তু অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, যতদিন ভারতে অতিশয় গ্রাম্য ভাষাভাষী পাঁচজন হিন্দুও থাকিবে, ততদিন সীতার উপাখ্যান থাকিবে। সীতা আমাদের জাতির মজ্জায় মজ্জায় মিশিয়া গিয়াছেন, প্রত্যেক হিন্দু নরনারীর শোণিতে সীতা বিরাজমানা। আমরা সকলেই সীতার সন্তান।"[৪]

গৃহলক্ষ্মী সীতা এখন বনলক্ষ্মী। রাজবধূ সীতা এখন তৃণশয্যায় শায়িতা বনকন্যা। এইভাবে পার হয়ে গেল তেরটি বছর। কিন্তু একদিনের জন্যও বনবাসের কোন অসুবিধায় বিরক্ত বা বিব্রত হননি সীতা। বনবাসের কথা শোনার পর থেকে এবং তারপরে বনবাসের প্রথম দিন থেকেই সবকিছু শান্তমনে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশ এবং সে-পরিবেশ মোটেই আরামদায়ক নয়—এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল পথশ্রমের ক্লান্তি আর অনশনজনিত বিষণ্ণতা; কিন্তু কোন অভিযোগ নেই সীতার। সে-কারণেই স্বামীজী তাঁকে 'সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি' এবং 'সর্বংসহা' বলে অভিহিত করেছেন।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ লিখেছেন ঃ "সীতা ভারতবর্ষের প্রাণের কোন্ গভীরে প্রবেশ করেছেন ভারতবাসীকে তা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ—বর্তমান কালে ভারতসত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। আধুনিক ভারতবর্ষে স্বামীজীর আগে এবং পরেও আর কোন আধুনিক চিন্তানায়ক জাতীয় জীবনে, বিশেষ করে ভারতীয় নারীর জীবনে সীতার অপরিসীম গুরুত্বের কথা এত জোর দিয়ে বলেছেন কিনা সন্দেহ।"[৫] তাঁর এই বিশ্লেষণ যে যথার্থ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। [ক্রমশ] (দুই)

---

৪ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, ১৩৭১ সং, পৃঃ ১৪৯

৫ 'সীতারূপিণী', 'শতরূপে সারদা'—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার, ১৯৮৫, পৃঃ ৬৫২

ইংল্যান্ড, কানাডা ও আমেরিকায় কয়েকদিন

স্বামী গোকুলানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

এই পরিক্রমাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

১৬ জুন ১৯৯৮, মঙ্গলবার। ভোর চারটার সময় উঠে স্নানাদি সেরে মন্দিরে গেলাম। মন্দিরের শান্ত পরিবেশে আর মনোরম বিস্তীর্ণ চত্বরে বেড়াচ্ছিলাম। ভাবছিলাম, আমাদের দেশের সাথে এদেশের কত তফাৎ! এখানকার হাওয়া বিশুদ্ধ, নির্মল, শরীর-মন জুড়িয়ে যায়। শহর তো বটেই, শহরতলী পর্যন্ত কী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! আশ্রমের ভাইদের সাথে প্রাতরাশ শেষ করে ছাত্রদের সঙ্গে বেড়াতে বের হলাম। আজকের ভ্রমণসূচীতে রয়েছে লন্ডনের সেইসব রাস্তা এবং ভবন পরিদর্শন, শতবর্ষ পূর্বে যেখানে একদা স্বামীজীর পদচিহ্ন পড়েছিল। প্রথমেই গেলাম ১৪এ, গ্রেকোট গার্ডেন্স—যেখানে স্বামীজী এবং অভেদানন্দজী থাকতেন। ভগিনী নিবেদিতাও এখানে স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন। এখান থেকে স্বামীজী শিষ্য আলাসিঙ্গা পেরুমল, মিসেস ওলি বুল, মিস এলবার্টা, মিস ম্যাকলাউড এবং মিস মেরী হেলকে পত্রাদি লেখেন। মিসেস বুল স্বামীজীর শিষ্যা ছিলেন। তিনি নরওয়েবাসী বিখ্যাত বেহালাবাদক মিস্টার ওলি বুলের স্ত্রী। স্বামীজী তাঁকে কখনো 'মা', কখনো 'ধীরামাতা' বলে সম্বোধন করতেন।

এরপর আমরা গেলাম ৩৯ ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট, যেখানে স্বামীজী থেকেছিলেন। তবে পুরনো ভবনের আজ আর কোন অস্তিত্ব নেই, তার জায়গায় 'ব্যাঙ্ক অফ বস্টন' নির্মিত হয়েছে। ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট থেকে লেখা এক পত্রে স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে তাঁর 'জ্ঞানযোগ'-এর ওপর বক্তৃতাগুলি ছাপানোর জন্য বলেছিলেন। আরেকটি পত্রে— ২০ নভেম্বর ১৮৯৬ স্বামীজী আলাসিঙ্গাকে কলকাতা এবং মাদ্রাজে দুটি কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনার কথা জানান। এও জানান যে, সস্ত্রীক মিস্টার সেভিয়ার হিমালয়ে আলমোড়ার কাছে 'মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রম' স্থাপন করতে যাচ্ছেন।

আমাদের পরবর্তী গন্তব্যস্থান ছিল ভিক্টোরিয়া রোডের পিছনে অবস্থিত বিখ্যাত ৬৩ সেন্ট জর্জেস রোড, যেখানে স্বামীজী ও অভেদানন্দজী ছিলেন। স্বামীজীর ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথ দত্তও এখানে এসেছিলেন। এখান থেকে স্বামীজী হেল ভগিনীদ্বয়, ভগিনী নিবেদিতা, শশী মহারাজ এবং মিস্টার ফ্রান্সিস লেগেট প্রমুখকে একাধিক পত্র লেখেন। এর মধ্যে ৭ জুন ১৮৯৬ নিবেদিতাকে লেখা পত্রখানি উল্লেখযোগ্য। স্বামীজী লিখেছিলেন ঃ "আমার জীবনের আদর্শ—মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সর্বকাজে সেই দেবত্ব বিকাশের পন্থা নির্ধারণ করে দিতে হবে।... তোমার মধ্যে একটা জগৎ-আলোড়নকারী শক্তি রয়েছে, ধীরে ধীরে আরো অনেক শক্তি আসবে... আমি আটঘাট বেঁধে কোন কাজ করি না। কার্যপ্রণালী আপনি গড়ে ওঠে ও নিজের কার্য সাধন করে। আমি শুধু বলি—ওঠ, জাগ।"



অ্যাভন নদী

৬৩ সেন্ট জর্জেস রোড থেকে গেলাম উইম্বলডনে। এখান থেকেও স্বামীজী হেল ভগিনীদ্বয়, মিসেস বুল, মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড এবং ওয়াল্ডোকে পত্র লেখেন। সবশেষে গেলাম রিজওয়ে গার্ডেন্স, এয়ার্লি লজ—যেখানে স্বামীজী মিস হেনরিয়েটা মুলারের আতিথ্য কিছুদিনের

জন্য স্বীকার করেছিলেন। ভগিনী নিবেদিতাও কাছাকাছি থাকতেন এবং প্রায়ই স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসতেন।

পথভ্রমণ শেষ করে আশ্রমে ফিরে এলাম। রাত্রে 'ডায়েরি' লিখতে লিখতে ভাবছিলাম, এতদিন ধরে স্বামীজী পদাঙ্কিত রাস্তায় কল্পনায় ঘুরতাম, আজ তা প্রত্যক্ষ করলাম। শতবর্ষ পার হয়ে গেছে, তবুও কিছুই হারায়নি যেন!



উইলিয়াম শেক্সপীয়ার

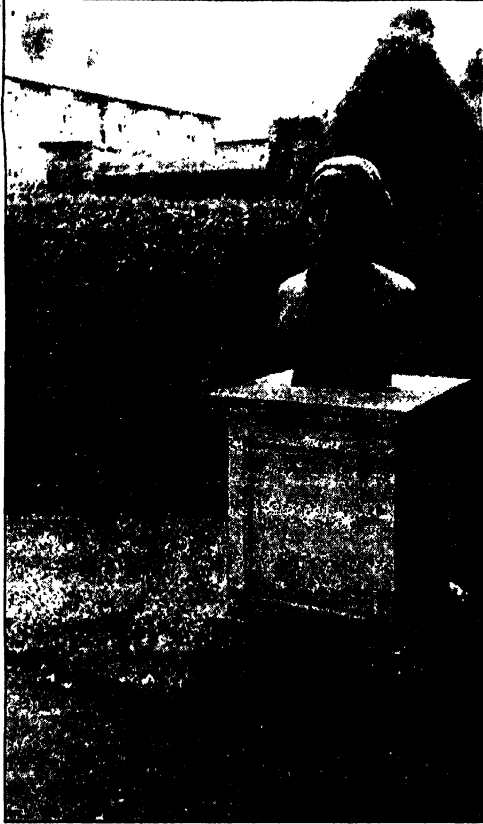
১৭ জুন গেলাম অ্যাভন নদীর তীরে স্ট্র্যাটফোর্ড শহরে, যেখানে উইলিয়াম শেক্সপীয়ারের জন্মস্থান। ইংরেজ অতি রক্ষণশীল জাত এবং পুরনো ঐতিহ্য সংরক্ষণে এঁদের জুড়ি মেলা ভার। এরই এক উজ্জ্বল নিদর্শন হেনলি রোডের ওপর শেক্সপীয়ারের বাসভবনটি। শেক্সপীয়ার তাঁর কোন আত্মচরিত লিখে রেখে যাননি; তাঁর সৃষ্টির মাঝে, তাঁর নাটক ও কবিতার মধ্যে তিনি বেঁচে আছেন। সাক্ষ্য হিসাবে নথিপত্র যা পাওয়া গেছে তাতে জানা যায়, তাঁর জন্ম ও কর্মক্ষেত্র ছিল স্ট্র্যাটফোর্ড। সম্প্রতি আরো কিছু গবেষণায় জানা গেছে যে, সাউথওয়ার্ক নামে এক শহরেও তিনি থেকেছিলেন। শেক্সপীয়ার যখন জন্মেছিলেন, তখন স্ট্র্যাটফোর্ড শহরটি স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত ছিল। নানা ধরনের বড় বড় ফলের বাগান আর বিশাল উঁচু উঁচু বৃক্ষে জায়গাটা পূর্ণ ছিল। আজ যদিও বেশির ভাগ বাগানের জায়গায় বাড়ি-ঘর হয়ে গেছে, তবুও ষোড়শ শতাব্দীর বহু রক্ষিত স্মৃতি মনকে পিছনের দিকে টেনে নিয়ে যায়। শেক্সপীয়ারের বাসভবনটি এক অমূল্য জাতীয় সম্পদ হিসাবে গণ্য হয়। তাঁর ব্যবহৃত বহু জিনিসপত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে সংরক্ষণ করা হয়েছে। শহরের যেকোন একটা সাধারণ বাড়ির মতো দেখতে এই বাড়িটিকে বলা হয়—"The most honoured monument of the world's greatest genious."

খুব আনন্দ হলো এই দেখে, শেক্সপীয়ার ভবনের প্রাঙ্গণে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তি স্থাপনা হয়েছে। ভাস্করের নাম দেবব্রত চক্রবর্তী। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু শেক্সপীয়ার বার্থ প্লেস ট্রাস্টকে এই মূর্তিটি উপহার দেন। ১৯৯৫ সালের ৪ জুলাই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন লন্ডনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ডাঃ এল. এম. সিংভী। শেক্সপীয়ার ট্রাস্ট এত যত্নে এবং শ্রদ্ধায় নাট্যকারের স্মৃতি সংরক্ষণ করেছে যে, দেখলে মনে হয় যেন সদ্য এক অতীত দাঁড়িয়ে আছে সামনে। এই স্থানটি খুব উপভোগ করলাম। শেক্সপীয়ার ভবন-সংলগ্ন পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র থেকে তাঁর একখানি জীবনীগ্রন্থও কিনলাম।



শেক্সপীয়ারের বসতবাড়ি

শেক্সপীয়ারের বাসভবন দেখে শহরের অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানগুলোও আমরা সবাই মিলে ঘুরে দেখলাম, যেমন—'মেরি অর্ডেন্স হাউস' (শেক্সপীয়ারের মামার বাড়ি), 'হলস্ ক্রাফট্' (কন্যা সুসান্না এবং জামাতা ডাঃ জন হল-এর বাসস্থান), 'অ্যানি হ্যাথাওয়েজ কটেজ' (শ্বশুরগৃহ), গ্রামার স্কুল-সংলগ্ন 'দ্য গিল্ড চ্যাপেল', 'নাশেস হাউস' (নাতনীর শ্বশুরগৃহ), 'নিউ প্লেস গার্ডেন' (শেক্সপীয়ারের মৃত্যুস্থান)



শেক্সপীয়ারের বাসভবনের প্রাঙ্গণে
রবীন্দ্রনাথের মর্মরমূর্তি

এবং 'দ্য কলেজিয়েট চার্চ' (প্রার্থনা ও সমাধি-স্থান)। সবশেষে দেখলাম 'হার্ভার্ড হাউস' (প্রসিদ্ধ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা জন হার্ভার্ড-এর মাতার বাসস্থান)। মোটামুটি প্রতিটি ভবনই রাস্তার ওপর এবং কাছাকাছি। তাই অল্প সময়ের মধ্যেই ভাল করে ঘুরে দেখা গেল। অ্যাভন নদীর ধারে কিছুক্ষণ বসলাম। স্বচ্ছ নীল জলে হাঁসের দল খেলা করে যাচ্ছে। ওপারে যাওয়ার জন্য একটা সেতুও আছে।

স্ট্র্যাটফোর্ড থেকে বেরিয়ে গেলাম নিকটবর্তী অক্সফোর্ড শহরে—দেশের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্রে। ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকদের ক্রমাগত আসা-যাওয়ায় শহর জমজমাট। মনে হয় এঁরা ছাড়া আর যেন কেউ এখানে থাকে না, বিদ্যালোচনা ছাড়া আর যেন কোন কাজ হয় না। ছাত্রদের কাছে শুনলাম, কেমব্রিজের মতো অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেও পঁয়ত্রিশটা কলেজ আছে; প্রত্যেকটি কলেজের নিয়মাবলী ও কার্যপদ্ধতি ভিন্ন। কলেজ-সংলগ্ন কিছু কিছু উপাসনালয় এবং ভোজনগৃহ বা 'কাফে'-তে পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। স্বল্প পরিসরের মধ্যেই কলেজগুলো প্রায় গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। পাঁচশ বছরের পুরনো 'ম্যাগডালেন কলেজ' দেখলাম। এর ঠিক পাশেপাশেই রয়েছে 'সেন্ট এডমন্ড হল কলেজ', 'ক্রাইস্ট কলেজ' এবং 'ব্যালিওল কলেজ'। ব্রড স্ট্রীটের ওপর 'দ্য অক্সফোর্ড স্টোরি' ভবনটিতে গেলে শহরের কলেজ-জীবনের সচিত্র বর্ণনা পাওয়া যাবে। উল্লেখযোগ্য আরেকটি কলেজ হলো ১৭১৪ সালে তৈরি 'ওয়ারসেস্টার কলেজ'। কলেজের সীমানার মধ্যেই বড় বড় বাড়ি, বাগান, এমনকি বড় বড় জলাশয়ও আছে। 'ইস্টগেট হোটেল' নামে একটা ছোট হোটেল আছে, যাকে ঘিরে অনেক পুরনো বাড়ি আর কলেজ রয়েছে। ভিতরে খানিকক্ষণ বসলে অক্সফোর্ড শহরের বিদ্যার্থীদের জীবন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা হয়।

অক্সফোর্ডে এসে মনে পড়ে গেল, এই শহরেই ১৮৯৬ সালের ২৮ মে স্বামীজীর সঙ্গে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যদর্শন এবং সংস্কৃতভাষাবিদ্ প্রসিদ্ধ জার্মান অধ্যাপক ফ্রেডারিক ম্যাক্সমূলারের সাক্ষাৎ হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থসাহায্যে তিনি 'ঋগ্বেদ' প্রকাশ করেন। এছাড়া 'সেক্রেড বুক্স অফ দ্য ইস্ট' (পঞ্চাশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) গ্রন্থমালার তিনি সম্পাদনা করেছিলেন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার কখনো ভারতে আসেননি, ভারতবর্ষকে স্বচক্ষে দেখেননি। শুধু ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন অধ্যাত্মসাহিত্যকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন এবং তার ফলস্বরূপ লাভ করেছিলেন এক গভীর অন্তর্দৃষ্টি, যার মাধ্যমে তিনি ভারতবর্ষের আন্তর রূপকে, তার নিত্য রূপকে দেখেছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি ভীষণ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন এবং স্বামীজীর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই ঠাকুরের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, তার ভিত্তিতে 'এ রিয়্যাল মহাত্মা' নামে 'নাইনটিস্থ সেঞ্চুরী' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন যা ইংল্যান্ডের পণ্ডিতমহলে আলোড়ন তুলেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রধান শিষ্য হিসাবে স্বামীজীও তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা লাভ করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে একদিন ম্যাক্সমূলারকে তিনি বলেছিলেনঃ "আজকাল হাজার হাজার মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূজা করছে।" ম্যাক্সমূলার গভীর আবেগের সঙ্গে বলেছিলেনঃ "ওঁর মতো ব্যক্তির যদি পূজা না করে তো কার পূজা করবে?" তিনি স্বামীজীকে বলেছিলেন, যদি প্রয়োজনীয় উপাদান তাঁকে দেওয়া যায় তবে তিনি সানন্দে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানি জীবনী লিখতে প্রস্তুত আছেন। পরবর্তী কালে স্বামী

সারদানন্দের প্রেরিত উপাদানের ওপর ভিত্তি করে ম্যাক্সমূলার 'লাইফ অ্যান্ড সেইংস অফ রামকৃষ্ণ' নামে বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। স্বামীজীকে বিদায় জানাতে রাত্রিতে ঝড়-জল উপেক্ষা করে তিনি স্টেশনে গিয়েছিলেন। স্বামীজী খুবই সঙ্কোচবোধ করছিলেন। একথা তাঁকে বললে ম্যাক্সমূলার বলেছিলেনঃ "শ্রীরামকৃষ্ণের একজন যোগ্যতম শিষ্যের দর্শনলাভের সৌভাগ্য তো প্রতিদিন হয় না।" স্বামীজী একবার তাঁকে ভারতে আসার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন তা স্বামীজীর বর্ণনাতে পাইঃ "বৃদ্ধ ঋষির মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তাঁহার নয়নে একবিন্দু অশ্রু নির্গতপ্রায় হইল, মৃদুভাবে শির সঞ্চালিত হইল, ধীরে ধীরে এই বাক্যগুলি স্ফুরিত হইল, 'তাহা হইলে আমি আর ফিরিব না; আমাকে সেইখানেই সমাহিত করিতে হইবে।' ..."

অক্সফোর্ড ভ্রমণ শেষ করে সেন্টারে ফিরলাম। সন্ধ্যায় মন্দিরে আরতি ও প্রার্থনাতে যোগ দিলাম। আশ্রমের শান্ত, সমাহিত, গম্ভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে সান্ধ্যপ্রার্থনার মধুর সুর আর ঘণ্টার সুমিষ্ট আওয়াজ মনকে সহজেই এক অপূর্ব আনন্দরাজ্যে নিয়ে যায়। পরে মন্দির থেকে বেরিয়ে ছাত্র দিলীপের সঙ্গে নিকটবর্তী এক সুপার মার্কেট দেখতে গেলাম। ঐ দেশের ছোট ছোট সুপার মার্কেটগুলো আমাদের দেশের বড় বড় দোকানকেও হার মানায়। সেখানে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে দর-কষাকষি করার কোন সুযোগ নেই।

ইংল্যান্ডে বাসরত বিনয় মুখার্জীর কাছে শুনেছিলাম, যাঁরা কেনাকাটা করতে এবং বাজার, দোকানপাট ঘুরে বেড়াতে ভালবাসেন, তাঁদের কাছে এখানকার 'মার্কেট'গুলি নাকি স্বর্গ। লন্ডন শহর অনেকগুলো 'শপিং ডিস্ট্রিক্টস' বা বাজারের জন্য নির্ধারিত অঞ্চলে ভাগ করা আছে। যেমন—চেলসি, কভেন্ট গার্ডেন, কেনসিংটন এবং এর পার্শ্ববর্তী নাইটসব্রিজ, মেফেয়ার, অক্সফোর্ড স্ট্রীট, রিজেন্ট স্ট্রীট, সেন্ট জেমস ইত্যাদি। প্রত্যেকটি অঞ্চলের বাজারের আলাদা আলাদা বিশেষত্ব আছে। যেমন চেলসি অত্যাধুনিক জামাকাপড় এবং সেন্ট জেমস লন্ডনের ধনী পুরুষ সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত। কোনরকম দর-কষাকষি এখানে চলবে না। এই অঞ্চলটিতে আছে পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট চিজ শপ, নাম—প্যাক্সটন অ্যান্ড হোয়াইটফিল্ড। নির্ধারিত মূল্যের থেকে কিছুটা কম দামে জিনিস পাওয়া যাবে অক্সফোর্ড স্ট্রীটের ডিসকাউন্ট শপ-এ। বছরের কোন কোন সময়, বিশেষ করে বড়দিন এবং প্রতি নতুন বছরের প্রারম্ভে এখানে সস্তায় জিনিসপত্রাদি পাওয়া যায়। শুনলাম, সেইসময় এখানে সবচেয়ে বেশি ভারতীয় এবং বাংলাদেশী আসেন স্বদেশের আত্মীয়স্বজনদের জন্য উপহার, জামাকাপড় কেনার উদ্দেশে। লন্ডনের প্রসিদ্ধ ডিপার্টমেন্টাল স্টোর-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সেলফ্রিজেস, জন ল্যুইস এবং মার্কস অ্যান্ড স্পেনসার। অতি উন্নত মানের সব ধরনের জিনিসপত্রাদি এখানে পাওয়া যায়। এদের শাখা ইংল্যান্ডের সর্বত্র। নাইটসব্রীজ অঞ্চলের জগদ্বিখ্যাত দোকান হ্যারোডস। অতি সম্ভ্রান্ত দোকনটা ছবির মতো সুন্দর। জিনিসপত্রের দাম খুব বেশি। শুনলাম, দেশের রানীর প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসের যোগান এই দোকানটিই দেয়। পর্যটকরা দোকানটা শুধু দেখতেই আসেন; কেনাকাটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। সাধারণ মানুষেরা অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণী স্ট্রীট মার্কেট থেকেই কেনাকাটা করে। কারণ, মোটামুটি ভাল মানের জিনিসপত্রাদি এখানে অনেক কম মূল্যে পাওয়া যায়। এইসব দোকানের জন্যও জায়গা বা অঞ্চল ভাগ করা আছে, যেমন পেটিকোট লেন, ক্যামডেন লক, বার্মন্ডসে, ক্যামডেন প্যাসেজ, পোর্তোবেলো মার্কেট ইত্যাদি।

১৮ জুন বিকালে রওয়ানা হলাম কের্ভাশ্যামের উদ্দেশে। কের্ভাশ্যামে স্বামীজী মিস্টার ই. টি. স্টার্ডির সঙ্গে থাকতেন। মিস্টার স্টার্ডি স্বামীজীর ভাবে এত অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে, স্বামীজী তাঁকে মন্ত্রদান করেন। ইংল্যান্ডে সমিতি গঠনের কাজে স্টার্ডি স্বামীজীকে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। এখান থেকে স্বামীজী একাধিক পত্র লেখেন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং মিসেস লেগেটকে। ১৮৯৫ সালের অক্টোবরে এখান থেকে মিসেস লেগেটকে এক পত্রে স্বামীজী মজা করে লিখেছিলেনঃ "রাস্তায় আমাকে লক্ষ্য করে কেউ কোন ব্যঙ্গ করে না। মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাবি, তাহলে কি আমার মুখের রং সাদা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আরশিতে সত্য ধরা পড়ে।" তবে কের্ভাশ্যাম থেকে লেখা চিঠিগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ২০ এপ্রিল ১৮৯৬ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা চিঠিটি। আজকের রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বীজ সেদিন রোপণ করা হয়েছিল এবং সঙ্ঘের বিস্তারিত নিয়মাবলী, সাধুদের থাকা, খাওয়া-দাওয়া, কাজকর্মের এক সুনির্দিষ্ট তালিকা প্রস্তুত হয়েছিল। মঠের বিভিন্ন বিভাগ—ধর্মবিভাগ, সাধনবিভাগ, প্রচারবিভাগ এবং বিদ্যাবিভাগের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছিল। এই চিঠিতেই স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের 'মানসপুত্র' স্বামী ব্রহ্মানন্দকে সঙ্ঘগুরু পদে প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। লিখেছিলেনঃ "গৌরী-মা, যোগীন-মা প্রভৃতিকে এই চিঠি দেখিয়ে তাঁদের দিয়ে ঐপ্রকার এক সঙ্ঘ মেয়েদের জন্য স্থাপন করাবে।... তাঁরা নিজেরাই সব কিছু করবেন, তোমাদের হুকুম সেখানে চলবে না। তাঁদেরও সমস্ত খরচপত্র আমি পাঠিয়ে দেব।" [ক্রমশ] (দুই)

মনসামঙ্গলের কবি নারায়ণ দেব

শঙ্কর ঘোষ

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো মঙ্গলকাব্য। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু সেকালে রচিত পুঁথি এখনো পাওয়া যায়নি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রথম এর লিখিত পূর্ণাঙ্গ পুঁথি পাওয়া গেছে। মধ্যযুগের বাঙালী সমাজকে মঙ্গলকাব্য একদা আকৃষ্ট করেছিল। এসমাজের অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত মানুষ তাঁদের জীবনের নানা রূপ এই কাব্যধারার মধ্যে দেখতে পেয়েছেন, মঙ্গলকাব্য বাংলার মাটির সম্পদ। এই কারণে একালের রচিত সাহিত্যের সব শাখার মধ্যে মঙ্গলকাব্যের পুঁথি সবচেয়ে বেশি সংগৃহীত হয়েছে। বাঙলা মঙ্গলকাব্যগুলি প্রকৃতপক্ষে লৌকিক দেবতাদের বাঙালী সমাজে প্রতিষ্ঠা ও তাঁদের পূজাপ্রচারের কাহিনী। নবোদ্ভূত দেবতা বা দেবীকে নানা বিরোধ ও সঙ্ঘাতের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে হয়েছে। বিরোধিতার মুখোমুখি হয়ে তাঁরা শক্তি ও কৌশল প্রয়োগ করে বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের শায়েস্তা করেছেন এবং শেষ অবধি নিজেদের পূজা আদায় করে ছেড়েছেন। এক্ষেত্রে সকল প্রকার ন্যায়নীতি বিসর্জন দিতে তাঁরা কুণ্ঠিত হননি। মঙ্গলকাব্যের কবিরা লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্য লিখলেও তার ফাঁকে ফাঁকে পৌরাণিক ও অলৌকিক লক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। মঙ্গলকাব্য ধারায় 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল' এবং 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যই প্রধান ও বৃহদায়তন। পুরাণে যেমন দেবমহিমা কীর্তিত হয়েছে, মঙ্গল-কাব্যগুলিতে তেমনি উদ্দিষ্ট দেবতাবিশেষের মহিমা বর্ণিত।

'মনসামঙ্গল' বা 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম 'মনসা', 'কেতকা' বা 'পদ্মাবতী'। মনসাদেবী সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। লৌকিক ভয়-ভীতি থেকেই তাঁর আবির্ভাব এবং সর্পসঙ্কুল পূর্ববঙ্গ (অধুনা বাংলাদেশ) যে দেবীর প্রধান পীঠস্থান হবে তা বলা বাহুল্য। অবশ্য সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়ে, এমনকি বাংলার প্রান্তীয় অঞ্চলেও মনসার পূজা, প্রভাব ও মনসামঙ্গলের আখ্যান প্রচলিত আছে। মনসামঙ্গলে বর্ণিত মনসার চরিত্র সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন প্রখ্যাত সমালোচক ডঃ দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাঙলা মঙ্গলকাব্যে পৌরাণিক ও লৌকিক চেতনার স্বরূপ' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে ঃ "তাঁর মধ্যে পৌরাণিক দেবীর জ্ঞান, বৈরাগ্য, করুণা, বাৎসল্য প্রভৃতি কিছুই নেই। এমনকি দয়া, মায়া, ভালবাসা, কোমলতা, নম্রতা প্রভৃতি মানবীয় কোন গুণও নেই। লোভ, স্বার্থপরতা, ঈর্ষা ও ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার তিনি প্রতিমূর্তি। পৌরাণিক শিবের কন্যারূপে তাঁকে দেখিয়ে এবং বিমাতার অত্যাচার তাঁর প্রতি দেখিয়ে শিব-চণ্ডীর সঙ্গে তাঁকে সম্পর্কান্বিত করা হয়েছে।"[১]

মনসামঙ্গলের কাহিনীটি উৎকর্ষে প্রথম শ্রেণীভুক্ত হলেও রচয়িতারা কেউই প্রথম শ্রেণীভুক্ত নন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কবি কানা হরিদত্তের হাতে মনসামঙ্গল কাব্যধারার সূত্রপাত ঘটলেও পঞ্চদশ শতাব্দীতে এমন দুজন কবির সন্ধান পেলাম, যাঁরা প্রতিভার গুণে মনসামঙ্গল কাব্যকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পেরেছিলেন। এঁদের একজন নারায়ণ দেব, অপরজন বিজয় গুপ্ত।

মনসামঙ্গল কাব্যধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলে যাঁকে সম্মান জানাতে হয়, যাঁর খ্যাতি একদা বঙ্গদেশের সীমা অতিক্রম করে আসামে ছড়িয়ে পড়েছিল, বরণীয় সেই কবি হলেন নারায়ণ দেব। 'সুকবিবল্লভ' ছিল তাঁর উপাধি।

নারায়ণ দেবের অধিকাংশ পুঁথিতে সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীর উল্লেখ রয়েছে। কবিপ্রদত্ত আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় যে, কবির পিতার নাম নৃসিংহ, মায়ের নাম রুক্মিণী। তাঁরা ছিলেন কায়স্থ। গোত্র মৌদ্গল্য। পিতামহ উদ্ধব রাঢ়দেশ থেকে এসে বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বোর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। এখনো সেই বোর গ্রামে নারায়ণ দেবের ভিটা বিরাজ করছে। বোর গ্রাম একদা শ্রীহট্টের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই আসামের লোকেরা কবিকে আসামের অধিবাসী বলে দাবি করেন। নারায়ণ দেবের কাব্য এই কারণে সহজেই আসামে প্রবেশলাভ করতে পেরেছিল। কবির আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। তবে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেছেন ঃ "নারায়ণ দেব খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।"[২]

নারায়ণ দেব তাঁর কাব্যের নাম রেখেছিলেন 'পদ্মাপুরাণ'। দেবী পদ্মার স্বপ্নাদেশ পেয়েই তিনি কাব্য-রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, তা কবি স্বীকার করেছেন—

"তৎপরে পদ্মা মোরে দেখাইল স্বপন।
কবিত্বের আশা মোর সেহি তো কারণ।।
গুণীর সাক্ষাতে আমি কি বলিব বাণী।
কোকিল সাক্ষাতে যেন কাকে করে ধ্বনি।।
মুনি মুখে শুনিয়াছি সৃষ্টির পতন।
পদ্মাপুরাণ কথা শুন জ্ঞানিজন।।"

'পদ্মাপুরাণ' তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আত্মপরিচয় ও দেববন্দনা। দ্বিতীয় খণ্ডের বিস্তৃত পরিধিতে বিচিত্র পৌরাণিক কাহিনীর বর্ণনা। তৃতীয় খণ্ডে চাঁদ সদাগরের কাহিনী। পৌরাণিক অংশের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, কবি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর এই পাণ্ডিত্য গ্রন্থের মূল কাহিনীর কাব্যরস সৃষ্টিতে কোথাও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এসম্পর্কে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ঃ "নারায়ণ দেব লৌকিক মঙ্গলকাব্য ফাঁদলেও সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, তার নানা প্রমাণ সমগ্র কাব্যের মধ্যেই ছড়িয়ে আছে। তিনি একটু পুরাণ-ঘেঁষা কবি ছিলেন, লৌকিক মনসাকাহিনীর চেয়ে পৌরাণিক

দেবদেবীর লীলার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। মহাভারত, শৈবপুরাণ, কালিদাসের কুমারসম্ভব প্রভৃতি সংস্কৃত উপাদান থেকে তাঁর দেবখণ্ডের কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে। হরপার্বতী লীলায় বহু স্থলে কুমারসম্ভবের সাক্ষাৎ প্রভাব আছে।"[৩]

কাব্যের বহিরঙ্গ অর্থাৎ ছন্দ ও অলঙ্কার অপেক্ষা অন্তরঙ্গ বা ভাব-কল্পনার গভীরতার দিকেই কবির লক্ষ্য ছিল বেশি। ফলে বর্ণনার সাবলীলতায় ও করুণ রসের পরিবেশনে তাঁর কাব্য অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। দংশনজ্বালায় অস্থির হয়ে লখিন্দর আর্তকণ্ঠে যখন বেহুলাকে ডাকছেন, তখন সেই হাহাকার পাঠকের অন্তরকেও স্পর্শ করে—

"ওঠ ওঠ ওহে প্রিয়া কত নিদ্রা যাও।
কাল নাগে খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও।।
তুমি হেন অভাগিনী নাহি ক্ষিতিতলে।
অকারণে রাঁড়ি হৈলা খণ্ড ব্রত ফলে।।
কত খণ্ড তপ তুমি কৈলা গুরুতর।
সে কারণে তোমা ছাড়ি যায় লক্ষীন্দর।।"

সদ্যবিধবা বেহুলার জ্যেষ্ঠভ্রাতার ক্রন্দনধ্বনিও হৃদয়-স্পর্শী ভাষায় ফুটে উঠেছে—

"মাত্র জিজ্ঞাসিলে আমি কি দিব উত্তর।
কি কথা কহিব আমি উজানী নগর।।"

স্বামীর মৃতদেহ সঙ্গে নিয়ে অকূল সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে বেহুলার বুকফাটা কান্না আরো মর্মস্পর্শী—

"জাগ প্রভু কালিন্দী নিশাচরে।
ঘুচাও কপট নিদ্রা ভাসি সাগরে।।
প্রভুরে তুমি আমি দুই জন।
জানে তব সর্বজন।।
তুমি তো আমার প্রভু আমি যে তোমার।
মড়া প্রভু নহ রে তুমি গলার হার।।"

কাব্যের প্রধান অঙ্গ চরিত্রসৃজন। সেদিক দিয়ে নারায়ণ দেব আদ্যন্ত নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর স্মরণীয় চরিত্রসৃষ্টি অবশ্যই চাঁদ সদাগর। প্রথার প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে নারায়ণ দেবের চাঁদ মনসার পূজা করেছেন। তবু হারানো সম্পদ নিয়ে বেহুলার প্রত্যাগমন থেকে শুরু করে মনসাপূজার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত চাঁদের চিত্তলোকের যে তীব্র দ্বন্দ্ব কবি দেখিয়েছেন, তা তাঁর শিল্পকৃতির পরিচায়ক। চাঁদ সদাগর বলছেন—

"কি করিব পুত্রে মোর কি করিব ধনে।
না পূজিব পদ্মাবতী দৃঢ় কৈল মনে।।"

মনুষ্যত্বই যদি হারিয়ে যায়, তবে সম্পদ দিয়ে কী হবে? তবু চাঁদ সদাগর যে মনসার পূজা দিতে সম্মত হয়েছেন এবং সে-সম্মতিতে তাঁর যে পরাজয় সূচিত করে, সে-পরাজয় দেবতার কাছে নয়, স্নেহের দুলালী পুত্রবধূ বেহুলার কাছে। নতুবা আরাধ্যা মনসার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বাঁহাতে শুধু একটি ফুল দেবীর উদ্দেশে নামমাত্র ছুঁড়ে দেওয়া যদি পূজা হয়, অনীহা-মিশ্রিত সেই পূজা নারায়ণ দেবের পৌরুষদীপ্ত শৈব নায়কের পক্ষেই একমাত্র সম্ভব। শৈব চাঁদ সদাগর যেন পুরুষকারের জীবন্ত আদর্শ। চাঁদ সদাগর যেমন নিয়তি-নির্যাতিত, উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত 'মেঘনাদবধ' কাব্যে রাবণও তেমনি নিয়তি-নির্যাতিত।

বেহুলার চরিত্রনির্মাণেও কবির কৃতিত্ব নজর এড়ায় না। বেহুলার পাতিব্রত্য অতুলনীয়। বেহুলার প্রতিটি বাক্যের উচ্চারণ আত্মবিকাশের জ্বলন্ত স্বাক্ষর। স্বামীর প্রাণ ফিরে পেতে স্বর্গের দেবসভায় বেহুলার নৃত্য প্রদর্শনের মধ্যেও সেই আত্মবিশ্বাসের অনুরণন লক্ষ্য করা যায়—

"বিপুলা সুন্দরী নাচে পরম হরিষে।
অরুণ উদয়ে যেন কমল প্রকাশে।।"

সদ্য স্বামী হারানো তরুণীর সমস্ত দুঃখ বুকের মধ্যে চেপে রেখে দেবতার মনোরঞ্জনে এই যে প্রচেষ্টা, এই নিষ্ঠাই তো বেহুলা চরিত্রের মানদণ্ড। কুলবধূর শান্তস্নিগ্ধ কুসুম কোমলতার পাশাপাশি দৈবের সঙ্গে সংগ্রামে বজ্রকঠোর দৃঢ়তা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কবিসৃষ্ট বেহুলার ছায়াপাত ঘটেছে যেন আধুনিক যুগের কবি মধুসূদনের আশ্চর্য সৃষ্টি বীরাঙ্গনা প্রমীলার মধ্যে।

তৎকালীন জীবনচিত্র বর্ণনায় নারায়ণ দেব কতখানি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন সে-সম্পর্কে ডঃ নরেশচন্দ্র জানা মন্তব্য করেছেন ঃ "প্রাচীন বাংলার গ্রাম দেশের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ভরা জীবনের নিখুঁত পরিচয় তাঁর কাব্যে বিধৃত রয়েছে। বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার বর্ণনায় অতিশয়োক্তি থাকলেও অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জানা যায়। কবির দৃষ্টি সর্বত্র সতর্ক।"[৪]

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের কবি হিসাবে নারায়ণ দেবের স্থান অনেক উচ্চে। তাঁর কাব্যই সর্বাধিক প্রচারের সৌভাগ্য-লাভ করেছে। অসমীয়ারা তাঁদের কবি বলে যে নারায়ণ দেবকে দাবি করেন, তার কোন প্রমাণ না থাকলেও এদেশের মতো আসামেও যে তিনি জনপ্রিয়—এটি তাঁর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পরিচায়ক। চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বা অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্রকে বাদ দিলে নারায়ণ দেবকেই মঙ্গলকাব্যের দক্ষতম কবি বলতে হয়। মনসামঙ্গল কাব্যধারার কবিগোষ্ঠীর মধ্যে নারায়ণ দেব ছিলেন উচ্চশির, রসিক পাঠকমাত্রেই তা মেনে নেবেন। ❑

পাদটীকা

১ উদ্ধৃত ঃ 'বিষয় ঃ প্রবন্ধ'—ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৯৯০, পৃঃ ৯৮

২ বাঙলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ১৯৭০, পৃঃ ৩১৪

৩ বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মর্ডান বুক এজেন্সী, ১৩৯২, পৃঃ ৬০

৪ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, সন্ধ্যা লাইব্রেরী, ১৯৯২, পৃঃ ৫৬

শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃপুরুষের নিবাস—দেরে বা দেরেপুর

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

রায়বাড়ির দেব-দেউল

চলিত নাম 'সাতবেড়ে' হলেও এই গ্রামের সরকারি নাম 'সাতবেড়িয়া'। মৌজা নং ৮৯; রেভিনিউ সার্ভে নং ৩৫৫০। এর পরিসর ৪৬৬.৬৯ একর। বৈদ্যনাথ লাহা জানিয়েছেন : "বর্তমানে এই গ্রামের জনসংখ্যা অল্প হলেও একসময় এই গ্রাম ছিল জনবহুল। এই গ্রামে দু-তিনটি চতুষ্পাঠী ছিল। দৈনিক প্রাতঃকালে মাছ, তরিতরকারি, শাক-সবজির বাজার বসত। সপ্তাহে দুদিন হাট বসত। অনেক ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির বাস ছিল এই গ্রামে। কালের তাণ্ডবলীলায় এ-গ্রাম বর্তমানে প্রায় জনশূন্য। চতুর্দিক ঝোপ-ঝাড়ে পরিপূর্ণ। দূরে দূরে দু-একটি পাড়া দৃষ্টিগোচর হয়।"[৩]

রামকিরণবাবু বা তাঁর পুত্র বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়ে এবং রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে ধর্মকর্মে মনোনিবেশ করেন। তিনি প্রথমে একটি পাথরের মন্দির তৈরি করান এবং সেখানে রঘুবীর শিলা প্রতিষ্ঠা করেন। পরে 'গঙ্গাধর' নামে আরেকটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁরও স্বতন্ত্র মন্দির নির্মাণ করান। প্রতি বছর তিনি দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, রাধাশ্যাম বিগ্রহের রাসযাত্রা, গঙ্গাধর শিবের গাজন ইত্যাদি জাঁকজমকের সঙ্গে সমাধা করতেন। তিনিই দুর্গামণ্ডপ, রাসমণ্ডপ প্রভৃতি নির্মাণ করান। রাধাশ্যাম বিগ্রহ ও রঘুবীর শিলার জন্য দৈনিক বিপুল পরিমাণ অন্নভোগ ও দুধের ক্ষীর তৈরির বরাদ্দ ছিল। সেই ভোগপ্রসাদে সাধু-সন্ন্যাসী, অতিথি অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করা হতো। দীনদুঃখীদের প্রতি দান-দক্ষিণারও বরাদ্দ ছিল এই রায় পরিবারের অর্থভাণ্ডার থেকে।

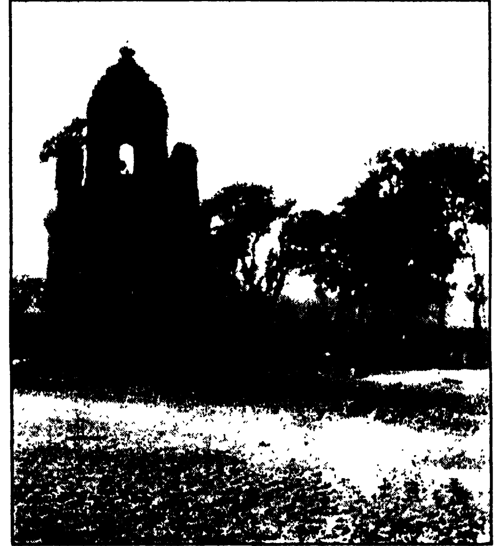
সাতবেড়ের রায় পরিবার কর্তৃক যেসমস্ত দেবদেবীর পূজার্চনা হতো এবং দেবদেবীর মন্দির নির্মিত হয়েছিল, তার অতীত ও বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন :

"বাণেশ্বর শিবমন্দির ইঁটের তৈরি ছিল। বর্তমানে ভগ্ন, বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। চালমুগরা ও পাকুড় গাছে আচ্ছাদিত।



সাতবেড়ের রায়বাড়ির শিবলিঙ্গ

ঠাকুর বর্তমানে রঘুবীরের মন্দিরে আছেন। পার্বতীনাথের মন্দির চ্যাকড়া বা ঝামাপাথরের ভিত ও ইঁট গাঁথুনি দিয়ে তৈরি। বর্তমানে সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। ঠাকুর রঘুবীর মন্দিরে আছেন। দুর্গাদালানটি উত্তরদিকে; মাটির তৈরি



সাতবেড়ের রায়বাড়ির রাসমঞ্চ

ছিল। বর্তমানে ধ্বংস হয়ে গেছে। কেবলমাত্র উঁচু ঢিবি ছাড়া কিছুই বোঝা যায় না। তবে দালানে ওঠার সিঁড়ি আছে। সিঁড়িটি ইঁটের গাঁথুনি। রাসমঞ্চটি ঝামাপাথর ও ইঁট নির্মিত ছিল। এর চূড়া মোট নয়টি। প্রধান একটি এবং ছোট আটটি। সেখানে রণরঘুবীর জীউর রাস উৎসব

৩ কামারপুকুরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, ১৯৬২ সং, পৃঃ ১০০-১০৯


সাতবেড়ের রায়দের রঘুবীর জিউ-এর মন্দির

হতো। চূড়া-সহ রাসমঞ্চটি আজও অক্ষত আছে। প্রবাদ আছে যে, ঐ রাসমঞ্চটি খেঁজুরবাঁদি ও লস্করপুর মৌজা ৯০০ টাকায় বিক্রি করে তৈরি করানো হয়। এটি দেখে মনে হয়, রায় পরিবার যখন পতনোন্মুখ তখন এটি তৈরি। বর্তমানে রাসমঞ্চের আশপাশে বাবলা ও আঁকড়গাছ জন্মেছে। নাটমন্দির বা অতিথিশালা বর্তমানে ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রাচীরের ভিতর ও বহির্গাত্রের চিহ্ন আছে। তুলসীমঞ্চ-দুটি ঝামাপাথরের তৈরি, আজও অক্ষত। রঘুবীর জীউর মন্দির ঝামাপাথর দিয়ে তৈরি। এ অঞ্চলের একটি প্রাচীন কীর্তি। তার দেওয়ালে ফাটল ধরেছে। দশ-পনের বছর পরেই ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা। মন্দিরটি দেউল আকারে তৈরি। চূড়াটি বৃত্তাকার। বর্তমানে মন্দিরের মধ্যে বাণেশ্বর, পার্বতীনাথ, রণরঘুবীর, দুটি লক্ষ্মীমূর্তি, সূর্য, গণেশ, শিব-নারায়ণ, সিংহবাহিনী অর্থাৎ পঞ্চদেবতা ও হনুমানজীর মূর্তি আছে। এঁদের নিত্য সেবাপূজা ও আরতি হয়। গঙ্গাধর শিবের মন্দির ইঁটের তৈরি ছিল। বর্তমানে অর্ধেকটা পড়ে গেছে। তাতে মাটির দেওয়াল দিয়ে খড়ের ছাউনি দেওয়া হয়েছিল। পূর্ব ও দক্ষিণদিকে যে-দরজা ছিল তার চিহ্নও বর্তমান। শিবলিঙ্গ মোট সাতটি—রাসমঞ্চে ভগ্ন দুটি, মন্দিরে ভগ্ন দুটি, পার্বতীনাথ, বাণেশ্বর ও গঙ্গাধর শিব। বর্তমানে উপরি উক্ত দেবদেবীর পূজা করেন সাতবেড়িয়া গ্রামের ভট্ট বংশোদ্ভূত সুধাংশু ভট্টাচার্য ও তাঁদের জ্ঞাতিবর্গ।"[৪]

উল্লিখিত বিবরণে রায় পরিবারের রাধাশ্যাম বিগ্রহের উল্লেখ নেই এবং সরকারি নথিতেও (সি. এস. পড়চায়) রাধাশ্যাম বিগ্রহের উল্লেখ পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি, ঐ বংশের কোন বিধবা রমণী তাঁর যুবক পুত্রের মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মারা যাওয়ায় ক্ষোভে দুঃখে রাধাশ্যাম বিগ্রহকে আমোদর নদীতে বিসর্জন দিয়েছিলেন। তবে সরকারি নথিতে রায় পরিবারের রাসমঞ্চ, রঘুনাথ জীউ (স্থানীয় ব্যক্তিরা বলেন 'রঘুবীর'), গঙ্গাধর শিব, বাণেশ্বর শিব ও রামেশ্বর শিবের নাম পাওয়া যায়। সাতবেড়িয়ার চোদ্দবিঘার রায় অট্টালিকা আজ আর নেই, নেই সেই গভীর রায়দীঘি। দেবদেউল সবই ধ্বংসস্তূপে পরিণত। কেবলমাত্র রঘুবীরের মন্দিরই কালের আঘাত ও অত্যাচার সহ্য করে দাঁড়িয়ে আছে অতীত ইতিবৃত্তের নীরব সাক্ষী হয়ে।

রামানন্দ ওরফে রামকান্ত

সাতবেড়িয়ার জমিদারি লাট চোদ্দবিঘার রায়েদের অধিকারে থাকলেও ঐ অঞ্চল বস্তুত বর্ধমান জমিদারের একটি তালুক ছিল এবং রায় মহাশয়গণ ছিলেন তার তালুকদার। তালুকদার তাঁর প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে তা জমা দিতেন বর্ধমানের মহারাজের কাছে। সমকালীন বর্ধমান জমিদারির মালিক ছিলেন মহারাজা তেজচন্দ্র রায় (১৭৭০-১৮৩২)।[৫] বর্ধমানের মহারাজা সমকালীন ব্রিটিশ বঙ্গে চিহ্নিত জমিদার। তিনি বর্ধমান জমিদারিভুক্ত নানা তালুকের রাজস্ব জমা দিতেন ব্রিটিশ গভর্নরকে। এক-একটি পরগনায় সে সময় বহু ছোটখাট তালুকদার ছিলেন। তাঁরা কেউই ব্রিটিশ গভর্নরকে সরাসরি রাজস্ব দিতেন না; তাঁরা সকলে দায়বদ্ধ ছিলেন বর্ধমানের রাজার কাছে।

'লীলাপ্রসঙ্গ'-এর বর্ণনায় লক্ষ্য করা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ-জনক ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় দেরেপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৭৭৫ সালে এবং তাঁর সঙ্গে সাতবেড়িয়ার তালুকদার রামানন্দ রায়ের বিরোধ বাঁধে ১৮১৪ সালে। তারপরই তিনি তাঁর পিতৃপুরুষের পৈতৃক বাসভূমি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং কামারপুকুরে বসবাস করতে শুরু করেন।

সাতবেড়ের সমকালীন রায় পরিবারের চালচিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী পাঠকবর্গের কৌতূহলের বিষয়

৪ কামারপুকুরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, ১৯৬২ সং, পৃঃ ১০০-১০৯

৫ বর্ধমান : সমাজ ও সংস্কৃতি—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, ২য় খণ্ড, ১৯৯০ সং, পৃঃ ১৮৫-১৮৯

অবশ্যই। সময়টা প্রায় দুশ বছর আগের। এই শতকের প্রথম দশকে সংগঠিত সেটেলমেন্ট রেকর্ডে দেখা যায়, সাতবেড়িয়া মৌজার (মৌজা নং ৮৯) ১১৩ নং খতিয়ানে ১২৬৪, ১২৬৭ ও ১২৬৮ নং দাগে যথাক্রমে রায় পরিবারের রাসমঞ্চ, রঘুনাথ জীউর মন্দির এবং রায় পরিবারের বাস্তুভিটার উল্লেখ আছে। ঐ দাগ নম্বরের মালিক হিসাবে নানা ব্যক্তির মধ্যে রামসর্ব রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখের। সাতবেড়িয়ার চোদ্দবিঘার রায়দের বিভিন্ন শরিকের রঘুনাথ জীউর সেবার পালাভাগের কুড়শীনামার আপস বণ্টনে কনিষ্ঠ শরিক হিসাবে রামসর্ব রায়ের নাম লক্ষিত হয়। এই বণ্টননামা সংগঠিত হয় ১২৮৩ সালের ১১ কার্ত্তিক (১৮৭৭ খ্রীস্টাব্দ)।[৬] এই দুটি প্রমাণ থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, রামসর্ব রায় সাতবেড়িয়ার রায় পরিবারের অধস্তন পুরুষ, যিনি উনিশ শতক ও বিশ শতকের মাঝে যোজকরূপে অবস্থান করছেন। উল্লিখিত খতিয়ানে যেহেতু রায় বংশের রাসমঞ্চ ও বাস্তুভিটার দাগনম্বর আছে, সেই কারণে অনুমিত হয়—ঐ বাস্তুভূমিও রামানন্দ রায়ের। ঐ খতিয়ান তালিকায় উল্লেখ আছে তায়দাদ ২৬৪২৮, যা ঐ বাস্তুখণ্ডের আঠার শতকের পরিচয়বাহী। তায়দাদপত্রে উল্লেখ আছে—"জাহানাবাদ পরগনাভুক্ত একদফা জমায় সাতবেড়্যা (৮৫ বিঘা), কাটনা (১০ বিঘা), আন্দরা (২৭ বিঘা), হাটজোস (৪ বিঘা), গুজরঘাট (১ বিঘা) এবং তিনাডি (৮ বিঘা) মৌজার মোট ১৩৪ বিঘা জমি অনেককাল অবধি শ্রীশ্রী ৺সেবা ও অতিথিসেবার কাজে লাগাইয়া আসিতেছি—শ্রীবিনোদরাম রায়, শ্রীরামকান্ত রায় ও শ্রীরামলোচন রায়; সন ১২০৯ সাল।" ১২০৯ সাল অর্থে ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দ।

রামকুমারের বয়স তখন ৯ বছর। ক্ষুদিরাম যখন তাঁর পৈতৃক বাসভূমি ত্যাগ করেন, সেই সময় তাঁর বয়স ৩৯ বছর। লীলাপ্রসঙ্গকার জানিয়েছেনঃ "সেই সময়ে (ক্ষুদিরামের আমলে) সাতবেড়ে, নারায়ণপুর ও দেরে নামক গ্রামত্রয় ভিন্ন জমিদারিভুক্ত ছিল এবং উহার জমিদার রামানন্দ রায় সাতবেড়ে নামক গ্রামে বাস করিতেছিলেন। এই জমিদার বিশেষ ধনাঢ্য না হইলেও বিষম প্রজাপীড়ক ছিলেন। কোন কারণে কাহারও উপর কুপিত হইলে ইনি ঐ প্রজাকে সর্বস্বান্ত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহার পুত্রকন্যাদির মধ্যে কেহই জীবিত ছিল না। লোকে বলে প্রজাপীড়নের অপরাধেই ইনি নির্বংশ হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পর ইহার বিষয়সম্পত্তি অপরের হস্তগত হইয়াছিল।"[৭]

উল্লেখ্য, তায়দাদে যে-সময়ের উল্লেখ আছে তা ক্ষুদিরামের সময়কালের সঙ্গে বিশেষ সঙ্গতিপূর্ণ। উল্লেখ্য, ব্যক্তিত্রয় সাতবেড়ে জমিদারির মালিক এবং তাঁরা হলেন বিনোদরাম রায়, রামকান্ত রায় ও রামলোচন রায়। রামানন্দ রায় যদি সমকালীন সাতবেড়ের জমিদার হন, তাহলে রঘুনাথ জীউর মন্দির ও চোদ্দবিঘার রায়ভিটায় তাঁর নাম উল্লেখ থাকা স্বাভাবিক। যেহেতু সমকালীন ঐ তায়দাদ লিপিতে আমরা বিনোদরাম রায়, রামকান্ত রায় ও রামলোচন রায়ের নাম পাচ্ছি এবং যেহেতু তাঁরা ক্ষুদিরামের সমকালীন, সেই কারণে আমাদের অনুমান 'রামানন্দ রায়' হিসাবে উল্লেখ্য ব্যক্তিই সরকারি নথিতে 'রামকান্ত রায়'। কারণ, সমকালীন রায়বাড়ির নথিতে রামানন্দ রায়ের নামের উল্লেখ নেই। খুব সম্ভবত সাধারণের মুখে তিনি 'রামানন্দ' নামে চিহ্নিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বাক্ষর করা নাম অবশ্যই রামকান্ত রায়। রায় পরিবারের এক অধস্তন প্রবীণার প্রতিবেদনেও জ্ঞাত হওয়া যায় যে, রামানন্দ রায় (রামকান্ত নয়)-রা তিন ভাই ছিলেন। বর্ণিত তায়দাদ লিপি সে-বক্তব্যেরও সঙ্গতিরক্ষা করে। আবার যদি এমন ধরা হয় যে, রামানন্দ রায় ঐ তিন ব্যক্তির পিতা ছিলেন, তাহলে লীলাপ্রসঙ্গের বর্ণনা অনুযায়ী সেই রামানন্দের সঙ্গে ক্ষুদিরামকে মেলানো সম্ভব নয়। কারণ, ১৮০৩ সালের নথিতে বর্তমান ব্যক্তিগণ সাতবেড়িয়ার জমিদারির মালিক। তাঁদের বয়স তখন কমপক্ষে পঁচিশের ঊর্ধ্বে এবং তাঁদের পিতা প্রয়াত। যদি তাঁদের পিতা জীবিত থাকতেন, তাহলে ঐ মহল্লার মালিকানা তাঁর নামেই নথিভুক্ত হতো। আবার যদি ভাবা যায় যে, তাঁদের কারো পুত্রের নাম রামানন্দ, তাহলেও বিপত্তি ঘটে। কারণ, ১৮০৩ সালে ঐ তিন ভাই জীবিত এবং তায়দাদ নথি উনিশ শতকের প্রথম দশক (১৮১০) পর্যন্ত সংগঠিত হয়েছে। আমরা ধরে নিতে পারি, ১৮১০ সাল পর্যন্ত তাঁরা জীবিত ছিলেন—যে-কারণে ঐ তায়দাদ লিপিতে তাঁদের পুত্রের নাম ওঠেনি বা তার ওপর মালিকানা বর্তায়নি। তাছাড়া আরেকটি শর্ত উত্থাপন-যোগ্যঃ জমিদারি তিন ভাইয়ের। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম ভ্রাতা নিহত হলে বা পরলোকগমন করলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা জমিদারি লাটের মালিক হতে পারতেন; সেক্ষেত্রেও পুত্রের নাম থাকার সম্ভাবনা নেই এবং সে-পুত্র থাকলেও সে ক্ষুদিরামের সময়ে জমিদারির মালিক ছিল না। কাজেই ক্ষুদিরাম সম্পর্কিত রামানন্দ তায়দাদ নথির রামকান্তের সঠিক সংস্করণ। [ক্রমশ] (দুই)

৬ সাতবেড়িয়ার রায় পরিবারের এই কুড়শীনামার সংগ্রাহক শ্রীপুর-নিবাসী শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়।

৭ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, পূর্বকথা ও বাল্যজীবন, ২য় অধ্যায়, উদ্বোধন কার্যালয়, ১৩৯৮ সং, পৃঃ ৩১-৩৫

শ্রীমা সারদা

বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়

জননী সারদা বিদ্যাদায়িনী
কল্যাণময়ী তুমি
করুণারূপিণী জগদ্ধাত্রী
তোমারে আমরা নমি।

সন্তান মোরা বড় অসহায়
দুঃখ, দৈন্য, পাপ
কুরে কুরে খায় নিত্য মোদের
নেইকো মনস্তাপ।

তুমি তো জননী দিব্যরূপিণী
স্নেহের প্রতিমা তুমি
জাগাও না কেন সন্তানে তব
অপরাধ সব ক্ষমি।

কত সন্তানে দিয়েছ জীবন
দিয়েছ আশিসকণা
আমরাও মাগো সন্তান তব
আমাদের ফিরায়ো না।

এসেছি অর্ঘ্য লয়ে
হৃদয়ের পূজা এনেছি সাজায়ে আজ
নতুন জীবনে দীক্ষিত কর মাগো
দাও গো নতুন সাজ।

সন্তান আজ বারেবারে যাচে
তোমার করুণাধারা—
তোমার নামের সুধা পান করে
হবে সে পাগলপারা।

নাছোড়

(বিবেকানন্দ স্মরণে)

কৌশিকীশরণ মিশ্র

তোমার জন্য নির্জন চাই
তুমি হট্টগোল জুড়লে।
তোমার জন্য সাফ-সুতরো হব
ভাবতেই, তুমি কালি জমালে বুকে।
তোমার জন্য মন কেমন করলে
তুমি জগৎজুড়ে খেলনা দেখাও।
আর তোমার জন্য জন্মালেই
তুমি হিড়হিড় করে
মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে চল।
তবু,
তবু তোমার জন্যই আবার আসব।

অলঙ্করণ : জয়ন্ত ঘোষ

এবার কি হবে প্রস্ফুটিত

শান্তিকুমার ঘোষ

তিনটি চাঁপা গাছ :
একই সঙ্গে ফুলে-ফুলে আছে ছেয়ে।
এবার কি হবে প্রস্ফুটিত
জীবন আমার।

ফুল্ল কুসুমে নেই বিন্দুমাত্র দৈন্য
নেই কোন গ্লানি।

আমারও ভিতরে আজ
না আছে শূন্যতা,
নেই তো নৈরাশ্য।

উপর্যুপরি স্তরগুলির তলে
এত যে হিংসা—এমন লোভ :
তাপমান ছাড়িয়ে যায় হিমাঙ্ক;

যা তুচ্ছ করে
শাখার শিখরে পুষ্প
জ্বেলেছে সৌন্দর্য-শিখা, বিতরে সৌরভ।

তাঁর কণ্ঠস্বর

নিশিনাথ সেন

সেই এক শান্তশিষ্ট দীর্ঘ অবয়ব
ঘোরাঘুরি করে
আমারই একান্ত এই মনের ভিতরে।
আশীর্বাদ ভরা দুটি চোখ
যেন চেয়ে আছে
আমার এজীবনের আনাচে কানাচে।

আজ আমি শুনতে পাই তাঁর সেই ধীর কণ্ঠস্বর—
"কারো পরে ভর
করো নাকো। নিজেকে নিজের মতো তৈরি করে নাও
শক্ত হয়ে দুপায়ে দাঁড়াও।
বহু বাধা ঝড়-ঝাপটা বিপত্তি বিপদ
জীবনে চলার পথে আসবেই। তবু থেকো সৎ
এ আমার কথা, অভিজ্ঞতা
প্রকৃতি এভাবে বাঁচে, বাঁচে বৃক্ষলতা
সর্বত্র ছড়িয়ে আছে ভাল করে দেখ তুমি দেখ
তাদের সততা।"

মানুষই ঈশ্বর

শচীন দত্ত

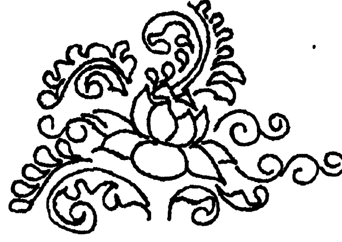
ছায়াপথ ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরে আসি
নক্ষত্রের তীব্র আলো ঝলসায় চোখ
কৃষ্ণগহ্বর খুঁজে ক্ষণিক বিশ্রাম
তবু তো মেটে না আশা তীব্র দৃঢ় রোখ।

বেগুনী পারের আলো দেখায় যে পথ
সমগ্র শরীর জুড়ে তড়িৎ আধান
অদ্ভুত তৃপ্তির ছোঁয়া, কী যে শিহরণ
রক্তমাংসে আলোড়ন সুখের আঘ্রাণ।

মহাকাশবলয়ের খুঁজি প্রান্তসীমা
নক্ষত্রের চূর্ণরশ্মি মেখে সারা গায়ে
মনে হয় হয়ে গেছি মহাশক্তিধর
অজস্র অশ্বের বেগ এসে গেছে পায়ে।

পৃথিবী নড়াতে পারি এত তেজ ধরি
কোথায় ঈশ্বর তার পাইনি ঠিকানা
অনর্থক তপস্যায় শুধু অপব্যয়?
মানুষেরই বলদর্পে প্রভূত নিশানা।

তুচ্ছ নয় মানুষের শক্তির সাধনা
মহাবিশ্বে একচ্ছত্র গ্রহ-তারকায়
পুঞ্জীভূত তেজোরশ্মির কেন্দ্রে সমাসীন
মানুষই ঈশ্বর তার পূর্ণ মহিমায়।



নতুন ঠিকানা

লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত

একটা প্রিয় স্মৃতি জেগে ওঠে
মনের অতলে।
যেন বনান্তের পারে চাঁদের উঁকিঝুঁকি।
অবিরত মনের বৃন্তে দুলছে স্মৃতি,
ঠিক যেন ভাষাহারা চোখের
আকাশে নতুন ঠিকানা।
আমি নিরন্তর ভাবি
কী সুন্দর স্মৃতির এই দ্বীপ
যা আমার জীবনে আনে
অসীমের স্বাক্ষর।

যুগপুরুষ

অজন্তা হালদার

যুগের ওপার থেকে
ডাক আসে বারবার
কিভাবে জীবনতরী
হব যে পারাপার।

'ছেড়ে এস সব বাধা—
আমিত্বের বন্ধন।'
কার বাণী, কার ডাক?
আনচান করে মন।

বসে আছে আঁখি মুদে
কালের জনক,
ঐ শক্তি ঐ ডাকে
নড়বে কি টনক?

জাতির যে বড় বাধা
চারিপাশে হানাহানি
শুনেও শুনে না কথা
একই বাক্যের ধ্বনি।

অর্পণ কর সুখ
এ-সুখ সে-সুখ নয়
ব্রহ্মপদে ত্যাগ কর
জীবন হবে প্রেমময়।

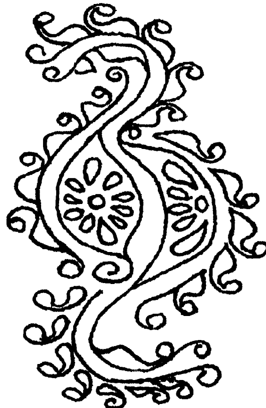
আমি ও আমার ঈশ্বর

মিলন চট্টোপাধ্যায়

আমি ছিলেম—
আণবিক সীমানার মধ্যে
আমার ছোট্ট
পরিবারের সুখ-দুঃখ নিয়ে।

তোমার সান্নিধ্যে
ক্ষুদ্র গণ্ডি পার হয়ে এলেম
অভিকর্ষের আওতায়,
তাই পরিবারের সীমানা
ছেড়েও ধরার আকর্ষণ
কাটাতে পারিনি—

কত লোকের ব্যথা
বেদনা, ভালবাসা নিয়ে



সেবাব্রতে আছি তোমারই
নির্দেশিত পথে।

তুমি মহাকর্ষের আস্বাদন পেয়েছ—
তাই, সমগ্র বিশ্বজুড়ে
তোমার ব্যাপ্তি।
অনাদি মহাশক্তিই তোমার প্রেরণা।

অপেক্ষায় আছি—
কোন শুভ মুহূর্তে
তোমার এক কণা শক্তি
আমার পার্থিব বন্ধন
হতে নিয়ে যাবে
মহাকর্ষের আঙিনায়।

ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে আদিবাসী ক্রীড়া

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

আদিবাসী তথা বনবাসীদের মধ্যে লুকিয়ে আছে বহু প্রতিভার আধার। যেকোন দেশের জাতীয় জীবনে এই আদিবাসীরাই প্রকৃত প্রাণস্পন্দন। সমাজ-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, বিশেষ করে খেলার মাঠে এই আদিবাসীদের ওপর নির্ভর করে সাফল্য ও গৌরবের ইতিবৃত্ত রচনা করেছে সাদা-কালো সব দেশ। ২০০০ সালের অলিম্পিকে আদিবাসীদের যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পবিত্র মশাল প্রজ্বলন থেকে শুরু করে প্রতিটি কর্মকাণ্ডেই প্রত্যক্ষ ভূমিকা লক্ষ্য করা গেছে কোন না কোন আদিবাসী ক্রীড়াবিদের। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়ার মতো 'হেভিওয়েট' দেশের যাবতীয় বিক্রম, বৈভবের পিছনে এই আদিবাসীদের ভূমিকা তো অনস্বীকার্য। বলা যায়, আদিবাসীরাই এইসব দেশের সাফল্যের নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি।



চতুর্থ আদিবাসী ক্রীড়া মহোৎসবের একটি দৃশ্য

অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও রয়েছে অসংখ্য আদিবাসী গোষ্ঠী। শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বাস্থ্য ও খেলাধূলায় এই আদিবাসী সমাজকে স্বপ্ন দেখানো, তাদের মধ্যে আত্মমর্যাদা ও স্বাভিমান বোধ জাগিয়ে তোলা, সর্বোপরি তাদের জাতীয় জীবনের মূল স্রোতে সংযোজিত করে সমাজকে আরো শক্তিশালী করার কর্মকাণ্ড চলছে দেশ জুড়ে।

আদিবাসীদের জাতীয় ক্রীড়া মহোৎসব সম্প্রতি (২৬-২৯ ডিসেম্বর ২০০০) অনুষ্ঠিত হলো আদিবাসীদের জন্য গঠিত নতুন রাজ্য ঝাড়খণ্ড প্রদেশের রাজধানী রাঁচিতে। পাঞ্জাব বাদে ভারতের প্রতিটি রাজ্যের আদিবাসী ক্রীড়াবিদ্‌রা এই ক্রীড়া মহোৎসবে অংশ নিয়েছিল। প্রতি চারবছর অন্তর এই ক্রীড়া মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গতবার উদয়পুরে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় ক্রীড়া মহোৎসবে বাংলার ছেলেমেয়েরা টেক্কা দিয়েছিল সব রাজ্যকে। এবারে কিন্তু বাংলাকে কেরালার পিছনে থাকতে হয়েছে। কেরালা ও বাংলা অ্যাথলেটিক্সে ৯টি করে সোনা পেলেও তিরন্দাজিতে বাংলার ছেলেমেয়েদের হতাশজনক পারফরমেন্সে পদক-প্রাপ্তির তালিকায় কেরালা শীর্ষে উঠে যায়। তারা ১৩টি সোনা-সহ ৩০টি পদক পায়। অন্যদিকে বাংলা ৯টি সোনা-সহ ১৯টি পদক সংগ্রহ করে সার্বিক চ্যাম্পিয়নশিপ খেতাব কেরালার হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। তৃতীয় স্থান পায় আয়োজক ঝাড়খণ্ড। সবথেকে বড় দল পাঠিয়েও আশানুরূপ পারফরমেন্স দেখাতে ব্যর্থ মধ্যভারত।

এই মধ্যভারতের জসপুরেই আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে আদিবাসী কল্যাণ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অসংখ্য শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে আজ সেটি সারা ভারতে পল্লবিত। মূলত শিক্ষা, ক্রীড়া ও শ্রদ্ধাজাগরণের ক্ষেত্রেই এঁরা বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে ২৫০টি সহ সারা দেশে ১৯৭৯টি ক্রীড়াকেন্দ্র আদিবাসী ছেলেমেয়েদের মধ্যে ক্রীড়া ও শরীরচর্চার প্রসার ও সফল কার্যকরণে ব্যাপৃত।

বস্তুত, এই আদিবাসীদের মধ্যে খেলাধূলার প্রতিভা প্রকৃতি-প্রদত্ত। তাদের মধ্যে খেলাধূলার প্রতি রুচি ও আগ্রহ সৃষ্টির পাশাপাশি সমাজ ও দেশ সম্পর্কেও তাদের আগ্রহ ও জাতীয়তাবোধ গড়ে তোলা হয়। সম্পূর্ণ ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুসারী হয়ে কাজ করে যাচ্ছে এই ক্রীড়াকেন্দ্রের কর্মকর্তারা। ফলে আদিবাসী ছেলেমেয়েদের মূল্যবোধ ও জীবনদর্শনের ভিতটা অতি অল্প বয়স থেকেই সত্য ও কর্তব্য-নিষ্ঠা এবং জাতীয় ভাবাবেগের আবর্তে গড়ে উঠেছে।

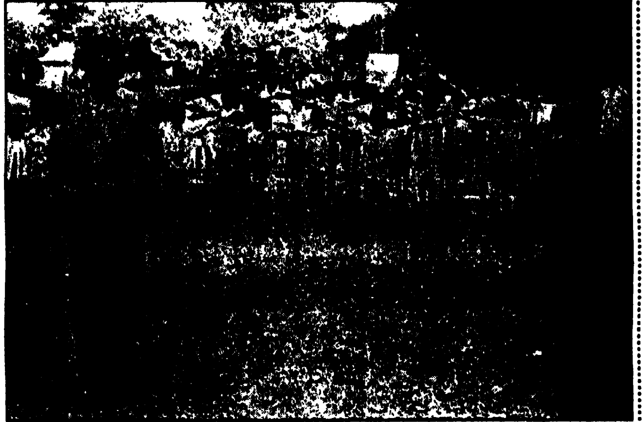
রাজস্থানের এক অখ্যাত প্রত্যন্ত গ্রামের গভীর বনাঞ্চল থেকে খুঁজে বের করে লিম্বারামকে লালন ও পালন করে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে এইরকম একটি কেন্দ্র। বনে মনের আনন্দে

পাখি ও অন্যান্য জীবজন্তু শিকার করাই ছিল লিম্বারামের নেশা। সেখানে একটি ক্রীড়া প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়েছিল। আর পাঁচজন আদিবাসী কিশোরের মতো স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কিশোর লিম্বা অংশ নিয়েছিলেন জীবনের প্রথম তীরন্দাজী প্রতিযোগিতায়। তারপর আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাঁকে। প্রাথমিক 'স্কুলিং'য়ের পর তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় সরকারি 'সাই' কেন্দ্রে। তারপরের ঘটনা তো ইতিহাস। বেজিঙে বিশ্বরেকর্ড, অলিম্পিকে সোনা জয়ের হাতছানি। বার্সিলোনা অলিম্পিকে নেহাতই দুর্ভাগ্য তাড়া না করলে লিয়েন্ডার পেজের আগে লিম্বারামই ভারতের জন্য অলিম্পিক মেডেল নিয়ে আসতে পারতেন। লিম্বারামই ভারতীয় তিরন্দাজিকে বিশ্বমানচিত্রে স্থান করে দিয়েছেন প্রায় একক কৃতিত্বে।

শুধু লিম্বারামই নন, অ্যাথলিট নিয়তি হেমব্রম, বুধুয়া ওঁরাও, হকি খেলোয়াড় পাওলোস হোরোর মতো আদিবাসী খেলোয়াড়রা জাতীয় স্তরে স্বীকৃতিলাভ করেছেন। নিয়তি, বুধুয়া দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্বও করেছেন। হোরোও বিপুল সম্ভাবনা জাগিয়ে শুরু করেছিলেন। অসম্ভব দ্রুতগতিসম্পন্ন এই উইঙ্গার থৌবা সিংহের জন্য জাতীয় দলের জার্সি গায়ে চাপাবার সুযোগ পাননি। তবে বেশ কয়েকবার অলিম্পিক বা বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শিবিরে ডাক পেয়েছিলেন।

রাঁচিতে অনুষ্ঠিত চতুর্থ জাতীয় ক্রীড়া মহোৎসবে এই বুধুয়া ওঁরাও ছিলেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি। জামসেদপুরের টাটা স্টীল কর্তৃপক্ষ এবং রাঁচি ও কলকাতার সাই কেন্দ্র এই 'জাতীয় মিট'কে সফল করতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে সমস্তরকম সহযোগিতা করেছে। এশিয়াডে সোনাজয়ী অ্যাথলিট চার্লস বোরোমিও, ব্রোঞ্জজয়ী সতীশ পিল্লাই, বাস্কেটবলের অলিম্পিয়ান হরভজন সিংহ, বিখ্যাত তীরন্দাজ সঞ্জীব সিংহের মতো টাটা স্পোর্টসে কর্মরত কৃতী ক্রীড়াবিদ্‌দের পাঠানো হয়েছিল মাঠে ও মাঠের বাইরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে। কলকাতার বিভিন্ন ক্রীড়া-ব্যক্তিত্বও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মূলত তীরন্দাজি, কবাডি, খো খো ও অ্যাথলেটিক্স (ম্যারাথন সহ)—এই চারটি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ ছিল। অদূর ভবিষ্যতে হকি, ভলিবলের মতো কয়েকটি খেলা অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যেহেতু এই দুটি ইভেন্টে আদিবাসী ছেলেমেয়েদের সহজাত দক্ষতা অনস্বীকার্য। মুম্বাই, উদয়পুর, কোচিতে অনুষ্ঠিত পূর্ববর্তী সব মিটকে ছাপিয়ে গেছে রাঁচির চতুর্থ ক্রীড়ামহোৎসব। গোটা ভারতের আদিবাসী সমাজকে হাজির করাতে পেরেছে রাঁচি। ভবিষ্যতে এই প্রতিযোগিতাটি অধিকতর সাফল্য-সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হবে—এ আশা আমাদের সকলের।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নারায়ণপুর



শরীরচর্চায় মগ্ন পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর শিশুরা

(বস্তার জেলা), ছত্তিসগড় আদিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা এবং খেলাধূলার প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। সম্প্রতি রাজ্যস্তরের ফুটবলে তারা অংশ নিয়েছে এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও তারা প্রথম একশ জনের মধ্যে স্থান করে নিয়েছে। ❑

ভ্রম-সংশোধন

গত [illegible] সংখ্যার [illegible] পৃষ্ঠার [illegible] স্তম্ভের ৩২ পঙ্‌ক্তিতে মাতৃপিতৃহন্তা-র পরিবর্তে মাতাপিতৃহন্তা [illegible]

গত চৈত্র ১৪০৭ সংখ্যার ২৫৮ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ৩৯ পঙ্‌ক্তিতে 'পরশানুভব'-র পরিবর্তে 'পরেশানুভব' [illegible]

গত বৈশাখ ১৪০৮ সংখ্যার ২২৭ পৃষ্ঠার ৫নং পত্রের তারিখটি ৩০।৩।(১৯)৩১-এর পরিবর্তে ৩০।৩।(১৯)[illegible]

এবং ২২৮ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ২২ পঙ্‌ক্তিতে ১৮৫৫-১৯৭১-র পরিবর্তে ১৮৫৫-১৮৭১ হবে।

[illegible]

শ্রীগৌরসুন্দর ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম

গৌরীশ মুখোপাধ্যায়*



রবীন্দ্রনাথ 'চারিত্রপূজা'য় বিদ্যাসাগরের চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন : "দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়। বহুকাল পূর্বে নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।"[১]

বস্তুত, ধর্মে, কৃষ্টিতে, সাহিত্যে, এককথায় সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে বর্তমান বাঙালী যে-বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারী, তার বীজ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই বপন করে গেছেন 'শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে' শ্রীগৌরসুন্দর। মহাপ্রভুর নাম 'গৌরসুন্দর' ছিল না। এটি তাঁর লৌকিক নাম। লোকমুখের এই নাম বাংলার প্রথম জীবনীকার বৃন্দাবন দাস গ্রহণ করে বলেছেন :

"গঙ্গাজলে কেলি করে শ্রীগৌরসুন্দর।
সর্ব বালকের মধ্যে অতি মনোহর।।"
(শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, আদি খণ্ড, ৩য় অধ্যায়)

মহাপ্রভুর আসল নাম ছিল বিশ্বম্ভর মিশ্র। দাদা বিশ্বরূপের নামের সঙ্গে মিল রেখেই এই নাম রাখা হয়েছিল। কিন্তু আসল নামটি খুব একটা চলেনি। ভাল নাম হলেও 'বিশ্বম্ভর' চলে গিয়েছিল দুটি অন্য নামের আড়ালে। সেই অন্য নাম দুটির একটি 'নিমাই'। নামটি রেখেছিলেন অদ্বৈত আচার্যের পত্নী সীতাদেবী। বিশ্বরূপের জন্মের পর শচীমাতার গর্ভে আরো কয়েকটি সন্তান আসে। কিন্তু সবগুলি নষ্ট হয়ে যায়। অতঃপর ১৪০৭ শকাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণের সময় শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরধ্বনির মাঝে শচীগৃহে ভূমিষ্ঠ হয় একটি সন্তান। তখন—

"অদ্বৈত আচার্য ভার্যা জগত পূজিতা আর্যা
নাম তার সীতাঠাকুরানী।
আচার্যের আজ্ঞা পাঞা গেলা উপহার লৈঞা
দেখিতে বালক শিরোমণি।।"
(ঐ, ১৩শ অধ্যায়)

বালকের দিব্যদ্যুতি দেখে সীতাদেবীর হৃদয় বাৎসল্য রসে দ্রবীভূত হলো। তাই—

"ডাকিনী শাকিনী হৈতে শঙ্কা উপজিল চিতে
ডরে নাম থুইল নিমাঞি।।" (ঐ)

'নিমাঞি' নামটির অর্থ দুটি। এক—যার মা নেই। অতএব মাতৃহীন 'নিমাঞি'র প্রতি যমের করুণা হবে। শিশুর মৃত্যু হবে না। দুই—নিমের ন্যায় তিক্ত। শিশু যমের অরুচি হবে। কারণ, খেতে গেলেই যমের মুখে তেতো লাগবে।

মহাপ্রভুর দুটি নামের অপরটি হলো 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী'। এই নামটি দিয়েছিলেন মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগুরু কেশব ভারতী।

"যত জগতের তুমি কৃষ্ণ বোলাইয়া।
করাইলা চৈতন্য—কীর্তন প্রকাশিয়া।।
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সর্বলোকে তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য।।"
(ঐ, মধ্য খণ্ড, ২৬শ অধ্যায়)

শ্রীগৌরসুন্দরের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের সচ্ছল সংসারে ছিলেন চারজন—জগন্নাথ, শচীদেবী, বিশ্বরূপ আর নিমাই। নিমাইয়ের ছেলেবেলাটা সাধারণভাবেই কেটেছিল। তবে মাতৃস্নেহ একটু বেশি থাকায় তিনি 'প্রবল দুরন্ত' ছিলেন। জগন্নাথ অবশ্য কর্তব্যবোধে যথারীতি শাসন করতেন। আর বিশ্বরূপ অনুগত ভাইকে খুবই ভালবাসতেন।

বিশ্বরূপের বয়স যখন মাত্র ষোল বছর, জগন্নাথ ও শচীদেবী তখন তাঁর বিবাহের উদ্যোগ করলেন। কিন্তু বিশ্বরূপের হৃদয়ে তখন প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে।

---

১ রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৬৫

* শ্রীগৌরীশ মুখোপাধ্যায়ের বেশ কয়েকটি রচনা পূর্বেও 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শ্রীগৌরীশ মুখোপাধ্যায় গত আগস্ট (২০০০) মাসে রামকৃষ্ণ-ধামে প্রয়াণ করেছেন।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

তিনি বিবাহ করবেন না। কিন্তু আদেশ করলে তা পালন করতে হবে। এই অবস্থায় গৃহত্যাগ করাই শ্রেয়। শোনা যায়, পুরী সম্প্রদায়ের এক সন্ন্যাসীর কাছে বিশ্বরূপ সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর নাম হয় 'শঙ্করারণ্য পুরী'। আরো শোনা যায়, আঠার বছর বয়সে পুনা শহরের কাছে পাণ্ডুপুরে অলৌকিকভাবে বিশ্বরূপের তিরোভাব হয়। তার ষোল বছর পর শ্রীচৈতন্য তাঁর অগ্রজের তিরোভাব স্থান দেখতে গিয়েছিলেন।

বিশ্বরূপের সন্ন্যাসগ্রহণ নিমাইয়ের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। লেখাপড়া শিখলে নিমাই বিশ্বরূপের পথ অনুসরণ করবে—এই আশঙ্কায় বাবা-মা তাঁকে পড়তে দিতে চাইতেন না। বালক নিমাইয়ের হৃদয় অশান্ত হয়ে উঠেছিল ঠিক এই কারণেই। অবশেষে নিমাইয়ের ইচ্ছা ফলবতী হলো। জগন্নাথ শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের পরামর্শে নিমাইকে গঙ্গাধর পণ্ডিতের টোলে ভর্তি করে দিলেন। নিমাইয়ের হৃদয়ে শান্তি ফিরে এল।

কিন্তু নিমাইয়ের শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার আগেই জগন্নাথ দেহত্যাগ করলেন। সংসারে সামান্য অভাব-অনটন দেখা দিল। তারই মাঝে কয়েক বছরের মধ্যেই ব্যাকরণ ও অলঙ্কারে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করে নিমাই টোলের পাঠ সমাপ্ত করলেন। কিন্তু তার আগেই মাতার আদেশে মাত্র পনের বছর বয়সে তিনি বল্লভ ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করেন।

অতঃপর নিমাই মুকুন্দ সঞ্জয় নামে এক ধনী ব্রাহ্মণের চণ্ডীমণ্ডপে নিজেই টোল খুললেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল বছর। এত অল্প বয়সে নবদ্বীপের মতো পণ্ডিত-সমাকীর্ণ নগরে আর কেউ টোল খুলতে সাহস করেনি। তার কিছুদিন পর লক্ষ্মীকে মায়ের কাছে রেখে নিমাই নদীপথে একবার পূর্ববঙ্গে গিয়েছিলেন। অনেকের অনুমান, এইসময় তিনি শ্রীহট্টে গিয়ে তাঁর পৈতৃক ভূসম্পত্তির শেষ ব্যবস্থা করে এসেছিলেন। পূর্ববঙ্গে থাকাকালেই নিমাইয়ের সঙ্গে তাঁর প্রথম ভক্ত তপন মিশ্রের মিলন হয়। তপনের ইচ্ছা ছিল নিমাইয়ের সঙ্গে নবদ্বীপে আসেন।

"মিশ্র কহে আজ্ঞা হয় আমি সঙ্গে আসি।
প্রভু কহে তুমি শীঘ্র যাহ বারাণসী।।
তথায় আমার সঙ্গে হইবে মিলন।
কহিব সকল তত্ত্ব সাধ্য ও সাধন।।"

(ঐ, আদি খণ্ড, ১০ম অধ্যায়)

নিমাই পূর্ববঙ্গে থাকাকালে তাঁর বালিকাবধূ লক্ষ্মীপ্রিয়ার সর্পদংশনে মৃত্যু হয়। নিমাই গৃহে প্রত্যাবর্তন করে এই ঘটনার কথা শুনে অত্যন্ত শোকাহত হন এবং শোকবিহ্বল চিত্তকে শান্ত করতেই তিনি শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে অদ্বৈত, মুকুন্দ প্রমুখ ভক্তদের সঙ্গে ভাগবত পাঠ ও নাম-সঙ্কীর্তনাদিতে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু সংসারের প্রতি নিমাইয়ের ঔদাসীন্য এবং ধর্মালোচনায় আগ্রহ দেখে শচীমাতা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তিনি নিমাইয়ের মধ্যে বিশ্বরূপের অনুবৃত্তি আশঙ্কা করে পুত্রের পুনর্বিবাহের আয়োজন করতে থাকলেন। এইসময় ঘটক কাশী মিশ্রের মাধ্যমে শচীমাতা রাজপণ্ডিত ও ধনী সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠালেন। সনাতন নিজেকে অতি ভাগ্যবান মনে করে শচীদেবীর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং নিমাইকে কন্যা সম্প্রদান করলেন।

কিন্তু শচীমাতার মনোবাসনা পূর্ণ হলো না। সংসারে নিমাইয়ের মন বসল না। এইসময় নবদ্বীপে একে একে এসে উপস্থিত হলেন হরিদাস ও নিত্যানন্দ। এই দুই ভক্তের সাহচর্যে নিমাই নামসঙ্কীর্তনে মেতে উঠলেন। এতদিন নিমাইয়ের নামসঙ্কীর্তন শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এখন নবদ্বীপের পথে পথে তিনি নামসঙ্কীর্তনে মেতে উঠলেন।

এরই মধ্যে পিতৃকৃত্য করতে নিমাই গয়াধামে যাত্রা করলেন। সেখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো ঈশ্বর পুরীর। ঈশ্বর পুরী ছিলেন মাধবেন্দ্র পুরীর প্রিয় শিষ্য। মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্যদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশি ঈশ্বরপ্রেম লাভ করেছিলেন। নিমাই ঈশ্বর পুরীর নিকট "মন্ত্রদীক্ষা চাহিলেন মধুর বচনে।" ঈশ্বর পুরী অতি আনন্দে মন্ত্রদীক্ষা দানে সম্মত হলেন। মন্ত্রটি 'গোপীজনবল্লভ'-এর দশাক্ষরী মন্ত্র।

গয়া থেকে ফিরে নিমাইয়ের অন্তরে আমূল ভাবান্তর দেখা দিল। কৃষ্ণপ্রেমে তিনি হয়ে উঠলেন বিভোর। গার্হস্থ্যধর্ম পালন করা, টোলে শিষ্যদের শিক্ষাদান করা—এসব কিছুই আর সম্ভব হলো না তাঁর পক্ষে। খানিকটা ভাবাবেশে তাঁর দিন কাটতে থাকল। অবশেষে, ১৪৩১ শকাব্দের 'মাঘ শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস'। জাহ্নবীতীরে কণ্টকনগরে গিয়ে কেশব ভারতীর কাছে তিনি সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণ করলেন। তাঁর সন্ন্যাসনাম হলো 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতী'। তখন তাঁর বয়স মাত্র চব্বিশ বছর।

সন্ন্যাসদীক্ষার পর ভাবাবিষ্ট শ্রীচৈতন্য বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে বৃন্দাবনের উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং রাঢ় অঞ্চলের নানা স্থানে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ান। এই অবস্থায় তিনদিন কাটে। অবশেষে নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তগণ তাঁকে ভুলিয়ে শান্তিপুরে অদ্বৈতের গৃহে নিয়ে আসেন। অদ্বৈত-গৃহে শচীমাতা এবং অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর মায়ের অনুমতি নিয়ে তিনি নীলাচলের উদ্দেশে যাত্রা করেন।

উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের গুরু কাশীনাথ মিশ্র মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। পুরীতে তাঁরই উদ্যানগৃহে মহাপ্রভুর বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। পুরীতে মহাপ্রভুর আরেকজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। তিনি বাসুদেব সার্বভৌম। ইনিই সেই অলৌকিক শক্তিধর পণ্ডিত, যিনি মিথিলা থেকে ন্যায়ের

সুবৃহৎ গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করে নবদ্বীপে এসেছিলেন। কারণ, ন্যায়ের গ্রন্থ মিথিলার বাইরে নিয়ে যাওয়া তখন নিষিদ্ধ ছিল। এইভাবে কণ্ঠস্থ করে ন্যায়ের গ্রন্থ নবদ্বীপে নিয়ে এসে সার্বভৌম মিথিলার একাধিপত্য ভেঙে দিয়েছিলেন। পরে সার্বভৌম পুরীতে বাস করেন।

১৪৩২ শকাব্দে "দক্ষিণ গমনে প্রভুর ইচ্ছা উপজিল।" মহাপ্রভু একাকী দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দের নির্বন্ধাতিশয্যে 'কৃষ্ণদাস নামে এক সরল ব্রাহ্মণ'কে কৌপীন, বস্ত্র ও জলপাত্র বহন করার জন্য সঙ্গে নিয়েছিলেন। পথে গোদাবরীতীরে উড়িষ্যার দক্ষিণ অঞ্চলের শাসক রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। দক্ষিণদেশীয় বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত রায় রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেমাতুর শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণপ্রেম, সাধ্য ও সাধন, রাধাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। রামানন্দ অতঃপর মহাপ্রভুর সঙ্গলাভের আশায় কর্মত্যাগ করে পুরী চলে আসেন ও স্থায়িভাবে বসবাস করেন।

মহাপ্রভু দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত বিস্তৃতভাবে ভ্রমণ করেছিলেন। যেসব স্থানে তিনি গিয়েছিলেন তার মধ্যে শ্রীরঙ্গম, সেতুবন্ধ, শ্রীঅনন্তপুরম, নাসিক, ত্র্যম্বকেশ্বর, কুশাবর্ত প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীচৈতন্যের দক্ষিণ ভারত ভ্রমণের ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ দুইখানি মহামূল্যবান গ্রন্থ 'ব্রহ্মসংহিতা' এবং 'কর্ণামৃত' লাভ করেছিলেন।

১৪৩৫ শকাব্দে মহাপ্রভু গঙ্গাতীর ধরে বৃন্দাবনের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন, কিন্তু অতিরিক্ত লোকসমাগমের জন্য গৌড় থেকে ফিরে আসেন। এইসময় তিনি শচীমাতা ও অদ্বৈতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাছাড়া এই প্রথম তিনি রূপ ও সনাতনের সঙ্গে মিলিত হন। কয়েক মাস পরে ১৪৩৬ শকাব্দে ঝারিখণ্ডের বনপথ ধরে পুনরায় তিনি বৃন্দাবনের উদ্দেশে যাত্রা করেন। পথে কাশীতে দিনকয়েক কাটিয়েছিলেন তাঁর প্রথম ভক্ত তপন মিশ্রের সঙ্গে। কাশী থেকে আসেন প্রয়াগ। সেখান থেকে মথুরা ও বৃন্দাবন। সেইসময় ব্রজমণ্ডলে ঘুরে ঘুরে মহাপ্রভু অনেক লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করেছিলেন। অবশিষ্টগুলি উদ্ধারের ভার দিয়ে আসেন রূপ ও সনাতনের ওপর। সন্ন্যাসগ্রহণের পর তীর্থভ্রমণ, শিক্ষাগ্রহণ ও দান, তীর্থ উদ্ধার ও স্থাপনে মহাপ্রভুর ছয়টি বছর অতিবাহিত হয়। নরদেহে তিনি বাকি আঠার বছর নীলাচল পরিত্যাগ করে আর কোথাও যাননি। নীলাচলে অবস্থানকালে অনুজোপম ভক্ত গদাধর পণ্ডিত এবং ঠাকুর হরিদাস মহাপ্রভুর সঙ্গে ছিলেন। আর গৌড় থেকে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, নরহরি প্রমুখ ভক্তগণ রথযাত্রার সময় নীলাচলে এসে মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হতেন।

শ্রীচৈতন্যের হৃদয়ে ঈশ্বরবিরহ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষের কয়েক বছর কৃষ্ণ-বিরহে তাঁর দিব্যোন্মাদ অবস্থায় কাটে। তাঁর সেইসময়ের অবস্থা তাঁরই রচিত 'শিক্ষাষ্টক'-এর সপ্তম শ্লোকে মর্মস্পর্শিভাবে বর্ণিত হয়েছে—

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেন মে।"

—নিমেষ হয়েছে যুগের ন্যায় দীর্ঘ, চক্ষুদ্বয় শ্রাবণ গগনের মতো বর্ষণ করছে। গোবিন্দবিরহে আমার সমস্ত জগৎ শূন্য হয়ে গেছে।

১৪৫৫ শকাব্দে মাত্র ৪৮ বছর বয়সে মহাপ্রভুর তিরোভাব ঘটে। কিন্তু তাঁর তিরোধান চির-রহস্যে আবৃত হয়ে আছে। তাই মহাপ্রভুর ভগবৎপ্রেম যেমন গত পাঁচ শতাব্দী ধরে অমৃতবর্ষণ করে আসছে, তাঁর নরজীবনও তেমনি লোক-অন্তরে মৃত্যুহীন হয়ে আছে।

[illegible]

গয়ায় পিতৃকৃত্য করতে গিয়ে নিমাই ঈশ্বর পুরীর কাছে প্রেমধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। নবদ্বীপে ফিরে এলে নদীয়াবাসী সবিস্ময়ে দেখল, পণ্ডিত-শিরোমণি নিমাই ভগবৎ-প্রেমিক শ্রীগৌরাঙ্গে পরিণত। লোকে তাঁর মুখে শুনল, সকল মানুষের হৃদয়ে কৃষ্ণ অধিষ্ঠিত। সুতরাং মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই। মানুষের একমাত্র পরিচয়—সে মানুষ। তিনি বললেন: "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।" মানুষ হরিভক্তিপরায়ণ হলেই তার মানবতা সার্থকতা লাভ করে। ভগবৎপ্রেমিক নিমাইয়ের মুখে মানুষের জয়গান শুনে সমাজে অবহেলিত মানুষ যেন নিজের নতুন এক পরিচয় লাভ করল।

ধর্মপ্রচারক বলতে সাধারণত যা বোঝায়, শ্রীচৈতন্য তা ছিলেন না। তিনি নিজে কোন ধর্মগ্রন্থ রচনা করেননি। কোন ধর্মগ্রন্থ রচনা করার প্রয়োজনও বোধ করেননি তিনি। "অন্তরে সমুদিত তত্ত্ব তাঁহার দেহে বাক্যে আচরণে যে সুনিশ্চিত অভিব্যক্তি লাভ করিত, জনগণের নিকট তাহা লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ অপেক্ষা মূল্যবান ছিল। বুদ্ধ বা ক্রাইস্ট গ্রন্থ রচনা করেন নাই। মহাপুরুষদের জীবনসূত্র, শিষ্যগণ ঐ সূত্রেরই ভাষ্যকার। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে মহাপ্রভুর কোন দান নাই, ভক্তগণই উহা গড়িয়া তুলিয়াছেন—এই ভাবের কোন মূল্য নাই।"[২]

জাহ্নবী-তীরবর্তী কণ্টকনগরে সন্ন্যাসদীক্ষা গ্রহণের পর নিমাই তাঁর গৌর অঙ্গে অরুণ বর্ণের বসন ধারণ করলেন। তখন থেকেই শ্রীচৈতন্য দেহ-মনে যেন শ্রীরাধায় পরিণত হলেন। আরো পরে—মহাপ্রভুর নরদেহের শেষ আঠার

২ বৈষ্ণব পদাবলী—অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, প্রমুখ সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫২ সং

বছর প্রেমোন্মাদিনী রাধার ন্যায় প্রেমোন্মাদ দশায় কাটিয়েছেন।

মহাপ্রভু ছিলেন মধুর রসের সাধক। কৃষ্ণ তাঁর কান্ত, আর তিনি কান্তা। তাই ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ প্রেমের। সেই সম্বন্ধ নিত্য-সম্বন্ধ। শ্রীচৈতন্যের পরমভাব নিষ্কাম ঈশ্বরপ্রেম। কোন পার্থিব বস্তু বা বিষয়ে তাঁর কামনা নেই। তিনি তাই বৈরাগ্যপথের পথিক। বেদ-পুরাণাদিতে দেবতাদের নিকট কেবল 'দাও দাও'-এর ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি। কিন্তু শ্রীচৈতন্য বললেন :

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।"

(শিক্ষাষ্টক, ৪)

—হে জগতের ঈশ্বর, আমি তোমার নিকট ধন, জন, সুন্দরী নারী বা কবি-প্রতিভা কামনা করি না। জন্মে জন্মে তোমাতে যেন আমার অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে যাত্রা করে গোদাবরীতীরে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে রায় রামানন্দের সাক্ষাৎ হয়েছিল। তখন তাঁর সঙ্গে রায় রামানন্দের বৈষ্ণবদের সাধ্যসাধন তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। সেখানেই সর্বপ্রথম গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রধান তত্ত্বগুলি একান্ত নিভৃতে আলোচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। পরে জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট এবং অন্যান্য সুপণ্ডিত গোস্বামীরা বৃন্দাবনে আসেন। এই সর্বত্যাগী মনীষী বৈষ্ণবগণ ধীরে ধীরে নানা তত্ত্বে সমৃদ্ধ করেছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে। সনাতন ও রূপ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক মতগুলি তাঁদের গ্রন্থে সংক্ষিপ্ত আকারে গড়ে তুলেছিলেন। জীব গোস্বামী তাঁর 'ষট্‌সন্দর্ভ'-এ সেই সংক্ষিপ্ত মতগুলির বিস্তৃত রূপ দিয়েছিলেন। জীব গোস্বামী অবশ্য ষড় গোস্বামীর অন্যতম আত্মলোপী গোপাল ভট্টের কাছে বহু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। গোপাল ভট্ট গৌড়ীয় বৈষ্ণব হলেও দক্ষিণ ভারতীয় ছিলেন। তাছাড়া মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত থেকে মহামূল্যবান বৈষ্ণব গ্রন্থদুটি (ব্রহ্মসংহিতা ও কর্ণামৃত) সংগ্রহ করেছিলেন। এইগুলি গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বের ভিত্তিস্বরূপ ছিল। সুতরাং গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ওপর দক্ষিণী প্রভাব অতি সুস্পষ্ট।

মহাপ্রভুর বৈরাগ্যধর্মের গভীরতায় প্রবেশ করতে অসমর্থ অনেকে এই ধর্মকে ভিক্ষুকের আলস্য আখ্যা দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত মহাপ্রভুর 'শিক্ষাষ্টক'-এর 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকটির অনুবাদের উল্লেখ করা যায়—

"বৃক্ষ যেন কাটিলেও কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারেও পানী না মাগয়।।"

(চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্য খণ্ড, ২০শ পরিচ্ছেদ)

মহাপ্রভুর এই ধর্ম নির্বীর্যের আলস্য নয়। স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যেও মহাপ্রভুর ন্যায় বীর্যবত্তার ভিত্তি ছিল। এই সমুন্নতশির বীরসন্ন্যাসী দেশে বিদেশে কতবার খাদ্যাভাবে মৃত্যুমুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু কখনো সামান্য উদর-পূর্তির জন্য হাত পাতেননি কারো কাছে। তাঁর কাছে উদর-পূর্তি তুচ্ছ ছিল। কারণ, কৃপান্ন অপেক্ষা শির অনেক উঁচু।

স্বামীজী যে শ্রীচৈতন্যের ভাবের অনুসারী ছিলেন, অন্য একটি প্রসঙ্গেও তা দেখা যায়। মহাপ্রভু ঈশ্বরের নিকট পার্থিব কোন সম্পদ কামনা করেননি। কামনা করেছেন—'ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি'।

অনেকে 'এক গালে চড় মারলে অন্য গালটি পেতে দাও' নীতির প্রতিফলন মহাপ্রভুর ধর্মের মধ্যে দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু মহাপ্রভু ছিলেন এই নীতির ঠিক বিপরীত। তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত—আম্বুয়া মুলুকের শাসক কাজীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর গণ-অভিযান। তাঁর আহ্বানে আপামর জনসাধারণ নগরের পথে পথে মৃদঙ্গ-মন্দিরা-শঙ্খ ইত্যাদি বাদ্য সহকারে উচ্চৈস্বরে হরিনামসঙ্কীর্তন শুরু করে। তাই শুনে অসহিষ্ণু হয়ে—

"যাহারে পাইল কাজী মারিল তাহারে।
ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ অনাচার কৈল দ্বারে।।"

(শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্য খণ্ড, ২৩শ অধ্যায়)

তখন—

"কীর্ত্তনের বাধ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রোধে হইলেন প্রভু রুদ্র মূর্ত্তিধর।।"

নিমাইয়ের আদেশে—"অনন্ত অর্বুদ লোক বোলে কাজী মার।"

"শুনিয়া কম্পিত কাজী গণ-সহ ধায়।
সর্প ভয়ে যেন ভেক ইন্দর পলায়।।"

"চৈতন্যের রসে" "মহামত্ত সর্বলোক" কাজীর ঘর-দুয়ার ভেঙে দিয়েছে, ফুল-ফলের উদ্যান তছনছ করেছে। অবশেষে—

"ভাঙিলেন সব যত বাহিরের ঘর।
প্রভু বোলে, 'অগ্নিদেহ বাড়ির ভিতর।।
পুড়িয়া মরুক সর্ব-গণের সহিতে।
সর্ব-বাড়ি বেড়ি অগ্নি দেহ চারিভিতে।।' (ঐ)

অবশ্য "সর্বগণ"কে পুড়িয়ে মারেননি তিনি। "সর্বলোক-রায়" "সর্ব-দাসের বচনে" ক্রোধ সংবরণ করেছিলেন।

নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্যের কাজীর অন্যায়ের প্রতিরোধে এই অভিযান ছিল অত্যাচারী বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে প্রথম গণ-অভ্যুত্থান। নীলাচলের মহাপ্রভু সমগ্র ভারতের আত্মচৈতন্যকে জাগ্রত করেছিলেন এবং ভারতের সনাতন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মকে রক্ষা করেছিলেন।

রাধা হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়-বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তি; তাঁরা স্বরূপত অভিন্ন হয়েও পৃথিবীতে ভিন্ন দেহে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অধুনা আবার সেই দুই ঐক্য লাভ করেছে; রাধা-ভাবদ্যুতিসম্বলিত চৈতন্যাখ্য সেই প্রকট কৃষ্ণ-স্বরূপকে আমরা প্রণাম করি। ❑

"কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই"

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আত্মজ্ঞান কাকে বলে। কোথায় আছে আত্মা? অবয়বে? অথবা পরিমণ্ডলে। দূরে? অথবা কাছে? "সন্নাপি ভিন্নাপি অভিন্নাপি।" আমি কি আছি? তুমি কি আছ? জগৎ কি আছে? এ কি স্বপ্ন?

এসব আলোচনা কেন? দেখছি তো, রোজই দেখছি। দিন আসে, দিন যায়। কত মানুষ, ব্যস্ততা, দ্বন্দ্ব, কোলাহল, অভাব, অভিযোগ, গঞ্জনা, বঞ্চনা, শোষণ, শাসন, জন্ম, মৃত্যু। এরই মাঝে আমি। আমার অবস্থান, আমার প্রস্থান। এই দর্শন থেকে হঠাৎ যখন প্রশ্ন বেরোয়—কেন? কি কারণে এই খেলা? যা থাকবে না, যা আমার সঙ্গে যাবে না, আমার অস্তিত্বের সঙ্গে যা মুছে যাবে, তার জন্য কেন এইসব যাবতীয় প্রয়াস? কেন ধরতে ছুটি, কেন আঁকড়ে ধরি, কেন আত্মসাৎ করি? কেন লোভ আসে, ঈর্ষা হয়? কেন মানুষ অপহরণ করে, খুন করে? আত্মহননই বা কাকে বলে?

কেউ একজন মানুষকে ভাবায়, তাই সে ভাবে। কেউ একজন মানুষকে দেখায়, যাদুকরের ভেলকি, তারপর প্রশ্ন তোলে—কি দেখলে? কি শিখলে? বস্তু কিছু খুঁজে পেলে, না সবই অবস্তু? এই প্রশ্নকে সবাই ধরে রাখতে পারে না। কর্মের স্রোতে প্রশ্ন ভেসে যায়। নিজেকে চিনতে চিনতে আর চেনা হয় না। হারিয়ে যাই। প্রবল স্রোতে খড়কুটো, কচুরিপানা সব যেমন ভেসে চলে যায় সেইরকম মানুষও ভেসে যায়। মানুষ ভাসে না, তার ওপর দিয়ে কাল ভেসে যায়। তার ভিতর থেকে তার সময়টুকু বের করে নিয়ে যায়। সবটা বেরিয়ে গেলে তার বাঁচাটা থেমে যায়। বাঁচা শেষ হওয়াকেই আমরা 'মৃত্যু' বলি। অনেক দিনের অনেক মানুষ নির্জন অবসরে মাঝে মাঝে এই প্রশ্ন নাড়াচাড়া করেছে—বাঁচা শেষ হলেই কি বাঁচা শেষ হয়ে যায়? জীব, জীবন ও বিনাশ—এ কি ভ্রম। যে-মুহূর্তে একজনের মধ্যে এই প্রশ্ন এল, সঙ্গে সঙ্গে তাকে বলা হলো—তুমি মানুষ, কিন্তু তুমি জিজ্ঞাসু। তোমার মধ্যে জানার ইচ্ছা এসেছে। এই প্রশ্নের উত্তর যেদিন বাইরে থেকে নয়, তোমার ভিতর থেকে উদিত হবে, তখনি তুমি জানতে পারবে—'তত্ত্বমসি'।

জ্ঞান বুঝতে চাও? আমি জানি। তুমি কি জান? তুমি পৃথিবীর সমস্ত বস্তুকে তো পৃথক পৃথক দেখছ। এটা একরকম, ওটা একরকম। এটা গরু, ওটা হাতি। শব্দও ভিন্ন ভিন্ন। হাঁসের প্যাঁক প্যাঁক। কুকুরের ঘেউ ঘেউ। এইবার একটু সাবধানে বুঝতে হবে। তোমার জানা হলো তোমার জ্ঞান। পৃথক বস্তু, শব্দ, গন্ধ, বর্ণ ইত্যাদি। কিন্তু তোমার এই জ্ঞান এল কোথা থেকে। জানার শক্তিটা পেলে কোথা থেকে। বিচার করছ, বিভেদ রচনা করছ কার শক্তিতে? শব্দজ্ঞান, স্পর্শবোধ, দৃশ্যবোধ এল কোথা থেকে? এই জ্ঞানের জ্ঞান, মহাজ্ঞানের খবর রাখ কি? শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান—এই শব্দগুলি থেকে বিশেষণ বা উপাধি 'শব্দ' আর 'স্পর্শ' সরিয়ে নিলে পড়ে থাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান, মূল জ্ঞান।

**"শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যা বৈচিত্র্যাৎ জাগরে পৃথক্।
ততো বিভক্তা তৎসম্বিদৈকরূপ্যান্ন ভিদ্যতে।।"**

(পঞ্চদশী, ৩)

জেগে আছি যখন—'জাগরে' (জাগ্রত অবস্থায়), তখন শব্দ, স্পর্শ, দর্শনে কতরকম বস্তুর অস্তিত্ব। স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্যহেতু—'বৈচিত্র্যাৎ'। আম থেকে জাম ভিন্ন, কাঁঠাল কাঁঠালের মতো। কিন্তু 'তৎসম্বিদৈকরূপ্যান্ন ভিদ্যতে'। বিভিন্ন বিচিত্র পদার্থকে চিনে নিতে সাহায্য করে যে-জ্ঞান, তা ভিন্ন নয়। অটুট জ্ঞান। নলেজ সুপ্রিম। জ্ঞানে এই বিভাজন নেই—আমের জ্ঞান, জামের জ্ঞান। যেমন—সূর্য। সূর্যে সব উদ্ভাসিত হয়—গাছপালা, ঘরদোর, ফুল, প্রজাপতি। সূর্যের অনেকরকম নেই। এক সূর্য। যেমন—আকাশ। ঘটাকাশ, পটাকাশ। একই আকাশ সরোবরে স্নানে নামে। আমাদের গবাক্ষে পর্দার মতো ঝুলে থাকে। রাস্তার কোথাও একটু জল জমে থাকলে কাঁচের মতো আটকে থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা—আকাশে একটি সূর্য। আর আমাদের জলপূর্ণ দশটি ঘট। এক-একটি ঘট একটি করে প্রতিবিম্বিত সূর্য। এক-একটা করে ঘট ভেঙে দাও। ঘটও নেই, প্রতিবিম্বিত সূর্যও নেই। ভাঙতে ভাঙতে শেষ ঘট। একটি ঘট, সেই ঘটে একটি বিম্ব সূর্য। এইবার সেই ঘটটি ভেঙে দাও। কি রইল? সকলেই বলবেন—সূর্যটা রইল। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, কি রইল কে জানে!

রবীন্দ্রনাথের 'বেলা শেষে'র সেই বিখ্যাত কবিতা, সেই পরম উপলব্ধি—

"প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে,
কে তুমি—
মেলেনি উত্তর!
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম-সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়,
কে তুমি—
পেল না উত্তর।"

আমি আমার দেহটাকে 'আমি' বলছি। আমার 'আমি'টাকে কে চেনাল? শরীরের ভিতর থেকে হৃদয় হেঁকে বলেনি, ফুসফুস বলেনি, যকৃৎ বলেনি। কে বলেছে, কোন্ সে অন্তরঙ্গ জন? সবাই বলছে 'আমি'। একই বোধের প্রকাশ শরীরে, শরীরে। কুকুর কি 'আমি' বলে? আমার লেজ, আমার থাবা? কুকুর বিপদ দেখলে পালায়। তার এই পালানো প্রমাণ করে, সে তার নিজ নিরাপত্তা সম্পর্কে

সচেতন। আরো ইতরতর প্রাণী ক্ষুধা দিয়ে তার অস্তিত্ব টের পায়। মিথুনেচ্ছায় সে বুঝতে পারে তার নিজস্ব অস্তিত্ব। শ্রেষ্ঠ চেতক হলো মৃত্যু। মৃত্যু তেড়ে আসছে জীবন বোঝাতে। বেহুঁশ জীবের হুঁশ হয় যখন মৃত্যু এসে চুলের ঝুঁটি ধরে। তখনি সে থমকে দাঁড়ায় থাকা আর না থাকার বিভাজনে। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে প্রায় নিবু নিবু চোখে—ঐ আমার সংসার, পুত্র, কলত্র, খাট, বিছানা, চশমা, চটি। তিনটে 'খাবি', তিন ঢোক বায়ু উগরে দিয়ে—কোথায়? কোথায় চললে বাছা। কেউ জানে না। সমাধানহীন রহস্য এক। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনুভবে জীবন শেষের একটি সুন্দর কবিতায় যেটুকু প্রকাশ করেছেন, তা হলো—

"ফুলদানি হতে একে একে
আয়ুক্ষীণ গোলাপের পাপড়ি পড়িল ঝরে ঝরে।
ফুলের জগতে
মৃত্যুর বিকৃতি নাহি দেখি।
শেষ-ব্যঙ্গ নাহি হানে জীবনের পানে অসুন্দর।
যে মাটির কাছে ঋণী
আপনার ঘৃণা দিয়ে অশুচি করে না তারে ফুল,
রূপে গন্ধে ফিরে দেয় ম্লান অবশেষ।
বিদায়ের সকরুণ স্পর্শ আছে তাহে,
নাইকো ভর্ৎসনা।
জন্মদিনে মৃত্যুদিনে দোঁহে যবে করে মুখোমুখি
দেখি যেন সে মিলনে
পূর্বাচলে অস্তাচলে
অবসন্ন দিবসের দৃষ্টি বিনিময়—
সমুজ্জ্বল গৌরবের প্রণতসুন্দর অবসান।"

কী অপূর্ব! 'প্রণতসুন্দর অবসান'! মানুষের মধ্যে যিনি কবি, তিনি তাঁর অবসানের দর্শন যেভাবে ব্যক্ত করেছেন, সে যেন লুটিয়ে পড়া একটি নম্র প্রণাম। এতে কোন বিশ্লেষণ নেই। দর্শনাতীত কোন দর্শন নেই। কিন্তু একটি ইঙ্গিত আছে—শেষের পর কোথায় আবার শুরু।

সক্রেটিস দণ্ডাজ্ঞা শুনলেন। বিষের পাত্র প্রস্তুত। এখনি একজন তুলে ধরবেন ঠোঁটের কাছে। অবধারিত মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বেন দার্শনিক। তিনি শুধু একটি কথা বললেন: "আমি যাচ্ছি মৃত্যুর দিকে, আপনারা যান জীবনের দিকে।"

সৈনিকরা রাইফেল তুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। স্থান রাশিয়া। ২২ ডিসেম্বর। বরফে ঢাকা প্রান্তরে সেই প্রবল শীতে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত বিদ্রোহীরা। একটিমাত্র আদেশের অপেক্ষা। সেই সারিতে রয়েছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডস্টয়েভস্কি। সবাই ভীত, সন্ত্রস্ত। অনেকে প্রলাপ বকছেন। ডস্টয়েভস্কি নির্ভয়ে বললেন: "না না, এত সহজে আমরা মরছি না।" হঠাৎ আদেশ এল, ওকে পাঠিয়ে দাও সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে।

মৃত্যু সম্বন্ধে মার্ক টোয়েনের মন্তব্য ভারী সুন্দর—"Whoever has lived long enough to find out what life is, knows how deep a debt of gratitude we owe to Adam, the first great benefactor of our race. He brought death into the world."—দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে যাঁরা জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে চেয়েছেন, তাঁরা জানেন আমরা আদমের কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণে কতটা ঋণী। মানবজাতির প্রথম সবচেয়ে উপকারী বন্ধু হলেন আদম। এই পৃথিবীতে তিনিই প্রথম মৃত্যু এনেছিলেন।

অনুভূতিসম্পন্ন প্রথম মানব তাঁর জন্মের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম মৃত্যুটিকেও সঙ্গে করে এনেছিলেন। উইলিয়াম হ্যাজলিট বললেন: "To die is only to be as we were before we were born." মৃত্যু কি? না, জন্মের আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া।

শ্রীরামকৃষ্ণ আরো সহজ করে দিলেন—খণ্ডের ঘর থেকে অখণ্ডের ঘরে চলে যাওয়া। প্রান্তরে একটি ঘর। চার দেওয়াল ছাদ। বাইরে অনন্ত আকাশ, ভিতরে দেওয়াল-ঘেরা খাঁচার আকাশ। ঘরটা ভেঙে দাও। টুকরো আকাশ আকাশেই তার বিভাজন মিশিয়ে দিল।

বেদান্ত অত সহজে ছাড়বেন কেন? তাঁরা মানুষের দেহ-খাঁচার বিশ্লেষণ করবেন।

"অন্নং প্রাণো মনো বুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চ তে।
কোশাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতিং ব্রজেৎ।।"
(পঞ্চদশী, ১।৩৩)

—কোষ অর্থাৎ খাপ। আমাদের শরীরে পাঁচটি কোষ—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। আত্মা এই পাঁচটি কোষের দ্বারা আবৃত। ভুলে গেছে নিজের স্বরূপ। জন্ম আর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বারেবারে আসা-যাওয়া।

পশ্চিমের মননে কি পাওয়া যাচ্ছে? কবির কলমে—সুইনবার্ন—

"That even the weariest river
Winds somewhere safe to sea....
Only the sleep eternal
In an eternal night."

প্রথম-দুটি পঙ্ক্তি যেন শিবমহিম্নস্তোত্রের সপ্তম শ্লোকের অনুবাদ—

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব।।"

—নদীসমূহের যেমন সমুদ্রই একমাত্র গতি, তেমনি হে শিব, তুমিই সকল মানুষের একমাত্র গতি—মুক্তিদাতা, মোক্ষদাতা।

দ্বিতীয় অনুভবে—যাচ্ছ কোথায়? অনুভবের পারে। পঞ্চদশীর (২।৫০) কথায়—

"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং কিন্ত্বভূত্তমঃ।
সদ্যোগাত্তমসঃ সত্ত্বং ন স্বতত্ত্বন্নিষেধনাৎ।।"

—সেই প্রলয়কালের অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বের এই জগৎ অসৎ ছিল না বা সৎ-ও ছিল না, কিন্তু অন্ধকার অর্থাৎ মায়া ছিল। জাগ্রত, ব্যক্ত মায়া থেকে চলেছি অব্যক্ত মায়ায়।

জয় মা। ❑

শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যসখা চিনু শাঁখারী

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়

"চিনু নামে একজন শাঁখারীর জাতি।
দরিদ্র তাহাতে বৃদ্ধ গ্রামেতে বসতি।।
ব্যবসায় অল্প আয় কষ্টে গুজরান।
কিন্তু তার গদাধরে ছিল বড় টান।।"
(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি)

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যলীলাকালে যাঁরা তাঁর নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় এবং মধুর প্রেমসম্বন্ধে স্বয়ং কৃতার্থ হয়েছিলেন, চিনু শাঁখারী সেই অগ্রণীবৃন্দের অন্যতম। আবার গৃহস্থ হয়ে যাঁরা অমায়িকতা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, সরলতা প্রভৃতি সাধুজনোচিত গুণরাশি নিজ জীবনে প্রকাশ করেছিলেন, চিনু শাঁখারী তাঁদের মধ্যেও অতি উচ্চাসনের অধিকারী। তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যসখা। শাঁখারী বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করলেও ভগবদ্ভক্তিতে অনেক ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বড় ছিলেন। সাধন করতে করতে তাঁর ভিতরে একসময়ে কিছু বিভূতি সিদ্ধাই প্রকাশিত হয়েছিল। বালক গদাধরের সঙ্গে এই সৌম্যমূর্তি পরম বৈষ্ণবের এক মধুর সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। গদাধরকে দেব-অংশসম্ভূত বলে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল এবং তিনি তাঁকে অত্যন্ত স্নেহও করতেন। তাই কখনো কখনো গদাধরকে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি আদর করতেন আর বলতেন: "ওরে গদাই, তোকে দেখে আমার গৌরকে মনে হয়।" প্রসঙ্গত, স্বামী সারদানন্দ বিরচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এ উল্লেখ আছে, চিনু গদাধরকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি ও পূজা করতেন।

চিনু শাঁখারীর প্রকৃত নাম ছিল 'শ্রীনিবাস'। সবাই তাঁকে 'চিনিবাস' বলে ডাকত এবং ঐ চিনিবাসেরই অপভ্রংশ 'চিনু' রূপে তিনি পরিচিত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে 'চিনে শ্যাকারী' বলে ডাকতেন। চিনুর আশ্রম ও একটি ছোট্ট দোকান ছিল গদাধরের বাড়ির নিকটেই কিছুটা পূর্বদিকে। দোকানে অল্প আয়। গদাধর যখনই দোকানে এসে বসতেন, তখনি চিনুর মনে হতো, কোথাও যেন আর কষ্ট নেই। রাত যতই অন্ধকার হোক, গদাধর যেন চিরন্তন সুপ্রভাত। যেই একটু বাড়তি রোজগার হতো, তাই দিয়ে তিনি মিষ্টি কিনে গদাধরকে খাওয়াতেন। গদাধর খেতেন, আর চিনু চেয়ে দেখতেন। ওদিকে খদ্দের এসেছে দোকানে, সে-খেয়াল নেই। গদাধরকে যেন চিনতে পেরেছিলেন চিনু! অক্ষয়কুমার সেনের বর্ণনায়—

"চিনিবাস বড় চিনে গদাই শিশুকে।
না রহে গদাই যথা চিনু নাহি থাকে।।" (ঐ)

গদাধর কামারপুকুর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, খবর পৌঁছেছে চিনুর দোকানে। তাই পরিপাটি করে মালা গেঁথে, কোঁচড়ে করে মিষ্টি নিয়ে এলেন তিনি। মাঠে ডেকে এনে পরিয়ে দিলেন মালা। গদাধর বলেন: "কি যে কর তুমি, এখন কি যাত্রা হচ্ছে যে তুমি আমায় মালা পরাচ্ছ? তার চেয়ে মিষ্টির ঠোঙাটা দাও।" "দিচ্ছি গো দিচ্ছি"—বলে মিষ্টিগুলো নিজের হাতে খাওয়াতে লাগলেন চিনু। জলে চোখ ভেসে যাচ্ছে। করজোড়ে বলছেন: "গ্রাম ছেড়ে শহরে চলেছ, মর্ত্যধামে তোমার কত লীলাখেলা হবে, কিছুই দেখতে পাব না। কদিন আর বাঁচব? তবু আজ যে আমাকে একটু ভাল করে চিনতে দিলে, আমার পারের কড়ি হয়ে রইল।"—

"আগত হয়েছে কাল জরাযুক্ত তনু।
কত হবে লীলাখেলা দেখিতে না পেনু।।
বড়ই রহিল দুঃখ আমার অন্তরে।
করুণ কটাক্ষে রেখ অধীন কিঙ্করে।।" (ঐ)

শ্রীরামকৃষ্ণ ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও হৃদয়ের সঙ্গে কামারপুকুরে ফিরলেন। ইতিপূর্বে প্রায় সাড়ে ছয়বছর শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে আগমন করেননি, সুতরাং চিনু প্রমুখ পরিচিত জনেরা তাঁকে দেখবার জন্য যেন উদ্গ্রীব হয়েছিলেন, খবর পেয়েই ছুটে এলেন। ভক্ত চিনুকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর পরিবারবর্গের সকলে বিশেষ আনন্দিত হলেন। ভক্তিমতী ব্রাহ্মণীও চিনুর বিশ্বাসভক্তি দর্শনে পরিতুষ্টা হলেন। মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত নানা ভক্তিপ্রসঙ্গে অতিবাহিত হলো এবং রঘুবীরের ভোগরাগাদি সম্পূর্ণ হলে চিনু প্রসাদ পেতে বসলেন। প্রসাদ পাওয়ার পর চিনু উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করতে গেলে ব্রাহ্মণী তাঁকে নিষেধ করলেন এবং বললেন: "থাক, এ এঁটো আমি তুলব।" চিনু তা মানতে মোটেই রাজি ছিলেন না, কিন্তু ব্রাহ্মণীর রূঢ় নিষেধের কাছে তাঁর আর হাত উঠল না। অগত্যা নিরস্ত হয়ে চিনু নিজ বাড়িতে ফিরলেন।

'লীলাপ্রসঙ্গ'-এ চিনু শাঁখারীর অদ্ভুত শক্তির একটি গল্প আছে। একসময় শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচিত কয়েকজন কামারপুকুরে চিনুর বাড়িতে গিয়ে অতিথি হলেন। তখন আমের সময় নয়, তাঁরা কিন্তু তাঁদের চিনুদাদাকে বললেন: "আমাদের আমের টক দিয়ে মৌরলামাছ খেতে বড় ইচ্ছা।" অতিথি নারায়ণ, তাঁরা আম দিয়ে টক খাবেন বলেছেন। মাছ যদিও জোগাড় হলো, কিন্তু আম এখন কোথায়? চিনু ভেবেই অস্থির, কেমন করে মুখরক্ষা হবে। উপায়ান্তর না দেখে কাতর হয়ে কাঁদতে কাঁদতে তিনি জোড়হাতে গলায় কাপড় দিয়ে একটি আমগাছের তলায় গিয়ে বললেন: "আমার ভিটেয় আজ ছলনা করতে নারায়ণ অতিথিরূপে এসে বলছেন, অসময়ে আম দিয়ে

মাছের টক খাবেন। আমি বড় গরিব। দীনহীন পথের কাঙাল। কেমন করে তাঁদের তুষ্ট করব? দেবতা কি দয়া করবেন না?" তারপর আশ্চর্য কাণ্ড! সত্যিসত্যিই গুটিকয়েক কাঁচা আম গাছ থেকে মাটিতে পড়ল। চিনু আনন্দে আটখানা হয়ে নাচতে নাচতে তাই দিয়ে টক রাঁধিয়ে তাঁদের পরিতুষ্ট করলেন।

"ভক্তবর শ্রীনিবাস শাঁখারীর জাতি।
ভগবৎ-ভক্ত তেঁহ প্রভুপদে মতি।।" (ঐ)

জানা যায়, ঐ লোকগুলি চিনুর এই অদ্ভুত শক্তির কথা পরে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে জানিয়েছিলেন এবং তিনি তার উত্তরে বলেছিলেনঃ "যে ঠিক ভক্ত, সে চেষ্টা না করলেও ঈশ্বর তার সব জুটিয়ে দেন।" বলা বাহুল্য, ভক্তিপথের সাধক চিনুর এই সিদ্ধাই শ্রীরামকৃষ্ণ পছন্দ করতেন না, তাই তিনি সিদ্ধাই থেকে বিরত হওয়ার জন্য তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের পরিণত বয়সেও চিনুর সঙ্গে তাঁর প্রেম-সম্পর্ক অটুট ছিল। সাধনার অন্তে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন মাঝে মাঝে কামারপুকুরে এসে অবস্থান করতেন, তখন চিনু বহুক্ষণ তাঁর সঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গে কালযাপন করতেন। সরল বিশ্বাসী চিনুর ভক্তি-ভালবাসার কথা শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং অনেকের কাছে বলতেন। বলতেনঃ "কি অবস্থা সব গেছে! দেশে চিনে শাঁখারী আর আর সমবয়সীদের বললাম, 'ওরে তোদের পায়ে পড়ি একবার হরিবোল বল।' সকলের পায়ে পড়তে যাই। তখন চিনে বললে, 'ওরে তোর এখন প্রথম অনুরাগ তাই সব সমান বোধ হয়েছে। প্রথম ঝড় উঠলে যখন ধুলা উড়ে তখন আমগাছ তেঁতুলগাছ সব একবোধ হয়। এটা আমগাছ এটা তেঁতুলগাছ চেনা যায় না।' " (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২য় ভাগ) "ওদেশে যখন যেতুম, ঐরূপ ছেলেদের কারু কারু মুখে নিজে খাবার দিতাম। চিনে শাঁখারী বলত, 'উনি আমাদের খাইয়ে দেন না কেন?' কেমন করে দেবে, কেউ ভাজ-মেগো, কেউ অমুক-মেগো, কে খাইয়ে দেবে?" (ঐ, ৩য় ভাগ)

চিনু শাঁখারী আনুমানিক বাঙলা ১২২৫-১২২৬ সালের কোন এক সময়ে, অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পনের-ষোল বছর আগে কামারপুকুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা গোপাল শাঁখারীর একমাত্র সন্তান ছিলেন। চিনুর বয়ঃক্রম যখন চব্বিশ-পঁচিশ বছর তখন তাঁদের একমাত্র কন্যা বিলাসিনীকে রেখে তাঁর পত্নী মারা যান। কন্যাটি ছাড়া তাঁর আর কেউ আপনজন ছিল না। তিনি সংসারের অসারতা বুঝে পুনরায় দারপরিগ্রহ করেননি। চিনু সদ্গুরুর অনুসন্ধান করতে থাকেন, অবশেষে হরিসভার নিকটবর্তী নদেপাড়ায় বৈষ্ণবদের মঠের মোহন্ত এক পরমধার্মিক সর্বত্যাগী কৃষ্ণভক্তের সন্ধান পান এবং তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণবমন্ত্র গ্রহণ করেন। কিছুকাল পর তিনি তাঁর কন্যা বিলাসিনীর বিবাহ দেন। কিন্তু দৈবচক্রে বিলাসিনীর স্বামীর প্রাণান্ত ঘটে। সেই থেকে একমাত্র স্নেহের কন্যাকে নিজের কাছে রেখে দেন। পরে তাঁকেও দীক্ষিত করান। তাঁর আশ্রমের ঈশানকোণে একটি গৃহে নিমকাঠে তৈরি মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের মূর্তি এবং মাটির সুন্দর রাধাকৃষ্ণের মূর্তি বিরাজ করত। চিনু সদাসর্বদা এঁদের পূজার্চনার মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করতেন। তিনি কোনসময়েই আহার্য বস্তু বা অর্থ জমা করে রাখতেন না। কোনসময় কিছু জমা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ হরিনাম-সঙ্কীর্তন করে সাধুসন্ন্যাসী, অনাথ-আতুরদের সেবাকার্য করে তা ব্যয় করে দিতেন। অহিংসাধর্মপালনে চিনু এতদূর যত্নবান ছিলেন যে, কীট-পতঙ্গাদিকেও কখনো কোন কারণে আঘাত করতেন না।

শেষবয়সে চিনু বহু পাষণ্ড ব্যক্তিকে সৎপথে এনে দীক্ষিত করান এবং সন্ন্যাস বা বৈষ্ণবধর্মের নানা অনুষ্ঠান করে পরম শান্তিতে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর লোকান্তর-কাল আনুমানিক বাঙলা ১২৯৬-১২৯৮ সাল। মৃত্যুর পর তাঁরই দীক্ষিত শিষ্যগণ তাঁর নশ্বর দেহখানি শোভাযাত্রা করে মুকুন্দপুরে বুড়োশিবের মন্দিরের পশ্চিমদিকে সমাধি দেন। এর কিছুকাল পরে সমাধিস্থানে তাঁর ভক্তশিষ্য কর্তৃক চিনুর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ একটি মন্দির নির্মিত হয়। বর্তমানে কেবল তাঁর সমাধিমন্দির ও বাস্তুভিটার স্থান ভিন্ন অপর কোন চিহ্ন বিদ্যমান নেই। পূর্বে এই স্থানটি 'বোষ্টমপাড়া' ছিল। এখন কোন বসতিও নেই। সম্প্রতি এই স্থানটি কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ❑

অনুষ্ঠান-সূচী (শ্রাবণ ১৪০৮)

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

জন্মতিথি-কৃত্য

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ	আষাঢ় কৃষ্ণা ত্রয়োদশী	৩ শ্রাবণ	বৃহস্পতিবার	১৯ জুলাই	২০০১
স্বামী নিরঞ্জনানন্দ	শ্রাবণ পূর্ণিমা	১৯ শ্রাবণ	শনিবার	৪ আগস্ট	২০০১
শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী	শ্রাবণ কৃষ্ণাষ্টমী	২৭ শ্রাবণ	রবিবার	১২ আগস্ট	২০০১

একাদশী-তিথি (রামনাম-সঙ্কীর্তন)

১, ১৪, ৩০ শ্রাবণ	মঙ্গলবার, সোমবার, বুধবার	১৭, ৩০ জুলাই,	১৫ আগস্ট	২০০১

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

হালিসহরে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভিটায় স্মৃতিফলক স্থাপন

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহী ভক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় হালিসহরের চৌধুরীপাড়ার গোপাল চ্যাটার্জী লেনের ঠিক উত্তরে বাস করতেন। বছর পঁচাত্তর আগেও কেদারনাথের বিধবা কন্যা থাকমণি সেই বাড়িতে থাকতেন। বর্তমানে বাড়িটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কেদারনাথ ছিলেন আপনভোলা মানুষ। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যসান্নিধ্য লাভ করতে তিনি নৌকা করে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে চলে আসতেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ও 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'তে বহুবার তাঁদের কথোপকথনের উল্লেখ রয়েছে। রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের ইতিহাসে তিনি একটি উল্লেখযোগ্য নাম। কোন প্রামাণ্য গ্রন্থে উল্লেখ না থাকলেও আমাদের বিশ্বাস, শ্রীরামকৃষ্ণের পদার্পণ নিশ্চয়ই ঘটেছিল হালিসহরে। কারণ, রামপ্রসাদ, রাসমণি ও শ্রীচৈতন্যের গুরু ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান হালিসহরে কি শ্রীরামকৃষ্ণ না এসে থাকতে পারেন? তাই আমার একান্ত আবেদন, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের ভিটায় একটি স্মৃতিফলক বসানো হোক। এবিষয়ে 'উদ্বোধন' পত্রিকার মাধ্যমে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শিবসৌম্য বিশ্বাস
সাংস্কৃতিক সম্পাদক
হালিসহর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ
উত্তর চব্বিশ পরগনা

গ্রেটার ওয়াশিংটনে নতুন মন্দির

১৮৯৪ সালে স্বামী বিবেকানন্দ কয়েক দিনের জন্য ওয়াশিংটনে এসেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তখন তিনি কোথায়, কোন্ বাড়িতে ছিলেন তার হদিশ পাওয়া যায় না। পরে স্বামী অভেদানন্দ একটি ক্ষুদ্র গৃহে বেদান্ত সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী কালে ওয়াশিংটন সেন্টারের দায়িত্বে আসেন স্বামী পরমানন্দ, স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ, স্বামী বিবিদিষানন্দ প্রমুখ। প্রতিবছরই বহু সাধু এখানে আসেন ও বক্তৃতা দেন।

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গুরুভাইদের এখানে বেদান্ত সোসাইটি খোলার ও বেদান্ত শিক্ষার পাঠ দেওয়ার ওপর খুব জোর দিয়েছিলেন। এই কাজ করার জন্য তিনি গুরুভাই স্বামী সারদানন্দকে ১৮৯৫ সালে এখানে ডেকে পাঠান। তাঁরা থাকাকালীনই নিউ ইয়র্ক, থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্ক, হলিউড, সিয়াটল, শিকাগো, ক্যালিফোর্নিয়া, প্যাসাডোনা এবং রিজলী ম্যানরে বেদান্ত সোসাইটি গড়ে ওঠে। এইসব সোসাইটির শতবর্ষ পালিত হচ্ছে একে একে।

কিন্তু আমেরিকার রাজধানীতে বেদান্ত সেন্টারের বীজ ১৮৯৮ সালে স্বামী অভেদানন্দ বপন করে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে গৃহী ভক্তরা ঘরে ঘরে পাঠচক্র, বক্তৃতা চালিয়ে যেতে থাকেন। এইরকম পাঠচক্র নিউ জার্সি, বাল্টিমোর, গ্রেটার ওয়াশিংটনের গৃহী ভক্তবৃন্দের বাড়িতে বাড়িতে চলতে থাকে। বেলুড় মঠ ও তার শাখাকেন্দ্র থেকে সাধুরা আমেরিকায় এলে গৃহী ভক্তদের আহ্বানে তাঁরা প্রতি বছর বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেন। মঠ ও মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজও এখানে এসেছেন। কালক্রমে জনসমাগম বৃদ্ধি পাওয়ায় একটা নিজস্ব হলঘর বা বেদান্ত সেন্টার স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

১৯৯৬ সালে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদে স্বামী আত্মজ্ঞানানন্দজীর তত্ত্বাবধানে একটা ছোট পুরনো বাড়ি-সহ ৫.৩ একর জমি বায়না করা হয়। ১৯৯৭ সালের এপ্রিল মাসে তা 'বেদান্ত সেন্টার'-এর নামে ক্রয় করা হয় এবং ঐ সময়েই তা রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধীনে আসে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপা যে, ঐ সেন্টারের সাথে ১৯৯৬ সাল থেকেই আমার যোগাযোগ রয়েছে।



গ্রেটার ওয়াশিংটনে নবনির্মিত বেদান্ত সেন্টার

স্বামী আত্মজ্ঞানানন্দজী ভক্তদের সহায়তায় নিজ হাতে এই পুরনো বাড়ি মেরামত করে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা

করেন। নিয়মিত পূজা-পাঠ, ক্লাস, বক্তৃতা, কর্মযোগ শিক্ষা ও অন্যান্য সেবামূলক কাজ চলতে থাকে। এখানে একটা ছোট পাঠাগার ও পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রও আছে। বর্তমানে হলিউড কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী স্বাহানন্দজী এই সেন্টারের প্রধান। এই সেন্টারে ১৯৯৮ সালে প্রথম পটে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ২০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

যে-জমি ১৯৯৭ সালে কেনা হয়েছিল, সেই জমিতে অতি দ্রুত মন্দির গড়ে ওঠে। আপাতত দেড়শ লোকের বসার জায়গা সমেত মন্দিরগৃহ, তৎসংলগ্ন সাধু ও অতিথিদের থাকার জন্য চারটি করে ঘর তৈরি হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে বড় হলঘর নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

৯ জুন ২০০০ শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতি ও আরাত্রিক ভজন দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। ১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দ বেলুড় মঠে প্রথমবার দুর্গাপূজার সময় বিল্ববৃক্ষমূলে বসে 'গিরি গণেশ আমার শুভকারি' গানটি গেয়েছিলেন। এখানেও ঐ গানটি দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের কয়েকটি গানের পর সমবেত কণ্ঠে 'রামকৃষ্ণ শরণম্' গানটি গাওয়া হয়। সেদিনের সান্ধ্য অধিবেশনে বক্তৃতা দান করেন রিজলী ম্যানর বেদান্ত সোসাইটির প্রধান স্বামী আত্মরূপানন্দজী।


গ্রেটার ওয়াশিংটন বেদান্ত সেন্টারে নতুন মন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সমাগত সন্ন্যাসী ও ভক্তবৃন্দ

১০ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে এই নতুন মন্দিরের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। বৈদিক স্তোত্র পাঠ করেন চারজন সাধু। এই মন্ত্রধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে পবিত্রতা, পূর্ণতা ও শান্তির আশীর্বাদ যেন বর্ষিত হতে থাকে। রেভারেন্ড বারবারা হেনরী যীশুখ্রীস্টের প্রার্থনা থেকে পাঠ করেন। তারপর পুণ্য গঙ্গাবারি সিঞ্চিত করেন স্বামী স্মরণানন্দজী। সমবেত প্রায় ৩০০ ভক্ত জয়ধ্বনি দিতে দিতে সাধুদের অনুসরণ করে নতুন মন্দিরে আনুষ্ঠানিক প্রবেশ করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক ভাবধারা পনেরশ বছর স্থায়ী হবে। মাত্র একশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, তাতেই দেখছি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বর্ণের মানুষ ধ্যানমগ্ন হয়ে বসছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ—এই তিনজনের সামনে। আকণ্ঠ ভোগের পর মন যখন শান্তির তৃষ্ণায় আকুল হয়ে ওঠে, তখন মানুষ ছুটে আসে এই তিনজনের কাছে। গ্রেটার ওয়াশিংটনে বেদান্ত সোসাইটির নব রূপায়ণের পুণ্যলগ্নে একথাগুলিই আমার বারবার মনে পড়ছিল।

বস্তুত, প্রাচ্য যে-ইতিহাস তৈরি করে, তা পশ্চিমী ধ্যানধারণার বাইরে। জয় শুধু সৈন্যবলে নয়—অর্থবলেও নয়—আধ্যাত্মিকতা দিয়েও জয় করা যায় এবং তা হয় সুদূরপ্রসারী—কল্যাণকারী। আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্ম বাদ দিয়ে বেদান্ত যা শিক্ষা দেয় তা অনুভব করবার। তাই তার শেষ নেই। নতুবা কত যুগ ধরে কত বিদেশীদের শাসন, কত বিধ্বংসী লুটতরাজের তলায় বেদান্ত চাপা পড়ে যাওয়ার কথা। কত ধর্মই তো এভাবে লুপ্ত হয়ে গেছে! বেদান্তের ক্ষেত্রে তা হয়নি। শুধু বাহ্য বা আনুষ্ঠানিক রূপায়ণ হয়েছে মাত্র।

আজ এই আধ্যাত্মিকতার জয়ের ইতিহাস লেখার সময় এসেছে। রাজ-আক্রোশ নয়, যুদ্ধভয় নয়, ধর্মান্তকরণ নয়, রক্তপাত নয়—জয় শুধু হৃদয় দিয়ে, জয় জ্ঞান দিয়ে, জয় প্রেম দিয়ে, জয় বৈরাগ্য দিয়ে।

জয় শ্রীরামকৃষ্ণ! জয় মা সারদাদেবী! জয় স্বামীজী!

তৃপ্তি শেঠ
কলকাতা-৭০০০৭৮

প্রসঙ্গ 'নিত্য প্রাসঙ্গিক বিবেকানন্দ'

'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত দিলীপকুমার ভারতীর 'নিত্য প্রাসঙ্গিক বিবেকানন্দ' শীর্ষক মনোজ্ঞ নিবন্ধটি পড়লাম। ঐ নিবন্ধে গান্ধীজী প্রসঙ্গে সাল-তারিখের কিছু গরমিল চোখে পড়ল। '১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ' নয়, '১৯১৫ খ্রীস্টাব্দ' পর্যন্ত গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিলেন। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে তিনি স্থায়িভাবে ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করে প্রথমে শান্তিনিকেতনে কিছুদিন অবস্থান করেন। গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকাকালীন যে কয়বার

ভারতবর্ষে আসেন তা 'ওকালতি' করার জন্য নয়, ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দকে দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে। এইরকমই একবার কলকাতায় এসে গান্ধীজীর ইচ্ছা হয় বেলুড় মঠে স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করার। তাঁর কথায় : "I went to Belur Math, mostly or may be all the way on foot. I was disappointed and sorry to be told that the Swami was at his Calcutta house, lying ill and could not be seen." এছাড়া তিনি একবার কালীঘাটেও যান এবং বলিদানের রক্তস্রোত তাঁকে দারুণ আঘাত করে।

উক্ত নিবন্ধে আরো একটি তথ্যভ্রান্তি আছে বলে মনে হয়। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন জওহরলাল নেহরু, যতদূর মনে হয় গান্ধীজী নন। ঐতিহাসিক পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব জওহরলালই উত্থাপন করেন।

রথিন মিত্র
রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৪

অন্য কোথাও এই বিষয়ে পড়িনি। কাজেই 'উদ্বোধন'-সম্পাদকের কাছে আমার অনুরোধ, আপনি এই ব্যাপারে আলোকপাত করলে 'উদ্বোধন'-এর পাঠক হিসাবে আমরা উপকৃত হব।

নির্মলেন্দু চক্রবর্তী
আশ্রম রোড, কোচবিহার-৭৩৬১০১

(১) স্বামী গম্ভীরানন্দ-কৃত 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' (৩য় খণ্ড) অনুযায়ী আমরা দেখতে পাই, স্বামীজী ১৯০১ সালের ৫ এপ্রিল বর্তমান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে চন্দ্রনাথ দর্শনে রওনা হন। সেখান থেকে তিনি অসমে যান এবং প্রায় একমাস তিনি অসমের বিভিন্ন স্থান ঘুরে কামাখ্যা দর্শন করে শিলং হয়ে ১২ মে বেলুড় মঠে ফিরে আসেন। এর মধ্যে ঠিক কোন্‌দিন কবে কোথায় স্বামীজী কাটিয়েছেন তা জানা যায়নি।

(২) আরো কিছু তথ্য আছে। এই সংখ্যার ৩৭৮ পৃষ্ঠায় 'আজ হতে শতবর্ষ আগে' দ্রষ্টব্য।

সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

একটি জিজ্ঞাসা

গত ২০ এপ্রিল ২০০১ কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'Hindustan Times'-এ একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, যার শিরোনাম : 'Letter Proves Vivekananda's Kamakshya Visit'। লেখাটি গুয়াহাটী থেকে পাঠিয়েছেন দিগম্বর পাটোয়ারী। লেখাটিতে দুটি তথ্য আমার বিশেষ নজরে আসে। প্রথমটি হলো—স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রম স্বামী বিবেকানন্দের আসাম-ভ্রমণের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন করছে ১৭ এপ্রিল থেকে ১ মে পর্যন্ত। দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি হলো—এখান থেকে স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০১ সালের ১৭ এপ্রিল একটি চিঠি লিখেছিলেন শিবকান্ত ও লক্ষ্মীকান্ত পাণ্ডাকে তাঁদের আতিথেয়তার প্রশংসা করে। স্বামীজী কামাখ্যা পাহাড়ে কয়েক সপ্তাহ ছিলেন এবং এখান থেকে তিনি শিলং যান এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। সে সময় তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন হেনরী স্টেডম্যান কটন (যিনি কটন কলেজের স্থাপয়িতা)। স্বামীজী মিস্টার কটনের তত্ত্বাবধানেই শিলঙে ছিলেন। স্বামীজী কামাখ্যা যান বাংলাদেশের চট্টগ্রাম থেকে ধুবড়ি হয়ে এবং ব্রহ্মপুত্রে দেশী নৌকায় ভ্রমণ করেন। লেখাটিতে সন-তারিখ ইত্যাদির কোন উল্লেখ নেই। আমি

বসুমতী-মার দুটি আলোকচিত্র

'উদ্বোধন'-এর গত বৈশাখ ১৪০৮ সংখ্যায় বসুমতী-মা সংক্রান্ত যে-তথ্য 'প্রাসঙ্গিকী'তে পরিবেশিত হয়েছে, তার



জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমার সংগ্রহে বসুমতী-মায়ের দুটি প্রাচীন আলোকচিত্র ছিল। ছবিদুটি পাঠালাম। যদি অনুগ্রহ করে ছাপেন তাহলে গত বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত বসুমতী-মায়ের জীবনচিত্রের সঙ্গে মনে মনে ছবিদুটিকে বসিয়ে আমাদের মতো অনেকেই অত্যন্ত আনন্দিত হবেন, সে-কথা বলা বাহুল্য।

গোলক সেন
জ্যাকেরিয়া স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

পানীয় জল ও আর্সেনিক দূষণ

চৈতালী মুখার্জী

খাদ্যের ছয়টি উপাদান (প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, চর্বি, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও জল)-এর মধ্যে জল একটি প্রধান উপাদান। জল ছাড়া জীবনধারণ করা অসম্ভব। খাদ্য ছাড়া মানুষ কয়েক সপ্তাহ বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু জল ছাড়া কয়েক দিনের বেশি বাঁচে না। একটি মানুষের প্রতিদিনের পানীয় ও ব্যবহারের জন্য অন্তত ১৫০ লিটার জল প্রয়োজন। এথেকে বোঝা যায়, কি বিশাল জলের প্রয়োজন আমাদের। আমরা যথেচ্ছ জল ব্যবহার করি—অপচয় করি। শহরাঞ্চলে রাস্তায় রাস্তায় দেখা যায়, পানীয় জলের কল থেকে অনবরত জল পড়ছে। জল নেওয়ার পর যে কল বন্ধ করতে হবে এই চেতনাটুকুও মানুষের মধ্যে হারিয়ে গেছে। অথচ জলের চাহিদা দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। শুধু কলকাতার জন্য পলতা ও গার্ডেনরীচ থেকে যে জল সরবরাহ করা হচ্ছে তাতে আর সঙ্কুলান হচ্ছে না; চাহিদা আরো বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটির তলার জলেরও প্রয়োজন বেড়ে চলেছে এবং তারই সঙ্গে আর্সেনিক দূষণের সম্পর্কের কথা চিন্তা করা হচ্ছে।

[illegible]

ভূগর্ভে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাকৃতিক উপাদানের মতো আর্সেনিকও একটি। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীর নিজস্ব গতিতে নড়াচড়ার ফলে যেসব জায়গায় লোহা বেশি মাত্রায় আছে, সেসব জায়গায় ভূ-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পাথর ও বালির সংঘর্ষে ভূগর্ভে আর্সেনিক জমা হয়। একে 'জিওলজিক্যাল ডিপোজিশন' বা 'জিওকেমিক্যাল ডিপোজিশন' বলে। এই যে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ভূগর্ভে আর্সেনিক আছে, তা আগে কেউ জানত না। হয়তো অনেকেরই শরীরে আর্সেনিক দূষণ-ঘটিত রোগের লক্ষণ পাওয়া গিয়েছিল এবং এখনো পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু আগে রোগটির কারণ নির্ণয় করা যায়নি অথবা এর প্রকোপ হয়তো এত বেশি ছিল না। এর প্রথম কারণ—জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার বেড়েছে। দ্বিতীয়ত, সবুজ বিপ্লব রূপায়িত করার জন্য ক্ষুদ্রসেচের জন্যও ভূগর্ভস্থ জলের প্রচুর ব্যবহার বেড়েছে।

যে-হারে আমরা ভূগর্ভের জল তুলছি, সে-হারে মাটির নিচে জল পূরণ হয় না। জল তোলার পর মাটির নিচে যে ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি হয়, তাতে জল চুঁইয়ে পড়লেও তা সম্পূর্ণ পূরণ হয় না। তাছাড়া এভাবে ওপর থেকে জল প্রবেশের ফলে অনেক ধরনের ধাতব লবণ দ্রবীভূত হয়ে নিচের স্তরের জলে মিশে যায়। এভাবে জল নিচে নামার সময় জলের জীবাণুগুলি (ভূমিজ জীবাণু—soil bacteria) বিনষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু অনেক ধাতব লবণ দ্রবীভূত হয়ে জলে মিশে জলকে ক্ষারযুক্ত ও দূষিত করে ফেলে। আর্সেনিকও এভাবে মিশে যায়।

জলে আর্সেনিক মেশার দ্বিতীয় কারণ হলো—কলকারখানা থেকে বেরিয়ে আসা দূষিত পদার্থের সঙ্গে আর্সেনিকও নদী বা ড্রেনে পড়ে শেষে ভূগর্ভস্থিত জলে মিশে যায়। গ্রামাঞ্চলে যেসব নলকূপ তৈরি হয়, তার চারপাশ ঠিকমত সিমেন্ট দিয়ে না বাঁধানোর ফলে নলকূপের গোড়াটি নড়বড়ে হয় এবং সেখান থেকে নোংরা জল বা বন্যার জল (আর্সেনিক মিশ্রিত) নলকূপের পাইপ বেয়ে মাটির নিচে জলে প্রবেশ করে জলকে দূষিত করে। তাই কাছেপিঠে কলকারখানা থাকলে এই দূষিত জল এভাবে নলকূপের মাধ্যমে মাটির তলায় যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় আর্সেনিক দূষণ ঘটেছে?

প্রথম আর্সেনিক দূষণ পাওয়া গিয়েছিল ১৯৮৩ সালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গঙ্গারামপুর গ্রামে। এনিয়ে এরপর প্রচুর আলোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়—অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ, কলকাতার স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, স্কুল অফ এনভায়রনমেন্টাল স্টাডিজ এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই সমস্ত গবেষণাগারে পরীক্ষার ফলে দেখা গেল, ৮টি জেলার ৬৮টি ব্লকের জলে আর্সেনিক দূষণ ঘটেছে। ৮টি জেলা হলো—মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলী। এখানে মাটির নিচের ২০-৮০ মিটারের মধ্যে জলে আর্সেনিক পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি কলকাতার বেহালা, গড়িয়া ও রানীকুঠি অঞ্চলের কিছু কিছু জায়গায় নলকূপের জল আর্সেনিক দূষিত মাত্রায় পাওয়া যাচ্ছে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র মতে, আর্সেনিকের স্বাভাবিক মাত্রা ১০০ মিলিলিটার জলে ০.০১ মিলিগ্রাম থেকে ০.০৫ মিলিগ্রাম। এর বেশি মাত্রায় আর্সেনিক থাকলে এবং সেই জল অধিক দিন ব্যবহার ও পান করলে আর্সেনিক দূষণের কবলে পড়তে হবে। প্রথমে চামড়ায় আর্সেনিক-জনিত কঠিন রোগ দেখা দেয় ও দীর্ঘদিন বেশি পরিমাণে জল গ্রহণ করলে ক্যান্সার ও মৃত্যু হতে পারে।

[illegible]

আর্সেনিক একটি ধাতুকল্প (metaloid)—ধাতুবৎ অধাতব পদার্থ। ভূগর্ভে আর্সেনিক অক্সাইড, হাইড্রোক্সাইড প্রভৃতি যৌগ (compound) হিসাবে থাকে। মাটির নিচে জলের স্তর কমে গেলে এইসব যৌগ জলে দ্রবীভূত হয়ে জলের আর্সেনিক-মাত্রা অনেক বাড়িয়ে দেয়। আর্সেনিক প্রকৃতিতে অনেকরকম যৌগ অবস্থায় থাকতে পারে। তবে প্রধানত এর দুটি যৌগ খুবই ক্ষতিকারক—একটি ইন-অরগ্যানিক আর্সেনাইট (arsenite) এবং অন্যটি অরগ্যানিক আর্সেনেট (arsenete)। এর মধ্যে আর্সেনাইট রূপটি মারাত্মক ক্ষতিকারক, বিশেষত জলে তার ঘনত্বের জন্য। দেহ খুব তাড়াতাড়ি এটি গ্রহণ করে এবং শরীরকোষের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জমতে থাকায় কোষগুলি

ধীরে ধীরে মরে যায়। আর্সেনাইট যৌগ বা আর্সেনেট যৌগ হিসাবে একইসঙ্গে থাকতে পারে অথবা আলাদা আলাদাভাবেও থাকতে পারে।

অনেকের ধারণা, খাদ্যের মধ্যে হয়তো আর্সেনিক থাকতে পারে না, কিন্তু শাকসবজি চাষে ও গাছপালায় সেই একই সেচের জল লাগছে, গরুও একই জল খাচ্ছে। তাই দুধ ও খাদ্যের মধ্যে আর্সেনিক থাকা সম্ভব। খাদ্যের মাধ্যমে আর্সেনিক মানুষের শরীরে কতটা ক্ষতি করতে পারে, এব্যাপারে এখনো স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনে গবেষণা চলছে। উত্তরপাড়ার ঘেঁটুগাছিতে কিছু জমিতে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। বিধানচন্দ্র কৃষি বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরাও এবিষয়ে গবেষণা চালাচ্ছেন। কিন্তু এখনো কোন রিপোর্ট চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়নি।

[illegible]

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০ লক্ষ টাকায় একটি যন্ত্র কিনেছে। যন্ত্রটির নাম 'হাইড্রাইড জেনারেশন অ্যাটমিক অবজারভেশন স্পেক্ট্রো ফোটমিটার'। এটি স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিনের গবেষণাগারে রয়েছে। এই যন্ত্রে সাধারণত নখ ও চুল থেকে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি দূষণ ধরা পড়ে এবং কলকাতায় একমাত্র এখানেই এই পরীক্ষাগুলি হয়। জলে আর্সেনিক আছে কিনা পরীক্ষা করা হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে।

বৃক্ক, যকৃৎ, প্লীহাতে আর্সেনিক জমা হয়, কিন্তু শরীর আক্রান্ত হলে প্রথমেই ধরা পড়ে হাত ও পায়ের নখ এবং মাথার চুলের পরীক্ষায়। এছাড়া দীর্ঘদিন ধরে আর্সেনিক মিশ্রিত জল ব্যবহার করার পর রক্তাল্পতা, লিউকোপেনিয়া ইত্যাদি রোগ দেখা দেয়।

শরীরে আর্সেনিক-জনিত যে-রোগ লক্ষিত হয়, তাকে 'আর্সেনিকোসিস' (Arsenicosis) বলে। পানীয় জলে ০.০১ মিলিগ্রাম/ লিটার বা তার কম শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, কিন্তু এর বেশি পরিমাণে আর্সেনিকযুক্ত জল বহুদিন ধরে পান ও ব্যবহার করলে আর্সেনিকোসিস রোগ দেখা দেয়। সাধারণত ১০ থেকে ১২ বছর একটানা আর্সেনিকযুক্ত জল পান ও ব্যবহার করলে আর্সেনিক সংক্রমণের যে-লক্ষণগুলি প্রকাশ পায়, তা হলো—

(১) সারা শরীরে কালো, সাদা বা বাদামী ছোট ছোট ছোপ পড়ে।

(২) হাত ও পায়ের চেটো পুরু হয়ে ফেটে যায়।

(৩) এর সঙ্গে ঘন ঘন সর্দি, হজমের গণ্ডগোল, শারীরিক দুর্বলতা এবং শরীর ক্রমশ রোগা হতে থাকে।

(৪) যকৃত ও প্লীহা বড় হয় এবং পা ফুলে থাকে।

(৫) শরীরের কোন কোন জায়গায় উঁচু হয়ে ওঠে, একে 'হাইপার কেরোটোটিক নোডিউল' (Hyper kerototic nodules) বলে। এটি বেশি হয় হাত ও পায়ের চেটোতে, পরে সারা শরীরে হতে পারে।

(৬) রক্তাল্পতা দেখা দেয়।

(৭) চোখে প্রায়ই জীবাণুসংক্রমণ হয়।

(৮) চামড়ায় ক্যান্সার দেখা দিতে পারে।

এইসব লক্ষণগুলি প্রকাশ হওয়ার পর আস্তে আস্তে রোগী পঙ্গু হয়ে পড়ে ও শরীরে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হতে থাকে। আস্তে আস্তে রোগী মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।

[illegible]

আর্সেনিকোসিসের জন্য কোন বিশেষ ওষুধ এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। শুধুমাত্র চিকিৎসকের পরামর্শ ও চিকিৎসা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যাতে রোগটি বাড়াবাড়ি আকার ধারণ না করে।

কলকাতার পি. জি. হাসপাতালে প্রতি বৃহস্পতিবার বেলা ২টা থেকে ৪টা অবধি আর্সেনিক ইউনিট খোলা হয়েছে। এখানে চিকিৎসকগণ এই রোগের চিকিৎসা ও উপদেশ দিয়ে থাকেন।

সল্ট লেকের ন্যাশানাল ইন্সটিটিউট অফ হোমিওপ্যাথির অধীনে হুগলী জেলার অশোকনগর, বেড়াচাঁপা, বামনগ্রাম ও মালদহে আর্সেনিক-কবলিত রোগীদের চিকিৎসা করা হচ্ছে। এখানকার চিকিৎসকরা মনে করছেন, প্রথম অবস্থায় পাঠাতে পারলে রোগীর ৮০ শতাংশ রোগ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় নিরাময় করা যায়। এখানেও প্রতি মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার বহির্বিভাগে চিকিৎসা চলছে।

উত্তরপাড়ার ঘেঁটুগাছিতে শিবপুর বি. ই. কলেজের পক্ষ থেকে একটি আর্সেনিক রিমুভ্যাল প্ল্যান্ট বসানো হয়েছে। অন্যান্য কয়েকটি আর্সেনিক-কবলিত জায়গাতেও এই প্ল্যান্ট বসানোর চেষ্টা চলছে। আর্সেনিক-মিশ্রিত জল পরিশোধন করা হচ্ছে 'অ্যাক্টিভেটেড অ্যালুমিনা' নামক রাসায়নিকের সাহায্যে। জলের মধ্যে এটি দিলে এতে আর্সেনিক যোগ হয়ে আর্সেনিকের অবশেষ পড়ে। এতে আর্সেনিকমুক্ত জল পাওয়া যায় ঠিকই; কিন্তু একে বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে কার্যকর করতে গেলে যে বিশাল পরিমাণে অবশেষ পরিবেশে জমা হবে, ভবিষ্যতে তার কি ব্যবস্থা করা হবে—তার কোন সদুত্তর এখনো পাওয়া যায়নি। অল্প পরিমাণ অবশেষ গোবরের সঙ্গে মিশিয়ে পুড়িয়ে ফেললে, বৈজ্ঞানিকদের মতে, পরিবেশের ক্ষতি হবে না; কিন্তু বিশাল পরিমাণে আর্সেনিক অবশেষ জমলে কি ক্ষতি হবে বা না হবে তা এখনো পরীক্ষাসাপেক্ষ।

তাই আমাদের কর্তব্য, যতটা সম্ভব ভূগর্ভের জল তুলে ব্যবহার না করা এবং ভূপৃষ্ঠের জল (নদী বা পুকুর) কিভাবে পরিশোধন করে পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা যায় তার দিকে দৃষ্টি দেওয়া। কারণ, ভূপৃষ্ঠের জল আর্সেনিক-মুক্ত, যদি না সেই জলে কলকারখানা থেকে কোন বর্জ্যপদার্থ এসে পড়ে।

আর্সেনিক-কবলিত অঞ্চলে ভূগর্ভের জল রান্না বা পানীয় হিসাবে ব্যবহারের আগে আর্সেনিকের মাত্রা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আগেই বলা হয়েছে, এই মাত্রা ০.০১ মিলিগ্রাম/লিটার-এর বেশি হলে সেই জল খাওয়া বা তার সাহায্যে খাদ্য প্রস্তুত করা একেবারেই বন্ধ করতে হবে। কিন্তু

আর্সেনিক-কবলিত অঞ্চলে সরকার বিকল্প ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত পুকুরের জলই বিশুদ্ধ করে পান করতে হবে।

পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করার জন্য বড় পুকুরের জল বিশুদ্ধ করার কাজে পঞ্চায়েত বা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির এগিয়ে আসা দরকার। পুকুরের জলে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে বিশোধন করতে হবে এইভাবে—

(ক) প্রথমে ১ লিটার জলে ৪০ গ্রাম বা চা চামচের ৮ চামচ ব্লিচিং পাউডার মেশাতে হবে। তারপর পরিষ্কার কাপড়ের সাহায্যে জলটি ছেঁকে নিতে হবে। কিছুক্ষণ পর থিতিয়ে গেলে ওপরের জলীয় অংশটি আস্তে আস্তে অন্য পাত্রে ঢেলে নিতে হবে। এটিকে 'ক্লোরিন সলিউশন' বলে। সলিউশন তৈরি করার পর তা বেশিক্ষণ ফেলে রাখা যাবে না। জলকে থিতিয়ে নিয়ে ওপর থেকে জল ছেঁকে নিতে হবে। এইরূপে প্রতি লিটার জলে উপরি উক্ত ক্লোরিন সলিউশন লাগবে ৩০ ফোঁটা। গ্রামের মানুষকে এবিষয়ে সচেতন করতে হবে।

ব্লিচিং পাউডারে অধিকাংশ জীবাণু ধ্বংস হলেও ভাইরাস হেপাটাইটিস-এও বেশ কিছু সিস্ট, ওভা ও স্পোর নষ্ট হয় না। এর জন্য ডবল ডোজ ব্লিচিং পাউডার দিতে হয়। কিন্তু এতে অসুবিধা আছে। বেশি পরিমাণে ব্লিচিং পাউডার দিলে শরীরের পক্ষে তা শুধু ক্ষতিকারকই নয়, ক্লোরিনের অত্যধিক গন্ধে পানের অযোগ্য এবং অধিক ব্যয়সাপেক্ষ হয়ে পড়ে।

(খ) দ্বিতীয় পন্থা হলো—জল ফুটিয়ে পান করা। মানুষকে ভালভাবে বোঝাতে হবে, কেন এবং কতক্ষণ ফোটাতে হবে। পুকুরের জল বা যেকোন জল ছেঁকে পাঁচ মিনিট (জল ফুটতে আরম্ভ হওয়ার পর থেকে পাঁচ মিনিট) ফোটালেই তা পানীয় জলে পরিণত হয়। এই পাঁচ মিনিটেই সবরকমের রোগজীবাণু—সিস্ট, ওভা ও স্পোর-সহ ও অরগ্যানিক ম্যাটার, পচা প্রোটিন ইত্যাদি যা জলে থাকে তা নষ্ট হয়ে যায় ও পানের উপযোগী জলে পরিণত হয়। ফোটানো জল অনেকে পান করতে চান না, কারণ ফোটানো জলের স্বাদ ও মিষ্টতা কমে যায়। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা জল ফুটিয়ে পাত্রের মুখ পরিষ্কার কাপড়ে ঢেকে সারা রাত রেখে দিলে পরের দিন জলের স্বাভাবিক স্বাদ ফিরে আসে। কারণ হলো—ফোটানো হলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যায়, তাই বিস্বাদ লাগে। একরাত্রি রেখে দিলেই অক্সিজেন জলের ভিতরে চলে যায় ও তার স্বাদ আবার ফিরে আসে।

বর্তমানে কলকাতায় নলকূপ বসানো আইনত বন্ধ করা হয়েছে, কলকাতার আশপাশেও নলকূপ বসাতে হলে পরিবেশ বিভাগের অনুমতি নিতে হয়। মাটির স্তর পরীক্ষা করে গ্রামেগঞ্জে নলকূপ বসানো যেতে পারে। কারণ, দেখা গেছে একই গ্রামে একটি জায়গায় নলকূপের জলে আর্সেনিক পাওয়া গেছে, অন্য নলকূপে পাওয়া যায়নি। তাই মাটির স্তর পরীক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী। আর্সেনিক দূষণ যদি আরো বিস্তৃত এলাকায় পাওয়া যায়, তাহলে ভবিষ্যতে হয়তো নলকূপের জলই ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। তাই বিকল্প হিসাবে বৃষ্টির জল ধরে রেখে পুকুরগুলিকেই শোধন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

[illegible]

ইনস্টিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ-এর অধ্যক্ষ ডঃ কে. জে. নাথ-এর মতে—আর্সেনিক-যুক্ত জল প্রথমে ফটকিরি দিয়ে পরিশ্রুত করতে হবে। এতে অন্যান্য পদার্থের সঙ্গে অনেক পরিমাণ আর্সেনিক থিতিয়ে নিচে জমে। এরপর এই জল বালির মধ্য দিয়ে গেলে আরো কিছু পরিমাণে আর্সেনিক আটকে যায়। এভাবে ৭৫-৮০ ভাগ আর্সেনিক-মুক্ত জল পাওয়া যেতে পারে।

বৃষ্টির জলকে ধরে রেখে তা থেকে ভূগর্ভস্থ জলস্তর বৃদ্ধির একটি প্রচেষ্টা করা যেতে পারে। এবিষয়ে নিচের ছবিটি দেখা যাক—



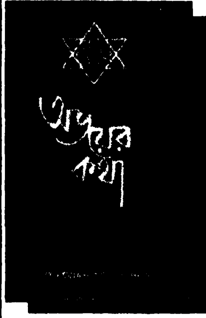
মাটির নিচে কুয়ো করে তার মধ্যে বৃষ্টির অতিরিক্ত জল প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে। কুয়োর মতো এতে দেওয়ালে ঢাকা থাকবে না। তাই মাটি জল শুষে নেবে, ফলে মাটির তলার জলের স্তর বেড়ে যাবে।

[illegible]

আর্সেনিক-দূষিত এলাকায় আর্সেনিক-মুক্ত জল পেতে হলে ভূগর্ভের জল তোলা বন্ধ করে ভূতলের জল ব্যবহার করতে হবে। তাই পুকুরগুলিকে সংস্কার করে দূষণমুক্ত করতে হবে। পুকুর বোজানো বন্ধ করতে হবে। এতে পরিবেশের ভারসাম্যও রক্ষা হবে। হয়তো আগামীদিনে এই জলই বৈজ্ঞানিক উপায়ে শুদ্ধ করে পান করতে হবে। এছাড়া যথেচ্ছ নলকূপ বসিয়ে জল তোলা বন্ধ করতে হবে। দেখা দরকার, পুকুরের জলে যেন কোনমতেই কলকারখানার বিষাক্ত জল না এসে পড়ে। সর্বোপরি আর্সেনিক দূষণ সম্বন্ধে গণচেতনা বাড়াতে হবে। জলশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, পরিবেশের ভারসাম্য ও দূষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী-পুকুর সংস্কার ও সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন হতে হবে। ❑

অভী হও

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়



অভয়ের কথা
ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক ঃ জয়দীপ রায়চৌধুরী
প্রাচী পাবলিকেশন
৬৩বি ন্যাশনাল প্রেস, বাকসাড়া
হাওড়া-৭১১৩০৬
পৃষ্ঠা ঃ ২৬+২৩০
মূল্য ঃ ৮০ টাকা

পৃথিবী ভয়ের আগার। 'জন্ম' মানে যাবতীয় যন্ত্রণার বিচিত্র অভিজ্ঞতার পথ ধরে নিলয়। মানুষের আসা, মানুষের যাওয়া। বহু রকমের বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতা। ভয়টা কোথায়!

"ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ম্।
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে জরায়া ভয়ম্।।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ম্।
সর্ব বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।।"

—ভোগে রোগের ভয়। প্রতিষ্ঠায় পতনের ভয়। বিত্তে রাজভয়। সম্মানে অপমানের ভয়। ক্ষমতায় শত্রুভয়। রূপে জরার ভয়। পাণ্ডিত্যে বিরোধভয়। সুনামে দুর্নামভয়। দেহে মৃত্যুভয়। সর্বত্র, সর্ববিষয়ে ভয়।

অভয় কোথায়? কোন্ মন্ত্রে ভয় থেকে অভয়ে যাওয়া যায়? ভয় থেকে মুক্তি! মহামানবেরা যুগে যুগে এসেছেন। বহু সাধকের বহু সাধনার ধারায় প্রবাহিত হয়েছে মানবসভ্যতা। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শাস্ত্রজ্ঞানের আদান-প্রদান ও অভ্যাসে অভয়মন্ত্র প্রচারিত হয়েছে। অনন্ত অনুসন্ধান। আসল বস্তুর সন্ধান কি মিলেছে?

বড় কঠিন পথ—এই বেদান্তের পথ। জীব আমি। জগৎ-প্রেক্ষিতে আমি বড় ক্ষুদ্র। বেদান্ত বলছেন—সে কি কথা! বিপরীতটাই যে সত্য। ক্ষুদ্র আমিটা ক্ষুদ্র নয়, সেইটাই বিশাল। বিশাল জগৎটাই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র—আত্মার একটা ক্ষুদ্র তুচ্ছ বিলাসমাত্র।

ভোগ ছেড়ে যোগে আসবে না তুমি? বেশ ভোগেই থাক। ভোগবাদও তো বাদ। সে-পথেও গুরু পাবে। কর্মের পৃথিবী। শ্রম আর শ্রমিকের পৃথিবী। বিদেশী গুরু কিয়ার হার্ডি শিষ্যকে বলছেন ঃ উদরপূর্তিই পুরুষার্থ। অভয়ে থাকতে হলে প্রচুর অন্ন সংগ্রহ কর। উদরই তোমার শত্রু। সেই শত্রুর বিনাশই তোমার সকল সংগ্রামের লক্ষ্য।

আমাদের চার্বাকের কণ্ঠস্বর দূর অতীত থেকে ভেসে এল—শোন, শুধু অন্ন হলেই চলবে না, আরো বহু ক্ষুধা আছে। আহারে আরো বৈচিত্র্য চাই—স্বাদু ও সুকোমল, তৎসহ বনিতা, পরিপাটী শয্যা! চার্বাকীয় দর্শন হলো—মৃত্যুই মোক্ষ, তার আগে যত পার সুখভোগ করে নাও। নীতিপালন! সে তোমার জন্য নয়। সেসব পরকে উপদেশ দেওয়ার জন্য উল্লেখ করবে। ঋণ করেও ঘৃত পান করবে। পারলে ঋণশোধ করবে, না পারলে মহাজনকে তামাদি আইনের কূট সাহায্যে বঞ্চিত করার চেষ্টা করবে।

চার্বাক মানুষের সংস্কারে গ্রাহ্য হলেন না। বেশ মজার কথা। অতি আধুনিক—bold। গবেষকরা বলতে লাগলেন, চার্বাক কোন একজন ঋষি নন। একটি গোষ্ঠী। এঁরা ভোগীদের বিদ্রূপ করেছেন। ব্যঙ্গ—satire। আসল কথা—ইহকালের মানুষ পরকালকে ভয় করতে বাধ্য। অন্যায়ের পাশে ন্যায় হাজির সদাসর্বদা।

চার্বাক যেমন বাস্তব বুদ্ধি দিতে চাইলেন, সেইরকম পরীক্ষা-নির্ভর সংশয়াতীত বিজ্ঞান মানুষকে খণ্ড সত্যের সন্ধান দিতে দিতে অজান্তেই বেদান্তের 'এক'-এর পাশে দাঁড়িয়ে এক ঈশ্বরকেই দৃঢ় করেছে। "পৃথিবীর প্রত্যক্ষ স্থৈর্য যে মিথ্যা, তাহা প্রমাণ হইল... আমরা বৈজ্ঞানিকের পদতলে বসিয়া আরো কত শত প্রত্যক্ষ অথচ ভ্রান্ত জ্ঞানগুলি বৈজ্ঞানিকের শ্রীমুখ-বচন-প্রমাণে শোধন করিয়া লইলাম।" প্রকৃতির নিয়মে পৃথিবী চলছে—উত্তম। কিন্তু প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মটি কি—বৈজ্ঞানিকরা আজও তা জানেন না। প্রতিক্ষণে, প্রতিমুহূর্তে জানাটা অজানা হয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীর যুগাবতারদের দ্বারে দ্বারে জীব অভয়প্রার্থী। গৌতম বুদ্ধ, খ্রীস্ট, শঙ্কর, রামানুজ, মহাপ্রভু, আরো আরো। সংসারে থেকে নিত্যানন্দ লাভের পথ কেউ কি দেখাতে পেরেছেন! যোগে থাকতে হবে। মহর্ষি পতঞ্জলিকে সঙ্গে নিয়ে গুহাবাসী হব কি? কপিলের কাছে জানব কি সাংখ্য মত?

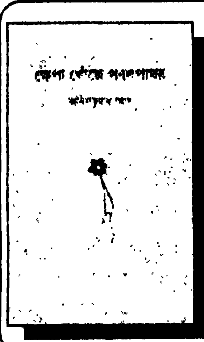
ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর **'অভয়ের কথা'** গ্রন্থটির মধ্যে এমন নানা প্রশ্ন এবং তার সহজ সাবলীল উত্তর বিধৃত হয়ে রয়েছে। এই গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখেছেন ঃ "আকাশে তারা জ্বলিয়া উঠে—একটা তারা অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠে ও কয়েকদিন মাত্র উজ্জ্বলতা বিকিরণ করিয়া আবার নিবিয়া যায়। বাঙ্গালা সাহিত্যের আকাশে ক্ষেত্রমোহনও সেইরূপ অকস্মাৎ জ্বলিয়া উঠিয়া চমক জন্মাইয়াছিল।... পৃথিবীতে আনন্দ বরিষণ করিতে সে আসিয়াছিল।"

'অভয়ের কথা' পড়তে পড়তে বাস্তবিক মনে হলো, ভয় থেকে আমাদের অভয়ে যেতে হবে—তবেই না আনন্দ! অভয় তো ভয়েতেই আছে। সব সম্প্রদায়, সব মত পরিভ্রমণ করে অবশেষে স্থিতি হলো ভক্তিতে—প্রেমাভক্তি। যে-পথ দর্শন করিয়াছেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ। গোপীপ্রেম। বিচার, জ্ঞান, বিজ্ঞান, যোগসমাধান—সব আছে, সব থাক। প্রেম মিলাও ভগবান। রাধাপ্রেম।

অভয়ের কথা এক অসাধারণ গ্রন্থ। একজন মানুষ ও তাঁর একটিমাত্র বই। দীর্ঘকাল অমুদ্রিত ছিল, সম্প্রতি প্রাচী পাবলিকেশন প্রকাশ করেছেন। কী উপকারই যে করলেন। ধন্য, ধন্য! মরুতে বৃষ্টিপাত। ❑

এক ডাক্তারের ভ্রমণকাহিনী

জলধিকুমার সরকার



ক্ষেপা খোঁজে পরশপাথর
অনিলকুমার ঘোষ
প্রকাশক ঃ উৎপল ভট্টাচার্য
কবিতীর্থ
৫০/৩, কবিতীর্থ সরণি
কলকাতা-৭০০ ০২৩
পৃষ্ঠা ঃ ৮০
মূল্য ঃ ৫০ টাকা

লেখক পেশায় একজন ডাক্তার। **'ক্ষেপা খোঁজে পরশপাথর'** বইটি প্রধানত তাঁর গবেষক জীবনকালে ভ্রমণকাহিনীর বর্ণনা। বহু দেশ-বিদেশের ল্যাবরেটরি তিনি ঘুরেছেন শিক্ষার্থী হিসাবে বা কোন বিদেশী সংস্থার 'ফেলোশিপ' নিয়ে। ভ্রমণকাহিনী ছাড়া সেখানকার ল্যাবরেটরির পারিপার্শ্বিক অবস্থার বর্ণনা এবং নবাগত বিদেশী কর্মীদের সুবিধা-অসুবিধার কথা এতে আছে। ভবিষ্যতে বিদেশী ল্যাবরেটরিতে যাঁরা যাবেন, বইটি তাঁদের কাজে লাগতে পারে।

লেখক নিজেকে 'ক্ষেপা' নামে পরিচিত করেছেন, কেন করেছেন জানাননি। তবে এইধরনের বইয়ে এত নিজের পরিবারবর্গের কথা অন্তর্ভুক্ত করা একটু অদ্ভুত লাগে। বাঙলা বইয়ে এত ইংরেজী কথা বা অনুচ্ছেদ থাকাও অবাঞ্ছনীয়। আশা করি, লেখক পরবর্তী সংস্করণে এবিষয়ে দৃষ্টি দেবেন। ❑

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি ঃ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠানাদি ও পরলোকপ্রাপ্তির সংবাদ 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশের জন্য উৎসব-অনুষ্ঠানাদি সমাপ্তির কিংবা পরলোকপ্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আমাদের দপ্তরে অবশ্যই পৌঁছানো প্রয়োজন। বিলম্বে প্রাপ্ত সংবাদ প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

—সম্পাদক, উদ্বোধন

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

বেলুড় মঠে নবনির্মিত সংগ্রহশালার উদ্বোধন

বেলুড় মঠে গত ৭ মে ২০০১ বুদ্ধপূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ত্রয়োদশ অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ একটি নবনির্মিত সংগ্রহশালার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। সকাল সাড়ে আটটায় ঐ গৃহের দ্বারোদ্ঘাটনের পরে শ্রীমন্দিরের পশ্চিমপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র এখনো কিছু সামান্য কাজ বাকি আছে। শীঘ্রই তা সমাপ্ত হবে। পূজনীয় সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ বলেন ঃ বেলুড় মঠের পুণ্য প্রাঙ্গণে এই সংগ্রহশালা স্বামী প্রভানন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল। এই পুণ্যদিনে এই সংগ্রহশালার শুভ দ্বারোদ্ঘাটন রামকৃষ্ণ মিশনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা সন্দেহ নেই। ভগবান বুদ্ধ যেমন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন, ইদানীংকালে শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দও সেইরকম ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলনে এবং সনাতন বেদান্তধর্মের প্রচারের মাধ্যমে এই আন্দোলনের জয়যাত্রা পৃথিবীর ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। আমার বিশ্বাস, এই সংগ্রহশালার পুণ্যস্পর্শে কেবল ভক্তবৃন্দই নয়, সকল মানুষের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হবে।

এই অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর



মিউজিয়ামের প্রধান ফটকে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সুসজ্জিত পট

আলোকচিত্র ঃ দাসানুদাস সাহা



উদ্বোধনের পর পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজ মিউজিয়াম পরিদর্শন করেন

আলোকচিত্র ঃ দাসানুদাস সাহা

জনসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ এবং আন্তর্জাতিক যাদুঘর কাউন্সিলের প্রাক্তন সভাপতি ডঃ সরোজ ঘোষ। আশীর্বাণী দান করেন পূজ্যপাদ সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ। স্বাগত-ভাষণ দেন মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী ভজনানন্দজী মহারাজ।

ডঃ সরোজ ঘোষ বলেন ঃ ভারতবর্ষে এই ধরনের সংগ্রহশালা বাস্তবিক অনন্য। সংগ্রহশালায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটা ধারাবাহিকতা (রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন সম্পর্কিত) এই সংগ্রহশালায় রয়েছে। এই ধারাবাহিকতা ভারতবর্ষে কোন যাদুঘর বা সংগ্রহশালায় পাওয়া যাবে না। স্বামী প্রভানন্দজী মহারাজ বলেন ঃ বহু মানুষের আর্থিক এবং প্রামাণ্য বস্তু (শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা প্রমুখের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও চিঠিপত্রাদি) দানে এবং তাঁদের ও বহু সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী ভাইয়ের সক্রিয় সহযোগিতায় এই সংগ্রহশালা গড়ে উঠেছে। এই সংগ্রহশালাকে আমরা আরো দশটা সংগ্রহশালার মতো ভাবি না। এটিকে আমরা পবিত্র মন্দির বলেই মনে করি। সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ, কোষাধ্যক্ষ স্বামী প্রমেয়ানন্দজী মহারাজ-সহ প্রায় একহাজার সন্ন্যাসী ও ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

উৎসব-অনুষ্ঠান

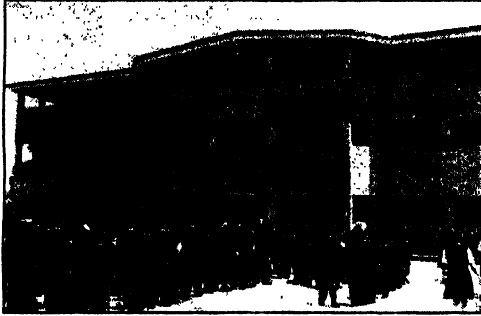
ম্যাঙ্গালোর আশ্রম (কর্ণাটক) গত ২৬ মার্চ ২০০১ আশ্রমের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উদ্যাপন করে। উৎসবটির উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে তিনি নবনির্মিত একটি লাইব্রেরি বিল্ডিং ও একটি অডিটোরিয়ামের দ্বারোদ্ঘাটন করেন।

শিলং আশ্রম (মেঘালয়) গত ২৯ ও ৩০ এপ্রিল ২০০১ স্বামীজীর শিলঙে শুভ পদার্পণের শতবর্ষপূর্তি উৎসব উদ্যাপন করে। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান-সহ একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ এবং ভাষণ দেন মেঘালয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী টি. এইচ. রঙ্গদ ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি।

চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (মেঘালয়) গত ৩০ এপ্রিল ২০০১ মেঘালয়ে স্বামীজীর শুভ পদার্পণের শতবর্ষপূর্তি উৎসবের আয়োজন করে। এই উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভক্তিমূলক সঙ্গীত, আবৃত্তি, বক্তৃতা ও জনসভা আয়োজিত হয়।



জনসভায় মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, রঞ্জন চ্যাটার্জী ও স্বামী নিত্যমুক্তানন্দজী



চেরাপুঞ্জি রামকৃষ্ণ মিশন হাইস্কুলের নবনির্মিত ভবন

উৎসবটির উদ্বোধন এবং জনসভায় সভাপতিত্ব ও আশ্রম বিদ্যালয়ের একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। জনসভায় ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের (বেলুড়) সম্পাদক স্বামী রমানন্দজী এবং মেঘালয় সরকারের শিক্ষাবিভাগের কমিশনার রঞ্জন চ্যাটার্জী। এছাড়া বিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্র বক্তৃতা দেয় এবং সঙ্গীত পরিবেশন করে। সভায় স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন চেরাপুঞ্জি আশ্রমের সম্পাদক স্বামী নিত্যমুক্তানন্দজী। উৎসবে বহু ভক্ত, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও কর্মীর সমাগম হয়। এই উপলক্ষ্যে আশ্রম পরিচালিত উচ্চ বিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

কম্প্যাক্ট ডিস্কে (মাল্টিমিডিয়া)
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা

কলকাতার অদ্বৈত আশ্রমের তত্ত্বাবধানে স্বামী বোধসারানন্দের উদ্যোগে স্বামীজীর ইংরেজী বাণী ও রচনা (নয় খণ্ড), তাঁর জীবনী, শিশুদের বিবেকানন্দ, মিস্ মেরী লুই বার্কের 'নিউ ডিস্‌কভারিজ' (ছয় খণ্ড)-সহ তিনশ ছবি সম্বলিত একটি সি. ডি. রম সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। গত ২৯ মে মাননীয় মন্ত্রী শ্রীমানব মুখোপাধ্যায় পার্ক স্ট্রীটে অবস্থিত 'মিউজিক ওয়ার্ল্ড'-এ এই সি. ডি. রমের বিক্রয়ের সূচনা করেন। প্রখ্যাত লেখক 'শংকর'-এর পরিচালনায় এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্বামী বোধসারানন্দ এবং শ্রীমানব মুখোপাধ্যায়। এই অনুষ্ঠানে 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দ উপস্থিত ছিলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে আর. পি. জি. পরিচালিত এগারটি 'মিউজিক ওয়ার্ল্ড'-এ এই সি. ডি. রম একই সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে।

সেবাব্রত

কৃষি পাঠশালা

সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের (জেলা—মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ) উদ্যোগে এবং ইউনাইটেড ফসফরাস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনায় গত ৬ এপ্রিল ২০০১ পশ্চিমবঙ্গের নবম কৃষি পাঠশালা আয়োজিত হয় আশ্রম-প্রাঙ্গণে। অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি ও পশুপালন শিক্ষাই ছিল এই পাঠশালার প্রধান উদ্দেশ্য। প্রাথমিকভাবে ১২০ জন কৃষক পাঠশালায় নাম নথিভুক্ত করেছেন। এর অনুশীলন চলবে ৪ মাস ধরে। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগের বিভিন্ন স্তরের আমলাগণ, ইউনাইটেড ফসফরাস লিমিটেড কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ ও স্থানীয় প্রায় ২৫০ কৃষক উপস্থিত ছিলেন।

সাইকেল রিক্সা বিতরণ

রাঁচি রামকৃষ্ণ মিশন টি. বি. স্যানাটোরিয়াম (ঝাড়খণ্ড) ঃ গত ৬ এপ্রিল ২০০১ ডুংরি গ্রামের দরিদ্র মানুষের মধ্যে ১২টি সাইকেল রিক্সা বিতরণ করেন ঝাড়খণ্ড উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি বিনোদকুমার গুপ্ত।

চক্ষু-চিকিৎসা শিবির

পুরী মঠ (ওড়িশা) গত ৮-১০ এপ্রিল ২০০১ একটি চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করে। শিবিরে ৯৭ জনের চিকিৎসা করা হয় এবং ২১ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়।

পোরবন্দর আশ্রম (গুজরাট) গত ১৩ এপ্রিল ২০০১ একটি চক্ষু-চিকিৎসা শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ১৭৩ জনের চোখ পরীক্ষা করা হয় এবং ১০ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়।

ইছাপুর মঠ (জেলা—হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৩ এপ্রিল ২০০১ একটি চক্ষু-চিকিৎসা শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ১৯ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়।

ত্রাণ

গুজরাট খরাত্রাণ

পোরবন্দর আশ্রম ভাদালা ও বাগাভাদর গ্রামে, ওয়াড়ি প্লট অঞ্চলে ও আশ্রমের মধ্যে কয়েকটি ত্রাণকেন্দ্র খুলেছে। এইসকল কেন্দ্রের মাধ্যমে খরাকবলিত ৫০০ পরিবারকে প্রত্যহ ৫০০ লিটার সরবত বিতরণ করা হচ্ছে।

পুনর্বাসন

গুজরাট

রাজকোট আশ্রম ঃ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনের জন্য ধানেতি গ্রামে ৮৮টি বাড়ির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর ১৮টি বাড়ির কাজ এগিয়ে চলেছে।

পোরবন্দর আশ্রম ঃ ভারওয়াড়া গ্রামে পরিকল্পিত ৩০টি বাড়ির মধ্যে 'নিজের বাড়ি নিজে কর' প্রকল্প অনুযায়ী ৪১টি পরিবার নিজেদের জমিতে বাড়ি তৈরির কাজ করছে। এজন্য প্রত্যেক পরিবারকে প্রাথমিকভাবে ১৫ ব্যাগ করে সিমেন্ট দেওয়া হয়েছে।

লিমডি আশ্রম জাম্বি ও রামরাজপুর গ্রামে একটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ শুরু করেছে।

ওড়িশা

ঝঞ্ঝায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনের জন্য বেলুড় মঠ গত ১৭ এপ্রিল ২০০১ একটি অনুষ্ঠানে জগৎসিংপুর জেলার কানাগুলি গ্রামে নবনির্মিত ৭১টি বাড়ির স্বত্ব ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের হাতে তুলে দেয়। এছাড়া এদিন নবনির্মিত ঝঞ্ঝা-প্রতিরোধক আশ্রয়গৃহ-সহ একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন ওড়িশার রাজ্যপাল এম. এম. রাজেন্দ্রন। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। সভায় সাধু, ভক্ত, সরকারি কর্মচারী ও বহু গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন।

দেহত্যাগ

গত ৫ মে ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে স্বামী চিদ্‌ভাসানন্দজী (অনিল মহারাজ) প্রয়াণ করেন। মূলত কিডনি বিকল হয়ে যাওয়ায় তিনি হাসপাতালে ভর্তি হন গত জুলাই মাসে। ডায়াবেটিসও ছিল। স্বামী যতীশ্বরানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য অনিল মহারাজ ১৯৭৩ সালে স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। নেদারল্যান্ড (হল্যান্ড)-এর রামকৃষ্ণ মিশন কেন্দ্রের তিনিই প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

গত ৬ মে ২০০১ **স্বামী নিষ্ঠানন্দজী (মনোহর মহারাজ)** ৮৮ বছর বয়সে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মস্তিষ্কের 'দুর্ঘটনা'জনিত কারণে তাঁর জীবনাবসান হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তান মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য মনোহর মহারাজ বাংলাদেশের ফরিদপুরে সঙ্ঘে যোগদান করেন ১৯৩৭ সালে। ১৯৫৫ সালে স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের কাছে তাঁর সন্ন্যাসদীক্ষা হয়। বেলুড় মঠ সহ মোট ১১টি কেন্দ্রে তিনি কর্মী হিসাবে কাজ করেছেন। ১৯৬৭-১৯৬৮ সালে ওড়িশা এবং রাঁচিতে ত্রাণকার্যেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

গত ২০ মে ২০০১ **স্বামী চন্দ্রানন্দজী মহারাজ (অধ্যক্ষ, পাটনা)** রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। গত মার্চ মাসে পাটনার রাস্তায় একটি দুর্ঘটনায় আহত মহারাজকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। সবরকম সুচিকিৎসা সত্ত্বেও তাঁর কিছু উন্নতি হয়নি। তিনি স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছে মন্ত্রদীক্ষা এবং স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। বেলুড় মঠ ও রেঙ্গুন কেন্দ্র নিয়ে মোট ১০টি কেন্দ্রে তিনি বিভিন্ন পদে থেকে সঙ্ঘের সেবা করেছেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

ফলহারিণী কালীপূজা ঃ গত ২২ মে ২০০১ মঙ্গলবার শ্রীশ্রীমায়ের পটে বিশেষ পূজা, হোম, কালীকীর্তন ও ভক্তিমূলক সঙ্গীতের মাধ্যমে ফলহারিণী কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শ্রীশ্রীমায়ের পট পরিবর্তন ঃ গত ২৪ মে ২০০১ বৃহস্পতিবার অভিষেক ও ষোড়শোপচারে পূজা, হোমের মাধ্যমে শ্রীশ্রীমায়ের প্রায়-বিনষ্ট ছবি পরিবর্তন করে নতুন ছবি



স্থাপন করা হয়। এই নতুন পটেতে পুষ্পার্ঘ্য দান এবং আরতি করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম অছি এবং পরিচালন পর্ষদের অন্যতম সদস্য স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ।

শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণ উৎসব ঃ গত ২৬ মে ২০০১ শনিবার উদ্বোধনের বাড়িতে শ্রীশ্রীমায়ের পদার্পণ উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোমের সম্পাদক স্বামী জয়ানন্দজীর সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সত্যবোধানন্দজী। কালীকীর্তন ও ভজন পরিবেশন করেন যথাক্রমে আন্দুল কালীকীর্তন সমিতি ও বাণীকুমার চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া সঞ্জিৎ অ্যান্ড পার্টির নাটক ও সতী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে দশহাজারেরও বেশি ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা ঃ ইংরেজী মাসের শেষ বৃহস্পতিবার 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ ও আলোচনা করছেন স্বামী সর্বগানন্দজী এবং প্রথম শুক্রবার 'ভক্তিপ্রসঙ্গে' ভাষণ দান করছেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। এছাড়া প্রথম ও তৃতীয় রবিবার 'গীতা' এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ রবিবার 'কঠ উপনিষদ্' পাঠ ও ব্যাখা করছেন যথাক্রমে স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দজী ও স্বামী বিনির্মলানন্দজী। ❑

বিবিধ সংবাদ

জাতীয় যুবদিবস ও স্বামীজীর জন্মতিথি

তেজপুর, আসাম : স্বামীজীর জন্মদিন ও জাতীয় যুবদিবস উপলক্ষ্যে গত ১২ জানুয়ারি ২০০১ তেজপুর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম তেজপুর কনকলতা সিভিল হাসপাতাল ও টি. বি. হাসপাতালে ১৭৫ জন রোগীর মধ্যে ফল ও বিস্কুট বিতরণ করে। ১৫ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মতিথিতে আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, পাঠ ও জনসভার আয়োজন করা হয়। প্রায় ৫০০ ভক্ত ঐদিন প্রসাদ গ্রহণ করেন। ২০ জানুয়ারি প্রায় ১৩০ জন স্কুলের ছাত্রছাত্রীর মধ্যে খাতা-পেন্সিল প্রভৃতি সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

বামুনমুড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা : রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় বামুনমুড়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম গত ১৪ জানুয়ারি ২০০১ স্বামী বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী যুবসম্মেলনের আয়োজন করে। বিভিন্ন অধিবেশনে স্বপন বসু, তৃপ্তিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, নচিকেতা ভরদ্বাজ, অমলেন্দু চক্রবর্তী প্রমুখ বিদ্বজ্জন অংশগ্রহণ করেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে যুবপ্রতিনিধিদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন অনুষ্ঠানের উদ্বোধক স্বামী মুক্তিকামানন্দজী।

ইড়পালা, মেদিনীপুর : ইড়পালা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম গত ১৫ জানুয়ারি ২০০১ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, পুষ্পাঞ্জলি ও ধর্মসভার মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি পালন করে। প্রায় ৬০ জন ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় ধর্মালোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, সেবাশ্রম ময়াল-ইছাপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সহযোগিতায় ২০১ জন দুঃস্থ বালক-বালিকার মধ্যে দুধ বিতরণ করেছে।

বরানগর মঠ সংরক্ষণ সমিতি : পুরাতন মঠ বরানগরে গত ১৫ জানুয়ারি ২০০১ স্বামীজীর শুভ আবির্ভাব তিথি উদ্‌যাপিত হয়। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সান্ধ্য ধর্মসভায় স্বামীজী প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী সনাতনানন্দজী।

রামপুরহাট, বীরভূম : রামপুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র গত ১৫ জানুয়ারি ২০০১ শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, পাঠ, ধর্মসভা ও ভজনের মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মতিথি পালন করে। দুপুরে উপস্থিত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। অশোককুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন।

জহরনগর, ভাণ্ডারা, মহারাষ্ট্র : জহরনগরের শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি গত ১৫ জানুয়ারি ২০০১ স্বামীজীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সভাপতিত্ব করেন উমাশঙ্কর দাশ। প্রায় ৩৫০ জন ভক্ত দুপুরে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

বনগ্রাম, উত্তর চব্বিশ পরগনা : বনগ্রাম বিবেকানন্দ বুক সেন্টার গত ১৫ জানুয়ারি ২০০১ স্বামীজীর জন্মতিথি পালন করে। এই উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র 'উদ্বোধন'-এর প্রচার ও গ্রাহকভুক্তির ব্যবস্থা করা হয়। জনসভায় বনগ্রাম হাইস্কুলের শিক্ষক শৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাস প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বাসুদেব সাধুখাঁর পরিচালনায় প্রায় ৩০০ ভক্ত ও 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকবৃন্দ দুপুরে খিচুড়ি ও মিষ্টান্ন প্রসাদ গ্রহণ করেন।

ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৩১ : ঢাকুরিয়া শীতলাতলা কালীবাড়ি উন্নয়ন সমিতি গত ১৬ জানুয়ারি ২০০১ স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে একটি বক্তৃতা-প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। বিষয় ছিল—'স্বামীজীর বাণী ও আদর্শ, দেশের বর্তমান অস্থিরতায় তার প্রাসঙ্গিকতা'। এতে ১৯ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

দেওমালি, অরুণাচলপ্রদেশ : গত ২১ জানুয়ারি ২০০১ স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তিরাপ জেলার দেওমালি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ পরিচালিত এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রায় ৪০০ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ভক্ত নরনারী অংশগ্রহণ করেন। শোভাযাত্রা-শেষে ভাষণ দান করেন অরুণাচলপ্রদেশের প্রাক্তন মন্ত্রী ও সঙ্ঘের সভাপতি ওয়াংফা লোয়াং, সেন্ট জর্জ স্কুলের ফাদার নর্বেট প্রমুখ।

সাঁকরাইল, হাওড়া : সাঁকরাইল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ গত ২১ জানুয়ারি ২০০১ সারাদিনব্যাপী স্বামীজীর ১৩৯তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন করে। প্রায় ১,০০০ ভক্ত হাতে হাতে প্রসাদ পান। যুবসম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন স্বামী সনাতনানন্দজী ও স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়।

খণ্ডখোলা, মেদিনীপুর : রঘুনাথবাড়ির অন্তর্গত খণ্ডখোলা পল্লীশ্রী সংস্থার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় গত ২৮ জানুয়ারি ২০০১ বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন আয়োজিত হয়। 'বর্তমান সমাজে স্বামীজীর বাণী ও আদর্শের প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী, নিতাই মাইতি, অধ্যাপক প্রতাপ মাইতি, ডাঃ সুবোধরঞ্জন জানা প্রমুখ। সম্মেলনে ১৮০ জন যুবপ্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব

খড়ার, মেদিনীপুর : বিগত ২০ ও ২১ জানুয়ারি ২০০১ মেদিনীপুরের খড়ারস্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করে। স্বামী পরব্রহ্মানন্দজী, স্বামী কালাতীতানন্দজী প্রমুখ প্রথম দিন এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী প্রমুখ দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। প্রায় ২,০০০ শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও ভক্তবৃন্দের সমাগম হয়েছিল। ঐদিন দুপুরে প্রায় ৯,০০০ ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

গোপালপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা : গত ২০ ও ২১ জানুয়ারি ২০০১ গোপালপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ১৬৫তম

শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মজয়ন্তী এবং বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও 'কথামৃত' পাঠ, ধর্মসভা, দরিদ্রদের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ ইত্যাদি ছিল অনুষ্ঠানের অঙ্গ। ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী। দুপুরে ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় বিদ্যালয়ের ছাত্ররা নাটক পরিবেশন করে।

দত্তপুকুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা : দত্তপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্রে গত ২১ জানুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মঙ্গলারতি, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি পরিবেশন ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী। বক্তব্য রাখেন হরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত, সন্তোষকুমার ঘোষ প্রমুখ।

উৎসব-অনুষ্ঠান

কদমতলা, হাওড়া : শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির গত ১৩-১৪ জানুয়ারি ২০০১ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, শ্রুতিনাটক ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করে। প্রথম দিনের বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অজরানন্দজী ও তরুণ গোস্বামী। দ্বিতীয় দিনের সভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা দেবাত্মপ্রাণাজী।

ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০৬৩ : গত ১৪ জানুয়ারি ২০০১ ঠাকুরপুকুরস্থিত আনন্দ বিবেক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় সরশুনা উচ্চ-বিদ্যালয়ে সারাদিনব্যাপী একটি ছাত্রসম্মেলনের আয়োজন করে। প্রায় ৩০০ ছাত্রছাত্রী ও ৫০ জন পর্যবেক্ষকের উপস্থিতিতে সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী। অনুষ্ঠানের শেষে তিনি বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে স্বামীজী, বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন।

সোদপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা : গত ১৪ জানুয়ারি ২০০১ সোদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র ও সারদা সঙ্ঘ যৌথভাবে পানিহাটী লোকসংস্কৃতি ভবনে এক ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করে। ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, আলোচনাসভা প্রভৃতি ছিল সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। সভায় ভাষণ দান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী।

নূতনপল্লী, কৃষ্ণনগর : গত ২১ জানুয়ারি ২০০১ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র বার্ষিক উৎসব এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মজয়ন্তী পালন করে। এই উপলক্ষ্যে 'লীলাপ্রসঙ্গ', 'কথামৃত', 'চণ্ডী', 'গীতা', 'বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছিল।

পানাগড়, বর্ধমান : পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম গত ২১ জানুয়ারি ২০০১ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ভক্তবৃন্দের অংশগ্রহণে প্রভাতফেরি, পূজা, পাঠ, হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। পূজা করেন সুন্দিয়াড়া রামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী প্রেমস্বরূপানন্দজী। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী তত্ত্বজ্ঞানন্দজী, বক্তব্য রাখেন নিমাইচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থসারথি পাঁজা, চণ্ডীদাস সরকার প্রমুখ।

যশোর রোড, দমদম : গত ২৫ ও ২৭ জানুয়ারি ২০০১ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে যশোর রোডস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবায়তনের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ করেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী এবং ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী একব্রতানন্দজী। সান্ধ্য ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। ভাষণ দেন স্বামী গোবিন্দানন্দজী ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী। ২৭ জানুয়ারি রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় যুবসম্মেলন আয়োজিত হয়। পরিচালনা করেন স্বামী সত্যবোধানন্দজী ও প্রণবেশ চক্রবর্তী।

কুমরুল, হুগলী : কুমরুল শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের বার্ষিক উৎসব গত ২৫ জানুয়ারি ২০০১ অনুষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, গীতা ও চণ্ডীপাঠ, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এবং ভক্তিগীতির মাধ্যমে। সারাদিনব্যাপী এই উৎসবে যোগদান করেন স্বামী গৌরীনাথানন্দজী, স্বামী কৌশিকানন্দজী এবং স্বামী দেবদেবানন্দজী। প্রায় ১৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দজী, স্বামী বিশ্বানন্দজী প্রমুখ।

তিলজলা, কলকাতা-৭০০ ০৩৯ : তিলজলা হাইস্কুল প্রাঙ্গণে তিলজলা বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয় গত ২৭ ও ২৮ জানুয়ারি ২০০১। স্বামী গোবিন্দানন্দজী বৈকালিক ধর্মসভার উদ্বোধন করেন। ভাষণ দেন সভানেত্রী প্রব্রাজিকা ধৃতিপ্রাণা, অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্তা, অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু। ২৮ জানুয়ারি শোভাযাত্রা, শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ এবং বৈকালিক ধর্মসম্মেলনের মাধ্যমে উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী, অধ্যাপক নীরদবরণ চক্রবর্তী, ডঃ স্বরূপ ঘোষ প্রমুখ।

মঠ-বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর : রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় মঠ-বিষ্ণুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০০১ ভক্তিগীতি, পদাবলীকীর্তন ও আলোচনার মাধ্যমে বিবেকানন্দ যুবসম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও গ্রাম থেকে প্রায় ৪০০ ছাত্রছাত্রী ও ভক্ত যোগদান করেন। সম্মেলনে স্বামীজীর বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক কাননবিহারী দে, অধ্যাপক মৃদুল ব্যানার্জী, পুলিন পইড়্যা এবং পৌরোহিত্য করেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দেন অধ্যাপক নির্মল মাইতি।

শরৎ কলোনী, কলকাতা-৭০০ ০৮১ : গত ৩ ও ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শরৎ কলোনী শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দ পাঠচক্রের নবম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, পাঠ, আলোচনাসভা, লীলাগীতি, ভক্তিগীতি ও শ্রুতি-নাটক অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী সত্যবোধানন্দজী ও অনুপ মণ্ডল। দ্বিতীয় দিনের সভায়

আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী এবং 'মায়ের কথা' থেকে পাঠ করেন মিহিরকুমার ঘোষ। দুদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রায় ২৫০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

নববারাকপুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা : গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০১ **নববারাকপুর শ্রীসারদা সঙ্ঘ** ২১তম আধ্যাত্মিক শিবির পরিচালনা করে। ধ্যান, ভজন, ভক্তিগীতি, পাঠ ও আলোচনা ছিল শিবিরের অঙ্গ। প্রথম অধিবেশনে প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণাজী এবং দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী পাঠ ও আলোচনা করেন। সারাদিনব্যাপী শিবিরে ১১৭ জন ভক্ত মহিলা যোগদান করেন।

উত্তর চব্বিশ পরগনা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ : গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০১ অষ্টম ষাণ্মাসিক সম্মেলনের আয়োজন করে **বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘে।** সম্মেলনে ৩৩টি আশ্রম থেকে ১০৩ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী যতীন্দ্রানন্দজী, ভাবপ্রচার পরিষদের সভাপতি স্বামী শিবময়ানন্দজী, স্বামী নিত্যরূপানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী এবং স্বামী মোক্ষপ্রিয়ানন্দজী। সম্মেলনে স্বাগত-ভাষণ দেন দীপককুমার রায় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সন্তোষকুমার ঘোষ।

স্যান্ডেলেরবিল, উত্তর চব্বিশ পরগনা : গত ৪-৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ **স্যান্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম** মঙ্গলারতি, সানাইবাদন, পূজা, 'কথামৃত' এবং 'মায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, বাউলগান, তরজা, নাটক ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করে। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী পরিপূর্ণানন্দজী এবং ভাষণ দান করেন স্বামী দিব্যানন্দজী, অধ্যাপক ডঃ শশাঙ্কশেখর মণ্ডল ও স্থানীয় বি. ডি. ও. সুরজিৎ রায়। স্বাগত-ভাষণ দেন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী দেবব্রতানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

সেবাব্রত

হাফলং, অসম : শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির উদ্যোগে একটি দাতব্য চিকিৎসাশিবিরের আয়োজন করা হয় গত ২১ জানুয়ারি ২০০১। প্রায় ১৭৫ জন দুঃস্থ মানুষের চিকিৎসা করেন পাঁচজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক।

আড়িয়াদহ, কলকাতা-৭০০ ০৫৭ : গত ২৩ জানুয়ারি ২০০১ **আড়িয়াদহ বিবেকানন্দ সাংস্কৃতিক চক্র** ২০তম বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করে। ঐতিহাসিক বাণরাজার শিবমন্দিরে অনুষ্ঠিত ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন সুনীলকুমার রুদ্র, শুভেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রায় ৩০০ দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খাতা ইত্যাদি বিতরণ করা হয়।

বহির্ভারত

যশোর, বাংলাদেশ : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম গত ১৫ জানুয়ারি ২০০১ স্বামী বিবেকানন্দের ১৩৯তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন করেন। এই উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য সম্প্রীতি শোভাযাত্রা ও হাসপাতালের রোগী ও দুঃস্থদের মধ্যে ফল বিতরণের আয়োজন করা হয়।

মৌলভীবাজার, বাংলাদেশ : শ্রীমঙ্গল উপজেলার রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে **শ্রীমঙ্গল উপজেলা বিবেকানন্দ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ** গত ১৫ জানুয়ারি ২০০১ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করে। এই উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, সম্প্রীতি র‍্যালি, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, আলোচনাসভা, নাটক ও দরিদ্রদের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা-সভায় স্বাগত-ভাষণ দেন পরিষদের সম্পাদক রণজিৎ রায় এবং সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি দ্বীপেন্দ্র ভট্টাচার্য। ভাষণ দেন শ্রীমঙ্গল সরকারি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অধ্যাপক পরিমলকান্তি দে, নৃপেন্দ্রলাল দাশ, হরিপদ সরকার, প্রমথেশদেব চৌধুরী প্রমুখ। এরপর 'ভক্ত মথুর' নাটক পরিবেশিত হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **বিনীতা বসু** গত ৩০ নভেম্বর ২০০০ ভোর ৪টায় ৮৩ বছর বয়সে পরলোক-গমন করেন। তিনি স্বামী শাশ্বতানন্দজী মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন। স্নেহশীলতা ও সরলতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য এবং মাল রামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘের সভাপতি **জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ** গত ২৬ ডিসেম্বর ২০০০ রাত্রি ১০টা ৩০ মিনিটে ৭০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। পরোপকারিতা ও মধুর ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **বাসন্তী সেনগুপ্ত** গত ১ জানুয়ারি ২০০১ সকাল ৭টা ৫ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মধুর ব্যবহার ও পরোপকারিতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি 'উদ্বোধন'-এর নিয়মিত গ্রাহক ও পাঠিকা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **অবন্তিপ্রভা বন্দ্যোপাধ্যায়** গত ২ জানুয়ারি ২০০১ বেলা ১টা ২০ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **কানাইলাল ঘোষ** গত ৬ জানুয়ারি ২০০১, ৭০ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি হাওড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন এবং 'উদ্বোধন' পত্রিকার নিয়মিত পাঠক ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য **বিবেকানন্দ হাজরা** গত ৬ জানুয়ারি ২০০১ সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটে ৭৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। সহজ-সরল ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা **ইভা বসু** গত ১০ জানুয়ারি ২০০১ রাত্রি ৩টা ২৭ মিনিটে ৮৪ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু প্রবীণ সন্ন্যাসীর স্নেহের পাত্রী এবং 'উদ্বোধন'-এর দীর্ঘদিনের গ্রাহিকা ছিলেন। রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ❑

বুদ্ধিজীবী/সমাজসেবক/শিক্ষক/কর্মী/ছাত্রদের
অভিভাবক/অভিভাবিকাদের কাছে আবেদন
নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম থেকে ৪৪ বছর ধরে
নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে অন্যরকম জনপ্রিয় মাসিক পত্রিকা

।। সমাজশিক্ষা ।।

পত্রিকাটি পাঠ করলেই এর বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারবেন। কোন শুষ্ক সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা এতে থাকে না, গল্পের মতোই সহজ সরল অথচ শিক্ষামূলক আলোচনা, মহাপুরুষদের জীবনের নানা দিক, শিশু ও কিশোরদের উপযোগী করে উপনিষদ্‌-রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ প্রভৃতির নানা গল্প ও আলোচনা, এমনকি বয়স্ক ও সদ্য-সাক্ষর শিশুদের জন্যও লেখা থাকে। এছাড়া থাকে গ্রামবাংলার উৎসব ও নানা পালা-পার্বণের নানা সংবাদ। একটি মাত্র পত্রিকায় এতসব আলোচনায় সবদিক থেকেই অনন্য ও অভিনব। স্বামী গম্ভীরানন্দজী, স্বামী ভূতেশানন্দজী, স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী, স্বামী প্রভানন্দজী, স্বামী প্রমেয়ানন্দজী, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী প্রমুখ রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের প্রখ্যাত সন্ন্যাসীরা যেমন এই পত্রিকায় লিখেছেন ও লিখছেন, তেমনি শঙ্করীপ্রসাদ বসু, নিমাইসাধন বসু, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসিত রায়চৌধুরী প্রমুখ সমাজের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌ ও সাহিত্যিকরা এতে লেখেন। আপনিও পড়ুন, গ্রাহক হোন এবং নিয়মাবলীর জন্য লিখুন। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সডাক ৭০ টাকা, 'আজীবন সদস্য' চাঁদা ৭০০ টাকা (২০ বছরে নবীকরণসাপেক্ষ)। অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক/ড্রাফট্‌ 'রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর'—এই নামে হবে।

রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
নরেন্দ্রপুর, কলকাতা-১০৩

স্বামী অসক্তানন্দ
সম্পাদক, 'সমাজশিক্ষা'

ঋগ্বেদ-সংহিতা

গায়ত্রী মণ্ডল

প্রথম খণ্ড

শ্রীঅনির্বাণকৃত টীকা, ভাষ্য ও অনুবাদসহ

বেদ-বাণী নতুনভাবে উদ্ভাসিত হলেন
যুগ-প্রয়োজনে। বিজ্ঞানমনস্কতার সঙ্গে বোধির
অপূর্ব সঙ্গম—এমনটি আর দেখা যায়নি।
বোর্ড বাঁধাই তেরো+২৪৯ পৃষ্ঠা
দক্ষিণা : দুইশত টাকা

—— প্রাপ্তিস্থান ——

প্রকাশক : হৈমবতী-অনির্বাণ ট্রাস্ট
১/১ রমণী চ্যাটার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৯
দূরভাষ : ৪৬৪-২১৯৩
এবং
শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩



সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন

সহৃদয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ অর্থানুকূল্যে আমাদের ভগ্নপ্রায় স্কুলগৃহটি পুনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি।

১।	১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ	:	১,২০,০০০ টাকা
২।	দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ	:	৫,০০,০০০ টাকা
৩।	পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার	:	৫,০০,০০০ টাকা
৪।	আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প	:	১০,০০,০০০ টাকা
৫।	একখানা অ্যাম্বুল্যান্স (Ambulance)	:	৫,০০,০০০ টাকা
			২৬,২০,০০০ টাকা

A/c Payee চেক/ড্রাফট 'Ramakrishna Mission Ashrama, Ramharipur'—এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফট পাঠাবার ঠিকানা—সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা—বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৭, দূরভাষ : এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি

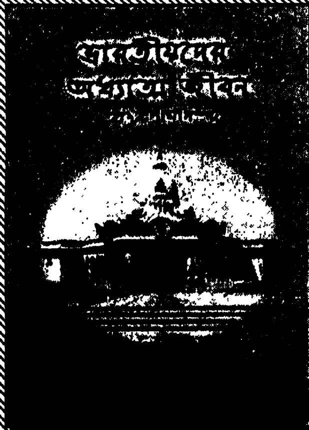
স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
রামহরিপুর, জেলা : বাঁকুড়া

উদ্বোধন-বাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের ৯২তম পদার্পণতিথি উপলক্ষ্যে



উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত

নতুন গ্রন্থাবলী



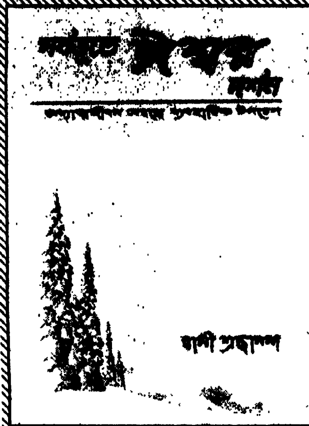
ভারতীয়দের
অধ্যাত্মজীবন
স্বামী রঙ্গনাথানন্দ
৫.০০



ব্যবহারিক বেদান্ত ও
মূল্যবোধ-বিজ্ঞান
স্বামী রঙ্গনাথানন্দ
৩০.০০



গিরিশচন্দ্র ও
অন্যান্য প্রসঙ্গ
নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
২৫.০০



সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন
স্বামী শ্রদ্ধানন্দ
৫০.০০



রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা
স্বামী প্রভানন্দ
৮০.০০

ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, সে কোথায় পড়ে আছে তা দেখেন না। 'ভাবগ্রাহী জনার্দন'।

শ্রীরামকৃষ্ণ

With Best Compliments from :

MODERN GUINEA HOUSE PRIVATE LIMITED

A JEWEL OF JEWELLERS



GOLD, DIAMOND, STONE MERCHANT

208, BIPIN BEHARI GANGULY STREET
(BOW BAZAR) KOLKATA-700 012
Phone : 241-6281/8203

Shop Remain Closed :
Sunday Full & Monday Upto 1.30 p.m.

"সত্যকে যে আঁকড়ে ধরে আছে ভগবানের কোলে সে শুয়ে আছে।"

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর অসীম কৃপা ও করুণাতে জন্মলগ্ন থেকে ঘাত-প্রতিঘাত ও সম্পাতের মধ্য দিয়ে আমাদের অগ্রগতি অব্যাহত। সকল শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আমাদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

[redacted]

শক্তিগড়, বিরাটী, কলকাতা-৭০০ ০৫১

প্রস্তুতকারক ঃ

বেবীপালী—BABYOIL

মাতৃস্নেহসম কাজ করে।
মায়েদের গর্ভকালীন দাগ মেটাতে সাহায্য করে।

SKINOPALI—নিম সমৃদ্ধ—SKIN CARE OIL

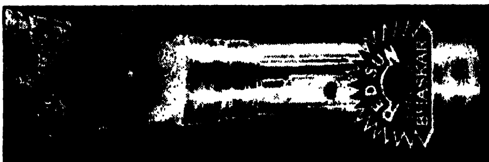
ত্বক পরিচর্যায় অপরিহার্য। গরমে ঘামাচি থেকে দেয় মুক্তি। চুলকানি ও বাতজ বেদনায় দেয় স্বস্তি। ফাটা গোড়ালি ও ঘামজনিত ঘায়ে দেয় আরাম।

আমি জানি ঠাকুর আমায় নিয়েছেন, তিনি সব সময়ে আমার সঙ্গে আছেন। আমি দুনিয়ার কাউকে ভয় করি না। যমকেও না।

গিরিশচন্দ্র

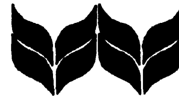
অন্ধকারে আলোর দিশা

RED SUN BRASS TORCH



SOURAV EX. IMPO (P) LTD.

22 CANNING STREET
ROOM NO. : 49 (5TH FLOOR)
KOLKATA-700 001
Phone : 210-4228, 220-7099



"QUALITY UPPER ASSAM TEAS FOR COLOUR, STRENGTH & BRISKNESS."

With Best Compliments from :

WARREN TEA LIMITED

31, CHOWRINGHEE ROAD
KOLKATA-700 016

TELEPHONE NOS. :
226-6611/13/14/18/49; 245-8190/8191

TELEGRAMS : WARRANTY

FAX NO. : 249-5980; 226-6716

With Best Compliments from :

DOBSON DISTRIBUTORS

88, DR. ABANI DUTTA ROAD
HOWRAH-711 101
PHONE : 666-1722
TELEFAX : 666-9969

Stockist

Serum Institute, Tablets India Ltd.,
Wallace Pharmaceuticals Ltd.,
Eli Lilly Ranbaxy, Pharmacia & Upjohn,
Orchid, Caplet,
Smith Kline Beecham (Vaccine),
Sunny Industries Pvt. Ltd.,
Midas Care, Arvind (S.K.K.L. Ltd.),
Neon Laboratories, Mayer,
Trio Pharma

মহামহোপাধ্যায়
দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত

বৃহদারণ্যকোপনিষদ্

(প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ভাগ)
প্রতি ভাগের দাম ঃ ১০০ টাকা মাত্র
আনন্দগিরিকৃত টীকা ও শাঙ্করভাষ্য সহ

স্বামী ওঁকারানন্দের

শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ ও ধর্মপ্রসঙ্গ

দাম ঃ ৪০ টাকা মাত্র

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই বইটি একটি মূল্যবান দলিল। —আনন্দবাজার পত্রিকা

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিঃ
২১ ঝামাপুকুর লেন ❑ কলকাতা ৭০০ ০০৯

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা উর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

With Best Compliments from :



TATA TEA LIMITED

Making a difference ... differently.

1, Bishop Lefroy Road
Kolkata-700 020

With Best Compliments From :

DIAMOND METAL PRODUCTS

Mfg. All Types of
Aluminium Pilfer Proof Caps

APOLO ELECTRIC BULB PVT. LTD.
27B/H/13/1, Chaulpatty Road
Kolkata-700010
Tele. : (O) 350-3901/353-1445
Fax : 350-6297
Mfg. G.L.S. Lamps & Night Lamps

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

কুক্‌মী
গুঁড়ো মশলা
কলকাতা

CAN YOU SURVIVE THE DANGERS OF CONTAMINATED BLOOD?



BLOOD. A unique gift of God.
Saviour of life when it is pure. Killer when it is impure or contaminated.
The onus is on us, as responsible citizens, to do our utmost to bring a change in the dismal scenario... to ensure that a Blood Bank supplies and receives only HEALTHY, SAFE AND CONTAMINATION-FREE BLOOD.

It is our right

Some alarming realities...

- In India, there are only 400 licensed Blood Banks supplying only 25% of the total needs.
- A vast majority of blood donors are *'professionals'* who donate 5-6 times in a month. They are mostly alcoholics and drug addicts, representing high risk groups for AIDS, hepatitis, etc.

Need of the hour...

- *Supply of contamination-free blood from licensed, quality-conscious Blood Banks.*
- *Motivate more and more voluntary, safe blood donors to replace 'professional' donors.*

ACTIONS

WHO

WHO Global Blood Safety initiative involving development of Integrated Blood Transfusion Services with selection of the *RIGHT DONORS AND PRESCREENING OF BLOOD TO ENSURE SAFE AND SECURE BLOOD TRANSFUSION.*

Government

- Established Blood Transfusion Councils at the National as well as State level.
- Strengthened Drug Control Administration in States for licensing and effective monitoring of Blood Banks in terms of adequacy of testing and storage facilities.

BLOOD SAVES ONLY WHEN IT IS SAFE.

একটি আবেদন

জয়শ্রী পার্ক উদ্‌ভাস স্প্যাসটিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বেহালা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের মানবিক সহায়তায় উৎসর্গিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থাটির পরিচালনায় আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী অভিভাবক-অভিভাবিকারা। এই রেজিস্টার্ড সংস্থাটি বিগত ১৯৯৫ সাল থেকে বেহালা অঞ্চলে কর্মরত। বেলুড় মঠের পরম পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ এবং অন্যান্য মহারাজদের অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদ-ধন্য এই জনকল্যাণমূলক সংস্থাটির উদ্দেশ্য ১০/১২টি ছেলেমেয়ের জন্য একটি আবাসিক গৃহ নির্মাণ এবং তৎসহ একটি সহায়তামূলক বহির্বিভাগ স্থাপন। জমি ক্রয় সহ এই উদ্দেশ্যে গৃহনির্মাণ প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে আনুমানিক ব্যয় ১০ লক্ষ টাকা।

"শিবজ্ঞানে জীবসেবা"র ভিত্তিতে এই প্রকল্পে সকলের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য সোসাইটির পক্ষ থেকে আবেদন জানাই। সহৃদয় দাতাগণের দান শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম অনুগ্রহস্বরূপ গৃহীত হবে।

যেকোন আর্থিক সহায়তা **'Jayshree Park Udbhas Spastic Welfare Society'**-র অনুকূলে অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফটে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানাই। দাতাগণের নাম এবং দানের অঙ্ক আমাদের বাৎসরিক স্যুভেনীর-এ প্রকাশিত হবে।

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা :
বি ২৯/১, জয়শ্রী পার্ক, কলকাতা-৩৪
ফোন : ৪৬৮-২৮৭৩

আগমনী মুখার্জী
সম্পাদিকা

নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের ওপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

✵

হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

✵

মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে, তার বিকাশই ধর্ম।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments From :

UTILITY INDUSTRIES & CHEMICAL WORKS

19Y, Raja Manindra Road, Kolkata-700037
Phone : 556-5543/6459

&

ASIMCO

22, Amalangsu Sen Road, Kolkata-700048
Phone : 556-5351/5543

Manufacturers of Phenyle. I.S.I., Lysol. I.P., Soaps, Antiseptic Lotions & Purified Water. I.P.

Dealers in all sorts of Medicines, Pharmaceuticals & Laboratory Chemicals.

With Best Compliments From :

AUTO REXINE AGENCY

House of Car Decoration
Specialist in Car-Air Conditioner

Office & Show Room :
31/A, Lenin Sarani, Kolkata-700 013
163, Lenin Sarani, Kolkata-700 013
Branch :
71A, Park Street, Kolkata-700 013
Phone : 244-1764/2184, 237-5435

ঘৃণার শক্তির চেয়ে প্রেমের শক্তি অনন্ত গুণে বেশি শক্তিমান।

স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments From :

M/S. BHARAT ENGINEERING STORES

36, Strand Road
2nd Floor, Room No. 13/A
Calcutta-700 001
Phone : 243-3576
Fax : 91-33-2209309

Approved/Reg. Govt. Supplier of Indian Ordnance Factories, Reputed Supplier of All Types of Induction Coils, Lamination Cores, Autotransformers and various Elec. items.

সেরা ফলন দেদার লাভ

লালন সুপার ফসফেট সার



প্রস্তুতকারক ঃ

সারদা ফার্টিলাইজার্স লিঃ

২, ক্লাইভঘাট স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০১

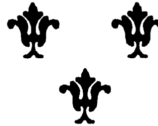
ফোন নং
অফিস ঃ ২২০-৫৪৩৫
রেসি. ঃ ৩৩৭-৭৩৬৫
মোবাইল ঃ ৯৮৩১০-১৯২৬৬

Haran Chandra Banerjee & Sons.

7C, CLIVE ROW, CALCUTTA-700 001

PAPER MERCHANTS, STATIONERS AND GOVT. SUPPLIERS

Phones : Office : 220-1700
Resi. : 665-9075



Distributors for :

TITAGHUR PAPER MILLS CO. LTD.
BENGAL PAPER MILLS CO. LTD.
SUPREME PAPER MILLS CO. LTD.
SIMPLEX MILLS CO. LTD.

With Best Compliments From :

AJIT AGARWAL

T-11 CIVIL TOWNSHIP
ROURKELA-4
PHONE : 501388



রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম

বৃন্দাবন, মথুরা, উত্তর প্রদেশ-২৮১১২১



রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন



সেবাশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে (১৯৬২) জওহরলাল নেহরু এবং স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ

একটি আবেদন

যুগপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে তীর্থস্থানের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে জীবনের শেষদিনগুলি অতিবাহিত করবার সঙ্কল্প করেছিলেন, শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের তপস্যাপূত সেই অতি প্রাচীন ও সনাতন ঐতিহ্যমণ্ডিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনধামে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র বাস্তব ও প্রত্যক্ষ রূপায়ণের জন্য ১৯০৭ সালে সূচনা হয়েছিল এক ক্ষুদ্র কর্মযজ্ঞের। যার ফলশ্রুতি আজ প্রায় ১৫১ শয্যাবিশিষ্ট 'মানুষের সেবাই ঈশ্বরের পূজা'-রূপ এক বৃহৎ মানবসেবা কেন্দ্র বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম।

সেবাশ্রমের সেবাকার্যের মধ্যে ১৫০টি শয্যাবিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসপাতালের ইন্ডোর ও আউটডোর বিভাগ ছাড়াও একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাবিভাগ, বিনা খরচে গরিব মেয়েদের ৩ বছরের নার্সিং ট্রেনিং, কুষ্ঠরোগী, দুঃস্থ ছাত্র, গরিব বিধবাদের নিয়মিত নানাপ্রকার সাহায্য করা হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবাশ্রমটি বৃন্দাবন তীর্থধামের অসহায় যাত্রিসাধারণ, ব্রজমণ্ডল ও দূর-দূরান্তের গ্রামবাসী এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সমস্ত রোগী-নারায়ণের একমাত্র ১০০% নিঃশুল্ক চিকিৎসাস্থান যা কোনরকম সরকারি সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র ভক্তদের দান দ্বারাই চলে।

মা ও শিশুদের ভালভাবে দেখাশুনা ও নার্সদের এব্যাপারে ভালভাবে প্রশিক্ষণের জন্য ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের নির্দেশে ৩০ শয্যার স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ম্যাটারনিটি ওয়ার্ড তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এব্যাপারে সমাজের সহৃদয় সর্বস্তরের মানুষ ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগীদের কাছে এই নিঃশুল্ক সেবাকার্য অব্যাহত ও সুসম্পন্ন করার জন্য আর্থিক সহযোগিতার আবেদন করছি।

৩০ আসনবিশিষ্ট নতুন প্রসূতিসদন নির্মাণব্যয়	৬০ লাখ
যন্ত্রপাতি	২০ লাখ
অপারেশন থিয়েটারের সংযোজন ও পুনর্নির্মাণ	১০ লাখ

আমাদের বিশ্বাস সর্বস্তরের মানুষের সহানুভূতি, সহযোগিতা ও বদান্যতায় মিশনের এই নিঃশুল্ক সেবাকার্য কালে মহীরুহ হয়ে উঠবে। সেবাশ্রমে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত।

নার্সিং স্কুলের প্রসপেক্টাস ১ এপ্রিল থেকে দেওয়া হয়। এছাড়া কোন সহৃদয় অবসরপ্রাপ্ত/প্রাক্তন **Army Doctor** এই সুন্দর পরিবেশে থেকে স্বেচ্ছাসেবিরূপে অথবা কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমাদের সেবাব্রতে অংশগ্রহণ করতে চাইলে তাঁর/তাঁদের উদ্দেশে আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

আর্থিক দান চেক বা ড্রাফটে পাঠালে **'Ramakrishna Mission Sevashram, Vrindaban'**—এই নামে পাঠাতে হবে।

বিনীত নমস্কারান্তে

স্বামী সুপ্রকাশানন্দ
অধ্যক্ষ

শ্রীশ্রী সারদামায়ের
মন্ত্রশিষ্য
ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য
প্রণীত

স্মৃতিমূলক জীবনীগ্রন্থ

- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
- শ্রীশ্রী সারদাদেবী
- স্বামী সারদানন্দের জীবনী
- শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ
- ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা
- প্রেমানন্দ-প্রেমকথা
- জীবন পরিক্রমা



আমাদের প্রকাশিত আরও বিভিন্ন
স্মৃতিমূলক জীবনীগ্রন্থ

বিশ্বনাথ দে
- রবীন্দ্রস্মৃতি

ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত
- বিবেকানন্দ স্মৃতি
- বঙ্কিম স্মৃতি
- রামমোহন স্মৃতি
- মধুসূদন স্মৃতি
- বিদ্যাসাগর স্মৃতি
- নজরুল স্মৃতি
- শরৎ স্মৃতি
- মা টেরেসা
- বায়রণ
- শেলী

শ্রী মোহিত কুমার বসাক
- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্মৃতি
- অরবিন্দ স্মৃতি
- নিবেদিতা স্মৃতি
- কিশোর শহীদ স্মৃতি
- সুভাষ স্মৃতি

সুবোধ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
- সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন
- *The Early life of Netaji*

সমরে গুহ
- নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা
- *Netaji Dead or Alive*





ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
☎ ২৪১-০৯৬৫ / ৯৪০৪



কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ২

গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

জেলা : হাওড়া

- **রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম** ❑ বেলুড় মঠ
- **রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম**
  ৪ নস্কর পাড়া লেন, পিন-৭১১ ১০১
- **সাঁত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**
  নর্থ বাকসাড়া, পোঃ জগাছা, পিন-৭১১ ৩১১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**
  গ্রাম+পোঃ মোল্লাহাট
  থানা : শ্যামপুর, পিন-৭১১ ৩১৪
- **মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়**
  গ্রাম+পোঃ মাকড়দহ, পিন-৭১১ ৪০৯
- **বালী গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  রবীন্দ্র পল্লী (সাঁপুইপাড়া)
  পোঃ সাঁপুইপাড়া (বালী), পিন-৭১১ ২২৭
- **সারদা বুক এজেন্সি**
  ১৫/৬ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন
  কদমতলা, পিন-৭১১ ১০১
- **শুকদেব সাঁতরা** ❑ গ্রাম : উত্তর পীরপুর
  পোঃ বানীবন, ভায়া : উলুবেড়িয়া, পিন-৭১১ ৩১৬
- **নির্মল ঘোষ**, ৬ রায় জে. এন. রায়বাহাদুর রোড
  বালী-৭১১ ২০১, ফোন : ৬৫৪-৪০৪৫
- **পাণিত্রাস বিবেকানন্দ সেবা সমিতি**
  গ্রাম+পোঃ পাণিত্রাস, পিন-৭১১ ৩২৫
- **হাঁটাল আঞ্চলিক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  হাঁটাল, পিন-৭১১ ৪০৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**
  সাঁকরাইল ভারত কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি
- **শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা মন্দির**
  জয়চণ্ডীতলা, প্রামাণিক পাড়া, ডোমজুড়, পিন-৭১১ ৪০৫
- **শ্রীমা সারদা ও শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  শুঁড়িখালি, খলিসানি, কালীতলা
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ সঙ্ঘ**
  ঘোষপাড়া বাজার, বালী, ফোন : ৬৭১-০৫৭৯
- **মাকড়দহ (২) অঞ্চল বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সমিতি**
  জোতগিরি, পোঃ লক্ষ্মণপুর, পিন-৭১১ ৩২৩
- **শ্রীশ্রীসারদা আশ্রম, জঙ্গলপুর**
  পোঃ আর্গোরি, পিন-৭১১ ৩০২
- **শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**, বি. গার্ডেন
  ৮/৩ বি. জি. লেন, পিন-৭১১ ১০৩
- **জোঁকা রামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম**, গ্রাম+পোঃ জোঁকা
  থানা—উদয়নারায়ণপুর, পিন-৭১১ ২২৬
- **বেলপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  গ্রাম : বেলপুকুর, পোঃ অযোধ্যা
  পিন-৭১১ ৩১২
- **শ্যামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘ**
  গ্রাম ও পোস্ট : অযোধ্যা (বেলপুকুর)
  পিন-৭১১ ৩১২

জেলা : মেদিনীপুর

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, তমলুক-৭২১ ৬৩৬
  ফোন : ৬৬০০৫/৬৬৭৬২
- **রামকৃষ্ণ মঠ**, পোঃ মঠ চণ্ডীপুর-৭২১ ৬৫৯
  ফোন : ৭২২১৮
- **রামকৃষ্ণ মঠ**, গড়বেতা, পোঃ আমলাগোড়া-৭২১ ১২১
  ফোন : ৬৫২০০
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**, পাঁশকুড়া-৭২১ ১৫২
- **খড়গপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**
  খড়গপুর-৭২১ ৩০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, ঘাটাল-৭২১ ২১২
- **কাঁথি নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ**, আঠিলাগরি, কাঁথি-৭২১ ৪০১
- **কৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, খড়ার-৭২১ ২২২
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**, খড়ার-৭২১ ২২২
- **দাসপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, দাসপুর-৭২১ ২১১
- **ক্ষীরপাই রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম**, ক্ষীরপাই-৭২১ ২৩২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র**, জাড়া-৭২১ ২৩২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**, চন্দ্রকোণা টাউন-৭২১ ২০১
- **জ্ঞানরঞ্জন হোতা**
  প্রযত্নে কুঠিঘাট রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ
  গোপীবল্লভপুর, পিন-৭২১ ৫০৬
- **খাসবাজার বিবেকানন্দ যুবপাঠচক্র**
  রাধাচন্দনপুর-৭২১ ১৬০
- **হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন**
  হলদিয়া অ্যাঙ্কারেজ ক্যাম্প, হলদিয়া পোর্ট-৭২১ ৬০৫
- **মোহনপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ মোহনপুর, পিন : ৭২১ ৪৩৬
- **রাধামোহনপুর রামকৃষ্ণ মিলন মন্দির**
  গ্রাম+পোঃ রাধামোহনপুর, পিন-৭২১ ১৬০
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা ও বিবেকানন্দ স্মরণতীর্থ**
  গ্রাম+পোঃ তাজপুর, পিন-৭২১ ৬৫৬
- **শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়**
  গ্রাম+পোঃ ধনেশ্বরপুর, পিন-৭২১ ১৬৬

সৌজন্যে
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ
৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯



All the secret of success is there : to pay as much attention to the means as to the end.

Swami Vivekananda



With Best Compliments From

DATTA FOOTWEAR INDUSTRIES PVT. LTD.

Regd. Office & Factory :

1, BIDHAN SARANI, KOLKATA-700 073

PHONE : 241-5248 ❑ FAX : (033) 241-7541

Unit-II

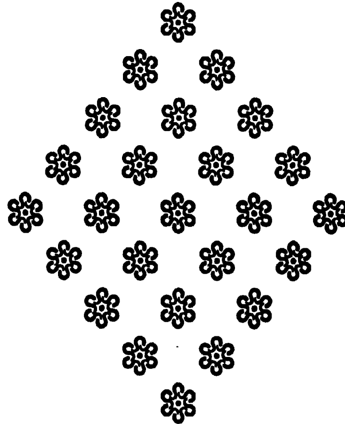
180, EAST SINTHI ROAD, KOLKATA-700 030

PHONE : 548-4500

With Best Compliments From :

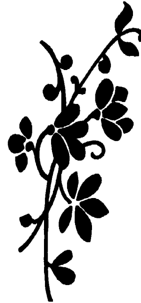
H. K. GHOSE & CO.

Paper Merchants & Exercise Book Makers



WARDLEY HOUSE
25A, SWALLOW LANE, KOLKATA-700 001
PHONE : 220-5209

With Best Compliments From :



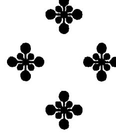
B. S. SUNDARIYA & SONS

146/2, OLD CHINA BAZAR STREET
CALCUTTA-700 001

PHONE : 242-4867

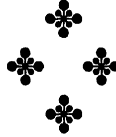
রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে যায়। অবতারেরাও সেইরকম সহস্র সহস্র লোকেদের ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ



মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার দিকে এগোতে চায় না। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আন্তরিক খুব যত্ন ও রোখ চাই।

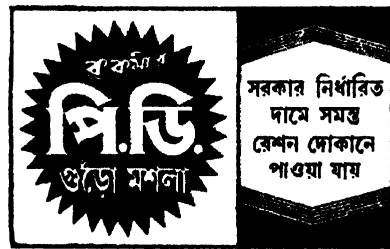
শ্রীমা সারদাদেবী

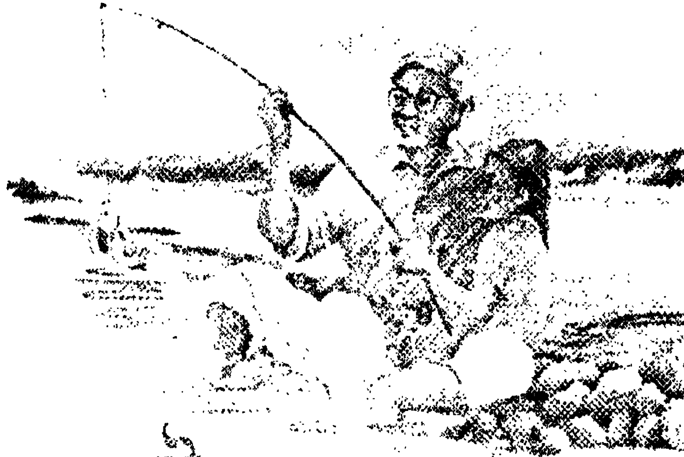


যে-দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয়, সে-দেশ ক্রমশ ধর্মহীন হইয়া দাঁড়ায়। ভারতে কখনো এরূপ চেষ্টা হয় নাই। সেইজন্য এখানে প্রকৃত ধর্মভাব এখনো জাগ্রত।

স্বামী বিবেকানন্দ







উপভোগ করুন নিরাপত্তাপূর্ণ
সুখী জীবনের পরম আনন্দ

পিয়ারলেস এম.আই.এস : ২০০০



মেয়াদ	[illegible]	জমারাশি
১ বৎসর	[illegible] টাকা : প্রথম বর্ষে	১,০০,০০০ টাকা
২ বৎসর	[illegible] টাকা : দ্বিতীয় বর্ষে	(ন্যূনতম ১০,০০০ টাকা
২½ বৎসর	[illegible] টাকা : দ্বিতীয় বর্ষের পরে	ও ৫,০০০ টাকার গুণিতকে
২½ বৎসরে	মোট ২১,[illegible] টাকা	যেকোন উচ্চরাশি)

মূল বৈশিষ্ট্যগুলি :

- গ্যারান্টিযুক্ত প্রাপ্তি
- অগ্রীম পোস্টডেটেড চেক—পুরো আর্থিক বৎসরের
- উচ্চ লিকুইডিটি
- [illegible] তুলনামূলকভাবে স্বল্প মেয়াদি প্রকল্পগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ প্রাপ্তি
- তিনমাস পরে জমারাশির [illegible] পর্যন্ত ঋণ পাওয়ার সুবিধা

ম্যাচিওরিটি দাবীপূরণের মোট পরিমাণ :
প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা



পিয়ারলেস
সঞ্চয়ের সহজ পথ
Estd 1932
আস্থার প্রতীক
Website http://www.peerless-in-india.com

ARUN S[illegible]

UDBODHAN
Phone : 554-2248, 554-2403
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com

Vol. 103 ❑ No. 6
❑ JUNE 2001 ❑

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No.
TECH/WB/RNP-15/LPWP-01/2001

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Regn. No.
TECH/WB/RNP-15/2001

উদ্বোধন

১০৩তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র



❑ গত ১লা মাঘ ১৪০৭ (১৫ জানুয়ারি ২০০১) **উদ্বোধন ১০৩তম বর্ষে** পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় **নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব** নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের **১০২ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম** ❑

❑ **বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন** একটি ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র মাত্র নয়, **উদ্বোধন** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। **ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের** সঙ্গে এবং **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন** ও **রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের** সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের** একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তে হবে।

❑ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে **উদ্বোধন** নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন** একটি সার্থক **পারিবারিক পত্রিকা**। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন**-এ প্রকাশিত হয়।

❑ উদ্বোধন শুধু **বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা** নয়, **উদ্বোধন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ পত্রিকা** এবং **বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক পত্রিকা**।

❑ ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র হয়েও **উদ্বোধন** তার মহান প্রবর্তকের নির্দেশ অনুসারে **কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আদর্শের মুখপত্র নয়। উদ্বোধন** তার **সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বিগত ১০২ বছর** ধরে অটুট রেখেছে।

❑ **উদ্বোধন**-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার **গ্রাহক** হওয়া নয়, একটি **মহান ভাবাদর্শ** ও ভাবান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

❑ **উদ্বোধন** একটি পত্রিকা মাত্র নয়, **উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী** এবং **স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর**।

❑ **স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন** যেন থাকে। উদ্বোধন-এর প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে গ্রাহক করলেই এখনি **উদ্বোধন-এর গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার** হয়ে যায়। তাই আপনার **নিজের গ্রাহক হওয়াই** যথেষ্ট নয়, **অন্যদের গ্রাহক করাও** আপনার কাছে **স্বামীজীর প্রত্যাশা**। স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের **গর্বিত** দায়িত্ব **আমাদের সকলের**। অবশ্য **ইন্টারনেট সংস্করণের** মাধ্যমে **উদ্বোধন আজ ভারত ও বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ঘরে** ঘরে পৌঁছে গিয়েছে।

❑ **স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা**। সেকথা স্মরণ করে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে অনুরাগী ও ভক্তগণ **উদ্বোধন-এর** প্রতি নিশ্চয়ই তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

❑ **উদ্বোধন-এর শারদীয়া সংখ্যাটির জন্য গ্রাহকদের** থেকে **আলাদা মূল্য নেওয়া হয় না**। এই সংখ্যাটি গ্রাহকদের জন্য আমাদের **শারদ উপহার**। প্রসঙ্গত সকলের অবগতির জন্য জানাই যে, **শারদীয় সংখ্যাটি** আকারে সাধারণ সংখ্যার **তিনগুণ** এবং বিশেষ সংখ্যা হওয়ায় অলঙ্করণের জন্য খরচও হয় যথেষ্ট। **গত কয়েক মাসে কাগজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি** এবং **অন্যান্য ব্যয়বৃদ্ধির** পরিপ্রেক্ষিতে শারদীয়া সংখ্যা সহ **গ্রাহক-পিছু আমাদের বার্ষিক খরচ দাঁড়িয়েছে মুদ্রিত গ্রাহকমূল্যের সওয়া তিন গুণ**। বিপুল অঙ্কের এই অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য আমরা নির্ভর **করি** সহৃদয় বিজ্ঞাপনদাতাদের সক্রিয় সহযোগিতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক বদান্যতার ওপর।

❑ **পত্রিকা প্রকাশ সংক্রান্ত ব্যয় প্রতি বছর বেড়ে গেলেও তিন বছর (১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০১) 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এত সুলভ মূল্যে এমন সম্পূর্ণ পত্রিকা বাঙলা ভাষায় আর একটিও নেই।**

❑ **উদ্বোধন**-এর সেবায় তিনটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি **'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল'**, অন্য দুটি যথাক্রমে **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** এবং **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'**। **উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 'Ramakrishna Math, Baghbazar'**—এই নামে পাঠাবেন। **ঠিকানা : সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩**। দাতার চিঠিতে বা M.O. কুপনে 'উদ্বোধন পত্রিকার সেবায়' অথবা **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** অথবা **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'**-এর জন্য যেন লেখা থাকে।

❑ **উদ্বোধন-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে** মতিলাল-তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাঁদের পুত্রকন্যাদের পক্ষে **স্থায়ী** ভিত্তিতে 'উদ্বোধন মেধা সম্মান' **(একবছরের জন্য উদ্বোধন-এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি)** নিবেদিত হয়েছে। **পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের** যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। **২০০১ সালের** জন্য অনুরূপ সম্মান সুকুমার-বিভারানী পাড়ুই-এর স্মৃতিতে তাঁদের পুত্র অমর পাড়ুই নিবেদন করেছেন। **এই সম্মানপ্রাপকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্ষদ পরিচালিত ২০০০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় 'সম্মান'-এর জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বোধন-সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ** করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বামী সর্বগানন্দ
সম্পাদক

সৌজন্যে

পি. বি. সরকার অ্যান্ড সন্স

(কোন ব্রাঞ্চ নেই)

জুয়েলার্স

সন অ্যান্ড গ্র্যান্ড সন্স অব লেট বি. সরকার

৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০ ❑ ফোন : ২২৩-৮৭১৩, ২২৩-৭৫৭৮


उद्बोधन
॥ ॥



"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিং
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

আনন্দবাজার পত্রিকা

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১



বড় মাপের সাফল্যের জন্য চাই বড় মাপের সুরক্ষা

আপনার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানানসই পলিসি বেছে নিন

এলআইসি'র জীবন শ্রী (তালিকা নং ১১২)

(নিশ্চিত যোগদানসহ লাভ রহিত পলিসি)

পেশাদার, উচ্চপদস্থ এক্সিকিউটিভ ও সফল ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ভাবে সৃষ্টি করা। কোম্পানিরা তাঁদের মুখ্য ব্যক্তিদের জন্য এই পলিসি নিতে পারেন।

সুবিধা

মেয়াদপূর্তিতে বা তার আগে মৃত্যু ঘটলে আশ্বাসিত অঙ্ক প্রদান, তৎসহ প্রতি বছরে আশ্বাসিত অঙ্কের প্রতি হাজারে টা. 75/- হারে নিশ্চিত যোগদান এবং সম্ভাব্য আনুগত্য যোগদান, যদি কিছু থাকে।

যোগ্যতা

বয়স: ১৮ বছর থেকে ৬০ বছর
পলিসির মেয়াদ ৫ বছর থেকে ২৫ বছর
ন্যূনতম আশ্বাসিত অঙ্ক টা. ৫ লক্ষ



লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

Insurance is the subject matter of the solicitation — Please visit: www.licindia.com



রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ

পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া-৭১১ ২০২, ফোন ঃ ৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২

সারদাপীঠ থেকে প্রকাশিত অডিও ক্যাসেটসমূহ

মূল্য ❑ SP-1 ও SP-31–34 ঃ ৩৫ টাকা, অন্যান্য ঃ ৩০ টাকা

SP-1	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্	সংস্কৃত ও বাঙলা
SP2, SP-7, SP-8, SP-10 হইতে 12	কথামৃতের গান (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড)	বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি
SP-3	শ্রীরামনামসংকীর্তন	সংস্কৃত ও হিন্দি
SP-4	বক্তৃতা—যুগপুরুষ	বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত
SP-5	শ্রীশ্রীচণ্ডীস্তব (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ)	বাঙলা, সংস্কৃত
SP-6	শিবমহিমা	বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি
SP-9	শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি
SP-13	শ্রীসারদাবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা
SP-20	বিবেকানন্দবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা
SP-24	শ্রীকৃষ্ণবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি
SP-14 হইতে SP-16	কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)	বাঙলা
SP-17	বীরবাণী	সংস্কৃত, বাঙলা, ইংরেজী ও হিন্দি
SP-18	গীতিবন্দনা	হিন্দি
SP-19	বক্তৃতা—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান	বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত
SP-21 ও SP-22	সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড)	হিন্দি
SP-23	ওঠো জাগো	হিন্দি
SP-25	শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি	হিন্দি
SP-26	বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি	হিন্দি
SP-27	বেদমন্ত্র	সংস্কৃত উপনিষদের মন্ত্রসমূহ
SP-28	সরস্বতী বন্দনা	বাঙলা, সংস্কৃত
SP-29	**Ramakrishna Movement**	Lecture by Revered Srimat Swami Bhuteshanandaji Maharaj
SP-30	**Religion in Practice**	do
SP-31 হইতে SP-34	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ) (১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড)	মূল সংস্কৃত এবং প্রতি অধ্যায়ের মুখবন্ধ
SP-35	আগমনী	বাঙলা
SP-36	ভজন সুধা	হিন্দি

শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্, শ্রীরামনামসংকীর্তন ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার C. D. প্রকাশিত হয়েছে।

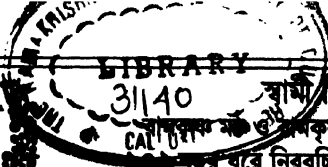
স্বামী সর্বগানন্দ, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ, স্বামী দিব্যব্রতানন্দ, শ্রীমহেশরঞ্জন সোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য দক্ষ শিল্পিগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন।

Video Cassette :
Centenary Celebration of the Ramakrishna Mission at Belur Math in 1998.
Duration—80 minutes
Rs. 250.00

প্রাপ্তিস্থান ঃ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি (কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক)

ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে M.O. অথবা Bank draft মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে।

0 1 AUG 2001



উদ্বোধন ॥১০৩॥

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
... বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র

১০৩তম বর্ষ | ৭ম সংখ্যা | শ্রাবণ ১৪০৮ | জুলাই ২০০১

প্রচ্ছদ ❑ ওপরে কৈলাস, নিচে মানস সরোবর। মানস সরোবরে সন্তরণরত হংসযুগল—লোকবিশ্বাসে, হর-পার্বতী।

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ



সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'

প্রচ্ছদ ❑ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ ❑ আলোকচিত্র : বেলুড় মঠের জনৈক সন্ন্যাসী

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ : ৬৫ টাকা; সডাক : ৭৫ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য : ৮ টাকা ❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) : ৩০০০ টাকা [একবছরের মধ্যে পরিশোধ্য কমপক্ষে ৫০০ টাকা প্রতি কিস্তি হিসাবে ৬টি কিস্তিতেও প্রদেয়]



'উদ্বোধন' ঃ আশ্বিন (শারদীয়া) ১৪০৮ সংখ্যা

গ্রাহকদের জন্য জরুরী বিজ্ঞপ্তি

- যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও 'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন/সেপ্টেম্বর (শারদীয়া) সংখ্যা প্রকাশিত হবে। মূল্য ঃ ৪০ টাকা।
- 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে না। গ্রাহকরা ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে অগ্রিম টাকা জমা দিলে অতিরিক্ত প্রতি কপি ৩০ টাকায় পাবেন। অতিরিক্ত কপি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিলে পাঠানোর খরচ বাবদ অতিরিক্ত ২২ টাকা (প্রতি কপির জন্য) জমা দিতে হবে। কপিটি অগ্রিম জমার ক্যাশমেমো দেখিয়ে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে ৫ অক্টোবর ২০০১ পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে। এর পরে এলে কার্যালয়ে কাজের অসুবিধা হয় বলে, আমরা নিশ্চয় করে কিছু বলতে পারি না।
- শারদীয়া সংখ্যাটি সাধারণ ডাকে না পেলে আমাদের পক্ষে সংখ্যাটির ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সাধারণ ডাকে আমরা পাঠাতে চাই না।
- ডাকযোগে (By Post) যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা এই সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ করতে চাইলে ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে সেই সংবাদ কার্যালয়ে অবশ্যই পৌঁছে দেবেন।
- যাঁরা ডাকযোগে (By Post) পত্রিকা নেন, তাঁরা চাইলে শারদীয়া সংখ্যাটি রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে পারেন। সেজন্য তাঁদের প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ২২ টাকা পাঠাতে হবে। তবে ঐ সংক্রান্ত সংবাদ এবং ২২ টাকা গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে অবশ্যই কার্যালয়ে এসে পৌঁছানো প্রয়োজন।
- যাঁরা আমাদের গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সডাক গ্রাহক হয়েছেন/নবীকরণ করেছেন, তাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি ঐ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে সংগ্রহ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রগুলিতে ২০ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে সেই সংবাদ জানাতে হবে, যাতে তারা আমাদের কাছে ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে সংবাদটি দিতে পারে।
  - শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহের সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে তাঁদের পত্রিকা ডাকযোগেই (By Post) যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
  - মনে রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ করার সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক। উল্লেখ না থাকলে অথবা কোন একটিমাত্র উল্লেখ করলে সংবাদটি গ্রাহ্য হবে না।
  - প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া সত্ত্বেও অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে জানান এবং তাঁদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহকদের সহৃদয় সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।
  - কিছু অসৎ ব্যক্তি কোন কোন গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যা কোনভাবে সংগ্রহ করে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের শারদীয়া সংখ্যা সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা যাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ করবেন, তাঁদের বিশেষভাবে জানানো হচ্ছে যে, শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় তাঁদের নবীকরণ/ গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/M.O. প্রাপ্তি-কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে (যদি ক্যাশমেমো/রসিদ/M.O. প্রাপ্তি-কুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে সেই মর্মে সম্পাদকের কাছে তা লিখিতভাবে জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে) নতুবা আমাদের পক্ষে তাঁদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না। আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে এব্যাপারে আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।
- কার্যালয় কাজের দিন (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ পর্যন্ত এবং শনিবার বেলা ১-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা, রবিবার বন্ধ থাকে।
- ১৭ সেপ্টেম্বর মহালয়া এবং ২৩ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর ২০০১ পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে। পূজাবকাশের পর ২ নভেম্বর ২০০১ শুক্রবার কার্যালয় খুলবে।

সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইন্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯

LIBRARY
CALCUTTA
01 AUG 2001

দিব্য বাণী



চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্।।

—সাধকের চিত্তদর্পণকে যা নির্মল করে (দোষমুক্ত করে), সংসাররূপ মহাদাবাগ্নিকে নির্বাপিত করে (সংসার দহনজ্বালা জুড়ায়), শ্রেয় (মুক্তি বা কল্যাণকর যাকিছু)-এর ওপর জ্যোৎস্না (আলো) নিক্ষেপ করে, যা পরাবিদ্যা (ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায়)-র জীবনস্বরূপ (প্রাণস্বরূপ অর্থাৎ সারকথা), যা আনন্দসাগরের স্ফীতি বাড়ায়, প্রতি পদে পূর্ণ অমৃত পরিবেশন করে, (হরি রসে) সকল আত্মাকে (সকল সাধক ভক্তকে) অবগাহিত (স্নান) করায়, সেই শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনই সর্বত্র জয়যুক্ত হয়ে থাকে (বা তার জয় হউক)।

*

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।

—শ্রীহরির কীর্তন অহর্নিশ কে করেন? যথার্থ হরিভক্ত কোন্ জন? যিনি তৃণের চেয়েও অবনত, বৃক্ষের চেয়েও সহিষ্ণু, আত্মাভিমান-ত্যাগী, অপরকে সম্মান প্রদর্শনে দক্ষ। এই গুণে ভূষিত হয়েই ভক্ত অহোরাত্র শ্রীহরিসঙ্কীর্তন করবেন।

*

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি।।

—ভক্তের ব্যাকুল আর্তিতে ধন, জন, মান, ঐশ্বর্য, ইন্দ্রিয়সুখের কোন স্থান নেই। এমনকি সর্বজ্ঞত্বও ভক্ত চান না। তাঁর লক্ষ্য একটিই, জন্মে জন্মে যেন শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধ অহৈতুকী ভক্তি হয়। [আসলে উত্তমপুরুষে এই নিবেদন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর। যখন বলছেন—'মম জন্মনি জন্মনি', তার অর্থ আমার জন্মে জন্মে যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা অহৈতুকী ভক্তিলাভ হয়।]

—মহাপ্রভু বিরচিত 'শিক্ষাষ্টকম্' থেকে

গুরুতত্ত্ব

('গুরুপূর্ণিমা' উপলক্ষ্যে বিশেষ সম্পাদকীয় নিবন্ধ)

শিষ্য গুরুকে শুধাইল ঃ কেমন ব্যাকুলতা হইলে ঈশ্বরের দর্শনলাভ হইতে পারে? গুরু কহিলেন ঃ বুঝাইতেছি, আইস। অতঃপর শিষ্যকে গুরু একটি জলাশয়ে লইয়া গেলেন। জলের ভিতর শিষ্যকে ডুব দিতে বলিলে যেই সে ডুবিয়াছে, গুরু বলপূর্বক তাহাকে চুবাইয়া ধরিলেন। খানিক পরে তাহাকে ছাড়িয়া দিলে শিষ্য হাঁসফাঁস করিয়া ভাসিয়া উঠিল। গুরু শুধাইলেন ঃ কেমন বোধ হইতেছিল? শিষ্য কহিল ঃ প্রাণ আটুবাটু করিতেছিল। গুরু কহিলেন ঃ ঐরূপ ঈশ্বরের জন্য যখন প্রাণ আটুবাটু করিবে, জানিও তোমার ঈশ্বরদর্শনের আর বিলম্ব নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ এই গল্পটি ভক্তদের শুনাইতেন। কহিতেন ঃ "ঈশ্বরের জন্য প্রাণ আটুবাটু করলে জানবে যে দর্শনের আর দেরি নাই। অরুণ উদয় হলে—পূর্বদিক লাল হলে বুঝা যায় সূর্য উঠবে।" পূর্বদিক লাল হইবার একটি গূঢ় অর্থ আছে। তাহা হইল শিষ্যের 'আধিকারিত্ব' অর্জন। আধিকারিত্ব না থাকিলে চরম উপলব্ধি সে করিতে পারিবে না। প্রাণ আটুবাটু করিলে বুঝিতে হইবে, শিষ্যের অধিকার জন্মিয়াছে।

মনুষ্যসমাজে দেখা যায় বিভিন্ন বিষয়ে আমরা খুব অধিকার-সচেতন। কিন্তু কর্তব্য-সচেতনতা অপেক্ষাকৃত কম। যেমন 'স্নাতক' ডিগ্রী লাভ হইলে তাহার এক প্রকার, স্নাতকের সহিত 'বি-এড্' ডিগ্রী থাকিলে তাহার অধিকার অন্যপ্রকার। সার্টিফিকেট একটি চাই-ই। উহাই তাহার অধিকার নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। সার্টিফিকেটে লেখা রহিয়াছে 'এই ব্যক্তি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ'। অমনি উদ্দিষ্ট ব্যক্তির অধিকার নির্ধারিত হইয়া গেল! এবং অসংখ্য অযোগ্য ব্যক্তি আজ সমাজের প্রত্যেক স্তরে এইরূপ একাধিক 'সার্টিফিকেট' লইয়া ঘুরিতেছে। আরো আশ্চর্য, কলিযুগের মাহাত্ম্যই বলিতে হয়, যিনি সার্টিফিকেট দিতেছেন, তাঁহারই যোগ্যতা নাই! একটি 'চোর' তাহারই সমগোত্রীয় আরেকজনকে 'সার্টিফিকেট' দিয়া দিল—'এই ব্যক্তি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক এবং অত্যন্ত সাধুচরিত্র'। উহা বড় বড় হরফে সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হইল। সাধারণ অজ্ঞ মানুষ জানিল, ইনি (চোর) যথার্থ সাধুচরিত্র বটে!

কিন্তু প্রাকৃতিক 'অধিকারবাদ' সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। বিশ্বপ্রকৃতি আজ যে-পর্যায়ে উত্তীর্ণ হইয়াছে, মনুষ্য-সমাজ আজ যে-অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, তাহা একদিনে হয় নাই। জিরাফের ঘাড় লম্বা। একদিনে তাহা হয় নাই। অর্থাৎ ধীরে ধীরে ক্রমবিবর্তনের পথে যথার্থ অধিকার অর্জন করিতে পারিলে, প্রকৃতিদেবী তাহাকে তাহার নির্দিষ্ট আসন দান করেন। জৈবিক বিবর্তনবাদ অনুযায়ী 'যোগ্যেরই বাঁচিবার অধিকার' তত্ত্বটি কাহারো অবিদিত নহে। বহু লক্ষ বৎসর ধরিয়া এই বিবর্তন সংঘটিত হইয়া আজ প্রত্যেক বস্তু তাহার নিজ অধিকার অনুযায়ী জগতে স্থান পাইয়াছে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজ অধিকার অনুযায়ী জগতে স্থান করিয়া লইয়াছে। আন্দোলন করিয়া গলা ফাটাইয়া চিৎকার করিলেই উহা প্রকৃতিদেবীর শ্রবণগোচর হয় না। অধিকার অর্জন করিতে হয়। এবং একথাও সত্য যে, এই অধিকার অর্জনের রহস্যটি সম্যক বুঝিলে ঐ কাজটি সহজতর হয়। এই রহস্য কোন ব্যক্তির পক্ষে বুঝা দুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য নহে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন ঃ ভগবান পিঁপড়ের পায়ের নূপুরধ্বনিও শুনিতে পান। কে নীরবে, নিভৃতে ঈশ্বরের জন্য কাঁদিয়াছে তাহা ভগবানকে সংবাদপত্র পড়িয়া জানিতে হয় না। তিনি অন্তর্যামী, তাই তিনি তাহা টের পান।

প্রসঙ্গ ঃ সমাজ ও গুরুবাদ

সামাজিক প্রেক্ষাপটে 'গুরুতত্ত্ব' বা 'গুরুবাদ'-এর প্রাসঙ্গিকতা বহুল পরিমাণেই রহিয়াছে। অবশ্য আধ্যাত্মিক প্রেক্ষিতে এই গুরুতত্ত্বের অসীম প্রয়োজনীয়তা, অনন্ত মহিমা। সে-কথায় পরে আসিতেছি। বর্তমানে 'প্রাইভেট টিউশান'-এর রমরমা চলিতেছে। আমাদের শৈশবকালে দেখিতাম 'প্রাইভেট টিউশান' ছাত্রছাত্রীরা প্রায় লুকাইয়া পড়িতেছে। ইহা ছাত্রের দৌর্বল্য সূচিত করে বলিয়া কিছুটা লজ্জাকর ছিল। আধুনিক সমাজে ইহা আভিজাত্যের প্রতীক! পুত্র পাঁচটি 'টিউশান' পড়িলে পিতামাতার বুক গর্বে ফুলিয়া উঠে! যাহাই হউক আমাদের বক্তব্য হইল, এই 'প্রাইভেট টিউশান'ও তো গুরুবাদের নামান্তর মাত্র। কেবল শিক্ষাক্ষেত্রে নহে, বাণিজ্য, কৃষি, পশুপালন, স্থাপত্যবিদ্যা, ইঞ্জিনীয়ারিং, কম্পিউটার, নৃত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, দারুশিল্প, স্বর্ণশিল্প হইতে শুরু করিয়া এমনকি ক্ষৌরকর্ম, মায় জুতাসেলাই পর্যন্ত সর্বত্রই কিছু 'ট্রেনিং'-এর দরকার হয়। দোকানে দোকানে গানের অসংখ্য রেকর্ড রহিয়াছে। গান শিখিতে চাহিলে কিন্তু একজন

'মাস্টার' চাই। রেকর্ড শুনিয়া গান শিখিয়া গাইলে নিজের মন ভরিতে পারে, অথবা অন্তরঙ্গ বন্ধু-পরিজনের মন ভরিতে পারে, ঐটুকুই! তাহার দ্বারা 'গানে ভুবন ভরিয়ে দেওয়া' সম্ভব নহে। তাহার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ অবশ্যই দরকার।

আরেকটি কথা বলা প্রয়োজন। আধ্যাত্মিক ব্যাপার ছাড়িয়া দিলেও, নিতান্ত জাগতিক ব্যাপারেও গুরু-শিষ্য সম্পর্ক বা শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক যদি শ্রদ্ধা-র উপর ভিত্তি করিয়া না থাকে, তাহা হইলে সামাজিক অবক্ষয়ের সূচনা হইবে—একথা পরীক্ষিত সত্য। পাশ্চাত্য দেশ-গুলিতে 'মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্যদেবো ভব...' ইত্যাদি আদর্শের অভাব আজ তাহাদিগকে যেন একটি আগ্নেয়গিরির চূড়ায় স্থাপন করিয়াছে। যেকোন মুহূর্তে ধ্বংসলীলা শুরু হইবার আশঙ্কায় পৃথিবী কম্পমান।

প্রসঙ্গ ঃ আধ্যাত্মিকতা ও গুরুতত্ত্ব

তত্ত্বকথায় পরে আসিব। এখন সাধারণ কথা দিয়াই শুরু হউক। যদি আমরা নিজেরাই নিজদিগকে প্রশ্ন করি—দৈনন্দিন জীবনে সংসারের তীব্র জ্বালায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া আমাদের কোন মানসিক শান্তি আছে কিনা? কখনো কখনো মনেতে এক অদ্ভুত ফাঁকা ফাঁকা ভাব, একটা আশ্রয়হীনতা, একটা বিচিত্র ভয়েতে যেন মন কোন একটি অবলম্বন চাহিতেছে—এইরূপ অনুভব হয় কিনা? অথবা হৃদয়ের গভীরে এই সৃষ্টিরহস্য জানিবার জন্য, ঈশ্বরের দিব্যসান্নিধ্য অনুভব করিবার জন্য, সীমাকে অতিক্রম করিয়া অসীমের আস্বাদন করিবার জন্য কখনো প্রাণে প্রাণে ব্যাকুলতা হয় কিনা? কিংবা সহসা কোন এক দিব্য আধ্যাত্মিক চরিত্রের মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হইলে মনেতে একটি স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের হিল্লোল বহিতে থাকে কিনা? শাস্ত্র বলিতেছেন, অন্তরের জ্বালা বা তৃষ্ণাই সাধকের নিকট গুরুশক্তির আবির্ভাব সূচিত করে। একইসঙ্গে শিষ্যের যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাও শাস্ত্রে পরিষ্কারভাবে বর্ণিত আছে। বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নাই। কেবল বলা যায়, শিষ্যের অন্তরে জ্বালা ও তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইয়া যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছাইবে যে, মনে হইবে মস্তকে যেন কেহ জ্বলন্ত কাঠ রাখিয়াছে অথবা গলিত অগ্নি ঢালিয়া দিতেছে, এবং সেই অগ্নি নির্বাপণের জন্য শিষ্য যেন নিকটবর্তী জলাশয়ে লাফাইয়া পড়িতে উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া চলিতেছে, তখন শিষ্যের যোগ্যতা অর্জন শুরু হইল বুঝিতে হইবে। সেই এক কথা, যেরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—'প্রাণ যেন আটুবাটু করিতেছে।'

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার বিখ্যাত 'মদীয় আচার্যদেব' গ্রন্থে বলিয়াছেন ঃ *"আমাদের এই জগতে ক্রমাগত পরিবর্তন ও নূতন নূতন পরিস্থিতির জন্য যখনই নূতন সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয় তখনই এক শক্তিতরঙ্গ আসিয়া থাকে। আর মানব আধ্যাত্মিক ও জড় উভয় স্তরে ক্রিয়াশীল বলিয়া উভয়ত্র এই সমন্বয়-তরঙ্গের আবির্ভাব হয়।"* 'সামঞ্জস্য' বা adjustment বলিতে স্বামীজী জড় প্রকৃতির পরিবেশ সংক্রান্ত সামঞ্জস্যের কথাই কেবল বলেন নাই, প্রত্যেক মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিতে 'কু' এবং 'সু' নামক যে দুইখানি বল সর্বদাই ক্রিয়া করিয়া থাকে, তাহাদের সামঞ্জস্যের কথাও বলিতেছেন। বস্তুত, মানুষের অন্তরের কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এই ষড়রিপু এবং তাহা হইতে জাত লক্ষ লক্ষ বাসনা তরঙ্গ মানুষের অন্তরের সু-ভাবটিকে মাথা তুলিতে দেয় না। কিন্তু এই কু-মানুষটি তাহার প্রকৃত সত্তা নহে বলিয়া সু-মানুষকে সে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিতেও পারে না। বরং অনুকূল পরিবেশে মানুষের সু-ভাবটির বিকাশ ঘটিলে লুপ্ত সম্বিত সে ফিরিয়া পায়। তখন তাহার মধ্যে স্বার্থপরতার ভাব হ্রাস পাইতে থাকে। তামসিকতা ও রাজসিকতা ক্রমশ হ্রাস পাইয়া সাত্ত্বিক গুণের বিকাশ ঘটে। অশুদ্ধ চিত্ত ব্যাকুলতার অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া ভক্তির রসায়নে ক্রমশ শুদ্ধ হইতে থাকে। এবং এই আধ্যাত্মিক শুদ্ধিকরণের পশ্চাতে গুরুশক্তি ক্রিয়াশীল হইয়া ওঠে। গুরুশক্তির প্রাবল্যে কখনো কখনো সব ভাসাইয়া লইয়া যায়, অর্থাৎ সকল নিয়মকানুনকে অতিক্রম করিয়া বুদ্ধির অগম্য এক মহনীয় স্তরে শিষ্যকে যেন বলপূর্বক ঠেলিয়া দেয়। অবশ্য সচরাচর এই ঘটনা ঘটে না। মদ্যপ গিরিশচন্দ্র ঘোষ যখন শ্রীরামকৃষ্ণ সকাশে মুক্তি কামনা করিয়া আর্জি জানাইলেন, ঠাকুর বলিলেন ঃ 'তুমি দুই বেলা ঈশ্বরকে স্মরণ করিও।' গিরিশ কহিলেন ঃ 'আমার কিছুই ঠিক নাই, পারিব না।' ঠাকুর কহিলেন ঃ 'আচ্ছা, দুইবেলা খাইবার পূর্বে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া খাইও।' গিরিশের তাহাতেও আপত্তি—'খাইবার সময়ে কি অবস্থায় থাকিব তাহার তো স্থিরতা নাই।' শ্রীরামকৃষ্ণও ছাড়িবার পাত্র নহেন। বলিলেন ঃ 'রাত্রে শুইবার পূর্বে একবার অন্তত তাঁহার স্মরণ করিও।' গিরিশ কহিলেন ঃ 'তাহাও পারিব না।' ঠাকুর কহিলেন, তবে আমাকে বকলমা দাও। গিরিশ তখন টের পান নাই বকলমা দেওয়া অর্থাৎ সমস্ত ভার শ্রীরামকৃষ্ণের উপর ছাড়িয়া দেওয়ার অর্থ কী! ইহার অর্থ হইল—পূর্ণ শরণাগতি, পূর্ণ অধীনতা, পূর্ণ কৃতদাসত্ব। ইহাই তো ধর্মজীবনের শেষকথা। গুরুশক্তির

দ্বারা গিরিশ হইলেন 'কৃতদাস'। 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা' হইল।

উপনিষদের ঋষি সামধ্বনি করিয়া উচ্চারণ করিলেন ঃ "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।" ইহার দুইভাবে অর্থ করা হয়। ইনি (গুরু বা দেবতা) যাঁহাকে বরণ করিয়া লন, তিনিই ইঁহাকে লাভ করেন। অথবা যিনি ইঁহাকে (গুরু বা দেবতাকে) বরণ করিয়া লন, তিনিই ইঁহাকে লাভ করেন। গুরুকে বরণ করিয়া লইবার যোগ্যতা শিষ্যকেই অর্জন করিতে হইবে। আবার গুরুও পরীক্ষা করিয়া লন শিষ্য যোগ্য কিনা। একমাস নরেনের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহেন নাই। যে নরেনকে দেখিবার জন্য তিনি মান-অপমান ভুলিয়া কলকাতায় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহে বলা নাই, কওয়া নাই, হাজির হইয়া উপাসনা পণ্ড করিয়াছিলেন, যে-নরেন্দ্রনাথের জন্য তাঁহার হৃদয়ে তন্ত্রীসকল গামছা নিঙড়াইবার মতো হইত, যে-নরেনকে দেখিলেই তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণকে তাহার মধ্যে দেখিয়া সমাধিলীন হইতেন—সেই নরেনকে উপেক্ষা করিয়া অন্যের সহিত কথা কহিতেছেন? ইহা সাধারণ মানুষের বিচারে নরেনের পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব ছিল বলিলে ভুল হইবে না। অথচ নরেন্দ্রনাথ নিয়মিত দক্ষিণেশ্বরে আসেন, পান সাজিয়া দেন, নিবিষ্ট চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শোনেন, হয়তো বা রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরেই শুইয়া পড়েন। দক্ষিণেশ্বরে আসিবার বিরাম কখনো ছিল না। একমাস পরে শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কহিলেন ঃ "ওরে তুই বলে এতটা সইতে পারলি, অন্য কেউ হলে আর আসত না।" নরেন্দ্রনাথও ছাড়িয়া কথা কহেন নাই। বিছানার তলায় টাকা রাখিয়া পরীক্ষা করিতেছেন, "টাকা মাটি মাটি টাকা", "আজকাল ধাতুর দ্রব্য ছুঁইতে পারি না" ইত্যাদি কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের মুখের কথা কিনা। যখন উভয় পক্ষের পরীক্ষা-পর্ব শেষ হইল, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন ঃ "ওরে আজ তোকে সব দিয়ে ফকির হলুম।" অপরদিকে নরেন্দ্রনাথ গুরুর জন্য যথাসর্বস্ব ত্যাগ করিয়া গৈরিক ধারণ করিয়া প্রণাম করিলেন—

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে।।"

(শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্, ৬।১৮)

—'যিনি আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া পরে তাঁহাকে বেদ প্রদান করিয়াছিলেন, আমি আত্মবিষয়ক (আত্মাকে জানিবার উপযুক্ত) বুদ্ধির প্রকাশক সেই দেবের (বা গুরুর) শরণ লইতেছি।' সীমা হইতে অসীমে এই উত্তরণ গুরুতত্ত্ব বুঝিবার একমাত্র সোপান বলিয়াই এই প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইল।

গুরু ও ইষ্টে ভেদ নাই। গুরুতে মানুষবুদ্ধি করা নিষিদ্ধ করিয়াছেন শাস্ত্র। সরল গ্রাম্য ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন ঃ "যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ি যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।" যতক্ষণ গুরু ও ইষ্টে এক বুদ্ধি হয় নাই, ততক্ষণ গুরু আকৃতি এবং গুণ-বিশিষ্ট হইয়াই প্রতিভাত হন। যখন গুরু ইষ্টে লীন হইলেন, তখন তিনি অনন্ত, নিরাকার, নিরবয়ব গুরুশক্তি-রূপে অবস্থিত হইলেন। সেই মহাশক্তি শিষ্যের মোহসিন্ধু নিমেষে বিনাশ করিয়া তাহাকে স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকেন। ইষ্টকে সাকাররূপে উপাসনা করিলেও গুরুশক্তি সেই ইষ্টেরই শক্তিরূপে শিষ্যের কল্যাণসাধন করিয়া থাকেন। সেই মহাশক্তি কখনো ব্রহ্মারূপে, কখনো শিবরূপে, কখনো বা জগৎপালনহার বিষ্ণুরূপে সাধকের সম্মুখে প্রতিভাত হন। **"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।"** নাম ও রূপের পারে সেই গুরুই আবার পরব্রহ্মস্বরূপ—**"গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।"** সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ গুরুকে প্রণাম করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, আনন্দ তিন প্রকার—বিষয়ানন্দ, ভজনানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দ। মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষয়ানন্দ লইয়া মত্ত থাকে। খুব কম মানুষই বিষয়ানন্দ ত্যাগ করিয়া ভজনানন্দের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ব্রহ্মানন্দের আস্বাদন সকলে করিতে পারে না। সৃষ্টির রহস্য ঐখানেই। কিন্তু গুরুশক্তির কৃপায় শিষ্য ব্রহ্মানন্দ আস্বাদন করিয়া জীবন্মুক্তির স্বাদ পাইতে পারে। **"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং।/ দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি-লক্ষ্যম্।"** গুরু এক, অদ্বিতীয়, **কেবল** জ্ঞানের মূর্তি। তিনি স্বয়ং ব্রহ্মানন্দে নিত্য প্রতিষ্ঠিত থেকে শিষ্যকে পরমানন্দসুখ প্রদান করেন। তিনি দ্বন্দ্বাতীত অর্থাৎ সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, শীত-গ্রীষ্ম, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ইত্যাদি দ্বন্দ্বের পারে। অনন্ত গগনের তুল্য, নিরাকার। 'তত্ত্বমস্যাদি' শাস্ত্রবাক্য প্রতিপাদক সেই গুরু **"একং নিত্যং বিমলচলং সর্বধীসাক্ষীভূতং/ ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি।"** অর্থাৎ সেই গুরু এক, নিত্য (অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতে সমভাবে বিরাজিত), মলবিহীন বা কালিমাবিহীন, 'অচল'। কেন? নিত্য, অনন্ত বলেই অচল। সকল মানবের বুদ্ধি কিনা সর্বধী। সেই সর্বধীর সাক্ষী যিনি, তিনিই গুরু। তিনি ইন্দ্রিয়াদির গোচর এই দৃশ্যমান বিশ্বচরাচরের অতীত, তাই 'ভাবাতীত'। সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ তিন গুণের পারের সেই সদ্গুরুকে আমি নমস্কার (প্রণাম) জানাই। ❑

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে যেসকল তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৩৫৯ সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। আশা করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

দ্য ইণ্ডিয়ান মিরর, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৬

ব্রাহ্মসমাজ।—হিন্দু ভক্ত রামকৃষ্ণ—যিনি 'পরমহংস' নামে পরিচিত, বর্তমানে দক্ষিণেশ্বরে থাকেন—এক অসাধারণ মানুষ। নৈতিক চরিত্র এবং আধ্যাত্মিকতায় তিনি উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করেছেন বলে মনে হয়। অনেক ব্রাহ্ম প্রচারক যাঁরা তাঁর কাছে মাঝেমাঝে যান, তাঁরা তাঁর ভক্তি, পবিত্রতা ও অন্তর্দৃষ্টির প্রভূত প্রশংসা করেন। যদিও তিনি একজন সত্যিকার হিন্দু, আধুনিক ব্রাহ্মসমাজের প্রতিও তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ। (ইংরেজী থেকে অনূদিত)

*

ঐ, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৭

ব্রাহ্মসমাজ।—রামকৃষ্ণ পরমহংস একজন ব্যতিক্রমী ধরনের হিন্দু ভক্ত। তিনি আমাদের আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং আমাদের আচার্যদের সঙ্গে প্রায়ই আলাপ-আলোচনা করেন। হৃদয়ে গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির প্রাবল্যে এবং শারীরিক দুর্বলতার কারণে তিনি প্রায়ই মৃতবৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন। (ইংরেজী থেকে অনূদিত)

(শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবসমাধি সাধারণ মানববুদ্ধির বোধগম্য ছিল না। তাই সেই অবস্থাকে 'মৃতবৎ সংজ্ঞাহীন' বলে প্রতিবেদক উল্লেখ করেছেন।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন')

*

ঐ, ১৫ জুন ১৮৭৯

দক্ষিণেশ্বরের যোগী-সমীপে।—পাশ্চাত্য মতে যাকে শিক্ষা বলে, তা রামকৃষ্ণের ছিল না। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত, আর যাই হোক, শ্রুতিমধুর ছিল না। স্ত্রী-পুরুষের প্রেম বা শালীনতা বিষয়ে তাঁর মতামত পাশ্চাত্য সমালোচকদের সুরুচিকে আঘাত করবে। আমি অবশ্য পাঠকদের আশ্বাস দিতে পারি যে, এই যোগী কেতাদুরস্ত না হলেও পবিত্র-হৃদয়। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব প্রেমপূর্ণ না হলেও তিনি অধ্যাত্মজগতে স্ত্রীজাতিকে যে উচ্চাসন দিয়েছেন, তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। এই সাধু বলেন যে, যতক্ষণ কাম থাকবে, যতক্ষণ কামিনী মনকে প্রলুব্ধ করবে, ততক্ষণ ঈশ্বর অনেক দূরে। ভক্ত যেন ঐসব প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে। তখনই এসকল প্রলোভন থেকে মুক্ত হয়ে মন নিরবচ্ছিন্নভাবে ঈশ্বরের আন্তরিক অনুসন্ধানে এগিয়ে যাবে। কিন্তু কিভাবে মনকে ঐসব প্রলোভন থেকে মুক্ত রাখা যায়? ...রামকৃষ্ণ বলেন, তিনরকম ভাবে তা করা যেতে পারে। প্রথম—বীরভাবে, অর্থাৎ পাপে মত্ত হয়ে পাপকে জয় করা, কাম চরিতার্থ করে কাম জয় করা।... পথটি ভাল নয়, কিন্তু দুঃখের বিষয়, হাজার হাজার লোক এই আত্মঘাতী পথ বেছে নিচ্ছে। দ্বিতীয় পথ হচ্ছে প্রকৃতিভাবে থাকা। যদি কোন পুরুষ স্ত্রীলোকের পোশাকে থাকে এবং স্ত্রীলোকের ভাবে ভাবিত হয়, তবে তার পুরুষভাব অন্তর্হিত হবে এবং স্ত্রীলোককে সে কুদৃষ্টিতে দেখতে পারবে না। স্ত্রীলোক তার দাসী হয়ে যাবে এবং স্বর্গদ্বার তার কাছে উন্মুক্ত হবে।

তৃতীয় পথ হচ্ছে মাতৃভাব—সব স্ত্রীলোককে মাতৃজ্ঞান করা। সন্তান ভাব এলে আর মনে কামভাব থাকবে না। কিন্তু অনেক পাঠকেরই মনে হতে পারে, এতে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ ইচ্ছা এবং প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করা হচ্ছে। কিন্তু ঘটনা অন্যরূপ হয়েছে দেখা যাচ্ছে। এই শেষোক্ত পন্থাই রামকৃষ্ণের সফলতার কারণ। তিনি নিজে যেভাবে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, তা অনেকের কাছে বিস্ময়ের ব্যাপার। এই ব্যাপারে তাঁর কাছে কত প্রলোভন এসেছে, কিন্তু সব অগ্নিপরীক্ষার পরেও তিনি বিশুদ্ধ ও সমুজ্জ্বল ধাতুরূপেই রয়ে গেলেন। (ইংরেজী থেকে অনূদিত)

ধর্মতত্ত্ব, ১ নভেম্বর ১৮৭৯

সংবাদ।—...বিগত ৩১ ভাদ্র বেলঘরিয়াস্থ তপোবনে ২৫/৩০ জন ব্রাহ্ম সম্মিলিত হইয়াছিলেন। সেখানে ভক্তিভাজন রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয়ের শুভাগমন হইয়াছিল। তাঁহার ঈশ্বরপ্রেম ও মত্ততা দেখিয়া সকলে মোহিত হইয়াছিলেন। এমন স্বর্গীয় মধুর ভাব আর কাহারো জীবনে দেখা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রমত্ত ভক্তের লক্ষণে উল্লিখিত হইয়াছে "ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।/ নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।।" "ভক্তগণ সেই অবিনাশী ঈশ্বরের চিন্তনে কখন রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, কখন আনন্দিত হয়েন, কখন অলৌকিক কথা বলেন, কখন নৃত্য করেন, কখন তাঁহার নামগান করেন, কখন তাঁহার গুণকীর্তন করিতে করিতে অশ্রুবিসর্জন করেন।" পরমহংস মহাশয়ের জীবনে এইসকল লক্ষণ সম্পূর্ণ লক্ষিত হয়। তিনি সেদিন ঈশ্বরদর্শন ও যোগপ্রেমের গভীর কথাসকল বলিতে বলিতে এবং সঙ্গীত করিতে করিতে কতবার প্রগাঢ় ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত ও উন্মত্ত হইয়াছিলেন, কতবার সমাধিমগ্ন হইয়া জড় পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চেষ্ট ছিলেন, কতবার হাসিয়াছেন, কাঁদিয়াছেন, নৃত্য করিয়াছেন, সুরামত্তের ন্যায়, শিশুর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, সেই প্রমত্ততার অবস্থায় কত গভীর গূঢ় আধ্যাত্মিক কথাসকল বলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহার স্বর্গীয় ভাব দর্শনে পুণ্যের সঞ্চার হয়, পাষণ্ডের পাষণ্ডতা, নাস্তিকের নাস্তিকতা চূর্ণ হইয়া যায়। ৬ রবিবারে অপরাহ্নে আচার্য মহাশয়ের ভবনেও পরমহংস মহাশয় পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেদিনও তাঁহার সমুদায় ভক্তিভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। কেবল সুমধুর নৃত্য সেদিন হয় নাই। তাঁহার সুমিষ্ট স্বরের মধুর ভাবের সঙ্গীতে পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। সেদিন সমাধির অবস্থায় তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা হইয়াছে। সচ্চিদানন্দ ঘন এই নাম শ্রবণমাত্র তাঁহার সমাধি হইয়াছিল। ❑

সঙ্কলন ও অনুবাদ ❑ জলধিকুমার সরকার

সম্পাদনা ❑ স্বামী সর্বগানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের তিনটি পত্র

ইংরেজীতে এই পত্রগুলি 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার জুলাই ও আগস্ট ১৯৭৭ সংখ্যায় এবং 'Complete Works'-এ প্রকাশিত হলেও তার বাঙলা অনুবাদ এখনো 'উদ্বোধন' পত্রিকা বা অন্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

ত্রিচিনপলির হিন্দু ছাত্রবৃন্দকে লিখিত

ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭

ভদ্রমহোদয়গণ,*

আপনাদের অভিভাষণটি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি; এটির মধ্যে আপনারা যেসব প্রীতিপূর্ণ কথা লিখেছেন, তার জন্য আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

কিন্তু বর্তমানে সময়ের অভাবে, এমনকি অল্পকালের জন্যও, ত্রিচিনপলি (অধুনা তিরুচ্চিনাপল্লী) যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়; এজন্য আমি বিশেষ দুঃখিত। শরৎকালে অবশ্য আমি সারা ভারতে বক্তৃতাসফরে বেরোব এবং ত্রিচিনপলিকে যে সে-সফরসূচী থেকে আমি বাদ দেব না, সে-কথার ওপর আপনারা নির্ভর করতে পারেন।

আবার আপনাদের ধন্যবাদ জানাই এবং সকলকে আশীর্বাদ করি। ইতি

আপনাদের স্নেহবদ্ধ
বিবেকানন্দ

* ত্রিচিনপলির ছাত্রসমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় প্রায় ৭৫০ জনের সাক্ষর-সম্বলিত একটি স্মারকপত্র নিয়ে কে. এস. কৃষ্ণমাচারি ও এস. এম. রাজারামের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল কুম্ভকোনমের অন্তর্গত নীলগিরি হল-এ স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে অন্তত দু-একদিনের জন্য তাঁদের কাছে থাকতে অনুরোধ করেন। উত্তরে স্বামীজী এই চিঠিখানি লিখেছিলেন। 'Madras Standard'-এ ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭ তারিখে এটি প্রকাশিত হয়।

ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত

দার্জিলিং
৩ এপ্রিল ১৮৯৭

কল্যাণীয়া মিস নোবল,

ভারতের নিপীড়িত জনগণের কল্যাণে তোমার করণীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের সন্ধান এইমাত্র পেলাম।

তোমার কাছে যে-ভদ্রলোকের পরিচয় জানাতে চাই, তিনি এখন মালাবার দেশীয় রাজ্যের অন্ত্যজ তিয়াস (Tiyas) সম্প্রদায়ের হয়ে কাজ করতে ইংল্যান্ডে আছেন।

শুধুমাত্র জাতের দরুন এই বেচারাদের কত অত্যাচার সইতে হয়, তা এই ভদ্রলোকের কাছ থেকে তুমি জানতে পারবে। কোন দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরিক প্রশাসনের কাজে হস্তক্ষেপ করতে নারাজ বলে ভারত সরকার এব্যাপারে হাত দিতে চান না। এসব মানুষের একমাত্র আশা-ভরসা ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট। ইংরেজ জনসাধারণের সামনে বিষয়টি তুলে ধরতে তুমি অনুগ্রহ করে অবশ্যই যথাসাধ্য সাহায্য করো।

তোমাদের চিরসত্যাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

জোসেফাইন ম্যাকলাউড বা সারা বুলকে লিখিত

শেষনাগ, চন্দনবাড়ি (শ্রীনগর থেকে অমরনাথের পথে)
জুলাই-এর শেষ (৩০), ১৮৯৮

পুরনো ডান্ডিটা ফেরত পাঠাচ্ছি, কারণ ওটা বয়ে নিয়ে যাওয়া শক্ত। মার্গারেটেরটা যেমন, তেমনি আমি আরেকটা পেয়েছি। পুরনোটা ভারনাগের তহসিলদার শ্রীখন্দচাঁদকে ফেরত পাঠিয়ে দিও; সে তো তোমার পূর্বপরিচিত। আমরা সকলে ভাল আছি। মার্গট কিছু নতুন ফুল আবিষ্কার করেছে এবং বেশ খোশমেজাজে আছে। বরফ বেশি নেই, তাই রাস্তা ভালই।

তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুঃ—আমি যতক্ষণ না আসছি ডান্ডিটাকে রেখে দিও; কুলি দুজনের প্রত্যেককে চার টাকা দুই আনা করে দিও।
বাতাকুটি—প্রথম বিশ্রামস্থল, ১২ মাইল; পহলগাঁও—তার পরের থামার জায়গা।

গীতার শক্তি ও মনোহারিত্ব

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

পূর্বানুবৃত্তি

এই আলোচনাটি দুর্গাপদ ঘোষ প্রমুখ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'



উপনিষদ্ থেকে এবং পরবর্তী কালে বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য প্রমুখ আচার্যদের মাধ্যমে আমরা এই শিক্ষা পেয়েছি যে, 'ব্রাহ্মণ' শব্দটির অর্থ হলো এমন একজন মানুষ, যিনি ব্রহ্মকে জ্ঞাত হয়েছেন এবং পরিণত হয়েছেন প্রেম ও করুণায় পূর্ণ এক ব্যক্তিত্বে। শঙ্করাচার্যের ভূমিকার এই অংশে ব্যবহৃত শব্দটির তাৎপর্য হলো ব্রাহ্মণের বিমূর্ত রূপ—ব্রাহ্মণত্ব—যা বলতে বোঝায় বিশেষ এক মানবীয় অবস্থাকে। ব্রাহ্মণত্ব বলতে বিশেষ কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীকে বোঝায় না; ব্রাহ্মণত্ব মানে হলো মানবীয় বিকাশের উচ্চ এক পর্যায়, যা কোন বিশেষ জাতি, শ্রেণী বা রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ থাকে না। 'ব্রাহ্মণ' পদবাচ্য মানুষ রয়েছেন রাশিয়ায়, আমেরিকায়, চীনে এবং অন্য সব স্থানেই। অদ্ভুত সুন্দর একটি চিন্তা আমাদের আছে; সেটি এই যে, ঈশ্বরের অবতার যখন পৃথিবীতে আবির্ভূত হন, তিনি কোন সামাজিক সংস্কার শুরু করে দেন না, কারণ সেটা সমাজ-সমস্যার খুব ওপর-ওপর একটা প্রতিকার-প্রচেষ্টামাত্র—রোগকে না সারিয়ে রোগের বহির্লক্ষণ সারানোর চেষ্টার মতো। অবতার একটি নতুন মূল্যবোধ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, যা ধীরে ধীরে মানুষের হৃদয়-মনকে অনুপ্রাণিত করে। তা থেকেই আসে নৈতিক ও মানবিক জাগরণ; এবং এই জাগরণই প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার সমাজ-সংস্কারের জন্ম দেয়। তিনি আসেন দুটি উদ্দেশ্যে: একটি হলো সনাতন ধর্মের মহিমা ও সর্বজনীনতা প্রতিষ্ঠা করা; অপরটি হলো সেই 'আদর্শ মানুষ'কে রক্ষা করা, যিনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রতিমূর্তিস্বরূপ এবং যিনি মানবীয় বিবর্তনের লক্ষ্যস্বরূপ ব্রাহ্মণত্ব নামক অবস্থায় উপনীত হয়েছেন।

সকল মানুষকেই সেই লক্ষ্যে গড়ে উঠতে হবে। শ্রীকৃষ্ণের 'অবতরণ'কে যার সঙ্গে সম্বন্ধিত করা হয়েছে, সেটি হলো—"ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থম্।" বেদের অসামান্য দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা—যেখানে এইসব সার্বজনীন ভাবের সন্ধান মেলে। এই দর্শন সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করতে কারো ভীত হওয়ার প্রয়োজন নেই। এই দর্শন প্রশ্নকে স্বাগত জানায়, কারণ এটি আদ্যন্ত যুক্তিসঙ্গত এবং উপলব্ধিজাত। দ্বিতীয়ত, এটি অত্যন্ত সার্বজনীন; এটি মানবতাকে দেখে সামগ্রিকভাবে একটি এককের মতো করে; তাকে জাতি, বর্ণ, রাষ্ট্র বা শ্রেণীতে বিভক্ত করে নয়। বৈদিক ঐতিহ্যের এটিই গুরুত্ব। তাই এটিকে তিনি বলছেন 'ভৌমস্য ব্রহ্মণো' এবং 'ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থম্'। বেদ, শ্রুতি বা উপনিষদে কেবল ঈশ্বর ও মানবতা সম্বন্ধে সার্বজনীন নীতিসমূহের কথাই আছে। শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন এটিকে রক্ষা করতে, এবং রক্ষা করতে সেই মানুষটিকে যিনি সেই শ্রুতিকে তাঁর নিজের জীবনে, অর্থাৎ তাঁর ব্রাহ্মণ-স্বভাব জীবনে মূর্ত করে তুলেছেন। আমাদের ঐতিহ্য ও সাহিত্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই দুটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে এসেছে। এটিকে প্রতিষ্ঠা করতে নারায়ণ স্বয়ং কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। নারায়ণ—যিনি এই দ্বি-ধারাবিশিষ্ট ধর্মের প্রবর্তক এবং যিনি এই জগৎকে সুস্থিত করতে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি ধর্মের দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রজাপতি ও কুমারদের সৃষ্টি করেছিলেন—তিনি যখন দেখলেন যে, জগৎ ভুল পথে চলেছে তখন শ্রুতির এই মহান বাণীকে আরো শক্তিশালী করতে, জীবনের আধ্যাত্মিক মাত্রাকে উন্নততর করতে এবং যে-মানুষ শ্রুতি বা ব্রাহ্মণত্বকে নিজ জীবনে মূর্ত করে তুলেছেন, তাকে সুরক্ষা দিতে তিনি জন্ম নিলেন দেবকী ও বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণরূপে। ঈশ্বরাবতারের মূল ভাব এটিই।

আমরা প্রায়ই শুনি যে, বৌদ্ধধর্ম হলো ব্রাহ্মণত্ব-বিরোধী। পাশ্চাত্য লেখকেরা এইরকম অনেক ব্যাপারেরই অপব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা জানেন না যে, পুরোহিত-ব্রাহ্মণ আর ঐসব মহান গ্রন্থে বর্ণিত ব্রাহ্মণ দুটি পৃথক অস্তিত্ব। অতীতে এমন বহু মহান ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেছেন, যাঁরা ছিলেন প্রকৃতই ধর্মপ্রাণ ও পবিত্র। আজ আমরা যাঁদের দেখি, তাঁরা সবাই পুরোহিত-ব্রাহ্মণ। তাঁরা যে সমাজে মহাবিঘ্নের কারণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ব্রাহ্মণ বলতে ঠিক কী বোঝায়, তা কখনো ভুললে চলবে না। আর তাই বুদ্ধ অবতারে দেখা যায়, ভগবান বুদ্ধ ঠিক এই

ধারণাটিকেই ব্যক্ত করেছেন। ব্রাহ্মণদের সম্বন্ধে তাঁর বিশাল শ্রদ্ধা ছিল। বুদ্ধ জানতেন যে, ব্রাহ্মণেরা উচ্চতম আধ্যাত্মিক ও বৌদ্ধিক সাধনে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ এবং তাঁদের জীবন অতীব সহজ-সরল। যদিও এটা নিশ্চিত সত্য যে, এমন মানুষ আছেন—যাঁরা সেই আদর্শে উপনীত হতে ব্যর্থ হয়েছেন; কিন্তু তা বলে আদর্শটিকে ভুলে গেলে চলবে না। বুদ্ধের আলোচনাদিতে 'ব্রাহ্মণ' এবং 'শ্রমণ' কথা-দুটি ঘুরেফিরে আসে। ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণ—উভয়কেই শ্রদ্ধা-সম্মান কর—বললেন বুদ্ধ। ব্রাহ্মণরা সাধারণত গৃহস্থ এবং শ্রমণরা সন্ন্যাসী। গৃহস্থদেরও উচ্চ সম্মান প্রদান করা হয়, কারণ তাঁরা একটি সাত্ত্বিক জীবন যাপন করেন।

অতি প্রাচীন কাল থেকে আমরা উপলব্ধি করেছি যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই এইরকম এমন এক ব্রাহ্মণ হয়ে ওঠার ক্ষমতা বা সম্ভাবনা আছে, যাঁর মধ্যে কোন শত্রুতা বা ঘৃণার ভাব নেই, যাঁর হৃদয় প্রেম ও করুণায় পূর্ণ। আধুনিক কালে আমরা পেয়েছি মহাত্মা গান্ধীকে। এক অর্থে বর্ণের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন বৈশ্য; কিন্তু চরিত্রের দিক দিয়ে ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। কারো প্রতি তিনি কোন ঘৃণার মনোভাব দেখাননি, এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকায় যে-পুলিস তাঁকে মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল—তাদের প্রতিও। বিচারালয়ে গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। আজও এমন মানুষ আছেন, এবং গান্ধীজীর মতো মানুষ আবার আমাদের নতুন করে আশ্বস্ত করছেন যে, এমন অবস্থা লাভ করা অসম্ভব নয়। প্রশ্ন হলো, আমরা কী করব?

আধুনিক জীববিদ্যা বলছে, বিবর্তনের রঙ্গমঞ্চে মানুষের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জৈব বিবর্তনের সকল প্রাসঙ্গিকতা শেষ হয়ে গেছে। মানুষের সমৃদ্ধ মস্তিষ্ক অসাধ্য সাধন করতে পারে; এবং উচ্চতর স্তরে যে-বিবর্তন প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল রয়েছে, তারই চর্চা বা সাধন করতে হবে আমাদের। স্যার জুলিয়ান হাক্সলে একে বলেছেন মনোসামাজিক বা psycho-social বিবর্তন; আর বেদান্ত একে বলে 'আধ্যাত্মিক বিবর্তন'। মানবীয় বিবর্তনের লক্ষ্য যে কী, জীববিদ্যা নিজেই এখনো পর্যন্ত তা খুঁজে পায়নি। তবে সে সিদ্ধান্ত করেছে যে, সে-লক্ষ্যটি নিয়ন্ত্রিত হবে গুণের দ্বারা; পরিমাণের দ্বারা নয়। এই 'গুণ'-এর পূর্ণাঙ্গ পরাকাষ্ঠা ভারতবর্ষ লক্ষ্য করেছে তার ব্রাহ্মণ-আদর্শের মধ্যে। এই হলো আদর্শটি এবং এই রইল কয়েকটি দৃষ্টান্ত—তুমি তোমার গতিবিধি সেই অভিমুখে পরিচালিত কর। হতে পার তুমি একজন সাধারণ মানুষ—তমঃ পূর্ণ মানুষ। তাতে কিছু এসে যায় না; জীবনে একটা অগ্রগতি আছে এবং সে-অগ্রগমন আছে এই লক্ষ্যটির অভিমুখে। ভারতের জনসাধারণের সামনে এই আদর্শটিকে স্থাপন করা হলে গোটা দেশটাই সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। তোমার সামর্থ্য অনুসারে সেই লক্ষ্যের দিকে এগোও। একটি, দুটি, তিনটি পদক্ষেপ—এবং তোমার জীবনে কী পরিবর্তনটাই না এসে যাবে! মানবীয় উৎকর্ষের ক্ষেত্রে এই 'ব্রাহ্মণ' ভাবটি প্রযোজ্য আমেরিকায়, রাশিয়ায়, জার্মানিতে, চীনে—সর্বত্র। *আজ আমাদের বুঝতে হবে যে, এটিই হলো সামাজিক বিবর্তনের লক্ষ্য।* আধুনিক সমাজতত্ত্বের অনেকটাই সামাজিক পরিসংখ্যানমাত্র, কিন্তু সত্যকারের সমাজতত্ত্ব হলো সেটিই, যেটি মানুষের আধ্যাত্মিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক বিবর্তনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। সেই লক্ষ্যে বিবর্তনশীল কোন সমাজের প্রকৃতি বা লক্ষণ কী? আমরা একে বলি আধ্যাত্মিক লক্ষ্য বা দিশা। মানুষের স্তরে বিবর্তনের লক্ষ্য হলো এই আধ্যাত্মিক দিশা। বিংশ শতাব্দীর জীববিদ্যা ধীরে ধীরে এর কথা বলতে আরম্ভ করেছেঃ অতিক্রম করে যাও এই দেহগত সীমাবদ্ধতাকে, এই ইন্দ্রিয়জ সীমাবদ্ধতাকে; সমৃদ্ধ মস্তিষ্ক রয়েছে সেই কারণেই। তারা মনোসামাজিক বিবর্তনের কথাও বলছে। বলছে সেই চেতনার কথা যা সমস্ত মানুষ ও সমস্ত সমাজের সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভব করতে পারে। তখন আর কোন শোষণ থাকবে না। এবং এটিই হলো ব্রাহ্মণ মানসিকতা।

অতএব, বিংশ শতাব্দীর জীববিদ্যা সকল সমাজে বিবর্তনের সামগ্রিক লক্ষ্যটি স্থির করে দিচ্ছে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অভিমুখে। শাঙ্করভাষ্যের বর্তমান উক্তির এ-ই হলো গুরুত্ব।

বেদান্ত অনুসারে, মানবীয় বিবর্তনের এটিই হলো পথ ও লক্ষ্য। অবতারের আবির্ভাব হয় মানুষকে এই বিবর্তনের পথে স্থাপন করতে, তাদের একটু ধাক্কা দিতে, একটু উদ্দীপনা জোগাতে। সেই উদ্দীপনা দেওয়া হলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক অশুভ অন্তর্ধান করে, কারণ তখন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব পালটে যায়, তার মূল্যবোধগুলি বদলে যায়; সে তার জীবনকে কোন উচ্চ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করে দেয়। তার ছোটখাট ভুলভ্রান্তি কারো অনিষ্টসাধন করে না। মানবের বৃদ্ধি ও প্রগতির এ-ই হলো ধারণা এবং এটি সাধন করতে পারেন কেবল একজন ঈশ্বর-অবতার, যিনি কিনা একাধারে একজন যুগপ্রবর্তক এবং একজন ঈশ্বরীয় সত্তা। এই মহাবলশালী আধ্যাত্মিক স্রোতকে বেগবতী করতে যে-শক্তির প্রয়োজন, তা আসতে পারে কেবল তাঁরই কাছ থেকে, যাঁকে আমরা বলি 'অবতার'। আপনারা অন্য যেকোন শব্দ ব্যবহার করতে পারেন। এটি এক অ-সাধারণ ক্ষমতা, যা কোন সাধারণ সাধু-সন্তের মধ্যে দেখতে পাওয়া যাবে না। এই ক্ষমতা তাই অ-সাধারণ; যা নতুন ঐতিহাসিক যুগের প্রবর্তন করতে পারে। এঁরা সংখ্যায় অত্যল্প; এঁরা জগৎ-আলোড়ক ব্যক্তিত্ব। আমরা রাম, কৃষ্ণ এবং বুদ্ধকে জগৎ-আলোড়নকারী ব্যক্তিত্ব বলে বিবেচনা করি, যীশুকেও তাই; এবং এই আধুনিক কালে আমরা পাচ্ছি শ্রীরামকৃষ্ণকে। আমাদের সমগ্র ঐতিহ্যের প্রেক্ষাপটে এ এক অতি সুন্দর চর্চার বিষয়।

পরিস্থিতি যখন খারাপের দিকে যায়, তখন সেই শক্তিকে পুনরায় অবতরণ করতে হয়, এবং তিনি আসেন। পরে গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে কৃষ্ণ বলবেন যে, অনেকে তাঁকে চিনতে পারবেন না, কারণ তিনি আসবেন সাধারণ একজন মানুষ হয়ে। কালে কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁকে চিনবে। কোন মহান মানুষের খুব কাছাকাছি অবস্থান করলে আমরা তাঁকে চিনতে পারি না। অবতারের এই ধারণাটি—যেটিকে শ্রীকৃষ্ণ গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে বর্ণনা করবেন—তা সনাতন ধর্ম ও খ্রীস্টধর্মের কেন্দ্রীয় ভাব তথা বিশেষত্ব। অন্য কোন ধর্মে অবতারের এই ধারণাটি নেই। এই আধুনিক কালে সমগ্র ব্যবস্থাটিকে যুগোপযোগী করে নেওয়ার অনুরূপ একটি প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল, এবং জন্ম নিয়েছিলেন এক মহান পুরুষ—শ্রীরামকৃষ্ণ। শিক্ষাটি আমাদের বইপত্রে আছে, কিন্তু আমরা তা বোঝার বা অনুসরণ করার উপায় খুঁজে পাই না। এমন কাউকে আসতেই হবে, যিনি আমাদের দেবেন নতুন অন্তর্দৃষ্টি। কে তা করবেন? কোন পণ্ডিত নয়, কোন পুরোহিত নয়, নয় কোন অধ্যাপক। তাঁরা কী জানেন? আসতে হবে প্রচণ্ড শক্তিধর কোন আধ্যাত্মিক সত্তাকে। এবং তিনি আসেন। তিনি আসেন নিঃশব্দে, অচঞ্চলভাবে —এবং বইয়ে দিয়ে যান এক নতুন আধ্যাত্মিক ভাববন্যা। সেই আধ্যাত্মিকতা মানুষকে ধীরে ধীরে পরিবেষ্টন করতে থাকে আর বদলে দিতে থাকে গোটা জগৎটাকে। [ক্রমশ] (সাত)

ভাষান্তর ঃ অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য

অনুষ্ঠান-সূচী (ভাদ্র ১৪০৮)

(বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুসারে)

জন্মতিথি-কৃত্য

স্বামী অদ্বৈতানন্দ	শ্রাবণ কৃষ্ণা চতুর্দশী	২ ভাদ্র	শনিবার	১৮ আগস্ট	২০০১
স্বামী অভেদানন্দ	ভাদ্র কৃষ্ণা নবমী	২৭ ভাদ্র	বুধবার	১২ সেপ্টেম্বর	২০০১

একাদশী-তিথি (রামনাম-সঙ্কীর্তন)

১৩, ২৯ ভাদ্র	বুধবার, শুক্রবার	২৯ আগস্ট,	১৪ সেপ্টেম্বর	২০০১

বাগবাজার শ্রীশ্রীমায়ের ঘাট সংরক্ষণ সমিতি

১০ গ্যালিফ স্ট্রীট, ফ্ল্যাট-৬৮, কলকাতা-৭০০ ০০৩ ফোন ঃ ৫৫৫-৩০৫১



আবেদন

উদ্বোধনে থাকাকালে শ্রীমা সারদাদেবী বাগবাজারের দুর্গাচরণ মুখার্জীর ঘাটে নিত্য গঙ্গাস্নান করতে আসতেন। তাঁর বহু পুণ্যস্মৃতি জড়িয়ে আছে এই প্রাচীন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘাটটিতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই পুণ্য ঘাটটি আজ জীর্ণ দশাগ্রস্ত ও অসামাজিক কর্মের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বাগবাজারের পল্লীবাসীরা, বিশেষ করে কয়েকজন উৎসাহী যুবক এই তীর্থসম ঘাটটির সংস্কার ও সংরক্ষণে প্রয়াসী। এবিষয়ে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রক, কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট, গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান, কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য কয়েকটি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। এই সংস্কার ও সংরক্ষণের কাজ যথেষ্ট ব্যয়বহুল। তাই সকল সমমনস্ক ও আগ্রহী জনগণকে সক্রিয়ভাবে এই প্রয়াসে সামিল হতে অনুরোধ করি। যেকোন আর্থিক অনুদান '**বাগবাজার শ্রীশ্রীমায়ের ঘাট সংরক্ষণ সমিতি**'র নামে কেবলমাত্র A/c Payee চেকের মাধ্যমে প্রদান করা যাবে।

সহৃদয় জনগণের আন্তরিক সহযোগিতার ওপরই এই মহৎ প্রয়াসের সার্থক রূপায়ণ নির্ভরশীল।

ডঃ কমল নন্দী
সভাপতি

পরিচালনায় ঃ **রামকৃষ্ণ বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব**
২১ রামকৃষ্ণ লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

বিনোদ চৌধুরী
সম্পাদক

আশীর্বাণী

স্বামী ভূতেশানন্দ

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দ্বাদশ অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ বিভিন্ন স্থানে ভাষণ দান করেছিলেন, যার সবটা সংরক্ষিত হয়নি। যেখানে যেটুকু পাওয়া গিয়েছে বা যাচ্ছে, তা মাঝেমধ্যে প্রকাশ করার ইচ্ছা আমাদের রয়েছে। আনুষ্ঠানিক ভাষণের আনুষ্ঠানিক মোড়কের ভিতরে যথেষ্ট সারকথা নিহিত থাকে। আমাদের লক্ষ্য সেইটি।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

উপস্থিত সকলকে সম্ভাষণ করে এখানে দু-একটি কথা বলছি। অনেকদিন ধরেই রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের এই সভাগৃহটির নির্মাণকাজ চলেছে। কাজটি একসময় ধীরে ধীরে চলছিল, আবার বন্ধও হয়েছিল। আমার আশঙ্কা হচ্ছিল যে, কাজটির ভিত্তিস্থাপন করেই এটি শেষ হবে কিনা? কিন্তু ঠাকুরের ইচ্ছায় এই ভিত্তিস্থাপন যেই করুন—কাজটি তার নিজের গতিতে চলে যায়। তাই দেরি হলেও কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে এবং দেখে আমাদের আনন্দ হচ্ছে যে, শুধু সম্পূর্ণ হয়েছে তা নয়—সুসম্পন্ন হয়েছে। সভাগৃহটি দেখতে খুব সুন্দর এবং এর আয়তন যদিও খুব বেশি নয়, তাহলেও মোটামুটি আমাদের সাধারণ কাজ চালানোর মতো হয়েছে। এখানে যা আসনসংখ্যা, তা আমাদের মতো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে হয়তো যথেষ্ট নয়, তা না হলেও আমাদের এইভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে পর্যাপ্ত। অনেক সময় আমাদের মনে হয় যে, আমাদের প্রধান কেন্দ্র এখানে, অথচ এখানে আমাদের একটি উপযুক্ত সভাগৃহ নেই। এই অভাবটি আজ সারদাপীঠের চেষ্টায় দূর হয়েছে। আমরা অন্তত এখনকার মতো এটি যথেষ্ট বলে মেনে নিতে পারি। কারণ, একেবারেই ছিল না, তার জায়গায় একটি স্থানে সকলে সমবেত হতে পারছেন। স্থানটি মনোরমও বটে। এতেই আমাদের সন্তোষ। এটি মনে রাখতে হবে। শেষ হতে সময় বেশি লাগল। অনেক সময় আমাদের একটু সময় লাগে, কারণ আমাদের হাতে সবসময় অর্থ থাকে না। ক্রমশ যখন দাতারা সাহায্য করেন, তখন ধীরে ধীরে কাজ এগিয়ে চলে। কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে। অবশ্য আগেই বলা হয়েছে, ঠাকুরের ইচ্ছাই হলো প্রধান। তিনি শিশির মহারাজকে (স্বামী সনাতনানন্দ) যন্ত্র করে কাজটি করিয়েছেন—এতেই আমাদের আনন্দ।

এখানে এই সভাগৃহে অনেক কাজ হবে, অনেক সভা অনুষ্ঠিত হবে, অনেক সৎপ্রসঙ্গ হবে—এর সুযোগ করে দিয়েছেন ঠাকুর। তাঁর প্রতি আমরা এজন্য অশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। আমাদের প্রণাম জানাচ্ছি ঠাকুরকে, মাকে, স্বামীজীকে যে, তাঁদের ইচ্ছায় এটি পূর্ণ হয়েছে। ঠাকুরের একটি কথা মনে পড়ল। তিনি দক্ষিণেশ্বরের মন্দির সম্বন্ধে বলতেন যে, সকলে বলে—এটি রানী রাসমণির করা। বলে না যে, এটি ঠাকুরের ইচ্ছায়, ভগবানের ইচ্ছায় হয়েছে। তাঁদেরও সেইরকম, কাকে যন্ত্র করে তিনি কাজ করবেন তা তিনিই জানেন। তাতে যন্ত্রের কোন বাহাদুরী নেই, যিনি সেই যন্ত্রকে সঞ্চালিত করছেন, তাঁরই কৃতিত্ব। তিনি করছেন আমাদের সকলের কল্যাণের জন্য। আমাদের কল্যাণ তিনি সর্বদাই করছেন, এখানেও তিনি করেছেন। ভবিষ্যতে আরো কত কী হবে!

অবশ্য এই সভাগৃহটির প্রশস্ততা দেখে মনে হচ্ছে, আরো অনেক বড় হলে এখানকার উপযুক্ত হতো। তবে আগে যেমন বলেছি—একেবারে ছিল না, তার জায়গায় একটি হলো, যাকে বলে—'মাথা গোঁজার জায়গা হয়েছে', সেইরকম এখানে একটু বসবার জায়গা হয়েছে। এতে আমাদের আনন্দের শেষ নেই। এখানে ঠাকুরের চরণে, মায়ের চরণে, স্বামীজীর চরণে প্রার্থনা—যেন এই সভাগৃহটি সৎ চিন্তার পরম্পরার ভিতর দিয়ে সার্থকতা লাভ করে। সৎ চিন্তা—শুধু চিন্তা নয়, শুধু ভাষণ নয়—যাতে মানুষের কল্যাণ হবে, শ্রোতাদের সকলের কল্যাণ হবে, এমন চিন্তাধারা এখানে যেন সর্বদা অব্যাহত থাকে—এই তাঁদের কাছ থেকে আশীর্বাদ চাইছি। এই আশীর্বাদ পেলে এই ছোট্ট প্রতিষ্ঠানটিও অনেক কাজের হবে—এবিষয়ে সন্দেহ নেই। আমরা দেখেছি, যা অনেক ক্ষুদ্র আকারে আরম্ভ হয়েছে, তা ধীরে ধীরে কত বেড়ে গেছে। এই সারদাপীঠ—যার অংশ বিদ্যামন্দির—কত ক্ষুদ্র আকারে আরম্ভ হয়েছিল। এখন তার কী বিশাল পরিণতি হয়েছে। আর বেলুড় মঠের তো কথাই নেই। যখন প্রথম আরম্ভ হয়েছিল তখন তো সাধুদের থাকার জায়গা ছিল না, খাওয়ারও সংস্থান ছিল না। ধীরে ধীরে তাঁর ইচ্ছায়, বিশেষ করে বলব মায়ের ইচ্ছায়, এই প্রতিষ্ঠানটির ক্রমশ শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে, জনপ্রিয়তা বাড়ছে এবং জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাধুদের—যাঁরা সঞ্চালন করছেন, তাঁদের দায়িত্বও ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। এই দায়িত্ব বহন করবার দায়িত্ব যিনি দিয়েছেন, তিনিই শক্তি দিন—এই প্রার্থনা।

আমরা ঠাকুর, মা, স্বামীজীর কাছে এই প্রার্থনা জানাই—আমাদের এই শুভ সূচনাটি যেন ক্রমশ ধীরে ধীরে আরো জনকল্যাণকামী হয় এবং সকলের ভালবাসা নিয়ে এটি ধীরে ধীরে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। আমার বেশি কিছু বলবার নেই, আমি আবার তাঁদের শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে এখানেই শেষ করছি এবং আপনাদের সকলের, যাঁরা উপস্থিত আছেন, যাঁরা উপস্থিত নেই, পরে আসবেন—তাঁদের সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।* ❑

* গত ২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের বিবেকানন্দ সভাগৃহ উদ্বোধন উপলক্ষ্যে পূজ্যপাদ মহারাজের ভাষণ। ভাষণটি দিলীপ পাল কর্তৃক টেপরেকর্ডে গৃহীত এবং অনুলিখিত। সম্পাদনা—স্বামী সর্বগানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক সঙ্গীত

স্বামী হর্ষানন্দ

সংস্কৃত থেকে বঙ্গানুবাদ : স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ব্যাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ প্রবীণ ও শাস্ত্রজ্ঞ সন্ন্যাসী স্বামী হর্ষানন্দজী স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক সঙ্গীত' ও স্তোত্রাদির সংস্কৃত ব্যাখ্যা করেছেন। বেলুড় মঠস্থ বিবেকানন্দ বেদ বিদ্যালয়ের আচার্য স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ সেগুলির প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ করছেন।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

"ভঞ্জন দুঃখগঞ্জন করুণাঘন কর্মকঠোর।
প্রাণার্পণ জগততারণ কৃন্তন কলিডোর।" ।।৫।।

শব্দার্থ : দুঃখগঞ্জন ভঞ্জন—গঞ্জনযোগ্য অর্থাৎ নিন্দনযোগ্য দুঃখের ভঞ্জক, নাশক। করুণাঘন—করুণাঘন, ঘনীভূত করুণাস্বরূপ। কর্মকঠোর—কঠোর কর্মকর্তা, অতিদুষ্কর কর্মকর্তা। প্রাণার্পণ জগততারণ—জগতের ত্রাণের জন্য যিনি নিজের প্রাণ অর্পণ করেছেন। কৃন্তন কলিডোর—কলির পাশবন্ধন ছেদন করতে সমর্থ।

ভাষ্য : 'হায়, কী কষ্ট! আমার দুঃখ না হোক!'—এমন আক্ষেপ সকলেই করে থাকে। আর এই দুঃখ আসে পূর্বকৃত পাপের ফলে। এই দুঃখ গঞ্জনযোগ্য, নিন্দনযোগ্যই হয়। ঈশ্বর যেহেতু সর্বকর্মাধ্যক্ষ, সেজন্য এই দুঃখ পরমকৃপালু পরমেশ্বরের দ্বারাই দূর হতে পারে। এক্ষেত্রে উপমা দেওয়া যায়—রাজা অপরাধীকে দণ্ড দিলে পরে অপরাধী যদি অনুতপ্ত হয়, তখন রাজা স্বয়ং যেমন তার দুঃখ দূর করে থাকেন, ভগবানও সেরূপ করে থাকেন। কেন তিনি **দুঃখগঞ্জন ভঞ্জন** করেন? কারণ, তিনি **করুণাঘন**—ঘনীভূত করুণাস্বরূপ। সেজন্যই তিনি দুঃখগঞ্জন ভঞ্জন করতে সমর্থ। জীবজগতের প্রতি করুণা ব্যতীত ভগবানের অবতার হওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেক অবতারের মধ্যেই করুণাস্বভাব ভগবানের এই বিশেষ গুণটি স্পষ্ট দেখা যায়। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীস্ট, শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, মহম্মদ প্রমুখ সকল অবতারপুরুষ এবং আচার্যই করুণাপরবশ হয়ে লোক-সংগ্রহে নিযুক্ত থাকেন। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মধ্যেও সেই কৃপা দেখা যায়। সেই করুণা বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ সৎ শিষ্যগণের প্রতি যেমন দেখা যায়, তেমনি দেখা যায় লোকদৃষ্টিতে অতিনিকৃষ্ট অন্ত্যজ রসিকের প্রতিও প্রবাহিত। অতএব শ্রীরামকৃষ্ণ যে করুণাঘন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কর্মকঠোর—অতি দুষ্কর কর্মকর্তা। মা কালীকে দর্শনের জন্য তাঁর প্রথম সাধনা থেকে আরম্ভ করে ষোড়শীপূজা পর্যন্ত তিনি যেসকল সাধনা করেছেন, বিশেষত তন্ত্রসাধনাসমূহ ও বেদান্তসাধনা, সেসব অতি উত্তম সাধকগণের পক্ষে করাও দুষ্কর। এজন্য তিনি কঠোর কর্মকর্তা। অতি উত্তম সাধকাগ্রণী। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি নিজ কৃপায় নির্বিকল্প সমাধি দান করে পুনরায় অবলীলাক্রমে তা নিজের মধ্যে আকর্ষণ করে তাঁর মনকে কাদার তালের মতো গঠনের মধ্য দিয়েও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কঠোরকর্মত্ব প্রমাণিত হয়। আমাদের মতো অতি সামান্য 'জায়স্ব-ম্রিয়স্ব' প্রকৃতির অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ সংসারে গতায়াতশীল জীবকেও তাঁর শ্রীপাদপদ্মের প্রতি আকর্ষণ করার মধ্যেও কি তাঁর কঠোরকর্মত্ব প্রমাণিত হয় না?

প্রাণার্পণ জগততারণ—জগতের ত্রাণে যিনি প্রাণ সমর্পণ করেছেন, তিনি হলেন প্রাণার্পণ জগততারণ। অমঙ্গলের হাত থেকে জগৎকে রক্ষা করার কার্য দ্বিবিধ—প্রথমত, অমঙ্গলকে সরাসরি বিনাশ করা; দ্বিতীয়ত, সকল অমঙ্গল দূর করার উপায়স্বরূপ ভগবৎ অনুগ্রহলাভের জন্য যে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োজন, সেই শক্তি জীবগণের হৃদয়ে জাগ্রত করে অমঙ্গল নাশ করাই হলো শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রধান সহায়তা। এভাবে জগৎকে ত্রাণ করার জন্য তিনি প্রাণ অর্পণ করেছিলেন। প্রাণার্পণও দুইপ্রকার—মহৎ কার্য সম্পাদন প্রযত্নে প্রাণবিসর্জন, যেমন ভগবান যীশুখ্রীস্ট করেছিলেন; অথবা সারাজীবন তাঁর লোককল্যাণকার্যকে অব্যাহত রাখতে মহান কার্যসহায়ক তৈরি করা। যেকোন মহাপুরুষের ক্ষেত্রেই এরূপ দেখা যায়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এই উভয় কার্যের জন্যই প্রাণ অর্পণ করেছিলেন। জীবের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তিনি সর্বদা পরিশ্রম করতেন; তাঁদের কৃত পাপ নিজ দেহে আকর্ষণ করে নিয়ে ক্যান্সাররোগ ধারণ করে তাদের পাপ বিনাশ করেছিলেন এবং অন্তকালেও তাঁর পদাশ্রিতদের উপদেশাদি দানে রত ছিলেন। কিন্তু এখানেই শেষ নয়; যাবজ্জীবন তিনি জগত্তারণের জন্য যে যে কার্য করেছিলেন এবং যে যে কার্য অনুমোদন করেছিলেন, দেহপাতের পরও শিষ্যপ্রবর বিবেকানন্দকে অবলম্বন করে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ স্থাপন করেন (যাতে তাঁর লোককল্যাণকর কার্যধারা অব্যাহত থাকে)। সঙ্ঘের মাধ্যমে সেই লোককল্যাণধারা আজও অব্যাহত আছে। অন্নগত প্রাণ ও কামকাঞ্চনাসক্তি—এই হলো কলিযুগের প্রধান লক্ষণ। ফলে অরিষড়্‌বর্গকেই মিত্র বলে বোধ হয়। অনাত্মবস্তুতে প্রীতিই হলো কলির বন্ধন। এই কলির বন্ধন একমাত্র আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তির দ্বারাই ছেদন হয়। জীবের মধ্যে এই প্রবৃত্তির প্রবর্তন করতে তিনি প্রাণার্পণ করেছিলেন। এই আধ্যাত্মিক শক্তির পুনরুজ্জীবন হেতুই তিনি **কৃন্তন কলিডোর**—কলির বন্ধনের কৃন্তয়িতা।

"বঞ্চন কামকাঞ্চন অতি নিন্দিত ইন্দ্রিয়রাগ।
ত্যাগীশ্বর হে নরবর দেহ পদে অনুরাগ।" ।।৬।।

শব্দার্থ : বঞ্চন কামকাঞ্চন—কাম ও কাঞ্চনজয়ী। অতিনিন্দিত ইন্দ্রিয়রাগ—ইন্দ্রিয়াসক্তির অতি নিন্দাকারী। ত্যাগীশ্বর—হে ত্যাগিশ্রেষ্ঠ। নরবর—হে নরবর, নরশ্রেষ্ঠ। দেহ—দাও। পদে—চরণে। অনুরাগ—ভক্তি।

ভাষ্য : বঞ্চন কামকাঞ্চন—কাম ও কাঞ্চনকে বঞ্চনা বা বর্জন করেন বলে শ্রীরামকৃষ্ণ কামকাঞ্চনজয়ী। চতুর্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে পরমপুরুষার্থ মোক্ষই জীবনের চরম লক্ষ্য—এই মনে করে উন্মার্গগমনের প্রবৃত্তিযুক্ত যে অর্থকাম, সেই কামকাঞ্চনকে তিনি জয় করেছিলেন অর্থাৎ সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছিলেন। সকল স্ত্রীলোকের প্রতি মাতৃভাব পোষণ করে, নিজ পত্নীকেও জগন্মাতা-জ্ঞান করে তিনি ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে তাঁকে ষোড়শী-রূপে পূজা করে প্রথম কামজয়ের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণ নামে জনৈক ব্যবসায়ী দশহাজার টাকা দিতে চেয়ে তাঁর নিকট তিরষ্কৃত হন। এটি হলো উক্ত বিষয়ের দ্বিতীয় উদাহরণ। লোকশিক্ষার্থে এমন উদাহরণ খুব অল্পই আছে। 'জগতের সবকিছুই পরমেশ্বরের দ্বারা আবৃত' (ঈশ উপনিষদ্, ১), 'জগতের সবকিছুই ব্রহ্ম' (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৩।১৪।১), 'যা এই নিখিল বস্তু, তা-ই আত্মা' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪।৫।৭), 'সমগ্র জীবজগৎ বাসুদেবই [ব্রহ্মই]' (গীতা, ৭।১৯)—এসকল শ্রুতি-স্মৃতি বাক্যে কথিত সর্বজগতের মূল, সর্বব্যাপী ও সর্বজগতের লয়স্থান যে পরব্রহ্ম, 'সেই পরব্রহ্ম আমিই'—এই তত্ত্ব সাক্ষাৎ করায় নিখিলজগতে যাঁর দ্বৈতভাব নেই, এমন মহামহিম ব্যক্তির কামকাঞ্চনাসক্তি থাকবে কি করে? অথবা যে-কামকাঞ্চন সর্বজগৎকে বঞ্চনা করতে সমর্থ, সেই কামকাঞ্চনকেই তিনি বঞ্চনা করেছেন; কেননা তিনি হলেন মায়াজাত সবকিছুর ঊর্ধ্বে অবস্থিত মায়াধীশ পরমেশ্বর। অতএব **ইন্দ্রিয়রাগ** বা ইন্দ্রিয়বিষয়ে সম্বন্ধযুক্ত আসক্তি তাঁর দ্বারা **অতি নিন্দিতই** হবে; যেহেতু এই আসক্তিই সকল অনর্থের মূল। এজন্যই তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) হলেন **ত্যাগীশ্বর। হে নরবর।** পুরুষোত্তম! **দেহ পদে অনুরাগ**—তোমার পাদপদ্মে অনুরাগ, ভক্তি দাও। সকল প্রাণীর যে স্বাভাবিক অনুরাগ তা হলো—অতি নিন্দিত বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগজাত ও সদা বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত; কিন্তু আমার যে অনুরাগ তা যেন তোমার কৃপায় ধর্ম ও মোক্ষকে অনুসরণ করে তোমার শ্রীপাদপদ্মে আকৃষ্ট হয়—এই আমার প্রার্থনা।

"নির্ভয় গতসংশয় দৃঢ়নিশ্চয় মানসবান।
নিষ্কারণ ভকতশরণ ত্যজি জাতিকুলমান।" ।।৭।।

শব্দার্থ : গতসংশয়—যাঁর সকল সংশয় দূর হয়েছে। নিষ্কারণ—যাঁর কোন কারণ নেই, কারণহীন। ভকতশরণ—ভক্তগণের আশ্রয়। ত্যজি জাতিকুলমান—জাতি ও কুলের অভিমান যিনি ত্যাগ করেছেন। অন্যান্য শব্দের অর্থ স্পষ্ট।

ভাষ্য : যাজ্ঞবল্ক্য যেমন বলেছিলেন : 'হে জনক, আপনি অভয়প্রাপ্ত হলেন' (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪।২।৪)—সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম সাক্ষাৎ করে শ্রীরামকৃষ্ণ **নির্ভয়** হয়েছেন। দ্বিতীয় ব্যতীত অর্থাৎ দ্বিতীয় বস্তু না থাকায় ভয় হবে কোথা থেকে? বাল্যকালেই শ্রীরামকৃষ্ণ ধ্যানাভ্যাস ও বৈরাগ্যাভ্যাসের জন্য সকলের ভীতিপ্রদ স্থান শ্মশানে যেতেন। যে-তত্ত্বের বিষয়ে নিজে দৃঢ়বিশ্বাস করতেন, তার অনুসরণকালে তিনি কোনকিছুতেই ভয় পেতেন না—একথা তাঁর জীবনপাঠকদের সুবিদিত। উপদেশ প্রদানের কালে তাঁর নিকট যাঁরা আসতেন, ধনবলে দর্পিত হলেও তাঁদের তিনি তৃণবৎ মনে করে, শুনতে কঠোর হলেও উচিত উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হতেন না। অবশ্য তাঁদের কল্যাণের জন্যই তিনি তা করতেন। এসবই তাঁর নির্ভয়ত্বকে প্রকাশ করে।

গতসংশয়—অপরোক্ষানুভূতি লাভ করায় তত্ত্ব-বিষয়ে সকল সংশয় তাঁর সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়েছিল।

দৃঢ়নিশ্চয় মানসবান—কোন বিষয়ে তিনি যদি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করতেন, তবে চতুর্মুখ ব্রহ্মাও তা অপনয়ন করতে অসমর্থ। কারণ, তাঁর সকল সিদ্ধান্তই ছিল মা কালীর আদেশানুসারী। তাঁর দৃঢ়নিশ্চয়তা সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত হলো—ধাত্রীমাতা ধনী কামারনীকে তিনি পূর্বে কথা দিয়েছিলেন যে, উপনয়নকালে তিনি কামারনীর কাছ থেকে ভিক্ষাগ্রহণ করবেন এবং সম্প্রদায়বিরুদ্ধ হলেও কার্যকালে তিনি তা করেছিলেন। তোতাপুরীর কাছে বেদান্তসাধনের সময় ভৈরবী ব্রাহ্মণী বিভিন্নভাবে তাঁকে সেই সাধনা থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেও শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ সিদ্ধান্ত ত্যাগ করেননি। সেইরকম তোতাপুরী হাততালি দিয়ে মা কালীর নাম করতে নিষেধ করলেও তিনি তা থেকে বিরত হননি।

নিষ্কারণ—কারণ অর্থাৎ মূল নেই যাঁর, তিনি নিষ্কারণ। পরমেশ্বরই সবকিছুর মূল; তিনি পরমেশ্বরের অবতার বলে তিনি নিষ্কারণ। **ভকতশরণ**—ভক্তগণের শরণ, আশ্রয়। অথবা 'নিষ্কারণ-ভকতশরণ'—একপদ হিসাবে ধরে অর্থ করা যায়—বিনা কারণেই ভক্তগণকে তুমি শরণ, আশ্রয় দাও; যেহেতু তুমি অহেতুক কৃপাসিন্ধু। **ত্যজি জাতিকুলমান**—মান, দর্প, আত্ম-সংভাবিতত্বম্ অর্থাৎ আত্মাভিমানিত্বম্। এই মান ব্রাহ্মণত্বের অভিমান হতে পারে, সৎকুলের অভিমান হতে পারে, ধনের অহঙ্কারও হতে পারে, অথবা অন্য কোন কারণেও অভিমান হতে পারে। এই অভিমানের মূল অহঙ্কার। অহঙ্কার আধ্যাত্মিক প্রগতির পথে কণ্টকস্বরূপ। অতএব অভিমানের মূলোৎপাটন বিনা আধ্যাত্মিক সাধনসিদ্ধির সম্ভাবনা নেই। এইজন্য সাধনকালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পঞ্চবটীমূলে বসে ধ্যান করার সময় জাতি-কুল-মান ত্যাগ করে বস্ত্র ও যজ্ঞোপবীত খুলে ফেলতেন। অথবা এমন অর্থও করা যায়—তিনি সর্বভূতে স্থিত এক পরমাত্মাকে দর্শন করে উত্তম-অধম জাতি, সৎকুল-দুষ্কুল, মান-অপমানাদি সর্বদ্বন্দ্বকে অতিক্রম করেছিলেন। [ক্রমশ] (তিন)

পাতঞ্জল-যোগসূত্র

ব্যাখ্যাতা ঃ স্বামী প্রেমেশানন্দ

সূত্রানুবাদ ঃ স্বামী শরণ্যানন্দ

সম্পাদনা ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

সমাধিপাদ

পরমাণু-পরমমহত্ত্বান্তোঽস্য বশীকারঃ।।৪০।।

এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহত্তম পদার্থ পর্যন্ত সর্ববিষয়ে মন ধারণা করিতে সমর্থ হয়।

ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতা সমাপত্তিঃ।।৪১।।

যোগীর চিত্তবৃত্তি তখন এইরূপ বশীভূত হইয়া যায় যে, স্বচ্ছ স্ফটিক যেমন বিভিন্ন বর্ণের বস্তুর নিকট থাকিলে সেই সেই বস্তুর বর্ণ ও আকার ধারণ করে, তাঁহার চিত্তও সেইরূপ আত্মা, মন ও বাহ্যবস্তুতে একাগ্রতা ও একীভাব প্রাপ্ত হয়।

মন্তব্য ঃ মনকে একাগ্র করিতে করিতে যখন এইরূপ শক্তি হয় যে, ইচ্ছামাত্র যে-বিষয়ে যখনি মন একাগ্র করিতে ইচ্ছা করিব, তখনি তাহা করিতে সমর্থ হইব। তখন অতি সূক্ষ্ম বিষয়ে (যেমন ঠাকুরের আধ্যাত্মিক অবস্থাসমূহের চিন্তা) যেমন মন স্থির হইবে, অতি বিরাট বস্তুর (যেমন আকাশ, সমুদ্র, হিমালয়) ধারণাতেও মন সমাহিত হইবে।

এই অবস্থার একটি উদাহরণ—অতি নির্মল স্বচ্ছ মণির নিকট কোন বস্তু রাখিলে ঐ মণিটি ও বস্তুটিকে একই রঙে রঞ্জিত হইতে দেখা যাইবে। মনে হইবে যেন বস্তুটি মণিতেই অবস্থিত। যেমন এক টুকরা কাঁচের নিকট একটি রক্তজবা রাখিলে কাঁচটি লাল দেখায়, আর মনে হয় ফুলটি যেন ঐ কাঁচের মধ্যেই আছে। মনের চরম একাগ্রতার ফলে মনরূপ কাঁচ ধ্যেয় বিষয়ে রঞ্জিত অর্থাৎ তদাকারকারিত হইয়া যায়। ধ্যেয় একটি এবং ধ্যাতা মন আরেকটি—এরূপ বোধ হয় না। উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ।।৪২।।

যে-সমাধিতে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান মিশ্রিত হইয়া থাকে, তাহা সবিতর্ক সমাধি।

স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্বিতর্কা।।৪৩।।

যে-সমাধিতে স্মৃতি শুদ্ধ হইয়া যায় এবং উহা ধ্যেয় বস্তুর অর্থমাত্র প্রকাশ করে, তাহা নির্বিতর্ক সমাধি।

এতয়ৈব সবিচারা নির্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা।।৪৪।।

পূর্বের দুইটি সূত্রের দ্বারা সবিচার ও নির্বিচার সমাধি এবং উহাদের সূক্ষ্মবিষয়ও ব্যাখ্যাত হইল।

সূক্ষ্মবিষয়ত্বং চালিঙ্গপর্যবসানম্।।৪৫।।

সূক্ষ্ম বিষয় অব্যক্ত বা প্রকৃতিতে পর্যবসিত হয়।

তা এব সবীজঃ সমাধিঃ।।৪৬।।

পূর্বোক্ত সমাধিগুলি সবীজ সমাধি (উহাতে কর্মফলের বীজ বর্তমান থাকে)।

মন্তব্য ঃ এখন বিতর্ক ও বিচার সমাধির কথা বলা হইতেছে। নিষ্কাম কর্ম ও উপাসনা না করিয়া যাঁহারা যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের সূক্ষ্ম বিষয়ে চিন্তা করিবার শক্তি থাকে না; ব্রহ্ম বিষয়ে চিন্তা করা তাঁহাদের সাধ্যাতীত। তাই এইপ্রকার সাধককে স্থূল বাহ্যবিষয় লইয়া প্রথম সাধনা আরম্ভ করিতে হয়।

সাধক প্রথমে কোন একটা স্থূল বস্তুকে অবিরাম চিন্তা করিতে অভ্যাস করিবেন। প্রথমে তিনি যতই একাগ্রচিত্তে চিন্তা করুন না কেন, তাঁহার বুদ্ধি সূক্ষ্ম না হওয়ায় তিনি বুঝিতে পারিবেন না যে, চিন্তার সময়ে চিন্তনীয় বিষয় ও বুদ্ধির মধ্যে মন বিচরণ করিয়া এই চিন্তা কার্য সম্পাদন করিতেছে। অনেকদিন এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যখন তাঁহার দৃষ্টিশক্তি সূক্ষ্মতা লাভ করিবে, তখন ধ্যেয় বস্তুতে তাঁহার মন যেন লীন হইয়া যাইবে। আমি চিন্তা করিতেছি কি না করিতেছি তাহা কিছুই মনে থাকিবে না। তিনি আত্মহারার ন্যায় ধ্যেয় বস্তুটিকে শুধু বোধে বোধ করিবেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের 'ছিপ দিয়া মাছ ধরা'র উপমাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

এইরূপে যখন যোগী সূক্ষ্ম বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে সর্ববস্তুর কারণ মূল প্রকৃতিতে মন তুলিয়া তাহাতে লীন করিতে পারিবেন, তখন সবীজ সমাধির শেষ সীমায় উপস্থিত হইবেন।

নির্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ।।৪৭।।

নির্বিচার সমাধিতে সত্ত্বগুণের প্রভাবে বুদ্ধি স্বচ্ছ হইয়া গেলে চিত্ত সম্পূর্ণ স্থির হয়, ইহাই বৈশারদী প্রজ্ঞা।

ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা।।৪৮।।

ইহাতে যে জ্ঞানলাভ হয় তাহা 'ঋতম্ভর' বা সত্যপূর্ণ জ্ঞান।

শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ।।৪৯।।

বিশ্বস্তজনের বাক্য ও অনুমান সাধারণ বস্তুবিষয়ক জ্ঞান প্রকাশ করে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা উচ্চতর সমাধিবিষয়ক জ্ঞানকে প্রকাশ করিতে পারে না।

তজ্জঃ সংস্কারোঽন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী।।৫০।।

এই সমাধি হইতে যে-সংস্কার উৎপন্ন হয় তাহা অন্যান্য সংস্কারের প্রতিবন্ধক।

মন্তব্য ঃ এই সৃষ্টির উপাদান কারণ প্রকৃতিতে মন সম্পূর্ণ একাগ্র করিতে পারিলে সমস্ত জ্ঞেয় বস্তুই যেন আয়ত্তাধীন হইয়া পড়ে। সুস্থ সবল ধনাঢ্য ব্যক্তিদের কোন শারীরিক ও মানসিক দুশ্চিন্তা না থাকায় তাঁহারা যেমন সর্বদা একটা প্রশান্তি অনুভব করেন, পূর্বোক্ত সাধকও তেমনি মনে বিন্দুমাত্র অশান্তি অনুভব করেন না। সেই শুদ্ধ প্রশান্তচিত্তে এই জগতের সকল সমস্যারই সমাধান যেন সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত থাকে। মানবজীবনের কোন সমস্যাই তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না। ইহা বুদ্ধিমান লোকের বিচারশক্তি নহে, ইহা একটি প্রত্যক্ষানুভূতি। এই অনুভূতির ফলে সাধকের মন পূর্ব সংস্কারের বশবর্তী হইয়া সাধারণ লোকের ন্যায় সাংসারিক কাজে লিপ্ত হইতে পারে না।

তস্যাপি নিরোধে সর্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ।।৫১।।

পূর্বোক্ত সংস্কারকেও নিরুদ্ধ করিতে পারিলে সকল সংস্কার নিরোধ হওয়ায় নির্বীজ সমাধি উৎপন্ন হয়।

মন্তব্য ঃ এই অবস্থাটি জীবত্বের পূর্ণবিকাশ। জীব তখন সমস্ত প্রকৃতিকে ইচ্ছামত পরিচালিত করিবার শক্তি লাভ করে। যে-সাধক এই অবস্থা লাভ করিয়াও তাহা কৈবল্য হইতে হীনাবস্থা মনে করেন, তিনি স্ব-স্বরূপের চিন্তা করিয়া এই সমাধিরও উর্ধ্বে উঠিয়া যান। ইহাই যোগসাধনার পূর্ণ পরিণতি কৈবল্যপ্রাপ্তি।

সমাধিতে ঈশ্বরদর্শন লাভ হইলে প্রকৃতির ভিতরের সবই জানিতে পারা যায়। কিন্তু প্রকৃতির বাহিরে না যাইতে পারিলে পূর্ণ জ্ঞান বা ব্রহ্মনির্বাণ হয় না। জীবের পক্ষে যতরকম আনন্দ প্রাপ্তি সম্ভব তাহা শ্রীশ্রীঠাকুর মা কালীর মধ্য দিয়া পাইয়াছিলেন, তাহার পর তোতাপুরীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করেন। ইহাই মানুষের পুরুষকারের শেষ সীমা।

সাধনপাদ

তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।।১।।

তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান—এইগুলি ক্রিয়াযোগ।

সমাধিভাবনার্থঃ ক্লেশতনূকরণার্থশ্চ।।২।।

সমাধি অভ্যাস ও ক্লেশযুক্ত বিঘ্নসমূহ দূর করিবার জন্য ক্রিয়াযোগের প্রয়োজন।

মন্তব্য ঃ 'বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা' অর্থাৎ বাহ্য শব্দাদি বিষয়ে অনাগ্রহী (দ্রঃ গীতা, ৫।২১) না হইলে কোন সূক্ষ্ম বিষয়ের গবেষণা করা সম্ভব নহে; তাই সাধনার প্রথম কথাই 'তপঃ' অর্থাৎ তপস্যা, অর্থাৎ শরীর-মনকে এমনভাবে প্রস্তুত করা যাহাতে তাহারা বাহ্য আঘাতে প্রতিক্রিয়া না করিয়া অবস্থান করিতে পারে।

'স্বাধ্যায়' ও 'ঈশ্বরপ্রণিধান' ঠিক বৈজ্ঞানিকদের theoretical study এবং practical laboratory work-এর মতো।

সমাধি অভ্যাসের প্রয়োজন দুইটি ঃ সংসারে দেখা যায়, বৃদ্ধ হইলে কেহ কেহ বাড়িঘরের ঝঞ্ঝাট এড়াইবার জন্য কাশী বা বৃন্দাবন চলিয়া যায়। সমাধি ব্যাপারটা ঠিক সেইরূপ। যাহাদের সংসার ভাল লাগে না, তাহারা ভগবানের চিন্তায় তন্ময় হইতে পারিলে আর কিছু না হোক এই জগতের ঝঞ্ঝাট হইতে আত্মরক্ষা করা সহজ হয়। অনেক ভণ্ড সত্ত্বগুণী আয়েসপ্রিয় লোককে দেখা যায়, যাহারা সত্ত্বগুণী মুমুক্ষু নন, কিন্তু কাজকর্ম বাড়াইবার জন্য নিরিবিলিতে বাস করেন। যদি এইরূপ ভাবাপন্ন লোক স্বাধ্যায়ের দ্বারা সাধ্যবস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহারা অনায়াসেই ঈশ্বরচিন্তায় সমাহিত হইতে সমর্থ হইবেন।

প্রথম অধ্যায়ে যোগীদের সাধ্য সমাধি কিরূপে লাভ করা যায়, তাহা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগসাধনের যোগ্যতালাভ করিবার উপায় সম্বন্ধে বলা হইবে। মানুষের দুঃখের হেতু অজ্ঞান অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ বিস্মরণ। তাহা দূর করিতে হইলে বহুপ্রকার চেষ্টার প্রয়োজন। জ্ঞানের একটু আভাস বুদ্ধিতে প্রকাশিত হইলে তখন মনকে একাগ্র করা বা সমাধিস্থ করা সম্ভব হয়। তখন প্রথম সাধনা—সুখ-দুঃখে অবিচলিত থাকার অভ্যাস করা। দ্বিতীয় সাধনা—আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্র অধ্যয়ন। তৃতীয় সাধনা—জীবের আত্মস্বরূপ ঈশ্বরের প্রতি মনোনিবেশ।

এই সাধনা তিনটি মনুষ্যমাত্রেরই অত্যাবশ্যক। ভারতবর্ষে ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বালকদিগকে এই তপস্যা শিক্ষা দেওয়া হইত। 'তপস্যা' শব্দটি 'তপ্' ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। 'তপ্' ধাতুর অর্থ 'তাপ' দেওয়া অর্থাৎ কষ্ট সহ্য করা। সেজন্য 'তপস্যা' শব্দের অর্থ 'তাপ' অর্থাৎ কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতালাভের সাধনা। 'তপস্যা' শব্দের প্রকৃত অর্থ এখন একেবারেই বিকৃত হইয়া গিয়াছে। 'তপস্যা' বলিতে কি বুঝায় এবং তাহার উদ্দেশ্য কি তাহা যেন কেহই কিছুই বুঝে না।

প্রতি জীবকে প্রকৃতির সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করিয়া জীবনরক্ষা করিতে হয় এবং নিজের অভ্যুদয় সাধন করিতে হয়। সামান্য একটু প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে প্রকৃতিতে যে প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়, তাহা নিবারণের জন্য মানুষের বহু কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। সর্বদাই দেখা যায়, তথাকথিত অশিক্ষিত অসভ্য লোকেরা অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় শীতাতপে দারুণ পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করে। শিক্ষিতেরা নিজের শরীরকে বাঁচাইবার জন্য সহস্রপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া বাহ্যদৃষ্টিতে পরম আরামে থাকেন। আবার জীবনের সুখ-দুঃখের বিচার করিলে দেখা যায়, অশিক্ষিতেরা আধিব্যাধি অর্থাৎ শারীরিক ও মানসিক কষ্ট সহ্য করিয়া নীরোগ ও নিশ্চিন্ত থাকে। তাহাদের খাদ্যবস্তু অনায়াসে জীর্ণ হয় এবং প্রত্যহ সুনিদ্রার ব্যাঘাত দেখা যায় না। কিন্তু শিক্ষিত লোকের আরামের সঙ্গে সঙ্গে কি পরিমাণ অস্বস্তি, শক্তিক্ষয় ও অর্থক্ষয় হয় তাহাও সকলের জানা। গ্রামের লোকের মুখে একটি প্রবাদ শুনিয়াছিলাম—'বাবু মরেন শীতে আর ভাতে'। অর্থাৎ বাবুদের সামান্য একটু শীত সহ্য করিবার শক্তি নাই। শিশুকাল হইতে শীতাতপের হাত হইতে দেহরক্ষার জন্য বিপুল আয়োজনের ফলে প্রকৃতির সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয় না। যদি কচিৎ কখনো ঘটনাচক্রে মুখোমুখি হইয়া যায় তখন সর্দি-কাশি, জ্বর-জ্বারি কতকিছু উপদ্রব হয়! আর বাবুদের 'ভাত'-এর অর্থাৎ আহারের ব্যবস্থা কত লোভনীয়! কিন্তু পাকযন্ত্রের স্বাভাবিক শক্তির অভাবে সুখাদ্যের রসানুভূতি হইলেও যথাযথ পরিপাক না হওয়ায় তাহার সঙ্গে কত দুঃখ জড়িত তাহা তো সকলেই জানেন। প্রাচীনেরা ইহা জানিতেন ও বুঝিতেন বলিয়া বাল্যকালে প্রকৃতির সঙ্গে বাস করা অভ্যাস করাইতেন। ঐরূপ পলাইয়া পলাইয়া থাকা যে কত কষ্টকর, প্রাচীনেরা তাহা জানিতেন বলিয়া আমাদের শাস্ত্রে তপশ্চর্যার এত গৌরব ঘোষণা করা হইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার মূল সুর ছিল—'Plain living and high thinking'। কিছুদিন পূর্বেও দেখিয়াছি, পর্ণকুটিরবাসী ভিক্ষান্নজীবী কঠোর সাধুদিগকে এই দেশের লোক দেববৎ মান্য করিত। ইহার রহস্য আর কিছুই নয়, লোকে সহজভাবেই বুঝিতে পারে—আমরা প্রকৃতির দাস হইয়া পরাধীন হইয়া আছি, আর এই তপস্বী পুরুষরা প্রকৃতিকে আয়ত্তাধীন রাখিয়াছেন। [ক্রমশ] (পাঁচ)



শ্রাবণ ১৩০৮/জুলাই ১৯০১

দুইটী [দুইটি] বন্ধু

(শ্রী শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী)

দুই বন্ধু দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছেন; যাইতে যাইতে একটী [একটি] সাধুর সঙ্গে উভয়েরই আলাপ হইল। তিনজনে একত্রিত হইয়া হরিদ্বার কুম্ভমেলায় যাত্রা করিলেন। সাধুসঙ্গে উভয় বন্ধু পরম আহ্লাদিত; ধর্ম্ম [ধর্ম] ও দর্শনের নানা প্রসঙ্গে পথশ্রমের ক্লান্তি দূর হইতে লাগিল। বন্ধুদ্বয়ও নির্ম্মল [নির্মল] চিত্ত; সাধুসমাগমে তাহারা আরও উজ্জ্বল হইতে লাগিল। একজন বন্ধুর তপস্যায় ভারী ঝোঁক; ঈশ্বর লাভে মহা অনুরাগী, ত্যাগশীল ও প্রশান্তচিত্ত। অন্যজনের শরীরে অসীম বল, বুকে অসীম সাহস; ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, কিন্তু জীবোপকারকরণেচ্ছু। সাধুসঙ্গে উভয়ের ভাবই স্ফুট হইতে স্ফুটতর হইতে লাগিল। হরিদ্বারে পঁহুছিয়া [পৌঁছিয়া] এক বন্ধু সাধুর নিকট হইতে দীক্ষা লইয়া, সাধন ভজনায় মনোনিবেশ করিলেন। অন্যজনের ঐ সকল ভাল লাগিত না; তিনি হরিদ্বারে সেই সাধুর ভিড়ে গিয়া দেখিতেন, কাহার ধূনিতে [ধুনিতে] কাঠ বা কয়লা নাই, কাহার এখনও খাওয়া হয় নাই; এবং তৎক্ষণাৎ ঐ সকল অভাব যথাসাধ্য পূর্ণ করিয়া দিতেন। প্রথম বন্ধুর ক্রমে বিবেক বৈরাগ্য উপস্থিত হইতে লাগিল; তিনি দ্বিতীয় বন্ধুকে বলিলেন, "ভাই, আমি আর দেশে যাইব না; সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরলাভের চেষ্টায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিব।" ২য় বন্ধু তাহাকে কত বুঝাইলেন; বলিলেন, "অনির্দ্দেশ্য [অনির্দেশ্য], কাল্পনিক বিষয়ের জন্য প্রত্যক্ষ জগৎ উপেক্ষা করা তোমার ন্যায় জ্ঞানীর পক্ষে বড়ই পরিতাপের বিষয়। চল ভাই, দেশে ফিরে যাই। তোমার মা বাপ তোমার জন্য শোকে অস্থির হইবেন।" কিন্তু ১ম বন্ধু সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না; ঘোর তপশ্চর্য্যায় [তপশ্চর্যায়] মনোনিবেশ করিয়া ইষ্ট উদ্দেশে উত্তরাভিমুখে চলিয়া গেলেন। অনেক দিন তাঁহার আর সংবাদ পাওয়া গেল না।

২য় বন্ধুটী [বন্ধুটি] বন্ধুবিচ্ছেদে শোকাভিভূত হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। সংবাদ পাইয়া সন্ন্যাসী বন্ধুর মা বাপের কি অবস্থা হইল, সংসারী মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন। ২য় বন্ধুটী [বন্ধুটি] দেশে আসিয়া একটী [একটি] উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইলেন; স্বচ্ছল আয়ে পারিবারিক অবস্থা উন্নত হইল; কিন্তু তিনি পরোপকার ব্রতটী [ব্রতটি] এখনও ভুলিয়া যান নাই; উদ্বৃত্ত টাকা দ্বারা তিনি আশেপাশের গরীব [গরিব] দুঃখীকে সাহায্য করেন; অতিথি অভ্যাগতকে নিয়মিত যত্ন সেবা করেন। লোকের বিপদে নিজেকে বিপদান্বিত মনে করেন। নিষ্কলঙ্ক; পরদুঃখে দয়ার্দ্রচিত্ত। এই বন্ধুর ব্যবহারে আশেপাশের লোক তাঁহাকে বড়ই শ্রদ্ধা করে; কিন্তু তাঁহার একটা রোগ এই যে, ঈশ্বরের কথা যেখানে হয়, সেখানে তাঁহার গতিবিধি নাই; যেন হিরণ্যকশিপু; ঈশ্বরনামে তাঁহার বড়ই অশ্রদ্ধা। অথচ কাহারও বয়স্থা কন্যার বিবাহের সাহায্য করেন, কাহারও উপনয়ন সংস্কার করাইয়া দেন, গাঁয়ের শব পোড়াইতে যান, অজ্ঞাতসারে জানালা দিয়া কখনো টাকা পয়সা ফেলিয়া দিয়া আসেন, যেখানে যাহার কোন বিপদ শোনেন, তখনি উর্দ্ধশ্বাসে [ঊর্ধ্বশ্বাসে] দৌড়াইয়া যান, প্লেগ বসন্ত-রোগীকে ক্রোড়ে করিয়া তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করেন। মান নাই, অপমান নাই, লোকের কথা গ্রাহ্য করেন না। যাহা ভাল মনে হয়, তাহাই করেন; এ জীবনে তিনি কাহারও কোন অনিষ্ট চিন্তা করেন নাই। এইরূপ কার্য্য [কার্য] করিয়া আমাদের বন্ধু মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলেন।

আমাদের ১ম বন্ধু যোগ ধ্যান তপস্যার প্রভাবে অতীব শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন, অণিমাদি সিদ্ধিলাভ হইয়াছিল; তাঁহার সেই সংসারী বন্ধু মুমূর্ষুদশাপন্ন; ধ্যানে এ বিষয় অবগত হইয়া গগনপথে মুহূর্ত্তে [মুহূর্তে] তিনি বন্ধুর পাশে উপনীত হইলেন। বলিলেন, "ভাই আমায় চিন?" ২য় বন্ধু সজলনয়নে বন্ধুর মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "ভাই! আমি সংসার থেকে চলিয়া যাইতেছি; কোথায় যাব জানি না; আমি এখনও বিশ্বাস করি না।" বলিতে বলিতে তাঁহার মহাশ্বাস উপস্থিত হইল। যোগসিদ্ধ বন্ধু দেখিতে লাগিলেন, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী নারায়ণ তাঁহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেছেন; বলিতেছেন—মুখে বা আমায় নাই মানিয়াছিলি; চল, অদ্য হইতে আমার পার্শ্বগ হইয়া থাকিবি, আয়।

প্রাপ্তিস্বীকার

তদানীন্তন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক লিখছেন ঃ

কলিকাতা বড়বাজার নিবাসী সেখ ফসিউল্লার এক শিশি "গোলাপের নির্য্যাস" [নির্যাস] পাইয়াছি। নির্য্যাস [নির্যাস] খাঁটী [খাঁটি] ও সুন্দর। আমরা বড় এক কুঁজা জলে ২০ ফোঁটা উক্ত নির্য্যাস [নির্যাস] দিয়া দেখিয়াছি—অতি সুন্দর খোসবো [খুসবু] হইয়াছে। বিজ্ঞাপনে লেখা আছে, এক বোতল গরমজলে ২ আউন্স নির্য্যাস [নির্যাস] দিলে, ।।০ [আট আনা] দামের এক বোতল গোলাপজল প্রস্তুত হয়, ইহাতে যথার্থই কোনও রূপ প্রতারণা নাই দেখিয়া আমরা বড় প্রীত হইলাম। এই পত্রিকায়* ইঁহাদের বিজ্ঞাপন আছে; সেই বিজ্ঞাপন পাঠ করিলে এই নির্য্যাস [নির্যাস] সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় জানিতে পারিবেন। মফঃস্বলে লইয়া যাইবার পক্ষে বড়ই ইহা সুবিধাজনক সন্দেহ নাই। ❑

* আষাঢ় ১৩০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি আমরা গত আষাঢ় ১৪০৮ সংখ্যায় এই বিভাগেই প্রকাশ করেছি।

সঙ্কলন ঃ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

বাল্মীকির সীতাচরিত্র

পলাশ মিত্র

[পূর্বানুবৃত্তি]



সীতা এখন পঞ্চবটী বনে। বিচিত্র স্বর্ণমৃগরূপী মারীচকে দেখে বিস্মিত হলেন তিনি। সর্বনাশের সূত্রপাত এখান থেকেই। স্বামীজী-কথিত 'সাক্ষাৎ পবিত্রতা অপেক্ষাও পবিত্রতরা' এবং 'নিত্যসাধ্বী ও নিত্যবিশুদ্ধ-স্বভাবা' সীতার জীবনে নেমে এল দুঃখের আঁধাররাত্রি। এরপর থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আর কখনো নিরবচ্ছিন্নভাবে শান্তি পাননি এই 'মহামহিমময়ী' নারী। কি কুক্ষণেই যে সীতা মৃগরূপী মারীচকে দেখে মুগ্ধ হয়ে রামকে তা এনে দিতে অনুরোধ করলেন! লক্ষ্মণ সেই স্বর্ণমৃগকে দেখেই আশঙ্কা করলেন, এ নিশ্চয়ই মায়াবী রাক্ষস মারীচ। রামকে তিনি বললেন ঃ "ভূতলে এইরকম রত্নচিত্রিত মৃগ নেই, এটা নিশ্চয়ই মায়ার কাজ, এতে অণুমাত্র সংশয় নেই।" কিন্তু রাক্ষসের মায়ায় বিমোহিতা সীতা রামকে বললেন ঃ "এই সুন্দর মৃগ আমার মন হরণ করেছে, অতএব তুমি ওটিকে নিয়ে এস, আমরা ওকে নিয়ে খেলা করব।" (অরণ্যকাণ্ড, ৪৫।৫-৭)

আসলে সীতার মনের বাসনা ছিল, বনবাসকাল অতিক্রান্ত হলে তাঁরা যখন আবার রাজ্যলাভ করবেন, তখন এই মৃগ অন্তঃপুরের এক শোভাবর্ধন করবে। তবে এই স্বর্ণমৃগটিকে লাভ করার জন্য সীতার আগ্রহ এবং কৌতূহল অনেকে ঠিকভাবে মেনে নিতে পারেন না এবং এর পরে লক্ষ্মণের প্রতি তাঁর রূঢ়বাক্যও নানাভাবে সমালোচিত হয়েছে। স্বামীর বিপদাশঙ্কায় তখন এতই বিচলিত হয়েছিলেন সীতা, সত্য কথা বলতে কি, তাঁর সব বিচার-বিবেচনা যেন লুপ্ত হয়েছিল। অসাধারণ জিতেন্দ্রিয়, ভক্তিমান লক্ষ্মণের প্রতি সীতার এই বাক্যবাণ অসংযত ও কঠোর বললে ভুল বলা হবে না। এই দেবোপম চরিত্রের দেবরকে সীতা দীর্ঘকাল দেখে আসছেন। বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবার মতো কোন কাজই এপর্যন্ত তিনি করেননি, সারাজীবন রামের ঘনিষ্ঠ সহচর হয়ে তিনি নিজের সবকিছু ত্যাগ করেছেন এবং সীতার চরণদুটি ছাড়া তিনি আর কিছুই দেখেননি। এ হেন লক্ষ্মণের প্রতি সীতার অসংযত আচরণ মেনে নিতে মন চায় না। সীতার তখনকার মানসিক অবস্থার কথা ভেবে সহানুভূতির সঙ্গে তাঁর এই আচরণের বিচার করলে তাঁর প্রতি দোষারোপের মাত্রা কিছুটা হয়তো কমলেও কমতে পারে। তবে এই বিষয়ে পাঠকগণের মধ্যে ঐকমত্য হওয়ার সম্ভাবনা কম।

মারীচের মৃগ রূপ তখন তিরোহিত হয়েছে। সে তখন বিকট রাক্ষসমূর্তি ধারণ করেছে। রামের অনুরূপ স্বরে সে 'হা সীতে! হা লক্ষ্মণ!' বলে চিৎকার করছে। সীতা ভাবলেন, তাঁর স্বামী বিপদে পড়ে ডাকছেন। তিনি আর স্থির থাকতে না পেরে লক্ষ্মণকে বললেন রামকে সাহায্য করতে যাওয়ার জন্য। কিন্তু লক্ষ্মণ রামের আদেশ অনুসারে সীতাকে রক্ষা করতে সেখানেই থেকে যেতে চাইলেন এবং বললেন, রাম ঐ রাক্ষসকে অবশ্যই বধ করে ফেলবেন। কিন্তু ধৈর্যহারা সীতা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন ঃ "তুমি রামের মিত্ররূপী শত্রু। আমাকে পাওয়ার জন্য তাঁর মৃত্যুকামনা করছ। আমাকে পাওয়ার লোভেই শ্রীরঘুনন্দনের অনুগামী হচ্ছ না।" (অরণ্যকাণ্ড, ৪৫।৫-৭) তারপরে লক্ষ্মণকে তিনি দুষ্টস্বভাব, দুরাচারী, গুপ্ত শত্রু, কুলদূষণ এবং আরো বহু কর্কশ বাক্যে বিদ্ধ করলেন। তারপরে বললেন, পৃথিবীমধ্যে রাম ব্যতিরেকে ক্ষণকালও তিনি জীবিত থাকবেন না। সীতার এ হেন আচরণে লক্ষ্মণের মনের অবস্থা কল্পনা করলে শিহরিত হতে হয়।

এই অংশটুকু ছাড়া সীতার চরিত্রে তথাকথিত দোষাবলীর আর কোন সন্ধান পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। প্রথমে স্বর্ণমৃগ দেখে তাঁর ঔৎসুক্য এবং পরে লক্ষ্মণের প্রতি এই অসংযত কর্কশ উক্তি—এই দুটি আত্মকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্তই কি তিনি উত্তরকালে ভোগ করেছেন?

যাই হোক, রামকে সাহায্য করতে লক্ষ্মণ চলে গেলে একাকিনী সীতাকে হরণ করে নিয়ে যেতে কুটিরদ্বারে উপস্থিত হলেন সাধুবেশধারী রাক্ষসরাজ রাবণ। ভিক্ষাগ্রহণের ছলে সীতাকে বাগে পেয়ে তিনি স্বমূর্তি ধারণ করলেন। প্রত্যুত্তরে সীতা যা বললেন, তা একদিকে যেমন তাঁর দৃপ্ত চরিত্রের পরিচয় দেয়, অন্যদিকে রামের প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার মহিমা প্রকাশ করে। সেইসময় যে-ভাষা তিনি প্রয়োগ করেছিলেন, তা শাণিত তরবারির চেয়েও ক্ষুরধার। তাঁর যুক্তির তীব্রতা, আবেগের স্বতঃস্ফূর্ততায় প্রখর আগ্নেয় বিস্ফোরণ এবং উপমা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে রামের সঙ্গে রাবণের পার্থক্য সূচিত করার যে বিশেষ বাক্‌রীতি—তা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়। তিনি বলেছিলেন ঃ "কাঞ্চন ও লোহায়, সিংহ ও শৃগালে, সমুদ্র ও নদীতে, চন্দন ও পঙ্কে, হস্তি ও

বিড়ালে, গরুড় ও কাকে যে প্রভেদ—রঘুনন্দন রামে ও রাবণে সেই প্রভেদ।" (ঐ, ৪৭।৪৪-৪৭)

সীতার এইসব কথা থেকে বোঝা যায় যায়, রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে তাঁর মহৎ গুণরাজির সঙ্গে সীতার পরিচয় গভীর ছিল এবং তার ফলে রামের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা এক স্বর্গীয় মহিমা লাভ করেছিল। রামের প্রতি তাঁর প্রেমও দিনে দিনে দৃঢ় হয়েছিল। তাঁর নিজের কথাতেই—"সূর্যের স্ত্রী সুবর্চলা যেমন সূর্যের প্রতি অনুরক্তা, আমিও তেমনি তাঁর প্রতি অনুরক্তা।"—"তং নিত্যমনুরক্তাস্মি যথা সূর্যং সুবর্চলা।" (সুন্দরকাণ্ড, ২৪।৯)

শান্ত, ধীরস্থির সীতা চরম বিপদের সময়েও ছিলেন অচঞ্চল। তাঁকে যখন হরণ করা হয়, তখন পর্বতশৃঙ্গে অবস্থানরত হনুমান, সুগ্রীব প্রমুখকে দেখে তিনি তাঁর কনকবর্ণ উত্তরীয় এবং আভরণগুলি ফেলে দেন, যাতে সীতার অপহরণের সংবাদ রামকে জানায় তারা। কিন্তু এমনভাবে ফেলেন যে, রাবণ তা জানতেও পারেননি। রাবণকে বাধা দেওয়ার জন্য সীতা যেমন আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন, তেমনই রামকে নিজের অপহরণবার্তা জানানোর জন্য যতরকমের চেষ্টা করা সম্ভব সবই করেছিলেন। বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হয়, রাবণের গমনপথের পশুপাখিদের পর্যন্ত তিনি তাঁর অপহরণ-সংবাদ জানাতে ভোলেননি। তিনি যদি চিৎকার করে জটায়ুকে না জাগাতেন কিংবা তাঁর গয়নাগাটি, উত্তরীয় প্রভৃতি নিক্ষেপ না করতেন, তবে রামের পক্ষে সীতার সন্ধান পাওয়া সম্ভব হতো কিনা বলা কঠিন। চরম বিপদের সময়েও তিনি আত্মহারা হয়ে একমুহূর্তের জন্যও বুদ্ধিভ্রষ্টা হননি।

আগের মতো লঙ্কাপুরীতেও সীতার দর্পিত রূপ দেখে রাবণের সব হিসেব গুলিয়ে গিয়েছিল। তাঁর কঠোর বচন সহ্য করার ক্ষমতা রাবণের ছিল না। অতিশয় শোকগ্রস্তা হলেও সীতার তেজস্বিনী রূপ ম্লান হয়নি কখনো এবং তিনি যে শচী, অরুন্ধতী, লোপামুদ্রা, সাবিত্রী প্রমুখ পতিব্রতাদের মতো পতির অনুগামিনী—তাও রাক্ষসীদের জানাতে ভোলেননি।

লঙ্কাপুরীতে সীতার অন্য রূপ। বিনম্র, মধুরভাষিণী এবং মাধুর্যের প্রতীক সীতাকে এই নিঃসহায় রাক্ষসপুরীতে বহু অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল, কিন্তু অসাধারণ তেজোমণ্ডিতা এই নারী এখানে যেন বিদ্রোহের প্রতীক। গভীর দুঃখে তিনি ম্লান, 'ক্লিন্নদেহা কোমল ব্রততী' যেন—কিন্তু আত্মবিশ্বাসে ফাটল ধরেনি তাঁর। অসাধারণ মনের শক্তি, প্রচণ্ড আত্মসম্মানবোধ, ব্যক্তিত্ব ও সহশীলতার সম্মিলনে কি লঙ্কাপুরী, কি অন্য কোন স্থানে —সীতা সবসময়ই অনন্যা। অসঙ্গত আচরণের জন্য রামকেও ভর্ৎসনা করতে দ্বিধাবোধ করেননি তিনি।

রাবণবধের আগে সীতার একধরনের দুশ্চিন্তা, আবার রাবণ নিহত হওয়ার পরে সীতার অন্য দুর্ভাবনা। সেই কবে রাজমহিষী হওয়ার মুহূর্তে বনবাসের বিপুল বোঝা। তাও যখন অবশেষে শেষ হলো এবং এত দিনের এত দুঃখকষ্টের শেষে স্বগৃহে যাওয়ার জন্য যখন অধীর প্রতীক্ষা, তখনি উৎফুল্লা সীতা রামের কাছ থেকে শুনলেন, তিনি বংশগৌরবরক্ষা ও পৌরুষত্ব দেখানোর জন্যই সীতাকে উদ্ধার করেছেন। পবিত্রতার প্রতিমূর্তি সীতাকে রাম সেদিন যেসব কথা বললেন, তাতে লজ্জায় আনত হলেন তিনি। রামায়ণের বর্ণনায়ঃ

"প্রবিশন্তীব গাত্রাণি স্বানি সা জনকাত্মজা।
বাক্‌শরৈস্তৈঃ সশল্যেব ভৃশমশ্রূণ্যবর্তয়ৎ।।"
(যুদ্ধকাণ্ড, ১১৬।৩)

—জনকনন্দিনী যেন আপনার গাত্রমধ্যেই লুক্কায়িত হতে ইচ্ছা করলেন। স্বামীর বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে তিনি শল্যপীড়িতের মতো যন্ত্রণাবোধ করে অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন।

তিনি নিজে যে পরিপূর্ণভাবে নির্মলচরিত্রের, সেবিষয়ে সীতার বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাই রামের এ হেন যুক্তিহীন ও চরম অসম্মানজনক কথা শুনে জানকী ধীরে ধীরে রামকে বললেনঃ "প্রাকৃত ব্যক্তি (নিম্নশ্রেণীর পুরুষ) প্রাকৃতা মহিলাকে যেমন বলে থাকে, আপনি আমাকে সেরকম কঠোর, অনুচিত ও শ্রুতিকটু কথা শোনাচ্ছেন কেন?"

মধুরভাষিণী সীতা প্রয়োজনে কী কঠোর কথা বলতে পারেন, আমরা আগে তা দেখেছি; এবারে আবার তা দেখা গেল। কিন্তু পতিপ্রাণা সীতার দুঃখ অন্য জায়গায়। তাঁর সকল কর্ম যে অলৌকিক ও দিব্য এবং তাঁর চারিত্রিক শক্তির অনন্যতাও যে বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য, রাম তার কোন সমুচিত সম্মান না করায় জনকনন্দিনী লক্ষ্মণকে চিতা প্রস্তুত করতে বললেন।

এর পরের ঘটনাবলী রামায়ণ-পাঠকবৃন্দের বিস্তারিত-ভাবে জানা আছে। অগ্নিপরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণা হয়ে পাতালপ্রবেশের সময় পর্যন্ত এই জন্মদুঃখিনী নারীর মনে শুধুই বেদনা ও অপমানের বোঝা। যে-স্বামী থেকে এক লহমার জন্যও তাঁর মন বিচলিত হয়নি—সেই স্বামীর কাছ থেকে এই নিষ্ঠুরতা, এই হৃদয়হীন ব্যবহার তাঁর নারীসত্তা তথা আত্মমর্যাদার পক্ষে কতটা অবমানকর, তা বোঝার মতো বুদ্ধি-বিবেচনা, চরিত্রবল ও মানসিক প্রস্তুতি ছিল বলেই তিনি জননী বসুন্ধরার গর্ভে স্থান প্রার্থনা করেছিলেন। ধরণীদেবীও তাঁর অতি আদরের পূতচরিত্রা

সাধ্বী দুহিতাকে আপন গর্ভে স্থান দিয়ে তাঁর জ্বালা-যন্ত্রণা ও অপমানের অবসান ঘটালেন। সীতার সেই পাতাল-প্রবেশ দেখে সেখানে সমাগত সকলেই হর্ষ ও শোকে নিমগ্ন হলেন। মুহূর্তকালের জন্য সমগ্র জগৎ যেন মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

লোকনিন্দার কারণে এবং প্রজারঞ্জক রাজার কর্তব্যের প্রয়োজনে রামচন্দ্র গভীর দুঃখে সীতাকে যেমন বিসর্জন দিয়েছিলেন, পতিপ্রাণা পত্নীও তেমনই স্বামীর কলঙ্ক অপনোদনের জন্য এই মহাদণ্ড শিরোধার্য করে একদিকে তাঁর সাধ্বী চরিত্রের, অন্যদিকে তাঁর তেজস্বিতার যে প্রমাণ রেখেছিলেন, তা এককথায় তুলনাহীন। কিন্তু কারো প্রতি কোন দোষারোপ করেননি সীতা। অভিযোগের তর্জনী তুলে ধরেননি কারো দিকে। সহিষ্ণুতার অমল আধার, কোমলতার প্রতিমূর্তি সীতা নিজের ভাগ্যের প্রতিই দোষারোপ করেছেন। উত্তরকাণ্ডে দেখা যাচ্ছে, বাষ্পজলে দুটি নয়ন প্লাবিত করে তিনি লক্ষ্মণকে বলছেন ঃ "বিধাতা দুঃখভোগের জন্যই আমার দেহ সৃষ্টি করেছেন; সেই কারণে আজ আমাকে আবার দুঃখেরই মুখ দেখতে হলো।" (৪৮।৩)

বাস্তবিকই, এই শুদ্ধাচারিণী, পতিপরায়ণা নারী সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে শুধু ব্যথার পূজাই সমাপন করলেন। কোমলতা, সহিষ্ণুতা ও পতিপ্রাণতার সঙ্গে ওজস্বিতার সম্মিলনে তাঁর চরিত্র অনন্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আত্মমর্যাদাবোধ। স্বামীর কাছেও তাই তিনি এই আত্মসম্মান বিসর্জন দিতে পারেননি। এই কারণেই নিবেদিতা সীতাকে 'Ideal of womanhood' বলেছেন।

মাদ্রাজে 'ভারতীয় মহাপুরুষগণ' শীর্ষক বক্তৃতায় স্বামীজী যথার্থই বলেছেন ঃ "আমাদের নারীদের আধুনিকভাবে গড়ে তোলার যেসকল চেষ্টা হচ্ছে, সেগুলির মধ্যে যদি সীতা-চরিত্রের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট করার চেষ্টা থাকে, তবে সেগুলি বিফল হবে।... ভারতীয় নারীদের সীতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের উন্নতিবিধানের চেষ্টা করতে হবে। এটিই ভারতীয় নারীব উন্নতির একমাত্র পথ।" [সমাপ্ত] ❑



সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন

সহৃদয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ অর্থানুকূল্যে আমাদের ভগ্নপ্রায় স্কুলগৃহটি পুনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি।

১।	১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ	ঃ	১,২০,০০০ টাকা
২।	দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
৩।	পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
৪।	আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প	ঃ	১০,০০,০০০ টাকা
৫।	একখানা অ্যাম্বুল্যান্স (Ambulance)	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
			২৬,২০,০০০ টাকা

A/c Payee চেক/ড্রাফ্ট 'Ramakrishna Mission Ashrama, Ramharipur'—এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফ্ট পাঠাবার ঠিকানা—সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা—বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ ঃ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি

স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া

ইংল্যান্ড, কানাডা ও আমেরিকায় কয়েকদিন

স্বামী গোকুলানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

এই পরিক্রমাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

১৯ জুন ১৯৯৮, শুক্রবার। আজকের দিনটি ধার্য করা হয়েছে ইংল্যান্ডের অন্যতম আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য স্থান—'উইন্ডসর ক্যাসেল' দেখার জন্য। সাড়ে আটটা নাগাদ আমার প্রাক্তন সব ছাত্রদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। পথমধ্যে টেমস নদীর পাশে এক রেস্তরাঁয় বসে নদীর শোভা দেখতে দেখতে কফি খেলাম সবাই মিলে। তারপর দুর্গের উদ্দেশে যাত্রা শুরু।

লন্ডনের পশ্চিমে প্রায় ৩৪ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত উইন্ডসর দুর্গ দেশের অতি-উন্নত গথিক স্থাপত্যবিদ্যার এক উজ্জ্বল নির্দশন। শুনলাম, প্রায় ১৩ একর জমির ওপর বিস্তৃত এই দুর্গ। দুর্গ হলেও একে একটা ছোটখাট শহর বলেই মনে হলো। ইংল্যান্ডে রানীকে জাতীয় একতার প্রতীক মানা হয়। দুর্গের অভ্যন্তরে রাজপ্রাসাদ—দেশের প্রাচীনতম রাজকীয় সরকারি বাসস্থান। বছরের নির্দিষ্ট সময়ে রানী এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা এই রাজপ্রাসাদে থাকেন, বাকি সময় কাটান বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে। পুরো দুর্গটি তিনভাগে বিভক্ত—নিম্নবর্তী চৌকি বা 'লোয়ার ওয়ার্ড', মধ্যবর্তী চৌকি বা 'মিডল ওয়ার্ড' এবং উচ্চবর্তী চৌকি বা 'আপার ওয়ার্ড'। উইন্ডসর দুর্গের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন 'উইলিয়াম দ্য কংকারার'।

দুর্গের ভিতর ২০টির বেশি 'টাওয়ার' বা বুরুজ আছে, দেখতে চৌকো বাড়ির মতো। দুর্গের চারটি দ্বার বা 'গেট' হলো—'কিং হেনরি এইট গেট', 'সেন্ট জর্জেস গেট', 'কিং জর্জ ফোর গেট' এবং 'নরম্যান গেট'। দুর্গের অন্তর্গত সীমানার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির পাশ দিয়ে দুর্গে প্রবেশ করতে হয় এবং উচ্চবর্তী, মধ্যবর্তী এবং নিম্নবর্তী চৌকির মধ্য দিয়ে ভ্রমণ শেষ করে 'কিং হেনরি এইট গেট' দিয়ে দুর্গের বাইরে আসা যায়। দুর্গের ভিতর অস্ত্রাগার, বিচারালয়, উপাসনালয়, স্মৃতিস্তম্ভ, গির্জা, নাট্যশালা, দীর্ঘ ও সঙ্কীর্ণ দালান, সুড়ঙ্গপথ, লম্বা লম্বা বারান্দা, অসংখ্য প্রাচীর, বাজার-হাট, শিল্প প্রদর্শনের জন্য প্রকোষ্ঠ এবং আরো কত কী আছে! দুর্গের সংগ্রহশালাটি অতি সুন্দর। সেখানে রাখা আছে প্রসিদ্ধ শিল্পী রুবেন্স, ভ্যান ডাইক এবং হলবেনের আঁকা তৈলচিত্র। অতি সমৃদ্ধ রঙের সংমিশ্রণে তৈরি লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির অঙ্কিত চিত্র দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়।

'উইন্ডসর গ্রেট পার্ক' ভবনটিও দেখলাম, এটা রাজবংশের অতীত শিকারের স্মৃতি বহন করে চলেছে। বন্য জীব শিকার করে নানারকম ওষুধপত্রাদি লাগিয়ে কাঁচের বাক্সের মধ্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে। দুর্গের আরেকটি দ্রষ্টব্যস্থান হলো 'কুইন্স মেরিজ ডলস হাউস'। পৃথিবীর নানান দেশের পুতুল দিয়ে সাজানো এই পুতুলের খেলাঘরটিকে নাকি পুরোটা বাক্সবন্দী করে ১৯২৪ সালে ওয়েম্বলীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এক প্রদর্শনীতে দেখানোর জন্য। দুর্গের ভিতর দামী দামী অপূর্ব কারুকার্যখচিত কাঠের আসবাবপত্রাদি, পার্সিয়ান গালিচা, মূল্যবান তৈলচিত্র, পোর্সিলিন ও চীনামাটির তৈরি ঘর-সাজানোর সামগ্রী, নানা ধরনের বাসনপত্র, পানপাত্র, ফুলদানি, ঝাড়লণ্ঠন দেখলে অবাক হতে হয়। বিভিন্ন ধরনের ক্রিস্টালের তৈরি অনেকগুলি রঙিন ঝাড়বাতি দিয়ে একটা পুরো ঘর সাজানো। দুর্গের সবচেয়ে বড় ঘর হলো 'দ্য ওয়াটার্লু চেম্বার'। বছরে একবার এখানে দেশের রানী 'নাইট' উপাধিধারী উচ্চ সম্প্রদায়ের পুরুষ ও তাঁদের স্ত্রীদের সঙ্গে এক মধ্যাহ্নভোজনের আসরে মিলিত হন। এঁদের সঙ্গে বছরে আরেকবার রানী মিলিত হন, সেটি প্রতি বছর জুন মাসে সেন্ট জর্জ গির্জার ভিতর। উইন্ডসর দুর্গের ভিতর রাজবংশের ১০ জন রাজা-রানীর স্মৃতিসৌধ আছে। এছাড়াও আছে অনেক বিলাসবহুল ঘর।

রাজপ্রাসাদের যে-অংশে রাজপরিবার থাকেন, সেখানে পরিবারের সদস্য এবং কর্মচারীদের ছাড়া কারো প্রবেশাধিকার নেই। 'মেরী টিউডর টাওয়ার'-এর দুপাশে বিশাল বিশাল ঘরবাড়ি জুড়ে সৈন্যসামন্ত এবং উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের থাকার ব্যবস্থা। ভালভাবে উইন্ডসর দুর্গ দেখতে হলে একাধিকবার আসতে হবে। তবে রাজবংশ, তাঁদের রাজপ্রাসাদ, রাজ ঐশ্বর্য এবং বিলাসিতার যেসব বর্ণনা বইতে পাওয়া যায়, তার মোটামুটি একটা ধারণা উইন্ডসর ক্যাসেল দেখলে পাওয়া যাবে। যাই হোক, এসব দেখে দুপুরের মধ্যেই আমরা আশ্রমে ফিরে এলাম।

পরদিন ২০ জুন। আমাদের গন্তব্যস্থান ক্যান্টারবেরী।

সেখানে রয়েছে জগৎপ্রসিদ্ধ গির্জা 'ক্যান্টারবেরী ক্যাথিড্রাল'। 'ক্যাথিড্রাল' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হলো বিশপের অধীনে কোন অঞ্চলের প্রধান গির্জা। দৈর্ঘ্যে ক্যান্টারবেরী গীর্জার আয়তন ৫১৪ ফুট। এর ইতিহাস অতি প্রাচীন। পঞ্চম শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর 'কেন্ট' নামক শহরটি স্যাক্সন শাসনের অধীনে আসে। কেন্টের রাজা প্রাচীন রোমান শহর 'ডুরোভার্নাম ক্যান্টিয়াকোরাম' নামক এক স্থানে নিজের রাজধানী স্থাপন করেন। পরবর্তী কালে এই জায়গাটির নাম 'ক্যান্টারবেরী' হয়। তেরশ বছরেরও অধিক সময় জুড়ে কেন্ট খ্রীস্টধর্ম প্রচারের এক অন্যতম কেন্দ্র ছিল। ৫৯৭ সালে এখানকার রাজার আমন্ত্রণে এক ধর্মীয় গোষ্ঠী রোম থেকে এখানে আসেন। এদের আগমনের ফলে দেশের রাজা এবং তাঁর বহু প্রজা খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন। এর ফলে শুধু যে ধর্মীয় মিশনই সাফল্যমণ্ডিত হলো তাই নয়, ঐ ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রধান বা অধিপতি সেন্ট অগাস্টিনকে ক্যান্টারবেরী গির্জার আর্চবিশপ হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।

গির্জার ভিতরে প্রবেশ করলে এক অদ্ভুত অনুভূতি হয়। এখানে দর্শনার্থীরা আসেন এখানকার স্থাপত্যকলা, দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্র, রঙিন স্বচ্ছ কাঁচের বহুল ব্যবহার, স্মৃতিসৌধ এবং ইংল্যান্ড, ইউরোপ-সহ সারা বিশ্বের প্রাচীন গির্জা-সম্পর্কিত ইতিহাসের এক জীবন্ত রূপ পরিদর্শন করতে। মানবজাতির সৃজনশীল প্রতিভা, আধ্যাত্মিক অনুভূতি এবং শুদ্ধ, নির্মল, পবিত্র ভালবাসার এক অপূর্ব সংমিশ্রণের ছাপ যেন এই গির্জার মধ্যে পরিস্ফুট। ইউরোপে ক্যান্টারবেরী ক্যাথিড্রালকে 'ভগবানের বাসস্থান' এবং 'স্বর্গদ্বার' বলা হয়। এই গির্জাটি কেবলমাত্র ইংল্যান্ডেরই সর্বপ্রধান মাতৃস্থানীয়া (Mother Church) গির্জা নয়, বিশ্বের আশি লক্ষেরও অধিক খ্রীস্টধর্মাবলম্বীদের (Anglican) জন্যও এটি প্রধান গির্জা হিসাবে পরিগণিত হয়।

ক্রাইস্ট চার্চ গেট দিয়ে গির্জায় ঢুকতে হয়। এই গেট পঞ্চদশ শতাব্দীতে টিউডর শাসনকালে নির্মিত। প্রবেশদ্বারের ওপর ভগবান যীশুর আসল মূর্তিটি ১৬৪২ সালে পিউরিটানরা নষ্ট করে। বর্তমান মূর্তিটির স্থপতি হলেন 'ক্লাউস রিংওয়াল্ড'। গেট দিয়ে ঢুকলে প্রথমেই নজর কাড়বে ১৬৬৩ সালে আর্চ বিশপ জুক্সনের দান—কারুকার্যখচিত এক বিশাল কাঠের দরজা। সেটা পার হলে যে-রাস্তা বা বারান্দা পড়বে তা দক্ষিণ পাশ দিয়ে গির্জার ভিতর ঢুকেছে। এই বারান্দার দুইধারের দেওয়ালে ভিক্টোরিয়ার আমলের অনেক মূর্তি দেখা যায়। এটা পার হলেই মূল গির্জায় প্রবেশ করা যাবে। প্রথমেই দেখলাম 'নেভ' বা গির্জার প্রধান অংশ, যেখানে লোকজন প্রার্থনার জন্য বসেন। গির্জার মধ্যবর্তী অংশে আছে ২৩৫ ফুট উঁচু প্রধান বুরুজ—'বেলহ্যারি'। একে 'সেন্ট্রাল টাওয়ার'ও বলা হয়। খিলানের পর খিলানের ছাদ দ্বারা পরিবেষ্টিত এই বুরুজ বা 'টাওয়ার'। দক্ষিণের দরজার ঠিক ওপরেই যীশুর দুহাত ছড়ানো এক মূর্তি মনকে আকৃষ্ট করে—যেন ডাকছেন সকলকে স্নেহভরে। নেভের সামনে আছে ধর্ম-প্রচারের বেদি বা মঞ্চ (pulpit)। অপূর্ব কাঠের কারু-কার্যময় এই প্রচারবেদি ১৮৯৮ সালে নির্মিত হয়। পশ্চিমের জানালা দিয়ে তাকালে রঙিন কাঁচ দিয়ে যীশুর জীবনের ইতিহাসকে ভিত্তি করে নির্মিত তেরটি মূর্তি দেখা যায়।

এরপরই পড়ে শহীদবেদি। এখানে ১১৭০ সালের ২৯ ডিসেম্বর খ্রীস্টধর্ম রক্ষায় জীবন বলিদান করেন সেন্ট থমাস বেকার। তাঁর পবিত্র স্মৃতিতেই এই বেদি। এই বেদির সামনে দাঁড়িয়ে যীশুর কাছে শহীদদের জন্য আজও মানুষ প্রার্থনা করেন। এই বেদিকে খ্রীস্টানরা এক পবিত্র তীর্থভূমি বলে মনে করেন। এখানে পেকহ্যাম এবং উইলিয়াম ওয়ারহ্যামের মতো ধর্মাত্মাদেরও সমাধি আছে। খিলান দিয়ে ঢাকা এই পথটুকু পার হলেই দেখা যায় ১৯৫৪ সালে নির্মিত আধুনিক এক বিশাল জানালা। ১৯৩৭ এবং ১৯৫৩ সালের রাজ্যাভিষেকে রাজবংশের যেসব সদস্যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, এখানে তাঁদের মূর্তি খচিত আছে। দ্বিতীয় এলিজাবেথের মূর্তিটিও বিদ্যমান। পূর্ব এবং পশ্চিমদিকের সিঁড়ি দিয়ে নামলে দেখা যায় গির্জার নিম্নস্থ খিলানাকৃতি সমাধিগৃহ—যাকে ইংরেজীতে 'ক্রিপ্ট' বলা হয়। দর্শকরা এখানে এসে নীরবতা পালন করেন। এরপর উঁচু, বাঁধানো পরিসর দিয়ে বেরিয়ে এলে পৌঁছানো যায় 'ওয়ারিয়র চ্যাপেল'-এ। আবার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলে দেখা যায় বিশাল 'পালপিটাম স্ক্রিন'। অনেক মূর্তিখচিত বড় বড় জানালার সমন্বয়ে এই বিশাল কাঠের স্ক্রিন নির্মিত। নেভ এবং কোয়্যার-এর মধ্যে পর্দার মতো দাঁড়িয়ে এই স্ক্রিন দুটো ভাগে জায়গাটাকে ভাগ করে দিয়েছে। পর্দা পার হলেই পৌঁছানো যাবে কোয়্যারে। খ্রীস্টধর্মের প্রচারক সেন্ট অগাস্টিনের সময় থেকেই এই গ্রেট কোয়্যারে ঈশ্বরের উপাসনা হয়ে আসছে। এরপরই দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে নেমে হেঁটে গেলে দেখা যাবে 'পিলগ্রিম' বা তীর্থযাত্রীদের জন্য সিঁড়ি। সিঁড়ি পার হলেই আসবে সেন্ট থমাসের পুণ্যবেদি 'ট্রিনিটি চ্যাপেল'। গির্জার অভ্যন্তরে এক বেদিস্থানে সেন্ট অগাস্টিনের ব্যবহৃত পুণ্য চেয়ার সযত্নে রক্ষিত আছে। সেইসময় থেকে আজ পর্যন্ত ইংল্যান্ডের প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ হিসাবে যাঁরাই নিযুক্ত হয়েছেন, সকল আর্চবিশপই এই চেয়ারটিতে বসে শপথ নিয়েছেন।

এই বিশাল গির্জার কাজ সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য রোজ নাকি সাত হাজার পাউন্ড (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) খরচ হয়!

২২, ২৩ এবং ২৪ জুন ছিল স্কটল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে ঘোরার জন্য নির্দিষ্ট। স্কটল্যান্ড ইংল্যান্ডের উত্তরে অবস্থিত এবং এই দুটি দেশই গ্রেট ব্রিটেনের অংশ। এদুটি দেশ মিলে এক হয়ে গেছে বটে, কিন্তু অতীতে এদের মধ্যে শত্রুতা চলেছিল বহু বছর ধরে। ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের পারস্পরিক ঝগড়ার মধ্যেও তাদের দুই রাজবংশের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক ছিল, তাদের ছেলেমেয়েদের বিবাহ-বন্ধনের মাধ্যমে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। শেষপর্যন্ত এই আত্মীয়তার মধ্য দিয়েই ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড মিলে এক হয়ে গেল। ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে ইংল্যান্ডের রানী অ্যানের শাসনকালে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের প্রতিনিধিরা একসঙ্গে বৈঠক করে স্থির করলেন যে, দুটি দেশই মিলিত হয়ে একটিমাত্র দেশরূপে পরিচিত হবে 'গ্রেট ব্রিটেন' নামে।

যাই হোক, আশ্রম থেকে ইউস্টন স্টেশনে এসে ট্রেন ধরলাম। ট্রেনে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা লাগল গ্লাসগো পৌঁছাতে। যেতে যেতে জানালার কাঁচের মধ্য দিয়ে বাইরের পৃথিবী দেখছিলাম। পাহাড় আর গাছপালার সীমা যেন ঘন নীল আকাশে হারিয়ে গেছে আর আকাশটা যেন একেবারে কাছে এসে ঠেকেছে! পাহাড়ের ঢালুতে গাছের সারি, কোথাও জঙ্গলের মধ্যে সরু পথ গ্রামের দিকে চলে গেছে। অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে চলছিলাম। পাহাড়গুলো দেখতে দেখতে শিলঙের পাহাড়ের কথা বারে বারে মনে পড়ছিল। কারণ, শিলঙকে 'প্রাচ্যের স্কটল্যান্ড' বলা হয়।

গ্লাসগো পৌঁছে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে এক ভক্তের গাড়ি করে বেড়াতে বেরলাম। প্রথমেই গেলাম জগৎ-প্রসিদ্ধ গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে। এই প্রতিষ্ঠানটি অতি প্রাচীন। ১৪৫১ খ্রীস্টাব্দে স্কটল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমস পোপ পঞ্চম নিকোলাসকে রাজি করিয়ে গ্লাসগোতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গ্লাসগোর বিশপ টার্নবুলের হুকুমনামা আদায় করেন। এইভাবে স্কটল্যান্ডে অ্যান্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রায় চল্লিশ বছর পর গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম হয়।

গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় স্কটল্যান্ডের সর্ববৃহৎ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। শুনলাম, ১৪,০০০-এর বেশি বিদ্যার্থী স্নাতক শ্রেণীতে এবং ৩,০০০-এর বেশি বিদ্যার্থী স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পড়ে। ছেলে-মেয়ের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। এদের ৪৫ শতাংশ আসে স্কটল্যান্ডের পশ্চিম ভাগ থেকে, কিছু আসে দেশের অন্য ভাগ থেকে, ১৬ শতাংশ আসে ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্থান থেকে, ৬ শতাংশ ইউরোপ এবং ৭ শতাংশ আসে পৃথিবীর ৮০টি বিভিন্ন জায়গা থেকে। কোন কোন শাখা উচ্চশিক্ষার জন্য বিদ্যার্থীদের বাইরেও পাঠায়। দেশের বাইরে প্রায় ২০০টি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই বিশ্ববিদ্যালয় নানারকম গবেষণা-মূলক কাজে যুক্ত। বিজ্ঞান, সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতি, সঙ্গীত, চিকিৎসাবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, গ্রহবিজ্ঞান ইত্যাদি বহু বিষয়ের শাখা-প্রশাখা সহ প্রায় ১০০টি কেন্দ্র গিলমোরহিল শহরে দেখা যায়। অধ্যাত্ম প্রচারের কেন্দ্রও একটা আছে। বিজ্ঞান-প্রধান শাখাগুলির জন্যই গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশি খ্যাতি। এখানে শিক্ষার মান অতি উঁচু। ১৯৩০ সালে নির্মিত গ্রন্থাগারটি বিশেষ দর্শনীয়। আরো দুটি উল্লেখযোগ্য ভবন হলো 'বয়েড ওর' এবং 'অ্যাডাম স্মিথ' ভবন। চারদিকের ভবনগুলির মধ্যে উঁচু বুরুজযুক্ত একটি ভবন আছে—যেটা অনেক দূর থেকে দেখা যায়। বহিরাগত ছাত্রছাত্রীদের থাকার জন্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা করে দেয়। ১৯৯৪ সালে 'মুরানো স্ট্রীট স্টুডেন্ট ভিলেজ' নামে যে আবাসন-গৃহ তৈরি হয়, তাতে ১,১৫০ জন বিদ্যার্থী থাকতে পারে। এই আবাসনগৃহের নিজস্ব দোকান এবং ডাক্তারখানা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতর স্বাগত-কক্ষে প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস ও কার্যপ্রণালীর বিবরণ ভিডিও মারফত দেখানো হয়।

পরদিন ২৩ জুন সকাল পৌনে নটায় সবাই মিলে বেড়াতে বেরলাম। সেন্ট্রাল বাস পয়েন্ট থেকে ট্যুরিস্ট বাসে চাপলাম 'লচ লোমন্ড' হ্রদ দেখতে। বাসযাত্রা বেশ আরামদায়ক। রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। চারদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব। প্রকৃতি অকৃপণ হাতে স্কটল্যান্ডকে সাজিয়েছেন। 'লচ লোমন্ড' পৌঁছে বাস থেকে নামলাম। চারদিকে সবুজ পাহাড়, অজস্র গাছপালা, মাঝে এই উপসাগরটি। স্বচ্ছ জলের ধারা মনকে শীতল করে। জলের মধ্যেই গাছপালা দিয়ে ঘেরা ছোট ছোট টিপি আছে, মাঝে মাঝে আছে সঙ্কীর্ণ উপত্যকাও। জল, পাহাড় একেবারে মিলেমিশে আছে। অনেক sheep dog বা মেষরক্ষক কুকুর দেখলাম। নানারকম খেলা দেখিয়ে এরা দর্শকদের মনোরঞ্জন করে। উপসাগরের ভিতর দিয়ে ভ্রমণের জন্য বড় বড় নৌকাযাত্রার ব্যবস্থা আছে। সারাদিন হ্রদের তীরে বসে জলের শান্ত অশান্ত দুই রূপই দেখে আবার বাসে চাপলাম। রাত্রি প্রায় সোয়া আটটার সময় ফিরে এলাম সবাই।

২৪ জুন স্কটল্যান্ডের আরেকটি প্রসিদ্ধ শহর এডিনবার্গ ঘুরে দেখার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এটি দেশের রাজধানী। শহরে অতি বড় বড় সুন্দর পাথরের বাড়িঘর

আছে। এডিনবার্গ পুরনো এবং নতুন—এই দুটি ভাগে বিভক্ত। পূর্বে এডিনবার্গ শহর বলতে দুর্গ থেকে রাজকীয় বাসস্থান 'দ্য প্যালেস অফ হলিরুড হাউস'—এই কর্মব্যস্ত স্থানটিকে বোঝাত। নতুন এডিনবার্গ শহরের জন্ম ১৭৬৭ সালে। এক অখ্যাত স্থপতি জেমস ক্রেগ-এর পরিকল্পনা করেন। শহরের একেবারে মধ্যস্থলে অবস্থিত এডিনবার্গ দুর্গ। এই দুর্গটিও একটা ছোটখাট শহরের মতো। স্কটিশ রাজবংশের বহু স্মৃতি সংরক্ষিত রয়েছে এখানে। তবে



এডিনবার্গ, স্কটল্যান্ড

সত্যিকথা বলতে কি, উইন্ডসর দুর্গের পর অন্য কোন দুর্গ দেখে তেমন মজা পাওয়া যায় না।

ভ্রমণসূচী অনুসারে ২৫ জুন ছিল স্কটল্যান্ডে আমার শেষদিন। দিনটা ছিল রৌদ্র-ঝলমল। গ্লাসগো শহর ঘুরে দেখার অভিপ্রায়ে সেন্ট জর্জেস স্কোয়ার থেকে কন্ডাকটেড ট্যুর বাসে চেপে গ্লাসগোকে দেখলাম। এই শহরকে অনেকগুলো উপাধিতে অলঙ্কৃত করা হয়েছে, যেমন—'গেটওয়ে টু স্কটল্যান্ড', 'ডিয়ার গ্রীন প্লেস' এবং 'কালচারাল ক্যাপিট্যাল অফ ইউরোপ'। ভ্রমণ শেষে আমরা গ্লাসগোর হিন্দুমন্দির দেখতে গেলাম। খুব ভাল লাগল মন্দিরটি দেখে। রাধা, কৃষ্ণ, শিব, রাম, সীতা, লক্ষ্মণ—সবার মূর্তিই আছে এখানে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী চারিদিকের দেওয়ালে খোদাই করা। মন্দিরের একটা প্রধান অংশে তাঁর এই বাণী খোদাই করা আছে—"Never quarrel about religion. All quarrels and disputations concerning religion simply show that spirituality is not present. Religious quarrels are always over the husks. When purity, when spirituality goes, leaving the soul dry, quarrels begin, and not before." শুনলাম, মন্দিরের পূজারী বৃন্দাবন থেকে এসেছেন। অতি নিষ্ঠাসহকারে পূজা করেন। মন্দিরে হিন্দুদের অনেক উৎসব হয়। শিবরাত্রি, নবরাত্রি, হনুমান-জয়ন্তী এবং রামনবমী ধুমধামের সঙ্গে পালন করা হয়। গ্লাসগোর এই হিন্দুমন্দিরের ঠিকানা—1, La Belle Place, Glasgow G3 7 LH.

২৬ জুন আবার লন্ডনে ফিরে এলাম। পরদিন 'টিলব্যারি ডক' দেখতে গেলাম। স্বামীজী যখন দ্বিতীয়বার ইংল্যান্ডে আসেন ১৮৯৬ সালের এপ্রিল মাসে (প্রথমবার এসেছিলেন ১৮৯৫ সালের শেষদিকে), তখন এই বন্দরে নেমেছিলেন। ঐ বছরের শেষেই ১৬ ডিসেম্বর ১৮৯৬ স্বামীজী লন্ডন ছেড়ে ভারতের অভিমুখে যাত্রা করেন মিস্টার এবং মিসেস সেভিয়ারকে সঙ্গে নিয়ে।

বিকালে গেলাম লন্ডনের ৩৭৩ হ্যানব্যারি রোডের ওপর অবস্থিত 'বিবেকানন্দ হিউম্যান সেন্টার'-এ। উদ্যোক্তাদের কাছেই সেন্টারের কার্য সম্পর্কে অনেক কিছু জানা গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণীর ওপর ভিত্তি করে এখানে নিয়মিত ক্লাস হয় এবং অনেকেই নিয়মিতভাবে আসেন। এখানে আমার বক্তৃতার বিষয় ছিলঃ 'The Universal Religion: Ramakrishna and Vivekananda'।

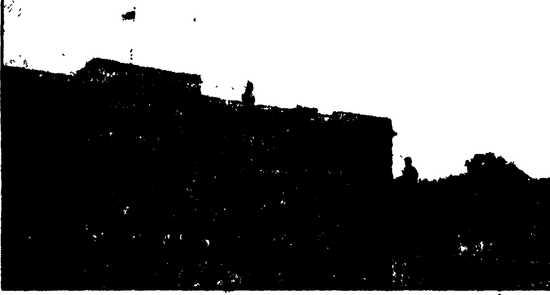
৩০ জুন ছিল আমার লন্ডনে থাকার শেষ দিন। এই কয়দিন অনেক ঘোরাঘুরি হয়েছে, অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। দেখেছি, ইতিহাস-সমৃদ্ধ এই দেশে ইংরেজ জাতির



টিলব্যারি ডক, স্কটল্যান্ড

স্বভাবগত রক্ষণশীলতার দৃষ্টান্ত চতুর্দিকে ছড়ানো। সেই মধ্যযুগে নির্মিত রাস্তা 'সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল' থেকে 'টাওয়ার অফ লন্ডন' আজও বর্তমান। লন্ডন শহরটাকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়। শহরের পূর্বপ্রান্তে বাণিজ্যিক তথা আর্থিক জীবন, পশ্চিমে সরকারি কর্মক্ষেত্র।

পূর্ব-পশ্চিমের এই দুই ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ঐতিহ্যমণ্ডিত যাবতীয় ভবন, যেমন—'দ্য টাওয়ার অফ লন্ডন' (যার রত্নভাণ্ডারের মধ্যে আমাদের দেশ থেকে নিয়ে যাওয়া এক বিশাল 'কোহিনূর' আছে),



বাকিংহাম প্যালেস, লন্ডন

'সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল', 'হাউজেস অফ পার্লামেন্ট', 'ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবে', 'বিগ বেন', 'বাকিংহাম প্যালেস' ইত্যাদি। এছাড়াও লন্ডনের দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে আছে 'ট্রাফালগার স্কোয়ার' (এখানে অসংখ্য পায়রার বাসস্থান), 'হাইড পার্ক' (যেখানে একটি টুল বা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে যে যা খুশি বলতে পারে), 'মাদাম তুঁসো মিউজিয়াম' এবং অনেকগুলি সংগ্রহালয়, যেমন—'দ্য ন্যাশানাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম', 'দ্য সায়েন্স মিউজিয়াম', 'দ্য ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম' ইত্যাদি। টেমস নদীর দক্ষিণপ্রান্তে দেখা যাবে 'ন্যাশানাল থিয়েটার', 'দ্য রয়েল ফেস্টিভ্যাল হল', 'দ্য হেওয়ার্ড গ্যালারি' ইত্যাদি। দেশের বিভিন্ন স্থানে যোগসূত্রের জন্য অতি সুন্দর 'সুপার হাইওয়ে' অথবা 'মোটর ওয়ে' আছে। পর্যটকদের থাকার জন্য নামী-দামী হোটেলের সঙ্গে সঙ্গে অনেক 'গেস্ট হাউস' এবং 'ফার্ম হাউস' আছে। খাওয়া-দাওয়া-থাকার সুবিধা ছাড়াও এখানে থাকলে ইংল্যান্ডের গ্রামীণ জীবন সম্বন্ধে একটা ধারণা হয়। অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত এদেশে থাকার খরচ সর্বত্রই অপেক্ষাকৃত কম। এই সময়টাকে 'অফ সিজন' বলা হয়। মধ্য এপ্রিল থেকে মধ্য অক্টোবর পর্যন্ত 'ট্যুরিস্ট সিজন'। অতি অল্প খরচে থাকার জন্য পুরো ইংল্যান্ডে সাড়ে তিনশর বেশি 'ইউথ হোস্টেল' আছে; নামে 'ইয়ুথ হোস্টেল' হলেও এখানে সব বয়সের পর্যটকরাই থাকতে পারে। এদেশে বাসভ্রমণের খরচ ট্রেনের থেকে অনেক কম। যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম 'মেট্রো ইন্টার সিটি সার্ভিস'—লন্ডন থেকে প্রধান প্রধান শহরে নিয়ে যায়।

আমাদের আশ্রমে সারাদিন ধরে ভক্তদের, ছাত্রদের সপরিবারে আনাগোনা লেগেই ছিল। এ কদিন সবার সঙ্গে খুব আনন্দে কাটিয়েছি। দয়াত্মানন্দজী, শিবরূপানন্দজী এবং ব্রহ্মচারী ভাইদের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছি। সন্ধ্যারতির পর আশ্রমে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আমার এক প্রাক্তন ছাত্রের বাড়ি এলাম। সেখানে সন্ধ্যায় 'কথামৃত' পাঠ হলো। জিনিসপত্র গোছগাছ করে শুতে গেলাম অনেক রাতে। পরদিন ১ জুলাই ভোর ৪টায় উঠে স্নানাদি সেরে রওনা হলাম হিথরো বিমানবন্দরের উদ্দেশে। এবার গন্তব্য কানাডা। [ক্রমশ] (তিন)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সহৃদয় পাঠকবর্গ আশা করি অবগত আছেন যে, গত ১ জুন ২০০১ থেকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডাকমাশুল দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 'উদ্বোধন' পত্রিকার ক্ষেত্রেও এই বর্ধিত হার সমভাবে প্রযোজ্য হওয়ায় ডাকযোগে যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁদের কাছ থেকে ডাকখরচ বাবদ যা নেওয়া হয়েছে, তাতে স্বাভাবিক কারণেই সঙ্কুলান হবে না। তবে আমরা স্থির করেছি, অতিরিক্ত ডাকখরচ সত্ত্বেও এবছরের বাকি ছয় মাসের জন্য আমরা গ্রাহকদের অতিরিক্ত কোন ডাকমাশুল পাঠাতে অনুরোধ করব না। বিগত তিন বছরে বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ও ডাকমাশুল অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

এছাড়া, পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে আরো জানাই যে, সারা বছরে গ্রাহকপ্রতি 'উদ্বোধন'-এর প্রকৃত খরচ কমপক্ষে ১৮০ টাকা হলেও বার্ষিক মাত্র ৬৫ টাকায় এই পত্রিকা তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি কাগজের মূল্য ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের সুধী পাঠকবর্গের কথা চিন্তা করে এইমুহূর্তে আমরা ডাকমাশুল বা পত্রিকার গ্রাহকমূল্য না বাড়ালেও আগামী বছর এই দুই ক্ষেত্রে কিছু মূল্য বাড়বে।

বর্ধিত গ্রাহকমূল্য কত হবে, সেবিষয়ে আমরা আগামী ভাদ্র মাসে জানাতে পারব। দয়া করে ভাদ্র সংখ্যায় '**বিশেষ বিজ্ঞপ্তি**' দেখে নেবেন।

আমাদের বিশ্বাস, সহৃদয় পাঠকবর্গ এই ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে 'উদ্বোধন'-এর জয়যাত্রা অব্যাহত রাখতে সাহায্য করবেন।—সম্পাদক, "উদ্বোধন"

অভিজ্ঞতা

দেবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

তোমার কাছে চাইতে গিয়ে আমার সকল কাজে,
ফুরায় না মোর চাওয়া-পাওয়া, এখন মরি লাজে!
আপন কথা কীর্তিগাথা যখন বলি আমি,
চতুর্দিকে দেখি শুনি,
আছে কতই নামী-দামী আমার চেয়েও গুণী।
কৃতিত্ব মোর বলতে গিয়ে আপনি যে যাই নামি।
তোমায় হেনে হেলা আমি খেলতে যখন যাই,
চেয়ে দেখি কেউ সাথী নয়, অবহেলাই পাই।
অহঙ্কারের অলঙ্কারে,
ভাবি ধরায় আপনারে—'নিজেই ভক্ত একা'!
দর্পচূর্ণ হয় নিমেষে,
দেবালয়েও এসে যখন পাইনে তোমার দেখা।
ভাবি যখন গর্বে হেসে—'আমিই ভক্ত একা'!
নিজের পথই খাঁটি ভেবে দেখি শুধুই পথ।
সবার পথে আলো, আমার কালো ভবিষ্যৎ।
'মোর ধর্মই ধরায় সত্য, অপর ধর্ম নয়'
ভাবি যখন, 'মোর জীবনই বিরাট কর্মময়'।
অধর্মে ছায় নিজের ধর্ম, অপর ধর্ম জাগে।
কতজনের মহৎ কর্ম মানবসেবায় লাগে!
তাই তো প্রভু এখন কাঁদি আমার জীবন-সাঁঝে।
(আমি) ভাবের ঘরে চুরি করে নিঃস্ব বিশ্বমাঝে।
এবার আমার সকল স্বার্থ-চাওয়া গুটিয়ে এনে,
তোমার পথে, তোমার আলোর স্রোতে নাও গো টেনে।
মিনতি করি করপুটে,
মনকে আমার নাও হে লুটে,
নাও হে কেড়ে তোমার ক্রোড়ে, তোমার চরণতলে।
তোমার কৃপাবিহীন ভবে,
জীবন আমার বিফল হবে।
নয়ন যেন সবার মাঝে তোমায় দেখে চলে।
'কাঁচা আমি'র থেকে আমায় বাঁচাও পলে পলে।

বিশ্বাস

সঞ্জয় ভুঁইয়া

আমি স্থির একটি বিশ্বাসে,
আমাকে স্থির করে দেয় একটি বিশ্বাস।
যখন দু-পা সংশয়ে এলোমেলো
আর সামনে শূন্যতা বিরাট;
বিশ্বাস কর, পাখির মতো নির্ভয়ে ডানা মেলা
শুধু সেই বিশ্বাসে ভর করে!

পরাপূজা-স্তোত্র

(শঙ্করাচার্য বিরচিত 'পরাপূজাস্তোত্রম্'-এর ছন্দানুবাদ)

সুনীলবিকাশ পাল

পূর্ণের হবে আবাহন কোথা?
সর্বাধারের কি আসন?
চিন্মাত্রের পাদ্য, অর্ঘ্য?
শুদ্ধের কিসে আচমন? (এক)

যিনি নির্মল কিসে স্নান তাঁর?
বিশ্বোদরের পরিধান?
নিরালম্বে উপবীত কি হেতু?
গন্ধশূন্যে পুষ্পাধান? (দুই)

নির্লেপে কেন গন্ধলেপন?
স্বতঃ সুন্দরে আভরণ?
নিত্য-তৃপ্তে নৈবেদ্য বা
তাম্বুলে বল কি প্রয়োজন? (তিন)

কিরূপে অনন্তে প্রদক্ষিণ বা
অদ্বয় করে কারে নতি?
বেদবাক্যের অগোচর যিনি
কিরূপে করিবে তাঁরে স্তুতি? (চার)

স্বয়ম্প্রকাশ বিভু যিনি তাঁর
কিসে দীপারতি, নীরাজন?
অন্তর্বহি পূর্ণ যিনি গো,
কিভাবে তাঁহার বিসর্জন? (পাঁচ)

ঐরূপে ব্রহ্মবিদোত্তমেরা
করিবেন এই পরাপূজা,
সর্ব অবস্থাতে দেবেশকে
একাত্মবোধে সর্বদা। (ছয়)

তোমাকে যতই জানি

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

শুধু আস্তিকের নও, না-ঈশ্বরে বিশ্বাসী যারা,
তাদেরও ভাবনার ভূমি দখল করেছ অক্লেশে।
সব নেতি, তোমার বিচারে,
সে এক অপূর্ব বোধে পৌঁছায় অস্তির কাছে।
তোমাকে যতই জানি, তত দেখি, আমার যা জানা,
দশমিক দেহ নিয়ে কুণ্ঠায় বড় লজ্জা পায়।
এই লজ্জা পেতে দিও,
তবেই তোমার চোখে চোখ রেখে দেখব মানুষ।
'বিশ্বায়ন' শব্দটা শুধু উচ্চারণে নয়,
তোমার সংজ্ঞায় সে যে 'বহুরূপে সম্মুখে'ই ঘোরে।

নাড়িশৃঙ্খল

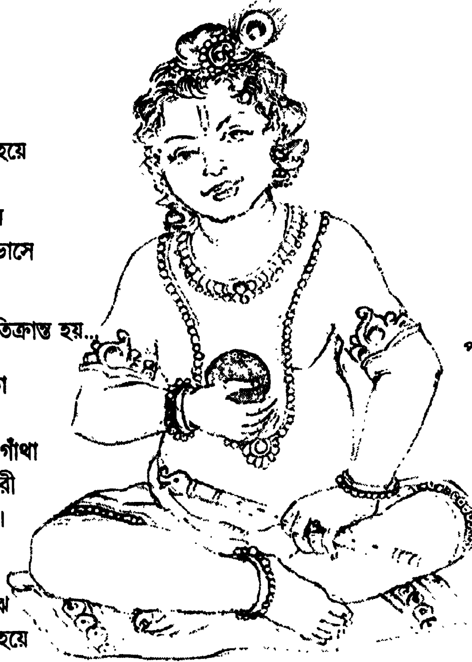
শিবাশিস দত্ত

বিশ্বময় জনারণ্যে তলিয়ে যাও
ভালবাসার সমুদ্রে নুনের পুতুল হয়ে
গলে মিশে যাও;
পৃথিবীর সব আলো সব অন্ধকার
আকাশের ক্যানভাসে ছবি হয়ে ভাসে
সেই ছবি দেখে নাও তুমি।

জীবনের বিবর্তনে আলোকবর্ষ অতিক্রান্ত হয়...

উৎসস্থলে উপবিষ্ট জগদ্ধাত্রী মাতা
সে-মাতার গর্ভজাত নাড়িশৃঙ্খলে
নিগূঢ় সত্যের মতো একই সূত্রে গাঁথা
পুত্র-কন্যা-আত্মীয় পুরুষ এবং নারী
ক্রমে ক্রমে হয়ে ওঠে বিশ্বজনীন।

ওরে মন!
তলিয়ে যাও বিশ্বময় জনারণ্য মাঝে
ভালবাসার সমুদ্রে নুনের পুতুল হয়ে
গলে মিশে যাও,
ভুলে যাও বর্ণ-জাতি-ভাষা ভেদসঙ্কীর্ণতা;
উৎসময়ীর উপাসনায় ধ্যানমগ্ন থাক চিরকাল।



কৃষ্ণ

(শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী স্মরণে)

শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়

একটি আশ্চর্য দীপ আচম্বিতে
পৃথিবীর বুকে
রেখে গেছে কি রহস্যই
আমাদের প্রতিটি হৃদয়ে
উদ্বেলিত অন্তরের বারবার
অকুণ্ঠ জিজ্ঞাসা
পায়নিকো আজও তবু কতদূরে
কোন্ সে-ঠিকানা!
একটি স্ফুলিঙ্গ শুধু অনির্বাণ
এইটুকু জেনে
প্রত্যয়ের শেষ সীমা মনে মনে
অবাক নির্ভর—
এই মাটি... এই ফুল...
প্রকৃতির যতেক সম্পদ
তারে ঘিরি রচিয়াছে পুলকেই
অপূর্ব বন্ধনী!
চির দীপ্ত সে-আলোক
আজও আছে নয়তো কল্পনা—
প্রতীক্ষায় শবরীর মতো একদিন
পাব সে-ঠিকানা!

খনি

নিতাই নাগ

একটু জলের আশায় তৃষ্ণাকাতর যারা,
একটু আলোর আশায় যারা গুমরে মরে
আঁধার ঘরে,
একটু ভালবাসার তরে যারা সিন্ধু বুকে
মুক্তা খোঁজে,
তাদের জন্য তুমি মাটির নিচে
রেখেছ সুপেয় জল;
তাদের জন্য তুমি আকাশ জুড়ে
দিয়েছ মেলে স্নিগ্ধ সোনার আলো;
তাদের জন্য তুমি ভালবাসার খনি
নিজের হৃদয়খানি দিয়েছ তুলে তাদের হাতে
গভীর ভালবেসে।



অলঙ্করণ : জয়ন্ত ঘোষ

মন রাঙিয়ে বসন রাঙা

গৌরগোপাল পাল

মন না রাঙিয়ে আগে রাঙালি বসন।
ভেবে তায় ঘুম নাই, কি হবে এখন।।

ভেবে যারা কাজ করে,
আছি আমি তার তরে,
কথা হয় হরি-হরে—জানে যে তা মন।।

তায় বলি আগে মন রাঙিয়ে যে ভাসে,
রাঙানো বসনে তার কিবা যায়-আসে;

বসনে কি লেখা থাকে—
হরিকে সে বেঁধে রাখে?
ফাঁকি দিলে পড়ে ফাঁকে—ফাঁকির জীবন।।

শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃপুরুষের নিবাস—দেরে বা দেরেপুর

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

রায় পরিবারের বংশতালিকা

যে সময় আমরা গবেষণাকর্মে হাত দিয়েছি, তখন রায় পরিবারের কোন ব্যক্তিই আর জীবিত নেই। এই বংশের শেষপুরুষ অন্যত্র (শ্বশুরালয়ে) বসবাস করছিলেন, তিনিও প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে প্রয়াত হয়েছেন। সাতবেড়িয়া গ্রামে যে রায় পরিবার বর্তমানে বসবাস করেন, তাঁরা তাঁদের দূর সম্পর্কের দৌহিত্র। তাঁরা রামানন্দ পরিবার সম্পর্কে কিছু জানেন না। সঙ্গতভাবেই রামানন্দ রায়দের বংশতালিকা নির্মাণে আমাদের কিছু প্রাচীন তথ্য ও সরকারি নথির ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয় সংক্রান্ত নথিগুলির বিশ্লেষণ জরুরী।

সাতবেড়িয়ার রায়বংশের রঘুনাথ জীউর সেবার পালাভাগের কুরসিনামায় অধস্তন বংশধরদের নাম ও পালাভাগ বণ্টনের রূপরেখা নিম্নরূপ (১২৮৩ বঙ্গাব্দের ১১ কার্তিক এই আপসবণ্টন হয়)ঃ

রামেশ্বর রায়	১ আনা	রামসদয় রায়	২ আনা
দুর্গাদাস রায়	১ আনা	শক্তিরাম রায়	৩ আনা
রামধেও রায়	৩ আনা	অনন্তরাম রায়	৩ আনা
রামঅক্ষয় রায়	১½ আনা	রামসর্ব রায়	১½ আনা
			ঃ (মোট ১৬ আনা)

শক্তিরাম, রামধেও ও অনন্তরাম অপুত্রক ছিলেন। তাঁদের অংশগুলি তাঁরা দেবোত্তর করে যান।

উল্লিখিত কুরসিনামা থেকে উনিশ শতকে রায় পরিবারের ব্যক্তিদের নাম জানা যায়। এই শতকের প্রথমার্ধে ডিস্ট্রিক্ট সেটেলমেন্ট রেকর্ডে (মৌজা দ্বারিয়াপুর ঃ ১৯৩৪, সি. এস. পড়চার মুদ্রণে) রঘুনাথ জীউর সেবাইত হিসাবে যাঁদের নাম লক্ষ্য করা যায় (এই তথ্য সংগ্রহ ও মুদ্রণের সময়কাল ১৯১৫-১৯৩৪ সাল।)ঃ

১। সতীশচন্দ্র রায় ও সুরেন্দ্রনাথ রায়
পিতা—রামময় রায়

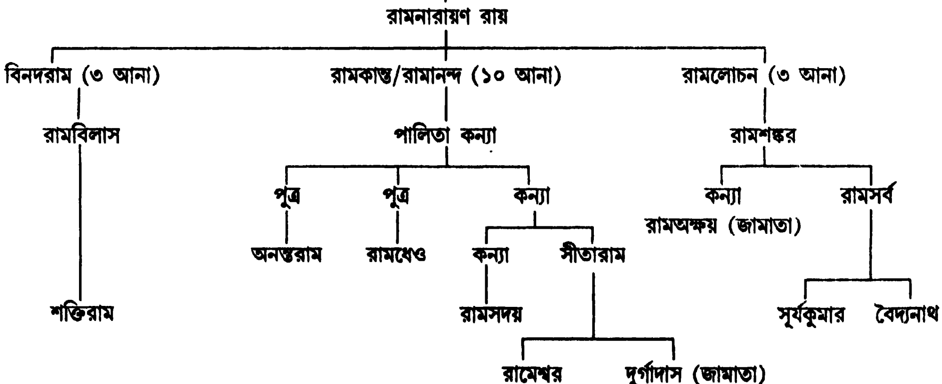
২। হরেন্দ্রনাথ রায়, পিতা—অন্নদাপ্রসাদ রায়

৩। সূর্যকুমার রায় ও বৈদ্যনাথ রায়
পিতা—রামসর্ব রায়।

উল্লিখিত দুই তথ্যেই আমরা কেবল রামসর্ব রায়ের উপস্থিতি দেখতে পাই। উভয় তথ্যে অন্যান্য শরিকদের নামের অনুপস্থিতির কারণ হিসাবে তাঁরা পরলোকগত ও নিঃসন্তান বলে অনুমিত হয়।

উল্লিখিত রামসর্ব রায়ের বিধবা স্ত্রীর জবানি থেকে জানা যায়, রামানন্দ রায়ের একাধিক ভ্রাতা এই জমিদারির মালিক হলেও তিনিই ছিলেন মুখ্য এবং জমিদারির সিংহভাগ (দশ আনা) নিজ অধিকারে রাখতেন।

আমরা অন্যত্র দেখেছি, আঠার শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের শুরু পর্যন্ত সাতবেড়িয়ার জমিদারির ক্ষমতায় যে তিনজনের উল্লেখ সরকারি দলিলে আছে, তাঁরা হলেন বিনদরাম, রামকান্ত ও রামলোচন। রামকান্ত ওরফে রামানন্দ বয়ঃক্রমে মধ্যম হলেও তিনিই মূলত জমিদারির মালিক ছিলেন এবং সিংহভাগ অংশ ভোগ



করেছেন। রামকান্ত (রামানন্দ) দশ আনা অংশের মালিক হলে বাকি ছয় আনা অপর দুই ভাই বিনদরাম ও রামলোচনের ভাগে বর্তায় এবং সেক্ষেত্রে তাঁদের প্রত্যেকের অংশ হয় তিন আনা করে। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থ থেকে আমরা অবগত হই, রামানন্দ নিঃসন্তান ছিলেন এবং রামসর্ব রায়ের বিধবা পত্নীর উক্তি থেকে জানা যায় যে, তাঁর সম্পত্তি তাঁর এক পালিতা কন্যার বংশধরেরা ভোগ করতেন। শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন—রায় পরিবারের শরিক শক্তিরাম রায় অপুত্রক ছিলেন। তিনি তাঁর সম্পত্তি দেবোত্তর করে যান। অনুরূপভাবে অনন্তরাম রায় ও রামধেও রায়ও অপুত্রক এবং তাঁদের সম্পত্তি দেবোত্তর করেন। রামঅক্ষয় দৌহিত্র সূত্রে সম্পত্তি পেয়েছেন এবং তাঁদের বংশধরগণ বর্তমান। সম্ভবত রামময় রায় ও অন্নদাপ্রসাদ রায় (যাঁদের নাম এই শতকের সি. এস. পড়চায় উল্লিখিত আছে) দৌহিত্র বংশজাত। এইসকল তথ্য থেকে সাতবেড়িয়ার রায় পরিবারের সম্ভাব্য বংশতালিকা গঠন করা হয়েছে।

দেরেপুর ও ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের বংশ

দেরেপুর (বা দ্বেরেপুর) সাতবেড়িয়া গ্রামের সংলগ্ন একটি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামেই ক্ষুদিরামের পূর্বপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁদের স্বর্গলাভও ঘটে এখানে। সম্ভবত অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সাতবেড়িয়ার জমিদারি মহল। জমিদারির প্রতিপত্তির সঙ্গে পূজাপার্বণ ছিল সেকালের বিধান। শশিভূষণ ঘোষ রচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তখনকার মানুষ সামান্য প্রাপ্তিতেই সন্তুষ্ট থাকত, আহার্য সহজলভ্য ছিল, জনমজুরও অল্প পারিশ্রমিকে কাজ করত। লোকে অর্থ উপার্জন করলে নিজের পর্ণকুটির না ভেঙে আগে মন্দির তৈরি করত। জলাশয়, পান্থনিবাস তৈরি করে মানুষের সেবা করত। এ হেন সময়ে সাতবেড়িয়ার জমিদার রায় মহাশয়ের অনুরোধক্রমেই সুলতানপুর থেকে বলরাম চট্টোপাধ্যায় বসতি শুরু করেন দ্বারিয়াপুর গ্রামে। সাতবেড়িয়ায় তখন চতুষ্পাঠী ছিল তিনটি। সেই সমস্ত পাঠশালে বিদ্যাদান এবং জমিদার-প্রতিষ্ঠিত নানা দেবদেউলে পূজা করার জন্যই তিনি বলরাম চট্টোপাধ্যায়কে আনিয়েছিলেন এবং তাঁকে উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। বলরাম চট্টোপাধ্যায়ের দুই পুত্র—দাতারাম ও রামলোচন। সরকারি নথিতে রামলোচন ও দাতারামের নামে দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির উল্লেখ রয়েছে। সমকালে দ্বারিয়াপুর মৌজা রায় জমিদারদের নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল এবং পরবর্তী কালে দ্বারিয়াপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশ সংশ্লিষ্ট বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের ভূসম্পত্তিতে জিবটার জমিদারদের নাম আছে। রামানন্দ রায়ের মৃত্যুর পর সাতবেড়িয়া জমিদারি লাট (দ্বারিয়াপুর সমেত) জিবটার রায় পরিবারের হস্তগত হয়। এই শতকের শুরুতে সংগঠিত সেটেলমেন্ট রেকর্ডেও সাতবেড়িয়ার জমিদার কর্তৃক তাঁদের গৃহদেবতার পূজার্চনা বাবদ ব্রাহ্মণকে বিশেষ পরিমাণ জমি অনুদানের উল্লেখ আছে। সাতবেড়িয়া ও দ্বারিয়াপুর গ্রামদ্বয়ের মধ্যে দ্বারিয়াপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশ প্রাচীন। সাতবেড়িয়ার জমিদারবাড়ির বিশাল দেবদেউল ও ব্যাপক পূজার্চনায় চট্টোপাধ্যায়দের মতো নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবার থাকবেন না তা ভাবা যায় না। সেই কারণেই, আমাদের অনুমান, ক্ষুদিরামের পূর্বপুরুষের সঙ্গে রামানন্দ রায়ের পূর্বপুরুষের বিশেষ সম্প্রীতি ছিল।

দ্বারিয়াপুরে প্রতিষ্ঠিত বলরাম চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রামলোচনের একমাত্র পুত্র মানিকরামের তিন পুত্র ও এক কন্যা। শ্রীরামকৃষ্ণ-জনক ক্ষুদিরাম (জন্ম সম্ভবত ১১৮১ সালে) হলেন মানিকরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র। দ্বিতীয় পুত্র নিধিরাম এবং কনিষ্ঠ পুত্র রামকানাই বা কানাইরাম। কন্যার নাম রামশীলা। ক্ষুদিরামের তিন পুত্র ও দুই কন্যা; তিন পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামকুমার, মধ্যম রামেশ্বর এবং কনিষ্ঠ গদাধর বা শ্রীরামকৃষ্ণ এবং কন্যাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা কাত্যায়নী ও কনিষ্ঠা সর্বমঙ্গলা। ক্ষুদিরাম যখন দেরেপুরে, তখন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র (১৮০৫ খ্রীস্টাব্দ) ও জ্যেষ্ঠা কন্যা (১৮১০ খ্রীস্টাব্দ) ভূমিষ্ঠ হন।

অপরদিকে বলরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র দাতারামের একমাত্র কন্যা লক্ষ্মীমণির সঙ্গে বাঁশবেড়িয়ার প্রসিদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের রামজীবনের বিবাহ হয়। তাঁদের পাঁচ সন্তান—শ্রীরাম, ভজরাম, দেবেন্দ্র, মহাভারত ও ঈশ্বর। এঁদের সন্তানসন্ততিই পরবর্তী কালে দ্বারিয়াপুরের ব্রাহ্মণবংশের প্রতিনিধিত্ব করেন। শ্রীরামের পুত্র যজ্ঞেশ্বর এবং যজ্ঞেশ্বরের দুই পুত্র নিত্যানন্দ ও বিহারী। বিহারীর পুত্র পশুপতি ও ভূপতি। ভজরামের পুত্র দীননাথ এবং দীননাথের পুত্র বিপুলাক্ষ ও প্রভাকর। দেবেন্দ্রনাথেরও দুই পুত্র বসন্তকুমার ও গোলকপতি। তাঁরা আনুড়ে (সম্ভবত মাতুলালয়ে) বসবাস করেন। মহাভারত তিন সন্তানের জনক—রামপদ, রামলাল ও রাজেন্দ্র। রামপদর সন্তান তিনকড়ি; রামলাল নিঃসন্তান এবং রাজেন্দ্র দুই সন্তানের (শম্ভুনাথ ও বিশ্বনাথ) পিতা। লক্ষ্মীমণিদেবীর পঞ্চম পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের দুই পুত্র—রামময় এবং রামরূপ। রামরূপের কোন সন্তানাদি হয়নি এবং রামময়ের একমাত্র সন্তান সাধক রামগতি।

দেরেপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশের সূচনা ও বিস্তার

আঠার শতকেই সীমাবদ্ধ। ঐ পরিবার প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ লিখেছেনঃ "প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে মধ্যবিত্ত অবস্থাসম্পন্ন ধর্মনিষ্ঠ এক ব্রাহ্মণ পরিবারের দেরেগ্রামে বাস ছিল। ইঁহারা সদাচারী, কুলীন এবং শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। ইঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত শিবালয়-সমন্বিত পুষ্করিণী এখনো 'চাটুয্যে পুকুর' নামে খ্যাত থাকিয়া ইঁহাদিগের পরিচয় প্রদান করিতেছে।...

"শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত অর্থকরী কোনরূপ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন কিনা জানা যায় না। কিন্তু সত্যনিষ্ঠা, সন্তোষ, ক্ষমা, ত্যাগ প্রভৃতি যে গুণসমূহ সৎ ব্রাহ্মণের স্বভাবসিদ্ধ হওয়া কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে, বিধাতা তাঁহাকে ঐসকল গুণ প্রচুর



দেরেপুরে ক্ষুদিরামের ভিটার পতিত ভূখণ্ড

পরিমাণে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘ ও সবল ছিলেন, কিন্তু স্থূলকায় ছিলেন না; গৌরবর্ণ ও প্রিয়দর্শন ছিলেন। বংশানুগত শ্রীরামচন্দ্রের ভক্তি তাঁহাতে বিশেষ প্রকাশ ছিল এবং তিনি নিত্যকৃত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপণ করিয়া প্রতিদিন পুষ্পচয়নপূর্বক রঘুবীরের পূজান্তে জল গ্রহণ করিতেন। শূদ্রের নিকট হইতে দান গ্রহণ দূরে থাকুক, শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ তিনি কখনো গ্রহণ করেন নাই এবং যেসকল ব্রাহ্মণ পণগ্রহণ করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিত, তাহাদিগের হস্তে জল গ্রহণ পর্যন্ত করিতেন না। ঐরূপ নিষ্ঠা ও সদাচারের জন্য গ্রামবাসীরা তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও সম্মানের চক্ষে দর্শন করিত।

"পিতার মৃত্যুর পরে সংসার ও বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের স্কন্ধেই পতিত হইয়াছিল এবং ধর্মপথে অবিচলিত থাকিয়া তিনি ঐসকল কার্য যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতেছিলেন। ইতঃপূর্বে বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিলেও তাঁহার পত্নী অল্পবয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং আন্দাজ পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি পুনরায় দ্বিতীয়বার দ্বারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার এই পত্নীর নাম শ্রীমতী চন্দ্রমণি ছিল; কিন্তু বাটীতে ইঁহাকে সকলে 'চন্দ্রা' বলিয়াই সম্বোধন করিত। শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর পিত্রালয় সারাটি মায়াপুর নামক গ্রামে অবস্থিত ছিল। তিনি সুরূপা, সরলা ও দেবদ্বিজপরায়ণা ছিলেন। কিন্তু হৃদয়ের অসীম শ্রদ্ধা, স্নেহ ও ভালবাসাই তাঁহার বিশেষ গুণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে এবং তিনি ঐসকলের জন্যই সংসারে সকলের প্রিয় হইয়া ছিলেন। সম্ভবত ১১৯৭ সালে শ্রীমতী চন্দ্রমণি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ১২০৫ সালে বিবাহের সময় তাঁহার বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র ছিল। সম্ভবত ১২১১ সালে তাঁহার প্রথম পুত্র রামকুমার জন্মগ্রহণ করে। উহার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে শ্রীমতী কাত্যায়নী নাম্নী কন্যার এবং ১২৩২ সালে দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বরের মুখাবলোকন করিয়া তিনি আনন্দিতা হইয়াছিলেন।"[৮]

"সমকালে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের রামশীলা নাম্নী এক ভগিনী এবং নিধিরাম ও কানাইরাম বা রামকানাই নামক দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। দেরেপুরের জমিদারের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইয়া যখন তিনি সর্বস্বান্ত হইলেন তখন তাঁহার উক্ত ভগিনীর বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ বৎসর এবং ভ্রাতৃদ্বয়ের ত্রিশ ও পঁচিশ বৎসর হইবে। তাঁহারা সকলেই তখন বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন। কামারপুকুরের প্রায় ছয় ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত ছিলিমপুরে ভাগবত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীমতী রামশীলার বিবাহ হইয়াছিল এবং রামচাঁদ নামক এক পুত্র ও হেমাঙ্গিনী নাম্নী এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। উক্ত বিপদের সময় রামচাঁদের বয়স আন্দাজ একুশ বৎসর এবং হেমাঙ্গিনীর ষোল বৎসর ছিল। শ্রীযুক্ত রামচাঁদ তখন মেদিনীপুরে মোক্তারি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী হেমাঙ্গিনীর দেরেপুরে মাতুলালয়েই জন্ম হইয়াছিল এবং ভ্রাতা অপেক্ষাও তিনি মাতুলদিগের অধিকতর স্নেহলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ইহাকে কন্যা-নির্বিশেষে পালন করিয়া বিবাহকাল উপস্থিত হইলে কামারপুকুরের প্রায় আড়াই ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত শিহড় গ্রামের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে স্বয়ং সম্প্রদান করিয়াছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিয়া তিনি ক্রমে রাঘব, রামরতন, হৃদয়রাম ও রাজারাম নামে চারি পুত্রের জননী হইয়াছিলেন।"[৯] [ক্রমশ] (তিন)

---

৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, পৃঃ ৩২-৩৪

৯ ঐ, পৃঃ ৪৩-৪৫

নতুন শতাব্দীতে খেলাধূলায় ভারত

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

"দুর্বল মস্তিষ্ক কিছু করিতে পারে না; আমাদিগকে সবলমস্তিষ্ক হইতে হইবে।... গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরো নিকটবর্তী হইবে।"—এই চিরস্মরণীয় বাণীর উদ্গাতা স্বামী বিবেকানন্দ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির মতো ক্রীড়াক্ষেত্রেও আমাদের অনুপ্রেরণার উজ্জ্বল আলোক-বর্তিকা। খেলাধূলার জগতেও ভারতবর্ষ গরীয়ান হয়ে উঠবে, পথ দেখাবে বিশ্বজগৎকে—একথা অন্তর থেকে বিশ্বাস করতেন স্বামীজী। তাঁর এই অন্তর্দৃষ্টি তথা জীবনবোধের প্রতিধ্বনি প্রথম শোনা গেল ১৯১১ সালে—যেদিন ক্যালকাটা ক্লাবের মাঠে ব্রিটিশ সামরিক দল ইস্ট ইয়র্কশায়ারকে পর্যুদস্ত করে জাতীয়তাবোধের আগুন জ্বালিয়েছিল ভারতবর্ষের 'জাতীয় ক্লাব' মোহনবাগান। বস্তুত, মোহনবাগানের এই ঐতিহাসিক জয় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও প্রাণসঞ্চার করেছিল।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রাচীন সাধুদের সূত্রে জানা যায়, স্বামী প্রেমানন্দ এই কীর্তিগৌরবে এতটাই আনন্দে উদ্বেল হয়ে পড়েছিলেন যে, জনে জনে সবাইকে ডেকে এই সাফল্যের তাৎপর্য ও সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করেছিলেন। বেলুড় মঠে সেদিন এক উৎসবের বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। সকলেই উপলব্ধি করেছিলেন মহাসমাধির কিছুকাল পূর্বে উচ্চারিত স্বামী বিবেকানন্দের সেই কালজয়ী উক্তির সারবত্তা। সেই শুরু, তারপর থেকে খেলার মাঠেও ভারত মাঝেমধ্যেই এরকম কিছু উত্তুঙ্গ কীর্তির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ১৯২৪-১৯৫৬ টানা ৩২ বছর অলিম্পিক হকিতে ভারত অজেয় শক্তি হিসাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। ১৯৬০-এর রোম অলিম্পিকে রূপো পাওয়ার পরের অলিম্পিকেই আবার সোনা। তারপর ১৯৮০-র মস্কো অলিম্পিকেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। মাঝে ১৯৭৫-র বিশ্বকাপ হকি খেতাব এবং আরো অসংখ্য আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অনায়াস-লব্ধ সাফল্য। হকি ছাড়াও ফুটবল, টেনিস, অ্যাথলেটিক্স, ব্যাডমিন্টন, বক্সিং, কুস্তি, দাবা প্রভৃতি বিভাগেও গত শতাব্দীতে এশীয় ও অলিম্পিক স্তরে ভারত ও ভারতীয় খেলোয়াড়েরা উল্লেখযোগ্য কীর্তিকল্পের সোপান রচনা করতে পেরেছে। আলোচ্য নিবন্ধে নতুন সহস্রাব্দের সূচনাপর্বে বিশ্ব-ক্রীড়াঙ্গনে ভারতবর্ষের ভূমিকা ও অবস্থান নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২০০০ সালের সিডনি মিলেনিয়াম অলিম্পিকে অবশ্য ভারতের পারফরমেন্স প্রত্যাশিত মাত্রায় উন্নীত হতে পারেনি। মালেশ্বরীর চমকপ্রদ পারফরমেন্সের কথা মাথায় রেখেও বলতে হয়, হকি ও টেনিসে আরো ভাল ফল করা উচিত ছিল। হকিতে এবারও গ্রুপ লিগের গাঁট অতিক্রম করা গেল না। আর টেনিসে লিয়েন্ডার পেজ ও মহেশ ভূপতি জুটি সাময়িক মনোমালিন্যজনিত বিচ্ছিন্নতার কারণে অলিম্পিকের সময়ে নতুন করে জুটি বেঁধে খেলেও প্রত্যাশিত ছন্দ খুঁজে পাননি। তবে দুজনেই বুঝতে পেরেছেন, সিঙ্গলসে তাঁদের পক্ষে এ. টি. পি. সার্কিটে কিছু করে দেখানো সম্ভব নয়। নিজেদের এবং দেশের স্বার্থে তাই ডাবলসেই অভিনিবিষ্ট থাকা একান্ত কাম্য। বোধোদয় হয়েছে দুজনেরই এবং আদ্যন্ত পেশাদারী মানসিকতায় নিজেদের ভাঙা সম্পর্ক জোড়া লাগিয়ে তাঁরা খেলছেন এবছর। সাফল্যও আসতে শুরু করেছে। এ. টি. পি. খেতাব গোটা দুয়েক করায়ত্ত, ফরাসী ওপেন জিতে বিশ্ব ক্রমপর্যায়ে তিন নম্বর স্থানে উঠে এসেছেন। ধীরে ধীরে অপহৃত এক নম্বর আসনটির দিকে তাঁরা ধাবমান। লি-হেশ জুটি উইম্বলডনে ফেভারিট হিসাবেই শুরু করবেন। জিতলেই এক নম্বরে চলে আসবেন।

তবে গত অলিম্পিকে ভারতের ব্যর্থতা ভুলিয়ে দিয়েছেন ভারতগৌরব বিশ্বনাথন আনন্দ। বছরের শেষপাদে বিশ্বদাবার চ্যাম্পিয়নশিপ লড়াইয়ে একের পর এক রথী-মহারথীকে ভূতলশায়ী করে ইরানের রাজধানী তেহেরানে নতুন শতাব্দী ও সহস্রাব্দের প্রথম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন-রূপে উঠে এলেন চেন্নাইয়ের বেসান্তনগরের তিরিশোর্ধ্ব 'ভিশি'। ভারত সভ্যতার অন্যতম অভিজ্ঞান দাবায় এযাবৎ আমাদের কোন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন তৈরি হয়নি বলে খানিকটা চাপা দুঃখবোধ ছিল দাবাপ্রেমীদের মনে। মীর সুলতাল খান অতুলনীয় প্রতিভার আধার হয়েও খেতাব জিততে পারেননি ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ায়। আনন্দ সেদিক থেকে ভাগ্যবান। ম্যানিলার বিখ্যাত ইউজিন টোরে চেজ স্কুলে প্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা তার ভিতটা এতটাই শক্তপোক্ত করে দেয় যে, গত শতাব্দীর সেরা দশ দাবাড়ুর 'এলিট' গ্রুপে তাঁর অন্তর্ভুক্তি নিয়ে কোন প্রশ্ন দেখা যায়নি। এর আগে পি. সি. এ. ও ফিডে বিশ্বখেতাবী লড়াইয়ের ফাইনালে উঠে গ্যারি কাসপারভ ও আনাতোলি কারপভের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছিলেন আনন্দ। কিন্তু নিরাশ না হয়ে, নতুন করে শুরু করে নিজেকে তুলে নিয়ে গেলেন সকলের ধরাছোঁয়ার বাইরে। দুবার অস্কার পেয়েছেন, পেয়েছেন স্পেনের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মান, সর্বোপরি ২৮০০ ফিডে এলো রেটিংয়ের দ্বারপ্রান্তে তিনি উপনীত। আধুনিক কালের বিশ্ব-ক্রীড়াঙ্গনে 'ভিশি আনন্দ'ই ভারতের একনম্বর সেলিব্রিটি। এ ধারণার সত্যতা আরো একবার প্রমাণিত হলো সম্প্রতি, যখন 'ভিশি' সুপার চ্যাম্পিয়নশিপে ভ্লাদিমির ক্রামনিককে হারিয়ে দিলেন।



অল ইংল্যান্ড ট্রফি হাতে পুল্লেলা গোপীচাঁদ

পুল্লেলা গোপীচাঁদ প্রকাশ পাড়ুকোনের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে এবছর অল ইংল্যান্ড খেতাব জিতেছেন। উইম্বলডন টেনিসের মতো অল ইংল্যান্ড হলো ব্যাডমিন্টন জগতে সবচেয়ে মর্যাদাব্যঞ্জক টুর্নামেন্ট। যতই পৃথক বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ হোক না কেন, অল ইংল্যান্ডে ভাল খেলা বিশ্বের সব খেলোয়াড়ের স্বপ্ন, স্বীকৃতির সর্বোত্তম মানদণ্ড।

অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ পেলে কি হবে, মালেশ্বরীকে সরিয়ে কুঞ্জরানী দেবী বিশ্ব ভারোত্তোলনের একশ বছরের ইতিহাসে মহিলাদের মধ্যে প্রথম পাঁচের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছেন। রাইফেল শুটিংয়ে যশপাল রানার উত্তরসুরী পেয়ে গেছে ভারত। ১৮ বছরের 'টিন এজার' অভিনব বিন্দ্রার হাত ধরেই ভারত শুটিঙের অলিম্পিক পদক জয়ের স্বপ্ন দেখছে—যে-স্বপ্ন একদা দেখিয়েও প্রত্যাশাপূরণে ব্যর্থ রণবীর সিংহ, সোমা দত্ত, যশপাল রানারা। এবছর ইউরোপীয় সার্কিটে অভিনব বিন্দ্রার পারফরমেন্স চমকে দিয়েছে বিশেষজ্ঞদের। সম্প্রতি বিশ্ব শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ১০ মিটার এয়ার রাইফেলে ব্যক্তিগত বিভাগে বিশ্বরেকর্ড-সহ চ্যাম্পিয়ন হয়ে অভিনব এথেন্স অলিম্পিকের আগে ভারতীয় শুটিংসমাজকে নড়েচড়ে বসতে বাধ্য করেছেন। এখন থেকেই যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ঠিকঠাক দেওয়া গেলে অভিনবই শুটিংয়ের অলিম্পিক পদক নিয়ে আসতে পারেন।

জাতীয় গৌরবগাথার প্রতিভূ হকিতেও সাফল্য এসেছে এবছর। ঢাকায় অনুষ্ঠিত দশ দেশের এক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে খেতাব জিতে বলজিৎ সিং ধীলনের দল প্রমাণ করেছে বড় ম্যাচে জেতার প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস ও টেকনিক্যাল উৎকর্ষ যথেষ্টই আছে ভারতীয়দের। অলিম্পিকের ঠিক আগেই পার্থে চারদেশীয় হকিতে অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েও সিডনিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল পোল্যান্ডের সঙ্গে ড্র করে সেমিফাইনালে উঠতে পারেনি ভারত। সম্প্রতি জুনিয়র এশিয়া কাপ হকিতে দাপটের সঙ্গে খেলে খেতাব জিতে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত ভারতীয় হকি।

বাঙালীর প্রিয় খেলা ফুটবল ঘিরে এখন হা-হুতাশ সর্বত্র। টিভিতে বিশ্বমানের খেলা দেখে এদেশের মানুষ ভারতীয় ফুটবল সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ। এই যখন চূড়ান্ত হতাশায় ভরা অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থা, তখন বাইচুঙ ভুটিয়ার নেতৃত্বে প্রিওয়ার্ল্ড কাপে ভারতের আত্মপ্রত্যয়ী ভূমিকা আগ্রহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে নিরাশাবাদীদের মনেও। ১৯৯০-এর বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলা আরব আমীরশাহী দলের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে অবিশ্বাস্য জয় এবং তাদের মাঠে মরণপণ লড়াই দেখে বলতে হয়—ভারতীয় ফুটবল একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। এই সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতেই বহুদিন পরে ভারত মারডেকার মতো আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্টে আবার যোগদানের আহ্বান পেয়েছে। বাইচুঙ, বিজয়ন, অধিনায়ক জো পল আনচেরিরা প্রমাণ করে দিয়েছেন, ঠিকঠাক পরিকল্পনা করে এগোলে ভারতও এশীয় ফুটবলের মাঝারি স্তরে বড় শক্তি হয়ে উঠতে পারে।

অলিম্পিকের বিশ্বসংসারে অন্তর্ভুক্ত না হলেও ক্রিকেট এখন জনপ্রিয়তায় এদেশে সব খেলাকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। তবে জনপ্রিয়তার ভিত্তি হলো সাফল্য, সেটা অন্তত ঘরের মাঠে বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে ভারত। টেস্টের এক নম্বর দল অস্ট্রেলিয়াকে হারাচ্ছে ভারত, ব্যাপারটি যথেষ্ট তৃপ্তিদায়ক ও গর্বের বিষয়, সন্দেহ নেই। ১৯৮৩ এবং ১৯৮৫-তে একদিনের দুটি সর্বোচ্চ প্রতিযোগিতায় জেতার পর টেস্ট ক্রিকেটে সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়াকে ২-১ ফলে হারানোটাই ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসের সর্বোত্তম গৌরবব্যঞ্জক অধ্যায়।

বিজয় অমৃতরাজ দু-দুবার ডেভিস কাপের ফাইনালে নিয়ে গেছেন ভারতকে। গ্র্যান্ড স্লাম খেতাব না পেলেও অসংখ্য এ. টি. পি. চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন। ডাবলসে দাদা আনন্দ অমৃতরাজের সঙ্গে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিঙে প্রথম পাঁচের মধ্যে ছিলেন। বিশ্ব টেনিসে তাঁর সপ্রতিভ, উজ্জ্বল ভাবমূর্তি আজ তাঁকে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির প্রেসিডেন্টের সমতুল্য পদাধিকারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক শান্তিদূত হিসাবে বিজয় দেশে দেশে শান্তির আবহে ঐক্য ও সম্প্রীতির জন্য কাজ শুরু করে দিয়েছেন। মানবসমাজ ও সভ্যতাকে শক্তিশালী ও সুসংহত করতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ও আই. ও. সি.-র যৌথ কর্মসূচীর প্রধান ধ্বজাবাহক আজ বিজয় অমৃতরাজ।

সব মিলিয়ে ক্রীড়াজগতে ভারতের বর্তমান অবস্থা হতাশজনক নয়, বরং ভবিষ্যতে বড় কোন সাফল্যেরই ইঙ্গিতবাহী। আমরা আশা করব, এই নতুন শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন ক্রীড়াক্ষেত্রের তরুণ প্রতিভারা আমাদের দেশকে গর্বিত করবে। ❑

সবই তোমার

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

"Every man for himself and God for us all."
(Spanish Proverb)

ঠাকুর বলছেন—ব্রহ্মও সত্য জগৎও সত্য। এই কথাটি আমাদের বেশ পছন্দের। আমরা সাধারণ মানুষ। জগৎ মিথ্যা বললে অবাক হতে হয়। রোজ সকালে চোখ খুললেই দেখি সেই একই ঘর, একই সিলিং, চারটে দেওয়াল, চারটে জানলা। বাইরে তাকালে সেই একই শহুরে গাছ। পাড়াতুতো কাকদের একইরকম চিৎকার, সাইলেন্সার ফাটা গাড়িটার সেই একই পাড়াকাঁপানো আওয়াজ। সেই একই ঘোষ বোস মিত্তির, সেই একই ট্যাক ট্যাক কথা। শরীরে সেই একইরকম ব্যামো—পেট কন্‌কন্‌, মাথা ঝন্‌ঝন্‌। সেই একই সমস্যা—কাজের মহিলা এসেছেন অথবা আসেননি। সেই একই আতঙ্ক—মেয়ের স্কুলবাস কেন আসছে না। গৃহিণীর সেই একই ঘোষণা—তবিলে পঞ্চাশটি টাকা পড়ে আছে, মাস কাবার হতে এখনো সাতদিন বাকি। সেই একই দুশ্চিন্তা—লোনের টাকায় বাড়ি তৈরি হয়েছিল, প্রত্যেক মাসে মাইনে থেকে পাঁচহাজার কেটে নিচ্ছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সেই একই দুঃখ—বয়স বাড়ছে, চুলে পাক ধরছে, মাথায় টাক পড়ছে, গাল তুবড়ে যাচ্ছে। যৌবন পালিয়ে যাচ্ছে। এই জগৎটাকে, তার সঙ্গে আমার এই অস্তিত্বটাকে আমি কেমন করে 'মায়া' বলব!

ঠাকুর বড় ভাল। শক্ত শক্ত কথা বলে, পরতে পরতে সংস্কৃত শ্লোক আওড়ে আমাদের এই খ্যাঁচোরম্যাঁচোর জীবনটাকে নস্যাৎ করে দেননি। একবারও বলেননি—এই! চোখ উলটে ঠাকুরঘরে বসে থাক, হাতে জপের মালা নিয়ে বিষয়চিন্তা কর। একবারও বলেননি—সংসারে ডিক্লেয়ার করে দে—তুই ঈশ্বরের কাছাকাছি চলে গেছিস। কেউ যেন তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে তোকে বিরক্ত না করে। শুধু তোর ভোগের ব্যাপারটি যেন 'টাইম টু টাইম' এসে হাজির হয়। বরং ঠাকুর বললেন—বাবা! সংসারটার সব যদিও অসার, কোন সারবস্তু নেই, তবু সংসারেই থাকতে হবে। কেমন করে থাকবে? সব ব্যাপারেই যেমন কায়দা আছে—গাড়ি চালাবার কায়দা, আলো জ্বালাবার কায়দা, উনুন ধরাবার কায়দা, মানুষকে খুশি করবার কায়দা—সেইরকম সংসারে থাকার একটা কায়দা আছে। যেমন বলে—মদ খাও ক্ষতি নেই, কিন্তু মদ যেন তোমাকে না খায়। নৌকা জলে থাকুক, জলেই তাকে থাকতে হবে, কিন্তু নৌকার ভিতরে যেন জল না থাকে। সংসারে থাক, কিন্তু সংসার যেন তোমার মধ্যে না ঢোকে। থাক। সে কেমন! যেমন পায়রার গলায় মটর গজগজ করে। সংসারে বীরের মতো থাকতে হবে। এমন একটা ভাব করতে হবে—তুমি আছ, আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা আছ। সে-বাঁধনটা কেমন! জাদুকরের ভেল্কি। বাজারের রাস্তায় জাদুকর খেলা দেখাচ্ছে—এক তাল দড়ি, আষ্টেপৃষ্ঠে তার গাঁট। দড়ির তালটা দর্শকদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—খুলে দিন, দেখি কে খুলতে পারেন! সকলেই চেষ্টা করল, কেউই খুলতে পারল না। তখন জাদুকর সেই জটপাকানো দড়ির তালটা নিজের হাতে নিয়ে একবার ঝাঁকাতেই সব গাঁট খুলে লম্বা দড়ি! তুমি সংসারী, এই কায়দাটা তোমাকেও শিখতে হবে। সংসার ঐরকম জটপাকানো দড়ির তাল। জাদুকর ভগবানের কাছ থেকে শিখে নিতে হবে সংসারের যাবতীয় জট খোলার কায়দা। সংসারে প্রতিমুহূর্তে পাশে ঈশ্বরকে প্রয়োজন। সবসময় এই কথাটি মনে রাখতে হবে—মানুষের প্রকৃত বন্ধু স্বয়ং ভগবান।

ভগবান কে? এসম্পর্কে আমাদের বিভিন্ন শাস্ত্র বহু রকমের কথা বলেছেন। ধরেই নেওয়া হয়েছে, সকলেই ঈশ্বর-বিশ্বাসী। কিন্তু ঠাকুর অসাধারণ, তিনি জানতেন পৃথিবীতে বিশ্বাসীর চেয়ে অবিশ্বাসীর সংখ্যাই বেশি। বেদান্ত বলছেন—এক ছাড়া দুই নেই। সর্বত্রই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ও আত্মা একই। একমাত্র ঠাকুরই বললেন—আত্মা যদি আছেন, অনাত্মাও আছেন। প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে তো অনন্ত খণ্ডিত হয়ে গেল। ঠাকুর বললেন—না। খণ্ডিত হলো না, শুধু ধরনটা পালটালো। আস্তিকের ভগবান আত্মা আর নাস্তিকের ভগবান অনাত্মা। দুটি ভাবেই কিন্তু আত্মার উপস্থিতি। আস্তিকের কাছে যিনি আত্মস্বরূপ, নাস্তিকের কাছে তিনি অনাত্মস্বরূপ। নাস্তিকের কাছে তিনি জড়। আস্তিকের কাছে তিনি চেতন। ভগবানের সৃষ্টি থেকে বেরবার উপায় নেই।

একটা ঝোলার মধ্যে নানা রকমের জিনিস ভরা আছে—সাপ, ব্যাঙ, পোকামাকড়, শিয়াল, ছাগল। বিপরীত-ধর্মী সমস্ত বস্তু ঐ ঝোলার মধ্যে। পৃথিবীটা যেন একটা ঝোলা। যিনি হরিনাম করছেন তিনিও যেমন ঈশ্বরের, যিনি গালাগাল দিচ্ছেন তিনিও ঈশ্বরের। কলা যাঁর, মুলোও তাঁর। সাপও যাঁর, ব্যাঙও তাঁর।

এই হলেন ঠাকুর। ভীষণ 'প্র্যাকটিক্যাল'। তিনি সংসারকে, সংসারী জীবকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন। চোখ বুজে ঈশ্বরদর্শন নয়, চোখ খুলে দর্শন। একদিন তিনি বলছেন—চোখ বুজলেই ঈশ্বরকে দেখা যায়, আর চোখ খুললে দেখা যায় না? তিনি বললেন—চোখ চেয়ে দেখ, সারা পৃথিবী জুড়ে সেই ঈশ্বরেরই খেলা। সর্বত্র তিনি। তিনি কখনো জড়, কখনো চেতন। তিনি কীট-পতঙ্গ, তিনি পাহাড়-পর্বত, তিনি নদী-সমুদ্র, তিনি বন-উপবন। এর কোনটাই মানুষের সৃষ্টি নয়। মানুষ স্রষ্টার সৃষ্টি। এসে দেখছে—সবই আছে, সবাই আছে, সেও আছে। যেদিন সে থাকবে না, সেদিন এইসব থাকবে। যেমন চলছিল, সব সেই রকমই

চলবে। শুধু সে-ই থাকবে না। এই যে অস্তিত্ব আর অনস্তিত্ব —এ শুধু সময়ের খেলা।

ঠাকুর চলে এলেন 'কালে'। কাল থেকে তুলে নিলেন কালীকে। কালকে যিনি কলন করেন তিনিই কালী। 'কলন' মানে গণনা করা। মহাকাল কাকে বলে—'ইটারনিটি', অনন্ত। যার শুরুও নেই শেষও নেই। এই মহাকালের বুকে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন তিনিই কালী—খণ্ড কাল। তাঁর বর্ণ কি?—কালো, 'ব্ল্যাক'। কেন কালো—কারণ, তিনি অনন্তের ঘরেই বসে আছেন, দূরে বহুদূরে। বলছেন—"কে জানে মা কালী কেমন/ ষড় দর্শনে না পায় দরশন।" তার মানে বেদ-বেদান্ত উপনিষদ্‌সমূহের কোন ক্ষমতাই নেই সৃষ্টির রহস্য ভেদ করার। অর্থাৎ রহস্য রহস্যই থাক, জ্ঞান অজস্র তর্কজাল সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু সত্যের কাছে পৌঁছে দিতে পারে না। 'সেরিব্রাল পাওয়ার' দিয়ে বিশাল বিশাল গ্রন্থ লেখা যেতে পারে, কিন্তু সত্যের যবনিকা উন্মোচন করা যায় না।

তাহলে? ভক্তি। ভক্তি কাকে বলে—যেন বৃষ্টি, শ্রাবণের ধারা। সব স্নিগ্ধ ও শ্যামল করে দেয়। শুষ্ককে আর্দ্র করে। ভক্তির পথে পৃথিবীটা ধরাছোঁয়ার মধ্যে চলে আসে। সেখানে শুরু হয় আমি-তুমির খেলা। এই আমিকে ঠাকুর বলছেন 'কাঁচা আমি'। 'তুমি' 'তুমি' করতে করতে এই কাঁচা আমি 'পাকা আমি'তে পরিণত হয়। তখন রহস্যের ঘেরাটোপ খুলে সত্য প্রকাশিত হন। আর তখনি আসে মুক্তি। তৈরি হয় কূটস্থ বুদ্ধি। ঠাকুর বলছেন—তখন ভারি শান্তি। তখন একটা নির্ভার উপস্থিতি। তখন সে নির্দ্বিধায় বলতে পারে—আমি নয়, তুমি তুমি, এসবই তোমার। আমিও তোমার। ❑

শব্দচেতনা ১

স্বামীজীর জীবনের নানান ঘটনা ও তাঁর বাণীকে ভিত্তি করে তৈরি বিশেষ শব্দছক

১			২		■	৩			
	■	■		■	■		■	■	■
	■	৪	■	৫	৬	■	■	৭	
	■	৮		■	৯				■
১০			■	■		■	■	■	১১
	■	■	■	১২	■	■	১৩		
■	১৪				■	১৫		■	
১৬		■	■	১৭		■		■	
■	■	■	১৮	■	■	১৯	■	■	
২০				■	২১				

পাশাপাশি : (১) যাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ রোমাঁ রোলাঁকে বলেছিলেন : "যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও তো এঁকে পড়।" (৩) স্বামীজীর পিতৃদেব। (৫) দেশগড়ার পথিকৃৎদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে স্বামীজীর ঘোষণা : "নেতা হতে যেও না, —— কর।" (৭) চার্লস ডিকেন্সের '—— উইক পেপার্স' বইটা স্বামীজী মাত্র দুবার পড়েই মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। (৮) কানাডার ভ্যাঙ্কুবর বন্দর থেকে এই যানে করে স্বামীজী শিকাগো পৌঁছান। (৯) কঠ উপনিষদের এই বালক চরিত্রটি স্বামীজীর খুব প্রিয় ছিল। (১০) কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে কাগজে লিখেছিলেন—"—— শিক্ষে দিবে।" (১৩) "আচ্ছা সিংহ, কেউ যদি তোমার মাকে অপমান করে তখন তুমি কি কর?"—স্বামীজীর এই প্রশ্নের উত্তরে প্রিয়নাথ সিংহ উত্তর দিলেন : "মশায়, তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তাকে —— শিক্ষা দিই।" (১৪) যে-সহপাঠীর পরীক্ষার ফি ও একবছরের বেতন কলেজের কেরানী রাজকুমারবাবুকে দিয়ে কৌশলে মকুব করিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ। (১৫) ফিজির কাছাকাছি এক অঞ্চলে যখন অগ্ন্যুৎপাত ঘটে বহু লোক মারা যাচ্ছে, তখনি যেন কিসের আঘাতে স্বামীজীর ঘুম ভেঙে গেল। এই অঞ্চলটি আসলে কি ছিল? (১৬) যে-পরিবারের এক মহিলা স্বামীজীকে প্রথম ধর্মমহাসভার অফিসে নিয়ে যান। (১৭) দ্বিতীয়বারের পাশ্চাত্যযাত্রার শেষে ডিসেম্বরের এই তারিখে স্বামীজী বেলুড় মঠে ফেরেন। (২০) কাশীর এই শিবের নামানুসারেই ভুবনেশ্বরী দেবী তাঁর ষষ্ঠ সন্তানের এমন নাম রাখেন। (২১) স্বামীজীর উপস্থিতিতে তাঁর যে গুরুভাই রামকৃষ্ণ মঠের প্রথম সাধারণ সম্পাদক হন।

ওপর-নিচ : (১) নরেন্দ্রনাথের সন্ন্যাস-পরবর্তী প্রথম নাম। (২) শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে যে-ঋষির অবতার বলতেন। (৩) শৈশবের নরেন্দ্রনাথ। (৪) কলকাতায় যাঁর বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। (৬) বারাণসীর দুর্গামন্দির থেকে ফেরার পথে এরাই স্বামীজীর পিছু নিয়েছিল। (৭) চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী স্বামীজী সম্পর্কে বলেছিলেন : "তিনিই আমাদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার ——।" (১১) স্বামীজী যে-গুরুভাইকে রামকৃষ্ণ মঠের শাখাকেন্দ্র গড়ে তুলতে মাদ্রাজে পাঠিয়েছিলেন। (১২) স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে স্বামীজী স্নেহভরে এই নামেই ডাকতেন। (১৩) স্বামীজী বলতেন : "গণ্যমান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর —— কোন ভরসা রেখো না।" (১৪) শিকাগো ধর্মমহাসভার মূল শাখার অনুষ্ঠানগুলি হয়েছিল 'কলম্বাস ——'-এ। (১৮) স্বামীজী বলেছিলেন : "—— দার তো সর্দার।" (১৯) ধর্মমহাসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে যতজনের পর স্বামীজী বক্তৃতা দিতে ওঠেন।

সূত্র : **পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়**

আদি শঙ্করাচার্য ১

পঞ্চম শতাব্দী। স্থান—কেরল প্রদেশ, দক্ষিণ ভারত। কালাডি গ্রামে এক অপুত্রক ব্রাহ্মণ শিবগুরু এবং তাঁর পত্নী বিশিষ্টা একটি পুত্রসন্তানের জন্য চন্দ্রমৌলীশ্বর শিবের কাছে কাতর প্রার্থনা করলেন। জন্ম হলো এক দিব্য পুত্রসন্তানের। শঙ্করের কৃপায় জন্ম, তাই পিতা নাম রাখলেন 'শঙ্কর'। ইনিই হলেন পরবর্তী কালে হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তা আচার্য শঙ্কর। মাত্র ৩২ বছর তাঁর আয়ু। এই অল্প বয়সেই সারা ভারতকে তিনি জাগিয়ে দিলেন। চল যাই সেই সময়ে, সেই দেশে!









চিত্ররূপ : দেবাশিস বসু
(স্বামী অপূর্বানন্দ-কৃত 'আচার্য শঙ্কর' গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত)



শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য*

জলধিকুমার সরকার



এটা অস্বীকার করা যায় না যে, শ্রীরামকৃষ্ণের আকর্ষণ ও তাঁর বিষয়ে আরো বেশি জানার কৌতূহল দিন দিন প্রবলভাবে বেড়ে চলেছে। তাঁর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে নানা পুস্তক রচিত হচ্ছে, নতুন নতুন পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে, এমনকি ঐধরনের পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। দেশ-বিদেশের মনীষিগণ তাঁর ও তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের বাণীতে বর্তমান যুগোপযোগী প্রাসঙ্গিকতা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছেন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কেন এমন হচ্ছে? শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে বা তাঁর বাণীর মধ্যে কী বিশেষত্ব বা অ-সাধারণত্ব দেখেছে লোকে, যা তারা পূর্বে কারো মধ্যে দেখেনি? এই আলোচনা নিঃসন্দেহে একটি তুলনামূলক আলোচনা—শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে অন্যদের তুলনা। তুলনার প্রথমেই প্রশ্ন এসে যাচ্ছে—এই তুলনার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে কি হিসাবে দেখব? মানুষ, যোগী, সাধু, সিদ্ধপুরুষ, অবতার না অবতারাবতার? শেষোক্ত কথাটি পেলাম বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে 'উদ্বোধন' পত্রিকার একটি সংখ্যায়। তাতে কেউ কেউ শ্রীরামকৃষ্ণকে অবতার (সর্বশক্তিমান, সর্বগুণাধার, সর্বজ্ঞানাধার, ঈশ্বরের মনুষ্য-রূপ) না বলে 'অবতারাবতার' বলেছেন। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে বলেছেন ঃ "যে রাম, যে কৃষ্ণ—সেই এ দেহে শ্রীরামকৃষ্ণ"। অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীরামচন্দ্রের ও শ্রীকৃষ্ণের অবতার ছিলেন, অবতারের অবতার ছিলেন। ঈশ্বরের অবতার ছিলেন না। তাঁদের ভাব—'এর বেশি দাম দেব না।'

সে যাই হোক, বর্তমান আলোচনায় আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে মানুষ এবং অবতার হিসাবে আলোচনা করব। বাল্যাবস্থাতেই তাঁকে মানুষ হিসাবে ধরা যায়, কারণ তার পরে অর্থাৎ সাধনাবস্থায় বা সাধনোত্তর (অবতার) অবস্থায় তাঁকে মানুষ হিসাবে বিবেচনা করতে গেলে তাঁর কর্মকাণ্ড সব ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় না। তবে সাধনাবস্থায় তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরার চেষ্টা করব।

বাল্যাবস্থার বৈশিষ্ট্য

কামারপুকুরে প্রথম কয়েক বছর শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু লক্ষ্য করা যায় না। তিনি তখন পল্লীর মুক্ত পরিবেশে দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের একটি আমুদে ছেলে, পাড়ার সকলের স্নেহের দুলাল। এখানে খুব প্রাসঙ্গিক না হলেও একটি কথা জানানো যেতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ দরিদ্র পরিবারের ছেলে ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর পিতা ক্ষুদিরাম কামারপুকুরে আসার আগে দেরেগ্রামে ১৫০ বিঘা জমির মালিক ছিলেন; অর্থাৎ তিনি বেশ অবস্থাপন্নই ছিলেন, কারণ সেকালে ৫ বিঘা জমির আয় থেকে একটি ছোট পরিবারের প্রায় সারা বছরের প্রয়োজন মিটে যেত। সে যাই হোক, ৬ বছর বয়সে গদাধরের কাছে যেন ভাবরাজ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে গেল। একদিন সকালে টোকায় মুড়ি খেতে খেতে গদাধর মাঠে বেড়াচ্ছিলেন। পরিষ্কার আকাশে একখণ্ড কালো মেঘ ভাসছিল। হঠাৎ সেই মেঘের নিচ দিয়ে একদল বক সারিবদ্ধভাবে উড়ে গেল। কালো মেঘের তলায় সাদা বকের সারি যে অদ্ভুত বর্ণবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করল তার সৌন্দর্যে বালক তন্ময় হয়ে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে একজন কবির ভাবসমাধি হতে পারে, কারণ তার পিছনে থাকে কবির শিক্ষা, চিন্তা ও কল্পনাশক্তি; কিন্তু একজন ৬ বছরের বালকের পক্ষে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি লাভ একটি অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত।

এই ধরনের ঘটনা আবার ঘটল তাঁর আটবছর বয়সে। কামারপুকুরের কয়েকজন রমণীর সঙ্গে গদাই এক ক্রোশ দূরে আনুড় গ্রামে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দিরে দেবীদর্শনে চলেছেন। মেঠো রাস্তায় পথচলাকালে তিনি সকলের সঙ্গে বিশালাক্ষীর গান গাইছেন। হঠাৎ দেখা গেল, গদাই দাঁড়িয়ে আছেন, মুখে কথা নেই, শরীর আড়ষ্ট, চোখে

* রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার-এর বিবেকানন্দ হল-এ গত ৩ জুন ২০০০ প্রদত্ত 'নীলিমা গুহ স্মারক বক্তৃতা'র ভিত্তিতে রচিত।

অশ্রুধারা। সর্দিগর্মি হয়েছে ভেবে মুখে জলের ঝাপটা, পাখার বাতাস ইত্যাদি যা করণীয় তা করা হলো, কিন্তু বালক সংজ্ঞাহীন। একজনের পরামর্শে বালকের কানের কাছে 'মা বিশালাক্ষী' নাম কয়েকবার বলায় বালকের সংজ্ঞা ফিরে এল।

একবছর পরে অর্থাৎ নয়বছর বয়সে অনুরূপ আরেকটি ঘটনা ঘটল। চৈত্রের শেষে শিবের গাজন; সন্ধ্যায় গ্রামে শিবের যাত্রা হবে। সকলেই উৎসাহী। কিন্তু সন্ধ্যার কিছু আগে খবর এল যে, যাত্রার দলে যে 'শিব'-এর অভিনয় করবে, সে হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় যাত্রা হবে না। গ্রামবাসীরা মুষড়ে পড়ল। কি করা যায়! গ্রামের মাতব্বররা ঠিক করলেন, চেহারা ও গান গাওয়ার দিক থেকে গদাই-ই 'শিব' সাজার উপযুক্ত। তাঁকে রাজি করাতে পারলে যাত্রা হতে পারে। গয়াবিষ্ণু প্রভৃতি গদাইয়ের বন্ধুবান্ধব তাঁকে রাজি করালেন। তাঁকে জটা পরিয়ে, দেহ বিভূতিমণ্ডিত করে, কোমরে বাঘছাল, হাতে ত্রিশূল দিয়ে 'শিব' সাজানো হলো। 'শিব' চলেছেন অভিনয়স্থলে—ধীর পদক্ষেপে, অন্তর্মুখী নির্নিমেষ দৃষ্টি, ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি। শিবস্তুতি দিয়ে যাত্রা আরম্ভ হলো। কিন্তু দেখা গেল 'শিব' বাহ্যজ্ঞানশূন্য, মুখে কথা নেই, নয়নে অশ্রুধারা। যাত্রা বন্ধ হয়ে গেল এবং গদাইকে কাঁধে করে বাড়ি নিয়ে আসা হলো। পরদিন সূর্যোদয়ের পর জ্ঞান ফিরে এল।

এই তিনটি ঘটনা থেকে বোঝা যায়, বালকের চিন্তার গভীরতা তাঁকে অতীন্দ্রিয় অনুভূতিরাজ্যে নিয়ে যেত। এটি নিশ্চয় বালক শ্রীরামকৃষ্ণের একটি অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য।

গদাধরের পড়াশোনার ব্যাপারে আসা যাক। পিতা ক্ষুদিরাম লক্ষ্য করলেন যে, গদাই অসাধারণ মেধাবী; স্তোত্র, পৌরাণিক গল্প প্রভৃতি একবার শুনলেই মুখস্থ হয়ে যায়। পাঠশালার শিক্ষকও বালকের সকল বিষয়ে মেধা লক্ষ্য করলেন। কিন্তু দেখা গেল যে, বালক কতকগুলি বিষয়ে শিখতে উৎসাহী, আবার কোন কোন বিষয়ে উদাসীন। দিন যত যেতে লাগল, ক্রমশ বোঝা গেল, এই উদাসীনতার পিছনে রয়েছে বালকের বিষয়গুলি সম্বন্ধে অপ্রয়োজনীয়তাবোধ—অপ্রয়োজনীয় এই জন্য যে, জীবনের স্থির লক্ষ্যে অর্থাৎ ভগবানলাভের পথে এগুলি অনাবশ্যক। গণিত এই পর্যায়ে পড়ে। কাজেই বিদ্যালয়ের শিক্ষা বেশিদূর এগোল না। এই অবস্থায় ১৪ বছর বয়সে জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার গদাইকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। উদ্দেশ্য—তাঁর নতুন প্রতিষ্ঠিত টোলে গদাইয়ের শিক্ষার ব্যবস্থা এবং পুরোহিতের কাজে যোগ দিয়ে রামকুমারকে সাহায্য করা। গদাই খুশি মনে পূজার কাজে যোগ দিলেন, কিন্তু টোলে পড়াশুনার ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিলেন—'চালকলাবাঁধা' বিদ্যাশিক্ষায় তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থকরী বিদ্যার প্রতি অনীহা নিশ্চয়ই বৈশিষ্ট্যের পর্যায়ে পড়ে।

'চালকলাবাঁধা' বিদ্যার কথায় একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। গদাধর কামারপুকুর অঞ্চলে পাঁচ বাড়িতে পূজার্চনা করেন এবং পূজার ফল, মিষ্টি প্রভৃতি গামছায় বেঁধে কাঁধে ফেলে বাড়ি আসেন। একদিন ঐরকম আসছেন, পাড়ার ছেলেরা রোয়াকে বসে গল্পগুজব করছে। গদাইকে গামছায় বাঁধা ফলমূল নিয়ে আসতে দেখে তারা "ও ঠাকুরমশাই, একটু গান শুনিয়ে যান।" বলে আহ্বান করায় গদাই "অ্যাঁ, গান শুনবে?" বলে তাদের সঙ্গে বসে পড়লেন। তন্ময় হয়ে তিনি একের পর এক গান গেয়ে চললেন। গান শেষে দেখলেন, ছেলেরা সব উধাও, তার সঙ্গে গামছায় বাঁধা ফলমিষ্টিও উধাও! একটু হেসে, গামছা ঝেড়ে কাঁধে ফেলে তিনি বাড়ি চললেন।[১]

সাধনপ্রণালীতে বৈশিষ্ট্য

(ক) সাধনাস্থল : সাধারণের ধারণা, মুনিঋষিদের সাধনার স্থান হিমালয় বা গভীর অরণ্য। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সকল সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন কলকাতার উপকণ্ঠে কোলাহলপূর্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি ও তৎসংলগ্ন উদ্যানে।

(খ) তাঁর সাধনার মূল অঙ্গ হলো—আন্তরিকতা, দৃঢ় নিষ্ঠা ও ভাবের গভীরতা, বিশেষ কোন সাধনপ্রণালী নয়। "মা, আমায় এখনো দেখা দিলি না।" বলে তিনি রাস্তায় মুখ ঘষেছেন; গান গাইতে গাইতে ভাবতন্ময় হয়ে রানী রাসমণির গায়ে চড় মেরেছেন; তিনদিনের চেষ্টায় নির্বিকল্প সমাধিলাভ করেছেন, যা করতে তাঁর গুরু তোতাপুরীর দীর্ঘ ৪০ বছর লেগেছিল—এসবই নির্দেশ করে তাঁর গভীর আন্তরিকতাকে।

(গ) বিভিন্ন মতে সাধনা : শ্রীরামকৃষ্ণ তান্ত্রিক, বৈষ্ণব ও বৈদিক মতে সাধনা ছাড়াও খ্রীস্টীয় ও ইসলাম মতে সাধনা করে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, সব ধর্মমতের সাধনাতে একই ভগবানকে লাভ করা যায়।

(ঘ) ত্যাগের সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ 'টাকা মাটি, মাটি টাকা" বলে টাকা ও মাটিকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করেছিলেন। সঞ্চয়ের জন্য সংগ্রহ করা ও ঘরে চাবি না লাগানোও তাঁর এই সাধনার অঙ্গবিশেষ।

(ঙ) মন থেকে কাম নির্মূল করার জন্য তিনি স্ত্রীবেশ

১ শ্রীম-দর্শন, ৩য় ভাগ, ১ম সং পৃঃ ৭২

ধারণ করে মথুরবাবুর পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে কিছুকাল একত্র বাস করেছিলেন।

এইসব দেখে তপস্যা বা সাধনা সম্বন্ধে আমাদের সব পুরনো ধারণা যেন ওলটপালট হয়ে যায়।

অবতার হিসাবে বৈশিষ্ট্য

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে অন্য অবতারদের তুলনা করতে গিয়ে প্রথমে যে অসুবিধায় পড়তে হয়, তা হলো অ-সম তথ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রামাণিক তথ্য প্রচুর। তাঁর বাণীর অনেকাংশই তাঁর জীবদ্দশায় লিখিত হয়েছে; তাঁর সম্বন্ধে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় বা সংবাদপত্রে লেখা হয়েছে; স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদের লেখা বহু তথ্যও বর্তমান, এমনকি তাঁর আলোকচিত্রও রয়েছে। অন্য সব অবতারদের ছবি হাতে আঁকা। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীস্ট প্রমুখ অবতারদের ক্ষেত্রে আমাদের নির্ভর করতে হয় পৌরাণিক উপাখ্যান বা তাঁদের উপদেশাবলীর ওপর—যেগুলি লিখিত হয়েছিল তাঁদের দেহত্যাগের অনেক পরে (বুদ্ধদেবের ক্ষেত্রে প্রায় ৩০০ বছর এবং যীশুখ্রীস্টের ক্ষেত্রে প্রায় ৬৫ বছর পরে)। লিখিত হওয়ার আগে মুখে মুখে চলা-কালীন সেগুলির মধ্যে অনেক কাল্পনিক তথ্য ঢুকে পড়া সম্ভব। এরূপ অবস্থা (অসম তথ্য) মেনে নিয়ে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীর বৈশিষ্ট্যগুলি একে একে আলোচনা করব।[২]

১) কোন ধর্মকে নিন্দা করা উচিত নয়, সব ধর্মই সত্য, কারণ সব ধর্মের মাধ্যমেই ঈশ্বরলাভ সম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ "বৎসরের পর বৎসর আমি এই এই ব্যক্তির সহিত বাস করিয়াছি, কিন্তু কখনো শুনি নাই তাঁহার জিহ্বা কোন সম্প্রদায়ের নিন্দাসূচক বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে। আমার বেশ মনে আছে, কোন একদিন এক ভারতীয় কোন সম্প্রদায়ের নিন্দা করিতেছেন। তিনি কেবল স্থিরভাবে বলিলেন, 'কেউ সদর দরজা দিয়া বাড়িতে ঢোকে, কেউবা পায়খানার দরজা দিয়া ঢুকতে পারে। এদের মধ্যেও ভাল লোক থাকতে পারে। আমাদের কাউকে নিন্দা করা উচিত নয়।' "[৩]

২) "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"। দুঃখী, দরিদ্র, আর্ত জনগণকে সেবা করার কথা সব ধর্মেই আছে। খ্রীস্টানদের দানধর্ম ও বৌদ্ধদের সেবাধর্মের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রবর্তিত পূজা-জ্ঞানে জনসেবার বস্তুগত সাদৃশ্য থাকলেও মূলগত পার্থক্য অনেক। বৌদ্ধধর্ম তো কোনরূপ ঈশ্বর-আরাধনায় বিশ্বাস করে না; খ্রীস্টধর্মে প্রতিবেশীকে আত্মবৎ ভালবাসতে বলা হলেও ঐ ধর্ম জীবাত্মা ও পরব্রহ্মের অভেদত্বে বিশ্বাসী নয়। উভয় ধর্মেই মানবসেবারূপ কার্যকে কেবল নৈতিক মূল্যই দেওয়া হয়েছে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান সম্পূর্ণ নতুন—মানুষের মধ্যে দেবত্বের উপলব্ধি। অর্থাৎ মানবরূপ বিগ্রহ অবলম্বনে তাকে সেবার মাধ্যমে যে-কেউ ঈশ্বরলাভ করতে পারে।

৩) নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মসান্নিধ্য। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ। স্বামীজীর জন্মোৎসব হচ্ছে বেলুড় মঠে। বহু লোকসমাগম হয়েছে, মিস ম্যাকলাউডও রয়েছেন। হঠাৎ তিনি শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য কি?" শ্রীম বললেন ঃ "নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মসান্নিধ্য। তিনি এক মুহূর্তের জন্যও ব্রহ্মচৈতন্য হতে বিচ্যুত হননি।" স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁকেও ম্যাকলাউড জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের কোন্ দিকটা আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়?" উত্তর এল—"একজন ব্রহ্মমদমত্ত মানবরূপে।" একই ধরনের প্রশ্নের উত্তরে স্বামী সারদানন্দ বললেন ঃ "ব্রহ্ম-সচেতনতা।"[৪] অর্থাৎ ভাষায় তফাৎ হলেও তিনজন একই উত্তর দিয়েছিলেন। অন্যত্র শ্রীম বলেছেন, দক্ষিণেশ্বরে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা আলাদাভাবে লক্ষ্য রেখেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ব্রহ্মসচেতনতা থেকে কখনো বিচ্যুতি হন কিনা। কিন্তু তাঁরা তাঁর জাগ্রত অবস্থায় এমনটি একবারও দেখেননি। এমনকি, নিদ্রাকালেও তিনি মাঝে মাঝে 'মা' 'মা' বলে ডেকে উঠতেন।

৪) কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ। ছোট-বড় সকল নারীই তাঁর কাছে ছিল জননী। স্ত্রীর সঙ্গে এক ঘরে ও এক শয্যায় শয়ন করেও দেহসম্বন্ধ না রাখা জগতের ধর্মাচার্যের ইতিহাসে অদ্বিতীয়। তাঁর কাছে স্ত্রী সারদাদেবী ও মন্দিরের মা ভবতারিণী ছিল এক। স্ত্রীকে ষোড়শীরূপে পূজা করে তিনি তাঁর পায়ে সমস্ত সাধনফল অর্পণ করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ টাকা ও ধাতুনির্মিত কোন জিনিস ছুঁতে পারতেন না; ছুঁলে তাঁর হাত বেঁকে যেত। চিকিৎসাশাস্ত্র মতে

---

২ পাঠকদের জানানোর জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের দুটি শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করছি। বর্তমান প্রবন্ধানুযায়ী তুলনামূলকভাবে নয়, কারণ অন্য অবতারদের বিশ্বাসযোগ্য তথ্যভিত্তিক শারীরিক বর্ণনা পাওয়া যায় না। স্বামী ব্রহ্মানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রথম নির্মিত মর্মরমূর্তি দেখে মন্তব্য করেছিলেন—(১) ঠাকুরের আজানুলম্বিত বাহু থাকার জন্য আসন-পিঁড়ি হয়ে বসলেও তাঁর শিরদাঁড়া কুঁজো হতো না। (২) সবার কান ভ্রূ-রেখার সমান সমান আরম্ভ হয়, কিন্তু ঠাকুরের কান চোখের কোণের রেখার নিচ থেকে আরম্ভ; অর্থাৎ তাঁর কান সাধারণ লোকের থেকে নিচে ছিল। (দ্রঃ দেবলোকের কথা—স্বামী নির্বাণানন্দ, ১ম সং, পৃঃ ১৬)

৩ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৮ম খণ্ড, ৩য় সং, পৃঃ ৩৮১

৪ শ্রীম-দর্শন, ৩য় ভাগ, পৃঃ ২২৬-২৩৪

এর অর্থ করা মুশকিল। স্বামী নির্বেদানন্দ এসম্বন্ধে বলেছেন ঃ "তাঁর ইচ্ছাশক্তি এত দুর্দমনীয় ছিল যে, মন থেকে এভাবে একবার যা ত্যাগ করতেন, তাঁর স্নায়ু ও মাংসপেশী পর্যন্ত সে-জিনিস আর সহ্য করতে পারত না কখনো—অতি তিক্ত, অতি বেদনাদায়ক বলে বোধ হতো তার সংস্পর্শ। এইজন্যই পরবর্তী জীবনে স্ত্রীলোকদিগের সামান্য স্পর্শ তাঁর স্নায়ুমণ্ডলী বিপর্যস্ত করে তুলত এবং টাকা ছুঁলেই হাত যন্ত্রণায় বেঁকে যেত। উচ্চ আধ্যাত্মিকতায় মনের সুরের সঙ্গে তাঁর দেহের সুরও একই পর্যায়ে বাঁধা ছিল; তাঁর ত্যাগের কঠোর সঙ্কল্পের বিপরীত পথে তাঁর শরীর যখনি পা বাড়াত, তখনই শাস্তি পেতে হতো তাকে।"[৫]

৫) ঘন ঘন সমাধি ও সমাধি থেকে ফিরে স্বাভাবিক অবস্থায় আসা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জগৎ থেকে অতীন্দ্রিয় জগতে যাওয়া ও বাহ্যজগতে ফিরে আসা। এ যেন শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত সেই রাজার ছেলের খুশিমতো রাজপ্রাসাদের সাততলায় ওঠা ও নেমে আসা। সমাধি অবস্থায় তাঁকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা বিস্ময়ে চেয়ে থাকতেন, কারণ অনেকে (যেমন বঙ্কিমচন্দ্র) এই অবস্থা আগে কখনো দেখেননি। একবার সমাধি থেকে নেমে শ্রীরামকৃষ্ণ অবাক হয়ে চেয়ে থাকা ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে বলেছিলেন ঃ "কি ডাক্তার, তোমার সায়েন্সে একথা লেখা নাই, তাই না?"

৬) অবতার, আবার অতি সাধারণ মানুষ। এই সমাধিবান পুরুষকে যখন দেখি থিয়েটার-সার্কাসে যাচ্ছেন, বালক ভক্তদের অঙ্গভঙ্গি সহকারে দেখাচ্ছেন—কীর্তনীয়া হাতে রঙিন রুমাল নিয়ে কিভাবে নথ তুলে থুতু ফেলছে, আর ছেলেরা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে, যখন তিনি ছোট মেয়েকে গান শোনাচ্ছেন—"আয় লো তোর খোঁপা বেঁধে দি, তোর ভাতার এলে বলবে কি" কিংবা শিষ্যদের জিনিস কেনার সময় যখন ফাউ নিতে বলছেন, তখন না ভেবে পারা যায় না—"ইনিই কি কিছুক্ষণ আগে সমাধিমগ্ন ছিলেন?"

৭) অসীম জ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণের কথার মধ্যে নিহিত যুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিভাবান ছাত্র শ্রীমকে প্রথম সাক্ষাতেই আকৃষ্ট করেছিল, তৎকালীন যুবসমাজের অদ্বিতীয় আকর্ষণ কেশবচন্দ্র সেনের মন হরণ করেছিল, জ্ঞানসূর্য বিবেকানন্দ তাঁর যুক্তি-বিচারের কাছে শুধু বারে-বারে মাথা নতই করেননি, পরবর্তী কালে বলেছিলেন ঃ "যদি জীবনে একটি তত্ত্বকথা বলে থাকি তবে তাহা তাঁহারই।" শ্রীরামকৃষ্ণের জ্ঞানের দ্যুতি বিদ্যাসাগরকে স্তম্ভিত করেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রকে হতবাক্ করেছিল, ব্রজেন্দ্রলাল শীলকে উদ্ভ্রান্ত করেছিল। ব্রহ্ম, শক্তি, ঈশ্বর, জীব, আত্মা, বেদ, তন্ত্র, জ্ঞান, বিজ্ঞান, মুক্তি, বিবেক, সংসার, সাধনপথ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব—সব বিষয়ে পণ্ডিতরা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে স্তম্ভিত হয়ে যেতেন। এত জ্ঞানের তিনি অধিকারী হলেন কিভাবে? স্বামী নির্বেদানন্দ এই সম্বন্ধে বলেছেন ঃ "তাঁর অতীন্দ্রিয় অনুভূতিগুলি ইন্দ্রিয়ের অগম্য প্রদেশ থেকে (সমাধি অবস্থায়) তথ্য আহরণ করে এনে তা বুদ্ধির কাছে ন্যস্ত করে দিত। বুদ্ধি সেগুলি ভালভাবে যাচাই করে নিয়ে তার ভিতর থেকে সর্ববিধ প্রকাশের পশ্চাতে অবস্থিত মূলগত একত্বকে আবিষ্কার করে নিত, যে-একত্বে মিলিত হওয়ার জন্য সমস্ত বিজ্ঞান, সমস্ত দর্শন নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। মনে হয় এই একত্ব দর্শনের পর জ্ঞানলাভের আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না।"[৬]

৮) হাস্যরস। 'কথামৃত'-এর পাতায় পাতায় যে হাস্যরসের ফুলঝুরি দেখা যায়, অন্য কোন অবতারের ক্ষেত্রে তা পাওয়া যায় না। হাস্যরসের মাধ্যমে গভীর তত্ত্বকথার পরিবেশন—শ্রীরামকৃষ্ণের এক নতুন অবদান।

৯) সময় সময় হঠাৎ অদ্বৈতভাবের উদ্দীপন। এই অবস্থা তাঁকে তুরীয়ভাবে লীন করে দিত। অন্যকে যন্ত্রণায় কাতর দেখলে তাঁর সংবেদনশীল শরীরে তার স্পন্দন উঠত। কালীবাড়ির উদ্যানে নবীন দূর্বাদলের ওপর দিয়ে একজনকে হেঁটে যেতে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের বুকে সেই যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন। এই যন্ত্রণা তিনি পেয়েছিলেন ৬ ঘণ্টা ধরে। চাঁদনীতে দাঁড়িয়ে থাকাকালীন নৌকায় একজন মাঝি অন্যজনের পিঠে চড় মারলে শ্রীরামকৃষ্ণ এমন চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলেন, যেন তাঁরই পিঠে কেউ চড় মেরেছে! সত্যসত্যই দেখা গেল, তাঁর পিঠে পাঁচ আঙুলের দাগ পড়েছে।

১০) যীশুখ্রীস্ট বা বুদ্ধদেব যেমন নতুন ধর্ম প্রচার করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তেমন কোন নতুন ধর্ম প্রচার করেননি। স্বামীজী বলেছিলেন ঃ শ্রীশ্রীঠাকুর এবং আমি জগতে যদি কোন নতুন তথ্য সম্প্রচার করে থাকি, তা হলো —সত্য একই, আমরা তাকে বিভিন্ন দিক থেকে দেখি।

শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্যের ইতি করা যায় না। এবিষয়ে শ্রীম মন্তব্য করেছেন ঃ "ঠাকুরের কি তুলনা আছে? তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। স্বামীজীর তুলনা করতে গিয়ে জুড়ি মিলল না তো ঠাকুরের!"[৭] ❑

---

৫ রামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ, ২য় সং, পৃঃ ৫৭

৬ ঐ, পৃঃ ১৫৫

৭ শ্রীম-দর্শন, ১ম ভাগ, ১ম সং, পৃঃ ৮

শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রুত রবীন্দ্রসঙ্গীত*

আলোককুমার চৌধুরী



শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গীতপ্রিয়তা সর্বজনবিদিত। 'কথামৃত'-এর পাতায় পাতায় তাই গান আর গান। শিষ্য ও ভক্তদের অনেক কঠিন প্রশ্নের সহজ বোধগম্য উত্তর তিনি দিয়েছেন গানের মাধ্যমে। নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে গান শুনতে তিনি খুব ভালবাসতেন, তাই নরেন্দ্রনাথ এলে দু-চার কথার পর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে গান গাইতে বলতেন। সবাই জানেন যে, গানের মাধ্যমে এই দুই মহাপুরুষের প্রথম সংযোগ। ১৮৮০ সালের ডিসেম্বর মাসে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর কলকাতার সিমলাতে সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে যান। তাঁকে তখন গান শোনাবার জন্য প্রতিবেশী বিশ্বনাথ দত্তের কলেজে পাঠরত অষ্টাদশবর্ষীয় পুত্র নরেন্দ্রনাথকে নিয়ে আসা হয়েছিল। পরে যেদিন নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বরে প্রথমবার দর্শন করতে যান, সেদিন তিনি দুটি ব্রহ্মসঙ্গীত গেয়ে শুনিয়েছিলেন—অযোধ্যানাথ পাকড়াশির লেখা 'মন চল নিজ নিকেতনে' ও বেচারাম চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'যাবে কি হে দিন বিফলে চলিয়ে'। এই যোগাযোগ উনবিংশ শতকের বঙ্গীয় রেনেশাঁসের ইতিহাসে অবশ্যই এক বিশিষ্ট মাহেন্দ্রক্ষণ।

শ্রীরামকৃষ্ণকে নরেন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে মোট পঞ্চাশের বেশি গান শুনিয়েছেন। সেসব গানের রচয়িতা অযোধ্যানাথ পাকড়াশি, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রমুখ ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্যস্থানীয় ব্যক্তি এবং অবশ্যই ঠাকুরবাড়ির মনস্বীরা, যেমন—দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ, স্বর্ণকুমারী দেবী এবং অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। এঁদের রচিত গান শ্রীরামকৃষ্ণ একাধিকবার শুনেছেন। 'ঠাকুরবাড়ির গান' নামে পরিচিত গানের মধ্যে সংখ্যাধিক্য, বিষয়বস্তুর ব্যাপ্তি ও স্বকীয় বিশিষ্টতায় রবীন্দ্রনাথ রচিত গান সেযুগে 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের গান' বা 'রবিবাবুর গান' নামে পরিচিত ছিল। সম্ভবত রবীন্দ্রোত্তর যুগে এগুলি 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' আখ্যা পায়। তাই প্রবন্ধের শিরোনামে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অনেকের কণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণ গান শুনে থাকলেও রবীন্দ্রনাথের গান একমাত্র নরেন্দ্রনাথই তাঁকে গেয়ে শুনিয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের এক বিশেষ সময়ে গানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, নরেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ—এই তিন লোকোত্তর ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক মেলবন্ধন হয়েছিল। অনবদ্য গানগুলির রচয়িতা ও সুরকার রবীন্দ্রনাথ, গায়ক নরেন্দ্রনাথ ও শ্রোতা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ।

'রামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতে সমাধি' গ্রন্থে কমলকৃষ্ণ মিত্র 'কথামৃত' থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া বা শোনা কিছু গানের আলোচনা করেছেন, কিন্তু পুনর্মুদ্রণ না হওয়ায় বইটি এখন পাওয়া যায় না। সৌভাগ্যক্রমে ১৯৯১ সালে স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর সম্পাদনায় রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার থেকে 'শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত' নামে অতীব মূল্যবান একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, যাতে মূলত 'কথামৃত' গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করে শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া, শোনা বা কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা সমস্ত গান ও সংশ্লিষ্ট তথ্য সঙ্কলিত হয়েছে। এই গবেষণামূলক গ্রন্থে দেখা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণ রবীন্দ্রনাথ রচিত অন্তত ছয়টি গানের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। এই ছয়টি গানই তাঁকে বিভিন্ন সময়ে গেয়ে শুনিয়েছেন নরেন্দ্রনাথ।

আমরা জানি, 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার ১২৮৭ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রথম সাতটি ব্রহ্মসঙ্গীত তাঁর প্রথম সঙ্কলন 'রবিচ্ছায়া' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয় ১২৯২ বঙ্গাব্দে। গানগুলি হলো—'তুমি কি গো পিতা আমাদের', 'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ', 'আমরা যে শিশু অতি অতি ক্ষুদ্র মন', 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা', 'এ কি এ সুন্দর শোভা কি মুখ হেরি এ', 'দিবানিশি করিয়া যতন হৃদয়েতে রচেছি আসন' এবং 'কোথা আছ প্রভু এসেছি দীনহীন'।

নরেন্দ্রনাথ তখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের গানের দলে অংশ নিতেন। এই গানগুলি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। আবার ঘটনাচক্রে রবীন্দ্রনাথের কাছেই নরেন্দ্রনাথ তাঁর রচিত ব্রহ্মসঙ্গীত শিখেছিলেন। ২৯ জুলাই ১৮৮১ সালে আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাবতীর সঙ্গে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহ হয়। সেই বিয়ের আসরে রবীন্দ্রনাথ রচিত তিনটি গান গাওযা হয়েছিল। গানগুলি হলো—'দুই হৃদয়ের নদী একত্রে মিলিল যদি', 'জগতের পুরোহিত তুমি' এবং 'শুভদিনে এসেছে দোঁহে'। এই গানগুলি ঐ বিবাহ উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই পাঁচজন গায়কের একটি দলকে শিখিয়েছিলেন, যাঁদের অন্যতম ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। যদিও মজার কথা, ত্রিধাবিভক্ত ব্রাহ্ম-সমাজের দলাদলির দরুন ঠাকুর পরিবারের কেউই বিবাহসভায় উপস্থিত ছিলেন না। যাই হোক, এটা স্পষ্ট যে, ব্রহ্মসঙ্গীতের মাধ্যমেই নরেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে পরিচয় গড়ে উঠেছিল।

'কথামৃত' গ্রন্থ অনুযায়ী নরেন্দ্রনাথ মোট ছয়দিন শ্রীরামকৃষ্ণকে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেছেন ঃ

---

* ২২শে শ্রাবণ স্মরণে নিবেদিত।

(১) ৭ এপ্রিল ১৮৮৩ বাগবাজারের বলরাম-মন্দিরে নরেন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন 'গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে'। গুরু নানকের বিখ্যাত ভজনের ('গগনময় থাল রবি চন্দ্র দীপকবনে তারকামণ্ডলা জনকমোতি') প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ এই গানটি 'জয়জয়ন্তী' রাগাশ্রয়ী। এই গানটি 'রবিচ্ছায়া' গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়নি, তাই অনেকে এই গানটিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনা বলে দাবি করেছেন। তবে রবীন্দ্রনাথের 'গীতবিতান'-এর তৃতীয় খণ্ডে 'পূজা ও প্রার্থনা' পর্যায়ের প্রথম গান হিসাবে এটি ছাপা হয়। (পৃঃ ৮২৭) তাই এই গানটি অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের রচনা। কবির জীবদ্দশাতে এই সংশয় দূর হয়েছে।

(২) ১৪ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে রবীন্দ্রনাথের যে-গানটি গেয়ে শোনান তা হলো—'দিবানিশি করিয়া যতন হৃদয়েতে রচেছি আসন'। ('গীতবিতান', পৃঃ ৮২৬)

(৩) ৯ মে ১৮৮৫ নরেন্দ্রনাথ বলরাম-মন্দিরে আবার 'গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে' গেয়ে শোনান।

(৪) ১৪ জুলাই ১৮৮৫ বলরাম-মন্দিরে তিনি গান 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা'। (ঐ, পৃঃ ৩১৮)

(৫) ২৪ অক্টোবর ১৮৮৫ শ্যামপুকুরবাটীতে নরেন্দ্রনাথ মোট ছয়টি গানের মধ্যে দুটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শোনান—'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' ও 'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ'। (ঐ, পৃঃ ৮২৮)

(৬) ২৭ অক্টোবর ১৮৮৫ শ্যামপুকুরবাটীতে নরেন্দ্রনাথ গাইলেন—'এ কি এ সুন্দর শোভা কি মুখ হেরি এ'। (ঐ, পৃঃ ২১৪)

গলদেশে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার পর চিকিৎসার সুবিধার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়। মোট সত্তর দিন (২ অক্টোবর ১৮৮৫ থেকে ১১ ডিসেম্বর ১৮৮৫) তিনি শ্যামপুকুরে একটি দোতলা বাড়িতে বাস করেছিলেন (৫৫নং শ্যামপুকুর স্ট্রীট)। সেইসময় তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব নেন ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এবং ধীরে ধীরে তাঁর ভক্ত হয়ে যান। প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে কাটাতেন। ২৪ ও ২৭ অক্টোবর ১৮৮৫-তে ডাক্তার সরকারের উপস্থিতিতে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শুনিয়েছিলেন। নরেন্দ্রনাথের গান শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। স্বামী প্রভানন্দের 'শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা' গ্রন্থে শ্যামপুকুর ও পরে কাশীপুরের শেষ দিনগুলির তথ্যানুগ বিবরণ আছে।

১১ ডিসেম্বর ১৮৮৫ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির দিন (১৬ আগস্ট ১৮৮৬) অবধি তিনি কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে অবস্থান করেছিলেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' অনুযায়ী সেখানে নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে কোন রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শোনাননি। বস্তুত, নরেন্দ্রনাথ ২২ এপ্রিল ১৮৮৬-তে ঠাকুরকে শেষবারের মতো গান শুনিয়েছিলেন। সেদিন অবশ্য তিনি কোন রবীন্দ্রসঙ্গীত গাননি। অনেকগুলি গানের মধ্যে অবশ্য 'দেশ' রাগে দেবেন্দ্রনাথের স্তোত্র—'পরিপূর্ণমানন্দম্/অঙ্গবিহীনং স্মর জগন্নিধানম্' অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এপর্যন্ত আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রুত পাঁচটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিকা দিয়েছি—'গগনের থালে', 'দিবানিশি করিয়া যতন', 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা', 'মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ' এবং 'এ কি এ সুন্দর শোভা'। এছাড়াও নরেন্দ্রনাথের মাধ্যমে আরেকটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। গানটি হলো—'আমরা যে শিশু অতি, অতি ক্ষুদ্র মন'। শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পরে ৮ মে ১৮৮৭-তে বরানগর মঠে নরেন্দ্রনাথ সারদাপ্রসন্নকে (পরবর্তী কালে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ) এই গানটির দুটি চরণ গেয়ে শোনান। 'কথামৃত'-এ এই প্রসঙ্গে যা লিপিবদ্ধ আছে তার থেকে বোঝা যায়, এই রবীন্দ্রসঙ্গীত ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে শুনেছিলেন। ❑



সদ্য প্রকাশিত

প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণা

সম্পাদনা : প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা

মূল্য : ১৫০ টাকা

৪৫৬ পাতার দুর্লভ গ্রন্থটি ২৮ পাতার সাদা-কালো ও রঙিন আলোকচিত্রে সমৃদ্ধ। গ্রন্থে আছে প্রব্রাজিকা মোক্ষপ্রাণামাতাজীর প্রামাণ্য জীবনী, স্বলিখিত মূল্যবান পত্র এবং সেইসঙ্গে সন্ন্যাসিনী ও ভক্তদের অন্তরঙ্গ স্মৃতিচারণ।

সীমিত সংখ্যায় প্রকাশিত [illegible]



প্রাপ্তিস্থান : শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা—৭০০ ০৭৬ এবং শ্রীসারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের অন্যান্য শাখাকেন্দ্র

* আরও যেখানে পাবেন:

অদ্বৈত আশ্রম; ইনস্টিটিউট অব কালচার; উদ্বোধন ও শো রুম, সারদাপীঠ

অষ্টাদশ শতাব্দীর উর্দু কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি মুহম্মদ তকী

সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়



উর্দু কাব্যের একটি নিজস্ব গৌরবময় ঐতিহ্য আছে, যদিও সে-ঐতিহ্য খুব প্রাচীন নয়। এই কাব্যের অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন মুহম্মদ তকী। তাঁর জন্ম আগ্রায় ১৭২২ অথবা ১৭২৩ খ্রীস্টাব্দে এবং মৃত্যু লখনৌ শহরে ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে।

কবি-রূপে ইনি নামগ্রহণ করেছিলেন 'তকী মীর'। তাঁর এই 'মীর' নামটি হলো 'তখল্লুস্' অর্থাৎ ছদ্মনাম। এটি ফারসী শব্দ। অর্থ হলো—'প্রধান'। কিন্তু সেসময় মীর দর্দ নামে আরেকজন কবি ছিলেন। তাঁর সঙ্গে পৃথক করার জন্য এঁকে বলা হয় 'মীর তকী মীর' এবং এই নামেই ইনি প্রসিদ্ধ। এঁর সময়েই নাদির শাহ দিল্লি লুণ্ঠন করতে আসেন। তখন অবশ্য কবি ছিলেন আগ্রায়। এর ঠিক তের বছর পরে আহমদ শাহ্ আবদালি আবার আসেন দিল্লি লুণ্ঠন করতে। তখন তকী মীর দিল্লিতেই ছিলেন। আবদালির দিল্লি-লুণ্ঠন নাদির শাহকেও ছাড়িয়ে যায়। দিল্লির পথঘাট রক্তে লাল হয়ে ওঠে। কবি কোনরকমে প্রাণ নিয়ে অতি কষ্টে পালিয়ে যান লখনৌয়ে। পরে অবশ্য দু-একবার তিনি দিল্লিতে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর শেষজীবন কাটে লখনৌতেই। আত্মসম্মানে আঘাত তিনি কখনো সহ্য করেননি। অত্যন্ত বলিষ্ঠ চরিত্রের মানুষ ছিলেন এই শায়র। কবির পিতা ছিলেন একজন মানবপ্রেমিক সুফি সাধক। তাই তাঁর চরিত্রে পিতার যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল। এখানে তাঁর কয়েকটি 'শের' অবলম্বন করে কবিমানসের প্রকৃতি ও তার বিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। তার আগে 'শের' সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া ভাল।

প্রায় সব ক্ষেত্রেই উর্দু গজলগুলি এক-একটি পূর্ণাঙ্গ রচনা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু তা নাও হতে পারে। ভাবের অনুষঙ্গে আবদ্ধ কয়েকটি শেরকেও পর পর সাজিয়ে একটি গজল করা যেতে পারে। প্রয়াত লেখক আবু সয়ীদ আইয়ুব তাই স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন ঃ "মনে রাখা ভাল যে, প্রায় কোন গজলই পরিচিত অর্থে, এমনকি আধুনিক কবিতার নজিরেও একটি কবিতা নয়—পাঁচ-সাতটি বা পনের-কুড়িটি শের-এর সমষ্টি, কেবলমাত্র ছন্দ ও মিলের ঐক্যে একত্রিত।... প্রকৃত প্রস্তাবে দুই পঙ্ক্তি-সম্বলিত শেরই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা।"[১] বক্তব্যের দিক দিয়ে ভাব-সম্পর্ক আছে—এমন দুটি চরণকে পৃথক করে একটি শের-রূপে, অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ একটি কবিতা-রূপেও গ্রহণ করা যায়। একটি উদাহরণ—কবি শাহীর লুধিয়ানবীর একটি বিখ্যাত গজলের দুটি চরণ—

"ডুব্‌তে দিল্ নে কিনারোঁ কী তমন্না কী থী।
ম্যাঁ নে চাঁদ ঔর সিতারোঁ কী তমন্না কী থী।।"

—আমার ডুবন্ত হৃদয় তীরকে কামনা করেছিল।
চাঁদ আর তারাদের পাওয়ার বাসনা ছিল আমার হৃদয়ে।

সমগ্র গজলটির সঙ্গে এই চরণ-দুটির অর্থ-সম্পর্ক থাকলেও একটি পৃথক শের-রূপেও চরণ-দুটিকে গ্রহণ করা যায়। ইংরেজীতে এই ধরনের কবিতাকে বলে 'couplet'। বাঙলাতেও এরকম কবিতা লেখা হয়েছে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই লিখেছেন। তাঁর 'স্ফুলিঙ্গ' কাব্যগ্রন্থের পাতা ওলটালেই এই ধরনের কবিতা চোখে পড়বে। দুটি উদাহরণ—

(১) "আপনি ফুল লুকায়ে বনছায়ে
গন্ধ তার ঢালে দখিন বায়ে।"

(২) "যে-বন্ধুরে আজো দেখি নাই
তাহারই বিরহে ব্যথা পাই।"

মাত্র দুটি চরণকে অবলম্বন করে এই ধরনের পূর্ণাঙ্গ কবিতায় কবির ভাব-অনুভূতির সূক্ষ্ম ও সংহত রূপ প্রকাশ পায়। দুটি চরণের মধ্যেই থাকে না-বলা অনেক কথা। দুটি চরণ পাঠককে এমনভাবে আকর্ষণ করে, যা দশটি চরণের দ্বারাও সম্ভব হতো না। তাই 'শের' বা দু-চরণের কবিতায় কবির সৃষ্টিশক্তির যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তা তাঁর অন্য রচনায় পাওয়া যায় না। অবশ্য শায়র হলেই যে উচ্চাঙ্গের শের রচনা করতে পারবেন বা কোন শায়রের সব শেরই যে উচ্চাঙ্গের কবিকৃতি—একথা বলা যায় না।

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই উর্দু শেরগুলির বিষয় মানবিক প্রেম ও বিরহ। কারো কারো লেখায় মাঝেমধ্যে সমাজচেতনা বা যুগধর্মও প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু মীরের মানবপ্রেমই রূপান্তরিত হয়েছে ঈশ্বরপ্রেমে।

মানবিক প্রেম ও বিরহজনিত বেদনা মীরকে খুবই উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল, কিন্তু তাঁর ওপর তাঁর সুফি-মনোভাবাপন্ন পিতার প্রভাব ছিল সক্রিয় এবং এই প্রভাবই সবরকম মানসিক সঙ্কট থেকে তাঁকে রক্ষা করেছে। নাহলে প্রেমের অনুভূতির ক্ষেত্রে তাঁর যে মহান উত্তরণ সম্ভব হয়েছিল, তা হয়তো হতো না। মানবিক প্রেম তাঁর কাছে ক্রমশ এমন এক আলোর রূপ নিয়েছে, যার মধ্য দিয়ে জগতের যাকিছু ভাল সব উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তাই তিনি লিখেছেন—

"মুহব্বৎ নে জুল্‌ফৎ সে কাঢ়া হ্যায় নুর।
মুহব্বৎ নহ্ হোতী নহ্ হোতা জুহুর।"

—প্রেম হলো অন্ধকার-নিবারক আলো,
প্রেমের অভাবে তাই প্রকাশ পেত না কিছু ভাল।

প্রেমের এই জ্যোতিস্বরূপ যখন কবির অন্তরকে

১ গালিবের গজল, ১ম সং, ভূমিকা, পৃঃ ৯-১০

আলোকিত করল, তখন জাগতিক প্রেম তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল। তখন তিনি বুঝতে পারলেন, প্রেমময় আল্লার কাছ থেকে তিনি কত দূরে ছিলেন। তাই মুক্তকণ্ঠে বললেন—

"পহুঁচা হো আপ্‌কো তো ম্যাঁ পহুঁচা খুদা কে তঈং
মালুম্ তব্ হুয়া কেহ্ বহুৎ ম্যাঁ ভী দূর থা।"

—খুদার কাছে পৌঁছে গেলাম ঢুকে নিজের অন্তর-পুরে,
বুঝতে পারি তখন আমি নিজেও ছিলাম কতই দূরে।

প্রেমের এই অনুভূতিতে পৌঁছেই কবির মনে জাগল সেই পরম উপলব্ধি যা সকল ধর্মের শাশ্বত সত্য—

"রাহ্ সবকো হ্যায় খুদাসে জান আগর পৌঁচা হ্যায় তো
হোঁ তরীকে মখ্‌তলিফ্ কিতনে হী মন্‌জ়িল এক হ্যায়।"*

—যদি কোথাও পৌঁছে থাক জেনো তবে গেছ খুদার কাছে
রাস্তা হোক না নানারকম, গন্তব্য একটাই আছে।

"যত মত তত পথ", কিন্তু সব পথই এক জায়গায় মিলিত হয়েছে—'তাঁর' চরণপ্রান্তে। কারণ সবার যাওয়ার জায়গা একটাই—'মনজ়িল এক হ্যায়'।

কোনরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে তকী মীর যেসময় লখনৌয়ে পালিয়ে আসেন, তখন তাঁর অবস্থা পথের ভিখারীর মতো। লখনৌয়ের একজন আমীর তাঁকে চিনতেন। একদিন ঐ অবস্থায় মীরকে রাস্তায় দেখে তিনি তাঁকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে আমীর একটা ভাল আসনে বসলেন, কিন্তু মীরকে বসার জন্য কোন আসন দিলেন না। মীর ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমীর তাঁকে একটা শের রচনা করে শোনাতে বললেন। আত্মসম্মানে সাঙ্ঘাতিক আঘাত পেয়ে ক্ষুব্ধ মীর কোন শের নয় এই কয়টি পঙ্‌ক্তি রচনা করে শোনালেন—

"কল্ পাঁও এক কাসহ্-এ সর পর জো আ গয়া
নগহ্ উহ্ উস্তখ্‌বান্ শিকস্তোঁ সে চুর থা।
কহ্‌নে লগা কেহ্ দেখ্‌কে চল্ রাহ্ বেখবর
ম্যাঁ ভী কভু কিসূকা সর-এ পুর্-গরূর থা।"

উর্দুতে চার লাইনের কবিতাকে বলে 'রুবাই'। এই তাৎক্ষণিক রচনাটিকে রুবাইও বলা যেতে পারে। আবু সয়ীদ আইয়ুব এই রচনাটির যে অনুবাদ করেছেন এখানে সেটি উদ্ধৃত করা হলো—

"কাল পথে হাঁটতে হাঁটতে পা পড়ে গেল
একটি মাথার খুলির ওপর,
দেখলাম খুলিটি টুকরো-টাকরা হয়ে গেছে,
বলে উঠল, ও হে বেপরোয়া পথিক
একটু দেখে পা ফেল,
আমিও একদিন কারো দর্পোদ্ধত মস্তক ছিলাম।"

কবির এই রচনাটির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গসৃষ্টির ক্ষমতা, যা তাঁর রচনায় দুর্লভ। আমীরকে এই পঙ্‌ক্তিকয়টি শুনিয়েই কবি আত্মসম্মানের সঙ্গে মাথা উঁচু করে আবার বেরিয়ে গেলেন পথে—আর একটি কথাও বললেন না বা শুনলেন না। তাই দেখা যায়, তকী মীরের আত্মসম্মান ও স্বভাবের বলিষ্ঠতাকে কেউ কোনদিন ছোট করতে পারেনি। অবশ্য পরে তাঁকে সসম্মানে আশ্রয় দিয়েছিলেন লখনৌয়ের নবাব আসিফউদ্দৌলহ। ❑

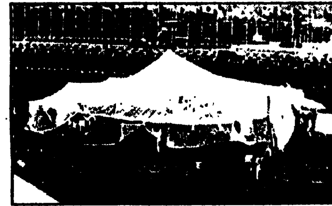
* সব ভাষার মতো উর্দুভাষারও কয়েকটি নিজস্ব ধ্বনি আছে, যেগুলির উচ্চারণ কানে শুনে অভ্যাস করতে হয়, কোন চিহ্ন দিয়ে সেগুলির উচ্চারণ বোঝানো যায় না। শুধু 'জ'-এর নিচে যেখানে বিন্দু (·) ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে সেটি ইংরেজী 'Z'-এর মতো উচ্চারিত হবে। অন্যত্র স্বাভাবিক 'জ'।—**লেখক**

বিজ্ঞান-সংবাদ

ম্যালেরিয়া দমনে দারিদ্র্য নিবারণ

বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার মতে, যেসব দেশে ম্যালেরিয়া প্রবল, সেসব জায়গায় ম্যালেরিয়া দমন করলে দারিদ্র্যসীমা কমে যাবে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও লন্ডন স্কুল অফ ট্রপিক্যাল হাইজিনের গবেষকগণ বিশ্লেষণ করে দেখাচ্ছেন যে, ভারতীয় উপমহাদেশ, শ্রীলঙ্কা এবং আফ্রিকার সাহারার নিচের দেশগুলিতে জাতীয় আয়ের ১.৩ শতাংশ ম্যালেরিয়ার ফলে নষ্ট হয়। আগের হিসাবের চেয়ে এই সংখ্যা আরো বেশি, কারণ সেই হিসাবে ম্যালেরিয়া অসুখে পর্যটন ব্যবসা ইত্যাদিতে যে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতি হয় তা ধরা হয়নি। বারবার ম্যালেরিয়ার আক্রমণে শিশুদের যে অপুষ্টি ও মৃত্যু হয় এবং বয়স্কদের যে কার্যসময় কমে, তাও ধরা হয়নি।

বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা এক রিপোর্টে সকল দেশ এবং ফাউন্ডেশনকে বছরে এক বিলিয়ন ডলার দিয়ে ম্যালেরিয়া রিসার্চের জন্য একটি তহবিল নির্মাণের আবেদন জানিয়েছে এবং সমস্ত ঔষধ প্রস্তুতকারক সংস্থাকে ম্যালেরিয়ার টিকা তৈরির জন্য 'ম্যালেরিয়া ভ্যাকসিন পারচেজ ফান্ড' তৈরি করতে বলেছে। ম্যালেরিয়ার টিকা তৈরির ব্যাপারে বর্তমানে কোন চেষ্টাই হচ্ছে না, কারণ এতে যা খরচ পড়বে সেই দাম দিয়ে ম্যালেরিয়া যে-দেশগুলিতে হয়, তারা টিকা কিনতে পারবে না। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন ও বিশ্ব ব্যাঙ্ক যে 'ভ্যাকসিন ফান্ড'কে সমর্থন করেছেন, তা তৈরি হলে টাকার অভাব হবে না। [**দ্রঃ British Medical Journal, 29 April 2000, p. 1161**] ❑



পৃথিবীর সর্ববৃহৎ মশারি যা নাইজেরিয়ার আবুজা শহরে ম্যালেরিয়ার ওপর এক আন্তর্জাতিক অধিবেশনের জন্য খাটানো হয়েছিল

শিল্পী মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ

সাক্ষাৎকার ঃ

দেবরূপ গঙ্গোপাধ্যায়


শিল্পী মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় উপমহাদেশে চিত্রকলা চর্চার ইতিহাস অতি প্রাচীন। লোকশিল্প চর্চার পাশাপাশি একইভাবে রাজ-অনুগ্রহপ্রাপ্ত শিল্পধারাও সমানে চলে আসছে। তার স্রোত কখনো কখনো স্তিমিত হয়ে পড়েছে, আবার কখনো কখনো দ্রুতলয়ে চলেছে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় উন্নত মানের ভাস্কর্যের নিদর্শন থাকলেও মহারাষ্ট্রের অজন্তা-ইলোরাতে প্রাচীনযুগীয় চিত্রকলা চর্চার সাফল্যের পূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাই। এই সময়ের বেশ কিছু পরে আবার উন্নত মানের নিদর্শন পাই রাজপুত, মোঘল চিত্রকলাতে। তার আগে ও পরে ছোট ছোট ঢেউয়ের আকারে আঞ্চলিক শিল্পচর্চা হয়েছে, তবে খুব উল্লেখযোগ্য নয়। ভারতবর্ষের পরাধীনতার দুশ বছরে ব্রিটিশ আর্ট স্কুলের 'Realistic' ঘরানার পাশাপাশি শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নব্যবঙ্গীয় ঘরানার পরীক্ষা-নিরীক্ষা সমৃদ্ধ চিত্রকলা ভারতের নিজ ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে ও রসিকজনকে আত্মবিশ্বাসী হতে আগ্রহান্বিত করে তুলেছিল। তবে এইসময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসুর আধুনিক মনন ভারতীয় শিল্পচর্চাকে সাবলম্বী করেছিল। এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে আমরা মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে বুঝতে চেষ্টা করব। শিল্পী মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামটি বাংলার চিত্র-রসিকদের কাছে সবিশেষ পরিচিত। সমসাময়িক কালের একজন গুণী শিল্পী তিনি। লোকচক্ষুর আড়ালে তাঁর বিশাল শিল্পসাধনার কিছুটা পরিচয় ও কর্মধারা 'উদ্বোধন'-এর পৃষ্ঠায় দেশ ও বিদেশের অগণিত সুধী পাঠক ও পাঠিকাদের কাছে তুলে ধরার জন্যই এই লেখার অবতারণা।

কিছুকাল আগে শিল্পীর সঙ্গে একান্ত আলোচনার প্রত্যাশিত মুহূর্তটি এসেছিল। তিনি উত্তর কলকাতার সিঁথি অঞ্চলের বাসিন্দা। তাঁর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে ড্রয়িংরুমে সংবাদপত্র পাঠরত অবস্থায় দেখলাম। দেখলাম, বাড়িতে চুন-বালির কাজ হচ্ছে, মিস্ত্রী খাটছে। তারই মধ্যে গৌরবর্ণের মাঝারি আকৃতির মানুষটির সঙ্গে চিত্রকলা সম্পর্কিত কথাবার্তা চলল কিছুক্ষণ, যা আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনে যেতে লাগলাম।

কথায় কথায় জানতে পারলাম—মানিকবাবুর জন্ম ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে অধুনা বাংলাদেশের কুমারভোগ গ্রামের সোমপাড়ায়। বাবা জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মা অমিয়বালা দেবী। দুই ভাইয়ের মধ্যে উনিই জ্যেষ্ঠ। তাঁর স্ত্রী কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তিন পুত্র ও এক কন্যা বর্তমান।

মানিকবাবু খুব ছোটবেলায় একদিন পথে হাঁটতে হাঁটতে দেখতে পেয়েছিলেন, পথের পাশে একজন লোক ফস্টার সাহেবের বই থেকে ড্রইং অনুশীলন করছে। ব্যাপারটা তিনি দুচোখ ভরে দেখলেন—যা মনে স্থায়ী দাগ কেটে গেল। পরবর্তী সময়ে সেইটাই হলো তাঁর অনুপ্রেরণা। এর কিছুদিন পরে তিনি কলকাতার ধর্মতলা অঞ্চলের গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ভর্তি হলেন। আর্ট কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পরবর্তী সময়ে অধ্যক্ষের পদে বসেন রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও তারপরে মুকুল দে। এই সময় হাসিঠাট্টার মজলিসে প্রখ্যাত শিল্পশিক্ষক বসন্ত গাঙ্গুলী ও শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাবার্তার সঙ্গে পরিচিত হন তিনি। কলেজের পঠনপাঠন শেষ করে মানিকবাবু কর্মজীবনের প্রথম সাত-আট বছর 'ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজ'-এ অতিবাহিত


মানিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অঙ্কিত চিত্র 'মধ্যপ্রদেশের যাযাবর'

করার অব্যবহিত পরে শিল্পশিক্ষকের পদ নিয়ে গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে যোগদান করেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে যাঁরা ছাত্র হিসাবে মানিকবাবুর কাছে আসেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী কালে ভারতবিখ্যাত শিল্পী হয়েছেন। এঁদের মধ্যে প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এবং সুনীল দাস, গণেশ পাইন প্রমুখ নামকরা শিল্পীরাও আছেন।

কথার জাল বুনতে বুনতে ঘড়ির কাঁটা অনেকটাই ঘুরে গেছে। সকালের ছায়াগুলো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়েছে। বর্ষাকাল বলে খুব একটা গরমের ভাব নেই। এবার ছবি দেখাবার জন্য মানিকবাবু মাঝারি আকারের অন্য একটি ঘরে আমাকে নিয়ে গেলেন। এটাই ওঁর স্টুডিও। দেখলাম, সামনের সাদা দেওয়ালে চৌকো আকৃতির সিল্কের কাপড়ের ওপর স্বচ্ছভাবে রং করা বেশ কয়েকটি ছবি। তার মধ্যে বৈদান্তিক ভাবধারার ওপর একটা ছবি রয়েছে। ওঁর দুজন ছাত্র-ছাত্রীকেও দেখলাম। মানিকবাবুকে তক্তপোশের নিচে রাখা লোহার বড় ট্রাঙ্ক থেকে ছবি বের করে দেখাতে ওরা সাহায্য করল। চারিদিকে ঘর, বাইরে সুন্দর শান্ত একটা ভাব বিরাজ করছে। জানলায় চড়ুইপাখির কিচিরমিচির যেন আবহসঙ্গীতের কাজ করছে। যাই হোক, বিভিন্ন পর্যায়ে করা বেশ কয়েকটা মাঝারি ২৪×৩০ ইঞ্চির অবাঁধাই ছবি দেখলাম। তাঁর কম্পোজিশনগুলো দেখতে দেখতে মনে হলো চিত্রের আঙ্গিকে, করণকৌশলে ও পটের তলের বিভাজনে অবনীন্দ্র-প্রভাব খুব বেশি মাত্রায় বর্তমান। চিত্রের মধ্যে প্রয়োজন অনুসারে জলধৌত বা 'ওয়াশ টেকনিক'-এর আশ্রয় নিয়েছেন উনি। এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, অবনীন্দ্রনাথ জাপানী ওয়াশ পদ্ধতি ও মোঘল শিল্পধারার সংমিশ্রণে এক নতুন আঙ্গিক নির্মাণ করেছিলেন। মানিকবাবু ছবির রসমাধুর্যের দিকটা চৈনিক চিত্রশিল্প থেকে আত্মস্থ করেছেন।

চৈনিক ও জাপানী জলরঙের ধারা বহু প্রাচীন। আনুমানিক প্রায় হাজার বছর আগে থেকে এই ধারা শিল্পীরা শিষ্যপরম্পরায় বাঁচিয়ে রেখেছেন। সেই জলরং ভারতীয় শৈলীতে 'সিল্ক' মাধ্যমে প্রয়োগ করেছেন মানিকবাবু। তাঁর সব ছবিতে শিল্কের রসসমৃদ্ধ ভাবটা উনি অনুকরণ করেননি, অনুসরণ করেছেন মাত্র। ভারতীয় চিত্রবিদ্যার ব্যাকরণ ও ঐতিহ্য মেনে তিনি সারাজীবন ছবি এঁকে গেছেন। চোখকে পীড়া দেয় এমন রং তিনি সর্বদা পরিহার করেন। তাঁর চিত্র রচনায় নীল, সবুজ, খয়েরী, লাল ও কালচে হলুদের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে মিশ্রিত রঙের প্রয়োগও দেখা যায়।

মানিকবাবু এযাবৎ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় পঞ্চাশটির মতো চিত্রপ্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। ছবিতে ভারতীয় গ্রাম্যজীবনের অনাড়ম্বর ভাব বারেবারে ফুটে উঠেছে। তার সঙ্গে তান্ত্রিক ও বৈদিক দর্শনের ভাবাত্মক দিক তাঁকে সমানভাবে অনুপ্রেরিত করেছে। ১৯৭০ সাল থেকে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সাফল্য-ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে গিয়ে তিনি তাঁর ইপ্সিত রচনাশৈলী ও আঙ্গিক খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর এই ধারা তিনি শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতেও সচেষ্ট। এখানেও তাঁর উদার ভাবটি



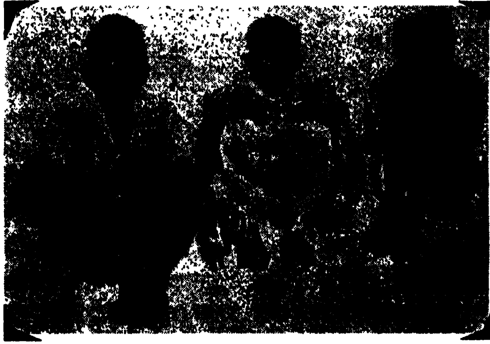
'মাহুত'

কাজ করেছে। ছবি এঁকে তিনি যা সাফল্য পেয়েছেন, তার ফলস্বরূপ বহু বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান ও সরকার থেকে স্বীকৃতি বা পুরস্কার পেয়েছেন। তার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যক্তিজীবনে সরল সাদামাটা প্রচারবিমুখই থেকে গেছেন চিরকাল। ঘরে বসে ছবি আঁকার পাশাপাশি দৃশ্যচিত্রের খোঁজে কাগজ, পেনসিল হাতে তিনি আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছেন এবং ফলস্বরূপ তার সবুজ প্রান্তরের স্নিগ্ধ, শান্ত, সপ্রাণ রূপ তাঁর তুলিতে বারবার ধরা দিয়েছে। যেমন একটি ছবিতে মধ্যপ্রদেশের নর্মদা নদীর দুই তীরের লোকজীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে অপূর্ব স্বাতন্ত্র্যে। এছাড়া ধর্মীয় বিষয়াশ্রিত ছবি 'ভবনদীর চর', 'কালী' প্রভৃতি চিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঋতু বিষয়ক ছবি 'শীতকাল'-এ দেখা যাচ্ছে, এক যুবক খেজুর রস সংগ্রহ করছে। তার কোমরে কতকগুলি মাটির কলসি বাঁধা। চিত্রটিতে রং ও আকারের মধ্যে সুসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা



'শীতকাল'

যায়, যা তাৎক্ষণিক আমাদের সেই জায়গায় নিয়ে যায়। এই চিত্রটি 'ইমপ্রেসনিস্ট' ধারার শিল্পীদের ছবিগুলিকেই মনে পড়ায়।



'বিষাদগ্রস্ত'

বর্তমানে মানিকবাবু দৈনন্দিন কাজের মধ্যে ছবি আঁকার জন্য সময় করে নিতে ভুলে যান না। রোজই দু-এক ঘণ্টা এর চর্চা করেন। কারণ, উনি মনেপ্রাণে শিল্পী, 'লোকদেখানো'র পক্ষপাতী নন। এখনকার আর্ট গ্যালারীতে 'মর্ডান আর্ট'-এর নামে পরীক্ষানির্ভর ছবি উনি পছন্দ করেন না। এই ভাবধারার পিছনে যে-কারণ বর্তমান তা হলো—এ এক ঐতিহ্যবহনকারী বিদ্যা, যা ভারতবর্ষের অজন্তা, ইলোরা ও বাঘগুহায় যে প্রাচীন চিত্রকলা দেখি, তারই পরম্পরা। দেখে মনে হয়, এ যেন কোন একজন



'বসন্ত'

বিশেষ শিল্পীর শিল্পকর্ম নয়, পর্যায়ক্রমে বেশ কয়েক প্রজন্মের শিল্পকর্মের ফসল। কারণ, এর পিছনে 'ঐতিহ্য' বা 'tradition' কাজ করেছে। তাঁর এই ধরনের সুন্দর চিন্তারাশি-সমন্বিত বোধের পরিচয় আমরা তাঁর লিখিত 'আকার-নিরাকার-বিকার' বইতেও যথেষ্ট পাই।

তিনি যেন 'সেই tradition'-এর 'সার্থক সৈনিক'—যিনি তাঁর লক্ষ্যপথ থেকে বিচ্যুত হননি। ❑

শিল্পকলা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ

রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তকে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন : "মানুষ নিজে যে-জিনিসটি তৈরি করে, তাতে কোন একটা idea express (মনোভাব প্রকাশ) করার নামই art (শিল্প)। যাতে idea-র (ঐরূপ ভাবের) expression (প্রকাশ) নেই, রং-বেরঙের চাকচিক্য পরিপাটি থাকলেও তাকে প্রকৃত art (শিল্প) বলা যায় না। ঘটি, বাটি, পেয়ালা প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রগুলিও ঐরূপে বিশেষ কোন ভাব প্রকাশ করে তৈরি হওয়া উচিত। প্যারিস প্রদর্শনীতে পাথরের খোদাই এক অদ্ভুত মূর্তি দেখেছিলাম। মূর্তিটির পরিচায়ক এই কয়টি কথা নিচে লেখা—Art unveiling nature, অর্থাৎ শিল্প কেমন করে প্রকৃতির নিবিড়াবগুণ্ঠন স্বহস্তে মোচন করে ভেতরের রূপসৌন্দর্য দেখে। মূর্তিটি এমনভাবে তৈরি করেছে যেন প্রকৃতিদেবীর রূপচ্ছবি এখনো স্পষ্ট বেরোয়নি; যতটুকু বেরিয়েছে, ততটুকু সৌন্দর্য দেখেই শিল্পী যেন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। যে-ভাস্কর এই ভাবটি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন, তার প্রশংসা না করে থাকা যায় না।" *(স্বামি-শিষ্য-সংবাদ, ৭ম সং, পৃঃ ১৯১-১৯২)*

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

প্রসঙ্গ 'সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ'

'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪০৭ সংখ্যায় জলধিকুমার সরকারের 'সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ ঃ বিজ্ঞানমতে ও বেদান্তদৃষ্টিতে' রচনাটিতে লেখা হয়েছে—"বিজ্ঞানমতে ধরে নেওয়া হয় যে, আজ থেকে ৪-৬ হাজার কোটি বছর আগে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল। হয়তো সূর্যের গলিত অবস্থায় তার খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে এসে, অথবা সৌরজগতে ছড়িয়ে থাকা ধূলিকণা জমাট বেঁধে পৃথিবীর জন্ম হয়েছে। এমনও হতে পারে যে, সমগ্র সৌরজগৎই এইভাবে সৃষ্টি হয়েছে।" (পৃঃ ৩৭) ঐ সংখ্যারই 'কথাপ্রসঙ্গে' লেখা হয়েছে—"সূর্য সেই কবে, কত সহস্র কোটি বছর আগে তাহার পরিক্রমা শুরু করিয়াছিল, কিন্তু আজও তাহার চলার কোন ক্ষান্তি নাই।" (পৃঃ ৬)

গৌরীপ্রসাদ ঘোষের লেখা 'নক্ষত্র-নীহারিকার রোমাঞ্চ-লোকে' গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে, সূর্য তার সাড়ে চারশ কোটি বছর জীবনকালে ছায়াপথ কেন্দ্রকে কুড়িবার প্রদক্ষিণ করে এসেছে মনে হয়। সেকেন্ডে ২৫০ কিলোমিটারের মতো গতিতে ছায়াপথ কেন্দ্রটি প্রদক্ষিণ করতে সৌরমণ্ডলের লাগে আনুমানিক সাড়ে বাইশ কোটি বছর। (দ্রঃ বাউলমন প্রকাশন, ১ম সং, জুন ১৯৯৮, পৃঃ ১৬)

ঐ লেখকেরই লেখা 'মহাবিশ্বে মহাকাশে' গ্রন্থে লেখা হয়েছে যে, বিজ্ঞানীরা মনে করছেন বিশ্বের বয়স ১,৫০০ কোটি থেকে ২,০০০ কোটি বছর। (লেখনী প্রকাশন, ২য় পরিবর্ধিত সং, জুন ১৯৯৪, পৃঃ ৯২) সুতরাং সূর্য এবং পৃথিবীর বয়স অবশ্যই এর থেকে কম হবে।

স্টিফেন হকিঙের 'এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম' গ্রন্থের শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত-কৃত বঙ্গানুবাদ 'কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'-এ লেখা হয়েছে—"অতীতের সুপারনোভার ধ্বংসাবশেষসমূহ ঘূর্ণায়মান বায়বীয় পদার্থের মেঘ থেকে প্রায় পাঁচশ কোটি বছর আগে আমাদের সূর্য গঠিত হয়েছে। (দ্রঃ বাউলমন প্রকাশন, জানুয়ারি ১৯৯৩, পৃঃ ১৩১) ঐ গ্রন্থেরই ১২১ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে—মহাবিশ্বের বয়স মাত্র দশ থেকে কুড়ি হাজার মিলিয়ন বছর অর্থাৎ একহাজার থেকে দুহাজার কোটি বছর এবং ১৩১ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে—আমাদের সূর্য দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় প্রজন্মের তারকা। সুতরাং সূর্যের বয়স মহাবিশ্বের বয়স থেকে বেশ কম হবে।

এর ফলে আমার মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। 'উদ্বোধন'-এ যদি সূর্যের উৎপত্তি, বর্তমান বয়স, ক্রমবিবর্তন এবং পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাহলে ভাল হয়।

হরনাথ ভট্টাচার্য
ময়ূর মহল, বর্ধমান-৭১৩১০২

'মহাত্মা রামকৃষ্ণ'—কিছু তথ্য

'উদ্বোধন'-এর গত বৈশাখ ১৪০৮ সংখ্যায় 'নতুন আবিষ্কার' বিভাগে 'মহাত্মা রামকৃষ্ণ' রচনাটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। রচনাটির শেষে এর উৎস হিসাবে বারাণসীর মিসির পোখরা-স্থিত ধর্মপ্রচারক কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 'ধর্মপ্রচারক' পত্রিকার ৭ম ভাগের ৪র্থ সংখ্যার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এটি কার রচনা তা এখানে লেখা নেই। হয়তো মূল পত্রিকাটিতে কোন নামের উল্লেখ ছিল না। তবে আমি অন্য একটি সূত্র থেকে জেনেছি, উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত হিন্দুধর্ম প্রচারক স্বামী কৃষ্ণানন্দ (কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন) এটি লিখেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি পরম আনন্দলাভ করেছিলেন।

কৃষ্ণানন্দ ছিলেন অদ্বিতীয় বক্তা, ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যাকার (গীতার্থসন্দীপনী ব্যাখ্যা) ও গীতিকার। তাঁর রচিত 'একবার বিরাজ গো মা হৃদি কমলাসনে' মাতৃসঙ্গীতটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। 'মহাত্মা রামকৃষ্ণ' রচনাটি কাশী যোগাশ্রম থেকে প্রকাশিত স্বামী কৃষ্ণানন্দের জীবনী 'কুমার পরিব্রাজক' গ্রন্থটিতে (পৃঃ ৪৩৩-৪৩৭) সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

রজত গুপ্ত
নিউ রায়পুর রোড, কলকাতা-৭০০০৮৪

প্রসঙ্গ স্বামী দেবদেবানন্দজী রচিত সঙ্গীত

'উদ্বোধন'-এর গত জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে স্বামী দেবদেবানন্দজী রচিত যে-সঙ্গীতটি উপস্থাপন করা হয়েছে তা সত্যিই অপূর্ব। সরল সাবলীল ভঙ্গিতে সহজভাবে বিভিন্ন স্থানে পরিবেশিত হচ্ছে এই সুন্দর সঙ্গীতটি। এই সঙ্গীতের কথাগুলি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে ঠাকুরের সম্বন্ধে বহুভাবে উপলব্ধি করা যায়। তাই বলা যেতে পারে, পূজনীয় মহারাজ আবালবৃদ্ধবনিতার বিষয়ে চিন্তা করেই যেন শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদে এই সঙ্গীত রচনা করেছেন। তাঁকে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জানাই।

সচ্চিদানন্দ দেব
ময়রাডাঙা রোড, বরানগর, কলকাতা-৭০০ ০৩৬

রক্তের উচ্চচাপ সম্পর্কে কয়েকটি জিজ্ঞাসা

'উদ্বোধন'-এর গত জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ সংখ্যার 'বিজ্ঞান' বিভাগে শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়ের 'রক্তের উচ্চচাপ বা হাইপারটেনশন' রচনাটি পড়ে এই চিঠি লিখছি। আমার বয়স ৬৫ বছর, রক্তের উচ্চচাপে ভুগছি প্রায় বছর চারেক। গত ১০।১।২০০১-এ রক্তচাপ ছিল ১৫০/৮০, ১।৩।২০০১-এ ১৫২/৮০ এবং ১৮।৪।২০০১-এ ১৫৪/৮০। আমি ওষুধ খাই, অন্য কোন রোগ নেই। গড়ন মাঝারি, স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। যৌগিক ব্যায়াম সম্পর্কে আমার প্রশ্ন, আমি বেশ কিছুদিন হলো

ভোর চারটের ১০-১৫ মিনিট আগে বা পরে উঠি এবং পবনমুক্তাসন, সর্বাঙ্গাসন, মৎস্যাসন ও গোমুখাসন করি। সর্বাঙ্গাসন তো শীর্ষাসন জাতীয়, তাহলে ওটা কি না করাই ভাল? আর ওটা না করলে মৎস্যাসন কি চলবে? সকালে প্রতিদিনই ৩০-৪০ মিনিট হাঁটার অভ্যাস আছে। 'মর্নিং ওয়াক' কি সূর্যোদয়ের আগে বা পরে করাতে কোন তফাৎ হয়? তাছাড়া, গরমকালে ঘামের সঙ্গে দেহ থেকে প্রচুর লবণ বেরিয়ে যায়, অথচ উচ্চ রক্তচাপের রোগীর লবণ খাওয়া বারণ। এসম্পর্কে কি করণীয়? ডাঃ শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায় অথবা অন্য কেউ যদি অনুগ্রহ করে এসম্পর্কে আলোকপাত করেন তাহলে খুবই উপকৃত হব।

দেবাশিস বসু
ভূপেন্দ্রনাথ রোড, উত্তরপাড়া
হুগলী-৭১২২৫৮

ছোটদের জন্য 'উদ্বোধন'-এ আরো লেখা চাই

বড়দের পাশাপাশি শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের কথাও শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহারাজ মনে রাখেন; তাঁর মহতী ভাবনার প্রতিফলন দীর্ঘদিন ধরে প্রকাশিত 'চিরন্তনী' বিভাগ। তবে মাত্র এক পৃষ্ঠায় তাদের মনের ক্ষুধা মেটে না। অন্তত দুটো পৃষ্ঠা 'চিরন্তনী' বিভাগের জন্য বরাদ্দ করার প্রস্তাব বিবেচনা করতে বিনম্র নিবেদন জানাই।

আরো একটি কথা—কখনো কখনো শব্দচয়ন ও 'কথা' শিশুদের বোধগম্যতায় অনায়াসলব্ধ নয়। কিশলয়মতি পড়ুয়াগণ যাতে অনাবিল আনন্দের খোরাক পায়, সেকথা মনে রেখে আলোচ্য বিভাগটির জন্য শব্দচয়ন ও রচনাশৈলী প্রাঞ্জল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস
ঝাউতলা, কাটোয়া, বর্ধমান-৭১৩১৩০

এই প্রার্থনা হোক সার্বজনীন

'উদ্বোধন'-এর গত জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত মারুফী খানের 'মাগো বড় তৃষ্ণা' লেখাটি অতি মর্মস্পর্শী। আজকের পৃথিবীতে চতুর্দিকে হিংসা-দ্বেষের নির্মম প্রকাশ, যুদ্ধের হুমকি ও বোমাবর্ষণ ক্রমশ আতঙ্ক সৃষ্টি করে চলছে। বনের হিংস্র শ্বাপদরা যেমন কে কার ওপর প্রভুত্ব করবে সে-সুযোগ খুঁজে বেড়ায়, তেমনি এক দেশ অন্য দেশের ওপর, এক জাতি অন্য জাতির ওপর, এক ধর্মাবলম্বী অন্য ধর্মাবলম্বীর ওপর অত্যাচার চালিয়ে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে।

লেখিকা বলেছেন, বর্তমানের হিংসা-বিধ্বস্ত পৃথিবীতে একমাত্র মায়ের আশ্বাসবাণীই আর্তজনের তৃষ্ণার্ত শুষ্ক জিহ্বাতে অমৃত সিঞ্চন করতে পারে। সন্তানের জন্য মায়ের অভয়বাণী আজও ধ্বনিত হচ্ছে—"আর কেউ না জানুক, জানবে তোমার একজন মা আছেন।" কিন্তু এই অভয়বাণী কে শোনে? জাতি-ধর্ম, সৎ-অসৎ, ধনী-নির্ধন সব পার্থক্যের গণ্ডি ভেঙে মায়ের স্নেহের প্লাবন সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়; এই বিশ্ব-মাতৃত্বের কোন তুলনা নেই! হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথিবীতে মায়ের আহ্বান কি কারো কানে পৌঁছাবে না?

এই হিংসা-দ্বেষ-জর্জরিত বিষাক্ত পরিস্থিতিতে, এই দারুণ দুঃসময়ে মায়ের স্নেহসুধায় শীতল হয়ে তৃষ্ণা মেটাবার জন্য লেখিকার আকুল আহ্বান যদি তথাকথিত সভ্য জাতিগুলির কর্ণে প্রবেশ করে, যদি তাদের একটুও সচকিত করতে পারে, তবেই এই লেখার সার্থকতা।

কল্যাণী কর
চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৯

ডি. লিট. সম্মান প্রত্যাখ্যান

'উদ্বোধন'-এর গত জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত 'শিক্ষা-সংস্কৃতি সংবাদ'-এ (পৃঃ ৩৪৪) 'রামকৃষ্ণ মিশন সম্পর্কে গবেষণায় প্রথম ডক্টরেট অফ লিটারেচার (ডি. লিট.)' শীর্ষক নিবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এই পত্র।* উক্ত সংবাদটি পড়ে অতীতের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। সেটি এখানে তুলে ধরছি।

১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অনুষ্ঠিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আচার্যরূপে উপস্থিত ছিলেন তদানীন্তন রাজ্যপাল অধ্যাপক সৈয়দ নুরুল হাসান। সেবার স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী মহারাজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সাম্মানিক ডি. লিট. উপাধি দেওয়া হয়েছিল। কর্তৃপক্ষের পত্রপ্রাপ্তি স্বীকার করে মহারাজজী বিনীতভাবে উক্ত উপাধি প্রত্যাখ্যান করে যে-পত্র দিয়েছিলেন, উপাচার্য মহাশয় সমাবর্তন উৎসবে তা পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। সেই পত্রের বিষয়বস্তু আমার স্মৃতিতে যতটুকু রয়েছে, তার সারাংশ এখানে তুলে ধরছি।

মহারাজজী জানিয়েছিলেন—'আমরা যখন সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করি তখন যশ, মান, খ্যাতি ইত্যাদি জাগতিক যাবতীয় কামনা-বাসনা ত্যাগ করে নতুন জীবন লাভ করি।... সেজন্য আপনাদের প্রদত্ত ডি. লিট. সম্মান গ্রহণে আমি অপারক।' পত্রপাঠান্তে উপাচার্য মহাশয় বলেছিলেনঃ 'স্বামী লোকেশ্বরানন্দজীর মতো যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান জানানো থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম।'

সেদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্য ডি. লিট. উপাধি প্রাপকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বিশ্ববিশ্রুত সত্যজিৎ রায়। অসুস্থতার কারণে তিনিও সমাবর্তনে অনুপস্থিত ছিলেন।

আমন্ত্রিত অভ্যাগত হিসাবে আমি সেদিনের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম।

অধ্যাপক বিনয় চক্রবর্তী
স্যাটিলাইট টাউনশিপ, কলকাতা-৭০০০৬১

** অধ্যাপক তাপস বসু সম্প্রতি 'রামকৃষ্ণ মিশন'-এর ওপর গবেষণা করে ডি. লিট. উপাধি পেয়েছেন।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'*

মূল মহাভারতে, কিন্তু বিস্তার আধুনিক কল্পনায়

দীপঙ্কর দাশগুপ্ত



অমৃত মন্থন
বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক : মডার্ন কলম
১০/২এ টেমার লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯
পৃষ্ঠা : ১২+১২৮
মূল্য : ৩২ টাকা

"কবি তব মনোভূমি রামের জন্মস্থান
অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেন,
সেই সত্য যা রচিবে তুমি
ঘটে যাহা সব সত্য নয়।"

কবিকে তাঁর একান্ত নিজস্ব ভঙ্গিতে দেখার ছাড়পত্র কবিই দিয়ে গেছেন। ঘটনার পূর্বসংস্কারের চেয়েও প্রশ্রয় পেয়েছে কবির সৃজনসত্তা। বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সেই ছাড়পত্রের জোরে মহাভারতের মহারণ্যে পর্যটক হয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থের গোড়াতেই এসম্পর্কে তাঁর নিবেদিত উদ্দেশ্য পরিষ্কার। 'অমৃত মন্থন' কাব্যনাট্যের উপজীব্য মহাভারতের কোন উপাখ্যান নয়, বরং এর পিছনে প্রত্যাশা মহাকাব্যের মহা-বিশেষিত চরিত্রগুলির মানবায়ন। সেইসব নরনারীর সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং চিরকালের অপ্রাপ্তির অতৃপ্তিও যে আমাদের সাধারণ মানুষেরই মতো, তা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন বিভিন্ন সংলাপের আর্তিতে।

চিন্তার মহনীয়তায়, বিষয়বস্তুর গৌরবে, ঘটনার বৈচিত্র্যে এবং কলেবরের বিশালতায় মহাভারত পৃথিবীতে অতুলনীয়। পণ্ডিতেরা বলেন, মানুষের জীবনে এমন কোন অবস্থা আসতে পারে না যখন মহাভারতের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা তার পথ-প্রদর্শক হয়ে উঠবে না। অর্থাৎ সমগ্র মানবসভ্যতার সবরকম আচার-অনুষ্ঠান ও চিন্তার রত্নখনি এই বিস্ময়কর মহাগ্রন্থ। তাই স্বাভাবিকভাবে কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেক স্রষ্টার কল্পনা রঞ্জিত হয়েছে মহাভারতের বর্ণিল আখ্যানে। অতীতে মহাভারত-কথার সূচনায় সৌতি লিখেছেন :

"আচখ্যুঃ কবয়ঃ কেচিৎ সম্প্রত্যাচক্ষতে পরে।
আখ্যাস্যন্তি তথৈবান্যে ইতিহাসমিমং ভুবি।।"

তাঁরও আগে এই কাহিনী অন্য কবিরা শুনিয়েছিলেন, কেউ কেউ এখন বলছেন এবং ভবিষ্যতে আরো কোন কবি বলবেন।

বর্তমান রচয়িতা মহাভারতের সুধাসমুদ্র মন্থন করে মানব-চরিত্রের বিচিত্র চিত্রশালা থেকে চয়ন করেছেন উল্লেখযোগ্য কিছু চরিত্র—ভীষ্ম, অম্বা, হিড়িম্বা, দুর্যোধন, দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠির, কর্ণ, অর্জুন কিংবা কুন্তি। এঁরা সব মহাভারতের কাহিনীর অনুবর্তী। তবে মহাভারতে এইসব চরিত্রগুলি যে-কথা বলেনি, কিন্তু বললেও বলতে পারত—সেগুলিই 'অমৃত মন্থন' কাব্যনাট্যে সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলির মুখে বসানো হয়েছে পরম আন্তরিকতায়, মাধুর্যমণ্ডিত ছন্দে। কখনো আত্মকথনে, কখনো সংলাপে মহাভারত তো নিছক মহৎ কোন শিল্পকর্ম নয়, বরং শিল্প-সাহিত্যের অনিঃশেষ ঐশ্বর্যভাণ্ডার। মহাকাব্যিক চরিত্রগুলির নানা সম্পর্কের পরিণতি ও কথোপকথনের গলিঘুঁজিতে মহর্ষি ব্যাসের যে বিভিন্ন ইঙ্গিত সুপ্ত রয়েছে, তা-ই প্রদীপ্ত করেছে লেখকের কল্পনা-বিভাকে। ইংরেজ সাহিত্যবোদ্ধার ভাষায় যাকে বলা যায় 'spurring of imagination'।

'পঞ্চরূপে পাঞ্চালী' শীর্ষক দ্বিতীয় পর্বে অবিস্মরণীয় চরিত্র দ্রৌপদীর সঙ্গে অর্জুন, ভীম, যুধিষ্ঠির তো বটেই, এমনকি কর্ণ ও কৃষ্ণের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্কের পুনর্গঠন সত্যি অনবদ্য। বীর্যশুল্কা নারীকে সহোদরদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে অর্জুনের বেদনার হদিশ মহাভারত দেয়নি, এখানে কিন্তু তাঁর হৃদয়ের রক্তমোক্ষণ ধরা পড়ে যায় প্রিয় পত্নীর প্রতি অর্জুনের সংলাপে :

"আমি কী পেয়েছি ভেবে দেখ তো পাঞ্চালী।
স্বয়ম্বর প্রত্যাগত স্তব্ধ সব্যসাচী
হতভম্ব মায়ের আজ্ঞায়
আর তার অদ্ভুত ব্যাখ্যায়।
ভিক্ষালব্ধ বস্তু যেন পাঁচ ভাই
সমভাবে নিই ভাগ করে।
তুমি কি আমার ভিক্ষালব্ধ যাজ্ঞসেনী?"

ব্যাসদেব 'সূতপুত্র' কর্ণের প্রতি দ্রৌপদীর তীব্র অপমান এবং তারই শোধ তুলতে বস্ত্রহরণপর্বে দ্রৌপদীকে কর্ণের চরম লাঞ্ছনার কাহিনী রচনা করেছেন। আর এখানে আমরা পাই অন্য এক দ্রৌপদীকে—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে যিনি কর্ণের প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরে লজ্জিতা, অনুতপ্তা এবং 'প্রথম পার্থে'র কাছে আত্মসমর্পণে ব্যগ্র। তাই তাঁকে বলতে শোনা যায় :

"পঞ্চপুত্রে অসম্পূর্ণা যেমন জননী
আমাকে বিশ্বাস কর বীর
পঞ্চস্বামীবতী পাঞ্চালীও
মনে মনে তেমনি অপূর্ণা চিরকাল।"

আদ্যন্ত পঠনসুখ ছাড়াও গ্রন্থটির একটি বিশেষ ইতিবাচক দিক রয়েছে। মহাকাব্যের সঙ্গে অন্যান্য কাব্য-উপন্যাসের তফাত এই যে, তা নিয়ে নিরন্তর চর্চা ও গবেষণা চলে। তবে তা সীমাবদ্ধ বিদগ্ধ মহলে। ব্যস্ত ও গণমাধ্যম-তাড়িত আধুনিক জীবনে মূল মহাকাব্যের রসাস্বাদন করার অবকাশ ও মানসিকতা দুই-ই অনুপস্থিত। সেখানে এই কাব্যনাট্য প্রথমেই বলে দেয় তার চলন মহাভারতের অনুসারী হলেও তার অনুগামী নয়। কাজেই পদে পদে সেই পাঠান্তরকে জানার কৌতূহল পাঠককে নিজের অজান্তেই কখন যেন মূল মহাভারতের পথে অভিযাত্রী হতে বাধ্য করে। □

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গুয়াহাটী আশ্রম (আসাম) : গত ১ মে ২০০১ আসামে স্বামী বিবেকানন্দের পদার্পণের শতবর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন করে। এই উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

চেরাপুঞ্জি আশ্রম (মেঘালয়) : গত ৭ মে ২০০১ নবনির্মিত বিদ্যালয় ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধন করেন মেঘালয়ের মাননীয় রাজ্যপাল এম. এম. জ্যাকব। এই উপলক্ষ্যে একটি জনসভা আয়োজিত হয়। সভায় ভাষণ দান করেন স্বামী দিব্যানন্দজী, এম. এম. জ্যাকব, মেঘালয় সরকারের পশু ও কৃষিমন্ত্রী এফ. এ. খঙ্গলাম। সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম অছি ও পরিচালন পর্ষদের সদস্য স্বামী তত্ত্ববোধানন্দজী। সভায় স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রমের সম্পাদক স্বামী নিত্যমুক্তানন্দজী। অনুষ্ঠানে বহু উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী, শিক্ষাকর্মী, অভিভাবক ও স্থানীয় মানুষের সমাগম হয়েছিল।

কাঁথি আশ্রম (মেদিনীপুর) : গত ১৩ মে ২০০১ নবনির্মিত ছাত্রাবাসের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ।

বেলগাঁও আশ্রম (কর্ণাটক) : পরিব্রাজক অবস্থায় স্বামীজী ১৮৯২ সালে বেলগাঁওয়ে যে-বাংলোতে প্রায় ৯ দিন বাস করেছিলেন, সেটি পুনঃসংস্কার করা হয়েছে। গত ২৩ মে ২০০১ বাংলোটির দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী এস. এম. কৃষ্ণ। এই উপলক্ষ্যে একটি জনসভা আয়োজিত হয়। সভায় ভাষণ দান করেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ ও এস. এম. কৃষ্ণ। পৌরোহিত্য করেন কর্ণাটক সরকারের পূর্তমন্ত্রী ধরম সিং। ঐদিন আশ্রমের একটি সাধুনিবাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ।

হায়দ্রাবাদ মঠ (অন্ধ্রপ্রদেশ) : ৮-১৫ বছর বয়স্ক বালক-বালিকাদের জন্য মাসাধিক কালব্যাপী একটি শিবিরে ১০৫০ জন বালক-বালিকা যোগদান করে। যোগাসন, ভজন, আলোচনা প্রভৃতি ছিল শিবিরের প্রধান বিষয়। গত ২৭ মে ২০০১ সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রধান বিচারপতি সত্যব্রত সিন্‌হা যোগদান করেছিলেন।

আঁটপুর মঠ (হুগলী) : গত ২৭ মে ২০০১ সারাদিনব্যাপী একটি ভক্তসম্মেলনে প্রায় ২৫০ জন ভক্ত যোগদান করেন। ভক্তিগীতি, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরপর্ব ছিল সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী, সুশীল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। আলোচনা করেন স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী, সনৎ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক অমরেন্দ্রনাথ আদক। সভাপতিত্ব করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী। দুপুরে উপস্থিত সকল ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। বিকালে ভক্তদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী ও স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী।

ছাত্রকৃতিত্ব

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ পরিচালিত ২০০১ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহের ফল নিম্নরূপ : **মালদার** ৯০ জন, **নরেন্দ্রপুরের** ১০৮ জন ও **টাকির** ৬২ জন পরীক্ষার্থীর সকলেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। 'স্টার' পেয়ে যারা উত্তীর্ণ হয়েছে তাদের পরিসংখ্যান হলো : আসানসোল—৬৩/১২০, বরানগর—১১৮/১৬৩, **কামারপুকুর**—৩৫/১০৪, **কাটিহার**—২৪/৬৭, **মালদা**—৭৪/৯০, মনসাদ্বীপ—৮/৬২, **মেদিনীপুর**—৫৭/৯৪, **নরেন্দ্রপুর**—১০৬/১০৮, **পুরুলিয়া**—৭৬/৯৭, **রহড়া**—১১৩/১৭৬, **রামহরিপুর**—১৪/৬০, **সারগাছি**—১৯/৮৪, **সরিষা**—৬৫/২৫৮ (দুটি বিদ্যালয়ে) এবং **টাকি**—১৬/৬২।

বিশেষ উল্লেখ্য, **নরেন্দ্রপুর অন্ধ বিদ্যালয়ের** ৯ জন পরীক্ষার্থীর সকলেই এবছর 'স্টার' পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ পরিচালিত ২০০১ সালের সি. বি. এস. ই. পরীক্ষায় **দেওঘর বিদ্যাপীঠের** ৬৭ জন পরীক্ষার্থীর সকলেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। এছাড়া **আলং**-এর ১০৪ জনের মধ্যে ৬৬ জন, **জামশেদপুরের (সিধগোড়া)** ৫৩ জনের মধ্যে ৪৩ জন, **নরোত্তমনগরের** ২৩ জনের মধ্যে ২২ জন, **বিবেকনগরের (ত্রিপুরা)** ৪২ জনের মধ্যে ৩০ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে। অধিকন্তু, **আলং**-এর ১৬ জন, **দেওঘরের** ৬৫ জন, **জামশেদপুরের** ১৭ জন, **নরোত্তমনগরের** ১০ জন এবং **বিবেকনগরের** ১০ জন ছাত্র 'স্টার' পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

মেঘালয় মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ পরিচালিত ২০০১ সালের উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষায় **চেরাপুঞ্জি উচ্চবিদ্যালয়ের** একটি ছাত্র চতুর্থ স্থান এবং আদিবাসী মেধা তালিকায় ঐ বিদ্যালয়ের আরেকটি ছাত্র সপ্তম স্থান অধিকার করেছে।

সেবাব্রত

অগ্নিত্রাণ

পুরী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম (ওড়িশা) : পুরী শহরের নাদখণ্ড মাঝিসাহি অঞ্চলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ৮২টি পরিবারের মধ্যে বাসনপত্র, লণ্ঠন, ধুতি, শাড়ি, গামছা, বিছানার চাদর, পলিথিন সীট প্রভৃতি বিতরণ করা হয়েছে।

খরাত্রাণ

পোরবন্দর আশ্রম (গুজরাট) : ভাদাণা, বাগাভাদর প্রভৃতি কয়েকটি শিবিরের মাধ্যমে গুজরাটের খরা-অধ্যুষিত অঞ্চলের পরিবারের মধ্যে প্রত্যহ প্রায় ৫০০ লিটার করে সরবত বিতরণ করা হয়েছে।

পুনর্বাসন

গুজরাট পুনর্বাসন

রাজকোট আশ্রমের মাধ্যমে ধানেতি গ্রামে বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। সেগুলির মধ্যে ২৬টি গ্রাউন্ড লেভেল, ২০টি

প্লিন্থ লেভেল, ১০টি লিন্টেল লেভেল এবং ৮টি রুফ লেভেল পর্যন্ত তৈরি হয়েছে।

লিমডি আশ্রমের মাধ্যমে জামাদি, আঙ্কেবাড়িয়া, উমেদপুর ও সিদ্ধার্থনগরে ৫টি বিদ্যালয় নির্মাণ ও ৪টি পুকুর খননের কাজ এগিয়ে চলছে।

বহির্ভারত

নিপ্পন বেদান্ত কিওকাই (জাপান)-এর উদ্যোগে গঠিত স্বামী বিবেকানন্দ জন্মদিন উৎসব কমিটি নিচি কিওকাই-এর সহযোগিতায় স্বামীজীর ১৩৯তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে গত ৩ জুন ২০০১ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বেলা ২টায় বেদপাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত-ভাষণ দেন অধ্যাপক সিরিল বেলিয়াথ। সুনির্দিষ্ট ধ্যানানুষ্ঠান (guided meditation) পরিচালনা করেন বেদান্ত কিওকাই আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী মেধসানন্দজী। এরপর 'ইউনিভার্সাল গসপেল' নামে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ভাষণ দেন জাপানে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত আফতাব শেঠ ও টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সেঙ্গাকু মায়েদা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উৎসব কমিটির সম্পাদক এ. পি. এস. মানি। বিকালে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন জাপানী ও ভারতীয় ভক্তেরা। **কাটসুজা মাতসুমোতোয়ের** পরিচালনায় 'ক্যারল' পরিবেশিত হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সিসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্যাথি মাতসুই ও সোকো টাচিবোরি। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা : ইংরেজী মাসের প্রথম ও তৃতীয় বৃহস্পতিবার যথাক্রমে 'ভাগবত' ও 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন স্বামী সনকানন্দজী। দ্বিতীয় ও চতুর্থ বৃহস্পতিবার 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ ও আলোচনা করছেন স্বামী সর্বগানন্দজী। প্রথম শুক্রবার 'ভক্তিপ্রসঙ্গে' আলোচনা করছেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। প্রথম ও তৃতীয় রবিবার 'গীতা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করছেন স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দজী। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

কল্যাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, নদীয়া : গত ৮-১১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব স্মরণে চারদিন ধরে ভক্তিগীতি, 'গীতা', 'ভাগবত' পাঠ, গীতি-আলেখ্য, নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভজন, কীর্তন, সেতারবাদন, যোগাসন প্রদর্শন এবং ধর্মসভার আয়োজিত হয়। দ্বিতীয় দিনের ধর্মসভায় আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণাজী এবং অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য। তৃতীয় দিনের সভায় ভাষণ দান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। ঐদিন তিনি নবনির্মিত একটি চিকিৎসালয়ের উদ্বোধন এবং ৬০ জন দরিদ্র বালক-বালিকার মধ্যে পোশাক বিতরণ করেন। চতুর্থ দিনের সভায় বক্তব্য রাখেন কথাসাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। ঐদিন দুপুরে প্রায় ৬,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

নাটাগড় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, উত্তর চব্বিশ পরগনা : গত ৯-১১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, 'কথামৃত' পাঠ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ধর্মসভার মাধ্যমে স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করা হয়। উৎসবে বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক স্বামী বন্দনানন্দজী, স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী, স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী এবং প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণাজী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ও প্রভাসকুমার দাশ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রম-সভাপতি অনিলকুমার সেনগুপ্ত। এই উপলক্ষ্যে ১৪০ জন দুঃস্থ মানুষকে বস্ত্র প্রদান এবং গুজরাটের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে বেলুড় মঠের ত্রাণ তহবিলে ১০,০০০ টাকা দেওয়া হয়।

পূর্বসিঁথি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, কলকাতা-৭০০ ০৩০ : গত ৯-১১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, লীলাগীতি এবং ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ পূজাদি এবং 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দজী। বিভিন্ন দিনের আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী, স্বামী পরদেবানন্দজী, স্বামী অনিমেষানন্দজী, স্বামী দেবস্বরূপানন্দজী ও ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। উৎসবের শেষদিন দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

সারদা রামকৃষ্ণ চাইল্ড অ্যান্ড ওম্যান সেবাকেন্দ্র, চেতলা, কলকাতা-৭০০ ০২৭ : গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০১ দমদম বেদিয়া পাড়ায় একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। পাঠ, ভক্তি-গীতি ও বস্ত্র-বিতরণ ছিল অনুষ্ঠানের অঙ্গ। অনুষ্ঠানে 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং দরিদ্র শিশু ও বিধবাদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন স্বামী দেবস্বরূপানন্দজী। ঐদিন প্রায় শতাধিক ভক্ত প্রসাদ পান।

নবগ্রাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির, হুগলী : গত ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, নাটক, পদাবলী কীর্তন ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। প্রথম দিনের ধর্মসভায় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এবং দ্বিতীয় দিনের সভায় স্বামী বন্দনানন্দজী, স্বামী ধৃতাত্মানন্দজী ও স্বামী অচ্যুতানন্দজী ভাষণ দান করেন। 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন অজিত ঘোষাল। দুদিনের উৎসবে প্রায় ১,৫০০ নরনারী যোগদান করেন।

সিঙুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, হুগলী : গত ১০-১১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ ভক্ত ও যুব সম্মেলন আয়োজিত হয়। ভক্তসম্মেলনে ভাষণ দেন স্বামী সর্বময়ানন্দজী ও ডঃ পবিত্র গুপ্ত। বিশেষ পূজা, সঙ্গীত, বস্ত্র-বিতরণ ও আলোচনাসভার মাধ্যমে যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কথায় ও গানে 'কথামৃত' পরিবেশন করেন স্বামী দেবদেবানন্দজী। ঐদিন ১২৫ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণ করা হয়। আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী ও সুবোধকুমার মণ্ডল এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী। ঐদিন প্রায় ৭০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

হালিশহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ, উত্তর চব্বিশ পরগনা : গত ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ বিশেষ পূজা, প্রভাতফেরি, ভক্তিগীতি, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, শ্রুতিনাটক ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অম্বিকেশানন্দজী ও ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় দিনে বক্তব্য রাখেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী, ডঃ নমিতা দত্ত প্রমুখ এবং 'কথামৃত' পাঠ করেন সঙ্ঘের সভাপতি বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐদিন প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

কাসুন্দিয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, হাওড়া : গত ১০-১১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ ভক্তিগীতি ও আলোচনাসভার মাধ্যমে শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য মৃগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দুদিনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী ও স্বামী সুহিতানন্দজী এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী, স্বামী বলভদ্রানন্দজী, স্বামী সত্যস্থানন্দজী ও অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী পরিপূর্ণানন্দজী, স্বামী সত্যস্থানন্দজী ও স্বামী অনিমেষানন্দজী। অনুষ্ঠানে স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রমের সম্পাদক বিমলকুমার ঘোষ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন লক্ষ্মীকান্ত বড়াল।

সিস্টার নিবেদিতা স্কুল, রবীন্দ্রনাথ টেগোর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৬৩ : গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ নিবেদিতা অ্যাকাডেমী অফ কালচারের পরিচালনায় একটি অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনের অনন্যতা' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। অনুষ্ঠানে প্রায় ৩৫০ জন ভক্ত প্রসাদ পান।

চাতরা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, বীরভূম : গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, পূজা, 'কথামৃত' ও 'মায়ের কথা' পাঠ, আলোচনা, ভজন, ভক্তিগীতি এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণ দেন স্বামী সগুণানন্দজী, স্বামী বাগীশানন্দ পুরী, স্বামী কৃষ্ণানন্দ গিরি, প্রশান্তকুমার সিন্‌হা ও সুকুমার মুখার্জী। দুপুরে প্রায় ৩০০ ভক্ত প্রসাদ পান। সভায় স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে সমিতির সম্পাদক বামদেব সাহা ও সভাপতি রাধাশ্যাম বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাত্রসায়ের শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, বাঁকুড়া : গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে আলোচনা করেন স্বামী জ্যোতির্ঘনানন্দজী ও স্বামী স্বগতানন্দজী। ৩১৬ জন যুব-প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। সম্মেলনশেষে দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণ করা হয়।

হাঁটাল আঞ্চলিক শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র, হাওড়া : গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় হাঁটাল বিশালাক্ষী হাইস্কুল প্রাঙ্গণে। ভক্তিগীতি, পাঠ ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। প্রথম অধিবেশনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী বোধাতীতানন্দজী, মনোজিৎ মণ্ডল প্রমুখ। দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রশ্নোত্তরপর্ব পরিচালনা ও সভাপতিত্ব করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন প্রব্রাজিকা বিশুদ্ধপ্রাণাজী ও দিলীপকুমার মহাপাত্র। সম্মেলনে স্বাগত-ভাষণ দেন মনোরঞ্জন মান্না এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মনোজকুমার মান্না। প্রায় ৭৫০ জন ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বালী গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, হাওড়া : গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০১ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, তরজা গান ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সগুণানন্দজী ও স্বামী পরিপূর্ণানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৩,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

হরিপাল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, হুগলী : গত ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা আয়োজিত হয়। সভায় ধর্মপ্রসঙ্গ করেন স্বামী বরানন্দজী ও স্বামী বিশ্বাদ্যানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৩৫০ জন ভক্ত প্রসাদ পান।

দাসপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, মেদিনীপুর : রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় গত ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ একটি যুবসম্মেলন ও ভক্তসম্মেলন আয়োজিত হয়। উভয় সম্মেলনের বিষয় ছিল পাঠ, ধ্যান, প্রার্থনা, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও আলোচনা। আলোচনা এবং বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী এবং স্বামী কালাতীতানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দেন সরোজকুমার মাইতি। যুবসম্মেলনে ৫০০ প্রতিনিধি এবং ভক্তসম্মেলনে ৭৫০ ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেককে উপহার প্রদান করা হয়।

কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি, নদীয়া : গত ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, রামনাম-সঙ্কীর্তন ও ধর্মসভার মধ্য দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসব পালন করা হয়। প্রথম দিনের ধর্মসভায় আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী ও ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় দিনের সভায় আলোচনা করেন স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী, স্বামী সত্যবোধানন্দজী ও রণজিৎচন্দ্র সাহা। ঐদিন দুপুরে প্রায় ৮০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

মধ্যমগ্রাম রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, উত্তর চব্বিশ পরগনা : গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও

স্বামীজীর আবির্ভাব স্মরণে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, নগর-পরিক্রমা ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সকালের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী ও সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় এবং বিকালের সভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী ও প্রগতি ঘোষ। ঐদিন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রী ও মহিলাদের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণ এবং গুজরাটে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সাহায্যার্থে ৫০১ টাকা প্রদান করা হয়।

চন্দননগর বারাসত গেট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন, হুগলী : গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দ নিলয়ে স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। ভক্তিগীতি ও আলোচনা ছিল উৎসবের অঙ্গ। আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা গৌতমপ্রাণাজী এবং স্বাগত ভাষণ দেন মহকুমাশাসক তাপস রায়। ঐদিন 'সেবা' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়।

দক্ষিণ বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা : গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ একটি অনুষ্ঠানে গুরুবন্দনা, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও 'মায়ের কথা' পাঠ প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী রাজীবানন্দজী। ২৫ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে পাঠচক্রে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন শতদল সাধুখাঁ। অনুষ্ঠানে ২০০ জনের অধিক ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

পুইনান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ, হুগলী : গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, 'চণ্ডী', 'কথামৃত' ও 'মায়ের কথা' পাঠ, গুরুবন্দনা, ভক্তিগীতি, গীতিনাট্য ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী ও স্বামী সর্বময়ানন্দজী। অনুষ্ঠানে দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে ৩০টি কম্বল ও ১২৩টি বস্ত্র বিতরণ এবং 'উত্তিষ্ঠত' নামে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করা হয়। ঐদিন দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

বালেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, চলান্তি, ওড়িশা : গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ বিশেষ পূজা, 'গীতা' পাঠ, ভক্তিগীতি, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, রামনাম-সঙ্কীর্তন ও ধর্মসভার মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ-গীতি পরিবেশন করেন স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দজী ও সম্প্রদায়। ধর্মসভায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী শ্রীকৃষ্ণানন্দজী, ব্রহ্মচারী জগৎচৈতন্য, ডঃ মোহিনীমোহন মাইতি, অধ্যাপক জয়ন্তকুমার দাস প্রমুখ এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী নিগমাত্মানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রমের সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ দাস এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ব্রহ্মচারী সুমন। দুপুরে প্রায় ৪,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

পাতুল মিলন মন্দির শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, হুগলী : গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী বরানন্দজী, অধ্যাপক পিনাকীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, হিমাংশু ঘোষ এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী গৌরীনাথানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। সভায় স্বাগত-ভাষণ দেন প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পঙ্কজ দে।

উলুবেড়িয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, নোনা, হাওড়া : গত ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ধর্মসভা আয়োজিত হয়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন সৈয়দপুর আশ্রমের স্বামী নির্মলানন্দজী, রানাঘাট কলেজের অধ্যক্ষ অরুণ ঘোষ, অধ্যাপক শ্যামল বিশ্বাস, অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম প্রমুখ। উৎসবে প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

নাগেরবাজার রামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ, কলকাতা-৭০০ ০২৪ : গত ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে প্রথম দিনে স্বামী ঋদ্ধানন্দজীর 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা এবং দ্বিতীয় দিনে ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। তৃতীয় দিনে অনুষ্ঠিত হয় প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি ও প্রায় ৭০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ।

নাহারলগন বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল, ইটানগর, অরুণাচলপ্রদেশ : গত ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভজন, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে হিন্দিতে ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বাত্মানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দেন স্টাডি সার্কেলের সম্পাদক শ্যামল সিন্‌হা রায়। এই উপলক্ষ্যে এই সংস্থা গুজরাটের ভূমিকম্পে সাহায্যার্থে রাজকোট আশ্রমকে ৫,০০০ টাকা প্রদান করে। উৎসবের শেষদিন দুপুরে প্রায় ১,২০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

তেজু শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলী, লোহিত, অরুণাচলপ্রদেশ : গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে পূজা, ভজন, 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ এবং আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

পাঞ্চেৎদাম শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ, ধানবাদ, বিহার : গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' ও শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী পাঠের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন করা হয়। ঐদিন দুপুরে প্রায় ২৫০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

আকালীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, ভদ্রপুর, বীরভূম : গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, ভক্তিগীতি প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

কৃষ্ণনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, নদীয়া : গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন আশ্রমের সম্পাদক দিলীপ মিত্র, দেবপ্রসূন ঘটক, অসিতকুমার চক্রবর্তী ও নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

খেপুত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি আশ্রম, মেদিনীপুর : গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে

বিশেষ পূজা, কীর্তন ও পাঠের আয়োজন করা হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন আশ্রম-সম্পাদক ব্রহ্মচারী শিশির। উপস্থিত সকল ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সাঁত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, জগাছা, হাওড়া : গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'গীতা' ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী পাঠ এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণ দেন ভবেশ বিশ্বাস।

রামপুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র, বীরভূম : গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালিত হয়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী দেবাত্মানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে পাঠচক্রের সম্পাদক বিশ্বেশ্বর রায় ও অর্ধেন্দু চৌধুরী। সভাশেষে কয়েকজন দুঃস্থ মানুষকে শীত-বস্ত্র প্রদান করা হয়। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

ভদ্রকালী শ্রীরামকৃষ্ণ পাদতীর্থ সেবক সঙ্ঘ, হুগলী : গত ২৫ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও আলোচনাসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হয়। আলোচনা করেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং ভাষণ দেন স্বামী গৌরীনাথানন্দজী। ঐদিন প্রায় ১,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, কোচবিহার : গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ বিশেষ পূজা ও পাঠের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন করা হয়।

রূপহী শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, নগাঁও, আসাম : গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

ডুমরিয়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, কিষানগঞ্জ, বিহার : গত ২৫ ফেব্রুয়ারি শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' পাঠ, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন দুলাল ভট্টাচার্য। ঐদিন দুপুরে প্রায় ২০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

তেজপুর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, আসাম : গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি এবং ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। সভায় 'কথামৃত' পাঠ করেন সাধনা ভট্টাচার্য। আলোচনা করেন সুবল দে। দুপুরে প্রায় ৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সেবাশ্রম গুজরাটের ভূমিকম্পের জন্য বেলুড় মঠের ত্রাণ তহবিলে ১,৫০০ টাকা প্রদান করে।

নারায়ণপুর সারদা শিশুশিক্ষা নিকেতন, উত্তর চব্বিশ পরগনা : গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' পাঠ, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনা করেন তথ্য আধিকারিক পরিমল মজুমদার, সুশীল মণ্ডল ও সৃষ্টিধর গাইন এবং সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সম্পাদক দেবদাস মণ্ডল।

সেবাব্রত

টালিগঞ্জ বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র, কলকাতা-৭০০০৩৩ : গত ১১ ফেব্রুয়ারি ২০০১ আয়োজিত একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে ৫৭ জন রক্তদান করেন। এই কেন্দ্র গুজরাটের ভূমিকম্পের জন্য ১,০০১ টাকা প্রদান করে।

জাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র, মেদিনীপুর : গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ৫১জন রক্তদান করেন। এছাড়া স্বামীজীর জীবনাদর্শ বিষয়ে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়।

'উদ্বোধন'-এর এক বিশিষ্ট কর্মীর প্রয়াণ

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, অকৃতদার সৌরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৮ মে ২০০১ রাত ৯টা ৪০ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী প্রয়াত সৌরেনবাবু প্রায় ২২ বছর যাবৎ একনিষ্ঠভাবে 'উদ্বোধন'-এ স্বেচ্ছাসেবা দান করেছেন। তাঁর সততা, মানসিক দৃঢ়তা ও শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে গভীর অনুরাগের জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লাভ করেছিলেন।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য অবনীকুমার মজুমদার ৮৬ বছর বয়সে গত ১৭ জানুয়ারি ২০০১ পরলোকগমন করেন।

শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের কৃপাপ্রাপ্ত জানকীনাথ মুখার্জী গত ২১ জানুয়ারি ২০০১ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা দুর্গারানী চক্রবর্তী গত ২৫ জানুয়ারি ২০০১ পরলোকগমন করেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ৮৫ বছর বয়সে গত ২৬ জানুয়ারি ২০০১ পরলোকগমন করেন।

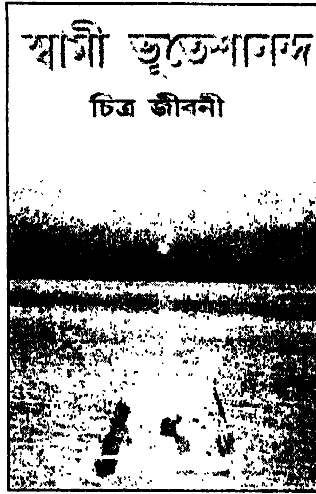
শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য সুবিমলকান্তি রায়চৌধুরী গত ২৯ জানুয়ারি ২০০১ পরলোক-গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য এবং বলরাম বসুর দৌহিত্র প্রণবেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র গত ৩১ জানুয়ারি ২০০১ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য অশোক গাঙ্গুলী ৬৩ বছর বয়সে গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০১ পরলোক-গমন করেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য নিমাইচন্দ্র দুই গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০১ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য সূর্যনারায়ণ নিয়োগী ৮৭ বছর বয়সে গত ৪ ফেব্রুয়ারি ২০০১ পরলোকগমন করেন। ❑



পরম পূজ্যপাদ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের
"চিত্র জীবনী" প্রকাশিত হয়েছে
(ইংরেজী ও বাঙলা সংস্করণ)
অতি বিরল ও দুষ্প্রাপ্য ৩০০টি মূল্যবান ছবির অপূর্ব সংমিশ্রণ
মূল্য—৩৫০ টাকা

পূজ্যপাদ মহারাজের শতবর্ষজয়ন্তী উপলক্ষ্যে
বিশেষ ছাড়—সেপ্টেম্বর ২০০১ পর্যন্ত

'স্বামী ভূতেশানন্দ স্মৃতিকথা' প্রকাশিত হবে ৮ সেপ্টেম্বর ২০০১

প্রাপ্তিস্থান ঃ
উদ্বোধন, অদ্বৈত আশ্রম, সারদাপীঠ, গোলপার্ক বুক স্টল এবং সোমসার অফিস

প্রকাশক ঃ
সোমসার শ্রীরামকৃষ্ণ সেবামন্দির, ৫ নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৬
ও
১০/১৩৯ হাডকো এস্টেট, ৯৫ বিধাননগর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫৪
ফোন ঃ ৩৩৪-৯৯০০

উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী



সংস্কৃত শাস্ত্র

স্বামী গম্ভীরানন্দ অনূদিত
(শাঙ্করভাষ্য সমেত)

ঈশোপনিষৎ	১০.০০
কেনোপনিষৎ	১৫.০০
মুণ্ডকোপনিষৎ	২০.০০
কঠোপনিষৎ	৩৫.০০

স্বামী জগদানন্দ অনূদিত

সংক্ষেপ শারীরকম্	৭৫.০০

স্বামী ভাবঘনানন্দ অনূদিত
(শ্রীধরস্বামীপাদ কৃত সুবোধিনী টীকাসহ)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	৯০.০০

স্বামী বাসুদেবানন্দ ব্যাখ্যাত ও অনূদিত
(শাঙ্করভাষ্য ও তার ব্যাখ্যা)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা	২০০.০০

জীবনী

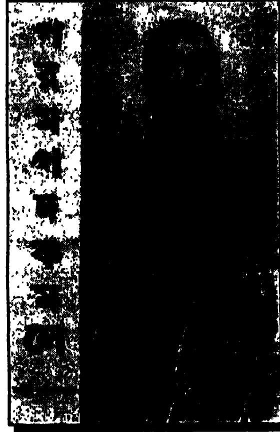
স্বামী শুদ্ধানন্দ	১৫.০০
প্রেমিকপুরুষ প্রেমানন্দ	২০.০০
মহাপুরুষ শিবানন্দ	২০.০০
সেবাদর্শে রামকৃষ্ণানন্দ	২৫.০০
স্বামী তুরীয়ানন্দ	৩০.০০
শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্মৃতিকথা	৩২.৫০
স্বামী অখণ্ডানন্দ	৪০.০০
ব্রহ্মানন্দচরিত	৬০.০০
সারদানন্দচরিত	৭০.০০

বিবিধ

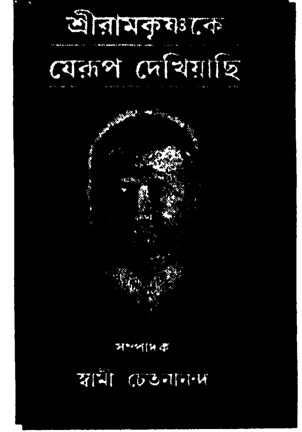
জীবন্মুক্তি সুখপ্রাপ্তি	১৪.০০
পরমার্থপ্রসঙ্গ	১৫.০০
স্বামী অখণ্ডানন্দের স্মৃতিসঞ্চয়	১৬.০০
গীতাতত্ত্ব	১৭.০০
শরণাগতি ও সেবা *(স্বামী অখণ্ডানন্দজীর পত্রাবলী)*	২০.০০
স্বামী অখণ্ডানন্দকে যেরূপ দেখিয়াছি	২০.০০
ধর্মপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ	২৫.০০
স্মৃতিকথা	২৫.০০
শিবানন্দ বাণী (অখণ্ড)	৩৫.০০
অতীতের স্মৃতি	৪৫.০০



শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে
স্বামী চেতনানন্দ
মূল্য : ৫০.০০



পরমপদকমলে
(২য় সংস্করণ)
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
মূল্য : ৬৫.০০



শ্রীরামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিয়াছি
সম্পাদনা : স্বামী চেতনানন্দ
মূল্য : ৭০.০০

ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, সে কোথায় পড়ে আছে তা দেখেন না। 'ভাবগ্রাহী জনার্দন'।

শ্রীরামকৃষ্ণ

ঈশ্বরে অনুরাগ হলে সমস্ত বিশ্বকেই আপন বোধ হয়। কারণ, সবই তাঁর সৃষ্টি।

স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments from:

MODERN GUINEA HOUSE PRIVATE LIMITED

A JEWEL OF JEWELLERS



GOLD, DIAMOND, STONE MERCHANT

208, BIPIN BEHARI GANGULY STREET (BOW BAZAR) KOLKATA-700 012
Phone : 241-6281/8203

Shop Remain Closed: Sunday Full & Monday Upto 1.30 p.m.

Supplier of Plants to Different Centres of Ramakrishna Math & Mission and all over India.

KAMAL NURSERY

P. O. Andul-Mouri
Howrah-711302
Phones : 669-0698, 669-1165

শ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থপরিক্রমা



স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের জন্মশতবর্ষ

আগামী ৮ সেপ্টেম্বর ২০০১ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের জন্মশতবর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থপরিক্রমা বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে গুরু মহারাজের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করবে। এই শতবর্ষে স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের নামে বড়িশায় একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসালয় ও অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা গড়ে উঠবে। এই জনসেবামূলক কর্মসূচীকে সার্থক রূপায়ণের জন্য সাত লক্ষ টাকা ব্যয়িত হবে। গুরু মহারাজের সকল ভক্ত, শিষ্য, অনুরাগী, শুভানুধ্যায়ী ও জনসাধারণের কাছে বিনীত আবেদন, উক্ত কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করতে উদার দাক্ষিণ্যে এগিয়ে আসুন। আপনার দান অ্যাকাউন্ট পেয়ী ড্রাফট/চেক "Sri Ramakrishna Tirtha Parikrama" অনুকূলে স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের জন্মশতবর্ষের জন্য উল্লেখ করে নিচের ঠিকানায় পাঠাতে পারেন। আপনার দান কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গৃহীত হবে।

ভক্তসম্মেলন
৮ সেপ্টেম্বর ২০০১ গুরু মহারাজের জন্মদিন উপলক্ষ্যে সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠান।
"বারিদীভবন" ১৮, বনমালী নস্কর রোড
কলকাতা-৭০০ ০৬০
(বেহালা থানার পশ্চিমে)

প্রেমাংশু রায়চৌধুরী (প্রধান সংগঠক)
সুধাংশু ভবন, ১৩২/এ ডায়মন্ড হারবার রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৮
দূরভাষ ঃ ৪৪৭-৯৯৭৬

ধর্মসম্মেলন
৯ সেপ্টেম্বর ২০০১ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে ধর্মসভা ও সঙ্গীতানুষ্ঠান
বিকাল ৬টায়
স্থান ঃ শরৎসদন
(বেহালা ম্যান্টন সুপার মার্কেটের ওপরে)

বিঃ দ্রঃ ঃ ওপরের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণেচ্ছু ভক্তগণ অবশ্যই ১০১ টাকা প্রণামী পাঠাবেন।

With Best Compliments From :

DOBSON DISTRIBUTORS

88, DR. ABANI DUTTA ROAD
HOWRAH-711 101
PHONE : 666-1722
TELEFAX : 666-9969

Stockist

Serum Institute, Tablets India Ltd., Wallace Pharmaceuticals Ltd., Eli Lilly Ranbaxy, Pharmacia & Upjohn, Orchid, Caplet, Smith Kline Beecham (Vaccine), Sunny Industries Pvt. Ltd., Midas Care, Arvind (S.K.K.L. Ltd.), Neon Laboratories, Mayer, Trio Pharma

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পতিতপাবন শ্রীরামকৃষ্ণ ৪০.০০
অহেতুকী কৃপাসিন্ধুর অপার কৃপা, পতিতপাবনের অপার দয়া। সেইজন্য আমায় আশ্রয় দিয়াছেন। আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার করুণা, আমার কোন চিন্তার কারণ নাই। —গিরিশচন্দ্র

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গুহা মন্দিরের দেবী ২৮.০০
বৈষ্ণোদেবী দর্শন ও ভ্রমণের গাইড বই। পৌরাণিক উপাখ্যান সহ। অনেক ছবি ও ম্যাপ বইটির বাড়তি আকর্ষণ।

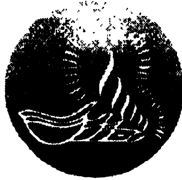
সোমনাথের
শিবঠাকুরের বাড়ি ৩৫.০০
দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও পঞ্চকেদার ভ্রমণ-কাহিনী। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও পঞ্চকেদার যেতে হলে সচিত্র এই বইটি নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাবে। কিভাবে যাবেন, কোথায় থাকবেন—সবই পাবেন বইটিতে।

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিঃ
২১ ঝামাপুকুর লেন ❑ কলকাতা-৭০০ ০০৯

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

With Best Compliments From :



TATA TEA LIMITED

Making a difference ... differently.

1, Bishop Lefroy Road
Kolkata-700 020

With Best Compliments From :

DIAMOND METAL PRODUCTS

Mfg. All Types of
Aluminium Pilfer Proof Caps

APOLO ELECTRIC BULB PVT. LTD.
27B/H/13/1, Chaulpatty Road
Kolkata-700010
Tele. : (O) 350-3901/353-1445
Fax : 350-6297
Mfg. G.L.S. Lamps & Night Lamps

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

কুক্‌মী
গুঁড়ো মশলা
কলকাতা

শ্রীশ্রী সারদামায়ের

মন্ত্রশিষ্য

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

প্রণীত

স্মৃতিমূলক জীবনীগ্রন্থ

- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
- শ্রীশ্রী সারদাদেবী
- স্বামী সারদানন্দের জীবনী
- শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ
- ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা
- প্রেমানন্দ-প্রেমকথা
- জীবন পরিক্রমা



আমাদের প্রকাশিত আরও বিভিন্ন

স্মৃতিমূলক জীবনীগ্রন্থ

বিশ্বনাথ দে

- রবীন্দ্রস্মৃতি

ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

- বিবেকানন্দ স্মৃতি
- বঙ্কিম স্মৃতি
- রামমোহন স্মৃতি
- মধুসূদন স্মৃতি
- বিদ্যাসাগর স্মৃতি
- নজরুল স্মৃতি
- শরৎ স্মৃতি
- মা টেরেসা
- বায়রণ
- শেলী

শ্রী মোহিত কুমার বসাক

- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্মৃতি
- অরবিন্দ স্মৃতি
- নিবেদিতা স্মৃতি
- কিশোর শহীদ স্মৃতি
- সুভাষ স্মৃতি

সুবোধ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

- সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন
- *The Early life of Netaji*

সমর গুহ

- নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা
- *Netaji Dead or Alive*





ক্যালকাটা বুক হাউস

১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

☎ ২৪১-০৯৬৫ / ৯৪০৪

আনন্দ পাবলিশার্সের বিনম্র নিবেদন

রামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দ-নিবেদিতা প্রসঙ্গ

অমলেশ ত্রিপাঠী
ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দ ৪০.০০



অরুণকুমার বিশ্বাস
সরস্বতী সারদার অনুধ্যানে ৩৫.০০



কমলকুমার মজুমদার, দয়াময়ী মজুমদার
অমৃতকথা ২৫.০০

কিশলয় ঠাকুর
মা সারদা ২৫.০০

কৃষ্ণা দত্ত (সংকলিত)
চিরন্তনী ১৫.০০

জ্যোতির্ময় বসুরায়
শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ বিজ্ঞানানন্দ ৫০.০০

মৃগেন্দ্রচন্দ্র দাস
মহীয়সী নিবেদিতা ৫০.০০

দয়াময়ী মজুমদার
গীতা ও রামকৃষ্ণের কথা ৩০.০০
মহাজীবন কথা: শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ ৫০.০০

নিমাইসাধন বসু
উইম্বলডনের মার্গারেট ৪০.০০

শাশ্বত বিবেকানন্দ (সম্পা.) ৮০.০০

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ
তব কথামৃতম্ ৭৫.০০



শঙ্করীপ্রসাদ বসু
নিবেদিতা লোকমাতা ১ম খণ্ড (১ম পর্ব) ১২০.০০
১ম খণ্ড (২য় পর্ব) ৭৫.০০
নিবেদিতা লোকমাতা ২য় খণ্ড ৫০.০০
নিবেদিতা লোকমাতা ৩য় খণ্ড ৪০.০০
নিবেদিতা লোকমাতা ৪র্থ খণ্ড ৭৫.০০
রামকৃষ্ণ-সারদা: জীবন ও প্রসঙ্গ ১০০.০০

শিশির কর
শিকাগোয় বিবেকানন্দ শতবর্ষ পরে ২০.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
ফোন : ২৪১-৪৩৫২, ২৪১-৩৪১৭
E-mail : ananda@cal3.vsnl.net.in

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত
শ্রীম-কথিত

পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত ঃ প্রতি সেট ঃ ২২৪ টাকা
[কেবল রেক্সিন বাঁধাই পাওয়া যায়]

শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যরা এবং কথামৃতকার শ্রীম নিজেও এই মহাগ্রন্থটি যেমনটি দেখিয়া গিয়াছেন এবং রাখিয়া গিয়াছেন (খণ্ড খণ্ড হিসাবে পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এবং দিনলিপি অনুসারে না সাজাইয়া) ঠিক তেমনটিই সংরক্ষণ করার পুণ্য দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর হইয়া আছেন 'কথামৃতের' আশি বছরেরও অধিক প্রাচীন প্রকাশক শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী (কথামৃত ভবন)। ফলে এই মহাগ্রন্থের Originality এবং সুমহান ঐতিহাসিক পবিত্র ঐতিহ্য সম্পূর্ণভাবে বহাল রহিয়াছে এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত 'কথামৃতে'।

প্রকাশক ঃ শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী
(কথামৃত ভবন)
১৩।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬
ফোন ঃ ৩৫০-১৭৫১

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির
ফোন ঃ ৪৭৪-২৩৩৫
৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো
কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত

শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহের বহু প্রশংসিত পুস্তকাবলী

গীতাতত্ত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ	৮০৲
পূর্ণতার সাধন	১৬৲
ভগবৎ প্রসঙ্গ	২৪৲
গল্পে ভগবৎ প্রসঙ্গ	২৪৲
শরণাগতের আদর্শ ও সাধনা	৩০৲
ঈশ্বর-সান্নিধ্য বোধের সাধনা	৮৲

শ্রীহরিশচন্দ্র সিংহের জন্মশতবার্ষিকী গ্রন্থ ঃ
প্রেমিক পুরুষ ১৫৲
অন্যান্য বই ঃ স্তোত্রমালিকা ৪

✣ প্রাপ্তিস্থান ✣
সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ), উদ্বোধন,
রত্না বুক হাউস, মহেশ লাইব্রেরী,
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোলপার্ক)

CAN YOU SURVIVE THE DANGERS OF CONTAMINATED BLOOD?



BLOOD. A unique gift of God.
Saviour of life when it is pure. Killer when it is impure or contaminated.
The onus is on us, as responsible citizens, to do our utmost to bring a change in the dismal scenario... to ensure that a Blood Bank supplies and receives only HEALTHY, SAFE AND CONTAMINATION-FREE BLOOD. It is our right

Some alarming realities...

- In India, there are only 400 licensed Blood Banks supplying only 25% of the total needs.
- A vast majority of blood donors are *'professionals'* who donate 5-6 times in a month. They are mostly alcoholics and drug addicts, representing high risk groups for AIDS, hepatitis, etc.

Need of the hour...

- *Supply of contamination-free blood from licensed, quality-conscious Blood Banks.*
- *Motivate more and more voluntary, safe blood donors to replace 'professional' donors.*

ACTIONS

WHO

WHO Global Blood Safety initiative involving development of Integrated Blood Transfusion Services with selection of the *RIGHT DONORS AND PRESCREENING OF BLOOD TO ENSURE SAFE AND SECURE BLOOD TRANSFUSION.*

Government

- Established Blood Transfusion Councils at the National as well as State level.
- Strengthened Drug Control Administration in States for licensing and effective monitoring of Blood Banks in terms of adequacy of testing and storage facilities.

BLOOD SAVES ONLY WHEN IT IS SAFE...

নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের ওপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে। — শ্রীরামকৃষ্ণ

✱

হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন। — শ্রীমা সারদাদেবী

✱

মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে, তার বিকাশই ধর্ম। — স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments From :

UTILITY INDUSTRIES & CHEMICAL WORKS

19Y, Raja Manindra Road, Kolkata-700037
Phone : 556-5543/6459

&

ASIMCO

22, Amalangsu Sen Road, Kolkata-700048
Phone : 556-5351/5543

Manufacturers of Phenyle. I.S.I., Lysol. I.P., Soaps, Antiseptic Lotions & Purified Water. I.P.
Dealers in all sorts of Medicines, Pharmaceuticals & Laboratory Chemicals.

সেরা ফলন দেবার লাভ

লালন সুপার ফসফেট সার



প্রস্তুতকারক ঃ

সারদা ফার্টিলাইজার্স লিঃ

২, ক্লাইভঘাট স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০১

ফোন নং
অফিস ঃ ২২০-৫৪৩৫
রেসি. ঃ ৩৩৭-৭৩৬৫
মোবাইল ঃ ৯৮৩১০-১৯২৬৬

ওরিয়েন্টের পুনঃপ্রকাশিত বই

- ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
  বাংলার বাউল ও বাউল গান ৮০০
- প্রমদারঞ্জন ঘোষ
  শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা ও জীবন-দর্শন ৮০
- রতনমণি চট্টোপাধ্যায়
  আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা ৮০

ওরিয়েন্টের প্রকাশিত বই

- ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
  রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ২৭৫
  রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা ১৬০
- ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
  ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস ৮০
  বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা ১০০
  (আদি ও মধ্যযুগ)
  বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা ৯০
  (আধুনিক যুগ)
  রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা, ১ম খণ্ড ১০০
  রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা, ২য় খণ্ড ২০০
- ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত
  সাহিত্যের স্বরূপ ১৫
  বাংলা সাহিত্যের একদিক ৬০
  বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি ৪০
- প্রমথনাথ বিশী
  রবীন্দ্র-নাট্য-প্রবাহ ১২৫
- ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল
  রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা ২০
- ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
  নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ২০
- অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী
  ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ৭৫
- সম্পাদনা : ডঃ অরুণকুমার বসু
  মেঘনাদবধ কাব্য—
  মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১ম-৪র্থ সর্গ)
  একেই কি বলে সভ্যতা—
  মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৩০
- সম্পাদনা : পবিত্র সরকার
  জনা ৪০
- সম্পাদনা : প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
  পালামৌ—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৩০
  চরিতকথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৩৫
- ডঃ অমিয়কুমার সামন্ত
  প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর ১০০
- রোমাঁ রোলাঁ
  রামকৃষ্ণের জীবন ৫০
  বিবেকানন্দের জীবন ৫০
  রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ ২৫

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি

৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

একটি আবেদন

জয়শ্রী পার্ক উদ্ভাস স্প্যাসটিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বেহালা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের মানবিক সহায়তায় উৎসর্গিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থাটির পরিচালনায় আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী অভিভাবক-অভিভাবিকারা। এই রেজিস্টার্ড সংস্থাটি বিগত ১৯৯৫ সাল থেকে বেহালা অঞ্চলে কর্মরত। বেলুড় মঠের পরম পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ এবং অন্যান্য মহারাজদের অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদ-ধন্য এই জনকল্যাণমূলক সংস্থাটির উদ্দেশ্য ১০/১২টি ছেলেমেয়ের জন্য একটি আবাসিক গৃহ নির্মাণ এবং তৎসহ একটি সহায়তামূলক বহির্বিভাগ স্থাপন। জমিক্রয়-সহ এই উদ্দেশ্যে গৃহনির্মাণ প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে আনুমানিক ব্যয় ১০ লক্ষ টাকা।

"শিবজ্ঞানে জীবসেবা"র ভিত্তিতে এই প্রকল্পে সকলের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য সোসাইটির পক্ষ থেকে আবেদন জানাই। সহৃদয় দাতাগণের দান শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম অনুগ্রহস্বরূপ গৃহীত হবে।

যেকোন আর্থিক সহায়তা 'Jayshree Park Udbhas Spastic Welfare Society'-র অনুকূলে অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফটে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানাই। দাতাগণের নাম এবং দানের অঙ্ক আমাদের বাৎসরিক স্যুভেনীর-এ প্রকাশিত হবে।

আগমনী মুখার্জী
সম্পাদিকা

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা :
বি ২৯/১, জয়শ্রী পার্ক, কলকাতা-৩৪
ফোন : ৪৬৮-২৮৭৩

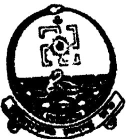
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রকাশিত বাঙলা গ্রন্থরাজি

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)	১০০.০০
স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)	১০০.০০
আত্মজ্ঞান	২২.০০
আত্মবিকাশ	২০.০০
আমার জীবনকথা (২ খণ্ডে)	৮৫.০০
ঈশ্বরদর্শনের উপায়	৩৫.০০
কর্মবিজ্ঞান	১০.০০
তরুণ বাংলার আদর্শ	৫.০০
দেবী দুর্গা	৬.০০
পত্র-সংকলন	১৬.০০
পঞ্চদশী-দর্শনের পরিচয়	৫.০০
পুনর্জন্মবাদ	৩০.০০
বিংশ-শতাব্দীর ধর্ম	৫.০০
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	২০.০০
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	৩০.০০
মরণের পারে	৫০.০০
মনের বিচিত্র রূপ	১২.০০
মানুষের দিব্যস্বরূপ	২৫.০০
মুক্তির উপায়	১৫.০০
যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ	৫.০০
যুগে যুগে যাঁদের আগমন	২৮.০০
যোগদর্শন ও যোগসাধনা	৫০.০০
যোগশিক্ষা	৪০.০০
শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম	২০.০০
সর্বজনীন ধর্ম ও বেদান্ত	৩০.০০
সাংখ্য, বৌদ্ধ ও বেদান্তদর্শন	৩০.০০
স্বামী বিবেকানন্দ	২.০০
স্তোত্ররত্নাকর ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি	১২.০০
হিন্দুনারী	১২.০০
হিন্দুরা যীশুখ্রীস্টের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু গীর্জা-ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ কেন?	৫.০০
বেদান্ত দর্শন	১০.০০
খ্রীস্টীয় বিজ্ঞান এবং বেদান্ত	৫.০০

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত

অধ্যাত্মসাধনায় দেবতা ও দেবীভাবনা	৪.০০
অভেদানন্দ-দর্শন (২ খণ্ডে)	১৪০.০০
কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব	১৮.০০
তীর্থরেণু	২৬.০০
তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা	৪০.০০
তন্ত্রতত্ত্বপ্রবেশিকা	৬০.০০
নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৪৫.০০
পদাবলী-কীর্তনের ইতিহাস	৩৫.০০
বাণী ও বিচার (৮ খণ্ডে)	৪০০.০০
বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তায় মন্ত্রতত্ত্ব ও মন্ত্রসাধনা	২০.০০
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (৩ খণ্ডে)	২২০.০০
শ্রীরামকৃষ্ণচন্দ্রিকা	৪০.০০
ভারতীয়-সঙ্গীত—ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক রূপরেখা	৩৪.০০
মন ও মানুষ (৩ খণ্ডে)	১৫৮.০০
মহিষাসুরমর্দিনী-দুর্গা	৩০০.০০
মন্ত্রভাবনা ও সঙ্গীত	১৪.০০
রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা	২০.০০
রাগ ও রূপ (২ খণ্ডে)	২২০.০০
সঙ্গীতপ্রতিভায় স্বামী বিবেকানন্দ	৮.০০
সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান	৫০.০০
সঙ্গীতে সাহিত্য, রসভাবনা ও সুন্দর	২৫০.০০
স্বামী অভেদানন্দ	৫.০০
স্বামী অভেদানন্দের জীবন ও দর্শন	৩৬.০০



শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

(পুস্তক প্রচার বিভাগ)

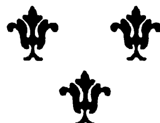
১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

Haran Chandra Banerjee & Sons.

7C, CLIVE ROW, CALCUTTA-700 001

PAPER MERCHANTS, STATIONERS AND GOVT. SUPPLIERS

Phones : Office : 220-1700
Resi. : 665-9075



Distributors for :

TITAGHUR PAPER MILLS CO. LTD.
BENGAL PAPER MILLS CO. LTD.
SUPREME PAPER MILLS CO. LTD.
SIMPLEX MILLS CO. LTD.

SRI RAMAKRISHNA SEVASHRAM



"SERVICE TO MAN IS SERVICE TO GOD"

Regd. No. S/15226 Dated 21.10.74

P.O. Ramakrishnapur ❏ Dist. South 24 Parganas ❏ Pin : 743610. W.B.

A member-ashrama of South 24 Parganas District Ramakrishna-Vivekananda Bhava Prachar Parishad (advised by Ramakrishna Math, Belur Math, W. B.)

Kolkata Office :

6 Baroda Thakur Lane, Kolkata-700 007 ☎ : 218-1285

কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন ও একটি আবেদন

প্রিয় ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ,

আপনাদের অকুণ্ঠ সাহায্যে ইতিমধ্যেই পূর্বপরিকল্পিত অতিথিভবন, বৃদ্ধ সাধুভবন ও চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বৃদ্ধাশ্রম গড়ে উঠেছে। ৪০ বিঘা জমির ওপর ডায়মন্ডহারবার রেললাইনের ধারে দক্ষিণ দুর্গাপুরে ৫০ জন অনাথ বালকের (অনূর্ধ্ব ১৮ বছর) ভরণপোষণ ও শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে একটি বালকাশ্রমকে ঘিরে আমাদের এই সেবাপ্রচেষ্টা। ১৯৭৩ সালে স্বামী রমানন্দজী মহারাজ কর্তৃক (বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ-এর সম্পাদক) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও ১৯৭৪ সালে রেজিস্ট্রিকৃত হয় এই প্রতিষ্ঠান। আমাদের প্রেরণা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও ধর্ম—ত্যাগ ও সেবা। লক্ষ্য ব্যাপক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তৈরি। মানুষই আমাদের ভগবান।

এই উদ্দেশ্যে সুন্দরবনের অনগ্রসর দরিদ্র গ্রামে ও তপশিলী অঞ্চলে ১৮টি 'বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু-বিদ্যালয়' খোলা হয়েছে। আপনাদের সহৃদয়তায় আশা করি ১০০টি বিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব হবে।

আমাদের আগামী পরিকল্পনা ঃ—	**প্রয়োজনীয় দান**
১) বালকাশ্রমের অসম্পূর্ণ আবাসন ও দাতব্য চিকিৎসালয় সম্পূর্ণ করা	৭ লক্ষ টাকা
২) মোট ১০০টি বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশুবিদ্যালয় স্থাপন ও স্থায়ী পরিচালনার লক্ষ্যে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করে মাসিক সুদের মাধ্যমে ব্যয়নির্বাহ করা	৪০ লক্ষ টাকা
৩) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের স্পর্শপূত ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ৫০০ ভক্তের একসঙ্গে বসার উপযোগী প্রার্থনাগৃহ-সহ সর্বজনীন উপাসনালয় শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নির্মাণ	২০ লক্ষ টাকা

আশ্রমে দেওয়া অর্থ **M.O.** অথবা **A/c. Payee Cheque/Draft**-এর মাধ্যমে পাঠানোর ঠিকানা—**Sri Ramakrishna Sevashram, 6 Baroda Thakur Lane, Kolkata-700 007। A/c. Payee** চেক/ড্রাফট পাঠালে **'Sri Ramakrishna Sevashram'**-এর অনুকূলে পাঠাতে হবে। সেবাশ্রমে যেকোন আর্থিক দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সকল দানের প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে।

নমস্কারান্তে

স্বামী শুদ্ধানন্দ
অধ্যক্ষ

সুধাংশু বিশ্বাস
সম্পাদক



কার্যালয় ভিন্ন 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৩

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

বাংলাদেশ ❑ **রামকৃষ্ণ মিশন**, ঢাকা-৩

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ❑ **সত্যনারায়ণ রায়**, ৮২৫ ডেটন কোর্ট, কনকর্ড, সি. এ.-৯৪৫১৮, ই. মেল : satya_ray@yahoo.com

দিল্লি

- **রামকৃষ্ণ মিশন**, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নিউ দিল্লি-১১০০৫৫
- **পারমিতা ঘোষাল**, ৪০/১৮, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯
- **মঞ্জুলা ঘোষ**, ৯, শিবালিক অ্যাপার্টমেন্ট, অলকানন্দা
  নিউ দিল্লি-১১০০১৯, ফোন : (০১১) ৬২১-৮৪৭৪

আন্দামান

- **রামকৃষ্ণ মিশন**, পোর্ট ব্লেয়ার, পিন : ৭৪৪১০৪
  ফোন : (০৩১৯২) ৩২৪৩২

আসাম

- **রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম**, শিলচর
- **রামকৃষ্ণ মঠ**, করিমগঞ্জ
- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, রামকৃষ্ণ মিশন রোড
  উলুবাড়ি, গুয়াহাটি, জেলা : কামরূপ-৭৮১০০৭
- **রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, বনগাইগাঁও
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, তিনসুকিয়া-৭৮৬১২৫
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, মহাত্মা গান্ধী রোড, নগাঁও-৭৮২০০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, পোঃ হোজাই, নগাঁও-৭৮২৪৩৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, জি. এন. বি. রোড
  পোঃ দুম দুমা, জেলা : তিনসুকিয়া-৭৮৬১৫১
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**
  গোসাইগাঁও, জেলা : কোকড়াঝাড় (বি. এ. সি.)-৭৮৩৩৬০
- **পরিমলকৃষ্ণ পাল**
  প্রযত্নে মেসার্স মা কালী স্টোর্স, বি. জি. রেলওয়ে গেট
  পোঃ + জেলা : কোকড়াঝাড়-৭৮৩৩৭০
- **এম. কে. বুক সেলার্স**, পো : বি. চারালী, জেলা : শোণিতপুর
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, পূর্ণানন্দ রোড, ডিব্রুগড়-৭৮৬০০১
- **শান্তিকুমার রায়**
  শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (তেজপুর), জেলা : শান্তিপুর

ত্রিপুরা

- **রামকৃষ্ণ মিশন**, আগরতলা
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  পোঃ খোয়াই, লালছড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা-৭৯৯২০১
- **সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, উদয়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১২০
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম**
  পোঃ বিলোনিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১৫৫
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি**, রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি রোড
  ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা-৭৯৯২৫০

নাগাল্যান্ড

- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, ডিমাপুর-৭৯৭১১২

ওড়িশা

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, চক্রতীর্থ, পুরী
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার সমিতি**
  খটবিন সাহী, কটক-৭৫৩০০৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**, হামিরপুর, পোঃ রাউরকেল্লা-৭৬৯০০৩

অরুণাচল প্রদেশ

- **শ্যামল সিনহা রায়**
  সম্পাদক, বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল, নাহারলগন, ইটানগর

বিহার

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, রামকৃষ্ণ অ্যাভেনিউ, পাটনা-৮০০০০৪

ঝাড়খণ্ড

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**
  ১১, ১২ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ রোড, মোরাবাদি, রাঁচি-৮৩৪০০৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**
  সেক্টর-১বি, বোকারো স্টীল সিটি
- **রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি**
  বিষ্টুপুর, জামশেদপুর-৮৩১০০১
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**, ব্যাঙ্ক রোড, ধানবাদ
- **রীতা ভট্টাচার্য**, 'অনুভব', এইচ. ই. স্কুল রোড, হীরাপুর,
  ধানবাদ-৮২৩৬৮৮

উত্তরপ্রদেশ

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, পোঃ নিরালানগর, লখনৌ-২২৬০২০

মধ্যপ্রদেশ

- **রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**
  কোয়ার্টার নং ৫০৭, (এস. এস.)/২, বাচেলি, জেলা : বস্তার

অন্ধ্রপ্রদেশ

- **পি. কে. মুখোপাধ্যায়**, চীফ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)
- **এম. কে. পাল**, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)
  ও. এন. জি. সি., কে. জি. পি
  ডি. নাম্বার : ৪৬-৭-৩৫, দানাভাইপেটা, রাজমুন্দ্রি-৫৩৩১০৩

মহারাষ্ট্র

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, রামকৃষ্ণ মিশন মার্গ, খার, মুম্বাই-৪০০ ০৫২
- **প্রদীপচন্দ্র পাল**, 'গুরুধাম', ই-২৮, আর. এইচ.-১, সেক্টর-৮
  বাসী, নবী, মুম্বাই-৪০০৭০৩
- **মহুয়া দাশগুপ্তা**, ৮-এ/১১, বৃন্দাবন সোসাইটি, থানে-৪০০৬০১

গুজরাট

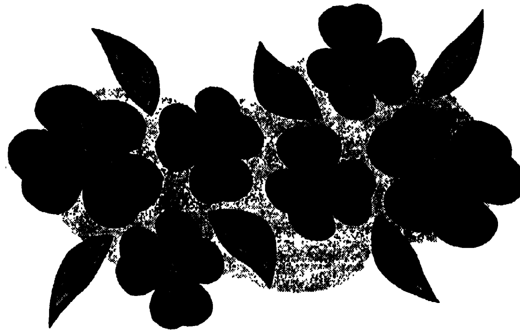
- **সলিলচন্দ্র ঘোষ**, সি-৩-৫০১, ও. এন. জি. সি. কলোনী
  আমেদাবাদ-৩৮০০০৫
- **মীরা মিত্র**, প্রযত্নে জি. সি. মিত্র
  ৩/৮২, জি. আর. টাউনশিপ, জওহরনগর, বরোদা-৩৯১৩২০
- **মোহিতরঞ্জন দাস**, ৫০৩, নর্মদা টাওয়ার্স
  ও. এন. জি. সি. কলোনী, পোঃ আঙ্কলেশ্বর-৩৯৩০১০
- **প্রভাত মুখার্জী**, সাইকৃপা অ্যাপার্টমেন্ট
  সিভিল হাসপাতাল রোড, নানকওয়াড়া, ভালসাড-৩৯৬০০১
  ফোন : ০২৬৩২/৪২৩৭৩
  ই. মেল : dr.pulak@ad1.vsnl.net.in

সৌজন্যে
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ
৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯



All the secret of success is there : to pay as much attention to the means as to the end.

Swami Vivekananda



With Best Compliments From

DATTA FOOTWEAR INDUSTRIES PVT. LTD.

Regd. Office & Factory :

1, BIDHAN SARANI, KOLKATA-700 073

PHONE : 241-5248 ❑ FAX : (033) 241-7541

Unit-II

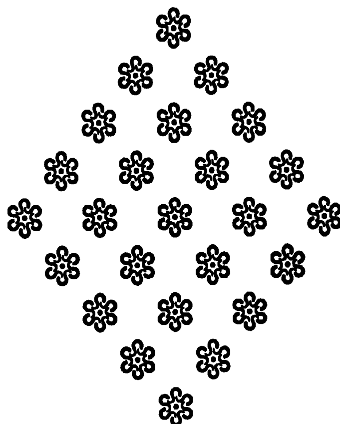
180, EAST SINTHI ROAD, KOLKATA-700 030

PHONE : 548-4500

With Best Compliments From :

H. K. GHOSE & CO.

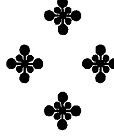
Paper Merchants & Exercise Book Makers



WARDLEY HOUSE
25A, SWALLOW LANE, KOLKATA-700 001
PHONE : 220-5209

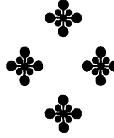
রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে যায়। অবতারেরাও সেইরকম সহস্র সহস্র লোকেদের ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ



মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার দিকে এগোতে চায় না। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আন্তরিক খুব যত্ন ও রোখ চাই।

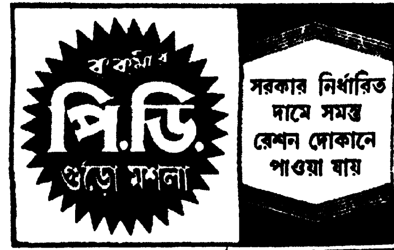
শ্রীমা সারদাদেবী



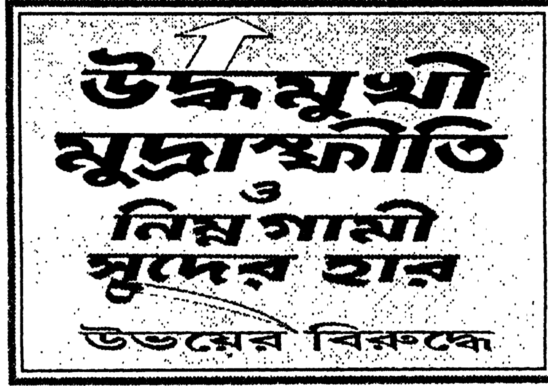
যে-দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয়, সে-দেশ ক্রমশ ধর্মহীন হইয়া দাঁড়ায়। ভারতে কখনো এরূপ চেষ্টা হয় নাই। সেইজন্য এখানে প্রকৃত ধর্মভাব এখনো জাগ্রত।

স্বামী বিবেকানন্দ





শক্তিশালী প্রতিরক্ষা



পিয়ারলেস এনক্যাশ বন্ড

২½ বৎসর মেয়াদী একটি ফিক্সড ডিপোজিট যোজনা

ব্যক্তি, বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, ট্রাস্ট, কো-অপারেটিভ সোসাইটি - সকলের জন্যই
বাজারের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় প্রকল্প

ভারতবর্ষের যেকোনো ব্রাঞ্চে ভাঙ্গানো যায়

মেয়াদ	সুনিশ্চিত ক্রমবর্দ্ধমান প্রাপ্তি	জমারাশি
২½ বৎসর	• ১ম বৎসর - ৮.৫% • ২য় বৎসর - ৯.৫% • ২য় বৎসরের পর - ১০.৫%	ন্যুনতম : ১০,০০০ টাকা এবং ৫,০০০ টাকার গুণিতকে যেকোনো উর্দ্ধরাশি

মূল বৈশিষ্ট্যগুলি :

- গ্যারান্টীযুক্ত ক্রমবর্দ্ধমান প্রাপ্তি
- ২ মাস পরে ঋনের সুবিধা (জমারাশির ৭৫% পর্য্যন্ত)
- ১২ মাস পরে যেকোনো সময় টাকা তোলার সুবিধা
- বিনামূল্যে দূর্ঘটনাজনিত মৃত্যুবীমার সুযোগ (ব্যক্তির ক্ষেত্রে) *
- বিনামূল্যে পিয়ারলেস সেভিংস কার্ড * — যা থাকলে ২২০০ টিরও বেশী সংস্থা দিচ্ছে তাদের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয়ে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট

* শর্তসাপেক্ষে

ম্যাচিওরিটি দাবীপূরণের মোট পরিমাণ : প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকা

বিশদ জানতে আপনার নিকটবর্তী যেকোনো পিয়ারলেস অফিসে যোগাযোগ করুন



® পিয়ারলেস

সঞ্চয়ের সহজ পথ
★
আস্থার প্রতীক

Estd. 1932

Website-http://www.peerless-in-india.com

গত আর্থিক বৎসরে
নতুন গ্রাহক সংখ্যা : প্রায় ২০ লক্ষ

ARUN SIGN · PGFI

This is further to the statutory advertisement published in THE ASIAN AGE on 10.04.2001

UDBODHAN
Phone : 554-2248, 554-2403
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com

Vol. 103 ❑ No. 7
❑ JULY 2001 ❑

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No. TECH/WB/RNP-15/LPWP-01/2001

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Regn. No. TECH/WB/RNP-15/2001

উদ্বোধন

১০৩তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র



❑ গত ১লা মাঘ ১৪০৭ (১৫ জানুয়ারি ২০০১) **উদ্বোধন ১০৩তম বর্ষে** পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় **নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব** নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের **১০২ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম** ❑

❑ **বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন** একটি ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র মাত্র নয়, **উদ্বোধন** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। **ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের** সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের** একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তে হবে।

❑ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে **উদ্বোধন** নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন** একটি সার্থক **পারিবারিক পত্রিকা**। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন** এ প্রকাশিত হয়।

❑ **উদ্বোধন** শুধু **বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা নয়**, উদ্বোধন **বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ পত্রিকা এবং বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক পত্রিকা।**

❑ ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র হয়েও **উদ্বোধন** তার মহান প্রবর্তকের নির্দেশ অনুসারে **কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আদর্শের মুখপত্র নয়। উদ্বোধন** তার **সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বিগত ১০২ বছর** ধরে অটুট রেখেছে।

❑ **উদ্বোধন**-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি **মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের** সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

❑ **উদ্বোধন** একটি পত্রিকা মাত্র নয়, **উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী** এবং **স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর।**

❑ **স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে। উদ্বোধন-এর প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে গ্রাহক করলেই** এখনি **উদ্বোধন-এর গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি** হাজার হয়ে যায়। তাই আপনার **নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করাও আপনার কাছে স্বামীজীর প্রত্যাশা।** স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের **গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের।** অবশ্য **ইন্টারনেট সংস্করণের** মাধ্যমে **উদ্বোধন আজ ভারত ও বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ঘরে ঘরে** পৌঁছে গিয়েছে।

❑ **স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।** সেকথা স্মরণ করে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে অনুরাগী ও ভক্তগণ **উদ্বোধন-এর** প্রতি নিশ্চয়ই তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

❑ **উদ্বোধন-এর শারদীয়া** সংখ্যাটির জন্য **গ্রাহকদের থেকে আলাদা মূল্য নেওয়া হয় না।** এই সংখ্যাটি গ্রাহকদের জন্য আমাদের **শারদ উপহার।** প্রসঙ্গত সকলের অবগতির জন্য জানাই যে, **শারদীয় সংখ্যাটি** আকারে সাধারণ সংখ্যার **তিনগুণ** এবং **বিশেষ সংখ্যা** হওয়ায় অলঙ্করণের জন্য খরচও হয় যথেষ্ট। **গত কয়েক মাসে কাগজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং অন্যান্য ব্যয়বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শারদীয়া সংখ্যা সহ গ্রাহক পিছু আমাদের বার্ষিক খরচ দাঁড়িয়েছে মুদ্রিত গ্রাহকমূল্যের সওয়া তিন গুণ।** বিশাল অঙ্কের এই অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য আমরা নির্ভর করি সহৃদয় বিজ্ঞাপনদাতাদের সক্রিয় সহযোগিতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক বদান্যতার ওপর।

❑ **পত্রিকা প্রকাশ** সংক্রান্ত ব্যয় প্রতি বছর বেড়ে গেলেও তিন বছর **(১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০১) 'উদ্বোধন'** এর গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। **এত সুলভ মূল্যে এমন সম্পূর্ণ পত্রিকা বাঙলা ভাষায় আর একটিও নেই।**

❑ **উদ্বোধন**-এর সেবায় তিনটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি **'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল'**, অন্য দুটি যথাক্রমে **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** এবং **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'। উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 'Ramakrishna Math, Baghbazar'**—এই নামে পাঠাবেন। **ঠিকানা : সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।** দাতার চিঠিতে **বা M.O** কুপনে উদ্বোধন পত্রিকার সেবায়' অথবা **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** অথবা **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'**-এর জন্য যেন লেখা থাকে।

❑ **উদ্বোধন-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে** মতিলাল-তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাঁদের পুত্রকন্যাদের পক্ষে **স্থায়ী ভিত্তিতে 'উদ্বোধন** মেধা সম্মান' **(একবছরের জন্য উদ্বোধন-এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি)** নিবেদিত হয়েছে। **পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের** যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। **২০০১ সালের** জন্য অনুরূপ **সম্মান** সুকুমার-বিভারানী **পাড়ুই**-এর স্মৃতিতে তাঁদের পুত্র অমর পাড়ুই নিবেদন করেছেন। **এই সম্মানপ্রাপকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্ষদ পরিচালিত ২০০০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় 'সম্মান'-এর জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বোধন-সম্পাদকের** সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বামী সর্বগানন্দ
সম্পাদক

সৌজন্যে

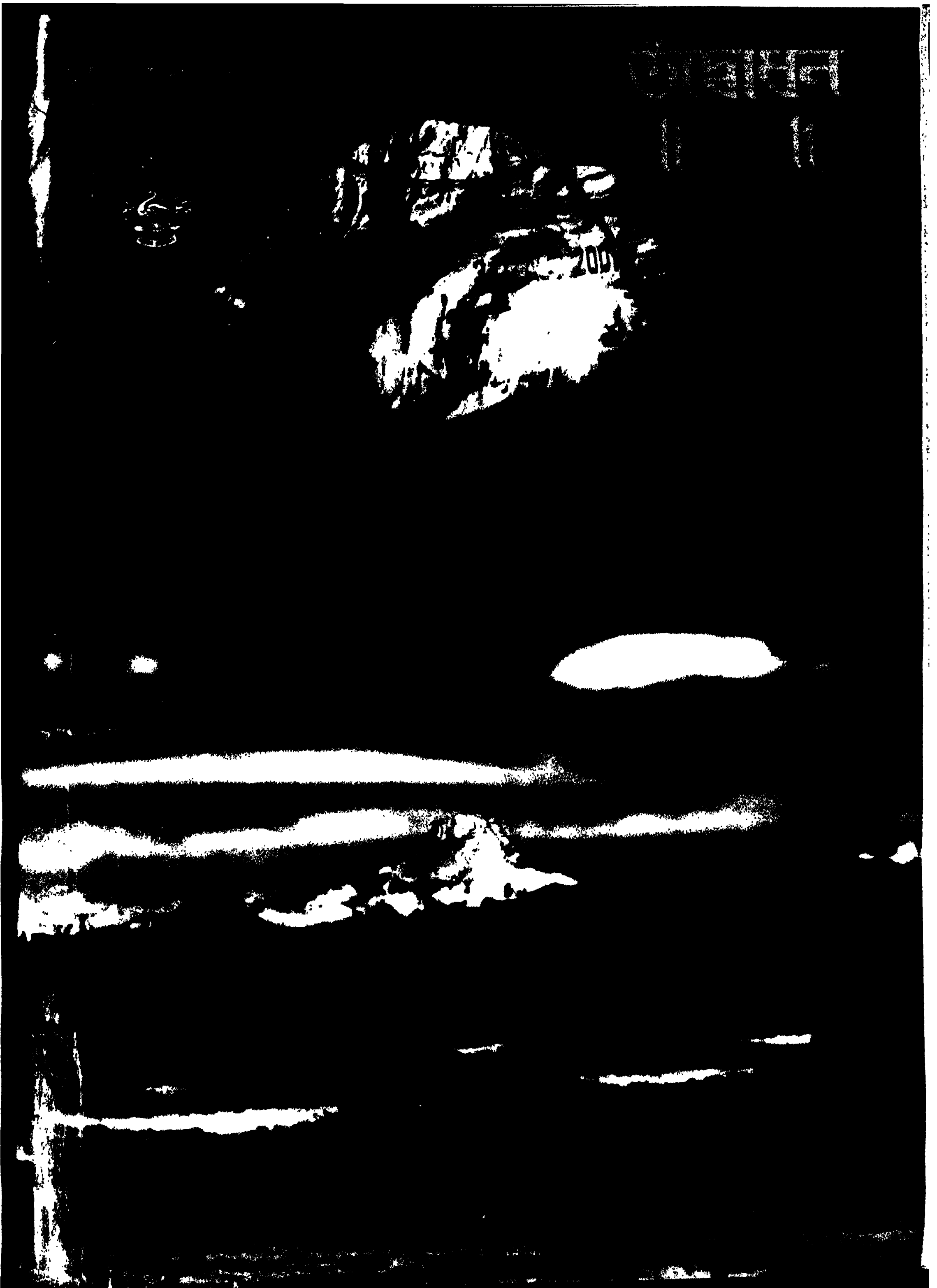
পি. বি. সরকার অ্যান্ড সন্স

(কোন ব্রাঞ্চ নেই)

জুয়েলার্স

সন অ্যান্ড গ্র্যান্ড সন্স অব লেট বি. সরকার

৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০ ❑ ফোন : ২২৩-৮৭১৩, ২২৩-৭৫৭৮





"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

আনন্দবাজার পত্রিকা

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

আপনার শিশুকে দেওয়ার মতো সেরা উপহার - ভবিষ্যতের সুরক্ষা।



শিশুদের জন্যে এলআইসি'র পলিসিসমূহ

আপনার শিশুকে এমন একটা উপহার দিন যেটা সারাজীবনের জন্যে হবে স্নেহভরা প্রতিপালন। আপনার শিশুকে সঠিক সময়ে উপযুক্ত ধরণের সহায়তা প্রদান করতে শিশুদের জন্যে আমাদের যেকোনও পলিসি থেকে একটা বেছে নিন।

প্ল্যান	সারণী নং	শিশুর বয়স (বছর)	ন্যূনতম সঞ্চয় পরিমাণ	প্রিমিয়াম প্রদেয়র অন্তরকাল
চিলড্রেন্স ডেকার্ড এনডোউমেন্ট (লাভ সহিত)	41 50	0 - 17 0 - 14	20,000/-	বার্ষিক, ষান্মাষিক, ত্রৈমাসিক, মাসিক
জীবন বাল্য (লাভ সহিত)	101	0 - 17	25,000/-	- ঐ -
জীবন কিশোর (লাভ সহিত)	102	1 - 12	20,000/-	- ঐ -
জীবন সুকন্যা (কেবলমাত্র শিশুকন্যার জন্যে) (লাভ সহিত)	109	1 - 12	20,000/-	- ঐ -
মানি ব্যাক চিলড্রেন্স অ্যাসুরেন্স প্ল্যান (লাভ রহিত)	113	0 - 10	40,000/-	বার্ষিক, ষান্মাসিক, ত্রৈমাসিক, এসএসএস
বাল বিদ্যা (লাভ রহিত)	135	0 - 12	25,000/-	একক প্রিমিয়াম

অধিক বিবরণের জন্যে, আপনার নিকটবর্তী এল আই সি শাখাতে বা এজেন্টের সংগে যোগাযোগ করুন।



লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া
Please visit : www.licindia.com

Insurance is the subject matter of the solicitation



রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ

পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া-৭১১ ২০২, ফোন ঃ ৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২

সারদাপীঠ থেকে প্রকাশিত অডিও ক্যাসেটসমূহ

মূল্য ❑ SP-1 ও SP-31-34 ঃ ৩৫ টাকা, অন্যান্য ঃ ৩০ টাকা

SP-1	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্	সংস্কৃত ও বাঙলা
SP2, SP-7, SP-8, SP-10 হইতে 12	কথামৃতের গান (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড)	বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি
SP-3	শ্রীরামনামসংকীর্তন	সংস্কৃত ও হিন্দি
SP-4	বক্তৃতা—যুগপুরুষ	বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত
SP-5	শ্রীশ্রীচণ্ডীস্তব (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ)	বাঙলা, সংস্কৃত
SP-6	শিবমহিমা	বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি
SP-9	শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি
SP-13	শ্রীসারদাবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা
SP-20	বিবেকানন্দবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা
SP-24	শ্রীকৃষ্ণবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি
SP-14 হইতে SP-16	কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)	বাঙলা
SP-17	বীরবাণী	সংস্কৃত, বাঙলা, ইংরেজী ও হিন্দি
SP-18	গীতিবন্দনা	হিন্দি
SP-19	বক্তৃতা—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান	বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত
SP-21 ও SP-22	সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড)	হিন্দি
SP-23	ওঠো জাগো	হিন্দি
SP-25	শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি	হিন্দি
SP-26	বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি	হিন্দি
SP-27	বেদমন্ত্র	সংস্কৃত উপনিষদের মন্ত্রসমূহ
SP-28	সরস্বতী বন্দনা	বাঙলা, সংস্কৃত
SP-29	**Ramakrishna Movement**	Lecture by Revered Srimat Swami Bhuteshanandaji Maharaj
SP-30	**Religion in Practice**	do
SP-31 হইতে SP-34	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ) (১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড)	মূল সংস্কৃত এবং প্রতি অধ্যায়ের মুখবন্ধ
SP-35	আগমনী	বাঙলা
SP-36	ভজন সুধা	হিন্দি

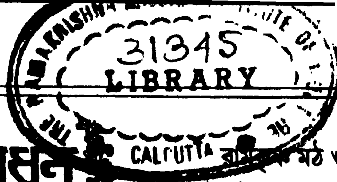
শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্, শ্রীরামনামসংকীর্তন ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার C. D. প্রকাশিত হয়েছে।

স্বামী সর্বগানন্দ, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ, স্বামী দিব্যব্রতানন্দ, শ্রীমহেশরঞ্জন সোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য দক্ষ শিল্পিগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন।

Video Cassette:
Centenary Celebration of the Ramakrishna Mission at Belur Math in 1998.
Duration—80 minutes
Rs. 250.00

প্রাপ্তিস্থান ঃ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি (কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক)

ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে M.O. অথবা Bank draft মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে।


31345
LIBRARY
CALCUTTA

30 AUG 2001

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

উদ্বোধন ॥১০৩॥

সূচীপত্র | ১০৩তম বর্ষ | ৮ম সংখ্যা | ভাদ্র ১৪০৮ | আগস্ট ২০০১

প্রচ্ছদ ❑ ওপরে কৈলাস, নিচে মানস সরোবর। মানস সরোবরে সন্তরণরত হংসযুগল—লোকবিশ্বাসে, হর-পার্বতী।

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'
প্রচ্ছদ ❑ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ ❑ আলোকচিত্র : বেলুড় মঠের জনৈক সন্ন্যাসী
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ : ৬৫ টাকা; সডাক : ৭৫ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য : ৮ টাকা ❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) : ৩০০০ টাকা [একবছরের মধ্যে পরিশোধ্য কমপক্ষে ৫০০ টাকা প্রতি কিস্তি হিসাবে ৬টি কিস্তিতেও প্রদেয়]



'উদ্বোধন' ঃ আশ্বিন (শারদীয়া) ১৪০৮ সংখ্যা

গ্রাহকদের জন্য জরুরী বিজ্ঞপ্তি

- যথারীতি নানা গুণিজনের রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে এবারেও **'উদ্বোধন'-এর আশ্বিন/সেপ্টেম্বর (শারদীয়া)** সংখ্যা প্রকাশিত হবে। **মূল্য ঃ ৪০ টাকা।**
- **'উদ্বোধন'**-এর গ্রাহকদের এই সংখ্যার জন্য **আলাদা মূল্য দিতে হবে না।** গ্রাহকরা ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে অগ্রিম টাকা জমা দিলে **অতিরিক্ত** প্রতি কপি **৩০ টাকায় পাবেন। অতিরিক্ত** কপি রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিলে **পাঠানোর খরচ বাবদ অতিরিক্ত ২২ টাকা (প্রতি কপির ডাকমাশুল) জমা দিতে হবে।** কপিটি অগ্রিম জমার ক্যাশমেমো দেখিয়ে **২৭ সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে ৫ অক্টোবর ২০০১ পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা যাবে।
- **শারদীয়া সংখ্যাটির ডুপ্লিকেট কপি দেওয়া সম্ভব নয়। তাই সাধারণ ডাকে আমরা পাঠাতে চাই না।**
- **ডাকযোগে (By Post)** যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁরা **ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করতে চাইলে **২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে কার্যালয়ে অবশ্যই জানাবেন। শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহের সংবাদ টেলিফোনে গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে কোন সংবাদ কার্যালয়ে না পৌঁছালে তাঁদের পত্রিকা সাধারণ ডাকযোগেই (By Post) যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হবে।**
- **যাঁরা ডাকযোগে (By Post) পত্রিকা নেন, তাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি রেজিস্ট্রি ডাকে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রতি কপির জন্য অতিরিক্ত ২২ টাকা পাঠাতে হবে। তবে ঐ সংক্রান্ত সংবাদ এবং ২২ টাকা গ্রাহকের নাম ও গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ-সহ ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে অবশ্যই কার্যালয়ে এসে পৌঁছানো প্রয়োজন।**
- আমাদের **গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রগুলির** মাধ্যমে যাঁরা সডাক গ্রাহক **হয়েছেন/নবীকরণ করেছেন,** তাঁরা শারদীয়া সংখ্যাটি **ঐ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে** সংগ্রহ করতে চাইলে **সংশ্লিষ্ট গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্রগুলিতে ২০ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে সেই সংবাদ জানাতে হবে, যাতে আমাদের কাছে ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে তারা সংবাদটি দিতে পারে।**
  - মনে রাখবেন, শারদীয়া সংখ্যাটি **ব্যক্তিগতভাবে (By Hand) সংগ্রহ** করার সংবাদ কার্যালয়ে জানানোর সময় **গ্রাহকের নাম এবং গ্রাহকসংখ্যার উল্লেখ আবশ্যিক। উল্লেখ না থাকলে অথবা কোন একটিমাত্র উল্লেখ করলে সংবাদটি গ্রাহ্য হবে না।**
  - প্রতি **বছরই জ্যৈষ্ঠ (মে) সংখ্যা থেকে এই বিজ্ঞপ্তি** দেওয়া **সত্ত্বেও অনেক গ্রাহক নির্ধারিত তারিখের পরে** জানান এবং তাঁদের অনুরোধ নথিভুক্ত করতে পীড়াপীড়ি করেন। **আমরা বিশেষভাবে জানাচ্ছি, নির্ধারিত তারিখের পর কোন অনুরোধ এলে আমাদের পক্ষে তা রক্ষা করা সম্ভব হবে না।** আশা করি, গ্রাহকদের সহৃদয় সহযোগিতা আমরা এবিষয়ে পাব।
  - **কিছু অসৎ ব্যক্তি** কোন কোন **গ্রাহকের** নাম ও **গ্রাহকসংখ্যা** কোনভাবে **সংগ্রহ** করে **সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের শারদীয়া সংখ্যা** সংগ্রহ করতে আসেন এবং করেন। সেজন্য সমস্ত গ্রাহক-গ্রাহিকা যাঁরা **শারদীয়া সংখ্যাটি ব্যক্তিগতভাবে (By Hand)** সংগ্রহ করবেন [২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৫ অক্টোবর ২০০১-এর মধ্যে], তাঁদের **বিশেষভাবে** জানানো হচ্ছে যে, **শারদীয়া সংখ্যাটি সংগ্রহ করার সময় তাঁদের নবীকরণ/ গ্রাহকভুক্তির 'ক্যাশমেমো'/M.O. প্রাপ্তি-কুপন/আজীবন গ্রাহকভুক্তির 'ফাইনাল পেমেন্ট'-এর রসিদটি সঙ্গে নিয়ে আসতে হবে।**
  - **যদি ক্যাশমেমো/রসিদ/M.O. প্রাপ্তি-কুপন হারিয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ২৪ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে সেই মর্মে সম্পাদকের কাছে তা লিখিতভাবে জানিয়ে সংগ্রহের অনুমতি নিতে হবে। নতুবা আমাদের পক্ষে তাঁদের পত্রিকা দেওয়া সম্ভব হবে না।** আশা করি, গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ অনুগ্রহ করে **এব্যাপারে আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।**
  - **একান্ত অসুবিধা থাকলে ২০ অক্টোবরের মধ্যে অবশ্যই নেবেন, নতুবা ঐ সংখ্যা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা থাকবে না।**
- **কার্যালয় কাজের দিন (সোম-শুক্র) সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৫.৩০ মিঃ পর্যন্ত এবং শনিবার বেলা ১-৩০ মিঃ পর্যন্ত খোলা, রবিবার বন্ধ থাকে।**
- **১৭ সেপ্টেম্বর মহালয়া এবং ২৩ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর ২০০১ পর্যন্ত দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয় বন্ধ থাকবে। পূজাবকাশের পর ২ নভেম্বর ২০০১ শুক্রবার কার্যালয় খুলবে।**

সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইন্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯



30 AUG 2001

দিব্য বাণী

ত্রিগুণাত্মিকা মহাশক্তি

সন্দেহোঽত্র মহাভাগ কথায়াস্তু মহাদ্ভুতঃ।
বেদশাস্ত্রপুরাণৈশ্চ নিশ্চিতস্তু সদা বুধৈঃ।।

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ত্রয়ো দেবাঃ সনাতনাঃ।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্ ব্রহ্মাণ্ডেঽস্মিন্মহামতে।।

ব্রহ্মা সৃজতি লোকান্ বৈ বিষ্ণুঃ পাত্যখিলং জগৎ।
রুদ্রঃ সংহরতে কালে ত্রয় এতেঽত্র কারণম্।।

একা মূর্তিস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
রজঃসত্ত্বতমোভিশ্চ সংযুতাঃ কার্যকারকাঃ।।

তেষাং মধ্যে হরিঃ শ্রেষ্ঠো মাধবঃ পুরুষো[illegible]
আদিদেবো জগন্নাথঃ সমর্থঃ সর্বকর্মসু।।

কঃ সন্দেহং ছিনত্ত্যেনং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
মুহ্যন্তি মুনয়ঃ কামং ব্রহ্মপুত্রাঃ সনাতনাঃ।।

দেবেষু বিষ্ণুঃ কথিতঃ সর্বগঃ সর্বপালকঃ।
যতো বিরাড়িদং সর্বমুৎপন্নং সচরাচরম্।।

শিবোঽপি শবতাং যাতি কুণ্ডলিন্যা বিবর্জিতঃ।
শক্তিহীনস্তু যঃ কশ্চিদসমর্থঃ স্মৃতো বুধৈঃ।।

তে বৈ শক্তিং পরাং দেবীং ব্রহ্মাখ্যাং পরমাত্মিকাম্।
ধ্যায়ন্তি মনসা নিত্যং নিত্যাং মত্বা সনাতনীম্।।

ঋষিগণ বলিলেন—হে সূত (ব্যাসশিষ্য), হে মহাভাগ, তোমার কথায় এক মহাসন্দেহ উদ্ভূত হইল। কারণ, বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্রবচনানুসারে জ্ঞানিগণ নিশ্চিত জানেন যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই দেবত্রয়ই সনাতন। এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ইঁহাদিগের অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই। ব্রহ্মা প্রাণীদের সৃজন, বিষ্ণু অখিল জগৎকে পালন এবং মহেশ্বর সকলকে সংহার করিয়া থাকেন। ইঁহারাই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কারণ। ইঁহারাই [illegible] রজঃ, সত্ত্ব ও তমোগুণ যুক্ত হইয়া স্ব-স্ব [illegible]ন। ইঁহাদিগের মধ্যে আবার কমলাকান্ত, [illegible]ত্তম আদিদেব শ্রীজগন্নাথ হরিই শ্রেষ্ঠ; কারণ তিনি সর্বকর্মে সক্ষম।

[illegible]শ্রবণে সূত কহিলেন—হে মুনিসত্তমগণ, ত্রিলোকমধ্যে এই সন্দেহ ছেদন করেন এমন কেহই নাই। এমনকি, ব্রহ্মাপুত্র সনাতনাদি মুনিগণও এবিষয়ে সন্দিগ্ধ। কেহ কেহ ভগবান বিষ্ণুকেই সর্বব্যাপী, সর্বপালক ও সর্বদেবগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করেন। কারণ, তাঁহা হইতে এই বিশ্বচরাচর উৎপন্ন হইয়াছে। জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যিনিই হউন, শক্তিহীন হইলে কোন কার্যে সক্ষম হন না। এমনকি শিবও কুলকুণ্ডলিনী শক্তিবিহীন হইলে শবত্বপ্রাপ্ত হন। দেবগণ সেই পরাৎপরা পরমাত্মিকা ব্রহ্মময়ী দেবীশক্তিকেই নিত্যা, সনাতনী জানিয়া সতত মনে মনে তাঁহারই ধ্যান করিয়া থাকেন।

[দেবীভাগবতম্, ১ম স্কন্ধ, ৮ম অধ্যায়]

[redacted]

তোমার পূজার ছলে...

('শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী' উপলক্ষ্যে বিশেষ সম্পাদকীয়)

—প্রেম চাই, প্রেম। প্রেম নিবে গো? প্রেম আছে।

উচ্চৈঃস্বরে পসারি মাথায় করিয়া ঝুড়িভর্তি প্রেম লইয়া ফিরিতেছে পল্লীর পথে পথে। কেহ বা উৎকর্ণ হইয়া দূর হইতে শুনিতেছে। কেহ তাচ্ছিল্যভরে জানালার ফাঁক দিয়া দেখিয়া ভাবিতেছে,

—এ আবার কী ফেরি করে গো!

সহসা নিকটবর্তী গৃহের দরজা খুলিয়া একটি যুবক বাহিরে আসিল।

—দাম কত? আমাকে দু-ছটাক প্রেম দিতে পার?

ফেরিওয়ালা মাথার ঝুড়ি মাথাতেই রাখিয়া বলিল,

—কাঁচা মাথা! দু-ছটাক প্রেমের দাম সদ্যশ্ছিন্ন কাঁচা মাথা।

অর্থাৎ যাহার জীবনটি ঈশ্বরার্থে উৎসর্গিত হইয়াছে—সে-ই প্রেমের যথার্থ অধিকারী। অহং-এর লেশমাত্রও থাকিলে ঈশ্বরের প্রতি যথার্থ প্রেম সম্ভব নহে। মাদ্রদহে কোন এক ধর্মসভায় স্বামী প্রেমানন্দজী একদা ভক্তদের এই গল্পটি বলিয়াছিলেন।

ভক্তি দুই প্রকারঃ বৈধী ভক্তি, রাগানুগা ভক্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, রাগানুগা ভক্তি বা রাগ-ভক্তি থাকিলে 'ভাব' হয়। ভাব পাকিলে 'মহাভাব'। মহাভাবের পর প্রেম। একদিন কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর বলিলেনঃ

—তোমরা প্রেম প্রেম কর। প্রেম কি সহজ জিনিস গা? চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল।

অতএব যদি প্রশ্ন উঠে, ঝুড়িতে লইয়া প্রেম কে বেচিতে পারে? সহজ উত্তর। স্বয়ং প্রেমস্বরূপ জগৎকারণ ঈশ্বর যখন নরদেহ ধারণ করিয়া আসেন, তিনিই তাহা করিতে সমর্থ। কিন্তু শর্ত হইল—কাঁচা মাথা চাই। চাই নিজেকে নিঃশেষে ঈশ্বরপাদপদ্মে বিকাইয়া দিবার 'হিম্মৎ'।

সেই সাহস কাহারো আছে কী?

যদি থাকে, স্বাগতম্, সুস্বাগতম্।

* * * * *

তত্ত্ব পরে বুঝিব। তাহার পূর্বে আসুন একবার মথুরা-বৃন্দাবন ঘুরিয়া আসি।

এক এক করিয়া সাতটি নবজাতককে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া নিষ্ঠুর কংস নিজ ভগিনী দেবকীর নিকট এক মূর্তিমান আতঙ্কে পরিণত হইল। কংসের কারাগারে নিজেদের সম্পূর্ণ অসহায় জানিয়াও অষ্টম গর্ভের সন্তানটিকে রক্ষা করিতেই হইবে—এমন এক দৃঢ় ইচ্ছা ও প্রত্যয় দেখা যাইল দেবকী ও বসুদেবের চিন্তায় ও আচরণে। এবং ইহাও সত্য যে, অলৌকিক কিছু না ঘটিলে অষ্টম গর্ভের সন্তানটিকে রক্ষা করা নিতান্তই অসম্ভব। অতঃপর কী ঘটিল সকলেরই জানা আছে। একদিকে যশোদার কন্যাসন্তান, অপরদিকে দেবকীর পুত্রসন্তান লাভ। কারাগারে যোগমায়ার প্রভাবে রক্ষিগণ নিদ্রাভিভূত। প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও বসুদেব নিজের কাজ সারিলেন। ঈশ-প্রত্যাদেশে শিশু-বদল নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইল। নির্বোধ কংস বুঝিয়াও বুঝিল না—'তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে'।

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনানুযায়ী শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্বে ও পরে চরাচর বিশ্বপ্রকৃতি যেন অপরূপা উচ্ছলা হইয়া সর্বত্র শ্রীভগবানের বন্দনায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীভগবান স্বীয় যোগমায়াকে অবলম্বনপূর্বক যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। সেই যোগমায়ার আকর্ষণে গোটা বিশ্ব যেন দুলিতে থাকে। 'গাভী ধায় বৎসের পিছে, আর গোপী ধায় কৃষ্ণপানে'। কী এক মহা আকর্ষণে উদ্বেল হইয়া উঠে পশু-পক্ষী, বৃক্ষরাজি, আকাশ-বাতাস, পর্বত-নদী। বৃন্দাবনবাসীর তো কৃষ্ণ বিনা আর অন্য কথাই নাই! মা যশোদার অন্তরে কোথা হইতে এক বিশ্বমাতৃত্ব আসিয়া জুটিল কে জানে! সদাই তিনি বিব্রত। যত আনন্দ, কষ্টও তত। নন্দ ঘোষের তো 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। জগতে আর কেহই তাঁহার পর নহে। এত কথা, এত ঘটনা যে বলিয়া ফুরায় না।

এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে অনুরূপ ঘটনাবলীর বর্ণনা পাই স্বামী সারদানন্দ-কৃত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে। সেই সময়ে মধু বসন্তের মলয় পবনে প্রকৃতি হইয়াছিল সলজ্জা, সাভরণা, উৎসারিত-নবজীবন-নির্ঝর। কামারপুকুরবাসীর হৃদয়ে কোন আনন্দের হিল্লোল সর্বদা বহিয়া যাইত, তাহারা সন্ধান করিয়াও তাহার হদিস পাইত না। কেন যে সহসা চন্দ্রমণির হৃদয়ে এক বিশ্বমাতৃত্ব ভর করিল, তাহার ব্যাখ্যা ক্ষুদিরামও পান নাই। একদিন জগৎকারণ ঈশ্বরের আগমন-সংবাদ সূচিত করিতে আসিলেন স্বয়ং চতুর্মুখ ব্রহ্মা। এ কোন কল্পকাহিনী নহে। ক্ষুদিরাম-জায়া সজ্ঞানে




স্বচক্ষে দেখিলেন, হাঁসে-চড়া চতুর্মুখ রক্তবর্ণ দেবতা গৃহের সম্মুখে আবির্ভূত। সরলা গ্রাম্য মহিলা তখন এক দিব্যমাতৃত্বের তাড়নায় আকুল হইয়া বলিলেন ঃ

—ও হাঁসে-চড়া ঠাকুর, বাবা রোদে পুড়ে লাল হয়েছ, এস দুটো পান্তা খেয়ে যাও।

অলৌকিক ঘটনাসমূহের ভূয়ো নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনে যেমন পাওয়া যায়, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে ততখানি না হইলেও বেশ কিছু ঘটনাবলী দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরের অবতারের আবির্ভাবের তাৎপর্য লুক্কায়িত আছে বলিয়া আমরা দাবি করিতে পারি না।

প্রকৃত তাৎপর্য নিহিত থাকে প্রেমস্বরূপ শ্রীভগবানের নরলীলায় মানবপ্রেমের বিকিরণে, দুঃখসাগরে নিমজ্জমান মানবকুলের প্রতি অনন্ত সহানুভূতির সম্যক অভিব্যক্তির মধ্যে। বঙ্গদেশে বার মাসে তের পার্বণ। বাংলার ঘরে ঘরে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উদ্‌যাপিত হয়। কিন্তু উৎসবের আনন্দ উৎসবেই নিবদ্ধ থাকিয়া যায়। বিশ্বকবির ভাষায়— 'তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি'। তবে ভক্তের হৃদয়ে নিত্য উৎসব। "অদ্যাপিও নিত্যলীলা করে গোরা রায়/ কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়।" বাহিরের দারিদ্র্য, সংসারজ্বালা ভক্তকে স্পর্শ করে না। কখনো কখনো অপরে ভুল বুঝিয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তবরিষ্ঠ সাধু নাগমহাশয়ের জীবনে আমরা দেখিয়াছি কত গঞ্জনা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে। ভিতরে, বাহিরে। এমনকি কিছু না বুঝিয়া সাধারণ মানুষ অবতার-পুরুষের চরিত্রেও স্বার্থপরতাদি দোষ আরোপ করিয়া থাকে। গীতায় শ্রীভগবান বলিলেন ঃ "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।" (৯।১১) অর্থাৎ, আমার স্বরূপ না জানিয়া মূঢ় ব্যক্তিগণ নররূপধারী আমাকে অবজ্ঞা করে। জীবের দুঃখে অসহিষ্ণু হইয়া যে চিৎ-স্বরূপ, আনন্দ-স্বরূপ শ্রীভগবান্ অখণ্ড ব্রহ্মাবস্থান ত্যাগ করিয়া ধরায় অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাঁহার এক কণিকামাত্র প্রেম নিজ জীবনে ধারণ করিতে পারিলেই এতাদৃশ মহাপুরুষের জন্মোৎসবের যথার্থ সার্থকতা।

বিষয়াসক্ত মন স্বাভাবিকভাবেই বহির্মুখী এবং অধোগামী। আমাদিগের নিরন্তর সচেতনতাই তাহাকে ধীরে ধীরে অন্তর্মুখ ও ঊর্ধ্বগামী করিয়া তুলিতে পারে। "শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া" (গীতা, ৬।২৫)—ধারণার দ্বারা মনকে বশীকরণ করিয়া বুদ্ধির সাহায্যে উপরত (ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে তুলিয়া লইয়া) হইয়া আত্মায় মনস্থির করিবে—ধীরে ধীরে। বুদ্ধির পরিণতি সাত্ত্বিকী ধৃতি (ধারণার শক্তি)-তে। 'চট্‌জলদি' ইহা সম্ভব নহে। কর্ণে যাহা শুনিলাম হয়তো ধারণা হইল না। মনের একাগ্রতা অভ্যাসের মাধ্যমে ধৃতি-শক্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তখন শ্রুত শব্দের সম্যক্ ধারণা হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সিংহনাদকারী যে শ্রীকৃষ্ণের কথা স্বামীজী বারংবার বলিতেছেন, সেই পাঞ্চজন্যধারী পুরুষসিংহ বাসুদেবের বাণী আজ হৃদয়ে ধারণা করা দরকার বলিয়াই এত দীর্ঘ ভূমিকার প্রয়োজন হইল। সেই মহাসারথী কেবলমাত্র অর্জুনের রথের সারথী নহেন, তিনি এই জগদ্ব্যাপী জীবনরথেরও সারথী। যুগে যুগে। দুঃখপীড়িত শোকক্লিষ্ট প্রতারিত জগদ্বাসীর প্রতিভূরূপে অর্জুন নতজানু হইয়া সেই সুদর্শনচক্রধারী বিশালবক্ষ শক্তিমানের সম্মুখে করজোড়ে বলিতেছেন ঃ "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" (ঐ, ২।৭)—হে প্রভো, আমি আজ তোমার শরণাগত, শিষ্যতুল্য। অনুগ্রহ করিয়া আমায় শ্রেয়-শিক্ষা দিয়া আমাকে বিপন্মুক্ত কর। ইহাই অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের চিরন্তন সংগ্রাম। কখনো শান্তমূর্তিতে, কখনো বা রুদ্রমূর্তিতে।

* * * * *

সুতরাং প্রশ্ন হইল, অবতারপুরুষ অথবা আচার্য পুরুষগণের আবির্ভাব উপলক্ষ্যে বিশাল সমারোহ এবং বিবিধ উৎসবের আয়োজন করিয়া কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিকতা এবং চিত্তবিনোদনেই কি সব সমাপ্ত হইয়া যাইবে? না তাঁহাদের আত্মত্যাগ, সত্যনিষ্ঠা, মানবপ্রেম ইত্যাদির চর্চা করিয়া আমরা নিজ নিজ হৃদয়ে ঐসকল গুণাবলী ধারণা ও বিকাশ করিয়া ইষ্টসাধনে সচেষ্ট হইব? অবশ্যই আমরা আমাদিগের জীবনে মহাপুরুষগণের অলৌকিক ত্যাগ, তিতিক্ষা, নিঃস্বার্থতাকে অনুসরণপূর্বক একটি সম্পূর্ণ সমাজ নির্মাণে সচেষ্ট হইব, ইহাই যুক্তিযুক্ত।

পুরুষার্থ চারিপ্রকার—ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। মোক্ষ বা মুক্তি অর্থাৎ স্বস্বরূপ উপলব্ধিই হইল পরম পুরুষার্থ। ভারতের সংস্কৃতি, ভারতের ধর্ম, ভারতের সমাজের মূল লক্ষ্য এই পরম পুরুষার্থ সাধন—ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত ভাবে। আজ ইন্‌ফরমেশন টেকনোলজি-সম্পৃক্ত এই সমাজব্যবস্থায় যে যে ত্রুটি-বিচ্যুতি মানুষের পরম পুরুষার্থ সাধনে ব্যাঘাত ঘটাইতেছে, সেগুলির চিহ্নিতকরণই একটি দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারণ, আমরা অনেক ক্ষেত্রেই দেখিয়াছি, যাহা মনুষ্যসমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক,

তাহাকেই কিছু মানুষ 'কল্যাণকর' বলিয়া প্রমাণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। সাধারণ মানুষকে বিপথে পরিচালিত করিয়া, মানুষের নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব স্বস্বরূপকে অস্বীকার করিয়া তাঁহারা যে সমাজের প্রভূত উন্নতিসাধন করিবেন—সে-আশা বড় নাই, বিশেষত ভারতবর্ষে। এদেশে মানুষের ধমনীতে ধর্ম নিহিত রহিয়াছে। প্রচণ্ড অনাচার, ব্যভিচার এবং মনুষ্যত্বের অবমাননার চরম মুহূর্তে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-রূপী শ্রীকৃষ্ণ বিচিত্র রূপে, বিচিত্র পথে হিন্দুধর্মের হাল ধরিয়াছেন। মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে জাগিয়া উঠিয়াছে মুমূর্ষু জাতি।

গীতার মহাবাণী উদ্ধৃত করিয়া স্বামীজী বলিতেছেন—"*'হে ভারত (অর্জুন) ওঠ, হৃদয়ের এই দুর্বলতা ত্যাগ কর, ত্যাগ কর এই নিবীর্যতা। উঠিয়া দাঁড়াও, সংগ্রাম কর।'—এই তাৎপর্যপূর্ণ শ্লোকটির দ্বারাই গীতার সূচনা।... কৃষ্ণ পরমাত্মা, স্বয়ং ভগবান। তিনি অবিলম্বেই অর্জুনের অসার যুক্তির আসল রূপ ধরিয়া ফেলিলেন—ইহা দুর্বলতা।... অর্জুনের হৃদয়ে কর্তব্য আর মায়ার দ্বন্দ্ব।... অনন্ত চৈতন্যলাভই মানবের লক্ষ্য। সেখানে আবেগের স্থান নাই, ভাবালুতার স্থান নাই... সেখানে মানুষ আত্ম-স্বরূপে দণ্ডায়মান।*" ('বাণী রচনা', ১৯৬৩, পৃঃ ৪৩০)

অতএব কুরুক্ষেত্রের সিংহনাদকারী শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আমাদের সম্মুখেই রহিয়াছে। বুদ্ধের আবির্ভাবের কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে ধ্বনিত হইয়াছিল এই মহামন্ত্র। ভাবিলে বিস্মিত হই, যেন আজকের সমস্যাগুলিই শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করিতেছেন! সমস্যা কেবল নহে, তাহার সমাধান-সূত্রটিও তিনি বলিয়া দিতেছেন। গীতার যে অসাধারণ ভূমিকা পূজ্যপাদ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী তাঁহার 'Universal Message of Bhagavad Gita' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—যাহার বঙ্গানুবাদ 'উদ্বোধন' পত্রিকায় এখন ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হইতেছে, উহার প্রতি ছত্রেই প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রীকৃষ্ণ কতখানি বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন এবং সমাজের প্রত্যেক মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য করিয়া কি অসাধারণ একটি উপহার জগদ্বাসীকে দিয়া গিয়াছেন।

দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নাই। যেমন, "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ" বলিয়া ভগবান হীন জাতপাতের কথা কখনোই উত্থাপন করেন নাই, বরং বলিলেন, আমার দ্বারা গুণ ও কর্ম অনুসারে চারিটি বর্ণ সৃষ্ট হইল। মানুষ জাতি হিসাবে এক। প্রত্যেকের শরীরে একই রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। এমন নহে—একজনের শরীরে রক্ত, অন্যের শরীরে মধু প্রবাহিত হইতেছে। গুণ ও কর্ম অনুসারে চারিটি বর্ণ রহিয়াছে। কেহ বিদ্যানুরাগী। কেহ অর্থানুরাগী। কেহ কৃষিকর্ম পছন্দ করে। কেহ বা সেবাকার্যে বিশেষ দক্ষ। এই বর্ণবিভাগ অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক এবং অবশ্যম্ভাবী। ইহাকে 'অতীতের প্রলাপ' বলিয়া বাতিল করিলে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইব বৈ লাভবান কখনোই হইব না। এবং এই একবিংশ শতাব্দীতেও এই বর্ণবিভাগ সমভাবে প্রযোজ্য।

অর্জুনের মুখ দিয়াও শ্রীভগবান কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক তত্ত্ব অভিব্যক্ত করিয়াছেন। অর্জুন বলিলেন ঃ

—কুলক্ষয়জনিত দোষ এই যুদ্ধের পরিণতি। কুলক্ষয় হলে সনাতন কুলধর্ম নষ্ট হয়ে যাবে। আর কুলধর্ম নষ্ট হলে অধর্মের প্রাদুর্ভাব রোধ করা যাবে না। অধর্ম প্রবেশ করলে কুলস্ত্রীর চরিত্রদূষণ অবশ্যম্ভাবী। এবং তার পরিণতি—বর্ণসঙ্কর। ফলে পিতৃপুরুষগণের পিণ্ডাদি ক্রিয়া লুপ্ত হবে। গোটা সমাজই তখন নরকে রূপান্তরিত হবে।

যদিও অর্জুনকে যুদ্ধে পুনর্নিয়োগ করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অতঃপর অদ্বৈত বেদান্তের অবতারণা করিলেন, তথাপি সমাজ-বিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিলে অর্জুনের কথার যাথার্থ্য সহজেই বোধগম্য হয়। এবং এই 'ফর্মুলা' যে আজও সমাজে প্রযোজ্য, তাহা প্রমাণসাপেক্ষ হইলেও অ-প্রামাণ্য নহে।

মনুষ্যসমাজের উৎকর্ষসাধনের অঙ্গ হিসাবে গীতার ভাষ্যে আচার্য শঙ্কর 'অভ্যুদয়'-এর প্রসঙ্গ আনিয়াছেন। ধর্ম কী তাহা সঠিক বুঝিয়া এবং সেই যথার্থ ধর্মকে অভিভাবক করিয়া 'অর্থ' (economy) ও 'কাম' (progeny)-এর নিয়ন্ত্রিত প্রয়োগেই সমাজের মুক্তির ইঙ্গিত রহিয়াছে—ইহাই অভ্যুদয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জগৎকল্যাণ-চিকীর্ষা অহেতুক। নিজের কোন প্রয়োজন নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনও অনুরূপ। তাঁহার নিজের প্রয়োজনে তিনি কিছুই করেন নাই। দুঃখ-ক্লিষ্ট, তাপিত মানুষের প্রতি অকারণ প্রেমের প্রেরণায়ই সকল দুঃখকে অবতারপুরুষগণ স্বীকার করিয়াছেন। অতএব শ্রীভগবানের আবির্ভাব মহোৎসব বস্তুত বাহিরের অপেক্ষা নিজ অন্তরে তাঁহাকে হৃদয়াসনে অধিষ্ঠিত করিবার প্রস্তুতিস্বরূপ। সেইসঙ্গে ইষ্টের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসায় নিজের দুঃখ-কষ্টকে ভুলিয়া একটি সুন্দর সৌহার্দ্যপূর্ণ ও পরমপুরুষার্থ-সাধক সামাজিক পরিমণ্ডল নির্মাণের প্রস্তুতিও বলা যাইতে পারে। ❑

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে যেসকল তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৩৫৯ সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। আশা করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

ধর্মতত্ত্ব, ১ নভেম্বর ১৮৭৯

সংবাদ।—গত বুধবার [১৩ কার্তিক] শারদীয়া পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শারদীয় উৎসব হইয়াছে। পূর্বাহ্নে মন্দিরে উপাসনা হয়। অন্নের ভিতরে ব্রহ্ম বিদ্যমান, অন্ন ঈশ্বরের সত্তা ও স্নেহ-দয়া প্রকাশ করিতেছে—এবিষয়ে জ্ঞান ও প্রেমপূর্ণ গভীর উপদেশ হইয়াছিল। বেলা একটার সময় নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করা যায়। একখানা বজরা ও ছখানা ভাওয়ালিয়া, দুখানা ডিঙ্গি প্রায় আশি জন যাত্রি লইয়া কলিকাতা হইতে যাত্রা করে। যাত্রিদিগের মধ্যে ১০/১২ জন ব্রাহ্মিকা ছিলেন। বজরা পতাকা ও পুষ্পপল্লবালঙ্কৃত হইয়াছিল। খোল-করতাল ও ভেরীর ধ্বনি-সহ গান করিতে করিতে সকলে যাত্রা করিলেন। দক্ষিণেশ্বরের বাঁধাঘাটে পহুঁছিলে পরমহংস মহাশয়ের ভাগিনেয় হৃদয় ঠাকুর বজরায় আসিয়া প্রমত্তভাবে "জাহ্নবী তীরে হরি বলে কে রে বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে,/ নৈলে কেন তাপিত পরান, অন্তর শীতল হতেছে,/ হরিনামের ধ্বনি শুনে পাষণ্ড দলন হতেছে"—এই গানটি করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাঁহার সঙ্গে আরো কয়েক দল ভক্ত মত্ত হইয়া যোগ দিলেন। অতি মনোহর দৃশ্য হইয়াছিল। পরে সকলে গান করিতে করিতে পরমহংস মহাশয়ের গৃহাভিমুখে চলিলেন। "সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপানন্দ ঘন" সকলে এই সঙ্কীর্তনটি করিতে করিতে পরমহংসের সাধনভূমি হইয়া তাঁহার নিকটে চলিয়া আসিলেন। গান শ্রবণে ও ভক্তগণের সমাগমে পরমহংস মহাশয়ের মূর্চ্ছা [সমাধি] হইল। সমাধি ভঙ্গ হইলে পরব্রহ্মস্বরূপ ও আমিত্ব নাশ বিষয়ে কয়েকটি অতি চমৎকার কথা বলেন। সন্ধ্যার সময় বাঁধাঘাটে সংক্ষেপে উপাসনা হয়। আচার্য মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া চন্দ্র ও ভাগীরথীকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দান করেন, তাহাতে ব্রহ্মপ্রেমের গভীর তত্ত্বসকল প্রকাশিত হয়। উপদেশের মধুর ভাবে পাষাণ-হৃদয় বিগলিত হইয়া প্রেমধারা প্রবাহিত হয়। উপদেশ শ্রবণে পরমহংস মহাশয় পুনঃ পুনঃ আনন্দধ্বনি করিতে থাকেন। প্রার্থনান্তে ঈশ্বরের মাতৃভাবের একটি নূতন রচিত সুমধুর সঙ্গীত হয়। তাহাতে পরমহংস মহাশয় আনন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। পরে তিনি কয়েকটি গান করিয়া সকল লোককে মত্ত করিয়া তোলেন। "মধুর হরিনাম নিয়ে রে জীব যদি সুখে থাকবি আয়।" সুমধুর স্বরে এই গানটি করিয়া তিনি সকল লোককে মোহিত করেন, তখনকার স্বর্গের ছবি বর্ণনা করা যায় না। এখানে পরমহংস মহাশয় দণ্ডায়মান অবস্থায় পুনর্বার সমাধিপ্রাপ্ত হন। রাত্রি ৮টার সময় সকলে কলিকাতায় যাত্রা করি। গত বৎসর অপেক্ষা এবার শারদীয় উৎসব অধিকতর মধুর ও জমাট হইয়াছিল।

*

সুলভ সমাচার, ৩০ জুলাই ১৮৮১

দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

পাঠকগণ উপরি উক্ত মহাপুরুষের নাম অনেকবার শুনিয়াছেন। ইনি কলিকাতা হইতে প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে রানী রাসমণির কালীবাটিতে অবস্থিতি করেন। আমরা এই মহাত্মাকে যতবার দেখিতেছি, ততবার তাঁহার উচ্চ জীবন ও ভাব দেখিয়া অবাক হইতেছি। আমরা দেখিতেছি, তিনি একজন প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ, তাঁহার মতো লোক আর এদেশে আছে কি না সন্দেহ। যোগবলে তাঁহার মন সর্বদাই ভগবানেতেই সংযুক্ত থাকে, আমরা যেমন ঘর, বাড়ি, ধন, মানের কথা কহি ও সর্বদাই সেইসমস্ত চিন্তা করি, তিনি পরমেশ্বরকে লইয়া সেইরূপ করেন। তিনি ছেলের মতো সরল এবং ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত হইয়া পাগলের মতো হন। তিনি কখনো 'হরি' বলিয়া ভক্তিতে মত্ত হইয়া শ্রীচৈতন্যের ন্যায় নৃত্য করেন, কখনো 'মা কালী' বলিয়া অত্যন্ত প্রেমে ভগবানকে ডাকিয়া শাক্তধর্মের আদর্শ কি তাহা দেখান। আবার কখন কখন পুরাতন যোগীদের মতন নিরাকার ব্রহ্মেতে নিমগ্ন হইয়া যান। ... সম্প্রতি তিনি কলিকাতায় একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাটীতে আসিয়া ভক্তিতে মত্ত হইয়া উপস্থিত প্রায় সকলকেই হরিনামে নৃত্য করাইয়াছিলেন। সেদিন আমাদিগের সহিত একখানি স্টীমারে বেড়াইতে গিয়া তাঁহার সাধন অবস্থায় জীবনের কয়েকটি পরীক্ষার কথা বলিয়া সকলকে অবাক করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন যে, আগে আগে রাত্রিতে তিনি আপনাকে কালো বিড়ালের বাচ্চা মনে করিয়া ভাবিতেন যে, তিনি মার কোল ঘেঁষিয়া শুইয়া আছেন এবং মার কাছে মিউ মিউ করিয়া ডাকিতেন, তাঁহার মাও প্রসন্ন হইয়া তাঁহার গা চাটিতেন ও স্নেহভাবে তাঁহার সহিত কথা কহিতেন, সেসময়ে তিনি অত্যন্ত সুখে রাত্রি কাটাইতেন। কখনো কখনো আপনাকে স্ত্রীলোক মনে করিতেন এবং স্ত্রীভাবে অত্যন্ত প্রেমে সেই পতির সহিত কথাবার্তা কহিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। কখনো কখনো দেখিতেন, ব্রহ্মরূপ সমুদ্র আসিয়া তাঁহাকে ডুবাইল, তিনি মনে করিতেন যেন তিনি সচ্চিদানন্দ-রূপ জলে ডুবিয়া রহিয়াছেন, যখন এইভাবে থাকিতেন, তাঁহার আহারাদি-বাহ্যক্রিয়া দূরে যাইত। একটু এই ভাব কমিলে তিনি আপন পরিচারককে বলিতেন, এইবেলা আমাকে আহার দেও, সেভাব এখন আমার কমিয়াছে। কিন্তু বলিতে বলিতে বানের জলে পড়িলে নিরাশ্রয় মনুষ্যের অবস্থা যেরূপ হয়, তাঁহারও অবস্থা সেইরূপ হইত।... ❑

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার
সম্পাদনা ❑ স্বামী সর্বগানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের দুটি পত্র

ভগিনী নিবেদিতাকে লিখিত

॥১॥*

আলমোড়া
২০ জুন ১৮৯৭

কল্যাণীয়া মিস নোবল,

তোমার প্রীতিপূর্ণ পত্রখানির জন্য অজস্র ধন্যবাদ...। মিস মূলার এখানে আছেন। তিনি নানান ব্যাপারের পরিকল্পনা করছেন। ফল কী হবে প্রভুই জানেন।...

এখানে যন্ত্রটা কিছুটা চালু করে দিয়ে আগামী গ্রীষ্মকালে আমি লণ্ডনে থাকব। দুমাসের মধ্যে এ পাহাড় থেকে নেমে উত্তর ভারতের বড় বড় শহরে বক্তৃতা-সফর করে বেড়াব। সারা শীতকালটা এই নিয়ে কাটবে। আমি এখানে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছি; তার বিভিন্ন কর্মসূচীর বিবরণী প্রস্তুত হলেই তোমাকে পাঠাব।

প্রসঙ্গত, আমার বন্ধু খেতড়ির রাজা এবং অন্যান্য কয়েকজন রাজপুত রাজন্যবর্গ, যাঁরা একটা উৎসব উপলক্ষ্যে ওখানে গিয়েছেন, তাঁদের জন্য ছোটখাট একটা অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে স্টার্ডিকে লিখেছিলাম। তাঁদের অনেকের সম্বন্ধেই আমি বিশেষ কৌতূহলী। তাই এইসকল ভারতীয়দের কোন খবর পেলে আমাকে অনুগ্রহ করে লিখ।

আমার অসীম ভালবাসা জানবে। ইতি

তোমাদের সত্যাবদ্ধ
বিবেকানন্দ

* এই পত্রটির কিয়দংশ 'পত্রাবলী'তে প্রকাশিত হয়েছে।

✧ ✧ ✧

॥২॥

(উত্তর এই ঠিকানায় প্রেরিতব্য)
ডাঃ লোগান, ৭৭০ ওক স্ট্রীট
সান ফ্রান্সিস্কো
ক্যালিফোর্নিয়া, ১৭ মে (১৯০০)

কল্যাণীয়া মার্গট,

এখনো কয়েকদিন আমি শিকাগোয় যেতে পারব না, সেজন্য আমি দুঃখিত। ডাক্তার (ডাঃ লোগান) বলছেন যে, সম্পূর্ণ সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত আমার ভ্রমণ নিষিদ্ধ। আমাকে সুস্থ করে তুলতে তিনি বদ্ধপরিকর। আমার পেট খুবই ভাল আছে এবং স্নায়ুও চমৎকার। স্বাস্থ্যের ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে। আর কয়েকদিনের মধ্যে আমি পুরোপুরি ঠিক হয়ে যাব। তোমার চিঠি ও সেইসঙ্গে যা পাঠিয়েছ আমি পেয়েছি।

তুমি যদি শীঘ্র নিউ ইয়র্কে যাও, তাহলে আমার চিঠিগুলো সঙ্গে নিয়ে যেও। আমি সোজা নিউ ইয়র্ক যাচ্ছি। আমার রওনা হওয়ার আগেই যদি তুমি নিউ ইয়র্ক ছাড়ো, সেক্ষেত্রে চিঠিগুলো একটা লেফাফায় পুরে তুরীয়ানন্দের কাছে গচ্ছিত রেখো এবং তাকে বলো আমার জন্য রেখে দিতে। সে যেন কোন কারণেই চিঠিগুলো না খোলে—ভারত থেকে আসা চিঠিগুলোও নয়। তুরীয়ানন্দ দায়িত্ব নেবে। তাছাড়া, দেখো আমার পোশাক-পরিচ্ছদ ও বইপত্রগুলো নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে যেন থাকে।

মিসেস হান্টিংটনের* সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে আমি অচিরেই তোমাকে একটা চিঠি পাঠাব। ব্যাপারটি গোপনীয়।

ভালবাসা ও আশীর্বাদ-সহ
বিবেকানন্দ

পুনঃ—টিকিটের জন্য শিকাগোয় আমাকে অপেক্ষা করতে হবে। মিসেস হেল যদি তখন পূর্বদিকে চলে গিয়ে থাকেন, তাহলে আমাকে দু-একদিন থাকতে দেওয়ার জন্য তুমি কি কাউকে বলতে পার?

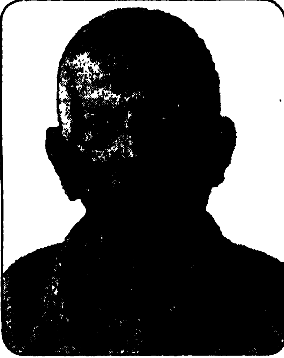
* মিসেস কলিস পটার হান্টিংটন; তাঁর স্বামী যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল প্যাসিফিক রেলরোডের ধনকুবের বৃহৎ চতুষ্টয়ের অন্যতম।

গীতার শক্তি ও মনোহারিত্ব

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

পূর্বানুবৃত্তি

এই আলোচনাটি দুর্গাপদ ঘোষ প্রমুখ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'



শ্রীরামকৃষ্ণের দেবত্ব প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ

সমাজে ক্রিয়াশীল বল বা শক্তিগুলির পারস্পরিক অনুপাতকে অবতার কিভাবে পরিবর্তন করেন? আচার্য শঙ্কর তাঁর ভাষ্যে এই প্রশ্নের উত্তর দেবেন। তবে আলোচনার এই পর্যায়ে এসে আমি আপনাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অর্থাৎ অবতারের গুরুত্ব প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ কী বলেছেন, তা পুনঃস্মরণ করতে চাই। সমাজে যখন সবকিছু ভ্রান্তপথগামী হয়, তখন সেই ভ্রান্তি সংশোধন করতে আবির্ভাব হয় অবতারের। আমেরিকার নিউ ইয়র্কে স্বামীজী 'আমার গুরুদেব'—এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন। যে চারবছর স্বামীজী আমেরিকা ও ইউরোপে ছিলেন, সে-সময়ে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কখনো কিছু বলেননি; বলেছেন কেবল বেদান্তের কথা। ক্রমে যখন মানুষ জানতে পারল যে, শ্রীরামকৃষ্ণ নামে তাঁর একজন আচার্য ছিলেন এবং তিনি অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন পুরুষ ছিলেন, তখন তারা স্বামীজীকে তাঁর গুরুদেব সম্বন্ধে বলবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায়। এই সূত্রেই তিনি নিউ ইয়র্ক এবং লণ্ডনে এই একটি বিষয়—'আমার গুরুদেব' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।[১] সেই বক্তৃতার সূচনায় রয়েছে শঙ্করের এই উক্তিটি : অবস্থা যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং সমাজ হয়ে ওঠে দুর্নীতিগ্রস্ত, তখন নৈতিক মূল্যবোধগুলির পুনঃস্থাপনের জন্য এক মহাশক্তি প্রকটিত হন। এইভাবে স্বামীজী বক্তৃতাটি শুরু করেছেন। সুন্দর ইংরেজীতে দেওয়া অসামান্য এই বক্তৃতাটিতে রয়েছে মহান এক আচার্যের অনুপম একখানি চরিত্রায়ন। পূর্বাশ্রমে ছাত্রাবস্থায় এবং রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ব্রহ্মচারী অবস্থায় আমি নিশ্চিতভাবে এই বক্তৃতাটি বার পঁচিশেক পড়েছি। এতটাই অনন্যসাধারণ এটি, সব দৃষ্টিকোণ থেকে। স্বামীজী শুরু করেছেন এইভাবে :

" 'যখন যখনি ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন তখনি মানবতাকে সাহায্য করতে আমি অবতরণ করি'—ঘোষণা করেছেন কৃষ্ণ, ভগবদ্গীতায়। আমাদের এই জগতে যখনি বিকাশের কারণে কিংবা নবসংযুক্ত পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে নতুনভাবে সবকিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তখনি আবির্ভূত হয় এক শক্তিতরঙ্গ। মানুষ যেমন আধ্যাত্মিক ও বস্তুতান্ত্রিক—এই দুটি স্তরে অবস্থান করে, সামঞ্জস্য-বিধায়ক শক্তিতরঙ্গগুলিও তেমনি আবির্ভূত হয় দুটি স্তরেই। সামঞ্জস্য সাধিত হয় একদিকে বস্তুতান্ত্রিক স্তরে—আধুনিক কালে প্রধানত ইউরোপ হয়েছে যার ভিত্তিভূমি; আর অপরদিকে, অর্থাৎ আধ্যাত্মিক স্তরে সামঞ্জস্য বিধানের ব্যাপারে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম থেকে ভিত্তিভূমি হয়ে থেকেছে এশিয়া মহাদেশ। আধ্যাত্মিক স্তরে আজ মানুষের প্রয়োজন আরেকটি সামঞ্জস্য বিধানের। আজ যখন বস্তুতান্ত্রিক ভাবভাবনা তাদের ঐশ্বর্য-শক্তির শীর্ষে আরোহণ করেছে; আজ যখন মানুষ ক্রমাগত জড়বস্তুর ওপর নির্ভরশীল হতে হতে তার দৈবস্বরূপ বিস্মৃত হয়ে অর্থ উৎপাদনের যন্ত্রমাত্রে পরিণত হতে চলেছে—তখন দরকার হয়ে পড়েছে একটা সামঞ্জস্য বিধানের। আর তখনি ধ্বনিত হয়ে উঠেছে সেই কণ্ঠস্বর। অবতীর্ণ হতে চলেছে সেই শক্তি, যা বস্তুতান্ত্রিকতার ঘনায়মান মেঘপুঞ্জকে করবে বিতাড়িত। ক্রিয়াশীল করে তোলা হয়েছে সেই শক্তিকে, যা নিকট ভবিষ্যতেই মানবতার কাছে পুনর্বার ফিরিয়ে নিয়ে আসবে তার প্রকৃত স্বরূপের স্মৃতি। এবং পুনর্বার সেই শক্তির উত্থানভূমি হবে এশিয়া মহাদেশই।

"আমাদের এই জগৎ শ্রম-বিভাজনের পরিকল্পনায় সংগঠিত। একথা বলে লাভ নেই যে, একজন মানুষের অধিকারেই সবকিছু থাকবে। একটা জাতির দখলে সবকিছু

১ উল্লিখিত বক্তৃতাটি ইংরেজীতে 'My Master' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে ('Complete Works', Vol. IV, p. 154) এবং বাঙলায় 'মদীয় আচার্যদেব' নামে অনূদিত হয়েছে ('বাণী ও রচনা', ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৪১)।

থাকবে—এটা বলাটা আরো অর্থহীন। অথচ আমরা কেমন শিশুর মতো নির্বোধ! শিশু তার অজ্ঞতায় ভাবে, গোটা দুনিয়ায় গর্ব করে রাখার মতো সম্পদ হলো তার ঐ খেলার পুতুলটি। তেমনি জড়শক্তিতে শক্তিমান জাতিও ভাবে যে, গর্ব করার মতো একমাত্র জিনিস হলো তার ঐ ধনসম্পদই; উন্নতি বলতে কেবল এটাই বোঝায়, সভ্যতা বলতেও তা-ই। এবং এমন অন্য কোন জাতি যদি থেকে থাকে যারা বস্তু-সম্পদ নিয়ে ভাবিত নয় এবং যাদের বস্তু-আহরণের ক্ষমতা নেই, তবে তারা বেঁচে থাকার উপযুক্ত নয়; তাদের সমগ্র অস্তিত্বটাই অনর্থক!

"অপরদিকে, অন্য কোন জাতি ভাবতে পারে যে, কেবল বস্তুবাদের ভিত্তিতে গঠিত সভ্যতা একেবারেই কোন কাজের নয়। প্রাচ্য থেকে এসেছিল এই কণ্ঠস্বর, যা একদা জগৎকে বলেছিল যে, বিশ্বের সকল সম্পদ যদি একজনের অধিকারে থাকে আর তার আধ্যাত্মিকতা না থাকে, তবে সে-সম্পদ কোন্ কাজে লাগবে? এ-ই হলো প্রাচ্য প্রকৃতি বা ধরন; অপরটি পাশ্চাত্য ধরন।

"এই দুই ধরনের প্রত্যেকটির আছে তার নিজস্ব ঐশ্বর্য, নিজস্ব মহিমা। বর্তমানের সামঞ্জস্য বিধান হবে এই দুই আদর্শের এক সমন্বয়সাধন; তাদের সার্থক মিলন। পাশ্চাত্যের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎটা যত সত্য, প্রাচ্যের কাছে অধ্যাত্মজগৎটা ততটাই। প্রাচ্যবাসী যাকিছু কামনা করে বা পাওয়ার আশা রাখে, তার সবটাই সে আধ্যাত্মিকতার মধ্যে পেয়ে যায়। জীবনটাকে বাস্তব বলে ভাবার সব উপাদানই সে আধ্যাত্মিকতার মধ্যে পায়। পাশ্চাত্যবাসীর কাছে সে একজন স্বপ্নবিলাসী; আবার প্রাচ্যবাসীর কাছে পাশ্চাত্যবাসী একজন স্বপ্নবিলাসী—ক্ষণিকের খেলনা নিয়ে সে খেলেই চলেছে। প্রাচ্যবাসীর এই ভেবে হাসি পায় যে, পাশ্চাত্যের বয়স্ক মেয়ে-পুরুষরা মিলে মুষ্টিমেয় কিছু বস্তু নিয়ে এত ব্যস্ত আছে, যা কিনা তাদের একদিন ছেড়ে যেতে হবে—আগে বা পরে। প্রত্যেকে অপরকে বলে—স্বপ্নবিলাসী।

"কিন্তু মানবজাতির অগ্রগতির জন্য পাশ্চাত্য আদর্শের যতটা প্রয়োজন, প্রাচ্য আদর্শেরও প্রয়োজন ততটাই—আমার মতে প্রাচ্য আদর্শের প্রয়োজন আরো বেশি করেই। যন্ত্র কোনদিন মানুষকে সুখী করেনি, কোনদিন করবেও না। যে আমাদের যন্ত্রে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা করছে, সে দাবি করবে যে, সুখটা আছে যন্ত্রে; অথচ তা তো সবসময়েই আছে মানুষের মনের মধ্যে। সেই মানুষই সুখী হতে পারেন যিনি তাঁর মনের প্রভু; অন্য কেউ নয়। আর, সত্যি কথা বলতে কি, যন্ত্রের ক্ষমতাই বা কী? যিনি একটা তারের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠাতে পারেন, তাঁকে কেন একজন মহান মানুষ বা মহা বুদ্ধিমান মানুষ বলা হবে? প্রকৃতি কি ঐ কাজটিই লক্ষগুণে করছে না প্রতি মুহূর্তে? তবে কেন তাঁরা ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রকৃতিরই উপাসনা করেন না? সারা জগতের ওপর যদি আপনারই ক্ষমতা চলে, যদি আপনি মহাবিশ্বের প্রতিটি পরমাণুর ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করে থেকে থাকেন, তবে তাতে এমন কী-ই বা এসে গেল? ও তো আপনাকে সুখ দিতে পারবে না, যতক্ষণ না আপনার নিজের মধ্যে আসছে সুখী হওয়ার ক্ষমতা, যতক্ষণ না আপনি জয় করছেন নিজেকে।

একথা ঠিক যে, মানুষ জন্মেছেই প্রকৃতিকে জয় করার জন্য; কিন্তু পাশ্চাত্যের মানুষ 'প্রকৃতি' বলতে কেবল জড় বা বাহ্য প্রকৃতিকে বোঝায়। এটা সত্য যে, বাহ্য প্রকৃতি তার পর্বত-নদী-মহাসমুদ্র নিয়ে রাজকীয়; রাজকীয় তার অসীম ক্ষমতা ও মহাবৈচিত্র্য নিয়ে। কিন্তু মানুষের আছে আরো রাজকীয় এক অন্তঃপ্রকৃতি, যা সূর্য-চন্দ্র-তারকার চেয়ে উন্নত, আমাদের এ-পৃথিবীর চেয়ে উন্নত; উন্নত এই ভৌত জগৎ-চরাচরের চেয়ে। আমাদের এইসব ক্ষুদ্র জীবনসীমাকে অতিক্রম করে তার ঊর্ধ্বে অবস্থিত সেই অন্তঃপ্রকৃতি হলো চর্চার অন্যতম একটি ক্ষেত্র। এখানে প্রাচ্যবাসীদের শ্রেষ্ঠত্ব; যেমন পাশ্চাত্যবাসীদের শ্রেষ্ঠত্ব অন্য ক্ষেত্রটিতে। অতএব, সঙ্গতভাবেই, যখনি একটি আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্যবিধানের প্রশ্ন আসে, তখনি সেটি আসা উচিত প্রাচ্য দেশ থেকে। এটিও সঙ্গত যে, যন্ত্র-নির্মাণ শিখতে চাইলে প্রাচ্যবাসীকে সে-শিক্ষালাভ করতে হবে পাশ্চাত্য-বাসীর পদতলে বসে। পাশ্চাত্যবাসী যখন ঈশ্বর ও আত্মা বিষয়ে জানতে চান; অবগত হতে চান এজগতের অর্থ ও রহস্য বিষয়ে, তখন তাঁকে অবশ্যই সে-শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে প্রাচ্যের পদতলে বসে।

"আমি আপনাদের সামনে এমন একজন মানুষের জীবন উপস্থাপন করতে চলেছি, যিনি ভারতবর্ষের এমনি এক তরঙ্গকে গতি প্রদান করেছেন।"

এরপর, শ্রীরামকৃষ্ণের অসামান্য জীবনকথা বিবৃত করে স্বামীজী উপসংহার করেছেন এইভাবে ঃ

"আধুনিক বিশ্বের কাছে এ-ই হলো শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী—'মতবাদের তোয়াক্কা করো না, তোয়াক্কা করো না অনড় অনুশাসনের কিংবা সম্প্রদায়, গীর্জা বা মন্দিরের; প্রত্যেক মানুষের অস্তিত্বের সারসত্য যে-আধ্যাত্মিকতা, তার তুলনায় এদের মূল্য সামান্যই। যার মধ্যে এই আধ্যাত্মিকতার যত বেশি বিকাশ হয়েছে, সে তত বেশি কল্যাণকারী শক্তির অধিকারী হয়েছে। প্রথমে সেটি উপার্জন কর, আয়ত্ত কর; এবং কারো সমালোচনা করো না; কারণ, সব মতে ও সম্প্রদায়ে কিছু না কিছু ভাল আছে। নিজেদের জীবন দিয়ে দেখাও যে, ধর্ম মানে কেবল কতকগুলো কথার কথা নয়, ধর্ম কতকগুলো নাম বা সম্প্রদায়মাত্র নয়—ধর্ম মানে আধ্যাত্মিক অনুভূতি। যাঁরা অনুভব করেছেন, কেবল তাঁরাই বুঝতে পারেন, অনুধাবন করতে পারেন। যাঁরা

আধ্যাত্মিকতায় উপনীত হয়েছেন, কেবল তাঁরাই এটি অন্যের মুখ্যে সঞ্চারিত করতে পারেন; কেবল তাঁরাই হতে পারেন মানবতার মহান আচার্য। কেবল তাঁরাই হলেন শক্তির উজ্জ্বল উৎসস্বরূপ।'

"যে-দেশে যত বেশি এমন মানুষ জন্মাবেন, সে-দেশ তত বেশি উঠবে; আর যে-দেশে এমন একটিও মানুষ নেই, সে-দেশের ভবিষ্যৎ সর্বনাশা; কিছুই তাকে বাঁচাতে পারবে না। অতএব, মানবের কাছে আমার প্রভুর বাণী এই—'আধ্যাত্মিক হও এবং নিজে সত্যকে উপলব্ধি কর।' তিনি থাকলে আপনাকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য ত্যাগের পথে পরিচালিত করতেন। আপন ভাইয়ের প্রতি আপনার ভালবাসার কথা থামিয়ে তিনি আপনাকে আপনার কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য কাজে নামাতেন। সময় এসেছে ত্যাগের, সময় এসেছে অন্তরের অনুভূতি লাভের। আর তবেই আপনি বিশ্বের সকল ধর্মের মধ্যে এক ঐক্যসূত্র প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। আপনি বুঝবেন যে, বিবাদ-বিসংবাদের প্রয়োজন নেই। কেবল তখনি মানবতাকে সাহায্য করার জন্য আপনি প্রস্তুত হবেন।

"সকল ধর্মের অন্তর্নিহিত মূলগত ঐক্য প্রচার ও ব্যাখ্যা করাই ছিল আমার আচার্যদেবের জীবনব্রত। অন্যান্য আচার্যরা বিশেষ বিশেষ ধর্ম প্রচার করেছেন, যেগুলির গায়ে তাঁদের নিজ নিজ নাম লেখা আছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর এই মহান আচার্য তাঁর নিজের জন্য কোন দাবি করেননি। তিনি সকল ধর্মকে নিরুদ্বিগ্ন রেখেছেন, কারণ তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, বাস্তবিক সকল ধর্মই হলো এক অদ্বিতীয় সনাতন ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ।" [ক্রমশ] (আট)

ভাষান্তর ঃ অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য

শব্দচেতনা ২

স্বামীজীর জীবনের নানান ঘটনা ও তাঁর বাণীকে ভিত্তি করে তৈরি বিশেষ শব্দছক

১	২		৩			৪			৫
					৬				
	৭			৮					
৯			১০			১১			
১২									১৩
			১৪		১৫			১৬	
	১৭								
১৮							১৯	২০	
			২১			২২			
২৩					২৪				

সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম দশজনের নাম পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

পাশাপাশি ঃ (১) স্বামীজীর বিখ্যাত একটি কবিতা (৪) মিস ম্যাকলাউডকে স্বামীজী বলেছিলেন ঃ "ভারতবর্ষকে ——।" (৬) দুরন্ত বিলেকে ভুবনেশ্বরী দেবী যে-মন্ত্রে শান্ত করতেন (৭) স্বামীজী ভারতবাসীর মধ্যে যে-গুণের সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন (১০) প্যারিসের প্রদর্শনীতে যে-বাঙালীর গর্বে স্বামীজী গর্বিত হয়েছিলেন (১২) স্বামী ব্রহ্মানন্দকে স্বামীজী যে-নামে ডাকতেন (১৬) "একরূপ, অ-রূপ-নাম-বরণ অতীত-আগামি-কাল-হীন" যে-গানের অন্তর্গত (১৭) স্বামীজী প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইংরেজী মুখপত্র (১৯) প্রথমবার পাশ্চাত্যযাত্রায় হংকং বন্দরে পৌঁছে এদের কর্মতৎপরতা দেখে মুগ্ধ হন স্বামীজী (২১) "দাও আর ফিরে —— চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল।" (২৩) ১৮৯৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর নিউ ইয়র্কের ক্লাসে প্রদত্ত স্বামীজীর বক্তৃতার বিষয় (২৪) শিকাগো ধর্মমহাসভায় আমন্ত্রিত অন্যতম ভারতীয় প্রতিনিধি।

ওপর-নিচ ঃ (২) বস্টনে কেট স্যানবর্ণের যে-বাড়িতে স্বামীজী উঠেছিলেন (৩) নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে এই গানটি শুনিয়েছিলেন—"—— ম্যায় গোলাম।" (৪) স্বামীজী বলেছিলেন ঃ "—— আগে, ভাষা তারপর।" (৫) স্বামীজী কথিত জাতির উন্নয়নে অতি প্রয়োজনীয় তিনটি গুণের অন্যতম (৮) ডেট্রয়েটে স্বামীজী এঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন (৯) পরিব্রাজক স্বামীজী দিল্লির পরে এই স্থানে আসেন (১১) আলমোড়ায় ক্ষুধার্ত স্বামীজীকে এক মুসলমান ফকির যা খেতে দেন (১৩) স্বামীজীর এক বিখ্যাত পাশ্চাত্য অনুরাগিণী (১৪) স্বামীজীর প্রিয় অন্যতম ঐতিহাসিক চরিত্র (১৫) মীরাবাঈয়ের এই গানটি স্বামীজী গাইতেন—"—— না জানে কোঈ...।" (১৮) পাশ্চাত্যে স্বামীজীকে বলা হতো—'সাইক্লোনিক ——' (২০) পরিব্রাজক স্বামীজী গোয়ায় পৌঁছালে তাঁকে শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে আসা হয় সুব্রেই ——-এর বাড়িতে (২১) স্বামীজী প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সীলমোহরে যোগের প্রতীক (২২) স্বামীজী বলেছিলেন—"জন্মেছিস যখন, তখন একটা —— রেখে যা।"

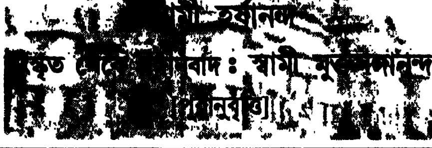
সূত্র ঃ পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অরিন্দম দাস

ভ্রম-সংশোধন

গত ফাল্গুন ১৪০৭ সংখ্যার ১২১ পৃষ্ঠায় প্রাপ্তি-সংবাদ-এ 'যা দেখেছি চোখ ভরে' বইটির লেখক 'পুলককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়' করা হয়েছে। হবে 'পুলককুমার মুখোপাধ্যায়'।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত
শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক সঙ্গীত

স্বামী হর্ষানন্দ
সংস্কৃত থেকে অনুবাদঃ স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ
(পূর্বানুবৃত্তি)



ব্যাঙ্গালোর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ প্রবীণ ও শাস্ত্রজ্ঞ সন্ন্যাসী স্বামী হর্ষানন্দজী স্বামী বিবেকানন্দ বিরচিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক সঙ্গীত'-এর সংস্কৃত ব্যাখ্যা করেছেন। সেগুলির প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ করেছেন বেলুড় মঠস্থ বিবেকানন্দ বেদ বিদ্যালয়ের আচার্য স্বামী মুক্তসঙ্গানন্দ।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

"সম্পদ তব শ্রীপদ ভব গোষ্পদ বারি যথায়।
প্রেমার্পণ সমদরশন জগজন দুঃখ যায়।" ।।৮।।

শব্দার্থঃ সম্পদ—সম্বল। তব শ্রীপদ—তোমার শ্রীপাদ-যুগল। ভব—সংসার। গোষ্পদ বারি—গরুর পায়ের চাপে তৈরি গর্তে যতটুকু জল ধরে। অন্যান্য শব্দের অর্থ স্পষ্ট।

ভাষ্যঃ জগতের যেসকল ভক্ত তোমার শ্রীপদযুগলকেই একমাত্র সম্বল করেছেন, তাঁরা অতি সহজেই এই সংসার-সমুদ্র পাড়ি দিতে সক্ষম; অচিরেই তাঁদের সকল দুঃখের অবসান হয়—এই অভিপ্রায়।

সম্পদ তব শ্রীপদ—শ্রীপতির পাদযুগল শ্রীযুক্তই হয়, যেহেতু শ্রী (লক্ষ্মী) ও হরি অভিন্ন—যেমন অগ্নি ও তার দাহিকাশক্তি অভিন্ন। এই জগতে ধনলোভী ব্যক্তিরা ধনরূপ সম্পদকেই অতি প্রিয় মনে করে। তাদের নিশ্চিত ধারণা—"সর্বে গুণাঃ কাঞ্চনমাশ্রয়ন্তি" (নীতিশতক, ৩৩)—সকল গুণই অর্থসম্পদকে আশ্রয় করে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু ভক্তগণ এরূপ মনে করেন না। তাঁরা বিশ্বামিত্র-উক্ত 'ধিক্ ক্ষত্রিয়বলকে, ব্রহ্মবলই একমাত্র বল'—একথার অনুকরণে 'সর্ব অনর্থের মূল ধনকে ধিক্, পরমার্থ-প্রদাতৃ হরিপদই একমাত্র ধন'—এরূপ নিশ্চয় করে ভগবৎপদযুগলকেই সম্পদ মনে করে থাকেন। তাঁদের কাছে এই **ভব** বা সংসার গোষ্পদ বারি বলেই মনে হয়। **প্রেমার্পণ**—মা কালীকে প্রেমার্পণ ও আত্মসমর্পণ করে তুমি মা কালীর চরণে প্রেমার্ঘ্যস্বরূপ অর্পিত হয়েছ। তুমি পণ্ডিত, এজন্য তুমি **সমদরশন**। 'পণ্ডা' শব্দের অর্থ আত্মজ্ঞান। পণ্ডা আছে যাঁর, তিনিই পণ্ডিত। আর পণ্ডিত ব্যক্তিই সমদর্শী হন। গীতায় আছে—বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে, গরুতে, হস্তিতে ও কুকুরে পণ্ডিতগণ সমদর্শী হন। তিনি 'সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চন'। (৫।১৮) স্বর্ণ ও মৃৎখণ্ডে সমদর্শী হওয়ায় 'টাকা মাটি মাটি টাকা' (ভগবানলাভের পক্ষে অনুপযুক্ত বলে ধন মৃৎখণ্ডের তুল্য) বলে শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়কেই গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছিলেন। অথবা একপদ করলে 'প্রেমার্পণ-সমদরশন'-এর অর্থ হবে—ঈশ্বরে প্রেমার্পণ করে তুমি সমদর্শন হয়েছ।

"নমো নমো প্রভু বাক্যমনাতীত মনোবচনৈকাধার।
জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর তুমি তমোভঞ্জন হার।" ।।৯।।

শব্দার্থঃ বাক্যমনাতীত—বাক্য ও মনের অতীত। মনোবচনৈকাধার—মন ও বাক্যের একমাত্র আধার বা আশ্রয়। জ্যোতির জ্যোতি—জ্যোতির্ময় পদার্থসমূহেরও জ্যোতি। হৃদিকন্দর—হৃদয়গুহা। তমোভঞ্জন হার—তমোহারী।

ভাষ্যঃ হে নিখিল জগতের একমাত্র প্রভো! তুমি **বাক্যমনাতীত**—অবাঙ্‌মনসোগোচর, যেহেতু তুমি নির্গুণ, গুণময়, নীরূপ ও নিখিলস্বরূপ। এমন হওয়া সত্ত্বেও তুমি **মনো-বচনৈকাধার**—আমাদের মন ও বাক্যের একমাত্র আধার, আশ্রয়। শ্রুতিতে আছে—তিনি মনেরও মন, বাক্যেরও বাক্য এবং প্রাণেরও প্রাণ। (কেন উপনিষদ্, ১।২); বাগেন্দ্রিয় দ্বারা যিনি উচ্চারিত হন না, যাঁর দ্বারা বাগেন্দ্রিয় প্রকাশিত হয়...। মন যাকে প্রকাশ করতে পারে না, যাঁর দ্বারা মন প্রকাশিত হয়। (ঐ, ১।৫-৬) তিনি (পরব্রহ্ম) জ্যোতির্ময় বস্তুসমূহেরও জ্যোতি। সেই জ্যোতির্ময়সকলের অমরজ্যোতিকে দেবগণ 'আয়ু' বলে উপাসনা করেন। (বৃহদারণ্যক উপনিষদ্, ৪।৪।১৬)। সেই ব্রহ্মকে সূর্য প্রকাশ করেন না, চন্দ্রতারকাও প্রকাশ করে না। এই বিদ্যুৎসকলও প্রকাশ করে না; এই অগ্নি আবার কিভাবে প্রকাশ করবে? তিনি প্রকাশমান বলেই সকল বস্তু দীপ্তিমান হয়। তাঁরই দীপ্তিতে এই সমুদয় প্রকাশিত হয়। (কঠ উপনিষদ্, ২।২।১৫) এইসকল শ্রুতিবাক্যই প্রমাণ করে যে, তিনি **জ্যোতির জ্যোতি**। এই পরমাত্মাস্বরূপ তুমি **তমোভঞ্জন হার**—অজ্ঞান-অন্ধকার নাশকারী। অতএব আমার হৃদয়কন্দর **উজল** বা উজ্জ্বল কর। আমার হৃদয়ে এসে তুমি বস। সূর্যোদয়ে যেমন ঘোর অন্ধকার তৎক্ষণাৎ দূর হয়, সেইরকম তোমার আগমনে আমার হৃদয়স্থ ঘনীভূত তমোও তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হবে। অভিপ্রায় এই যে, ভক্ত যখন প্রভু পরমাত্মাকে স্বহৃদয়ে ধ্যান করেন, তখন সেই পরমাত্মা ভক্তির দ্বারা প্রীত হয়ে ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে তার হৃদয়গ্রন্থি (অবিদ্যা-অহঙ্কার বাসনা) ছেদন করে অনন্তকোটি জন্মের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন। এজন্যই এই প্রার্থনা করা হয়।

"ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ বাজে অঙ্গ সঙ্গ মৃদঙ্গ
গাইছে ছন্দ ভকতবৃন্দ আরতি তোমার—
জয় জয় আরতি তোমার
হর হর আরতি তোমার
শিব শিব আরতি তোমার।" ।।১০।।

ভাষ্যঃ ধে ধে ধে **লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ** শব্দগুলি অনুকারাত্মক শব্দ (অনুকার ধ্বন্যাত্মক শব্দ)। মৃদঙ্গ ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র তাল-লয় সহযোগে বাজালে 'ধে ধে ধে লঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ' ইত্যাদি শব্দ হয়। এইসব শব্দযোগে ভক্তগণ **জয় জয় আরতি তোমার, হর হর আরতি তোমার, শিব শিব আরতি তোমার** উচ্চারণ করে তোমার ছন্দোবদ্ধ আরাত্রিক-গান গায়।

যিনি ভববন্ধন খণ্ডন করেন, সেই শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আমার এই বাঙ্ময় পুষ্প (অর্থাৎ পুষ্পস্বরূপ এই ব্যাখ্যা) অর্পিত হলো, তিনি তা কৃপা করে গ্রহণ করুন। [সমাপ্ত] ❑

পাতঞ্জল-যোগসূত্র

ব্যাখ্যাতা ঃ স্বামী প্রেমেশানন্দ

সূত্রানুবাদ ঃ স্বামী শরণ্যানন্দ
সম্পাদনা ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

সাধনপাদ

স্বাধ্যায়' শব্দের অর্থ—প্রাচীন মতে বেদাধ্যয়ন বা শাস্ত্রপাঠ এবং যোগশাস্ত্র মতে মন্ত্রজপ। তপস্যা ও স্বাধ্যায়ের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন না থাকিলে পাঠ ও জপ উভয় ক্রিয়াই বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। যাহা অধ্যয়ন করিলে অভ্যুদয়ের পথে চলিতে চলিতে নিঃশ্রেয়স পর্যন্ত পৌঁছিবার সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাই 'স্বাধ্যায়'। মানুষকে জানিতে হইবে—সে কি, কেন এই জীবনধারণ করিয়াছে এবং পরে তাহার অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে? চৈতন্য নিজেকে আবৃত করিয়া লক্ষ লক্ষ জন্ম, কোটি কোটি বৎসর নিজের কর্মের ফলভোগ করিতেছেন। ইচ্ছা করিলে যথোচিত উপায়ের সহায়ে এই সৃষ্টির সকল ভোগই লাভ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব এবং ইচ্ছা করিলে তিনি জীবনের পরপারে গিয়া পূর্ণ শান্তিলাভও করিতে পারেন। এই কথাগুলি জানা মোটেই কঠিন নহে। এখনো পুরাতন গ্রাম্যলোক অনেক তত্ত্ব মনে রাখিয়াছে। ভারতবর্ষে সর্বত্র এই তত্ত্ব সকলকে শিখাইবার ব্যবস্থা ছিল। হিন্দুজাতি এত বিপ্লবেও যে টিকিয়া আছে তাহা এই জ্ঞানেরই ফল। যে-আহাম্মক জানে না—আমি কে, কোথায় আছি এবং কোথায় যাইব, তাহার সঙ্গে তো পশুপক্ষীর কোন পার্থক্য দেখিতেছি না। যোগীর কথা বলাই বাহুল্য। ইহা প্রত্যেক মানুষেরই সর্বাগ্রে জানা কর্তব্য।

'ঈশ্বর-প্রণিধান' শব্দের অর্থ, যোগশাস্ত্রের টীকাকারগণ বলিয়াছেন, ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করিয়া নিজের কর্তব্য সম্পাদন করা। ঈশ্বর-প্রণিধানের মূল উদ্দেশ্য—জীবন সার্থক করিবার জন্য অনন্ত শক্তির আধার ঈশ্বরের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করা এবং তাঁহার নিকট হইতে শক্তিলাভ করিয়া অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স সাধন করা। ঈশ্বর যে সর্বশক্তিমান—ইহা প্রায় সব ধর্মাবলম্বীই জানেন, তবে জীব যে তাঁহার সহিত নিত্যযুক্ত—ইহা প্রায় কেহই জানেন না। ধর্মসমূহ প্রচারিত হইতে না হইতে পুরোহিতদের হাতে গিয়া পড়ে। পুরোহিতগণ যদি প্রচার করেন—ব্রাহ্মণের সঙ্গে ঈশ্বরের যে সম্বন্ধ, চণ্ডালের সঙ্গে সম্বন্ধটিও ঠিক সেইরূপ, তাহা হইলে তাঁহাদের ব্যবসা কিরূপে চলিবে? এই কারণে শিক্ষার অভাবে সর্বদেশে সর্বকালে মানুষ নিজেকে ঈশ্বর হইতে দূরে সরাইয়া আপনাকে হীন করিয়া রাখে। মানুষের মধ্যে এমন তমোগুণী পশুতুল্য লোকও আছে, যাহারা পুরোহিতদের হাতে জীবনের সব দায়িত্ব দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়। পুরোহিতরা যাহা হিতকর বুঝেন তাহাই করিতে করিতে ক্রমে স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠিতে পারেন। এই যে জগন্ময় 'ঈশ্বরের ইচ্ছা', 'আল্লার হুকুম', 'কপালের লেখা' প্রভৃতি মতবাদের চাপে মানুষ বিপন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাহা পুরোহিতদেরই মস্তিষ্কপ্রসূত। তাহা দূর করিবার একমাত্র উপায় ঈশ্বর-প্রণিধান। ইহার অর্থ—ঈশ্বর মানা বা কোন সম্প্রদায়ে ভর্তি হওয়া, ব্রাহ্মণদের সন্ধ্যাহ্নিক বা আধুনিক সাধকদের 'জব্-ধ্যান' নহে, অবিরাম ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্মৃতি জাগ্রত রাখা। আমাদের দেশে 'হরি সর্বময়'—এই কথাটি সর্বত্রই প্রচার করা হইয়াছিল। কিন্তু এখন কোথাও তত্ত্বচর্চা নাই, তাহার ফলে সাম্প্রদায়িক মতবাদে 'ঈশ্বর-প্রণিধান' চাপা পড়িয়া গিয়াছে।

স্বামীজী বলিতেন ঃ "The only God I believe in... [is] the sum total of all souls." [দ্রঃ Letters of Swami Vivekananda, 10th Imprn., 1998, p. 350] আমরা প্রত্যেকে তাঁহার সঙ্গে নিত্যযুক্ত, আমরা সেই শক্তিসমুদ্রে এক-একটি ঘূর্ণি, আমাদের দেহ-মনে যাহা কিছু শক্তি তাহা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছে। আমরা যতই তাঁহার কাছে থাকিতে পারিব, তাঁহার সম্বন্ধে সচেতন থাকিব, ততই আমাদের মধ্যে শক্তির বিকাশ হইবে। আমাদের ভিতরে ভিতরে ঈশ্বরের সঙ্গে যে যোগ আছে, তাহা বুঝাইবার জন্য হিন্দুদের বেদ-পুরাণে বহু চেষ্টা করা হইয়াছে। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ রাখিলে মন-বুদ্ধি নির্মল হয়। তাই ঈশ্বরের শক্তি শুদ্ধ মন-বুদ্ধির মাধ্যমে অন্তরে প্রতিফলিত হয়। কোন বিশেষ পুরুষের পূর্বকর্মফলে বিশেষ শক্তির প্রকাশ হইতে দেখা যায়, কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ না থাকিলে সেই শক্তি আসুরিক শক্তিতে পরিণত হইয়া জগতের অনিষ্টসাধন করে। ঈশ্বর-প্রণিধানহীন লোক শুধু নীতিশাস্ত্র পাঠ করিয়া নৈতিক জীবনযাপন করিতে পারে, কিন্তু সামান্য প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা তাহার থাকে না। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, ভক্তসাধক ও ত্যাগী সন্ন্যাসিগণ সৎকর্ম, পরোপকার প্রভৃতি করিতে গিয়া ঈশ্বর-প্রণিধানে বিরত হওয়ায় অধঃপতিত হইয়া জনসমাজে হাস্যাস্পদ হন।

সুতরাং তপস্যার দ্বারা প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার শক্তিলাভ করিয়া ব্যষ্টিতত্ত্ব বুঝিতে পারিলে সমষ্টির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিয়া মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিতে পারে।

অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ।।৩।।

অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ (আসক্তি)—এইগুলি পঞ্চক্লেশ।

অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্।।৪।।

অবিদ্যা অন্য ক্লেশগুলির উৎপত্তির কারণ। ক্লেশগুলি কখনো সুপ্তভাবে, কখনো সূক্ষ্মভাবে, কখনো অন্য বৃত্তির দ্বারা অভিভূত, কখনো বা প্রকাশিত হইয়া থাকে।

অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্য-শুচি-সুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।।৫।।

অনিত্য, অশুচি, দুঃখকর ও অনাত্ম বস্তুতে যথাক্রমে নিত্য, শুচি, সুখকর ও আত্মা বলিয়া যে-ভ্রম, তাহাই অবিদ্যা।

দৃগ্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাঽস্মিতা।।৬।।

দ্রষ্টা ও দর্শনশক্তির একাত্মতা হইল অস্মিতা।

সুখানুশয়ী রাগঃ।।৭।।

যে-মনোবৃত্তি কেবল সুখকর বস্তুতে থাকিতে চায়, তাহা রাগ।

দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।।৮।।

দুঃখকর পদার্থে যে-মনোবৃত্তির স্থিতি, তাহা দ্বেষ।

স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ।।৯।।

যাহা পূর্বকালীন মৃত্যুভয় হইতে উৎপন্ন এবং যাহা পণ্ডিতব্যক্তিদের মধ্যেও বর্তমান, তাহাই অভিনিবেশ।

মন্তব্য ঃ জগৎকারণ ব্রহ্ম খেলার ছলে বিদ্যামায়ার দ্বারা তাঁহার কিয়দংশ আবৃত করিয়া সেই অংশকে বহুখণ্ডে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যোগীরা সেই বিদ্যামায়ার আবরণে আবৃত অবস্থা লাভ করিয়া জীবন্মুক্তির সুখভোগ করিতে পারেন। তবে যোগশাস্ত্রের উদ্দেশ্য একমাত্র কৈবল্যপ্রাপ্তি। সেই অবস্থা লাভ করিবার জন্যই যোগসাধনা উপায়রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

ক্বচিৎ কোন সিদ্ধ যোগী ঐ অবস্থা লাভ করিতে পারেন। অন্যান্য সমস্ত জীব ব্রহ্মের দ্বিতীয় আবরণ অবিদ্যামায়ার দ্বারা আবৃত। আত্মবিস্মৃত হইয়া জীব বোধ করে, সে একটি জড়সত্তা। এই জড়সত্তাকেই বলে 'বুদ্ধি'। ঐ বুদ্ধি হইতেই মানুষের মন, প্রাণ, দেহ প্রপঞ্চিত হয়। নিজেকে ভুলিয়া জীব বুদ্ধিকে 'আমি' বলিয়া বোধ করে। তাহার ফলে এই সুখদুঃখময় জীবন লইয়া তাহাকে এই সৃষ্টিরঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে হয়। বুদ্ধির অভিজ্ঞতার ফলে কতকগুলি জিনিস ভাল বোধ হয়, আবার কতকগুলি বোধ হয় মন্দ। আর এই দ্বন্দ্বময় জীবনটাকে 'আমি' ভাবিয়া ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য জীবের কি যে বিপুল উদ্যম চলিয়াছে, তাহা জগতের সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। একটা সামান্য পেন্সিল হারাইয়া ফেলিবার ভয়ে আমরা কত সাবধানতা অবলম্বন করি। আর যাহাকে আমার সত্তা বলিয়া মনে করি, সেই দেহমনের ক্ষতি সহ্য করা আমাদের পক্ষে তো অসম্ভব।

তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ।।১০।।

সূক্ষ্ম সংস্কারগুলিকে উহাদের কারণে পরিণত করিয়া নাশ করিতে হয়।

ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ।।১১।।

ধ্যানের দ্বারা উহাদের স্থূল অবস্থা নাশ করা যায়।

ক্লেশমূলঃ কর্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ।।১২।।

পূর্বোক্ত ক্লেশগুলি কর্মের আশয় বা আধার, ইহারা বর্তমান জীবনে অথবা পরজীবনে ফল প্রসব করে।

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।।১৩।।

মনে এই সংস্কাররূপ মূল থাকায় তাহা মনুষ্যাদি জাতি, আয়ু এবং সুখ-দুঃখ ভোগের কারণ হয়।

তে হ্লাদপরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ।।১৪।।

পুণ্য ও পাপ সংস্কারগুলির কারণ বলিয়া উহাদের ফল যথাক্রমে সুখ ও দুঃখ।

মন্তব্য ঃ এই বিপদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায় আত্মবিস্মৃতি দূর করিয়া স্বরূপ অনুভব করা। তাহা করিতে হইলে স্ব-স্বরূপের কথা ভাবিতে ভাবিতে মনের বিষয়কারা বৃত্তি বন্ধ করিতে হইবে। এই প্রকারে নিরুদ্ধ চিত্তকে তাহার কারণ অবিদ্যায় এবং অবিদ্যাকে তাহার কারণ স্ব-স্বরূপে লীন করিতে হয়। আমাদের কর্মসমূহের কার্য শেষ হইলে সূক্ষ্ম সংস্কার-রূপে চিত্তে সঞ্চিত হইয়া থাকে। সেইসব কর্মের প্রেরণায় মানুষকে বারবার জন্মগ্রহণ করিতে হয় এবং প্রতি জন্মে পূর্ব কর্মের ফলভোগ করিতে হয়। কোন ভাল কর্ম করিলে তাহাতে যেমন পুণ্য হয়, তেমনি আবার কর্মসিদ্ধির উপায় বা পদ্ধতি অবলম্বনের উপর পাপও হইবার সম্ভাবনা। ইহার ফলে মানুষের জীবনে যেমন সুখ আছে, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখও আছে। এইজন্য বিচারশীল মানুষের দৃষ্টিতে এই জগৎটা দুঃখময় বলিয়া বোধ হয়। জড়বস্তুর স্বভাব এই যে, তাহা অবিরাম পরিবর্তন, পরিবর্ধন, ক্ষয় প্রভৃতি নানাপ্রকার পরিণামগ্রস্ত হইয়া চলে। আমরা আত্মবিস্মৃত হইয়া সেই জড়কে (অর্থাৎ বুদ্ধিকে) 'আমি' বোধ করি। তাই লক্ষ লক্ষ জন্ম ধরিয়া এই ভ্রান্ত 'আমি'টিকে ঠিক রাখিবার জন্য অবিরাম ব্যস্ত থাকি। একটা কর্ম করিলেই তাহা আবার আরেকটি কর্ম করিবার প্রেরণা দিয়া থাকে। তাহাতে কখনো নিজের উপকারক কর্ম করি, কখনো বাধ্য হইয়া নিজের অনিষ্টকারক কর্ম করিয়া থাকি। আর "সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।" (গীতা, ১৮।৪৮) এই কর্মপ্রেরণায় সুখে-দুঃখে উঠা-নামা করিতে করিতে এক দেহ নাশ হইলে আরেক দেহ নির্মাণ করি, এইরূপে অনন্তকাল ধরিয়া কর্মভোগ করিয়া আমরা জীবনযাপন করিতেছি। [ক্রমশ] (ছয়)



রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম

(প্রাপ্ত পত্র)

"উদ্বোধন সম্পাদক মহাশয় শ্রীচরণেষু,—

নিবেদন এই[,] আমরা স্বামী স্বরূপানন্দের উদযোগে [উদ্যোগে] কয়েক দিবস যাবৎ সাহারাণপুর জেলার অন্তর্গত, হরিদ্বার-সমীপবর্ত্তী [সমীপবর্তী] কন্খল [কনখল] নামক স্থানে একটী [একটি] আশ্রম স্থাপিত [স্থাপন] করিয়াছি। আশ্রমের উদ্দেশ্য [-রূপে] নিরাশ্রয় ও পীড়িত সাধু ও গরীবদিগের [গরিবদিগের] সেবা, ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা করা হয়।

এখানে হাসপাতাল কিম্বা [কিংবা] কোন ডাক্তার নাই, সুতরাং নিরাশ্রয় সাধু ও গরীবদিগের [গরিবদিগের] অসুখ হইলে কষ্ট সহজেই অনুভবনীয়; বিশেষতঃ [বিশেষত] এটী [এটি] তীর্থস্থল [তীর্থস্থান] এবং সাধুদিগের একটী [একটি] প্রধান আড্ডা, অতএব নানাদেশ হইতে অনেক দরিদ্র যাত্রী ও সাধু এখানে আসিয়া বাস করে ও ভিক্ষা এবং মাধুকরী-বৃত্তি দ্বারা কোনমতে জীবন ধারণ করে, কিন্তু অসুখ হইলে তাহাদের ঔষধ, পথ্য ও সেবা করিবার কেহই নাই; অতএব এরূপ একটী [একটি] আশ্রম এখানে অতীব প্রয়োজনীয় বিধায় পূজনীয় স্বামীজির [স্বামীজীর] উপদেশানুসারে এই আশ্রমটী [আশ্রমটি] স্থাপিত [স্থাপন] করা হইয়াছে। আশ্রমের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, সুতরাং সর্ব্বসাধারণের [সর্বসাধারণের] নিকট আমরা সাহায্যপ্রার্থী। সম্প্রতি ২টী [২টি] রোগী দেখিতেছি। কার্য্য [কার্য] বিবরণ মাসান্তে পাঠাইব। ইতি।

দাস

১৩ই জুলাই, ১৯০১ — কল্যাণানন্দ"

আজকালকার আজ্ঞাপালন!

মনে করুন, আপনারই একটী [একটি] আফিস [অফিস] আছে। আফিসে [অফিসে] আপনার তাঁবে শতাধিক কেরাণী [কেরানি] খাটেন; তবু, আপনাকেও হয় ত [হয়তো] সমস্ত দিবসই ভূতগত পরিশ্রম করিতে হয়। একদিন অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন, কার্য্যের [কার্যের] উপর কার্য্য [কার্য] চারিদিক্ হইতে আসিয়া পড়িতেছে; এক মুহূর্ত্তও [মুহূর্তও] চেয়ার হইতে উঠিবার সময় পাওয়া দূরে থাক, চেয়ারেই পা-মুড়ে বসিবার সময় পাইতেছেন না, এমন সময় হঠাৎ কোনও [কোন] কার্য্যবশতঃ [কার্যবশত] সম্মুখস্থ একটী [একটি] কেরাণীবাবুকে [কেরানিবাবুকে] তাড়াতাড়ি বলিলেন, "যাও ত [তো] হেঁ [হে] চট্ করে ইষ্টারণ [ইস্টার্ন] ট্রেডিং কোম্পানীর গ্রেহাম সাহেবের কাছ থেকে এই জিনিষটার [জিনিসটার] দরটা জেনে এসো ত [তো]।" মনিব তখন হাজারই ব্যস্ত থাকুন, কেরাণীবাবু [কেরানিবাবু] হয় ত [হয়তো], অবাধে বিনা কিছু-না-কিছু প্রশ্ন এবং সেই সকল নির্ব্বোধ [নির্বোধ] প্রশ্নের দ্বারা মনিবের মাথা একটু-না-একটু গরম না করিয়া, কোনও [কোন] মতে যাইতে পারিবেন না।

—ইষ্টারণ [ইস্টার্ন] ট্রেডিং কোম্পানির আফিস [অফিস] কোথা? ফটকে দরওয়ান ঢুকতে দেবে ত [তো]? সেখানকার নিয়ম কি?—ছাতা-টাতা কি বাইরে দরওয়ানের কাছে রেখে যেতে হয়? গ্রেহাম সাহেবকে ত [তো] আমি চিনি না? গ্রেহাম সাহেব কোন্ ঘরে বসেন? গ্রেহাম সাহেবের চেহারা কি রকম?...

কেরাণীবাবু [কেরানিবাবু] অত বোকা মানুষ না হইতেন যদি, তাহা হইলে খোদ কর্ত্তাকে [কর্তাকে] কোন প্রশ্ন না করিয়া, আফিসের [অফিসের] অপর কাহারও নিকট হইতে স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন।...

যদি তিনি মাঝারী [মাঝারি] ধাতের লোক হইতেন, তাহা হইলে হয়ত [হয়তো] অবাধে এই এই রকমের কোন না কোন উত্তর দ্বারা আপনার মাথা আরও গরম করিয়া দিতেন—আমার হাতে এখন অনেক কার্য [কাজ] রয়েছে। আমার শরীরটা এখন বড় খারাপ। রোদ্দুরে, মশাই, আমার যেতে বড় কষ্ট হয়। আর কারুকে যদি পাঠান বড় ভাল হয়। আমি কোথাও গেলে, মশাই, বড় কেরাণীবাবু [কেরানিবাবু] বড় ব্যাজার [বেজার] হন। একটু বাদে যাচ্ছি। এখন যে আমাদের টিফিনের সময়! অমুককে পাঠান ত [তো] বড় ভাল হয়। গ্রেহাম সাহেব আমার উপর [ওপর] বড় চটা! আর কোথাও পাঠান ত [তো] যাই; গ্রেহাম সাহেবের কাছে আমি যেতে পারবো [পারব] না। আমাকে এখুনি আজ ছুটী [ছুটি] নিয়ে বাড়ি যেতে হবে, বড় দরকার। ইত্যাদি।

আর, কেরাণীবাবু [কেরানিবাবু] যদি একটু কড়া ধাতের হইতেন, তাহা হইলে ত [তো] আর কথাই ছিল না; হয় ত [তো] এইরূপ কোন এক তীব্র উত্তরের দ্বারাই মনিবকে চটাইয়া আগুন করিয়া দিতেন—"আমি ত [তো] আপনার ব্যায়রা [বেয়ারা] নই। বড় দরকার থাকে, আপনি টেলিফোঁ [টেলিফোন] কর্‌তে [করতে] পারেন। আমি আপনার এ কার্য্যের [কার্যের] জন্য মাহিনা খাই না। আজ বলবেন দরটা জেনে এসো, কাল বলবেন বাজারটা ক'রে আনো, পরশু বলবেন তামাকটা সাজো, তারপর দিন বলবেন জুতোটা ঝাড়ো; মশাই, মাফ করবেন, আমরা ভদ্রলোকের ছেলে।"

এই সকল স্থলে, আপনি নিজে যদি মনিব হইতেন, আপনার সেই কর্ম্মচারীর [কর্মচারীর] সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতেন, মনে করিয়া দেখুন। যেসকল আফিসে [অফিসে], বা যেসকল কর্ম্মক্ষেত্রে [কর্মক্ষেত্রে], এইরূপ কর্ম্মচারীর [কর্মচারীর] দল লইয়া কার্য্য [কার্য] চালাইতে হয়, সেসকল স্থানের কার্য্যও [কার্যও] কত সুসম্পন্ন হয়, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। এমন আফিস [অফিস] বা এমন কার্য্যক্ষেত্র [কার্যক্ষেত্র] কোনও দেশে নাই, যে আফিস [অফিস] বা কার্য্যক্ষেত্র [কার্যক্ষেত্র] খুঁজিলে, এইরূপ কর্ম্মচারী [কর্মচারী] একজনও না বাহির হয়।...

আপনি অবাক হইয়া মনে করিলেন—বাঃ অদ্ভুত আজ্ঞাপালনের দৃষ্টান্ত বটে!!

ওপরের উদ্ধৃত অংশে একশ বছর আগেকার 'work culture' বা 'কর্মসংস্কৃতি'র যে-চিত্র ফুটে উঠেছে, তার প্রেক্ষিতে আজকের কর্মসংস্কৃতি তুলনীয় মনে হওয়ায় এই অংশটি উদ্ধৃত করা হলো।—সম্পাদক

সঙ্কলন: রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ● সম্পাদনা: স্বামী সর্বগানন্দ

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দের ভূমিকা ও তাৎপর্য

অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দের যে ভূমিকা, তাতে প্রতিফলিত রয়েছে তাঁর জাতীয়তা ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনা। বললে অত্যুক্তি হবে না, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার উদ্দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রে উদ্দীপিত যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ১৯০২ থেকে ক্রমশ প্রবল আকার ধারণ করে ব্রিটিশ সরকারকে বিপর্যস্ত করে তোলে—তার নেতা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, যিনি পরবর্তী কালে 'শ্রীঅরবিন্দ' নামে পরিচিত হন। অবশ্য তাঁর পিছনে অনুপ্রেরণার অগ্নিময় বার্তা নিয়ে উপস্থিত ছিলেন '[illegible] মন্ত্র' স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি তৎকালীন জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের ধনতন্ত্রী পাশ্চাত্যের প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করে অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন; স্বাধীনতালাভের জন্য আবেদন অনুনয়-বিনয়ের নীতিকে তিনি মোটেই পছন্দ করেননি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, কিছু সাহসী শক্তিমান স্বদেশপ্রেমী যুবকের সংগঠন স্বাধীনতা এনে দিতে পারবে, যাদের পেশী লৌহগঠিত ও স্নায়ু ইস্পাতে তৈরি, ইচ্ছাশক্তি প্রবল ও দুর্দমনীয়। তিনি স্পষ্টত বলেছিলেন, দৌর্বল্যের পরিণতি দাসত্বে। সুতরাং বলপ্রয়োগ করেই স্বাধীনতার অধিকার লাভ করতে হবে, ভিক্ষার সাহায্যে নয়। একজন ভিক্ষুক যা সংগ্রহ করে, তাকে বলে দান (dole), যার মূলে থাকে করুণা ও অবজ্ঞা।

অরবিন্দের আন্দোলন দেশব্যাপী যে জাগরণের সূচনা করে, তার পরিণতিতে পরবর্তী কালে বহু বিপ্লবী নায়কের আবির্ভাব ঘটে—যাঁরা ঐ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে চলেন ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত—যেদিন ভারত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। বস্তুত, অসহযোগ ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মূলে ছিল অরবিন্দেরই ভাবনা, যার বাস্তব রূপায়ণে অবশ্য প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেওয়া সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে।

তাঁর ঐ ভূমিকার তাৎপর্য বিচার করলে দেখব, সেটি ছিল সুদূরপ্রসারী, তাতে অন্তঃগূঢ়রূপে নিহিত তাঁর জীবনের মর্মকথা, আদর্শ ও দর্শন। মনে বিস্ময় জাগতে পারে, যখন তাঁর পরবর্তী জীবনে জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক রূপটিকে খুঁজে পাই না। অবশ্য অরবিন্দের কাছে জাতি ছিল সমগ্র দেশ—ভারতবর্ষ, কোন একটি ধর্মগত বা সাংস্কৃতিক বা প্রাদেশিক অথবা ভাষাগত গোষ্ঠী নয়। তিনি নিজেই বলেছেন ঃ "দেশ জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা, জাতি নহে, ধর্ম নহে, আর কিছুই নয়, কেবল দেশ। অনেক পরস্পর-বিরোধী জাতি এক দেশে নিবাস করে... কিন্তু তাহাতে ভয় কি?" প্রকৃতপক্ষে তাঁর জাতীয়তাবাদ ছিল বৃহত্তর মানব-প্রেমেরই এক আংশিক রূপ। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মানুষের যে মূল সমস্যা ও আকাঙ্ক্ষা, তারই প্রেরণায় তাঁর জীবনগতি ও তপস্যা। তিনি বলেছেন ঃ "আলো চাই, স্বাতন্ত্র্য চাই, চাই অমৃতত্বের অধিকার, চাই দিব্যজীবনের ভাস্বর মহিমা। এই অভীপ্সা নিয়ে যেমন মানুষের যাত্রা শুরু, এর চরিতার্থেই তার ইতি।"

তিনি মানুষকে দেখেছিলেন সামগ্রিক রূপে, একটি একক হিসাবে। অনুভব করেছিলেন, পৃথিবীর কোথাও কোন অঞ্চল যদি পরাধীন থাকে, তাহলে মানবকুলেরই প্রকৃত প্রগতি সেখানে এসে প্রতিহত হবে, যেমন শরীরের একাংশে যদি রক্তচলাচল ব্যাহত হয় তাহলে সমগ্র শরীরই বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, ভারতবর্ষ যতকাল পরাধীন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকবে ততকালই তার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে থাকবে, আচরণ-গতি রইবে অত্যন্ত সীমিত ও ক্ষীণ হয়ে এবং বিশ্ব তার কাছে যা প্রত্যাশা করে তা সে কখনোই দিতে পারবে না। তাই স্বাধীন ভারতের জন্মদিনে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট অরবিন্দ ঘোষণা করলেন ঃ "১৫ আগস্ট... এই দিনে ভারতের একটা যুগের শেষ হলো, আরম্ভ হলো নতুন যুগ। কিন্তু কেবল আমাদের জন্যই নয়—এশিয়ার জন্য, সমগ্র জগতের জন্য এদিনের অর্থ আছে। সে-অর্থ হলো নেশনগোষ্ঠীর মধ্যে একটা নতুন নেশন-শক্তির আবির্ভাব, অফুরন্ত যার ভবিষ্য সম্ভাবনা; মানবজাতির রাষ্ট্রিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভবিষ্য গঠনে যার থাকবে বৃহৎ অবদান।"

আরো তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, ঐ মানবতাবাদেরও গভীরে রয়েছে এক আধ্যাত্মিক প্রাণের নির্ঝর, যার লক্ষ্য মানুষের সবরকম বন্ধন মোচন—মনের বন্ধন, প্রাণের বন্ধন, জড় শরীরের বন্ধন এবং সেখানে আত্মার স্বরূপকে ফুটিয়ে তোলা। এই হলো তাঁর আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ (spiritual humanism)। জীবের সমস্ত বন্ধন এসেছে বিশ্বপ্রকৃতির অধস্তন বিভাগে—যাকে বলা হয় অবিদ্যার রাজ্য, বৈদিক ভাষায় 'অপরা প্রকৃতি',

অরবিন্দের বর্ণনায় 'lower nature'। আর ঐ আধ্যাত্মিক নির্ঝর নিঃসৃত হয়েছে বিশ্বপ্রকৃতির উর্ধ্বতন বিভাগ থেকে, যাকে বেদে বলা হয়েছে 'পরাপ্রকৃতি', অরবিন্দের ভাষায় 'higher nature'; বাইবেল, কোরান ও হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে তা 'স্বর্গ' বলে চিত্রিত। ঐ নির্ঝর সর্বপ্রথমে আর্য ঋষিকুলের অন্তরে নেমে এসে বৈদিক মন্ত্রে ধ্বনিত হয়েছিল এবং পরবর্তী কালে তা পৃথিবীর অল্প কিছু মানুষের মধ্যে এসে পৌঁছায়, যাঁরা 'দেবদূত' বলে পরিচিত। অরবিন্দ ছিলেন ঐসমস্ত মানুষদের অন্যতম, যিনি তাঁর তপস্যায় দিব্যচেতনার শক্তি ও আলোককে আয়ত্ত করে জীবকুলকে তুলে নিতে চেয়েছিলেন পরাপ্রকৃতির জ্ঞানালোকের মধ্যে, সৌন্দর্যচেতনা ও নীতিবোধের উন্নততর ভূমিতে। অথবা বলতে পারি, চেয়েছিলেন অপরাপ্রকৃতিরই বিপুল সম্ভাবনাকে উর্ধ্বের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে তুলে ধরতে। তিনি বলেছিলেনঃ "আমাদের এই অর্ধপাশব মানবতার কোরক হতে ফুটবে দেবমানব এবং দিব্যজীবনের মহিমা।" বলেছিলেনঃ "এই পার্থিব আধারেই ফুটবে দ্যুলোকের দীপ্তি, মর্ত আধারেই সার্থক হবে অমৃতের প্রৈতি।"

মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশের অনুকূল সমাজ-পরিবেশের কথাও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছিলেন তিনি। উপযুক্ত সমাজব্যবস্থাতে থাকবে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ সঙ্গতি, যেখানে রাষ্ট্র গোষ্ঠীর স্বার্থকে ক্ষুণ্ণ না করে প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে এনে দেবে পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ। আবার তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, বিজ্ঞান, দর্শন, সংস্কৃতি এবং সমাজচেতনার বিকাশের ক্ষেত্রে, বিশেষত আত্মার বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যষ্টিই প্রাকৃতিক নিয়মে প্রাধান্য পায়। তিনি বলেছিলেনঃ "মানবজাতির মধ্যে বিরাজমান চিন্ময় আত্মা ব্যষ্টি মানুষের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করে, বিকশিত হয়ে রূপ পরিগ্রহ করে, প্রগতিশীল ও গঠনশীল ব্যষ্টির মধ্য দিয়ে এই আত্মা জাতির কাছে একটা নবসৃষ্টির আবিষ্কার ও সম্ভাবনার সুযোগ উপস্থিত করে... জনসাধারণ তাদের অনুসরণ করে দুর্ভাগ্যবশত অতি ত্রুটিপূর্ণ ও বিভ্রান্তভাবে, যার ফলে প্রায়ই, এমনকি সাধারণত, সৃষ্ট বস্তুটি বিকৃত হয় কিংবা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।" দুঃখের বিষয়, দুর্ভাগা এদেশের নেতৃবৃন্দ যদি স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী বা সুভাষচন্দ্র—এঁদের কোন একজনেরও প্রদর্শিত পথে আধ্যাত্মিক মানবতাবাদের সঠিক রূপায়ণে এগিয়ে চলতেন, তাহলে নিশ্চয়ই আজ ভারতবর্ষ জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে মানবজাতির নেতৃত্ব-গ্রহণে সক্ষম হতো।

অরবিন্দের জন্ম কলকাতায়, ১৮৭২ সালের ১৫ আগস্ট। তাঁর শৈশব ও প্রথম যৌবন—সাত থেকে একুশ বছর বয়স পর্যন্ত কেটেছে ইংল্যাণ্ডে। ভারতে ফেরার পর তের বছর কাটে গুজরাটের বরোদায় এবং মাত্র তিন-চার বছর কাটে জন্মস্থান কলকাতায়। তাঁর পরবর্তী জীবন (১৯১০-১৯৫০) কাটে পণ্ডিচেরীর তাপসগুহায়।



বালক অরবিন্দ

১৮৭৯ সালে, যখন তাঁর বয়স সাত বছর, তখন থেকে তিনি গড়ে ওঠেন ইংল্যাণ্ডের পরিবেশে। যখন তিনি লণ্ডনের সেণ্ট পলস্ স্কুলের ছাত্র, তখন থেকেই তাঁর কাব্যিক প্রতিভা প্রকাশ পায়। তাঁর বাবা সিভিল সার্জন কৃষ্ণধন ঘোষ ভারত থেকে চিঠিপত্রের মাধ্যমে অরবিন্দকে ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের মনোভাব সম্পর্কে ক্রমশ অবগত করতে থাকেন। ইংরেজের অত্যাচার সম্বন্ধে যেসমস্ত কাহিনী ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত হতো, সেগুলি তিনি অরবিন্দের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। এর ফলে অরবিন্দ মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। কেম্ব্রিজে ভারতীয় ছাত্রদের একটি ক্লাব ছিল, যার নাম 'Indian Majlis'। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগানো। অরবিন্দ যখন কেম্ব্রিজের ছাত্র, তখন তিনি ঐ ক্লাবের সম্পাদক হয়েছিলেন। লণ্ডনে অনুরূপ একটি ক্লাব 'Lotus and Dagger'-এরও তিনি সভ্য হয়েছিলেন।

ক্লাব-দুটিতে তিনি প্রায়ই ব্রিটিশ সরকারের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতেন।

ফাইনাল এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে বৃত্তি নিয়ে অরবিন্দ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তিন বছরের ক্ল্যাসিক্যাল ট্রাইপস-এর পাঠ্যক্রম দুবছরে আয়ত্ত করে তিনি প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন এবং তারপর আই. সি. এস. পরীক্ষাতেও ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়ে চাকরি পান। কিন্তু অশ্বারোহণের পরীক্ষায় স্বেচ্ছায় ফেল করে তিনি চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। আসলে বিদেশী সরকারের গোলামিগিরিতে তাঁর এতটুকু ইচ্ছা ছিল না, বাবার কথা রাখার জন্যই শুধু তিনি পরীক্ষায় বসেছিলেন। তাঁকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়—কেন তিনি আই. সি. এস. পরীক্ষা দিলেন, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: "কি করব? বাবার হুকুম... ফেল করে দুদিক বজায় রইল—বাবার কথা রাখা আবার গোলামিগিরি থেকে অব্যাহতি।"

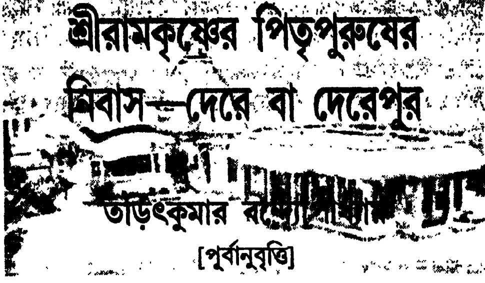
সেই সময় বরোদার মহারাজা সায়াজী রাও লণ্ডনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কাছে আত্মপরিচয় দিয়ে অরবিন্দ বরোদা সরকারি দপ্তরে সন্তোষজনক বেতনে একটি চাকরির ব্যবস্থা করে নেন। ঐ চাকরিতে যোগদান করার জন্য তিনি ২১ বছর বয়সে ভারতে ফিরে আসেন—১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে। জাহাজ থেকে নেমে ভারতের মাটিতে পা দেওয়া মাত্রই তাঁর এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়। তিনি দেখেন, এক বিশাল অসীমতা সারা বিশ্ব ছেয়ে আছে, আর প্রত্যেক ব্যক্তি ও বস্তুর মধ্যে ঐ একই অসীমতা বিরাজমান। এই হলো তাঁর জীবনে আধ্যাত্মিক চেতনার প্রথম উন্মেষ, আত্মা সম্পর্কে প্রথম উপলব্ধি। নিমেষে তাঁর মধ্যে নেমে আসে এক বিপুল নীরবতা ও প্রশান্তি। এই ধরনের চেতনা বাহ্য পরিবেশ থেকে তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি নিশ্চয়। তাঁর বাবা ছিলেন নাস্তিক। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর ছেলেমেয়েদের সবরকম ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে, আর সাহেবী আদবকায়দায় ইউরোপীয় সংস্কৃতির মধ্যে গড়ে তুলতে। তাই তিনি ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন বিদেশে; কিন্তু বিধাতার বিধান ছিল অন্যরূপ। স্বাভাবিক আস্তিক ভাবাপন্ন ছেলে, বাবার নাস্তিক ভাবে ভাবিত হতে পারেননি। অরবিন্দ ছিলেন সাহিত্য ও ইতিহাসের ছাত্র। তাঁর মধ্যে যে নিগূঢ় ও অব্যক্তভাবে নিহিত ছিল যে আধ্যাত্মিক চেতনার নির্ঝর, তারই ক্ষণিক স্ফুরণ হলো তখন। কিন্তু এর প্রভাব রয়ে গেল তাঁর চিন্তায় ও আচরণে।

বরোদা রাজ্যের নানা দপ্তরে কাজ করার পর তিনি কৌশল করে বদলি নেন সরকারি কলেজে ফরাসী ও ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক হিসাবে। কিছুকাল পরে ৭৫০ টাকা বেতনে তিনি ভাইস প্রিন্সিপালের পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩৬ সালে যখন তাঁকে প্রিন্সিপালের পদে উন্নীত করার আয়োজন চলছিল, তখন তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করার উদ্দেশ্যে বরোদা কলেজ ছেড়ে দিয়ে মাত্র ১৫০ টাকা বেতনে কলকাতার জাতীয় কলেজে প্রিন্সিপালের পদ গ্রহণ করেন। এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা সুবোধ মল্লিক ছিলেন অরবিন্দের বিপ্লবকর্মের সহকর্মী ও বন্ধু।

ইতিপূর্বে বরোদা কলেজে অধ্যাপনার সময় তিনি বহু গ্রন্থ পাঠ এবং অনেকগুলি ভারতীয় ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। সংস্কৃত ও বৈদিক গ্রন্থাবলী পাঠ করে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি একজন উৎকৃষ্ট মানের কবিও ছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'সাবিত্রী' রচনার শুরু এই সময়ে। রচনাটি সম্পূর্ণ হয় ১৯৫০ সালে।

গোড়ায় ভারতের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত না হয়ে অরবিন্দ নীরবে দেশের অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। তাঁর কেম্ব্রিজের বন্ধু কে. এস. পাণ্ডের 'ইন্দুপ্রকাশ' নামে একটি পত্রিকা চালু ছিল। পত্রিকাটিতে অরবিন্দ নিজের নাম গোপন রেখে ব্রিটিশ সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে সমালোচনাসূচক নিবন্ধ প্রকাশ করতে থাকেন। তৎকালীন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (Indian National Congress) ছিল সরকারের খোশামুদে ধরনের। তার নেতৃবৃন্দ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাকে এক অলীক কল্পনা বলে মনে করতেন, যার ফলে ভারতের জনসাধারণ পূর্ণ স্বাধীনতার কথা ভাবতেই পারত না। অরবিন্দ জোরালো ভাষায় দেশের নেতাদের রাজনীতি ও ব্রিটিশ সরকারের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সমালোচনা করে কতকগুলি নিবন্ধ প্রকাশ করেন, সেগুলির নাম—'পুরাতন প্রদীপের পরিবর্তে নতুন প্রদীপ' ('New Lamps for Old')। নির্ভীকতার ভিত্তিতে এক গতিশীল নেতৃত্বের প্রয়োজন সম্পর্কে পাঠকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভিতর থেকে কতক সদস্য বেরিয়ে এসে স্বতন্ত্রভাবে এক দল গঠন করেন এবং অরবিন্দ মারাঠা বিপ্লবী বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে দলটিকে সুগঠিত করেন। অবশেষে ঐ দল সর্বভারতীয় কংগ্রেস (All India Congress) নামে পরিচিত হওয়ায় কংগ্রেস প্রকৃতপক্ষে দুদলে বিভক্ত হয়ে যায়—নরমপন্থী (Moderates) এবং জাতীয়তাবাদী চরমপন্থী (Nationalists)। [ক্রমশ] (এক)

সহায়ক গ্রন্থ: (১) হে চিরদিনের, (২) দিব্যজীবন।



শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃপুরুষের নিবাস—দেরে বা দেরেপুর

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

ক্ষুদিরামের সম্পত্তি

ঘটনাবিন্যাসে লক্ষণীয়, মানিকরামের প্রথম পুত্র ক্ষুদিরামের জন্ম ১১৮১ বঙ্গাব্দে (১৭৭৫ সালে)। তখন মানিকরামের বয়স আনুমানিক পঁচিশ-ত্রিশ। তাহলে তাঁর জন্মসময় দাঁড়ায় ১৭৪৫-১৭৫০ সাল। ১২০৯ বঙ্গাব্দে লিখিত তায়দাদ রেকর্ডে লক্ষ্য করা যায় যে, দাতারাম ও রামলোচন চট্টোপাধ্যায়ের নামে দেবোত্তর ২৬ বিঘা এবং ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি ৩০ বিঘার উল্লেখ আছে। সেকালে ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি ব্রাহ্মণদের দেওয়া হতো এবং তাঁরা টোল ও চতুষ্পাঠী পরিচালনা করতেন। রায়বাড়ির কুলদেবতা রণরঘুবীর, বাণেশ্বর শিব, পার্বতীনাথ শিব প্রমুখ দেবতার নিত্যপূজা ও অন্যান্য পালাপার্বণে পূজাদির কাজে তাঁদের ব্যস্ত থাকতে হতো। হয়তো সেই কারণেই তাঁরা রায় জমিদারি থেকে দেবোত্তর সম্পত্তি পেয়েছিলেন।

দেরেপুর গ্রামে চট্টোপাধ্যায় বংশের ইতিকথা বড় বিচিত্র! এই গ্রামে ব্রাহ্মণ পরিবারবর্গের আগমন ঘটেছিল তাঁদেরই সূত্র ধরে, অথচ বর্তমানে কোন প্রকাশ্য নমুনাতেই প্রাচীন চট্টোপাধ্যায় বংশের অস্তিত্ব দেখা যায় না। ব্যতিক্রম কেবল চট্টোপাধ্যায় বংশের প্রতিষ্ঠিত শ্মশানেশ্বর শিবলিঙ্গ ও সীতারাম জীউ বিষ্ণুশিলা। 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এ বর্ণিত চট্টোপাধ্যায় বংশের প্রতিষ্ঠিত শিবালয়-সমন্বিত পুষ্করিণী—

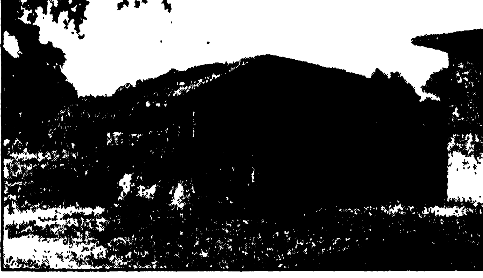


'চাটুজ্জে পুকুর'

যা 'চাটুজ্জে পুকুর' নামে খ্যাত ছিল, অধুনা তা 'ষষ্ঠীপুকুর' নামে রেকর্ডভুক্ত। সেই রেকর্ডভুক্তিও প্রায় শতবর্ষ পূর্বেই ঘটেছে। ফলত দীর্ঘ পরিশ্রমে যে কয়েকটি প্রামাণিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, তা দেরেপুরে চট্টোপাধ্যায় বংশের অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধির উজ্জ্বল নিদর্শন। ১২০৯ বঙ্গাব্দের তায়দাদ নথি অনুসরণ করলে বোঝা যায় যে, ঐ তায়দাদে দাতারাম ও রামলোচনের নামে যে-সম্পত্তির উল্লেখ আছে, তা তাঁরা পুরুষানুক্রমে ভোগ করেছেন। 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এ স্বামী সারদানন্দ দেরেপুর প্রসঙ্গে আলোচনাকালে যে তথ্য-সঙ্কেত দিয়েছেন ("হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের নিকট শুনিয়াছি, দেরেপুরে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের প্রায় দেড়শত বিঘা জমি ছিল।"), তার সঙ্গে ঐ তায়দাদ নথির বিশেষ মিল পাওয়া যায়। কাজেই প্রমাণসাপেক্ষেই আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, দেরেপুরে অবস্থানকালে ক্ষুদিরাম যদিও বিশেষ কোন কর্মে নিযুক্ত ছিলেন না, কিন্তু তিনি নিঃস্ব ছিলেন না। তাঁর পিতামহ অর্থাৎ দাতারাম ও রামলোচন চট্টোপাধ্যায়ের নামে ১২০৯ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত ৫০-৬০ বিঘার সম্পত্তি ছিল, তার অর্ধেকের অধিকারী ছিলেন তিনি।

দেরেপুর মৌজার ৭৫নং খতিয়ানটি আমাদের কাছে যথেষ্ট মূল্যবান, কারণ, এর মধ্যে চট্টোপাধ্যায় পরিবার-বর্গের প্রতিষ্ঠিত সীতারাম জীউয়ের উল্লেখ আছে এবং তার সেবাইত হিসাবে উল্লেখ আছে দেরেপুর গ্রামের একাধিক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের (যাঁরা বস্তুত চট্টোপাধ্যায়দের দৌহিত্র)। ঐ খতিয়ানই দেরেপুর চট্টোপাধ্যায় পরিবারের ঐতিহাসিক অস্তিত্বের সরকারি নথির (তায়দাদ নং ৩৭৩৯৪) সন্ধান দিয়েছে। ঐ তায়দাদ-সংশ্লিষ্ট খতিয়ানে বাস্তু, ডাঙা, পুকুর ও শালি জমির যেসকল দাগ-নম্বর বর্তমান, তার অর্ধেক অংশের শরিক ছিলেন চট্টোপাধ্যায় বংশের ব্যক্তিগণ। আমাদের অনুমান, ঐ সমস্ত দাগ-নম্বরেই ছিল চট্টোপাধ্যায় বংশের বাস্তুঘর, রন্ধনশালা, গোশালা ও দেবালয়।

দেরেপুর গ্রামে এখনো 'চাটুজ্জে পুকুর'-এর (দাগ নং ৪৫২) নিকটবর্তী দেবালয়ে (বর্তমানে মাটির দেওয়ালে টিনের ছাউনি দেওয়া) সীতারাম জীউ ওরফে রঘুবীর ও শ্মশানেশ্বর শিব বিরাজমান। চট্টোপাধ্যায় পরিবারের ঐ শিবের নামকরণ প্রসঙ্গে স্থানীয় প্রবাদ আছে যে, মানিকরাম ঐ শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করেন দেরেপুর গ্রামে। তাঁর পিতা রামলোচন প্রয়াত হলে তাঁকে দাহ করা হয় ঐ দেবালয়ের অনতিদূরে। তাঁর বাসনা ছিল, তিনি কাশীধামে দেহ রাখবেন। তাঁর সে-সাধ পূর্ণ না হওয়ায় মৃত্যুকালে তিনি পুত্রকে অনুরোধ জানান যে, সাধারণের শ্মশানে তাঁকে দাহ না করে তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিবালয়ের ঈশান কোণে তাঁর নিজের যে জমি আছে, সেখানে যেন তাঁকে সৎকার করা হয়; এতে বংশের কোন অকল্যাণ হবে না। পিতার



দেরেপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশের ঠাকুরবাড়ি

নির্দেশমতো মানিকরাম তাঁর দাহকার্য তাঁদের ভিটাসংলগ্ন ঐ ভূখণ্ডেই করেছিলেন। সেই থেকে চট্টোপাধ্যায়দের প্রতিষ্ঠিত মহাদেব 'শ্মশানেশ্বর শিব' নামে পরিচিত হন। বর্তমানে যেখানে মন্দিরটি দাঁড়িয়ে, পূর্বে সেটি ঐ জায়গায় ছিল না। ঐ মন্দিরের সম্মুখভাগে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ইটবাঁধানো এক অতি প্রাচীন চাতালের নির্দশন এখনো বিদ্যমান। সেখানেই ছিল প্রাচীন চট্টোপাধ্যায় বংশের দেবদেউল। সেই মন্দিরটি ধ্বংস হলে বর্তমান স্থানে মন্দির নির্মিত হয়; প্রাচীন মন্দিরের দরজা সেখানে লাগানো হয় এবং বিগ্রহসমূহ বর্তমান মন্দিরে স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে ঐ মন্দিরে রঘুবীর ও শিবলিঙ্গের সঙ্গে চিন্তামণি ধর্ম ও কামিনীদেবীর পূজা হচ্ছে।

দেরেপুরে ক্ষুদিরামের সংসার

মানিকরাম পূজার্চনা ও কৃষিকার্যের দেখাশোনা নিয়েই নির্বিঘ্নে দিন কাটাচ্ছিলেন। তাঁর দেহরক্ষার পর ক্ষুদিরামই সংসারের দায়িত্ব পালন করে চলছিলেন। দেরেপুরে থাকাকালে তিনি প্রথমে ভগিনী রামশীলার বিবাহ দিয়েছিলেন। রামশীলার কন্যা হেমাঙ্গিনী মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানেই প্রতিপালিত হন। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তা হলে ক্ষুদিরাম তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করেন সিহড়ের কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এবং সেই বিবাহানুষ্ঠান দেরেপুরেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই গ্রামে সারাটীর মেয়ে চন্দ্রমণিদেবী বধূ হয়ে এসেছিলেন ক্ষুদিরামের গৃহে। সেই কারণে ঐ গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণের মাতুল পণ্ডিতপ্রবর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদধূলি পড়েছে একাধিকবার। ঐ ভূখণ্ডেই ক্ষুদিরামের প্রথম পুত্র রামকুমার (১৮০৫) এবং কন্যা কাত্যায়নীর (১৮১০) জন্ম হয়।

ক্ষুদিরামের দুই ভ্রাতা নিধিরাম ও কানাইরাম তাঁর সংসারেই ছিলেন। মধ্যম ভ্রাতা নিধিরাম কৃষিকার্য দেখাশোনা করতেন। তাঁর বিবাহ হয়েছিল বাঁকুড়া জেলার তাজপুর গ্রামে। জমিদার রামানন্দ রায় কর্তৃক তাঁরা বাস্তুচ্যুত হলে তিনি তাঁর শ্বশুরালয়ে চলে যান এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা কানাইরাম বা রামকানাই ভক্তিমান ও ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। কথিত আছে, তিনি 'রামের বনবাস' যাত্রা শুনতে গিয়ে দেখেন যে, কৈকেয়ী রামচন্দ্রকে বনে পাঠাবার জন্য ষড়যন্ত্র করছেন; তখন সেই অভিনয়কে সত্যজ্ঞান করে ভাবুক রামকানাই সেই অভিনেত্রীকে প্রহার করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তিনি খুবই নিষ্ঠাবান ভক্ত, পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। দুর্গোৎসবে প্রধান পুরোহিতের ভূমিকাও নিতেন তিনি। উপবাসের দিন তিনি জল পর্যন্ত গ্রহণ করতেন না। দীর্ঘ উপবাসে তাঁর শরীর ক্রমশ ভেঙে পড়ে। মহালয়ার দিন পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করতে তিনি পায়ে হেঁটে বৈদ্যবাটী আসতেন। ঐরকম একবার তর্পণে গিয়েই গঙ্গাতীরে তাঁর প্রয়াণ ঘটে। (গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য প্রদত্ত তথ্য থেকে জ্ঞাত)

রামানন্দ রায়ের সঙ্গে ক্ষুদিরামের বিরোধের পর তিনি দেরেপুর ত্যাগ করে প্রথমে উঠেছিলেন তাঁর শ্বশুরালয় বর্ধমান জেলার রায়না গ্রামে। পরে তিনি কামারপুকুরের নিকটবর্তী গ্রাম মুকুন্দপুরে আসেন। সেখানেই তাঁর দুই পুত্র রামতারক ও কালিদাস প্রতিপালিত হয়। রামতারক ওরফে হলধারীও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সময় দক্ষিণেশ্বরে পূজারীরূপে নিযুক্ত ছিলেন। কথিত আছে, তিনি বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন। কালীমন্দিরে পূজারী থাকাকালীন তাঁর শিশুসন্তানের মৃত্যু হয়। তাঁর আর কোন সন্তান হয়নি। মুকুন্দপুরেই বাস করতেন হলধারীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালিদাস। তাঁর বিবাহ হয়েছিল গোঘাটে। তাঁর দুই পুত্র দীননাথ ও রামদাস এবং এক কন্যা হরমণি। দীননাথও দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে পূজাকর্মে ব্রতী ছিলেন। তিনি প্রথমে রাধাগোবিন্দের পূজকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তখন তিনি 'দীনু পূজারী' নামে পরিচিত ছিলেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে যেদিন ষোড়শী-জ্ঞানে পূজা করেছিলেন সেদিন দীনু পূজারীই পূজার উপচার সাজিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি সুগায়কও ছিলেন। ঠাকুর তাঁর কণ্ঠে ভক্তিমূলক সঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হন। ঠাকুরের জীবৎকালে তিনি কলেরায় আক্রান্ত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর ব্যাধি নিরাময়ে শ্রীশ্রীমা নিজের চরণধূলি, ঠাকুরের চরণধূলি ও মা কালীর স্নানজল দিয়েছিলেন। দীননাথ ছিলেন অবিবাহিত। আনুড় গ্রামের প্রবীণতম ব্যক্তি দুর্গাদাস ভট্টাচার্য (শিবরামের পুত্র পার্বতীচরণের বন্ধু) জানিয়েছেন, তিনি পার্বতীচরণের কাছে শুনেছেন, তাঁদের এক আত্মীয় পরিবার মুকুন্দপুরে বাস করতেন। 'বর্ধমান জ্বরে' (বিশেষ ধরনের ম্যালেরিয়া, যা বিগত শতকে হুগলী জেলায় বহু মানুষের প্রাণনাশের কারণ হয়েছিল।) তাঁদের সকলেই মারা গেছেন। ঐ ব্যাধিতে সেসময় কামারপুকুর, মুকুন্দপুর, শ্রীপুর, ভূরসুবো প্রভৃতি গ্রামের প্রায় অর্ধেক লোক মারা গেছে। এ-সংবাদ তিনি শুনেছেন তাঁর দাদু ও বাবার কাছ থেকে।

দেরেপুর গ্রামে ক্ষুদিরামের জন্ম ১৭৭৫ সালে (মৃত্যু কামারপুকুরে ১৮৪২ সালে ৬৮ বছর বয়সে)। তিনি দেরেপুর ত্যাগ করেন ১৮১৪ সালে অর্থাৎ ৩৯ বছর বয়সে। তাঁর জীবনের সিংহভাগ সময়ই কেটেছে দেরেপুরে—পিতা-

মাতা, ভ্রাতা-ভগিনী, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও আত্মীয়-পরিজন সমাবৃত হয়ে। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কানাইরামের জন্ম ১৭৯০ সালে এবং ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রমণির বিবাহ হয় ১৭৯৯ সালে। সেই সময় তাঁর ভগিনী রামশীলার বয়স ১৯ বছর। 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এর বিবরণক্রমে জানা যায়, রামশীলার পুত্র রামচাঁদ ও কন্যা হেমাঙ্গিনী জন্মগ্রহণ করেন যথাক্রমে ১৭৯৩ ও ১৭৯৮ সালে। কার্যত ক্ষুদিরামের বিবাহের একবছর আগে হেমাঙ্গিনীর জন্ম এবং যেহেতু হেমাঙ্গিনীর প্রতিপালন দেরেপুরেই হয়, সেই কারণে আমাদের অনুমান—অন্তত ঐ শতকের (১৭০১-১৮০০ সাল) শেষপর্যন্ত ক্ষুদিরামের পিতা ও মাতা জীবিত ছিলেন। ১৭৯৮ সালে ক্ষুদিরামের প্রথমা স্ত্রী (যাঁর পিত্রালয় ছিল গোঘাটের সন্নিকটস্থ হাজিপুর গ্রাম) প্রয়াতা হন। ভগিনীর নবজাতক কন্যার প্রতিপালন ও অসুস্থ ভগিনীর দেখাশোনা ইত্যাদি কাজ নারী ব্যতীত মোটেই সম্ভব নয়, সেই কারণে আমাদের ধারণা—চন্দ্রমণির দেরেপুরে আগমনকালে ক্ষুদিরাম-জননী জীবিতা ছিলেন। অপরদিকে ১৮১৪ সালে জমিদার রামকান্ত রায়ের সঙ্গে বিরোধের ফলে ক্ষুদিরামের দেরেপুর পরিত্যাগকালে তাঁর পিতা-মাতার সংবাদ 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এ অনুল্লেখিত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়টি রামকুমার বা শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে কখনো শোনা যায়নি। তাই আমাদের অনুমান, উনিশ শতকের প্রথম দশকে ক্ষুদিরামের পিতা ও মাতা প্রয়াত হন।

দেরেপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ

আগেই আলোচনা করা হয়েছে, দেরেপুরে চট্টোপাধ্যায় বংশের বাস্তু, ডাঙা, পুকুর, শালি জমি প্রভৃতি বর্তমানে 'বন্দ্যোপাধ্যায়' পদবীধারী ব্যক্তিগণ ভোগ করছেন। সম্পর্কে তাঁরা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়দের দৌহিত্র। দেরেপুরের চট্টোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ-তালিকা থেকে অনুমিত হয় যে, মানিকরামের পুত্র ক্ষুদিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশজাত (দৌহিত্র বংশে লক্ষ্মীমণি দেবীর বংশধরগণ) শ্রীরাম, ভজরাম, দেবেন্দ্র, মহাভারত ও ঈশ্বরচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন। এই শতকের শুরুতে তৈরি সেটেলমেন্ট রেকর্ডে দেরেপুর গ্রামের চট্টোপাধ্যায় বংশ-সংশ্লিষ্ট শ্মশানেশ্বর শিব, সীতারাম জীউ, চিন্তামণি ধর্ম ও 'চাটুজ্জে পুকুর' ইত্যাদির সঙ্গে যেসমস্ত ব্যক্তির নাম জড়িত আছে, তাঁরা বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের পৌত্র ও প্রপৌত্র। ঐ শরিকগণ লক্ষ্মীমণি দেবী ও রামজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন পুত্রের বংশধর, অর্থাৎ তাঁরা হলেন শ্রীরাম (বিহারীলাল), মহাভারত (রামপদ ও রাজেন্দ্র) এবং ঈশ্বরচন্দ্রের (রামময়) পুত্র। বর্তমানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের শরিক ঐ ব্যক্তিদের পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ।

প্রসঙ্গত, তান্ত্রিক সাধক রামগতি ছিলেন লক্ষ্মীমণি দেবীর পৌত্র রামময়ের একমাত্র পুত্র। তাঁর জন্ম ১২৯২ বঙ্গাব্দের ২০ জ্যৈষ্ঠ। তাঁর পিতার নাম রামময় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতার নাম হরিদাসী দেবী। তিনি শৈশবেই পিতার সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন এবং সেখানেই পঠন-পাঠন শুরু করেন। যৌবনের শুরুতেই তিনি পোর্ট কমিশনারের অফিসে চাকরি পেয়ে যান। ষোল বছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয় কোকন্দ-নিবাসী রামচন্দ্র ভট্টাচার্যের একমাত্র কন্যা ভুবনেশ্বরী দেবীর সঙ্গে। এর কিছুদিন পরেই তাঁর পিতা ও মাতার মৃত্যু হয়। এই শোকবিহ্বলতায় তিনি ভাবরাজ্যের বাসিন্দা হন। অফিস থেকে তিনি সোজা চলে যেতেন কলকাতার নিমতলার শ্মশানে। সেখানে তাঁর সঙ্গে একদিন সাক্ষাৎ হয় 'নধরকান্তি' নামে এক সাধুর। তিনি তাঁকে সাধনভজনের উপদেশ দেন। এরপর তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ঘরে ফিরে এসে সাধনভজনেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। স্ত্রী তাঁকে উৎসাহ দিয়ে তাঁর সাধনপথের সঙ্গী হতে চান। প্রথমে তিনি ইতস্তত করলেও পরে তাতেই রাজি হন এবং দেরেপুর গ্রামের অনতিদূরে বাঁকুড়া জেলার হাসনডাঙা গ্রামে এক তান্ত্রিক গুরু জ্ঞানানন্দ সরস্বতীর কাছে উভয়ে দীক্ষাগ্রহণ করেন। এরপর গুরুর সঙ্গে তাঁরা যাত্রা করেন কাশীধামের উদ্দেশে। সেখানে হরিশ্চন্দ্র মহাশ্মশানে কিছুদিন সাধনা করার পর তাঁরা যাত্রা করেন কামাখ্যার পথে। কামাখ্যায় সাধনকালে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এক ভৈরবীর। তিনি তাঁদের তারাপীঠে বামাক্ষ্যাপার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পরামর্শ দেন। এরপর গুরু সমভিব্যাহারে তাঁরা যাত্রা করেন তারাপীঠ অভিমুখে। পরিশেষে বামদেবের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁর নির্দেশমতো সাধনভজনে আরো কিছুকাল অতিবাহিত করেন। পরিশেষে পান বামদেবের আশীর্বাদ। তারপর নিজ গ্রামে ফিরে এসে রামগতি প্রতিষ্ঠা করেন দেবী কালিকার মূর্তি, আর সেইসঙ্গে শুরু করেন তীব্র সাধনভজন। তান্ত্রিক সাধক রামগতি ১৩৯২ বঙ্গাব্দে শতায়ু জীবনের অবসান ঘটিয়ে গমন করেন অমৃতলোকে। [ক্রমশ] (চার)

অনুষ্ঠান-সূচী ঃ আশ্বিন ১৪০৮

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য	ঃ	স্বামী অখণ্ডানন্দ ভাদ্র অমাবস্যা ১ আশ্বিন, সোমবার (১৭ সেপ্টেম্বর ২০০১)
পূজাতিথি-কৃত্য	ঃ	মহালয়া ভাদ্র অমাবস্যা
একাদশী-তিথি	ঃ	১২, ২৭ আশ্বিন যথাক্রমে শুক্রবার ও শনিবার (২৮ সেপ্টেম্বর, ১৩ অক্টোবর ২০০১)

ইংল্যাণ্ড, কানাডা ও আমেরিকায় কয়েকদিন

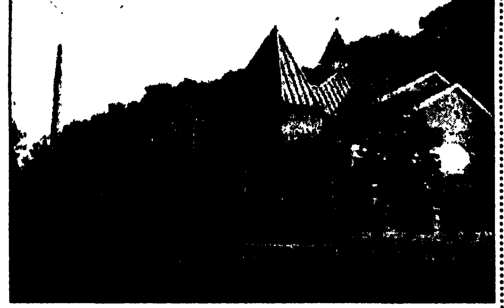
স্বামী গোকুলানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

এই পরিক্রমাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরে অবস্থিত কানাডা পাশ্চাত্যের সমৃদ্ধ দেশ। এদেশের 'motto' হলো—'From Sea to Sea'। কারণ প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর এবং মেরুসাগর কানাডাকে ঘিরে আছে। স্থলপথে একমাত্র আমেরিকার সঙ্গেই কানাডা যুক্ত। ফরাসী পর্যটক জ্যাক্স কার্টিয়ের লিখিত এক পত্রিকায় 'Kanata' কথাটার উল্লেখ আছে, যা পরে 'Canada'-তে রূপান্তরিত হয়েছে। 'Kanata' ভারতীয় শব্দ, এর অর্থ 'গ্রাম'। প্রথমে অবশ্য দেশের সরকারি নাম ছিল 'New France', ১৮৬৭ সালে নতুন নাম হয় 'Dominion of Canada' অথবা শুধু 'Canada'। আয়তনের তুলনায় এদেশের লোকসংখ্যা বেশ কম। এখানে অনেক প্রসিদ্ধ পর্বতশৃঙ্গ দেখা যায়, যেমন—রকি, কলম্বিয়া, কোস্ট এবং সেন্ট এলিস। এছাড়া অনেক বড় বড় হ্রদও আছে, যেগুলির কিছুটা কানাডাতে, কিছুটা আমেরিকার সীমানায় পড়ে। দেশের বৃহত্তম হ্রদ 'দ্য গ্রেট বীয়ার লেক' অবশ্য কানাডার সীমার মধ্যেই পড়ে। এর আয়তন ৩১,৩২৬ কিলোমিটার। দেশের অধিকাংশ লোক শিক্ষিত এবং ফরাসী ও ইংরেজী দুই ভাষাতেই কথা বলে। দেশের প্রধান শহর টরন্টো, মনট্রিল, ভ্যাঙ্কুভার এবং অটোয়া। ১৯৯১ সালের জনগণনা থেকে জানা যায়, কানাডা ১০টি প্রদেশে এবং ২টি রাজ্যে বিভক্ত। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব রাজধানী আছে। কানাডার রাজধানী অটোয়া, এটি অণ্টারিও প্রদেশের অন্তর্গত।

দিগন্ত-প্রসারিত সমুদ্রের জলরাশি ও উর্মিমালার নৃত্য দেখতে দেখতে লণ্ডন থেকে টরন্টোতে এসে পৌঁছালাম স্থানীয় সময় সকাল প্রায় সাড়ে দশটায়। টরন্টো কেন্দ্রের প্রধান স্বামী প্রমথানন্দজী এবং আশ্রমের কয়েকজন ভাই এসেছিলেন বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে। প্রমথানন্দজী এই সেণ্টারে 'রিট্রিট'-এ যোগদান করার জন্য আমাকে এখানে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আশ্রমের গাড়িতেই ১২০, ইমেট অ্যাভিনিউ-এ অবস্থিত বেদান্ত সোসাইটিতে এলাম। আশ্রম ও মন্দির-গৃহ অতি মনোরম। ঘরগুলি ছিমছাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

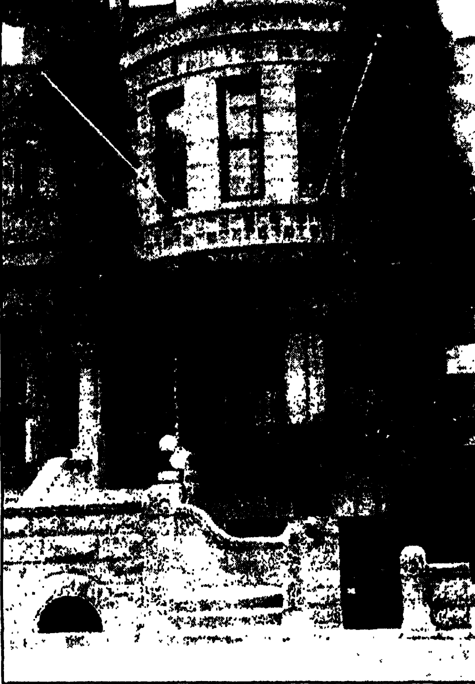


বেদান্ত সোসাইটি অফ টরন্টো, কানাডা

২ জুলাই বৃহস্পতিবার স্বামী প্রমথানন্দজী, ব্রহ্মচারী মুক্তিচৈতন্য এবং জনৈক ভক্তের সঙ্গে সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ জগদ্বিখ্যাত নায়াগ্রা জলপ্রপাত দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। দুপুর প্রায় বারটা নাগাদ আমাদের গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছালাম। জানালার কাঁচ নামাতেই প্রচণ্ড জলরাশির আওয়াজ শোনা গেল। নেমে দেখলাম, বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে জলধারা নামছে এবং সেখানে ঘন সাদা স্রোতের সৃষ্টি হয়েছে। যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখি শুধু জল আর জল। চারদিকের সমস্ত কিছুই যেন সজীব, মুখর, স্পন্দিত, উদ্ভাসিত এবং প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। জলের ভিতর যাওয়ার জন্য ওয়াটারপ্রুফ ও জুতো পরে লিফটে চেপে অনেকটা নিচে নামলাম। তারপর একটা



নায়াগ্রা জলপ্রপাত, কানাডা



বেদান্ত সোসাইটি অফ নিউ ইয়র্ক

জেটি পার হয়ে সকলে 'মেইড অফ দ্য মিস্ট' নামে একটা বিশাল নৌকায় উঠলাম। চারদিক কাঁচ দিয়ে ঢাকা। জলপ্রপাতের মধ্য দিয়ে নৌকা এগিয়ে চলল। একসময় মনে হলো, যদি কোনরকমে কাঁচ খুলে পড়ে যায়, তাহলে কোন্ অতলে তলিয়ে যাব কে জানে! দক্ষ সাঁতারুও এখানে সাঁতার কাটতে অক্ষম। জলের মধ্যে প্রতিফলিত সাতরঙে রাঙানো রামধনুর সৌন্দর্য ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। নায়াগ্রার এই জলপ্রপাত দেখে স্বামীজী বলেছিলেন, সগুণ ঈশ্বরও নিত্য। যতদিন নায়াগ্রার জলপ্রপাত রয়েছে, ততদিন তাতে প্রতিফলিত রামধনুও থাকবে। জলপ্রপাত জগৎ-প্রপঞ্চস্বরূপ, আর রামধনু সগুণ ঈশ্বরস্বরূপ। দুটিই নিত্য সনাতন।

নৌকাভ্রমণ শেষে আমরা গেলাম 'স্কাইলন টাওয়ার' দেখতে। এটি সাত ভাগে বিভক্ত। সবচেয়ে উঁচু তলায় আছে 'অবজারভেশন ডেক'। এটি ৭৭৫ ফুট উচ্চে। এতে উঠলে ১২৯ কিলোমিটার পর্যন্ত দৃষ্টি যাবে। দূরবীন দিয়ে তাকাতেই নায়াগ্রা জলপ্রপাতকে আরো কাছ থেকে, আরো বিশদভাবে দেখলাম। অবজারভেশন ডেকের নিচের দুটি তলাতে ভোজনালয় আছে। মোটামুটি পৃথিবীর সব দেশের খাবারই পাওয়া যায়। এখানে একটা ঘূর্ণায়মান ভোজনাগারও আছে —খুব আস্তে আস্তে ঘুরছে এবং সব জায়গা থেকেই নায়াগ্রা দেখা যাচ্ছে। এর নিচের তলাগুলোতে নানান ধরনের দোকান ও আমোদ-প্রমোদ কেন্দ্র। টাওয়ার দেখে যখন বেরিয়ে এলাম, দিনের আলো তখন ম্লান হতে শুরু করেছে। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই অসংখ্য আলোয় টাওয়ার সেজে উঠল। জলপ্রপাতের সামনে দাঁড়িয়ে অসীম আকাশের সৌন্দর্য দেখলাম। সূর্যাস্তের মুহূর্তে পশ্চিম আকাশ তখন নানা রঙের ঐশ্বর্য ছড়িয়ে দিচ্ছে।

৪ জুলাই সকাল থেকেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। সাড়ে নটার সময় প্রমথানন্দজীর সঙ্গে বেরিয়ে ট্যাক্সি নিয়ে রিগ্যাল হোটেলে গেলাম। আমাদের আশ্রমের প্রাক্তন ছাত্ররা সেখানে এক প্রীতি-সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। এঁরা কেউ বেলুড় বিদ্যামন্দির, কেউ রহড়া, কেউ বা নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র ছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই আজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। বেলুড় বিদ্যামন্দিরের ছাত্র ডাঃ আনন্দমোহন চক্রবর্তী কানাডার মতো দেশে এক নামী বিজ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। তিনি 'ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয়েজ'-এর এক স্বনামধন্য অধ্যাপক। ১৯৭৫ সালে দেশের বিশেষ বিজ্ঞানী হিসাবে তাঁকে 'হল অফ ফেম'-এ বিশিষ্ট সম্মান পদক দেওয়া হয়। তাঁকে 'ফাদার অফ বায়োটেকনোলজি' হিসাবেও গণ্য করা হয়। ছাত্রের গর্বে গর্বিত বোধ করলাম। সবাই মিলে কিছুটা সময় কাটালাম।

৬ জুলাই আমার জীবনের এক স্মরণীয় দিন, এক স্বপ্নের বাস্তবে রূপান্তরিত হওয়ার দিন। টরন্টো থেকে স্বামী প্রমথানন্দজী, ব্রহ্মচারী মুক্তিচৈতন্য এবং আমি প্রায় বারটা নাগাদ নিউ ইয়র্ক এসে পৌঁছালাম। এখানে আমাদের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রটি ১৭ ইস্ট ৯৪ স্ট্রীট-এর ওপর অবস্থিত। এই কেন্দ্রের প্রধান স্বামী আদীশ্বরানন্দজী আমাদের সকলকে স্বাগত জানালেন। দ্বিপ্রহরে মধ্যাহ্নভোজনের পর গেলাম সহস্রদ্বীপোদ্যানে। প্রথমেই সেই পাহাড়টার কাছে গেলাম, যেখানে একটা ওক গাছের নিচে স্বামীজী বসে ধ্যান করেছিলেন এবং নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে গিয়েছিলেন। ১৮৯৫ সালে আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ক্রমাগত বক্তৃতা দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে স্বামীজী কয়েক সপ্তাহের নির্জনবাসের

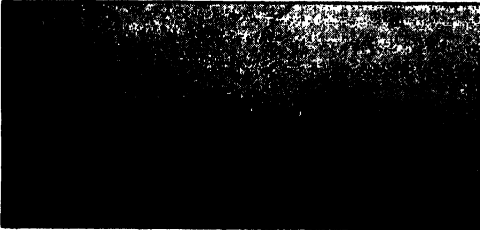


সহস্রদ্বীপোদ্যানে এই ওক গাছের তলায় স্বামী বিবেকানন্দের নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল

জন্য এই সহস্রদ্বীপোদ্যানে আসেন। কয়েকজন আমেরিকাবাসী তাঁর উপদেশে এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে, তাঁরা ঐ সুযোগে সবসময় তাঁর কাছে থেকে বিশেষভাবে সাধনভজন শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন। এই দ্বীপটি সেন্ট লরেন্স নদীর ওপর অবস্থিত। এখানে স্বামীজী মিস ডাচারের গৃহে সাত সপ্তাহ অবস্থান করেন। এখান থেকে মিস মেরী হেলকে লিখিত এক পত্রে স্বামীজী লিখেছিলেন ঃ "এস্থানটি বড় ভাল লাগছে। আহার যৎসামান্য; অধ্যয়ন, আলোচনা, ধ্যানাদি কিন্তু খুব চলছে। অপূর্ব এক শান্তির আবেগে মন ভরে উঠেছে। প্রতিদিনই মনে হয় আমার করণীয় কিছু নেই। আমি সর্বদাই পরম শান্তিতে আছি। কাজ তিনিই করছেন। আমরা যন্ত্রমাত্র। তাঁর নাম ধন্য!... আমি গুণাতীত রাজ্যে বিচরণ করছি... যে-উচ্চভূমি থেকে মনে হয়, সারা বিশ্ব যেন একটা ডোবা। হরি ওঁ তৎ সৎ। একমাত্র তিনিই আছেন, আর কিছু নেই।"

বিকেল চারটে কুড়ি থেকে পাঁচটা ত্রিশ—প্রায় এই এক ঘণ্টা দশ মিনিট স্বামীজীর ঘরে বসেছিলাম। এ ছিল আমার সারা জীবনের স্বপ্ন। স্বপ্ন ছিল তাঁর ঘরে বসে জপ-ধ্যান করার। সে-ইচ্ছা আজ পূর্ণ হলো। ঘরে বসে মনে হলো, স্বামীজী আজও তাঁর দিব্যদেহে এখানে উপস্থিত রয়েছেন। এক অফুরন্ত আনন্দ বুকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম তাঁর ঘর থেকে।

৭ জুলাই ব্রহ্মচারী মুক্তিচৈতন্যকে নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম সেই ওক গাছটি দেখতে, যেখানে স্বামীজীর নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল। ঐখানে বসে আমরা 'দেববাণী' ও 'সন্ন্যাসীর গীতি' থেকে কিছু কিছু অংশ পাঠ করলাম। স্বামীজীকে প্রণাম জানিয়ে সেখান থেকে চলে এলাম। তারপর মনট্রিলের পথে



সেন্ট লরেন্স নদী, সহস্রদ্বীপোদ্যান যার ওপরে অবস্থিত

রওনা হলাম স্বামী প্রমথানন্দজীর সঙ্গে। পথিমধ্যে একজায়গায় নেমে কিছুক্ষণ নৌকাবিহার করলাম। নৌকার নাম 'আঙ্কেল সাম বোট'। এদের অনেকগুলো নৌকা আছে এবং কোন কোন দ্বীপের মধ্যে থাকার ব্যবস্থাও এরা করে থাকে। নটা থেকে দশটা—পুরো এক ঘণ্টা নৌকা চড়ে সহস্রদ্বীপোদ্যানের ভিতর আমরা ঘুরে বেড়ালাম। যাত্রার শুরু হয়েছিল 'আলেকজান্দ্রিয়া বে' থেকে। অন্যদিকে 'ক্লেটন বে' থেকেও যাত্রা শুরু করা যায়। ভিতরে বসার সুবন্দোবস্ত আছে, ওপরের খোলা ডেক থেকেও বসে দেখার ব্যবস্থা আছে। নৌকাটা আমাদের অনেকগুলো দ্বীপের কাছাকাছি নিয়ে গেল, 'বোল্ট ক্যাসেল'-এর সামনে প্রায় দশ মিনিট দাঁড়াল। শুনলাম, গ্রীষ্মকালে থাকার জন্য ১৯০০ সালে এই দুর্গের ভিতর প্রাসাদ বানানো হয়েছিল, কিন্তু শেষপর্যন্ত কেউ এসে এখানে থাকেনি। আরেকটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দ্বীপ 'গ্রেনেডিয়ার' দেখলাম। একদা নাকি এখান থেকে বহু যুদ্ধ হয়েছিল। দ্বীপগুলোর মধ্য দিয়ে সরু সরু জলপথে চলতে খুব ভাল লাগছিল। চারদিকের প্রাকৃতিক শোভা অপূর্ব। এছাড়া



সহস্রদ্বীপোদ্যানে স্বামীজীর স্মৃতিবিজড়িত প্রার্থনাগৃহ

জলের ওপরেই কতগুলো ছোট ছোট বিশ্রামস্থান আছে। নৌকাভ্রমণ করতে করতেই 'থাউজ্যাণ্ড আইল্যাণ্ড ব্রিজ' দেখলাম। এই ব্রিজের ওপর দাঁড়ালে কানাডা ও আমেরিকা—দুদেশের অনেকাংশ দেখা যায়। নৌকা থেকেও দূরে টরন্টো, অটোয়া এবং মনট্রিল শহরের কিছু অংশ দেখা যায়।

ঐদিন বিকালে মনট্রিলে স্বামী শিবানন্দ যোগকেন্দ্রে স্বামী প্রমথানন্দজী এবং আমার যাওয়ার নিমন্ত্রণ ছিল। হৃষীকেশে স্বামী শিবানন্দের 'ডিভাইন লাইফ সোসাইটি' নামে এক বিশাল সংস্থা আছে। স্বামী শিবানন্দ খুব বড় সাধক ছিলেন। তিনি সারাজীবন গঙ্গাবক্ষে একটা ছোট্ট কুটিরে জীবন কাটিয়ে গেছেন। তাঁর তিরোধানের পর ভক্তরা এই আশ্রম স্থাপন করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এই আশ্রমের শাখা আছে। এখানকার আশ্রমের পরিবেশ অতি শান্ত ও মনোরম। ঐসময় তাঁরা বাৎসরিক আধ্যাত্মিক শিবিরের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তাঁরা আমাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। প্রায় সাড়ে তিনশ বিদেশী শ্রোতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। প্রমথানন্দজীর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'হিন্দুধর্ম', আমার ছিল 'মানসিক চাপ জয়ের উপায়'।

৯ জুলাই মনট্রিল বিমানবন্দর থেকে 'এয়ার কানাডা' বিমানে হ্যালিফ্যাক্সে এসে পৌঁছালাম।

১০ জুলাই প্রথমে গেলাম সেন্ট ভিনসেন্ট ইউনিভার্সিটি দেখতে। ওখানে ধর্ম-বিভাগের প্রধান মিস্টার জ্যাক্সের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটালাম। সেখান থেকে গেলাম সেন্ট মেরী

ইউনিভার্সিটিতে। ওখানে সাক্ষাৎ হলো প্রফেসর বোওলবের সঙ্গে। ইনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্ম-বিভাগের প্রধান। তিনি তাঁর আরো কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবাদ সম্পর্কে তাঁদের কিছু



সেন্ট ভিনসেন্ট ইউনিভার্সিটি

প্রশ্নের উত্তর দিতে হলো। এঁদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভালই লাগল।

বিকালে গেলাম 'টাইটানিক গ্রেভ ইয়ার্ড' দেখতে। বিরাট সমাধিক্ষেত্র। বাইরে পাশাপাশি কয়েকটা ফুলের দোকান। সমাধিক্ষেত্রে জনসাধারণ অনবরত ফুল নিয়ে যাচ্ছে প্রিয়জনের স্মৃতির উদ্দেশে। কাছেই আটলান্টিক সমুদ্রের উপকূলে একটা সুন্দর পার্ক আছে। গাছপালা, ফুলে ফুলে ভরা ছবির মতো সুন্দর পার্ক।

১২ জুলাই হ্যালিফ্যাক্সের নিকটবর্তী নোভাস্কটিয়ার অন্তর্গত 'পেগিজ লাভ' নামে একটা জায়গায় বেড়াতে গেলাম। নোভাস্কটিয়াতে 'বেদান্ত আশ্রম সোসাইটি' এবং 'হিন্দু সংস্থা' নামে দুটো কেন্দ্র আছে। সেখানে নানান ধরনের ধর্মালোচনা হয়। শুনলাম, টরন্টোতে বেদান্ত সোসাইটি যখন আধ্যাত্মিক শিবিরের আয়োজন করে, তখন এই দুটি কেন্দ্র সেখানকার উৎসবে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে।

১৩ জুলাই হ্যালিফ্যাক্স থেকে বিমানে ক্যালগ্যারি হয়ে ভিক্টোরিয়া এলাম। এতদিন ঘুরছিলাম আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে, এবার এলাম প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে। 'সন্ট স্প্রিং আইল্যাণ্ড' দেখার জন্য এলাম 'সোয়ার্জ বে'-তে। চারপাশে জলের মধ্যে ছোট একটা দ্বীপ।

১৪ জুলাই সকাল থেকে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল। বৃষ্টি থামলে কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে নিকটবর্তী ম্যাক্সেল পাহাড়ে বেড়াতে গেলাম। চারদিকের ঘন কুয়াশা দেখে চেরাপুঞ্জীর কথা মনে পড়ছিল।

১৫ জুলাই বুধবার 'হারবার এয়ার'-এ ভ্যাঙ্কুভার যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। ভ্যাঙ্কুভারকে 'দ্য জেম সিটি অফ দ্য প্যাসিফিক' বলা হয়। সকাল সাড়ে সাতটার সময় বিমানবন্দরে গিয়ে জানা গেল, বিমান—যাকে 'সি প্লেন' বলা হয়, এখন ছাড়বে না। সুতরাং একটা বড় স্টীমারে আড়াই ঘণ্টা ধরে সমুদ্রের ওপর দিয়ে ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে এলাম। ভ্যাঙ্কুভার ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের অন্তর্গত। প্লেন না ছাড়ায় একদিক দিয়ে ভালই হয়েছিল। সমুদ্র-ভ্রমণের একটা ভাল অভিজ্ঞতা হয়ে গেল। সমুদ্রের সৌন্দর্য প্রাণভরে উপভোগ করে বন্দরে নামলাম। এরপর দেখতে গেলাম সেই বন্দর—যেখানে শিকাগো যাওয়ার পথে স্বামীজী পদার্পণ করেছিলেন ১৮৯৩ সালের ২৫ জুলাই। তিনি 'এমপ্রেস অফ ইণ্ডিয়া' জাহাজে করে এসেছিলেন। পাশ্চাত্যে যেহেতু তাঁর প্রথম পদার্পণ ভ্যাঙ্কুভারে হয়েছিল, তাই তাঁর অনুরাগীরা এটিকে একটি ঐতিহাসিক স্থান বলে মনে করেন। তাঁরা 'হিস্টোরিক্যাল রিসার্চ কমিটি' নামে এক সংস্থা গঠন করেন।

১৯৯৩ সালের ২৫ জুলাই এই কমিটি স্বামীজীর আমেরিকায় পদার্পণের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে অতি ধূমধামের সঙ্গে এক উৎসব পালন করেছে। বম্বে (মুম্বাই) থেকে যাত্রা শুরু করে পেনাং, সিঙ্গাপুর, হংকং, কোবে, ইয়াকোহামা হয়ে পাশ্চাত্যে স্বামীজীর প্রথম পদার্পণ ভ্যাঙ্কুভারে, তারপর এখান থেকে তিনি উইনিপেগ হয়ে শিকাগো যান। স্বামীজীর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে এই কমিটি গবেষণা করে, বিশেষ প্রচেষ্টা ছিল ভ্যাঙ্কুভারে স্বামীজীর দিন কেমনভাবে কেটেছে তার ওপর আলোকপাত করা। গবেষণা করে এই কমিটি এই সিদ্ধান্তে এসেছে, 'ডেইলি ওয়ার্ল্ড' পত্রিকায় স্বামীজীর আগমনের সময় ছিল বিকাল সাতটা, মঙ্গলবার, ২৫ জুলাই ১৮৯৩। জাহাজে যাত্রীদের তালিকায় সর্বশেষে স্বামীজীর নাম লেখা ছিল—'Mr. S. Vivekanandra'। জাহাজের লোকেরা 'Swami' যে সাধুদের একটা উপাধি, এটা না বুঝে 'Swami' কথাটার আদ্যক্ষর নিয়ে 'S' লিখেছিলেন এবং রীতি অনুযায়ী নামের আগে একটা 'Mr.' যুক্ত করেছিলেন। 'বিবেকানন্দ' বানানটাও তাঁরা সঠিক লেখেননি, লিখেছিলেন 'Vivekanandra'। ২৫ জুলাই ভ্যাঙ্কুভারে সমস্ত হোটেলের অতিথিদের নামের তালিকাভুক্ত খাতা থেকে বিবেকানন্দ নামের কাউকে পাওয়া যায় না, ভারতবর্ষ থেকে শিল্পপতি মিঃ টাটার নাম শুধু পাওয়া যায়। সুতরাং স্বামীজী খুব সম্ভব ২৫ জুলাই রাত্রে জাহাজের মধ্যেই ছিলেন। অর্থাভাব এর কারণ কিনা জানা যায় না। ভ্যাঙ্কুভার থেকে পরদিন অর্থাৎ ২৬ জুলাই 'দ্য কানাডিয়ান প্যাসিফিক রেলওয়ে' সংক্ষেপে সি. পি. আর.-র ট্রেনে স্বামীজী দশটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে চাপেন এবং ২৮ জুলাই রাত্রি দশটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে উইনিপেগ-এ আসেন। উইনিপেগ থেকে প্রকাশিত ৩১ জুলাই ১৮৯৩ সোমবার 'মনিটোবা ফ্রি প্রেস' পত্রিকায় ছাপা হয়—"Swami Vevekananda, a Hindoo priest arrived from the West last night on his way to Chicago where he will attend the world's congress of religion as a deligate from India." খবরটিতে 'Vevekananda' এবং

'Hindoo'—দুটো বানান ভুল ছিল এবং 'Parliament'-এর স্থানে 'Congress' লেখা ছিল। সবচেয়ে বড় ভুল ছিল ঐ উক্তিতে—'arrived from the West last night'। এতগুলো ভুলের কারণ হিসাবে ধরা হয় যে, খুব সম্ভব স্বামীজীর সাক্ষাৎকার ২৮ জুলাই, শুক্রবার রাত্রে নেওয়া হয়। পরদিন ২৯ জুলাই তারিখে প্রকাশের জন্যই সংবাদটিতে 'last night' কথাটি লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেদিন না বেরিয়ে সংবাদটি ৩১ জুলাই, সোমবার প্রকাশিত হয়। অসাবধানী এবং অসতর্ক সম্পাদক অথবা type-setter কোনরকম পরিমার্জন না করেই খবরটা সোমবারের সংবাদপত্রে ছাপিয়েছিল।

জাহাজ থেকে স্বামীজী এক পত্রে লেখেন যে, যথেষ্ট পরিমাণে গরম জামাকাপড় সঙ্গে ছিল না বলে জাহাজের ক্যাপ্টেন একটা ক্লোক তাঁকে ব্যবহারের জন্য দিয়েছিলেন। অন্য এক চিঠিতে স্বামীজী কানাডার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিবরণ দেন, বিশেষ করে রকি পর্বতমালার।

১৬ জুলাই ভিক্টোরিয়া বিমানবন্দর থেকে বিমান ধরে ভ্যাঙ্কুভার এবং টরন্টো হয়ে নিউ ইয়র্ক এলাম রাত প্রায় সাড়ে নটায়। বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানালেন নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী তথাগতানন্দজী।

১৭ জুলাই ডেল্টা বিমানে বস্টন এলাম সকাল প্রায় সাড়ে দশটার সময়। বস্টন শহর ম্যাসাচুসেটস প্রদেশের অন্তর্গত। বিমানবন্দর থেকে প্রথমে গেলাম বস্টন বেদান্ত সেন্টারে। এই কেন্দ্রের প্রধান স্বামী সর্বগতানন্দজী। বস্টনে রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটি চার্লস নদীর দক্ষিণে, কর্মমুখর শহরের মাঝখানে অবস্থিত। সেন্টারের তিনতলার লাইব্রেরি ঘর থেকে নদীতে চরে-বেড়ানো হাঁসের দল, পালতোলা নৌকা ও যাত্রীবাহী নৌকা দেখা যায়। নদীর অপর প্রান্তে অবস্থিত কেমব্রিজ শহরের অন্তর্গত জগৎপ্রসিদ্ধ MIT অর্থাৎ Massachusetts Insititute of Technology প্রতিষ্ঠানটিও লাইব্রেরির ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায়। গত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের বেদান্ত সোসাইটির সম্পর্ক অতি গভীর ও সুন্দর। ১৯৫৫ সালে মিট-এর অধ্যক্ষ জেমস্ কিলিয়ান প্রতিষ্ঠানের ভিতরেই একটি চ্যাপেল প্রতিষ্ঠা করেন সর্বধর্ম-মতাবলম্বীদের প্রার্থনার জন্য। এই প্রতিষ্ঠান বস্টন কেন্দ্রের স্বামী অখিলানন্দজী এবং স্বামী সর্বগতানন্দজীকে প্রার্থনাসভায় ধর্ম এবং অধ্যাত্ম আলোচনার ক্লাস নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভিতরেই বেদান্ত সোসাইটির একটি শাখা খোলার অনুমতি দেন। সর্বগতানন্দজী নিয়মিতভাবে ওখানে আধ্যাত্মিক ভাষণ দেন, গীতার ব্যাখ্যা শোনান এবং ছাত্রছাত্রীদের নানারকম উপদেশদানে সহায়তা করেন। মিট-পরিবারে আজ তিনি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সদস্য। ১৯৯৬ সালে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠান সর্বগতানন্দজীকে সম্মান-পদক দিয়ে সম্মানিত করেন। এরপরে ১৯৯৮ সালের ৫ জুন প্রতিষ্ঠানের Commencement Day-তে (এই দিনে অজস্র লোকের উপস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের ডিগ্রী দেওয়া হয়) হোয়াইট হাউস-এর অনুরোধে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিন্টনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, সঙ্গে রকারফেলার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত বিজ্ঞান-গবেষক ডঃ ডেভিড হো-কেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সর্বগতানন্দজীকেও অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি ক্লিন্টন, ডঃ ডেভিড হো, কেমব্রিজ শহরের মেয়র এবং মিট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে মঞ্চে ছিলেন স্বামী সর্বগতানন্দজীও। কানাডার জাতীয় সঙ্গীতের পরই স্বামী সর্বগতানন্দজী যখন "ওম্ অসতো মা সদ্‌গময়ো..." পাঠ করেন, তখন দশ হাজার দর্শক দাঁড়িয়ে সেটা শুনেছিলেন। তাঁর সুললিত মন্ত্রোচ্চারণে অনুষ্ঠানে একটা আধ্যাত্মিক ভাব সঞ্চারিত হয় এবং সকলে আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়েন। অনুষ্ঠান-শেষে সর্বগতানন্দজী রাষ্ট্রপতি ক্লিন্টনকে স্বামী বিবেকানন্দের ওপর লিখিত 'দ্য গিফট্ আনওপেণ্ড' বইটি উপহার দেন।

আমরা যখন বস্টন কেন্দ্রে পৌঁছালাম, তখন সর্বগতানন্দজী সেন্টারে ছিলেন না। তিনি বস্টন কেন্দ্রের রিট্রিট সেন্টার শ্রীসারদা আশ্রমে ছিলেন। এই আশ্রমটি ম্যাসাচুসেটস-এর অন্তর্গত মার্শফিল্ড পাহাড়ের নিকট অবস্থিত। সর্বগতানন্দজী ওখানে ভক্তদের জন্য একটি গ্রীষ্মকালীন আধ্যাত্মিক শিবিরের আয়োজন করেছিলেন। শিবিরে যোগদানের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে অনেক সাধু এসেছিলেন। আমরা প্রায় একটা নাগাদ শ্রীসারদা আশ্রমে পৌঁছালাম। সারাদিন নানা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে রাতে মহারাজের কাছে বসে অতীতের নানা কাহিনী শুনলাম। তিনি পূজ্যপাদ স্বামী অখণ্ডানন্দজীর কাছে সন্ন্যাসদীক্ষা লাভ করেন। গুরুর আজ্ঞায় একবার তিনি বম্বে থেকে কনখল পর্যন্ত পদব্রজে গিয়েছিলেন।

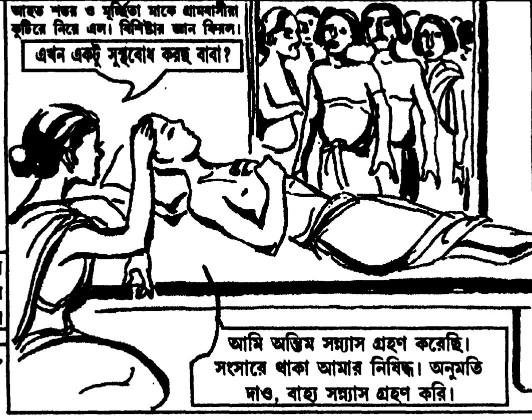
১৯ জুলাই ছিল বিদেশে আমার থাকার শেষদিন! দুপুরে স্বামী তথাগতানন্দজীর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন সারলাম। ওঁর এক প্রিয় শিষ্য স্বামী পবিত্রানন্দের সঙ্গে আমায় পরিচয় করিয়ে দিলেন। শুনলাম ইনি পিয়ানোতে 'রামনাম' বাজান। আশ্রমে একজন মুসলমান ভদ্রলোক এলেন, বললেন স্বামীজীর জীবন ও বাণীর ওপর লিখিত একটি বই পড়ে উনি বিশেষ আনন্দ পেয়েছেন। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বস্টন বিমানবন্দরে এলাম। ভক্ত, ছাত্র, পরিচিত অনেকেই এলেন বিদায় দিতে। বিষাদের ছায়া ঘনালো সবার মুখে। বিমান ছাড়ল নির্দিষ্ট সময়েই।

দিল্লি বিমানবন্দরে এসে পৌঁছালাম রাত পৌনে এগারটার সময়। ঘরে বসে ডায়েরিতে লিখলাম : যা এতকাল স্বপ্নে ছিল, তা বাস্তবে রূপায়িত হলো। প্রভুর কৃপাতেই সব সম্ভব হলো। [সমাপ্ত] ❑



আদি শঙ্করাচার্য ২

পঞ্চম শতাব্দী। স্থান—কেরল প্রদেশ, দক্ষিণ ভারত। কালাডি গ্রামে এক অপুত্রক ব্রাহ্মণ শিবগুরু এবং তাঁর পত্নী বিশিষ্টা একটি পুত্রসন্তানের জন্য চন্দ্রমৌলীশ্বর শিবের কাছে কাতর প্রার্থনা করলেন। জন্ম হলো এক দিব্য পুত্রসন্তানের। শঙ্করের কৃপায় জন্ম, তাই পিতা নাম রাখলেন 'শঙ্কর'। ইনিই হলেন পরবর্তী কালে হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তা আচার্য শঙ্কর। মাত্র ৩২ বছর তাঁর আয়ু। এই অল্প বয়সেই সারা ভারতকে তিনি জাগিয়ে দিলেন। চল যাই সেই সময়ে, সেই দেশে!



আমার প্রাণে এত আনন্দ কেন হচ্ছে? আমার বাছা সন্ন্যাস নেবে। সে তো গৌরবের। আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

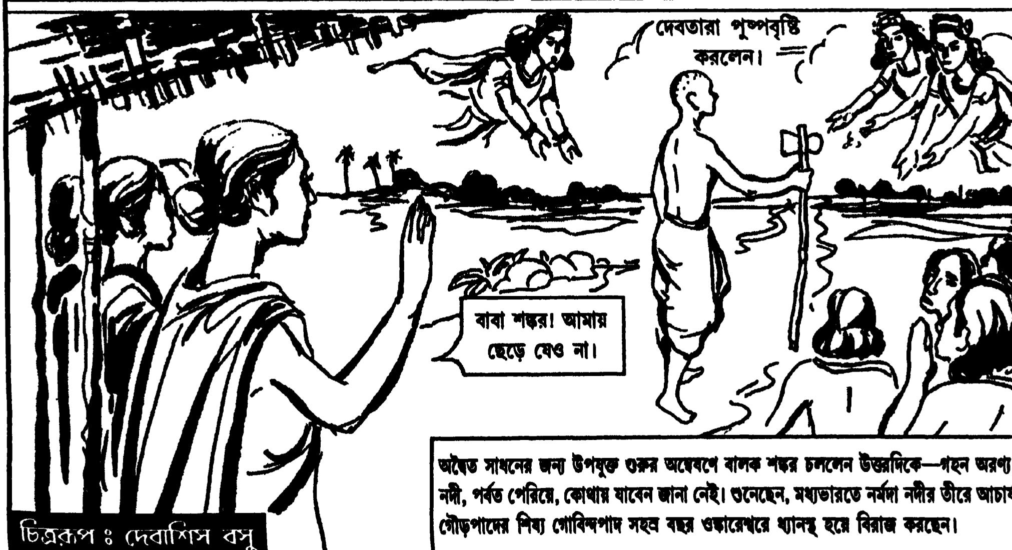
দয়া করে তুমিই আমার সন্ন্যাসগ্রহণের সব আয়োজন করে দাও মা।

সে কি কথা বাবা!

হে বলস্বরূপ ভগবান, আমার মায়ের প্রাণে বলসঞ্চার কর প্রভু।







ঠাকুর—দিশা দাও

সুজন সেনগুপ্ত

অনুবীক্ষণের নিচে রেখে এক ফুলের পরাগ
মুগ্ধ চোখ মেলে দেখি কত রেখাচিত্র আলপনা
প্রতি ফুলে ভিন্নতর এত ছবি, এত রূপ-রাগ
দিগন্তে দিগন্তে ব্যাপ্ত সুন্দরের জাগায় কল্পনা।

আরেক উন্নত যন্ত্রে সে-পরাগ লক্ষগুণে বড়
পুরনো দর্শন সব ক্ষণমাত্রে উড়ে চলে যায়;
প্রতি আলিম্পন বিন্দু কত ছবি এনে করে জড়ো
আগে থেকে ছবিগুলি বৃহত্তরে এসে ধরা দেয়।

"বিত্তের বৈভবে নয়, চিত্তের সৌরভে" দরশন
এখনো কি যা দেখেছি সেই ছবি সর্বশেষ দেখা
কত জ্ঞানলাভ হলে সে অ-ধরা হবেন আপন
সে-বারতা জানা নাই, বুঝি কোথা আছে তাহা লেখা।

সব শেষ যন্ত্রখানি আছে যার গবেষণাগারে
হে ঠাকুর দিশা দাও, যাই সেই জ্ঞানের ওপারে।

পূজার আসনে বসে

দিলীপ মিত্র

পূজার আসনে বসে,
দুচোখ বন্ধ করে বলছি, ভক্তি দাও।
মনে মনে কিছু প্রশ্ন জাগে,
যুক্তিহীন ভক্তি,
যার অন্য নাম মৃত্যু।
বীরসন্ন্যাসী বিবেকের বাণী।
পূজার আসনে বসে,
প্রতিদিন রাত্রে জঠরযন্ত্রণার কথা ভাবা,
সেও এক আত্মপ্রতারণা।
পূজার আসনে বসে,
একান্ত স্বার্থপর বৃত্তের চিন্তা,
প্রাপ্তির নীচতা।
পূজার আসনে বসে,
আমি শুদ্ধ হতে চাই।
মনের ভিতরে কাম-কাঞ্চন,
লোভের অন্তহীন ইচ্ছা।
পূজার আসনে বসে,
মনে এখন অন্য এক তপস্যা।
মনে পড়ে—
"তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।"

ঘর-গেরস্থালি

সমুদ্রঝিনুক বন্দ্যোপাধ্যায়

মায়ার মাটির ঘর গড়েছি
ধু-ধু বালির চরে,
গান রেখেছি, প্রাণ রেখেছি
চার কামরার ঘরে।

রাত-জোয়ারে ঢেউ বালিকায়
দিচ্ছে করতালি,
উঠছে ধোঁয়া, উড়ছে ধুলো
সংস্কারের বালি।

ঘূর্ণিঝড়ে কাঁপছে বাড়ি
কাঁপছে বসত ভিটে,
প্রপঞ্চময় রাত-চাবুকে
পিঠেতে কালসিটে।

এই বেশ আছি ক্লিন্ন দেহে
তবুও তোমায় ধরে,
সংসারে এক সন্ন্যাসী বেশ
তোমায় স্মরণ করে।

রয়েছ তুমি

সৈয়দ আনিসুল আলম

দুর্গম গিরি শোভিত কাননে
বিজন মরুতে শ্যামল আঙিনে
সাগরের ঢেউ অশনি পতনে
রয়েছ ঝটিকাগানে।
রয়েছ বাদলে জলদের গায়
আঁকাবাঁকা শিখায় বিজলি খেলায়
প্রিয়ার নয়নে পাখির কূজনে
ঝরনার কলতানে।
রামধনু-রঙে পেয়েছি তোমায়
সাঁঝের আবিরে গোধূলিবেলায়
আঁধার গগনে তারকা হাসিতে
চাঁদের মাধুরীদানে।
পরম আশ্রয় তোমারে জানিয়া
ডাকিলেন যিনি হৃদয় দানিয়া
পেয়েছেন তিনি তোমার করুণা
জীবনের গানে গানে।

টুকরোগুলো

ব্রত চক্রবর্তী



১

ঠিক পাশের লোকটিকে ছুঁলে
বিশ্ব ছোঁয়া হয়;
এত ব্যস্ত ছিলেন,
আপনি তাও করেননি?

২

ফুলগুলোর উদারতা
আমাকে অবাক করে দেয়।
কবিরাও এখান ওখান থেকে বায়না নিয়ে
কবিতা লেখে এখন;
আর ফুলগুলো, কী আশ্চর্য,
ফোটে আজও আপনা থেকেই।

৩

একদিন হাতেনাতে ধরেছি আমি ঈশ্বরকে,
যখন অন্ধকারে
নিজের কবিতা—ফুলগুলো
গাছে গাছে লিখছেন।

৪

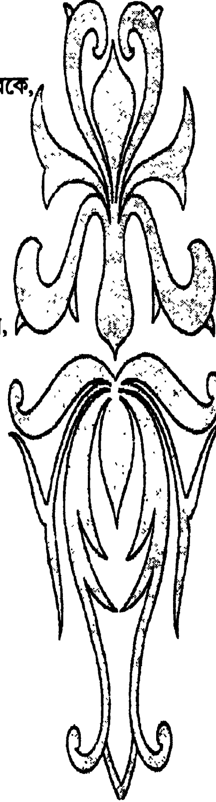
এটা-সেটা নানা কথার পর
তিনি যখন
ভালবাসার কথা বলতে শুরু করলেন,
এই এতক্ষণে
মুখে আলো লাগল তাঁর।

৫

একজন বলল, ডানদিকে যাব
একজন বলল, বাঁদিকে
কেউ বলল, ওর কাছে যাব
কেউ বলল, তার কাছে
কেউ একজনও বলল না—
নিজের দিকে যাব।

৬

অনেকক্ষণ গলা জড়াজড়ি করে
বসে থাকার পরও
দুঃখগুলো যখন দেখল
কারোর মনোযোগ পাচ্ছে না,
তখন নিজেরাই দলবেঁধে
সুখ আনতে চলল।



সন্তান

জয়নাল আবেদীন

আমরা স্নান সেরে বসে আছি
মা ভাত বেড়ে দেবেন
হঠাৎ খবর, তাঁর বড় অসুখ
আমরা থালা রেখে উঠে পড়লুম।

একদিন মা সেরে উঠলেন
আগের মতোই তিনি ভাত বেড়ে দিতে চান।

কিন্তু আমরা ভাইয়েরা আর এক জায়গায়
হতে পারলাম না।

বড় কে?

রূপককুমার পাল

একদিন তাঁর সভাসদ্‌দের শুধালেন আকবর—
"জগতের মাঝে কেবা বেশি বড়? আমি, নাকি ঈশ্বর?"
পাছে রেগে যান ভারতেশ্বর সমুচিত উত্তরে;
সভাসদ্ সবে রহিল নীরবে মাথাগুলি হেঁট করে।
বীরবল ছিল সভার মাঝারে সবার শ্রেষ্ঠ গুণী,
জোড়করপুটে দাঁড়ায়ে সে উঠে এমন কথাটি শুনি।
বীরবল বলেঃ "কেন জাগে মনে প্রশ্ন এমনতর?
সকলেই জানে, হে প্রভু, আপনি আল্লার চেয়ে বড়।
হেন কাজ আছে ভারতপতির সাধ্য যা সহজেই—
সে-কাজ করার ক্ষমতা কখনো জগৎপতিরও নেই।"
এই কথা শুনে ব্যথা পেয়ে মনে বাদশা বলেন তারেঃ
"তুমি শেষকালে পরিণত হলে নির্বোধ চাটুকারে!
কী এমন কাজ যাতে আমি আজ আল্লার চেয়ে বড়?
চাটুকারিতার এমন কথার প্রমাণ দিতে কি পার?"
বীরবল কনঃ "যাবজ্জীবন পাঠাতে নির্বাসনে
আপনি পারেন আপনার কোন অপরাধী প্রজাজনে।
এমন ক্ষমতা আছে কি তাঁহার যিনি খোদা, ভগবান—
বিশ্বে এবং বিশ্ব-বাহিরে সদা যিনি বিরাজমান!
তাঁর রাজত্বে করিলেও কেহ অপরাধ শত শত,
পারেন না তিনি করিতে তাহারে কখনো নির্বাসিত।"
বাদশা বলেনঃ "ধন্য ধন্য ধন্য হে বীরবল।
চাটুকার নও, এ কেবল তব চাটুকারিতার ছল।
মিথ্যার ছলে আল্লারে তুমি করিলে সবার বড়,
তোমার কথায় পেলাম আজিকে শিক্ষা মহত্তর।
বিধাতার সাথে নিজের তুলনা—মিথ্যা এ অভিমান
ভুলেও না যেন কোনদিনও আর নাহি পায় মনে স্থান।
নহ বীরবল মন্ত্রী কেবল—বন্ধু আমার আজ।"
এই বলে তাঁরে বাঁধে বাহুডোরে আকবর মহারাজ।

বিশ্বরূপ দর্শন

[শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে নিবেদিত বিশেষ নিবন্ধ]

কৃষ্ণা সেন



প্রিয় শিষ্য অর্জুনের প্রতি কৃপাবৎসল শ্রীভগবান কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অঙ্গনে তার মন থেকে মোহ দূরীভূত করতে পরমগোপনীয় অধ্যাত্মতত্ত্ব প্রকাশ করলেন। অর্জুন বুঝলেন—ভগবানই একমাত্র কর্তা; 'তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র'। তিনি ইচ্ছামাত্র ব্রহ্মাপদও যেমন দিতে পারেন, তেমনি আবার ঠেলে দিতে পারেন অধোগতির পথেও। সর্বভূতের উৎপত্তিস্থল সেই কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ, আবার বিলয়ও তাঁরই মধ্যে। সর্বব্যাপক হয়েও তাঁর সত্তা বিশিষ্ট রূপে উদ্ভাসিত। তিনিই শরণ্য, বরেণ্য এবং জগৎকারণ-স্বরূপ।

ভক্তের জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে, বোধশক্তি জাগ্রত হয়েছে, কিন্তু চিত্তে এক অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হয়ে উঠেছে—'হে পরমেশ্বর! আপনি যে আত্মতত্ত্ব আমার কাছে উদ্ঘাটিত করলেন, তা নিঃসন্দেহে যথার্থ; কিন্তু তবু হে পুরুষোত্তম! "দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরম্" (গীতা, ১১।৩)—ইচ্ছা হয় সেই বিরাট বিভূতিকে প্রত্যক্ষ করি। তবে আমি যোগ্য কিনা, সে-বিচারের ভার তোমার। উপযুক্ত যদি মনে কর, তাহলে একবার দেখাও সেই বিশ্বরূপ। তোমার বাণী আমাকে তৃপ্তি দিয়েছে। সেই তৃপ্তির স্পর্শে ধন্য হোক আমার এই দুনয়ন।' ভক্তহৃদয় আজ অনন্যা ভক্তির প্লাবনে ব্যাকুল; তাই সমর্পিতপ্রাণ অর্জুনের আকুল আবেগে সাড়া তো আসবেই।

ভক্তবাসনা চরিতার্থ করতে সদাতৎপর পার্থসারথি ভক্তের সামনে উন্মোচিত করলেন তাঁর সেই অলৌকিক দিব্যরূপ। বললেন ঃ 'দেখ পার্থ, আমি এক হয়েও বহুরূপে প্রকটিত। নানা বর্ণ, বিচিত্র, শত-শত, সহস্র-সহস্র, বিভিন্ন আকৃতি-বিশিষ্ট আমার এই দিব্যরূপের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখ। কি কি দেখবে? কি দেখতে চাও? দ্বাদশ আদিত্য দেখ, অষ্ট বসু দেখ, একাদশ রুদ্র দেখ, উনপঞ্চাশ মরুৎ দেখ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে দেখ। এদের প্রায় সবাই তোমার পরিচিত। কিন্তু অজানা, অচেনা, অদেখা অনেক কিছুও তুমি আমার দেহে দেখতে পাবে। প্রাণভরে যা দেখতে চাও দেখ; বহু অদৃষ্টপূর্ব, বহু আশ্চর্য ব্যাপার এই দেহে তুমি লক্ষ্য করবে।'

অর্জুন 'গুড়াকেশ' অর্থাৎ জিতনিদ্র; যে-তমোগুণ থেকে নিদ্রা, আলস্য, প্রমাদ প্রভৃতির উদ্ভব, অর্জুন সেই তমোগুণকে জয় করতে পেরেছেন, কিন্তু তবু তাঁর দৃষ্টির গোচরে আসে না সেই বিশ্বরূপ, সেই বিরাট অস্তিত্বের অনুভব। কারণ, দিব্যবস্তু দেখতে চাই দিব্যচক্ষু। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন ঃ "তাঁকে চর্মচক্ষে দেখা যায় না। সাধন করতে করতে ঈশ্বরের কৃপায় একটি প্রেমের শরীর হয়—তার প্রেমের চক্ষু, প্রেমের কর্ণ। সেই চক্ষে তাঁকে দেখে, সেই কর্ণে তাঁর বাণী শোনা যায়।... খুব ভালবাসা হলে তবেই তো চারিদিক ঈশ্বরময় দেখা যায়। তাঁকে রাতদিন চিন্তা করলে তাঁকে চারিদিকে দেখা যায়।" পরমকারুণিক পার্থসখা তাই প্রিয় সখাকে দিলেন সেই দিব্যদর্শন ক্ষমতা—

"ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।।"

(১১।৮)

—তুমি তোমার এই চর্মচক্ষু দিয়ে আমার এই ঐশরূপ দর্শনে সমর্থ হবে না। সেজন্য তোমায় দিব্যচক্ষু দিচ্ছি, তার সাহায্যে আমার এই ঐশ্বরিক অঘটন-ঘটন-সামর্থ্যরূপা যোগশক্তি দেখ।

ভগবান বললেন, 'পশ্য'—দেখ। অর্জুন তো দেখলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেখলেন আরেকজন—ধৃতরাষ্ট্রের অমাত্য গালবপুত্র সঞ্জয়। স্বজনবধ দর্শনে অনিচ্ছুক ধৃতরাষ্ট্র শুনতে চান যুদ্ধের যাবতীয় ঘটনা। তাই ব্রহ্মর্ষি ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে 'দিব্যচক্ষু' না দিয়ে দিলেন সঞ্জয়কে। যুদ্ধের সব সংবাদ প্রাসাদের অভ্যন্তরে থেকেও তাই সঞ্জয়ের গোচরীভূত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সবটাই প্রায় সঞ্জয়ের উক্তি; শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদ ব্যাসের কৃপায় সঞ্জয়ের মুখে আমাদের পরম প্রাপ্তি।

সঞ্জয় বলছেন, মহাযোগেশ্বর হরি তাঁর অলৌকিক বিশ্বরূপ নিয়ে অর্জুনের সামনে প্রকটিত হলেন। ভক্তনয়ন থেকে মায়িক বাধা অপসারিত; এটি সম্ভব হয়েছে মহাযোগেশ্বর হরির কৃপায়—ভক্তের সব অমঙ্গল অন্ধকার যিনি হরণ করেন, তিনিই তো হরি। বিরাট সেই বিশ্বরূপে অগণিত নয়নযুক্ত অসংখ্য মুখ; তাঁর আভরণ দিব্য, তাঁর উদ্যত আয়ুধসকল দিব্য, মাল্য-বস্ত্রাদিও দিব্য। শ্রীঅঙ্গে যে

গন্ধ ও অনুলেপন, তাও দিব্য। অতি উজ্জ্বল ও শুদ্ধসত্ত্বময় বলেই এই রূপ এক অপার্থিব দিব্যভাবে পরিপূর্ণ। আশ্চর্যময় এই রূপ অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন, ছেদহীন। সর্বদিক দিয়ে, সর্বত্র এই রূপ পূর্ণরূপে দৃষ্ট; সর্বতোভাবে অখণ্ড বলেই এই রূপ 'বিশ্বতোমুখ'। অর্জুন আজ কি প্রত্যক্ষ করছেন? "জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদিকন্দর"-রূপে যিনি বিরাজিত—তাঁকেই। আকাশে যদি যুগপৎ সহস্র সূর্যের প্রভা সমুদিত হয়, তাহলে সে-দীপ্তি সেই মহাত্মার অর্থাৎ বিশ্বরূপের প্রভাবতুল্য হতে পারে। ঈশ্বরের করুণায় অপার্থিব নয়নের অধিকারী হয়েছেন বলেই অর্জুন দেখছেন প্রাণভরে, নাহলে সহস্র সূর্যের কিরণমালার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা কার সাধ্য?



অধ্যাত্মপথের পথিক জ্ঞানী ভক্ত জানেন, পরব্রহ্মের প্রকাশ ত্রিবিধ। শ্রুতিতে আছে—

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি।" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ৩।১)

—যাঁর থেকে জীবগণ জন্মেছে, যাঁর মধ্যে সকল জীবের অস্তিত্ব এবং যাঁর মধ্যে সকল জীব গমন করে, তিনিই পরব্রহ্ম।

অর্জুনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর স্থিতিশীল রূপটি দর্শনের—"যেন জাতানি জীবন্তি"। শ্রীভগবান তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করে তাঁকে সামগ্রিকভাবে দেখালেন তাঁর বিনাশের রূপটি। অমৃতময় স্থিতিশীল রূপ যেমন অর্জুনকে 'হৃষ্টরোমা' করেছে, তেমনি বিনাশের বিভীষিকায় তিনি 'বেপমান'—কম্পিত। সেই দেবদেবের বিরাট দেহে অর্জুন দেখছেন অখিল জীবের সমাবেশ—সেখানে দেব-পিতৃ-মনুষ্যাদি নানাভাবে বিভক্ত হয়ে বিরাজিত। বহুর মধ্যে এক পুরুষ, আবার এক পুরুষের মধ্যে বহু ইন্দ্রিয়ের সমাবেশ। মানুষের সামনে জগতের যেটুকু অংশের প্রতিফলন, তা যে এক পরম পুরুষের আংশিক স্ফুরণ মাত্র—এই বোধ আমাদের নেই। এই অনুভূতির উদয় হয় পরমগুরুর কৃপাকণা লাভে।

বিস্মিত অর্জুনের মনে জেগেছে এই পরম উপলব্ধির শিহরণ। ভাবাবেগের আতিশয্যে রোমাঞ্চিত-কায় অর্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে বিশ্বদেবকে অবনত মস্তকে প্রণতি জানালেন। বললেনঃ 'হে দেব! তোমার শ্রীদেহে আমি দেখছি অনেক কিছুই। পদ্মাসনে আসীন ব্রহ্মা ও তাঁর স্থাবর-জঙ্গম সকল সৃষ্টি, সকল দেবতা, বশিষ্ঠ প্রমুখ ঋষিগণ, বাসুকি, অনন্ত, তক্ষক প্রভৃতি সাপেরা সকলেই আছেন। এই যে বিশেষ ভূতসঙ্ঘ—জলচর, স্থলচর, উভচর, অণ্ডজ, মানুষ, পশু, পাখি, কীট, পতঙ্গ, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর—সকলেই দিব্য, কারণ সবই যে তোমার দেবদেহে বর্তমান। যখন তোমার থেকে এদের পৃথক করে দেখি, তখন এদের এই দিব্য অস্তিত্ব খুঁজে পাই না; কিন্তু এখন এরা তোমারই দিব্যদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপে প্রতিভাত হচ্ছে বলেই এদেরকে 'দিব্য' বিশেষণে আখ্যাত করা যেতে পারে। হে বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপ! তোমার আনন বহু, নয়ন বহু, কর বহু, উদর বহু। তুমি সর্বব্যাপ্ত—'সর্বতঃ'। পূর্ব-পশ্চিম চারদিকে, অগ্নি-বায়ু চারকোণে, ওপর-নিচে যেদিকেই তাকাই, সেদিকেই তুমি। এই অনন্ত কাণ্ডের আদি, অন্ত, মধ্য কিছুই খুঁজে পাই না। তুমি যে রাজাধিরাজ, তাই মাথায় উজ্জ্বল কিরীট; এই মহাবিশ্বের সর্বকর্মচক্রের সংবিধানকর্তা তুমি। তাই তুমি চক্রধারী। নীতি-দুর্নীতির চরম বিচার কর বলে তোমার হাতে গদা। তোমার শ্রীঅঙ্গের দ্যুতি, তোমার তেজোরাশির সর্বব্যাপী দীপ্তি, প্রদীপ্ত অগ্নি ও সূর্যের মতো প্রভাবিশিষ্ট। যেদিকে চোখ ফেরাই, সেদিকেই অপরিমেয় তুমি বিরাজমান। তুমি সব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষমতার ওপরে। কিন্তু তুমি দুর্নিরীক্ষ্য—'নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে', যদিও 'রয়েছ নয়নে নয়নে'। আমি কেবল তোমার কৃপাশক্তির বলে এই দিব্যদর্শনের অধিকারী হয়েছি। তুমি অক্ষর পরব্রহ্ম, জ্ঞানিগণের জ্ঞাতব্য—এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, চরম আধার। "সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে" (গীতা, ১১।১৮)—

আমার মতে তুমি অব্যয়, সনাতন বৈদিক ধর্মের পালক এবং চিরন্তন পুরুষ। তুমি সেই পরম মহেশ্বর, দেবতার পরম দৈবত, পতির পতি, পরমের পরম, ভুবনেশ্বর। তোমার অনন্ত রূপের যে অনন্ত শক্তি, তা আমি অনুভব করছি। আদি-মধ্য-অন্তহীন, অপরিমিত বীর্যশালী তোমার অসংখ্য বাহু; চন্দ্র-সূর্য তোমার দুই চোখ; প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তোমার মুখ। তোমার এই তীব্র তেজ সারা বিশ্বকে সন্তপ্ত করে তুলছে। পৃথিবী আর স্বর্গের মধ্যে অন্তরীক্ষে যতখানি জায়গা আর দশদিকে যতখানি স্থান—আগে ভাবতাম, এসবই ফাঁকা; কিন্তু এখন বুঝতে পারছি—"ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্"—তোমার বিপুল সত্তা দিয়ে তুমি ভরে রেখেছ সব। এই যে অতি আশ্চর্য বিস্ময়কর রূপ, ক্রমশ যেন তার মধ্যে আভাসিত হচ্ছে এক ভীষণের প্রকাশ। তোমার এই অদ্ভুত উগ্রমূর্তি দর্শনে ত্রিভুবন ক্লিষ্ট-কাতর। দেবতারা তোমার মধ্যে প্রবেশ করছেন; কেউ কেউ কৃতাঞ্জলিপুটে 'রক্ষা কর' বলে প্রার্থনা করছেন। মহর্ষিরা, সিদ্ধপুরুষেরা চারদিক থেকে 'স্বস্তি, স্বস্তি' উচ্চারণ করে জগতের কল্যাণকামনায় বিবিধ স্তবে তোমার প্রসন্নতা বিধানে সচেষ্ট হয়েছেন। একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, সাধ্য নামে দেবতারা, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, উনপঞ্চাশ মরুৎ, উষ্মপায়িগণ, পিতৃগণ, গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধ—সকলেই তোমার এই অতি অদ্ভুত বিশ্বরূপের দিকে তাকিয়ে আছেন বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে। সকলেই আশ্চর্য, পরম বিস্ময়ে নিমগ্ন —"বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে" (ঐ, ১১।২২)।

বিশ্বেশ্বরের এই বিরাট রূপ অর্জুন তথা সকল দ্রষ্টার মনে এনে দিয়েছে এক স্তব্ধতার ভাব। অন্তর আনন্দে ভরে উঠেছে, কিন্তু বাইরে স্তব্ধতা। এই স্তব্ধতার, এই উপলব্ধির বর্ণনায় মহাভারতকারও তাই অর্জুনের ভাষ্যে অনুষ্টুপ্ ছন্দ বর্জন করে এনেছেন ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা ও সম্মিলিত উপজাতির ছন্দ। অর্জুনের কথা অক্ষরের ভারে ভারী, তাই গতি আগের ছন্দের তুলনায় কম, কিন্তু প্রকাশের ক্ষমতা অতুলনীয়। অর্জুনের গম্ভীর ভাবকে বহনের জন্য এই মন্থর গতিই যেন প্রয়োজন ছিল।

অদ্ভুত বিশ্বরূপের স্থানে ক্রমশ ফুটে উঠছে এক ভয়াবহ বিশ্বরূপ। নিদারুণ বেদনায় অর্জুন বলছেন : 'হে মহাবাহো! তোমার বহু মুখ, চোখ, বাহু, উরু, পদ ও উদর এবং বিশালদন্ত-বিশিষ্ট ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখে প্রাণিগণ অতীব ভীত—আমিও ভীত হয়েছি। হে ভগবন্ বিষ্ণো! আকাশচুম্বী তেজোময় বিচিত্রবর্ণ, বিস্ফারিত লোচন, বিশাল দীপ্ত নয়নবিশিষ্ট তোমার ভয়ঙ্কর রূপ আমার মনকে ব্যথিত করে তুলছে; আমি ধৈর্য হারিয়েছি, মনকেও শান্ত করতে পারছি না। হে দেবেশ! এ কী ভীষণ দৃশ্য! তোমার বিস্তৃত বিকৃত মুখগহ্বরের মধ্যে প্রলয়ের অনল প্রজ্বলিত। দীর্ঘদন্তে বিকৃত কী ভয়াল তোমার মুখ! তোমার এই কালানলসন্নিভ আকৃতি আমাকে দিগ্‌ভ্রান্ত করে তুলছে, মনে একবিন্দু স্বস্তি নেই। তুমি জগতের নিবাস-স্থল, সেই তুমি জগদ্‌বিনাশে প্রবৃত্ত—এই সম্ভাবনাই আমাকে বুদ্ধিহারা করেছে। হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও, শান্তমূর্তি ধারণ কর, সকলের ভয়ভীতি দূর হোক। কী বিভীষিকাময় দৃশ্য—সকলে ছুটছে, ছুটছে! ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণেরা, আমাদের পক্ষের বড় বড় নামজাদা বীরেরা—সবাই বেগে, অতি বেগে প্রবেশ করছে তোমার মুখবিবরে। আর তোমার সেই মুখ! সে যেন ভয়ঙ্কর সূক্ষ্ম ধারাল বিশাল দন্তপঙ্‌ক্তিভরা বিশাল গহ্বর! সকলে প্রবেশ করছে সেই মুখবিবরে। কারো কারো মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে ঐ করাল দশনে, কারো বা চূর্ণিত মস্তক তোমার দন্তসন্ধিতে সংলগ্ন হয়ে রয়েছে দেখা যাচ্ছে। নিখিল জীবনপ্রবাহের একমাত্র কাজ যেন ঐ সর্বব্যাপী জ্বলন্ত মুখবিবরে প্রবেশ করা! নদীর জলপ্রবাহ যেমন সমুদ্রাভিমুখে প্রধাবিত হয়ে সাগরসঙ্গমে নিজেকে নিঃশেষ করে, পতঙ্গেরা যেমন অতি বেগে ধাবমান হয়ে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন দেয়—তেমনি এই পৃথিবীর অধিবাসীরাও যেন মহাবিনাশের জন্য ছুটে চলেছে তোমার ঐ ভয়ঙ্কর মুখবিবরের মধ্যে। তোমার আকর্ষণশক্তিও অমোঘ। তোমার জ্বলন্ত মুখগুলি প্রাণিগণকে গ্রাস করে বারবার যেন লেহন বা আস্বাদন করছে। হে বিষ্ণো! তোমার ভীষণ তেজে, তীব্র প্রভায় দগ্ধ হচ্ছে সমগ্র জগৎ। উগ্রমূর্তি এই আপনাকে আমি চিনি না। আপনি কে তা আমাকে বলুন। হে দেববর! আপনাকে নমস্কার করি, আপনি প্রসন্ন হোন। আপনাকে চেনার বা আপনার কার্য অনুধাবন করার শক্তি বা সামর্থ্য আমার একেবারেই নেই। আপনাকে জানি জীবনদাতা হিসাবে, কিন্তু আজ মৃত্যু মহোৎসবের আঙিনায় দাঁড়িয়ে আমি হতবাক্! বিস্ময়-বিমূঢ়! প্রভু! আমার সভীতি-সভক্তি প্রণাম গ্রহণ করুন।

অর্জুনের অতি প্রিয় চিররসময় সখা আজ তেজোময় বিশ্বধাতা। সখাকে তাই তাঁর সম্বোধন 'ত্বং' থেকে 'ভবান্'—তুমি থেকে আপনিতে, কারণ বিশ্বেশ্বরের এই বিশ্বরূপ যে এক অজানা রহস্যে ঘেরা।

ভক্তকে অভয়প্রদানই ভক্তবৎসলের কাজ; ভগবান তাই বললেন : 'আমি লোকক্ষয়কারী অতিভীষণ কাল; ত্রিলোকের সবকিছু নাশ করাই আমার ধর্ম। প্রাকৃত প্রত্যেক বস্তুর আমি শেষ পরিণাম। আমি এখানে এই

সমস্ত লোককে সংহার করতে প্রবৃত্ত হয়েছি। তুমি যুদ্ধ কর বা না কর, তাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বিপক্ষ দলের কোন যোদ্ধাই জীবিত থাকবে না। মহাকালরূপে আমিই সকলকে সংহার করব। অতএব তুমি যুদ্ধের জন্যে কৃতসঙ্কল্প হয়ে অস্ত্রধারণ কর, শত্রুজয় করে যশ লাভ কর ও নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ কর। কুরুক্ষেত্রের এই মহারণে সকলের ভাগ্যেই মৃত্যুরেখা পূর্বাঙ্কিত, তুমি এখন শুধু নিমিত্তমাত্র হও। সকল কার্যের কর্তা আমি, জীব উপলক্ষ্য মাত্র। ভীষ্ম, দ্রোণ, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য বীরগণকে আমি পূর্বেই নিহত করেছি—তাদের মৃত্যু স্থিরনিশ্চিত। আমি যাদের মেরে রেখেছি, তুমি তাদেরই নিহত করবে। মনে কোন কর্তৃত্বাভিমান রেখো না, তাহলে আর দুঃখ পাবে না—জয়ীও হবে। তুমি যন্ত্র, আমি যন্ত্রী। আমার এই মৃত্যুমন্দিরে তুমি পূজারী হও।'

সঞ্জয় জানাচ্ছেন, শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনে অর্জুন আবার দুটি হাত যুক্ত করে প্রণত হলেন এবং গদগদভাবে সেই জগদাধার জগন্নিলয় বিশ্বরূপকে স্তবে প্রসন্ন করার মানসে বলতে লাগলেন ঃ 'হে হৃষীকেশ। হে সর্বেন্দ্রিয়ের অধিপতি শ্রীহরি! সর্বচরাচর আপনার মাহাত্ম্যকীর্তনে আনন্দিত হয়ে ওঠে—আপনার প্রতি অনুরক্তিই এর কারণ; আপনি প্রাণিগণের একমাত্র গতি। আপনি যেমন ভক্তপালক, তেমনি দুষ্টের সংহারক। তাই স্বাভাবিক নিয়মেই দেখি, রাক্ষসেরা আপনার দর্শনে পলায়নপর, আবার সিদ্ধেরা প্রণামরত। হে অনন্ত! হে জগন্নিবাস! হে দেবেশ! আপনি ব্রহ্মারও গুরু, সদসতের অতীত অক্ষরব্রহ্ম; আপনিই আদি কর্তা। তাই সমগ্র জগৎ কেন আপনাকে নমস্কার করবে না? যা ব্যক্ত, যা অব্যক্ত—সবই আপনি, আপনি ছাড়া এই ত্রিজগতে অন্য কিছুই নেই। হে অনন্তস্বরূপ। আপনি আদিদেব, অনাদি পুরুষ, আপনিই এ বিশ্বের একমাত্র লয়স্থান; আপনিই জ্ঞাতা, আবার আপনিই জ্ঞাতব্য—আপনিই পরম ধাম, আপনিই বিশ্বব্যাপী ভূমা। আপনিই বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র; ব্রহ্মা আপনি, ব্রহ্মার জনকও আপনি। আপনাকে সহস্রবার নমস্কার, আবার পুনঃ পুনঃ নমস্কার। হে সর্বাত্মন্! আপনাকে সামনে থেকে নমস্কার, পশ্চাৎ থেকে নমস্কার, সর্বদিক থেকে নমস্কার। আপনার অনন্ত বীর্য, অমিত বিক্রম, অপরিমিত প্রভাব। আপনি ছাড়া চরাচরে আর কিছু নেই—আপনি সর্বস্বরূপ। আপনার এই অপ্রমেয়, অবিচিন্ত্য অনন্ত রূপ না জেনে কখনো অজ্ঞানতাবশত, কখনো প্রণয়বশত কত অশোভন আচরণ করেছি। কখনো একা, কখনো বা দশজনের সামনেই আহার, বিহার, শয়ন ও উপবেশন করেছি। পরিহাস করে আপনার কত অমর্যাদা করেছি—"কৃষ্ণ", "যাদব", "সখা" বলে করেছি অশালীন সম্বোধন। সেই সবকিছুর জন্য, হে অচ্যুত, আপনার কাছে বিনীতভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। হে অপ্রতিমপ্রভাব! হে পরমপূজ্য! আপনি এই চরাচর জগতের পিতা, আপনি রুষ্ট হবেন না। আপনি যে কেবলমাত্র পূজনীয় তা নয়, আপনি গুরুবৎ এবং গুরু অপেক্ষাও অধিক—ত্রিভুবনে অতুলনীয়; আপনার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? তাই দেহ-মন-প্রাণ সকলই আপনার পাদপদ্মে নিবেদন করে বলছি—"আর কারো পানে চাহিব না আর, করিব হে আমি প্রাণপণ"। পিতা যেমন পুত্রকে ক্ষমা করে, বন্ধু যেমন বন্ধুর দোষ দেখে না, প্রিয় যেমন প্রিয়ার অপরাধ নেয় না—সেইরকম আপনি প্রেমময়, আমাকে আপনার কাছে টেনে নিয়েছেন; কাজেই সাহস করে বলছি, আমার পূর্বকৃত সব অপরাধ ক্ষমা করুন। দেবেশ! আপনার কৃপায় আপনার ক্ষর ও অক্ষর—দুই রূপের দর্শন হলো। আমি ধন্য। কিন্তু ঐ বিরাট রূপের দর্শন আমার মনকে ত্রাসিত করে তুলছে, প্রাণ যেন চাইছে এই রূপের উপসংহার। কৃপা করুন দেবদেব; হে জগদাধিপতি! সেই আমার নিত্য ধ্যানের চিরপরিচিত রূপটি নিয়ে আবার আমার সামনে আপনার আবির্ভাব হোক। আপনার কিরীট-পরিহিত, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী রূপটি চিরসৌম্য, চিরসুন্দর। তাই সহস্রবাহু সম্বরণ করে আমার সামনে সেই চতুর্ভুজ মূর্তিতে পুনঃপ্রকাশিত হোন। হে বিশ্বমূর্তে! আমার উদ্বেলিত চিত্তে প্রশান্তি আনতে ঐ রূপটির এখন বিশেষ প্রয়োজন।

প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে অভীষ্ট পূর্ণ।

ভগবান বললেন ঃ 'অর্জুন, তোমার প্রতি প্রসন্নতায় নিজ ঐশযোগে তোমাকে এই তেজোময়, অন্তঃশূন্য, জগদাদিভূত শ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপ দেখিয়েছি। আমার এই রূপের এইভাবে দর্শন অন্য কেউ পায়নি। এই দর্শন অতি দুর্লভ। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! না বেদ অধ্যয়নে, না যজ্ঞদানে, না অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ায়, না চান্দ্রায়ণাদি উগ্র তপস্যায় আমার এই রূপ দেখা যায়। একমাত্র তুমিই এই বিরাট রূপদর্শনে সমর্থ হয়েছ। আমার এই ভয়ঙ্কর রূপে ব্যথিত হয়ো না, ভয় পেও না। ভয়মুক্ত প্রসন্নচিত্তে তোমার অভিপ্রেত আমার সেই পূর্বরূপ দেখ।'

ঈশ্বরকৃপাতেই তাঁর দর্শন। অর্জুনের এই যে বিশ্বরূপ দর্শন, তা একমাত্র ভগবানের কৃপায়। সঞ্জয় দেখলেন, মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আশ্বস্ত করে আবার পূর্বের সেই সৌম্যমূর্তি ধারণ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ "ভক্ত যে-রূপটি ভালবাসে, সেই রূপে তিনি দেখা দেন, তিনি যে ভক্তবৎসল। বীরভক্ত হনুমানের জন্য রামরূপ ধরেছিলেন।... হাজার চেষ্টা কর,

তাঁর কৃপা না হলে কিছু হয় না। মানুষের এক ছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বুঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? তিনি যদি কৃপা করে বুঝিয়ে দেন তাহলে বুঝা যায়।"

সেই সৌম্য মানবরূপ দর্শন করে অর্জুন প্রসন্নচিত্ত ও প্রকৃতিস্থ হলেন। ঘোর রূপের বিভ্রান্তি কেটে গিয়ে চিত্তে এল মহা তৃপ্তি, পরা শান্তি—"সচেতাঃ সংবৃত্তঃ অস্মি" (ঐ, ১১।৫১)—অর্জুন স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তিতে স্থিত হলেন। স্বস্থ অর্জুনকে বিশ্বাদিদেব বললেন: 'এই যে আমার সুদুর্দর্শ বিরাট রূপ দেখলে, তা দর্শন করা সুকঠিন। দেবতারাও এ রূপের নিত্য দর্শনাকাঙ্ক্ষী। এ রূপ বেদাধ্যয়ন, চান্দ্রায়ণাদি তপস্যা, গো-সুবর্ণাদি দান ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের পুণ্যফলে দর্শন করা যায় না—একথা আগেও বলেছি, আবারও বলছি। এই রূপ তপস্যাদি-লভ্য নয়, কৃপালব্ধ। এই রূপ দর্শনের জন্য চাই কৃপাসিক্ত নয়ন। আর চাই অনন্যা ভক্তি—"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ" (ঐ, ১১।৫৪)। বলতে গেলে, অনন্যা ভক্তিও কৃপারই দান। কৃপাতেই চিত্তভূমিতে আসে ভক্তির গভীরতা। তাই অনন্যা একনিষ্ঠময়ী প্রীতিতেই আমাকে পাবে—"জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ"। কিভাবে আমাকে পাবে? প্রথমত, আমার স্বরূপের জ্ঞানলাভ করে পাবে আমার দর্শন। তারপর আমার অন্তরভূমিতে প্রবেশ করে আমাকে আস্বাদন করবে।'

মানুষের একদিকে কৃষ্ণ, আরেকদিকে কৃষ্ণের সংসার। সব্যসাচী অর্জুনের যেমন দুহাতেই ধনুর্বাণ চালাবার ক্ষমতা ছিল, আমাদেরও তেমনি ধর্ম ও সংসার—দুদিকেই সমদৃষ্টি রেখে চলতে হবে। কিন্তু এ যে বড় সুকঠিন; এর জন্য প্রয়োজন শুদ্ধাভক্তি। যে-ভক্তির মধ্যে কোন কামনা থাকে না, সেই ভক্তি দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। আর তাই বিশ্বরূপ দর্শনের সর্বশেষ শ্লোকে এই শুদ্ধাভক্তি প্রাপ্তির নির্দেশ দিলেন ভগবান স্বয়ং—অর্জুনকে সামনে রেখে বিশ্বের সকল মানবের উদ্দেশে—

"মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব।।"
(১১।৫৫)

এই একটি শ্লোকেই কর্ম, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও পরাভক্তির বার্তা। কর্ম অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু সেই কর্মে থাকবে না কর্তৃত্ব ও ফলের আকাঙ্ক্ষা—তা হবে কৃষ্ণপ্রীতি হেতু। তিনিই নিখিল জীবের আত্মার আত্মা—"সর্বভূতাত্ম ভূতাত্মা"। এই জ্ঞান জন্মালে তবেই ভক্ত হন শ্রীকৃষ্ণপরায়ণ, আর তখনি সাধকের মন থেকে ঘৃণা, বিদ্বেষ, হিংসা দূর হয়ে যায়। জ্ঞানের আলোকে তখন 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু'। তাই জ্ঞানী, ভক্ত, সাধক তখন 'নির্বৈর'। আবার মনে যদি বিন্দুমাত্র আসক্তি থাকে, ভগবান দূরে সরে যান। তাই আসক্তি সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করার জন্য 'সঙ্গবর্জিত' হতে হবে। এই সঙ্গবর্জিত অবস্থাই যোগের সোপান। নিজেতে থাকা, নিজ স্বরূপেতে থাকা ও পরমাত্মাতে লীন থাকা সাধকের চোখে একই কথা। সমদর্শী অবস্থায় জ্ঞানী ভক্ত আরাধ্যের সঙ্গে মিলিত হন। এই মিলনের পথ পরাভক্তি বা প্রেমভক্তি। প্রেমভক্তি যত বাড়ে, ততই ভক্ত হন ভগবানের অন্তরতম। ক্রমে মহাভাবভূমিতে ভক্ত ভগবানে, ভগবান ভক্তে ঘটে নিবিড়তম যোগ। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—"নিষ্ঠার পর আসে ভক্তি, ভক্তি পাকলে ভাব, ভাব ঘনীভূত হলে মহাভাব, সর্বশেষ প্রেম।"

তাই হে পরম দয়াল প্রভু, তোমার কৃপাবারি সিঞ্চনে আমাদের শরণাগতি দাও, অনাসক্ত কর। তোমার অহরহ স্মরণ-মননে আঁধার দিশা পারাপারে সক্ষম কর। ❑

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সহৃদয় পাঠকবর্গ আশা করি অবগত আছেন যে, গত ১ জুন ২০০১ থেকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ডাকমাশুল দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। 'উদ্বোধন' পত্রিকার ক্ষেত্রেও এই বর্ধিত হার সমভাবে প্রযোজ্য হওয়ায় ডাকযোগে যাঁরা পত্রিকা নেন, তাঁদের কাছ থেকে ডাকখরচ বাবদ যা নেওয়া হয়েছে, তাতে স্বাভাবিক কারণেই সঙ্কুলান হবে না। তবে আমরা স্থির করেছি, অতিরিক্ত ডাকখরচ সত্ত্বেও এবছরের বাকি ছয় মাসের জন্য আমরা গ্রাহকদের অতিরিক্ত কোন ডাকমাশুল পাঠাতে অনুরোধ করব না। বিগত তিন বছরে বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ও ডাকমাশুল অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

এছাড়া, পাঠকবর্গের জ্ঞাতার্থে আরো জানাই যে, সারা বছরে 'উদ্বোধন'-এর প্রকৃত খরচ গ্রাহকপ্রতি কমপক্ষে ১৮০্ টাকা হলেও বার্ষিক মাত্র ৬৫্ টাকায় এই পত্রিকা তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি কাগজের মূল্য ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের সুধী পাঠকবর্গের কথা চিন্তা করে এইমুহূর্তে আমরা ডাকমাশুল বা পত্রিকার গ্রাহকমূল্য না বাড়ালেও আগামী বছর এই দুই ক্ষেত্রে কিছু মূল্য বাড়বে বলে গত মাসে জানানো হয়েছিল। অসংখ্য মধ্যবিত্ত পাঠকদের কথা মাথায় রেখে আগামী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য মাত্র দশ (১০) টাকা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। অর্থাৎ বার্ষিক গ্রাহকমূল্য হবে পঁচাত্তর (৭৫) টাকা (মাঘ থেকে পৌষ সংখ্যা) এবং ডাকমাশুল বৃদ্ধির কারণে সডাক গ্রাহকমূল্য হবে পঁচানব্বই (৯৫) টাকা মাত্র।

আমাদের বিশ্বাস, সহৃদয় পাঠকবর্গ এই ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে 'উদ্বোধন'-এর জয়যাত্রা অব্যাহত রাখতে সাহায্য করবেন।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

গড়ের মাঠের আকর্ষণ বিদেশী ফুটবলাররা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফ্রেড পাগসলে থেকে জোস র‍্যামিরেজ ব্যারেটো, সেই সুদূর অতীতের বার্মা (অধুনা মায়ানামার) আগত পাগসলেই ছিলেন কলকাতা মাঠে খেলতে আসা প্রথম বিদেশী ফুটবলার। তারপর সাইবেরিয়ার পরিযায়ী পাখির মতো কলকাতা ফুটবলের হাতছানিতে সাড়া দিয়ে খেলতে এসেছেন অজস্র বিদেশী ফুটবলার। সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে শতাধিক বিদেশী ফুটবলার এযাবৎ কলকাতা মাঠে খেলে গেছেন বা এখনো খেলছেন। এদের মধ্যে অনেকেই জনসম্মোহনী ও চিত্তাকর্ষক ফুটবল উপহার দিয়ে গড়ের মাঠের একশ বছরের প্রাচীন গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছেন। এমনই কয়েকজনকে নিয়েই এই নিবন্ধ।

চারের দশকের মাঝপর্বে এসেছিলেন পাগসলে। খেলেছিলেন লাল-হলুদ জার্সি গায়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। তখন ইস্টবেঙ্গল ছিল দুরন্ত দল। সুনীল ঘোষ, প্রমোদ দাশগুপ্ত, ব্যোমকেশ বসু, আপ্পারাও, আমেদ খান, পাখি সেনের মতো সুদক্ষ ফুটবলারদের মধ্যেও নিজের জাত চিনিয়ে দিয়েছিলেন সুদর্শন পাগসলে। দুপায়ে ছিল প্রচণ্ড শট। খেলতেন মাঝমাঠে, 'ডাউন দ্য মিডল' একটা চোরা গতি ছিল তাঁর। সেসময় দূরপাল্লার জোরালো শটে বহু ম্যাচে দলকে প্রয়োজনীয় জয় এনে দিয়েছিলেন এই বার্মিজ ফুটবলারটি। পরবর্তী কালে সাতের দশকের শেষ দিকে আরেক বার্মিজ মোহন ছেত্রী মোহনবাগানের হয়ে খেলতে এলেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। পাঁচের দশকে পাকিস্তান থেকে বেশ কয়েকজন কৃতী ফুটবলার এসেছিলেন। ওমর, মাসুদ ফকরি, আবিদ হোসেন, মুসা, নূর, হাসানরা মাঠে নামলেই গ্যালারি ভরে যেত।

এদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় ওমরের। প্রথমে মহামেডান, তারপর ইস্টবেঙ্গলে খেলেছিলেন শক্তিশালী এই ফুটবলারটি। পাওয়ার ফুটবল খেললেও দুপায়ে দেখার মতো ড্রিবল ছিল তাঁর। শৈলেন মান্না, আমেদ হোসেনের মতো সর্বভারতীয় ডিফেণ্ডাররাও তাঁকে রুখতে হিমসিম খেতেন। অলরাউণ্ড দক্ষতাসম্পন্ন ছিলেন এই ফুটবলারটি। দলকে খেলাতেন এবং নিজেও প্রয়োজনে গোল করে ম্যাচ জেতাতেন। ১৯৫৯-এ সুদান জাতীয় দলের বিরুদ্ধে আই. এফ. এ. একাদশের ঐতিহাসিক জয়ের প্রধান কারিগর ছিলেন তিনিই। তিনি যদি ভারতীয় নাগরিকত্ব নিতেন, তাহলে নির্দ্বিধায় এদেশের হয়ে অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস খেলার সুযোগ করে নিতেন আপন যোগ্যতায়। মাসুদ ফকরি পাকিস্তানী হলেও ইস্টবেঙ্গলে খেলতে এসেছিলেন লণ্ডন থেকে। বিলেতে দ্বিতীয় ডিভিশন লিগে নিয়মিত খেলে নিজেকে শাণিত করে তুলেছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন, সুগঠিত ফকরি। তাঁর খেলার একটা সুললিত স্টাইল ছিল। তিনি প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন ছিলেন না, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত ফুটবল খেলতেন। দুপায়েই ভাল কাজ ছিল তাঁর। সেন্টারিং, ফিডিং, শুটিং, হেডিং সব বিষয়েই কমবেশি দক্ষ ছিলেন তিনি। ফরোয়ার্ডে খেললেও মাঝমাঠে নেমেও দলকে নির্ভরতা দিয়েছেন। তবে কলকাতা মাঠে ১৯৫৩-৫৪ দুটি মরশুম খেলেই দেশে ফিরে যান তিনি।

ফকরির সমসাময়িক ছিলেন মুসা। খেলেছেন ইস্টবেঙ্গলেই। মুসার ছিল প্রচণ্ড গতি, দুর্দান্ত আক্রমণের বাসনা, বল হারালে ডিফেণ্ডারকে তাড়া করার প্রবণতার সঙ্গে পরবর্তী কালের চিমার খানিকটা মিল আছে। চিমার মতো অত বড় চেহারা না হলেও যথেষ্ট বলোদ্দীপ্ত ফুটবল খেলতেন। আবিদও কলকাতা মাঠে স্বল্প-কালীন অবস্থানে নিজের জাত চিনিয়েছেন। রাজস্থান, মহামেডানে সুনামের সঙ্গেই তিনি খেলেছেন। কিন্তু ছয়ের দশকে পাকিস্তান সরকার সেদেশের ফুটবলারদের বিদেশে খেলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেয়।



মজিদ বাসকার



চিমা ওকোরি

১৯৭৪-এ ইস্টবেঙ্গল হংকং থেকে নিয়ে আসে রুক বাহাদুরকে। বলা হয়েছিল, রুক বাহাদুর এশীয় মানের ফুটবলার। কিন্তু কোচ প্রদীপ ব্যানার্জী তাঁকে দুদিন অনুশীলনে দেখেই আর মাঠে নামাতে ভরসা পাননি। আফ্রিকার জাইরের বিশ্বকাপ খেলা ফুটবলার কাকোকারও একই দশা হয়েছিল। ভরা বর্ষায় বৃষ্টিস্নাত ভিজে মাঠে তাঁকে খেলাবার ঝুঁকিই নেয়নি ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষ। তবে আফ্রিকার প্রথম ফুটবলার হিসাবে ডেভিড উইলিয়ামস কিন্তু ময়দানী তারকাদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে নিজের অস্তিত্বের ভিত গড়ে নিয়েছিলেন। সাবেক মাদ্রাজ থেকে কলকাতার মহামেডান স্পোর্টিংয়ে খেলতে এসেই দর্শক-হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন খেলোয়াড়ী দক্ষতার পাশাপাশি নানা ধরনের গেমসম্যানশিপের

প্রয়োগনৈপুণ্যে। ইস্টবেঙ্গলে যখন জীবনের সেরা ফর্মে খেলছেন, তখনি মাঠের বাইরের এক অবাঞ্ছিত ঘটনার প্রেক্ষিতে তাঁকে কলকাতা ছাড়তে হয়েছিল।

ডেভিড উইলিয়ামস গেলেন, তাঁর জায়গা নিলেন মজিদ বাসকার, জামসেদ নাসিরি ও মেহেমুদ খাবাজি। ইরানের এই তিন ফুটবলার ১৯৮০-তে দলবদলের বাজারে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ইস্টবেঙ্গলে খেলতে এসেছিলেন। তার আগে অবশ্য সেদেশের বিশ্বকাপার সানজারি মহামেডানে এসে গুটিকয়েক ম্যাচ নিজের দক্ষতা অনুযায়ী খেলে বিদায় নিয়েছিলেন। মজিদ বাসকার এযাবৎ কলকাতা মাঠে খেলে যাওয়া সর্বোত্তম বিদেশী ফুটবলার, হালের ব্যারেটোই তাঁর সমগোত্রীয়। মজিদ, জামসেদ, খাবাজি একসঙ্গে এলেও টিকে গেলেন প্রথমোক্ত দুজনই। আরো ভালভাবে বললে জামসেদই। কারণ, মজিদ তিন-চারবছর চমকপ্রদ ধ্রুপদী ফুটবল খেলার পর মাদকাসক্ত ও অসংযমী জীবনযাপন করার দরুন অকালেই হারিয়ে গেলেন ফুটবল মাঠ থেকে।

জাত ফুটবলারের সমস্ত গুণই ছিল মজিদের। বলকে যেন কথা বলাতেন। যখন নিজের ফর্মে খেলতেন, পাশে সবাইকে নিষ্প্রভ মনে হতো। ১৯৮০-১৯৮১-তে ইস্টবেঙ্গল, ১৯৮২-১৯৮৩-তে মহামেডানকে বহু টুর্ণামেন্টে টেনে নিয়ে গেছেন একক দক্ষতায়। জামসেদ প্রথমে সাপোর্টিং স্ট্রাইকার হিসাবে প্রতিপন্ন হলেও পরের দিকে ইস্টবেঙ্গলের নির্ভরযোগ্য ফরোয়ার্ড হিসাবে সারা ভারতবর্ষের সব টুর্ণামেন্টে দলকে জিতিয়েছেন। ১৯৮৫-র ফেডারেশন কাপে লাল-হলুদ শিবিরের জয়ের প্রধান কাণ্ডারি ছিলেন তিনিই।



জোস র‍্যামিরেজ ব্যারেটো

মজিদ সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়েন নাইজেরিয়ান চিমা ওকোরি। 'বুলডোজিং' ফুটবল খেলে টানা ১৬ বছর মহামেডান, ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানকে অজস্র ট্রফি পাইয়ে দিয়েছেন তিনি। দুপায়ে প্রচণ্ড শট, ছোট জায়গায় চকিত টার্ণিং, গোল চেনার অদ্ভুত ক্ষমতা আর শক্তিনির্ভর 'থ্রাস্ট' ফুটবল এদেশের ঘরোয়া খেলায় তাঁকে ডিফেণ্ডারদের কাছে আতঙ্ক করে তুলেছিল। পাঁচবার কলকাতা লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতা, সারা ভারতে সব টুর্ণামেন্ট মিলিয়ে তিনপ্রধানের হয়ে তিন শতাধিক গোল রেকর্ড হিসাবে অনন্য। চিমা কখনোই মজিদ, ব্যারেটো বা স্বদেশীয় এমেকা এজুগোর সমমানের না হলেও গোল করার নিরিখে ভারতীয় ফুটবলে চিমার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এমেকা এজুগো ছিলেন এক খামখেয়ালী ফুটবলার। একটানা কখনো খেলেননি কলকাতা মাঠে। ১৯৮৬-তে চিবুজোরের সঙ্গে এসেছিলেন ইস্টবেঙ্গলে, ফিরে গিয়ে ১৯৯০-তে আবার আসেন মহামেডানে খেলতে। সেবার নেহরু কাপে মহামেডানের সেমিফাইনালে উঠেছিল মূলত তাঁর অসাধারণ ফুটবলশৈলীর জন্য। অলরাউণ্ড ফুটবলার, যেকোন পজিশনে খেলতে পারতেন। তবে কলকাতা ফুটবলে আটকে না থেকে তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক ফুটবলের সুবিস্তৃত মঞ্চে। খেলেছেন মালয়েশিয়ায়, ডেনমার্কে। অলিম্পিক ও বিশ্বকাপে তিনি নাইজিরিয়ার জাতীয় স্কোয়ার্ডে ছিলেন। তাঁর সতীর্থ ক্রিস্টোফার, চিবুজোররা বেশ কয়েক বছর চলনসই ফুটবল খেলেছেন কলকাতা মাঠে। একই সময়ে এসেছিলেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপার জুলিয়েন ক্যামিনো। তবে সুবিধা করতে পারেননি।

নয়ের দশকে এসেছেন অগণিত আফ্রিকান, ব্রাজিলিয়ান, ইউরোপীয়ান ও এশিয়ান ফুটবলার। এঁদের মধ্যে নজরকাড়া ফুটবল খেলেছেন নাইজিরিয়ার বার্নাড, ওমোলোজা, ইসিয়াকা; কেনিয়ার স্যামি ওমেলো; ব্রাজিলের প্রেতো, ব্যারেটো, স্যান্টোস; ঘানার জ্যাকসন, মুসা; ইংল্যাণ্ডের প্রিণ্ডেভিলি, ম্যাগুইরি; নেপালের গণেশ থাপা; উজবেকিস্তানের ইগর স্কিরভিন; বাংলাদেশের মুন্না, নকিব; শ্রীলঙ্কার রোশন পেরেরা প্রমুখ। বর্তমানে যেসকল বিদেশী ফুটবলার ভারতের বিভিন্ন মাঠে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন, মোহনবাগানের নয়নের মণি ব্যারেটোই তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সব অর্থেই তিনি কমপ্লিট ফুটবলার। ব্রাজিলিয়ান ঘরানার ছাপ তাঁর খেলায়। ১৯৯৯-এর জাতীয় লিগে তিনি মোহনবাগানকে চ্যাম্পিয়ন করেছেন। ২০০০-এর লিগে অল্পের জন্য ব্যর্থ হলেও সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়া তাঁর আটকায়নি। ওমেলো এযাবৎকালের সেরা বিদেশী ডিফেণ্ডার। তাঁর খুব কাছাকাছিই থাকবেন ইস্টবেঙ্গলের বর্তমান রক্ষণস্তম্ভ জ্যাকসন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের কথা বহুবার বলেছেন, তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায়। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল প্রাচ্য ধর্মের সঙ্গে পাশ্চাত্য বস্তুবিজ্ঞানের সুষ্ঠু সমন্বয়। কিন্তু বলতে বলতে তিনি জীবনের বহু ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটির প্রয়োগের প্রসঙ্গ এনেছেন। ফুটবল খেলা স্বামীজী ভালবাসতেন। একবার তো বলেইছিলেন—গীতাপাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেললে তোমরা ঈশ্বরের কাছাকাছি পৌঁছাবে। সেটা অন্য প্রসঙ্গ। আমরা দেখছি, এখন ফুটবল খেলাকে অবলম্বন করে পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রাচ্যের একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠতেই পারে—যেমন স্বামীজী চেয়েছিলেন। ফুটবলকে অবলম্বন করে এদেশের খেলোয়াড় অন্য দেশে যায়, অন্য দেশের খেলোয়াড় এদেশে আসে, সুতরাং একটা সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানও আমাদের অজান্তেই ঘটে চলেছে। সেটা কাম্যও বটে। ❑

প্রেমেশ্বর?

স্বামী গোপেশানন্দ

এই জগতে প্রবৃত্তির জয় সর্বত্র। সংসার তো প্রবৃত্তির লীলাক্ষেত্র। ঠাকুর-স্বামীজী একে উলটে করতে চাইলেন ত্যাগের লীলাক্ষেত্র। চাইবেনই তো। নিবৃত্তিই যে তাঁদের প্রবৃত্তি! তাই তো বলি, প্রবৃত্তির জয় সর্বত্র।

এখানেই থামছি না। এ তো সবে আরম্ভ! গুলতানি চলতে থাকবে যতক্ষণ না সব গুলিয়ে যায়।

কথায় বলে, প্রবৃত্তি মানুষকে অধর্মে ও নিবৃত্তি মানুষকে ধর্মের দিকে নিয়ে যায়। ভাবটা হচ্ছে—যত দোষ প্রবৃত্তির আর নিবৃত্তি যেন ধোয়া তুলসীপাতা!

খিদে পেলে খেতে হয়—সদ্যোজাত শিশুও তা জানান দেয় বিনা শিক্ষাদীক্ষাতেই। এই প্রবৃত্তি কি মন্দগামী? খোকা কি পওহারী বাবার মতো অনাহারে বেঁচে থাকবে? কট্টর বৈজ্ঞানিক বলেন—আরে, হাওয়া খাওয়া মানে তো হাওয়ার সঙ্গে যে জল ও অঙ্গার আছে তাও খাওয়া। সুতরাং খাওয়ার আর বাকি থাকল কি? এ তো দেখছি বৈজ্ঞানিক উপায়ে খাওয়ার শ্রেষ্ঠ পন্থা। এইভাবে খেয়ে এইসব বৈজ্ঞানিক এখন বেঁচে থাকলে হয়!

জন্তুর মতো 'সিজন্যাল জীব' মানুষ নয়; খিদে না পেলেও মানুষ খায়, অনুরোধে ঢেঁকি গেলে, এমনকি ইচ্ছা না থাকলেও জপ করে। অর্থাৎ প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করাই মানুষের প্রবৃত্তি। এই অবস্থায় প্রবৃত্তি নিবৃত্তির কচকচানির থেকে নিবৃত্ত হয়ে ত্যাগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি—আপনারা অবধান করুন।

জানতে ইচ্ছা করে, যিনি ত্যাগ করেন তিনি কি শুধুই বঞ্চিত হন? ত্যাগ করে কিছু লাভ না হলে ত্যাগ করতে যাব কেন? আবার লাভের আশায় ত্যাগ করলে সেই ত্যাগ কি যথার্থ 'ত্যাগ'-পদবাচ্য? ত্যাগ ও বর্জন কি সমার্থক? কোন্ শব্দে কোন্ অর্থ বুঝব তা আগে নিজেদের মধ্যে ঠিক করে না নিলে পণ্ডশ্রম হবে। আমাদের কাছে ত্যাগের মহত্ত্ব ও মর্যাদা অসীম। ত্যাগ আমাদের ভালবাসা ও আদরের বস্তু। ধরুন, আপনি রামকে ভালবাসেন, ভালবাসেন বলেই এই দুর্মূল্য বাজারেও বহু কষ্টোপার্জিত অর্থব্যয়ে রামকে আম খাওয়ালেন। এতে রামেরও আনন্দ, আপনারও আনন্দ। এতে পরমানন্দ লাভ না হলেও ভোজনানন্দ তো হলো! যেমন ত্যাগ তেমন লাভ। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"। অবশ্য রামের যদি আমধারণের ক্ষমতা থাকে, ভোজনানন্দ তখনি হয়। অর্থাৎ যথার্থ ত্যাগ যথাস্থানে হওয়া চাই। মুক্তার হার বাঁদরের গলায় ত্যাগ করা যায় না। আবার ধরুন, রাম আপনার হাড়জ্বালানী জীবনসঙ্গী। 'পরিত্রাণায় স্ত্রীণাম্' ডিভোর্স যখন জ্বলজ্বল করছে, তখন 'বিদায় দে মা' বলে রামকে বর্জন করলেই নিস্তার। বলতে চাইছি, বর্জন ঘৃণাপ্রসূত, ত্যাগ প্রেমপ্রসূত, চিরকল্যাণময়ী।

শ্রীশ্রীঠাকুরকে বিশেষভাবে কী মনে হয়েছিল নরেনের, যখন নরেন প্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করেন—এখন সেইখান থেকে আরম্ভ করি।

নির্বাক হয়ে নরেন্দ্রনাথ ভাবতে লাগলেন—"উন্মাদ হইলেও ঈশ্বরের জন্য এরূপ ত্যাগ জগতে বিরল ব্যক্তিই করিতে সক্ষম; উন্মাদ হইলেও এই ব্যক্তি মহাপবিত্র ও মহাত্যাগী।"

এই অল্প সময়ের পরিচয়ে নরেন কি করে ঠাকুরকে ঠিক ঠিক বুঝলেন ও এত বড় কথা বলে ফেললেন—এ এক মহা আশ্চর্য! আমরা জানি, ঠাকুর নরেনকে দেখেই চিনে ফেলেছিলেন। অথচ নরেনও যে ঠাকুরকে ধরে ফেলেছিলেন, সেবিষয়ে আমরা উদাসীন। নরেন কি করে ঠাকুরকে মহাত্যাগী বলে বুঝলেন সে-ব্যাখ্যা কোথায়? এর মধ্যে অবশ্য ঠাকুর নিজহস্তে নরেনকে মাখন, মিছরি ও যথেষ্ট পরিমাণে সন্দেশ খাইয়েছেন। এর জন্য নিশ্চয় নরেন ঠাকুরকে 'মহাত্যাগী' বলে আখ্যা দেননি। ত্যাগী না হলে ত্যাগীকে চেনা যায়?

প্রথম যখন নরেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে ঢোকেন, তখন নরেনের নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য ছিল না। ধনীর দুলাল হয়েও মাথার চুল ও শরীরের বেশভূষায় পরিপাট্য ছিল না। বাইরের কোন কিছুতেই যেন আঁট ছিল না, সবই আলগা, যেন অন্য রাজ্যের মানুষ! বিশাল বিশাল চোখদুটিকে কে যেন মনের অনেকটা ভিতরের দিকে ডিমে তা দেওয়া পাখির মতো টেনে রেখেছিল। এসব কি ত্যাগীর লক্ষণ?

নরেন্দ্রনাথ যখন বিবেকানন্দ, তখন বলছেন—"ঠাকুর ত্যাগের বাদশা", "ত্যাগীশ্বর"। অথচ ঠাকুর কী কী ত্যাগ করেছেন তার ফর্দ তো ছাপা অক্ষরে কোথাও এখনো দেখলাম না! শেষে কি বাঁশবনে শিয়াল কানা হলাম!

সেই ফর্দ তৈরির চেষ্টার্থে এই লেখা। শ্রীশ্রীঠাকুর কী কী ত্যাগ করেছেন, আধার বুঝে কাকে কী দিয়ে গেছেন—এসব আঁতিপাতি খুঁজেও প্রমাণপত্র-সহ ত্যাগের তালিকা আজও তৈরি হলো না। দাতার ডোনেশনের রসিদ কোথায়? শ্রুতি বলছে, উনি সব বেনামীতে অর্থাৎ মা সব করছেন বলে বালকবৎ কালাতিপাত করেছিলেন। আমাদের এই পরম প্রিয় 'অহং'-কে উনি সর্বতোভাবে ত্যাগ করেছিলেন। যেখানে 'নাহং'-কে 'অহং' করা বৈ পৃথিবীতে আর কাজ নেই। সেই 'অহং' থেকে মুক্ত হওয়া কত কঠিন তা আমরা ভাবতেই পারি না, পণ্ডিতেরা বোধহয় আরো পারেন না। অষ্টপাস যে অষ্টপাশ।

যাদের স্থূলবুদ্ধি, তারা জানতে চায়—উত্তরাধিকারী সূত্রে ঠাকুরের যা যা ছিল তা কি উনি ত্যাগ করেছেন?

(এরপর ৫৪৮ পৃষ্ঠায়)

মহাভারতের নীতিগল্প
(শান্তিপর্ব)

[১]
নির্বোধ উট

সত্যযুগে এক জাতিস্মর উট অরণ্যমধ্যে কঠোর নিয়মধারণ পূর্বক তপস্যা করিত। অনন্তর সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাহার তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিলেন। তখন উষ্ট্র কহিল ঃ "ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার এই গ্রীবা (গলদেশ) শত যোজন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হউক।" ভগবান কমলযোনি উষ্ট্রের প্রার্থনা শ্রবণে "তথাস্তু" বলিয়া স্বীকার করিলেন। উষ্ট্রও প্রার্থিত বরলাভ করিয়া অরণ্যে প্রস্থানপূর্বক নিশ্চিন্তচিত্ত হইয়া আলস্যে কালক্ষেপ করিতে লাগিল। বরলাভের দিন হইতে একদিনও তাহার আহারের নিমিত্ত অন্য স্থানে গমন করিতে বাসনা হয় নাই।

একদা সেই উষ্ট্র নিশ্চিন্তচিত্তে শতযোজন বিস্তৃত গ্রীবা প্রসারণপূর্বক বিচরণ করিতেছে, এমন সময়ে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইল। তখন ঐ নির্বোধ পশু স্বীয় মস্তক ও গ্রীবা গিরিগুহায় সংস্থাপিত করিয়া রহিল। অনন্তর মেঘ হইতে অনবরত বারিধারা নিপতিত হওয়াতে সমুদায় জগৎ জলে প্লাবিত হইয়া গেল। ঐসময় এক মাংসজীবী শৃগাল শীতার্ত, ক্ষুধার্ত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পত্নীর সহিত সেই গুহামধ্যে প্রবেশপূর্বক উষ্ট্রকে দেখিতে পাইয়া তাহার গ্রীবা ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন নির্বোধ উষ্ট্র আপনার সেই দুর্দশা দর্শনে যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া একবার ঊর্ধ্বে ও পুনরায় অধোভাগে গ্রীবা নিক্ষেপ করিয়া উহা সঙ্কুচিত করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু কোনমতেই কৃতকার্য হইতে পারিল না। শৃগাল ও শৃগালী স্বচ্ছন্দে তাহার মাংস ভক্ষণপূর্বক প্রাণসংহার করিয়া বর্ষাবসানে গুহা হইতে প্রস্থান করিল। দুর্বুদ্ধি উষ্ট্র এইরূপে আলস্যপরায়ণ হইয়া নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

নীতিকথা ঃ আলস্য মানুষের শরীরের মহাশত্রু।

[২]
পুনরায় কুকুর হও

পূর্বকালে কোন জনশূন্য নিবিড় অরণ্য মধ্যে এক ফলমূলাহারী জিতেন্দ্রিয় তপোধন বাস করিতেন। ঐ মহর্ষি তপোনিরত, শান্তস্বভাব, স্বাধ্যায় (অধ্যয়ন)-সম্পন্ন ও উপবাসপরায়ণ ছিলেন। বনচারী জন্তুসমুদয় সেই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন মহাত্মার সদ্ভাবদর্শনে বিশ্বস্তচিত্তে নিয়ত তাঁহার সন্নিধানে সমুপস্থিত থাকিত। ক্রূর ব্যাঘ্র, মদমত্ত হস্তী, দ্বীপী (চিতাবাঘ), গণ্ডার, ভল্লুক ও অন্যান্য শোণিতলোলুপ ভীমদর্শন শ্বাপদকুল তাঁহার শিষ্যের ন্যায় দাসভূত ও প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া প্রত্যহ তাঁহার নিকট আগমনপূর্বক কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিত।

ঐ আশ্রমে একটি গ্রাম্য কুকুর বাস করিত। ঐ কুকুর ফলমূলাহারী, উপবাসনিরত, দুর্বল ও শান্তস্বভাব ছিল। সে কদাপি মহর্ষিকে পরিত্যাগপূর্বক অন্যত্র গমন করিত না। সতত ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতঃ তাঁহার পাদমূলে উপবিষ্ট থাকিত। তপোধন তাহার ভক্তি দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া মনুষ্যের ন্যায় তাহার প্রতি স্নেহ করিতেন। একদা এক মহাবল পরাক্রান্ত শোণিতলোলুপ স্বার্থপরায়ণ ব্যাঘ্র ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া আহারলাভার্থ সৃক্কণীলেহন, পুচ্ছ আস্ফালন ও মুখব্যাদানপূর্বক সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় আশ্রমাভিমুখে আগমন করিল। তখন সেই কুকুর ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রকে সমাগত দেখিয়া প্রাণরক্ষার্থে তপোধনকে কহিল ঃ "ভগবন্! ঐ দেখুন কুকুরদিগের পরম শত্রু দ্বীপী আমাকে বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছে; আপনি সর্বজ্ঞ, এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া আমাকে অভয় প্রদান করুন।"

তখন সর্বজীবের ভাবজ্ঞ মহর্ষি কুকুরের ভয়ের কারণ অবগত হইয়া তাহাকে কহিলেন ঃ "বৎস! ক্ষুদ্র ব্যাঘ হইতে আর তোমার মৃত্যুভয় থাকিবে না। অতঃপর তুমি স্বীয় রূপ পরিত্যাগপূর্বক দ্বীপীর আকার প্রাপ্ত হও।" মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র সারমেয় ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের আকার ধারণপূর্বক সুবর্ণ সদৃশ সমুজ্জ্বল অঙ্গপ্রভায় সুশোভিত হইয়া অকুতোভয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। তখন সেই ক্ষুধাতুর দ্বীপী সম্মুখে আপনার অনুরূপ পশু সন্দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে এক শোণিতলোলুপ ভয়ঙ্কর শার্দূল ক্ষুধার্ত হইয়া জিহ্বা লেহন ও মুখ ব্যাদানপূর্বক সেই ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের অভিমুখে আগমন করিতে লাগিল। মহর্ষির প্রধান স্নেহভাজন দ্বীপী তদ্দর্শনে ভীত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ তপোধনের শরণাপন্ন হইল। তপোধনও তাহাকে ভীত

দেখিয়া তপঃপ্রভাবে অচিরাৎ ভীষণ শার্দুলত্ব প্রদান করিলেন। তখন সেই সমাগত ব্যাঘ্র দ্বীপীকে শার্দুলের ন্যায় অবলোকন করিয়া আগত ব্যাঘ্র তাহার বিনাশবাসনা পরিত্যাগ করিল। এইরূপে সেই সারমেয় মহর্ষির প্রভাবে শার্দুলত্ব লাভ করিলে পর তাহার ফলমূল ভক্ষণের অভিলাষ এককালে তিরোহিত হইয়া গেল। তদবধি সে মৃগরাজ সিংহের ন্যায় জন্তুসমুদয় ভক্ষণ করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল।

একদা ঐ ব্যাঘ্র মৃগবধ করিয়া তাহাদিগের শোণিত মাংসে আপনার তৃপ্তিসাধনপূর্বক পর্ণকুটীর সমীপে শয়ন করিয়া আছে, এমন সময় বিশাল বিষাণ (দাঁত)-সম্পন্ন অতি প্রকাণ্ড মেঘাকার মত্ত হাতি তথায় আগমন করিল। ব্যাঘ্র সেই বলগর্বিত মদস্রাবী কুঞ্জরকে সমাগত দেখিয়া ভীতচিত্তে মহর্ষির শরণাপন্ন হইল। মহর্ষি তদ্দর্শনে স্নেহপরবশ হইয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ কুঞ্জরত্ব প্রদান করিলেন। আগন্তুক গজ উহাকে মহামেঘের ন্যায় অবলোকন করিয়া ভীতচিত্তে তথা হইতে অপসৃত হইল। এইরূপে ব্যাঘ্র ঋষির প্রভাবে কুঞ্জরত্ব লাভ করিয়া পরম প্রীতি সহকারে শল্লকীবন ও পদ্মবনে পর্যটন করতঃ বহুকাল অতিক্রম করিল।

অনন্তর একদা করিকুল-কালান্তক গিরিকন্দরসম্ভূত কেশররাজি বিরাজিত এক ভীষণ কেশরী সেই গজের সমীপে সমুপস্থিত হইল। হস্তী সিংহকে উপস্থিত দেখিয়া ভীতমনে কম্পিত কলেবরে মহর্ষির নিকট গমন করিল। মহর্ষিও তৎক্ষণাৎ তাহাকে সিংহত্ব প্রদান করিলেন। তখন সে সেই আগন্তুক বন্য সিংহকে তুল্য জাতি বলিয়া লক্ষ্যই করিল না। আগন্তুক সিংহ তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া যাহার পর নাই ভীত হইল। এইরূপে সেই কুঞ্জর মহর্ষির অনুকম্পায় সিংহত্ব লাভপূর্বক সিংহভয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া আশ্রমমধ্যে বাস করিতে লাগিল। অন্যান্য ক্ষুদ্র পশুসকল উহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া জীবনরক্ষার্থে তপোবন হইতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে একদা এক সর্বপ্রাণিবিনাশক মহাবল পরাক্রান্ত শোণিতলোলুপ অষ্টপাদ উর্ধ্বনেত্র বন্য শরভ (পৌরাণিক জন্তুবিশেষ) ঐ সিংহকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত মহর্ষির আশ্রমে সমুপস্থিত হইল। মহর্ষি আপনার সিংহকে শরভের ভয়ে ভীত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ শরভত্ব প্রদান করিলেন। তখন সেই আগন্তুক শরভ মহর্ষির শরভকে অতি ভীষণ ও মহাবল পরাক্রান্ত দেখিয়া ভীত মনে দ্রুতবেগে তপোবন হইতে পলায়ন করিল। এইরূপে সেই কুকুর মহর্ষির অনুকম্পায় শরভত্ব লাভ করিয়া পরম সুখে তাঁহার সন্নিধানে অবস্থান করিতে লাগিল। অন্যান্য মৃগগণ তাহার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া জীবনরক্ষার্থ তপোবন হইতে চতুর্দিকে পলায়ন করিল। ঐসময় সেই শরভের বন্য ফলমূল ভক্ষণে কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না। সে শতত প্রাণিগণের প্রাণসংহার করিয়াই জীবিকা নির্বাহ করিত।

অনন্তর একদা সেই দুর্দান্ত শরভ বলবতী শোণিত তৃষ্ণায় একান্ত অভিভূত হইয়া আপনার পরম হিতৈষী মহর্ষিকে সংহার করিবার অভিলাষ করিল। তখন মহাত্মা তপোধন তপোলব্ধ জ্ঞানচক্ষু প্রভাবে সেই অকৃতজ্ঞের দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া উহাকে কহিলেন ঃ "অরে পামর! তুই অগ্রে কুক্কুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলি, পরে আমার অনুকম্পায় ক্রমে ক্রমে তোর দ্বীপীত্ব, ব্যাঘ্রত্ব, কুঞ্জরত্ব, সিংহত্ব ও পরিশেষে শরভত্ব পর্যন্ত লাভ হইয়াছে। আমিই স্নেহপরবশ হইয়া তোকে ক্রমশ উন্নত করিয়াছি। এক্ষণে তুই আমাকেই নিরপরাধে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিস, অতএব তুই অবিলম্বে পুনরায় স্বীয় পূর্বতন কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হ।" মহাত্মা মহর্ষি এইরূপে শাপ প্রদান করিলে সেই মুনিজনদ্বেষ্টা দুষ্টপ্রকৃতি শরভ অচিরে পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইল।

এইরূপে সেই সারমেয় পুনর্বার স্বীয় পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইল। তখন তপোধন তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিয়া তপোবন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

নীতিকথা ঃ নীচকে প্রশ্রয় প্রদান করা কদাপি বিধেয় নহে। ❑

সঙ্কলক ঃ সঞ্জয় মাইতি

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ১

পাশাপাশি ঃ (১) বিবেকানন্দ, (৩) বিশ্বনাথ, (৫) সেবা, (৭) পিক, (৮) রেল, (৯) নচিকেতা, (১০) নরেন, (১৩) উত্তম, (১৪) হরিদাস, (১৫) দ্বীপ, (১৬) হেল, (১৭) নয়, (২০) বীরেশ্বর, (২১) সারদানন্দ।

ওপর-নিচ ঃ (১) বিবিদিষানন্দ, (২) নর, (৩) বিলে (৪) সুরেন, (৬) বানর, (৭) পিতা, (১১) রামকৃষ্ণানন্দ, (১২) পেসন, (১৩) উপর, (১৪) হল, (১৮) শির, (১৯) চার।

শ্রীরামকৃষ্ণের রেখে যাওয়া ছাঁচ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

"Pride, the never-failing vice of fools."
Alexander Pope

ঠাকুর বলছেন—টাকায় কি হয়? নিজেই উত্তর দিচ্ছেন—বাড়ি হয়, জামা-কাপড় হয়, ভোগের নানা উপকরণ এসে যায়। টাকা আরো টাকা, ভোগ আরো ভোগ। এরপরে তিনি একটি ফাঁক রেখেছিলেন। আমরা এসে সেই ফাঁকটি ভরে নেব বলে। সেটি কি? মৃত্যু। টাকা মানেই মৃত্যু। গোল গোল টাকাকে বলা হয় শয়তানের চাকা।

ধনী মানুষ প্রতিদিনের মতো পথে নামলেন কর্মস্থলে যাবেন বলে। যেতে পারলেন না। মাঝপথ থেকেই তাঁকে লোপাট করে দেওয়া হলো। এইবার চলবে টাকার টানাপোড়েন। এখন আর লাখের অঙ্কে কেউ কথা বলে না। সব কোটিতে উঠে গেছে! অপহৃত মানুষটি তাঁর আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরে আসবেন তাঁর জীবনের সমস্ত সঞ্চয় অপহরণকারীদের হাতে তুলে দিয়ে। তাহলে টাকায় কি হয়? পথের ভিখিরি হয়। এটি একালের সত্য। একালের দর্শন।

ঠাকুর পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে হাত রেখে বলবেন—কি বুঝছ? অনেক আগেই আমি সতর্ক করেছিলাম। ততটুকু অর্থেরই প্রয়োজন, যতটুকু সুস্থ-সুন্দর জীবনযাপনের উপায় করে দিতে পারে। আমি যেমন দরিদ্র হতে বলিনি, সেইরকম বিরাট ধনী হতেও বলিনি। অর্থ অনর্থের মূল—কথাটা তোমাদের শোনা আছে, কিন্তু তোমাদের লোভ, তোমাদের আকাঙ্ক্ষা 'টাকা টাকা' করেই তোমাদের জীবনটাকে নষ্ট করে দেয়।

একালে আমরা প্রতিদিন যেসব ঘটনা শুনি, তাতে আমাদের চোখ খুলে গেছে। ঠাকুরের উপদেশ এখন শুধু উপদেশ নয়—আমাদের রক্ষার মন্ত্র। যদিও একালের শিক্ষা একালের মতো আমাদের এইটাই বলতে চাইবে—জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ধনকুবের হওয়া। বিপদের সম্ভাবনা থাকবে ঠিকই, তবে টাকার একটা অন্যরকমের স্বাদ আছে। অন্যরকমের একটা নেশা। একটা নলের মধ্যে একটা ব্যাঙকে ঢুকিয়ে দিলে সে যেমন থপ্‌থপ্ করে এগিয়েই চলবে সেইরকম টাকার টানেলে একালের শিক্ষায় যত মানুষ সব ঐ ব্যাঙের মতো এগোচ্ছে আর এগোচ্ছে। কিন্তু সাপও আছে। প্রতিটি খাঁজে খাঁজে মুখ ঝুলিয়ে বসে আছে। শুধু একটি শব্দ—খপ্। কোটিপতি গায়েব।

আধুনিকরা প্রশ্ন করেন, ঠাকুর-মা-স্বামীজীর শিক্ষায় আমাদের কি হবে? কি লাভ? অসামাজিক কার্যকলাপ, দুরন্ত দুর্দান্ত পশুধর্মী মানুষের অত্যাচারে শিক্ষাদীক্ষা, জনজীবন সবই যেতে বসেছে। প্রশ্ন হলো—ঠিক আছে, লাভ কিছু নেই, তাহলে আমরা সব উপেক্ষা করে হাঁ করে বসে থাকি বারান্দায়, ছাতের আলসেতে আর বলতে থাকি—কোন লাভ নেই, কোন লাভ নেই। আর থেকে থেকে চা খাই, ঘুমের ওষুধ আরেকটা। আর সর্বনাশের টাইটেল মিউজিক তৈরি করি—'গেল গেল সব গেল'! আর এক-বড়ি ঘুমের ওষুধ খেয়ে কোনরকমে রাতটা কাটিয়ে অবক্ষয়ের ব্যারোমিটারে মাপতে থাকি শেষ হতে আর কত দেরি? সেই যেমন মহাভারতে বকরাক্ষসের গল্প ছিল—প্রতিদিন কোন না কোন পরিবার থেকে একটি করে সুপুষ্ট মানুষ ও তৎসহ বহু খাদ্যসম্ভার সেই রাক্ষসের লাঞ্চের জন্য পাঠাতে হবে। সেই মানুষটিকেই বহন করে নিয়ে যেতে হবে ঐ খাদ্যসম্ভার। রাক্ষসের দুনিয়ায় এইটাই ছিল নিয়ম। বকরাক্ষস বসে বসে সব মিলিয়ে নেবে—মেনুটি ঠিকমতো হয়েছে কিনা। ঘণ্টাখানেক পরে দেখা যাবে সব সাফ। তিনি শুয়ে আছেন ভুঁড়িটি ফুলিয়ে। আর তারই পরিবারের কেউ একজন তাকে বাতাস করছে।

মানুষ এত সহজ জীব নয়। নিয়তির কাছে কেউ কেউ আত্মসমর্পণের কথা ভাবলেও সব মানুষ ভেড়া হতে রাজি নয়। মানুষের এই চেতনার বলয়েই ঠাকুর, মা আর স্বামীজীর রাজত্ব। ঠাকুরেরও একটি সাম্রাজ্য আছে। জমি, রাজার জমিদারী আজ থাকে তো কাল থাকে না। তার এলাকা ফিতে দিয়ে মাপা যায়। মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে যে জমি, তার কোন অন্ত নেই। সেই জমির, সেই হৃদয়-রাজত্বের রাজা শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর ব্যাখ্যায় মৃত্যু একটা অন্য মাত্রা পেয়েছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণের মতো বলছেন না—মৃত্যুকে ভয় পেও না, মৃত্যু বলে কিছু নেই। ঠাকুর এটিকেই একটু উলটে দিলেন। বললেন—রোজ তুমি মৃত্যুর কথা ভাব। তাহলে তোমার আসক্তি কেটে যাবে। মৃত্যুর কথা ভাবলে তোমার ক্ষুদ্র 'আমি'র সবজান্তা অহঙ্কারটা চলে যাবে। তখন তুমি অতি সুন্দর, ঝরঝরে, ভয়মুক্ত একটি জীবনের অধিকারী হবে।

একালে ঠাকুরের আরেকটি কথার সত্যতা প্রতিদিনই আমরা যাচাই করে নিতে পারছি। সেটি হলো—সিকিউরিটি, ইন-সিকিউরিটি। ব্ল্যাক ক্যাট, জেড ক্যাটাগরি কোনকিছুই কিছু নয়। এত বড় একটা দেশে মারব মনে করলে মেরে দিতে কয়েক মিনিট সময় লাগবে মাত্র। ঠাকুর বলেছিলেন—মানুষ নয়, একমাত্র ভগবানই তোমার বন্ধু। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন হবে—এ কি সেকেলে কথা! ভগবানের নাম করলেই আমি বিপন্মুক্ত হয়ে যাব? আমার

কোন ভয় থাকবে না? ঠাকুরের এই কথাটির মধ্যে গূঢ় একটি সত্য আছে। সেটি হলো—ঈশ্বরকে যদি কেউ একমাত্র বন্ধু, রক্ষাকর্তা ভাবে তাহলে তার কর্ম এবং চরিত্র এমন হবে যে, পৃথিবীতে তার শত্রু বলে কেউ থাকবে না—এমন কথাও বলা যাচ্ছে না। তাহলে? তাহলে এমন মানুষ এমন কোন কাজে জড়িত হবে না যার মধ্যে নীচ বিষয় আছে। এমন কোন কাজে জড়িত হবে না, যেখানে নীচ শত্রুরা তার জীবনসংশয় করে তুলতে পারে। এখানেও একটি কথা আছে—ঈশ্বরকে যে বন্ধু করেছে, তাকেও তো শহীদ হতে হয়। আমরা তো খ্রীস্টকে ছেড়ে দিইনি, মহাপ্রভু তো নিরাপদ ছিলেন না, বুদ্ধদেবও তো নিষ্কৃতি পাননি। সন্দেহবাদীদের আমরা তাহলে কী বলব? শ্রীকৃষ্ণকে তো একটি ব্যাধ মেরে ফেলল। এর উত্তর একটাই—সাধারণ মানুষের মৃত্যুর মধ্যে সন্তুষ্টি নেই। সাধারণ মৃত্যুর মধ্যে আনন্দ নেই, তৃপ্তি নেই, আছে কেবল বিভীষিকাময় দুঃখ। কিন্তু ঈশ্বরনির্ভর মানুষের মৃত্যু বড় আনন্দের।

শ্রীরামকৃষ্ণই বা বাকি থাকেন কেন? সর্বক্ষণ যিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্যে থাকতেন, তাঁকে এত যন্ত্রণা পেতে হলো কেন? কারণ একটাই—তিনি যেমন আমাদের ঈশ্বর দিয়েছেন, সেইরকম মৃত্যুটাও দিয়ে গেলেন। ঈশ্বর-সমন্বিত একটি অপূর্ব জীবনের জীবনলীলা তিনি যখন শেষ করলেন, তার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সঙ্গে জড়িত স্বাভাবিক যে যন্ত্রণা—যাকে বলা হয় 'সাফারিং', সেটাকে তিনি সরিয়ে রাখতে চাইলেন না। তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন হয়ে যেত একপেশে। যদি এইভাবে বলি—শ্রীকৃষ্ণকে ব্যাধ মেরে ফেলেছিলেন। ক্রাইস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। তাতে বাইবেল কি ক্রুশবিদ্ধ হলো, না গীতা তীরবিদ্ধ হলো। শ্রীরামকৃষ্ণ কতটা অদ্ভুত তা বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে তাঁর কোন 'গীতা' নেই, তাঁর কোন 'বাইবেল' নেই। তাঁর জীবন আছে। একমাত্র তিনিই বলতে পারেন—আমার জীবনই বাণী। এখানেও একটি বড় প্রশ্ন আছে। সেটি হলো—'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ' ইত্যাদি গ্রন্থ। উত্তর—এর কোনটিই তাঁর জীবৎকালে রচিত হয়নি। যাঁরা পান করেছিলেন তাঁরাই মাতাল হয়ে লিখেছিলেন। মদ কোনদিন হেঁকে ডেকে বলে না মদ খেলে কি হয়। একজন খায়, আরেকজন দেখে বোঝে মদ খেলে কী হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবচন্দ্রকে তিরস্কারই করেছিলেন বলা চলে—তুমি কাগজে আমার সম্বন্ধে কী লিখেছ? কে তোমাকে লিখতে বলেছে? তুমি যদি এইসব লেখটেখ, তাহলে তুমি বাপু আমার কাছে আর এসো না। ঠাকুরের জনৈক ভক্ত, যিনি পরে সন্ন্যাসী হলেন, তিনি ঠাকুরের কথা নোট করতেন। ঠাকুর একদিন জিজ্ঞেস করলেন—কি করছিস? তারপর বললেন—ওসবের কোন প্রয়োজন নেই। তিনি যা লিখেছিলেন সব বিসর্জন দিয়ে এলেন গঙ্গার জলে। মাস্টারমশাই কখনো তাঁর সামনে বসে খাতা-পেন্সিল বের করে কিছু লেখার চেষ্টা করতেন না। তিনি বাড়ি গিয়ে ডায়েরিতে লিখতেন তাঁর প্রখর স্মৃতির সাহায্যে। ঠাকুরের মহাপ্রয়াণের পর তাঁর ঐ নোট্‌স হয়েছিল তাঁর ধ্যানের বিষয়। তিনি ধ্যান করতেন, এক-একটি ঘটনা তাঁর চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে উঠত। অতীত ভারতে ঋষিকুলে যে-পদ্ধতিটি অনুসৃত হতো সেটি হলো—ঋষিদের জীবন ছিল উজ্জ্বল বেদান্ত, তাঁদের জীবনই ছিল উপনিষদ্। শিষ্যরা প্রতি মুহূর্তে সেই জীবনবেদের সান্নিধ্যে থেকে ধীরে ধীরে তৈরি হয়ে উঠতেন। নোট্‌স নিয়ে, তর্ক করে, ক্যাসেট শুনে, মাথায় হেডফোন লাগিয়ে সে-জীবন তৈরি হতো না। ঠাকুরও এই পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। আমাকে দেখ, আমার সঙ্গে থাক—হওয়ার চেষ্টা কর। স্বামীজীকে দিয়ে পরবর্তী কালে গুছিয়ে বলালেন—ধর্ম মানে 'হওয়া'। ঐ 'সেমিনার' করে হওয়া যায় না, যে-হওয়াটা বেদান্তের অভিপ্রেত। একটি কথা, সারকথা তিনি বলে গেছেন—পবিত্র হতে হবে, পবিত্রতাই ধর্ম। স্বামীজী বললেন—বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসটা কেমন? ঈশ্বর আছেন, আমি আছি—এইরকম? না, স্বামীজী যে-বিশ্বাসের কথা বলছেন, সেই বিশ্বাসের উৎস আকাশ নয়—সেই বিশ্বাসের উৎস হলো এই পৃথিবী। আর সেই পৃথিবীর মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষ। স্বামীজী বলছেন—নিজের ওপর বিশ্বাস। যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সে-ই পাপী। স্বামী প্রেমানন্দ ভারি সুন্দর একটি কথা বললেন—'তিনি আমাদের জন্যে একটি ছাঁচ রেখে গেছেন। এখন আমাদের মনের কাদা চটকাতে হবে, সেই ছাঁচে ঢালতে হবে। তখন একটি সুন্দর মূর্তি আবির্ভূত হবে। ঠাকুর সমস্ত জগতের জন্য এসেছিলেন।'

ঠাকুর যে-জিনিসটিকে অত্যন্ত অপছন্দ করতেন, সেটি হলো অহঙ্কার। স্বামী প্রেমানন্দ বলছেন, ঠাকুর তাঁকে একদিন বলেছিলেন এবং প্রায়ই বলতেন: "আমি অহঙ্কার ছাড়া আর সবকিছু সহ্য করতে পারি।" প্রেমানন্দজী বলছেন, সেইজন্য তিনি যখন কারো সঙ্গে দেখা করতে চাইতেন, আগে হৃদয়কে পাঠাতেন দেখে আসতে তার অহঙ্কার আছে কিনা।

ধর্ম পণ্ডিতদের হাতে পড়ে আমাদের জীবন থেকে ছিটকে গেল। হয়ে গেল তর্ক, টীকাটিপ্পনী। পণ্ডিতকুল এক জায়গায় সমবেত হয়ে নিজেদের অহঙ্কার প্রকাশ করবেন। ঈশ্বর-টিশ্বর পরে দেখা যাবে। আগে সিদ্ধান্ত হোক—আমি ঠিক, না তুমি ঠিক! পাত্রাধার তৈল, না তৈলাধার পাত্র! সেই শ্রুতি-স্মৃতি-বেদ-বেদান্ত একালে এসে ইনটেলেক-চুয়ালদের হরেক রকমের ভয়ঙ্কর কচকচিতে সাধারণ মানুষের

নাগালের বাইরে চলে গেল। ধর্ম এখন গভীর গোলমেলে ব্যাপার! আর ধার্মিক মানে ভুরু কোঁচকানো দুঃসহ এক মানুষ। তিনি জনজীবনের বাইরে অতি মূল্যবান এক উপস্থিতি। ঈশ্বরকে বুঝতে হলে আগে তাঁকে বুঝতে হবে। এঁদের পাশাপাশি নৈরাজ্যবাদীরা আসবেনই। তার কারণ, জ্ঞানীর ধর্ম বোঝার মতো জ্ঞান আমার হলো না। আমি চিরকাল পুরোহিতের ধর্মটাই দেখে এলাম! সত্যনারায়ণে ফ্ল্যাট হয়, মা ষষ্ঠীতে সন্তান হয়, আর শিবের আরাধনায় মামলা জেতা যায়। তাহলে সমস্যাটি কী দাঁড়াল? ঠাকুর খবর নিতেন—লোকটির অহঙ্কার আছে কিনা। যদি থাকে আমি তার ত্রিসীমানায় নেই। তাদের কাছে ঠাকুর নেই। ফলে তাদের সম্বল তারাই। আরেকদল যারা সরল বিশ্বাসী তাদের অবস্থা—যেদিকে হাওয়া সেইদিকে পাল তোল। ঠাকুর সেই কারণে বলতেনঃ "জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।" পেতে হবে, মামার বাড়ির গল্প শুনলে হবে না। মামাকে পেতে হবে। স্বামীজী একদিন ঠাকুরকে প্রশ্ন করেছিলেন—আপনার কত স্নেহ, কত কৃপা পাচ্ছি কিন্তু কি লাভ হলো কিছুই বুঝতে পারছি না। ঠাকুর উত্তর দিয়েছিলেন—কিছুকাল যাক, ধীরে আস্তে সময়ে বুঝবি কি লাভ হলো। নরেন্দ্রনাথ কম যান না। তিনি বললেন—সময়ে বুঝব? আমি যদি কাল মরে যাই? ঠাকুর বললেন—যা, তোর কাল থেকেই হবে। ঠাকুর তো আমাদের কাছে নেই যে, আমার সন্দেহের সমাধান মুহূর্তে করে দেবেন! তাঁর তো সেই শক্তি ছিল। তবে ঠাকুর ব্যবস্থা করে রেখে গেছেন। তিনি স্বামীজীকে আমাদের সংশয়ের মাঝে দাঁড় করিয়ে দিয়ে গেছেন। স্বামীজী বলছেন—ঠাকুর হলেন প্রবল ইচ্ছাশক্তির নাম। একটি উদ্দীপনার নাম। তুমি শুধু বল—আমার আছে, সব আছে। আমার ইচ্ছা তীব্র ইচ্ছা—তার নামই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ।

তিনি কী দিলেন? আমার 'কাঁচা আমি'টাকে পিটিয়ে 'পাকা আমি' করে আমাকেই দিয়ে গেলেন। নাও, এইবার পৃথিবীটা দেখ। গুড়ও আছে পিঁপড়েও আছে, আমও আছে মাছিও আছে। থাকবে। ও নিয়ে মাথা খারাপ করার কোন কারণ নেই। জগৎটাকে পালটাবার ক্ষমতা আমার নেই, নিজেকে পালটাবার ক্ষমতা আমার আছে।

জীবনের উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বরলাভ। ঈশ্বর হলেন শান্তি আর আনন্দ। বিরিয়ানিই খাই আর বিলেতেই যাই, শান্তি আর আনন্দ বিনা জীবন হলো জ্বালামুখী—

"I suffer and am oppressed in this world,
this world which is all right, full of twists
and turns, all tied up in knots and sealed
with seals, knots without number and
seals beyond measure." [The laments of the soul from The Book of Adam] ❑

(৫৪৩ পৃষ্ঠার পর)

কামারপুকুরের দায়িত্ব তো শ্রীশ্রীমাকে দিয়েছিলেন। নিজের প্রসাদী আমগাছের ছায়ায় এখন দিনেরবেলায় মন্দিরে, রাত্রে শোওয়ার ঘরে ভালই আছেন। দক্ষিণেশ্বরকে তো কামারপুকুর-জয়রামবাটীর হাটবাজার করে তুলেছিলেন। গর্ভধারিণী মাকে তো কাছেই রেখেছিলেন। আর পৈতৃক সম্পত্তি ত্যাগ করলে এমন কী ত্যাগ হতো! কীই বা ছিল! ত্যাগের ফর্দ বানাতে গিয়ে 'পেনি ওয়াইজ পাউন্ড ফুলিশ' হয়ে যাচ্ছি না তো?

আগে কিছু অর্জন করতে হবে, তারপর যথার্থ ত্যাগ সম্ভব। অথচ স্বামীজী ঠাকুরকে একেবারে "ত্যাগীশ্বর" বলে দিলেন। স্বামীজী তো একমাত্র সনাতন বেদকেই শাস্ত্ররূপে মানতেন। বেদের ব্যাখ্যা নানা জনে নানারকম করেন বলে উনি বলেছেনঃ "ঠাকুরের উক্তি আধুনিক সর্বাঙ্গসুন্দর বেদমতের ব্যাখ্যা। শ্রীরামকৃষ্ণরূপ অনুবীক্ষণের মধ্য দিয়া এই শাস্ত্রের মর্ম সংগ্রহ করিতে হইবে।"

যেমন ধরুন—গীতার ব্যাখ্যা কতকাল ধরে কতজনে কতরকম করে আসছেন। অথচ অল্পকথায় ঠাকুর বললেনঃ গীতার সার ত্যাগ। গীতা, গীতা দশবার বললে হয়ে যায় তাগী তাগী (ত্যাগী, ত্যাগী—প্রত্যয়-যোগে তাগী ও ত্যাগী একই অর্থ হয়।) আর স্বামীজী বললেন, প্রভুই হচ্ছেন স্বয়ং ত্যাগীশ্বর। স্বামীজীর কথায় মনে হচ্ছে ঠাকুর বেদ-বেদান্তকেও ছাড়িয়ে গেছেন।

বার বছর ধরে জীবনপণ করে একনাগাড়ে যেভাবে ঠাকুর তপস্যা করেছেন, সে-তপস্যা পৃথিবীর ইতিহাসে দ্বিতীয় কোন অবতার করেননি; আর তা করার দরকারও হবে না—তা আপনারা ভালভাবেই জানেন। সেই তপস্যায় যে পরমপ্রাপ্তি—"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ" (গীতা, ৬।২২)—যা মনুষ্যশরীরে ধারণ করা অসম্ভব, সেই ফল মায়ের সেবায়, মায় জপের মালা সুদ্ধ শ্রীশ্রীমায়ের চরণে ত্যাগীশ্বর ত্যাগ করলেন। কী আশ্চর্য। বললেন না—'আমি ফকির হয়ে গেলাম।' তাহলে এই মহাত্যাগে উনি কি কিছু পেয়েছিলেন? এইখানেই খটকা। প্রশ্নটাই ভুল। এত বড় ত্যাগের উৎস বা প্রেরণা হচ্ছে মহাপ্রেম। অর্থাৎ প্রেমের ফলই হচ্ছে ত্যাগ। তবুও যদি নাছোড়বান্দা মন জানতে চায়—ত্যাগের ফল কী? তাহলে ঘুরেফিরে বলতে হয়—ত্যাগের ফল প্রেম।

অবতারবরিষ্ঠ ত্যাগ ও প্রেমকে এক করে গেছেন। তার জন্যই তো স্বামীজীর জীবনপাত ত্যাগ ও সেবায়। এখন যদি স্বামীজীর ত্যাগীশ্বরকে 'প্রেমেশ্বর' বলা হয়, তাহলে নতুন কিছু বলা হলো না এবং গুলতানিটি সর্বতোভাবে বৃথাও গেল না। ❑

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

স্বামী বিবেকানন্দের গুয়াহাটী এবং শিলং ভ্রমণের শতবর্ষপূর্তি উৎসব

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর গর্ভধারিণী ভুবনেশ্বরী দেবীর ইচ্ছাপূরণের জন্য পূর্ববঙ্গের তীর্থস্থান চন্দ্রনাথ দর্শন করে ১৯০১ সালের এপ্রিল মাসে গুয়াহাটীর মহাতীর্থ কামাখ্যা দর্শনে আগমন করেন। মা কামাখ্যার মন্দিরে গিয়ে স্বামীজী কুমারীপূজাও করেছিলেন। এইসময় তিনি কামাখ্যা-মন্দিরের পাণ্ডা লক্ষ্মীকান্ত এবং শিবকান্ত শর্মার বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন। এঁদের বংশধর পঞ্চানন শর্মার বাড়ি বিবেকানন্দ-অনুরাগীদের এক পরম আকর্ষণীয় স্থান। সেখানে স্বামীজী যে-কক্ষে বাস করেছিলেন, যে-চৌকিতে (বর্তমানে ভগ্নপ্রায়) শয়ন করেছিলেন—সেসব দেখে অভিভূত হয়েছি।

ভক্তদের জ্ঞাতার্থে জানাই, একটি খাতাতে তৎকালীন এবং পরবর্তী কালের রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বহু সাধুর স্বাক্ষর রয়েছে। ঐ খাতাতেই ১৭ এপ্রিল ১৯০১ তারিখে স্বামীজী গৃহস্বামীদের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে একটি প্রশংসাপত্র লিখে দেন, সেটিও রয়েছে—স্বামীজী লিখেছিলেন ঃ "I have great pleasure in certifying the great amiability and helpfulness of the brothers Sivakanta and Lakshmikanta Panda of Sri Kamakhya Tirtham. They are men who help most and are satisfied with the least. I can unhesitatingly recomend them to the Hindu public visiting the most holy shrine." (অতি আনন্দের সঙ্গে আমি কামাখ্যা তীর্থের শিবকান্ত ও লক্ষ্মীকান্ত পাণ্ডা ভ্রাতৃদ্বয়ের নম্র স্বভাব এবং অন্যকে সাহায্য করার মানসিকতার প্রশংসা করছি। এঁরা এমনই মানুষ, যাঁরা সকলের প্রভূত সাহায্য করেন এবং অতি অল্পে সন্তুষ্ট থাকেন। আমি নির্দ্বিধায় এই অতি পবিত্র ধামের হিন্দুতীর্থযাত্রীদের কাছে এদের দুজনের নাম অনুমোদন করছি।) এই প্রশংসাপত্র অসমবাসীর গৌরব। তবে তা ভালভাবে সংরক্ষণ না করলে নষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা।

স্বামীজীর কামাখ্যাধামে আগমন উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতিকৃতি-সমন্বিত একটি প্রস্তরফলক গুয়াহাটী রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচেষ্টায় সম্প্রতি স্থাপিত হয়েছে। ১৯০০ সালের নভেম্বর মাসে একটি পাবলিক হল-এর শিলান্যাস হয়। অসমের প্রাক্তন চিফ কমিশনার জে. ডব্লিউ. কুইন্টনের নামানুসারে এর নামকরণ হয় 'কুইন্টন হল'। ১৯০১ সালের এপ্রিল মাসে স্বামীজী শিলঙে উপস্থিত ছিলেন। স্যার হেনরি কটনের বিশেষ আগ্রহে স্বামীজী ২৭ এপ্রিল ১৯০১ এই হল-এর উদ্বোধন করেন এবং বক্তৃতা দেন। এই ঐতিহাসিক হলটি ১৯৯৩ সালে শিলং রামকৃষ্ণ মিশনের হাতে আসে। হলটির বর্তমান নাম 'বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টার'। ২০০১ সালের ২৯ এপ্রিল শিলং রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের শিলং ভ্রমণের শতবর্ষপূর্তি উৎসব এই ঐতিহাসিক হল-এই পালন করেন।

Gowhati
17th April 1901

I have great pleasure in certifying the great amiability and helpfulness of the brothers Sivakanta and Lakkhikanta Panda of Sri Kamakhya Tirtham. They are men who help most and are satisfied with the least. I can unhesitatingly recommend them to the Hindu public visiting the most holy shrine.

Swami Vivekananda

কুইন্টন হল-এ স্বামীজীর বক্তৃতা প্রসঙ্গে বীরেন্দ্রকুমার মজুমদারের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়—"১৯০১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল কি মে মাস। শিলং-এ আছেন স্বামীজী। সেখানে একটি সভায় বক্তৃতা করছেন। তখন মাইকের প্রচলন হয়নি। সেদিন স্বামীজী ইংরেজীতে অসাধারণ বক্তৃতা করেছিলেন। তাঁর বক্তৃতা বুঝতে এবং শুনতে কারো এতটুকু অসুবিধা হয়নি। হল-এ পেট্রোম্যাক্সের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। বক্তৃতা চলাকালীন হঠাৎ আলো নিভে যায়। অন্ধকারে ভরে যায় সারা হল। পাশাপাশি পরস্পরকে দেখা যাচ্ছিল না। হঠাৎ দেখা গেল, ঐ গভীর অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠছে স্বামীজীর মূর্তি। স্পষ্ট দেখলাম—সবাই দেখল, যেখানে স্বামীজী দাঁড়িয়ে আছেন সেই অংশটি আলোয় আলোময়। এ কোন ইলিউশন (ভ্রম) নয়, সুস্পষ্ট দর্শন। শ্রোতারা সকলেই ঐ দিব্যদর্শন লাভ করে সেদিন ধন্য হয়েছিল। স্বামীজীর পাণ্ডিত্য ও কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে শ্রোতারা সকলেই মুগ্ধ হয়েছিল। বক্তৃতার পর সবাই বলাবলি করছিলেন—'স্বামীজী দিব্য অধিকারপ্রাপ্ত

বাগ্মী, আর জ্ঞানের সমুদ্র।' " ('উদ্বোধন', ১০৩তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮, পৃঃ ৩০৮)

স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান বাংলাদেশের চন্দ্রনাথ দর্শন করে কোন্ পথে গুয়াহাটী এসেছিলেন তার কোন প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে জলপথে আসাই স্বাভাবিক। কারণ, সেসময় অসমের সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের রেলপথে যোগাযোগ ছিল না। ধুবড়ি-নিবাসী অনিমা মুখার্জীর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, স্বামীজী প্রথমে ধুবড়িতে আসেন। সেসময় ধুবড়িতে বন্দর ছিল। 'রিভার স্টিমার নেভিগেশন' নামে একটি সংস্থা ছিল। লোকেরা তাতেই যাতায়াত করত।

তখনকার দিনে জলপথই যে একমাত্র পরিবহন ব্যবস্থা ছিল, তার আরো প্রমাণ পাওয়া যায় কটন কলেজ শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে অরূপ হাজারিকার রচিত 'কটন গৌৰব নে অসম গৌৰব' গ্রন্থ থেকে। স্বামীজীর গুয়াহাটী ভ্রমণের প্রায় সমকালেই কটন কলেজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন চলছিল। শ্রীহাজারিকা লিখেছেন : "কলেজের শুভারম্ভের দিন অর্থাৎ ১৯০১ সালের ২৭ মে কলেজের নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ ফ্রেডারিক ইউলিয়ম সুদমার্যন গৌহাটিতে নর্থব্রুক গেটে জাহাজ থেকে তীরে পদার্পণ করেন। সেসময় অসমের সঙ্গে বাইরের সংযোগ-পথ জাহাজই ছিল। রেলপথ সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি।"

সেসময় গোযানেই শিলং যাতায়াত করতে হতো। জনপ্রতি ৬ টাকা ভাড়া ছিল।

এসকল তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করা যায়, স্বামীজী জলপথেই গুয়াহাটী আগমন করেন।

ডাঃ বাণী ভট্টাচার্য
গুয়াহাটী, অসম

প্রসঙ্গ 'দিব্যস্মৃতি'

'উদ্বোধন'-এর গত জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ সংখ্যায় 'দিব্যস্মৃতি'তে বীরেন্দ্রকুমার মজুমদারের একটি স্মৃতিকণিকা স্থান পেয়েছে। পাদটীকায় তাঁর পরিচয় হিসাবে যা দেওয়া হয়েছে, তাতে আরো কিছু তথ্য সংযোগ করতে এই পত্রের অবতারণা।

বীরেন্দ্রকুমার মজুমদার ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য। (দ্রঃ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, অখণ্ড সং, ১৪০৭, উদ্বোধন কার্যালয়, পৃঃ ৯৭) তিনি শিলংস্থিত A. G. Office-এ সরকারি চাকরি করতেন। পরবর্তী কালে অবসরজীবন রাঁচি ও ভুবনেশ্বরে অতিবাহিত করেন।

ভবরঞ্জন ঘোষ
সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগনা

জিজ্ঞাসা : দানাকালীর মাতৃসন্দর্শন-সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণের দুই গৃহী ভক্ত গিরিশ ঘোষ ও কালীপদ ঘোষ ভক্তমণ্ডলে নবযুগের 'জগাই মাধাই' বলে খ্যাত। গিরিশ ঘোষ তাঁর 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' বিশ্বাসের জোরে ঠাকুরকে অবতার বলে চিনতে পেরেছিলেন এবং তাঁর কৃপালাভ করে নট ও নাট্যকার থেকে কবি তথা ভক্তজ্ঞানী গিরিশচন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। তাঁর বন্ধু দানাকালীও ঠাকুরের কৃপায় অদ্ভুতভাবে উচ্ছৃঙ্খল জীবন ত্যাগ করে নবজীবন লাভ করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র শ্রীমা সারদাদেবীরও কৃপা পেয়ে ধন্য হয়েছেন। আপন গৃহে তিনি মাতৃপূজাও করেছেন। কিন্তু কালীপদ ঘোষের সেরূপ মাতৃসান্নিধ্য লাভের কথা কোন গ্রন্থে আমি পাইনি। তিনি যখন বোম্বাইতে চাকুরীরত, তখন বিভিন্ন সময়ে স্বামীজী, ব্রহ্মানন্দজী, তুরীয়ানন্দজী, অভেদানন্দজী, অখণ্ডানন্দজী প্রমুখ তাঁর গৃহে পদার্পণ করেছেন, কিন্তু কালীপদ ঘোষের মাতৃকৃপালাভের কোন সংবাদ বা সংলাপ ভক্ত-পাঠকবৃন্দ পেয়েছেন কি? দানাকালীর স্ত্রী, যিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে তাঁর স্বামী সম্পর্কে নালিশ করেছিলেন, তাঁর নামই বা কি? কবে কার সঙ্গে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যান? গিরিশচন্দ্রের দ্বিতীয়া পত্নীর নাম ও জীবন সম্পর্কেও আলোকপাত করে কোন পাঠকবন্ধু 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমে আমার জ্ঞানতৃষ্ণা মিটিয়ে তৃপ্ত করলে উপকৃত ও বাধিত হব।

চিন্ময়ীপ্রসন্ন ঘোষ
কর্তিয়া, মেদিনীপুর

প্রসঙ্গ 'পৃথিবীর বয়স'

'উদ্বোধন'-এর গত মাঘ ১৪০৭ সংখ্যায় 'ধর্ম ও বিজ্ঞান' বিভাগে প্রকাশিত জলধিকুমার সরকারের 'সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ : বিজ্ঞানমতে ও বেদান্তদৃষ্টিতে' প্রবন্ধটি খুবই সুলিখিত। আকরগ্রন্থগুলির নাম উল্লেখ করলে আরো ভাল হতো। প্রবন্ধটিতে উল্লিখিত একটি তথ্যে সামান্য ভুল আছে। বলা হয়েছে যে, পৃথিবীর সৃষ্টি আজ থেকে ৪-৬ হাজার কোটি বছর আগে। কিন্তু আমরা ভূবিজ্ঞানের ছাত্ররা বই পড়ে যা জানতে পেরেছি তাতে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে ৪.৫-৪.৬ বিলিয়ন বছর আগে। ১ বিলিয়ান বছর = ১×১০^৯ বছর = ১০০×১০^৭ বিলিয়ন বছর = ১০০ কোটি বছর। অর্থাৎ আজ থেকে ৪৫০-৪৬০ কোটি বছর আগে। এই তথ্য ভূবিজ্ঞানের যেকোন বইতে পাওয়া যাবে।

অগ্নিভ দাস
তৃতীয় বর্ষ, ভূবিজ্ঞান, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

লেখকের উত্তর

'উদ্বোধন'-সম্পাদককে লিখিত চিঠির জন্য অগ্নিভ দাসকে ধন্যবাদ জানাই। আমার লেখাটিতে ভ্রমবশত ৪-৬ হাজার কোটি বছর আগে লেখা হয়েছিল। সেই স্থানে ৪০০ থেকে ৬০০ কোটি বছর হবে। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমি আন্তরিক দুঃখিত।

জলধিকুমার সরকার
টালিগঞ্জ, কলকাতা-৩৩

নিজের দেহ ও মনকে বশে আনা—শাস্ত্রীয় ও আধুনিক দৃষ্টিতে

শিবেন্দ্রকুমার সাহা

অন্তরিন্দ্রিয় কিংবা বহিরিন্দ্রিয়—এই উভয়কেই উপযুক্ত ফলিত বিজ্ঞানের (applied science) প্রয়োগে বশে আনা সম্ভব। অনুভব হলো মনের কাজ। সঠিক অনুভব সুস্থ চেতনার স্তরেই সম্ভব। শাস্ত্রকারেরা চেতনার বর্ণনা করেছেন জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—এই তিনটি অবস্থায়। আধুনিক কালে শুধু সুপ্তি অর্থাৎ নিদ্রা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। নিদ্রিত মানুষ স্বপ্ন দেখে 'চক্ষুর দ্রুত অবস্থান পরিবর্তন' (Rapid Eye Movement Sleep বা R. E. M.) অবস্থায়। সুষুপ্তিতে এই দ্রুত অবস্থান পরিবর্তন হয় না। ই. ই. জি. যন্ত্র দিয়ে মস্তিষ্কের জৈব-বৈদ্যুতিক তরঙ্গ চিনে তার কাজকর্ম ও সচেতনতা সম্বন্ধে অনেকখানি ধারণা করা যায়। 'আলফা' তরঙ্গ পাওয়া যায় চোখ বুজে শান্ত অবস্থায় থাকলে। 'বিটা' তরঙ্গ পাওয়া যায় কর্মতৎপর থাকলে। উদ্বেগ ও হতাশা থাকলে 'থিটা' আর গভীর ঘুমে আসে 'ডেলটা' তরঙ্গ। মন তখনো সচেতন।[১] ফ্রয়েড প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা সজ্ঞান মনের চেতন এবং অবচেতন অবস্থার কথা বলেছেন; এই দুই অবস্থায় ও নিদ্রায় কিংবা জাগরণেও তথ্যাদির আদানপ্রদান হয়।

প্রাচী এবং প্রতীচী উভয় দেশীয় মনোবিজ্ঞানীরাই যৌন প্রেরণাকে একটি বড় মানসিক শক্তি বলে মানেন। ব্রহ্মচর্য অসীম ক্ষমতার উৎস—একথা প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌রা বলেছেন; আর ফ্রয়েডের সমর্থকরা তো সবরকম মানসিক প্রক্রিয়াতেই যৌন প্রেরণার ছায়া দেখেন।

দেহ এবং মন পরস্পর অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। সুস্থ দেহেই সুস্থ মনের বাস। মনকে বশ করতে তাই শরীরকে অবজ্ঞা করলে চলবে না। কালিদাস বলেছেনঃ "শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্" (কুমারসম্ভব, ৫।৩৩)। দেহ এবং মনের যোগাযোগের রাস্তা ধরেই ইন্দ্রিয় অতিক্রম করে সাধারণ অনুভূতির অতিরিক্ত পরম অনুভূতি লাভ করা সম্ভব। সাধারণ অনুভব প্রত্যেক সুস্থ মানুষেরই আছে। সেই অনুভবকে পোষণ করে পুষ্টি (খাদ্য), পরিবেশ, বংশগতি ইত্যাদি।

বিভিন্ন রকম ঔষধ দিয়ে এবং ঔষধ-অতিরিক্ত (Non-Pharmacological) উপায়েও অনুভবের রাজ্যে বিপ্লব ঘটানো যায়। এই শ্রেণীর ঔষধকে বলে 'সাইকোডেলিক ড্রাগ' (Psychodelic Drug)। এতে চিন্তা ও অনুভবের রাজ্যে অসাধারণ পরিবর্তন আসে। স্বপ্ন অথবা একধরনের ধর্মভাব ছাড়া এই ধরনের ব্যত্যয় হয়তো আর কিছুতে দেখা যায় না। এই অবস্থায় অনুভব পরিষ্কার ও অন্তর্মুখী। মন যেন এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতিতে দ্রষ্টা ও দৃশ্য—এই ভাবে ভাগ হয়ে গেছে... ক্রমে যেন সবকিছুরই সীমারেখা লোপ পাচ্ছে, নিজের অস্তিত্বই যেন হারিয়ে যাচ্ছে। সব মানুষের সঙ্গে এবং মহাবিশ্বের সঙ্গে সবকিছুই যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে যাচ্ছে।[২] এই যে অনুভব তা যদি ঔষধের প্রয়োগে হয়, তবে তো এই অপূর্ব অনাস্বাদিত অনুভবের জন্য উৎসুক মন ব্যগ্র হবেই। আর এইভাবেই লোকে হয়তো নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নামের ফেরেই 'মারিজুয়ানা' (marijuhana) হয় 'সিদ্ধি'। কোন্ রসিকজন যে এই পদার্থটির নাম দিয়েছিল সিদ্ধি, সেকথা ভেবে তাঁর বা তাঁদের রসবোধের প্রশংসা করতে হয়। 'সিদ্ধি' নামটির সার্থকতা অনুভব করা যাবে ঐ দ্রব্য গ্রহণে নেশাগ্রস্তের মনে কি ভাবের উদয় হয় তার একটু বর্ণনা শুনলে। তাদের মতে, এই নেশায় শ্রবণ উন্নত হয়, দৃশ্য উজ্জ্বল হয়, গন্ধ, স্পর্শ—সবই আগের চেয়ে বেশি অর্থবহ হয়। সময়ের গতি প্রায় স্তব্ধ হয়ে যায়, নিমেষকে মনে হয় যুগ। প্রাণে খুশির জোয়ার।

আমাদের দেশের মুনি-ঋষিরা এসব কথা হয়তো জানতেন, কেননা তাঁদের মধ্যে এইজাতীয় ঔষধের প্রচলন দেখা যায়। আধুনিক কালে 'এক্সট্যাসি' (ecstasy) নামে এই ধরনের এক নেশার দ্রব্য মনোবিজ্ঞানীরা একসময় সাইকোথেরাপির (psychotherapy) কাজে লাগাতে তৎপর হয়েছিলেন।

এবারে ওষুধের কথা বাদ দিয়ে অন্যভাবে কি করে এই অবস্থার সৃষ্টি করা যায় (Non-Pharmacological measures), তার কিছু কথা বলা যাক। বিশেষ ধরনের, দেহের ও মনের শৃঙ্খলা অনুসরণ করলে মনকে সাময়িক বা স্থায়িভাবে বশীভূত করা যায়। সেইসমস্ত কথা পরিষ্কারভাবে লেখা আছে আমাদের দেশের সনাতন শাস্ত্রে। যথাবিহিত অভ্যাস না করলে উপলব্ধির বিকল্প স্তরে, অর্থাৎ সাধারণ থেকে পরম অনুভূতির স্তরে উত্তরণ হয় না।. এর জন্য প্রয়োজনীয় সময়টুকু দিতে হবে। অযথা অস্বাভাবিকভাবে

---

১ ১ ডেলটা = ০.৫-৪ হার্জ, থিটা = ৪-৮ হার্জ, আলফা = ৮-১৪ হার্জ এবং বিটা = ১৪ হার্জের বেশি কম্পন।

২ দ্রঃ Goodman & Gilman, Pharmacology, 8th Edn., p. 533

এবং অস্বাভাবিক গতিতে সহজ প্রবৃত্তিকে নিরুদ্ধ করতে গেলে বিপর্যয় হতে পারে। শারীরিক ও মানসিক ধস নামতে পারে। সেক্ষেত্রে মনকে বশ করার বদলে পাগল হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। আবার কিছুদূর নিয়মমাফিক অগ্রসর হয়েও অনেকে সিদ্ধাই ইত্যাদিতে প্রলুব্ধ হয়ে আরেক ধরনের মানসিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন।

ওষুধ (drug) না খেয়ে প্রাণায়াম, ধ্যান ইত্যাদির সাহায্যে শরীরের স্বেচ্ছাধীন (voluntary) এবং স্বতঃক্রিয় (autonomic) স্নায়ুগুলির কার্যকলাপের ওপর কিছুটা কর্তৃত্ব কায়েম করা যায়। মনে হয়, ইচ্ছামত রক্তচাপ, নাড়ির গতি, অন্তঃক্ষরণ (endocrene, cytokine ইত্যাদি) এবং অনাক্রম্যতা কার্যের (immunity) ও অন্যান্য অনেক জৈব-রাসায়নিক ও জৈব-বৈদ্যুতিক কার্যকলাপের ওপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। তাই তো এই ব্যাপারে নিত্যনতুন গবেষণার ফলে নিত্যনতুন তথ্য জানা যাচ্ছে। এমনকি ফুসফুস এবং হৃদ্‌যন্ত্রের কার্যকলাপের ওপরও কিছুটা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছে। প্রশিক্ষিত প্রত্যঙ্গ (organ) সমপরিমাণ কাজ কম অক্সিজেন ব্যবহার করেই হয়তো সমাধা করতে পারে। কম অক্সিজেন মানে কম জারণ (oxidation)। ফলে কম ক্ষয়—বেশি স্থায়িত্ব—দীর্ঘায়ু। চিকিৎসকেরা তো আজকাল ঔষধ হিসাবেও 'অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট' (anti-oxidant) ব্যবহার করেন।

মানুষ চিরকালই অমর হওয়ার স্বপ্ন দেখেছে। আমাদের শরীরের প্রত্যেকটি কোষ জীবিত এবং হয়তো, বলা যায়, সবাই সামগ্রিকভাবে নিজের ভাল-মন্দ বোঝে এবং প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। বেশি প্রতিক্রিয়া হলে 'অসুখ' সৃষ্টি হয়। কিন্তু কত কম থাকতে আমরা তা পারি? এই প্রচেষ্টা চলছেই। কতকগুলি প্রশ্নের এখনো সমাধান বাকি —যেমন শরীরের কোষগুলির কি নির্দিষ্ট সময় বাঁচার জন্য তাদের মধ্যে 'প্রোগ্রাম' করা আছে? নির্দিষ্ট নিয়মে কোষেরা মরে গিয়ে কোন জৈব-ঘড়ির (biological clock) প্রভাবে পুনরায় তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়ার সমাপ্তি কি ঘোষণা করে? বিজ্ঞানীরা অনেকে ভাবতে শুরু করেছেন যে, কোষ-বিভাজনের ক্রম নিয়ন্ত্রণ করে হয়তো একদিন অমরত্বের দুয়ারে পৌঁছে যাওয়া যাবে। তারও আগে 'ক্লোনিং' (clonning) ইত্যাদি উপায়ে নতুন জীবনের খোঁজ তো চলছেই। এই সমস্ত নব-উন্মোচিত দিগন্তের ওপর ওষুধের সাহায্য ব্যতিরেকে নিয়ন্ত্রণ কতখানি সম্ভব, তা সঠিক জানা দরকার। আমাদের দেশের ঋষি-মুনিরা তো শত শত, এমনকি হাজার হাজার বছর বাঁচেন বলে শোনা যায়। দেহ ও মনের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব কি মানুষ পূর্বে পেয়েছে অথবা এতদিনে পেতে চলেছে? একটু যেন রূপালী রেখা আজকাল দেখা যাচ্ছে!

প্রাণায়াম একধরনের শ্বাসের ব্যায়াম। পূরক, কুম্ভক ও রেচক হলো তার তিন অবস্থা। প্রশ্বাসের সঙ্গে অক্সিজেন নিলে শরীরের মধ্যে সেটি কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি করে। একটি সহজ রাসায়নিক সূত্র এমন হতে পারে— $CO_2 + H_2O = H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$। এই সূত্রে বোঝা যাবে যে, অধিক অক্সিজেন ব্যবহারে অধিক কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অধিক কার্বন ডাই অক্সাইড শরীর-অভ্যন্তরস্থ জলের সঙ্গে মিশে অধিক অম্লতার সূত্রপাত করে। শরীরের মধ্যে ক্ষার-অম্লের সম্পর্ক খুবই সূক্ষ্ম। পি. এইচ. (pH) ৭.৩৫ এবং ৭.৪৫-এর মধ্যে রাখতে হয় সুস্থতার জন্য।

কাজেই কম অক্সিজেন ব্যবহারের 'প্রশিক্ষণ' ছাড়াই কুম্ভক বেশি সময় ধরে করতে গেলে এই ক্ষার-অম্লের সাম্যাবস্থা বিপর্যস্ত হওয়া স্বাভাবিক। এমনকি কার্বন ডাই অক্সাইড রক্তে জমে বিষক্রিয়াও (CO_2 intoxication) হতে পারে, তাতে চেতন অভিব্যক্তির নানারকম বিভ্রাট দেখা দেওয়া সম্ভব।

প্রাণায়ামে দীর্ঘ শ্বাস নিতে হয়। তাই পরিচ্ছন্ন পরিবেশ না হলে হাওয়ায় ভাসমান ধূলিকণা, বিশেষত অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা (০.৫ মাইক্রণ মাপের) অ্যালভিওলাসে (ফুসফুসের প্রান্তে) গিয়ে স্বাভাবিক অক্সিজেন গ্রহণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। তাই সঠিক আসন ও সঠিক পরিবেশ খুবই জরুরী।

শ্বাসগ্রহণেই সাধারণভাবে জীবনের প্রকাশ, তাই মৃত্যু মানে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ বা প্রাণবায়ুর বহির্গমন। এই প্রাণ প্রতিটি জীবিত কোষে প্রতিষ্ঠিত। এবং ঐ জীবিত কোষ-সমূহের সমষ্টিই দেহ। বলতে গেলে, প্রতিটি জীবিত কোষ তাদের পরিবেশের সঙ্গে নিয়ত ক্রিয়াশীল এবং সংবেদী। এইভাবেই সমস্ত জীবদেহটির একটি ভাবমূর্তি তৈরি হয়। তাই আজকাল মৃত্যুর সংজ্ঞা নির্ধারণ মুশকিল হয়ে পড়েছে। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস এবং হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া চালু রেখে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণের ওপরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চলছে।

কিন্তু শুধু শ্বাসগ্রহণই জীবন নয়। জীবনের একটা অর্থ থাকা চাই এবং সেই অর্থ বা উদ্দেশ্য হলো—আনন্দ। পরমানন্দের খোঁজই জীবন ও সাধনার লক্ষ্য। ব্যাধি না থাকা যেমন সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য নয়, তেমনি ত্রিতাপ জ্বালা জুড়ানোই শেষকথা নয়। আনন্দময় অনুভূতিটুকু আবশ্যক। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই রসে-বশে থাকতে চেয়েছেন, শুকনো সন্ন্যাসী হতে চাননি। ❑

জনগণের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ছোটদের অবস্থা

পাশ্চাত্য সমাজে শুধু যে বিভিন্ন বয়সের লোকের সংখ্যা বদলাচ্ছে তা নয়, অন্য অনেক বিষয়েও পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। কোন একটি কারণেই যে এরকম হচ্ছে তা নয়। এই পরিবর্তনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়েছে ছোট ছেলেমেয়েদের ওপর। লোকের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাওয়ার জন্যই যে সমাজে বিভিন্ন বয়সের লোকের সংখ্যা বদলেছে তা নয়। এখন সন্তান জন্মাচ্ছে কম, শিশুমৃত্যুর হার কমে গেছে এবং প্রথম সন্তান জন্মাবার সময় পিতামাতার বয়সও আগের চেয়ে বেশি।

পাশ্চাত্যে শিশুমৃত্যুর হার কম, জন্মহারও সেই সঙ্গে কমে যাওয়ার ফলে জন্মমৃত্যুর অনুপাত প্রায় সমান হচ্ছে। সেজন্য দেশে ছেলেমেয়ের সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। সেজন্য উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বলা হয়ে থাকে যে, পিতামাতার অনেকগুলি সন্তান থাকলে অসুখবিসুখে কিছু সন্তান মারা গেলেও কিছু তো বেঁচে থাকবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, উন্নত মানের পরিবার পরিকল্পনা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু হওয়ার ফলে সেখানে শিশুমৃত্যু কমে গেছে। ধনী দেশে পিতামাতা জন্মনিয়ন্ত্রণ করে; তারা আশা করে যে, তাদের প্রতিটি সন্তান জীবিত থাকবে; সেজন্য তারা বৃহৎ পরিবারের প্রয়োজন আছে মনে করে না। প্রকৃত অবস্থা যাই হোক, বিভিন্ন দেশের অবস্থা তুলনা করলে এটা বোঝা যাবে যে, ছেলেমেয়ের ওপর দৃষ্টিভঙ্গি, পরিবারের আয়তন, শ্রীবৃদ্ধি ও শিক্ষার মধ্যে যোগসূত্র আছে।

বর্তমানে ইচ্ছা করে সন্তান হওয়া বন্ধ করা বা দেরিতে প্রথম সন্তান হওয়া প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। ১৯৯১ সালে সন্তানের জন্মের সময় মায়েদের গড়পড়তা বয়স ছিল ২৭.৫ বছর; এটিই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সবচেয়ে অধিক বয়স। এই যে বেশি বয়সে প্রথম সন্তান হতে দেওয়ার মনোভাব, এটি দেখা গেছে সকল সামাজিক শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যেই বর্তমান, যদিও সমাজে সব শ্রেণীতে বয়সবৃদ্ধি সমানভাবে হয়নি। ১৯৭৭ সালে প্রথম ও দ্বিতীয় (অর্থাৎ অভিজাত) সম্প্রদায়ের বিবাহিত মেয়েদের ৩৬ শতাংশের প্রথম সন্তান হওয়ার বয়স ছিল ৩০ বছর বা তার চেয়ে বেশি, সেটা ১৯৯৭ সালে হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৬৩ শতাংশ। চতুর্থ ও পঞ্চম সামাজিক শ্রেণীর মেয়েদের ঐ সংখ্যাগুলি ছিল ১৭ শতাংশ ও ৪১ শতাংশ। যেসব মহিলা সন্তানহীন হয়ে থাকতে চায়, তারা সবাই বেশ উচ্চশিক্ষিত এবং মা হওয়ার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন এবং স্বামীর সঙ্গে তারা পরিপক্ক ও স্থায়ী (mature & stable) সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী। সন্তান হলে বাড়ি করা বা ভাড়া নেওয়া, সংসার-ধর্ম করা এবং অফিসে কাজ করার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব নয় বলে তারা মনে করে এবং বিবাহ করলে নিম্নবিত্ত শ্রেণীর পরিবার হয়ে থাকতে হবে বলে মনে করে। পুরুষদের এবিষয়ে মনোভাব ঠিক জানা যায় না, তবে মনে হয় পুরুষরা অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে পিতা হওয়া নিয়ে ভাবনা-চিন্তা কমই করে (fatherhood is low on the public agenda of manhood)।

যদি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলারা মনে করে যে, সবরকম অবস্থা অনুকূল হওয়ার পর বিয়ে করবে, তাহলে তারা ভাবী সন্তানের জন্য যথেষ্ট টাকা জমাতে পারবে। তারা সন্তানকে বা সন্তানদের খুব ভাল শিক্ষা ও ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা করতে পারবে। আবার এও হতে পারে যে, তারা একমাত্র সন্তানের ওপর তাদের সমস্ত উচ্চাশা রূপায়িত করতে চেষ্টা করবে যার অবশ্যম্ভাবী ফল—মানসিক উদ্বেগ। এই যে সন্তান সম্বন্ধে মনোভাবের কথা বলা হলো, সেরকম যত্ন নেওয়া সকল ক্ষেত্রে হবে না। গরিব ঘরের মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে হবে, ছেলেমেয়েরা অবহেলার শিকার হবে, তাদের শিক্ষা আরম্ভ হবে দেরিতে। এই দুই থাকের ছেলেদের মধ্যে পার্থক্য বয়স বাড়ার সঙ্গে বেড়েই চলবে।

বর্তমান কালে বাবা-মা ও ছেলেমেয়েদের এই যে বয়সের পার্থক্য বলা হলো, তাতে দাদু-দিদার সঙ্গে নাতি-নাতনীর সম্পর্কের পরিবর্তন হচ্ছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক দৃঢ় না হলে সন্তানরা সাধারণত বাবা-মা ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে মধুর সম্পর্কে আসতে চায়। খুব বৃদ্ধ দাদু-দিদা কি সেই স্থান পূর্ণ করে নাতি-নাতনীর আনন্দের বা বিষাদের অংশীদার হতে পারে? ছেলেমেয়েরা যদি পঙ্গু হয়ে জন্মায় বা পরে পঙ্গু হয়, বয়স্ক পিতামাতারা কি তাদের যত্ন নিতে পারবে? গত বিশ বছরে দেখা যাচ্ছে যে, ৩০ বছরের বেশি বয়সের মায়েরা তাদের পঙ্গু সন্তানের জন্য অন্যের কাছে আর্থিক সাহায্য চাইছে, এইরকম সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা বেশ বেড়ে যাচ্ছে।

এরকমভাবে বিবাহের বয়স বেড়ে চললে মা-বাবার বৃদ্ধ বয়সে ছেলেমেয়েদের কাছে সেবা-শুশ্রূষা পাওয়া কমে যাবে, কারণ শেষোক্তদের তখন নিজেদের সন্তানদের দেখাশোনার কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে। **[British Medical Journal, 20 November 1999, pp. 1356-1357]** ❑

ওয়ার্ডসোয়ার্থ ঃ রূপে রূপান্তরে

অপূর্বকুমার সান্যাল



ওয়র্ডসোয়র্থ ও তাঁর কবিতা
সম্পাদনা ঃ
বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়
প্রদীপরঞ্জন সেনগুপ্ত
প্রকাশক ঃ সাহিত্যলোক
৩২/৭ বিডন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৬
পৃষ্ঠা ঃ ৯৬
মূল্য ঃ ৫০ টাকা

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাক্ষাৎকার হয়তো অনিবার্যই ছিল, কিন্তু অলক্ষ্যে কবি ওয়ার্ডসোয়ার্থ যে অনুঘটকের কাজ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। জেনারেল অ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশনের (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ) অধ্যক্ষ উইলিয়াম হেস্টি এই কবির 'The Excursion'-এ অতীন্দ্রিয় অনুভূতির ব্যাখ্যাসূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উল্লেখ করেছিলেন ছাত্র নরেন্দ্রনাথের কাছে। তারপরই ঘটে সেই ঐতিহাসিক সাক্ষাৎকার ও নরেন্দ্রনাথের 'বিবেকানন্দ'-এ উত্তরণ। "ওয়ার্ডসোয়ার্থের কাছে ভারতবাসীর তথা সমস্ত মানবজাতির এক বিশেষ ঋণ আছে।"—গ্রন্থের প্রারম্ভিক 'মুখবন্ধ'-এ সেই ঋকৃথ স্মরণ করিয়ে দিয়ে সম্পাদক বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় একটি অসাধারণ কৃত্য সম্পন্ন করেছেন। নানান প্রবন্ধে ইতস্তত উল্লিখিত হলেও ওয়ার্ডসোয়ার্থ সম্পর্কিত একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তকে এই উল্লেখ বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে।

'লিরিক্যাল ব্যালাডস্' (১৭৯৮)-এর দ্বিশতবার্ষিকী স্মরণে ওয়ার্ডসোয়ার্থ রোমান্টিক ভাবনা সংক্রান্ত ছয়টি প্রবন্ধ ও কবির আঠারটি কবিতার বঙ্গানুবাদই এই প্রকাশনার বৈশিষ্ট্য।

সমগ্র ইউরোপীয় রোমান্টিকতার প্রেক্ষিতে ইংল্যাণ্ডের রোমান্টিক কবিকুলশিরোমণি—যাঁকে আর্নল্ড 'High Priest of Nature' ('প্রকৃতির প্রধান পুরোহিত') আখ্যা দিয়েছিলেন, সেই ওয়ার্ডসোয়ার্থের অবস্থান ও মূল্যায়ন এই প্রবন্ধগুলির উপজীব্য। 'রোমান্টিকতা ঃ সংজ্ঞার সন্ধানে', 'ওয়ার্ডসোয়র্থ ঃ দুশ বছর পরে' (বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়), 'ওয়ার্ডসোয়র্থ ও কবিতার ভাষা', 'দুই কবি, দুটি কবিতা' (প্রদীপরঞ্জন সেনগুপ্ত) প্রবন্ধগুলি মননশীলতা ও পাণ্ডিত্যে ঋদ্ধ। 'রোমান্টিকতা ঃ সংজ্ঞার সন্ধানে', যেখানে রোমান্টিকতার ইউরোপীয় বিশাল পটভূমি—জার্মান, ফরাসী, রুশ ও ইতালীয় পরিপ্রেক্ষিতের বিশ্লেষণ রয়েছে, সেটি বিশেষ উল্লেখের যোগ্য। 'দুই কবি, দুটি কবিতা' একটি প্রগাঢ় (intensive) আলোচনা, কিন্তু দুটি কবিতায় কেন্দ্রীভূত হওয়ায় ('বসুন্ধরা' ও 'Tintern Abbey') এর পরিসর অনেক ক্ষুদ্র হয়ে আসে। সামগ্রিক ভাবে রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডসোয়ার্থ তো বটেই, বঙ্গীয় তথা ভারতীয় কবিকুলের ওপর ওয়ার্ডসোয়ার্থের প্রভাব সম্বন্ধীয় একটি গভীর চিন্তামূলক প্রবন্ধ এরকম একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তকে অপেক্ষিত ছিল।

কবির সমগ্র গ্রন্থাবলী থেকে নির্বাচিত আঠারটি কবিতার বঙ্গানুবাদই এই পুস্তকের মূল প্রয়াস। কবিতার অনুবাদ নিয়ে তো বাদানুবাদের অন্ত নেই। যা কখনোই অনুবাদযোগ্য নয়, তাই-ই কবিতা। ইতালীয় প্রবাদ 'Traduttore traditore'-এর অর্থ ঃ অনুবাদক মাত্রই বিশ্বাসঘাতক। কবিতার অনুবাদ কি মূলের অনুগত হবে, না রিচমণ্ড ল্যাটিমোরের মতের মতো আরেকটি স্বতন্ত্র কবিতা হয়ে উঠবে? মূলের ধ্বনিটিকে অনুবাদের প্রতিধ্বনি কি সদাই ব্যঙ্গ করবে? Catford এবং Nida এই অনুবাদতত্ত্বকে এক বিচিত্র ভাষাতাত্ত্বিক রূপ দিয়েছেন।

যাক সেসব তত্ত্বকথা। শিক্ষিত বাঙালীমাত্রেই মূল কবিতার অনুভবগুলির দ্বারা জারিত, বঙ্গানুবাদ কি সেই অনুভূতির বিকল্প হতে পারে? তবু অনুবাদগুলি অনেকক্ষেত্রেই সার্থকতার পথে অগ্রসর হয়েছে। এমনকি সামান্য '-টী', '-টি' প্রত্যয় যোগগুলিও গভীর অর্থবাহী হয়ে উঠেছে; যেমন 'The Idiot Boy'—'বোকা ছেলেটা' বা 'To my Sister'—'লক্ষ্মী বোনটি মোর'। প্রদীপরঞ্জন মূল প্রবন্ধে 'Expostupation and Reply'-এর অনুবাদ 'প্রশ্ন ও উত্তর' রাখলেও কবিতাটির অনুবাদে 'অনুযোগ ও প্রত্যুত্তর' রেখে মনে হয় মূল ভাবের অনুসরণ করেছেন। এটিই সার্থকতর।

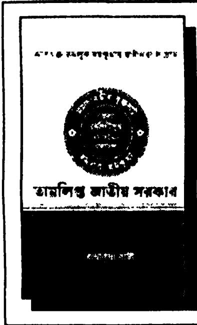
কবির প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতা 'Ode : Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood'-এর অনুবাদে মূল অনুষঙ্গ 'childhood' বা 'শৈশব' কথাটির অনুল্লেখ 'অনশ্বরতার অন্তরঙ্গ গান'-এ মনে হয় কিছুটা অঙ্গহানি ঘটিয়েছে। তবে 'টীকা'য় বার্ণিক রায় ভালেরি ও মালার্মে থেকে শঙ্করাচার্যের 'আনন্দলহরী' পর্যন্ত ঘুম ও জাগরণ প্রসঙ্গকে প্রসারিত করেছেন। 'To a Skylark'-এর অনুবাদ কখনো হয়েছে 'চাতকপাখিকে', কখনো 'ভরতপক্ষী' (পৃঃ ৮৯ ও ৯১)। ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'The Revenie of Poor Susan'-এর thrush পাখির অনুবাদ-সমস্যা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'ময়না' দিয়েই অবশ্য সমাধান করেছিলেন। কোন কবিতারই মূল ইংরেজী দেওয়া না থাকলেও 'My heart leaps up' ('হৃদয় আমার লাফিয়ে ওঠে') ও 'The Borderers III' ('ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া') মাত্র এই দুটি কবিতার মূল ইংরেজী কেন উদ্ধৃত হলো, ঠিক

বোঝা গেল না। ইংরেজী নামগুলি হয় বাঙলা, নয় ইংরেজী —একই রূপে ও লিপিতে থাকা বাঞ্ছনীয়। 'T. S. Eliot' আছেন, আবার কখনো 'টি. এস. এলিওট'ও আছেন (পৃঃ ২২); 'Spinoza' আছেন, আবার 'স্পিনোজা'ও আছেন (পৃঃ ৩৬)। আরেকটি ছোট অনুযোগ। 'ওয়ার্ডসোয়ার্থ'—এই বানান ও রূপেই তো রবীন্দ্রনাথ থেকে সব বাঙালী কবি ও সমালোচককুল তাঁকে চিনে আসছেন, ধ্বন্যাত্মক (phonetic) লিপ্যন্তরটি কি খুব জরুরী ছিল?

এসব ছোটখাট ত্রুটিবিচ্যুতি সামান্যই। সাধারণভাবে ইংরেজী কবিতার মূল আস্বাদ গ্রহণ ইংরেজী শিক্ষার অবমূল্যায়নের সঙ্গে ক্রমেই কমে আসছে। যাঁরা ইংরেজী একেবারেই জানবেন না, তাঁদের কথা ভাবার সময় এসে গেছে। যাঁরা জানেন, তাঁদের কাছেও মাতৃভাষায় ইংরেজ কবিকে যাচাই করে নেওয়া একটা চ্যালেঞ্জের মতো। সেদিক থেকে এই অনুবাদ খুবই কালোপযোগী। ভূমিকায় বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় ও 'বড় কবির জন্য বড় মাপের বই' ও প্রদীপরঞ্জন সেনগুপ্তও 'আরও গভীরভাবে বাংলায় ওয়র্ডসোয়র্থ চর্চা করার অভিলাষ' ব্যক্ত করেছেন। সম্পাদকদ্বয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলে বঙ্গ ভাষা ও সাহিত্য উপকৃত হবে।❑

স্বাধীনতার বহ্নিশিখা

সত্যকৃষ্ণ দাশশর্মা



অবিভক্ত তমলুক মহকুমার স্বাধীনতা সংগ্রাম
তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার
রাধাকৃষ্ণ বাড়ী
প্রকাশক : সুশীলকুমার ধাড়া
পৃষ্ঠা : ২৮+৪০০+২৮
মূল্য : ২৫০ টাকা

মোট ১৬টি অধ্যায়ে এই বিশাল গ্রন্থে ভারতের একটি ক্ষুদ্র প্রান্তে মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার স্বাধীনতাকামী মানুষ গান্ধীজীর ১৯৪২-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাকে সাড়া দিয়ে কি করে প্রবল পরাক্রান্ত ব্রিটিশ সরকারের সর্বপ্রকার দলন এবং দমননীতি উপেক্ষা করে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একটি স্বাধীন জাতীয় সরকার গঠন এবং সমান্তরাল শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেছিলেন, তারই পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বহু মূল্যবান তথ্যপ্রমাণ-সহ এতে বিধৃত।

জাতীয় সরকারের স্থিতিকাল যদিও মাত্র ২২ মাস (ডিসেম্বর ১৯৪২ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৪৪) তবুও একটা সুষ্ঠু সরকার পরিচালনার জন্য যেসব পরিকাঠামো প্রয়োজন, যথা—স্বরাষ্ট্র, কারা, বিচার, রাজস্ব, ডাক, প্রচার ইত্যাদি যাবতীয় বিভাগ সুসংবদ্ধভাবে গঠিত হয়েছিল এবং সবগুলি বিভাগই পূর্ণমাত্রায় কার্যকরী ছিল। এছাড়া ছিল 'বিপ্লবী' নামে সরকারের একটি মুখপত্রও—যাতে সরকারের যাবতীয় কার্যবিবরণী এবং নির্দেশাদি নাগরিকদের জ্ঞাতার্থে লিপিবদ্ধ করা হতো।

অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থ থেকে এর একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। আগাগোড়া এটি একটি আকরগ্রন্থ। সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী এবং জাতীয় সরকার পরিচালন দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে আজও যাঁরা জীবিত আছেন, মূলত সেইসব বীর যোদ্ধাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণে এই গ্রন্থটি সমৃদ্ধ।

তাছাড়া উপরি পাওনা হিসাবে এতে পাওয়া যাবে গোটা মেদিনীপুর জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামের কিছু ইতিহাস, জেলা এবং তমলুক মহকুমার ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। সেইদিক থেকেও গ্রন্থটি আরো আকর্ষণীয় হয়েছে। ভাষা আগাগোড়া প্রাঞ্জল এবং সুখপাঠ্য। মুদ্রণ, অলঙ্করণ ইত্যাদি সবদিক থেকেই একটা পরিচ্ছন্ন রূপ এতে পরিস্ফুট।

গ্রন্থকার রাধাকৃষ্ণ বাড়ী এবং তাঁর সহযোগী যোদ্ধা যাঁরা এই গ্রন্থরচনার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের সকলের কাছে, বিশেষ করে প্রকাশক সুশীলকুমার ধাড়া—যিনি নিজেই একজন কিংবদন্তি পুরুষ এবং নবতিবর্ষ-উত্তীর্ণ কিন্তু মনেপ্রাণে আজও তরুণ—তাঁদের কাছে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকবে এই আকরগ্রন্থখানি উপহার পাওয়ার জন্য। ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে এটি নিঃসন্দেহে একটি অমূল্য সংযোজন এবং ছাত্রছাত্রী ও ইতিহাসপাঠে আগ্রহী গবেষক—সকলেরই অবশ্যপঠনীয়।

গ্রন্থে দু-একটি ভুল বা নামের অসঙ্গতি আছে বলে মনে হয়। যথা ১২৫ পৃষ্ঠায় এস. পি., জে. এস. সি. কাউগিল নামের পাশে লেখা হয়েছে 'আই. পি. এস.'; হওয়া উচিত 'আই. পি.', 'আই. পি. এস.' নয়। কেননা ব্রিটিশ ভারতে এদের 'আই. পি.' বলা হতো। 'আই. পি. এস.' স্বাধীনোত্তর সংস্করণ। ১৩৬ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত পুলিস অফিসারের নাম মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় না মণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তা যাচাই করা দরকার। কেননা অন্য একটি গ্রন্থে 'মণিভূষণ' নাম পাওয়া যায়।❑

রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

গত ২৫ মে ২০০১ ত্রিচুর আশ্রমের (কেরালা) নবনির্মিত উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে বহু সাধু, ভক্ত, শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল।

চেন্নাই মঠ (তামিলনাড়ু) গত মে মাসে (২০০১) মাসাবধি ৮-১৫ বছর বয়স্ক বালক-বালিকাদের নিয়ে একটি শিবির পরিচালনা করে। যোগাসন, স্তোত্রপাঠ, ভজন, শিল্পকলা, নৈতিক রীতিনীতি অনুশীলন প্রভৃতি ছিল শিবিরের অনুষ্ঠিত বিষয়। শিবিরে প্রায় ৫০০ বালক-বালিকা যোগদান করেছিল।

কনখল সেবাশ্রম (উত্তরাঞ্চল) গত ৬ জুন ২০০১ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার শতবর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন করে। উৎসবের উদ্বোধন এবং ভাষণ দান করেন উত্তরাঞ্চলের রাজ্যপাল সুরজিৎ সিং বার্ণালা। এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, উচ্চপদস্থ কর্মচারী ও জনসাধারণের সমাবেশ হয়েছিল।

সারগাছি আশ্রমে (মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ) গত ১৬ ও ১৭ জুন ২০০১ মধ্যবঙ্গ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের ২৬তম সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বৈদিক মন্ত্রপাঠ, সমবেত প্রার্থনা, ধ্যান ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। দুদিনব্যাপী সম্মেলনে স্বাগত-ভাষণ দান এবং সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দজী, স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী ও স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজী। সম্মেলনে মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, নদীয়া, বর্ধমান ও উত্তর চব্বিশ পরগনার প্রায় ৪০টি আশ্রম থেকে ২০০ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন।

বলরাম-মন্দির (বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩) গত ২৩ জুন ২০০১ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্পর্শপূত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব উদ্‌যাপন করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ১৮৮৪ সালের ৩ জুলাই রথের পুনর্যাত্রা উৎসবে বলরাম-মন্দিরে আগমন করে কীর্তন সহযোগে ভক্তগণের সঙ্গে প্রথম রথরজ্জু আকর্ষণ করেন। এরপরেও তিনি কয়েকবার রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন।

সেই পুণ্য ঘটনাটির স্মরণে প্রতি বছরের মতো এবছরও রথযাত্রা উৎসবে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, সঙ্কীর্তন ও রথরজ্জু আকর্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বহু সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী-সহ প্রথম রথরজ্জু আকর্ষণ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছি ও পরিচালন পর্ষদের অন্যতম সদস্য স্বামী গীতানন্দজী মহারাজ। এরপর সুশৃঙ্খলভাবে রথ টানেন কয়েক হাজার ভক্ত নরনারী। পুনর্যাত্রার দিনও কয়েকজন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী-সহ প্রথম রথরজ্জু আকর্ষণ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অছি ও পরিচালন পর্ষদের অন্যতম সদস্য স্বামী তত্ত্ববোধানন্দজী। দুদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

তমলুক মঠ (মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ) গত ২৩ ও ২৪ জুন ২০০১ যথাক্রমে যুবসম্মেলন ও ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করে। যুবসম্মেলনে ২১৯ জন যুবপ্রতিনিধি এবং ভক্তসম্মেলনে ৩৪০ জন ভক্ত যোগদান করেন। আলোচনা, ভক্তিগীতি, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও চিত্র প্রদর্শন ছিল দুটি সম্মেলনের অনুষ্ঠিত বিষয়। সম্মেলনদুটির বিভিন্ন সময়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী পূর্ণানন্দজী, স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী ও স্বামী বলভদ্রানন্দজী।

গত ২৪ জুন ২০০১ কোয়েম্বাটুর বিদ্যালয়ের (তামিলনাড়ু) নবনির্মিত আন্তর্জাতিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় তিনি সভাপতিত্বও করেন।

বেলুড় মঠ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাক্ষেত্র উত্তর কলকাতার সিঁথি বেণীপালের বাগানবাড়িটি নিঃশর্ত দানরূপে অধিগ্রহণ করেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতিরক্ষার্থে গত ৪ জুলাই ২০০১ একটি স্মৃতিভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও 'কথামৃত' পাঠ অনুষ্ঠিত হয়।

রামহরিপুর আশ্রম (বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ) গত ৮ জুলাই ২০০১ দুর্গাপুর তারকনাথ হাইস্কুল প্রাঙ্গণে একটি ভক্ত-সম্মেলনের আয়োজন করে। বৈদিক মন্ত্রপাঠ, ভক্তিগীতি, প্রশ্নোত্তর পর্ব ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের বিভিন্ন অঙ্গ। সম্মেলনে স্বাগত-ভাষণ দান করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী তত্ত্বস্থানন্দজী। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী রমানন্দজী ও স্বামী পূর্ণানন্দজী। রামহরিপুর, বড়জোড়া, বোলিয়াতোড়, দুর্গাপুর, অমরকানন প্রভৃতি স্থান থেকে প্রায় ৬৮০ জন ভক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন।

সেবাব্রত

চক্ষুচিকিৎসা-শিবির

আগরতলা আশ্রম (ত্রিপুরা) গত ২৯-৩১ মে ও ২৫-২৭ জুন ২০০১ দুটি চক্ষুচিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবির-দুটিতে যথাক্রমে ৩২ ও ৪২ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়।

লিমডি আশ্রম (গুজরাট) গত ২১ জুন ২০০১ একটি চক্ষুচিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ২০৯ জনের চোখ প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা করা হয় এবং ২৪ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়।

পোরবন্দর আশ্রমের (গুজরাট) পরিচালনায় গত ৮ জুন ২০০১ একটি চক্ষুচিকিৎসা-শিবির আয়োজিত হয়। শিবিরে

প্রাথমিকভাবে ১৮৬ জনের চোখ চিকিৎসা করা হয় এবং ১৩ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়।

পুরী মঠের (ওড়িশা) পরিচালনায় গত ১৭-১৮ জুন ২০০১ একটি চক্ষুচিকিৎসা-শিবিরে ২২ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়। গত ১৪-১৮ জুন ২০০১ এই মঠ আয়োজিত বালি হরচণ্ডী মেলায় ৭০০ জনের চোখ সাধারণভাবে চিকিৎসা করা হয়।

আলসুর আশ্রম (কর্ণাটক) গত ১৬-২২ জুন ২০০১ একটি চক্ষুচিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে প্রাথমিকভাবে ২৩০ জনের চোখ পরীক্ষা করা হয় এবং ৫৮ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়। এছাড়া এই আশ্রম গত মাসে দুঃস্থ ও দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৪০০ খাতা ও ১৫০টি ইউনিফর্ম বিতরণ করে।

সাধারণ চিকিৎসা-শিবির

গুয়াহাটী আশ্রম (আসাম) অম্বুবাচী মেলা উপলক্ষ্যে গত ২২-২৬ জুন ২০০১ কামাখ্যাদেবীর মন্দির-চত্বরে একটি বিনামূল্যে চিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ২২৫৪ জনের চিকিৎসা করা হয়।

পুনর্বাসন

গুজরাট

বেলুড় মঠ সুরেন্দ্রনগর শিবিরের মাধ্যমে ৬টি বিদ্যালয় নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পরিকল্পিত বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী কেশুভাই প্যাটেল। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় বহু সন্ন্যাসী, বিশিষ্ট নাগরিক, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয় নরনারীর সমাবেশ হয়েছিল।

লিমডি আশ্রমের মাধ্যমে ৪টি পুকুর খননের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। 'নিজের বাড়ি নিজে কর' পরিকল্পনায় ১০০ পরিবার উপকৃত হয়েছে এবং ৬টি বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে।

পোরবন্দর আশ্রমের মাধ্যমে ভারওয়াড়া গ্রামে ২৮টি বাড়ির আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ শেষ হয়েছে এবং ৬টি বাড়ির নির্মাণকাজ প্লিন্থ লেভেল পর্যন্ত এগিয়েছে। গত ৩০ জুন ২০০১ থোয়ানা ও মহিরা গ্রামে এই আশ্রমের দ্বারা নবনির্মিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেন গুজরাটের যুব ও সংস্কৃতি রাষ্ট্রমন্ত্রী মহেন্দ্রভাই ত্রিবেদী এবং মৎস্য ও আইনমন্ত্রী বাবুভাই বখিরিয়া। বিশেষ উল্লেখ্য, উক্ত বিদ্যালয়দুটির নতুন নামকরণ করা হয় **'বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির'**।

রাজকোট আশ্রমের মাধ্যমে ধানেতিতে ১০৭টি বাড়ি নির্মাণের কাজ ক্রমশ এগিয়ে চলেছে।

বহির্ভারত

গত ৬-৭ জুন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে **কলম্বো আশ্রমের (শ্রীলঙ্কা)** শাখাকেন্দ্র বাত্তিকালোয়া ছাত্রাবাসের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসব আয়োজিত হয়। বর্ণাঢ্য ভেলা শোভাযাত্রা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্মরণিকা প্রকাশ ও জনসভা ছিল উৎসবের বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয়। জনসভায় ভাষণ দেন কয়েকজন বিশিষ্ট বক্তা এবং স্মরণিকাটি প্রকাশ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী। অনুষ্ঠানে কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী ও ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

দেহত্যাগ

স্বামী ক্ষান্ত্যানন্দজী (নিশিকান্ত মহারাজ) গত ২১ জুন ২০০১ ভোর ৫টা ৫০ মিনিটে শিলচর আশ্রমে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তিনি দেড় বছর ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে মন্ত্রদীক্ষা লাভ করে ১৯৪২ সালে তিনি বেলুড় মঠে যোগদান করেন। ১৯৫২ সালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে সন্ন্যাস লাভ করেন। দীর্ঘ ৩৪ বছর যাবৎ তিনি আমৃত্যু শিলচর আশ্রমের প্রধান ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বেলুড় মঠ, আসানসোল ও রাজকোট কেন্দ্রে বিভিন্ন সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। সহজ-সরল ও প্রচারবিমুখ স্বভাবের জন্য সকলেই তাঁকে ভালবাসত।

স্বামী সমতানন্দ (রঘুনাথ) ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ জুন ২০০১ রাত ৯টা ৩৫ মিনিটে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে দেহত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল মাত্র ৩২ বছর। তিনি আগরতলা আশ্রমের সেবক ছিলেন। সেখান থেকে গত ২৪ জুন কোমা অবস্থায় তাঁকে কলকাতায় আনা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা সত্ত্বেও তাঁর শারীরিক অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। অবশেষে সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে তিনি স্বধামে গমন করেন।

তিনি ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য। ১৯৮৯ সালে তিনি রামহরিপুর আশ্রমে যোগদান করেন। ১৯৯৯ সালে শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের কাছ থেকে তিনি সন্ন্যাস লাভ করেন। যোগদান কেন্দ্রের পর আগরতলা আশ্রমে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবাকাজে নিযুক্ত ছিলেন। পরিতাপের বিষয়, রামকৃষ্ণ মিশন তাঁর মতো একজন অল্পবয়স্ক তেজস্বী ও যুব সদস্যকে হারাল।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

গুরুপূর্ণিমা তিথি পালনঃ গত ৫ জুলাই ২০০১ গুরুপূর্ণিমা তিথি পালন করা হয়। এদিন সন্ধ্যারতির পর গুরুতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সর্বগানন্দজী।

আবির্ভাব-তিথি পালনঃ গত ১৯ জুলাই ২০০১ শ্রীমৎ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়। এদিন সন্ধ্যারতির পর তাঁর জীবনী আলোচনা করেন স্বামী সনকানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

ভাঙড় শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা : গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০১ প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ্যে সানাইবাদন, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা দেবাত্মপ্রাণা ও অধ্যাপিকা ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য এবং সভানেতৃত্ব করেন প্রব্রাজিকা সদানন্দপ্রাণা। সভাশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জয়দেব সাধুখাঁ। এদিন প্রায় ৮০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

ইড়পালা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, মেদিনীপুর : গত ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০১ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, বাউল গান, সেতার বাদন, কীর্তন ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন দুপুরে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান। দ্বিতীয় দিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন এবং ৩৫ জন দুঃস্থ নরনারীকে বস্ত্র প্রদান করেন স্বামী গুড়াকেশানন্দজী। এছাড়া বক্তব্য রাখেন গোপীবল্লভ গোস্বামী, শম্ভুনাথ প্রামাণিক প্রমুখ।

বঙ্কিমনগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, নদীয়া : গত ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে প্রথম দিনে অনুষ্ঠিত হয় প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি এবং ৩৫০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ। দ্বিতীয় দিনের সভায় ভাষণ দেন স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী ও রঞ্জিৎকুমার ঘোষ।

শ্যামপুকুরবাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ, কলকাতা-৭০০ ০০৪ : গত ২৫-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০১ বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি এবং ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মসভায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে' আলোচনা করেন স্বামী পুরাণানন্দজী, হর্ষ দত্ত প্রমুখ।

খড়্গপুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি, মেদিনীপুর : গত ৩-৬ মার্চ ২০০১ ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসব পালন করা হয়। উৎসবের প্রথম দিন শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী। এদিন সোসাইটির একটি সাধুনিবাসের উদ্বোধন করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। দ্বিতীয় দিন শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপিকা ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য। উল্লেখ্য, সোসাইটি গত ২৫ ফেব্রুয়ারি বিশেষ পূজা, 'কথামৃত', 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ, ১,৫০০ ভক্তের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন করে।

সাঁকরাইল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, হাওড়া : শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে গত ৪ মার্চ ২০০১ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বপন পুরকায়েত। দুপুরে প্রায় ২০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

বহড়াগোড়া শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবপ্রচার এবং সেবাসমিতি, পূর্ব সিংভূম, ঝাড়খণ্ড : গত ৪ ও ৫ মার্চ ২০০১ পাঠ, রামায়ণ গান, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন বিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ডাঃ শান্তনু পণ্ডা, শক্তিপদ সাউ এবং সভাপতিত্ব করেন কালীপদ পণ্ডা। স্বাগত-ভাষণ দেন সমিতির সম্পাদক লক্ষ্মীকান্ত রজক। উৎসবে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

বাঁশবেড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, কুণ্ডুঘাট, হুগলী : গত ১০-১১ মার্চ ২০০১ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভক্তসম্মেলন ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ভক্তসম্মেলনে বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, রামায়ণ গান, গীতি-আলেখ্য ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দজী। পরদিন ধর্মসভায় ভাষণ দেন বেলানগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের স্বামী শঙ্করদেবানন্দজী, ডঃ নমিতা দত্ত প্রমুখ। দুদিনে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

দুর্গাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, বর্ধমান : গত ১০-১২ মার্চ ২০০১ বিশেষ পূজা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, গীতিনাট্য ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ৪,২০০ ভক্ত প্রসাদ পান। সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী সুবীরানন্দজী, স্বামী গিরিশানন্দজী ও স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী এবং পৌরোহিত্য করেন স্বামী তত্ত্বস্থানন্দজী।

কোন্নগর শ্রীরামকৃষ্ণ মনন সভা, হুগলী : গত ১১ মার্চ ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষ্যে উষাকীর্তন, স্তব, পাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী ও রজতশুভ্র চট্টোপাধ্যায়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন সকালে প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণাজী এবং বিকালে স্বামী অচ্যুতানন্দজী ও দেবানন্দ ব্রহ্মচারী। উৎসবে উপস্থিত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

রানিয়া কুলটুকারী রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা : গত ১১ মার্চ ২০০১ ভজন, পথপরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, নাটক, পাঠ এবং ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

চকচণ্ডীনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, হরিপাল, হুগলী : গত ১১ মার্চ ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পূজা, পাঠ, ভজন, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষণ দেন কলকাতা মেট্রোপলিটনের প্রধান জেলাশাসক সমীরকুমার নিয়োগী ও অধ্যাপক ডঃ বিশ্বনাথ দাস। সভাপতিত্ব করেন স্বামী গৌরীনাথানন্দজী। উৎসবে প্রায় ৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

বেলডাঙ্গা সারদা রামকৃষ্ণ পাঠচক্র, মুর্শিদাবাদ : গত ১১ মার্চ ২০০১ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, পাঠ ও আলোচনাসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। সকালে 'কথামৃত' ও 'বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী কাশীনাথানন্দজী। কণা বন্দ্যোপাধ্যায় 'মাতৃপ্রসঙ্গ' আলোচনা করেন। দুপুরে প্রায় শতাধিক ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। বিকালের আলোচনাসভায় ভাষণ দেন স্বামী

বিশ্বনাথানন্দজী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পাঠচক্রের সম্পাদক প্রশান্ত শ্রীমানী। এই উপলক্ষ্যে গুজরাটের ভূমিকম্পের জন্য সংগৃহীত অর্থ বেলুড় মঠের ত্রাণ তহবিলে প্রদান করা হয়।

জাড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, মেদিনীপুর : গত ১১-১২ মার্চ ২০০১ বিশেষ পূজা, 'গীতা' ও বেদ পাঠ, শ্রীরামকৃষ্ণ-কীর্তন, নাটক ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী যজ্ঞেশ্বরানন্দজী, স্বামী জগন্নাথানন্দজী প্রমুখ।

চারিগ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রঘুনাথপুর, কলকাতা-৭০০ ০৫৯ : গত ১১-১৪ মার্চ ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উপলক্ষ্যে ভক্তিগীতি, নগর-পরিক্রমা, পাঠ, সরোদবাদন, দরিদ্র মানুষের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রম-সম্পাদক সুবলচন্দ্র নস্কর। বক্তব্য রাখেন স্বামী সত্যবোধানন্দজী, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ ঘোষ ও প্রণবেশ চক্রবর্তী।

তেলুয়া রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, আরামবাগ, হুগলী : গত ১৪-১৬ মার্চ ২০০১ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, নারায়ণসেবা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী জ্যোতির্ঘনানন্দজী।

পর্ণশ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা মন্দির, বেহালা, কলকাতা-৭০০ ০৬০ : গত ১৪-১৭ মার্চ ২০০১ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী তদ্‌গতানন্দজী ও ডঃ হোসেনুর রহমান। পৌরোহিত্য করেন ডঃ সুনন্দা ঘোষ। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অধ্যাপক মৃগাঙ্কমোহন ঘোষ।

বগুলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ, নদীয়া : গত ১৬ মার্চ ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে 'কথামৃত' পাঠ করেন অসীম চক্রবর্তী। ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দজী, অজিত ভদ্র প্রমুখ। উপস্থিত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

কৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, খড়ার, মেদিনীপুর : গত ১৭-১৮ মার্চ ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, ভজন, বাউলগান, ছৌ নৃত্য, নারায়ণসেবা ও ধর্মসভা আয়োজিত হয়। দুদিনের সভায় ভাষণ দান করেন স্বামী আপ্তকামানন্দজী, স্বামী দেবদেবানন্দজী, স্বামী প্রাণদানন্দজী, স্বামী অমৃতলোকানন্দজী, স্বামী গৌরীনাথানন্দজী প্রমুখ। প্রায় ৮,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

গোন্দলপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি, চন্দননগর, হুগলী : গত ১৭ ও ১৮ মার্চ ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব স্মরণে বিশেষ পূজা, স্তোত্রাদি পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। দুদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী, স্বামী সাধনানন্দজী, নীলমণি কুমার ও সুনীলরঞ্জন চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

রথতলা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ, নদীয়া : গত ১৭-১৮ মার্চ ২০০১ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ, রামনাম-সঙ্কীর্তন, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসব পালন করা হয়। দুদিনের ধর্মসভায় বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন স্বামী পরমাত্মানন্দজী, স্বামী সত্যকামানন্দজী, স্বামী আত্মবোধানন্দজী, ডঃ দীপক দত্ত প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে দরিদ্র বিধবা এবং দুঃস্থ ও মেধাবী বালক-বালিকাদের মধ্যে বস্ত্র ও পাঠসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

কোতুলপুর শ্রীমা সারদা পাঠচক্র, বাঁকুড়া : গত ১৮ মার্চ ২০০১ বিশেষ পূজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, পাঠ ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। 'কথামৃত' ও 'লীলাপ্রসঙ্গ' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী। 'কথা ও সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ' পরিবেশন করেন স্বামী নিস্পৃহানন্দজী। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, অধ্যাপক শ্যামল সর্দার ও অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর মণ্ডল। সভাপতিত্ব করেন স্বামী অমেয়ানন্দজী। এদিন দুপুরে প্রায় ৪,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, হুগলী : গত ১৮ মার্চ ২০০১ সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন ব্রহ্মচারী দীপ্তচৈতন্য। 'মায়ের কথা' পাঠ করেন অরুণিমা চট্টোপাধ্যায়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী ও অধ্যাপক ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অজয় দাশ। এই উপলক্ষ্যে গুজরাটের ত্রাণ তহবিলে ২,০০০ টাকা প্রদান করা হয়।

নবগ্রাম রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, কোন্নগর, হুগলী : গত ১৮ মার্চ ২০০১ সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ঊষাকীর্তন, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা আয়োজিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী ক্ষেমানন্দজী, স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী প্রমুখ। ধর্মসভায় সকালে ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণাজী এবং বিকালে ভাষণ দেন স্বামী ভবহরানন্দজী ও স্বামী শ্রীনিবাসানন্দজী। উপস্থিত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

নারায়ণপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, উত্তর চব্বিশ পরগনা : গত ১৮ মার্চ ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষ্যে নগর-পরিক্রমা, শ্রীশ্রীচণ্ডী ও 'কথামৃত' পাঠ, বিশেষ পূজা, বাউলগান, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য এবং ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী স্বতন্ত্রানন্দজী ও চন্দ্রমাধব শীল। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সেবাশ্রমের সম্পাদক নারায়ণ চক্রবর্তী। এই উপলক্ষ্যে ২৬ জন দুঃস্থ নরনারীকে বস্ত্র প্রদান করা হয়। উৎসবে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

সারদা রামকৃষ্ণ চাইল্ড অ্যান্ড ওম্যান সেবাকেন্দ্র, কলকাতা-৭০০ ০২৭ : গত ১৮ মার্চ ২০০১ ঘোলা সোদপুরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, পাঠ, দুঃস্থ বিধবাদের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণ এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী ব্রহ্মাপদানন্দজী।

ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী। অনুষ্ঠানে প্রায় ২৫০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

গড়িয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ, কলকাতা-৭০০ ০৮৪ : গত ১৮ মার্চ ২০০১ ভক্তিগীতি, গীতিনাট্য, আবৃত্তি ও ধর্মসভার মাধ্যমে সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা দেবাত্মপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা বেদরূপপ্রাণাজী এবং সভাপতিত্ব করেন ডঃ প্রসিত রায়চৌধুরী। উপস্থিত সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

সারেঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি, বাঁকুড়া : গত ২৪ মার্চ ২০০১ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা, বেদপাঠ, ভক্তিগীতি, বিশেষ পূজা ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী একব্রতানন্দজী। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী জ্যোতির্ঘনানন্দজী, স্বামী অমৃতলোকানন্দজী ও স্বামী বরদাত্মানন্দজী। উৎসবে প্রায় ১২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

পুরুনিয়া প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ, বাঁকুড়া : গত ২৪ মার্চ ২০০১ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, প্রসাদ বিতরণ ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হয়। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ চিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী এবং বক্তব্য রাখেন বিমলচন্দ্র দে, বাসুদেব গোস্বামী ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

হিন্দমোটর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, কোতরং, হুগলী : গত ২৪-২৫ মার্চ ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় বিশেষ পূজা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভা। দুপুরে প্রায় ১,৮০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী তদ্‌গতানন্দজী ও প্রণবেশ চক্রবর্তী।

বিজয়গড় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, কলকাতা-৭০০ ০৯২ : গত ২৪ ও ২৫ মার্চ ২০০১ শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দরিদ্র মানুষের মধ্যে বস্ত্র-বিতরণ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় প্রথমদিন শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা মহেশপ্রাণাজী এবং দ্বিতীয়দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে ভাষণ দেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী।

অযোধ্যা শ্যামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘ, হাওড়া : গত ২৫ মার্চ ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সত্যস্থানন্দজী, মাধাই বৈদ্য ও গৌরহরি বেরা। দুপুরে প্রায় ৮০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

সেবাব্রত

বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত চলমান পাঠচক্র, উত্তর চব্বিশ পরগনা : গত ৫-৩০ মে ২০০১ হাড়োয়া শ্রীমা সারদা সেবাসঙ্ঘের সহযোগিতায় ১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিশুদের সচিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনীগ্রন্থ বিতরণ করা হয়েছে।

বহির্ভারত

পিরোজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাংলাদেশ : গত ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশেষ পূজা, 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, পদাবলী-কীর্তন, দুঃস্থ ও দরিদ্র মানুষকে বিনাব্যয়ে চিকিৎসাপ্রদান এবং ধর্মসভা ছিল অনুষ্ঠানের বিভিন্ন অঙ্গ। ধর্মসভায় পৌরোহিত্য করেন বাগেরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী পরদেবানন্দজী। ভাষণে অংশগ্রহণ করেন জনাব এস. এম. জহরুল ইসলাম, অধ্যাপক ডঃ জি. সি. দেব, অধ্যাপক ডঃ আনিসুজ্জামান, অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী, কান্তিবন্ধু ব্রহ্মচারী, অধ্যাপিকা ডঃ বীণাপাণি বাগচী, আনন্দচন্দ্র বিশ্বাস, জনাব মহম্মদ লিয়াকত আলী সেখ বাদশা, ডাঃ সুখরঞ্জন দাস, অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ সাহা ও ডাঃ জ্ঞানরঞ্জন চক্রবর্তী। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে আশ্রমের সভাপতি অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ রায় ও উৎসব কমিটির সভাপতি প্রেমাংশুশেখর হালদার। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন তাপস ভট্টাচার্য ও শশাঙ্ক দাস।

পরলোকে

এক বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর জীবনাবসান : শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য নিখিলরঞ্জন সেনগুপ্ত গত ১০ জুলাই ২০০১ প্রয়াণ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি উত্তর কলকাতার সরস্বতী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া বহু জনহিতকর কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বিশেষ উল্লেখ্য, ১৯১৮ সালে তিনি শ্রীশ্রীমায়ের কোলে ওঠার সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁর পিতামাতা উভয়েই শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা আরতি চক্রবর্তী গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০১ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য অপূর্বকুমার ভট্টাচার্য গত ৯ ফেব্রুয়ারি ২০০১ পরলোকগমন করেন।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য সত্যেন্দ্রকুমার পাল গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০১ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা নমিতা রুদ্র গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০১ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য কালিদাস রায় গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০১ সকাল ৬টায় প্রয়াণ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৬ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ভুবনমোহন রায় গত ৫ মার্চ ২০০১ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ফণীন্দ্রকুমার পাল গত ৭ মার্চ ২০০১ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। ❑

এক অনন্য জীবনকথা

ট্যান্টিন

দা লাইফ অফ জোসেফিন ম্যাকলাউড

ফ্রেন্ড অফ স্বামী বিবেকানন্দ

প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা



এই অসাধারণ ইংরেজী গ্রন্থটি সমৃদ্ধ হয়েছে 'ট্যান্টিন' জোসেফিন ম্যাকলাউডের স্মৃতিচারণ, আলাপচারিতা, পত্রসম্ভার এবং আত্মকথায়। ভারতবর্ষ এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি জোসেফিনের অসীম শ্রদ্ধা-ভালবাসা 'প্রাচ্য-পাশ্চাত্য', 'নতুন ও পুরনো পৃথিবী'র সকল ভেদরেখাকে অতিক্রম করেছিল। তিনি শুধু স্বামীজীর শিষ্যা ও বন্ধু ছিলেন না, স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর একাত্মতা।

বিশেষ ছাড় ১ এপ্রিল ২০০১ থেকে। মূল্য ১২০.০০ টাকা। পুস্তক বিক্রেতাদের জন্য ৯০.০০ টাকা

ফোন নং ৫৬৪-০৭১২

★ আরো যেখানে পাবেন :
অদ্বৈত আশ্রম, ইনস্টিটিউট অফ কালচার,
উদ্বোধন ও সারদাপীঠের শো-রুম



প্রাপ্তিস্থান :
শ্রীসারদা মঠ
দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৭০০ ০৭৬



সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন

সহৃদয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ অর্থানুকূল্যে আমাদের ভগ্নপ্রায় স্কুলগৃহটি পুনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি।

১।	১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ	ঃ	১,২০,০০০ টাকা
২।	দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
৩।	পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
৪।	আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প	ঃ	১০,০০,০০০ টাকা
৫।	একখানা অ্যাম্বুল্যান্স (Ambulance)	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
			২৬,২০,০০০ টাকা

A/c Payee চেক/ড্রাফট 'Ramakrishna Mission Ashrama, Ramharipur'—এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফট পাঠাবার ঠিকানা—সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা—বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ ঃ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি

স্বামী তত্ত্বজ্ঞানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া

উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ক গ্রন্থাবলী

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা
(দু খণ্ডে) ৭০.০০
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি ১২৫.০০
শ্রীরামকৃষ্ণ
(আলোকচিত্রে জীবনকথা) ১৪০.০০
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ
(দু খণ্ডে) ১৬০.০০
বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ
.... ২২৫.০০
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-প্রসঙ্গ
(সাত খণ্ডে) ২৭৫.০০
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (রঙিন)
১ম ভাগ ১২৫.০০
২য় ভাগ ১০০.০০



শ্রীশ্রীমা বিষয়ক গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীমা ও সপ্তসাধিকা ২০.০০
শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা ২৫.০০
মাতৃসান্নিধ্যে ২৫.০০
জননী শ্রীসারদাদেবী ৩৫.০০
শ্রীশ্রীমায়ের কথা ৭০.০০
শ্রীমা সারদাদেবী ৮০.০০
শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে
(তিন খণ্ডে) ১০০.০০
শ্রীমা সারদা পুঁথি ১০০.০০
শ্রীমা সারদাদেবী
(আলোকচিত্রে জীবনকথা)... ১৪০.০০

শিশুদের গ্রন্থাবলী

শিশুদের বিবেকানন্দ........ ১৭.০০
শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিত্র)
.... ১৮.০০
শিশুদের মা সারদাদেবী (সচিত্র)
.... ২০.০০
শিশুদের নিবেদিতা ২০.০০
ছোটদের সারদাদেবী ২৫.০০
শিশুদের রামায়ণ ২৭.৫০
দেবশিশুদের গল্প শোন.... ৩০.০০
শ্রীকৃষ্ণের গল্প শোন (দু খণ্ডে)
.... ৫৫.০০
মহাভারতের গল্প শোন (চার খণ্ডে)
.... ১৪০.০০



'কথামৃতে'র বিলীয়মান দৃশ্যাবলী

মূল্য : ৩০.০০

'কথামৃত'-এ বর্ণিত সেদিনের গ্রাম্য দৃশ্যাবলী চিত্রে ও বর্ণনায় ধরে রাখা হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে।



মহীয়সী ভারতীয় নারী

শ্রীমা জন্মশতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ

মূল্য : ১৫০.০০

এই অতুলনীয় গ্রন্থটির মুখ্য বিষয়বস্তু হলো—ভারতীয় নারী যুগ যুগ ধরে আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে যে মাতৃত্বের মহান আসনে অধিষ্ঠিতা হয়ে এবং অবিচলিত নিষ্ঠায় নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও সেবার আদর্শ অনুসরণ করে সমাজে যে গঠনমূলক ভূমিকা পালন করে চলেছেন, সেই সত্যের উদ্ঘাটন।



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত মহানির্দেশিকা

মূল্য : ১০০.০০

(উদ্বোধন পুস্তক বিক্রয়কেন্দ্র থেকে ৬০.০০ টাকায় পাওয়া যাবে)

উদ্বোধন প্রকাশিত অখণ্ড 'কথামৃত' বা শ্রীম ঠাকুরবাড়ী প্রকাশিত ৫ খণ্ড 'কথামৃত' উভয়েরই নির্দেশিকার কাজ করবে।

প্রয়োজনীয় স্থানে 'Cross reference' থাকায় শব্দ বা ঘটনা খোঁজা সহজ।

ভারতীয় যেকোন ভাষায় এই ধরনের নির্দেশিকা (Concordane) এই প্রথম।

ব্রহ্ম বিদ্যানুবর্তী সঙ্ঘ

সহৃদয় মানুষের কাছে আন্তরিক আবেদন

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দেশ-বিদেশের অনেক সংস্থাই অসহায় মানুষের কাছে সহৃদয় সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসেন। প্রশংসনীয় সেবাও করেন। কিন্তু এমন অনেক এলাকা রয়েছে যেখানে অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া মানুষ দারিদ্র্য, অশিক্ষা, রোগ ও কুসংস্কারের সঙ্গে লড়াই করে নিত্য বিপর্যয়ের মধ্যে বাস করছেন। বড় বড় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্য এইসব সুদূর এলাকায় পৌঁছায় না।

আমরা মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমার অন্তর্গত এক অনুন্নত এলাকার সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করেছি। তারই অঙ্গ হিসাবে ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি মাধ্যমিক পর্যায়ের আবাসিক বিদ্যালয় এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের একমাত্র শিক্ষাকেন্দ্রটি। এটি নিঃসন্দেহে স্থানীয় জনসাধারণের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ করে অত্যন্ত সফলভাবে এগিয়ে চলেছে। এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা আগামী দিনের জন্য আরো কিছু জনকল্যাণমূলক কাজ হাতে নেওয়ার সঙ্কল্প নিয়েছি—যার মধ্যে রয়েছে শিশু ও মাতৃকল্যাণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, মহিলাদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার কর্মসূচী ইত্যাদি।

আমাদের একান্ত অনুরোধ, আপনিও এই গঠনমূলক কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং সর্বান্তঃকরণে এগিয়ে আসুন।

এই উদ্দেশ্যে প্রদত্ত **আর্থিক দান ১৯৬১ সালের আয়করবিধির ৮০জি ধারানুযায়ী করমুক্ত**। আপনার দান "Brahma Bidyanubarti Sangha NOS Study Centre"-এর অনুকূলে ডিমাণ্ড ড্রাফট অথবা রেখাঙ্কিত চেকে নিম্ন ঠিকানায় পাঠান—

"Brahma Bidyanubarti Sangha"
Tara Ma Tala
Vill.+P.O. : Gangedda
Dist. : Murshidabad, Pin. : 742137, West Bengal
Phone : (03484) 55693

উপরি উক্ত যেকোন বিষয়ে আপনার সুচিন্তিত পরামর্শ সাদরে বিবেচিত হবে।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত
সকল ধর্মপ্রেমী ও দেশহিতৈষী যুবকদের উদ্দেশে আবেদন ঃ

আপনি যদি আধ্যাত্মিক ও জনকল্যাণমূলক কাজ করতে আগ্রহী হন, তাহলে বিনা দ্বিধায় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

আবশ্যিক যোগ্যতা ঃ যেকোন শাখার স্নাতক, সর্বশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে সংযোগস্থাপনে কুশলতা। (অনুরূপ সাংগঠনিক কাজের অভিজ্ঞতা থাকা বাঞ্ছনীয়।)

অস্বচ্ছল পরিবারের মেধাবী ও শিক্ষার্জনে প্রকৃত আগ্রহী ছাত্রদের জন্য আমাদের আবাসিক বিদ্যালয়ে পড়ার ও থাকা-খাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

With Best Compliments From :

DOBSON DISTRIBUTORS

88, DR. ABANI DUTTA ROAD
HOWRAH-711 101
PHONE : 666-1722
TELEFAX : 666-9969

Stockist

Serum Institute, Tablets India Ltd., Wallace Pharmaceuticals Ltd., Eli Lilly Ranbaxy, Pharmacia & Upjohn, Orchid, Caplet, Smith Kline Beecham (Vaccine), Sunny Industries Pvt. Ltd., Midas Care, Arvind (S.K.K.L. Ltd.), Neon Laboratories, Mayer, Trio Pharma

ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, সে কোথায় পড়ে আছে তা দেখেন না। 'ভাবগ্রাহী জনার্দন'।

শ্রীরামকৃষ্ণ

With Best Compliments From :

MODERN GUINEA HOUSE PRIVATE LIMITED

A JEWEL OF JEWELLERS



GOLD, DIAMOND, STONE MERCHANT

208, BIPIN BEHARI GANGULY STREET
(BOW BAZAR) KOLKATA-700 012
Phone : 241-6281/8203

Shop Remain Closed :
Sunday Full & Monday Upto 1.30 p.m.

রামকৃষ্ণ সাহিত্য

শ্রীম-কথিত
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত দাম : ১৫০ টাকা মাত্র
নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ দাম : ৪০ টাকা মাত্র
নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও রেণুকা চট্টোপাধ্যায়ের
শ্রীশ্রীমা সারদা দাম : ৩৬ টাকা মাত্র
তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
শ্রীশ্রীমা ও ডাকাতবাবা দাম : ৩০ টাকা মাত্র
নির্মলকুমার রায়ের
চরণ চিহ্ন ধরে দাম : ৬০ টাকা মাত্র
রবিদাস সাহারায়ের
যুগাবতার রামকৃষ্ণ দাম : ২০ টাকা মাত্র
আমাদের শ্রীমা সারদামণি দাম : ২০ টাকা মাত্র
ভগিনী নিবেদিতা দাম : ২০ টাকা মাত্র
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ দাম : ২০ টাকা মাত্র
দেব সাহিত্য কুটীরের শ্রদ্ধার্ঘ্য
তোমারি হউক জয় দাম : ১৫ টাকা মাত্র
His Divine Footsteps **Rs. 12.00 only**
(Edited by Dev Sahitya Kutir)
Dr. Mamata Kundu's
A Critical Study of Universal Religion of Ramakrishna Paramahansa Rs. 50 only

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড ❑ ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা উর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

With Best Compliments From :

DIAMOND METAL PRODUCTS

Mfg. All Types of Aluminium Pilfer Proof Caps

APOLO ELECTRIC BULB PVT. LTD.
27B/H/13/1, Chaulpatty Road
Kolkata-700010
Tele. : (O) 350-3901/353-1445
Fax : 350-6297
Mfg. ▣ *G.L.S. Lamps & Night Lamps*

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ



শ্রীশ্রী সারদামায়ের
মন্ত্রশিষ্য
ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য
প্রণীত

স্মৃতিমূলক জীবনীগ্রন্থ

- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
- শ্রীশ্রী সারদাদেবী
- স্বামী সারদানন্দের জীবনী
- শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ
- ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা
- প্রেমানন্দ-প্রেমকথা
- জীবন পরিক্রমা



আমাদের প্রকাশিত আরও বিভিন্ন
স্মৃতিমূলক জীবনীগ্রন্থ

বিশ্বনাথ দে
- রবীন্দ্রস্মৃতি

ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত
- বিবেকানন্দ স্মৃতি
- বঙ্কিম স্মৃতি
- রামমোহন স্মৃতি
- মধুসূদন স্মৃতি
- বিদ্যাসাগর স্মৃতি
- নজরুল স্মৃতি
- শরৎ স্মৃতি
- মা টেরেসা
- বায়রণ
- শেলী

শ্রী মোহিত কুমার বসাক
- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্মৃতি
- অরবিন্দ স্মৃতি
- নিবেদিতা স্মৃতি
- কিশোর শহীদ স্মৃতি
- সুভাষ স্মৃতি

সুবোধ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
- সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন
- *The Early life of Netaji*

সমর গুহ
- নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা
- *Netaji Dead or Alive*





ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
☎ ২৪১-০৯৬৫ / ৯৪০৪

ওরিয়েন্টের পুনঃপ্রকাশিত বই

- ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
  বাংলার বাউল ও বাউল গান ৮০০৲
- প্রমদারঞ্জন ঘোষ
  শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা ও জীবন-দর্শন ৮০৲
- রত্নমণি চট্টোপাধ্যায়
  আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা ৮০৲

ওরিয়েন্টের প্রকাশিত বই

- ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
  রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ২৭৫৲
  রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা ১৬০৲
- ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
  ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস ৮০৲
  বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা ১০০৲
  (আদি ও মধ্যযুগ)
  বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা ৯০৲
  (আধুনিক যুগ)
  রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা, ১ম খণ্ড ১০০৲
  রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা, ২য় খণ্ড ২০০৲
- ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত
  সাহিত্যের স্বরূপ ১৫৲
  বাংলা সাহিত্যের একদিক ৬০৲
  বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি ৪০৲
- প্রমথনাথ বিশী
  রবীন্দ্র-নাট্য-প্রবাহ ১২৫৲
- ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল
  রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা ২০৲
- ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
  নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ২০৲
- অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী
  ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ৭৫৲
- সম্পাদনা ঃ ডঃ অরুণকুমার বসু
  মেঘনাদবধ কাব্য—
  মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১ম-৪র্থ সর্গ)
  একেই কি বলে সভ্যতা—
  মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৩০৲
- সম্পাদনা ঃ পবিত্র সরকার
  জনা ৪০৲
- সম্পাদনা ঃ প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
  পালামৌ—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৩০৲
  চরিতকথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৩৫৲
- ডঃ অমিয়কুমার সামন্ত
  প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর ১০০৲
- রোমাঁ রোলাঁ
  রামকৃষ্ণের জীবন ৫০৲
  বিবেকানন্দের জীবন ৫০৲
  রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ ২৫৲

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন
ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

একটি আবেদন

জয়শ্রী পার্ক উদ্‌ভাস স্প্যাসটিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি বেহালা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের মানবিক সহায়তায় উৎসর্গিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থাটির পরিচালনায় আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী অভিভাবক-অভিভাবিকারা। এই রেজিস্টার্ড সংস্থাটি বিগত ১৯৯৫ সাল থেকে বেহালা অঞ্চলে কর্মরত। বেলুড় মঠের পরম পূজনীয় প্রেসিডেন্ট মহারাজ এবং অন্যান্য মহারাজদের অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদ-ধন্য এই জনকল্যাণমূলক সংস্থাটির উদ্দেশ্য ১০/১২টি ছেলেমেয়ের জন্য একটি আবাসিক গৃহ নির্মাণ এবং তৎসহ একটি সহায়তামূলক বহির্বিভাগ স্থাপন। জমিক্রয়-সহ এই উদ্দেশ্যে গৃহনির্মাণ প্রকল্পের প্রাথমিক পর্যায়ে আনুমানিক ব্যয় ১০ লক্ষ টাকা।

"শিবজ্ঞানে জীবসেবা"র ভিত্তিতে এই প্রকল্পে সকলের সক্রিয় সহযোগিতার জন্য সোসাইটির পক্ষ থেকে আবেদন জানাই। সহৃদয় দাতাগণের দান শ্রীশ্রীঠাকুরের পরম অনুগ্রহস্বরূপ গৃহীত হবে।

যেকোন আর্থিক সহায়তা 'Jayshree Park Udbhas Spastic Welfare Society'-র অনুকূলে অ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক বা ড্রাফটে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানাই। দাতাগণের নাম এবং দানের অঙ্ক আমাদের বাৎসরিক স্যুভেনীর-এ প্রকাশিত হবে।

আগমনী মুখার্জী
সম্পাদিকা

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
বি ২৯/১, জয়শ্রী পার্ক, কলকাতা-৩৪
ফোন ঃ ৪৬৮-২৮৭৩

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments From :

AUTO REXINE AGENCY

House of Car Decoration

Specialist in Car-Air Conditioner

Office & Show Room :

31/A, Lenin Sarani, Kolkata-700 013

163, Lenin Sarani, Kolkata-700 013

Branch :

71A, Park Street, Kolkata-700 013

Phone : 244-1764/2184, 237-5435

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বাদশ সঙ্ঘগুরু

পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের

জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

* শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ও ভক্তদের স্মৃতিচারণ (১০৮টি উপদেশ-সহ) — ৩০্
* স্বামী ভূতেশানন্দ-মহাতীর্থ পরিক্রমা — ৬৫্
* স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের পত্রাবলী প্রসঙ্গ (১ম ও ২য় খণ্ড) — ৪৫্ ও ৩০্
* ভক্তসঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ — (যন্ত্রস্থ)
* ভক্তসঙ্গে সহাস্য স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ — (যন্ত্রস্থ)
* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও আধুনিক বিজ্ঞান — ৩০্
* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান — ৪০্
* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও প্রার্থনা — ২০্
* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সাহিত্যে প্রবাদ, প্রবচন ও দেববাণী প্রসঙ্গ (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) — ৩০্ (প্রতিটি)
* শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও গীতাতত্ত্ব — ২০্
* আমাদের নরেন—আমাদের সর্বস্ব — ৩০্

প্রকাশক : শ্রীমতী পার্বতী চক্রবর্তী

রানীসায়র, উত্তরপাড়, বর্ধমান-৭১৩১০১, ফোন : ৯৫৩৪২-৫৬১৪৪৯

❋ প্রাপ্তিস্থান ❋

ডঃ অরুণকুমার চক্রবর্তী, এম. বি. বি. এস. (ক্যাল), এম. আর. সি. পি. (লণ্ডন)

রানীসায়র, উত্তরপাড়, বর্ধমান-৭১৩১০১, ফোন : ৯৫৩৪২-৫৬১৪৪৯

শ্রীদিলীপ পাল, ফোন : ৫৫৪-৫৯১৮

নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের ওপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

❋

হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

❋

মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে, তার বিকাশই ধর্ম।

স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments From :

UTILITY INDUSTRIES & CHEMICAL WORKS

19Y, Raja Manindra Road, Kolkata-700037

Phone : 556-5543/6459

&

ASIMCO

22, Amalangsu Sen Road, Kolkata-700048

Phone : 556-5351/5543

Manufacturers of Phenyle. I.S.I., Lysol. I.P., Soaps, Antiseptic Lotions & Purified Water. I.P.

Dealers in all sorts of Medicines, Pharmaceuticals & Laboratory Chemicals.

সেরা ফলন দেদার লাভ

লালন সুপার ফসফেট সার



প্রস্তুতকারক :

সারদা ফার্টিলাইজার্স লিঃ

২, ক্লাইভঘাট স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০ ০০১

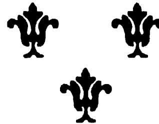
ফোন নং { অফিস : ২২০-৫৪৩৫ / রেসি. : ৩৩৭-৭৩৬৫ / মোবাইল : ৯৮৩১০-১৯২৬৬

Haran Chandra Banerjee & Sons.

7C, CLIVE ROW, CALCUTTA-700 001

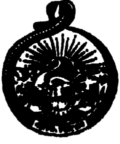
PAPER MERCHANTS, STATIONERS AND GOVT. SUPPLIERS

Phones : Office : 220-1700
Resi. : 665-9075



Distributors for :

TITAGHUR PAPER MILLS CO. LTD.
BENGAL PAPER MILLS CO. LTD.
SUPREME PAPER MILLS CO. LTD.
SIMPLEX MILLS CO. LTD.



রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম

বৃন্দাবন, মথুরা, উত্তর প্রদেশ-২৮১১২১



রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন



সেবাশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে (১৯৬২) জওহরলাল নেহরু এবং স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ

একটি আবেদন

যুগপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে তীর্থস্থানের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে জীবনের শেষদিনগুলি অতিবাহিত করবার সঙ্কল্প করেছিলেন, শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের তপস্যাপূত সেই অতি প্রাচীন ও সনাতন ঐতিহ্যমণ্ডিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনধামে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র বাস্তব ও প্রত্যক্ষ রূপায়ণের জন্য ১৯০৭ সালে সূচনা হয়েছিল এক ক্ষুদ্র কর্মযজ্ঞের। যার ফলশ্রুতি আজ প্রায় ১৫১ শয্যাবিশিষ্ট 'মানুষের সেবাই ঈশ্বরের পূজা'-রূপ এক বৃহৎ মানবসেবা কেন্দ্র বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম।

সেবাশ্রমের সেবাকার্যের মধ্যে ১৫০টি শয্যাবিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসপাতালের ইন্ডোর ও আউটডোর বিভাগ ছাড়াও একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাবিভাগ, বিনা খরচে গরিব মেয়েদের ৩ বছরের নার্সিং ট্রেনিং, কুষ্ঠরোগী, দুঃস্থ ছাত্র, গরিব বিধবাদের নিয়মিত নানাপ্রকার সাহায্য করা হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবাশ্রমটি বৃন্দাবন তীর্থধামের অসহায় যাত্রিসাধারণ, ব্রজমণ্ডল ও দূর-দূরান্তের গ্রামবাসী এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সমস্ত রোগী-নারায়ণের একমাত্র ১০০% নিঃশুল্ক চিকিৎসাস্থান যা কোনরকম সরকারি সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র ভক্তদের দান দ্বারাই চলে।

মা ও শিশুদের ভালভাবে দেখাশুনা ও নার্সদের এব্যাপারে ভালভাবে প্রশিক্ষণের জন্য ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের নির্দেশে ৩০ শয্যার স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ম্যাটারনিটি ওয়ার্ড তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এব্যাপারে সমাজের সহৃদয় সর্বস্তরের মানুষ ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগীদের কাছে এই নিঃশুল্ক সেবাকার্য অব্যাহত ও সুসম্পন্ন করার জন্য আর্থিক সহযোগিতার আবেদন করছি।

৩০ আসনবিশিষ্ট নতুন প্রসূতিসদন নির্মাণব্যয়	৬০ লাখ
যন্ত্রপাতি	২০ লাখ
অপারেশন থিয়েটারের সংযোজন ও পুনর্নির্মাণ	১০ লাখ

আমাদের বিশ্বাস সর্বস্তরের মানুষের সহানুভূতি, সহযোগিতা ও বদান্যতায় মিশনের এই নিঃশুল্ক সেবাকার্য কালে মহীরুহ হয়ে উঠবে। সেবাশ্রমে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত।

নার্সিং স্কুলের প্রসপেক্টাস ১ এপ্রিল থেকে দেওয়া হয়। এছাড়া কোন সহৃদয় অবসরপ্রাপ্ত/প্রাক্তন Army Doctor এই সুন্দর পরিবেশে থেকে স্বেচ্ছাসেবিরূপে অথবা কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমাদের সেবাব্রতে অংশগ্রহণ করতে চাইলে তাঁর/তাঁদের উদ্দেশে আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

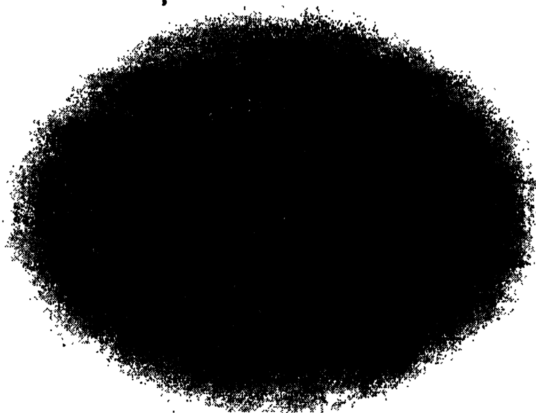
আর্থিক দান চেক বা ড্রাফটে পাঠালে 'Ramakrishna Mission Sevashram, Vrindaban'—এই নামে পাঠাতে হবে।

বিনীত নমস্কারান্তে

স্বামী সুপ্রকাশানন্দ

অধ্যক্ষ

With Best Compliments From :



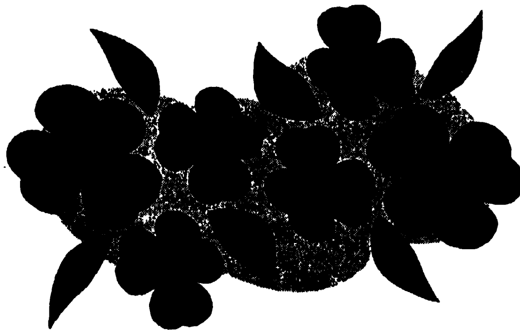
M/s. BAJRANGLAL ANIL KUMAR

K2-L1, TIWARI BECHAR COMPLEX
2ND FLOOR, MAIN ROAD
BISTUPUR
JAMSHEDPUR-831 001
TEL : 0657-433457/432926



All the secret of success is there : to pay as much attention to the means as to the end.

Swami Vivekananda





DATTA FOOTWEAR INDUSTRIES PVT. LTD.

Regd. Office & Factory :

1, BIDHAN SARANI, KOLKATA-700 073

PHONE : 241-5248 ❑ FAX : (033) 241-7541

Unit-II

180, EAST SINTHI ROAD, KOLKATA-700 030

PHONE : 548-4500



জেলাভিত্তিক 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৪

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

হুগলী

- রামকৃষ্ণ মঠ, আঁটপুর
- শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, ৭০ প্রফুল্ল চাকী রোড, কোতরং
- শ্রীরামকৃষ্ণ মনন সভা
  ১৫৬ এস. সি. চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোন্নগর, পিন : ৭১২২৩৫
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ
  গ্রাম+পোঃ পুইনান, পিন : ৭১২৩০৫
- স্বামী উমেশানন্দ, অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম
  কুণ্ডুঘাট, বাঁশবেড়িয়া-৭১২৫০২
- মোহিতকুমার বর্মণ, সম্পাদক, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  বিদ্যুৎপল্লী, সিঙ্গুর, পিন : ৭১২৪০৯, ফোন : ৬৩০-০৪৩৯
- ডঃ চিন্ময়ী নন্দী
  (স্টেট ব্যাঙ্কের পিছনে), পোঃ ডানকুনি, পিন : ৭১১২২৪
- মনীষা নন্দী, প্রযত্নে দেবজিৎ নন্দী
  স্টেশন রোড, পোঃ ডানকুনি, পিন : ৭১১২২৪
- সুশান্ত মাইতি
  প্রযত্নে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালিকা আশ্রম (কামাক্ষাতলা)
  মির্জাপুর পশ্চিমপাড়া, সিঙ্গুর, পিন : ৭১২৪০৯
  ফোন : ৬৩০-০৭০৯
- হরনারায়ণ বিশ্বাস
  ৫ রাজেন্দ্র অ্যাভেনিউ প্রথম লেন, উত্তরপাড়া, পিন : ৭১২২৫৮
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার
  প্রযত্নে অজিতকুমার মুখার্জী, ৬৪/জি ডঃ সরোজ মুখার্জী স্ট্রীট
  উত্তরপাড়া, পিন : ৭১২২৫৮, ফোন : ৬৬৩-৮৫২৬
- গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ কুটীর
  ১০৩/২, বি. কে. স্ট্রীট, উত্তরপাড়া
  পিন : ৭১২২৫৮ ফোন : ৬৬৩-৭০৪৬
- বরুণকুমার চক্রবর্তী, সম্পাদক, শ্রীবিবেকানন্দ সঙ্ঘ
  ত্রিবেণী কেন্দ্র, গ্রাঃ বৈকুণ্ঠপুর, পোঃ ত্রিবেণী
  পিন : ৭১২৫০৩, ফোন : ৮৪৬২৮৪
- অশোক ব্যানার্জী (দেবু)
  শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠচক্র, পীরতলা, শিয়াখালা।
- দীপশিখা ঘোষ, সম্পাদিকা, মাঙ্গলিক মহিলা মহল
  জনাই, পিন : ৭১২৩০৪, ফোন : ৯১১২-৪৪১১৪
- গরলগাছা বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র, গ্রাম+পোঃ গরলগাছা, মান্নাপাড়া
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, গ্রাম+পোঃ ভাঙ্গামোড়া, পিন : ৭১২৪১০
- স্বপন মুখোপাধ্যায়
  সম্পাদক, শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ
  ১৩বি, সান্যাল লেন, পোঃ শ্রীরামপুর
  পিন : ৭১২২০১, ফোন : ৬৬২-৬৬৭৮
- কল্পতরু বিবেকানন্দ যুব উন্নয়ন কেন্দ্র
  তারকেশ্বর, পিন-৭১২৪১০
- নিকুঞ্জবিহারী দাস, কোঁচাটি, পোঃ ত্রিবেণী, পিন-৭১২৫০৩
- শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ
  ৩০৫, নারায়ণ রায়ের বেড়, ঝিঙ্গেপাড়া, পিন-৭১২১০৩

নদীয়া

- রামকৃষ্ণ আশ্রম, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বঙ্কিমনগর, হালালপুর-৭৪১২০১
- রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, চাকদহ-৭৪১২২২
- বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন, চাকদহ-৭৪১২২২
- রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, ব্লক-বি, সিভিক সেন্টার
  কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি, এ-৮/৪৫৬, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- ছায়া ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ নিকেতন
  বি-৪/৪৬৬, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- রামকৃষ্ণ সারদা কুটীর, প্রযত্নে অসীমকুমার দে
  নলুয়া পাড়া, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র, প্রযত্নে স্বপনকুমার ভৌমিক
  ৩৫ বেঁজেখালি লেন, নূতন পল্লী, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০৯
- শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাসঙ্ঘ, রানাঘাট-৭৪১২০১
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ
  পোঃ বগুলা, পিন-৭৪১৫০২

বীরভূম

- বোলপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্দ্র
  পৌর বাণিজ্যিক সদন (বাস স্ট্যান্ড), স্টল নং ৫
  পিন-৭৩১২০৪
- আকালীপুর রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, ভদ্রপুর-৭৩১২০৩
- মিলন দাস, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ
  চৈতালি মার্কেট, সিউড়ি-৭৩১১০১
- ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী, প্রযত্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  সাঁইথিয়া (কলেজ রোড), সাঁইথিয়া-৭৩১২৩৪

মুর্শিদাবাদ

- শান্তশ্রী, বেলডাঙ্গা সারদা রামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  আশ্রমপাড়া, বেলডাঙ্গা, পিন-৭৪২১৩৩

বাঁকুড়া

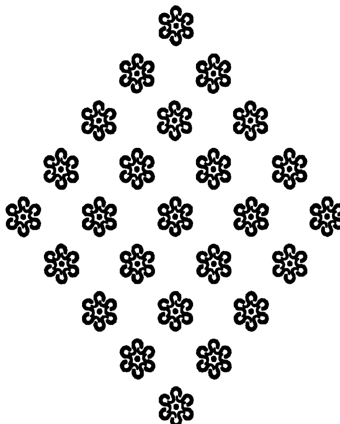
- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, পিন-৭২২২০৩
- শ্রীমা সারদা পাঠচক্র, কোতুলপুর-৭২২১৪১
- উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়
  'অঙ্কন', স্টল নং-২, মোহনবাগান মার্কেট, পিন-৭২২১০১
- বিষ্ণুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
  প্রযত্নে নিমাই মুখোপাধ্যায়, বৈলাপাড়া, কলেজ রোড
- ডঃ সুনির্মল বেরা
  প্রযত্নে সারেঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি
  সারেঙ্গা, পিন-৭২২১৫০

সৌজন্যে
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ
৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯

With Best Compliments From :

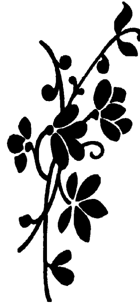
H. K. GHOSE & CO.

Paper Merchants & Exercise Book Makers



WARDLEY HOUSE
25A, SWALLOW LANE, KOLKATA-700 001
PHONE : 220-5209

With Best Compliments From :



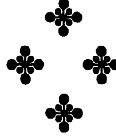
B. S. SUNDARIYA & SONS

146/2, OLD CHINA BAZAR STREET
CALCUTTA-700 001

PHONE : 242-4867

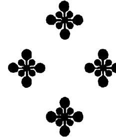
রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে যায়। অবতারেরাও সেইরকম সহস্র সহস্র লোকেদের ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ



মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার দিকে এগোতে চায় না। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আন্তরিক খুব যত্ন ও রোখ চাই।

শ্রীমা সারদাদেবী



যে-দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয়, সে-দেশ ক্রমশ ধর্মহীন হইয়া দাঁড়ায়। ভারতে কখনো এরূপ চেষ্টা হয় নাই। সেইজন্য এখানে প্রকৃত ধর্মভাব এখনো জাগ্রত।

স্বামী বিবেকানন্দ





শক্তিশালী প্রতিরক্ষা



পিয়ারলেস এনক্যাশ বন্ড

২½ বৎসর মেয়াদী একটি ফিক্সড ডিপোজিট যোজনা

ব্যক্তি, বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, ট্রাস্ট, কো-অপারেটিভ সোসাইটি - সকলের জন্যই বাজারের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় প্রকল্প

ভারতবর্ষের যেকোনো ব্রাঞ্চে ভাঙ্গানো যায়

মেয়াদ	সুনিশ্চিত ক্রমবর্দ্ধমান প্রাপ্তি	জমারাশি
২½ বৎসর	• ১ম বৎসর - ৮.৫% • ২য় বৎসর - ৯.৫% • ২য় বৎসরের পর - ১০.৫%	ন্যূনতম : ১০,০০০ টাকা এবং ৫,০০০ টাকার গুণিতকে যেকোনো উর্দ্ধরাশি

মূল বৈশিষ্ট্যগুলি :

- গ্যারান্টীযুক্ত ক্রমবর্দ্ধমান প্রাপ্তি
- ২ মাস পরে ঋনের সুবিধা (জমারাশির ৭৫% পর্য্যন্ত)
- ১২ মাস পরে যেকোনো সময় টাকা তোলার সুবিধা
- বিনামূল্যে দূর্ঘটনাজনিত মৃত্যুবীমার সুযোগ (ব্যক্তির ক্ষেত্রে) *
- বিনামূল্যে পিয়ারলেস সেভিংস কার্ড * — যা থাকলে ২২০০ টিরও বেশী সংস্থা দিচ্ছে তাদের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয়ে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট

** শর্তসাপেক্ষে*

ম্যাচিওরিটি দাবীপূরণের মোট পরিমাণ : প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকা

বিশদ জানতে আপনার নিকটবর্ত্তী যেকোনো পিয়ারলেস অফিসে যোগাযোগ করুন



® পিয়ারলেস

সঞ্চয়ের সহজ পথ

★

আস্থার প্রতীক

Estd. 1932

Website-http://www.peerless-in-india.com

গত আর্থিক বৎসরে নতুন গ্রাহক সংখ্যা : প্রায় ২০ লক্ষ

ARUN SIGN : PGFI

This is further to the statutory advertisement published in THE ASIAN AGE on 10.04.2001

UDBODHAN
Phone : 554-2248, 554-2403
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com

Vol. 103 ❑ No. 8
❑ AUGUST 2001 ❑

Licensed to Post Without Prepayment
Licence No.
TECH/WB/RNP-15/LPWP-01/2001

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Regn. No.
TECH/WB/RNP-15/2001

উদ্বোধন

১০৩তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র



❑ গত ১লা মাঘ ১৪০৭ (১৫ জানুয়ারি ২০০১) **উদ্বোধন ১০৩তম বর্ষে** পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় **নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের ১০২ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম** ❑

❑ **বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন** একটি ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র মাত্র নয়, **উদ্বোধন** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। **ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে এবং রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন** ও **রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের** সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের** একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তে হবে।

❑ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে **উদ্বোধন** নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন** একটি সার্থক **পারিবারিক পত্রিকা**। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন**-এ প্রকাশিত হয়।

❑ **উদ্বোধন** শুধু **বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা নয়, উদ্বোধন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ পত্রিকা এবং বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক পত্রিকা।**

❑ ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র হয়েও **উদ্বোধন** তার মহান প্রবর্তকের নির্দেশ অনুসারে **কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আদর্শের মুখপত্র নয়। উদ্বোধন** তার **সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বিগত ১০২ বছর ধরে অটুট রেখেছে।**

❑ **উদ্বোধন**-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার **গ্রাহক** হওয়া নয়, একটি **মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের** সঙ্গে যুক্ত হওয়া।

❑ **উদ্বোধন** একটি পত্রিকা মাত্র নয়, **উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর।**

❑ **স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে। উদ্বোধন-এর প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে গ্রাহক করলেই এখনি উদ্বোধন-এর গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার হয়ে যায়।** তাই আপনার **নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করাও** আপনার কাছে **স্বামীজীর প্রত্যাশা।** স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের **গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের।** অবশ্য **ইন্টারনেট সংস্করণের** মাধ্যমে **উদ্বোধন** আজ **ভারত ও বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে।**

❑ **স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।** সেকথা স্মরণ করে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে অনুরাগী ও ভক্তগণ **উদ্বোধন**-এর প্রতি নিশ্চয়ই তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

❑ **উদ্বোধন-এর শারদীয়া সংখ্যাটির** জন্য **গ্রাহকদের থেকে আলাদা মূল্য নেওয়া হয় না।** এই সংখ্যাটি গ্রাহকদের জন্য আমাদের শারদ উপহার। প্রসঙ্গত সকলের অবগতির জন্য জানাই যে, **শারদীয় সংখ্যাটি** আকারে সাধারণ সংখ্যার তিনগুণ এবং **বিশেষ সংখ্যা** হওয়ায় অলঙ্করণের জন্য খরচও হয় যথেষ্ট। **গত কয়েক মাসে কাগজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং অন্যান্য ব্যয়বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শারদীয়া সংখ্যা** সহ **গ্রাহক-পিছু আমাদের বার্ষিক খরচ দাঁড়িয়েছে মুদ্রিত গ্রাহকমূল্যের সওয়া তিন গুণ।** বিশাল অঙ্কের এই অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য আমরা নির্ভর করি সহৃদয় বিজ্ঞাপনদাতাদের সক্রিয় সহযোগিতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক বদান্যতার ওপর।

❑ **পত্রিকা প্রকাশ** সংক্রান্ত **ব্যয় প্রতি বছর** বেড়ে গেলেও **তিন বছর (১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০১)** 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। **এত সুলভ মূল্যে এমন সম্পূর্ণ পত্রিকা বাঙলা ভাষায় আর একটিও নেই।**

❑ **উদ্বোধন**-এর সেবায় তিনটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি **'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল'**, অন্য দুটি যথাক্রমে **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** এবং **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'। উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 'Ramakrishna Math, Baghbazar'—এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা : সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।** দাতার চিঠিতে বা M.O. কুপনে **'উদ্বোধন পত্রিকার সেবায়'** অথবা **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** অথবা **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'**-এর জন্য যেন লেখা থাকে।

❑ **উদ্বোধন-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে** মতিলাল-তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাঁদের পুত্রকন্যাদের পক্ষে **স্থায়ী ভিত্তিতে 'উদ্বোধন মেধা সম্মান' (একবছরের জন্য উদ্বোধন-এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি)** নিবেদিত হয়েছে। **পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায়** প্রথম **২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের** যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। **২০০১ সালের** জন্য অনুরূপ **সম্মান** সুকুমার-বিভারানী পাড়ুই-এর স্মৃতিতে তাঁদের পুত্র অমর পাড়ুই নিবেদন করেছেন। **এই সম্মানপ্রাপকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্ষদ পরিচালিত ২০০০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় 'সম্মান'-এর জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বোধন-সম্পাদকের সঙ্গে** যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বামী সর্বগানন্দ
সম্পাদক

সৌজন্যে

পি. বি. সরকার অ্যান্ড সন্স

(কোন ব্রাঞ্চ নেই)

জুয়েলার্স

সন অ্যান্ড গ্র্যান্ড সন্স অব লেট বি. সরকার

৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০ ❑ ফোন : ২২৩-৮৭১৩, ২২৩-৭৫৭৮

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক : স্বামী সর্বগান

দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

উদ্বোধন

॥ ১০৩ ॥

LIBRARY
3 OCT 2001



শারদীয়া সংখ্যা

১৪০৮ • ১০৩তম বর্ষ • ৯ম সংখ্যা

[illegible] কার্যালয় • কলকাতা



"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান —পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে —গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

আনন্দবাজার পত্রিকা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১



মুক্ত হয়ে চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচ মেটান ।

আপনি জানেন না যে কখন অসুস্থতার আঘাত আসবে। তাই আজই নিন এলআইসি'র হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্ল্যানস আশাদীপ-II এবং জীবন আশা-II। এগুলি আপনার চিকিৎসার খরচ খরচার ব্যাপারে সঠিক যত্ন নেবে আর সঙ্গে সঙ্গে আপনি আর্থিক সমৃদ্ধিও পাবেন।

আশাদীপ (II)-(লাভ সহিত)
সারণী নং 121
সুবিধালাভ :*

(ক) দুর্ভাগ্যবশতঃ পলিসিধারকের ক্যান্সার (মারাত্মক), হৃৎপেশী ধমনীর রোগের সঙ্গে জড়িত বাইপাস সার্জারি, পক্ষাঘাতজনিত স্ট্রোক বা উভয় কিডনীর অকেজোতার শিকার হলে :
- আশ্বাসিত অর্থরাশির 50% অবিলম্বে দেওয়া হবে।
- পরবর্তী প্রিমিয়ামগুলি মকুব করা হবে।
- মেয়াদপূর্তির তারিখ বা মৃত্যু যেটি আগে হবে পর্যন্ত বছরগুলিতে প্রতি বছর আশ্বাসিত অর্থরাশির 10% দেওয়া হবে।
- আশ্বাসিত অর্থরাশির অবশিষ্ট 50% এবং কায়েমী বোনাসসমূহ (আশ্বাসিত পূর্ণ অর্থরাশির উপর) মেয়াদপূর্তি বা মৃত্যু, যেটা আগে হবে তখন দেওয়া হবে।

(খ) সৌভাগ্যবশতঃ যদি পলিসিধারক উপরোক্ত রোগগুলির দ্বারা আক্রান্ত না হন মেয়াদপূর্তিতে বা আকস্মিক মৃত্যু যেটা আগে হবে তখন কায়েমী বোনাসসমূহ সমেত আশ্বাসিত পূর্ণ অর্থরাশি দেওয়া হবে।

জীবন আশা II-(লাভ রহিত)
সারণী নং 131
সুবিধালাভ :*

- সুনির্দিষ্ট শল্যচিকিৎসা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আশ্বাসিত অর্থরাশির 20% বা 50% (যোগ্যতা অনুসারে) দেওয়া হবে।
- প্রতি 2 বছরের শেষে নির্দিষ্ট সময়কাল অন্তর নেওয়া হিসেবে আশ্বাসিত অর্থরাশির 2%, যার প্রথম কিস্তি শুরু হবে পলিসি নেওয়ার 3 বছর পরে বা পরবর্তী তারিখে জরুরি হিসেবে একটা বর্ধিত এককালীন থোক অর্থরাশি প্রাপ্ততার বিকল্প আছে।
- মেয়াদপূর্তিতে, সম্পূর্ণ হওয়া প্রতি পলিসি বছরের জন্যে প্রতি হাজার আশ্বাসিত অর্থরাশিতে 70 টাকা হারে গ্যারেন্টিযুক্ত অতিরিক্ত এবং আনুগত্য অতিরিক্ত সমেত, যদি কিছু থাকে আশ্বাসিত অর্থরাশি দেওয়া হবে। তবে পূর্বে নির্দিষ্ট সময়কাল অন্তর গ্রহণ করা এবং শল্যচিকিৎসা প্রক্রিয়ার সুবিধালাভে নেওয়া কোনও অর্থরাশি থাকলে তাহা কাটা যাবে।
- মৃত্যু হলে, গ্যারেন্টিযুক্ত অতিরিক্ত এবং আনুগত্য অতিরিক্ত সমেত, যদি কিছু থাকে আশ্বাসিত পূর্ণ অর্থরাশির তাহলে তাহা পূর্বে দেওয়া অর্থরাশির নির্বিশেষে প্রদান করা হবে।

• নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে দুর্ঘটনাজনিত সুবিধালাভ পাওয়া যায়।

- যোগদানের বয়স : 18 থেকে 50 বছর (মেয়াদ পূর্তিতে সর্বোচ্চ বয়স – 65 বছর)
- পলিসির সময়সীমা 15, 20 এবং 25 বছর
- আশ্বাসিত অর্থরাশি : ন্যূনতম - 50,000 টাকা, সর্বোচ্চ - 5,00,000 টাকা।

বিশদ জানতে আপনার নিকটবর্তী এলআইসি শাখা বা এজেন্টের সহিত যোগাযোগ করুন।


লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া
Please visit www.licindia.com

Insurance is the subject matter of the solicitation

* এইসব প্ল্যানের সুবিধালাভের ওপর প্রথম বছরে বাধানিষেধ প্রযোজ্য।



রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ

পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া-৭১১ ২০২ ● ফোন : ৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ ● বৈদ্যুতিন ডাক : rmsppp@vsnl.com

সারদাপীঠ থেকে প্রকাশিত অডিও ক্যাসেটসমূহ

মূল্য ❑ SP-1 ও SP-31–34 : ৩৫ টাকা, অন্যান্য : ৩০ টাকা

SP-1	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্	সংস্কৃত ও বাঙলা
SP2, SP-7, SP-8, SP-10–12	কথামৃতের গান (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড)	বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি
SP-3	শ্রীরামনামসংকীর্তন	সংস্কৃত ও হিন্দি
SP-4	বক্তৃতা—যুগপুরুষ	বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত
SP-5	শ্রীশ্রীচণ্ডীস্তব (আবৃত্তি : স্বামী সর্বগানন্দ)	বাঙলা, সংস্কৃত
SP-6	শিবমহিমা	বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি
SP-9	শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি
SP-13	শ্রীসারদাবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা
SP-20	বিবেকানন্দবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা
SP-24	শ্রীকৃষ্ণবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি
SP-14–16	কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)	বাঙলা
SP-17	বীরবাণী	সংস্কৃত, বাঙলা, ইংরেজী ও হিন্দি
SP-18	গীতিবন্দনা	হিন্দি
SP-19	বক্তৃতা—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান	বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত
SP-21–22	সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড)	হিন্দি
SP-23	ওঠো জাগো	হিন্দি
SP-25	শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি	হিন্দি
SP-26	বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি	হিন্দি
SP-27	বেদমন্ত্র (আবৃত্তি : স্বামী সর্বগানন্দ)	সংস্কৃত উপনিষদের মন্ত্রসমূহ
SP-28	সরস্বতী বন্দনা	বাঙলা, সংস্কৃত
SP-29 &	**Ramakrishna Movement**	Lecture by Swami Bhuteshanandaji Maharaj, 12th President, Belur Math
SP-30	**Religion in Practice**	do
SP-31–34	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (আবৃত্তি : স্বামী সর্বগানন্দ) (১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড)	মূল সংস্কৃত এবং প্রতি অধ্যায়ের মুখবন্ধ
SP-35	আগমনী	বাঙলা
SP-36	ভজন সুধা	হিন্দি
SP-37	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-অষ্টোত্তর শতনাম	(স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখিত)

কম্প্যাক্ট ডিস্ক / মূল্য প্রতিটি ১৫০ টাকা

Cd/SP-1	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্	(সান্ধ্য আরাত্রিক ভজন, গুরুবন্দনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষ্ণ শরণম্)
Cd/SP-3	শ্রীরামনামসঙ্কীর্তন	রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি দিনে গাওয়া হয় (সংস্কৃত ও হিন্দি)
Cd/SP-31–34	শ্রীমদ্ভগদ্গীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ)	(সংস্কৃত) (সুরে আবৃত্তি ১ম—১৮শ অধ্যায়)

স্বামী সর্বগানন্দ, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ, স্বামী দিব্যব্রতানন্দ, শ্রীমহেশরঞ্জন সোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য দক্ষ শিল্পিগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন।

প্রাপ্তিস্থান : বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি (কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক)

ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে M.O. অথবা Bank draft মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে।

Video Cassette : Centenary Celebration of the Ramakrishna Mission at Belur Math in 1998. Duration—80 minutes Rs. 250.00

প্রতি বছর ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত বিশেষ ছাড়



রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্য

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় সঙ্গীত, পৃ: ৪৮৪ (প্রাসঙ্গিক তথ্য সহ ৪৪টি গানের সংকলন ও ২০টি গানের স্বরলিপি) —সং: স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ৫০

শতরূপে সারদা, পৃ: ৮৬৪ সং: স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ১৪০

সঙ্গীতকল্পতরু [স্বামী বিবেকানন্দের (নরেন্দ্রনাথ দত্তের) সংকলিত এটি ১১২ বছর পরে পুনঃপ্রকাশিত—মোট ৬৪৭টি গান] ২০০

বিবেকানন্দের বেদান্ত চিন্তা, পৃ: ২৮০ —দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী ৫০

দেবলোকে, পৃ: ৩০৪ (শ্রীশ্রীমা ও কয়েকজন সন্ন্যাসী পার্ষদের স্মৃতিকথা) স্বামী অপূর্বানন্দ ৫০

চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, পৃ: ১১০০ —সং: স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ১৭৫

শ্রীশ্রীসারদাদেবী : আত্মকথা, পৃ: ১৩৮ —অভয় দাশগুপ্ত ২৫

আমার ভারত অমর ভারত (ছাত্র ও যুব-সমাজের উপযোগী সংকলন) —স্বামী বিবেকানন্দ ২৫

নিজমুখে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও উপলব্ধি, পৃ: ২৩০ —অভয় দাশগুপ্ত ৩০

পূর্ণযোগী শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃ: ৯২ —দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী ১৫

শাস্ত্র

তত্ত্বচিন্তামণি, পৃ: ১১৮—শ্রীবিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য ৩০

বেদান্ত পরিভাষা, পৃ: ২২৫ —শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য ১০০

শব্দ শাস্ত্রের ইতিহাস, পৃ: ৭০৮ (সংস্কৃত, পালি এবং প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ ও শব্দকোষের ইতিহাস)—কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত ২০০

খণ্ডনখণ্ডখাদ্যম্ (সংস্কৃত), পৃ: ২২৮ —শ্রী শ্রীমোহন ভট্টাচার্য ৫০

সুলভ মূল্যের বই

বিশ্ববরেণ্য শ্রীরামকৃষ্ণ, পৃ: ৫২ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ৪

যুবনায়ক বিবেকানন্দ, পৃ: ৭৬ স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ২

পরিব্রাজক স্বামীজী : দেশে ও বিদেশে ৮ (বিদেশে প্রচার ও ভারত-পরিক্রমা), পৃ: ১১৬

বিবেকানন্দের ভারত-প্রত্যাবর্তন, পৃ: ৪৮ ৮

ভারতের নিবেদিতা, পৃ: ৮৪ ৮

Books in English

- **WAY TO GOD as Taught by Sri Ramakrishna** : Swami Lokeswarananda–Rs 150 (*pages 462*)
- **A Portrait of Sri Ramakrishna** : Ed. A. Salm & others–Rs 250 (*pages 928*)
- **Sri Ramakrishna's Religion** : R. K. DasGupta- Rs 40 (*pages 188*)
- **Sri Ramakrishna and Christ** : Hans Torwesten–Rs 80 (*pages 240*)
- **Swami Vivekananda in Contemporary Indian News, Vol-I** . Sankari Prasad Basu -Rs 325 (*pages 764*)

The Cultural Heritage of India (Paperback edition) : Vol I - VI –Rs 1000

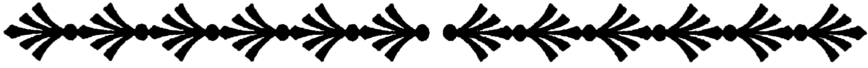
- **Swami Vivekananda on Indian Philosophy and Literature** R. K. DasGupta–Rs 50 (*pages 160*)
- **Swami Vivekananda and Indian Nationalism** . Subodh Chandra Sen Gupta–Rs 50 (*pages 188*)

Upanishads *(by Swami Lokeswarananda)* : (Nine Upanishads : Total Price Rs.350)

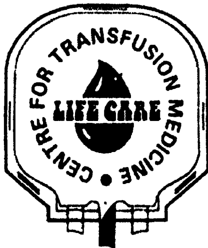
- **Swami Vivekananda : Studies in Soviet Union** Rs 80 (*pages 400*)
- **Sri Ramakrishna : A Prophet for the New Age** (A Biography by Richard Schiffman) Rs 75 (*pages 256*)
- **Swami Vivekananda's Vedantic Socialism** : R. K. DasGupta–Rs 30 (*pages 180*)
- **How to Overcome Mental Tension** : Swami Gokulananda– Rs 35 (*pages 222*)
- **Vedanta in Practice** : Swami Lokeswarananda -Rs 40 (*pages 225*)
- **A Concordance to Swami Vivekananda, Vol.I** : Rs 275 (*pages 543*) & **Vol. II** : Rs 350 (*pages 631*)
- **Practical Spirituality** Swami Lokeswarananda- Rs 35 (*pages 251*)
- **Pearls of Wisdom** . Swami Vivekananda Rs 25 (*pages 226*)
- **Indian Philosophical System** Rs 50 (*pages 116*)
- **The Religions of the World** (Lectures at Ramakrishna Centenary Parliament of Religions 1937, Calcutta) Rs 150 (*pages 1055*)
- **Vedanta : Concepts and Application** Rs 50 (*pages 482*)
- **Leo Tolstoy and Sri Ramakrishna** : Serigei D. Serebriany Rs. 7 (*pages 44*)
- **Tolstoy and Vivekananda** : A. P. Gnatyuk Danil Chuk Rs.3 (*pages 38*)

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার • কলকাতা ৭০০০২৯

ফোন : ৪৬৪-১৩০৩-৫/৪৬৬-১২৩৫-৭ • *E.Mail* : rmic@vsnl.com ; *Website* : www.sriramakrishna.org



তাই, তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে —
আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে।।



কলকাতা - ৭০০ ০১৪
দূরভাষ - ২৮৪ ৬৯৪০



ঠাকুর একমাত্র রক্ষাকর্তা—এটি সর্বদা মনে রাখবে, এটি ভুল হলে সব ভুল। যে ঠাকুরের শরণাগত হয়, তার ব্রহ্মশাপেও কিছু হয় না।

শ্রীমা সারদাদেবী

With Best Compliments from :

JOY GURU CONSTRUCTION

DEVELOPER, CONTRACTOR, PLANNER, DESIGNER & INTERIOR DECORATOR

Resi. :

P-313, UNIQUE PARK, BEHALA, KOLKATA-700 034

PHONE : 404-0348

Office :

635, D. H. ROAD, BEHALA, KOLKATA-700 034

(NEAR SIMULTALA BAZAR)

PHONE : 468-7980, 9831024649



যে ঠাকুরের ওপর নির্ভর করে, তিনি তাকে সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

With Best Compliments from :

Sur Industries Pvt. Ltd.

163 Acharyya J. C. Bose Road, Kolkata-700 014

Phone : 244-4233

With The Best Compliments From :



GREAVES LIMITED

'THAPAR HOUSE'
25, BRABOURNE ROAD
KOLKATA-700 001
TELEPHONE :
242-4320, 242-4321, 242-4316
FAX : 2424325

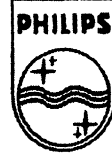
সংসারে কেমন করে থাকতে হয় জান? যখন যেমন, তখন তেমন। যাকে যেমন, তাকে তেমন। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।

শ্রীমা সারদাদেবী

With Best Compliments from :



MOLIN ELECTRIC COMPANY



MAIN OFFICE :

9/4A, NALIN SARKAR STREET, KOLKATA-700 004, INDIA

PHONE : 91-033-555 3323/4269 FAX : 91-033-543 4320

• ENGINEERS • CONSULTANTS • GOVT. LICENSED CONTRACTORS



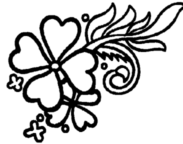
LEADER OF LEADERS SINCE 1950



To succeed you must have tremendous perseverance, tremendous will.

Swami Vivekananda

With Best Compliments from :



S. P. MUKHERJEE

PONDICHERRY-605003

শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি

গ্রাম ও পোঃ—শ্রীখণ্ড, জেলা—বর্ধমান, পিন—৭১৩১৫০

দূরভাষ ঃ (০৩৪৫৩) ৪১২৩৩ ◆ রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ এস/৮২৪৭৮/১৯৯৫-১৯৯৬

সবিনয় নিবেদন,

কাটোয়ার সন্নিকটস্থ শ্রীশ্রীমহাপ্রভু ও নরহরি ঠাকুরের লীলাক্ষেত্র শ্রীপাঠ শ্রীখণ্ডের **'শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি'** বেলুড় মঠ অনুমোদিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার কেন্দ্র। ১৯৯২ সালে বুদ্ধপূর্ণিমায় বেলুড় মঠ ও জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের সন্ন্যাসিগণের উপস্থিতিতে পূজা, হোম, পাঠ ও ভজনের মাধ্যমে আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আশ্রমস্থিত মন্দিরে নিত্য দুইবেলা পূজা-পাঠ ও সন্ধ্যারতি হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজীর জন্মতিথি ও মন্দির প্রতিষ্ঠার শুভদিনটি বিশেষ সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। এই আশ্রম বিভিন্ন জনহিতকর কার্যে, বিশেষ করে দাতব্য চিকিৎসা, বিনামূল্যে বিভিন্ন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ঔষধ প্রেরণ ও এতদঞ্চলের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ত্রাণকার্যে সরাসরি অংশগ্রহণ করিয়া থাকে।

বিগত বৎসরে অতিবর্ষণে আশ্রমটি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে ইহার আশু সংস্কার প্রয়োজন। আশ্রমটিকে পুরোপুরি সংস্কার ও সাধুসন্তদের বাসপোযোগী করার জন্য আনুমানিক ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকার প্রয়োজন। সহৃদয় দেশবাসী ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কাছে সাধ্যমতো আর্থিক সাহায্যের জন্য জানাই সনির্বন্ধ অনুরোধ। **অনুগ্রহপূর্বক M.O./ Cheque/Draft সমিতির ঠিকানায় পাঠাইবেন।**

ভবদীয়
ডাঃ শীতল ব্যানার্জী
সভাপতি

বিনয়াবনত
গৌতম চক্রবর্তী
ভক্ত, কলকাতা

সৌজন্যে :

THE CONCEPT

139, S. P. Mukherjee Road, Mudiali, Kolkata-26

Tutorial Home for JEE/IIT/HS/SF/ISC/ICSE/CBSE Students.
Physics, Chemistry, Maths., Biology, Mechanics,
English, Bengali, Hindi.

Phone No. : 463-3282/534-4552

BRITANNIA
Eat Healthy, Think Better
MarieGold™
আপন জন সাথে হলে
চায়ের আসর জমে ওঠে

With Best Compliments From :

RECKITT BENCKISER (INDIA) LTD.

41 CHOWRINGHEE ROAD
KOLKATA-700 071

Manufacturers of :

Harpic, Lizol, Robin Blue, Mortein, Cherry Blossom, Disprin Plus, Dettol Multisurface Cleaner and Many more well known Brands.

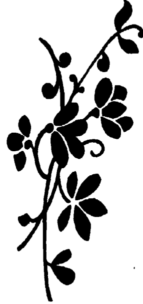
৺শিখরেন্দু নারায়ণ দে
৺নীহারবালা দে
৺অনিলা দাঁ

এর

স্মৃতির উদ্দেশে

শ্রীমতী সুনীলা কুণ্ডু
শ্রীমতী মনিলা দাঁ

With Best Compliments from :



MARUTI UDYOG

146/2, OLD CHINA BAZAR STREET
KOLKATA-700 001
PHONE : 242-2854, 242-4867

সুদীর্ঘ শতাধিক বৎসরের ওপর নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত একটি বলিষ্ঠ, অসাম্প্রদায়িক, গঠনমূলক ও রুচিশীল লেখা-সমৃদ্ধ 'উদ্বোধন' পত্রিকার সর্বতোভাবে সাফল্য এবং তার উত্তরোত্তর ব্যাপক প্রসার, প্রচার এবং সমগ্র বিশ্বে ও সমাজে সঠিকভাবে প্রতিটি জনসাধারণকে মানসিক ও চরিত্র গঠনে সহায়তা ও উদ্বুদ্ধ করুক—এই আমাদের পরম আকাঙ্ক্ষা।

আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ—

রজতশুভ্র মুখোপাধ্যায় (বেণু)
গোপা মুখোপাধ্যায় (চট্টোপাধ্যায়)
রাজেশ্বর্য্য মুখোপাধ্যায় (সেলিনা)

রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর থেকে ৪৫ বৎসর ধরে প্রকাশিত জনপ্রিয়, সাড়াজাগানো ও লব্ধ প্রতিষ্ঠিত 'সমাজশিক্ষা' পত্রিকার সর্বাঙ্গীণ সাফল্য, প্রচার, প্রসার, শ্রীবৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা সহ—

রজতশুভ্র মুখোপাধ্যায় (বেণু)
গোপা মুখোপাধ্যায় (চট্টোপাধ্যায়)
রাজেশ্বর্য্য মুখোপাধ্যায় (সেলিনা)

AN OPPORTUNITY FOR YOU TO SAVE A LIFE!

BLOOD

AN UNIQUE GIFT OF GOD
SAVIOUR OF LIFE—WHEN IT IS PURE
KILLER—WHEN IT IS CONTAMINATED

BLOOD CANNOT BE MADE IN LABORATORIES. IT HAS NO SYNTHETIC ALTERNATIVE. WHEN LIFE DEPENDS ON AVAILABILITY OF BLOOD, IT IS ONLY YOU WHO CAN SAVE ANOTHER HUMAN BEING.

ALL WE NEED IS THE WILL TO HELP

- DONATE YOUR HEALTHY BLOOD
- INSIST ON AND RECEIVE PURE, PRE-SCREENED BLOOD
- LET US ALL JOIN HANDS TO START A MOVEMENT FOR PURE AND SAFE BLOOD

DONATE BLOOD
AND
SAVE A LIFE

Issued in public interest by :



Infar (India) Limited, 7 Wood Street, Kolkata-700 016

আগে ঈশ্বর তারপর জগৎ; তাঁকে লাভ করলে তাঁর জগতের বিষয়ও জানা যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

Be brave and be sincere then follow the path with devotion and you must reach the Lord.

Swami Vivekananda

With Best Compliments from :

SADHUKHAN & CO.

Stockist :
ETERNIT EVEREST LTD.
Authorised Dealer :
CICO TECHNOLOGY LTD.
Dealer :
ASIAN, SHALIMAR, TATA PIGMENTS, MURARKA PAINTS & TATA G. C. SHEETS.

28, R. G. KAR ROAD
Kolkata-700 004
Phone : 554-9849 (O), 555-8536 (R)

With Best Compliments from :

BAKES & CAKES

139/A, RASHBEHARI AVENUE
KOLKATA-700 029
Phone : 464-0847/3473

India will be raised, not with the power of the flesh, but with the power of the spirit; not with the flag of destruction, but with the flag of peace and love, the garb of the Sannyasin; not by the power of wealth, but by the power of the begging bowl.

Swami Vivekananda

Many people seek God only after disappointment in other spheres. But one who from childhood can place one's heart at the Master's feet like a fresh flower is blessed indeed.

Sri Ma Sarada Devi

With Best Compliments from:

SRI SUBHAS TALUKDAR
&
SMT. FALGOONI TALUKDAR

7G, M. S. Flat
Minto Road
New Delhi-110002



Quoted by

A DEVOTEE

ওঁ নমো ভগবতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

ঈশ্বরো জয়তী

পবিত্রং চরিতং যস্যাঃ
পবিত্রং জীবনং তথা
পবিত্রতাস্বরূপিণ্যৈ তস্যৈ
দেব্যৈ নমো নমঃ।।

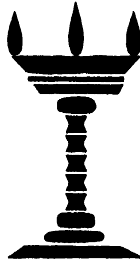
বেহালা-নিবাসী অজিতকুমার ব্যানার্জী গত ৩রা জুলাই ২০০১ রাত্রি ২টা ৪০ মিনিটে ৮৪ বছর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণলোকে গমন করিয়াছেন। পরোপকারিতা ও মধুর ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবান্দোলনের প্রতিষ্ঠান 'সুরপীঠ'-এর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন এবং প্রচারে আজীবন সহযোগিতা করিয়া গিয়াছেন। স্বনির্ভরতা, কর্তব্যপরায়ণতা, সেবাপরায়ণতা প্রভৃতি তাঁহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন।

তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের ভক্তিবিনম্র প্রণাম নিবেদন করি।

হাসিরানী ব্যানার্জী *(সহধর্মিণী)*
তপন ব্যানার্জী, তড়িৎ ব্যানার্জী ও সিদ্ধার্থ ব্যানার্জী *(পুত্রগণ)*
শিবাণী ব্যানার্জী, তপতী ব্যানার্জী ও মালবিকা ব্যানার্জী *(পুত্রবধূগণ)*

১১, শহিদ দীনেশ গুপ্ত রোড, যদু কলোনী, বেহালা, কলকাতা-৭০০ ০৩৪

With Best Compliments From :

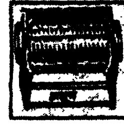


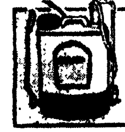
S. SUNDARIYA

KOLKATA-700 001

ডীলারের সুবিধার্থে—অভাবনীয় কম দামে

সকলপ্রকার স্প্রেয়ার, প্রেসার, প্যাডি উইডার
ও উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য জেলাভিত্তিক
ডীলার ও স্টকিস্ট চাই


ধান ঝাড়াই মেসিন


স্প্রেয়ার


প্যাডি উইডার

সারদা ইন্ডাস্ট্রীজ

৩৬নং স্ট্র্যান্ড রোড, ২য় তল, রুম নং ১৫, কলকাতা-৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন ঃ ২৪৩-৩১৪১

The easiest way to own a home



SBI HOUSING LOAN

- Low rate of interest
- No hidden cost
- Variable interest rate

State Bank of India
Reaching Out

শারদীয়া শুভেচ্ছা

সোনার আজ ও কাল

কারুকৃতি


মডার্ন গিনি হাউস প্রাঃ লিঃ

২০৮, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোনঃ ২৪১-৬২৮১/৮২০৩

Credit Cards Accepted



জরুরী বিজ্ঞপ্তি

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালীর ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া চাই। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' বাঙালী সংস্কৃতিচেতনায় আজ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

'উদ্বোধন' ঃ গ্রাহকভুক্তি, নবীকরণ ❑ ১০৪তম বর্ষ

২০০২ খ্রীস্টাব্দ ● ১৪০৮-১৪০৯ বঙ্গাব্দ

গ্রাহকভুক্তি ঃ বিগত তিন বছর আমরা গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত রাখতে পেরেছি, কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও আগামী বছর (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০২ খ্রীস্টাব্দ) থেকে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য সামান্য বৃদ্ধি করতেই হচ্ছে। এজন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ৯৫ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ঃ ৮০০ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান অথবা আজীবন (৩০ বছরের জন্য) সদস্যভুক্তির জন্য আমাদের অফিসে লিখবেন, নিয়মাবলী পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আজীবন গ্রাহকমূল্য ৩০০০ টাকা। এক বা ন্যূনতম ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ৫০০ টাকা হিসাবে।

বছরের মাঝখানে গ্রাহকভুক্তি ঃ যেকোন সময়েই গ্রাহকভুক্তি হতে পারে। তবে যাঁরা নবীকরণ করবেন তাঁদের কাছে একান্ত অনুরোধ, পূজার আগেই সদস্যপদ 'রিনিউ' করিয়ে নেবেন। তাহলে দপ্তরে কাজের সুবিধা হয়। যাঁরা নতুন গ্রাহক হচ্ছেন তাঁদের মাঘ (জানুয়ারি ২০০১) থেকে সব মাসের পত্রিকাই দেওয়া হবে।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ M.O. অথবা A/c Payee Bank Draft বা Postal Order **"Udbodhan Office"**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড** ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। পত্রোত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন।

চেক গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে।

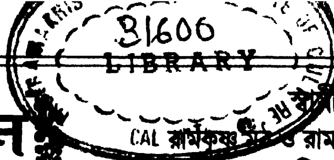
M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই সুবিধাজনক।

❑ **কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।**

❑ **যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।**

e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইন্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯



- 3 OCT 2001

উদ্বোধন ॥১০৩॥
স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
১০৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র

১০৩তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা আশ্বিন ১৪০৮ সেপ্টেম্বর ২০০১

[পরপৃষ্ঠায়]

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ



সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'
প্রচ্ছদ ❑ মুদ্রণ ঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ ❑ আলোকচিত্র ঃ দাসানুদাস সাহা
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য (২০০১ সালের জন্য) ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৬৫ টাকা; সডাক ঃ ৭৫ টাকা
আলাদাভাবে কিনলে বর্তমান সংখ্যার মূল্য ঃ ৪০ টাকা ❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ঃ ৩০০০ টাকা

পূজাবকাশ

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে কার্যালয়ের সকল বিভাগ ২৩ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর ২০০১ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

দিব্য বাণী

3 OCT 2001
CALCUTTA

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারঃ স্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধা মাত্রাত্মিকা স্থিতা।।

অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচার্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবজননী পরা।।

ত্বয়ৈব ধার্যতে সর্বং ত্বয়ৈতৎ সৃজ্যতে জগৎ।
ত্বয়ৈতৎ পাল্যতে দেবি ত্বমৎস্যন্তে চ সর্বদা।।

বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপা ত্বং স্থিতিরূপা চ পালনে।
তথা সংহৃতিরূপান্তে জগতোঽস্য জগন্ময়ে।।

মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী।।

প্রকৃতিস্ত্বং হি সর্বস্য গুণত্রয়বিভাবিনী।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা।।

ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীস্ত্বং বুদ্ধির্বোধলক্ষণা।
লজ্জা পুষ্টিস্তথা তুষ্টিস্ত্বং শান্তিঃ ক্ষান্তিরেব চ।।

হে সনাতনি, হে সত্ত্বামাত্ররূপা, আপনিই দেবোদ্দেশে হবির্দানের স্বাহামন্ত্ররূপা, পিতৃগণের পারলৌকিক ক্রিয়ায় স্বধামন্ত্ররূপা এবং দেবাহ্বানের বষট্‌ মন্ত্রস্বরূপা ও উদাত্তাদি-স্বররূপা। আপনিই অমৃতরূপা এবং অ-উ-ম ত্রিবিধ মাত্রারূপে অবস্থিতা প্রণবরূপা। বিশেষরূপে যা অনুচ্চার্য আপনি সেই নির্গুণা ও গায়ত্রীমন্ত্ররূপা। আপনি সর্বোত্তমা শ্রেষ্ঠা শক্তি ও দেবগণের আদিমাতা। হে দেবি, আপনিই এই জগৎ ধারণ, সৃষ্টি ও পালন করেন এবং প্রলয়কালে আপনি জগৎ সংহার করেন। হে জগৎস্বরূপা, আপনি এই জগতের সৃষ্টিকালে সৃষ্টিশক্তিরূপা, পালনকালে স্থিতিশক্তিরূপা এবং প্রলয়কালে সংহারশক্তিরূপা। আপনি মহাবাক্যলক্ষণা ব্রহ্মবিদ্যা, মহাবিদ্যা, মহতী মেধা (ধারণা), মহতী স্মৃতি, মহৎ অজ্ঞান, মহতী দেবশক্তি এবং মহতী অসুরশক্তিরূপা। আপনিই সর্বভূতের প্রকৃতি ও ত্রিগুণের পরিণাম বিধায়িনী, কালরাত্রি (যখন ব্রহ্মার লয় হয়), মহারাত্রি (যখন জগতের লয় হয়), ভয়ঙ্করী মহানিশা বা মানুষী রাত্রিরূপা (যখন জীবের নিত্য লয় হয়)। আপনি লক্ষ্মী, সর্বনিয়ন্ত্রী, অধর্মবিমুখী, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, লজ্জা, পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তি ও ক্ষমা-রূপধারিণী।

[শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১।৭৩-৭৯]

জয়দে বরদে শুভদে জননি!

আজ শারদপ্রভাতে নির্মল রৌদ্রকিরণোচ্ছল প্রকৃতির স্পর্শে প্রাণের উচ্ছ্বাস বাহিরে আসিয়া পড়িতেছে। শীতের ছোঁয়ায় পাখির কলরবে দেবীর আগমনবার্তা সূচিত হইতেছে। কেহ যেন গতানুগতিকতার বাহিরে বৃহত্তর প্রাপ্তির কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। দশপ্রহরণ-ধারিণীর অকালবোধন ও দিব্য লীলাকথা দিকে দিকে সম্প্রসারিত হইতেছে। এমন সময়ে দেবী চণ্ডিকার সেই অচিন্ত্যলীলার আবরণে ঢাকা গোপন তত্ত্বকথা শুনিতে মন আগ্রহী হইবে কী? যেদিকে তাকাই দেখিতে পাই কত রঙিন বিচিত্র বিনোদন-সম্ভার লইয়া 'পুজোর বাজার' সম্মুখে উপস্থিত। বালক-বালিকা নববস্ত্রপরিহিত হইয়া অঙ্গনে অঙ্গনে আনন্দকোলাহলে রত। সেই রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শবাহী প্রলোভনের সামগ্রী মনকে শ্রেয়ের পথ ভুলাইয়া প্রেয়ের পথে আকর্ষণ কি করিতেছে না? করিলেও করিতে পারে। মন যদি রঙিন জগতে ছুটিয়া বেড়াইতে চাহে, ক্ষতি নাই। কত আর বেড়াইবে? একদিন না একদিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। বলিবে—"পাখি তুই ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাক, ঠিক বসে থাকরে, রামকৃষ্ণ নামের মাস্তুলে।" সহস্র বৎসরের অধ্যাত্মসাধনা, সংস্কৃতি এবং অগণিত ঋষিকুলের মহনীয় লোককল্যাণচিকীর্ষা আজও ফল্গুধারার ন্যায় আমাদের অজান্তেই প্রবাহিত হইতেছে। ক্ষণিকের ইন্দ্রিয়সুখ সাধারণ মানুষের চিত্তে উন্মাদনার সঞ্চার করিলেও যে-জাতির রক্তে রক্তে ধর্মবীজ লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহার সুরক্ষার ব্যবস্থা ঈশ্বর যথেষ্ট আটঘাঁট বাঁধিয়াই করিয়া রাখিয়াছেন। আমরাই তাহার সন্ধান জানি না। দিকে দিকে বিপন্ন মানুষের আর্তনাদ আর শত শত ভক্তের আর্তি যখন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতেছে তখন জগৎপালিনী জগজ্জননী কি কৈলাসে উদাসীন রহিতে পারেন? তিনি অবশ্যই জীবনে ও তত্ত্বে অবতরণ করিয়া আমাদের মনের গভীরের দোর্দণ্ডপ্রতাপী মহিষাসুরকে সংহার করিতে প্রয়াস করিবেন।

* * * * *

অতীতে মহিষাসুরের সহযোদ্ধা রুরু নামক এক অসুর পৃথিবীতে ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিল। দেবী চণ্ডিকার সহিত ভীষণ যুদ্ধে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার পুত্র দুর্গমাসুর একহাজার বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার দর্শন লাভ করে। ব্রহ্মা দর্শন দিয়া কহিলেনঃ "হে দুর্গমাসুর, আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি। তুমি ঈপ্সিত বর প্রার্থনা কর।" গুরু শুক্রাচার্যের নির্দেশ অনুসারে দুর্গমাসুর বেদচতুষ্টয় প্রার্থনা করিল। আরও প্রার্থনা করিল, যেন সে দেবতাগণের অবধ্য হয়। ঋক্, সাম, যজুঃ, অথর্ব—এই চারি বেদ ব্রহ্মা তাহাকে অর্পণ করিয়া চলিয়া গেলেন। এদিকে বেদ লুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভূতলস্থ সকল যজ্ঞাগ্নি নির্বাপিত হইল। দেব-দ্বিজগণ সকলে বেদমন্ত্র বিস্মৃত হইলেন। সকল আধ্যাত্মিকতা যেন পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইল। হাহাকার উঠিল। স্বর্গে দেবগণ হুতাশনের ঘৃতাহুতি হইতে বঞ্চিত হইয়া দুর্বল হইয়া পড়িলেন। পৃথিবীতে অগ্নির তেজ কমিয়া গেল। ধরায় বৃষ্টির অভাবে খরায় মানুষ ও পশুর শবের পাহাড় হইয়া গেল।

দেবগণকে দুর্গমাসুর স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিল। পৃথিবী হইতে ঋষি-মুনিগণ ও দেবগণ একত্রে কৈলাসে শিবসন্নিধানে উপস্থিত হইয়াও ভয়ে গিরিগুহায় লুকাইয়া পড়িল এবং শক্তিস্বরূপিণী মহেশ্বরীর ধ্যানে নিমগ্ন হইল। এদিকে পৃথিবী তোলপাড় হইতেছে। সমগ্র প্রাণিকুলের কাতর আর্তনাদে বিচলিত হইয়া দেবী আবির্ভূতা হইলেন। শত শত অক্ষি (চোখ)-বিশিষ্টা হইয়া বিচিত্র রূপে। চতুর্ভুজা। দক্ষিণের দুই হস্তে যথাক্রমে কমল এবং বাণ ও

শারদ শুভেচ্ছা

দেখিতে দেখিতে একটি বৎসর ফুরাইল। নূতন সহস্রাব্দের প্রথম দুর্গোৎসব আসিয়া পড়িল। সুখস্মৃতির আড়ালে দুঃখের স্মৃতি অপরিবর্তিত থাকিলেও শারদ আনন্দপ্লাবনে মনের মালিন্য স্বতই ধুইয়া যায়। সাবরণা, সাভরণা, সপার্ষদা, সপরিবারা দেবী দুর্গার আগমনবার্তা এবারেও দেহে-মনে নূতন প্রাণসঞ্চার করিতেছে। ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া, সঙ্কীর্ণতার বেড়াজাল ভেদ করিয়া, জাতপাতের বালাই ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেবীকে স্বাগত জানাইবার জন্য আমরা প্রস্তুত। উৎসবের আনন্দ সকলে সমানভাবে ভাগ করিয়া লইবার অঙ্গীকার আমাদের স্বাধিকার। 'উদ্বোধন'-এর অনুরাগী সকল সৌভাগ্যবান-সৌভাগ্যবতী সুধী পাঠক-পাঠিকাকে 'উদ্বোধন'-এর সেবকবৃন্দের পক্ষ হইতে হার্দিক শারদ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাইতেছি। শ্রীশ্রীজগদম্বার আশীর্বাদ আমাদের সকলের উপর বর্ষিত হইয়া বন্ধুর জীবনপথ সহজগম্য করিয়া তুলুক—ইহাই আমাদের নিরন্তর প্রার্থনা।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

বামে এক হস্তে ধনু অপর হস্তে ক্ষুধা-ক্লেশ নিবারক ফলমূল, শাকাদি। জগতের মানুষের গভীর দুঃখকষ্ট দেখিয়া দেবী রোরুদ্যমানা হইলেন। তাঁহার শত শত আঁখি হইতে অশ্রু স্রোতস্বিনীরূপে ঝরিতে লাগিল। সেই অশ্রু মর্ত্যে প্রবাহিত হইয়া পুনরায় প্রাণসঞ্চার করিল। যতদিন পুনরায় বৃক্ষরাজি ও প্রকৃতি ওষধিবান না হইয়া উঠে ততদিন ক্ষুধার্ত মানুষ ও পশুকে তিনি ফল, মুল, শাকাদি বিতরণ করিতে লাগিলেন। দেবীকে তাই 'শতাক্ষী' ও 'শাকম্ভরী' নামে অভিহিত করা হইল।

ইতোমধ্যে দুর্গমাসুর সংবাদ পাইয়া সসৈন্য দেবীনিধনে উপস্থিত হইল। প্রলয়রূপিণী দেবী সংহারমূর্তি ধারণ করিয়া নিজ অঙ্গ হইতে বত্রিশটি শক্তি সৃষ্টি করিলেন। অবশেষে দুর্গমাসুরকে স্বহস্তে বধ করিয়া ত্রিলোকে দেবী 'দুর্গা' নামে পরিচিতা হইলেন। দুর্গমাসুরকে বধ করিবার পর একটি জ্যোতির্ময় গোলক দেবীর শরীরে প্রবেশ করিল। লুপ্ত বেদচতুষ্টয় পুনরায় প্রকাশিত হইল। বেদমূর্তি দুর্গা জগতে সনাতন ধর্ম রক্ষা ও পুনঃপ্রচার করিলেন।

* * * * *

মাতৃশাসিত এই বঙ্গদেশ সর্বদাই শাক্ত ভাবধারায় সম্পৃক্ত। হরেকরকম অনুষ্ঠান, পূজাপার্বণের ছয়লাপ। এই সমস্ত অনুষ্ঠানাদি ভক্তি ও জ্ঞানের আধারে যখন আধারিত হয়, তখনি ইহার সার্থকতা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত শ্রীশ্রীচণ্ডী কেবল একটি পৌরাণিক কাহিনীমাত্র নহে, উহার পশ্চাতের বিরাট তত্ত্ব সহস্র সহস্র বৎসরব্যাপী ভারতবর্ষকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। হিন্দুধর্মকে বলা হয় অপৌরুষেয়। ইহা কোন ব্যক্তি বা পুরুষনির্ভর নহে বলিয়াই অনিবার্যভাবে ইহা নীতিনির্ভর, অর্থাৎ তত্ত্বনির্ভর। একটি সুন্দর উদাহরণ দিব। তাহার পূর্বে স্মরণ করিয়া লই আমাদের সেই প্রতীক্ষিত উষামুহূর্তের কথা, প্রতি বৎসর মহালয়ার পুণ্য তিথিতে রাত্রি অবসানে, পক্ষীর কলরব যখন শুরু হয় নাই, আকাশবাণী হইতে সম্প্রচারিত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সেই পূর্বপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিবার জন্য 'পড়ি-কি-মরি' দৌড়, সেই পরিচিত যন্ত্রবাদ্য, প্রিয় শিল্পিগণের গাওয়া সেই প্রাণস্পর্শী গানের ঝরণাধারায় অভিস্নান করিয়া 'মহিষাসুরমর্দিনী'র দিব্য লীলাগীতির কথা। ইহা যেন আজ বাঙালী সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি, এই অনুষ্ঠানের মূল ভিত্তি 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত। এই গ্রন্থের প্রথমেই দেবীধ্যান পাঠ করিয়া 'অর্গলাস্তোত্র' পাঠ করিতে হয়। মনে পড়ে সেই পূর্বপরিচিত মন্ত্র—"জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী/ দুর্গা শিবা ক্ষমাধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে" ইত্যাদি। 'কীলকস্তব' ইহার পরেই পাঠ্য। 'কীলক' অর্থ 'প্রতিবন্ধক'। অতএব 'কীলকস্তব' প্রতিবন্ধক দূর করিবার প্রার্থনা।

এখন এই কীলক স্তবেরই একটি প্রখ্যাত মন্ত্রের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে ব্রহ্মর্ষি সত্যদেবের অপূর্ব ব্যাখ্যা অনুধাবন করিব। মার্কণ্ডেয় ঋষি বলিতেছেন—

"কৃষ্ণায়াং বা চতুর্দশ্যামষ্টম্যাং বা সমাহিতঃ।
দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি নান্যথৈষা প্রসীদতি।।"

অর্থাৎ—
যিনি কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী বা চতুর্দশীতে অনন্যচিত্ত হইয়া বিধিপূর্বক শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ বা শ্রবণ করেন, তাঁহার প্রতিই দেবী প্রসন্না হন। অতএব সাধকের নিকট এই তিথিদ্বয়



বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার শততম বৎসরে অনুষ্ঠিত কুমারীপূজা।
আলোকচিত্র : দাসানুদাস সাহা

অতি পবিত্র। 'দুর্গাপ্রদীপ' টীকায় 'দদাতি প্রতিগৃহ্নাতি'-র অর্থ করা হইল—অর্জিত বিত্তসম্পদাদি দেবীর চরণে সমর্পণ করিয়া সবই দেবীর মনে করা এবং শাস্ত্রবিধি অনুসারে সংসার নির্বাহের জন্য তাহা হইতে যেন মায়ের নিকট হইতে লইতেছি—এইরূপ মনে করিয়া অর্থ গ্রহণ করা।

ঠিক কথা। কিন্তু ইহার পশ্চাতে আরো কিছু কথা রহিয়াছে। বস্তুত, *'কৃষ্ণাষ্টমী'* এবং *'কৃষ্ণা চতুর্দশী'*—সাধকের গুণ বা বিশেষণ বৈ অন্য কিছুই নহে। চতুর্দশীতে এক কলামাত্র চন্দ্র অবশিষ্ট থাকে। অষ্টমী তিথিতে চন্দ্রের অর্ধেক দৃশ্যমান থাকে, বাকি অদৃশ্য। চন্দ্র মনের প্রতীক।

অর্থাৎ কৃষ্ণা-চতুর্দশী তিথিতে চন্দ্রের যেমন ষোল কলার মাত্র এক কলা অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ সেই সাধক যাহার মনের পনের কলা মাতৃচরণে নিমগ্ন রহিয়াছে, মাত্র এক কলা মাতৃসুধা পান করিবার জন্য 'আমি আমার' রাজ্যে সাধককে ধরিয়া রাখিয়াছে, তিনিই *'কৃষ্ণা চতুর্দশী'*। তাঁহার প্রতি দেবী প্রসন্না হন। এই *'কৃষ্ণা চতুর্দশী'* অবস্থায় সাধকের সমাধির দৃঢ়াবস্থা। *'কৃষ্ণাষ্টমী'* যে সাধক, তাহার মনের অর্ধেক দেবীর শ্রীচরণস্থিত হইয়া রহিয়াছে, বাকি অর্ধেক ক্রমশ ক্ষীয়মাণ। দেবীর কৃপা সম্যক অনুভব করিতে হইলে মনের অর্ধেক দেবীকে নিবেদন করিতে হইবে—ইহাই তাৎপর্য। *'দদাতি-প্রতিগৃহ্নাতি'* অর্থাৎ দিয়া থাকেন ও নিয়া থাকেন; ইহার তাৎপর্য কী? বস্তুত, আধ্যাত্মিক জগতে দোকানদারী নাই। আমি ইহা দিলাম, পরিবর্তে আমাকে উহা দাও—ইহা বস্তুজগতের কথা; অধ্যাত্ম রাজ্যে ইহা নাই। অথচ এই দেওয়া ও নেওয়া ব্যাপারটি সর্বত্র দেখা যায়। ইহার রহস্যভেদ একমাত্র হইতে পারে, যদি আমরা আত্মস্বরূপ উপলব্ধির স্তরে সমাহিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'দেওয়া-নেওয়া' ব্যাপারটি কী তাহা বুঝিতে পারি। মায়ের কৃপায় সাধক যখন *'কৃষ্ণা চতুর্দশী'*, তখন তিনি আত্মস্বরূপিণী অম্বিকার অনুভব করিয়া নিজেরই প্রতিবিম্ব সর্বত্র দেখিয়া থাকেন। আয়নার প্রতিবিম্বে কেহ যদি মালা পরাইতে যায়, সে-মালা নিজের কণ্ঠেই ফিরিয়া আসে। তাৎপর্য এইরূপ দাঁড়ায় যে, দদাতি (দিতেছেন) এবং প্রতিগৃহ্নাতি (প্রতিগ্রহণ করিতেছেন) যেন একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। গীতামুখে শ্রীভগবান বলিয়াছেনঃ "আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন"। স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ বিশ্বের দরবারে কেবল নিজেরই প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া থাকেন।

* * * * *

পুরাণে দুর্গা, পার্বতী, গৌরী, চণ্ডিকা, ভগবতী ইত্যাদি সবই পৃথক পৃথক চরিত্ররূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ভক্তের দৃষ্টি লইয়া আমরা সব একাকার করিয়া ফেলি। তাহাতে দোষ নাই। কারণ শক্তি বা সত্তা একটিই। এবং ভক্তিও অনন্য। একই অভিনেত্রী বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় করিয়া চলিতেছেন ভাবিলে সব গোল মিটিয়া যায়। মায়ের লীলার তো অন্ত নাই। একাই লীলা করিতেছেন তাহাও নহে। সঙ্গে মহেশ্বর দেবাদিদেব শঙ্কর পুরুষরূপে রহিয়াছেন বলিয়াই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির এই বিচিত্র লীলা। পুরুষকে বাদ দিয়া প্রকৃতিকে ভাবাই যায় না। শ্রীরামকৃষ্ণকে বাদ দিয়া আমরা শ্রীশ্রীমাকে ভাবিতে পারি না। "রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং তন্নামশ্রবণপ্রিয়াং তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ।" শিব ও শক্তি সমন্বিত রূপ এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ড। এই তত্ত্বটি বুঝিতে ও বুঝাইতে প্রাচীন ভারতের পুরাণকার মনীষিবৃন্দ অশেষ প্রযত্ন করিয়াছিলেন। এবং আজও আচার্যগণ ও সাধককুল এই প্রচেষ্টায় বিরত হন নাই। সাধারণ মানুষের পক্ষে এই শিব-শক্তি তত্ত্ব বুঝা দুষ্কর হইলেও বহু বিচিত্র পৌরাণিক উপাখ্যানের মাধ্যমে উহা সহজে বোধগম্য হয়। কেবল তাহাই নহে, সেইসব উপাখ্যান শুনিয়া মনের প্রফুল্লতা বৃদ্ধি পাইয়া জীবনের ক্লান্তি-বিধ্বস্ত মুহূর্তেও নব উদ্যম সঞ্চারিত হয়। ফলে সম্মুখের বন্ধুর পথ অনায়াসে অতিক্রম করিবার কৌশলটুকু মানুষ সহজে শিখিয়া লয়।

* * * * *

এই দীর্ঘ আলোচনার সারকথা উপনিষদের ঋষি আমাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে জানাইয়া দিলেন—

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।।"
(ঈশ উপনিষদ্, ৯)

—যে-ব্যক্তি অবিদ্যার (অধর্মাচরণ, অনাচার) উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়। স্বাভাবিক। কিন্তু যে-ব্যক্তি বিদ্যার (ধর্মানুষ্ঠানাদির) উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি গাঢ়তর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়। আশ্চর্যের বিষয়! যিনি ধর্মাচরণ করেন তাঁহার তো আলোয় প্রবেশ করিবার কথা! ভাষ্যকার বলিলেন, ধর্মানুষ্ঠান যদি জ্ঞানহীন মূঢ় ব্যক্তির ন্যায় যান্ত্রিকভাবে কেহ করিয়া চলে, সেই ব্যক্তি গভীরতর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়। অর্থাৎ কেন উপাসনা করিতেছি, কিভাবে করিতেছি, এইপ্রকারেই বা কেন করিতেছি, অন্যপ্রকারে করিলে কী হইত ইত্যাদি প্রশ্নের মীমাংসা নিজের নিকট স্পষ্ট থাকিলেই অনুষ্ঠাতা জ্যোতির্ময় মার্গে ঈপ্সিত লক্ষ্যে চলিতে পারিবেন। আরো সহজ ভাষায় বলিতে পারি, জন্মাবধি আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সেখানেই মৃত্যুবরণ করা কাম্য নহে। অতএব, দুর্গোৎসবের বাহ্য রোশনাইয়ের সীমায়িত আনন্দকে মাধ্যম করিয়া শাশ্বত আনন্দের লক্ষ্যে নিজেকে উন্নীত করাই শ্রেয় ও শুভপ্রদ। শাস্ত্রমুখে ঋষি এই কথাই বারংবার বলিতে চাহেন। যেমন 'মই'কে অতিক্রম করিবার জন্যই তো 'মই'য়ের ব্যবহার। 'মই'য়ের আবহে আবদ্ধ থাকিবার জন্য আমরা নিশ্চয়ই 'মই' ব্যবহার করি না। শ্রীশ্রীজগদম্বা আমাদিগকে অনন্তে উত্তরণের শক্তি প্রদান করুন—এই প্রার্থনা।

"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।" ❑

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে যেসকল তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৩৫৯ সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ সালে গ্রন্থটির যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। আশা করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

দি নিউ ডিসপেনসেসন, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২

গত বৃহস্পতিবার স্টীমারে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত একটি আকর্ষণীয় প্রমোদভ্রমণ হয়েছিল। রেভারেণ্ড যোসেফ কুক, মিস পিগট এবং নববিধানের প্রচারক (A postle of New Dispensation) কয়েকজন যুবকের সঙ্গে বেলা ১১টায় যাত্রা করেন। দলটির পৌঁছানোর খবর পেয়েই দক্ষিণেশ্বরের পূজনীয় পরমহংস মহাশয় গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়ান এবং তাঁকে স্টীমারে তুলে নেওয়া হয়। ভাবাবেশে তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক উত্তেজনার বিভিন্ন স্তর প্রকাশ পেতে লাগল। বহুক্ষণ সমাধিস্থ থাকার পর তিনি প্রার্থনা করলেন, গান গাইলেন এবং বিভিন্ন আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা করলেন। মিস্টার কুক তাঁকে মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং যা দেখলেন তাতে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হলো। মিস্টার কুককে খ্রীস্টধর্ম ও খ্রীস্টীয় চিন্তাধারার চরমপন্থী বলে গণ্য করা যেতে পারে। পরমহংস ভারতীয় কৃষ্টি, যোগ এবং ভক্তি-সাধনার সংক্ষেপে ঐতিহ্যিক প্রাচ্যধর্মের প্রতীক ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক এঁদের দুজনকে মিলিয়ে দিয়ে প্রমাণ করলেন যে, নববিধানের মধ্যেই দুই মতের সমন্বয়সাধন হয়েছে। (ইংরেজী থেকে অনূদিত)

*

ধর্মতত্ত্ব, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২

সংবাদ।—...১২ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার আমেরিকার প্রসিদ্ধ ধর্মবিষয়ে বক্তা যোসেফ কুকসাহেবের সম্মানার্থ প্রেরিতমণ্ডলী এবং কতিপয় বন্ধু সমবেত হইয়া বাষ্পীয় শকটযোগে দক্ষিণেশ্বর গমন করেন। এই সঙ্গে মানার্হা মিস পিগটও ছিলেন। দক্ষিণেশ্বর হইতে পরমহংস মহাশয়কে বাষ্পীয় শকটে তুলিয়া লওয়া হয়। তাঁহার ভাবাবেশের ঘোর সমুদয় সময়ের মধ্যে একবারও প্রায় তিরোহিত হয় নাই। ভাবাবেশে প্রার্থনা উপদেশসঙ্গীত সকলই মধুর ও জ্ঞানদ। তিনি দেবীকে সাক্ষাৎ অবলোকন করিয়া যে প্রার্থনা করেন, তাহা অতি জীবন্ত। তাঁহার দেবতা তাঁহাকে কেবলই ধর্মপ্রচারার্থ পীড়াপীড়ি করেন। তিনি কিছুতেই মাথা দিতে চান না। শুদ্ধসত্ত্ব দু-চারিজন যাঁহারা আছেন তাঁহাদিগের দ্বারা এই কার্য নির্বাহ করিতে প্রার্থনা করিয়া থাকেন। যোসেফ কুক সাহেব এবং কুমারী পিগট তাঁহার আশ্চর্য ভাবে প্রমুগ্ধ হইয়াছিলেন।...

*

সুলভ সমাচার, ২৯ এপ্রিল ১৮৮২

সাপ্তাহিক সংবাদ।—সম্প্রতি জোড়াসাঁকোর হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার সাম্বাৎসরিক উৎসব হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় তদুপলক্ষ্যে তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং শ্রীযুক্ত ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী মহাশয় ভাগবৎ পাঠ করিয়াছিলেন। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, পরমহংস মহাশয় তথায় যাইয়া সন্তোষ লাভ করেন নাই এবং সামাধ্যায়ী মহাশয়ও অসন্তুষ্ট হইয়া আসিয়াছেন।...

*

দি নিউ ডিসপেনসেসন, ৩০ জুলাই ১৮৮২

গত ২১ জুলাই 'লিলি কটেজ'-এ নিমন্ত্রিত হয়ে দক্ষিণেশ্বরের পরমভক্ত পরমহংসের সঙ্গে যাজক ও তাঁর বন্ধুদের আরেক দফা দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনা হয়। পরমহংসের বয়স যদিও ৪২ বছরের খুব বেশি হবে না, তবুও তাঁকে, আগে যেরকম দেখা গিয়াছিল, তার চেয়েও অধিক বয়স্ক বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু তাঁর মধ্যে যেসব অদ্বিতীয় গুণাবলী প্রকাশ পেত, তা কম দেখা গেল না, বরং সেগুলি সময়ের সঙ্গে আরো পরিপক্বতা লাভ করেছে। বালকের মতো সরল হলেও তিনি সুবুদ্ধিসম্পন্ন ও বিচক্ষণ ছিলেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ঈশ্বরের প্রেমে উন্মত্ত হয়ে যেতেন। বিভিন্ন ব্রাহ্মমতাবলম্বীদের প্রতি তাঁর অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল এবং তিনি যেখানেই আধ্যাত্মিক আলোচনা করতেন, ব্রাহ্মরা সদলবলে সেখানে উপস্থিত হতেন। (ইংরেজী থেকে অনূদিত)

*

দি নিউ ডিসপেনসেসন, ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮২

দুই মহাত্মা।—সম্প্রতি পরমশ্রদ্ধেয় পরমহংস বিখ্যাত লোকহিতৈষী ও পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কেন গেলেন? ঐরকম যাওয়ার ফলে সেই নির্জনবাসী সন্ন্যাসীর কি পার্থিব বা অপার্থিব লাভ হবে? মহাত্মাদের সঙ্গে দেখা করার একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল পরমহংসের। তাঁর বন্ধুদের সবসময়েই বড় যাকিছু তা দেখাতে বলতেন এবং এই ব্যাপারে অনেক সময় তিনি কাকুতিমিনতি করতেন। এখন তিনি 'সিংহ' দেখতে ব্যগ্র। কখনো তিনি কি করে নদীর ওপর বাষ্প স্টীমার চলে, তা দেখতে ব্যগ্র, কখনো বা গির্জায় কিভাবে হাজার লোক প্রার্থনা করেন, তা দেখতে চান। তিনি যেমন জন্তুজানোয়ারদের মধ্যে এবং নিষ্প্রাণ বস্তুর মধ্যে বৃহৎকে সম্মান করতেন, সেইরকম মানুষের মধ্যেও যাঁরা নামী বা যশস্বী, তাঁদের শ্রদ্ধা করতেন। বড়দের দেখার তাড়নাই দক্ষিণেশ্বরের ভক্তকে কলকাতায় বিদ্যাসাগরের বাড়িতে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। কোন পার্থিব লাভের আশায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি একাজ করেননি। (ইংরেজী থেকে অনূদিত) ❑

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার
সম্পাদনা ❑ স্বামী সর্বগানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের দুখানি পত্র



॥১॥

শ্রীশ্রীগুরুদেব

জয়রামবাটী
১৩২৪/৩রা চৈত্র

আশীর্বাদান্তে সমাচার—

মা, তোমার প্রেরিত টাকা ১০৲ দশটী [দশটি] পাইয়া সুখী হইলাম। টাকা ও চিঠিপত্রাদি অপর কাহারও নামে না পাঠাইয়া আমার নামে পাঠাইবে। আজকাল আমার শরীর পূর্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছে। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে।

আশী—

তোমার মাতাঠাকুরানী

প্রেরক
পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী
পোঃ—আনুড়
গ্রাম—জয়রামবাটী
জেলা—হুগলী

প্রাপক
কল্যাণীয়া—
শ্রীমতী মৃণালিনী ঘোষ
Ranchi P. O.
C/o—B. C. Basu Esq.

॥২॥

শ্রীশ্রীগুরুদেব শরণম্

বাগবাজার, কলিকাতা
২০।৫।(১৯)১৮

কল্যাণীয়াসু,

মা, তোমার পত্র ও প্রেরিত ফল পাইয়া সুখী হইলাম। আমি এখানে আসিয়া ভালই ছিলাম। হঠাৎ গত দুইদিন পুনরায় একটু একটু জ্বর হইয়াছে। আজ ভাল আছি। বোধহয় আর জ্বর হবে না। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। ভুবনেশ্বর হতে সুধীরার খবর পাইয়াছি। অপেক্ষাকৃত একটু ভাল আছে।

ইতি আশীর্বাদিকা

তোমার মাতাঠাকুরানী

(পুনঃ) ফলগুলির মধ্যে পেঁপেগুলির কয়েকটা নষ্ট হয়েছিল। আর সব ভাল পৌঁছেছে।

প্রাপক
পরমকল্যাণীয়া
শ্রীমতী মৃণালিনী ঘোষ কল্যাণীয়াসু
C/o—Sj. Roy B. C. Bose Bahadur
Lalgarh, Ranchi

স্বামী সারদানন্দের দুখানি পত্র

।।১।।

শ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

কলিকাতা
২০।১২।(১৯)২৬

কল্যাণবরেষু[১],

তোমার ১৪ই ডিসেম্বরের পত্র যথাকালে পাইয়াছি। নানা হাঙ্গামায় উত্তর দিতে পারি নাই। প্রবোধবাবু তোমাকে আরও কিছুদিন রাখিবার জন্য প্রার্থনা করেন নাই। তবে তিনি এখন নানা হাঙ্গামায় বিশেষভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন এবং তুমি চলিয়া আসিলে স্কুলের কার্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে—এইকথা মাত্র জানাইয়াছেন। অতএব তুমি যখন বুঝিতেছ তুমি চলিয়া আসিলে স্কুলের বিশেষ অসুবিধা হইবে না, তখন তুমি যাহা ইচ্ছা করিবে। তুমি প্রবোধবাবুর স্কুলের কার্য আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া কর নাই—প্রবোধবাবুর অনুরোধে এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় যখন ঐ কার্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলে তখন প্রবোধবাবু এবং তুমি উভয়ে মিলিয়া তুমি ওখানে আর কিছুদিন থাকিবে কিনা তদ্বিষয়ে মীমাংসা করিবে।

তোমার প্রশ্নগুলির উত্তর—

১ম—গুরু ও ইষ্টে প্রভেদ ইহাই, গুরুরূপে ভগবান আবির্ভূত হইয়া শিষ্যকে ইচ্ছা-দর্শন করাইয়া দেন এবং পরিশেষে ইষ্টের সহিত মিলিত হইয়া থাকেন। সুতরাং পরিণামে গুরু ও ইষ্টে কোন প্রভেদ থাকে না। শ্রীশ্রীমা তোমাকে যেরূপ বলিয়াছেন ঠিক সেইরূপ করিয়া যাইও।

২। সাধারণত গুরুর ধ্যান মস্তকে দ্বাদশদল শ্বেতপদ্মে এবং ইষ্টের ধ্যান হৃদয়ে অষ্টদল রক্তপদ্মে করিবার বিধি আছে। যাহার ঐরূপ করিবার সুবিধা না হয় সে হৃদয়ে বা ভ্রূমধ্যে যা হয় করে।

৩। গায়ত্রী জপ ৫৮ বার অথবা ৩৮ বার অথবা ২৮ বার করাও চলে। অন্য সকল প্রশ্নের উত্তর যখন আসিবে তখন সময়মত জিজ্ঞাসা করিলে বলিব।

আমার শরীর অমনি একপ্রকার যাইতেছে। এখানকার অন্য সকলের কুশল। আমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা সতত জানিবে। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসারদানন্দ

।।২।।

শ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

কলিকাতা
১৫।২।(১৯)২৭

পরমকল্যাণীয় রামময়[২],

তোমার ২২শে জানুয়ারি তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। কয়েকটি বন্ধুর বিপদের দরুন বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম ও আছি। সেজন্য সময়মত উত্তর দিতে পারি নাই। সেজন্য কিন্তু কিছু মনে করিও না। ওখানে যাইয়া তোমার শরীর ও মন ভালই আছে জানিয়া সুখী হইলাম। শ্রীশ্রীমার কৃপায় সুস্থ শরীরে তাঁহার কাজ করিতে পার, ইহাই প্রার্থনা করি। আমার আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা তুমি জানিবে এবং শ্রীমান হরিকে ও আশ্রমস্থ অন্যান্য সকলকে দিবে। আশাকরি হরি ভালই আছে এবং পড়াশুনাও বেশ

১ শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (কাতু)-কে লিখিত পত্র।

২ রামময় মহারাজ (স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ) শ্রীশ্রীমায়ের অন্তরঙ্গ সেবক ছিলেন।



হইতেছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় বসন্তের প্রকোপ দূরীভূত হউক এবং সকলে শান্তি ও আনন্দে থাক ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। আমি ভাল আছি। এখানকার কুশল। ইতি

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীসারদানন্দ

প্রতিঃ পরমকল্যাণীয় রামময়
(গোপালচৈতন্য)

স্বামী কল্যাণানন্দের পত্র



শ্রীশ্রীদুর্গা শরণম্

Norian Math
(Narayan Math, Silk Factory Road)
Srinagar, Kashmir State
17.10.(19)27

প্রিয় দেবেন (দেবানন্দ),

তোমার ৺বিজয়ার প্রণামপত্র আচ্ছাবল হইয়া এখানে আসিয়াছে। আমরা গত ১০ই এখানে আসিয়াছি। তুমি আমার উমেশ এবং গবিন্দের (গোবিন্দের) ৺বিজয়ার নমস্কার, আলীঙ্গণ (আলিঙ্গন), প্রীতি সম্ভাষণ, ভালবাসাদি জানিবে। আমরা আচ্ছাবলেও ৺পূজার তিনদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা, ভোগ, চণ্ডি (চণ্ডী) ও গীতা পাঠ প্রভৃতি দিয়াছিলাম। এবারে আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা সুন্দররূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে জানিয়া অতীব আনন্দিত হইলাম। তোমাদের সকলের অত্যন্ত পরিশ্রম ও যত্নে যে ঐ কার্য হইয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। শুধু কর্ম দ্বারা লোক ধর্মপথে অগ্রসর হইতে পারে না, তার সঙ্গে ২ (সঙ্গে সঙ্গে) উপাসনাও বিশেষ প্রয়োজন—একথা স্বামীজী অনেকবার বলেছেন। "যেমন পাখি একটা ডানায় উড়িতে পারে না সেইরূপ শুধু কর্ম দ্বারা লোক অগ্রসর হইতে পারে না।" তুমি সকলকে নিয়া যে আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের পূজা করিয়াছ তাহাতে আমি অত্যন্ত সুখি (সুখী) হইয়াছি এবং তোমাদেরও মায়ের উপাসনা করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতি নিশ্চয়ই হইয়াছে ও হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীযুত নিশ্চয়ানন্দ যে পরিশ্রম করিয়া তোমাদের ঐ কার্যে সহায়তা করিয়াছে এবং উৎসাহ দিয়াছে তাহাতে তাহার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে এবং তোমাদেরও শ্রীশ্রীমায়ের উপাসনায় সহায়তা হইয়াছে।

তুমি আমাদের আন্তরীক (আন্তরিক) ভালবাসাদি জানিবে।

সতত শুভাকাঙ্ক্ষী
কল্যাণানন্দ[৩]

৩ রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাযজ্ঞের অন্যতম পুরোধা স্বামী কল্যাণানন্দ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের মন্ত্রশিষ্য ও কনখল সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তাঁর অসাধারণ জীবনকথা 'স্বামীজীর পদপ্রান্তে' গ্রন্থে বিধৃত আছে।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

আশীর্বাণী*

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

এই আলোচনাটি দুর্গাপদ ঘোষ প্রমুখ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক



রামকৃষ্ণ সংগ্রহশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি খুব আনন্দিত।... ইতিপূর্বে স্বামী প্রভানন্দ এবং ডঃ সরোজ ঘোষের মুখে আমরা এই সুন্দর সংগ্রহশালাটির বিবরণ শুনেছি। ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাইরে অসংখ্য সংগ্রহশালা আছে, কিন্তু এই সংগ্রহশালায় অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন আন্দোলনের সূচনা হয়। তাঁর কীর্তি এবং সর্বজীবে তাঁর প্রেম ও সমবেদনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত যে অসংখ্য সংগ্রহশালা ও স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে, তা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-কেন্দ্রিক এই সংগ্রহশালাটি এতদিনে বাস্তব রূপলাভ করল এবং এটি ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাপী এক নতুন ভাবধারা উন্মেষের সহায়ক হবে। এই সংগ্রহশালা বিগত শতাব্দীর একটি নথিমাত্র নয়; বরং বলা যায়, এটি ভারতবর্ষ তথা সমগ্র বিশ্বে এক নতুন যুগের অভ্যুদয় সূচিত করছে। কারণ, শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন সমগ্র জগতের জন্য, শুধুমাত্র ভারতবর্ষের জন্য নয়। অতএব অতি শীঘ্র সমগ্র জগৎ বেশকিছু উন্নত ভাবের বিকাশ প্রত্যক্ষ করতে শুরু করবে, যেমন—মানবজাতির মধ্যে ঐক্য ও শান্তি, মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা এবং সর্বধর্মসমন্বয়।

এমন একটি সংগ্রহশালার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামীজীর সুমহান বাণী বিশ্বব্যাপী বিস্তারলাভ করবে। সুতরাং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এ এক বিশেষ প্রেরণাস্বরূপ, যা এক নতুন ভবিষ্যতের, এক নতুন বিশ্বজনীন ভাবধারার উন্মেষ ঘটাবে—শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, বরং সমগ্র পৃথিবীতেই। এবং এ কারণেই শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর আবির্ভাব। এই সংগ্রহশালাটিতে এসব কিছুরই প্রতিফলন ঘটেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের পাদস্পর্শধন্য কলকাতা শহরের উপস্থাপনা দেখে আমি আনন্দিত। কাশীপুর উদ্যানবাটী, বরানগর আশ্রম, বেলুড় মঠ এবং মঠের অন্যান্য শাখাকেন্দ্র—যেসকল স্থানে এই ভাবান্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, সবই তুলে ধরা হয়েছে এখানে। কিভাবে এই ভাবান্দোলন শুরু হলো, কিভাবে তা বিস্তারলাভ করল এবং ভবিষ্যতের জন্যই বা কিরূপে ক্রিয়মাণ থাকবে—এসব কিছুই এই সংগ্রহশালাটিতে সুপরিস্ফুট। আমাদের সকলের কাছেই এ এক পরম প্রেরণাস্বরূপ।

আজ একটি বিশেষ দিন। আজ ভগবান বুদ্ধের জন্মতিথি। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং বিশ্বব্যাপী এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীস্ট, শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামচন্দ্র—এঁরা সকলেই ছিলেন অধ্যাত্মপুরুষ এবং ইতিহাসস্রষ্টা। তাঁরা জগতে এক নতুন ভাবের অবতারণা করেছিলেন। তাঁরা তাঁদের পূর্বসূরিগণের কর্মধারার পুনরাবৃত্তি করেননি; তাঁরা নতুন নতুন

* গত ৭ মে ২০০১ বেলুড় মঠে নবনির্মিত রামকৃষ্ণ সংগ্রহশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পরম পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ মহারাজের আশীর্বাণীর বাঙলা অনুবাদ। ♦ ভাষান্তর: রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

ভাবান্দোলনের সূচনা করেছিলেন। এযুগে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, আরেকটি নতুন ভাবপ্রবাহ শুরু হয়ে গেছে এবং সে-প্রবাহ শুধুমাত্র ভারতবর্ষের মধ্যেই নয়, পরন্তু সমগ্র বিশ্বে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে। মুদ্রিত গ্রন্থ এবং এজাতীয় সংগ্রহশালার মাধ্যমে তাঁর বাণী আজ পরিব্যাপ্ত হয়ে চলেছে।

জগতের পূর্ববর্তী আচার্যগণের সাক্ষাৎ আমরা পাই শুধুমাত্র নানা রূপকথা এবং বিক্ষিপ্ত ইতিহাসভিত্তিক পৌরাণিক উপাখ্যানের মধ্যে। তাঁদের দেখতে কেমন ছিল, সেটি পর্যন্ত আমাদের অজানা। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর একটি বক্তৃতায় এবিষয়টির উল্লেখ করেছেন। হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন স্থানে তাঁদের মূর্তি খোদাই বা নির্মাণ করা হয়েছে—যার মাধ্যমে তাঁদের একটি রূপ আমাদের চোখে ভেসে ওঠে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন সম্পর্কে তেমন কোন উপাখ্যান নেই। তাঁর বেশ কয়েকটি আলোকচিত্রও আমরা পাই। তাঁর জীবৎকালেই প্রকাশিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মতো বিদগ্ধ পণ্ডিত এবং অন্যান্যদের রচনা আমরা পেয়েছি। এর অল্প কয়েক বছর পরেই বিখ্যাত দুই পাশ্চাত্য পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার এবং রোমাঁ রোলাঁ তাঁর সম্বন্ধে অতি সুন্দর সুন্দর গ্রন্থ রচনা করেছেন। আর আছে শ্রীম-রচিত 'কথামৃত' এবং স্বামী সারদানন্দের 'লীলাপ্রসঙ্গ'। তাঁর মহিমা বর্ণনা করে আজও অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বহু প্রেরণাদায়ী গ্রন্থ ইতিপূর্বে রচিত হয়েছে। এজাতীয় মুদ্রিত রচনাই বিশ্বব্যাপী এক নতুন ভাবধারার উন্মেষ ঘটায়, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মহাপুরুষগণ নতুন নতুন ভাবান্দোলনের প্রবর্তন করেন। অন্যেরা যা করেছেন, তাঁরা শুধু তার পুনরাবৃত্তি করেন না। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন যুগপ্রবর্তক; ঠিক বুদ্ধদেবেরই মতো যুগপৎ অবতার এবং যুগপ্রবর্তক। বুদ্ধদেবও এক নতুন ভাবান্দোলনের সূচনা করেন, সৃষ্টি করেন বিশ্বব্যাপী এক নতুন ভাবপ্রবাহ। সেকালে ভারতবর্ষের ভাবধারা কেবলমাত্র ভারতবর্ষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত না। তখন ভারতবর্ষ থেকে বহু সন্ন্যাসী বুদ্ধদেবের শান্তি ও সমন্বয়ের বাণী নিয়ে বিশ্বপরিক্রমা করেছেন। এজাতীয় বাণী ভারতবর্ষ বারবার জগতে প্রচার করেছে।

আধুনিক যুগে আমরা দেখছি, বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে সমগ্র জগতে একপ্রকার সংযুক্তি ঘটছে বটে, কিন্তু মানুষের মন ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে না। জগতে এখনো ব্যাপক হিংসাত্মক কার্যকলাপ চলছে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই অবস্থার পরিবর্তন আসবে। আজ এই সংগ্রহশালাটির উদ্বোধনের ফলে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের ক্ষেত্রে প্রেরণার এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হলো। আমার স্থির বিশ্বাস, সমগ্র বিশ্বে সমন্বয় ও শান্তির বাণী প্রসারের ক্ষেত্রে এই সংগ্রহশালাটি এক বিরাট যন্ত্রস্বরূপ হয়ে উঠবে।

স্বামী প্রভানন্দকে আমার শুভেচ্ছা জানাই। এই সংগ্রহশালাটিকে বাস্তব রূপ দিতে তাঁকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমি খুশি যে, তিনি সাফল্যের সঙ্গে সেটি সুসম্পন্ন করেছেন। আজ আমরা বেলুড় মঠের পবিত্র পরিমণ্ডলে বসে এই মহান সংগ্রহশালাটির উদ্বোধন অনুষ্ঠান উপভোগ করছি। বেশ কিছু সম্মানীয় অতিথিবর্গ এখানে উপস্থিত আছেন দেখে আমি আনন্দিত। আপনারা সংগ্রহশালাটি পরিদর্শন করুন। জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই এখানে স্বাগত।

প্রার্থনা করি, শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপা আমাদের সকলের ওপর বর্ষিত হোক। ❑

অনুষ্ঠান-সূচী ঃ কার্ত্তিক ১৪০৮

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

পূজাতিথি-কৃত্য ঃ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা
আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী
৬ কার্ত্তিক, মঙ্গলবার
(২৩ অক্টোবর ২০০১)
শ্রীশ্রীকালীপূজা
দীপান্বিতা অমাবস্যা
২৮ কার্ত্তিক, বুধবার
(১৪ নভেম্বর ২০০১)

একাদশী-তিথি ঃ ১০, ২৫ কার্ত্তিক
যথাক্রমে শনিবার ও রবিবার
(২৭ অক্টোবর, ১১ নভেম্বর ২০০১)

আশীর্বাণী

স্বামী ভূতেশানন্দ



দেওঘর বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল দীর্ঘদিন আগে। স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ, যিনি ইতিপূর্বে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তিনি প্রায় শুরু থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন হেডমাস্টার এবং সেক্রেটারি রূপে। অবশ্য তারও কয়েক বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই প্রতিষ্ঠান। তারপর থেকে দীর্ঘকাল ধরে এই কাজ চলে আসছে ছাত্রদের কল্যাণকল্পে আবাসিক বিদ্যালয়রূপে। বলা বাহুল্য, দীর্ঘকালের এই সেবার সুযোগে প্রতিষ্ঠানটির যথেষ্ট সুনাম হয়েছে। আমি এখানকার শিক্ষার মান সম্বন্ধে বেশি কিছু বলতে চাইছি না; কারণ এখানকার ছাত্রদের পরীক্ষার ফলাফল থেকেই বোঝা যায় যে, তারা খুব ভালভাবেই উত্তীর্ণ হয় এবং ধারাবাহিকভাবেই তা হয়ে আসছে। আমার বিশেষ করে মনে হয়, এই প্রতিষ্ঠানের বিশাল মাঠ আর ছাত্রাবাসের যেসব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, তা আমাদের বাল্যকালে কল্পনাও করতে পারি না। আমাদের ছাত্র-বন্ধুদের কাছে বিশেষভাবে বলতে চাই, তারা যেন এর পূর্ণ সুযোগ নেয়। এই সুযোগগুলি যে সকলে পায় তা নয়—খুব দুর্লভ। আমাদের দেশে এখনো পর্যন্ত এরকম সুবিধা, এরকম প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা খুব কম জায়গাতেই আছে। কাজেই এখানে সুযোগসুবিধাগুলি ছাত্ররা পূর্ণভাবে সদ্ব্যবহার করবে—এইটি আমার বিশেষ প্রার্থনা। ছাত্রদের কাছে এটাই আমার আকাঙ্ক্ষা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত প্রতিষ্ঠানের যাঁরা সঞ্চালক, তাঁদের কাছেও আমার এইটিই প্রত্যাশা। তাঁরা নিশ্চয়ই এবিষয়ে বিশেষ সজাগ আছেন এবং সচেতনভাবে তা পরিচালনা করছেন। সর্বোপরি আমরা ঠাকুর-মা-স্বামীজীর কাছে প্রার্থনা করি, তাঁদের এই প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে সার্থক হোক।

এখানে উপস্থিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ভক্ত এবং উপস্থিত সজ্জনেরা—যাঁরা এই প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে আগে পরিচিত ছিলেন না, তাঁরা নিশ্চয়ই দেখে মুগ্ধ হচ্ছেন যে, কী সুন্দর পরিবেশ এখানকার। এই পরিবেশ গঠনের পিছনে যে অগাধ পরিশ্রম—বিশেষ করে সাধুবৃন্দ করেছেন, তার সঙ্গে আমার নিজের ব্যক্তিগত পরিচয় তো আছেই আর যাঁরা এখানে আছেন তাঁদের ভিতরেও কেউ কেউ জানতে পারেন। অনেক সাধনার ফলে এই প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান পরিবেশ এবং এর সফলতা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এইরকম প্রতিষ্ঠান চারিদিকে গড়ে উঠুক—এটি আমাদের অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। আমাদের মাত্র কয়েকটি জায়গায় অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ার সুযোগ হয়েছে—যেমন এখানে এবং এর শাখারূপে প্রতিষ্ঠিত পুরুলিয়ায়—যা এখন একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। তাছাড়া আছে রহড়া, সরিষা, নরেন্দ্রপুর, বেলুড় বিদ্যামন্দির এবং বেলঘরিয়ায়। বেলঘরিয়ায় অবশ্য শুধু ছাত্রদের থাকার সুযোগ আছে, সেখানে স্কুল বা কলেজের বন্দোবস্ত করা হয়নি।

যাহোক, বাংলার আশেপাশে এবং বিশেষভাবে দাক্ষিণাত্যে চেন্নাই ও কোয়েম্বাটুরে এমন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সেখানকার প্রতিষ্ঠানগুলি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন, কী বিশাল আয়োজন সেখানে করা হয়েছে। এসবই ঠাকুরের কৃপায় এবং বিশেষ করে মায়ের আশীর্বাদে। মা চেয়েছিলেন, আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এইরকম বড় বড় কাজ হোক। নিশ্চয়ই তাঁদের আশীর্বাদ এই পরিণতির পিছনে রয়েছে। আমরা তার জন্য তাঁদের আন্তরিক ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাচ্ছি। তাঁদের আশীর্বাদ ছাড়া কখনোই এইভাবে প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠতে পারত না। আরো কিছু জায়গায় এধরনের প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত হচ্ছে।

এইরূপ প্রতিষ্ঠানের যে বিশেষ করে দরকার ছিল—এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্বামীজী বিশেষ করে চেয়েছিলেন যে, শিক্ষাকে পূর্ণাঙ্গ করতে হবে, যেন সেই শিক্ষার ভিতর দিয়ে মানুষ তার নষ্ট মনুষ্যত্বকে আবার ফিরে পেতে পারে। "Man making institution"—স্বামীজী বলতেন। মানুষ তৈরি হোক। 'মানুষ' হওয়া মানে কেবল কতকগুলি বিষয়ে শিক্ষালাভ করা নয়, শুধু চাকরি করা বা মান-সম্মান পাওয়া নয়; তাদের এই বিদ্যার্জনের সঙ্গে সঙ্গে মনোবৃত্তির এমন বিকাশ ঘটুক, যাতে তারা দেশের ও দশের সকলের কাজে লাগতে পারে। সেবার মাধ্যমে তারা যাতে দেশের কল্যাণ করতে পারে, এইজন্যই

বিশেষ করে স্বামীজীর আকাঙ্ক্ষা ছিল বিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তোলা। সেই চেষ্টা বর্তমানে খানিকটা রূপায়িত হচ্ছে। আশাকরি ভবিষ্যতে আরো হবে।

আদর্শকে লক্ষ্য করে আমাদের চলতে হবে। আদর্শ ছাড়া অন্য যত চেষ্টা, আপাতদৃষ্টিতে যত সফলতা—সব নিরর্থক। আদর্শকে ভুললে চলবে না। যে-আদর্শ স্বামীজী তাঁর গুরুর কাছ থেকে দায়স্বরূপে পেয়েছেন—তাই-ই আমাদের জন্য তিনি রেখে গেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের সঞ্চালক এবং বিদ্যার্থীগণ—সকলের জন্য এই আদর্শ যেন উজ্জ্বল থাকে। এই আদর্শ অমোঘ ও শাশ্বত। তাই এই আদর্শ অনুসরণ করলে আমাদের প্রচেষ্টা কখনো ব্যর্থ হবে না। এইটি সর্বদা মনে রাখতে হবে। আর এই প্রচেষ্টায় যাঁরা সহযোগিতা করবেন, তাঁদের যে কল্যাণ হবে—এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কারণ, এর পিছনে ঠাকুর, মা এবং স্বামীজীর অমোঘ আশীর্বাদ রয়েছে। কাজেই ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর কাছে আমাদের প্রার্থনা—তাঁদের কৃপায় এই প্রতিষ্ঠান দিন দিন যেন আরো সফলতা লাভ করে, দেশের কল্যাণকর্মে আরো ব্যাপকভাবে যেন নিয়োজিত হতে পারে। তাঁদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হোক, যাঁরা এই সেবাকর্মে নিযুক্ত তাঁদের প্রয়াস সার্থক হোক, বিদ্যার্থীবৃন্দের জীবন ধন্য হোক এবং দেশের প্রকৃত কল্যাণ হোক—তাঁদের কাছে এই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।* ❑

* ১৯ এপ্রিল ১৯৯০-এ দেওঘরে প্রদত্ত রেকর্ডেড ভাষণের অনুলিখন : দিলীপ পাল।

শব্দচেতনা ৩

পুরাণভিত্তিক

১	২			■	৩		৪		■
■		■	■	৫		■		■	৬
■	৭		৮		■	৯			
■		■		■	১০				■
■	■	১১		■		■	■	■	১২
১৩		■	■	১৪		■	১৫		
	■	■	■		■	১৬	■	■	
	■	■	১৭					■	
১৮		১৯	■		■		■	২০	■
■	■	২১		■	■	■	২২		

পাশাপাশি : (১) দুর্গার অপর নাম, ফলমূল-শাকাদি দানরতা দেবী (৩) যে-অসুর থেকে লক্ষ লক্ষ অসুর সৃষ্টি হয় (৫) কালীর অন্য নাম (৭) অনন্তাবতার, শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা (৯) বায়ুর অপর নাম (১০) দুঃশলার স্বামী (১১) মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র (১৩) সরস্বতীর অপর নাম (১৪) বুধের পত্নী, বৈবস্বত মনুর কন্যা (১৫) স্বর্গের বিনোদন উৎপাদনকারিণী (১৭) যদুবংশীয় রাজা নিঘ্নের পুত্র (১৮) সাংখ্য-প্রণেতা (২১) ইন্দ্রের অস্ত্র (২২) দুর্গার সহচরী

ওপর-নিচ : (২) শ্রীরাধিকার জননী (৩) বিষ্ণুর পত্নী (৪) শিবের অনুচর (৫) শ্রীকৃষ্ণের এক নাম (৬) চন্দ্র যার প্রতীক (৮) বিশ্রবা মুনির পুত্র (১০) সত্যকামের জননী (১২) শ্রীবিষ্ণুর নাম (১৩) গণেশের এক নাম (১৪) নল ও দময়ন্তীর পুত্র (১৬) শিবের আসন (১৯) শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র (২০) শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র

সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম দশজনের নাম পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

শক্তিসাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান*

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ



‘শক্তিসাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান’ বিষয়টি খুবই আকর্ষণীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু একই সঙ্গে খুব কঠিনও। তবে বিষয়টি সম্পর্কে দার্শনিক জটিলতা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সাধনপদ্ধতির অনুপুঙ্খ আলোচনায় আমরা যাব না, চেষ্টা করব বিষয়টিকে সহজভাবে উপস্থাপন করতে। বিষয়টির দুটি অংশ ঃ (১) আমাদের শক্তিসাধনার ঐতিহ্য, (২) সেই ঐতিহ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান। আমরা প্রথমে আমাদের শক্তিসাধনার ঐতিহ্য তথা আমাদের দেশে শক্তিসাধনার পটভূমি আলোচনা করব। দ্বিতীয় ও পরবর্তী পর্বে শক্তিসাধনার সেই ঐতিহ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ কোন্ অবদান রেখেছেন তা আলোচনা করা হবে। শক্তিসাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান বুঝতে গেলে ঐ পটভূমির রূপরেখাটি জানা দরকার।

।।১।।

‘শক্তিসাধনা’ বলতে আমরা সাধারণত ‘তন্ত্রসাধনা’ বা ‘তান্ত্রিক সাধনা’ও বুঝে থাকি। কিন্তু তা সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ, ‘তন্ত্রসাধনা’ বা ‘তান্ত্রিক সাধনা’র মধ্যে শাক্ত তন্ত্রসাধনার সঙ্গে বৈষ্ণব তন্ত্রসাধনা এবং শৈব তন্ত্রসাধনাও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ‘শক্তিসাধনা’য় শুধু আদ্যাশক্তির সাধনাকেই বোঝায়। ‘তন্ত্রসাধনা’ বা ‘তান্ত্রিক সাধনা’ বলতে সাধারণভাবে যে সাধনপদ্ধতি ও সাহিত্যের কথা আমাদের মনে আসে, প্রাচীনত্বের নিরিখে কোন কোন পণ্ডিত তাকে বৈদিক যুগের সমসাময়িক, এমনকি বৈদিক যুগাপেক্ষা পূর্ববর্তী বলে মনে করলেও অনেক পণ্ডিতের মতে তা খ্রীস্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর চেয়ে প্রাচীন নয়। তাঁদের মতে, ‘মহাভারত’ বা ‘রামায়ণ’-এ—যা চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে তাদের বর্তমান আকার লাভ করেছিল—সেখানে তান্ত্রিক সাধনা বা তান্ত্রিক সাহিত্যের কোন উল্লেখ নেই। ষষ্ঠ শতাব্দীর বিখ্যাত কোষগ্রন্থ ‘অমরকোষ’-এ ‘তন্ত্র’ শব্দটির অনেকগুলি অর্থ থাকলেও ‘তন্ত্র’ নামে প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচলিত কোন ধর্মীয় সাধনা বা সাহিত্যের উল্লেখ সেখানে করা হয়নি। পঞ্চম শতাব্দী থেকে ফা-হিয়েন প্রমুখ যেসব চৈনিক পরিব্রাজকের ভারত-বিবরণ পাওয়া যায়, সেখানেও ‘তন্ত্র’-এর কোন উল্লেখ পাচ্ছি না। এপর্যন্ত প্রাচীনতম তন্ত্রসাহিত্যের যে পুঁথি পাওয়া গিয়েছে, পণ্ডিতরা সেটিকে সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে লেখা বলে মনে করছেন। অবশ্য তন্ত্রের উদ্ভব যখনই হোক না কেন, উইন্টারনিজ, নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ পণ্ডিতরা মনে করেছেন—তন্ত্রের আদি জন্মভূমি এবং পুষ্টিভূমি আমাদের বঙ্গদেশ।

সাধনার পদ্ধতি বা দর্শন যখন থেকেই একটি সুনির্দিষ্ট আকার লাভ করুক না কেন, ভারতবর্ষে দেবীপূজা বা শক্তিপূজার ঐতিহ্য যে খুবই প্রাচীন সেবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এতটাই প্রাচীন যে, ইতিহাসের আলোও সেখানে পৌঁছায়নি। সেই হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর যুগেও শক্তিপূজা বা স্ত্রী-দেবতার পূজা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। সে-যুগের কিছু নারী-দেবতার টেরাকোটা মূর্তি এবং শিলমোহরে খোদিত দেবীমূর্তি পাওয়া গিয়েছে, যেগুলিকে পরবর্তী কালের শক্তিমূর্তিগুলির প্রাক্-রূপ বলা যেতে পারে। নৃতত্ত্ববিদ্দের মতে, ঐ মূর্তিগুলি প্রধানত শস্য, প্রাণশক্তি ও প্রজননশক্তির আধার পৃথিবী বা মাতা বসুন্ধরার প্রতীক।

বৈদিক যুগে আমরা পেয়েছি পৃথিবী, অদিতি, সরস্বতী, সাবিত্রী, উষা, উমা, অম্বিকা এবং দুর্গাকে। অনেকে মনে করেন, ঋগ্বেদের সুবিখ্যাত ‘দেবীসূক্ত’ ও ‘রাত্রিসূক্ত’ এবং তার পরিশিষ্টের অন্তর্গত ‘শ্রীসূক্ত’-এর মধ্যে রয়েছে পরবর্তী কালের শক্তিভাবনা ও শক্তিসাধনার শক্তিশালী বীজ। কেউ কেউ বলেন, রাত্রিসূক্তের ভুবনেশ্বরী রাত্রিদেবীই পরবর্তী কালে কৃষ্ণা-ভয়ঙ্করী কালীতে এবং দেবীসূক্তের ‘বাক্’ সরস্বতীতে ও শ্রীসূক্তের ‘শ্রী’ লক্ষ্মীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। অবশ্য এবিষয়ে পণ্ডিতরা একমত নন। শুক্লযজুর্বেদ (৩৪।৩২) ও অথর্ববেদে (৩।১০।২) রাত্রির স্তুতি, শতপথ ব্রাহ্মণ (৭।২।৭) ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৪।১৭) নৃর্ঋতির উল্লেখ এবং তৈত্তিরীয় আরণ্যকে অগ্নিরূপিণী দুর্গার স্তুতি শক্তিসাধনার ধারায় গুরুত্বপূর্ণ সঙ্কেতবাহী। বৈদিক সাহিত্যে ‘কালী’ নামটি আমরা প্রথম পাই মুণ্ডক উপনিষদে। সেখানে অবশ্য ‘কালী’ কোন স্ত্রী-দেবতার নাম নয়, কালী সেখানে যজ্ঞাগ্নির সপ্তজিহ্বার একটি জিহ্বা। মহাভারতেই প্রথম লোলজিহ্বা, রক্তনয়না, ভয়ঙ্করী, শত্রুমর্দিনী কালীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তারপর কালীর উল্লেখ পাই পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত ‘চণ্ডী’তে। এখানে দেবী পার্বতীর হিমালয়ে ‘কালিকা’ নামে সমাখ্যাতা হওয়ার এবং পার্বতী বা অম্বিকার ভ্রূকুটিকুটিল ললাটফলক থেকে

* গত ২২ জুলাই ২০০০ গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারে প্রদত্ত নিভাননী দেবী স্মারক বক্তৃতা এবং ‘শক্তিসাধনা ও মুক্তি’ বিষয়ে গত ২২ নভেম্বর ১৯৯৮ নয়া দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীমন্দির সোসাইটির রজতজয়ন্তী উৎসবের সমাপ্তি অধিবেশনে প্রদত্ত মূল ভাষণকে এখানে সম্মিলিত রূপদান করা হয়েছে।

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

করালবদনা কালীর আবির্ভাবের কথা পাচ্ছি। কালী শুম্ভ-নিশুম্ভের দুর্ধর্ষ সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ডকে বধ করলেন এবং অবধ্য রক্তবীজের রক্ত থেকে উত্থিত অসংখ্য অসুর যোদ্ধাকে চামুণ্ডা রূপে গ্রাস করলেন। 'চণ্ডী'র পর কালীর প্রসঙ্গ পাই পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে। তারপর কালিকাপুরাণে এসে দেখি, সেখানে কালীই মূলাশক্তি বা আদ্যাশক্তি। গুহ্যকালী উপনিষদ্, দেবীভাগবত, দেবীপুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ এবং কালীতন্ত্র, তন্ত্রসার, মহাকাল-সংহিতা, ব্রহ্মযামল ও মহানির্বাণতন্ত্রে দেবীর কালীরূপের প্রাধান্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

এজাতীয় উপনিষদ্, উপপুরাণ ও তন্ত্রগুলি দশম-দ্বাদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে রচিত বলে পণ্ডিতরা বলেন। বঙ্গদেশে শক্তিসাধনার ইতিহাসে এই সময়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শক্তিসাধনার ঐতিহ্যে 'প্রপঞ্চ-সারতন্ত্র' খুবই উল্লেখযোগ্য একটি তন্ত্র। এই তন্ত্রটি আচার্য শঙ্করের (অষ্টম-নবম শতাব্দী) রচনা বলে অনেকে মনে করেন। আচার্যের 'আনন্দলহরী' এবং 'সৌন্দর্যলহরী' স্তোত্রদুটির স্থানও শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে খুবই উচ্চে।

যাই হোক, হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর যুগ থেকে শুরু করে ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্ত, দেবীসূক্ত, শ্রীসূক্ত এবং শুক্লযজুর্বেদ, অথর্ববেদ এবং কোন কোন ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের পথ বেয়ে মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্রসাহিত্যের মধ্য দিয়ে ভারতের শক্তিসাধনার ধারা প্রবাহিত হয়েছে। অবশেষে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বাঙলা লৌকিক সাহিত্য, শাক্ত সাহিত্য তথা মঙ্গলকাব্য ও পদাবলী সাহিত্যের ধারাপথে আধুনিক যুগ পর্যন্ত যে শক্তিসাধনার ধারা আমাদের দেশে, প্রধানত বঙ্গদেশে গড়ে উঠেছে তা একটি সমন্বয়জাত মিশ্রধারা। এর মধ্যে দ্রাবিড় প্রভাব যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে আর্য প্রভাব এবং লোকায়ত প্রভাব। আবার রয়েছে বৌদ্ধ এবং জৈন প্রভাবও। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে শক্তিবাদ বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। প্রসঙ্গত যীশুজননী মেরীকে কেন্দ্র করে খ্রীস্টধর্মেও শক্তিবাদ স্থান করে নিয়েছে। যাই হোক, ভারতীয় শক্তিসাধনার ইতিহাসে আর্য, দ্রাবিড়, লোকায়ত, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবের পাশাপাশি বৈদেশিক ভাব-বিনিময়ের প্রশ্নটিকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রাচীন গ্রীসের রাহী দেবী, এশিয়া মাইনরের সিবিলি, মিশর বা ইজিপ্টের আইসিস এবং তিব্বত, নেপাল, ভুটানের আঞ্চলিক দেবীদের ছায়াপাত ভারতের শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে হয়েছিল কিনা, হলে কিভাবে ও কতটা হয়েছে সেসম্পর্কে পণ্ডিতরা বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। শক্তিসাধনায় বশিষ্ঠ-প্রবর্তিত 'চীনাচার' নামে যে সাধনপদ্ধতি সুপরিচিত, তার পীঠস্থান ছিল সম্ভবত হিমালয়-সন্নিহিত তিব্বত, নেপাল, ভুটান ও কামরূপ।[১] এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের বাইরে গ্রীস, ক্রীট, ইজিপ্ট প্রভৃতি স্থানে নারী-দেবতার পূজার নিদর্শন পাওয়া গেলেও সে-পূজা জগন্মাতৃকার পূজা ছিল না। তা ছিল মাতৃভাব ভিন্ন অন্য ভাবের শক্তিপূজা। বস্তুত, জগৎকারণ ঈশ্বরকে 'মা' বলে ডাকা, 'জগজ্জননী', 'জগদম্বা' প্রভৃতি নামে অভিহিত ও আহ্বান করার ঐতিহ্য শুধুমাত্র ভারতবর্ষেরই নিজস্ব। খ্রীস্টধর্ম যীশুজননী মেরীর পূজা প্রচলন করে পাশ্চাত্যে প্রথম নারীকে মাতৃভাবে পূজার কিঞ্চিৎ প্রচার করেছিল। কিন্তু পাশ্চাত্যের পরিমণ্ডলে তা একটি উল্লেখযোগ্য ভাব হিসাবে গড়ে উঠতে পারেনি। তবে খ্রীস্টধর্মে মেরীর পূজার পিছনে ভারতীয় তথা হিন্দু-প্রভাব রয়েছে কিনা, তা নিয়ে গবেষণা হতেই পারে। একমাত্র ভারতবর্ষের ঋষি এবং সাধকগণই প্রথম উপলব্ধি ও প্রচার করেছিলেন জগৎকারণ ঈশ্বর যেমন পিতা, তেমনি আবার মাতাও। সমস্ত নারীতে মাতৃরূপে তিনিই অধিষ্ঠান করছেন। 'চণ্ডী'তে বলা হয়েছেঃ "স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু" (১১।৬)—হে দেবী, জগতের যাবতীয় স্ত্রীমূর্তিতে তুমিই প্রকাশিত হয়ে রয়েছ। সকল নারীর মধ্যে জগজ্জননীকে দেখার এই ঐতিহ্য একান্তভাবেই ভারতবর্ষের নিজস্ব। অবশ্য মাতৃরূপে শক্তিসাধনা সর্বসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় হতে সময় লেগেছিল।

হরপ্পা-মহেঞ্জোদারোর যুগ থেকে শুরু করে বেদ-উপনিষদ্, পুরাণ, তন্ত্রকে অবলম্বন করে ভারতবর্ষে যে শক্তিসাধনা বা মাতৃসাধনার ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তা কালক্রমে বিন্ধ্য পর্বতকে কেন্দ্র করে উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্বে প্রধানত তিনটি ধারায় প্রসারিত হয়েছে। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণাংশ 'অশ্বক্রান্তা' নামে, বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরে কাশ্মীর পর্যন্ত 'রথক্রান্তা' নামে এবং বিন্ধ্য পর্বত থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ভারতের পূর্বাঞ্চল 'বিষ্ণুক্রান্তা' নামে পরিচিত। 'বিষ্ণুক্রান্তা'র অন্তর্ভুক্ত বঙ্গদেশে শক্তিসাধনা 'কালীকুল' নামে এক বিশেষ ধর্মসাধনায় রূপলাভ করেছিল। কখন এই সাধনধারার সূচনা হয়েছিল সেকথা নিশ্চিতভাবে বলার মতো তথ্য পাওয়া না গেলেও মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, এই সাধনা অন্তত দেড়হাজার বছরের পুরনো। হাজার বছরের প্রাচীন চর্যাপদগুলির মধ্যে এই সাধনার একটি মরমিয়া ও সহজিয়া রূপ আমরা দেখি। তারপর সেই সাধনার ধারা আরেকভাবে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে মঙ্গলকাব্যগুলি এবং শাক্তপদাবলীতে রূপলাভ করে।

১ দ্রঃ ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য—শশিভূষণ দাশগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ৩য় মুদ্রণ, ১৩৭৮, পৃঃ ১২

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

যাই হোক, 'শক্তিসাধনা' বলতে স্বাভাবিকভাবেই আমরা বুঝি আদ্যাশক্তির সাধনা। বঙ্গদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সেই সাধনা প্রধানত 'কালীসাধনা'। দুর্গার সাধনাও আদ্যাশক্তির সাধনা, দশমহাবিদ্যার অন্যান্য শক্তিদেবতার সাধনাও শক্তিসাধনা। কিন্তু 'শক্তিসাধনা' বলতে আমরা সাধারণত বুঝি কালী বা দশমহাবিদ্যার মধ্যে প্রথম মহাবিদ্যার সাধনা। 'চণ্ডী' নামে যিনি ভারতের নানা স্থানে পূজিতা হন, তিনিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'কালী' রূপে পূজিতা। কাশ্মীর, কামরূপ, কাঞ্চি, কাথিয়াবাড়, কলকাতা, কন্যাকুমারী প্রভৃতি ভারতের সর্বত্রই শক্তিধর্ম ও শক্তিসাধনা প্রসারিত। ভারতের এমন কোন অংশ নেই, যেখানে শক্তিধর্ম ও শক্তিসাধনার ঐতিহ্য অনুপস্থিত। তবে একটি কথা বোধ হয় বলা যায় যে, শক্তিধর্ম ও শক্তিসাধনার ঐতিহ্য ও ধারা বাংলায় এবং বাঙালীর কাছে যেমন ব্যাপক প্রাধান্য লাভ করেছে, তেমনটি বোধ হয় ভারতের আর কোথাও করেনি। ভাবাবেগ এবং জনপ্রিয়তার নিরিখে বাংলাকে 'শাক্তধর্মের দেশ' বা 'শক্তিপ্রধান দেশ' বলা যেতেই পারে। বাঙালীর কাছে দুর্গাপূজার তুল্য জনপ্রিয় কোন পূজাই নেই এবং বাঙালী 'পূজা' বলতে দুর্গাপূজাকেই বোঝে, কিন্তু বাঙালীর নিত্যদিনের চিন্তা ও চেতনায়, পূজা ও প্রার্থনায় কালী দুর্গার চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছেন।

প্রচলিত কথায় শোনা যায়—"যেখানেই বাঙালী, সেখানেই মা কালী।" 'ব্রহ্মযামল'-এর বিখ্যাত আদ্যাস্তোত্রে দেবী আদ্যাশক্তি ভারতের কোন্ অঞ্চলে কোন্ মূর্তিতে পূজিতা হন তার তালিকায় আছে—"কালিকা বঙ্গদেশে চ"। বঙ্গদেশে তিনি 'কালিকা' নামে পূজিতা। কালীকুলের সাধনার আলোচনায় এই বক্তব্যে একটি ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা আছে বলে মনে হয়। কারণ, বঙ্গদেশ যে শক্তিসাধনার প্রবলতর ধারা কালীসাধনার প্রধান কেন্দ্র, তার প্রমাণ এখানে পাওয়া যাচ্ছে। লিপিবদ্ধ ইতিহাসের নিরিখে মোটামুটি পঞ্চদশ শতক থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলার শক্তিসাধনার কেন্দ্রে অধিষ্ঠিতা কালীই। দুর্গা, চণ্ডী, দশমহাবিদ্যার অন্যান্য প্রকাশ বাংলায় প্রধানত কালীর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছেন।

বাংলায় শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে কালীর প্রাধান্যের কারণ কি? এবিষয়ে পণ্ডিতরা বলেছেনঃ দুর্গাপূজায় উৎসব-আনন্দের দিকটাই বড়। দুর্গাপূজায় যেন উৎসবই প্রধান। বলা যায়, শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান—সকল বাঙালীর যেন জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজা। দীপাবলীর কালীপূজায় উৎসব-অংশ কম না হলেও দুর্গাপূজার সঙ্গে তা তুলনীয় নয়। সাধারণত বাঙালী পরিবারে দুর্গাপূজার সময় ছাড়া দুর্গার পূজা হয় না। পক্ষান্তরে আমাদের নিত্যদিনের পূজা ও প্রার্থনায় এবং সাধকদের সাধনায় কালীর প্রাধান্য অনস্বীকার্য দুর্গাপূজার উৎসব-প্রাধান্যের জন্যই সম্ভবত সাধনার ক্ষেত্রে কালী প্রাধান্যলাভ করেছেন। তাছাড়া তন্ত্র এবং পুরাণ ও উপপুরাণগুলিতে কালীর কথা যত পাওয়া যায়, দুর্গা বা আদ্যাশক্তির অন্যান্য রূপের কথা তত পাওয়া যায় না। তন্ত্র এবং পুরাণ ও উপপুরাণগুলিতে দেখানো হয়েছে দুর্গা, চণ্ডী, পার্বতী, কালী অভিন্ন এবং কোথাও কোথাও দেখা যায় যে, দুর্গা, চণ্ডী, পার্বতী প্রভৃতি মূলাশক্তি কালীরই এক-একটি রূপভেদ মাত্র। এইভাবে আদ্যাশক্তি-ভাবনার উদ্ভব ও ক্রমবিবর্তনে আমাদের কাছে কালীই হয়ে উঠেছেন মহাদেবী বা সর্বমূলা আদ্যাশক্তি এবং শক্তিসাধনা প্রধানত আবর্তিত হয়েছে কালীকে কেন্দ্র করেই।

বঙ্গদেশে কালীপূজা এবং কালীর যে সুপরিচিত মূর্তিকে আমরা পূজা করি, শোনা যায়, শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক প্রখ্যাত তন্ত্রসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তার প্রবর্তক। তাহলে কি বঙ্গদেশে কালীপূজা তথা শক্তিসাধনার প্রাচীনত্ব পনেরশ-ষোড়শ শতকের? তা হতেই পারে না। কারণ, আজ থেকে অন্তত ১০০০ বছর আগেও কলকাতার কালীঘাটে বা সেকালের কালীক্ষেত্রে মেঘবর্ণা, আলুলায়িত কুন্তলা, লম্বিতজিহ্বা, দিগ্‌বসনা, বরাভয়করা দেবী কালিকার পূজা হতো এবং বহু সাধক সেখানে মাতৃসাধনা তথা শক্তিসাধনায় রত ছিলেন। জনশ্রুতি অনুসারে, সত্যযুগে সতীর দক্ষিণ চরণের কনিষ্ঠা অঙ্গুলি এখানে পতিত হয়েছিল এবং কালীক্ষেত্রের জন্ম হয়েছিল। কথিত আছে, ব্রহ্মাই প্রথমে এখানে কালীসাধনা করেছিলেন। সংশয়ী বা তথাকথিত যুক্তিবাদীরা এই সংবাদটিকে গুরুত্ব দিতে না পারেন, কিন্তু বঙ্গদেশে কালীসাধনার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে সংবাদটি যথেষ্টই আলোকপাত করে।

প্রসঙ্গত একটি কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বাংলায় শক্তিসাধনার ঐতিহ্য অনেক প্রাচীন হলেও প্রধানত পঞ্চদশ শতাব্দীর পর থেকে এই সাধনা পৃথগ্‌ভাবে একটি দর্শনের আকার নিয়েছিল। ভারতীয় দর্শনগুলির সঙ্কলক—পঞ্চদশ শতাব্দীর বিখ্যাত সাধক ও মনীষী মাধবাচার্য তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'সর্বদর্শনসংগ্রহ' গ্রন্থে ষোলটি প্রচলিত ভারতীয় দর্শনের আলোচনা করেছেন। সেখানে কিন্তু 'শাক্তদর্শন'-এর কোন উল্লেখ তিনি করেননি, যদিও 'শৈবদর্শন' ও 'শৈবসাধনা'র কয়েকটি শাখার উল্লেখ সেখানে রয়েছে। সুতরাং আমরা অনুমান করতে পারি যে, স্বতন্ত্র দর্শন হিসাবে শাক্তদর্শন পঞ্চদশ শতাব্দীর পর থেকেই জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করে। সম্ভবত তখন থেকেই শক্তিসাধনারও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে এবং ক্রমে জনপ্রিয়তায় তা অন্যান্য সাধনাকেও অতিক্রম করে যায়। তার আগে

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

শক্তিসাধনার ধারাটি মূলত একটি গুহ্য-সাধনা বা রহস্য-সাধনা হিসাবেই প্রচলিত ছিল।

অধিকারভেদে শক্তিসাধনায় তিনটি ভাবের সাধনার কথা জানা যায়—পশুভাব, বীরভাব এবং দিব্যভাব। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—এই পঞ্চ 'ম'কার নিয়েই শক্তিসাধনার বিধান। শক্তিসাধনায় পঞ্চ 'ম'কারের ব্যবহার আবশ্যিক। যাঁরা পশুভাবের অর্থাৎ নিম্নস্তরের সাধক তাঁরা স্থূল পঞ্চ 'ম'কার সহযোগে সাধনা করেন এবং প্রায়শই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বিকৃত সাধনা বা তথাকথিত বামাচারে প্রবৃত্ত হন। সেজন্য কলিযুগে পশুভাবের সাধনা নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ শক্তিসাধনার নামে এই কুৎসিত বামাচারের কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। যাঁরা উচ্চতর স্তরের সাধক বা বীরভাবের সাধক, তাঁরাও স্থূল পঞ্চ 'ম'কার সহযোগে সাধনা করেন, তবে সেখানে চিত্তের দৃঢ়তা, মনের একাগ্রতা এবং সঙ্কল্পের শক্তির প্রভাবে তাঁরা স্থূল পঞ্চ 'ম'কারকে নির্বিকারভাবে গ্রহণ করে সাধনপথে এগিয়ে চলেন। বীরভাবের সাধকদের সম্পর্কে সেজন্য বলা হয়ঃ "রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ।" শক্তিসাধনার বিখ্যাত সাধকদের অধিকাংশই বীরভাবের সাধক। বস্তুত, বীরভাবের সাধনা সম্পূর্ণ করতে পারলে তবেই দিব্যভাবের সাধনায় প্রবেশাধিকার আসে। দিব্যভাবের অর্থাৎ উচ্চতম স্তরের সাধক যাঁরা, তাঁরা পঞ্চ 'ম'কারকে প্রতীকরূপে গ্রহণ করেন এবং শুদ্ধ চিত্তে একাগ্র সাধনায় লক্ষ্যে উপনীত হন। দিব্যভাবের সার্থক সাধক শুধু বিরল নয়, বিরলতম। এই ভাবের শুদ্ধতম সাধনায় সিদ্ধ একজনেরই নাম আমরা জানি। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ।

বাংলার শক্তিসাধনার বীরভাবের ধারায় প্রথম সুপ্রসিদ্ধ নাম নবদ্বীপের শক্তিসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। তাঁর কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। কালীর প্রচলিত মূর্তি তাঁরই ধ্যানলব্ধ বলে প্রসিদ্ধ। কালীপূজার বিধান ও কালীসাধনার পদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে তাঁর সঙ্কলিত 'তন্ত্রসার' গ্রন্থে। আগেই বলেছি, তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকের মানুষ। আগমবাগীশের পর প্রসিদ্ধ শক্তিসাধক সর্বানন্দ পরমহংস। পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশের) মেহারের শ্মশানে ছিল তাঁর সাধনপীঠ। জীবনের শেষভাগে তিনি কাশীতে বাস করতেন। তিনি নাকি একসঙ্গে কালী-সহ দশমহাবিদ্যার দর্শনলাভ করেছিলেন। বিখ্যাত তন্ত্র-সঙ্কলন 'সর্বোল্লাসতন্ত্র' গ্রন্থের প্রণেতা ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের লোক। ষোড়শ শতকের তৃতীয় পাদের বিখ্যাত শক্তিসাধক ছিলেন ব্রহ্মানন্দ গিরি। সাধনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি রচনা করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'শাক্তানন্দতরঙ্গিনী'। তাঁর 'তারারহস্য' গ্রন্থটিও শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ষোড়শ শতকের আরেক শক্তিসাধক পূর্ণানন্দ ছিলেন ব্রহ্মানন্দের শিষ্য। পূর্ণানন্দের 'শ্যামারহস্য' শক্তিসাধনার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

বাংলার শক্তিসাধনায় শাক্তগীতির মাধ্যমে এক নতুন ধারার উদ্বোধক ছিলেন সাধক রামপ্রসাদ সেন (১৭২০-১৭৮১)। শাক্তপদাবলীর প্রবর্তক রামপ্রসাদ ছিলেন আঠার শতকের লোক। কথিত আছে, মা কালী তাঁর কন্যারূপে তাঁর বাড়ির বেড়াবাঁধার কাজে সাহায্য করেছিলেন। জগজ্জননীর সঙ্গে তাঁর আটপৌরে সম্পর্ক শক্তিসাধনাকে এক নতুন মাত্রা দান করেছিল। তাঁর শাক্তগীতিতে সাধনা এবং দর্শনের এক অসাধারণ সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর এই গীতি থেকে বোঝা যায়, তিনি প্রধানত বীরভাবের সাধক হলেও তাঁর সাধনায় তিনি বীরভাবের সঙ্গে দিব্যভাবের সমন্বয়সাধন করেছিলেন। তার ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা তাঁর শাক্তগীতিতে শক্তিসাধনার মধ্যে এক উদার সর্বজনীন অসাম্প্রদায়িকতার আদর্শের পরিচয় লাভ করি, যার সার্থক পরিপূর্ণতা আমরা দেখি শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে।

পরবর্তী কালের শক্তিসাধকদের মধ্যে বর্ধমানের কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৭৭২-১৮২১), সাধক বামদেব বা বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বা সাধক বামাক্ষ্যাপার (১৮৩৮-১৯১১) কথাও আমরা সবাই জানি। বামাক্ষ্যাপার সাধনক্ষেত্র তারাপীঠ শক্তিসাধনার সুবিখ্যাত কেন্দ্র হিসাবে প্রাচীনকাল থেকেই প্রসিদ্ধ। মুর্শিদাবাদ জেলার কিরিটীশ্বরী মন্দিরে নাটোরের রানী ভবানীর দত্তক পুত্র রাজা মহাসাধক রামকৃষ্ণ রায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন অষ্টাদশ শতকের লোক।

বাংলার শক্তিসাধনার ঐতিহ্য আরো অনেক সিদ্ধ সাধকের অবদানে সমৃদ্ধ, কিন্তু স্থানাভাবে তাঁদের কথা বলা এখানে সম্ভব হবে না।

শক্তিসাধনার মূল উদ্দেশ্য হলো, সাধকের অন্তরস্থিত শক্তির জাগরণ—যার ফলে সাধক তাঁর পশুসত্তা বা দানবসত্তার বিনাশ ঘটিয়ে শিবসত্তার উপলব্ধি করতে পারেন। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত বলেছেন, মায়ের পদতলে পতিত শিবদেহ আসলে মায়ের পাদস্পর্শে রূপান্তরিত দানবদেহ। শক্তিসাধনা সেজন্য নিছক একটি সাধনা নয়, তা হলো 'সাধন-সমর'—পশুমানব বা দানব-মানব থেকে শিব-মানবে উত্তরণের মহা সংগ্রাম। সেই উত্তরণেই মানবের মুক্তি। সেই মুক্তির বার্তাই শক্তিসাধনার বার্তা।

।।২।।

অবশেষে এলেন দক্ষিণেশ্বরের অবতার, মা ভবতারিণীর উপাসক শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বাংলার তথা ভারতের

শক্তিসাধনাকে পৃথিবীখ্যাত করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর সাধনরহস্য তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের কাছে উন্মোচন করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিভাবনা স্বামী বিবেকানন্দের কর্মে, চিন্তায় ও দর্শনে সম্প্রসারিত হয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার কাছে শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিভাবনাকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। বস্তুত, স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতার শক্তিভাবনা পৃথগ্‌ভাবে বিস্তৃত আলোচনার বিষয় হতে পারে। সেজন্য তাঁদের প্রসঙ্গ বর্তমান আলোচনায় আমরা রাখছি না।

আমরা এখন আসছি আমাদের আলোচনার দ্বিতীয় পর্বে—'শক্তিসাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের অবদান' প্রসঙ্গে।

বাংলা তথা ভারতের শক্তিসাধনার তরঙ্গশীর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের অবস্থান। বস্তুত, বাংলা তথা ভারতের শক্তিসাধনার বিচিত্র ধারা তাঁর সাধনায় মিলিত হয়ে এক মহাসঙ্গম রচনা করেছিল। শক্তিসাধনার ক্ষেত্রে তিনি সত্যিই এক অভাবনীয় সেতুবন্ধন করেছিলেন। শৈশবে আনুড়ের বিশালাক্ষী দর্শনে যাওয়ার পথে ঘনকৃষ্ণ মেঘের পটভূমিতে শ্বেতশুভ্র বলাকাশ্রেণী দেখে তিনি প্রথম সমাধিস্থ হয়েছিলেন। তাঁর গভীর সংবেদনশীল মন কি তখন ঐ ঘনকৃষ্ণ ও ঘনশুভ্র বর্ণের সহাবস্থানের মধ্যে সৃষ্টির মূলরহস্য শিব-শক্তি তত্ত্বের সন্ধানলাভ করেছিল? এর উত্তর আমাদের জানা নেই, কিন্তু ঐ মুহূর্ত থেকেই কি জগতের শ্রেষ্ঠ সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যসাধনার সূচনা হয়নি? সেই সাধনা মানুষের জীবসত্তা থেকে শিবসত্তায় উত্তরণের পরম সাধনা, সেই সাধনা মৃন্ময়ীর মধ্যে চিন্ময়ীর জাগরণের সাধনা, সেই সাধনা সমস্ত নারীর মধ্যে জগজ্জননীর অধিষ্ঠান উপলব্ধির সাধনা, সেই সাধনা দ্বৈত ও অদ্বৈতের, সাকার ও নিরাকারের, সগুণ ও নির্গুণের, যোগ, বেদান্ত ও তন্ত্রের, শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব সাধনের, হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান ধর্মের সমন্বয়-সাধনা। সেই সাধনা ভূমির মানুষের ভূমার ঐশ্বর্যে পূর্ণ হওয়ার সাধনা।

শ্রীরামকৃষ্ণের আনুষ্ঠানিক সাধনার সূচনা দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে শক্তিসাধনার মাধ্যমে। শুধুমাত্র ভাব ও ব্যাকুলতার প্রেরণায় তিনি তাঁর অসাধারণ সাধনা আরম্ভ করেছিলেন এবং জগজ্জননীর দর্শনলাভ করেছিলেন। এইভাবে 'আগে ফুল পরে ফল' প্রকৃতির এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে তাঁর ক্ষেত্রে 'আগে ফল, পরে ফুল' দেখা গিয়েছিল। জগজ্জননীর দর্শনলাভের পর ভৈরবী যোগেশ্বরীর নির্দেশে শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথ ও প্রণালী অবলম্বনে বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত ৬৪টি তন্ত্রে বর্ণিত সমস্ত সাধনা তিন বছর ধরে এক-এক করে তিনি সমাপ্ত করেছিলেন এবং প্রত্যেক সাধনায় চূড়ান্ত সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কোন সাধনেই সিদ্ধিলাভ করার জন্য তাঁর তিনদিনের বেশি সময় লাগেনি।[২]

শক্তিসাধনার পথ ও প্রণালী অনুসারে, পঞ্চ 'ম'কারের সাধন, বিশেষ করে 'কারণ' গ্রহণ এবং সাধনসঙ্গিনী হিসাবে শক্তি বা স্ত্রীলোক গ্রহণ না করলে সাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অসাধারণ বীরভাব-সাধনা সম্পূর্ণ করেছিলেন তন্ত্রকথিত পঞ্চ 'ম'কার এবং পঞ্চ 'ম'কারের প্রধান দুই অঙ্গ 'কারণ' ও 'নারী'কে সাধনসঙ্গিনী হিসাবে না গ্রহণ করে এবং নারীমাত্রে মাতৃবুদ্ধি অক্ষুণ্ণ রেখে। এসম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন: "(তন্ত্রসাধনার শেষ পর্বে) যেদিন নরনারীর সম্ভোগানন্দ দর্শনপূর্বক শিব-শক্তির লীলাবিলাস জ্ঞানে মুগ্ধ ও সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেইদিন বাহ্যচৈতন্যলাভের পর ব্রাহ্মণী (অর্থাৎ ভৈরবী যোগেশ্বরী) বলিয়াছিল, 'বাবা, তুমি আনন্দাসনে সিদ্ধ হইয়া দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে। উহাই এই মতের (অর্থাৎ বীরভাবের) শেষ সাধন।' উহার কিছুকাল পরে... যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া বীরভাবের সাধন সম্পূর্ণ করিয়াছিলাম। দীর্ঘকালব্যাপী তন্ত্রোক্ত সাধনের সময় আমার রমণীমাত্রে মাতৃভাব যেমন অক্ষুণ্ণ ছিল, তদ্রূপ বিন্দুমাত্র 'কারণ' গ্রহণ করিতে পারি নাই। কারণের নাম মাত্রেই জগৎকারণের উপলব্ধিতে আত্মহারা হইতাম এবং 'যোনি' শব্দ শ্রবণমাত্রেই জগদ্‌যোনির উদ্দীপনায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িতাম।"[৩]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মাত্র তিন বছর সাধনায় শাস্ত্রোক্ত শক্তিসাধনার সম্পূর্ণ সিদ্ধি যখন তাঁর করায়ত্ত হয়, তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৮ বছর। এত কম সময়ে এবং এত কম বয়সে সম্পূর্ণ সিদ্ধির দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত শক্তিসাধনার ইতিহাসে আর নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিসাধনার বিশেষত্ব এই যে, তিনি প্রমাণ করেছিলেন, বীরভাবের সাধনায় পঞ্চ 'ম'কার, 'কারণ' ও সাধনসঙ্গিনী হিসাবে নারীগ্রহণ "অবশ্যকর্তব্য অঙ্গ" নয়। প্রচ্ছন্ন ভোগলিপ্সু সাধক আপন ভোগেচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য ঐসমস্ত অনুষ্ঠান করে থাকে এবং একটি সমুচ্চ শুদ্ধ সাধনাকে কলঙ্কিত করে। আপন অসাধারণ সাধনার দৃষ্টান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ শক্তিসাধনার ধারাকে শুধু নতুন মাত্রা, গভীর দ্যোতনা ও প্রবল শক্তি দানই করেননি, শাস্ত্রোক্ত ঐ সাধনার সারবত্তাকেও পূর্ণভাবে প্রমাণ করেছিলেন এবং ঐ সাধনাকে তার মূল গৌরবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বামী সারদানন্দ এসম্পর্কে মন্তব্য করেছেন:

২ দ্রঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, সাধকভাব, ১৩শ অধ্যায়, পৃঃ ২০৪-২০৫

৩ ঐ, পৃঃ ২০১

"কঠোর সংযমকে ভিত্তিস্বরূপ অবলম্বনপূর্বক তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহে প্রবৃত্ত হইলে ফল প্রত্যক্ষ হইবে, নতুবা নহে—একথা লোকে কালধর্মে প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিল এবং তাহাদিগের অনুষ্ঠিত কুক্রিয়া-সকলের জন্য তন্ত্রশাস্ত্রই দায়ী স্থির করিয়া সাধারণে তাহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অতএব রমণীমাত্রে মাতৃভাব-পূর্ণহৃদয় ঠাকুরের এইসকল অনুষ্ঠানের সাফল্য দেখিয়া যথার্থ সাধককুলকে কোন্ লক্ষ্যে চলিতে হইবে তাহার নির্দেশলাভপূর্বক যেমন তাঁহারা উপকৃত হইয়াছেন, তন্ত্রশাস্ত্রের প্রামাণ্যও তেমনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ শাস্ত্র মহিমান্বিত হইয়াছে।"[৪]

শক্তিসাধনার শেষে স্বাভাবিকভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের মধ্যে অষ্টসিদ্ধি বা অপরিমেয় অলৌকিক বিভূতির আবির্ভাব অনুভব করেছিলেন। দেখা গিয়েছে, শুধু সাধারণ শক্তিসাধকরাই নন, অসাধারণ সাধকরাও ঐ ক্ষমতা বা সিদ্ধাইয়ের প্রয়োগ থেকে বিরত থাকেন না। শক্তিসাধকদের মধ্যে একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণই ছিলেন ঐ ধারায় উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তিনি সিদ্ধাইকে তীব্রভাবে ঘৃণা করতেন এবং বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁর শিষ্যদের ঐ বিষয়ে কঠোরভাবে সতর্ক করে বলেছিলেন, সিদ্ধাইয়ের প্রয়োগ সাধককে ইষ্টপথ থেকে ভ্রষ্ট করে তাঁর অধোগতি ঘটায়। শ্রীরামকৃষ্ণের নিজ জীবনের দৃষ্টান্ত এবং এবিষয়ে তাঁর কঠোর সতর্কবাণী শক্তিসাধনার ধারায় এক উজ্জ্বল দিক-নির্দেশিকা হিসাবে চিরকালের জন্য চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে বলেছেন যে, তিনি একান্তভাবেই 'জগদম্বার বালক'। মা ভিন্ন তিনি আর কিছুই জানতেন না। সাধনার প্রথম অবস্থায় মায়ের দর্শনের জন্য 'মা দেখা দে' বলে পঞ্চবটীমূলে, গঙ্গাতীরে মুখ ঘষে তিনি ব্যাকুল হয়ে কাঁদতেন। শোনা যায়, ব্যাকুলতার তীব্রতায় এমনভাবে তিনি গঙ্গাতীরে মুখ ঘষতেন যে, মুখ ফেটে অঝোরে রক্ত ঝরত এবং লোকে ভাবত, যুবকটির বুঝি সদ্য মাতৃবিয়োগ হয়েছে! তাঁর এই অসাধারণ মাতৃ-ব্যাকুলতা' শক্তিসাধনার সাধক ও ভক্তদের চিরন্তন প্রেরণার উৎস। তাঁর এই প্রবল মাতৃ-ব্যাকুলতাকে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেনঃ "ব্যাকুলতার ঝঞ্ঝা"। বলেছেনঃ "In the life of Ramakrishna Paramahansa, we see a colossal spiritual capacity... taking, as it were, the kingdom of heaven by violence." অরবিন্দ-সম্পাদিত 'Karmayogin' পত্রিকায় ১৯ মার্চ ১৯১০ তারিখের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিলঃ "আগামী পাঁচশ বছর পৃথিবী আর দ্বিতীয় রামকৃষ্ণের জন্ম দিতে পারবে না। যে ভাবরাশি এবং আধ্যাত্মিক শক্তি তিনি আমাদের দান করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাকে আমাদের জীবনে ও কর্মে রূপায়িত করতে না পারছি, ততক্ষণ আর বেশি চাইবার আমাদের অধিকার আছে কি? আর বেশি নিয়েই বা আমরা কি করব?... একা রামকৃষ্ণই পূর্বতন ধর্মাচার্যদের জীবন, সাধনা ও উপলব্ধির পূর্ণ সমন্বয়কে নিজের মধ্যে মূর্ত করে তুলেছিলেন।"

মাতৃপ্রাণতা মাতৃসাধক মাত্রেরই বৈশিষ্ট্য, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃপ্রাণতা ছিল অতুলনীয়। সবকিছুই তাঁর—"মা জানেন।" এই অতুলনীয় মাতৃনির্ভরতার জন্য অন্যান্য সাধনার মতো তন্ত্রসাধনার আগেও তাঁকে তাঁর মায়ের কাছে অর্থাৎ জগজ্জননীর কাছে অনুমতি গ্রহণ করতে দেখি। মায়ের সুস্পষ্ট নির্দেশ ও অনুমোদন ভিন্ন জীবনে তিনি কিছু করেননি। নিজেকে নিঃশেষে মাতৃ ইচ্ছার কাছে এভাবে সমর্পণ শক্তিসাধনার ইতিহাসে বিরল। এই অতলস্পর্শী মাতৃপ্রাণতা শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিসাধনাকে এক দুর্লভ মাধুর্য দান করেছে এবং সেইসঙ্গে ভারতের শক্তিসাধনার ঐতিহ্যে এক সুগভীর মাত্রা সংযুক্ত করেছে।

এইসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, তাঁর ভাবময় কণ্ঠে বাংলার বিখ্যাত মাতৃসঙ্গীতগুলি অসাধারণ ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠত। 'কথামৃত'-এর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় আমরা দেখি, বাংলার মাতৃসঙ্গীতকে শ্রীরামকৃষ্ণ এক অতুলনীয় মাধুর্যে, গাম্ভীর্যে এবং ভাবের ঐশ্বর্যে নতুন মাত্রা, নতুন শক্তি এবং নতুন গভীরতা দান করেছিলেন। শক্তিসাধনার ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণের এই অবদানও স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

দেখা গিয়েছে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সন্ত-সাধকদের মধ্যে, এমনকি সিদ্ধ সন্ত-সাধকদের মধ্যেও একধরনের একদেশদর্শিতা, পরমত-অসহিষ্ণুতা থাকে। শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে, দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মতের মধ্যে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্ট ও মুসলমান ধর্মের মধ্যে যে পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা এবং নিজে অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ—এই দাম্ভিকতার মনোভাব আমরা দেখি, সেজন্য সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় ও মতগুলির সন্ত-সাধকদের তো বটেই, এমনকি আচার্যদের ভূমিকাকেও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের অভূতপূর্ব সাধনা—যার সূচনা ও সমাপ্তি (পত্নীকে দেবীরূপে পূজা) মাতৃসাধনায়—শ্রীরামকৃষ্ণকে দান করেছিল এক অতুলনীয় মুক্ত দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিতে তাঁর কাছে অদ্বৈত বেদান্তের ব্রহ্ম এবং তন্ত্রের শক্তি অভিন্ন বলে প্রতিভাত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেনঃ "যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলি; যখন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় এইসব কাজ করছেন, তাঁকে শক্তি বলি। স্থির জল—ব্রহ্মের

৪ দ্রঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১১শ অধ্যায়, পৃঃ ২০৫

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

উপমা; জল হেলছে দুলছে—শক্তির উপমা।" অদ্বৈত বেদান্তে শক্তি উপেক্ষিত এবং তন্ত্রে উপেক্ষিত ব্রহ্ম। কিন্তু সেই ব্রহ্ম এবং শক্তির সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বের উদ্‌ঘোষণ ভারতের সাধনা ও দর্শনের ইতিহাসে অবশ্যই এক নতুন দিকচিহ্ন স্থাপন করেছে। শুধু তাই নয়, শক্তিসাধনার পূর্ণ সিদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে তিনি বলেছিলেন, মা তাঁকে দেখিয়েছেন—সাকার-নিরাকার, সগুণ-নির্গুণ, রূপ-অরূপ সব তিনিই, আবার তিনি এসমস্তের পারও। ঐ সিদ্ধির ভূমিতে দাঁড়িয়েই তিনি বলেছিলেনঃ দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত পরস্পরবিরোধী নয়, ঐগুলি মানব-মনের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রবণতাভিত্তিক স্তরমাত্র। যেমন ছাদে ওঠার সিঁড়ি। তবে সর্বোচ্চ স্তর বা ছাদ হলো অদ্বৈতভূমি। তিনি আরো বলেছিলেন, মা তাঁকে দেখিয়ে দিয়েছেন—"সবাই সেই এক বস্তুকেই খুঁজছে। অথচ এ ওর সঙ্গে ঝগড়া করছে, ও এর সঙ্গে ঝগড়া করছে! হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, ব্রাহ্ম, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব—সব পরস্পর ঝগড়া। এ বুদ্ধি নাই যে, যাঁকে কৃষ্ণ বলছ, তাঁকেই শিব, তাঁকেই আদ্যাশক্তি বলা হয়; তাঁকেই গড, তাঁকেই আল্লা বলা হয়! এক রাম তাঁর হাজার নাম। বস্তু এক, নাম আলাদা। তাই দলাদলি, মনান্তর, ঝগড়া, লাঠালাঠি, মারামারি, কাটাকাটি—এসব ভাল নয়।"

এই বিদ্বেষ, বিতণ্ডা ও অসহিষ্ণুতার মনোভাবকে তিনি 'মতুয়ার বুদ্ধি' বলে নির্দেশ করেছিলেন এবং এই বুদ্ধিকে ধ্বংস করার পথ হিসেবে দিয়েছিলেন তাঁর উপলব্ধিজাত সমন্বয়ের মহাবাণী—"যত মত তত পথ"।

এই উপলব্ধি তাঁর অসাধারণ ধর্মসাধনার ফলশ্রুতি সন্দেহ নেই, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন, এই উপলব্ধির পিছনে ছিল সকল পদার্থে তাঁর অদ্বৈতবুদ্ধি—শক্তিসাধনা সমাপ্তির পর যা এমন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল যে, তাঁর দৃষ্টি থেকে সমস্ত ভেদ চিরতরে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলতেন, তাঁর দৃষ্টিতে তখন আর কিছু হেয় বা নগণ্য ছিল না, সবই ছিল পবিত্র। তিনি বলেছেনঃ "তুলসী ও সজনে গাছের পাতা আমার কাছে সমান পবিত্র মনে হতো।"[৫]

এই অতুলনীয় অদ্বৈতবুদ্ধি শুধু তাঁর উপলব্ধিই ছিল না, তাঁর জীবনটিই ছিল তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। রোমাঁ রোলাঁ বলেছেনঃ "Ramakrishna more than any other man not only conceived, but realized in himself the total unity of the river of God, open to all rivers and all streams." রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেনঃ "বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা,/ ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।" শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্বৈতবুদ্ধি থেকেই উঠে এসেছিল তাঁর সমন্বয়ের মহা আদর্শ।

সমন্বয়ের এই মহা আদর্শ জগৎকে শ্রীরামকৃষ্ণের এক মহাদান। কিন্তু তাঁর সমস্ত চিন্তা, কর্ম ও সাধনার মতো এই আদর্শের পিছনে তাঁর কোন পরিকল্পনা বা শ্রীশ্রীমায়ের ভাষায়—কোন 'মতলব' ছিল না। সব বিষয়েই তিনি বলতেনঃ "আমি অত শত জানি না বাপু। আমি খাই-দাই থাকি, আর মায়ের নাম করি।" তিনি কেবল অসাধারণ সাধনা করে গিয়েছিলেন, তাঁর অসাধারণ জীবন যাপন করেছিলেন। তাঁর ছিল এক অসচেতন মহাজীবন এবং তা যাপন করেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁর সেই অসচেতন জীবন ও সাধনার ব্যাখ্যা দেবে ইতিহাস। স্বামীজী বলেছিলেনঃ "He (Ramakrishna) was contented simply to live [unconsciously] that great life and to live it to others to find the explanation!"[৬]

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনার শেষে জগজ্জননীর মুখ থেকে তিনি দিব্যবাণী শুনেছিলেন—"ভাবমুখে থাক।"[৭] শ্রীরামকৃষ্ণের এই 'ভাবমুখে' থাকার বিষয়টি ধর্মজগতে এক অভিনব আদর্শ। তাঁর এই 'ভাবমুখে থাকা' বেদান্তের ইতিহাসে এক নতুন ভাববিপ্লবের সূচনা করেছে। সতী-অসতী, পাপী-পুণ্যবান, সাধু-অসাধু, ধর্ম-কর্ম—সবেতেই তিনি, তাঁতেই সব। শ্রীরামকৃষ্ণ কালীর নৈবেদ্য বিড়ালকে দিয়েছিলেন। মাকে পূজা করতে গিয়ে মায়ের বিগ্রহের পাশে এক বারবনিতাকে দেখেছিলেন। দেবেন নাই বা কেন? দেখবেন নাই বা কেন? কারণ, মা-ই যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ঐসকল রূপে। জীব তো শিব ছাড়া আর কিছু নয়। বেদান্তের 'নেতি নেতি'কে ফিরিয়ে আনলেন মায়ের 'ইতি ইতি'তে। কারণ, সবই যে সেই এক মাতৃসমুদ্র থেকে উৎসারিত। 'মা, মা'—জগৎজুড়ে শুধুই 'মা'। সেই এক-এর মোহনায় সব নদনদী নিজেদের সত্তা হারিয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল।

শক্তিসাধনায় দেবী সাধকের উপাস্যা। শ্রীরামকৃষ্ণের উপাস্যা ছিলেন কালী। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে শ্রীশ্রীমা নিবেদিতাকে বলেছিলেনঃ "শ্রীরামকৃষ্ণই স্বয়ং কালী।" শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে একসঙ্গে কালী ও শিবকে দেখেছিলেন মথুরবাবু। শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদদের মধ্যেও কেউ কেউ শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে কালীকে দেখেছেন, যেমন স্বামী ব্রহ্মানন্দ এবং গিরিশচন্দ্র। প্রসঙ্গত শ্যামপুকুরবাটীতে ১৮৮৫ সালের

৫ দ্রঃ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১১শ অধ্যায়, পৃঃ ২১০
৬ The Master as I saw Him—Sister Nivedita, Udbodhan Office, 1998, p. 46
৭ ঐ, গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ১ম অধ্যায়, পৃঃ ১

কালীপূজার রাত্রের সেই সুপ্রসিদ্ধ ঘটনাটি স্মরণীয়। সেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ কালীর ভাবে আবিষ্ট হয়ে সমবেত ভক্তদের পূজা গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেন ছিলেন ঘটনার অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি লিখেছেন ঃ

"কেবা কালী কেবা প্রভু না পারি বুঝিতে।
কালীতে কেবল তিনি মা কালী তাঁহাতে।।"

'লীলাপ্রসঙ্গ'-এও ঘটনাটির অনবদ্য বর্ণনা রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহান্তের পর শ্রীশ্রীমা "আমার মা কালী গো, আমাকে একলা ফেলে কোথায় গেলে!" বলে ডুকরে কেঁদে উঠেছিলেন। 'কথামৃত'-এ আছে, শ্রীম শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে শুনেছিলেন —মা আর তিনি এক।[৮] শক্তিসাধনার ইতিহাসে উপাসক এবং উপাস্যার এই একীভবনের কথা আর কখনো শোনা যায়নি। সুতরাং শক্তিসাধনার ইতিহাসে এটি শ্রীরামকৃষ্ণের একটি অনন্য সংযোজন।

শক্তিসাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা বড় অবদান নিজ পত্নীতে তাঁর মাতৃবুদ্ধি—জগজ্জননীবুদ্ধি। শ্রীশ্রীমাকে তিনি বলেছিলেন—তাঁকে, তাঁর গর্ভধারিণী চন্দ্রাদেবীকে এবং মন্দিরের মা ভবতারিণীকে তিনি এক দেখেন। তাঁর এই কথা জগৎপ্রসিদ্ধ। তেমনি জগৎপ্রসিদ্ধ তাঁর নিজ পত্নীকে জগজ্জননী-জ্ঞানে—ষোড়শী-জ্ঞানে পূজার মহাঘটনাটিও। এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী সারদানন্দের ভাষায়, তাঁর সাধনযজ্ঞের "পূর্ণাহুতি" প্রদান করেছিলেন। শুধু শক্তিসাধনার ইতিহাসে নয়, সমগ্র জগতের সমস্ত সাধনার ইতিহাসে এমন অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত আর নেই।

পুরী সম্প্রদায়ভুক্ত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের ইতিহাসেও এই অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত পুরী সম্প্রদায়ের মূল মঠ শৃঙ্গেরী মঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ষোড়শী, যাঁর অপর নাম 'শ্রীবিদ্যা' বা 'ত্রিপুরাসুন্দরী'। শ্রীরামকৃষ্ণ উভয় নামেই শ্রীশ্রীমাকে আবাহন ও পূজা করে সেদিন তাঁকে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আসনে আনুষ্ঠানিকভাবে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনা শুরু করেছিলেন তন্ত্রসাধনার কালীকুলে, আর সাধনার সমাপ্তি ঘটালেন পুরী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত শ্রীকুলে। এটি যেমন তন্ত্রশাস্ত্রসম্মত, তেমনি আবার শঙ্করাচার্য-নির্দেশিত সাধনসম্মতও। একইসঙ্গে এখানে সমন্বয় ঘটল উত্তরের সাধনার সঙ্গে দক্ষিণের সাধনার, তন্ত্রের সঙ্গে বেদান্তের। আবার সমন্বয় ঘটল গার্হস্থ্যের সঙ্গে সন্ন্যাসের। কারণ, কালীকুলের শক্তিসাধনা প্রধানত গৃহস্থের সাধনা। শ্রীকুলের সাধনা দশনামী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীর সাধনা। সুতরাং সমন্বয় ঘটল শঙ্করাচার্যের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের, কালীর সঙ্গে ষোড়শীর, শ্রীবিদ্যার সঙ্গে সারদাদেবীর, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সঙ্গে দশনামী সম্প্রদায়ের, বেলুড় মঠের সঙ্গে শৃঙ্গেরী মঠের।

শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিসাধনায় স্ত্রীগুরু গ্রহণ, পত্নীকে জগজ্জননী-জ্ঞানে পূজা এবং সব নারীতে মাতৃজ্ঞানের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ সমাজবিকাশ ও সমাজবিবর্তনের এক নতুন ধারার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, শ্রীমাকে কেন্দ্র করে নারী-জাগরণের এক অসাধারণ সম্ভাবনা শ্রীরামকৃষ্ণের এই অভিনব শক্তিসাধনায় নিহিত। বস্তুত, স্বামীজীর পরিকল্পিত এবং শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবর্ষে রূপায়িত শ্রীসারদা মঠ শ্রীরামকৃষ্ণের স্বপ্নসম্ভব এক মহাকাব্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী এবং একইসঙ্গে তাঁর উপাস্যার চেতনবিগ্রহ-স্বরূপিণী সারদাদেবীর মধ্যে আমরা দেখি আমাদের সকলের চেনা মাতৃমূর্তিকে—আমাদের সকলের মা-টিকে। চেনা, আবার চেনা নয়ও। কারণ, মানব-আধারে তিনি যে জগতের দিব্যজননী। জগতের সামনে দিব্যমাতৃত্বের এই অপরূপ চেতন মাতৃমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মাতৃসাধক জগৎকে 'মা' মন্ত্র শিখিয়েছিলেন। শুধু মন্ত্রই নয়, মন্ত্রের সাথে তিনি দিয়েছিলেন মাতৃবিগ্রহও—কাঠের, মাটির, ধাতুর বা পাথরের নয়—সত্যিকারের, রক্তমাংসে গড়া অপূর্ব এক চেতন প্রতিমা। সারদাদেবীর সুবিখ্যাত জীবনীকার ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য অপূর্ব ভাষায় লিখেছেন ঃ "জগতের ইতিহাসে এই মাতৃমূর্তি নিরুপমা। কলির প্রভাববশে মাতৃভক্তিহীন পাপমলিন সংসারে সন্তপ্ত সন্তানগণকে অভয়কোলে আশ্রয় দিবার জন্য মাতৃভক্তির প্রচারক শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যানগঠিত মানসী প্রতিমা।" এই মা-ই জগজ্জননী, জগজ্জননীতেও এই মা-ই।

স্বামী সারদানন্দ 'ভারতে শক্তিপূজা' গ্রন্থের উপসংহারে লিখেছেন ঃ "যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য আবির্ভাবে নারী-প্রতীকে শক্তিপূজা ভারতে বর্তমান যুগে আবার বিশেষ সজীব হইয়া উঠিয়াছে। নারী-প্রতীকে এমন শুদ্ধ ভাবের শক্তিপূজা জগৎ আর কখনো দেখিয়াছে কিনা সন্দেহ।... হে ভারত-ভারতী,... যে-ভাব অবলম্বনেই তোমরা... শক্তিপূজায় অগ্রসর হও না কেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র জীবন সর্বদা সম্মুখে রাখিয়া তদনুষ্ঠান করিও এবং তাঁহার এইকথা হৃদয়ে স্থির ধারণা করিয়া রাখিও যে ত্যাগ, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য [সংযম] সহায়ে একাঙ্গী ভক্তিপ্রেমের সাধনায় প্রবৃত্ত না হইলে কোনও ভাবে পূজা করিয়াই জগন্মাতার দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারিবে না।... অতএব তাঁহার অভয়বাণী হৃদয়ে ধারণ করিয়া শক্তিপূজায় অগ্রসর হও—ধন্য হও।" ❑

৮ দ্রঃ উদ্বোধন সং, পৃঃ ১০১৪

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

নতুন পৃথিবীর তীর্থাস্বাদন

স্বামী স্মরণানন্দ*

> এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

বেদান্ত সোসাইটি অফ নর্দার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়া, সান ফ্রান্সিস্কো থেকে আমন্ত্রণ এসেছিল সেখানকার শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। গত ৮ এপ্রিল ২০০০ তাঁদের আহ্বান স্বীকার করে আমি আমেরিকার উদ্দেশে রওনা হয়েছিলাম। নতুন পৃথিবী অর্থাৎ আমেরিকা এবং কানাডাতে যাতায়াত ইদানীং খুব সহজ এবং স্বাভাবিক হয়ে গেছে। তাই সেখানকার ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখার মধ্যে চমক কিছুই নেই। তবুও বহু সাধুভাই এবং ভক্তদের অনুরোধে এই ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখার সিদ্ধান্ত নিলাম। তবে অন্য ধাঁচের। অর্থাৎ এই আলোচনায় কেবলমাত্র দ্রষ্টব্য স্থানের গতানুগতিক বর্ণনাই নয়, বিগত শতাব্দীতে আমেরিকায় বেদান্ত আন্দোলনের পর্যালোচনা এবং দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সমাপ্তির প্রেক্ষাপটে আধুনিক সভ্যতার কথঞ্চিৎ বিশ্লেষণ করার চেষ্টাও থাকবে। আধুনিক বিশ্বে আকাশ-গমন, ফ্যাক্স, ই-মেল, ওয়েবসাইট ইত্যাদির সাহায্যে দূরত্বকে জয় করার ফলে অন্তত জাগতিক স্তরে বৈদিক সুপ্রাচীন বাণী—'যত্র বিশ্বং ভবতি একনীড়ম্' (যেখানে সারা জগৎ একটি গৃহে রূপান্তরিত হয়) যেন বাস্তবায়িত হয়ে উঠেছে। অবশ্য মানসিক স্তরে এই সমত্ব বা ঐক্য সঙ্ঘটিত হতে আরো কত শতাব্দী পেরিয়ে যাবে কে জানে!

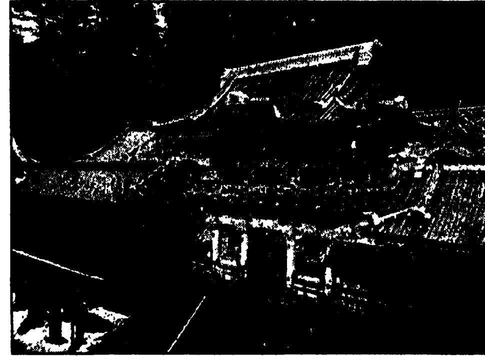
জাপান

প্রথমের ব্যাপারগুলো প্রথমেই বলি।

সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের প্লেনে সিঙ্গাপুর হয়ে জাপানের উদ্দেশে ৮ এপ্রিল কলকাতা ছাড়লাম। সিঙ্গাপুরে ৩/৪ ঘণ্টার বিরতি ছিল। জাপানের নারিতা বিমানবন্দরে পৌঁছালাম ৯ এপ্রিল বিকালে। সেখান থেকে জুশিতে আমাদের আশ্রম নিপ্পন বেদান্ত কিয়োকাই পৌঁছাতে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় লাগল। শহরটি ছবির মতো। টোকিও থেকে ১৬০ কিলোমিটার দক্ষিণে। শহরের রাস্তায় অসংখ্য গাড়ি। স্বাভাবিক কারণেই ধীরগতিতে চলেছে। কিন্তু তুলনায় পাতাল রেল বেশ দ্রুত। এই রেলব্যবস্থা অতি চমৎকার—পরিচ্ছন্ন, দ্রুতগামী ও অত্যন্ত কুশলতার পরিচয়বাহী।

১৯৫৯ সালে স্থাপিত হওয়ার পর নিপ্পন বেদান্ত সোসাইটি ১৯৮৪ সালে মিশন কর্তৃক অধিগৃহীত হয়। জাপানে বেদান্ত আন্দোলনের অগ্রদূত হলেন হারু নাকাই এবং সুমিত্র রাও। বিরানব্বই বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের আগে পর্যন্ত শ্রীমতী নাকাই জাপানে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচারের কাজে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। বস্তুত, তাঁরই চেষ্টায় 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' এবং স্বামী বিবেকানন্দের কিছু বই এখন জাপানী ভাষায়ও পাওয়া যাচ্ছে।

আমাদের আশ্রমের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী মেধসানন্দ ধীরে কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবেই অল্প কিছু ভক্তের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর ভাব বিস্তার করে চলেছেন। একদিন সন্ধ্যায় আমি 'গৃহস্থদের জন্য অধ্যাত্মজীবন' প্রসঙ্গে তাদের কিছু বলেছিলাম। অবশ্য দোভাষীর সাহায্যে।



জাপানের বিখ্যাত তোশোগু দেবালয়ের সম্মুখভাগ

জাপানের কাছে ভারতবাসীর অনেক কিছু শেখার আছে—তাঁদের পরিচ্ছন্নতাবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, ভদ্র ব্যবহার ইত্যাদি। তাঁদের নান্দনিক চেতনাও আমাদের শিক্ষণীয় বস্তু। প্রত্যেকটি বাড়ির সামনে, যত ছোটই হোক, একটি ফুলের বাগান থাকবে। হেমন্তের আলোকোজ্জ্বল দিনে গিয়েছিলাম বলে চেরিব্লসমের স্তূপের মধ্যে গিয়ে পড়েছিলাম—হালকা বেগুনি, গাঢ় লালচে নীল, রক্তবর্ণ, আরো নানা রঙের। চেরিব্লসম ছাড়াও ছিল আরো অনেক ধরনের মরসুমী ফুল, যেমন—অ্যাজালিয়া ও প্যানসি ইত্যাদি রাস্তার ধারে ধারে, কত বাহারী ফুলের গাছ যেন রাস্তাঘাট সজ্জিত করে রেখেছে! জাপানীরা সাধারণত

* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের পূজ্যপাদ সাধারণ সম্পাদক। মূল ইংরেজী রচনা থেকে ভাষান্তর করেছেন স্বামী সর্বগানন্দ।

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

মৃদুভাষী। কোলাহল প্রায় শোনাই যায় না। তাই কেউ বুঝতেই পারবেন না যে, তিনি এক জনবহুল শহরে রয়েছেন!

সান ফ্রান্সিস্কো রওনা হওয়ার তাড়া ছিল বলে দর্শনীয় মন্দির, দেবস্থানগুলি সব দেখার সময় পেলাম না। জাপানে অনেক বৌদ্ধমন্দির এবং শিন্টো দেবস্থান রয়েছে। তার মধ্যে কমযোগী মন্দির, হাচিমানা দেবস্থল (শিন্টো) পুরনো রাজধানী কামাকুরায় দর্শন করলাম। ১১ এপ্রিল মিঃ লোনী হার্ক নামে জাপানে স্থায়িভাবে বসবাসকারী একজন ইংরেজ ভক্ত (পূর্বে তিনি হলিউড বেদান্ত সোসাইটিতে যাতায়াত করতেন) আমাদের অত্যন্ত জনবহুল টোকিও শহরে নিয়ে গেলেন। কোথাও গাড়ি রাখার জায়গা নেই। (এই গাড়ি রাখার সমস্যা আমাকে শেষপর্যন্ত ধাওয়া করেছিল। এসম্বন্ধে পরে আরো বলব।) আমরা সম্রাটের স্মৃতিসৌধ মেজি-মন্দির দর্শন করলাম। এই সম্রাটই জাপানকে আধুনিক যুগে পৌঁছে দিয়েছিলেন। প্রায় ৮০,০০০ বর্গমিটারের ওপর অবস্থিত এই স্মৃতিমন্দিরে সম্রাট ও রানীর দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের আত্মা রয়েছে! আসাকুসা বৌদ্ধমন্দিরও দর্শন করলাম। মন্দিরটি খুব বড় ও ভারি নান্দনিক। দুপুরে বেলুড় বিদ্যামন্দিরের এক প্রাক্তন ছাত্র জ্যোতির্ময় রায়ের বাড়িতে ভোজন সারা হলো।

আমাদের আশ্রমটির চারিদিকের পরিবেশ যেন ছবি আঁকা। কাছেই একটি ঘন জঙ্গলাবৃত ছোট্ট পাহাড়। ১২ তারিখ সকালে আমরা পাহাড়ে উঠেছিলাম। পর্বতশীর্ষ থেকে এক অপূর্ব দৃশ্য চোখে পড়ে—একদিকে প্রশান্ত মহাসাগর, অন্যদিকে কামাকুরা শহর। তবে মেঘাবৃত ছিল বলে ফুজিয়ামা পর্বত দেখা সম্ভব হয়নি।

সান ফ্রান্সিস্কোর বিমান ধরার জন্য ঐদিনই দুপুর ১টার সময় স্বামী মেধসানন্দ এবং আরো কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে আমরা ট্রেনে নারিতা বিমানবন্দরের উদ্দেশে রওনা হলাম। ইয়োকোহামাতে আরেকটি এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে এয়ারপোর্টে বেশ কিছুক্ষণ আগেই পৌঁছে গেলাম। মনে হচ্ছিল, আরো কিছুদিন জাপানে থাকতে পারলে বেশ হতো। কিয়োটো, নারা ও অন্যত্র অনেক দর্শনীয় স্থান রয়েছে। কিন্তু ভ্রমণসূচী ঠিক রাখতে হবে। কাজেই, এখন আমেরিকার উদ্দেশে চললাম।

সান ফ্রান্সিস্কো—১

প্লেন সময়মতোই ছেড়েছিল। টোকিও থেকে আমেরিকার পশ্চিমপ্রান্তে লস এঞ্জেলিসে পৌঁছাতে প্লেনে সময় লাগে সাধারণত দশ ঘণ্টা। অথচ সন্ধ্যা পৌনে সাতটায় রওনা হয়ে ঐদিনই দুপুর সোয়া বারটায় পৌঁছে গেলাম লস এঞ্জেলিস। ব্যাপারটা ভারি মজার! ডেটলাইন পেরিয়ে যেতে হলো বলে আমরা সময়ের অক্ষাংশে অনেকটা পিছনে চলে এসেছি! (জাপানে যখন দিনটা ফুরিয়ে গেল, লস এঞ্জেলিসে তখন সবে দুপুর।)

লস এঞ্জেলিসে পৌঁছে আবার সেই সমস্যা। অর্থাৎ প্লেন রাখার জায়গা নেই! দুপুর ১২.১৫ মিনিটে পৌঁছেও প্লেন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ১ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো। কারণ প্লেন রাখার খালি জায়গা (parking-bay) ছিল না। ঘটনাচক্রে সিঙ্গাপুর থেকে জাপান এবং জাপান থেকে লস এঞ্জেলিস—দুবারই আমার কপালে নিরামিষ আহার জোটেনি—যদিও এবিষয়ে আগেই জানানো ছিল। হয়তো কোনপ্রকার যোগাযোগে বিভ্রাট হয়েছিল। অগত্যা কিছু বিস্কুট, চা, কফি খেয়েই কাটাতে হয়েছিল সারা পথ। লস এঞ্জেলিসে স্বামী সর্বদেবানন্দ এবং অন্যান্য ভক্তেরা কিছু খাবার এনেছিলেন। কিন্তু সেগুলি গাড়িতে ছিল। আর এখানেও গাড়ি রাখার জায়গা নেই! সুতরাং হরিমটর। আমেরিকায় পা রাখার পর থেকেই আমি লক্ষ্য করলাম পার্কিঙের জায়গার তীব্র অভাব। তাই এটিই আমেরিকার প্রথম সমস্যা বলে আমার ধারণা হলো।

দেরি না করে ঐদিনই বিকাল ৩টা ৪০ মিনিটের ফ্লাইটে রওনা হয়ে ৫টায় সান ফ্রান্সিস্কোয় পৌঁছালাম। নর্দার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়ার বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ ও আরো কয়েকজন এসেছিলেন বিমানবন্দর থেকে আমায় নিয়ে যাওয়ার জন্য।

সান ফ্রান্সিস্কো শহরটি অসমতল, উঁচু-নিচু। আবহাওয়া সারাবছরই মনোরম ও স্বাস্থ্যকর। প্রশান্ত মহাসাগর এবং উপসাগরে তিনদিক পরিবেষ্টিত এই শহরে সবসময়ে বেশ হাওয়া খেলে বলে খুব গরম বা খুব ঠাণ্ডা কখনো পড়ে না। সরলরেখায় রাস্তা এবং উন্নত অট্টালিকায় সাজানো সুন্দর শহর। পাশ্চাত্যের শহরগুলির কেন্দ্রস্থলে (down-town) প্রায়ই দেখা যায় গগনচুম্বী অট্টালিকা এবং মূলত অফিস ও ব্যবসা-কেন্দ্র। থাকার বাড়ি প্রায়শই শহরের কেন্দ্রস্থলে না হয়ে বাইরের দিকে হয়। রাস্তার ধারে সুন্দর গাছের সারি, চওড়া রাস্তার সঙ্গে মানানসই পায়ে চলার চওড়া রাস্তা, গাড়ি ও মানুষ চলাচলের পক্ষে সুখকর। তবে যেহেতু গাড়ির সংখ্যা প্রচুর, তাই অফিস টাইমে গতি স্বাভাবিক-ভাবেই শ্লথ হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়বার আমেরিকা ভ্রমণের সময়ে স্বামী বিবেকানন্দ ১৯০০ সালে নর্দার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়া বেদান্ত সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। বহু বছর ধরে সেটি নিয়মিত গতিতে বেড়ে উঠেছে। সোসাইটির তিনটি বাড়ি আছে। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ (শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম সাক্ষাৎ শিষ্য) ওয়েবস্টার স্ট্রীটে যে-বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন, সেটি এখন 'হিন্দু মন্দির' বা

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

'পুরনো মন্দির' নামে পরিচিত। কিন্তু কাজকর্ম বেশিটাই হয় ভ্যালেহো স্ট্রীটের এই বাড়িটিতে। সেটি 'নতুন মন্দির' বলে পরিচিত। এটিতে অপূর্ব একটি ঠাকুরঘর রয়েছে। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ, ভগবান বুদ্ধ এবং যীশুখ্রীস্টের ব্রোঞ্জমূর্তি রয়েছে। রাস্তার অন্যদিকে আরেকটি বাড়িতে রয়েছে একটি কনভেন্ট। এখানে সন্ন্যাসিনীরা থাকেন।

সান ফ্রান্সিস্কোর পূর্বতন অধ্যক্ষগণ হলেন যথাক্রমে স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ, স্বামী প্রকাশানন্দ এবং স্বামী অশোকানন্দ। বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ ১৯৭০ সাল থেকে এখানে আছেন। এখানে তিনটি রিট্রিট (সাধনাবাসন বা অধ্যাত্ম-শিবির) আছে। তার মধ্যে মেরিন কাউন্টির অন্তর্গত ওলেমার রিট্রিটটি বৃহত্তম। ২০০০ একর অরণ্যবেষ্টিত পাহাড়। ধ্যানের উপযোগী অতি শান্ত স্থান। একটা ছোট বাড়ি, মোটামুটি থাকার উপযুক্ত। প্রায় ২০০ মাইল দূরে লেক তাহো-র ধারেও আরেকটি রিট্রিট আছে। ৬,৫০০ ফুট উঁচুতে প্রায় ২০০ একর জমিতে বিস্তৃত। পাইন গাছে ঢাকা। লেকটিও বড়। প্রায় ৭০ মাইল পরিধি। গ্রীষ্মকালে এখানে অধ্যাত্ম-শিবিরে যোগদানের জন্য ভক্তরা আসেন। তৃতীয় রিট্রিটটি মরু এলাকার পাশেই—শান্তি আশ্রম। ১৪০ একর জমির ওপর অবস্থিত। এখানেই ২ আগস্ট ১৯০০ থেকে জুন ১৯০২ পর্যন্ত শিষ্য এবং ভক্তদের নিয়ে স্বামী তুরীয়ানন্দ অধ্যাত্মসাধনায় রত ছিলেন। তাঁরা কাঠের নির্মিত কুঠিয়ায় থাকতেন। জলের অভাবে এই স্থানে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দুষ্কর।

সান ফ্রান্সিস্কোতে প্রথম প্রথম কাজ করা বেশ শক্ত ছিল। কিন্তু পরে ভক্তসমাগম বৃদ্ধি পেয়েছে যথেষ্ট। এখন এই আশ্রমটি সুপ্রতিষ্ঠিত। ১০০ বছর আগে ১৪ এপ্রিল এই আশ্রম শুরু হয়েছিল। সেই পুণ্যলগ্নের স্মরণে ঐ তারিখে একটি ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সিস্টার গার্গী (বিখ্যাত বই 'স্বামী বিবেকানন্দ ইন দ্য ওয়েস্ট ঃ নিউ ডিসকভারিজ'-এর লেখিকা) ঐ কেন্দ্রের গড়ে ওঠার ইতিহাস পাঠ করলেন। 'রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদর্শ ও কর্মধারা' বিষয়ে আমিও কিছু বললাম। আগের দিন অর্থাৎ ১৩ এপ্রিল স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ আমাকে শহর দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন। যে 'গোল্ডেন গেট পার্ক' স্বামীজী ১৯০০ সালে দেখতে গিয়েছিলেন, সেটিও দেখার সৌভাগ্য হলো।

সিয়াটল

১৫ এপ্রিল সান ফ্রান্সিসকোর উত্তরে অবস্থিত সিয়াটলের উদ্দেশে রওনা হলাম। প্রায় কানাডার সীমান্তে এটি ওয়াশিংটন রাজ্যের সবচেয়ে বড় শহর। এক ঘণ্টার উড়ান। বিকাল ৫টায় পৌঁছালাম। সিয়াটল আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দ এবং আরো কিছু ভক্ত এসেছিলেন আমাকে নিতে। বিমানবন্দরে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করলাম। সব ঘোষণাই ইংরেজী এবং জাপানী ভাষায় হচ্ছিল। এমনকি বিমানবন্দরের বিভিন্ন নির্দেশিকাও এই দুটি ভাষায় লিখিত ছিল!

আরো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলাম—আমেরিকাতে, এমনকি ছোটখাট শহরেও বিমানবন্দর যেকোন ভারতীয় বিমানবন্দরের চেয়েও বড়। অর্থাৎ মানুষ প্রধানত বিমানেই চলাফেরা করেন। ট্রেন ততটা জনপ্রিয় নয়। ছোটখাট দূরত্ব এঁরা গাড়িতেই চলে যান। রাস্তাগুলি খুব চওড়া। কোন কোন রাস্তায় ১০টি লেনও থাকে। সারা দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত সুন্দর রাস্তাই যেন এত বড় দেশের শরীরে ধমনীর মতো বিরাজ করছে।

বিমানবন্দরের ব্যবস্থাও ভারী চমৎকার এবং অত্যন্ত কর্মকুশলতার পরিচয়বাহী। প্লেন থেকে নেমে যেখানে মাল নেব, সেই জায়গায় পৌঁছানোর আগেই দেখতাম মাল পৌঁছে গেছে। অবশ্য দ্রুততা, কর্মদক্ষতা, পরিচ্ছন্নতা এবং নান্দনিক সচেতনতার নিরিখে সিঙ্গাপুর বিমানবন্দর নিশ্চয়ই বিশ্বের এক নম্বরে।

সবুজে ঢাকা এবং আকছার ছোট ছোট জলাশয়ে ভর্তি সিয়াটল শহর। বসন্তকালে গিয়েছিলাম, তাই চারিদিকে রঙের বাহার। রডোডেনড্রনে ভর্তি, অ্যাজালিয়া ফুটে রয়েছে চারিদিকে। এছাড়া রয়েছে ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরা এবং আরো কত ধরনের ফুল। রাস্তার ধারে সারি সারি গাছ। আর দুপাশে পায়ে চলার পথ ও তার ধারে একটানা grass-lawn।

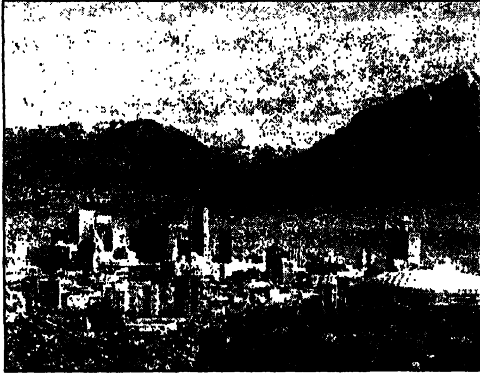
১৯৩৮ সালে এইরকম একটি সম্ভ্রান্ত এলাকায় শুরু হয়েছিল আমাদের আশ্রম। মুখোমুখি অবস্থিত রাস্তার দুপাশে আশ্রমের দুটি বাড়ি আছে। কাজেই ঐ কেন্দ্রের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য যথেষ্ট জায়গা রয়েছে। তবে গাড়ি রাখার জায়গাটাই বড় সমস্যা।

সিয়াটল দুটি নামকরা কোম্পানির মূল কেন্দ্র। একটি মাইক্রোসফ্‌ট, আরেকটি বোয়িং কোম্পানি। সফ্‌ট্‌ওয়ার কোম্পানিটিতে প্রচুর ভারতীয় কর্মী (প্রায় ৩০ শতাংশ) কাজ করেন।

১৬ এপ্রিল সকাল ১১টায় 'বেদান্ত এবং আধুনিক বিশ্ব' বিষয়ে আমি কিছু বললাম। প্রায় ১০০ শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে আমেরিকান ও ভারতীয় প্রায় সমান সমান। আমেরিকায় বেশির ভাগ আশ্রমে রবিবার সকাল ১১টায় উপাসনা হয়। চার্চীয় উপাসনার ধারাই এই বিষয়ে অনুসরণ করা হয়েছে। রবিবারে সাধারণত ঘুম থেকে উঠতে দেরি হয়, তাছাড়া গৃহস্থালি কর্মও প্রচুর জমে

থাকে। ফলে সকাল সাড়ে দশটার আগে তৈরি হওয়া সম্ভব হয় না। তাই এরূপ ব্যবস্থা হয়েছে।

গৃহস্থালি প্রসঙ্গে দু-একটা কথা বলা ভাল। পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে, এমনকি অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যাণ্ডেও সমস্ত কাজ—গাড়ি ধোয়া, জামাকাপড় কাচা, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার দিয়ে ঘর পরিষ্কার করা, বাসনপত্র ধোয়া ইত্যাদি সবই নিজেদেরই করতে হয়। ভৃত্য সেখানে পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলেও পারিশ্রমিক আকাশছোঁয়া। অত্যন্ত বড়লোক কেউ কেউ ড্রাইভার রাখতে পারেন। হয় স্বামী অথবা স্ত্রী নিজেরাই গাড়ি চালান, প্রায়শই নিজেদের পৃথক পৃথক গাড়ি থাকে। মাহিনা করা চালকের চালানো গাড়ি এদেশে অত্যন্ত বিরল। ১৬ বছর বয়সের ঊর্ধ্বের যেকোন যুবক-যুবতীর গাড়ি চালানোর লাইসেন্স থাকে। ট্রাফিক আইন খুব কড়া। আইন না মানলে জরিমানার দায়ে নাকাল হতে হয়। পাশ্চাত্যের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক কারণেই প্রাচ্যের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্নতর।


ভ্যাঙ্কুবার শহরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

১৭ তারিখ সকালে স্বামী ভাস্করানন্দের সঙ্গে তপোবন রিট্রিটে গেলাম। ৪৫ মিনিটের দূরত্ব। (আমেরিকায় মাইল বা কিলোমিটারে না বলে সাধারণভাবে গাড়িতে যেতে যে সময় লাগে, সেই সময়ের পরিমাপেই দূরত্বের বর্ণনা দেওয়া হয়।) প্রায় ২১ একর জমিতে এই অধ্যাত্ম-শিবির। অদ্ভুত সুন্দর শান্ত পরিবেশ। ঘাসের লন, ফুলের সমারোহ, একটি ছোট্ট ঝরনা, বন—সব মিলিয়ে স্থানটি আকর্ষণীয়। মন্দিরটিও ভারী চমৎকার। বড় হলটিতে ১০০ জন ভক্তের জায়গা হতে পারে। উপাসক-উপাসিকাদের জন্য পৃথক পৃথক দুটি বাড়ি রয়েছে। মাসে একবার করে আধ্যাত্মিক শিবিরে কিছু স্থানীয় ভক্ত এবং সিয়াটল ভ্যাঙ্কুবার থেকে ভক্তরা আসেন। পরদিন সকালে স্বামী ভাস্করানন্দ স্নোকোমিশ জলপ্রপাত দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ৬০ মিনিটের দূরত্ব। জলপ্রপাতটি আকারে যথেষ্ট বড়। স্নোকোমিশ নদী (এটি একটি American-Indian নাম) প্রবল বেগে নিচে নেমে আসছে। ফেরার পথে পশ্চিম ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয় একটু দেখে এলাম। বিশাল চৌহদ্দি। মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। সিয়াটল শহরের কেন্দ্রস্থলে ধনী ও বিলাসবহুল এলাকাও দেখলাম।

১৯ তারিখ সকালে স্বামী ভাস্করানন্দ আমাকে কানাডার ভ্যাঙ্কুবার বি. সি.-তে নিয়ে গেলেন। ৩ ঘন্টার রাস্তা। তবে কাস্টমসের নিয়মকানুন আরো ১ ঘন্টা দেরি করিয়ে দিতে পারত। বেলা ১২টায় ভ্যাঙ্কুবার পৌঁছালাম। প্রার্থনাকক্ষ, তিনটি ঘর, একটি রান্নাঘর-সহ এখানকার ভক্তরা (বেশির ভাগই ভারতীয়) কিনেছেন। চমৎকার পরিবেশ! কিন্তু কোন ধর্মসভা আয়োজনের সুযোগ নেই। ধর্মসভা করতে গেলে অডিটোরিয়াম ভাড়া নিতে হবে।

ভ্যাঙ্কুবার শহরের চারিদিকে সমুদ্র এবং অদূরে পাহাড় শহরটির সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। কোথাও কোথাও পাহাড়ের ওপর বরফ তখনো ছিল। বরফে ঢাকা ঐ অংশগুলির কয়েকটি 'স্কি' খেলার জায়গা। বসন্ত এসে যাওয়ায় ফুলে ফুলে বিচিত্র রঙের বাহার। রডোডেনড্রন, টিউলিপ ফুটে আছে চারিদিকে। পরের দিন ডঃ ভাট আমাদের নিয়ে গেলেন কুইন এলিজাবেথ পার্কে। পার্কটি সত্যিই সুন্দর—ফুলে ভরা, একটি কৃত্রিম জলপ্রপাত রয়েছে, বিচিত্র বৃক্ষ-লতায় পরিপূর্ণ।

বিকালে ডঃ ভাটের সঙ্গে গেলাম সেই জেটিতে, যেখানে ১৮৯৩ সালে স্বামী বিবেকানন্দ জাহাজ থেকে আমেরিকার মাটিতে অবতরণ করেছিলেন। তিনি আমাকে কাছেই সেই রেলস্টেশনটি দেখালেন। খুবসম্ভব এখান থেকেই স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগোর উদ্দেশে উইনিপেগের ট্রেন ধরেছিলেন।

সন্ধ্যায় একটি ছোট্ট হল-এ বক্তৃতার আয়োজন ছিল। ৪৭ জন শ্রোতার উদ্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ে কিছু বললাম। পরদিন সকালে স্বামী ভাস্করানন্দের সঙ্গে সিয়াটলের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। অ্যালেন ফ্রীডম্যান গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলেন। সিয়াটলে পৌঁছাতে পৌঁছাতে দুপুর ১টা ১৫ মিনিট বাজাল—মূলত কাস্টমসের বিলম্বের জন্য (অর্থাৎ প্রায় ৪ ঘন্টা লাগল)। সিয়াটলে আমাদের ভক্তরা ভারতীয় এবং আমেরিকান—প্রায় সমসংখ্যক।

পোর্টল্যাণ্ড

২২ এপ্রিল সকাল ৯টায় সিয়াটল ছাড়লাম। পোর্টল্যাণ্ড আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী শান্তরূপানন্দ ও কয়েকজন ভক্ত আমাকে নিতে বিমানবন্দরে এসেছিলেন। অরিগন রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর পোর্টল্যাণ্ড। আমেরিকায় একটা

মজার ব্যাপার হলো—কোন রাজ্যের রাজধানী বৃহত্তর শহরগুলির চেয়ে ছোট আকারের একটি শহরে হয়, সম্ভবত ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলো থেকে রাজনৈতিক নেতাদের দূরে রাখার উদ্দেশ্যেই।

পোর্টল্যাণ্ডে আমাদের আশ্রম স্থাপিত হয়েছিল ১৯২৫ সালে। অভিজাত এলাকা মাউণ্ট ট্যাবর জেলায় অবস্থিত এই আশ্রমে দুটি বাড়ি আছে এবং সংলগ্ন বাগান ও গাড়ি রাখার জায়গাও (যা বড়ই দুর্লভ) আছে। দুটি ব্লক পেরিয়ে 'মায়ের বাড়ি'। তিন বছর পূর্বে এই আশ্রমের পূর্বতন অধ্যক্ষ স্বামী অশেষানন্দ যথেষ্ট পরিণত বয়সে (৯৮ বছর) লোকান্তরিত হওয়ার পর স্বামী শান্তরূপানন্দ বেশ কম বয়সেই এই আশ্রমের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এখানে ভক্তরা প্রায় সবই আমেরিকান।

২৩ তারিখ রবিবার 'দৈনন্দিন জীবনে শান্তি' বিষয়ে বললাম। শ্রোতার সংখ্যা ছিল প্রায় ৭০। সাধারণত রবিবারের ক্লাসে যে সংখ্যা হয়, তার চেয়ে কিছু বেশিই ছিল। স্বামী শান্তরূপানন্দের সঙ্গে আমি সন্ধ্যার পর 'মায়ের বাড়ি' দেখতে গেলাম। আশ্রম পরিচালনা সমিতির সভানেত্রী বীরা এডওয়ার্ডস তাঁর কন্যা এ্যালিসকে নিয়ে এখানে থাকেন। তিনি কয়েকজন মহিলা ভক্তকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করে রাত্রের আহারের পর আশ্রমে ফিরে এলাম।

প্রায় ৪৫ মিনিট দূরে পোর্টল্যাণ্ড আশ্রমের একটি রিট্রিট সেণ্টার আছে। ২৪ তারিখে আমরা সেখানে গেলাম। আশ্চর্য হলাম, কাজের দিন হওয়া সত্ত্বেও সেখানে ৩৫ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। ১২০ একর জমিতে বিস্তৃত বনাচ্ছাদিত এই রিট্রিটটি। দূরে বরফে ঢাকা পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। একটা ছোট উপাসনালয় রয়েছে। এছাড়া আছে একটি রান্নাঘর ও একটি খাবারঘর। বনের মধ্যে বুদ্ধ, যীশু ও অন্যান্য ধর্মের উদ্দেশে নির্মিত পৃথক পৃথক ঠাকুরঘরও রয়েছে।

ভক্তদের উদ্দেশে অল্প কিছু বললাম। তারপর দুপুরের আহার সেরে ফেরা। ২৪ এবং ২৫ তারিখ সন্ধ্যাবেলা অনেক ভক্তসমাগম হলো পোর্টল্যাণ্ড আশ্রমে। বেশির ভাগই আমেরিকান। দীর্ঘ সময় প্রশ্নোত্তর আলোচনা হলো। রাত্রে খাওয়ার পর তাঁরা ফিরে গেলেন।

২৬ এপ্রিল স্বামী শান্তরূপানন্দ আমাকে কলম্বিয়া গিরিবর্ত্ম এবং মাক্‌লনোমা জলপ্রপাত দেখাতে নিয়ে গেলেন। কলম্বিয়া নদীর ধার বরাবর রাস্তা। খাদটি খুব গভীর এবং ঠাণ্ডা বাতাস সর্বদা প্রবলবেগে বইছে। আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল যেন! জলপ্রপাতটি খুব উঁচু থেকে পড়ছে।



ভ্যাঙ্কুবারের কুইন এলিজাবেথ পার্কে স্বামী ভাস্করানন্দের সঙ্গে লেখক

পাশ্চাত্যে দেখেছি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসম্পন্ন যেকোন স্থানই পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হয়। যাবতীয় সুবিধা থাকে সেখানে। ভারতবর্ষে হয়তো আরো সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ কোথাও কোথাও রয়েছে, কিন্তু ন্যূনতম সুবিধা যেটুকু পর্যটকদের দরকার, তাও থাকে না। আরেকটা লক্ষণীয় পার্থক্য হলো—ভারতবর্ষে যেখানেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বেশি, সেখানে একটা মন্দির নির্মিত হয়। কিন্তু পাশ্চাত্যে একটা পর্যটনকেন্দ্র গড়ে ওঠে। দু-দেশের সংস্কৃতির মধ্যে এটা একটা মৌলিক পার্থক্য।

টরণ্টো (কানাডা)

পরদিন সকালেই রওনা হলাম টরণ্টোর উদ্দেশে। বিমানবন্দরে স্বামী শান্তরূপানন্দ ছাড়াও কয়েকজন ভক্ত এসেছিলেন আমাকে বিদায় জানাতে। পোর্টল্যাণ্ডের তুলনামূলকভাবে ছোট্ট বিমানবন্দরেও চার স্তরে পার্কিঙের ব্যবস্থা। কম করে ৪০০ থেকে ৫০০ গাড়ি দাঁড়াতে পারে। শিকাগোতে বিমান পরিবর্তন করতে হয়েছিল। সেখানে প্রশান্ত মহাসাগর-উপকূলবর্তী সময়ের চেয়ে ঘড়ি দুঘণ্টা আগে চলে! শিকাগো বিমানবন্দরটি পৃথিবীর বৃহত্তম যদি নাও হয়, তবে বৃহত্তমগুলির অন্যতম নিশ্চয়ই। টরণ্টোতে সন্ধ্যার মুখেই পৌঁছে গেলাম। বিমানবন্দরে স্বামী প্রমথানন্দের সঙ্গে আরো অনেকেই ছিলেন। কানাডাতে এসেছি বলে যাবতীয় আইনানুগ পরীক্ষানিরীক্ষায় পাশ (immigration and customs) করতে হলো। ভাগ্য ভাল, সমস্যা কিছু হয়নি।

পরের দিন স্বামী প্রমথানন্দ আমাকে নায়গারা জলপ্রপাত দেখাতে নিয়ে গেলেন। আমরা নায়গারা শহরের কাছে চিত্ত মজুমদারের বাড়িতে গেলাম। আমেরিকান স্ত্রীর সঙ্গে তিনি ঐ বাড়িতেই থাকেন। দীক্ষিত ভক্ত এবং বহু ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ—রান্নাবান্না, বাগান করা, ইঞ্জিনিয়ারিং, কি নয়!

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

নায়গারা! বিশ্ববিখ্যাত জলপ্রপাত এবং এর এই বিশ্বজোড়া খ্যাতি যথার্থই প্রাপ্য। দুটি জলপ্রপাত আছে। একটি আমেরিকান, অন্যটি কানাডিয়ান, অশ্বক্ষুরাকৃতি জলপ্রপাত বলে খ্যাত। পৃথিবীর অন্য কোন জলপ্রপাত এত বৃহদায়তন নয়। যদিও এর উচ্চতা বেশি নয়।

আমরা ৭৭৫ ফুট উঁচু স্কাইলন টাওয়ারের ওপরে উঠে নায়গারার ভয়াল রূপটি দেখলাম! সত্যিই দেখার মতো একটা জিনিস। ওখান থেকে নেমে আবার গেলাম 'মেইড অফ দ্য মিস্ট' নৌকায় চেপে জলপ্রপাতের একেবারে কাছে। নৌকার ব্যবস্থাপকরাই সকলকে প্লাস্টিকের বর্ষাতি দিয়েছিলেন—গায়ে দেওয়ার জন্য। রোমহর্ষক, শ্বাসরোধক একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। যদিও টাওয়ারে ওঠা এবং নৌকায় চড়ার জন্য কিছু দক্ষিণার প্রয়োজন হয়, তবে দেখার পরে ডলারের খরচটা গায়ে লাগে না।

আমরা শ্রীমজুমদারের বাড়ি ফিরে গেলাম। তিনি বেশ কয়েকজন বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কয়েকটি সুস্বাদু ব্যঞ্জন রেঁধেছিলেন আমাদের জন্য। খুব লোক।

টরন্টোতে আমাদের কেন্দ্রটি সুন্দর একটি লোকালয়ে দোতলা এক বাড়িতে অবস্থিত। মোচাকৃতি চূড়াবিশিষ্ট বাড়িটি দেখতে একটু অদ্ভুত ধরনের। অবশ্য আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে খুব মানানসই। একটি বাড়ি একটি পার্কের পাশে একাকী দাঁড়িয়ে আছে, সামনে দিয়ে গেছে একটি মূল (বড়) রাস্তা। সেই রাস্তায় আরো দুটি রাস্তা এসে মিশেছে। অদূরে একটি সুন্দর ও বৃহৎ গল্ফ মাঠ। অন্য পাশে একটি নদী বয়ে চলেছে। নদীর পাড়ে চলার রাস্তা। রাস্তার একদিকে বন। কখনো কখনো হরিণও দেখা যায়। নদীর অপর পাড়েও দেখা যায় একটি চলার রাস্তা। সবমিলিয়ে এই কেন্দ্রটি একটি মনোরম পরিবেশে অবস্থিত। দুবছর আগে বেশ সস্তায়ই (পাঁচ লক্ষ ডলার) স্বামী প্রমথানন্দ জায়গাটি কিনেছেন।



বেদান্ত সোসাইটি অফ টরন্টো

২৯ ও ৩০ এপ্রিল, শনি ও রবিবারে একটা বার্ষিক ধর্মশিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় ৬০-৭০ জন ভক্ত যোগ দিয়েছিলেন—তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ভারতীয়। 'উপনিষদ্ এবং আধুনিক যুগ'-এর ওপর একঘণ্টা বক্তৃতা করলাম। ১২টা থেকে ১২.৩০টা পর্যন্ত একটি প্রশ্নোত্তরপর্বও ছিল। রবিবারের সকালে স্বামী প্রমথানন্দ বললেন। বিকালে 'রামকৃষ্ণ মিশন, তার আদর্শ ও কর্মধারা' বিষয়ে আমি বক্তব্য রাখলাম। এই উপলক্ষ্যে ভারতীয় Consul-General শ্রীভাণ্ডারী স্ত্রী ও কন্যা-সহ উপস্থিত ছিলেন। পরে আরো একটি প্রশ্নোত্তরপর্ব হয়েছিল। সোমবার 'শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা' বিষয়ে কিছু বলার জন্য স্বামী প্রমথানন্দ আমাকে নিয়ে গেলেন টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে। মাত্র ২০-২৫ জন উপস্থিত ছিলেন। আমি ৫০ মিনিট বললাম। এর শেষে একটি ৪৫ মিনিটের প্রশ্নোত্তরপর্ব হলো।

কানাডার বৃহত্তম শহর টরন্টোর জনবসতির পাঁচমিশালী চরিত্র। কানাডিয়ান ছাড়াও বহু অন্যান্য জাতির মানুষ, যেমন—ভারতীয়, পাকিস্তানী, শ্রীলঙ্কার তামিল, থাই, জাপানী, ভিয়েৎনামী ইত্যাদি অনেকে এখানে থাকেন। শ্রীলঙ্কার তামিল জনগোষ্ঠী এখানে বেশ ভাল সংখ্যায় রয়েছেন। কারও থেকে শুনলাম, এঁদের সংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ। এঁরা এখানে তিনটি তামিল বেতার-কেন্দ্র (radio-station) চালাচ্ছেন। এর মধ্যে দুটি বেতার-কেন্দ্র থেকে তামিল ভাষায় আমার দুটি সাক্ষাৎকার সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। পরের দিন তামিলভাষীদের দ্বারা পরিচালিত রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে তামিলে বক্তৃতা করার জন্য তাঁরা আমাকে রাজি করান।

৩ মে, বুধবার রওনা হলাম শিকাগোর উদ্দেশে। স্বামী প্রমথানন্দ আমাকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন। টরন্টোতে আমেরিকান কাস্টমস বিমানবন্দরে কতকগুলি অনর্থক প্রশ্ন করল। আমি বিকাল ৩টায় শিকাগো পৌঁছালাম।

বস্তুত, কানাডাকে আমেরিকার সম্প্রসারিত অংশ বলা যায়। এর আয়তন আমেরিকার চেয়ে বড়। অথচ জনসংখ্যা মাত্র ৩ কোটি, আর আমেরিকার ২৫ কোটি। বলা হয়, আমেরিকার সীমান্তের ২০০ কিলোমিটারের মধ্যে কানাডার সব মানুষ বাস করে। বরফাচ্ছাদিত থাকায় কানাডার উত্তরাংশ মনুষ্যের বসবাসের অযোগ্য। জনসংখ্যা বাড়াবার জন্য কানাডা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষকে সেখানে থাকার অনুমতি দেয়। কিন্তু বৈদেশিক নিয়মনীতি শিথিল নয় মোটেই। গ্রীষ্মে বেশ গরম হয় যদিও, শীতে ঠাণ্ডার কামড় দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। গ্রীষ্মে টরন্টোতে তাপমাত্রা ৮৫° ফারেনহাইট হলেও শীতে –৩০° ফারেনহাইটে নেমে যায়। [ক্রমশ] (এক)

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সুধাসাগর-তীরে ঃ

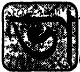
উষার শুকতারা অমৃতলাল ও সূর্যময় আলাউদ্দিন

স্বামী শিবপ্রদানন্দ



ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ

[জন্ম ৬ অক্টোবর, দুর্গাষ্টমী, ১৮৮১(?), মৃত্যু ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭২]

রতবর্ষের আধুনিক রাগসঙ্গীতের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে যে-প্রতিভা চিরায়ত সূর্যের মর্যাদা লাভ করেছে, তিনি অনন্য আলাউদ্দিন খাঁ। তিনি তাঁর স্বীয় শক্তির মাধ্যমে সমকালকে অতিক্রম করেছিলেন। তাই অনাগত কালের যাত্রাপথের আনন্দগান তাঁর অনুভূতি আর সৃজনশক্তিকে চৈতন্যরসে সিক্ত করে রেখেছিল। তিনি নিছক শিল্পী ছিলেন না, ছিলেন সাধক এবং সঙ্গীত-প্রেমিক। আত্মনিবেদনের মধ্য দিয়ে তিনি পরমকে স্পর্শ করেছিলেন এবং সেই কারণে প্রত্যাশার দিগন্তকে ছাপিয়ে তাঁর আসন সংবেদনশীল মনোভূমির সবটুকু জুড়ে পাতা আছে।

নৃত্য, বাদ্য ও গায়ন ভারতীয় সঙ্গীতের তিনটি মুখ্য উপাদান। শুধু বাদ্য অর্থাৎ যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রেই আলাউদ্দিনের অবদান ও স্থানের মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে, যদিও কণ্ঠসঙ্গীতের ক্ষেত্রে তাঁর ধ্রুপদ গানের বিপুল সংগ্রহ ছিল। আলাউদ্দিন তাঁর ওস্তাদদের কাছ থেকে প্রায় তিন হাজার ধ্রুপদ ও ধামার সংগ্রহ করেছিলেন, যার মধ্যে বারশ তিনি যেকোন সময়ে খুব সহজেই পরিবেশন করতে পারতেন। আসলে আলাউদ্দিন যেখানে যা পেয়েছেন, তাই গ্রহণ করেছেন, শেখার আনন্দেই শিখেছেন।

সেকালে গুরু-পরম্পরায় যে-বিদ্যা শেখানো হতো তা কিছুটা বংশগতভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আলাউদ্দিন উজ্জ্বল ব্যতিক্রমী চরিত্র হিসাবে আবির্ভূত হয়ে নির্বিচারে শিষ্যদের শিখিয়েছেন, ফলে তাঁদের প্রতিভার স্ফুরণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে ঘটেছে। তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের নামের সম্পূর্ণ তালিকা এবং তাঁদের বাদনভঙ্গি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করতে গেলে তা পৃথক প্রবন্ধের আকার গ্রহণ করবে। তবে আন্তর্জাতিক স্তরে পণ্ডিত রবিশঙ্কর, আলি আকবর, তিমিরবরণ, বাহাদুর খাঁ, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, পান্নালাল ঘোষ, অন্নপূর্ণা দেবী, শিশিরকণা ধরচৌধুরী, ব্রিজভূষণ কারবা, ভি. জি. যোগ, হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া প্রমুখের নাম আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য (নুলো গোপাল), অমৃতলাল দত্ত (হাবু দত্ত), আহমেদ আলি ও উজীর খাঁর কাছে প্রাপ্ত শিক্ষায় সিদ্ধিলাভ করে আলাউদ্দিন এমন বিশেষত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, যা তাঁকে অন্য সঙ্গীতগুরুর থেকে স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা দিয়েছিল। আর নিজস্ব শক্তি সঞ্চারিত করে তিনি গড়ে তুলেছিলেন প্রবাদপ্রতিম শিষ্যমণ্ডলী। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় এক আঙ্গিকে বাজাতেন, রবিশঙ্করের বাদনরীতি আলাদা, অথচ উভয়ের মধ্য দিয়েই আলাউদ্দিন বিস্তৃতি লাভ করেছেন। আলাউদ্দিন-পুত্র আলি আকবরের বাদনশৈলী সম্পর্কে পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ একটি আশ্চর্য মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখছেন ঃ "আলি আকবর যে-সুরের জাল বিস্তার করতে পারেন, খাঁসাহেব তা পারতেন না। কিন্তু আলাউদ্দিনের বাজনা যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা আলি আকবরের বাজনা শুনলেই বুঝতে পারবেন যে, এইখানে আলাউদ্দিন খাঁ আছেন। বিশেষ করে ছন্দের কাজ যখন আলি আকবর করেন, তখন সত্যি বলতে হয়, হ্যাঁ পিতার উপযুক্ত পুত্র।"

আলাউদ্দিনের বাজনা সম্পর্কে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, তাঁর বাজনায় মাধুর্যের চেয়ে ঋজুতার ভাবই বেশি ছিল। শান্তরসের পরিবর্তে পরিবেশনের সময় রুক্ষতা ফুটে উঠত আর তবলীয়ার সঙ্গতে অনেক সময় তিনি প্রসন্ন হতেন না। ১৯৫২ সালে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের সঙ্গে এই নিয়ে যে বিশ্রী ব্যাপার ঘটেছিল, শুভানুধ্যায়ী-দের মধ্যস্থতায় তা মিটমাট হয়ে যায়। পণ্ডিত রবিশঙ্করের মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ

"আলাউদ্দিন খাঁ মানেই ...hypersensitive and extremely nervous আর ভীষণ রাগী।... নার্ভাস হয়ে গিয়ে আরো চটে গিয়ে তাঁর তার ছিঁড়ত, বীভৎস সব ব্যাপার হতো। ক্রমশ ঐসব কাণ্ড মিলিয়ে-জুলিয়ে ওঁর বাজনায় ঐসব ব্যাপারগুলোই বড় হয়ে উঠত। কিন্তু সেটা যে কত ভুল, সেটা আমরা নিজের চোখে দেখেছি। আমরা তো শিখেছি তাঁর কাছে! দেখেছি দু-মিনিটের মধ্যে কারো চোখে জল কি করে আনতেন!... আমরা যখন শিখতাম মাইহারে, তখন দেখেছি বাজনা ধরে উনিও কাঁদছেন, আমরাও কাঁদছি। এখন আমি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বলতে পারি যে, কী ভাল ওঁর বাজনা, কী যে সুরেলা হাত ছিল ওঁর, রাগে কী যে ওঁর ধ্যান, তা কথায় বলা মুশকিল। লোকেরা ওঁর এই দিকটা দেখেনি।"

আলাউদ্দিনের শিষ্যগোষ্ঠীর অন্তর্গত নন, এমন একজন যশস্বী সরোদিয়া বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত আলাউদ্দিনের বাদনভঙ্গি সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন ঃ

(ক) আলাউদ্দিনের পরিণত বয়সের সরোদবাদনে গায়কী অঙ্গ ও বীণাবাদনের সৌকর্য ও ভঙ্গিমা প্রকাশ পেয়েছে। সরোদে তিনি গায়কী ও বীণের বাজ অদ্ভুতভাবে মিলিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

(খ) আলাউদ্দিনের লয়কারীর মজা হলো তানের পরিবর্তনশীল গতি, যার ফলে মাত্রা ক্রমশ বদলে যায় অথচ কোথাও ধাক্কা পায় না। অসাধারণ লয়জ্ঞান এবং যেকোন স্বরবিন্যাসকে যেকোন সংখ্যায় বা মাত্রায় ইচ্ছামত প্রসারিত বা সঙ্কুচিত করার বিরল ক্ষমতা থেকেই এটা সম্ভব হয়।

(গ) আলাউদ্দিন তাঁর বাদনে পরিচ্ছন্ন ও সুখশ্রাব্য কৃন্তন, কৃন্তন ও মীড়ের সমন্বয় এবং গমকের মধ্যে দুরূহসাধ্য ডির ডির বোলকে সংযুক্ত করেছেন।

(ঘ) আলাউদ্দিন খাম্বাজ, ভৈরবী, কাফী অঙ্গের রাগগুলির প্রত্যেকটিতেই কিছু না কিছু ধ্রুপদ বাজাতে পারতেন। ধ্রুপদের যে চার বাণীর কথা বলা হয়ে থাকে, সেগুলির স্বাতন্ত্র্য এখন স্পষ্ট নয়। এরা পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে। একমাত্র তিনিই এই চার বাণীর ঋজু গতি, জটিল গতি ও গমকপ্রধান ভঙ্গি একইসঙ্গে তাঁর যন্ত্রে বাজাতে পারতেন।

(ঙ) বেহালার চড়া পর্দায় বাজানো ছোট ছোট রাগ রূপায়ণে অথবা সরোদে বাজানো ছোট ছোট গৎগুলিতে আলাউদ্দিন খাঁ বাউল, ভাটিয়ালি প্রভৃতি লোকায়ত সুরকে আশ্চর্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলতে পারতেন।

আলাউদ্দিন তাঁর জীবনের প্রথম দিকে শিষ্যদের প্রণাম নিতে রাজি হতেন না। ছাত্ররা প্রণাম নিবেদন করলে বিচলিত হয়ে বলতেন ঃ "হায়! ব্রাহ্মণের পুলাগুলি আমার পা ছুঁয়ে পাপের ভাগী করছে।" রীতিমাফিক 'নাড়া' বাঁধাতেও তাঁর আস্থা ছিল না। যে-শিষ্য আন্তরিকতা নিয়ে তাঁর কাছে শিখতে যেত, তাকেই তিনি শিক্ষা দিতেন। অবশ্য শিষ্যদের সুখসুবিধা ও শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে আলাউদ্দিন-পত্নী মদিনা বিবির নীরব অথচ বিরাট অবদান ছিল। শিষ্যদের শিক্ষাদানের পূর্বে আলাউদ্দিন খাঁ তাঁর প্রিয় কিছু বন্দিশ পেশ করতেন। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো ঃ

(ক) না ধিন্ ধিন্ না, না ধিন্ ধিন্ না,
না তিন্ তিন্ না, না ধিন্ ধিন্ না।

প্রথম 'না'-এর অর্থ 'বৈঠনা'—গুরুর সামনে কিভাবে আসন গ্রহণ করতে হবে। দ্বিতীয় 'না'-এর অর্থ 'বোল্‌না'—গুরুকে কিভাবে সম্ভাষণ করতে হবে। তৃতীয় 'না'-এর অর্থ 'কর্‌না'—গুরু যা শিক্ষা দেবেন তা কিভাবে অভ্যাস করতে হবে। চতুর্থ 'না'-এর অর্থ 'জ্ঞা-না'—জ্ঞান অধিগত করার পদ্ধতি।

(খ) স্থায়ী— নির্ধন কে ধন সারদা মাতা
ভজ ভজ রে মন মাতা সারদেশ্বরী
অন্তরা— আলাউদ্দিন কি মাতা সারদা
নিশদিন রটত সুর সারদেশ্বরী

আলাউদ্দিন প্রদত্ত শিক্ষাদানের মাধ্যমে উপনিষদের যুগে গুরুগৃহবাসের সময় শিষ্যদের জন্য অনুসৃত নীতি প্রতিফলিত হয়েছে। তার সঙ্গে দেবী সরস্বতীর প্রতি শরণাগতি একটি বিশেষ মাত্রা সংযোজিত করেছে। ছাত্র ও শিল্পীর জীবনে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম ঘৃণা। যতীন ভট্টাচার্য 'Ustad Allauddin Khan and his music' গ্রন্থে লিখছেন ঃ "Before regular training began, the Maharaja had to take a vow to abstain from all vices, such as drinking, over indulging in sex and so on." আলাউদ্দিন খাঁয়ের কাছে মাইহার রাজার সঙ্গীতশিক্ষা প্রসঙ্গে উক্তিটি করা হয়েছে।

আলাউদ্দিন তাঁর শিষ্যের জীবনে বিনয় ও আত্মসমাহিত ভাবকে প্রাধান্য দিতে আগ্রহী ছিলেন। আলাউদ্দিনের সেই নির্দেশকে একটি স্মৃতিচারণায় তাঁর শিষ্য নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "He (Allauddin Khan) would say, whenever you are giving a performance, meditate on your Guru first and then you will see that he takes you over and carries you through. Never approach a raga with a feeling

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

of pride or vanity in your heart. Music grows out of the purest feelings of your soul and hence of the mind of the musician, if only purified can produce the vibration." তাছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—কঠোর ও কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ শিষ্যদের জীবনে কিঞ্চিৎ বিলাসিতার অনুপ্রবেশ যেমনি আলাউদ্দিন খাঁ বরদাস্ত করতেন না, তেমনি ছাত্রদের কাছে পারিশ্রমিক বা উপহার গ্রহণে তাঁর তীব্র অনীহা ছিল। জব্বলপুর সঙ্গীত কলেজের অধ্যাপকের আনা দামী ও সুস্বাদু মিষ্টান্ন নির্বিকারভাবে কুকুরের মুখে তুলে দিয়ে তিনি অধ্যাপক-শিষ্য ও অন্যান্য শিষ্যবর্গকে বলেছিলেন ঃ "তোমাদের ভরণ-পোষণ দিয়া রাখতে পারি না। আগে তাও রাখছি। এখন আমার পুষ্যি অনেক। তোমরা আমারে দিবা কি? আমি গুরু, আমি তোমাদের দিমু।" শিষ্যের একাগ্রতা ও নিষ্ঠা রক্ষায় অনমনীয় মনের পরিচয় রেখেছেন আলাউদ্দিন। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে বারাণসী রামকৃষ্ণ মিশনে আয়োজিত সঙ্গীতানুষ্ঠানে ছাত্র শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে সরোদবাদন পরিবেশন করছেন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। তবলা সঙ্গতে কণ্ঠে মহারাজ ও কিষাণ মহারাজ। সুরের সাগরের গভীরে পৌঁছে গেছেন আলাউদ্দিন। একজায়গায় একটি টিপ শ্যাম গাঙ্গুলি ছেড়ে দিলেন। আলাউদ্দিন তাঁর পানের ডিসটা শ্যাম গাঙ্গুলির কপাল লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলেন। কপাল কেটে দরদর করে রক্তপাত হতে থাকল। রক্তাক্ত শ্যাম গাঙ্গুলিকে নির্বিকারভাবে আলাউদ্দিন সুরের পথ ধরে যৌথভাবে নিয়ে চললেন। ভোর সাড়ে চারটায় অনুষ্ঠান শেষ হলো। ততক্ষণে রক্ত বন্ধ হয়েছে। আলাউদ্দিন শিষ্যকে জড়িয়ে ধরলেন। সুরের ধারাকে তখন ছাপিয়ে গেছে অশ্রুধারা। রক্তের রঙে রঙিন সেই ঘটনা আজও সঙ্গীতরসিকদের হৃদয়ে আশা ও প্রেরণার দ্যুতি ছড়ায়।

আলাউদ্দিন দিনে পাঁচবার নামাজ পড়তেন। তিনবার হজ করে ফিরেছেন। ছাত্র নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়কে সন্ধ্যা হলে বলতেন ঃ "যাও গায়ত্রী জপ করগে।" ধর্মের অন্ধ গোঁড়ামি তাঁর ছিল না। হরসুন্দরী দেবীর পুত্র, মদনমঞ্জরী দেবীর স্বামী আর অন্নপূর্ণা পিতা আলাউদ্দিন ছিলেন মাইহারের ইষ্টদেবী মা সারদার একনিষ্ঠ ভক্ত—যেমন তাঁর দাদা সুরসাধক (দোতারা, বাঁশি ও তবলাবাদনে সিদ্ধহস্ত) আফতাবউদ্দিন খাঁ ছিলেন গেরুয়া আলখাল্লাধারী কালীভক্ত। বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গসঙ্গীতশিল্পী উৎপলা গোস্বামীর মন্তব্য এই ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন ঃ "ধর্মের কাজ যদি হয় মানুষের আত্মার শুদ্ধিকরণ, তবে পৃথিবীর সব ধর্মই এক। যে-ধর্ম মানুষের মধ্যে মানবিকতার উদ্বোধন ঘটায়, যে-ধর্ম বিশ্বভ্রাতৃত্বের দ্যোতক —আলাউদ্দিন খাঁ সেই ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন।"

দৈনন্দিন জীবনে তুচ্ছ ক্ষুদ্রতা বর্জন করে জাতি-ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে এক উদার মানসিকতায় আলাউদ্দিন বিরাজ করতেন। যথার্থ সঙ্গীতসাধনা ভগবৎপ্রাপ্তির সোপান হয়ে তাঁকে উদারতায় উত্তীর্ণ করেছিল। হিন্দু-মুসলমানের কোন হাঙ্গামার কথা শুনলে তিনি গম্ভীর হয়ে যেতেন। কখনো মৃদুস্বরে ফকির আওয়ালের রচনা 'গুরু তোমার পথ ঢেকেছে মন্দিরে মসজিদে' গানটি গাইতেন। হিন্দুদের অস্পৃশ্যতার যেমন তিনি সমালোচনা করতেন, তেমনি নারীর প্রতি অশ্রদ্ধাকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের গোঁড়ামি বিষয়ে তিনি মুখর ছিলেন। সারদা-মন্দিরে নিত্য আরতি দেখতে যেতেন তিনি। কট্টর হিন্দুরা আপত্তি করলে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত বলেছিলেন ঃ "সত্যিকারের শাস্ত্রবর্ণিত ব্রাহ্মণ হলেন বাবা আলাউদ্দিন। তোমরা তাঁর মতো ব্রাহ্মণ আমাকে যদি এনে দিতে পার, তাহলে তোমাদের কথা আমি নিশ্চয় মেনে নেব।"

আলাউদ্দিন খাঁ ত্রিপুরার (বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত) অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়িয়া পরগনার শিবপুর গ্রামে ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে (অবশ্য জন্মসাল নিয়ে মতপার্থক্য আছে) বাঙালী দরিদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। যদিও আলাউদ্দিন মুসলমান নামধারী, তবু তাঁর নিজের জবানী থেকে জানা যায়—তাঁর পূর্বপুরুষের নাম ছিল 'দেবশর্মা' (দীননাথ দেবশর্মা) অর্থাৎ তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। ছোটবেলায় আলাউদ্দিনের ডাকনাম ছিল 'আলম'। আলমের বাবা সদু খাঁ সেতারশিল্পী ছিলেন। তাঁর দাদা ওস্তাদ আফতাবউদ্দিন খাঁ সুরসাধক ছিলেন। ভাই আয়েত আলি খাঁ (স্বনামধন্য সরোদিয়া ওস্তাদ বাহাদুর খাঁর পিতা) সুরসৃষ্টিতে দক্ষ না হলেও নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র নির্মাণে পটু ছিলেন। সদু মিঞার একটি 'নাগারচী' (বাদ্যযন্ত্রের দল) ছিল। ফলে বালক আলাউদ্দিন একদিকে যেমন সবসময় সুরের আবহ পেয়েছিলেন, তেমনি নানা বাদ্যযন্ত্রে হাত পাকানোর সুযোগও লাভ করেছিলেন।

শিবপুরের রাজা কৃষ্ণকিশোর চৌধুরী স্থাপিত শিবমন্দিরে বিভিন্ন স্থান থেকে সন্ন্যাসীরা আসতেন। সেখানে তাঁরা সেতার ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন। সাত বছরের বালক আলম দাদা আফতাবউদ্দিনের কাছ থেকে শুনে আয়ত্ত-করা ঠেকা তবলায় সন্ন্যাসীদের আসরে সঙ্গত করতেন। তাঁদের কাছে প্রাপ্ত অনুপ্রেরণা ও আশীর্বাদ আলমের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগ্রত করে জীবন ও সঙ্গীতকে একটি ধারায় পরিচালিত করেছিল। পরবর্তী কালে

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

আলাউদ্দিন বলেছিলেন ঃ "আমার সঙ্গীতহীন কোন সত্তা নেই।" অল্পবয়সেই পূর্ববাংলার প্রবাদপুরুষ ডাঃ মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কাছে তিনি মন্ত্রদীক্ষা লাভ করেন। মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী তখন 'Tolstoy of Bengal' হিসাবে তৎকালীন অবিভক্ত বাংলায় খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বালক আলাউদ্দিনের অন্তরতর অধ্যাত্মচেতনা তাঁর পরবর্তী জীবনকে মানবিকতাবোধ, উদারতা, সততা এবং সেবাধর্মে উত্তীর্ণ করেছে। তাই অতি সাধারণ ঘরের ছেলে হয়েও স্বীয় সাধনাবলে তিনি কিংবদন্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন। আলমের কিন্তু প্রথাগত লেখাপড়ায় মন ছিল না। লেখাপড়ায় অমনোযোগের জন্য মা আলমকে একদিন প্রহার করেন। মায়ের প্রতি দুর্জয় অভিমানে আলম আনুমানিক ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে গৃহত্যাগ করেন।

আলম শুনেছিলেন, কলকাতায় বহু গুণী শিল্পীর বসবাস। কোনভাবে কলকাতা পৌঁছাতে পারলে তাঁদের কৃপায় যথার্থ তালিম পাওয়া যাবে। কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত গ্রাম্য বালক কলকাতায় এসে দুঃসহ কষ্টের মুখোমুখি হলেন। অনিদ্রা ও অনাহার-ক্লিষ্ট শরীর নিয়ে তিনি প্রাথমিকভাবে নিমতলা শ্মশানঘাটে আশ্রয় নিলেন। সেখানে একদল সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তাঁদের সূত্রে তিনি কলকাতার একটি অন্নসত্রের সংবাদ পান এবং গৃহত্যাগের পর সেই প্রথম পেট ভরে আহার্য লাভ করেন। পরে বীরেন্দ্র রায় নামক এক সদাশয় জমিদারের আন্তরিক সহযোগিতায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সভাশিল্পী প্রখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর নতুন নাম হয় 'মনোমোহন'। নাম বদলের মধ্যে অবমাননার গ্লানি থাকলেও তাকে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া আলমের গত্যন্তর ছিল না।

প্রায় দীর্ঘ আটবছর গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করার পর আলাউদ্দিন বেশ মুনসিয়ানা অর্জন করেন। কিন্তু গোপাল ভট্টাচার্যের দেহান্ত হলে আলাউদ্দিন কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়েন। এই সময় উত্তর কলকাতার একটি সঙ্গীতের আসরে বড় ভাই আফতাবউদ্দিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। আনন্দে উল্লসিত হয়ে দাদা আফতাবউদ্দিন আলাউদ্দিনকে প্রায় জোর করেই শিবপুরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। আলাউদ্দিন তখন কুড়ি বছরের যুবক। দীর্ঘদিন পরে হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়ে বাবা-মার আনন্দ আর ধরে না! পারিবারিক বন্ধনের মায়ায় আবদ্ধ করার জন্য বাবা-মা কৌশল অবলম্বন করে ছেলের বিবাহের আয়োজন করলেন। ঢাকার সঙ্গীতজ্ঞ গুল মামুদের কন্যা মদনমঞ্জরী দেবীর সঙ্গে আলাউদ্দিনের বিবাহ হলো। কিন্তু যাঁর বুকের খাঁচায় অচিন পাখির অবাধ যাতায়াত, তাঁকে বাঁধবে কোন্ পার্থিব সুখ? বিবাহের রাত্রে ঘর শূন্য করে আলাউদ্দিন ফের উধাও হলেন।

আলাউদ্দিন কলকাতায় এসে গয়া-ঘরানার প্রখ্যাত এসরাজ-শিল্পী কানাইলাল ঢেঁড়ীর শিষ্য হাবু দত্তের কাছে যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ পান। এক্ষেত্রে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন পূর্ববঙ্গ থেকে পলাতক তাঁর প্রায় সমবয়স্ক আরো এক সঙ্গীত-পিপাসু যুবক শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—যিনি হাবু দত্তের কাছে এসরাজবাদন শিক্ষালাভ করেন। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে আলাউদ্দিন হাবু দত্তের শিষ্যত্ব বরণ করে এসরাজ, কর্ণেট, বেহালা, বাঁশি, ব্যানজো, চেলো, ফিতল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে অশেষ দক্ষতা অর্জন করেন। হাবু দত্তের সূত্রে প্রখ্যাত কবি ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে আলাউদ্দিন খাঁয়ের পরিচয় হয়। গিরিশচন্দ্রের সূত্রে লোবো প্রভু (ফোর্ট উইলিয়ামের গোয়ানীজ ব্যাণ্ডমাস্টার) তাঁকে ইংরেজী বাজনার স্বরলিপি (স্টাফ নোটেশন) এবং ওস্তাদ হাজারীলালের কাছে শাহেনাই, নাকাড়া, টিকরা শিক্ষালাভ করেন। এছাড়াও লুলু গোস্বামী ও নন্দবাবুর কাছে মৃদঙ্গ ও তবলা বিষয়ে পাঠ গ্রহণ করে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেন।

বিভিন্ন স্বনামধন্য সঙ্গীতজ্ঞের কাছে তালিম নিলেও হৃদ্য সম্পর্কের সুবাদে হাবু দত্তের প্রভাব আলাউদ্দিন খাঁয়ের ওপর সর্বাধিক ছিল। হাবু দত্ত দেশীয় ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতবিদ্যায় পটু ছিলেন। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে হাবু দত্ত পরলোকগমন করেন। হাবু দত্তের জীবনের শেষ অবধি আলাউদ্দিনের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক সম্পর্ক ছিল। প্রখ্যাত গবেষক ডঃ প্রদীপকুমার ঘোষ এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন ঃ "বাল্য-কৈশোরে গুরুদের প্রভাব বালক-বালিকাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে গড়ে তুলতে অনেকটাই সাহায্য করে। আলাউদ্দিন-গুরু হাবু দত্ত সেই ভূমিকাটুকুই পালন করেছিলেন।" অথচ সেনী-রামপুর ঘরানার বরেণ্য বীণকার ও ধ্রুপদ-শিল্পী উজীর খাঁকেই ইতিবৃত্তকারগণ আলাউদ্দিনের জীবনে খুব বড় করে প্রতিফলিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সঙ্গীত-সমালোচক অরুণকুমার বসু আক্ষেপের সুরে বলেছেন ঃ "হাবু দত্তের গুরুকৃত্যকে আলাউদ্দিন-জীবনীকার যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখেননি।" রামপুর ঘরানার ধ্রুপদ, খেয়াল, বীণবাদনের মতো ঠুম্‌রীও অতি বিখ্যাত ছিল। কারণ, উজীব খাঁ (ছত্র সিং) 'ছতরপিয়া' নাম দিয়ে অসংখ্য ঠুম্‌রী রচনা করেছিলেন। উজীর খাঁর কাছে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে আলাউদ্দিন ঠুম্‌রী শিক্ষা গ্রহণ করলেও ঠুম্‌রীর প্রতি তাঁর অনুরাগ সম্পর্কে সন্দেহ থেকে যায়। কারণ, সঙ্গীতের আসরে আলাউদ্দিনকে ঠুম্‌রী বাজানোর অনুরোধ করলে তিনি

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

চোখের জলে করজোড়ে বলতেনঃ "মা-কে বে-পর্দা করতে পারব না। ঠুম্‌রী আমার হাতে আসবে না।"

উজীর খাঁ ১৮৯২ থেকে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সাতবছর কলকাতার ধর্মতলা স্ট্রীট-সংলগ্ন চাঁদনী অঞ্চলে অতিবাহিত করেছিলেন। সেইসময় আর দুজন সঙ্গীত-গুণীর সঙ্গে হাবু দত্ত তাঁর কাছে নাড়া বাঁধেন। তাঁদের মধ্যে হাবু দত্তই শ্রেষ্ঠ ও খ্যাতিমান ছিলেন। এই পর্যায়ের শেষভাগে ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে আলাউদ্দিন যখন কলকাতায় এসে হাবু দত্তের শিষ্যত্ব বরণ করেন, তখন উজীর খাঁর গুণপনার কথা শোনার সম্ভাবনা থাকলেও তাঁর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাননি। সেই সুযোগ আসে ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে যখন হাবু দত্ত দেহান্তরিত হন। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের রামপুরে উজীর খাঁ সকাশে উপস্থিত হলেও প্রথমদিকে উজীর খাঁ তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষাদান করেননি। উজীর খাঁর বড় ছেলে প্যার মিঞার (খাঁ) মৃত্যুর পর উজীর খাঁ মাত্র দুই-তিন বছর বেঁচেছিলেন এবং ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর দেহান্ত হয়। শুধুমাত্র ঐটুকু সময়ের জন্য উজীর খাঁয়ের কাছে তালিম গ্রহণের সুযোগ পান। বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী রচিত তথ্যসম্বলিত একটি ইংরেজী প্রবন্ধ 'অমৃতবাজার' পত্রিকায় ১৭ ডিসেম্বর ১৯৬২ (আলাউদ্দিনের দেহান্তের দশ বছর পূর্বে) খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। অথচ তার কোন প্রতিবাদ হয়নি।

হাবু দত্ত কলকাতার একটি বিখ্যাত পরিবারের বিখ্যাত ও প্রতিভাবান সঙ্গীতগুণী হিসাবে স্বীকৃত ছিলেন. সেইসময় কলকাতার সবচেয়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতি-সম্পন্ন যে কয়েকটা মাত্র পরিবার ছিল, তাদের মধ্যে সিমুলিয়ার দত্ত পরিবার ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার অন্যতম প্রধান। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে সিমুলিয়ার গৌরমোহন মুখার্জী লেনে দত্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। হাবু দত্তের প্রকৃত নাম অমৃতলাল দত্ত। পিতা কেদারনাথ দত্ত, পিতামহ কালীপ্রসাদ দত্ত। এই কালীপ্রসাদ ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের পিতামহ দুর্গাপ্রসাদ দত্তের অনুজ। অমৃতলাল দত্তের অনুজ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ (টুমু) দত্ত একজন বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রী ছিলেন। স্বামী নির্লেপানন্দ রচিত 'স্বামীজীর স্মৃতি সঞ্চয়ন' গ্রন্থ সূত্রে জানা যায়, সুরেন্দ্রনাথ দত্ত থিয়েটারে ক্লারিওনেট ও হারমোনিয়াম বাজাতেন। প্রথম বয়সে ইনি সপরিবারে খ্রীস্টান হন। শেষ বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী সারদানন্দের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন। অন্যদিকে অমৃতলাল শৈশবে মেট্রোপলিটন স্কুলে ভর্তি হলেও বিদ্যালয়ের পাঠ সম্পূর্ণ করতে পারেননি।

পিতা বিশ্বনাথ দত্তের ব্যবস্থাপনায় ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ এবং তাঁর সঙ্গে হাবু দত্ত ও টুমু দত্ত গোয়ালিয়র ঘরানার খেয়াল-গায়ক ও সেতারবাদক আহম্মদ খাঁর শিষ্য বিখ্যাত বাঙালী শিল্পী বেণী গুপ্তর (মতান্তরে অধিকারী) কাছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন।

হাবু দত্তর বাল্যকাল থেকেই কর্ণেট, বাঁশি, বেহালা এবং এসরাজ বাজানোর সখ ছিল। সেই সূত্রে যৌবনের প্রারম্ভে বহুতর বাদ্যযন্ত্র বাজানোর ক্ষেত্রে তিনি অশেষ মুনশিয়ানা অর্জন করেন। তখন বাঙলা থিয়েটারের ঊষাকাল। ক্লারিওনেট ট্রাম্পেট, বেহালা, কর্ণেট, ঢোল, পাখোয়াজ সহযোগে তখন থিয়েটার মহলে কনসার্ট বাজানোর রেওয়াজ ছিল। তখনো 'বৃন্দবাদন' কথাটার প্রচলন হয়নি। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে বাড়ির অভিভাবকদের অজ্ঞাতে উত্তর কলকাতার বিডন স্ট্রীটে গিরিশচন্দ্র ঘোষ পরিচালিত ন্যাশনাল থিয়েটারে হাবু দত্ত চাকরি গ্রহণ করেন। সিমুলিয়ার দত্ত পরিবারের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের পূর্ব-পরিচয় সূত্রে হাবু দত্তের প্রতি তাঁর স্নেহের কথা সর্বজনবিদিত ছিল। ন্যাশনাল থিয়েটারে আবহসঙ্গীতের পরিচালক হিসাবে হাবু দত্ত অল্পসময়ের মধ্যে গুণিমহলে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। আলাউদ্দিন খাঁ হাবু দত্তের কাছে নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রে শিক্ষালাভ করে তাঁরই সুপারিশে স্টার থিয়েটারে কনসার্ট দলে তালবাদকের চাকরি গ্রহণ করেন। মিনার্ভা থিয়েটারে দশ টাকা বেতনে চাকরি করেছিলেন আলাউদ্দিন। হাবু দত্তের সুপারিশে গিরিশচন্দ্রের থিয়েটারে চাকরি গ্রহণের পূর্বে গিরিশচন্দ্রের থিয়েটারে তাঁর নতুন নামকরণ হয়। তিনি 'প্রসন্নকুমার বিশ্বাস' নামে পরিচিত হন। কালক্রমে সেই প্রসন্নকুমার 'ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ' নামে সঙ্গীতজগতের অধীশ্বর হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হন। ডঃ প্রদীপ ঘোষ লিখেছেনঃ "আলাউদ্দিন যে হাবু দত্তের মৃত্যুকাল (১৯১২ খ্রীস্টাব্দ) পর্যন্ত গুরুর কাছে তালিমও নিয়েছিলেন তার নিশ্ছিদ্র প্রমাণও রয়েছে।" ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে উজীর খাঁ রামপুর দরবারে স্থায়িভাবে নিযুক্ত হয়ে কলকাতা ত্যাগ করেন। ব্যাণ্ড, বৃন্দবাদন বিষয়ে উজীর খাঁর কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। অথচ রামপুর এস্টেটে উক্ত বিষয় পরিবেশন করার প্রয়োজন ছিল। সেজন্য তিনি ছাত্র হাবু দত্তের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে সতীর্থ পাঞ্চেৎগড়ের যাদবেন্দ্রনন্দন মহাপাত্রকে সঙ্গে নিয়ে হাবু দত্ত রামপুর রওনা হন। হাবু দত্তই প্রথম বাঙালী সঙ্গীতগুণী—যিনি গুরু উজীর খাঁর সঙ্গে রামপুর দরবারে সসম্মানে একই পদে চাকরি করেছিলেন। এরকম বিরল সম্মান আর কোন বাঙালীর ভাগ্যে জোটেনি। ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দের মহাসমাধির সংবাদ পেয়ে হাবু দত্ত কলকাতায় ফিরে আসেন। ফলে উক্ত সময়টুকু ছাড়া প্রায়

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

দীর্ঘ ১২ বছর (১৮৯৯-১৯০০ খ্রীস্টাব্দ এবং ১৯০২-১৯১২ খ্রীস্টাব্দ) হাবু দত্ত আলাউদ্দিনকে সঙ্গীতশিক্ষা দান করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আলাউদ্দিন খাঁ এত বেশি সময় কোন শিক্ষাগুরুর কাছে তালিম গ্রহণ করেননি। ফলে হাবু দত্তের প্রভাব আলাউদ্দিনের ওপর সর্বাধিক ছিল।

সেকালের বাঙলা থিয়েটারে সংযুক্ত থাকার সূত্রে হাবু দত্ত কুসংসর্গে পড়ে মাদক দ্রব্যে আসক্ত হয়ে পড়েন। ফলে দত্ত পরিবারে কেউই তাঁকে পছন্দ করতেন না। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে ভালবাসতেন। বেণী ওস্তাদের কাছে একত্রে তালিম নেওয়ার সুবাদে হাবু দত্তের সঙ্গীতের প্রতি নিষ্ঠাকে একদিকে তিনি যেমন প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তেমনি অন্যদিকে নরেন্দ্রনাথ হাবু দত্তের কাছে সঙ্গীতের তালিম নিয়েছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাস নাগাদ—যখন শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ অবস্থায় কাশীপুর উদ্যানবাটীতে অবস্থান করছেন—তখন নরেন্দ্রনাথ হাবু দত্তকে তাঁর পদপ্রান্তে হাজির করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যস্পর্শে হাবু দত্ত সম্পূর্ণ নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়ে যান। কুসংসর্গজনিত নেশা থেকে মুক্ত হয়ে হাবু দত্ত শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদাদেবীর একজন নিষ্ঠাবান ভক্ত হয়ে ওঠেন।

বিশিষ্ট রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ গবেষক অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের মতে, হাবু দত্ত স্বামী বিবেকানন্দের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন। হাবু দত্ত জীবনের ধ্রুবতারা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি অশেষ ভক্তি নিবেদন করে একটি সঙ্গীত রচনা করেন। কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান আয়োজিত শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসবে ভক্তিগীতিটি প্রথম নিবেদিত হয় এবং ভক্তজনমনে বিশেষ প্রেরণার সঞ্চার করে। পরে 'তত্ত্বমঞ্জরী' (ভাদ্র ১৩১৬, ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দ) পত্রিকায় গানটি মুদ্রিত হয়। ভক্তিগীতির বাণী এইরূপ ঃ

"এই কি ছিল মনে গুণমণি
সাধে সাধি বাদ হানিলে অশনি
এলে তাপিতে নিতে কোলে
দেখ দেখ হে অনলে
হৃদয়কমল জ্বলে দিবা রজনী।"

হাবু দত্ত ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগ তরুণ বয়সে আলাউদ্দিনের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তাই পরবর্তী কালে মাইহার থেকে কলকাতায় এলে শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি, বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও বেদান্ত মঠে আন্তরিক প্রণাম নিবেদনের জন্য যেতেন।

আলাউদ্দিনের শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তি ও সাত্ত্বিক জীবন-যাপন হাবু দত্তের প্রভাবেই সম্ভবপর হয়েছিল। ঘরে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চিত্রপটের উপস্থিতি সম্পর্কে কলকাতার একজন শিষ্যকে এক চিঠিতে *(চিঠির বানান ও উপস্থাপনা অপরিবর্তিত আছে)* জানিয়েছিলেন ঃ "আমার ঘরে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রী বিবেকানন্দের ফট আছে।..." মাইহারে আলাউদ্দিনের স্ত্রী মদিনা বেগমের ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের চিত্র আজও শোভিত ও বিশেষ মর্যাদায় পূজিত হচ্ছে।

১৯৫৩ সালে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ও সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী রাম বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় আলমবাজার অঞ্চলে আশ্রমিক পরিবেশে সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে সরোদবাদনের শিল্পী ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ এবং তবলায় সঙ্গত করেন হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বা হীরুবাবু। অনুষ্ঠানের শুরুতে মা কালীর মূর্তির সামনে আরতি হয়। মূর্তির সন্নিকটে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি সাজানো ছিল। অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রখ্যাত তবলচী হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (হীরুবাবু) তাঁর 'স্মৃতিকণা' প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ "অনুপম আলাপ করে [আলাউদ্দিন খাঁ] কেঁদে উঠলেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে মগ্ন হয়ে গেলেন, তারপর ভজন গাইলেন। প্রত্যেকের চোখে জল এসে গিয়েছিল। তারপর আবার আমার সঙ্গে সরোদ বাজিয়ে যে স্বর্গীয় সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করলেন, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।" অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়কে প্রদত্ত একটি একান্ত সাক্ষাৎকারে হীরুবাবু উক্ত ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ "বাজাতে বাজাতে খাঁ সাহেব 'মা মা' করতে করতে তন্ময় হয়ে গেলেন এবং হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন। 'মা কি বাজাব?'—মনে হলো যেন সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। খানিকক্ষণ আবার বাজালেন, কিছুক্ষণ আলাপ করলেন, তারপর চুপ করে যেন প্রার্থনা করতে লাগলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণের নাম করলেন—ঠাকুরের নামে যেসব মন্ত্র আছে, গান আছে, সেগুলি মুখস্থ পড়লেন—গান গাইলেন।"

ঐ একই বছরে রামকৃষ্ণ-বেদান্ত মঠে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে আলাউদ্দিন খাঁয়ের বাজনার সঙ্গে হীরুবাবু সঙ্গত করেন। সেই অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ "আমি খাঁসাহেবের সঙ্গে বাজিয়েছিলাম। সেদিন খাঁসাহেবের পরনে ছিল সন্ন্যাসীর পোশাক। সেই পোশাক পরে যখন জোড়হাত করে রামকৃষ্ণ-মূর্তিতে প্রণাম করছিলেন তখন তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন উনি ওখানকারই একজন সন্ন্যাসী।"

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

আত্মপরিচয় দান করতে গিয়ে দাদা আফতাবউদ্দিন প্রসঙ্গে আলাউদ্দিন হীরুবাবুকে বলেছিলেনঃ "সবাই তাঁকে বলত ফকির আফতাবউদ্দিন। শাক্ত সাধকের মতোই ছিল তাঁর আচরণ—ঝাঁকড়া চুল, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। গান করতে করতে সমাধিস্থ হতেন। বেলুড় মঠেও যাতায়াত ছিল—অনেক প্রবীণ সন্ন্যাসীর মুখেই তাঁর কাহিনী শোনা যাবে। গ্রামের বাড়িতে 'কালী' নাম করতে করতে বেলগাছতলায় তাঁর মৃত্যু হয়।"

আলাউদ্দিন খাঁয়ের পূর্বপুরুষরা হিন্দু ছিলেন এবং তাঁরা ছিলেন কালীভক্ত। পৈতৃক ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তিনি কালীভক্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগী হয়ে উঠেছিলেন। হীরুবাবু জানিয়েছেনঃ "খাঁ সাহেবের গলায় একটা হার ছিল—তাতে (লকেটে) একদিকে পরমহংসদেব, অন্যদিকে শ্রীমা।" অথচ গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তাঁর স্ব-ধর্মাচরণে ব্রতী ছিলেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে জানিয়েছেনঃ "আমি আলাউদ্দিনের সঙ্গে দারুণ মিশেছি। উনি এখানে (বেদান্ত মঠে) অনেকবার এসেছেন। ঠাট্টাও করেছি অনেক। উনি এখানে বেলগাছের নিচে নামাজ করতেন, আবার পরমুহূর্তেই মন্দিরে গিয়ে প্রণাম করতেন। আমরা বলতাম, 'দুটো কেন?' হেসে বলতেন, 'রেখেছি দুটোই'।"

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তীব্র অনুরাগ ও আত্মনিবেদন আলাউদ্দিন খাঁয়ের জীবনকে এমন এক গভীর ঔদার্যে উত্তীর্ণ করেছিল, যার ফলে ইসলামীয় ধর্মাচরণের সঙ্গে তিনি হিন্দু ধ্যানধারণার আশ্চর্য সামঞ্জস্য বিধান করতে পেরেছিলেন। কালের বিচারে আত্মমগ্ন সেই মহান শিল্পী তাই যথার্থ সুরের গুরু হিসাবে আদৃত হয়েছেন। সর্বধর্মসমন্বয়ের অপ্রতিহত শক্তি শুধু আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের জীবন ও সাধনাকেই সঞ্জীবিত করেনি, তাঁর পুত্র-শিষ্যদের জীবনকেও সমভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর পুত্র প্রখ্যাত সরোদিয়া আলি আকবর খাঁ যে কৌটাটিতে মেরজাপ, তার ইত্যাদি সংগ্রহ করে সঙ্গীত আসরে নিয়ে যান, তার ভিতরে তিনটি ছবি আছে। মধ্যে মা কালী, একপাশে তাঁর বাবা, অন্যপাশে তাঁর মায়ের ছবি। আলি আকবর খাঁ আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে যে ভারতীয় সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানে ছাত্রছাত্রীরা ভারতীয় সঙ্গীত-সাধনা ও ভারতীয় পদ্ধতির প্রতি কতটা নিষ্ঠাবান সে-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেনঃ "আমাদেরই প্রথায় বাইরে জুতো খুলে ওরা (বিদেশী ছাত্রছাত্রীরা) ক্লাসে ঢোকে—ভূমিষ্ঠ হয়ে সারদা মা, শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা কালীর ছবিকে ও শিক্ষকদের প্রণাম করে।... ওরা বুঝেছে ভারতীয় সঙ্গীত নিছক চিত্ত-বিনোদনের বস্তু নয়—এ হলো ঈশ্বরের পূজা।"

আলাউদ্দিন খাঁয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য পণ্ডিত রবিশঙ্কর তাঁর ব্যক্তিজীবনে সঙ্গীতগুরুর অশেষ প্রভাব সম্পর্কে বলেছেনঃ "আমার জীবনে দুটো আধ্যাত্মিক স্রোত কাজ করেছে চিরকাল। মায়ের দিক থেকে আমরা ঘোর তান্ত্রিক ছিলাম। আমার বাবার তরফেও আমরা অত্যন্ত গভীরভাবে ধর্মপ্রাণ ছিলাম।... পরে সেটাই আস্তে আস্তে কিরকম দানা বাঁধতে লাগল। যার (সেই ভাবের)



(বাঁদিক থেকে) ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও পণ্ডিত রবিশঙ্কর, (ডানদিকে) পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ

বিস্ফোরণ হলো যখন বাবা আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের কাছে গেলাম। একটা প্রায় সিদ্ধপুরুষ গান-বাজনায়, কিন্তু মন পড়ে আছে ধর্মের দিকে। সেই কালী মা, সেই ঠাকুর রামকৃষ্ণ, সেই আল্লা-খোদা, সমস্ত ধর্মেরই বলতে পার।"

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁকে যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-রসে জারিত করেছিলেন, তিনি তাঁর সঙ্গীতগুরু হাবু দত্ত। ডাঃ প্রদীপ ঘোষ উক্ত বিষয়ে বহু প্রামাণ্য তথ্য উপস্থাপিত করেছেন। অন্যদিকে অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ও একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। অবশ্য সেক্ষেত্রে তিনি হীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের বক্তব্যে অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "হীরুবাবু খাঁ সাহেবের তবলচী, বহু স্থানে একসঙ্গে বাজিয়েছেন। আর বেদান্ত মঠে তাঁর আসা-যাওয়া ছিল, সেই সূত্রেই প্রজ্ঞান মহারাজের (স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ) সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।" 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ' গ্রন্থের রচয়িতা অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় তাঁদের সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের প্রেক্ষিতে বলেছেন ঃ "রামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর (আলাউদ্দিন খাঁ) অনুরাগ গড়ে ওঠে হাবু দত্তের মারফত। হাবু দত্তের মাধ্যমেই হিন্দু নাম নিয়ে তিনি থিয়েটারে কাজ করতে ঢোকেন। এসব কথাই আমার বইতে আছে। সম্ভবত সেখান থেকেই তাঁর রামকৃষ্ণ-প্রীতি দেখা দেয়, পরে সেটা গভীর হয়।"

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সুধাসাগর তীরে বসে অবিস্মরণীয় শিল্পী অমৃতলাল ও আলাউদ্দিন শুধু মুগ্ধ বিস্ময়ে দিনাতিপাত করেননি, সেই সুধাসাগরে অবগাহন করে অমৃত-স্পর্শে ধন্য হয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় সঙ্গীতের মহাকাশে সঙ্কীর্ণতার অন্ধকারে যিনি উদারতা ও ব্যাপ্তির আশ্বাস-সমৃদ্ধ শুকতারা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, তিনি অমৃতলাল (হাবু) দত্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সুধাসাগর তীরে উদীয়মান সেই শুকতারা ভারতীয় সঙ্গীতের উষাকালকে সর্বপ্রথম স্বাগত জানিয়েছিল। সুধাসাগর তীরে আহরিত উষালগ্নের সেই পবিত্র আলো সূর্যময় আলাউদ্দিন আধুনিক ভারতের সঙ্গীতজীবনে ছড়িয়ে দিয়ে তাকে চিরায়ত সাধনার ঔজ্জ্বল্য দান করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় সঙ্গীতকে উপলক্ষ্য করে জাতীয় জীবনের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ "আমাদের দেশে সকল বিষয়েই স্বাধীন চিন্তার স্রোত যেপ্রকারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, সঙ্গীতেও তাহা লক্ষিত হয়। যাহা হইয়া গিয়াছে তদপেক্ষা অধিক আর কিছুই হইতে পারে না, এই বিশ্বাস জাতীয় জীবনে দৃঢ় প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল। শিক্ষার অভাবই এইরূপ বিশ্বাসের মূল কারণ।... ইঁহারা সঙ্গীতের মূলসূত্রসকল কিছুই বুঝেন নাই, কেবল শর্করাবাহী গর্দভের ন্যায় এবং গড্ডালিকা প্রবাহের ন্যায় মূর্খ কুসংস্কারপূর্ণ ওস্তাদ প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন।... কিন্তু এই কুসংস্কারের কুজ্ঝটিকামালা ভেদ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।"

আলাউদ্দিন খাঁয়ের অন্যতম শিষ্য এবং আলি আকবরের জামাতা ই. এস. পেরেরা একটি অসাধারণ মন্তব্য করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ "সঙ্গীতসাধনায় যে আত্মিক উন্নতি ঘটে, তার প্রতিফলন পাওয়া যায় সৃজনশীলতায়। এই সৃজনশীলতা একটি অনিবার্য আত্মিক নিবেদন, যাতে ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটে নিবিড় মনঃসংযোগের, অভিনিবেশের। যখন তিনি (আলাউদ্দিন) গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে বাজাতেন, তাঁর মনে হতো, প্রচলিত পথগুলি তাঁর ভাবপ্রকাশের পক্ষে অপ্রতুল।" আলাউদ্দিন খাঁ পূর্বসূরীদের অন্ধ অনুকরণ পরিহার করে ভারতীয় সঙ্গীতকে পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। শুধু স্বপ্ন দেখিয়ে ক্ষান্ত হননি তিনি, ঐতিহ্যের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ইচ্ছার মেলবন্ধন ঘটিয়ে সেতার, সরোদ, সুরবাহার, বেহালা, বাঁশি ও অন্যান্য যন্ত্রের বাদনশৈলীতে এনেছিলেন কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। সমকালীন সঙ্গীতবিদ্‌দের মতো তাঁর শাস্ত্রীয় গোঁড়ামি ছিল না, অথচ এই বিপ্লবের সাধনা কিন্তু অশাস্ত্রীয় ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের শরণাগত শিল্পসাধক আলাউদ্দিনের চিরভাস্বর প্রতিভা ভারতের অন্ধ কারাগারে বন্দী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ধারাকে মুক্ত করে তাকে বেগবতী ও সমৃদ্ধ করেছিল। প্রতিভাবান শিষ্যের ঘাট ছুঁয়ে সেই সৃজনের ধারা 'কাল'কে ছাপিয়ে কালান্তকালে প্রসারিত হয়ে চলেছে। ❑

আকর গ্রন্থসূচী

(১) আলাউদ্দিন খাঁ ঃ জীবন সাধনা ও শিল্প
—অরুণকুমার বসু ও কঙ্কন ভট্টাচার্য সম্পাদিত
(২) শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ—নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
(৩) রাগ-অনুরাগ—রবিশঙ্কর
(৪) আমার কথা—আলাউদ্দিন খাঁ
(৫) চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত
(৬) সঙ্গীতসাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু
—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়
(৭) Baba Allauddin Khan—Ashish Khokar

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

অঙ্ক

সুনীতি মুখোপাধ্যায়

গণিতের সেই মাস্টারমশাইকে মনে পড়ল,
যাঁর কাছে শিখেছিলাম সরল কষার অঙ্ক।
আমার এই বিকেল ছোঁয়া জীবনে তাঁর অবয়বে তুমি
জীবনের অঙ্কটা সময়ের ব্ল্যাকবোর্ডে টুকে শেখাচ্ছ,
কেমন করে অহং-এর রৈখিক বন্ধনী তুলে
একে একে আসক্তি-কামনা আর মায়ার
প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয় বন্ধনী তুলতে তুলতে
গুণ-ভাগ-বিয়োগ আর যোগের শেষে
সেই অহম্ ব্রহ্মের উত্তর মেলাতে হয়।
ঠাকুর, আমি শিখতে শিখতে, ভুলতে ভুলতে
আবার যে জড়িয়ে পড়ছি বন্ধনীর বৃত্তে!



আগমনী আসছে ঘরে

শেখ সদরুদ্দীন

আগমনী আসছে ঘরে, আলোর বাজনা বাজছে তাই—
শিশুর মতো সোনা-রোদ্দুর গড়াগড়ি খায় ধূলায়;
কাশের বনে হাসির হাওয়া, আজকে খুশির অন্ত নাই,
মায়ের পায়ের অর্ঘ্য হতে শিউলি-বকুল ফুল লুটায়!

খুশির খবর বুকে নিয়ে যাচ্ছে ভেসে মেঘ-ভেলা,
মা শারদার হাসি মেখে ফুটেছে শ্বেত পদ্মফুল—
মৌমাছি আর বিহঙ্গমের কুঞ্জবনে আজ মেলা,
ঘাসে ঘাসে মুক্তো জ্বলে, মানস-কুসুম দোদুল-দুল।

এই প্রকৃতির আনন্দ-রং মানুষ মাখে চোখ-মুখে,
ঘরের মেয়ে আসছে উমা, খুশির জোয়ার বইছে রে—
বিশ্বময়ী মা অভয়া অভয় দেবে শোক-দুখে,
সন্তানেরই দুঃখ-ব্যথা জগন্মাতা সইছে রে!

দুর্গামায়ের ছেলেমেয়ের আছে কত প্রার্থনা—
অন্ন দিও, অর্থ দিও, খ্যাতি দিও, রূপ দিও।
ভবানীকে নিবেদনে সন্তান হয় ব্যর্থ না,
সন্তানেরা চিরদিনই মায়ের কাছে সুপ্রিয়।

তাই তো সবাই ডাকে মাকে, অন্নপূর্ণা অন্নদায়,
ভক্তজনের আবাহনে শুভঙ্করী আসছে রে—
অশুভ নাশ দশভুজেতে, দনুজ-দলন দুইটি পায়,
বরাভয়ে মা শঙ্করী বিশ্বে ভালবাসছে রে!

স্বপ্নের ডাকঘর

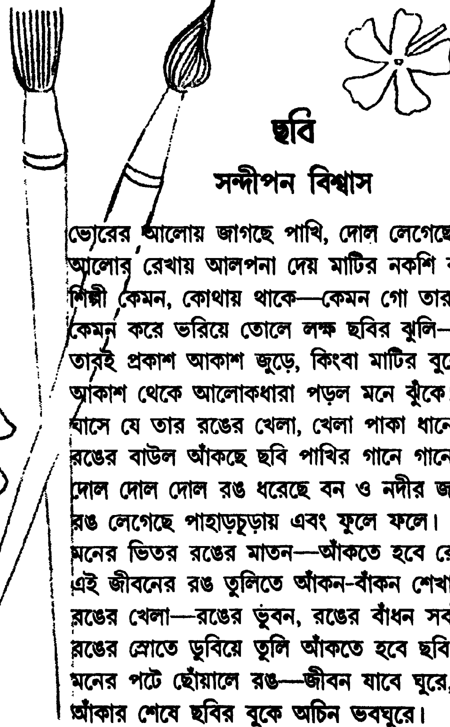
সবিতা দাস

মনের মধ্যে ছোট্ট অমল, চিরকাল বসে আছে
সে চির কিশোর, সে চির অমল, মালিন্য নেই তার,
সে জানে, রাজার চিঠি একদিন পৌঁছাবে তার কাছে
রাজা নিজ হাতে খুলে দেবে এই রুদ্ধ মনের দ্বার।

বুকের মধ্যে যে অমল, তার দুচোখে স্বপ্ন ভাসে
জরা ব্যাধি তারে ছুঁতেও পারে না, সে চির নবীন প্রাণ,
মনে মনে ঘোরে পাহাড়ে, নদীতে, সুদূরের নীলাকাশে
কান পেতে শোনে, উদাসী প্রাণের মন কেমনের গান।

ডাকঘর কৈ? সে কি দেখা যায় ঐ গঙ্গার কূলে?
ডাকহরকরা, রাজার আসার চিঠি কবে দেবে আনি?
কবে রাজা এসে বন্ধ ঘরের সকল দুয়ার খুলে
সযতন স্নেহে, কোলে তুলে নেবে, এ অমল প্রাণখানি?

পথ চেয়ে চেয়ে ক্লান্ত অমল, দুচোখে তন্দ্রা এলে,
হে রাজার রাজা, এস একবার তার বিছানার পাশে,
ঘরের কোণের প্রদীপ নিভায়ে তারার আলোটি জ্বেলে
নিয়ে যেও এই বন্দী পাখিরে, মুক্তির মহাকাশে।



ছবি

সন্দীপন বিশ্বাস

ভোরের আলোয় জাগছে পাখি, দোল লেগেছে পাতায়
আলোর রেখায় আলপনা দেয় মাটির নকশি কাঁথায়।
শিল্পী কেমন, কোথায় থাকে—কেমন গো তার তুলি?
কেমন করে ভরিয়ে তোলে লক্ষ ছবির ঝুলি—
তারই প্রকাশ আকাশ জুড়ে, কিংবা মাটির বুকে,
আকাশ থেকে আলোকধারা পড়ল মনে ঝুঁকে!
ঘাসে যে তার রঙের খেলা, খেলা পাকা ধানে—
রঙের বাউল আঁকছে ছবি পাখির গানে গানে।
দোল দোল দোল রঙ ধরেছে বন ও নদীর জলে,
রঙ লেগেছে পাহাড়চূড়ায় এবং ফুলে ফলে।
মনের ভিতর রঙের মাতন—আঁকতে হবে রেখা
এই জীবনের রঙ তুলিতে আঁকন-বাঁকন শেখা।
রঙের খেলা—রঙের ভুবন, রঙের বাঁধন সবই,
রঙের স্রোতে ডুবিয়ে তুলি আঁকতে হবে ছবি
মনের পটে ছোঁয়ালে রঙ—জীবন যাবে ঘুরে,
আঁকার শেষে ছবির বুকে অচিন ভবঘুরে।

চল সোজা

ফুল্লরা মুখোপাধ্যায়

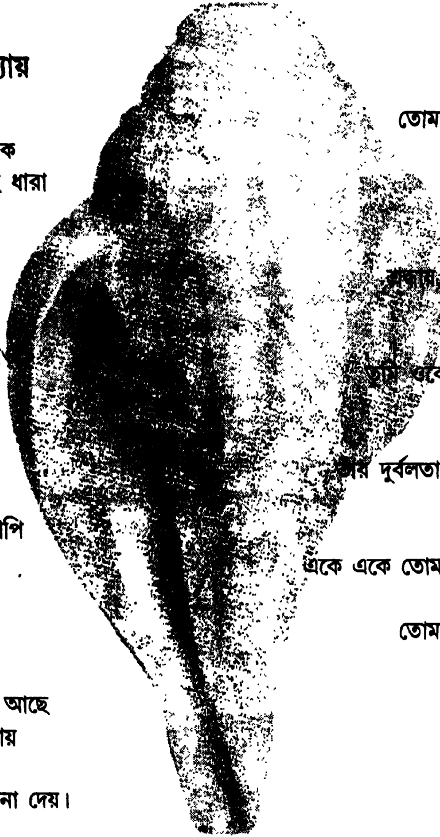
চল সোজা—
সোজা মানেই সরল নিষ্কণ্টক
কুল কুল বয়ে যাওয়া স্বচ্ছ ধারা
যেন সদ্যফোটা কমলিনীকে
সুপ্রভাতের আশীর্বাদ।

ফিরে দেখ,
পানাভরা মজা বিল
চোখ জুড়োনো শোভা হলে
মরণের ফাঁদ
পা পড়লেই সর্বনাশ।

চল সোজা—
পথ মসৃণ
হলুদ ফসলভরা লক্ষ্মীর ঝাঁপি
রুমঝুম নূপুরের শিঞ্জিনী
যেন নিবিড় আঁধারের
উজ্জ্বল বর্তিকা।

ফিরে দেখ,
অধিকার নিয়ে যারা বেঁচে আছে
বিচিত্র জীবিকায় জীবনতৃষায়
পা ফেল সাবধানে
রক্তের স্বাদ যেন জাগিয়ে না দেয়।

চল সোজা—
অরণ্য নদীপথ পার হয়ে
পবিত্র অনাবিল আকাশের তলে
যদি মেলে অনাবৃত সত্যের
অমৃত সন্ধান।



অয়ি গান্ধারী

সাগরিকা শর্মা

তোমার কথা ভেবে আমি অবাক হই গান্ধারী
শতপুত্রের জননী তুমি—
তারা প্রায় সকলেই পথভ্রষ্ট।
তোমার অতি প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র
অভিমানী, উদ্ধত দুর্যোধন
শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় তোমার প্রতি আপ্লুত যে—
সেও ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত।
ন্যায়ধর্মই তোমার প্রাণ
তুমি ওকে ফিরিয়ে আনতে পারনি ন্যায়ের পথে।
পুত্রস্নেহ তোমার মনে ফল্গু নদী।
অন্ধ স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রস্নেহ
তাঁর দুর্বলতা, তাঁর হাহাকারকেও তুমি প্রশ্রয় দাওনি।
শান্ত, কোমল কণ্ঠে সবসময় বলেছ—
যেখানে ধর্ম, সেখানেই জয়।
একে একে তোমার সব পুত্রই জীবন বিসর্জন দিল যুদ্ধে।
তুমি তো মা,
তোমার মরুভূমি মনে শূন্যতার ঝড়ো হাওয়া।
তোমার চোখে কি জল এসেছিল—
গোপনে, আড়ালে?
জানি না।
তপোবনে যোগাসনে বসে
যোগাগ্নির দহনে স্বর্গবরণ করলে
ধৃতরাষ্ট্র, তুমি, কুন্তী ও সঞ্জয়।
সম্পূর্ণ তোমাদের ইহলোকের জীবন।
তুমিই শুধু ধর্মাদর্শের
মহীয়সী মা
আমাদের কাছে রইলে
চিরায়মানা দীপ্তিময়ী হয়ে।

অনাবাদী

শুভ্রকান্তি দে



একরাশ সম্ভাবনা বুকে নিয়ে
এতগুলো উর্বর বছর খরায় কেটে গেল।
স্বপ্ন ছিল, ছিল দুরন্ত আশা
সঙ্গে ছিল জয় করার উদ্যম
তবুও,
শুধু বৃষ্টির অভাবে ফসল তোলা হলো না।

একরাশ সোনার ফসলের সম্ভাবনা
একটা জলভরা মেঘের আশায় থেকে থেকে
শুকিয়ে গেল—বারবার।
মাসের পর মাস, বছর ঘুরে বছর
শুধুই অনুর্বরতার নাভিশ্বাস শুনেই কেটে গেল।

এতগুলো উর্বর বছর অনাবাদী রয়ে গেল।



নিবেদন

অজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

শিশির-ভেজা ঘাসের 'পরে
শিউলিগুলো পড়ল ঝরে,
বসুমতীর চরণপূজা করতে সমাপন।
প্রজাপতি পাখনা দিয়ে
দোলা দিল ফুলের বনে,
মনমাতানো পাখির ডাকে
পূজার আগমন।
আনন্দ আজ সবার ঘরে
বিলিয়ে দিতে সবার মাঝে
সেজেছে আজ বসুন্ধরা
করতে নিমন্ত্রণ।
সুরের সাথে সুর মিলিয়ে
অহং যত ফেলে দিয়ে
বিশ্বমায়ের চরণে কর
হৃদয় নিবেদন।

চোখ চাই

তারাশঙ্কর রায়

মাথার ওপর টিনের চালে
ছিদ্রটি ছোট
বড়জোর একটি পেরেক গলবে
অথচ ছিদ্রটিতে চোখ রাখলে
দেখা যায় বিরাট আকাশ,
দূর থেকে দেখলে
ছিদ্রটি চোখেও পড়ে না,
কাছে যেতে হয়
কাছে গেলেই দেখা যায়
ছিদ্রটি ছোট,
কিন্তু ছিদ্রটিতে চোখ রাখলেই
ভেসে ওঠে
ছিদ্রটির তুলনায়
কোটি কোটি গুণ বড় বিশাল আকাশ—
অজস্র তারায় ভরা,
চোখ চাই
দেখার চোখ চাই
তাহলেই হলো
না হলে কিছু নয়
কিছু নেই।



অচিনে

উত্থানপদ বিজলী

কেউ বলে এই পথে যাও
কেউ বলে ঐ পথ ঠিক
ভিন পথে যেতে বলে কেউ
বুঝে গেছি কেউ না বেঠিক।

কেউ বলে তিনি আলোময়
কেউ বলে গাঢ় অমানিশা
কেউ বলে অতল সাগর
খুঁজে কেউ পায় নাকো দিশা।

কেউ বলে তিনি তো অসীম
কেউ বলে শুনেছি সাকার
কেউ বলে অরূপ রতন
অখণ্ড আর নিরাকার।

যে যার মতন সবে বলে
সব কিছু নিয়ে তিনি ঠিক
বুঝতে বুঝতে গেল দিন
দুটো চোখ করে চিক্‌চিক্।



রামধনু-রং

লক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস

মনটাকে নিয়ে মানসিকতার শেষ নেই
কি ভাবে কখন? কি করে কখন? জানা নেই
কখনো সে-মন জল থইথই কৃষ্ণদীঘি
চলা ও ফেরায় সে-মনের কোন বাধা নেই।

কখনো সে-মন উড়ু উড়ু বড় উচাটন
বড় দুরন্ত—দূর-দুরান্তে ছুটে যায়
লীলা-চঞ্চলা হরিণী—বন অরণ্যে
ভীত-শঙ্কিত চকিত চাহনি—ফিরে ফিরে চায়।

সে-মন কখনো নিয়ে আসে রামধনু-রং
হতবিহ্বল দিশাহীন আমি উদাসীন
তোমার মহাবিশ্বে যে-মন হারায় না
আমার সে-মন আমারই শুধুই অমলিন।

সে-মন কখনো মনে মনে হয় তামসিক
কখনো সে-মন রাজকীয়, বড় রাজসিক
ললাট-লিখন যদি হয় মহাজীবনের
সত্ত্বগুণের স্নিগ্ধ সে-মন নান্দনিক।

নেমেই এস

নীলিমা সেন গঙ্গোপাধ্যায়

লোকে বলে ছড়িয়ে আছ দিক-দিগন্তে
দেখতে না পাই
তিনটি নয়ন? কিংবা আলোর ঝক্‌ঝকানি?
অবোলা নই—
বকবকানির সারই জানি
মায়ার খেলার চড়াইটাতে—
হোঁচট খেয়ে
অন্তরীক্ষে নীহারিকার ছায়াপথে
অলিগলি কোথায় খুঁজি?
অনুভবের গোড়ার কথা নাই বা বুঝি।

তাই তোমাকে
বলছি প্রভু নেমেই এস নিঃশর্তে
খাট পালঙ্ক ফ্রিজ ও টিভির
লাট খাওয়া এই চর্কিপাকে।

তোমায় আমি বসতে দেব
শূন্য-বোনা ব্রহ্মাসনে
অন্তহীন সে-জিজ্ঞাসাটার
জবাব তখনই নেব জেনে।

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

খোঁজা

অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

পিছনপানে রইল পড়ে সব
যতেক হাসি যত না কলরব
চৈত্রহাওয়া উদাস করে ধায়
দূরের নদী কোথাও বয়ে যায়।

বনের ছায়া অঙ্গে যত ছিল
পাতার মতো উড়িয়ে ছুটি নিল
চোখের মাঝে কেবল দুটি চোখ
খুঁজতে থাকে অচেনা সেই লোক।

যেন সে কচি আমের ঘ্রাণে বোল
বলত সদা খোলরে দুয়ার খোল
এখন শুধু তাহার কথা বাজে
মন লাগে না মন লাগে না কাজে।

অজয় নদী ওগো অজয় নদী
তুমি কি তাকে দেখেছ এবছর
বোশেখ এলে হঠাৎ দেখ যদি
বলিও তারে আমি কি এত পর?

সারাজীবন তাহার লাগি বাঁচা
অধরা মাঝি তরঙ্গে তার নাচা
পথের ধুলো হতে পেলাম কই
বাতাস ডাকে হরিধ্বনি খই।

অজয় তুমি বইতে থাক সুখে
বালিতে জলে চাঁদের আলো শীতে
চোখ থাকতে অন্ধ হওয়ার দুখে
আমার যাওয়া হারাবে সঙ্গীতে
আগুন এসে বলবে কথা প্রাণে
চক্ষু মুদি মধুর পরিত্রাণে।

দৃষ্টিদান

কৌশিকীশরণ মিশ্র

বিবেকানন্দের চোখের দিকে
তাকিয়ে থাকতে থাকতে—
শিশু বলল, পারব।
যুবকেরা বেরিয়ে পড়ল—করতেই হবে।
প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা বললেন—এতদিন
যা করে উঠতে পারিনি
আজ থেকে তার প্রায়শ্চিত্ত শুরু।
বিবেকানন্দ চোখ বুজলেন।
সকলের কাজ শুরু হলো।

আরেক খেলা

মোহন সিংহ

গঙ্গাতীরে এ মন্দিরে পূজার সময়
সকাল সন্ধ্যে মধ্যরাতে
কত ভক্ত নরনারী
দিব্যি আসে।

ঢাকের আওয়াজ
সপ্তমী অষ্টমী আর নবমীতেও।

আজ বিজয়া
নীল আকাশে মেঘের গায়ে ধুনোর গন্ধ।

মা ও মেয়ে
লক্ষ্মী এবং সর্বজয়া
গঙ্গাতীরে যোগ দেবে আজ সিঁদুরখেলায়।

বাহকদল কাঁধে নিচ্ছে মার সংসার
হলুদ জলে ভিজে গেছে আলতারাঙা পায়ের পাতা
সিঁথি থেকে সিঁদুর পড়ছে ঘাসের ওপর থরথরিয়ে;

হঠাৎ আওয়াজ : 'লক্ষ্মী নেই'
একী হলো, কারা তুলল ঐ প্রতিমা!

মায়ের ঘাটে মাথা ঠুকছে সর্বজয়া!

সিঁদুরখেলায় যায় না দেখা সিঁদুর মোছার সিঁদুর পরার আরেক খেলা।

নক্ষত্র পতন

শেখ আবদুল মান্নান

নক্ষত্র খসে পড়লে নিভৃতে অনেক ছবি আঁকা হয়
ভেঙে পড়ে অতিরিক্ত বর্ণমালা... প্রান্তছায়া উদাসীন বাঁধে
অস্ফুট দূরে দাঁড়িয়ে অভিমানে ঘর বাঁধে—

যখন কেউ নিদ্রাহীন রাত কাটায় সবুজ পাতা চোখে
বাঁচার পূর্ণ শোক স্মৃতিবিজড়িত মেঘের ডানায় ফুটে ওঠে
ফোঁটা ফোঁটা শব্দ আঁধারের গা বেয়ে,

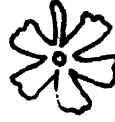
সমস্ত হিসাব ফেলে যখন কেউ কবিতা পড়ে
কবি ফের বেঁচে ওঠে রাস্তার আড়াল থেকে
ভাবনার কৃষ্ণচূড়া গভীর আস্থা নিয়ে ঘণ্টি বাজায়
অপূর্ণ চাঁদ তৃপ্তিতে গড়িয়ে পড়ে আকাশের গা বেয়ে।

ব্যবহৃত পৃথিবীতে

নচিকেতা ভরদ্বাজ

ব্যবহৃত পৃথিবীতে আজকে যেদিকে চাই—প্রত্যাসন্ন ঝড়ের স্মারক
মৃত অন্ধকারগুলি চারিদিকে—বিবর্ণ ব্যর্থতা—শব!
অথচ কী আশ্চর্য, পরিণতিহীন শত সংগ্রামের উন্মাদ ভূমিকা!
পরাজিত অন্ধকারে আজ সব দেবোত্তর জীবনের দাম
পণ্যমূল্যে পরিণত। কোথাও মানুষ নেই। মানুষের শবও পলাতক।
পৃথিবী কি পুনর্বার নতুন অর্থে জীবনকে খুঁজে পাবে? নীল নীহারিকা
আবার আশ্চর্য কোন নক্ষত্রের জন্ম দেবে—পূর্ণের প্রণাম?
অসম্ভব। সমস্ত যৌবন-সেনা পলাতক সূর্যের অনেক ওপারে।

আজকে এখানে কোন মানুষ, দেবতা নেই। যা আছে তা
ভগ্ন ভ্রষ্ট পরাজিত সৈনিকের শব।
আর আছে ঘরে ঘরে অসংযম, ভ্রষ্টাচার, অকল্যাণ, পাপ।
গার্হস্থ্যের ঘৃত-দীপ—তাও কবে নিভে গেছে। সূর্যের সংসারে
কোন আলো বেঁচে নেই। এখন নষ্টচন্দ্র!
প্রথাবদ্ধ আত্মহত্যা. সময়ের বলির বিপ্লব
চারিদিকে লোভ-হিংসা-ষড়যন্ত্র-স্বার্থের প্রলাপ।
দূষিত যৌবন-মন। কুমারীর পবিত্র হৃদয়ের বীণা
তাও যে বাজে না আর। এমনকি শিশুদের মনেও চিন্তা, ভয়।
প্রেম, সে পতিতা আজ। অর্জিত জীবনের বর্ণালী উত্তাপ
সব আজ অবসিত। মাতা-পিতা প্রভৃতি যে সম্বন্ধে আসীনা
জীবনের রূপকল্প—সেসব সম্পর্ক-সমন্বয়
আজ আর নেই। এখন চারদিকে শুধু বিকৃতি, বিকার।
দিনগত পাপক্ষয়। মানুষের দৃষ্টির, কথার আলোকে
নেই কোন নিহিত অর্থ। বন্ধুত্ব কেবলমাত্র কথার নিপুণ ব্যবহার।
সাহিত্য-শিল্প-ধর্ম—আমাদের সমস্ত উত্তরাধিকার
বিপন্ন করুণ স্তব্ধ, কখনো বা প্রগলভতা। অশ্রুনত অসহায় শোকে
ম্রিয়মাণ চারিদিক। শুধুই ঈশ্বরকে নয়। এমনকি নিজেদেরও
নির্বাসন দিয়েছি নরকে।







বিশ্বরূপ

দীনেশ গঙ্গোপাধ্যায়*

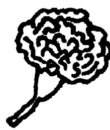
বিশ্ব ভরে দেখি তোমার
উদার অতল রূপ।
ছোটয় বড়য় মিলিয়ে তুমি
অসীম অপরূপ।
ক্ষুদ্র তৃণে ক্ষুদ্র ফুলে
নাচ তুমি দুলে দুলে
গ্রহ, তারা আকাশ ভরে
বিরাট বিশ্বরূপ।
শুনেছি এ সৌরজগৎ
একটি দুটি নয়;
অনন্ত এ জগৎভরা
রূপেরই বিস্ময়।
চন্দ্র, তপন দুটি নাকি
অনিদ্রিত তোমার আঁখি
কঠিন এবং কোমল দুটি
দৃষ্টি অপরূপ।
আকাশ তোমার অঙ্গবাস
বায়ু তোমার বাঁশি
বজ্র তোমার কণ্ঠনাদ
বিজলি তোমার হাসি।
মূর্তি তোমার অভ্রভেদী
এই পৃথিবী পূজার বেদি
জীবন মরণ তার আরতির
প্রদীপ এবং ধূপ।
বিশ্বভরে দেখি তোমার
উদার অতল রূপ।

---

* *অধুনা প্রয়াত।*

সমীক্ষা

প্রভঞ্জন রায়চৌধুরী



আমিও মেকি, ওরাও মেকি—
আশেপাশে তেমনই দেখি;
ভেজাল কিনি খাঁটি কিনি না,
নিখাদ সোনা কভু চিনি না।
কষ্টিপাথর দিয়ে ঠাকুর, ক্লিন্ন মন ঘষে নাও,
মেকিত্ব মুছে দিয়ে আসল হীরের ছটা ফোটাও।



মানব

রাজকুমার শেখ

সমস্ত হৃদয়ের ভিতরে
তুমি আছ
সে কে তুমি?
আমার মাস বছর হলো, বছর কাল হলো
তবু তোমার দেখা মেলে না
কোন্ সাগরের মুক্তো তুমি?
আমি বলি না—তুমি বল
মানবের ভিতরে—দেবমানব না থাকলে
সব ফুল যেত যে ঝরে—
সব ফুল 'তুমি', তুমি আছ জেনেই
আজও সন্ধ্যাতারা আছে জেগে।

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

মা

[illegible]প্রসন্ন ঘোষ

'মা'—বড় মধুর নাম।
ডাকি, অহরহ ডাকি।
কারণে অকারণে শিশুটির মতো।

'মা' বড় শুদ্ধভাব।
যুগেশ্বর-উচ্চারিত যুগমন্ত্রখানি।
দেখি, পাপড়ি খুলে হাসে পদ্ম,
গান গেয়ে ওঠে [illegible]
নির্মেঘ হয় নীল-চোখো অনন্ত আকাশ,
স্নেহ ঝরে শিশিরের মতো।...
রাংতা-মোড়া মি[illegible]
আনকো বাতাস [illegible] শরীর
করুণার মতো।
প্রতীক্ষার তীব্র তৃষ্ণা যায় [illegible]
ঘটে-পটে-ভবের হাটে-মন্দিরে-[illegible]রূপিণী।
সর্বৈশ্বর্যময়ী ঐশ্বর্য সব ঢেকে নেমে[illegible]রে।

"পাতানো মা নয়, সত্যিকারের মা, জন্মজন্মান্তরের।"
তাই ডাকি... মা-মা-মা,... অহরহ ডাকি।

পরম অক্ষর

অয়ন বিশ্বাস

পুণ্য-অয়ন পৃথিবীর
সংবাৎসরিক কক্ষপথ পরিক্রমার পথে
এ পরম মাহেন্দ্রক্ষণ—
তোমার জন্মলগ্নে
তোমার পদলগ্ন আমি,
কালজয়ী মহালগ্ন এ
[illegible]কালাতীত, হে কালপুরুষ!

মহাজীবনের মহাজনমের
জয়[illegible] বাজে আকাশিয়া প্রচ্ছদের
ধীর স্নিগ্ধ উষালোকে।
[illegible]কি জানি সে-অন্ধকার কংসকারা,
লুম্বিনীর বনবিতান; নাকি
[illegible]কালের [illegible] অলৌকিক ঢেঁকিশাল কিনা!

জ্যোৎস্নার বাসন্তী গঙ্গায়
শব্দহীন বাতাস বয়
ত[illegible] অতৃপ্ত লৌহতপ্ত দুপুর আকাশ।
যখন [illegible] এ বুকের গভীরে কান পাতি
শুনি অঘোষিত মৃত্যুর কণ্ঠস্বর;
বিঘোষিত জীবন-যন্ত্রণা—
আমার এ-জীবন জুড়ে।
তাই তোমার অনাবৃত পায়ের ধূলায়
ক্লান্ত আমি ধূসর হতে
বারবার ফিরে ফিরে আসি
কী এক পরম বিস্ময়ে!
শতাব্দীর নবীন প্রভাতে

নবোদিত অরুণের সকরুণ প্রভাতে
ক্রান্তদর্শী, হে মহর্ষি
চিরস্থির হও ধ্রুবতারা—
ভোরের স্বপ্নে বিভোর আমার চলার পথে।
জীবন-দেবতা তুমি
সুরহারা, সৃষ্টিছাড়া আমার এ বিবর্ণ আকাশ
ভরাও তোমার নীলে।

দেখি সবকিছু মুছে মুছে যায়
জেগে থাকে শুধু
তোমার পুণ্যনামের অক্ষরনিচয়—
আজি জপি সেই পরম অক্ষর।

রেখাচিত্র

শেখ মুস্তাক আমেদ

এখানে এখন কেউ ভাল নেই
ভাল মায়াবী জননী;
কারোর জন্য [illegible] থাকে না কেউ
সবকিছু গিলে খা[illegible]জের মতো
বদলে গিয়েছে সব চরিত্র!
মানুষ ও প্রকৃতির; তখন বিপর্যয়
পুড়ে খাক সবু[illegible] খেত
চাষীর বুকে [illegible]
তীব্র উল্লাসে [illegible]ড়
বৃষ্টি শোনায় [illegible]
হায়! নষ্ট সম[illegible] অবাধ [illegible]
পারিজাত এ-জ[illegible]সে।

অলঙ্করণ: জয়ন্ত ঘোষ

শ্রীশ্রীদেবীপূজার উৎস সন্ধানে

স্বামী নিত্যাত্মানন্দ

পটভূমিকা

দৈত্যরাজ শুম্ভ ছিল ঋষি কশ্যপ এবং দক্ষকন্যা দনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। নিশুম্ভ এবং নমুচি এঁদের মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র। এই তিন ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং মধ্যম ভ্রাতা একাসনে বসে এক অযুত বর্ষ ব্রহ্মার সাধনায় নিমগ্ন ছিল। তাদের সাধনায় তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা বর দেন—এই দুই দানববীর পশু, পাখি, দেব, দানব প্রভৃতির মধ্যে পুরুষজাতীয় কারো হাতে নিহত হবে না, অধিকন্তু তারা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

বরলাভের পর এই দুই ভ্রাতা ত্রিলোক বিজয়ের স্বপ্নে বিভোর হয়ে স্বর্গ থেকে ইন্দ্র, বায়ু, কুবের প্রমুখ দেবতাদের বিতাড়িত করেছিল। তখন দেবতারা গুরু বৃহস্পতির পরামর্শ অনুযায়ী দেবী ভগবতীর আরাধনায় রত হন। দেবী ভগবতী দেবতাদের অভয় দিয়ে জানান, তিনি যথাসময়ে তাঁদের সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন।

এদিকে অসুরাধিপতি নমুচি ইন্দ্রের হাতে পরাজিত ও নিহত হওয়ার পর শুম্ভ ও নিশুম্ভ প্রতিহিংসা চরিতার্থের জন্য ত্রিলোকে উৎপীড়ন শুরু করে। শেষপর্যন্ত দেবী ভগবতীর হাতে নিশুম্ভ নিহত হয়। তখন শুম্ভ ক্রোধে ও সদর্পে দেবী ভগবতীকে বলে—দেবীর কোন শক্তি নেই, অপরের শক্তিতে নির্ভর করে তিনি নিশুম্ভকে হত্যা করেছেন।

দেবী ভগবতী তখন নিজের কথা বলতে গিয়ে শুম্ভকে জানান যে, এই জগতে তিনিই একাকিনী। দ্বিতীয়া আর কে আছে?—

"একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ।।"
(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১০।৫)

শুম্ভ দেখল, এই মহাদেবী থেকেই অষ্ট মাতৃকাশক্তি উৎপন্ন হয়েছেন এবং সেই দেহেই বিলীন হয়ে যাচ্ছেন। শেষে মহাদেবী একাকিনীই রইলেন। তাঁর ইচ্ছাতেই অষ্ট মাতৃকাশক্তির আবির্ভাব এবং অন্তর্ধান। শুম্ভও অতঃপর দেবীর হাতে নিহত হলো। ডামরতন্ত্রে আছে—

"ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্ণবী তথা।
বারাহী নারসিংহ্যৈন্দ্রী চামুণ্ডা মাতরঃ স্মৃতাঃ।।"

—এই অষ্ট মাতৃকাশক্তি শ্রীশ্রীদেবী থেকে অভিন্না নন। পরা জ্ঞানের অভাবের জন্য আলাদা বলে মনে হয়। গীতায় আছে, ভগবান স্বীয় মায়া দ্বারা স্বেচ্ছায় দেহধারণ করে থাকেন জগতের কল্যাণের জন্য—"সম্ভবাম্যাত্ম-মায়য়া।" (গীতা, ৪।৬)

আবার শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।২।২৯) আছে, ঐ মহাদেবীই যোগমায়া নামে অভিহিতা। বেদে আছে—"একোঽহং বহু স্যাম্", অর্থাৎ আমি এক, আবার বহুরূপে প্রতিভাত হতে পারি। ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন। তাঁর ইচ্ছাতেই তিনি চলেন। তাঁর সত্তার অনন্ত প্রকাশ, অনন্ত নাম। অধিকারিভেদে এই সত্তা নাম, রূপ, কর্ম ও গুণ অনুসারে ভিন্ন। তিনি স্বয়ম্ভূ। দেবী ভাগবতে আছে—

"সেয়ং শক্তির্মহামায়া সচ্চিদানন্দরূপিণী।
রূপং বিভর্ত্যরূপা চ ভক্তানুগ্রহ হেতবে।।"

—সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী মহামায়া পরাশক্তি অরূপা হয়েও ভক্তগণকে কৃপা করার জন্য বহুরূপ ধারণ করতে পারেন।

দেবীভাগবতে আরো আছে—দেবী বলছেন ঃ

"সদৈকত্বং ন ভেদোঽস্তি সর্বদেব মমাস্য চ।
যোঽসৌ সাহম্ অহং যাসৌ ভেদোঽস্তি মতিবির্বিভ্রমাৎ।।"

—আমি ও ব্রহ্ম এক। উভয়ের মধ্যে ভেদ নেই। তিনিই আমি। আমি যা, তিনিও তা-ই। এই ভেদ ভ্রমকল্পিত, বাস্তবে নয়।

বেদের অন্তর্ভুক্ত মহাশক্তি

বিশ্বের সর্বত্র শক্তির আরাধনা সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে আজ পর্যন্ত নিরন্তর চলছে। বিভিন্ন নামে তিনি আরাধিতা হয়েছেন। বেদে তিনি দেবী গায়ত্রী। এই মহাশক্তিস্বরূপিণী গায়ত্রীর জপ ও বন্দনা সুপ্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি চলে আসছে। তাঁর ধ্যানে আছে—

"ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রিচ্ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে।।"

—হে বরদে দেবি, হে অক্ষরত্রয় প্রতিপাদ্যা ব্রহ্মপ্রকাশিনি, হে ছন্দসমূহের জননি, বেদোদ্ভবা গায়ত্রি, তুমি আবির্ভূতা হও। তোমায় প্রণাম করি। বেদোক্ত বাক্ হচ্ছেন ব্রহ্মময়ী, আদ্যাশক্তি এবং বিশ্বেশ্বরী।

ঋগ্বেদে 'দুর্গা' শব্দ না থাকলেও (দেবীসূক্ত অনুযায়ী) তিনি 'অগ্নিরূপিণী'। তিনি জগন্মাতা আদ্যাশক্তি। আবার তাঁকে 'রাত্রিদেবী'ও বলা হয়েছে। মাতা ভুবনেশ্বরীর পূজার মন্ত্র ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। তিনি 'বিশ্বদুর্গা', 'সিন্ধুদুর্গা', 'অগ্নিদুর্গা' প্রভৃতি নামে অভিবন্দিতা হয়েছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডী হচ্ছেন ঋগ্বেদস্বরূপা প্রথম চরিত্র এবং তাঁর ছন্দ হচ্ছেন গায়ত্রী। বেদমাতা এই গায়ত্রী ঋগ্বেদধারিণী দেবী কুমারী তথা মহাকালী ব্রহ্মরূপা ব্রাহ্মী।

সামবেদীয় কেন উপনিষদের উপাখ্যান থেকে জানা যায়, উমা হৈমবতী দেবী ইন্দ্রকে দর্শন দিয়ে বলেছিলেন

যে, দেবতারা ব্রহ্মশক্তির দ্বারা শক্তিশালী। এই ব্রহ্মশক্তি ও দেবীশক্তি অভিন্ন। বেদমাতা গায়ত্রী সায়াহ্নে সামবেদ-ধারিণী 'বৃদ্ধা' দেবী অর্থাৎ মহাসরস্বতী শিবরূপা মাহেশ্বরী।

যজুর্বেদে দেবীকে 'হব্যবাহিনী অগ্নি' রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। শুক্লযজুর্বেদের বাজসনেয়-সংহিতায় এবং কৃষ্ণ-যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দেবী অম্বিকার নাম পাওয়া যায়। তাঁকে সেখানে বিভিন্ন নামে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বেদমাতা গায়ত্রী মধ্যাহ্নে যজুর্বেদধারিণী যুবতী তথা মহালক্ষ্মী বিষ্ণুরূপা বৈষ্ণবী রূপে আখ্যায়িতা হয়েছেন। একই আদ্যাশক্তি তথা মহাশক্তির বিভিন্ন প্রকাশ।

অথর্ববেদের মুণ্ডক উপনিষদেও (১।২।৪) একই দেবীশক্তির বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে আছে—

"কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ।।"

—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী (উগ্রা), বিশ্বরুচী (প্রদীপ্তা)—এই সাতজন দেবী অগ্নির জিহ্বা নামে খ্যাতা।

বেদোত্তর যুগে দেবীবন্দনা

অতি প্রাচীনকাল থেকেই শক্তির অভিব্যক্তিরূপে জলাশয়, নদী, পাথর, বৃক্ষ প্রভৃতিকে পূজা করার রীতি চলে আসছে। বিশেষভাবে উত্তর-পূর্ব ভারত-সহ ভারতের প্রায় সকল প্রান্তের জাতি ও উপজাতির মধ্যে এইরূপ পূজার্চনার রীতি আজও বিদ্যমান। এমনকি হাঁস, মোরগ বলি দিয়ে শক্তির আরাধনা করা হয়, যা প্রত্যক্ষ করা যায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে। বহির্ভারতের নানা স্থানে এরূপ পূজার্চনার রীতি আছে।

এই উপমহাদেশে শক্তিসাধনার ৫১টি পীঠস্থান বর্তমান। সুদূর অতীত কাল থেকে অদ্যাবধি দেবীর পূজাযজ্ঞ এইসব পীঠস্থানে হয়ে আসছে। দেবী কাশ্মীরে 'অম্বা', দাক্ষিণাত্যে 'অম্বিকা', গুজরাটে 'হিঙ্গলা' ও 'রুদ্রাণী', মিথিলায় 'উমা', কান্যকুব্জে 'কল্যাণী', কুমারিকা প্রদেশে 'কন্যাকুমারী', বিন্ধ্যাচলে 'বিন্ধ্যাচলবাসিনী' প্রভৃতি নামে দেবী প্রতিদিন পূজিতা হচ্ছেন। নেপাল, ভূটান, শ্রীলঙ্কা, তিব্বত-সহ বহু স্থানে দেবীর নিত্য পূজারতি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। 'নবরাত্রি' অনুষ্ঠানে দেবী ভক্তদের বিশেষভাবে অনুগ্রহ করেন। যিনি ব্রজধামে 'কাত্যায়নী' নামে পূজা গ্রহণ করে ব্রজকুমারীদের অভীষ্ট বর প্রদান করেছিলেন। ব্রজবালাদের প্রার্থনা ছিল—

"কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ।।"

—হে কাত্যায়নি, হে মহামায়া, মহাযোগিনি, জগদীশ্বরি দেবি। নন্দগোপপুত্র কৃষ্ণকে আমার পতি কর। তোমাকে প্রণাম করি।

ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী এই দেবী, শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সময়ে যশোদার গৃহে যোগমায়া রূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন এবং অষ্টভুজা দুর্গামূর্তি 'নীলোৎপলা শ্যামা' এই যোগমায়া দুরাচারী কংসকে আসন্ন বিপদের বিষয়ে বারেবারে সাবধান করেছিলেন। এই অষ্টভুজা দেবী 'গৌরীমাতা' নামে রামায়ণে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি রাজনন্দিনী সীতার পূজা ও প্রার্থনা গ্রহণ করে ধনুর্ধারী শ্রীরামচন্দ্রকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য সীতাকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায় যে, আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে মূর্তি বা প্রতিমাতে পূজা করা হতো। বিশেষভাবে পাঞ্জাবের হরপ্পায় এবং সিন্ধুপ্রদেশের মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ থেকে তা জানা যায়। তাছাড়া ২৭ হাজার বছর পূর্বে প্রস্তর যুগে প্রতীকপূজার প্রচলন হয়েছিল বলে জানা গেছে। তারপর কালক্রমে চতুর্থ হিমযুগে মাতৃকল্পিত দেবীমূর্তির প্রচলন হয়। আবার অনেকের মতে, তখন থেকেই সাকার মূর্তিতে দেবদেবীর পূজা শুরু হয়।

উপরি উক্ত দুটি ধ্বংসাবশেষ ছাড়াও ভারতের নানান স্থানের মাটির নিচে প্রাচীন দেবদেবীর মন্দির, মূর্তি ইত্যাদি আবিষ্কৃত হচ্ছে। তার মধ্যে আছে—রাজস্থানের যোধপুরের পাশে 'ওশিয়া' ধ্বংসাবশেষ। কথিত আছে যে, সেখানে সম্রাট আকবরের সময়ে কিছুটা সংস্কার হয়েছিল। বর্তমানে সেখানে 'শচীয়ামাতা' নামে মা দুর্গা পূজিতা হচ্ছেন। পাশেই লুপ্ত সূর্যমন্দির এবং কালীমন্দির ছাড়া জৈনমন্দির অবস্থিত। পূর্ব ভারতের মায়ানমার সীমান্তে ১৯৭০ সালে জঙ্গল কেটে এবং মাটি খুঁড়ে সিয়াং জেলায় দেবী দশভুজার কারুকার্যমণ্ডিত এবং দৃষ্টিনন্দন মূর্তির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। মালিনীথানের এই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীদেবীকে বরণ করে দেবী পার্বতীর কাছে আশীর্বাদের জন্য এসেছিলেন বলে অনেকের ধারণা। ধ্বংসাবশেষ দেখে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অভিমত যে, এটি দ্বাদশ শতকের কোন একসময়ে লুপ্ত হয়েছিল।

মালিনীথানের কিছুদূরে তেজুসদিয়ার রাস্তায় আরো একটি ধ্বংসাবশেষ আছে। একসময়ে দেবী কালিকার সদৃশ 'তাম্রেশ্বরী' দেবীর অর্চনা হতো। বিগত দু-শতাব্দী আগে পর্যন্ত সেখানে নরবলির প্রথা ছিল বলে স্থানীয় জনসাধারণের অভিমত। বর্তমানে এই ধ্বংসাবশেষ শুধু প্রাচীন স্মৃতি বহন করে চলেছে।

প্রাচীন যুগে বহির্ভারতে শক্তি উপাসনা

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা এবং বাদারিয়ান সভ্যতায় দেখা যায় যে, সেইসময় শস্য উৎপাদনকারিণী মৃত্তিকাকে এবং প্রাণ ও শক্তির উৎসরূপে পৃথিবীকে মাতৃজ্ঞানে বন্দনা

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

করা হতো। 'হিন্দু মাইথোলজি' অনুযায়ী মিশরীয়রা 'আইসিশ' নামক দেবতাকে দেবীজ্ঞানে উপাসনা করত। এই দেবী শ্রীদুর্গারই নামান্তর। পরবর্তী সময়ে মিশরে মহিষাসুরবিমর্দিনী দেবীমূর্তিও পাওয়া যায়।

গ্রীস দেশে মাতৃজ্ঞানে 'মিনার্ভা', 'ডায়ানা' প্রভৃতিকে বন্দনা করা হতো। সেই দেশের জনগণ হিন্দুদের উপাস্য দেবী লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে যথাক্রমে 'ভেনাস' ও 'মিনার্ভা' নামে অভিহিত করতেন। অন্যত্র 'ভেনাস' এবং 'সিবলি'কে যথাক্রমে দুর্গা এবং মহাকালী রূপে উপাসনা করা হতো। একসময় ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলেও জগন্মাতাকে দেবীরূপে অর্থাৎ শক্তিরূপে কল্পনা করে স্তুতি করা হতো।

ক্ষীরোদমোহন বসুর মতে, আমেরিকাতেও প্রাচীন-কালে পৃথিবীকে মাতৃজ্ঞানে বন্দনা করা হতো। পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সেই যুগে দেবী দুর্গাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হতো। বিখ্যাত লেখক স্যার জেমস জি. ফ্রেজার প্রণীত 'এডোনিস' গ্রন্থে আছে, প্রকৃতির সর্ববিধ সৃজনীশক্তিরূপে বিভিন্ন নামে দেবীশক্তির আরাধনা করা হতো। ফিনিসিয়া দেশের বিবলাসের ধ্বংসাবশেষ থেকে দেবীবন্দনার সন্ধান পাওয়া যায়। বিদেশে একসময় 'হেবাস', 'ওরেণ্ডা', 'আইশিস' ইত্যাদি নামে দেবীসাধনা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন যুগে 'হিটাইট'দের 'দেবসমাজ'-এ দেবীমূর্তির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ডঃ কারপেন্টার প্রণীত 'কমপ্যারেটিভ রিলিজিয়ন' গ্রন্থে উল্লেখ আছে—মাতৃদেবী প্রাকৃতিক মূর্ত শক্তি এবং সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, জল, উদ্ভিদ, প্রাণী প্রভৃতির মধ্যে প্রকাশিত হন। বজ্রের শক্তিও দেবীর শক্তি। লেখক উত্তর আমেরিকার উপাস্য দেবী 'ওরেণ্ডা' সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এই তথ্য জানিয়েছেন।

ভারতের বাইরে, বিশেষত চীন, জাপান, কম্বোজ, চম্পা, যবদ্বীপ, মাল, সুমাত্রা, জাভা প্রভৃতি দেশে হিন্দু ও বৌদ্ধগণ কর্তৃক প্রাচীনকাল থেকে দেবীপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তেমনি অনুষ্ঠিত হচ্ছে তিব্বত, ভূটান, নেপাল ও বাংলাদেশে। জাপানের 'চনিষ্ট' দেবী বা 'কোটি শ্রী' বা 'সপ্ত কোটি' বুদ্ধমাতৃকা নামে যিনি অভিহিতা, তিনিই দেবী চণ্ডী। (এস্থলে প্রথম শব্দটি জাপানী এবং দ্বিতীয় শব্দটি সংস্কৃত) বৌদ্ধধর্মের দেবী 'মারীচি' দশভুজা। তিব্বতের লামাগণ তাঁকে দেবী 'উষা' রূপে আবাহন করেন। চীনের ক্যান্টন শহরে বৌদ্ধমন্দিরে দেবীর শতভুজা মূর্তি দেখা যায়, যা শ্রীদুর্গার অন্য এক রূপ। অনেকের মতে, প্রাচীন কপিলাবস্তু নগরের শাক্যবংশের শাক্যবর্ধন মন্দিরের দেবী 'অভয়া'র অপর নাম শ্রীদুর্গা। বৌদ্ধ তন্ত্রের দেবী হলেন 'অপরাজিতা'। তিনি অষ্টভুজা এবং পীতবর্ণা। তাছাড়া দেবী 'বজ্রতারা' অনেকের আরাধিতা। একই দেবী ভারতের বাইরে কোথাও দ্বিভুজা, কোথাও চতুর্ভুজা, কোথাও দশভুজা ও দ্বাদশভুজা রূপে বিরাজিতা হয়ে শরণাগতের অশেষ কল্যাণ করে আসছেন।

জৈনধর্মে দেবীর আবাহন

এই ধর্মের উভয় সম্প্রদায়ের মন্দিরে সরস্বতীর মূর্তি ও আরো ষোলজন দেবীর মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। দেবী সরস্বতীকে জৈনগণ 'ভারতী', 'সারদা', 'ব্রহ্মাণী', 'বাগীশ্বরী', 'ব্রহ্মবাদিনী', 'ব্রতচারিণী' ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন, যার সঙ্গে দেবী দুর্গার অন্যান্য নামের সাদৃশ্য আছে। তবে ক্ষেত্রবিশেষে পূজার মন্ত্রগুলিকে আলাদা করা হয়েছে। জৈনধর্মের সরস্বতীকে 'বিশ্বরূপিণী' বলা হয়েছে। হিন্দুদের প্রচলিত সরস্বতীর ধ্যানের সঙ্গে জৈনধর্মোক্ত সরস্বতীর ধ্যানের কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

ভারতীয় তন্ত্রশাস্ত্রে দেবীবন্দনা

মাতৃশক্তির আরাধনাকে কেন্দ্র করে এই উপমহাদেশে বহু প্রাচীন কাল থেকে তন্ত্রসাধনা শুরু হয়েছিল। বহু তন্ত্রশাস্ত্রে তার উল্লেখ আছে। একসময় এই উপমহাদেশে অসংখ্য তন্ত্রশাস্ত্র ছিল এবং তন্ত্রোক্ত দেবীপূজার পদ্ধতিও অতি বিচিত্র ধরনের ও অত্যন্ত গোপনীয় ছিল। তবে সবারই লক্ষ্য ছিল—দেবী ভগবতীকে পূজা ও বন্দনায় সন্তুষ্ট করে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধি লাভ করা। ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে, বৌদ্ধতন্ত্রের নিকট হিন্দুতন্ত্র বহুভাবে ঋণী। দশমহাবিদ্যা প্রভৃতি বৌদ্ধতন্ত্র থেকেই আহৃত হয়েছে। বৌদ্ধতন্ত্রে যেমন 'বজ্রযান', 'সহজযান' ও 'কালচক্রযান' নামে তিনটি বিভাগ আছে, তেমনি 'আগম' ও 'কমল' নামে হিন্দুতন্ত্রেরও দুইটি প্রধান বিভাগ আছে। আবার বৌদ্ধতন্ত্রে যেমন 'ক্রিয়াতন্ত্র', 'চর্চাতন্ত্র' ইত্যাদি চারটি সাধনপদ্ধতি আছে, তেমনি হিন্দুতন্ত্রে 'বামাচার' ও 'দক্ষিণাচার' নামে প্রধানত দুটি সাধনপদ্ধতি আছে। কুলার্ণবতন্ত্রের মতে, দেবীপূজার প্রশস্ত পূজাপদ্ধতি হলো তন্ত্রোক্ত সাধনপদ্ধতি। একসময় এই উপমহাদেশের ৫১টি দেবীতীর্থে তন্ত্রোক্ত সাধনপদ্ধতির প্রাধান্য ছিল। কয়েকটি তীর্থ ছাড়া অন্যত্র অদ্যাপি প্রাচীন ধারা অব্যাহত। তাছাড়া বিভিন্ন সাধকগণ নিজস্ব দেবালয় তৈরি করে একসময় সাধন-ভজন করতেন। তার মধ্যে আছে নাটোর, হালিশহর, দক্ষিণেশ্বর, তারাপীঠ, মেহার প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে, দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর মন্দিরকেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ স্বীয় সাধনার স্থান হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন এবং তান্ত্রিক সন্ন্যাসিনী ভৈরবী ব্রাহ্মণীর উপদেশমত ৬৪টি তন্ত্রের সাধনায় অল্পদিনের মধ্যে সিদ্ধ হয়েছিলেন। উপমহাদেশের বহু স্থানে আজও পঞ্চমুণ্ডীর আসন আছে, যা তন্ত্রসাধনার সহায়ক।

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

একসময় নালন্দা ও বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে তন্ত্রশাস্ত্র পড়ানো হতো। তন্ত্রের মধ্যে আছে—বীরতন্ত্র, তোড়লতন্ত্র, ফেৎকারিনীতন্ত্র, পিচ্ছিলাতন্ত্র, শক্তিসঙ্গমতন্ত্র, মাতৃকাতন্ত্র, কুলার্ণবতন্ত্র, যোগিনীতন্ত্র, তারারহস্যতন্ত্র, কালীকুলসর্বস্য-তন্ত্র, সম্মোহনতন্ত্র, গৌতমীয়তন্ত্র, মহানির্বাণতন্ত্র, শাম্ভবীতন্ত্র প্রভৃতি। বহুবিধ মুদ্রাসমেত দেবীর পূজার নানান পদ্ধতি নিয়ে এইসব তন্ত্রে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যার লক্ষ্য হলো—আদ্যাশক্তি মহামায়াকে প্রত্যক্ষ দর্শন এবং তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করা। উল্লেখ্য যে, তন্ত্রশাস্ত্রের সঠিক সংখ্যা নিয়ে অদ্যাবধি পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে।

বহুবিধ পুরাণ থেকে জানা যায় যে, দেবীকে বহুভাবে প্রাচীনকাল থেকে বন্দনা করা হচ্ছে। বৃহন্নারদীয় পুরাণে দেবীকে 'বিশ্বপ্রসবিণী' বলা হয়েছে। সেখানে আছে—

"উমেতি কেচিদাহুস্তাং শক্তিং লক্ষ্মীং তথাপরে।
ভারতীত্যপরে চৈনাং গিরিজেত্যম্বিকেতি চ।।
দুর্গেতি ভদ্রকালী চণ্ডী মাহেশ্বরীতি চ।
কৌমারী বৈষ্ণবী চেতি বারাহীতি তথাপরে।।"

—সেই দেবীকে কেউ শক্তি, কেউ উমা, কেউবা লক্ষ্মী বলেন। ভারতী, গিরিজা, অম্বিকা, দুর্গা, ভদ্রকালী, চণ্ডী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী প্রভৃতি নামেও তিনি অভিহিতা।

শিবের শক্তিরূপে দেবীর প্রকাশকে দুইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমত, তিনি শান্ত ও মমতাময়ী। দ্বিতীয়ত, তিনি চঞ্চলা ও উগ্রস্বভাবসম্পন্না। বিভিন্ন গুণ, কর্ম, স্থান ও কালের জন্য তিনি বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়েছেন। যেমন—তাঁর শান্তপ্রকৃতির জন্য তিনি 'উমা', 'গৌরী', 'হৈমবতী' ও 'ভবানী' নামে খ্যাত হয়েছেন। তেমনিভাবে দুর্জনকে শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি যে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছেন, তাতে তিনি 'উগ্রচণ্ডা', 'উগ্রচণ্ডী', 'কালী', 'ভৈরবী' ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েছেন।

চণ্ডীতে তিনি 'দুর্গা', 'দশভুজা', 'মুক্তকেশী', 'সিংহবাহিনী' ইত্যাদি নানা নামে পরিচিত হয়েছেন। আবার তিনি শিবগেহিনীরূপে তিনি 'ভগবতী দেবী', 'শিবা', 'ঈশানী', 'সর্বাণী', 'ত্র্যম্বকী' ইত্যাদি নামে সম্বোধিত হয়েছেন। দেবীর জন্ম, কর্ম ও গুণের জন্য তিনি 'অদ্রিজা', 'গিরিজা', 'কন্যাকুমারী', 'সতী', 'আর্যা', 'জয়া', 'বিজয়া', 'ভ্রামরী', 'কর্ণমোতি', 'শিবদূতী', 'দক্ষিণা', 'সর্বমঙ্গলা', 'সিংহরথী' ইত্যাদি অসংখ্য নামে ভূষিত হয়েছেন। কঠোর তপস্যা করেছেন বলে তিনি 'অপর্ণা', 'কাত্যায়নী' ইত্যাদি নাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ভূত ও প্রেতের হিতাকাঙ্ক্ষী, তাই তাঁর নাম হয়েছিল 'ভূতনায়িকা', 'গণনায়িকা' ইত্যাদি। মহাশক্তির সৃষ্টিকারিণী রূপে তিনি 'মহাকালী'। কোন কোন তান্ত্রিকের মতে তিনি 'পঞ্চাননা', 'পঞ্চদশলোচনা' ইত্যাদি। অতীব রৌদ্রমূর্তি এই মহাকালী বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা-ধারিণী।

পুরাণের মতে দেবী সর্বশক্তিময়ী। তিনি প্রকৃতির সমস্ত প্রাণীর শক্তিরূপে বিরাজ করছেন। তিনি ব্রহ্মময়ী, তবু ভক্তদের কাছে তিনি সাকাররূপে ধরা দিয়ে থাকেন।

বর্তমানে বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ, কালিকাপুরাণ, দেবী-পুরাণ—এই তিনটি গ্রন্থে উল্লিখিত দেবীর পূজা-পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। সমস্ত পুরাণেই দেবীর পূজার বিধি, মাহাত্ম্য ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পুরাণ বলতে আমরা মহাপুরাণ ও উপপুরাণকে গ্রহণ করে থাকি। তবে পুরাণের সঠিক সংখ্যা নিয়ে শাস্ত্রকারদের মধ্যে মতভেদ আছে।

বৈষ্ণব যুগে দেবী-আরাধনা

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক যুগে প্রায় সব জমিদার এবং স্থানীয় রাজার বাড়িতে একটি করে 'চণ্ডীমণ্ডপ' বা 'দুর্গামণ্ডপ' দেখা যেত। পরবর্তী সময়ে (ব্রিটিশ ভারতে) পূর্ব-ভারতের প্রায় সমস্ত চা-বাগানগুলিতে 'দুর্গামণ্ডপ' (মতান্তরে নাচঘর) তৈরি হয়েছিল, যেখানে দেবী দুর্গার সাড়ম্বরে পূজাযজ্ঞ হতো। বৈষ্ণবাচার্য নিত্যানন্দ খড়দহে নিজের বাড়িতে মায়ের পূজা করতেন। সেই যুগের কবি চণ্ডীদাস দেবী বাসুলির অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। বিখ্যাত পণ্ডিত রঘুনন্দন (১৫০০-১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দ) 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' নামক একখানা মৌলিক গ্রন্থ ঐ সময়ে প্রণয়ন করেন। অপর বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' ১৪৭৯ খ্রীস্টাব্দে স্বহস্তে লিখে প্রকাশ করেন। বহু বৈষ্ণব সাধকের মতে, শ্রীরাধা দুর্গারই এক নবরূপ (হ্লাদিনী শক্তি)।

শাক্ত সম্প্রদায়ে দেবীপূজা

একসময়ে ভারতে শাক্ত সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল। শক্তিসাধকদের বলা হয় 'শাক্ত'। শ্মশানভূমিকে কেন্দ্র করে বা স্বগৃহে শাস্ত্রোক্ত আসনকে কেন্দ্র করে সাধক সাধনায় ব্রতী হতেন। সিদ্ধিলাভ করে তাঁরা মাতৃ-আজ্ঞায় জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করতেন। যেমন ভৈরবী ব্রাহ্মণীর উপদেশমত বিধিপূর্বক মাতৃসাধনায় সিদ্ধিলাভ করে শ্রীরামকৃষ্ণদেব জগতে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি ছাড়া ছিলেন সাধক কমলাকান্ত, বামাক্ষ্যাপা, রামপ্রসাদ, সর্বানন্দ ঠাকুর প্রমুখ স্বনামধন্য শাক্ত সম্প্রদায়ের সাধক। তাঁরা প্রথমে পশু ও বীরভাবে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। পরে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

ভারতের শক্তিসাধনা বহু প্রাচীন। ৫১টি শক্তিপীঠ ছাড়াও ভারতে আরো বহু জানা-অজানা শক্তিপীঠ আছে। সেখানে বিধি অনুযায়ী মাতৃজ্ঞানে দেবীপূজা হয়। তারাপীঠ,

বর্ধমানের চান্নাগ্রাম, নাটোর (বাংলাদেশ), মেহার, হালিশহর, দক্ষিণেশ্বর ইত্যাদি শক্তি আরাধনার জন্য বিখ্যাত। আজও সেখানে শাক্তদের সঙ্কীর্তনে মুখরিত হয় মন্দিরপ্রাঙ্গণ।

দেবীসাধনার ৫১টি পীঠস্থান নিয়ে মতভেদ আছে। যেমন—জ্ঞানার্ণবতন্ত্রের মতে ৫০টি, কুব্জিকাতন্ত্রের মতে ৪২টি এবং তন্ত্রসার গ্রন্থের মতে ৪টি (জলন্ধর, উজ্জয়িনী, পূর্ণগিরি এবং কামরূপ)। আবার পুরাণের ১৮শ অধ্যায়ে ৭টি পীঠস্থানের উল্লেখ আছে। ৫১টি পীঠস্থানের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে কালিকাপুরাণ, চূড়ামণিতন্ত্র, শিবচরিত ইত্যাদি গ্রন্থে। ২৬টি উপপীঠস্থানের বিষয়েও নানান মতভেদ আছে। অনেক ভক্ত উপপীঠস্থানের কয়েকটি সিদ্ধস্থান হিসাবে মনে করলেও তার ঐতিহাসিক সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়নি এযাবৎ।

বহু প্রাচীন কাল থেকে জলদস্যু বা জঙ্গলদস্যু স্বীয় কার্যে যাওয়ার আগে কালীপূজা করে বের হতো। ক্রমশ সেসব মন্দিরগুলো 'ডাকাতে কালীবাড়ী' নামে আখ্যায়িত হয়। লোকচক্ষুর আড়ালে এইজাতীয় মন্দিরকে কেন্দ্র করে একসময়ে বহু মানুষ শক্তিসাধনা করেছেন।

একসময়ে শাক্ত জমিদার বা রাজারা দেবীমন্দিরের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আজও বহু প্রাচীন শক্তিমন্দিরে বহু রাজ্য সরকার এবং সমাজস্থ ধার্মিক ও গুণিজন (বংশপরম্পরায়) দেবালয়-সংস্কার, পূজা ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ে নিয়মিত সাহায্য করে থাকেন। শক্তিসাধনার ফলস্বরূপ শহরে, গ্রামে, বহু জনপদে, কালীবাড়ি বা কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শাক্তযুগের বৈশিষ্ট্য ছিল—আদ্যাশক্তি মহামায়াকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করে সিদ্ধিলাভ অর্থাৎ মুক্তিলাভ।

যুগপ্রয়োজনে দেবীর শরণ

বৈদিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত দেবীপূজার ধারা সর্বত্র চলছে। একদিনের জন্যও বাদ পড়েনি। ভবিষ্যতেও চলবে। মুমুক্ষু ভক্তদের দেবীর শরণে মুক্তি—এমনই প্রগাঢ় বিশ্বাস। দেবী কোন্ রূপে কোন্ সময়ে ভক্তদের দেখা দেবেন, তা তিনিই জানেন।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন বলেছেন—তিনি যুগে যুগে প্রয়োজন হলেই আসবেন, ঠিক তেমনি দেবী দুর্গাও বলেছেন—তিনি প্রয়োজনে দেবতা ও ভক্তদের রক্ষা করবেন। গীতায় আছে—

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।" (৪।৭)

—যখনি ধর্মের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিশ্চিহ্ন হয়, তখনি মায়া বলে নিজেকে আমি সৃজন করি।

আবার চণ্ডীতে দেবী মহামায়া বলছেন—

"ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যামরিসংক্ষয়ম্।।" (১১।৫৫)

—যখনি দানবগণের উপস্থিতিতে কোনপ্রকার বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি হবে, তখনি আমি দেবশত্রু অসুরদের সমুচিত দণ্ড দেব।

সততং নমামি

উপরি উক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, দেবতা বা দেবী তাঁদের ইচ্ছামত ভক্তসঙ্গে লীলা করেন—লীলা করেন ধর্মকে রক্ষা করবার জন্য। তাঁরাই বিভিন্ন নামে বিভিন্ন সময়ে দেশ ও সমাজকে রক্ষা করে চলেছেন। সেই আদ্যাশক্তি মহাদেবী 'অনন্তা' নামে বিভূষিতা হয়েছেন। যেমন তিনি লক্ষ্মী রূপে বিষ্ণুর ভার্যা, সীতা রূপে রামচন্দ্রের সঙ্গিনী হয়ে এসেছিলেন। তিনি আবার রাধা, মাতা মেরী, বিষ্ণুপ্রিয়া রূপে মানবদেহ ধারণ করে সস্নেহে শিক্ষা দিয়ে গেলেন কিভাবে কৈবল্য লাভ করা যায়। তেমনি এই যুগে সারদা রূপে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরনী হয়ে এসেছেন।

আদ্যাশক্তি মহাদেবী মাতৃরূপে সর্বত্র বিরাজিতা। তিনি তাই বিশ্বজননী। তিনি ব্রহ্মাণী রূপে নিয়ত সৃষ্টি করে চলেছেন, নারায়ণী রূপে জীবজগৎকে লালন-পালন করছেন, আর শিবাণী রূপে প্রতিটি প্রাণীর পরিণতি নির্ণয় করছেন। দেবীর এই সুমহান রূপকে অর্থাৎ তাঁর চরম সত্তাকে উপলব্ধি করবার জন্য আমরা মায়ের কাছেই প্রার্থনা করি—

"প্রসীদ মাতর্বিনয়েন যাচে নিত্যং ভব স্নেহবতী সুতেষু।
প্রেমৈকবিন্দুং চিরদগ্ধচিত্তে বিষিঞ্চ চিত্তং কুরু নঃ সুশান্তম্।।"

—মা! সবিনয়ে প্রার্থনা করছি, তুমি প্রসন্না হও। সন্তানগণের প্রতি নিত্য স্নেহশীলা হও। চিরদগ্ধ চিত্তে একবিন্দু স্নেহবর্ষণ করে আমাদের শান্ত কর। আমাদের মঙ্গল কর। ❑

আকর গ্রন্থ

১। শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত
২। মন্ত্রার্থ দীপিকা—স্বামী ওঁকারেশ্বরানন্দ
৩। নিত্য পূজা-পদ্ধতি—জগন্মোহন তর্কালঙ্কার
৪। পৌরাণিক অভিধান—সুধীরচন্দ্র সরকার

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

মহিমাচরণের অহঙ্কারে আঘাত হেনেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রণবেশ চক্রবর্তী



[illegible]র্বসাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পর অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ লোকালয় ছেড়ে কোন গিরিগুহায় গিয়ে আশ্রয়গ্রহণ করেননি, আশ্রয়গ্রহণ করেননি কোন শ্মশানের রহস্যময় পরিমণ্ডলে, বরং ভক্তজনের টানে ভগবান ফিরে এসেছিলেন সংসারজীবনের মূল কেন্দ্রে। তিনি মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিলেনঃ "তোরা কে কোথায় আছিস, আয় আয়।" পণ্ডিত-মূর্খ, ধনী-দরিদ্র, নামী-অনামী—সকলকেই তিনি ডাক দিয়েছিলেন।

তাঁর সেই প্রাণজাগানিয়া ডাকে সেকালের অনেক আর্ত ও পিপাসার্ত মানুষ ছুটে এসেছিলেন। সমবেত হয়েছিলেন তাঁর আনন্দসভায়। দক্ষিণেশ্বর হয়ে উঠেছিল নবযুগের মানবতীর্থে। সেদিন যাঁরা তাঁর অদৃশ্য আকর্ষণে ছুটে এসেছিলেন তাঁরই পদপ্রান্তে, তাঁদের মধ্যে ছিলেন মহিমাচরণ চক্রবর্তী। বহু বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছিল শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দসভায়—এ যেন অনন্তকালের জলস্রোত এসে মিলিত হয়েছে রামকৃষ্ণ-সাগরে। মহিমাচরণ সেই অনন্ত স্রোতেরই এক বর্ণময় ধারা। করুণাঘন শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় মহিমাচরণ আজও আমাদের জীবনে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত।

অপূর্ব-দর্শন ছিলেন এই মানুষটি। শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দসভায় যখন তিনি গৈরিক বসন পরে একতারা হাতে নিয়ে বসতেন, তখন অনেকেই মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতেন। অবশ্য সবসময় গৈরিক বসন পরতেন না তিনি। খুব সুন্দর কথা বলতে পারতেন, ভাল গান গাইতে পারতেন। ঠাকুরও তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ভালবাসতেন। তাঁর বাক্যচ্ছটায় মুগ্ধ হয়ে অনেকেই তাঁর সামনে অনেক আধ্যাত্মিক প্রশ্ন তুলে ধরতেন। ঠাকুরও অনেক আধ্যাত্মিক প্রশ্ন উত্থাপন করতেন। স্বামী সারদানন্দ তাঁর 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ'-এ লিখেছেনঃ "ঠাকুর তাঁহাকে এক আঁচড়েই চিনিয়া লইয়াছিলেন।" (উদ্বোধন কার্যালয়, ১ম সং, পৃঃ ৩৬৭)

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর এই ভক্তকে চিনেছিলেন প্রথম দর্শনেই। মহিমাচরণ যে পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার বর্জন করতে পারেননি—সেটাও ঠাকুর জানতেন। তাই কোন কোন সময় সমবেত সকলকে দেখিয়ে তিনি মহিমাচরণকে বলতেনঃ "তুমি পণ্ডিত, এদের কিছু উপদেশ দাও।" মন্ত্রসাধনের মাঝে মাঝে মহিমাচরণ অন্যান্য ভক্তের সঙ্গে আলাপ করতেন। আসলে গুরুগিরি করার একটা প্রচ্ছন্ন বাসনা সবসময় তাঁর মধ্যে সক্রিয় ছিল, সক্রিয় ছিল ধর্ম-উপদেষ্টারূপে নিজেকে জাহির করার মানসিকতা।

অথচ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে আসার পর থেকেই তিলে তিলে তাঁর যাবতীয় অহঙ্কার চূর্ণ হতে থাকে, পাণ্ডিত্যের অহমিকা মিলিয়ে গিয়ে তাঁর অন্তরে জেগে উঠতে থাকে ভক্তিভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ-রূপ জ্ঞানসূর্যের উত্তাপে তাঁর অহঙ্কারের বরফ গলে জল হতে থাকে। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার গলে ভক্তিভাবের জল কিন্তু একদিনেই উৎসারিত হয়নি। তার জন্য প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত ক্ষেত্রের। প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত প্রস্তুতির।

কাশীপুর উদ্যানবাটীর কাছেই ছিল মহিমাচরণের বাড়ি। কাশীপুর রোডের ওপর দিয়ে 'গান অ্যাণ্ড শেল ফ্যাক্টরি'র যে রেললাইনটি গিয়েছে, তার পূর্বসীমায় বসাকবাগানে ছিল তাঁর বাগানবাড়ি। শ্রীরামকৃষ্ণ বেশ কয়েকবার এই বাড়িতে এসেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই বাড়িতেই পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। দুঃখের বিষয়, বর্তমানে বাড়িটির কোন অস্তিত্ব নেই।

মহিমাচরণ ছিলেন ছোটখাটো একজন জমিদার। জমিদারির যা আয় হতো, তাতেই তাঁর জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহ হয়ে যেত। মনের আনন্দে বিদ্যাচর্চা নিয়ে দিন কাটাতেন তিনি। বাড়িতেই পণ্ডিত রেখে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন, এতেই পেতেন আত্মতৃপ্তি এবং কিছুটা

আত্মশ্লাঘাও। অক্ষয়কুমার সেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'তে লিখেছেন ঃ

"গণ্যমান্য লোকে করে অতুল সম্মান।
বড়ই বেদান্তবাদী জ্ঞানমার্গে টান।।" (পৃঃ ২৯৯)

সেদিন তিনি নিজের বাড়িতে বসে আপনমনে শাস্ত্রপাঠ ও শাস্ত্রচর্চা করছিলেন। এমন সময় তাঁর বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন অধরলাল সেন। প্রতিভাবান কৃতী ছাত্র অধরলাল ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি যখন মহিমাচরণের বাড়িতে এলেন, তখন মহিমাচরণ গুরু ও শিষ্যের ভূমিকা সম্পর্কে গভীর শাস্ত্রব্যাখ্যায় নিয়োজিত ছিলেন। উচ্চশিক্ষিত অধরলাল ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ সেইসব ব্যাখ্যা শুনে শেষটায় প্রতিবাদ করে নিজের জ্ঞান ও বুদ্ধিমতো বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করলেন। বলা বাহুল্য, পাণ্ডিত্যের অভিমানে জর্জরিত মহিমাচরণও অধরলালের ব্যাখ্যা মেনে নিতে রাজি হলেন না। ফলে দেখা দিল একটা ঘোরতর অচলাবস্থা। শেষপর্যন্ত দুজনেই একমত হয়ে ঠিক করলেন, তাঁরা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যাবেন। তিনি যাঁর মত সমর্থন করবেন, অপরজন সেটাই মেনে নেবেন। তর্কের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে দুজনেই এলেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। ঠাকুর অন্তর্যামী—তিনি সবই জানতেন। তবুও রহস্যময় হাসি ছড়িয়ে দিয়ে দুজনের একসঙ্গে আসার কারণ জানতে চাইলেন। দুজনের কুশল প্রশ্ন করলেন।

মহিমাচরণ তাঁদের বক্তব্য ও সমস্যার কথা সবিস্তারে জানালেন। ঠাকুর হাসিমুখে তাঁদের সব বক্তব্য শুনলেন। তারপর গুরু-শিষ্য সম্পর্কে তাঁদের তিনরকম ব্যাখ্যার ওপর অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষায় চতুর্থ ব্যাখ্যাটি উপস্থাপন করলেন। সেই ব্যাখ্যায় শুধু তাঁরা দুজনেই হতবাক হলেন না, উপস্থিত সকলেই বিস্ময়-বিমুগ্ধ হলেন। পাণ্ডিত্যের অভিমানে গর্বোদ্ধত মহিমাচরণের মাথা তখনি যেন বেশ কিছুটা নুইয়ে পড়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের পদতলে।

প্রায় সাড়ে তিনশ বছরের পথ অতিক্রম করে আমরা যদি ইতিহাসের গতিতে পিছন ফিরে তাকাই, তাহলে অনুরূপ আরেকটি ঘটনার কথা অতি সহজেই স্মরণ করতে পারব। নীলাচলে উপস্থিত হয়েছেন তরুণ সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। জগন্নাথ-মন্দিরে এক বিশেষ পরিস্থিতিতে তাঁর পরিচয় হয়েছিল সেকালের বিখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমের সঙ্গে। বাসুদেবই সাগ্রহে শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে এসেছিলেন স্বগৃহে। কিন্তু এই নবীন সন্ন্যাসীকে দেখে পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে স্ফীত বাসুদেব তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু তর্কের পথ গ্রহণ করলেন না। তিনি সার্বভৌমের কাছে 'ভাগবত' ব্যাখ্যা শুনতে চাইলেন। সার্বভৌম 'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো' ইত্যাদি ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের দশম শ্লোকের তের প্রকার ব্যাখ্যা করলেন। তখন মহাপ্রভু শোনালেন সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাখ্যা এবং দেখালেন নিজের ষড়ভুজ মূর্তি। সার্বভৌম পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার বিসর্জন দিয়ে শ্রীচৈতন্যের স্তব করতে শুরু করলেন। এ এক অপূর্ব আত্মনিবেদন।

ঠিক একইভাবে সেদিন মহিমাচরণও আত্মনিবেদন করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ-সমীপে।

।।২।।

মহিমাচরণের বেশ অহঙ্কার ছিল নিজের সম্পর্কে। তাঁকে যদি কেউ দীক্ষা সম্পর্কে বা তাঁর গুরুর সম্পর্কে প্রশ্ন করতেন, তিনি বলতেন ঃ "আমার গুরুর নাম আগমাচার্য ডমরুবল্লভ।" 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' থেকে জানতে পারি, কখনো কখনো তিনি বলতেন, ঠাকুরের মতো তিনিও পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত তোতাপুরীর কাছেই দীক্ষাগ্রহণ করেছেন। তিনি বলতেন, পশ্চিমে তীর্থপর্যটনকালে একস্থানে তাঁর দীক্ষা হয়েছিল। তোতাপুরীই নাকি শ্রীরামকৃষ্ণকে 'ভক্তি অবলম্বন' করে থাকতে বলেছিলেন এবং তাঁকে 'জ্ঞানমার্গের সাধক' হয়ে থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন। (পৃঃ ৩৬৮)

এরকম অহংবোধে আচ্ছন্ন কথাবার্তা ছিল তাঁর। তিনি ঠাকুরের অকৃপণ স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছিলেন সত্য, কিন্তু সেই শুদ্ধসত্ত্ব প্রভাব তিনি নিজের জীবনে প্রবাহিত করতে সমর্থ হননি। কারণ, যশাকাঙ্ক্ষা তাঁকে সম্পূর্ণ অহংবোধ মুক্ত হতে দেয়নি।

'লীলাপ্রসঙ্গ' অনুসরণ করেই আমরা জানতে পারি, নামযশের প্রত্যাশা ছিল তাঁর প্রবল। সদাই নিজেকে জাহির করতে চাইতেন। লীলাপ্রসঙ্গকার লিখছেন ঃ "নানা সদ্‌গুণভূষিত হইলেও চক্রবর্তী মহাশয় লোকমান্যের জন্য নিরন্তর লালায়িত ছিলেন। বোধহয় মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে যদি লোকমান্য পাওয়া যাইত, তাহা হইলে তাহা করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কিসে লোকে তাঁহাকে ধনী, বিদ্বান, বুদ্ধিমান, ধার্মিক, দানশীল ইত্যাদি যাবতীয় সদ্‌গুণশালী বলিবেন—এই ভাবনা তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য নিয়মিত করিয়াও সময়ে সময়ে তাঁহাকে লোকের নিকট

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিত। চক্রবর্তী মহাশয় কোন সময়ে এক অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিয়া তাহার নাম রাখিয়াছিলেন 'প্রাচ্য-আর্য-শিক্ষাকাণ্ড-পরিষৎ', তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন 'মৃগাঙ্কমৌলী পূততুণ্ডী...'।" তিনি মনে করতেন, তাঁর মতো একজন স্বনামধন্য পণ্ডিতের পক্ষে কোন সাধারণ নাম রাখা সম্ভব নয়। তাই শুধু নিজের পুত্রের নাম নয়, তাঁর বাড়িতে একটা হরিণ ছিল, তিনি তার নাম রেখেছিলেন 'কপিঞ্জল'।

বিশেষ পালা-পার্বণে দেখা যেত, দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটীতলে ব্যাঘ্রচর্ম বিছিয়ে গেরুয়া বসন পরে তিনি বসে আছেন। সেইসময় তিনি রুদ্রাক্ষ ধারণ করতেন এবং একতারা হাতে নিয়ে সাধনায় বসতেন। বাড়ি ফেরার সময় কিন্তু ঐ ব্যাঘ্রচর্মটি সঙ্গে নিয়ে যেতেন না, ওটি ঠাকুরের ঘরে ঝুলিয়ে রেখে যেতেন। কারণ, লোকে ওটা দেখে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করবে, ওটি কার? তখন ঠাকুর তাঁর নাম করলে শ্রোতারা ধারণা করবেন, মহিমাচরণ একজন মস্তবড় সাধক।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। গঙ্গার পশ্চিমপাড়ে ভদ্রকালী গ্রামে একবার ঠাকুর এসেছেন সেযুগের নামকরা পাঁচালী-গায়ক শিবু আচার্যের আমন্ত্রণে। সঙ্গে মহিমাচরণও আছেন। চারদিকে রটে গেছে—ঠাকুর এসেছেন, তাই পুণ্যার্থী ও দর্শনার্থীর ভিড়ও হয়েছে খুব। ভিড়ের তুলনায় বাড়িটা খুবই ছোট। তাই তিলধারণের স্থান নেই। সেই উৎসবে একজন তার্কিক পণ্ডিতও এসেছেন—ব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী। তাঁর মনোবাসনা, শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে একটু শাস্ত্র আলোচনা করবেন। ঠাকুর অন্তর্যামী। তিনি একবার দেখেই সামাধ্যায়ীর মনোভাব বুঝে নিয়েছেন। সামনেই বসেছিলেন মহিমাচরণ। ঠাকুর তাঁকেই প্রথমে আলোচনা শুরু করতে বললেন। মহিমাচরণ সম্ভবত এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। তাই বাক্যব্যয় না করে ঠাকুরের আদেশ পালন করতে এগিয়ে গেলেন।

তর্ক শুরু হলো দ্বৈত-অদ্বৈত ভাব নিয়ে। ঈশ্বর এক না বহু—এই হলো বিষয়। সামাধ্যায়ী প্রবল যুক্তিজালে দ্বৈতভাবকে উড়িয়ে দিলেন। পরে উঠল সেব্য-সেবকের ভাব ও ভক্তিভাবের কথা। সামাধ্যায়ী ঝড়ের গতিতে সেসবও উড়িয়ে দিতে থাকেন। এসব তত্ত্ব তিনি গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। তাঁর ক্ষুরধার যুক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধির সামনে মহিমাচরণ একসময় অসহায় হয়ে পড়লেন। সামাধ্যায়ীর গতিকে রুদ্ধ করবে কে? মহিমাচরণ নিজের বক্তব্যকে কিছুতেই প্রতিষ্ঠা করতে না পেরে একেবারে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লেন।

এতক্ষণ ঠাকুর সবকিছুই লক্ষ্য করছিলেন। এবার তিনি তর্কের আসরে এলেন মহিমাচরণের পক্ষ নিয়ে। কিন্তু এলে কি হবে? ঠাকুর যা বলেন, সামাধ্যায়ী যুক্তির খড়্গ দিয়ে সেটাকেই কেটে দেন। ঠাকুর বুঝলেন, এ একজন পাকা তার্কিক, একটা কিছু না করলেই নয়। তিনি ভাইপো রামলালকে নিয়ে একটু বাইরে গেলেন। একান্তে মা ভবতারিণীকে বললেন ঃ "মা, ব্যাটা বেজায় তার্কিক।" মাতৃস্মরণেই তাঁর ভাব হলো, হলেন ভাবাবিষ্ট। সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন তর্কের আসরে, পণ্ডিতের কাছে গিয়ে তাঁর হাত ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন ঃ "এতক্ষণ কি বলছিলে—আবার বল।"

ঠাকুরের দিব্যস্পর্শে সামাধ্যায়ী যেন বাক্যহারা হয়ে গেলেন! হয়ে গেলেন স্তম্ভিত, বোধবুদ্ধিহীন। এ এক অদ্ভুত অবস্থা! তাঁর মুখ দিয়ে কোন কথাই সরল না। ঠাকুর বারবার তাঁকে প্রশ্ন করলেন, উত্তরে তিনি আমতা আমতা করে শুধু বললেন ঃ "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি যা বলেছেন, সবই ঠিক।" সামাধ্যায়ী তখন যেন আর এজগতে নেই—ঠাকুরের দিব্যস্পর্শে তিনি তখন বাহ্যজ্ঞানহারা।

এভাবেই শুষ্ক পাণ্ডিত্য হলো পর্যুদস্ত, পাণ্ডিত্যের দর্প হলো চূর্ণ। সমবেত সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো প্রত্যক্ষ করল এই ঐশীলীলা। মহিমাচরণও হলেন আত্মস্থ। নিজের অহমিকা অনেকাংশে হলো ম্লান।

লক্ষ্য করার বিষয়, মহিমাচরণের এই অহংবোধ ও পাণ্ডিত্যের মিথ্যা গরিমার কথা জেনেও শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর গৃহে পদার্পণ করেছেন, তাঁকে কৃপা করেছেন। ধীরে ধীরে সেই মানুষটির জীবনকে নিজের মতো করে গড়ে নিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

।।৩।।

স্বামী সারদানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এ লিখেছেন ঃ "কলিকাতাবাসী ভক্তসকলের ঠাকুরের নিকট যাইবার বহু বৎসর পূর্ব হইতে মহিমাচরণ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন।" (পৃঃ ৩৪৭) কিন্তু মহিমাচরণ চক্রবর্তী প্রথম কবে শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য-সন্নিধানে আসেন, তা জানা যায়নি। সম্ভবত সেইসময় 'কথামৃত'-এর মতো কোন ইতিবৃত্ত লেখারও কোন উদ্যোগ ছিল না। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর

উপক্রমণিকায় বলা হয়েছেঃ "শ্রীযুক্ত কেশব সেন যখন বেলঘরের বাগানে ভক্তসঙ্গে ঈশ্বরের ধ্যানচিন্তা করেন, তখন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভাগিনেয় হৃদয়ের সঙ্গে তাকে দেখতে যান; ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে। বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, 'নেপালের কাপ্তেন' এইসময় (ঠাকুরের কাছে) আসতে থাকেন। সিঁথির গোপাল (বুড়ো গোপাল) ও মহেন্দ্র কবিরাজ, কৃষ্ণনগরের কিশোরী ও মহিমাচরণ এইসময় ঠাকুরকে দর্শন করেছিলেন।" (পৃঃ ৫)

সেই শুরু। তারপর অন্তত পঁচিশবার আমরা 'কথামৃত'-এ তাঁর উপস্থিতি লক্ষ্য করি। 'লীলাপ্রসঙ্গ' থেকে ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি, নরেন্দ্রনাথ দত্ত ও অন্যান্য ত্যাগী সন্তানরা ঠাকুরের কাছে আসার অনেক আগেই মহিমাচরণ সেখানে এসেছিলেন। প্রসঙ্গত, নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎ ১৮৮১ সালে সিমলাপাড়ায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে।

এখানে স্মরণে রাখা প্রয়োজন, 'কথামৃত'-রচয়িতা শ্রীম দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আসেন ১৮৮২ সালের মার্চ মাসে। তারপর থেকে তিনি ডায়েরি লিখতে শুরু করেন। ফলে ১৮৮২ সালের মার্চ মাস ও তার পরবর্তী সময়ের দিনলিপি তিনি লিখে রেখেছেন। তার আগের কোন বিবরণ আমরা তাঁর লেখায় প্রত্যক্ষভাবে পাই না। সেইজন্য ১৮৭৫ থেকে ১৮৮২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত মহিমাচরণ কতবার ঠাকুরের কাছে এসেছেন, তার কোন তথ্য বা বর্ণনা আমরা পাইনি। তাছাড়া শ্রীম কেবলমাত্র ছুটির দিনে দক্ষিণেশ্বরে আসতেন। সেইসব দিনের বিবরণই তিনি লিখেছেন। তার বাইরে অন্যান্য দিনের ঘটনা 'কথামৃত'-এ নেই। সেইজন্য 'কথামৃত'-এ বর্ণিত ১৮৮২ থেকে ১৮৮৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে আমরা 'কথামৃত'-এ দুই-পাঁচ বার মহিমাচরণের সাক্ষাৎ পাই। তার বাইরে তিনি নিশ্চয়ই এসেছিলেন, তবে সে-তথ্য আমাদের জানা নেই।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এ আমরা প্রথম মহিমাচরণের সাক্ষাৎ পাই ১৮৮৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি। সেদিনটা ছিল শনিবার। বিকাল ৩টা। স্থান—দক্ষিণেশ্বর মন্দির। সেইসময় পড়ে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের বাঁ হাতের হাড় সরে গিয়েছিল। খুবই আঘাত পেয়েছিলেন তিনি। ঠাকুর নিজের ঘরে খাটে বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে বসে আছেন ভক্তরা। সেই ভক্তদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মহিমাচরণ।

মহিমাচরণ নিজের তীর্থদর্শনের গল্প বলছিলেন। ঠাকুর গভীর আগ্রহ নিয়ে সেই গল্প শুনছিলেন। মহিমাচরণ বললেন, নর্মদার তীরে তিনি এমন একজন সাধু দেখেছেন, যিনি অন্তরে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করছেন, আর বাইরে তার শরীরে পুলক হচ্ছে। আবার তিনি এমন প্রণব আর গায়ত্রী উচ্চারণ করেন যে, যারা তাঁর সামনে বসে থাকে, তাদের দেহে-মনে রোমাঞ্চ হয়, পুলক হয়।

এরকম একটার পর একটা প্রসঙ্গ চলতে থাকে আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণের আনন্দসভায়। একসময় শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমাচরণ ও অন্যান্য ভক্তদের শেখান, কিভাবে মাকে ডাকতে হয়। ঠাকুর বললেনঃ "আমি মা বলে এইরূপে ডাকতাম—'মা আনন্দময়ী—দেখা দিতে যে হবে!'." তিনি ব্যাকুলভাবে মা আনন্দময়ীকে ডাকছেন, আর তা শুনতে শুনতে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন মহিমাচরণ। ভগবানের পদতলে বসে ভক্তের এই অশ্রুবিসর্জন সমগ্র পরিবেশকে এক দিব্য আনন্দে পূর্ণ করে তুলেছিল। মহিমাচরণ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গেই ভাসতে থাকেন আনন্দসাগরে।

'কথামৃত'-এ মহিমাচরণ চক্রবর্তীর সর্বশেষ উল্লেখ পাই কাশীপুর উদ্যানবাটীতে। সেদিনটা ছিল ১৮৮৬ সালের ১১ মার্চ, বৃহস্পতিবার। শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ। শুয়ে আছেন। ভক্তরা কাছে দাঁড়িয়ে। নরেন্দ্রনাথ (পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ), শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ), মাস্টার (কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) এবং আরো অনেকে সেখানে উপস্থিত। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ অসুস্থ শরীর নিয়েই ভক্তদের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে বললেনঃ "সেদিন মহিম চক্রবর্তীর বাড়িতে আমরা গিয়েছিলাম।" মহিমাচরণের নাম শুনে ঠাকুরের খুব আনন্দ হলো। তিনি প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে জানতে চাইলেনঃ "তারপর?" নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে ক্ষোভ। বললেনঃ "ওর মতো এমন শুষ্কজ্ঞানী দেখিনি।" একথাতেও রহস্যময় ঠাকুরের আনন্দ যেন ঝরে পড়ল। হাসতে হাসতে আবার জানতে চাইলেনঃ "কেন, কি হয়েছিল?" নরেন্দ্রনাথ জানালেন, তিনি তাঁদের গান গাইতে বলায় গঙ্গাধর (স্বামী অখণ্ডানন্দ) গান ধরল—

"শ্যামনামে প্রাণ পেয়ে ইতিউতি চায়,
সম্মুখে তমাল বৃক্ষ দেখিবারে পায়।"

এই গান শুনে মহিমাচরণ বললেনঃ "ওসব গান কেন? প্রেম-ট্রেম ভাল লাগে না। তাছাড়া স্ত্রী-পুত্র নিয়ে থাকি, এসব গান এখানে কেন?"

নরেন্দ্রনাথের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনে শ্রীরামকৃষ্ণের

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। কথামৃতকার মাস্টারমশাইকে বললেনঃ "ভয় দেখেছ!" অর্থাৎ রাধার ব্যাকুলতা ও প্রেমভাব মহিমাচরণের পছন্দ হয়নি। তিনি পাণ্ডিত্যের অভিমানী, ওসব মধুর ভাব—'প্রেম-ট্রেম' তাঁর ভাল লাগে না।

এই একটি ঘটনাতেই আমরা মহিমাচরণ চক্রবর্তীর মানসিক গঠনের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই।

।।৪।।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি'তে আমরা বেশ কয়েকবার মহিমাচরণের উল্লেখ পাই। আগেই বলা হয়েছে, মহিমাচরণের বাড়িতেই শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন অক্ষয়কুমার সেন। সেদিনটির এক চমৎকার চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন তাঁর 'পুঁথি'তে।

নির্দিষ্ট দিনে ঠাকুরকে গাড়িতে মহিমাচরণের বাড়িতে নিয়ে এলেন পরম গৃহিভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার। সঙ্গে অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে ছিলেন ভাই ধীরেন্দ্র ও পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেন। মহিমাচরণের বাড়ি-ঘর কেমন ছিল, তার একটা সুন্দর বর্ণনা আমরা 'পুঁথি'তে পাই। পুঁথিকার লিখেছেনঃ "উদ্যান-ভবন বাড়ি, গাছপাতা রকমারি, চারিদিকে তাহার ভিতর।" (পৃঃ ৪০৩)

বাড়িতে ঢুকেই সাজানো উদ্যান। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে পথ। শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়ি থেকে নেমে সেই পথ ধরে এলেন বাড়ির মধ্যে। প্রথমেই বৈঠকখানা। সেখানে সাদা ধবধবে ফরাস পাতা। আগে থেকেই বহু ভক্ত সেখানে বসে আছেন। ভক্তদের ঠিক মাঝখানে পাতা হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের আসন। ভক্তদের মাঝখানে গিয়ে তিনি আসন গ্রহণ করলেন। তাঁর দিব্য উপস্থিতিতে গোটা পরিবেশটাই যেন আলোকিত হয়ে উঠল। শুরু হলো ঈশ্বরীয় কথা। মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সকলে শুনছেন। তারপর বেজে উঠল খোল-করতাল। বাইরের প্রাঙ্গণে সঙ্কীর্তন শুরু হলো। কীর্তন যখন জমে উঠল, সকলে যখন মাতোয়ারা—ঠিক তখনি সেই কীর্তনের আসরে শ্রীরামকৃষ্ণ যোগ দিলেন। তাঁর অপরূপ কণ্ঠ, স্বর্গীয় দেহসুষমা সমগ্র পরিমণ্ডলকে এক দিব্যজ্যোতিতে প্লাবিত করে দিল। নৃত্যে ও গানে তিনি তখন বাহ্যজ্ঞানহারা।

সমবেত ভক্তজন মুগ্ধ নয়নে দেখলেন ভগবানের শ্রীঅঙ্গে মহাশক্তির খেলা। এমন দৃশ্য কি সহজে দেখা যায়? একসময় তিনি ফিরে এলেন নিজের আসনে। নৃত্য-গীতের পর এবার ভক্তজনের উদ্দেশে শুরু হলো সহজ কথায় নানা উপদেশ। অতি সহজ সরল কথা, কিন্তু গভীর অর্থ ও ভাবে পূর্ণ। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সকলে তাকিয়ে আছেন ঠাকুরের দিকে। এত যে নাচলেন, গাইলেন, এত যে কথা বলছেন—তবু যেন তাঁর ক্লান্তি নেই, ক্ষান্তি নেই। সকলের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়াতেই যেন তাঁর সব আনন্দ। তিনি যেখানে, সেখানেই এভাবে জমে ওঠে আনন্দের হাট।

তারপর একসময় শেষ হলো এই স্বর্গীয় সভা। এরপর প্রসাদ বিতরণ। মহিমাচরণ বিরাট আয়োজন করেছেন। 'পুঁথি'তে পাই তার বর্ণনা—

"ফল-মূল আদি করি লুচি তরকারি।
অগণন ব্যঞ্জন সুতার রকমারি।।
তাজা তাজা ভাজি কত নাহি ধরে পাতে।
দেড়গণ্ডা রকমের অম্বল পশ্চাতে।।
নানা জাতি মিষ্ট দধি ক্ষীর কটরায়।
যাঁর যাহা রুচি প্রিয় তাই দেন তাঁয়।।
সৌরভ শীতল জল অতি তৃপ্তকর।
কতই মশলা ছাঁচি পানের ভিতর।।" (পৃঃ ৪০৫)

বাড়িটির আয়তনের তুলনায় ভিড় হয়েছিল বেশি। তাই অনেকে প্রসাদ গ্রহণ করেই চলে গেলেন। অনেকে আবার ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করতে থাকেন। তাঁদের দেখায় যেন ক্লান্তি নেই। আর মহিমাচরণ? ভগবানের পায়ে আত্মসমর্পণের জন্য তিনি তো তাঁর সব অহঙ্কার বিসর্জন দিয়েই বসে আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে মধুর কণ্ঠে গান ধরলেনঃ "আমি ভক্তি দিতে কাতর হই।/ আমি মুক্তি দিতে কাতর নই রে।।" তিনি কি মহিমাচরণকে লক্ষ্য করেই এই গান গেয়েছিলেন? আত্মগরিমার বর্ম দিয়ে ঘিরে রাখা মহিমাচরণের হৃদয়ে ভক্তিভাবের যে ফল্গুধারা প্রবাহিত, তারই উৎসমুখটা যেন ঐ গানের সুরে সুরে খুলে যেতে বসেছিল। মুক্তিই তো তিনি চান, তাই পাণ্ডিত্যের সব অলঙ্কার একে একে খুলে দিয়ে তিনি তো বৈরাগীর হৃদয় নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের করুণা-ভিখারি।

সারাদিনের আনন্দযজ্ঞ একসময় শেষ হয়। এবার শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমাচরণের গৃহ থেকে বিদায় নেবেন। কিন্তু মহিমাচরণ তাঁকে বিদায় দিতে চান না। তাই তাঁর দুচোখের কোণে পরমপ্রাপ্তির আনন্দময় অশ্রু চিকচিক করতে থাকে। ভগবানের করুণাসাগরে স্নান করে মহিমাচরণ চক্রবর্তী লাভ করলেন এক নতুন জীবন। ❑

বীরভূমের লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি পট

গীতিকণ্ঠ মজুমদার

বিড় 'পড়ম্' শব্দ থেকে এসেছে 'পট' শব্দটি। এই শব্দের অর্থ 'বস্ত্র'। পটচিত্র নিয়ে যাঁরা গান করেন, তাঁদের বলা হয় 'পটুয়া'। ভারতবর্ষের বুকে পটচিত্রের প্রচলন বহু পূর্ব থেকেই হয়ে আসছে। বর্তমানে পট প্রায় লুপ্ত।

বাণভট্টের 'হর্ষচরিত', বিশাখা দত্তের 'মুদ্রারাক্ষস', কালিদাসের 'শকুন্তলা', ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত' গ্রন্থে পটের উল্লেখ আছে। পটের বিষয়—রাম ও কৃষ্ণের লীলা ইত্যাদি।

পটচিত্রকে জনপ্রিয় করার জন্য যে-ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন বীরভূমের তৎকালীন কালেক্টর গুরুসদয় দত্ত (১৯৩১-১৯৩৩)। তিনি পট তথা গ্রামীণ শিল্প নিয়ে গবেষণার সুবিধার্থে ১৯৩১ সালে 'বঙ্গীয় পল্লীসমাজ রক্ষা সমিতি' স্থাপন করেন। পটুয়াদের অঙ্কিত পটচিত্র নিয়ে ১৯৩২ সালের মার্চ মাসে কলকাতায় 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল ভবন'-এ তিনি এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। তাঁর এই নিরলস প্রয়াস আজ ইতিহাস। তিনি ঐ প্রদর্শনী করেই ক্ষান্ত হননি, ঐ প্রদর্শনীতে তিনি আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে এসেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশচন্দ্র সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিদের। গুরুসদয় দত্ত উপলব্ধি করেছিলেন, পট ও পটুয়াসঙ্গীত ক্রমশ বিলুপ্তির দিকে। এর কারণ উল্লেখ করে বলেছিলেন : "আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশই এর কারণ।" যান্ত্রিক সভ্যতা এবং শহুরে শিক্ষাবিস্তারের জন্য পটের চাহিদা ও গুণগ্রাহিতা বিলুপ্ত হচ্ছে। এছাড়া আরেকটি কারণ হলো—পটচিত্র মানুষকে ঠিকমতো পারিশ্রমিক এনে দিতে পারছে না। তাই পটুয়ারা অন্য উপায়ে বেশি রোজগারের প্রতি বেশি নজর দিয়েছে।

পটে বাঙালীর নিজস্ব জীবনযাত্রাপ্রণালী প্রতিফলিত হয়েছে; প্রতিফলিত হয়েছে তার কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারা। নৃতত্ত্বের দিক দিয়েও দেখা যায়, পট হলো অসাম্প্রদায়িক। তবে পট মূলত বীরভূমের সম্পদ। রাঢ় অঞ্চলের পট বা পটুয়াসঙ্গীত লোকসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অবদান। চিত্র এবং সঙ্গীতের সমন্বয়ে পট বিরল গুরুত্বের অধিকারী। দুঃখের বিষয়, বীরভূমে বর্তমানে পটুয়াদের সংখ্যা খুবই হ্রাস পাচ্ছে। এই জেলার চাঁদপাড়া, শিবগ্রাম, কানাচী, ষাটপলশা, ইটাগড়িয়া প্রভৃতি জায়গায় পটুয়াদের দেখা যায়। একসময় পটই ছিল পটুয়াদের জীবিকা। পটুয়ারা আসলে হলো 'বেজিয়া' উপজাতি। সাপ নিয়ে এরা খেলা দেখাত। সর্পশিল্পকে বীরভূমের পটুয়ারা বহু পূর্বেই বিদায় দিয়েছে। এখন পট থেকেও প্রায় সরে এসেছে। কদাচিৎ দু-চারজন পটের সাহায্যেই জীবিকানির্বাহ করে।

পটুয়াদের ধর্ম ইসলাম। ইসলাম ধর্মের মানুষেরা পটুয়াদের মেয়েকে বিয়ে করে। কিন্তু পটুয়াদের সঙ্গে তাদের মেয়েদের বিয়ে দেয় কদাচিৎ। পটুয়ারা নামাজ



পটুয়াসঙ্গীত পরিবেশন করছেন শিবগ্রামের জিতু পটুয়া। *আলোকচিত্র : লেখক*

পড়ে, রমজান মাসে উপবাস করে, আবার হিন্দুদের দেবদেবী নিয়ে পটুয়াসঙ্গীত পরিবেশন করে। তাই পটুয়ারা দুই ধর্মের মধ্যে সম্প্রীতির বড় মাধ্যম। পটুয়াদের একটা আলাদা ভাষা আছে—যে-ভাষার সঙ্গে ওড়িয়া ভাষার মিল আছে। অবশ্য এ-ভাষা এখন আর ব্যবহৃত হয় না। সবাই এখন বাঙলা ভাষায় কথাবার্তা চালায়।

বীরভূমে পটুয়ারা সাধারণত হিন্দুদের গ্রামেই বসবাস করে। বিশেষত তারা গ্রামের একটা অংশে দলবদ্ধভাবে বাস করে। অতীতে ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন কায়েম হলে পটুয়ারা মুসলিম শাসকদের কাছ থেকে সাহায্যের আশ্বাস

পেয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তবে পূর্বপুরুষদের রীতি বজায় রাখে অর্থাৎ হিন্দু দেবদেবী নিয়ে গান ছাড়ে না। যেমন—

"পেরথমেতে দেখেন কর্তা ঠাকুর জগন্নাথ
রামলক্ষ্মণ লয়া হনু লঙ্কা চইলা যায়।
রাবণ আইস্যা যোগীর বেশে সীতা হরণ করে
শূর্পনখার নাক যেমন লক্ষ্মণঠাকুর কাটে।"

বীরভূমের ঐতিহ্য এই পট এখন বিলুপ্তির পথে। কারণ, পটুয়ারা এখন রাজমিস্ত্রির কাজে ব্যস্ত। মিস্ত্রির কাজ করে যে-পরিমাণ অর্থ তারা রোজগার করছে, পট দেখিয়ে ভিক্ষা করে তার এক-পঞ্চমাংশও হয় না। দ্বিতীয়ত,



পটুয়াসঙ্গীত পরিবেশনরত শিবগ্রামের সুভাষ পটুয়া। *আলোকচিত্র : লেখক*

রাজমিস্ত্রির মধ্যে বা চিত্রকরের কাজ করে আভিজাত্য বজায় রাখা যায়, কিন্তু পট দেখিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করে সেই আভিজাত্য বজায় থাকে না। পটুয়াদের মধ্যে শিক্ষার আলোও ব্যাপকভাবে প্রবেশ করছে। সরকারি সমস্ত সুযোগসুবিধা তারা পাচ্ছে। বড় চাকরিতেও পটুয়ারা আজ ঢুকে পড়েছে। ফলে পট মাঠে মার খাচ্ছে।

বীরভূম জেলার শিবগ্রামে চল্লিশ-ঘর পটুয়াদের মধ্যে মাত্র চারজন পটুয়া পটবৃত্তির কাজে নিযুক্ত। দশ বছর আগে এই সংখ্যা ছিল দশ। যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ এবং আর্থ-সামাজিক পালাবদলের ফলে মানুষের অবস্থা দিন দিন ভাল হচ্ছে। গ্রামে গ্রামে প্রচুর পাকা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। ফলে পটুয়ারা কাজ পাচ্ছে, তবে শিবগ্রামে যে চারজন পটুয়া পট দেখিয়ে জীবিকানির্বাহ করে তাদের মধ্যে হানিফ পটুয়াই 'হোলটাইমার'। বাকিরা পট ছাড়া অন্য কাজও করে। এপ্রসঙ্গে হানিফ পটুয়ার বক্তব্য : "এটা আমার পৈতৃক রোজগার। তাছাড়া, কোন কাজ করার তেমন ক্ষমতা আমার নেই। তাই সকাল থেকেই পট নিয়ে বেরিয়ে পড়ি, সন্ধ্যায় ঘরে ঢুকি।" এই পটচিত্র দেখিয়ে এবং গান শুনিয়ে হানিফ যে চাল এবং টাকা রোজগার করে, তাতেই তার পরিবারের ছয় সদস্যের দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটে। পটের জন্য হানিফ সরকারি কোন অনুদান পায়নি।

গ্রামীণ লোকসংস্কৃতিতে পটের বিশেষ ভূমিকা আছে। এই পট নিয়ে পটুয়া ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ের মানুষরা মাথা ঘামায় না; সেখানে বাউল, আলকাপ, পল্লীগীতি প্রভৃতি সঙ্গীত আজ জনপ্রিয়তার শীর্ষে। গুরুসদয় দত্তের পরে বীরভূমের বাঁকু পটুয়া এই পটকে জনপ্রিয় করার জন্য কাজ করে চলেছেন, দেশে-বিদেশে পটচিত্র প্রদর্শনও করছেন। তবে তাঁর প্রয়াস যথেষ্ট নয়। বৃহৎ জনসমাজে পটকে জনমুখী করার জন্য দরকার বৃহৎ জনগোষ্ঠীর। ফলে বীরভূম তার ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে ব্যর্থই হয়েছে বলা যায়।

বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সস্তা জনপ্রিয়তা লাভের জন্য লোকসঙ্গীতের মধ্যে অশ্লীলতা প্রবেশ করেছে। এবিষয়ে লোকসঙ্গীতের অনুরাগীদের সচেতন হওয়া আবশ্যক। কারণ, বাঙলা সংস্কৃতির ভিত্তিভূমিতে রয়েছে লোকসঙ্গীত। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থে বলেছেন : "বাংলাদেশকে জানিতে হইলে গানের মধ্য দিয়া ইহাকে জানা যত সহজ, অন্য কোন বিষয়ের মধ্য দিয়াই তাহা তত সহজ নহে। প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম কাল পর্যন্ত বাঙালীর সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পদই তাহার সঙ্গীত। বাঙালীর ধ্যানধারণা, সামাজিক আচার-আচরণ, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী-জীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতি সবই সঙ্গীতসাধনায় যে বিচিত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিতে না পারিলে বাঙালীর চরিত্র এবং তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যাইবে না।" (১ম খণ্ড, পৃঃ ২)

বীরভূম বঙ্গ-সংস্কৃতিকে প্রধানত যে-দুটি সম্পদ দিয়ে পরিপুষ্ট করেছে, তা হলো পট এবং বাউল। বাউলের জনপ্রিয়তা থাকলেও পট গবেষকদের বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হতে চলেছে। কিন্তু বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে পটকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে পট যখন বড় ভূমিকা পালন করছে, তখন তার ঐতিহ্যকে ধরে রাখলে সমাজের কল্যাণ, জাতির কল্যাণ তথা ভারতের কল্যাণ। ❑

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

বাঙলা সঙ্গীতে জননী চিরন্তনী

রোমি সাহা

[redacted] তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফেরে।'—মরমিয়া কবির হৃদয়মথিত এই ছত্রটি প্রতিটি সন্তানেরই প্রাণের উচ্চারণ। জন্মমুহূর্ত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই অমৃতরসপূর্ণ নামটি সঞ্জীবিত করে রেখেছে সন্তানের পূত আত্মা। হৃদয়ের তাপহারী, দুঃখমোচক মৃত্যুঞ্জয়ী বিশল্যকরণী এই মাতৃনাম।

বিশ্বে এমন কোন একটি শব্দের সৃষ্টি হয়নি যা মাতৃনামকে অতিক্রম করতে পারে। বিভিন্ন ধর্ম এক-একটি গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষকে বেঁধে রাখতে পারে। আবার পৃথক পৃথক ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষ নানা নামে ঐ একই ঈশ্বরেরই ভজনা করেন। তাই ঈশ্বরের নাম এবং মহিমা সর্বব্যাপ্ত। আবার স্বল্প হলেও নিরীশ্বরবাদী মানুষ বিশ্বে দুর্নিরীক্ষ্য নয়। অপার মাতৃনামমহিমা কিন্তু অতিক্রম করে গেছে সকল নাম ও শক্তিকে। তাই একমাত্র মাতৃনামই হতে পারে বিভেদ-বিদীর্ণ বিশ্ববন্ধনের একমাত্র সূত্র।

এই অক্ষয়, অব্যয় মাতৃনামকে আমরা আস্বাদন করেছি নানা রূপে, নানা ভাবে। মা কখনো আবির্ভূত হয়েছেন দেশজননীর মূর্তিতে, কখনো সন্তানের দুঃখবিনাশিনী জগদ্ধাত্রী রূপে। আবার কখনো রূপান্তরিতা হয়েছেন ভুবনমনোমোহিনী বিশ্বজননীতে। সেখানে তিনি সমগ্র মানবজাতির ধাত্রী। আবার ঐ জননীই হয়েছেন ভক্তহৃদয়ের পূত অশ্রুজলে সিক্ত ভগবতী আনন্দময়ী। ইনিই অন্তরের শ্বেতপদ্মদলে বিরাজিতা জননী চিরন্তনী। কখনো তিনি সন্তান-স্নেহমুগ্ধা জননী, আবার কখনো লীলাময়ী কন্যারূপিণী। জননীর এ এক অনন্য ভাবলীলা।

এদেশের মাতৃভক্ত সন্তানেরা সঙ্গীতের মাধ্যমে বিচিত্ররূপিণী মায়ের হৃদয়হরা নানা ভাবপ্রতিমা রচনা করেছেন। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত থেকে শুরু করে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, নজরুল, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত প্রমুখ কবিরা কখনো দেশ, কখনো বিশ্ব, কখনো হৃদয়বাসিনী চিন্ময়ী মাতৃদেবীকে বন্দনা করেছেন সঙ্গীতের মাধ্যমে।

ভারতবর্ষে যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব রয়েছে তার দুটি ধারা আমরা দেখতে পাই—পুরুষকেন্দ্রিক ও শক্তিকেন্দ্রিক। পুরুষপ্রধান হলো বেদ ও উপনিষদ্ এবং শক্তি বা নারীপ্রধান হলো তন্ত্র। শোনা যায়, আদি অনার্য উৎস থেকেই নাকি মাতৃভাবনা এসেছে। ইউরোপে জার্মানরা তাদের দেশকে বলে 'ভেটারল্যাণ্ড' বা 'পিতৃভূমি'। আমরা বলি 'মাতৃভূমি'। পিতা ভ্রাম্যমাণ, মা হলো প্রকৃতির মতো। এমনকি ইংরেজরাও নিজের দেশকে বলে 'ফাদারল্যাণ্ড'। খ্রীস্টধর্মের ভিতর যাঁরা ক্যাথলিক, তাঁরা খ্রীস্টের চেয়েও মা মেরীকে বেশি প্রাধান্য দেন এবং স্বয়ং ঈশ্বর তাঁর গর্ভে এসেছিলেন বলে 'মা মরিয়ম' তাঁদের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের প্রাচীন মন্ত্রের ভিতরও অজস্র মাতৃমন্ত্র আছে। শঙ্করাচার্য মাতৃস্তোত্রের ভিতর দিয়েই বিশ্ব-নিরাময়ের চেষ্টা করেছেন।—

"ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন নপ্তা
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি।।"

আবার আধুনিক কালে মাতৃভক্ত কবি ও গীতিকারদের চিন্তায়, ভাবনায় দেশজননী রূপান্তরিত হয়েছেন বিশ্বজননীতে। যখন সমগ্র দেশ বিদেশী শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, তখন সেই বন্ধন মোচনের জন্য তাঁরা অন্তরে শক্তির উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন। সেদিনের গীতিকাররা তাই পরাধীনতার অবসান ঘটাতে দেশজননীর বন্দনা গানে মুখর হয়ে উঠেছিলেন।

দেশবাসীর চিত্তের জাগরণ প্রথম ঘটেছিল ঋষিকবি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' গানে। তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাস জাগ্রত দেশপ্রেমের প্রতীক, আর সেই উপন্যাসে সংযোজিত সঙ্গীতটি আজ ভারতের জাতীয় সঙ্গীততুল্য। এটি কেবলমাত্র একটি সঙ্গীত নয়, জননীকে অবলম্বন করে আত্মশক্তি উদ্বোধনের বীজমন্ত্র এটি। ধর্মে বর্ণে বহুধাবিভক্ত বিচ্ছিন্ন ভারতবাসী এই একটিমাত্র ধ্বনিতে অন্তরের মধ্যে গভীর ঐক্য অনুভব করে। ঋষি অরবিন্দ বলেছিলেনঃ "যে-মহাসঙ্গীতটি বঙ্কিম রচনা করলেন, সেই মন্ত্র উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একদিনে সমস্ত জনতা জাতীয়তাবোধে দীক্ষিত হয়ে গেল। দেশজননী এই সঙ্গীতের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন।"

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির মতো। তাই তাঁর 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত এক মহামন্ত্রধ্বনি। অবিস্মরণীয় একটি দৃশ্য আছে 'আনন্দমঠ'-এ। ভবানন্দ ও মহেন্দ্র প্রান্তর পার হয়ে চলেছেন। একসময় ভবানন্দের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো একটি সঙ্গীত—

"বন্দে মাতরম্ মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিতযামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্,
সুখদাং বরদাং মাতরম্।।"

মহেন্দ্র বললেন : "এ তো দেশ, এ তো মা নয়!" তার উত্তরে দেশভক্ত ভবানন্দ বললেন : "আমরা অন্য মা মানি না—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'।"

সমগ্র সঙ্গীতটির ভিতর শ্যামলিমায় সুশোভিতা, বরদায়িনী, মমতাময়ী এক মাতৃমূর্তি লুকিয়ে আছে। এই অসাধারণ সঙ্গীতটি ফাঁসির মঞ্চে বিপ্লবীদের কণ্ঠে জীবনের জয়গানরূপে ধ্বনিত হয়েছিল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বঙ্গজননীকে দ্বিখণ্ডিত করার যে-প্রয়াস ইংরেজ সরকার করেছিল, সারা দেশ মুখর হয়ে উঠেছিল তার প্রতিবাদে। সেসময় রবীন্দ্রনাথ বঙ্গজননীর এক অপরূপ রূপমহিমার ভাব তাঁর একাধিক সঙ্গীতে প্রকাশ করেছিলেন। যেমন—

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।।"

এই সময় রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি দেশাত্মবোধক গানে সমগ্র ভারতবাসীর অন্তরকে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন—

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম, মাগো, তোমায় ভালবেসে।।"

এই সঙ্গীতের ভাব এবং সুর প্রতিটি দেশবাসীর অন্তরে বীণার ধ্বনির মতো বেজে উঠেছে। এখানে ঐশ্বর্যময়ী দেশজননীর মূর্তিকে কবি তাঁর অনন্য বাণী ও সুললিত ছন্দে এমনভাবে প্রকাশ করেছেন যে, দেশজননী রূপান্তরিত হয়ে গেছেন বিশ্বজননীতে। দেশজননীর কী অপূর্ব মূর্তি তিনি অঙ্কন করেছেন তাঁর এই সঙ্গীতে—

"অয়ি ভুবনমনোমোহিনী, মা
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী
জনক জননি জননী।।"

চিরকল্যাণময়ী বরাভয়া জননী দাঁড়িয়ে আছেন আপন মহিমায়। তাঁর চরণ ধৌত করছে নীল সিন্ধুর জল। তাঁর শ্যামল অঞ্চল চঞ্চল হয়ে উঠেছে বায়ুস্পর্শে। তাঁর হিমাচল-রূপ ললাটের ওপর শুভ্র তুষারের কিরীট। জাহ্নবী যমুনা বয়ে চলেছে তার বিগলিত করুণাধারার মতো।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের দেশাত্মবোধক গানগুলিও মাতৃগরিমার স্পর্শে মহিমময়। এখানেও সুনীল জলধি থেকে উত্থিতা ভারতজননীর বন্দনায় সমস্ত বিশ্ব মুখরিত—

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব,
সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ!"

তাঁর অন্য একটি গান বহুখ্যাত এবং হৃদয়হারী। এখানে কবি ভারতজননীকে সকল দেশের সেরা রূপে দেখে তাঁর বন্দনায় মুখর হয়েছেন—

"ধন ধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা...
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি।।"

এজাতীয় বন্দনা গানে রজনীকান্তের অবদানও বিশেষভাবে স্মরণীয়। বঙ্গভঙ্গের কালে ইংরেজের অপপ্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল সমস্ত বাঙালী। বাঙালীসমাজ বর্জন করেছিল বিলাতী দ্রব্য। স্বদেশী বস্ত্রগ্রহণের ভাবমন্ত্র সেদিন ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের দিকে দিকে। সেসময় কান্তকবির গান গাওয়া হতো বাংলার ঘরে ঘরে—

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই;
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সুতোর সঙ্গে মায়ের
অপার স্নেহ দেখতে পাই,
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষে চাই।"

স্বাধীনতা আন্দোলনের যাঁরা সৈনিক, তাঁদের সেদিন কণ্ঠে কণ্ঠে ফিরেছে এই গান। জননীর প্রতি এক তীব্র, গভীর, প্রগাঢ় ভালবাসা প্রকাশিত এই গানে। এই জননী বাঙালী হৃদয়ের একান্ত ভাবনার রসে জারিত। জগৎপূজ্যা ভারতজননীর অভ্যুদয়ের জন্য অতুলপ্রসাদ গাইলেন—

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

"উঠ গো ভারতলক্ষ্মী! উঠ আদি জগত-জন পূজ্যা।
দুঃখ দৈন্য সব নাশি, কর দূরিত ভারত-লজ্জা।।
ছাড় গো, ছাড় শোক-শয্যা, কর সজ্জা।
পুনঃ কমল কনক ধন-ধান্যে।।"

* * * * *

আমরা আমাদের গৃহজননীকে দেখেছি মমতার প্রতিমূর্তিরূপে। সন্তানের শির সিক্ত হয়েছে জননীর স্নেহ-বিগলিত অশ্রুধারায়। সন্তানের জন্য মায়ের যে স্নেহ, আকুলতা ও উদ্বেগ তা প্রকাশ পেয়েছে বৈষ্ণব পদাবলীকারদের সঙ্গীতেও।

মা যশোদা তাঁর বালগোপালের জন্য সদাই সজাগ। গোষ্ঠে যাওয়ার জন্য সন্তানের প্রবল ইচ্ছাকে এড়াতে না পেরে তিনি বলছেনঃ বাছা, তুমি গোষ্ঠে যাও, কিন্তু সবসময় স্মরণ করবে আমার সাবধানবাণী। পদকার গাইছেন—

"আমার শপতি লাগে না যাইহ ধেনুর আগে
পরাণের পরাণ নীলমণি
নিকটে রাখিহ ধেনু পুরিহ মোহন বেণু
ঘরে বসে আমি যেন শুনি।"

এই গানে মাতৃহৃদয়ের আর্তি আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। এখানে নারায়ণ মানুষের ঘরে এসে হয়েছেন আনন্দগোপাল।

বৈষ্ণব পদাবলী কিংবা আগমনী বা বিজয়ার গানে আমরা দেবদেবীকে একান্ত প্রিয় করে নিয়েছি। তাঁরা আমাদেরই ঘরের সন্তান-সন্ততি, মর্তজননীর স্নেহের স্পর্শে আপ্লুত। দুর্গতিনাশিনী, দশপ্রহরণধারিণী, সিংহবাহিনী মা দুর্গা তাঁর রুদ্ররূপ পরিত্যাগ করে বাঙালী গৃহে এসেছেন একান্ত মর্ত্যগৃহের কন্যারূপে। মর্ত্যজননীর অশ্রু-ভালবাসায় প্লাবিত হয়েছেন দেবী দুর্গা কিংবা মহাকালী। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত কিংবা নজরুলের শ্যামাসঙ্গীতে দেবী হয়েছেন আমাদেরই স্নেহ-ভালবাসায় সিক্ত কন্যা। রামপ্রসাদ গেয়েছেন—

"মন কেন মার চরণছাড়া...
বার হয়ে দেখ কন্যারূপে মা
রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া।।"

রামপ্রসাদ মহাকালীকে অন্তরবাসিনী জননীরূপে কেবল মাতৃমূর্তিতে কল্পনা করেননি, আপন জননীর কাছে সন্তানেরা যেমন অনুযোগ, অভিযোগ করেন—রামপ্রসাদও ঠিক তেমনি মহামায়া, মহাকালীর কাছে অনুযোগ, অভিযোগ করেছেন।

নজরুলের ভক্তিসঙ্গীতগুলিতে প্রাণের আবেগ জননীর চরণে পুষ্পাঞ্জলিরূপে নিবেদিত হয়েছে। তিনি কৃষ্ণবর্ণা, দিগ্‌বসনা কালীর বর্ণনা দিয়ে বলছেন—

"কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব,
যার হাতে মরণ বাঁচন।।...
সিন্ধুতে মার বিন্দুখানিক, ঠিকরে পড়ে রূপের মানিক,
বিশ্বে মায়ের রূপ ধরে না, মা আমার তাই দিগ্‌বসন।।"

ব্রহ্মময়ী মাকে দেবী বলে ভক্তকবিরা দূরে সরিয়ে রাখেননি, তাঁদের একান্ত অন্তরঙ্গমূর্তিতে চিত্রিত করেছেন। যদিও পুরাণ ও তন্ত্রে দুর্গার সংহারকারিণী মূর্তি, তবু বাংলার সজল শ্যামল প্রকৃতি, তার কোমল মৃত্তিকা, বাঙালীর ভাবপ্রবণ অন্তর জন্ম দিয়েছে মাতৃ-মমতার এক দিব্যরূপ।

বহুদিন পরে গিরিরানী মা মেনকার ব্যাকুল হৃদয়ে এসে ধরা দিয়েছেন উমা। এখানে মেনকার আর্তি সমস্ত বাঙালী জননীর হৃদয়ের আকুলতা। প্রিয় কন্যাটি যখন পতিগৃহে যায়, তখন কন্যার শুভাশুভ চিন্তা করে মা ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। তিনি বারেবারে স্বামীর কাছে অভিযোগ তোলেন কন্যাকে সত্বর মাতৃসান্নিধ্যে না নিয়ে আসার জন্য। আক্ষেপ করে বলেনঃ তুমি পাষাণ (কেননা, উমার পিতা হিমালয়), তাই তোমার প্রাণটিও পাষাণের মতো কঠিন, সন্তানের জন্য তোমার কাতরতা নেই।

আবার উমা যখন মায়ের কাছে আসেন অল্প কদিনের জন্য, তখন মায়ের প্রাণ তাকে ছেড়ে দিতে চায় না। নবমী পোহালে আসবে দশমী। তখন উমাকে চলে যেতেই হবে পতিগৃহে। তাই সন্তানস্নেহে আকুল জননী নবমী নিশির কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলছেন—

"ওগো নবমী নিশি পোহায়ো না ধরি পায়ে
তুমি মোরে ছেড়ে গেলে উমা মোরে ছেড়ে যায়।"

নবমীর রাত্রে এই আর্তি আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হতে থাকে। এখানে দেবজননী দেবকন্যা—মর্ত্যজননী মর্ত্যকন্যায় রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। যিনি ছিলেন একমাত্র গিরিরানী মেনকার আনন্দের ধন, অপরূপা সেই কন্যা আজ রূপান্তরিত হয়েছেন বিশ্বজননীতে। কী মহিমময় সেই মাতৃমূর্তি! যা ছিল মা মেনকার হৃদয়ের আর্তিতে খণ্ড, তা আজ সবার প্রাণের ভালবাসায় লাভ করল পূর্ণমহিমা। বাংলার হৃদয় থেকে যিনি বেরিয়ে এলেন, তাঁকে দেখে সার্থক হলো দৃষ্টি, ধন্য হলো জন্ম। ❑

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

সার্থকনামা কবি 'দুখু মিঞা' কাজী নজরুল ইসলাম

নির্মলকুমার রায়

[redacted]দ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম কি মুসলমান, না হিন্দু? না, তিনি হিন্দুও নন, মুসলমানও নন। তিনি জাত-ধর্মের উর্ধ্বে 'মানবতাবাদী' এক বিস্ময়কর পুরুষ। কোন একটি জাতি বা একটি ধর্মের মধ্যে তাঁকে ধরে রাখা যায়নি—'মানুষ' হিসাবেই তাঁর পরিচয়, 'মনুষ্যত্ব'ই তাঁর ধর্ম। তাঁর সংগ্রামমুখর জীবন যেমন বৈচিত্র্যময়, তাঁর বহুমুখী প্রতিভাও তেমন সর্বগ্রাসী। সাহিত্যজগতে এমন কোন বিষয় নেই, যেখানে নজরুল অনুপস্থিত। আবার সমাজসেবী, দেশপ্রেমিক, বিদ্রোহী নজরুলের অধিষ্ঠান আজও জনমানসে অটুট রয়েছে। সর্বোপরি, ভক্ত নজরুল শুধু গানে নয়—প্রাণকেও উৎসর্গ করেছিলেন ঈশ্বরের চরণে। অথচ তাঁর প্রায় সমগ্র জীবনটাই ছিল চরম দুঃখে ভরা। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন চিরদুঃখী। অত্যন্ত দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে নজরুলের জন্ম হওয়ায় তাঁর ডাকনাম ছিল—'দুখু মিঞা'।

কাজী নজরুল ইসলামের পূর্বপুরুষেরা ছিলেন বিহারের পাটনার অধিবাসী। সম্রাট শাহ আলমের সময়ে তাঁরা পাটনার হাজীপুর গ্রাম থেকে চলে এসেছিলেন বঙ্গদেশের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে। সেখানে তাঁরা স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। মোগল আমলে প্রতিষ্ঠিত এলাকার এক বিচারালয়ে তাঁরা 'কাজী' বা বিচারকের পদ পাওয়ায় পরবর্তী কালে এঁদের বংশধরগণ সবাই 'কাজী' নামে ভূষিত হন। এঁদেরই অন্যতম বংশধর 'কাজী নজরুল ইসলাম'।

নজরুলের পিতার নাম—কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম—জাহেদা খাতুন। ফকির আহমদের স্ত্রী দুটি, পুত্র সাতটি ও কন্যা দুটি। নজরুলের সহোদর ভাই দুটি—জ্যেষ্ঠ কাজী সাহেবজান, কনিষ্ঠ কাজী আলী হোসেন এবং ভগিনী উম্মে কুলসুম। নজরুল ছিলেন তাঁর পিতার দ্বিতীয় পক্ষের দ্বিতীয় সন্তান।

১৮৯৯ সালের ২৪ মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ) মঙ্গলবার বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে নজরুলের জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন স্থানীয় ফকির সাহেবের মাজার ও এক মসজিদের ইমাম। গ্রামের মক্তবে লেখাপড়া করার সময় কবি মাত্র ৮ বছর বয়সে পিতৃহীন হন এবং প্রচণ্ড দারিদ্র্যের সম্মুখীন হন। এই মক্তব থেকেই তিনি ১০ বছর বয়সে প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবর্তী কালে নির্মম দারিদ্র্যের জন্যই তিনি ঐ মক্তবেই শিক্ষকতা করতে বাধ্য হন। এইসময় পাড়ায় পাড়ায় মোল্লার কর্ম করে তিনি যৎসামান্য রোজগারও করতেন এবং সংসারে সাহায্য করতেন। তখন পশ্চিমবঙ্গের পল্লী অঞ্চলে 'লেটোর পালাগান' খুব জনপ্রিয় হওয়ায় বালক নজরুল পালাগান রচনা শুরু করেন এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য 'লেটোর দলে' তিনি ওস্তাদের পদ গ্রহণ করেন আরো কিছু রোজগারের আশায়। পরে অবশ্য আবার তিনি লেখাপড়ার উচ্চাশা নিয়ে ১১ বছর বয়সে মাথরুন হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন; তখন সেখানকার শিক্ষক ছিলেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। কিন্তু আর্থিক অনটনের জন্য তিনি স্কুল ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং পুনরায় পালাগানে যোগদান করেন।

এইসময় এক পালাগানের আসরে তাঁর গান শুনে এক বাঙালী খ্রীস্টান, যিনি রেলে গার্ডের চাকরি করতেন, তাঁর প্রসাদপুরের বাংলোয় নজরুলকে বাবুর্চির কাজে নিযুক্ত করেন; কিন্তু নানা কারণে ঐ মদ্যপ গার্ডের দেওয়া চাকরি অল্পদিন বাদেই ছেড়ে দিয়ে তিনি চলে আসেন আসানসোল শহরে। সেখানে এম. বখশের চা-রুটির দোকানে তিনি একটি চাকরি পান, মাহিনা মাসে মাত্র এক টাকা এবং আহার। তাঁর বাসস্থান না থাকায় তিনি কাজের পর দোকানের পাশেই একটি তিনতলা বাড়ির সিঁড়ির নিচে নিদ্রা যেতেন। এই বাড়ির বাসিন্দা ছিলেন আসানসোলের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত দারোগা কাজী রফিজউল্লাহ। নজরুলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটায় তিনি নজরুলকে মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে তাঁর গৃহভৃত্যের কাজে নিযুক্ত করেন। নজরুলের প্রতি বিশেষ স্নেহবশত তিনি তাঁকে পুনরায় লেখাপড়া শেখাবার উদ্দেশ্যে তাঁর নিজের বাড়ি পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ জেলায় কাজীর শিমলা গ্রামে নিয়ে আসেন এবং পাশের গ্রাম দরিরামপুরের হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেন। এইসময় একটি ভাঙা হারমোনিয়াম যোগাড় করে নজরুল লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গীতচর্চাও করতেন।

এই স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষার পরই তিনি আবার আসানসোলের গ্রামে ফিরে আসেন এবং রানীগঞ্জে তাঁর এক আত্মীয়ের সহায়তায় তিনি শিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯১৫ থেকে ১৯১৭—এই তিন বছর তিনি অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী অবধি লেখাপড়া করেন এবং মাসিক সাতটাকা বৃত্তি পান। এখানেই তিনি পরবর্তী কালের প্রখ্যাত সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে পেয়েছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে। ইতিপূর্বে মক্তবে ছাত্ররূপে থাকাকালীন তিনি আরবী ও ফারসী ভাষায় প্রথম পাঠ নেওয়ার দরুন এতে তাঁর খুব অনুরাগ জন্মেছিল। এই স্কুলে তাঁর দ্বিতীয় ভাষা ছিল ফারসী। সঙ্গীতের প্রতিও তাঁর বিশেষ আগ্রহ লক্ষ্য করে এই স্কুলেরই সহকারী শিক্ষক ও সঙ্গীতজ্ঞ সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলাল নজরুলকে নিজের বাড়িতে এনে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শেখাতেন।

১৯১৭ সালে (প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের তৃতীয় বছরে) যখন স্কুলের দশম শ্রেণীতে প্রি-টেস্ট পরীক্ষা শুরু হয়েছে, তখন বিশ্বযুদ্ধের দরুন শহরের দেওয়ালে আঁটা বড় বড় পোস্টারে

বাঙালী যুবকদের সেনাবাহিনীতে যোগদানের আহ্বান লক্ষ্য করে তিনি পরীক্ষা ফেলে 'বেঙ্গল রেজিমেণ্ট' বা বাঙালী পল্টনে যোগদান করেন। প্রথমে তিনি লাহোর হয়ে পেশোয়ারের কাছে নৌশেরাতে তিন মাসের ট্রেনিং নেন এবং পরে হেডকোয়ার্টার করাচিতে ৪৯নং বাঙালী পল্টনে যোগ দেন। কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই তিনি নিজ কর্মদক্ষতায় সামরিক বিভাগে 'ব্যাটেলিয়ান কোয়ার্টার-মাস্টার হাবিলদার'-এর দায়িত্বপূর্ণ পদে উন্নীত হন। ১৯২০ সালের মার্চে ৪৯নং বাঙালী পল্টন ভেঙে দেওয়ার ফলে নজরুলের সৈনিকজীবন প্রায় আড়াই বছরের মতো সীমাবদ্ধ ছিল।

যুদ্ধফেরত যোদ্ধার মতোই এর পর থেকে শুরু হয় নজরুলের সংগ্রামী জীবন। চারদিক থেকে নানা দুঃখ, শোক, দারিদ্র্য, অশান্তি তাঁকে ঘিরে ফেললেও, এমনকি রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁর কারাবাস হলেও তাঁর বিপ্লবী জীবন 'অগ্নিবীণা'র ঝঙ্কারে সকল দুর্ভাগ্যকে জয় করেছে, আন্তর-জীবনের গূঢ় ভাবশক্তি বৃদ্ধি করেছে, সহজাত ঈশ্বরপ্রীতি তাঁকে সার্বভৌম ভাবাদর্শে উন্নীত করেছে, সুখে-দুঃখে স্থিতপ্রজ্ঞরূপে তিনি অবিচল থেকেছেন এবং সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক মানুষ হিসাবেই তিনি জীবনের পূর্ণতা অর্জন করেছেন।

নজরুলের বেদনাবিধুর জীবনের কথা স্মরণ করলে এই সরল, আপনভোলা, ধৈর্যশীল, উদার মানুষটিকে 'কিংবদন্তি' রূপে উল্লেখ করা যায়। শৈশবকাল থেকে অবর্ণনীয় দারিদ্র্যই যাঁর ভূষণ, শোক-তাপ-জ্বালা যাঁর ঐশ্বর্য, পরাধীনতার বন্ধন যাঁর কাছে আশীর্বাদ—সেই জাজ্বল্যমান মানবতাবাদী পুরুষটির জীবন ছিল দিব্য লাবণ্যমণ্ডিত। তাই সংসারে বাস করেও তিনি সংসারী হতে পারেননি, সংসারী সেজেছিলেন মাত্র। আর সংসারী সেজেছিলেন বলেই সাংসারিক কোন প্রতিবন্ধকতা তাঁকে পরাস্ত করতে পারেনি।

আশৈশব দারিদ্র্য ছাড়াও তিনি একইসঙ্গে মর্মস্পর্শী নানা ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলেন। প্রথমা স্ত্রী নার্গিস আসার খানমের সঙ্গে তাঁর জীবন আদৌ সুখের হয়নি; বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই বিচ্ছেদ হয়। দ্বিতীয়া স্ত্রী প্রমীলা সেনগুপ্তের সঙ্গে তাঁর গভীর প্রণয় থাকলেও পরবর্তী কালে প্রমীলা দেবী পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হয়ে উত্থানশক্তি-রহিত হন এবং অবশেষে স্বামীর জীবদ্দশাতেই ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর প্রথম পুত্র আজাদ কামালের অকালমৃত্যুর পর তাঁর অত্যন্ত প্রিয় দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলেরও মৃত্যু হয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর কাব্যস্রোত অফুরন্তধারায় বঙ্গসাহিত্যকে প্লাবিত ও সমৃদ্ধ করে। রাজদ্রোহের অপরাধে বিদ্রোহী নজরুল যখন হুগলী জেলে বন্দী, তখন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে কবির স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং তাঁর 'বসন্ত' নাট্যগ্রন্থটি নজরুলের নামে উৎসর্গ করে জেলখানায় পাঠিয়ে দিয়ে স্নেহের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন। এটি নজরুলের জীবনে এক বিশেষ ঘটনা।

নজরুল দেশকে যেমন অনেক কিছু দিয়ে গেছেন, দেশও তাঁকে অনেক কিছু দিয়েছে। ১৯৪৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী' পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করে। ১৯৬০ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক 'ডি. লিট.' উপাধি প্রদান করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইতিপূর্বে ১৯৪২ সালের ১০ জুলাই থেকে মস্তিষ্কের ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তিনি স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে এসব সম্মান উপলব্ধি করতে পারেননি। দেশে-বিদেশে নানাপ্রকার চিকিৎসা সত্ত্বেও তাঁকে রক্ষা করা যায়নি। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট (১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ১২ ভাদ্র) বাংলাদেশের ঢাকায় তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, পূর্ব পাকিস্তানের কবলমুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের অনুরোধে ভারত সরকার নজরুলকে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলে ১৯৭২ সালের ২৪ মে তাঁকে বাংলাদেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। মৃত্যুর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে মসজিদের পাশে কবি নজরুলকে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সমাহিত করা হয়।

বলা আবশ্যক, কবির প্রথম দুই পুত্র ছাড়া (যাদের পূর্বেই মৃত্যু হয়েছিল) অপর দুই পুত্র হলেন কাজী সব্যসাচী এবং কাজী অনিরুদ্ধ। এখন উভয়ই প্রয়াত। কবির কোন কন্যাসন্তান ছিল না।

এপার বাংলার মতো ওপার বাংলার জনগণের কাছেও নজরুল ছিলেন তাদের প্রাণের কবি। বাংলাদেশ সরকার তাঁর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধায় বাংলাদেশের 'নাগরিকত্ব' দান করায় তিনি একাধারে ভারত ও বাংলাদেশের নাগরিকরূপে গণ্য হতেন। বাংলাদেশ সরকার তাঁকে রাজকীয় সম্মানে সেখানে বাস করার ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক 'ডি. লিট.' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। এমনকি, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সাহিত্যিক পুরস্কার '২১শে পদক'ও তাঁকে প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু মস্তিষ্কের ব্যাধিতে আক্রান্ত কবির জীবনে এগুলির কোন প্রভাবই পড়েনি।

জনপ্রিয় কবি নজরুল দুই বাংলার মৈত্রীবন্ধনকে নিজের অজ্ঞাতসারে এইভাবে সুদৃঢ় করে এক আত্মিক যোগসূত্রের পথিকৃৎরূপে অমর হয়ে আছেন। কবি ও সাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়ের ভাষায়—

"ভুল হয়ে গেছে বিলকুল—
আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নিকো নজরুল।
এই ভুলটুকু বেঁচে থাক—
বাঙালী বলতে একজন আছে,
দুর্গতি তার ঘুচে যাক।" ❑

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

বাসনার অবসান

বি. আর. রাজম আয়ার

লেখক-পরিচিতি ঃ বি. আর. রাজম আয়ার (১৮৭২-১৮৯৮) রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের শতবর্ষ-অতিক্রান্ত ইংরেজী মুখপত্র 'Prabuddha Bharat'-এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন। ঐ পদে কর্মরত অবস্থায় মাত্র ২৬ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়। সেই সময়কালে (১৮৯৬-১৮৯৮) ঐ পত্রিকায় তাঁর রচিত বেদান্ত-বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ, গল্প ও অনুবাদ ১৯২৫ সালে 'Rambles in Vedanta' নামক সঙ্কলনগ্রন্থে পুনঃপ্রকাশিত হয়। এই গল্পটি সেই সঙ্কলনগ্রন্থ থেকে গৃহীত ও অনূদিত। **অনুবাদক ঃ বসন্তরঞ্জন দাশগুপ্ত।**

দক্ষিণ ভারতের শহর তাঞ্জোরের রাজপথে একদিন এক দরিদ্র অশিক্ষিত ব্রাহ্মণ ভ্রমণকালে পরমাসুন্দরী রাজকন্যাকে প্রাসাদশীর্ষে সহচরী-সহ ক্রীড়ামত্ত দেখে মুহূর্তমধ্যে এত প্রেমাভিভূত হন যে, সম্পূর্ণ চলচ্ছক্তি রহিত হয়ে সেই অনুপম সৌন্দর্যলেহনে রত হন। কথায় বলে—'প্রেমে মানুষ অন্ধ হয়', কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রেম এত তীব্র হয় যে, প্রকাশ্য রাজপথে ঐভাবে রাজপ্রাসাদের দিকে নির্লজ্জ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকা যে কত বিপজ্জনক তাও তিনি সম্পূর্ণ বিস্মৃত হন। তিনি যখন ঐ অবস্থায় বিমূঢ় ও হতবাক, সেইসময় দুর্ভাগ্যবশত রাজকন্যার প্রতি ব্রাহ্মণের ঐ কুৎসিত লোলুপ দৃষ্টি নজরে পড়ে স্বয়ং মহারাজের এবং তৎক্ষণাৎ রাজাদেশে ব্রাহ্মণকে বন্দী করে রাজপ্রাসাদে আনা হয়। ক্রুদ্ধ রাজা ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করেন—কে সে এবং কোন্ সাহসে সে রাজকন্যার প্রতি কুৎসিত দৃষ্টিতে চেয়েছে? উত্তরে ব্রাহ্মণ বলেন ঃ "মহারাজ, সৌন্দর্য যাদের—সে তাদের নিজেদের জন্য নয়, বরং যারা উপভোগ করে তাদের জন্য।" এই দুর্বিনীত উত্তর শোনামাত্র রাজা ব্রাহ্মণের মুখমণ্ডল তপ্ত লোহাদ্বারা চিহ্নিত করে নগর থেকে তাঁকে বহিষ্কারের আদেশ দেন। সেই রাজাদেশানুসারে ব্রাহ্মণের শুধুমাত্র মুখমণ্ডলেই নয়, সমস্ত শরীরে কলঙ্কচিহ্ন এঁকে গাধায় চাপিয়ে নগর থেকে বিতাড়িত করা হয়।

রাত্রিশেষে ব্রাহ্মণ রাজ্যের সীমান্তে এসেও যখন কোন্ পথে যাবেন স্থির করতে পারেন না—সেইসময় কিছু দূরে অবস্থিত এক কালীমন্দির দেখতে পান এবং নির্দ্বিধায় সেখানে প্রবেশ করে দেখেন, মন্দির শূন্য এবং ভাবলেন মহাদেবী নিশ্চয়ই পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে নৈশভ্রমণে বেরিয়েছেন। অতঃপর ব্রাহ্মণ মন্দিরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেন, যাতে কেউ আর ভিতরে আসতে না পারে। দরজা বন্ধ করেও ব্রাহ্মণ কিন্তু তাঁর চোখদুটি বন্ধ করতে পারলেন না, কারণ তখনো তাঁর সমস্ত অন্তর জুড়ে বিরাজ করছে তাঞ্জোরের সেই রাজকন্যা এবং তাঁর মন সর্বক্ষণ তাকে লাভ করার উপায় নির্ণয়ে ব্যস্ত। কিন্তু হায়! দীর্ঘ চিন্তার শেষেও তিনি রাজকন্যাকে রাজপ্রাসাদের বাইরে লাভ করার কোন উপায়ই ভেবে পেলেন না, আর যদিও বা কোন উপায় থাকত, তাহলেও রাজকুমারীর পক্ষে তাঁর মতো কুৎসিত ব্যক্তিকে ভালবাসা একেবারেই বাতুলতা বলে মনে হলো।

যখন তাঁর মন এমন অসংলগ্ন ও বিপর্যস্ত চিন্তায় মগ্ন, সেই মুহূর্তে তিনি দরজায় প্রচণ্ড করাঘাতের শব্দ শুনতে পেলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে হলো, দেবীকে মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে না দিলে তিনি ব্রাহ্মণের ঈপ্সিত বর দান করতে বাধ্য হবেন। তাই তিনি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকার পর বললেন ঃ "যদি দরজা খুলি, তবে আপনি আমায় কি দেবেন?" উত্তরে দেবী বললেন ঃ "যা চাও তাই। এখন আমি অত্যন্ত ক্লান্ত, শীঘ্র তিনটি বর প্রার্থনা কর—পাবে।" ব্রাহ্মণ নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন ঃ "তুমি যদি সত্যই মা কালী হও তবে প্রথম বরে—কাল সকাল হওয়ার আগেই আমি যেন তাঞ্জোরের রাজা হই। দ্বিতীয় বরে কাল সন্ধ্যার আগেই রাজকন্যা যেন আমার বধূ হন এবং তৃতীয় বরে আমি আরো তিনবার যা কামনা করব তাই যেন লাভ করি।" 'তথাস্তু'—মা কালী সঙ্গে সঙ্গে বরদান করলেন। ব্রাহ্মণ তখন দরজা খুলে বাইরে এলেন ও দেবী মুহূর্তমধ্যে মন্দিরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হলেন এবং বাইরে থেকে তাঁর নাসিকাগর্জন শোনা গেল।

ঠিক সেইসময়ে তাঞ্জোরের রাজা হঠাৎ মারা গেলেন এবং রাজহস্তী রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই রাজার সন্ধানে ছুটে এসে নগরের বাইরে অবস্থিত মন্দির-প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণকে মালা পরিয়ে রাজপ্রাসাদে তুলে নিয়ে এল এবং অচিরে ব্রাহ্মণের তাঞ্জোরের রাজপদে অভিষেক সম্পন্ন হলো। কিছুক্ষণ পরেই ব্রাহ্মণ-রাজা তাঁর প্রাপ্য অপর তিনটি বরের কথা স্মরণ করলেন। প্রথমে চাইলেন, তাঁর দেহের সমস্ত কলঙ্কচিহ্ন মিলিয়ে যাবে এবং তিনি সুদর্শন হবেন। দ্বিতীয়ত, তিনি সমকালীন শ্রেষ্ঠ বিদ্বান বলে প্রসিদ্ধ হবেন এবং তৃতীয়ত, যখন প্রয়োজন হবে তখন আরো তিনটি বর লাভ করার অধিকারী হবেন। মুহূর্তমধ্যে ব্রাহ্মণ-রাজা তাঁর ইচ্ছামতো সুপুরুষ বিদ্বান ব্যক্তিতে পরিণত হলেন এবং রাজকুমারী তাঁকে দর্শনমাত্র প্রেমমুগ্ধ হয়ে স্বেচ্ছায় পতিত্বে বরণ করলেন। কিছুদিন তিনি সুখে থাকলেন বটে, কিন্তু অচিরেই সেই সমস্ত সুখে ক্লান্তি ও বিরক্তি এল এবং আবার তিনি ভিন্ন ভিন্ন সুখ কামনা করতে লাগলেন।

বাকি পাওনা তিনটি বরের কথা মনে হতেই এবার ব্রাহ্মণ-রাজা প্রথমে কামনা করলেন যে, তিনি সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট হবেন; দ্বিতীয়ত, তাঁর একহাজার রানী হবে—যারা প্রত্যেকেই আগের স্ত্রীর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী হবে এবং

তারপরেও আরো তিনটি বর তাঁর ইচ্ছামত পাওনা থাকবে। মহাদেবীর বরে সবকিছুই তিনি লাভ করলেন, কিন্তু তবুও তিনি সুখী হতে পারলেন না। অগত্যা তিনি আবার বাসনা করলেন, তিনি যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জ্ঞান লাভ করেন—ক্ষুদ্রতম প্রাণী থেকে সুদূর তারকামণ্ডলী পর্যন্ত যাকিছু অবস্থিত, সমস্ত রহস্য ও অলৌকিক ঘটনাবলী জানতে পারেন এবং পূর্বের আরব্ধ সমস্ত সিদ্ধি কার্যকর করতে পারেন। সর্বশেষে তাঁর ইচ্ছামত আরো তিনটি বর পাওনা থাকবে। আবার তাঁর কামনা পূর্ণ হলো এবং সমস্ত জগৎ তাঁকে অলৌকিক পুরুষ এবং ঈশ্বরের অবতার বলে জানল, কিন্তু তথাপি তিনি অন্তরে কোন সুখ অনুভব করলেন না।

ব্যক্তিগত বিপর্যয়, সাংসারিক অশান্তি, গৃহযুদ্ধ এবং তাঁর প্রতিষ্ঠা অনুযায়ী বিভিন্ন সুখ-সমৃদ্ধি-যন্ত্রণা, হর্ষ-বিষাদ ইত্যাদি ক্রমাগত তাঁর মনের শান্তির ব্যাঘাত ঘটাতে লাগল এবং তিনি ক্রমান্বয়ে কখনো আহ্লাদিত, ব্যথিত, বিপর্যস্ত, আবার কখনো ক্রোধান্বিত অথবা উৎফুল্ল বোধ করতে লাগলেন। তাঁর মন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নদীতে পতিত খড়কুটোর মতো এমনি অবস্থায় উপনীত হলো, যার ফলে তাঁর জীবন থেকে সমস্ত আনন্দ নিঃশেষ হয়ে গেল। তিনি সমুদ্রজয় করলেন, বায়ু-ভ্রমণ করলেন, তবু সুখী হলেন না; কারণ সেইসমস্ত সুখ অচিরেই পুরনো হয়ে গেল এবং যদি কোন একটা বিষয় তাঁর আনন্দের কারণ হলো, তবে অন্য দশটি তাঁর মনের শান্তির বিঘ্ন ঘটাল। যারা তাঁর কাছে আসত, তাদের মনের কথা তিনি জানতে পারতেন, কিন্তু যে স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা, অহঙ্কার তাদের ব্যবহারে প্রকাশ পেত—সেসমস্তই যেন তাঁর নিজের কৃত বলে মনে হতো এবং তার ফলে তাঁর জীবন মহাকালীর বরলাভের আগের অবস্থা থেকেও কদর্য ও অসহনীয় বলে মনে হলো। তিনি এত অসুখী বোধ করতে লাগলেন যে, এই জীবন আর রাখতে চাইলেন না, যা মহাদেবীর বরে আরো অনেক কাল নিজের ইচ্ছামত তিনি ভোগ করতে পারতেন। তিনি জীবনে সুখলাভ করার অনেক উপায় চিন্তা করলেন, এমনকি আত্মহত্যা করার কথাও ভাবলেন, কিন্তু পাছে আবার জন্মলাভ করে এই দুঃখময় জগতে একই অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়—সেই ভয়ে তাও করতে অপারগ হলেন। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, স্বর্গ-মর্ত্য, জল-স্থল-অন্তরীক্ষ—কোথাও তিনি শান্তি পেলেন না। তিনি চাইলেন মনের চিরশান্তি ও সুখ, কিন্তু এই পৃথিবীতে কোথাও তা খুঁজে পেলেন না।

অবশেষে একসময় হঠাৎ তাঁর মনে হলো যে, হয়তো তাঁর নিজের অন্তরের মধ্যেই কোথাও শান্তির আশ্রয় আছে এবং হয়তো সমস্ত কামনা-বাসনা পরিত্যাগ করলে তিনি পরমশান্তি লাভ করতে পারেন। কিন্তু তা কি সত্যই সম্ভব?

কিন্তু মনের কামনা-বাসনা কি করে পরিত্যাগ করা যাবে? তিনি ভাবতে লাগলেন, তা কি অনন্ত নিদ্রায় নিজেকে সুপ্ত রেখে—যেখানে এমনকি স্বপ্নও প্রবেশ করতে পারবে না, তাতেই কি হবে সমস্ত অশান্তির সমাপ্তি? এমন কিছুই কি আর চাইবার থাকবে না, পেতে স্পৃহা হবে না—যা পেলে সমস্ত কিছুই পাওয়া যায়? তিনি বারংবার নিজেকে এই প্রশ্ন করলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই ভেবে পেলেন না এমন কোন জিনিস আছে যা তিনি কখনোই লাভ করেননি বা পাননি—কিংবা না পাওয়ার ব্যথা অনুভব করেছেন। এই নিরাশা আর মহা-অন্ধকারের মাঝখানে তিনি যেন হঠাৎ একটু আলোর ঝলকানি দেখতে পেলেন, হঠাৎ আবার তাঁর মনে হলো—তিনি তখনো তো সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সত্য জানতে পারেননি—কে এই সমস্ত অপূর্ব সৃষ্টির কর্তা ও স্রষ্টা? কে অথবা কি তিনি? তিনি কেমন? তৎক্ষণাৎ এই সত্য জানার এক অত্যুগ্র বাসনা তাঁর অবসাদগ্রস্ত মনকে এক নতুন প্রেরণা জাগাল। এই মানসে তিনি তাঁর দেবীর তিনটি অব্যবহৃত বরদানের কথা স্মরণ করে প্রথমে মনের অখণ্ড শান্তি ভিক্ষা করলেন। দ্বিতীয় বরে সেই সৃষ্টিকর্তার স্বরূপ জানতে চাইলেন এবং তৃতীয় বর তাঁর প্রয়োজনমতো ব্যবহার করার জন্য আরো তিনটি বর কামনা করলেন। মুহূর্তমধ্যেই শক্তিমতী দেবীর প্রসাদে এক অনির্বচনীয় আনন্দে তাঁর হৃদয় পূর্ণ হয়ে গেল এবং তিনি অনুভব করলেন যে, মহান ও মহাশক্তিধর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা তাঁর নিজের হৃদয়ের মধ্যেই বিরাজিত—যিনি তাঁরই নিজস্ব সত্তা। যখন তাঁর এই বোধ নিশ্চিত হলো, তখন পূর্বের সমস্ত কিছু জ্ঞান, সিদ্ধিলাভ, তাঁর রাজ্যপাট, সুন্দরী স্ত্রীগণ, তারকারাজি—যার মধ্যে তিনি ভ্রমণ করেছেন, তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-যন্ত্রণা মুহূর্তমধ্যেই বোধ ও দৃষ্টি থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেল। তাঁর মনে হলো যে, এতদিন তিনি যা দেখেছেন, যা জেনেছেন তা ছিল এক স্বপ্নমাত্র এবং সেইসময় যে আনন্দলাভ অথবা যন্ত্রণা পেয়েছেন তা ছিল সম্পূর্ণ সাময়িক এক মায়া আর বিভ্রম—যার কারণ ও স্রষ্টা ছিলেন তিনি নিজেই। তিনি অনুভব করলেন, সমস্ত সৃষ্টি অথবা ধ্বংস—সবই মায়া, যার সত্যিকারের কোন অস্তিত্বই নেই। তখন তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে চীৎকার করে বলে উঠলেনঃ 'আমিই আনন্দময়', 'আমিই সত্য', 'আমিই ঈশ্বর'। 'আমি ছাড়া কিছুই নেই।'

বহুদিন পর দেবী মহাকালী সেই ব্রাহ্মণকে আবার দর্শন দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কেন সে আজও তাঁর প্রদত্ত শেষ তিনটি বর এখনো ব্যবহার করেনি। ব্রাহ্মণ বললেনঃ "আমি এখন সেই সম্পদ লাভ করেছি, যার পর আর কিছুই চাইবার থাকে না। আমি সর্বজ্ঞানকে অনুভব করেছি। যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ ও সর্বশ্রেষ্ঠ লোক এবং মহানন্দলাভ করেছি, তারপর আর কোনকিছুই আকাঙ্ক্ষা থাকে না। আমার এখন একমাত্র ইচ্ছা যে, আমি যেন সমস্তক্ষণ এইরূপ দিব্যানন্দে মগ্ন থাকি, আমি যেন সমস্ত কামনা-বাসনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকি। আপনি আমায় কৃপা করুন।"

দেবী মহাকালী ব্রাহ্মণকে আশীর্বাদ করে বললেন—'তথাস্তু'। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ❑

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

সমাজবাদ হলো চিরায়ত জীবনদর্শন

অসীমকুমার চৌধুরী

১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান দ্রুত উন্নতির প্রেক্ষায় পাশ্চাত্যের একদল বুদ্ধিজীবী বলতে শুরু করেছিলেন যে, মতাদর্শের প্রয়োজন ফুরিয়ে আসছে। তাঁদের বক্তব্যের শিরোনাম ছিল—'The End of Ideology'। তারপর ১৯৯০-এর দশকের গোড়ায় যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেল, তখন সেই বুদ্ধিজীবীরা মন্তব্য করলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের যে পতন ঘটল, তার ফলে দুনিয়া মতাদর্শের নিগড় থেকে মুক্তি পেল। অবাধ অর্থনীতির পুনরাবির্ভাবের পথে আর কোন বাধা রইল না।

কিন্তু সমগ্র বিষয়টি অত সহজ-সরল নয়। এর মধ্যে বেশ কিছু প্রশ্ন রয়েছে, খানিকটা চালাকিও জড়িয়ে আছে। প্রথমত, লেনিনের ইচ্ছামন্ত্রের জোরে ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর একটি সামরিক বাহিনীর সাহায্য নিয়ে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত গণপরিষদ্ ভেঙে দিয়ে বলশেভিক পার্টি যেভাবে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেছিল, তাকে সত্যিকার 'বিপ্লব' বলা যায় কি? এই ঘটনাকে বিপ্লব বলে চালানোর জন্য প্রচুর ঢাকঢোল পেটানো হয়েছে, তাকে মার্ক্সীয় বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড বলে অভিহিত করা হয়েছে, বিপ্লবোত্তর নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থার সংবিধানকে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তথাপি সেই ঘটনাটি না ছিল প্রকৃত বিপ্লব, না ছিল কার্ল মার্ক্সের মত ও পথ অনুসারী কোন কর্মকাণ্ড। কার্ল মার্ক্সের কথা অনুসারী কমিউনিস্ট বিপ্লবের উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল পাশ্চাত্যের শিল্পায়িত উন্নত দেশগুলি—কৃষিপ্রধান অনুন্নত দেশ নয়। তিনি বলেছিলেন, পুঁজিবাদী উৎপাদনব্যবস্থার প্রসার ও ক্রমোন্নতি শিল্পায়িত সমাজকে ধীরে ধীরে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করবে—মালিক শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণী। শ্রমিক শ্রেণী তাদের উৎপাদন থেকে যত আত্মচ্যুত (alienated) হতে থাকবে, তত বেশি তাদের মধ্যে শ্রেণীচেতনা জাগতে থাকবে। এই আত্মচ্যুত শ্রমিকশ্রেণীই তাদের সচেতনতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিজেদের সুসংহত করে শোষকদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘাতের মধ্য দিয়ে নতুন সমাজের উদ্বোধন ঘটাবে। সেটাই হবে নিষ্পেষিত মানুষের মুক্তির সূচনা। চেতনা, মুক্তি—এসব একান্তভাবে আধ্যাত্মিক বিষয়। এখানে বস্তুতান্ত্রিকতা প্রধান নয়। অনাহার, দারিদ্র্য, নিষ্পেষণ—এগুলি নিশ্চয়ই বাইরের ব্যাপার অর্থাৎ বস্তুগত। কিন্তু এই বাইরের ঘটনা যে অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি করে, তার কোন বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা হয় না। সামান্য পশুও খিদে পেলে কেড়ে খায়, পেট ভরে গেলেই তৃপ্ত হয়। কিন্তু বস্তুগত তৃপ্তি মানুষের জীবনের শেষকথা নয়, কারণ মানুষ আবেগোচ্ছল বুদ্ধির (emotional quotient) দ্বারা পরিচালিত হয়। একজন সন্ন্যাসী হয়তো গুহায় বসে আত্মমোক্ষ লাভের জন্য তপস্যা করতে পারেন, কিন্তু সাধারণ সামাজিক মানুষের পক্ষে তো সে-পথে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই তারা 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' অভীপ্সা নিয়ে কাজ করতে চায়, আর তাতে সার্থক হলেই তাদের মোক্ষলাভ বা কার্ল মার্ক্সের কথায় তাদের 'আত্মচ্যুতি'র অবসান।

কিন্তু নিজেদের বিপ্লবের সাধ মেটানোর জন্য লেনিন-স্তালিন মার্ক্সের চিন্তার দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিলেন এবং সবটাই বলশেভিক বা কমিউনিস্ট পার্টি সংজ্ঞায়িত শ্রেণী তৎপরতার সঙ্গে জুড়ে দিলেন। তার সঙ্গে মার্ক্সের আত্মচ্যুতি মুক্তির দর্শনের যোগ কোথায়? সেইজন্য বলা হয়, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলশেভিজম্ লেনিনবাদের দর্শন, কার্ল মার্ক্সের দর্শন নয়। মার্ক্সের দর্শন হলো মানুষের দর্শন। কিন্তু লেনিন-স্তালিনপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি জীবনের সকল ক্ষেত্রকেই শ্রেণী বিশ্লেষণের আওতায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন-সহ সব দেশেই লেনিনের ও তৃতীয় আন্তর্জাতিকের (Third International) নীতি মেনে গণতন্ত্রবিহীন অতিকেন্দ্রিক শৃঙ্খলাপরায়ণ দল গড়ে তোলা হয়েছে; এই দল আসুরিক, এখানে মানবিকতার ছিটেফোঁটাও নেই। অর্থাৎ মার্ক্স শিব গড়তে চাইলেন, ওঁরা বাঁদর গড়ে দিলেন। কথাগুলো কটু শোনাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সমাজতন্ত্রের নাম নিয়ে সমগ্র বিশ্বে কমিউনিস্ট শাসনের যে-চেহারা আমরা দীর্ঘ সাত দশক ধরে দেখেছি, তাকে আর যে-নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, মানুষের মুক্তির ইতিহাস বলে বর্ণনা করা যাবে না। কমিউনিস্ট শাসনের এই ইতিহাসটি অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী স্বল্পকথায় বড় সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন: "সাম্যবাদী দুনিয়ার যে অবক্ষয় ও পতন হলো, তার অন্যতম কারণ এই: নামে 'শ্রমিকরাজ' হলেও ওখানে সৃষ্টি হলো এক নতুন শাসকশ্রেণী (New Class)। দলের পাণ্ডারা ও আমলাতন্ত্র হাতে হাত মিলিয়ে গড়ে তুলল এক নতুন অভিজাত শোষকশ্রেণী। এদের হাতেই দেশের সম্পদের মালিকানা। এঁরাই সমাজজীবনের সর্বক্ষেত্রে মাতব্বরি করেন, কর্তামি করেন। এঁরাই পার্টির নাম ভাঙিয়ে খুঁটে খুঁটে খান। অথচ এই নতুন সুবিধাভোগী শাসকশ্রেণী ভুলে গেলেন যে, 'জনগণই শক্তির উৎস'। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এঁরা ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত সুখ-সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য নিয়েই মেতে রইলেন; আর জনগণ গেল নেপথ্যে। শেষপর্যন্ত এই নতুন শ্রেণীও ইতিহাসের মার খেয়ে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে উধাও হলো।"

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

সুতরাং যে-পণ্ডিত যে-কথাই বলুন না কেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্ক্সের দর্শন তথা সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদ থেকে ছিল বহু বহু দূরে। মার্ক্স 'Economic And Philosophical Manuscripts 1844' গ্রন্থে কমিউনিজম বা সাম্যবাদের বর্ণনায় বলেছেন: "Communism is the positive transcendence of private property, as human self-estrangement, and therefore as the real appropriation of the human essence by and for man. Communism, therefore, as the complete return of man to himself and as a social (i.e. human) being—a return become conscious and accomplished within the entire wealth of previous development." অর্থাৎ মার্ক্সের মতে সম্পত্তিলোভী, পণ্যভোগাসক্ত, শ্রমবিভক্ত সমাজে মনুষ্য-স্বরূপের শুধুই খণ্ডিত প্রকাশ। সংসারের কর্মশালায় মানুষ তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজে নিজেকে নিযুক্ত রেখে দিনযাপনের গ্লানি বহন করে চলেছে। আনন্দহীন এই সমাজে মানুষের আমন্ত্রণ নেই, কিন্তু কমিউনিজম হবে এমন এক সমাজ—যেখানে মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হবে, মানুষ ফিরে যাবে স্ব-স্বরূপে, যেখানে আত্মচ্যুতি-মুক্ত মানুষ সাত্ত্বিকতায় হবে অধিষ্ঠিত। কিন্তু কোথায় কী! বস্তুবাদীরা এসব কথা বোঝেন না, বোঝার চেষ্টাও করেন না।

'বস্তুবাদী' বলতে কেবল কমিউনিস্টদের কথাই বলছি না, পাশ্চাত্যের তথা আমাদের এই ভারতবর্ষেরও যেসমস্ত মানুষ অবাধ অর্থনীতির পুনরাগমন হতে চলেছে বলে দুহাত তুলে নাচছেন এবং তাকেই 'বিশ্বায়ন' বলে সাধারণ্যে প্রচার করছেন, তাঁদের উদ্দেশেও বলা যায় যে, সমাজতন্ত্রের আসল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে অন্য জায়গায়। 'কমিউনিস্ট টোটালিটেরিয়ানিজম' বা সর্বগ্রাসী ব্যবস্থাকে কমিউনিস্টদের মতো পুঁজিবাদীরাও সমাজতন্ত্র বলে অভিহিত করেছিলেন, তাকে আক্রমণ করেছিলেন। আসলে তা ছিল শূন্যে ঘুষি ছোঁড়ার মতো ব্যাপার, কারণ তারা ভালই জানতেন স্বৈরাচারী সর্বগ্রাসী শাসন বেশিদিন টেকে না। তাঁদের সত্যিকার মোকাবিলা করতে হবে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সঙ্গে। গণতান্ত্রিক সমাজবাদই হলো প্রকৃত সমাজতন্ত্র। পুঁজিবাদীরা খরগোশের মতো গর্তের মধ্যে মুখ লুকিয়ে আর পার পাবেন না। টোটালিটেরিয়ানিজমের অবসানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সম্মুখ সমরে উপনীত হয়েছে। কিন্তু কোনরকম বলপ্রয়োগের দ্বারা এই গণতান্ত্রিক সমাজবাদের মোকাবিলা করা যাবে না; কারণ এই *আদর্শ* মানুষ ও তার নিরবচ্ছিন্ন সুস্থ বিকাশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বলতে আমরা কী বুঝি, সে-সম্পর্কে কিছু আলোচনা এখানে আবশ্যিক হয়ে পড়ে। প্রথমত মনে রাখতে হবে যে, গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সর্বজনীনভাবে প্রয়োগযোগ্য কোন ফর্মুলা নেই। সমাজবাদের মূল আদর্শ যদিও ভারতবর্ষের প্রাচীনতম শাস্ত্র বেদ-উপনিষদে ছড়িয়ে রয়েছে, তবু এখনি সেকথায় যাচ্ছি না। আধুনিক যুগে 'সোস্যালিজম্' বা সমাজবাদ বলতে যা বোঝায়, তার উদ্ভব ঘটেছে উনিশ শতকের ইউরোপে। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে যে রাজনৈতিক আদর্শটি প্রসারলাভ করেছিল তা হলো গণতন্ত্র—সাধারণ কথায় উদারনৈতিক গণতন্ত্র। ইউরোপে যে-ব্যবস্থাটি তিনশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিবর্তিত হতে হতে উনিশ শতকে যে-চেহারা পেয়েছিল, তাকে মার্ক্সীয় পরিভাষায় বলা হলো 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র'। তারই বিকল্প হিসাবে গড়ে উঠল কমিউনিস্ট তথা মেহনতি জনগণের গণতন্ত্র বা 'Dictatorship of the Proletariat'। কার্ল মার্ক্স 'Paris Commune (1871)' গ্রন্থে 'Dictatorship of the Proletariat' বা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের যে চরিত্রচিত্রণ করেছিলেন তা হলো—এই কমিউন গণতান্ত্রিকভাবে গঠিত একটি সংগঠন, যার অধিকাংশ সদস্যই শ্রমিকশ্রেণীর স্বীকৃত প্রতিনিধি। এই কমিউনে দেশের তথাকথিত সম্মানীয় ব্যক্তিদের কোন ভূমিকা তো নেইই, এমনকি পুলিসের হাত থেকেও সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাদের কমিউনের অস্থায়ী এজেন্ট বা কর্মচারীতে রূপান্তরিত করা হয়। মার্ক্স অবশ্য বলেছেন যে, শ্রমিকশ্রেণী কমিউনের কাছ থেকে অলৌকিক কিছু ঘটিয়ে দেওয়ার আশা করে না। তারা জানে, সমাজ অপ্রতিরোধ্যভাবে যে উন্নততর অবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং যার সঙ্গে তাদের মুক্তির প্রশ্নটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে—তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য শ্রমিকদের দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যেতে হবে এবং পর্যায়ক্রমিক এই ঐতিহাসিক অগ্রগমনের পথ ধরেই মানুষ ও তার পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটবে। কিন্তু ১৯১৭ সালে সোভিয়েত বিপ্লবের পর লেনিনের নেতৃত্বাধীন বলশেভিক পার্টি যখন শ্রমিকশ্রেণীর নামে সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নিল এবং সবকিছুকে শ্রেণীস্বার্থ দিয়ে বিশ্লেষণ করা শুরু করল, তখন গণতন্ত্র দুভাগ হয়ে গেল—'বুর্জোয়া গণতন্ত্র' ও 'মেহনতি জনগণের গণতন্ত্র'। দ্বিতীয় পন্থীদের বক্তব্য ছিল—গণতন্ত্রে যে আলাপ-আলোচনার কথা বলা হয়, তা আসলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার এক নেতিবাচক কর্মপন্থা। বুর্জোয়াদের সঙ্গে কোন আলাপ-আলোচনা চলে না, বুর্জোয়া ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে পারলেই 'প্রকৃত' গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, যা নাকি সোভিয়েত ইউনিয়ন করেছিল।

কিন্তু উনিশ শতকের শেষের দিকেই এডওয়ার্ড বার্নস্টাইন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, পশ্চিম ইউরোপে গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদের বিকাশ শ্রেণীবিভক্তি ঘটিয়ে সঙ্কটসৃষ্টির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে কখনো বিপর্যস্ত করছে না। সর্বহারাদের দুর্দশা না বেড়ে তাদের

আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছিল গণভোট-নির্ভর গণতান্ত্রিক সমাজে। উপরন্তু, বৃত্তি ও পেশাজীবী এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব শুরু হয়েছিল, যার ফলে ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যবর্তী নগ্ন বৈপরীত্য ক্রমশ অপসৃত হচ্ছিল। ট্রেড ইউনিয়নগুলি সুসংগঠিত হচ্ছিল এবং তারা বাঁচার মতো মজুরি ও অন্যান্য দাবি নিয়ে যৌথ দর-কষাকষির (collective bargaining) মতো নানা ধরনের শান্তিপূর্ণ সংগঠিত আন্দোলন শুরু করেছিল। বর্ধিত আর্থিক ও রাজনৈতিক সুযোগ পেয়ে শ্রমিকশ্রেণী ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য জায়গায় সোস্যাল ডেমোক্রেটিক বা লেবার পার্টির মতো নিজেদের রাজনৈতিক দল গড়ে তুলেছিল এবং নিজেদের শক্তির ওপর নির্ভর করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাও শুরু করেছিল। এই 'অ-বিপ্লবী' পথকে মার্ক্স নিজেও উনিশ শতকের সত্তরের দশকের শুরুতে তাঁর 'হেগ ভাষণে' স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন। তাঁর দিক থেকে সেটাই স্বাভাবিক ছিল, কারণ তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের আত্মচ্যুতিমুক্তি ঘটানো—ফর্মুলা তৈরি নয়। তিনি নিজেই লিখে গেছেন যে, মক্ষিকারাও একরকমভাবে একই মাপের চাক গঠন করে না। অতএব তাঁকে অনুসরণ করে বলা যেতে পারে যে, ফর্মুলা রচনা করে সামাজিক পরিবর্তন ঘটানোর প্রচেষ্টা বাতুলতা।

গণতন্ত্রের পথ ধরেই যে সামাজিক রূপান্তর ঘটবে—একথাটা বার্ণস্টাইন পরিষ্কারভাবে বলেছিলেন। তাঁর এ-বক্তব্যের জন্য তাঁকে 'শোধনবাদী' (revisionist) বলে গালাগাল দেওয়া হলেও ইউরোপের ইতিহাস বার্ণস্টাইনের বক্তব্যকেই সমর্থন করেছিল। কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা জানেন যে, ইউরোপের শিল্পসভ্যতা 'সম্পন্ন সমাজ' গড়ে তুলতে সক্ষম হলেও এমন সমাজ এখনো নির্মাণ করতে পারেনি যেখানে শোষণ ও বঞ্চনা নেই। তবে সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার পথও যে রুদ্ধ হয়ে যায়নি, তাও তারা জানেন। কারণ মতান্ধতা বা গুরুবাক্য অনুপস্থিত থাকায় গণতান্ত্রিক সমাজবাদ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির সঙ্গেও নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে। গণতান্ত্রিক সমাজবাদের জোর যে কতখানি তার উল্লেখ করেছেন ডঃ বি. বিবেকানন্দন তাঁর এক গবেষণামূলক নিবন্ধে। তাঁর সেই গবেষণা সুইডেনের ওপরে। তিনি লিখেছেন—যদিও সেদেশে যন্ত্রশিল্পের মাত্র ৮ শতাংশ লোক-উদ্যোগের হাতে রয়েছে (তার মধ্যে ৫ শতাংশ সমবায়িক উদ্যোগের হাতে), তথাপি লোক-উদ্যোগ জাতীয় আয়ের প্রায় ৬৫ শতাংশ সৃষ্টি করে এবং সুইডেনে জাতীয় আয়ের ৪৫ শতাংশ অর্থ সামাজিক ব্যয়ের জন্য ধার্য করা হয়। সেখানে আয়ের বৈষম্যকে (নিম্নতম ও উচ্চতম আয়ের গড়) ১:৪-এ নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। আর এসমস্ত কিছুই সম্পন্ন হয়েছে গণতন্ত্রকে কোনরকম সঙ্কুচিত না করে। ঘটনা হলো, বর্তমান বিশ্বে মুষ্টিমেয় যে কয়টি মুক্ততম গণতন্ত্র রয়েছে, সুইডেন তাদের অন্যতম। সেদেশের নাগরিকদের জীবনযাত্রার মানও অত্যন্ত উঁচু।

কারো কারো মনে হতে পারে যে, গণতান্ত্রিক সমাজবাদ এত জোর পেল কোথা থেকে? এই প্রশ্ন ওঠার আগেই বলা হয়েছে, অ-মতান্ধতাই গণতান্ত্রিক সমাজবাদের সবচেয়ে বড় জোর। এর ফলে বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী সমাজতন্ত্রের মূল নীতিগুলো সৃষ্টিশীল ও ফলপ্রসূভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব। স্বাধীনতা, সাম্য, সুবিচার, সদাচার ও সংহতির জন্য মানুষের যে-আকাঙ্ক্ষা, সেখানেই নিহিত রয়েছে সমাজতন্ত্রের শিকড়। সমাজতন্ত্র যতখানি আর্থ-সামাজিক, ঠিক ততখানিই নৈতিক ও সাংস্কৃতিক। অধুনালুপ্ত প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির 'গয়া থিসিস'-এ (১৯৫৫) এই সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতা এবং সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। 'সংস্কৃতি' কথাটি আর কোন রাজনৈতিক দলের থিসিসে এত পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়নি। সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতার সূত্র ধরেই সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিষয়টি এসেছে।

এই প্রসঙ্গে গয়া থিসিসের প্রাসঙ্গিক অংশটি উল্লেখ করা আবশ্যিক। সেখানে বলা হয়েছে—সমাজবাদী নৈতিক আইন হলো মানবিক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক। এটি মানবিক, কারণ মানুষের জীবন নিয়েই তার কারবার, মানবপ্রকৃতিতেই তা প্রোথিত এবং মানবিক প্রয়োজন ও অভিজ্ঞতাই তাকে জন্ম দিয়েছে। এটি সামাজিক, কারণ এটি হলো সামাজিক শৃঙ্খলাবিধি এবং তা সামাজিক মানুষের মনস্তাত্ত্বিক সৃষ্টি। এটি ঐতিহাসিক, কারণ মানুষের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তা বিবর্তিত হয়েছে এবং ইতিহাস-নির্ধারিত প্রয়োজন ও শর্তাবলীর দাবিতে তা পরিবর্তিত হয়েছে। প্রকৃত মানবিক নৈতিকতার জন্য আবশ্যক পূর্ণ সামাজিক সচেতনা যা কেবল শোষণহীন, আধিপত্যহীন সমাজেই মানুষ গড়ে তুলতে পারে। সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, নৈতিকতার সমস্যাটিকে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখতে হবে। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করলে বুঝতে পারা যায়, অর্থনৈতিকভাবে বিভক্ত সমাজে প্রকৃত মানবিক নৈতিকতাবোধ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। কারণ, সেখানে আধিপত্যকারী শ্রেণীর স্বার্থভিত্তিক নৈতিকতাকেই সাধারণ নৈতিকতা বলে চাপিয়ে দেওয়া হয়। অতএব অকৃত্রিম সুস্থ নৈতিকতাবোধ গড়ে তোলার জন্য চাই শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজ। গণতান্ত্রিক সমাজবাদের লক্ষ্য সেটাই।

এবারে প্রাচীন ভারতের কথায় আসা যাক। সমাজতন্ত্র বা সমাজবাদ—এই শব্দদুটির কোনটি ব্যবহৃত না হলেও বেদ-উপনিষদের পুরোটাই সমাজবাদের কথা। উপনিষদের ঋষিরা যেভাবে সমাজবাদ এবং গণতন্ত্রের কথা ভেবেছেন, জাতিসত্তাকে স্বীকৃতি দিয়েও মানুষকে আন্তর্জাতিকতার

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

চেতনায় দীক্ষিত করতে চেয়েছেন, তার কোন তুলনা নেই। আজ আমাদের দেশে যারা পাশ্চাত্য থেকে আমদানি করা বিশ্বায়ন নিয়ে নাচানাচি করছেন, তাঁরা কিন্তু এক অর্থে শিকড়হীন। কারণ তাঁরা জানেন না, হাজার হাজার বছর আগে বৈদিক ঋষিরা স্বপ্ন দেখেছিলেন—"যত্র বিশ্বং ভবতি একনীড়ম্‌" অর্থাৎ যখন গোটা পৃথিবীটা একটি গৃহ হবে, একটি পরিবার হবে। ভারতবর্ষের ঋষিরা যে পরম প্রার্থনা উচ্চারণ করেছিলেন তা হলো—"সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ"—জগতে সবাই সুখী হোক। "সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ"—সকলে নিরাময় হোক। "সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু"—সকলে যেন মঙ্গল দেখে। "মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ"—এই পৃথিবীর মধ্যে সকলে দুঃখরহিত হয়ে সুখে থাকুক। প্রাচীন ঋষিদের এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যে ভালবাসার প্রকাশ ঘটেছে, তাই হলো সমাজবাদের মূল সুর।

স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম ভারতীয়, যিনি নিজেকে 'সোস্যালিস্ট' বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার সঙ্গে তাঁর সম্যক পরিচয় ঘটেছিল। অ্যানার্কিজম, নিহিলিজম, সোস্যালিজম, কমিউনিজম প্রভৃতি সব আন্দোলনের সাহিত্য তিনি পড়েছিলেন। ১৯০০ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে পিটার ক্রপোটকিনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও কথাবার্তা হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে তখন প্লেখানভের যে সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি সক্রিয় ছিল, তাদের আন্দোলন সম্বন্ধেও তিনি অবহিত ছিলেন। এসমস্ত আন্দোলনেরই কিন্তু সেসময়ে শৈশব অবস্থা। তথাপি আজ থেকে একশ বছর আগে স্বামীজী ঘোষণা করলেন যে, কোন না কোন ধরনের সমাজতন্ত্র পৃথিবীর বুকে এগিয়ে আসছে—যে-ব্যবস্থায় নিচুতলার মানুষ 'স্বধর্ম' বজায় রেখে অর্থাৎ 'বুর্জোয়াদের ধর্ম' গ্রহণ না করে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করবে। তিনি বলেছিলেন যে, 'নতুন মানুষ'-এর শাসন অর্থলোলুপ ভোগসর্বস্ব লোভী সমাজ গড়ে তুলবে না। দুনিয়ার হালচাল এবং সেদিনের ভারতবর্ষের অবস্থা দেখে তিনি বুঝেছিলেন যে, সমগ্র মানবসমাজের 'মৌলিক রূপান্তর' প্রয়োজন।

কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি একথাটিও বলতে ছাড়েননি যে, পাশ্চাত্যের সোস্যালিজম্‌ হলো 'আধখানা রুটি'। আজ পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক সমাজবাদীরা বুঝতে পারছেন, সেখানে 'সম্পন্নসমাজ' গড়ে উঠলেও শোষণমুক্ত বঞ্চনাহীন সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি, কিন্তু সেটা যে সম্ভব হবে না—সেকথা একশ বছর আগেই স্বামী বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন। কারণ, 'আধখানা রুটি' দিয়ে গোটা সমাজের পেট ভরানো তো যায়ই না, শেষপর্যন্ত তা মুষ্টিমেয়র দখলেই চলে যায়। অথচ তাদের জানা নেই যে, কেমন করে ঐ 'আধখানা রুটি'কে একটা গোটা রুটিতে পরিণত করা যায়। বেদ-উপনিষদের শিক্ষায় সমৃদ্ধ স্বামী বিবেকানন্দ জানতেন যে, বস্তুতান্ত্রিকতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণ ঘটাতে পারলেই আধখানা রুটি গোটা রুটিতে পরিণত হবে। আসলে যেটা চাই সেটা হচ্ছে শিক্ষা, উপলব্ধি এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ। তাই তো তিনি প্রাচ্যের বৈদান্তিক আদর্শের সঙ্গে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানকে মিলিয়ে নতুন সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন। টোটালিটেরিয়ানিজমের পতন, ভোগবাদের দুঃখজনক পরিণতি আজ আমাদের স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় ফিরিয়ে এনেছে। একশ বছরেরও বেশি আগে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'বর্তমান ভারত' নিবন্ধে ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবন সম্পর্কে যে-কথা কয়টি বলেছিলেন, সেটাই আমাদের মেনে চলার চেষ্টা করতে হবে: "সমষ্টির জীবনে ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি। অনন্তর সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু—পালনে অমরত্ব।" আজ দুনিয়াজুড়ে যে-ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে, সবই আমাদের অপরিণামদর্শিতার ফল। সারা পৃথিবীতে যে-পরিমাণ খনিজ তেল রয়েছে তাতে চল্লিশ বছরও চলবে না, যে-পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে তা পঁয়ষট্টি বছরের মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যাবে। পাশ্চাত্যের গবেষকরাই বলছেন, ধনী দেশের মানুষ যদি ভোগের পরিমাণ না কমায় তাহলে দুনিয়া জুড়ে খাদ্যাভাব দেখা দেবেই। তাই আমাদের বাঁচতে হলে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ-এর সাহায্য নিতে হবে—যেখানে রয়েছে পরিবেশকে সজীব ও সতেজ রেখে আধ্যাত্মিকতায় জারিত বস্তুগত উন্নয়নের কথা। ❑

রচনাসূত্র

(১) Economic And Philosophical Manuscripts, 1844—Karl Marx

(২) Paris Commune, 1871—Karl Marx

(৩) স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়

(৪) প্রবন্ধ সংগ্রহ—সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১ম ও ২য় খণ্ড, শিক্ষা সংস্কার সমিতি, কলকাতা

(৫) গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ও সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী কমিউনিজম এক নয়—প্রেম ভাসিন, 'সমাজবাদী ভাবনা', ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৯৬

(৬) বিষয় সমাজতন্ত্র, 'সমাজবাদী ভাবনা', ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯৯

(৭) সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হলো মানুষকে পূর্ণাঙ্গ করে তোলা—স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, 'সমাজবাদী ভাবনা', ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৯৯

(৮) Contemporary Socialism And Analysis—(Ed.) A. K. Panda, Pradip Bose, B. Vivekanandan, Harman Publishing House, New Delhi, 1992

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

মল্লিকবাড়ির সোনার প্রতিমা

সৈকত হালদার

৮৮৩ সালের ২১ জুলাই এক ঐতিহাসিক দিন। এই দিন শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন উত্তর কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার মল্লিকবাড়িতে সিংহবাহিনীদেবীর দর্শনে। ঠাকুরদালানে মায়ের উজ্জ্বল রূপ দেখে ঠাকুরের ভাবসমাধি হয়। সেই পবিত্র দিনটি স্মরণ করে পাথুরিয়াঘাটার মল্লিকবাড়িতে প্রতি বছর উৎসবের আয়োজন করা হয়। আজও মল্লিকবাড়ির বংশধররা ঐ পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত দিনটিতে পালা করে সিংহবাহিনীর পূজা করে চলেছেন। সিংহবাহিনী মূর্তিটি প্রায় ৪০০ বছরের প্রাচীন।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় যদুনাথ মল্লিক ছিলেন একজন বিখ্যাত বাগ্মী ও স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিক। তিনি থাকতেন ৬৭ পাথুরিয়াঘাটা স্ট্রীটে। এটাই 'মল্লিকবাড়ি' নামে পরিচিত। এই বাড়িতে বহু পুণ্যাত্মার পদধূলি পড়েছে। পদধূলি পড়েছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরও। কিভাবে এই বাড়িতে সিংহবাহিনী মূর্তির প্রতিষ্ঠা হলো, সে-প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট কাহিনী আছে।

বাংলাদেশে দুর্গাপূজার প্রচলন হয় সম্রাট আকবরের আমলে। সেটা পনের শতকের কথা। তখন দেবীমূর্তি হতো মাটির। কোথাও কোথাও পাথরের বা অন্য ধাতবমূর্তিরও সন্ধান পাওয়া যায়, এমনকি স্বর্ণমূর্তির কথাও শোনা যায়। অম্বরের রাজা মানসিংহের কুলদেবী ছিলেন দুর্গা। মূর্তিটি ছিল অষ্টধাতুর দেবী সিংহবাহিনী।

আকবরের পর দিল্লির সিংহাসনে বসেন জাহাঙ্গীর। তাঁর অত্যাচারে হিন্দুরা ছিল ভীত-সন্ত্রস্ত। সেই উৎপীড়নের ভয়ে সিংহবাহিনীর পূজারী ব্রাহ্মণ তাঁকে নিয়ে চট্টগ্রামে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের এক গুহায় আত্মগোপন করেন।

সেই সময়ে সপ্তগ্রাম ছিল অখণ্ড বাংলার সেরা বাণিজ্যনগরী। ঐ নগরীতে বাস করতেন বণিকশ্রেষ্ঠ বৈদ্যনাথ দে মল্লিক। তিনি নৌকায় করে ঢাকা থেকে যাচ্ছিলেন বাণিজ্য করতে। সেখানে তিনি শুনতে পান মানসিংহের মূর্তিটির কথা।

বৈদ্যনাথ সেই মূর্তি দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন এবং যাত্রাপথ পরিবর্তন করেন। ব্রহ্মপুত্র নদ বাহিত হয়ে তিনি পৌঁছান চন্দ্রনাথ পাহাড়ের কাছে। সেই সময়ে পূজারী দেবীর স্বপ্নাদেশ পান—বৈদ্যনাথ দে মল্লিক আমার পরম ভক্ত। আমি তার গৃহে যেতে চাই। আমার জন্য তোমাকে আর নির্জনে কষ্টভোগ করতে হবে না। তুমি কোনরকম আপত্তি করো না। তার হাতে আমাকে সমর্পণ কর। তবে তুমি যখন আমাকে স্মরণ করবে আমি দেখা দেব।

দেবীর স্বপ্নাদেশ পাওয়া সত্ত্বেও পূজারী মূর্তি ছাড়লেন না, পরন্তু বৈদ্যনাথের সঙ্গে ঠাণ্ডা ব্যবহার করলেন। বৈদ্যনাথ পূজারীর কাছে এসে দেখলেন, পূজারী সজল নয়নে দেবীর দিকে তাকিয়ে আছেন। চোখ দিয়ে ঝরে পড়ছে জলের ধারা। ফিরে গেলেন বৈদ্যনাথ। পরদিন দেবী আবার আদেশ দিলেন পূজারীকে। সেদিন বৈদ্যনাথ যেতেই পূজারী তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর পরিচয়? বৈদ্যনাথ উত্তর দিলেন ঃ "আমি এক বঙ্গসন্তান। নিবাস সপ্তগ্রামের অন্তর্গত ত্রিবেণী গ্রামে। জাতিতে সুবর্ণবণিক।"

পরিচয়পর্বের পর মূর্তিটি বৈদ্যনাথের হাতে সমর্পণ করে পূজারী বললেন ঃ "প্রতি মঙ্গল, শনি এবং দুর্গাপূজায় দেবীর সামনে পশুবলি করবেন।" বৈদ্যনাথ পূজারীকে প্রণাম করে দেবীমূর্তি নিয়ে বিদায় নিলেন। কথিত আছে, বৈদ্যনাথ মল্লিক দেবীমূর্তিটি নিয়ে আসার পথে তা নদীতে পড়ে যায়। দিশাহারা হয়ে পড়েন তিনি। মাকে কাছে পেয়েও হারানোর বেদনায় বৈদ্যনাথ আত্মহত্যার পরিকল্পনা নেন। কেননা এ-মুখ তিনি কাউকে দেখাতে চান না। এমন সময়ে দেবী তাঁকে স্বপ্নাদেশ দেন—পরদিন সূর্যোদয়ের সময় নদীতে স্নান করতে গেলে তাঁর গায়ে দেবীমূর্তির দেহ ঠেকবে। কথামত বৈদ্যনাথ পরদিন স্নান করতে এলে মূর্তিটি গায়ে ঠেকে। যথারীতি ভক্তিভরে প্রণাম করে বৈদ্যনাথ মূর্তিটি তুলে নেন। নিয়মানুসারে সেই থেকে সিংহবাহিনী মূর্তি গঙ্গার ওপারে যায় না। সপ্তগ্রামে ফিরে এসে ১০২০ বঙ্গাব্দে (১৬১৪ খ্রীস্টাব্দে) গোবিন্দ দ্বাদশী তিথিতে দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন বৈদ্যনাথ।

১৬৩৮ সালে বৈদ্যনাথের মৃত্যু হয়। তারপর মূর্তির সেবাপূজার দায়িত্ব পড়ে পৌত্র রাজারাম দে মল্লিকের ওপর। এই সময়ে জব চার্ণক সুতানুটি ও কলকাতা কিনলেন। রাজারাম কলকাতার রাজাবাজারে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন।

পরবর্তী কালে দে মল্লিকদের বংশধর বেড়েছে। সেজন্য সেবায়েতরা পালা করে পূজার দায়িত্ব নিয়ে থাকেন। পালাদারদের সংখ্যা ২০০-র বেশি। প্রত্যেক বাড়িতে বিশেষ দুদিন ছাড়াও রোজ চারবেলা পূজা হয়। মল্লিকবাড়ির এই ঐতিহাসিক দেবীমূর্তিটি দেখতে প্রচুর লোকের সমাবেশ হয়। তাঁকে প্রণাম করে ভক্তেরা অন্তরে শান্তি পান। ❑

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার উৎস এবং এযুগের সামাজিক পরিবেশে তার প্রাসঙ্গিকতা

পূর্ণানন্দ রায়



ন্দপুরাণ পাঠে আমরা জানতে পারি, প্রজা সৃষ্টির অভিপ্রায়ে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ধর্ম, রুদ্র, মনু, সনক, ভৃগু প্রমুখ কয়েকজন মানসপুত্রের সৃষ্টি করেন; আর তাঁর দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ থেকে উৎপত্তি হয়েছিল প্রজাপতি দক্ষের। দক্ষের কনিষ্ঠা কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন দেবী সতী—যিনি পতিরূপে গ্রহণ করেছিলেন দেবাদিদেব মহাদেবকে। মহাদেবের প্রতি প্রজাপতি দক্ষ ছিলেন অত্যন্ত বিরূপ। একসময়ে ভৃগু ঋষি এবং অন্যান্য প্রজাপতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত মহাযজ্ঞে একমাত্র দেবাদিদেব শিব ও ব্রহ্মা ছাড়া অন্যান্য দেবতারা প্রজাপতি দক্ষের প্রতি যথোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন। এর ফলে তিনি দেবতাদের প্রতি যেমন প্রসন্ন হয়েছিলেন, তেমনি শিবের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে এই অভিসম্পাত দিয়েছিলেন যে, শিব অন্যান্য দেবতার মতো যজ্ঞভাগের অধিকারী হবেন না। পরবর্তী সময়ে যখন তিনি ব্রহ্মা কর্তৃক সমস্ত প্রজাপতির রাজা নির্বাচিত হয়েছিলেন, তখন আনন্দ ও গর্বে মত্ত হয়ে দক্ষ আয়োজন করেছিলেন 'বৃহস্পতি' নামক একটি বৃহৎ যজ্ঞের। ত্রিজগতের সকলেই এই মহাযজ্ঞে হয়েছিলেন আমন্ত্রিত; কেবলমাত্র আমন্ত্রণলিপি পাঠানো হয়নি কন্যা সতী ও জামাতা শিবকে।

লোকমুখে পিতা কর্তৃক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের সংবাদ শ্রবণে অধীরা সতী স্বামীর কাছে অনুমতি ভিক্ষা করলেন পিত্রালয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু অনুমতি দিতে শিব অস্বীকার করায় সতী ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর শক্তি প্রদর্শনের জন্য ধারণ করেছিলেন ভয়ঙ্করী কালী মূর্তি। কিন্তু মহাদেবের মনে ভয়োৎপাদনে সতী হয়েছিলেন ব্যর্থ। তখন তিনি দশদিকে দশমূর্তিতে আবির্ভূতা হয়ে অবরুদ্ধ করেছিলেন স্বামীর গতিপথ। ভগবতীর এই দশটি বিশেষ রূপ ত্রিলোকে অভিহিত হয় 'দশমহাবিদ্যা' নামে। এই দশটি রূপ হচ্ছে যথাক্রমে—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা। শিবের বরে দেবী এই দশটি মূর্তিতেই পূজিতা হন পৃথিবীর বুকে।

পুরাণ পাঠে আমরা আরো জানতে পারি যে, যজ্ঞস্থলে পিতার মুখে পতিদেবতার নিন্দাবাণী ও কটূক্তি শ্রবণ করে ক্রোধে ও ক্ষোভে অধীরা সতী দেহত্যাগ করেছিলেন এবং শিবকে আবার পতিরূপে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ের কন্যা পার্বতীরূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। তিনি পিত্রালয়ে 'উমা' ও 'গৌরী' নামেও পরিচিতা ছিলেন। পার্বতীর জন্ম, বাল্যকাল, শিবকে পতিরূপে পাওয়ার জন্য তাঁর কঠোর তপস্যা এবং হরগৌরীর মধুর মিলনকে কেন্দ্র করে মহাকবি কালিদাস রচনা করেছেন তাঁর অমর কাব্য 'কুমারসম্ভব'। প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে, বিশেষত মঙ্গল-কাব্যগুলিতেও আমরা পার্বতীর পিতৃগৃহে অবস্থানের আনন্দময় দিনগুলি এবং তাঁর বিবাহিত জীবনের হর্ষাপ্লুত দিনগুলির নিখুঁত বর্ণনা পাই। এইসব মঙ্গল-কাব্যে একদিকে যেমন ফুটে উঠেছে কন্যাবিরহে কাতরা মা মেনকার গভীর আর্তি, অন্যদিকে তেমনি চিত্রিত হয়েছে স্বামি-সোহাগিনী পার্বতীর গর্ব ও আনন্দের নানা

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

প্রকার ঘটনা। এইসব কাব্যে বর্ণিতা গৌরী একাধারে জগজ্জননী এবং বাংলার জননীদের কাছে কন্যাসমা। মোটকথা, বাঙালী জাতি জগন্মাতাকে করে নিয়েছে নিকট আত্মীয়ের মতো একান্ত আপন, তাঁকেও সকলে অতি আপনজনের আসনে বসিয়ে ভাগ করে দিতে চেয়েছে তাঁদের আনন্দ, বেদনা এবং অভাবের জ্বালা। এখানেই অন্যান্য দেবদেবীর সঙ্গে দেবী দুর্গার পার্থক্য। তিনি উচ্চাসনে আসীনা হলেও অনায়াসে হন ভক্তদের সহবর্তিনী, মাটির ওপর পাতা আসনে বসতে তাঁর মনে জাগে না এতটুকু দ্বিধা ও সঙ্কোচ। অনেক দেবতা বা দেবী আছেন, যাঁদের ভক্তি করা হয় ভয়ে, কিন্তু দুর্গা তাঁর এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। বাঙালীদের কাছে তিনি গর্ভধারিণী মায়ের মতো—যাঁকে স্পর্শ করা যায়, আবদার করা যায় এবং সম্ভব হয় কোলেপিঠে চড়ে আদর ও সোহাগ লাভ করা। তাই দেখি, রামপ্রসাদের ডাকে সাড়া দিয়ে জগন্মাতা তাঁকে বেড়া বাঁধার কাজে সাহায্য করছেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব যখন নিজের এঁটো খাবার ভবতারিণীর মুখে তুলে দিচ্ছেন, তখন হাসিমুখে তিনি তা গ্রহণ করছেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠে আমরা অবগত হই যে, দেবী দুর্গার পূজার প্রথম প্রচলন হয়েছিল বসন্ত ঋতুতে রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি কর্তৃক। বসন্তকালে দেবীর পূজানুষ্ঠান হওয়ার কারণে এই পূজা অভিহিত হয় 'বাসন্তী পূজা' নামে। রাজ্যচ্যুত সুরথ এবং সংসার-তাড়িত বৈশ্য যখন মহামুনি মেধসের কাছে আপন আপন দুঃখ-দুর্দশার বিবরণ দিয়ে প্রতিকারের উপায় যাচ্ঞা করলেন, তখন মুনিবর তাঁদের উপদেশ দিয়েছিলেন দেবী মহামায়ার আরাধনায় ব্রতী হওয়ার জন্য। সুরথ ও সমাধি উৎসুক হয়েছিলেন মহামায়ার পরিচয় জ্ঞাত হওয়ার জন্য। তাঁরা মেধসকে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ "কা হি সা মহামায়েতি?" অর্থাৎ কে এই মহামায়া? উত্তরে মহর্ষি বলেছিলেন, তিনি নিত্য আদি জননী। সৃষ্টির এক-একটি বীজকে বলা হয় 'ভূত'। এমনি অসংখ্য ভূতের সমবায়ে গঠিত হয়েছে মহাবিশ্ব। সুতরাং দেবী মহামায়াই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃজয়িত্রী। আবার তিনিই জগৎপালিকা জগদ্ধাত্রী এবং অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা। সৃষ্টির প্রয়োজনে তিনিই হন সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারিণী। তখন তিনি আবির্ভূতা হন মহাকালী, রুদ্রাণী অথবা রণচণ্ডী-রূপে। মুনিবর আরো বলেছিলেন যে, দেবী মহামায়া জন্মরহিতা। যদিও যুগে যুগে তাঁকে বিভিন্ন রূপে অবতীর্ণা হতে দেখে লোকে ভাবে যে, তিনি জাতা হন, কিন্তু আসলে তিনি অযোনিসম্ভূতা। তিনি প্রকৃতিরূপিণী ব্রহ্ম। নব নব সৃষ্টির প্রয়োজনে ব্রহ্ম কখনো পুরুষ, কখনো প্রকৃতি, আবার একাধারে তিনি পুরুষ ও প্রকৃতি উভয়েই; আবার নিরাকার ব্রহ্মের কথাও সাধকদের অজানা নয়।

শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠে আমরা আরো জানতে পারি যে, কালান্তরে বলগর্বী ও অত্যাচারী দৈত্য সম্রাট মহিষাসুর নিধনের জন্য আবির্ভাব ঘটেছিল দেবী দুর্গার। ক্রুদ্ধ দেবতাদের দেহনিঃসৃত পর্বতপ্রমাণ তেজঃপুঞ্জ থেকে আবির্ভূতা হয়েছিলেন অগ্নিবর্ণা, মহাতেজস্বিনী এবং পরম রূপবতী মহাদেবী। আনন্দাকুল দেবতারা দেবীকে সুসজ্জিতা করেছিলেন বিবিধ অলঙ্কারে এবং আপন আপন অস্ত্রের দ্বারা। সেইসব অস্ত্রের সাহায্যেই দেবী দুর্গা বধ করেছিলেন ত্রিলোকত্রাস ও মহাবলশালী মহিষাসুরাদি অসুরকে।

এগুলিকে আমরা যদি প্রতীকী বর্ণনা বলে ধরে নিই, তাহলে আমরা কী কী সত্যে উপনীত হতে পারি? প্রথমত, সৃষ্টির মূলে পুরুষের চেয়ে প্রকৃতির অবদানই বেশি। একথা স্বীকার্য যে, পুরুষের মধ্যে রয়েছে সৃষ্টির বীজ। কিন্তু সেই বীজ নিজের মধ্যে ধারণ করে প্রকৃতিই তাকে নিজের জীবনরস দিয়ে বর্ধিত করে এবং একসময়ে জন্ম দেয় শিশু, শাবক ও ফলের। এজন্য শাস্ত্রে মাতাকে পিতার চেয়ে উচ্চতর আসন দান করা হয়েছে। সুতরাং মাতৃজাতি আমাদের কাছে পরম শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্রী। তাঁরা জগন্মাতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি। শাস্ত্রকারেরা নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে গিয়ে বলেছেন ঃ "যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ/ যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।" (মনুসংহিতা, ৩।৫৬) অর্থাৎ নারী জাতি যেখানে পূজিতা হন, সেখানে দেবতারা বাস করেন। আর যেখানে তাঁদের পূজা হয় না, সেখানে সর্বধর্ম ও কার্যানুষ্ঠান বিফল হয়ে যায়।

অন্যদিকে দেবতাদের দেহনিঃসৃত সম্মিলিত তেজঃপুঞ্জ থেকে দেবী দুর্গার উৎপত্তির প্রতীকী অর্থ হচ্ছে—তিনি আলোকময়ী ও আলোকরূপিণী। তিনি আলোর খড়্গাঘাতে অবিরামভাবে বিনাশ করে চলেন অন্ধকাররূপিণী মহিষকে। দেবী দুর্গা সকল প্রকার অশুভ ও অসত্যের অন্ধকারনাশিনী।

মহাদেবীর উৎপত্তির কাহিনীর আরেকটি তাৎপর্য—সঙ্ঘশক্তির জয় অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী। যেখানে এককভাবে যুদ্ধ করে শত্রুকে পরাজিত করা সম্ভব হয়

না, সেখানে সম্মিলিতভাবে একই প্রকার অস্ত্রের দ্বারা মহাপরাক্রমশালী অরাতিকেও পরাভূত ও পর্যুদস্ত করা যায় অনায়াসে।

জগন্মাতা শ্রীদুর্গা অসুরদলনী। তিনি স্বমুখেই স্বর্গের অমরবৃন্দ এবং পৃথিবীর মনুষ্যকুলকে বলেছেন যে, যখনি অসুরের অত্যাচারে ধরণী ও স্বর্গলোক প্রপীড়িতা হবে, তখনি অসুরনিধনের জন্য তিনি হবেন আবির্ভূতা। অর্থাৎ অসুরনিধনই হচ্ছে দেবী দুর্গার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। আমাদের দৃশ্যমান জগতেই যে এইসব অত্যাচারী ও অধর্মাচারী অসুর অবস্থান করে তা নয়, আমাদের অন্তরের মধ্যেও অনুভূত হয় তাদের সদম্ভ উপস্থিতি। কবির ভাষায়ঃ "মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেতে সুরাসুর।" ক্রোধ, হিংসা, ঈর্ষা, লোভ, অহঙ্কার ইত্যাদি দোষগুলি আসুরিক প্রবৃত্তির নামান্তর মাত্র। এগুলি হৃদয়ের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠলে মানুষ পরিণত হয় অমানুষে, তখন সে হয়ে পড়ে মূর্তিমান দানব। অর্থাৎ আমাদের অন্তরের মধ্যে প্রতিনিয়ত দেবাসুরের যে সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেই সংগ্রামে দেবী শক্তির পরাজয় ঘটলেই আমরা পরিণত হয়ে পড়ি ঘৃণ্য দানবে। এই দেবী শক্তি বলতে আমরা বুঝি সত্যাশ্রয়িতা, ন্যায়পরায়ণতা, প্রেম, প্রীতি, নম্রতা, ধর্মের প্রতি অবিচল আস্থা ইত্যাদি গুণাবলীকে। এসমস্ত গুণের অবস্থানের ফলে যেকোন মানুষ দৈব বলে বলীয়ান হয়ে সহজেই সক্ষম হন অন্তরস্থিত দানবীয় প্রবৃত্তিগুলিকে পরাভূত করতে। অর্থাৎ আমরা একথা সহজেই বলতে পারি যে, দেবী দুর্গা শুভ ও মঙ্গলের প্রতীক, তাই তিনি আখ্যাতা হন 'শুভদা' ও 'সর্বমঙ্গলা' রূপে। তাঁর অমল স্পর্শে মুছে যায় সকলপ্রকার মলিনতা, তাঁর আরাধনায় মাতৃসাধকেরা অধিকারী হন নির্মল হৃদয় এবং পবিত্র জীবনের। আত্মশুদ্ধি, আত্মিক উন্নতি এবং সুপ্ত আত্মিক শক্তির জাগরণ ও বিকাশসাধনই হচ্ছে মাতৃ আরাধনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

দেবী দুর্গা ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ ফলপ্রদায়িনী। তাই পরাজিত, পর্যুদস্ত ও আত্মীয়স্বজন কর্তৃক বিতাড়িত সুরথ ও সমাধিকে মেধস উপদেশ দিয়েছিলেন মাতৃপূজায় ব্রতী হওয়ার। সূর্যের উত্তরায়ণ কাল হচ্ছে দেবদেবীদের আরাধনা করার উপযুক্ত সময়। কারণ, দেবলোকে এই সময়ে দিন হয় বলে দেবতারা থাকেন জাগ্রত। এজন্যই ঋষিবর বসন্তকালে মাতৃপূজার আয়োজন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। মাতৃপূজায় সফল হয়ে দেবীর বরে রাজা সুরথ ফিরে পেয়েছিলেন তাঁর হৃতরাজ্য, অন্যদিকে সংসারের প্রতি বীতরাগী বৈশ্য সমাধি জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন মোক্ষলাভের। বলা বাহুল্য, মায়ের আশীর্বাদে তিনি অন্তিমে স্থান পেয়েছিলেন তাঁর অভয় চরণে।

আশ্বিন মাসে যে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়, তাকে আমরা বলি 'শারদীয়া দুর্গাপূজা'। কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠে জানা যায় যে, পদ্মযোনি ব্রহ্মার নির্দেশে রাবণবধের জন্য রামচন্দ্র সাগরের বালুকাবেলায় আয়োজন করেছিলেন দেবীপূজার। এইসময়ে সূর্যের গতিপথ দক্ষিণে সরে যায়, অর্থাৎ আশ্বিনমাস হচ্ছে সূর্যের দক্ষিণায়ন কালের অন্তর্ভুক্ত। এই সময়টি হচ্ছে দেবতাদের নিদ্রার কাল। রাবণবধের প্রয়োজনে রামচন্দ্র এই 'অকাল'-এ দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন বলে একে বলা হয় 'অকালবোধন'। অর্থাৎ অকালে তাঁর বোধন অর্থাৎ জাগ্রত করে পূজার অনুষ্ঠান হয়েছিল। বর্তমানে এই শারদীয়া দুর্গাপূজাই অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়।

ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই হচ্ছেন সর্বশক্তির মূলাধার। তাঁর শক্তিতেই সকলে শক্তিমান, তাঁর শক্তিতেই বিশ্বজগৎ রয়েছে চলমান। আর্য ঋষিরা এই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আরাধনা করেছেন মাতৃরূপে। দেবী দুর্গা সেই মাতৃরূপিণী ঈশ্বর—যিনি ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের দৃষ্টিতে প্রকৃতিরূপিণী ব্রহ্ম। তিনি মহাবীর্যবতী ও মহাতেজস্বিনী। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অপরাজেয়া ও অপ্রতিরোধ্যা, তিনি এক ও অদ্বিতীয়া। কৃষ্ণপ্রিয়া মীরাবাঈ বলেছেনঃ "জগতে কৃষ্ণ ছাড়া কোন পুরুষ নেই", তেমনি মাতৃসাধকের কাছে মা ছাড়া বিশ্বজগতের কোন অস্তিত্ব নেই। তিনি বহুরূপে প্রকাশমানা হলেও এক ও অভিন্না, বেদান্তের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মন্ত্রের শাশ্বত মূর্তি হচ্ছেন দেবী দুর্গা। এই প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত—অসুররাজ মহিষাসুর দেবী দুর্গার সঙ্গে সংগ্রামকালে লক্ষ্য করলেন, অসংখ্য মাতৃমূর্তি নানা রূপ ধারণ করে নানাভাবে দেবীকে সাহায্য করে চলেছেন। অসুররাজ যেখানে একলা, সেখানে দেবী বহুর সাহায্যপুষ্ট। এভাবে অন্যের সহায়তাপ্রাপ্ত হয়ে দেবী দুর্গা নিহত করতে চাইছেন তাঁর প্রবল অরাতিকে। কিন্তু যুদ্ধের পূর্বে উভয়ের মধ্যে কথা হয়েছিল যে, তাঁরা লড়াই করবেন এককভাবে। তাই ক্রোধে ও ক্ষোভে অধীর হয়ে ত্রিভুবনজয়ী মহিষাসুর কটাক্ষ করলেন দেবীর প্রতি। তখন দেবীর স্বর্গীয় কণ্ঠে ধ্বনিত হলোঃ "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা/ পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্-

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

বিভূতয়ঃ।।" (শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১০।৫) অর্থাৎ এজগতে আমিই তো আছি। আমাকে ছাড়া দ্বিতীয় আর কে আছে? ওরে দুষ্ট, যা দেখছিস, এসবই আমার বিভূতি। এই দ্যাখ এরা সব আমার মধ্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। তাঁর কথা শেষ হতে না হতেই বিভিন্ন মাতৃমূর্তি লীন হয়ে গেল তাঁর অঙ্গে, মহাশক্তি তখন একা। এই অদ্বিতীয়া মাতৃশক্তিই ঈশ্বর বা পরমাত্মা। জীবাত্মা সেই পরমাত্মার অংশবিশেষ। এই পরমাত্মাই জীবনের স্রষ্টা, আবার তাঁর কাছে ফিরে যাওয়াই হচ্ছে মুক্তি বা মোক্ষ। যেহেতু মাতৃরূপিণী ঈশ্বর এই দেবী দুর্গা মোক্ষদায়িনী, তাই মানবজীবনের পরম লক্ষ্য হওয়া উচিত মোক্ষলাভের জন্য তাঁর আরাধনা করা।

মানবজীবনে দুঃখ-কষ্ট, শোক-তাপ ও অভাব-অনটনের যেন অন্ত নেই! মানুষ আপাত সুখের অধিকারী হলেও তার জীবন দুঃখবারিধির সঙ্গেই তুলনীয়। মানুষের জীবন নানা কারণে নানা বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়ে এবং অসহনীয় আঘাতে জর্জরিত হয়ে সর্বদাই বিচলিত ও কম্পমান হয়। বলা বাহুল্য, মানুষের দুঃখ-কষ্ট অনেক পরিমাণে স্বোপার্জিতও। ভোগের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় প্রতিটি মানুষ আজ দিশাহারা। স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতা তাকে পরিণত করেছে বোধহীন দানবে। হিংসা ও অসূয়ার দ্বারা চালিত হয়ে সে হারিয়ে ফেলেছে তার বুদ্ধি, জ্ঞান ও বিবেক। "অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম—এই আত্মজ্ঞান তার অন্তর থেকে হয়েছে অন্তর্হিত। এই আত্মিক দুর্গতিই মানুষের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশার কারণ হয়ে উঠেছে।

এই ঘোর দুর্দিন থেকে মানুষের মুক্তির উপায় কি? উপায় একটাই এবং তা হচ্ছে জগন্মাতার চরণে নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন। দেবীর পদাম্বুজে আত্মসমর্পণ বা আত্মবিলয়ের মাধ্যমেই সম্ভব মানবজীবনকে অনাবিল আনন্দ ও অপার্থিব সুখে পরিপূর্ণ করা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন ঃ "সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।" (১৮।৬৬) 'চণ্ডী'তেও বলা হয়েছে সেই পরমেশ্বরীর শরণ নিলে, তাঁকে আরাধনা করলে ভোগ, স্বর্গ, মুক্তি—প্রভৃতি সকল অভীষ্ট প্রদান করেন তিনি।

প্রশ্ন উঠতে পারে—বর্তমান সামাজিক পটভূমিকায়, এই বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক উন্নতির যুগে, ক্রমবর্ধমান নাস্তিকতার এই যুগসন্ধিক্ষণে দুর্গাপূজার প্রাসঙ্গিকতা কতখানি? কে এই অসুর? দেবী দুর্গার অস্তিত্ব কি অলীক কল্পনা অথবা সত্য সত্যই দেবীশক্তি বিশ্বজুড়ে ক্রিয়াশীল? উত্তরে বলা যায় যে, এই নাস্তিকতার যুগে মানুষের জীবনতরী যখন কর্ণধারবিহীন অবস্থায় অকূল সমুদ্রে দিশাহীনভাবে ভেসে চলেছে, তখন মানুষের মধ্যে ধর্মীয় অনুরাগ জাগ্রত করার জন্য এবং মানবজীবন-তরীকে সবুজকূলে উপনীত করার জন্য মাতৃ আরাধনার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ধর্ম ছাড়া মানুষ বাঁচবে কিভাবে? যা ধারণ করে মানুষ সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকে অথবা মানবজীবন যার ওপর বিধৃত, তাকেই বলে ধর্ম। সুতরাং দেবীর আরাধনার প্রাসঙ্গিকতা এযুগে যে আরো বেশি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এযুগেও আমরা প্রতিনিয়ত লক্ষ্য করে চলেছি অসুরকুলের মহাতাণ্ডব। যারা শক্তির অহঙ্কারে মত্ত হয়ে সমগ্র পৃথিবীকে পদানত করতে চাইছে, তাদের সঙ্গে পুরাণ-বর্ণিত অসুরদের পার্থক্য কোথায়? ধনগর্ব যাদের সীমাহীন, যাদের ভোগলিপ্সা প্রবল, জৈব প্রবৃত্তির ক্রীতদাস মানুষ-রূপধারী, তারাই তো অসুর। যারা অসত্য ও অন্যায়কে করেছে জীবন-রথের সারথি, যারা ক্রোধ, হিংসা ও অসূয়া দ্বারা পদে পদে হচ্ছে তাড়িত—তারা তো অসুর নামে কুখ্যাত হওয়ারই যোগ্য। সুতরাং অসুরের অবস্থান সর্বযুগেই, সর্বকালেই। এযুগেও তার ব্যতিক্রম নয়।

অন্যদিকে দেবী দুর্গা শুভশক্তি ও শুভবুদ্ধির জনয়িত্রী। তিনি আলোকরূপিণী ও মঙ্গলদাত্রী। বর্তমান পৃথিবীতে আমরা যেখানেই লক্ষ্য করি শুভশক্তির প্রকাশ, শুভবুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে মানুষ যেখানে স্থাপন করে এক মহান আদর্শ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যেখানে বিপন্নজনের উদ্ধারের জন্য মানুষ নিজের বিপদকে তুচ্ছজ্ঞান করে, পরহিতের জন্য যখন কোথাও ঘটে আত্মোৎসর্গের মহৎ ঘটনা—তখনি তো আমরা বলতে পারি যে, এযুগেও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থান করছে দেবীর মঙ্গল শক্তি। তিনি অদৃশ্যভাবে বিরাজ করছেন সমগ্র পৃথিবীজুড়ে।

মাতৃ আরাধনার এই পবিত্র লগ্নে মাতৃচরণে প্রার্থনা জানাই—শুধু বাইরের রূপে নয়, আমরা যেন রূপান্বিত হই অন্তরের ঐশ্বর্যে। আমরা কেবল জীবনযুদ্ধেই জয়ী হতে চাই না—চাই যশ বা খ্যাতি অর্জন করতে সুকর্মসাধনের মাধ্যমে। আর বাইরের শত্রুবিনাশই নয়—আমরা যেন বিনষ্ট করতে পারি অন্তরের রিপুগুলিকে। এই মহান ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় আমরা মায়ের চরণে প্রার্থনা জানাই—"হে জগদম্বে, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।" ❑



আশ্বিন ১৩০৮/ সেপ্টেম্বর ১৯০১

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণোৎসব

গত জন্মাষ্টমীর দিন কলিকাতার সন্নিকটবর্ত্তী [সন্নিকটবর্তী] কাঁকুড়গাছী [কাঁকুড়গাছি] যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের উৎসব হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দিন বৃষ্টি সত্ত্বেও ৪/৫ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। ৪০/৫০ দল সঙ্কীর্ত্তন [সঙ্কীর্তন] সম্প্রদায় নামকীর্ত্তন [নামকীর্তন] করিয়াছিলেন। প্রায় দুই হাজার লোককে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

বৈজ্ঞানিক কথা

(শ্রীঅনুকূল চন্দ্র ঘোষ)

অদ্ভুত বৃক্ষ। উত্তর আমেরিকার দক্ষিণে নিকারাগোয়া নামক হ্রদের সন্নিকটে এক প্রকার অদ্ভুত বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। বৃক্ষটির পত্রের দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪ ফুট, বৃন্ত ১০ ফুট। কিন্তু একটির অধিক পাতা হয় না। এই গাছে যে ফুল হয়, তাহার বোঁটার পরিধি ১ ফুট; ফুলটি দৈর্ঘ্যে ২ ফুট। বর্ণ ঈষৎ লোহিত। ইহার গন্ধ গলিত শবের ন্যায়।

ভাসমান ক্ষেত্র। আজোরস্ [অ্যাজোর্স] দ্বীপপুঞ্জের কিছু পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগরের এক অংশ সামুদ্রিক উদ্ভিদ্ দ্বারা ঘন আচ্ছাদিত। এই আচ্ছাদিত অংশের পরিমাণ ইংলণ্ডের [ইংল্যাণ্ডের] ২৯ গুণ। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, অন্যান্য সারের ন্যায় এই উদ্ভিদের উৎপাদিকা-শক্তি আছে। ইহাদিগকে সার স্বরূপ [সারস্বরূপ] ব্যবহার করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল।

চন্দ্র ও নক্ষত্রের তাপ বিকিরণ। সূর্য্যের [সূর্যের] তাপ বিকিরণ করার কথা সকলে জানেন। অনেকদিন হইল বিলাতের রয়েল [রয়্যাল] সোসাইটীতে [সোসাইটিতে] স্থিরীকৃত হইয়াছে যে চন্দ্রও আলোকের সহিত তাপ বিকিরণ করে। থার্ম্মোপাইল [থার্মোপাইল] নামক সামান্য যন্ত্রের সাহায্যে এই তাপের অস্তিত্ব নির্দ্দেশ [নির্দেশ] করা যাইতে পারে। সুতরাং চন্দ্রকে কেবল হিমাংশু নাম দেওয়া ভুল। এমন কি নক্ষত্র সকলও আলোকের সহিত তাপ বিকিরণ করে [তাহা] প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ভূমধ্যস্থ তাপ। ইংলণ্ডস্থ [ইংল্যাণ্ডস্থ] কেন্টিস [কেন্টস্] নগরে সহস্র ফুট গভীর একটি কূপ আছে। বিলাতের "ভূমধ্যতাপ-নির্ণয়-সভা' এই কূপের মধ্যে অনেকগুলি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, প্রতি ৫২।। [৫২½] ফুট নিম্নে তাপ [তাপমাত্রা] ১ ডিগ্রি করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ [ব্যাসার্ধ] প্রায় ৪০০০ মাইল বা ৪০০০×১৭৬০×৩=২১১২০০০০ ফুট। ইহা হইতে পৃথিবীর কেন্দ্রদেশে তাপের পরিমাণ কত [তা] অনায়াসে কল্পনা করা যাইতে পারে।

ইতর জীবের অনুভব শক্তি। সর্ব্বাপেক্ষা [সর্বাপেক্ষা] নিকৃষ্ট জীবও অনুভব করিতে পারে। একটি জলপূর্ণ পাত্র কৃষ্ণবর্ণের কাগজ দ্বারা আবৃত করিলে জলমধ্যস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটগুলি যেন নির্জীব হইয়া পড়ে। কিন্তু যদি কাগজের সামান্য একটু ছিদ্র দ্বারা উজ্জ্বল আলোক প্রবেশ করিতে দেওয়া যায়, দেখা যাইবে যে, কীটগুলি জলের আলোকিত অংশের দিকে লাফাইয়া আসিবে। সূর্য্যালোক [সূর্যালোক] বিশ্লেষণ করিলে যে সপ্তবর্ণের আলোকমালা (Solar Spectrum) পাওয়া যায়, তাহা যদি ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমরা দেখিব যে অধিক সংখ্যক কীট পীতবর্ণের [yellow] রশ্মি দ্বারা আলোকিত অংশের উপর একত্রিত থাকিবে, কিন্তু বেগুনি বর্ণের [violet] রশ্মির দ্বারা আলোকিত অংশের উপর অতি অল্পসংখ্যক কীটকে দেখিতে পাইব। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে ঐ জলকীটদিগের পীতবর্ণ চিনিবার ক্ষমতা আছে।

জড়ের অনুভব শক্তি। এতদিন পাশ্চাত্য পদার্থ-বিজ্ঞান জড় ও চৈতন্য বলিয়া দুইটী [দুইটি] বিভিন্ন বিভাগ দেখিয়া আসিতেছিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু জড় পরমাণুর এমন সব নূতন খেলা বাহির করিয়াছেন, যাহাতে ঐ বিভাগ লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। তিনি দেখাইয়াছেন চেতন পদার্থের ন্যায় জড়েরও স্পন্দন শক্তি আছে এবং উভয়েরই স্পন্দন এক জাতীয়। তিনি জড়ের মত্ততা, জড়ের শ্রান্তি, বিষপ্রয়োগে জড়ের অবসাদ ও ঔষধ প্রয়োগে পুনরায় তাহার স্বীয় প্রকৃতি প্রাপ্তি দেখাইয়া, জড় ও চৈতন্য যে একই শক্তির অবস্থান্তর মাত্র [সেটি] প্রমাণ করিতেছেন। জড় ও চৈতন্যের ঐক্য প্রমাণিত হইলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে এক মহা অভূতপূর্ব্ব [অভূতপূর্ব] বিপ্লব উপস্থিত হইবে। সে বিপ্লবের কেন্দ্র হইবেন আমাদের জগদীশবাবু। ("মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি" মন্ত্রে প্রাচীন আর্য্য [আর্য] ঋষিগণ সমস্ত জগতের ঐক্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। জগদীশবাবু পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে সেই ঐক্য প্রমাণ করিয়া আজ সমগ্র হিন্দু ভারতবাসীর গৌরবের পাত্র হইলেন, নিশ্চিত—[তদানীন্তন] সম্পাদক)।

এসিটাইলিন [অ্যাসিটাইলিন]। এসিটাইলিন [অ্যাসিটাইলিন] গ্যাস যে বিষাক্ত তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। পক্ষী, ইন্দুর [ইঁদুর], ভেক প্রভৃতি ইতর জীবেরা অতি সামান্য পরিমাণ এসিটাইলিন [অ্যাসিটাইলিন] মিশ্রিত বায়ু সেবন করিলে প্রাণত্যাগ করে; কিম্বা [কিংবা] অতি অল্প পরিমাণ গ্যাস তাহাদের রক্তের সহিত মিশাইয়া দিলে [তাহারা] মরিয়া যায়। অতি সাবধানে ইহার ব্যবহার করা উচিত।

তারকাগণনা। অনেকের বিশ্বাস যে, যেসকল তারকা আমাদের নয়নগোচর হয়, তাহাদের গণনা করা যায় না। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। আকাশের যে অংশ আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে চর্ম্মচক্ষে [চর্মচক্ষে] দুই সহস্রের অধিক তারকা দেখিতে পাওয়া যায় না [কিন্তু] সমস্ত আকাশে ৬০০০ তারকা মনুষ্যের চর্ম্মচক্ষুর [চর্মচক্ষুর] গোচর হয়। তবে দূরবীক্ষণ-যন্ত্র সহকারে কোটি কোটি তারকা দেখিতে পাওয়া যায়।

> পাঠকগণের অবগতির জন্য শতবর্ষ পূর্বে 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক ভাবনা-চিন্তার কিছু নমুনা দেওয়া হলো।—সম্পাদক

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ● সম্পাদনা : স্বামী সর্বগানন্দ

প্রাচীন ভারতবর্ষের খেলাধূলা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

[redacted]নবসভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস যেমন বিভিন্ন জীব-জন্তুর ফসিল, আদিম মানুষের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, নিত্যব্যবহার্য তৈজসপত্রাদি, পর্বত ও গুহার অভ্যন্তরের চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি দেখে এবং অনুমানের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে, খেলাধূলার উৎপত্তির ইতিহাসও তেমনি কিছু প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান ও সাক্ষ্য এবং কিছু অনুমানকে নির্ভর করে এগিয়েছে। প্রাচীন মন্দিরের ভাস্কর্য, টেরাকোটা ফলক, অ্যাথলিটদের প্রতিমূর্তি, গল্পকথা, বীরগাথা, সঙ্গীত প্রভৃতি প্রাচীন খেলার অস্তিত্বের কথা ঘোষণা করে।

হিংস্র শ্বাপদসমাকীর্ণ পর্বতারণ্যের যাযাবরীয় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ বিপদসঙ্কুল হওয়ায় একদা শারীরিক শক্তির চর্চা ব্যতীত জীবনসংগ্রামে জয়লাভের অন্য কোন উপায় ছিল না। তাই পণ্ডিতগণ লক্ষ্য করেছেন যে, প্রধানত আত্মরক্ষার তাগিদেই মানুষকে দৌড়, লাফ, তীর ও প্রস্তর নিক্ষেপ, শিকার প্রভৃতির কলাকৌশল শিখে নিতে হয়েছিল। উৎকর্ষ সাধনের তাগিদে স্বাভাবিকভাবেই তখন প্রতিযোগিতারও ব্যবস্থা ছিল। আর্য যুবকরা বিভিন্ন পালাপার্বণ, আনন্দানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ও অবসরের ফাঁকে নানান শারীরিক ক্রীড়া ও অস্ত্রপরীক্ষার ব্যবস্থা করতেন। শ্রীরামচন্দ্রের হরধনু ভঙ্গ, বীরাষ্টমী, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভায় অর্জুনের লক্ষ্যভেদ জাতীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করি। তাছাড়া, রামায়ণ, মহাভারতের সময় অর্থাৎ প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজজীবনে দ্যূতক্রীড়া বা পাশা, রথের দৌড়, কুস্তি, গদাযুদ্ধ, বর্শা ও অসিচালনা—এরকম নানা ধরনের খেলাধূলার প্রচলন ছিল।

সেকালের রাজা, মহারাজা, সামন্ত, মহাসামন্ত প্রভৃতিদের প্রধান বিহারই ছিল শিকার বা মৃগয়া। আর অন্ত্যজ ও ম্লেচ্ছ শবর, পুলিন্দ, চণ্ডাল, ব্যাধ প্রভৃতি অরণ্যচারী মানুষের জন্য শিকারই ছিল জীবনধারণের প্রধান উপজীব্য। রাজা, মহারাজাদের কাছে অরণ্যচারী জন্তু বা পাখি শিকার ছিল বীরত্বের পরিচায়ক। শিকারে পারদর্শী নৃপতিদের সেযুগে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করা হতো। অন্যদিকে আদিবাসী অর্থাৎ জঙ্গলে বসবাসকারী মানুষদের এসব হিংস্র শ্বাপদকুলের সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে টক্কর দিয়ে বেঁচে থাকতে হতো বলে তারাও বর্শানিক্ষেপ, তিরন্দাজি প্রভৃতি বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষতা ও ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তবে তাদের দক্ষতা প্রদর্শনের কোন উপযুক্ত মঞ্চ ছিল না।

প্রাচীন ধনুর্বিদ্যা বা লক্ষ্যভেদের খেলাই আধুনিক তিরন্দাজি। সুপ্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী এই খেলাটি রাজা, মহারাজা ও সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে আদিবাসী ও উপজাতিদের মধ্যে প্রভূত জনপ্রিয় ছিল। সে-যুগে এই খেলা শিক্ষা ও ধর্মীয় আচরণের অঙ্গীভূত ছিল। হরধনু ভঙ্গের মধ্যে বা রামায়ণে যুদ্ধের কাহিনীতে ধনুর্বাণের ব্যাপক ব্যবহার দেখে ধনুর্বাণের জনপ্রিয়তা বোঝা যায়। মহাভারতের এক গুরুত্বপূর্ণ কৌশল ছিল এই ধনুর্বিদ্যা। দ্রোণাচার্যের হাতে গড়া অর্জুন ও তাঁর ভাইদের ধনুর্বিদ্যার অসাধারণ কীর্তি যা একালের তিরন্দাজদের অনুপ্রেরণার উৎস। মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনায় ভীষ্ম, দ্রোণ, একলব্য, কর্ণ, অশ্বত্থামা, অভিমন্যুরও অসাধারণ তিরন্দাজীর পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুত, মহাভারতের সময় ধনুর্বিদ্যায় উৎকর্ষসাধনের ওপরই নির্ভর করত রাজপুরুষদের কুলতিলক। বৈদিক যুগ থেকে এই বিশেষ ক্রীড়া বা বিদ্যাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠালাভের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া তখন যুদ্ধবিগ্রহে বিক্রম ও পরাক্রমশালী হতে গেলে ধনুর্বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন ছিল অবশ্যম্ভাবী লক্ষ্য ও কর্তব্য। শুধু খেলা বা শিক্ষাই নয়, তিরন্দাজি বা ধনুর্বিদ্যা ছিল রাজ্য বিস্তারের প্রধান হাতিয়ার।

কুস্তি বা মল্লযুদ্ধ ছিল আদিম যুগে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। দুজন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে এই খেলা ইতিহাসের প্রায় গোড়া থেকেই প্রচলিত। প্রাচীন সাহিত্যে মল্লবীরদের পোশাকের যে-বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে দেখি, মল্লবীরেরা কাপড় বাঁধতেন আঁট করে। কারো মাথায় থাকত মল্লটোপ বা বীরটোপর, হাতে বীরবালা, পায়ে বীরবৌলি, ঘুঙুর। সর্বাঙ্গে মাখা হতো রাঙামাটি। সেকালের মল্লবীরদের দক্ষতা মুষ্টিযুদ্ধ ও কুস্তি কসরতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাদের অসিচালনা, লাঠিখেলাতেও ওস্তাদ হতে হতো। প্রথমে কুস্তি বা মল্লক্রীড়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও বিক্ষিপ্তভাবে অনুষ্ঠিত হতো। এর কিছু নিদর্শন পাই মহাভারতের যুগে। পরবর্তী যুগে প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করার জন্য রাজা-রাজড়া বা ধনবান ব্যক্তিগণ সুঠামদেহীদের পৃষ্ঠপোষণা করে নিজেদের কাছে রেখে দিতেন এবং ঠিকমত তাদের স্বাস্থ্যচর্চা হচ্ছে কিনা অথবা কোন ধনবান ব্যক্তির অধীনে কত শক্তিধর দেহী আছে, তা দেখা বা দেখাবার জন্য মাঝেমাঝেই কুস্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন। মোগল আমলে কুস্তি আরো জনপ্রিয় হয়। বাবর, হুমায়ুন, আকবর সকলেই ছিলেন কুস্তিতে পারদর্শী। সেসময় সাধুসন্ত, ফকিররাও নিজ নিজ আখড়ায় শিষ্যদের কুস্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। হনুমন্তী, ভীমসেনী, জরাসন্ধী এবং শূরসেনী—এই চার পদ্ধতিতে কুস্তি অনুষ্ঠিত হতো।

বর্তমানে দাবা অত্যন্ত জনপ্রিয় এক ক্রীড়ায় পরিণত হয়েছে। আজ সারা বিশ্বে এর সমাদর। এ খেলাটির

উৎপত্তিস্থল যে ভারতবর্ষ, সেবিষয়ে পণ্ডিতগণ মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে এসেছেন। বিভিন্ন নামে এই খেলা প্রাচীন ভারতে পরিচিত ও প্রচলিত ছিল। মহাভারতের পাশাখেলা ছিল এর সমানুবর্তী। 'শতরঞ্জ' বা 'চতুরঙ্গ' নামেই সেসময় দাবার ব্যাপ্তি ও বিস্তৃত ছিল আর্যাবর্তে। চতুরঙ্গ হচ্ছে চার অঙ্গ অর্থাৎ চারপ্রকার সৈন্যবাহিনী। যুদ্ধের আগে যুযুধান রাজা, মহারাজারা নকল যুদ্ধের মহড়ার জন্য এই খেলাটি খেলতেন। চারধরনের আক্রমণ (চার বাহিনীর) বিন্যাসের একটা পরিকল্পনা করে নেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। তাছাড়া রাজপরিবারের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল এই খেলাটি। আধুনিক যুগে যে-পদ্ধতি ও ধারায় দাবা খেলা অনুষ্ঠিত হয়, ঠিক সেই ধারা ও পদ্ধতিতে প্রাচীন ভারতে চতুরঙ্গ বা শতরঞ্জ অনুষ্ঠিত না হলেও দুটির আঙ্গিকের মধ্যে প্রকরণগত যথেষ্ট মিল আছে।

পাশা প্রাচীন খেলাসমূহের একটি। আদি যুগে এই খেলা 'অক্ষক্রীড়া' নামে পরিচিত ছিল। বৈদিক যুগে বিভীতক বহেড়া নামক বৃক্ষ থেকে অক্ষ নির্মিত হতো। মহেঞ্জোদারো সভ্যতার উৎখননে পোড়ামাটির তৈরি অক্ষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই অক্ষের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সাধারণ মানুষ। কিন্তু রাজা-মহারাজা, সামন্ত প্রভুদের অক্ষ বা পাশা ছিল হস্তিদন্ত, স্বর্ণ বা রজত-নির্মিত। পূর্বে দ্যূতক্রীড়া বা জুয়াখেলাও এই নামে পরিচিত ছিল। মনুসংহিতায় এই ক্রীড়া দশ কামজ-ব্যসনের অন্যতম বলা হয়েছে। কাশীরাম দাস লিখেছেন—

"হেনকালে শকুনী লইয়া পাশা সারি,
যুধিষ্ঠিরে বলে তবে প্রবঞ্চনা করি।
পুরুষের মনোরম দ্যূতক্রীড়া জানি,
দ্যূতক্রীড়া কর আজি ধর্ম নৃপমণি।"

অক্ষক্রীড়ার ফলে পাণ্ডবদের দুর্দশার কথা মহাভারতে বর্ণিত আছে। মহাভারতের নানা স্থানে নানা সময়ে পাশাখেলার নিদর্শন পাওয়া যায়। নিষাধিপতি নল পুষ্করের সঙ্গে দ্যূতক্রীড়ায় সর্বস্ব হারালে দময়ন্তীকে পণ রেখে অক্ষ খেলতে উৎসাহ দেখিয়েছিলেন। বনবাসের সময় ঋষি বৃহদশ্ব যুধিষ্ঠিরকে শিখিয়েছিলেন অক্ষবিদ্যার বিভিন্ন কলাকৌশল। এ থেকে বোঝা যায়, শুধু রাজা-রাজড়াই নয়, মুনি-ঋষিরাও জানতেন অক্ষবিদ্যা। অজ্ঞাতবাসের সময় যুধিষ্ঠির বিরাট রাজ্যে নিজেকে অক্ষদক্ষ বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকেও দ্যূতক্রীড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন লোককাহিনীতে পাশাখেলার উল্লেখ আছে। পাশাখেলায় জয়ী হয়ে বন্দিনী রাজকন্যাকে উদ্ধার করা, বহু ধনরত্নের অধিকারী হওয়ার নানা কাহিনী অনেকেরই জানা। পূর্বে এই খেলা দেবপূজার অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হতো। নানা ধর্মীয় আচার-আচরণেও পাশা বা অক্ষক্রীড়ার উপস্থিতি লক্ষণীয়। তবে পণ রেখে পাশাখেলার নিন্দা করা হয়েছে প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে। বলা হয়েছে—'পাশা নরকের দ্বারস্বরূপ'। পণ রেখে পাশাখেলার নিন্দা শোনা যায় ভীষ্ম, বিদুর প্রমুখের মুখে—এমনকি সেই ভয়ঙ্কর দ্যূতসভার অন্যতম প্রতিযোগী যুধিষ্ঠিরের মুখেও। ধৃতরাষ্ট্রের আমন্ত্রণ নিয়ে বিদুর ইন্দ্রপ্রস্থে এলে যুধিষ্ঠির এই পণ-ভিত্তিক পাশাখেলার নিন্দাই করেছিলেন। কিন্তু তাঁর যুক্তি ছিল—যেহেতু তিনি রাজা, তাই কোন রাজার আমন্ত্রণ তিনি প্রত্যাখ্যান করবেন না। তাতে রাজধর্মেরই হানি হবে। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, তখনকার দিনে এক রাজা অন্য রাজাকে যেকোন প্রতিযোগিতায় চ্যালেঞ্জ জানালে তা গ্রহণ করতেই হতো; নাহলে সেটা রাজার পরাজয়ই সূচিত করত। তবে শকুনি যে পাশা খেলতেন, তা স্পষ্টতই ছলপূর্ণ। বর্তমান আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে যে অনৈতিকতার অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করি, তা যে শকুনির কপটতারই আধুনিক সংস্করণ, সেটা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না।

বৈদিক যুগে ঘোড়ায় টানা রথের দৌড় দেখতে যথেষ্ট জনসমাগম হতো। আজকের ঘোড়দৌড়ই ছিল সেকালের 'চ্যারিয়ট রেস' বা 'রথের দৌড়'। সাধারণত রাজা-রাজড়াদের রাজ্যাভিষেক কিংবা ধর্মীয় উৎসবের অঙ্গ হিসাবেই এই খেলাটি আয়োজিত হতো। বীরধর্মের পূজারী, শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত আর্যাবর্তের রাজারা রথের দৌড়কে কেন্দ্র করে আনন্দে মাতোয়ারা হতেন, সাধারণ মানুষও সেই আনন্দ-উৎসবে সামিল হতো।

সেযুগে আরো কয়েকটি জনপ্রিয় খেলার মধ্যে ছিল অসিচালনা, বর্শা ও গদাযুদ্ধ। ধৃতরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপনায় রাজকুমারদের অস্ত্রকৌশল প্রদর্শনের সময় নকুল-সহদেব অসিচালনায় অসাধারণ পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। বর্শা-চালনায় অসামান্য নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন যুধিষ্ঠির এবং গদাযুদ্ধে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হয়ে উঠেছিলেন ভীম-দুর্যোধন। রীতিমত 'গ্যালারি'তে বসে সেই প্রদর্শনী সোৎসাহে প্রত্যক্ষ করেছে জনসাধারণ।

বর্তমান যুগে সাঁতার কাটা প্রতিযোগিতার অঙ্গীভূত হলেও মানুষ মনের আনন্দেই সাঁতার কাটে। সেযুগেও তাই ছিল। প্রমাণকোটিতে পঞ্চপাণ্ডব ও কৌরবদের যে জলক্রীড়ায় মত্ত হয়ে উঠতে দেখি, তা এই সাঁতার কাটারই রূপান্তর মাত্র। আর এযুগে অনেকেই কবাডির মধ্যে অভিমন্যুর চক্রব্যূহে প্রবেশের ছায়া লক্ষ্য করে থাকেন।

খেলা মানুষকে শুধু মনের আনন্দই দান করে না, তার শরীরকে মজবুত করে তুলতেও প্রধান ভূমিকা নেয়। তাই খেলার আবেদন চিরকালীন। যেমন এই আধুনিক যুগে, তেমনি অতি প্রাচীন যুগেও খেলাধুলার চর্চা আমাদের সমাজব্যবস্থার একটি জনপ্রিয় আঙ্গিক ছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। ❑

'কথামৃত'-এ বিভাষিত শ্রীরামকৃষ্ণ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

।।'প্রথম পরিচ্ছেদ'।।

'আজ রবিবার'

[redacted]র বলা হয়েছে, তারিখ বলা হয়নি এখনো। সময় অনুক্ত। আমরা দেখছি। দলে দলে ভক্তরা আসছেন পরমহংসদেবকে দর্শন করতে। মা কালীকে নয়, পরমহংসদেবকে। একটা ভিড়। গায়ে গা লেগে যাচ্ছে। কাঁধে কাঁধ ঠেকে যাচ্ছে। মানুষের মেলা। কত রকমের মানুষ! সাধু, পরমহংস, হিন্দু, খ্রীস্টান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, পুরুষ, নারী। যে আসছেন, ঠাকুর তাঁর সঙ্গেই কথা বলছেন।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যিনি পরে 'শ্রীম' নামে বিখ্যাত হবেন, তিনি এখনো ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলেননি। তিনি সব দেখছেন। তিনি এই উদ্যান-সমন্বিত অপূর্ব মন্দিরটি নির্মাণ করছেন অক্ষরমালায়। ভিত্তিভূমি—একটি গ্রন্থের কয়েকটি পাতা। প্রবাহিত হবে গঙ্গা। একটি প্রশস্ত ঘাট সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে নেমে যাবে প্রবাহের বারি স্পর্শ করার জন্য।

এই ঘাটে একটি নৌকা লাগবে। একজন নামছেন। এই একজনকে নামরূপে চিহ্নিত করা যাবে না। এই নৌকা কালের তরণী। যিনি অবতরণ করছেন তিনি কাল, সদা বর্তমান। অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই। তিনি সর্বদা।

সোপান বেয়ে উঠতে উঠতে তিনি একটি অতীত দেখে ছোট্ট একটি শ্বাস ফেলবেন। সেটি হয়ে যাবে বাক্য —এই ঘাটে পরমহংসদেব স্নান করতেন। এটি ক্ষীণ শ্বাস নয়, দীর্ঘশ্বাস। এই একটি লাইনে মহেন্দ্রনাথ বুঝিয়ে দিলেন—পাঠক! তুমি এখন আমার সঙ্গে যেখানে যাবে, সেটি বৃন্দাবন; কিন্তু নন্দপুর চন্দ্রবিনা অন্ধকার। যজ্ঞ শেষ। পড়ে আছে বিভূতি। এই লাইনটি তিনি পেতে রাখলেন। এর ওপর দিয়েই যেতে হবে অতীতে।

একটি আচ্ছাদনের তলায় কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হবে, যার নাম 'চাঁদনি'। কিছু দেখার আছে। এখানে ঠাকুরবাড়ির চৌকিদারেরা থাকে। এদিকে, ওদিকে পড়ে আছে তাদের খাটিয়া, আমকাঠের সিন্দুক, দু-একটা লোটা। এটি সুখের স্থান। এখানে বিশ্রাম। এখানে সংসার নেই। সকালে পাড়ার বাবুরা গঙ্গাস্নানে এসে এখানে বসে তেল মাখতে মাখতে খোশগল্প করেন। আরো কিছু পরে সূর্য যখন মধ্য গগনে আসবে, সূর্যের কিরণে গঙ্গার জল যখন কাঁচের টুকরোর মতো ঝকঝক করবে, তখন এই চাঁদনি ভরে যাবে অন্য চরিত্রে—যত সাধু, ফকির, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী বসে আছেন, এই বুঝি বাজে অতিথিশালার ঘণ্টা! শব্দিত আহ্বান—ভোগ শুরু হলো। চাঁদনি নিমেষে শূন্য। কখনো কখনো গৈরিকধারী ভৈরবীও দেখা যাবে, ত্রিশূল-হস্তে এগিয়ে চলেছেন অতিথিশালার দিকে। প্রসাদ গ্রহণ করবেন। আমকাঠের সিন্দুক শ্রীম চাঁদনিতে রেখে গেলেন। স্মরণে রাখতে বললেন, পরে এটি শ্রীরামকৃষ্ণ উপমায় ব্যবহার করবেন। একজন ভৈরবীকে এগিয়ে রাখলেন, আরেকজন আসবেন। অবতরণ করবেন এই ঘাটে নয়, আরো কিছু উত্তরে বকুলতলার ঘাটে। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন।

* * *

চাঁদনিটি দ্বাদশ শিবমন্দিরের ঠিক মাঝখানে। সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গায় স্নান করে সিক্ত বসনে এই শিবমন্দিরে আরোহণ করতেন। এরই একটিতে সেই ঘটনা ঘটেছিল। তখন তাঁর উন্মাদ অবস্থা—আমরা এই কথা বলি; ইংরেজরা এটিকে সুন্দর করে বলেন—'God intoxicated'। শ্রীরামকৃষ্ণ নন্দীশ্বর শিবমন্দিরে প্রবেশ করেছেন, ভিজে কাপড়ের জল পায়ের কাছে টপ্‌টপ্ করে পড়ছে, তিনি হাত জোড় করে স্তোত্র বলছেন—"মহিম্নঃ পারং তে পরমবিদুষো যদ্যসদৃশী"। ক্রমে স্তোত্রের সেই অংশটি এল—

"অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি।।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত, আর্ত চিৎকারে ভেঙে পড়লেন ঃ "মহাদেব গো! তোমার গুণের কথা আমি কেমন করে বলব!" বুক ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। কান্নার স্বরে, পাগলের মতো গদগদ আলাপে, অদৃষ্টপূর্ব আচরণে মন্দিরে মহা শোরগোল। কর্মচারীরা

সব ছুটে এসেছেন, কেউ কেউ বলছেন—এই রে শিবের মাথায় না চেপে বসে! গোলমাল শুনে মথুরবাবুও এসেছেন। এমন আবেগমথিত আরাধনা তিনি কখনো দেখেননি। তিনি মুগ্ধ।

ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রশমিত। হুঁশ আসছে। বাহ্য জগতের বোধ ফিরছে। বাইরে তাকিয়ে দেখছেন—স্বয়ং মথুরবাবু, চারপাশে মন্দিরের যত কর্মচারী। শ্রীরামকৃষ্ণ একটি বালকের মতো সসঙ্কোচে শিবমন্দির থেকে বেরিয়ে এসে ভয়ে ভয়ে মথুরবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হ্যাঁগো, বেসামাল হয়ে আমি কি কিছু করে ফেলেছি?

মথুরবাবু বললেন ঃ না বাবা, তুমি স্তবপাঠ করছিলে; পাছে এরা না বুঝে তোমায় বিরক্ত করে, তাই আমি এখানে দাঁড়িয়েছিলুম পাহারায়।

* * *

মহেন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে পাকা উঠানে চলে এসেছেন। এইবার তিনি মূল মন্দিরদুটিকে বসাবেন বিরাট উঠানের মাঝখানে। উত্তরে রাধাকান্তের মন্দির—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ—পশ্চিমাস্য। আর দক্ষিণে মা কালীর মন্দির।

তিনি প্রথমে আমাদের নিয়ে যাবেন রাধাকান্তের মন্দিরে। ধাপে ধাপে উঠে যাব মর্মর প্রস্তরাবৃত দালানে। প্রথমেই তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন আমাদের মাথার ওপরে। একটি ঝাড় ঝুলছে। তারপরে অর্থবহ একটি মন্তব্য জুড়বেন—এখন ব্যবহার নাই, তাই রক্তবস্ত্রের আবরণী দ্বারা রক্ষিত। 'নাই' শব্দটির একটি ভীষণ আঘাত। প্রভু নাই। রানী নাই। মথুরবাবু নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বারিকা নাই। যে-লীলার আলোয় এই দেবোদ্যান একদিন নবজাগরণ মন্ত্রে উদ্ভাসিত হয়েছিল, সেই আলো অন্যত্র সরে গেছে। ঝাড় আর জ্বলে না। শ্রীরামকৃষ্ণ মথুরবাবুকে বলেছিলেন ঃ তুমি, তোমার স্ত্রী জগদম্বা আর দ্বারিকা পর্যন্ত আমি দক্ষিণেশ্বরে আছি, তারপর আর থাকব না। গলরোগে আক্রান্ত হয়ে ঠাকুর শ্যামপুকুরে এলেন। প্রায় দুমাস থাকলেন। গলরোগের কোন নিরসন নেই। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল বললেন ঃ কলকাতার পরিবেশ দূষিত, অপরিচ্ছন্ন। এখানে নিরাময় সম্ভব নয়। মুক্ত পরিবেশ চাই। স্বামী প্রভানন্দ লিখছেন—"চিকিৎসক ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ঠাকুরের স্থান পরিবর্তনের পরামর্শ দেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যান। কিন্তু মথুরানাথ-পুত্র ত্রৈলোক্যের অসহযোগিতায় ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর যাওয়া হয়ে ওঠে না।"

এর পরে কথামৃতকার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন এক প্রহরীর প্রতি। দ্বারবান মন্দিরটি পাহারা দিচ্ছে। একবার চুরি হয়েছিল মথুরবাবুর আমলে। পশ্চিমের পড়ন্ত রোদ ঠেকাবার জন্যে ক্যামবিসের পর্দার ব্যবস্থা রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে জলের জালা। চৌকাঠের কাছে পাত্রে শ্রীচরণামৃত। এইবার তিনি বিগ্রহ দর্শন করাবেন। সিংহাসনারূঢ় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ। দুটি বিগ্রহের কথা বললেন না।

১৮৫৫ সাল। দেবালয় প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যেই একটি ঘটনা ঘটল। জন্মাষ্টমীর পূজাদি নির্বিঘ্নে হলো। পরের দিন নন্দোৎসব। দুপুরের পূজা, ভোগরাগাদি হয়ে গেছে। এইবার রাধাগোবিন্দের বিশ্রামের সময়। পূজারী ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রাধারানীকে কক্ষান্তরে শয়ন করিয়ে এসে গোবিন্দজীকে নিয়ে যাচ্ছেন কোলে করে। মার্বেলের মেঝেতে জল পড়েছিল, তিনি পা হড়কে পড়ে গেলেন। গোবিন্দজীর একটি পা ভেঙে গেল। মন্দিরে হইহই পড়ে গেল। পণ্ডিতসভা হলো। তাঁরা একবাক্যে বিধান দিলেন—'ভগ্নমূর্তি গঙ্গায় বিসর্জিত হোক। নতুন মূর্তি স্থাপন করাই বিধেয়। ভগ্নমূর্তিতে পূজা নিষিদ্ধ।' এই কয়মাসেই মথুরবাবু তরুণ শ্রীরামকৃষ্ণে আকৃষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব ও ধরনধারণে তিনি মুগ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি বল ঠাকুর। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হয়ে বললেন ঃ রানীর জামাইদের কেউ পড়ে গিয়ে যদি পা ভেঙে ফেলে, তবে কি তাকে বিসর্জন দিয়ে আরেকজনকে এনে তার জায়গায় বসানো হবে, না তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে? এখানেও সেইরকমই করা হোক—মূর্তিটি জুড়ে যেমন পূজা চলছে সেইরকমই চলুক। ধর্মের জগতে এ এক ঐতিহাসিক 'verdict'। শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তিটি এমনভাবে জুড়ে দিলেন, দেখে কিছু বোঝার উপায় রইল না। পরে অবশ্য আরেকটি মূর্তি আনা হয়।

এইবার মহেন্দ্রনাথ আমাদের মা ভবতারিণীর সামনে দাঁড় করালেন। এই দর্শন হবে অতি নিখুঁত, সুচারু, পুঙ্খানুপুঙ্খ। সশরীরে গেলে এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এ যেন—"মন তুই দেখ আর আমি দেখি"! বর্ণনার ভাষাও কী সুন্দর! যেন কালিদাস মেঘদূত লিখছেন—

"শ্বেতকৃষ্ণমর্মরপ্রস্তরাবৃত মন্দিরতল ও সোপানযুক্ত উচ্চবেদি। বেদির উপরে রৌপ্যময় সহস্রদল পদ্ম, তাহার উপর শিব, শব হইয়া দক্ষিণদিকে মস্তক—উত্তরদিকে পা করিয়া পড়িয়া আছেন। শিবের প্রতিকৃতি শ্বেত-

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

প্রস্তরনির্মিত। তাঁহার হৃদয়োপরি বারাণসী-চেলি-পরিহিতা নানাভরণালঙ্কৃতা এই সুন্দর ত্রিনয়নী শ্যামাকালীর প্রস্তরময়ী মূর্তি। শ্রীপাদপদ্মে নূপুর, গুজরিপঞ্চম, পাঁজেব, চুটকি আর জবা বিল্বপত্র।"

মহেন্দ্রনাথ এটিও বলে দিলেন ঃ "পাঁজেব পশ্চিমের মেয়েরা পরে। পরমহংসদেবের ভারী সাধ, তাই মথুরবাবু পরাইয়াছেন।" রসিক ঠাকুর কি না জানতেন!

মাকে আবার দেখি, চোখদুটো মহেন্দ্রনাথের। "মার হাতে সোনার বাউটি, তাবিজ ইত্যাদি। অগ্রহাতে—বালা, নারিকেল-ফুল, পঁইচে, বাউটি; মধ্যহাতে—তাড়, তাবিজ ও বাজু; তাবিজের ঝাঁপা দোদুল্যমান। গলদেশে—চিক, মুক্তার সাতনর মালা, সোনার বত্রিশ নর, তারাহার ও সুবর্ণনির্মিত মুণ্ডমালা; মাথায় মুকুট, কানে কানবালা, কানপাশ, ফুলঝুমকো, চৌদানি ও মাছ। নাসিকায়—নথ, নোলক দেওয়া। ত্রিনয়নীর বাম হস্তদ্বয়ে নৃমুণ্ড ও অসি, দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরাভয়। কটিদেশে নরকর-মালা, নিমফল ও কোমরপাটা।"

ধন্য মহেন্দ্রনাথ। গহনার এত নাম, এত বৈচিত্র্য স্বর্ণালঙ্কার-ব্যবসায়ীরা কি জানেন? 'কথামৃত' গ্রন্থখানি মাথার কাছে রাখি। সব আলো নিভে যাক। ভিয়েনের রসের মতো রাত আরো ঘন, আরো চিটচিটে হোক। শুনতে পাব গ্রন্থের দুই মলাটের ভিতর জীবন্ত মা ঝম্-ঝম্ করছেন।

তখন অনুরোধ করব, মা রাত যে অনেক হলো। উত্তর-পূর্ব কোণে ঐ দেখ তোমার বিচিত্র শয্যা। এইবার তুমি বিশ্রাম কর, অমন ঝম্‌ঝম্ করে আর ঘোরে না। ঐ যে দেয়ালে ঝুলছে চামর। তোমার ছেলে রামকৃষ্ণ এসে ব্যজন করবেন। বেদির ওপর পদ্মাসনে রুপোর গেলাসে তোমার জল।

মহেন্দ্রনাথ বলছেন ঃ "তলায় সারি সারি ঘটি; তন্মধ্যে শ্যামার পান করিবার জল। পদ্মাসনের উপরে পশ্চিমে অষ্টধাতুনির্মিত সিংহ, পূর্বে গোধিকা ও ত্রিশূল। বেদির অগ্নিকোণে শিবা, দক্ষিণে কালোপ্রস্তরের বৃষ ও ঈশান কোণে হংস। বেদি উঠিবার সোপানে রৌপ্যময় ক্ষুদ্র সিংহাসনোপরি নারায়ণশিলা; একপার্শ্বে পরমহংসদেবের সন্ন্যাসী হইতে প্রাপ্ত অষ্টধাতুনির্মিত রামলালা নামধারী শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহমূর্তি ও বাণেশ্বর শিব। আরো অন্যান্য দেবতা আছেন।... দেওয়ালের একপার্শ্বে জলপূর্ণ তামার ঝারি—মা মুখ ধুইবেন।"

মহেন্দ্রনাথ এইবার মন্দির অভ্যন্তরের শোভা দর্শন করাচ্ছেন। ঊর্ধ্বে চাঁদোয়া, মায়ের পিছন দিকে ঝুলছে সুন্দর বেনারসি বস্ত্রখণ্ড, বেদির চারকোণে রৌপ্যময় স্তম্ভ। তার ওপর বহুমূল্য চন্দ্রাতপ। দোহারা মন্দির। দালানের কয়েকটি ফোকর সুদৃঢ় কপাট দ্বারা সুরক্ষিত। দরজার কাছে পঞ্চপাত্রে শ্রীচরণামৃত। এখানেও একজন চৌকিদার।

মহেন্দ্রনাথ মন্দিরের গঠন ব্যাখ্যা করছেন—মন্দির-শীর্ষ নবরত্নমণ্ডিত। নিচের থাকে চারটি চূড়া, মধ্যের থাকে চারটি, আর সবার ওপরে একটি। একটা চূড়া এখন ভেঙে আছে। "এই মন্দিরে এবং ৺রাধাকান্তের ঘরে পরমহংসদেব পূজা করিয়াছিলেন।"

অতীত। চোখের জলের অতীত। কত দিন হলো! সেই অপূর্ব পূজারী তাঁর আসন, চামর, তাঁর রামলালা, তাঁর বাণলিঙ্গ শিব, তাঁর অগণিত ভক্ত, তাঁর পদার্পণে ধন্য তীর্থসমূহকে ছেড়ে চলে গেছেন! 'কথামৃত'-এ এই লাইনটি পাতার কত বছর আগে?

১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে মহেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। তারিখ। মতান্তর আছে। সন্দেহ আছে। 'কথামৃত'-র পাদটীকায় প্রকাশকের মন্তব্য—"প্রথম দর্শনের তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ আছে।" পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ একটি অমূল্য পুস্তক প্রকাশ করেছেন—'কলকাতা, ইতিহাসের দিনলিপি'—কলকাতার পাঁচশ বছরের কালানুক্রমিক দিনলিপি। এই কাজটি করেছেন নীরদবরণ হাজরা। এই দিনপঞ্জিতে আছে—"১৮৮২, ২৬ জানুয়ারি—শ্রীম নামে খ্যাত মহেন্দ্র গুপ্ত এদিন প্রথম রামকৃষ্ণদেবের সান্নিধ্যে যান এবং ডায়রি লেখা শুরু করেন। এরই ফলে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থমালা গড়ে ওঠে।" ২৬ জানুয়ারি ছিল বৃহস্পতিবার।

এও কি ঠিক? মহেন্দ্রনাথ প্রথম দশন শুরু করছেন—"বসন্তকাল, ইংরেজী ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাস। ঠাকুরের জন্মোৎসবের কয়েকদিন পরে। শ্রীযুক্ত কেশব সেন ও শ্রীযুক্ত জোসেফ কুক সঙ্গে ২৩ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ঠাকুর স্টিমারে বেড়াইয়াছিলেন—তাহারই কয়েকদিন পরে। সন্ধ্যা হয় হয়।"

মহেন্দ্রনাথ সাল, তারিখ, বার, এমনকি তিথি সম্পর্কে এত সচেতন এবং নিখুঁত, অথচ প্রথম দর্শনের মতো জীবনের এত বড় একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যখন ডায়েরিতে লিখলেন, তখন বার-তারিখ বললেন না কেন? তখন কি বুঝতে পারেননি, কি হতে চলেছে, অথবা কোন মনস্তাত্ত্বিক কারণ? জীবনের ঐ সময়টাকে ভুলতে চেয়েছেন? কেন? [ক্রমশ] [এক]

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

চিরস্মরণীয় বীর-শিরোমণি

মহারাণা প্রতাপসিংহ

জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

> এই রচনাটি 'অধ্যাপক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।
> —সম্পাদক

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[illegible]রপ্রসূ ভারতমাতা যুগে যুগে এমন সব মহান সন্তানদের জন্ম দিয়েছেন, যাঁদের নাম স্মরণমাত্র দেশবাসীর হৃদয় শ্রদ্ধায় ও গর্বে ভরে ওঠে, প্রাণে সঞ্চারিত হয় আত্মত্যাগচিকীর্ষা ও নিঃস্বার্থপরতা এবং জাগ্রত হয় প্রবল উদ্যম। এমনই এক প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ বীর-শিরোমণি মহারাণা প্রতাপসিংহ। রাজপুতানার ইতিহাসকে উজ্জ্বল ও গৌরবময় করে তোলার পথিকৃৎ মহারাণা প্রতাপ ছিলেন অনন্য দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতার একনিষ্ঠ পূজারী, রণকুশল, স্বার্থত্যাগী, নীতিজ্ঞ এবং প্রকৃত উদার ক্ষত্রিয় বীর। তিনি এমন এক সঙ্কট মুহূর্তে মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, যখন তাঁর রাজ্যের রাজধানী চিতোর-সহ প্রায় সমগ্র সমতলভূমি ছিল বিদেশী মুসলমান শাসকদের পদানত। মেবারের নেতৃস্থানীয় সরদাররা পূর্ববর্তী যুদ্ধগুলিতে নিহত হয়েছিলেন। সেই পরিস্থিতিতে মোগল বাদশাহ্ আকবর প্রতাপসিংহকে বিধ্বস্ত করতে তাঁর সাম্রাজ্যের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। বহু রাজপুত রাজা নিজ বংশের কন্যাদের আকবরের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভোগবিলাসে জীবনযাপন করছিল। কিন্তু তৎকালীন ভারতের সর্বাধিক শক্তিশালী ও ঐশ্বর্যসম্পন্ন সম্রাট আকবরকে প্রতাপসিংহ তাঁর ক্ষুদ্র রাজ্যের সীমিত ক্ষমতায় বহু বছর যাবৎ প্রতিরুদ্ধ করে রাখেন। মহাশক্তিধর বিশাল মোগল সাম্রাজের অধীশ্বর কখনোই তাঁকে নিজ আয়ত্তে আনতে সক্ষম হননি। প্রতাপ শুধুমাত্র বীর ও রণকুশলীই ছিলেন না, পরন্তু ধার্মিক ক্ষত্রিয় ছিলেন। আকবরের কূটনীতির জবাব দিতে সক্ষম ছিলেন একমাত্র তিনিই। তাঁর নাম শুধু রাজপুতানায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হয়। বিশ্বে বীরগণ যতদিন পূজিত হবেন, ততদিন মহারাণা প্রতাপের অত্যুজ্জ্বল ও অবিস্মরণীয় নাম মানবজাতিকে স্বাধীনতা তথা দেশাত্মবোধের প্রেরণা দিয়ে যাবে।

প্রতাপসিংহের জন্ম জ্যৈষ্ঠ শুক্লা তৃতীয়া, (৯ মে ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দ) রবিবার। তাঁর পিতা ছিলেন রাণা উদয়সিংহ এবং জননী রানী জয়বন্তী। জন্মস্থান কুম্ভলমের।

প্রতাপ ছিলেন মেবারের সুপ্রসিদ্ধ বাপ্পা রাওয়ালের বংশধর। বাপ্পা রাওয়াল ছিলেন গুহিল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। এঁরা সিসোদিয়া বংশোদ্ভব হিসাবেও পরিচিত ছিলেন। এই বংশের রাণা লক্ষ্মণসিংহের পৌত্র হমীর নিজ শক্তি ও রাজ্যসীমা বিপুল বৃদ্ধি করেছিলেন। রাণা কুম্ভ ছিলেন ঐ বংশের অত্যন্ত প্রতাপশালী শাসক। তাঁর শাসনকালে মেবার রাজ্যের অনেক বিস্তার ঘটেছিল। তিনিই তাঁর যুদ্ধজয়ের স্মারকস্বরূপ চিতোরের বিশ্ববিখ্যাত 'কীর্তিস্তম্ভ' নির্মাণ করিয়েছিলেন—স্থাপত্যকলায় যেটি শুধু অনুপমই নয়, পরন্তু তৎকালীন হিন্দু সংস্কৃতি তথা কলাশিল্পের সাক্ষাৎ নিদর্শনও।

রাণা কুম্ভ যেমন অদ্বিতীয় বীর ছিলেন, তেমনি ছিলেন অতুলনীয় রাজনীতিজ্ঞ এবং বিদ্যানুরাগী। রাণা কুম্ভের পৌত্র ছিলেন বীর রাণা সাঙ্গা, যাঁর পত্নী ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ ভক্তিময়ী সাধিকা মীরাবাঈ। রাণা সাঙ্গাও ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও নিপুণ সুশাসক। মোগল সম্রাট বাবর স্বীকার করেছিলেন—"রাণা সাঙ্গার শক্তি এত বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, মালবা, গুজরাট ও দিল্লির সুলতানদের মধ্যে কেউই একাকী তাঁকে হারাতে পারত না।"

রাণা সাঙ্গার মৃত্যুর পর থেকেই মেবারের শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র রতনসিংহ এবং বিক্রমাজিৎ ক্রমান্বয়ে মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৫৩৪ খ্রীস্টাব্দে গুজরাট-মালবারে সুলতান বাহাদুর শাহ মেবার আক্রমণ করেন এবং আড়াই মাসের অধিককাল চিতোর দুর্গ ঘেরাও করে রাখেন। বাধ্য হয়ে সাঙ্গার স্ত্রী রানী কর্মবতী ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দের ২৪ মার্চ বাহাদুর শাহের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করেন, কিন্তু চিতোর দুর্গ তখনো তাঁর অধরাই থেকে যায়। ১৫৩৪ খ্রীস্টাব্দের শেষদিকে বাহাদুর শাহ্ পুনরায় চিতোর আক্রমণ করেন। রাণা বিক্রমাজিৎ ও উদয়সিংহকে আগেই বুঁদিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের মা রানী কর্মবতীর নির্দেশনায় সব সরদার চিতোর রক্ষার যুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়, কিন্তু তোপের গোলার মুখে তারা দাঁড়াতে পারেনি। সেজন্য ৮ মার্চ ১৫৩৫ চিতোরে জহরব্রত অনুষ্ঠিত হয় এবং সেইদিনই বাহাদুর শাহ চিতোর দুর্গ

অধিকার করে নেন। কিন্তু মোগল সম্রাট হুমায়ুনের কাছে পরাস্ত হয়ে বাহাদুর শাহ্ মন্দসৌর থেকে পলায়ন করেন এবং গুজরাটী সৈন্যরা চিতোরের দুর্গ ছেড়ে চলে গেলে পুনরায় মেবারের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বিক্রমাজিৎ ও উদয়সিংহ তখন সেখানে ফিরে আসেন।

রাণা সাঙ্গার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পৃথ্বীরাজের অবৈধ পুত্র বনবীর বিদ্রোহী সরদারদের সাহায্য নিয়ে ১৫৩৬ খ্রীস্টাব্দের শেষদিকে রাণা বিক্রমাজিৎকে হত্যা করে স্বয়ং মেবারের সিংহাসন দখল করেন। প্রভুভক্ত ধাত্রী পান্না নিজ পুত্রকে ঘাতকের হাতে তুলে দিয়ে উদয়সিংহের জীবনরক্ষা করে। মেবারের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী মানুষেরা উদয়সিংহকে কুম্ভলমের নিয়ে যান। মেবারের প্রধান সরদারগণ ১৫৩৭ খ্রীস্টাব্দে উদয়সিংহকে মেবারের শাসক বলে ঘোষণা করেন। এর তিন বছর পর ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দে বনবীরকে পরাজিত করে উদয়সিংহ চিতোর অধিকার করেন। ঐবছরই উদয়সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রতাপের জন্ম হয়।

মোগল সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করার পরেই আকবর উপলব্ধি করেন যে, বীর রাজপুতদের সমর্থন ও সহযোগিতা ব্যতীত তাঁর সাম্রাজ্যকে নিষ্কণ্টক করা সম্ভব নয়। তাই ১৫৬২ খ্রীস্টাব্দে অম্বরের রাজা ভারমলের কন্যাকে বিবাহ করে আকবর রাজপুত ঘরানাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করেন। সূত্রপাত হয় একটি নতুন পরম্পরার। এইভাবে মানসিংহ, প্রতাপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শক্তিসিংহ প্রমুখ বহু রাজপুত রাজা ও সরদারকে নিজের দলে টেনে নেন সম্রাট আকবর। এভাবেই দেশদ্রোহীদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

১৫৬৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩ অক্টোবর আকবর চিতোর দুর্গ অবরোধ করেন। পুরো চার মাস কঠোর অবরোধ থাকায় দুর্গের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী প্রায় শেষ হয়ে যায়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৫৬৮ রাত্রে চিতোরে সর্বশেষ জহরব্রত অনুষ্ঠিত হয় এবং পরদিন সকালে ভীষণ যুদ্ধ হয়, যাতে সমস্ত রাজপুত সৈন্য বীরের মৃত্যু বরণ করে এবং চিতোর ও তার সন্নিহিত সমস্ত এলাকায় রাণা উদয়সিংহের অধিকারের সমাপ্তি ঘটে।

বেশ কয়েক মাস বনে-পাহাড়ে গা-ঢাকা দিয়ে উদয়সিংহ ১৫৭১-র মাঝামাঝি গোগুন্দা পৌঁছান এবং সেখানেই ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৫৭২ তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর প্রতাপের যোগ্যতা, সহৃদয় ব্যবহার এবং অভূতপূর্ব বীরত্ব প্রত্যক্ষ করে মেবারের প্রায় সমস্ত প্রধান সরদার একমত হয়ে নির্দ্বিধায় প্রতাপকে মেবারের রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেদিন পরাধীনতার ঘোর অন্ধকারে স্বাধীনতার অতন্দ্র প্রহরী রাণা প্রতাপ যে অভিনব ও অখণ্ড জীবন-জ্যোতি প্রজ্বলিত করেন, বহু শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও তা স্বাধীনতার অনন্য সাধক তথা দেশের জন্য জীবন উৎসর্গকারীদের অবিচ্ছিন্ন প্রেরণার উৎসরূপে আজও ভাস্বর হয়ে আছে।

মহারাণা প্রতাপসিংহ

মেবারের স্বাধীন নৃপতি মহারাণা প্রতাপ

রাণা উদয়সিংহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে রাজপরিবারের পরম্পরা অনুযায়ী যুবরাজ জগমালকে রাজসিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু জগমাল উদয়সিংহের দাহ-কার্যে সম্মিলিত হননি। শ্মশান থেকে ফিরে প্রধান সরদাররা যখন জগমালকে উদয়সিংহের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে জানতে পারেন, তখনি তাঁরা সর্বসম্মতিক্রমে প্রতাপকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন এবং জগমালকে বলেন: "রাণার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিসাবে তোমার আসন সিংহাসনের সম্মুখে।" একথায় ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ জগমাল অসন্তুষ্ট হয়ে আকবরের শরণাপন্ন হন এবং তাঁকে আকবর জাহাজপুর পরগনার জায়গির দান করেন।

এইভাবে ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি দোলের দিন গোগুন্দাতে প্রতাপ মেবারের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছুদিন পরে প্রতাপ কুম্ভলমেরে যান এবং সেখানেই তাঁর রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠিত হয়।

আজমের থেকে চিতোর-মন্দসৌর হয়ে মালবা যাওয়ার রাস্তার সন্নিহিত পশ্চিমের এলাকা এবং মাণ্ডলগড়ের সুদৃঢ় দুর্গ-সহ পূর্বদিকের মেবারের সমগ্র ক্ষেত্র চিতোর-জয়ের সময় থেকেই মোগল সাম্রাজ্যের অধিকারে চলে গিয়েছিল। রণথম্ভোর বুঁদির শাসক হাড়া রাও সুর্জন এবং রামপুরার চন্দ্রাবত রাও দুদাও মোগলের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিল। এইভাবে মহারাণা প্রতাপ উত্তরাধিকার সূত্রে মেবারের খণ্ডিত রাজ্যই লাভ করেছিলেন।

প্রতাপের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরেই মেবারের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। কুম্ভলমের ও গোগুন্দাকে কেন্দ্র করে প্রতাপ মেবারের অবশিষ্ট রাজ্যের শাসনব্যবস্থাকে সংহত ও সংগঠিত করে তুললেন। পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী ভীল ইত্যাদি বনবাসী ও গিরিজনদের মধ্য থেকে সুঠামদেহী ধনুর্ধারীদের সঙ্ঘবদ্ধ করে প্রতাপ তাদের মেবার সৈন্যবাহিনীর শক্তিশালী অঙ্গে পরিণত করলেন। কুম্ভলমেরে সামরিক সরঞ্জাম ও খাদ্যবস্তুর পুরোপুরি ব্যবস্থা করে তিনি ঐ কেন্দ্রকে প্রধান সৈন্যঘাঁটিতে রূপান্তরিত করলেন। আরাবল্লী পর্বতশ্রেণীর সমস্ত পার্বত্য কেন্দ্র, বিশেষত গোগুন্দার নিরাপত্তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সবরকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

রাজপুতানায় মোগলদের শক্তিবৃদ্ধি

রামপুরার চন্দ্রাবত ও বুঁদির হাড়া শাসকরা মোগলদের বড় সহায়কে পরিণত হয়েছিল। ওদিকে মোগলরা গুজরাট জয়ের পর ঈডর ও ডুঙ্গরপুরকেও নিজেদের অধীন করে নিয়েছিল। পরে সিরোহীর শাসকও তাদের অধীনতা স্বীকার করে নেয়। ১৫৭০ খ্রীস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর আকবর নাগৌরে উপনীত হলে মারোয়াড়ের বিদ্রোহী রাও চন্দ্রসেন এবং বিকানীরের রাও কল্যাণমল সেখানে গিয়ে আকবরের অধীনতা স্বীকার করেছিলেন। পরে অবশ্য চন্দ্রসেনের ওপর আকবর রুষ্ট হলে তিনি আমৃত্যু আকবরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন।

প্রতাপ মেবারের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর দেখা গেল যে, মেবারের উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্বের সমস্ত ক্ষেত্রের ওপর মোগলদের সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মেবারের নতুন রাণা প্রতাপই একমাত্র অবশিষ্ট রইলেন, যিনি আকবরের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এই স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত রাখার সংগ্রামে প্রতাপ একেবারে একাকী হয়ে পড়লেন। সমগ্র রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে মহাসঙ্কটময় হয়ে উঠেছে, তা তিনি প্রত্যক্ষ করলেন।

প্রতাপ জানতেন যে, আকবরের সৎ ভাই মির্জা মহম্মদ হকীম কাবুলের জায়গির অধিকার করে রেখেছিল। এই মহম্মদ হকীম ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দে পাঞ্জাবের ওপর ব্যর্থ আক্রমণ চালিয়েছিল। আকবরের দূর সম্পর্কের ভাই ও ভাইপো এবং অসন্তুষ্ট শক্তিশালী মির্জাদের বিদ্রোহের আগুন মাঝেমাঝেই জ্বলে উঠত। আকবরের এইসব ক্ষতি-সাধনকারী কণ্টকগুলি সম্বন্ধে মহারাণা প্রতাপ অবহিত ছিলেন।

প্রতাপের সম্মুখে দুটি মাত্র পথ ছিল—হয় আকবরের পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে অন্যান্য রাজপুত রাজাদের মতো নতমস্তকে শাহী দরবারে হাজির হয়ে বাদশাহের সেবা করা, অথবা মোগলের অধীনতা স্বীকার না করে বিরোধিতার কণ্টকময় পথ গ্রহণ করে সারাজীবন সাহস, দৃঢ়তা ও ধৈর্য সহকারে সমস্ত বিপদ ও কষ্ট সহ্য করে স্বাধীনতারক্ষার জন্য সংগ্রাম করা।

ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার অধিকারী মোগল সাম্রাজ্যের সর্বশক্তিসম্পন্ন যুবক সম্রাটের স্বভাবে তাঁর হিংস্র তুর্ক ও রক্তপিপাসু মোগল পূর্বপুরুষদের চরম নৃশংস প্রবৃত্তি মাঝেমাঝেই প্রকাশ হয়ে পড়ত—বিশেষত তিনি যখন অতিরিক্ত মদ্যপান করতেন কিংবা কোন কারণে ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন। ক্রুদ্ধ ও মদোন্মত্ত আকবর তাঁর সেবায় নিরত রাজপুত নৃপতি, তাঁদের আত্মীয় অথবা সম্মানিত সরদারদের প্রতি কিরকম জঘন্য অত্যাচার ও দুর্ব্যবহার করতেন, তার জ্বলন্ত বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শী আবুল ফজলের 'দলপত বিলাস'-এ বর্ণিত আছে। এসব কথা প্রতাপও শুনেছিলেন এবং রাও চন্দ্রসেন তাঁর নাগৌর যাত্রার সময়ে আকবরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর নিজ অভিজ্ঞতার কথা তাঁকে জানিয়েছিলেন বলে মনে হয়। এক বিদেশী বিধর্মী আক্রমণকারীর অধীনতা স্বীকার করে তার দুর্ব্যবহার তথা অত্যাচার সহ্য করা আপসহীন প্রতাপের পক্ষে একেবারেই সম্ভব ছিল না।

অতএব ভারতের প্রাচীন গৌরবোজ্জ্বল রাজবংশের ঐতিহ্য ও যশোকীর্তির উত্তরাধিকারী মহারাণা প্রতাপ তাঁর মহান পিতামহের পরম্পরাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্য নিয়ে মোগল-বিরোধিতার নীতিকেই দৃঢ়তার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। মোগল আধিপত্যের বিরোধী অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তিগুলির মতো তাঁর দৃষ্টিতেও আকবর বাবরের মতোই ছিলেন এক সফল বিদেশী আক্রমণকারী। সেই কারণে দৃঢ়তার সঙ্গে মোগল-বিরোধী নীতি গ্রহণ ভিন্ন প্রতাপের সামনে অন্য কোন বিকল্প ছিল না।

মহারাণা প্রতাপের সিংহাসন আরোহণের দিন থেকেই আকবর তাঁর গতিবিধির ওপর নজর রেখেছিলেন। গুজরাট-বিজয়ের জন্য যাত্রা করার সময় আকবর জলাল খাঁ কোরজীকে প্রতাপের কাছে তাঁর সরকারি দূত হিসাবে পাঠিয়েছিলেন। আকবরের আশা ছিল যে, কিছু সময়ের ব্যবধানে প্রতাপ বিনাযুদ্ধে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নেবেন। প্রতাপকে চিনতে আকবরের অনেক দেরি হয়েছিল।

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

গুজরাট জয়ের পর আকবর মেবারের ব্যাপারে কিছু করার প্রয়োজন অনুভব করলেন এবং অম্বরের মানসিংহকে একটি মোগল সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি করে ঈডর, ডুঙ্গরপুর হয়ে উদয়পুরের দিকে রওনা হওয়ার আদেশ দিলেন। মানসিংহকে এই নির্দেশ দেওয়া হলো যে, মোগলের অধীনতা যেসমস্ত রাজ্য স্বীকার করে নেবে, তাদের যেন সসম্মানে শাহী দরবারে নিয়ে আসা হয়।

ডুঙ্গরপুর থেকে মানসিংহ অল্প কিছু সৈন্য নিয়ে উদয়পুর যাত্রা করলেন, অবশিষ্ট মোগল সৈন্যদের সোজা আজমেঢ়ে পাঠিয়ে দিলেন। প্রতাপ সেইসময় গোগুন্দায় ছিলেন। সেখান থেকে তিনি উদয়পুরে এসে মানসিংহকে সাদর সংবর্ধনা জানালেন। আকবরের নির্দেশে মানসিংহ মহারাণা প্রতাপকে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, প্রলোভন দেখালেন এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে শাহী দরবারে যাওয়ার জন্য বিশেষ আগ্রহও প্রকাশ করলেন। ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে এই সাক্ষাৎকার ঘটে।

মহারাণা সরাসরি মানসিংহের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান না করে তাঁকে বললেন যে, তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁকে শাহী দরবারে যেতে দেবে না। তিনি নানা কৌশলে মানসিংহের অনুরোধ এড়িয়ে গেলেন এবং মানসিংহের দৌত্য ব্যর্থ হলো। মানসিংহের বিদায়ের পূর্বদিন মহারাণা উদয়সাগরের নিকট সুরম্য প্রাসাদে তাঁকে মধ্যাহ্নভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু ভোজনের সময় মহারাণা স্বয়ং উপস্থিত না হয়ে কুঁয়র অমরসিংহকে আদেশ দিলেন : "তুমি মানসিংহকে ভোজনের সময় আদর-আপ্যায়ন করো।" মানসিংহ ভোজনে অংশগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করলে অমরসিংহ জানান—"মহারাণার পেট ব্যথা করছে, তাই তিনি ভোজন করবেন না, আপনি ভোজন করুন।" একথায় ক্রুদ্ধ হয়ে মানসিংহ বলে উঠলেন : "এই পেট ব্যথার ওষুধ আমি ভালই জানি। এখনো পর্যন্ত আমি আপনাদের মঙ্গলের কথাই চিন্তা করেছি, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করে দিচ্ছি।" একথা শুনে মহারাণা বলে পাঠালেন : "আপনি যখন আপনার সৈন্য নিয়ে আসবেন, তখন মালপুরাতে আমরা আপনাকে অভ্যর্থনা জানাব এবং যখন আপনি আপনার ফুফা (আকবর)-এর সাহায্য নিয়ে আসবেন, তখন যেখানে সুযোগ হবে, সেখানেই আপনাকে স্বাগত জানাব।" একথা শুনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে মানসিংহ সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন। এইভাবে উভয়ের মধ্যে পাকাপাকি শত্রুতার সৃষ্টি হলো। মানসিংহ যবন-সম্পর্কের কারণে অধঃপতিত হওয়ায় তার জন্য পরিবেশিত ভোজন পুকুরে ফেলে দিতে এবং ঐ স্থানের মাটি খুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেখানে পবিত্র জল ছেটাতে আদেশ দিলেন মহারাণা প্রতাপ।

অপমানিত মানসিংহ রাজধানীতে ফিরে সমস্ত ঘটনা আকবরকে জানালেও তখনি এব্যাপারে কিছু করা সম্ভব ছিল না। কয়েক মাস পরে সেপ্টেম্বরে আকবর আমেদাবাদ থেকে রাজা ভগবন্তদাসকে মহারাণার নিকট এই আশায় পাঠালেন যে, এই প্রবীণ রাজপুত শাসক সম্ভবত প্রতাপকে প্রভাবিত করতে পারবেন। সেইসময় প্রতাপ গোগুন্দাতে ছিলেন, সেখানেই রাজা ভগবন্তদাস প্রতাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। মহারাণা রাজাকে যথোচিত অভ্যর্থনা জানালেন, কিন্তু আকবরের দরবারে যেতে রাজি হলেন না। মিষ্টি কথা বলে তিনি রাজা ভগবন্তদাসকে বিদায় করলেন। এর প্রায় দুমাস পর গুজরাটের রাজধানী থেকে ফেরার সময় রাজা টোডরমল পথমধ্যে মহারাণা প্রতাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু তাঁকেও ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে আসতে হয়।

মহারাণা প্রতাপকে অন্যান্য রাজপুতদের মতো নিজের অধীনে আনার জন্য আকবর অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব ছিলেন। দৃঢ়চেতা প্রতাপকে কিছুতেই টলানো সম্ভব না হওয়ায় মেবার-মোগল সঙ্ঘাত প্রায় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ল।

হলদিঘাটের যুদ্ধ

নানা সূত্রে তথা বিভিন্ন প্রভাবশালী সরদারের মাধ্যমে মহারাণা প্রতাপকে দরবারে নিয়ে আসার সকল চেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো, তখন আকবর প্রতাপের ওপর দমননীতি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দের ৭ মার্চ আজমেঢ়ে আকবর এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিলেন অম্বরের মানসিংহকে। তাঁকে মোগল বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করে তাঁর সঙ্গে বক্‌শি আসফ খাঁ, গাজী খাঁ বদখশী প্রমুখের সঙ্গে মানসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র মাধোসিংহ, কাকা জগন্নাথ কছবাহা, খুড়তুতো ভাই খঙ্গার ও শেখাবত কছবাহা এবং রাও লুনকরণকেও তাঁর বাহিনীতে নিযুক্ত করা হলো।

পূর্ণ সামরিক প্রস্তুতির পর ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের গোড়াতেই শাহী সেনা মণ্ডলগড় থেকে গোগুন্দা রওনা হলো। মোহী গ্রাম থেকে অগ্রসর হয়ে মোগল সৈন্যবাহিনী বনাস নদীর উত্তরে অবস্থিত মোলেলা গ্রামের নিকট শিবির স্থাপন করল। সেখান থেকে খমনৌর গ্রাম এবং হলদিঘাটের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত যে সমতলভূমি বিস্তৃত, তার মধ্য দিয়েই বনাস নদী প্রবাহিত। এখান থেকেই পার্বত্য প্রদেশ আরম্ভ হয়েছে।

মহারাণা প্রতাপও কুম্ভলমের থেকে গোগুন্দা পৌঁছে সেখানে মেবার সেনাকে সুসজ্জিত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করলেন। গোগুন্দার সুরক্ষার জন্য হলদিঘাটের উত্তরপ্রান্তে অশ্বারোহী সশস্ত্র সৈন্যদের প্রহরা নিযুক্ত করা হলো। মেবারের সেনানায়করা পাহাড়ের আড়াল থেকে বিপুল সংখ্যক শক্তিশালী মোগলবাহিনীর সম্মুখীন হওয়াই সমীচীন হবে বলে সিদ্ধান্ত নিলেন।

আক্রমণোদ্যত মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য মহারাণা প্রতাপ যখন তৎপর হলেন, তখন আশপাশের

প্রদেশগুলির মোগল-বিরোধী শক্তিও প্রতাপের সঙ্গে যোগ দিল। মেবার রাজ্যের সমস্ত প্রধান সরদার ও যোদ্ধারা ছাড়াও প্রতাপের মামাতো ভাই মানসিংহ সোনগরা, বীর জয়মল মেড়াতিয়ার পুত্র রামদাস, গোয়ালিয়রের পদচ্যুত রাজা বিক্রমাদিত্যের পুত্র রামশাহ তোমর, তাঁর তিন পুত্র এবং বিরোধী পাঠানদের নেতা হকীম খাঁ সুরও দলবল নিয়ে মোগল সৈন্যদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য এসে উপস্থিত হলেন। মেরপুরের রাণা পুঞ্জা তাঁর বিশ্বস্ত ধনুর্ধর ভীলদের বাহিনী নিয়ে এসে পৌঁছালেন। প্রকৃতপক্ষে এটি শুধু মেবার-মোগলের যুদ্ধই ছিল না, স্বাধীনতারক্ষার জন্য যাঁরা মহারাণা প্রতাপের দেশাত্মবোধের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরা এবং মোগল বাদশাহের প্রতি নানা কারণে ক্ষুব্ধ পাঠানরা এই যুদ্ধের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন।

মহারাণা প্রতাপ তাঁর রাজপুত সৈন্যবাহিনী-সহ গোগুন্দা থেকে যাত্রা করে লোহসিং নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন। এই স্থানটি গোগুন্দা থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে ছয় মাইলের একটু বেশি এবং খমনৌর থেকে প্রায় সাড়ে দশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। মোলেলাতে শিবির স্থাপন করেও মানসিংহ বুঝতে পারেননি যে, প্রতাপের শিবির এত কাছে। খমনৌর থেকে মানসিংহ শিকারের অছিলায় দক্ষিণের পার্বত্য প্রদেশের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করতে বেরিয়ে প্রতাপের শিবিরের মাত্র কয়েক ক্রোশ দূরে এসে উপনীত হলেন। তখন তাঁর কাছে মাত্র একহাজারের মতো সৈন্য ছিল। গুপ্তচরদের কাছ থেকে মানসিংহের এইরকম প্রায় অরক্ষিত অবস্থানের কথা জেনে প্রতাপ মানসিংহের ওপর আক্রমণ করার জন্য তৎপর হলেন। তখন ঝালা বীদা তাঁকে এই বলে নিরস্ত করলেন যে, এইভাবে ছলনা বা প্রবঞ্চনা করে শত্রুকে হত্যা করা প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অশোভন। রাজপুতদের এই নীতিবোধ অনেক সময়ই তাঁদের গভীর সঙ্কটের কারণ হয়েছিল। এক্ষেত্রেও নিশ্চিত জয়ের পথ থেকে প্রতাপকে সরে যেতে হলো।

হলদিঘাট থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে নয় মাইল দূরে অবস্থিত লোহসিং সুরক্ষিত ছিল। সেখানে যাওয়ার পথ ছিল হলদিঘাটের মধ্য দিয়ে এবং সেখানে যেতে হলে সঙ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটের মধ্যে প্রবেশ করা ছাড়া উপায় ছিল না। মানসিংহের মোগল সৈন্যদের দেড় মাইল দীর্ঘ গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়ে এক বা দুইজনের পঙ্‌ক্তিতে আসা সম্ভব ছিল এবং সে-চেষ্টা করলে স্বল্পসংখ্যক ধনুর্ধর বীর সমগ্র মোগল সেনাকে আটকে দিতে পারত।

প্রতাপের উচিত ছিল মানসিংহকে সেখানে আসতে বাধ্য করা এবং উক্ত গিরিসঙ্কটে তাঁদের ঘিরে ফেলে মোগল সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলা। কিন্তু মনে হয়, রাজপুতরা তখনো পর্যন্ত গেরিলা যুদ্ধের কলাকৌশল যথাযথভাবে রপ্ত করতে পারেনি। আর প্রতাপের বীর সরদাররা শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সম্মুখ সমরের জন্য অত্যধিক উতলা হয়ে পড়েছিলেন। এই কারণে যুদ্ধ করার জন্য প্রতাপ স্বয়ং উক্ত দুর্গম পথ দিয়ে খমনৌর গ্রামের নিকটবর্তী সমতলভূমিতে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে এলেন। পার্বত্য পথ থেকে বেরিয়ে প্রত্যেক দলকে নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান গ্রহণ করতে আদেশ দেওয়া হলো, যাতে অল্প সময়ের মধ্যে ব্যূহরচনা করা সম্ভব হয়। হরাবলের নেতৃত্বে ছিল হকীম খাঁ সুর এবং তাঁর অধীনে ছিল রণদুর্মদ পাঠান সৈন্যদল।

মানসিংহ তাঁর সৈন্যবাহিনীর একটি অংশকে খমনৌর গ্রাম থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে হলদিঘাটের উত্তর সীমান্তে দাঁড় করালেন। এর ফলে মোগল বাহিনী বনাস নদীর বাঁক পর্যন্ত বিস্তৃত হলো। এই ঐতিহাসিক যুদ্ধ হলদিঘাটের উত্তর সীমান্ত থেকে খমনৌর গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তরে সঙ্ঘটিত হলো।

কয়েক ক্রোশের দূরত্বে দুই পক্ষের সৈন্যবাহিনী কয়েক দিন অবস্থান করার পর প্রত্যাশিত মেবার-মোগল যুদ্ধ—যা হলদিঘাটের যুদ্ধ নামে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হয়ে আছে—১৮ জুন ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দ (আষাঢ় কৃষ্ণা সপ্তমী), সোমবার প্রাতঃকালে শুরু হলো। ঐতিহাসিক আলবেরুণী মোগল বাহিনীর মীর বক্‌শী আসফ খাঁয়ের সঙ্গে ছিলেন এবং ঐ যুদ্ধে তিনিও অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর ইতিহাস-গ্রন্থ 'মুন্তখুরুত-বারীখ'-এ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ এইভাবে লিপিবদ্ধ আছে—

"রাণা (প্রতাপ)-এর সৈন্যবাহিনী ঘাঁটির পিছন থেকে বেরিয়ে আসার পূর্বেই তাকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছিল। এক ভাগের সেনাপতি ছিল হকীম সুর আফগান। এই দলটি পাহাড়ের পশ্চিমদিক থেকে বেরিয়ে আমাদের ওপর আক্রমণ করে, যার ফলে হরাবলে আমাদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে।" এইসময় আলবেরুণী হরাবলের প্রধান সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ছিলেন। উভয়পক্ষের বীর সৈন্যদের মৃতদেহে যুদ্ধক্ষেত্র ভরে উঠল। আলবেরুণী আরো লিখেছেন ঃ

"রাণার সৈন্যবাহিনীর অন্য ভাগের নেতৃত্বে ছিলেন স্বয়ং রাণা (প্রতাপ)। এই দল ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে গাজী খাঁয়ের সৈন্যদলকে আক্রমণ করে এবং গাজীর সৈন্যদলকে সংহার করতে করতে একেবারে মাঝখানে পৌঁছে যায়।

"গোয়ালিয়রের রাজা রামশাহ সবসময় রাণার থেকে এগিয়ে থাকতেন। তিনি মানসিংহের রাজপুতদের বিরুদ্ধে এমন বীরত্ব প্রদর্শন করলেন, যার বর্ণনা করা লেখনীর সামর্থ্যের বাইরে।... আসফ খাঁকেও পালাতে হলো।... এসময় যদি সৈয়দরা টিকে না থাকত, তাহলে তিনি অবশ্যই আমাদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করতেন।

"উভয় সৈন্যবাহিনীর রণোন্মত্ত হাতিরা দুর্দান্তভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করে। মানসিংহও মাহুতের

আসনে বসে অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করে। বাদশাহের প্রধান হাতি রাণার রামপ্রসাদ নামক হাতির সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করে। অবশেষে রামপ্রসাদের মাহুত তীরবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে যায়, তখন শাহী হাতির মাহুত তৎপরতার সঙ্গে লাফ মেরে তার পিঠে উঠে বসে। এইভাবে রাণার রামপ্রসাদ হাতি ধরা পড়ে।"

আলবিরুণীর মতে—"এইরূপ পরিস্থিতি দেখে রাণা আর টিকতে পারলেন না এবং পালিয়ে গেলেন, যার ফলে রাণার সৈন্যবাহিনী হতাশ হয়ে পড়ল। এইসময় মানসিংহের দেহরক্ষীরা অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করে। হকীম সুর—যে সৈয়দদের সঙ্গে লড়াই করছিল, সেও দৌড়ে এসে রাণার সঙ্গে মিলিত হলো।... রাণা ফিরে গিয়ে পাহাড়ের দিকে পালালেন, যেখানে তিনি দুর্গের মতো সর্বপ্রকারে সুরক্ষিত ছিলেন।"

যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে রাণা প্রতাপ হলদিঘাটের মধ্য দিয়েই পাহাড়ের পথ ধরেন। প্রতাপের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সাদা ঘোড়া চেতকের পিছনের একটা পা যুদ্ধের সময় গুরুতর আহত হয়। তথাপি আহত চেতক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রায় ছয় মাইল দূরে বলীচা গ্রাম পর্যন্ত তার প্রভুকে পিঠের ওপর বসিয়ে নিরাপদে নিয়ে আসে এবং সেখানেই প্রভুভক্ত চেতকের মৃত্যু হয়। ঐ স্থানে চেতকের স্মারক আজও বিদ্যমান।

মহারাণা প্রতাপ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে চলে আসার পর মেবারের অবশিষ্ট সৈন্যরাও পালিয়ে যায়। দুপুরে যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর আলবেরুণীর বর্ণনা অনুসারে—"তখন এত বেশি গরম পড়ছিল যে, আমাদের সৈনিকদের চলাফেরার ক্ষমতাটুকুও অবশিষ্ট ছিল না। সেইসঙ্গে শাহী সেনার মধ্যে এই আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, চুপি চুপি ছলনার সাহায্যে রাণা পাহাড়ে ওত পেতে বসে আছেন। এই কারণে আমাদের সৈন্যরা রাণার পশ্চাদ্ধাবন না করে নিজেদের শিবিরে ফিরে গিয়ে আহত সৈনিকদের সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসায় মনোনিবেশ করে।"

পঁচিশ বছরের শাসনকালে রাণা প্রতাপ একমাত্র হলদিঘাটের যুদ্ধেই উন্মুক্ত প্রান্তরে রীতিমতো ব্যূহরচনা করে মোগল সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এরপর মোগল সৈন্যদের বিরুদ্ধে তিনি গেরিলা যুদ্ধপ্রণালী অবলম্বন করেন। অতএব, হলদিঘাটের যুদ্ধে মহারাণা প্রতাপের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করা অসমীচীন নয়।

মোগল সৈন্যরা সংখ্যায় ছিল অনেক বেশি। ঐ বাহিনীতে কামান ও বন্দুকধারী সৈন্যও ছিল। মোগল বাহিনীর ওপর প্রতাপ সরাসরি ভীষণ আক্রমণ করে প্রায় জয়লাভের দ্বারদেশে এসে উপনীত হলেও তাঁর বাহিনীর অত্যাবশ্যক সংরক্ষিত দল (চন্দাবল) গঠন করেননি। এই কারণেই প্রাথমিক সাফল্যকে তিনি ধরে রাখতে পারেননি। পলায়নপর মোগলবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবনকারী মেবারের সৈন্যদল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিল, যার ফলে ঐ দলগুলিকে সুসংহত করে পুনরায় যে জোরালো আক্রমণ অত্যাবশ্যক ছিল, তা করা সম্ভব হয়নি।

হলদিঘাটের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মহারাণা প্রতাপের পশ্চাদপসরণ কিন্তু যুদ্ধকৌশলেরই অঙ্গ ছিল বলে মনে হয়। কারণ, মহারাণা পর্বতের আড়াল থেকে হঠাৎ আক্রমণ করতে পারেন বলে মানসিংহের সৈন্যবাহিনী ভীষণভাবে আতঙ্কিত ছিল, সেই কারণে তারা মেবারের সৈন্যবাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করার সাহস করেনি। সেইসঙ্গে মোগল সৈন্যরা গোগুন্দাতে বন্দীর মতো দিনযাপন করছিল। পাহাড়ের পিছন থেকে মহারাণার সৈন্যদল অতর্কিতে আক্রমণ করে বসতে পারে—এই ভয়ে মানসিংহের সৈন্যরা তাদের শিবিরের চতুর্দিকে গভীর খাদ খনন করে তার পাশ থেকে উঁচু প্রাচীর তুলে দিয়েছিল। তাদের রসদও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কখনো বা কিছুটা রসদ এলেও বুভুক্ষু মোগল সৈন্যরা সেগুলি আনার জন্য এগিয়ে গেলেই রাজপুতরা তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। এই ভীষণ সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ লাভ করার জন্য মোগল সৈন্যরা মরিয়া হয়ে রাজপুতদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে সেখান থেকে পালিয়ে আজমেড়ে বাদশাহের কাছে গিয়ে তাদের অসহায় অবস্থার কথা জানায়।

মানসিংহ দীর্ঘ চার মাস গোগুন্দাতে অবস্থান করেও মহারাণাকে ধরা তো দূরের কথা, তাঁর কোন ক্ষতিই করতে পারেননি। তখন আকবর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে এবং আসফ খাঁ ও কাজী খাঁকে সত্বর ফিরে আসার হুকুম দেন। মহারাণাও মোগলদের দখল করা থানাগুলিকে পুনরায় নিজের রাজ্যের থানায় রূপান্তরিত করেন।

মহিলাদের প্রতি ভগিনী ও কন্যার দৃষ্টি

শাহী সেনা ফিরে যাওয়ার পর মহারাণা প্রতাপ আবার নতুন উদ্যোগে শক্তিসঞ্চয়ে ব্রতী হলেন এবং সিরোহীর রাও সুরতান, জালোরের নৃপতি তাজ খাঁ এবং তাঁর শ্বশুর ঈডরের রাজা নারায়ণদাসকে নিজের পক্ষে সম্মিলিত করে নিলেন। এঁরা সকলে মিলে আরাবল্লী পাহাড়ের উভয় দিকে এমন হামলা ও লুণ্ঠন শুরু করে দিলেন এবং গুজরাটের দিকে শাহী থানাগুলির ওপর এমন আক্রমণ আরম্ভ করলেন যে, অবস্থা আয়ত্তে আনতে আকবর জালোর ও সিরোহীতে সৈয়দ হাশিম খাঁ, তরসু খাঁ এবং রায়সিংহকে পাঠিয়ে দিলেন। রাণা যাতে গুজরাট আক্রমণ করতে না পারেন, তার জন্য তিনি তরসু খাঁকে পাঠান এবং সৈয়দ হাশিম ও রায়সিংহকে নাডোলের নিকট

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

অবস্থান করতে আদেশ দেন। কিন্তু এতে কোন লাভই হলো না।

দক্ষিণের অঞ্চলে মহারাণার মাথা তুলে দাঁড়াবার সংবাদ পেতেই আকবর শিকারের অজুহাতে মেবারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। তিনি ভাবলেন, যে-কাজ স্বয়ং বাদশাহ করতে পারেন, চাকর-বাকর দিয়ে সে-কাজ করানো সম্ভব নয়। অতএব, ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দের ১৩ অক্টোবর তিনি আজমেড় থেকে গোগুন্দা রওনা হলেন। তাঁর সেখানে আসার সংবাদ পেয়ে তাঁর পৌঁছাবার আগেই মহারাণা পাহাড়ে চলে গেলেন। গোগুন্দা থেকে আকবর কুতুবুদ্দীন খাঁ, রাজা ভগবানদাস (ভগবন্তদাস) এবং মানসিংহকে রাণাকে ধরার জন্য পাহাড়ের দিকে রওনা করে দিলেন। তাঁরা যেখানে-যেখানে গেলেন, সেখানেই মহারাণা তাঁদের ওপর অবিশ্রান্ত আক্রমণ করতে থাকলেন, যার ফলে পরিশেষে পরাজিত হয়ে তাঁদের বাদশাহের কাছে ফিরে যেতে হলো। মনে হয়, আবুল ফজল তাঁদের পরাজয়ের সংবাদ গোপন করার জন্য শুধু এটুকুই লিখেছিলেন—"ওরা রাণার প্রদেশে গেল, কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান না পেয়ে অনুমতি ছাড়াই ফিরে এল। আকবর অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁদের শাস্তি দিলেন। কিন্তু ওঁরা ক্ষমা প্রার্থনা করায় আবার তাঁদের কাজে বহাল করলেন।"

এত দৌড়াদৌড়ির ফল এই হলো যে, উদয়পুর ও গোগুন্দার শাহী থানাগুলি তুলে দিতে হলো এবং মোহীর থানেদার মুজাহিদ বেগ নিহত হলো। একবার মহারাণার রাজপুত সৈন্যরা শাহী সেনার ওপর হামলা করে, সেইসময় মীর্জা খাঁর স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলাদের ধরে আনে কুঁয়র অমরসিংহ। মহারাণা প্রতাপ ঐ মহিলাদের নিজের ভগিনী ও কন্যার মতো সম্মান দিয়ে তাদের মির্জা খাঁর কাছে পাঠিয়ে দেন। মহারাণার এই উদার দৃষ্টিভঙ্গির দরুন মির্জা খাঁ তখন থেকেই মেবারের মহারাণাদের প্রতি সদ্ভাব পোষণ করতে থাকেন।

মোগলদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ

১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি ভামাশাহ মালবা আক্রমণ করে ২৫ লক্ষ টাকা ও ২০ হাজার মোহর উদ্ধার করে চুলিয়া গ্রামে মহারাণার কাছে অর্পণ করেন, যাতে মহারাণা ঐ অর্থের সাহায্যে পুনরায় তাঁর সৈন্যবাহিনী সংগঠিত করে মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে স্বাধীনতারক্ষার লড়াই চালিয়ে যেতে পারেন। ভামাশাহের ত্যাগের কাহিনী ইতিহাসে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়।

রাজপুত সৈন্যরা একে একে কুম্ভলগড়, বাঁসওয়াড়া, ডুঙ্গরপুর প্রভৃতি এলাকা মোগল ও তার সেবাদাসদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে উদ্ধার করে। এই সংবাদ পেয়ে আকবর বিশাল সৈন্যবাহিনী ও বিপুল অর্থ-সহ শাহবাজ খাঁকে মেবার অধিকার করে মহারাণাকে গ্রেপ্তার করে আনার জন্য প্রেরণ করলেন। তার সঙ্গে গাজী খাঁ, মুহম্মদ হুসেন, শেখ তিমুর বক্‌শি ও মীরজাদা আলি খাঁকে পাঠানো হলো এবং রাণা প্রতাপকে যেমন করে হোক আকবরের বশ্যতা স্বীকার করানোর কড়া হুকুম দেওয়া হলো।

শাহবাজ খাঁ বিশাল বাহিনী নিয়ে মেবারে পৌঁছালে মহারাণা পুনরায় পাহাড়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। শাহবাজ খাঁ দু-তিন মাস মেবারে দৌড়াদৌড়ি করে একেবারে নাজেহাল হয়ে থানাগুলিতে কর্মচারীদের নিযুক্ত করে বিশ্রাম করার জন্য বাড়ি ফিরে গেলেন। তখন মহারাণা প্রজাদের আদেশ দিলেন যে, পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া সমতলভূমিতে কেউ চাষ করে মুসলমানদের সাহায্য করবে না। কেউ তা করলে তার মুণ্ডচ্ছেদ করা হবে। অতএব ঐ অঞ্চলের চাষীরা সপরিবার অন্যত্র চলে গেল। শাহী ফৌজের জন্য আজমেড় থেকে রসদ পাঠানো হতো, কিন্তু মেবারের রাজপুতরা সুযোগ পেলেই সেসব লুণ্ঠন করে নিত। উঁটালের শাহী থানেদারের আদেশে জনৈক কৃষক নিজের খেতে সবজির চাষ করছে—এই খবর শুনে মহারাণা রাত্রিবেলা শাহী সেনাশিবিরে প্রবেশ করে ঐ চাষীর মুণ্ডচ্ছেদ করে মোগলদের সঙ্গে লড়াই করে আবার পাহাড়ের পিছনে চলে যান। তখন থেকে মহারাণার ভয়ে আর কেউ ঐ প্রদেশে চাষ করার সাহস করেনি।

কর্নেল টডের মতে, মহারাণা তাঁর পূর্বপুরুষদের নীতি অনুসারে তাঁর প্রজাদের পার্বত্য প্রদেশে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। মুসলমানদের সঙ্গে লড়াইয়ের কারণে সমতল প্রদেশগুলি একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার ফলে আরাবল্লীর সন্নিহিত পূর্বদিকে পাথুরে উপত্যকার সম্পূর্ণ এলাকা, যার মধ্যে বনাস ও বেড়চ নদীগুলি প্রবাহিত, সেগুলির এমন দুর্দশা হলো যে, যেখানে খাদ্যশস্যের উৎপাদন হতো—সেখানে ঘাস ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি কাঁটায় ভরা বাবলা গাছে ভরে গেল এবং সেসব অঞ্চলে বন্য জন্তুরা চরে বেড়াতে লাগল। এইভাবে রাণা প্রতাপ রাজপুতানার উর্বর তথা ফলপ্রসূ উদ্যানকে বিদেশী আক্রমণকারীদের কাছে অনুর্বর ও অনুপযোগী করে দিলেন, যার ফলে মোগলদের রাজধানী ও ইউরোপের মধ্যে যে-বাণিজ্য সুরাটের বন্দরের মাধ্যমে চলত এবং যেসব পণ্য মেবারের মধ্য দিয়ে চলাচল করত, তা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। কারণ, পথমধ্যে সেসব পণ্য লুণ্ঠিত হতো।

মহারাণার দৃঢ়তা

রাজপুতানায় এই জনশ্রুতি একদিন অত্যন্ত প্রচলিত হলো যে, বাদশাহ বিকানীরের রাজা জয়সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কবি পৃথ্বীরাজকে বলেছেন : "রাণা প্রতাপ আমাকে এখন বাদশাহ বলেন এবং আমার অধীনতা স্বীকার করার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন।" পৃথ্বীরাজ বললেন : "এই সংবাদ মিথ্যা।" বাদশাহ

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

বলেন : "তুমি সঠিক সংবাদ আনিয়ে আমাকে জানাও।" তখন পৃথ্বীরাজ নিম্নলিখিত দুটি দোহা লিখে মহারাণার নিকট পাঠান—ঐ দোহাদুটির বাঙলা অনুবাদ এইরকম—

"মহারাণা প্রতাপ সিংহ যদি নিজ মুখে 'বাদশাহ' বলেন, তাহলে কশ্যপের পুত্র (সূর্যদেব) পশ্চিমে উদিত হবেন।" অর্থাৎ পশ্চিমে সূর্যোদয় যেমন অসম্ভব, তেমনই মহারাণার মুখ থেকে 'বাদশাহ' শব্দের উচ্চারণও অসম্ভব। (১)

"হে দীবাণ (মহারাণা)! আমি কি আমার গোঁফে তা দেব, না নিজে তলোয়ার দিয়ে নিজের শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করব—এই দুটির মধ্যে একটি কথা লিখে জানাবেন।" (২)

এর উত্তর মহারাণা তিনটি দোহায় লিখে পাঠান। তার বঙ্গানুবাদ এইরকম—

"(ভগবান) একলিঙ্গজী এই শরীর থেকে (অর্থাৎ প্রতাপের মুখ থেকে) বাদশাহকে 'তুর্ক'ই বলাবেন এবং সূর্যের উদয় পূর্বদিকেই হবে, যেমন হয়ে থাকে।" (১)

"হে বীর রাঠোর পৃথ্বীরাজ! যতদিন প্রতাপসিংহের তলোয়ার যবনদের মাথার ওপর থাকবে, ততদিন আপনি আপনার গোঁফে তা দিতে থাকুন।" (২)

"(রাণা প্রতাপসিংহ) মাথার ওপরে হাতুড়ির আঘাত সহ্য করবে, কারণ সমপর্যায়ের ব্যক্তির যশ বিষের সমান তিক্ত হয়। হে বীর পৃথ্বীরাজ! তুর্ক (বাদশাহ)-এর সঙ্গে বাকযুদ্ধে আপনি জয়লাভ করুন।" (৩)

এই উত্তর পেয়ে পৃথ্বীরাজ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন।

১৫৭৮ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে মহারাণা প্রতাপ ও তাঁর সম্পূর্ণ রাজপরিবারকে কয়েক বছর যাবৎ ক্রমাগত পার্বত্য অঞ্চলে আত্মরক্ষার জন্য স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছিল। শাহবাজ খাঁ এবং জগন্নাথ কছবাহার আক্রমণের সময় তাঁর রাজপরিবারকে বিষম সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু কর্নেল জেমস টড তাঁর গ্রন্থে মহারাণার রাজপরিবারের যেরূপ কষ্টকর জীবনের বর্ণনা করেছেন (যেমন, ঘাসের বীজের রুটি খেয়ে ক্ষুধানিবারণ, শিশুর হাত থেকে বনবিড়ালের রুটি ছিনিয়ে নিয়ে পলায়ন ইত্যাদি), তার অনেকটাই অতিরঞ্জিত ও কষ্টকল্পিত বলে মনে হয়। যদিও এই কাহিনী ও গল্পগুলি খুবই প্রচলিত। বস্তুত, মহারাণার পরিবারের কাউকে কোনদিন ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করতে হয়নি। তবে রাজমহলের বিলাসিতার জীবন তাঁরা স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে কৃচ্ছ্রসাধনার জীবন বরণ করে নিয়েছিলেন। বনবাসী ভীলরা সর্বক্ষণ তাঁদের পাহারা দিত এবং তাঁদের যাতে কোন কষ্ট না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখত।

সাফল্য ও শান্তির শেষ দশক : মহারাণা প্রতাপের জীবনাবসান

ভারতীয় ইতিহাসের প্রচণ্ড শক্তিশালী সাম্রাজ্য-নির্মাতা সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে প্রায় কুড়ি বছর সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ পরিচালনাকারী মহারাণা প্রতাপ মোগল সাম্রাজ্যের বিশাল ব্যাপ্তির মাঝখানে একটি দ্বীপের মতো মেবারের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। ঐতিহাসিকরা মহারাণার কূটনৈতিক, প্রশাসনিক এবং সামরিক দক্ষতার গুণগুলি উপেক্ষা করেছেন। তাঁরা প্রতাপের আদর্শ, সংগ্রাম, ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের বিষয়ে আলোচনা করেছেন, কিন্তু তাঁর বিজিগীষা এবং দীর্ঘকালব্যাপী অবিরাম যুদ্ধ করে অবশেষে সাফল্যলাভের কথা তাঁরা গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেননি। মহারাণা প্রতাপ তাঁর অসাধারণ প্রশাসনিক দক্ষতার জন্যই কুড়ি বছর পর্যন্ত তিনশ মাইলের ক্ষুদ্র পার্বত্য এলাকায় অবস্থান করে মোগল সৈন্যদের অনবরত আক্রমণ ও ধ্বংসলীলার মধ্যেও নিজের রাজ্যকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আকবর সৎ ভাই মির্জা মহম্মদ হকীমের কাবুলে মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে ১৫৮৫ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে কাবুল ও পাঞ্জাবে যান। তারপর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে আকবর ও মোগল সেনারা এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, মেবারে প্রতাপের মোগল-বিরোধী কার্যকলাপের প্রতি মনোযোগ দেওয়া আর সম্ভব হয়নি।

জগন্নাথ কছবাহা প্রতাপের ক্রমাগত আক্রমণে একেবারে নাজেহাল হয়ে আজমেঢ়ে ফিরে যাওয়ার পর মহারাণাও গোড়বাড় অঞ্চল থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মেবারের পার্বত্য অঞ্চলে ফিরে এসে চাবণ্ড পৌঁছান। সেখানে রাজমহল, অন্যান্য ঘরবাড়ি, সভা-মণ্ডপ, আস্তাবল, গোশালা ইত্যাদি ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অতএব, মহারাণা প্রতাপ ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকেই স্থায়িভাবে চাবণ্ডে বসবাস আরম্ভ করে দেন এবং তাঁর জীবনের শেষ এগার বছর সেখানেই অতিবাহিত করেন। চাবণ্ডে তাঁর জীবন নির্বিঘ্নে ও শান্তিতেই কাটে।

চাবণ্ডে পৌঁছে মহারাণা প্রতাপ এই নতুন রাজধানীর সৈনিকদের নিরাপত্তা এবং এযাবৎ তাঁর অধীনস্থ এলাকায় যে ভীষণ ক্ষতি ও অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর করে সেখানে শাসনব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খল ও সুদৃঢ় করার কাজে মনোনিবেশ করেন। সর্বত্র তিনি সৈনিক সংগঠনগুলিকে শক্তিশালী করে তোলেন এবং সেনাবাহিনী ও সমস্ত দুর্গগুলিকে যথাযথভাবে সুসজ্জিত করেন।

নতুন উৎসাহে মহারাণা প্রতাপ মেবার প্রদেশের সমস্ত মোগল অধিকৃত অঞ্চলগুলিকে পুনরায় অধিকার করেন এবং ১৫৮৭ খ্রীস্টাব্দে বর্ষা শেষ হওয়ার পর প্রতাপ ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কুঁয়র অমরসিংহ ঐ অঞ্চলের মোগল থানাগুলির ওপর পৃথক পৃথক ভাবে হামলা করেন। উদয়পুর, গোগুন্দা, মোহী, মদারিয়া ইত্যাদি সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থান পুনরায় প্রতাপের অধিকারভুক্ত হয়। মাণ্ডলগড় থেকে উত্তর-পূর্বে অবস্থিত জাহাজপুর ক্ষেত্রও প্রতাপের অধিকারে চলে আসে।

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

এইভাবে চিতোর ও মাণ্ডলগড় দুর্গ এবং ঐ দুর্গগুলিকে আজমেড়ের সঙ্গে সংযোগকারী রাজপথগুলি ছাড়া প্রায় সমগ্র মেবার প্রদেশের ওপর মহারাণা তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। এইভাবে প্রতাপ আকবরকে কার্যত পরাজিত করেন।

মহারাণা প্রতাপের পুনরায় মেবার প্রদেশ অধিকারের সংবাদ পেয়ে আকবর লাহোর থেকে প্রথমে করৌলীর রাজা গোপালদাস যাদবকে এবং তাঁর মৃত্যুর পর শিরোজা খাঁকে আজমেড়ের সুবেদার নিযুক্ত করে পাঠান। কিন্তু এঁরা কেউই মহারাণা প্রতাপের বিরুদ্ধে কোন সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেননি। অতএব, মহারাণা প্রতাপের জীবিতকালে আর কখনো মোগল-মেবার সঙ্ঘাত হয়নি। প্রজারাও সুখে-শান্তিতে ছিল।

চাবণ্ডে নিবাসকালে ১৫৯৭ খ্রীস্টাব্দের প্রথমার্ধে বাঘ শিকারে গিয়ে মহারাণা প্রতাপ আহত হন এবং তার ফলে তাঁর অন্ত্রে গুরুতর পীড়া দেখা দেয়। কিছুদিন পীড়িত থাকার পর মেবারের এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশপ্রেমিক মাঘ শুক্লা একাদশী, ১৯ জানুয়ারি ১৫৯৭ খ্রীস্টাব্দ, বুধবার শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। চাবণ্ড থেকে দেড় মাইল দূরে বণ্ডোলী গ্রামের নিকট এক খালের ধারে মহারাণা প্রতাপের দাহ-সংস্কার করা হয়। সেখানে আজও তাঁর স্মারক বিদ্যমান।

কথিত আছে যে, আকবর যখন লাহোরে মহারাণা প্রতাপের মৃত্যুসংবাদ পান, তখন তিনি অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত ও স্তব্ধ হয়ে যান। কারণ, সারাজীবনে নানা যুদ্ধে তাঁকে পরাজিত করেও একদিনের জন্যও তাঁর মাথা তিনি নত করাতে পারেননি।

মহারাণা প্রতাপ বিজয়ী বেশেই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন। পুণ্যপুরুষ প্রতাপসিংহ তাঁর ওপর একমুহূর্তের জন্যও মোগল-দাসত্বের কলঙ্কচিহ্ন লাগতে দেননি। সারাজীবন মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সমগ্র দেশে আপন কীর্তির জয়ধ্বজা উড্ডীন করে তিনি যাত্রা করলেন স্বর্গলোকে।

মহারাণা প্রতাপের গুরুত্ব এবং প্রভাব আজও হ্রাস পায়নি। ইংরেজ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যেসকল বিপ্লবী সংগ্রাম করেছিলেন, তাঁরাও প্রতাপের জীবন ও আদর্শ থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেছিলেন। ওড়িশার বুড়িবালাম নদীর তীরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বীর বাঘাযতীন ও মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীরা যে-সঙ্ঘাতে লিপ্ত হন, সেই পবিত্র স্থানটিকে বিদ্রোহী কবি নজরুল 'নবভারতের হলদিঘাটী' বলে চিহ্নিত করেছিলেন।

শহীদ গণেশশঙ্কর বিদ্যার্থী লিখেছেন ঃ

"প্রতাপ! আমাদের দেশের প্রতাপ! আমাদের জাতির প্রতাপ! দৃঢ়তা ও উদারতার প্রতাপ! তুমি নেই, শুধু তোমার যশ ও কীর্তি আছে। যতদিন এই দেশ থাকবে এবং যতদিন জগতে দৃঢ়তা, উদারতা, স্বাধীনতা ও তপস্যার প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে, ততদিন শুধু আমরা ক্ষুদ্র প্রাণীরাই নয়, সারা বিশ্বজগৎ তোমাকে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখবে। বিশ্বের যেকোন দেশে তুমি থাকলে তোমার পূজা করা হতো এবং তোমার নামে মানুষ নিজেকে উৎসর্গ করত। যদি তুমি আমেরিকায় থাকতে তাহলে ওয়াশিংটন ও আব্রাহাম লিঙ্কন থেকে তোমার কোনভাবেই কম পূজা হতো না। ইংল্যাণ্ডে থাকলে ওয়েলিংটন ও নেলসনকে তোমার সামনে মাথা নত করতে হতো। স্কটল্যাণ্ডে ওয়ালেস ও রবার্ট ব্রুস তোমার সঙ্গী হতেন। ফ্রান্সে জোন অফ আর্ক তোমার সমকক্ষ বলে গণ্য হতেন এবং ইটালি তোমাকে ম্যাৎসিনীর সমপর্যায়ে রাখত। কিন্তু হায়! আমরা ভারতীয়, আমাদের দুর্বল আত্মাদের কাছে কীই বা আছে যা দিয়ে আমরা তোমার পূজা করতে পারি এবং তোমার নামের পবিত্রতা উপলব্ধি করতে পারি। এক ভারতীয় যুবক অশ্রুপূর্ণ নেত্রে নিজের হৃদয়কে চেপে রেখে লজ্জার সহিত, তোমার কীর্তি গাইতে পারি না, কাঁদতে পারি না, শুধু (তোমার নাম) উল্লেখ করা ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারি?" ❑

সূত্র ঃ

১। মহারাণা প্রতাপ ঃ জীবনী, মহত্ত্ব ও দেশ—ডঃ রঘুবীর সিংহ, পঞ্চশীল প্রকাশন, জয়পুর, ১৯৮৩
২। বীর-শিরোমণি মহারাণা প্রতাপসিংহ—মহামহোপাধ্যায় রায়বাহাদুর গৌরীশঙ্কর হীরাচন্দ ওঝা, বৈদিক যন্ত্রালয়, আজমেড়, ১৯৮৫
৩। হলদীঘাটী চতুঃশতী সমারোহ ১৯৭৬ ঃ স্মরণিকা, ১৯ জুন ১৯৭৬, শ্রীবড়বাজার কুমারসভা পুস্তকালয়, কলকাতা-৭

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

আমি ধন্য আমি কৃতার্থ*

মাধবলাল চট্টোপাধ্যায়



পরমারাধ্য মহাপুরুষ মহারাজকে আমি জীবনে মাত্র একবারই দেখেছি, যেদিন আমি তাঁর কৃপালাভে ধন্য হই।

আমি একবছর বয়সেই পিতৃমাতৃহীন হই। একান্নবর্তী পরিবারের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমার জেঠতুতো দাদা মহেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী চপলাসুন্দরী দেবী আমাকে আপন সন্তানের মতো লালন-পালন করেন। আমরা নিজেরা তিন ভাই। জ্যেষ্ঠ কুঞ্জলাল চট্টোপাধ্যায়কে আমরা 'মেজদা' বলে ডাকতাম। তিনি ও মেজবৌদি ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিত। 'ছোড়দা' কেশবলাল চট্টোপাধ্যায় ও ছোটবৌদি শৈলবালা দেবী ছিলেন শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের আশ্রিত। মেজদা কুঞ্জলাল চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ত্রিপুরার বিলোনীয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি সরকারি কোয়ার্টারে থাকতেন। ছবছর বয়সে আমাকে বিলোনীয়া স্কুলের প্রাথমিক শাখায় ভর্তি করা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তান শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজ সম্ভবত ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মে বিলোনীয়ার মেজদার বাড়িতে আসেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, সেইসময় আমি বিলোনীয়ায় না থাকায় তাঁর পুণ্য দর্শন থেকে বঞ্চিত হই। তখন তিনি বিলোনীয়ায় কয়েকজন ভক্তকে দীক্ষাও দিয়েছিলেন। বিলোনীয়ার বাড়িতে রামকৃষ্ণ মিশন এবং অন্যান্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু, বৈষ্ণব, ফকির অতিথি হয়ে আসতেন। এইভাবেই আমি ছোটবেলায় সেখানে পূজনীয় স্বামী অরূপানন্দজী, স্বামী অনুভবানন্দজী ও স্বামী নিখিলানন্দজী মহারাজের সঙ্গলাভ করার সুযোগ পেয়েছি। এইসব সাধুসন্তের আলাপ-আলোচনা বসে শুনতাম, আনন্দও পেতাম। মনে আছে, আমাদের স্কুলে স্বামী নিখিলানন্দজী মহারাজ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। আমার খুব ভাল লেগেছিল। সেটা ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের কথা। বেলুড় মঠ থেকে পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দজী মহারাজের অসুস্থতার খবর পেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি মঠে ফিরে যান। নতুবা আরো কিছুদিন তাঁর থাকার কথা ছিল। রাসবিহারী মহারাজ (স্বামী অরূপানন্দজী) কয়েকবার আমাদের বাড়িতে এসেছেন। দীর্ঘকাল ছিলেনও। শুনেছি, 'মায়ের কথা'র দ্বিতীয় ভাগ তিনি ঐ বাড়িতে বসেই লেখেন।

ইতিমধ্যে মেজদা কৈলাসহর (উত্তর ত্রিপুরা) হাইস্কুলে বদলি হয়ে আসেন। আমি তখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি। মেজদা ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দেবের সহযোগিতায় কৈলাসহর শহরে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রজেন্দ্রবাবুই ছিলেন প্রকৃত কর্মী। তিনি ছিলেন মহাপুরুষ মহারাজের আশ্রিত। তাঁর কাছ থেকেও আমি খুব প্রেরণা পাই। আমার মনে কিছুদিন ধরেই দীক্ষালাভের বাসনা জাগে। স্বপ্নেও মহারাজকে দেখতাম। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে মনের বাসনা জানিয়ে চিঠি লিখি। উত্তরে মহারাজ লেখেন ঃ "দীক্ষা আর কি? ঠাকুরের নাম কর, ব্রহ্মচর্য পালন কর।" চিঠির উত্তর যখন আসে, তখন রাসবিহারী মহারাজ আমাদের বাড়িতে ছিলেন। তিনি আমাকে কি করে জপ করতে হয় শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তখন ঐভাবে জপ করতে লাগলাম। কিছুদিন পর আবার মন অশান্ত হয়ে উঠল। পূজনীয় মহারাজের কাছ থেকে চিঠি এল, লিখেছেন—"তোমার সুবিধামত সময় করিয়া আসিও। দীক্ষা হইয়া যাইবে।" (চিঠির ভাষা এদিক-ওদিক হতে পারে।) আমার খুব আনন্দ হলো।

---

* মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দজীর মন্ত্রশিষ্য মাধবলাল চট্টোপাধ্যায় সম্প্রতি আগরতলায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। দীর্ঘদিন তিনি আগরতলা আশ্রমের (গঙ্গাইল রোড) সম্পাদক ছিলেন। স্মৃতিকথাটি স্বামী প্রমেয়ানন্দজীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।—সম্পাদক

১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে আমার প্রবেশিকা পরীক্ষা শেষ হলো। মাসাধিক কাল পরে, মেজদার চেষ্টায় আমার কলকাতা যাওয়ার এক মহা সুযোগ উপস্থিত হয়। ব্রজেন্দ্রবাবুর মামা, বর্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্ট জেলার পঞ্চখণ্ড-নিবাসী অশ্বিনীকুমার দে ও তাঁর স্ত্রী সরোজিনী দেবী মহাপুরুষ মহারাজের নিকট দীক্ষালাভের উদ্দেশে কলকাতা যাবেন। মেজদা আমাকেও এঁদের সঙ্গেই যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন।

কলকাতায় প্রথমে সঙ্গীদের আত্মীয়বাড়িতে উঠি। পরদিন ভোরে বেলুড় মঠে যাই ও সেখানে গঙ্গাস্নান করে দীক্ষার উপকরণ নিয়ে আমরা দোতলায় পূজনীয় মহারাজের ঘরে প্রবেশ করি। মহারাজের শরীর তখন খুবই অসুস্থ। তিনি বিছানায় বসে আছেন। চেহারার মধ্যে কী এক অপূর্ব সৌম্য ভাব, অবাক হয়ে দেখছি। আমাদের সঙ্গের ছোট মেয়েটিকে দেখে মহারাজের কী আনন্দ! মহারাজ মেয়েটিকে নিয়ে খুব আনন্দ করতে লাগলেন। মহাপুরুষ মহারাজের নির্দেশে সেবক মহারাজ একটি রেকাবি করে মেয়েটিকে ফল-মিষ্টি খেতে দেন। মহারাজ আনন্দে মেয়েটিকে বলছেন ঃ "খা খুকি খা।" মহারাজের এমন আনন্দময় রূপ দেখে আমি মুগ্ধ।

এরপর মহারাজ বিছানায় বসেই আমাদের ওপরে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেন ও মহামন্ত্র দান করলেন। হৃদয়-মন অনাবিল আনন্দে ভরপুর হয়ে গেল। মহারাজকে ভক্তিভরে প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ঐসময় গঙ্গার দিকের বারান্দার একপ্রান্তে পূজনীয় স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজকে দেখলাম চেয়ারে বসে আছেন। অসুস্থ বলে কাছে যেতে দেওয়া হলো না। দূর থেকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করে আমরা নিচে নেমে এলাম। সেদিন দুপুরে মঠে প্রসাদ পেয়েছিলাম।

বিকালের দিকে আবার আমরা পূজনীয় মহারাজের কাছে যাই। গঙ্গার দিকে মুখ করে যে-ঘর আছে, মহারাজ ঐ ঘরে বসেছিলেন। অনেক ভক্তও ছিলেন। মহারাজ হাসিমুখে ভক্তদের সঙ্গে কুশল-প্রশ্নাদি করছিলেন এবং নানা কথা বলছিলেন। কথাগুলি এখন আর আমার স্মৃতিতে নেই। আমি একপাশে বসে শুধু মহারাজকে প্রাণভরে দেখছিলাম। যখন আমাদের চলে যাওয়ার সময় হলো, তখন বড় কষ্ট হচ্ছিল। আর কি তাঁকে দেখতে পাব? ত্রিপুরা যে অনেক দূর! সেখান থেকে ইচ্ছামত আসা সহজ নয়। যাহোক, গুরুদেবকে প্রাণভরে প্রণাম করে সঙ্গীদের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

পরদিন সকালে আমরা দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে গেলাম। পূর্বে 'কথামৃত'র পৃষ্ঠায় যা বর্ণনা পড়েছি, তার জীবন্ত রূপ দেখে ধন্য হলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে ওঠার সিঁড়িতে যখন পা দিয়েছি, তখন দেখতে পেলাম, ঠাকুরের ঘর থেকে একজন সুদর্শন প্রৌঢ় ভক্ত 'জাগো মা কুলকুণ্ডলিনী' গানটি গুনগুন করে গাইতে গাইতে আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেলেন। ঠাকুরের ঘরে 'কথামৃত'র বর্ণনামতো ছোট খাট, বড় খাট এবং দেওয়ালের ছবিগুলি তেমনি আছে দেখলাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম, সামনের মেঝেতে বসে থাকতেন স্বামীজী প্রমুখ ঠাকুরের লীলাপার্ষদগণ, রামবাবু ও অন্যান্য ভক্তরা এবং আরো কত সাধুসজ্জন। এই পবিত্র গৃহের মধ্যে ঠাকুরের মুহুর্মুহু সমাধি, বিচিত্র লীলাখেলা, প্রেমবিহ্বল সঙ্গীতলহরী অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করত। কিছুক্ষণ অনুধ্যান ও জপের পরে আমরা দক্ষিণেশ্বরের সবকিছু ঘুরে দেখলাম।

এরপর আমরা যাই বাগবাজারে 'মায়ের বাড়ী'তে। মায়ের ঘরে এসে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর একজন দীর্ঘকায়, প্রশান্ত মুখমণ্ডল সন্ন্যাসী এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। আমরা প্রণাম করলাম। তিনি আমাকে নাম-ধাম জিজ্ঞেস করলেন, আমিও উত্তর দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ "তুমিই কি 'উদ্বোধন'-এর জন্য কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলে?" আমি বললাম ঃ "হ্যাঁ মহারাজ।" তাঁর জিজ্ঞাসা করার কারণ এই যে, কয়েক মাস আগে আমি 'উদ্বোধন'-এর জন্য দুটি কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলাম। তার মধ্যে একটি ছাপা হয়েছিল। কবিতাটির নাম মনে নেই। আরেকটি কবিতার নাম 'আগমনী'। এই কবিতাটি তখনো পর্যন্ত ছাপা হয়নি, পরের পূজা সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। তিনি আমাকে বললেন ঃ "আরো ভাল করে পড়াশুনা করে লিখ।" পরে জানলাম, তিনি 'উদ্বোধন'-এর তদানীন্তন সম্পাদক স্বামী বাসুদেবানন্দজী মহারাজ। তাঁর কাছ থেকে জীবনে আমি একটা বড় শিক্ষা পেলাম যে, কোন ভাবকে জীবনে উপলব্ধি না করে ভাষায় নিজের চিন্তা বলে প্রকাশ করতে নেই।

উদ্বোধন থেকে বের হয়ে আমরা কথামৃতকার পরম পূজ্যপাদ মাস্টারমশায়ের দর্শনলাভ করার বাসনায় আমহার্স্ট স্ট্রীটে তাঁর স্কুলবাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর মাস্টারমশাইয়ের স্কুলবাড়িটি খুঁজে পেলাম। সেদিন স্কুল বন্ধ ছিল। আমরা স্কুলবাড়ির ভিতর প্রবেশ করে একজন যুবকের দেখা

পেলাম এবং তাঁকে আমাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম। আমরা যে বহুদূর থেকে এসেছি তাও জানালাম। যুবকটি আমাদের অপেক্ষা করতে বলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরতলায় উঠে গেলেন এবং অল্প সময়ের ভিতরেই আমাদের ওপরতলায় ডেকে নিয়ে একটি বেঞ্চের ওপরে বসতে বলে তিনতলায় উঠে গেলেন। ফিরে এসে তিনি বললেনঃ "মাস্টারমশায় এখন খাওয়া-দাওয়া করে বিশ্রাম করছেন, তবে তিনি এখনি নেমে আসবেন।" উনি আসা অবধি আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে, পরিবেশটা বেশ শান্ত।



কিছুক্ষণের মধ্যে শ্রীম ওপর থেকে নেমে এলেন। স্মিতহাস্যময় পুরুষ। আমাদের খুব তেষ্টা পেয়েছিল। তাই উনি সঙ্গে সঙ্গে যুবকটিকে আমাদের জন্য জল আনতে বললেন, আর নিজে উঠে গিয়ে তালমিছরি নিয়ে এলেন। আমি এখানে আসার আগে উদ্বোধন থেকে স্বামীজীর দুখানা বই কিনেছিলাম। যুবকটির হাত থেকে জলের গ্লাস নেওয়ার জন্য আমি বইদুখানি বেঞ্চের ওপর রাখতে মাস্টারমশায় স্নেহকোমল কণ্ঠে আমায় বললেনঃ "ওখানে রেখ না, এগুলো স্বামীজীর বই, স্বামীজীর বই, স্বামীজীর বই" বলতে বলতে আমার হাত থেকে বইগুলি নিয়ে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে সামনের তাকে রাখলেন। তাঁর সেই শ্রদ্ধাভাব ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ঘটনাটি স্বামীজীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনেক বাড়িয়ে দিল। তখন থেকে কোন ধর্মগ্রন্থ রাখার ব্যাপারে যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বনের চেষ্টা করে আসছি।

প্রাথমিক পরিচয়ের পর মাস্টারমশায় আমার পড়াশোনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছি জানতে পেরে বাঙলা প্রশ্নটির ওপরে কিছু আলোচনা করলেন। তারপর আমাদের তেতলায় তাঁর শয়নঘরে নিয়ে গেলেন। শয়নঘরে একটি চৌকির ওপর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সাদাসিধে একটি বিছানা দেখলাম। আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই। মাস্টারমশায় আমাদের শয়নকক্ষ দিয়ে ছাদের ওপরে নিয়ে গিয়ে খোলা জায়গায় তুলসীকাননটি দেখিয়ে দিলেন। শ্রদ্ধানতচিত্তে তুলসীকাননে প্রণাম করে কৃতার্থ হলাম। ইচ্ছা হয়েছিল কিছুক্ষণ বসে থাকি। কিন্তু মাস্টারমশায়ের বিশ্রাম করা হয়নি। তাই আমরা তাঁর শয়নকক্ষে ফিরে এসে তাঁকে প্রণাম করে বিদায় গ্রহণ করলাম। কেবলই মনে হতে লাগল—আমরা ধন্য, আমরা কৃতার্থ। স্বয়ং যুগাবতারের একজন ঘনিষ্ঠ সহচরকে দর্শন-স্পর্শন করেছি।

এরপর অনেকদিন কলকাতায় আসার সুযোগ হয়নি। তারপর সুযোগ হলো শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মশতবর্ষে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন আয়োজিত শতবার্ষিকী সভায় যোগ দেওয়ার। সেই উপলক্ষ্যে দশ-বারদিন বেলুড় মঠেই ছিলাম। সেইসময় একদিন আমি সভা শুরু হওয়ার একটু আগেই টাউন হল-এ পৌঁছে যাই। সভাঘরের দরজা তখনো খোলেনি। আমি দেখে অভিভূত হলাম যে, দরজার বাইরের বারান্দায় পরম পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণের সঙ্গে কথা বলছেন। অপ্রত্যাশিত এই সুযোগ আমি হারাতে দিলাম না। তাঁকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলাম।

সুদূর ত্রিপুরায় থাকা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচরদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছি—একথা মনে করে আমি নিজেকে ধন্য, কৃতার্থ মনে করি। তাঁদের পবিত্র, উজ্জ্বল স্মৃতি আজ আমার বৃদ্ধবয়সের অমূল্য সম্পদ। ❑

সমাধানঃ শব্দচেতনা ২

পাশাপাশিঃ (১) সখার প্রতি, (৪) ভালবাস, (৬) শিব, (৭) রজঃ, (১০) জগদীশচন্দ্র, (১২) রাজা, (১৬) সৃষ্টি, (১৭) প্রবুদ্ধ ভারত, (১৯) চিনা, (২১) নাহি, (২৩) কর্মযোগ, (২৪) নাগরকর।

ওপর-নিচঃ (২) খামার, (৩) প্রভু, (৪) ভাব, (৫) সততা, (৮) ব্যাগলি, (৯) মীরাট, (১১) শশা, (১৩) ক্রিস্টিন, (১৪) বুদ্ধ, (১৫) দরদ, (১৮) মংক, (২০) নায়েক, (২১) নাগ, (২২) দাগ।

শব্দচেতনা-২-এর সঠিক উত্তরদাতাদের নাম
(৩১ আগস্ট ২০০১-এর মধ্যে পাওয়া)

স্বস্তিক পুরকাইত, ডঃ প্রমথনাথ সামন্ত, সুচিত্রা চক্রবর্তী, রত্না চৌধুরী।

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

উমা হৈমবতী

(কেন উপনিষদ্ অবলম্বনে)

শিশু ও কিশোর বিভাগ

একসময়ে দেবতা ও অসুরদের মধ্যে দারুণ লড়াই লাগল।





যুদ্ধ করতে করতে দেবতারা ভাবলেন, আমরা নিশ্চয়ই হেরে যাব। পরমুহূর্তে মনে হলো, যুদ্ধে যখন নেমেছি, পালাব না, হারাও চলবে না। অমনি তাঁদের অন্তরে অসীম বলের সঞ্চার হলো। দেবতাদের মারমূর্তি দেখে অসুররা ঘাবড়ে গেল। শেষমেশ দেবতারাই জয়লাভ করলেন। সকলে তখন আত্মপ্রশংসায় মগ্ন হলেন।





হঠাৎ মজলিশ থেমে গেল।






যথা আজ্ঞা দেবরাজ। আমি এখনি যাচ্ছি।


হে পূজনীয় যক্ষদেব। কে আপনি, কেনই বা এসেছেন দয়া করে বলুন।


তার আগে বল তুমি কে?
আমি অগ্নি, জাতবেদা। জগতের সবকিছু পুড়িয়ে ফেলতে পারি।


ভাল কথা। তোমার শক্তির মহিমা জেনে খুশি হলাম। এই ঘাসের টুকরোটা পোড়াও দেখি।
এর মাথাটা খারাপ নাকি? যোজনের পর যোজন আমি দাবানল হয়ে ছারখার করে দিই। আর এই একটুকরো ঘাস?


এ কি সর্বনাশ। পুড়ছে না কেন? আমার সমস্ত তেজ দিয়েও পোড়াতে পারছি না! লজ্জার ব্যাপার! কে এই যক্ষ? ঘাসটাই বা কী? এখন ইন্দ্রকে কি বলব?


কি তাই জানতে পারলে, কে ঐ যক্ষ।
আজ্ঞে না মহারাজ, আমার সামর্থ্যে কুলালো না। আমি লজ্জিত।


সে কি কথা? আচ্ছা বেশ, পবনদেব আপনি যান দেখে আসুন।
যথা আজ্ঞা দেবরাজ ইন্দ্র।


অতঃপর পবনদেব ও বরুণদেব দুজনেই বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এলেন।... অগত্যা ইন্দ্র নিজেই চললেন।
এ কি হলো? যক্ষদেব কোথায় গেলেন? কেবলই জ্যোতি। এই তো তাঁকে দেখলাম!
হে অদৃশ্য যক্ষরাজ আপনি অনুগ্রহ করে দর্শন দিন, দয়া করে বলুন আপনার পরিচয়।
ওঁ
ওঁ
ওঁ
ওঁ
ওঁ
ওঁ
ওঁ


সহসা আবির্ভূতা হলেন মাহেশ্বরী উমা হৈমবতী, হিমালয়নন্দিনী, সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা।
হে দেবরাজ, তোমরা যাঁকে দেখলে তিনিই ব্রহ্ম। তাঁর শক্তিতে দেবতারা সকলে শক্তিমান, তাঁর বলে তোমরা বলীয়ান। অসুরদের পরাভূত তোমরা নিজের শক্তিতে করোনি। তাঁর শক্তিতে করেছ। তোমাদের অহঙ্কার বিনাশের জন্যই তাঁর আগমন।
মা!
চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু

সৃষ্টি

অশোক রায়

সৃষ্টির কথা উঠলে প্রথমেই মনে আসে কবে এবং কিভাবে ঘটেছিল পৃথিবীর সৃষ্টি? কারণ, সৌর-পরিবারের তৃতীয় কন্যা হলেন আমাদের পৃথিবী বা মাতা ধরিত্রী। খুব সম্ভবত সৌর-পরিবারের একমাত্র এই গ্রহেই আছে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—চৈতন্যময় জীব, "যার চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে"।

এবিষয়ে সর্বপ্রথম মাথা ঘামান ক্রান্তদর্শী দার্শনিকেরা, তারপর জ্যোতির্বিদ্ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। আর সব শেষে মাঠে নামেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীরা। বহু পরম্পরা ও প্রযুক্তির সাহায্যে জানা গেছে, পৃথিবীর জন্ম প্রায় ৪৬০ কোটি বছর আগে। সদ্যজাত পৃথিবী তখন ছিল অত্যন্ত উত্তপ্ত—একটা গ্যাসীয় অগ্নিপিণ্ড। তারপর ধীরে ধীরে তাপ হারিয়ে তা ঘন গোলকের রূপ নিল; উপরিভাগে দেখা দিল কঠিন আবরণ—ভূত্বক বা 'লিথোস্ফিয়ার'।

ভূত্বক যেদিন সৃষ্টি হলো, সেই সেদিন থেকে আজ অবধি সময়কালকে বিজ্ঞানীরা বলেন 'জিওলজিক্যাল টাইম স্কেল' বা ভূতত্ত্বীয় সময়কাল। সর্বশেষ হিসাবমত পৃথিবীর বয়স ৪৬০ কোটি বছর।

ধরিত্রী তখন ছিল উত্তপ্ত। পরিমণ্ডলে ঘনিয়ে এল মেঘ —শুরু হলো বৃষ্টি। আনুমানিক ৬০,০০০ বছর ধরে পৃথিবীর সর্বত্র চলতে থাকে এই বৃষ্টি। প্রথমে বৃষ্টির জল উত্তপ্ত হয়ে পরিমণ্ডলেই আবার বাষ্প হয়ে ফিরে গেল। তারপর তাপ হারিয়ে আবার ঝরে পড়ল বৃষ্টি রূপে। ফলে উত্তাপ হ্রাসের হারটাও হলো ত্বরান্বিত। এইভাবে একসময় আকাশে যত জলকণা ছিল, তার বেশিটাই নেমে এল পৃথিবীর বুকে—যেখানে যত এবড়ো-খেবড়ো খানাখন্দ ছিল সবই হলো জলে টইটম্বুর। জন্ম নিল মহাদেশ ও মহাসমুদ্র।

প্রথম বৃষ্টির জলে এই সমুদ্র বা মহাসমুদ্রগুলি ছিল মিঠে জলের। ক্রমে তাতে চারপাশের লবণ-ধোয়া জল মিশে পরিণত হলো নোনা জল। উত্তাপ প্রায় বর্তমানের কাছাকাছি নেমে এল—মাতা ধরিত্রী হলেন শীতল।

বিজ্ঞানীরা জেনেছেন পৃথিবীর জন্মকথা, সূর্য বা অন্যান্য নক্ষত্রের সৃষ্টির কারণ; ভেদ করেছেন ছায়াপথ বা গ্যালাক্সির জন্মরহস্য। দেখা গেছে, এক-একটা ছায়াপথ ১০০ কোটি থেকে ৫০,০০০ কোটিরও বেশি নক্ষত্র ও নক্ষত্র-পরিবার নিয়ে গঠিত। আবার এই গ্যালাক্সিগুলিও নাকি থাকে পুঞ্জে পুঞ্জে, পারস্পরিক অভিকর্ষজ টানে বাঁধা। [অনেকগুলি গ্যালাক্সিপুঞ্জ নিয়ে গঠিত হয় মহা-গ্যালাক্সিপুঞ্জ (এক-একটা গ্যালাক্সির ব্যাস ২৫ হাজার থেকে ১০ লক্ষ আলোকবর্ষ।) আমরা যে গ্যালাক্সির বাসিন্দা, তার ব্যাস ১ লক্ষ আলোকবর্ষ। এই গ্যালাক্সি-গুলিকেই মনে করা হয়—বিশ্বসৌধ রচনার একক বা এক-একটি ইঁট। একই পুঞ্জে দুটি গ্যালাক্সির মধ্যে আনুমানিক গড় দূরত্ব ১০-১৫ লক্ষ আলোকবর্ষের মতো; এবং এক পুঞ্জ থেকে আরেক পুঞ্জের দূরত্ব কোটি আলোকবর্ষের পর্যায়ে।]

বিজ্ঞানের দৃষ্টি হয়েছে সুদূরপ্রসারী (১০০০ কোটি আলোকবর্ষের মতো)। প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী হাবল (Edwin Hubble) বলেছিলেন—টেলিস্কোপের দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত গ্যালাক্সিগুলিকে একইভাবে ছড়ানো দেখা যাচ্ছে। মহাশূন্য গ্যালাক্সি-পরিকীর্ণ। সুদূর প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এই গ্যালাক্সি-সমাবেশের সমাপ্তির কোনরকম আভাস পাওয়া যায়নি।

মহাবিশ্বের রহস্য অনন্ত অপার। এই রহস্যভেদে একে একে এসেছে অভিকর্ষ ও মহাকর্ষ তত্ত্ব, তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্ব, সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব ও কোয়াণ্টাম তত্ত্ব। ফলে একদিকে যেমন উন্মোচিত হয়েছে কত বিস্ময়ের দ্বার, আবার অন্যদিকে দেখা দিয়েছে কত নতুন নতুন বিস্ময়। কিন্তু মহাকাশ যেন অনন্ত, অপার, দুর্জ্ঞেয়।

এল চমকপ্রদ বিগ ব্যাং (Big Bang Theory) থিয়োরী। বলা হলো—১৫০০ কোটি থেকে ২০০০ কোটি বছর আগে মহাবিশ্বের আদিম মহাবিস্ফোরণই সর্ব সৃষ্টির কারণের কারণ। আর এই আদিম মহাবিস্ফোরণের আগের অবস্থাটা ছিল রহস্যময়; সমস্ত বস্তু-সমন্বিত একটা তেজস্ক্রিয় পারমাণবিক কেন্দ্রক। যার উপাদান ছিল অকল্পনীয় রকমের ঘন (১ ঘন সেন্টিমিটারের ওজন ২৫ কোটি টন, আর ব্যাস ছিল ৫০ কোটি কিলোমিটারের মতো)। ঐ বিশ্বডিম্ব-পরমাণুর আয়তন ছিল মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথের ব্যাসের একটা গোলকের মতো, যার তাপমাত্রা ছিল অকল্পনীয় (১০,০০০ কোটি ডিগ্রি কেলভিন)। আর সময়ের ঘড়ি তখনো ছিল স্তব্ধ (time = 0)। বিশ্বডিম্বের গঠন ছিল একেবারে সরল—বস্তুকণা আর রশ্মিকণার এক অবিমিশ্রিত ঝোলের (undifferentiated soup of matter and radiation) মতো। এই নিদারুণ অবস্থায় বস্তুকণা রশ্মিকণায় এবং রশ্মিকণা বস্তুকণায় নিরন্তর রূপ-বিনিময় করতে পারে। আর এই অবস্থায় বস্তুকণাদের মধ্যে নয়, রশ্মিকণাদের মধ্যেই বিশ্বের অধিকাংশ শক্তি নিহিত ছিল। আইনস্টাইনের $E = mc^2$ সূত্র থেকে বোঝা

যায়, আজকের প্রোটন বা নিউট্রনের ভরের মধ্যে সেদিনের বহু সহস্র গামা রশ্মিকণার শক্তি জমাট বেঁধে আছে। আদিপর্বের এই নিদারুণ তাপমাত্রায় বিশ্বের অধিকাংশ শক্তিই ছিল রশ্মিময় বা জ্যোতির্ময় (radiation-dominated universe)। শাস্ত্রে বলে—ব্রহ্ম অগুস্বরূপ, জ্যোতির্ময়।

বিশ্বকবির ভাষায়—

"প্রথম আদি তব শক্তি—
আদি পরমোজ্জ্বল জ্যোতি তোমারি হে
গগনে গগনে।"

মহাবিস্ফোরণের পর বিশ্ব যত স্ফীত হতে লাগল, তাপমাত্রা ততই কমতে থাকল। আর তখনি রশ্মি-প্রাধান্যের যুগের হলো অবসান; শুরু হলো বস্তু-প্রাধান্যের যুগ। অর্থাৎ শক্তি ঘর-সোহাগে দানা বাঁধল বস্তুতে। ফলে এখন আমরা 'matter dominated universe'-এ বাস করি।

কিন্তু এত করেও প্রশ্নের শেষ হয় না। প্রথমত, (১৫০০-২০০০ কোটি বছর আগেকার) এই মহা-বিস্ফোরণই কি সবকিছুর শুরু? নাকি, আগেকার এক প্রসারিত অবস্থা থেকে মহাসঙ্কোচনের ফলেই এই মহাবিস্ফোরণ হয়ে আবার এক প্রসারণ পর্বের শুরু? তাহলে বিশ্ব কি একটা দোলকের মতো (একবার প্রসারিত, একবার সঙ্কুচিত হচ্ছে) স্পন্দনশীল? দ্বিতীয়ত, মহাশূন্য থেকে পদার্থের সৃষ্টি হলো কিভাবে?

বস্তুত, এই মহাবিশ্বের ছবি আমাদের কাছে এক দুর্বার সম্মোহন। মনে এক অসীম বিস্ময়ের দোলা জাগায়। এত জেনেও মনে হয়, আমরা যেন সবে রহস্যের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। মহাবিশ্বের সংগঠনে সর্বত্রই দেখা যায় এক অসীম, অভাবনীয় সূক্ষ্মতা আর অত্যাশ্চর্য সর্বব্যাপী সামঞ্জস্য। জড়জগৎ, জীবজগৎ, অণু-পরমাণুলোক থেকে শুরু করে বিপুলতম বস্তুপুঞ্জ—সর্বত্রই এক অতিসূক্ষ্ম ও অপূর্ব সুষম বুননের ছাপ। মহাজাগতিক সংহতির (cosmic harmony) এই পরমাশ্চর্য দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চতম স্তরের বিজ্ঞানীরাও অনেকে ভাবছেন, এই আশ্চর্য সূক্ষ্ম ও সঙ্গতিময় বিন্যাস—এ কি নিছক ঘটনাচক্র-প্রসূত (blind chance), নাকি সচেতন পরিকল্পনার (conscious design) আভাস? আরো আশ্চর্যের বিষয়, প্রকৃতির যে অসংখ্য নিয়ম বা সূত্রগুলি বিশ্বের নাড়িতে নাড়িতে কাজ করছে, মনে হয় সেগুলির ছন্দ মানুষের চেতনার ছন্দের সঙ্গে মেলে বলেই মানুষ বিশ্বস্পন্দনের গূঢ় সূত্রগুলিকে একে একে আবিষ্কার ও উপলব্ধি করতে পেরেছে। বহু বিজ্ঞানীই তাই এখন মনে করেন যে, বিশ্বের অন্তঃপ্রক্রিয়াগুলির এই বিচিত্র উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভব হতো না; আর মানুষের গাণিতিক চিন্তাপ্রসূত সমীকরণগুচ্ছ দিয়ে বিশ্বের জটিল প্রক্রিয়াগুলির ব্যাখ্যা সম্ভব হতো না—যদি বিশ্বপ্রক্রিয়া এবং মানুষের মানসপ্রক্রিয়ার মধ্যে গভীরতম স্তরে একটা সামঞ্জস্য না থাকত। এসকল থেকে বহু প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর মনে একটা সুদূর অনুমান জেগে উঠেছে যে, এই মহাবিশ্বের সংগঠন যেন মানুষের চেতনার সমধর্মী—অনন্তগুণ শক্তিশালী, অসীম উন্নত কোন চেতনার আভাস। ফলে, বিজ্ঞানীমনেও দানা বাঁধতে শুরু করল অধিতাত্ত্বিক চিন্তার (meta-physical speculation) ছায়া।

হাইসেনবার্গের 'অনিশ্চয়তা সূত্র' উপস্থাপন উপলক্ষ্যে আর্থার এডিংটন বলেন—এখন থেকে বিজ্ঞানীদের মনে ধর্ম কিছুটা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করল। এই একই সময়ে জেমস জিনসের মন্তব্য, বিশ্বের বিচিত্র গঠন দেখে মনে হয়, জগৎ কোন 'pure mathemetician'-এর সৃষ্টি। আদিবিশ্বের স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রচেষ্টা মানুষকে আরো তথ্যচিন্তার রোমাঞ্চলোকে নিয়ে গেছে, ফলে 'meta-physical speculation'-এর প্রবণতা আরো ব্যাপক হয়ে দেখা দিয়েছে। এই নিগূঢ় সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কয়েকজন বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানীর অনুভূতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কারণ, হিন্দু দার্শনিকদের আর্যপ্রজ্ঞায় এই একই সত্যের অনুরণন ঘটেছে সুপ্রাচীন কাল থেকে—বারে বারে—যুগে যুগে। তাই মনে হয় সত্য-সুন্দরের সাধনমার্গের বিভিন্নতা থাকলেও 'Destiny is one'—'একমেবাদ্বিতীয়ম্'।

'Quantam Theory'-এর জনক ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের মন্তব্য—বিজ্ঞানের ক্ষমতা নেই প্রকৃতির পরম ও চরম রহস্যকে উদ্ঘাটিত করার; কারণ, আমরা নিজেরাই প্রকৃতির এবং প্রকৃতি রহস্যের অংশস্বরূপ। যেন শ্রীরামকৃষ্ণের সেই নুনের পুতুলের সাগরে মিশে যাওয়ার উপমা।

বিজ্ঞানসাধক আইনস্টাইনের অনুভূতি—আমাদের কাছে যা দুর্ভেদ্য রহস্যস্বরূপ তার অস্তিত্ব অবশ্যই আছে। তার অভিব্যক্তি মহত্তম প্রজ্ঞা ও অনবদ্য সৌন্দর্যের দীপ্তিতে। আবার অন্যত্র তিনি বলেছেন, বিশ্বসূত্রগুলির মধ্যে এমন একটি চৈতন্যের অভিব্যক্তি রয়েছে, যা মানুষের তুলনায় অসীম উন্নত। স্পিনোজার মতো তিনিও বিশ্বব্যবস্থার সামঞ্জস্যের মধ্যে প্রতিভাত ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন; তবে মানুষের ভাগ্য বা কার্যকলাপ নিয়ে সারাক্ষণ মাথা ঘামানো এমন কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে তাঁর বিশ্বাস নেই।

নীলস বোরের অনুভূতিতে—অস্তিত্বের রঙ্গমঞ্চে আমরা একাধারে অভিনেতা ও দর্শক। আরউইন

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

শ্রডিঞ্জারের ভাষায়—কর্তা ও কর্ম অভিন্ন। (কার্য ও কারণ—এক ও সম্পৃক্ত।) আবার অন্যত্র তিনি বলছেন, আমি জানি না আমি কোথা থেকে এসেছি বা আমি কে। (যেন নচিকেতার সেই সনাতন প্রশ্ন—আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি? কোথায় যাইব?)

ফ্রেড হোয়েল তো এক কদম এগিয়ে সরাসরি বললেন —বিশ্বলোক দোদুল্যমান নয়, বরং একটা স্থিরাবস্থায় (steady state) থাকে। এই অবস্থার কোন আদি নেই, যদিও এর উপাদানগুলির সৃষ্টিমুহূর্ত বলে একটা ব্যাপার আছেই। বিগ ব্যাং তত্ত্বের সঙ্কোচ-প্রসারণ-জাত কোন সমস্যা এই steady state-এ নেই। নোবেল বিজয়ী ইলিয়া প্রিগর্গি আইনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন উল্লেখ করে বললেন, অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, আজকের বিজ্ঞানের গতি ভারতীয় কবির নির্দেশিত পথেই চলছে। মনে হয় এই নিঃসীম উপলব্ধির মুখোমুখি হলে—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।।"
(মুণ্ডক উপনিষদ্, ২।২।৮)

বৈচিত্র্য আর বৈপরীত্যের মধ্যে ঐক্যসূত্রের সন্ধানই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, আর এই প্রেরণা থেকেই শুরু হয়েছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার মধ্যে সমন্বয়সাধনের প্রচেষ্টা—যার দ্বারা চরম ও পরম সত্যকে একেবারে প্রমাণ না করা গেলেও অন্তত অনুভব করা যায়, উপলব্ধি করা যায়। এই প্রচেষ্টার সূত্রপাত করেন স্বয়ং আইনস্টাইন। বর্তমানে মহাসমন্বয় তত্ত্বের (Grand Unified Theories বা GUT) চিন্তায় বৈজ্ঞানিকরা এক ছাতার তলায় এসে দাঁড়াতে শুরু করেছেন। জানি না এই চিন্তার পরিণতি কিসের ইঙ্গিতবাহী।

রাতের আঁধারে মহাকাশের দিকে তাকালে মনে হয়, মানুষের সবচেয়ে বড় স্পর্ধা হলো—মহাশূন্যের এক নগণ্য বালুকণায় পাক খেতে খেতে নিজের মস্তিষ্কের ক্ষমতা দিয়ে এক অভাবনীয় মহাবিপুলতাকে তত্ত্বজালে বন্দী করার চেষ্টা; আবার একই সাথে এর অসীম সৌন্দর্যে মুগ্ধ হওয়া। বৈপরীত্যে সৃষ্ট জগৎ-সংসার, তারই ফসল মানুষ; ফলে তার মধ্যেও বিরাজ করছে শুভ ও অশুভ শক্তি। এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে সংহত করে হীন প্রবৃত্তিগুলির নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠতে পারলেই বিশ্বরহস্যের সন্ধানের মধ্য দিয়ে সেই সংহত শক্তির সাহায্যে নিজের অস্তিত্ব-রহস্য সন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বরহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে।

এতক্ষণ ধরে যা আলোচনা হলো সবই তো বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানীদের অনুভূতির কথা। এবারে আলোচনা করা যাক হিন্দু দার্শনিকদের আর্ষপ্রজ্ঞায় সেই একই কথা কিভাবে উপলব্ধ হলো।

সাংখ্যদর্শনে আছে, প্রকৃতি অনাদি, অন্তহীন, নিত্য, অসীম, অতিসূক্ষ্ম, অলিঙ্গ ও নিরবয়ব। সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চ এই অব্যক্তের পরিণামেই ব্যক্ত। এ-ই অক্ষয়, যার হ্রাস-বৃদ্ধি নেই। জানা গেল, বিশ্বজগতের শাশ্বত সনাতন উপাদান হলো শক্তি। তার আদি নেই, অন্ত নেই, লয় নেই, ক্ষয় নেই, আছে শুধু রূপান্তরের মায়াজাল ("নাসদ্ উৎপদ্যতে ন সদ্ বিনশ্যতি"—সাংখ্যসূত্র)। তাই অনন্তকাল ধরে জগৎসংসার জুড়ে অবিরাম চলছে শক্তির এক 'ভানুমতীর খেল'। ফলে, কায়ারূপে শক্তিরই ঘনীভূত প্রকাশকে আমরা দেখতে পাই গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য, ছায়াপথ থেকে শুরু করে ইহজগতের সমস্ত বিচিত্রতার মধ্যে—বস্তুরূপে। 'একোঽহম্ বহুস্যাম্'-এর বাসনায় অব্যক্ত অক্ষর ব্যক্ত হলো নামরূপে। কবির ভাষায়—

"এ জগৎ মিথ্যা নয় বুঝি সত্য হবে,
অক্ষর আকারে শুধু লিখিত রয়েছে।
অসীম হতেছে ব্যক্ত সীমারূপ ধরি।"

তিনিই জগৎপতি হরির যোগনিদ্রারূপা তামসী মহাকালী-রূপে উৎপন্না; তিনি মুক্তির উপায়স্বরূপ—ব্রহ্মবিদ্যা। আবার তিনিই সৃষ্টির অভিলাষে ত্রিগুণময়ী আদ্যাশক্তি, প্রকৃতি বা সনাতনী। নিজেকে রূপান্তরিত করলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরে।

হিন্দুদর্শনে ভগবান বিষ্ণু হলেন অনন্ত নিখিল মহাবিশ্বের সৃষ্টির কারণ—এক মহাশক্তি; আর জগৎপ্রপঞ্চ তাঁরই ইচ্ছাধীন। কিন্তু নিজে কারণাতীত। মহাবিশ্বের বিস্তারই শ্রীবিষ্ণুর সর্বব্যাপকতার প্রতীকস্বরূপ। বিষ্ণু কথাটি 'বিষ্' ধাতুর বিস্তারে—যিনি সর্বব্যাপী সর্ববস্তুর অন্তর্যামিস্বরূপ—হৃষীকেশ (হৃষীকের ঈশ)। অর্থাৎ যিনি এই বিশ্বে সর্বত্র অণু-পরমাণুতে বিরাজিত—তিনিই বিষ্ণু। আবার একই অর্থে তিনি—বিভু।

রজোগুণে তিনি সৃষ্টিকর্তা—ব্রহ্মা। তারপর সত্ত্বগুণ স্বীকার করে চলে তাঁর পালনকার্য—এ তাঁর বিষ্ণুরূপ। আবার তমোগুণে ভীষণ রুদ্ররূপে তিনিই হন মহেশ্বর। এই তিনে মিলে হলো তাঁর সগুণ অবস্থা। আর যখন তিনি বিশ্রামার্থ যোগনিদ্রায় নিমগ্ন হন, তখন তাঁর নির্গুণ অবস্থা। ভগবান বিষ্ণু আর সূর্যের একাত্মতার রূপকল্পনা সেই বৈদিক যুগ থেকে চলে আসছে পৌরাণিক যুগ অবধি। তাই বলা হয়, 'তস্মাৎ সূর্য বিরাজতে'—তাঁতেই সূর্য বিরাজিত। হিন্দুধর্মের চোখে সূর্য কিন্তু কোনকালেই শুধুমাত্র একটা জড় নক্ষত্র নয়। তিনি পৃথিবীর সর্বকারণের কারণ, সত্যস্বরূপ—পরমাত্মা। কিন্তু নিজে এসব কারণের অতীত বা কারণাতীত। আর আজ আধুনিক বিজ্ঞানও এই সত্য

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

মানে যে, পৃথিবীর জন্ম থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সমগ্র স্থাবর-জঙ্গমের সর্বকারণের কারণ হলো সূর্য। The Sun is not only the source of heat and light, it is the only source of life. "আদিত্যো হ বৈ প্রাণঃ"—সূর্যই প্রাণের উৎস। ঋগ্বেদে বলে—"প্রাণঃ প্রজানাম্ উদয়ত্যেষ সূর্যঃ।"—সূর্য থেকেই প্রাণের ধারা পৃথিবীতে প্রবাহিত হয়। "নূনং জনাঃ সূর্যেণ প্রসূতাঃ।"

তাহলে মূল প্রশ্ন এসে দাঁড়াচ্ছে, পৃথিবীতে প্রাণ এল কি করে? এবারে আসা যাক সেই আলোচনাতেই। বিজ্ঞানীরা জানালেন, পৃথিবীর বয়স ৪৬০ কোটি বছর। এই বিপুল সময়কালকে তাঁরা ভাগ করলেন বিভিন্ন কল্পে, যুগে, উপযুগে। দার্শনিক শাস্ত্রকারদের হিসাবও খুব কাছাকাছি—৪৩২ কোটি বছর, যা ব্রহ্মার এক 'দিনমান কাল' বা 'কল্প'। আবার এইরকমই ৪৩২ কোটি বছর ধরে চলে তাঁর 'রাত্রিকাল'। অর্থাৎ ৪৩২+৪৩২=৮৬৪ কোটি বছরে ব্রহ্মার একদিন (অহোরাত্র)। এইরকম ৩৬০ দিনে এক বছর। আর ব্রহ্মার আয়ু ১০৮ বছর (সূর্যসিদ্ধান্ত, ১।১৩, ১২।৩৫।৬৭; গীতা—জগদীশচন্দ্র ঘোষ, ৮।১৭)। আর এই বিপুল সময়কালকে (৪৩২ কোটি বছর) তাঁরা ভাগ করেছেন তিন কল্পে—ব্রহ্মকল্প, বরাহকল্প ও পাদ্মকল্প। ব্রহ্মকল্প—ভগবান বিষ্ণু যেদিন মধু ও কৈটভ নামে দুই দৈত্যকে হত্যা করে তাদের মেদ দিয়ে মেদিনীর সৃষ্টি করলেন। অর্থাৎ পৃথিবীতে যেদিন ভূত্বক সৃষ্টি হলো—সেদিন থেকে ব্রহ্মকল্পের শুরু। বরাহকল্প—তৃতীয় অবতার বরাহ-রূপে ভগবান বিষ্ণু যেদিন পৃথিবীকে মহাপ্লাবনের হাত থেকে বাঁচালেন। অর্থাৎ কমবেশি ৬.৫ কোটি বছর আগে (টার্শিয়ারী উপ-মহাযুগের প্যালিয়োসিন-ইয়োসিন যুগ)—যেসময় টেথিস সাগরের বুক থেকে হিমালয় পর্বতমালা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছিল। পাদ্মকল্প—এই কল্পে প্রজাপতি ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থান করে ত্রিভুবন সৃষ্টি করলেন—২.৫-৩ কোটি বছর আগে। (সম্ভবত অলিগোসিন যুগের পর থেকেই শুরু।) বৃষ্টিধারা-স্নাত মাতা বসুন্ধরা হলেন শীতল। উত্তাপ ততদিনে প্রাণসৃষ্টির অনুকূল হয়েছে বটে, কিন্তু আবহমণ্ডলে ছিল না অক্সিজেন। স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়নি ওজোন-ছাতাও। আমরা সকলেই জানি, অক্সিজেন ছাড়া প্রাণ বাঁচে না, আর আজকের ওজোন-ছাতাই পৃথিবীতে মহাজাগতিক রশ্মির হাত থেকে জীবজগৎকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাহলে সেসময় এই দুই অনুকূল শক্তির সহায়তা ছাড়াও প্রাণ এল কি করে?

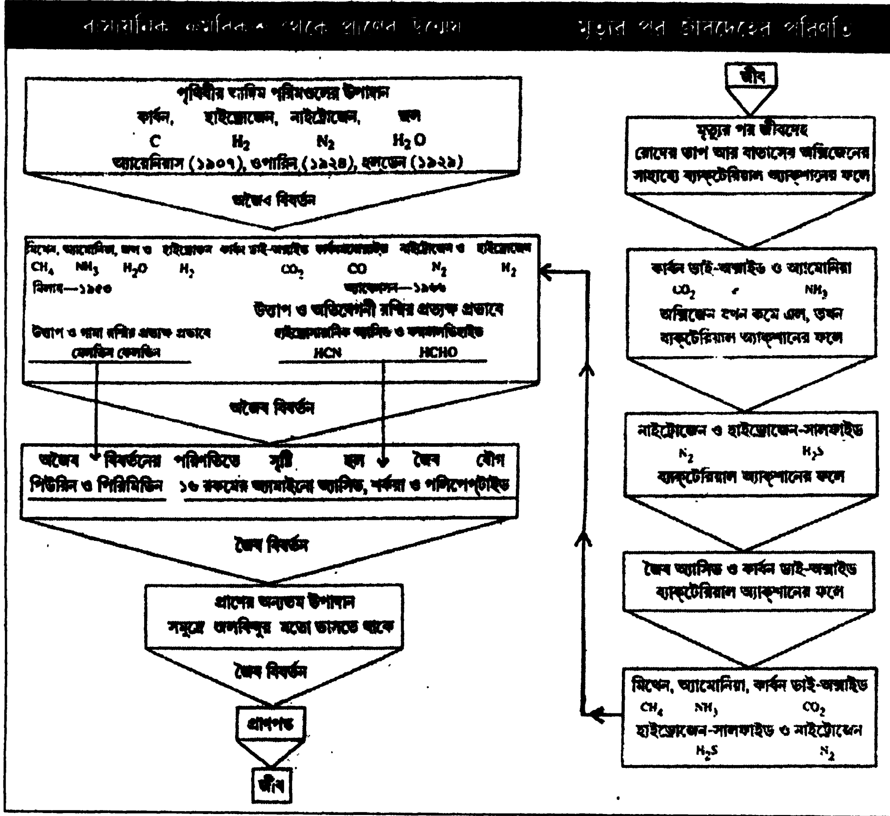
পাশ্চাত্যের দার্শনিক, পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীরা সবরকম জটিলতা এড়িয়ে, বিশেষ করে চার্চকে না ঘাঁটিয়ে, অ্যারিস্টটল থেকে নিউটন অবধি বিশ্বাস করতেন, প্রাণ স্বয়ম্ভু। অর্থাৎ পৃথিবীতে জীব আপনা থেকেই জন্মেছে। কারণ, 'ওল্ড টেস্টামেন্ট'-এর মতে—ঈশ্বর ছয়দিনে পৃথিবীর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছিলেন—"On the first day, He said, let there be light. And there was light.... On the seventh day, He took rest."—একথাকেই তাহলে অস্বীকার করতে হয়। আর সেযুগে চার্চের বিরোধিতা করার পরিণতি কি হতো তা আমরা সকলেই জানি। ব্রুনো, গ্যালিলিও প্রমুখ বিজ্ঞানীদের কপালে কী নিদারুণ উৎপীড়ন জুটেছিল। এরপর এলেন বার্জেলিয়াস। বললেন, অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থের সৃষ্টি হতে পারে না। কিন্তু তাঁরই ছাত্র উলার পালটে দিলেন এই ধারণাটা। আর লুই পাস্তুর 'স্বয়ম্ভু তত্ত্ব'টা যে ভ্রান্ত তা প্রমাণ করে দিলেন।

অবশেষে এলেন মিলার, অ্যাবেলসন ও মেলভিন কেলভিন। পরীক্ষাগারে কৃত্রিমভাবে তৈরি করলেন পৃথিবীর আদিম পরিমণ্ডল। তারপর তাতে উত্তাপ, অতি-বেগুনী রশ্মি ও গামা রশ্মির সঙ্ঘাতে (যেমনটি হতো আদিম পৃথিবীতে মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে) সৃষ্টি করলেন ১৬ রকমের অ্যামাইনো অ্যাসিড, পলিপেপটাইড (অ্যামাইনো অ্যাসিডের শৃঙ্খল) ও পিউরিন পিরিমিডিন।

তাহলে অ্যামাইনো অ্যাসিড, পলিপেপটাইড—এরা কি? এরা জীবও নয়, জীবনও নয়—জীবনের আবশ্যিক উপাদান বা প্রাণসৃষ্টির অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান—জীবনের পদধ্বনি। আর পিউরিন পিরিমিডিন হলো বংশগতির ধারক ও বাহক D.N.A. অণু বা জিনের অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই D.N.A. অণুকেই বিজ্ঞানীরা জীবনের মূল উপাদান বলে মনে করেন। কারণ, D.N.A. অণু গঠনের মধ্যেই নিহিত আছে স্বতঃপ্রজনন ক্ষমতা বা জীবনের মূল লক্ষণ। আরো বিস্ময়ের কথা, মৃত্যুর পর জীবদেহের পরিণতি ঠিক একই উজানস্রোতে—'যথা হইতে আসিয়াছি, তথায় ফিরিয়া যাই"।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীর আদিম পরিমণ্ডলে প্রাণের দুই সহায়ক শক্তি অক্সিজেন ও ওজোন-ছাতা না থাকাতেই প্রাণসৃষ্টির অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তৈরি হওয়া সম্ভব হলো।

অজৈব বিবর্তনের পরিণতিতে শুরু হলো জৈব বিবর্তন। গঠিত হলো প্রাণের আবশ্যিক উপাদান। তারপর নিশ্চয়ই ঐ (জীবনের সম্ভাবনাময়) যৌগগুলো চলে গিয়েছিল সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গে—সমুদ্রের গভীরে—তেজস্ক্রিয় রশ্মির নাগালের বাইরে। তারপর দীর্ঘ কোটি কোটি বছরে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে বৃহৎ অণুশৃঙ্খল



গঠন করে জলবিন্দুর (Droplets) আকার নিল। কালে আকারে তা বড় হলো। তারপর হঠাৎ একদিন বিভাজিত হলো একাধিক অনুরূপ ফোঁটায়—প্রাণ-সম্ভাবনায়। সম্ভাবনাময় হলেন মাতা ধরিত্রী।

সিংহলী বৈজ্ঞানিক পুন্নমপেরুমারের মতে—প্রথমে ঐ জাতের জৈবযৌগে সমুদ্রের এক শতাংশ পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। ফলে জৈবযৌগ-মিশ্রিত সমুদ্রজল ঘন হয়ে এসেছিল। বিজ্ঞানীরা (oparin) একে বললেন—'Primordial Broth'—'গরম হালকা স্যুপ', যা শাস্ত্রের 'ক্ষীরসমুদ্র'। কবি জয়দেবের গাথায়—'প্রলয়পয়োধি-জল'। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—'প্রাণপঙ্ক'। আর এই প্রাণপঙ্ক থেকেই পঙ্কজের অভ্যুদয়। (ভগবান বিষ্ণু ক্ষীরসমুদ্র থেকেই সৃষ্টি করেছিলেন তাবৎ জীবজগৎ।)

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে আছে—মদনের কামবাণের প্রভাবে ভগবান বিষ্ণুর রেতঃপাত হয়। দেবগণের সাক্ষাতে পাছে তা প্রকাশ পায়, তাই তিনি সেই রেত সমুদ্রজলে রেচন করলেন। তারপর সহস্র সহস্র বছর সেই রেত সমুদ্রজলে নিষিক্ত হয়ে ডিম্বরূপ ধারণ করে। কালে সেই ডিম্ব বিবর্ধিত হতে হতে এক মহাবিশাল রূপ নেয়। তার প্রতি রোমকূপ থেকে সৃষ্টি হয় প্রাণের। জন্ম নেয় সকল জীবজন্তু।

এসব আলোচনা থেকে জানা গেল, জীবের জন্ম স্থলে নয়, জলে—অতি ক্ষুদ্র ডিম্বাণু-রূপে। সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে, জীবের জন্ম জলের গভীরেও নয়, জল-স্থলের মিলনবেলায় বা আর্দ্র জায়গায়।

কিন্তু তখনো আবহমণ্ডলে মুক্ত অক্সিজেন প্রায় ছিল না বললেই চলে (০.০৬%)। আর এই সামান্য পরিমাণটুকুও জুটেছিল অজৈব-জৈব বিবর্তনের 'বাই-প্রোডাক্ট' হিসাবে, আর কিছু জলীয় বাষ্পের অণু ভেঙে গিয়ে (Photo disociation)। এল আদিম ব্যাকটেরিয়ার দল—'ইউব্যাকটেরিয়াম'। তারা আবহমণ্ডলে জমে থাকা জৈবযৌগের সাহায্যে এক অভিনব উপায়ে সূর্যরশ্মিকে

কাজে লাগিয়ে জীবনচক্র চালিয়ে যেত বলেই বৈজ্ঞানিকদের অনুমান। তারপর ধীরে ধীরে সারা পৃথিবীর সমুদ্রের তলায় ছড়িয়ে পড়ল নীল-সবুজ অ্যালগি বা শৈবালের দল, শুরু হলো সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া। ফলে আবহমণ্ডলে বাড়তে লাগল অক্সিজেনের পরিমাণ, দেখা দিল উন্নত থেকে উন্নততর জীব। অনুমান, আজ থেকে ১০ কোটি বছর আগে বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা আজকের সমান সমান (২১%) হলো। আর মাত্র ২০ লক্ষ বছর আগে দেখা দিল মনুষ্য সম্ভাবনা।

সৃষ্টির ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনে, বিশেষ করে গীতার জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ পর্বে বলা আছে—জীব ব্রহ্মেরই অংশস্বরূপ, তাই জীবের মধ্যে যে-শক্তি নিহিত, তা ব্রহ্মশক্তি। এই শক্তির বিকাশই হলো ক্রমবিকাশ।

সর্বপ্রথম স্থাবরের জন্ম, স্থাবর থেকেই জঙ্গমের অভ্যুদয়। পৃথিবীতে প্রথম সৃষ্টি হলো জলজ প্রাণী, তারপর ক্রমবিকাশের ধারা বেয়ে আত্মপ্রকাশ করল বানর (বানরই মানুষের নিকটতম পূর্বপুরুষ)। এরপর জড়বিজ্ঞান কেবল দেহের ক্রমবিকাশই আলোচনা করে; আর্যপ্রজ্ঞা দেখেন দুটি তত্ত্ব—দেহ ও দেহী বা শরীর ও আত্মা।

'অন্ন' কথাটা জড়ের প্রতীক। তাই আমাদের এই জড়-দেহটাকে বলা হয় আত্মার 'অন্নময় কোষ'। এই স্তরে আত্মা অন্নময় পুরুষ (Physical self)। ক্রমে অন্ন থেকে প্রাণের উদ্ভব হয়, অর্থাৎ ইতর প্রাণিবর্গের জন্ম। এরপর আত্মা ধারণ করে 'প্রাণময় কোষ' বা প্রাণময় পুরুষ (Vital self)। এই স্তরে আত্মা ধারণ করে 'মনোময় কোষ' বা 'মনোময় পুরুষ' (Mental self)। পশু আর মানুষের পার্থক্য এখান থেকেই শুরু (ইতর প্রাণিবর্গ আর উদ্ভিদের প্রাণ আছে, কিন্তু মননশক্তি নেই)। এই মননশক্তির বিকাশের ফলেই মানুষ বিবর্তনের পথে আরো এক ধাপ এগিয়ে গেল। কিন্তু মনোময় কোষেই আত্মার ঊর্ধ্বগতি শেষ হয়নি। এরপরেই বিজ্ঞান অর্থাৎ সত্য-জ্ঞান (সত্যং ঋতং) লাভ করে হয় 'আনন্দময় কোষ' বা 'আনন্দময় পুরুষ' (Self of Truth or Self of Mind)। আর তখন বিজ্ঞানময় পুরুষই আনন্দময়-এ (Self of Bliss) পূর্ণতা লাভ করে।

এই পঞ্চকোষ বা পঞ্চপুরুষ ব্রহ্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ, যা জীবের ক্রমবিকাশের নামান্তর।

সাংখ্য, বেদান্ত বা পুরাণে জীবের ৮৪ লক্ষ যোনি ভ্রমণের কথাও এই তত্ত্বকেই সমর্থন করে—স্থাবর, জলচর, কূর্ম, পক্ষী, পশু, বানর। তারপর মানুষজন্ম।

তাই মনে প্রশ্ন জাগে, সৃষ্টিকর্তার লীলাচঞ্চলতার প্রকাশই কি বিশ্বরূপ, না বিবর্তন? এই সত্য প্রথম প্রকাশিত হয় শঙ্করাচার্য বিরচিত 'দশাবতার স্তোত্র'-এ। তারপর কবি জয়দেব 'দশাবতার' স্তোত্রে বিস্তৃত বর্ণনা দেন। ডারউইনের জন্মেরও কয়েকশ বছর আগে জয়দেব পর্যায়ক্রমে যে দশজন অবতার (মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি) সাজিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে পরবর্তী যুগে ক্রমবিবর্তন-বাদেরই অগ্রজ। সৃষ্টির আদিতে, সর্বপ্রথম পৃথিবী ছিল জলময়, প্রাণের সৃষ্টি তখনো হয়নি। এ হলো অন্নময় রূপ (উপনিষদে 'অন্ন' কথাটা জড়ের প্রতীক)। কারণ-বারি ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে ভৌতিক জলে পরিণত হলো। সেই জলের প্রথম প্রজা বা প্রাণীই হলো মীন বা মৎস্য (প্যালিয়োজোয়িক কল্পের সিলুরিয়ান-ডিভোনিয়ান যুগকেই 'মৎস্য যুগ' বলে)। এইসময় ভগবান মীন রূপে বেদোদ্ধার করেছিলেন। এই বেদ কিন্তু গ্রন্থ নয়, সৃষ্টি-জ্ঞান (Procreation)। তখন সে পারঙ্গম হয়েছে বংশরক্ষায়, যা ছিল সেযুগের জীবনবেদ। মন্ত্র ছিল—"গোত্রং নো বর্ধতাম্।"

এরপর এলেন দ্বিতীয় অবতার কূর্ম। জল ছেড়ে সে ডাঙায় উঠতে শিখেছে, অর্থাৎ উভচর প্রাণী; শিখেছে বাতাস থেকে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করতে (ডিভোনিয়ান-কার্বনিফেরাস যুগ)। কূর্ম জল থেকে কাদা মেখে ডাঙায় উঠে এল—এটাই তার ধরণী-ধারণ।

তৃতীয় অবতার বরাহ। সে এখন ডাঙার প্রাণী হলেও জলের মায়া ত্যাগ করতে পারেনি—বাস করে কাদায়। বিবর্তিত হয়েছে স্তন্যপায়ী জীবে, শিখেছে সন্তান প্রসব করতে (সেনোজোয়িক কল্পের প্যালিওসিন-ইয়োসিন যুগ)। তার স্বভাবগত ধর্মই হলো দন্তাঘাতে মৃত্তিকা বিদারণ। সেই সময়েই টেথিস সমুদ্র থেকে হিমালয় পর্বতমালার অভ্যুত্থানের সূচনার প্রথম পর্ব; যার ফলে আসাম, বঙ্গদেশ, কচ্ছ, কাথিওয়াড়, সিন্ধু, বেলুচিস্তান আর উত্তর-পশ্চিম হিমালয় অঞ্চলে প্রবল সমুদ্রোচ্ছ্বাস দেখা দেয়। এই সময়কাল অবধি ধর্ম চতুষ্পাদ।

চতুর্থ অবতার নৃসিংহ (অর্ধেক পশু আর অর্ধেক মানুষ) অর্থাৎ 'ট্রান্জিশন ফেজ' (যেমন আধুনিক শিম্পাঞ্জি, লেমুর, গিবন, ওরাংওটাং, গরিলা ইত্যাদি)—দেড়-দু কোটি বছর আগে প্রাইমেট বর্গে যার শুভ সূচনা (অলিগোসিন-মাইয়োসিন যুগে)। ভগবান নৃসিংহ হিরণ্যকশিপু নামে দৈত্যকে নখ-তাড়নে বিনাশ করেছিলেন। বিবর্তনের পথে এক বিশেষ প্রতিকূল শক্তি প্রকৃতির স্বাভাবিক দান শ্রেষ্ঠ গ্রাসাচ্ছাদনকে নষ্ট করত। হিরণ্য বা স্বর্ণ হয়েছিল যার কশিপু বা গ্রাসাচ্ছাদন, সেই হিরণ্যকশিপু। কবিশেখর পণ্ডিত ভুবনমোহন দাস তাঁর 'অবতার তত্ত্ব' কবিতায় বলেছেন—এই গ্রাসাচ্ছাদন হলো

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

বনজাত কদলী। সেই কলাগাছের শত্রু একধরনের কেঁচো (কলাগাছ সাধারণত আর্দ্র জায়গায় জন্মায় বলেই কেঁচোর উপদ্রব বেশি)। নরহরি তাঁর নখ-তাড়নে কেঁচোগুলোকে ধ্বংস করে ভাবী মনুষ্য প্রজাতির জীবনধারণের আদি খাদ্যকে সংরক্ষিত করেন (আজও শিম্পাঞ্জি, বেবুন, ওরাংওটাং, লেমুর প্রভৃতি প্রাণীরা কেঁচো-জাতীয় কীটের স্বভাব শত্রু। এরা প্রধানত নিরামিষাশী হলেও সকলেই অল্পবিস্তর কীট-ভুক।) কলা মানুষের অন্যতম আদি খাদ্য, তাই আজও এই পরম উপকারী কলাগাছ আমাদের সবরকম মাঙ্গলিক কাজে ব্যবহৃত হয়; আর কলা ছাড়া কোন পূজাই সিদ্ধ হয় না।

এরপর এলেন পঞ্চম অবতার বামন—হুবহু রামাপিথেকাস, ড্রায়োপিথেকাস বা অস্ট্রালোপিথেকাস অর্থাৎ হোমোগণের শুভ আবির্ভাব (প্লাইয়োসিন যুগের কথা)। মাঝে মাঝে সে দুই পায়ে উঠে দাঁড়ালেও চলতে গেলে অল্পবিস্তর হাতের সাহায্য লাগে। উচ্চতায় সে বর্তমান মানুষের অর্ধেক। এই সময় থেকে ধর্ম হলো ত্রিপদ। এই অবধি জীবের ক্রমবিকাশকে বলে 'প্রাণময় রূপ'। তারপর থেকেই মানুষ আর পশুতে শুরু হলো পার্থক্য; ফলে সূচনা হলো—মনোময় রূপ।

এরপর পূর্ণ মানুষের রূপ নিয়ে এলেন ষষ্ঠ অবতার ভৃগুরাম বা পরশুরাম। তাঁর শ্রীকরে পরশু বা কুঠার। তিনি দৈহিক ক্ষমতাবলে ক্ষাত্রধর্মী নন, তাঁর শক্তি মস্তিষ্কবল, তাই ব্রাহ্মণ। তিনি আগুনের ব্যবহার জানেন—তাই অগ্নিহোত্রী। ভগবান পরশুরাম সহস্রবাহু কার্তবীর্যার্জুনকে নিধন করে একুশবার ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করেছিলেন; আর আপন গর্ভধারিণী মাতা রেণুকাকে হত্যা করেছিলেন। মানুষের সহস্রবাহু হয় না, কিন্তু ক্ষেত্রজাত অর্জুন গাছ তো মহীরুহ। তার সহস্র বাহু বা শাখা-প্রশাখাকে কুঠারের আঘাতে ছেদন করে একুশবার নিঃক্ষত্রিয় (জঙ্গল পরিষ্কার) করে তিনি মানুষের বসবাসযোগ্য জমি তৈরি করেছিলেন। আর কৃষির প্রথম প্রচেষ্টাস্বরূপ মাতা ধরিত্রীর বুকে অস্ত্রাঘাত করে মাটি রেণু রেণু করেছিলেন—এই ছিল তাঁর 'মাতৃহত্যা'। এতদিনে পাশবিক যুগের অবসানান্তে দেখা দিল মানব সভ্যতার অরুণালোক। নিঃসপত্ন হলো বুদ্ধিজীবী মানুষ। এই সময় থেকে ধর্ম দ্বিপদ।

এরপর আবির্ভূত হন সপ্তম অবতার সীতাপতি শ্রীরাম। তিনি ধনুর্বাণধারী। এই দূরক্ষেপী অস্ত্রের কাছে পরশুর অনুপযোগিতা প্রমাণিত হওয়ায় দর্পচূর্ণ হলো পরশুরামের। বিদায় নিতে হলো পুরাতনীকে। এক রাম জঙ্গল পরিষ্কার করে রেখেছিলেন, আরেক রাম তাতে শুরু করলেন নতুন আবাদ—মানবিকতার। দেখা দিল স্থায়ী জনপদ—রাজ্য, গোষ্ঠীপতি; এলেন রাজা। ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরাম বিবর্তিত হলেন ধনুর্ধর শ্রীরামে। শুরু হলো প্রতিরক্ষা, প্রতিপালন আর প্রজানুরঞ্জন। মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বিবর্তিত হলো—এলেন আদর্শ পিতা, আদর্শ মাতা, আদর্শ পতি, আদর্শ পত্নী। এই যুগেই আবার দ্বিতীয় দফায় উন্নততর কৃষিব্যবস্থার প্রচেষ্টা শুরু হলো—এ হলো তাঁর 'অহল্যা উদ্ধার' (হলের সাহায্যে অস্পৃষ্ট অর্থাৎ অনাবাদী জমিতে উর্বরতা সঞ্চার)। আর তাঁর 'সীতাপতি' নামটাও সার্থক, কারণ 'সীতা' অর্থে লাঙ্গলের ফলা। এই হলো—জ্ঞানময় রূপ।

কাটল আরো অনেকদিন, এলেন অষ্টম অবতার সঙ্কর্ষণ রাম। ইনি তৃতীয় রাম—হলধর বলরাম। কৃষি সভ্যতার পূর্ণ প্রকাশ হলো এযুগেই টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস নদীর মোহনায়—সুমার-এ। ঐ কৃষিজীবী হোমিনিডরাই জেরিকো আর সুমারে গড়ে তুলল জনপদ। বৈদিক আরণ্যক সভ্যতা আর পৌরাণিক কৃষি সভ্যতা—একই ঔপনিষদিক সভ্যতার অভিন্ন ধারা; ফলে কৃষি পেল পূর্ণতা, জ্ঞানের হলো চরমোৎকর্ষ। নরদেহেই এযুগে আবির্ভূত হলেন পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ—"কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্"।

তারপর শুরু হলো ঐতিহাসিক যুগ, আবির্ভূত হলেন নবম অবতার সিদ্ধার্থ গৌতম বা বুদ্ধদেব। মাত্র তিনটি কথায় বলে গেলেন জীবনের অমৃত মন্ত্র—'অহিংসা পরম ধর্ম'।

এতদিনে জ্ঞানময় পূর্ণতা লাভ করে আনন্দময় রূপে। আর সবশেষে ভবিষ্যবিজ্ঞানের থার্মোনিউক্লিয়ার কৃপাণধারী কল্কি আছেন কল্পনায়।

"দশাবতারধারিণে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ।" ❑

গ্রন্থপঞ্জি

১। মহাবিশ্বে মহাকাশে—গৌরীপ্রসাদ ঘোষ, লেখনী প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৪

২। শ্রীগীতা—জগদীশচন্দ্র ঘোষ, প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরি, কলকাতা, ১৯২৫

৩। চণ্ডীমাহাত্ম্য—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৮৪

৪। সূর্যসিদ্ধান্ত—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ (সম্পাদিত), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা

৫। শালগ্রাম শিলার সন্ধানে—অশোক রায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০০০

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

জ্যোতির্লিঙ্গ ভীমাশঙ্কর

স্বামী অচ্যুতানন্দ



ইতিপূর্বে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে বিশ্বনাথ, কেদারনাথ, সোমনাথ, নাগেশ্বর, ত্র্যম্বকেশ্বর ও ঘৃষ্ণেশ্বর নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবারের আলোচনায় জ্যোতির্লিঙ্গ ভীমাশঙ্কর।—লেখক

সকাল ৭টায় পুনে আশ্রম থেকে রওনা হয়েছিলাম ওখানকার এক মারাঠী ভক্ত তুঙ্গারেজীর গাড়িতে। যাত্রী আমরা দুজন সাধু, তুঙ্গারেজী আর গাড়ির চালক। দুজনই খুব ভক্ত আর আমাদের যাত্রাপথের সবকিছুই তাঁদের নখদর্পণে।

শ্রাবণ মাস শিবের মাস। আজ সোমবার। লক্ষ্য আমাদের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম মহারাষ্ট্রের ভীমাশঙ্কর। আশ্রম থেকে ফুল, মালা, বিল্বপত্র, কর্পূরাদি ও গঙ্গাজল শিশিতে করে নিয়েই রওনা হয়েছি। পুনে শহর ছাড়িয়ে গাড়ি ক্রমশ পাহাড়ী এলাকায় ঢুকে পড়ল। ভাল রাস্তা, বেশ জোরে গাড়ি চলছে। দুধারে পাহাড়। কখনো কাছে, কখনো দূরে গাছপালায় ঢাকা সবুজ পাহাড়। সুন্দর দৃশ্য। এই রাস্তায় বাসও চলে। পুনে রেলস্টেশনের পাশে শিবাজীনগর বাসস্ট্যাণ্ড থেকে বাস ছাড়ে। ট্যাক্সিও পাওয়া যায়। চার থেকে সাড়ে চার ঘণ্টায় এই পথেই ভীমাশঙ্কর মন্দিরে পৌঁছানো যায়। পথে কোন কোন জায়গায় পাহাড়ী রাস্তায় গাড়ি একমুখী হয়ে যায়, আবার কিছুদূর রাস্তা চওড়া পেলে যাওয়া-আসা দুই-ই সম্ভব হয়। আমরা সহ্যাদ্রি পাহাড়ের খের তহশিলের ভবরগিরি রথাচল ও ভীমাশঙ্কর পাহাড়ের জঙ্গল ভেদ করে চড়াই বেয়ে ক্রমশ ওপরের দিকে উঠতে লাগলাম। জঙ্গল ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল। পথে ক্বচিৎ দুই-একটি গাড়ি চলছে। পথে লোক নেই বললেই হয়।

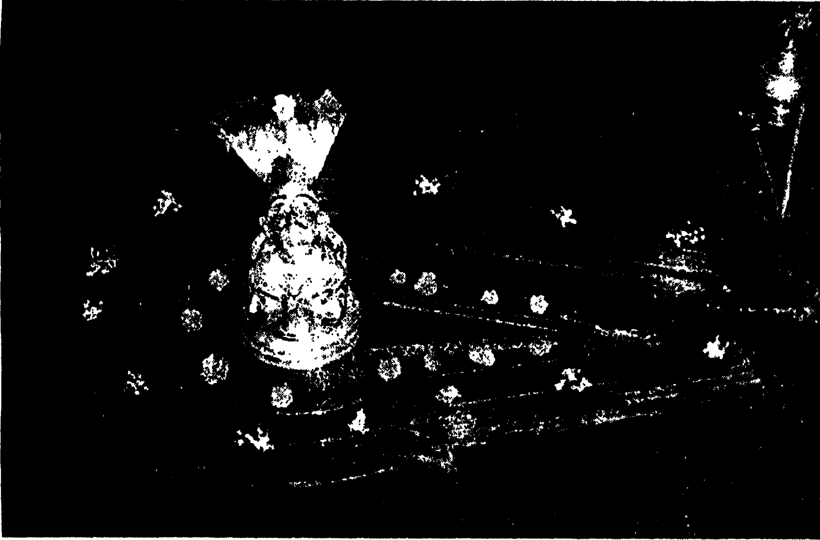
জঙ্গল পার হয়ে আমাদের গাড়ি আড়াই ঘণ্টায় ভীমাশঙ্কর-মন্দিরের কাছে এসে পৌঁছাল। আমরা পুনে থেকে প্রায় ৯৫ কিলোমিটার দূরে এসেছি। সমুদ্রতল থেকে এর উচ্চতা প্রায় ৩,৪০০ ফুট। একটু ঠাণ্ডা ভাব মনে হচ্ছিল। হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। চারিদিক পাহাড় আর জঙ্গল, তার মধ্যে কিছুটা জায়গা পরিষ্কার সমতল। তারই একপাশে একটু নেমে গিয়ে ভীমাশঙ্করের বহু প্রাচীন ঘন কালো গ্রানাইট পাথরের মন্দির। খুব বেশি উঁচু নয়। আমরা গাড়ি থেকে নেমে সামনে এক বিরাট পুরনো কুয়োর জলে হাত-পা ধুয়ে খানিকটা জল পান করলাম। খুব পরিষ্কার ও সুস্বাদু জল। কুয়োর গায়ে একটা পাথরে লেখা আছে, সপ্তদশ শতকে পেশোয়া রঘুনাথজী এই কুয়োটি কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে আমরা মন্দিরদ্বারে হাজির হলাম। ছোট নাটমন্দির, কিন্তু খোদাই করা থাম ও ছাদের কার্নিশগুলি খুব সুন্দর। এখানেও লেখা আছে, ১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দে পুনের মারাঠী শাসক চিমনাজী অন্তাজী নায়েক এই সভামণ্ডপটি তৈরি করিয়েছেন। গর্ভমন্দিরে প্রবেশের আগে বৃষভরাজ নন্দীশ্বরকে প্রণাম জানিয়ে আমরা ভিতরে প্রবেশ করলাম। গর্ভমন্দিরের ছোট ভিতরটা আলো-আঁধারী। প্রদীপের আলো ও সামনের দরজা দিয়ে যেটুকু আলো আসছে তাই দিয়ে বিগ্রহ দর্শন হয়। আমরা নটা চল্লিশে মন্দিরে ঢুকেছিলাম। প্রায় খালি মন্দির। দু-একজন দর্শনার্থী, আর পূজারীরা তিন-চারজন। আমরা ভিতরে যেতেই সম্ভবত সন্ন্যাসী দেখে পূজারীরা খুব সম্মান করে কয়েকটি কাঠের পিঁড়ে গৌরীপট্টের পাশে পেতে দিলেন। আমরা সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া পূজার উপকরণ দিয়ে আমাদের মনের মতো করে পূজা করলাম। গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে চন্দন-বিভূতি লেপন করে দিলাম শিবলিঙ্গের গায়ে। তারপর ফুলমালা দিয়ে সাজিয়ে কর্পূরারতি করে

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

নারকেল ও নকুলদানা দিয়ে ভোগ নিবেদন করলাম। পূজারীরা আমাদের মন্ত্রপাঠ শুনে খুশিই হলেন বলে মনে হলো। শেষে একটু জপ করে প্রণামমন্ত্র পাঠ করলাম। পূজারীরাও আমাদের সঙ্গে করজোড়ে সমস্বরে বলতে লাগলেন—"যং ডাকিনী-শাকিনিকা সমাজে নিষেব্যমানং পিশিতাশনৈশ্চ/ সদৈব ভীমাদিপদপ্রসিদ্ধং তং শঙ্করং ভক্তহিতং নমামি।"—এই জঙ্গলে ডাকিনী-শাকিনী অধ্যুষিত ও তাঁদের দ্বারা সেবিত ভীমপ্রভাবান্বিত কৃপাময় ভক্তবৎসল শঙ্করকে প্রণাম জানাই।

অন্ধকারে চোখ সয়ে গিয়েছে। সামনে বেশ বড় গৌরীপট্টের মধ্যে মূল ভীমাশঙ্কর লিঙ্গ। এক হাতেরও কম উঁচু। তবে লিঙ্গের মাথায় মাঝখানে সামান্য একটু ফাটলের মতো দেখা যায়। পুরোহিতেরা আমাদের দেখিয়ে দিলেন, সেই ফাটলের মধ্য দিয়ে খুব ক্ষীণধারায় জল উপচে উঠছে। আমার প্রথমে মনে হয়েছিল, আমরা যে জল ঢেলেছি ওটা বোধ হয় সেই জল। তাঁরা সেই জল গামছা দিয়ে মুছিয়ে দেওয়ার পর আবার একইরকম জলের ধারা বেরতে লাগল। পুরোহিতেরা বললেন, ঐ লিঙ্গের একধারে মহাদেব অন্যদিকে পার্বতী আর মাঝখানের ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসছে ভীমা নদী। এটিই ভীমা নদীর উৎসমুখ। ভীমাশঙ্করের পশ্চিম দেওয়ালে মা পার্বতীর দণ্ডায়মানা সুন্দর মূর্তি। ঠিক এইরকম দেখেছিলাম ত্র্যম্বকেশ্বরে। সেখানেও গোদাবরী নদী খুব সরু হয়ে লিঙ্গত্রয়ের মাথা থেকে বেরিয়ে আসছিল। এখানেও এই সূক্ষ্ম স্রোতোধারা গৌরীপট্টের মুখ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে একটি ছোট নালার আকারে পাহাড়ের ফাঁকে মিলিয়ে গিয়েছে। আরো দূরে পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরনার আকারে এই ভীমা নদী গিয়ে মিশেছে সমতলে কৃষ্ণা নদীতে।



জ্যোতির্লিঙ্গ ভীমাশঙ্কর

আজ ভিড় বেশি নেই। তাই আমরা শিবস্তোত্র পাঠ করে প্রায় একঘণ্টা মন্দিরে বসে রইলাম। এর মধ্যেই পুরোহিতেরা সোমবার বলে রুদ্রীপাঠ ও রুদ্রাভিষেক করলেন। এই ছোট্ট মন্দিরে তাঁদের মারাঠী উচ্চারণে রুদ্রস্তুতি এত সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করছিল যে, আমাদের মনও এক অদ্ভুত আবেশে ভরে গিয়েছিল। সাড়ে দশটার সময় নাটমন্দিরে এসে দাঁড়াতে আরেক সুন্দর দৃশ্য দেখতে পেলাম। একদল মারাঠী ভক্ত—মাথায় পাগড়ি, গলায় কাপড় দিয়ে ঝোলানো এসরাজের মতো একটু লম্বা একধরনের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে বাজিয়ে নাচছে আর গান গাইছে। সুন্দর সুর করে তালে তালে গাইছে। সঙ্গী মারাঠী ভক্তটি জানালেন, এরা বারারি সম্প্রদায়ের সাধক। সন্ত তুকারামের প্রবর্তিত এই সম্প্রদায়ের সাধকরা কখনো বসে গান করেন না। ভগবান বিঠ্‌ঠলজীর সেবক এঁরা। বিঠ্‌ঠলজী যেহেতু সর্বদা কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তাই তাঁর ভক্তেরা তাঁর সামনে বসেন না। তুকারামেরই রচিত বিখ্যাত 'অভঙ্গ' এঁরা গাইতে থাকেন। মহারাষ্ট্রে

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

ভক্তিভাবের এই অভঙ্গ গান খুবই বিখ্যাত ও প্রচলিত। তাঁদের নমস্কার জানিয়ে নাটমন্দির ঘুরে দেখতে লাগলাম। সামনেই একটা বিরাট পিতলের ঘণ্টা ঝোলানো। তার গায়ে লেখা আছে, ১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে এক পেশোয়া এটি তৈরি করিয়ে ভীমাশঙ্করের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন। বর্তমানে কিন্তু এটি নড়ানো নিষেধ লেখা আছে—ভেঙে যেতে পারে বলে। আমাদের সঙ্গী আরো জানালেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করেছেন পেশোয়াদের দেওয়ান নানা ফড়নবিশ। মূল মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে দশাবতারের ছোট ছোট মূর্তি খোদাই করা আছে। একটি প্রধান চূড়া। বাইরে খুব বেশি অলঙ্করণ নেই। মন্দিরের সামনে একটি মহারাষ্ট্রীয় ধাঁচের কালোপাথরের দীপস্তম্ভ। বিশেষ পর্বে এখানে একসঙ্গে অনেক প্রদীপ জ্বালানো হয়। তার সামনে ছোট একটি মন্দিরে শনৈশ্চরের মন্দির। অন্য মন্দিরে এরকম সচরাচর দেখা যায় না।

মন্দির-চত্বরের বাইরে সামান্য দূরে গোরক্ষনাথ সম্প্রদায়ের মঠ। সুন্দর ছোট্ট আশ্রম। কয়েকজন 'কানফাট যোগী' সম্প্রদায়ের সাধু সেখানে আছেন। আমরা সেখানে দর্শন করতে গেলাম। মন্দিরে গোরক্ষনাথ ও শিবের মূর্তি আছে। সাধুরা আমাদের সেখানে প্রসাদ নিতে নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু সময় কম বলে আমরা ক্ষমা চেয়ে নিলাম। তাঁদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম, এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে তাঁরা থাকেন কি করে? তাঁরা জানালেন, রাত্রি ৮টার মধ্যে শিবের শয়ন হয়ে গেলে পূজারীরা মন্দিরের পাশেই তাঁদের বাড়িতে ঢুকে পড়েন। আশপাশে যে ৪-৫টি দোকান আছে, সেসবও সন্ধ্যার পরেই ঝাঁপ বন্ধ করে দেয়। সরকারি গেস্ট হাউস একটি আছে। সরকারি কর্মচারীরা সেখানে এসে ওঠে। কিন্তু রাত্রিতে আর কেউ বাইরে বের হয় না। এই আশ্রমের সাধুরাও শিবের ভোগ-আরতি দর্শন করে নিজেদের আশ্রমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। কারণ, এই গভীর পাহাড়ী জঙ্গলে এখনো বাঘ, চিতা, ভাল্লুক, হরিণ, বন্য শুয়োর ও নানারকমের বিষধর সাপ, ময়ূর ইত্যাদি আছে। বেশি রাত্রে তাদের ডাক শুনতে পাওয়া যায়। দিনের বেলাতেও জঙ্গলের গভীরে যাওয়া যায় না। এখানে যা সামান্য দু-চারটি দোকান আছে সেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যায়, তবে একসঙ্গে বেশি জিনিস কিনতে হলে পাহাড়ের নিচে শহরতলীতেই যেতে হয়। এইসব জঙ্গলে অনেক ধরনের ওষধি গাছও আছে। স্থানীয় আদিবাসী ভীল সম্প্রদায়ের লোকেরা সেসব জানে, প্রয়োজনে তারা সেগুলি সংগ্রহ করে এনে দেয়।

যোগী সাধুর মুখেই এখানকার মাহাত্ম্য শোনবার ইচ্ছায় এক সাধুকে অনুরোধ করলাম এই তীর্থকথা কিছু শোনাবার জন্য। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের আশ্রমের বারান্দায় একটি চটের আসন বিছিয়ে আমাদের বসতে বলে একটা ঘটিতে খানিকটা গুড়ের সরবত নিয়ে এসে আমাদের খেতে দিয়ে বললেনঃ "থোড়া পী লিজয়ে, উস্‌কে বাদ ম্যায় আপকো ইয়ে তীর্থকা বারেমে কুছ কহুঙ্গা।" তারপরে তিনি এই তীর্থের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলতে লাগলেন।

আগে এই জঙ্গলে ডাকিনী-শাকিনিদের বাস ছিল। ছিল রাক্ষুসে স্বভাবের বন্যমানুষদের বাস। এখনো এইসব জঙ্গলে ভীলজাতীয় আদিবাসীদের বাস, তবে সেইসব লোকালয় জঙ্গলের গভীরে বেশি নেই। পুরাণে জানা যায় তিনটি কাহিনী। প্রথমটিতে আছে—পুরাকালে ত্রিপুরাসুর নামে এক দৈত্য এই জঙ্গলে থাকত। তার হিংস্র স্বভাব ও অত্যাচারে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালবাসী দারুণ বিপন্ন হয়। তারা ভগবান শঙ্করের শরণ নেয়। তাদের প্রার্থনায় স্বয়ং মহাদেব এই ত্রিপুরাসুর দৈত্যকে বিনাশ করতে রাজি হন ও বিরাট ভীমকায় শরীর ধারণ করে তার সামনে উপস্থিত হন। মহাদেবের এই রুদ্রমূর্তি দেখে অসুর ভয় পেলেও তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। কয়েকদিন যুদ্ধের পর অসুরকে তিনি বধ করেন। এই সময় রণক্লান্ত মহাদেব সহ্যাদ্রি পর্বতের ওপর এই ঠাণ্ডা জায়গায় এসে বিশ্রাম নেন। তাঁর পরিশ্রান্ত শরীর থেকে প্রচুর ঘাম ঝরতে থাকে। ক্রমে সেই স্বেদরাশি একটি ক্ষীণ স্রোতের ধারায় পরিণত হয়। ভীমকায় শঙ্করের শরীর থেকে নির্গত হয়েছে বলে সেটি 'ভীমা নদী' নামে পরিচিত হয়। এখনো গভীর জঙ্গলের মধ্যে সেই স্রোতের ধারা দেখা যায়। ভক্তগণ অসুরনিধনের পর আশুতোষ মহাদেবকে বলেঃ "সন্ত-সাধুদের রক্ষা করবার জন্য আপনি কৃপা করে এখানে অধিষ্ঠিত থাকুন।" ভোলানাথ তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য সেইখানে জ্যোতির্লিঙ্গরূপে 'ভীমাশঙ্কর' নামে চিরস্থির হয়ে যান। তাঁর শরীরের স্বেদ আজও ভীমানদীর ধারা হয়ে নির্গত হয় এই লিঙ্গ থেকে।

দ্বিতীয় পুরাণকাহিনীটি এইরকম—বহুদিন আগে এই অঞ্চলে এক রাক্ষস ছিল। তার নাম ছিল কর্কটি। তার একমাত্র মেয়ে কর্কটির সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল বিরাধ নামে এক রাক্ষসের। এই বিরাধ ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের হাতে বধ হওয়ার পরে কর্কটি তার বাবা-মায়ের কাছে চলে আসে। কিন্তু সেখানেও বিপদ হয়। সুতীক্ষ্ণ মুনির অভিশাপে বাবা-মা দুজনেই ভস্মীভূত হয়ে গেলে কর্কটি

একাকী এই সহ্যাদ্রি পর্বতে এসে বাস করতে থাকে। এই সময় রাবণের ভাই কুম্ভকর্ণ এদিকে বেড়াতে এসে রাক্ষসী কর্কটিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করে এবং সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে লঙ্কায় ফিরে যায়। ইতিমধ্যে গর্ভবতী হয়ে পড়ে কর্কটি। কিছুকাল পর তার এক পুত্রসন্তান হয়। পুত্রের নাম রাখা হয় ভীম। কুম্ভকর্ণের পুত্র ভীম অল্পবয়সেই অসাধারণ বলশালী ও দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে। ওদিকে লঙ্কায় রাম-রাবণের যুদ্ধে কুম্ভকর্ণ মারা যায়, রাবণ বধ হয় এবং বিভীষণ রাজত্ব পায়। সহ্যাদ্রি পর্বতে বালক ভীম তার মায়ের কাছে জানতে পারে, তার বাবা কুম্ভকর্ণ লঙ্কাধিপতি রাবণের ছোট ভাই। তাঁর মৃত্যু হয়েছে শ্রীহরির অবতার রামচন্দ্রের হাতে। সে আরো জানতে পারে, তাঁর মায়ের প্রথম স্বামী বিরাটও রামচন্দ্রের হাতেই নিহত হয়েছে।

এই কথা শোনার পরে রাক্ষস ভীম সেই বয়সেই প্রতিজ্ঞা করে, সে রামকে মারবে। আর সেজন্য শুরু করে ব্রহ্মার তপস্যা। হাজার বছর ঊর্ধ্ববাহু হয়ে একপায়ে দাঁড়িয়ে ও সূর্যের দিকে তাকিয়ে ভীম একাগ্রমনে কঠোর তপস্যা করতে থাকে। সেই কঠোর তপস্যার ফলে তার মাথা থেকে দারুণ এক তেজ বেরতে শুরু করে এবং সেই তেজে দেবতাদের শরীর জ্বলতে আরম্ভ করে। তাঁরা তখন চিন্তিত হয়ে ব্রহ্মার শরণাগত হলে ব্রহ্মা দেবতাদের বাঁচাতে সেই তপস্বী ভীমের কাছে গিয়ে তাকে বর দিতে চান। ভীম তখন বলে ঃ "আপনি আমায় অতুল বলশালী হওয়ার বর দান করুন।" ব্রহ্মার বরে অতুলনীয় বল লাভ করে ভীম তখনকার কামরূপের মহাবীর্যশালী ও অত্যন্ত শিবভক্ত রাজা প্রিয়ধর্মকে যুদ্ধ করে বন্দী করে। ওদিকে দেবতারাও ভীমের আক্রমণে বিপন্ন হয়ে মহাকোশী নদীর তীরে ভগবান শঙ্করের শরণ নেন। রাজা প্রিয়ধর্মা ও রানী সুদক্ষিণা সেই বন্দীশালাতেই গোপনে মাটির শিবলিঙ্গ তৈরি করে একমনে তাঁর মানসপূজা এবং 'ওঁ নমঃ শিবায়' —এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করতে থাকেন। দেবতাদের প্রার্থনা ও ভক্ত রাজার আরাধনায় প্রসন্ন হয়ে শিব অসুর নিধনে সম্মত হন।

এদিকে বন্দীশালায় রাজা প্রিয়ধর্মার গোপন শিবপূজার সংবাদ অনুচর মারফত পেয়ে ভীম ভীষণ রেগে গিয়ে বন্দীশালায় এসে শিবের নামে নানা কুকথা বলতে থাকে। রাজা কিন্তু তখনো অবিচলিতভাবে শিবের কাছে প্রার্থনা করে যেতে লাগলেন। তাতে ভীম আরো রেগে গিয়ে বলে ঃ "তোমার আরাধ্য দেবতা শিবের ভক্তহিতকারী বল এইবার দেখ।" এই বলে সেই মাটির শিবের দিকে ভীম ক্ষুরধার তরোয়াল নিক্ষেপ করল। কিন্তু তরবারি তাঁকে স্পর্শ করার আগেই সেই মৃন্ময় শিবলিঙ্গ থেকে এক দিব্য জ্যোতির্ময় বিগ্রহ বাইরে এসে বললেন ঃ "পশ্য ভীমেশ্বরোঽহং স রক্ষার্থং প্রকটাম্যহম্।"—দেখ, ভীমেশ্বর আমি ভক্তকে রক্ষা করতে আবির্ভূত হলাম। "এতস্মাৎ পশ্য মে শীঘ্রং বলং ভক্তসুখাবহম্।"—দেখ, কেমন করে আমি আবার ভক্তের সুখ-শান্তির ব্যবস্থা করি। এই বলে মহাদেব তাঁর দিব্য ত্রিশূলাস্ত্রের সাহায্যে সেই তরবারিকে শতটুকরো করে দিলেন। এই দেখে মহাসুর ভীম নানা অস্ত্র দিয়ে মহাদেবকে আঘাত করতে চেষ্টা করলে ভগবান শঙ্করও নিমেষ মধ্যে সেগুলি চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে লাগলেন। এইভাবে দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধ চললে সন্ত্রস্ত দেবগণ ও নারদের আকুল প্রার্থনায় রুদ্রদেব এক ভীমহুঙ্কারে ভীমাসুরকে ভস্মসাৎ করে দিলেন। তার নিজের ও অনুচরদের দেহভস্ম বনে-জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়ল। সেইগুলিই পরিণত হলো নানা ওষধি বৃক্ষে।

দেবতা ও রাজা প্রিয়ধর্মার আকুল প্রার্থনা করলেন—হে শম্ভু! জগতের কল্যাণ ও সকলের সুখ-শান্তির জন্য আপনি এখানে প্রতিষ্ঠিত হন। আপনার নাম আজ থেকে সর্বমঙ্গলনিদান ভীমাশঙ্কর বলে প্রচারিত হোক।

ভগবান 'তথাস্তু' বলে সেই পার্থিব মৃৎলিঙ্গেই জ্যোতির্লিঙ্গ-রূপে অধিষ্ঠিত হলেন। আজকের এই ভীমাশঙ্কর লিঙ্গ সেই ভক্তত্রাণকারী প্রাচীন লিঙ্গই।

পূজারী ব্রাহ্মণ কথা শেষ করার আগে এও জানালেন, এই প্রাচীন তীর্থে অনেক ঐতিহাসিক পুরুষও এসেছেন—স্বয়ং ছত্রপতি শিবাজী ও তাঁর পুত্র রাজারাম, পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ ও রঘুনাথজী, গোরক্ষনাথজী, সন্ত জ্ঞানেশ্বরজী প্রমুখ। শিবাজীর গুরু সন্ন্যাসী রামদাস স্বামী এখানে কিছুদিন তপস্যা করেছিলেন। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে এই তীর্থভূমির কথা উল্লেখ আছে। এখানে মহাশিবরাত্রি, অঘোর চতুর্দশী ও বৈকুণ্ঠ চতুর্দশীতে বহু ভক্তের সমাগম হয় ও মেলা বসে। এর আশপাশে আরো কিছু ছোটখাট কুণ্ড ও মন্দির আছে।

প্রসঙ্গ শেষ করে পূজারী আমাদের মন্ত্র পাঠ করালেন —"অনিত্যায় চ নিত্যায় নিত্যানিত্যায় তে নমঃ/ অচিন্ত্যায় চ চিন্ত্যায় চিন্ত্যাচিন্ত্যায় তে নমঃ/ ভক্তানামার্তিনাশায় প্রিয়-নারায়ণায় চ/ উমাপ্রিয়ায় শর্বায় গণাধীশায় তে নমঃ॥" "ভীমাশঙ্করায় রুদ্ররূপায় মহাদেবায় নমো নমঃ।"

দেবাদিদেবের উদ্দেশে প্রণাম করে সাধুজীকে কিছু দক্ষিণা দিয়ে আমরা ফেরার পথে গাড়িতে উঠলাম। বেলা তখন সাড়ে এগারটা। ❑

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শ্রীশ্রীমা

হৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ



ব উদ্ধারের জন্য ভগবান যখন অবনীতে অবতীর্ণ হন, তখন তাঁর একক আবির্ভাব হয় না। তাঁর সাথে আগমন ঘটে শক্তিরও। শক্তি ভিন্ন শিবের জীব উদ্ধার অসম্ভব। তাই তো ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গিনীরূপে শ্রীসীতা, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধা, অমিতাভ বুদ্ধের শ্রীযশোধরা, শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া শক্তিরূপে আবির্ভূতা। কবিকুলোত্তম কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশম্'-এ অনুপম উপমায় তা প্রকাশ করেছেন—

"বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতীপরমেশ্বরৌ।।" (১।১)

—বাক্ এবং অর্থ যেমন পরস্পর যুক্ত, একটিকে ছেড়ে আরেকটি থাকতে পারে না, তেমনি শক্তিরূপিণী পার্বতী শক্তিমান পরমেশ্বরের সঙ্গে নিত্য নিবিড় সম্পর্ক।

সেই শক্তি ও শক্তিমানের একত্ব হেতু এযুগেও অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণীরূপে মা সারদামণি অবতীর্ণা। তাই পরমপুরুষ পরমহংসদেবের জীবনে যেমন অলৌকিকের অজস্রতা, তেমনি শ্রীশ্রীমাও দৈবী মহিমায় সমন্বিতা। আমরা আজ শুভঙ্করী শ্রীশ্রীমায়ের মঙ্গলময়ী রূপটি দেখতে অভিলাষী।

* * * * *

১৩১২ সালের বৈশাখ মাস। বেকারত্বের জন্য বকুনি খান বেকার যুবক গুরুনাথ। বিক্রমপুরের কাঁঠালতলীতে বনদুর্গার ভগ্ন দেউল। চারিদিকে জঙ্গল। চাকরির জন্য গুরুনাথ মায়ের কাছে অরুন্তুদ আর্তি নিবেদন করেন। নিদাঘ-তাপে ঘর্মাক্ত ক্লান্ত, তাই কিঞ্চিৎ তন্দ্রামগ্ন। ভক্তের কাতর কান্নায় সাড়া দেন কাত্যায়নী। গেরুয়াবসনা, ত্রিশূলহস্তা জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে তিনি ভক্তের গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনার সুরে বলেন ঃ "তোকে আর কাঁদতে হবে না, তোর চাকরির ব্যবস্থা হচ্ছে।"

গুরুনাথ বিস্ময়ে হন তন্ময়। অন্তরে জাগে অনির্বচনীয় আনন্দ, অবাচ্য অনুভূতি। সেবছরই আশ্বিন মাসে গুরুনাথ চাকরি পান ঢাকায়। সেখান থেকে বদলি হন রাঁচিতে। ১৩২৩ সালে বেলুড় মঠের পূজা দর্শনে যান। গুরুনাথ বিস্ময়ে হতবাক, সেই ত্রিশূলধারিণী সন্ন্যাসিনী যে শ্রীমা! অনুভূতির এক অমৃত প্রস্রবণে অবগাহন করেন গুরুনাথ। ভগবতী-জ্ঞানে ভক্তিভাবে প্রণত হন তিনি। কণ্ঠে তাঁর উদ্গীত হয় চণ্ডীর স্তোত্র—

"যা দেবী সর্বভূতেষু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।" (৫।৬৭)

উদ্বোধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা সারদা। উদ্বোধনে বসে লীলাময়ী কত লীলা করেছেন! যক্ষ্মারোগীর চিকিৎসা করে বরিশালের ডাক্তার সুরেশচন্দ্র নিজেই ঐ কালব্যাধিতে আক্রান্ত হন। মৃত্যুপথযাত্রী ভক্ত ইষ্টদেবী মা সারদাকে পত্র লেখেন ঃ "মা আমার মরণ ব্যাধি, বাঁচা দায়। চরণদর্শনে গমন আমার সাধ্যাতীত। তুমি এসে হতভাগ্যকে দেখে যাও।"

ভক্তের বিপদে বিপত্তারিণী শ্রীমা বিগলিতা হন। তিনি নিজের একখানি ফটো ও একবছরের বাঁধানো 'উদ্বোধন' পাঠান। সঙ্গে পত্র দেন ঃ "বাবাজীবন, ভয় নাই। অসুখ তোমার সেরে যাবে। যে-ফটো পাঠালাম তা দেখে আমাকে স্মরণ করো আর 'উদ্বোধন' পড়ো।" সুরেশচন্দ্র নিত্য 'উদ্বোধন' পঠন ও ফটো দেখে মাকে স্মরণে সম্পূর্ণ সুস্থ হন। তাই তো ভাগবতের কথায় বলা যায়—

"ন তেঽস্তি স্বপরভ্রান্তির্বিশ্বস্য সুহৃদাত্মনঃ।
তথাপি স্মরতাং শশ্বৎ ক্লেশান্ হংসি হৃদি স্থিতঃ।।"
(১০।৫৮।১০)

* * * * *

নিখিলমাতৃহৃদয়সাগরমন্থন সুধামুরতি শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী। জগতের কল্যাণের জন্য পৃথিবীতে তাঁর পদার্পণ। একবার জয়রামবাটীতে দারুণ খরা। ধান লাগিয়ে চাষীরা প্রমাদ গনে। তারা গিয়ে ওঠে শ্রীশ্রীমার কাছে। অন্তরের বেদনা নিবেদন করে হৃদয়রাজ্ঞীর চরণতীর্থে অশ্রুনির্যাসে—"মা আকাশে মেঘ নাই, বিন্দু বিসর্গ বৃষ্টি পড়ে না। বাল বাচ্চা নিয়ে কি খেয়ে বাঁচব। একটা কিছু কর জগজ্জননি!"

মা তাদের খেতের দিকে নিয়ে যান। তারপর আকাশ পানে চেয়ে বলেন ঃ "হায় ঠাকুর কি করলে। শেষে এবার কি না খেয়ে সব মরবে!" পরমাপ্রকৃতির কথা কি প্রকৃতি অন্যথা করতে পারে? রাত্রেই গোবি সাহারার বুকে অঝোরে

ঝরে চেরাপুঞ্জীর বৃষ্টি। মায়ের উদ্দেশে জয়ধ্বনি দেয় গ্রামবাসী। জয়রামবাটীতে সেবার প্রচুর ফসল ফলে। পুঁথিকারের কথায় তাই বলতে বাসনা জাগে—

"খেলার ডালি মা তোমার গোটা সৃষ্টিখানি।
লীলাময়ী লীলাপরা লীলাস্বরূপিণী।।"

* * * * *

পূর্ববঙ্গের চন্দ্রমোহন দত্ত আসেন কলকাতায় চাকরির আশায়। কদিন অনশনে অর্ধাশনে তাঁর দিন কাটে। মমতাময়ী শ্রীমা তাঁকে ডেকে উদ্বোধনে পরিচারকের কাজ দেন। বাৎসল্য-রসরসিকা মায়ের স্নেহাচ্ছাদে বেশ সুখে আনন্দে দিন কাটে তাঁর। হঠাৎ খবর আসে, তাঁর ভদ্রাসন কীর্তিনাশা গ্রাস করেছে। ভাবনার প্লাবনে বিধ্বস্ত হয় চন্দ্রমোহনের অন্তর। সম্মুখে ধু-ধু নিরাশার সাহারা। এখন উপায়? 'শুভহেতুরীশ্বরী' শ্রীশ্রীমার শ্রুতিগোচর হয় সে-বার্তা।

ব্যথায় ব্যথান্বিতা তিনি। সবার অগোচরে চন্দ্রমোহনকে তিনশ টাকা দিয়ে বলেন—দেশে গিয়ে এই নিয়ে ঘর মেরামত করে ফিরে এসো। এই পরম পাওয়ার আনন্দে উদ্বেল হয়ে ওঠেন চন্দ্রমোহন। সেই টাকায় ঘর মেরামত করে তৃপ্তির সুধাসমুদ্রে ভাসতে ভাসতে তিনি উদ্বোধনে মায়ের স্নেহছায়ায় ফিরে আসেন।

* * * * *

কোঠারের পোস্টমাস্টার দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এক চক্রে পড়ে খ্রীস্টানধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু পরধর্ম ভয়াবহ জ্ঞানে আবার অনুতাপানলে দগ্ধ হন। কয়েকজন ভক্ত তাঁর সেই বক্ষবেদনার কথা মাকে জানান। স্নেহময়ী মা পুনরায় হিন্দুধর্মে দীক্ষার ব্যবস্থা দেন। দেবেন মস্তকমুণ্ডনের পর প্রায়শ্চিত্ত করে শ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা পান। দেবেনবাবুর কণ্ঠে উচ্চারিত হয় স্বামী অভেদানন্দের সুললিত শ্লোক—

"কৃপাং কুরু মহাদেবি সুতেষু প্রণতেষু চ।
চরণাশ্রয়দানেন কৃপাময়ী নমোঽস্তুতে।।"

* * * * *

অনুশীলন সমিতির সদস্য প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত কিছুদিন উদ্বোধনে মায়ের স্নেহপক্ষপুটে কাটান। হঠাৎ পুলিস তাঁর সন্ধান পায়। প্রিয়নাথ তখন বাধ্য হয়ে উদ্বোধন ত্যাগ করেন। যাত্রাকালে অভয়া অভয় দিয়ে বলেন : "ভয় করো না, ঠাকুর সব ঠিক করে দেবেন।" মায়ের সে-বাণী সফল হয়। প্রিয়নাথ পরে আবার উদ্বোধনে ফিরে আসেন। শ্রীমায়ের কাছে দীক্ষা পেয়ে সন্ন্যাস নাম পান—'স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ'।

মঙ্গলময়ী মায়ের লীলাকথা আমাদের বর্ণনার সাধ্য কোথায়! তাই কবিতা-কলিতে অঞ্জলি দিয়ে বক্তব্য শেষ করি—

"সারাটি জীবন লোককল্যাণে থেকেছ মা তুমি লিপ্ত;
তব করুণায় কত ম্লানমুখ পলকে হয়েছে দীপ্ত।
পদকোকনদে পড়ি মাগো পুটে
বিন্দু মধু দাও চঞ্চুপুটে
শুভঙ্করি, তব চরণামৃতে হোক তৃষিত এ প্রাণ তৃপ্ত।" ❑

তথ্যসংগ্রহ : (১) শ্রীশ্রী সারদাদেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য (২) শতরূপে সারদা—সম্পাদক : স্বামী লোকেশ্বরানন্দ

বিবেকানন্দ সোসাইটি

১৫১, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৬, ফোন : ৩৫০-৮৩৩৩

স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পর লোকমাতা নিবেদিতার উদ্যোগে ও অনুপ্রেরণায় ২৩ আগস্ট ১৯০২ সালে কলকাতায় **বিবেকানন্দ সোসাইটি** প্রতিষ্ঠিত হয় স্টার থিয়েটারে আহুত এক জনসভায়। এই পুণ্য প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী অখণ্ডানন্দ, স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, বিবেকানন্দ-শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দ ও স্বামী বিরজানন্দ প্রমুখের আধ্যাত্মিক নেতৃত্বে বিবেকানন্দ সোসাইটির তদানীন্তন কর্মীরা সঞ্জীবিত হওয়ার দুর্লভ সৌভাগ্যে গৌরবান্বিত হয়েছিলেন। সেই পুণ্য প্রতিষ্ঠানটি শতবর্ষপূর্তির দ্বারপ্রান্তে উপনীত। আগামী বছরে বৎসরব্যাপী শতবর্ষপূর্তি উৎসবের সূচনা হবে। যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে শতবর্ষপূর্তি উৎসব পালন অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও ব্যয়বহুল। বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণে সোসাইটির সকল সদস্য ও শুভার্থীর আন্তরিক ও সক্রিয় সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আপনাদের যথাসাধ্য আর্থিক অনুদান **'The Vivekananda Society'** নামাঙ্কিত A/c Payee চেকের মাধ্যমে সোসাইটির ঠিকানায় পাঠাবেন।

সহৃদয় জনসাধারণ, বিবেকানন্দ-অনুরাগী ও সোসাইটির সকল সদস্যকে শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করি।

স্বামী নির্জরানন্দ
সভাপতি

বিশ্বনাথ দত্ত
সম্পাদক

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

পুরুলিয়ার লোকনৃত্য ঃ ছো

শান্তি সিংহ

চৈত্র-বৈশাখ মাসেই পুরুলিয়ার রুক্ষ, লাল কাঁকুরে মাটি সূর্যের খরতাপে ঝলসে তামা রঙ। তখন পলাশ-শিমুল-কৃষ্ণচূড়া ওড়ায় রঙিন নিশান। রেশমি-কোমল, ঘি-রঙা শিরিষ আর পেলব মহুয়া বাতাসে ছড়ায় মদির আবেশ। শালবনে নতুন পাতার চিকন শোভা আর শালমঞ্জরীর সতেজ উচ্ছ্বাসভরা লাবণ্য প্রাণে জাগায় আশ্বাস। তখনি পুরুলিয়ার বহু গ্রামে খেটে-খাওয়া মানুষেরা খরার যন্ত্রণা ভুলে সান্ধ্য অন্ধকারে আদিম শৌর্যে বলদর্পী 'ছো-নাচে' বিশেষ শিল্পভাবনাকে রূপ দেন। তখন তাঁরা শিব, দুর্গা, গণেশ, কার্তিক, মহিষাসুর প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্রের সঙ্গে অনুভব করেন একাত্মতা। ঢোল, সানাই, ধামসা (বিশাল রণবাদ্য বিশেষ) প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে শোনা যায়—তাক্-ঝাঁ, তাক্-ঝাঁ টিক্-ঝাঁ, তেটে-খিটি-তাক্ ইত্যাদি তাল। সেই তালের সঙ্গে ছো-নৃত্যশিল্পীর বীরদৃপ্ত পদছন্দ এবং শারীরিক বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি শিল্পশোভন বীরভাবে ছন্দিত হয়। এভাবেই ছো-নাচে ফুটে ওঠে বীররসাত্মক পালা। রামায়ণ-মহাভারত বা পৌরাণিক কাহিনী অনুসরণে ছো-নৃত্যশিল্পীরা পালার আকারে মহিষাসুরবধ, মহীরাবণবধ, কিরাত-অর্জুন, অভিমন্যুবধ, বকাসুরবধ, রাধাকৃষ্ণ ইত্যাদি নানা কাহিনীর নাটকীয় দ্বন্দ্ব শূরনৃত্যে (heroic dance) রূপ দেন। লক্ষণীয় হলো, এই ছন্দিত তাণ্ডবে নারীরা অংশগ্রহণ করেন না। পুরুষরাই নারী চরিত্রকে যথাযথ রসব্যঞ্জনায় রূপায়িত করেন। প্রবল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভশক্তির যুদ্ধ এবং পরিণামে শুভশক্তির বিজয় ছো-নাচে প্রধানভাবে ফুটে ওঠে।

চৈত্র মাসে শিবের গাজন থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের ১৩ তারিখ অর্থাৎ 'রোহিন' অবধি ছো-নাচের প্রশস্ত কাল। অবশ্য বাণিজ্যিক কারণে এই সময়ের আগে বা পরে ছো-শিল্পীরা নেচে থাকেন। অনেক ছো-শিল্পী মাঘ মাসে সরস্বতীপূজার সময় ছো-নাচের মহড়া শুরু করেন।

নামকরণ

'ছো' অথবা 'ছৌ'—এই নামকরণ নিয়ে বিতর্ক আছে। পুরুলিয়া জেলার বাঘমুণ্ডি, চড়িদা (লৌকিক উচ্চারণে 'চইড়দা'), বান্দোয়ান, আড়শা, ঝালদা, দ্বাঘরজুড়ি, পলমা, কাঁটাডি প্রভৃতি সব এলাকায় এবং মেদিনীপুর জেলার চিল্কিগড়, দুবড়া প্রভৃতি অঞ্চলে 'ছো' কথাটি শোনা যায়। তাই ডঃ সুধীর করণ স্পষ্টভাবে তাঁর ধ্রুপদী গবেষণাগ্রন্থ 'সীমান্ত বাংলার লোকযান'-এ বলেছেন ঃ "শিবের গাজনকে উপলক্ষ্য করে পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় বিশেষ একধরনের লোকনৃত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ঘটেছে—যার নাম ছো-নাচ। না, 'ছৌ' নয়, কোন কারণেই ছৌ নয়; নিছক ছ-এ ও-কার—ছো।"

লোকসংস্কৃতিবিদ্ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলার লোকসাহিত্য' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে যথারীতি 'ছো' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তারপর ছো-নাচের দলকে আমেরিকা-লণ্ডন-প্যারিস প্রভৃতি দেশে নিয়ে যাওয়ার সময় শহুরে উচ্চারণে যথেষ্ট প্রস্বর (stress) যুক্ত করে 'ছো' কথাটিকে 'ছৌ' (chhow) নামে চিহ্নিত করেন।

দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার আঞ্চলিক উচ্চারণে 'পোকা', 'মোটা', 'গোটা', 'সোজা', 'লোক' ইত্যাদি শব্দ যথাক্রমে 'পকা', 'মটা', 'গটা', 'সজা', 'লক'; অনুরূপভাবে 'ছো'-এর উচ্চারণ অনেকের মুখে 'ছ'ও শোনা যায়।

ওড়িয়া ভাষায় 'ছু-অ' শব্দ আছে, যার অর্থ 'ছলনা'। ছো-নাচে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ সবই তো শিল্পিত মায়া বা ছলনা। তাই ডঃ সুধীর করণ ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে বলেন ঃ "পুত্র > পুত্ত > পু-অ > পো যেমন হয়, তেমনি সূত্র > সূত্ত > ছুত্ত > ছু-অ > ছো।"

চৈত্র সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয় শিবের গাজন। লৌকিক বিশ্বাসে শিবের 'জাগরণ'-এর পরের দিন অর্থাৎ 'তেলহলদা'-র দিন শৈবপন্থী 'ভক্ত্যা'গণ তৎকালীন নৈষ্ঠিক জীবনের কৃচ্ছ্রতার মাঝে উক্ত দিনে বিভূতি (ছাই) মেখে 'সঙ' সেজে 'বুড়াবাবা' এবং নন্দীভৃঙ্গী, ভূতপ্রেত-সহ ভূতনাথের বিচিত্র শোভাযাত্রা বের করেন। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম অঞ্চলে 'সঙ'-এর নাম 'আলকাপ' বা 'কাপ', যার অর্থ 'কৌতুক' বা 'কৌতুক নকশা'। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় অর্থাৎ পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলেও 'কাপ' কথাটি প্রচলিত। পুরুলিয়া এবং সংলগ্ন বিহার-ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে অনেকে 'ছো' কথাটি 'কাপ'-এর সমার্থক হিসাবে ব্যবহার করেন।

ছো প্রসঙ্গে 'সঙ' কথাটির ভাবব্যঞ্জনা ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও মান্য করেছেন। তিনি স্বীকার করেছেন ঃ "Therefore I believe that the word has been derived from the Sanskrit word 'SANG' (the word is a late Sanskrit) heaving one who dresses himself to represent another character mostly clown. The use of masks to transfer one's identity to another character is a special feature of the Chhau Dance."

কথাকলি নৃত্যের উদ্ভব কেরলে। সেখানে রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় এই নৃত্যে প্রথমে কৃষ্ণ-বিষয়ক কাহিনী এবং ক্রমে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী যুক্ত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে—কথাকলি নৃত্যের উদ্ভবের পিছনে রয়েছে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়ভাষী জাতি, সেখানকার স্থানীয় আদি অধিবাসী এবং আর্য-সংস্কৃতি—এই ত্রয়ী-সংস্কৃতির মিশ্রণের

প্রভাব। দ্রাবিড়-ভাষী লোকেরা স্থানীয় আদি অধিবাসীদের সঙ্গে অস্তিত্ব রক্ষায় যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতেন। ফলে তাঁদের যুদ্ধনৃত্যে স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতির কাহিনী এসে যায়।

অনুরূপ ভাবনায় দেখা যায়—ছোটনাগপুর মালভূমির বিস্তীর্ণ আরণ্যবন্ধুর অঞ্চলে মুণ্ডা-ওরাওঁ প্রভৃতি আদি অধিবাসীদের বসবাস ছিল। উক্ত অঞ্চলের দলপতিগণ, যাঁরা ইংরেজ আমলে ভূস্বামী-রাজা হিসাবে চিহ্নিত, তাঁরা নিজেদের রাজশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে লাঠিয়াল বা ঢাল-তরোয়ালধারী বৃত্তিভোগী পাইক সেনা রাখতেন। এক হাতে ঢাল, অন্য হাতে লাঠি নিয়ে আদিবাসী শ্রেণীর পাইকরা অবসর সময়ে নৃত্যের অনুশীলন করতেন। এভাবে 'ঢালীনাচ', 'পাইকনাচ' দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় গড়ে ওঠে।

মোগল-পাঠান আগমনের সঙ্গে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বর্গী হাঙ্গামায় বাংলার উক্ত সীমান্ত অঞ্চলের জন-জীবনে জাগে প্রবল ত্রাস। তখন এইসব অঞ্চলের সামন্ত-রাজগণ ঢালী-পাইক-রায়বেঁশে-নাটুয়া নাচের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে একশ্রেণীর প্রজাদের প্রতিরক্ষাশক্তি হিসাবে গড়ে তোলেন। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে, বীরভূমের রাজনগরে, বর্ধমানে বা ছোটনাগপুর অঞ্চলে তখন ঢালী-নাচ, পাইক-নাচ খুবই জনপ্রিয় ছিল। 'ধর্মমঙ্গল'-এ ডোমজাতির দৈহিক শক্তিমত্তার পরিচয় আছে। তাই তখনকার ডোম-সৈন্যদলের কথা বাঙলার ছড়ায় বিধৃত—"আগে ডোম, বাগে ডোম, ঘোড়া ডোম সাজে/ ঝাঁঝ-কাঁসর-মৃদঙ্ বাজে।" (অবশ্য এই ছড়াটির ভিন্ন পাঠও আছে।)

ময়ূরভঞ্জ এবং সেরাইকেলার রাজারাও ঢাল-তরোয়ালধারী সৈনিকদের ছাউনির মধ্যে (military cantonment) যুদ্ধনৃত্যের অনুশীলনে উৎসাহ দিতেন। তাই অনেকে মনে করেন 'ছাউনি' কথা থেকে 'ছো' কথাটির উৎপত্তি। ময়ূরভঞ্জ ও সেরাইকেলায় 'ছ-উ' উচ্চারণ করা হয়। চলতি ওড়িয়া ভাষায় 'ছ-উ' শব্দের অর্থ—'আক্রমণ করা' বা 'লুকিয়ে শিকার করা' বোঝায়। বিখ্যাত ওড়িয়া লেখক কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর অভিমত—দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলায় যে পাইক-নাচ ছিল, তা ছ-উ নৃত্যের এক অংশ। এভাবেই অনেক লোকসংস্কৃতির গবেষক মনে করেন—ছাউনী > ছাউ > ছ-উ।

১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে খ্যাতিমান ইমপ্রেসারিও হরেন ঘোষ সেরাইকেলা থেকে ছো-নাচের দল নিয়ে ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন। সেই দলে অন্যতম ছো-নৃত্যশিল্পী ছিলেন সেরাইকেলার রাজকুমার শুভেন্দুকুমার। তিনি বিদেশে 'ছ-উ' কথাটি 'Chhow' নামে লেখেন। সম্ভবত তা থেকেই অনেক শিক্ষিত মানুষ 'ছৌ' কথাটি উচ্চারণ করেন। ময়ূরভঞ্জের বারিপদায় সাম্প্রতিককালে সরকারি অনুদান-প্রাপ্ত 'ময়ূরভঞ্জ ছৌনৃত্য প্রতিষ্ঠান' নামকরণ হয়েছে। তবে উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত স্মরণিকায় 'Chhow' এবং 'Chhau' দুটি শব্দের ব্যবহার আছে। অথচ মানভূম-পুরুলিয়ার বিস্তীর্ণ লোকজীবনে 'ছো-নাচ' কথাটির প্রচলন। বাঘমুণ্ডি রাজপরিবারের বংশধর দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংদেও এবং ব্রজেন্দ্রনাথ সিংদেও বলেন—'ছৌ' নয়, 'ছো'। অন্যদিকে ওড়িশার লোকসঙ্গীতেও 'ছ-উ' বা 'ছো' কথাটি আছে।

সেরাইকেলার বিখ্যাত লোকনৃত্যশিল্পী কেদারনাথ সাহু মনে করেন—'ছায়া' (shadow) শব্দ থেকে 'ছ-উ' কথাটি এসেছে। হরেন ঘোষও তাঁর বিশেষ পুস্তিকায় লেখেন ঃ "The Chhau (Skt. Chhaya = Shade) is a masked dance."

ডঃ সুকুমার সেনের মতে, ইন্দ্রজাল জাগানো অভিনয় ভাবনাজাত 'শৌভিক' শব্দ থেকে 'ছো' কথাটি এসেছে। পুরুলিয়ার জনজীবনে 'ছো' শব্দের সার্বিক ব্যবহার। অথচ ময়ূরভঞ্জ সেরাইকেলায় অনেকেই বলেন—'ছ-উ' বা 'ছৌ'। এই বিতর্কের অবসান সহজভাবেই ধ্বনিবিজ্ঞানের পরিবর্তন-সূত্রে করা যায়। স্বরধ্বনির বৃদ্ধি-নিয়মে ও-কার ঔ-কার হয়ে থাকে। তাই 'ছো' কথাটি 'ছৌ' হয়ে যায় শহুরে বা অনেক শিক্ষিতজনের মুখে—প্রস্বর (stress) যুক্ত হওয়ার ফলেই। তবে লোকসংস্কৃতির আলোচনায় ছো-এর উৎসভূমি পুরুলিয়ার প্রাকৃতজনপ্রিয় 'ছো' কথাটি ব্যবহার করা অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

ছো-নাচের উৎসভূমি ও ক্রমবিস্তার

নৃত্যের সঙ্গে নাট্যের অন্তর্লীন যোগ আছে। নাটকে নট অর্থাৎ অভিনেতা শিল্পকলাযুক্ত অভিনয়ে শারীরিক বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে নানাভাবে স্বরক্ষেপণ করেন। তাঁর বাচনিক শিল্পকুশলতার সঙ্গে শারীরিক বিচিত্র মুদ্রা এবং মাঝেমধ্যে সাঙ্গীতিক চেতনারও প্রকাশ ঘটে। নৃত্যে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি ছন্দের তালে তালে ফুটে ওঠে। সেখানে মুখের ভাষা নেই, অথচ শরীরের বিচিত্র মুদ্রায় মনের ভাষা মূর্ত হয়। কারণ, শিল্পপ্রিয় নরনারীর চেতনার গভীরে নৃত্যবোধ অন্তর্নিবিষ্ট (integrated) থাকে। তার বিকাশ ঘটে অনুকূল পরিবেশে।

হাজার বছরের পুরনো 'চর্যাপদ'-এ নাটকের উল্লেখ আছে। সিদ্ধাচার্য বীণাপাদ লিখেছেন ঃ "নাচন্তি বাজিল গান্তি দেবী/ বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই।" অস্যার্থ ঃ "বজ্রচিত্তরাজ নাচে, দেবী করে গান।/ বুদ্ধ-নাটক হয় বিশিষ্ট নির্বাণ।" নাটকে বর্ণিত চরিত্রাবলীর মাঝে ভাবের দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রবলভাবে ফুটে উঠলে নাট্যগুণ সমৃদ্ধ হয়। নচেৎ ঘটনার সাবলীল গতি গীতি-কবিতার ভাব জাগায়। কবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দম্'-এ নাট্যগুণ অপেক্ষা গীতিগুণ (Lyric quality) অধিক। সে-তুলনায় বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' অনেকখানি নাট্যরসসমৃদ্ধ।

ছো-নাচের কাহিনীতে দেখা যায়, দুর্জয় অশুভশক্তির বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম এবং পরিণামে শুভশক্তির জয়। তাই সেখানে দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনিবার্য। ফলে নাট্যগুণ সমধিক।

মুখোশ পরিহিত চরিত্রগুলি শিল্পশোভন বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে বীররস, রৌদ্ররস, করুণরস, বীভৎসরস ফুটিয়ে তোলেন। মুখোশে মুখ ঢাকা থাকলেও মুখমণ্ডলের ভাব-ভাষা মস্তক আন্দোলনে এবং আবেগস্ফুরিত শারীরিক ভাষায় (Body language) আশ্চর্যভাবে ফুটে ওঠে।



ছো-নাচের আসরে শ্রীকৃষ্ণচরিত্র আলোকচিত্র : বিশ্বনাথ লাই

পুরুলিয়ার আদি অধিবাসী কূর্মি-মাহাত, ভূমিজ, রাজোয়াড়, বাউরি, ডোম, হাড়ি, সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতি জনগোষ্ঠী ছো-নাচে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেন। নৃ-বিজ্ঞানের বিচারে এঁরা অরণ্যচারী আদি-অস্ত্রাল জনগোষ্ঠীর (Proto-Austroloid) বংশধর। পুরুলিয়ার 'অযোধিয়াবুরু' অর্থাৎ অযোধ্যা পাহাড়ে এখনো প্রতিবছর বুদ্ধপূর্ণিমা তিথিতে এঁদের 'শিকার-পরব' মহাসমারোহে রণতূর্যে পালিত হয়। সাঁওতালদের 'ভুয়াং-নাচ' প্রকৃতপক্ষে তাঁদের শিকার-নৃত্য। তখন তাঁরা বারবার প্রবল বিক্রমে হাতে ধনুকের ছিলা আকর্ষণ করেন। সেই টঙ্কারধ্বনির সঙ্গে 'ভুয়াং-ভুয়াং' শব্দে ও নৃত্যে অরণ্যপ্রান্তর মুখরিত হয়ে ওঠে। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়—পাইক-নাচ, নাটুয়া-নাচ, ঢালী-নাচ, রায়বেঁশে-নাচ, ভুয়াং-নাচ প্রভৃতি সবই রণনৃত্য। পশ্চিমবাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে মানভূম-পুরুলিয়া, বিহার (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড রাজ্যও) এবং ওড়িশার প্রান্তসীমা খুবই কাছে। এই অঞ্চলে একদা সামন্তরাজ ঘাটোয়াল-ভূস্বামিগণ নিজেদের অস্তিত্বরক্ষায় বেতনভুক পাইক-ঢালী-লেঠেল ইত্যাদি সেনা-কর্মচারী রাখতেন। তাঁরা সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের। অবসর সময়ে তাঁরা ছাউনীতে পাইক-নাচ, নাটুয়া-নাচ, ঢালী-নাচ, ভুয়াং-নাচ প্রভৃতির অনুশীলন করতেন। ফলত, ছাউনীতে অনুশীলনরত নাচ ক্রমে ছো-নাচের রূপ নেয়।

প্রথমদিকে ছো-নাচ একালের মতো সুসজ্জিত ও পরিশীলিত ছিল না। রামায়ণ-মহাভারত বা পৌরাণিক কাহিনী অনুসারী পালাতেও বিভক্ত ছিল না। তা ছিল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নিছক রণনৃত্য (War dance)। আমরা জানি—বৈষ্ণবচেতনা বৃন্দাবন থেকে আলোচ্য প্রান্তিক বাংলায় প্রথমে আসে মল্লভূম-বাঁকুড়ায়। শ্রীজীব গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্যগণ রাঢ়-বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের জন্য বহু বৈষ্ণব পুঁথিপত্র শ্রীনিবাস আচার্যের মাধ্যমে প্রেরণ করেন। দুস্তর অরণ্যপ্রান্তর পেরিয়ে, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের কাছে পুঁথিবোঝাই গরুর গাড়িটি এলে মল্লভূমরাজ বীর হাম্বিরের অনুচরবর্গ ধনরত্নপূর্ণ পেটিকা অনুমান করে সেই গাড়ির জিনিসপত্র লুঠ করে। শ্রীনিবাস আচার্য এবং তাঁর দুই সঙ্গী নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ সুকৌশলে অপহৃত পুঁথি উদ্ধারে সচেষ্ট হন। পরবর্তী ঘটনা অনেকেরই জানা। রাজা বীর হাম্বির সপরিবারে শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে দীক্ষা নেন। তখন থেকেই শৈবতান্ত্রিক বীর হাম্বির বৈষ্ণব ভাবপ্রচারে সক্রিয় হন। আমরা জানি, জয়ানন্দ দাস বনবিষ্ণুপুরকে বৈষ্ণব ভাবনার আদর্শ কেন্দ্র হিসাবে 'গুপ্ত বৃন্দাবন' বলেছেন। ক্রমে বিষ্ণুপুরের স্থানীয় গ্রামগুলির নাম হয়—দ্বারকা, মথুরা, অযোধ্যা ইত্যাদি। দিঘিগুলির নাম হয়—কৃষ্ণ বাঁধ, যমুনা বাঁধ, কালিন্দী বাঁধ ইত্যাদি। বীর হাম্বিরের রাজত্বকাল ১৫৯১ থেকে ১৬১৬ খ্রীস্টাব্দ। ওড়িশার আফগান শাসক কতলু খাঁর সঙ্গে মোগল সেনাপতি মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের যে-যুদ্ধ হয়, সে-যুদ্ধে আক্রান্ত কুমার জগৎসিংহকে উদ্ধার করার জন্য মানসিংহের সুনজরে আসেন বীর হাম্বির। তাঁরই আনুকূল্যে বীর হাম্বিরের রাজ্যসীমা উত্তরে সাঁওতাল পরগনার দামিন-ই-কো, অন্যদিকে জেলার উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমাংশ; পূর্বে বর্ধমানের কিয়দংশ এবং পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পঞ্চকোট রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পঞ্চকোট গড়ের খড়িবাড়ি তোরণে বীর হাম্বিরের নাম উৎকীর্ণ হয়। সময়কাল ১৬০০ খ্রীস্টাব্দ। মন্দিরময় বিষ্ণুপুরের শিল্পতরঙ্গ অর্থাৎ বৈষ্ণব ভাবনার তরঙ্গ পুরুলিয়াতেও ছড়ায়। কাশীপুরের কাছে চেলিয়ামায় টেরাকোটার অপরূপ কারুকার্যমণ্ডিত রাধাবিনোদ-মন্দির ১৬১৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

স্থাপিত হয়। ছাতা পরবের জন্য বিখ্যাত পুরুলিয়ার চাকলতোড় গ্রামেও শ্যাম রায়ের একটি জোড়বাংলা মন্দির অষ্টাদশ শতকে নির্মিত হয়। পুরুলিয়ার বরাবাজারেও অষ্টকোণাকৃতি রাসমঞ্চ নির্মিত হয়। বাঘমুণ্ডি রাজবাড়ি বর্তমানে কালগ্রাসে ভগ্নপ্রায়। সেই রাজবাড়ির প্রাঙ্গণে সুরম্য রাধাগোবিন্দ-মন্দির ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে তৈরি হয়। কাছেই নবরত্নবিশিষ্ট রাসমঞ্চে রামায়ণ-মহাভারতের নানা কাহিনী পোড়া ইঁটের গায়ে প্যানেলে একদা চিত্রিত হয়। লক্ষণীয়, ছো-নাচের পালায় সেসব কাহিনী বিধৃত।

বাঘমুণ্ডির সামন্তরাজের উদ্যোগে আদিম রণনৃত্যসঞ্জাত লোকনৃত্য ছোয়ের রণকুশলতার মাঝে সুকৌশলে রামায়ণ-মহাভারত বা পৌরাণিক কাহিনীর অনুপ্রবেশ ঘটে। একই সঙ্গে ছো-নাচে মুখোশ-শিল্প যথোপযুক্তভাবে ব্যবহারের জন্য একদল সুদক্ষ মৃৎশিল্পী বর্ধমান থেকে এনে বসান বাঘমুণ্ডির সংলগ্ন চড়িদা গ্রামে। ছো-নাচের কিংবদন্তি শিল্পী গম্ভীর সিং মুড়া বাঘমুণ্ডির মানুষ। তিনি ছো-নাচের জন্য ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্মশ্রী' এবং ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে 'সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি' পুরস্কারে সম্মানিত হন। তাঁর ছো-নাচের দলের ম্যানেজার ছিলেন অনিল সূত্রধর। তিনি বলেছেন, তাঁদের পূর্বপুরুষ বর্ধমান থেকে পুরুলিয়ায় এসেছিলেন তৎকালীন বাঘমুণ্ডির সামন্তরাজের আমন্ত্রণে। রাজা মৃৎশিল্পীদের নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আজ থেকে কুড়ি বছর আগে একটি প্রবন্ধে ('ছৌ-মুখোশের শিল্পী সম্প্রদায়') লিখেছেন : "আমার বিশ্বাস আলোচ্য শিল্পীরা বর্ধমান জেলার কোন এক অঞ্চল থেকে চড়িদায় গিয়ে বসতি করে থাকবেন, যদিও সে-অঞ্চলটি ঠিক কোথায়, তা এখনো বলা যায় না। বাংলার কুমোরেরা চিরাচরিতভাবে 'বর্ধমান থাক', 'অষ্টকুল থাক' প্রভৃতি যেসব গিল্ড বা আঞ্চলিক পেশাদার গোষ্ঠীতে বিভক্ত, তার মধ্যে 'বর্ধমান থাক' কর্তৃক অনুসৃত শিল্পপদ্ধতির সঙ্গে চড়িদার শিল্পীদের মৃৎশিল্প এবং কারিগরীর সাদৃশ্য আছে।"

পুরুলিয়ার ছো-মুখোশশিল্পী নকুল দত্ত, নির্মল পাল, গণেশ সূত্রধর, হীরালাল সূত্রধর প্রমুখ জানান, তাঁদের পূর্বপুরুষ বর্ধমান থেকে বাঘমুণ্ডিরাজের আমন্ত্রণে এই জেলায় এসে বসতি গড়েন।

বাঘমুণ্ডি রাজন্যবর্গের সুপরিকল্পিত পৃষ্ঠপোষকতায় লোকনৃত্য ছো শিল্পসুষমায় বর্ণোজ্জ্বল হয়। বাঘমুণ্ডির বিখ্যাত লোকনৃত্য-বিশেষজ্ঞ শেখ গোলাম মহম্মদ বলেছেন : "বাঘমুণ্ডির রাজা মদনমোহনের আমলটাই ছিল ছো-নাচের স্বর্ণযুগ। গীত-বাদ্য-নৃত্য-অভিনয় সমন্বিত হয়ে ছো-নাচ তখন পূর্ণাবয়ব ও নিয়মবদ্ধ হয়ে ওঠে।"

শূরনৃত্য ছো-এর মূলে আছে আদি অধিবাসী জনগোষ্ঠীর রণকৌশল এবং গাজন-নৃত্যের ঐন্দ্রজালিক ভাবনা (Magic Cult)। লক্ষণীয়, ছো-নাচের ছকের মাঝে 'ডেগ' এবং 'চাল' আছে। এক 'ডেগ' চলার পরে দেহের ভারসাম্য রেখে ছো-নাচিয়ে দুটি হাত বুকের সমান্তরাল অথবা ওপরে তুলে 'উড়া মালট' দেয়। আছে ময়ূর চাল, সর্প চাল, বক চাল, বাঘ চাল। এসব প্রকৃতিজগৎ থেকে সংগৃহীত। ছো-নাচে আছে বিভিন্ন তাল ও মাত্রা। যথা, চার মাত্রার তাল— ধেনাক্। ধেনাক্। ধেনাক্। তাক্। এটি শিকারী নাচের তাল। নাটুয়া-নাচ থেকে এসেছে। ছো-নাচে এটি 'উলফা' বা 'নাটা তাল'। ছয় মাত্রার তাল—তাক্ ঝাঁ। তাক্ ঝাঁ। টিক্ ঝাঁ। তেটে। খিটি। তাক্।

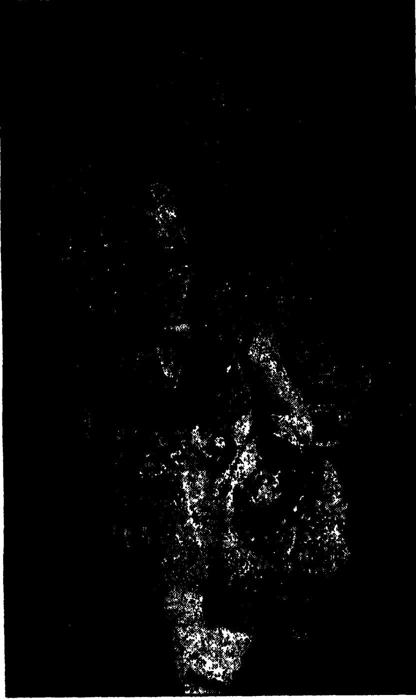


ছো-নাচের 'গণেশ' আলোকচিত্র : বিশ্বনাথ লাই

ছো-শিল্পীর নাচের দ্রুতি বাড়ার সঙ্গে ৬ মাত্রার তাল ১২ মাত্রা কিংবা ২৪ মাত্রাও হয়ে যায়। বিচিত্র তাল ফুটে ওঠে বিভিন্ন নৃত্যভঙ্গিমায়। তালের নানারকম মাত্রা, যা রীতিমতো অনুশীলনের অপেক্ষা রাখে। তাই ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন : "ছো নৃত্যনাট্যের মধ্যে যে আমরা আজ এক সুসংহত প্রণালীবদ্ধ নৃত্যপদ্ধতি প্রত্যক্ষ করি, তা কখনো আনুপূর্বিক আদিবাসী সমাজের পরিকল্পনা বলে মনে হতে পারে না। এর মধ্যে আদিবাসীর কিছু কিছু প্রেরণা থাকলেও তাকে শৃঙ্খলাযুক্ত এবং প্রণালীবদ্ধ করবার কৃতিত্ব নিশ্চয়ই কোন উচ্চতর সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতির প্রাপ্য।... মণিপুরী নৃত্য কিংবা কথাকলি নৃত্যে আদিবাসীর উপাদান

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

কিছু কিছু থাকলেও সামগ্রিকভাবে তা উচ্চতর সংস্কৃতির পরিকল্পনা এবং সৃষ্টি। ছৌ-নৃত্যনাট্যও তাই।" এরকমই মনোভাব পোষণ করেন ডঃ কপিলা বাৎসায়ন। তিনি 'Traditional Indian Theatre' গ্রন্থে বলেছেন : "The Natyasastra devotes a complete chapter to the representation of animals and birds on the stage through masks and skins in the lokadharmi tradition. What we see today in Purulia is perhaps the continuity of the tradition mentioned by Bharata." (p. 91)



রাক্ষসযুগল আলোকচিত্র : বিশ্বনাথ লাই

ছো-এর আসরে পুরুলিয়ার ছো-নৃত্যশিল্পীরা তাঁদের দৃপ্ত পদসঞ্চারে ৫-৬ ফুট বা তারও বেশি ঊর্ধ্বে শূন্যে উপর্যুপরি লম্ফপ্রদান, চক্রাকারে উল্লম্ফন, দুই হাঁটুর ওপর আন্দোলিত শরীরের ভর রেখে কয়েক মিটার দ্রুত ছন্দে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ দৃপ্তভঙ্গিতে বিচিত্র মুদ্রায় নাচের কসরত দেখিয়ে বীরদর্পে শূন্যে পুনঃ পুনঃ লম্ফপ্রদান করে আসরকে মাতিয়ে তোলেন। ছো-নৃত্যশিল্পীদের নৃত্যের তালে তালে বিচিত্র তাল-লয়যুক্ত হয়ে বাজে ঢোল, ধামসা, সানাই। (বিগত বেশ কয়েক বছর ছো-নাচের বাদ্যযন্ত্র হিসাবে যুক্ত হয়েছে বিচিত্র তাল-লয়-সমন্বিত ক্ল্যারিওনেট এবং আরো নানা ধরনের শৌখিন বাদ্যযন্ত্র। এর পিছনে আছে আধুনিকতার নামে বাণিজ্যিক ভাবনা।)

১৯১২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির সঙ্গে যুক্ত ছিল বিহার এবং ওড়িশা। সেরাইকেলা ওড়িশা থেকে আলাদা হয়ে ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে বিহারে যুক্ত হয়। তার আগে পর্যন্ত দুটি বিখ্যাত ছো-অঞ্চল ময়ূরভঞ্জ ও সেরাইকেলা ওড়িশার অন্তর্গত সিংভূম জেলার অন্তর্গত ছিল। বিহারের মানভূম জেলা ভেঙে ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দের ১ নভেম্বর পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি। সম্প্রতি বিহার ভেঙে হয়েছে ঝাড়খণ্ড রাজ্য।

রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনায় বোঝা যায়—উপরি উক্ত অঞ্চলগুলি কাছাকাছি থাকায় সাংস্কৃতিক ঐক্য বজায় ছিল। সেই সাংস্কৃতিক ঐক্যের সূত্রে উক্ত অঞ্চলের ভূস্বামী বা রাজন্যবর্গের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। একইভাবে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামের চিল্কীগড় রাজপরিবার সঙ্গে কাছে-দূরের অন্য রাজন্যবর্গের বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক মিলন ঘটেছে।

মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম থেকে অনতিদূরে চিল্কীগড়। এখানে জ্যৈষ্ঠ মাসে শিবের গাজন-পরবে ধবলদেব-রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় একদা একমাসব্যাপী গাজন ও ছো-নাচ চলত। এখনো জ্যৈষ্ঠ মাসের কয়েকদিন গাজন ও ছো-নাচ মহাসমারোহে পালিত হয়। চিল্কীগড়ের গাজন-পরবে কালী পাতা, দুর্গা পাতা, শিব পাতা, রঙ্কিণী পাতা, হনুমান পাতা নামে পাঁচরকম 'পাতা' শোভাযাত্রা-সহ বের হয়। (পঙ্ক্তি থেকে 'পাতা' কথাটির উৎপত্তি) এখানে গাজন-পরবের শেষদিন 'জাগরণ'। তার ঠিক আগের দিন 'মেল'। সেদিন 'বড় পাতা' বের হয়। 'মেল'-এর দিন মধ্যরাতে 'সতী' অনুষ্ঠান। দাঁড় ভক্ত্যাকে খাটে শুইয়ে মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়ার মতো 'হরিবোল' ধ্বনি দিয়ে ছো-নাচের আসরের কাছে আনয়ন করা রীতি। ঝাড়গ্রাম থেকে কিছু দূরে চন্দ্রী এবং দুবড়া গ্রাম। এই গ্রামগুলিতেও চৈত্র সংক্রান্তির সময় শিবের গাজন ও ছো-নাচ হয়।

ছো-নাচ আজ ভুবনবিদিত। জনপ্রিয় এই লোকনৃত্যের উৎসভূমি অজলা-অফলা, টাঁইড়-বাইদের দেশ পুরুলিয়া—যে-জেলা অনেকের কাছে খরার জেলা, কুষ্ঠের জেলা হিসাবেও পরিচিত। পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি থেকে ছো-নাচ এই জেলার ঝালদা, জয়পুর, আড়শা, বান্দোয়ান, কাঁটাডি, আনাড়া, পাড়া এবং আরো অসংখ্য জায়গায় যেমন ছড়িয়ে গেছে, তেমনি পুরুলিয়া থেকে এ-নাচের বিস্তার ঘটেছে বর্তমানের চাষ-চন্দনকিয়ারী, তামাড়-বুণ্ডু-সিল্লি, রামগড়-গিরিডি প্রভৃতি এলাকায় এবং দক্ষিণ বাঁকুড়ার রানীবাঁধ, সাবড়াকোণ প্রভৃতি অঞ্চলে। মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম-বিনপুর-বাঁশপাহাড়ী প্রভৃতি এলাকায় জনসংস্কৃতির প্রসারণে

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

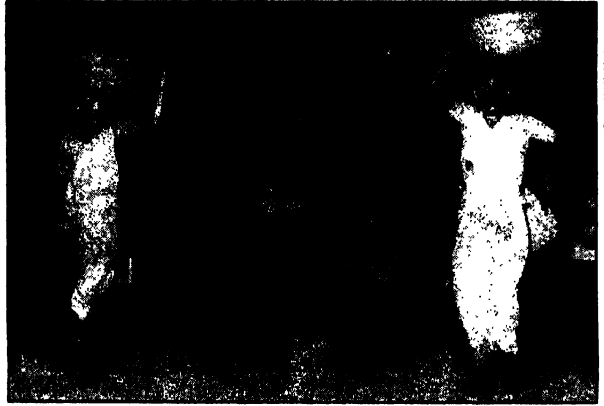
ছড়িয়েছে। আবার পুরুলিয়ার বাঘমুণ্ডি থেকেই ছো-নাচের বিস্তার ঘটেছে সেরাইকেলায়। সেখান থেকে ময়ূরভঞ্জেও ছড়িয়ে পড়েছে ছো-নাচের দৃপ্ত রণনৃত্য। সেরাইকেলায় ছো-নাচের শুরুতে থাকে চৈতিগান, তা বাঘমুণ্ডি ঘরানার। আবার ময়ূরভঞ্জের ছো-নাচে কৃষ্ণলীলায় ১৬ জন কৃষ্ণ এবং ১৬ জন রাধার বেশে নাচেন। (বলা বাহুল্য, পুরুষ শিল্পীরা রাধা সাজেন।) একে বলা হয় 'তামুড়িয়া-কৃষ্ণ'। বৃহত্তর মানভূম জেলার তামাড়ে এই নৃত্যশৈলীর প্রচলন ছিল। ১৮৭১-১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে প্রবল দুর্ভিক্ষের সময় বহু গ্রামবাসী তামাড় ছেড়ে ময়ূরভঞ্জে চলে যান। এই দেশান্তরের সুবাদে লোকসংস্কৃতির প্রসারণ ঘটে।

ময়ূরভঞ্জে ছো-নাচের একটি স্যুভেনিরে (১৯৮৪) স্বীকার করা হয়েছে—"Chhou dance originated in Purulia. The Raja of Seraikella borrowed it from Purulia. But Seraikella dance is masked dance that was reformed in Mayurbanj."

সেরাইকেলা থেকে উপেন্দ্র বিসওয়াল এবং বনমালী দাস নামে দুজন ছো-নৃত্য প্রশিক্ষককে ময়ূরভঞ্জে একদা আনয়ন করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল ছো-নাচের বিস্তার। মনোমোহন দাস তাঁর 'Economics of Chhau Dance'-এ লিখেছেন ঃ "For example Late Upendra Biswal and Late Banamali Das, grand father of the present speaker Sri Pasanna Kumar Das were brought from Saraikala and were provided jagirs for directing chhau dance."

পুরুলিয়ার ছো-নাচে ব্যবহৃত মুখোশগুলি বীরভাব বা দৈবীরূপ কিংবা আসুরিক ভয়ঙ্করতা প্রকাশে উগ্র এবং ধ্রুপদী শৈলীতে বিশ্বাসী, যা অনেকের চোখে রক্ষণশীল মনোভাবযুক্ত। সেখানে মানবিক ভাবের ব্যঞ্জনা, সূক্ষ্ম কাব্যবোধের প্রকাশ নেই। কিরাত-কিরাতিনীর মুখোশ নির্মাণে অবশ্য ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। জীবজন্তুর মুখোশও বাস্তবধর্মী। অথচ সেরাইকেলার ছো-মুখোশ মানবিক ভাবস্ফুরিত, শিল্পীর সূক্ষ্ম তুলিতে কাব্যিক সুষমায় ব্যঞ্জনামুখর। তবে পুরুলিয়ার মুখোশের অনুরূপ শিরস্ত্রাণ এবং চালচিত্রযুক্ত। আবার ময়ূরভঞ্জের ছো-নাচে মুখোশের বাড়াবাড়ি নেই। ছো-শিল্পীরা মুখে রঙ ব্যবহার করেন। বড়জোর যাত্রা দলের অভিনেতার মতো শিল্পীর মাথায় মুকুট শোভা পায়। সেখানে ছো-নাচিয়ে এক হাতে ঢাল, অন্য হাতে তরোয়াল নিয়ে নৃত্যকৌশল প্রদর্শন করে। তা যেন সেনা-ছাউনীতে সৈনিকদের যুদ্ধনৃত্যের মহড়া। পুরুলিয়ার ছো-মুখোশে মূল ধ্রুপদী ঐতিহ্য এবং আঙ্গিক প্রকরণ মোটামুটি অক্ষুণ্ণ; তবে সাম্প্রতিক কালে সামাজিক রাজনৈতিক পালা ছো-নাচে যেমন আসছে, তেমনি আধুনিকতার নামে ক্ল্যারিওনেট ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রসহ হিন্দি ফিল্মিগানের ঢেউও জাগছে, যার মূলে আছে প্রবল বাণিজ্যিক ভাবনা। তবু পুরুলিয়ার ছো-নাচের প্রধান অবলম্বন বীররস, রৌদ্ররস, করুণরস। মেদিনীপুরের মুখোশনির্মাণ কৌশল ও ছো-নাচ পুরুলিয়া ঘরানার সঙ্গে কিঞ্চিৎ স্থানীয় শিল্পভাবনা যুক্ত।

পুরুলিয়ার ছো-নাচের পালা মূলত ধারাবাহিক পৌরাণিক বা সামাজিক কাহিনী (theme)-নির্ভর এবং আধ ঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা বা তারও কিছু বেশি সময় লাগে প্রতিটি পালা অভিনয়ে; অথচ সেরাইকেলার ছো-নাচের



ছো-নাচে সামাজিক পালা আলোকচিত্র ঃ বিশ্বনাথ লাই

পালাগীতি কবিতার মতো স্বল্প-দৈর্ঘ্যের এবং মানবিক সূক্ষ্ম অনুভূতি বা ভাব (mood)-নির্ভর। ফলে সেখানে মধুর-রসের প্রাধান্য। সেরাইকেলার রাজপরিবারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানকার ছো-নাচে প্রথম থেকেই এসেছে মানবিক সৌন্দর্যবোধ, সূক্ষ্ম রুচি। তাই সেরাইকেলার ছো-মুখোশের চোখ টানাটানা, নাক টিকালো, ওষ্ঠাধর আবেগস্ফুরিত। মুখোশের মধ্যে নেই রণোন্মাদনা, আছে কমনীয় ভাবের স্নিগ্ধ আবেশ। সেখানে ছো-নাচের পালা প্রতীকব্যঞ্জনায় বা প্রেমভাবনায় যেন নিটোল গীতি- কবিতা। সেইসব পালার নামও এরকম—ফুল ও বসন্ত (ঋতুনৃত্য), ময়ূর-নৃত্য, মরু-মরীচিকা, মাঝদরিয়ায় নাবিক ইত্যাদি। সেরাইকেলার রাজপরিবারের কোন কোন উৎসাহী প্রতিনিধি আধুনিক শিল্পসুষমায় নৃত্যনাট্যের পরিকল্পনা এনেছেন ছো-নাচে। তার বিষয়গুলি এরকম—অর্ধনারীশ্বর, মেঘদূত, অভিসার, দেবদাসী, অসি-নৃত্য, ফুল ও ভ্রমর, বন্দে মাতরম্ ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এসব ছো-পালা রসজ্ঞ দর্শকদের কাছে 'lyrical and soft', অন্যদিকে পুরুলিয়ার ছো-নাচে আছে 'more vigour than grace'।

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে হরেন ঘোষের নেতৃত্বে সেরাইকেলার ছো-নাচের দল বিদেশে বিপুল জনপ্রিয় হয়েছিল। 'The Times' পত্রিকা সেসময় মন্তব্য করেছিল ঃ "Unusual and interesting entertainment... extraordinary beauty... grave loveliness." রসজ্ঞ অভিমত 'News Chronicle' দিয়েছিল ঃ "A passionate display of Hindu colour and movement which should be seen by anyone who has the chance. An extraordinary richness of emotion."

১৯৭২ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে পুরুলিয়ার ১১ জন ছো-নৃত্যশিল্পী এবং ৬ জন বাজনদার নিয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য লণ্ডনে লোকনৃত্য পরিবেশনের জন্য যাত্রা করেন। তারপর প্যারিস, হল্যাণ্ড, স্পেন প্রভৃতি দেশে ছো-নৃত্য পরিবেশিত হয়। ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে পুনরায় তিনি পুরুলিয়ার ছো-নৃত্যশিল্পীদের নিয়ে আমেরিকা-যাত্রা করেন। যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যত্র পঁচিশটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছো-নৃত্য প্রদর্শন করেন ও প্রাসঙ্গিক বক্তৃতা দেন। বিদেশে পুরুলিয়ার ছো-নাচ উচ্চপ্রশংসিত হয়। সেখানকার প্রথম শ্রেণীর নানা পত্রিকায় সশ্রদ্ধ রসজ্ঞ অভিমত ছাপা হয়। ডঃ ভট্টাচার্য পুরুলিয়ার ছো-দল নিয়ে অস্ট্রেলিয়া, হংকং প্রভৃতি দেশেও ভ্রমণ করেছেন।

ছো-নাচের এই বিশ্বজোড়া খ্যাতিকে পুরুলিয়ার কোন কোন ছো-নাচপ্রিয় মানুষ সুনজরে দেখেননি। এসম্পর্কে গোলাম মহম্মদ খাঁর অভিমত পুরুলিয়ার 'ছত্রাক' পত্রিকায় (১৩৮৫ বঙ্গাব্দ) প্রকাশ পায়। তা এরকম ঃ "ইসব আজ্ঞা গাঁ-ঘরের জিনিস, ফরেন লেগবার জন্য ত হয় নাই। ঢোল-ধামসা এমনেই? পাহাড় কাঁপাই দিবেক তবেই না? হলঘরে আঁটবেক? চক্‌কর দিয়াটাও বন্ধ। একটা নাগড়া-কুলকুলিও নাই—যুদ্ধটা কী করে জম্‌বেক? গণেশবন্দনা, আসরবন্দনা, ঝুমুর সব খতম। পরিবেশটাই আলাদা, পয়সা আর নামের লোভটাই ধরাই দিছে—আনন্দটাই নাই।"

পুরুলিয়ার সামন্তরাজ-ভূস্বামিবর্গের প্রণোদনায় একদা অশিক্ষিত পটুত্ব-সর্বস্ব পাইক-নাচ তাল-মাত্রাযুক্ত ছো-নাচে উন্নীত হয়। মেদিনীপুর, সেরাইকেলা, ময়ূরভঞ্জে সম্প্রসারিত ছো-নাচের ইতিহাসও অনুরূপ। পরিবর্তমান কালের গতিতে ক্ষয়িষ্ণু রাজন্যবর্গের পরিবর্তে বর্তমানে এই লোকনৃত্যে এসেছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা। কিন্তু সরকারি আনুকূল্য তো সব শিল্পীর ভাগ্যে জোটে না। তাই ছো-শিল্পীদের আর্থিক অবস্থা সামগ্রিকভাবে উজ্জ্বল নয়, বরং নানা সমস্যায় তাঁরা উদ্বিগ্ন। তাছাড়া এইসব ছো-শিল্পী অধিকাংশ আসেন সমাজ-ব্যবস্থার তথাকথিত নিম্নবর্গ থেকে। পুরুলিয়ার অন্তত ৮০ ভাগ ছো-শিল্পী তপসিলী জাতি/উপজাতি, আদিবাসী ও কুর্মী সম্প্রদায়ভুক্ত। চাষ-আবাদ, বিড়ি বাঁধা, জনমজুর খাটা, রিক্সা চালানো ইত্যাদি তাঁদের পেশা। প্রাণের নেশা বা তাঁদের শিল্পের প্রতি ভালবাসা হিসাবেই ছো-নাচ। এই সমাজচিত্র সেরাইকেলা, ময়ূরভঞ্জ ছো-শিল্পীদের মধ্যে ফুটে ওঠে।

পশ্চিমবঙ্গে লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, রাজ্য সঙ্গীত অ্যাকাডেমি প্রভৃতি সংস্থা লোকসংস্কৃতি ও লোকনৃত্যের পুনরুজ্জীবন এবং পোষ্টাই হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। নানা ওয়ার্কশপ ও অনুষ্ঠান রাজ্যের জেলাশহর, গ্রামগঞ্জে প্রায়ই হচ্ছে। শিল্পীদের সম্মানের পাশাপাশি দুঃস্থ শিল্পীদের নানা ধরনের অনুদান প্রকল্প বিগত দুই দশকে ব্যাপক হারে চালু হয়েছে। তবু প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল।

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের 'কচ ও দেবযানী' কাব্যনাট্যটি ছো-নাচে পরীক্ষামূলকভাবে রূপায়িত হয়েছে। পুরুলিয়ার ছো-নৃত্যধারার সঙ্গে সেরাইকেলা ও ময়ূরভঞ্জ ছো-নৃত্য ধারার মেলবন্ধন ঘটানোর প্রয়াস সেখানে লক্ষণীয়। সারা ভারতের নানা জায়গায় ৩২টি অনুষ্ঠান করার পর গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০০1 কলকাতার রবীন্দ্রসদনে ৩৩তম অনুষ্ঠানটিও দর্শক-নন্দিত হয়। কচ এবং দেবযানীর ভূমিকায় যথাক্রমে প্রতাপ সরকার ও শেলি পালের অভিনয়ের সঙ্গে পুরুলিয়ার জগৎ মুর্মু, বিধান মাণ্ডি, রবিদাস হেমব্রমের যুদ্ধনৃত্য দর্শকদের মুগ্ধ করে। এই নৃত্যনাট্যের প্রযোজক জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির রাজ্য নৃত্য-নাটক-সঙ্গীত ও দৃশ্যকলা অ্যাকাডেমি।

ছো-নাচের মুখোশ নির্মাণ

আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে মানুষ বিপদগ্রস্ত হলে ঝাড়ফুঁকওয়ালা কেউ কেউ এগিয়ে এসে মঙ্গলবিধান করতেন। জাদুবিদ্যায় (Magic Cult) ছিল তাঁদের অগাধ আস্থা ও নিরন্তর চর্চা। তাঁদের ধর্মীয় অনুশাসনের অঙ্গ হিসাবে কল্পিত দেবদেবী বা জীবজন্তুর মুখোশের ব্যবহারও ছিল। তাতে সাধারণ নরনারীদের মনে জাগত ভয়মিশ্রিত ভক্তি। 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'-র পঞ্চদশ খণ্ডে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুখোশ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আছে। নিউগিনি-নিউ আয়ারল্যাণ্ডে শুকনো ঘাস, পাম-নারকেল গাছের পাতা বা তন্তু প্রভৃতি দিয়ে বানানো হতো মুখোশ। উত্তর আমেরিকার 'পুয়েবলো' ও 'শামন' জনগোষ্ঠীর মানুষ বৃষ্টির প্রার্থনায় মুখোশ-নৃত্য পরিবেশন করতেন। মেক্সিকো, ইতালি, গ্রিস, মেসোপটেমিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে টেরাকোটা বা ধাতুনির্মিত মুখোশ ব্যবহারের কথা জানা যায়। কাম্বোডিয়া-শ্যামদেশে নৃত্যে সোনার তৈরি মুখোশের ব্যবহার ছিল। আফ্রিকার মানুষ সাদা রঙের মুখোশ বিশেষভাবে পছন্দ করতেন।

আগেই বলা হয়েছে, পুরুলিয়ার মুখোশ-গড়া শিল্পীদের মূল আবাস বাঘমুণ্ডির কাছে চড়িদা গ্রাম। তাঁদের পূর্বপুরুষরা বর্ধমান জেলা থেকে এসেছিলেন। তাঁরা বর্ণহিন্দু এবং দত্ত-পাল-শীল ইত্যাদি পদবীযুক্ত। একালে গরাই-সিংমুড়া বা ভাট সম্প্রদায়ের মানুষও মুখোশ-শিল্পে রুজি-

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

নির্বাহ করেন। অনেকে চাষ-আবাদের পাশে এই বৃত্তি নিয়েছেন।

মুখোশ-নির্মাণের প্রাথমিক উপাদান মাটি দিয়ে গড়া ছাঁচ (Model)। সেটি রোদে শুকিয়ে শক্ত করা হয়। গণেশের মুখের ছাঁচ হবে হাতির মুখের মতন, তাতে দেবদেবীর দিব্যভাবের আদল থাকবে। আর রাক্ষসের ছাঁচ হবে বড় বড় চোখ-দাঁতযুক্ত। প্রাথমিক পর্যায়ের নাম 'মাটিগড়া'। তারপর শুকনো মাটির ওপর মিহি ছাইগুঁড়ো পাউডারের প্রলেপের মতন লাগানো হয়। তার ওপর পুরনো খবরের কাগজ আঠায় ভিজিয়ে নরম করে কয়েকপ্রস্থ লাগানো হয়। এর নাম 'কাগজ-চিটানো'। এই



ছো-মুখোশ নির্মাণরত শিল্পীরা আলোকচিত্র ঃ বিশ্বনাথ লাই

Pasting পদ্ধতিকে আঞ্চলিক উচ্চারণে কেউ কেউ বলেন 'কাগজ-সিটানো'।

কাগজের প্রলেপটি শুকিয়ে গেলে তার ওপর মিহি কাদার মণ্ড ধরনের আস্তরণ দেওয়া হয়। তার নাম 'কাবিজ-লেপা'। কাদার প্রলেপটি শুকিয়ে গেলে তার ওপর পুরনো বা ছেঁড়া নরম কাপড় সুকৌশলে সেঁটে দেওয়া হয়। এ পর্যায়ের নাম 'কাপড়-সিটানো'। তারপর মাখন-চামচের মতন কাঠের 'কর্ণিক' বা 'করনি' দিয়ে মুখোশটিকে পালিশ করা হয়। এর নাম 'থাপি-পালিশ'। তারপর ছোট্ট বাটালি দিয়ে চোখ-মুখ পরিষ্কার করে ঠিকমতন 'ভাব' আনা হয়। এর নাম 'খুশনি-খোঁচা'। এরপর আরেকবার কাদাগোলা জল লাগিয়ে পুরোপুরি শুকিয়ে নেওয়া হয় মুখোশটি। তারপর খড়িমাটি-গোলা জল লাগিয়ে পুনরায় মুখোশটি শুকানো হয়। পরবর্তী পর্যায়ে মুখোশের চরিত্র অনুযায়ী হয় 'রঙ করা' এবং 'সাজানো'।

দেবদেবীর গাত্রবর্ণ (Skin Colour) এবং তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে লোকশিল্পীরা বংশপরম্পরায় মৌখিক ধারায় (oral tradition) এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ। দেবী দুর্গার মুখোশের রঙ গাঢ় হলুদ বা উজ্জ্বল কমলা রঙের। লক্ষ্মী বা কার্ত্তিকের মুখোশ অনুরূপ রঙের। কালীর মুখোশ কালো বা নীল রঙের। শিব, সরস্বতী বা গণেশের মুখোশের রঙ সাদা। দুর্গা, কালী, শিব ও গণেশের ত্রিনয়ন। রাম বা কৃষ্ণের মুখোশে নীলের আভা। কপালে তিলক। হনুমানের মুখোশ গোলাপী রঙের। পরশুরামের মুখোশ কমলা-লাল। কিরাত-কিরাতিনী গাঢ় মেটে রঙের। রাক্ষস-দৈত্যদের মুখোশ কালো বা গাঢ় সবুজ রঙের। মোটা গোঁফ, ভয়ঙ্কর দন্তুর, বড় বড় চোখ। জীবজন্তুদের মুখোশে বাস্তবধর্মী রঙ।

মুখোশ-সাজানোরও বিশেষ রীতি আছে। উজ্জ্বল রঙযুক্ত রাঙতা কাগজ (যার ডাকনাম 'জামির পাতা') নানা কায়দায় কাটা হয়। সেইসঙ্গে সরু তারে গাঁথা হয় নানা ধরনের রঙিন পুঁতিমালা। শোলার কারুকার্য, গঙ্গাযমুনা মালা, রোলেক্সের বাহারি কাজ, রঙিন কাগজের ফুল, নানা ধরনের অলঙ্কার, ময়ূর বা মুরগীর পালক ইত্যাদি দিয়ে শিল্পী খুবই যত্নসহ মুখোশ সাজান। ঘামতেল দিয়ে মুখোশের ঔজ্জ্বল্য বাড়ানো হয়। বর্তমানে এক-একটি মুখোশের দাম ৩০০-৪০০ টাকা থেকে ৮০০-১০০০ টাকা। 'কাজ' অনুযায়ী দাম।

ছো-নাচের এক-একটি পালায় বহু টাকার মুখোশ লাগে। আবার একটি মুখোশ ব্যবহার করে খুব বেশি পালায় 'নাচা' যায় না। মুখোশের আকাশছোঁয়া দাম, বাদ্যযন্ত্রাদির বিশাল খরচ মিটিয়ে শৌখিন ছো-নাচের দল তো দূর অস্তু, এক-একটি বাণিজ্যিক দলেরও নাভিশ্বাস দশা! ছো-শিল্পীদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়—"প্যাটে (পেটে) ভাত নাই হাম্‌দের, উদিকে হাথি-পুষা (হাতি-পোষা) খরচ, চইল্‌বেক ক্যাম্‌নে?"

মুখোশ-শিল্পের বাণিজ্যিক কদর দেশে-বিদেশে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বা ড্রইংরুমে মুখোশ সাজিয়ে রাখা এখন 'স্ট্যাটাস-সিম্বল'। অথচ মুখোশের আড়ালে 'মুহা-গড়া' অর্থাৎ মুখোশ-গড়া শিল্পীদের (স্থানীয় ভাষায় 'করিগর') এবং ছো-নৃত্যশিল্পীদের দারিদ্র্যক্লিষ্ট করুণ মুখচ্ছবি শ্রীর বিপ্রতীপে নিথর বেদনায় জেগে থাকে! কানে এখনো ভাসে 'পদ্মশ্রী' সম্মানে সম্মানিত, বিশ্ববিজয়ী ছো-নৃত্যশিল্পী গম্ভীর সিং মুড়ার দারিদ্র্যপীড়িত অথচ অকপট ক্ষোভ—"ম্যাডাল (মেডেল) ধুয়ে কি জল খাব? তাথে কি প্যাট ভর্‌বেক?" ❑

প্রসঙ্গ 'গীতাঞ্জলি'

বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

'গীতাঞ্জলি' ও উইলফ্রেড আওয়েন



তাঞ্জলি' প্রসঙ্গে প্রথমেই বিশ্বযুদ্ধে নিহত ইংরেজ কবি উইলফ্রেড আওয়েনের অন্তিম মুহূর্তের একটি ছবি মানসপটে ভেসে ওঠে। যুদ্ধবিরোধী জীবনপ্রেমিক এই অকাল-প্রয়াত কিশোর কবির মৃত্যু হয় ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশের ছয়বছর পর অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পাঁচবছর পর—১৯১৮ সালের ৪ নভেম্বর। যুদ্ধে মৃত কবি আওয়েনের পকেটে প্রাপ্ত ডায়েরিতে যে-কবিতাটি পাওয়া গিয়েছিল, তা তাঁর নিজের রচনা নয়, ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র অন্তর্গত ৯৬ সংখ্যক কবিতা, যার আরম্ভ এইভাবে—"When I go from hence, let this be my parting word, that what I have seen is unsurpassable." বাঙলা 'গীতাঞ্জলি'তে এটি ১৪২ সংখ্যক গান, যার শুরু এইরকম—

"যাবার দিনে এই কথাটি
বলে যেন যাই
যা দেখেছি যা পেয়েছি
তুলনা তার নাই।"

অনবদ্য এই পঙ্‌ক্তিগুলির অমরস্রষ্টা উপনিষদের নবীন ভাষ্যকার রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের সমস্ত দর্শনের সার-কথাই তো—"যা দেখেছি যা পেয়েছি—তুলনা তার নাই।"



গীতাঞ্জলি রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ

নোবেল পুরস্কার ও তার শতবর্ষপূর্তি

'গীতাঞ্জলি' প্রসঙ্গে আসার আগে 'গীতাঞ্জলি'র সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত যে-ব্যাপারটি সেই নোবেল পুরস্কার সম্বন্ধে সামান্য আলোচনা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিশেষ করে, নোবেল পুরস্কার প্রবর্তনের শতবার্ষিকী সমাপ্ত হয়েছে এই ২০০০ সালে। 'গীতাঞ্জলি' এবং নোবেল প্রাইজ শব্দদুটি আমাদের কাছে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এমনকি সাধারণ বাঙালীর কাছে শব্দদুটি সমার্থক না হোক, পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে গণ্য। তাই 'গীতাঞ্জলি' প্রসঙ্গে প্রবেশ করার আগে নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তক স্যার আলফ্রেড বার্ণহার্ড নোবল সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া প্রয়োজন।

মৃত্যুর এক বছর আগে ১৮৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর সুইডেনের আলফ্রেড বার্ণহার্ড নোবেল তাঁর সঞ্চিত অর্থের এক বিরাট অংশ সুইডেনের সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে রাখেন এবং উইল করে যান—এই সঞ্চিত অর্থের সুদ থেকে প্রতি বছর পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, শারীরবিজ্ঞান, সাহিত্য এবং বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে উল্লেখ-যোগ্য প্রতিভাধরকে পুরস্কার দেওয়া হবে। নোবেলের উইলের এই পুরস্কারই 'নোবেল পুরস্কার'। নোবেল পুরস্কারের জন্য নিয়মাবলী নির্ধারণকল্পে ১৯০০ সালের ২৭ জুন 'নোবেল ফাউণ্ডেশন' গঠিত হয় এবং এই ফাউণ্ডেশনের তত্ত্বাবধানেই ১৯০১ সাল থেকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া শুরু হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৬৯ সাল থেকে অর্থনীতিতে অবদানের জন্যও নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তন হয়।

পুরস্কার প্রবর্তনের ত্রয়োদশ বর্ষে (১৯১৩ সালে) রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গীতাঞ্জলি' রচনার (ইংরেজী অনুবাদ) জন্য সাহিত্য বিভাগের পুরস্কারটি পান। তখন ঐ

পুরস্কারের অর্থমূল্য ছিল আট হাজার পাউণ্ড। তখনকার ভারতীয় টাকায় প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা—সঠিক মূল্যে এক লক্ষ ষোল হাজার দুশো উনসত্তর টাকা। বর্তমানে এই পুরস্কারের অর্থমূল্য ভারতীয় টাকায় চার কোটির ওপর। রবীন্দ্রনাথের আগে ইউরোপের বাইরে আর কেউ এই পুরস্কারে ভূষিত হননি।

প্রাক্-'গীতাঞ্জলি' পর্ব ও 'গীতাঞ্জলি'

রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক প্রকাশিত হয় ১৯০৯ সালে। এই নাটকের অনেকগুলি গান ১৯০৮ সালে রচিত। এই নাটকে সন্নিবেশিত তেইশটি গানের মধ্যে যে এগারটিকে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় 'গীতাঞ্জলি'র অগ্রদূত বলতে চেয়েছেন, তাদের প্রথম ছত্রগুলি এইরকম—(১) আরো আরো প্রভু আরো আরো, (২) আমরা বসব তোমার সনে, (৩) আমাকে যে বাঁধবে ধরে, (৪) কে বলেছে তোমায় বঁধু, (৫) বলো ভাই ধন্য হরি (বাঁচান বাঁচি মারেন মরি), (৬) নয়ন মেলে দেখি আমায় বাঁধন বেঁধেছে, (৭) আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়, (৮) রইল বলে রাখলে কারে, (৯) ওরে আগুন আমার ভাই, (১০) ওরে শিকল তোমার কোলে করে এবং (১১) সকল ভয়ের ভয় যে তারে।

'গীতাঞ্জলির সূত্রপাত' অধ্যায়ে প্রভাতবাবু লিখেছেন ঃ "এতকাল যেসব কথা উপদেশমালায় ব্যক্ত হইয়াছিল, তাহা এখন ধীরে ধীরে ছন্দে ও সুরে আত্মপ্রকাশ করিতে শুরু করিল। এই আষাঢ় (১৩১৬) মাসে (১৯০৯ সালের জুন-জুলাই) 'গীতাঞ্জলি'র গানের প্রথম ধারা নামিল—'জগৎজুড়ে উদার সুরে', 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে', 'কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো', 'আজি শ্রাবণঘনগহন মোহে', 'আষাঢ়সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল' এবং 'আজি ঝড়ের রাতে'।" (রবীন্দ্রজীবনী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৫) প্রসঙ্গত এই ছয়টি গান ১৯০৮ সালে 'শারদোৎসব'-এ এবং ১৯০৯ সালে 'গান'-এ মুদ্রিত হয়।

'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালের আগস্ট মাসে (১৩১৭ বঙ্গাব্দের ৩১ শ্রাবণ)। তার প্রথম কুড়িটি বাদ দিলে 'গীতাঞ্জলি'র জন্যই লেখা ১৩৭টি গানের রচনা-পর্ব প্রায় একবছরের (১০ ভাদ্র ১৩১৬ থেকে ২৯ শ্রাবণ ১৩১৭) এবং এর মধ্যে রচনা-দিনের সংখ্যা ৯২। শেষ গানটি রচনার দুদিন পরে ৩১ শ্রাবণ ১৩১৭ 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হয়।

'গীতাঞ্জলি' রচনার এই বর্ষব্যাপী সময় কবির জীবন, সংসার ও বিদ্যালয় নিয়ে অত্যন্ত কর্মকোলাহল এবং সংগ্রামেরও বছর। এই পর্বের মধ্যেই কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের বিবাহ (১৪ মাঘ ১৩১৬) হয় গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিধবা ভাগনী প্রতিমাদেবীর সঙ্গে। এই পর্বের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিন ১৩১৭ সালের ২৫ বৈশাখ—কবির পঞ্চাশ বছরে পদার্পণ।

এই সময়ে কবির নানা ব্যাপারে ব্যস্ততার অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে জীবনীকার প্রভাতবাবু তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'র দ্বিতীয় খণ্ডে 'সংসার ও বিদ্যালয়' অধ্যায়ে ('গীতাঞ্জলি' রচনার সমকাল) বলেছেন ঃ "'গীতাঞ্জলি' ... একটি তুরীয়তার মধ্যে বাস করিয়া রচিত হয় নাই, তাহা ... দৈনিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, তুচ্ছ কথা ও কাজের ফাঁকে ফাঁকে, অফুরন্ত চলাফেরার মাঝে মাঝে লেখা...। কবি আধ্যাত্মিক অবিচ্ছিন্নতার মধ্যে গানগুলিকে পান নাই, ইহাই আমাদের বক্তব্য।" (পৃঃ ২৯৭)

'গীতাঞ্জলি' গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে কবি লিখেছেন ঃ "এই গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি গান পূর্বে অন্য দু-একটি পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু স্বল্প সময়ের ব্যবধানে যেসমস্ত গান পরে পরে রচিত হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটি ভাবের ঐক্য থাকা সম্ভবপর মনে করিয়া তাহাদের সকলগুলিই এই পুস্তকে একত্র বাহির করা হইল।"

অসূয়ার দর্পণে 'গীতাঞ্জলি'র কবিতা

প্রকাশের পর 'গীতাঞ্জলি' কোন অভাবনীয় সংবর্ধনা লাভ করেনি। 'প্রবাসী' পত্রিকার শ্রাবণ ও ভাদ্র (১৩১৭) সংখ্যায় প্রকাশিত পাঁচটি কবিতার (পরে 'গীতাঞ্জলি'র অন্তর্ভুক্ত) অত্যন্ত বিদ্রূপ ও কদর্য সমালোচনা করেন 'সাহিত্য'-সম্পাদক ও রবীন্দ্রদ্বেষী সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি। জগজ্জয়ী 'গীতাঞ্জলি'র সেই বিদ্রূপ আলোচনার কিঞ্চিৎ নিদর্শন—"শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'অপমান' নামক কবিতায় আপনার প্রতিভারই অপমান করিয়াছেন। 'মাতৃ অভিষেক' নামক কবিতার ছন্দে কবির 'মানসী' ও 'সোনার তরী'র মন্ত্রধ্বনি মনে পড়ে। কিন্তু 'মাতৃ অভিষেক' কবিতা নহে, ছন্দে গ্রথিত বক্তৃতা। 'পোহায় রজনী জাগিছে জননী বিপুল নীড়ে'—সুকল্পনা নহে। 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'র নীড়ে অর্থাৎ পাখির বাসায় জননী জাগিতেছেন—এই খণ্ডকল্পনা রবীন্দ্রনাথের যোগ্য নহে।" প্রসঙ্গত, 'অপমান' শিরোনামে 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' 'গীতাঞ্জলি'র ১০৮ সংখ্যক এবং 'মাতৃ অভিষেক' শিরোনামে 'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে' ১০৬ সংখ্যক কবিতা। কবিতা-দুটি 'প্রবাসী'র শ্রাবণ (১৩১৭) সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

ভাদ্র (১৩১৭) সংখ্যার 'প্রবাসী'তে 'প্রণতি' ['যেথায় থাকে সবার অধম'—'গীতাঞ্জলি'র ১০৭ সংখ্যক কবিতা], 'সাধনা' ['ভজন পূজন সাধন আরাধনা'—১১৯ সংখ্যক কবিতা] এবং 'রাজবেশ' ['রাজার মতো বেশে তুমি'—১২৭ সংখ্যক কবিতা] কবিতা তিনটি প্রকাশিত হলে সে-প্রসঙ্গে 'সাহিত্য' পত্রিকার আশ্বিন ১৩১৩ সংখ্যায় (পৃঃ ৪০১) প্রকাশিত সমালোচনার কিঞ্চিৎ নিদর্শন—"প্রথমেই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি কবিতা—ত্র্যহস্পর্শ। স্বাক্ষর দেখিয়া বুঝিলাম রবীন্দ্রনাথের রচনা। নতুবা বিশ্বাস করিতাম না। ইহাতে কবিবরের প্রতিভার পরিচয় নাই। ধর্মোপদেশ আছে, কবিত্ব নাই। শিক্ষানবীশ ও রবীন্দ্রনাথের অনুকারীদের রচনাতেও এত অক্ষমতা দেখা যায় না। রবীন্দ্রনাথের ন্যায় প্রতিষ্ঠাপন্ন কবি এই অপচারগুলি সাধারণের দ্বারে নিক্ষেপ করিতেছেন কেন—তাহা কে বলিবে? জগতে কিছুই অবিনশ্বর নহে, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাও অবশেষে ব্রহ্মসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া 'নির্বাণ' লাভ করিল। 'রাখো রে ধ্যান, থাক রে ফুলের ডালি, ছিঁড়ুক বস্ত্র লাগুক ধুলাবালি, কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে।' ('সাধনা')—রবীন্দ্রনাথ ইহা মুদ্রিত করিতে লজ্জিত হন নাই, কিমাশ্চর্যমতঃপরম! কর্মযোগে ঘর্ম ঝরিয়া পড়িবে কিনা বলিতে পারি না, কিন্তু কবিতাত্রয়ের শ্রীঅঙ্গ কবিবরের ললাটের ঘর্মে সিক্ত হইয়াছে, সেবিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। এতদিন ঘাম হইতে 'ঘামাচি'র সৃষ্টি হইতেছিল; কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর 'কর্মযোগের ঘর্ম' কবিতায় পরিণত হইতেছে। রবীন্দ্রবাবু যদি গদ্যে 'আধ্যাত্মিকতা'র প্রচার করেন, তাহা হইলে তাঁহার কবিকীর্তিকে এত ক্ষতবিক্ষত হইতে হয় না।"

অসূয়াপ্রসূত এইসব আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের অবিনাশী কবিকীর্তি কতটা ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল তা কারোরই অজ্ঞাত নয়, তবে স্বভাবতই কবির কোমল চিত্ত এতে ব্যথিত হতো। এর অব্যবহিত পরেই কবি 'প্রবাসী' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে দীর্ঘ পত্রে তাঁর অভিমানাহত হৃদয়বেদনার কথা জানান। সেখানে তিনি লেখেন: "আমার কবিতা তো রয়েইছে, যদি ভাল হয় তো ভালই, যদি ভাল না হয় তো ও আবর্জনা দূর করবার জন্যে ঢোলাই খরচা লাগবে না—আপনি নিঃশব্দে সরে যাবে।"

মহাকাল তখন অলক্ষ্যে বসে হাসছেন, আর এই 'আবর্জনা'র জন্য মাত্র তিনবছর পরে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি নির্দিষ্ট করে রাখছেন।

'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদের ইতিহাস

রবীন্দ্রনাথ ১৯১২ সালে একান্ন বছর বয়সে তৃতীয়বার লণ্ডনে যান। এর আগে আঠার বছর বয়সে বিদ্যাশিক্ষার জন্য এবং উনত্রিশ বছর বয়সে তিনি ভ্রমণ মানসে সেখানে গিয়েছিলেন। এই তৃতীয়বারের যাত্রাপ্রসঙ্গে কবি এক পত্রে লিখেছেন: "অল্প বয়সে যখন বিদেশে গিয়েছিলাম—তখন তাহার মধ্যে একটা আর্থিক উদ্দেশ্য ছিল। সিভিল সার্ভিসে প্রবেশের বা ব্যারিস্টার হওয়ার চেষ্টা একটা ভাল কৈফিয়ত—কিন্তু বাহান্ন বছর বয়সে (প্রকৃতপক্ষে তখন কবির বয়স ৫১ বছর) সে-কৈফিয়ত খাটে না—এখন কোন পারমার্থিক উদ্দেশ্যের দোহাই দিতে হইবে।" এর পরে সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি বলেন: "কেবলমাত্র বাহির হইয়া পড়াই আমার উদ্দেশ্য। ভাগ্যক্রমে পৃথিবীতে আসিয়াছি, পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় যথাসম্ভব সম্পূর্ণ করিয়া যাইব... দুইটা চক্ষু পাইয়াছি, সেই দুটা চক্ষু বিরাটকে যত দিক দিয়া বিচিত্র করিয়া দেখিবে—ততই সার্থক হইবে।"

১৯১২ সালের ১৬ জুন কবি লণ্ডনে পৌছান। এর অব্যবহিত পরেই তিনি রোটেনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর বাড়িতে এসে তাঁর হাতে একটি ছোট নোটবই তুলে দেন। সেই নোটবইটিই কবিকৃত 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী পাণ্ডুলিপি—রোটেনস্টাইনকে উৎসর্গীকৃত।

এপ্রসঙ্গে রোটেনস্টাইন তাঁর 'Man and Memories' গ্রন্থে লিখেছেন: "As he entered the room, he handed me a note book. in which, since I wished to know more of his poetry. he had made some translation during his passage from India."

রোটেনস্টাইনের মাধ্যমে কয়েকদিনের মধ্যে কবি ইংল্যাণ্ডের এইচ. জি. ওয়েলস প্রমুখ কয়েকজন সেরা মনীষীর সঙ্গে পরিচিত হলেন। রোটেনস্টাইন শুধু কবিকে মনীষী বন্ধুমহলেই পরিচিত করলেন না, কবির কাব্যকে রসিকমহলে পরিচিত করার আয়োজনেও প্রবৃত্ত হলেন। এর পর রোটেনস্টাইন তাঁর পরিচিত সমসাময়িক সাহিত্যিকদের (ব্রাডলে, স্টপফোর্ড ব্রুক এবং ইয়েটস) কাছে 'গীতাঞ্জলি'র টাইপ করা কপি পাঠালেন তাঁদের প্রতিক্রিয়ার জন্য। এঁরা সকলেই অভিভূত হয়ে নিজেদের প্রতিক্রিয়ার কথা জানান।

এরপর কবিকে সাহিত্যিক বন্ধুমহলে পরিচিত করার জন্য ৭ জুলাই ১৯১২ রোটেনস্টাইন নিজের বাড়িতে একটি বৈঠক ডাকলেন। সেই সভায় অন্যান্য বিদগ্ধজনের মধ্যে ইয়েটসও ছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি

কবিতা পড়ে শোনান। ঐ সভায় উপস্থিতদের অন্যতম ছিলেন সি. এফ. এন্ড্রুজ। এরপর ইয়েটস প্রমুখের চেষ্টায় ১২ জুলাই ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে ট্রকেভারো হোটেলে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনার ব্যবস্থা হয়। এই সভায় ইংল্যাণ্ডের প্রায় সব বড় সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। কবি ইয়েটস ছিলেন এই সভার সভাপতি।

এরপর ইংল্যাণ্ডের তাবড় সাহিত্যিকদের প্রশংসাধন্য 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদ (Gitanjali : Song Offerings) ইয়েটসের সুদীর্ঘ ভূমিকা-সম্বলিত হয়ে ১৯১২ সালের ১ নভেম্বর প্রকাশিত হলো ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্যোগে। এই ভূমিকা সম্বন্ধে ইয়েটস রোটেনস্টাইনকে লেখেন ঃ "I don't want anything crossed by Tagore's modesty." এই গ্রন্থ প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আমেরিকায়।

কেউ কেউ মনে করেন, 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের আগে এন্ড্রুজ, ইয়েটস প্রমুখ তা সংশোধন করে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাববিনয়ে এবং ইংরেজী জ্ঞান বিষয়ে নিরহঙ্কারতার কারণে কবি ইয়েটসকে অনুবাদগুলি মার্জিত করে দিতে বলেছিলেন অবশ্যই। তার উত্তরে ইয়েটস বলেছিলেন ঃ "এই অনুবাদের কোন কথা বদল করে মার্জিত করে তুলতে পারা যায়—যদি কেউ এমন কথা বলে, তবে সে সাহিত্য কি জানে না।"

১৯১৩ সালের ৬ মে কবি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাদেবীকে লিখছেন ঃ "'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী তরজমা যে কেমন করে লিখলুম এবং কেমন করে লোকের এত ভাল লেগে গেল, সে-কথা আমি আজ পর্যন্ত ভেবেই পেলুম না। আমি যে ইংরেজী লিখতে পারিনে—একথাটা এমনি সাদা যে, এসম্বন্ধে লজ্জা করবার মতো অভিমানটুকুও আমার কোনদিন ছিল না।... রোটেনস্টাইন যখন কথাপ্রসঙ্গে আমার কবিতার নমুনা পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমি কুণ্ঠিত মনে তাঁর হাতে আমার খাতাটি সমর্পণ করলুম। তিনি যে অভিমত প্রকাশ করলেন, সেটা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না, তখন তিনি ইয়েটসের কাছে আমার খাতা পাঠিয়ে দিলেন।"

বাঙলা 'গীতাঞ্জলি'র গান/কবিতার সংখ্যা ১৫৭টি। এর মধ্যে ৫০, ৫২ এবং ৫৫ সংখ্যক গানগুলির ('নিভৃত প্রাণের দেবতা', 'তুমি আমার আপন' এবং 'আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে') পাণ্ডুলিপির এবং মুদ্রিত পুস্তকের পাঠে কিছু পার্থক্য আছে। অনুসন্ধিৎসুদের এবিষয়ে রবীন্দ্র-রচনাবলীর (বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ) ষষ্ঠ খণ্ডের 'গ্রন্থপরিচয়' অংশ দেখে নিতে অনুরোধ করি। ১৩১৫ সালে রচিত 'গীতাঞ্জলি'র ১৪ সংখ্যক গানটি ('জননী, তোমার করুণ চরণখানি') কবি রচনা করেন পূর্বরাত্রে তাঁর স্বর্গতা জননীকে স্বপ্নে দেখে। বাঙলা 'গীতাঞ্জলি' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩১৭ বঙ্গাব্দে। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত সংস্করণে প্রথমে ১৪২ সংখ্যক গানটি ('যাবার দিনে এই কথাটি') অন্তর্ভুক্ত হয়। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের অন্তর্গত 'বাঁচান বাঁচি মারেন মরি' গানটি আগে 'গীতাঞ্জলি'তে মুদ্রিত হয়েছিল, ১৩৩২ সংস্করণ থেকে এটি বর্জিত।

ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'তে—যে-গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন—১০৩টি কবিতার অনুবাদ আছে। এর মধ্যে 'গীতাঞ্জলি' থেকে ৫৩টি, 'গীতিমাল্য' থেকে ১৬টি, 'নৈবেদ্য' থেকে ১৬টি, 'খেয়া' থেকে ১১টি, 'শিশু' থেকে ৩টি এবং 'চৈতালি', 'স্মরণ', 'কল্পনা', 'উৎসর্গ' ও 'অচলায়তন' থেকে একটি করে সঞ্চয়িত। 'নৈবেদ্য'র 'জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যেখানে' এবং 'মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর'—এই দুই কবিতাকে ভেঙে ইংরেজী অনুবাদে একটি করে নেওয়া হয়েছে। তাই উপরি উক্ত যোগফল ১০৪ এর জায়গায় ১০৩ হয়েছে।

ইংরেজীতে 'গীতাঞ্জলি'—'Song offerings' প্রকাশ ও প্রতিক্রিয়া

রবীন্দ্রনাথের মতে, তাঁর আধ্যাত্মিক কবিতা ও গানের শ্রেষ্ঠগুলি ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'তে সন্নিবেশিত হয়েছিল।

ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রকাশিত 'গীতাঞ্জলি' সাড়ে সাতশ কপি ছাপা হয়েছিল। তার মধ্যে সুধীজনকে বিতরণ করা হয় পাঁচশ। বাকি আড়াইশ কপি দু-মাসের মধ্যে বিক্রি হয়। ইণ্ডিয়া সোসাইটির আখ্যাপত্রে শিল্পী রোটেনস্টাইনের আঁকা রবীন্দ্রনাথের একটি স্কেচ ছাপা হয়। আগেই বলা হয়েছে, বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল রোটেনস্টাইনকে। নভেম্বরের শেষদিকে ম্যাকমিলান কোম্পানী 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে ১৯১৩ সালের মার্চ মাসে তাঁদের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। নমুনা হিসাবে 'Gitangali : Song Offerings'-এর তৃতীয় অনুবাদটি (বাঙলা 'গীতাঞ্জলি'র ২২ সংখ্যক গান 'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী'-র অনুবাদ) নিম্নরূপ—

"I know not how thou singest, my master! I ever listen in silent amazement.

"The light of thy music illuminates the world. The life breath of thy music runs from sky to sky. The holy stream of thy music breaks through all stony obstacles and rushes on.

"My heart longs to join in thy song, but

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

vainly struggles for a voice. I would speak, but speech breaks not into song, and I cry out baffled. Ah, thou hast made my heart captive is the endless meshes of thy music, my master!"

ম্যাকমিলানের মালিক 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের আগে বইটির বিষয়ে তাঁদের বিশেষজ্ঞ পাঠকদের মতামত চেয়ে পাঠান এবং সেই মতামতের ভিত্তিতে বই প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে রোটেনস্টাইনকে ২৬ নভেম্বর ১৯১২ তারিখে লেখেনঃ "We shall be glad to publish the volume is question at our own risk giving the author half of any profits that may be realised." প্রকাশনার একবছরের মধ্যে বইটি এগারবার পুনর্মুদ্রিত হয় এবং এই সময়ে চব্বিশ হাজার ছাপিয়ে যায় 'গীতাঞ্জলি'র বিক্রয়।

একটি আপাত অবিশ্বাস্য গৌরবোজ্জ্বল তথ্য, নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে ১৯১৪ সালের মে-জুন মাসে ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র আট লক্ষ কপি বিক্রি হয়। (দ্রঃ 'প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩২১, পৃঃ ৩৯৫)

ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রকাশিত ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি' ১ নভেম্বর ১৯১২ সালে প্রকাশিত হতেই ইংল্যাণ্ডের প্রায় সব পত্রিকা ও সংবাদপত্র একে অভিনন্দন জানায়। প্রকাশের ছয়দিন পরেই ৭ নভেম্বর ১৯১২ ইংরেজী সাহিত্যশাস্ত্রের বুনিয়াদি ধারার বাহক 'Times' পত্রিকায় সাপ্তাহিক সাহিত্য ক্রোড়পত্রে উল্লেখযোগ্য সমালোচনা প্রকাশিত হয়। 'Times' পত্রিকায় দেশ-বিদেশের প্রধান ঘটনাগুলি বছরের শেষদিনের কাগজে প্রকাশিত হতো। এর সাহিত্য বিভাগে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্বন্ধে লেখা হয়েছিল—"In poetry, many will have found the richest of the year's sheaves to be the introductions, through his own translations of the poems of the Indian mystic, Mr. Rabindranath Tagore."

ম্যাকমিলান কোম্পানীর 'Gitanjali'-র সুলভ সংস্করণের সমালোচনা বেরোয় 'Glove'-এ (১ এপ্রিল ১৯১৩), 'New Statesman'-এ (১৯ এপ্রিল ১৯১৩) এবং 'Hibbert Tourman', 'Bookman' প্রভৃতি নামী মাসিক পত্রিকায়। সব আলোচনাই ছিল প্রশংসাপূর্ণ এবং দীর্ঘ। 'Daily News and Leader' পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃতি বাঙলা অনুবাদে—"কবিতাগুলি কবির নিজের করা ইংরেজী অনুবাদ, ভাবতে পারা যায় না। আমাদের মুখের ভাষা ও ছন্দ নিয়ে সৃষ্ট হয়েছে এক নিখুঁত ও শ্রেষ্ঠ কাজ। কিন্তু কবিতার রূপের চেয়ে এর নিহিত উপাদানের জন্য এটি আমাদের সমকালীন এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থরূপে স্বীকৃত হলো। এই বই নিশ্চিতভাবে আত্মা সম্পর্কিত। কিন্তু সেই আত্মা সন্ন্যাসীর আত্মা নয়, যে-সন্ন্যাসী জীবনের সব কিছু পরিহার করেছেন। এ হলো দার্শনিকের এবং প্রেমিকের আত্মা, যিনি জীবনের মধ্য দিয়ে শাশ্বতের প্রকাশ উপলব্ধি করতে পেরেছেন।" মিস্টার কিপলিং লিখেছেনঃ "পুব পুবের মতো, পশ্চিম পশ্চিমেই। দুয়ের মিলন কখনো সম্ভব নয়। বর্তমান কবিতার মধ্য দিয়ে কিন্তু দুয়ের মিলন ঘটেছে। কবিতাগুলি মানবতার তন্ত্রী স্পর্শ করেছে। এই মানবতা টেমস ও গঙ্গার ধারে একই রকম।... কবি আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে আধুনিক চিন্তা ও প্রয়োজনের যোগাযোগ ঘটিয়েছেন।"

'Times Literary Supplement' (T.L.S.)-এর সমালোচনার একটি বাক্য অবিস্মরণীয়—"এই কবিতাগুলি পড়ার সময় মনে হয়, আমরা যেন ডেভিডের প্রার্থনাসঙ্গীত ('Psalms of David') পড়ছি—যিনি নিজের বিশ্বাস থেকে জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে অনুভব করে ডাকছেন।" ('Psalms of David' বাইবেলের 'Old Testament'-এর অন্তর্গত ১৫০টি প্রার্থনাসঙ্গীতের সঙ্কলন।)

লস্ট প্রপার্টি অফিসে "গীতাঞ্জলি"

এই আলোচনার মাঝে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থ থেকে তাঁর অমনোযোগে 'Gitanjali'-র ভবিষ্যৎ কি হতে পারত, তার একটি মজাদার বিবরণ স্মরণ করা যাক। ১৯১২ সালের লণ্ডনযাত্রায় রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবীও কবির যাত্রাসঙ্গী ছিলেন। 'পিতৃস্মৃতি' গ্রন্থে রথীন্দ্রনাথ লিখেছেনঃ "আমরা লণ্ডনে এসে পৌঁছালাম এক সন্ধ্যায়। চেয়ারিং ক্রশ স্টেশনে এসে জানা গেল, টমাস কুক আমাদের জন্য ব্লুমসর্বোর অঞ্চলে একটি হোটেলের কয়েকটি কামরা ভাড়া করে রেখেছেন। স্টেশন থেকে টিউব রেল যোগে আমরা ব্লুমসর্বোর অভিমুখে রওনা দিলাম। মাটির তলায় সুড়ঙ্গ রেলপথে এই আমার প্রথম অভিযান। নতুন অভিজ্ঞতার জন্যই হোক কিংবা অত্যধিক দায়িত্বভারের জন্যই হোক—আমি নিজের হাতে অতি সন্তর্পণে বাবার যে অ্যাটাচি কেসটি বহন করে আনছিলাম—টিউব থেকে নামবার মুখে সেইটিই নামাতে ভুলে গেলাম। এই অ্যাটাচির মধ্যেই বাবার ইংরেজী অনুবাদের পাণ্ডুলিপি, আরো অনেক দরকারি কাগজপত্র ছিল। পরের দিন বাবা যখন রোটেনস্টাইনের বাড়ি

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

যাবেন, অ্যাটাচির খোঁজ পড়ল আর তখনি বোঝা গেল, সেটি টিউবে ফেলে আসা হয়েছে। আমার অবস্থা অনুমেয়। শুকনো মুখে আমি চলে গেলাম টিউব রেলের লস্ট প্রপার্টি অফিসে। সেখানে যেতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হারানো ধন ফেরত পাবার পর আমার প্রাণে যে কী গভীর স্বস্তি হয়েছিল, সে আমি কখনো ভুলব না। মাঝে মাঝে একটা দুঃস্বপ্নের মতো ভাবি, যদি ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি' আমার অমনোযোগ ও গাফিলতির দরুন সত্যিই হারিয়ে যেত, তাহলে...।"

কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি ও তার প্রতিক্রিয়া

'Gitanjali' ('song offerings') প্রকাশিত হওয়ার এক বছরের মধ্যেই কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ ঘোষিত হয়। বিলেতের রয়েল অ্যাকাডেমির সদস্য টি. স্টার্জ মুর সুইডিস অ্যাকাডেমির কাছে রবীন্দ্রনাথের নাম সুপারিশ করেন নোবেল পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলে। উল্লেখ্য, এই বছরের পুরস্কারের জন্য ইউরোপের বিখ্যাত আঠাশজন সাহিত্যিকের নাম বিবেচনাধীন ছিল। রবীন্দ্রনাথের রচনা নোবেল কমিটির কাছে সমর্থনযোগ্য করতে রবীন্দ্রনাথের সমর্থক সদস্যদের কম পরিশ্রম করতে হয়নি! রবীন্দ্রনাথের থেকে বয়সে পাঁচ বছরের ছোট সুইডেনের সাহিত্যিক নব ও তদানীন্তন নোবেল কমিটির সদস্য হ্যালস্ট্রমের (Per August Leonard Hallstrom) উৎসাহ ছিল সর্বাধিক। হ্যালস্ট্রম এব্যাপারে যে চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করেন, তাতে একটি বাক্য লক্ষণীয়—"Something more remarkable than anything that European poetry has to offer."

সদস্যদের কেউ কেউ বললেন, আরো একবছর অপেক্ষা করা যাক। কেউ বললেন, মূল (বাঙলা) রচনাগুলি সম্বন্ধে আরো কিছু ধারণা করে নেওয়া যাক ততদিনে। রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে দুবছরের বড় এবং তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির তিনবছর পরে নোবেল-জয়ী সুইডেনের বিখ্যাত সাহিত্যিক ভারনার ফন হিডেনস্টাম 'গীতাঞ্জলি'র সুইডিস রূপান্তর পাঠ করেছিলেন। তিনি বললেন: "আর একবছর নয়, 'গীতাঞ্জলি'ই নোবেল পুরস্কারের জন্য যথেষ্ট।"

যথারীতি অনেক বাদানুবাদ, অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ১৯১৩ সালের ১৩ নভেম্বর ঘোষণা করা হলো—রবীন্দ্রনাথই এবছরের সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার বিজয়ী।

রয়টার তারযোগে পৃথিবীময় রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্ববিজয়ের কথা ঘোষিত হলে ভাল, মন্দ এবং ভাল-মন্দ মেশানো নানা মতামতের বিচিত্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। সমসাময়িক একখানি কাগজও ছিল না, যাতে বাঙালী কবির এই কৃতিত্বের সংবাদ এবং তার সঙ্গে কিছু না কিছু মন্তব্য প্রকাশিত না হয়েছিল।

ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশের পর থেকে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি পর্যন্ত একবছর 'গীতাঞ্জলি'র সম্বন্ধে যেসব আলোচনা হয়েছিল, তা ছিল সাহিত্যের বিচার। নোবেল পুরস্কার ঘোষণার পর শুরু হলো সাহিত্যিকের বিচার। বহু ব্যর্থকাম দেশ কবিকে, তাঁর কবিতাকে এবং পুরস্কারদাতা সুইডিস অ্যাকাডেমিকে আক্রমণ শুরু করল।

রবীন্দ্রনাথ ককেশীয় শ্বেতাঙ্গ বা প্রতীচ্যবাসী না হয়েও কি করে এই পুরস্কার পেতে পারেন—এমন কথাও শোনা গেল একদলের মুখে মুখে। ইংরেজরা টমাস হার্ডির, ফরাসীরা আনাতোল ফ্রাঁসের, জার্মানরা রসেজারের পক্ষে ওকালতি করে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাহিত্যকর্মকে তুচ্ছ করার চেষ্টা করতে লাগল। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অশোভন কর্দমবৃষ্টি হলো। "সুইডিস অ্যাকাডেমির প্রাচীনপন্থী সদস্যদের পক্ষে হার্ডির 'Pessimism' অথবা আনাতোল ফ্রাঁসের 'Scepticism' বরদাস্ত করা কঠিন।"—এমন মন্তব্য করা হলো 'Daily News and Leader' নামে বিখ্যাত ইংরেজী দৈনিকে—যে-পত্রিকা বইটি প্রকাশের পর এবং নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগে দারুণ প্রশংসা করেছিল। 'New Age'-এর সম্পাদক ক্রুদ্ধ মন্তব্য করলেন: "এমন কবিতা যেকেউ লিখতে পারে।"

এই ঘটনায় উৎসাহিত হয়ে অনেক ভারতীয় লেখক তাঁদের রচনার ইংরেজী অনুবাদ করিয়ে সুইডিস অ্যাকাডেমিতে পাঠাতে লাগলেন। তাঁদের ধারণা, রবীন্দ্রনাথের ঐ সরল 'গীতাঞ্জলি' যদি নোবেল পুরস্কারের উপযুক্ত হয়, তাঁদের রচনাই বা হবে না কেন?

কলকাতায় এই সংবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩ নভেম্বর 'Empire' নামে অধুনালুপ্ত সান্ধ্য দৈনিকে। কবি তখন শান্তিনিকেতনে এবং এই আনন্দ-সংবাদ তখনো তাঁর অগোচরে। এর দুদিন পরে ১৫ নভেম্বর কবি রথীন্দ্রনাথ ও দীনেন্দ্রনাথ মোটরযোগে চৌপাহাড়ী শালবনে বেড়াতে যাওয়ার পথে টেলিগ্রামে জানলেন এই সুখবর। কলকাতা থেকে টেলিগ্রামে খবর পাঠিয়েছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

অভিমানাহত কবির বেদনা

কলকাতার প্রায় পাঁচশ রবীন্দ্রভক্ত নরনারী ২৩ নভেম্বর একটি স্পেশাল ট্রেনে শান্তিনিকেতন এলেন কবিকে সংবর্ধনা জানাতে। শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে এই সংবর্ধনাসভার আয়োজন হয়। এই দলের মধ্যে ছিলেন—জগদীশচন্দ্র বসু, জাস্টিস আশুতোষ চৌধুরী, ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, রেভারেণ্ড মিলবার্ণ, মৌলবী আবদুল কাসেম, অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখ।

সেদিন শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে বাংলাদেশের জ্ঞানিগুণীরা, নানা প্রতিষ্ঠান ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা কবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। কবি এর পরে প্রতিনিধিদের ভাষণের উত্তরে যে প্রতিভাষণ দেন—তা কিঞ্চিৎ কঠোর হয়েছিল। অনেকের মতে তা সময়োচিত এবং বিশেষ করে কবির চরিত্রোচিত হয়নি। তবে কবি দীর্ঘকাল একশ্রেণীর লোকের কাছ থেকে যে অসূয়াসূচক অবজ্ঞা ও অপমান ভোগ করেছেন, তার স্মৃতি তাঁকে এই ভাষণে প্রবুদ্ধ করেছিল, সন্দেহ নেই।

অভিমানাহত কবির এই ভাষণে অতিথিরা অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং কলকাতার সংবাদপত্রে দীর্ঘকাল এনিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু এবিষয়ে সবচেয়ে কৌতুককর ঘটনা হলো—যে-বিপিনচন্দ্র পাল দেড়বছর আগে কবির সমস্ত রচনা ও সাধনাকে 'ফাঁকি' বলে ঘোষণা করেছিলেন, তিনিই এখন 'Hindu Review' পত্রিকায় কবির উক্তির সমর্থন করে বললেন ঃ "No man of Rabindranath's position and sensibilities could have been less bitter under similar circumstances."

প্রতি বছর আলফ্রেড নোবেলের মৃত্যুদিন ১০ ডিসেম্বর নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার (মানপত্র, অর্থমূল্য ও পদকাদি) দানের জন্য ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪ কলকাতার রাজভবনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল সভায় কবিকে উদ্দেশ করে বলেন ঃ "আপনি জানেন, গত ১০ ডিসেম্বর ১৯১৩ স্টকহোমে মহামান্য সম্রাট বাহাদুরের প্রতিনিধি আপনার হয়ে সুইডেনের মহামান্য রাজাবাহাদুরের কাছ থেকে নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেন এবং আপনার কথামত আপনার বিনীত নমস্কার নিবেদন করেন। সেদিন সান্ধ্যভোজে ব্রিটিশ প্রতিনিধির প্রতি আপনি যে-বাণী প্রেরণ করেছিলেন—তা পঠিত হলে তাঁরা বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন।" রবীন্দ্রনাথ সুইডিস অ্যাকাডেমির কাছে যে-বাণী পাঠিয়েছিলেন তা এইরকম—"Grateful appreciations of the breadth of understanding which has brought the distant near and made of a stranger a brother."

'গীতাঞ্জলি'র সর্বাধুনিক অনুবাদ

'গীতাঞ্জলি' ভারতের বিভিন্ন ভাষায় তো বটেই, পৃথিবীর নানান সমৃদ্ধ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। সম্প্রতি ইংরেজ কবি জো উইন্টার অনূদিত 'The Gitanjali of Rabindranath Tagore' রাইটার্স ওয়ার্কশপ থেকে পি. লাল প্রকাশ করেছেন 'সীমিত সংখ্যক সংস্করণ' রূপে। ২০০০ সালের জানুয়ারি মাসে এই বইটি লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। জো উইন্টার বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং ফেলো।

অনুবাদটির বিশেষত্ব এই যে, এটি বাঙলা 'গীতাঞ্জলি'র ১৫৭টি গান/কবিতার সম্পূর্ণ ইংরেজী অনুবাদ—যা আগে কখনো করা হয়নি। মূল বাঙলা গ্রন্থের ধারাবাহিকতা রেখেই অনুবাদগুলি বিন্যস্ত হয়েছে এবং গদ্যানুবাদ নয়—মাত্রা, মিল ও ছন্দ বজায় রেখে এই অনুবাদকর্ম সম্পাদিত হয়েছে।

সব তুচ্ছতা, সব হীনতা, সব কুণ্ঠার কথা ভুলে পরিশেষে মনে পড়ে সেই উইলফ্রেড আওয়েনের পকেটে রাখা রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত কবিতার পঙ্‌ক্তিগুলি, যেখানে উচ্চারিত হয়েছে জাগ্রত বসন্তের সেই আবাহন—

"যা দেখেছি যা পেয়েছি
তুলনা তার নাই।" ❑

তথ্য সহায়তা

(১) গীতাঞ্জলি
(২) Gitanjali—Song Offerings
(৩) রবীন্দ্র-রচনাবলী
(৪) রবীন্দ্রজীবনী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, পুনর্মুদ্রণ, পৌষ ১৩৯৫
(৫) পিতৃস্মৃতি—রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(৬) 'দেশ' পত্রিকার ২০ মার্চ ১৯৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত 'গ্রন্থলোক'-এ নীলিমা সেন-গঙ্গোপাধ্যায় কৃত 'The Gitanjali of Rabindranath Tagore' (জো উইন্টার অনূদিত)-এর আলোচনা।
(৭) 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা (রবীন্দ্রসংখ্যা ১৪০৫)—দিব্যজ্যোতি মজুমদার সম্পাদিত।

জরথুস্ট্রের মরমীয় দর্শন ও বাণী

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়



স্টীয় নবম শতাব্দীর ইরাণীয় লেখক জদ্‌স্প্রম পারসী ভাষায় জরথুস্ট্রের ঐশী অভিজ্ঞতার কথা সংক্ষেপে জানিয়ে গিয়েছিলেন (জদ্‌স্প্রম ঃ ২০, ২১)। জরথুস্ট্র স্বয়ং যখন শিষ্যদের কাছে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ দান করতেন, তখন তার ভিতর মরমীয় দর্শনের সূক্ষ্ম আত্মোপলব্ধির চেয়ে 'অহুর মজদা'র স্বরূপকে বুঝিয়ে বলার দিকেই প্রবণতা থাকত বেশি। তিনি দেশের সাধারণ মানুষের বহু-অহুর বা বহু-ঈশ্বর ভজনার বিপক্ষে বলতে গিয়ে এবং সেইসব মানুষের আপন বিশ্বাসের গণ্ডির মধ্যে নিয়ে আসার জন্য তাদের বোধগম্য ভাষাতেই একেশ্বরের স্বপক্ষে ধর্মোপদেশ দিতেন। কিন্তু সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়েই জরথুস্ট্র বহু-দেবতার পূজারী সমসাময়িক ইরাণীয়দের বোঝাতে চেয়েছিলেন—

"The Great God Ahura Mazda is almighty. The universe, and all that is within, has been created by His divine inclination and will. He has no co-equal."[১]

একটি পৃথক সমশক্তিমান অশুভ আত্মা অহুর মজদাকে সদাসর্বদা বিপরীতকরণে প্রবৃত্ত করে চলেছে—এই প্রক্ষিপ্ত মতবাদগুলি খুব সম্ভব পরবর্তী কালে 'আবেস্তা'য় স্থান পেয়েছে। "A separate evil spirit of equal power with Ahura Mazda, and always opposed to Him, is entirely foreign to Zarathustra's theology though the existence of such an opinion among the ancient Zoroastrians is evident from some of the later writings, such as the vendidad. The dualism—the idea of two original independent spirits, one good and the other evil, utterly distinct from one another and each counteracting the creation of the other—crept in due to a confusion of Zarathustra's philosophy with his theology."[২]

জরথুস্ট্রের ধর্মোপদেশের সঙ্গে তাঁর দর্শনের স্পষ্টতই একটি ব্যবধান ছিল। অহুর মজদাকে জরথুস্ট্র কেমনভাবে কোথায় দেখেছিলেন তার একটি বিবরণ আছে 'য়শন (Yasna) ঃ ১৫'-তে। অনেক পরবর্তী কালে (নবম শতাব্দী) জদ্‌স্প্রম রচিত আরেকটি পারসী গ্রন্থেও জরথুস্ট্রের ঈশ্বরদর্শনের বর্ণনা আছে।

'হৌমা' নামক বসন্তকালীন এক উৎসবের দিনে প্রাতঃকালে জল নিতে জরথুস্ট্র নিজে একবার নদীর তীরে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে তিনি হঠাৎ এক জ্যোতির্ময় অস্তিত্বের সাক্ষাৎলাভ করেন। তিনি ছিলেন 'বহু মনু' অর্থাৎ 'শুভমানস'। তিনি জরথুস্ট্রকে অহুর মজদা ও আর পাঁচটি জোতিষ্মান অস্তিত্বের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই সাত জ্যোতির্ময় অস্তিত্বের কাছ থেকেই জরথুস্ট্র পরম জ্ঞান লাভ করেন।

প্রকৃতপক্ষে সেদিন জরথুস্ট্র কি দেখেছিলেন, তা জানা না গেলেও তাঁর মানসিক পটভূমিতে যে ঈশ্বর-সান্নিধ্যলাভের বাতাবরণ অনেক দিন ধরেই প্রস্তুত হয়েইছিল, সেকথা আমরা জানি। সুতরাং সেই প্রশান্ত উজ্জ্বল প্রভাতের অনুকূল পরিবেশে তাঁর মানসপটে পরমজ্যোতির আবির্ভাব একরকম সম্ভাবিতই ছিল। এই প্রসঙ্গে পি. ডি. মেহতা চমৎকার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঃ

"It is not easy to visualize what could have happened. But see! The time is the early dawn. The cleansing water of the cool stream, the lovely colouring of the sky and the beauty of distant peaks changing swiftly from blue to rose pink and bright gold as the sun climbs above the horizon; all have a quietening and uplifting spiritual influence. There is a curiously peaceful exhilaration for the disciplined mind. Zarathustra's feet hardly seen

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

to touch the earth as he walks on. An extraordinary calm pervades everything and without any expectancy on his part there is an intense awareness that the presence is here, felt, 'seen'. And so the fervent devotee longing of the years finds fulfilment in meeting the forms shaped by the conditioning of the psyche since childhood. Thus it is that Zarathustra 'sees' Ahura Mazda and the Holy Immortals."[৩]

সত্যদর্শনের জন্য নীরব গভীর ধ্যানমগ্নতাই যে শ্রেষ্ঠ পন্থা, জরথুস্ট্র অন্যত্র নিজেই তা জানিয়ে গেছেন—

"তখনি আমি তাঁকে পরম মুক্ত একক সত্তা হিসাবে অনুভব করতে পারলাম, হে মজদা অহুর, যখন শুভমানস আমাকে সম্পূর্ণভাবে ঘিরে ধরল। তিনি ঘোষণা করলেন —'নীরব ধ্যানই দিব্যজ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট পন্থা।"[৪]

নীরব ধ্যানই যদি দিব্যজ্ঞানলাভের শ্রেষ্ঠ পন্থা হয়, তাহলে চোখের সামনে আর পাঁচটা মানুষের মতো ঈশ্বরকে দেখতে পাওয়ায় যে সেই চরিতার্থতা লাভ হবে না—এই সত্য জরথুস্ট্র নিশ্চয় উপলব্ধি করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এই উপলব্ধিতেই তাঁর আসল পরিচয় নিহিত। ঈশ্বরকে মানুষের রূপে দেখা বা স্বর্গ ও নরকের প্রসঙ্গ জরথুস্ট্রোত্তর যুগে 'আবেস্তা'য় গৃহীত। খ্রীস্টপূর্ব ৮০০-২০০ অব্দ থেকে তৃতীয়-নবম খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত 'আবেস্তা'য় স্বর্গ-নরকের কাহিনী সংযোজিত হতে থাকে।

জরথুস্ট্রের মৃত্যুর অনেক পরে রাজা দ্বিতীয় শাবুহরের সমসাময়িক (৩০৭-৩৭৯ খ্রীস্টাব্দ) সন্ত অদ্র বিরফ স্বর্গ-নরকের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে গেছেন; কিন্তু তাঁর বহু শতাব্দী আগেও জরথুস্ট্র এমন ধরনের কোন স্বর্গ-নরকের বিবৃতি দেননি। জরথুস্ট্র একান্তভাবে জীবনের প্রকৃত ধর্ম ও বিশ্বনিয়ম (অশই)—যাকে 'বেদ'-এ 'ঋত' বলা হতো—শুধুমাত্র সেই সত্যই মেনে চলেছিলেন। জরথুস্ট্র জীবনধর্মকে বিশ্বনিয়মেরই অঙ্গীভূত মনে করতেন, তাই 'দেহ' তাঁর কাছে ছিল অপরিসীম মূল্যবান। স্বর্গ এবং নরক আমাদের দেহ-মনেরই বিশেষ অবস্থা। আমাদের পরিচিত প্রবাদবাক্য 'যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তা আছে এই ভাণ্ডে' জরথুস্ট্রের অধ্যাত্মদর্শনেরও মূল কথা। পি. ডি. মেহতা জরথুস্ট্রের এই দেহতত্ত্বকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ঃ

"What we call 'body' is actually the Whole Reality—material body, psyche, spirit—all subsisting as a Unitary Organism which is *Transcendence* embodied. What is called material, finite and mortal, and what is called immaterial, eternal and immortal—all these in their integrated wholeness constitute the living body, the individual man who is veritably the microcosm, the miniature cosmos representing the macrocosm, the One Total Reality. This 'body' is sacred. Hence Zarathustra's emphasis on purity of body."[৫]

জরথুস্ট্রের কর্মবাদ ছিল অনেকটাই হিন্দু ও বৌদ্ধ কর্মফলবাদেরই মতো। এই কর্মবাদকে তিনি বলেছেন—'জীবনের ভিত্তিনিয়ম'।

হিন্দু ও বৌদ্ধ কর্মবাদে বারংবার শরীর পরিগ্রহ করে জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে কর্মফলভোগ ও কর্মচক্র থেকে বেরিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ইসলাম ও খ্রীস্টধর্মে একটিমাত্র জন্মেই ঈশ্বরের দিব্য বিচার (devine justice)-এর কথা বলা হয়েছে। জরথুস্ট্রের কর্মবাদে শেষোক্ত মতবাদেরই সমর্থন পাওয়া যায়।

কর্মের ভিত্তিতে ঈশ্বরের দিব্যবিচারের শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া যায় অ্যারিস্টটলের 'নিকোমাশিয়ান এথিক্স'[৬] গ্রন্থে। সেখানে বলা হয়েছে—"Justice is the practice of perfect virtue to all others to oneself."[৭] অ্যারিস্টটল যাকে বলছেন 'Perfect Virtue' বা 'যথার্থ ধর্ম', তাকেই জরথুস্ট্র বলেছেন 'অশই'। 'অশই' হলো বিশ্বনিয়ম, যাকে নিত্য চর্চার মধ্যে আনতে পারলে জীবনের চরম অন্তিমে বহুর বোধ থেকে এক-এর চেতনায়, সর্বৈব বিচ্ছিন্নতা থেকে অশেষ মিলনের মধ্যে পৌঁছানো যায়। মানবসত্তার চরম পরিণতি শুভেরই মধ্যে। সেই পরম শুভ হলেন ঈশ্বর। তিনি আমাদের মুক্তি প্রদাতা। মুক্তিই মানবজীবনের লক্ষ্য। জরথুস্ট্র বলছেন ঃ

"Holy, then, did I recognizing Thee,
O Wise Lord.
I perceived Thee foremost of the birth of life,
When Thou didst endow acts and
words with retribution;
Bad unto bad, good blessing unto holy,
Through Thy Wisdom, at the final goal of life!"[৮]

জরথুস্ট্রের গাথাগুলির (Gathas) মধ্যে প্রায় সর্বত্রই শান্ত শুদ্ধ জীবনযাপনের প্রতি ব্যাকুল আর্তি ফুটে উঠেছে। জগতের শোষণ, পীড়ন, অত্যাচারের প্রতিবিধানের জন্য তিনি তাঁর অন্তরতমের নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন। সেই প্রাচীন আদিম পৃথিবীর সরল মানুষগুলিকে বা তাদের গৃহপালিত পশুগুলিকে কিভাবে পাশবিক শক্তির হাত

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

থেকে রক্ষা করবেন—এইসব নিয়েই কণ্ঠ সরব হয়ে উঠেছে। অহুর মজদার উদ্দেশে সুদীর্ঘ প্রার্থনা ধ্বনিত হয়েছে জরথুস্ট্রের কণ্ঠে ঃ

"আমি তোমায় প্রার্থনা জানাই, হে অহুর মজদা,
তুমিই তো সে—বিরাজমান তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল নয়ন,
পুছছে যারা প্রশ্ন কিংবা
চাইছে যারা ক্ষমতাসীন রুক্ষ দৃঢ় হতে
তাদের সকল বার্তা মুছে তোমার নিজের মুখে
আদেশ কর—আলোকোজ্জ্বল বাণী,
আমি যেন সব মানবের সঠিক পথের
দিশারী হই (প্রভু),...
তুমিই তো হে অহুর মজদা,
রূপ দিয়েছ বস্তুকে তার চিন্ময়তায়—
প্রতিষ্ঠিত করেছ এই দেহকে, এই বুকের নিঃশ্বাস...
আকাশ এবং ধরার মিলন কে দিয়েছেন রচে?
কে আমাদের পতন থেকে বাঁচান মহাকাশে?
গাছপালা আর সলিলরাশি রক্ষে সে কোন্ জন?
বায়ু এবং মেঘকে জুড়ে কে এনে দেন গতি?
সৃজনকর্তা কোথায় বল, এ মহাসৃষ্টির?
এই আঁধারের, এই আলোকের কোন্ সে কারিগর?
কে রচে দেন সুপ্তি মোদের, আবার জাগরণ?
কার রচনায় উষার পরে দুপুর, শেষে রাতি
মানবলোকের কর্মধারায় কার সে সজাগ দিঠি?"[৯]

জরথুস্ট্র আপন চেতনার মধ্যে আগেই হয়তো খুঁজে পেয়েছিলেন এই প্রশ্নের উত্তরগুলি; না হলে 'প্রভু' বলে কাউকে সম্বোধন করতেন না। অহুর মজদাই যে এসমস্ত ঘটাচ্ছেন—এই বিশ্বাস তিনি রেখেছিলেন বলেই যেন তাঁর মহান বিস্ময়কর শক্তির পরোক্ষ প্রশস্তিই করেছেন জিজ্ঞাসার প্রলেপ মাখিয়ে। তবে মহাসৃষ্টির সমগ্র বিস্ময় বাদ দিয়ে ঈশ্বর নন—এই চেতনা তাঁর মধ্যে যে গভীরভাবেই ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আইজ্যাক নিউটনের জন্মের এত আগে 'কে আমাদের পতন থেকে বাঁচায় মহাকাশে'—মহাজগৎ সম্বন্ধে এই ধরনের ঔৎসুক্য সত্যই অভিনব। এই একই ঔৎসুক্য কাউকে পদার্থজগতের সূক্ষ্মতম নিয়ম আবিষ্কারে প্রাণোদিত করে, কাউকে ভাবজগতের গভীরতম বোধে উদ্বুদ্ধ করে। জরথুস্ট্রের পথ ছিল নিঃসন্দেহে শেষেরটিই। লিউইস ব্রাউন জরথুস্ট্র সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

"He was one of the greatest prophet of nature worship to a most advanced ethical cult."[১০]

জরথুস্ট্র রচিত গাথাগুলি স্পষ্ট করে বুঝতে হলে তাঁর ব্যবহৃত শাস্ত্রীয় পরিভাষাগুলি সম্বন্ধেও দুর্বোধ্যতা রাখা চলবে না। প্রথমেই আসবে 'অহুর মজদা' শব্দটি। এই শব্দটি তেমন অপরিচিত নয়। ইনিই 'অনন্ত', 'অসীম', 'মহা একক' এবং 'পরম সত্য'। 'অমেষাস্পেন্তস' 'অহুর মজদা'-র বিকাশের ছয়টি দিক। এরা মানবের কাছে অহুর মজদার অমর উপহার। এরা হলো 'অশই' বা 'অশ বহিস্ত' (উচ্চতম সততা), 'বোহুমনু' (শুভ মানস), 'খ্ষত্র বৈরিয়' (চরম শক্তি), 'অরমৈতি' (দিব্যপ্রেম), 'হউরবতৎ' (বিশুদ্ধতা) ও 'অমেরেতৎ' (অমরতা)। যখন মানুষের ভিতর উপরি উক্ত গুণগুলি পূর্ণ প্রকাশ হয়, তখন তিনি স্বয়ং হয়ে ওঠেন 'অহুর মজদা'। মনে পড়ে উপনিষদের সেই মহাবাক্য—'অহং ব্রহ্মাস্মি'। জরথুস্ট্রের মধ্যেও 'অমেষাস্পেন্তস' পূর্ণ বিকশিত হয়েছিল বলেই জগতের পরম সত্যের সঙ্গে তিনি এক হয়ে যেতে পেরেছিলেন।

"When the perfected Holy One is in that fully-awakened and actively functioning conscious, he is no longer separate from the Absolute. He is in perfect communication with his Lord....

Zarathustra himself, in that profoundest consciousness of the Unitary whole, is Ahura Mazda."[১১]

মানুষের মধ্যে সেই 'পরম সত্য' জাগ্রত হওয়ার পিছনে 'ফ্রভশি'-এর অবদানও কম নয়। 'ফ্রভশি' হলো ঈশ্বরের সেই উপাদান, যা ঈশ্বরের নির্দেশেই মানুষের মধ্যে উপ্ত হয়। শুধু মানুষের মধ্যে নয়—আকাশ, বাতাস, পশু, ফুল, পাখি—সমস্ত জৈব ও অজৈব পদার্থের ভিতরেই 'ফ্রভশি' ঈশ্বরের অভিলাষে প্রেরিত হয়। ফ্রভশি যেন আগুনের পাখি, তার দুটি আগুনের ডানা দিয়ে মানবসত্তাকে সমস্ত অমঙ্গল থেকে সর্বক্ষণ রক্ষা করে চলে—

"The Fravashi is depicted as a bird with its protective wings spread out.... They were created by God before He made the universe, and are the elements of Ahura Mazda in man. They are our guardian angels who watch over our actions, guide us on the path to righteousness and protect us. After our death, the Fravashi assigned to us returns to God pure and sinless, unaffected by all our actions.... The Fravashis are separate entities which are not only provided for each man and woman, but also for the earth, fire, sky, plants, water, animals, the blessed Zarathushtra and all things

animate and inanimate to preserve and promote their well being."[১২]

অহুর মজদাকে জরথুস্ট্র সর্বসময়েই 'সর্বশক্তিমান' বলে মনে করার পরও অমঙ্গলের অশুভ প্রক্ষেপের ভয়ে প্রতি মুহূর্তে তিনি অসহায় ভয়ার্ত; তাই তাঁর জীবনের একান্ত প্রার্থনা—

"Oh Almighty Mazda, I am myself a weak person and prone to fall into temptation. Please forgive me my weaknesses of thought, word or deed. Pardon my sins of the flesh."[১৩]

জরথুস্ট্র মনে করতেন, অহুর মজদা 'সর্বশক্তিমান', কিন্তু মানুষের শক্তি সীমিত। অহুর মজদা সর্ব শুভময়, কিন্তু মানুষ তা নয়। কোন মানুষ যতই উন্নত মানসিকতাসম্পন্ন হোক না কেন, তাঁর মধ্যেও ত্রুটি থাকে, দুর্বলতা থাকে— যা তার পরম চরিতার্থতায় পৌছাবার পথে বাধা সৃষ্টি করে। জরথুস্ট্র মনে করতেন তিনি স্বয়ং সেইরকম একজন মানুষ ছিলেন। এই যে বাধাসৃষ্টিকারী বিপরীতমুখী শক্তি, অমঙ্গল —একেই জরথুস্ট্র বলেছেন 'অঙ্‌গ্রমৈন্যু'! ঈশ্বর বা অহুর মজদা সর্বশক্তিমান হয়েও সরাসরি অঙ্‌গ্রমৈন্যুকে বিশ্ব থেকে উচ্ছেদ করতে পারছেন না। তাঁর মঙ্গলময়তায় কি এইখানে ছেদ পড়ল? নাকি তাঁর সর্বশক্তিমানতা এই জায়গায় এসে অর্থহীন হয়ে পড়ল? এর উত্তরও জরথুস্ট্র নিজেই দিয়ে গেছেন। যখন থেকে 'প্রকৃতি'র জন্ম; মঙ্গল ও অমঙ্গল, ভাল ও মন্দ, সুখ ও দুঃখ—ঐ একই সঙ্গে তখনি জন্মলাভ করেছে। অহুর মজদা প্রকৃতি নন, কিন্তু মানুষ হলো প্রকৃতি-ভূত, তাই মানুষের মধ্যে মানুষকে ঘিরে মঙ্গল ও অমঙ্গল দুই-ই রয়েছে।

"With the creation of the universe and with the birth of nature—the principles of opposites began to take shape. With the good comes bad, night is followed by day, joy with sorrow and so possibly Zarathustra conceived the idea of the devil, sin's author and nature's evil principle and made it personal, thereby clarifying evil in man's mind and giving it a definite shape and an evil personality, something to be shunned and avoided and so came Angre Mainyu, the lord of all evil."[১৪]

আধুনিক সুধী প্রাবন্ধিকের চিন্তাধারায় আজ যে দার্শনিক অনুসন্ধান দেখতে পাই, বহু শতাব্দী আগে জরথুস্ট্রের মধ্যে হুবহু সেই একই চিন্তার অভিব্যক্তি আমাদের বিস্মিত করে—

"আমরা মঙ্গল বলিতে ও আনন্দ বলিতে যাহা বুঝিতে পারি, অমঙ্গল ছাড়িয়া ও দুঃখ ছাড়িয়া তাহার অস্তিত্ব নাই। ... যেদিন জগতে মঙ্গলের আবির্ভাব হইয়াছে, সেইদিনই অমঙ্গলের যুগপৎ উদ্ভব হইয়াছে। একই দিনে একই ক্ষণে একই উদ্দেশ্যসাধনে উভয়ের উৎপত্তি।... মঙ্গলের অভিমুখে ধাবিত হইতে চাহিতেছ, অমঙ্গল তোমাকে ছাড়িবে না। জগতের এই নিয়ম; অথবা জগতের অস্তিত্ব এই নিয়মের সূত্রে ধৃত রহিয়াছে।"[১৫]

জরথুস্ট্রের মতে, অহুর মজদা এই লৌকিক মঙ্গল ও অমঙ্গলের উর্ধ্বে। 'আবেস্তা'য় অমঙ্গল হলো 'অঙ্‌গ্রমৈন্যু' এবং মঙ্গল হলো এরই সহচর 'স্পেন্তামৈন্যু'। মানুষের জীবনে অহরহ এই দুই শক্তির লড়াই চলে। অহুর মজদা এই লৌকিক মঙ্গল প্রদাতা নন। তিনি মঙ্গলামঙ্গলাতীত। অথবা বলা যায়, দার্শনিক অর্থে পরম মঙ্গল বা শ্রেয়-দাতা। তাই তাঁরই অভিপ্রায়ে মানুষকে পরম মঙ্গলের পথটি দেখিয়ে দেওয়ার জন্য মানুষের চেতনার ভিতর তিনি 'ফ্রভশি'কে প্রেরণ করেন। 'ফ্রভশি'-র কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। 'ফ্রভশি' অনেকটা বিবেকের মতো। নৈতিক চেতনার সঙ্গে তীব্র অধ্যাত্মশক্তির যোগ—যা সহজেই দুর্বলতা থেকে, প্রলোভন থেকে রক্ষা করে মানুষকে পরম লক্ষ্যের অভিমুখে নিয়ে যায়। জরথুস্ট্র তাই অহুর মজদার কাছে প্রার্থনা করেন—

"Help me dear God, successfully to make my way in life by cultivating Vohu Manu and by receiving Thy divine symbol, the Holy Fire Within me also burns a part of the same Holy Fire, the Divine Spark or Fravashi, which not only gives me life-sustaining warmth but provides me with divine guidance and energy to fulfil my mission of life."[১৬]

জরথুস্ট্রের মতে, এই অগ্নিময়ী শক্তি 'ফ্রভশি'-র সহায়তাতেই মানুষ অহুর মজদার চিরমঙ্গলময় অভীষ্টলোকে উত্তীর্ণ হতে পারে। সারাজীবন ধরে তীব্র একটি বিশুদ্ধিকরণের প্রবণতাই জরথুস্ট্রের জীবনের প্রধান আরাধনা ছিল। তাঁর কাছে অহুর মজদা ছিল পরম বিশুদ্ধ সত্তা। অবশ্য তাঁর ধর্মতত্ত্বে (theology) একধরনের দ্বিচারিতা (dualism) আমরা দেখতে পাই। অহুর মজদা সর্বশক্তিমান, সর্বদেশ-কাল-জীবের স্রষ্টা, সর্ববৈপরীত্য-শূন্য, সর্বমঙ্গলময়, অথচ অঙ্‌গ্রমৈন্যু দাপটের সঙ্গে তাঁরই সমস্ত সৃষ্টিকে সন্ত্রস্ত করে, ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। এই দ্বিচারিতার ব্যাপারটি ইহুদী-পুরাণেও রয়েছে। খুব সম্ভবত জরথুস্ট্রের এই মতবাদের

দ্বারাই ইহুদীরা প্রভাবিত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ডঃ জেহনার লিখছেন ঃ

"Judaism deeply influenced by Zoroastrianism during and after the Babylonian captivity can scarcely be questioned, and extraordinary likeness between the Dead Sea Text and Gothic conception of the nature and origin of evil.... According to the account given in the Manual of Discipline, God created man to have dominion over the world and made for him two spirits,... they are spirits of truth and of error."[১৭]

জরথুস্ত্রের শুভ ও অশুভের দ্বন্দ্বের সঙ্গে ইহুদীদের এই দ্বন্দ্বের মূলত কোন প্রভেদ নেই। এর কারণ হলো—আবহমান কাল থেকেই মানুষ নিজেরই দুর্বলতা ও প্রলোভনের তাড়নায় যে-পথকে সে সত্য বলে মনে করে, সে-পথে যেতে পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এইখান থেকে সে শুধু যে নিজের মঙ্গল ও অমঙ্গল রূপে বিশ্বের সবকিছুকে ভাগ করে নিচ্ছে তাই নয়, আপনার সত্তাকেও দ্বিখণ্ডিত করে নিচ্ছে। তারপর এই দ্বিখণ্ডিত সত্তা ক্রমশ ব্যক্তিত্বে অভিষিক্ত হচ্ছে। অঙ্‌গ্রমৈন্যু ও স্পেন্তামৈন্যু এইভাবেই 'আবেস্তা'-তে দানব ও দেব-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পুরাণেও এই 'ভাব' (Idea)-কে দেবতায় পরিণত করার দৃষ্টান্ত অহরহ দেখা যায়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কালী, দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, কুবের—এঁরা সকলেই ভাব-দেবতা।

সত্যানুভূতিকে যখন রূপকের মোড়কে আবৃত করা হয় অর্থাৎ একটি ব্যক্তি-বিশেষরূপে রূপায়িত করা হয়, তখন সত্যের সঙ্গে সরাসরি সংযোগও অনেকটা আবৃত হয়ে পড়ে। ব্যক্তিরূপটি দার্শনিক গভীরতা ত্যাগ করে অনেকটাই সরলায়িত হয়ে পড়ে। তাই কোন কারণে পূর্বের সেই দার্শনিক বিশ্লেষণে ফিরে আসতে গেলে তা অনেক বেশি জটিল হয়ে পড়ে। জরথুস্ত্রের অহুর মজদাও তেমনি অঙ্‌গ্রমৈন্যু ও স্পেন্তামৈন্যু—এই দুই সত্তার জন্য 'দ্বিচারিতা' (dualism)-র অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে পড়ে। এই দুই দেব-দানব যে মানবেরই দুই সত্তা—অহুর মজদার নয়, রূপকের আবরণীর জন্যই কিছুটা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়। মানবসত্তা শুধু অঙ্‌গ্রমৈন্যুকে নয়, স্পেন্তামৈন্যুকেও অতিক্রম করে তবে অহুর মজদার সান্নিধ্যে পৌঁছায়। অঙ্‌গ্রমৈন্যুকে অপক্ষপাতী (neutral) করবার জন্যই স্পেন্তামৈন্যুর আগমন। মানবের মধ্যে অমঙ্গল প্রশমিত হলে সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলের পৃথক প্রয়োজনীয়তাও শেষ হয়ে যায়। মানব তখন বিশুদ্ধ সত্তায় রূপান্তরিত হয়, অর্থাৎ জরথুস্ত্রের অতীন্দ্রিয় দর্শন অনুযায়ী অহুর মজদা তখনি তাকে দর্শন দেন। সেই দিক থেকে জরথুস্ত্রবাদে কোন প্রকৃত দ্বিচারিতা নেই। ❑

পাদটীকা

১ In Search of My God, The Lost Generation Publication, Los Angeles, 1978, p. 7
২ Ibid.
৩ Zarathustra, Great Britain, 1985, pp. 84-85
৪ য়শন ৪৩ ঃ ১৫, ইংরেজী অনুবাদ থেকে অনূদিত
৫ Zarathustra, pp. 64-65
৬ Nicomachian ethics, BK-5, Chap. 2
৭. Zarathustra, p. 64
৮. Yasna 43.5 : Avesta, World Scripture, p. 126
৯. Yasna 44.3-5 : Avesta থেকে অনূদিত
১০. The World's Great Scriptures, New York, 1956
১১. Zarathustra, p. 28
১২. In search of my God, pp. 5-6
১৩. Ibid., p. 265
১৪. In Search of My God, p.13
১৫. 'অমঙ্গলের উৎপত্তি', 'জিজ্ঞাসা'—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, ১৯৮২, পৃঃ ১০৫-১০৬
১৬. 'কেম-না মজদা' ঃ আবেস্তা, দ্রঃ In Search of My God, p. 265
১৭. The Down and Twilight of Zoroastrianism—Dr. R. C. Zaehner, London, 1961

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. Songs of Zarathustra : the gathas– Framroze Ardeshir Dastur & Peloo Nanavutty, London, 1952
২. Zarathustra and Zarathustrianism in the Avesta—R. E. Dastur, Leipzing, 1906
৩. Zoroaster the prophet of Ancient Iran—A. V. W. Jackson, New York, 1899
৪. The Zoroastrian Religion in the Avesta—Jehangir C. Tavadia, [Karl. F. Geldner-এর মূল জার্মান গ্রন্থের অনুবাদ] Bombay, 1933
৫. The Divine Songs of Zarathustra—I. J. S. Taraporevala, Bombay, 1962
৬. The Complete Works of Aristotle—edited by J. Barnes, Princton, 1984.

জাড়া রায় পরিবারের দুর্গাপূজা

রোহিণীনাথ মঙ্গল

"দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।
দারিদ্র্যদুঃখভয়হারিণি কা ত্বদন্যা
সর্বোপকারকরণায় সদার্দ্রচিত্তা।।"

(শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৪।১৭)

হে দারিদ্র্যহারিণি, হে দুঃখবিনাশিনি, দুঃসময়ে আপনাকে স্মরণ করলে আপনি সকলের ভয় নাশ করেন। সুসময়ে বিবেকিগণ আপনাকে চিন্তা করলে আপনি তাঁদের সুবুদ্ধি প্রদান করেন। সকলের কল্যাণের জন্য সর্বদা দয়ার্দ্রচিত্ত আপনি ছাড়া আর কে আছেন?


রূপ মহিমা যে-দেবীর, তিনি যে ধরাধামে অত্যন্ত আদৃত ও পূজিত হবেন, এতে আশ্চর্যের কি আছে! তবে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে তাঁর পূজার ব্যয় সাধারণ মানুষের সাধ্যাতীত বলেই বোধহয় বাংলাদেশে রাজারাই এই মাতৃপূজার প্রচলন করেছিলেন। পরে বিত্তশালী জমিদারেরা যথেষ্ট আড়ম্বরের সঙ্গে এই আরাধনার ধারাকে ধরে রেখেছিলেন যুগপৎ নিজেদের ও প্রজাকুলের মঙ্গল ও আনন্দের তাগিদে। সেইসঙ্গে দুর্গোৎসবের মাধ্যমে প্রকাশিত হতো জমিদারীসুলভ আভিজাত্যের প্রচ্ছন্ন অহঙ্কারও। 'দুর্গা' নামকরণের পিছনে এর কারণটি লুকিয়ে আছে। অনেকের মতে, রাজবংশীয়দের দুর্গে দেবী পূজা পেতেন বলেই তাঁর নাম 'দুর্গা'।

মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা থানার অন্তর্গত জাড়াগ্রামের (জে. এল. নং ১৫২) জমিদার রায় পরিবারের দুর্গাপূজা এবছর ২০০ বছরে পদার্পণ করল। প্রাচীনত্বের দিক থেকে এই পারিবারিক পূজা ঐতিহ্যবাহী। এই প্রাচীনত্বের সূত্র ধরে ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের প্রয়োজনে শহর ও গ্রামের দুর্গাপূজা নিয়ে একটি ডকুমেন্টারি ফিল্ম তোলা হয়েছিল প্রখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের ঘনিষ্ঠ ক্যামেরাম্যান নিমাই ঘোষের তত্ত্বাবধানে। সেই তথ্যচিত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল এই রায় পরিবারের দুর্গোৎসব। এই সালেই রায় পরিবারের পূজাকে কেন্দ্র করে 'যুগান্তর' পত্রিকায় একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯৮৫ খ্রীস্টাব্দে বিজয়া দশমীর পর চতুর্দশীর দিন 'আজকাল' পত্রিকায় রায় পরিবারের এই দুর্গতিনাশিনী দেবীমূর্তির বিসর্জনের চিত্র প্রকাশিত হয়।

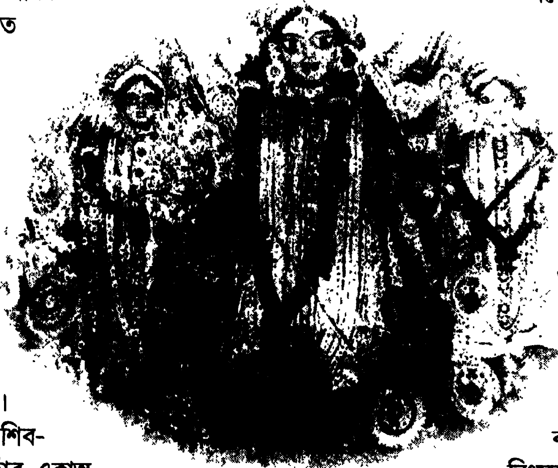
জাড়ায় এই জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠা ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে। বর্ধমান মহারাজার দেওয়ান রামেশ্বর রায়ের তৃতীয় পুত্র রামগোপাল রায় ওরফে গোপাল রায় এই এলাকার কোন কোন লাট ও মহল বর্ধমান মহারাজের কাছ থেকে পত্তনি পান। পিতার মৃত্যুর পর তিনি জাড়ার বিত্তশালী নিয়োগী পরিবারের আহ্বানে জাড়ায় স্থায়িভাবে বসবাসের জন্য অট্টালিকা নির্মাণ করান। কুলদেবতা গোপাল জীউয়ের প্রতিষ্ঠা ও কালীপূজার মাধ্যমে দুই স্ত্রী ও মাতা-সহ তিনি বর্ধমান থেকে জাড়ার নতুন ভবনে প্রবেশ করেন। শোনা যায়, নিয়োগী পরিবারের কর্তা ছিলেন গোপাল রায়ের ভিক্ষাপিতা।

কালক্রমে জমিদারী ও আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গোপাল রায়ের পৌত্র রাজীবলোচন রায় কালীপূজার পাশাপাশি দুর্গাপূজারও পত্তন করেন ১২০৭ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে। সেইসময়ে তাঁর জমিদারীর বার্ষিক আয় ছিল প্রায় দুই লক্ষ টাকা। এই বছর দুর্গাপূজা শুরু হওয়ার আগেই রাজীবলোচন দুর্গাদালান, মন্দির ও সম্মুখে খড়ের চালের নাটমন্দির তৈরি করান। পরবর্তী কালে দাদা কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পর বর্ধমান মহারাজ তেজচাঁদ বাহাদুরের অধীনে দেওয়ানের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তিনি জাড়ার জমিদারীর সমস্ত দায়িত্ব নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। তিনি খড়ের চালের নাটমন্দিরকে পোক্ত নাটমন্দিরে রূপান্তরিত করেন। খানাকুল-রাধানগরের গৌরহরি রায় (বন্দ্যোপাধ্যায়) ছিলেন রাজীবলোচনের ভগিনী-পতি ও স্বনামধন্য রাজা রামমোহন রায়ের জ্ঞাতিভ্রাতা। সেই সুবাদে রাজীবের সঙ্গে রামমোহনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে রাজীবলোচন জাহানাবাদ পরগনার গোবিন্দপুর ও চন্দ্রকোণা পরগনার রামেশ্বরপুর তালুক দুটি পত্তনি নেওয়ার ব্যাপারে রামমোহনকে সাহায্য করেছিলেন। উত্তরভারত ভ্রমণের

আগে রামমোহন চুক্তি করেছিলেন যে, ভ্রমণকালে তাঁর সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকবেন রাজীবলোচন এবং ভ্রমণকালে তাঁর মৃত্যু হলে নিঃসন্তান রামমোহনের ভাগনে গুরুদাস মুখোপাধ্যায় এইসব সম্পত্তির মালিক হবেন। পরে অবশ্য তিনি দুই পুত্রসন্তানের জনক হয়েছিলেন।

১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে রামমোহনের সঙ্গে তাঁর নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদের বকলমে মাতা তারিণীদেবীর বিষয়-সম্পত্তির অধিকার নিয়ে মামলা হয়। সেই মামলায় রামমোহনের পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন রাজীবলোচন। শেষপর্যন্ত রামমোহন জয়লাভ করেন। এ হেন বন্ধু রামমোহনের রাজীবলোচনের গৃহে আতিথ্যগ্রহণ করা অস্বাভাবিক ছিল না, কিন্তু আমন্ত্রিত হলেও দুর্গাপূজায় সে-বাড়িতে অতিথি হওয়া একজন গোঁড়া মূর্তিপূজা-বিরোধীর পক্ষে অসম্ভব ছিল।

এই প্রসঙ্গে আরেক স্বনামধন্য মানুষের নাম স্মরণযোগ্য। তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। রাজীবলোচনের পুত্র শিবনারায়ণ রায় ছিলেন তাঁর একান্ত সুহৃদ। তিনি বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনে বিধবা-বিবাহের পক্ষে ও বহু বিবাহের বিপক্ষে যে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন, সেকথার উল্লেখ আছে 'বিদ্যাসাগর রচনাবলী'তে। তাঁদের মধ্যে হৃদ্যতা এমনই ছিল যে, শিবনারায়ণ কলকাতায় গেলে কোন কোন সময়ে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করতেন। ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের পর বর্ধমান মহারাজ বিদ্যাসাগরকে তাঁর নিজের গ্রাম বীরসিংহের পত্তনি নিতে অনুরোধ করেন। তিনি সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় বীরসিংহ-সহ কোমরগঞ্জ, পাথরা, অর্জুনআড়ি, কাঁচিয়া ও কোমরসা মৌজা নিয়ে গঠিত লাট কোমরসা শিবনারায়ণ পত্তনি নেন বর্ধমান মহারাজের কাছ থেকে। বিদ্যাসাগর জাড়াতে কখনো এসেছিলেন কিনা জানা যায় না, কিন্তু স্বাধীনতা-সংগ্রামী সনাতন রায় দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর পারিবারিক প্রবাদ সূত্রে জানান, শিবনারায়ণের আমন্ত্রণে বিদ্যাসাগর একবার পূজার সময় পালকিতে চেপে কিছুক্ষণের জন্য রায়বাড়িতে এসেছিলেন।


জাড়া রায় পরিবারের দুর্গাপ্রতিমা

শিবনারায়ণের জমিদারী পরিচালনার ভার নেওয়ার পূর্বে বর্ধমান মহারাজ তো বটেই, তাছাড়া কলকাতার শীল, শ্রীরামপুরের গোস্বামী, উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি জমিদারদের কাছ থেকে পত্তনি পাওয়া মহল নিয়ে জাড়া রায়বংশের জমিদারীর কলেবর যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। শিবনারায়ণের আমলে জমিদারীর আয় বেড়ে দাঁড়ায় বার্ষিক চার লক্ষ টাকা। স্বাভাবিকভাবেই পূজার উৎসবে আড়ম্বরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ের মাত্রাও বেড়েছিল। পরে যখন অংশীদারদের মধ্যে জমিদারীর ভাগ বাটোয়ারা হলো, তখন কুলদেবতা গোপাল জীউয়ের নিত্যসেবা এবং কালী ও দুর্গা-পূজার খরচের ভার অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। এমনকি শিব-নারায়ণের অকালপ্রয়াত কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মীনারায়ণের নিঃসন্তান বিধবা স্ত্রী গণেশজননী কর্তৃক নিজের জমিদারীর অংশ থেকে জাড়া হাইস্কুল ও পারিবারিক উৎসব আয়োজনের জন্য প্রদত্ত বর্তমান হুগলী জেলার গোঘাট থানার অন্তর্গত পীরিজপুর ও কর্ণপুর মৌজা দুটিও শরিকদের মধ্যে বিভাজিত হয়। যাই হোক, এইভাবেই চলে আসছিল সাতকড়িপতি রায়ের সময় পর্যন্ত। ঐ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে জমিদারী প্রথার বিলোপ হলে ভবিষ্যতের কথা ভেবে সাতকড়িপতি বেশ কিছু পুকুর-জমি দেবোত্তরের আওতাভুক্ত করে আইনানুগ উপায়ে উৎসব পরিচালনার জন্য ট্রাস্ট বডি গঠন করেন। তাঁর প্রবর্তিত ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত চালু আছে।

এই বংশেরই সন্তান নতুন বাড়ির শরচ্চন্দ্র রায় ছিলেন তাঁর সমকালে ঐ অঞ্চলের জনপ্রিয় গায়ক ও গীতিকার। তিনি তাঁর রচিত আগমনী গান সংশোধনের

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

জন্য পড়ে শোনাতেন তাঁর প্রতিবেশী কবি যোগেন্দ্রচন্দ্র মঙ্গলকে। এ-তথ্য যোগেন্দ্রচন্দ্র মঙ্গলের রোজনামচা থেকে জানা যায়। তাঁর গানের নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব না হলেও শারদীয়া পূজার আগে যে এই গ্রামে আগমনী গান রচনা ও পরিবেশনের একটা রেওয়াজ ছিল তা বোঝা যায়।

১৪ একর জমি জুড়ে বিশাল রায়বাড়ির অধিকাংশই আজ ধ্বংসের মুখে। তবুও তার যা অবশিষ্ট রয়েছে তা এখনো দর্শনীয়। দুর্গাপূজার ষষ্ঠীর দিন যথাবিধি কল্পারম্ভ হয়। ঐদিন সন্ধ্যায় কাছারিগৃহ-সংলগ্ন উন্মুক্ত স্থানে দেবীর বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

দুর্গাপূজায় শ্রীশ্রীচণ্ডীর পূজা ও পাঠ অবশ্যকর্তব্য। এই পাঠ সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলে। ষষ্ঠীর দিন থেকে এই পূজোপলক্ষ্যে নহবত বসে এবং ঢাকঢোলের নিনাদে অনুরণিত হয় পূজামণ্ডপ। এই কয়দিন পূজক ও তন্ত্রধারকের ভক্তিমিশ্রিত গুরুগম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ শ্রোতৃবর্গকে ভাবাবিষ্ট করে।

জাড়ার রায় পরিবারে দেবী দুর্গার যে-মূর্তি পূজিত হয় তাঁর গাত্রবর্ণ হলুদ, তিনি দশভুজা, তাঁর হাতে ত্রিশূল, চক্র, বজ্র, ধনুর্বাণ, কুঠার ইত্যাদি দশ আয়ুধের সমাহার। সিংহ তাঁর বাহন। নিকষ কালো এক মহিষ দেবীর পদতলে, তার দেহ থেকে বেরিয়ে এসেছে মহিষাসুর। মহিষাসুরের বক্ষদেশ দেবীর ত্রিশূলে বিদ্ধ। দেবীর দুপাশে আছেন গণেশ, কার্তিক, সরস্বতী ও লক্ষ্মী। শোলার ডাকের সাজে দেবী ও তাঁর পুত্রকন্যাগণ অপরূপ সুন্দর হয়ে ওঠেন। দেবীর মুখমণ্ডল, আকার ও ডাকসাজের প্রাচীন রীতি বংশপরম্পরায় অনুসৃত হয়ে চলেছে।

অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিক্ষণে অষ্টমীর শেষ ২৪ মিনিট এবং নবমীর প্রথম ২৪ মিনিট—এই ৪৮ মিনিটে অনুষ্ঠিত হয় সন্ধিপূজা। 'শ্রীশ্রীচণ্ডী' অনুসারে এই সময় দেবী মহামায়া শুম্ভ ও নিশুম্ভের দুই সেনাপতি চণ্ড ও মুণ্ডকে নিহত করেন। লোকবিশ্বাস, এইসময় দেবী দুর্গা স্বমূর্তিতে আবির্ভূতা হন। সন্ধিপূজার তাই এত গুরুত্ব। পঞ্জিকা ও ঘড়ির যখন প্রচলন ছিল না, তখন সূর্যের গতিবিধি ও নক্ষত্রের অবস্থান বিচার করে বোধন ও সন্ধিক্ষণের সময় নিরূপণ এবং তাঁবির ব্যবহার করে সন্ধিপূজার লগ্ন ঠিক করা হতো। চন্দ্রকোণার ভান রাজত্বের আমলে রায়বংশের কুলদেবী মল্লেশ্বরীর শারদোৎসবে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তাঁবির সাহায্যে সন্ধিপূজার লগ্ন নির্ধারিত হলে কামানে আগুন দিয়ে তোপধ্বনি করা হতো। সেই ধ্বনি শুনে চন্দ্রকোণা পরগনার অন্যান্য স্থানের দুর্গাপূজায় সন্ধিপূজা শুরু হতো। ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচন্দ্র মোগলবাহিনীর সহায়তায় চন্দ্রকোণার শেষ রাজা রঘুনাথ সিংহকে পরাজিত করে এই পরগনার অধিকার পান। তিনিও মল্লেশ্বরী দেবীর পূজার পূর্বতন রীতিকেই মেনে চলতেন। শোনা যায়, রায়বাড়ির দুর্গাপূজার প্রথম পর্বে মল্লেশ্বরী দেবীর পূজাঙ্গনে তোপধ্বনির শব্দ এবাড়ির দুর্গোৎসবের সন্ধিপূজা আরম্ভ করতে সাহায্য করত। পরে অবশ্য উপযুক্ত সময় নিরূপণের ব্যাপারটি বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ও ঘড়ির ওপর নির্ভরশীল হয়ে গেছে।

দুর্গাপূজার সন্ধিক্ষণে রাজারাজড়া বা জমিদারদের পূজায় ছাঁচি কুমড়ো, আখ, কলা, লেবু, সুপারী, গোল মরিচ, মহিষ, পাঁঠা, গোসাপ, মাগুর মাছ, পায়রা ইত্যাদি বলি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ধীরে ধীরে পশুবলির বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠার কারণে অনেক জায়গায় পশুহত্যা বন্ধ হয়ে যায়। জাড়ার রায়বাড়ির দুর্গাপূজার শুরু থেকেই কিন্তু পশুবলির রেওয়াজ ছিল না। এখানে সন্ধিপূজায় দেবীর উদ্দেশে আখ, কলা ও ছাঁচি কুমড়ো বলি দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে মা দুর্গার আরাধনা আমাদের অন্তরের শুভশক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। বলি একটি প্রতীকী অনুষ্ঠানমাত্র।

পূজার সূচনালগ্ন থেকেই রাজীবলোচন রায় সপ্তমীর দিন মধ্যাহ্নে পূজারতি সমাপনের পর ব্রাহ্মণভোজন ও নবমীর মধ্যাহ্নে রায় পরিবারের সকলের অন্নগ্রহণের ব্যবস্থা করেছিলেন। সপ্তমীর দিন ব্রাহ্মণদের খিচুড়ি ভোগ, কয়েকটি তরকারি, একটি মাছের পদ ও মিষ্টান্ন খাওয়ানো হতো। তখন মিষ্টান্ন বলতে ছিল তক্তি, পেঁড়া, লাড্ডু ইত্যাদি। নবমীপূজায় জ্ঞাতি ও বিশেষ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের ভোজে স্বাভাবিকভাবেই কিছু রূপান্তর ও কিছু উন্নত পদের সংযোজন থাকত। খিচুড়ি ভোগের পরিবর্তে থাকত অন্নভোগ, সেইসঙ্গে ডাল ও বিভিন্ন তরিতরকারি ছাড়াও থাকত মাছের একাধিক পদ, পরমান্ন ও মিষ্টান্ন। সপ্তমী ও নবমীর ভোজ চলে আসছিল দীর্ঘদিন ধরে। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে (১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে) সপ্তমীর রাত্রিতে ভয়ঙ্কর ঝড়ের দাপটে ক্ষতিগ্রস্ত ছিন্নমূল দরিদ্র মানুষের কথা ভেবে কিশোরীপতি রায় মহাষ্টমীতে কাঙালী ভোজনের ব্যবস্থা করেন। সেই থেকে আজও সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীর দিন যথারীতি এই ভোজপর্ব চলে আসছে।

রায়বাড়ির দুর্গোৎসব কেবল পূজা ও ভোজ নিয়েই সমাপিত হতো না, মানসিক বিনোদনের খোরাকও এর

সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে যাত্রাপালার অনুষ্ঠান সমানতালে হতো। স্থানীয় ও বাইরের যাত্রাদল আনিয়ে যাত্রার আসর বসানো হতো। রায় পরিবারের ছেলেরা ১৮৮২ ও ১৮৮৪ সালের মধ্যে কোন এক বছরে যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়ের হামারবাড়ির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে জাড়ার বুকে প্রথম ও মেদিনীপুর জেলার মধ্যে দ্বিতীয়বার সখের থিয়েটার প্রদর্শনের আয়োজন করে। তারপর রায় বংশের নাটক-প্রিয় উদ্যোক্তারা গ্রামের আরো কিছু যুবককে সঙ্গে নিয়ে 'জাড়া মডেল থিয়েটার' নাম দিয়ে প্রতিবছর পূজায় নাটক মঞ্চস্থ করতে থাকেন। অর্থ সঙ্কলানের পথ রুদ্ধ হওয়ায় এখন আর পূজা উপলক্ষ্যে যাত্রা বা থিয়েটারের আসর বসে না, তবে এই বংশের উৎসাহী কিশোর-কিশোরীরা আবৃত্তি, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটিকাভিনয়ের মাধ্যমে পূজার কদিন সকলকে মাতিয়ে রাখে।

কালের গতিপথে বিজয়া দশমী তার সকরুণ উপস্থিতি নিয়ে একসময় হিন্দু বাঙালীর সম্মুখে প্রকটিত হয়। মনে নামে বিষাদের ছায়া। পঞ্চাশজন বাহকের কাঁধে চেপে রায় পরিবারের দেবীমূর্তি গ্রামের ভাগবৎখানা নামক পুষ্করিণীতে বিসর্জিত হন। কবি-গায়করা যেমন মাতৃপূজার পূর্বে রচনা করতেন আগমনী গান, তেমনি পূজা শেষে বিজয়ার গান রচনাতেও পিছপা হননি। দেবীর বিজয়ায় আবেগমথিত কণ্ঠে কবি নজরুল গেয়েছেন—

"যাস নে মা ফিরে যাস নে জননী
ধরি দুটি রাঙা পায়।
শরণাগত দীন সন্তানে
ফেলি ধরার ধূলায়।।
দিব্যশক্তি দিলি দেবতারে
মৃত্যুহীন প্রাণ
তবু কেন মাগো তাহাদের তরে
তোর এত বেশি টান;
আজও মরেনি অসুর, মরেনি দানব
ধরণীর বুকে নাচে তাণ্ডব।
সংহার নাহি করি সে-অসুরে
চলে যাস বিজয়ায়!"

প্রতিমা নিরঞ্জনের পর ফেরার পথে রায়বাড়ির বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবক, যুবতী, কিশোর, কিশোরী ও শিশুরা গ্রামের মানুষকে সাথী করে এই নজরুলগীতিটি সমবেত কণ্ঠে গাইতে গাইতে দেবীর প্রতি তাঁদের অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। ❑

ভ্রম সংশোধন

গত ভাদ্র ১৪০৮ সংখ্যার 'উদ্বোধন'-এর ৫৩২ পৃষ্ঠার শেষের আগের প্যারাগ্রাফে লেখা হয়েছে—

ওঁর এক প্রিয় শিষ্য স্বামী পবিত্রানন্দের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। শুনলাম ইনি পিয়ানোতে রামনাম বাজান।

এখানে বক্তব্যটি নিম্নরূপ হবে—

স্বামী পবিত্রানন্দজীর এক প্রিয় শিষ্যা মিস জেন গেনেট, ৯৩ বছরের বৃদ্ধা আশ্রমবাসিনীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি আমায় বললেন ঃ "Be yourself." স্বামী পবিত্রানন্দজীর আরেক শিষ্য মিঃ জন স্লেঙ্কের সঙ্গেও পরিচয় হলো। তিনি নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির সেক্রেটারি, ঐ আশ্রমের সঙ্গীত পরিচালক এবং পিয়ানোতে রামনাম বাজান।

ঐ একই পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফের শেষের দিকে *'সন্ন্যাসদীক্ষা'* শব্দটির পরিবর্তে *'মন্ত্রদীক্ষা'* পড়তে হবে।

গত ভাদ্র ১৪০৮ সংখ্যার ৫৫৬ পৃষ্ঠার ১ম স্তম্ভের ৩৪ পঙ্‌ক্তিতে *'তিনি কয়েকবার রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন'*-এর পরিবর্তে *'তিনি আরেকবার রথযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন'* হবে। ঐ সংখ্যার ৫৫৯ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের ১২ পঙ্‌ক্তিতে *'স্বামী অচ্যুতানন্দজী'*-র পরিবর্তে *'স্বামী অচ্যুতাত্মানন্দজী'* হবে।

গত শ্রাবণ ১৪০৮ সংখ্যার ৪৫৮ পৃষ্ঠায় ছবির পরিচয়ে *'টিলব্যারি ডক, স্কটল্যাণ্ড'*-এর স্থানে *'টিলব্যারি ডক, ইংল্যাণ্ড'* হবে।

ভগিনী নিবেদিতার অনুধ্যান*

শ্যামলী মহাপাত্র



ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ ভগিনী নিবেদিতা পাশ্চাত্যের নারী হয়েও বৈদিক আদর্শে নিজেকে ক্রমশ মহিমান্বিত করে তুলেছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতায় বেড়ে ওঠা সদ্য-যুবতী মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল স্বামী বিবেকানন্দের যাদুস্পর্শেই নিজেকে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ভারতীয় নারীর আদর্শে নিজেকে গড়ে তুলে হয়ে উঠেছিলেন 'ভগিনী নিবেদিতা'। ভারতীয়দের প্রতি অদম্য ভালবাসা, গভীর সমবেদনা, আত্মত্যাগ ও সর্বোপরি দুর্নিবার উৎসাহই তাঁর যাত্রাপথের পাথেয় হয়েছিল। তাঁর শিক্ষাপ্রদ ও মাধুর্যমণ্ডিত চারিত্রিক গুণাবলী জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সর্বকালের ও সর্বদেশের মানুষকেই অনুপ্রাণিত করে।

১৮৬৭ সালের ২৮ অক্টোবর ভোরে উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের বিখ্যাত নোবল বংশে জন্ম হয় মার্গারেটের। মাত্র একবছর বয়সেই তাঁকে তাঁর ঠাকুরমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বাবা স্যামুয়েল ও মা মেরী। কারণ, জীবিকার প্রয়োজনে তাঁদের ইংল্যাণ্ডে যেতে হয়েছিল। চারবছর পর ওল্ডহ্যাম শহরে ধর্মযাজকের পদে আসীন হওয়ামাত্র মার্গারেটকে নিজেদের কাছে নিয়ে আসেন নোবল দম্পতি। কিন্তু মার্গারেটের বয়স যখন সাত-আট বছর, তখন মার্গারেট, তাঁর বোন মে এবং একমাত্র ভাই রিচমণ্ডকে রেখে মাত্র চৌত্রিশ বছর বয়সে পিতা স্যামুয়েল মারা যান। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে স্যামুয়েল মেরীকে বলেছিলেন, স্বয়ং ঈশ্বর যদি কখনো মার্গারেটকে আহ্বান করেন, মেরী যেন কোনভাবেই তাকে বাধা না দেন। কারণ, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল—ঈশ্বর-নির্দিষ্ট বড় কিছু একটা করার জন্য জন্ম হয়েছে মার্গারেটের। পরবর্তী কালে পিতা স্যামুয়েলের বিশ্বাস বাস্তবায়িত হয়েছিল।

মার্গারেট ও তাঁর বোন মে-র শিক্ষাজীবন শুরু হয় হ্যালিফ্যাক্স স্কুলে। সেখানকার শিক্ষা ও সুন্দর ধর্মীয় পরিবেশে তাঁদের মানসিক, নৈতিক ও ধর্মজীবন সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছিল। প্রথমে মিস ল্যারেট ছিলেন সেখানকার প্রধান শিক্ষয়িত্রী। তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতা মার্গারেটকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। কারণ, শৈশব থেকেই তাঁর সহজাত সংস্কার ও মনোবৃত্তি ঐরকম শিক্ষাগ্রহণের অনুকূলেই ছিল। মিস ল্যারেটের পর প্রধান শিক্ষয়িত্রী মিস কলিন্স স্বল্প সময়ের মধ্যেই মার্গারেটের প্রতিভা ও কৌতূহলী মনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠলেন এবং তাঁকে আলাদাভাবে আরো কিছু শিক্ষা দিতে লাগলেন।

যদিও বাইবেল ঐ স্কুলের ছাত্রীদের দৈনন্দিন পাঠের বিষয় ছিল, কিন্তু মার্গারেট শুধুমাত্র পাঠ্যবিষয় হিসাবেই বাইবেল পড়তেন না। ঐ কৈশোর বয়স থেকেই যীশুর উদ্দীপনাময়ী বাণী ও প্রার্থনা মার্গারেটের মনে ভগবৎ প্রেম ও বিশ্বাসের প্রদীপ প্রজ্বলিত করেছিল। মার্গারেট অনুভব করেছিলেন, জড়বিজ্ঞান নয়, ধর্মবিজ্ঞান ও নিজস্ব অনুভূতির আলোকেই মানুষের সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব এবং এইভাবে ধর্মীয় শিক্ষাপদ্ধতির মাধ্যমেই মার্গারেট বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় অসাধারণ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন।

কৈশোর থেকেই পরিপালিত শিক্ষয়িত্রী হওয়ার সুপ্ত বাসনা তাঁর মাত্র ১৮ বছর বয়সেই পূর্ণ হয়েছিল। কেসউইকের বোর্ডিং স্কুলে তিনি সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষিকার দায়িত্ব পান। সেই থেকেই শুরু হয় তাঁর

* আগামী ২৮ অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতার ১৩৪তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে এই বিশেষ রচনাটি নিবেদিত হলো।

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

শিক্ষকতার জীবন। কিন্তু বছর দুয়েক পর তিনি একাকিত্বের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৮৮৭ সালে শিক্ষকতা ছেড়ে রাগবির অনাথ আশ্রমে সর্বহারা অনাথ মেয়েদের সেবায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত করে আরো বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রের সন্ধান করতে লাগলেন। সুযোগও মিলল। প্রথমে রেক্সহ্যামের সেকেণ্ডারী স্কুলে, তারপর চেস্টারে। সেইসময় মার্গারেট শিশু-মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের প্রগতিমূলক শিক্ষাপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার বিশেষ সুযোগ পান। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি সপরিবারে উইম্বলডনে চলে যান এবং একটি ছোট্ট স্কুলে চার থেকে ছয় বছরের শিশুদের নতুন শিক্ষা-পদ্ধতিতে গড়ে তুলতে সোৎসাহে আত্মনিয়োগ করেন।

ঐসময় মার্গারেট বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় শিক্ষামূলক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন এবং 'ফ্রি আয়ারল্যাণ্ড' নামক বিপ্লবী সম্প্রদায়ের সান্নিধ্যে আসেন। রাশিয়ার বিপ্লবকাহিনী এবং রুশ নেতৃগণের লাঞ্ছিত নির্বাসিত জীবনবৃত্তান্ত মার্গারেটের হৃদয়ে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করে। একদিকে আধ্যাত্মিক চিন্তা, অন্যদিকে পরাধীন দেশবাসীর শৃঙ্খলিত জীবনযন্ত্রণা মার্গারেটের মনে তুমুল ঝড় তোলে। তাঁর এই বিপ্লবী মনোভাবে ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি উইম্বলডনের অন্য এক অঞ্চলে 'রাস্কিন স্কুল' খুললেন, যার অধ্যক্ষা হলেন তিনি নিজেই। সেই সময়ে বিখ্যাত 'সিসেম ক্লাব'-এ বার্নার্ড শ, হাক্সলে প্রমুখ বিশিষ্ট লেখক বৈজ্ঞানিকেরা যাতায়াত করতেন। মার্গারেট সেখানকার সম্পাদিকা ও অন্যতম বক্তা নির্বাচিত হলেন এবং নিজের রুচিসম্মত কাজের সুযোগ পেয়ে তিনি 'শিশু মনস্তত্ত্ব' ও 'নারীর অধিকার'—এই দুটি বিষয়কে ঐ ক্লাবের প্রধান আলোচ্য বিষয় করে তুললেন।

মার্গারেটের বিচারশীল মন শুধু বাস্তব জগতের বিষয়বস্তু বা জড়বিজ্ঞানের আলোচনাতেই নিবৃত্ত হতে পারল না, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উদ্ঘাটনের জন্যও ক্রমশ ব্যাকুল হয়ে উঠল। সেইসময় তাঁর মন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সন্দিহান হয়ে উঠেছিল, আর তখনি লেডি ইসাবেল মার্গসনের বাড়িতে এক ঘরোয়া বৈঠকে মার্গারেট সন্ধান পেলেন সেই অনন্যসাধারণ যোগিপুরুষ, তাঁর ভাবী গুরু স্বামী বিবেকানন্দের। স্বামীজীকে প্রথম দর্শনে মার্গারেটের মনে যে-অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল, সেগুলি তিনি তাঁর বিখ্যাত 'The Master as I saw Him' গ্রন্থে লিখে গেছেন। গৈরিক আলখাল্লা পরিহিত স্বামীজীর মুখমণ্ডল জুড়ে এক অদ্ভুত কোমলতা ও মহত্ত্বের ভাব ছড়িয়ে ছিল। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের মনে হচ্ছিল, যেন কোন দূর দেশের বার্তা নিয়ে ঈশ্বর স্বয়ং তাঁদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি কথোপকথন প্রসঙ্গে বলেওছিলেন, স্বামীজী তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নির্দেশেই তাঁর বৈদান্তিক বার্তা সমগ্র জগতে প্রচারের জন্য বেরিয়েছেন। তাঁর বিশ্বাস, বেদান্তের উদার জ্ঞানসমূহ সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষই তাদের নিজ নিজ ধর্মের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও গ্রহণ করতে পারে এবং স্বামীজীর ঐ আশ্বাসবাণীই মার্গারেটকে নতুন পথের সন্ধান দিল।

বিভিন্ন সভায় স্বামীজীর বক্তব্য ও উপদেশ-বাণী মার্গারেটকে ক্রমশ আধ্যাত্মিক চিন্তাসাগরে নিমগ্ন করছিল। স্বামীজী স্বয়ং সেটা অনুধাবন করছিলেন। ১৮৯৭-এ লণ্ডন ছেড়ে আসার আগে মার্গারেটকে একদিন ডেকে স্বামীজী বলেছিলেন, ভারতবর্ষই মার্গারেটের প্রকৃত স্থান এবং তার জন্য তাঁকে প্রস্তুত হতে হবে। দেশে ফিরেও তিনি মার্গারেটকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন: "পাড়ি দেবার আগে অবশ্যই ভেবে নেবে। তবে কাজে নামার পর যদি কোনভাবে ব্যর্থ হও বা বিচলিত হও, দেশের জন্য কোন কাজ কর বা নাই কর, বৈদান্তিক হতেও যদি অক্ষম হও, তবুও আমি তোমার পাশে থাকব, শপথ করছি।"

ঐবছরই অক্টোবরে স্বামীজী আরো একটি চিঠি লিখলেন মার্গারেটকে: "ভালবাসার শক্তিতেই জড়বস্তু চিন্ময় হয়। জড়ের মধ্যে তিলে তিলে চৈতন্যের উদয় করেই অগ্রসর হতে হবে। শুধুমাত্র ভাবালুতায় কোন কাজ হয় না। বজ্রের মতো কঠোর ও কুসুমের মতো কোমল হয়েই চলতে হবে সর্বত্র।"

স্বামীজীর ঐ চিঠি পাওয়ার পর মার্গারেট আ'র চুপ করে থাকতে পারলেন না। ১৮৯৮-এর ২৮ জানুয়ারি মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল ভারতে এসে পৌঁছালেন। কলকাতার বন্দরে স্বয়ং স্বামীজী তাঁকে স্বাগত জানালেন। এর কয়েকদিন পরই মিস মুলার, মিস ম্যাকলাউড ও মিসেস ওলি বুল (যিনি 'ধীরামাতা' নামে পরিচিত হয়েছিলেন) উপস্থিত হন। বেলুড় মঠের নির্মাণ কাজ তখন চলছিল। ঐ নতুন জমিতেই তাঁদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল অস্থায়িভাবে। স্বামীজী নিয়মিত সেখানে তাঁদের খোঁজখবর নিতেন ও ভারতের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, পুরাণ, সামাজিক রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে সবাইকে, বিশেষ করে মার্গারেটকে বুঝিয়ে তাঁদের সামনে ভারতবর্ষের এক

উজ্জ্বল আলেখ্য তুলে ধরার চেষ্টা করতেন এবং অফুরন্ত শক্তি ও প্রেরণা সঞ্চার করতেন সবার মনে।

স্বামীজী বুঝতে পেরেছিলেন, মার্গারেটকে ভারতের বিশাল কর্মযজ্ঞে নামাতে হলে তাঁকে আগে জন-সাধারণের সঙ্গে পরিচিত করাতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে ১৮৯৮-এর মার্চে স্টার থিয়েটার হল-এ মার্গারেটের বক্তৃতার আয়োজন করেন। বক্তব্যের বিষয় ছিল—'ইংল্যাণ্ডে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তার প্রভাব'। হল-এ উপস্থিত অগণিত দর্শক মার্গারেটের সুচিন্তিত অভিনব বক্তব্যে অভিভূত হয়ে এই বিদেশিনীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠে এবং মার্গারেটের ঐ সাফল্যে স্বামীজীর উৎসাহ আরো বেড়ে যায়।

তখন বাগবাজারে ১০/২ বোসপাড়া লেনের ভাড়াবাড়িতে সঙ্ঘজননী শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী যোগানন্দজী থাকতেন। স্বামীজী বুঝেছিলেন, মার্গারেট ও তাঁর সঙ্গীদের যদি শ্রীশ্রীমা গ্রহণ করেন তাহলে কুসংস্কারগ্রস্ত হিন্দুসমাজও তাঁদের গ্রহণ করবে এবং মার্গারেট ও তাঁর সহকর্মীদের এদেশে কাজ করতে কোন অসুবিধা হবে না। একদিন স্বামীজী মার্গারেট ও তাঁর সঙ্গীদের বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে পাঠালেন। নিজে থাকলেন আড়ালে। শ্রীশ্রীমা সেদিন অন্য মহিলাদের মতোই ঐ বিদেশিনীদেরও সস্নেহে স্বাগত জানিয়ে সকলের সঙ্গে একই ঘরে একসঙ্গে বসে ঠাকুরের প্রসাদী ফল-মিষ্টি খেয়েছিলেন এবং একজন দোভাষীর মাধ্যমে মার্গারেট ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে বাক্যালাপ করেছিলেন। শেষে তাঁদের প্রাণভরে আশীর্বাদ করে মার্গারেটের উদ্দেশে বলেছিলেনঃ "তুমি আসায় আমার ভারি আনন্দ হয়েছে মা।" মায়ের এই উক্তি ও সম্বোধন তাঁর সঙ্গীদেরও আনন্দিত ও উৎসাহিত করেছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাধন্যা ও ভক্ত মহিলাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গোঁড়া অথচ সর্বজনশ্রদ্ধেয়া অঘোরমণি দেবী (যিনি 'গোপালের মা' নামে পরিচিতা ছিলেন) সস্নেহে মার্গারেট ও তাঁর সঙ্গীদের কাছে ডেকে নিয়েছিলেন। মার্গারেট ও তাঁর সঙ্গীরা এক পূর্ণিমার রাতে নৌকাযোগে কামারহাটীতে গোপালের মাকে যখন দর্শন করতে গিয়েছিলেন, গোপালের মা তাঁদের সবাইকে নির্দ্বিধায় নিজের বিছানায় বসিয়ে চুম্বনে আদরে ভরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের ঘরের মুড়ি নারকেলও খাইয়েছিলেন। মার্গারেট ও তাঁর সঙ্গীরা গোপালের মায়ের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং প্রসাদ-জ্ঞানে



শ্রীশ্রীমা ও নিবেদিতা

গোপালের মায়ের কাছ থেকে আরো মুড়ি চেয়ে নিয়েছিলেন আমেরিকায় পাঠাবেন বলে। এইভাবে বিদেশিনীরা একে একে পুরুষ ও মহিলা ভক্তবৃন্দের কাছে ক্রমে সমাদৃত ও আদরণীয় হয়ে উঠেছিলেন। স্বামীজী মনে মনে উৎফুল্ল হয়েছিলেন এই ভেবে যে, হিন্দুসমাজ বিশেষ করে হিন্দু মহিলারা মার্গারেটকে সাদরে গ্রহণ করতে আর দ্বিধা করবে না।

স্বামীজী মার্গারেটকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করার কথা তখনি স্থির করেন এবং মার্গারেট সে-খবর পাওয়া মাত্র নিজেকে মনেপ্রাণে প্রস্তুত করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, ব্রহ্মচর্য ব্রতের পবিত্রতায় তাঁর বিচ্ছিন্ন জীবনধারা সাবলীল ছন্দে প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ পাবে। ১৮৯৮ সালের ২৫ মার্চ ব্রাহ্মমুহূর্তে বেলুড়ে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের উদ্যানবাটীতে স্বামী বিবেকানন্দ মার্গারেটকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করে নাম দেন 'নিবেদিতা'।

সেই বছরই এপ্রিলে কলকাতায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। স্বামীজী দার্জিলিং থেকে সে-খবর পেয়ে কলকাতায় ছুটে আসেন এবং গুরুভাইদের সঙ্গে নিয়ে প্লেগাক্রান্ত রোগীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। পরের বছর যখন কলকাতায় আবার প্লেগ দেখা দেয়, স্বামীজী নিবেদিতাকে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাসঙ্ঘের

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত করেন। নিবেদিতা তাঁর সন্ন্যাসী সেবক সহকর্মীদের নিয়ে কোদাল হাতে বাগবাজার পল্লীর রাস্তাঘাট পরিষ্কার করেন এবং রোগীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁকে ঐ অবস্থায় দেখে পল্লীর যুবকেরাও ঝাড়ুহাতে রাস্তায় নেমেছিল এবং নিবেদিতার ঐ মহৎ কাজে সামিল হয়েছিল।

ঐবছরই মে মাসে স্বামীজী তাঁর কয়েকজন গুরুভাই এবং মার্গারেট ও তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে তীর্থদর্শনের উদ্দেশ্যে উত্তরভারতে রওনা হন। প্রথমে নৈনীতালে কয়েকদিন বিশ্রাম সেরে সকলে আলমোড়ার উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং পথের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, স্বয়ং স্বামীজীর সঙ্গ ও সান্নিধ্যের কথা নিবেদিতা 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে' গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন। এইসময় স্বামীজী সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে প্রায় বিস্মৃত ইতিহাসের অনেক মর্মকথা শোনাতেন। নানান ঐতিহাসিক ঘটনা সুন্দর গল্পচ্ছলে বলতেন। কিন্তু সহসা স্বামীজী অনুভব করলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবের ক্ষীণ ফল্গুধারা তখনো প্রবাহিত নিবেদিতার মনে। তিনি আরো উপলব্ধি করলেন, তাঁর ওপর নিবেদিতা ক্রমশ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। ঐ অবস্থায় নিবেদিতার দ্বারা কোন জনকল্যাণমূলক কাজ করা সম্ভব নয়। তাই নিবেদিতাকে স্বাবলম্বী ও তাঁর ভাবনাকে পুরোপুরি ভারতমুখী করতে স্বামীজী সহসা তাঁর প্রতি কঠোরভাবে উদাসীন হন। স্বামীজীর হঠাৎ এই পরিবর্তনে নিবেদিতা প্রথম প্রথম খুবই মর্মাহত হন। কিন্তু পরে তিনি অনুভব করেন স্বামীজীর আসল উদ্দেশ্য কি। তখন তিনি লজ্জিত হন এবং স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে তৎপর হন।


উত্তরভারতে স্বামীজী ও নিবেদিতা

এরপর এক সন্ধ্যায় দ্বিতীয়ার চাঁদ দেখে স্বামীজী সকলকে আহ্বান করেন মুসলিমদের মতো বাল-শশীকে নিয়ে নতুন আনন্দে জীবন শুরু করতে। নিবেদিতা তখনি অশ্রুজলে স্বামীজীর পদযুগল ধুয়ে তাঁর আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন। স্বামীজী তাঁকে আশীর্বাদ করে বলেন, নিবেদিতা কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। বস্তুত, তখনি নিবেদিতার প্রকৃত পুনর্জন্ম হয়েছিল। সেই সময় শান্ত সমাহিত আত্মস্থ নিবেদিতার মুখ জুড়ে এক গভীর প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়েছিল। 'The Master as I saw Him' গ্রন্থে নিবেদিতা তাঁর এই অনুভূতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

আলমোড়া থেকে সদলবলে স্বামীজী পাঞ্জাব হয়ে কাশ্মীরে পৌঁছেছিলেন। শ্রীনগরে সকলে মিলে একটি হাউসবোট ভাড়া করে কয়েকদিন ছিলেন। কাশ্মীরের দর্শনীয় ও আধ্যাত্মিক স্থানগুলি দেখার পর সবচেয়ে দুর্গম পর্বতগুহা অমরনাথ দর্শনের জন্য স্বামীজীর মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। অবশেষে পথশ্রমে ক্লান্ত ও বিশেষত পথের দুর্গমতার কথা চিন্তা করে একমাত্র নিবেদিতাকেই সঙ্গী করে স্বামীজী রওনা হন। পথে অবশ্য প্রায় তিন হাজার সাধু-সন্ন্যাসী ও ভক্ত তাঁদের যাত্রাপথের সঙ্গী হয়েছিলেন। অকল্পনীয় চিরতুষারাবৃত পার্বত্য সৌন্দর্যের কথা, পথমধ্যে দুঃসহ কষ্টের কথা, অবশেষে গুহাভ্যন্তরে অমরনাথের তুষারলিঙ্গের অবর্ণনীয় রূপ ও মহিমার কথা এবং শিবলিঙ্গ দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর অন্তরে যে তাৎক্ষণিক অনুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল, নিবেদিতা তা তাঁর 'The Master as I saw Him' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

১৮৯৮-এর ১৮ অক্টোবর অসুস্থ শরীরে স্বামীজী স্বামী সদানন্দের সঙ্গে ফিরে আসেন বেলুড় মঠে। নভেম্বরে কলকাতায় পৌঁছেই নিবেদিতা বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের কাছে সপ্তাহখানেক থাকেন। পরে বোসপাড়া লেনে এক ভাড়াবাড়িতে নিবেদিতার নতুন আবাসস্থল হয়েছিল। ঐ বাড়িটির কথা এবং বাড়ির আশপাশের পরিবেশের কথা 'Studies From an Eastern Home' গ্রন্থে লিখতে গিয়ে নিবেদিতা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, অতি অস্বাস্থ্যকর অবস্থা ও পরিবেশের মধ্যে তাঁকে থাকতে হলেও তাঁর কোন ক্ষোভ ছিল না। কারণ, স্বামীজীর নির্দেশমতো নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিণীর জীবনযাপনের জন্য ঐ বাড়িটি ছিল উপযুক্ত। এই বাড়ির একতলায় ১৯০০ সালে কালী-পূজার দিন স্বামী বিবেকানন্দ এক বালিকা বিদ্যালয়ের সূচনা করেন। যদিও প্রথমে এর 'শ্রীরামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়' নামকরণ করা হয়,

পরবর্তী কালে ১৯১৮ সালে 'রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়' নামটি চিরস্থায়ী হয়।

নিবেদিতা তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ ঢেলে সম্পূর্ণভাবে অভিনব পদ্ধতিতে পল্লীর বালিকাদের শিক্ষা দিতে শুরু করেন। প্রথমে যদিও গোঁড়া হিন্দুসমাজ বিদেশিনী নিবেদিতার কাছে তাঁদের ঘরের মেয়েদের পাঠাতে অস্বীকার করেছিল, পরবর্তী কালে তারা সকলেই নিবেদিতার উদার মধুর ব্যবহার ও নতুন শিক্ষাদান পদ্ধতিকে স্বীকৃতি জানায়। স্কুলের ছাত্রীসংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলে।

এরপর অতি পরিশ্রম ও অনিয়মের ফলে হঠাৎই স্বামীজী অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিছুদিন পর তিনি চিকিৎসকের নির্দেশে লণ্ডনে পাড়ি দেন নিবেদিতা ও স্বামী তুরীয়ানন্দের সঙ্গে। লণ্ডন থেকে যান আমেরিকার নিউ ইয়র্কে। নিবেদিতা সেখানে তাঁর স্কুলের জন্য সকলের কাছে বছরে এক ডলার করে দশ বছরের জন্য চাঁদা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আদায় করেন এবং 'পারস্পরিক সাহায্য সমিতি' গড়ে তাঁর ভারতগামী সঙ্গীদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও সহযোগিতায় উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তোলেন।

নিবেদিতার এই দ্বিতীয়বার আমেরিকা ভ্রমণ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ঐসময় স্বামীজী নিবেদিতাকে আরো নতুন নতুন দৃষ্টান্ত দ্বারা জীবনে মাথা উঁচু করে চলতে অনুপ্রেরণা দেন। সমাজের তুচ্ছাতিতুচ্ছ সংস্কারগুলিকে ঝেড়ে ফেলে তিনি স্বাধীনভাবে চলার নির্দেশ দেন নিবেদিতাকে। স্বামীজী শেষবারের মতো পাশ্চাত্য পরিভ্রমণ করে ডিসেম্বরে বেলুড় মঠে ফিরে আসেন। নিবেদিতা তখন লণ্ডনে। ১৯০২ সালের প্রথমদিকে স্বামীজী যখন অসুস্থ শরীরে কাশীতে রয়েছেন, নিবেদিতা তখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। প্রায় বছর দুয়েক ধরে নিবেদিতার অনুপস্থিতিতে ও অর্থের অভাবে মেয়েদের স্কুলটি বন্ধ ছিল। নিবেদিতা আমেরিকা থেকে সংগৃহীত অর্থে নতুন উদ্যমে স্কুলটি আবার চালু করেন। স্বামীজী শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে কাশী থেকে কলকাতায় ফিরে জুনের শেষ সপ্তাহে নিবেদিতার সঙ্গে বোসপাড়া লেনের বাড়িতে দেখা করেন এবং তাঁকে স্কুল সম্বন্ধে কিছু কথা বলার জন্য বেলুড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তখনি স্বামীজী তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, মৃত্যুর জন্য তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন। ৩ জুলাই কি এক দুর্বার টানে নিবেদিতা স্বামীজীর দর্শনপ্রার্থী হন। স্বামীজী সেদিন তাঁকে স্বহস্তে আহার পরিবেশন করেন ও তাঁর হাত ধুয়ে তোয়ালে দিয়ে মুছিয়ে দেন। নিবেদিতা সঙ্কুচিত হলে স্বামীজী যীশুর কথা তুলে বলেছিলেন, যীশুও শিষ্যদের পা ধুইয়ে দিয়েছিলেন। স্বামীজী সেদিন শেষবারের মতো নিবেদিতাকে আশীর্বাদ করেছিলেন।

১৯০২ সালের ৪ জুলাই শুক্রবার রাত ৯টায় স্বামী বিবেকানন্দ নরলীলা সংবরণ করেন। সেদিন বেলুড় মঠে স্বামীজীর দাহকার্যে উপস্থিত থেকে নিবেদিতা উপলব্ধি করেছিলেন, স্থূলশরীর ত্যাগ করলেও স্বামীজী তাঁর সঙ্গেই রয়েছেন। বস্তুত, স্বামীজীর সেই অমোঘ আশ্বাসবাণী—"আমরণ আমি তোমার পাশে থাকব" নিবেদিতার চলার পথের পাথেয় হয়েছিল।

স্কুলটি পুনরায় খুললেও একা নিবেদিতার পক্ষে চালানো ক্রমশ দুরূহ হয়ে উঠেছিল। স্বামীজীর অন্যতম শিষ্যা ভগিনী ক্রিস্টিন সেইসময় তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং দুজনের মিলিত প্রয়াসে ১৯০৩ থেকে কিণ্ডারগার্টেন থেকে বয়স্ক—সকলেই যেমন শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল, তেমনি স্কুলটি বিবাহিত ও বিধবাদেরও শিক্ষাকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে নিবেদিতা তাঁর দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'Hints on national education in India'-এ লিখেছেন—শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা বুদ্ধিকে ভারাক্রান্ত করাকে শিক্ষা বলে না। জীবন্ত ভাবরাশি যা বিদ্যার্থীর বুদ্ধি, হৃদয় ও ইচ্ছাশক্তিকে বিকশিত ও পরিমার্জিত করে যথার্থ মানুষ করে তোলে, তাকেই আসল শিক্ষা বলে। নিবেদিতার মতে শিক্ষার পূর্ণ পরিণতি হলো সেবা ও আত্মত্যাগে।

স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে নিবেদিতা তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের মতাদর্শেই অনুপ্রাণিত ছিলেন। তিনিও অনুভব করেছিলেন, কোন জাতিকে বাঁচিয়ে রাখতে নারী ও পুরুষ উভয়ের যৌথ শিক্ষা ও শক্তির প্রয়োজন। প্রাচীন ভারতের আদর্শ নারীদের ঐতিহ্য ও শিক্ষাকে সম্মুখে রেখেই বর্তমান প্রজন্মের প্রতিটি নারীর শিক্ষাগ্রহণ প্রয়োজন বলে তিনি মনে করতেন। শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে তিনি বলেছিলেন, প্রাচীন ও নবীন ভারতের সমন্বিত আদর্শে মহিমান্বিতা *শ্রীশ্রীমা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ বাণী*। তাঁর জ্ঞান ও মাধুর্য, শিষ্টতা ও উদারতা প্রতিটি নারীর জীবনে আদর্শ হয়ে উঠুক—এটাই তাঁর কাম্য ছিল। নিবেদিতা স্বামীজীর মতাদর্শে নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন তাঁর শিক্ষায়তনটিকে।

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

সেটি আজও সেই মহান আদর্শের এক জ্বলন্ত প্রতীক রূপে বিদ্যমান। শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্য দূরীকরণেও তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। শিক্ষাসংস্কারকগণকে তিনি সতর্ক করে বলেছিলেন, শিক্ষাব্যবস্থার বৈষম্য হেতু দেশের সর্বত্র গড়ে ওঠা আত্মঘাতী প্রাদেশিকতা ও সঙ্কীর্ণ মনোভাব দেশের আবহাওয়াকেই বিষিয়ে দেবে। পঞ্চাশ বছর আগে যে-ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেছিলেন, আজ আমরা তাই প্রত্যক্ষ করছি।

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে স্বামীজী নিবেদিতার পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পর জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বৈঠকে নিবেদিতা প্রায়ই যেতেন। ফলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গভীর সৌহার্দ্য গড়ে উঠেছিল তাঁর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অবসর কাটাতে পদ্মানদীর ধারে তাঁদের শিলাইদহের কাছারিবাড়িতে যখন থাকতেন, নিবেদিতাকেও সাদর আমন্ত্রণ জানাতেন। নিবেদিতা সেখানে কয়েকদিন কাটিয়ে ভারতের পল্লীসমাজ ও সেখানকার মানুষদের আরো বেশি করে বুঝেছিলেন। বুঝেছিলেন পল্লীসমাজই ভারতের প্রাণ। অনুভব করেছিলেন, ভারতের পরাধীনতাই তার সমগ্র উন্নতির অন্তরায়। তিনি তাঁর 'The web of Indian life' গ্রন্থে ভারতের বাণীকে বিশ্বমানবের মর্মবাণী বলে উল্লেখ করে ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য ও বহুবৈচিত্র্যের মধ্যেও ঐক্যের কথা বলেছেন।

ঐসময় নিবেদিতা বিপ্লবাত্মক রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে ক্রমশ জড়িয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন যেহেতু স্বামীজীর নির্দেশে রাজনীতি থেকে দূরে থাকত, তাই নিবেদিতা তৎকালীন মঠাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে রাজি করিয়ে কাগজে একটি বিজ্ঞাপন দেন—"নিবেদিতার কোন কাজ রামকৃষ্ণ মঠ কর্তৃপক্ষের সম্মতির অপেক্ষায় থাকল না। তিনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে কাজ করবেন।" সঙ্ঘের নীতি থেকে তিনি ঐভাবে নিজেকে সরিয়ে নিলেও তাঁর সঙ্গে সঙ্ঘের সকলেরই আন্তরিক ও আত্মিক যোগাযোগ বজায় ছিল।

নিবেদিতা স্বোপার্জিত অর্থ থেকে তাঁর শিক্ষায়তনের সব দেনা মিটিয়ে শ্রীশ্রীমায়ের জন্য একটি বাড়ি কেনার উদ্দেশ্যে মঠ কর্তৃপক্ষকে কিছু টাকা দেন। বাকি টাকায় বাগবাজারে নিজের বসতবাড়ির কিছু সংস্কার করেন ও স্বামী সদানন্দের সঙ্গে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। বরোদায় তিনি বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ ও রমেশচন্দ্র দত্তের সঙ্গে পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হন। কলকাতায় ফিরে মাদ্রাজ কংগ্রেসের আমন্ত্রণে তিনি দক্ষিণ ভারত যান। ফিরে সদলবলে বুদ্ধগয়া, রাজগীর প্রভৃতি দর্শন করে তিনি বিস্মিত হন এবং ভারতের বিস্ময়কর ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচনা করেন 'Footfalls of Indian history'।

নিবেদিতা নিয়মিতভাবে তখন 'অমৃতবাজার পত্রিকা', 'ডন', 'প্রবাসী', 'মডার্ণ রিভিউ', 'স্টেটসম্যান' প্রভৃতি সংবাদপত্রে পরাধীন ভারতের বিপ্লবকাহিনী ও নির্যাতনের কথা নির্ভয়ে লিখতেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি ১৯০৭ সালে লণ্ডনে যান এবং ১৯০৯ সালে কলকাতায় ফেরেন। ১৯১০ সালে তিনি পুনরায় আমেরিকা যান মৃত্যুশয্যায় শায়িত মাতৃতুল্য বান্ধবী ওলি বুলকে দেখতে। ১৯১১ সালের এপ্রিল মাসে তিনি ভারতে ফিরে দেহ ও মনের দিক থেকে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েন। অক্টোবরের প্রথমে তিনি জগদীশচন্দ্র বসু ও তাঁর স্ত্রীর আমন্ত্রণে যান দার্জিলিঙের রায়ভিলায়। সেখানে তিনি হঠাৎ কঠিন আমাশয়ে আক্রান্ত হন। তাঁকে সুস্থ করে তুলতে বসু-দম্পতির অক্লান্ত প্রয়াস এবং কলকাতার নামী ডাক্তারদের, বিশেষ করে ডাঃ নীলরতন সরকারের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। নিজের অন্তিমকাল উপস্থিত জেনে নিবেদিতা তাঁর সমস্ত অর্থ তাঁর শিক্ষায়তন পরিচালনার জন্য দান করেন বেলুড় মঠের ট্রাস্টিদের হাতে।

১৯১১ সালের ১৩ অক্টোবর শুক্রবার সকাল ৭টায় সহসা নিবেদিতার উজ্জ্বল মুখটি এক গভীর প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। অনুচ্চ কণ্ঠে ধ্বনিত হয় চিরশাশ্বত বাণী। তারপর তিনি ঢলে পড়েন মৃত্যুর কোলে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের চরণে সমর্পিতা, বিবেকানন্দের মানসকন্যা নিবেদিতা তাঁর অগণিত বন্ধুবান্ধব, শুভাকাঙ্ক্ষী ও ভক্তদের কাছ থেকে হঠাৎই যেন চলে গেলেন। তাঁর অন্তর্ধানে গোটা বাংলা তথা ভারত বিস্মিত ও মর্মাহত হয়েছিল।

শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক টানে যে-বিদেশিনী একদিন নিজের সমস্ত সুখ, বিলাস, ঐশ্বর্য, স্বার্থ ও দেশ ত্যাগ করে ভারতের ঐতিহ্য, আদর্শ, সমাজ, রাজনীতি, শিল্প, বিজ্ঞান, সর্বোপরি শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যেভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র সকলের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে 'ভগিনী নিবেদিতা' হয়ে উঠেছিলেন, তা সত্যিই বিস্ময়কর। তাঁর সৃষ্টি, কীর্তি এবং ভারতবাসীর প্রতি অতুলনীয় শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও কর্তব্যনিষ্ঠা তাঁকে অমর করে রেখেছে। ❑

দুই শতকের উইলের আলোকে বাঙালী সমাজ

পূর্ণেন্দুনাথ নাথ


উইল হলো ইচ্ছাপত্র। কোন ব্যক্তির অবর্তমানে তাঁর সম্পত্তির ব্যবহার কিভাবে হবে, তাঁর প্রস্তাবিত কার্যগুলি কে বা কারা সম্পাদিত করবেন, কি কি শর্ত মেনে তা করা হবে ইত্যাদি নির্দেশাবলীই উইলে লেখা থাকে। ইংরেজরা এদেশে আসার পরই এই ধরনের উইল তৈরি করার ব্যাপক উদ্যোগ শুরু হয়। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে বাংলার বিত্তশালী সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই এধরনের উইল তৈরি করে যান। এইসব উইলে একদিকে যেমন তাঁদের সম্পদের বিশালত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়, অন্যদিকে তৎকালীন বাংলার সমাজজীবনেরও একটি চিত্র পাওয়া যায়।

এইসব উইলের অধিকাংশই বাঙলা ভাষায় রচিত, কিছু কিছু উইল ইংরেজীতে রচিত। বাঙলা উইলে সমকালীন বাঙলা গদ্যভাষার একটি পরিচয় পাওয়া যায়, যদিও আদালতী ভাষা হিসাবে কিছু আড়ষ্টতা ও বাধ্যবাধকতা বর্তমান।

উইল-প্রণেতার অবর্তমানে উইলকে কার্যে পরিণত করতে যে-ব্যক্তির ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হতো, তাঁকে কোথাও 'কর্মাধ্যক্ষ', কোথাও 'কার্যকারক', কোথাও বা 'একজেকিউটর' বলা হয়েছে। ঐ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কোথাও স্ত্রী, পুত্র ইত্যাদি আত্মীয় হতেন, কোথাও বা সম্পূর্ণ অনাত্মীয় ব্যক্তি হতেন। যেমন ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দের ১৮ আগস্টে লিখিত একটি উইলে দেখা যায়ঃ "লিখিতং শ্রী জুগল কিশোর আঢ্যস্য। উইল পত্রমিদং কার্য্যঞ্চ আগে আমি আমার স্ত্রী শ্রীমতি কিশোরি দাসি ও আমার পুত্র শ্রী নন্দলাল আঢ্যকে স্বইসসা পূর্ব্বক আমার ইষ্টেটের জাইন্ট একযেকিউটরস্ করিলাম আমার দৌলাত ও আমলা ওগয়রহ সমূহের মালিক করিলাম।" *(ভাষা ও বানান অপরিবর্তিত)*

আবার ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে করা একটি উইলে ব্রজমোহন আঢ্য লিখছেন যে, তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিচালন ও নির্দেশকে কার্যে রূপান্তরিত করবেন প্রভুরাম দে, রঘুনাথ চন্দ্র, স্বরূপ চন্দ্র ও গোকুল দাস। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তৈরি এক উইলে রূপচাঁদ ধর জনৈক গোবিন্দচন্দ্র ধরকে একজিকিউটর করেন।

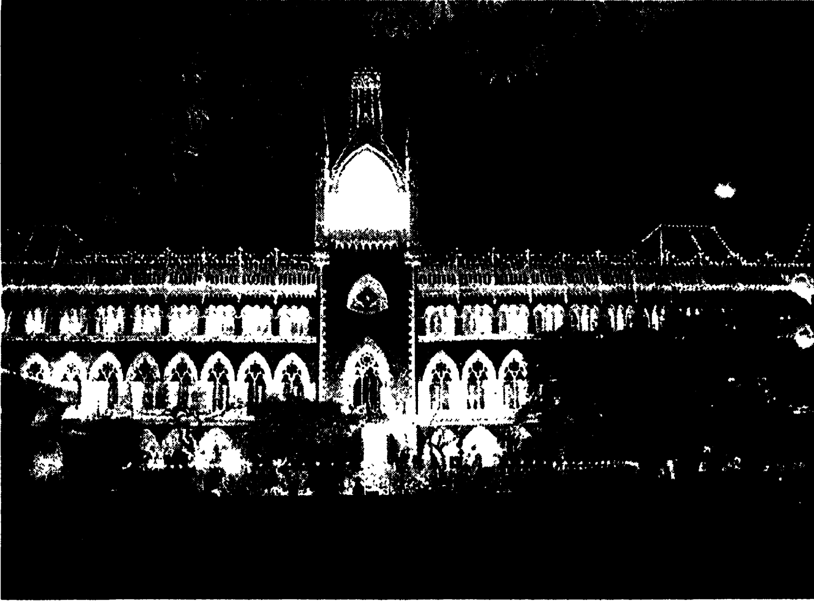
পূর্বোক্ত ব্রজমোহন আঢ্য যে উইল করেন, তাতে তাঁর আত্মীয়-পরিজনের জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ করেননি। সম্পত্তির সমস্ত আয়ই মানবহিতার্থে ব্যয়ের নির্দেশ ছিল। তাতে বলা ছিল যে, তাঁর সম্পত্তির আয় থেকে শ্রীশ্রীঈশ্বর আখড়া অর্থাৎ যেখানে বৈষ্ণব সাধুরা থাকেন তার ব্যয়নির্বাহ করতে হবে। আর ঐ আয় থেকে নগদ চার হাজার টাকা খরচ করে সর্বসাধারণের উপকারার্থে একটি পুকুর খনন করতে হবে।

রূপচাঁদ ধরের যে-উইলের কথা আগে উল্লেখ করা হয়েছে, তার একটা বৈশিষ্ট্য হলো যে, ঐ উইলে সমস্ত সম্পত্তির সঙ্গে তাদের দামেরও উল্লেখ আছে। তাই ঐ উইলটিকে আদালত ভবিষ্যৎ উইলের আদর্শরূপে ঘোষণা করে। ঐ উইলে বলা হয়েছে যে, সম্পত্তির আয় থেকে ত্রিশ হাজার টাকা করে প্রতি বছর দুর্গাপূজা, দোলযাত্রা ও অন্যান্য পূজার জন্য খরচ করতে হবে। তাছাড়া পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা রূপচাঁদের মৃত্যুর পর বিভিন্ন সৎকাজে ব্যয়িত হবে। সেইসঙ্গে কাশী, গয়া ও শ্রীক্ষেত্র তীর্থে বিভিন্ন সৎকাজে দশ হাজার টাকা করে খরচ করতে হবে।

রূপচাঁদের উইলের একজিকিউটর গোবিন্দচন্দ্র ধরও ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ১ নভেম্বর নিজে একটি উইল করেন। তার প্রথমেই উল্লেখ করেন যে, তাঁর সম্পত্তির মধ্যে পাঁচ হাজার টাকা তাঁর মা ঠাকুরমণির নামে থাকবে। তিনি যতদিন বেঁচে থাকবেন, ততদিন ঐ টাকার সুদ তিনি পাবেন। আর তাঁর মৃত্যুর পর ঐ পুরো টাকা দিয়ে তাঁর একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ হবে। এই উইলের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো যে, এতে অন্যদের মধ্যে যেভাবে অর্থ বণ্টন করার উল্লেখ রয়েছে তা খুবই আকর্ষণীয়। বলা হয়েছে, তাঁর সম্পত্তি থেকে দুশ টাকা পাবেন পুরোহিত রামধন ঠাকুর। আর বাড়ির সকল কর্মচারী, পেয়াদা, চাকর, ঝি, পাচক ইত্যাদিরা পাবেন তাঁদের মাইনের দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ। তাছাড়া গয়া, কাশী, বৃন্দাবন ও শ্রীক্ষেত্র—এই চার জায়গায় এক হাজার টাকা করে খরচ করে পুণ্যসঞ্চয় করতে হবে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সেকালে পোষ্য-পরিজনের সঙ্গে কর্মচারী-দেরও সমদৃষ্টিতে দেখা হতো।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত দুখানি উইল থেকে বাঙালী সমাজজীবনের দুটি স্খলনের চিত্র পাই।

১৮২৪ খ্রীস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারি জনৈক উদয়নারায়ণ বসাক তাঁর উইলে লিখছেন ঃ "আমার ছোট স্ত্রী সমি পেয়ারী দাখি আপন পিতার অনুমতিতে সন্তান উৎপত্তির কারণ অন্যপুরুষ সঙ্গ করিয়াছেন তাহাতে অনুপাতক হইয়াছে প্রায়াশ্চীতি করিতে কহিয়াছিলাম করেন নাই এই কারণে আমি ইহাকে ত্যাগ করিয়াছি। শাস্ত্রানুসারে প্রায়াশ্চীতি না করিলে উহার দাহ ও অশৌচ ও শ্রাদ্ধ নাই। কদ্যাপী আমার মৃত্যুর পরে ইনি পুনরায় আমার বাটীতে থাকে তবে ইহাকে ১০ টাকা হিসাবে খোরাক ও পোষাক করণ খরচ দিবে।" *(ভাষা ও বানান অপরিবর্তিত)*



রাত্রে আলোকমালায় সুসজ্জিত কলকাতা হাইকোর্ট

বহুবিবাহ প্রথা সমাজের নৈতিকতাকে কতদূর নিচে নিয়ে গিয়েছিল, এই উইলখানিই তার প্রমাণ।

১৮১৯ খ্রীস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি করা এক উইলে জনৈক রঘুনাথ পাল লিখছেন ঃ "আর বড়পক্ষের মেজপুত্র শ্রী সিবনারায়ণ পাল মন্দলোক সমিভার করিয়া মন্দবুদ্ধি প্রকাশ করিয়াছেন ১ দফা সন ১৮১৭ সাল ইংরাজি কাপতেনি করিয়া টাকা কর্জ্য করেন কাপতেনির য়সাদ জে সকল মন্দ লোকেরা আন্দাজ দুই হাজার টাকার খত কিম্বা, নোট লিখাইয়া লয় কিছুকাল বাদ দিয়া কিছু জিনিষ দেয় কিছু টাকা দেয় ডিসকঔট আন্দাজ চার পাচ টাকার হিং লয়ে দুই হাজার টাকার খত দিলে খাতোকে আন্দাজ হাজার বারসত টাকা পায় বাকী চাতরি করিয়া লয় এইরূপে শ্রী গোপাল চন্দ্র বেন্যার স্থানে ও বিশ্বনাথ ঘোষের স্থানে দুই হাজার করিয়া চারি হাজার টাকা কর্জ্য করেন এবং চার পাচ মাহার মর্দে বদকযুই করিয়া টাকা বাজে খরচ করেন ঐ টাকার নিমির্থে ঘরে লুকাইয়া থাকেন কহেন আমি কুকর্ম করিয়াছী এমত অন্যায় কখন করিব না এইবার আমাকে কর্জ্য হইতে উদ্ধার করিয়া দেন তাহাতে আমি ঐ দুই জোনাকে টাকা দিয়া পরিশোদ করিলাম পরে ইং ১৮১৮ সাল ১ জানের আমার অবাদ্য হইয়া বাটী তেয়াগ করিয়া জাইয়া কলিঙ্গা মোকামে এক বাটী ভাড়া লইয়া এবং ঐ কাপতেনি টাকা কর্জ্য করেন ঐ সকল মন্দ লোকের স্থানে জানিতে পাই গাড়ি ঘোড়া ও ব্রজোবাসি চাকর এবং পালকী এবং কতোগুলি মন্দো লোক সঙ্গে থাকেন এইমতে বাকোয়া খরচ করিয়া সাত মাহাতে পোনোর হাজার টাকা দেন হইয়া বড় জেলে কয়েদ হইয়াছেন যেমত সন্তান হইতে আমার ইষ্টেত সকল নষ্ট হইতে পারে একারণ এমত কুপুত্র শ্রী সিবনারায়ণ পাল এই উইলে তের্জ্জিপুত্র স্থির করিলাম। আমার দুই সংসার তাহাতে বড়পক্ষের জেষ্টপুত্রের দুই পুত্র ছোটপক্ষের তিনপুত্র আর বড়পক্ষের ত্রিতিও

একপুত্র একুনে পুত্র পৌত্র ৬ দুইপক্ষের কন্য ৯ একুনে ১৫ পোনের সন্তান এইদিগের জাহাকে জাহা দিলাম তাহাই পাইবেক ও আমার ইষ্টেতের সহিতের শ্রী সিবনারায়ণ পালের কোনো দাওয়া কস্মিন কালে নাই এবং এই সকল উত্তর অধিকারী পুত্র কন্য উপর কোন দাও করেন তাহা পাইবেন নাই।" *(ভাষা ও বানান অপরিবর্তিত)*

এরপর তাঁর সম্পত্তির বিলিব্যবস্থা এবং পোষ্যগণের প্রতি তাঁর দেয় সম্পত্তির বিবরণ দিয়ে তিনি আবার লিখছেন ঃ "শ্রীযুত সিবনারায়ণ পাল খোরপোষ নিমির্থে ইষ্টেত হইতে নগদ মাং ২৫ পচিষ টাকা দরমাহা পাইবেন যিনি সেওয়ার জে ইষ্টেত থাকলে তাহা এই উলের পুত্র পউত্রদিগের সাজায় থাকীবেন সিবনারায়ণ পালের এই পচিষ টাকা সেওয় যায় কোন দাওয়া ইষ্টেতে নাই।" *(ভাষা ও বানান অপরিবর্তিত)* সেই সময়ে 'বাবু কালচার' সমাজে যে কতদূর ক্ষত সৃষ্টি করেছিল, তার চিত্র পাই এই উইলে।

ওপরের দুটি উইল থেকে আরেকটি বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা হলো—স্ত্রী বা সন্তান যত অসৎ পথই নিক না কেন, তাদের ভবিষ্যতের ন্যূনতম গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ব্যবস্থা করাকে তৎকালীন সমাজ অবশ্যকর্তব্য বলে মনে করত।

সেসময়ে আর্যাবর্তে একটি শ্লোক প্রচলিত ছিল ঃ

"অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ সৌরাষ্ট্রান্ মগধানস্তথা।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারম্ অর্হতি।।"

অর্থাৎ অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধে তীর্থযাত্রা ভিন্ন অন্য কোন কাজে গেলে অবশ্যই প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। অপর যেকোন কারণই বর্তমান থাকুক না কেন, বাঙালী সমাজ ধর্মহীন বা ভক্তিশূন্য কখনোই ছিল না। অন্তত এই উইলগুলিই তার প্রমাণ।

ওপরে উল্লিখিত প্রায় সকল উইলেই মোট সম্পত্তির কিছু অংশ ধর্মীয় কাজে ব্যয়িত হওয়ার নির্দেশ আছে। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের ৬ এপ্রিলে লিখিত এক উইলে কৃষ্ণচন্দ্র পালচৌধুরী লেখেন ঃ "আমার স্বনামে ও বেনামে সঞ্চিত অর্থ ও সম্পত্তি থেকে এক লক্ষ টাকা খরচ করে একটি শিব প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং আমার ছোট স্ত্রী অন্যান্য খরচ ছাড়া ত্রিশ হাজার টাকা শুধু পুণ্য কাজ করার জন্য পাবেন।" *(ভাষা ও বানান অপরিবর্তিত)* এইরকম ধর্মীয় কাজ করার নির্দেশ প্রায় সব উইলে থাকলেও বিশিষ্ট ধনী নিমাইচরণ মল্লিকের উইলটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য।

১৮০৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে নিমাইচরণ এক উইলে তাঁর আট ছেলের মধ্যে প্রথম দুই ছেলেকে কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন এবং বলেন যে, এই দুভাই তাঁর নির্দেশিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ পালনের সময়ে অপর ছয়ভায়ের মত নেবে। কিন্তু সকলের মধ্যে মতের মিল না হলে বড় দুভায়ের মত অনুযায়ী কাজ হবে।

এরপর উইলকারীর বর্ণনা—কি কি ধর্মীয় কাজ করতে হবে ঃ "আমার ইচ্ছা যে, শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ও শ্রীশ্রী-জগন্নাথের কিছু কাজ করি। আর গঙ্গার ধারে একটি ঘাট নির্মাণ করি। তাছাড়া নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্‌ভাগবত, মহাভারত, বাল্মিকীপুরাণ ও চৈতন্যমঙ্গল পাঠ হবে। মাহেশের শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবজী, বল্লভপুরের শ্রীশ্রী-রাধাবল্লভজী ও কাঁচরাপাড়ার শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়জীর নিয়মিত পূজার্চনার জন্য আমার হিসাবের খাতায় নগদ অর্থ জমা আছে। সেই অর্থের সুদ থেকে ঐসব দেবতার মাসিক খরচ আমি যেভাবে নির্বাহ করি তোমরাও নিয়মিতভাবে সেইভাবে খরচ করবে। তাছাড়া শ্রীশ্রী-বৃন্দাবনে একটি কুঞ্জ নির্মাণের জন্য আমার মা আমাকে কিছু টাকা দিয়েছিলেন। তা আমার খাতায় জমা আছে। আমার জীবদ্দশায় একাজটি আমি সম্পন্ন না করতে পারলে তোমরা তা সম্পন্ন করবে। সেইসঙ্গে অম্বিকায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর উদ্দেশে একটি মন্দির নির্মাণের ইচ্ছা আমার আছে। আমার অবর্তমানে একাজটিও আমার অর্থ থেকে তোমরা করে দিও।" *(ইংরেজী থেকে অনূদিত)*

নিমাইচরণ মল্লিকের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেদের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে এক দীর্ঘস্থায়ী মামলা হয়। অবশেষে ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে আদালত উইল অনুযায়ী শুধু পুণ্যকাজের জন্য এই খরচটি অনুমোদন করেন ঃ

(১) বৃন্দাবনে একটি কুঞ্জ নির্মাণ—১০,০০০ টাকা, (২) জগন্নাথের খড়ের চাল সমেত একটি পাকা দালান নির্মাণ—৫,০০০ টাকা, (৩) গঙ্গার একটি ঘাট নির্মাণের বাকি অংশ (নিমাইচরণ মল্লিক জীবিত অবস্থায় কিছু অংশ করেন)—৬,৯৮৪ টাকা, (৪) শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ (নিয়মিত)—৪০,৮০০ টাকা, (৫) বাল্মিকী-রামায়ণ পাঠ (নিয়মিত)—৪০,৮০০ টাকা, (৬) মহাভারত পাঠ (নিয়মিত)—৪০,৮০০ টাকা, (৭) অম্বিকার শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মন্দির নির্মাণ—৪১,০৮৩ টাকা ০৩ পাই, (৮) বৃন্দাবনে অপর একটি কুঞ্জ নির্মাণ—১০,০০০ টাকা, (৯) মাহেশের শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, বল্লভপুরের শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজী ও কাঁচড়াপাড়ার

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়জীর নিয়মিত পূজা বাবদ—৯,১৫৯ টাকা ০৯ আনা ০৬ পাই।

সেইসঙ্গে পুণ্যকাজের খরচও আদালত অনুমোদন করে—নিমাইচরণ মল্লিক ও তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর নিয়মিত একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ বাবদ ৭২ টাকা করে প্রতি ক্ষেত্রে ১,২০০ টাকা হিসাবে ২,৪০০ টাকা, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মৃত্যুর পর প্রতি বছর প্রতি ক্ষেত্রে ৬ টাকা খরচ করে মহালয়া অমাবস্যায় ও দীপান্বিতা অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ। এর জন্য মোট ১০০ টাকা করে ৪০০ টাকা। সব মিলিয়ে দেখা যায় যে, নিমাইচরণ মল্লিকের উইলে শুধু ধর্মকর্মাদির জন্য ২,০৭,২২৬ টাকা ০৯ আনা ০৯ পাই খরচের বিধান আছে।

এই উইলের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, নিমাই মল্লিক তাঁর উইলে শুধু ছেলেদের নয়—মেয়েদেরও সংস্থান রেখে যান। তাঁর দুই বিবাহিতা কন্যা কমলমণি ও অলকমণি উভয়ের জন্যই আলাদা বসতবাটী ও নগদ ১০,০০০ টাকা করে দিয়ে যান, যার সুদ থেকে প্রতি মেয়ের বছরে ৮০০ টাকা করে আয় হবে।

আরেকটি উইলের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। এর লিখিত প্রতিরূপ পাওয়া যায়নি। কিন্তু ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দের একটি মামলায় বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষই তাঁদের পূর্বপুরুষের করা এই উইলের কথা স্বীকার করেছেন। ঠাকুর পরিবারের আদিপুরুষ জয়রাম ঠাকুর কলকাতার পুরনো কেল্লা এলাকায় বাস করতেন। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলা কলকাতা আক্রমণ করলে সিরাজের সৈন্যরা জয়রামের প্রচুর ধনসম্পত্তি লুট করে। অন্ততপক্ষে তাঁর ৫ থেকে ৭ হাজার টাকার মণিমুক্তা ও গৃহের সব সম্পত্তি লুট হয়। জয়রাম ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দেই মারা যান। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর জীবিত বড় ছেলে নীলমণি ঠাকুরকে নির্দেশ দেন যে, তাঁর বাড়ি, জমি, বাগান ইত্যাদি বিক্রি করে যে-টাকা পাওয়া যাবে এবং লুট হওয়া সম্পত্তির কোন ক্ষতিপূরণ পাওয়া গেলে সব টাকাই গৃহদেবতা রাধাকান্ত দেবের নিয়মিত সেবা ও উৎসব এবং সাধু-ফকিরদের আহারাদি-সহ সেবার জন্য ব্যয় করতে হবে। সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে সন্ধি হলে ইংরেজদের পক্ষে মিস্টার ড্রেক জয়রামের লুট হওয়া সম্পত্তি বাবদ ছয়হাজার টাকা আদায় করে নীলমণিকে দেন। নীলমণি সমস্ত অর্থ—জয়রামের সম্পত্তি বিক্রিবাবদ ৫,০০০ টাকা, জয়রামের রেখে যাওয়া নগদ ২,০০০ টাকা এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ পাওয়া ৬,০০০ টাকা—মোট ১৩,০০০ টাকা কোম্পানীর কাগজে বিনিয়োগ করেন এবং তার সুদ থেকে রাধাকান্ত দেবের নিয়মিত পূজা-উৎসব ও সাধু-ফকিরদের সেবার ব্যবস্থা চালু করেন।

এসবের বিপরীতে আরেকটি উইলের উল্লেখ তাৎপর্যবহ। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে গোকুলচন্দ্র কারফরমা নামে কোন ব্যক্তি তাঁর উইলে এক প্রতিবাদী চিত্র তুলে ধরেন। উইলের প্রথমেই তিনি খুব স্পষ্টভাষায় বলেছেন যে, এই উইল হিন্দু মতানুসারে সিদ্ধ কিনা তাতে তাঁর সন্দেহ আছে। "তবুও এটিই আমার উইল।" এরপর তিনি লিখছেন : "আমার যা নির্দেশ তা বেদের চেয়ে বড় বলে জানবে এবং অতি অবশ্যই সেই অনুযায়ী কাজ করবে। শ্রাদ্ধশান্তি ইত্যাদির কোনই মূল্য নেই। এসব করলেও কেউ জগতের দুঃখ-কষ্ট থেকে সরে থাকতে পারবে না। তাই আমার কঠোর নির্দেশ যে, আমার সৎকার ও শ্রাদ্ধ ইত্যাদি তোমাদের নিজের মনের শান্তির জন্য করতে পার, কিন্তু কিছুতেই তার জন্য দুশো টাকার বেশি খরচ করতে পারবে না।" আবার ঐ উইলের শেষে তিনি লিখছেন : "আমার বিমাতা আমার সরকারে (পরিবারে) আছেন। তাই উইল-গ্রহীতাদের প্রতি আমার নির্দেশ যে, আমার অবর্তমানে ইনি যতদিন বাঁচবেন, ততদিন আমার সম্পত্তি থেকে তাঁর উপযুক্ত ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে এবং এঁর মৃত্যুর পর সৎকার, শ্রাদ্ধশান্তির ব্যাপারে চারশো থেকে পাঁচশো টাকা খরচ করতে পার।" *(ইংরেজী থেকে অনূদিত)*

লক্ষণীয় যে, শ্রাদ্ধশান্তির ব্যাপারে উইলকারীর এতই অবিশ্বাস যে, শুধু অন্যান্যদের মনোতুষ্টির কারণে তিনি নিজের শ্রাদ্ধের জন্য অতিকষ্টে মাত্র দুশো টাকা খরচ করতে দিতে রাজি, কিন্তু বিমাতা যেহেতু এসবে বিশ্বাস করেন, তাই তাঁর জন্য চারশ থেকে পাঁচশ টাকা খরচ করতে দিতেও অরাজি নন। বিমাতার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠার (১৮০০ খ্রীস্টাব্দ) প্রায় সমসাময়িক কালে বাঙালী চরিত্রে এই বিদ্রোহী রূপের পরিচয় এইরকম উইলেই পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের উইলগুলি যদি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাহলে সেখান থেকে যেমন বাঙালীর বিত্তের পরিমাণের একটি আন্দাজ পাওয়া যাবে; তেমনি পাওয়া যাবে বাঙালীর ধর্মীয় মনোভাব, তার পরোপকারের চেষ্টা, তার জনসেবার ইচ্ছা, তার ওপর সামাজিক কুপ্রথার প্রভাব, তার প্রতিবাদী চরিত্র—সবকিছুরই একটি পরিষ্কার চিত্র। ❑

বিনা ওষুধে রোগারোগ্য

হৃদীন্দ্রনাথ চৌধুরী

নুষের জীবনে সুস্থ থাকা ও অসুস্থ হওয়া—এই দুটিই স্বাভাবিক ঘটনা। সাধারণ মানুষ চায়, ভাল স্বাস্থ্য ও নীরোগ অবস্থায় তাদের দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত হোক। কিন্তু মানুষ তা চাইলেও দেখা যাচ্ছে যে, তাদের নানারকম অসুখ হচ্ছে এবং অসুস্থ হলেই তারা চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁদের ব্যবস্থামত ওষুধ খেয়ে রোগ থেকে মুক্তি পাচ্ছে। এটাই আমাদের দেশের চিরাচরিত প্রথা বা সামাজিক ব্যবস্থা।

বর্তমানে ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাইরে উন্নত দেশগুলিতে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা বিষয়ে বহু গবেষণা চলছে, যার ফলে বিভিন্নপ্রকার নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কৃত হয়ে মানুষের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু এইসব ওষুধে রোগীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সুস্থ হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুস্থ হওয়ার পরিবর্তে রোগীর শরীরে নানাপ্রকার জটিল সমস্যার উদ্ভব হচ্ছে ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে রোগীদের মৃত্যু পর্যন্ত হচ্ছে। যদিও চিকিৎসকরা এসব ক্ষেত্রে ড্রাগ অ্যালার্জি বা ঐরকম কিছু বলছেন। যাহোক আমরা এবিষয়ে বিতর্কের মধ্যে যাচ্ছি না। কারণ আমাদের উদ্দেশ্য—কিভাবে বিনা ওষুধে গাছপালা, শাকসবজি বা ফলমূলের ব্যবহারে মানুষ সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হতে পারে, তারই অনুসন্ধান করা।

আমাদের দেশে ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এই বিষয়ে বহু গবেষণা চলছে। এর নাম 'প্রাকৃতিক চিকিৎসা', চিকিৎসকদের নাম 'প্রাকৃতিক চিকিৎসক' এবং এই বিষয়ের বৈজ্ঞানিকদের নাম 'প্রাকৃতিক গবেষক'। এঁদের প্রধান গবেষণার বস্তু—বিনা ওষুধে রোগারোগ্য অর্থাৎ ফলমূল, শাকসবজির রস বা কাঁচা খাওয়ার প্রণালী এবং এদের ব্যবহারে বিনা ওষুধে রোগ নিরাময়।

ভারতের আদিবাসীরা কোন্ গাছের কোন্ অংশ থেকে ওষুধ তৈরি করে রোগ নিরাময় করছে—এই বিষয়ে আমাদের দেশে আরো গবেষণার প্রয়োজন আছে, যার ফলে আমরা সস্তায় বা নামমাত্র মূল্যে নানারকম ওষুধ তৈরি করে রোগীদের সুস্থ করতে পারি। আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ যখন নিম্ন মধ্যবিত্ত বা দারিদ্র্যসীমার নিচে—যারা বর্তমানের দুর্মূল্য বাজারে কোনরকমে দুমুঠো খাওয়ার ব্যবস্থাই করতে পারছে না তখন সেইসব ব্যক্তিদের জন্য আদিবাসীদের ওষুধ থেকে কতকগুলি গ্রহণ করে অতি সস্তায় আমরা তাদের সরবরাহ করতে পারি। প্রাকৃতিক বৈজ্ঞানিকদের উপদেশমতো শাকসবজি, ফলমূল প্রভৃতির সাহায্যে কোন্ কোন্ রোগ থেকে সুস্থ হওয়া সম্ভব, তাও আমাদের প্রধান গবেষণার বিষয় হওয়া উচিত। এর ফলে ঐসমস্ত দরিদ্র মানুষ তাদের স্বল্প বা সীমিত আয়ের মধ্যে থেকেও সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারবে।

প্রথমে ভিটামিনের প্রসঙ্গে আসা যাক। ভিটামিন মানুষের শরীরের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। এই ভিটামিন শরীরে কম থাকলে মানুষ নানাপ্রকার রোগে আক্রান্ত হয়। ভিটামিন সম্বন্ধে আমাদের দেশে ও বিদেশে বহু গবেষণা চলছে, বিশেষ করে কোন্ কোন্ ভিটামিন কোন্ কোন্ মানুষের প্রয়োজন—সেবিষয়ে। চিকিৎসকরাও এই ভিটামিন সম্বন্ধে পরামর্শ দিচ্ছেন, যখন তাঁরা রোগীকে কঠিন ওষুধ, যেমন অ্যান্টিবায়োটিক বা স্টেরয়েডাল ড্রাগ দিচ্ছেন। যাহোক আমরা মনে করি যে, বাজারে এই ওষুধ যা ট্যাবলেট, ক্যাপসুল বা সিরাপ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তা যখন সাধারণ মানুষের কেনার সামর্থ্য নেই তখন অন্য উপায়ে কিভাবে তাদের এই ভিটামিন খাওয়ার সুযোগ হতে পারে তা আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। দেখতে হবে, সাধারণত যে-কয়টি ভিটামিন শরীর সুস্থ রাখার জন্য প্রয়োজন, যেমন—'এ', 'বি', 'সি' ও 'ই', তা কিভাবে প্রাকৃতিক উপায়ে পেতে পারি। কতগুলি ফলমূল, শাকসবজি থেকে এইসকল ভিটামিন টাটকা অবস্থায় পাওয়া যায়।

এই সম্বন্ধে আমেরিকার বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক জিয়ানি উইলসন, যিনি আমেরিকার ফুড অ্যাণ্ড নিউট্রিশনাল বোর্ড অফ ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের সঙ্গে যুক্ত, তিনি বলেছেন—ঐ সংস্থার নির্দেশমতো ভিটামিন ব্যবহার করলে মানুষ অনেকপ্রকার রোগ থেকে মুক্তি পেয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে। তিনি আরো বলেছেন যে, মানুষ তার খাদ্যের মাধ্যমে সমস্ত ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ পেতে পারে, যার ফলে মানুষ সুস্থ থাকবেই।

ভিটামিন 'এ'

সাধারণত কাঁচা টাটকা করলা থেকে ভিটামিন 'এ' ও লৌহ-জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। এই সবজিটি বা এর পাতার রস কাঁচা অবস্থায় খেলে কুষ্ঠ, অর্শ ও জণ্ডিসে খুবই উপকার হয়। হাম বা পক্সে করলা সিদ্ধ খুবই উপকারী। ডায়াবেটিস রোগীদের করলার রস একটি মূল্যবান ওষুধ। এটি শরীরের রক্তাল্পতা দূর করে এবং লিভার ও প্রস্রাবের নানারকম অসুখ সারায়। এর পাতার রস খেলে পেটে কৃমি বা ঐধরনের নানা পরজীবীগুলি নষ্ট হয়। জে. জে.

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

সিফার্ণের মতে, গাজরের রস থেকে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়। এটি ক্যান্সারের চিকিৎসায় বিশেষ সাহায্য করে। ডাক্তার হ্যারী বেঞ্জামিন এবং জে. জে. সিফার্ণের মতে, গাজর ও বীট থেকে যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়। বিটের রস খেলে রক্তাল্পতা, সাধারণ দুর্বলতা এবং স্নায়বিক দুর্বলতা দূর হয়। এই রসের সাহায্যে টিউমার সারানোও সম্ভব। ডাঃ জন বি. লাস্ট ১৬ আউন্স গাজর ও বিটের রস খাইয়ে টিউমার আক্রান্ত রোগীকে সুস্থ করেছেন। তাঁর মতে, প্রত্যেক মানুষের প্রতিদিন কিছু কিছু টাটকা ফল, যেমন—আপেল, আঙুর, নাসপাতি ও আনারস খাওয়া প্রয়োজন। আপেল থেকেও ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায়, যার দ্বারা বাতের খুব উপকার হয়।

ভিটামিন 'বি'

এই ভিটামিন শরীরের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়, কারণ এটি আমাদের হৃৎপিণ্ডের অসুখ থেকে রক্ষা করে, শরীর ও মন সুস্থ রাখে। ভিটামিন 'বি' অনেকপ্রকারের হয়। তার মধ্যে ভিটামিন 'বি-১২' শরীরে রক্ত উৎপাদন করে ও স্নায়বিক দুর্বলতা দূর করে। এটি মানুষের, বিশেষ করে বৃদ্ধদের খুবই প্রয়োজন। কারণ, এতে তাদের কোন মানসিক অবসাদ আসে না। এই ভিটামিন গাজর, বীন, বীট, পালংশাক, ডালিম, মাছ, মাংস, বিশেষ করে মুরগীর মাংসে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। সেকারণে জিয়ালি উইলসনের মতে, বয়স্ক ব্যক্তিরা যাঁরা এই ভিটামিন ইঞ্জেকশন নিতে পারেন না তাঁরা নিয়মমতো উল্লিখিত শাকসবজি ও মাছ-মাংস খেতে পারেন। তবে এই ভিটামিন পরিমাণমতো খেতে হবে, যেমন ভিটামিন 'বি-৬' পুরুষদের দৈনিক ১.৭ মিলিগ্রাম এবং স্ত্রীলোকদের ১.৫ মিলিগ্রাম খাওয়া উচিত।

ভিটামিন 'সি'

বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা ভারতে এবং অন্যান্য দেশে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই ভিটামিন মানুষের অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। বিভিন্ন প্রকার লেবু থেকে—যেমন পাতি-লেবু, কাগজিলেবু, গন্ধরাজলেবু, মুসাম্বি ও কমলালেবু থেকে যথেষ্ট পরিমাণ ভিটামিন 'সি' আমরা পাই। তাছাড়াও আমলকী ও টম্যাটোতে এই ভিটামিন রয়েছে। এই ভিটামিন দাঁত, মাড়ি মজবুত করে এবং শরীরে ঠাণ্ডা লাগা নিবারণ করে। বৃদ্ধদের এই ভিটামিন খাওয়া প্রয়োজন, যেহেতু এটি পরিপাকে বিশেষ সাহায্য করে এবং স্বাস্থ্যকরও বটে। পাতিলেবুর রস দিনে কয়েকবার খেলে লিভারের অসুখ, গ্যাস্ট্রিক আলসার, বাত ও গলার অসুখ সারে। তাছাড়াও গরম জলে পাতিলেবুর রস মিশিয়ে খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। ডাঃ ফ্রেড আর. ক্লেনার তাঁর 'ভাল স্বাস্থ্যের উপায়' গ্রন্থে ভিটামিন 'সি' সম্বন্ধে লিখেছেন যে, লেবুর রস ব্যবহারে হৃৎপিণ্ডের সমস্যা, নানারকম বাতব্যাধি, সাধারণ ঠাণ্ডা লাগা, হাঁপানি, বমিভাব, বিশেষ করে লিভারের নানারকম অসুখ নিরাময় হয়। এসম্বন্ধে দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে ভিটামিন 'সি'-র উপকারিতা সম্বন্ধে আমরা যথেষ্ট তথ্য পাই। দৈনিক প্রত্যেক পুরুষের কমপক্ষে ৯০ মিলিগ্রাম, স্ত্রীলোকের ৭৫ মিলিগ্রাম এবং শিশুর ৩৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি' খাওয়া প্রয়োজন। এই ভিটামিন যখন পর্যাপ্ত পরিমাণে শাকসবজি ও ফল থেকে যেমন—গাজর, বীট, বীন, পালংশাক, লেবু প্রভৃতি থেকে পাওয়া যাচ্ছে, তখন তা-ই আমাদের ব্যবহার করা উচিত। এতে শরীর খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়। ডালিম থেকেও ভিটামিন 'সি' পাওয়া যায়।

ভিটামিন 'ই'

প্রাথমিক গবেষণায় জানা গেছে যে, এই ভিটামিন আমাদের শরীরের পক্ষে খুবই প্রয়োজন। এর ব্যবহারে অনেক রোগ নিরাময় হয়। এটি মুখের ত্বকে রক্তচলাচল বাড়ায়, যার ফলে ত্বক সতেজ থাকে। অধ্যাপক জগৎজীবন ঘোষ জানিয়েছেন যে, এই ভিটামিনের ব্যবহারে ক্যান্সার, ডায়াবেটিস, হৃদ্‌যন্ত্রের গোলযোগ সারানো সম্ভব। বিশেষ করে যারা ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত, তাদের কিডনির কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং অন্ধত্ব বা ঐরকম বিপজ্জনক অবস্থা থেকে রোগীরা অব্যাহতি পেতে পারে। এই ভিটামিন বীন, বাঁধাকপি, পালংশাক, টাটকা কড়াইশুটি, কাঁচা লঙ্কা, ক্যাপসিকাম ও কাবলি ছোলা থেকে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সের ফুড ও নিউট্রিশনাল বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী এই ভিটামিন হৃৎপিণ্ডের অপক্রিয়া ও চোখের ছানি দূর করে। আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাতেও তা প্রমাণিত হয়েছে। ডাঃ হ্যারি বেঞ্জামিনের মতে, গাজরের রস থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন 'ই' পাওয়া যায়। এটি অক্সিজেনের ক্ষতিকারক প্রভাব কাটিয়ে কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে দেয় ও শরীরের ক্লান্তি দূর করে। পরিবেশ দূষণের ফলে যে ক্ষতি হয়, তা থেকে ফুসফুসকে বাঁচানো এবং ইস্কিমিক হার্টের সমস্যা কমানো যায়। বস্টনের টাফ্টস বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিকরা জানিয়েছেন যে, প্রত্যেক মানুষ ১০০ থেকে ৪০০ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট পর্যন্ত এই ভিটামিন ব্যবহার করলে ভাল স্বাস্থ্য বজায় রাখতে পারবে। এটি খাওয়ার নিয়ম প্রধানত দিনে বা রাত্রে আহারের পরে। এর ব্যবহারে বয়স্ক ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং তাদের কোন মানসিক অবসাদ আসে না। ❑

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পত্র এবং প্রসঙ্গত

'উদ্বোধন'-এর গত ফাল্গুন ১৪০৬ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজকে লেখা ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের চিঠিটি পড়ে খুব ভাল লাগল। ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় বর্তমান প্রজন্মের কাছে খুব একটা পরিচিত নাম বলে মনে হয় না। অথচ শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে তাঁর যে অধিকার এই লেখার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তার সমকক্ষ রচনা খুঁজে পাওয়া ভার। তাছাড়া প্রচলিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানও কিছু কম নয়।

মাত্র ১৯ বছর বয়সে সামান্য পুঁজি, অগ্রজের সমর্থন ও মায়ের আশীর্বাদ মাথায় করে তিনি আমেরিকা পাড়ি দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ তেমন ছিল না, তাই কঠিন কায়িক পরিশ্রম করে লোকের বাড়িতে বাসন মেজে, ঘরের কাজ করে তাঁকে পড়াশুনা ও থাকা-খাওয়ার খরচ জোটাতে হয়েছে। এইভাবেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েট হন এবং থিসিস লিখতে বসেন। মূলত নিউ ইয়র্কবাসী হলেও তিনি পরিব্রাজক-রূপে সারা আমেরিকা ঘুরে বক্তৃতা দিতেন। কাজ করেছেন বেসরকারি রাষ্ট্রদূতের। তাঁর জনপ্রিয়তা ও শিক্ষার যশ আমেরিকা ছাড়িয়ে ইউরোপেও গিয়ে পৌঁছেছিল। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও তাঁর নিমন্ত্রণ আসত। সেখানে বক্তৃতা দিয়ে যেসব চিন্তাবিদদের সঙ্গে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে বার্টাণ্ড রাসেল, বার্নার্ড শ, আইনস্টাইন, এইচ. ডি. ওয়েলস প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রবাসের বন্ধন যত কঠিন হয়েছে, দেশের প্রতি টান তাঁর ততই বেড়েছে। ভারতীয় সংস্কার, সংস্কৃতিকে তিনি একদিনের জন্যও ভুলে থাকেননি। বাঙলা বই ও সংবাদপত্র সংগ্রহ করেছেন দেশের মন জানবার জন্য। ঈশ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদও প্রকাশ করেছেন। তাঁর লেখা 'Devotional Passage from Hindu Bible' আমেরিকার শিক্ষিত সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। তাঁর লেখা 'Caste and out caste' জগতের যেকোন ভাষাতে সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। ভারতকে হেয় করতে মিস ক্যাথরিন মেয়ো লিখেছিলেন 'Mother India'। তথ্য ও অকাট্য যুক্তি দিয়ে তা খণ্ডন করলেন ধনগোপাল তাঁর 'A son of Mother India Answers' গ্রন্থে। তারপরে তাঁর লেখা 'Visit India with me' বইটি প্রকাশিত হলো উদ্ধত পাশ্চাত্যবাসীর প্রতি এক দুর্দান্ত চ্যালেঞ্জের মতো।

তিনি স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। 'কথামৃত'-এর রচয়িতা শ্রীম-র পরামর্শে দক্ষিণেশ্বরে বহুজনের কাছ থেকে অজ্ঞাত তথ্য সংগ্রহ করে ধনগোপাল লিখলেন 'Face of Silence'। বইটি রোমাঁ রোলাঁর বোন ইংরেজী থেকে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে তাঁকে শোনান। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা জেনে রোমাঁ রোলাঁ অভিভূত হয়ে ধনগোপালকে লেখেন ঃ "Mr. Mukherjee, what can I do to make you immortal in Europe?" উত্তরে ধনগোপাল লেখেন ঃ "Nothing for me. Please make my master Ramakrishna, Vivekananda well known in Europe." এরপর রোমাঁ রোলাঁ লেখেন 'The Life of Ramakrishna'। স্বামীজীর বিশেষ ভক্ত মিস ম্যাকলাউড বলেছিলেন ঃ "After Swamiji Dhangopal is the proper person to interpret India to the West." (বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, পৃঃ ৫৩০) প্রসঙ্গত, শেষজীবনে তিনি স্বামীজীর মতো মাথায় পাগড়ি বেঁধে বক্তৃতা করতেন।

বাঙলা ভাষায় তাঁর লেখা বই কম—'যূথপতি' ও 'চিত্রগ্রীব'। ইংরেজী ভাষায় লেখা 'Gay Neck' বইটি তাঁকে শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্যিকের সম্মান এনে দেয় 'জন নিউ বেরি' মেডালের মাধ্যমে। তাঁর লেখা বইগুলি সেইসময় ফরাসী, জার্মানি, ইতালি, রাশিয়ান ও চেকোশ্লোভাকিয়ান ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। বিশিষ্ট ভারতপ্রেমী অধ্যাপক ইয়ানিচেক ধনগোপালের ৬টি বই চেক ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশে তাঁর তেমন প্রচার হয়নি।

জওহরলাল নেহরু তাঁর এই সমবয়সী বন্ধুটির সঙ্গে নিয়মিত পত্রালাপ করতেন। তাঁর লেখা 'Letters from a Father to his Daughter' বইটি ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রকাশনার ভার তিনি ধনগোপালের ওপর দিয়েছিলেন। বলতে গেলে, তিনি ছিলেন সুসাহিত্যিক, দার্শনিক ও কবি; কিন্তু তাঁর ভাবালুতার সঙ্গে বাস্তব বুদ্ধির এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছিল।

তাঁর অগ্রজ বিপ্লবী ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়কে লেখা কিছু চিঠি পারিবারিক সূত্রে আমাদের কাছে আছে। আমার স্বামী ডাঃ সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত তাঁর চিঠিটির সঙ্গে এই চিঠিটির বক্তব্যের মিল দেখেই এই পত্রের অবতারণা। এই চিঠির মধ্যেও আমরা দেখতে পাই শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর সন্তানদের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি। তিনি সংস্কারমুক্ত ছিলেন, কিন্তু নাস্তিক নন। অধ্যাত্মবাদী, সংগ্রামী, বিদ্রোহী, কিন্তু প্রচণ্ড বিনয়ী। ভাইকে চিঠি লিখতেন, শেষে লেখা থাকত—'দাস ধনগোপাল'। ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়কে লেখা তাঁর একটি চিঠি *(ভাষা ও বানান অপরিবর্তিত)*—

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

D. G. MUKERJI
325 EAST 72ND STREET
NEW YORK

Jan 28
1936

Dr. Jadu G. Mukerji
33 Circular Rd.
Ranchi, India

Dear Old man,

In your letter dated Dec. the 26th, 1935 you say that there is nearly Rs. 598-15 as—op total owing to me from Nakaka's estate, Dulichand's purchase of my share of 7 Down Lane Plus what you call potential accounts.

Now why not keep it there and pay for Debi's and Shakuntala's training as far as the money can be stretched? If one marries the money can be wholely devoted to the other's education. If they both marry do send the money to me.

If they do fail to marry then use the money for their education wisely and stretch it to cover the longest period of months. After the sum is exhausted I shan't be responsible for their education. In this age of change and flux one should not make any stipulation. At least I must not. God must take care of the girls.

I am glad you, baby and your wife are well. Good. May Shri Ramakrishna protect you there! We are well. In fact all is well with us. That too is His Kripa!

Dhan Gopal

একটা কথা বলি। এটা গুহ্য কথা। দেবী, শকুন্তলা প্রভৃতিকে একবার সারগাছিতে গিয়ে প্রভু স্বামী অখণ্ডানন্দজীকে প্রণাম করিয়ে ফেল। তাঁকে প্রণাম কোল্লে সব ভাল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। তিনি মহাভাবে ওতপ্রোত। এরকম ঈশ্বরীয় মানুষ জগতে কবে আসিবে প্রভুই জানেন। তাঁকে প্রণাম করাও। যাও সকলকে নিয়ে সব বাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

জয় শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী কি জয়।

দাস
ধনগোপাল

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

প্রসঙ্গত, চিঠিতে উল্লিখিত 'দেবী' ও 'শকুন্তলা' হলেন তাঁর বিধবা মেজদির দুই কন্যা। যাদুগোপাল ছিলেন ধনগোপালের আদর্শ পুরুষ। অগ্রজের উদ্দেশে লেখা 'My Brother's Face' বইটি পড়লে তার জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বইটিতে তখনকার বিপ্লবী দলের কার্যক্রম সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। অনেক সমাজসেবী সংস্থার সঙ্গে যাদুগোপাল যুক্ত ছিলেন, বিশেষ করে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে। রাঁচিতে রামকৃষ্ণ মিশন টি. বি. স্যানাটোরিয়ামের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি অনেক সাহায্য করেছিলেন এবং অনেকদিন পর্যন্ত কার্যকরী সমিতির অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯৭৬ সালের ৩১ আগস্ট তাঁর দেহাবসান হয়।

যাদুগোপাল এবং ধনগোপাল দুজনেরই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা ছিল। ধনগোপাল প্রত্যক্ষভাবে যোগ না দিলেও সুদূর আমেরিকায় বসে তাঁর বলিষ্ঠ লেখনী দ্বারা বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আমেরিকায় যান 'ফাদার মার্টিন' নাম নিয়ে। সেখানে তাঁকে জার্মান স্পাই সন্দেহ করা হলে তিনি পালিয়ে স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ধনগোপালের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ধনগোপাল তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানান এবং তাঁর পূর্ব নাম মুছে ফেলে নতুন নামকরণ করেন M. N. Roy। পরবর্তী জীবনে তিনি এই নামেই সমধিক খ্যাত হন।

শ্যামলী মুখোপাধ্যায়
রাঁচি, ঝাড়খণ্ড-৮৩৪০০১



কথামৃত ভবনে শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমঙ্গলচণ্ডী ঘট

প্রসঙ্গ শ্রীম-র ঠাকুরবাটী (কথামৃত ভবন)

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম)-র ঠাকুরবাটী (কথামৃত ভবন) সম্পর্কে অনেকের কৌতূহল আছে। তাঁদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সংক্ষেপে কিছু তথ্য পরিবেশন করছি।

শ্রীম (১৪ জুলাই ১৮৫৪—৪ জুন ১৯৩২) ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও লীলাসহচর এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' ও 'The Gospel of Sri Ramakrishna'-এর অমর গ্রন্থকার। শ্রীম-র পৈতৃক বাটী (১৩/২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬) 'শ্রীম-র ঠাকুরবাটী (কথামৃত ভবন)' নামে বিশেষ পরিচিত। এই ঠাকুরবাটী এক মহাতীর্থ। ভারত তথা সমগ্র বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে সাধুসন্ত, ভক্ত, গবেষক এবং ঐতিহাসিক সুধীজনের এখানে নিত্য যাতায়াত।

শোনা যায়, এই ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব একাধিকবার পদধূলি দিয়েছেন। তাই শ্রীম এই ঘরেই 'কথামৃত' রচনা করেন। কলকাতায় এলে এই ঠাকুরবাটীর দোতলার একটি ঘরে শ্রীশ্রীমা কখনো কখনো থাকতেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের স্বপ্নাদেশে ১৮৮৮ সালের ৬ অক্টোবর, শনিবার (২১ আশ্বিন ১২৯৫) এই ঘরে মঙ্গলচণ্ডীর ঘট ও শ্রীরামকৃষ্ণের পট স্থাপন করে নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন। এই ঘটস্থাপনের সময়ই শ্রীম-র মনে 'কথামৃত' রচনার অনুপ্রেরণা জাগে। এই ঘরে শ্রীশ্রীমা বহু ভক্তকে দীক্ষাদানও করেছিলেন। 'কথামৃত'-এর পঞ্চম ভাগ শেষ করে এই ঘরেই শ্রীম "গুরুদেব, মা, আমায় কোলে তুলে নাও।"—এই শেষ বাক্য উচ্চারণ করে মহাসমাধি লাভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের শিষ্যবৃন্দ এই ঘরেই বহুবার মিলিত হন শ্রীম-র সঙ্গে। এই ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত পাঞ্জাবী, মোলেস্কিনের র‍্যাপার, চুমকী ঘটি, শ্রীমকে ঠাকুরের উপহার দেওয়া 'চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্কীর্তন দলের ছবি' ও শ্রীম-র ব্যবহৃত পাদুকা ভক্তজনের দর্শনের জন্য সংরক্ষিত আছে। একটি কাচের বাক্সে সংরক্ষিত শ্রীরামকৃষ্ণের পাদুকা, শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের পবিত্র কেশ ও নখ, শ্রীশ্রীমায়ের ব্যবহৃত জপের মালা, সিঁদুরকৌটা ও চরণচিহ্ন নিত্যপূজিত হয়।

দীর্ঘকাল ধরে এই ঠাকুরবাটীতে প্রতি বছর শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীম-র জন্মতিথি উৎসব পালিত হয়ে আসছে। শারদীয় দুর্গোৎসবের

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

মহাষ্টমীর দিন এ-গৃহে মহাসমারোহে মা চণ্ডীর ঘট পূজা হয়।

প্রতিদিন সকাল সাড়ে আটটায় দর্শনের জন্য মন্দির খুলে দেওয়া হয়। দুপুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশ্রামের পর বিকালেও মন্দির পুনরায় খোলা হয়।

দীপক গুপ্ত
গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন : ৩৫০-১৭৫১

প্রসঙ্গ বিদেশে দুর্গাপূজা

বাংলার মতো সুদূর বিদেশেও দুর্গাপূজা হয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিত পূজা করেন। সকলে মিলে আনন্দ হয়, অঞ্জলি দেওয়া হয়, আরতি, সন্ধিপূজা, প্রসাদ-বিতরণ সবই যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষে অনুষ্ঠিত হয় জলসা।

গত বছর (২০০০) আমেরিকার বস্টন শহরের কাছে কানেক্টিকাটে থাকার দরুন হার্ডফোর্ডে পূজা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বার্ণসিড মেথডিস্ট চার্চ-এ সেখানকার বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন অফ গ্রেটার হার্ডফোর্ড-এর পূজা। পূজা আরম্ভ হলো বেলা ১০টায়। দুজন ব্রাহ্মণ পূজা করছিলেন। মঞ্চের ওপর সুন্দর শোলার সাজে সজ্জিতা হয়ে মা জগজ্জননী সপরিবারে অধিষ্ঠিতা। নেই কোন মণ্ডপের বাহার, কোন আলোকসজ্জার জাঁকজমক। শুধু মনে হলো, অনেকগুলি পরিবার একত্রিত হয়ে আনন্দ করছে, মাকে প্রণাম করছে। মহিলারা সকলেই শাড়ি পরেছেন। অনেকে লাল-পাড় গরদ পরেছেন, পায়ে আলতা ও অলঙ্কারে সজ্জিতা। সকলেই কাজ করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এক-একজন পূজার উপকরণ নিয়ে আসছেন। কাগজের প্লেটে নৈবেদ্য। পূজার যোগাড় ভালই। দৈ, মিষ্টি, সন্দেশ, নানা ফল, ফুল, নারকেল ইত্যাদি। মনে হলো যেন দেশের বাড়ির পূজামণ্ডপে বসে পূজা দেখছি। উলুধ্বনি ও ঢাকের বাজনাও (অবশ্য রেকর্ডেড) বাদ যায়নি।



কানেক্টিকাট প্রদেশের হার্টফোর্ড-এ স্থানীয় বাঙালীদের দ্বারা আয়োজিত দুর্গাপূজা

পঞ্জিকার মতে এবার পূজা ছিল ৪ অক্টোবর, কিন্তু আমরা এখানে পূজাতে অঞ্জলি দিলাম ২৭ সেপ্টেম্বর। দশমীর বিসর্জন হলো ২৮ সেপ্টেম্বর। কারণ, পূজাতে কোন ছুটি নেই এদেশে। কাজেই শনি-রবিবার পূজা হয়।

নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটিতে পূজা হলো এক রবিবার, আর পরের রবিবার বিজয়া দশমী পালন করা হলো। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পূজার অঞ্জলি একদিনে একসাথেই দিলাম। শাঁখের আওয়াজ, উলুধ্বনি, সকলের আনন্দ-কোলাহল মিলে এক সুন্দর পরিবেশ। অঞ্জলির সব ফুল, বেলপাতা একটা পাত্রে করে মায়ের চরণে দেওয়া হলো। প্রণামমন্ত্রও মাইকে পাঠ করা হলো। পূজা বেলা ২টার মধ্যে শেষ। দশমীর দিন মাকে বরণ, সিঁদুরখেলাও যথারীতি হলো। শান্তিজল সকলে নেওয়ার পর পূজার সমাপ্তি ঘোষণা করা হলো। মনে হলো, বাঙালীরা যেখানে ছিল সেখানেই আছে।

এরপর মা সপরিবারে চলে যাবেন কারো বাড়িতে। সেখানে একবছর থাকবেন। আবার একবছর পর মাকে নতুন সাজে দেখতে পাওয়া যাবে। মা স্বদেশে পূজা নেওয়ার সাথে সাথে বিদেশেও ঘুরে গেলেন। প্রবাসী ভক্তদের মনে কষ্ট দিলেন না। সকল ভক্তই যে তাঁর সন্তান। দিনক্ষণ, তিথি অনুযায়ী নাই বা পূজা হলো, তবুও বিদেশে এত অসুবিধার মধ্যে প্রবাসী বাঙালীসমাজ যে তাদের এই প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে—সেটাই বড় কথা। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন : "যখন যেমন, তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন।"

বহু বছর যাবৎ যাঁরা দেশে যাননি বা যাওয়ার উপায় নেই, তাঁদের বেদনা মা বোঝেন; তাই তো মায়ের বিদেশ ঘোরা। এত হাসি, গান, আনন্দের আদান-প্রদানের উৎসস্থল যেন তিনিই। সকলে যেন স্বদেশের ভাল লাগা, প্রীতি-স্নেহের স্বাদ পাওয়ার জন্য এই দিনটির অপেক্ষা করে থাকেন।

অঞ্জলি গুহ
চারুচন্দ্র প্লেস ইস্ট
কলকাতা-৭০০ ০৩৩

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

ব্রোমিন আবিষ্কারের ১৭৫ বছর

সলিল মুখোপাধ্যায়

১৮২৬ সালের ১৪ আগস্ট রাসায়নিক মৌল আবিষ্কারের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। কারণ, ঐ দিনটিকে ব্রোমিন (Br) আবিষ্কারের দিন হিসাবে প্যারিসের অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস স্বীকৃতি দেয়। তাই আজ থেকে ১৭৫ বছর আগে ১৮২৬ সালের এই দিনটিতে ব্রোমিন আবিষ্কারের দিন হিসাবে ধরা হয়। বিজ্ঞানী এ. ব্যালার্ড (A. Balard) ছিলেন এই মৌলটির আবিষ্কারক। যদিও সি. লোভিগ (C. Löwig) নামে একটি ছাত্রও আলাদাভাবে ব্রোমিন আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলেন।

১৮২৫ সালে জার্মানির ক্রেইজনচ (Kreiznach) শহরে একটি ঝরনার জলে খনিজ পদার্থের উপস্থিতি নিয়ে কাজ করছিলেন সি. লোভিগ। তিনি লক্ষ্য করেন যে, ঐ ঝরনার জলের গাঢ় দ্রবণে ক্লোরিন গ্যাস পরিচালিত করলে দ্রবণের রং লাল হয়ে যায়। ঐ গাঢ় দ্রবণে ইথার দিয়ে তিনি একটি লালচে বাদামী রঙের তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থ বের করতে সক্ষম হন। লোভিগ এই পদার্থটিকে শনাক্ত করতে না পেরে এটিকে একটি ফ্লাস্কে ভরে জার্মানির হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেষজ রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক এল. মেলিন (L. Gmelin)-এর কাছে নিয়ে আসেন। অধ্যাপক মেলিন তাঁকে ঐ ঝরনার জল থেকে আরো বেশি পরিমাণে পদার্থটি সংগ্রহ করে তার নানা ধর্ম বিশদভাবে বিশ্লেষণ করার পরামর্শ দেন।

এমনই এক সময়ে বিজ্ঞানী এ. ব্যালার্ড ফ্রান্সের একটি বিজ্ঞান-পত্রিকায় সমুদ্রজলে বিশেষ পদার্থের উপস্থিতি সম্বন্ধে একটি গবেষণামূলক নিবন্ধ লেখেন। ব্যালার্ড ঐ নিবন্ধে উল্লেখ করেন যে, ১৮২৪ সালে তিনি সমুদ্রের জলে জন্মানো বিভিন্ন ধরনের ঘাস ও শৈবাল থেকে বিভিন্ন রাসায়নিকের সাহায্যে নানা ধরনের যৌগ নিষ্কাশনের চেষ্টা করেছিলেন। সেইসময় তিনি লক্ষ্য করেন যে, সমুদ্র-শৈবালের ভস্ম থেকে উৎপন্ন ক্ষারীয় দ্রবণে ক্লোরিন জল ও শ্বেতসার যোগ করলে দ্রবণটি দুটি স্তরে ভাগ হয়ে যায়। তলার স্তরটির রঙ নীল এবং ওপরের স্তরটির রঙ হয় লালচে বাদামী। ব্যালার্ড নিশ্চিত ছিলেন যে, তলার স্তরটিতে আয়োডিন বর্তমান; কারণ এটি শ্বেতসারের সঙ্গে নীল রঙ সৃষ্টি করে। কিন্তু ওপরের স্তরটি দেখে ব্যালার্ড প্রথমে মনে করেছিলেন যে, এটি ক্লোরিন ও আয়োডিনের একটি যৌগ। পরে আরো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তিনি এটিকে একটি আলাদা মৌল হিসাবে চিহ্নিত করেন এবং মৌলটিকে পৃথক করতে সক্ষম হন।

ব্যালার্ড লবণ-জলের ল্যাটিন নাম 'মিউরিয়া' (Muria) থেকে এই নতুন মৌলটির নাম রাখেন 'মিউরাইড' (Muride)। এই কাজের স্বীকৃতির জন্য তাঁর বন্ধুরা তাঁর কাজের একটি পূর্ণ বিবরণ প্যারিস অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস-এ পাঠাতে পরামর্শ দেন। ১৮২৫ সালের ৩০ নভেম্বর তিনি বন্ধুদের পরামর্শমত 'সমুদ্রজলে উপস্থিত বিশেষ পদার্থ সম্বন্ধে বিবরণ' নামে একটি গবেষণাপত্র অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস-এ জমা দেন। ক্লোরিন ও আয়োডিনের রাসায়নিক ধর্মের সঙ্গে নতুন মৌল মিউরাইডের বিরাট মিলের কথা এই গবেষণাপত্রে বলা হয়। অ্যাকাডেমির সদস্যরা ব্যালার্ডের পর্যবেক্ষণগুলি ভাল করে দেখার জন্য বিজ্ঞানী গে-লুসাক, বিজ্ঞানী এল. ভ্যায়কুইলিন এবং বিজ্ঞানী থেনার্ডকে নিয়ে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি ব্যালার্ডের গবেষণাপত্রটি খুঁটিয়ে দেখে তাঁর পর্যবেক্ষণগুলিকে সমর্থন করেন। ১৮২৬ সালের ১৪ আগস্ট ব্রোমিন আবিষ্কারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে কমিটি মেনে নেয়। তবে নতুন মৌলের 'মিউরাইড' নামটি তাঁদের পছন্দ হয়নি। যেহেতু মৌলটি তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত, তাই তাঁরা 'মিউরাইড' নামটি পরিবর্তন করে 'ব্রোমিন' নামটি সুপারিশ করেন। গ্রীক শব্দ 'ব্রোমোস' (bromos)-এর অর্থ 'তীব্র দুর্গন্ধ'।

কয়েকটি খনিজ লবণে, সমুদ্র এবং ঝরনার জলে ব্রোমিনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। ব্রোমিন নিষ্কাশনের প্রধান খনিজ হলো কার্নেলাইট (Carnalite)। জার্মানির স্টাশফার্টের কার্নেলাইট খনিজে পটাশিয়াম ক্লোরাইড ও ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইডের মিশ্রণের সঙ্গে শতকরা একভাগ ম্যাগনেশিয়াম ব্রোমাইড মিশে থাকে। পটাশিয়াম ক্লোরাইড পৃথক করার পরে যে-দ্রবণ অবশিষ্ট থাকে, তার মধ্যে ক্লোরিন ও স্টীম পাঠিয়ে ব্রোমিন তৈরি করা হয়। এটি ব্রোমিনের একটি বৃহদায়তন পদ্ধতি, বা বলা চলে শিল্প উৎপাদনের প্রধান উৎস। আটলান্টিক মহাসাগরের জলে প্রায় ০.০০৭ শতাংশ ব্রোমিন আছে। আবার ডেড সি-র জলে ব্রোমিনের মাত্রা প্রায় ০.০৪২ শতাংশ। সমুদ্রের জলে ব্রোমিন সাধারণত ক্ষার ধাতুর লবণ হিসাবে থাকে।

ব্রোমিনের চাহিদা দিন দিন বেড়ে যাওয়ার জন্য আমেরিকার আটলান্টিক সমুদ্র উপকূলে সমুদ্রের জল থেকে ব্রোমিন উৎপাদন করা শুরু হয়। সাধারণত সমুদ্রের জলে উপস্থিত সোডিয়াম, পটাশিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড কেলাসিত (crystallised) করার পর যে অবশেষ পড়ে থাকে, তার মধ্য দিয়ে ক্লোরিন গ্যাস পাঠিয়ে ব্রোমিন তৈরি করা হয়। আমেরিকার ওহিও (Ohio)-র ঝরনার

জলে শতকরা ৩.৪-৩.৯ ভাগ ম্যাগনেশিয়াম ব্রোমাইড পাওয়া গিয়েছে। এটিও ব্রোমিন নিষ্কাশনের একটি উৎস। ওহিও এবং মিশিগানের কয়েকটি লবণের খনিতে প্রাপ্ত খাদ্যলবণ (সোডিয়াম ক্লোরাইড) বা সাধারণ লবণ কেলাসিত করার পর যে লবণ-জল পড়ে থাকে, তার থেকেও ব্রোমিন উৎপন্ন করা হয়ে থাকে।

ব্রোমিন ঘন লাল রঙের ঝাঁঝালো তরল পদার্থ। এটি কিন্তু পৃথিবীর একমাত্র অধাতু মৌল, যা সাধারণ তাপমাত্রায় তরল। এটি উদ্বায়ী (volatile) বলে স্বাভাবিক তাপেও লাল রঙের বাষ্পে পরিণত হয়। ক্লোরিনের চেয়ে ব্রোমিন কম সক্রিয়, কিন্তু রাসায়নিক ধর্মে এদের মধ্যে খুব মিল রয়েছে। ব্রোমিন অধিকাংশ ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে ব্রোমাইড যৌগ গঠন করে। এটি জলে শতকরা ৩.৬ ভাগ দ্রবীভূত (২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়) হয়ে লাল রঙের দ্রবণ তৈরি করে। এই দ্রবণকে 'ব্রোমিন-জল' বলা হয়। এই ব্রোমিন-জল অন্ধকারে যদিও স্থায়ী, কিন্তু দীর্ঘসময় সূর্যালোকে রাখলে ধীরে ধীরে জলের অক্সিজেন মুক্ত হয় ও হাইড্রোব্রোমিক অ্যাসিড তৈরি হয়। এই ধরনের বিক্রিয়া ক্লোরিনের সঙ্গে তুলনীয়। ব্রোমিন-জলের খুব সামান্য মাত্রায় ব্লিচিং (bleach—শুভ্রতা সম্পাদন) ধর্ম রয়েছে।

আলকাতরা থেকে রঙ প্রস্তুত করতে ব্রোমিনের ব্যবহার রয়েছে। জৈব রাসায়নিক সংশ্লেষণে (*synthesis*) মিথাইল-ম্যাগনেশিয়াম ব্রোমাইডের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। ইথিলিন ডাই-ব্রোমাইড ও মিথাইল ব্রোমাইড কীটনাশক হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন ব্রোমাইড যৌগ ওষুধ তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। পটাশিয়াম ব্রোমাইড রঙ তৈরির কাজে এবং সিলভার ব্রোমাইড ফটোগ্রাফির কাজে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

ব্রোমিন সবসময় ছিপি-আঁটা বোতলে রাখা প্রয়োজন। ব্রোমিনের বাষ্পে আমাদের চোখ আক্রান্ত হয় এবং তরল ব্রোমিন আমাদের ত্বকের পক্ষেও ক্ষতিকারক। ব্রোমিন বেশি মাত্রায় শরীরে লাগলে দুরারোগ্য ক্ষতের সৃষ্টি করতে পারে।

যদিও ব্রোমিন আবিষ্কৃত হয়েছিল আজ থেকে ১৭৫ বছর আগে, তবুও এর নিষ্কাশন বেশ ব্যয়বহুল। এমনকি এর ব্যবহারও বেশ সীমিত। মানুষের প্রয়োজনে এই তরল অধাতু মৌলটি নিয়ে আরো বেশি গবেষণার প্রয়োজন। ❑

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. Chemical Elements, How They Were Discovered—D. N. Trifonov & V. D. Trifonov, 1982
২. General and Inorganic Chemistry—P. K. Dutta, 5th Edition

ভক্তের ভগবান

যুবরাজের বৈরাগ্য

স্বামী শ্রীনিবাসানন্দ

খুব বেশিদিনের কথা নয়। রাজসাহী (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত) শহরের অদূরে খেতুর। খেতুরের রাজা কৃষ্ণানন্দ, মহারানী নারায়ণী দেবী। কৃষ্ণানন্দ ছিলেন রাজসাহীর অন্তর্গত গরানহাটা পরগনার জমিদার—লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক। তাঁদেরই পুত্র বৈষ্ণবোত্তম নরোত্তম দাস।

যুবরাজ নরোত্তম একদিন রূপোর পালকিতে চড়ে স্থানান্তরে চলেছেন। মধ্যাহ্নে বিশ্রামার্থে পালকি থেকে নেমে সামনেই অবস্থিত এক বৃহৎ কদমগাছের তলায় উপবেশন করেন। স্নিগ্ধ ছায়ায় ও মৃদুমন্দ সমীরণে তিনি তন্দ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন, কে যেন তাঁকে ডাকছে। কিন্তু তা কি করে সম্ভব? বেহারারা ছাড়া আর তো কোন লোকজন নেই, এ নিশ্চয়ই তাঁর মনের ভ্রম। তিনি স্থির হয়ে বসলেন। এমন সময় তিনি আবার শুনতে পেলেন, কে যেন ব্যাকুল কণ্ঠে তাঁর নাম ধরে ডাকছেন। অদ্ভুত রহস্যময় অশরীরী বাণী শুনে অস্থির হয়ে ওঠেন নরোত্তম। সারা শরীরে জাগে এক অজানা শিহরণ। অধীর আগ্রহে তিনি নিকটবর্তী গ্রামে পৌঁছে প্রাচীনদের নিকট নিজের অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করলেন।

এক বৃদ্ধ বললেন, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য একবার রামকেলীতে আসেন। সংকীর্তনে উন্মত্ত হয়ে তিনি একদিন খেতুরের দিকে তাকিয়ে 'নরোত্তম, নরোত্তম' নাম ধরে কয়েকবার ডেকেছিলেন। অন্য একদিন তিনি ঐ কদমতলায় বসে বিশ্রাম করেছিলেন। শুনে যুবরাজ নরোত্তমের মনটা উদাস হয়ে গেল। সেইদিন রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখলেন মহাপ্রভু তাঁকে বলছেন : "নরোত্তম, তোমার জন্যই ঐ কদমগাছ তলায় আমি 'ডাক' থুইয়া গিয়াছিলাম।"

নরোত্তমের প্রাণে সেই থেকেই ইহজগতের সবকিছু কেমন বিস্বাদ হয়ে গেল। পিতার রাজ্যসম্পদ, সমাজ, সংসার সব মিথ্যা বোধ হতে লাগল। শ্রীভগবানের প্রিয় আবাসভূমি শ্রীধাম বৃন্দাবনের জন্য প্রাণ আঁকুবাঁকু করতে লাগল। সংসারে একটি দিন বাস করাও যেন অনন্তকাল নরকবাস-তুল্য মনে হতে লাগল।

সর্বপ্রকার সংসার-বাসনা জলাঞ্জলি দিয়ে সেই সুদর্শন যুবরাজ বৈরাগীর বেশে শ্রীধাম বৃন্দাবনে উপনীত হলেন। তখন মহাপ্রভুর দুই অন্তরঙ্গ শিষ্য রূপ ও সনাতন গোস্বামী লুপ্ত বৃন্দাবন আবিষ্কার ও বৈষ্ণবশাস্ত্রাদি প্রণয়নান্তে স্বধামে গমন করেছেন।

তাঁদের শিষ্যপ্রতীম জীব গোস্বামী তখন গোবিন্দদেবের মন্দিরে নরোত্তমকে আশ্রয় দিয়ে যাবতীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র, আচরণাদি যত্নপূর্বক শিক্ষা দেন। ধীরে ধীরে নরোত্তমের পবিত্র অন্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তি ও প্রেমের প্লাবন প্রবাহিত হলো। গুরুদেব জীব গোস্বামী উপযুক্ত শিষ্য পেয়ে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে 'ঠাকুর' উপাধি প্রদান করেন। সেই থেকে তিনি 'নরোত্তম ঠাকুর' নামে পরিচিত হন।

এইসময় বিখ্যাত গায়ক তানসেনের গুরু সঙ্গীতাচার্য হরিদাস ঠাকুর বৃন্দাবনে বাস করতেন। নরোত্তমের বিনীত ব্যবহার ও শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে হরিদাস ঠাকুর তাঁকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন ও ধ্রুপদ সঙ্গীত শিক্ষা দেন।

পরবর্তী জীবনে খেতুরে ফিরে এসে 'গরানহাটি কীর্তন'-এর সৃষ্টি করেন নরোত্তম। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে সেখানে এক বিরাট বৈষ্ণব সম্মেলন হয়। সেই মহোৎসবে তাঁর সৃষ্ট কীর্তন প্রথম গান করেন ও সকলকে মুগ্ধ করেন। এরপরে অচিরেই বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্মের জোয়ার বইতে থাকে। ❑

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

পারসীদের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রয়োজনে শকুনির অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন

এক অজানা অসুখে সারা ভারতবর্ষে 'গ্রিফন' (Griffon) শকুনিরা মারা যাচ্ছে। বন্যপ্রাণী-বিশারদরা এই জাতীয় প্রাণীর অস্তিত্বরক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হয়েছেন। কিন্তু ভারতের প্রাচীন ধর্মাবলম্বী পারসীদের কাছে ব্যাপারটি একটি বাস্তব সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পারসীরা তাঁদের মৃতদেহ সংকারের জন্য শকুনির ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় তাদের মৃতদেহ জমেই যাচ্ছে।

মুম্বাইয়ে পারসীদের সবচেয়ে বড় অন্ত্যেষ্টিস্থল, যেটি উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, সেই স্থানে মৃতদেহ রাখা হয়। সেখানে এমন দেহও রয়েছে, যা তিনবছর ধরে শকুনি খায়নি; এর ফলে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়া ছাড়াও জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনাও রয়েছে। পারসীরা পাশ্চাত্য থেকে বিশেষজ্ঞ এনে শকুনির সংখ্যা বাড়াবার চেষ্টা করছেন। তাঁদের প্রচেষ্টা যদি সফল হয়, তাহলে পারসীদের ধর্মীয় আচার রক্ষা হওয়া ছাড়াও ভারতে শকুনিরা আবার ফিরে আসবে।

পারসীরা প্রাচীন পারস্য দেশের জরথুস্ত্র-অনুগামী (Zoroastrian)। তাঁরা বিশ্বাস করেন, মাটি, জল ও আগুন পবিত্র এবং মৃতদেহ দ্বারা এদের দূষিত করা উচিত নয়। সেজন্য তাঁরা মৃতদেহ ঘেরা জায়গায় রেখে দেন এবং শত শত 'গ্রিফন' শকুনি দেহ সংকারের কাজ সম্পন্ন করে। ধনী পারসী পরিবারের মৃতদেহ শকুনিদের জন্য যে নির্দিষ্ট স্থানে রাখা হয়, তার নাম 'টাওয়ার অফ সাইলেন্স'। মালাবার হিলের ওপরে সেটি বেশ সুপরিচিত স্থান।

কিন্তু গত কয়েক বছরে ভারতবর্ষের বহু স্থানে 'গ্রিফন' প্রজাতির শকুনি প্রায় নিঃশেষিত হয়েছে। আগে সন্দেহ করা হয়েছিল, ভারতে বহুল প্রচলিত কীটনাশক ডি. ডি. টি. বিষই এর কারণ। কিন্তু লণ্ডন জুলজিক্যাল সোসাইটির ভেটারিনারি প্যাথলজিস্ট অ্যান্ড্রু কানিংহাম মনে করেন, ঐরকম বিষক্রিয়ায় কেবল এক প্রজাতির শকুনি মারা যাবে বা হঠাৎ বিভিন্ন স্থানে এবং এত ব্যাপকভাবে এইরকম ঘটনা ঘটবে, তার সম্ভাবনা কম। জীবাণু সংক্রমণের সম্ভাবনা আরো বেশি এবং কানিংহাম গতবছর বসন্তকালে কয়েকটি মৃত শকুনির দেহে ভাইরাস সংক্রমণ হওয়ার কিছু লক্ষণ দেখেছিলেন।

গতবছর মুম্বাইয়ের পারসীরা যখন এইরকম অসুখের সম্ভাবনা বুঝতে পেরেছিলেন, তখন তাঁরা ব্রিটেনের গ্লসেস্টারশায়ারে অবস্থিত 'ন্যাশনাল বার্ডস সেন্টার অফ প্রে সেন্টার'-এর প্রধান জেমিমা প্যারি জোন্সের কাছে গিয়েছিলেন। জেমিমা বলেন, তাঁরা ভেবেছিলেন, শকুনিরা অন্য কোথাও চলে গেছে। জেমিমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, *'টাওয়ার অফ সাইলেন্স'-এর ভিতরে অন্য কেউ জাল ফেলে* শকুনিদের শিকার করে নিয়ে যেতে পারে কিনা। জেমিমা বলেন, সমস্যাটা সরজমিনে দেখা দরকার। গোড়ার দিকে তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। কেবলমাত্র নীচজাতির কর্মীদেরই সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল। এমনকি পারসী নেতারাও কয়েকশ বছর সেখানে ঢোকেননি। কিন্তু সম্ভবত জেমিমাই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এই অন্ত্যেষ্টিস্থলের ভিতরটা দেখেছেন। তিনি বলেছেন, মৃতদেহগুলি বিভিন্ন অবস্থায় রয়েছে—একেবারে তাজা থেকে একবারে গলিত পর্যন্ত। গত তিনবছরে দেহগুলি শকুনিরা খায়নি। শীতকালে এগুলি শুকিয়ে যায়, কিন্তু বর্ষার আরম্ভে এগুলির কি অবস্থা হয় তা ভাবা যায় না।

স্বাস্থ্যের দিক থেকেও শবগুলি বিপজ্জনক অবস্থা সৃষ্টি করে। কাক, চিল এখন দলে দলে আসে, খায় এবং যেখানে সেখানে মাংস ছড়িয়ে চলে যায়। প্যারি জোন্স এই অবস্থার যা মূল্যায়ন করেছেন, তাও খুব আশাপ্রদ নয়। শকুনিদের ওখানে আটকে রাখলে সমস্যার সমাধান হবে না। ওদের খোলা জায়গা ও মিশ্রিত খাদ্য দরকার। তাঁর মতে, মুম্বাই শহরের এই সংকারস্থান বিক্রি করে সেই অর্থে শহরের বাইরে মুক্তাঞ্চলে বড়রকমের পক্ষীশালা তৈরি করা যায়। এমনকি সেখানে ধৃত পাখিদের নিয়ে তাদের বংশবৃদ্ধি করানো যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ২০০ পাখিই যথেষ্ট। অবশ্য পাখিদের বংশবৃদ্ধি করানোর চেষ্টা আগে কখনো হয়নি। তাছাড়া প্রকৃতিতে গ্রিফন শকুনির সংখ্যা এমন কমে গেছে যে, এই উদ্দেশ্যে সেখান থেকে পাখি ধরা সহজও নয় এবং উচিতও নয়।

সমস্যা হচ্ছে—কোন্ অজানা রোগে শকুনিরা মারা যাচ্ছে? ধরা অবস্থাতেও তো তারা সেই রোগে মারা যেতে পারে। ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা মৃতদেহ পরীক্ষা করে কারণ জানার চেষ্টা করছেন। আমেরিকা ও ইউরোপের বৈজ্ঞানিকরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসতে চান। কিন্তু তাঁরা এদেশীয় পাখির জিন (gene) পেটেন্ট করে নিতে পারেন—এ-ভয় আছে। কারণ জানা গেলে রোগের চিকিৎসা সহজ হয়ে যাবে। কারণ হিসাবে মৃত পক্ষীদের ব্যাকটিরিয়া, ভাইরাস, ফাঙ্গাস জীবাণু খোঁজা হচ্ছে। এগুলি কারণ হলে মুরগী-ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সেই রোগের চিকিৎসাপদ্ধতি বা টীকা জানা যাবে। প্যারি জোন্স, যিনি মরিশাসে কেস্ট্রেল পাখিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হওয়ার অবস্থা থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, তিনি আশা করেন যে, শকুনির প্রজনন করিয়ে তাদের আবার ফিরিয়ে আনা যেতে পারে।

[New Sciencetist, 5 August 2000, p. 20] ❑

ঈশ্বর তাঁদের সঙ্গে বাস করতেন

শঙ্করীপ্রসাদ বসু



God Lived With Them
Swami Chetanananda
Published By :
Advaita Ashrama
5 Dehi Entally Road
Kolkata-700 014
Pages : 656
Price : 100.00

[redacted]দেশে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীরা যান রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বেদান্তমন্দির নির্মাণ করতে। বিভিন্ন সন্ন্যাসীর হাতে সেইসব মন্দিরের নানা আকার ঘটে। এঁদের একজন স্বামী চেতনানন্দ। তিনি স্থির করেছিলেন, তিনি কাগজ, কালি, রঙ দিয়ে মন্দির তৈরি করবেন। সেই কালি প্রেমভক্তির রক্তরসায়ন, তার রঙ চৈতন্যের এবং কাগজটি পাতা আছে বক্ষপটের ওপরে। এই আশ্চর্য মন্দির থেকে মাঝে মাঝে এক-এক মূর্তি বেরিয়ে আসে। এবার এসেছে নতুন গ্রন্থরূপী মূর্তি—**'God Lived With Them'**। আগের মূর্তির নাম ছিল—'They Lived With God'। সাদা কথায়, আগের বইটি শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্যদের চরিতচিত্র, আর এই বইটি তাঁর অন্তরঙ্গদের জীবনকথা।

আলোচ্য বইটির নাম বড়ই সাহসিক—'ঈশ্বর তাঁদের সঙ্গে বাস করতেন'। উলটো পক্ষে মনে হতে পারে, এ আর এমন কথা কি। ঈশ্বর তো সকলের সঙ্গেই থাকেন। স্বামী চেতনানন্দ কিন্তু কথাগুলিকে বিশিষ্টার্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি যে-ঈশ্বরের কথা বলছেন, তিনি রক্ত-মাংসের দেহধারী ঈশ্বর—সে-ঈশ্বরের একান্ত গৃহের বাসিন্দা হতে হলে সকলকে ঘরছাড়া হয়ে আসতে হবে। কয়েকটি মানুষ গৃহত্যাগ করে ঈশ্বরঘরের বাসিন্দা হয়েছিলেন। তাঁদের কাছে ঈশ্বর বাধাহীন—নিরাবরণ। তাঁরাও ঈশ্বরের কাছে তাই। শরীরের একটা আবরণ থাকে বটে, কিন্তু তা চূর্ণ হয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে। তখন সব মিশে একাকার। চৈতন্যসমুদ্রের লীলা চলে নিজের ঢেউগুলি নিয়ে। ঢেউগুলির ওঠা-পড়া থাকলে ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির তরঙ্গে তরঙ্গে নাচানাচি করেন। আর তা না থাকলে প্রলয়ের ঈশ্বর নিশ্চল, নির্মম, নির্বিকার।

এই গ্রন্থে সৃষ্টির ঈশ্বরের প্রসঙ্গেই স্বামী চেতনানন্দ ব্যাপৃত। সেই ঈশ্বরকে তিনি বন্দী করেছেন তাঁর সখা-শিষ্যদের বেষ্টনীর মধ্যে—যাঁদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর অবতরণ; যাঁদের কাঁধে উঠে, মাথায় চড়ে, পিঠে ঝুলে, হাত ধরে তাঁর পৃথিবীর পথচলা।

বিষয়বস্তু অনুযায়ী বইটি, বিশেষত তা স্বামী চেতনানন্দের হাত থেকে বেরিয়েছে বলে কেবল বস্তুময় নয়—ভাবময়, রসময় এবং রূপময়। পূজার জন্য তিনি বেছে বেছে সুন্দর ফুলগুলি তোলেন, সযত্নে মালা গেঁথে অনুরাগের চন্দনে ডুবিয়ে প্রভুর গলায় পরিয়ে দেন। তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন, ঈশ্বরের অন্তরঙ্গদের কথা বলার সময় তাঁদের বহিরঙ্গ কার্যাবলী কোনভাবে অন্তরস্থ ঈশ্বরসত্যের দীপ্তিকে যেন আচ্ছন্ন না করে। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যগণের কর্মময় জীবনের কথা বলার সময়ে অনেকেই তাঁদের অনুচিতভাবে আশ্চর্য কর্মী-রূপেই চিত্রিত করে থাকেন—এই ধরনের একটা অভিযোগ স্বামী চেতনানন্দের মনে ছিল কিনা জানি না। থাক বা না থাক, তিনি ঐসব অন্তরঙ্গের মূল জীবনসত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের কাজে কদাপি বিরত হননি—তাঁরা ছিলেন জীবনের ব্যস্ততম কর্মক্ষণেও ঈশ্বরকর্মী।

স্বামী বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণের ষোলজন সন্ন্যাসী শিষ্যের জীবনকথা এই গ্রন্থে বিধৃত। পাকা কলমে লেখা এই জীবনচিত্রগুলিতে স্বামী চেতনানন্দ দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে তথ্যগত বাস্তবতা রক্ষা করেও নাটক, ছোটগল্প এবং মধুর কাব্যের স্বাদ একত্র করা যায়। ঘটনাগুলি বাস্তব, কিন্তু তাদের ইশারা অন্যত্র। যে স্বচ্ছন্দবিহারী সুন্দর পাখিটি গাছে এসে বিশ্রাম নিচ্ছে, তার বস্তুগত বর্ণনা করলেও তার ডানার অনন্তের গন্ধ মুছে যায় না।

এই গ্রন্থে প্রচুর গবেষণা আছে। কেবল প্রচলিত রামকৃষ্ণ-সাহিত্য ওলট-পালট করে তিনি তথ্যসন্ধান করেননি, নতুন চিত্তাকর্ষক তথ্যও জোগাড় করেছেন। অপ্রকাশিত চিঠিপত্র, ডায়েরি, স্মৃতিকথা ইত্যাদিতে পেয়েছেন নানা প্রয়োজনীয় বিষয়। আগেই স্বামী গম্ভীরানন্দের 'শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা' লেখা হয়ে গেছে। নিবিড় নিবিষ্ট ভাবঘনময় সেই জীবনচিত্রগুলি অনবদ্য। সেখানে প্রদত্ত তথ্য ব্যবহারের সুযোগ তাঁর ছিল, কিন্তু সেখানেই তিনি থামেননি—তৃষ্ণাকাতর হয়ে আরো সন্ধান করেছেন। স্বামী গম্ভীরানন্দকে নির্দিষ্ট পৃষ্ঠামাপের মধ্যে কাজটা করতে হয়েছিল, কিন্তু স্বামী চেতনানন্দের সেই বাধ্যবাধকতা ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গদের সম্পর্কে কোন সংবাদই তাৎপর্যহীন নয়, সবকিছুর সঙ্গে দৃশ্য বা অদৃশ্য স্বর্ণসূত্র জড়ানো আছে। তাই কোন কিছুই বাদ দেওয়া যায় না। আবার সবকিছুকে বিদগ্ধ বিশ্বমনে গ্রাহ্য করার দায়িত্বও আছে—কেননা তাঁর বই বিশেষভাবে পাশ্চাত্য পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত। (যদিও বলা যায়, ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির কল্যাণে শিক্ষিত

ভারতীয়রা অনেক সময়ে পশ্চিমীর চেয়ে অধিক পশ্চিমী। তার ওপরে, ভারতবর্ষ বহু ভাষার দেশ, সুতরাং ভারতের সর্বশ্রেণীর পাঠকের কাছে পৌঁছাতে হলে সাধারণ ভাষা ইংরেজীর সাহায্য নিতেই হয় এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্কৃতির ভিন্নতার কারণে সর্ববোধ্য ভাবগুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করাও প্রয়োজন।)

যে-কথা একটু আগে বলেছি, সেবিষয়ে নিজেই প্রশ্ন তুলব—এই বই কি সাদা কথায় শ্রীরামকৃষ্ণ-অন্তরঙ্গদের জীবনচিত্র—ব্যাপক তথ্যানুসন্ধানের ভিত্তিতে রচিত? কথাটি আপাতসত্য হলেও পূর্ণসত্য নয়। কিছু দুঃসাহসের সঙ্গে বলা যায়, বইটি এক অর্থে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীও বটে। শ্রীরামকৃষ্ণের মর্ত্যজীবন কি মাত্র পঞ্চাশ বছরে সমাপ্ত? না। আরো বেশ কিছুদিন তিনি স্বরূপ-শক্তিতে বর্তমান ছিলেন—তাঁর আলোচ্য শিষ্যদের মধ্য দিয়ে। শ্রীরামকৃষ্ণের দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষব্যাপী সাধনার কথা আমরা শুনি। কিন্তু যিনি অবতীর্ণ ঈশ্বর, তাঁর আবার সাধনা কি? ভক্তজন বলেন, ওসব লোকশিক্ষার জন্য করা। ঠিক। তাহলেও এই কথাটা কি করে অস্বীকার করা যাবে যে, যখন তিনি দেহধারণ করেছেন তখন জন্ম-বৃদ্ধি-লয়ের অধীনতাও স্বীকার করেছেন? সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় একইসঙ্গে ক্রিয়াশীল। সুতরাং অবতীর্ণ ঈশ্বরকে সাধনার ধারাপথে অগ্রসর হতেই হয়—সে তাঁর মায়ার আবরণ খোলার লীলা। বড় কঠিন লীলা। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর দহনজ্বালায় আর্তনাদ—বালিতে মুখ ঘষে রক্তাক্ত কান্না, আত্মহননের খড়্গের ভাষায় জগজ্জননীকে তাঁর চরম সতর্কবাণী—"যদি তুই দেখা না দিবি...!" আমরা ভাবি, তারপরেই তাঁর সিদ্ধি এবং আত্মারাম অবস্থায় আলোকবিকিরণ। স্বামী চেতনানন্দের লেখা জীবনচরিতগুলি পড়ে জানলাম—ঠাকুরের আত্মবিদারণ পর্ব দীর্ঘায়ত হয়েছিল অন্তরঙ্গদের যন্ত্রণাময় সাধনপর্বের মধ্য দিয়ে। ঐসব অন্তরঙ্গদের করে তুলতে হবে এক এক রামকৃষ্ণ—অবশ্যই তাঁরা হবেন আংশিক রামকৃষ্ণ—সোজা কথায় রামকৃষ্ণের অংশাবতার। সেই অংশাবতারদের সাধনাগত আত্মনির্মাণের কথা স্বামী চেতনানন্দ অনবদ্য আকারে উপস্থিত করেছেন। উপস্থিত করেছেন সিদ্ধির পরে ভক্তবৃন্দের মধ্যে তাঁদের পূর্ণকাম অবস্থানের কথাও।

ঈশ্বরাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের ঐ কঠোর সাধনা কেন—কেবল এই প্রশ্ন নয়, ঠাকুরের শিষ্যদের, যাঁরা ঈশ্বরকোটি, তাঁদের তীব্র কঠিন সাধনা কেন—এ-প্রশ্ন ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের কোন কোন গৃহী শিষ্যেরও। স্বামী ব্রহ্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র, সমুচ্চ অধ্যাত্মশক্তির অধিকারী; তিনি কেন ভিখারির মতো ঠাকুরের কাছে কৃপা প্রার্থনা করছেন—এ-প্রশ্ন এমনকি অন্য কারো নয়, তাঁর গুরুভাই স্বামী সুবোধানন্দের। ব্রহ্মানন্দের উত্তর ঃ "ভাই, তুমি যা বলছ তা সত্য। ঠাকুর আমাদের এতই ভালবাসতেন যে, তিনি তাঁর যা দেবার সবই আমাদের দিয়েছেন। তবু তো শান্তি মেলেনি। এর থেকেই দেখা যাচ্ছে, আমাদের জীবনোদ্দেশ্য সফল করার জন্য অবশিষ্ট কাজ আমাদেরই করতে হবে। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় বান্ধব, তবু শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন, 'যদি তুমি ঠিকভাবে আমার দেওয়া অধ্যাত্ম সত্যগুলি উপলব্ধি করতে চাও, তাহলে তোমাকে হিমালয়ে কোন নির্জন স্থানে গিয়ে কঠোর তপস্যা করতে হবে। যদি চাও তোমাকে অলৌকিক দর্শনাদি দিতে পারি, কিন্তু তা যথেষ্ট হবে না। ঈশ্বর-চিন্তা ও ঈশ্বর-ধ্যান অনেক বড় জিনিস।' " (দ্রঃ পৃঃ ৮৯)

এখানে স্বতই মনে পড়বে কাশীপুরে ত্যাগী গুরুভাইদের তপস্যায় প্রণোদিত করতে নরেন্দ্রনাথ কী বলেছিলেন—যেখানে রামচন্দ্র দত্তরা "প্রভুকে দেখেছি, আমাদের আর কি দরকার"—এই রসানন্দে বুঁদ হয়েছিলেন। অপরপক্ষে নরেন্দ্রনাথ স্বকৃত সাধনায় অর্জিত আনন্দের অধিকার চেয়েছিলেন।

গ্রন্থটিতে এমন সব রত্নমাণিক্যের ছড়াছড়ি। এখানে রত্নগুলি মন, চিত্ত এবং আত্মার রহস্যরসে ডোবানো। খণ্ড কাহিনীগুলি সংগৃহীত হয়েছে প্রচলিত গ্রন্থাদি থেকে, আবার তার সঙ্গে নতুন সম্ভারও সংযুক্ত।

জীবনসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দকে ঢেউয়ের পর ঢেউ কাটাতে হয়েছে—বাইরের ঢেউ, ভিতরের ঢেউ। যোদ্ধা তিনি, বাইরের ঢেউ তাঁকে উদ্দীপিত করেছে রণরঙ্গে, কিন্তু অবশ্যই বিচলিত হয়েছিলেন ভিতর থেকে ধেয়ে আসা প্রতিরোধের তরঙ্গে। সেবাকর্মমূলক মিশন প্রতিষ্ঠা করা কি সঙ্গত হয়েছে—গুরুভাইদের এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়ার কথা আমরা জানি। দ্বন্দ্ব কি তাঁর নিজের মনেও ছিল না? 'বেদান্ত' কখনই সংগঠিত ধর্ম নয়—সাধু-সন্ন্যাসীরা তাকে যুগে যুগে ব্যক্তিসাধনার বিষয় করেছেন। বিবেকানন্দ চাইলেন এমন একটি সন্ন্যাসী সঙ্ঘ, যা বেদান্তবাণীকে বহন করে নিয়ে যাবে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে। কিন্তু তিনি সংগঠিত ধর্মের ভাল-মন্দ দুইই জানতেন। সুতরাং আমেরিকায় থাকাকালে তাঁর মনে এবিষয়ে কোন্ আন্দোলন চলছিল, তা উপস্থিত করেছেন স্বামী চেতনানন্দ। "সংগঠন করব, কি করব না? সংগঠন যদি করি তাহলে ভাবের গাঢ়তা নাশ হবে। আর যদি না করি তাহলে ভাববিস্তার ঘটবেও না।" (দ্রঃ পৃঃ ৫৩)

বিবেকানন্দের উপায় ছিল তাঁর "প্রভু আমার, সখা আমার"-এর সঙ্গে পরামর্শ করা। সেই পরামর্শ সেরে তিনি নিজ কৃতকর্মের সমর্থনে ঝাঁঝিয়ে উঠে বলেছিলেন ঃ "তোরাই কেবল রামকৃষ্ণকে বুঝিস—আর আমি বুঝি না? তিনি অনন্ত ভাবময়—তাঁর ইয়ত্তা তোরা করবি?" ইত্যাদি। এই প্রভু/সখাটির সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা হতো, তাঁকে সরাসরি খাওয়ানোর দায়ও তিনি নিয়েছেন। স্বামী বোধানন্দ একদিন অন্তরাল থেকে শুনেছেন—স্বামীজী বলছিলেন ঃ "সখা, দয়া করে খেয়ে নাও।" (দ্রঃ পৃঃ ৬৬) তার পরের কথাটা অবশ্যই হবে, যা লেখা নেই—'তুমি না খেলে আমরা কি করে খাই বল?'

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

স্বামী ব্রহ্মানন্দের সাধনার হেতু কি ছিল তা একটু আগে দেখেছি। সুখ-দুঃখ, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে অনুদ্বিগ্নমন কিভাবে হতে হয়, তার দৃষ্টান্ত আছে তাঁর সাধনজীবনে। বৃন্দাবনে অযাচক ব্রত নিয়ে তিনি তখন তপস্যা করছেন। সেইসময়ে এক ব্যক্তি তাঁর সামনে একটি নতুন কম্বল রেখে গেলেন। ব্রহ্মানন্দ নির্বিকার। একটি চোর এসে সেই কম্বলটি তুলে নিয়ে গেল। ব্রহ্মানন্দ পূর্ববৎ নির্বিকার। (দ্রঃ পৃঃ ৯০) কিন্তু তাঁর ভিতরে কৌতুকপ্রবণ যে-মানুষটি সর্বদা নড়াচড়া করতেন, তিনি নিজ শিষ্যদের ধ্যানজপের সাক্ষাৎ ফলদানের মজাও করতেন। স্বামী প্রভবানন্দের স্মৃতিঃ "তাঁর একটি প্রিয় কৌতুক ছিল—ধ্যানরত কোন শিষ্যের সামনে ফলমিষ্টির একটি ডিস রেখে দেওয়া। ধ্যানভঙ্গে শিষ্যটি দেখত, তার সামনে তার প্রিয় খাদ্যগুলি সাজানো আছে। পরে মহারাজ জিজ্ঞাসা করতেন—'তুমি তোমার তপস্যার ফললাভ করেছিলে তো?' " (দ্রঃ পৃঃ ১১৯)

স্বামী বিবেকানন্দ যে বলতেন, ঠাকুরের সব ভাবনা ও অনুভূতির ইয়ত্তা করা যায় না, স্বামী ব্রহ্মানন্দও এক বিশেষ দিক দিয়ে তাই বলতে বাধ্য হয়েছিলেন—বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষণাগার দর্শনের পরে। জগদীশচন্দ্রের সহকারী বৈজ্ঞানিক ডঃ বশী সেন তাঁকে সেখানে যন্ত্রযোগে বহির্বস্তুর সংস্পর্শে বৃক্ষলতার মধ্যে অনুভূতির ফলস্বরূপ স্পন্দনাদির রূপ দেখান। ফিরে যাওয়ার পরে, যা দেখেছেন সেবিষয়ে আবিষ্টভাবে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন ঃ "একটা সময় গেছে যখন ঠাকুর ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে পারতেন না—লাফিয়ে লাফিয়ে খালি জায়গার ওপর পা রেখে চলতেন, যাতে ঘাস মাড়াতে না হয়। সেসময় আমরা বিশ্বাসই করতুম না ঘাসের কোন অনুভূতি আছে। কিন্তু আজ যা দেখলুম তাতে বুঝেছি—কি অভ্রান্ত ঠাকুরের উপলব্ধি।" (দ্রঃ পৃঃ ১২৩-১২৪)

শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক কাজের মধ্যে মৃন্ময় অবস্থান ও চিন্ময় অবস্থানের ভেদরেখা মুছে দেওয়াও ছিল। সুতরাং তাঁর পার্থিব দেহান্তের পরেও তাঁর প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যবোধ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নিরন্তর ঘটত। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কিছু উক্তি সঙ্কলন করে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। ১৯১২ সালে বারাণসীতে অবস্থানকালে তিনি যখন সঙ্কলনটি সমাপ্ত করেন, তখনকার একটি ঘটনা স্মরণযোগ্য। যেসময় তিনি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করছিলেন, তখন তিনি তাঁর ঘরে কাউকে থাকতে দিতেন না। কখনো কখনো মধ্যরাত্রে উঠে সেবককে পাণ্ডুলিপি নিয়ে আসতে বলতেন। একবার পাণ্ডুলিপি সংশোধন করার পরে তিনি বলেছিলেন ঃ "ঠাকুর এসে আমাকে বললেন, আমি ওকথা বলিনি—আমি এ-ই বলেছিলুম।"

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' স্বামী সারদানন্দ একাধিক কারণে লিখতে শুরু করলেও রচনাকালে তিনি আদেশ-চালিত ছিলেন, তাও জানা যায় স্বামী নিখিলানন্দের স্মৃতিকথা থেকে। 'লীলাপ্রসঙ্গ' অসম্পূর্ণ রচনা—তাতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের কাশীপুর-পর্ব নেই ('আত্মপ্রকাশে অভয়দান' অংশ বাদ দিলে)। এ নিয়ে পাঠকসমাজে ও ভক্তমণ্ডলীতে ক্ষোভের সীমা ছিল না। সেজন্য অনেকের মতো স্বয়ং স্বামীজী-শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দ তাঁকে ১৯২৫ সালে বারাণসীতে গ্রন্থের শেষ পর্ব লিখতে অনুরোধ করেন। স্বামী সারদানন্দের শরীর ভাল নয়, তাই স্বামী নিখিলানন্দ তাঁর বক্তব্য টুকে নেবেন (কাশীপুরের ঘটনার বিষয়ে সারদানন্দের নোট করাও ছিল)—এই ব্যবস্থা করেন। তারপর কি ঘটল স্বামী নিখিলানন্দের স্মৃতিকথার অনুবাদে সরাসরি উপস্থিত করা যায় ঃ "আমরা যখন [বারাণসী থেকে] পুরী যাচ্ছি, স্বামী সারদানন্দকে স্বামী শুদ্ধানন্দ লেখাটির বিষয়ে আবার স্মরণ করিয়ে দিলেন।... তখন স্বামী সারদানন্দ এই তাৎপর্যপূর্ণ কথাগুলি বলেছিলেন—'যখন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী জীবিত ছিলেন তখন আমি ভিতরে বিশেষ শক্তি অনুভব করে লীলাপ্রসঙ্গ লেখা শুরু করেছিলুম। তাঁর দেহত্যাগের পরে মনে হয়েছিল, আমার সব শক্তি চলে গেল। তারপর পেলুম স্বামী ব্রহ্মানন্দকে—আবার শক্তি অনুভব করতে লাগলুম। তাঁর দেহত্যাগের পরে মনে হলো আমার মস্তিষ্কে যেন পুরো পক্ষাঘাত হয়ে গেছে। আমার পক্ষে বইটি শেষ করা সম্ভব হলো না।' " (দ্রঃ পৃঃ ৩৩৮)

এইখানেই শেষ নয়। স্বামী সারদানন্দ আরো বলেছিলেন ঃ "লীলাপ্রসঙ্গ লিখতে শুরু করার সময়ে আমার মনে হয়েছিল—আমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বুঝে ফেলেছি। কিন্তু এখন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, গভীর গহন ঠাকুরের জীবন। আমি কেবল মহাবৃক্ষের ডালপালার মধ্যে ঘোরাফেরা করছি—শিকড় মাটির অনেক নিচে।" (দ্রঃ পৃঃ ৩৩৮)

সত্যই কি স্বামী সারদানন্দ তাঁর গ্রন্থে কেবল ডালপালার সংবাদ দিয়েছিলেন? বোধহয় না। তিনি চরম ও পরম কথাগুলি এর পরে বলেন ঃ "লীলাপ্রসঙ্গ সম্ভবত কখনই শেষ করা যাবে না। আমি ভিতর থেকে প্রেরণা বোধ করছি না। *ঠাকুর যা চেয়েছিলেন তাই আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলেন। এখন যখন নিজে লীলাপ্রসঙ্গ পড়ি, তখন অবাক হয়ে ভাবি—এসব কি আমিই লিখেছিলুম? আমার আর নিজের কিছু করবার নেই। ঠাকুরই যেন সব করছেন।*" (দ্রঃ পৃঃ ৩৩৮)

সুতরাং বলা যায়, স্বামী সারদানন্দ রামকৃষ্ণ-জীবনসত্য পরিবেশনের কালে শ্রৌত ঋষির ভূমিকা নিয়েছিলেন। সে-ভূমিকা তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন সবকিছু শ্রীরামকৃষ্ণকে নিবেদন করার ফলে। মান বা অপমান, যা পেয়েছেন—সবই 'তাঁর'।

স্বামী চেতনানন্দ তাঁর গ্রন্থভুক্ত চরিত্রগুলির মৌল বৈশিষ্ট্য দু-এক আঁচড়ে তুলে ধরতে পেরেছেন। স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন অদ্বৈতবাদী দার্শনিক সন্ন্যাসী। ছাত্রাবস্থায় তিনি চিত্রাঙ্কণে কিছু নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন, কিন্তু কিছু পরে ড্রয়িং ক্লাসে যাওয়া ছেড়ে দেন। তাতে শিক্ষক মহাশয় ক্ষুণ্ণ হয়ে

তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেন—শিল্পচর্চা ত্যাগ করা উচিত নয়—এই ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে। কিন্তু তাঁর এই ছাত্রটি বলেন—না, আমি শিল্পী নয়, দার্শনিক হব। কারণ—"একজন শিল্পী কোন বস্তুর বাইরের আকারেই মনোনিবেশ করেন, কিন্তু একজন দার্শনিক ভিতরে প্রবেশ করে কার্যের কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। আমি তাই দার্শনিক হতে চাই।" (দ্রঃ পৃঃ ৪৪২)

শিল্পী কেবল বাইরের আকার নিয়েই ব্যস্ত থাকেন—এই মত অবশ্য সর্বদা সত্য নয় এবং স্বামী অভেদানন্দও পরবর্তী কালে সেই মত পোষণ করতেন বলে মনে হয় না। কিন্তু প্রথমাবধি তাঁর মনোরূপ বোঝার জন্য স্বামী চেতনানন্দ-উদ্ধৃত তাঁর উক্তিটি অতীব সহায়ক।

স্বামী তুরীয়ানন্দও ছিলেন জ্ঞানমার্গী অদ্বৈতপন্থী সন্ন্যাসী। ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে পরিব্রাজক হয়ে তিনি ভারতের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তপস্যাদিও করছেন। পরিক্রমণের সময় ভিক্ষা করতে হয় ঘরে ঘরে, তবে যদি আহার্য জোটে। একদিন তাঁর মনে হলো—"এ আমি কী করছি। আমি তো ভ্যাগাবণ্ড। সকলে পরিশ্রম করছে, কিছু না কিছু তৈরি করছে, আর আমি তো কিছুই করছি না।" বৃন্দাবনের কাশীঘাটে একটি গাছের তলায় একদিন ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে শুয়ে পড়েছেন; নিদ্রিত অবস্থায় তাঁর এক অপূর্ব 'দর্শন' হলোঃ "দেহ থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছেন; নিদ্রাকালে নিজেকে তিনি দেখছেন। দেখলেন, তাঁর শরীর বাড়ছে তো বাড়ছেই—তার শেষ নেই, সীমা নেই। শরীর এত বিশাল হয়ে দাঁড়াল যে, সারা পৃথিবীকে ঢেকে ফেলল। তখন তিনি নিজেকে সম্বোধন করে বললেন, 'না, না, তুমি ভ্যাগাবণ্ড নও, তুমি বিশ্বব্যাপ্ত, তুমি সর্বানুস্যূত আত্মা।' এই চিন্তা আসামাত্র তিনি খাড়া হয়ে উঠলেন আনন্দে, তাঁর নৈরাশ্যের ইতি ঘটল সেখানেই।" (দ্রঃ পৃঃ ৩৬৬)

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের কাজকর্ম করাবার জন্য বিহারী মেষপালক যুবক রাখতুরামকে—যিনি ডঃ রামচন্দ্র দত্তের বাড়িতে ভৃত্যরূপে বহাল ছিলেন—নিজের কাছে রেখে দেন একটি অলৌকিক কাণ্ড ঘটাবার জন্য। ভৃত্য রাখতুরামকে সিদ্ধ মহাপুরুষ 'লাটু মহারাজ' করে তুলতে হবে এবং তা তিনি করেওছিলেন। ঠাকুরের সেবা করতে এসে সেবার আসল চেহারাটা লাটু দেখতে পেয়েছিলেন। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের স্মৃতিকথায় ক্ষুদ্র কিন্তু উজ্জ্বল একটি অধ্যাত্মকাহিনী পাই। শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন দুপুরে লাটুকে শিবমন্দিরে ধ্যান করতে পাঠান। বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা ঘনালেও লাটুর দেখা নেই। ঠাকুরের নির্দেশে রামলাল গিয়ে দেখেন, লাটু প্রস্তরবৎ স্থির, কিন্তু ঘেমে নেয়ে গেছেন। সেকথা শুনে ঠাকুর পাখা হাতে করে সেখানে উপস্থিত, রামলালকে এক গ্লাস জল আনতেও বললেন। ঠাকুর বাতাস করতে শুরু করলে লাটু কাঁপতে লাগলেন। ঠাকুর বললেনঃ "ওরে লেটো, সন্ধ্যে যে হয়, কখন লণ্ঠন পরিষ্কার করে জ্বালবি বল?" ঠাকুরের কণ্ঠস্বর শুনে ক্রমে লাটুর জ্ঞান ফিরে আসতে লাগল, চোখ খুললেন, আর সামনে ঠাকুরকে দেখে হতভম্ব। ঠাকুর বললেনঃ "ওরে, তুই বড্ড ঘেমেছিস্‌, একটু বিশ্রাম করে তবে উঠবি।" ইতিমধ্যে লাটু পুরো জ্ঞান ফিরে পেয়ে বুঝেছিলেন, কি ঘটেছে। আক্ষেপে চেঁচিয়ে বললেনঃ "এ আপুনি কী করছেন? এতে কি আমার পাপ হোবে না? হামারি তো আপনাকে সেবা করার কথা।" গভীর স্নেহের সঙ্গে ঠাকুর বললেনঃ "ওরে, আমি কি তোর সেবা করছি—তোর ভিতরে যে শিব ঢুকে আছেন, সেবা করছি তাঁরই। এই অসহ্য গরমে তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। আচ্ছা, তুই কি বুঝতে পেরেছিলি, তিনি তোর ভিতরে ঢুকে পড়েছিলেন?" লাটু বললেন: ঃ "না, হামি তো কিছুই জানে না। হামি শিবলিঙ্গ দেখছিলাম—দেখি কি সেখানে অপূর্ব জ্যোতি। শুধু মালুম আছে, সারা মন্দির সেই জ্যোতিতে ডুবে আছে। তারপর হামার জ্ঞান হারিয়ে যায়।" (দ্রঃ পৃঃ ৪০৬)

স্বামী সুবোধানন্দ গুরুভাইদের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ, তাই নাম 'খোকা মহারাজ'। খোকার মতোই সরল তিনি। মঠাধ্যক্ষ স্বামী শিবানন্দ তাঁকে ঢাকায় দীক্ষা দিতে বলেছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজের আদেশ অবশ্যই শিরোধার্য। সুতরাং তিনি দীক্ষা দেওয়ার বন্যা বইয়ে দিলেন—তার থেকে বাদ গেল না শিশুরাও। এবার স্বামী শিবানন্দকে বিচলিত হতে হলো। প্রশ্ন করলেনঃ "সে কি, শিশুরা কি করে জপ-ধ্যান করবে?" খোকা মহারাজের সরল নির্বিকার উত্তরঃ "ওসব আমি জানি না। আপনি দীক্ষা দিতে আদেশ করেছেন—আমি দীক্ষা দিয়েছি। কাউকে বঞ্চিত করিনি।" (দ্রঃ পৃঃ ৫৪৯)

খোকার উলটোদিকে বুড়ো। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী অদ্বৈতানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণেরও বয়োজ্যেষ্ঠ। তাই সাধারণ নাম 'বুড়োবাবা'। তিনি খুব হাসিখুশি থাকতেন। তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণ-স্মৃতির একটি মাণিক্য—

ডাঃ মহেন্দ্র পালের সঙ্গে তিনি দক্ষিণেশ্বর গেছেন। উদ্যানপথে চলবার সময় দেখেন, মাথায় বিষ্ঠার টব নিয়ে মেথরানী আসছে। ঠাকুর দেখামাত্র তার সামনে সাষ্টাঙ্গ হয়ে শুয়ে পড়লেন, বললেনঃ "মাগো, তুমি ছাড়া একাজ আর কে করতে পারে?" (দ্রঃ পৃঃ ৫১৬)

হ্যাঁ, মা-ই তো সন্তানের মলমূত্র পরিষ্কার করে তাকে বড় করে তোলেন।

স্বামী অখণ্ডানন্দের ছিল 'চক্ষু মেলিয়া বিশ্ব দেখিবার' নেশা। প্রথমে সেই বিশ্বকে এবং পরবর্তী কালে বিশ্বমধ্যে তাঁর ঠাকুরকে তিনি দেখতে শুরু করলেন আতুর মানুষের মধ্যে। সেই মনুষ্যশ্রেণীতে তাঁর দিব্যভাবের গুরুভাইরাও ছিলেন। আলমবাজার মঠে একদিন দেখলেন, তাঁর গুরুভাইরা ঘুমাচ্ছেন ঘর্মাক্ত দেহে। পাখা এনে তাঁদের বাতাস করতে লাগলেন। খানিক পরে সবিস্ময়ে অনুভব করেন, পাখা করার পরিশ্রমে নিজে মোটেই ঘর্মাক্ত নন, শরীর শীতল হয়ে গেছে।

উপলব্ধি করলেন, অপরের সুখ ও দুঃখের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার শক্তি তাঁর হয়েছে। (দ্রঃ পৃঃ ৫৭৭)

সুতরাং এমন ঘটনা ঘটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়—মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী চলেছে। মধ্যবয়সী রমণী গয়া বৈষ্ণবী কঠিন আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে মলমূত্র মাখা অবস্থায় মুমূর্ষু হয়ে পড়ে আছেন। নিঃসম্বল স্বামী অখণ্ডানন্দ জমিদারের কাছে ভিক্ষা করে তাঁর সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করলেন। গয়া বৈষ্ণবী বেঁচে গেলেন। দুচোখ ভরা জল নিয়ে তিনি অখণ্ডানন্দজীকে বলেছিলেন ঃ "বাবা, পূর্বজন্মে তুমি আমার ছেলে ছিলে।" অখণ্ডানন্দজী বললেন ঃ "পূর্বজন্মে কেন মা, আমি এই জন্মেই তোমার ছেলে।" (দ্রঃ পৃঃ ৫৭৮)

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ছিলেন গম্ভীর পুরুষ। আধ্যাত্মিক দর্শনাদিতে মগ্ন। সন্ন্যাসীর আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনে ব্রতী। এ হেন স্বামী বিজ্ঞানানন্দ নানা মজার খেয়ালখুশিতে থাকতেন। তার মধ্যে আবার গভীরের টান এসে যেত। একটা দৃষ্টান্ত। তাঁর শরীর ঢাকা থাকত অনেকগুলি পকেট-সমেত এক বিরাট ঢোলা জামায়। আর ভিতরে গায়ের সঙ্গে লেগে থাকত গেঞ্জি। এই ঢোলা জামা ও গেঞ্জির মধ্যে বেশ কয়েকটি জামার স্তর। তাঁর গাত্রাভরণ মোচন একটা দর্শনীয় ব্যাপার ছিল। ১৯৩৩ সালে কলম্বোয় থাকাকালে এক তরুণ সন্ন্যাসী চমৎকৃত হয়ে দেখেন—মহারাজ কোট খুললেন, সোয়েটার খুললেন, শার্ট খুললেন, টি-শার্ট খুললেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। বিজ্ঞানানন্দজীর এই বস্ত্রমোচন পর্ব সন্ন্যাসীটিকে শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা স্মরণ করিয়ে দিল। তিনি বললেন ঃ "ঠাকুর মানুষের অহংকে পেঁয়াজের খোসার সঙ্গে তুলনা করেছেন। খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে দেখা যায় শেষপর্যন্ত কিছুই নেই। আপনার জামা ছাড়ানো সেই ধরনের।" বিজ্ঞানানন্দজী হাসলেন, বললেন ঃ "আরে শাস্ত্রে বলেছেন, শরীরের মধ্যে আছে পঞ্চকোষ। আমি তার ওপর সাতটি কি আটটি আচ্ছাদন দিয়ে রাখি, পাছে লোকেরা আমার আত্মাকে দেখতে পায়!"

মহাকাব্যিক বীরচরিত্রের মতো বীর্যোন্নত স্বামী নিরঞ্জনানন্দ কৈশোরে-যৌবনে প্রেতচর্চার উত্তম মিডিয়াম ছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সেই ব্যসন থেকে মুক্ত করেছিলেন। "তুই ঠিক কর, ভূত হবি কি ভগবান হবি?"—একথা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যপড়া মানুষের মোটামুটি জানা আছে। সেইভাবে জানা নেই একটি ঘটনার কথা। নিরঞ্জন তাঁর কাকা আহিরীটোলা-নিবাসী ডাঃ প্যারীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে সম্মোহিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু এক ঘণ্টার ওপর চেষ্টা করেও তাতে সফল হতে পারেননি। (দ্রঃ পৃঃ ২৪৪)

স্বামী প্রেমানন্দ সার্থকনামা। ঈশ্বরপ্রেম ও ঈশ্বরভক্ত-প্রেমের মূর্তিমান বিগ্রহ এই অলৌকিক পুরুষ ভালবাসায় সকলকে ভাসিয়ে দিতেন, কিন্তু শিক্ষা দিতেন নির্দিষ্ট অব্যর্থভাবে। যখন এক তরুণ সন্ন্যাসী বলেছিলেন—ঠাকুর আপনাদের বিরাট করে দিয়েছেন। তখন তিনি বলেছিলেন ঃ "না, তিনি আমাদের সব অহং কেড়ে নিয়ে দীনাতিদীন করে দিয়েছেন।" (দ্রঃ পৃঃ ২০২) স্বামী প্রেমানন্দের প্রশ্নের উত্তরে স্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ যখন বলেছিলেন, তিনি গীতা পড়েছেন; তখন তিনি দৃঢ়ভাবে বলেন ঃ "কদাপি বলবে না গীতা পড়েছি, বলবে গীতা পড়ছি। কেউ গীতা পড়ে শেষ করতে পারে না।" (দ্রঃ পৃঃ ২০৩)

দক্ষিণেশ্বরে আনন্দময় শ্রীরামকৃষ্ণ সমাগত মানুষদের অপূর্ব কথায়, ভাবপূর্ণ নৃত্যে, গীতে মোহিত করেছেন। সমাধির জ্যোতির্ময় লোকে বারবার প্রবেশ করে ফুটিয়ে তুলেছেন লোকাতীতের উদ্ভাস। 'কথামৃত'-এর কল্যাণে এইসব চিত্র অনেকের পরিচিত। তুলনায় কাশীপুরে ব্যাধিশরাহত শ্রীরামকৃষ্ণের বর্ণনা অল্পই মেলে। সেকালের একটি যন্ত্রণাছিন্ন চিত্র স্বামী প্রেমানন্দ তুলে ধরেছেন, যা দেখিয়ে দেয় কোন্ মূল্যে পরিত্রাতারা করুণাবর্ষণ করেন ঃ "ঠাকুর যখন ক্যান্সারের মর্মন্তুদ যন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন, তখনো প্রতিদিন প্রতীক্ষা করে থাকতেন কখন কোন্ ঈশ্বরপিপাসু মানুষ আসবে! রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতেন আর বলতেন, 'কি হলো, আজ যে তেমন কেউ এল না!'... [শরীরের এমন অবস্থা যে] ভাল করে কথা বলতে পারেন না, ফিসফিস করে কথা বলতেন—খিদে পেলেও [গলায় ক্যান্সার বলে] খেতে পারতেন না। শুয়েও শান্তি ছিল না, বসেও নয়—দিবারাত্রি সারা শরীর জ্বলছে। সেই ভয়ঙ্কর কষ্টের মধ্যেও মানুষের প্রতি তাঁর করুণার শেষ ছিল না, ঈশ্বরলাভে তাদের যে সাহায্য করতে হবে। এইরকম চলেছিল দেড় বছর। এ যদি ক্রুশবিদ্ধ হওয়া না হয়, তাহলে তা কী আমি জানি না।" (দ্রঃ পৃঃ ১৯১)

স্বামী চেতনানন্দ আমাদের ফলন্ত আমবাগানের মধ্যে নিয়ে গেছেন। বইটি হাতে নিয়ে যাঁরা আম খেয়ে মুখটি মুছে ফেলবেন, তাঁরা মজায় থাকবেন। কিন্তু আমার ওপর দায় পড়েছে আমবাগানের হিসেব দিতে হবে। বাগানের রূপে-রসে-গন্ধে দিশাহারা মানুষের পক্ষে এ বড় কঠিন দায়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিসাব মেলাতে অসুবিধা হয়েছে বৈকি! যেমন তিনি পূর্বপ্রচলিত জীবনীগুলির সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেছেন স্বামীজীর 'বিবেকানন্দ' নামগ্রহণ সম্পর্কে ঃ সন্ন্যাসের সময়ে স্বামীজী 'বিবিদিষানন্দ' নাম নেন, পরে খেতড়ির মহারাজের অনুরোধে গ্রহণ করেন বিবেকানন্দ নাম। (দ্রঃ পৃঃ ৩৯) স্বামীজীর পত্রাবলীতে কিংবা তাঁর সম্বন্ধে 'স্মৃতিকথা'য় 'বিবিদিষানন্দ' নামটি আমাদের চোখে পড়েনি। তবে সন্ন্যাসের সময়ে যে ঐ নামটি নিয়েছিলেন, স্বামী অভেদানন্দের স্মৃতিকথাতেও তা আছে। কিন্তু ইদানীং প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, স্বামীজী পরিব্রাজক অবস্থায় 'সচ্চিদানন্দ' নামটি ব্যবহার করেছেন (বা করতেন) এবং 'বিবেকানন্দ' নামটিও। খেতড়ির মহারাজ সেই নামটি শোনার পরে স্বামীজীর একাধিক নামের মধ্যে সম্ভবত 'বিবেকানন্দ' নামটি স্থায়িভাবে গ্রহণের জন্য অনুরোধ করে স্বামীজীকে রাজি

করিয়েছিলেন—যে-নামটি অচিরে মন্ত্রধ্বনি হয়ে দাঁড়াবে। আমরা এইটুকু বলতে পারি, অনেক নাম-মন্ত্রের মধ্যে 'বিবেকানন্দ' নামক বিশেষ মন্ত্রটিকে বাছার কৃতিত্ব খেতড়ির মহারাজের।

স্বামী চেতনানন্দ লিখেছেন, ১১ জুন ১৮৯৮ তারিখে স্বামীজী সদলে কাশ্মীরে যাওয়ার জন্য আলমোড়া ছাড়েন। কাশ্মীরে থাকার সময়ে মহারাজা তাঁকে অতীব শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন এবং একটি মঠ ও সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের জন্য কিছু জমি দিতে চেয়েছিলেন। (দ্রঃ পৃঃ ৫৬) স্বামী চেতনানন্দের কথাগুলির মধ্যে ভুল নেই এবং তাঁকে বিস্তৃত বিষয় সংক্ষেপ করতে হয়েছিল বলে মাঝের কিছু কিছু প্রসঙ্গ বাদ পড়েছে। বাদ পড়া অংশ সংক্ষেপে এই—স্বামীজী প্রথমবার কাশ্মীরে পৌঁছান ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮ এবং কাশ্মীরের বিচারপতি ঋষিবর মুখোপাধ্যায়ের অতিথি হন। কাশ্মীরের মহারাজা তখন জম্মুতে ছিলেন। প্রাসাদে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান মহারাজার ভাই রাজা রাম সিং। তারপর কয়েকটি জায়গা ঘুরে স্বামীজী কাশ্মীরের মহারাজার আমন্ত্রণে জম্মুতে আসেন এবং ২২ অক্টোবর মহারাজা সেখানকার প্রাসাদে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। তাঁদের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয় ও পরে সভায় স্বামীজীর হিন্দি বক্তৃতা শুনে মহারাজা অত্যন্ত আনন্দিত হন। ১৮৯৯ সালের জুন মাসে স্বামীজী আবার কাশ্মীরে আসেন এবং সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত থাকেন। এই পর্বে মহারাজা শ্রীনগরে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা জানান এবং এই সময়েই মঠ ইত্যাদি করার জন্য মহারাজা ভূমিদান করতে স্বীকৃত হন—যা শেষপর্যন্ত ব্রিটিশ রেসিডেন্টের চক্রান্তমূলক আচরণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এইসকল কথা স্বামীজীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শিষ্যগণ-লিখিত জীবনীর সর্বশেষ সংস্করণে রয়েছে, যা স্বামী চেতনানন্দের জানার মধ্যেই আছে। তাই পুনশ্চ বলছি, ঘটনার সংক্ষেপ-করণের কারণে তিনি সবটা পরিবেশন করেননি।

স্বামী চেতনানন্দ লিখেছেন, স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে নিবেদিতা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ তাঁকে বুঝিয়ে দেন, যেহেতু সন্ন্যাসী সঙ্ঘের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক নেই, তাই নিবেদিতাকে রাজনীতি বা মঠ—কোন একটিকে বেছে নিতে হবে। এরপরেই নিবেদিতার সঙ্গে সরকারিভাবে মঠের সম্পর্কচ্ছেদ ঘটে। (দ্রঃ পৃঃ ৯৫)

কথাটি ঠিক এইভাবে সত্য নয়। স্বামীজী শরীরে থাকাকালেই নিবেদিতা ওকাকুরার সঙ্গে গোপন রাজনৈতিক কার্যাদি করতে থাকেন, সেজন্য স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর মতসঙ্ঘর্ষ হয়। পরে স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী সারদানন্দ নিবেদিতাকে যেসব কথা বলেছেন, তা বস্তুতপক্ষে স্বামীজীর কথারই পুনরাবৃত্তি। স্বামীজীর নির্দেশেই ঐ দুজন কার্যকর করেছিলেন মাত্র।

স্বামী চেতনানন্দ লিখেছেন, স্বামীজীকে শিকাগো ধর্মমহাসভায় পাঠানোর জন্য প্রভাবশালী কিছু দক্ষিণী মানুষ সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন। তিনি ঠাকুরের নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ১৮৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি যখন কন্যাকুমারিকায় ভারতের শেষ শিলাখণ্ডের ওপর ধ্যানমগ্ন হয়েছিলেন, তখনি তিনি পাশ্চাত্যে যাওয়ার জন্য ঠাকুরের নির্দেশ পান। (দ্রঃ পৃঃ ৪২)

কন্যাকুমারিকার সমুদ্রশিলায় অবস্থানকালে ঠাকুরের কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্বামী চেতনানন্দের মতো সন্ধানী গবেষক নিশ্চয় কোন বিশেষ সূত্রে পেয়েছেন, যা আমাদের গোচরে আসেনি। কিন্তু স্বামী গম্ভীরানন্দের বা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শিষ্যগণের বিবেকানন্দ-জীবনীতে তা নেই। সমুদ্রের ওপর দিয়ে ঠাকুর পশ্চিমের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন—এই দর্শনের ঘটনা স্বামীজী পরবর্তী কালে মাদ্রাজে থাকার সময়ে জানিয়েছিলেন। স্বামী চেতনানন্দ তা উল্লেখ করেছেন। এখানে আমরা কি ধরে নেব, সমুদ্রশিলায় অবস্থানকালে পাশ্চাত্যগমনে স্বামীজীর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে স্বামী চেতনানন্দ একটি 'সঙ্গত' অনুমান করেছেন?

এই গ্রন্থে আমাদের কাছে অত্যন্ত বিশেষ গুরুত্ব পাবেন সেই মানুষটি, যাঁর জন্য স্বামী বিবেকানন্দ নিজ ঈপ্সিত সন্ন্যাসনামটি গ্রহণ না করে তাঁর ওপর অর্পণ করেছিলেন—'রামকৃষ্ণানন্দ'। রামকৃষ্ণে নিত্য আনন্দ যাঁর—সেই রামকৃষ্ণানন্দ। রামকৃষ্ণানন্দজীর ত্যাগ আমাদের স্তম্ভিত করে। বরানগর ও আলমবাজার মঠকে তিনি বুকে আঁকড়ে রক্ষা করেছিলেন—যখন অন্য গুরুভাইরা ধর্মাবেগে ভারতবর্ষের নানা স্থানে পরিব্রাজক হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নিরাপত্তাহীন মঠকে তিনি আগলে থেকেছেন। সেই মঠ যখন স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে গঙ্গাতীরে নিজ জমিতে প্রতিষ্ঠিত হলো, তখন গুরুভাই স্বামীজীর কথাকে গুরুবাক্য বলে গ্রহণ করে চলে গিয়েছিলেন সুদূর মাদ্রাজে—অস্থির সমুদ্রে শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকস্তম্ভ স্থাপনের জন্য। শশী মহারাজের প্রভু শান্তি দেওয়ার জন্য শশীকে নির্বাচন করেননি। স্বামী চেতনানন্দ ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-অর্চনার এই মহাবীর পূজকের রূপটি তুলে ধরেছেন। চমক লাগবে একটি ঘটনার কথা শুনে। শশী শ্রীরামকৃষ্ণের সন্নিধানে প্রথম উপস্থিত হওয়ার পরে যখন পদধূলি নেওয়ার জন্য হাত বাড়াচ্ছিলেন, তখন ঠাকুর পা সরিয়ে নেন। (দ্রঃ পৃঃ ২৬৫) কী কঠিন! শশী কি মহাপাপী? শশী কি অস্পৃশ্য? শশী প্রথমে অত্যন্ত আহত হয়েছিলেন। পরে কারণটি নিজে বোঝেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণও তা বলেছেন। আকুলতা বাড়াতে হবে—অবিলম্বে না-পাওয়ার যন্ত্রণা যাতে চিরলাভের পরম শান্তিতে পর্যবসিত হয়, তাই দূরে সরিয়ে কাছে টানার বিচিত্র ঈশ্বরলীলা। ক্ষুদ্র প্রাণী এই অবজ্ঞায় বিদায় নেবে—আর মহাপ্রাণ মানুষ আছড়ে আছড়ে পড়বে তটের প্রতিঘাত পেয়ে! ❑

উৎসব-অনুষ্ঠান

গুয়াহাটী আশ্রম (আসাম) স্বামীজীর কামাখ্যা-মন্দিরে আগমনের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে মন্দির-চত্বরে একটি স্মৃতি-ফলক স্থাপন করে। গত ২৯ জুলাই ২০০১ ফলকটির আবরণ উন্মোচন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় তিনি সভাপতিত্ব এবং অসমিয়া ভাষায় রচিত 'বিবেকানন্দ চিত্রকথা' গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান (কলকাতা-৭০০০২৬) গত ২৪ জুলাই ২০০১ প্রতিষ্ঠানের ৭০তম প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপন করে। এই অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী ডঃ সূর্যকান্ত মিশ্র, কলকাতার মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন। গত ২৮ জুলাই ১৫তম বার্ষিক বিজ্ঞান সম্মেলনে ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রমুখ।

কালাডি আশ্রম (কেরালা) বিদ্যালয়ের একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ খোলা হয়েছে। গত ৪ জুলাই ২০০১ বিভাগটির উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।



রামকৃষ্ণ মিশনের নতুন কেন্দ্র স্থাপন

রামকৃষ্ণ মিশন জাম্বিয়ার লুসাকায় **'রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেন্টার, লুসাকা'** নামে একটি শাখাকেন্দ্র স্থাপন করেছে। আশ্রমটির ঠিকানা হলো—**Ramakrishna Vedanta Centre**, Nsunzu Road, P.O. Box 31588, Lusaka, Zambia, Phone : 260-1-25-3090।

মালয়েশিয়ায় একটি নতুন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। কেন্দ্রটির ঠিকানা হলো—**Persatuan Sri Ramakrishna Sarada**, Lot 36, Jalan 10/7, 46000 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, Phone: 60-3-79600385; e-mail: <swami@time.net.my>

কলকাতার বরানগরে এযাবৎ 'বরানগর মঠ সংরক্ষণ সমিতি' পরিচালিত 'বরানগর মঠ' রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই মঠের ঠিকানা হলো—**Ramakrishna Math**, 125/1, Pramanick Ghat Rd., Kolkata-700 036, Phone : 033-557-0827। বিশেষ উল্লেখ্য, এটি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের আদি মঠ।

সেবাব্রত

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে **কামারপুকুর ও ইছাপুর মঠের (হুগলী)** তত্ত্বাবধানে সমগ্র আরামবাগ মহকুমায় কুষ্ঠ-নিবারণের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করার জন্য অ-চিকিৎসক ও চিকিৎসা-সহায়ক কর্মীদের প্রশিক্ষণ বিষয়ে গত ২০ জুলাই ২০০১ ইছাপুর মঠে একটি শিবিরের উদ্বোধন হয়।

চক্ষুচিকিৎসা-শিবির

বৃন্দাবন আশ্রম (উত্তরপ্রদেশ) গত ১ জুলাই একটি চক্ষুচিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ১০৮ জনের চোখের চিকিৎসা এবং তন্মধ্যে ৯ জনের চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

পোরবন্দর আশ্রম (গুজরাট) গত ১৯ জুলাই ২০০১ একটি চক্ষুচিকিৎসা-শিবিরের আয়োজন করে। শিবিরে প্রাথমিকভাবে ২৩৪ জনের চোখ পরীক্ষা করা হয় এবং ২৮ জনের চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

আলসূর আশ্রম (কর্ণাটক) গত ২১-২৭ জুলাই ২০০১ একটি চক্ষুচিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ২২৭ জনের চোখ চিকিৎসা করা হয় এবং ৬৬ জনের চোখের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়।

বন্যাত্রাণ

গত জুলাই মাসে প্রবল বর্ষণের ফলে ওড়িশার কয়েকটি জেলার লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়। সংবাদ পাওয়া মাত্রই এই বন্যাপীড়িত মানুষের সেবার্থে রামকৃষ্ণ মিশনের তরফে তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এজন্য সঙ্ঘের শাখাকেন্দ্র পুরী মঠ, পুরী মিশন ও ভুবনেশ্বর মঠ দুর্গতদের মধ্যে রান্নাকরা খাবার (খিচুড়ি), শুকনো খাবারের প্যাকেট, চিঁড়ে, গুড়, চিনি প্রভৃতি বিতরণ করেছে এবং প্রাথমিকভাবে চিকিৎসা-ত্রাণ দিয়েছে। এখনো ত্রাণকার্য অব্যাহত আছে। এই ত্রাণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপ :

পুরী মঠের মাধ্যমে পুরী সদর, গোপ, ব্রহ্মগিরি ও কাকদপুর ব্লকের ৯৫টি গ্রামের ১৩,২৪৯ জন মানুষের মধ্যে শুকনো খাবারের প্যাকেট ও ৮৪,৯৮০ জনের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ এবং ২,৪৭৭ জনের প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়েছে।

পুরী মিশনের মাধ্যমে পুরী সদর ও গোপ ব্লকের ৪৪টি গ্রামের ৫,১৮৭ জন মানুষের মধ্যে শুকনো খাবারের প্যাকেট ও ৪৭,০৭৫ জনের মধ্যে খিচুড়ি বিতরণ করা হয়েছে এবং ২২৮ জন মানুষকে চিকিৎসা-ত্রাণ দেওয়া হয়েছে।

ভুবনেশ্বর মঠ কান্তপদ, রসুলপুর, বাদাচানা, দাঙ্গাড়ি ও বারি ব্লকের ২৪টি গ্রামের ২১,০৬৯ জন মানুষের মধ্যে শুকনো খাবারের প্যাকেট বিতরণ করেছে।

গুজরাট ভূমিকম্প পুনর্বাসন

পোরবন্দর আশ্রমের মাধ্যমে পোরবন্দর জেলায় দুটি নবনির্মিত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। গত ২১ জুলাই ২০০১ বিলেশ্বর গ্রামে অনুষ্ঠিত প্রথম বিদ্যালয়টির দ্বারোদ্ঘাটন করেন গুজরাট সরকারের ক্ষুদ্র ও মাঝারি সেচমন্ত্রী মুলুভাই বেরা। গত ২৯ জুলাই বানানা গ্রামে অবস্থিত দ্বিতীয় বিদ্যালয়টির দ্বারোদ্ঘাটন করেন রাজ্যের ভারী শিল্প রাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ বল্লভভাই কাথিরিয়া। দুটি বিদ্যালয়ের নতুন নামকরণ করা হয় **'বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির'**। এছাড়া এই

আশ্রমের পরিচালনায় ৫০টি বাড়ি নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলেছে। অধিকন্তু, আশ্রমের পরিকল্পিত ২১টি বিদ্যালয়ের নির্মাণকার্য বেশ এগিয়েছে। ইতিমধ্যে ৪টি বিদ্যালয় নির্মাণ করে হস্তান্তর করা হয়েছে।

লিমডি আশ্রম ৯টি বিদ্যালয় নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। এর মধ্যে ৬টির নির্মাণকার্য এগিয়ে চলেছে।

সুরেন্দ্রনগর ত্রাণশিবিরের মাধ্যমে ৭টি বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ গ্রহণ করা হয়েছিল। তার মধ্যে ৩টির নির্মাণকার্য এগিয়ে চলেছে।

বহির্ভারত

ময়মনসিংহ রামকৃষ্ণ আশ্রম (বাংলাদেশ) গত ৫ জুলাই ২০০১ গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করে। বেদ ও স্তোত্র পাঠ, ভক্তিগীতি, সমবেত জপধ্যান, প্রশ্নোত্তরপর্ব, রামনাম-সঙ্কীর্তন ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের অনুষ্ঠিত বিষয়। সম্মেলনে আলোচনা এবং ভক্তগণের প্রশ্নের উত্তর দান করেন আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সর্বেশ্বরানন্দজী। এদিন শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের রেকর্ডেড ভাষণ ভক্তদের শোনানো হয়। সারাদিনব্যাপী সম্মেলনে প্রায় ৪৫০ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন শেষে লটারীর মাধ্যমে ঠাকুর-মা-স্বামীজী বিষয়ক গ্রন্থ ও ছবি ভক্তগণকে প্রদান করা হয়।

বেদান্ত সোসাইটি অফ ওয়েস্টার্ণ ওয়াশিংটন (সিয়াটল, আমেরিকা) গত আগস্ট মাসের দুটি রবিবার 'মনঃসংযম ও ধ্যান' বিষয়ে ভাষণ দান করেন সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী ভাস্করানন্দজী। তিনি প্রথম ও চতুর্থ মঙ্গলবার শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা এবং দ্বিতীয় মঙ্গলবার 'দ্য গস্‌পেল অফ শ্রীরামকৃষ্ণ' পাঠ ও আলোচনা করেন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ৪ আগস্ট ও ১৮ আগস্ট ২০০১ যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী নিরঞ্জনানন্দজী মহারাজ ও শ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়। এই দুই তিথিতে তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী বিনির্মলানন্দজী ও স্বামী সনকানন্দজী।

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী : গত ১২ আগস্ট ২০০১ শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি পালন করা হয়। এই তিথিতে 'ভাগবত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী সনকানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। □

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, হিঙ্গলগঞ্জ, উত্তর চব্বিশ পরগনা : গত ১ এপ্রিল ২০০১ সুন্দরবন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের প্রথম ষাণ্মাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১৪টি প্রতিষ্ঠান থেকে ৩৩ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন। সম্মেলনে আলোচনা করেন ভাবপ্রচার পরিষদের সভাপতি স্বামী শিবময়ানন্দজী এবং স্বামী অঘোরাত্মানন্দজী ও স্বামী সত্যস্থানন্দজী।

শ্রীরামপুর স্বামী বিবেকানন্দ সোস্যাল অ্যাণ্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন, হুগলী : গত ১ এপ্রিল ২০০১ স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। সভায় ভাষণ দেন স্বামী বিশ্বময়ানন্দজী, প্রজ্বল দত্ত, কল্যাণ আশিস মুখার্জী ও ডঃ গৌরগোপাল মাইতি।

ইছাপুর-নবাবগঞ্জ রামকৃষ্ণ সাধন সমিতি, উত্তর চব্বিশ পরগনা : গত ১-৩ এপ্রিল ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, লীলাকীর্তন, গীতিনাট্য ও ধর্মসভা ছিল উৎসবের অঙ্গ। পূজাদি করেন স্বামী অম্বিকেশানন্দজী। ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী রমানন্দজী ও সুজন চন্দ। দুপুরে প্রায় ২,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

হিজলডিহা বিবেকানন্দ সেবা সমিতি, বাঁকুড়া : গত ২ এপ্রিল ২০০১ স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বেদপাঠ, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, পাঠ, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ভক্তিগীতি, নৃত্যনাট্য, যাত্রাপালা ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী নিস্পৃহানন্দজী, স্বামী জ্যোতির্ঘনানন্দজী, স্বামী গোপেশানন্দজী, স্বামী শিবপদানন্দজী, অমরশঙ্কর ভট্টাচার্য প্রমুখ এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী রমানন্দজী।

বাঁকাগাছা ইয়ং স্টার, জনাই, হুগলী : গত ৬-৮ এপ্রিল ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী শঙ্করদেবানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৪,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

ভাঙ্গামোড়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, হুগলী : গত ৬-৯ এপ্রিল ২০০১ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেবাশ্রমের সুবর্ণ-জয়ন্তী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, যুবসম্মেলন, ভক্তসম্মেলন, ভক্তি-গীতি, বাউলগান, রামায়ণ-গান ও ধর্মসভা ছিল চারদিনব্যাপী উৎসবের প্রধান অঙ্গ। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত যুবসম্মেলনে প্রায় ১০০ জন যুবপ্রতিনিধি যোগদান করে। সম্মেলনে আলোচনা করেন স্বামী সত্যবোধানন্দজী, অধ্যাপক অমর আদক ও অধ্যাপক প্রদীপ পাল। ভক্তসম্মেলনে আলোচনা করেন স্বামী

উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮ উদ্বোধন শারদীয়া ১৪০৮

কৌশিকানন্দজী, কৃষ্ণনগর আশ্রমের স্বামী বেদান্তানন্দজী, অধ্যক্ষ ডঃ তুষার পাল ও লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী ত্যাগরূপানন্দজী এবং ভাষণ দেন অধ্যাপক তপনকুমার ঘোষ ও অধ্যাপক অরবিন্দ হোড়। সভায় স্বাগত-ভাষণ দেন অমিয়কুমার অধিকারী। এদিন দুপুরে প্রায় ৫,০০০ নরনারায়ণের সেবা অনুষ্ঠিত হয়।

তপন শ্রীরামকৃষ্ণ সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ, দক্ষিণ দিনাজপুর : গত ৭ ও ৮ এপ্রিল ২০০১ সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' ও 'স্বদেশমন্ত্র' পাঠ, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, নরনারায়ণসেবা, নৃত্যনাট্য এবং ধর্মসভা ছিল উৎসবের প্রধান অঙ্গ। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মঙ্গলানন্দজী। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মিহিরকুমার ঘোষ।

কুলবাতপুর রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, হুগলী : গত ৮ এপ্রিল ২০০১ বিশেষ পূজা, 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করা হয়। ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী অঘোরানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

হাট-সরবেড়িয়া বিবেকানন্দ সেবা সঙ্ঘ, মেদিনীপুর : গত ৮ এপ্রিল ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি যুবসম্মেলন এবং ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, 'বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ, আলোচনা, প্রশ্নোত্তর-পর্ব, ভক্তিগীতি, পদাবলী-কীর্তন ছিল সম্মেলনের অনুষ্ঠিত বিষয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী, বেদান্ত মঠের স্বামী আত্মবোধানন্দজী, অমিয় চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রায় ২,০০০ যুবপ্রতিনিধি ও ভক্ত নরনারীকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

কামারকুণ্ডু-গোপালনগর শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, হুগলী : গত ৮ এপ্রিল ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ পূজা, গীতি-আলেখ্য, শোভাযাত্রা ও ধর্মসভা। সভায় ভাষণ দেন স্বামী ব্রহ্মপদানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৩৫০ জন ভক্ত প্রসাদ পান।

ধুবড়ি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, অসম : গত ৮ এপ্রিল ২০০১ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধুবড়িতে স্বামী বিবেকানন্দের শুভ পদার্পণের শতবর্ষপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে উৎসবের উদ্বোধন হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন অখিলবন্ধু দত্ত, শান্তিপদ রায়, নৃপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, সুভাষচন্দ্র পাল, প্রণব সেনশর্মা প্রমুখ এবং পৌরোহিত্য করেন মুরারিমোহন সরকার।

পিতুলসাহা পশড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, খারুই, মেদিনীপুর : গত ১২-১৪ এপ্রিল ২০০১ প্রভাতফেরি, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করা হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন জগৎতারণ আচার্য, অধ্যাপক সুভাষ মান্না প্রমুখ এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী। উৎসবে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বারুইপুর মাঙ্গলিক গীতি সংস্থা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা : গত ১৫ এপ্রিল ২০০১ প্রভাতফেরি, পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, শ্রুতিনাটক ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব ও সংস্থার বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। ধর্মসভায় আলোচনা করেন সন্তোষ দত্ত, ডাঃ বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ও কালীচরণ মুখোপাধ্যায়। উৎসবে প্রায় ২০০ ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

বাটানগর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা : গত ২০-২২ এপ্রিল ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব ও যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রভাতফেরি, 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, বাউলগান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনাসভা প্রভৃতি ছিল তিনদিনব্যাপী উৎসবের প্রধান অঙ্গ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী ঋদ্ধানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী চেতসানন্দজী, স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী, প্রণবেশ চক্রবর্তী প্রমুখ। উৎসবে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

দমদম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ, কলকাতা-৭০০০৩০ : গত ২১ এপ্রিল ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব-উৎসব উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' পাঠ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সকালে 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন অধ্যাপক দীপক গুপ্ত। ভাষণ দান করেন স্বামী পূতানন্দজী ও ডঃ গৌতম মুখার্জী। বিকালের ধর্মসভায় আলোচনা করেন অধ্যাপক হোসেনুর রহমান ও দেবনাথ চক্রবর্তী এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী সনাতনানন্দজী। সভায় স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে ভারতী ব্যানার্জী ও শঙ্কর আইচ। দুপুরে প্রায় সহস্রাধিক ভক্ত প্রসাদ পান। এই উপলক্ষ্যে রামকৃষ্ণ মিশনের ত্রাণ তহবিলে ২০০২ টাকা প্রদান করা হয়।

চাঁদপাড়া বাজার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, উত্তর চব্বিশ পরগনা : গত ২১-২২ এপ্রিল ২০০১ বিশেষ পূজা, বেদপাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হয়। দুপুরে প্রায় ২,৫০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী ও দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।

সীতারামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সঙ্ঘ, বর্ধমান : গত ২১-২২ এপ্রিল ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে বেদ ও 'কথামৃত' পাঠ, বিশেষ পূজা, নগর-পরিক্রমা, নাটক, নৃত্যনাট্য ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সান্ধ্য ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী গিরিশানন্দজী, ডঃ আবদুস সামাদ ও জয়দেব মুখোপাধ্যায়।

মজঃফরপুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, ঝাড়খণ্ড : গত ২১-২৩ এপ্রিল ২০০১ তিনদিন ধরে সেবাশ্রমের প্ল্যাটিনাম জুবিলী ও বিহার-ঝাড়খণ্ড ভাবপ্রচার পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বেদপাঠ, ভজন, নগর-পরিক্রমা ও ধর্মসভা ছিল অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ। প্রথমদিন বিকালে স্বামীজীর একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন এবং একটি স্মরণিকা প্রকাশ করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। তিনি ছাড়াও ধর্মসভায় ভাষণ দান

করেন স্বামী শিবময়ানন্দজী, স্বামী অধ্যাত্মানন্দজী, স্বামী শশাঙ্কানন্দজী, স্বামী নিখিলাত্মানন্দজী, স্বামী সুবীরানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী কৃষ্ণানন্দজী প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সেবাশ্রমের সম্পাদক স্বামী প্রবুদ্ধানন্দজী। তিনদিনের উৎসবে প্রায় ১০,০০০ ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন।

জাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র, মেদিনীপুর : গত ২২ এপ্রিল ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে সানাই-বাদন, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন ব্রহ্মচারিণী সুবর্ণাদেবী। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী দেবদেবানন্দজী, স্বামী জ্যোতির্ঘনানন্দজী ও স্বামী বিশ্বানন্দজী। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। সন্ধ্যায় 'গানে গানে কথামৃত' পরিবেশিত হয়। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে ২০ জন রক্তদান করেন।

বেড়াচাঁপা অঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, উত্তর চব্বিশ পরগনা : গত ২২ এপ্রিল ২০০১ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ করেন স্বামী বীরানন্দজী। ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী বিশ্বাধিপানন্দজী, অধ্যাপক শ্যামল সর্দার ও ডঃ শশাঙ্কশেখর মণ্ডল এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী মুক্তিকামানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৩০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

বৃহত্তর কলকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদের (কলকাতা-৭০০ ০০৩) ১৮তম অধিবেশন গত ২২ এপ্রিল ২০০১ অনুষ্ঠিত হয় **পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে (কলকাতা-৭০০ ০৪৭)**। ভক্তিগীতি ও আলোচনাপর্ব ছিল অধিবেশনের মুখ্য বিষয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন পরিষদের সভাপতি স্বামী পূতানন্দজী, স্বামী ঋদ্ধানন্দজী, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী সুহিতানন্দজী, স্বামী বোধসারানন্দজী, ডঃ কমল নন্দী প্রমুখ। সভায় স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে সলিল বিশ্বাস ও সুবোধ দাশগুপ্ত।

দাঁতন শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম, মেদিনীপুর : গত ২৬ এপ্রিল ২০০১ বেদ ও 'চণ্ডী' পাঠ, বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ করেন স্বামী লোকেশানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে দুঃস্থ নরনারীর মধ্যে ধুতি ও শাড়ি বিতরণ করা হয় এবং বেলুড় মঠের ত্রাণ তহবিলে ১,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। এদিন দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

গোমুণ্ডা শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, মেদিনীপুর : গত ২৬ ও ২৭ এপ্রিল ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব ও ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমদিন আয়োজিত হয় বেদপাঠ, ভক্তিগীতি, রামায়ণ গান ও ধর্মসভা। সভায় ভাষণ দেন স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দজী, স্বামী সুরেন্দ্রানন্দজী ও স্বামী পরিতৃপ্তানন্দজী। দুপুরে প্রায় ৩,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। পরদিন ভক্তসম্মেলনে আলোচনা করেন স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দজী। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এদিন প্রায় ৫,০০০ ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

আরারিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বিহার : গত ২৮ ও ২৯ এপ্রিল ২০০১ সেবাশ্রমের প্ল্যাটিনাম জুবিলী উৎসবের আয়োজন করা হয়। বেদ, 'গীতা' ও 'চণ্ডী' পাঠ, বিশেষ পূজা, কীর্তন এবং ধর্মসভা ছিল উৎসবের বিশেষ অঙ্গ। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন এবং ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দেন স্বামী বিজয়ানন্দজী।

চন্দননগর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ শ্রীঅরবিন্দ নিলয়, হুগলী : গত ২৯ এপ্রিল ২০০১ ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনাসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালিত হয়। 'সবার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ' বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী।

রথতলা হুগলী জেলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, হুগলী : গত ১লা মে ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ্যে ভক্তিগীতি ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। প্রায় ৬০০ ভক্তের উপস্থিতিতে আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী।

আলিপুরদুয়ার শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, জলপাইগুড়ি : গত ৪-৬ মে ২০০১ আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' ও 'মায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা এবং ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী দেবদেবানন্দজী ও স্বামী মঙ্গলানন্দজী। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

কাসুন্দিয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, হাওড়া : গত ৫ ও ৬ মে ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় বেদ ও স্তোত্রাদি পাঠ, ভক্তিগীতি এবং ধর্মসভা। প্রথমদিন ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী ও হর্ষ দত্ত। দ্বিতীয়দিন ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণাজী, প্রব্রাজিকা প্রদীপ্তপ্রাণাজী এবং সভানেতৃত্ব করেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে বিমলকুমার ঘোষ ও লক্ষ্মীকান্ত বড়াল।

কোন্নগর 'উত্তরণ', হুগলী : গত ৫ ও ৬ মে ২০০১ বিজয়কৃষ্ণ শিক্ষায়তনে দুদিনব্যাপী একটি যুবশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৩৫ জন কিশোর ও যুবক যোগদান করে। চরিত্রগঠন, ইচ্ছাশক্তির বিকাশ, সঙ্গীত ও শরীরচর্চা ছিল শিবিরের মূল উদ্দেশ্য। শিবিরে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী সত্যবোধানন্দজী, ধর্মচক্রের স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী, অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য, বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী, অধ্যাপক হেমাদ্রি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

গুরুদাসনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ঘাটাল, মেদিনীপুর : গত ৬ মে ২০০১ 'জীবসেবাই শিবসেবা' প্রসঙ্গে এক আলোচনা-সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী কালাতীতানন্দজী, অধ্যাপক কমলকুমার মান্না প্রমুখ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডাঃ সুকুমার গোস্বামী।

বিধাননগর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ কেন্দ্র, কলকাতা-৭০০ ০৬৪ : গত ৭ মে ২০০১ বুদ্ধজয়ন্তী ও কেন্দ্রের

প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ্যে বেদপাঠ, ভজন, বিশেষ পূজা ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। বুদ্ধদেবের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী অচ্যুতানন্দজী। এদিন দুপুরে প্রায় ৪০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

আকালীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম, বীরভূম: গত ৭ মে ২০০১ বেদ, 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, বিশেষ পূজা, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে বুদ্ধজয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মসভায় বুদ্ধদেবের জীবনী আলোচনা করেন প্রব্রাজিকা দেবাত্মপ্রাণাজী ও মধুমিতা মুখার্জী। স্বাগত-ভাষণ দেন ব্রহ্মচারিণী সারদা এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন রীনা ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০ ভক্ত বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

গুড়িখালী শ্রীশ্রীমা সারদা ও শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, হাওড়া: গত ১৯ মে ২০০১ আশ্রমগৃহের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে ভক্তিগীতি, বিশেষ পূজা, 'গীতা', 'চণ্ডী', 'কথামৃত', 'মায়ের কথা' এবং 'বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী ও অধ্যাপিকা জাহানারা বেগম। স্বাগত-ভাষণ দেন আশ্রমাধ্যক্ষ জয়গুরু ব্রহ্মচারী।

রায়গঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, উত্তর দিনাজপুর: গত ১৯ ও ২০ মে ২০০১ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে প্রভাতফেরি, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। দুদিনের ধর্মসভায় ভাষণ দেন পূর্ণিয়া আশ্রমের স্বামী বিজয়ানন্দজী, শুভেন্দু মুখার্জী ও সুজিত রায়। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শেখর দাস। দুপুরে প্রায় ১,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, মেদিনীপুর: গত ২০ মে ২০০১ শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব পালিত হয়। পাঠ, ভক্তিগীতি ও আলোচনাসভা ছিল উৎসবের বিভিন্ন অঙ্গ। আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী, স্বামী শ্যামানন্দজী ও অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু। সভাপতিত্ব করেন কমলকৃষ্ণ দত্ত এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দেবপ্রসাদ মণ্ডল।

গোবরডাঙা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘ, খাঁটুরা, উত্তর চব্বিশ পরগনা: গত ২০ মে ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি শিক্ষক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ভক্তিগীতি ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের প্রধান বিষয়। আলোচনা করেন স্বামী বিধানানন্দজী, হরিপদ দে ও ভুবন রায় সরস্বতী। অনুষ্ঠানে প্রায় ২৫০ জন শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে প্রায় ১০৫ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে পাঠসামগ্রী প্রদান করা হয়।

কাঁচড়াপাড়া নর্থ ২৪ পরগনা অ্যাণ্ড নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট ইয়ুথ ট্রেনিং ক্যাম্প কমিটি: গত ২৫-২৭ মে ২০০১ কাঁচড়াপাড়া হাইস্কুলে একটি যুবশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। চরিত্রগঠন, মনঃসংযোগ, সঙ্গীত ও আলোচনা ছিল শিবিরের বিশেষ অঙ্গ। শিবিরে উত্তর চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন স্থান থেকে প্রায় ২০০ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিল। শিবিরে স্বামী ভক্তিপ্রিয়ানন্দজী, রঞ্জিতকুমার ঘোষ, বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী প্রমুখ আলোচনা করেন।

গান্ধী কলোনী শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র ও সেবাশ্রম, কলকাতা-৭০০ ০৯২: গত ২৬-২৮ মে ২০০১ ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য, কীর্তন, বাউলগান, শ্রুতিনাটক ও ধর্মসভার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়। বিভিন্ন দিনের ধর্মসভায় আলোচনা করেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী সুপর্ণানন্দজী, স্বামী সর্বভূতানন্দজী, প্রণবেশ চক্রবর্তী এবং প্রব্রাজিকা বিকাশপ্রাণাজী। এই উপলক্ষ্যে প্রায় ২০০ দুঃস্থ মানুষকে বস্ত্র প্রদান করা হয় এবং প্রায় ১,০০০ দরিদ্রনারায়ণকে বসিয়ে সেবা করা হয়।

সাঁকরাইল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, হাওড়া: গত ২৭ মে ২০০১ বিশেষ পূজা, পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পাঠে অংশগ্রহণ করেন নারায়ণ দেবনাথ, মায়া রায়, সুমিত্র চক্রবর্তী প্রমুখ। আলোচনা করেন প্রণবকুমার ঘোষাল ও স্বপনকুমার পুরকাইত।

কোঠাবাড়ি মা সারদা সেবাকেন্দ্র, উত্তর চব্বিশ পরগনা: গত ২৭ মে ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি যুবসম্মেলন আয়োজিত হয়। সঙ্গীত, পাঠ, আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরপর্ব ছিল সম্মেলনের প্রধান বিষয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী শুকদেবানন্দজী, ডাঃ অরুণকুমার দাস প্রমুখ। সম্মেলনে ৩৫০ জন যুবপ্রতিনিধি যোগদান করে। সকলকে দুপুরে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এদিন ১৪ জন মরণোত্তর চক্ষুদান করেন।

সেবাব্রত

বলাইচক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ গ্রন্থাগার ও সেবাশ্রম, হুগলী: গত ১৫ এপ্রিল ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় একটি রক্তদান শিবির পরিচালিত হয়। শিবিরে ৭২ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

দক্ষিণ বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা: গত ২২ এপ্রিল ২০০১ পাঠচক্রের পরিচালনায় এবং সারদা কল্যাণ সমিতির (উত্তর চব্বিশ পরগনা) সহযোগিতায় বিনামূল্যে একটি চক্ষুচিকিৎসা-শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ২১৭ জনের চোখ পরীক্ষা করা হয় এবং ৩১ জনের ছানি অস্ত্রোপচার করা হয়। উল্লেখ্য, পাঠচক্রে গত ৬ মে ভক্তিগীতি, পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত' পাঠ করেন স্বামী ব্রজেশানন্দজী। অনুষ্ঠানে বহু ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

বাগবাজার রামকৃষ্ণ বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব, কলকাতা-৭০০ ০০৩: গত ২২ এপ্রিল ২০০১ আর. জি. কর মেডিকেল ব্লাড ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন স্বামী সর্বময়ানন্দজী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্থানীয় পৌরপিতা সলিল চ্যাটার্জী, বিধায়ক তারক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। শিবিরে ৭৫ জন রক্তদান করেন। ❑

এক অনন্য জীবনকথা

ট্যান্টিন

দা লাইফ অফ জোসেফিন ম্যাকলাউড

ফ্রেন্ড অফ স্বামী বিবেকানন্দ

প্রব্রাজিকা প্রবুদ্ধপ্রাণা



এই অসাধারণ ইংরেজী গ্রন্থটি সমৃদ্ধ হয়েছে 'ট্যান্টিন' জোসেফিন ম্যাকলাউডের স্মৃতিচারণ, আলাপচারিতা, পত্রসম্ভার এবং আত্মকথায়। ভারতবর্ষ এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি জোসেফিনের অসীম শ্রদ্ধা-ভালবাসা 'প্রাচ্য-পাশ্চাত্য', 'নতুন ও পুরনো পৃথিবী'র সকল ভেদরেখাকে অতিক্রম করেছিল। তিনি শুধু স্বামীজীর শিষ্যা ও বন্ধু ছিলেন না, স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর একাত্মতা।

বিশেষ ছাড় ১ এপ্রিল ২০০১ থেকে। মূল্য ১২০.০০ টাকা। পুস্তক বিক্রেতাদের জন্য ৯০.০০ টাকা

ফোন নং ৫৬৪-০৭১২



প্রাপ্তিস্থান :
শ্রীসারদা মঠ
দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা-৭০০ ০৭৬

★ আরো যেখানে পাবেন :
অদ্বৈত আশ্রম, ইনস্টিটিউট অফ কালচার,
উদ্বোধন ও সারদাপীঠের শো-রুম



সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন

সহৃদয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ অর্থানুকূল্যে আমাদের ভগ্নপ্রায় স্কুলগৃহটি পুনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি।

১।	১০ জন দুস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ	ঃ	১,২০,০০০ টাকা
২।	দুস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
৩।	পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
৪।	আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প	ঃ	১০,০০,০০০ টাকা
৫।	একখানা অ্যাম্বুল্যান্স (Ambulance)	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
			২৬,২০,০০০ টাকা

A/c Payee চেক/ড্রাফট 'Ramakrishna Mission Ashrama, Ramharipur'—এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফট পাঠাবার ঠিকানা—সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা—বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ ঃ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি

স্বামী তত্ত্বজ্ঞানানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া

উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

স্বামীজী বিষয়ক গ্রন্থাবলী

ভারতে বিবেকানন্দ ৩৫.০০
স্মৃতির আলোয় স্বামীজী ৬০.০০
স্বামী বিবেকানন্দ (দু খণ্ডে) (প্রমথনাথ বসু) ১৩০.০০
যুগনায়ক বিবেকানন্দ (তিন খণ্ডে) ১৬৫.০০
স্বামী বিবেকানন্দ (আলোকচিত্রে জীবনকথা)...... ১৬৫.০০
বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ... ২০০.০০
পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ (দু খণ্ডে) (নতুন তথ্যাবলী সমেত)......... ২৫০.০০



নবপ্রকাশিত পুস্তকাবলী

ভারতীয় অধ্যাত্মজীবন....... ৫.০০
গিরিশচন্দ্র ও অন্যান্য প্রসঙ্গ ২৫.০০
ব্যবহারিক বেদান্ত ও মূল্যবোধ বিজ্ঞান ৩০.০০
সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন ৪০.০০
রামকৃষ্ণ মঠের আদিকথা ৮০.০০

সংস্কৃত শাস্ত্র

শ্রীশ্রীচণ্ডী (ছোট) ৭.০০
শ্রীশ্রীচণ্ডী (পকেট)............... ১৬.০০
শ্রীশ্রীচণ্ডী (পুঁথি).................. ৩০.০০
শ্রীশ্রীচণ্ডী (বড়) ৪০.০০
শ্রীশ্রীগীতা (ছোট)................... ৬.০০
শ্রীশ্রীগীতা (পকেট) ১৮.০০
শ্রীশ্রীগীতা (পুঁথি) ৩০.০০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৫০.০০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সুবোধনী টিকা সমেত) ৯০.০০
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (শাঙ্কর ভাষ্য সমেত)............. ২০০.০০

উপনিষদের সন্দেশ

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

মূল্য ঃ ১০০.০০

'উপনিষদের সন্দেশ' গ্রন্থটি তিনটি প্রধান ঈশ, কেন ও কঠ উপনিষদের আধুনিক চিন্তাধারার ও বর্তমান প্রয়োজনের আলোকে মন্ত্রানুক্রমিক এক যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা। সমগ্র উপনিষদ্ সাহিত্যের ক্ষুদ্র অংশ হলেও এগুলির মধ্যেই এই অমর সাহিত্যের মূল ভাবগুলির এক প্রাঞ্জল অভিব্যক্তি ধরা রয়েছে।



ভাগবত-কথা

স্বামী গীতানন্দ

মূল্য ঃ ১০০.০০

ভাগবতের সংস্কৃত অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। যাঁরা অন্তত কিছুটা সংস্কৃত জানেন তাঁদের জন্য ভাগবতের কিছু কিছু স্তবস্তুতি ও মনোমুগ্ধকর অংশ এই গ্রন্থে সংস্কৃত অনুবাদ-সহ সন্নিবেশিত হয়েছে। আর সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা অনুবাদের মাধ্যমে ভাগবতের রসাস্বাদনে তৃপ্ত হবেন।

বিদ্যারণ্য স্বামীকৃত পঞ্চদশী

অনুবাদক ঃ স্বামী বাণেশানন্দ

মূল্য ঃ ১২০.০০

'পঞ্চদশী' একটি ঐতিহ্যবাহী মোক্ষ শাস্ত্র। অদ্বৈত বেদান্তের প্রতিপাদ্য প্রায় সকল বিষয়ের ওপর ছন্দোবদ্ধ আলোচনায় সঙ্কলন এই গ্রন্থ।

With Best Compliments From :

DOBSON DISTRIBUTORS

88, DR. ABANI DUTTA ROAD
HOWRAH-711 101

PHONE : 666-1722

TELEFAX : 666-9969

Stockist

Serum Institute, Tablets India Ltd.,
Wallace Pharmaceuticals Ltd.,
Eli Lilly Ranbaxy, Pharmacia & Upjohn,
Orchid, Caplet,
Smith Kline Beecham (Vaccine),
Sunny Industries Pvt. Ltd.,
Midas Care, Arvind (S.K.K.L. Ltd.),
Neon Laboratories, Mayer,
Trio Pharma

ঈশ্বরে অনুরাগ হলে সমস্ত বিশ্বকেই আপন বোধ হয়। কারণ, সবই তাঁর সৃষ্টি।

স্বামী বিবেকানন্দ

Supplier of Plants to Different Centres of Ramakrishna Math & Mission and all over India.

KAMAL NURSERY

P. O. Andul-Mouri
Howrah-711302

Phones : 669-0698, 669-1165

নির্মল কুমার রায়ের

চরণ চিহ্ন ধরে ৬০.০০

(শ্রীরামকৃষ্ণের সমগ্র লীলাস্থল)

শ্রীরামকৃষ্ণের চরণস্পর্শপূত স্থানের বিবরণ এবং পথনির্দেশ। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুরাগী, ভক্তবৃন্দ এবং গবেষকদের কাছে বইটি অনেক দিনের একটি বড় অভাব পূর্ণ করেছে। শ্রীম-র ভাষায়—সবই মহাতীর্থ। তাঁর চরণরজে সবই জীবন্ত।

HIS DIVINE FOOTSTEPS 12.00

(Complete account of the holy places)

Short descriptions and route indications of the places visited by Sri Ramakrishna. This book will serve as a guide book to the followers, tourists and the research workers on Sri Ramakrishna.

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিঃ

[illegible]

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা উর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

With Best Compliments From :

DIAMOND METAL PRODUCTS

Mfg. All Types of
Aluminium Pilfer Proof Caps

APOLO ELECTRIC BULB PVT. LTD.

27B/H/13/1, Chaulpatty Road
Kolkata-700010

Tele. : (O) 350-3901/353-1445
Fax : 350-6297

Mfg. G.L.S. Lamps & Night Lamps

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments From :

AUTO REXINE AGENCY

House of Car Decoration

Specialist in Car-Air Conditioner

Office & Show Room :

31/A, Lenin Sarani, Kolkata-700 013

163, Lenin Sarani, Kolkata-700 013

Branch :

71A, Park Street, Kolkata-700 013

Phone : 244-1764/2184, 237-5435

নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের ওপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে। শ্রীরামকৃষ্ণ

হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন। শ্রীমা সারদাদেবী

মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে, তার বিকাশই ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments From :

UTILITY INDUSTRIES & CHEMICAL WORKS

19Y, Raja Manindra Road, Kolkata-700037

Phone : 556-5543/6459

&

ASIMCO

22, Amalangsu Sen Road, Kolkata-700048

Phone : 556-5351/5543

Manufacturers of Phenyle. I.S.I., Lysol. I.P., Soaps, Antiseptic Lotions & Purified Water. I.P.

Dealers in all sorts of Medicines, Pharmaceuticals & Laboratory Chemicals.

সেরা ফলন দেদার লাভ

লালন সুপার ফসফেট সার



প্রস্তুতকারক ঃ

সারদা ফার্টিলাইজার্স লিঃ

২, ক্লাইভঘাট স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০ ০০১

ফোন নং { অফিস ঃ ২২০-৫৪৩৫ / রেসি. ঃ ৩৩৭-৭৩৬৫ / মোবাইল ঃ ৯৮৩১০-১৯২৬৬

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ



শ্রীশ্রী সারদামায়ের

মন্ত্রশিষ্য

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

প্রণীত

স্মৃতিমূলক জীবনীগ্রন্থ

- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
- শ্রীশ্রী সারদাদেবী
- স্বামী সারদানন্দের জীবনী
- শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ
- ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা
- প্রেমানন্দ-প্রেমকথা
- জীবন পরিক্রমা



আমাদের প্রকাশিত আরও বিভিন্ন

স্মৃতিমূলক জীবনীগ্রন্থ

বিশ্বনাথ দে

- রবীন্দ্রস্মৃতি

ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

- বিবেকানন্দ স্মৃতি
- বঙ্কিম স্মৃতি
- রামমোহন স্মৃতি
- মধুসূদন স্মৃতি
- বিদ্যাসাগর স্মৃতি
- নজরুল স্মৃতি
- শরৎ স্মৃতি
- মা টেরেসা
- বায়রণ
- শেলী

শ্রী মোহিত কুমার বসাক

- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্মৃতি
- অরবিন্দ স্মৃতি
- নিবেদিতা স্মৃতি
- কিশোর শহীদ স্মৃতি
- সুভাষ স্মৃতি

সুবোধ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

- সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন
- *The Early life of Netaji*

সমর গুহ

- নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা
- *Netaji Dead or Alive*



ক্যালকাটা বুক হাউস

১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

২৪১-০৯৬৫ / ৯৪০৪

আনন্দ পাবলিশার্সের বিনম্র নিবেদন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত



শ্রীম-কথিত সমগ্র সংস্করণ দাম ৭৫.০০

এই সেই পুণ্যগ্রন্থ, শ্রীমা যার সম্পর্কে বলেছিলেন, "কলিযুগ ধন্য। ঠাকুরের অবিকল ফটোটা তুলে নিলেগা।"
শ্রীম-কথিত কালজয়ী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের পাঁচটি খণ্ডকে এক মলাটের মধ্যে এনে প্রকাশিত হয়েছে এই পরম কাঙ্ক্ষিত সমগ্র সংস্করণ। নানা দিক থেকে এ-বইকে মূল্যবান করে তোলা হয়েছে। মূল গ্রন্থের প্রতিটি অক্ষর এখানে অক্ষুণ্ণ, অফসেটে মুদ্রিত, বহু ছবি সহ টেকসই বোর্ড-বাঁধাই। সবই নিখুঁত এবং আকর্ষণীয়। সবসময়ের সঙ্গী হওয়ার মতো বইয়ের মাপ। সব মিলিয়ে এক সশ্রদ্ধ নিবেদন।

বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ

রথীন্দ্রনাথ মজুমদার
গল্পকার বিবেকানন্দ ২০.০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
বন্ধু বিবেকানন্দ ৫০.০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
বিবেকানন্দ চরিত ৬০.০০

রামায়ণ চর্চা • মহাভারত চর্চা

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী
কৃষ্ণা কুন্তী এবং কৌন্তেয় ২০০.০০



বাল্মীকির রাম ও রামায়ণ ৩৫.০০
মহাভারতের



ভারত যুদ্ধ এবং কৃষ্ণ ৫০.০০

বিষ্ণুপদ চক্রবর্তী
মহাভারত ৩৫.০০
রামায়ণ ১০০.০০

সুখময় ভট্টাচার্য
মহাভারতের চরিতাবলী ৮০.০০
রামায়ণের চরিতাবলী ৬৫.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
ফোন : ২৪১-৪৩৫২, ২৪১-৩৪১৭
E-mail : ananda@cal3.vsnl.net.in

ভগবান যদিও সর্বত্র আছেন বটে কিন্তু তাঁকে আমরা জানতে পারি কেবল মানবচরিত্রের মধ্য দিয়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments From :

M/S. BHARAT ENGINEERING STORES

36, Strand Road, 2nd Floor, Room No. 13/A, Kolkata-700 001

Phone : 243-3576 • Fax : 91-33-2209309

Approved/Reg. Govt. Supplier of Indian Ordnance Factories, Reputed Supplier of All Types of Induction Coils, Lamination Cores, Autotransformers and various Elec. items.

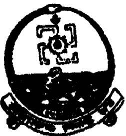
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রকাশিত বাঙলা গ্রন্থরাজি

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)	১০০.০০	মানুষের দিব্যস্বরূপ	২৫.০০
স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)	১০০.০০	মুক্তির উপায়	১৫.০০
আত্মজ্ঞান	২২.০০	যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব	৫.০০
আত্মবিকাশ	২০.০০	যুগে যুগে যাঁদের আগমন	২৮.০০
আমার জীবনকথা (২ খণ্ডে)	৮৫.০০	যোগদর্শন ও যোগসাধনা	৫০.০০
ঈশ্বরদর্শনের উপায়	৩৫.০০	যোগশিক্ষা	৪০.০০
কর্মবিজ্ঞান	১০.০০	শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম	২০.০০
তরুণ বাংলার আদর্শ	৫.০০	সর্বজনীন ধর্ম ও বেদান্ত	৩০.০০
দেবী দুর্গা	৬.০০	সাংখ্য, বৌদ্ধ ও বেদান্তদর্শন	৩০.০০
পত্র-সংকলন	১৬.০০	স্বামী বিবেকানন্দ	২.০০
পঞ্চদশী-দর্শনের পরিচয়	৫.০০	স্তোত্ররত্নাকর ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি	১২.০০
পুনর্জন্মবাদ	৩০.০০	হিন্দুনারী	১২.০০
বিংশ-শতাব্দীর ধর্ম	৫.০০	হিন্দুরা যীশুখ্রীস্টের প্রতি শ্রদ্ধাশীল,	
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	২০.০০	কিন্তু গীর্জার ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ কেন?	৫.০০
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	৩০.০০	বেদান্ত দর্শন	১০.০০
মরণের পারে	৫০.০০	খ্রীস্টীয় বিজ্ঞান এবং বেদান্ত	৫.০০
মনের বিচিত্র রূপ	১২.০০		

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত

অধ্যাত্মসাধনায় দেবতা ও দেবীভাবনা	৪.০০	ভারতীয়-সঙ্গীত—ঐতিহাসিক ও	
অভেদানন্দ-দর্শন (২ খণ্ডে)	১৪০.০০	সাংস্কৃতিক রূপরেখা	৩৪.০০
কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব	১৮.০০	মন ও মানুষ (৩ খণ্ডে)	১৫৮.০০
তীর্থরেণু	২৬.০০	মহিষাসুরমর্দ্দিনী-দুর্গা	৩০০.০০
তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা	৪০.০০	মন্ত্রভাবনা ও সঙ্গীত	১৪.০০
তন্ত্রতত্ত্বপ্রবেশিকা	৬০.০০	রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা	২০.০০
নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৪৫.০০	রাগ ও রূপ (২ খণ্ডে)	২২০.০০
পদাবলী-কীর্ত্তনের ইতিহাস	৩৫.০০	সঙ্গীতপ্রতিভায় স্বামী বিবেকানন্দ	৮.০০
বাণী ও বিচার (৮ খণ্ডে)	৪০০.০০	সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান	৫০.০০
বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তায় মন্ত্রতত্ত্ব ও মন্ত্রসাধনা	২০.০০	সঙ্গীতে সাহিত্য, রসভাবনা ও সুন্দর	২৫০.০০
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (৩ খণ্ডে)	২২০.০০	স্বামী অভেদানন্দ	৫.০০
শ্রীরামকৃষ্ণচন্দ্রিকা	৪০.০০	স্বামী অভেদানন্দের জীবন ও দর্শন	৩৬.০০



শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

(পুস্তক প্রচার বিভাগ)

১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

With Best Complimentst from:

G. D. SPRING
MFG. CO. (P.) LTD.

MANUFACTURERS & EXPORTERS

Regd. Office:

Howrah Amta Road, Balitikuri
Howrah-711 402, West Bengal
India
Phone : 91 (033) 6531040/6533863

City Office:

147, Netaji Subhas Road
1st Floor, Kolkata-700 001
Phone : 91 (033) 2312869
Fax : 91 (033) 2310855
e-mail : spring@giasc101.vsnl.net.in

With Best Complimentst from:

B. P. SPRING &
Engineering Co.
Pvt. Ltd.

Manufacturer of Alloy Steel Helical Coil
Springs for Rail & Others

Approved by:

R.D.S.O. Lucknow



A DEPARTMENT OF INDIAN REGISTER OF SHIPPING

ISO 9002/EN ISO 9002
APPROVED BY IRQS



ACCREDITED BY THE DUTCH COUNCIL FOR ACCREDITATION

Regd. Office & Works:

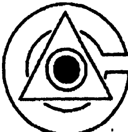
90, Benaras Road
Howrah-711 106
Phone : 651-2472/651-5855

With Best Complimentst from:

Howrah Forgings
Limited

MANUFACTURERS OF HELICAL COIL
SPRINGS & ELASTIC RAIL CLIPS,
S. S. MASTS. & G. R. PADS ON
APPROVED LIST OF
R D S O/RITES/RAILWAYS




Accredited by
the Dutch Council

NH 6, Alampur
P.O. New Kolorah
Howrah-711 302
e-mail ID : ferrous@cal.vsnl.net.in

With Best Complimentst from:



PHONE : 653-0135
FAX : (033) 653-1908

Quality Spring &
Engineering Co.
Pvt. Ltd.

ALL KINDS OF HELICAL COIL SPRING
& BRIGHT BAR MANUFACTURERS

REGISTERED WITH SSI, NSIC & RDSO

Howrah-Amta Road
Balitikuri
Howrah-711 402

With Best Complimentst From:

BEEKAY STEEL INDUSTRIES LIMITED

MANUFACTURERS ◆ ENGINEERS ◆ EXPORTERS

On Approved Lists of Railway Board :
R. D. S. O. : D. G. S. & D. & N. S. I. C.

Regd. Office :

'SAGAR ESTATE'

2, N. C. DUTTA SARANI (Formerly CLIVE GHAT ST.)
(6TH Floor)
KOLKATA-700 001, INDIA

CABLE : WARGILES ★ TELEX : 021-7113 SUN IN

FAX : 91-33-2206789 ★ PHONE : 220-0661/0639/0704/0692

Works :

286 & 287, GRAND TRUNK ROAD

SALKIA, HOWRAH-711 106

PHONE : 655-3807, 655-6426, 655-8982 ★ FAX : 655-2603

e-mail : beekayst@cal.vsnl.net.in

Visit us at : www.beekaysteel.com

With Best Compliments From :

BESCO LIMITED

Steel Founders to the Nation

Designer, Manufacturer and Exporter of Cast Steel Bogies for Freight Cars, High Tensile Centre Buffer Couplers, Friction Draft Gears, Austenitic Manganese Steel Crossing for Railway Permanent Way and Railway Wagons. We also cater to the needs of Defence, Mining, Steel Plants, Thermal Power Plants, Ship Building & Heavy Engineering Industry.

Product range includes carbon, low alloy and high Manganese Steel castings to international specification viz. JUS, GOST, DIN, ASTM, BS etc. A single piece may weigh from 100 Kgs. to 5,000 Kgs.

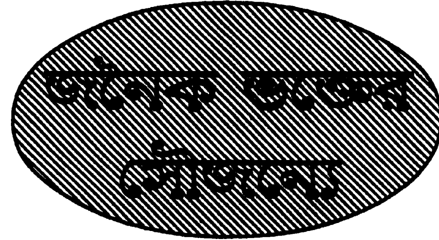
Commited towards a role model in Engineering Industry Environment.

Works & Head Office :

8, Anil Maitra Road, Ballygunge
Kolkata-700 019
Phone : (91) (33) 440-6364/6365/4666
Fax : (91) (33) 440-4075

যতই শক্তিপ্রয়োগ, যতই শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন, যতই আইনের কড়াকড়ি কর না কেন—কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারিবে না। একমাত্র আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শিক্ষাই অসৎ প্রবৃত্তি পরিবর্তিত করিয়া জাতিকে সৎপথে চালিত করিতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ



Unselfishness is more paying, only people have not patience to practise it.

Swami Vivekananda



A WELL WISHER

সান রেকর্ডস নিবেদিত ভক্তির ডালি
শারদ অর্ঘ্য ২০০১

- "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্" SR 0037
  সুস্মিতা গোস্বামী, শঙ্কর সোম ও সহশিল্পিবৃন্দ
- "সমর্পণ" (ভক্তিগীতি) SR 0044
  শঙ্কর সোম
- "সত্য জননী" (মাতৃসঙ্গীত) SR 0043
  প্রিয়া ভট্টাচার্য (মুম্বাই)
- "মাতৃবন্দনা" SR 0023
  সুদেষ্ণা গাঙ্গুলী

এছাড়া

"হে মহাযোগী" SR 0012 এবং "সন্ধ্যারতি" SR 0036

আজই সংগ্রহ করুন

☆ যোগাযোগের ঠিকানা ☆

M/s. SUN RECORDS PRIVATE LTD.
156A, Lenin Sarani
Kamalalaya Centre, Kolkata-700 013
Phone : 236-7641, 236-7643

If you can but follow one of the Master's teachings, you get everything.

Sri Ma Sarada Devi

FOR ADVERTISE YOUR MATERIAL THROUGH CCTV NETWORK
AT HOWRAH RLY. STATION

Please Contact With :

M/s. R. P. BASU & CO.

6/2, MADAN STREET, KOLKATA-700 072

PHONES : 236-1520, 237-3722

একশ একত্রিশ বৎসর সততার সহিত পরিচালিত

অক্ষয় কুমার লাহা

১নং ধর্মতলা স্ট্রীট
কলিকাতা -১৩

রং

WHITE PAINTS

প্রাচ্য কালারম্যান

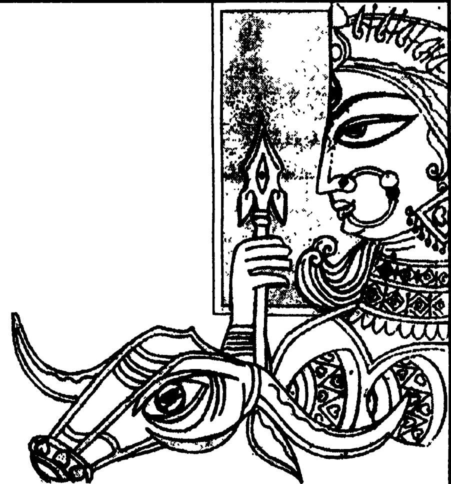
ফোন নং ২২৮-২৭৬৫, ২২৮-০৯৪০, ২২৮-১৭১৬

ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২১-৯৯৫৪

পূজায় চাই

নূতন শাড়ি

- বেনারসী
- বমকাই
- ইককত
- সিল্ক
- বালুচরী
- কাঁথাস্টিচ
- জামদানী



স্থাপিত ঃ ১৮৬২

প্রিয় গোপাল বিষয়ী

৭০, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা-৭

ফোন ঃ ২৩৮-৬৪০২/২৮৩৩

With Best Compliments of:

A. TOSH & SONS (INDIA) LIMITED

TRADING HOUSE



"TOSH HOUSE"

P-32 & 33, India Exchange Place
P.O. Box No. 2444, Kolkata-700 001.
Cable : 'Payaal' Kolkata
Telex : 0214393 TOSH IN; Fax : 91 33 221 5691/5751
Phones : 221-5689, 221-5756, 221-5693, 221-5673, 221-5818.
E-mail : atoshcal@satyam.net.in

Inland Branches : SILIGURI, COCHIN, COIMBATORE, TUTICORIN
Foreign Branches : MOSCOW, KIEV

স্বামী অব্জজানন্দ প্রণীত

এক সোনার মানুষ মূল্য : ১০০.০০
শ্রীমৎ স্বামী প্রেমেশানন্দ মহারাজের জীবনের তথ্যসমৃদ্ধ প্রামাণিক সম্পূর্ণ জীবনচরিত—প্রথম সংস্করণ প্রকাশের কয়েক মাসের মধ্যেই যে-গ্রন্থ নিঃশেষপ্রায়—স্বল্প সংখ্যক কয়েকখানি কপি মাত্র অবশিষ্ট।

প্রকৃতিং পরমাং
মূল্য—প্রথম ভাগ : ৬৫.০০; দ্বিতীয় ভাগ : ৫০.০০
দুই ভাগে সম্পূর্ণ শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর চরিতানুধ্যান।

এনৎ উপাসীত মূল্য : ৫০.০০
উপনিষদের আলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ-মনন

উপনিষদ্ অভিধ্যান :
ঈশোপনিষৎ মূল্য : ২০.০০
কেনোপনিষৎ মূল্য : ১০.০০

শ্রীশ্রীমায়ের অমৃতকথা মূল্য : ২.০০
অষ্টোত্তর বাণীপুষ্প চয়নিকা

প্রাপ্তিস্থান : মহেশ লাইব্রেরী, ২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ ◆ রত্না বুক হাউস, ৭ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩ ◆ সর্বোদয় বুক স্টল, হাওড়া স্টেশন, হাওড়া-৭১১ ১০১

প্রকাশক কৃষ্ণনাথ বসু, ৯৩/১জি, বৈঠকখানা রোড কলকাতা-৭০০ ০০৯, ফোন : ৩৫০-২৮৭৪, (বাড়ি) ৫৪২-২৪৩১

> That knowledge which purifies the mind and heart alone is true knowledge.
> **Sri Ramakrishna**

With Best Compliments From:

EAST INDIA ARMS CO.

1, CHOWRINGHEE ROAD
KOLKATA-700 013
PHONE NO. 228-2989, 228-9700

তিনি [ভগবান] জীবজন্তু সবই হয়েছেন বটে, তবে সংস্কার ও কর্মফল অনুসারে সকলে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে। সূর্য এক, কিন্তু জায়গা ও বস্তুভেদে তার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন।

শ্রীমা সারদাদেবী

সৌজন্যে

শ্রীমা সারদা বুক বাইণ্ডিং

১৮/৪ বেলেঘাটা রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৫
ফোন ঃ ২৫১-৯৭৯৩

GRAM : CHEMLIME (CAL.)



238-2850
239-0134
232-0502

CHOUDHURY & CO.

DEALERS IN:
QUICK LIME, CHEMICAL LIME, HYDRATED LIME, BUILDING LIME, LIMESTONE, DOLOMITE, SAND, BAUXITE, NIRU LIME ETC.

67/45, STRAND ROAD
KOLKATA-700 007

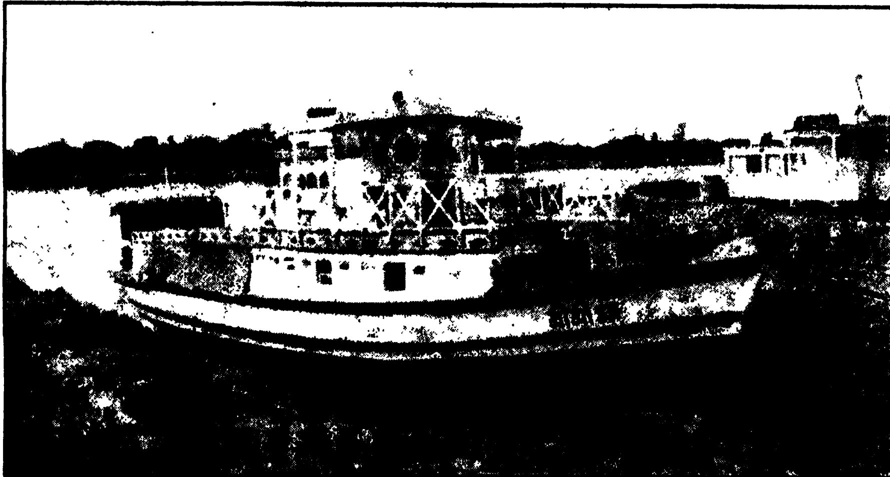
With Best Compliments From :

A
WELL
WISHER

একটি বিশেষ আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশন সমাজ সেবক শিক্ষণ মন্দির, বেলুড় মঠ-এর প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বারা সংগঠিত **সার্বিক বিবেকানন্দ গ্রাম সেবা সংস্থা, বেলুড় মঠ, হাওড়া** গত আট বছর ধরে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশিত পথে মূলত নিম্নলিখিত দুটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ধারায় সমাজসেবামূলক কর্মসূচী রূপায়ণে নিযুক্ত আছে।

একটি ধারায়—দুর্গম, লোনা জলবেষ্টিত ও মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন সুন্দরবন অঞ্চলের চরম দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামবাসীদের সুলভ স্বাস্থ্য-পরিষেবা প্রদানের জন্য চালু করা হয়েছে আমাদের স্বাস্থ্য-পরিষেবা কর্মসূচী—লঞ্চবাহিত ভাসমান চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে। তৎসহ রাখা হয়েছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা মাসে মাসে বিশেষ চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা। এছাড়া বর্তমানে বছরে একবার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় বিনাব্যয়ে চক্ষু অপারেশন শিবির। স্বাস্থ্য-পরিষেবার অঙ্গ হিসাবে রূপায়িত হয়ে চলেছে সুলভ বিজ্ঞানসম্মত শৌচাগার স্থাপনের ব্যাপক কর্মসূচী।



সংস্থার অপর কর্মধারাটি ভয়াবহ বেকার সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় তৎপর। এই ধারাটিতে জীবিকাভিত্তিক কারিগরি প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী রূপায়িত হয়ে চলেছে।

উল্লেখ্য, আমাদের এই সংস্থা একটি অব্যবসায়ী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও দাতাগণের মুক্তহস্ত দানই এর সকল কর্মসূচী রূপায়ণের মূলভিত্তি।

সহৃদয় দাতাগণের কাছে আমাদের বিশেষ আবেদন এই যে, আপনাদের দান-সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদের এই সেবামূলক কর্মসূচীকে আরো বিস্তৃত ও সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে সাহায্য করুন।

মানি অর্ডার, ব্যাঙ্ক ড্রাফট অথবা চেক এই নামে পাঠাতে হবে—'সার্বিক বিবেকানন্দ গ্রাম সেবা সংস্থা' (SARVIK VIVEKANANDA GRAM SEVA SANSTHA) ১৮/২, লালাবাবু সায়ার রোড, বেলুড় মঠ, হাওড়া। ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ৬৫৪-২৩২৮।

আপনাদের প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারানুসারে করমুক্ত।

With Best Compliments from :

A WELL WISHER

MRITUNJOY STORES

Liquid & Toilet soap, Soft soap, D.D.T., Insecticides, Spray, Chemicals, Phenyl, Fireworks, Toilet Paper and many other miscellaneous domestic requisites dealer & marine stores supplier.

27, BIPLABI RASHBEHARI BASU ROAD (CANNING ST.) KOLKATA-700 001

Stockists of :

✱ Bayer (India) Ltd. ✱ Herbertsons Ltd. ✱ The Waxpol Industries Ltd. ✱ Index Corpn. ✱ Balsara Hygiene Products ✱ Eastern Chem. Ind. ✱ Hindustan Insecticides ✱ Rallis India ✱ Bombay Chemical ✱ Mafatlal Dyes & Chem. ✱ Chemi-Synth ✱ BC. PL. ✱ Nocil

Phones : 242-0747, 242-3793
Resi. : 241-3321

No work is secular. All work is adoration and worship.

Swami Vivekananda

With Best Compliments from :

NAGENDRANATH GHOSH & COMPANY

159, Netaji Subhas Road
Kolkata-700 001
Phones : 238-5422, 238-6605

Dealer :

NUT, BOLT, ROOFING BOLT, RIVET, WASHER, L.HOOK, J HOOK ETC.

Stockist :

TATA, G.K.W., LOCAL MACHINE MAKE, PUNJAB MAKES BOLTS & NUTS

Call on the Lord who pervades the entire universe. He will shower His blessings upon you.

Sri Ma Sarada Devi

With Best Compliments from:

UNITED ELEVATORS PVT. LTD.

Manufacturers of 'UE' Lifts

Regd. Office:
10, Hastings Street
(Kiron Sankar Roy Road)
2nd Floor
Kolkata-700 001
Phone: 242-3492/248-1225

এম এল সি অডিও-র

শারদ অর্ঘ্য ২০০১

- "কৃষ্ণসুদামা" (পালাকীর্তন)
  সুপ্রিয়া হালদার
- "লোকনাথ মহানাম" (ভক্তিগীতি)
  অনুপ ঘোষাল, শ্রীকান্ত আচার্য, শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্পা কুণ্ডু, পল্লব ঘোষ, স্বাগত দে, অনিতা সিনহা ও সুস্মিতা গোস্বামী
- "প্রসাদ পদাবলী" (১ম খণ্ড)
  স্বর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়
- "চিরশাশ্বত মা" (ভক্তিগীতি)
  শঙ্কর সোম

যোগাযোগের ঠিকানা

MLC AUDIO
71/2B, BIDHAN SARANI
KOLKATA-700 006
দূর আলাপনী: 554-4329 (7 A.M.–10 A.M.)

জীবের অহঙ্কারই মায়া, এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। যদি ঈশ্বরের কৃপায় আমি অকর্তা—এই বোধ হয়ে গেল, তাহলে সে-ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ

With Best Compliments from:

B. B. CHATTERJEE & CO. (P.) LTD.

Bakelite Sheets, Rods, Tubes, Powder, Asbestos
Jointing Sheets, Powder, Fibre, Gland Packing
Teflon Rods, Sheets, PP, HDPE, PVC Rods,
Sheets, Gasket, Ebonite Rods & Sheets
Glass Wool & Mineral Wool Etc.

22, Raja Woodmunt Street
Kolkata-700 001
Post Box No.: 49
Ph. (Off.): 243-1860, 243-2046, 242-7044
Fax: 033-243-2414
Gram: 'AESBEMAKO' (C)

ধর্মই মানবের চিন্তা ও জীবনের সর্বোচ্চ স্তর।

স্বামী বিবেকানন্দ

A Reliable Centre for Diagnosis of Chronic Diseases

✡ ULTRASONOGRAPHY ✡ ECHOCARDIOGRAPHY ✡ X-RAY ✡ E.C.G. ✡ E.E.G.
✡ POLYCLINIC ✡ PATHOLOGY (COMPUTERISED) ✡ ENDOSCOPY

RAMKANAI SCAN CENTRE

P-18B, Raja Rajkrishna Street, Kolkata-700 006
(Near Rangana Theatre)
Phone : 554-9953/6168

Associates of :

DR. M. C. PAUL'S BACTERIOLOGICAL LABORATORIES

131-C, Bidhan Sarani, Kolkata-700 004 ✧ Phone : 555-3490, 555-5522

City Centre :

35, Rebert Street, Kolkata-700 012 ✧ Phone : 234-6056

পিঁপড়ের মতো সংসারে থাক। এই সংসারে নিত্য, অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশানো—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

With Compliments from :

BISWAJIT SAMANTA

1ST CLASS ENLISTED CONTRACTOR
P. H. E. DTC.
GOVT. OF WEST BENGAL

29/1, Umacharan Bose Lane
Sibpur, Howrah-711 102

Phone : 660-8534 (Works)
660-3595 (Resi.)

নাম জপতে জপতে ইন্দ্রিয়গুলোর অনিষ্ট শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। ধ্যান, জপ, ঈশ্বরচিন্তা ও সৎকাজ করলে পাপ কেটে যায়। ইষ্টে যার সর্বদা মন থাকে তার কখনো অনিষ্ট হয় না।

শ্রীমা সারদাদেবী

With Best Compliments from :

SUPER PLASTIC

(S. S. I. REGD. NO. PMT 21/09/13768)

ALL KINDS OF PLASTIC MOULDING SPECIALIST IN "COMB" MOULDING

SASTITALA, KONA ROAD
SANTRAGACHI
HOWRAH-711 104
PHONE : 667-2986

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ

With Best Compliments From :

BISWAMBHAR NAG DAS & CO.

MANUFACTURERS, WHOLESALE DEALERS, ALL KINDS OF HANDLOOM PRODUCTS

26, SHIBTOLA STREET
KOLKATA-700 007
Phone : 230-1750, 233-6633
239-5396 PP

With Best Compliments From :

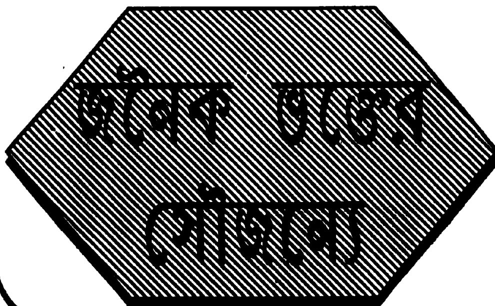
EVEREADY>>>
INDUSTRIES INDIA LTD.

1, MIDDLETON STREET
KOLKATA-700 071
FAX : 91-33-240 2059
PHONE :
247 3950/240 0147/287 1182

ছোট জিনিস বলে কি তুচ্ছ বোধ করতে আছে? যাকে রাখ সেই রাখে। যার যা সম্মান তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করতে হয়। সামান্য কাজটিও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

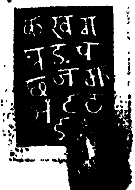






Everyday, Tata Tea helps bring fingers together.

The difference is either a fresh new day. Or a fresh new life.



Tata Tea runs 280 adult literacy centres. 160 child care centres. 26 Hospitals. Schemes like Project Dare in the High Range of Munnar to take care of the educational needs of mentally handicapped children. Schools to educate workers' children. Wildlife protection foundations and sanctuaries. Yes, the name Tata Tea means more than a giant tea company. For thousands across the country it means life.

TATA TEA



মানুষ তো ভগবানকে ভুলেই আছে। তাই [illegible] তিনি নিজে এক-একবার এসে সাধন করে পথ [illegible] দেখালেন ত্যাগ। ঠাকুর এবার এসেছেন ধনী, [illegible] সকলকে উদ্ধার করতে। মলয়ের হাওয়া খুব [illegible] তুলে দেবে, শরণাগত হবে—সে-ই ধন্য হয়ে যাবে।

শ্রীমা সারদা দেবী



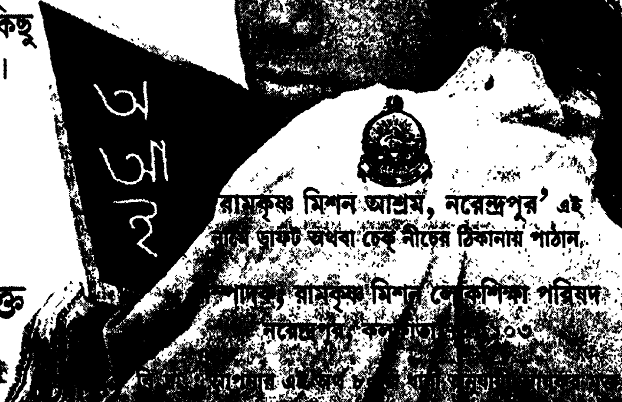
জনৈক

ভক্তের সৌজন্যে

'দাও আর ফিরে নাহি চাও, থাকে যদি হৃদয়ে সম্বল'

প্রায় চৌত্রিশ কোটি শিশু আছে ভারতবর্ষে, যাদের বয়স চোদ্দ বছরের মধ্যে। এরা জীবন বিকাশের ন্যূনতম উপকরণ—শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সুস্থ পরিবেশ থেকে বঞ্চিত। অভাব তাদের তাড়িয়ে নিয়ে যায় অজানা ভয়াল এক ভবিষ্যতের দিকে। তাদের সহায় সম্বলহীনা মা জানেন না কার দ্বারে তিনি দাঁড়াবেন। আমাদের দেশে আজও শিশুমৃত্যুর হার ৬৯ এবং শতকরা ০.৪১ জন মা শিশু-জন্মের সময় মারা যান। রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ দীর্ঘকাল মা ও শিশু বিকাশ কর্মসূচী রূপায়ণ করে চলেছে প্রায় পঞ্চাশ হাজার শিশুর মধ্যে। পরম পূজ্যপাদ সংঘাধ্যক্ষ, শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের কৃপাধন্য **'বিবেকানন্দ চাইল্ড ডেভলপমেন্ট ফান্ডের'** মাধ্যমে রামকৃষ্ণ মিশন আপনাকেও সুযোগ করে দিচ্ছে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল এরকম একটি অথবা একাধিক পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর—একটি শিশুকে স্পনসর করে অথবা এককালীন কিছু অর্থ দিয়ে।





'রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর' এই নামে ড্রাফট অথবা চেক্ নীচের ঠিকানায় পাঠান.

সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ
নরেন্দ্রপুর, কলকাতা ...১০৩

একটি শিশুর জন্য এককালীন ১২০০০ টাকা বা বাৎসরিক ১৫০০ টাকা (১০০০ টাকা কেবল শিক্ষার জন্য) স্পনসর করুন।

ঈশ্বরলাভই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।
শ্রীরামকৃষ্ণ

With Best Compliments From :

Phone : 651-8465

**PAUL'S
LATHE CHUCK
ESTD. 1941**

PAUL'S ENGINEERING WORKS PVT. LTD.

MANUFACTURER OF 'PAUL' BRAND 4 JAW INDEPENDENT DOG CHUCK & SELF CENTRING CHUCK.

P-7, NATABAR PAUL ROAD
HOWRAH-711 105

ঘৃণার শক্তির চেয়ে প্রেমের শক্তি অনন্তগুণে বেশি শক্তিমান।
স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments From :

PEECO HYDRAULIC PVT. LTD.

AMBIKA KUNDU LANE
RAMRAJATALA, HOWRAH-711 104
(W.B.)
PHONE : 667-2017/7225
GRAM : 'OILDROLIK'

SANTRAGACHI, P.O. HOWRAH
FAX NO. 033-6677226
033-6602699
TELEX : 021-5041 HWTO IN

With Best Compliments From :

Chatto Chemicals Pvt. Ltd.

Manufacturers of Electroplating Chemicals, Salts, Plants & Equipments for Plating on Metals, Non-Conductors, Printed Circuit Boards etc.

4/1, Bhabanath Sen Street, Kolkata-700004
Phone : 554-5171, 554-9565, 554-9461 ✧ Fax : 91(33)554 7337 ✧ e-mail : chatto@vsnl.com

WE ARE HERE TO HELP YOU, SOLVE YOUR ELECTROPLATING PROBLEMS, SET UP YOUR NEW ELECTROPLATING PLANTS.

Services Available :
Kolkata : 4/1, Bhabanath Sen Street, Kolkata-700004
Phone : 554-5171, 554-9565, 554-9461 • Fax : 91(33)554 7337
Delhi : 220 A, Allied House, Rohtok Road, Delhi-110035
Phone : 365 7721
Mumbai : A-101, Shiv Dham, Linking Road, Malad (W), Mumbai-400064
Phone : 888-5584
Aligarh : H. No. 6/349, Nai Basti, Aligarh-202001
Ludhiana : M/s. Agrani Enterprises
434, Old Oswal Street. Millar Ganj, Ludhiana-141003

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম কোটি কোটি লোকপূর্ণ ভারতের সর্বত্র পরিচিত। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার শক্তি ভারতের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছে; আর যদি আমি জগতের কোথাও সত্য সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে একটা কথাও বলিয়া থাকি, তাহা মদীয় আচার্যদেবের—ভুলগুলি কেবল আমার।

স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments From:

SANTRAGACHI RUBBER & CHEMICAL WORKS

City Office:
83, Bentinck Street, Kolkata-700 001
Phone: 236-6633

Factory:
1, Bholanath Nundy Lane
P.O. Santragachi, Howrah
Phone: 667-5236 Gram: DHOLES, Howrah

সংসার কর না কেন, তাতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরেতে মন রেখে কর। জেনো যে, বাড়িঘর পরিবার আমার নয়, এসব ঈশ্বরের। আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে। আর বলি যে, তাঁর পাদপদ্মে ভক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে সর্বদা প্রার্থনা করবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

With Best Compliments From:

NEW HINDUSTHAN CYCLE STORES

20A, GALIFF STREET
KOLKATA-700 004
Phone : 555-6178

হাজার বছরের অন্ধকার ঘর যেমন একবার একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বাললে তখনি আলো হয়, তেমনি জীবের জন্মজন্মান্তরের পাপও তাঁর (ঈশ্বরের) একবার কৃপাদৃষ্টিতে দূর হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ



মানিক চন্দ্র পাইন
জুয়েলার্স
১১১/১, বিধান সরণি
কলকাতা-৭০০ ০০৪
দূরভাষ ঃ ৫৫৫-৩২৬২

জলে নৌকা থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্তু নৌকায় যেন জল না থাকে। তেমনি সাধক সংসারে থাকুক ক্ষতি নাই, কিন্তু সাধকের ভেতর যেন সংসার না থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



With Best Compliments From:

M/s. TRADECO

27G, GOPI MOHAN DUTTA LANE
KOLKATA-700 003
PHONE : 555-5536/3756

GOVT. APPROVED PHARMACEUTICALS DISTRIBUTORS

Chakraburti's

AID TO ED

(Estd. 1960)

POSTAL & ORAL COACHING INSTITUTE

Affiliated to The Institute of Cost & Works Accountants of India.

128 Keshab Chandra Sen St., Kolkata-9 (1st Floor), Phone : 350-5733

Admission going on twice in a year January to June and July to December for ICWAI (Foundation). Intermediate Courses State-I & II. All H.S. & Graduate can get admission.

Excellent Results. Efficient Faculty Members.

Time of Enquiry : 4—9 P.M.

General Dept. :

39 Mahatma Gandhi Road, Kolkata-9
Phone : 352-1906

Admission going on Madhyamik, H.S., B.A., B. Sc., B. Com., (Pass & Hons)
All types of competitive courses.

Fee most reasonable.
Contact : 4—8 P.M.

ঘৃণার শক্তির চেয়ে প্রেমের শক্তি অনন্তগুণে বেশি শক্তিমান।

স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments From:



Debasish Ghosh

A.M.I.E. (CIVIL)
L.B.S. (CL-I)–C.M.C., L.B.S. (GR-A)–R.G.M.

'SANTINIKETAN'
AE-167, RABINDRAPALLY
KRISHNAPUR
KOLKATA-700 101
PHONE : 571-0407

When the mind is free from attachment to sense-objects, it turns to God and is fixed on Him.

Sri Ramakrishna

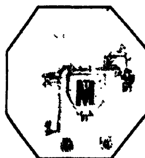
With Best Compliments From:

SRI RAMAKRISHNA PHARMACY

105-A, Rashbehari Avenue
Kolkata-700 029
Phone : 464-0999/464-4875
Mobile No. : 9831035770

OXYGEN AVAILABLE

সহ্যের সমান গুণ নেই, সন্তোষের সমান ধন নেই।—শ্রীমা সারদাদেবী



MAA TARA INDUSTRIES

Manufacturers and Repairers of:
Power and Distribution Transformer and Repairers of All Types of Transformers (Approved by S. S. I. Unit)

Factory:
BHAKURI MORE
CHALTIA, BERHAMPORE, DIST. MURSHIDABAD

Regd. Office:
112, BARUIPARA LANE, KOLKATA-700 035
PHONE : 50765 ○ STD : 03482

আমাদের পূর্বপুরুষগণের রীতিনীতিগুলি মন্দ ছিল বলিয়া যে ভারতের অবনতি হইয়াছে তাহা নহে; এই অবনতির কারণ, ঐ রীতিনীতিগুলির যে ন্যায়সঙ্গত পরিণতি হওয়া উচিত ছিল তাহা হইতে দেওয়া হয় নাই।

স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments from :

COLORA OFFSET

(Multicolour Offset Printer)

31A, S. P. MUKHERJEE ROAD, KOLKATA-700 025

PHONE NOS. : 474-9967, 475-4600
FAX : 474-9967

With Best Compliments from :

THE KALYANI SPINNING MILLS LIMITED

(A Government of West Bengal Undertaking)

Registered Office :
6A, RAJA SUBODH MULLICK SQUARE (5TH FLOOR) KOLKATA-700 013
Phone : 237-0090, 237-0091 • Fax : 237-7808 • e-mail : kalyspin@cal2.vsnl.net.in

Units :

Unit I
KALYANI, DIST. : NADIA
Fax : 5828-229
Count range—20s to 100s & also available spliced electronically cleaned auto-cone yarn.

Unit II
ASHOKENAGAR, DIST. : 24 PGS. (N)
Fax : 9116-57270
Count range—6s to 40s yarn.
O/E—6s to 16s

Step in for Superior Quality of Hank, Carded & Combed Yarn
(Cotton, P.V., Polyester & Viscose)

Exporters are welcome to procure our quality Yarn

In dedicated service to Handloom, Powerloom & Hosiery Industries

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।।
স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments from:

K.C. PAUL & SONS

UMBRELLA MERCHANTS & DEALERS IN FIRE WORKS
DESIGNED TO BE APPROVED BY US

82, Pandit Purusottom Ray Street
Kolkata-700 007
Phones: 238-2924/7104 • Gram: CHERACHATA
Factory
Tulsi Bhavan
254B, Chittaranjan Avenue (N)
Kolkata-700 006
Phone: 241-1241

ভগবান কল্পতরু—তাঁর কাছে যে যেমন চায় সে তাই পায়।
শ্রীরামকৃষ্ণ

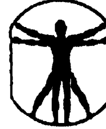
With Best Compliments from:

Kaberi Das (D.P.T.)

Nivedita Physiotherapy Centre

218/5, Mahendra Bhattacharjee Road
Chakraberia, Howrah-4
Phone: 667-9471

LEASER PHYSIOTHERAPY
ELECTRO-THERAPY
SPEECH-THERAPY
INSTRUMENT EXERCISE



MASSAGE
YOGASANA
HEALTH CARE UNIT
NATUROTHERAPY
(HOME SERVICE AVAILABLE)

Time: Monday to Saturday 5 P.M. to 9 P.M.

Be brave and be sincere; then follow the path with devotion and you must reach the Lord.
Swami Vivekananda

Gram: 'TECOLUGS'



Phone: 577-8582

TARAKNATH ELECTRIC CO.

Electrical Mechanical And Electronic Engineers

Repairer of:

POWER & DISTRIBUTION TRANSFORMER, SWITCH BOARD & MOTOR ETC.

Post Bag No. 787 ✧ Kolkata-700 003

Regd. Office:
1/1, SISIR KUMAR DAWN ROAD
KOLKATA-700 036

Repairing Division:
1, SISIR KUMAR DAWN ROAD
KOLKATA-700 036

Pure knowledge and pure love are both one and the same.
Sri Ramakrishna

Space donated by :

PURITY SANCTITY HONESTY

A Reliable & Trusted Name in Homoeopathic World

POWELL HOMOEO RESEARCH LABORATORY

(BONDED)

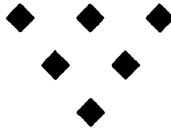
Laboratory
Powell House
Block-GN, Plot No. 28
Sector-V, Salt Lake City
Kolkata-700 091
Ph. : 357-3544

Head Office
BC-62, Sector-I, Salt Lake
Kolkata-700 064
Ph. : 334-1666
Fax : 033-358-9661
Gram : Powellres

নাম জপতে জপতে ইন্দ্রিয়গুলোর অনিষ্ট শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। ধ্যান, জপ, ঈশ্বরচিন্তা ও সৎ কাজ করলে পাপ কেটে যায়। ইষ্টে যার সর্বদা মন থাকে, তার কখনো অনিষ্ট হয় না।

শ্রীমা সারদাদেবী

With Best Compliments From :



G. NANDY & COMPANY

235, NETAJI SUBHAS ROAD
HOWRAH-1

শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণপরায়ণে ।
সর্বস্যার্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।

শ্রীশ্রীচণ্ডী

With Best Compliments From :

THE BHARAT BATTERY MFG. CO. (P.) LTD.

238A, A. J. C. BOSE ROAD
KOLKATA-700 020
PHONE : 247-0982/240-3467

Diamond®
PHONE
225 3229
244 9856
Choke & Fittings for
Tubelight & M. V. Lamp
DIAMOND ELECTRICAL AGENCIES
PODDAR COURT (GROUND FLOOR) CAL-1

ঈশ্বরের শরণাগত হলে বিধির বিধি খণ্ডন হয়ে যায়। তাঁর নিজের হাতের কলম নিজ হাতে কাটতে হয়।

শ্রীমা সারদাদেবী

With Best Compliments from:

M/S. UTILITY STORES

HARDWARE MERCHANT & COMMISSION AGENT

(WIRE NAILS, TATA AGRICULTURAL IMPLEMENTS & OTHER HARDWARE GOODS SUPPLIERS)

76B, Netaji Subhas Road
Kolkata-700 007



With Best Compliments from:

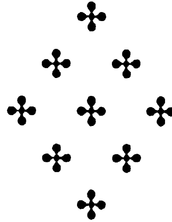
KIRLOSKAR BROTHERS LIMITED

8 CAMAC STREET, 'SHANTINIKETAN'
1ST FLOOR, SPACE : 3
KOLKATA-700 017

PHONE : (EPABX) : 282-7225/0891/6885/7849 (RESI.) : (033) 411-2831
FAX : (O33) 282-9915 E-mail : aguha@ccu.kbl.co.in

Lamp cannot burn without oil.
Man cannot live without God.

Sri Ramakrishna



Quoted by :

A DEVOTEE

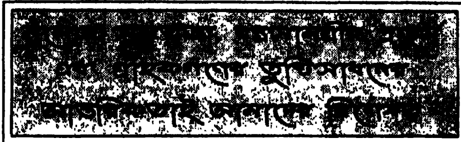
পূজা, হোম, যাগযজ্ঞ কিছুই কিছু নয়। যদি তাঁর (ভগবানের) ওপর ভালবাসা আসে, তাহলে আর এসব কর্মের বেশি দরকার নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ

সংসারে কেমন করে থাকতে হয়, জান? যখন যেমন, তখন তেমন। যাকে যেমন, তাকে তেমন। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।

শ্রীমা সারদাদেবী

ক্রেতাসাধারণের সেবা ও আধুনিকতায় রুচির প্রতীক



শ্রীরামকৃষ্ণ বস্ত্রালয়

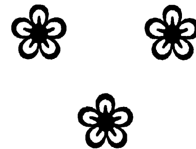
বি. ই. ১০১, সল্ট লেক সিটি

কলকাতা-৭০০ ০৬৪

ফোন :

৩৩৭-০০৪০, ৩৫৮-০৫২০, ৩২১-৯৮০৮

With Best Compliments from :



Santimoy Banerjee

General Order Suppliers

254A, KALICHARAN GHOSH ROAD

KOLKATA-700 050

PHONE : 528-0666

যে-কর্মই কর, ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কামনাশূন্য হয়ে করতে পারলে তাঁর (ঈশ্বরের) সঙ্গে যোগ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ

With Best Compliments From :



TINA IRON STORES

IRON MERCHANTS

254A, Kalicharan Ghosh Road
Kolkata-700 050
Phone :
558-3526 (O), 558-4723 (R)



শারদীয়ার শুভেচ্ছা

যুগ যুগান্তের ঐতিহ্যবাহী স্বর্ণ শিল্পী ও মনিকার
কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত ভ্যালুয়ার

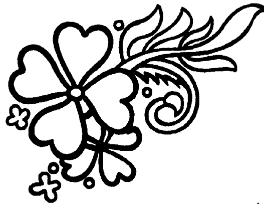
এম, সরকার ও সন্স
গ্রেট গ্রান্ড সন্‌ অফ লেট
বি, সরকার

এ ই ৩৩৫, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৬৪

ফোন ঃ ৩৫৮-৯০৫১
৩৫৮-৯১৮৩

The happiest moments we ever know are when we entirely forget ourselves.

Swami Vivekananda



Quoted by :

A DEVOTEE

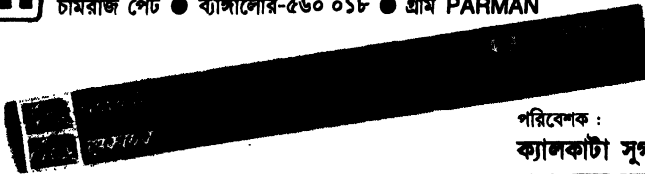
কি প্রশান্তি
বিরাজিছে
এ সুগন্ধ মাঝে



উৎসব ও নিত্যপ্রয়োজনে
ব্যবহার করুন
গুরুদেব
সুগন্ধী ধূপকাঠি



পরিমল মন্দির
১১৪, ৪র্থ মেন রোড ● পোস্ট বক্স নং ১৮৫৪
চামরাজ পেট ● ব্যাঙ্গালোর-৫৬০ ০১৮ ● গ্রাম PARMAN



পরিবেশক :
ক্যালকাটা সুগন্ধী ধূপ ফ্যাক্টরী
৬৮এ, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৭, ফোন : ২৩৯-৮১৩৬

সূর্য যদি মেঘাচ্ছন্ন হয় কিছুক্ষণ
যদি বা আকাশ হের বিষণ্ণ গম্ভীর,
ধৈর্য ধর কিছুকাল হে বীর হৃদয়
জয় তব জেনো সুনিশ্চয়।।
স্বামী বিবেকানন্দ

With Compliments from:

K. C. DASS

Manufacturer of :
READYMADE GARMENTS

112, BIDHAN SARANI
KOLKATA-700 004
PHONE : 554-2637/555-4765/555-3085

Specialist in:
SCHOOL UNIFORMS

আমি সতেরও মা, অসতেরও মা।
শ্রীমা সারদাদেবী



CHANDRA & BROS.

MANUFACTURING JEWELLERS & ORDER SUPPLIERS

Dealers In:
GUINEA GOLD ORNAMENTS & PRECIOUS STONES

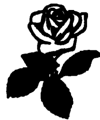
121/C, BEPIN BEHARI GANGULY STREET (BOWBAZAR), KOLKATA-700 012
PH : 237-4704
125/B, BEPIN BEHARI GANGULY STREET (BOWBAZAR), KOLKATA-700 012
PH : 227-5925
169/A, BEPIN BEHARI GANGULY STREET (BOWBAZAR), KOLKATA-700 012
PH : 241-9110
106, BEPIN BEHARI GANGULY STREET (BOWBAZAR), KOLKATA-700 012
PH : 237-2322

(AIR-CONDITIONED) SUNDAY CLOSED

God is one, but He has innumerable forms. He is the creator of all and He Himself takes the human form.
Guru Nanak

To work alone you have the right, but never claim its results. Let not the result of actions be your motive, nor be attached to inaction.
Sri Krishna

With Best Compliments from:



M/S. MOUSTACHE INTERNATIONAL (P) LTD.

33, Tollygunge Circular Road
Kolkata-700 053

With Best Compliments from:

INDIA STEAM LAUNDRY
(PRIVATE LIMITED)

80, JAWPORE ROAD
KOLKATA-700074

Phone : 548-4379, 548-5273, 548-7037

EDUCATION IS THE PANACEA
FOR OUR ILLS.
Swami Vivekananda

With Best Compliments of :

VIVEKANANDA HEEM GHAR PRIVATE LIMITED

P.O.–DHANIAKHALI
DIST.–HOOGHLY, W. B.
PIN.–712302

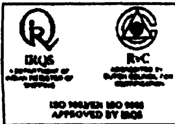
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ।।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

With Best Compliments of :

M/s. Netai Charan De Cold Storage (P.) Ltd.

**P.O. & Vill.–Dedhara
Dist.–Hooghly (W. B.)**

*Take more potato for good health
If no diabetes.*



Recon
ENGINEERING COMPANY (P) LTD.

Manufacturers of

AIR & VACUUM BRAKE EQUIPMENT, EXHAUSTERS & COMPRESSORS SPARES INDIGENOUSLY, BI-PARTING DOOR OPERATOR COMPLETE

OUR MARK OF QUALITY

Head Office :

6G, Maruti, 12 Loudon Street, Kolkata-700 017
Phone : 247-5971/5553, 287-0549
E-mail : reconeng@vsnl.com
Fax No. : 247-5971/5553

Branch Office :

40 Strand Road, 3rd Floor, Room No. 19B, Kolkata-700 001, Phone : 243-1170

Works :

Baltikuri, Howrah (W.B.), Phone : 653-0359

Our Spare Parts Division :

Ichapur, Sastibagan, Howrah, Phone : 667-9345

With Compliments from :



INDIAN TEA ASSOCIATION

ROYAL EXCHANGE
6, NETAJI SUBHAS ROAD
KOLKATA-700 001

TELEGRAM : TEA
PHONE : 220-8393 (14 LINES)
FAX : 91 (033) 243 4301

Everything is produced by ignorance and dissolves in the wake of knowledge.
Sankaracharya

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।
বৃহদারণ্যক উপনিষদ্

With Best Compliments of :

THE NATIONAL CHEMICAL INDUSTRIES

Surer Pukur
P.O. Chandannagore
Dist. Hooghly (W. Bengal)
Pin. :712136
Phones : 683-1595 (R), 683-6360 (O)

Specialist in ALUM
(FERRIC & NON FERRIC)

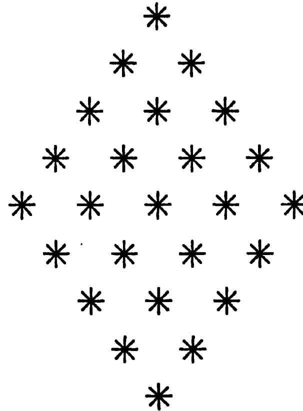
With Best Compliments of :

M/s. Purna Cold Storage (P.) Ltd.

P.O.–Dhaniakhali
Dist.–Hooghly
West Bengal, Pin :712302

I do not believe in a God or religion which cannot wipe the widow's tears or bring a piece of bread to orphan's mouth.

Swami Vivekananda



Space Donated by :

A WELL WISHER

When a man has begun to be ashamed of his ancestors, the end has come.

Swami Vivekananda

With Best Compliments from :

BUIL TECH-INDIA

Architects • Engineers • Planners

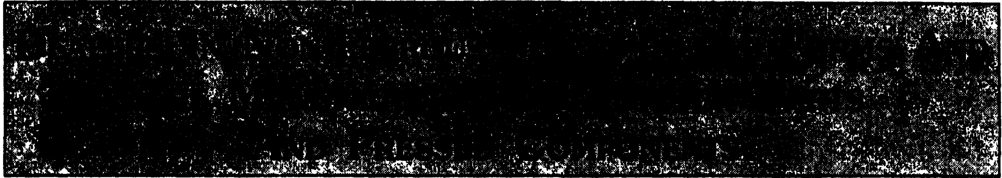
SUDIP KR. UPADHYAY
(ARCHITECT)

27H, Baishnabghata Bye Lane
Kolkata-700 047
Phone : 411-6289

With Best Compliments from :

CMC MANUFACTURING CO. PVT. LTD.

Electrical & Mechanical Engineers



Regd. Office :

85, NETAJI SUBHAS ROAD
1ST FLOOR
KOLKATA-700 001
TEL. : 243-3433, 243-2800
FAX : (033) 337 9333
E-MAIL : cmc@cal2.vsnl.net.in.

Works :

BENARAS ROAD, VILLAGE : EKSARA
P.O. : CHAMRAIL
HOWRAH - 711 323
TEL. : 49398, 49400
FAX : 49208
LOCAL CODE : 9112
STD CODE : 03212

Let's make things better.



PHILIPS

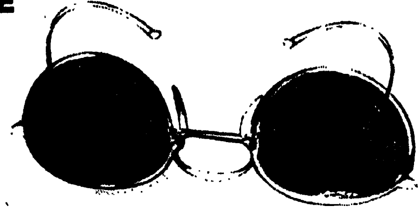
WORLD CLASS

With an Indian Point-of-view

A PREMIER GOLDEN TRADING HOUSE

- **Resourceful**
- **Dynamic**
- **State-of-the-art Technologies**
- **Superb Teamwork**

THE SILK PEOPLE





ESI LIMITED

Wonders of India – In every fold!

Corporate Office :
19, R. N. Mukherjee Road, Kolkata 700 001 (India)
Ph : 243-0817 (5 lines), 248-8820 Fax : (91) (033) 248 2486, 475 8590
Telex : 021-4569 SILK IN E-mail : esilk@vsnl.com
Website : www.esilindia.com

Delhi Office :
A-66. Naraina Industrial Area, Phase-I, New Delhi 110 028 (India)
Phone : 5791541 (4 lines) Fax : (91) (011) 579 0525, 579 6822
E-mail : esidelhi@nda.vsnl.net.in

DISTINCTIVE  **EXQUISITE**  **UNIQUE**

যার আছে সে মাপো—যার নেই সে জপো।

শ্রীমা সারদাদেবী

This world is a prison for the faithful, but a paradise for unbelievers.

Muhammad



With Best Compliments from :

M/s. BAGHBAZAR DRUG HALL

CHEMISTS & DRUGGISTS

44B, Baghbazar Street
Kolkata-700 003
Phone : 555-5256



With Best Compliments of :

ALEYA CINEMA

220A, Rash Behari Avenue
Kolkata-700 019

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বাদশ সঙ্ঘগুরু
পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের
জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

* শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ও ভক্তদের স্মৃতিচারণ (১০৮টি উপদেশ-সহ) — ৩০৲
* স্বামী ভূতেশানন্দ-মহাতীর্থ পরিক্রমা — ৬৫৲
* স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের পত্রাবলী প্রসঙ্গ (১ম ও ২য় খণ্ড) — ৪৫৲ ও ৩০৲
* ভক্তসঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ — (যন্ত্রস্থ)
* ভক্তসঙ্গে সহাস্য স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ — (যন্ত্রস্থ)
* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও আধুনিক বিজ্ঞান — ৩০৲
* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান — ৪০৲
* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও প্রার্থনা — ২০৲
* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সাহিত্যে প্রবাদ, প্রবচন ও দেববাণী প্রসঙ্গ (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) — ৩০৲ (প্রতিটি)
* শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও গীতাতত্ত্ব — ২০৲
* আমাদের নরেন—আমাদের সর্বস্ব — ৩০৲

প্রকাশক : শ্রীমতী পার্বতী চক্রবর্তী
রানীসায়র, উত্তরপাড়, বর্ধমান-৭১৩১০১, ফোন : ৯৫৩৪২-৫৬১৪৪৯

❋ প্রাপ্তিস্থান ❋
ডঃ অরুণকুমার চক্রবর্তী, এম. বি. বি. এস. (ক্যাল), এম. আর. সি. পি. (লণ্ডন)
রানীসায়র, উত্তরপাড়, বর্ধমান-৭১৩১০১, ফোন : ৯৫৩৪২-৫৬১৪৪৯
শ্রীদিলীপ পাল, ফোন : ৫৫৪-৫৯১৮

Blame neither man, nor God, nor anyone in the world. When you find yourselves suffering, blame yourselves, and try to do better.

Swami Vivekananda

With Best Compliments From :

AKSHOY KUMAR GHOSH & SONS

CUSTOM HOUSE
15/1, STRAND ROAD
KOLKATA-700 001
Phone : 220-1237

With Best Compliments Of :

WESTINGHOUSE SAXBY FARMER LIMITED

(A GOVERNMENT COMPANY)

ISO 9002 Company.

INDIA'S PIONEER MANUFACTURERS OF

✦ Quality Brakes & Signalling Equipment for Railways and Defence Vehicles.
✦ ISI Marked 5 HP "WESTINGHOUSE" Brand Disel Engine Pump Set for Agricultural use.
✦ Company undertakes Route Relay Interlocking projects for Rlys. And also all types of Civil Engineering jobs.

Regd. Office :
17 CONVENT ROAD, KOLKATA-700 014
Telephone No. : 244-7161 (7 Lines)
Signalling Unit : 244-3156 (4 Lines)
Fax : 244-7165
e-mail : wsfedp@cal2.vsnl.net.in

কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ এক কামড়েই বাজিমাৎ
ঋষি পাঁপড়



শ্রীযুত শ্রীমধু নির্মাতার তৈরী

দি বেদান্ত কেশরী

(সফল জীবনযাপনের লক্ষ্যে এক বাস্তবমুখী গাইড)

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত একদল নিষ্ঠাবান ও উদ্যমী ভক্ত ১৯১৪ সালে **'দি বেদান্ত কেশরী'** নামে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের যে ইংরেজী মাসিক পত্রিকাটি চালু করেন, সেটি আজ প্রায় নয় দশক ধরে আমাদের মাতৃভূমির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে। এই পত্রিকায় থাকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে **মূল্যবোধভিত্তিক প্রবন্ধ** (যেগুলির বেশির ভাগই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের দ্বারা লিখিত)ঃ সর্বাঙ্গীণ জীবনযাপন ❑ পারিবারিক মূল্যবোধসমূহ ❑ যুবশক্তির বিকাশ ও ব্যবহার ❑ আধ্যাত্মিকতা ❑ সংস্কৃতি ❑ বিজ্ঞান ❑ সাংগঠনিক মূল্যবোধ বিপ্লব ❑ ব্যক্তিত্ব বিকাশ ❑ দর্শন ❑ অন্যান্য।

ঐতিহ্যপূর্ণ বাঙলা মুখপত্র **'উদ্বোধন'**-এর পাঠকবর্গ **'দি বেদান্ত কেশরী'** পাঠ করেও আনন্দলাভ করবেন। অনুগ্রহ করে আপনি নিজে **'দি বেদান্ত কেশরী'**র **গ্রাহক হয়ে** এবং আপনার বন্ধুদের **গ্রাহক করিয়ে** সেবাকার্যে অংশগ্রহণ করুন।

গ্রাহকমূল্যঃ **ভারত—বার্ষিক ৬০ টাকা,** প্রতি সংখ্যা (জানুয়ারি থেকে নভেম্বর) ৬ টাকা, বিশেষ সংখ্যা (ডিসেম্বর) ৫০ টাকা, ৩ বছর ১৭০ টাকা, ৫ বছর ২৭৫ টাকা, আজীবন ৬০০ টাকা। **বিদেশে—** বার্ষিক US$20, আজীবন US$300।

• ONLINE-এ পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়, আপনার Master বা VISA কার্ড ব্যবহার করে। অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন এই ঠিকানায়ঃ www.sriramakrishnamath.org।

ধন্যবাদান্তে,

দয়া করে এই ঠিকানায় লিখুনঃ
Manager, **The Vedanta Kesari**
Sri Ramakrishna Math
Mylapore, Chennai-600 004

আপনাদের সেবায়
স্বামী জ্ঞানদানন্দ
ম্যানেজার

মনের যথার্থ শান্তি ইন্দ্রিয়জয়ের দ্বারাই হয়, ইন্দ্রিয়ের অনুগমন করিলে হয় না।

যীশুখ্রীস্ট



With Best Compliments From:

Mr. Sudhin Mondal

202, Acharya Prafulla Chandra Road
Kolkata-700 004
Phone : 555-4012

সৃষ্টিই সুখ-দুঃখময়। দুঃখ না থাকলে কি সুখ বোঝা যায়? চিরদিন কেউ দুঃখী থাকবে না, সব জন্ম কারও দুঃখে যাবে না।

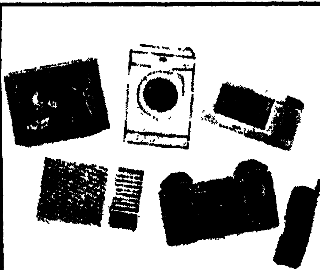
শ্রীমা সারদাদেবী

Space Donated by:

For best Water Services
USE
MANGALAM
Asbestos Cement Pressure Pipe

I am the mother of the wicked, as I am the mother of the virtuous.

Sri Ma Sarada Devi



EXCHANGE

Cell Phone Connection available.



Suravani
(Hatibagan)
80, Bidhan Sarani, Kolkata-700 006
Ph. : 555-3109, 555-3429

উচ্চ প্রশংসিত নতুন দুটি ক্যাসেট
প্রাপ্তিস্থান :
সিম্ফনি, মেলডি ইত্যাদি ক্যাসেটের



ঠাকুর বাড়ির গান
যোগাযোগ :
তপতী
ভৌমিক

দ্বিতীয় ক্যাসেট :



তপতী ভৌমিক SWC

(P) 1999 SOUND WING 48A Motilal Nehru Calcutta 700 029
Unauthorised Copying, public performance and broadcasting of this tape prohibited

Man must love others, because those others are himself.

Swami Vivekananda

With Best Compliments of:

ALBERT DAVID LIMITED

15, CHITTARANJAN AVENUE
KOLKATA-700 072

Decades of Illustrious Presence
In Health Care Industry

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি
গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ।।

শ্রীমদ্ভাগবত

With Best Compliments from:

REJA TARAPADA SOLVENT EXTRACTION CO. (P) LTD.

Vill. & P.O. Naisarai
P. S. Arambagh
Dist. Hooghly
West Bengal
Phone:
953211 55190
953211 52242
953211 52243



নবগ্রাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির

৭ নবীন সেন রোড, পোঃ নবগ্রাম, জেলা—হুগলী, পিন ঃ ৭১২২৪৬

দূরভাষ ঃ ৬৭৩-৯২০৮

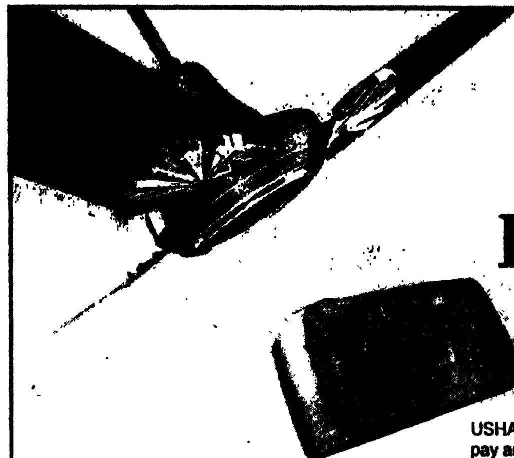
একটি বিনম্র আবেদন

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একাধিকবার শুভপদার্পণে হুগলী জেলার কোন্নগর এবং তৎসন্নিহিত সমগ্র অঞ্চল ধর্মীয় বাতাবরণে শুচিস্নিগ্ধ এক তীর্থভূমি। কোন্নগর এবং নবগ্রামের কতিপয় শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুরাগীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনের পূজ্যপাদ সন্ন্যাসিবৃন্দের আশীর্বাদপুষ্ট "নবগ্রাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির" ১৯৮৪ সাল থেকে দীর্ঘ আঠার বছর নিরলস এবং নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতি রবিবাসরীয় সান্ধ্য ধর্ম অধিবেশনের মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ-অনুধ্যান এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবপ্রচারে ব্রতী। পরিতাপের বিষয়, এই অঞ্চলে অদ্যাবধি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি প্রশস্ত মন্দির নির্মিত হয়ে ওঠেনি। বহুদিনের অনুভূত এই অভাব পূরণে আমরা সচেষ্ট হয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থ সংস্থানে পাঁচ লক্ষ টাকায় শান্ত মনোরম পরিবেশে আটকাঠা জমি ক্রয় করে মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু করেছি। মন্দির-সংলগ্ন নাটমণ্ডপ, অনুধ্যান কেন্দ্র, দাতব্য চিকিৎসালয়, ছোট একটি অতিথিশালা, গ্রন্থাগার এবং সর্বোপরি স্বামীজীর মানুষ-গড়া ধর্মবিকাশ কেন্দ্র ইত্যাদি প্রকল্প রূপায়ণে আরো অন্যূন কুড়ি লক্ষ টাকার প্রয়োজন। প্রত্যেক হৃদয়বান ব্যক্তির কাছে আমাদের সনির্বন্ধ আবেদন—এই মহান কর্মযজ্ঞে আপনার আর্থিক সাহায্য 'নবগ্রাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠমন্দির'-এর আনুকূল্যে চেক বা ব্যাঙ্ক ড্রাফট পাঠিয়ে বাধিত করবেন।

বিনীত

কানাইলাল ব্যানার্জী
সভাপতি

অজিত ঘোষাল
সম্পাদক



USHA

The undisputed leader in fans.

Imported, focus free camera

With every fan *

USHA brings you a really sensational offer. Just by an USHA fan. pay an additional Rs.40/* and you'll find yourself the owner of a fabulous camera! Hurry! Offer available for a limited period only

*Conditions apply. Offer not valid on Racer series and Excella ceiling fan Fans also available without this offer.

USHA INTERNATIONAL LTD. It's a better life.

ganguly™

7 Rabindra Sarani, Kolkata 700 001. Phone 225 4192, 225 4490

কুসংস্কার মানুষের শত্রু বটে, কিন্তু ধর্মান্ধতা আরো খারাপ।—স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments from :

POLYMER CHEMICAL INDUSTRIES

Manufacturers of :

BROWN FACTICE, WHITE FACTICE, PLASTOZINC, SODIUM SULPHATE, SULPHUR POWDER

Office :

75/B, Mahatma Gandhi Road, Kolkata-700 009

Phone : 241-0174, 241-1128, 241-0081

Factory :

Prasasma, Andul-Mouri, Howrah

Phone : 669-0404



শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম

চক্ কাশীপুর (বিড়লাপুর), বজবজ

দক্ষিণ ২৪ পরগনা-৭৪৩৩১৮

রেজি. নম্বর : এস/৯১২০৬, ফোন : ৪২০-৮০৩৭

সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও ভাবধারা 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্তর্গত বজবজে গঙ্গার নিকটস্থ বিড়লাপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, দাতব্য চিকিৎসালয়, দুঃস্থ ছাত্রাবাস ইত্যাদি পরিচালনা ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা, নিত্যপূজা, সন্ধ্যারতি প্রভৃতি ছাড়াও বাৎসরিক দুর্গাপূজা, কালীপূজা, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি প্রভৃতি অতিকষ্টে সযত্নে পালন করা হয়।

বর্তমানে আশ্রমটির সংস্কারকল্পে, যথা—মন্দির-সংস্কার, প্রাচীর নির্মাণ, বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, চিকিৎসালয় প্রভৃতি পাকা করিবার জন্য প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। উদারহৃদয় সর্বস্তরের মানুষ ও প্রতিষ্ঠানমাত্রের কাছে আমার একান্ত আবেদন মুক্তহস্তে অর্থ দান করে উপরি উক্ত কার্য সম্পন্ন করতে সহায়তা ও সহযোগিতা করুন।

মন্দির-সংস্কার ও প্রাচীর নির্মাণ কার্যে	৫ লক্ষ টাকা
স্কুলবাড়ি, চিকিৎসালয়, গ্রন্থাগার স্থাপন কার্যে	১০ লক্ষ টাকা
দুঃস্থ ছাত্রাবাস, সাধুনিবাস ও অতিথিভবন নির্মাণকার্যে	১০ লক্ষ টাকা
	মোট ২৫ লক্ষ টাকা

সেবাশ্রমে প্রদত্ত এই দান ভারতীয় আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী আয়করমুক্ত। দানের অর্থ চেক বা ড্রাফট্-এ পাঠালে "Sri Ramakrishna Ashram, Chak-Kashipur"—এই নামে পাঠাবেন।

১০ হাজার বা ততোধিক টাকা অনুদানকারীর নাম শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা থাকবে।

বিনীত
স্বামী কাশীকানন্দ
সম্পাদক

সৌজন্যে :

কে. সি. পাল অ্যান্ড সন্স

প্রসিদ্ধ ছাতা প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা

৮২, পণ্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৭

ওরিয়েন্টের পুনঃপ্রকাশিত বই

- ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
  বাংলার বাউল ও বাউল গান ৮০০
- প্রমদারঞ্জন ঘোষ
  শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা ও জীবন-দর্শন ৮০
- রতনমণি চট্টোপাধ্যায়
  আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা ৮০

ওরিয়েন্টের প্রকাশিত বই

- ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
  রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ২৭৫
  রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা ১৬০
- ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
  ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস ৮০
  বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা ১০০
  (আদি ও মধ্যযুগ)
  বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা ৯০
  (আধুনিক যুগ)
  রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা, ১ম খণ্ড ১০০
  রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা, ২য় খণ্ড ২০০
- ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত
  সাহিত্যের স্বরূপ ১৫
  বাংলা সাহিত্যের একদিক ৬০
  বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি ৪০
- প্রমথনাথ বিশী
  রবীন্দ্র-নাট্য-প্রবাহ ১২৫
- ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল
  রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা ২০
- ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
  নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ২০
- অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী
  ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ৭৫
- সম্পাদনা : ডঃ অরুণকুমার বসু
  মেঘনাদবধ কাব্য—
  মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১ম-৪র্থ সর্গ)
  একেই কি বলে সভ্যতা—
  মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৩০
- সম্পাদনা : পবিত্র সরকার
  জনা ৪০
- সম্পাদনা : প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
  পালামৌ—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৩০
  চরিতকথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৩৫
- ডঃ অমিয়কুমার সামন্ত
  প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর ১০০
- রোমাঁ রোলাঁ
  রামকৃষ্ণের জীবন ৫০
  বিবেকানন্দের জীবন ৫০
  রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ ২৫

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি

৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

শ্রীম-কথিত

পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত : প্রতি সেট : ২২৪ টাকা

[কেবল রেক্সিন বাঁধাই পাওয়া যায়]

শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যরা এবং কথামৃতকার শ্রীম নিজেও এই মহাগ্রন্থটি যেমনটি দেখিয়া গিয়াছেন এবং রাখিয়া গিয়াছেন (খণ্ড খণ্ড হিসাবে পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এবং দিনলিপি অনুসারে না সাজাইয়া) ঠিক তেমনটিই সংরক্ষণ করার পুণ্য দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর হইয়া আছেন 'কথামৃতের' আশি বছরেরও অধিক প্রাচীন প্রকাশক শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী (কথামৃত ভবন)। ফলে এই মহাগ্রন্থের Originality এবং সুমহান ঐতিহাসিক পবিত্র ঐতিহ্য সম্পূর্ণ-ভাবে বহাল রহিয়াছে এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত 'কথামৃতে'।

প্রকাশক : শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী

(কথামৃত ভবন)

১৩।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬

ফোন : ৩৫০-১৭৫১

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির

ফোন : ৪৭৪-২৩৩৫

৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো

কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত

শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহের বহু প্রশংসিত পুস্তকাবলী

গীতাতত্ত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ ৮০

পূর্ণতার সাধন ১৬
ভগবৎ প্রসঙ্গ ২৪
গল্পে ভগবৎ প্রসঙ্গ ২৪
শরণাগতের আদর্শ ও সাধনা ৩০
ঈশ্বর-সান্নিধ্য বোধের সাধনা ৮

শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহের জন্মশতবার্ষিকী গ্রন্থ :

প্রেমিক পুরুষ ১৫

অন্যান্য বই : স্তোত্রমালিকা ৪

✤ প্রাপ্তিস্থান ✤

সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ), উদ্বোধন,
রত্না বুক হাউস, মহেশ লাইব্রেরী,
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোলপার্ক)



"SERVICE TO MAN IS SERVICE TO GOD"

SRI RAMAKRISHNA SEVASHRAM

Regd. No. S/15226 Dated 21.10.74

P.O. Ramakrishnapur ❑ Dist. South 24 Parganas ❑ Pin : 743610. W.B.

A member-ashrama of South 24 Parganas District Ramakrishna-Vivekananda Bhava Prachar Parishad (advised by Ramakrishna Math, Belur Math, W. B.)

Kolkata Office :

6 Baroda Thakur Lane, Kolkata-700 007 ☎ : 218-1285

কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন ও একটি আবেদন

প্রিয় ভগিনী ও ভ্রাতৃবৃন্দ,

আপনাদের অকুণ্ঠ সাহায্যে ইতিমধ্যেই পূর্বপরিকল্পিত অতিথিভবন, বৃদ্ধ সাধুভবন ও চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত বালকদের প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বৃদ্ধাশ্রম গড়ে উঠেছে। ৪০ বিঘা জমির ওপর ডায়মন্ডহারবার রেললাইনের ধারে দক্ষিণ দুর্গাপুরে ৫০ জন অনাথ বালকের (অনূর্ধ্ব ১৮ বছর) ভরণপোষণ ও শিক্ষার দায়িত্ব নিয়ে একটি বালকাশ্রমকে ঘিরে আমাদের এই সেবাপ্রচেষ্টা। ১৯৭৩ সালে স্বামী রমানন্দজী মহারাজ কর্তৃক (বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ-এর সম্পাদক) ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়। আমাদের প্রেরণা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ ও ধর্ম—ত্যাগ ও সেবা। লক্ষ্য—ব্যাপক শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ তৈরি। মানুষই আমাদের ভগবান।

এই উদ্দেশ্যে সুন্দরবনের অনগ্রসর দরিদ্র গ্রামে ও তপশিলী অঞ্চলে ১৮টি 'বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশু-বিদ্যালয়' খোলা হয়েছে। আপনাদের সহৃদয়তায় আশা করি ১০০টি বিদ্যালয় স্থাপন সম্ভব হবে।

আমাদের আগামী পরিকল্পনা ঃ—	প্রয়োজনীয় দান
১) বালকাশ্রমের অসম্পূর্ণ আবাসন ও দাতব্য চিকিৎসালয় সম্পূর্ণ করা	৭ লক্ষ টাকা
২) মোট ১০০টি বিবেকানন্দ অবৈতনিক শিশুবিদ্যালয় স্থাপন ও স্থায়ী পরিচালনার লক্ষ্যে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করে মাসিক সুদের মাধ্যমে ব্যয়নির্বাহ করা	৪০ লক্ষ টাকা
৩) রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের স্পর্শপূত ভিত্তিপ্রস্তরের ওপর জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ৫০০ ভক্তের একসঙ্গে বসার উপযোগী প্রার্থনাগৃহ-সহ সর্বজনীন উপাসনালয় শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দির নির্মাণ	২০ লক্ষ টাকা

আশ্রমে দেওয়া অর্থ **M.O.** অথবা **A/c. Payee Cheque/Draft**-এর মাধ্যমে পাঠানোর ঠিকানা— **Sri Ramakrishna Sevashram, 6 Baroda Thakur Lane, Kolkata-700 007**। **A/c. Payee** চেক/ড্রাফট পাঠালে **'Sri Ramakrishna Sevashram'**-এর অনুকূলে পাঠাতে হবে। সেবাশ্রমে যেকোন আর্থিক দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সকল দানের প্রাপ্তিস্বীকার করা হবে।

নমস্কারান্তে

স্বামী শুদ্ধানন্দ
অধ্যক্ষ

সুধাংশু বিশ্বাস
সম্পাদক



জেলাভিত্তিক 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

কলকাতা

- **রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যান)**, কাঁকুড়গাছি, কলকাতা-৫৪
  ফোন : ৩৩৪-৬০০০
- **রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম)**, হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-২৫
  ফোন : ৪৫৫-৪৬৬০
- **সেঞ্চুরি বোর্ডস**, ২৮বি গড়িয়াহাট রোড
  কলকাতা-২৯, ফোন : ৪৪০-৬২৮৭/৭৬৭৯
- **কথামৃত সঙ্ঘ**, ৩৬ রসা রোড সাউথ থার্ড লেন, ফোন : ৪২২-০৩৩২
- **সলিলা সরকার**, এ-ই ৬৫৫, সল্ট লেক
- **বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র**
  ডি ডি ৪৪, সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪
- **রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম**, ৫/৩৬ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ ও প্রার্থনা-মন্দির**, ৭৩ ডায়মণ্ডহারবার রোড
  বড়িশা (সখের বাজার), ফোন : ৪৪৬-০৬৮৮/৪৪৭-১৩৭১
- **দেবাশিস পেপার সাপ্লায়ার্স**, ১৩/৫/৩ রামকান্ত বোস স্ট্রীট, বাগবাজার
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনালোক**, সেলিমপুর
- **বিবেকানন্দ যুবকল্যাণ কেন্দ্র**, চেতলা
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, টেম্পল লেন, ঢাকুরিয়া
- **শোভনা ভৌমিক**, ৯ আর. এন. টেগোর রোড
  নবপল্লী, কলকাতা-৬৩, ফোন : ৪৬৭-১১২২
- **রামকৃষ্ণ কুটীর**, এইচ-২৯এ নবাদর্শ, বিরাটী
- **ত্রিপর্ণ রামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র**
  বি/৬/৪, ৩৯এ গোবিন্দ আড্ডি রোড, কলকাতা-২৭
- **আদ্য ব্রাদার্স**, ১২/১বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দ পাঠচক্র**, শরৎ কলোনী, কলকাতা-৮১
- **বিবেক-বাণী স্টাডি সার্কেল**, ১৩১ মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউসিং
  সেক্টর-এ, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা ৩৯
- **মলয় ভৌমিক**, ৪/১ বেনেপাড়া লেন, কলকাতা-১৪
- **আর. ডি. ব্রিগস অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ**, ৯ বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলকাতা-১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনসঙ্ঘ, সঙ্ঘমন্দির**
  ১১ তারামণি ঘাট রোড, পশ্চিম পুটিয়ারি, কলকাতা-৪১
- **'সারদা ভবন', জীবনকুমার ভট্টাচার্য**
  ৩৪ প্রিয়নাথ ঘোষ স্ট্রীট, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬
- **পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**
  ৪/১৮-বি বিদ্যাসাগর উপনিবেশ, কলকাতা-৪৭
- **হ্লাদিনী, স্বত্বাধিকারিণী : সুচিত্রা চ্যাটার্জী**
  ৮০এ যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেনিউ, কলকাতা-৫
  ফোন : ৫৩০-২৫৮০ (দুপুর ১২টা—সন্ধ্যা ৭টা)
- **স্বপন দাস**, ৯ সাউথ কুলিয়া রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা-১০
- **দাসানুদাস সাহা**, ১এ কুমারটুলী স্ট্রীট, কলকাতা-৫, ফোন : ৫৫৪-৬২৯৯
- **ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়**, ১/২ডি সেণ্টার সিঁথি রোড
  কলকাতা-৫০, ফোন : ৫৫৬-৯৫৭২
- **রবি হাজরা**, ১৩/৬/৩ রামকান্ত বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৩
- **সুধাংশু বিশ্বাস**, শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ৬ বরদা ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭
- **বিজনকৃষ্ণ অধিকারী**, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবা কেন্দ্র
  ১৫৩ বিবেকানন্দ সরণি, গরফা, কলকাতা-৭৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ**, বিরাটি, কলকাতা-৫১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবায়তন**, ২৪/৬১ যশোর রোড
  এয়ারপোর্ট, গেট নং-১, কলকাতা-২৮, ফোন : ৫১১-৭০৬৪
- **দক্ষিণ দুর্গানগর বিবেকানন্দ মন্দির**, ৪৮ বিবেকানন্দ সরণি, কলকাতা-৬৫
- **দমদম শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা পরিষদ**
  ২নং এয়ার পোর্ট গেট, পোঃ রাজবাটী, কলকাতা-৮১, ফোন : ৫১১-৮২৪১
- **পার্থ ভট্টাচার্য, সম্পাদক, শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ সেবাসংসদ**
  ২ মতিলাল কলোনী, কলকাতা-৮১, ফোন : ৫১২-৬৮৮৫/৬৬১৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ**, ২৪৯ শকুন্তলা পার্ক, কলকাতা-৬১
- **অময়ানন্দ ভট্টাচার্য**, ডলফিন স্টুডিও, ৩/১ ভূপেন রায় রোড
  বেহালা, কলকাতা-৩৪, ফোন : ৪৫৮-৯৪২৭, ৪৪৬-০৩৮১
- **কালীমোহন সাহা**, ৭/২ ব্রজমোহন মণ্ডল রোড
  সন্তোষপুর, যাদবপুর, কলকাতা-৭৫, ফোন : ৪১৬-৬২১৩
- **তিলজলা বিবেকানন্দ সেবাসংসদ**
  ১৪৩/২০, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৩৯

হাওড়া

- **রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম**, বেলুড় মঠ, পিন : ৭১১ ২০২
- **রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম**, ৪ নস্কর পাড়া লেন, পিন : ৭১১ ১০১
- **সাঁত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**, নর্থ বাকসাড়া, পোঃ জগাছা, পিন : ৭১১ ৩১১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**
  গ্রাম+পোঃ মোল্লাহাট, থানা : শ্যামপুর, পিন : ৭১১ ৩১৪
- **মাকড়দহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সাধনালয়**, গ্রাম+পোঃ মাকড়দহ, পিন : ৭১১ ৪০৯
- **বালী গ্রামাঞ্চল শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**, রবীন্দ্র পল্লী (সাঁপুইপাড়া)
  পোঃ সাঁপুইপাড়া (বালী), পিন : ৭১১ ২২৭
- **সারদা বুক এজেন্সি**, ১৫/৬ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী লেন
  কদমতলা, পিন : ৭১১ ১০১
- **শুকদেব সাঁতরা**, গ্রাম : উত্তর পীরপুর
  পোঃ বাণীবন, ভায়া : উলুবেড়িয়া, পিন : ৭১১ ৩১৬
- **নির্মল ঘোষ**, ৬ রায় জে. এন. রায়বাহাদুর রোড
  বাদামতলা, বালী, পিন : ৭১১ ২০১, ফোন : ৬৫৪-৪০৪৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্ সঙ্ঘ**, ঘোষপাড়া বাজার, বালী, ফোন : ৬৭১-০৫৭৯
- **পানিত্রাস বিবেকানন্দ সেবা সমিতি**, গ্রাম+পোঃ পানিত্রাস, পিন : ৭১১ ৩২৫
- **হাঁটাল আঞ্চলিক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র**, পিন : ৭১১ ৪০৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**
  সাঁকরাইল ভারত কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি
- **ডোমজুড় শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**
  পিন : ৭১১৪০৫, ফোন : ৬৬৯-০৮০৬
- **শ্রীরামকৃষ্ণ প্রার্থনা মন্দির**
  জয়চণ্ডীতলা, প্রামাণিক পাড়া, ডোমজুড়, পিন : ৭১১ ৪০৫
- **শ্রীমা সারদা ও শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, গুঁড়িখালি, খলিসানি, কালীতলা
- **মাকড়দহ (২) অঞ্চল বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সমিতি**
  জোতগিরি, পোঃ লক্ষ্মণপুর, পিন : ৭১১ ৩২৩
- **শ্রীশ্রীসারদা আশ্রম**, জঙ্গলপুর, পোঃ আগোরি, পিন : ৭১১ ৩০২
- **শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**, বি. গার্ডেন, ৮/৩ বি. জি. লেন, পিন : ৭১১ ১০৩
- **জোঁকা রামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম**, গ্রাম+পোঃ জোঁকা
  থানা—উদয়নারায়ণপুর, পিন : ৭১১ ২২৬
- **বেলপুকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  গ্রাম : বেলপুকুর, পোঃ অযোধ্যা, পিন : ৭১১ ৩১২
- **শ্যামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সঙ্ঘ**
  গ্রাম ও পোঃ অযোধ্যা (বেলপুকুর), পিন : ৭১১ ৩১২
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, পোঃ অভয়নগর
  বেলানগর, পিন : ৭১১ ২০৫, ফোন : ৬৫৯-১১৪৪
- **দীনবন্ধু পণ্ডিত**, প্রযত্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ হোমিও হল, পোঃ চককাশী
  থানা : বাউড়িয়া, পিন : ৭১১৩০৭, ফোন : ৬৬১-৮১১২

With Best Compliments From : **B. S. SUNDARIYA & SONS**
146/2, OLD CHINA BAZAR STREET KOLKATA-700 001, PHONE : 242-4867

বিপণন কেন্দ্র : কলকাতা হাওড়া

- **অদ্বৈত আশ্রম স্টল**, শিয়ালদহ স্টেশন, ৩নং প্ল্যাটফর্ম
- **অদ্বৈত আশ্রম স্টল**, হাওড়া স্টেশন (মেন এবং নিউ কমপ্লেক্স)
- **রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম**, বেলুড় মঠ
- **সর্বোদয় বুক স্টল**, হাওড়া রেলস্টেশন
- **মিডিয়া সেন্টার**, ১/১০ বেহালা কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স (দ্বিতীয় তল) ৬২০ ডায়মণ্ডহারবার রোড, কলকাতা-৩৪
- **উজ্জ্বল বুক স্টোর্স**, ৬এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট (দোতলায়), কলকাতা-৭৩
- **রূপসী বাংলা**, ২৬১ এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৬
- **উজ্জ্বল বুকস**, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
- **শ্যামবাজার বুক স্টল**, ২২০, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৪
- **পাতিরাম বুক স্টল**, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

মেদিনীপুর

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, তমলুক-৭২১ ৬৩৬, ফোন : ৬৬০০৫/৬৬৭৬২
- **রামকৃষ্ণ মঠ**, পোঃ মঠ চণ্ডীপুর-৭২১ ৬৫৯, ফোন : ৭২২১৮
- **রামকৃষ্ণ মঠ**, গড়বেতা, পোঃ আমলাগোড়া-৭২১ ১২১, ফোন : ৬৫২০০
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**, পাঁশকুড়া-৭২১ ১৫২
- **খড়গপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**, খড়গপুর-৭২১ ৩০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, ঘাটাল-৭২১ ২১২
- **কাঁথি নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ**, আঠিলাগরি, কাঁথি-৭২১ ৪০১
- **কৃষ্ণপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, খড়ার-৭২১ ২২২
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**, খড়ার-৭২১ ২২২
- **দাসপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, দাসপুর-৭২১ ২১১
- **ক্ষীরপাই রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম**, ক্ষীরপাই-৭২১ ২৩২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র**, জাড়া-৭২১ ২৩২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ**, চন্দ্রকোণা টাউন-৭২১ ২০১
- **জ্ঞানরঞ্জন হোতা**, প্রযত্নে কুঠিঘাট রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ গোপীবল্লভপুর, পিন : ৭২১ ৫০৬
- **খাসবাজার বিবেকানন্দ যুবপাঠচক্র**, রাধাচন্দনপুর-৭২১ ১৬০
- **হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন** হলদিয়া অ্যাঙ্কারেজ ক্যাম্প, হলদিয়া পোর্ট-৭২১ ৬০৫
- **মোহনপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**, গ্রাম+পোঃ মোহনপুর, পিন : ৭২১ ৪৩৬
- **রাধামোহনপুর রামকৃষ্ণ মিলন মন্দির** গ্রাম+পোঃ রাধামোহনপুর, পিন : ৭২১ ১৬০
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা ও বিবেকানন্দ স্মরণতীর্থ** গ্রাম+পোঃ তাজপুর, পিন : ৭২১ ৬৫৬
- **শ্রীরামকৃষ্ণ অর্চনালয়**, গ্রাম+পোঃ ধনেশ্বরপুর, পিন : ৭২১ ১৬৬

হুগলী

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, আঁটপুর, পিন : ৭১২ ৪২৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম**, ৭০ প্রফুল্ল চাকী রোড, কোতরং
- **শ্রীরামকৃষ্ণ মনন সভা** ১৫৬ এস. সি. চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কোন্নগর, পিন : ৭১২২৩৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাপ্রার্থী সঙ্ঘ**, গ্রাম+পোঃ পুইনান, পিন : ৭১২৩০৫
- **স্বামী উমেশানন্দ**, অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম কুণ্ডুঘাট, বাঁশবেড়িয়া-৭১২৫০২
- **মোহিতকুমার বর্মণ, সম্পাদক, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র** বিদ্যুৎপল্লী, সিঙ্গুর, পিন : ৭১২৪০৯, ফোন : ৬৩০-০৪৩৯
- **ডঃ চিন্ময়ী নন্দী**, (স্টেট ব্যাঙ্কের পিছনে), পোঃ ডানকুনি, পিন : ৭১১২২৪
- **মনীষা নন্দী**, প্রযত্নে দেবজিৎ নন্দী স্টেশন রোড, পোঃ ডানকুনি, পিন : ৭১১২২৪
- **সুশান্ত মাইতি**, প্রযত্নে শ্রীশ্রীআনন্দময়ী কালিকা আশ্রম (কামাক্ষাতলা) মির্জাপুর পশ্চিমপাড়া, সিঙ্গুর, পিন : ৭১২৪০৯, ফোন : ৬৩০-০৭০৯
- **হরনারায়ণ বিশ্বাস** ৫ রাজেন্দ্র অ্যাভেনিউ প্রথম লেন, উত্তরপাড়া, পিন : ৭১২২৫৮
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, খড়ার** প্রযত্নে অজিতকুমার মুখার্জী, ৬৪/জি ডঃ সরোজ মুখার্জী স্ট্রীট উত্তরপাড়া, পিন : ৭১২২৫৮, ফোন : ৬৬৩-৮৫২৬
- **গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়** রামকৃষ্ণ কুটীর, ১০৩/২, বি. কে. স্ট্রীট, উত্তরপাড়া পিন : ৭১২২৫৮ ফোন : ৬৬৩-৭০৪৬
- **বরুণকুমার চক্রবর্তী**, সম্পাদক, শ্রীবিবেকানন্দ সঙ্ঘ, ত্রিবেণী কেন্দ্র গ্রাঃ বৈকুণ্ঠপুর, পোঃ ত্রিবেণী, পিন : ৭১২৫০৩, ফোন : ৮৪৬২৮৪
- **অশোক ব্যানার্জী (দেবু)** শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠচক্র, পীরতলা, শিয়াখালা।
- **দীপশিখা ঘোষ, সম্পাদিকা, মাঙ্গলিক মহিলা মহল** জনাই, পিন : ৭১২৩০৪, ফোন : ৯১১২-৪৪১১৪
- **গরলগাছা বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**, গ্রাম+পোঃ গরলগাছা, মান্নাপাড়া
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, গ্রাম+পোঃ ভাঙ্গামোড়া, পিন : ৭১২৪১০
- **স্বপন মুখোপাধ্যায়** সম্পাদক, **শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ** ১৩বি, সান্যাল লেন, শ্রীরামপুর-৭১২২০১, ফোন : ৬৬২-৬৬৭৮
- **কল্পতরু বিবেকানন্দ যুব উন্নয়ন কেন্দ্র**, তারকেশ্বর, পিন : ৭১২৪১০
- **নিকুঞ্জবিহারী দাস**, কোঁচাটি, পোঃ ত্রিবেণী, পিন : ৭১২৫০৩
- **শ্রীশ্রীসারদা রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ** ৩০৫, নারায়ণ রায়ের বেড়, ঝিঙ্গেপাড়া, পিন : ৭১২১০৩

নদীয়া

- **রামকৃষ্ণ আশ্রম**, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, বঙ্কিমনগর, হালালপুর-৭৪১২০১
- **রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ**, চাকদহ-৭৪১২২২
- **বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন**, চাকদহ-৭৪১২২২
- **রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ**, ব্লক-বি, সিভিক সেন্টার, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- **কল্যাণী শ্রীরামকৃষ্ণ সোসাইটি**, এ-৮/৪৫৬, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- **ছায়া ভট্টাচার্য**, রামকৃষ্ণ নিকেতন, বি-৪/৪৬৬, কল্যাণী-৭৪১২৩৫
- **রামকৃষ্ণ সারদা কুটীর**, প্রযত্নে অসীমকুমার দে নলুয়া পাড়া, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র**, প্রযত্নে স্বপনকুমার ভৌমিক ৩৫ বেঁজেখালি লেন, নূতন পল্লী, কৃষ্ণনগর-৭৪১১০৯
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাসঙ্ঘ**, রানাঘাট-৭৪১২০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ**, পোঃ বগুলা, পিন : ৭৪১৫০২

বীরভূম

- **বোলপুর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যকেন্দ্র** পৌর বাণিজ্যিক সদন (বাস স্ট্যাণ্ড), স্টল নং ৫, পিন : ৭৩১২০৪
- **আকালীপুর রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রম**, ভদ্রপুর-৭৩১২০৩
- **মিলন দাস**, শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ, চৈতালি মার্কেট, সিউড়ি-৭৩১১০১
- **ডঃ ভাস্কর কয়ড়ী**, প্রযত্নে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র সাঁইথিয়া (কলেজ রোড), সাঁইথিয়া-৭৩১২৩৪

মুর্শিদাবাদ

- **শান্তশ্রী**, বেলডাঙ্গা সারদা রামকৃষ্ণ পাঠচক্র আশ্রমপাড়া, বেলডাঙ্গা, পিন : ৭৪২১৩৩

বাঁকুড়া

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, পোঃ রামহরিপুর, পিন : ৭২২২০৩
- **শ্রীমা সারদা পাঠচক্র**, কোতুলপুর-৭২২১৪১
- **উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/দীপক বন্দ্যোপাধ্যায়** 'অঙ্কন', স্টল নং ২, মোহনবাগান মার্কেট, পিন : ৭২২১০১
- **বিষ্ণুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম** প্রযত্নে নিমাই মুখোপাধ্যায়, বৈলাপাড়া, কলেজ রোড
- **ডঃ সুনির্মল বেরা**, প্রযত্নে সারেঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটি সারেঙ্গা, পিন : ৭২২১৫০

With Best Compliments From :
WARDLEY HOUSE
25A, SWALLOW LANE, KOLKATA-700 001
PHONE : 220-5209
H. K. GHOSE & CO.
PAPER MERCHANTS & EXERCISE BOOK MAKERS

উত্তর চব্বিশ পরগনা

- **রামকৃষ্ণ মঠ**, বারাসত, পিন : ৭৪৩২০১
- **রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম**, রহড়া, পিন : ৭৪৩১৮৬
- **শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম**
  পোঃ রাজারহাট-বিষ্ণুপুর, পিন : ৭৪৩ ৫১০
- **বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
- গোবরডাঙা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘ, খাঁটুরা
- বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ, নববারাকপুর
- **অলক পাল চৌধুরী**, প্রসন্ন চ্যাটার্জী রোড, সঙ্কটাপল্লী
  পোঃ ঘোলা বাজার, পিন : ৭৪৩১৭০
- ঘোলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বি-৭, বি পার্ক, সোদপুর
- বিবেকানন্দ আলোচনা-চক্র, নিমতলা
- **ইছাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
- মানিক ঘোষ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র
  শ্রীমা সারদা সরণি, গঙ্গাপুর, দত্তপুকুর, পিন : ৭৪৩ ২৪৮
- **বীজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ**, শহীদনগর, কাঁচড়াপাড়া
- **হালিশহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ, প্রযত্নে রামকৃষ্ণ চিলড্রেন্স হোম**
  গ্রাম+পোঃ মালঞ্চ, ভায়া : হাজিনগর, থানা : বীজপুর
- **স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**
  পোঃ স্যাণ্ডেলেরবিল, হিঙ্গলগঞ্জ, পিন : ৭৪৩ ৪৩৫
- **পান্নালাল ব্যানার্জী**, প্রযত্নে তারা আলয়, ২৯ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড
  (স্টেশনের সম্মুখে), পোঃ নৈহাটী, পিন : ৭৪৩ ১৬৫
- **কথাশিল্প**, প্রযত্নে গোপালচন্দ্র ঘোষ
  শক্তিগড়, চাকদা রোড, বনগ্রাম, ফোন : ৫৫-৬৯৪/৭২৫
- **বিবেকানন্দ বুক সেন্টার**, প্রযত্নে বাসুদেব সাধুখাঁ
  'ট' বাজার, বনগ্রাম, ফোন : (৯৫৩২১৫) ৫৯৩৯৭
- **সুজিত ঘোষ**, ৩ এফ. রোড, আনন্দপুরী
  পোঃ নোনা চন্দনপুকুর, ব্যারাকপুর, ফোন : ৫৬০-১২৩০
- রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (পাঠচক্র), ৪৭/৭ টেগোর টেম্পল রোড
  পোঃ শ্যামনগর, পিন : ৭৪৩ ১২৭
- শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, বনগ্রাম, পিন : ৭৪৩ ২৩৫
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রামকৃষ্ণপল্লী, বনগ্রাম, পিন : ৭৪৩ ২৩৫
- নিমতলা বিবেকানন্দ আলোচনাচক্র
  শরৎ পাঠাগার, নিমতলা, পোঃ পূর্ব বিষ্ণুপুর
- শ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ, ৪৭ কে. এন. মুখার্জী রোড
  তালপুকুর, বারাকপুর, পিন : ৭৪৩ ১৮৭
- **স্বপন চক্রবর্তী**, সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র
  গ্রাম+পোঃ দেবালয় (বেড়াচাঁপা অঞ্চল), পিন : ৭৪৩ ৪২৪
- **ভাটপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**, প্রযত্নে শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
  ১৮/২ বিন্দুবাসিনী রোড, পোঃ ভাটপাড়া, পিন : ৭৪৩১২৩
- **ন'পাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**
  কৃষ্ণনগর রোড, পোঃ ন'পাড়া, বারাসত
  পিন : ৭৪৩ ৭০৭, ফোন : ৫৪২-৩৭৩৯/৬৭০২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত চলমান পাঠচক্র**, প্রযত্নে কালীপ্রসাদ সরকার
  টাকী রোড, পোঃ বসিরহাট, ফোন : ৫৫০১৮
- **রামকৃষ্ণ স্মরণ তীর্থ**, সোদপুর রোড, মধ্যমগ্রাম, পিন : ৭৪৩২৭৫
- **হাবড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম**
  স্বামীজী সরণি, হাবড়া, ফোন : ৫৫৩৯২

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, সরিষা, পিন : ৭৪৩৩৬৮
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ**, ভাঙ্গড়
- **হৃদয়ভূষণ নস্কর, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ কন্যানগর, আমতলা, পিন : ৭৪৩ ৩৯৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, পোঃ বি-রামকৃষ্ণপুর, পিন : ৭৪৩ ৬১০
- **রামকৃষ্ণ পাঠমন্দির**, গ্রাম : চকমানিক, পোঃ বাওয়ালি
  পিন : ৭৪৩ ৩৮৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বাটানগর)**, পোঃ মহেশতলা, পিন : ৭৪৩ ৩৫২
- **বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য, সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  উকিলপাড়া, বারুইপুর, পিন : ৭৪৩ ৩০২
- **জীবনকৃষ্ণ দাস**, প্রযত্নে মহেশ্বর স্টোর্স
  কাছারী বাজার, বারুইপুর, পিন : ৭৪৩ ৩০২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ স্টোর্স**, প্রযত্নে অনন্তকুমার দাস, পোঃ চাম্পাহাটী
  চাম্পাহাটী বাজার, পিন : ৭৪৩ ৩৩০, ফোন : ৯১১৮-৬০৪৫০
- **শঙ্করচন্দ্র মণ্ডল**, প্রযত্নে কৃষ্ণগোপাল নস্কর
  গ্রাম : বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ দক্ষিণ বারাসত, পিন : ৭৪৩ ৩৭২
- **শতদল সাধুখাঁ**, প্রযত্নে 'গৃহশ্রী', হরিধন চক্রবর্তী সরণি, সোনারপুর
- **বিভূতিভূষণ ঘরামি, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ কৌতলা, পিন : ৭৪৩ ৬০৩, ফোন : ৯১৭৪-৭৪৩১৫
- **কাশীনগর বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র**, গ্রাম+পোঃ কাশীনগর, পিন : ৭৪৩ ৩৪৯
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
  ১০ মাইল বাজার, পোঃ মহারাজগঞ্জ, থানা : নামখানা, পিন : ৭৪৩ ৩৫৭
- **ডাঃ হরেকৃষ্ণ সিংহ, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ চেতনা**
  ২৩৩ জেমস লং সরণি, জোকা, পিন : ৭৪৩ ৫১২, ফোন : ৪৬৭-১১৫২
- **রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম**, গ্রাম+পোঃ বিবেকানন্দনগর, পিন : ৭৪৩ ৩৫২

বর্ধমান

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, আসানসোল-৭১৩৩০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, শ্যামসায়র (পূর্ব), বর্ধমান-৭১৩১০১
- **নরহরি পুস্তকালয়**, ৮১ বি. সি. রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**, রামমোহন অ্যাভেনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৪
- **আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়**
  ডি/২০, গ্রীসম স্ট্রীট, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২
- **স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি**
  বিদ্যাসাগর অ্যাভেনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫
- **নিমানন্দ নায়ক**, ৬৩ কবিগুরু সরণি
  সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, ফোন : ৫৬৮৮২৩
- **সাধুডাঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, ডি. ভি. সি. কলোনী, দুর্গাপুর-৭১৩২০১
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**
  এ. বি. এল. টাউনশিপ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৬
- **গুসকরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টার**, পিন : ৭১৩১২৮
- **অঞ্জনকুমার পাল**, প্রযত্নে বিবেকানন্দ পাঠচক্র
  কুমোরপাড়া (নারায়ণ ভবন), কাটোয়া-৭১৩১৩০
- **শীতল ব্যানার্জী**
  প্রযত্নে শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি, শ্রীখণ্ড-৭১৩১৫০
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র**, আমলাদহি, চিত্তরঞ্জন-৭১৩৩৩১
- **পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম**, দার্জিলিং মোড়, পানাগড় বাজার-৭১৩১৪৮
- **স্বামী অসীমানন্দ**, সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবামৃত সঙ্ঘ সেবাশ্রম
  গ্রাম+পোঃ বুদবুদ, পিন : ৭১৩৪০৩, ফোন : ৫১২৬৫০
- **রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**, ৫৫/১ ভীমাচরণ রোড, কুমার বাজার
  রানীগঞ্জ, পিন : ৭১৩৩৪৭
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র (মহীতোষ সামন্ত)**
  বাঁকোলা এরিয়া কমপ্লেক্স, পোঃ উখড়া, পিন : ৭১৩৩৬৩

উত্তরবঙ্গ

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১
- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, মালদা-৭৩২১০১
- **বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, রামকৃষ্ণ টিম্বার ডিপো
  নিউ মার্কেট, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১
- **স্বপনকুমার আইচ**, প্রযত্নে তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
  বিধানপল্লী, তুফানগঞ্জ, কুচবিহার-৭৩৬১৬০
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, কুচবিহার, প্রযত্নে অজয়কুমার গাঙ্গুলী
  রাজবাড়ি গভঃ হাউসিং, ব্লক সি-১/৯
  কুচবিহার-৭৩৬১০১, ফোন : ২৮৬৮৮

সৌজন্যে

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯

Haran Chandra Banerjee & Sons.

PAPER MERCHANTS, STATIONERS AND GOVT. SUPPLIERS

7C, CLIVE ROW, KOLKATA-700 001

Phone : Office : 220-1700 Resi. : 665-9075

'উদ্বোধন'-এর আন্তর্জাতিক এবং আন্তঃরাজ্য গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র

বাংলাদেশ ❑ রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা-৩

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ❑ সত্যনারায়ণ রায়, ৮২৫ ডেটন কোর্ট, কনকর্ড, সি. এ.-৯৪৫১৮, ই. মেল : satya_ray@yahoo.com

দিল্লি

- রামকৃষ্ণ মিশন, রামকৃষ্ণ আশ্রম মার্গ, নিউ দিল্লি-১১০০৫৫
- পারমিতা ঘোষাল, ৪০/১৮, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯
- মঞ্জুলা ঘোষ, ৯, শিবালিক অ্যাপার্টমেন্ট, অলকানন্দা নিউ দিল্লি-১১০০১৯, ফোন : (০১১) ৬২১-৮৪৭৪

আন্দামান

- রামকৃষ্ণ মিশন, পোর্ট ব্লেয়ার, পিন : ৭৪৪১০৪ ফোন : (০৩১৯২) ৩২৪৩২

আসাম

- রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, শিলচর, পিন : ৭৮৮০০৪
- রামকৃষ্ণ মঠ, করিমগঞ্জ, পিন : ৭৮৮৭১০
- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন রোড উলুবাড়ি, গুয়াহাটি, জেলা : কামরূপ, পিন : ৭৮১০০৭
- রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বনগাইগাঁও
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, তিনসুকিয়া-৭৮৬১২৫
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, জি. এন. বি. রোড পোঃ দুম দুমা, জেলা : তিনসুকিয়া, পিন : ৭৮৬১৫১
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, মহাত্মা গান্ধী রোড, নগাঁও-৭৮২০০১
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, পোঃ হোজাই, নগাঁও-৭৮২৪৩৫
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, গোসাইগাঁও জেলা : কোকড়াঝাড় (বি. এ. সি.), পিন : ৭৮৩৩৬০
- পরিমলকৃষ্ণ পাল, প্রযত্নে মেসার্স মা কালী স্টোর্স, বি. জি. রেলওয়ে গেট পোঃ + জেলা : কোকড়াঝাড়, পিন : ৭৮৩৩৭০
- এম. কে. বুক সেলার্স, পো : বি. চারালী, জেলা : শোণিতপুর
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, পূর্ণানন্দ রোড, ডিব্রুগড়-৭৮৬০০১
- শান্তিকুমার রায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম (তেজপুর), জেলা : শান্তিপুর

ত্রিপুরা

- রামকৃষ্ণ মিশন, গঙ্গাইল রোড, আগরতলা, পিন : ৭৯৯০০১
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, পোঃ খোয়াই, লালচড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা-৭৯৯২০১
- সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, উদয়পুর, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১২০
- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা আশ্রম, পোঃ বিলোনিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা-৭৯৯১৫৫
- শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি রোড ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা-৭৯৯২৫০

নাগাল্যান্ড

- শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ডিমাপুর-৭৯৭১১২

ওড়িশা

- রামকৃষ্ণ মঠ, চক্রতীর্থ, পুরী, পিন : ৭৫২০০২
- শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার সমিতি, খটবিন সাহী, কটক-৭৫৩০০৮
- শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, হামিরপুর, পোঃ রাউরকেল্লা, পিন : ৭৬৯০০৩

অরুণাচল প্রদেশ

- শ্যামল সিনহা রায় সম্পাদক, বিবেকানন্দ স্টাডি সার্কেল, নাহারলগন, ইটানগর

বিহার

- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রামকৃষ্ণ অ্যাভেনিউ, পাটনা-৮০০০০৪

ঝাড়খণ্ড

- রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম ১১, ১২ স্বামী বিশুদ্ধানন্দ রোড, মোরাবাদি, রাঁচি-৮৩৪০০৮
- শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, সেক্টর-১বি, বোকারো স্টীল সিটি
- রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটি, বিষ্টুপুর, জামশেদপুর-৮৩১০০১
- রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি, ব্যাঙ্ক রোড, ধানবাদ
- রীতা ভট্টাচার্য 'অনুভব', এইচ. ই. স্কুল রোড, হীরাপুর, ধানবাদ-৮২৩৬৮৮

উত্তরপ্রদেশ

- রামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ নিরালানগর, লখনৌ-২২৬০২০

মধ্যপ্রদেশ

- রামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ কোয়ার্টার নং ৫০৭, (এস. এস.)/২, বাচেলি, জেলা : বস্তার

অন্ধ্রপ্রদেশ

- পি. কে. মুখোপাধ্যায়, চীফ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল)
- এম. কে. পাল, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) ও. এন. জি. সি., কে. জি. পি ডি. নাম্বার : ৪৬-৭-৩৫, দানাভাইপেটা, রাজমুন্দ্রি-৫৩৩১০৩

মহারাষ্ট্র

- রামকৃষ্ণ মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন মার্গ, খার, মুম্বাই-৪০০ ০৫২
- প্রদীপচন্দ্র পাল, 'গুরুধাম', ই-২৮, আর. এইচ.-১, সেক্টর-৮ বাসী, নবী, মুম্বাই-৪০০৭০৩
- মহুয়া দাশগুপ্তা, ৮-এ/১১, বৃন্দাবন সোসাইটি, থানে-৪০০৬০১

গুজরাট

- সলিলচন্দ্র ঘোষ, সি-৩-৫০১, ও. এন. জি. সি. কলোনী আমেদাবাদ-৩৮০০০৫
- মীরা মিত্র, প্রযত্নে জি. সি. মিত্র ৩/৮২, জি. আর. টাউনশিপ, জওহরনগর, বরোদা-৩৯১৩২০
- মোহিতরঞ্জন দাস, ৫০৩, নর্মদা টাওয়ার্স ও. এন. জি. সি. কলোনী, পোঃ আঙ্কলেশ্বর, পিন : ৩৯৩০১০
- প্রভাত মুখার্জী, সাইকৃপা অ্যাপার্টমেন্ট সিভিল হাসপাতাল রোড, নানকওয়াড়া, ভালসাড-৩৯৬০০১ ফোন : ০২৬৩২/৪২৩৭৩ ই. মেল : dr.pulak@ad1.vsnl.net.in

Distributors for :

TITAGHUR PAPER MILLS CO. LTD., BENGAL PAPER MILLS CO. LTD., SUPREME PAPER MILLS CO. LTD., SIMPLEX MILLS CO. LTD.

Exercise Book Manufacturer & Distributor

ছড়ায় মধুর বসন,
ভারত দর্শন।
পূজোর ঘরে জমিয়ে মনটা,
ভরে ওঠে চিত্তের কোনটা।
দেব দেবীর প্রিয় এ ধূপ,
যেমন গন্ধ তেমন এর রূপ।
দীর্ঘ সময় জ্বলার তরে,
প্রতি ঘরে এর নাম করে।
জ্বলার পরেও ঘ্রাণটা থাকে,
তাইতো হৃদয় এরেই ডাকে।
শত শত বরষ থাকুক,
ভালোবেসে সবাই রাখুক।

ভারত দর্শন

সুগন্ধী ধূপকাঠি



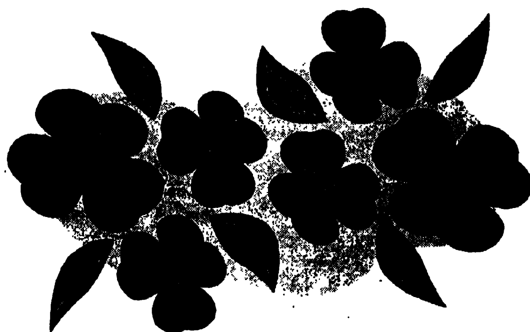
প্রস্তুতকারক ঃ
অশোকা ট্রেডিং কোং
২০৪, কটনপেট বাঙ্গালোর ৫৬০০৫৩

পরিবেশক ঃ
ঘোষ পারফিউমারী ওয়ার্কস
কলিকাতা-৭



All the secret of success is there : to pay as much attention to the means as to the end.

Swami Vivekananda



With Best Compliments From

DATTA FOOTWEAR INDUSTRIES PVT. LTD.

Regd. Office & Factory :

1, BIDHAN SARANI, KOLKATA-700 073

PHONE : 241-5248 ❑ FAX : (033) 241-7541

Unit-II

180, EAST SINTHI ROAD, KOLKATA-700 030

PHONE : 548-4500



নিজের ওপর বিশ্বাস রাখ।
প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় কাজের জনক।
স্বামী বিবেকানন্দ

—: সৌজন্যে :—

MJ (TM) মল্লিক জুয়েলার্স

বড়বাজার

ফোন ঃ ২৩১-০৭৬২, ২৩৩-৪৫২৭

অতিরিক্ত বিপণন কেন্দ্র :

মল্লিক জুয়েলার্স

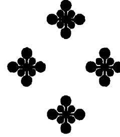
ভবানীপুর

ফোন ঃ ৪৭৪-২৭১৮

R-CAS

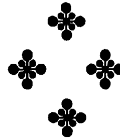
রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে যায়। অবতারেরাও সেইরকম সহস্র সহস্র লোকেদের ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ



মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার দিকে এগোতে চায় না। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আন্তরিক খুব যত্ন ও রোখ চাই।

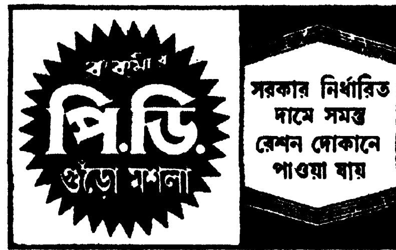
শ্রীমা সারদাদেবী



যে-দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয়, সে-দেশ ক্রমশ ধর্মহীন হইয়া দাঁড়ায়। ভারতে কখনো এরূপ চেষ্টা হয় নাই। সেইজন্য এখানে প্রকৃত ধর্মভাব এখনো জাগ্রত।

স্বামী বিবেকানন্দ





With Best Compliments From :

SINCE 1916

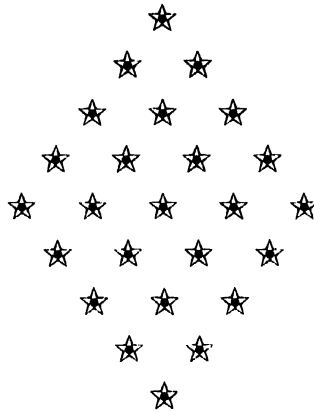
HARIDAS CHUNDER (CLEARING AGENTS) (P) LIMITED

'ELQUS HOUSE'
10, CROOKED LANE, KOLKATA-700 069
INDIA
PHONE :
(033)-248-7830/248-0097/248-4017/243-0897
GRAM : 'Thomelk', Kolkata
FAX :
91-33-248-2067/91-33-243-0185/91-33-245-0683
TELEX : 21-7488 CSF IN
e-mail : csf@cal.vsnl.net.in

IMPORT-EXPORT CUSTOMS CLEARING/ FORWARDING AGENTS

Customs House Office :	Mercantile Building :
15/1, STRAND ROAD KOLKATA-700 001 PHONE : 220-2650	9/C, LAL BAZAR STREET KOLKATA-700 001 PHONE : 248-2685/220-5971

With Best Compliments From :



SRI BALAJI INTERNATIONAL

156/A, LENIN SARANI
KOLKATA-700 013

Whatever you offer to God
will return to you a thousand fold.
Sri Ramakrishna

With Best Compliments From :

S. S.
INTERNATIONAL
(INDIA)

EXPORTERS OF CHILDRENS GARMENTS

ABHINANDAN
27-A/B, ROYD STREET
KOLKATA-700 016
INDIA
TEL :
91-33-229 5601
91-33-229 9500
91-33-229 8587
FAX : 91-33-249 2379
e-mail : ssintlind@gnccl.global.net.in

"MOVING TO THE NEXT MILLENNIUM

Indian Oil People ... towards Excellence ..."



IndianOil

Indian Oil Corporation Limited

(Marketing Division)

INDIANOIL BHAVAN
2, GARIAHAT ROAD (SOUTH)
DHAKURIA
KOLKATA-700 068

শক্তিশালী প্রতিরক্ষা

উর্দ্ধমুখী মুদ্রাস্ফীতি

ও

নিম্নগামী সুদের হার

উভয়ের বিরুদ্ধে

পিয়ারলেস এনক্যাশ বণ্ড

২½ বৎসর মেয়াদী একটি ফিক্সড ডিপোজিট যোজনা

ব্যক্তি, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, ট্রাস্ট, কো অপারেটিভ সোসাইটি - সকলের জন্য

সঞ্চয়ের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় পথ

ভারতবর্ষের যেকোনো ব্যাঙ্কে ভাঙানো যায়

মেয়াদ	[illegible]	[illegible]
২½ বছর	• ১ম বছর - ৮.৫% • ২য় বছর - ৯.০% • ২য় বছরের পর - ১০.৫%	ন্যূনতম : ১০,০০০ টাকা এবং ৫,০০০ টাকার গুণিতকে যেকোনো ঊর্দ্ধসীমা

মূল বৈশিষ্ট্যগুলি :

- গ্যারান্টীযুক্ত ক্রমবর্দ্ধমান প্রাপ্তি
- ২ মাস পরে ঋণের সুবিধা (জমারাশির ৭৫% পর্যন্ত)
- ১২ মাস পরে যেকোনো সময় টাকা তোলার সুবিধা
- বিনামূল্যে দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুবীমার সুযোগ (ব্যক্তির ক্ষেত্রে) *
- বিনামূল্যে পিয়ারলেস সেভিংস কার্ড * — যা থাকলে ২২০০ টিরও বেশী সংস্থা দিচ্ছে তাদের দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা ক্রয়ে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট

* শর্তসাপেক্ষে



পিয়ারলেস

সঞ্চয়ের সহজ পথ

★

Estd. 1932

আস্থার প্রতীক

Website: http://www.peerless-in-india.com

ম্যাচিওরিটি দাবীপূরণের মোট পরিমাণ : প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকা

গত আর্থিক বৎসরে নতুন গ্রাহক সংখ্যা : প্রায় ২০ লক্ষ

This is further to the statutory advertisement published in THE ASIAN AGE on 10.04.2001

UDBODHAN
Phone : 554-2248, 554-2403
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.net
udbodhan@vsnl.com

Vol. 103
No. 9
SEPTEMBER
2001

Licensed to Post
Without Prepayment
Licence No.
TECH/WB/RNP-15/LPWP-01/2001

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Regn. No.
TECH/WB/RNP-15/2001

উদ্বোধন

১০৩তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র



✤ গত ১লা মাঘ ১৪০৭ (১৫ জানুয়ারি ২০০১) **উদ্বোধন** ১০৩তম **বর্ষে** পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় **নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব** নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের **১০৩ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম** ✤

- ❑ **বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন** একটি ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র মাত্র নয়, **উদ্বোধন** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। **ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের** সঙ্গে এবং **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের** সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের** একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তে হবে।
- ❑ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে **উদ্বোধন** নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন** একটি সার্থক **পারিবারিক পত্রিকা**। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন-এ** প্রকাশিত হয়।
- ❑ **উদ্বোধন** অসাম্প্রদায়িক ঃ ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র হয়েও **উদ্বোধন** তার মহান প্রবর্তকের নির্দেশ অনুসারে কোন **সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আদর্শের মুখপত্র নয়। উদ্বোধন** তার **সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বিগত ১০৩ বছর** ধরে অটুট রেখেছে।
- ❑ **উদ্বোধন-**এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার **গ্রাহক** হওয়া নয়, একটি **মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের** সঙ্গে যুক্ত হওয়া।
- ❑ **উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর।**
- ❑ **স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে।** উদ্বোধন-এর প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে গ্রাহক করলেই এখনি **উদ্বোধন-এর গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি** হাজার হয়ে যায়। তাই আপনার **নিজের গ্রাহক** হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করাও আপনার কাছে **স্বামীজীর প্রত্যাশা।** স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের **গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের।** অবশ্য ইন্টারনেট সংস্করণের মাধ্যমে **উদ্বোধন** আজ **ভারত ও বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর** ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছে।
- ❑ **স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।** সেকথা স্মরণ করে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে অনুরাগী ও ভক্তগণ **উদ্বোধন-এর** প্রতি নিশ্চয়ই তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।
- ❑ **উদ্বোধন-এর শারদীয়া** সংখ্যাটির জন্য **গ্রাহকদের** থেকে **আলাদা মূল্য নেওয়া হয় না।** এই সংখ্যাটি গ্রাহকদের জন্য আমাদের **শারদ উপহার।** এর বিশাল অঙ্কের অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য আমরা নির্ভর করি সহৃদয় **বিজ্ঞাপনদাতাদের** সক্রিয় সহযোগিতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক বদান্যতার ওপর।
- ❑ **পত্রিকা প্রকাশ সংক্রান্ত ব্যয় প্রতি বছর বেড়ে গেলেও তিন বছর (১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০১) 'উদ্বোধন' এর গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত** রাখা হয়েছে। **এত সুলভ মূল্যে এমন সম্পূর্ণ পত্রিকা বাঙলা ভাষায় আর একটিও নেই।**
- ❑ **উদ্বোধন-**এর সেবায় চারটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি **'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল'**, অন্য তিনটি যথাক্রমে **'স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ স্মৃতি তহবিল', 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** এবং **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'।** উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে **'Ramakrishna Math, Baghbazar'**—এই নামে পাঠাবেন। ঠিকানা ঃ **সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন,** বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩। দাতারা চিঠিতে বা M.O. কুপনে তহবিলের নাম অবশ্যই উল্লেখ করবেন।
- ❑ **উদ্বোধন-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে** মতিলাল-তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাঁদের পুত্রকন্যাদের পক্ষে স্থায়ী ভিত্তিতে **'উদ্বোধন মেধা সম্মান' (একবছরের জন্য উদ্বোধন-এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি)** নিবেদিত হয়েছে। **পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্‌ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের** যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। **২০০১** সালের জন্য অনুরূপ **সম্মান** সুকুমার-বিভারানী পাড়ুই এর স্মৃতিতে তাঁদের পুত্র অমর পাড়ুই নিবেদন করেছেন। **এই সম্মানপ্রাপকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্ষদ্‌ পরিচালিত ২০০১ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ১০ জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় 'সম্মান'-এর জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বোধন-সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ** করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বামী সর্বগানন্দ
সম্পাদক

সৌজন্যে

পি. বি. সরকার অ্যান্ড সন্স

(কোন ব্রাঞ্চ নেই)

জুয়েলার্স

সন অ্যান্ড গ্র্যান্ড সন্স অব লেট বি. সরকার

৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০ ❑ ফোন ঃ ২২৩-৮৭১৩, ২২৩-৭৫৭৮

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ **সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ**



"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

আনন্দবাজার পত্রিকা

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১



বড় মাপের সাফল্যের জন্য চাই বড় মাপের সুরক্ষা

আপনার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানানসই পলিসি বেছে নিন

এলআইসি'র জীবন শ্রী (তালিকা নং 112)

(নিশ্চিত যোগফলসহ লাভ সহিত পলিসি)

পেশাদার, উচ্চপদস্থ এক্সিকিউটিভ ও সফল ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ভাবে সৃষ্টি করা। কোম্পানিরা তাঁদের মুখ্য ব্যক্তিদের জন্য এই পলিসি নিতে পারেন।

সুবিধা

মেয়াদপূর্তিতে বা তার আগে মৃত্যু ঘটলে আশ্বাসিত অঙ্ক প্রদান, তৎসহ প্রতি বছরে আশ্বাসিত অঙ্কের প্রতি হাজারে টা. 75/- হারে নিশ্চিত যোগফল এবং সম্ভাব্য আনুপাতিক যোগফল, যদি কিছু থাকে।

যোগ্যতা

বয়স: 18 বছর থেকে 60 বছর

পলিসির মেয়াদ 5 বছর থেকে 25 বছর

ন্যূনতম আশ্বাসিত অঙ্ক টা. 5 লক্ষ



লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

Insurance is the subject matter of the solicitation — Please visit: www.licindia.com



রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ

পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া-৭১১ ২০২ ● ফোন ঃ ৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ ● বৈদ্যুতিন ডাক ঃ rmsppp@vsnl.com

সারদাপীঠ থেকে প্রকাশিত অডিও ক্যাসেটসমূহ

মূল্য ❑ SP-1 ও SP-31–34 ঃ ৩৫ টাকা, অন্যান্য ঃ ৩০ টাকা

SP-1	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্	সংস্কৃত ও বাঙলা
SP2, SP-7, SP-8, SP-10–12	কথামৃতের গান (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড)	বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি
SP-3	শ্রীরামনামসংকীর্তন	সংস্কৃত ও হিন্দি
SP-4	বক্তৃতা—যুগপুরুষ	বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত
SP-5	শ্রীশ্রীচণ্ডীস্তব (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ)	বাঙলা, সংস্কৃত
SP-6	শিবমহিমা	বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি
SP-9	শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি
SP-13	শ্রীসারদাবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা
SP-20	বিবেকানন্দবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা
SP-24	শ্রীকৃষ্ণবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি
SP-14–16	কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)	বাঙলা
SP-17	বীরবাণী	সংস্কৃত, বাঙলা, ইংরেজী ও হিন্দি
SP-18	গীতিবন্দনা	হিন্দি
SP-19	বক্তৃতা—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান	বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত
SP-21–22	সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড)	হিন্দি
SP-23	ওঠো জাগো	হিন্দি
SP-25	শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি	হিন্দি
SP-26	বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি	হিন্দি
SP-27	বেদমন্ত্র (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ)	সংস্কৃত উপনিষদের মন্ত্রসমূহ
SP-28	সরস্বতী বন্দনা	বাঙলা, সংস্কৃত
SP-29 &	**Ramakrishna Movement**	Lecture by Swami Bhuteshanandaji Maharaj, 12th President, Belur Math
SP-30	**Religion in Practice**	do
SP-31–34	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ) (১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড)	মূল সংস্কৃত এবং প্রতি অধ্যায়ের মুখবন্ধ
SP-35	আগমনী	বাঙলা
SP-36	ভজন সুধা	হিন্দি
SP-37	শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-অষ্টোত্তর শতনাম	(স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখিত)

কম্প্যাক্ট ডিস্ক / মূল্য প্রতিটি ১৫০ টাকা

Cd/SP-1	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্	(সান্ধ্য আরাত্রিক ভজন, গুরুবন্দনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষ্ণ শরণম্)
Cd/SP-3	শ্রীরামনামসঙ্কীর্তন	রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি দিনে গাওয়া হয় (সংস্কৃত ও হিন্দি)
Cd/SP-31–34	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ)	(সংস্কৃত) (সুরে আবৃত্তি ১ম—১৮শ অধ্যায়)

স্বামী সর্বগানন্দ, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ, স্বামী দিব্যব্রতানন্দ, শ্রীমহেশরঞ্জন সোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য দক্ষ শিল্পিগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি (কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক)

ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে M.O. অথবা Bank draft মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে।

Video Cassette : Centenary Celebration of the Ramakrishna Mission at Belur Math in 1998. Duration—80 minutes Rs. 250.00

৩।৪।৫ ... CALCUTTA ... 2001

উদ্বোধন ॥১০৩॥

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র

১০৩তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা কার্তিক ১৪০৮ অক্টোবর ২০০১

প্রচ্ছদ ❑ ওপরে কৈলাস, নিচে মানস সরোবর। মানস সরোবরে সন্তরণরত হংসযুগল—লোকবিশ্বাসে, হর-পার্বতী।

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ



সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ ঃ সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'
প্রচ্ছদ ❑ মুদ্রণ ঃ স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ ❑ আলোকচিত্র ঃ বেলুড় মঠের জনৈক সন্ন্যাসী
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ ঃ ৬৫ টাকা; সডাক ঃ ৭৫ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য ঃ ৮ টাকা ❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) ঃ ৩০০০ টাকা [একবছরের মধ্যে পরিশোধ্য কমপক্ষে ৫০০ টাকা প্রতি কিস্তি হিসাবে ৬টি কিস্তিতেও প্রদেয়]



জরুরী বিজ্ঞপ্তি

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালীর ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া চাই। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' বাঙালী সংস্কৃতিচেতনায় আজ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

'উদ্বোধন' ঃ গ্রাহকভুক্তি, নবীকরণ ❑ ১০৪তম বর্ষ

২০০২ খ্রীস্টাব্দ ● ১৪০৮-১৪০৯ বঙ্গাব্দ

গ্রাহকভুক্তি ঃ বিগত তিন বছর আমরা গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত রাখতে পেরেছি, কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও আগামী বছর (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০২ খ্রীস্টাব্দ) থেকে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য সামান্য বৃদ্ধি করতেই হচ্ছে। এজন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫্ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ৯৫্ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ঃ ৮০০্ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০্ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০্ টাকা।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান অথবা আজীবন (৩০ বছরের জন্য) সদস্যভুক্তির জন্য আমাদের অফিসে লিখবেন, নিয়মাবলী পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আজীবন গ্রাহকমূল্য ৩০০০্ টাকা। এক বা ন্যূনতম ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ৫০০্ টাকা হিসাবে।

বছরের মাঝখানে গ্রাহকভুক্তি ঃ যেকোন সময়েই গ্রাহকভুক্তি হতে পারে। তবে যাঁরা নবীকরণ করবেন তাঁদের কাছে একান্ত অনুরোধ, পূজার আগেই সদস্যপদ 'রিনিউ' করিয়ে নেবেন। তাহলে দপ্তরে কাজের সুবিধা হয়। যাঁরা নতুন গ্রাহক হচ্ছেন তাঁদের মাঘ (জানুয়ারি ২০০১) থেকে সব মাসের পত্রিকাই দেওয়া হবে।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ M.O. অথবা A/c Payee Bank Draft বা Postal Order **"Udbodhan Office"**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড** ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। পত্রোত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন।

চেক গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে।

M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই সুবিধাজনক।

❑ **কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।**

❑ **যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।**

e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইন্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯

LIBRARY

দিব্য বাণী

ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে নুতিমহো
ন চাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাঃ।
ন জানে মুদ্রাস্তে তদপি চ ন জানে বিলপনং
পরং জানে মাতস্ত্বদনুসরণং ক্লেশহরণম্।।

—হে মাতা, হে জননি, আমি তোমার অধম, অজ্ঞান সন্তান। আমি মন্ত্র জানি না, পূজা করিতে জানি না, স্তব-স্তুতি করিতে পারি না। মুদ্রাদি প্রদর্শন করিয়া তোমার প্রীতি উৎপাদন করিব—সে-সামর্থ্যও আমার নাই। এমনকি কাতরতা প্রকাশেও আমি অক্ষম। তোমার সমীপে উপস্থিত হইয়া কাতর স্বরে তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার অজ্ঞানমূঢ়তা প্রকাশ করিব—তাহাও পারি না। কেবল এইটুকুই জানি, যেমন শিশু তাহার জননীর পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবিত হয়, তেমনি করিয়া তোমার অনুসরণ করিলে যাবতীয় দুঃখ দূর হইতে পারে।

পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি বহবঃ সন্তি সরলাঃ
পরং তেষাং মধ্যে বিরলতরলোঽহং তব সুতঃ।
মদীয়োঽয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো তব শিবে
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি।।

—হে জননি, এই পৃথিবীতে তোমার অগণ্য সন্তান রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কতই না সরলচিত্ত, সুস্থিরমতি তোমার প্রীতি উৎপাদনে সক্ষম। কেবল আমিই তাহাদের মধ্যে অস্থিরচিত্ত, মোহাবিষ্ট, জগতের ভোগ-ঐশ্বর্যের হাতছানি আমাকে ভুলাইয়া তোমা হইতে দূরে সরাইয়া লইতে পারে। তাহা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু তুমি মাতা। আমি জানি, কুপুত্র যদি কদাচিৎ জন্মে তো কুমাতা কখনো দৃষ্ট হয় না। সেই ভরসায় আমি সতৃষ্ণ নয়নে তোমার প্রতি চাহিয়া থাকি।

ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা ন চ বিভববাঞ্ছাঽপি চ ন মে
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাঽপি ন পুনঃ।
অতস্ত্বাং সংযাচে জননি জননং যাতু মম বৈ
মৃড়ানী রুদ্রাণী শিবশিবভবানীতি জপতঃ।।

—হে জননি, তুমি শশিমুখী। জগৎকে তোমার মহামায়ার জালে আবৃত করিয়া প্রাণিবর্গকে আসক্তি দ্বারা বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ। সত্য কহিতেছি, আমার মুক্তির ইচ্ছা নাই। ধনসম্পত্তির ইচ্ছা নাই, জ্ঞানলাভের অপেক্ষা নাই। কোনরূপ সুখবাসনাও নাই। হে জননি, তোমার শ্রীপাদপদ্মে আমার একটিই প্রার্থনা—এই জীবন, 'মৃড়ানী রুদ্রাণী শিব শিব ভবানী' এই জপ করিতে করিতে, তোমার নামগুণকীর্তন করিতে করিতে যেন অতিবাহিত হয়।

—শঙ্করাচার্যকৃত 'দেব্যপরাধক্ষমাপনস্তোত্রম্' হইতে উদ্ধৃত

মাতৃ-উপাসনা, সঙ্গীত ও অধ্যাত্মসাধনা

(এক)

সেদিন ছিল ২১ জুলাই ১৮৮৩। শনিবার। সন্ধ্যা সমাগত। অধরলাল সেনের বৈঠকখানায় শ্রীরামকৃষ্ণ অকস্মাৎ আসিয়া পড়িয়াছেন। আসিবার কথা ছিল না। সঙ্গে মাস্টার ও রামলালদাদা। অধর বলিয়াছিলেন, অনেকদিন যাবৎ শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনে তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছিল। সেদিন প্রাতে তিনি অনেকক্ষণ ঠাকুরকে ডাকিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তাই বুঝি ভক্তবৎসল ভক্তের ডাকে বিচলিত হইয়া আসিয়া পড়িয়াছেন! শ্রীশ্রীঠাকুর বসিয়া আছেন। রামলালদাদা সম্মুখে উপবিষ্ট। ঠাকুর কহিলেন ঃ "মায়ের নাম কর।" রামলালদাদা দেওয়ান নন্দকুমার রচিত একটি মাতৃসঙ্গীত শুরু করিলেন। গানের কলি নিম্নরূপ—

"ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী
মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্য বিনোদিনী।...
আধার ভৈরবাকার ষড়্দলে শ্রীরাগ আর
মণিপুরেতে মল্লার বসন্তে হৃদ্‌প্রকাশিনী।
বিশুদ্ধ হিন্দোল সুরে, কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে
তান-মান-লয়-সুরে তিনগ্রাম সঞ্চারিণী।...
মহামায়া মোহপাশে বদ্ধ কর অনায়াসে।"

এটি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রিয় গান। তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতি অনুসারে দেহতত্ত্বের কথা আছে এই গানে। সেইসঙ্গে রহিয়াছে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে মাতৃ-উপাসনার ইঙ্গিত। ঈশ্বর-সাধনার সহিত সঙ্গীত যে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত—একথা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে। এই সঙ্গীতে মার্গসঙ্গীতের সহিত কুণ্ডলিনী জাগরণের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের কথা বিধৃত করিয়াছেন সাধক-গীতিকার দেওয়ান নন্দকুমার। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেওয়ান নন্দকুমার এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মহারাজ নন্দকুমার এক ব্যক্তি নহেন।) তাঁহার রচিত আরেকটি গান—'কবে সমাধি হবে শ্যামা চরণে' শ্রীরামকৃষ্ণ গাহিতেন।

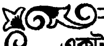
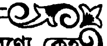
'শুভ বিজয়া'র প্রার্থনা ও শুভেচ্ছা

'শুভ বিজয়া'র পুণ্যলগ্নে জগজ্জননীর কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের অন্তরের সকল মালিন্য, কলুষ, দ্বেষ ও ভেদ-বুদ্ধি, স্বার্থপরতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা, সঙ্কীর্ণতা, লোভ ও হিংসাকে যেন আমরা নির্মূল করতে পারি। এই উপলক্ষ্যে 'উদ্বোধন'-এর সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, পৃষ্ঠপোষক, শুভানুধ্যায়ী এবং 'উদ্বোধন'-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমরা 'শুভ বিজয়া'র আন্তরিক অভিনন্দন, প্রীতি, শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানাই।

সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

স্বামী বিবেকানন্দও শেষজীবনে এই গানটি গাহিয়া প্রায়ই আপনাতে আপনি ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িতেন।

তন্ত্রসাধনের তাত্ত্বিক আলোচনা শ্রীরামকৃষ্ণ স্বমুখে বহুবার করিয়াছেন—'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে। মানবের দেহাভ্যন্তরে সাতটি চক্রের কথা তন্ত্রে বর্ণিত আছে এবং এই চক্রগুলি বিভিন্ন আকারের পদ্মরূপে বিদ্যমান। "...এই অবস্থা যখন হলো, তার ঠিক আগে আমায় দেখিয়ে দিলে—কিরূপে কুণ্ডলিনীশক্তি জাগরণ হয়ে ক্রমে ক্রমে সব পদ্মগুলি ফুটে যেতে লাগল, আর সমাধি হলো। দেখলাম, ঠিক আমার মতন বাইশ-তেইশ বছরের ছোকরা সুষুম্না নাড়ীর ভিতর গিয়ে জিহ্বা দিয়ে পদ্মের সঙ্গে রমণ করছে! প্রথমে গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি। চতুর্দল, ষড়্দল, দশদল পদ্ম সব অধোমুখ হয়েছিল—ঊর্ধ্বমুখ হলো।... হৃদয়ে যখন এল—বেশ মনে পড়ছে—জিহ্বা দিয়ে রমণ করবার পর দ্বাদশদল অধোমুখপদ্ম ঊর্ধ্বমুখ হলো, আর প্রস্ফুটিত হলো! তারপর কণ্ঠে ষোড়শদল, আর কপালে দ্বিদল। শেষে সহস্রদল পদ্ম প্রস্ফুটিত হলো।"

একটা সামগ্রিক চিত্র যেন ঠাকুর তুলিয়া ধরিলেন। মূলাধারে (গুহ্যদেশে, মেরুদণ্ডের শুরু যেখানে) চতুর্দল পদ্ম। স্বাধিষ্ঠানে (লিঙ্গদেশে) ষড়্‌দল পদ্ম। মণিপুরে (নাভিদেশে) দশদল পদ্ম। হৃদয়ে (অনাহত চক্রে) দ্বাদশদল পদ্ম। কণ্ঠে (বিশুদ্ধ চক্রে) ষোড়শদল। ভ্রূদ্বয়ের মাঝখানে (আজ্ঞা চক্রে) দ্বিদল পদ্ম। এই পদ্মসমূহের পাপড়ির ওপর বর্ণমালার সব বর্ণ লিখিত আছে—বীজাকারে। সহস্রার (ব্রহ্মতালু) যেন দলছাড়া। সেখানে সহস্রদল পদ্ম। মন সেখানে গেলে সমাধি হয়, সেখানে অহংবোধশূন্যতা, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'। সঙ্গীতসাধক নন্দকুমার ঐ ষট্‌চক্রে ছয়টি রাগ স্থাপন করিলেন। তিনি কি স্বেচ্ছায় এইরূপ করিলেন? বোধহয় তাহা নহে। তাঁহার অনুভবে ঐ রাগসকলের রূপ (যথা—ভৈরব, শ্রী, মল্লার, বসন্ত, হিন্দোল, কর্ণাটক বা কর্ণাটী) যেন মন্ত্রের ন্যায় স্বর্ণাক্ষরে একাদিক্রমে প্রকাশিত হইল। দেবী মহামায়া কুণ্ডলিনীশক্তি-রূপে যেন সেই সেই রাগ-রূপ পরিগ্রহ করিয়া সাধকের নিকট আনন্দানুভূতির দার্ঢ্য প্রদান করিলেন। অপর দিক হইতে বিচার করিলে বলা যায়, ঐ ছয়টি রাগ হয়তো শক্তিস্বরূপিণী *হরমোহিনীর* প্রিয় রাগ। সঙ্গীতসাধক যখন ঐ রাগসকলের কোন একটি ধ্যানমগ্ন চিত্তে গাহিতে থাকেন, তখন তাঁহার অন্তরে দেবীর অনুকৃতি হয়তো বা ঐ রাগের মাধ্যমেই ফুটিয়া উঠে। কারণ, রাগ-রাগিণীর দুটি রূপ বিদ্যমান—একটি নাদময় রূপ, একটি দেবদেহময় রূপ। ঐকান্তিকতা, ত্যাগ, পবিত্রতা, তিতিক্ষা সহায়ে সঙ্গীত-সাধনার মাধ্যমেই দেবদেহময় চাক্ষুষী রূপটি সাধকের অন্তরে জাগিয়া উঠে। নাদময় রূপটি শ্রাব্য।

* * * * *

অধরলাল সেনের বাটীতে ১৮৮৩ সালের আগস্ট মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ যখন পুনরায় শুভাগমন করিয়াছিলেন, সেদিন তিনি স্বয়ং এই গানটি গাহিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে অন্যত্রও পাই, "...এই সময়ে [যখন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজকের পদ গ্রহণ করিলেন] যথারীতি পূজা সমাপনান্তে দেবীকে নিত্য রামপ্রসাদ প্রমুখ সিদ্ধ ভক্তদিগের রচিত সঙ্গীতসমূহ শ্রবণ করানো তিনি পূজার অঙ্গবিশেষ বলিয়া গণ্য করিতেন" ('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ', অধ্যায়—ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন)। অর্থাৎ সঙ্গীতের সহিত অধ্যাত্মজীবনের *প্রত্যক্ষ* যোগ রহিয়াছে—এইকথা বলিবার জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

বস্তুত, সঙ্গীত ঈশ্বরের পদচিহ্ন। গহন অরণ্যে কেহ প্রবেশ করিলে যেমন পদচিহ্ন ধরিয়া তাহার সন্ধান করিতে হয়, সেইরূপ সঙ্গীতময় পদচিহ্ন ধরিয়া অগ্রসর হইলে প্রেমস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, অনন্তমাধুর্য-নিলয় শ্রীভগবানের সন্ধান পাওয়া যায় বলিয়া ইতিহাস প্রমাণ করিয়াছে। এবং ইহাই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ আরো একবার প্রমাণ করিয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পূর্বেও বহু সঙ্গীতসাধক সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। সাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, নাটোরের মহারাজা রামকৃষ্ণ, স্বামী হরিদাস (তানসেনের গুরু), মিঞা তানসেন, সঙ্গীতসাধিকা মীরাবাঈ, সুরদাস, কবীর, নামদেব, তুকারাম, দক্ষিণভারতে পুরন্দর দাস, শ্রীত্যাগরাজ, মুথুস্বামী দীক্ষিতার, নায়নার সাধকবৃন্দ, এদিকে তুলসীদাস, জয়দেব কবি প্রমুখ। যদি পূর্ণ আত্মনিবেদনের ভাব বিদ্যমান থাকে, কণ্ঠসঙ্গীত বা যন্ত্রসঙ্গীত—উভয়ই সঙ্গীতসাধককে অধ্যাত্ম অনুভূতি-লাভে সাহায্য করিয়া থাকে।

সঙ্গীত যে ঈশ্বরানুভূতিলাভের একটি স্বীকৃত পথ সে-কথা বারংবার ইতিহাসে প্রমাণিত হইয়াছে, যদিও আধুনিক কালে কোন কোন পণ্ডিত একথা মানিতে রাজি নহেন। তাঁহারা বলেন সঙ্গীতের সহিত অধ্যাত্মজীবনের সরাসরি কোন যোগ নাই। কারণ, সঙ্গীত একটি বিদ্যামাত্র বা উপকরণ বা পদ্ধতি—যাহার সাহায্যে সাধক যেমন ঈশ্বরলাভ করিয়া থাকেন, তেমনি ব্যবসায়িগণ অর্থোপার্জন করিয়া থাকেন, ভোগবিলাসী মানুষ চিত্তবিনোদন করিয়া থাকেন। আবার এই সঙ্গীতের প্রয়োগে অধুনা চিকিৎসাবিজ্ঞানে রোগ নিরাময়ও করা সম্ভব হইতেছে।

ইহার উত্তরে প্রথমেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ রচিত একটি গানের কলি মনে ভাসিয়া উঠিতেছে—"দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে/আমার সুরগুলি পায় চরণ, আমি পাইনে তোমারে।" সুর মানুষের মনকে সীমা হইতে অসীমে লইয়া যায়। সুর ঈশ্বরের এক বিশেষ সৃষ্টি। সেই অসীমের স্পর্শ পাইলে বস্তুবাদিগণ তাহার বহিঃপ্রকাশ বিভিন্নভাবে প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু পশ্চাতের কারণটি কী তাহা সম্যক বুঝিতে পারেন না। যোগশাস্ত্রের আলোকে ইহার সুন্দর ব্যাখ্যা রহিয়াছে। মননশীল অন্তর্মুখী সাধক ঐ কারণটি অনুধাবন করিতে সমর্থ হন। সংক্ষেপে বলিলে সেই কারণটি এইরূপ ঃ

যোগিগণ বলেন, মন যখন জলাশয়ে স্থির জলের ন্যায় তরঙ্গহীন অবস্থায় বিরাজ করে, তখন ঐ মনোরূপ জলে আনন্দস্বরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব পড়ে। তখন সেই অনন্ত সচ্চিদানন্দঘন আনন্দস্বরূপ আত্মার স্পর্শে মন অসীমায়িত হইয়া উঠে এবং অন্তরে দিব্য আনন্দের স্ফুরণ হয়। এই আনন্দ বাহিরের কোন উপকরণ হইতে আসিয়াছে ভাবিয়া বস্তুবাদিগণ বিভ্রান্ত হইয়া পড়েন। অতএব সঙ্গীতকে চিত্তবিনোদনের কাজে ব্যবহার করিলেও মানুষ নিজের অজান্তেই অনন্তের স্পর্শজাত আনন্দে আপ্লুত হইয়া থাকে। ব্যবসায়িগণ সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মাত্র। দেহ-মন-চিত্তকে সংযম, পবিত্রতা এবং ঐকান্তিক একাগ্রতার মাধ্যমে প্রস্তুত করিয়া তুলিলে অনন্তের স্পর্শজাত সেই দিব্য আনন্দকে ধারণ করিবার শক্তি সঞ্চিত হয়। নতুবা ক্ষণিকের জন্য মন আনন্দে আপ্লুত হইলেও পুনরায় বিচার-বিহীনতাজনিত অজ্ঞতার কারণে ঐ সঙ্গীত মানুষের কাম-ক্রোধাদি ষড়্‌রিপুকে পরিণামে বর্ধিত করিয়া তোলে। মানুষের দুর্বল মুহূর্তের সুযোগ গ্রহণ করিয়া সুযোগসন্ধানীর দল তখন স্বার্থসিদ্ধি করিয়া থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন ঃ "যখন গান গাইবি মনে মনে ভাববি ঈশ্বরকে শোনাচ্ছিস।" আস্তিক্যবুদ্ধি সহায়ে শ্রীরামকৃষ্ণের এই উপদেশ অনুসরণ করিয়া সঙ্গীত-সাধনা সাধকের পক্ষে পরমকল্যাণপ্রদ বৈ অকল্যাণদ কখনো হয় না। এবং যখনই বিচার করিয়া সচেতনভাবে নিখুঁত স্বর-প্রয়োগে *'তান-মান-লয়-সুরে তিনগ্রাম-সঞ্চারিণী'* আদ্যাশক্তি মহাবিদ্যার আরাধনা পূর্ণতা লাভ করে, তখন সাধকের এবং শ্রোতার অন্তরে এক অননুভূতপূর্ব আনন্দের প্রবাহ বহিতে থাকে, তাহার প্রমাণ আমরা দক্ষিণেশ্বরে এবং অন্যান্য স্থানেও পাইয়াছি। ইহাকে সঙ্গীতের 'সাধক-কেন্দ্রিক' ফলশ্রুতি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। ইংরেজীতে বলিলে ইহা সাধকের উপর সঙ্গীতের subjective প্রভাব। তাহার মন যেমন যেমন সুরের গভীরে প্রবিষ্ট হইতেছে, তাহার নিদ্রিত কুণ্ডলিনীশক্তি ক্রমশ জাগ্রতা হইতেছেন। ধীরে ধীরে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্রে সেই সুরের অভিঘাত গিয়া পড়িতেছে। এবং সাধক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে অতিক্রম করিয়া ক্রমে অতীন্দ্রিয় সুরলোকে উপনীত হইতেছেন। কিন্তু সঙ্গীতের আরেকটি দিক এখনো অনুক্ত রহিয়াছে। উহা সঙ্গীতের objective বা যুষ্মদীয় প্রভাব। ইহাকে সমষ্টিগত প্রভাবও বলা যাইতে পারে। বিখ্যাত পাণিহাটী মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণের উপস্থিতিতে আমরা সঙ্গীতের এই সমষ্টি-প্রভাবের নমুনা পাইয়াছি। সুরতরঙ্গ এবং ভাবতরঙ্গ যেন একত্রিত হইয়া বাহির হইতে আসিয়া শ্রোতার উপর সমুদ্রের প্রবল জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় আপতিত হইল এবং বিশাল জনসমুদ্র ঐ সুরজলধির তরঙ্গাভিঘাতে ভাসিয়া চলিল। কোথা হইতে এক ঘণ্টা, দুই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা কাল অতিক্রান্ত হইল কেহ বুঝিল না। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' গ্রন্থদ্বয়ে ইহার অনবদ্য বর্ণনা রহিয়াছে। ঐ অসাধারণ ভাবতরঙ্গ এবং সুরজালে সাধক-অসাধক, গৃহী-সন্ন্যাসী, ভক্ত-অভক্ত সকলেই কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছে কাহারও হুঁশ নাই। এই বৃন্দগীতির বা সমষ্টিগত সঙ্গীতের প্রভাব যখন ব্যাপক আকার ধারণ করে, তখন প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর ব্যক্তিগত আনন্দের প্রাপ্তি যে কিছু কম পড়িয়া যায় তাহা নহে। বরং একে অপরকে সাহায্য করিতে করিতে ক্রমশ উহা বৃদ্ধিই পাইতে থাকে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় ইহাকে forced vibration বা পরবশ কম্পন বলা হইয়া থাকে। ইহাই সঙ্গীতের মাধুর্য।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে বলা হইয়াছে, ওঙ্কার হইতে এই সৃষ্টি। সেই মহানাদ, 'একমেবাদ্বিতীয়ম্‌', একরস, অখণ্ড, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ চৈতন্যসত্তা ক্রমে মহদাদি (বুদ্ধি, অন্তঃকরণ, প্রাণ ইত্যাদি) অধস্তন প্রকৃতিতে বিবর্তিত হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিল। অতএব, 'সর্বমোঙ্কার এব'—এই বিশ্বচরাচর ওঙ্কার ব্যতীত কিছুই নহে। সঙ্গীতকে অবলম্বন করিয়া জীব সেই এক সর্বব্যাপী ওঙ্কারের লক্ষ্যে চলিয়া স্বস্বরূপে অবস্থানপূর্বক জীবন্মুক্তির আনন্দ অনুভব করিবে—ইহাই সঙ্গীতসাধক নন্দকুমার যেন বলিতে চাহিয়াছেন। সঙ্গীতের এই আরোহণ পদ্ধতিকে আধ্যাত্মিক পরিভাষায় 'অনুলোম মার্গ' বলা যাইতে পারে। অপরদিকে সচ্চিদানন্দ নির্গুণ, নিরাকার, এক, অখণ্ড চৈতন্য কিভাবে প্রণব ওঙ্কারের সাহায্যে এই প্রপঞ্চময়, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে রূপান্তরিত হইলেন, সঙ্গীতের সেই অনির্বচনীয় অবরোহণ পদ্ধতিকে 'বিলোম-মার্গ' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। অর্থাৎ *মা হরমনোমোহিনী* স্বীয় ভুবন-ভুলানো অঘটনঘটনপটিয়সী শক্তিবলে সঙ্গীতের এই বিলোম-অনুলোম মার্গ অবলম্বন করিয়া যেন কখনও জগজ্জাল বিস্তার করিতেছেন, আবার কখনও বা অব্যক্ত স্বরূপে প্রত্যাবর্তন করিয়া সৃষ্টির বিলয় করিতেছেন। ❑

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে যেসকল তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৩৫৯ সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। আশা করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।—সম্পাদক

দি নিউ ডিসপেনসেসন, ৮ জানুয়ারি ১৮৮২

আশার ইঙ্গিত—কলকাতার ধর্মজীবন ও ধর্মচিন্তা সম্বন্ধে যাঁরা চিন্তাভাবনা করেছেন, তাঁরা নিশ্চয় দক্ষিণেশ্বরের শ্রদ্ধাস্পদ পরমহংস হিন্দু ও নববিধানী ব্রাহ্মদের মধ্যে কিভাবে যোগসূত্র হয়ে আছেন তা দেখে আশ্চর্যান্বিত হচ্ছেন। সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় হিন্দুদের বাড়িতে পরপর অনেকগুলি ধর্মসভা হয়েছিল, যেখানে উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে মেলামেশার ফলে চিন্তায় ও ভগবৎ আরাধনায় এমন একটা ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল যা সত্যই আকর্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল। এইসব সভার কার্যবিবরণীতে থাকত পরমহংসের অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক কথোপকথন, স্তবগান, প্রশ্নোত্তর এবং কীর্তন। দ্বিতলের বারান্দায় উচ্চবর্ণের হিন্দু পরিবারের রমণীগণ পর্দার পিছনে সমবেত হয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ঐসব শুনতেন। জ্ঞানী-পণ্ডিত, শিক্ষিত-যুবক, গোঁড়া বৈষ্ণব ও যোগীরা দলে দলে আসতেন, কেউ আসতেন কৌতূহলী হয়ে, কেউ সাধুসঙ্গলাভের জন্য বা সৎসঙ্গের জন্য। আবার অন্য অনেকে আসতেন জ্ঞানলাভের আশায় বা সঙ্কীর্তনে যোগ দেওয়ার জন্য। ঐসকল ক্ষেত্রেই আমরা জীবন্ত ভক্তিভাবের উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করেছি, যা সমগ্র দর্শকবৃন্দকে যেন ভাসিয়ে দিত! এর প্রভাব হয়েছিল বিস্ময়কর। প্রেম ও উচ্ছ্বাসের বন্যায় ধর্মীয় মতভেদ ভেসে গেল। এই প্রেম ও আধ্যাত্মিক মিশ্রণ শেষে যে কোথায় নিয়ে যাবে, সেসম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী কে করতে পারবে? প্রভুর ইচ্ছাগুলি যেন মূর্ত হয়ে উঠছে। *(ইংরেজী থেকে অনূদিত)*

*

ধর্মপ্রচারক, ৬ আগস্ট ১৮৮৪

মহাত্মা রামকৃষ্ণ।—গহন বনে কত সুগন্ধ পুষ্প ফুটিয়া থাকে, তাহা লোকসমাজ কিরূপে জানিবে? তাহারা বনজ, বনের শোভা বর্ধন করিয়াই, বিজনে বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিয়াই বনের ফুল বনে মিশাইয়া যায়। ফুল যাঁহার শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়, ফুল তাঁহারই সহিত হাসিয়া খেলিয়া দিন কাটাইয়া দেয়। মহাত্মা রামকৃষ্ণ ভগবৎ-সাধনকাননের একটি সুগন্ধ পুষ্প। পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য, কীর্তি-আদি যেসকল উপায় দ্বারা লোকসকলকে সাধারণত পৃথিবীতে বিখ্যাত ও পরিচিত করিয়া দেয়, রামকৃষ্ণ ছন্দাংশেও তাহার ছায়া স্পর্শ করেন নাই। ইনি বনের ফুল বনে ফুটিয়াই বনদেবতার কোলে ক্রীড়া করিতেছেন। সৌভাগ্যবান পুরুষেরাই তাঁহার সঙ্গ-সৌগন্ধ লাভে আনন্দিত হইয়া থাকেন। এই মহাত্মা জেলা বর্ধমানের অন্তর্গত একটি পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃক্রম উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনের গতি ও উন্নতির বেগ সাধারণ লোকের পশ্চাতে পশ্চাতে যায় নাই। লোকে যেসময় ভবিষ্যজ্জীবনের সাংসারিক উন্নতির জন্য বিদ্যালয়ে যত্নপূর্বক অধ্যয়ন করিতে থাকে, সেসময়ে রামকৃষ্ণ আনন্দময়ীর আনন্দলাভের জন্য আপনার মনে আপনি ভাবিতেন, আপনি গান করিতেন, আপনি নাচিতেন, আপনার ভাবে আপনি মাতিয়া বিগলিত হইতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি স্বেচ্ছাক্রমে বর্ধমানের রাজবাটীতে আসিতেন। তিনি সঙ্গীতবিদ্যায় তানসেন কলাবৎ না হইলেও বর্ধমানের রাজপুরবাসিগণ তাঁহাকে একজন ভক্তগায়ক বলিয়া জানিত। পণ্ডিতদিগকে মহারাজা সৎকার করিতেন বলিয়া দূরাদ্দূরতর দেশ হইতেও রাজবাটীতে সময় সময় অনেক পণ্ডিতের সমাগম হইত।...

মহাত্মা রামকৃষ্ণ এক্ষণে 'রামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে এ প্রদেশে প্রসিদ্ধ। পাঠক! ইনি গৈরিক কৌপীনধারী নহেন, ইঁহার মস্তক মুণ্ডিত নহে, অথচ ইঁহাকে কেন লোকে পরমহংস বলে বুঝিয়াছেন? ইনি পরিচ্ছদে পরমহংস নহেন, কিন্তু কার্যে পরমহংস।... তিনি সাধনার দ্বারা কামিনী ও কাঞ্চনকে বস্তুতই "কায়েন মনসা বাচা" পরিত্যাগ করিয়াছেন, এতদ্দ্বয় তাঁহার শরীরের সহিত সংস্পৃষ্ট হইলে তাঁহার হস্তপাদাদি বাঁকিয়া যায়, শরীর সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়ে। এমনকি, যদি কোন বেশ্যাগামী অপরিচিত পুরুষ তাঁহাকে দৈবাৎ স্পর্শ করে, তবে তাঁহার শরীরের মধ্যে একটি আশ্চর্য সংবেগ উদয় হয় এবং ইহা দ্বারা তাঁহার দূষিত প্রকৃতি অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারেন। একটু প্রণিধান করিলেই তিনি অনায়াসে লোকের মনোভাব বুঝিতে পারেন। তাঁহার প্রকৃতি এত উদার ও সরল যে, তাঁহাকে কেহই কখনো শত্রু ভাবিতে অবকাশ পায় না। বস্তুত, তিনি অজাতশত্রু; তাঁহার নিকটে কিয়ৎক্ষণ বসিলে কথায় কথায় এত উচ্চ ও হৃদয়ভেদী উপদেশ পাওয়া যায় যে, বহুদিন শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়াও তত্তাবৎ সহজে লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই।

সঙ্কলন ❑ জলধিকুমার সরকার
সম্পাদনা ❑ স্বামী সর্বগানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের তিনটি পত্র

ভগিনী ক্রিস্টিনকে লিখিত



।।১।।

(মূল ইংরেজী থেকে অনূদিত)

১৯ ওয়েস্ট থার্টি এইটথ্ স্ট্রীট
নিউ ইয়র্ক
৯ আগস্ট ১৮৯৫

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

তুমি নিশ্চয়ই চমৎকার আবহাওয়া খুবই উপভোগ করছ। এখানে এখন অতিরিক্ত গরম, তবে তার জন্য আমার কোন দুর্ভাবনা নেই। সহস্রদ্বীপোদ্যান থেকে নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত আমার ভ্রমণটি বেশ মনোরম হয়েছিল। যদিও ইঞ্জিনটি লাইনচ্যুত হয়েছিল, কিন্তু সর্বক্ষণ ঘুমিয়ে থাকার ফলে আমি সেসব কিছুই জানতে পারিনি। মিস ওয়াল্ডো অ্যালবেনিতে ট্রেন থেকে নেমে গিয়েছেন, কিন্তু আমি ঘুমিয়ে ছিলাম বলে তাঁকে বিদায় জানাতে পারিনি। এখনো তাঁর কাছ থেকে কোন চিঠিপত্র পাইনি। আশা করি শীঘ্রই পাব। ডঃ এন. এল. উইট ও মিস রাথ এলিস নিশ্চয় বাড়ি চলে গিয়েছেন।

আমরা তাদের টেলিপ্যাথিক বার্তা পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু মিস এলিস নিশ্চয় তা পায়নি, নচেৎ উত্তর দিত। যাত্রার জন্য আমি এখন প্রস্তুতি নিচ্ছি।

এখানে একটি সভাতে যোগদানের জন্য আমি সময়মত এসে পড়েছিলাম এবং গত সন্ধ্যায় আরেকটি ছিল। আজ সন্ধ্যায় আবার আরেকটিতে যাব এবং এখান থেকে আমার চলে না যাওয়া পর্যন্ত প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই সভা আছে।

মিসেস ফাঙ্কি (মেরি কেরোলিন ফাঙ্কি) কি করছেন, আর মিস (মেরি এলিজাবেথ) ডাচার? তুমি কি আগের মতো পাহাড়ে ধ্যান করতে যাও? কৃপানন্দের চিঠি পেয়েছ কি?

যত শীঘ্র সম্ভব আমাকে চিঠি লিখ—তোমার চিঠি পাওয়ার জন্য আমি খুবই উদ্গ্রীব হয়ে আছি।

আশীর্বাদ ও ভালবাসা-সহ চিরদিন তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুনঃ—মিসেস ফাঙ্কি ও মিস ডাচারকে আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ জানাই।

।।২।।

(মূল ইংরেজী থেকে অনূদিত)

প্রযত্নে ই. টি. স্টার্ডি
হাই ভিউ, ক্যাভারশ্যাম
রিডিং, ইংল্যাণ্ড
৪ অক্টোবর ১৮৯৫

প্রিয় ক্রিস্টিনা[১],

তোমার সুন্দর চিঠিগুলি আমি নিয়মিত পেয়েছি। কিন্তু নানা বিষয় নিয়ে আমি এতই ব্যস্ত ছিলাম যে, শীঘ্র উত্তর দিতে পারিনি। এত দীর্ঘ এই বিলম্ব মোটেই শোভনীয় নয়, দয়া করে আমাকে মার্জনা করো। প্রতিদিনই আমি তোমাকে আমার ভালবাসা প্রেরণ করি—আমেরিকাতে লেখা আমার প্রতিটি চিঠিতে। কৃপানন্দের কাছ থেকে আমি আরেকটি চিঠি পেয়েছি। তারপর থেকে সে নীরব। সে এখন কোথায়? ডেট্রয়েটে সে খুব ভাল কাজ করেছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত; সে খুবই নিয়মানুগ ও অধ্যবসায়ী। এইসকল মানুষেরই সর্বদা সাফল্য আসে।

মরসুম শেষ হয়ে গেছে বলে এখানে ইংল্যাণ্ডে কাজের অগ্রগতি খুবই শ্লথ—আরো এক মাসের মতো আমি এখানে থাকব এবং তারপর আমেরিকা রওনা হব। মিসেস ফাঙ্কি, মিসেস ফেল্পস ও ডেট্রয়েটের সকল বন্ধুগণকে আমার ভালবাসা জানিও। পবিত্রতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সাহায্যে সব বাধা অতিক্রম করা যায়। সকল মহৎ কার্যকে অবশ্যই অপরিহার্যরূপে ধীরগতিতে চলতে হয়।

আমি সুস্থ দেহে ও আনন্দেই আছি এবং যথাবিধি এই আশায় অপেক্ষা করছি যে, কার্যসকল নিজস্ব ধারায় পরিণত হয়ে উঠবে। যখন সময় হবে, তখনি তুমি আমাকে এক পঙ্ক্তি চিঠি লিখে ডাকে দেবে। আশা করি তোমার ভগিনী এতদিনে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। প্রভু তাকে আশীর্বাদ করুন।

প্রিয় ক্রিস্টিনা, প্রভুর আশীর্বাদ তোমার ওপর চিরকাল বর্ষিত হোক—এই কামনা করি এবং তোমার জীবনের পথ শান্তিতে ও পবিত্রতায় মণ্ডিত হোক—এই হলো নিরন্তর প্রার্থনা।

তোমার চির স্নেহপরায়ণ বন্ধু
বিবেকানন্দ

---

১ এই চিঠিখানির মাত্র তিনটি পঙ্ক্তি 'বাণী ও রচনা'র ২১২ নং পত্রে ভুলক্রমে নিবেদিতার নামে ছাপা হয়েছে।

।।৩।।

(মূল ইংরেজী থেকে অনূদিত)

২২৮ ডব্লু থার্টিনাইন্থ স্ট্রীট
৮ ডিসেম্বর ১৮৯৫

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

আমি আমেরিকার মাটিতে পুনর্বার এসে উপস্থিত হয়েছি এবং ২২৮ ডব্লু থার্টিনাইন্থ স্ট্রীটের ঠিকানায় থাকবার ঘর নিয়েছি; এখানে আগামী সোমবার থেকে কাজ শুরু করব। বড়দিনের পর কোন এক সময় আমি ডেট্রয়েট ও শিকাগোর মধ্য দিয়ে ভ্রমণ শুরু করব—এরূপ ইচ্ছা আছে।

জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার ব্যাপারে আমি আদৌ পরোয়া করি না এবং আমার মনে হয় না যে, প্রবেশমূল্য নিয়ে আর কোন জনসভায় বক্তৃতা দেব। যদি তুমি মিসেস ফেল্পস বা আমাদের অন্য বন্ধুদের সঙ্গে দেখা কর এবং কয়েকটি ক্লাসের ব্যবস্থা করতে পার (প্রবেশমূল্য ছাড়া), তবে কাজের অনেকটা সুবিধা হবে।

তোমার সুযোগমত যত তাড়াতাড়ি পার চিঠি দিও এবং মিসেস ফাঙ্কিকে এবং আমাদের সকল বন্ধুকে আমার গভীরতম ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাবে।

সদা প্রভুপদাশ্রিত তোমাদের
বিবেকানন্দ

পুনঃ কৃপানন্দ তোমার ও মিসেস ফাঙ্কির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সে তোমাকে তার প্রীতিপূর্ণ শ্রদ্ধাভিবাদন জানাচ্ছে।

গীতার শক্তি ও মনোহারিত্ব

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

পূর্বানুবৃত্তিঃ ভাদ্র ১৪০৮ সংখ্যার পর

এই আলোচনাটি দুর্গাপদ ঘোষ প্রমুখ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক



ভারতীয় ভাবনায় 'শ্রুতি' ও 'স্মৃতি'

পনিষদের মতো এইসব প্রাচীন গ্রন্থ (গীতা) অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, আধুনিক কাল যেসব মহাত্মার জন্ম দিয়েছে, তাঁদের ভাব-ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে এইসব গ্রন্থরাজির রয়েছে বিশাল ভাবসাদৃশ্য। আসলে, একটা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে। এই যে নতুন সামঞ্জস্যবিধান, তা বস্তুত সেই প্রাচীন সামঞ্জস্যবিধানই; কেবল সেটি ঘটছে আধুনিক পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে। ভারত বারেবারে এই শিক্ষাই লাভ করেছে। অবস্থা বদলায়; আমাদের দরকার হয় প্রাচীন সত্যের পুনরুচ্চারণ—কেবল নতুন আঙ্গিকে। সত্য একই থাকে, বদলায় শুধু তার বহিরঙ্গ। আমাদের অতিপ্রাচীন ধারাবাহিক ঐতিহ্য থেকে পরম্পরাক্রমে আমরা এই বোধে উপনীত হই। দুটি শব্দ আছেঃ 'শ্রুতি' ও 'স্মৃতি'। শ্রুতির অর্থ 'বেদ', বিশেষত তার উপনিষদ্ অংশসমূহ—যেখানে রয়েছে শাশ্বত সত্যের প্রসঙ্গ; আর স্মৃতিগুলিতে আছে সমসাময়িক সামাজিক বিধিনিষেধের উল্লেখ ও আলোচনা। স্মৃতির স্থান শ্রুতির নিচে। ভারতীয় ঐতিহ্যে এই ভাবটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছেঃ "শ্রুতি স্মৃতি বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী"—শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধস্থলে শ্রুতির অধিকারই গুরুত্ব পাবে। শ্রুতি হলো চিরকালীন, শাশ্বত। 'সনাতন ধর্ম' বলতে শ্রুতিকে বোঝায় —যেখানে রয়েছে মানুষের স্বরূপ, ঈশ্বরের স্বরূপ, আধ্যাত্মিক অনুভূতিলাভের উপায়—এইসব চিরন্তন সত্যের কথা। এগুলি আমাদের জন্য সত্য, সত্য আমেরিকানদের জন্য, সত্য সকলের জন্য। এগুলি সার্বজনীন সত্য। বিজ্ঞানের সত্যসমূহ যেমন সার্বজনীন, শ্রুতির সত্যও তেমনি সার্বজনীন, কারণ এগুলি এসেছে এমন এক বিজ্ঞান থেকে, যে-বিজ্ঞান মানুষকে চর্চা করে তার অন্তর্লীন গভীরতায়; যে-বিজ্ঞান হলো মানবীয় সম্ভাবনার বিজ্ঞান। একেই আমরা বলি 'সনাতন ধর্ম'; 'সনাতন' অর্থে যা চিরস্থায়ী, শাশ্বত। ভগবান বুদ্ধ তাঁর উপদেশে বারেবারে এর উল্লেখ করেছেনঃ "এষ ধর্মঃ সনাতনঃ"—এই ধর্ম সনাতন বা নিত্য। এর সঙ্গে আসে 'যুগধর্ম'—যা কোন বিশেষ যুগ বা সময়কালের, ইতিহাসের কোন বিশেষ পর্বের, কোন বিশেষ শ্রেণীর ধর্ম। এরই নাম 'স্মৃতি'।

স্মৃতিগুলি আসে, যায়। ভারতবর্ষে কতগুলি স্মৃতি প্রণীত ও বর্জিত হয়েছিল? আজ পুরনো স্মৃতিগুলি যদি আমাদের জাতীয় গণতান্ত্রিক সংবিধানের বিপক্ষে চলে যায়, তবে তাদের সবগুলিকে পরিহার করা হয়। পুরনো স্মৃতিকে বদলে সমসাময়িক চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নতুন স্মৃতি গড়ে নেওয়ার সৎসাহস আমাদের আছে। ভারতবর্ষে আছে এই এক মহান ভাবনাঃ সামাজিক পরিবর্তন। এবং সেইসঙ্গে এখানে শাশ্বত শিক্ষাগুলিকে পরিবর্তিত পরিস্থিতি অনুসারে নবরূপে উপস্থাপন করা হয়। তার জন্য প্রয়োজন মহান আচার্যগণের, কারণ তাঁদের এটি করার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও অধিকার আছে। সেই অধিকার কিন্তু বিশপ, পোপ, পুরোহিত বা ঐরকম কোন প্রথাগত ধর্মীয় পদাধিকারীর প্রাতিষ্ঠানিক পদমর্যাদা থেকে আসে না। সে-অধিকার আসে আধ্যাত্মিক উপলব্ধি থেকে; সে-অধিকার উৎসারিত হয় একজন প্রকৃত আধ্যাত্মিক আচার্যের অন্তরের অসীম করুণা থেকে। এইভাবেই সৃষ্টি হয় নতুন স্মৃতিসমূহের। ভারতবর্ষ দৃঢ়ভাবে এই আদর্শকে আঁকড়ে থেকেছে। ফল হয়েছে—বৈদিক যুগ থেকে এই আধুনিক যুগ পর্যন্ত প্রচুর পরিবর্তন হয়েছে আমাদের ধর্মে, আমাদের সমাজে, আমাদের দেশে; অথচ আমরা রয়ে

গেছি সেই একইরকম। *আমরা শাশ্বত অথচ নিয়ত পরিবর্তনশীল।* 'সনাতন ধর্ম' কথাটির এ-ই হলো সারমর্ম।

অধ্যাপক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ছিলেন কলেজে বিবেকানন্দের এক-ক্লাসের ছাত্র এবং মাইসোর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। অসাধারণ মেধা ছিল তাঁর। তিনি বলেছেন ঃ "ভারতের বয়স বেড়েই চলেছে, কিন্তু ভারত কখনো বুড়িয়ে যাচ্ছে না।" ("India is ever ageing, but never old.") এর কারণ হলো, এখানে বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রয়োজনমতো সামঞ্জস্যবিধানের কাজ চলছে। এ হলো সেই ভারতবর্ষ, যা আজ নতুন পরিবেশে নব রূপ পরিগ্রহ করছে। নিজের অঙ্গে প্রয়োজনমতো পরিবর্তন সাধন করে চলেছে—এ সেই প্রাচীন ভারতবর্ষ। গাছের অঙ্গ থেকে অনেক মৃত কাঠ কেটে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। *স্মৃতিকে পরিবর্তন করার—তা-ও আবার শান্তিপূর্ণভাবে—এই যে সৎসাহস, তা একটি বিশুদ্ধ হিন্দু ঐতিহ্য।* অন্য কোন ধর্ম সে-সাহস দেখায়নি। অন্য সব ধর্মে স্মৃতিগুলিই শেষকথা; তাদের ছোঁওয়া যায় না, এবং কোন সংস্কারক ওগুলিকে পরিবর্তন করতে গেলে 'সমুচিত' শাস্তিবিধান দিয়ে তাকে হত্যা করা হয়। কিন্তু আমরা বলি, কোন স্মৃতি সেকেলে বা অচল হয়ে গিয়ে থাকলে তাকে বদলে নতুন স্মৃতি তৈরি করে নাও। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনে মোগল আমলের মুদ্রা চলবে না। তার অর্থ, আধুনিক কালে পুরনো স্মৃতিগুলির কোন মূল্য নেই। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে নতুন মুদ্রার প্রয়োজন হয়েছিল; ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রয়োজন হয়েছিল নতুন আরেকটির। প্রায় একশ বছর আগে কেউ বিদেশে গেলে ভারতীয় সমাজ তাকে একঘরে করে দিত। কিন্তু আজ আর কে এর তোয়াক্কা করে?

পরিবর্তন অনেক এসেছে; সেগুলি আমাদের ধর্মকে করেছে পরিশুদ্ধ, সমাজকে করেছে সবল সুস্থ। কিন্তু ভুললে চলবে না শ্রুতি বা সনাতন সত্যকে, মানুষের আধ্যাত্মিক স্বরূপকে এবং সেই সত্য উপলব্ধির পথে জীবনের অভিযাত্রাকে। এ-ই হলো সনাতন ধর্ম। অবতার এটির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, এবং সেটিই তাঁর মহৎ অবদান। যিনি শুধুমাত্র একজন সমাজনেতা, তিনি আসেন, মত প্রচার করেন এবং সমাজের কিছু সংস্কার করে দিয়ে যান। কিন্তু একজন অবতার সমাজকে একেবারেই বিঘ্নিত করেন না। সমাজে তিনি প্রচলন করে দিয়ে যান একটি নতুন মূল্যবোধ-ব্যবস্থার; তার সাহায্যে আমরা ভাল-মন্দ বুঝতে পারি, সংস্কার সাধিত হয় এবং সেই অনুসারে আমরা পরিবর্তিত হতে থাকি—ধীরে ধীরে। এই মৃদু, নিঃশব্দ পথেই এই মহান আধ্যাত্মিক পদ্ধতি সমাজের ওপর কাজ করতে থাকে। এটি একটি মহান ভাবনা। বরণীয় সেই আচার্য যে এসেছেন এবং চলে গেছেন—তা আমরা জানতে পারি না। কিন্তু তিনি রেখে গেছেন অসামান্য এক শক্তি। মাত্র কদিন আগে আমি বহুদূরের দেশ বুলগেরিয়ার সোফিয়া শহর থেকে একটি চিঠি পেয়েছি। আলেকজাণ্ডার নামে এক ভদ্রলোক লিখছেন; দারুণ চিঠি। তিনি বলছেন ঃ "আমার স্ত্রী এবং আমি 'The Gospel of Sri Ramakrishna' (অর্থাৎ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত'-এর ইংরেজী অনুবাদ) পড়ছি। আমার বয়স তিরিশ বছর, স্ত্রীর তেইশ। ওঁর নাম তাত্থিয়া, আমার আলেকজাণ্ডার। বইটি অসাধারণ। আমরা কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আর বেশি কিছু জানি না। আমরা চাইছি, আপনি আমাদের আরো কিছু তথ্য দিন। আমি ব্যাঙ্গালোরে বিখ্যাত চলচ্চিত্র-অভিনেত্রী দেবিকা রানীর কাছে লিখেছিলাম। উত্তরে তিনি আমাকে জানিয়েছেন, হায়দ্রাবাদের স্বামীজীর কাছে চিঠি লিখতে।" ভদ্রলোক লিখছেন যে, তিনি আরো জানতে চান শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে, বিবেকানন্দ সম্বন্ধে। এইসব অনুপ্রেরণা লাভ করতে তাঁরা এতটাই ব্যগ্র। তাই আমি লিখলাম ঃ "আমি আপনাকে কয়েকটি বই পাঠিয়ে দেব।" এবং দক্ষিণ বার্লিনে একজনকে বললাম বইগুলি ওঁদের পাঠাতে। শ্রীরামকৃষ্ণের মতো মহান আচার্যরা মানুষের জীবনে প্রবেশ করেন নিঃশব্দে, বিনা কোলাহলে, এবং পাঠকের মধ্যে ঘটতে শুরু করে পরিবর্তন। অবতার যখন আসেন, তখন এমনটাই ঘটে। শঙ্করাচার্য এই ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করেছেন যে, কিভাবে একজন অবতার সমাজে কর্ম করেন এবং মানুষকে তাদের নিজ নিজ আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে স্থাপন করে মৃদুভাবে কেমন করে সমাজের রূপান্তরসাধন করেন। কিভাবে তিনি এটি করেন? শঙ্করাচার্য মাত্র কয়েকটি বাক্যে এটিকে ব্যাখ্যা করেছেন।

শঙ্করাচার্য-কৃত গীতার ভূমিকা অধ্যয়ন করার সময় আমরা দুটি মহান ভাবনার কথা পেয়েছি। এক—সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের দরুন সমাজ অধোগতিপ্রাপ্ত হয়। অত্যধিক লোভ, ক্রোধ এবং ঐজাতীয় অন্যান্য মানসিকতার প্রকাশ দেখা যায়; তারা সমাজের নৈতিক সুস্থিতিকে বিঘ্নিত করে। অতএব ধর্মের হ্রাস এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়—যেমন শঙ্করাচার্য বলেছেন। তারপর উদগ্র ইন্দ্রিয়পরায়ণতা এবং অদম্য কামনাবাসনার প্রাদুর্ভাবের ফলে পতনের সূত্রপাত হয়; ফলে ধ্বংস হয়

বিবেক ও বিজ্ঞান। 'বিবেক' অর্থ বিচার—কী করা উচিৎ আর কী নয়, তা বিচার করার ক্ষমতা। কোনকিছুর প্রতি অত্যধিক আসক্তি দেখা দিলেই আমাদের সৎ-অসৎ বিচারবুদ্ধি ধাক্কা খায়। এর সঙ্গেই ব্যাহত হয় 'বিজ্ঞান' বা 'প্রজ্ঞা'। মানুষ তার ইন্দ্রিয়জ ক্ষুধা সংযত করতে না পারলেই তার মনোজগতে কিছু একটা ঘটে যায়। ইন্দ্রিয়রা পালায়—কঠ উপনিষদের ভাষায় বলতে গেলে—যেমন কিনা ঘোড়াগুলো মিলে গাড়িকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলে যায়, আর আরোহীকে অসহায় বলি করে। মানুষ ও তার সমাজ যখন অধঃপতনের পথে এগোয়, তখন তাদের অবস্থাও হয় এইরকম। ধর্মের গ্লানি হলে স্বাভাবিকভাবেই বাড়ে অধর্ম। নৈতিকতা কম থাকলে মানবসমাজে বাড়ে অনৈতিকতা।

মানবীয় বিবর্তন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে অবতারের ভূমিকা

ভারতবর্ষে আমাদের অসামান্য এক দৃঢ়বিশ্বাস আছে যে, যখনি এইরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং সাধারণ মানবীয় প্রজ্ঞা যখন পূর্বের সমতা ফিরিয়ে আনতে পারে না, তখনি পৃথিবীতে আবির্ভূত হন এক দৈবী সত্তা বা প্রকাশ। তাঁর শিক্ষার মধ্য দিয়ে সমাজ লাভ করতে আরম্ভ করে এক নতুন সাম্য এবং মূল্যবোধের এক নব-উপলব্ধি। ধর্মের হয় উত্থান এবং অধর্মের পতন। ঠিক এই কারণটির জন্যই আমাদের দেশে নিরন্তর নানা সমস্যা লেগে থাকলেও আমরা বেঁচে আছি বিগত ৫,০০০ বছর ধরে। বুদ্ধের জন্মের আগে এদেশে ছিল প্রচুর বুদ্ধিচর্চা এবং ব্যক্তিজীবনে ছিল অর্থহীন ধর্মীয় কৃচ্ছ্রতা। সাধারণ মানুষ বেঁচে থাকত সবরকম কুসংস্কার ও মানসিক দুর্বলতা নিয়ে। তারপর বুদ্ধ এলেন খ্রীস্টপূর্ব সপ্তম বা ষষ্ঠ শতকে। তিনি কোন সমাজসংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটালেন না। তিনি শুধু মানুষের আধ্যাত্মিক আবেগ-অনুভূতিগুলিকে উদ্দীপ্ত করে দিলেন। ফলে মানুষের মধ্যে আবার জেগে উঠল সততা, বিশ্বাসযোগ্যতা, করুণা ও সেবাভাব। মানুষের আধ্যাত্মিক সচেতনতার ফলপরিণাম এগুলি। মহান আচার্যরা কাজ করেন এইভাবেই, এবং এমন মহান মানুষদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে এইভাবেই জন্ম হয় বড় বড় সংস্কার আন্দোলনের। গাছের কেবল ডালপাতায় জল না দিয়ে গোড়ায় জল দেওয়ার মতো ব্যাপার এটি।

এইসব মহৎ মানুষ কোন সংস্কার আন্দোলন শুরু করে দেন না, কারণ এইসব আন্দোলন সমাজের বা মানুষের মূল ব্যাধিটিকে নিয়ে কাজ করে না। উদাহরণস্বরূপ, শ্রীরামকৃষ্ণ কোন সংস্কার আন্দোলন শুরু করেননি; কিন্তু তাঁর অনুপ্রেরণায় আসবে অনেক সংস্কার আন্দোলন; আসবেন কত সন্ন্যাসী, শিল্পী প্রভৃতি। তাঁর আগমনের মাধ্যমে মানবসমাজকে প্রদান করা হলো এক মৌলিক আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা। আমাদের দেশে এটিই ঘটেছে বারেবারে। ভারতবর্ষ অধোগতি দেখেছে, আবার দেখেছে ঊর্ধ্বগতি, উন্নয়ন, পুনর্গঠন। কোন জাতি বহুদিন বেঁচে থাকলে প্রায়ই তার এই ধরনের শারীরিক ও মানসিক অসুখ দেখা দেয়, কিন্তু জাতি আবার নবীন হয়ে ওঠে। এই অভিজ্ঞতার নিরিখে ভারতবর্ষ অ-দ্বিতীয়, এবং বহু ঐতিহাসিক এ-কথার উল্লেখ করেছেন।

পৃথিবীতে উৎপত্তি হয়েছে আরো অনেক সভ্যতার, তারা তাদের ভূমিকা পালন করেছে কয়েক শতক ধরে; তারপর শুরু হয়েছে পতন এবং অবশেষে এসেছে মৃত্যু। সেসব সভ্যতার চর্চা এখন আমরা করি কেবল বইতে ও সংগ্রহশালায়। আমাদের নিজেদের সভ্যতার কিন্তু রয়েছে একটি ধারাবাহিকতা। ক্ষণেক্ষণেই এই সভ্যতা হয়ে ওঠে নতুনভাবে উজ্জীবিত, তার দেহে আসে নবযৌবনদীপ্তি, আসে প্রচণ্ড শক্তি এবং তার অবস্থার ঘটতে আরম্ভ করে উন্নতি। শুরু হয় একটি নতুন যুগের, এবং মানুষের মধ্যে আসে সমুচ্চ নৈতিক সচেতনতা, মানবিক আবেগ ও সেবার মনোভাব।

এডওয়ার্ড গিবনের 'দি ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল অফ দি রোমান এম্পায়ার' বইটি পড়লে আমরা জানতে পারি, রোমান সাম্রাজ্য ছিল কী বিপুল শক্তিমান! রোমানদের অধীনে ছিল পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, দক্ষিণ ইউরোপ এবং উত্তর আফ্রিকা—প্যালেস্টাইন ও ইসরায়েল-সহ। ধীরে ধীরে এসে গেল অবনতি। কী ছিল তার চরিত্র? কী করেই বা এল তা? জাতিটা সেই একই ছিল, লোকজন ছিল বুদ্ধিমান, কিন্তু বেড়েছিল তাদের সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা। লোকেরা চাইল না শ্রমসাধ্য কাজ করতে, কিংবা পরিশ্রমের জীবনযাপন করতে। প্রত্যেকে চাইল মুনাফা ও সম্ভোগ; সমাজকল্যাণে কাজ করতে উৎসাহী রইল খুব অল্প সংখ্যক লোকই। এই করে রোমানরা অলস হয়ে পড়ল; তারা কেবল সুখের সন্ধান করল, আর কায়িক শ্রমের কাজগুলো করাল ক্রীতদাসদের দিয়ে। সুখ আর ভোগের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রুচিবোধ বিকৃত হয়ে গেল; তারা পারস্পরিক হিংসায় এবং উদ্দাম আমোদ-আহ্লাদে মত্ত হয়ে পড়ল। তাদের অ্যাম্ফিথিয়েটারগুলোতে হিংস্র জানোয়ারদের সঙ্গে লড়াই করতে নামিয়ে দেওয়া হতো ক্রীতদাসদের; উচ্চপদস্থ সরকারি কর্তাব্যক্তিরা-সহ হাজার হাজার লোক দেখত সে-দৃশ্য, আর যখন একটা সিংহ

একটা পুরুষমানুষকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলত, তখন তারা জোরে জোরে হাততালি দিয়ে উঠত। এইসব পরিস্থিতিতে সুরুচি ও মানবিক মূল্যবোধের অধোগমন লক্ষ্য করা যায়। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সেসময়ের মানুষ বুঝতে পারেনি যে পতন শুরু হয়েছে; কারণ পতনটা হচ্ছিল ধীরগতিতে। সভ্যতা গড়ে ওঠে ধীরে, পড়েও ধীরে। শখানেক বছর কেটে যাওয়ার পরেই কেবল মানুষ বুঝতে পারে যে, সমাজজীবনে কোথাও একটা গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। রোমান সাম্রাজ্যে ধর্মের অবস্থাটাও গিবন উল্লেখ করেছেন দারুণ একটি বাক্যে। রোমান সাম্রাজ্যে সব ধর্মীয় সম্প্রদায় ও ধর্মমতকে সাধারণ মানুষ যতটা সত্য বলে বিশ্বাস করতেন, দার্শনিকরা ভাবতেন ততটাই মিথ্যা বলে, এবং বিচারকরা ভাবতেন ততটাই ব্যবহার-যোগ্য (useful) বলে! বইয়ের শিরোনাম—'দি ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল অফ দি রোমান এম্পায়ার' খুবই ইঙ্গিতবাহী। সেদেশের মানুষ তখন যাপন করত অনৈতিক জীবন। যখন বিদেশী আক্রমণকারীরা এল, তখন যুবসম্প্রদায় যুদ্ধ করে সাম্রাজ্য রক্ষা করতে চাইল না। যুদ্ধ করার জন্য তারা রেখে দিয়েছিল ভাড়া করা সৈন্যদল।

আমরা আরাম চাই, চাই সুখ। নাইট ক্লাব ছেড়ে মানুষ সমরাঙ্গনে যেতে চায় না। এই অধোগতি যখন সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশের মানুষকে আক্রমণ করে, তখন গোটা সৌধটা ভেঙে পড়ে। একটিমাত্র বৈদেশিক আক্রমণে গোটা রোমান সমাজ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল; আর উঠল না। এ-ই হলো রোমান সাম্রাজ্যের কাহিনী। ইজিপ্ট, ব্যাবিলোনিয়া, আসিরিয়া—এইরকম অন্য অনেক সাম্রাজ্যও একইরকম পর্বের মধ্য দিয়ে গেছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপের অনেক চিন্তাবিদ্ সবিস্ময়ে ভাবতে থাকেন, ইউরোপও এমনই একটা পর্বের মধ্য দিয়ে চলছিল কিনা। ইউরোপীয় সভ্যতা নিয়ে ইউরোপে বিংশ শতকে প্রথম যে-বইটি প্রকাশিত হয়, তার নাম 'দি ডিক্লাইন অফ দি ওয়েস্ট'; লেখক জার্মান দার্শনিক-পণ্ডিত অসওয়াল স্পেংলার (১৮৮০-১৯৩৬)। খুব জোরের সঙ্গে লেখা বইটিতে লেখক বলেছিলেন, পাশ্চাত্য সমাজ তার দায়িত্ব পালন করে ফেলেছে; এখন সে পতনের পথে। কিন্তু ফ্রান্সের হেনরি মাসাউ (যিনি 'ইন ডিফেন্স অফ দি ওয়েস্ট'-এর লেখক)-এর মতো কিছু রক্ষণশীল মানুষ সেকথা মানেননি; তাঁদের মনে হয়েছিল যে তাঁরা তখনো যথেষ্ট শক্তিশালী, কারণ তাঁদের অধীনে ছিল অনেকগুলি উপনিবেশ। তারপর এল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—যা ছিল আরো সাঙ্ঘাতিক; এবং এখন পাশ্চাত্যে অনেক চিন্তাভাবনা হচ্ছে তাদের সংস্কৃতিতে 'কিছু একটা'র অভাবের প্রসঙ্গ নিয়ে। অত্যধিক ক্রূর বস্তুতান্ত্রিকতা এবং চাহিদার দ্রুত বৃদ্ধি আসলে এক উৎকট সমাজ-সমস্যার তাৎপর্যবাহী। এইসব কারণে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার পতন নিয়ে আরো নতুন নতুন গ্রন্থ লিখিত হয়ে চলেছে। [ক্রমশ] (নয়)

ভাষান্তর ঃ অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য

অনুষ্ঠান-সূচী ঃ অগ্রহায়ণ ১৪০৮

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য ঃ **স্বামী সুবোধানন্দ**
কার্তিক শুক্লা দ্বাদশী
১১ অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার
(২৭ নভেম্বর ২০০১)
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ
কার্তিক শুক্লা চতুর্দশী
১৩ অগ্রহায়ণ, বৃহস্পতিবার
(২৯ নভেম্বর ২০০১)

পূজাতিথি-কৃত্য ঃ **শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা**
কার্তিক শুক্লা নবমী
৮ অগ্রহায়ণ, শনিবার
(২৪ নভেম্বর ২০০১)
শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা
কার্তিক পূর্ণিমা
১৪ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার
(৩০ নভেম্বর ২০০১)

একাদশী-তিথি ঃ ১০, ২৫ অগ্রহায়ণ
যথাক্রমে সোমবার, মঙ্গলবার
(২৬ নভেম্বর, ১১ ডিসেম্বর ২০০১)

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ৩

পাশাপাশি ঃ (১) শাকম্ভরী, (৩) রক্তবীজ, (৫) শ্যামা, (৭) বলরাম, (৯) প্রভঞ্জন, (১০) জয়দ্রথ, (১১) দ্রোণ, (১৩) বিদ্যা, (১৪) ইলা, (১৫) অপ্সরা, (১৭) প্রসেনজিৎ, (১৮) কপিল, (২২) বজ্র, (২২) বিজয়া

ওপর-নিচ ঃ (২) কলাবতী, (৩) রমা, (৪) বীরভদ্র, (৫) শ্যাম, (৬) মন, (৮) রাবণ, (১০) জবালা, (১২) নারায়ণ, (১৩) বিনায়ক, (১৪) ইন্দ্রসেন, (১৬) অজিন, (১৯) লব, (২০) ব্রজ

পাতঞ্জল-যোগসূত্র

ব্যাখ্যাতা ঃ স্বামী প্রেমেশানন্দ

সূত্রানুবাদ ঃ স্বামী শরণ্যানন্দ

সম্পাদনা ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি ঃ ভাদ্র ১৪০৮ সংখ্যার পর]

সাধনপাদ

পরিণামতাপ-সংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ।।১৫।।

পরিণামকালে, ভোগকালে ভোগব্যাঘাতের আশঙ্কায়, সুখকর নূতন তৃষ্ণা উৎপাদন করে বলিয়া এবং গুণবৃত্তিগুলি পরস্পরবিরোধী বলিয়া বিবেকীর নিকট সবই যেন দুঃখকর বোধ হয়।

মন্তব্য ঃ এই অবস্থায় কাহারও যদি বিচারবুদ্ধি পরিস্ফুট হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে এই জীবনের সবই দুঃখকর বলিয়া মনে হয়।

পরিণাম-দুঃখ—জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা অবিরাম নানাপ্রকারে পরিণত না হইতেছে। নিজের দেহ শিশুকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত কত অবস্থার ভিতর দিয়া চলে। মানুষের মনেরও পরিণাম এত বিচিত্র যে, গোঁড়া ব্রাহ্মণের ছেলে কালাপাহাড় মুসলমান হইয়া হিন্দুধর্মের উচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সংসারে পিতা-পুত্রের নানাপ্রকার কলহে মারাত্মক পরিণতি হইতে দেখা যায়। আত্মীয়-কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কাহার পরিণাম কিরূপ দাঁড়াইবে তাহা ভাবিলে আতঙ্ক হয়। আর সকল বস্তুরই "জায়তে অস্তি বর্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতি" (জন্ম, বিদ্যমানতা, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয় ও নাশ)—এই ষড়্‌বিকার বা পরিণাম সুনিশ্চিত। ভূমিকম্পে বড় বড় ধনীলোক নিজের প্রাসাদের নিম্নে পড়িয়া মরে। অর্থসঞ্চয় করিয়া লোহার সিন্দুকে রাখিলে ডাকাত আসিয়া মালিকের গলা কাটিয়া ধন লইয়া যায়। যাহার চোখ আছে সে দেখে, এই প্রাকৃতিক পরিণামের রাজ্যে কোন বস্তুই নিশ্চিন্তমনে স্বস্তিতে থাকিতে দেয় না।

তাপ-দুঃখ—আমাদের নিজেদের দেহে ব্যাধি-জরা-মরণ-দুঃখ স্থায়ী অধিবাসী। মনে কত দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা দিন-রাতই মানুষকে কষ্ট দিতেছে। আমরা তো সারাদিন শরীর-মনের দুঃখনিবৃত্তির জন্য খাটিয়া মরি। কিন্তু আধ্যাত্মিক দুঃখ দেহ থাকিতে কখনো দূর হয় না। তারপর আমরা যেখানেই যাই না কেন, মশা-মাছি, চোর-ডাকাত, নিন্দুক, ভিন্ন-মতাবলম্বী এবং হিংস্র জন্তুর ভয়ে শঙ্কিত থাকিতে হয়। অন্যান্য জীবের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মানুষ বন্দুক, কামান প্রভৃতি কত অস্ত্র নির্মাণ করিয়াছে, তবুও এই আধিভৌতিক দুঃখ দূর হইল না। ইহা কি একটি দারুণ তাপের বিষয় নহে? আবার সারা বৎসর ধরিয়া শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষার উপদ্রব কত সহ্য করিতে হয়। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড়, ভূমিকম্প, বজ্রপাত, উল্কাপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎপাত মানবজীবনের সকল দুঃখকেই যেন চিরসঙ্গী করিয়া রাখিয়াছে। ইহা আধিদৈবিক তাপ। আমরা লালসায় এত মোহগ্রস্ত অন্ধ হইয়া রহিয়াছি যে, দারুণ ত্রিতাপে যে জ্বলিয়া মরিতেছি তাহা এই আশার ছলনায় দেখিয়াও দেখি না। কিন্তু বিবেকবুদ্ধি একটু জাগিয়া উঠিলে এই জগতে বাস, এই মানবদেহ ধারণ দারুণ শাস্তি বলিয়া মনে হয়।

সংস্কার-দুঃখ—"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য-কর্মকৃৎ" (গীতা, ৩।৫)—কাজ না করিয়া কোন জীব ক্ষণকালও নিশ্চল হইয়া থাকিতে পারে না। একটু নড়িলে-চড়িলেই আবার তাহা সংস্কাররূপে চিত্তে সঞ্চিত হইয়া থাকে। আমাদের সকল কর্মকেই 'ব্যুমেরাং' অস্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা যায়। পূর্বকৃত কর্মের প্রেরণায় যখন আমরা সেই কর্মের পুনরাবৃত্তি করি, তাহা তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া আসিয়া আমাদের চিত্তে সংস্কাররূপে পরিণত হইয়া যায়।

কোন অনাদিকালে আমাদের সূক্ষ্মদেহে একটু কিছু করিবার প্রবৃত্তি কোন অজ্ঞাত কারণে উপস্থিত হইয়াছিল। সেই আদিকর্ম ঘুরিয়া ঘুরিয়া একবার কর্ম, একবার সংস্কার-রূপে পরিণত হইতে হইতে আমাদিগকে কত কোটি বৎসর এই সংসারপথে চক্রের ন্যায় অবিরাম ঘুরাইতেছে! অনন্তকালের অভ্যাসবশত এই দারুণ দুঃখময় ঘূর্ণনকে আমরা 'জীবন' বলিয়া মনে করি এবং এই জীবন রক্ষার জন্য কী দারুণ ব্যর্থ চেষ্টা যে করিয়া থাকি, তাহা চোখে পড়িলে মানুষকে পাগল করিয়া তুলে। এখন আমরা এমন এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছি যে, এই কর্মচক্রের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের কোন উপায় নাই বলিয়াই মনে হয়। আমরা কি প্রয়োজনে যে এই জীবনযুদ্ধ চালাইয়া যাইতেছি তাহার কিছুই বুঝিতে পারি না। কেবল এক আশাই যেন আমাদের জীবনের পরিচালক।

বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত হইলে যাহা করিয়াছি এবং যাহা করিতেছি—কোনটাই আমার উপকারক বলিয়া বোধ হয় না। এই আতঙ্কে শাস্ত্রজ্ঞানহীন বহু বিবেকবান ব্যক্তি শূন্যবাদী হইয়া আত্মহত্যার ব্যর্থ চেষ্টায় জীবনপাত করিয়াছেন।

গুণবৃত্তিবিরোধ দুঃখ—এই জগতে সকল বস্তুই তিন গুণে নির্মিত, আবার এই তিনটি গুণ পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাববিশিষ্ট। সত্ত্বগুণী বলেনঃ ঐ নীলাকাশের অপূর্ব সৌন্দর্য-মাধুর্য ভাল করিয়া লক্ষ্য কর। রজোগুণী অমনি

বলিয়া উঠেন : চল, আমরা ঐ নীলাকাশতলে কে কত তাড়াতাড়ি ছুটিতে পারি দেখি। তমোগুণী বলিলেন : দেখ, ছুটাছুটি করিয়া হয়রান হইয়া লাভ কি? চল আমরা পরম স্বস্তিতে তৃণশয্যায় শুইয়া আনন্দলাভ করি। ব্রহ্মা বলেন : নূতন নূতন জিনিস সৃষ্টি কর। বিষ্ণু বলেন : আর বাড়াইয়া লাভ কি? যেগুলি আছে সেগুলিকে রক্ষা কর। শিব বলেন : ঐসব হাঙ্গামায় দরকার কি? জগৎ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দাও। সমস্ত জগৎটাই এই তিন গুণের খেলা।

নিজেদের জীবনেও এই তিনগুণের প্রেরণাতে সবাই ছুটাছুটি করিতেছি। সুষুপ্তির পর যখন জাগিয়া উঠিলাম, তখন দেহমনে বেশ একটা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করিলাম। তখন বিদ্যার্থী পড়িতে বসে, ভক্ত ভগবানের চিন্তায় নিরত হয়, ভোগী কাননে কাননে ভ্রমণ করিয়া সৌন্দর্য সম্ভোগ করে। কিছুক্ষণ পরে মনের অন্তস্তল হইতে রজোগুণ জাগিয়া উঠিয়া কর্তব্যকর্ম করিবার প্রেরণা দেয়। তখন সকলে কাজকর্ম লইয়া মাতিয়া উঠি। কাজ করিতে করিতে অবসন্ন হইয়া রাত্রিতে ঘুমাইয়া পড়ি। অনাদিকাল হইতে আমরা এই তিন গুণের গোলামি করিতে করিতে জীবন কাটাইতেছি। যাহারা বুঝিতে পারে না তাহারা এই জীবনকে তাহাদের অধীন মনে করিয়া বেশ একটা গর্বসুখ অনুভব করে। কিন্তু যাহারা চক্ষুষ্মান তাহারা স্পষ্ট দেখিতে পায়, জীবনের চিন্তা-ভাবনা কাজকর্ম সব কিছুতেই আমরা তিনগুণের ক্রীতদাস মাত্র— "ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ মোহিতম্।" (গীতা, ৭।১৩)

শুধু যে ব্যক্তিগত জীবনেই এই তিনগুণের ঘাত-প্রতিঘাত চলিতেছে তাহা নয়, আমাদের সহবাসীদের মধ্যেও এই তিনগুণের বৈচিত্র্যহেতু দৈনন্দিন ব্যবহারে কত যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয় তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া কেহ বুঝিবে না। এমনকি যেসব বস্তু লইয়া আমরা সংসারে বাস করি, তাহাতেও এই তিনগুণের বৈচিত্র্য এবং ঘাত-প্রতিঘাত সর্বদাই অনুভব করা যায়। তিন প্রকৃতির লোকের তিনরূপ খাদ্য, তিনরূপ পোশাক-পরিচ্ছদ, এমনকি কণ্ঠস্বর পর্যন্ত তিনগুণে ত্রিবিধরূপে রঞ্জিত। এইসব রুচিবৈচিত্র্য, কর্মবৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে মানাইয়া চলা যে কী দুষ্কর, তাহা আমরা অবিরাম দেখিতেছি। এই গুণবৃত্তিবিরোধ হেতুই সমাজ ও দেশ বৈচিত্র্যময় হইয়া আছে।

অতএব দেখা যাইতেছে আমরা ইচ্ছামত সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক কর্ম—কোনটাতেই স্থির হইতে পারি না। মুমুক্ষু সাধক সর্বদা ভগবচ্চিন্তায় মগ্ন হইয়া থাকিতে চান, যেহেতু বহুজন্মের অভিজ্ঞতার ফলে ঈশ্বরচিন্তাই শান্তি-লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া তিনি জানিয়াছেন। কিন্তু তিনি ভগবচ্চিন্তায় কিছুক্ষণ ডুবিয়া থাকিলেই শরীর-মন তাহা সহ্য করিতে পারে না। মুমুক্ষু সাধককে বহু জন্ম ধরিয়া রজঃ ও তমঃর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হয়। উচ্চাঙ্গের সাধকদিগকেও এই জীবনে মনকে সম্পূর্ণরূপে সমাহিত করিতে দারুণ উদ্যম করিতে হয়। তোতাপুরীর মতো মহাপুরুষকেও চল্লিশ বৎসর ধরিয়া অবিরাম এই যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। আর আমরা তো নিত্যই রজঃ ও তমোগুণের অত্যাচার প্রত্যক্ষ করি।

হেয়ং দুঃখমনাগতম্।।১৬।।

যে-দুঃখ উৎপন্ন হয় নাই, তাহা ত্যাগ করা কর্তব্য।

দ্রষ্টৃ দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ।।১৭।।

দ্রষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া দুঃখকে ত্যাগ করা উচিত।

মন্তব্য : আমরা বহুকাল এই দুঃখ ভোগ করিয়াছি। যাহা ঘটিয়া গিয়াছে সেই সম্বন্ধে ভাবিয়া কোন লাভ নাই। আর যাহাতে এই দুঃখভোগ করিতে না হয় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। এই দুঃখের হেতু—আমি চিৎস্বরূপ এবং প্রকৃতির সকল কাজের সাক্ষী মাত্র; কিন্তু ভ্রমে পড়িয়া নিজেকে দৃশ্যের সঙ্গে এক করিয়া ফেলিয়াছি।

প্রকাশক্রিয়াস্থিতিশীলং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং
ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্।।১৮।।

'দৃশ্য'-এর অর্থ পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয়। ইহারা প্রকাশ, ক্রিয়া ও স্থিতিশীল এবং পুরুষের ভোগ ও মুক্তির কারণ।

বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি গুণপর্বাণি।।১৯।।

গুণের কয়েকটি অবস্থা আছে—বিশেষ, অবিশেষ, মহৎ ও প্রকৃতি।

মন্তব্য : এই জগতের সকল বস্তু—আমাদের মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় সবই সত্ত্ব, রজঃ তমঃ—এই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি হইতে জাত, তাই সৃষ্টির সবই ত্রিগুণময়। প্রকৃতি প্রথমে একেবারে ক্রিয়াহীন একটি জড়বস্তুস্বরূপ হইয়া থাকেন। তাহা হইতে সমষ্টি-বুদ্ধির প্রকাশ হয়। বুদ্ধিবৃক্ষের ফল পঞ্চ তন্মাত্র, তাহা হইতে সৃষ্ট হয় এই স্থূলজগৎ। ইহা ভাল করিয়া বুঝিলে জগৎটা যে কি ভেলকিবাজী তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। তাহার ফলে মানুষ মুক্তির জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে।

দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোঽপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ।।২০।।

দ্রষ্টা চৈতন্যমাত্র, তিনি পবিত্রতাস্বরূপ হইয়াও বুদ্ধির মাধ্যমে দেখিয়া থাকেন।

তদর্থ এব দৃশ্যস্যাত্মা।।২১।।

চিন্ময় পুরুষের জন্য প্রকৃতি পরিণামপ্রাপ্ত হয়।

মন্তব্য : আমি যদিও চিন্মাত্র, তথাপি আমি যে এই জগৎকে জানি, তাহার কারণ আমি নিজের কথা ভুলিয়া গিয়া জগতের দ্রষ্টা বুদ্ধির সহিত এক হইয়া গিয়াছি। আমার সম্মুখে যেদিন বুদ্ধি আসিয়া উপস্থিত হইল, সেইদিন বুদ্ধির সম্মুখস্থ প্রকৃতির যত খেলা তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইলে আমি সেই প্রতিবিম্বযুক্ত বুদ্ধিকে দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া গেলাম। তাই আমি বোধ করি, প্রকৃতির এই খেলা যেন আমার জন্যই চলিতেছে। [ক্রমশ] (সাত)



কার্ত্তিক ১৩০৮/
অক্টোবর ১৯০১

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

[গুরু কে? অধিকারী নির্ণয়।]

বিজয়। ব্রাহ্মসমাজের কাজ করতে হয়, তাই সদাসর্ব্বদা আসতে পারি না; সুবিধা হলেই আসবো।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রতি)। দেখ, আচার্য্যের কাজ বড় কঠিন, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ ব্যতিরেকে লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না।

"যদি আদেশ না পেয়ে উপদেশ দাও, সে উপদেশ লোকে শুনবে না, সে উপদেশের কোন শক্তি নাই। আগে সাধন করে বা যেকোনরূপে হোক ঈশ্বরকে লাভ করতে হয়, তারপর আদেশ পেয়ে Lecture দিতে হয়। অমনি অমনি Lecture-এ কি ফল হবে?

"ওদেশে একটী পুকুর আছে, নাম হালদারপুকুর। তার পাড়ে রোজ লোকে বাহ্যে করে রাখ্‌ত, পরদিন সকালে যারা ঘাটে আস্‌তো, তারা তাদের গালাগালি দিয়ে খুব গোলমাল কর্‌তো। কিন্তু গালাগালে কোন কাজ হতো না—আবার তার পর দিন সেই পাড়েতেই বাহ্যে। শেষে কোম্পানির চাপরাসী এসে নোটিস্ টাঙ্গিয়ে দিলে যে, 'এখানে কেউ ওরূপ কাজ করতে পারবে না, যদি কর, তবে শাস্তি হবে।' কোম্পানির এই নোটিসের পর আর কেউ পাড়ে বাহ্যে কর্‌তো না।

"তাঁর আদেশের পর যেখানে সেখানে আচার্য্য হওয়া যায় ও Lecture দেওয়া যায়। যে তাঁর আদেশ পায়, সে তাঁর কাছ থেকে শক্তি পায়। তখন এই কঠিন আচার্য্যের কর্ম্ম কর্‌তে পারে।

"একজন বড় জমিদারের সঙ্গে একজন সামান্য প্রজা বড় আদালতে মোকদ্দমা করেছিল। তখন বুঝ্‌তে হবে যে, ঐ প্রজার পেছনে একজন বলবান্ লোক আছে। হয়তো আর একজন বড় জমিদার তার পেছনে থেকে মোকদ্দমা চালাচ্ছে। মানুষ সামান্য জীব, ঈশ্বরের সাক্ষাৎ শক্তি না পেলে আচার্য্যের এমন কঠিন কাজ করতে পারে না।"

বিজয়। মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে যে Lecture উপদেশাদি হয়, তাতে কি লোকের পরিত্রাণ হয় না?

[সচ্চিদানন্দ গুরু ও মুক্তি]

শ্রীরামকৃষ্ণ। মানুষের কি সাধ্য যে, অপরকে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত করে! যাঁর এই ভুবনমোহিনী মায়া, তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত করতে পারেন। সচ্চিদানন্দ গুরু বই আর গতি নাই। যারা ঈশ্বরলাভ করে নাই, যারা তাঁর আদেশ পায় নাই, যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান্ হয় নাই, তাদের কি সাধ্য যে, জীবের ভববন্ধন মোচন করে।...

রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম

কণ্খল্ [কনখল]

উদ্বোধনের পাঠক মহোদয়গণ ১৫ই ভাদ্রের উদ্বোধনে রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম-সম্বন্ধী [সম্বন্ধীয়] স্বামী কল্যাণানন্দর পত্র* পাঠ করিয়াছেন।

যদিও তীর্থস্থানে অন্নসত্রাদির সদ্ভাব থাকায় সাধুদিগকে ভিক্ষাক্লেশ পাইতে হয় না সত্য, কিন্তু যেসকল তীর্থস্থান লোকালয় হইতে দূরে, বিশেষত পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত, তথায় রোগাক্রান্ত হইলে যে তাঁহাদিগকে সমধিক ক্লেশ ভোগ করিতে হয় তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সাধু মহাত্মারা সচরাচর একাকী বিচরণ ও অবস্থান করিতে ভালবাসেন, সুতরাং অসুস্থ হইলে তাঁহাদিগকে যে কত যাতনা সহ্য করিতে হয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কত মহাত্মারই না সামান্য সেবার অভাবে সমগ্র জগতের শুভকল্পে নিযুক্ত পুণ্যপুঞ্জময় দেহ বিসর্জ্জিত হইয়া থাকে।

উপরোক্ত [উপরি উক্ত] অভাবের গুরুত্ব অনুভব করিয়া তৎ-প্রতিবিধানের যৎসামান্য চেষ্টা স্বরূপে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজী মহারাজের অনুবর্ত্তী সন্ন্যাসিমণ্ডলী রোগগ্রস্ত, অসহায় সাধু ও তীর্থযাত্রীদিগের পরিচর্য্যার নিমিত্ত গত আষাঢ় মাস হইতে হরিদ্বারের নিকট কণ্খলে [কনখল-এ] উক্ত সেবালয় স্থাপন করিয়াছেন। ঐ সেবালয়ে ঔষধ ও পথ্য প্রদান করিয়া সাধু ও দরিদ্র তীর্থযাত্রীদিগের সেবা করা হইতেছে। সহায়তা পাইলে ক্রমে ক্রমে অন্য তীর্থেও এবম্বিধ দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

পরের অভাব ও ক্লেশে আপনি অভাব ও ক্লেশ বোধ করিয়া উৎফুল্ল অন্তরে তাহা দূর করিতে সচেষ্ট হওয়া মনুষ্যজীবনের সার্থকতা সিদ্ধির অন্যতম উপায়। যাঁহারা ভারতের প্রাচীন পবিত্র ধর্ম্মভাব আজিও প্রদীপ্ত রাখিয়াছেন, যাঁহারা ভারতবাসীর, কেবল ভারতবাসীর কেন, সমগ্র জগদ্বাসীর হিতসাধনের জন্য আপনাদিগের মহৎ জীবনে মহৎ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অসুস্থতার সময়, তাঁহাদিগের শারীরিক ক্লেশ উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করা যে পরম কল্যাণকর সেবিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহা অপেক্ষা মনুষ্যের শরীর ও অর্থের আর কি সদ্ব্যবহার হইতে পারে? এই জন্যই আমরা আশা করি যে, সকলেই আপনাপন সাধ্যানুসারে সাহায্য করিয়া উক্ত সেবালয়ের উৎকর্ষ ও স্থায়িত্ব বিধান করিবেন।

যিনি যাহা কিছু এই শুভানুষ্ঠানের জন্য প্রদান করিবেন, তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও তাহার প্রাপ্তি স্বীকার "প্রবুদ্ধ ভারত" পত্রে প্রকাশিত হইবে।

টাকা পাঠাইবার ঠিকানা ঃ স্বামী বিমলানন্দ, সহকারী সম্পাদক, "প্রবুদ্ধ ভারত", অদ্বৈত আশ্রম, মায়াবতী, আলমোড়া (কুমায়ুন)।

* ভাদ্র ১৩০৮ সংখ্যার 'উদ্বোধন'-এ প্রকাশিত স্বামী কল্যাণানন্দজীর এই পত্রটি আমরা গত ভাদ্র ১৪০৮ সংখ্যায় এই বিভাগে প্রকাশ করেছি।—সম্পাদক

সঙ্কলন ঃ রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

নতুন পৃথিবীর তীর্থাস্বাদন

স্বামী স্মরণানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

শিকাগো

শিকাগো! শব্দটি উচ্চারিত হলেই প্রতিটি হিন্দুর অন্তরে বিশেষ উদ্দীপনা জাগরিত হয়। কারণ, এই শিকাগোতেই স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৩-এর সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত ধর্মমহাসভার অভিভাষণে তাঁর বাগ্মিতার দ্বারা পাশ্চাত্য জয় করেছিলেন। কাজেই অনেক স্বপ্ন নিয়ে শিকাগো শহরের মাটিতে পা রাখলাম। কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই, অনেকটাই আশাহত হলাম।

আমাদের আশ্রমটি হাইড পার্ক বুলেভার্ডের অভিজাত লোকালয়ে অবস্থিত। তিনটি বাড়ি রয়েছে। পাশাপাশি দুটি বড় বাড়িতে আশ্রম। অন্য বাড়িটি 'শ্রীমায়ের বাড়ি' নামে পরিচিত। মূল আশ্রম আর মায়ের বাড়ির মাঝে অন্য ব্যক্তির একটি বাড়ি রয়েছে। 'মায়ের বাড়ি' নামক এই বাড়িটিতে কখনো কখনো মহিলা ভক্তেরা থাকেন।

স্বামী চিদানন্দ ছাড়া আরো তিনজন আমেরিকান সন্ন্যাসী এই আশ্রমে থাকেন। তাঁদের মধ্যে দুজন অশীতিপর। ১৯৩০ সালে শুরু হওয়ার পর এই আশ্রমের ওপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে।

৪ মে আমি শিকাগোর কেন্দ্রস্থলে (down-town) মিস্টার হেলের বাড়ি একসময়ে যেখানে ছিল, সেই স্থানটি দেখতে গেলাম। সেখানে এখন একটি গগনচুম্বী অট্টালিকা হয়েছে। একইরকমভাবে মিসেস লায়ন যেখানে থাকতেন, সেখানেও এখন একটি বিশাল হোটেল হয়েছে। এই দুটি বাড়িই বহুবার স্বামী বিবেকানন্দের অবস্থানের মাধ্যমে পবিত্র হয়েছিল। যেখানে তিনি ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে বসে পড়েছিলেন, আর মিসেস হেল বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেন—সেখানে এখন একটি চার্চ হয়েছে। অবশ্য লিঙ্কন পার্ক এখনো আছে। স্বামীজী সেখানে প্রাতঃভ্রমণ করতেন। একবার তিনি এই পার্কে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে বসেছিলেন। এক ভদ্রমহিলা তাঁর শিশুটিকে স্বামীজীর কোলে বসিয়ে গিয়েছিলেন। শিশুটিও সেখানে চুপ করে বসেছিল যতক্ষণ না তার মা আবার এসে তাকে কোলে তুলে নেন। এবং এই ঘটনা পর পর বেশ কয়েকদিন ঘটেছিল! আর্ট ইনস্টিটিউট—যেখানে স্বামীজী তাঁর ঐতিহাসিক শিকাগো বক্তৃতা দিয়েছিলেন, এখনো সেখানেই রয়েছে, কিন্তু এর ভিতরে অত্যধিক পরিবর্তন হয়েছে। যেখানে বিশাল শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে স্বামীজী বক্তৃতা করেছিলেন, সেই বিখ্যাত কলম্বাস হলটিকে খুপরি খুপরি করে মাত্র ৫০০ শ্রোতার জন্য একটা অডিটোরিয়াম নির্মিত হয়েছে। বাড়ির বাকি অংশ এখন একটি বিশাল শিল্প-সংগ্রহশালা। আরো বহু স্থান আছে, শিকাগো অবস্থানকালে যেখানে যেখানে স্বামীজী গিয়েছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দা অসীম চৌধুরী এই বিষয়ে একটি আয়াসসাধ্য গবেষণা করেছেন। অদ্বৈত আশ্রম থেকে তাঁর বইটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।



শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউট

মিশিগান হ্রদটি যেন দেশের অভ্যন্তরে এক সমুদ্রের মতো—জল স্বচ্ছ ও স্বাদু। তার তীরে অবস্থিত এই শিকাগো আমেরিকার তৃতীয় বৃহত্তম শহর। পুরনো শহর। তাই পৃথিবীর পুরনো স্থাপত্যের নিদর্শন এখনো রয়েছে। আমাদের কেন্দ্রটি হ্রদটির বেশ কাছেই। শিকাগোকে অনেক সময়ে ঝোড়ো-শহর বলা হয়, কারণ প্রায়ই প্রবল ঠাণ্ডা বাতাস শহরের ওপর দিয়ে বয়ে যায়। এবং আবহাওয়াও দুর্নির্ণেয়। একদিন সারারাত পাখা চালিয়ে আমাকে শুতে হলো, পরেরদিন সামান্য বৃষ্টির পর এমন ঠাণ্ডা হলো যে,

মোটা সোয়েটার চাপাতে হয়েছিল। গ্রীষ্মে ভালই গরম, তাপমাত্রা ৯০° ফারেনহাইট হয় কখনো। আবার শীতকালে –২০° ফারেনহাইটে নেমে যায়। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ও খুব প্রাচীন। এর প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে নোবল প্রাইজ পাওয়া মানুষ অনেক আছেন।

৫ মে সকালে আমরা ২½ ঘণ্টার পথ 'গ্যাঞ্জেস রিট্রিট'-এর উদ্দেশে রওনা দিলাম। এই 'গ্যাঞ্জেস' নামটি বরোদার মহারাজার দেওয়া। তিনি যখন মিশিগানে এসেছিলেন, তখন এখানকার গভর্ণরের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা হয়েছিল। গভর্ণরের অনুরোধে তিনি চার-পাঁচটি স্থানের নামকরণ করেন। এই 'গ্যাঞ্জেস' নামটি তাদের অন্যতম। প্রায় ১০০ একর জায়গার ওপর এই রিট্রিটটি অবস্থিত। এখানকার (Vivekananda Monastery) সবই অতিকায়। একটি প্রার্থনাকক্ষ আছে—১০০ জন চেয়ারে বসতে পারেন। একটি অডিটোরিয়াম আছে—৫০০ জনের বসার ব্যবস্থা। দুটো খাবার ঘর—একটা বড়, একটা ছোট। সাধু ও অতিথিদের জন্য কয়েকটি বাড়ি। মহিলা অতিথিদের জন্য রাস্তার উলটোদিকে ছয়টি বাড়ি। সব মিলিয়ে এক বৃহৎ ব্যাপার। ভারত থেকে প্রচুর সেগুন কাঠ আনিয়ে এইসব বাড়ি তৈরির কাজে লাগানো হয়েছে। এখন কর্মীর অভাবে এর রক্ষণাবেক্ষণই মহা সমস্যা।

স্বামী চিদানন্দ আমাকে হল্যাণ্ডে নিয়ে গেলেন। হল্যাণ্ডের কিছু মানুষ আমেরিকায় এসে এই ছোট্ট সুন্দর শহরটিতে থাকেন। বসন্তকাল বলে হল্যাণ্ডের জাতীয় ফুল 'টিউলিপ' সর্বত্র ফুটে রয়েছে। চমৎকার রঙের বাহার। পরদিন সকালে মিশিগান হ্রদ দেখতে গেলাম। তরঙ্গরাশি মনোরম তীরে এসে আছড়ে পড়ছে। জলের রঙেরও পরিবর্তন হচ্ছে। তার তীরে অবস্থিত আকাশছোঁয়া গাছের সারি খুবই চিত্তাকর্ষক। দুপুরে খাওয়ার সময়ে কিছু ভক্ত এসেছিলেন। বিকালে শিকাগোতে ফিরে এলাম।

রবিবার সকাল ১১টায় 'আজকের আধ্যাত্মিক আদর্শ—শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রসঙ্গে বক্তৃতা হলো। ২০০-র বেশি শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে ৪০-৫০ জন আমেরিকান। বাকি ভারতীয়। দুপুরে সকলের জন্য ভারতীয় খানার ব্যবস্থা ছিল। অনেকেই অবশ্য নিজেরা খাবার নিয়ে এসেছিলেন। পরদিন আমরা লারমণ্টে 'হিন্দু-মন্দির' দেখতে গেলাম। বেশ বড় জায়গা। সাজানো। বড় লন আছে। মন্দিরে প্রধান দেবতা—শ্রীভেঙ্কটেশ্বর (বালাজী)। অন্যান্য দেবমূর্তিও রয়েছে। দক্ষিণ ভারতীয় পূজারীরা পূজা-অর্চনা করেন। কলকাতায় নির্মিত স্বামী বিবেকানন্দের একটি ব্রোঞ্জমূর্তি শিকাগোতে অন্যত্র বসানোর জন্য আনা হয়েছিল। কিন্তু ঘটনাচক্রে সেটি এই হিন্দু-মন্দিরের চত্বরে স্থান করে নিয়েছে। স্বামীজী যেন শিকাগো ধর্মমহাসভায় ঢুকছেন—এই ভঙ্গিমায় নির্মিত মূর্তিটি। শ্রীরামচন্দ্র, সীতা এবং অন্যান্য মূর্তিগুলি তেমন সুবিধার নয়। লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে বানানো মূর্তিগুলি আরো অনেক উচ্চ মানের হওয়া উচিত ছিল।

যাহোক, পরের দিন বিজ্ঞান ও শিল্প-সংগ্রহালয় দেখতে গেলাম। আশ্রম থেকে বেশি দূরে নয়। স্বামীজীও দেখেছেন এই সংগ্রহশালা। অবশ্য এই ১০০ বছরে আরো কত কিছুই সংযোজিত হয়েছে এখানে। 'বিজ্ঞানের মহান অগ্রগতি'কে ধন্যবাদ। সবটা খুঁটিয়ে দেখতে হলে একদিনে কখনো সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের ছাত্রদের জন্য এটি জ্ঞানের খনি তুল্য।

৮ তারিখে রাত্রে গরম লাগছিল। অথচ পরের দিন ভীষণ ঠাণ্ডা! শিকাগো এমনই।

সেন্ট লুইস

১০ তারিখে শিকাগো থেকে বিদায় নিয়ে সেন্ট লুইসের পথে যাত্রা করলাম। কিন্তু চেক-ইন-এর পর জানা গেল, কোন কারণে প্লেন ছাড়তে দেরি হবে। তাই আমি অন্য প্লেনে সেন্ট লুইস রওনা দিলাম। কিন্তু আমার মালপত্র সঙ্গে গেল না। সেন্ট লুইসে পৌঁছে বিমানবন্দরের অফিসে জানানো হলো, যে-প্লেনটি দেরিতে আসছে তাতে আমার মালপত্র রয়েছে। তাঁরা বললেন যে, আগামীকাল ৯টার মধ্যে আমাদের আশ্রমে ব্যাগেজ পৌঁছে দেবেন। এবং যে-কথা সেই কাজ। এই হলো অনবদ্য কর্মকুশলতার নজির এবং এই ব্যাপারে এঁদের কাছে ভারতীয়দের অনেক শেখার আছে।

১৯৩৮ সালে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ সেন্ট লুইসে এই বেদান্ত সোসাইটি স্থাপন করেন। আশ্রমটিতে দুটি বাড়ি, একটি বাগান এবং গাড়ি পার্কিঙের জায়গা আছে। সুন্দর পরিবেশে এটি অবস্থিত। স্বামী চেতনানন্দ বর্তমানে এই আশ্রমের অধ্যক্ষ।

এই শহরের বেশির ভাগ মানুষ ক্যাথলিক এবং সেই কারণে বেশ রক্ষণশীল। শহরের ক্যাথিড্রালটি স্থাপত্য-শিল্পের একটি বিস্ময়। প্রায় ২০০ বছর আগে ফ্রান্সের রাজা নবম লুইয়ের স্মৃতিতে এই চার্চ নির্মিত হয়েছিল। ভিতরের ছাদে আঁকা ছবিগুলি ও মোজাইকের কাজ চমৎকার।

১১ তারিখ সন্ধ্যায় আমি 'রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ' বিষয়ে বক্তৃতা করলাম। ৬০ জন শ্রোতা ছিলেন। পরদিন সকালে বিমানে স্বামী চেতনানন্দ আমাকে ক্যানসাস শহরে নিয়ে গেলেন। ক্যানসাসের বেদান্ত সোসাইটি ভক্তদের

দ্বারাই স্থাপিত ও পরিচালিত—অবশ্য সেন্ট লুইস কেন্দ্রের অধ্যক্ষের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতায়। এখানে একটি সুন্দর বাড়িতে আশ্রমটি অবস্থিত। পরিবেশটিও সুন্দর। সন্ধ্যায় প্রায় ৪০ জন ভক্ত জমায়েত হয়েছিল। প্রায় ১½ ঘণ্টা ধর্মালোচনা হলো। নৈশাহার হলো ৯টায়।

পরদিন সকালে বেশ ঠাণ্ডা ছিল। সাড়ে ১০টায় বক্তৃতা হলো—'বেদান্ত ঃ একবিংশ শতাব্দীর ধর্ম' বিষয়ে। বিকালে সেন্ট লুইসে ফিরে এলাম। প্রথমেই আশ্রমে না গিয়ে মিসিসিপি ও মিসৌরী নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থল দেখতে গেলাম আমরা। সেন্ট লুইস থেকে প্রায় ৪৫ মিনিটের দূরত্ব। অতি চমৎকার দৃশ্য! নদীটি বিশ্বের তৃতীয় দীর্ঘতম নদী। পরদিন রবিবার। সকাল সাড়ে ১০টায় 'বেদান্ত কি?' বিষয়ে এক ঘণ্টা আলোচনা করলাম। ৮৫ জন শ্রোতা ছিলেন। বেশির ভাগই আমেরিকান।

বিকালে স্বামী চেতনানন্দ আমাকে একটা হিন্দু-মন্দিরে নিয়ে গেলেন। চার একর জমির ওপর সুন্দর সাজানো মন্দির। মূল দেবতা শ্রীভেঙ্কটেশ্বর। পূজারী দক্ষিণ ভারতীয়। ভিতরে জৈনধর্মাবলম্বীদের জন্য আলাদা ঠাকুরঘর আছে। ঐ ঘরটি রাজস্থান থেকে আনা সাদা মার্বেলের ওপর খোদাই করা অতি সমৃদ্ধ ভাস্কর্যে পূর্ণ। যেন ভারতের 'দিলওয়ার'! মন্দিরের একাংশ আমেরিকায় স্থানান্তরিত হয়েছে! দেখলে মনে হয় মন্দিরটি বেশ সমৃদ্ধশালী।

হলিউড

মে মাসের ১৫ তারিখে ডেনভারের প্লেন ধরলাম। স্বামী চেতনানন্দ বিদায় জানাতে এসেছিলেন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬,০০০ ফুট উঁচু মালভূমি (plateau)-তে অবস্থিত আকাশনগরী ডেনভার। সেখানে পৌঁছালাম দুপুর সাড়ে ১২টায়—সেন্ট লুইসের সময়ানুসারে। কিন্তু স্থানীয় সময় ওটা নয়। স্থানীয় সময় সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে পুনরায় রওনা হলাম বারব্যাঙ্কের উদ্দেশে (লস এঞ্জেলিসের আরেকটি বিমানবন্দর)। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, সময়ের হিসাবে ডেনভার সেন্ট লুইসের চেয়ে ১ ঘণ্টা পিছিয়ে। ইতিমধ্যে ডালাস থেকে ফেরার পথে স্বামী সর্বদেবানন্দ ডেনভারে এসে আমার সঙ্গ নিলেন। সুতরাং বারব্যাঙ্ক পৌঁছানো পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে অনেক বিষয়ে আলোচনা করা গেল। যদিও উড়ানের মোট সময় ২½ ঘণ্টা, আমরা প্যাসিফিক টাইম দুপুর ১টা ১৫ মিনিটে বারব্যাঙ্ক পৌঁছে গেলাম এবং ২টার মধ্যেই হলিউড আশ্রমে পৌঁছালাম।

আমেরিকাতে চারটি 'টাইম জোন' আছে। হাওয়াইকে ধরলে পাঁচটি। অতএব পশ্চিম উপকূল (West coast) পূর্বের (East coast) চেয়ে তিন ঘণ্টা পিছিয়ে। ভারতীয় সময় ৯ ঘণ্টা এগিয়ে নিউ ইয়র্কের সময়ের চেয়ে এবং ১২ ঘণ্টা এগিয়ে লস এঞ্জেলিসের সময়ের চেয়ে। কাজেই 'ভারতের মতো একটি 'টাইম জোন'-এ অভ্যস্ত পর্যটকের কাছে এইরূপ বারবার সময়ের পরিবর্তন কি পরিমাণ বিভ্রান্তিকর হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়!

হলিউডকে লস এঞ্জেলিসের শহরতলী বলা যায়। চলচ্চিত্র জগতের মানুষের কাছে এটি আশ্রয়স্থল। ১৯৩০ সালে স্বামী প্রভবানন্দ এখানে আশ্রমটি স্থাপন করেন। তারপর থেকে এর কাজের পরিধি বিস্তারিত হয়েছে নানাভাবে এবং আকর্ষণ করেছে বিখ্যাত লেখক, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্যদের। বহু বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব যেমন—অল্ডাস হাক্সলি, ক্রিস্টোফার ইশারউড (যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের একটি জীবনী লিখেছেন)-এর মতো লেখকরা এই আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।



সান্তা বারবারা কনভেন্ট

হলিউডের এই আশ্রমে অনেকগুলি বাড়ি আছে। তার মধ্যে একটি সন্ন্যাসিনীদের জন্য (convent)। আরো একটি 'কনভেন্ট' আছে সান্তা বারবারায়—১½ ঘণ্টার পথ। ট্র্যাবুকো ক্যানিয়নে (এটি আরেক দিকে—১½ ঘণ্টার পথ) একটি আশ্রম (monastery) রয়েছে। পার্শ্ববর্তী রাজ্য মেক্সিকোর সীমান্তে সান দিয়েগোতে একটি বাড়ি রয়েছে। এবং প্যাসাডেনাতে ১৯০০ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে যেখানে স্বামীজী ৪-৫ সপ্তাহ মীড় ভগিনীদের অতিথি হয়েছিলেন, ঐ বাড়িটিও এই কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানেই আছে। বর্তমানে এটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্তমণ্ডলীর কাছে একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে।

দুপুরের আহার ও বিশ্রামের পর আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো হলিউড জলাধার দেখাবার জন্য; হাঁটাও হলো,

পাহাড়েও চড়া হলো। বৃহদাকার পর্বত, ছোট পাহাড় ও উপত্যকায় ভর্তি। ক্যালিফোর্ণিয়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আকর্ষণীয়। আমেরিকার সবচেয়ে বড় ও ধনী রাজ্য এটি। এর উত্তরভাগ সবুজ ও হ্রদবহুল। দক্ষিণভাগ শুষ্ক ও অনুর্বর। তবে আবহাওয়া মোটামুটি ভাল ও স্বাস্থ্যকর। গ্রামের দিকে প্রচুর খামার বাড়ি (Farm house) রয়েছে। এখানে চাল, গম, ভুট্টা উৎপাদন করা হয়। আপেল ও কমলালেবুর বাগান রয়েছে। অন্যান্য ফলের বাগানও আছে।

প্রাচুর্যের দেশ আমেরিকা। প্রয়োজনের বেশি উৎপাদন হলে খাদ্যশস্য নষ্ট করে ফেলা হয়। কারণ, দাম যাতে না কমে। চাষীদের স্বার্থেই তা করা হয়। যখন একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এই বাড়তি খাদ্যশস্য আফ্রিকার ক্ষুধার্ত মানুষের জন্য জাহাজে করে কি পাঠানো যায় না? তিনি বলেছিলেন, জাহাজে পাঠানোর খরচই বড় বাধা। বস্তুত, এটি হয়তো অনেকগুলির মধ্যে একটি কারণ।

সন্ধ্যা ৭টায় সন্ন্যাসী ভাইদের সঙ্গে এক আকর্ষণীয় প্রশ্নোত্তর-পর্ব হলো। আমেরিকায় আমাদের কেন্দ্রগুলির মধ্যে হলিউডেই সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর সংখ্যা সর্বাধিক—৩০-এরও বেশি। সন্ন্যাসিনীরা সকলেই আমেরিকান। তাঁরা দুটি 'কনভেন্ট'-এ থাকেন—একটি হলিউডে, অপরটি সান্তা বারবারায়। সন্ন্যাসীরা থাকেন হলিউড এবং ট্র্যাবুকোতে। অবশ্য দু-একজন প্যাসাডেনা বা সান দিয়েগোতেও থাকেন।

পরদিন সকালে সান্তা বারবারা রওনা হলাম স্বামী সর্বদেবানন্দের সঙ্গে। অমৃতা সাম গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলেন। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূল ধরে সানসেট বুলেভার্ড হয়ে অতি মনোরম দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়ে তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন। ম্যালিবুতে একটি হিন্দুমন্দিরে গেলাম। শিকাগো বা সেন্ট লুইসের মন্দিরগুলির মতো এটিও বিশাল জায়গা নিয়ে অবস্থিত। দুটি পৃথক মন্দির—একটি শ্রীভেঙ্কটেশ্বরের, অপরটি শিবের। পূজার জন্য দক্ষিণ ভারত থেকে বৈষ্ণব ও শৈব পূজারী আনা হয়েছে। তাঁরা এখানেই থাকেন ও পূজাদি করেন। একটা মজার জিনিস দেখলাম মন্দিরে দক্ষিণ ভারতীয় পদ্ধতিতে বিবাহ হচ্ছিল। তবে বর আমেরিকান আর কনে দক্ষিণ ভারতীয়।

সান্তা বারবারা পৌঁছানোর আগে পথে অমৃতার বাড়িতে একবার থামতে হলো। সুন্দর ছোট্ট কুঠিয়া যেন। একটু কফি খেয়ে আবার সান্তা বারবারার উদ্দেশে রওনা। দুপুর ১২টায় পৌঁছালাম। এটি একটি ছোট্ট শহর। আমাদের কনভেন্টটি প্রায় ৫০ একর উঁচু-নিচু জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। রক্ষণাবেক্ষণ চমৎকার। দূরে আকাশের কোলে প্রশান্ত মহাসাগর দেখা যাচ্ছে। প্রচুর গাছপালা ও ফুল স্থানটিকে সাজিয়ে রেখেছে, যার ফলে সেখানকার পরিবেশটি হয়ে উঠেছে শান্ত। মন্দির ও গর্ভগৃহ শিল্পসমৃদ্ধ। তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের শিল্পকলাও (motifs) ব্যবহৃত হয়েছে। অদ্ভুত একটা আভা বেরচ্ছে বেদিতে রাখা ছবিগুলি থেকে। বনের মধ্যে একটা ছোট্ট কুঠিয়া—শ্রীশ্রীমায়ের ছবি সম্বলিত ঠাকুরঘর রয়েছে। ধ্যানের উপযুক্ত স্থান।

'বেদান্ত এবং আধুনিক বিশ্ব' বিষয়ে বললাম বিকালে। প্রায় ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন। রবিবার বা ছুটির দিন হলে এই সংখ্যা ২০০ হতো। কিছু আলোচনা ও রাতের আহার সেরে ১০টায় শুতে গেলাম। অতিথি সন্ন্যাসীদের জন্য একটি পৃথক বাড়ি আছে। হলিউড কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী স্বাহানন্দ এবং স্বামী সর্বদেবানন্দ এক সপ্তাহ অন্তর এখানে শাস্ত্রাদি আলোচনার জন্য আসেন।

পরদিন সকালেই সিকোয়া ন্যাশনাল পার্কের উদ্দেশে রওনা হলাম। পার্কটি সিয়েরা নেভাদা পর্বতমালার ওপর অবস্থিত। উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম জীবন্ত বস্তু—জেনারেল শেরম্যান বৃক্ষটিকে দেখা। দূরত্ব অনেক। আমরা ঐ স্থানের কাছাকাছি পৌঁছেও সময়াভাবে ফিরে এলাম। কারণ, রাস্তার মেরামতির জন্য ঘণ্টায় মাত্র ১০ মিনিট করে ঐ রাস্তায় যানবাহন চলাচল করতে দেওয়া হচ্ছিল। তার ফলে অনেক সময় নষ্ট হলো। যেহেতু আমাদের সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার মধ্যেই হলিউডে ফিরতে হবে, তাই এছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। মনে হলো, কত কাছে এসেও কত দূরে!

সিকোয়া প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলি। এগুলি মোচাকৃতি শীর্ষবিশিষ্ট বৃক্ষ (conifers)। এর সঙ্গে রেডউড জাতীয় বৃক্ষের সাদৃশ্য রয়েছে। বৃক্ষগুলি দুধরনের হয়। যেগুলি প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে হয়, তাদের নাম—'সিকোয়া সেম্পারভিরেন'। খুব উঁচু হয়। সর্বোচ্চ বৃক্ষটি ৩৬৭ ফুট ৮ ইঞ্চি উঁচু। অন্য শ্রেণীর বৃক্ষটির নাম 'সিকোয়াডেনড্রন জাইগ্যান্টিনাম'। এগুলি আয়তনে বেশি বাড়ে এবং বাঁচে বেশিদিন। তিনহাজার দুশ বছর পর্যন্ত। আগেরটি বাঁচে ২000 বছর পর্যন্ত। তবে উচ্চতায় দ্বিতীয়টি একটু ছোট—৩১১ ফুট। আর শেরম্যান বৃক্ষের ব্যাস ৪০ ফুট।

আমরা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬,০০০ ফুট ওপরে চলেছি। রাস্তার দুধারে বরফ পড়ে রয়েছে। কিছু কিছু সিকোয়া গাছ দেখা যাচ্ছে। বৃহত্তমটি অবশ্য নয়। বনের ফাঁকে ফাঁকে তুষারাবৃত পর্বতশীর্ষ চোখে পড়ছে। সিয়েরা নেভাদা



সিকোয়া বৃক্ষ

পর্বতমালায় বেশ কিছু পর্বত-শিখর আছে ১০,০০০ ফুট বা তারও বেশি উঁচু। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ হলিউডে ফিরে ভগবদ্গীতা বিষয়ে ৬৫-৭০ জন শ্রোতার সামনে কিছু বললাম।

পরদিন সকালে আমরা ডিজনিল্যাণ্ড হয়ে ট্র্যাবুকো ক্যানিয়ন রওনা হলাম। আমরা বলতে স্বামী সর্বদেবানন্দ, প্রসূন, তার বাবা এবং আমি। ট্র্যাবুকোতে ঘন জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ী পরিবেশে এই আশ্রমটি অবস্থিত।

ডিজনিল্যাণ্ড জগৎপ্রসিদ্ধ জায়গা। বেলুড় মঠ থেকে রওনা হওয়ার সময়ে আমেরিকা যাচ্ছি শুনে একটি চার বছরের ছেলে আমাকে তার জন্য একটি মিকিমাউস নিয়ে আসতে বলেছিল। কেউ যদি ক্যালিফোর্ণিয়ায় যায় এবং ডিজনিল্যাণ্ড না দেখেই দেশে ফেরে তার জন্য অনেক ভ্রূ-কোঁচকানো আপসোসের ডালি নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবে।

বিশাল জায়গা জুড়ে একটা কাল্পনিক জগৎ এই ডিজনিল্যাণ্ড। যদি সবটা দেখবেন বলে কেউ ভাবেন, নির্ঘাত দুদিন পুরো সময় লাগবে। একটা অদ্ভুত আকর্ষণীয় প্রমোদ উপকরণ। অবশ্য আমি বলতে পারি না যে, আমাদের মতো বয়স্কদের এটি দীর্ঘক্ষণ আকর্ষিত করে রাখতে পারবে বলে। আমি আড়াই ঘণ্টা ছিলাম। 'স্মল ওয়ার্ল্ড' অংশটি এবং আরেকটি অংশে কৃত্রিম কণ্ঠস্বরে আব্রাহাম লিঙ্কনের গেটিসবার্গের বক্তৃতা (Gettysberg Address) আমার ভাল লেগেছিল। তবে ক্যারিবিয়ানের জলদস্যু (Pirats of the Carribbean) অংশটি আমার কাছে উদ্দেশ্যহীন এবং শিশুমনের পক্ষে বরং ক্ষতিকর বলেই মনে হলো। যাহোক, ডিজনিল্যাণ্ড যেকোন পর্যটকের কাছেই একটি মহাবিস্ময়।

ট্র্যাবুকো পৌঁছালাম দুপুর দেড়টায়। আশ্রমে মাত্র পাঁচজন সন্ন্যাসী আছেন। একজন বাদে সকলেই বয়স্ক। একটি দেখার বস্তু আছে—'ধর্মসমন্বয়ের সারি' (Harmony of Religions Trail)। জঙ্গলের মধ্যে সোয়া মাইল লম্বা স্থানের ওপর আমেরিকান-ইণ্ডিয়ান সহ বিভিন্ন ধর্মের ছোট ছোট মন্দির পরপর সাজানো রয়েছে। দিনটি ছিল ভগবান বুদ্ধের জন্মজয়ন্তী। তাই ভগবান বুদ্ধের বেদিতে কিছু বুনো ফুলের অঞ্জলি দিলাম।

ট্র্যাবুকোর গর্ভমন্দিরটি বিশেষভাবে পরিকল্পিত। বেদি থেকে ২½ ফুট নিচুতে মেঝে। জায়গাটি প্রায় অন্ধকার করা থাকে ধ্যানের সুবিধার জন্য।

সন্ধ্যায় রাজী আসরানীর বাড়িতে রাত্রের আহারের জন্য গেলাম। ভদ্রমহিলা অত্যন্ত ভক্ত। পেশায় একজন অ্যানাসথেসিস্ট। কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে তিনি একটি সংগঠন চালান 'অস্তি' (ASTI—American Service to India) নামে, যার মাধ্যমে ভারতে বহু সেবামূলক কাজের জন্য তাঁরা আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকেন।

পরদিন সকালে সান দিয়েগোর উদ্দেশে যাত্রা করলাম। রাস্তায় লাগুনাতে উষা হার্ডিঞ্জের বাড়িতে নেমেছিলাম। ভারি কালীভক্ত। বছরে একবার অন্তত তাঁর ভারতে আসা চাই। আর দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে যেতেই হবে। বাড়ির মধ্যে ঠাকুরঘরটি অনেক সাধু-সন্তদের ছবি ও মূর্তি ছাড়াও অজস্র দেবদেবীর ছবি বা মূর্তিতে ঠাসা। পেশায় তিনি একজন লেখিকা। বাড়ির সংলগ্ন নিজস্ব জায়গাতে তাঁর একটি কালীমন্দির তৈরি করার বাসনা রয়েছে। তাঁর বাড়িতে যাওয়াতে যারপরনাই খুশি হলেন ভদ্রমহিলা।

উষার বাড়ি ছেড়ে আবার সান দিয়েগোর পথে। ক্যালিফোর্ণিয়ার প্রধান রাস্তাগুলির মাঝে ও পার্শ্ববর্তী পায়ে চলার পথে পূর্ণ প্রস্ফুটিত বিভিন্ন রঙের গাছ সারি সারি লাগানো আছে। ক্যালিফোর্ণিয়ার 'সান' বা 'সাণ্টা' সম্পর্কে দু-চার কথা বললে মন্দ হয় না। সর্বত্র এই শব্দদ্বয়ের ব্যবহার। স্প্যানিশ ভাষায় 'সান' (বা 'স্যান')-এর অর্থ Saint অর্থাৎ সাধু বা সন্ত। স্ত্রীলিঙ্গে 'সাণ্টা'। সুতরাং বলা যায়, ক্যালিফোর্ণিয়া পুরুষ ও নারী সাধু-সন্তের রাজ্য। কোন একসময়, হয়তো ২০০ বছর আগে, এই স্থান মেক্সিকোর সঙ্গে যুক্ত ছিল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জ্যাক্সন এই অঞ্চলটি অধিগ্রহণ করেন। কিন্তু নামগুলি স্প্যানিশই থেকে গেল। যেমন—সান ফ্রান্সিসকো।

আরেকটা মজার ব্যাপার হলো—স্প্যানিশ নামগুলি স্প্যানিশদের মতো উচ্চারণ করতে হবে। তাই 'সান জোস'-কে বলতে হবে 'সান হোস'। 'ভ্যালেজো'-কে বলতে হবে 'ভ্যালেহো' ইত্যাদি। অবশ্য 'জ্যাক'-কে 'হ্যাক' এবং 'জীন'-কে 'হীন' বলা চলবে না।

পৌনে বারটা নাগাদ সান দিয়েগো আশ্রমে পৌঁছে একটু চা-বিস্কুট খেয়ে আমরা গেলাম সান দিয়েগোর বিখ্যাত পশুশালা দেখতে। জায়গাটি অনেকটা দক্ষিণে বলে সূর্যের উত্তাপও যথেষ্ট ছিল। যদিও এই পশুশালাটিকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পশুশালাগুলির অন্যতম বলা হয়, কিন্তু আমার মনে হলো, এটি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পশুশালা বলে দাবি করতে পারে না।

দেরি করে আহার সেরে সামান্য বিশ্রাম। সন্ধ্যারতির পর 'Pot-luck dinner'-এর ব্যবস্থা ছিল। প্রায় ৪০ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। আমি 'আধ্যাত্মিক জীবন' প্রসঙ্গে কিছু বললাম। দেখলাম, শ্রোতারা বেশ আগ্রহী।

পরদিন সকালে আমরা একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত গোলাপের বাগান-সহ পার্কে গেলাম। বিভিন্নপ্রকার ক্যাক্টাসও রয়েছে দেখলাম। এই স্থানের চারিদিকেই সংগ্রহ-শালাগুলিতে মুরিস স্থাপত্যের ছোঁয়া চোখে পড়েছিল।

প্রাতঃরাশ সেরে হলিউড রওনা হলাম। প্যাসাডেনায় যে-বাড়িতে স্বামীজী চার-পাঁচ সপ্তাহ কাটিয়েছিলেন, সেই তীর্থে এক ঘণ্টা থেমেছিলাম। দুপুর ১২টায় হলিউডে পৌঁছালাম। বিকালে হলিউড কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী স্বাহানন্দের সঙ্গে আমেরিকায় আমাদের কার্যধারার বিভিন্ন দিক নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হলো।

পরের দিনটি ছিল—বার্ষিক শ্রীরামকৃষ্ণ ভোজ (Annual Sri Ramakrishna Dinner)। বেলা ১১টায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করলাম। প্রায় ৩০০ শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। তার তিন-চতুর্থাংশই আমেরিকান। দুপুরের আহারের পর 'অস্তি' (ASTI)-র সদস্যদের সঙ্গে কিছু কথা হলো। বিকাল ৪টায় একটি প্রশ্নোত্তর-পর্বে ৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

প্রায় ৪৫ বছর আগে যখন মুম্বাইতে ছিলাম, তখন জয়ন্ত মুখার্জী নামে এক ঘনিষ্ঠ ভক্ত পরিবারের ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। তখন সে স্কুলে পড়ত। এখন সে আমেরিকার নাগরিক। তার ইচ্ছা, আমাকে গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন দেখাবে। অতএব রবিবার এসে সে রাত্রে থেকে গেল, যাতে ভোরে আমরা রওনা হতে পারি। পরদিন ভোরে আমরা লাস ভেগাসের বিমান ধরলাম। সেখান থেকে সিনিক এয়ারলাইন্সের বিমানে গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নে পৌঁছালাম দুপুরে। একটি হোটেলে দুপুরের আহারের পর পর্যটক কোম্পানি আমাদের নিয়ে চলল গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের দক্ষিণ প্রান্তে এবং সেখান থেকে পশ্চিমে।

সত্যিই যুগপৎ এক বিস্ময়কর ও ভয়ঙ্কর দৃশ্য! দক্ষিণ প্রান্তটির গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭,০০০ ফুট। আর উত্তরপ্রান্তের গড় উচ্চতা ৮,০০০ ফুট। সোজা গেলে উত্তর প্রান্ত যদিও মাত্র ১০ মাইল, কিন্তু রাস্তা ধরে গেলে ২১৫ মাইল। ভূতলের এই চমকপ্রদ আকৃতি পৃথিবীর বিস্ময়গুলির মধ্যে একে স্থান করে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে কলোরাডো নদীর স্রোতধারায় ধীরে ধীরে ভূখণ্ডটি এমন চেহারা নিয়েছে যেন কতকগুলি বিশাল খাদের ভয়াল সমাহার! হয়তো কোথাও খাদটি সোজা ৫,০০০ ফুট নিচে নেমে গেছে। কেবলমাত্র চোখে দেখেই মানুষ স্তব্ধ হয়ে যায়! শুষ্ক বৃক্ষহীন ভূখণ্ড—খানিকটা মরু এলাকার চেহারা। ৭,০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও বেশ গরম। অথচ শীতে এখানেই তাপমাত্রা ০° ফারেনহাইট হয়ে যায়। গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের কয়েকটি পাহাড়ের চূড়ার নাম অদ্ভুতভাবে ভারতীয়! 'শিব', 'বিষ্ণু', 'ব্রহ্মা', 'বুদ্ধ' ইত্যাদি। সারাবছর ধরে এই পর্যটনকেন্দ্রটি হাজার হাজার মানুষকে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে। কেউ কেউ অতি সাহসিকতা দেখাতে গিয়ে ঐ খাদে নেমে পড়ে ও সরু শৈলশ্রেণীর ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকে বা সাইকেল চড়তে থাকে। ফলে বিপদ ঘটে। মৃত্যুও হয়। তবে উদ্ধারকারী দল আছে। জীবনরক্ষাকার্যে তারা খুব দক্ষ।

জয়ন্ত ও আমি লাস ভেগাস হয়ে সন্ধ্যা সাড়ে ৮টায় হলিউডে ফিরলাম। এটি আমেরিকার আরেক মজাদার জায়গা। লাস ভেগাস আমেরিকার জুয়াড়ীদের রাজধানী। মরুভূমির মধ্যে অবস্থিত এই স্থানটি ক্যাসিনোর মাধ্যমে উপার্জনের দ্বারা বেশ ধনসম্পদে পূর্ণ হয়ে রয়েছে। জুয়াপ্রেমিক পর্যটকরা সারাবছর ধরে এখানে আসে। এমনকি বিমানবন্দরেও জুয়াখেলার যন্ত্র বসানো আছে। তাই আমিও সেখানে গেছি শুনলে অনেকেই হাসি সংবরণ করতে পারে না!

পরদিন ২৩ মে কোন ব্যস্ততা ছিল না। অবশ্য সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের সঙ্গে দেড় ঘণ্টার একটি প্রশ্নোত্তর-পর্ব হলো।

কাছেই সন্ন্যাসিনীদের মঠে স্বামী স্বাহানন্দ ও স্বামী সর্বদেবানন্দের সঙ্গে দুপুরের আহার সারলাম। সন্ধ্যায় প্রায় ৪০-৫০ জন শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে 'উপনিষদের বাণী' বিষয়ে বললাম। [ক্রমশ] (দুই)

বেলুড় মঠ

আরতি নাথ

ঐ শান্তিময় নীরবতা হৃদয়ে বিছিয়ে নাও,
মুক্তকরে বস ছায়াস্নিগ্ধ বৃক্ষমূলে।
তাকাও দূরে, আরো দূরে
ডুবে যাও ধীরে, অতি ধীরে
অতল গহন গভীরে।
শান্ত এই প্রসন্নতা বহন করে হৃদয়ে
লালন কর প্রতিনিয়ত।
এই আলোকিত নির্জনতার গভীর থেকে অনুক্ষণ
উঠেছে যে বন্দনাগান,
বিশাল বনস্পতির শাখায় শাখায়,
পাতায় পাতায়, মৃদুভাবে মর্মরিছে
নদীপ্রবাহ যোগ করেছে তাতে [illegible]
পাখি আর কাঠবিড়ালের সানন্দ সঞ্চরণে।
কখনো বা গৈরিক বসনের ঝলকে
মূর্ত হয়ে উঠেছে অনন্ত বিভাষিত সেই দিব্য জগৎ।
জীবনবীণাটি বেঁধে নাও তারই সুরে,
বেসুরো হতে দিও না কখনো তাকে।

ভ্রম

(যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ[illegible]

অলককুমার চৌধুরী

সমস্ত কিছুর মাঝে জেগে থাকে ভ্রম,
ভ্রমই ভাঙায় ঘুম
সঠিক চেতনার পথে—

অথচ [illegible] না তাকে [illegible]
সাবধানে পা ফে[illegible]
বিচারের [illegible]লো জ্বেলে[illegible]

তবু সময়ের গ্রন্থিতে [illegible]ম জাগে
একান্ত মরমী [illegible]
সত্যের আঙুল হয়ে কপালে পরায়[illegible]
জাগে, সবকিছু যখন অচেতন[illegible]

[illegible] জাগে ভ্রম
[illegible]ন্ধকারের আলোক জ্বালে
[illegible] এক অনন্ত সৃজন
[illegible] শুদ্ধ হয় সত্যের সামীপ্যে।

ঋষিবন্দনা

প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়

মহাজগতের মিলনযজ্ঞ মাঝে,
মেতে উঠে নব প্রেমে—
হত-বিহ্বল সব সংসার কাজে,
মাতাতে এলে হে নেমে।

কলুষতা যত মানবসাগর তীরে,
সব প্রেমময় মিশায়েছ তব প্রাণে;
কত আশা নাথ, তোমার তীর্থনীরে
[illegible] হয়ে নেচে ওঠে তব গানে।

[illegible]হে পুণ্যতীর্থধারা
[illegible] চায় না থাকতে সুপ্ত—
তোমার পরশে নাচে উতলা পারা,
প্রকাশিতে চায় যা আছে সদা গুপ্ত।

[illegible] যোগী ঋষি,
মানবের [illegible] রয় মিশি
[illegible]কিত দ্বারে—
হে মহামানব, তুমি এস আজ
[illegible] হে নমস্কারে।

অ[illegible]দররূপে

ইন্দ্রা মুখো[illegible]

[illegible]
[illegible]সি,
আয় তোরা [illegible] দেখবি যদি
আঁধার রাতের শশী।

[illegible]মের মাথায় পেখম পালক
মাথায় মায়ের মুকুট,
কখম যে স[illegible]
(পেয়ে[illegible]ক মনের [illegible]ক।

মুণ্ডমালা দি[illegible]লে
শ্যামা [illegible] ভয়।
[illegible]

উপলব্ধি

প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়

ভোরের প্রথম আলো
দুই নীল চোখের তারায়
কী যে স্বপ্ন ছড়ায়!
ভাঙা পাঁচিলের ফাঁকে ছোট ছোট অশ্বত্থের চারা
বিস্ময় বিহ্বল চোখে আকাশে তাকায়!
পদ্মার জলে কাঁপে চৈত্রের দুপুর...
আলোছায়া দোল খায়
উড়ে যাওয়া চিলের ডানায়।
এমন স্বপ্নের দিন তবু ম্লান হয়ে ক্রমশ বিলীন
কেন যে কালের এই অমোঘ প্রবাহে!
শেষ রাগিণী কেন বাজে এত ক্লান্ত সুরে?
অবশেষে সূর্য ডোবে—চিরতরে
কোথা কোন্ বিষণ্ণ সাগরে
রিক্ত, ক্লিষ্ট হৃদয়ের ব্যথা আষাঢ়ের বৃষ্টি হয়ে ঝরে।
অথচ—অনন্ত আকাশতলে বিপুল আনন্দধারা
অলক্ষ্যে ঝরে অবিরাম
পূর্বাশার প্রান্তদেশ জুড়ে কোন মহাসিন্ধুকূলে।
অলকানন্দার ধারা
ধুয়ে মুছে জীবনের ক্লেশ দুঃখ ভার
ধেয়ে চলে লক্ষ্য স্থির সাগরসঙ্গমে।
অমেয় শান্তি যেথা নিরন্তর বয়ে যায়
হৃদয়ের মর্মে দোলা দিয়ে।
আর—উত্তাল তরঙ্গমাঝে
দূরে কে যে বৈঠা বায় একা একা...
উদ্দাম উল্লাসে কোন্ অমর্ত্য আহ্বানে।



আত্মবঞ্চনা

নবকুমার সরকার

তোমাকে বললাম ঃ
আমায় সুখ দাও, সমৃদ্ধি দাও;
হাসি ফুটল তোমার ঠোঁটে,
তুমি বললে ঃ তথাস্তু।
তোমাকে বললাম ঃ
আমি অনেক বিদ্যা চাই, চাই খ্যাতি,
প্রসন্ন হলো তোমার চোখ,
তুমি বললে ঃ তথাস্তু।
আমার দুরন্ত ইচ্ছে উপচে পড়ল।
তোমাকে বললাম ঃ
আমার প্রচুর অর্থ চাই,
প্রচুর—প্রচুর—
তুমি একটুও না ভেবে বললে ঃ তথাস্তু।
তোমার প্রতি বিগলিত হয়ে
দাবির ফর্দ দীর্ঘতর করলাম।
তোমার বদান্য হাত কাঁপল না একটুও;
সবেতেই বললে ঃ তথাস্তু।
আমাকে ঘিরে ফেলল হীরে-জহরত,
মণিমাণিক্যের স্তূপ;
জমে উঠল বিলাস-ব্যসনের উদ্দাম উপচার,
সর্বাঙ্গে ঝলসে উঠল বৈভবের স্বর্ণগরিমা—
সাফল্যের তরে কুর্নিশ জানাল মুগ্ধ মানুষের দল।
দেখলাম—সত্যিই কল্পতরু তুমি।
অক্ষয় দানপাত্র তখনো উন্মুখ তোমার হাতে,
প্রশ্ন করলে ঃ আর কি চাও?
দমবন্ধ করা ঐশ্বর্য ঠেলে মরিয়া হয়ে বললাম ঃ
এবার তোমাকে চাই আমি।
হঠাৎ ঔদাসীন্য গ্রাস করে তোমায়।
তুমি নিরুত্তর।
বললাম ঃ শুনতে পাচ্ছ, তোমাকেই চাই আমি।
কার্পণ্যে কঠোর হয় তোমার মুখ,
তুমি নিশ্চুপ।
চিৎকার করে বললাম ঃ বিলম্ব সত্ত্বেও
তোমাকেই চাই আমি।
আমার নিষ্ফল প্রার্থনা হাহাকার হয়ে
ছড়িয়ে পড়ল মহাশূন্যে,
ঠিক তখনি প্রাণের ভিতর কার আক্ষেপ শুনি—
মূর্খ, নিজেকে এমনি করে ঠকালি এতকাল!

চিন্ময়ী

ভক্তি দেবী

রাজার রাজার রানী হয়েও ছোট ঘরে থাকে,
আপনাকে সে একটু যেন আড়াল করে রাখে।
তোরা চিনিস নাকি তাঁকে?
অষ্টপ্রহর সেবাব্রতের নীরব কারুকাজ—
লালপাড়ে তার ঘোমটা মাথায় নেইকো কোন সাজ
সদাই পল্লীবধূর লাজ।
সোনার বরণ হাতদুটিতে অমিতি-পাক বালা
অনাথ আতুর সবার হাতে অমৃতবারি ঢালা
তার সেটাই জপের মালা।
মৃন্ময়ী নয়, চিন্ময়ী সে নিত্যকালের মা
লক্ষ ছেলের প্রাণের সুধা, হৃদয় সুষমা
সে যে শিয়র-পাশের মা।



'প্রবাসী'র শতবর্ষের আলোকে রামানন্দ

মণ্টু দাস

আজ থেকে শতবর্ষ আগে অর্থাৎ ১৯০১ সালে 'প্রবাসী'র আত্মপ্রকাশ। সেকালে এই পত্রিকাটির সম্পাদনা করেছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। এই বর্ষটি বাঙলা ভাষা-সাহিত্যসেবীদের কাছে আত্মোপলব্ধির বর্ষ, কারণ ব্রিটিশ ভারতে নির্ভীকতার সঙ্গে মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী' প্রকাশ করে তিনি বঙ্গভাষাভাষীদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, ভারতের যুবসমাজকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্তির মহামন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। একারণেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সম্পাদিত 'প্রবাসী' চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষে সুদূর এলাহাবাদ শহরের 'কায়স্থ পাঠশালা'য় অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন এবং প্রবাসে বসবাসকালে তিনি সেখান থেকে 'প্রবাসী' সম্পাদনা ও প্রকাশ করেছিলেন। এই পত্রিকা প্রকাশের মুখ্য আদর্শ ও লক্ষ্য তিনি পত্রিকার শীর্ষে মুদ্রিতাকারে প্রচার করেছিলেন—

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

নির্ভীক, নিরপেক্ষ, সত্যনিষ্ঠ ও ন্যায়নিষ্ঠ সাংবাদিকতাই ছিল তাঁর জীবনাদর্শ। এই আদর্শবোধকে সামনে রেখে তিনি পথ চলতেন। কোনদিন কোন পরিস্থিতি এবং কোন প্রলোভন তাঁকে আদর্শচ্যুত করতে পারেনি। আর পারেনি বলেই রামানন্দ হতে পেরেছিলেন আদর্শ সাংবাদিক। এখানেই তাঁর যথার্থ সাফল্য।

যখনি ভারতবর্ষ বিদেশী শাসনের অন্তরালে শোষণ, জুলুম, অত্যাচারে জর্জরিত হয়েছে, তখনি তার বিরুদ্ধে রামানন্দের কলম প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে। এমনকি তিনি ব্রিটিশ অপশাসনের বার্তা ইংল্যাণ্ডবাসীর কর্ণগোচর করতে 'প্রবাসী'র পাশাপাশি বিশুদ্ধ ইংরেজীতে প্রকাশ করেছিলেন 'মডার্ণ রিভিউ'। জানা যায়, তৎকালে বঙ্গ-ভাষাভাষী ভারতীয়রা 'প্রবাসী'র জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত, তেমনি ইংল্যাণ্ডবাসীরা 'মডার্ণ রিভিউ' হাতে পাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করত। এই জনপ্রিয়তার জন্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় হয়েছিলেন বিশ্ববিশ্রুত সাংবাদিক।

সেকালের 'প্রবাসী' পত্রিকার সাহিত্যের পাতায় লিখতেন বাঙলা সাহিত্যের প্রতিভাধর প্রাজ্ঞ ও বিদগ্ধ কবি-সাহিত্যিকবৃন্দ। 'প্রবাসী'র আত্মপ্রকাশকালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'প্রবাসী' কবিতাটি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস 'প্রবাসী'র মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল। এমনকি রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী উপন্যাস 'গোরা' ধারাবাহিকভাবে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়ে বাঙলা সাহিত্যপ্রেমীর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। এছাড়া সমকালের বাঙলা সাহিত্যের দিক্পাল সাহিত্যিকদের গুরুত্বপূর্ণ লেখায় 'প্রবাসী' সুসমৃদ্ধ হয়েছিল। একদা ভারতভগিনী নিবেদিতা 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ'য়ের জন্য লেখার ডালি সাজিয়ে রামানন্দের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বাঙলা সাহিত্যের দিক্পাল আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, ক্ষিতিমোহন সেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র রায়, চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রনাথ পালিত, অবিনাশচন্দ্র দাস, নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গোপাললাল দে প্রমুখ ছিলেন 'প্রবাসী'র প্রথম সারির লেখকবৃন্দ।



রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাদর্শকে পাথেয় করে সুদৃঢ় পদক্ষেপে পথপরিক্রমা করতেন সাংবাদিকতার অগ্রপথিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। সুবিখ্যাত চিত্রশিল্পী ফ্রাঙ্ক ডোরাক অঙ্কিত 'পরমহংস রামকৃষ্ণ' চিত্রটি 'প্রবাসী'তেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো-বক্তৃতার বীরোচিত চিত্রটিও 'প্রবাসী'র শোভাবর্ধন করেছিল। পণ্ডিত শিবরাম শাস্ত্রীর ইংরেজী প্রবন্ধ 'পরমহংস রামকৃষ্ণ'-এর বঙ্গানুবাদ 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করেন রামানন্দ। তাছাড়া তাঁর নিজের লেখা 'সারদামণি দেবী' নিবন্ধটিও বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল। রামানন্দবাবু বহু নবীন ও প্রবীণ চিত্র-শিল্পীর চিত্রসম্ভার 'প্রবাসী'তে ছাপতেন। জানা যায়, তিনি স্বয়ং ছিলেন একজন রঙিন ছবির ব্লকমেকার। তাঁর চিত্রাবলী প্রকাশ সম্পর্কে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু লিখেছেনঃ "আজকের এই ভারতীয় চিত্রকলার উচ্চ মান ও প্রতিষ্ঠার মূলে শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু একজন প্রধান ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।" সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মসমাজ-ভুক্ত হয়েও ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবানুসারী ব্যক্তিত্ব।

সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আমাদের জন্য বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংবাদ-সাহিত্যসম্ভার রেখে গেছেন। তাঁর লেখা 'বিবিধ প্রসঙ্গ' পাঠে বোঝা যায়, তিনি ছিলেন একজন চিন্তাশীল ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাংবাদিক। এই কলামে তিনি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন, যেমন—'দেশীয় রাজ্যসমূহের নরেশদের ও ব্রিটিশশাসিত ভারতীয়দের মূল্য',

'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা-বিরোধী কনফারেন্স', 'আসন বণ্টনে দোষদ্ঘাটন করি কেন', 'মিঃ জিন্নার রফার শর্ত', 'ভারতীয়করণ এরূপে কখনো হইবে না', 'সমগ্র ভারতে শিক্ষায় সরকারি ব্যয় হ্রাস', 'ব্যবস্থাপক সভায় বাক্যকথনের স্বাধীনতা', 'ধর্মনৈতিক উন্নতির প্রয়োজনীয়তা', 'নির্বাচনে সরকারি কর্মচারীদের হস্তক্ষেপ', 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে রফা' ইত্যাদি। এই লেখাগুলি পরাধীন ভারতবর্ষের একজন সাংবাদিকের পক্ষে যে কত বড় নির্ভীকতা ও দৃঢ়তার পরিচায়ক তা বর্তমান প্রজন্মের সাংবাদিকদের স্তম্ভিত করে। ইদানীংকালের সাংবাদিকতায় যে রামানন্দবাবুর মতো নিষ্ঠা ও নির্ভীকতার উপাদান নেই তা নয়, তবে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে সাংবাদিকতার কলাম যেন ক্রমশ ভোঁতাই হয়ে যাচ্ছে। সামাজিক দুর্নীতিমুক্ত সমাজ-দেশ গড়ার ব্রত থেকে কেমন যেন বিচ্যুত হয়ে পড়ছে। এমত সময়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ সাংবাদিকদের কর্তব্য বলেই মনে হয়।

হিন্দু সমাজের অভিশপ্ত পণপ্রথা বিলোপ, নারীজাগরণ, নারীপ্রগতি, নারীশিক্ষা প্রভৃতি সম্পর্কে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যেভাবে চিন্তাভাবনা করেছিলেন, বর্তমান প্রজন্মের সাংবাদিকদের কাছে সত্যই তা ভাববার বিষয়। তিনি 'প্রবাসী'তে লিখেছিলেনঃ "নারীরক্ষা একান্ত আবশ্যক। 'নারীরক্ষা' ব্যাপক অর্থে বুঝা উচিত। নারীদিগকে কেবল দুর্বৃত্ত লোকদের হাত হইতে নয়, অজ্ঞতা, রোগ ও অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করাও সমাজের কর্তব্য।" হিন্দু নারীদের জাগরণের পাশাপাশি তিনি মুসলমান নারীদের জাগরণের কথাও সমভাবে ভাবতেন। নারীর প্রতি আচরণ সম্পর্কে মুসলমান জনমত গঠন প্রসঙ্গে তিনি 'প্রবাসী'তে লিখেছিলেনঃ "বঙ্গের গবর্ণর ঢাকায় বলিয়াছেন যে, নারীদের যেপ্রকার নির্যাতন আইন অনুসারে দণ্ডনীয়, সেপ্রকারে নির্যাতিতা মুসলমান নারীর সংখ্যা সর্বাধুনিক পরিসংখ্যান অনুসারে সেইপ্রকার নির্যাতিতা হিন্দু নারীর চেয়ে অধিক।" নারীজাগরণ সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেনঃ "যে-দেশে, যে-জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে-দেশ কখনো বড় হতে পারেনি, কস্মিন্‌কালেও পারবে না।" নারীজাগরণের স্বপক্ষে মুহম্মদ শহীদুল্লার অভিমতঃ "যে স্ত্রীকে সম্মান করে, ঈশ্বর তাহাকে সম্মানিত করেন।" আর সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নারীরক্ষা আন্দোলন সংগঠিত করার এক বিরল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাই রাজনৈতিক মতাদর্শের দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ও সুভাষচন্দ্রের অনুগামী হয়েও তিনি হিন্দু মহাসভার সুরাট অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন, কিন্তু এই ব্রাহ্মধর্মী, মানবতাবাদী মানুষটি কখনো হিন্দু-মুসলমান মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেননি। এমনকি তিনি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেছিলেন, কারণ অখণ্ড ভারতবর্ষের স্বাধীনতাই ছিল তাঁর অভিপ্রেত।

১৮৬৫ সালের ২৯ মে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম। এই সময়ে বাংলায় বহু মনীষী জন্মেছিলেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ও তাঁদেরই মতো একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি বাঁকুড়া জেলা শহরের গন্ধেশ্বরী নদীতীরবর্তী পাঠকপাড়া পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি বাঁকুড়া জেলা স্কুলের শিক্ষক কেদারনাথ কুলভীর সংস্পর্শে আসেন এবং গভীর স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হন। কেদারনাথবাবু ছিলেন বাঁকুড়ার ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তী সময়ে কর্মজীবনে প্রবেশকালে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ফলস্বরূপ গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবার, আত্মীয়স্বজন তাঁকে পিতৃগৃহে বসবাস থেকে বঞ্চিত করেন। বাঁকুড়াপ্রেমী মানুষ রামানন্দ এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় ফিরে বাঁকুড়া শহরের স্কুলডাঙা পল্লীতে এক বিশাল ইমারত নির্মাণ করেন। এই বাড়িতে তিনি সপরিবারে বসবাস করেছিলেন এবং এই বাড়িতে অবস্থানকালে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ'-এর সম্পাদনা করেন। জানা যায়, এসময় তাঁর বাঁকুড়ার বাড়িতে আসতেন আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, সত্যকিঙ্কর সাহানা বিদ্যাবিনোদ, অধ্যাপক রামশরণ ঘোষ, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, হেমেন্দ্রনাথ পালিত প্রমুখ পণ্ডিতবৃন্দ। এঁদের সঙ্গে তিনি গভীর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। এঁদেরই প্রচেষ্টাতে এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক উদ্যোগে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ১-৩ মার্চ ১৯৪০ 'হিল হাউস'-এ অবস্থান করে বাঁকুড়া শহরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন। এখানেই রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও 'প্রবাসী'র অবদান অসামান্য।

১৯৪৩ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পরলোকগমন করেন। তাঁর পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত ইমারতটি আজ পরিচর্যা এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংসের মুখে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধিও বাঁকুড়ার পুরাকৃতি রক্ষার জন্য স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু বাঁকুড়া শহরের বুকে এখনো পর্যন্ত 'প্রত্নতত্ত্ব ভবন' নির্মাণের কাজ বাস্তবায়িত হয়নি। ❑

সহায়ক গ্রন্থ

(১) অর্ধশতাব্দীর বাংলা ও মুক্তিসাধক রামানন্দ—শান্তাদেবী
(২) সত্যসাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—রবি দত্ত
(৩) 'প্রবাসী'র ১৩৪১, ১৩৪২, ১৩৪৩ সংখ্যা
(৪) 'উদ্বোধন', মাঘ ১৪০৭
(৫) 'সুচেতনা', 'রামানন্দ স্মরণ সংখ্যা', ১৯৯০
(৬) বাঁকুড়ায় রবীন্দ্রনাথ—রবি দত্ত
(৭) বাঁকুড়ার পুরাকৃতি রক্ষা—যুগলকিশোর চট্টোপাধ্যায়, 'প্রবাসী', চৈত্র ১৩৪১

দার্শনিক দৃষ্টিতে দেবী দুর্গা

দেবব্রত দাস



স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী লিখছেন ঃ "স্বামীজী মঠে প্রথম দুর্গাপূজা (কাল—১৯০১) করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তজননী শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানীর অনুমতিক্রমে স্থির হইল, তাঁহারই নামে সঙ্কল্প করিয়া পূজা হইবে। কলিকাতার কুমারটুলী হইতে প্রতিমা আনা হইল। ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলাল পূজক, স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের পিতা সাধক ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য তন্ত্রধারক হইলেন।... যথাশাস্ত্র মায়ের পূজা নির্বাহিত হইল; শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর অনভিমত বলিয়া পশু-বলিদান হয় নাই। গরিব-দুঃখীদিগকে নারায়ণজ্ঞানে পরিতোষপূর্বক ভোজন করানো দুর্গোৎসবের অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল।... মহাষ্টমীর পূর্বরাত্রে স্বামীজীর জ্বর হওয়ায় পরদিন পূজায় যোগদান করিতে পারেন নাই; সন্ধিক্ষণে উঠিয়া মহামায়ার চরণে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। নবমী রাত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের গাওয়া দু-একটি গান গাহিলেন। পূজা-শেষে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর দ্বারা যজ্ঞদক্ষিণান্ত করা হইল। দুর্গাপূজার পর মঠে লক্ষ্মী ও শ্যামাপূজাও যথাশাস্ত্র নির্বাহিত হয়।... বেদান্তবাদী বা ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াও স্বামীজী আচার্য শঙ্করের মতো পূজানুষ্ঠানাদির প্রতি শ্রদ্ধাবান ও অনুরাগী ছিলেন।"

সকল দেবতার দেহনিঃসৃত তেজোরাশি থেকেই দেবী দুর্গার উৎপত্তি। সে-কারণেই দেবী দুর্গাকে 'মহাশক্তি' বা 'মহামায়া' বলা হয়। দুর্গাপূজা হলো শক্তিপূজা।

'দুর্গ' শব্দের অর্থ হলো 'দৈত্য', 'মহাবিঘ্ন', 'ভববন্ধ', 'কুকর্ম', 'শোক', 'দুঃখ', 'নরক', 'যমদণ্ড', 'জন্ম', 'মহাভয়', 'অতিরোগ' ইত্যাদি। 'আ' হন্তৃবাচক। অর্থাৎ যে-দেবী এগুলিকে বিনাশ করেন, তিনিই 'দুর্গা'। আবার অন্যভাবেও দেখা যেতে পারে। 'দ-কার' দৈত্যনাশ অর্থবাচক, 'উ-কার' বিঘ্ননাশবাচক, 'রেফ্' রোগঘ্নবাচক, 'গ' পাপঘ্নবাচক এবং 'আকার' ভয় ও শত্রুনাশবাচক। যাঁকে স্মরণ, যাঁর নাম উচ্চারণ ও শ্রবণ করলে দৈত্য, নিখিলবিঘ্ন, সর্বপ্রকার রোগ, সর্বপাপ, সকল ভয় ও অখিল শত্রু নিশ্চয়রূপ নাশ হয় বা বিনষ্ট হয়, সেই শক্তিই 'দুর্গা' নামে পরিকীর্তিতা হয়ে থাকেন।

সাধারণত হিন্দু বাঙালী দেবতাকে মাতৃজ্ঞানে দেবীমূর্তিতে পূজা করতে অভ্যস্ত। একারণেই আমাদের দুর্গা, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, কালী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী নারীরূপা। এই দেবীগণ 'মা' নামে সম্বোধিতা; তাই আমরা 'মা দুর্গা', 'মা লক্ষ্মী', 'মা কালী' বলে থাকি। 'শ্রীশ্রীচণ্ডী'তে বলা হয়েছে ঃ

"যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।" (৫।৩৭)

তত্ত্বদর্শীর দৃষ্টিকোণ থেকে দশভুজা দুর্গার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটি এইরকম—জীবাত্মা দশপ্রথায় (ধৃতি, ক্ষমা, দম, যম প্রভৃতি) ধর্মরূপ অস্ত্র দ্বারা পাপাধার মহিষাসুরকে বধ করছেন। ধর্মই পাপনাশের একমাত্র উপায়। পাপ দূর করতে গেলে সব বিঘ্ন নষ্ট করে কার্যসিদ্ধি করতে হয়। এইজন্যই মা দুর্গা বিঘ্নহারক সিদ্ধিদাতা গণেশ, শক্তিধর কার্তিক, জ্ঞানদাত্রী সরস্বতী ও ঐশ্বর্যশালিনী লক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়েছেন এবং পাশবশক্তির প্রতীক পশুরাজ সিংহকে বশীভূত করে বাহনরূপে ব্যবহার করেছেন এবং বিষধর সর্পকে পাপাসুরকে দংশন করাবার জন্য উত্তেজিত করেছেন।

স্ত্রী যখন যে-অবস্থায় থাকুন না কেন, স্বামী চিরদিন তার মাথার মণি ও পরমারাধ্য দেবতা। তাই দেবী দুর্গা রণোন্মত্তা সিংহবাহিনী অবস্থাতেই স্বামী মহাদেবকে শিরোপরি সংস্থাপন করেছেন। শিব ছাড়া শিবার পূজা হয় না। শিব ও শিবা অভিন্ন।

খুব সম্ভবত, খ্রীস্টীয় গণনার সূচনা থেকেই উমা বা পার্বতী শিবের সঙ্গিনী বা অভিন্ন শক্তি হিসাবে পরিগণিত হতে থাকেন। 'উমা-মহেশ্বর' বা 'হর-পার্বতী' আদি-পিতা ও আদি-মাতা হিসাবে ভারতে সার্বজনীন স্বীকৃতি পেয়েছেন।

সন্তানের প্রকৃত লালন-পালন ও পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য মা ও বাবা উভয়েরই প্রয়োজন। বাবার সাহায্য না

পেলে মা সম্যগ্‌রূপে সন্তানকে লালনপালন করতে পারেন না। বাবার যেসকল শক্তি আছে, মায়ের মধ্যে সেসকল শক্তি পূর্ণভাবে নেই। আবার মায়ের মধ্যে যেসব শক্তি আছে, বাবার মধ্যে তার অনেকগুলিরই অভাব আছে। উভয়ে মিলিত না হলে, উভয়ে পরস্পরকে সাহায্য না করলে সন্তানের লালনপালনাদি কার্য পূর্ণভাবে নিষ্পন্ন হয় না। প্রকৃতপক্ষে মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি এক পূর্ণ অখণ্ড শক্তিরই দুই অর্ধ। কোন কার্যই এই দুই শক্তির পারস্পরিক সহযোগিতা ভিন্ন নিষ্পন্ন হয় না। 'মা দুর্গা' হলেন 'মা' ও 'বাবা'র মিলিত ভাব—যিনি শিব, তিনিই শিবা। 'মা দুর্গা' কেবল 'মা' নন, তিনি 'মা' ও 'বাবা'র মিলিত ভাব—শিব থেকে শিবা অভিন্ন, যেমন পুরুষ থেকে প্রকৃতি বা শক্তিমান থেকে শক্তি অভিন্ন। শিব বিনা শক্তি এবং শক্তিরহিত শিব কখনো হতে পারেন না। গৌরী-শঙ্করের ঐক্যকে যিনি সাক্ষাৎ করতে পারেন, তিনিই যথার্থ জ্ঞানী। সূতসংহিতায় বলা হয়েছে ঃ

"ন শিবেন বিনা শক্তির্ন শক্তিরহিতঃ শিবঃ।
উমা-শঙ্করয়োরৈক্যং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।"

যদি শিব ও শিবা অভিন্ন হন, যদি মাতৃশক্তি ও পিতৃশ[illegible] অর্ধ হন, তবে আমরা 'মা দুর্গা'কে কেন দেবীমূর্তিতে, [illegible] পূজা করি? শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ (১৮৫৮-১৯২৭) বলেছেন [illegible] 'মাতৃভাব'ই সর্বাগ্রে জা[illegible] থাকে, মানুষেরাও [illegible] মাকেই আগে চেনে, [illegible] ইহারা [illegible]নায়, [illegible] কোল পাইলেই ইহারা শা[illegible] সুখী [illegible] গর্ভধারিণী [illegible]ানের জন্য কত ক্লেশ সহিয়া [illegible] করিবার নিমিত্ত গর্ভধারিণী নিজ দুঃখ[illegible] মনে করেন না, জননী স্বসুখনিরভিলাষ হইয়া সন্তানের সুখহেতু সতত সচেষ্ট হন। অতএব জীবহৃদয়ে সর্বভাবের মধ্যে মাতৃভাবই সর্বাগ্রে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, আমার তাহাই বিশ্বাস।"[১]

স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন ঃ "ভারতে পিতাই সবসময় সন্তানদের শাসন করেন। সেইজন্য পিতার উপর ভক্তিশ্রদ্ধায় খানিকটা ভয়ও মিশিয়া থাকে। আরো একটি ভাব হইল ভগবানকে 'মা' বলিয়া চিন্তা করা। ভারতে জননী সর্বদাই যথার্থ ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্রী। তাই ঈশ্বরের প্রতি মাতৃভাব ভারতে খুব স্বাভাবিক।"[২]

ঋগ্বেদ পরিশিষ্টে, তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ও দেবী উপনিষদে 'দুর্গা' শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

ঋগ্বেদের অষ্টম অষ্টকের সপ্তম অধ্যায়ে চতুর্দশ বর্গানিন্তর পঞ্চবিংশতি ঋগাত্মক পরিশিষ্টে আছে—

"তামাগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ সুতরসি তরসে নমঃ।।"

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এবং দেবী উপনিষদেও এই মন্ত্রটি পাওয়া যায়। তবে এই উপনিষদ্-দুটিতে মন্ত্রটির সামান্য পাঠান্তর আছে।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে মন্ত্রটি নিম্নরূপ—

"তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে
সুতরসি তরসে নমঃ।।" (৪।১০।২)

[illegible] সায়ণাচার্য-কৃত তৈত্তিরীয় আরণ্যক ভাষ্যে পাওয়া [illegible]—যিনি অগ্নিবর্ণা (প্রদীপ্ত অগ্নি যাঁর বর্ণ—যাঁর রূপ), যিনি স্বকীয় [illegible] তপঃসন্তাপে আমাদের [illegible]ণকে [illegible] রোচনশীল—[illegible] পরমাত্মা কর্তৃক দৃষ্ট বলে জ্যোতির্ময়ী; স্বর্গ, পশু, পুত্র প্রভৃতির নিমিত্ত উপাসকদিগের দ্বারা যিনি জুষ্টা—সেবিতা, [illegible] উপাসকেরা যাঁর সেবা [illegible], যিনি সংসারার্ণব-তারিণী, আমরা তাঁর শরণাগ[illegible] হচ্ছি। [illegible] সর্ব[illegible]বিনাশকর্ত্রী, হে দুস্ত[illegible]র্ণবত্রাণকারি[illegible] মা দু[illegible] আমি তোমাকে নমস্কার করা[illegible]

দেবী উ[illegible] মন্ত্রটির ভাষ্যে বলা হয়েছে—সেই মহাভয়বিনাশিনী, মহাদুর্গপ্রশমনী, মহাকারুণ্যরূপিণী দেবীকে আমি প্রণাম করছি। ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁর প্রকৃত স্বরূপ জানেন না, একারণে তাঁকে 'অজ্ঞেয়া' বলা হয়; তাঁর অন্ত নেই, তাই তিনি 'অনন্তা' নামে উক্তা হয়ে থাকেন; তাঁকে কেউ গ্রহণ করতে পারে না, এজন্য তিনি 'অলক্ষ্যা' নামে অভিহিতা হন; তাঁর জন্ম উপলব্ধ না হওয়ায় তাঁকে 'অজা' বলা হয়; একা হয়ে সর্বত্র বর্তমানা বলে তাঁকে 'একা' বলা হয়; এক অদ্বিতীয়া হলেও যিনি বিশ্বরূপিণী, তাঁকে 'অনেকা' নামেও অভিহিত করা হয়। যিনি সর্বমন্ত্রের মাতৃকাদেবী, যিনি সর্বশব্দের জ্ঞানরূপিণী,

১ দ্রঃ 'দুর্গা, দুর্গার্চ্চন ও নবরাত্রতত্ত্ব', প্রাচী পাবলিকেশন, বৈশাখ ১৪০৭, পৃঃ ৩২
২ 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', ১০ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ৭ম সং, পৃঃ ২৭

যাঁর থেকে শ্রেষ্ঠা কেউ নেই—সেই অজ্ঞেয়া, অনন্তা, অলক্ষ্যা, অজা, একা, অনেকা, সেই চিন্ময়াতীতা, সেই শূন্যসাক্ষিণী 'দুর্গা' নামে প্রকীর্তিতা হয়ে থাকেন।

কেবলমাত্র বৈদিক মন্ত্রেই নয়, দেবী দুর্গা ভারতের অনার্য আদিবাসীদের মধ্যেও যে পূজিতা ছিলেন, এর প্রমাণ আমরা পেয়ে থাকি। 'খিল হরিবংশ'কে মহাভারতের পরিপূরক বা পরিশিষ্ট বলা হয়ে থাকে। সেই 'খিল হরিবংশ'-এ দেখা যায়, দেবী দুর্গা শবর, বর্বর এবং পুলিন্দদের দ্বারা পূজিতা হতেন।

আগেই বলা হয়েছে, শিব ও শিবা অভিন্ন; মাতৃশক্তি ও পিতৃশক্তি এক পূর্ণশক্তির বা অখণ্ড শক্তির দুই অর্ধ। মা দুর্গার কৃপা ব্যতিরেকে কেউই এই পরম সত্য যথার্থভাবে অনুভব করতে পারেন না। যথাশক্তি ও যথার্থভাবে মা দুর্গার পূজা করতে করতে তাঁর অনুগ্রহে সমাধিসিদ্ধি হয়। সমাধিনেত্র উন্মীলিত হলে ঋত বা পরব্রহ্মের প্রথমজ বা প্রথমোৎপন্ন বিমল আদিভূত জ্ঞানের অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিহীন জ্ঞানবিরহিত বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিকাশ হয়ে থাকে। এই অবস্থায় অর্থাৎ মা দুর্গার অনুগ্রহে যখন বহির্মুখী চিত্তবৃত্তি সর্বতোভাবে অন্তর্মুখী করতে পারা যায়, তখন যথার্থ অদ্বৈতজ্ঞানের উদয় হয়, সর্বসংশয় বিদূরিত হয়। এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ নেই, যিনি দুর্গা তিনিই শিব—এই পরম সত্যের যথার্থ অনুভব হয়।

মা দুর্গা শিবা, চিন্মাত্রাশ্রয় মায়াশক্তিতে অনুপ্রবিষ্টা সম্বিৎ—চিচ্ছক্তি। তিনিই লীলাবিগ্রহধারিণী 'উমা', তিনি নিখিল জড়বর্গের উপাদানভূতা চিন্মাত্রাশ্রয়া 'মায়া'। তিনিই জড়শক্তিরূপে সাধারণের পরিচিতা।

''শিবামেতামুমামেনাং জড়শক্তিং তথৈব চ।
জড়কার্যং জগজ্জীবং ভেদং তথৈব চ।।''
(সূত-সংহিতা)

এই করুণাসাগরা, সদাকারা, পরমানন্দময়ী, সংসারোচ্ছেদকারিণী শিব থেকে অভিন্না, শিবঙ্করী পরমাদেবী শাঙ্করীকে যে ভাগ্যবান যথার্থভাবে পূজা করে, মা দুর্গার অনুগ্রহে তার সর্বসিদ্ধি হয়, সর্ব অভীষ্ট প্রাপ্তি ঘটে।

''করুণাসাগরামেতাং যঃ পূজয়তি শাঙ্করীম্।
কিং ন সিধ্যতি তস্যেহ তস্যা এব প্রসাদতঃ।।'' (ঐ)

মা দুর্গা প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের মিলিত ভাব, মা দুর্গা পরব্রহ্মস্বরূপিণী। তাঁর থেকে প্রকৃতি-পুরুষাত্মক জগতের আবির্ভাব হয়েছে।

''কাসি ত্বং মহাদেবী সাব্রবীদহং ব্রহ্মস্বরূপিণী।
মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগচ্ছূন্যং চাশূন্যং চ।।''
(দেবী-উপনিষদ্, ১)

ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ পরমপুরুষার্থসিদ্ধির জন্য মা দুর্গার স্বরূপ জেনে যথার্থভাবে তাঁর পূজা করা ভিন্ন জীবের অন্য উপায় নেই। ঐহিক বাধা দূরীকরণ ও ঐহিক সুখলাভার্থ জীব বুদ্ধিপূর্বক বা অবুদ্ধিপূর্বক যাকিছু করে, তা প্রকৃতপক্ষে মা দুর্গারই উপাসনা। রূপরসাদি আপাত-প্রতীয়মান বিভিন্ন ভাবসমূহের দেশকালাদি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন নিরূপাধিক, পূর্ণ পরসম্বিৎ বা পরব্রহ্মের সাথে যে সঙ্গতি, যে ঐক্যানুভূতি—তাই প্রকৃত দুর্গাপূজা। কায়িক, বাচিক ও মানসিক শুভকর্মমাত্রেই পূজা। চিত্তমল, বাঙ্মল ও কায়মলের শোধনই দুর্গাপূজার প্রধান কর্তব্যকর্ম।

নবরাত্র ব্রত শরৎকাল ও বসন্তকালে করতে হয়। 'শরৎ' ও 'বসন্ত' ঋতুদ্বয় প্রাণিদিগের পক্ষে অতি দুঃখে অতিবাহিত হয়। এই সময়ে মানবগণের বিবিধ পীড়া উপস্থিত হয়, অনেকেই কাল-কবলিত হয়ে থাকে। চৈত্র মাসে (বসন্তকাল) ও আশ্বিন মাসে (শরৎকাল) জ্ঞানবান ব্যক্তিদিগের ভক্তিপূর্বক দেবী চণ্ডিকা বা দুর্গার পূজা অবশ্যকর্তব্য। 'শরৎ' ও 'বসন্ত'—মহাঘোর এই ঋতুদ্বয় সর্বজনমধ্যে 'যমদংষ্ট্রা' নামে প্রচলিত। আশ্বিন মাসে অর্থাৎ শরৎকালে দেবী দুর্গার পূজা 'শারদীয়া দুর্গাপূজা' ও চৈত্র মাসে অর্থাৎ বসন্তকালে দুর্গার পূজা 'বাসন্তী পূজা' নামে খ্যাত।

শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ নবরাত্র তত্ত্বটির ব্যাখ্যা নিম্নরূপে করেছিলেন, যার দার্শনিক গুরুত্ব অপরিসীম—যা আত্মজ্ঞানে আবৃত করে রাখে, যা আত্মার স্বরূপকে জানবার পথে প্রতিবন্ধকস্বরূপ, যা দুঃখময় সংসারে যাতায়াতের কারণ, যা অপরিচ্ছন্ন জ্ঞান—তাই হলো 'মায়া'। মায়ার হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কৃতিলাভ করতে গেলে পরমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। দুরত্যয়া মায়ার হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য অখণ্ড সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মার শরণাগত হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নেই। 'মায়া' শব্দটি বেদে 'আবরক অসুর' অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। নয়প্রকার বা নয় গুণিতক রাত্রি বা মায়াকে অতিক্রম করতে না পারলে দেবতা সর্বতোভাবে মায়া বা 'আবরক অসুর'কে জয় করতে সমর্থ হন না।[৩]

এটিই দুর্গাপূজার নবরাত্র তত্ত্ব। ❑

৩ দ্রঃ 'দুর্গা, দুর্গার্চ্চন ও নবরাত্রতত্ত্ব'—শিবরামকিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ, প্রাচী পাবলিকেশন, বৈশাখ ১৪০৭, পৃঃ ৯৩

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দের ভূমিকা ও তাৎপর্য

অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তিঃ ভাদ্র ১৪০৮ সংখ্যার পর]

১৮৯৯ সালে অরবিন্দ যতীন্দ্রনাথ নামে এক দীর্ঘকায় বলবান বাঙালী যুবককে বরোদা রাজ্যের সৈন্য-বিভাগে ভর্তি করলেন, যাতে যুবকটি যুদ্ধসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ নিয়ে বাংলায় এসে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারে। এই হলো সক্রিয় রাজনীতিতে তাঁর প্রথম পদক্ষেপ। একটি মারাঠা যুবককে তিনি ইউরোপে পাঠালেন বোমা তৈরি শিখতে এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে। ১৯০০ সালে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যতীন্দ্রনাথ অরবিন্দের নির্দেশে বাংলাদেশে উপস্থিত [illegible] বিপ্লবী দল গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। [illegible] পাঠানো হলো যতীন্দ্রনাথের দলগঠনের কাজে সাহায্য করার জন্য। অরবিন্দ নিজেও মাঝে মাঝে বরোদা [illegible] থেকে ছুটি নিয়ে বাংলায় চলে আসতেন ঐ দলগঠনের কাজে। [illegible]-১৯০২ সালের মধ্যে একবার তিনি যতীন্দ্রনাথ ও বারীনকে সঙ্গে নিয়ে মেদিনীপুরে উপস্থিত হয়ে একটি [illegible] কমিটি গঠন করলেন, যে-কমিটির সঙ্গে ক্ষুদিরাম [illegible] যুক্ত হয়েছিলেন। অরবিন্দ বরোদা থেকে সারা দেশে বিপ্লবী দল গঠন করে দলগুলির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ১৯০৫ সালে বাংলায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয় এবং অরবিন্দ ১৯০৬ সালে তাঁর বিপ্লবী দল-সহ ঐ আন্দোলনে যোগাদান করেন, যাতে দলটি জনপ্রিয় হয়ে ব্যাপক আকার ধারণ করতে পারে।

তাঁর রাজনীতির তিনটি ধারা। প্রথমটি হলো একটি বিপ্লবী দল গঠন এবং গোপনে বিপ্লবমূলক চিন্তার প্রচার—যার লক্ষ্য সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুতি। দ্বিতীয়ত, প্রকাশ্যে আন্দোলন করে যাওয়া, যাতে দেশ পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। তৃতীয়ত, জনসাধারণকে অসহযোগ ও নিরুপদ্রব (নিষ্ক্রিয়) আন্দোলন (non-cooperation and passive resistance movement)-এর জন্য প্রস্তুত করা। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের বীজ এখানেই রোপিত হয়।

সরকারের সঙ্গে গুপ্ত সংগ্রাম (guerilla warfare)-এর কথা তো অরবিন্দ ভেবেইছিলেন। অধিকন্তু দেশব্যাপী প্রতিরোধ ও বিদ্রোহের প্রয়োজনও বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন। আবার, ভারতীয় সৈন্যদলকে প্ররোচিত করা—এটিও ছিল তাঁর লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্যের দিকে কয়েকটি পদক্ষেপের ফলে সৈন্যদের একাংশে বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল।

অরবিন্দ 'যুগান্তর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। কিছুকাল তিনি পত্রিকাটির গোপন পরিচালক ও বেনামী সম্পাদক হিসাবে কাজ করেছিলেন। পত্রিকাটিতে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ, ব্রিটিশ শাসনকে অস্বীকার করার কথা, এমনকি বিক্ষিপ্ত গেরিলাযুদ্ধ সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য তথ্য প্রকাশিত হতে থাকে। পত্রিকাটি সরকারের বিষদৃষ্টিতে পড়ে এবং সেটির সহকারী সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা)-কে পুলিস গ্রেপ্তার করে। এর ফলে পত্রিকাটি আরো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

দেশবরেণ্য বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার জনক। অরবিন্দ নিজের নাম গুপ্ত রেখে পত্রিকাটির সম্পাদনা করতেন। কাগজটি মানুষের মনকে নাড়া দেয়। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ, এমনকি সামান্য দোকানদার পর্যন্ত বিপ্লবীদের সাহায্যদানে এগিয়ে আসে। সরকার আর সহ্য করতে পারল না। প্রমাণ না থাকলেও পুলিস অরবিন্দকে পত্রিকাটির সম্পাদক মনে করে গ্রেপ্তার করে। সেইসময় রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি কবিতা রচনা করলেন—"অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।" অরবিন্দ অবশ্য মুক্তি পেলেন, কারণ তাঁর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যেই তাঁর সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আবিষ্কার করেছিলেন যে, অরবিন্দের বিপ্লবী জীবনের [illegible] ছিল এক বৃহৎ আধ্যাত্মিক চেতনার নির্ঝর—যার প্রকাশে ও পূর্ণ পরিণতিতে মানুষের হৃদয়শৃঙ্খল খসে যাবে এবং মানুষ চেতনার এক উন্নততর স্তরে উন্নীত হবে। রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দকে দেবদূতরূপে চিত্রিত করে লিখেছেন ঃ

"দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্রদূতে বলো, কোন রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে...
তাই শুনি আজ
অন্তরবেগে নির্ঝরের উন্মত্ত নর্তন।"

১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী মজঃফরপুরে বোমা ফাটিয়ে অত্যাচারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে হত্যা করলেন দুজন শ্বেতাঙ্গ মহিলাকে। পুলিসের খানাতল্লাসি শুরু হলো এবং বহু বিপ্লবী ধরা পড়ল। ২ মে পুলিস অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করে আলিপুর জেলে নিয়ে যায়। তাঁর বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ ছিল, সেগুলির খণ্ডনের ভার হাতে নিয়েছিলেন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। ১৯০৮ সালের ১৮ মে থেকে অরবিন্দের বিচার শুরু হয় এবং বিচারের সমাপ্তি হয় ১৯০৯ সালের ৫ মে। অরবিন্দের সমর্থনে চিত্তরঞ্জন যে শেষ ভাষণ দিয়েছিলেন, তাতে জজ, জুরী ও আদালত অভিভূত হয়ে অরবিন্দকে মুক্তিদান করে।



নিজ কক্ষে অধ্যয়নরত শ্রীঅরবিন্দ

আদালত থেকে বেরিয়ে এসে অরবিন্দ দেখলেন যে, তাঁর হাতে গড়া বিপ্লবীদলকে ব্রিটিশ প্রশাসন যেন একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছে এবং সরকারের দমননীতিতে দেশ অবসাদগ্রস্ত। তিনি হতাশ না হয়ে একাই বক্তৃতা ও কাগজের মাধ্যমে আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন। 'কর্মযোগিন্' (ইংরেজী) ও 'ধর্ম' (বাঙলা)—এই দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনাময় জাতীয়তাবাদী রচনাবলী প্রকাশিত হতে থাকে। এদিকে পুলিসের দেশব্যাপী দমননীতি অব্যাহত রইল। অরবিন্দ লিখলেন ঃ "ভগবানের আদেশে যে জাতি একবার জেগে উঠেছে তাকে অত্যাচার দমাতে পারে না। ইতিহাস তার সাক্ষী।... দমন হলো ভগবানের হাতের হাতুড়ি, আমাদের পিটিয়ে পিটিয়ে গড়ে তুলছেন এক প্রবল জাতি—যাতে আমরা তাঁর কাজের যন্ত্র হতে পারি।" সরকার ভেবে দেখল, অরবিন্দকে রাজনীতি থেকে সরাতে না পারলে ব্রিটিশ রাজত্ব ভারতে টিকবে না। তাঁকে গ্রেপ্তারের জন্য সরকার ওয়ারেন্ট জারি করল। এইবার আইন-আদালতের পথে নয়, যেকোন এক অজুহাতে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নির্বাসনে রাখা হবে—এই ছিল সরকারের পরিকল্পনা। ভগিনী নিবেদিতা মারফত এই সংবাদ অরবিন্দের কাছে পৌঁছায়। এসময় আবার অন্তর থেকে একটি নির্দেশ পেলেন তিনি—চন্দননগরে চলে যেতে হবে এবং তিনি তৎক্ষণাৎ তাই করলেন। এরপরে তাঁর অন্তর থেকে নির্দেশ আসে পণ্ডিচেরীতে চলে যাওয়ার জন্য। তিনি অতি গোপনে কলকাতায় এসে জাহাজে উঠে পণ্ডিচেরীতে উপস্থিত হন ১৯১০ সালের ৪ এপ্রিল। পণ্ডিচেরীর দিকে যাত্রার পূর্বেই তাঁর ভবিষ্যদ্দৃষ্টি খুলে যায়। তিনি জানতে পারলেন—"যে-কর্মের প্রবর্তনা আমি করেছিলাম... তা অন্যের দ্বারা আমার পূর্বনির্দিষ্ট পথেই অগ্রসর হবে এবং আমার ব্যক্তিগত ভূমিকা ও উপস্থিতি ব্যতিরেকেই এই আন্দোলন অন্তে বিজয়ী হবে।" এক তীব্র অথচ সংগঠিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনের কথাও তিনি চিন্তা করেছিলেন—পরবর্তী কালে যে-পথ গ্রহণ করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু অরবিন্দ তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করলেন—এইরকম আন্দোলনে নেতার ভূমিকায় তিনি আর থাকতে পারবেন না। সুতরাং কোনরকম ভয় বা হতাশা যে তাঁকে রাজনীতি থেকে সরিয়ে দেয়, সেকথা আদৌ সত্য নয়। তিনি বলেছেন ঃ "এধরনের বোধ আমার মনে কখনো আসেনি। আমি সরে এসেছিলাম, যাতে অন্য কিছু আমার যোগের পথে এসে না দাঁড়ায় এবং এসম্পর্কে সুস্পষ্ট আদেশ পেয়েছিলাম।" যদিও তিনি ইতিপূর্বেই যোগের পথে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলেন, তবুও কে যেন তাঁর অন্তর থেকে জানিয়ে দিলেন যে, এখনো তাঁর যোগের প্রকৃত লক্ষ্যটাই বাকি। গভীরতর তপস্যার দ্বারা অন্তরের নির্ঝরকে নিয়ে আসতে হবে নিজের সম্মুখভাগে—বহিরাংশে বহিঃপ্রকাশের মধ্যে, যাতে মনুষ্যকুল সেটির নিঃসন্দিগ্ধ পরিচয় পেয়ে ঐ স্রোতে অবগাহন করে অমৃতত্বের অধিকার লাভ করতে পারে।

।।৩।।

আধ্যাত্মিক বিপ্লবটাই ছিল তাঁর জীবনকথার অন্তরতম মর্ম এবং এরই প্রতিফলন বা লক্ষণ ফুটে ওঠে তাঁর বৈপ্লবিক কর্মধারাতে। তাই তিনি যখন তাঁর রাজনীতির মর্মে নিহিত প্রকৃত জীবনাদর্শের পরিচয় পেলেন, তখন তাঁর রাজনীতিটাকে গৌণ মনে করে নিজের আধ্যাত্মিক দিকটাকেই প্রাধান্য দিয়ে তুলে ধরতে চাইলেন মানুষের সামনে, মানুষেরই সর্বাঙ্গীণ কুশল কামনা করে। ভগবান বলে মনে করি যাঁকে, তিনি যদি সর্বব্যাপী হয়ে থাকেন, তাহলে মানুষের যথার্থ ভাগবত চেতনাও তার সবরকম সাংসারিক চেতনাতেও পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকবে। সূর্যের আলোতে যেমন গ্রহনক্ষত্র মিশে থাকে অথচ লুপ্ত হয় না, ঠিক তেমনি অরবিন্দের রাজনীতি ও মানবতা মিশেছিল তাঁর আধ্যাত্মিক চেতনাতে, লুপ্ত হয়ে যায়নি। রাজনীতি থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তাঁর মধ্যে চিরন্তন সুর বেজে ওঠে—'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে'। একে পলায়নী মনোবৃত্তি (escapism) মনে করলে ভুলই হবে। তিনি স্বয়ং বলেছেন ঃ "রাজনীতির ক্ষেত্রে আমি কিছু করতে পারব না এরকম বোধের দ্বারা প্রবৃত্ত হয়ে আমি রাজনীতি ত্যাগ করিনি।" 'দিব্যজীবন' গ্রন্থে অরবিন্দ লিখেছেন ঃ "আমাদের সমগ্র প্রকৃতিতে একটা ঊর্ধ্বমুখী তপস্যা আছে—অস্তিত্বের বর্তমান ভূমি থেকে সে প্রতিনিয়ত উত্তীর্ণ হতে চাইছে একটা ঊর্ধ্বতন ভূমিতে। অথচ এই উদয়নের ফলে আত্মবিনাশ সে চায় না। ... নিজেকে ছাপিয়ে যাব বলে দেহ-প্রাণ-মনকে ধ্বংস করতে হবে অথবা চিন্ময় রূপান্তরের ফলে তারা খর্ব এবং ক্ষীণবীর্য হবে—একথা সত্য নয়।"

১৮৯৩ সালে বিলাত থেকে ফিরে ভারতের মৃত্তিকার স্পর্শেই অরবিন্দ আত্মার অসীমতা সম্পর্কে অনুভূতি লাভ করেছিলেন। অনন্ত ভগবানকেই প্রত্যক্ষ করলেন তিনি,

ভগবানের এক বিশেষ ভঙ্গিমাতে; বিশ্বের সমস্ত কেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে (প্রত্যেক জড়বস্তু ও উদ্ভিজ্জ পদার্থ, প্রত্যেক প্রাণী ও ব্যক্তির মধ্যে) অনুভব করলেন তাঁকে। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন ঃ আমি পূর্ণ সচ্চিদানন্দ, পরমপুরুষ এবং আমি প্রত্যেকের অন্তরে পরিপূর্ণভাবেই বিরাজ করি। এই যে জীবাত্মারূপী ঈশ্বর, তাঁকে বলি বিশ্বচর ঈশ্বর। জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী যাঁরা তাঁরা হয়তো বলবেন যে, পূর্বজীবনে ভারতভূমিতেই তপস্যা করে যে আধ্যাত্মিক চেতনাকে আয়ত্ত করেছিলেন তিনি, যা তাঁর বর্তমান জীবনের পরিবেশে অবদমিত ও অব্যক্ত হয়েছিল এতকাল, সেটির উন্মেষ ঘটল ভারতের মাটি স্পর্শ করার ফলে। ভারতের মৃত্তিকা থেকে যে উদ্দীপনা পেলেন তিনি, সেটি যেন তাঁর বিস্মৃত আধ্যাত্মিক চেতনাকে স্মৃতিপটে পুনরুজ্জীবিত করল। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও পিতার নিরীশ্বরবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কঠিন প্রভাবকে কাটিয়ে অন্তরস্থ আধ্যাত্মিক চেতনার যে উন্মেষ, তাকে একধরনের আধ্যাত্মিক বিপ্লব বলতে পারি। অরবিন্দ যখন এক রাজনৈতিক বিপ্লবীর ভূমিকায় কর্মরত, তখন কলকাতা থেকে অল্প সময়ের জন্য বরোদায় এসে মারাঠা যোগী বিষ্ণুভাস্কর লেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁর সাহচর্যে তিনদিনের মধ্যেই নির্বাণলাভ করেন। ঐ নির্বাণ অবস্থায় অরবিন্দ ভগবান (সচ্চিদানন্দ)-কে প্রত্যক্ষ করলেন তাঁর আরেকটি ভঙ্গিমাতে। তিনি অনুভব করলেন যে, ভগবান নির্গুণ (নিরাকার), দেশ-কাল ও বিশ্বের অতীত। এইরকম ভঙ্গিমাতে আছেন যে 'ভগবান' তাঁকে অরবিন্দ 'অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ' ('Sachidananda Unmanifest') বলে অভিহিত করেন। এরপর (১৯০৮-১৯০৯) যখন তিনি আলিপুর জেলে তপস্যারত, ঐ সচ্চিদানন্দকে তাঁর এক নতুনতর (তৃতীয়) ভঙ্গিমাতে প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি দেখলেন, সচ্চিদানন্দ সগুণ (সাকার), দেশকালগত ও বিশ্বময়। এই হলো অরবিন্দের বর্ণনায় 'ব্যক্ত সচ্চিদানন্দ' ('Sachidananda Manifest')। ১৯১০ সালে যখন তিনি পণ্ডিচেরীর তপস্যাগুহায়, তখন তিনি সচ্চিদানন্দকে অনুভব করলেন এক সমন্বয়সূচক ভঙ্গিমায়; দেখলেন—ভগবান একাধারেই অব্যক্ত ও ব্যক্ত, নিরাকার ও সাকার, বিশ্বাতীত ও বিশ্বময়। তাঁকে উপনিষদে বলা হয়েছে 'পরম ব্রহ্ম'। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে শ্রীরামকৃষ্ণের কথাটি—ভগবান সাকার ও নিরাকার এবং আরো কত কি! গীতায় ভগবান 'পুরুষোত্তম' বলে অভিহিত। তিনিই পরমপুরুষ, অরবিন্দের ভাষায়— "The Supreme"।

পরমপুরুষের শক্তি দুরকমের—বিদ্যা (জ্ঞান) ও অবিদ্যা (অজ্ঞান)। তিনি তাঁর বিদ্যার সাহায্যে নিজের অব্যক্ত অঞ্চলের সম্ভাব্য রূপগুলিকে ক্রমিক ধারায় ফুটিয়ে তুলছেন, যার ফলে সৃষ্ট হয়েছে পরাপ্রকৃতির বা ব্যক্ত সচ্চিদানন্দের। এই সৃষ্টিধারা অফুরন্ত, আদি, অন্তহীন। সচ্চিদানন্দ নতুন নতুন রূপ ও ছন্দে অহরহ আত্মপ্রকাশ করে চলেছেন; তাঁর প্রত্যেক রূপ হচ্ছে একটি অনন্ত জগৎ ঃ

"কিরণ কমল দলে দলে তার
কত যে জগৎ উঠিছে ফুটি।"[১]

আবার, তাঁর অবিদ্যাশক্তির সাহায্যে পরমপুরুষ নিজেকে সঙ্কুচিত করে সসীমে পরিণত হয়েছেন—তাঁর জ্ঞান, বীর্য ও আনন্দ সবই সীমিত হয়ে পড়েছে। অবিদ্যা হলো তাঁর আত্মসঙ্কোচনের সামর্থ্য, যার ফলে অনন্ত হয়েছেন সান্ত; পূর্ণ যিনি তিনি হয়েছেন অপূর্ণ ও আপেক্ষিক (relative)। এই অপূর্ণতাই তো জীবকুলের দ্বন্দ্ব ও দুঃখের হেতু। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তিনি তাঁর জ্ঞানশক্তি, অনন্তত্ব ও পূর্ণতাকে বিসর্জন না দিয়েই হয়েছেন সান্ত (সীমিত) ও অপূর্ণ। কবিগুরুর দৃষ্টিতে—'সীমার মাঝে অসীম'। পরমপুরুষ একাধারে যেমন অব্যক্ত (নির্গুণ) ও ব্যক্ত (সগুণ), তেমন আবার তিনি যুগপৎ অসীম (infinite) ও সসীম (finite), স্বয়ম্ভু (absolute) ও আপেক্ষিক (relative)। আবার তিনি জ্ঞানের (বিদ্যার) রাজ্যেও এক ও বহু, অভিন্ন ও ভিন্ন। যে-ব্যাপারটি মানুষী বুদ্ধির পক্ষে রহস্যময় ও অচিন্তনীয়—যা স্মরণ করিয়ে দেয় শ্রীচৈতন্যের অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বকে।

পরমপুরুষ এবার আরো এক নতুন ভঙ্গিমাতে অরবিন্দের চেতনাতে আত্মপ্রকাশ করতে থাকেন। তিনি দেখলেন যে, ঐ সচ্চিদানন্দ পৃথিবীর বিবর্তন ধারাতেও সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছেন—যার ফলে প্রস্তরকুল থেকে উদ্ভূত হয়েছে স্নায়ুহীন জৈবপদার্থ ও উদ্ভিদ্‌কুল, জৈবকুল থেকে উদ্ভূত হয়েছে স্নায়ুযুক্ত ইতরপ্রাণী এবং ইতরপ্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়েছে মানুষ। ভগবান কতভাবেই না রয়েছেন! এর ইঙ্গিত দিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন ঃ "তিনি কত কি!" যখন অরবিন্দ রাজনৈতিক বিপ্লবের কাজে ব্যস্ত, তখন তাঁর ভাই বারীন শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ পেলেন—"মন্দির গড়।" অরবিন্দ এর তাৎপর্য বুঝলেন অনেক পরে। তিনি বুঝলেন যে, জড়শরীরের মধ্যে পরম দেবতার দিব্য রূপায়ণের সময় আগতপ্রায়। মানুষের ভিতরে অমৃতের পুত্র হওয়ার যে সম্ভাবনা নিহিত, তার বাস্তব রূপায়ণ এখন জরুরী, তাকে মূর্ত করে তুলতে হবে। এ এক নতুন ধরনের সাধনার প্রেরণা। প্রাণী বিবর্তনের ক্রমিক ধারায় মানুষ থেকে অতিমানুষের বিবর্তন ঘটবে পৃথিবীতে—যিনি হবেন পরা-প্রকৃতির অতিমানস (supremental) ধাতু দিয়ে তৈরি, দিব্য উপাদানে গড়া। [ক্রমশ] (দুই)

সহায়ক গ্রন্থ ঃ
(১) হে চিরদিনের, (২) দিব্যজীবন, (৩) অরবিন্দায়ন।

১ ঋক্ সংহিতা, ১।৩৫।৭ (অনুবাদক—অনির্বাণ)

আদি শঙ্করাচার্য ৩

শিশু ও কিশোর বিভাগ

অবশেষে দীর্ঘ পথচলার অবসান হলো নর্মদা নদীর তীরে জ্যোতির্লিঙ্গ ওঙ্কারেশ্বর নামক মহাতীর্থস্থানে এসে।

হে প্রাজ্ঞ ঋষিবৃন্দ, কেরল প্রদেশের কালাডি গ্রাম থেকে আমি এসেছি গুরু গোবিন্দপাদের কাছে শিক্ষা ও আত্মজ্ঞান লাভ করার ইচ্ছায়।

সুদূর কেরল প্রদেশ থেকে তুমি এই নর্মদার তীরে ওঙ্কারেশ্বরে এসেছ? ধন্য তোমার গুরুভক্তি। ঐ দেখ, সঙ্কীর্ণ গুহা। সেখানেই গোবিন্দপাদ সহস্র বছর যাবৎ ধ্যানমগ্ন। হে বালক, বোধহয় তোমারই কারণে!

শঙ্কর গুহায় প্রবেশ করলেন

হে যতিরাজ, আমার ন্যায় দীনের প্রণাম গ্রহণ করুন। হে গোবিন্দ ভগবৎপাদ, আপনি ব্যাসপুত্র শুকদেবের শিষ্য গৌড়পাদের কাছে অদ্বৈতবিদ্যা লাভ করে সহস্র বছর যাবৎ জগৎকে ব্রহ্মজ্ঞান দেওয়ার জন্য এখানে সমাধিমগ্ন আছেন। কৃপা করে চোখ খুলুন। আমি ব্রহ্মজ্ঞানলাভের মানসে আপনার চরণে আশ্রয়প্রার্থী।

গোবিন্দপাদ ব্যথিত হয়েছেন—এই সংবাদ দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল। শত শত নরনারী এসে ভিড় করে দেখল গুরু-শিষ্যের দিব্য মিলন।





চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু

শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃপুরুষের নিবাস—দেরে বা দেরেপুর

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তিঃ ভাদ্র ১৪০৮ সংখ্যার পর]

।।২।।

রামানন্দ ও ক্ষুদিরাম সম্বাত

এই অধ্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ-জনক ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের দেরেপুর পরিত্যাগের ঘটনা ও সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব। সেইসঙ্গে সমকালীন সমাজ ও দেশীয় শাসনব্যবস্থার রূপটির সঙ্গেও আমরা পরিচিত হব, নতুবা ঘটনার ঐতিহাসিক তাৎপর্য যথার্থ পরিস্ফুট হবে না।

সমকালীন বিচারব্যবস্থা

ক্ষুদিরামের দেরেপুরে বসবাসের সময়কাল আঠার শতকের শেষের কয়েক দশক থেকে শুরু করে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ। সমকালে ব্রিটিশ শাসকের প্রশাসনিক ব্যবস্থার ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটলেও তা ছিল মূলত জমিদার শ্রেণীর আনুকূল্য-সঞ্জাত। সেকালে দেশ শাসন ও রাজস্ব আদায়ের জন্য বাংলা সুবাকে প্রধান পাঁচটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল। এইরকম একটি বিভাগের নাম ছিল বর্ধমান বিভাগ। বর্ধমান বিভাগ সৃষ্টির সময় এর অধীনস্থ চারটি জেলা ছিল, যথা—বর্ধমান (বর্তমান বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়ার সমন্বয়ে), মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর-সহ বাঁকুড়া এবং পাঞ্চেৎ ও রামগড়-সহ বীরভূম।[১০] আঠার শতকে বর্তমান হুগলী জেলা ছিল বর্ধমান জেলার অধীনে। ১৭৯৫ সালে হুগলী স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা পায়।[১১] আঠার শতকের শেষ দশকের প্রায় শেষের দিকে হুগলী জেলা পৃথক হলেও তার পৃথক শাসনতন্ত্র গড়ে উঠতে বেশ সময় লেগেছিল। ১৮২০ সাল পর্যন্ত হুগলী জেলা বর্ধমান কালেক্টরির অধীনস্থ ছিল।[১২] ফলত এই জেলার সংলগ্ন পরগনা ও তালুকের রাজস্ব জমা দিতে হতো বর্ধমান কালেক্টরিতেই। বিচারব্যবস্থাও ঐসময় পর্যন্ত বর্ধমান জেলা প্রশাসনের হাতেই ন্যস্ত ছিল। কামারপুকুর, সাতবেড়িয়া, নারায়ণপুর, দেরেপুর প্রভৃতি মৌজা সমকালে জাহানাবাদ পরগনার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ঐ ভূখণ্ডসমূহও বর্ধমান জমিদারিভুক্ত ছিল। সমকালীন রচনা 'হরিহরমঙ্গল সঙ্গীত'-এ তার প্রমাণ পাওয়া যায়ঃ

"জমিদারী বর্ধমান জগতে প্রধান নাম শ্রীল তেজচন্দ্র যার পতি।
মহারাজ বাহাদুর যশে পূর্ণ মহীশূর যার গুণে ধন্য বসুমতী।।...
আরসা আর অম্বুয়া বামুনভূম বালিয়া চন্দ্রকোণা চৌমহা ঘাটাল।
খণ্ডঘোষ খরিদা ধরি বিষ্ণুপুর বারহাজারি পাণ্ডুয়ায় মানাদ জাঙ্গাল।।
জাহানাবাদ জয়পুর লিখিলাম দুরাদূর ভূরশূট আদি মঙ্গলঘাট।
অপর তরফ যত বিস্তার লিখিব কত ধেঞ যথা যুগাদ্যার পাট।।
বর্ধমান তুল্য পুরী তুলনা দিবার নারি সর্বমঙ্গলা যেই পুরে।
রাজা অতি পুণ্যবান হরিভক্তিপরায়ণ লক্ষ্মী নারায়ণ যার ঘরে।।"[১৩]

শাসনব্যবস্থা ও রাজস্ব আদায়ের জন্য আঠার শতকের শেষের দিকে ব্রিটিশ সরকার প্রধান জেলাগুলিতে কালেক্টর নিয়োগ করেছিল। তাদের জজ ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিল। আঠার ও উনিশ শতক জুড়ে প্রতি জেলায় অসংখ্য ছোট ছোট জমিদারের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়; প্রকৃতপক্ষে তারা কেউই জমিদার নয়। তারা আসলে বিভিন্ন মাত্রার পত্তনি-তালুকদার (দার-পত্তনিদার, সে-পত্তনিদার বা চৌ-পত্তনিদার)। তারা সকলেই দায়বদ্ধ ছিল জমিদারের কাছে। বর্ষশেষে তারা রাজস্ব দিত জমিদারকে। জমিদার রাজস্ব দিত ব্রিটিশ শাসককে। কিন্তু তালুকদার বা পত্তনিদারদের রাজস্ব আদায়ের কৌশল ছিল বিচিত্র। তারা জমিদার ছিল না; তারা ছিল জমির রাজস্ব আদায়ের মালিক এবং সেই রাজস্বের অংশবিশেষে ভোগ-দখলদার ছিল তারা। মূল জমিদারের সঙ্গে প্রজার সংযোগ থাকত না। ফলে দেশের প্রকৃত শাসক যে ব্রিটিশরাজ তাদের শাসনব্যবস্থারও সুযোগ প্রজারা নিতে পারত না। পত্তনিদার বা তালুকদারদের জোর-জুলুমের কথা কোন প্রজা ব্রিটিশ শাসকের বিচারালয়ে হাজির হয়ে বলার সাহস রাখত না। 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় এ-সমস্যার অংশবিশেষ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে বিবৃত হয়েছেঃ "ভূম্যধিকারীর লোকে বলপ্রয়োগ দ্বারা তাহাদের (প্রজাদের) ধান্য গ্রহণ করে; গো-সকল হরণ করে এবং তাহাদিগকে গোনী-বদ্ধ করিয়া জলমগ্ন করে ও প্রহার করে। ভূস্বামী ও দারোগা এবং তাহাদের কর্মচারীরা প্রজাদিগের যেপ্রকার শারীরিক দণ্ড করে, তাহা কলিকাতাবাসী অনেক লোক সবিশেষ অবগত নহেন।"[১৪] এরপর জমিদার কর্তৃক আঠার প্রকার প্রজাশাসনের উল্লেখ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে ঐ পত্রিকায় জমিদার কর্তৃক প্রজাসম্পত্তি অপহরণের সংবাদও পরিবেশিত হয়েছে। সমকালীন আইনব্যবস্থা ও বিচার প্রহসনেরও উল্লেখ পাওয়া যায় আরেক প্রাচীন গ্রন্থ 'মেদিনীপুরের ইতিহাস'-এ।

১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর জোরে প্রজাগণ ভূমির ওপর থেকে সকল ক্ষমতা হারিয়েছিল। আকবরের আমলে প্রদত্ত কৃষকের

১০ দ্রঃ বর্ধমানঃ সমাজ ও সংস্কৃতি—যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, ২য় খণ্ড, ১৯৯০, পৃঃ ২৬৬
১১ হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ—সুধীরকুমার মিত্র, ১ম খণ্ড, মণ্ডল বুক হাউস, ১৯৯১, পৃঃ ৪২
১২ বর্ধমানঃ সমাজ ও সংস্কৃতি, ১ম খণ্ড, ১৯৯০, পৃঃ ১১
১৩ ঐ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭১
১৪ পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন, 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা, বৈশাখ, ১৭৭২ শক, ৮১ সংখ্যা

সকল অধিকার এই আইনে নাকচ হয়ে গিয়েছিল। পূর্বে জমিদার ছিল রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারী মাত্র, কিন্তু কোম্পানি আইনে জমিদার হলো প্রকৃত জমির মালিক এবং বাৎসরিক খাজনার ভিত্তিতে প্রজা একবছরের জন্য ভূমি চাষের অধিকার পেয়েছিল। ফলে রাজস্ব বকেয়া অভিযোগের ভিত্তিতে জমিদার বা তার তাঁবেদার পত্তনিদার বা তালুকদারগণ অনায়াসে প্রজাকে ভূমি থেকে উৎখাত করতে পারত। ভূমির রাজস্ব বৃদ্ধির অজুহাতেও তারা তাদের ইচ্ছানুযায়ী কোন প্রজাকে অনায়াসে উৎখাত করে অন্যকে বন্দোবস্ত দিতে পারত। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে ৫নং রেগুলেশন বলে ঘোষিত ছিল যে, কৃষককে জমির ওপর অধিকার দেওয়া বা না দেওয়ার ক্ষমতা জমিদারের ইচ্ছাধীন।

রামানন্দ ও ক্ষুদিরাম বিতর্ক

দেরেপুরের নিকটস্থ খেঁজুরবাঁদি, কোকন্দ, বেতরা প্রভৃতি গ্রাম ছিল নকুণ্ডা লাটভুক্ত। আঠার শতকে এই লাটের মালিক ছিলেন কলকাতার মিত্র পরিবার। ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ঐ লাট কেনেন কলকাতা-নিবাসী দুর্গাচরণ মিত্রের কাছ থেকে। দুর্গাচরণ মিত্রের পিতার সঙ্গে সাতবেড়িয়ার জমিদার (তালুকদার) রামানন্দ রায়ের এক ফৌজদারী মামলা হয় বর্ধমান ফৌজদারী আদালতে। সেই মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য রামানন্দ রায় ক্ষুদিরামকে অনুরোধ করেন। কিন্তু সাক্ষ্যবাণী 'মিথ্যা কথন' বলেই ক্ষুদিরাম রামানন্দ রায়ের অনুরোধ রাখতে অস্বীকার করেন। ফলে সে-মামলায় রামানন্দ রায় হেরে যান এবং মিত্র পরিবারের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে নেন। কিন্তু বিস্মৃত হতে পারেন না ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধ প্রত্যাখ্যানের কথা। তিনি তাঁর ক্ষতির চেষ্টায় উঠেপড়ে লাগেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে সমকালীন জমিদারতন্ত্র এবং ব্রিটিশরাজের শাসন প্রহসনের কথা। তখন শুরু হয়ে গেছে কর্ণওয়ালিসের কুখ্যাত 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'। তার জোরে জমিদার সহজেই স্থায়ী প্রজাকে ভূমিহীন এবং প্রয়োজনে বাস্তুচ্যুতও করতে পারত। রামানন্দ রায় সেই অস্ত্রই ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করলেন।

ঘটনাচক্রে রামানন্দ রায় ও ক্ষুদিরামের বিতর্কের সময় ঐ অঞ্চলে কয়েক বছর ভাল ফসল হয়নি। প্রথম বছর খরা ও পরের বছর অতিবৃষ্টির জন্য ফসল হয়নি। ফলে ক্ষুদিরামের পক্ষে রামানন্দের তালুকদারে ঠিকমত রাজস্ব দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই সুযোগে রামানন্দ ক্ষুদিরামকে কোনরকম সহৃদয়তা না দেখিয়ে রাজস্ব বকেয়ার অভিযোগে তাঁর যাবতীয় কৃষি-ভূমি অধিকার করে নিলেন। অবশিষ্ট থাকল তাঁর বাস্তুভূমিটুকু। ভূমিহীন হওয়ায় তিনি জমির ফসল থেকে বঞ্চিত হলেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই শুরু হলো ক্ষুদিরাম ও তাঁর পরিজনবর্গের। রামানন্দ রায় এজাতীয় সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি বর্ধমান দেওয়ানী আদালতে ক্ষুদিরামের নামে ছয়মাসের বন্দোবস্তে দশহাজার টাকা ঋণ অপরিশোধের অভিযোগে এক মামলা দায়ের করেন।[১৫] ক্ষুদিরাম চিরকালই নিরীহ প্রকৃতির ছিলেন; তিনি আদালত ও মকদ্দমা পছন্দ করতেন না। যেহেতু ঐসমস্ত বিষয়ে মিথ্যাকথন জড়িত, সেই কারণে ঐসকল স্থান থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতেন। ফলে ক্ষুদিরাম রামানন্দ রায়ের এই চক্রান্তের একটিও প্রতিবাদ করলেন না। রামানন্দ রায় একতরফা ডিক্রি লাভ করলেন, সেইসঙ্গে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের বাস্তুভিটা অধিকার করে তাঁকে বাস্তুচ্যুত হতে বাধ্য করলেন।

যে-ক্ষুদিরাম দেরেপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশের স্বাচ্ছন্দ্য ও শ্রীবৃদ্ধিতে নিয়োজিত রঘুবীরের নিত্যপূজা ও নিত্যসেবা ভিন্ন কখনো জলস্পর্শ করেননি; দোল-দুর্গোৎসবে যিনি দেবতার আরাধনা ও আরতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠতেন—সেই ক্ষুদিরাম তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গকে রাখলেন উপবাসী, বিল্বপত্রহীন; তাঁর সীতারাম জিউ থাকলেন অভুক্ত, অতৃপ্ত! শুধু একটি সত্যের খাতিরে সকল সুখ-সম্পদ যিনি হেলায় উপেক্ষা করতে পারেন, তাঁর গৃহেই তো আসবেন স্বয়ং ভগবান! ক্ষুদিরাম তাঁর পূর্বপুরুষের বাস্তুভূমি পরিত্যাগ করে কামারপুকুর অভিমুখে পাড়ি দিলেন। অথচ যে রামানন্দ রায়ের জন্য তাঁর এই দুর্যোগপূর্ণ জীবনপ্রবাহ শুরু হলো, তাঁর পূর্বপুরুষের মানসিকতা এমন কুটিলতাপূর্ণ ছিল না। ক্ষুদিরামের পিতামহের আমল থেকে তাঁরা রায়বাড়ির পুরোহিত। রায় পরিবারের রণরঘুবীর ও পার্বতীনাথ শিবের পুরোহিত ছিলেন তাঁরা কয়েক পুরুষ ধরে। সেই সম্পর্কেই রামানন্দ রায়ের পিতামহ ক্ষুদিরামের পিতামহকে বহু ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেছিলেন। রামানন্দ সে-সম্পত্তি কেড়ে নিলেন। সমকালীন ঘটনা ও রামানন্দের ক্রূরতা প্রকাশ করেছেন ঐ অঞ্চলের এক পাঁচালীকার ঃ

"তাই তো বলি কলির কংস রায় জমিদার শা-এ।
রাজা বলিস কিসের জোরে, পুড়িয়ে প্রজা মেরে?
ঘটিবাটি সবই নিত রাজার নায়েব শা।
বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় পেয়াদা গোমস্তা।।
সুযোগ বুঝে রাজার লোকে আগুন দিত চালে।
ভিটে ছেড়ে উঠত প্রজা রাজার গোয়ালশালে।।
অমনি নায়েব আসত ছুটে লেঠেল নিয়ে সাথে।
রাজার জমায় উঠত সে ভুঁই মালিক বসত পথে।।
গুরু পুরুত কাউকে রেহাই দেয়নি রায় বংশ।
সেই পাপেতেই হলো রাজা সবংশে ধ্বংস।।"[১৬]

শিবু চণ্ডাল ও ক্ষুদিরাম

সাতবেড়িয়ার চণ্ডালপাড়ার অস্তিত্ব আজও আছে এবং তাদের বাস্তুভূমি সাতবেড়িয়ার চোদ্দ বিঘার রায়েদের বাস্তুর সন্নিকটেই। কথিত আছে, রামানন্দ রায় তাঁর কোলেপুকুরের

১৫ শ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায় সংগৃহীত তথ্য থেকে গৃহীত।

১৬ 'রাঢ়ের কড়চা' পাঁচালী গীত থেকে সংগৃহীত।

উত্তরপাড়ের দক্ষিণদিকে জায়গা দান করে ঐ চণ্ডালদের বসিয়েছিলেন। ঐ চণ্ডালদের পূর্বপুরুষরা ছিল রামানন্দ রায়ের স্থায়ী লাঠিয়াল বাহিনীর প্রতিনিধি। দাঙ্গা চালানো, জমিদারকে রাজস্ব পাঠানো, অন্যের জায়গা দখল নেওয়া, কারো সম্পত্তি বা ফসল লুঠ ইত্যাদি কর্মে তাদের ডাক পড়ত ঘনঘন। ঐ চণ্ডাল বংশেরই এক পুরুষ গুরুচরণ চণ্ডাল ছিল রায় পরিবারের এক নামকরা লাঠিয়াল এবং সে রামানন্দ রায়ের আমলেরই ব্যক্তি। গুরুচরণের ছেলের নাম শিবদাস চণ্ডাল (সংক্ষেপে শিবু চাঁড়াল)। ঐ শিবু চাঁড়াল ও ক্ষুদিরামকে নিয়ে এক বিশেষ কিংবদন্তি এখনো ঐ অঞ্চলের ব্যক্তিদের মুখে মুখে ঘোরে—আদালতে মকদ্দমায় একতরফা ডিক্রি নিয়ে রামানন্দ রায় যখন ক্ষুদিরামের বাস্তুভিটার দখল নেন, তখন সেই দখলদাঙ্গায় পাঠিয়েছিলেন শিবু চাঁড়ালকে। শিবুকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন ক্ষুদিরামকে বেঁধে আনতে। শিবদাস প্রতাপান্বিত তালুকদার রামানন্দের আজ্ঞা অমান্য করতে পারে না। সে ও তার লাঠিয়ালরা যথারীতি ক্ষুদিরামের গৃহ চূর্ণবিচূর্ণ করে, সেইসঙ্গে যায় ক্ষুদিরামকে বাঁধতে। ক্ষুদিরাম কোন প্রতিবাদ করেননি। শিবদাস যে-মুহূর্তে ক্ষুদিরামকে দড়ি দিয়ে বাঁধতে গেল তখনি সে ক্ষুদিরামের জায়গায় দেখে জটাজূটধারী দেবাদিদেব মহাদেব দণ্ডায়মান। শিবদাসের হাত কেঁপে উঠল; দড়িগাছা হাত থেকে আলগা হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। শিবদাস আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারল না—তার পেশীবহুল দীর্ঘ দেহ ক্ষুদিরামের পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বলল ঃ "ঠাকুরমশাই, আমায় মার্জনা করুন। আমি মহাপাপী। আমার কৃপা করুন। পেটের দায়ে রামানন্দ রায়ের হুকুম তামিল করতে গিয়ে কী পাপে আজ আমি জড়াতাম; ঠাকুর রঘুবীর আমায় রক্ষা করেছেন।"

শোকাকুল অনুতপ্ত শিবদাসকে মাটি থেকে তুললেন ক্ষুদিরাম। শিবদাস ক্ষুদিরামকে কাতরকণ্ঠে জানালেন ঃ "ঠাকুরমশাই, আপনি আর এক দণ্ড এখানে থাকবেন না। ও রায় জমিদার মানুষ নয়, পিশাচ! আপনি তাড়াতাড়ি চলুন —আজ রাতের মধ্যেই আপনাকে সাতবেড়ে জমিদারি সীমানার বাইরে রেখে আসি।"

ক্ষুদিরাম শিবদাসের কথায় সম্মতি জানালেন। রাতের অন্ধকারেই ক্ষুদিরাম পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করে পেরিয়ে এলেন রামানন্দের জমিদারির চৌহদ্দি। কিন্তু এই কৃতকর্মের জন্য শিবদাসকে রামানন্দ ক্ষমা করলেন না। তিনি চাবুক মেরেছিলেন শিবদাসকে। তারপর মনের দুঃখে রামানন্দের অধীনে চাকরি ছেড়ে শিবদাস দীর্ঘদিন নিরুদ্দেশে থাকে—চলে যায় পশ্চিমে। পরে যখন সে স্বদেশে ফিরে আসে, তখন আর রামানন্দ জীবিত নেই। তখন চৌদ্দবিঘার রায়বাড়িতে শুরু হয়েছে ধ্বংসের পদধ্বনি! [ক্রমশ] (পাঁচ)



সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন

সহৃদয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ অর্থানুকূল্যে আমাদের ভগ্নপ্রায় স্কুলগৃহটি পুনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি।

১।	১০ জন দুস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ	ঃ	১,২০,০০০ টাকা
২।	দুস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
৩।	পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
৪।	আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প	ঃ	১০,০০,০০০ টাকা
৫।	একখানা অ্যাম্বুল্যান্স (Ambulance)	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
			২৬,২০,০০০ টাকা

A/c Payee চেক/ড্রাফ্‌ট 'Ramakrishna Mission Ashrama, Ramharipur'—এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফ্‌ট পাঠাবার ঠিকানা—সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা—বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ ঃ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি

স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া

কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল'

শঙ্কর ঘোষ

অতি সাধারণ কাব্যকাহিনীকে যিনি অপরূপ রূপ-মাধুরী দিয়ে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারতেন, যাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য সমগ্র মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে, যাঁকে দীনেশচন্দ্র সেন মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবির আসনে বসিয়েছেন—তিনি হলেন কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।

মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যের শুরুতে গ্রন্থোৎপত্তির যে বিস্তৃত এবং মূল্যবান বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে আমরা জানতে পারি, বর্ধমান জেলার অন্তর্গত দামুন্যা গ্রামে কবির পৈতৃক বাসস্থান ছিল। ডিহিদার মাহমুদ শরিফের অত্যাচারে তিনি সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে এক রাত্রে সপরিবারে বেরিয়ে পড়েন। তার ওপর ডাকাত রূপ রায় তাঁর সর্বস্ব লুট করে নেওয়ায় তাঁরা কপর্দকশূন্য অবস্থায় কয়েকটা দিন অনাহারে কাটান। দামোদর পার হয়ে তাঁরা পৌঁছান কুচট্যানগরে। একদিন ক্লান্ত অবসন্ন নিদ্রামগ্ন কবিকে দেবী চণ্ডী স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁর মাহাত্ম্য-বিষয়ক কাব্যরচনার নির্দেশ দেন। এরপর কবি শিলাই নদী অতিক্রম করে মেদিনীপুর জেলার আড়রা গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়লাভ করেন এবং বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। পরবর্তী কালে রঘুনাথ রায় যখন জমিদার হলেন, তখন তাঁর সভাসদরূপে তাঁর অভিলাষে মুকুন্দরাম 'চণ্ডীমঙ্গল' রচনা করলেন। কবি তাঁর কাব্যের নাম দিলেন 'অভয়ামঙ্গল'। রঘুনাথ রায় কবিকে 'কবিকঙ্কন' উপাধিতে ভূষিত করেন। কবির এই 'অভয়ামঙ্গল' সাধারণের কাছে 'কবিকঙ্কন চণ্ডী' নামেই পরিচিত হয়ে আছে।

কবির কাব্যরচনার সময়কাল নিয়ে কিছু বিতর্ক রয়ে গেছে। কেউ বলেছেন ১৫৭৭, কেউ বলেছেন ১৫৩৯ খ্রীস্টাব্দ। ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ঃ "এবিষয়ে কোন সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সহজ নয়। তবে নানা উল্লেখ থেকে মনে হচ্ছে, তাঁর অভয়ামঙ্গল (চণ্ডীমঙ্গল) ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকেই সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল—অবশ্য কাব্যরচনা আরম্ভ হয়েছিল এর অনেক আগে। কারণ, এত বড় একখানি কাব্যরচনায় অনেক সময় লেগেছিল এইরকম অনুমানই স্বাভাবিক।"[১]

কাব্যটির মূল্যায়ন করতে বসলে একটি কথাই মনে ভেসে ওঠে—প্রতিভার স্পর্শ যেখানে পড়ে, সেখানেই সোনার ফসল ফলে। কাব্যের কাহিনী তো কবি পেয়েছিলেন তৈরি অবস্থাতেই। কাব্যটির প্রাচীনতম কবি হলেন মানিক দত্ত। এছাড়া ছিলেন আরেক স্মরণীয় কবি দ্বিজমাধব। এঁদের তৈরি কাহিনীকে কবিকঙ্কন যেই রসদৃষ্টিতে দেখলেন, অমনি মামুলি কাহিনী নবরূপে ভাস্বর হয়ে উঠল। নিতান্ত গতানুগতিক কাহিনীর অনুবর্তন করেও তাঁর কাব্য অনায়াসে রসোত্তীর্ণ হলো শুধুমাত্র বাস্তবরসের পরিবেশন-নৈপুণ্যের জন্য। প্রসিদ্ধ সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এপ্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "জীবনের প্রত্যক্ষ রূপের, স্বতঃস্ফূর্ত জীবন-রস-রসিকতার প্রাচুর্যের যে প্রকাশ মুকুন্দরামের মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায়, তাহা বাঙলা সাহিত্যে অভিনব। বস্তু-সঞ্চয় ও বাস্তবরসের পরিবেশন-নৈপুণ্য—দুই দিক দিয়াই মুকুন্দরাম মধ্যযুগে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।"[২]

মুকুন্দরাম সম্পর্কে একটি অভিযোগ বহু সমালোচকই করেছেন যে, নিজের জীবনের দুঃখময় অভিজ্ঞতাগুলিকে অব্যর্থভাবে তিনি তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। তাই তাঁরা মুকুন্দরামকে 'দুঃখবাদী কবি' বলেই চিহ্নিত করতে চান। প্রমাণস্বরূপ তাঁরা ফুল্লরার বারমাসের একটানা দুঃখ বর্ণনা, কৈলাসে ভিখারি শিবের সংসারে নিত্য টানাটানির বর্ণনা, কালকেতুর হাতে নিগৃহীত পশুদের সদলবলে মা চণ্ডীর কাছে দুঃখ নিবেদনের বর্ণনা প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা তাঁরা প্রমাণ করতে চেয়েছেন, মুকুন্দরাম দুঃখবাদের কবি এবং কবির কাব্যটি দুঃখবাদের কাব্য। দুঃখের কথা উল্লেখ করলেই যদি কবিতে দুঃখবাদী আখ্যা দেওয়া হয়, তবে পৃথিবীর বহু স্বনামধন্য কবিই ঐ একই অভিধায় ভূষিত হবেন। মুকুন্দরাম দুঃখ বর্ণনার কবি নিশ্চয়ই। কালকেতু-ফুল্লরার অস্বচ্ছল জীবনযাত্রা বর্ণনায় দুঃখের কথা তো থাকবেই। তাঁর কাব্যে দুঃখের বর্ণনা তাই স্বাভাবিক। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হলো, তাঁর কাব্য দুঃখ অতিক্রমণের আনন্দসঙ্গীত হয়ে উঠতে পেরেছে। 'দুঃখ বর্ণনার কবি' আর 'দুঃখবাদী কবি' যে এক নয়, সমালোচকেরা এই সহজ সত্যকে বিস্মৃত হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সমালোচক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন ঃ "মুকুন্দরামের রচনায় দুঃখ-বর্ণনা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাঁহার কাব্যে দুঃখেই দুঃখের শেষ নাই, দুঃখ উত্তীর্ণ হইবার পরম আশ্বাসবাণীও ধ্বনিত হইয়াছে।"[৩]

করুণরসের পাশাপাশি হাস্যরস সৃষ্টিতেও মুকুন্দরাম মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে আছেন। রঙ্গব্যঙ্গ রসসৃষ্টিতে মুকুন্দরাম, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, নির্মল শুদ্ধ সংযত শিল্পী। তাঁর বর্ণনায় রয়েছে প্রসন্ন উদার সজীবতা। কালকেতুর ভোজন, পুরনারীদের পতিনিন্দা, শিবের দারিদ্র্য, মুরারি শীলের শঠতা, ধনপতি সওদাগরের লালসা, ভাঁড়ু

দত্তের নির্লজ্জতার মধ্যে হাস্যরসের নির্মল স্রোতে সাধারণ বিষয়গুলি হয়ে উঠেছে পরম উপভোগ্য রসের সামগ্রী। যেমন, সুসজ্জিত বৈদ্যগণ হাতে চিকিৎসার পুঁথিপত্র নিয়ে রোগীর সন্ধানে পথে পথে ফিরছেন—

"কারু দেখি সাধ্য রোগ ঔষধ করায় যোগ
বুকে ঘা মারায় সর্বদায়।
অসাধ্য দেখিয়া রোগ পলাইতে করে যোগ
নানা ছলে মাগয়ে বিদায়।।"

এমন হাস্যরসে বিদ্রূপের ঝাঁজ নেই, আছে স্নিগ্ধতার প্রলেপ। এখানে মুকুন্দরাম দক্ষ 'হিউমারিস্ট'। এমন অজস্র হাস্যরসের বর্ণনা তাঁর সমগ্র কাব্যে ছড়িয়ে আছে।

কবিকঙ্কন আত্মপরিচয়জ্ঞাপক যে-অংশ রচনা করেছেন, তেমন বাস্তব, সরস ও মানবিক আবেদনে সমৃদ্ধ সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন রচনা মধ্যযুগে আর দেখা যায় না। বিশেষত সেই সামান্য অবকাশে তিনি যে ইতিহাসচেতনার পরিচয় দিয়েছেন, তার মূল্যও অসামান্য। মুকুন্দরামের আত্মবিবরণী শীর্ষক অংশ তদানীন্তন সমাজ ও বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে। অথচ অবাক হওয়ার মতো বিষয় হলো এই যে, কবিকে যিনি লাঞ্ছিত ও বাস্তুহারা করেছিলেন, সেই ডিহিদার মাহমুদ শরিফের অপরাধের দায়িত্ব একটা গোটা ধর্মসম্প্রদায়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার মতো বুদ্ধিবিকার কখনোই ঘটেনি মুকুন্দরামের। বরং গুজরাট নগর পত্তন, ভারতবর্ষে মুসলমানগণের আগমন, মুসলমানের জাতি-বিভাগ ইত্যাদি প্রসঙ্গে সহানুভূতিশীল কবিমানসের সহমর্মিতা নিয়েই মুকুন্দরাম মুসলমান সমাজজীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ ও বাস্তব চিত্রায়ণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। গুজরাট নগরে সমাগত মুসলমান-জীবনের একটি চিত্র—

"বড়ই দানিস-বন্দ, কাহাকে না করে ছন্দ,
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরায় কাম্বোজ বেশ, মাথে নাহি রাখে কেশ,
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি।।"

শুধু মুসলমানদের বর্ণনাতেই নয়, হিন্দুসমাজের নানান চিত্র অঙ্কনেও কবি পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। এপ্রসঙ্গে সমালোচক ভূদেব চৌধুরী বলেছেন ঃ "হিন্দুসমাজ ও তার অন্তর্বর্তী শাখাসমষ্টির বর্ণনাতেও যে পুঙ্খানুপুঙ্খতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে একদিকে মুকুন্দরামের সমাজনিষ্ঠ মানসভঙ্গির বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ব্যক্ত হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, স্মার্ত পৌরাণিক জাতিভেদপ্রথা সত্ত্বেও গুণ-কর্ম-বিভাজিত অসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীচেতনার পরিচয় হয়েছে সর্বাধিক প্রকট।"[৪]

গ্রন্থারম্ভে মুকুন্দরাম যেসকল দেবদেবীর বন্দনা রচনা করেছেন, তাতে তাঁর উদার ধর্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্যরচনা করতে গিয়ে চৈতন্যবন্দনায় কৃপণতা প্রকাশ করেননি। কবি বলছেন ঃ

"ভুবনে বিদিত নাম সুধন্য নদীয়া গ্রাম
জম্বুদ্বীপ সার নবদ্বীপ।
ঘোর কলি অন্ধকার শ্রীচৈতন্য অবতার
প্রকাশিল হরিনাম গীত।।"

মুকুন্দরামকে আধুনিক বাঙলার বস্তুতান্ত্রিক ঔপন্যাসিক-দের অগ্রদূত বলা হয়ে থাকে। উপন্যাসের প্রধান দাবি চরিত্রসৃষ্টি। মুকুন্দরাম সেদিক থেকে মধ্যযুগের প্রায় সব কবিকে ছাপিয়ে গেছেন। 'মুরারি শীল' তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। সে বাংলার 'শাইলক'। মুরারির স্ত্রীও স্বামীর উপযুক্তই বটে। 'ভাঁড়ু দত্ত' চরিত্র পরিকল্পনায় কবি এমন সূক্ষ্ম মানবচরিত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, যা আধুনিক লেখকদের মধ্যেও সুলভ নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ভাঁড়ু দত্ত' চরিত্র নির্মাণ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ "কবিকঙ্কন এই ছাঁদের মানুষটিকে আমাদের কাছে যে মূর্তিমান করিতে পারিয়াছেন তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। ভাষায় এমন একটু কৌতুকরস লইয়া সে জাগিয়া উঠিয়াছে যে, সে শুধু কালকেতুর সভায় নয়, আমাদেরও হৃদয়ের দরবারে অনায়াসে স্থান পাইয়াছে।"[৫] আভিজাত্যের গৌরবহীন সাধারণ বাঙালী-জীবন থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে যে সাহিত্যিক চরিত্রসৃষ্টি সে-যুগেও সম্ভবপর ছিল, কবির কাব্য পাঠ করলে তা জানা যায়। তাঁর পরিকল্পিত কালকেতু ও ফুল্লরা এরই উজ্জ্বল প্রমাণ। মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যের এই নায়ক-নায়িকাকে আভিজাত্য থেকে দূরে রেখেও এঁদের মধ্যে যে অপূর্ব মানবিক গৌরব দান করেছেন, তা মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে বিরলতম ঘটনা। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ কবির আসনটিতে মুকুন্দরামকে তাই নিঃসংশয়ে বসানো যেতে পারে। ❑

পাদটীকা

১ 'বাঙলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত', মডার্ণ বুক এজেন্সি, বৈশাখ ১৩৯২, পৃঃ ৭৫
২ 'বাঙলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা', ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১ম প্রকাশ, ১৯৫৯, পৃঃ ৪৮
৩ 'বাঙলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস', এ. মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ৫ম সং, ১৯৭০, পৃঃ ৫০৮
৪ 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিকথা' (১ম পর্যায়), বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ, ২য় সং, ১৯৫৭, পৃঃ ৩৯৩
৫ 'সাহিত্য', বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, আশ্বিন ১৩৭৬, পৃঃ ৮৮

প্রসঙ্গ ছট পরব

পরমানন্দ প্রামাণিক

দুর্গাপূজার পর কালীপূজা। কালীপূজার পর পঞ্চম-দিনে অর্থাৎ ভাইফোঁটার পরদিন বিহারের সবচেয়ে বড় উৎসব 'ছট পরব'। তার আভাস এই কলকাতা শহরেও দেখা যায়। বিহারের প্রবাসী অধিবাসীরা এই উৎসব কলকাতার বুকে বেশ জাঁকজমকের সঙ্গেই পালন করেন। মূল পূজার দিন অর্থাৎ কালীপূজার পর ষষ্ঠদিনে সূর্য অস্ত যাওয়ার আগেই বিহারী অধিবাসীদের ছট পরবের ব্যাগু ও ঢাকের আওয়াজে কলকাতার রাস্তাঘাট সরগরম হয়ে ওঠে। ছট পরব অর্থাৎ সূর্যবন্দনা চলে তিনদিন ধরে। এতে কোন মূর্তি থাকে না। যেকোন জলাশয়ে বা নদীর ধারে সূর্যাস্তের পর সূর্যদেবের বন্দনার মধ্য দিয়ে উৎসবের সূচনা ও তার পরদিন সূর্যোদয়ের আগে এই পরবের সমাপ্তি। এই সূর্যবন্দনার জন্য এক-একটি পরিবার জলাশয়ে বা নদীর কিনারে নিজেদের জায়গা নির্দিষ্ট করে নিয়ে পূজার আগে সেই জায়গাটা পরিষ্কার করে পূজার আয়োজন করে। জায়গার দখল নিয়ে দুই পরিবারে কখনো বিরোধ হতে দেখা যায় না।

ভারতবর্ষে সূর্যপূজা অতি প্রাচীন। কিন্তু বর্তমানে তা প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। কেবলমাত্র বিহার এবং বিহার-সংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গে ও উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি জেলায় ছট পরব এখন সীমাবদ্ধ। 'ছট' শব্দের উৎপত্তি সংস্কৃত 'ষষ্ঠী' শব্দ থেকে। 'ষষ্ঠী' অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠদিনে এই উৎসব পালিত হয়। 'ভবিষ্যপুরাণ'-এর মতে একে 'রবিষষ্ঠী' বা 'সূর্যষষ্ঠী' বলে। কিন্তু বিহারের নালন্দার উপকণ্ঠে সুরজপুর-বড় গাঁওয়ের সূর্যমন্দিরে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠদিনে 'চৈত্র ছট' উৎসবে বহু জনসমাগম হয়।

ছট পরবের প্রচলন সম্বন্ধে লোকগাথা থেকে জানা যায় যে, মুনি বৈশম্পায়ন পাণ্ডবদের বনবাসের চতুর্দশ বছরের গোপন বসবাসের কথা রাজা জনমেজয়ের কাছে জানতে চাইলে রাজা উত্তরে বলেন, যখন ত্রিশ হাজার সাধু যুধিষ্ঠিরের কাছে আহারের জন্য আসেন, তখন তাঁর দেওয়ার কিছুই ছিল না। দ্রৌপদী স্বামীর অপ্রস্তুত অবস্থার কথা চিন্তা করে তাঁদের কুলপুরোহিত ধৌম্যের দিকে তাকালে মুনি তাঁকে রাজা শরহতির একমাত্র কন্যা সুকন্যার কীর্তিকথা বর্ণনা করেন। রাজা শরহতি একবার বনে শিকারে গিয়ে চ্যবন মুনিকে ধ্যান করতে দেখেন। তাঁর চোখ ছাড়া সারা শরীর বল্মীকে ঢেকে গিয়েছিল। সুকন্যা বালিকাসুলভ চপলতায় সেই মুনির চোখে খোঁচা দিলে চোখ থেকে রক্তপাত হয় এবং সুকন্যা ভয় পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু মুনি জানতে পেরে তার ওপর অসন্তুষ্ট হন এবং সুকন্যা ও তার সঙ্গীদের অভিশাপ দেন। তারপরই রাজার দুর্ভাগ্য শুরু হয় এবং রাজার প্রধান পুরোহিত সুকন্যাকে এই দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী করে প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ রাজাকে চ্যবন মুনির সঙ্গে সুকন্যার বিবাহ দিয়ে মুনিকে শান্ত করার পরামর্শ দেন। বিবাহের পর সুকন্যা অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করার সময় এক নাগকুমারীকে সূর্যের বন্দনা করতে দেখে তার কারণ জানতে চাইলে সে উত্তরে বলে, কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী-সপ্তমীর সন্ধিক্ষণে সূর্যদেবতার পূজা করলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। সুকন্যা সেইমতো সূর্যদেবতার পূজা অর্থাৎ 'ছটপূজা' শুরু করে।

মহাভারতের বনপর্বে উল্লিখিত আছে যে, বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ যখন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে বনবাসে অনুগমনের আয়োজনে ব্যস্ত, তখন যুধিষ্ঠির তাঁদের সেবায় অপারক হওয়ায় বিব্রতবোধ করতে থাকেন। তিনি তখন ধৌম্যের উপদেশ প্রার্থনা করলে ধৌম্য তাঁকে সূর্যের শরণাপন্ন হতে পরামর্শ দেন। যুধিষ্ঠির সেই পরামর্শ অনুসারে জলে নেমে সূর্যের স্তব করতে থাকেন। সূর্যদেব যুধিষ্ঠিরের স্তবে তুষ্ট হয়ে তাঁকে তাম্রনির্মিত একটা 'স্থালী' (থালা) প্রদান করে বলেন ঃ "দ্রৌপদীর ভোজনের পূর্ব পর্যন্ত এই পাত্রস্থ খাদ্যসম্ভার নিঃশেষিত হবে না এবং পাকশালায় পক্ক ফলমূল, শাক, আমিষ প্রভৃতি চতুর্বিধ অন্ন অক্ষয় হয়ে থাকবে। চতুর্দশ বর্ষ শেষে তুমি পুনরায় রাজ্যপ্রাপ্ত হবে।" এই বলে তিনি অন্তর্হিত হন। সেই চতুর্বিধ অন্ন অল্প পরিমাণে হলেও অক্ষয়রূপে প্রতিদিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতো। সূর্যের আশীর্বাদে যুধিষ্ঠির প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্তির সঙ্গে ভোজন করিয়ে গার্হস্থ্যধর্ম পালন করতেন। পুরাণের কথানুসারে যখন দেবদেবীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের প্রশ্নে বিবাদ উপস্থিত হয়, তখন সূর্যদেবের মধ্যস্থতায় ছটদেবী বা দেবী ভগবতী শ্রেষ্ঠ বলে স্থিরীকৃত হন। তাই আজও ছটদেবীকে ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত এবং অসহায় মানুষ যথাক্রমে 'ভুখা-মাঈ', 'পিয়াসা-মাঈ' এবং 'আশা-মাঈ' নামে পূজা করে।

বিহারের হিন্দুধর্মাবলম্বী এবং সেখানে বহুপুরুষ ধরে বসবাসকারী বাঙালী, মাড়োয়ারীরা বিহারের বাস তুলে দিয়ে অন্যত্র চলে গেলেও ছট পরবকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, সূর্যদেবতা যদি সন্তুষ্ট থাকেন তবে তাঁর কাছে ভক্তিভরে প্রার্থনা করলে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবেই। সেই বিশ্বাসেই তাঁরা সূর্যদেবের আশীর্বাদ পেতে ছটপূজা করেন। আবার সেই বিশ্বাসেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই শুধু নিরম্বু উপবাসেই নয়, গৃহ থেকে পূজার জন্য নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত সমস্ত পথে 'দণ্ড' কাটতে কাটতে যান। এই আত্মনিগ্রহ ও উপবাসে তাঁরা মনে করেন, সূর্যদেব তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন। যাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় তাঁরা পরবর্তী বছরগুলিতেও একইভাবে সূর্যদেবতার পূজা করেন।

এই পরব উদ্‌যাপনকারীরা দীপাবলীর পর পঞ্চম দিন থেকে উপবাস করে সূর্যাস্তের পর দুধে চিনি মিশিয়ে চাল ফুটিয়ে আহার করেন। এর নাম 'খারানা'। উপবাসকালে মেঝেতে কোন বিছানা বা চাদর না পেতে শয়ন করতে হয়। ষষ্ঠদিন সারাদিন নিরম্বু উপবাসে থেকে পরবের জন্য আটা বা ময়দার গুঁড়ো জলে গুলে মেখে ছোট ছোট চ্যাপটা মণ্ড তৈরি করে তাতে সূর্যের চিহ্ন এঁকে মিছরির গুঁড়ো মিশিয়ে ঘিয়ে ভেজে ভোগ তৈরি করা হয়। এর নাম ঠাকুয়া বা ঠেকুয়া, খেতে অতি সুস্বাদু। ষষ্ঠদিনেই আসল পূজার সূচনা, যার ব্যাপ্তি সপ্তম দিনের প্রত্যূষ পর্যন্ত। এই পরবের জন্য তাঁরা লোকগাথাও গেয়ে থাকেন।

নারী-পুরুষ উভয়েই এই পূজা করতে পারেন, তবে নারীর সংখ্যাই বেশি। পূজাতে কোন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না, তবে পূজা পরিচালনার জন্য একজন পূজক থাকেন। তিনি সংশ্লিষ্ট পরিবারেরই সদস্য। এই পূজায় একটা ডালিতে কলার কাঁদি-সহ বিভিন্ন ফল, শাকসবজি, ঠাকুয়া, মিছরি ও নানাপ্রকার মিষ্টি এবং একটি কুলোতে জ্বলন্ত প্রদীপ, ধূপ, ধুনা, দুধ, দই, আমলকী, পানপাতা, সুপারি ও সিঁদুর দিয়ে সাজানো হয়। তারপর দুহাতে ডালি ও কুলো নিয়ে নতুন কাপড় পরে মিছিল করে নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়া হয়। পুকুর বা নদীতে কোমরসমান জলে নেমে একজায়গায় ঘুরে ঘুরে প্রায় পনের থেকে তিরিশ মিনিট সূর্যের উদ্দেশে গানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানিয়ে ডালি ও কুলো পালটাপালটি করে অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়।

এই পূজাতে সামর্থ্য অনুযায়ী অন্তত চার-পাঁচরকম ফল দিতেই হয়। সচরাচর কলা অধিক সংখ্যায় দেওয়ার কারণ—পরিমাণে অনেক হয় এবং অনেক লোকের মধ্যে বিতরণেও সুবিধা। পূজা-শেষে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের কপালে সিঁদুর লাগিয়ে পুনরায় ডালা ও কুলো নিয়ে সূর্যের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানিয়ে নারকেল অর্ঘ্য প্রদান করা হয়। সবশেষে ডালিতে জ্বলন্ত প্রদীপ ও নারকেল রেখে পরিবারের সকলে একে একে ডালির ওপর নতুন কাপড় বিছিয়ে দেন। তারপর তাঁদের প্রত্যেকের সামনে দুবার করে ডালিটা ঘুরিয়ে কপালে ছুঁইয়ে দেওয়ার আগে একটু করে ঘটির জল সামনে ঢেলে দেওয়া হয়। এরপর আবার ডালিতে পানপাতা ও সুপারি দিয়ে আগের অনুষ্ঠানের পুনরাবৃত্তি করতে হয়। অবশেষে পরিবারের সকলে যিনি পূজা দিয়েছিলেন তাঁকে ঘিরে ঘটি স্পর্শ করে দাঁড়ান। তারপর সকলে এক এক করে সেই ঘটি জলে



পূজার আয়োজন চলছে। আলোকচিত্র ঃ স্বরূপ মৈত্র

ভর্তি করে পুনরায় তা পুকুরে বা নদীতে ঢেলে দেন। এভাবেই ঐদিনের পূজা শেষ হয়। তারপর যিনি পূজা করছিলেন তিনি ভেজা কাপড় বদল করে শুকনো নতুন কাপড় পরেন এবং পূজার প্রসাদ কিছুটা সপ্তম দিনের পূজার জন্য রেখে বাকিটা উপস্থিত সকলের মধ্যে বিতরণ করেন। এই প্রসাদ নিতে কেউই অস্বীকার করতে পারে না। এমনকি একজন হরিজনও যদি কোন ব্রাহ্মণকে প্রসাদ প্রদান করেন, তিনিও নিতে বাধ্য হন। এই প্রসাদ অস্বীকার করলে তিনি নিজেই সমাজে ধিকৃত হবেন। এঁদের বিশ্বাস, প্রসাদ প্রত্যাখ্যান করলে সমূহ বিপদ ও বিপর্যয়কেই ডেকে আনা হবে। প্রসাদ-বিতরণ শেষে পূজার ডালি ও কুলো সাধারণত পুরুষরাই মাথায় বহন করে বাড়ি ফেরেন। তবে মহিলাদেরও এই কাজে কোন বাধা নেই। চলে আসার সময় তাঁরা পাড়ে কিছু ঠাকুয়া ও সিঁদুর রেখে আসেন।

এই পূজা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হওয়ায় এবং গভীর মনঃসংযোগ ও নিষ্ঠার প্রয়োজন হওয়ায় অনেকেই এই পূজা করতে সাহস পান না। যাঁরা কষ্টসহিষ্ণু নন, তাঁরা এই পূজা করেন না। এই পূজাতে বিন্দুমাত্র অবহেলাও জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে বলে এঁদের বিশ্বাস।

সপ্তম দিনের প্রত্যূষে আগের দিনের মতো মিছিল করে তাঁরা আবার নির্দিষ্ট জায়গায় ডালি ও কুলো হাতে জমায়েত হন। পূর্বদিনের সূর্যাস্তে অর্ঘ্যদানের মতোই সূর্যোদয়ের আগে একই পদ্ধতিতে সূর্যদেবতার উদ্দেশে অর্ঘ্যদান করা হয়। এই দিন নিজেদের নির্দিষ্ট জায়গার চারকোণে চারটি কলাগাছ পোঁতা হয় এবং সকলে সূর্যবন্দনা করতে শুরু করেন। ব্যতিক্রম হিসাবে এইদিন জলে না নেমে পোঁতা কলাগাছের ঘেরার ভিতর নানা জন্তুজানোয়ারের মাটির মূর্তি রেখে অর্ঘ্য প্রদান করা হয়। ষষ্ঠদিন সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে এগুলির পূজা করা হয়। অর্ঘ্যদান শেষে বুকসমান জলে নেমে একটা বালতি জলভর্তি করে জ্বলন্ত প্রদীপ ভাসিয়ে দিয়ে পূজার জায়গায় মাটির কোশী রেখে সবাই মিছিল করে ফিরে আসেন। এদিন পূজা সূর্যোদয়ের আগেই শেষ করতে হয়। এই পূজা চলাকালে পরিবারের মহিলারা বাড়ি থেকে শুরু করে পাড়ে পূজা দেওয়া পর্যন্ত সূর্যদেবতাকে সন্তুষ্ট করতে সূর্যবন্দনা বা সূর্যস্তব করেন।

আগেই বলা হয়েছে, এই পূজায় পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। এটি যথার্থ অর্থে পরব বা ব্রত। কারণ, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সবাই এই পূজা নিজেরাই করতে পারেন। সাধারণত চল্লিশোর্ধ্ব মহিলারাই এই ব্রত পালন করেন।

সূর্যকে দেবতা হিসাবে পূজা করার রীতি কেবলমাত্র উন্নত সমাজের হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বহুকাল আগে থেকেই আদিবাসী ও উপজাতিদের মধ্যে এর বহুল প্রচলন। ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগনা ও ছোটনাগপুরের ওঁরাও, মুণ্ডা, ভূমিজ ও হো-দের মধ্যে বহু প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত সূর্যকে 'সিনবোঙ্গা' নামে পূজা করা হয়ে আসছে। (দ্রঃ Dalton : 1973 : Description of Ethnology of Bengal, Calcutta, Reprint, pp. 187-188) সাঁওতালদের 'ডোমিসিন' উৎসবও 'সিনবোঙ্গা'র পূজা। সাধারণত প্রতি পাঁচবছর অন্তর ফাল্গুন ও বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উপগোষ্ঠীর সভ্যরা এই উৎসব পালন করে। এই উৎসব দুদিন ধরে চলে। প্রথম দিনের উৎসবের নাম 'উমনরক' বা 'শুদ্ধিকরণ'। এইদিন উপগোষ্ঠীর লোকেরা স্নান করে শুদ্ধ হয়ে পূজা দেয়। দ্বিতীয় দিনের উৎসবের নাম 'সারদি'। এদিন বোঙ্গাকে (দেবতাকে) মুরগি উৎসর্গ করা হয়। সাঁওতালদের সর্বোচ্চ দেবতা 'কাণ্ডে'। 'কাণ্ডে' শব্দের অর্থ 'সূর্য'। এঁকে অনেকসময় 'সিনবোঙ্গা' বা 'সিনকাণ্ডে'ও বলা হয়। সিনবোঙ্গা মুণ্ডারী শব্দ। সাঁওতালরা সিনবোঙ্গাকে তাদের জীবন ও শস্যরক্ষা, চাষের জন্য বৃষ্টিপাত ও যাবতীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দেওয়ার মালিক বলে মনে করে। সাঁওতালরা 'নিনকাণ্ডে'কে সিনকাণ্ডের পত্নী হিসাবে মান্য করে। আর আকাশের তারকারাজি তাঁদের সন্তান-সন্ততি বলে এদের বিশ্বাস।



সূর্যদেবতার উদ্দেশে অর্ঘদান করা হচ্ছে। আলোকচিত্র ঃ স্বরূপ মৈত্র

ওঁরাওরা প্রকৃতি-পূজারী। সূর্যই 'ধর্মেশ' নামে এদের প্রধান ও সর্বোচ্চ দেবতা। তিনি সকলের ওপর সমান দৃষ্টি রাখেন। সূর্যের পত্নীকে এরা 'দেবী-মাঈ' হিসাবে মান্য করে। তাঁর জন্য কোন মন্দির নেই, তবে প্রত্যেক গ্রামের প্রবেশপথে ছোট চালা করে তার মধ্যে সাতটি ছোট ছোট মাটির ঢিবিতে তাঁর পূজা হয়। মুণ্ডাদেরও প্রধান দেবতা 'সিনবোঙ্গা' বা সূর্যদেবতা। মুণ্ডাদের ধারণা, ইনিই প্রথম মাতা-পিতা সৃষ্টি করেন এবং তারা সেই মাতা-পিতারই সন্তান-সন্ততি।

সাঁওতাল পরগনা ও ছোটনাগপুরের আদিবাসীরা ছাড়াও অসমের গারোরা জমির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনে ফসল বোনার প্রাক্কালে সূর্যের পূজা করে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। মধ্যপ্রদেশের গোণ্ডদের গৃহদেবতা 'সুরজনারায়ণ' বা 'নারায়ণদেও' সূর্যদেবতারই রূপান্তর। প্রতি গৃহে তাঁকে নিয়মিত পর্যাপ্ত ধান ও সবজি

উৎপাদনের জন্য এবং শিশু, চাষের জমি, বাগান ও গো-ধনের রক্ষাকর্তা হিসাবে শূকর বলি দিয়ে পূজা দেওয়া হয়। অন্ধ্রের চেঞ্চুরাও 'সূর্যনারায়ণ' নামে সূর্যদেবতার পূজা করে।

এই আদিবাসীরা বিহারে, মধ্যপ্রদেশে, অন্ধ্রে ও অসমে বহু প্রাচীনকাল থেকেই বসবাস করছে এবং যেহেতু বিহারে সূর্যবন্দনা ছট পরব নামে বহুল পরিচিত ও প্রচলিত, তাই মনে হয় বিহারে এই পূজার প্রচলন হয়তো আদিবাসীদের দেখেই হয়েছে। তবে এবিষয়ে আরো গভীর গবেষণার প্রয়োজন আছে। এমনও হতে পারে, বিহারবাসীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত উপলব্ধি থেকেই এই পূজার প্রচলন হয়েছে।

এই ঐতিহ্যগত অনুষ্ঠানে বর্তমানে রুচি, ধারণা ও উপযুক্ত উপকরণাদির অভাবে অনেক পরিবর্তন এসেছে। এবিষয়ে অভিজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনায় জানা যায় যে, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পরবে পূজারী ও ভক্তদের মনে, কাজে, আচরণে এবং আড়ম্বরে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। অন্তরে তাঁরা যতটা একাগ্রতা ও নিষ্ঠা নিয়ে এই পরব এখনো পালন করে চলেছেন, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে সেই আন্তরিকতা ও একাগ্রতার প্রকাশ দেখা যাচ্ছে না। এই ঐতিহ্য ও আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ পরব ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পটভূমিকা থেকে অনেকখানিই বিচ্যুত হয়েছে—কিছুটা রুচির পরিবর্তনে, কিছুটা আগ্রহের অভাবে এবং একান্নবর্তী পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে ছোট ছোট পরিবারে রূপান্তরিত হওয়ায় সময়ের ও অভিভাবকত্বের অভাবে। আজকের যুবমানসে এই পরব ধর্মীয় অনুষ্ঠান অপেক্ষা সামাজিক অনুষ্ঠান-রূপে পরিগণিত হচ্ছে।

তবুও জনজীবনে এই পরবের ভূমিকা অপরিসীম। কারণ, গৃহের মঙ্গলকামনা ছাড়াও এই পরব পালনের মাধ্যমে একটা সুস্থ সমাজচেতনা সকলের মধ্যে জাগ্রত হয়। হরিজন-ব্রাহ্মণ ভেদাভেদ দূর হয়ে গ্রামে একটা সৌহার্দের পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে অসাম্য দূর হয়। ❑

উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত
স্বামী সর্বগানন্দের নতুন ক্যাসেট
স্তবমালা-১
গুরুস্তব
শ্রীশ্রীচণ্ডী
শ্রীরামাষ্টকম্
রুদ্রস্তোত্রম্
গঙ্গাস্তোত্রম্
শ্রীজগন্নাথাষ্টকম্
নির্বাণষট্কম্
স্বামী সর্বগানন্দ
STAVAMALA-1
Music composed and Sung by : Swami Sarvagananda
UDBODHAN OFFICE
1 Udbodhan Lane, Kolkata-700003
স্তবমালা-১ STAVAMALA-1

'কথামৃত'-এ বিভাষিত শ্রীরামকৃষ্ণ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

মহেন্দ্রনাথ লিখছেন ঃ "আমি যখন প্রথম যাই, কী অদ্ভুত কাণ্ড! বাড়িতে বনিবনা হলো না বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে। মনে হলো—কী, যাদের জন্য এত করলুম তাদের এই ব্যবহার! এ-যন্ত্রণা আর সহ্য হচ্ছে না। এ-বাড়িতে আর থাকা হবে না—suicide করে সব যন্ত্রণা দূর করব। একদিন রাত দশটার সময় বের হয়ে পড়লুম। গাড়ি করে বরানগরে বোনের বাড়িতে যাচ্ছি, মাঝরাস্তায় চাকা ভেঙে গেল। নিকটে একজন আলাপী লোকের বাড়ি ছিল, সেখানে ওঠা গেল। তারা মনে করলে আপদ জুটেছে। হয়তো রাত্রে থাকবে। তারপর অন্য গাড়ি ডাকিয়ে বরানগর যাই।

"পরদিন বিকেলে এ-বাগান ও-বাগান বেড়িয়ে বেড়িয়ে সময় কাটাচ্ছি, সঙ্গে সিধু [সিদ্ধেশ্বর মজুমদার, বরানগরের বাসিন্দা]। উভয়ে দেহে ও মনে অবসন্ন হয়ে এক বাগানে মাটিতেই বসে পড়লুম। সিধু বললে, 'চল যাই আরেকটি বাগান আছে, রাসমণির। ওখানে একটি সাধু থাকেন।' আসা গেল মেন গেট দিয়ে। তখন সন্ধ্যা হওয়ার আধঘন্টা বাকি।

"বাগান দেখে মুগ্ধ হলুম। ফুল দেখছি, ফুল তুলছি, ফুল শুঁকছি। আর ফুলের সৌন্দর্যের কথা ভাবছি। আমি একটু poet ছিলাম কিনা!"

বাড়ির পরিস্থিতি এতটাই উত্তাল, রাত দশটায় স্ত্রীর হাত ধরে বেরিয়ে এসেছেন। সঙ্গে পুত্র। ভাবছেন, আত্মহত্যা করব। পরের দিন ঐ বিভ্রান্ত poetic মন নিয়ে এ-বাগান, সে-বাগান করতে করতে দক্ষিণেশ্বর। সে-রাতে তাঁর ডায়েরি লেখার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না। আর আত্মহত্যা! সে তো হয়েই গেল। মহেন্দ্রনাথের মৃত্যু হলো সেই সন্ধ্যায়। জন্মগ্রহণ করলেন 'শ্রীম'। 'ডেট অফ বার্থ' লেখা হলো না।

১৮৮২-তে প্রথম দেখা, ১৮৮৬-তে ঠাকুর ফিরে গেলেন। ১৮৯৭-তে ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হলো—'Gospel of Sri Ramakrishna'। ১৯০২ সালে প্রকাশিত হলো 'কথামৃত'-এর প্রথম ভাগ। ১৯০৪-এ দ্বিতীয় ভাগ, ১৯০৮-এ তৃতীয় ভাগ, ১৯১০-এ চতুর্থ ভাগ। তারপর দীর্ঘ ২২ বছর পরে ১৯৩২-এ প্রকাশিত হলো পঞ্চম ভাগ। মহেন্দ্রনাথ সব করে গিয়েছিলেন। প্রকাশ দেখে যেতে পারেননি। ১৯৩২ সালে ফলহারিণী কালীপূজার পরদিন ৪ জুন সকাল সাড়ে ছয়টার সময় শ্রীগুরুপাদপদ্মে মিলিত হলেন। শেষ কথা—"মা, গুরুদেব, আমাকে কোলে তুলে নাও।"

এই যে আমরা এতক্ষণ সময়ের অন্যধারায় চলে গেছি, মহেন্দ্রনাথ বোধহয় অধৈর্য হচ্ছেন। কে কোথায় গেছেন! সবাই তো বসে আছেন 'কথামৃত'-এর উদ্যানে! তিনি আমাদের পাশে পাশে হাঁটছেন আর বলছেন, এই হলো নাটমন্দির। কালীপূজার দিন এখানে যাত্রা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশে মথুরবাবু এখানে ধান্যমেরু করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে ভৈরবীপূজা করেছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ এইবার দক্ষ মাস্টারমশাইয়ের মতো বোঝাচ্ছেন—পশ্চিমে দ্বাদশ শিবমন্দির, আর তিন পাশে সার সার একতলা ঘর। পুবের ঘরগুলির মধ্যে আছে ভাঁড়ার, লুচিঘর, বিষ্ণুর ভোগঘর, নৈবেদ্যঘর, মায়ের ভোগঘর, ঠাকুরদের রান্নাঘর আর অতিথিশালা। রানী রাসমণির কী অপূর্ব ব্যবস্থা! অতিথি, সাধু যদি অতিথিশালায় না খান, তাহলে দপ্তরখানায় খাজাঞ্চীর কাছে যেতে হবে। খাজাঞ্চী ভাণ্ডারীকে হুকুম দিলে সাধু ভাঁড়ার থেকে সিধে পাবেন। আর ঐ নাটমন্দিরের দক্ষিণে বলিদানের স্থান।

মহেন্দ্রনাথ এসব পুঙ্খানুপুঙ্খ বলছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনক্ষেত্রের কোন কিছু যেন আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে না যায়। বলছেন, বিষ্ণুঘরের রান্না নিরামিষ। আর কালীঘরের রান্না আমিষ। এইবার একালের ভাষায় একটি 'ফ্রিজ শট'—১৮৮২ সালের পর ২০ বছরের মধ্যে একটি দৃশ্য অক্ষরের বিন্দুতে অঙ্কিত এবং জীবন্ত। 'লণ্ডন টাইমস'-এ কিছুকাল আগে একটি ছবি বেরিয়েছিল, ল্যাটিন আমেরিকার পেরুতে খননকার্য চলছিল একটি জায়গায় ইতিহাসের অনুসন্ধানে। খুঁড়তে খুঁড়তে মাটির গভীরে অদ্ভুত এক দৃশ্য! কবে কোনকালে একদল শ্রমিক রুপোর অনুসন্ধান করছিল, সেইসময় ধস নামে। সবাই চাপা পড়ে যায়। তারপর, সময় প্রবাহিত হচ্ছে, রেন ফরেস্টের আচ্ছাদনে চলে গেছে অতীত, অতীতের সব চরিত্র। বর্তমান যখন মাটি খুঁড়ে সেই অতীতকে প্রকাশ করল, দেখা গেল—যে যে-অবস্থায় ছিল সেই অবস্থায়, সেই আকৃতিতে কালো কয়লা হয়ে গেছে। কেউ গাঁইতি তুলেছিল, কেউ লোহার শাবল, কেউ দুহাত তুলে মাটির চাঙড় খসাচ্ছিল। এটি হলো 'ফসিল'। মহেন্দ্রনাথ বর্ণিত দৃশ্য শতাব্দীপারেও জীবন্ত।

রন্ধনশালার সামনে বিশাল কর্মব্যস্ততা। অনেক শব্দ, নারীকণ্ঠের অনেক কথা। কী হচ্ছে ওখানে? বড় বড় বঁটি। সামনে দাসীরা। বড় বড় মাছ কোটা হচ্ছে। রুপোর তবকের মতো চাকা চাকা মাছের আঁশ, বঁটির তলায় তলায় স্তূপাকার। এ-দৃশ্য মহেন্দ্রনাথ কবে দেখলেন, দ্বিতীয় দর্শনের দিন? সকাল আটটায়? এই দর্শনেরও তারিখ সেইভাবে নির্দিষ্ট নেই। আছে—মার্চ ১৮৮২।

আমরা এইবার অন্তরালে সরে যাই। সরে যাই ভবিষ্যতে। আমরা তখনো পৃথিবীতে আসিনি। কালের যবনিকার আড়াল থেকে দেখি। ঐ তো ঠাকুর আসছেন। দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ। সকাল ঠিক আটটা। বসন্তকাল। গঙ্গার বাতাসে শীতের মৃদু কামড়। শীতের সূর্য

গ্রীষ্মের আকাশে সরছে। সকালের কিরণে মন্দিরচূড়া নীল আকাশের উদার চন্দ্রাতপের তলায় ঝলমল করছে। দলছুট পায়রারা ডানার শব্দ তুলে ঝাঁকে ফিরছে। উঠানে এখনো থইথই রোদ আসেনি।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ঘরের বাইরে আসছেন। চটি-পরা ডান পাটি চৌকাঠের ওপর দিয়ে ধীরে, সুললিত একটি ছন্দে দক্ষিণের বারান্দায় রাখলেন। ধীরে, অতি ধীরে এগিয়ে চলেছেন পূর্বদিকে। লালপাড় ধুতি। গায়ে মোলেস্কিনের র‍্যাপার। র‍্যাপারের কিনারা শালু দিয়ে মোড়া। তিনি বারান্দার পূর্বপ্রান্তের দিকে এগোচ্ছেন। সেখানে বসে আছেন এক ক্ষৌরকার। চামড়ার ফালিতে ক্ষুর ঘষছেন। ছোট্ট একটি বাটিতে এক ডেলা ফটকিরি। কাঠের বাক্সের ওপর জলের বাটি, বুরুশ, সাবান, কাঁচি ইত্যাদি সরঞ্জাম। তাঁর সামনে অল্প উচ্চতার একটি টুল।

মহেন্দ্রনাথ এগোচ্ছেন, বিভোর। তিনি উঠানে, শ্রীরামকৃষ্ণ তিন ধাপ উঁচু বারান্দায়। ঠাকুর তাঁকে দেখামাত্রই চিনতে পেরেছেন। হাসতে হাসতে বললেন ঃ "তুমি এসেছ!" ঠাকুর ক্ষৌরকারের সামনে টুলে বসে বললেন ঃ "আচ্ছা, এখানে বস।"

মহেন্দ্রনাথের মনে পড়ছে কয়েকদিন আগের প্রথম দর্শনের স্মৃতি। সিধু বলেছিল, এখানে এক সাধু আছেন। সদর ফটক দিয়ে ঢুকে সোজা ঠাকুরের ঘরে। একঘর লোক, নিস্তব্ধ নিথর। ঠাকুর বসে আছেন তক্তপোশে, পূর্বদিকে মুখ করে। মুখে হাসি। দিনের আলো নিবে আসছে। পশ্চিমে গঙ্গার কূলে সূর্যাস্তের সমারোহ।

দৃশ্যটি দেখে মহেন্দ্রনাথের তৎক্ষণাৎ মনে হলো, সাক্ষাৎ শুকদেব ভগবৎকথা বলছেন, আর সর্বতীর্থের সমাগম হয়েছে। অথবা যেন শ্রীচৈতন্য পুরীক্ষেত্রে রামানন্দ-স্বরূপাদি ভক্তসঙ্গে বসে আছেন ও ভগবানের নামগুণকীর্তন করছেন। যে-কথাটি মহেন্দ্রনাথের কানে এল, ঠাকুর বলছেন ঃ "যখন একবার হরি বা একবার রামনাম করলে রোমাঞ্চ হয়, অশ্রুপাত হয়, তখন নিশ্চয়ই জেনো যে, সন্ধ্যাদি কর্ম আর করতে হবে না। তখন কর্মত্যাগের অধিকার হয়েছে—কর্ম আপনা-আপনি ত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। তখন কেবল রামনাম, কি হরিনাম, কি শুদ্ধ ওঁকার জপলেই হলো।" আবার বললেন ঃ "সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়। গায়ত্রী আবার ওঁকারে লয় হয়।"

এইটুকু শুনে মহেন্দ্রনাথ ও সিধু বাগান দর্শনে গেলেন। কোথায় এসেছেন, কেমন জায়গা দিনের আলো থাকতে থাকতে দেখে নিতে হবে। তারপর না হয় এসে একপাশে বসবেন, শুনবেন আরো কথা, মধুর কথা—যে-কথায় জীবনের দিগন্ত খুলে যায়—

"তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।।"

সন্ধ্যারতি শুরু হয়ে গেল। কাঁসর, ঘণ্টা, খোল, করতাল একসঙ্গে বেজে উঠল। বাগানের দক্ষিণ সীমান্তের নহবত থেকে সানাইয়ের সুর এসে মিশল। "সেই শব্দ ভাগীরথী-বক্ষে যেন ভ্রমণ করিতে করিতে অতি দূরে গিয়া কোথায় মিশিয়া যাইতে লাগিল। মন্দ মন্দ কুসুমগন্ধবাহী বসন্তানিল। সবে জ্যোৎস্না উঠিতেছে। ঠাকুরদের আরতির যেন চতুর্দিকে আয়োজন হইতেছে।"

দেবালয়ে আরতি দর্শন করে দুজনে উঠনের ওপর দিয়ে মৃদু মৃদু কথা বলতে বলতে আসছেন। শব্দ-সমারোহ হঠাৎ থেমে যাওয়ায় নৈঃশব্দ্য আরো গভীর মনে হচ্ছে। তাঁরা আসছেন। দ্রুত অন্ধকার হয়ে আসছে উদ্যানভূমি। চাঁদের আলো ফুটছে ভাল। সর্বত্র প্রসন্নতা।

ঠাকুরের ঘরের দরজা বন্ধ। বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে সেই বিখ্যাত বৃন্দে। শ্রীরামকৃষ্ণকে অতি সহজ কথায় এমনভাবে কেউ প্রকাশ করতে পারেননি। তাই তিনি অমর হয়ে বসে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণের জগতে। শুধু 'বৃন্দে' বললে হবে না। বলতে হবে, 'বৃন্দে ঝি'। শ্রীরামকৃষ্ণ যে ব্রাত্যজনের সখা! রসিক মেথর তাঁর কৃপাধন্য। বাগানের মালী ভর্তাভারি তাঁর সখা। পতিত রমণীরাও তাঁর আশীর্বাদে ধন্য।

বৃন্দের সঙ্গে সেই সন্ধ্যায় মহেন্দ্রনাথের যে-কথা হয়েছিল তা 'কথামৃত'-এর অনবদ্য এক উন্মোচনী। কোথাও এর তুলনা পাওয়া যাবে না। দৃশ্যটি এইরকম—বৃন্দে দাঁড়িয়ে আছেন রুদ্ধ দ্বারের বাইরে। যেন সন্ধ্যাকালে ঠাকুরকে পাহারা দিচ্ছেন। এধারে, ওধারে আলো জ্বলে উঠেছে। সেই আলোর তির্যক রেখা যেন দরজার কাছে প্রণামের মতো লুটিয়ে পড়ছে।

মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন ঃ "হ্যাঁগা, সাধুটি কি এখন এর ভিতর আছেন?"

বৃন্দে। হ্যাঁ, এই ঘরের ভিতর আছেন।

মহেন্দ্র। ইনি এখানে কতদিন আছেন?

বৃন্দে। তা অনেকদিন আছেন।

মহেন্দ্র। আচ্ছা, ইনি কি খুব বইটই পড়েন?

বৃন্দে। আরে বাবা বই-টই! সব ওঁর মুখে।

মহেন্দ্রনাথ অবাক হয়ে সিধুর দিকে তাকালেন। না পড়লে জ্ঞান হবে কি করে!

মহেন্দ্রনাথ বৃন্দেকে বললেন ঃ "আচ্ছা, ইনি বুঝি এখন সন্ধ্যা করবেন? আমরা কি এ-ঘরের ভিতর যেতে পারি? তুমি একবার খবর দেবে?"

বৃন্দে। তোমরা যাও না বাবা। গিয়ে ঘরে বস।

মহেন্দ্রনাথ তখনো জানেন না উত্তরের নহবতে চিকের আড়ালে কে আছেন। বৃন্দে অর্থাৎ বৃন্দা দাসী কেন দাঁড়িয়ে আছেন। ১৮৭৭ সাল থেকে ঠাকুর এবং মায়ের সেবায় নিযুক্ত। ঠাকুরই বৃন্দাকে 'বৃন্দে' করেছেন।

মহেন্দ্রনাথ ধীরে, ভয়ে দরজা খুলছেন। অতি উপযুক্ত সময়ে 'কথামৃত'-এর উদ্বোধন। [ক্রমশ] (দুই)

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

বেদান্তই আগামী পৃথিবীর শাসনকর্তা

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আমেরিকার বিখ্যাত 'লস এঞ্জেলস টাইমস' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় চিত্র-সহ একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। হলিউডে চিত্রতারকাদের অভিজাত পল্লীতে এক ধনী পরিবারের উচ্চশিক্ষিতা যুবতী ন্যান্সি লুইস মুর প্রকাশ্য দিবালোকে একটি ব্যস্ত মোটর সার্ভিস স্টেশনে নিজেই নিজের গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। কেউ কিছু করার আগেই আগুনের লেলিহান শিখা ন্যান্সির সারা শরীর গ্রাস করে ফেলেছিল। ন্যান্সি কিন্তু ছিল নির্বিকার, নীরব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে জ্বলছিল। তার বাঁহাতে ধরা ছিল এক ভারতীয় আধ্যাত্মিক পুরুষের আলোকচিত্র। সেই পুরুষের দিকেই নিবদ্ধ ছিল ন্যান্সির দৃষ্টি। সংবাদে অবশ্য ঐ আধ্যাত্মিক পুরুষের কোন পরিচয় দেওয়া ছিল না। দেওয়া ছিল না ন্যান্সির ঐভাবে মৃত্যুর কারণও। সেসময় লস এঞ্জেলসে ছিলেন 'দেশ' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক সাগরময় ঘোষ। তিনি আলোকচিত্রটি দেখে চিনতে পেরেছিলেন কে ঐ আধ্যাত্মিক পুরুষ। তিনি হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ভোগসর্বস্ব পাশ্চাত্যের অনিবার্য পরিণতির যেন প্রতীক হয়ে উঠে ন্যান্সি দেখাতে চাইছিল আগামী পৃথিবীর মুক্তির পথ।

এই অসাধারণ ঘটনাটির কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল গত ১১ সেপ্টেম্বর রাত্রে টিভির সামনে বসে। অবাক হয়ে দেখছিলাম, বর্তমান পৃথিবীর সর্বাধিক শক্তিশালী রাষ্ট্র আমেরিকার অহঙ্কারের প্রতীক—গগনচুম্বী দুই বাণিজ্যকেন্দ্র আর প্রতিরক্ষা দপ্তরটি কিভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে যাচ্ছে! হিংসা, গোঁড়ামি, লোভ ও অসহিষ্ণুতার যে বিষবৃক্ষ আজ বিশ্ব জুড়ে তার শাখাপ্রশাখা বিস্তার করেছে, তার ভয়াবহ পরিণাম প্রত্যক্ষ করতে করতে আমার মনে পড়ছিল—ঠিক ১০৮ বছর আগে ১৮৯৩ সালের এই ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে ঐ আমেরিকারই শিকাগো ধর্মমহাসভায় শ্রীরামকৃষ্ণের ভাববিগ্রহ স্বামী বিবেকানন্দের অসাধারণ কথাগুলি ঃ "সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি ও এগুলির ভয়াবহ ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল অধিকার করে রেখেছে। এরা পৃথিবীকে হিংসায় পূর্ণ করেছে, বারবার একে নরশোণিতে সিক্ত করেছে, সভ্যতা ধ্বংস করেছে এবং সমগ্র জাতিকে হতাশায় মগ্ন করেছে। এই ভীষণ পিশাচগুলি যদি না থাকত, তাহলে মানবসমাজ আজ আগের চেয়েও অনেক উন্নত হতো।"

ভাবতে পারিনি, স্বামীজী যেদিনটিতে সমগ্র বিশ্বকে এই ভয়ঙ্কর বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন—সেদিনই আমরা পৃথিবীর বাসযোগ্যতার প্রশ্নটির সম্মুখীন হব। একেই কি বলে 'আর্যদৃষ্টি'? নিশ্চয়ই তাই। না হলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী—বলতে পারি, বেদান্তের সনাতন বাণী—এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষরূপে আমাদের সামনে উপস্থিত হলো কি করে? বস্তুত, বেদান্তের বাণী—যা জীবনব্যাপী সাধনায় মানবসমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিশ্বময় প্রচার করেছিলেন তাঁর যোগ্য উত্তরসাধক স্বামী বিবেকানন্দ—তা কোন দেশ, কাল বা জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না। এই সর্বজনীন ও সর্বকালীন ভাব ও আদর্শই যে আমাদের বেঁচে থাকার একমাত্র মন্ত্র, গত ১১ সেপ্টেম্বরের নির্মম অভিজ্ঞতার পর তা আরো বেশি করে অনুভূত হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত 'মতুয়ার বুদ্ধি' যে আমাদের কত বড় সর্বনাশের কারণ হতে পারে আজকের সন্ত্রাসবাদ-সন্ত্রস্ত পৃথিবীই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই গোঁড়ামির কোন স্থান থাকতে পারে না। এই সুন্দর বসুন্ধরা নানা মত ও পথের সকল মানুষের জন্যই। শুধু আমি বা আমার মতাবলম্বী মানুষই থাকব, অন্যদের এখানে কোন স্থান হবে না—এমন ভাবা যে কেবল অযৌক্তিক নয়, অপরাধও তা বোঝার সময় এসে গিয়েছে। বিবেকানন্দের উদার ও মহান বাণী তাই বর্তমান পৃথিবীর একমাত্র রক্ষাকবচ।

এই পত্র লেখার সময় কাগজে কাগজে দেখতে পাচ্ছি, কুখ্যাত মুসলিম জঙ্গী নেতা ওসামা বিন লাদেনকেই আমেরিকা এই ভয়ানক ধ্বংসলীলার জন্য সন্দেহ করছে এবং প্রস্তুতি নিচ্ছে লাদেনকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলির বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যুদ্ধযাত্রার। এখনো আমরা জানি না, এর পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে; তবে নির্দ্বিধায় বলা যায়, ভবিষ্যৎ পৃথিবী দাঁড়িয়ে রয়েছে এক নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে। মৃত্যুর প্রহর গুণতে গুণতে মনে প্রশ্ন জাগে, এক মহাপ্রলয়ের পরেই কি উত্থান ঘটবে শান্তির বার্তাবহ ভারতবর্ষের? স্বামী বিবেকানন্দ যে বলেছিলেন—বেদান্তই আগামী পৃথিবীর রক্ষাকর্তা, বলেছিলেন—সমগ্র বিশ্ব আজ ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে রয়েছে এবং বিশ্ব জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে বেদান্তের একাধিপত্য, তা কি এবার আমরা প্রত্যক্ষ করব? প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যারা আজ লাদেনকে আশ্রয় দিয়ে আমেরিকার মারণাস্ত্রের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, সেই অসহিষ্ণু, গোঁড়া তালিবানী শাসকরাই কয়েক মাস আগে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল শান্তির দূত ভগবান বুদ্ধের সুবিশাল মূর্তিটি। অহিংসার পূজারী সেদিন নিশ্চয়ই 'হাসছিলেন' এই নির্বোধের কাণ্ড দেখে। ইতিহাসের প্রতিশোধ যে এত দ্রুত নেমে আসবে তা কে জানত?

কাঞ্চনকুমার দাস
চিৎপুর ব্রীজ এপ্রোচ, কলকাতা-৭০০০০৩
১৪ সেপ্টেম্বর ২০০১

প্রসঙ্গ 'বসুমতী-মা'

'উদ্বোধন'-এর গত বৈশাখ ১৪০৮ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে ছবি চৌধুরীর 'বসুমতী-মা ঃ এক অবিস্মরণীয় সান্নিধ্য' শীর্ষক দীর্ঘ পত্রখানি পড়ে যারপরনাই আনন্দিত হয়েছি। আগে

বসুমতী-মায়ের সম্বন্ধে আরো দু-একটি রচনা পড়ে কিছু তথ্য অবগত ছিলাম। তাঁর সামনে বসে তাঁর মুখে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের বিষয় শোনা অশেষ ভাগ্যের কথা। লেখাটি বিশেষ মনোগ্রাহী হয়েছে। লেখার গুণে আমরা যেন ঐ মহীয়সীর সেই সময়কার মোটামুটি একটি পূর্ণচিত্র পাই। এজন্য লেখিকাকে অজস্র ধন্যবাদ। এরপর আষাঢ় সংখ্যায় বসুমতী-মায়ের দুটি আলোকচিত্র প্রকাশ করে পূজনীয় সম্পাদক মহারাজ ও পত্রলেখক শ্রীগোলক সেন পাঠকদের ধন্যবাদার্হ হলেন।

'উদ্বোধন'-এর সর্ববিষয়ে উন্নতি হোক—এই প্রার্থনা করি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর উন্নততর ও পরিমার্জিত রূপ অবশ্যই পাঠকদের আনন্দবর্ধন করেছে। সুদূর প্রবাসে এই আনন্দটুকুর জন্য প্রতিমাসেই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকি।

নীলা সেনগুপ্ত
রয়েল গার্ডেন্স, কাসাভাপেরুমালাপুরম
চেন্নাই-৬০০০২৮

'উদ্বোধন'-এর গত আষাঢ় ১৪০৮ সংখ্যায় শ্রীগোলক সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত বসুমতী-মায়ের আলোকচিত্র দুটি দেখে মনে আনন্দের পরিবর্তে বিষণ্ণতা এনে দিল। অবতারবরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণদেব নিজ ইষ্টদেবীর নামে যাঁর নামকরণ করেছিলেন, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামীজীর যিনি ছিলেন অশেষ স্নেহধন্যা, যিনি ছিলেন 'বসুমতী' পত্রিকার স্বত্বাধিকারী উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী—তিনি স্বভাবতই রামকৃষ্ণ-ভক্ত ও অনুরাগীদের কাছে এক শ্রদ্ধেয় এবং প্রণম্য ব্যক্তিত্ব। বসুমতী-মায়ের জরাগ্রস্ত আলোকচিত্র দুটি ছাড়া কি আর কোন আলোকচিত্র তোলা হয়নি? চিত্রদুটি দেখে মন ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। কৌমার, যৌবন, জরা দেহধারীর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অনস্বীকার্য। কিন্তু আমরা আমাদের ভগবানের ভগবৎকল্পজনের, শ্রদ্ধেয়জনের, প্রিয়জনের মাধুর্যমণ্ডিত, শ্রীমণ্ডিত চিত্রগুলিকেই ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি সহকারে সংরক্ষিত করে রাখি। গৃহে, দেবালয়ে, পুণ্যস্থানে জরাগ্রস্ত চিত্র চোখে পড়ে না। এমনকি মৃত্যুশয্যায় শায়িত শবদেহকেও মালা, চন্দন, ফুলের দ্বারা সুশোভিত করে চিত্র তোলা হয়। একটি চিত্রে বসুমতী-মায়ের পঞ্জরাস্থি ভিন্ন আর সব অস্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে ইংরেজ কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'Yarrow Unvisited' কবিতাটির কথা মনে পড়ে। কবি লোকমুখে Yarrow নদীর কথা অনেক শুনে মনে মনে নদীটি সম্বন্ধে একটি মনোরম চিত্রের কল্পনা করেছিলেন। চাক্ষুষ দেখার পর মানসপটে আঁকা ছবিটি ভেঙে যায় খান খান হয়ে। উচ্ছলতায় প্রাণবন্ত কল্লোলিনী নদীর পরিবর্তে শীর্ণকায়া এক জলধারা দেখে কবি আর্তনাদ করে বলেন—'এই সেই নদী। যার কল্পনায় আমি একটি সুন্দর ছবি এঁকেছিলাম।' পরে লিখেছেন, Yarrow নদীটি অদেখা, অজানা থাকলেই ভাল হতো—

"We have a vision of our own
Oh! Why should we undo it."

আমারও মনের অবস্থা একইরকম হয়েছিল ঐ আলোকচিত্র দুটি দেখে। বসুমতী-মায়ের জীবনচিত্র পড়ার পর মনের মধ্যে যে-ছবিটি এঁকেছিলাম, সেটি যেন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। জীবনচিত্রের সঙ্গে আলোকচিত্র দুটিকে মেলাতে পারলাম না।

অম্বিকা মুখার্জী
বিক্রমাদিত্য সরণি,
দুর্গাপুর-৭১৩২১২

প্রসঙ্গ 'শ্রীরামকৃষ্ণ, কুবীর গোঁসাই ও তাঁর জনপ্রিয় একটি গান'

'উদ্বোধন'-এর গত জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮ সংখ্যায় দেবাশিস দত্তের 'গবেষণা নিবন্ধ'টি পড়ে খুবই আনন্দ পেলাম। জানতে পারলাম কুবীরের জন্মস্থান, সম্প্রদায় ও জন্ম-মৃত্যুর সন। কুবীর সম্বন্ধে জানবার কৌতূহল ছিল অনেকদিনের, যা দেবাশিসবাবু মিটিয়ে দিলেন এবং এর জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই। দেবাশিসবাবু লিখেছেন, ঠাকুরের পরিবেশিত 'ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন' গানে বিষয়বস্তুর পরিবর্তন না হয়ে গানের কথার অর্থাৎ শব্দের পরিবর্তন হয়েছে। বহুকাল ধরে কোন গান চললে কালের গতির সঙ্গে বিষয়বস্তুর পরিবর্তন না হয়ে গানের কথার পরিবর্তন আমাদের কাছে অনেক ক্ষেত্রেই সহজ এবং সুন্দর মনে হয়েছে। প্রচলিত খেয়াল, ঠুংরী ও ভজন গানে এই পরিবর্তন বেশি লক্ষ্য করা যায়। এমনকি নজরুলের রচিত গানের কথার পরিবর্তন করে বিশিষ্ট শিল্পী মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় নজরুলগীতি রেকর্ড করেছেন।

আরেকটি বর্ণনায় লেখকের গণনায় একটু ভুল হয়েছে মনে হয়। তিনি লিখেছেন—" 'কথামৃত'-এর বর্ণনা অনুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণ এই গানটি মোট আটবার গেয়েছিলেন।" কিন্তু উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 'কথামৃত'-এর জুলাই ১৯৯০ সংস্করণে গানের সূচীতে রয়েছে, ঠাকুর 'ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন' গানটি মোট নয়বার গেয়েছিলেন। এছাড়া আরো একটি গান ঠাকুর নয়বার গেয়েছেন—'গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি'। এই দুটি গানই তিনি বেশি গেয়েছেন।

সুধীন্দ্রমাধব মুখার্জী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড
সোদপুর

প্রসঙ্গ 'আদর্শ সমাজবাদ ঃ সহস্রাব্দের স্বপ্ন'

শ্রীশক্তিচরণ চট্টরাজের পত্র 'প্রাসঙ্গিকী'তে ১৪০৪-এর জ্যৈষ্ঠ ও কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। বিষয় ছিল—সমাজবাদ। পরবর্তী কালে বিভিন্ন সময়ে তিনি বহু চিঠি পেয়েছেন। সেইসব চিঠির উত্তর একত্রে তিনি পত্র লিখে আমাদের পাঠিয়েছেন। সেই পত্রাংশ এখানে প্রকাশ করা হলো।

সম্পাদক

(১) জড়বাদই শেষকথা নয়, তা শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিয়ে গিয়েছেন এবং এটি ভারতবর্ষের চিরন্তন বাণী।

(২) অনেকেই বুঝতে চাইছেন না যে, বেদান্ত দিয়ে মার্ক্সবাদের মোকাবিলা না করতে পারলে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য, কারণ মার্ক্সবাদ হলো স্বার্থভিত্তিক এক উগ্র জড়বাদ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন হলো বেদান্তভিত্তিক সেবামূলক নির্ভেজাল অধ্যাত্মবাদ—যার পথপ্রদর্শক হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ এবং প্রধান প্রবক্তা স্বামী বিবেকানন্দ।

(৩) "খালি পেটে ধর্ম হয় না" বলার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীরামকৃষ্ণ বস্তুবাদের প্রবক্তা হয়ে গেছেন। মার্ক্স যখন বলেন—"Religion is the opium of the masses." অর্থাৎ 'ধর্ম জনগণের আফিং' তখন কি তাঁর কথার উদ্দেশ্য ঐ একই নয়? স্বামীজীর উক্তি—"ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্মের কথা শোনানো বা দর্শনশাস্ত্র শেখানো, তাকে অপমান করা।" (দ্রঃ 'বাণী ও রচনা', ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯) বা "First bread and then religion." ('Complete Works', Vol. III, p. 432) অর্থাৎ "আগে রুটি তারপর ধর্ম" শ্রীরামকৃষ্ণের কথারই প্রতিধ্বনি। তবে "Religion is the opium of the masses." কথাটা মার্ক্সের শেষকথা। ঐকথা বলেই তিনি থেমে গেছেন, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ কথা বলে থেমে যাননি। তিনি সেটিকে উচ্চতর সত্যের সঙ্গে যোগ করে শেষকথা হিসাবে বলেছেনঃ "এই দুর্লভ মনুষ্যদেহ ধারণ করে যে সচ্চিদানন্দকে লাভ করতে না পারে, তার জন্মধারণ করাই বৃথা।"

(৪) বেদান্ত যেভাবে মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে পারে, মার্ক্সবাদ তা পারে না, কারণ মার্ক্সবাদ পূর্ণ জীবনদর্শন নয়। মার্ক্সবাদী তত্ত্ব 'অসত্য' নয়, কিন্তু 'অসম্পূর্ণ'।

(৫) বেদান্ত আমাদের জীবন সম্পর্কে একটা পূর্ণ বৃত্ত দেয়, কিন্তু মার্ক্সবাদ সেই বৃত্তের নিম্নের অর্ধাংশ দেয় মাত্র। মার্ক্সবাদ জাগতিক স্তরেই সীমাবদ্ধ, কিন্তু বেদান্ত জাগতিক এবং জগদতীত দুটোকে নিজের অঙ্গীভূত করে পূর্ণ হয়েছে।

(৬) মার্ক্সের নামের সঙ্গে সম্পর্কিত করে বলা হলেও মার্ক্সবাদের আসল নাম হলো 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ'। বেদান্তের দৃষ্টিতে এটি হলো 'দ্বৈতবাদী জড়বাদ'। তাই দ্বৈতবাদের মধ্যে যাকিছু অপূর্ণতা, স্ববিরোধ, সাম্প্রদায়িকতা এবং 'মতুয়ার বুদ্ধি' আছে এবং জড়বাদের মধ্যে যাকিছু স্বার্থপরতা, অদূরদর্শিতা, দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘর্ষ ও অত্যাচার আছে—তার সবই আছে মার্ক্সবাদের মধ্যে। তাই একজন যথার্থ অদ্বৈতবেদান্তীর পক্ষে মার্ক্সবাদের অসারতা প্রমাণ করা কঠিন নয়।

(৭) বেদান্ত তার অবস্থান থেকে মার্ক্সবাদকে স্বীকার করে নিতে পারে, কিন্তু মার্ক্সবাদ তার অবস্থান থেকে বেদান্তকে স্বীকার করে নিতে পারে না। এতেই প্রমাণিত হয় যে, বেদান্ত মার্ক্সবাদের চেয়ে উদারতর এবং উচ্চতর দর্শন।

(৮) অনেকেই জানেন না যে, বেদান্তের ভিত্তি ছাড়া মার্ক্সবাদ দাঁড়াতেই পারে না। বিশ্বের যাবতীয় দর্শন দাঁড়িয়ে আছে অদ্বৈতবেদান্তের ভিত্তির ওপর। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় স্বামী বিবেকানন্দের কথা। তিনি বলেছেনঃ "বর্তমান যুগের যত ভাবান্দোলন আছে, জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সেগুলির এক অপূর্ব ঐক্যমূলক দর্শন—অদ্বৈতবেদান্তের প্রতিরূপ।" (দ্রঃ 'বাণী ও রচনা', ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৮)

(৯) সমাজতন্ত্র হলো উচ্চস্তরের এক নৈতিকতা, যা আবার অধ্যাত্মবাদের অঙ্গ। নৈতিকতা আমাদের লক্ষ্য নয়, কিন্তু নৈতিকতা আমাদের আধ্যাত্মিক তথা সামাজিক রূপান্তরের সহায়ক।

(১০) স্বামী বিবেকানন্দ 'Practical Vedanta' বা ব্যবহারিক বেদান্তের কথা বলতেন। তাঁর প্রচারিত সমাজতন্ত্র হলো সমাজব্যবস্থার ক্ষেত্রে সেই 'Practical Vedanta' বা ব্যবহারিক বেদান্ত।

(১১) ব্রহ্ম সত্য—এই যুক্তিতে যেমন জগৎ সত্য, তেমনি বেদান্তের সত্যের ভিত্তিতে মার্ক্সবাদ সত্য। খেয়াল রাখতে হবে যে, মার্ক্সবাদও সত্য, কিন্তু বেদান্তের দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ নিম্নতর সত্য এবং তাই জীবনের পূর্ণতার জন্য নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে উঠে আসতে হবে।

(১২) আমার ধারণা, মার্ক্সবাদ একদিন নস্যাৎ হবেই, কারণ মার্ক্সবাদী তত্ত্ব মূলত মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি-বিরোধী। মার্ক্সবাদ কট্টর জড়বাদী, কিন্তু মানুষ প্রকৃতিগতভাবে অধ্যাত্মবাদী বা আধ্যাত্মিক, তাই জড়বাদকে মানুষ তার শেষ আশ্রয় বলে কিছুতেই মানবে না।

শক্তিচরণ চট্টরাজ
রামপুরহাট, বীরভূম-৭৩১২২৪

উর্দু কাব্য ও উর্দু ভাষা

'উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ ১৪০৮ সংখ্যার 'সাহিত্য' বিভাগে সৌম্যেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অষ্টাদশ শতাব্দীর উর্দু কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি মুহম্মদ তকী' রচনাটি উৎকৃষ্ট। উর্দু ভাষার নিজস্ব ধ্বনিগুলি ছয়-সাতটি ভাষা থেকে নেওয়া। কাজেই 'জে্', 'জ়াল', 'জো়য়্', 'জো়য়াদ্' এই চারটি ধ্বনি ঠিক 'Z'-এর মতো নয়। তেমনি, 'সীন', 'সে', 'সোয়াদ' 'হে, হে্, হে্, হে'—এগুলিও ঠিক 'স্' বা 'হ্'-এর মতো নয়। আরবী, পারসী, তুরকি, গ্রীক, হিন্দি, ইংরেজী, সংস্কৃত—এইসব ভাষা থেকে শব্দ নিয়ে উর্দু ভাষা গঠিত। উর্দুতে একটি সুন্দর শের আছে—"খুদ্ হী কো কর্ বুলন্দ্ ইত্না কি হর্ তকদীর সে পহ্লে,/ খুদা বন্দে সে খুদ্ পুছে বতা তেরী রজা ক্যা হ্যায়।" (নিজেকে এমন উন্নত কর যে, নিজের কিছু চাওয়ার আগেই ঈশ্বর নিজে তোমাকে যেন জিজ্ঞাসা করেন—বল তোমার কি কাম্য?)

স্বাধীন ভারতের শেষ নবাব বাহাদুর শাহ জাফরের বিখ্যাত গজলগুলির মধ্যে 'লগতা নহীঁ হ্যায় দিল্ মেরা উজড়ে য়ে দরার মেঁ' বা 'ন কিসী কী আঁখ কা নুর হুঁ ন কিসী দিল কা করার হুঁ' বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে। 'মীর' কথাটি 'আমির' কথাটিরই সংক্ষিপ্ত রূপ। বাঙলা, ওড়িয়া, মালয়ালম প্রভৃতি

ভাষায় যে 'এ'-কার বাঁদিকে দেওয়া হয় তাও বোধহয় উর্দুর প্রভাবে। তাছাড়া 'তক্তা', দজ্জাল', 'ঝক্কি', 'ঝামেলা', 'আসবাব', 'আবহাওয়া', 'আদল' প্রভৃতি অগণ্য শব্দ উর্দু থেকে বাঙলাতে এসেছে। তাই উর্দু সমস্ত বাঙালীর অবশ্য শিক্ষণীয়। 'আড়িয়াদহ' এবং 'দেয়াড়া' বা 'দিয়াড়া' যে একই শব্দ, তা উর্দু জানলে বোঝা যায়। পারসীতে 'দহ' মানে 'গ্রাম'। 'আড়া' মানে তির্যক। নদীতীরের গ্রামের নাম তাই 'দেয়াড়া' হয়। এই গ্রাম রাজারহাটের পিছনেই নদীতীরে অবস্থিত।

কুড়নচন্দ্র ঘোষ
ময়ূরবিহার, দিল্লি-১১০০৯১

শ্রীঅরবিন্দের চাকরি প্রসঙ্গ

'উদ্বোধন'-এর গত ভাদ্র ১৪০৮ সংখ্যায় শ্রীঅনিলকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দের ভূমিকা ও তাৎপর্য' প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে 'উদ্বোধন'-এর আদর্শ ও লক্ষ্য অনুযায়ী একটি ইতিবাচক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটিতে আছে শ্রীঅরবিন্দ "আই. সি. এস. পরীক্ষাতেও ভালভাবে উত্তীর্ণ হয়ে চাকরি পান। কিন্তু অশ্বারোহণের পরীক্ষায় স্বেচ্ছায় ফেল করে তিনি চাকরি থেকে বরখাস্ত হন।" তাঁর চাকরি পাওয়া ও বরখাস্ত হওয়ার ঘটনাটি ঠিক নয়। ঘটনাটি হলো—"আগস্ট মাসে (১৮৯২) অরবিন্দ I. C. S. পরীক্ষায় পাশ করেন। লোভনীয় চাকরিতে যোগদানের সুযোগ তাঁর সামনে এল। একটিমাত্র শর্ত, অশ্বারোহণে সাফল্য বাকি রইল। আগস্ট থেকে নভেম্বর শ্রীঅরবিন্দ চারবার এই পরীক্ষার সুযোগ পেলেন, কিন্তু প্রত্যেকবারই পরীক্ষার সময় তিনি অনুপস্থিত। মনে হয় তিনি I. C. S.-এর চাকরি নেবেন না ঠিক করেছিলেন।" (দ্রঃ 'সর্বকালের সার্বজনীন শ্রীঅরবিন্দ'—নীরদবরণ চক্রবর্তী, পৃঃ ১৩) এসম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন ঃ "অশ্বারোহণে অকৃতকার্য হয়ে যখন আমি চাকরির চেষ্টা করছিলাম, বরোদার মহারাজা গায়কোয়াড় সেসময় লণ্ডনে ছিলেন। আমার ঠিক মনে নেই কিভাবে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়েছিল।" (ঐ, পৃঃ ১৫) যাহোক, মাসিক ২০০ টাকা বেতনে মহারাজার অধীনে কাজ করার জন্য ১২ জানুয়ারি ১৮৯৩ শ্রীঅরবিন্দ এস. এস. কার্থেজ জাহাজে ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করেন। নীরদবরণ চক্রবর্তী শ্রীঅরবিন্দের শেষ বারবছরের সঙ্গী ছিলেন। তাই তাঁর লেখা প্রামাণ্য বলে মনে করা হয়।

প্রহ্লাদচন্দ্র প্রধান
বাহারপোতা, মেদিনীপুর-৭২১১৫১

শব্দচেতনা ৪

স্বামীজীর জীবনের নানান ঘটনা ও তাঁর বাণীকে ভিত্তি করে তৈরি বিশেষ শব্দছক

১		২		■	■	৩			৪
	■		■	৫	■	■	■	■	
৬		■	৭				■	৮	
	■	৯	■		■	■	১০	■	
■	১১		■	■	■	১২		■	■
■	■	১৩		■	■	■	১৪		■
১৫	■		■	■	১৬	■		■	১৭
১৮		■	১৯				■	২০	
	■	■	■	■		■	২১	■	
২২				■	■	২৩			

সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম দশজনের নাম পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

পাশাপাশি ঃ (১) নরেন্দ্রনাথ এর আখড়াতে ব্যায়াম শিখতেন (৩) স্বামীজী এই গুরুভাইকে স্নেহ করে 'গ্যাঞ্জেস' বলে ডাকতেন (৬) ভগিনী নিবেদিতার মতে গুরু, গীতা আর যার সম্মিলনে স্বামীজীর ব্যক্তিত্ব সংগঠিত হয়েছিল (৭) বিবেকানন্দের গুরুভাই বাবুরামের সন্ন্যাসনাম (৮) 'কথামৃত'-প্রণেতা (১১) শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ঃ "অন্যেরা কলসীঘটি এসব হতে পারে, নরেন্দ্র ——।" (১২) পরিহাসচ্ছলে স্বামীজী দ্বিতীয় শ্রেণীর ভক্তদের এই নামে ডাকতেন (১৩) নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গেয়ে শোনান—"কি সুখ জীবনে মম ওহে —— দয়াময় হে।" (১৪) দেরাদুনে স্বামীজীর সঙ্গে এই জাত-বেনের দেখা হয় (১৮) পওহারী বাবার নিকট স্বামীজী শিখেছিলেন—"যন্ সাধন —— সিদ্ধি।" (১৯) শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন ঃ "নরেন খাপখোলা ——।" (২০) স্বামীজী যে-গুরুভাইকে মঠের মেরুদণ্ডস্বরূপ বলে উল্লেখ করতেন (২২) স্বামীজীর প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য (২৩) স্বামীজী বলতেন ঃ "ঠাকুর হলেন অবতারের ——।"

ওপর-নিচ ঃ (১) শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশচন্দ্রকে বলেন ঃ "আমি নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ জ্ঞান করি; আর আমি ওর ——।" (২) রাজকুমারকে এই আড্ডায় যাওয়ার কথা প্রচারের ভয় দেখিয়ে নরেন্দ্রনাথ বন্ধু হরিদাসের পরীক্ষার টাকা মকুব করেছিলেন (৪) নরেন্দ্রনাথের মাতামহী (৫) এই বন্ধুই নরেন্দ্রনাথকে তাঁর পিতৃবিয়োগের কথা প্রথম বলেছিল (৯) দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির খাজাঞ্চী (১০) বিবেকানন্দের কাছে সন্ন্যাস নেওয়ার পর দক্ষ-এর নাম (১৫) বৃন্দাবন থেকে হরিদ্বার যাওয়ার পথে স্বামীজীকে এই রেলস্টেশনে দেখা যায় (১৬) নরেন্দ্রনাথ বেণী ওস্তাদের কাছে শিখেছিলেন (১৭) স্বামীজীর নির্বিকল্প সমাধি প্রথম যেখানে হয় (২১) নির্বিকল্প সমাধি হলে দাশরথি সান্যাল ঠাকুরের মুখে জলসেচন করতে গেলে নরেন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ "জল দেবার দরকার নেই। উনি অজ্ঞান হননি, ওঁর —— হয়েছে।"

সূত্র ঃ **পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়**

শিশুর অপুষ্টি ও কৃমিরোগ

অমিয়কুমার ভট্টাচার্য

কেঁচো-কৃমি (round worm) পেটের অসুখের একটি সাধারণ কারণ। বয়স্কদের তুলনায় শিশুরা এই অসুখে বেশি আক্রান্ত হয়, সাধারণত তাদের পেটে কৃমির সংখ্যাও বেশি থাকে। সংক্রমণ-সংখ্যা হিসাবে পৃথিবীর প্রথম দশটি পরজীবীজনিত অসুখের মধ্যে এই কৃমিরোগ একটি। আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় একশ কোটি। কয়েকটি সমীক্ষায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যায় বিশেষ তারতম্য দেখা গেছে। যেমন উত্তরভারতে এই সংখ্যা শতকরা প্রায় ২ এবং দক্ষিণভারতে ৮৫-৯০। গ্রাম্য পরিবেশে ও জীবনযাপন পদ্ধতিতে কৃমিরোগের সংক্রমণ সহজ। আবার শহরের যেসব অঞ্চলে ঘনবসতি ও মল অপসারণের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা থাকে না, সেসকল স্থানও এই রোগবিস্তারের বিশেষ অনুকূল। কেঁচো-কৃমি স্বাস্থ্যহানি তো করেই, উপরন্তু শিশুদের অপুষ্টি এমনকি মৃত্যুরও কারণ হয়। অথচ প্রায়ই রোগটিকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগ বিশেষ জটিল হয় না এবং চিকিৎসাও কার্যকরী ও ব্যয়সাপেক্ষ নয়। সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে প্রতিরোধ দুঃসাধ্য নয়।

রোগের কারণ ও রোগ-সংক্রমণ

যেসব কৃমি থেকে পেটের অসুখ হতে পারে, কেঁচো-কৃমি তার মধ্যে একটি। এই কৃমি (Ascaris lumbricoides) পরজীবী গোত্রের প্রাণী। দেখতে কেঁচোর মতো—গোলাকৃতি ও লম্বা। এটি সাধারণত মানুষের পেটেই দেখা যায়। কখনো কখনো কুকুর, বেড়াল বা ভেড়ার পেটেও দেখা যায়। শূকরও প্রায় অনুরূপ একটি কৃমিতে আক্রান্ত হয়। তবে সেগুলি মানুষের দেহে অসুখ সৃষ্টি করে না। কারণ, এদের ডিম মানুষের পেটে গেলে পূর্ণতা পায় না এবং শূকর-দেহে যে রোগলক্ষণ দেখা যায়, সেগুলি মানুষের কৃমিরোগে দেখা যায় না।

মানুষের সদ্যপরিত্যক্ত মলে জীবন্ত অবস্থায় কৃমির রঙ হয় হালকা বাদামী বা ঈষৎ গোলাপী, মরে গেলে সাদা। লম্বায় ২০-৪০ সেমি., ব্যাস ৩-৬ মিমি.। দুদিক সরু। সূক্ষ্ম দাঁত ও ঠোঁটযুক্ত দিকটা মুখ। পিছনের দিকের বক্রতা দিয়ে স্ত্রী-পুরুষ চেনা যায়। এদের পেটের ভিতর রয়েছে হজম ও প্রজনন-যন্ত্র। কেঁচো-কৃমির জীবনচক্র বেশ জটিল। কিন্তু রোগলক্ষণ বুঝতে এটি মোটামুটি জানা দরকার। পরিণত স্ত্রী কৃমি রোজ প্রায় দুই লক্ষ ডিম পাড়তে পারে। এগুলির কিছু নিষিক্ত ও কিছু অনিষিক্ত। ডিম মলের সঙ্গে নির্গত হয়। মাটিতে প্রয়োজনীয় উষ্ণতা (২৮-৩০° সে.) ও আর্দ্রতা (৪০%) পেলে নিষিক্ত ডিমে ১০-৪০ দিনে শূক বা লার্ভা জন্মায়। তারপর ঐ অবস্থায় অনুকূল পরিবেশে কয়েক বছর বাঁচতে পারে।'লার্ভাযুক্ত ডিম খাদ্য, পানীয় জল, কাঁচা ফল ও শাকসবজির সঙ্গে পেটে যায়। খাদ্যদূষণের একটি প্রধান কারণ সার হিসাবে ব্যবহৃত মল। কিন্তু অন্যভাবেও সংক্রমণ ঘটে। বাড়ির উঠানে, রাস্তায়, ফুটপাথে অনেক সময় শিশুরা মলত্যাগ করে, মাটি মুখে দেয়। এমনকি ধুলো-বাতাসের সঙ্গেও ঐ মাটি গলায় গেলে বা পোষা কুকুর-বেড়ালের লোমে লেগে থাকা ডিম থেকে শিশুরা আক্রান্ত হতে পারে। লার্ভাযুক্ত ডিম পেটে গেলে ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ গ্রহণী বা ডিওডেনামের জারক রসে ডিমের ওপরের আবরণ কিছুটা দুর্বল হয়ে যায় এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের পরবর্তী অংশ জেজুনামে ডিম থেকে ছোট (০.২৫ মিমি.×১৪ মাইক্রো মি.) লার্ভা বেরিয়ে আসে। এই লার্ভা ক্ষুদ্রান্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ভেদ করে শিরার মাধ্যমে যকৃৎ ও হৃৎপিণ্ড হয়ে ফুসফুসে আসে। তারপর কফের সঙ্গে গলায় আসে এবং আবার গিলে ফেলা হলে ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশে পৌঁছায় ও পূর্ণতা পায়। সেখানে প্রায় একবছর বাঁচে। লার্ভাযুক্ত ডিম পেটে যাওয়ার সময় থেকে ক্রমপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদি ঘুরে অন্ত্রে ফিরে পূর্ণতা পেতে সময় লাগে ২-৩ মাস। পূর্ণতা পেলেই স্ত্রী কৃমি ডিম পাড়তে শুরু করে। আশ্রয়দাতার অন্ত্রে পেশীর সঙ্কোচনের জন্য কৃমি নিম্নগামী হয় না ও মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায় না। কারণ, অবিরাম পাক দিয়ে তারা গতিশীল থাকে। আশ্রয়দাতার হজমের উৎসেচকগুলি কৃমির কোন ক্ষতি করতে পারে না। কারণ, কৃমি-নিঃসৃত রস ঐগুলির প্রতিরোধ করে। কৃমি নিজস্ব উৎসেচকের সাহায্যে শর্করা, প্রোটিন ও ফ্যাট থেকে পুষ্টি নেয়। শর্করা প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করে। ডিম তৈরির জন্যও তাদের প্রোটিন লাগে।

মানবশরীরের অনাক্রম্যতা-শক্তি (immunity) অন্ত্রে বা ফুসফুসে লার্ভার পরিবর্তনে আংশিকভাবে বাধা দেয়, কিছু লার্ভা মরেও যায়। তাই যত লার্ভাযুক্ত ডিম পেটে যায়, তার তুলনায় পরিণত কৃমির সংখ্যা কিছুটা কম হয়। যেসব অঞ্চলে কৃমিরোগের প্রাদুর্ভাব বেশি, সেখানে বারবার কৃমি সংক্রমণ হয়। এই অবস্থায় রোগ-প্রতিরোধ শক্তি বৃদ্ধি পায় ও কৃমির সংখ্যা কিছুটা কমে।

রোগলক্ষণ

লার্ভাযুক্ত ডিম থেকে পরিণত কৃমিতে রূপান্তরিত হওয়ার বিভিন্ন অবস্থায় রোগলক্ষণের তারতম্য দেখা যায়। লার্ভা মানুষের যকৃতের বৃদ্ধি ঘটাতে পারে। পেটে অস্বস্তি, বমিভাব অথবা বমি হয়। যখন ফুসফুসে যায়, তখন অতিসংবেদনশীলতা-জনিত কিছু প্রতিক্রিয়া (hypersensitive reactions) ঘটে। অল্প জ্বর, সর্দি-কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকজ্বালা এবং কখনো কখনো রক্তমিশ্রিত কফ নির্গত হয়। চামড়ায় উদ্‌গমন (rash) দেখা দিতে পারে। রক্তে ইওসিনোফিল কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়। বুকের এক্সরে ফটোতে ফুসফুসের কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। অস্বাভাবিক ক্ষেত্রে লার্ভা বিপথে গেলে মস্তিষ্কে, সুষুম্নাকাণ্ডে (meningo-encephalitis) ও বৃক্কে প্রদাহ এবং চোখের অসুখ হতে পারে। পরিণত কৃমি যখন অন্ত্রে বাস করে, তখন আশ্রয়দাতার খুব একটা অসুবিধা নাও হতে পারে—অবশ্য কৃমির সংখ্যা যদি বেশি না হয়। কৃমি থেকে

নিঃসৃত জৈব-রাসায়নিক পদার্থ অন্ত্রের রক্ত-চলাচল এবং পেশীর সঙ্কোচন ও চলমান গতি অস্বাভাবিক করে। ফলে পেটে অল্প অল্প অথবা মোচড় দিয়ে ব্যথা, অস্বস্তি ও ফাঁপা বোধ হয়। বেশি কৃমি থাকলে রোগা শিশুর পেটে হাত দিলে 'থলের মধ্যে কৃমি'—এমন অনুভূত হয়। শিশুদের অপুষ্টিও দেখা দেয়। কৃমির শরীর থেকে কিছু বস্তু (allergen) নিঃসৃত হয়ে বিরূপ শারীরিক প্রতিক্রিয়া (allergy) সৃষ্টি করে। ফুসফুস, অন্ত্র, ত্বক, চোখ ইত্যাদি অঙ্গেও এগুলি দেখা যায়। হাঁপানি, চামড়ায় চাকা চাকা ভাবে ফুলে ওঠা, চোখের সাদা অংশের প্রদাহ, পেটে কামড়ে ধরার মতো তীব্র ব্যথা ও পাতলা মল—এগুলি অ্যালার্জিজনিত লক্ষণ। অন্য কোন অসুখের জন্য জ্বর হলে, খুব ঝালমশলা দেওয়া খাবার খেলে, অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনে রোগীকে অজ্ঞান করা হলে এবং কিছু ওষুধ, এমনকি কৃমির ওষুধ খেলেও কোন কোন সময়ে কিছু জটিল উপসর্গ দেখা দিতে পারে। এই প্রতিকূল পরিবেশে কৃমিগুলি হয় দলা পাকিয়ে যায় অথবা অতিরিক্ত মাত্রায় চঞ্চল হয়ে পড়ে। দলা পাকিয়ে গেলে অন্ত্রের গতি ব্যাহত হয় (intestinal obstruction)। চঞ্চল কৃমি ছোটাছুটি শুরু করলে অন্ত্রের মধ্যে যেসব স্বাভাবিক ছিদ্রপথ আছে, সেগুলিতে ঢুকে পড়তে পারে। পিত্তনালীতে ঢুকলে ন্যাবা (jaundice), অগ্ন্যাশয়ের নালীতে ঢুকলে প্রদাহ (pancreatitis) ও লাঙ্গুলিতে প্রদাহ (appendicitis) সৃষ্টি করে। পেপটিক ক্ষত (ulcer) বা টাইফয়েড রোগীর ক্ষুদ্রান্ত্রের ক্ষত ভেদ করে ঢুকলে অন্ত্রাবরক ঝিল্লির প্রদাহ (peritonitis) হয়। ওপরদিকে মুখ, গলা, নাক ইত্যাদিতে কৃমি চলে গেলে অথবা শ্বাসনালীতে আটকে গেলে মারাত্মক হতে পারে। এই জটিল অবস্থা অনেকটাই নির্ভর করে কৃমির সংখ্যাধিক্যের ওপর। তবে দেখা যায়, যদি কেবলমাত্র দু-একটি স্ত্রী অথবা পুরুষ কৃমি থাকে তাহলেও তারা বেশি চঞ্চল ও বেশ অসুবিধার সৃষ্টি করে। পূর্ণবয়সে সঙ্গীর খোঁজে হয়তো এরকম আচরণ।

শিশুদের অপুষ্টি

নিম্ন-আয় পরিবারে বহু শিশু খাদ্যাভাবে ভোগে। অপুষ্টির এটি প্রধান কারণ হলেও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ঘন ঘন উদরাময়, শ্বাসনালীর অসুখ ইত্যাদির সংক্রমণ ও ত্রুটিপূর্ণ শিশুপালন পদ্ধতির ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত পাঁচবছরের নিচের শিশুরাই অপুষ্টির শিকার হয়। আপাতদৃষ্টিতে এদের অনেককেই অসুস্থ মনে হয় না, কিন্তু দৈহিক ওজন ও উচ্চতা মাপলে বোঝা যায় বৃদ্ধি (growth) নিম্ন মানের। খাদ্য হয়তো কোনক্রমে দৈনন্দিন চাহিদা মেটায়, কিন্তু শারীরিক বৃদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট নয়। বিশেষ জৈব-রাসায়নিক পরীক্ষায় দেখা যায়, এই শিশুরা অনেক পুষ্টি-উপাদানের অভাবে ভোগে। কম ওজনের ও খর্বকায় 'আপাত স্বাভাবিক' এই শিশুদের অপুষ্টির মান অল্প বা মাঝারি ধরনের। কিন্তু তারা যখন কোন সংক্রামক রোগে ভোগে, তখন এই অপুষ্টি বেড়ে যায়। পা ফোলে এমনকি সারা শরীর ফুলে যায়, আবার কিছু শিশু ক্রমশ শুকিয়ে যায়। চামড়ায় ঘা, নানারকম ভিটামিন ও খনিজ লবণের অভাবও সঙ্গে থাকে। উপরন্তু গুরুতর জৈব-রাসায়নিক পরিবর্তনও ঘটে।

এই শিশুদের মধ্যে কেঁচো-কৃমির প্রাবল্যও দেখা যায়। কৃমি অপুষ্টিকে আরো বাড়িয়ে দেয়, কিন্তু ঠিক কিভাবে কৃমি অপুষ্টি ঘটায় সেটা বোঝা যায় না। নানারকম তথ্য পাওয়া গেলেও এবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয় না। তবে বোঝা যায়, প্রোটিন ঠিকমতো শোষিত হচ্ছে না। ফ্যাট বা স্নেহজাতীয় খাদ্য, দুধের শর্করা ও ক্যালসিয়ামও ঠিকমতো শোষিত হয় না।



তিনবছর বয়সের এই শিশুটির পেটে অনেক কৃমি ছিল। চিকিৎসার পর দেড় মাসে ওজন ৮.৫ কিলোগ্রাম থেকে বেড়ে ১১ কিলোগ্রাম হয়।

কৃমিরোগে আরো একটি গুরুতর অপুষ্টির সহাবস্থান উল্লেখযোগ্য। সেটি ভিটামিন 'এ'-র অভাব। কেঁচো-কৃমি অন্ত্রে ভিটামিন 'এ' শোষণে বিশেষ বাধা সৃষ্টি করে। নানা কারণে এটি হতে পারে। সম্ভাব্য কারণগুলি হলো—শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির গঠন ও কাজে পরিবর্তন, ফ্যাট তথা ফ্যাটে দ্রব ভিটামিন 'এ' (যদিও এসকল শিশুর খাদ্যে এগুলির খুবই অভাব) শোষণে বাধা, নিজ প্রয়োজনে কৃমির ভিটামিন 'এ' ব্যবহার অথবা কৃমির শারীরিক উপস্থিতি। যাই হোক, অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশু এমনিতেই ভিটামিন 'এ'-র অভাবে ভোগে, কৃমি সেই পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে দেয়। চোখের রেটিনার কাজ ঠিকমত হয় না। অল্প আলোয় দৃষ্টিশক্তি কমে যায়। শিশুরা এটা বলতে পারে না। কিন্তু তারা অস্বাভাবিকভাবে দরজা বা দেওয়ালে ধাক্কা খেলে সন্দেহ করা যেতে পারে। চোখের বাইরের সাদা অংশের (conjunctive) মসৃণতা নষ্ট হয় ও শুকিয়ে যায়। বেশি অপুষ্টি হলে চোখের মণিতে (cornea) ক্ষত হতে পারে। সেরে গেলে কর্ণিয়া সংস্থাপন করে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া সম্ভব। কিন্তু চোখের মণি গলে গেলে (kerato-malacia) চোখ একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ভিটামিন 'এ' অপুষ্টি শিশুদের অন্ধত্বের একটি প্রধান কারণ। এই অপুষ্টি শারীরিক বৃদ্ধিও ব্যাহত করে ও বেশ কিছু জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়

ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। কৃমি-আক্রান্ত শিশুদের চোখে অস্বাভাবিকতা না দেখা গেলেও রক্তে ভিটামিন 'এ'-র মাত্রা কমে যায়। মূলকথা হলো, কেঁচো-কৃমি প্রমাণিতভাবে ভিটামিন 'এ' অপুষ্টির সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়; কাজেই কৃমি-আক্রান্ত শিশুকে ভিটামিন 'এ'র চিকিৎসা করাতেই হবে। অবশ্য খুব বেশি অপুষ্টি থাকলে রুগ্ন শিশুর কৃমি-চিকিৎসা অপুষ্টির কিছুটা উন্নতির পরই করা উচিত। কলকাতার বস্তিবাসী শিশুদের মধ্যে কৃমিরোগ প্রায়ই দেখা যায়। আবার তাদের বেশ কিছু ভিটামিন 'ডি' ও ক্যালসিয়ামের অভাবে রিকেট রোগে ভোগে। রিকেট রোগে অস্থি-র বৃদ্ধি অস্বাভাবিক হয় ও হাত-পা বেঁকে যায়, মাথা ও পেট মোটা হয় এবং বুকের অস্থি-র বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। ভিটামিন 'ডি' স্নেহপদার্থে দ্রবণীয়। কৃমি ভিটামিন 'ডি' শোষণে বাধা দেয় কিনা তা প্রমাণিত হয়নি। ভিটামিন 'ডি'-র প্রধান উৎস সূর্যালোকের অতিবেগুনী রশ্মি। ত্বকের কোষ এই রশ্মির সাহায্যে ভিটামিন 'ডি' সংশ্লেষ করে। সম্ভবত বস্তির যে-পরিবেশে শিশুরা কৃমিরোগে ভোগে, সেখানে খাদ্যাভাব ছাড়াও তারা যথেষ্ট সূর্যালোক পায় না। অধিকন্তু, কৃমি ক্যালসিয়াম শোষণেও বাধা দিয়ে রিকেট রোগের কারণ হয়।

রোগনির্ণয়

কৃমি মল অথবা বমি থেকে নির্গত হলে রোগনির্ণয় সহজ। সাধারণ পদ্ধতি অবশ্যই অনুবীক্ষণে মলপরীক্ষা। কৃমির ডিম দেখা গেলে রোগনির্ণয় নিশ্চিত। প্রয়োজনে বিশেষ পদ্ধতিতে ডিম একত্রীকরণ (concentration method) করেও দেখা যায়। গ্রহণীর ক্ষত (duodenal ulcer), পিত্তকোষ অথবা অগ্ন্যাশয়ের প্রদাহ—এসব রোগনির্ণয়ে লেন্সযুক্ত নলযন্ত্র (endoscope) মুখের মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে দেখা হয়। এই যন্ত্রে কেঁচো-কৃমি দেখা যেতে পারে এবং এর সাহায্যে কৃমি বের করে আনাও সম্ভব। কৃমি পিত্তনালী অথবা অগ্ন্যাশয়ে নালীতে ঢুকে মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি করলে এভাবে চিকিৎসা খুবই সহজ ও ফলপ্রসূ হয়।

চিকিৎসা

কেঁচো-কৃমির চিকিৎসায় কয়েকটি খুবই কার্যকরী (৯০-১০০ শতাংশ) ও প্রায় নিরাপদ ওষুধ আছে। অনেক সময় গাছগাছড়া বা অন্য টোটকা ওষুধ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পরিবর্তে অ্যালোপ্যাথিক ওষুধগুলিই বেশি ব্যবহারযোগ্য। এগুলি হলো Albendazole, Mebendazole ও Pyrantel। আরেকটি ওষুধ Piperazine কার্যকরী হলেও পার্শ্বক্রিয়ার জন্য আজকাল ব্যবহৃত হয় না। এগুলি ব্যবহারের ফলে কৃমি মলের সঙ্গে জীবিত বা মৃত অবস্থায় নির্গত হয় অথবা অন্ত্রের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়। যেভাবে এই ওষুধগুলি কাজ করে তাতে কৃমি আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে যাওয়াই প্রত্যাশিত। কিন্তু দেখা যায়, কিছু কৃমি খুবই চঞ্চল হয়ে ছোটাছুটি শুরু করে ও আগে যেসব জটিল অবস্থার কথা বলা হয়েছে সেগুলির সৃষ্টি হয়। কৃমি দলা পাকিয়ে অন্ত্রের গতিরোধ (intestinal obstruction) করতে পারে অথবা অন্ত্রের স্বাভাবিক ছিদ্রপথগুলিতে ঢুকে মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে। এসব ক্ষেত্রে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হয়। কিছু চিকিৎসকের মতে, অন্ত্রের গতিরোধের মূল কারণ অন্ত্রের পেশীর তীব্র সঙ্কোচন। তাঁরা চিকিৎসার প্রথম পর্যায়ে ওষুধ দিয়ে রোগীকে পর্যবেক্ষণে রাখেন। যদি ব্যথা কমে, দু-চারদিনে কৃমি বেরিয়ে যায় ও অবস্থার উন্নতি হয়, তাহলে অস্ত্রোপচার করেন না। অন্যথায় অস্ত্রোপচার করতে হয়। এণ্ডোস্কোপ দিয়েও অন্ত্র বা শ্বাসনালীতে আবদ্ধ কৃমি বের করা হয়। ঐ নলের মধ্য দিয়ে কৃমির ওষুধও দেওয়া যায়।

প্রতিরোধ

কৃমিরোগের প্রতিরোধ সহজ নয়। চিকিৎসা করলেও পুনরাক্রমণ খুবই সাধারণ ঘটনা। মল অপসারণের স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি না থাকায় প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ কৃমির ডিম খাদ্য, পানীয় ও পরিবেশ দূষিত করছে। আমাদের দেশের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বাতাসে অক্সিজেন ও অতিবেগুনী রশ্মির প্রাচুর্য ডিমগুলিকে পরিণত করতে খুবই সহায়ক। গ্রামাঞ্চলে লোকে মাঠে মলত্যাগ করে। মল সার হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। এর ফলে শাকসবজি, ফলমূল দূষিত হয়। সারা বছরই রোগ সংক্রমণ চলতে থাকে। কিন্তু কৃমিরোগের ব্যাপকতা শুধু গ্রামেই সীমাবদ্ধ নয়, শহরের বস্তি অঞ্চলে অনেক বেশি দেখা যায়। সেখানে নোংরা পরিবেশে ঝুপড়িতে অথবা ফুটপাথে শিশুরা বড় হয়। বস্তিগুলি হয় জনাকীর্ণ। স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন সেখানে মোটেই সম্ভব নয়। স্বাস্থ্যসচেতনতা ও সাধারণ জ্ঞান সেখানে ভয়াবহভাবে কম। বস্তিতে, রাস্তায় শিশুরা যত্রতত্র মলত্যাগ করে। সেখানে কেঁচোর ডিমগুলি পরিণত হয়। আবার শিশুরা এগুলি মাটি বা মাটিমিশ্রিত খাবারের সঙ্গে মুখে দেয়। মাছিও ডিম বয়ে নিয়ে যায়। শহরের উচ্চবিত্তরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাসস্থানে থাকলেও তাঁরা নিরাপদ নন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা খাদ্য ও পানীয় দূষিত করে। ফলে তাঁদেরও কৃমিরোগ হয়, কিন্তু অনেক সময়ে সন্দেহ করা হয় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে কৃমিরোগ প্রতিরোধের আদর্শ পদ্ধতি হলো মল অপসারণের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা। সেইসঙ্গে প্রয়োজন পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্যসম্মত সুলভ শৌচাগার নির্মাণ ও কারিগরী জ্ঞান। খাদ্য ও পানীয় জল দূষণ সম্বন্ধেও জনগণকে অবহিত হতে হবে। স্কুলে ও বয়স্ক শিক্ষালয়ে এবিষয়ে শিক্ষাদান প্রয়োজন। কিন্তু এইভাবে কৃমিরোগ প্রতিরোধ সময়সাপেক্ষ এবং দেশের আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক নানা সমস্যা এর সঙ্গে জড়িত। কাজেই অন্য দুটি অপেক্ষাকৃত সহজ পদ্ধতি আশু গ্রহণযোগ্য ও কার্যকরী বলে প্রমাণিত—(১) শিশু, বয়স্ক, দরিদ্র, নিম্নবিত্ত বা উচ্চবিত্ত সকলের ক্ষেত্রেই পেটের অসুখের একটি কারণ কৃমি—এই সম্ভাবনা মনে রাখা ও প্রয়োজনে চিকিৎসা করা। মনে রাখতে হবে যে, খাদ্যাভ্যাস ও পরিবেশ অপরিবর্তিত থাকার জন্য পুনরাক্রমণের সম্ভাবনাও রয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে বারবার চিকিৎসার প্রয়োজন হতে পারে। (২) যেসব অঞ্চলে কৃমিরোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি, সেখানে একসঙ্গে একই দিনে মলপরীক্ষা না করেই সব শিশু বা ব্যক্তিকে কৃমির ওষুধ খাইয়ে দিতে হবে। এটি একটি স্বীকৃত ও কার্যকরী প্রতিরোধ পদ্ধতি। নির্দিষ্ট অঞ্চলে তিনমাস অন্তর এভাবে সকলকে ওষুধ খাইয়ে যথেষ্ট সুফল লক্ষ্য করা গেছে। ❑

রোগজীবাণুর আগামী দিনের করালমূর্তি সম্বন্ধে

বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থা এক সাম্প্রতিক ইস্তাহারে সাবধান করেছে যে, সাধারণ অসুখের জীবাণুও অ্যান্টি-বায়োটিক (antibiotic)-প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করায় অবস্থা এখন ভয়াবহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর সকল দেশের সরকার যদি রোগদমন করতে এবং রোগজীবাণুর অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করা বন্ধ করতে আরো চেষ্টা না করে, তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ বের হওয়ার আগে যে-অবস্থা ছিল সেই অবস্থাই আবার ফিরে আসবে এবং তখন কার্যকরী চিকিৎসার অভাবে জনগণ করালমূর্তিধারী (অর্থাৎ অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধকে অকেজো করার ক্ষমতা অর্জনকারী) জীবাণুর (super bugs) আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যাবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার বার্ষিক রিপোর্টে ঐ সংস্থার ডাইরেক্টর জেনালের গ্রো ব্রাণ্ডটল্যাণ্ড বলেনঃ "বর্তমানে সমস্ত সাঙ্ঘাতিক রোগের কার্যকরী ওষুধ আছে। কিন্তু আমরা সেই মূল্যবান ওষুধগুলিকে রোগজীবাণুর অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে নষ্ট করতে বসেছি।" রিপোর্টে বলা হয়েছে কিভাবে প্রধান সংক্রামক অসুখগুলিও—যেমন যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, এইডস, নিউমোনিয়া, উদরাময় প্রভৃতির ওষুধগুলি আস্তে আস্তে অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধ ক্ষমতার কবলে পড়েছে।

এস্তোনিয়া, ল্যাটভিয়া, চীন ও রাশিয়ার কোন কোন অংশে ১০ শতাংশের ওপর যক্ষ্মারোগীর জীবাণু সবচেয়ে কার্যকরী দুটি ওষুধের প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করেছে। থাইল্যাণ্ডে ম্যালেরিয়ার তিনটি চালু ওষুধের কার্যকারিতা এইভাবে নষ্ট হয়েছে। হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস আক্রান্ত রোগীদের ৩০ শতাংশের ক্ষেত্রে ল্যামিভুডিন ওষুধ একবছর পরে আর কার্যকরী থাকছে না। এইডস রোগের চিকিৎসায় এইচ. আই. ভি. জীবাণুর জিডোভুডিন ও অন্যান্য ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বেড়েই চলেছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার ডাঃ রোজমাণ্ড উইলিয়মস বলেনঃ "আমরা যদি এখনি এই বিষয়ে প্রতিকারের চেষ্টা শুরু না করি, তাহলে আমাদের ওষুধ বলতে আর কিছু থাকবে না। শুধু আমাদের ইউরোপ-আমেরিকার কথা ভাবলে চলবে না, সারা বিশ্বের অবস্থা চিন্তা করতে হবে। বহু দেশ এইরকম অবস্থা সামলাতে পারবে না, ধনী দেশগুলিকে তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।"

পৃথিবীতে আজ অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধ ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়েছে কম ও বেশি অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার হওয়ার জন্য। পুরোমাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার হচ্ছে না বলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জীবাণু সংক্রমণ বন্ধ হচ্ছে না, যার ফলে অ্যান্টিবায়োটিক-প্রতিরোধকারী জীবাণুগুলি বেঁচে যাচ্ছে, সংখ্যায় বাড়ছে এবং অন্যের দেহে ছড়িয়ে পড়ছে। অন্যদিকে ধনী দেশগুলিতে রোগীর চাহিদা মেটাতে মাত্রাতিরিক্ত ওষুধ প্রেসক্রিপশনে লিখতে হচ্ছে। তাছাড়া কৃষিকার্যে অত্যধিক অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার এই সমস্যা বাড়িয়ে দিচ্ছে। ডঃ উইলিয়মস বলেন যে, এই সমস্যার সমাধানে এবিষয়ে কড়া নজর রাখা প্রয়োজন। সেইসঙ্গে দরকার জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও তাদের শিক্ষা দেওয়া, চিকিৎসকদের এবিষয়ে শিক্ষা দেওয়া এবং তাড়াতাড়ি রোগনির্ণয় করে প্রথমেই এমন ওষুধ দিতে হবে, যাতে সব রোগজীবাণু ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় কোন জীবাণু প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করতে না পারে। এছাড়া ওষুধ প্রস্তুতকারক কারখানাগুলিকেও উৎসাহ দিতে হবে, যাতে তারা নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার করে। **[British Medical Journal, 17 June 2000, p. 1624]** ❑

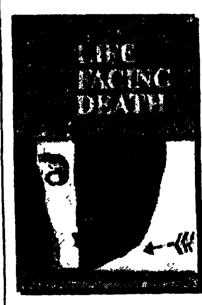
জীবাণু-যুদ্ধের সম্ভাবনা

১৯৯৩ সালে ম্যানহ্যাটানের 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার-এ, ১৯৯৫ সালে ওকলাহোমা শহরের 'ফেডারেল বিল্ডিং'-এ এবং ঐবছরই টোকিও পাতালরেলে যে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ হয়েছিল, তাতে আমেরিকা সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ভয় পাচ্ছে। এখনো পর্যন্ত আমেরিকার ওপর জীবাণু দ্বারা আক্রমণ করা হয়নি, কিন্তু অনেকেই মনে করে, যেকোন সময় এমন হওয়া সম্ভব। সম্প্রতি 'ইনস্টিটিউট অফ মেডিসিন' এবং 'ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস' জনসাধারণের ওপর রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু-আক্রমণ সম্বন্ধে গবেষণা করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত করেছেন। **[British Medical Journal, 8 January 2000, p. 71]** ❑

ভাষান্তর ঃ জলধিকুমার সরকার

জীবন-মৃত্যুর গোধূলিতে ঈশ্বরানুভব

অমলেন্দু চক্রবর্তী



Life Facing Death
Bankim Chandra Sen
Published by :
Tarun Sen
7/D, Ramkrishna Lane
Kolkata-700 003
Pages : 256+10+12
Price : Rs. 70.00

ভারতের অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাসে মৃত্যু হলো একপ্রকার জীবনজিজ্ঞাসা, আত্মানুসন্ধানের এক জীবন্ত দলিল। শীতের অবসানে আড়ষ্ট দেহের আচ্ছাদন ফেলে দিয়ে মুক্ত মলয়ের লীলাকে আস্বাদনের মতোই অমৃতময় সেই অনুভূতি। আমাদের হৃদয়ে সেবা ও ভক্তির সর্বাঙ্গীণ উন্মেষে এই বুদ্ধির যখন নির্বাণ ঘটে, তখনি জীবনের মূলীভূত নিত্য-সত্য প্রাচুর্যের মধ্যে পরিস্ফুট হয়। তখনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে ইচ্ছা হয়—

"তখনই বুঝিতে পারি,
আছি আমি, একান্তই আছি।
মহাকাল-দেবতার অন্তরের
অতি কাছাকাছি মহেন্দ্র-মন্দিরে।
জাগ্রত জীবন-লক্ষ্মী পরায় বিজয়মাল্যখানি
উন্নমিত শিরে।"

ঈশ্বরের বিধানে আকস্মিকতা বলে কিছু নেই। তিনি স্বপ্রকাশ এবং পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ। কিন্তু মৃত্যু আমাদের অনেকের কাছেই আকস্মিক এক বিপর্যয় বলে মনে হয় এবং সে-সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টিতে আঁধার ছাড়া আর কিছু ধরা পড়ে না। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু ঠিক ততটা আকস্মিকভাবে আসে না। মনের গভীর স্তরে যে আলোকের উন্মেষ হয়, তা মনের দৃষ্টিপথে পড়ে না। দেহের বিচার নিয়ে মন বেশি ব্যস্ত থাকে বলে সে মৃত্যুকে আকস্মিক বলে মনে করে। কিন্তু মৃত্যু যখন ঈশ্বরেরই বিধান, তখন মৃত্যুর হাতছানিতে প্রেমেরই সাড়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু এক অনন্ত জীবনরসেরই আস্বাদন, তাঁর প্রেম নিত্য মৃত্যুর ভিতর দিয়ে এই মর্ত্যজগতেও আমাদের অনন্ত জীবনের সম্ভাবনায় সঞ্জীবিত রাখে। অনিত্য এই পার্থিব পরিবেষ্টনের মধ্যে নিত্যসত্যস্বরূপ ভগবৎ-প্রেমের এই স্পর্শ আমরা যে পাই না তা নয়, কিন্তু তার সাড়া কতকটা খাপছাড়াভাবেই আমাদের মনকে নাড়া দেয়। কালের অমোঘ গতির মধ্য দিয়ে ভগবানের এই যে লীলা, তা একদিক থেকে যেমন অতি সূক্ষ্ম, অব্যক্ত এবং গুপ্ত, তেমনি অন্যদিকে তা নিত্য, ব্যক্ত এবং দীপ্ত। ভাগবতে আমরা দেখতে পাই, রূপময়, গুণময়, লীলাময় যে ভগবান—সেই ভগবানই আমাদের সত্যকার আশ্রয়। তিনিই আমাদের সাধ্য এবং সাধন-তত্ত্ব। তাঁরই স্মরণে কালের আবরণ অপসারিত হয় এবং অমৃতত্ব আমাদের জীবনকে মহিমান্বিত করে তোলে। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মৃত্যুকে অতিক্রম করতে এই সাধনারই উপদেশ দিয়েছেন।

১৯৬৯ সালে ভক্তপ্রবর বঙ্কিমচন্দ্র সেন 'জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে' শীর্ষক একটি পুস্তক প্রকাশ করে সমসাময়িক ভক্তসমাজে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। পেশায় সাংবাদিক হলেও শ্রীসেন তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য শুধু বেদ-উপনিষদ্-ভাগবত ও গীতার চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, অধ্যাত্মবিদ্যার সকল রত্নভাণ্ডারকে তিনি তাঁর ওজস্বী ভাষায় ভক্তসমাজের কাছে ব্যক্ত করেছেন। আমাদের বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থ **'Life Facing Death'** ইতিপূর্বে বাঙলায় লেখা 'জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে' গ্রন্থটির ইংরেজী সংস্করণ। মূল বাঙলা গ্রন্থটির সবকটি অধ্যায়ই আলোচ্য গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

বাংলা তথা ভারতের সাধনজগতে বঙ্কিমচন্দ্র সেন সর্বজনপরিচিত। প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাহিত্যিক খগেন্দ্রনাথ মিত্রের মতে, শ্রীসেন এমন একজন ভক্ত যিনি তাঁর রচনাশৈলীর মাধ্যমে সমসাময়িক সকল শ্রদ্ধাবান ব্যক্তির হৃদয়াসনে এক স্থায়ী আসন করে নিয়েছিলেন। **'Life Facing Death'** গ্রন্থটি একপ্রকার আত্ম-আবিষ্কার। সরল ভাবোচ্ছ্বাসে বঙ্কিমচন্দ্র এক অমূল্য উপলব্ধির চিত্র এঁকেছেন সহজ ও সরল স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে—এক মনোজ্ঞ শিল্পীর তুলিতে। মহৎ উপলব্ধি ব্যতীত ভাগবতী ভাষায় রচনা রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না। গ্রন্থটির প্রতিটি অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই অমৃতলাভের সার্থকতার বাণী—নানা বৈদিক ও ঔপনিষদিক সত্যের অম্লান আভা, যার আলোকচ্ছটায় দূরীভূত হয় আমাদের মন ও প্রাণের প্রতিদিনের গ্লানি ও তুচ্ছতা।

পথ-দুর্ঘটনায় আহত শ্রীসেনের জীবনে ঘটে এমন এক অলৌকিক অভিজ্ঞতা, যার ফলে তিনি এক অপূর্ব জ্যোতির্ময় পুরুষের সান্নিধ্যলাভ করেন। বিদ্যুতের এক চমকে তিনি অনুভব করেন ভগবৎপ্রেমের এক অপরূপ মাধুর্য। সত্যের সঙ্গে এইভাবে সাক্ষাৎ সংযোগ ঘটলে সাধক সর্বদর্শী হয়ে থাকেন। তিনি সর্বাত্ম ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে কৃতার্থতা লাভ করেন। এটিই প্রকৃত বিদ্যা—"সা বিদ্যা পরমামুক্তের্হেতুর্ভূতা

সনাতনী।" ভাগবতে আমরা দেখতে পাই, মন্ত্রার্থের সঙ্গে মনের সংযোগ-সাধনাত্মিকা এই যে লীলাময়ী শক্তি—শ্রীভগবানের আত্মমায়ার আশ্রয় ব্যতীত মন তাঁর সম্পর্কে অগ্রসর হতে পারে না। আত্মমায়াই অনুভবকে জাগ্রত করে মন্ত্রার্থকে প্রত্যক্ষ প্রভাবে উদ্দীপ্ত করে তোলে। আচার্য শঙ্কর তাঁর গীতাভাষ্যে এই সত্যই স্বীকার করে বলেছেন ঃ ভগবান নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত-স্বভাব হয়েও নিজ মায়ার আশ্রয়ে তিনি যেন দেহধারণ করেন এবং ভক্তদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে থাকেন।

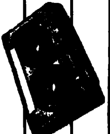
প্রকৃতপক্ষে বচন ও আচরণ—এই দুই-ই অবিচ্ছেদ্য-ভাবে লীলারসে বিধৃত থাকে। শ্রীসেনের মতে, লীলাকে অবলম্বন না করলে অধ্যাত্মসাধনার পথে রসের সঞ্চার হয় না। আবার লীলা শুধু মস্তিষ্কের বিষয় নয়, হৃদয়ে উপলব্ধি করার বস্তু। হৃদয়ের আলোকে মস্তিষ্ক যদি উজ্জ্বল না হয়, ভগবানের সম্বন্ধসূত্রে জীবনে প্রকৃত আনন্দ লাভ করার সব উপযোগই নষ্ট হয়ে যায়। মানুষের এই অধিকার আছে বলেই মানুষের মর্যাদা এত বেশি; কারণ মানুষ অমৃতের পুত্র। ভারতের সব অধ্যাত্মসাধনা তাই শ্রুতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

'Do I get frightened by the woes of Life'—এই অধ্যায়ে শ্রীসেন যে ধ্রুবসত্যটিকে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, তার মর্মার্থ হলো ঃ দুঃখ এবং মৃত্যু আমাদের জীবনে দুটি পরম সত্য। সিদ্ধান্তটি শুনতে পরস্পরবিরোধী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি বিরোধী নয়। সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা দুঃখকে সুখের এবং মৃত্যুকে অমৃতত্বের প্রতিকূল বলে মনে করি, কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। উপলব্ধি ব্যাপারটা হৃদয়ের। আমরা হৃদয় দিয়ে দুঃখকে গ্রহণ করতে পারি না বলেই দুঃখ বা মৃত্যুর স্বরূপজ্ঞানও আমাদের লাভ হয় না। উপনিষদে বলা হয়েছে, দুঃখের স্বরূপ উপলব্ধির ভিতর দিয়েই হৃদয়ে ভাবাত্মিকা এই শক্তির বলিষ্ঠ প্রাণরস—অমৃতত্ব বিধৃত রয়েছে। তাই স্বরূপত দুঃখই অমৃতত্বলাভের পথ এবং এই রসের সঞ্চারিধর্মে দুঃখ স্বরূপত সঞ্জীব।

শ্রীসেন পুস্তকটির চতুর্দশ অধ্যায়ে (Principles of Movement beyond Death) ঈশ উপনিষদের একটি অমৃতময় উপদেশের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। উপদেশটি হলো ঃ যে আত্মাকে জানে না, সে আঁধারলোকে প্রবেশ করে। এই বচনটিকে সূত্রস্বরূপ অবলম্বন করে অধ্যাত্মসাধনার অন্তর্নিহিত গূঢ়তত্ত্ব শাস্ত্রে বহুভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সত্যের সন্নিকর্ষ, অর্থাৎ তার প্রজ্ঞানময় স্পর্শে চিত্তবৃত্তির পরিস্ফূর্তিতে অনাহত এবং অব্যবহিত যে একান্ত লাভ, তাই আলো এবং তা থেকে দূরত্বই অন্ধকার। ভগবৎকথা প্রসঙ্গে শ্রীসেন যথার্থই বলেছেন ঃ গুরুকৃপার পরম বীর্য হৃদয়ে সঞ্চারিত হলে ভগবৎ-মাধুর্যের অগ্নিময় চাতুর্য সেখানে মেলতে শুরু করে। অধিদৈবত যিনি, তিনি পরমদৈবত লীলায় মূর্ত হয়ে ওঠেন। ফলে মরণের কোন অনুভূতিই জীবের আর থাকে না। বহ্নিময় পরিমণ্ডলে মৃত্যু শ্রীভগবানের ধ্যান-মঙ্গল মূর্তি হয়ে ওঠে।

সত্যই যেন ভক্তির ভাগীরথী বঙ্কিমচন্দ্র সেন। গুরুই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবৎ-মাধুর্যের উদ্দীপক। পথ আত্মসমর্পণ—করুণাঘন শ্রীগুরুর অনন্য-শরণ। শ্রীসেন তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থটিতে আমাদের এই আলোকিত ইশারা দিয়েছেন। সেই আলোকেই আমরা দেখতে পাই সদ্গুরুর স্বরূপসত্তা আর আবির্ভাব-তাৎপর্য। ভক্তের বিনাশ নেই—এটি স্বয়ং ভগবানেরই শ্রীমুখের উক্তি। একটু আগ্রহ থাকলেই ভক্তসঙ্গ লাভ করা যায়। ভক্তসঙ্গ দুর্লভ হলেও একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়। জগৎকে বাঁচাতে হলে একমাত্র ধন্বন্তরী—ভক্ত। পুস্তকটি এককথায় ভক্তের 'স্তবকবচমালা'। সুধী ও ভক্ত পাঠকদের কাছে **'Life Facing Death'** গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করি।❑

ক্যাসেট সমালোচনা



জে. এম. ডি. সাউণ্ড-এর বাঙলা ভক্তিগীতির ভাণ্ডারে নবতম সংযোজন 'পুষ্পাঞ্জলী'র দ্বিতীয় খণ্ড। দুটি পিঠ মিলিয়ে মোট নয়টি গান রয়েছে। সাইড 'এ'-তে রয়েছে—'কি কব মনের কথা', 'ঐ বাজে বাঁশরী', 'শোন গো ললিতা', 'কে এল কুঞ্জদ্বারে' ও 'দোলে রাধেশ্যাম দোলে'। সাইড 'বি'-তে রয়েছে—'শোন গিরি তোমায় বলি', 'কোথা গেল মোরে', 'শ্যাম তুমি আর বাঁশী' এবং 'ওগো লীলাময় তোমার' (যদিও ক্যাসেটের ওপর ছাপা হয়েছে 'তোমাব')। গানগুলির রচয়িতা আকাশবাণী কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত গীতিকার অনুপমা দে এবং গেয়েছেন বাঙলা রাগাশ্রয়ী, পুরাতনী ও ভক্তিগীতির প্রবাদপ্রতীম শিল্পী রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। সুরগুলি প্রধানত রাগাশ্রয়ী এবং প্রচলিত আগমনী, কীর্তন এবং ভক্তিগীতির দ্বারা প্রভাবিত। গায়কের দক্ষতা প্রশ্নাতীত, কিন্তু বার্ধক্যের কঠিন শাসন গানগুলির ওপর কিছুটা প্রভাব ফেলেছে। কোথাও কোথাও সেইহেতুই উচ্চারণের কিছুটা অস্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। তবু এবয়সেও রামকুমারবাবু যে এখনো সজীব, তা গানগুলিই প্রমাণ করে।

আবহসঙ্গীত আরো চিন্তা করে সংযোজন করা উচিত ছিল, কেননা বেহালা ও সেতারের মিলিত অনুসরণ একটু খাপছাড়া লেগেছে। সাইড 'এ'-র শেষ গানটির আবহে অকারণে কিছুটা অতি আধুনিক আবহ সংযোজিত হয়েছে। সম্পাদনার নজর এড়িয়ে ঐ পিঠেরই 'কে এল কুঞ্জদ্বারে' গানদুটির শেষে একটু ছন্দপতন ঘটিয়ে দ্রুত শেষ করা হয়েছে।

মোটের ওপর বৈঠকী ঢঙে গানগুলি শ্রোতার ভালই লাগবে। রচনা ও গায়কীর গুণে দু-তিনটি গান সহজেই মনে প্রভাব ফেলবে, বিশেষত সাইড 'বি'-র শেষ গানটি। তবে ভক্ত আরেকটু ভক্তিভাব চাইবেন বলেই ধারণা।❑

—কৌশিক মুখোপাধ্যায়

উৎসব-অনুষ্ঠান

গুয়াহাটী আশ্রম (অসম) *স্বামীজীর অসমে পদার্পণের* শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে অসমের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। গত ১১ আগস্ট ২০০১ একটি বিরাট জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সভায় সভাপতিত্ব করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ। এদিন তিনি অসমিয়া ভাষায় অনূদিত 'সবার স্বামীজী' পুস্তিকাটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন।

এলাহাবাদ আশ্রম (উত্তরপ্রদেশ) গত ১২ আগস্ট ২০০১ এলাহাবাদ স্টেশন-চত্বরে একটি বুকস্টল স্থাপন করেছে।

গত ২২ আগস্ট ২০০১ **জম্মু আশ্রমের (জম্মু ও কাশ্মীর)** একটি কার্যালয় বিভাগ ও গ্রন্থকেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত জনসভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন এবং ভাষণ দেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ ফারুক আবদুল্লা।

গত ২২ আগস্ট ২০০১ **পুরুলিয়া বিদ্যাপীঠের (পশ্চিমবঙ্গ)** উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন এবং এই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।

সালেম আশ্রম (তামিলনাড়ু) গত ২৭ আগস্ট ২০০১ বস্তিবাসীদের জন্য পুদর কল্লাম কুতুর বস্তিতে একটি 'ফ্রি কোচিং সেণ্টার' চালু করে।

ছাত্রকৃতিত্ব

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ পরিচালিত ২০০১ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় **নরেন্দ্রপুর আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ)** দুটি ছাত্র ৮ম ও ১৯তম স্থান অধিকার করেছে।

উত্তরপ্রদেশ উচ্চ শিক্ষা পর্ষৎ পরিচালিত ২০০১ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় **কানপুর আশ্রম বিদ্যালয়ের (উত্তরপ্রদেশ)** একজন ছাত্র ১৭তম স্থান অধিকার করেছে।

গত ২৪ আগস্ট ২০০১ ইটানগরে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক বিজ্ঞান সেমিনারে **আলং আশ্রম বিদ্যালয়ের (অরুণাচল প্রদেশ)** একজন ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

সেবাব্রত

নাগপুর মঠ (মহারাষ্ট্র) নাগপুরের নিকটবর্তী ভিহিরগাঁও-এর ১০০ দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ইউনিফর্ম বিতরণ করেছে।

চিকিৎসা-শিবির

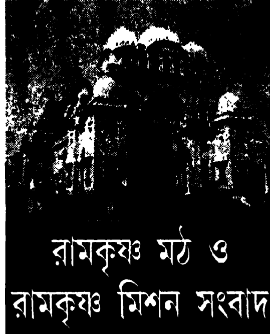
আলসূর আশ্রম (কর্ণাটক) গত ১৫ আগস্ট ২০০১ হাড়ে অজৈব প্রাকৃতিক পদার্থের ঘনত্ব পরীক্ষা করার জন্য একটি দাতব্য শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ১১০ জন রোগী যোগদান করেন। উল্লেখ্য, গত ১৮-২৮ আগস্ট আশ্রম পরিচালিত চক্ষুচিকিৎসা-শিবিরে ২২৪ জনের চোখ পরীক্ষার *পর ৭১ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়।*

লিমডি আশ্রম (গুজরাট) গত ১৬ আগস্ট ২০০১ একটি চক্ষুচিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ১১৯ জনের চোখ চিকিৎসা করে ১৮ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়।

আগরতলা আশ্রম (ত্রিপুরা) গত ১৬-১৮ আগস্ট ২০০১ একটি চক্ষুচিকিৎসা শিবির পরিচালনা করে। এতে ১১৬ জনের চোখ চিকিৎসা করে ৩২ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়।

ওড়িশা বন্যাত্রাণ

পুরী মঠ সদর, গোপ, ব্রহ্মগিরি ও কাকদপুর ব্লকের ৮৬টি গ্রামের বন্যাকবলিত মানুষের মধ্যে ৩৭,২৯৫ কিলোঃ চিঁড়া, ১০৯ কিলোঃ গুড়, ১,৫১৫ কিলোঃ চিনি, ১৯,০৫০ কিলোঃ চাল, ৩,৭০০ কিলোঃ ডাল, ১৩,৯১৮ কিলোঃ সবজি ইত্যাদি বিতরণ করেছে। এছাড়া ৩,২২৫ জনকে চিকিৎসা-ত্রাণ দেওয়া হয়েছে।



পুরী মিশন পুরী সদর ও গোপ ব্লকের ৪৭টি গ্রামের বন্যাগ্রস্ত মানুষের মধ্যে ৩,০৮০ কিলোঃ চিঁড়া, ৪০০ কিলোঃ চিনি, ১৭,৪৫০ কিলোঃ চাল, ৩,৩৮০ কিলোঃ ডাল, ১২,৬৫৩ কিলোঃ সবজি প্রভৃতি বিতরণ করেছে এবং ১,৭৬০ জনের চিকিৎসা-ত্রাণ দিয়েছে।

ভুবনেশ্বর মঠ কান্তপদ, রসুলপুর, বাদাচানা, ডাঙারি ও বারি ব্লকের ২৩টি গ্রামের বন্যাবিধ্বস্ত মানুষের মধ্যে ১২,২৫০ কিলোঃ চিঁড়া, ১,০৭৫ কিলোঃ চিনি, ৭,৬০০ কিলোঃ ডাল, ৮০ কিলোঃ সবজি ইত্যাদি বিতরণ করেছে।

বেলুড় মঠের মাধ্যমে বাদাচানা ব্লকের ৫টি গ্রামের বন্যাকবলিত মানুষের মধ্যে ৩,৭৫০ কিলোঃ চিঁড়া, ৪০০ কিলোঃ চিনি, ২,৪০০ কিলোঃ চাল, ২,৪০০ কিলোঃ ডাল, ২১,২৪০ কিলোঃ সবজি বিতরিত হয়েছে।

গুজরাট পুনর্বাসন

গুজরাটে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য **পোরবন্দর আশ্রম** আদবানা গ্রামে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করে দিয়েছে। গত ১১ আগস্ট ২০০১ বিদ্যালয়টির উদ্বোধন করেন গুজরাট সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হরেন পাণ্ড্য। ভাগবাদর ও ভারওয়াড়া গ্রামে এই আশ্রমের মাধ্যমে যে-দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মিত হয়েছে, গত ১৯ আগস্ট ২০০১ সে-দুটির উদ্বোধন করেন যথাক্রমে গুজরাটের পশুপালনমন্ত্রী কিরিতসিং রাণা এবং শিক্ষামন্ত্রী আনন্দিবেন প্যাটেল।

এছাড়া **বেলুড় মঠ** পরিচালিত ধানেতি ও সুরেন্দ্রনগর শিবির এবং **লিমডি ও পোরবন্দর আশ্রমের** মাধ্যমে ২০টি বাড়ি ও ৫টি বিদ্যালয়ের নির্মাণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ২৩০টি বাড়ি ও ২০টি বিদ্যালয়ের কাজ এগিয়ে চলেছে।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

আবির্ভাব-তিথি পালন : গত ১২ ও ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০১ যথাক্রমে শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজ এবং শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি পালন করা হয়। গত ১২ সেপ্টেম্বর স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজের জীবনী পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী সনকানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

উত্তরাঞ্চল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি : গত ২৬-২৭ মে ২০০১ **গঙ্গারামপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘে (দক্ষিণ দিনাজপুর)** বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, বেদ, 'গীতা' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, প্রশ্নোত্তরপর্ব এবং আলোচনাসভার মাধ্যমে পরিষদের ১৯তম ষাণ্মাসিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী মঙ্গলানন্দজী, স্বামী ঋতানন্দজী, পূর্ণিয়া আশ্রমের স্বামী বিজয়ানন্দজী প্রমুখ। সম্মেলনে ৩৮টি আশ্রম থেকে ৪৪ জন প্রতিনিধি ভিন্ন বহু ভক্তও উপস্থিত ছিলেন।

ত্রিপুরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ : গত ২-৪ জুন ২০০১ **খোয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে (ত্রিপুরা)** নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিষদের ১৯তম বার্ষিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। নগর-পরিক্রমা, বিশেষ পূজা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, রক্তদান শিবির ও সান্ধ্য ধর্মসভা ছিল সম্মেলনের বিভিন্ন অঙ্গ। আলোচনা করেন স্বামী দিব্যানন্দজী ও স্বামী অজরানন্দজী। সম্মেলনে ত্রিপুরার ৩২টি আশ্রম থেকে ১৮০ জন প্রতিনিধি এবং প্রায় ৩০০ ভক্ত যোগদান করেন।

নারায়ণপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা আশ্রম, উত্তর চব্বিশ পরগনা : গত ৩ জুন ২০০১ সানাইবাদন, শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, 'চণ্ডী' ও 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। 'চণ্ডী' পাঠ করেন বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন কমলপদ মণ্ডল। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী চেতসানন্দজী ও স্বামী পুরাতনানন্দজী। সভাপতিত্ব করেন নীলমণি পাহাড়। উৎসবে প্রায় ১০,০০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান। এই উপলক্ষ্যে ১০ জন দুঃস্থ মহিলাকে বস্ত্র প্রদান করা হয়।

রামপুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র, বীরভূম : গত ৫ জুন ২০০১ বিকালে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সভায় আলোচনা করেন শক্তিচরণ চট্টরাজ ও বিশ্বেশ্বর রায়। স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কনকলতা মণ্ডল ও অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়। আলোচনাশেষে ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয়।

নন্দীগ্রাম হলদিয়া ঝাঁসীরানী মহিলা মণ্ডল, মেদিনীপুর : গত ৫ জুন ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় এক বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বেদপাঠ, সঙ্গীত, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের বিষয়। সম্মেলনে আলোচনা করেন স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দজী, শ্রীকান্ত মিদ্যা, সবিতা পাত্র প্রমুখ।

শিবপুর সারদা সেবাসঙ্ঘ, হাওড়া : গত ৬ জুন ২০০১ প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, স্তব ও 'চণ্ডী' পাঠ এবং ধর্মসভার মাধ্যমে সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাদিবস পালিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী পুরাণানন্দজী। অনুষ্ঠানে প্রায় ৯০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

রতনপুর দেশপ্রাণ সঙ্ঘশ্রী পাঠাগার, মেদিনীপুর : গত ৬ জুন ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বেদপাঠ, সঙ্গীত, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের অনুষ্ঠিত বিষয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দজী, শ্রীকান্ত মিদ্যা, দেবাশিস মিদ্যা, কল্যাণী মাইতি প্রমুখ।

বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, দক্ষিণ দিনাজপুর : গত ৬ ও ৭ জুন ২০০১ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, গীতিনাট্য, 'কথামৃত' পাঠ ও ধর্মসভার মাধ্যমে আশ্রমের বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। 'কথামৃত' পাঠে মোহিনীমোহন রায় এবং 'ভাগবত' পাঠে স্বামী বাগীশানন্দ পুরী অংশগ্রহণ করেন। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী বাগীশানন্দ পুরী ও প্রশান্তকুমার সিন্‌হা। দুপুরে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

উত্তর কলকাতা বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল, কলকাতা-৭০০০০৩ : গত ৮-১০ জুন ২০০১ তিনদিন ধরে ক্যানিং ডেভিড সেশান উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রায় ৩০০ যুবক নিয়ে একটি যুবশিক্ষণ শিবির পরিচালিত হয়। বেদপাঠ, সঙ্গীত, মনঃসংযম, চরিত্রগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারিক পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা প্রভৃতি ছিল শিবিরের অনুষ্ঠিত বিষয়। শিবিরে বিভিন্ন দিনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী বোধস্বরূপানন্দজী, বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, রাঞ্জিতকুমার ঘোষ, গৌরগোপাল সাহা প্রমুখ। **প্রসঙ্গত উল্লেখ্য,** গত ২৯ জুলাই ২০০১ স্বামীজীর ভাবাদর্শে একটি সারাদিনব্যাপী আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী বিধানানন্দজী, নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ কমল নন্দী, সোমনাথ বাগচী প্রমুখ। ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক-সহ মোট ২০২ জন সভায় যোগদান করেন।

মূলাজোড় রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (পাঠচক্র), উত্তর চব্বিশ পরগনা : গত ১০ জুন ২০০১ পাঠ, আলোচনা, প্রশ্নোত্তরপর্ব, ভক্তিগীতি প্রভৃতির মাধ্যমে একটি ভক্তসম্মেলন আয়োজিত হয়। 'কথামৃত' এবং 'মায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা করেন যথাক্রমে স্বামী মুক্তিকামানন্দজী ও স্বামী রমানন্দজী। এঁরা দুজন

ভিন্ন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী নিত্যরূপানন্দজী, স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী, স্বামী অম্বিকেশানন্দজী ও স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী। সম্মেলনে ২১০ জন ভক্ত যোগদান করেন।

কন্টাই পালপাড়া সারদাদেবী মহিলা মণ্ডল, মেদিনীপুর : গত ১০ জুন ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সঙ্গীত, আলোচনাসভা ছিল সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দজী, প্রশান্ত প্রধান, নমিতা মাইতি, সবিতা পাত্র প্রমুখ। সম্মেলনশেষে প্রত্যেক যুবপ্রতিনিধিকে একটি করে 'সবার স্বামীজী' পুস্তিকা প্রদান করা হয়।

হুগলী জেলা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ : গত ১০ জুন ২০০১ পরিষদের একটি ষাণ্মাসিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয় **খানপুর বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘে।** আলোচনা-সভায় ভাষণ দেন স্বামী অমেয়ানন্দজী ও স্বামী জ্ঞানব্রতানন্দজী এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী দেবদেবানন্দজী। ৩০টি আশ্রম থেকে ১০০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন।

কাটোয়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র, বর্ধমান : গত ১ জুলাই ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় স্থানীয় 'রবীন্দ্র পরিষদ হল'-এ একটি যুব-সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ, আবৃত্তি, প্রশ্নোত্তরপর্ব, ক্যুইজ ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের বিষয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী, স্বামী পরেশাত্মানন্দজী ও অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গৌতমচন্দ্র দাস। সম্মেলনে প্রায় ৩৫০ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

তিনসুকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, অসম : গত ৫ জুলাই ২০০১ বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, জপ-ধ্যান, 'গীতা' পাঠ ও আলোচনাসভার মাধ্যমে গুরুপূর্ণিমা তিথি পালিত হয়। সভায় আলোচনা করেন স্বামী ঈশাত্মানন্দজী। অনুষ্ঠানে প্রায় ১,০০০ ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

রায়পাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা ভ্রাতৃসঙ্ঘ, কৃষ্ণনগর, নদীয়া : গত ৫ জুলাই ২০০১ পূজা, ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' পাঠ, কীর্তন ও ধর্মসভার মাধ্যমে সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দেন পথক্লান্ত বাগচী, নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। উৎসবে প্রায় ১৫০ জন ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

কোন্নগর হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, হুগলী : গত ৫ জুলাই ২০০১ পূজা, 'ভাগবত' পাঠ, সঙ্কীর্তন ও আলোচনার মাধ্যমে হরিসভাতে শ্রীরামকৃষ্ণের শুভাগমন স্মরণে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজের আশীর্বাণী পাঠ করা হয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী পরিপূর্ণানন্দজী ও অজয় মুখোপাধ্যায়।

কৃষ্ণনগর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র, নদীয়া : গত ৫ জুলাই ২০০১ গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে পূজা, বেদ, 'গীতা', উপনিষদ্, 'ভাগবত', রামচরিতমানস পাঠ ও আলোচনা এবং কালীকীর্তন পরিবেশিত হয়। পাঠ ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী কৌশিকানন্দজী, স্বামী ব্রজেশানন্দজী ও দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী।

সাঁকরাইল সেন্ট্রাল শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ, হাওড়া : গত ৫ জুলাই ২০০১ গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সভায় আলোচনা করেন নারায়ণ দেবনাথ ও স্বপনকুমার পুরকাইত।

হলদিয়া টাউনশিপ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, মেদিনীপুর : গত ৮ জুলাই ২০০১ একটি ভক্তসম্মেলন আয়োজিত হয় ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট অডিটোরিয়াম-এ। আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরপর্ব ছিল সম্মেলনের প্রধান বিষয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী সগুণানন্দজী, স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী শ্যামানন্দজী, অধ্যাপক ডঃ তাপস বসু প্রমুখ। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কমলকৃষ্ণ দত্ত ও দেবপ্রসাদ মণ্ডল। সম্মেলনে প্রায় ৪০০ ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

পাঁশকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, মেদিনীপুর : গত ৮ জুলাই ২০০১ আয়োজিত ভক্তসম্মেলনের বিষয় ছিল বেদ, 'গীতা', 'কথামৃত' পাঠ, ভক্তিগীতি, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও আলোচনাসভা। 'গীতা' পাঠ করেন জগত্তারণ আচার্য এবং 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী, সুখেন্দুশেখর জানা ও অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র মাইতি। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রণয়কুমার দাশ ও অধ্যাপক অমিয়কুমার জানা। সম্মেলনে প্রায় ৫০০ ভক্ত যোগদান করেন। উল্লেখ্য, গত ১৪ জুলাই সেবাশ্রম পরিচালিত একটি চক্ষুচিকিৎসা শিবিরে ১০০ জনের চোখ পরীক্ষা করে ৬৭ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়।

ক্ষীরপাই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিলন মন্দির, মেদিনীপুর : গত ৮ জুলাই ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে আলোচনা করেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী, স্বামী গুড়াকেশানন্দজী, স্বামী বিষ্ণুরূপানন্দজী, অধ্যাপক কমল মান্না প্রমুখ। প্রশ্নোত্তরপর্ব পরিচালনা করেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন পঙ্কজ চক্রবর্তী ও বিনয়কৃষ্ণ কুলভী। সম্মেলনে প্রায় ১,০০০ ছাত্রছাত্রী যোগদান করেছিল।

হাফলং শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, অসম : গত ১৯-২২ জুলাই ২০০১ পাঠ ও ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন স্বামী গোকুলানন্দজী। শেষদিনে ভক্তসম্মেলনে ভক্তিগীতি, 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা ছাড়া 'বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ করেন বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী এবং 'মায়ের কথা' থেকে পাঠ করেন গীতা নাহা। আলোচনা করেন প্রশান্তসাধন চৌধুরী, কুম্ভকুমার হোজাই প্রমুখ এবং পৌরোহিত্য করেন স্বামী গোকুলানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ

দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুরেশচন্দ্র পাল ও শচীন্দ্রকুমার দেব। সম্মেলনে প্রায় ৬০০ ভক্ত বসে প্রসাদ পান।

কোন্নগর শ্রীরামকৃষ্ণ মনন সভা, হুগলী : গত ২১ ও ২৮ জুলাই ২০০১ দুটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে ভাষণ দেন যথাক্রমে স্বামী ধৃতাত্মানন্দজী ও স্বামী অচ্যুতানন্দজী। দুটি অনুষ্ঠানেই প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, হুগলী : গত ২৫ জুলাই ২০০১ ভক্তিগীতি, পাঠ, বিশেষ পূজা ও ধর্মসভার মাধ্যমে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। 'কথামৃত' পাঠ করেন শিখরেন্দু ভট্টাচার্য। ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী গৌরীনাথানন্দজী, কেষ্ট মুখোপাধ্যায়, ডাঃ রত্না দে প্রমুখ। সভায় স্বাগত-ভাষণ দেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যথাক্রমে স্বপন মুখোপাধ্যায় ও অজয় দাশ।

উত্তর চব্বিশ পরগনা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ : গত ২৮-২৯ জুলাই ২০০১ পরিষদের ৮ম বার্ষিক সম্মেলন আয়োজিত হয় **হাবড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমে (উত্তর চব্বিশ পরগনা)**। সম্মেলনে আলোচনা করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কোষাধ্যক্ষ ও পরিচালন পর্ষদের অন্যতম সদস্য স্বামী প্রমেয়ানন্দজী, স্বামী মুক্তিকামানন্দজী, স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী ও স্বামী ঋতানন্দজী। সম্মেলনে স্বাগত-ভাষণ দেন ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। ৩৪টি আশ্রম থেকে ৮৯ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন।

টালিগঞ্জ বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র, কলকাতা-৭০০০৩৩ : গত ২৮ ও ২৯ জুলাই ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত, পাঠ ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজে আয়োজিত সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী, স্বামী বোধসরানন্দজী, গৌতম দাস ও নাসিরুদ্দিন আহমেদ। পাঠ করেন সুব্রত ঘোষ। সম্মেলনে প্রায় ৪৫০ জন ছাত্রছাত্রী যোগদান করেছিল।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য বিরাটি-নিবাসী পরেশচন্দ্র দত্ত গত ১৪ মার্চ ২০০১ প্রয়াণ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য পূর্ণশশী বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৩ মার্চ ২০০১ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি ছিলেন সত্যনিষ্ঠ ও অকপট।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য সত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী গত ২৪ মার্চ ২০০১ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমের তিনি সহ-সভাপতি ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা অবিবাহিতা, শিক্ষয়িত্রী চিন্ময়ী তপাদার গত ১৪ এপ্রিল ২০০১ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বছর। উদারতা ও সরলতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা ব্রহ্মচারিণী কণিকা গত ২৫ এপ্রিল ২০০১ প্রয়াণ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য মাধবলাল চট্টোপাধ্যায় গত ১৬ মে ২০০১ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। তিনি আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের সহ-সভাপতি ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর দুটি চক্ষু মরণোত্তর দান করে গেছেন।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, সিঁথি-নিবাসী রাধারমণ রায়চৌধুরী গত ২৭ মে ২০০১ প্রয়াণ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর। তিনি সিঁথি বেণী পাল উদ্যান শ্রীরামকৃষ্ণ সমাজের সহ-সভাপতি এবং উদ্যানটি বেলুড় মঠকে দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য অকৃতদার শরচ্চন্দ্র দত্তচৌধুরী গত ২৯ মে ২০০১ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তিনি জয়রামবাটী শ্রীশ্রীমাতৃমন্দির ও কোয়ালপাড়া আশ্রমের একনিষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবী ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ডাঃ সত্যেন্দ্রকুমার নন্দী গত ১২ জুন ২০০১ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। সৎস্বভাব ও মধুর ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ ও শ্রীমায়ের একনিষ্ঠ সেবিকা যোগীন মায়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী বাগবাজার-নিবাসিনী শিপ্রারানী মিত্র ৬১ বছর বয়সে গত ১৮ জুন ২০০১ পরলোকগমন করেন।

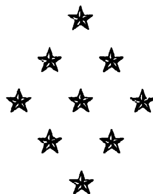
শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য নিরঞ্জনকুমার গোস্বামী গত ২১ জুন ২০০১ 'রামকৃষ্ণ' নাম উচ্চারণ করতে করতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। পরোপকারিতা ও মধুর ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা অধ্যাপিকা মীরা ঘোষ গত ২ জুলাই ২০০১, ৫৭ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি ও সহজ-সরল ব্যবহার ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য রঞ্জন সেনগুপ্ত গত ১৫ জুলাই ২০০১, ৮৬ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি কলকাতা শ্যামবাজারস্থিত সরস্বতী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। এছাড়া তিনি নবগ্রাম বিদ্যাপীঠ, হীরালাল পাল বালিকা বিদ্যালয়েরও সম্পাদক ছিলেন। তাঁর পিতামাতা উভয়েই শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং তিনিও শ্রীশ্রীমায়ের কোলে ওঠার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। ❑

No work is secular. All work is adoration and worship.

Swami Vivekananda



A
WELL
WISHER

Let us therefore take up a great ideal, and give up our whole life to it. Let this be our determination, and may He, the Lord, who "comes again and again for the salvation of His own people", to quote from our scriptures—may the great Krishna bless us, and lead us all to the fulfilment of our aims!

Swami Vivekananda

With Best Compliments from :

Shri D. K. Jha

C/o. M/s. D. K. Engineering & Construction

**M. G. Road, Jaigaon
Dist. Jalpaiguri
(West Bengal)**

**Phone :
(03566) 63063, (03566) 64104**

ভগবান যদিও সর্বত্র আছেন বটে কিন্তু তাঁকে আমরা জানতে পারি কেবল মানবচরিত্রের মধ্য দিয়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments from :

M/S. BHARAT ENGINEERING STORES

**36, Strand Road, 2nd Floor
Room No. 13/A, Kolkata-700 001**

Phone : 243-3576 • Fax : 91-33-2209309

Approved/Reg. Govt. Supplier of Indian Ordnance Factories, Reputed Supplier of All Types of Induction Coils, Lamination Cores, Autotransformers and various Elec. items.

With Best Compliments from :





M/s. JALAN DISTRIBUTORS

(Maruti Authorised Dealer)

**28/3A CONVENT ROAD
KOLKATA-700 014**

**PHONES : 244-8401
244-6635
244-5502**



উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

স্বামীজী বিষয়ক

যুগনায়ক বিবেকানন্দ ১৬৫.০০
স্বামী গম্ভীরানন্দ (তিন খণ্ডে)

স্বামী বিবেকানন্দ (দু-খণ্ডে)
প্রমথনাথ বসু ১৩০.০০

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ ৪০.০০
শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ ... ২৫০.০০
(নতুন তথ্যাবলী) (দু-খণ্ডে)
মেরী লুই বার্ক

স্মৃতির আলোয় স্বামীজী ... ৬০.০০
সম্পাদনা ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ক

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত ২৫.০০
রামচন্দ্র দত্ত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা ১৬.০০
অক্ষয়কুমার সেন

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শ ৪০.০০
স্বামী ভূতেশানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্ত্যলীলা .. ৭০.০০
স্বামী প্রভানন্দ (দু-খণ্ডে)

শ্রীরামকৃষ্ণের 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' ১৫.০০
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

শ্রীমা সারদাদেবী বিষয়ক

শ্রীমা সারদাদেবী ৮০.০০
স্বামী গম্ভীরানন্দ

জননী সারদাদেবী ৪০.০০
স্বামী অপূর্বানন্দ

মাতৃসান্নিধ্যে ২৫.০০
স্বামী ঈশানানন্দ

শ্রীশ্রীমা ও সপ্তসাধিকা ২০.০০
স্বামী তেজসানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে ... ১০০.০০
সম্পাদনা ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ (৩ খণ্ড)



বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ

সম্পাদনা ঃ
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

মূল্য ঃ ২০০.০০

'বিশ্বপথিক বিবেকানন্দ' গ্রন্থের দুই মলাটের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়েছেন ভারতপথিক ও বিশ্বপথিক-রূপে আবির্ভূত সেই প্রত্যাদিষ্ট জ্যোতির্ময় পুরুষ। উপস্থাপিত হয়েছে উভয় পর্বে তাঁর অসাধারণ সাধনা, কর্ম, সংগ্রাম এবং বিজয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতিবৃত্ত।

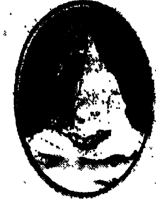


বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ

সম্পাদনা ঃ
স্বামী প্রমেয়ানন্দ
নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
স্বামী চৈতন্যানন্দ

মূল্য ঃ ২২৫.০০

এই গ্রন্থে 'ভাস্বর ভাবসাগর' শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অপূর্ব ভাবরাশির কিছু পরিচয় দিতে প্রয়াস করা হয়েছে। ঐতিহাসিক পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূল্যায়ন ঐতিহাসিক পটভূমিকায় করার ও তাঁর ভাবসমূহকে বিচার-বিশ্লেষণের নিকষে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে।



যুগজননী সারদা

সম্পাদনা ঃ
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

মূল্য ঃ ৫০.০০

পবিত্রতাস্বরূপিণী শ্রীশ্রীমায়ের কথা অনুধ্যান করলে আমাদের চিন্তা অন্তত অল্প সময়ের জন্যও অগণিত পার্থিব ব্যাপৃতি থেকে দূরে সরে যায়। তখন আমরা অনুভব করি, মানুষ কেবলমাত্র পৃথিবীর চিরাভ্যস্ত কাজ করেই যাবে না। ঊর্ধ্বতর লোকের কথাও তাদের ভাবতে হবে। এটাই জীবনের পরম সান্ত্বনা, পরম আশ্বাস।

ডাক মারফত বই ক্রয় করতে হলে সরাসরি "ম্যানেজার, উদ্বোধন অফিস, ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৩" —এই ঠিকানায় লিখুন।

ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল—সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?

স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments From :

AUTO REXINE AGENCY

House of Car Decoration

Specialist in Car-Air Conditioner

Office & Show Room :

31/A, Lenin Sarani, Kolkata-700 013

163, Lenin Sarani, Kolkata-700 013

Branch :

71A, Park Street, Kolkata-700 013

Phone : 244-1764/2184, 237-5435

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বাদশ সঙ্ঘগুরু

পরমপূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের জন্মশতবর্ষে শ্রদ্ধাঞ্জলি

* শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য ও ভক্তদের স্মৃতিচারণ (১০৮টি উপদেশ-সহ) — ৩০
* স্বামী ভূতেশানন্দ-মহাতীর্থ পরিক্রমা — ৬৫
* স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের পত্রাবলী প্রসঙ্গ (১ম ও ২য় খণ্ড) — ৪৫ ও ৩০
* ভক্তসঙ্গে ধর্মপ্রসঙ্গে স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ — (যন্ত্রস্থ)
* ভক্তসঙ্গে সহাস্য স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ — (যন্ত্রস্থ)
* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও আধুনিক বিজ্ঞান — ৩০
* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান — ৪০
* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও প্রার্থনা — ২০
* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সাহিত্যে প্রবাদ, প্রবচন ও দেববাণী প্রসঙ্গ (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) — ৩০ (প্রতিটি)
* শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী ও গীতাতত্ত্ব — ২০
* আমাদের নরেন—আমাদের সর্বস্ব — ৩০

প্রকাশক : শ্রীমতী পার্বতী চক্রবর্তী

রানীসায়র, উত্তরপাড়, বর্ধমান-৭১৩১০১, ফোন : ৯৫৩৪২-৫৬১৪৪৯

❋ প্রাপ্তিস্থান ❋

ডঃ অরুণকুমার চক্রবর্তী, এম. বি. বি. এস. (ক্যাল), এম. আর. সি. পি. (লণ্ডন)

রানীসায়র, উত্তরপাড়, বর্ধমান-৭১৩১০১, ফোন : ৯৫৩৪২-৫৬১৪৪৯

শ্রীদিলীপ পাল, ফোন : ৫৫৪-৫৯১৮

নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের ওপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

❋

হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

❋

মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে, তার বিকাশই ধর্ম।

স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments From :

UTILITY INDUSTRIES & CHEMICAL WORKS

19Y, Raja Manindra Road, Kolkata-700037

Phone : 556-5543/6459

&

ASIMCO

22, Amalangsu Sen Road, Kolkata-700048

Phone : 556-5351/5543

Manufacturers of Phenyle. I.S.I., Lysol. I.P., Soaps, Antiseptic Lotions & Purified Water. I.P.

Dealers in all sorts of Medicines, Pharmaceuticals & Laboratory Chemicals.

সেরা ফলন দেদার লাভ

লালন সুপার ফসফেট সার



প্রস্তুতকারক :

সারদা ফার্টিলাইজার্স লিঃ

২, ক্লাইভঘাট স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০ ০০১

ফোন নং
অফিস : ২২০-৫৪৩৫
রেসি. : ৩৩৭-৭৩৬৫
মোবাইল : ৯৮৩১০-১৯২৬৬

With Best Compliments From :

DOBSON DISTRIBUTORS

88, DR. ABANI DUTTA ROAD
HOWRAH-711 101
PHONE : 666-1722
TELEFAX : 666-9969

Stockist

**Serum Institute, Tablets India Ltd.,
Wallace Pharmaceuticals Ltd.,
Eli Lilly Ranbaxy, Pharmacia & Upjohn,
Orchid, Caplet,
Smith Kline Beecham (Vaccine),
Sunny Industries Pvt. Ltd.,
Midas Care, Arvind (S.K.K.L. Ltd.),
Neon Laboratories, Mayer,
Trio Pharma**

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের

শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ৪০.০০

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বঙ্গ নাট্য-সমাজের নেপথ্য কাহিনী। শ্রীরামকৃষ্ণ থিয়েটার দেখতে এসে বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেছিলেন। তারপর থেকে পেশাদারী মঞ্চের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাঁকে রঙ্গমঞ্চের গুরুর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁকে প্রণাম না করে আজও কোন শিল্পী কোন কাজ করেন না।

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের

শ্রীশ্রীমা ও ডাকাত বাবা ৩০.০০

তেলো-ভেলোর ভয়ঙ্কর মাঠে ডাকাত-দম্পতির সামনে ঘটেছিল শ্রীমা সারদাদেবীর চিন্ময়ী রূপের আত্মপ্রকাশ। তেলো-ভেলো শ্রীশ্রীমায়ের লীলাপ্রকটভূমি। তারই পূর্ণাঙ্গ বিবরণ। সঙ্গে সেই মহাতীর্থ দর্শনের পথনির্দেশ।

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিঃ
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের ও স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা উর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

With Best Compliments From :

DIAMOND METAL PRODUCTS

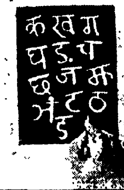
Mfg. All Types of
Aluminium Pilfer Proof Caps

APOLO ELECTRIC BULB PVT. LTD.
27B/H/13/1, Chaulpatty Road
Kolkata-700010
Tele. : (O) 350-3901/353-1445
Fax : 350-6297
Mfg. G.L.S. Lamps & Night Lamps



Everyday, Tata Tea helps bring fingers together.

The difference is either a fresh new day. Or a fresh new life.



Tata Tea runs 280 adult literacy centres. 160 child care centres. 26 Hospitals Schemes like Project Dare in the High Range of Munnar to take care of the educational needs of mentally handicapped children. Schools to educate workers' children. Wildlife protection foundations and sanctuaries. Yes, the name Tata Tea means more than a giant tea company. For thousands across the country it means life.

TATA TEA



ওরিয়েন্টের পুনঃপ্রকাশিত বই

- ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
  বাংলার বাউল ও বাউল গান ৮০০
- প্রমদারঞ্জন ঘোষ
  শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা ও জীবন-দর্শন ৮০
- রতনমণি চট্টোপাধ্যায়
  আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা ৮০

ওরিয়েন্টের প্রকাশিত বই

- ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
  রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ২৭৫
  রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা ১৬০
- ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
  ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস ৮০
  বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা ১০০
  (আদি ও মধ্যযুগ)
  বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা ৯০
  (আধুনিক যুগ)
  রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা, ১ম খণ্ড ১০০
  রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা, ২য় খণ্ড ২০০
- ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত
  সাহিত্যের স্বরূপ ১৫
  বাংলা সাহিত্যের একদিক ৬০
  বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি ৪০
- প্রমথনাথ বিশী
  রবীন্দ্র-নাট্য-প্রবাহ ১২৫
- ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল
  রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা ২০
- ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
  নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ২০
- অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী
  ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ৭৫
- সম্পাদনা ঃ ডঃ অরুণকুমার বসু
  মেঘনাদবধ কাব্য—
  মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১ম-৪র্থ সর্গ)
  একেই কি বলে সভ্যতা—
  মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৩০
- সম্পাদনা ঃ পবিত্র সরকার
  জনা ৪০
- সম্পাদনা ঃ প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
  পালামৌ—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৩০
  চরিতকথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৩৫
- ডঃ অমিয়কুমার সামন্ত
  প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর ১০০
- রোমাঁ রোলাঁ
  রামকৃষ্ণের জীবন ৫০
  বিবেকানন্দের জীবন ৫০
  রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ ২৫

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন
ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, সে কোথায় পড়ে আছে তা দেখেন না। 'ভাবগ্রাহী জনার্দন'।

শ্রীরামকৃষ্ণ

With Best Compliments From:

MODERN GUINEA HOUSE PRIVATE LIMITED

A JEWEL OF JEWELLERS



GOLD, DIAMOND, STONE MERCHANT

208, BIPIN BEHARI GANGULY STREET
(BOW BAZAR) KOLKATA-700 012
Phone : 241-6281/8203

Shop Remain Closed:
Sunday Full & Monday Upto 1.30 p.m.

কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ এক কামড়েই বাজিমাৎ

ঋষি পাঁপড়



শ্রীযুত শ্রীমধু নির্মাতার তৈরী

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ



শ্রীশ্রী সারদামায়ের

মন্ত্রশিষ্য

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

প্রণীত

স্মৃতিমূলক জীবনীগ্রন্থ

- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
- শ্রীশ্রী সারদাদেবী
- স্বামী সারদানন্দের জীবনী
- শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ
- ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা
- প্রেমানন্দ-প্রেমকথা
- জীবন পরিক্রমা



আমাদের প্রকাশিত আরও বিভিন্ন

স্মৃতিমূলক জীবনীগ্রন্থ

বিশ্বনাথ দে

- রবীন্দ্রস্মৃতি

ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

- বিবেকানন্দ স্মৃতি
- বঙ্কিম স্মৃতি
- রামমোহন স্মৃতি
- মধুসূদন স্মৃতি
- বিদ্যাসাগর স্মৃতি
- নজরুল স্মৃতি
- শরৎ স্মৃতি
- মা টেরেসা
- বায়রণ
- শেলী

শ্রী মোহিত কুমার বসাক

- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্মৃতি
- অরবিন্দ স্মৃতি
- নিবেদিতা স্মৃতি
- কিশোর শহীদ স্মৃতি
- সুভাষ স্মৃতি

সুবোধ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

- সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন
- *The Early life of Netaji*

সমর গুহ

- নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা
- *Netaji Dead or Alive*

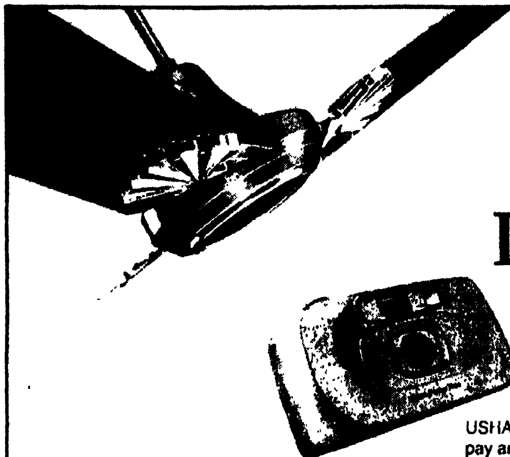




ক্যালকাটা বুক হাউস

১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

☎ ২৪১-০৯৬৫ / ৯৪০৪



USHA

The undisputed leader in fans.

Imported, focus free camera With every fan *

USHA brings you a really sensational offer. Just by an USHA fan pay an additional Rs.40/* and you'll find yourself the owner of a fabulous camera! Hurry! Offer available for a limited period only.

*Conditions apply. Offer not valid on Racer series and Excella ceiling fan. Fans also available without this offer.

Usha International Ltd. It's a better life.

ganguly™

7 Rabindra Sarani, Kolkata 700 001, Phone 225 4192, 225 4490

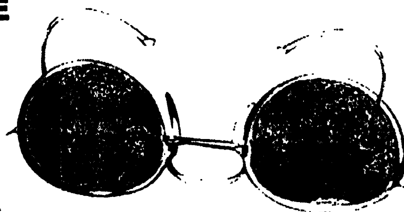
WORLD CLASS

With an Indian Point-of-view

EASTERN THE SILK PEOPLE

A PREMIER GOLDEN TRADING HOUSE

- Resourceful
- Dynamic
- State-of-the-art Technologies
- Superb Teamwork





ESI LIMITED

Wonders of India – In every fold!

Corporate Office :
19, R. N. Mukherjee Road, Kolkata 700 001 (India)
Ph : 243-0817 (5 lines), 248-8620 Fax : (91) (033) 248 2486, 475 8590
Telex : 021-4569 SILK IN E-mail : esilk@vsnl.com
Website : www.esilindia.com

Delhi Office :
A-66, Naraina Industrial Area, Phase-I, New Delhi 110 028 (India)
Phone : 5791541 (4 lines) Fax : (91) (011) 579 0525, 579 6822
E-mail : esidelhi@nda.vsnl.net.in

DISTINCTIVE  EXQUISITE  UNIQUE

AN OPPORTUNITY FOR YOU TO SAVE A LIFE!

BLOOD

AN UNIQUE GIFT OF GOD
SAVIOUR OF LIFE—WHEN IT IS PURE
KILLER—WHEN IT IS CONTAMINATED

BLOOD CANNOT BE MADE IN LABORATORIES. IT HAS NO SYNTHETIC ALTERNATIVE. WHEN LIFE DEPENDS ON AVAILABILITY OF BLOOD, IT IS ONLY YOU WHO CAN SAVE ANOTHER HUMAN BEING.

ALL WE NEED IS THE WILL TO HELP

- DONATE YOUR HEALTHY BLOOD
- INSIST ON AND RECEIVE PURE, PRE-SCREENED BLOOD
- LET US ALL JOIN HANDS TO START A MOVEMENT FOR PURE AND SAFE BLOOD

DONATE BLOOD
AND
SAVE A LIFE

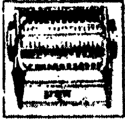
Issued in public interest by :

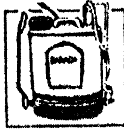


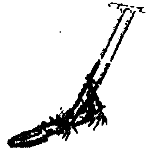
Infar (India) Limited, 7 Wood Street, Kolkata-700 016

ডীলারের সুবিধার্থে—অভাবনীয় কম দামে

সকলপ্রকার স্প্রেয়ার, থ্রেসার, প্যাডি উইডার ও উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য জেলাভিত্তিক ডীলার ও স্টকিস্ট চাই


ধান ঝাড়াই মেসিন


স্প্রেয়ার


প্যাডি উইডার

সারদা ইন্ডাস্ট্রীজ

৩৬নং স্ট্র্যান্ড রোড, ২য় তল, রুম নং—১৫
কলকাতা-৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন ঃ ২৪৩-৩১৪১

দেশবন্ধু মিষ্টান্ন ভাণ্ডার

বিশুদ্ধ সুরভি ঘৃতের খাবার

DESHBANDHU MISTANNA BHANDAR

২২৭ মহাত্মা গান্ধী রোড, বড়বাজার
কলকাতা-৭০০ ০০৭
ফোন ঃ ২৫৮-০৩৭০

শাখা ঃ

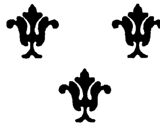
৭৭, হাজরা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৯
১ দেশপ্রিয় পার্ক রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৬

Haran Chandra Banerjee & Sons.

7C, CLIVE ROW, KOLKATA-700 001

PAPER MERCHANTS, STATIONERS AND GOVT. SUPPLIERS

Office : 220-1700
Resi. : 665-9075



Distributors for :

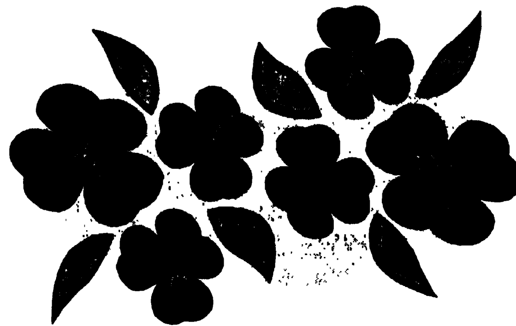
TITAGHUR PAPER MILLS CO. LTD.
BENGAL PAPER MILLS CO. LTD.
SUPREME PAPER MILLS CO. LTD.
SIMPLEX MILLS CO. LTD.

Exercise Book Manufacturer & Distributor



All the secret of success is there : to pay as much attention to the means as to the end.

Swami Vivekananda



With Best Compliments From

DATTA FOOTWEAR INDUSTRIES PVT. LTD.

Regd. Office & Factory:

1, BIDHAN SARANI, KOLKATA-700 073

PHONE : 241-5248 ❑ FAX : (033) 241-7541

Unit-II

180, EAST SINTHI ROAD, KOLKATA-700 030

PHONE : 548-4500





রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম

বৃন্দাবন, মথুরা, উত্তর প্রদেশ-২৮১১২১



রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন



সেবাশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে (১৯৬২) জওহরলাল নেহরু এবং স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ

একটি আবেদন

যুগপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে তীর্থস্থানের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে জীবনের শেষদিনগুলি অতিবাহিত করবার সঙ্কল্প করেছিলেন, শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের তপস্যাপূত সেই অতি প্রাচীন ও সনাতন ঐতিহ্যমণ্ডিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনধামে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র বাস্তব ও প্রত্যক্ষ রূপায়ণের জন্য ১৯০৭ সালে সূচনা হয়েছিল এক ক্ষুদ্র কর্মযজ্ঞের। যার ফলশ্রুতি আজ প্রায় ১৫১ শয্যাবিশিষ্ট 'মানুষের সেবাই ঈশ্বরের পূজা'-রূপ এক বৃহৎ মানবসেবা কেন্দ্র বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম।

সেবাশ্রমের সেবাকার্যের মধ্যে ১৫০টি শয্যাবিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসপাতালের ইন্ডোর ও আউটডোর বিভাগ ছাড়াও একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাবিভাগ, বিনা খরচে গরিব মেয়েদের ৩ বছরের নার্সিং ট্রেনিং, কুষ্ঠরোগী, দুঃস্থ ছাত্র, গরিব বিধবাদের নিয়মিত নানাপ্রকার সাহায্য করা হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবাশ্রমটি বৃন্দাবন তীর্থধামের অসহায় যাত্রিসাধারণ, ব্রজমণ্ডল ও দূর-দূরান্তের গ্রামবাসী এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সমস্ত রোগী-নারায়ণের একমাত্র ১০০% নিঃশুল্ক চিকিৎসাস্থান যা কোনরকম সরকারি সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র ভক্তদের দান দ্বারাই চলে।

মা ও শিশুদের ভালভাবে দেখাশুনা ও নার্সদের এব্যাপারে ভালভাবে প্রশিক্ষণের জন্য ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের নির্দেশে ৩০ শয্যার স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ম্যাটারনিটি ওয়ার্ড তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এব্যাপারে সমাজের সহৃদয় সর্বস্তরের মানুষ ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগীদের কাছে এই নিঃশুল্ক সেবাকার্য অব্যাহত ও সুসম্পন্ন করার জন্য আর্থিক সহযোগিতার আবেদন করছি।

৩০ আসনবিশিষ্ট নতুন প্রসূতিসদন নির্মাণব্যয়	৬০ লাখ
যন্ত্রপাতি	২০ লাখ
অপারেশন থিয়েটারের সংযোজন ও পুনর্নির্মাণ	১০ লাখ

আমাদের বিশ্বাস সর্বস্তরের মানুষের সহানুভূতি, সহযোগিতা ও বদান্যতায় মিশনের এই নিঃশুল্ক সেবাকার্য কালে মহীরুহ হয়ে উঠবে। সেবাশ্রমে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত।

নার্সিং স্কুলের প্রসপেক্টাস ১ এপ্রিল থেকে দেওয়া হয়। এছাড়া কোন সহৃদয় অবসরপ্রাপ্ত/প্রাক্তন Army Doctor এই সুন্দর পরিবেশে থেকে স্বেচ্ছাসেবিরূপে অথবা কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমাদের সেবাব্রতে অংশগ্রহণ করতে চাইলে তাঁর/তাঁদের উদ্দেশে আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

আর্থিক দান চেক বা ড্রাফটে পাঠালে **'Ramakrishna Mission Sevashram, Vrindaban'**—এই নামে পাঠাতে হবে।

বিনীত নমস্কারান্তে

স্বামী সুপ্রকাশানন্দ

অধ্যক্ষ



জেলাভিত্তিক 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৫

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

জেলা : উত্তর চব্বিশ পরগনা

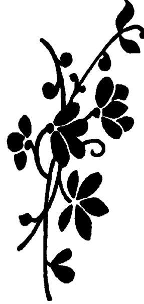
- **রামকৃষ্ণ মঠ, বারাসত**
- **শ্রীরামকৃষ্ণ নিরঞ্জনানন্দ আশ্রম**
  পোঃ রাজারহাট-বিষ্ণুপুর, পিন : ৭৪৩ ৫১০
- **রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, রহড়া**
- **বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
- **গোবরডাঙ্গা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগী সঙ্ঘ**, খাঁটুরা
- **বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ**, নববারাকপুর
- **অলক পালচৌধুরী**, প্রসন্ন চ্যাটার্জী রোড
  সন্তোষপল্লী, পোঃ ঘোলা বাজার, পিন : ৭৪৩১৭০
- **ঘোলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, বি-৭, বি পার্ক, সোদপুর
- **বিবেকানন্দ আলোচনা-চক্র**, নিমতলা
- **ইছাপুর শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
- **মানিক ঘোষ**, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র
  শ্রীমা সারদা সরণি, গঙ্গাপুর, দত্তপুকুর, পিন : ৭৪৩ ২৪৮
- **বীজপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ**
  শহীদনগর, কাঁচড়াপাড়া
- **স্যান্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**
  পোঃ স্যান্ডেলেরবিল, হিঙ্গলগঞ্জ, পিন : ৭৪৩ ৪৩৫
- **হালিশহর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্ঘ**
  প্রযত্নে রামকৃষ্ণ চিলড্রেন্স হোম
  গ্রাম+পোঃ মালঞ্চ, ভায়া : হাজিনগর, থানা : বীজপুর
- **পান্নালাল ব্যানার্জী**, প্রযত্নে তারা আলয়
  ২৯ ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র রোড (স্টেশনের সম্মুখে)
  পোঃ নৈহাটী, পিন : ৭৪৩ ১৬৫
- **কথাশিল্প**, প্রযত্নে গোপালচন্দ্র ঘোষ
  শক্তিগড়, চাকদা রোড, বনগ্রাম, ফোন : ৫৫-৬৯৪/৭২৫
- **বিবেকানন্দ বুক সেন্টার**, প্রযত্নে বাসুদেব সাধুখাঁ
  'ট' বাজার, বনগ্রাম, ফোন : (৯৫৩২১৫) ৫৯৩৯৭
- **সুজিত ঘোষ**, ৩ এফ. রোড, আনন্দপুরী
  পোঃ নোনা চন্দনপুকুর, ব্যারাকপুর, ফোন : ৫৬০-১২৩০
- **রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ (পাঠচক্র)**, ৪৭/৭ টেগোর টেম্পল রোড
  পোঃ শ্যামনগর, পিন : ৭৪৩ ১২৭
- **শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**, বনগ্রাম, পিন : ৭৪৩ ২৩৫
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**, রামকৃষ্ণপল্লী, বনগ্রাম, পিন : ৭৪৩ ২৩৫
- **নিমতলা বিবেকানন্দ আলোচনাচক্র**
  শরৎ পাঠাগার, নিমতলা, পোঃ পূর্ব বিষ্ণুপুর
- **শ্রীশ্রীমা সারদা সঙ্ঘ**, ৪৭ কে. এন. মুখার্জী রোড
  তালপুকুর, বারাকপুর, পিন : ৭৪৩ ১৮৭
- **স্বপন চক্রবর্তী, সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ দেবালয় (বেড়াচাঁপা অঞ্চল), পিন : ৭৪৩ ৪২৪
- **ভাটপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সঙ্ঘ**
  প্রযত্নে শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮/২ বিন্দুবাসিনী রোড
  পোঃ ভাটপাড়া, পিন : ৭৪৩ ১২৩
- **ন'পাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**
  কৃষ্ণনগর রোড, পোঃ ন'পাড়া, বারাসত
  পিন : ৭৪৩ ৭০৭, ফোন : ৫৪২-৩৭৩৯/৬৭০২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত চলমান পাঠচক্র**
  প্রযত্নে কালীপ্রসাদ সরকার
  টাকী রোড, পোঃ বসিরহাট, ফোন : ৫৫০১৮
- **রামকৃষ্ণ স্মরণতীর্থ**
  সোদপুর রোড, মধ্যমগ্রাম, পিন : ৭৪৩ ২৭৫
- **হাবড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রম**
  স্বামীজী সরণী, হাবড়া, ফোন : ৫৫৩৯২

জেলা : দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, সরিষা**
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ**, ভাঙ্গড়
- **হৃদয়ভূষণ নস্কর, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ কন্যানগর, আমতলা, পিন : ৭৪৩ ৩৯৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**, পোঃ বি-রামকৃষ্ণপুর, পিন : ৭৪৩ ৬১০
- **রামকৃষ্ণ পাঠমন্দির**
  গ্রাম : চকমানিক, পোঃ বাওয়ালি, পিন : ৭৪৩ ৩৮৪
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম (বাটানগর)**, পোঃ মহেশতলা
  পিন : ৭৪৩ ৩৫২
- **বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য**
  সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র
  উকিলপাড়া, বারুইপুর, পিন : ৭৪৩ ৩০২
- **জীবনকৃষ্ণ দাস**, প্রযত্নে মহেশ্বর স্টোর্স
  কাছারী বাজার, বারুইপুর, পিন : ৭৪৩ ৩০২
- **শ্রীরামকৃষ্ণ স্টোর্স**, প্রযত্নে অনন্তকুমার দাস
  পোঃ চাম্পাহাটী, চাম্পাহাটী বাজার
  পিন : ৭৪৩ ৩৩০, ফোন : ৯১১৮-৬০৪৫০
- **শঙ্করচন্দ্র মণ্ডল**, প্রযত্নে কৃষ্ণগোপাল নস্কর
  গ্রাম : বিবেকানন্দ পল্লী, পোঃ দক্ষিণ বারাসত, পিন : ৭৪৩ ৩৭২
- **শতদল সাধুখাঁ**
  প্রযত্নে 'গৃহশ্রী', হরিধন চক্রবর্তী সরণি, সোনারপুর
- **বিভূতিভূষণ ঘরামি, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  গ্রাম+পোঃ কৌতলা, পিন : ৭৪৩ ৬০৩, ফোন : ৯১৭৪-৭৪৩১৫
- **কাশীনগর বিবেকানন্দ যুব কেন্দ্র**
  গ্রাম+পোঃ কাশীনগর, পিন : ৭৪৩ ৩৪৯
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ**
  ১০ মাইল বাজার, পোঃ মহারাজগঞ্জ
  থানা : নামখানা, পিন : ৭৪৩ ৩৫৭
- **ডাঃ হরেকৃষ্ণ সিংহ, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ চেতনা**
  ২৩৩ জেমস লং সরণি, জোকা
  পিন : ৭৪৩ ৫১২, ফোন : ৪৬৭-১১৫২
- **রামকৃষ্ণ বেদান্ত আশ্রম**
  গ্রাম+পোঃ বিবেকানন্দনগর, পিন : ৭৪৩ ৩৫২

সৌজন্যে
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ
৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯

With Best Compliments From :



B. S. SUNDARIYA & SONS

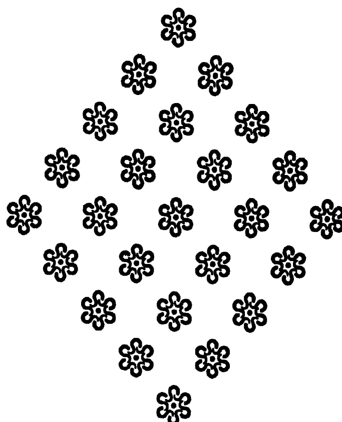
146/2, OLD CHINA BAZAR STREET
CALCUTTA-700 001

PHONE : 242-4867

With Best Compliments From :

H. K. GHOSE & CO.

Paper Merchants & Exercise Book Makers

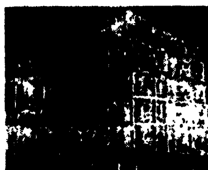


WARDLEY HOUSE
25A, SWALLOW LANE, KOLKATA-700 001
PHONE : 220-5209

The Complete Works of Balmer Lawrie











... In a Nut-Shell

Discover Balmer Lawrie lock, stock and barrel. A Company of many dimensions, multiple products and diverse services. And these are :

Petroleum & Chemicals • *Greases & Lubricants* • *Oleo-Chemicals* • *Leather Chemicals* • *Antioxidants & Functional Additives* • *Polybutenes & Downstream* • *Synthetic Esters* • *Aviation Lubricants*

Engineering & Packaging • *Steel Barrels & Drums* • *LPG Cylinders* • *Metal & Plastic Cans and Conipails* • *Tin Lithography* • *Valerex Plastic Drums* • *Closures & Components* • *Marine Freight Containers*

Trading & Services • *Tea Exports & Trading* • *Air & Sea Cargo* • *Travel & Tours* • *Freight Container Leasing*

Technical Services • *Turnkey Project Engineering*
• *Project management & Consultancy*
• *Engineering Design & Development*
• *Applications Research Laboratory*
• *Product Development Centres*



Balmer Lawrie & Co. Ltd.

Moving with the times

WONDERFUL PRODUCTS FROM kemikox

CONSUMER PRODUCTS		INDUSTRIAL PRODUCTS	
KEMITOL	- Toilet Cleaner	RUSTCON	- Rust Converter
KLINZ FRESH	- White Deodorant-cum-Cleaner	(Derusting and rust preventive compound)	
OASH	- Liquid Hand Soap	VAANIS	- Paint Remover
BUD BUD	- Detergent Powder	RUSTOFF 100	- Rust Remover
		KEMIRAD-S	- Descaleing Agent

WE HAVE SOME OTHER INDUSTRIAL & DOMESTIC CLEANING PRODUCTS TOO

সুগন্ধী মোমবাতী **AROMA** এবং ধুনো-ধূপ **ARATI** আমাদের দুটি অনবদ্য উৎপাদন

DISTRIBUTORS and DEALERS WANTED

KEMIKOX FORMULATORS PVT. LTD.

SSI Unit, Regd. with NSIC, RAILWAYS and DGS&D

P.B. No.: 2673, G. P. O, Kolkata-700 001

Telephone No.: 91 33 4426240, Fax No.: 91 33 4428044

E-mail: kemikox@vsnl.net, Website: www.kemikox.com

তমসো মা জ্যোতির্গময়

একটি বোতাম টিপতেই আলোর ঝলক। দূর হয়ে যায় ঘরের অন্ধকার। মনেরও। কিন্তু কতটা সফল হতো এই প্রয়াস যদি না থাকত বিদ্যুতের যাদুস্পর্শ?

দেশে বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়ছে, আর তার সঙ্গে বেড়ে চলেছে বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা—ঘরে-বাইরে। বসতবাড়িতে, শিল্পোদ্যোগে, ব্যবসা-বাণিজ্যে। এই বিদ্যুৎ-চাহিদার ৭০ শতাংশ মেটাচ্ছে তাপবিদ্যুৎ—কয়লাই যার মূল জ্বালানী।

এই কয়লার যোগান দিচ্ছে কোল ইন্ডিয়া। এবং তার ৬.৪ লক্ষ কর্মী। আটটি রাজ্যের দূরদূরান্তরে, দুর্গম পরিবেশে নিরলস পরিশ্রম করে এরা কয়লার সরবরাহ অব্যাহত রাখছে। ঘরে-বাইরে আলোর রোশনাই-এর সমৃদ্ধির প্রতিজ্ঞায় দৃপ্ত কোল ইন্ডিয়া।

আলোয় আলোকময় ভবিষ্যতের সন্ধানী—কোল ইন্ডিয়া।



কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

১০ নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১

With Best Compliments from:

Pawan Gupta

M/s. BANWARILAL GUPTA

WHOLESALER OF:

MARBLES & GRANITES (MARBLE TILES, SLAB, GLAZED TILES)
PLYWOOD (COMMERCIAL, WATER PROOF & SUNMIKA)
TIMBER (ALL TYPES OF TIMBER)

81, ULTADANGA MAIN ROAD
KOLKATA-700 067

PHONE: 356-2186 (O), 550-9773 (R)

With Best Compliments from:

Suresh Kumar Agarwal

KAILASH MARBLE UDYOG

Dealers in:

❑ J. K. WHITE CEMENT ❑ MARBLE SLABS ❑ MOSAIC MATERIALS
❑ CERAMICS TILES ❑ GRANITE

Show Room:

Under Ultadanga V.I.P. Bridge (Near O. P. House)
Culvert Godown No. 3, Scheme No. VII M
Kolkata-700 067

Godown:

11D, Canal Circular Road, Kolkata-700 067
Phone: 355-9368/0879/0195 (O), 352-1949 (G),
550-9773 (R), 98300 53923 (M)

দি বেদান্ত কেশরী

(সফল জীবনযাপনের লক্ষ্যে এক বাস্তবমুখী গাইড)

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত একদল নিষ্ঠাবান ও উদ্যমী ভক্ত ১৯১৪ সালে **'দি বেদান্ত কেশরী'** নামে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের যে ইংরেজী মাসিক পত্রিকাটি চালু করেন, সেটি আজ প্রায় নয় দশক ধরে আমাদের মাতৃভূমির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে। এই পত্রিকায় থাকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে **মূল্যবোধভিত্তিক প্রবন্ধ** (যেগুলির বেশির ভাগই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের দ্বারা লিখিত)ঃ সর্বাঙ্গীণ জীবনযাপন ❑ পারিবারিক মূল্যবোধসমূহ ❑ যুবশক্তির বিকাশ ও ব্যবহার ❑ আধ্যাত্মিকতা ❑ সংস্কৃতি ❑ বিজ্ঞান ❑ সাংগঠনিক মূল্যবোধ বিপ্লব ❑ ব্যক্তিত্ব বিকাশ ❑ দর্শন ❑ অন্যান্য।

ঐতিহ্যপূর্ণ বাঙলা মুখপত্র **'উদ্বোধন'**-এর পাঠকবর্গ **'দি বেদান্ত কেশরী'** পাঠ করেও আনন্দলাভ করবেন। অনুগ্রহ করে আপনি নিজে **'দি বেদান্ত কেশরী'**র **গ্রাহক হয়ে** এবং আপনার বন্ধুদের **গ্রাহক করিয়ে** সেবাকার্যে অংশগ্রহণ করুন।

গ্রাহকমূল্য ঃ **ভারত—বার্ষিক ৬০ টাকা,** প্রতি সংখ্যা (জানুয়ারি থেকে নভেম্বর) ৬ টাকা, বিশেষ সংখ্যা (ডিসেম্বর) ৫০ টাকা, ৩ বছর ১৭০ টাকা, ৫ বছর ২৭৫ টাকা, আজীবন ৬০০ টাকা। **বিদেশে—** বার্ষিক US$20, আজীবন US$300।

• ONLINE-এ পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়, আপনার Master বা VISA কার্ড ব্যবহার করে। অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন এই ঠিকানায় ঃ www.sriramakrishnamath.org।

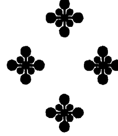
ধন্যবাদান্তে,

দয়া করে এই ঠিকানায় লিখুন ঃ
Manager, **The Vedanta Kesari**
Sri Ramakrishna Math
Mylapore, Chennai-600 004

আপনাদের সেবায়
স্বামী জ্ঞানদানন্দ
ম্যানেজার

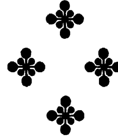
রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে যায়। অবতারেরাও সেইরকম সহস্র সহস্র লোকেদের ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ



মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার দিকে এগোতে চায় না। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আন্তরিক খুব যত্ন ও রোখ চাই।

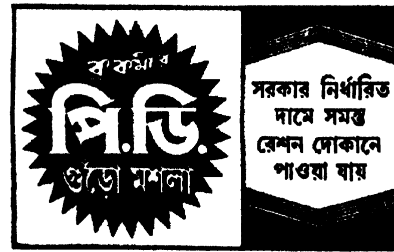
শ্রীমা সারদাদেবী



যে-দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয়, সে-দেশ ক্রমশ ধর্মহীন হইয়া দাঁড়ায়। ভারতে কখনো এরূপ চেষ্টা হয় নাই। সেইজন্য এখানে প্রকৃত ধর্মভাব এখনো জাগ্রত।

স্বামী বিবেকানন্দ





রিটায়ারমেন্ট সলিউশন্‌স

সুনিশ্চিত নিরাপত্তা। সুনিশ্চিত নগদীকরণ।
সুনিশ্চিত জীবন সুরক্ষা। সুনিশ্চিত অবসরকাল।

সুরক্ষা • নগদীকরণ • করের সুবিধালাভ • জীবন বীমা

[illegible] প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি বা ভি আর এস থেকে প্রাপ্ত অর্থরাশি। এখন [illegible] নিশ্চিত করা। সেইজন্যে আমরা আপনাকে দিচ্ছি [illegible] সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। [illegible] আইসিআইসিআই প্রু রিঅ্যাসিওর। যাতে [illegible] সুবিধালাভ [illegible] **নগদীকরণ :** নিয়মিত ও সুনির্দিষ্ট বার্ষিক ফেরৎলাভের সুনিশ্চয়তা। **করের সুবিধালাভ :** ধারা 88'র অধীনে 60,000 টাকা পর্যন্ত। [illegible] উত্তরজীবী সুবিধালাভ [illegible] **জীবন সুরক্ষা :** প্রদেয় প্রিমিয়ামের 110% পর্যন্ত। **সুরক্ষা :** [illegible] আপনার মূল অর্থরাশির সম্পূর্ণ সুরক্ষা এবং [illegible] আর্থিক [illegible] উত্তরজীবী সুবিধালাভ। [illegible] আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন। [illegible] আমরা আপনাকে দিচ্ছি সুরক্ষা ও সম্পূর্ণ [illegible] আর্থিক সমাধান।

আপনি দিচ্ছেন		
পলিসি	সময়কালের শেষে	উত্তরজীবী সুবিধালাভ (টাকা)
[illegible] 2,00,000 [illegible]	[illegible]	18,100
	[illegible]	18,100 [illegible]
	[illegible]	2,00,000
	মোট অর্থপ্রাপ্তি	1,08,600 + 2,00,000 [illegible] 3,08,600

কোলকাতায় 243 7400 নম্বরে ফোন করুন

ICICI PRU ReAssure
Anticipated Endowment Policy SP

ICICI PRUDENTIAL
LIFE INSURANCE
সুরক্ষা জীবনের প্রতি পদে।

[illegible] এই ওয়েবসাইটে সাক্ষাৎ করুন।

LOWE LINTAS ICICI [illegible] 2115 B

UDBODHAN
Phone : 554-2248, 554-2403
website : www udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com

Vol. 103
No. 10
OCTOBER
2001

Licensed to Post
Without Prepayment
Licence No.
TECH/WB/RNP-15/LPWP-01/2001

ISSN 0971-4316
. R.N. 8793/57
Postal Regn. No.
TECH/WB/RNP-15/2001

উদ্বোধন

১০৩তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র



❑ গত ১লা মাঘ ১৪০৭ (১৫ জানুয়ারি ২০০১) **উদ্বোধন ১০৩তম বর্ষে** পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় **নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব** নিয়ে কোন **সাময়িকপত্রের ১০২ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম** ❑

- ❑ বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা **উদ্বোধন** একটি ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র মাত্র নয়, **উদ্বোধন** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। **ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের** সঙ্গে এবং **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের** সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত** রামকৃষ্ণ **সঙ্ঘের** একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তে হবে।
- ❑ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে **উদ্বোধন** নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন** একটি সার্থক **পারিবারিক** পত্রিকা। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন**-এ প্রকাশিত হয়।
- ❑ উদ্বোধন শুধু বাংলার **সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা** নয়, **উদ্বোধন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ পত্রিকা** এবং **বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক পত্রিকা।**
- ❑ ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র হয়েও **উদ্বোধন** তার মহান প্রবর্তকের নির্দেশ অনুসারে **কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আদর্শের মুখপত্র নয়। উদ্বোধন** তার **সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বিগত ১০২ বছর** ধরে অটুট রেখেছে।
- ❑ **উদ্বোধন**-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার গ্রাহক হওয়া নয়, একটি **মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের** সঙ্গে যুক্ত হওয়া।
- ❑ **উদ্বোধন** একটি পত্রিকা মাত্র নয়, **উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর।**
- ❑ **স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে। উদ্বোধন-এর প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে গ্রাহক করলেই** এখনি **উদ্বোধন-এর গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার** হয়ে যায়। তাই আপনার **নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্যদের গ্রাহক করাও** আপনার কাছে **স্বামীজীর প্রত্যাশা।** স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের **গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের।** অবশ্য **ইন্টারনেট সংস্করণের** মাধ্যমে **উদ্বোধন** আজ **ভারত ও বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ঘরে ঘরে** পৌঁছে গিয়েছে।
- ❑ **স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।** সেকথা স্মরণ করে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে অনুরাগী ও ভক্তগণ **উদ্বোধন-এর** প্রতি নিশ্চয়ই তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।
- ❑ **উদ্বোধন-এর শারদীয়া** সংখ্যাটির জন্য গ্রাহকদের থেকে আলাদা মূল্য নেওয়া হয় না। এই সংখ্যাটি গ্রাহকদের জন্য আমাদের **শারদ উপহার।** প্রসঙ্গত সকলের অবগতির জন্য জানাই যে, **শারদীয় সংখ্যাটি** আকারে সাধারণ সংখ্যার **তিনগুণ** এবং **বিশেষ সংখ্যা** হওয়ায় অলঙ্করণের জন্য খরচও হয় যথেষ্ট। **গত কয়েক মাসে কাগজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং অন্যান্য ব্যয়বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শারদীয়া সংখ্যা** সহ **গ্রাহক-পিছু আমাদের বার্ষিক খরচ দাঁড়িয়েছে মুদ্রিত গ্রাহকমূল্যের সওয়া তিন গুণ।** বিশাল অঙ্কের এই অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য আমরা নির্ভর করি সহৃদয় বিজ্ঞাপনদাতাদের সক্রিয় সহযোগিতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক বদান্যতার উপর।
- ❑ **পত্রিকা প্রকাশ** সংক্রান্ত **ব্যয় প্রতি বছর বেড়ে** গেলেও **তিন বছর (১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০১) 'উদ্বোধন'**-এর **গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত** রাখা হয়েছে। **এত সুলভ মূল্যে এমন সম্পূর্ণ পত্রিকা বাঙলা ভাষায় আর একটিও নেই।**
- ❑ **উদ্বোধন** এর সেবায় তিনটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি **'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল'**, অন্য দুটি যথাক্রমে **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি** তহবিল' এবং **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি** তহবিল'। **উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত।** আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে **অনুগ্রহ করে 'Ramakrishna Math, Baghbazar'—এই নামে পাঠাবেন।** ঠিকানা **ঃ সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।** দাতার চিঠিতে বা M.O. কুপনে **'উদ্বোধন পত্রিকার** সেবায়' অথবা **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** অথবা **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'**-এর জন্য যেন লেখা থাকে।
- ❑ **উদ্বোধন-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে** মতিলাল-তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাঁদের **পুত্রকন্যাদের** পক্ষে **স্থায়ী ভিত্তিতে 'উদ্বোধন মেধা সম্মান' (একবছরের জন্য উদ্বোধন-এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি)** নিবেদিত হয়েছে। **পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের** যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। ২০০১ সালের জন্য অনুরূপ সম্মান সুকুমার-বিভারানী পাড়ুই-এর স্মৃতিতে তাঁদের পুত্র অমর পাড়ুই নিবেদন করেছেন। **এই সম্মানপ্রাপকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্ষদ পরিচালিত ২০০০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় 'সম্মান'-এর জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বোধন-সম্পাদকের সঙ্গে** যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বামী সর্বগানন্দ
সম্পাদক

পি. বি. সরকার অ্যান্ড সন্স

সৌজন্যে

(কোন ব্রাঞ্চ নেই)

জুয়েলার্স

সন অ্যান্ড গ্র্যান্ড সন্স অব লেট বি. সরকার

৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০ ❑ ফোন ঃ ২২৩-৮৭১৩, ২২৩-৭৫৭৮

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ





"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে। জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ করবে।

আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।

পাঁকে থাকে

কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।

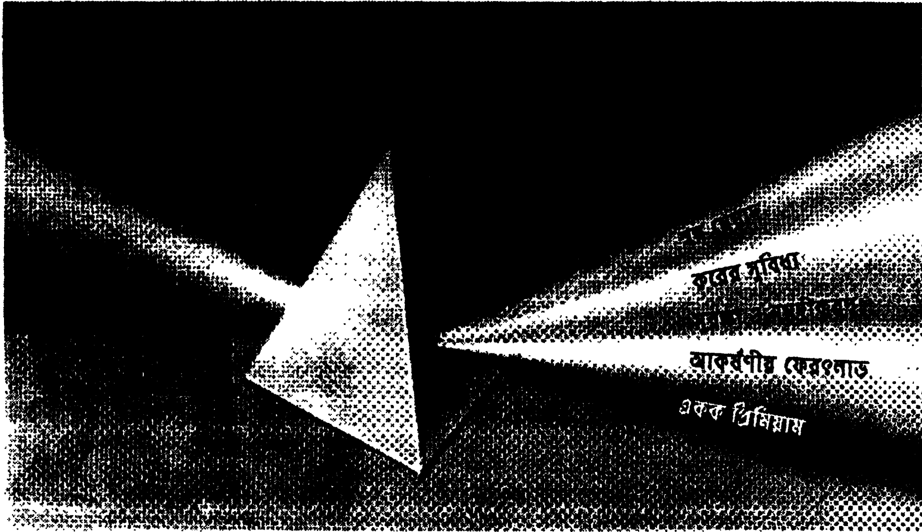
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

আনন্দবাজার পত্রিকা

৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

বীমা নিবেশ 2001



বীমা নিবেশ, বহুবিধি চাহিদার একক সমাধান এখন
বীমা নিবেশ 2001 (টেবিল নং. 141) রূপে পরিবর্তিত সুবিধেগুণ
সহ পুনঃপ্রবর্তিত হ'ল।

বৈশিষ্ট্যসমূহ :

- আশ্বাসিত অর্থাঙ্কের সীমা হ'ল 25,000/- টাকা থেকে 50 লক্ষ টাকার মধ্যে (টা. 5,000/-এর গুণিতকে)।
- প্রিমিয়াম মূল্য : টা. 1000 আশ্বাসিত মূল্যের জন্য একক প্রিমিয়াম প্রদান 5 বছরের মেয়াদের ক্ষেত্রে টা. 952 এবং 10 বছরের মেয়াদের ক্ষেত্রে টা. 863।
- যোজনার মেয়াদ : 5 বছর এবং 10 বছর।
- 18 বছর এবং 70 বছর বয়সের মধ্যে যেকোনো ব্যক্তিসাধারণ যোগদান করতে পারবেন।
- ধারা 88-'র অধীনে কর-সংক্রান্ত সুযোগসুবিধে পাওয়া যাচ্ছে।
- লয়ালটি অ্যাডিশন্স-এর বন্দোবস্ত আছে।
- প্ল্যান-এর মেয়াদকালে ঝুঁকির সুরক্ষাব্যবস্থা কিছু নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সাপেক্ষে হবে।
- **10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আশ্বাসিত অর্থাঙ্কের জন্যে কোনো ডাক্তারী পরীক্ষা করানোর দরকার নেই।**
- কর-মুক্ত কম্পাউণ্ড-এর গ্যারান্টীসহ সংযোজন : প্রথম 5 বছরে মূল আশ্বাসিত অর্থাঙ্কের বার্ষিক 75 টাকা প্রতি হাজারে, তারপরে মূল আশ্বাসিত অর্থাঙ্কের বার্ষিক 80 টাকা প্রতি হাজারে।

চিকিৎসা আবশ্যকতার সাপেক্ষে টা. 5 লক্ষ পর্যন্ত টার্ম অ্যাসুওরেন্স রাইডার পাওয়া যায়।

* কর-মুক্ত আয় 9.62% পর্যন্ত

60 বছর এবং তার উর্ধ্বে বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের এবং 50 বছর এবং তার উর্ধ্বে ভি আর এস গ্রহণকারী নাগরিকদের মূল প্রিমিয়াম থেকে 0.5% বিশেষ ছাড় দেওয়া হবে।

বীমা নিবেশ 2001 - *বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত।*

বিশদ বিবরণের জন্যে নিকটতম শাখা অফিসে অথবা এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।



লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া

ভারতকে আমরা উত্তমরূপে জানি

*শর্তাবলি প্রযোজ্য

Please visit www.licindia.com



রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ

পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া-৭১১ ২০২ ● ফোন : ৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ ● বৈদ্যুতিন ডাক : rmsppp@vsnl.com

সারদাপীঠ থেকে প্রকাশিত অডিও ক্যাসেটসমূহ

মূল্য ❑ SP-1 ও SP-31–34 : ৩৫ টাকা, অন্যান্য : ৩০ টাকা

SP-1	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্	সংস্কৃত ও বাঙলা
SP2, SP-7, SP-8, SP-10–12	কথামৃতের গান (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড)	বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি
SP-3	শ্রীরামনামসংকীর্তন	সংস্কৃত ও হিন্দি
SP-4	বক্তৃতা—যুগপুরুষ	বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত
SP-5	শ্রীশ্রীচণ্ডীস্তব (আবৃত্তি : স্বামী সর্বগানন্দ)	বাঙলা, সংস্কৃত
SP-6	শিবমহিমা	বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি
SP-9	শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি
SP-13	শ্রীসারদাবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা
SP-20	বিবেকানন্দবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা
SP-24	শ্রীকৃষ্ণবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি
SP-14–16	কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)	বাঙলা
SP-17	বীরবাণী	সংস্কৃত, বাঙলা, ইংরেজী ও হিন্দি
SP-18	গীতিবন্দনা	হিন্দি
SP-19	বক্তৃতা—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান	বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত
SP-21–22	সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড)	হিন্দি
SP-23	ওঠো জাগো	হিন্দি
SP-25	শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি	হিন্দি
SP-26	বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি	হিন্দি
SP-27	বেদমন্ত্র (আবৃত্তি : স্বামী সর্বগানন্দ)	সংস্কৃত উপনিষদের মন্ত্রসমূহ
SP-28	সরস্বতী বন্দনা	বাঙলা, সংস্কৃত
SP-29 &	**Ramakrishna Movement**	Lecture by Swami Bhuteshanandaji Maharaj, The 12th President, Belur Math
SP-30	**Religion in Practice**	do
SP-31–34	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (আবৃত্তি : স্বামী সর্বগানন্দ) (১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড)	মূল সংস্কৃত এবং প্রতি অধ্যায়ের মুখবন্ধ
SP-35	আগমনী	বাঙলা
SP-36	ভজন সুধা	হিন্দি

কম্প্যাক্ট ডিস্ক / মূল্য প্রতিটি ১৫০ টাকা

Cd/SP-1	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্	(সান্ধ্য আরাত্রিক ভজন, গুরুবন্দনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষ্ণ শরণম্)
Cd/SP-3	শ্রীরামনামসঙ্কীর্তন	রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি দিনে গাওয়া হয় (সংস্কৃত ও হিন্দি)
Cd/SP-31–34	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ)	(সংস্কৃত) (সুরে আবৃত্তি ১ম—১৮শ অধ্যায়)

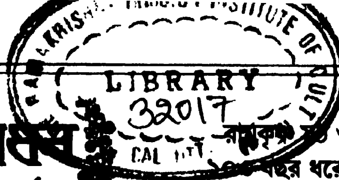
স্বামী সর্বগানন্দ, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ, স্বামী দিব্যব্রতানন্দ, শ্রীমহেশরঞ্জন সোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য দক্ষ শিল্পিগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন।

প্রাপ্তিস্থান : বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি (কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক)

ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে M.O. অথবা Bank draft মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে।

Video Cassette : Centenary Celebration of the Ramakrishna Mission at Belur Math in 1998. Duration—80 minutes Rs. 250.00

LIBRARY 32017
1 DEC 2001



উদ্বোধন ১০৩

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
১০৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র

১০৩তম বর্ষ ১১শ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৪০৮ নভেম্বর ২০০১

প্রচ্ছদ ❑ ওপরে কৈলাস, নিচে মানস সরোবর। মানস সরোবরে সন্তরণরত হংসযুগল—লোকবিশ্বাসে, হর-পার্বতী।

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ



সম্পাদক :

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'
প্রচ্ছদ ❑ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ ❑ আলোকচিত্র : বেলুড় মঠের জনৈক সন্ন্যাসী
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ : ৬৫ টাকা; সডাক : ৭৫ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য : ৮ টাকা ❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) : ৩০০০ টাকা [একবছরের মধ্যে পরিশোধ্য কমপক্ষে ৫০০ টাকা প্রতি কিস্তি হিসাবে ৬টি কিস্তিতেও প্রদেয়]



শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম

পোঃ কালাডি, জেলা ঃ এর্ণাকুলাম, কেরালা, পিন ঃ ৬৮৩৫৭৪
দূরভাষ ঃ (০৪৮৪) ৪৬২৩৪৫/৪৬১০৭১ এবং ৪৬৩১৪১ (বিদ্যালয়)
ই. মেল ঃ srka-adv@eth.net এবং srka-adv@netkracker.com

সেবাব্রতের আহ্বান

একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

বন্ধু এবং শুভার্থিগণ,

আপনারা নিশ্চয়ই অবহিত আছেন যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে যথার্থ মানবচরিত্র গঠনের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিগণের ভাবধারার বিকাশ ঘটিয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রেম ও শ্রদ্ধা, গ্রহণ ও সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে এক নব্য সমাজধারা প্রবর্তন করে যে ব্যাপক আন্দোলনের সূচনা করেছে, তার অন্তর্নিহিত সার্বজনীনতা, আধুনিকতা এবং সমন্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আজ এই আন্দোলন একটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ভাবরূপে স্বীকৃতিলাভ করেছে।

শিক্ষার মাধ্যমে এই মানবিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শগুলিকে মানুষের কাছে অতি সহজে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে রামকৃষ্ণ মিশন এজাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। গত ৬৫ বছরব্যাপী শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জনহিতকর নানা কাজে মূল্যবান অবদানের জন্য **কেরালা প্রদেশের কালাডিতে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্রটির**, বোধকরি, আজ আর নতুন করে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। আদি শঙ্করাচার্যের পবিত্র জন্মস্থানে অবস্থিত এই শাখাকেন্দ্রটি বর্তমান পরিকাঠামোর মধ্যেই একটি নতুন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

অতএব, আমরা সমাজসচেতন এবং লোকহিতকর সকল বন্ধু, সাহায্যকারী এবং শুভার্থিগণের কাছে এই মহৎ কাজের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে বাধ্য হচ্ছি। এককালীন, মাসিক ভিত্তিতে অথবা 'স্পনসর' রূপে যেকোন আর্থিক সাহায্য সরাসরি আশ্রমের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই সাহায্য সকলের মধ্যে এক সুসম্পর্ক গড়ে তুলবে এবং এই মহৎ কাজে যৌথ উদ্যোগের অংশীদার হতে পারার জন্য সমাজের কাছে সকলে ধন্যবাদার্হ হবেন, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই।

আনুমানিক ব্যয়ের তালিকা

(১)	উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য নতুন বাড়ি নির্মাণ	৭৫ লক্ষ টাকা
(২)	পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানের জন্য পরীক্ষাগার নির্মাণ	১৫ লক্ষ টাকা
(৩)	অফিস এবং শ্রেণীকক্ষের জন্য আসবাবপত্র ইত্যাদি	৫ লক্ষ টাকা
(৪)	লাইব্রেরির জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি	৫ লক্ষ টাকা
(৫)	বিদ্যালয়ের কাজের জন্য একটি গাড়ি ক্রয়	৫ লক্ষ টাকা
	মোট	১০৫ লক্ষ টাকা

সকল দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।
আপনার আন্তরিক সাহায্য প্রার্থনা করি।

আপনাদের শ্রীরামকৃষ্ণের
স্বামী পুরন্দরানন্দ
অধ্যক্ষ

LIBRARY

দিব্য বাণী

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।।

—আমিই রুদ্র ও বসু-রূপে বিচরণ করি। আমিই দ্বাদশ আদিত্য। সকল দেবতা আমারই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। আমিই ইন্দ্র, অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি।

⁂

অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্।।

—আমিই সমগ্র জগতের ঈশ্বরী। উপাসকের সম্মুখে আমিই ধনপ্রদাত্রী দেবীশক্তি তথা পরব্রহ্ম শক্তি। প্রপঞ্চরূপে বহুভাবে অবস্থান করিয়া আমিই সর্বভূতে জীবরূপে প্রবিষ্টা।

⁂

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মান্ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি।।

—আমার শক্তিতে সকলে আহার, দর্শন, শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ, শব্দশ্রবণ করিয়া থাকে। যাহারা আমাকে অন্তর্যামিনী-রূপে জানে না তাহারাই জন্ম-মরণাদি ক্লেশপ্রাপ্ত হয়। হে কীর্তিমান! তোমাকে আমি শ্রদ্ধালভ্য ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতেছি শ্রবণ কর।

⁂

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্।।

—(আমিই ঈদৃশব্রহ্মস্বরূপিণী) আমিই যাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ করি। আমি কাহাকেও ব্রহ্মা করি, কাহাকেও অতীন্দ্রিয় রাজ্যবিহারী ঋষি করি, কাহাকেও বা ব্রহ্মমেধাবান করি।

দেবীসূক্তম্, ঋগ্বেদ (১০।১২৫।১, ৩-৫)

মাতৃ-উপাসনা, সঙ্গীত ও অধ্যাত্মসাধনা

(দুই)

সাধনকালে শ্রীরামকৃষ্ণের গান গাহিবার ধরনধারণ কেমন ছিল তাহার বিবরণ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগিনেয় হৃদয়রামের মুখে শুনিয়া স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন ঃ

"...ঠাকুরের পূজা একটা দেখিবার বিষয় ছিল। যে দেখিত সে-ই মুগ্ধ হইত। আর ঠাকুরের সেই প্রাণের উচ্ছ্বাসে মধুর কণ্ঠে গান।... তাহাতে ওস্তাদি, কালোয়াতি, ঢং ঢাং কিছুই ছিল না। ছিল কেবল গীতোক্ত ভাবটি আপনাতে সম্পূর্ণ আরোপ করিয়া মর্মস্পর্শী মধুর স্বরে যথাযথ প্রকাশ এবং তাল-লয়ের বিশুদ্ধতা। ভাবই যে সঙ্গীতের প্রধান, একথা যে তাঁহার গান শুনিয়াছে সে-ই বুঝিয়াছে। আবার তাল-লয় বিশুদ্ধ না হইলে ঐ ভাব যে আত্মপ্রকাশে বাধা পাইয়া থাকে, একথা ঠাকুরের মুখনিঃসৃত সঙ্গীত শুনিয়া... বেশ বুঝা যাইত।

"হৃদয় বলিত, এই কালে গীত গাহিতে গাহিতে দুই চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত। এবং যখন পূজা করিতেন তখন এমন তন্ময়ভাবে উহা করিতেন যে, পূজাস্থানে কেহ আসিলে বা নিকটে দাঁড়াইয়া কথা কহিলেও তিনি উহা আদৌ শুনিতে পাইতেন না।" বস্তুত, সঙ্গীতকে অবলম্বন করিয়া সুরের মাধ্যমে সাধকের মন যেরূপ ঊর্ধ্বগামী হয়, তেমনি সুরকে অবলম্বন করিয়াই শ্রীভগবান পুনরায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আমি-আমার রাজ্যে নামিয়া আসেন। ১৮৮৩ সালের ২১ জুলাই তারিখে গীত 'ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী' শীর্ষক যে-গানটির প্রসঙ্গ চলিতেছিল তাহারই পূর্বানুবৃত্তি করিব। অধরলাল সেনের বাড়ি হইতে শ্রীশ্রীঠাকুর যদু মল্লিকের বাটীতে সিংহবাহিনী দর্শনে আসিয়াছেন। সিংহবাহিনীর অপূর্ব মূর্তি দর্শন করিতে করিতে তিনি একেবারে সমাধিস্থ। অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। রামলাল পাশে দাঁড়াইয়াছিল। ঠাকুর বলিলেন ঃ "তুমি ওইটি গাও—তবে আমি ভাল হব।" রামলাল গাহিতেছেন ঃ "ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী" ইত্যাদি। অর্থাৎ ঐ সঙ্গীত অবলম্বন করিয়া অর্ধবাহ্যদশা হইতে ঠাকুরের মন বাহ্যদশায় নামিয়া আসিবে—ইহাই তাৎপর্য। অতএব মনের উপর সঙ্গীতের একটি আরোহণমূলক বা একাগ্রতাসাধক এবং একটি অবরোহণমূলক বা ব্যুত্থানাত্মক ভূমিকা রহিয়াছে তাহা বুঝা যায়। সঙ্গীতের এই দুইটি ভূমিকার কথা পূর্বেই ইহার অনুলোম-বিলোমাত্মক গতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

যাঁহারা সঙ্গীতপ্রিয় তাঁহারা জানেন, বিশ্বপ্রকৃতি সঙ্গীতময়। স্বামী বিবেকানন্দ একদা এক খরস্রোতা পার্বত্য নদীর তীরে বসিয়া বলিয়াছিলেন, শুনিতেছি নদীটি এখন 'হর হর' শব্দে বহিতেছে। সেখানেও সুরের ঝঙ্কার। সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি—এই স্বরগ্রামও প্রকৃতি হইতেই (পশুপক্ষীর ডাক হইতে) উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া সঙ্গীতজ্ঞগণ বিশ্বাস করেন। মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি অনুভব করিলেন—"সর্বমোঙ্কার এব" (মাণ্ডুক্য উপনিষদ্)। অর্থাৎ প্রণবমন্ত্র ওঙ্কার হইতে এই বিশ্বচরাচর সৃষ্ট হইয়াছে। এই সৃষ্টির আদিতে এক, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, অখণ্ড-অনাদি-অনন্ত, অবিকারী, একরস, চিদানন্দ ব্রহ্মরূপ সদ্বস্তু ব্যতীত কিছুই ছিল না। তাই তো ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হইয়াছে—"সদেব সোম্য ইদমগ্র-আসীত।" কেমন সেই নাম-রূপাতীত সদ্-চিদ্-আনন্দ অবস্থা? উপনিষদ্ বলিতেছেন—"যৎ তদ্ অদ্রেশ্যম্, অগ্রাহ্যম্, অগোত্রম্, অবর্ণম্, অচক্ষুঃশ্রোত্রং তদ্ অপাণিপাদম্।" যাহাকে দেখা যায় না, যাহা ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য নহে, যাহার গোত্র নাই অর্থাৎ জন্মমৃত্যু নাই, যাহা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি বর্ণের অতীত, যাহার চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ কিছুই নাই, যাহা নিত্য আনন্দময়—সেই ওঙ্কার প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবস্তু হইতে এই জগৎ-চরাচরের সৃষ্টি কিরূপে হইয়াছে? পূর্বোক্ত সেই প্রণব-মন্ত্র অবলম্বন করিয়াই সৃষ্টিকর্তা মন্ত্রাত্মক বা নাদাত্মক এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন। আরোহণ মার্গে সাধক আবার সেই প্রণব-মন্ত্রকে অবলম্বন করিয়াই ইন্দ্রিয়াতীত, বাক্য-মনাতীত স্বধামে গমন করিয়া থাকেন। মন্ত্রের প্রয়োগ স্বর বা শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া হইয়া থাকে। এই স্বরপ্রয়োগ ঋষিগণ বৈদিক যুগেই শুরু করিয়াছিলেন। সেই স্বর বা শ্রুতি প্রয়োগকৌশল পাণিনীয় ব্যাকরণ সূত্রে বিধৃত রহিয়াছে। "উচ্চৈরুদাত্তঃ, নীচৈরনুদাত্তঃ, সমাহারঃ-স্বরিতঃ।" অর্থাৎ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত—এই তিনটি

শ্রুতিকে প্রয়োগ করিয়া বেদমন্ত্র উচ্চারিত হয়। সাঙ্গীতিক পরিভাষায় ইহারা সেই বিখ্যাত 'ত্রয়ী'—মন্দ্র-কোমল-নিষাদ, ষড়জ এবং কোমল ঋষভ। অর্থাৎ স্বরপ্রয়োগ বা সুরপ্রয়োগ অধ্যাত্মজীবনের একটি অপরিহার্য পন্থারূপে চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার সহিত আছে 'ছন্দ'। গোটা বিশ্বচরাচর যে এক অদ্ভুত নিগূঢ় ছন্দে ছন্দে চলিয়াছে তাহা বাস্তবিক ধ্যানগম্য।—"তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম/ নৃত্যের তালে তালে নটরাজ।" নটরাজের সেই নৃত্যের ছন্দে এই ব্রহ্মাণ্ড হেলিতেছে, দুলিতেছে।

পুরাণাদি গ্রন্থে সাধক সুরের প্রসাদে আপ্লুত হইয়াছেন—দেখিতে পাই। গন্ধর্ববিদ্যায় পারদর্শী হইবার প্রথম শর্তই হইল সুর-তাল-ছন্দের জ্ঞান। বৈদিক যুগেও ঋগ্বেদের মন্ত্র সুর সহযোগে উচ্চারিত হইত। তখন উহাই হইত সামবেদ। সনাতন সামবেদীয় মন্ত্রোচ্চারণ অদ্যাবধি ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মস্থানে শুনা যায়। স্বামী বিবেকানন্দ একদা সিন্ধু নদের তীরে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে এক ঋষির দর্শন পাইয়াছিলেন; গায়ত্রীমন্ত্র এক রোমাঞ্চকর সুরে সেই ঋষি আবৃত্তি করিতেছিলেন। তখন স্বামীজী বুঝিয়াছিলেন, এই সুর কেবলমাত্র বস্তুজগৎ-নির্ভর কতকগুলি জড়পদার্থের কম্পনমাত্র নহে, পরন্তু ইহা অনাদিতে সৃষ্টির একটি আধ্যাত্মিক রূপ বিশেষ। ইহা এক অনির্বচনীয় শক্তি। এই শক্তিই মাতৃরূপে পূজিতা—'ভুবন ভুলানো মা হরমোহিনী'। এই শ্রুতিরূপেই নাদাত্মক বিশ্ব-চরাচরের শাশ্বত অস্তিত্ব।

মহামায়া জগজ্জননীর বন্দনা করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন ঃ "ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং হি বষট্‌কারঃ স্বরাত্মিকা" (শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১ম অধ্যায়)। অর্থাৎ হে দেবি, আপনিই উদাত্ত-অনুদাত্ত, স্বরিত-রূপিণী স্বর-স্বরূপা—স্বরাত্মিকা। দেবী চণ্ডিকাই কখনো শ্রুতিমধুর নাদরূপিণী হইয়া ভক্তের আনন্দবিধান করেন, কখনো তিনি শত্রুগণের ভীতিসঞ্চারকারী মহা অট্টহাস্যময়ী শিবদূতী! (ঐ, ৯ম অধ্যায়) অর্থাৎ সঙ্গীতে নিহিত শক্তি কখনো হইয়া উঠে প্রলয়ঙ্করী। কখনো বা জগৎপালনকর্ত্রী। যখন মহামায়া স্বয়ং বলিতেছেন ঃ "ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি/ তদাতদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরিসংক্ষয়ম্‌" (ঐ, ১১শ অধ্যায়), তখন তাঁর দুইটি রূপ একত্রে প্রতিভাসিত হইয়া উঠে। একটি 'অরি-সংক্ষয়ম্‌'—শত্রুনিধনকারিণী, অপরটি ভক্তরক্ষাকারিণী। নেতিবাচক এবং ইতিবাচক উভয় ঘটনার একত্র সম্মিলন। পরেই ঋষি বলিতেছেন ঃ "এবং ভগবতী দেবী সা নিত্যাপি পুনঃ পুনঃ/ সম্ভূয় কুরুতে ভূপঃ জগতঃ পরিপালনম্‌।।" (ঐ, ১২শ অধ্যায়) জগতের পরিপালনের জন্য 'নিত্যা' দেবীর পুনঃপুনঃ আগমন। জগৎ কোথায়? সাধকের জগৎ সাধকের অন্তরে। সঙ্গীতরূপিণী দেবী একদিকে সাধকের অন্তরের অধ্যাত্মশক্তিকে যেমন জাগরিত করিয়া তুলেন, অপরদিকে 'দানবোত্থা ভবিষ্যতি'—অন্তরের ষড়্‌রিপু, স্বার্থপরতাদি দানবকে নিধন করিবারও ব্যবস্থা করেন। ইহাই সঙ্গীতের দ্বৈত-ভূমিকা।

গানটির নবম পঙ্‌ক্তিতে নন্দকুমার গাহিয়াছেন—"মহামায়া মোহপাশে বদ্ধ কর অনায়াসে"। সঙ্গীতকে যেমন 'ঈশ্বরের পদচিহ্ন' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তেমনি ইহা সাধককে বিচিত্র মোহপাশে আবদ্ধ করিয়াও ফেলিতে পারে। অর্থাৎ গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া সাধক পথ হারাইতে পারে। কেমন করিয়া ইহা ঘটে? সঙ্গীতের সাত্ত্বিক দিকটি, ঈশ্বরময় দিকটি যদি ক্রমশ অবহেলিত হইতে থাকে, তাহা হইলে অসুরপ্রকৃতি অর্থাৎ তমঃপ্রধান বা রজঃপ্রধান মানুষের মধ্যে সুরের প্রভাবে কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, হিংসা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অথচ সেই শক্তিই রাগ-রাগিণীরূপে সাধকের অন্তরে কল্যাণপ্রদায়িনী, রক্ষাকর্ত্রীরূপে বিরাজমানা। যে-শক্তি শুম্ভ-নিশুম্ভ-চণ্ড-মুণ্ড-মহিষাসুর-দলনী, তিনিই কখনো সাত্ত্বিক সুরসাধকের অন্তরে কাম-ক্রোধাদি রিপুদলদলনীরূপে আবির্ভূতা, কখনো তামসিক সাধকের অন্তরে অসুরবৃত্তির প্রসারণকারিণী মহামায়া। এই অঘটনঘটনপটীয়সী আদ্যাশক্তিই একদিকে মানুষের কুণ্ডলিনী শক্তিরূপে বিরাজিতা, অপরদিকে তিনিই আবার—*'বীণাবাদ্য বিনোদিনী'*, অর্থাৎ মহাপদ্মে উপবিষ্টা স্বমহিমায় প্রোজ্জ্বল দিব্যসুরস্রাবী মহাসরস্বতী। কখনো *ভৈরব*-রূপে, কখনো *শ্রীরাগ*-রূপে, কখনো *মল্লার,* কখনো *বসন্ত,* কখনো *হিন্দোল* কিংবা কখনো *কর্ণাটক* (কর্ণাটী)-রূপে সাধকের দেহাভ্যন্তরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় তাঁহারই প্রকাশ। [গানের বাণীর জন্য কার্তিক ১৪০৮ সংখ্যার 'কথাপ্রসঙ্গে' দ্রষ্টব্য]

সপ্তভূমির আদি মূলাধারে এই শক্তি ভৈরবাকার। শিবের মূর্তি। সাঙ্গীতিক পরিভাষায় *ভৈরব* রাগ (কোমল



ঋষভ, কোমল ধৈবত) গাহিবার সময়কাল উষা। তাহার গাম্ভীর্য, তাহার শান্ত-সৌম্য গায়কীর মধ্যে যেন ধীরে ধীরে মহাদেবের ধ্যানমগ্ন রূপটি ফুটিয়া উঠে। ঐ পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয়ার্ধে কবি বলিতেছেন—*"ষড়্‌দলে শ্রীরাগ আর"*। অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠানচক্রে ষড়্‌দলপদ্ম। ঐ ষড়্‌দলপদ্মে দেবী শ্রীরাগরূপধারিণী। শ্রীরাগে তীব্রমধ্যমের প্রাধান্য। উহা যেন সৃষ্টিধর্মী তীব্র কামনার দ্যোতক। নাভিদেশে অর্থাৎ *"মণিপুরেতে মল্লার"*। এখানে অষ্টদলপদ্ম। অনাহত চক্র হৃদয়ে। ঠাকুর বলিতেন—হৃদয় (ধ্যানের) 'ডঙ্কাপেটা' জায়গা। হৃদয়ে দ্বাদশদল পদ্মে দেবী উপবিষ্টা। *"বসন্তে হৃদ্‌প্রকাশিনি"*। বসন্ত রাগে দেবীর প্রকাশ হৃদয়ে। বসন্ত রাগের মধ্যে একটা অন্তর্মুখিনতা যেমন রহিয়াছে, শুদ্ধ এবং তীব্রমধ্যমের প্রয়োগে একটি বহির্মুখিনতাও বিদ্যমান। ইহা যেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়—'সাকার-নিরাকারের মধ্যে বাচ্‌ খেলিবার স্থান'। সেই দেবী *হিন্দোল* রাগরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন বিশুদ্ধচক্রে অর্থাৎ কণ্ঠে। এখানে ষোড়শদল পদ্ম। হিন্দোলের সুরমাধুর্যে অনন্তের হাতছানি। যেন ক্রমশ সীমা হইতে সাধকের অসীমে উত্তরণ ঘটিতেছে। অবশেষে আজ্ঞাচক্রে অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে দ্বিদল পদ্মে দেবী *কর্ণাটক* (কর্ণাটী) রাগরূপধারিণী।

ইহার পর সাধক নন্দকুমার বলিতেছেন—দেবী *"তাল-মান-লয়-সুরে ত্রিসপ্ত সুরভেদিনী"*। সঙ্গীত পূর্ণতার দিকে সাধককে লইয়া যায়। ভাবপ্রধান সঙ্গীতে তাল-মান-লয়-সুরের বিচ্যুতি ঘটিতে পারে—এই কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা অন্যরূপ। তাল-মান-লয়-সুরের কোনরূপ অপূর্ণতা সাধককে কেবল ভাব-সহায়ে পূর্ণতার দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইবে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সে-কথার প্রমাণ নাই। এমনকি ভাব-সমাহিত অবস্থায়ও যখন ঠাকুর কোনরূপ বেতাল, বেসুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন, বেদনায় তাঁহার মুখ বিকৃত হইত। দেওয়ান নন্দকুমারও একই আশঙ্কা করিয়া বলিলেন—দেবী তখনি *ত্রি-সপ্ত সুরভেদিনী* (স্বরগ্রামকে অতিক্রম করিয়া অসীমের পথযাত্রী) হইবেন যখন সাধক *তাল-মান-লয়-সুরে* সঙ্গীত পরিবেশন করিবেন। [প্রসঙ্গত 'মান' শব্দের আধুনিক পরিভাষা scanning অর্থাৎ শ্রুতির উপর গানের বাণী বা শব্দের যে বিন্যাস তাহাই মান।] ❑

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

লেখক-লেখিকাদের জ্ঞাতব্য বিষয় :

১। 'উদ্বোধন' পত্রিকার লেখার বিষয়—ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, সমাজদর্শন, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প, ক্রীড়া, স্বাস্থ্য ইত্যাদি। উপন্যাস বিবেচিত হয় না।
২। লেখা ইতিবাচক হওয়া চাই, আক্রমণাত্মক নয়।
৩। কবিতা, পত্র ছোট বা সংক্ষিপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।
৪। **শারদীয়া সংখ্যার জন্য ৩১ মার্চের মধ্যে** লেখা পাঠাবেন।
৫। লেখার সঙ্গে উপযুক্ত ছবি (গ্লসি প্রিন্ট) পাঠালে ভাল হয়।
৬। উচ্চমানের কোন লেখা ব্যতীত পূর্বে প্রকাশিত কোন লেখা গ্রাহ্য হবে না। 'মাধুকরী' বিভাগেই কেবলমাত্র ঐধরনের লেখা প্রকাশিতব্য।
৭। জেরক্স বা কার্বন কপি গ্রাহ্য নয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব হবে না। পরিষ্কার হস্তাক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠে লিখবেন। শব্দসংখ্যা ২,৫০০-এর কম। নাম, ঠিকানা, ফোন নং দেবেন।
৮। **একই লেখা দু-তিন জায়গায় পাঠাবেন না**। এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠাবেন।
৯। লেখার মাধ্যমে লেখক-লেখিকার মতামত প্রকাশ পায়। তবে ঐ মতামত আমাদের অনুমোদিত নাও হতে পারে। মতামত প্রকাশের দায়িত্ব সম্পূর্ণ লেখক-লেখিকাদের। লেখার মধ্যে কোন উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকা চাই। গ্রন্থের নাম, সংস্করণ, পৃষ্ঠা, গ্রন্থকার, প্রকাশক ইত্যাদির উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।
১০। রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত/পরিবর্ধিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

গ্রন্থ-পরিচয় বিভাগ

১। গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য কমপক্ষে **দু-কপি** বই পাঠাবেন।
২। দুবছরের মধ্যে সমালোচনা না ছাপা হলে বুঝতে হবে মনোনীত হয়নি।

সংবাদ ইত্যাদি

১। অনুষ্ঠানাদির সংবাদ অনুষ্ঠানের **১৫ দিনের মধ্যে** আমাদের হাতে আসা চাই। বিবরণ সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।
২। পত্রোত্তরের জন্য স্বনামাঙ্কিত ও স-ডাকটিকিট খাম বা পোস্টকার্ড পাঠাবেন।

গ্রাহকভুক্তি

১। ব্যক্তিগত উদ্যোগে অথবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাঁরা আমাদের অনুমোদিত গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্ররূপে গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চান তাঁদের লিখিতভাবে সম্পাদকের কাছে আবেদন করতে হবে। কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগৃহীত হলে 'উদ্বোধন'-এ ব্যক্তির/ কেন্দ্রের নাম-ঠিকানা প্রকাশিত হবে।
২। ব্যক্তিগত উদ্যোগে যাঁরা গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চান তাঁদের আবেদন-পত্র স্থানীয় মঠ-মিশন বা ভাবপ্রচার পরিষদের অধীন প্রাইভেট কেন্দ্রের প্রধানের অনুমোদিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রাহক-সংগ্রহ করতে চাইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক/ সভাপতিকে আবেদন করতে হবে।

সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে যেসকল তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৩৫৯ সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। আশা করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।—সম্পাদক

দি ইন্ডিয়ান মিরর, ১৯ আগস্ট ১৮৮৬

দক্ষিণেশ্বরের অতি সম্মানিত রামকৃষ্ণ পরমহংস, যিনি গত কয়েক মাস যাবৎ গলায় ক্ষতের কারণে কষ্ট পাচ্ছিলেন, গত রবিবার ১৫ আগস্ট বেলা এক ঘটিকায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। গলার অসুখে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু কেউ ভাবেনি যে এত শীঘ্র তিনি চলে যাবেন। ঐদিন সন্ধ্যায় তিনি আগের মতোই আহারের পর শয্যায় শয়ন করেছিলেন। তাঁর সেবকদের একটি গানে জেগে উঠে তাঁদের গানে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণ পরে তাঁর গলার স্বর শুনতে না পেয়ে সেবকরা ভেবেছিলেন যে, আগের মতো সমাধিস্থ হয়েছেন। কিন্তু অন্যবারের তুলনায় সমাধি অবস্থা অধিকক্ষণ চলতে থাকায় তাঁরা তাঁর গায়ে হাত দিয়ে এবং নাড়ি পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন যে, তিনি চিরনিদ্রায় অভিভূত হয়েছেন। ঐদিনই ডাক্তার এলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর অসুখ সারবে কিনা, কিন্তু ডাক্তারের কাছ থেকে সন্তোষজনক জবাব না পেয়ে তিনি বলেছিলেন যে, যেকোন সময় তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত।

পরের দিন সন্ধ্যায় কাশীপুর শ্মশানঘাটে তাঁর দেহ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। শবযাত্রায় তাঁর বহু ভক্ত, বন্ধু ও যাঁরা তাঁর সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন—সকলেই তাঁকে শেষ দেখার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। হরিনাম সঙ্কীর্তন করতে করতে শোভাযাত্রা ঘাটে এসে পৌঁছালে গঙ্গার ধারে খাটটি নামানো হয় এবং উপস্থিত সকলে শবের চারিদিকে মাটিতে বসে পড়েন। ব্রাহ্মসমাজের গায়ক-যাজক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল যথোপযোগী কয়েকটি গান গাইলেন। গানে উপস্থিত শোকসন্তপ্ত সকলের মন ভারাক্রান্ত হওয়ার পর দেহ চিতায় তোলা হয়। দেড় ঘণ্টার মধ্যেই দেহ ভস্মীভূত হয়ে পড়ে। মাত্র কয়েকটি অস্থি উপযুক্ত স্থানে সমাহিত করার জন্য তুলে রাখা হয়েছিল। *(ইংরেজী থেকে অনূদিত)*

*

সুলভ সমাচার ও কুশদহ, ২৭ আগস্ট ১৮৮৬

...আমরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিয়া যাহা দেখিয়াছি, তাহা নিম্নে অবিকল লিখিলাম।

গত সোমবার (২৩ আগস্ট ১৮৮৬) প্রাতে নয়টার সময় সিমুলিয়া স্ট্রীটের ১৩নং ভবন হইতে সঙ্কীর্তন-সহ অনেকগুলি ভদ্রলোক স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অস্থিপূর্ণ তাম্রকলস লইয়া সমাদরের সহিত বাহির হইলেন, দলে অনুমান পঞ্চাশজন ভদ্রলোক ছিলেন। অগ্রে খোল-করতাল-শিঙ্গা-সহ বিডন স্ট্রীট থিয়েটারের কয়েকজন অভিনেতার একটি সঙ্কীর্তনের দল, তৎপরে কতকগুলি সৌখিন যুবক পাখোয়াজের সহিত একটি নবরচিত সঙ্গীত করিতে করিতে চলিলেন। পরমহংস মহাশয়ের শিষ্যেরা ক্রমান্বয়ে উক্ত কলসটি মস্তকে করিয়া চলিতে লাগিলেন। ফুলের মালায় কলসটি সুসজ্জিত করা হইয়াছিল, উপরে বহুমূল্য ছত্র ধরা হইয়াছিল, পার্শ্বে আড়ানী যোগে বাতাস করা হইতেছিল, দুইদিক হইতে চামর ব্যজন করা হইতেছিল, সর্বপশ্চাতে নববিধানের প্রচারকদ্বয় অবনত মস্তকে গমন করিতেছিলেন। সিমুলিয়া হইতে কাঁকুড়গাছির ৮০ সংখ্যক উদ্যানে পঁহুছিয়া একটি ইষ্টকনির্মিত সমাধিগহ্বরে কলসটি রাখিয়া পুষ্প অর্পণপূর্বক অনেকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। উদ্যানটি পত্র, পুষ্প ও সামিয়ানায় সুশোভিত করা হইয়াছিল। তৎপরে বাবু যদুনাথ মিত্রের উদ্যানে উৎসব হইল।

ধর্মতত্ত্ব, ৩১ আগস্ট ১৮৮৬

সংবাদ।—ভাদ্রোৎসবের [৭ই ভাদ্র] পূর্ব... বৃহস্পতিবার দিন মন্দিরে সন্ধ্যার পর ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল স্বর্গগত পরমহংসদেবের জীবনী বিষয় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সেদিন দেবালয়ে পূর্বাহ্নে ৭টা হইতে পরমহংস সম্বন্ধে বিশেষভাবে উপাসনা প্রার্থনাদি হইয়াছিল। প্রেরিত বর্গসকলে বিনামাবর্জন ও হবিষ্যান্ন করিয়া বিশেষভাবে সেই দিন যাপন করিয়াছিলেন।

১লা ভাদ্র সোমবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় কাশীপুরস্থ গোপালবাবুর বাগানবাটী হইতে পরমহংসদেবের দেহ বরানগরের শবদেহ ঘাটে নীত হয়। কলিকাতা হইতে একশত, দেড়শত লোক যাইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন। একটি নূতন খট্টার উপর বিচিত্র শয্যা স্থাপিত ছিল, পুষ্পগুচ্ছ ও পুষ্পমালায় খাটখানা বেশ সাজানো হইয়াছিল। নূতন গৈরিক আচ্ছাদন ও পুষ্পমালা দ্বারা শবের শোভা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরমহংসের শিষ্যবৃন্দ ও বন্ধুবর্গ ভক্তিসহকারে পদধারণপূর্বক প্রণাম করিয়া খট্টা বহনপূর্বক হরিধ্বনি করিতে করিতে উদ্যানপ্রাঙ্গণ হইতে বাহির হন। একদল বৈষ্ণব মৃদঙ্গ করতাল-সহ সঙ্কীর্তন করিয়া অগ্রে অগ্রে গমন করে। কলিকাতা হইতে ডাক্তার গোপালচন্দ্র বসু, বাবু রাজমোহন বসু ও কালিদাস সরকার প্রভৃতি অনেক বিধানবাদী ব্রাহ্ম এবং ভাই অমৃতলাল বসু, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ও গিরিশচন্দ্র সেন এবং প্রাণকৃষ্ণ দত্ত—এই চারিজন বিধানপ্রচারক শবের সঙ্গে ঘাট পর্যন্ত যাইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের ত্রিশূল ও ওঁকার, বুদ্ধধর্মের খুন্তি, মোহম্মদীয় ধর্মে অর্ধচন্দ্র, খ্রীস্টধর্মের ক্রুশচিহ্নিত পতাকা সর্বাগ্রে বাহিত হইয়াছিল। ঘাটে খট্টা স্থাপন করিয়া কিয়ৎক্ষণ দেহকে প্রদক্ষিণপূর্বক সঙ্কীর্তন হয়। পরে সঙ্গীতপ্রচারক ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল কোন কোন বন্ধু কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তৎসময়োপযোগী ৩।৪টি সঙ্গীত করেন। তাঁহার সুললিত কণ্ঠের সঙ্গীত পরমহংসদেব বড়ই আদর করিতেন। অবশেষে শ্মশানে তাঁহার পবিত্র দেহের পার্শ্বে বসিয়াও ভাই ত্রৈলোক্যনাথকে সঙ্গীত করিতে হইল। [এই প্রসঙ্গে আরো তথ্যের জন্য ৯৩৩ পৃষ্ঠায় 'প্রাসঙ্গিকী' দ্রষ্টব্য।—সম্পাদক]

সঙ্কলন ও অনুবাদ ❑ জলধিকুমার সরকার

সম্পাদনা ❑ স্বামী সর্বগানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দের তিনটি পত্র

ভগিনী ক্রিস্টিনকে লিখিত



॥১॥

(মূল ইংরেজী থেকে অনূদিত)

২২৮ ডব্লু থার্টিনাইন্থ স্ট্রীট
নিউ ইয়র্ক
১০ ডিসেম্বর ১৮৯৫

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

সম্ভবত এতদিনে তুমি আমার প্রথম চিঠিখানি পেয়েছ। তোমার চিঠিটি আমি এইমাত্র পেলাম।

ইংল্যাণ্ডে আমি চমৎকার সাফল্যলাভ করেছি এবং সেখানে একটি কেন্দ্রীয় গোষ্ঠী রেখে এসেছি; আগামী গ্রীষ্মে পুনর্বার আমার না যাওয়া পর্যন্ত তারা কাজটা চালিয়ে নিয়ে যাবে। তুমি জেনে অবাক হবে, আমার কয়েকজন ঘনিষ্ঠতম বন্ধু চার্চ অফ ইংল্যাণ্ডের কর্তাব্যক্তি।

এবারের বড়দিনে ২৪ ডিসেম্বর থেকে এক সপ্তাহের জন্য আমি মিঃ ও মিসেস লেগেটের সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে যাচ্ছি। তারপর আবার আমার কাজ শুরু করব। ইতিমধ্যে ক্লাসগুলি আরম্ভ হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে একবার ডেট্রয়েট ও শিকাগোর মধ্য দিয়ে চট্ করে ঘুরে আবার এখানে ফিরে আসার অভিপ্রায়ের কথা তোমাকে লিখেছিলাম।

মিসেস ফেল্পস্‌কে আমার ভালবাসা জানিও এবং দয়া করে তাঁর সঙ্গে মিলে [ডেট্রয়েটে] ক্লাসগুলির ব্যবস্থা করো। সবচেয়ে ভাল হয় যদি একটি জনসভার ব্যবস্থা করতে পার—যেখানে আমি আমার কাজের সাধারণ পরিকল্পনা প্রকাশ করতে সক্ষম হব। ইউনিটারিয়ান চার্চটি হয়তো পাওয়া যাবে, আর যদি প্রবেশমূল্য না নিয়ে বক্তৃতা করা হয়, তবে এক বিরাট সমাবেশ হবে। খুব সম্ভবত দানের সংগ্রহ থেকেই খরচটা কুলিয়ে যাবে। তারপর তা থেকে বড়সড় ক্লাসের রসদ আমরা পেয়ে যাব এবং তারপর তাদের সামনে এগিয়ে দিয়ে মিসেস ফেল্পস্‌কে, তোমাকে ও মিসেস ফাঙ্কিকে তাদের সঙ্গে মিলে কাজ করার জন্য রেখে আসব।

এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব এবং মিসেস ফেল্পস্ ও মিসেস ব্যাগলি যদি চান তবে তাঁরা সেকাজ অত্যন্ত দ্রুত কার্যকরী করতে পারেন।

ভালবাসা ও আশীর্বাদ-সহ চিরদিন তোমাদের
বিবেকানন্দ

।।২।।
(মূল ইংরেজী থেকে অনূদিত)

প্রিন্স রিজেন্ট লুইপোল্ড জাহাজ
৩ জানুয়ারি ১৮৯৭

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

বেলা দুটো নাগাদ পোর্ট সৈয়দে পৌঁছে যাচ্ছি। আবার এশিয়া। অনেকদিন তোমার কাছ থেকে কোন চিঠি পাইনি। আশা করি তোমার সব খবর শুভ। মিসেস ফাঙ্কি, মিসেস ফেল্পস্ এবং অন্য সব বন্ধুরা কেমন আছেন? সকলকে আমার ভালবাসা জানিও। যখন চিঠি লেখার মতো মনের অবস্থা হবে তখন লিখ।

সকল ভালবাসা-সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

।।৩।।
(মূল ইংরেজী থেকে অনূদিত)

দার্জিলিং
উত্তর দেওয়ার ঠিকানা ঃ
আলমবাজার মঠ, কলকাতা
১৬ মার্চ ১৮৯৭

প্রিয় ক্রিস্টিনা,

ফটো এবং কবিতাটির জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এমনকি এর অর্ধেক সুন্দরও কিছু দেখিনি। সিংহল [শ্রীলঙ্কা] থেকে কলকাতায় পৌঁছেই আমাকে এত বেশি কাজ করতে হয়েছিল যে, এর আগে তোমার মহামূল্য উপহারের প্রাপ্তিস্বীকার করতে পারিনি। এই কাজের চাপ আমার স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে দিয়েছে এবং দেখা দিয়েছে দুরারোগ্য বহুমূত্র ব্যাধি—যা আর কয়েক বছরের মধ্যে নিশ্চয়ই আমার পরমায়ু শেষ করে দেবে।

কলকাতার নিকটতম শৈলাবাস দার্জিলিং থেকে এখন তোমাকে লিখছি; এখানে লণ্ডনের মতো ঠাণ্ডা আবহাওয়া। এই আবহাওয়াতে হৃতস্বাস্থ্যের কিছুটা পুনরুদ্ধার হয়েছে। যদি বেঁচে থাকি, তবে হয়তো আগামী বছর বা তার কাছাকাছি কোন সময়ে আমেরিকায় যাব।

তোমাদের সকলের খবর কি? মিসেস ফাঙ্কি ও মিসেস ফেল্পস্ কেমন আছেন?

তোমার সুযোগমতো কিছু কিছু ডলার সঞ্চয় করে রাখছ তো? ওটা খুবই জরুরী।

ডাক চলে যাবে বলে আমি তড়িঘড়ি করে লিখছি। তুমি জেনে খুশি হবে যে, ভারতীয়রা আমাকে সম্মানিত করার জন্য যেন একযোগে জেগে উঠেছে। আমিই আজকের দিনের বরেণ্য ব্যক্তি। আমার সংবর্ধনায় যেসকল ভাষণ দেওয়া হয়েছে এবং তার উত্তরে আমার অভিভাষণগুলিকে একত্রিত করে গুডউইন একটি পুস্তক আকারে ছাপাতে চলেছে। সর্বত্রই মানুষের মধ্যে এক অভূতপূর্ব সাড়া জেগেছে।

সকল ভালবাসা-সহ তোমাদের
বিবেকানন্দ

গীতার শক্তি ও মনোহারিত্ব

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

পূর্বানুবৃত্তি

এই আলোচনাটি দুর্গাপদ ঘোষ প্রমুখ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক



আমেরিকা কি পতনের পথে?
এবং
কিভাবে তা এড়ানো সম্ভব?

১৯৭১-১৯৭২ সালে দীর্ঘ আমেরিকা ভ্রমণকালে আমার হাতে এল ১৯ জুলাই ১৯৭১-র 'টাইম' (একটি আমেরিকান সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রিকা), যার 'American Notes' শীর্ষক বিভাগে 'Of the U.S. and Rome' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল এই প্রতিবেদনটি—"ভাবলে অবাক হতে হয়, কিভাবে রোম ইন্টারভেন্সানিস্টদের সম্বন্ধে আমেরিকার কল্পিত ভয়কে জাগিয়ে রেখে চলেছে এবং 'ঠাণ্ডা যুদ্ধে'র যোদ্ধারা সেই প্রাচীন সাম্রাজ্যের দৃষ্টান্ত তুলে ধরছে—যাকে বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠা করতে আমেরিকাকে নাকি এগিয়ে আসতেই হবে। অন্যদিকে, রোমের প্রসঙ্গ তুলছে তারাও—যারা পশ্চিমের পতন লক্ষ্য করছে প্রত্যেক দীর্ঘকেশ মস্তকে এবং প্রত্যেক মাদকপ্রবণতায়। ক্যানসাস সিটিতে উত্তর-পশ্চিম সংবাদ-সম্পাদকের কাছে কথা বলার সময় প্রেসিডেন্ট নিক্সন ওয়াশিংটনের ফেডারেল বিল্ডিংগুলির উল্লেখ করেন এবং বলেন ঃ

'এই পিলারগুলো দেখে কখনো কখনো ভাবি, এদের দেখেছি গ্রীসের অ্যাক্রোপলিসে[১]; দেখেছি রোমের ফোরামেও[২]—বিশাল, দৈত্যকায় পিলার সব; আর দু-জায়গাতেই আমি এদের পাশ দিয়ে হেঁটেছি, রাত্রে। মনে মনে ভাবি, গ্রীস আর রোমের কী হয়েছিল... দেখুন, আজ পড়ে আছে শুধু ঐ পিলারগুলো। আসলে যেটা ঘটেছে তা হলো, অতীতের বিরাট বিরাট সভ্যতাগুলো যখন সম্পদশালী হয়ে উঠেছে, যখন তাদের বেঁচে থাকার, উন্নতি করার ইচ্ছা চলে গেছে, তখন তারা অবক্ষয়ের শিকার হয়ে পড়েছে; আর তাতেই সেসব সভ্যতা একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। আমেরিকা এখন ক্রমশ সেই পর্যায়ে পৌঁছাচ্ছে।'

"নিশ্চিত হওয়ার জন্য নিক্সন তাড়াতাড়ি তাঁর ভরসা ও বিশ্বাস ব্যক্ত করেন এই বলে যে, নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য প্রয়োজনীয় 'জীবনীশক্তি, সাহস ও বল' এ-জাতির আছে। এই উচ্চকিত মন্তব্য সত্ত্বেও সব মিলিয়ে প্রভাবটি দাঁড়িয়েছিল তাৎক্ষণিক স্পেংলারিজমের[৩]।"

১৯৬৮-১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে আমার আমেরিকা সফরের সময় সেদেশের সুপরিচিত ডুড্‌ল্ লেখক রজার প্রাইসের একটা বই হাতে এল, যার নাম বেশ চোখে পড়ার মতো ঃ 'ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল বাই গিবন অ্যাণ্ড রজার প্রাইস'। বিখ্যাত বই 'দি ডিক্লাইন অ্যাণ্ড ফল অফ দি রোমান এম্পায়ার'-এর লেখকের নামটি যে প্রাইস তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছেন তার কারণ শুধু এই নয় যে, প্রাচীন রোম ও তাঁর স্বদেশ আমেরিকার অধঃপতনের মধ্যে তিনি একটি সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। তার অন্য একটি কারণ—রোমের অধোগতি সম্বন্ধে গিবনের বই থেকে তিনি উপযুক্ত একটি অংশ উদ্ধৃত করেছেন তাঁর বইয়ের বাঁদিকের পাতায়, আর ডানদিকের পাতায় দিয়েছেন তুলনামূলক দৃষ্টান্তবাহী অনুরূপ এক স্বনির্বাচিত চিত্র—সমসাময়িক আমেরিকান জীবন প্রসঙ্গে।

বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার—তার মধ্যে সাধারণভাবে বলতে গেলে ইউরোপীয়, আর বিশেষভাবে বলতে গেলে আমেরিকান সভ্যতার—একটা স্বকীয় মহত্ত্ব আছে। এই পাশ্চাত্য সভ্যতার কোনরকম অবক্ষয় হলে তা হবে মানবতার বিরাট বড় এক ক্ষতি। আমি নিশ্চিত যে, এটি প্রতিহত হবে সংস্কৃতিগুলির পারস্পরিক আদান-প্রদান, মিলন ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে—যেমনটি ঘটে চলেছে বর্তমান ভারতবর্ষে, এবং আধুনিক ভারতকে বিবেকানন্দ যেমনভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। আমেরিকাতেই উনিশ

১ নগরীর দুর্গ-সমন্বিত সুরক্ষিত অংশ। ২ নাগরিক সভা-সমাবেশের স্থল।

৩ স্পেংলারিজম—অর্থাৎ স্পেংলার (Spengler)-এর মতবাদ। পূজ্যপাদ মহারাজজী এই মতবাদটির উল্লেখ করেছেন আগেই (দ্রঃ 'উদ্বোধন', কার্তিক ১৪০৮, পৃঃ ৮২৭) এবং বর্তমান প্রসঙ্গের শেষাংশেও।—অনুবাদক

শতকে ঘটে গেছে অতীন্দ্রিয়বাদী (ট্রান্সেনডেন্টালিস্ট) আন্দোলন, যা আমেরিকান সংস্কৃতিকে দিতে চেয়েছে অধ্যাত্মমুখী এক দিশা। সেটিই আরো শক্তিশালী প্রকাশ খুঁজে পেয়েছিল র‍্যাল্ফ ওয়াল্ডো এমার্সন, হেনরি ডেভিড থোরো এবং ওয়াল্ট হুইটম্যান-এর মধ্যে। লণ্ডন ছেড়ে আমেরিকা ফিরে আসার সময় এমার্সন ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবী কার্লাইলের কাছ থেকে পেলেন একখানি গীতা—যার সম্বন্ধে আমরা বর্তমান বক্তৃতাগুলিতে[৪] অধ্যয়ন করছি। গ্রন্থটি পেয়ে এমার্সন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধগুলি অন্যরকম ভঙ্গি ও মেজাজে লিখতে আরম্ভ করলেন; সেগুলিতে লক্ষ্য করা গেল গীতার ধ্যানধারণার সুস্পষ্ট প্রতিফলন।

'লাইফ অফ বিবেকানন্দ'-তে রোমাঁ রোলাঁ এই মন্তব্যটি করেছেন (পৃঃ ৫২-৫৩):

"জুলাই ১৮৪৬-এ এমার্সন লিখছেন যে, থোরো তাঁর কাছে স্বলিখিত 'এ উইক অন দ্য কনকর্ড অ্যাণ্ড মেরিম্যাক রিভার্স' থেকে কিছু কিছু পড়ে শোনাচ্ছেন। এখন এই কাজটি (সেকসান, মানডে) হলো গীতা এবং সেইসঙ্গে ভারতের অন্যান্য মহান কাব্য ও দর্শনের এক সোৎসাহ প্রশংসা।

"ভারতীয় চিন্তাভাবনা নিশ্চয়ই এমার্সনের মধ্যে জোরালো আবেগের জন্ম দিয়েছিল, যার জন্য ১৮৫৬-তে তিনি গভীরভাবে বৈদান্তিক এক সুন্দর কবিতা লিখলেন, যার নাম 'ব্রহ্ম' (ঐ, পৃঃ ৫৪):

'If the red slayer thinks he slays,
Or if the slain think he is slain,
They know not well the subtle ways
I keep, and pass, and turn again.
Far or forgot to me is near;

Shadow and sunlight are the same;
The vanished gods to me appear;
And one to me are shame and fame.

They reckon ill who leave me out;
When me they fly, I am the wings;
I am the doubter and the doubt,
And I the hymn the Brahmin sings.

The strong gods pine for my abode,
And pine in vain the sacred Seven;
But thou; meek lover of the good!
Find me and turn thy back on heaven.' "[৫]

আমেরিকান অতীন্দ্রিয়বাদী থোরো তাঁর বই 'ওয়াল্ডেন'-এ গীতার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন এইভাবে:

"প্রাতঃকালে আমি আমার বুদ্ধিকে অবগাহন স্নান করাই ভগবদ্গীতার সুবিশাল মহাজাগতিক দর্শনে, যা রচনার পর দেবতাদের বহু বছর কেটে গেছে এবং যার তুলনায় আমাদের আধুনিক পৃথিবী ও তার সাহিত্যকে অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য বলে বোধ হয়।"[৬]

ভৌতবিজ্ঞানের ওপর ভর করে আমেরিকা কিন্তু কেবল জড়বাদেরই বিকাশ ঘটিয়ে চলেছিল। তারপর উনিশ শতকের শেষে এল বিবেকানন্দের বেদান্ত-বিজ্ঞান। শিকাগো ধর্মমহাসভায় এবং তারপর চারবছর ধরে আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের নানা জায়গায় তিনি ব্যাখ্যা করলেন মানবীয় সম্ভাবনার এই বিজ্ঞানকে, যা ঘোষণা করে প্রত্যেক মানুষের অমরত্বকে, তার অন্তরের দেবত্বকে।

স্বামী বিবেকানন্দ 'রাজযোগ'-এর ওপর এক বক্তৃতায় বেদান্তের এক সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিয়েছেন এইভাবে:

"আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য ও অন্তঃ প্রকৃতি বশীভূত করে আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান—এগুলির মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায় দ্বারা এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। এটিই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মত, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ধর্মের গৌণ অঙ্গ মাত্র।"

পাশ্চাত্যে এই বাণী নানারূপে ধীরে ধীরে প্রসারলাভ করছে। আমি নিশ্চিত যে, তৃতীয় সহস্রাব্দের শুরু থেকে ইউরোপীয় ও আমেরিকান সভ্যতাগুলির আধ্যাত্মিক মাত্রালাভের লক্ষ্যে ক্রমিক অগ্রগতি অবশ্যম্ভাবী।

সভ্যতাসমূহের অবক্ষয়-প্রক্রিয়াকেই শঙ্করাচার্য তাঁর মনোবৈজ্ঞানিক চর্চায় তুলে ধরেছেন: "অনুষ্ঠাতৃণাং কামোদ্ভবাৎ হীয়মান-বিবেক-বিজ্ঞান হেতুকেন।" ভাবটি অত্যন্ত সহজ সংস্কৃতে প্রকাশ করেছেন। "যখন দেখা দেয় 'অনুষ্ঠাতৃণাং', যখন নাগরিকদের মধ্যে অত্যধিক 'কাম' জন্ম

---

৪ 'উদ্বোধন'-এ বর্তমানে যে-রচনাটি প্রকাশিত হচ্ছে, সেটি পূজ্যপাদ মহারাজজী কর্তৃক প্রথম ধারাবাহিক ইংরেজী বক্তৃতারূপে প্রদত্ত হয় ১৯৮৮-৯০-তে, হায়দ্রাবাদের রামকৃষ্ণ মঠে এবং গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে তৎকর্তৃক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্পাদিত হয়।—অনুবাদক

৫ কবিতাটির ভাষা ও ছন্দের সৌকর্যের জন্য এটিকে মূল ইংরেজীতেই রেখে দেওয়া হলো। আদ্যন্ত বৈদান্তিক ভাবপূর্ণ কবিতাটিতে কবির প্রত্যয়ী উচ্চারণ: হত্যাকারী যদি ভাবে সে ঘাতক, হত যদি ভাবে সে মৃত—তবে তারা উভয়েই ভ্রান্ত। আমার কাছে কিবা নিকট কিবা দূর; কিবা ছায়া কিবা সূর্যালোক; কিবা নিন্দা কিবা স্তুতি। সপ্ত ঋষি ও দেবতারা আমাকে চায়, আমার জন্য নিষ্ফল ক্রন্দন করে। আমি সংশয়ী, আমিই সংশয়। ব্রাহ্মণ যে স্তুতিগান করেন, আমি সে-ই।—অনুবাদক

৬ দ্রঃ Walden—S. Chand & Co., New Delhi, p. 266

নেয়''; 'কাম' যখন একটি স্তরের ওপর চলে যায়, তখন সমাজে নানা দোষ দেখা দেয় এবং '' 'বিবেক-বিজ্ঞান'-এর পতন শুরু হয়।'' ''ধর্ম হয় পরাভূত''—অভিভূয়মানে ধর্মে—এবং ''যখন অধর্ম বাড়ে''—প্রবর্ধমানে চ অধর্মে। প্রায় সব সমাজেই পরবর্তী কালে এই অবস্থা দেখা দেয়, যদিও তারা সবাই শুরু করে ভালভাবে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন চিন্তাবিদের লেখায়, যেমন স্পেংলার (যার উল্লেখ আগে করেছি), এমনকি আর্নল্ড টয়েনবীর লেখাতেও একটি ভাবনা ঘুরেফিরে আসে; সেটি এই যে, সংস্কৃতি হলো মানবসমাজের প্রাণবন্ত দিক এবং সেটি দুর্বল হয়ে গেলে সভ্যতার শুরু হয় অধঃপতন। স্পেংলারের মতে, সভ্যতা নিজেই পতনের চিহ্নস্বরূপ, আর সংস্কৃতি হলো উন্নতির লক্ষণচিহ্ন। মানুষ যখন চায় আরো আরাম, আরো সুখ, দৈনন্দিন জীবনে আরো যন্ত্র, তখন তার স্নায়ুতন্ত্র উদ্দীপিত হয়ে ওঠে; চাহিদা বাড়ে এবং সভ্যতার পতন শুরু হয়। যখন আমরা কঠোর পরিশ্রম করে জাতিগঠনের সাধনা করি, তখন আমরা থাকি—দার্শনিক ভাষায় যেমন বলা হয়—'হতে থাকা'র পর্বে; সেটিই সংস্কৃতি। আর যখন তৈরি 'হয়ে যাওয়া' শেষ হয়ে গেছে—তখন সেটি সভ্যতা, সেটিই পতনের শুরু। একজন গরিব লোক খুব খেটেখুটে একটা আর্থিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলল। তার ছেলেকে সংগ্রাম করতে হলো না; সে কেবল সেই সম্পদের ওপর বেঁচে রইল, এবং একটা বা দুটো প্রজন্মের মধ্যেই সূচনা হয়ে গেল পতনের। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আর আরামের সবরকম বন্দোবস্তের মধ্যে সংগ্রামের আর কোন প্রয়োজন থাকে না; এবং প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অবস্থিত যে-বীরসত্তা, সে তখন দমবন্ধ হয়ে মারা যায়। সৌভাগ্য একই পরিবারে তিন বা চার পুরুষের বেশি স্থায়ী হয় না। এইভাবে সংস্কৃতি ও সভ্যতা 'হতে থাকা' ও 'হয়ে যাওয়া' পর্বের মধ্য দিয়ে চলে—এই বিশ্লেষণ স্পেংলার ও অন্যান্যদের।

কিভাবে ভারত অনেক অবক্ষয় দেখেছে
কিন্তু এড়িয়ে গেছে মৃত্যু

আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতি এইসমস্ত পর্বের মধ্য দিয়ে গেছে। বৈদিক যুগের কথাই ধরা যাক। মহান সংস্কৃতি সে-সময়ের। তাকে গড়ে তুলতে মানুষকে কী প্রচণ্ড পরিশ্রমই না করতে হয়েছে; কত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে! তখন মানুষের মন ছিল সক্রিয়, সবল, প্রচুর প্রাণশক্তিসম্পন্ন। এটি চলেছিল মহাকাব্যের কাল পর্যন্ত। তারপর এল বিরাট এক ধাক্কা। তিন হাজারের বেশি বছর আগের কুরুক্ষেত্রে সংঘটিত মহাভারতের যুদ্ধ ছিল ভয়ঙ্কর এক ধাক্কা। জাতির শ্রেষ্ঠ অংশভুক্ত মানুষেরা হাজারে হাজারে মারা পড়লেন যুদ্ধে। আমাদের ইতিহাসে সেটিকে এক যুগান্তকারী ঘটনা হিসাবে গণ্য করা হয়। কিছু পরে নতুন শক্তি এল, কিন্তু তারও আবার পতন হয়ে গেল। এইভাবে চলল—যেমন ঢেউ ওঠে আর পড়ে; কিন্তু আমাদের অসাধারণত্ব বা অনন্যতা হলো—যার উল্লেখ আমি আগেই করেছি—আমাদের ক্ষয় হয়, কিন্তু আমরা কখনো বিনষ্ট হই না। কোন নতুন শক্তি আসে এবং আমরা পুনরায় সুস্থ-সতেজ হয়ে উঠি। উনিশ শতকে কতদূর নিচে আমরা নেমে গিয়েছিলাম! সেসময়ের সাহিত্য পড়লে বোঝা যায়, ভারতবর্ষে মানুষের মন কোন্ অধঃপাতে চলে গিয়েছিল। নিজস্ব শক্তি, উদ্যম, সৃজনশীলতা—সব অন্তর্ধান করেছিল; জাতি হিসাবে আমরা অর্ধমৃত হয়ে গিয়েছিলাম। সেই অবস্থার মধ্য থেকে এল প্রচণ্ড এক জাগরণ; এল নতুন অগ্রগতি ও বিকাশ। কী করে সেসব ঘটল? এখানেই আসে মহান একটি ভাব। কেবল যে একজন আধ্যাত্মিক আচার্য দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়ে মানুষকে উন্নীত করেন, তা নয়; কখনো কখনো একটি আন্তঃসাংস্কৃতিক মেলবন্ধনও ঘটে যায়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আমাদের অনেক মূর্খ ধ্যানধারণা নষ্ট করায় কাজে এসেছিল। নতুন নতুন পথ দেখিয়ে তা আমাদের আরো শক্তিশালী করে তুলেছিল। পাশ্চাত্যের মানুষ সেটা না চাইলেও ফলত এমনটাই ঘটেছিল; ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য চিন্তার অনুপ্রবেশ ও সংমিশ্রণ জন্ম দিল এক নবজাগরণের, জন্ম দিল নবশক্তির ও নবযৌবনের। [ক্রমশ] (দশ)

ভাষান্তর : অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য

অনুষ্ঠান-সূচী : পৌষ ১৪০৮

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য : **স্বামী প্রেমানন্দ**
অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী
৮ পৌষ, সোমবার
(২৪ ডিসেম্বর ২০০১)

যীশুখ্রীস্ট
৮ পৌষ, সোমবার
(২৪ ডিসেম্বর ২০০১)

শ্রীমা সারদাদেবী
অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা সপ্তমী
২০ পৌষ, শনিবার
(৫ জানুয়ারি ২০০২)

স্বামী শিবানন্দ
অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী
২৪ পৌষ, বুধবার
(৯ জানুয়ারি ২০০২)

একাদশী-তিথি : ১০, ২৪ পৌষ
বুধবার, বুধবার
(২৬ ডিসেম্বর ২০০১ এবং
৯ জানুয়ারি ২০০২)

পাতঞ্জল-যোগসূত্র

ব্যাখ্যাতা ঃ স্বামী প্রেমেশানন্দ

অনুলিখন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ
সম্পাদনা ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

সাধনপাদ

কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্যনষ্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ।।২২।।

যিনি পরমপদ লাভ করিয়াছেন তাঁহার অজ্ঞান নাশ হইলেও অপরের উহা বর্তমান থাকে।

মন্তব্য ঃ দার্শনিকদের মধ্যে একদল (মহর্ষি কপিল) বলেন, প্রত্যেক জীবই অবিদ্যারহিত হইলে পূর্ণ হইয়া স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করেন। এইরূপ অনন্ত জীব আছেন। আরেকরকম মত আছে, যদি সকল জীবই মূলত এক ব্রহ্মস্বরূপ হয়, তাহা হইলে মুক্তি তো একজন একজন করিয়া হইতে পারে না, এক জীবের মুক্তি হইবামাত্র সকল জীবেরই মুক্তি হইয়া যাইবে। ইহাকে বলে 'একজীববাদ'। কিন্তু মহর্ষি পতঞ্জলি বলিতেছেন, কোন সাধক বিদ্যা ও অবিদ্যার আবরণ দূর করিতে পারিলে অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ হইবে। কিন্তু মায়ার ভিতর যাহারা থাকিবে, তাহারা বদ্ধ অবস্থাই অনুভব করিবে।

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ।।২৩।।

দৃশ্য ও দ্রষ্টার শক্তিদ্বয়ের স্বরূপ উপলব্ধির হেতু সংযোগ।

তস্য হেতুরবিদ্যা।।২৪।।

এই সংযোগের কারণ অবিদ্যা।

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্।।২৫।।

অজ্ঞানের নাশ হইলে পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগ নষ্ট হয়, ইহাই দ্রষ্টার কৈবল্যপদে অবস্থিতি।

মন্তব্য ঃ এইপ্রকার সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? জীবকে এত কষ্ট দিয়া সৃষ্টিকর্তার কি লাভ হয়?

আমরা জগৎকে বহুধা-বিভক্ত বৈচিত্র্যময় দেখি। কিন্তু ব্রহ্ম দেখেন—তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হেলাইয়া দুলাইয়া নাচাইয়া তিনি নিজেকে নিজেই অনুভব করিতেছেন, তাই তাঁহার চক্ষে এই সৃষ্টিলীলা একটি ছেলেখেলামাত্র।

এক জমিদারের বৃদ্ধা জননী শহর দেখিতে গিয়া তাঁহাদের এক কাছারিবাড়িতে উঠিয়াছিলেন। ঐ বাড়ির সামনে ছেলেদের খেলার মাঠ ছিল। একদিন বৃদ্ধা দেখিলেন, ছেলেরা একটি গোলাকার বস্তু লইয়া একদল আরেক দলের দিকে ছুঁড়িতেছে। ছেলেদের খেলায় উন্মত্ততা দেখিয়া বৃদ্ধা ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিলেন এবং খেলা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য বাড়ির সকলকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধার চিৎকারে বাড়ির সকল লোক আসিয়া উপস্থিত হইল এবং ঐ গোলাকার বস্তুটি যে একটি চর্মনির্মিত বল এবং ছেলেরা উন্মত্তের মতো যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছে তাহা আসলে খেলামাত্র, উহাতে কাহারো কোন অনিষ্ট হইবে না—এই কথা বারংবার তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও বৃদ্ধা কিছুতেই এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারটি সহ্য করিতে পারিলেন না। এইরূপ বৃথা শক্তিক্ষয় করিবার কোন কারণ তাঁহার বোধগম্য হইল না। এই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ব্যাপারটিও আমাদের দৃষ্টিতে একটি ভয়ানক নিষ্ঠুর কার্য বলিয়া মনে হয়। তাই তো স্বামীজী (তখন নরেন্দ্রনাথ) বলিয়াছিলেন ঃ "The scheme of the universe is devilish! I could have created a better world!" (দ্রঃ 'কথামৃত', উদ্বোধন সং, ১৯৮৬, পৃঃ ১১৫০)

কিন্তু যাঁহারা দেখিয়াছেন—ছেলেরা ভীষণ ধস্তাধস্তি করিয়া খেলা শেষ হইলে হাত-পা ধুইয়া আরামে বসিয়া যখন খেলার গল্প করে, তখন বুঝা যায় এই ব্যাপারটি খেলোয়াড়দের পক্ষে কত আনন্দপ্রদ। এই সৃষ্টিখেলাতেও কোন খেলোয়াড় যখন জীবন্মুক্ত অবস্থায় উপস্থিত হয়, তখন তাহার অতীত লক্ষ জন্মের সকল দুঃখ-যন্ত্রণাই নিতান্ত খেলা বলিয়া মনে হয়। এই খেলা না খেলিলে খেলার পর বিশ্রামের মূল্য বুঝিতে পারা যায় না। তাই খেলা বিশ্রামের মূল্য বুঝায় এবং বিশ্রাম খেলাকে চায়। যখন জীবাত্মা এই অনন্ত সৃষ্টির তুলনায় ব্রহ্ম বা স্ব-স্বরূপ যে কত বড় তাহা জানিতে পারে, তখন আর সৃষ্টির দিকে তাকাইবার ইচ্ছা থাকে না। সে পরমানন্দে কৈবল্যসুখে চিরকাল মগ্ন হইয়া যায়।

বিবেকখ্যাতিরবিপ্লবা হানোপায়ঃ।।২৬।।

নিরন্তর বিবেকের অভ্যাসই অজ্ঞান নাশের কারণ।

তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা।।২৭।।

জ্ঞানীর বিবেকজ্ঞানের সাতটি উচ্চতম স্তর আছে।

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ।।২৮।।

যোগের বিভিন্ন অঙ্গ সাধন করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে জ্ঞান প্রকাশিত হয়, উহার শেষ সীমা বিবেকখ্যাতি।

মন্তব্য ঃ চিৎস্বরূপ আবৃত হওয়ার অর্থ—আমি যে চিৎ, সেই বোধের দিকে দৃষ্টি না দিয়া অচিৎকে লইয়া মাতিয়া উঠা। আমরা সর্বদাই এইরূপ হইতে দেখি। মা নিজের সুখ-সুবিধা সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া ছেলের জন্য যে সর্বদা প্রাণ দিতে প্রস্তুত তাহা আমরা নিত্যই দেখিয়া থাকি। এই আত্মবিস্মৃতিতে আমি ঠিক পূর্ববৎই থাকি, কোন উপায়ে ভ্রমটা দূর করিতে পারিলেই আমাদের স্বরূপ যে অটুট আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারি। বুদ্ধি মার্জিত করিতে করিতে মানুষের স্বরূপ ও কল্পিত রূপ—এ দুইটি যে সম্পূর্ণ বিপরীত বস্তু তাহা বুঝিবার ক্ষমতা হয়। তাহাকেই বলে 'বিবেক'। (বিবেক = বি—বিচ্+ঘঞ্; বিচ্ ধাতুর অর্থ পৃথক করা, to separate।)

এই বিবেক সম্পূর্ণরূপে প্রকটিত হইতে অনেক সময় লাগে। পতঞ্জলি বলেন, বিবেক-প্রকাশের শেষ সীমায় সাতটি স্তর আছে। তাঁহার প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে অভ্যাস করিতে

করিতে যখন জ্ঞানের (ব্রহ্মজ্ঞান নহে) পূর্ণপ্রকাশে বিবেক সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয়, তখনি মানুষ মুক্তিলাভ করে।

যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি।।২৯।।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই আটটি যোগের অঙ্গস্বরূপ।

অহিংসা সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহা যমাঃ।।৩০।।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ—এইগুলিকে যম বলে।

এতে জাতি-দেশ-কাল-সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্বভৌমা মহাব্রতম্।।৩১।।

এই সাধনগুলি জাতি, দেশ, কাল ও সময় নির্বিশেষে সকলেরই মহাব্রতরূপে অনুষ্ঠান করা কর্তব্য।

শৌচ-সন্তোষ-তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ।।৩২।।

শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান—এইগুলি নিয়ম।

মন্তব্য ঃ পরাবিদ্যা ভারতে পূর্ণপরিণতি লাভ করিয়াছিল। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যেসকল অপূর্ব তত্ত্ব শাস্ত্রে লিখিত আছে, বৈদিকধর্ম নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহা এখন ঠিক আরব্যোপন্যাসের আজগুবি গল্পের মতো হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা প্রাচীন শাস্ত্র অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেন, তাঁহারা অন্যান্য অপরাবিদ্যার ন্যায় পরাবিদ্যারও আলোচনা করিয়া থাকেন। পণ্ডিত অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞদিগের লেখা পড়িলে বা তাঁহাদের কথা শুনিলে বুঝা যায়—আমরা যেমন ভূগোল পড়ি, মানচিত্র দেখি অথবা ভ্রমণকাহিনী পড়ি, অধ্যাত্মবিজ্ঞান সম্পর্কে এখন পণ্ডিতরা সেইরূপই আলোচনা করেন। সাধকগণের সঙ্গে আলাপ করিলেও মনে হয়, এই বিদ্যা কেউ জীবিকানির্বাহের উপায়রূপে, কেউবা অবসর বিনোদনের জন্য, অথবা অন্যের নিকট ব্যাখ্যা করিয়া গৌরবলাভের জন্য চর্চা করিয়া থাকেন।

এই জগতে প্রত্যেক বিদ্যাই গুরুপরম্পরায় অভ্যাস বা সাধন না করিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। সম্প্রদায় বা 'স্কুল'ই বিদ্যারক্ষার একমাত্র উপায়। জগতে সকল জ্ঞানই সম্প্রদায় কর্তৃক রক্ষিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে বহুদিন হইতেই ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায় প্রায় লোপ পাইয়াছে। শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য প্রমুখ মহাপুরুষদের চেষ্টায় তাহা বাহ্যত 'অস্তিমাত্র'-রূপে সমাজে দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু এখন কোন ধর্মসম্প্রদায়ই সুগঠিত, সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত নয়।

যেকোন বিদ্যা জগতে প্রচার করিতে হইলে তাহার আচার-প্রচার ও পরিরক্ষণের প্রয়োজনবোধ মানুষের মধ্যে থাকা চাই। আবার সকল বিদ্যাই এক জন্মে কখনো বিকশিত হয় না। যেকোন লোককে কি সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া যায়? পূর্ব পূর্ব জন্ম হইতে যে সঙ্গীত অভ্যাস করিয়াছে, তাহারই কণ্ঠে সঙ্গীতের যোগ্যতা প্রকাশ পায়। ইহা প্রত্যেক বিদ্যার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। কিন্তু বর্তমানে মানবজীবন-রহস্যবিদ্যা সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত বলিয়া জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া অধ্যাত্মসাধনার উপযোগী সমাজগঠনের কথা আকাশকুসুম হইয়া পড়িয়াছে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরাবিদ্যার সমস্ত দিক নিজে অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়াছেন। স্বামীজী তাহা সর্বজন-বোধগম্যরূপে প্রচার করিয়াছেন। যদি এই বিদ্যার মনন করিতে করিতে মানবজাতির মধ্যে শুভসংস্কার লইয়া কেউ জন্মগ্রহণ করে, তবে তাহার পক্ষে সাধন করা পূর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য হইবে।

সমস্ত বিদ্যারই দুইটি দিক আছে—theory and practice—তত্ত্ব এবং প্রয়োগ অথবা আমরা যাহাকে বলি সাধ্য ও সাধন। অধ্যাত্মবিদ্যার সাধ্য সম্বন্ধীয় সমস্ত জ্ঞানই উপনিষদ্, গীতাদি গ্রন্থে সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যার সাধনপ্রণালী বহু শাস্ত্রে নানারূপে ব্যাখ্যাত হইতে হইতে মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত 'যোগসূত্র'-এ (রাজযোগে) পূর্ণপরিণতি লাভ করিয়াছে। এই গ্রন্থে লিখিত প্রণালী অবলম্বনে নিশ্চিতরূপে মানবজীবনের পূর্ণপরিণতি এবং জীবনের অতীত প্রদেশে উপস্থিত হইবার অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিবার প্রণালী সুস্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। জগতে জ্ঞান বিষয়ে বহুপ্রকার চিন্তা প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু এই অষ্টাঙ্গ যোগবিদ্যার মতো অদ্ভুত বিদ্যা জগতে আর কখনো প্রচারিত হয় নাই।

যোগশাস্ত্রে সাধনপ্রণালীকে আটভাগে বিভক্ত করিয়া ঠিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বুঝানো হইয়াছে। মানুষের ভিতরে যে পশুভাব আছে, তাহা নিবারণের জন্য অষ্টাঙ্গযোগের প্রথম সাধনা—যম। ইহার অর্থ—পশুরা জীবনরক্ষার জন্য কোন কাজ হইতে বিরত হয় না, ঐ পাশব সংস্কার হইতে নিজেকে মুক্ত করা। অহিংসা—আত্মরক্ষা করিতে গিয়া নিজের সুবিধার জন্য অন্যের অনিষ্ট করিবার যে প্রবৃত্তি, তাহা মন হইতে নির্মূল করা। সত্য—জীবনধারণ করিতে হইলে সমাজের সকলের ভিতর একটা পূর্ণ সৌহার্দ্য প্রয়োজন। সত্যে প্রতিষ্ঠিত না হইলে পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ বিশ্বাস ও সৌহার্দ্য কখনোই সম্ভবপর হয় না। অস্তেয়—নিজের সুবিধার জন্য অন্যের কোন বস্তু অন্যায়ভাবে গ্রহণ করিলে লালসা বৃদ্ধি হয় এবং পরস্পরের মধ্যে একটা দারুণ সন্দেহের ভাব থাকে। যে পরের জিনিস অন্যায়ভাবে গ্রহণ করে, তাহার মনে ঐ চৌর্যভাব তাহাকে নিজের সত্তারক্ষায় সর্বদা শঙ্কিত করিয়া রাখে। এইরূপ চঞ্চল মন লইয়া আধ্যাত্মিক পথে চলা যায় না। মথুরবাবুর পরিবারের অন্য শরিকের শাক লইবার ঘটনা এবং শ্রীরামকৃষ্ণের আচরণ প্রসঙ্গত আমরা স্মরণ করিতে পারি। ব্রহ্মচর্য—ইহার আরেকটি নাম বৃহৎ ব্রত। মানুষ যত ব্রত আচরণ করে, তাহার মধ্যে ইহা সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, কোন কাজ করিতে হইলে সর্বাগ্রে আত্মশক্তির অপব্যয় নিবারণ করিতেই হইবে। বীর্যধারণ না করিলে প্রাণশক্তির ক্ষয়হেতু সাংসারিক কার্যেও সাফল্য লাভ করা যায় না। বীর্যধারণ করিতে হইলে মন হইতে সর্বপ্রকার উত্তেজনার কারণ নিবারণ করিতে হয়। সেইজন্যই ইহাকে 'Conservation of Energy' বলা হয়। অপরিগ্রহ—যোগসাধনায় তো দূরের কথা, ভদ্রসমাজে থাকিতে হইলেও পরের নিকট হইতে কোন কিছু গ্রহণ করা যায় না। কোন ভদ্রলোকের সন্তানকে কেউ কোন জিনিস উপহার দিলে সে যদি

তাহা গ্রহণ করে তবে কোন উপায়ে দাতাকে তদনুরূপ, এমনকি তদপেক্ষা কিছু বেশি জিনিস দিয়া সে শান্তিলাভ করে। অপরিগ্রহ সম্বন্ধে প্রাচীন সমাজে অত্যন্ত কঠোর নিয়ম ছিল। শাস্ত্র যাহাদিগকে দানগ্রহণে অধিকারী বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন—সেই ব্রাহ্মণরাও শাস্ত্রনির্দিষ্ট স্থান ব্যতীত কখনো অন্যের নিকট হইতে কোন জিনিস গ্রহণ করিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় অপরিগ্রহ সম্বন্ধে কতদূর সচেতন ছিলেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে প্রাচীন ধারণা ছিল যে, নিজের জীবনের সকল দায়িত্ব নিজেকেই লইতে হইবে। পরের সাহায্য গ্রহণ করিলে সাহায্যকারীর জীবনের দায়িত্ব দান-গ্রহীতার উপরে আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ তাহার পাপের শাস্তি ভোগ করিতে হয়। বহুকাল দেশ পরাধীন থাকায় আত্মসম্মানবোধহীন দুঃখ-দারিদ্র্যপীড়িত ভারতবাসী অপরিগ্রহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অসতর্ক হইয়া পড়িয়াছে। যেখানে সুযোগ পায়, পরের অর্থে নিজের সাধ মিটাইতে সে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচবোধ করে না। ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক জীবনের ইহা একটি ভীষণ বিঘ্ন বটে।

মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য ওপরে আলোচিত পাঁচটি মহাব্রত সকল দেশে সকল কালে অবশ্য অনুষ্ঠিতব্যরূপে মহর্ষি পতঞ্জলি নির্দেশ দিয়াছেন।

যোগসাধনার আরো পাঁচটি অনুষ্ঠিতব্য ব্রতের কথা বলা হইতেছে। শৌচ—শরীর-মনকে পবিত্র রাখা যোগসাধনার একটি অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। যেসব বস্তুর সঙ্গে পবিত্রতার ভাব যুক্ত আছে, সন্ধ্যাহ্নিক করিবার সময় তাহা যে কত সহায়ক তাহা সকলেই জানেন। স্নান করিয়া পরিষ্কার ধৌত বস্ত্র পরিলে মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠে। কোন দেবালয়ে প্রবেশ করিলেই মনে একটা পবিত্রতার ভাব জাগিয়া উঠে। ঠাকুরঘরে গঙ্গাজল, সুগন্ধি ধূপ, সুগন্ধ পুষ্প ইত্যাদি ঘরটির আবহাওয়া যেন পবিত্র করিয়া রাখে। পবিত্র জিনিসের সংস্পর্শে গেলেই স্বাভাবিক নিয়মে মনে পবিত্রতার ভাব প্রবল হইয়া উঠে। আমাদের স্বরূপ পবিত্রতম বস্তু, তাই আমাদের দেহ-মন যত শুদ্ধ বোধ করিবে ততই ভগবানের সন্নিকর্ষ অনুভূত হইবে।

পরিচ্ছন্নতা সব দেশেই সভ্যতার একটি অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত। পাশ্চাত্য দেশে বলা হয়ঃ "Cleanliness is next to Godliness." পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে হইলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সতত সচেতন মনের প্রয়োজন হয়, যাহা অধ্যাত্মসাধনার বিশেষ সহায়ক। অবশ্য শৌচসাধনা 'শুচিবাই' নয়। পবিত্রতার ভাবটি পরিষ্কাররূপে বুঝিয়া অন্তরে-বাহিরে তাহার অভ্যাস করিতে হয়। মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে তাহা সম্ভব হয় না। সত্ত্বগুণের বিকাশ না হইলে শুচিতা কি জিনিস তাহা বুঝা যায় না। ঐ যে আধুনিক সুগন্ধি ধূপ ব্যবহার, কাপড়ে-চোপড়ে 'সেন্ট' লাগানো—ইহা রজোগুণের কাজ। তমোগুণ হইতে তাহা শ্রেষ্ঠ হইলেও সত্ত্বগুণীর পক্ষে তাহা হেয়।

দ্বিতীয় ব্রত—'সন্তোষ'। 'সন্তোষ' বলিতে সর্বাবস্থায় মনের প্রশান্ত ভাব রক্ষা করা বুঝায়। নানাপ্রকার কাম্যবস্তুর লালসায় মনকে উদ্বিগ্ন রাখিলে মনের শক্তিক্ষয় হয়। অভ্যুদয়ের পথে যাহার পক্ষে যতটা সম্ভব উৎসাহ, উদ্যম লইয়া চলিতে হইবে এবং সাধ্যানুসারে যাহা করা যায় তাহাতেই তৃপ্ত থাকিতে হইবে। এই দেহেই তো আমার জীবন পরিমিত নয়, আমি অনন্তবার দেহধারণ করিয়া আমার জীবনের চরম উন্নতি সাধন করিতে পারিব—এইরূপ ভাবিয়া পরম উৎসাহের সহিত কর্তব্য সম্পাদন করিয়া মন স্থির রাখিলে খুব শান্তিতে জীবনযাপন করা যায়। এই ভাবটিকেই 'plain living and high thinking' (সাধারণ জীবনযাত্রা এবং উন্নত চিন্তাশীলতা) বলা হয়। ইহাতে আত্মোন্নতি ব্যাহত হয় না, বরং মাথা ঠাণ্ডা থাকায় ধীর পদবিক্ষেপে উন্নতির নিশ্চিত পথে অগ্রসর হওয়া যায়।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের সন্ন্যাসের প্রভাব সমস্ত দেশকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে। এই সন্তোষের সাধনা যে অভ্যুদয়ের বিরোধী নহে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া 'যেন তেন প্রকারেণ বাঁচিয়া থাকিলেই হইল'—এইভাবে গত কয়েক শতাব্দী ভারতবাসীর জীবন কাটিয়া গিয়াছে। যে যেই অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় পড়িয়া থাকাই আমাদের দেশের ধর্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কুশিক্ষা ইহার একটি কারণ হইলেও সহস্র বৎসরব্যাপী পরাধীনতাই ইহার প্রধান কারণ। আমরা গত সহস্র বৎসর এমন এক অবস্থায় ছিলাম যে, কোনরকম প্রাণধারণ করা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে তাকাইবার উপায় ছিল না।

একদিন একটা হাস্যকর ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা এখানে উল্লেখ করিলে মন্দ হয় না। ১৯১১ সনে আমরা দুই বন্ধু এক বৃদ্ধ শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাড়িতে অতিথি হইয়াছিলাম। তাঁহার সঙ্গে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা হইতেছিল। তিনি সর্বাবস্থায় সন্তোষের ভাব দেখাইয়া তৎকালীন প্রচলিত একটি প্রবাদবাক্য বলিয়াছিলেনঃ

"বেগুনপোড়া কি মন্দ!
পেট ভরিলে কী আনন্দ!"

এই কথা শুনিয়া নবভাবে ভাবিত আমার বন্ধুটি তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেনঃ "তাহলে মশায়, ছাই খান না কেন; তাতেও তো পেট ভরে?"

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে ঐ একটি সুর ছিল—"নড়িস নে, চড়িস নে, চুপ করে বসে থাক!" ইহাকেই তখন 'সন্তোষের সাধনা' বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইত। কিন্তু সন্তোষ সত্ত্বগুণের বিশেষ প্রকাশিত অবস্থা। দেহ-মনে সত্ত্বগুণের বিকাশ হইলে জীবনে যে একটা প্রশান্ত ভাব প্রকাশ পায় তাহাই সন্তোষ। ভগবদ্ভক্ত বুঝিতে পারেন—আমি যাঁহার সন্তান তিনি এই জগতের মালিক, সুতরাং আমার পক্ষে 'ক্যাঙলামি' করিয়া ছটফট করা অশোভন। ঠিক পথে চলিলে আমার জনক ভগবানই আমার সমস্ত প্রয়োজন মিটাইয়া দিবেন। ইহাই প্রকৃত সন্তোষ।

তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান সম্বন্ধে এই অধ্যায়ের প্রথমেই আলোচনা করা হইয়াছে। [ক্রমশ] (আট)



অগ্রহায়ণ ১৩০৮
নভেম্বর ১৯০১

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

[মুক্তি বা ঈশ্বরলাভের উপায়]

বিজয়। মহাশয়। কেন আমরা এরূপ বদ্ধ হয়ে আছি? কেন ঈশ্বরকে দেখতে পাই না?

[অহঙ্কার ও উপাধি]

শ্রীরামকৃষ্ণ। জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। 'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।' যদি ঈশ্বরের কৃপায় 'আমি অকর্ত্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তা হলে সে ব্যক্তি তো জীবন্মুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই।

"এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্য্যকে দেখা যায় না,—মেঘ সরে গেলেই সূর্য্যকে দেখা যায়। যদি গুরুর কৃপায় একবার অহংবুদ্ধি যায়, তাহলে ঈশ্বর দর্শন হয়।

"দেখ না, আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ ঈশ্বর; মধ্যে সীতারূপী মায়া ব্যবধান আছে বলে লক্ষ্মণরূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখতে পান নাই।

"এই দেখ, এই গামছাখানা দিয়ে আমি মুখের সামনে আড়াল করছি। আর আমায় তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। তবু আমি এত কাছে। সেইরূপ ভগবান সকলের চেয়ে কাছে আছেন, তবুও এই মায়া-আবরণের দরুণ তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না।

"জীব তো সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। কিন্তু এই মায়া বা অহঙ্কারে তাদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভুলে গেছে।

"এক একটী উপাধি হয় আর জীবের স্বভাব বদলে যায়। যে কালাপেড়ে কাপড় পরে আছে, অমনি দেখবে, তার নিধুর টপ্পার তান এসে জোটে; আর তাস খেলা, বেড়াতে যাবার সময় হাতে stick (ছড়ী)—এই সব এসে জোটে। রোগা লোকও যদি বুট জুতা পরে, সে অমনি সিস্ দিতে আরম্ভ করে, আর সিঁড়ি উঠবার সময় সাহেবদের মত লাফিয়ে উঠতে থাকে। মানুষের হাতে যদি কলম থাকে, এমনি কলমের গুণ যে, সে অমনি একটা কাগজ-টাগজ পেলেই তার উপর ফ্যাস্ ফ্যাস্ করে টান দিতে থাকবে।

"টাকাও একটী বিলক্ষণ উপাধি। টাকা হলেই মানুষ আর এক রকম হয়ে যায়; আর সে মানুষ থাকে না।

"এখানে একজন ব্রাহ্মণ আসা যাওয়া করতো। সে বাহিরে বেশ বিনয়ী ছিল। কিছুদিন পরে আমরা কোন্নগরে বেড়াতে গিছলুম। হৃদে সঙ্গে ছিল। নৌকা থেকে যাই নামছি, দেখি, সেই ব্রাহ্মণ গঙ্গার ধারে বসে আছে, বোধ হয় হাওয়া খাচ্ছিল। আমাদের দেখে বলছে, 'কি ঠাকুর? বলি—আছো কেমন?' তার কথার স্বর শুনে আমি হৃদেকে বল্লুম, 'ওরে হৃদে! এ লোকটার টাকা হয়েছে, তাই এই রকম কথা।' হৃদে হাসতে লাগল।

"একটা ব্যাঙের একটা টাকা ছিল। তার গর্ত্তে টাকাটা ছিল। একটা হাতী সেই গর্ত্ত ডিঙ্গিয়ে গিছিল, তখন ব্যাঙটা বেরিয়ে এসে খুব রাগ করে হাতীকে লাথি দেখাতে লাগল, আর বল্লে, 'তোর এত বড় সাধ্য যে, আমায় ডিঙ্গিয়ে যাস।' টাকার এতো অহঙ্কার।

ত্যাগ

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি. এ.)

শান্তি কোথা, বলি যথাতথা ভ্রমে জীব আপন পাশরা।
দেহভগ্ন, মন চিন্তামগ্ন তবু কেহ নহে আশাছাড়া।।১
মৃত্যুজরা, আধিব্যাধি পীড়া হেরি জীব তবু দৃষ্টিহীন।
বর্ত্তমান হেরে জ্যোতিষ্মান কামিনীকাঞ্চন রসে লীন।।২
জন্মি কেন, কেন বা মরণ, কোথা যাব ক'জন ভাবয়?
যদি ভাবে, তখনি ত ডুবে, বিজুলী জলদে যথা লয়।।৩
ছলে বলে, এ ভবমণ্ডলে, কামিনীকাঞ্চন লাভ করি।
বুদ্ধিমান বলে অভিমান জীবের, না ব্যতিক্রম হেরি।।৪
বাক্যজালে জানায় সকলে মম সম কেবা ভবে আর?
ক্ষুধাতুর বায়স চতুর—সদা তার পুরীষ আহার!!।৫
প্রতিজনে সুধালে বিজনে, 'সুখলাভ করেছ কি ভাই'।
মর্ম্মভেদী উঠে সেই কাঁদি 'সুখশান্তি এসংসারে নাই'।।৬
বাহিরেতে কত রকমারি, যেন সুখ শান্তি নিরবধি।
ভিতরেতে বহে দিনে রেতে, তপ্তধারা বৈতরণী নদী।।৭
মান-মদে, কিবা উচ্চপদে বিদ্যালাভে অথবা সুযশে।
ধনেজনে, প্রিয় আলিঙ্গনে, কিছুতেই শান্তি নাহি বাসে।।৮
তবে শান্তিলাভ বুঝি ভ্রান্তি, আস্তিকের ছল বিজৃম্ভণ?
ধর্ম্ম কর্ম্ম পুরাণ কোরাণ সকলি কি নিশার স্বপন?৯
সর্ব্বত্যাগী পরহিতে রত, মহাজন মিছা নাহি বলে'
অনুক্ষণ তোমার মতন কামিনীকাঞ্চনে নাহি টলে।।১০
সাধুবাক্য শাস্ত্রের শাসন, তাই জীব শুন একবার।
সম্মুখেতে পাও কি দেখিতে জরা মৃত্যু ঘোর অন্ধকার?১১
ভোগে সুখ নাহি, চিরদুখ—দিনে দিনে বাড়ায় বাসনা।
ত্যাগ—ত্যাগ—মন্ত্র মহাভাগ দিবানিশি করেন সাধনা।।১২
ত্যাগ বিনে এ তিন ভুবনে শান্তিলাভ দৈব বিড়ম্বন।
বীরহিয়া, সকল ছাড়িয়া ভগবানে করে অন্বেষণ।।১৩

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : স্বামী সর্বগানন্দ

নতুন পৃথিবীর তীর্থাস্বাদন

স্বামী স্মরণানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

সান ফ্রান্সিস্কো-২

পরদিনই সকাল ১১টায় সান ফ্রান্সিস্কোর উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলাম। বিমানবন্দরে স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ এবং স্বামী বেদানন্দ নিতে এসেছিলেন। একটি ব্যস্ততাহীন দিন। সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা লাগছিল, কারণ শীতল হাওয়া বইছিল। তবু ৪৫ মিনিট হাঁটলাম।

২৫ তারিখ সকালে পাশ্চাত্যে আমাদের কার্যধারা প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হলো স্বামী প্রবুদ্ধানন্দের সঙ্গে। বিকালে 'গোল্ডেন গেট ব্রীজ' ছাড়িয়ে সান র‍্যাফেলে গেলাম। এখানে অতি সুন্দর এক পরিবেশে সন্ন্যাসিনীদের একটি ছোট আশ্রম আছে। সেখানে পাঁচজন সন্ন্যাসিনী থাকেন।

সেখান থেকে গেলাম 'ম্যুর উড্‌স পার্ক'-এ। এটি উপকূলবর্তী রেডউড বৃক্ষ Sequoia Sempervirens-এর একটি মনোমুগ্ধকর সংরক্ষণকেন্দ্র। এখানে রেডউড কখনো কাটা হয়নি। অথচ ক্যালিফোর্ণিয়ার উপকূলের অন্যান্য অংশে এবং ওরিগন রাজ্যে সবচেয়ে প্রাচীন রেডউড বৃক্ষগুলিকেও কেটে ফেলা হয়েছে। এই ম্যুর অঞ্চলে কয়েকটি খুব উঁচু রেডউড বৃক্ষ রয়েছে। এগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ বৃক্ষটি হলো ২৫২ ফুট। কয়েকটি বৃক্ষ ১,০০০ বছরের পুরনো। তবে বেশির ভাগই ৫০০ থেকে ৮০০ বছরের পুরনো। আমেরিকায় সর্বোচ্চ রেডউড বৃক্ষের উচ্চতা হলো ৩৬৭.৮ ফুট। পৃথিবীর এই সর্বোচ্চ বৃক্ষটি রয়েছে 'রেডউড ন্যাশনাল পার্ক'-এ।

পরদিন সকাল সাড়ে ১১টায় সিস্টার গার্গী (মেরী লুই বার্ক)-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। ইনিই ছয় খণ্ডের 'Swami Vivekananda in America: New Discoveries' গ্রন্থটির লেখিকা। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সাবলীল লেখনীর ফলস্বরূপ এই অমূল্য এবং প্রামাণ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ করেছে। এই ৮৭ বছর বয়সেও তিনি রান্না করা, বাসন মাজা, পড়া, লেখা প্রভৃতি সকল বিষয়ে প্রচণ্ডভাবে স্বাধীন। মনে হয় 'সর্বং পরবশং দুঃখম্' (অন্যদের ওপর নির্ভরতাই দুঃখ)—এই নীতিতে তিনি বিশ্বাসী। তাঁর ঐকান্তিক ভক্তি ও অনুরাগ প্রতি শীতকালে তাঁকে দু-তিন মাস বেলুড় মঠ-বাসের জন্য ভারতে টেনে আনে।



ওলেমাতে অনুষ্ঠিত জনসভার একাংশ

বিকালে স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ, আমি, ডঃ ভাট, ব্রহ্মচারী ত্যাগীশচৈতন্য, ভ্যাল্ এবং অন্যান্য কয়েকজন মিলে দেড়-ঘণ্টার পথ ওলেমা রিট্রিটের উদ্দেশে রওনা হলাম। পরবর্তী চারদিনের জন্য সেখানে বড়সড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। তৃণভূমি ও অরণ্যে ঢাকা আশ্রমটি ২০২০ একর জমিতে অবস্থিত। অধ্যাত্মশিবির বা রিট্রিটের জন্য ওলেমা একটি আদর্শ স্থান। পাইন, রেডউড ও অন্যান্য অনেকপ্রকার গাছের জঙ্গলে ঢাকা অনুচ্চ পাহাড়ী অঞ্চল। একটি আদর্শ পরিবেশ। প্রচুর হরিণ রয়েছে। কিছু আছে সম্পূর্ণ সাদা। মানুষ দেখে অভ্যস্ত এই হরিণগুলি আমাদের দেখে ভয় পায় না। তারা শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আমাদের দেখতে থাকে।

তবে এই সম্পত্তি রক্ষা করা একটি দুঃসাধ্য কাজ। প্রতি সোমবার স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ এখানে চলে আসেন। মঙ্গলবার আশ্রমবাসীদের জন্য পাঠ ও আলোচনা করেন। রবিবার সকালে ফিরে যান সান ফ্রান্সিস্কোয়।

২৭ তারিখ সকালে যুবক-যুবতীদের জন্য একটি অনুষ্ঠান ছিল। ২০ বছর বা একটু বেশি বয়সী ৪০-৫০ জন যুবক-যুবতী উপস্থিত ছিল। অবশ্য প্রায় ৮০ জন বয়স্ক ভক্তও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে যুবক-যুবতীরা তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে মানবীয় সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করল। প্রার্থনাকক্ষে সন্ধ্যারতির পর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুইপ্রকার সঙ্গীতেরই ব্যবস্থা ছিল।

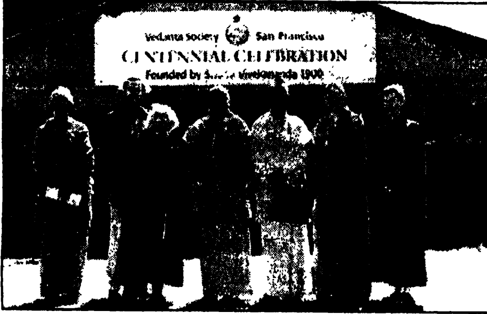
বার্কলে

রবিবার সকালে বার্কলের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। দেড়-ঘণ্টার পথ। আসলে এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয়-কেন্দ্রিক শহর। বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবী-বিখ্যাত। অনেক ভারতীয় ছাত্র এখানে পড়ে। বিভিন্ন বিভাগে অধ্যাপকদের মধ্যেও বেশ কিছু ভারতীয় রয়েছেন। আশ্রমটি ছোট। অধ্যক্ষ স্বামী অপরানন্দ। 'দৈনন্দিন জীবনে শান্তি' বিষয়ে আমি বক্তৃতা করলাম। প্রায় ৭০ জন উপস্থিত ছিলেন। বিকালে

ওলেমাতে ফিরে এলাম বাচ্ছাদের অভিনীত একটি নাটক দেখার জন্য। নাটকটির নাম—'বৃষভ-প্রদত্ত শিক্ষা' (The Message of the Bull)।

সান ফ্রান্সিস্কো-৩

ওলেমাতে থাকার সময়ে জঙ্গলের মধ্যে সকাল-সন্ধ্যায় হাঁটা বাদ দিইনি। ২৯ তারিখ সকালে শতবার্ষিকী আন্তর্ধর্ম আলোচনাসভার (Centennial Inter-faith Meet) আয়োজন করা হয়েছিল। শামিয়ানা সম্পূর্ণ ভর্তি ছিল। ১২০০-রও বেশি শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ইহুদীধর্ম, খ্রীস্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, সুফিধর্ম এবং বৈদান্তিক ধর্মের প্রতিনিধিরা। আমি বক্তব্য রাখলাম বেদান্ত সম্বন্ধে। অনুষ্ঠানটি ছিল দুটি পর্বের। সকালের অধিবেশন এবং বৈকালিক অধিবেশন। শ্রোতারা সাগ্রহে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, যার মধ্যে বেশ কৌতুকও মিশ্রিত ছিল।

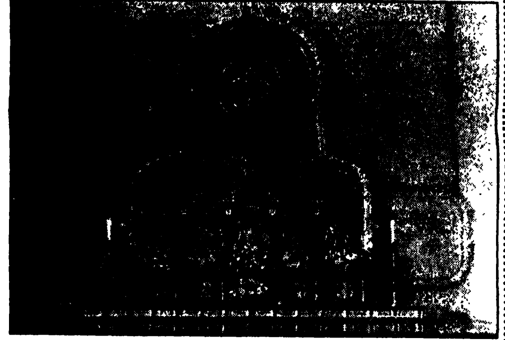


আন্তর্ধর্মসম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ

পরদিনের অনুষ্ঠানটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'কর্মযোগ'। অর্থাৎ সমস্ত প্যাণ্ডেল, মঞ্চ ইত্যাদি খুলে গোটা চৌহদ্দি পূর্ব্ববৎ করা। অবশ্য নানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে যথেষ্ট দ্রুতই সব হয়ে গেল। মনে রাখতে হবে, পাশ্চাত্যে এইসব কাজ অন্যদের দিয়ে করানো যথেষ্ট খরচসাপেক্ষ বলে নিজেদেরই করতে হয়।

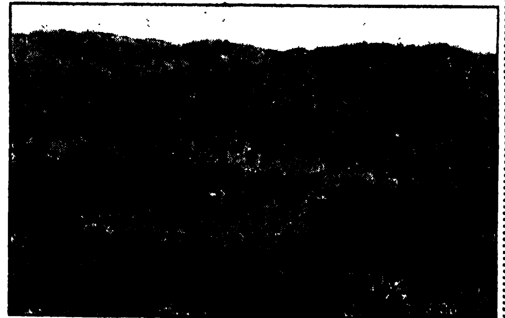
৩১ তারিখ সকালে স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ আমাকে ওলেমা রিট্রিটের কয়েকটি স্থান দেখাতে নিয়ে গেলেন। একটি জায়গা দেখালেন, যেখানে ভবিষ্যতে মন্দির করার পরিকল্পনা আছে। স্থানটি ঘন জঙ্গলে পরিবৃত একটি টিলার ওপর অবস্থিত। রিট্রিট-এ মহিলাদের জন্য চমৎকার পরিবেশে সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি একটি অতি সুন্দর বাড়ি আছে। রিট্রিটে যোগ দিতে যাঁরা আসেন তাঁরা এখানে কয়েকদিন থাকেন, নিজেরাই রান্না করে নেন। তার জন্য মাইক্রোওভেন-সহ যাবতীয় সরঞ্জাম সবই এখানে আছে।

বিকালে সান ফ্রান্সিস্কোয় ফিরলাম। আশ্রমের পরিচালন-সমিতির সভাপতি ডঃ কার্টি নিজেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলেন। পরদিন শান্তি আশ্রমের উদ্দেশে বেরলাম।


সান ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সোসাইটির প্রার্থনাকক্ষ

দু-ঘণ্টা লাগল পৌঁছাতে। পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত ১৪০ একরের এই ভূখণ্ড কোন এক ভক্ত ১৯০০ সালে স্বামী বিবেকানন্দকে দান করেছিলেন। ঐ বছরেই স্বামীজী স্বামী তুরীয়ানন্দকে জীবনে বেদান্ত অভ্যাস করে দেখাতে এবং শিক্ষা দিতে এখানে রেখে যান। স্যান অ্যাণ্টনি উপত্যকার এই স্থানে স্বামী তুরীয়ানন্দ হাতে-গোনা কয়েকজনকে নিয়ে আসেন। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা দু-একটি লাল পাইন গাছ সম্বলিত এই শুষ্ক নির্জন স্থানে কয়েকটি তাঁবু খাটানো হয়, কয়েকটি কুটিরও তৈরি করা হয়। তারপর শুরু হয় কর্ম ও ধ্যানের কঠোর জীবন। অনুভব করলাম, সত্যিই স্থানটি প্রার্থনা ও ধ্যানের উপযুক্ত। যাঁর মন ঈশ্বর-অভিমুখী, তিনিই এই নির্জনতা ও নীরবতা উপভোগ করতে সক্ষম, অন্যে নয়। যদি একটু জলের সুব্যবস্থা থাকত, তাহলে থোরোর ['The Walden Pond'-র বিখ্যাত লেখক Henry David Thorean (1817-1862)] মতো এখানে বাস করা সম্ভব হতো।

১৯৫২ সালে দাবানলে কয়েকটি কুটির পুড়ে যায়। এখন পাঁচটি অবশিষ্ট আছে। একটি প্রার্থনাগৃহ ও একটি রান্নাঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাকি তিনটি থাকার জন্য। আমাদের দুপুরের খাবারের কোন সমস্যা ছিল না, যেহেতু আমরা খাবার ও জল সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। ছিলাম মোট


১৯০০ সালে স্বামীজী এখানে 'শান্তি আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন।

১০ জন—৭ জন সাধু এবং ৩ জন ভক্ত। বিকাল ৫টা নাগাদ ফিরে এলাম সান ফ্রান্সিস্কোতে।



'শান্তি আশ্রম'-এর ধুনি মণ্ডপে লেখক ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দ

পরদিন সকালে আমরা (গতকালের ১০ জনই) রওনা হলাম 'লেক তাহো'-র উদ্দেশে। ২০০ মাইল দূরে, সমুদ্রতল থেকে ৬,৫০০ ফুট ওপরে পাহাড়ে ঘেরা এই লেক। মাঝে মাঝে বরফের বেণী নেমে এসেছে কোন কোন পাহাড় থেকে। ২২ মাইল লম্বা ও ১৪ মাইল চওড়া এই হ্রদটি খুব গভীর। গ্রীষ্মকালের এটি একটি জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র। নর্দার্ণ ক্যালিফোর্ণিয়া বেদান্ত সোসাইটির অধীনে এখানে ১০০ একর জমির ওপর একটি রিট্রিট রয়েছে। জায়গাটি পাইন আর ফার গাছে পরিপূর্ণ। এখানে তিনটি কুঠিয়া আছে। একটি মহিলাদের জন্য। ১৯৩৫ সালে ঐ বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ স্বামী অশোকানন্দ এই জায়গাটি অধিগ্রহণ করেন।

সন্ধ্যায় আমরা হ্রদের চারধারে প্রায় ১০০ মাইল ঘুরতে বেরলাম। অতি মনোরাম দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়ে পথ। কেবল কারে চড়ে আমরা ৮,২০০ ফুট উচ্চতায় উঠে হ্রদ ও চারপাশের পাহাড়ের অপূর্ব দৃশ্যাবলী দেখতে পেলাম।

পরদিন সকালে স্বামী সর্বদেবানন্দ ও প্রসুন হলিউড ফিরে গেলেন। আমরা ৯টা ১৫-তে রওনা দিয়ে স্যাক্রামেন্টো বেদান্ত সোসাইটিতে পৌঁছালাম। স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ ও অন্যান্য সকলে সান ফ্রান্সিস্কো ফিরে গেলেন। আমি থেকে গেলাম স্যাক্রামেন্টোতে। এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ হলেন স্বামী প্রপন্নানন্দ।

স্যাক্রামেন্টো

ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্যের রাজধানী স্যাক্রামেন্টো। চমৎকার শান্ত সবুজে পূর্ণ শহরটি। আট একর জমির ওপর ফুল ও ফলের গাছে ভর্তি আমাদের আশ্রমটি। একটি 'L'-আকৃতির একতলা বাড়ি। ঐ বাড়িতেই প্রার্থনাকক্ষ, অফিস ও থাকার ঘর। যেন ঠিক ভারতে আমাদের একটি আশ্রম।

রবিবার সকালে 'বেদান্ত ও আধুনিক বিশ্ব' প্রসঙ্গে আমি কিছু বললাম। জনা পঞ্চাশেক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। বেশির ভাগই আমেরিকান।

বিকালে এবং পরদিন স্থানীয় দর্শনীয় জায়গা দেখতেই কেটে গেল। 'স্যাক্রামেন্টো' নদী আর 'আমেরিকান' নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত স্যাক্রামেন্টো শহর। পুরনো শহরটি উনবিংশ শতাব্দীতে যেমনটি ছিল সেইভাবেই রাখা আছে। যা সেই কালের স্মৃতিকে জাগিয়ে দেয়। রেলের সংগ্রহশালাটিতে অনেক আকর্ষণীয় ও দর্শনযোগ্য বস্তু রয়েছে। ১০০ বছর আগে স্বামীজী যখন ক্যালিফোর্ণিয়ায় এসেছিলেন, তখন রেলপথই মূল পরিবহন মাধ্যম ছিল। আজকাল বিমানে অথবা গাড়িতেই বেশির ভাগ মানুষ যাতায়াত করেন। রেলপথ মূলত মালবহনের জন্য ব্যবহৃত হয়। দর্শনার্থীদের জন্য একটি আসল 'পুলম্যান কোচ' মডেল হিসাবে যত্ন করে রাখা আছে। পুলম্যান কোচ আগেকার দিনের অভিজাত সম্প্রদায়ের ভ্রমণের জন্য ব্যবহৃত হতো। কোচটিকে কৃত্রিম উপায়ে এমনই গতিশীল করার ব্যবস্থা রয়েছে যে, মনে হবে যেন সত্যিই চলন্ত গাড়ির ভিতরে আছি।

ওয়াশিংটন ডি. সি.

৬ তারিখ সকালে রওনা হয়ে ওয়াশিংটন পৌঁছালাম বিকাল ৪টা ১৫ মিনিটে। পূর্ব উপকূলবর্তী সময় প্রশান্ত মহাসাগরীয় সময়ের থেকে তিন ঘণ্টা এগিয়ে। আশ্রমে পৌঁছালাম বিকাল ৫টা ১৫ মিনিটে। হলিউড কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী স্বাহানন্দ তাঁর হস্তদ্বয় পূর্ব উপকূলেও প্রসারিত করেছেন, যার ফল হলো হলিউড কেন্দ্রের তথাকথিত উপকেন্দ্র 'বেদান্ত সোসাইটি অফ ওয়াশিংটন ডি. সি.'। এর অধ্যক্ষ তিনি নিজেই। স্বামী আত্মজ্ঞানানন্দকে এই আশ্রমটি দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। উনি আমেরিকান হলেও বাঙলা ও সংস্কৃত জানেন। বড় রাস্তার ওপর সাড়ে পাঁচ একর জমিতে এই আশ্রমটির নতুন বাড়ির দ্বারোদ্ঘাটন হওয়ার কথা ১০ জুন। ৫ লক্ষ ডলার লেগেছে বাড়িটি নির্মাণ করতে। জয়ন্ত সরকার সক্রিয়ভাবে আশ্রম পরিচালনার কাজে স্বামী আত্মজ্ঞানানন্দকে সাহায্য করে থাকেন।

পরদিন সকালে এক ভক্ত সুরিন্দর আমাকে 'ক্যাপিটল' এবং 'রোটাণ্ডা' দেখাতে নিয়ে গেলেন। আধ ঘণ্টা লাইনে দাঁড়াতে হলো। ২৮৭ ফুট উঁচু চমৎকার সৌধ এই 'ক্যাপিটল' কিন্তু একদিনে হয়নি। দুই শতাব্দীর প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে এর বর্তমান জমকালো রূপটি। আসল বেলেপাথরের বহির্ভাগ ক্ষয়ে যেতে থাকলে এটিকে মার্বেল দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়। আর রোটাণ্ডার ভিতরে শিল্পকলা এবং মূর্তি আমেরিকার প্রত্যেকটি রাজ্যের ইতিহাস বিবৃত করে। ফলে রোটাণ্ডায় ঢুকলে অতি চমৎকারভাবে গোটা আমেরিকার ইতিহাস জানা যায়। এখান থেকে আমরা লিঙ্কন মেমোরিয়াল এবং জেফারসন মেমোরিয়াল দেখতে গেলাম। আব্রাহাম লিঙ্কনকে আমেরিকার ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রনায়ক বলে গণ্য করা হয়। কারণ, 'সকলেই

সমানাধিকার নিয়ে জন্মেছে, অতএব দাসপ্রথা হলো অনৈতিক'-রূপ জাতীয় নীতি বা রাষ্ট্রনীতির প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি নিজের জীবন ও আভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধের ঝুঁকি নিতেও ভয় পাননি। অন্যদিকে জাতির জনকদের অন্যতম থমাস জেফারসন তাঁর অপূর্ব সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তৈরি করেছিলেন আমেরিকার সংবিধান।

অবশ্য আমাদের গাড়ি রাখার পুরনো সমস্যা এখানেও তাড়া করেছিল। গাড়ি রাখার জায়গা পাওয়া গেল লিঙ্কন মেমোরিয়াল থেকে ১ মাইল দূরে! তারপর রোদের মধ্যে হেঁটে সেখানে আসতে হলো।

আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডি. সি.-র রূপটি সত্যিই অনবদ্য। পোটোম্যাক নদী, সারি দেওয়া বৃক্ষ সমন্বিত রাস্তা এবং সর্বত্র বিরাজিত সবুজ গাছপালা—সব মিলিয়ে এটিকে আদর্শ শহরে পরিণত করেছে। বিশেষত লিঙ্কন মেমোরিয়াল থেকে শহরের দৃশ্যটি অসাধারণ।

পরদিন সকালে অমর পাল আমাকে শহরের কেন্দ্রস্থলে (down town) 'স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশন'-এর যাদুঘর ও সংগ্রহশালা দেখাতে নিয়ে গেলেন। বললেন, মেট্রো রেলে যাওয়াই ভাল। কারণ, অফিসটাইমে সেখানে গাড়ি রাখার সমস্যা হবে। কিন্তু মেট্রো স্টেশনে চারতলা গাড়ি রাখার ব্যবস্থা থাকলেও জায়গা মিলল না। অগত্যা গাড়ি নিয়েই যেতে হলো স্মিথসোনিয়ানে। কপাল ভাল, গাড়ি পার্কিঙের একটা জায়গা পাওয়া গেল। কয়েক মিনিট দেরিতে পৌঁছালেই সেই সুযোগটা হারাতাম।

বিশাল বাড়িগুলিতে বহু সংগ্রহশালা, গ্রন্থাগার ইত্যাদি রয়েছে। 'বায়ু ও মহাকাশ' সংগ্রহশালায় আমরা ইমপেক্স পর্দায় মহাকাশযাত্রা দেখলাম। সত্যিই ভয়াবহ—মাথা টনটন করে। সেখান থেকে গেলাম শিল্প-সংগ্রহশালায় ও 'প্রাকৃতিক ইতিহাস' সংগ্রহশালায়। সব খুঁটিয়ে দেখতে দু-তিনদিন লেগে যাবে।

সকালে সুরিন্দর পোটোম্যাক নদীর বিশাল জলপ্রপাত দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। চারদিকের ঘন অরণ্যের মধ্যে সে এক বিস্ময়কর দৃশ্য!

সন্ধ্যায় স্বামী স্বাহানন্দ, স্বামী আত্মজ্ঞানানন্দ এবং আমি প্রায় ১৫০ জনের শ্রোতৃমণ্ডলীর সভায় বক্তৃতা করলাম। এঁদের বেশির ভাগই ভারতীয়।

পরদিন (১০ জুন) নতুন প্রার্থনাগৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করতে হলো আমাকে। স্বামী স্বাহানন্দ এবং আমাকে কিছু বলতেও হলো। প্রায় ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন। অনেকেই চেয়ার না পেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

নিউ ইয়র্ক

সেইদিনই ওয়াশিংটন ডি. সি. থেকে বিমানে বেলা আড়াইটার সময় রওনা হয়ে নিউ ইয়র্কের লা-গার্ডিয়া বিমানবন্দরে বিকাল সাড়ে পাঁচটায় পৌঁছে দেখি, স্বামী আদীশ্বরানন্দ এবং স্বামী তথাগতানন্দ আমাকে নিতে এসেছেন। তাঁরা যথাক্রমে স্থানীয় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র এবং বেদান্ত সোসাইটির অধ্যক্ষ। আমরা বিমানবন্দর থেকে সরাসরি চলে এলাম অভিজাত মানহাটান দ্বীপে অবস্থিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রে। নাইনটিফোর্থ স্ট্রীট, যেখানে আমাদের এই আশ্রম অবস্থিত, বস্তুত ফিফ্থ অ্যাভিনিউ এবং ম্যাডিসন অ্যাভিনিউয়ের সংযোগকারী রাস্তা। সেন্ট্রাল পার্কটিও খুবই কাছে। নিউ ইয়র্কের প্রায় সব বাড়িই আকাশছোঁয়া এবং একেবারে গায়ে গায়ে লেগে থাকা। তার ওপর ভীষণ গরম, ভারতে গ্রীষ্মকালের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

পরদিন (রবিবার, ১১ জুন) সকালে যথারীতি আমার প্রাতর্ভ্রমণ হলো—স্বামী বিদানন্দের (ব্যারী) সঙ্গে। বেলা ১১টায় 'শ্রীরামকৃষ্ণ প্রচারিত ধর্মের আধুনিকতা' বিষয়ে বক্তৃতা করলাম। ২০০ জন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। বিকালে পিটার আর ব্যারী আমাকে কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান দেখাতে নিয়ে গেল—'স্ট্যাচু অফ লিবার্টি', 'ইউনাইটেড নেশন্স বিল্ডিং', 'ব্রুকলীন হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি'—স্বামীজী যেখানে বক্তৃতা করেছিলেন।

ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত পোর্তোরিকো আমেরিকার শাসনাধীন। ওখানকার অধিবাসীরা সকলেই স্প্যানিশ এবং তাদের অনেকেই আমেরিকার সবচেয়ে বড় শহর নিউ ইয়র্কে বাস করে। এদিন (রবিবার) পোর্তোরিকানরা তাদের বার্ষিক আনন্দমিছিল বের করেছিল ফিফ্থ অ্যাভিনিউতে। প্রায় ১০ লক্ষ লোক সারাদিন ধরে নাচছে, গাইছে। পুলিস ফিফ্থ অ্যাভিনিউতে মিছিলকারীদের সুবিধার্থে গাড়ি চলাচল বন্ধ রেখেছিল। তা সত্ত্বেও মানহাটানের অন্যান্য জায়গায় ট্রাফিক জ্যাম হয়েছিল। এসবই আমায় কলকাতার কথা মনে করিয়ে দিল।

পরদিন স্বামী আদীশ্বরানন্দ, ব্যারী এবং কলকাতার ডাঃ গৌর দাসের সঙ্গে ফ্লোরিডাতে সেন্ট পিটার্সবার্গের উদ্দেশে রওনা দিলাম। টাম্পা বিমানবন্দরে বিকাল পৌনে ৫টায় নেমে গাড়িতে ৩০ মিনিটের পথ পেরিয়ে সেন্ট পিটার্সবার্গে পৌঁছালাম। স্বামী আদীশ্বরানন্দের আধ্যাত্মিক অভিভাবকত্বে এখানকার বেদান্ত আশ্রম আমেরিকার ভক্তরাই চালান। তিনি নিউ ইয়র্ক থেকে বছরে দু-একবার এসে কয়েকদিন থেকে যান। বেশ একটা আশ্রমিক পরিবেশ। বড় বড় ঘর ও রান্নাঘর-সহ একটি বড় দোতলা বাড়ি। ১২০ জন বসতে পারেন এরকম একটি পৃথক প্রার্থনাগৃহ, গাড়ি রাখার জায়গা—সবটাই একটা বাগানের মধ্যে।

এখানকার আবহাওয়া ভারতের মতোই গরম। আশ্রমটিও প্রায় উপসাগরের ওপর অবস্থিত। আমেরিকার অন্যান্য শহরের তুলনায় এই শহরের বাতাবরণ শান্ত, জীবনযাত্রাও ধীরগতির। রাত্রে সাড়ে ৮টায় আহার সেরে সোয়া ১০টায় শুতে গেলাম।



ম্যানর হাউস, রিজলী

পরদিন সকালে বেড়াতে বেরলাম। সন্ধ্যাবেলা 'স্বামী বিবেকানন্দ প্রচারিত বেদান্তের বাণী' বিষয়ে বক্তৃতা করলাম। ১০০ জন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। অধিকাংশই আমেরিকান। এখানকার ভক্তরা যেন একটি সুখী পরিবার-ভুক্ত দল। আশ্রম রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার জন্য কেউ কেউ আশ্রমের পাশেই বাড়ি কিনেছেন। আমরা দুপুর ১২টা নাগাদ নিউ ইয়র্কের লা গার্ডিয়া বিমানবন্দরে ফিরে এলাম।

১৫ তারিখ সকালে স্টোন রিজ কাউন্টির অন্তর্গত 'রিজলী ম্যানর'-এ যাব বলে রওনা হলাম। বেলা ১১টায় ডাঃ গৌর দাস এবং স্বামী আত্মরূপানন্দের সঙ্গে রিজলীতে পৌঁছালাম। ঝিরঝির বৃষ্টি ও ঘন কুয়াশার ফলে আবহাওয়া শীতল ছিল। এই বাড়িটি স্বামীজীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু মিঃ ফ্রান্সিস লেগেটের সম্পত্তি ছিল। ১৮৯৫ সালে স্বামীজী দুবার বড় বাড়িটিতে ছিলেন। ১৮৯৯ সালে এসে আবার রাস্তার ধারে ও রিজলীর প্রবেশদ্বারের কাছেই বাড়িটিতে প্রায় ৭ সপ্তাহ ছিলেন। দুবছর আগে যখন জায়গাটি কেনা হয়েছিল, তিনটি বাড়ি-সহ মোট ৮৩ একর জমি ছিল। বেদান্ত সোসাইটি অফ সাদার্ণ ক্যালিফোর্নিয়ার পক্ষে স্বামী স্বাহানন্দ এটির অধিগ্রহণ করেন। তিনিই এর পরিচালন সমিতির অধ্যক্ষ এবং স্বামী আত্মরূপানন্দ হলেন তত্ত্বাবধায়ক। বড় ম্যানরটি ছাড়া আরো বাড়ি রয়েছে। একটি মহিলা-আশ্রমিকদের জন্য, অন্যটি (যেটি গত শতাব্দীতে একটি আস্তাবল ছিল) পুরুষদের। মর্টগেজের সব টাকা এখনো মেটেনি। কিছু দেনা রয়ে গেছে।

গতকালই স্বামী স্বাহানন্দ এসে গিয়েছিলেন। ১৬ জুন বলতে গেলে আমাদের বিশ্রামের দিন ছিল। সারাদিনের কাজের মধ্যে কেবল বিকালে 'ক্যাটস্কিল' পাহাড়ে একটি পর্যটনকেন্দ্র দেখতে যাওয়া। সুন্দর একটি বাগান, একটি হোটেল, আর একটি সরোবর পর্যটকদের এখানে আকর্ষণ করে।

শনিবার ১৭ তারিখ ৫০ জনেরও বেশি ভক্ত জড়ো হয়েছিলেন। তাঁদের উদ্দেশে কিছু বলতে হলো। পিটার ও তার স্ত্রী মিঠু (সঙ্ঘমিত্রা) নিউ ইয়র্ক থেকে এসে গিয়েছিল। বিকালে আমরা অর্থাৎ একটা গাড়িতে স্বামী আত্মরূপানন্দ এবং আমি, অন্য একটা গাড়িতে পিটারের সঙ্গে ডাঃ গৌর দাস রওনা হলাম নিউ ইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটির উদ্দেশে। তিন ঘণ্টার রাস্তা। সেণ্ট্রাল পার্কের পশ্চিমদিকে বেদান্ত সোসাইটি অবস্থিত। স্বামীজী থাকতেই ১৮৯৪ সালে এই কেন্দ্রটির সূচনা হয়েছিল। পাশ্চাত্যে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এটাই প্রাচীনতম কেন্দ্র। প্রায় দু-দশক পরে বর্তমান বাড়িটি কেনা হয়। স্বামী তথাগতানন্দ এই কেন্দ্রের অধ্যক্ষ। রবিবার সকালে প্রায় ১৩০ জনের শ্রোতৃমণ্ডলীর উপস্থিতিতে আমি 'শ্রীরামকৃষ্ণ, বেদান্ত এবং আধুনিক মানব' বিষয়ে বক্তৃতা করলাম। শ্রোতৃমণ্ডলীর ৬০ শতাংশ ছিলেন ভারতীয়।



রিজলী ম্যানর-এ প্রার্থনাকক্ষ

বিকাল ৩টা ১৫ মিনিটে বেদান্ত সোসাইটি থেকে রওনা হয়ে গেলাম 'কুইন্স আইল্যাণ্ড'-এ। এখানে একদল বাংলাদেশী একটি 'বিবেকানন্দ কালচারাল অ্যাণ্ড ফিলোজফিক্যাল সেণ্টার' চালাচ্ছেন। প্রধান উদ্যোক্তা ঢাকার প্রকাশ চক্রবর্তী একজন পরিশ্রমী ও উদ্যমী যুবক। একটি সংস্থায় চাকরি করেন। দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত। প্রায় ৫০-৬০ জন বাংলাদেশীর উপস্থিতিতে আমি প্রথমে ৩০ মিনিট ইংরেজীতে এবং পরে ২০ মিনিট বাঙলায় বক্তৃতা করলাম। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাংলাদেশীই আমেরিকায় খুব ভালভাবে তাঁদের জায়গা করে নিয়েছেন। সাড়ে ৬টায় রওনা হয়ে সাড়ে ৮টায় রিজলীতে ফিরে এলাম। তখনো পুরো অন্ধকার নামেনি।

পরদিন সকালে মেঘলা ছিল। কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। স্বামী আত্মরূপানন্দ 'ক্যাটস্কিল' পাহাড়ের পাদদেশে চমৎকার ছোট্ট নগরী 'উডস্টক'-এ একটি তিব্বতী বৌদ্ধ মঠ দেখানোর জন্য আমাকে নিয়ে গেলেন। দেখে মনে হলো বেশ সমৃদ্ধ।

সন্ধ্যা নাগাদ নিউ জার্সি থেকে কয়েকজন ভক্ত এলেন দেখা করতে। [ক্রমশ] (তিন)

মূল ইংরেজী থেকে অনুবাদ ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

হজরত মহম্মদ

শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বের বুকে এসেছিলে তুমি চিরশাশ্বত নবী,
হে মহান দূত, কত দূরে আজ কোন্‌খানে আছ তুমি?
শুধু হানাহানি বিদ্বেষ-বিষে পূর্ণ হবে কি ধরা!
আজ কেহ নাই, বিশ্বহৃদয় হতাশায় শুধু ভরা।

এ-পৃথিবীতে এসেছিলে তুমি শান্তির দূত হয়ে
জ্বেলেছিলে তুমি জ্ঞানের প্রদীপ মানুষের হৃদয়ে!
ভালবাসিলে ভগবানে তুমি মানুষের মাঝে এসে—
করুণা-বারতা ঘোষণা করিলে বিশ্বজগৎ মাঝে!

আজ শুধু স্মৃতি তোমার সে-বাণী—মৈত্রী, মুদিতা, আশা
জগতের লোক ভুলে গেছে আজ মানুষেরে ভালবাসা—
এনে দাও তুমি শান্তির আলো, দূর হোক যত মনের কালো—
অশুভ-শক্তি দূর করে দাও, দাও প্রভু দাও আলো।

তুমি আসছ এগিয়ে

শান্তিকুমার ঘোষ

যে-বীজ বুনেছিলাম অর্ধশতক আগে,
তা আজ মুঞ্জরিত ফুল ও পল্লবে... সৌগন্ধ্যবিথার;
যে-পঙ্‌ক্তি বেঁধেছিলাম সোনার অক্ষরে,
এখন তা উঠছে বেজে মন্ত্রের নির্ঘোষে...
শুনি অনাহত;
যে-সম্পর্ক-ডোরগুলি ভেবেছি অচ্ছেদ্য হবে—
হবে চিরস্থায়ী,
কখন অজান্তে খসে পড়ল একে একে—
থাকি তবু অমূলসম্ভব;

স্থির জানি অত্যাগসহন তুমি
দিনে দিনে আসছ এগিয়ে।

নতুন সূর্য জ্বাল

উমা দে শীল

ফসিলের গবেষণা করে কাল আর কাটে না।
হে সৃষ্টির দেবতা,
তুমি নতুন সূর্য জ্বাল।
রহস্যের আবরণ টেনে
নতুন আবেগে প্রেমে ডুবে যাও।
মুছে দিয়ে ফসিলের এই যাদুঘর,
এবার সবুজ এনে দাও।

ভারতবর্ষ

জয়ন্ত খাটুয়া

ভারতবর্ষ! ইথারে ইথারে আজও ভেসে আসে
চিরায়ত সঙ্গীতের সুর
জীবন মানেই সাধনা, তপস্যা-সম্ভূত একত্বের অনুভূতি।
খণ্ড, জড়, মৃত জীবনে সঙ্গোপনে অমৃতের সন্ধান।

ভারতবর্ষ! বহন করেছ সহস্র সহস্র বছর
অক্লেশে অম্লান আরণ্যক বাণী
বরষার প্লাবনের মতো অনিরুদ্ধ গতিতে,
ছুটেছ পৃথিবীর এক থেকে অন্য প্রান্তে
আবেগ, আবেশে নয়—যথার্থই
বিবশ, মৃত, নষ্ট সভ্যতায় মৃতসঞ্জীবনী হয়ে।

ভারতবর্ষ! বিশ্বমুক্তির ঘোষণা—'অমৃতস্য পুত্রাঃ';
তবু দাসত্বের শৃঙ্খলে বদ্ধ হলো একদিন।
শতাব্দীর পর শতাব্দী বিদেশী শাসনে পিষ্ট,
লাঞ্ছনা, ভয়, অবিশ্বাস, বেয়নেট আর বুলেট
কোনকিছুই পারল না টানতে ইতি অস্তিমে।
শহীদের রক্তে রাঙানো মাটি
প্রমাণ করল আরেকবার, ত্যাগই অমৃত-মুক্তি আনে
অজেয় আত্মার জাগরণই স্বাধীনতা।

ভারতবর্ষ! এক সনাতন ফিনিক্স,
আবার পুড়ছ নিজস্ব আগুনে,
নিজেকে মার্জিত করতে, সংস্কৃত
নিরর্থ পালক, চর্ম, মাংস পোড়াচ্ছ, অন্তঃস্থ সত্তার স্বার্থেই
আবার চঞ্চুতে শান্তির বার্তা, দুচোখে প্রদীপ্ত প্রজ্ঞা
অবয়বে নতুন যৌবন নিয়ে উড়ে যাবে অনন্ত আকাশে।

অন্তরে তুমি

গৌতম মালাকার

বাসিতে পারি না ভাল তোমারে আমি
না পারি বুঝিতে হে অন্তরযামী।
হে প্রিয়, হে সখা—
দেখে নাই এ নয়ন তব মুখ কায়া।
ঘন মেঘে আবরিত আমার এ-হৃদয়
বর্তমান সূর্য, তবু হয় না উদয়।
আশা তবু নাহি ছাড়ি, তারে যায় না যে ছাড়া,
হইবে সে মেঘ দূরীভূত, যবে নামিবে নয়নধারা।
জাগিবে আবৃত আলো বরষিবে কিরণ,
হায়, কোথা যাবে দেহ, কোথা যাবে মন,
হাজারো কিরণধারায় সে জাগিছে একজন!

জাদুঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ

(বেলুড়ের নবনির্মিত সংগ্রহশালা দর্শনে)

ত্রিবিক্রম চট্টোপাধ্যায়

জাদুঘর ঘিরে জাগে শিহরণ
পুলকে অধীর চিত্ত,
কিবা কব ভাই ইতিকথা তার
হৃদয় করিছে নৃত্য।

ঠাকুরের লীলা এখানে-ওখানে,
স্বামীজী, মায়ের কথা,
ছড়ায়ে রয়েছে চারিদিকে তার
কত অতীতের গাথা।

সবার ওপরে মাতাল আমায়—
কল্পতরুর ঠাঁই,
সারা দুনিয়ায় এমন ঘটনা
কেহ কভু দেখে নাই।

স্বয়ং ঠাকুর দাঁড়ায়ে এখানে,
ডাকে তাঁর প্রিয়জনে—
দু-হাত ভরিয়া নিয়ে যারে তোরা
যার যাহা আছে মনে।

চরণের কাছে পড়িয়া গিরিশ
বলে ওঠে অসহায়—
উদ্ধার কর অনাথের নাথ
স্থান দাও তব পায়।

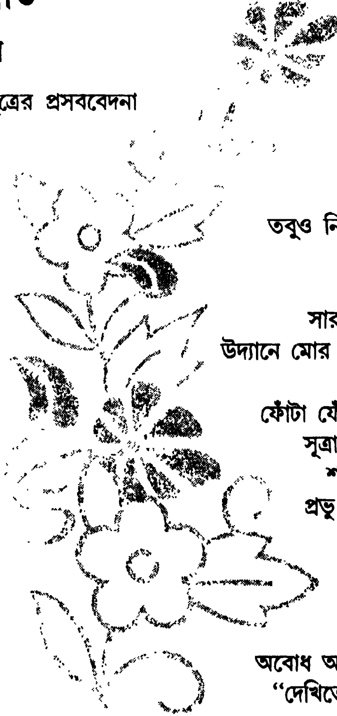
কাছে ছিল যারা উঠিল মাতিয়া
গায় ঠাকুরের গান,
নবরূপে প্রভু এসেছ ধরায়
সাক্ষাৎ ভগবান।

আরো কত আছে আলো ঝলমল
জাদুঘর জোড়া ভাই,
জুড়াবে নয়ন, ভরিবে পরান,
তুলনা তাহার নাই।

নিকষার আর্তি

মানসী পাল

জননী নিকষা! নীরবে সহিলে শতপুত্রের প্রসববেদনা
পুত্রসুখ লাগি!
প্রতি গৃহে এই জননীর ব্যথা
জন্মদাতা বোঝে কি সে-ব্যথা
প্রকৃতি যে নিয়ম করে।
তবু চায় নারী হইতে জননী
গানে গানে কবি বলে সে-কাহিনী
হয় না ব্যতিক্রম।
দুবাহু বাড়ায়ে শিশু ভোলানাথ,
হাসে আর কাঁদে হইয়া অনাথ।
হাসিয়া কহেন জননী নিকষা—
আছি আমি হেথা, মরেছি কখন?
"মহাঘোর রোলে ছাইল গগন,
করি দশদিক্ জ্যোতি মগন"।
দেখিলাম কত যুদ্ধ জীবনে,
সে-গাথানী আমি গাহিব কেমনে
বেঁচে আছি তাই দেখি যত খেলা
সবই যে আমার প্রভুরই লীলা
ছুটে ছুটে চলি দিবস-রজনী
যুগে যুগে আছি হইয়া জননী
নহি রাক্ষসী, আমি যে রমণী।



অলঙ্করণ : জয়ন্ত ঘোষ

প্রভু যে আমার করিছেন খেলা
সুগ্রীব-সখারূপে।
জননী নিকষা ভাবে আর ছোটে
মরিতে চাহে না সুন্দর হাটে।
তুমি প্রভু এক, দুই নাই কিছু
যদি রাখ ভবে দেখি আরো কিছু।
যত তাপ ছিল বিধাতার হাতে
সব আসি জোটে নিকষার চিতে
তবুও নিকষা ছোটে আর ছোটে পেয়েছে মধুর স্বাদ।
আজি এ প্রভাতে কি হেরিনু চোখে
বিস্ময় জাগে নিকষার মনে—
সারারাত ধরে বরষা ঝরিল অবিরাম সেই ধারা
উদ্যানে মোর সবুজের মেলা, ফুল কুঁড়িগুলি শতদল মেলি
দিতেছে প্রাণের সাড়া।
ফোঁটা ফোঁটা জল, তারে আছে ঝুলে মণিমুকুতা হয়ে,
সূত্রাকারে গাঁথা মালা যেন গেঁথেছেন কোন্জনে!
শত সহস্র কর্ম আমারে বেঁধেছে মিথ্যা ডোরে,
প্রভু যে আমার রয়েছেন সাথে ভাসি অশ্রুনীরে।
"দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া"
জীবন কি শুধু মিথ্যা আলেয়া?
শুধাই নিজেরে দিবা অবসানে
প্রশ্ন জাগিছে জীবন-সায়াহ্নে
অবোধ আমি যে ঘুমিয়েই শুধু নিজেরে দিয়াছি ফাঁকি।
"দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা, দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু"
নিকটেই মোর মহাসমুদ্র অজস্র বারিবিন্দু।

শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃপুরুষের নিবাস—দেরে বা দেরেপুর

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

ক্ষুদিরামের দেরেপুর ত্যাগের পর রায় জমিদারি

১৮১৪ সালে ক্ষুদিরাম দেরেপুরের পৈতৃক বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করে পাড়ি দিলেন কামারপুকুরে। কামারলাটের অধিকর্তা তখন সুখলাল গোস্বামী। ফলে রামানন্দ রায় আর সেদিকে হাত বাড়াতে সাহসী হলেন না। জমিদারের খুশিমত কাজ করেননি ক্ষুদিরাম এবং সেই কারণেই তাঁকে বাস্তুচ্যুত হতে হয়েছিল। অবশ্য এই ঘটনা ঘটিয়েও সুখী হতে পারেননি রামানন্দ। বর্ধমান জমিদারির সেরেস্তায় রামানন্দের বকেয়া রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল অনেক। তখন বঙ্গদেশের জমিদারগণ 'সূর্যাস্ত আইন' বলে রাতারাতি যেকোন তালুকদার বা পত্তনিদারকে উৎখাত করতে পারতেন। সেই সমস্যায় বিশেষ জড়িয়ে পড়েন রামানন্দ রায়। তার ওপর তাঁর আগ্রাসন নীতি তাঁকে ক্রমশ ধ্বংসের পথেই নিয়ে গেল। এব্যাপারে রায়বংশের এক অধস্তন প্রবীণা জানিয়েছেন ঃ "সাতবেড়িয়ার কাছে কোকন্দ গ্রাম। সেখানে এক প্রশস্ত দীঘি আছে। দীঘির পাড়ে বারুণীর সময় বড় মেলা হয়। তার কাছেই আছে কোকন্দর শিব। কোন এক মেলার সময় রামানন্দ ও তাঁর ভাইদের সঙ্গে কোকন্দ গ্রামবাসীদের এক দারুণ বিবাদ উপস্থিত হয় এবং ঐ শিব নিয়ে গোলযোগ বাঁধে। গ্রামবাসিগণ বলেন যে, এ-শিব তাঁদের গ্রাম্যদেবতা; ইনি স্বয়ম্ভু! জমিদার রায়মহাশয় বলেন যে, এ-শিব তাঁদের এবং এতে কারো অধিকার নেই। এই নিয়ে বিবাদ হতে হতে ক্রমশ তা দাঁড়াল দাঙ্গায়। রামানন্দ ঐ শিবকে কোকন্দ থেকে সাতবেড়িয়ায় তুলে আনতে লাঠিয়াল পাঠালেন। তাঁর ভাইরাও গেলেন ঐ দাঙ্গায়। গ্রামবাসীদের সঙ্গে রামানন্দের লাঠিয়ালদের তুমুল লড়াই হলো; এতে তাঁর দুভাই নিহত হলেন। সে-যাত্রায় রামানন্দ কোনক্রমে রক্ষা পেলেন। কিন্তু পরে এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখলেন যে, বিশ্বেশ্বর তাঁকে বলছেন, 'তোরা যে পাপ-অত্যাচার করেছিস তার প্রতিফল তোদের বংশানুক্রমে ভোগ করতে হবে; তোদের বংশে যারা জন্মগ্রহণ করবে যৌবনে তারা রক্তবমি উঠে মারা যাবে।' ঘটনাও ঘটেছিল তাই। রামানন্দ নিজেও মারা যান রক্তবমিতে। এ-বংশের সমস্ত পুরুষের মৃত্যু ঐভাবেই ঘটেছে। রামানন্দের মৃত্যুর পর সমস্ত জমিদারি নিলামে বিক্রি হয়। গ্রামের নিকটে যেসমস্ত জমি ছিল, তাও আমাদের বংশের দেখার লোকের অভাবে আত্মীয়-কুটুম্বরা আত্মসাৎ করেছে। বর্তমানে রঘুবীরের পাঁচ-ছয় বিঘা জমি আছে। কোনরকমে দেবতার নিত্যপূজা হয়। কি আর বলব, দিনরাত্রি রঘুবীরকে ডাকছি, তিনি যেন শীঘ্র এই দুঃখীর ভবযন্ত্রণা শেষ করেন।"[১৭]

রায় পরিবারের এই অধস্তন প্রবীণা হলেন রায়বংশের উত্তরপুরুষ রামসর্ব রায়ের স্ত্রী। ১৯৫০ সালেও তিনি জীবিত ছিলেন এবং সাতবেড়িয়ার চোদ্দবিঘার রায়মহলের এক প্রান্তে এক জীর্ণ কুটিরে তিনি একাকী বাস করতেন। তাঁর দুই পুত্র ছিল—সূর্যকুমার রায় ও বৈদ্যনাথ রায়। সূর্যকুমার আগেই এ-ভিটা ত্যাগ করে শ্বশুরালয়ে বসবাস করছিলেন। তিনিও ঐ রোগে মারা যান। তখন প্রবীণার কনিষ্ঠ পুত্র ভগিনীগৃহে (বাঁকুড়া জেলার মসিনাপুর গ্রামে) বসবাস করছিলেন। পরে তিনিও রক্তবমন রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

এই প্রবীণার বক্তব্যের সত্যতা বোঝা যায় সরকারি সেটেলমেন্ট রেকর্ড দেখে। সেখানে লক্ষ্য করা যায়, উনিশ শতকের শেষেই সাতবেড়িয়ার জমিদারি আর রায়বংশের হাতে নেই। ঐ ভূখণ্ড 'বাজেয়াপ্ত চৌকিদারী চাকরান' হিসাবে জিবটার (বাঁকুড়া জেলা) পরিতোষ রায়দের অধিকারে চলে গেছে। সেখানে নামমাত্র সম্পত্তি সূর্যকুমার রায় ও বৈদ্যনাথ রায়ের নামে আছে।

সাতবেড়ের রায়বংশ বনাম দেরেপুরের চট্টোপাধ্যায় বংশ

ইতিহাসের কটাক্ষ বড় বিস্ময়কর। তার গতি কোন ব্যক্তির ইচ্ছাধীন নয়, আর তা নয় বলেই ইতিহাসের ধারা নিজের গতিতে চলে কোন বৃহত্তর সুন্দরকে সৃষ্টি ও স্থিতির পরিকাঠামো দিতে। আমরা ভারতীয় সংস্কৃতিতে 'প্রহ্লাদ-হিরণ্যকশিপু', 'রাম-রাবণ', 'কৃষ্ণ-কংস', 'যুধিষ্ঠির-দুর্যোধন' প্রভৃতি আখ্যান লক্ষ্য করেছি। 'ক্ষুদিরাম-রামানন্দ' অধ্যায় তারই যেন এক সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। সে-আখ্যানও এক বৃহৎ কল্যাণ-সৃজন মানসে গ্রথিত। কে জানে এই ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণের 'বৃহত্তর সমাজ-মানস' সংগঠনে প্রেরণা জুগিয়েছে কিনা। কারণ, আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে লক্ষ্য করেছি জমিদার গোষ্ঠীকে বিশেষ আমল না দিতে; তিনি দৃঢ় প্রত্যয়েই এক জমিদারকে বলেছেন ঃ "রাজা-টাজা বলতে পারব না, কারণ সেটা মিথ্যা কথা হবে!"[১৮] আরো বিশেষভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রে যা দেখা যায়, তা হলো সমাজের

১৭ কামারপুকুরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, পৃঃ ১০৭-১০৯

১৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ২।১।১

দীন-দুঃখী-ব্রাত্য মানুষদের নিয়ে যে গরিষ্ঠ আমজনতা—তাদের সঙ্গে তিনি নিবিড় নৈকট্য স্থাপন করেছেন।

যাই হোক, বিস্ময়করভাবে ঐ দুটি পাশাপাশি গ্রামে দুই পরিবারের সম্প্রীতি-বিবাদ বিশেষ বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ক্ষুদিরামের পূর্বপুরুষের দেরেপুর গ্রামে আগমন রায় পরিবারের উর্ধ্বতন ব্যক্তিদের মাধ্যমেই ঘটেছে বলে অনুমান। কারণ, রামলোচন ও দাতারামের চিহ্নিত সম্পত্তি দেবোত্তর হিসাবে উল্লিখিত এবং সমকালে সাতবেড়িয়া ও দেরেপুর মৌজা রায় জমিদারির অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম পর্বে দুই পরিবারের সখ্যতা সর্বজনবিদিত। দ্বিতীয় সাদৃশ্যটি বড় বিচিত্র; উভয় পরিবারের গৃহদেবতাই রঘুবীর। তৃতীয় সাদৃশ্যও অদ্ভুত; দুই পরিবারের ব্যক্তিদের নাম যুগ্মশব্দের এবং 'রাম' শব্দের সংযোগ উভয়ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়।

।।৩।।

দ্বারিয়াপুর ক্ষুদিরাম রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম

ক্ষুদিরামের বাস্তুভূমি দেরেপুর গ্রামে নবগঠিত সেবাশ্রমের ইতিবৃত্তও বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। প্রায় দুশ বছর আগে লর্ড কর্ণওয়ালিশ এদেশে চালু করেছিলেন যে কুখ্যাত 'বন্দোবস্ত আইন', তারই দৌলতে জমিদার কর্তৃক ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় দেরেপুরের নিজের বাস্তুভূমি থেকে চিরকালের জন্য উৎখাত হয়েছিলেন। প্রায় দুশ বছর পর সেই বাস্তুভূমিতে তাঁর স্মরণমানসে স্থানীয় তরুণদের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'দ্বারিয়াপুর ক্ষুদিরাম রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম' এবং 'ক্ষুদিরাম স্মারক মন্দির'।

'দ্বারিয়াপুর ক্ষুদিরাম রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ পর্বে এক তরুণের কথা সবিশেষ স্মরণযোগ্য। সেই তরুণ দেরেপুর গ্রামেরই এক কৃষকের সন্তান—মহাদেব রায়। সে প্রাণখুলে জানাল তার অভিব্যক্তিঃ "আমাদের গ্রামে আগে থেকেই বড়দের একটা সঙ্ঘ ছিল; তার নাম 'ক্ষুদিরাম চন্দ্রমণি যুব সঙ্ঘ'। কেন এইরকম নাম বা তার ইতিহাস কি—এসম্পর্কে আগে মাথা ঘামাইনি। কেবল চাষবাসেই সময় দিতাম, আর মাঝে মাঝে কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে গিয়ে ঠাকুরকে দর্শন করে আসতাম। কিন্তু কৈকালায় শ্রীরামকৃষ্ণ-নামাঙ্কিত এক আশ্রমের মৃণাল মহারাজের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়ায় ক্রমশ উপলব্ধি করতে থাকি, আমরা অর্থাৎ দেরেপুরবাসীরা শ্রীরামকৃষ্ণ-সাম্রাজ্যে নেহাত তুচ্ছ নয়। এর মাটিতেই একসময় বসবাস করতেন শ্রীরামকৃষ্ণের পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। তাই তাঁর স্মরণে এখানে একটি অনুষ্ঠানের কথা আমার মাথায় আসে। আমার সে-ইচ্ছার কথা জানাই কামারপুকুর মঠের অধ্যক্ষ স্বামী দেবদেবানন্দজীকে। মহারাজ আমার কথা শোনা মাত্র দেরেপুরে উৎসবের পরিকল্পনা ও তদুপযোগী কর্মসম্পাদনের ব্যবস্থা করে দেন। দেরেপুরে ক্ষুদিরাম স্মরণোৎসবের প্রথম বর্ষ পালিত হয় ১৪০১ সালে। সেবছর ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী দেবদেবানন্দজী; ভাষণ দেন আদ্যাপীঠ আশ্রমের ব্রহ্মচারী মুরালভাই প্রমুখ। ১৪০২ সালে দ্বিতীয় বার্ষিক স্মরণোৎসব সভায় স্বামী দেবদেবানন্দজী ও ব্রহ্মচারী মুরালভাই ভাষণ দান করেন। পরের বছর তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে সেবাশ্রমের মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল সেবাশ্রমের নিজস্ব জায়গায়। ঐ জায়গার আয়তন সাড়ে এগার শতক (দাগ নং ৪৪৯)। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে ঐ জায়গায় মাটি খোঁড়ার সময় পাওয়া গেছে একটি তেলের পলা, পাথরের থালা ও একটি পাথরের মূর্তি। সেসমস্ত জিনিস স্বামী প্রভানন্দজীর কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। আমাদের বিশ্বাস, ঐ ভূখণ্ডেই ছিল ক্ষুদিরামের রান্নাঘর। তাঁর বাস্তুভূমিতেই মন্দির নির্মিত হচ্ছে ভেবে আমরা খুবই আনন্দিত।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সরকারি নথিতে দেরেপুর মৌজা সংক্রান্ত ৩৭৩৯৪ নং তায়দাদভুক্ত সম্পত্তির দাগনম্বরগুলির মধ্যে ঐ দাগনম্বরটি বর্তমান এবং সেই নথিতে ব্যক্ত যে, ক্ষুদিরামের পূর্বপুরুষগণের অধিকারে ছিল ঐ তায়দাদ-সংশ্লিষ্ট দাগনম্বরগুলি। কাজেই বর্তমানে সেবাশ্রমের মন্দির যে-ভূখণ্ডে নির্মিত, তা যে ক্ষুদিরামের বাস্তুভূমিতেই অবস্থিত তা সরকারি নথি থেকে বোঝা যায়।

বর্তমানে মন্দিরের কাজ সমাপ্তির পথে। দেরেপুরে ক্ষুদিরাম রামকৃষ্ণ স্মরণমন্দির নির্মাণপর্বে স্বামী দেবদেবানন্দজীর ঐকান্তিক প্রয়াস ও সহযোগিতা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য। বিভিন্ন ভক্তদের দানেই গড়ে উঠেছে এই মন্দির। মন্দির-নির্মাণের সঙ্গে এই সেবাশ্রম নানা সমাজ উন্নয়নমূলক প্রকল্পও হাতে নিয়েছে। বার্ষিক মহোৎসবের সময় ভক্তদের অন্নপ্রসাদ দানের সঙ্গে গ্রামের দুঃস্থ ব্যক্তিদের পোশাক বিতরণ অনুষ্ঠানও পালন করে সেবাশ্রম।

দ্বারিয়াপুর ক্ষুদিরাম রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে যেতে হলে কামারপুকুর চটি থেকে বদনগঞ্জগামী বাসে চেপে দ্বিতীয় স্টপেজে (সাতবেড়িয়া) নেমে ডানদিকে মোরাম রাস্তায় ১৫-২০ মিনিট হাঁটতে হবে। কামারপুকুর চটি থেকে রিক্সায় চেপেও সরাসরি দেরেপুর সেবাশ্রমে যাওয়া যায়।

মহাকালের গর্ভে অতীতের অনেককিছুই বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের অমর স্মৃতিবাহী 'চাটুজ্জে পুকুর' আজও বর্তমান। রয়েছে চট্টোপাধ্যায় বংশের সীতারাম জীউ ও শ্মশানেশ্বর শিবলিঙ্গও। মন্দির নবরূপে নির্মিত হয়েছে, কিন্তু মন্দিরের সেই দরজা ২০০ বছরের স্মৃতি বহন করে এখনো টিকে আছে। ঘটনাবহুল দেরেপুর ইতিবৃত্তের একমাত্র সাক্ষী সে। মন্দিরদ্বারের প্রহরী-রূপে সেই-ই দাঁড়িয়ে আছে মহাকালের সাক্ষী হয়ে! তাকে প্রত্যক্ষ করাও এক পুণ্য।

উপসংহার

নিবন্ধের বিভিন্ন পর্বে আমরা সমকালীন সাতবেড়ে ও দেরেপুর গ্রামের অবস্থা এবং ক্ষুদিরামের বিপর্যয়ের ঘটনা অবগত হয়েছি। সেইসঙ্গে দেখেছি সমকালীন সমাজমানস, জমিদারতন্ত্র ও তার স্তাবককুলের ক্রিয়াকাণ্ড। ঘটনা পরম্পরায় কতগুলি প্রশ্ন থেকেই যায়। যেমন—দেরেপুর গ্রাম জাহানাবাদ পরগনার অধীনে হওয়ায় তা বর্ধমানের জমিদার তেজচন্দ্র রায়ের অধীনে ছিল। বহু মন্দির-নির্মাণ ও দানের বদান্যতা তিনি দেখালেও তাঁরই অধীনস্থ এক সামান্য তালুকদার অন্যায়ভাবে এক নিরীহ সত্যনিষ্ঠ প্রজাকে বাস্তুচ্যুত করেছেন—এ-ঘটনা কি তিনি জানতেন না? হয়তো এমন বহু ক্ষেত্রেই তাঁর নিস্পৃহতা নানা অন্যায়কর্মে রসদ জুগিয়েছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন—যে-সম্পত্তি (যা মোটেই সামান্য নয়) চট্টোপাধ্যায় বংশের ছিল, তারই সমান শরিক দেরেপুর গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ; তাঁরা তাঁদের পৈতৃক সম্পত্তির অর্ধেকের ভাগীদার (তায়দাদ ৩৭৩৯৪ অনুযায়ী)। সেই সম্পত্তির বর্তমান মালিক দেরেপুর গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের বর্তমান প্রজন্ম। দেরেপুর থেকে কামারপুকুর মাত্র কয়েক মাইলের ব্যবধান। দেরেপুর বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে বহু গুণী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁরা কেউ কখনো কি ভাবেননি যে, নিজ বাস্তুভূমি থেকে বলপূর্বক স্থানচ্যুত চট্টোপাধ্যায় পরিবার-বর্গকে তাঁদের গৃহদেবতা ও বাস্তুভূমি ফিরিয়ে দেওয়া বা তাঁদের স্বভূমিতে ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন? দেরেপুরের ইতিহাসে কিন্তু এজাতীয় উদ্যোগ আমরা দেখি না। এই নির্দয়তাও কিন্তু চন্দ্রমণি ও ক্ষুদিরামকে সহ্য করতে হয়েছিল। স্মরণ রাখতে হবে, এই আঘাত একান্ত স্বজনের (দৌহিত্র আত্মীয়ের), নির্দয় জমিদারের নয়! তবুও উত্থান-পতনের ধারাপথ বেয়ে প্রবহমান মহাকালের ইঙ্গিতেই ক্ষুদিরাম-চন্দ্রমণি তাঁদের স্বভূমিতে মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছেন। নিঃসন্দেহে বলা যায়, জমিদার কর্তৃক উৎখাত হলেও শ্রীরামকৃষ্ণ-জনক ক্ষুদিরামকে উৎখাত করা কখনো সহজ নয়। তিনি সতত সঞ্চরমাণ! তীর্থভূমি দেরেপুর, তোমায় শতকোটি প্রণাম! ❑ [সমাপ্ত]

শব্দচেতনা 

স্বামীজীর জীবনের নানান ঘটনা ও তাঁর বাণীকে ভিত্তি করে তৈরি বিশেষ শব্দছক

১		২		■	■	৩			৪
	■		■	■	■	■	■	■	
৫		■	৬		৭		■	৮	
	■	৯	■	■		■	১০	■	
■	■	১১		■	■	■		■	■
■	■		■	■	■	১২		■	■
১৩	■		■	১৪	■	■		■	১৫
১৬		■	১৭				■	১৮	
	■	■	■	■	■	■	১৯	■	
২০				■	■	২১			

সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম দশজনের নাম পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

পাশাপাশি: (১) এই গুহায় এসেছিলেন স্বামীজী (৩) উত্তর ভারতের এই রেলস্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার স্বামীজীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন (৫) স্বামীজীর পদবী (৬) শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগদানের জন্য পরিচয়পত্র চাইতে স্বামীজী এঁর কাছে গিয়েছিলেন (৮) "—— বলি মরমের কথা।" (১১) স্বামীজী অভেদানন্দজীকে বলেন: "কালী, আমার ভেতর এতটা —— জমেছে যে, ভয় হয় পাছে ফেটে যাই।" (১২) এই শহরে এসে পরিব্রাজক বিবেকানন্দ তিলকের গৃহে বাস করেছিলেন (১৬) ১৮৯৬ সালের ২১ ডিসেম্বর স্বামীজী এখানে আসেন (১৭) স্বামীজীর আমেরিকা-যাত্রায় অর্থসংগ্রহের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তি প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন (১৮) যাঁকে উদ্দেশ করে স্বামীজী বলেছিলেন: "যদি মানুষ হয়ে ফিরতে পারি তবেই ফিরব।" (২০) খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত এই ভারতীয় মহিলা স্বামীজীর সাফল্যে ঈর্ষান্বিতা হয়েছিলেন (২১) স্বামীজী যাঁকে 'মহাপুরুষ' আখ্যা দিয়েছিলেন।

ওপর-নিচ: (১) স্বামীজীর পদার্পণধন্য গোপাললাল শীলের বাড়ি এখানে অবস্থিত (২) যাঁর মুখে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম প্রথম শোনেন নরেন্দ্রনাথ (৪) শরৎচন্দ্র গুপ্তের সন্ন্যাস-নাম (৭) স্বামীজীর প্রিয় উপনিষদ্ (৯) নরেন্দ্রনাথের সান্যাল সতীর্থ (১০) নরেন্দ্রনাথের বরানগর-নিবাসী বন্ধু (১৩) পরিব্রাজক বিবেকানন্দ গোয়া থেকে কর্ণাটকের পথে প্রথমে এখানে আসেন (১৪) "—— মোর শেষ হলো।" (১৫) স্বামীজী যাঁর কাছে বেলুড়ে বেদ বিদ্যালয় স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন (১৯) "শিবজ্ঞানে জীব——।"

সূত্র: **পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়**



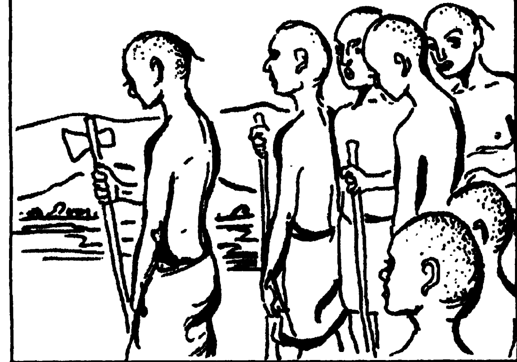
আদি শঙ্করাচার্য ৪

শিশু ও কিশোর বিভাগ













ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দের ভূমিকা ও তাৎপর্য

অনিলকুমার মুখোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

বিংশ শতাব্দীর বস্তুবাদী ব্রিটিশ দার্শনিক স্যামুয়েল আলেকজাণ্ডার (১৮৫৯-১৯৩৮) দেশ-কাল (Space-Time)-কে বিশ্বের মূল বলে ধরে নিয়ে বিবর্তনের ব্যাখ্যায় অগ্রসর হয়েছিলেন। দেশ-কাল প্রকৃতপক্ষে গতি (motion)-র নামান্তর। তাঁর মতে, চিৎশক্তির (চেতনার) ভূমিকা ব্যতিরেকেই শুধু গতির পরিণতিতেই এই বিবর্তন। গতি যতই জটিলতর রূপ পরিগ্রহ করে, ততই উন্নততর শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটতে থাকে—প্রথম আবির্ভাব জড়ের, এরপর জড় থেকে প্রাণের এবং প্রাণ থেকে মনের আবির্ভাব। তাঁর ভবিষ্যদ্দৃষ্টিতে মনুষ্যকুলের একাংশ তার স্বজাতিকে (প্রজাতিকে) ছাপিয়ে রূপান্তরিত হবে দেবকুলে (race of deities)। সুতরাং শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে বলা যায়, প্রকৃতির মর্মে রয়েছে উর্ধ্বমুখী তপস্যা, যার ফলে বিশ্বগতি উচ্চ থেকে উচ্চতর ভূমিতে উত্তরণ করে এসেছে। কিন্তু প্রকৃতি যদি মূলত নিশ্চেতন উদ্দেশ্যহীন জড়পদার্থের মতো একটা কিছু হতো, তাহলে তার পক্ষে কোনো লক্ষ্যসিদ্ধির তপস্যা সম্ভব হতো না এবং উত্তরায়ণ একটা আকস্মিক ব্যাপার, গতির এক আকস্মিক পরিণতি বলেই বিবেচ্য হতো। যে-গতিধারা মূলত বুদ্ধিবর্জিত ও অন্ধ, সেটি যে সবসময় উন্নয়নমুখী থাকবে, উন্নততর সৃষ্টির পথে চালিত হবেই—এমন কথা বলা যায় না। সুতরাং একথা বললে ভুল হবে না যে, আলেকজাণ্ডার প্রকৃত গতি ও বিবর্তনের বর্ণনা দিয়েছেন মাত্র, কিন্তু ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। তিনি অবশ্য অবশেষে বলতে বাধ্য হন যে, দেশ-কালের মধ্যে গোড়া থেকেই দেবত্বে পরিণত হওয়ার একরূপ প্রেরণা নিহিত রয়েছে।

তাহলে বিশ্বের মূল উপাদানটি হচ্ছে দেশ-কাল এবং সেটিতে নিহিত দেবত্বের প্রতি আকর্ষণ বা প্রেরণা (nisus)। কিন্তু দেশ-কালের আদিম অবস্থাতে যখন চেতনার আবির্ভাব হয়নি এবং দেবত্বের কোনরূপ ধারণাই সম্ভব ছিল না, তখন দিব্যরূপায়ণের প্রেরণা থাকতে পারে কি করে? প্রকৃতির অন্তর্নিহিত চেতনা ও উদ্দেশ্যমুখিনতাকে স্বীকার করে না নিলে বলা যায় না যে, প্রকৃতির গতি ও পরিবর্তন দেবত্বকে বা সত্য, শিব ও সুন্দরকে লক্ষ্য করে উর্ধ্বমুখী প্রগতির পথ ধরে চলেছে। পক্ষান্তরে, শ্রীঅরবিন্দের আধ্যাত্মিক বিবর্তন-তত্ত্বের (spiritual theory of evolution) মধ্যে পাই বিবর্তনধারার এক পর্যাপ্ত ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা। তাঁর ধারণায়, সচ্চিদানন্দ (পরমপুরুষ) তাঁর অবিদ্যাশক্তির সাহায্যে নিজেকে ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত করে অবশেষে জড়জগতে পরিণত হয়েছেন। ঐ আত্মসঙ্কোচনের প্রথম পরিণাম হলো মন (মানস জগৎ), দ্বিতীয় পরিণাম প্রাণ (প্রাণময় জগৎ) এবং তৃতীয় পরিণাম জড় (জড়জগৎ)। সুতরাং জড়ের মধ্যে সচ্চিদানন্দ সঙ্কুচিত (সংগুপ্ত) হয়ে অবস্থান করছেন। জড়কে এক বিশেষ অর্থে বলা যায় অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ। তাই একথাও বলা যায় যে, পার্থিব বিবর্তনের মূলে জড়ের মধ্যে ভগবৎ উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্নরূপে নিহিত। জড়ের ভিতর দিয়ে যতই তিনি আত্মপ্রকাশ করেন, ততই জড়জগৎ মার্জিত ও সমৃদ্ধতর হয়ে প্রাণের আবির্ভাবের অনুকূল হয়ে ওঠে। এইভাবে প্রাণময় কোষের বিবর্তন সম্ভব হয়। আর এইভাবেই সচ্চিদানন্দের আত্মপ্রকাশের পরিণতিতে মনোময় কোষের আবির্ভাব ঘটে। স্নায়ু-মস্তিষ্কযুক্ত ইতর প্রাণীদের মধ্যে মনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, কিন্তু ঐসমস্ত মন মানুষী মনের তুলনায় খুবই অনুন্নত।

অরবিন্দ মানুষী মনের স্তরগুলিকে আবিষ্কার করে বর্ণনা দিয়েছেন—সাধারণ মানস, দীপ্তমানস (illumined mind), বোধি (intuitive mind) এবং অধিমানস (over mind)। সচ্চিদানন্দের আত্মসঙ্কোচনের প্রথম পরিণতি হলো অধিমানস এবং এরপর ক্রমিক পরিণতিতে বোধি, দীপ্ত মন এবং সাধারণ মনের সৃষ্টি। এরপরও আত্মসঙ্কোচন অব্যাহত থাকায় পারম্পর্যের ধারায় ইতর প্রাণীর মন ও উদ্ভিদের উদ্ভব হয়েছে এবং ঐ আত্মসঙ্কোচনের অন্তিম পর্বে জড়ের আবির্ভাব। এরপর বিপরীতমুখী যাত্রার শুরু; সচ্চিদানন্দের ক্রমিক আত্মপ্রকাশ বা অভিব্যক্তির (বিবর্তনের) আরম্ভ—জড় থেকে প্রাণে; এরপর প্রাণ থেকে মনে। জড়ের মধ্যে অব্যক্ত যিনি, তিনি জড়কেই আধার করে নিয়ে উর্ধ্ব থেকে উর্ধ্বতর ভূমিতে আত্মপ্রকাশ করেছেন; উন্মেষ হয়েছে প্রাণময় ও মনোময় কোষের। বিবর্তন (evolution) হচ্ছে চৈতন্যস্বরূপ ভগবানের (সচ্চিদানন্দের) ক্রমিক আত্মপ্রকাশ, যার পূর্ববর্তী ভূমিকাটি হলো তাঁরই আত্মসঙ্কোচন।

প্রগতির দুটি ধারা—একটি হলো বিস্তৃতি বা সম্প্রসারণ এবং অন্যটি উদ্গতি বা উত্তরণ—যাকে 'বিবর্তন' বলি। মানুষ অনেক বিষয় আবিষ্কার ও উদ্ভাবন করে। সৌরমণ্ডলের সুদূর প্রান্তে, পৃথিবীর কি সমুদ্রের গভীরতম তলদেশে অথবা জড়বস্তু ও জড়শক্তির সূক্ষ্মতম বিভূতির রাজ্যেও যদি তার দৃষ্টি ও জ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে, তবুও সে মানুষী স্তরেই সীমাবদ্ধ। এই হলো প্রগতির সম্প্রসারণ। মানুষী সভ্যতার যতই বিকাশ হয়ে থাকুক না কেন, তা মানুষী স্তরকে ছাপিয়ে যায়নি। আবার প্রকৃতির মর্মে রয়েছে উর্ধ্বমুখী যাত্রার প্রেরণা, যার ফলে সম্ভব হয়েছে বিবর্তন। ইতরপ্রাণী থেকে হয়েছে মানুষের আবির্ভাব। এই হলো উত্তরণ।

এখন প্রশ্ন—এই বিবর্তনধারাটি কোন্ মানুষী স্তরে এসে সেটির অন্তিম লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে? আর কি বিবর্তন সম্ভবই নয়? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে হলে আগে জানতে হবে বিবর্তন বা জীবনের লক্ষ্য কি? হার্বার্ট স্পেনসার, চার্লস ডারউইন প্রমুখ বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীদের মতে, জীববিবর্তনের লক্ষ্য আত্মরক্ষার সাফল্য, প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকা এবং জীবনযাত্রা নির্বাহ। পক্ষান্তরে উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিক হেনরি বার্গসঁ এই মতের সমালোচনা করে বলেছেন, পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে প্রতিযোজিত করে জীবনযাত্রা নির্বাহ—এইটুকুই যদি প্রাণের (বিবর্তনের) প্রধান লক্ষ্য হয়ে থাকে, তাহলে বলতে পারি যে, মানুষের আবির্ভাবের অনেক কাল পূর্বেই বিবর্তনের অত্যন্ত নিম্নস্তরে সেই লক্ষ্য সিদ্ধ হয়েছিল। সুতরাং ঐ অনুন্নত স্তরেই বিবর্তনের সমাপ্তি হওয়ার কথা। এমন কিছু অত্যন্ত অনুন্নত শ্রেণীর প্রাণী দেখা যায়, যারা মানুষেরই মতো সুষ্ঠুভাবে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে প্রতিযোজিত করে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে চলেছে। তবুও উত্তরণের প্রেরণা প্রাণীদের মধ্যে অব্যাহত রয়েই গেছে—'এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা'। কেন? কোন্ প্রেরণায় প্রাণের ঊর্ধ্বমুখী গতি জটিলতর ও বিপদসঙ্কুল অবস্থাগুলির মধ্য দিয়ে—মৃত্যুর সম্ভাবনাকেও অগ্রাহ্য করে ক্রমশ এগিয়ে গেছে? এই অভিযানে কোন কোন শ্রেণীর প্রাণী মৃত্যুকে পর্যন্ত বরণ করে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাই এই সিদ্ধান্তে আসতেই হয় যে, জীববিবর্তনের প্রকৃত লক্ষ্য শুধুমাত্র জীবনযাত্রা নির্বাহ নয়। জীবনের মূলে একপ্রকার উদ্দীপনা রয়েছে—উন্নততর, বৃহত্তর ভূমিতে পৌঁছানোর, নৈপুণ্য ও উৎকর্ষের শিখরে উত্তরণের। "A very inferior organism is as well adapted as ours to the conditions of existence, judged by its success in maintaining life. Why, then, does life which has succeeded in adapting itself go on complicating itself more and more dangerously? Why did not life stop wherever it was possible? Why has it gone on? Why indeed, unless it be that there is an impulse driving it to take ever greater and greater risk towards its goal of ever higher and higher efficiency?"[২] এই হলো বার্গসঁর বক্তব্য। আধ্যাত্মিক বিবর্তনবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বলা যায় যে, পার্থিব জীবনে সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রকাশকে পরিপূর্ণ করাই হলো এই প্রাণিবিবর্তনের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

মনুষ্যসমাজ কি সত্য, শিব ও সুন্দরকে সম্পূর্ণরূপে মূর্ত করে তুলতে সক্ষম হয়েছে? মানুষ কি যথার্থই প্রকৃতির নিখুঁত সৃষ্টি? তাহলে সমাজের মধ্যে এত দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধের ধ্বংসলীলা কেন? একবার পদার্থবিজ্ঞানী আইনস্টাইন মনস্তত্ত্ববিদ সিগমণ্ড ফ্রয়েডকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: "মনোবিজ্ঞানের আলোতে এমন পথের সন্ধান দিতে পারেন কি, যে-পথে চললে বিশ্বসমাজে যুদ্ধবিগ্রহের সম্ভাবনা থাকবে না?" ফ্রয়েড উত্তর দিলেন: "তা সম্ভব নয় কখনো, কেননা মানুষের প্রকৃতিতেই যুদ্ধপ্রবৃত্তি ও ধ্বংসবৃত্তি অনিবার্যরূপে নিহিত। মানুষ এক উন্নততর শ্রেণীর প্রাণী (higher animal) মাত্র, অতিপ্রাণী (super animal) নয়; আর ধ্বংসবৃত্তি (death-instinct, thanatos) জীবনবৃত্তির অন্তর্গত সৃজনবৃত্তির (eros) মতোই একটি মূল পাশব বৃত্তি।" [মন্তব্য: স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশকেই ধর্ম বলে অভিহিত করেছিলেন। এই মূল পাশববৃত্তিকে অতিক্রম করার ক্ষমতা কেবলমাত্র মানুষেই বিদ্যমান—একথাই বেদান্ত ঘোষণা করেন।—সম্পাদক]



শ্রীঅরবিন্দ

মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের বক্তব্যকে নিজের ভাষায় ব্যক্ত করে শ্রীমা (প্যারিসের মিরা—পণ্ডিচেরী আশ্রমের 'শ্রীমা') বলছেন: "In his physical nature he is yet wholly an animal, a thinking and speaking animal... undoubtedly, nature cannot be satisfied with such an imperfect result." মানুষ তার

২ "An Introduction to Modern Philosophy"—C. E. M. Joad, p. 88

জড়দেহগত প্রকৃতিতে প্রাণীরই গোষ্ঠীভুক্ত—চিন্তা ও বাক্‌শক্তিসম্পন্ন প্রাণীমাত্র এবং প্রকৃতি তার বীক্ষণাগারে এইরকম ত্রুটিপূর্ণ সৃষ্টিকে নিয়ে কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। সে চায় এমন এক জীবের আবির্ভাব ঘটাতে, যার চেতনা মানুষী চেতনার স্তর থেকে অনেক ঊর্ধ্বে, যার আবির্ভাব পৃথিবীতে এনে দেবে ঐক্যতান-মধুর সুখী সুন্দর জীবনধারা। ঐ চেতনাকে শ্রীঅরবিন্দ 'অতিমানস সত্য-চেতনা' (supramental truth-consciousness) বলে অভিহিত করেছেন। অতিমানস (supermind) হলো ব্যক্ত সচ্চিদানন্দের (পরাপ্রকৃতির) প্রাথমিক রূপ, বহিরাবরণ।

বোধ করি, ভারতের এত সাধনা—প্রাচীন ও গতানুগতিক, সবই অজ্ঞাতে অতিমানস বিবর্তনকে (নতুন প্রাকৃত বিবর্তনকে) সার্থক করার জন্য। সচ্চিদানন্দের মধ্যে উত্তরণের সুদূর লক্ষ্য হলো সেখানকার আলো ও শক্তিকে (অতিমানসকে) পৃথিবীতে নামিয়ে এনে পৃথিবীর রূপান্তর (transformation) ঘটানো। পৃথিবীটা সচ্চিদানন্দের কুনজরে চিরকাল পড়ে থাকবেই বা কেন? পার্থিব বিবর্তনধারার মধ্যে অতিমানস নেমে আসে যদি, তাহলে মানুষের আত্মাই শুধু নয়—তার মন, প্রাণ ও দেহ অবিদ্যার বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে রূপান্তরিত হবে দেবত্বে। সাবিত্রী যখন স্বর্গে গিয়ে সত্যবানের কাছে উপস্থিত হলেন, তখন সত্যবান তাঁকে বললেনঃ "তুমি আর জরামৃত্যুর রাজ্যে ফিরে যেও না।" সাবিত্রী উত্তর দিলেনঃ "স্বর্গে আসাটাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না; আমার প্রধান উদ্দেশ্য হলো স্বর্গের আলোকে (অতিমানসকে অর্থাৎ সত্যবানকে) পৃথিবীতে নামিয়ে আনা, যাতে সেখানে দুঃখ, জরা ও মৃত্যু আর না থাকতে পারে।" জরা ও মৃত্যুর দৃশ্যই বুদ্ধদেবকে নির্বাণের পথে ছুটিয়েছিল। নির্বাণ অথবা স্বর্গলাভের কি প্রয়োজন—যদি মানুষের উজান বওয়ার (revolutionary) তপস্যায় পার্থিব জীবনেই ফুটে ওঠে দ্যুলোকের দীপ্তি—"মর্ত্য আধারেই সার্থক হয় অমৃতের প্রেতি"? তাই তো নরেন্দ্রনাথ যখন নির্বাণলাভের সঙ্কল্প ব্যক্ত করলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার করেই বললেনঃ "ছি ছি, তুই এতবড় আধার, তোর মুখে এই কথা। আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি, তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে, তা না হয়ে তুই কিনা শুধু নিজের মুক্তি চাস। এ তো অতি তুচ্ছ হীন কথা!"[৩] শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিত ছিল সুদূরপ্রসারী—রূপান্তরের সাধনা পর্যন্ত। বারীন্দ্রনাথকে তিনি যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন "মন্দির গড়", তার তাৎপর্য শ্রীঅরবিন্দের উপলব্ধিতে হলো 'অতিমানস রূপান্তর'—মানুষের জড়-শরীরে পরমদেবতার প্রতিষ্ঠা। "মন্দির গড়" কথাটি এই অর্থ নিয়ে তাঁর মনে আন্দোলিত হয়। তবে, কোন যুগাবতার একটা যুগে সব যুগের কাজ করেন না—যে-যুগে জন্মগ্রহণ করেন সেই যুগেরই কাজটুকু সমাপ্ত করে চলে যান। শ্রীঅরবিন্দ এমন একটা নতুন যুগের দিকে মানুষের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে চাইলেন, যেখানে অতিমানসিক বিবর্তনের (রূপান্তরের) সাধনার শুরু। তিনি বুঝেছিলেন, বিবর্তনের ইতি নেই। মানুষের অতিমানসিক রূপান্তরের পরও পৃথিবীর বিবর্তন তখন চলতেই থাকবে; অবশ্য তা চলবে এক নতুন খাতে—জ্ঞান থেকে জ্ঞানের দিকে, ছন্দ থেকে ছন্দের দিকে, আনন্দ থেকে আনন্দের দিকে। যে-বিবর্তনধারা এখনো পর্যন্ত পৃথিবীতে চালু রয়েছে, তার গতি অজ্ঞান থেকে জ্ঞানের দিকে, দ্বন্দ্ব থেকে ছন্দের দিকে, দুঃখ থেকে সুখের দিকে।

॥৪॥

শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লব কি ধরনের ছিল তা বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। প্রথমত, তিনি চেয়েছিলেন অজ্ঞানের বন্ধন থেকে আত্মার স্বাতন্ত্র্য, মানবাত্মার মুক্তি—অজ্ঞানাচ্ছন্ন জড় প্রাণ ও মনের কলুষ থেকে বিমুক্ত করে আত্মাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে—যার ফলে এই উপলব্ধি জন্মাবে যে, জীবাত্মাই ব্রহ্ম অথবা ব্রহ্মের অংশবিশেষ। এইধরনের বিপ্লব অবশ্য তাঁর ক্ষেত্রে নতুন কিছু নয়; গতানুগতিক সাধককুলেরও লক্ষ্য সেটাই—আত্মার মুক্তি ও জীবনযন্ত্রণার চির অবসান (আত্যন্তিক নিবৃত্তি)।

শ্রীঅরবিন্দ কিন্তু জড়, প্রাণ ও মনকে কলুষের উৎস বলে মনে না করে সেগুলিকেও মুক্ত ও স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। অজ্ঞানই তো বন্ধন ও কলুষের মূল। আর মন প্রাণ ও জড়শরীর থেকে যদি বন্ধন খসে যায়, তাহলে সেগুলিতেও অসীমের সুর বেজে উঠবে, সার্থক হবে কবি শেলীর স্বপ্ন—

"Make me thy Lyre, even as the forest is :
...Be thou, spirit fierce,
My spirit! be thou me impetuous one!
(Ode to the West Wind)

তবেই তো পূর্ণ হৃদয়ে বলা যাবে—"আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।"

শ্রীঅরবিন্দ বিষয়টিকে পার্থিব বিবর্তনের চরম নিয়তি বলেও জেনেছিলেন। বলেছিলেনঃ "প্রাকৃত চেতনার এই আধারেই দিব্যপুরুষের বিজ্ঞানবীর্য ও সত্তাকে মূর্ত করে তোলা, এই জড় মনের প্রদোষছায়াকে অতিমানসের জ্যোতি-রুচ্ছ্বাসে উদ্ভাস্বর করা, এই জগতের আপাত প্রতীয়মান নিয়তিকৃত নিয়মের মধ্যে জাগিয়ে তোলা অকুণ্ঠিত স্বাতন্ত্র্যের প্রমুক্ত উল্লাস, এই নশ্বর মৃত্যুছায়াকবলিত দেহের মধ্যে অমৃতের নিরন্তর নির্ঝর আবিষ্কার করে দেবতার সোমপাত্রে

৩ যুগনায়ক বিবেকানন্দ—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ১ম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ৫ম সং, পৃঃ ১৫১

একে রূপান্তরিত করা—এমনি করে জড়ের মধ্যেই পরম দেবতার দিব্যরূপায়ণ, এই তো পার্থিব পরিণামের চরম নিয়তি।" গতানুগতিক সাধককুল মুক্তি বলতে বোঝেন জড়শরীর থেকে আত্মার স্বাতন্ত্র্য ও ব্রাহ্মী স্থিতি। পক্ষান্তরে, শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ব্যক্ত করলেন এই কথায়—"চিন্ময় যিনি তাঁরই বিলাস এই মৃন্ময় তনুতে।... যে-জড়কে নিয়ে তাঁর এই সাজের মেলা, অফুরান এই ঘর-বাঁধার খেলা, সেও কখনো অসার্থক বা অগৌরবের নয়।... দেহের প্রতি যে বিতৃষ্ণা আমাদের অভ্যস্ত, তার মোহ কাটিয়ে উঠতে চাই উপনিষদের ঋষির সেই সত্য ও গভীর দৃষ্টি—যা চিন্ময় এবং অন্নময়ের সকল বিরোধ ছাপিয়ে এক অদ্বয়তত্ত্বকে দেখতে পায় দুইয়ের মূলে। দ্বিধাহীন প্রত্যয় নিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বলা চাই তাঁদেরই মতো—'অন্নও ব্রহ্ম'।"

আবার সসীমতা, অপূর্ণতা ও আপেক্ষিকতার মধ্যে যে বিবর্তনধারা (পার্থিব বিবর্তনধারা), তার মধ্যেও ঐশী তাৎপর্যের আবিষ্কার। এটি হলো তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তার এক বৃহত্তম পদক্ষেপ। প্রকৃতির মর্মে যে উর্ধ্বমুখী তপস্যা, তাতে সচেতনভাবে অংশগ্রহণ হলো তাঁর তপস্যার শেষ পর্ব। যাতে মানুষ সজ্ঞানে অপরাপ্রকৃতির এই প্রয়াসে অংশ নিয়ে সিদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে পারে, সেইজন্যই তো তার মধ্যে চেতনা ও ব্যক্তিত্ব এত বিকশিত। বিবর্তনধারার অসংখ্য কেন্দ্রগুলির প্রত্যেকটিতে পরমাত্মা সক্রিয় ব্যক্তি-আত্মা বা চৈত্যপুরুষ (psyche)-রূপে নিহিত থেকে বিবর্তনকে ক্রমশ উর্ধ্ব থেকে উর্ধ্বতর ভূমির দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন এবং কেবল আত্মসচেতন জীব মানুষের পক্ষেই সম্ভব নিজের মধ্যে প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থিত ঐ চৈত্যপুরুষ ও তাঁর তপস্যা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ঐ তপস্যায় অংশগ্রহণ করা, প্রকৃতির প্রতিরোধ ও মন্থরতাকে কাটিয়ে অতিমানস বিবর্তনের পথে মানবগোষ্ঠীকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে চলা।

প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিণামের ছন্দে যদি বিবর্তনের লক্ষ্য সিদ্ধ হয়, তাহলে ঐ লক্ষ্যসাধনে দীর্ঘকাল ব্যয়িত হবে। ইতরপ্রাণীর ধারা পেরিয়ে মানুষীধারার প্রবর্তন করতে কত কোটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল! আবার মানুষীধারাকে সম্পূর্ণ করে অতিমানসধারাকে এনে দিতে অনুরূপ দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হবে। শ্রীঅরবিন্দের মতে পৃথিবীতে অতিমানসের আবির্ভাব সম্ভব হবে—"হয় ব্যক্তির উজান বওয়ার তপস্যায় (revolutionary individual effort), নয়তো বিশ্বপ্রকৃতির স্বাভাবিক ছন্দে (an evolutionary general progression)।" পণ্ডিচেরী আশ্রমে শ্রীঅরবিন্দের যে চল্লিশ বছরের তপস্যা, তাকে বলতে পারি তাঁর উজান বওয়ার তপস্যা। এর লক্ষ্য প্রকৃতির জড়তা ও তার মন্থরতাকে ভেঙে তারই মধ্যে "জাগিয়ে তোলা অকুণ্ঠিত স্বাতন্ত্র্যের প্রমুক্ত উল্লাস"। এই হলো শ্রীঅরবিন্দের মূল বিপ্লব, যার চিহ্ন ফুটে ওঠে তাঁর রাজনীতির ক্ষেত্রে—ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে।

শ্রীঅরবিন্দ ১৯৫০ সালের ৫ ডিসেম্বর রাত্রি ১টা ২৬ মিনিটে রহস্যময় কোন কারণে মৃত্যুবরণ করেন। ব্যাপারটি যেন ইচ্ছামৃত্যু। শ্রীমা বলেছিলেন, যে-কারণে তিনি দেহত্যাগ করেছেন "তা এত মহৎ যে মানুষের বুদ্ধি তা বুঝবে না।" 'সাবিত্রী' কাব্যের সম্পূরণের পরই শ্রীঅরবিন্দের মৃত্যুবরণ। তিনি যেন তাঁর জড়শরীরে অতিমানসকে নামিয়ে রূপান্তরের আগেই নিজের সত্তাকে দেহ থেকে সরিয়ে নিলেন, কিন্তু রূপান্তরের কিছু পূর্বলক্ষণ শরীরে দেখা দিল; প্রমাণ হিসাবে চিহ্ন রেখে গেলেন। আশ্রমবাসী ডাক্তার নীরদবরণের বর্ণনায় —"মৃত্যুর পর ভোরে দেখা গেল যে, তাঁর দেহ সোনালী রঙে উজ্জ্বল। এই স্বর্ণাভা পাঁচদিন ধরে অত্যুজ্জ্বল থাকে এবং শত শত লোক দেখতে পায়। পাঁচদিন অবধি তাঁর দেহে কোন বিকৃতি দেখা দেয়নি।" পণ্ডিচেরীর তৎকালীন ফরাসী সরকারের নিয়মানুযায়ী কোন মৃতদেহকে ২৪ ঘণ্টার অধিক সময় মাটির বাইরে রাখা সম্ভব ছিল না। তাই সরকারের পক্ষ থেকে দুজন ডাক্তার (ফরাসী ও ব্রিটিশ) মৃতদেহটিকে পরীক্ষা করে দেখেন ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে মন্তব্য করেনঃ "Miracle beyond medical science." আশ্রম থেকে ঘোষিত হয়ঃ "His body is charged with a concentration of supramental light that there is no sign of decomposition and the body will be kept lying on his bed so long as it remains intact."[8] শরীরে বিকৃতি না দেখা দেওয়া পর্যন্ত দেহটিকে রাখা হয় এবং ৯ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৫টায় দেহ সমাধিস্থ করা হয়। ❑ [সমাপ্ত]


অন্তিমশয্যায় শায়িত শ্রীঅরবিন্দ

সহায়ক গ্রন্থ ঃ
(১) হে চিরদিনের, (২) দিব্যজীবন, (৩) অরবিন্দায়ন।

8 The Mystery of December 5, 1950, All India Magazine, Dec. 1998, Sri Aurobindo Society, Pondicherry, p. 11

অবহেলিত বাংলার যোগাসন ও জিমন্যাস্টিক্স

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

অলিম্পিকে ভারতবর্ষ কি কোনদিনও জাতি হিসাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না? স্বাধীনতার পর চুয়ান্ন বছর অতিক্রান্ত, কিন্তু এখনো এ-প্রশ্ন আমাদের তাড়া করে বেড়ায়, একধরনের হতাশা ও মানস-যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হই আমরা। কেন এই অবস্থা? এর অন্যতম কারণ, ভারতবর্ষে শরীরচর্চাকে সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি কখনো। অথচ এদেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে অন্যতম ঐতিহ্য হলো যোগাসন—যার গুরুত্ব আজ সার্বজনীন। পাশ্চাত্যের উন্নত দেশসমূহ দেহ-সৌষ্ঠব ও জিমন্যাস্টিক্স চর্চা বজায় রেখেও অগ্রাধিকার দিয়েছে যোগ-ব্যায়ামকে। শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানসিক শক্তি ও লক্ষ্যে একনিষ্ঠ হওয়ার চাবিকাঠি তারা খুঁজে পেয়েছে যোগাসনের মধ্যে। এর সঙ্গে আবশ্যক শারীরিক কলাকৌশলে উৎকর্ষসাধনের হাতিয়ার জিমন্যাস্টিক্স, যার নান্দনিক মহিমায় উদ্ভাসিত বিশ্বক্রীড়াঙ্গন।



মহীশূর রামকৃষ্ণ মিশনে যোগাসন প্রশিক্ষণ চলছে

আধুনিক ভারতবর্ষের সঙ্গে সনাতন ভারতবর্ষের সমন্বয়ে এক শাশ্বত সভ্যতার স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ—জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যাঁর চিন্তা ও দর্শনের প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি মনে করতেন, মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, সুস্থ ও সবল শরীর না হলে মানুষের পক্ষে বড় কিছু করা সম্ভব নয়। তাই তিনি নিজে সবরকমের শরীরচর্চা করেছেন, কুস্তি, যোগাসন ও খেলাধূলায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন ভারতবাসীকে দেহ-মন-আত্মায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত বিংশ শতকের অন্যতম বাঙালী সুদেহী নীলমণি দাস—'আয়রন ম্যান' নামেই যিনি সমধিক পরিচিত। কথা হচ্ছিল তাঁর সুযোগ্য পুত্র ও 'আয়রন ম্যান হেলথ হোম' নামক সুবিস্তৃত যোগাসন ও ব্যায়াম সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী স্বপন দাসের সঙ্গে।

একান্ত আলাপচারিতায় স্বপন দাসের কাছ থেকে জানা গেল, এরাজ্যের যোগাসনের প্রকৃত রূপরেখাটি। পশ্চিমবঙ্গে যোগাসনের প্রকৃত প্রসার ঘটে স্বাধীনতার অব্যবহিত পূর্বেই। সেসময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কিংবা পূজানুষ্ঠানে দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শনীর আয়োজন করা হতো। এইসব প্রদর্শনীতে কলকাতার নামকরা 'বডি-বিল্ডার'রা দেহসৌষ্ঠবের নানাধরনের কলাকৌশল প্রদর্শন করতেন। প্রচুর দর্শক সমাগম হতো এসব জায়গায়। এরকমই এক অনুষ্ঠানে ব্যায়াম প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে যোগাসনের নানা আঙ্গিকের ব্যবহারিক প্রয়োগ ও তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছিলেন ব্যায়ামের কিংবদন্তি বিষ্টুচরণ ঘোষ। ব্যাপারটি বেশ উপভোগ্য হয়েছিল সমবেত দর্শকদের কাছে। তারপর থেকে এধরনের আসরগুলিতে দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শনীর সঙ্গে যোগাসনের প্রদর্শনীও আবশ্যিক ও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে।



'আয়রন ম্যান' নীলমণি দাস

এরাজ্যে যোগাসনের পথপ্রদর্শক হলেন বিষ্টুচরণ ঘোষ ও নীলমণি দাস। পরবর্তী কালে এসেছেন মনতোষ রায়, তুষার শীল প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বরানগরের 'শিবানন্দ সরস্বতী যোগকেন্দ্র', মানিকতলার 'আয়রন ম্যান হেলথ হোম', বিষ্টুচরণ ঘোষের 'ঘোষেস কলেজ অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন', ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের 'যোগাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র', মনতোষ রায় ও তুষার শীলের 'যোগা ও মাল্টি জিমন্যাসিয়াম', 'ওয়ার্ল্ড যোগা সোসাইটি'—এসব কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যোগাসনবিদ্‌রা রাজ্য ও জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছে। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য যোগাসনের দুটি স্বতন্ত্র রাজ্যসংস্থা আছে। একটি 'ওয়েস্ট বেঙ্গল যোগা অ্যাসোসিয়েশন', যার প্রধান কর্ণধার বিখ্যাত বডিবিল্ডার কমল ভাণ্ডারী, অপরটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ যোগাসন-বিশেষজ্ঞ ডাঃ নীরেন মজুমদারের 'ওয়েস্ট বেঙ্গল যোগা রিসার্চ ইনস্টিটিউট'। ১৯৮৯-৯০ সাল নাগাদ রাজ্য সরকারের ক্রীড়াপর্ষদ্ এই দুই সংস্থাকে এক করার একটা দুরূহ প্রয়াস চালিয়েও ব্যর্থ হন। এই দুই

পৃথক রাজ্যসংস্থাই এরাজ্যে যাবতীয় যোগাসন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে এবং সেসমস্ত প্রতিযোগিতায় কৃতী প্রতিযোগীদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় পাঠানো হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৯৪-এ পণ্ডিচেরীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলার পল্লব দাশগুপ্ত চ্যাম্পিয়ন হয়ে বাংলা ও ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। এদেশে দুবার বিশ্ব প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। একবার পণ্ডিচেরীতে, তারপর কেরালায়। এধরনের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাই পরবর্তী কালে অলিম্পিকে এর অন্তর্ভুক্তির ভিত্তি।

জিমন্যাস্টিক্স

অলিম্পিকে অ্যাথলেটিক্স ও সাঁতারের পরই সবচেয়ে বেশি পদক রয়েছে জিমন্যাস্টিক্সে। অ্যাথলেটিক্স ও জিমন্যাস্টিক্সকে প্রাত্যহিক জীবনচর্চার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জার্মানি, চিন-সহ বিশ্বের প্রতিটি ক্রীড়া-উন্নত দেশ। তাই প্রতিটি অলিম্পিকে এইসব দেশের জয়যাত্রা অব্যাহত। আমরা এই দুটি বিষয়কে, বিশেষ করে জিমন্যাস্টিক্সকে চূড়ান্ত অবহেলা করে এসেছি, তাই অলিম্পিক মানচিত্রে ভারতবর্ষের অবস্থান সিন্ধুতে বিন্দুর মতো।

ভারতবর্ষে জিমন্যাস্টিক্সের আঁতুড়ঘর এই কলকাতাই। কলকাতাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এদেশের প্রথম জিমন্যাস্টিক্স ক্লাব—'বউবাজার ব্যায়াম সমিতি'। রাজ্যসংস্থার সদর কার্যালয়ও এই ক্লাবপ্রাঙ্গণে। রাজ্যসংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বেশ কিছুকাল পরে জাতীয় সংস্থার জন্ম হয়। অথচ এই রাজ্যসংস্থার জিমন্যাস্টিক্সের হাল-হকিকৎ দেখলে একরকম হতাশা ও বেদনা এসে গ্রাস করে। সরকার ও বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির ন্যূনতম পৃষ্ঠাপোষকতার অভাবে জিমন্যাস্টিক্সের ফ্লোর ও যাবতীয় অ্যাপারেটাসের ঠিকমতো পরিচর্যাও হয় না। সিমেন্টের মেঝেতে কিংবা ঘাসহীন মাঠেই তৈরি হয়ে রাজ্যের ছেলেমেয়েরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

ভারতবর্ষের জিমন্যাস্টিক্সে বাংলার মেয়েরা বরাবরই ভাল পারফরমেন্স করে এসেছে। প্রতিটি জাতীয় আসর ও জাতীয় গেমস-এও মেয়েদের বিভাগে পদকের সিংহভাগ দখল করেছে বাংলার মেয়েরা। জাতীয় স্তরে ১৪বার তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এই মুহূর্তে এরাজ্যের সবচেয়ে আলোচিত জিমন্যাস্ট হলেন টুম্পা দেবনাথ। ইম্ফলে গত জাতীয় গেমস-এ টুম্পা ৬টি পদক দিয়েছেন বাংলাকে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভাল কিছু করে দেখানোর সম্ভাবনা ও প্রতিভা রয়েছে এই অষ্টাদশী তরুণীর। এছাড়া সাম্প্রতিক কালে উল্লেখযোগ্য পারফরমেন্স দেখিয়েছেন তিথি ভট্টাচার্য, পম্পা ঘোষ, সুন্দরী মণ্ডলরা। বাংলার অঞ্জু দে ১৯৮২-র এশিয়ান গেমস-এর আগে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিলেন। এশিয়াডে অঞ্জু ব্যর্থ হলেও তাঁর কলাকৌশল প্রদর্শন উচ্চপ্রশংসিত হয়েছিল। তারও আগে অম্বালিকা মজুমদার বাংলাকে জাতীয় পর্যায়ে সম্মান ও মর্যাদার উঁচু আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

পক্ষান্তরে বাংলার পুরুষ জিমন্যাস্টরা কখনোই নির্দিষ্ট ছন্দ ও মাত্রা অনুযায়ী নিজেদের পারফরমেন্স তুলে ধরতে পারেননি। বিক্ষিপ্তভাবে অবশ্য কেউ কেউ চমক দেখিয়েছেন, খেতাব জিতে জাতীয় দলে জায়গা করে নিয়েছেন। বাংলার নিমাই কাঞ্জি কমনওয়েলথ গেমস জিমন্যাস্টিক্সে অংশ নিয়েছেন। তাছাড়া গৌর দে, দিলীপ ওঝারা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমাদর পেতেন। জিমন্যাস্টিক্সের পীঠস্থান সোভিয়েত রাশিয়াতেও তাঁরা দেশের প্রতিনিধি হিসাবে গিয়েছিলেন। তবে এই মুহূর্তে অলিম্পিক তো দূর অস্ত্, মানের ক্রমাবনতি হওয়ায় এশিয়ান গেমস-এও ভারতীয় দল (পুরুষ ও মহিলা দুই-ই) অংশগ্রহণের ছাড়পত্র পায় না।

অলিম্পিকের নিয়ম অনুযায়ী পুরুষ বিভাগে রিং, প্যারালাল বার, হরাইজেন্টাল বার, ভল্টিং, ফ্লোর এক্সারসাইজ ও পমেল হর্স—এই ছয়টি বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। অন্যদিকে মহিলা বিভাগের আঙ্গিকগুলি হলো—বিম, ভল্টিং, ফ্লোর, আন-ইভন বার। তাছাড়া রিদমিক জিমন্যাস্টিক্সও অলিম্পিকের তালিকাভুক্ত। তবে এই ইভেন্টটি এখনো সেভাবে প্রসারলাভ করেনি এরাজ্যে। এপ্রসঙ্গে বলতে হয়, 'বউবাজার ব্যায়াম সমিতি' ছাড়াও 'শ্রীরামপুর কল্যাণ সমিতি', 'দত্তবাগান শিশুমঙ্গল' এবং হুগলী, চন্দননগর, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এরকম বেশ কয়েকটি ভাল জিমন্যাস্টিক্স ক্লাব আছে। জলপাইগুড়িতেও এখন বেশ কয়েকটি অঞ্চলে জিমন্যাস্টিক্স জনপ্রিয়। মূলত এসব ক্লাবই ধরে রেখেছে বাংলার জিমন্যাস্টিক্সকে। ❑

সমাধান : শব্দচেতনা ৪

পাশাপাশি : (১) অম্বু গুহ, (৩) গঙ্গাধর, (৬) গঙ্গা, (৭) প্রেমানন্দ, (৮) শ্রীম, (১১) জালা, (১২) দানা, (১৩) নাথ, (১৪) নন্দ, (১৮) তনু, (১৯) তরোয়াল, (২০) শশী, (২২) সদানন্দ, (২৩) অবতার।

ওপর-নিচ : (১) অনুগত, (২) গুলি, (৪) রঘুমণি, (৫) হেমালী, (৯) ভোলানাথ, (১০) জ্ঞানানন্দ, (১৫) হাতরাস, (১৬) খেয়াল, (১৭) কাশীপুর, (২১) ভাব।

'কথামৃত'-এ বিভাষিত শ্রীরামকৃষ্ণ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

কি দেখছেন মহেন্দ্রনাথ—ঘরের ভিতরটা ভোরের কুয়াশার মতো সাদা ধুনোর ধোঁয়ায়? দরজা ফাঁক হওয়া মাত্রই খানিক বেরিয়ে গেল বাইরে। দূরে সেই তক্তপোশে সম্পূর্ণ একা বসে আছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে দেখছেন বলে মনে হচ্ছে স্বপ্ন। ঠাকুর কখনো স্পষ্ট, কখনো অস্পষ্ট। সমস্ত দরজা বন্ধ।

মহেন্দ্রনাথ শিক্ষিত। জ্ঞানের গরিমামণ্ডিত। তাই ভূমিষ্ঠ হলেন না, বদ্ধাঞ্জলি হয়ে প্রণাম করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মৃদুস্বরে বললেন, বস। ধুনোর গন্ধ। প্রদীপের মৃদু আলো। গঙ্গার তীর। বিশাল দেবালয়। বিস্তীর্ণ উদ্যান। বাইরে ঝরছে চাঁদের আলো। হিমহিম বাতাস। সানাই থেমে গেলেও বাতাসে ঘুরছে সুর। মহেন্দ্রনাথ ভাবুক মানুষ, তাঁর মনে হতে লাগল, তিনি পুরাণের যুগে ফিরে গেছেন।

দুজনে পাশাপাশি বসে আছেন মেঝেতে।

ঠাকুর একসময় জানতে চাইলেন—কোথায় থাক, কি কর, বরানগরে কেন এসেছ? মহেন্দ্রনাথ সব বললেন। কথা বলতে বলতে লক্ষ্য করছেন, ঠাকুর মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন। মহেন্দ্রনাথ আজ নয়, পরে জানতে পারবেন সন্ধ্যার পর ঠাকুরের ভাব হয়। যত রাত বাড়বে তত ভাব বাড়বে। সারা রাত তিনি ঘুমোন না। তিনি রাত্রির অধীশ্বর।

মহেন্দ্রনাথ বললেন: "আপনি এখন সন্ধ্যা করবেন, তবে এখন আমরা আসি।"

ভাবস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন: "না, সন্ধ্যা—তা এমন কিছু নয়।"

মহেন্দ্রনাথ ও সিধু প্রণাম করলেন। ঠাকুর বললেন: "আবার এস।"

দুজনে ফিরছেন। পিছনে পড়ে রইল নিরালা উদ্যান-মন্দির। থইথই চাঁদের আলোয়। বসন্তের বাতাস ছেড়েছে খুব। গঙ্গার কলকল্লোল।

মহেন্দ্রনাথ ভাবছেন, শুধুই ভাবছেন, কে এই সৌম্য? কেন ইচ্ছে করছে এখনি আবার ফিরে যাই?

দ্বিতীয় দর্শনে মহেন্দ্রনাথ আরো কাছে। একেবারে পাশে। সকালের পরিপূর্ণ আলোয় একেবারে স্পষ্ট। স্বর্ণকান্তি, স্নিগ্ধ। "এখানে বস" বলায় মহেন্দ্রনাথ বসেছেন। ক্ষৌরকার প্রস্তুত। মহেন্দ্রনাথ র‍্যাপার দেখছেন, পা দেখছেন, চটি দেখছেন। সন্ধ্যার সাধকের রূপ নয়, যেন এক বিশিষ্ট গৃহী। চুম্বকের মতো আকর্ষণশক্তি। ভীষণ এক প্রভাব। অসাধারণ এক সাধারণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথা বলেন একটু থেমে থেমে। প্রথমদিনের প্রশ্নই আবার করলেন: "হ্যাঁগা, তোমার বাড়ি কোথায়?"

"আজ্ঞা, কলকাতায়।"

"এখানে কোথায় এসেছ?"

"এখানে বরাহনগরে বড়দির বাড়িতে এসেছি। ঈশান কবিরাজের বাটী।"

কবিরাজ ঈশানচন্দ্র মজুমদার ঠাকুরের অতি পরিচিত। ঈশানচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে আসেন। কখনো কখনো চিকিৎসা করেন। মহেন্দ্রনাথের ভগিনীপতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন: "ওহ্ ঈশানের বাড়ি!" একটু বিরতির পর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন: "হ্যাঁগা, কেশব কেমন আছে? বড় অসুখ হয়েছিল।" মহেন্দ্রনাথ বললেন: "আমিও শুনেছিলাম বটে, এখন বোধহয় ভাল আছেন।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে লাগলেন: "আমি আবার কেশবের জন্য মার কাছে ডাব-চিনি মেনেছিলুম। শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে যেত, আর মার কাছে কাঁদতুম, বলতুম, 'মা, কেশবের অসুখ ভাল করে দাও; কেশব না থাকলে আমি কলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কব?' তাই ডাব চিনি মেনেছিলুম।"

ক্ষৌরকার তাঁর কাজ করে চলেছেন। কথা আসছে নানারকম। সকাল গুটিগুটি এগোচ্ছে দুপুরের দিকে। মন্দির-চত্বরে ভক্তসমাগম বাড়ছে। পুণ্যার্থীরা শিবমন্দিরের উঁচু রকে ঘোরাফেরা করছেন। মন্ত্রোচ্চারণের শব্দ। মায়ের মন্দিরে পূজার আয়োজনের ব্যস্ততা।

ঠাকুরের কাছে আরেকজন এসে বসেছেন। শক্ত-সমর্থ এক পুরুষ। একটু পরেই শুরু হবে সেই বিখ্যাত অহঙ্কার চূর্ণ পালা। দক্ষ শিকারী শ্রীরামকৃষ্ণ, মহেন্দ্রনাথ পরে যাঁকে তুলনা করবেন পশুরাজ সিংহের সঙ্গে। Majestic, Dignified. আরেকটু ইংরেজী এসে যাচ্ছে। উপায় নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ ধীরে ধীরে মহেন্দ্রনাথে প্রবেশ করছেন। কেন?

God is working His purpose out as your succeeds to year
God is working His purpose out and the time is drawing near;
Nearer and nearer draws the time, the time that surely be,
When the earth shall be filled with the glory of God
as the waters cover the sea. [A.C. Ainger]

শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ প্রশ্ন করলেন: "তোমার কি বিবাহ হয়েছে?"

"আজ্ঞা হ্যাঁ।"

ঠাকুর শিউরে উঠলেন—"ওরে রামলাল! যাঃ, বিয়ে করে ফেলেছে!"

যে-পুরুষটি অদূরে এসে বসেছেন, তাঁর নাম তাহলে রামলাল। মহেন্দ্রনাথ পরে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও

জানতে পারবেন। ঠাকুরের মেজদা রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের বড় ছেলে। কালীবাড়ির পূজারী।

ঠাকুরের ভীষণ মন্তব্যে মহেন্দ্রনাথ অবনতমস্তক। বিয়ে নামক অপরাধ করে ফেলেছেন তিনি।

পরের প্রশ্ন—"তোমার কি ছেলে হয়েছে?"

বিখ্যাত শিক্ষক। ব্রাহ্ম আন্দোলনের স্পর্শ আছে। তাঁর স্ত্রী নিকুঞ্জদেবী ঠাকুরচরণ সেনের কন্যা, বিখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনের সম্পর্কে ভগিনী। ঠাকুরের দ্বিতীয় প্রশ্নে এমন এক মহেন্দ্রনাথেরও বুক টিপ্‌টিপ্ করছে।

ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলেন : "আজ্ঞা, ছেলে হয়েছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ আরো হতাশ হয়ে বললেন : "যাঃ, ছেলে হয়ে গেছে!"

মহেন্দ্রনাথ খুব বিপন্নবোধ করছেন। লজ্জিত। স্তব্ধ। আমরা তাঁর মুখ দেখতে পাচ্ছি। মহেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব এখন শ্রীরামকৃষ্ণের হাতের মুঠোয়।

মহেন্দ্রনাথ অনুভব করতে পারছেন, তাঁর অহঙ্কার চূর্ণ হচ্ছে। অহঙ্কার মানে 'আমি'। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত, খাস কলকাতার উচ্চবংশীয় এক যুবক, হঠাৎ উপলব্ধি করছেন, তাঁর 'আমি' ছিঁড়ে ফালাফালা।

করুণাময় ঠাকুর। ক্ষৌরকার চলে গেছেন। ঠাকুর একা। মুখখানি ফুটে উঠেছে স্থলপদ্মের মতো। অতি অন্তরঙ্গ, অন্তরঙ্গতম দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ তাকিয়ে আছেন মহেন্দ্রনাথের দিকে। বড় দুর্যোগের মধ্য দিয়ে চলেছে তাঁর জীবন। গৃহ-আত্মীয়স্বজন বিষবৎ। উৎস—বিবাহ। পড়ে আছেন দিদির বাড়িতে। পিতা-পুত্র শত্রুর মতো। এতটাই হতাশ, 'আমি'র আধার শরীরটাকে বিসর্জন দিতে চাইছেন। ঠাকুর যে সব জানতে পারেন! কৃপা করবেন তিনি। মুখে মধুর হাসি। মহেন্দ্রনাথ ভগবানকে দেখেননি, এখন শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখছেন।

স্নেহভরা মধুর গলায় শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন : "দেখ, তোমার লক্ষণ ভাল ছিল। আমি কপাল, চোখ—এসব দেখলে বুঝতে পারি। আচ্ছা, তোমার পরিবার কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি?"

পরিবারকে নিয়েই তো সমস্যা! আর ঠাকুর সেই পরিবারের প্রসঙ্গই তুলেছেন!

মহেন্দ্রনাথ বললেন : "আজ্ঞা ভাল, কিন্তু অজ্ঞান।"

মহেন্দ্রনাথ আবার বিপদে পড়লেন।

ঠাকুর ভীষণ বিরক্ত হয়ে বললেন : "আর তুমি জ্ঞানী!"

এখন নয়, পরে এই কৃপাময় তাঁকে জানাবেন জ্ঞান কাকে বলে, অজ্ঞান কাকে বলে। ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান, ঈশ্বরকে না-জানার নামই অজ্ঞান।

শ্রীরামকৃষ্ণের এইবার অদ্ভুত প্রশ্ন : "আচ্ছা, তোমার 'সাকারে' বিশ্বাস, না 'নিরাকারে'?" 'লজিক' কি বলে? যুক্তিবিদ্যা! দুটো বিরুদ্ধ অবস্থা একই বস্তুর, বস্তুর অস্তিত্বকেই তো অপ্রমাণ করে। নৈয়ায়িকরা শুনলে তো লাফিয়ে উঠবেন। সাদা দুধ কি আবার কালো হতে পারে!

মহেন্দ্রনাথ বললেন : "আজ্ঞা, নিরাকার—আমার এইটি ভাল লাগে।"

ঠাকুর তখন সেই বিখ্যাত কথাটি বললেন—knowledge supreme—"তা বেশ! একটাতে বিশ্বাস থাকলেই হলো। নিরাকারে বিশ্বাস, তা তো ভালই। তবে এ-বুদ্ধি করো না যে, এইটি কেবল সত্য আর সব মিথ্যা। এইটি জেনো যে, নিরাকারও সত্য, আবার সাকারও সত্য। তোমার যেটি বিশ্বাস, সেইটিই ধরে থাকবে।"

মহেন্দ্রনাথ অবাক। কোন পুঁথিতে এ-বিদ্যা নেই। তর্ক করার ইচ্ছা হচ্ছে। এইবার তাঁর অহঙ্কারে তৃতীয় আঘাত।

মহেন্দ্রনাথ বললেন : "আজ্ঞা, তিনি সাকার, এ-বিশ্বাস যেন হলো। কিন্তু মাটির প্রতিমা তিনি তো নন!"

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন : "মাটি কেন গো! **চিন্ময়ী প্রতিমা**।"

মহেন্দ্রনাথ 'চিন্ময়ী' শব্দটির সঙ্গে পরিচিত নন।

মহেন্দ্রনাথ বললেন : "আচ্ছা, যারা মাটির প্রতিমা পূজা করে, তাদের তো বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, মাটির প্রতিমা ঈশ্বর নয়, আর প্রতিমার সম্মুখে ঈশ্বরকে উদ্দেশ করে পূজা করা উচিত।"

ঝড়ের আগে প্রকৃতি যেমন থমথম করে, ঠাকুরের মুখ সেইরকম থমথমে।

"তোমাদের কলকাতার লোকের ঐ এক! কেবল লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া! আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই! তুমি বুঝাবার কে? যাঁর জগৎ, তিনি বুঝাবেন। যিনি এই জগৎ করেছেন, চন্দ্র, সূর্য, মানুষ, জীবজন্তু করেছেন; জীবজন্তুদের খাবার উপায়, পালন করবার জন্য মা-বাপ করেছেন, মা-বাপের স্নেহ করেছেন—তিনিই বুঝাবেন।... তিনি তো অন্তর্যামী। যদি ঐ মাটির প্রতিমা পূজা করাতে কিছু ভুল হয়ে থাকে, তিনি কি জানেন না—তাঁকেই ডাকা হচ্ছে! তিনি ঐ পূজাতেই সন্তুষ্ট হন। তোমার ওর জন্য মাথাব্যথা কেন? তুমি নিজের যাতে জ্ঞান হয়, ভক্তি হয়, তার চেষ্টা কর।"

মহেন্দ্রনাথ চুরমার। শ্রীশ্রীমা বলতেন : "ঠাকুর ছাঁচ ভেঙে নতুন ছাঁচে গড়তে পারতেন।"

মহেন্দ্রনাথ আর কখনো তর্ক করবেন না। এইবার তিনি তৈরি করবেন নিজেকে! বেলা বাড়ছে, কথা শেষ হচ্ছে না। শ্রীরামকৃষ্ণ আগে মহেন্দ্রনাথকে শূন্য করলেন। সংস্কার ছেদন করলেন। এইবার পূর্ণ করছেন, নতুন সংস্কার তৈরি করছেন।

এল মাছের উপমা। যার যেমন পেটে সয় মা সেইভাবেই রাঁধেন। আর বললেন : "**ঈশ্বরের নামগুণগান সর্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ।... সব কাজ করবে, কিন্তু মন ঈশ্বরেতে**

রাখবে।... বড় মানুষের বাড়ির দাসী সব কাজ কচ্ছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মতো মানুষ করে। বলে 'আমার রাম', 'আমার হরি', কিন্তু মনে বেশ জানে—এরা আমার কেউ নয়।"

বেলা বাড়ছে। ঠাকুর নিশ্চয় মোলেস্কিনের র‍্যাপারটি খুলে রামলালের হাতে দিয়ে দিয়েছেন। তিনি চলে গেছেন কালীঘরে। এইবার পূজা আরম্ভ হবে। ভোগ নিবেদন। অতিথিশালার দিকে ভিড় জমছে। রঙবেরঙের মানুষ।

ঠাকুর ক্লান্তিহীন। আরো বলবেন। বলবেন ঃ "ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়।... সংসার জল, আর মনটি যেন দুধ। যদি জেলে ফেলে রাখ, দুধে-জলে মিশে এক হয়ে যায়, খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তাহলে ভাসে। তাই নির্জনে সাধনা দ্বারা জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসার-জলে ফেলে রাখলেও মিশবে না, ভেসে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়—এই পর্যন্ত। ভগবানলাভ হয় না।... সুন্দর দেহেই বা কি আছে!... এইসব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়?"

মহেন্দ্রনাথের প্রশ্ন ঃ "ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায়?"

"হ্যাঁ, অবশ্যই করা যায়। মাঝে মাঝে নির্জনে বাস; তাঁর নামগুণগান, বস্তুবিচার—এইসব উপায় অবলম্বন করতে হয়।" মহেন্দ্রনাথ নদী নন, রামকৃষ্ণ-সাগরের তটে পরিণত হয়েছেন। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে।

মহেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাস করছেন ঃ "কি অবস্থাতে তাঁকে দর্শন হয়?"

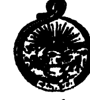
শ্রীরামকৃষ্ণ—"খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। মাগছেলের জন্য লোকে এক ঘটি কাঁদে, টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে? ডাকার মতো ডাকতে হয়।... তিন টান একত্র হলে তবে তিনি দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের ওপর, মায়ের সন্তানের ওপর, আর সতীর পতির ওপর টান। এই তিন টান যদি কারো একসঙ্গে হয়, সেই টানের জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে।"

মহেন্দ্রনাথের কি ভাগ্য ঠাকুর তাঁকে গান শোনাচ্ছেন—

"ডাক দেখি মন ডাকার মতো কেমন শ্যামা থাকতে পারে।"

মহেন্দ্রনাথ বুঁদ হয়ে ফিরে এলেন বোনের বাড়িতে। খোল সেই এক, কিন্তু পুর বদলে গেছে। 'কথামৃত'-এর কালাধারে কলকাতার অনেক রাজপথ ফিতের মতো গোটানো আছে। এইবার একটি পথ খুলবে। ঘোড়ার গাড়ির চাকার শব্দ শোনা যাবে। দক্ষিণেশ্বরের ফটক খুলে গেছে। শীর্ণ ঘোড়া, জীর্ণ গাড়ি, অতি মূল্যবান আরোহী। শ্রীরামকৃষ্ণ। অন্য সময়ে যাঁর বসনের ঠিক থাকে না, তিনি আজ সেজেছেন। বেশ চমৎকার লাগছে। একবার কেশবচন্দ্র বলেছিলেন ঃ "আজ যে বড় সাজ! কালোপাড় ধুতির বাহার!" রসিক ঠাকুরের উত্তর ঃ "কেশবের মন ভোলাতে।" তাঁর সঙ্গে রয়েছেন ভবনাথ, হাজরামশাই আর মহেন্দ্রনাথ।

৫ আগস্ট ১৮৮২ সাল। বেলা প্রায় ৪টে। বেশ রোদ। দৃক্‌পাত নেই ঠাকুরের। [ক্রমশ] (তিন)

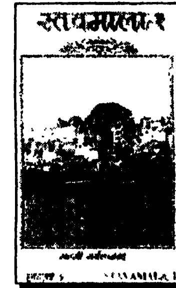


উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত

স্বামী সর্বগানন্দের

তিনটি নতুন ক্যাসেট

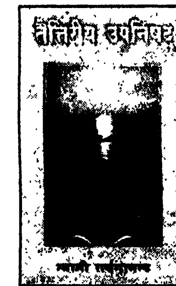
মূল্য ঃ ৩৫্ টাকা (ক্যাসেট প্রতি)



স্তবমালা-১



স্তবমালা-২



কৃষ্ণযজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় উপনিষদ্

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

প্রসঙ্গ কাশীপুর মহাশ্মশানে গীত তাৎপর্যবাহী দুটি গান

কাশীপুর উদ্যানবাটীর দোতলার ঘরে ১৬ আগস্ট ১৮৮৬ রাত ১টা ২ মিনিটে শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধিতে নিমগ্ন হন। তখনো উপস্থিত যুবক ভক্তবৃন্দ ব্যাপারটি সম্যক উপলব্ধি করতে পারেননি। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন। বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের পরামর্শে শ্রীরামকৃষ্ণের পিঠে তখন ঘি মালিশ করা হচ্ছিল; কারণ তাঁদের মনে হয়েছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধি অবস্থায় রয়েছেন, ঘি মালিশ করলে সাধারণ ভূমিতে ফিরে আসবেন। এদিকে শ্রীশ্রীমা এই সংবাদ পেয়ে দোতলায় এসে "মা কালী গো, আমায় ছেড়ে কোথায় গেলে" বলে মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়েন।

পরদিন সকাল হতেই কলকাতার পথে পথে এই সংবাদ রটে গেল এবং দলে দলে অনুরাগী ভক্তবৃন্দ উদ্যানবাটীতে সমবেত হতে লাগলেন। দ্বিপ্রহরে ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার শ্রীরামকৃষ্ণের দেহ পরীক্ষা করে শরীরে প্রাণের কোন চিহ্ন পেলেন না। তিনি ভক্ত-পরিবৃত পরমহংসদেবের একটি ছবি তুলতে বললেন এবং এই বাবদ ১০ টাকা দিলেন। ছবি তোলা হলো।

বিকাল ৫টার সময় কাশীপুরের শ্মশানঘাটে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যদেহ নিয়ে যাওয়া হলো। দিব্যদেহ চিতায় তুলে ভক্তগণ সকলে নিস্তব্ধ হয়ে চিতা ঘিরে বসে রইলেন। কারো কোন কর্মোদ্যোগ নেই। এমন সময় কোন ভক্তের অনুরোধে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় ব্রাহ্মভক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল তাঁর উদ্দেশে বেশ কয়েকটি স্বরচিত গান গাইলেন। কারণ, তিনি ত্রৈলোক্যনাথের গান খুব পছন্দ করতেন।

ঐদিন ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের গাওয়া দুটি মাত্র গান সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলামৃত' গ্রন্থের 'শ্মশান' অধ্যায়ে (পৃঃ ২৩৫-২৩৬) গানদুটির প্রথম ছত্র পাওয়া যায়—

(১) "জয়! জয়! সচ্চিদানন্দ হরে।
হোক তব ইচ্ছা পূর্ণ, সুখ-দুঃখের ভিতরে।..."

(২) "মা তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হয়েছি।
হাসিব না কাঁদিব তাই বসে ভাবিতেছি।।..."

সম্পূর্ণ গানদুটি 'চিরঞ্জীব সঙ্গীতাবলী' গ্রন্থে (১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত) পাওয়া যায়—

(১) (কীর্তন-খ্যামটা)

"জয়! জয়! সচ্চিদানন্দ হরে।
হোক তব ইচ্ছা পূর্ণ, সুখ-দুঃখের ভিতরে।
বিচ্ছেদে-মিলনে, জীবনে-মরণে,
তোমার ইচ্ছার জয় হেরি নয়নে,
কর নিত্য নর-বেশে খেলা, দাসের অন্তরে। (প্রেম)
সম্পদে-বিপদে, বিষাদে-আনন্দে, রোগে-শোকে
চিরদিন আছি ও পদে;
হাসি কাঁদি তোমার রঙ্গ দেখে যোগানন্দ ভরে।"

(২) (সিন্ধু-একতালা)

"মা তোর রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হয়েছি,
হাসিব, না কাঁদিব, তাই বসে ভাবতেছি।
বিচিত্র এই ভবের খেলা ভাঙ গড় দুইবেলা,
ঠিক যেন ছেলেখেলা, বুঝতে পেরেছি।
এতকাল রইনু কাছে, বেড়াইনু পাছে পাছে,
চিনতে না পেরে এখন হার মেনেছি।"

গানদুটি চিরঞ্জীব শর্মা অর্থাৎ ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের তাৎক্ষণিক রচনা। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে এই গানদুটির কোন উল্লেখ নেই। তবে স্বামী সারদানন্দ শ্রীশ্রীমায়ের লীলাসংবরণের পর কাশীধামে জনৈক প্রাচীন সন্ন্যাসী কর্তৃক শ্রীশ্রীমায়ের জীবনীগ্রন্থ রচনার জন্য অনুরুদ্ধ হলে তিনি তাঁর অক্ষমতা জানান এবং কিছুক্ষণ মৌন থেকে উপরি উক্ত দ্বিতীয় গানটি গেয়ে শোনান।

এই গানটি গেয়েছিলেন স্বামী শিবানন্দও। স্বামী সুবোধানন্দের লীলাসংবরণের (১৯৩২) সংবাদ পেয়ে স্বামী শিবানন্দ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ বেলুড় মঠে তাঁর কাছে এলে তাঁকে দেখে তিনি "খোকা আর নেই" বলে কেঁদে ওঠেন। পরে তিনি আপন মনে ঐ দ্বিতীয় গানটি গাইতে থাকেন এবং বলেন, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল কাশীপুর মহাশ্মশানে ঠাকুরকে এই গান শুনিয়েছিলেন।

সন্তোষকুমার দত্ত
সিঁথি, কলকাতা-৭০০ ০৫০

বিঃ দ্রঃ এই প্রসঙ্গে এই সংখ্যার 'সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ' দ্রষ্টব্য (পৃঃ ৯০৩)।—সম্পাদক

একটি দিব্য দর্শন

১৯৭৭ সালের জুন মাসে পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেব ও তাঁর স্নানযাত্রা দর্শনের পর ভুবনেশ্বর মঠের অতিথিভবনে আশ্রয় লাভ করি। সেই সময়ে ঐ মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের ষষ্ঠ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দের মন্ত্রশিষ্য ও সেবক স্বামী সত্যানন্দ। তিনি একদিন ভুবনেশ্বর ও পুরী সম্পর্কে জানা-অজানা কিছু সংবাদ আমাকে প্রদান করেন। ভুবনেশ্বর প্রসঙ্গে তাঁর মুখে শোনা বিভিন্ন তথ্যের মধ্যে যেটি আমাকে অধিক আকৃষ্ট করেছিল, সেটি হলো—ভুবনেশ্বর মঠে স্বামী ব্রহ্মানন্দ কর্তৃক শ্রীশ্রীমায়ের তিনজন মন্ত্রশিষ্যকে একই সঙ্গে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত করা। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ১২ জানুয়ারি স্বামীজীর তিথিপূজার দিন তিনি এই দীক্ষা-দান করেছিলেন। এঁরা হলেন—স্বামী বীরেশ্বরানন্দ (প্রভু মহারাজ), স্বামী দয়ানন্দ (বিমল মহারাজ) ও স্বামী অভয়ানন্দ (ভরত মহারাজ)।

কথোপকথনের শেষে স্বামী সত্যানন্দ একদা পুরীতে সঙ্ঘটিত একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার কথা উল্লেখ করেন, যা তিনি মঠ ও মিশনের বহু প্রাচীন সন্ন্যাসীর মুখে একাধিকবার শুনেছেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ একবার পুরীতে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শনের উদ্দেশে মন্দিরে যাচ্ছিলেন। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতেই

তিনি দেখেন, আদুড় গায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তিনি লক্ষ্য করেন, গোলাপী রঙের একটা বড় ফুলের মালা শ্রীশ্রীঠাকুরের গলায় শোভা পাচ্ছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে লুটিয়ে পড়েন। প্রণাম শেষে উঠে দাঁড়াতেই তিনি দেখেন, শ্রীশ্রীঠাকুর সেখানে নেই। তখন তিনি 'জয় শ্রীরামকৃষ্ণ, জয় শ্রীরামকৃষ্ণ' বলতে বলতে জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন। জগন্নাথদেবের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি দেখেন, কিছুক্ষণ পূর্বে মন্দিরের বাইরে শ্রীরামকৃষ্ণের গলায় যে-মালাটি দেখেছিলেন সেই মালাটি শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসারিত দুই হাতের ওপর ঝুলছে। পূজ্যপাদ মহারাজ সাশ্রুনয়নে শ্রীজগন্নাথদেবকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে মন্দির ত্যাগ করেন। এই অলৌকিক ঘটনার কথা তিনি তাঁর গুরুভাই, সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্তদের কাছে ব্যক্ত করেছিলেন।

পীযূষকান্তি রায়
চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯

'শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য'

'উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ (১৪০৮) সংখ্যায় জলধিকুমার সরকারের 'শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য' নিবন্ধে উল্লেখ আছে—"এই অবস্থায় ১৪ বৎসর বয়সে জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমার গদাইকে কলকাতায় নিয়ে এলেন।" কিন্তু 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এর প্রথম ভাগের ('পূর্বকথা ও বাল্যজীবন') 'পরিশিষ্ট' অংশে আছে—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দের ৬ ফাল্গুন ব্রাহ্মমুহূর্তে এবং কলকাতায় এসে ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠীতে তিনি বসবাস শুরু করেন ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে। অর্থাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর ১৭ বছর (১৪ বছর নয়) বয়সে কলকাতায় এসেছিলেন—এটাই ঠিক।

মৃণালকান্তি চক্রবর্তী
কে. এম. নস্কর রোড, কলকাতা-৭০০ ০৪০

লেখকের উত্তর

আমি পত্রলেখকের সঙ্গে একমত। কলকাতা-আগমনের সময় শ্রীরামকৃষ্ণের বয়স '১৪'-র স্থানে '১৭' বছর হবে। এই ভুলের জন্য আমি দুঃখিত।

জলধিকুমার সরকার
টালিগঞ্জ, কলকাতা-৭০০ ০৩৩

প্রসঙ্গ শ্রীশ্রীমায়ের আলোকচিত্রের ইতিহাস

শ্রীশ্রীমায়ের সর্বাধিক প্রচারিত ও পূজিত আলোকচিত্রখানি ছাড়া আরো অনেক আলোকচিত্র আছে। এই আলোকচিত্রটি ও তাঁর আরেকটি 'নতমুখ' আলোকচিত্রের ইতিহাস আমরা জেনেছি স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ সঙ্কলিত 'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে' (দ্বিতীয় ভাগ) গ্রন্থ থেকে। কিন্তু বাকি আলোকচিত্রগুলির ইতিহাস সেভাবে জানা যায় না।

শ্রীশ্রীমা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন মাতৃত্বের লীলা প্রকাশের জন্য। তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল এই লীলার প্রকাশ। এই আলোকচিত্রগুলি তার ব্যতিক্রম হতে পারে না। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহারাজের কাছে নিবেদন, তিনি যদি এগুলি সম্পর্কে কিছু আলোকপাতের ব্যবস্থা করেন, তাহলে আমরা সাধারণ মানুষ ব্রহ্মময়ীর অপূর্ব লীলার রসাস্বাদনে নিজেদের পবিত্র করে তুলতে পারি।

স্বপন চক্রবর্তী
রাজা গোপেন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৫

শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষাগুরু

আমি 'উদ্বোধন' পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। প্রথমেই এই শতবর্ষজয়ী পত্রিকার পরিচালক হিসেবে আপনাদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।

বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা থেকে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার কথা জানতে পারি। কিন্তু এঁদের জীবনের আমাদের অজানা অনেক ঘটনা রয়ে গেছে। আমরা ধীরে ধীরে এইসব বিষয়ে অবহিত হচ্ছি এবং এব্যাপারে 'উদ্বোধন' পত্রিকা নিঃসন্দেহে এক অনির্বাণ আলোককেন্দ্র।

একটি বিশেষ প্রশ্ন সম্পর্কে এই পত্রের অবতারণা। প্রশ্নটি হলো—শ্রীশ্রীমা সম্ভবত শ্রীরামকৃষ্ণেরই নির্দেশানুসারে স্বামী পূর্ণানন্দ নামে এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে কামারপুকুরে দীক্ষা নিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থে নিম্নরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—

(১) "শ্রীমা ও লক্ষ্মীদেবী উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছিলেন। সন্ন্যাসী বেশ মোটাসোটা, শান্ত ও সুপুরুষ ছিলেন—নাম স্বামী পূর্ণানন্দ। ইনি তখন কামারপুকুরে গিয়াছিলেন।" (শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ, ৫ম সং, ১৯৭৫, পৃঃ ১৩৪)

(২) "পুত্রের নাম পূর্ণচন্দ্র রাখতে ইচ্ছুক একজনকে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন, তিনি ঐ নাম ধরে ডাকতে পারবেন না, ঐ নাম তাঁর গুরুর নাম।" (শ্রীশ্রীসারদাদেবী—ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, ক্যালকাটা পাবলিশার্স) বাঁকুড়ার বিভূতি ঘোষের বিবরণ অনুসরণ করে তিনি আরো বলেছেন যে, পূর্ণানন্দ বাঙালী ছিলেন।

এতদ্ব্যতীত স্বামী সারদানন্দ প্রণীত 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এ বিভিন্ন স্থানে এক সন্ন্যাসীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সেগুলি হলো—

"জনৈক সাধুপুরুষ কালীবাটিতে আগমনপূর্বক ঠাকুরের দ্বারা পরে লোককল্যাণ বিশেষরূপে সাধিত হইবে, একথা জানিতে পারিয়া ছয়মাস কাল তথায় অবস্থান করিয়া নানা উপায়ে তাঁহার শরীর রক্ষা করিয়াছিলেন।" (১ম ভাগ, সাধকভাব, ১৫শ অধ্যায়, ঠাকুরের বেদান্তসাধন, ১৩৮০, পৃঃ ২৯৮)

"এই সময়ে একজন সাধু এসেছিল। তার হাতে রুলের মতো একগাছা লাঠি ছিল। সে অবস্থা দেখেই চিনেছিল; আর বুঝেছিল এ শরীরটে দিয়ে মা-র অনেক কাজ এখনো বাকি আছে, এটাকে

রাখতে পারলে অনেক লোকের কল্যাণ হবে। তাই খাবার সময় খাবার এনে মেরে মেরে হুঁশ আনবার চেষ্টা করত। একটু হুঁশ হচ্ছে দেখেই মুখে খাবার গুঁজে দিত। এই রকমে কোনদিন একটু-আধটু পেটে যেত, কোনদিন যেত না। এইভাবে ছমাস গেছে।" (পূর্বার্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়, 'ভাবসমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা', পৃঃ ৫৫) এছাড়াও 'শ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব' অধ্যায়ে এই বিষয়ের উল্লেখ আছে।

আমার প্রশ্ন, স্বামী পূর্ণানন্দের বিস্তৃত কোন পরিচয় পাওয়া যায় কি? দ্বিতীয়ত, শ্রীরামকৃষ্ণের শরীররক্ষাকারী এই সন্ন্যাসীই কি উক্ত স্বামী পূর্ণানন্দ? এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, কালীপুর আশ্রম, কামাখ্যা এবং জগৎপুর আশ্রম, চট্টগ্রাম—এই দুই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী পূর্ণানন্দের (১২৪১-১৩৩৫) শিষ্য-প্রশিষ্যদের বিশ্বাস, তাঁদের গুরুদেবই উক্ত সন্ন্যাসী এবং শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষাগুরু।

সিতাংশুশেখর গঙ্গোপাধ্যায়
বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯৭

মানুষের প্রকৃত বন্ধু স্বয়ং ভগবান

'উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ ১৪০৭ সংখ্যায় সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'সবই তোমার' নিবন্ধটি পড়ে খুব ভাল লাগল। একজায়গায় তিনি লিখেছেন ঃ "মানুষের প্রকৃত বন্ধু স্বয়ং ভগবান।" অনেক সময়ই আমরা সহজ সত্যটি বিস্মৃত হই।

এপ্রসঙ্গে জানাই, বহুদিন আগে আমার এক খ্রীস্টান বন্ধুর কাছে একটি গল্প শুনেছিলাম। 'উদ্বোধন'-এর পাঠকদের কাছে গল্পটি নিবেদন করছি।

এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিল—'হে প্রভু, যখনি আমি পিছন ফিরে আমার বিগত জীবনের দিকে তাকাই, তখনি দেখি যে, জীবনের বালুচরে আমার পদচিহ্নের পাশে পাশে তোমার পদচিহ্ন অর্থাৎ দুজনের পদচিহ্ন সমানে চলে আসছে। হে প্রভু, আমি উপলব্ধি করেছি যে, তুমি সর্বক্ষণ আমার পাশে থেকেছ—আমার সঙ্গে সঙ্গে, আমাকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে নিয়ে চলেছ। হে দয়াময় প্রভু, সেইজন্য আমি তোমায় ধন্যবাদ জানাই।' ধন্যবাদ জানানোর পর ভক্তটি আরো বলে—'কিন্তু হে প্রভু, তোমার প্রতি আমার একটি অভিযোগও আছে। এই দীর্ঘ জীবনপথ পরিক্রমায় যখনি আমার সবচেয়ে বেশি বিপদ ঘটেছে, যেসময়ে আমার ওপরে সবচেয়ে বেশি ঝড় বয়েছে, তখনি দেখি মাত্র একজোড়া পদচিহ্ন! এরকম কেন হলো প্রভু? যখন আমার সবচেয়ে বেশি বিপদ, যখন তোমাকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তখনি আমাকে একলা চলতে হলো কেন? ঠিক তখনি তুমি আমায় একলা ছেড়ে গেলে কেন?'

ভক্তের কথা শুনে ঈশ্বর মৃদু হাসলেন। স্মিতমুখে বললেন —'বৎস, তোমার সেই ভয়ঙ্কর বিপদের মুহূর্তে তোমায় আমি কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম!'

অভিনন্দ ঘোষ
প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলকাতা

রক্তের উচ্চচাপ এবং প্রসঙ্গত

'উদ্বোধন'-এর গত শ্রাবণ ১৪০৮ সংখ্যার 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে দেবাশিস বসু রক্তের উচ্চচাপ সংশ্লিষ্ট যে-প্রশ্নগুলি করেছিলেন, নিচে সেগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছি।

(১) ব্লাডপ্রেসার যদি এখনো ১৫০-১৭৫/৮০ মিলিমিটার্স থাকে, তাহলে তা নামিয়ে আনা প্রয়োজন। বেশির ভাগ সময় যাতে ওপরের মাত্রাঙ্ক অর্থাৎ সিস্টোলিক ব্লাডপ্রেসারটি ১৪০-এর নিচে থাকে তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। যদি তার জন্য ওষুধ অদলবদল করতে হয়, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী তা অবশ্যই করণীয়। রক্তের উচ্চচাপ আয়ত্তে আনার সময় প্রথম প্রথম যদি কোন অসুবিধাও হয়, তাহলেও আশু মঙ্গলের কথা ভেবে এই শুভ প্রচেষ্টা চালানো বাঞ্ছনীয়। অবশ্য ব্যক্তিবিশেষে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। তবে সুখের কথা, তাদের সংখ্যা কমই। দেখা গেছে, সেরিব্রাল অ্যাটাক বা স্ট্রোক, হার্ট ফেলিওর, কিডনী ফেলিওর এবং হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনাও তত কম হবে যত সুন্দরভাবে রক্তের উচ্চচাপ আয়ত্তে রাখা সম্ভব হবে।

(২) সর্বাঙ্গাসন শীর্ষাসন-জাতীয়ই এবং শ্রীবসুর সঙ্গে এবিষয়ে আমি একমত, অর্থাৎ এটি ছাড়া অন্যগুলির অনুশীলন করাই ভাল। এই প্রসঙ্গে আরো খেয়াল রাখতে হবে যে, বেশি ভারী জিনিস তোলা বা গায়ের জোর লাগে এমন কিছু ঠেলা বা টানার শ্রমসাপেক্ষ চেষ্টা (isometric exercises) না করাই মঙ্গল। 'জোরে হাঁটা' বা 'মর্নিং ওয়াক' অবশ্যই স্বাস্থ্যপ্রদ। তার জন্য চড়া রৌদ্রে না বেরোনোই ভাল। অবশ্য উত্তর আমেরিকার, বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের কথা আলাদা, এখানে রোদে সমুজ্জ্বল দিনগুলি হাতে গোনা যায়।

(৩) ঘামের সঙ্গে শরীর থেকে লবণ অবশ্যই বেরিয়ে যায়। কিন্তু ব্লাডপ্রেসারের রোগীর তার জন্য আলাদা করে লবণ খাওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং জল খাওয়া যাতে কম না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। রান্নায় লবণ প্রয়োজনমতো দেওয়ায় বাধা নেই। ফলমূল খাওয়ার ব্যবস্থা যথারীতি প্রশস্ত। ওয়াকিবহাল থাকতে হবে যে, শরীর থেকে পটাশিয়াম বেশি বেরিয়ে গেলে সেটা যেন ঠিকমতো আবার সংযোজন করা হয়। ব্লাডপ্রেসার কমানোর জন্য যখন ডায়ুরেটিক (diuretic) জাতীয় ওষুধ খাওয়া হয়, যেমন হাইড্রোক্লোরোথায়াজাইড (hydrochloro-thiazide), ইণ্ডেপামাইড (indapamide) বা ক্লোরথ্যালিডোন (chlorthalidone) ইত্যাদি, তখন প্রস্রাবের সঙ্গে বেশি পরিমাণে পটাশিয়াম বেরিয়ে যায় এবং তার জন্য নানা ধরনের জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। সেগুলি প্রতিরোধ করার জন্য মাঝে মাঝে রক্তপরীক্ষা করে সোডিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদির পরিমাণ দেখা দরকার এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে প্রয়োজন হলে আলাদা করে পটাশিয়াম ট্যাবলেট খাওয়া বিধেয়।

আশাকরি উত্তরগুলি বুঝতে অসুবিধা হবে না।

ডাঃ শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়
সিরাকিউজ, নিউ ইয়র্ক
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

যুগনেতা কেশবচন্দ্র সেন*

তাপসশঙ্কর দত্ত



যুগের প্রয়োজন মিটিয়েছিলেন বলেই কেশবচন্দ্র সেনকে 'যুগনায়ক' বলা হয়ে থাকে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য-পদে বসিয়েছিলেন। ব্রাহ্ম সমাজের বারবার ভাঙাগড়ার মধ্যেও কেশবচন্দ্রের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বাগ্মী। তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা শোনার নিয়মিত শ্রোতা ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, 'কথামৃত'-লেখক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ) ও আরো অনেকে। মন্ত্রমুগ্ধ নরেন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতা শুনে আক্ষেপ করে একসময় বলেছিলেন ঃ "যদি ওঁর মতো বাগ্মী হতে পারতাম!" সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রকে তাঁর বক্তৃতা নিয়মিত শুনতে দেখে তাঁর এক বন্ধু প্রশ্ন করেন ঃ "ব্রাহ্ম না হয়ে আপনি কেন কেশবের বক্তৃতা শুনতে যান?" উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন ঃ "সহজ সাবলীল বাঙলা শিখতে যাই।" মাদ্রাজে জাতিভেদের বিরুদ্ধে কেশবচন্দ্রের কয়েকটি বক্তৃতা শুনে শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁকে 'Thunderbolt of Bengal' আখ্যা দিয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, সংবাদপত্র পরিচালনা, সমাজ-সংস্কার, প্রচার, ত্যাগ, বাগ্মিতা ও স্বদেশপ্রীতিতে কেশবচন্দ্র উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কর্তৃত্ব ও ব্যক্তিত্বকে সমবয়সীরা সমীহ করে চলত। বাল্যবন্ধু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার পরবর্তী কালে বলেছিলেন ঃ "মনে হতো যেন ও আমাদের শিক্ষক।"

কলুটোলার বিখ্যাত সেন পরিবারে কেশবের জন্ম হয় ১৮৩৮ সালের ১৯ নভেম্বর। পিতামহ রামকমল সেন অর্থ, প্রতিপত্তি ও শিক্ষাদীক্ষায় সেন পরিবারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে যান। তাঁর মধ্যম পুত্র প্যারীমোহনের মধ্যম পুত্র ছিলেন কেশবচন্দ্র। প্যারীমোহন মাত্র ৩৪ বছর বয়সে মারা গেলে তাঁর সহধর্মিণী সারদাদেবী ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভাসুর হরিমোহনের তত্ত্বাবধানে চলে আসেন।

গোঁড়া বৈষ্ণব পরিবারে লালিত-পালিত কেশবের ছেলেবেলা থেকেই ধর্মের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। নির্জনে বসে ধ্যান করতে তিনি খুব ভালবাসতেন। ধর্মীয় ভাব প্রবল থাকলেও তিনি কিন্তু পৌত্তলিকতাতে বিশ্বাসী ছিলেন না। "তুই কি ঠাকুর-দেবতা মানিস না?"—ব্যথিত মায়ের প্রশ্নের উত্তরে কেশব বলেন ঃ "নিশ্চয়ই মানি, কিন্তু তিনি ঐ পটে নেই। তাঁকে জানতে হবে, উপলব্ধি করতে হবে। তাঁকে লাভ করার জন্য ধ্যান ও প্রার্থনাকেই জীবনের মন্ত্র করে নিতে হবে।" জলবসন্তে আক্রান্ত কেশব ডাক্তারের পরামর্শে মাছ, মাংস ও ডিম খাওয়া ছেড়ে দেন মাত্র ১৪ বছর বয়সে। তিনি মরদেহ ত্যাগ করেন মাত্র ৪৬ বছর বয়সে। জীবনের শেষ ৩২ বছর, প্রকৃতপক্ষে বেশির ভাগ সময়টাই তিনি নিরামিষাশী থেকে যান।

রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত নতুন ব্রাহ্ম সমাজ সেসময় সমাজে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করলে কেশবচন্দ্র তাতে আকৃষ্ট হয়ে ১৮৫৭ সালের শেষভাগে ব্রাহ্ম সমাজের অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেন। রামমোহন বলেছিলেন—ধর্মহীন সভ্যতা অর্থহীন। কিন্তু ধর্ম পৌত্তলিকতায় নয়, ধর্মের উদ্দেশ্য সত্যকে উপলব্ধি করা, ঈশ্বরের সেবা, ঈশ্বরের সন্তানদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা এবং বিভিন্ন দেশের মনীষীদের উপদেশ পালন করা। তাঁর এই কথাকে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য কেশবচন্দ্র উঠেপড়ে লেগে যান। তাঁর জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনে 'কথামৃত'-লেখক মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ ও আরো অনেকে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন। ব্রাহ্ম যুবকদের নিয়ে একটি 'সঙ্গত সভা' প্রতিষ্ঠা করে কেশবচন্দ্র সমাজ-সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করেন। বিধবা বিবাহ চালু করার জন্য তিনি 'বিধবা বিবাহ' নাটক মঞ্চস্থ করেন। সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তিনি শিক্ষা-সংস্কার, নিম্নবিত্তদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে ব্রতী হন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'ইণ্ডিয়ান মিরর', 'বামাবোধিনী পত্রিকা', 'ক্যালকাটা কলেজ' ও 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' পত্রিকা।

* ১৯ নভেম্বর কেশবচন্দ্র সেনের জন্মদিন উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিশেষ নিবন্ধ।

কেশবচন্দ্রের প্রচণ্ড কর্মক্ষমতা ও সাংগঠনিক শক্তি লক্ষ্য করে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তাঁকে কলকাতা ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য-পদে বরণ করে নেন। প্রবীণ সভ্যদের মতো জেঠামশাই হরিমোহন সেনও তাঁকে আচার্য-পদ গ্রহণে নিষেধ করে বলেন, তিনি আচার্যবরণ উৎসবে গেলে কলুটোলার বাড়ির দরজা তাঁর জন্য চিরদিনের মতো বন্ধ হয়ে যাবে। কথা না শুনে তিনি সস্ত্রীক উৎসবে যোগদান করেন। সারাদিন ব্যস্ত থেকে কেশব যখন সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার উপক্রম করছেন, তখন তাঁর জেঠামশাইয়ের কথা মনে পড়ে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ একথা শুনে সস্ত্রীক কেশবের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন। কয়েকদিনের মধ্যে অসুস্থ হলে তাঁর মা সারদাদেবী কেশবচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রীকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

ব্রাহ্মণদের পৈতাধারণ জাতিভেদপ্রথার সহায়ক উপলব্ধি করে আচার্য কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত ব্রাহ্মণদের পৈতা ত্যাগ করতে নির্দেশ দেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-সহ সবাই পৈতা ত্যাগ করেন। জাতিভেদপ্রথা নির্মূল করার জন্য তাঁরই তত্ত্বাবধানে প্রসন্ন-রাজলক্ষ্মীর অসবর্ণ বিবাহ সম্পন্ন হয়। তাঁর এসব কর্মকাণ্ড দেখে প্রবীণরা অত্যন্ত বিরক্ত হন। ফলে ব্রাহ্ম সমাজ ভেঙে যায়। কেশব 'ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ' নামে নতুন সমাজ গঠন করেন। মন্দির, উপাসনাস্থল সবই থেকে গেল আদি ব্রাহ্ম সমাজে, যার আচার্য হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এতদিন ব্রাহ্ম সমাজের যাবতীয় খরচপত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই মিটিয়েছিলেন। কিন্তু কেশব দমবার পাত্র ছিলেন না। তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় 'ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ'-এর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হলো অল্পদিনের মধ্যে। বিরাট শোভাযাত্রা করে ১৮৬৯ সালের ২২ আগস্ট মন্দির উদ্বোধন করে কেশবচন্দ্র ঘোষণা করলেন—"সব ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তির জন্য এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হলো।" উনবিংশ শতাব্দীতে সর্বধর্মসমন্বয়ের বীজ প্রথম রোপিত হলো কেশবচন্দ্রের মাধ্যমে। ধর্মীয় ব্যাপারে সমাজে নতুন আলোর সন্ধান তিনিই দিয়েছিলেন। তাই তিনি যথার্থই 'যুগনায়ক'।

কেশবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বহু মানুষ তাঁর সমাজে যোগদান করে। শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও সেসময় তাঁর ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য হন। সারা ভারত ঘুরে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। অসবর্ণ বিবাহকে আইনসিদ্ধ করার জন্য এক বিবাহ-বিধির খসড়া তৈরি করে পাঠান গভর্ণর জেনারেলের কাছে। তাঁর চেষ্টায় কিছু সংশোধিত হয়ে তাঁরই প্রেরিত খসড়া 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট' নামে আইনে পরিণত হয় ১৮৭২ সালে।

ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে ও ভারত সম্বন্ধে ইংরেজদের ধারণা পরিবর্তন করার জন্য কেশবচন্দ্র ইংল্যাণ্ড যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। তাঁর এই পরিকল্পনা ইংল্যাণ্ডবাসী ভারতের অবসরপ্রাপ্ত গভর্ণর জেনারেল লর্ড লরেন্সকে জানালে তিনি তাঁকে উৎসাহিত করেন। ১৮৭০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ইংল্যাণ্ড রওনা হন কেশবচন্দ্র। ইংল্যাণ্ডে তাঁর বিশেষ কোন পরিচিতি না থাকায় পূর্বপরিচিত এক অনুরাগী একটি সভার আয়োজন করেন। সভার শুরুতে জনৈক ধর্মযাজক তাঁকে সতর্ক করে বলেন, তিনি গ্রীক, ল্যাটিন ও আধুনিক বিজ্ঞান না জানলে তাঁকে শূন্য বেঞ্চকে বক্তৃতা শোনাতে হবে। উত্তরে কেশবচন্দ্র বলেন: "আমি এসব কিছুই জানি না—ঈশ্বর যা বলতে বলবেন তাই বলব।" তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে ধর্মযাজক সভাশেষে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেন।

ঘরোয়া বৈঠক, আলোচনা ছাড়াও কেশবচন্দ্র জনসভায় সত্তরটি বক্তৃতা দিয়ে ইংল্যাণ্ডে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে সেখানকার চিন্তাশীল মানুষরা ভারত সম্বন্ধে নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করে। সমাজের জ্ঞানিগুণী ব্যক্তিরা তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েন। জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁকে ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তান বলে অভিহিত করেন। কেশবচন্দ্র নিরামিষাশী বলে মহারানী ভিক্টোরিয়া তাঁর সম্মানে আয়োজিত ভোজসভায় আমিষবর্জনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। পরাধীন দেশের একজন নাগরিকের এই সম্মান এক অভূতপূর্ব ঘটনা। আট মাস ইংল্যাণ্ডে থেকে দেশে ফেরার সময় তিনি সদর্পে ঘোষণা করেন: "I Come here as an Indian and returning as a confirmed Indian."

দেশে ফিরে এসে তিনি পাঁচদফা কর্মসূচী গ্রহণ করেন—(১) গরিব জনসাধারণের জন্য এক পয়সায় বাঙলা সংবাদপত্র 'সুলভ সমাচার' প্রকাশ, (২) মধ্য ও নিম্ন আয়ের মানুষের অবসর সময়ে ঘড়ি মেরামত, সেলাই ইত্যাদি হাতের কাজ শেখার ব্যবস্থা, (৩) স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, (৪) দান ও সেবাতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা এবং (৫) মদ্যপান নিবারণ। জনকল্যাণমুখী কর্মধারার সঙ্গে তিনি ধর্মপ্রচারও করতে থাকেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে সর্বধর্ম-সমন্বয়ের জন্য হিন্দু প্রচারক দিয়ে বাঙলাতে কোরানের অনুবাদ করে এবং রামায়ণ, মহাভারত ও খ্রীস্টের বাণী মুসলমানদের দিয়ে উল্লিখিত উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার হতে থাকে। তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'অ্যালবার্ট হল' ও 'ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন'। এক ঈশ্বরের সন্তানদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই—এই ধারণাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য তিনি বেলঘরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করেন 'ভারত আশ্রম'। বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ দিনের পর দিন এখানে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, ধর্মালোচনা, উপাসনা ও বসবাস করতে থাকেন।

জনহিতকর কাজে ব্যস্ত কেশবচন্দ্র একসময় তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সুনীতির বিয়ের প্রস্তাব পান কুচবিহারের তরুণ মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের সঙ্গে। 'সিভিল

ম্যারেজ অ্যাক্ট' অনুযায়ী পাত্র-পাত্রী দুজনেই ছিল নাবালক-নাবালিকা, যে-আইনের উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি নিজেই। রাজপরিবার ছিল গোঁড়া হিন্দু আর কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম। তাঁর দুটি প্রস্তাব—পাত্র-পাত্রী প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে হবে না এবং শুধুমাত্র বাক্যদান হবে আর বিয়ে হবে ব্রাহ্মমতে—রাজপরিবার মেনে নেয়। সপরিবারে কুচবিহারে গিয়ে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই ক্রিয়া চলতে দেখে তিনি অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেন। তাঁর শর্ত মেনে নিলে অনুষ্ঠান আবার শুরু হয়। অনুষ্ঠান-শেষে মেয়েকে নিয়ে সপরিবারে কেশবচন্দ্র চলে আসেন কলকাতায়।

এই বিয়ে নিয়ে ব্রাহ্ম সমাজে ভুল বোঝাবুঝি শুরু হয়ে যায়। সমাজের একটি বড় অংশ তাঁকে 'মিথ্যাচারী' আখ্যা দেয়। বিরোধীরা শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' নামে ভিন্ন সমাজ গঠন করেন। যে-দুটি অভিযোগের ভিত্তিতে ব্রাহ্ম সমাজ ভেঙে গেল, বাস্তবে সে-দুটি অভিযোগের কোন সত্যতা ছিল না। পাত্র-পাত্রী প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পরই বিয়ে হয়েছিল ব্রাহ্ম-মতে।

প্রচণ্ড কাজের চাপ ও সমাজ ভেঙে যাওয়ায় কেশবচন্দ্র অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। সুস্থ হওয়ার পর তিনি আবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন, কিন্তু কাজের ধারা বদল করে ফেলেন। নিজের মতবাদ ছোট ছোট পুস্তিকার মাধ্যমে ছাপিয়ে তিনি জনসাধারণের মধ্যে বিলি করতে থাকেন। তাঁর মতবাদে ভক্তিভাবের প্রাধান্যও পরিলক্ষিত হতে থাকে। প্রচারক নিযুক্ত করে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় প্রচারক পাঠাতে থাকেন তিনি। সস্ত্রীক গৈরিক বসন পরিধান করে এসময় থেকে তিনি ভিক্ষান্নে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে থাকেন। তাঁর ব্রাহ্ম সমাজের নাম হয় 'নববিধান'। বিধবা-বিবাহ বহুল প্রচারের জন্য প্রথম জীবনে তিনি 'বিধবা বিবাহ' নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তিনি 'নব বৃন্দাবন' নাটক মঞ্চস্থ করেন কয়েকবার। সময় সময় তিনি অভিনয়ে নিজেও অংশগ্রহণ করতেন। এসময় বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত কেশবের জীবনসংশয় দেখা দেয়। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অত্যন্ত প্রিয় কেশবের জন্য তাঁর মা ভবতারিণীর কাছে ডাব-চিনি মানত করেছিলেন এবং বলেছিলেন: "মা, কেশব চলে গেলে আমি কার সঙ্গে মনের কথা বলব?" সেটা ১৮৮২ সাল, কেশব তখন গুরুতর অসুস্থ। তখনকার মতো কিছুটা সুস্থ হলেও কিছুদিন পর তিনি আবার অসুস্থ হয়ে ১৮৮৪ সালের ৮ জানুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: "আমার অর্ধ অঙ্গ আজ খসে গেল।" তিনদিন তিনি ঘর থেকে বের হননি বা কারোর সঙ্গে কথা বলেননি। কেশবই ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের আদি প্রচারক। তাঁরই পত্রিকাগুলির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের পূত চরিত্র ও সারগর্ভ বাণী জনসাধারণ জানতে পেরে দক্ষিণেশ্বরে আসতে থাকে।

আপাতদৃষ্টিতে কেশবের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অনেক বিষয়ে মিল ছিল না। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সনাতন ধর্মাবলম্বী, কেশব ছিলেন ব্রাহ্ম। উভয়ে বিবাহিত হলেও শ্রীরামকৃষ্ণ স্ত্রীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা করেছেন, কেশব সন্তান-সন্ততি নিয়ে ছিলেন পুরোপুরি সংসারী। কেশব প্রচার চাইতেন এবং নিজের মতবাদ প্রচার ও নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য দল নিয়ে চলতেন। কথাপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণকে কেশব বলেছিলেন: "আপনি দল রাখতে জানেন না।" শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু প্রচারবিমুখ ছিলেন। তাঁর অনুগতপ্রাণ রামচন্দ্র দত্ত তাঁর জীবনী লিখতে চাইলে তিনি বলেছিলেন: "জীবনী লিখলে আমার শরীর থাকবে না।" কিন্তু কেশবচন্দ্র জীবদ্দশায় তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন প্রায় নিরক্ষর, কিন্তু কেশব ছিলেন পণ্ডিত, জ্ঞানিগুণী দ্বারা সমাদৃত বিশ্ববিখ্যাত বাগ্মী। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর বাড়িতে বা ভক্তবাড়িতে কিছু ভক্তসমাবেশে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন, তবে বক্তা হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল না। উভয়ে সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বললেও কেশবচন্দ্র সর্বধর্মসমন্বয় বলতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেলামেশা, একত্র থাকা-খাওয়া, একের ধর্মগ্রন্থ অপরের দ্বারা প্রচার বলে ধরে নিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু ধর্মকে চরম লক্ষ্যে যাওয়ার পথ ধরে নিয়ে সর্বধর্মের সারবত্তা উপলব্ধি করে সমন্বয়ের কথা বলেছেন। তাঁর ভাষ্যকার বিবেকানন্দ পরবর্তী কালে শিকাগো ধর্মমহাসভায় বলেন: "প্রত্যেক ধর্মই অপর ধর্মের সারভাগগুলি গ্রহণ করে পুষ্টিলাভ করবে ও স্বীয় বিশেষত্ব বজায় রেখে নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী বর্ধিত হবে।" কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের বহুল প্রচারের জন্য হিন্দুধর্মকে গ্রাহ্যের মধ্যে নেননি, শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্মকে সর্বধর্মের উৎস বলে ধরে নিয়েছিলেন। কন্যাশোকে জর্জরিত ব্রাহ্ম মনমোহন মিত্র সান্ত্বনার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে এলে তিনি বলেন, ব্রাহ্মোরা যে-ধর্মের কথা বলেন তা সামাজিক ধর্ম—সমাজের শুভাশুভ নিয়েই তার কথা। সে-ধর্মে ভগবান সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা নেই। কিন্তু তিনি তাঁদের যে-ধর্মের কথা বলছেন তা আধ্যাত্মিক ধর্ম। জাগতিক দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে ভেদ অনিবার্য, কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতে তা নেই।

পরবর্তী কালে অনুরাগীদের সঙ্গে কেশবের মতবিরোধ হয়ে বিচ্ছেদে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আপাত অমিল থাকলেও তাঁদের সম্পর্ক শেষদিন পর্যন্ত অটুট থেকে গভীর থেকে গভীরতর হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম কেশবের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি সাক্ষাতের কারণ জানতে চান। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন: "বিষয়ী লোকদের সঙ্গে কথা বলে হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। তাই মাকে বললাম, 'মা, দুটো মনের কথা বলার লোক পাই কোথা?' তা মা তোমার নাম করলেন।"

কেশব—কে আপনার মা?

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমার মা ব্রহ্মময়ী গো!

কেশব—কিন্তু আমি তো আপনাদের দেবদেবীকে মানি না।

শ্রীরামকৃষ্ণ—সে কি গো! ব্রহ্ম মানো, আর ব্রহ্মময়ীকে মানো না?

কেশব—তিনি আপনাকে আমার কাছে আসতে বললেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ—হ্যাঁগো, না হলে আর কে বলবে বল।

বিদায় নেওয়ার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দক্ষিণেশ্বর যেতে বলেন। কেশব পরবর্তী কালে অনেকবার দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণও কেশবের বাড়ি ও তাঁর ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবাদিতে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন অনেকবার। শ্রীরামকৃষ্ণে সমর্পিতপ্রাণ সুরেশচন্দ্র দত্ত কেশবকে বারবার দক্ষিণেশ্বর ছুটে আসতে দেখে আবেগতাড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন: "যে-কেশব বক্তৃতা করলে পৃথিবীর লোক ছুটে আসত, নিরক্ষর রামকৃষ্ণের শ্রীমুখের কথা শোনবার জন্য সেই কেশব দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করে বিনীতভাবে বসে থাকতেন।" বেলঘরিয়ার বাগানে প্রথম দর্শনের পর কেশব ২৮ মার্চ ১৮৭৫, রবিবার তাঁর 'মিরর' সংবাদপত্রে লেখেন: "আমরা অল্পদিন হলো দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস রামকৃষ্ণকে বেলঘরের বাগানে দর্শন করেছি। তিনি শান্ত স্বভাব, কোমল প্রকৃতি ও দেখলে বোধহয় সবসময় যোগেতে আছেন। এখন আমাদের বোধ হচ্ছে যে, হিন্দুধর্মের গভীরতম প্রদেশ অনুসন্ধান করলে কত সৌন্দর্য, সত্য ও সাধুতা দেখতে পাওয়া যায়। তা না হলে পরমহংসের ন্যায় ঈশ্বরীয় ভাবে ভাবিত যোগিপুরুষ কিরূপে দেখা যাচ্ছে?" শ্রীরামকৃষ্ণও কেশব সম্বন্ধে অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় তিনি বলেছিলেন: "তোমারই ল্যাজ খসেছে; অর্থাৎ তুমি সব ত্যাগ করে সংসারের বাইরেও থাকতে পার; আবার সংসারেও থাকতে পার; যেমন ব্যাঙাচি ল্যাজ খসলে জলেও থাকতে পারে, আবার ডাঙাতেও থাকতে পারে।" ১৮৮০ সালে রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্র কেশবের সঙ্গে দেখা করে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি বলেন: "দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস সামান্য নন; এক্ষণে পৃথিবীর মধ্যে এত বড় লোক কেউ নেই। ইনি এত সুন্দর, এত অসাধারণ ব্যক্তি, এঁকে অতি সাবধানে সন্তর্পণে রাখতে হয়। অযত্ন করলে এঁর দেহ থাকবে না। যেমন সুন্দর মূল্যবান জিনিস গ্লাসকেসে রাখতে হয়।"

উপদেশচ্ছলে শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে বলেছিলেন: "তোমরা যা কর—নিরাকার সাধন, সে খুব ভাল। ব্রহ্মজ্ঞান হলে ঠিক বোধ করবে—ঈশ্বর সত্য আর সব অনিত্য; ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। সনাতন হিন্দুধর্মে সাকার-নিরাকার দুই মানে; নানাভাবে ঈশ্বরের পূজা করে—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর।... তোমরা সাকার মান না, তাতে কিছু ক্ষতি নেই; নিরাকারে নিষ্ঠা থাকলেই হলো। তবে সাকারবাদীদের টানটুকু নেবে। 'মা' বলে তাঁকে ডাকলে ভক্তি-প্রেম আরো বাড়বে।... তোমরা বক্তৃতা দাও সবার উপকারের জন্য, কিন্তু ঈশ্বরলাভ করে, ঈশ্বরদর্শন করে বক্তৃতা দিলে উপকার হয়। তাঁর আদেশ না পেয়ে লোকশিক্ষা দিলে উপকার হয় না।" কেশবচন্দ্র একবার শ্রীরামকৃষ্ণকে জীবন্ত ধর্মমূর্তি-জ্ঞানে তাঁর শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে পূজা করেছিলেন নিজের বাড়িতে। দক্ষিণেশ্বর যাওয়ার সময় কেশবচন্দ্র ফুল বা ফল সঙ্গে নিয়ে যেতেন দেবদেবীদের নিবেদনের জন্য। আসার সময় মনের ভাব প্রকাশ করে ঠাকুরকে ওগুলি গোপনে দিয়ে যেতেন। দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরে আসার সময় তিনি ঠাকুরের চরণস্পর্শপ্রাপ্ত কোন জিনিস ভক্তি সহকারে বাড়ি নিয়ে আসতেন। কেশবের পরিবারের সকলে ঠাকুরকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করত। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের প্রথম মিলনই মহামিলনে পরিণত হয়েছিল। যে-মিলনে বিচ্ছেদ নেই, যে-মিলনে সদা আনন্দ বিরাজমান—সেই মিলনই কেশবের সঙ্গে তাঁর হয়েছিল।

কেশবচন্দ্র যদি সারা ভারতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার না করতেন, তবে শিক্ষিত যুবকদের অনেকেই সেসময় খ্রীস্টান হয়ে যেত। রাজশক্তির প্রলোভন ও হিন্দুধর্মের সহজ সরল ব্যাখ্যা না থাকায় তারা হিন্দুধর্মকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনত না। হিন্দুধর্ম পৌত্তলিকতা ও ঘৃণা-বিদ্বেষপ্রসূত জাতিভেদে সীমিত—এই ধারণাই তাদের বদ্ধমূল ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, সনাতন হিন্দুধর্ম সাকার-নিরাকার দুই মানে। নিরাকারে যাওয়া বড় কঠিন—সাকারের মাধ্যমেই নিরাকারে যেতে হয়। সমাজের প্রয়োজনে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতেই জাতিভেদপ্রথার প্রবর্তন করা হয়েছিল হিন্দুধর্মে। এতে ঘৃণা-বিদ্বেষের কোন স্থান নেই। স্বার্থান্বেষীরা পরবর্তী কালে শ্রেণীবিভাগের সুযোগ নিয়ে ঘৃণা-বিদ্বেষ আরোপ করে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করেছে। সবার মধ্যে একই ভগবান বিরাজ করছেন। কেউ দেশশাসন করতে পারে, কেউ জুতো সেলাই করতে পারে, কিন্তু মানুষ হিসাবে সবাই সমান। "ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়,/... জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।" "আমি সেই ভগবানকে পূজা করি, অজ্ঞেরা যাকে মানুষ বলে থাকে।"—বিবেকানন্দের এই কথাগুলি সনাতন হিন্দুধর্মেরই অন্তর্নিহিত কথা।

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার কেশবের মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করে ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে জানতে পারেন। ধীরে ধীরে বহু তথ্য সংগ্রহ করে অবশেষে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী রচনা করেন। ❑

মানুষের অমর হওয়ার ব্যাপারে ইতিহাস কি বলে?

স্টিভেন সাপিন ও ক্রিস্টোফার মার্টিন

অমর হতে চেষ্টা করার কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। টেলিভিশন, ইন্টারনেটও প্রায়ই জানাচ্ছে যে, ব্যাপারটা অনেকটা হাতের মুঠোর মধ্যেই। হয়তো পি-২১ জিনের ওপর আধিপত্য আনতে পারলে, অথবা আদি কোষকে (stem cell) দেহে ঠিক জায়গায় বসাতে পারলেই ব্যাপারটি সম্ভব হবে। রাজনৈতিক অভিভাবকরা তো এবিষয়ে সবুজসঙ্কেত দিয়েই দিয়েছেন। যেদিন মানুষের 'জিনোম' (genome—বংশগতির নিয়ন্ত্রক উপাদান জিনের-কুলজি)-এর গোপন তথ্যের ৮৫ শতাংশ উদ্ঘাটিত হয়েছিল, আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন ঘোষণা করেছিলেনঃ "আমাদের সন্তানদের সন্ততিরা জানবে যে, ক্যান্সার সুদূর আকাশের নক্ষত্র হয়ে গেছে।"

আমরা এখন জানি যে, ডি. এন. এ. বংশগতির উপাদান; কিন্তু বাইবেল থেকে জানা যায়—সপ্তদশ শতাব্দীতেও শিক্ষিত ইংরেজরা মনে করত—স্বর্গের উদ্যানে দুরকমের গাছ আছে; প্রথমটি 'জীবনবৃক্ষ', যার ফল আদম ও ইভ খেয়েছিল। দ্বিতীয়টি 'জ্ঞানবৃক্ষ', যার ফল খেলে জাগ্রত হবে পাপপুণ্য বোধ এবং তাই সেটি খাওয়া তাদের বারণ ছিল। তাদের বলা হয়েছিল—এই ফল খেলেই তোমাদের মৃত্যু হবে। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত অধিকাংশ চিকিৎসকই তা বিশ্বাস করতেন এবং তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, মানুষ মূলত অমর হয়ে জন্মেছে এবং নৈতিক চরিত্র স্খলনের ফলেই মৃত্যুকে কৃত্রিমভাবে আনা হয়েছে।

বার্ধক্য সম্বন্ধে বিভিন্ন মতঃ আয়ু কমে যাওয়াকে অনেকে বলেন 'সভ্যতার অসুখ'। এটা হয়েছে দুর্নীতি, অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং খাওয়া-দাওয়ার হঠকারিতার জন্য। অর্থাৎ আয়ুর অবক্ষয় বন্ধ করা সম্ভব যদি বার্ধক্যের কারণ জেনে সেইমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বার্ধক্যের কারণগুলিকে দুভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত, বৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের উত্তাপ কমে যায়, গা ঠাণ্ডা হতে শুরু করে (getting old was getting cold)। এটা সকলেরই জানা যে, জীবিত প্রাণী নিষ্প্রাণ বস্তু অপেক্ষা উষ্ণ। দ্বিতীয়ত, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের আর্দ্রতা হ্রাস পায়, মৃত্যু হলে শরীর শুকিয়ে যায়। একটি বাচ্চার নরম আর্দ্র ত্বকের সঙ্গে বৃদ্ধের কুঁচকে যাওয়া ত্বকের তুলনা করে দেখলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। প্রাচীন গ্রীস থেকে শুরু করে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বার্ধক্য সম্বন্ধে মতবাদগুলি বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, এগুলি কেবল আর্দ্রতা অথবা শুষ্কতা বা উভয় নিয়েই। অর্থাৎ দীর্ঘায়ু লাভ করতে হলে শরীরের উষ্ণতা ও আর্দ্রতা বজায় রাখতে হবে। আবার পৌরাণিক যুগ থেকে আরম্ভ করে এখনো পর্যন্ত সব বিশেষজ্ঞই বলেছেন আহার সীমিত করতে। কিন্তু শরীরের তাপরক্ষার জন্য খেতেই হবে। সেক্ষেত্রে প্রকৃত কৌশল হলো—অগ্নিশিখা যেন প্রবল না হয়। শরীরের জীবনরক্ষক উষ্ণতা বজায় রাখার জন্য শুধু খাদ্য ও পানীয়ই যথেষ্ট নয়, এগুলি হজম করার জন্য প্রয়োজন উষ্ণতাও। প্রচুর মশলা-যুক্ত খাদ্য হজমের জন্য বেশি আগুন জ্বালালে আমাদের সীমিত জ্বালানী শীঘ্র কম পড়ে যাবে।

সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ায় ফ্র্যান্সিস বেকন আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি নিয়ে অনেক লেখালিখি করেছিলেন। তিনি নানা কথার মধ্যে শরীরের আর্দ্রতা রক্ষার ওপর জোর দিয়েছিলেন। একজন ৩০০ বছর বয়স্ক লোককে তাঁর আয়ুবৃদ্ধির গোপন রহস্য জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেনঃ "বাইরে তেল ও ভিতরে মধু।" ("Oil without, honey within.") প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আগেকার দিনে ত্বক কুঁচকে যাওয়া বন্ধ করার জন্য অলিভ অয়েল মাখানো হতো।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রেনে ডেসকার্টিস চিকিৎসাশাস্ত্রের সাহায্যে আয়ুবৃদ্ধি নিয়ে অনেক গবেষণা করেছিলেন। ঠিক তার আগে মাইকেল দ্য মন্টেন ওষুধের সাহায্যে আয়ু বাড়ানোর চেষ্টার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মত—'মদ্যপান ছাড়ুন, মাংস খাওয়া ছাড়ুন, ঠাণ্ডা লাগাবেন না, কেবল ডানপাশ ফিরে শোবেন, দিনে তিনবার রুবার্ব বড়ি খাবেন।' একথা বললেও তিনি এবিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। অন্য মতে, চিকিৎসকের পরামর্শে চললে জীবন শোচনীয় হয়ে দাঁড়াবে। তাঁরা বলেন—'চিকিৎসকের কথা শুনবেন, তবে তার কতটা মেনে চলবেন, তা আপনার হাতে। ডাক্তারের কথা শুনে চলা মানে শোচনীয় জীবন। অনেকে চিকিৎসকের কথামতো চলে বেঁচে থাকে হয়তো, কিন্তু সেটা বেঁচে থাকা নয়। বেঁচে থাকা মানে শুধু মৃত্যুকে এড়িয়ে চলা নয়, বাঁচা মানে জীবনীশক্তিকে কাজে লাগাতে পারা, মানুষ যা করতে পারে তা করা, মানুষের মতো কষ্ট পাওয়া এবং মানুষের মতো মৃত্যু হওয়া। আমরা জন্মেছি—বৃদ্ধ হব, অসুখ হবে, ওষুধ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও। যা আমরা পরিহার করতে পারব না, তা আমাদের সহ্য করতে শিখতে হবে।

আমরা কি সত্যিই অমর হতে চাই?

জীবচিকিৎসা গবেষকদের কাছে সকলেই শুধু চায়—অসুখবিসুখ যেন কম লোকের হয়। কিন্তু এই চাওয়া অনেকদিন ধরেই চলছে এবং দীর্ঘদিন ধরে চলছে বলেই ইতিহাস বলছে—এব্যাপারে খুব বেশি আশাবাদী হয়ো না। আমাদের অসুখবিসুখ ও মৃত্যু এখন বেশ কিছুদিন চলবে। আমাদের পূর্বপুরুষদের চেয়ে অনেক বেশি রোগ আরোগ্য

করতে পারি। কিন্তু তাঁদের চেয়ে অনেক কম সহ্য করতে পারি। ফিউডনার যা বলেছেন তা সত্য; তিনি বলেছেন ঃ "আমরা যে-উদ্দেশ্য নিয়ে চলছি, তাতে হতাশা আসবেই। কারণ প্রযুক্তিবিদ্যা পাল্টাচ্ছি, কিন্তু তাতে মৃত্যুকে বন্ধ করা যাচ্ছে না। সেক্ষেত্রে আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার মূল কাঠামোর পরিবর্তন করতে হবে, যাতে ভাল জীবনযাত্রা প্রণালীর অঙ্গ হিসাবে থাকবে অসুখবিসুখ ও মৃত্যু।"

আমরা এখন যে প্রতিবিধানের কথা উত্থাপন করছি, তা স্বাস্থ্য বিষয়ে ততটা নয়, যতটা নীতি হিসাবে; বিশেষজ্ঞদের মত নয়, পুরনো সাধারণ জ্ঞানকেই আবার তুলে ধরা। তাই মন্টেনের কিছু উপদেশ নিতে হবে, তা না চাইলে তাঁর বিংশতি যুগের উত্তরাধিকারী জর্জ বার্নার্ড শ-এর মতের একটু নিতে হবে, যিনি 'দ্য ডক্টর্স ডিলেমা'-র ভূমিকায় লিখেছেন ঃ "তোমার স্বাস্থ্যকে তার শেষবিন্দু পর্যন্ত ব্যবহার কর। স্বাস্থ্য এইজন্যই। তোমার মৃত্যুর আগে তার সবটা ব্যবহার কর এবং আয়ু বাড়াতে চেষ্টা করো না, চিরকাল বেঁচে থাকার চেষ্টা করো না; তাতে তুমি সফল হবে না।" **[British Medical Journal, 20-30 December 2000, pp. 1580-1585]** ❑

ভাষান্তর ঃ জলধিকুমার সরকার

অ্যালুমিনিয়াম পাত্রের উপযোগিতা

সৈয়দ আনিসুল আলম

খুব বেশি দিনের কথা নয়। মাত্র একশ বছর আগে এদেশে মাটির পাত্রেই সংসারের কাজকর্ম চলত। রান্নার হাঁড়ি, কলসি, থালা, বাটি এবং নানারকম পানপাত্র মাটি থেকেই তৈরি হতো। সাধারণ মানুষই এসকল ব্যবহার করত। যাদের অবস্থা ভাল ছিল তারা তামা, পিতল ও কাঁসার পাত্র ব্যবহার করত। বিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই অ্যালুমিনিয়াম পাত্রের ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। এতে কয়েকটি সুবিধা আছে। এই ধাতু যেমন হালকা, তেমনি উত্তম তাপবাহী। দামেও সস্তা। এটি ভাল তাপপরিবাহী বলে রান্নাও তাড়াতাড়ি হয়। আবার এর এত গুণ থাকায় আমাদের দেহে ক্ষতিও করতে পারে। সেই হিসাবে আমরা অনেকেই এগুলি রাখি না। তীব্র ক্ষার ও অ্যাসিড জাতীয় খাদ্য রান্নার সময় এই পাত্রের সংস্পর্শে এসে অ্যালুমিনিয়াম সল্ট তৈরি করে। এগুলি আমাদের শরীরের দেহকোষগুলির পক্ষে ক্ষতিকর, বিশেষ করে স্নায়ুতন্ত্র ও পাকস্থলীর ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটায়। পেটের গণ্ডগোল মারাত্মক হতে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্য হলে 'ক্রনিক' হয়ে যায়। বহুদিন ভুগতে হয়।

আমাদের দেহরক্ষার জন্য প্রয়োজন অতি নগণ্য পরিমাণ ধাতব পদার্থ। আর্সেনিক, লৌহ, দস্তা, বোরন, ম্যাঙ্গানিজ, অ্যালুমিনিয়াম, বেরিয়াম, তামা, কোবাল্ট, রূপা, টাইটেনিয়াম ইত্যাদি বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যাদির মাধ্যমে আমাদের শরীরে প্রবেশ করছে। বায়োকেমিক্যাল রিসার্চে জানা গেছে নগণ্য কণামাত্রই যথেষ্ট। এর বেশি পরিমাণ দেহে প্রবেশ করলে তা ক্ষতিকরই হবে। অ্যালুমিনিয়াম পাত্র ব্যবহার করে বিভিন্ন খাদ্যের মাধ্যমে অতিরিক্ত অ্যালুমিনিয়াম দেহে প্রবেশ করলে দেহের যে ক্ষতি হবে তা সহজেই বোঝা যায়। তবে ভাত, ডাল রান্নায় এই পাত্র এতটা ক্ষতি করে না। অ্যালুমিনিয়াম পাত্রের গায়ে একপ্রকার অ্যালয় (Alloy) ব্যবহার করা যায়, যা ঐ ধাতুকে পৃথক করে রাখে।

অ্যালুমিনিয়াম পাত্রে কফি তৈরি করলে তার ভিতরের গায়ে কালো ছোপ পড়ে যায় এবং ক্রমাগত ঐভাবে কফি পান করলে গ্যাস্ট্রিক আলসার দেখা দেয়। ইংল্যাণ্ডের এডগার জে. স্যাকশন নিজে এবং অপরাপরকে দিয়ে বিভিন্ন স্থানে এবিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে অ্যালুমিনিয়াম পাত্রের মানবদেহে বিষক্রিয়া সম্পর্কে নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছেন। এজন্য অ্যালুমিনিয়াম পাত্রের ভিতরের গাত্র ফুডপ্রুফ দিয়ে তৈরি করতে হয়। এর ফলে ক্ষার বা অ্যাসিড জাতীয় খাদ্য রান্নার সময় কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটবে না। অথবা অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় দিয়ে পাত্র নির্মিত হলে এবিষয়ে আর ক্ষতির ভয় থাকে না। এখন স্টীল, হিণ্ডালিয়াম ইত্যাদির পাত্র পাওয়া যায়। তাছাড়া মূল্যবান প্রেসারকুকার এসব দোষ থেকে মুক্ত এবং সবদিকে স্বাস্থ্যের পক্ষে নিরাপদ। প্রোফেসর প্রেসকটের রিপোর্টে বলা হয়েছে, অ্যালুমিনিয়াম পাত্রে উত্তম সুগন্ধিযুক্ত কফি তৈরি করা যায় না। এই পাত্রের ভিতরের গাত্রে কফির সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে, যার ফলে পাত্রের ভিতরের গাত্রে কালো দাগ পড়ে। উক্ত পাত্রে তৈরি কফি বেশিদিন ধরে পান করলে গ্যাস্ট্রিক হয়। পরীক্ষা করে আরো দেখা গেছে, অ্যালুমিনিয়াম পাত্রে রান্না ত্যাগ করায় পেটের ক্রনিক রোগ ইত্যাদি সেরে গেছে। উল্লিখিত কারণের জন্য বেশি ক্ষার ও বেশি অ্যাসিড-জাতীয় খাদ্য অ্যালুমিনিয়াম পাত্রে রান্না করা উচিত নয় এবং নিরাপদও নয়। তাছাড়া এতে কফি তৈরি করে পান করা যায় না। তবে অ্যালুমিনিয়াম পাত্রে ভাত, ডাল রান্না করা এবং ক্ষার ও অ্যাসিডহীন খাদ্যবস্তু রান্না করে খাওয়া যায়। তবে প্রয়োজনমতো স্টীল, হিণ্ডালিয়াম, পিতল, কাঁসা ও প্রেসার-কুকারে রান্না করতে হবে। সুস্বাস্থ্যের জন্য এইসকল নিয়ম পালন করা অত্যাবশ্যক। ❑

সত্যান্বেষী বিজ্ঞানে অলৌকিক বলে কিছু নেই

বৈদ্যনাথ বসু



জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান?
অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশক:
উৎস মানুষ প্রকাশন
বি ডি-৪৯৪, সল্ট লেক
কলকাতা-৭০০০৬৪
পৃষ্ঠা: ৮+৪০
মূল্য: ২০ টাকা

'কণিকা' কাব্যের 'চালক' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলছেন—

"অদৃষ্টেরে শুধালেম, চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে?
সে কহিল, ফিরে দেখ। দেখিলাম থামি,
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি।"

এই কবিতার বক্তব্য—বর্তমান বা ভবিষ্যতের 'আমি'র পিছনে রয়েছে পশ্চাতের 'আমি', সে-ই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে; অর্থাৎ কর্মফল থেকে মানুষের নিস্তার নেই। একথা যেমন যুক্তিসম্মত, তেমনি আমাদের সনাতন শাস্ত্রধর্মসম্মত। এবং এখানেই জ্যোতিষশাস্ত্রের মূল প্রোথিত।

হিন্দুশাস্ত্রমতে প্রারব্ধই মানুষের জন্ম এবং জীবনের ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে এজন্মে সুখদুঃখ, সাফল্য-ব্যর্থতা প্রদান করে। আবার শাস্ত্র একথাও বলে যে, এ-জন্মের শুভকর্মের দ্বারা প্রারব্ধের কুপ্রভাব হ্রাস করা সম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়—"সর্পদংশন লেখা ছিল, কিন্তু প্রার্থনার ফলে ঈশ্বরকৃপায় বৃশ্চিকদংশন হলো।"

মানুষের জীবনে সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। বিদ্যার্জনের একটা সময় আছে। পরীক্ষা সময়মতো দিতে হবে, ট্রেন ধরতে হলে সময়মতো যেতে হবে, ফসল পেতে হলে সময়মতো জমি তৈরি করে বীজ ছড়াতে হবে, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার কষ্ট লাঘবের জন্য সময়মতো প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন কাজগুলো আমরা সময়মতো করলেই জীবনে শৃঙ্খলা এবং সুখশান্তি বজায় রাখতে পারি। সময়েরও আবার ভালমন্দ আছে, সময়ের কাজ অসময়ে করলে ফল শুভ নাও হতে পারে। শুভ ফল পেতে হলে কাজটি ঠিক সময়ে করতে হবে। একই কারণে মানুষের জন্মসময়টি তার জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া অস্বাভাবিক নয়। জন্মসময় (Initial Condition) এবং প্রারব্ধ (Boundary Condition) মানুষের জীবনের ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণ করতেই পারে। একথাটা বুঝতে সুবিধা হবে যদি আমরা জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনুরূপ নিয়ম দেখতে পাই। প্রথমত, গতিবিদ্যার ক্ষেত্রে আমরা জানি—কোন বস্তুর গতির প্রারম্ভিক শর্ত (Initial Condition) এবং প্রযুক্ত বল ও তা প্রয়োগের শর্তাবলী (Boundary Condition) যদি নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায়, তাহলে ঐ বস্তুর পরবর্তী সমগ্র গতিই নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং বস্তুটি পরবর্তী কালে কখন কোথায় থাকবে, কিভাবে চলবে তা হিসাব করে বলে দেওয়া যায়। দ্বিতীয় উদাহরণ, জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানে (Astrophysics) ভোগ্ট্-রাসেল তত্ত্বের বক্তব্য—কোন নক্ষত্রের প্রারম্ভিক ভর এবং রাসায়নিক উপাদান যদি নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায়, তবে নক্ষত্রটির পরবর্তী গঠন-প্রকৃতি এবং জীবনবৃত্তান্ত চিরদিনের জন্য স্থিরীকৃত হয়ে যায়।

জড়বিজ্ঞানে যদি এমন সব নিয়ম থাকতে পারে, তবে মানুষের জীবনেই বা অনুরূপ নিয়ম প্রযুক্ত হতে পারবে না কেন? জন্মসময় এবং প্রারব্ধ—দুইয়ে মিলে মানুষের জীবনের ঘটনাবলী নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, এমন ভাবা বৃথা। এটা তো বিজ্ঞানের নিয়মমতোই হতে পারে, বিজ্ঞানের সঙ্গে এই ধারণার বিরোধ কোথাও নেই।

তবে হ্যাঁ, জ্যোতিষীদের একটি সমস্যা আছে বটে। কোন মানুষের জন্মকাল জ্যোতিষীর জানা থাকলেও মানুষটির প্রারব্ধ তাঁর ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যায়। তাই হাতের কাছে আসল জিনিসটি না পেয়ে তাঁরা জাতকের জন্মকালে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান এবং পরবর্তী কালে গণনার সময়ও তাদের অবস্থান ও সন্নিবেশ পর্যালোচনা করে জাতক সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসেন বা নানারকমের ভবিষ্যদ্বাণী করেন।

এখানে যে-কথাটি বেশ জোরের সঙ্গে বলা দরকার তা হলো, গ্রহনক্ষত্রের দ্বারা প্রযুক্ত কোন বল জাতকের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে না, গ্রহনক্ষত্রের গতি ও অবস্থান সময়ের নির্দেশ দেয়। এই সময়ই হচ্ছে যেকোন জাতকের জীবনের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু এরকম গণনায় ভুল সিদ্ধান্তে আসা খুবই সম্ভব। এখানে জ্যোতিষীর উৎকর্ষ, স্বচ্ছতা এবং তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের পরিচ্ছন্নতার প্রশ্ন জড়িত। তিনি কত বেশি নির্ভুল সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন, তা তাঁর এই গুণগুলির ওপর নির্ভর করে। তাঁর গণনা যদি পাঁচটার মধ্যে তিনটি বা দুটি মেলে আর দুটি বা তিনটি না মেলে, তবে সেটির গুণাগুণ বিজ্ঞান-সম্মতভাবেই বিচার করতে হবে। কটা মিলল না বলেই তাঁকে বুজরুক বা প্রতারক বলা অন্যায় হবে। যে-কটা মিলল তার জন্যও তাঁকে মর্যাদা দেওয়া দরকার।

এই অনিশ্চয়তা জ্যোতিষশাস্ত্রের মূল প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। জ্যোতিষ একটি শাস্ত্র, একে জড়বিজ্ঞানের অর্থে 'বিজ্ঞান' বলা ঠিক হবে কিনা এবং একে সেই অর্থে কেউ বিজ্ঞান বলেন কিনা তা আমার জানা নেই। তবে জ্যোতিষীদের বুজরুক বা প্রতারক বলাটা অসমীচীন নিশ্চয়ই। জ্যোতিষীদের মধ্যে কিছু লোক নিশ্চয়ই অযোগ্য, কারণ, তারা মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের প্রতারণা করে। তাদের জন্য যদি গোটা জ্যোতিষশাস্ত্রকেই বুজরুকি এবং প্রতারণামূলক বলি, তবে চিকিৎসাশাস্ত্র, আইনশাস্ত্র, অধ্যাপনা, বহুরকমের ব্যবসা প্রভৃতি আরো অনেক কিছুকেই আমরা একই দোষে দুষ্ট সাব্যস্ত করতে বাধ্য হব। অসৎ দুষ্টলোক মানুষকে প্রতারণা করবে—এটা তাদের স্বধর্ম এবং এর জন্য কোন শাস্ত্র বা 'প্রফেশন' দায়ী নয়। আগুনের ব্যবহার করে কেউ যদি অপরাধমূলক কাজ করে, তবে দোষারোপ করব আগুনকে না অপরাধীকে? এই অবস্থায় শুধুমাত্র জ্যোতিষীরাই মানুষকে প্রতারণা করছেন, তাঁরাই শুধু সমাজের ক্ষতি করে বেড়াচ্ছেন—এই একপেশে অভিযোগ নিশ্চয়ই অবাঞ্ছিত।

কথাগুলি এসে গেল অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান'** বইটি পড়তে পড়তে। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের যে-বাণীটি বইয়ের প্রথমেই উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেটি অতি সত্য, কিন্তু শুধুমাত্র জ্যোতিষীদের লক্ষ্য করে এই তীক্ষ্ণশরটি ছোঁড়ার মধ্যে মহত্ত্ব কিছু নেই। আইনস্টাইন নিজে সেটা জ্যোতিষীদের লক্ষ্য করে বলেননি। জ্যোতিষীরা নিশ্চয়ই এই মহান বিজ্ঞানীকে বিব্রত করেননি। জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় তিনি বরং বুঝেছিলেন যে, ধূর্ত লোকের সংখ্যা বিজ্ঞানীদের (বিজ্ঞান-ব্যবসায়ীদের) মধ্যে অনেক বেশি।

আমরা ছাত্রবয়সে 'বিজ্ঞানের ছাত্র', 'বিজ্ঞান গবেষক', 'বিজ্ঞানের শিক্ষক বা অধ্যাপক', 'বিজ্ঞানী' ইত্যাদি কথাগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। এঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশুনা করতেন, লাইব্রেরিতে বা নির্জনে দীর্ঘসময় বিজ্ঞান বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতেন, ল্যাবরেটরিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, কখনো বা অধিক রাত্রি পর্যন্ত বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। এঁরা ক্লাসে যা পাঠ বা নোট দিতেন, তারপর ছাত্রছাত্রীদের আর অন্য কারোর সাহায্য নিতে হতো না। এ-বঙ্গে তখন শিক্ষাক্ষেত্রে ছিল স্বর্ণযুগ। তারপর দিনকাল পালটাতে থাকল। ক্রমে গত প্রায় দুই দশক থেকে ধীরে ধীরে এল 'বিজ্ঞানমনস্ক'দের যুগ। তাঁদের প্রকাশিত জনপ্রিয় বিজ্ঞান-রচনায় যে সচরাচর অজস্র ভুল থাকে, তা থেকে বর্তমান ক্ষুদ্র-কলেবর পুস্তকখানিও রেহাই পায়নি। নিচে ভুলগুলি তুলে ধরা হলো—

(১) ৪র্থ পৃষ্ঠায় আলোকবিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ধাপগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রথম ভুল—আলোর তরঙ্গবাদ তত্ত্ব টমাস ইয়ং (১৭৭৩-১৮২৯)-এর আবিষ্কার নয়, ইয়ং-এর প্রায় একশ বছর আগে ডাচ বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান হিগিন্স (১৬২৯-১৬৯৫) ছিলেন আলোর তরঙ্গবাদের প্রথম প্রবক্তা। দ্বিতীয় ভুল হলো—১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে মাইকেলসন-মরলির বিখ্যাত পরীক্ষার পরে ইথার মাধ্যমের অস্তিত্বকে চিরতরে বাতিল করা হয়েছে। লেখক এখন এই একবিংশ শতকেও সেই ইথার মাধ্যমটিকে আবার ফিরিয়ে এনেছেন। তৃতীয় এবং সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ভুল—লেখকের কথায়—"আলোর কণাবাদ তত্ত্ব গবেষকদের চোখের আড়ালে চলে গেল।" এটা পড়লে পাঠকের মনে হবে, 'কণাবাদ তত্ত্ব' বুঝি চিরতরে বাতিল হয়ে গেল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব (১৯০০) এবং আইনস্টাইনের ফোটন তত্ত্ব (১৯০৫) আলোর কণাতত্ত্বকে যে শুধু রাজগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছে তাই নয়, এই কাজগুলিই পরে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি তৈরি করেছে। লেখকের আলোকবিজ্ঞানের উপস্থাপনাটি তাই একেবারেই অসম্পূর্ণ মনে হয়েছে এবং পাঠকের পক্ষে বিভ্রান্তিকরও বটে।

(২) "প্রাচীন সভ্যতা সবদেশেই ছিল কৃষিনির্ভর।"—একথা সর্বৈব সত্য নয়। মধ্যপ্রাচ্যের এবং অন্যান্য অনেক দেশেই পশুপালন এবং পশুশিকার ছিল প্রধান জীবিকা। সেখানে কৃষিকাজ বিশেষ এগোয়নি। ভবিষ্যৎ জানার ইচ্ছা প্রত্যেক মানুষেরই সহজাত প্রবৃত্তি, এটা কোন দুর্বলতা নয়। আবার বর্ষাকাল কখন আসবে, কৃষিনির্ভর দেশে তা জানাই থাকত; এর সঙ্গে ভবিষ্যৎ জানার ইচ্ছার কোন সম্পর্ক নেই।

জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা ভারতে আসে মেসোপটেমিয়া থেকে—এ-তথ্যটি ঠিক নয়। লি ভেরিয়ার এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে খ্রীস্টপূর্ব ৩১০২ সালে কলিযুগের সূচনা হয়েছিল। এর কিছুকাল আগেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়েছিল। মহাভারতে আমরা পাই, কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব ছিলেন ভূত-ভবিষ্যৎ গণনাকার্যে বিশেষ পারদর্শী। আমরা আরো জানি, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে শ্রীকৃষ্ণ শান্তিস্থাপনের উদ্দেশ্যে দৌত্যকার্যে হস্তিনাপুরে গিয়েছিলেন। দৌত্য ব্যর্থ হওয়ায় ফিরে আসার সময় তিনি কর্ণের সঙ্গে দেখা করে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করেন এবং কর্ণকে ভাইদের পক্ষে ফিরে আসতে অনুরোধ করেন। কর্ণ সেই অনুরোধ বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে তখনকার গ্রহসন্নিবেশ ব্যাখ্যা করে বলেন যে, অচিরে প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ হবে এবং সেই যুদ্ধে ব্যাপক প্রাণহানি হবে। (উদ্যোগপর্ব, ১৪৩।১২-২৭) এসব থেকে আমরা জানতে পারি যে, প্রাচীন ভারতে অর্থাৎ মহাভারতের যুগে, এমনকি তারও আগে জ্যোতিষশাস্ত্রের ব্যাপক চর্চা ছিল এবং তখনকার জ্যোতিষগণনা ছিল অভ্রান্ত, কারণ তখন এই কাজটি ছিল যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞদের হাতে। অতএব একথা জোর দিয়ে বলা যায়, জ্যোতিষশাস্ত্র অতি

প্রাচীন এবং এই শাস্ত্র ভারতের নিজস্ব সম্পদ, অপর কারো কাছ থেকে ধার করা নয়।

(৩) লেখক জানিয়েছেন ঃ "ইউরোপে শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন ক্লডিয়াস টলেমি।" (পৃঃ ১০) তথ্যটি ঠিক নয়। ক্লডিয়াস টলেমি ছিলেন মিশরের আলেকজান্ড্রিয়ার মানুষ, ইউরোপের নয়।

(৪) সূর্যকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের পরিবর্তে ভূকেন্দ্রিক বিশ্বতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে গণনা করলেও কিছু হেরফের হওয়ার কথা নয়, কারণ হিসাবগুলি আপেক্ষিক গতিনির্ভর, কাকে স্থির করা হলো সেটি অপ্রধান। (দ্রঃ পৃঃ ১৫-১৬)

(৫) "মার্কিন দেশের ক্যালিফোর্নিয়া শহর।" (পৃঃ ২৫) —লেখকের একথাটি ভ্রান্তিমূলক। ক্যালিফোর্নিয়া আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শহর নয়, একটি বৃহৎ রাজ্য।

(৬) ২৯ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হস্তরেখার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা হাস্যকর। হস্তরেখার কারণ যদি মাতৃগর্ভে শিশুর মুঠি করা হাত হয়, তবে মুঠির বাইরে কবজির দিকে হাতের যে অর্ধেক থাকে সেই অংশে মোটা মোটা দাগগুলো হয় কিভাবে? সেগুলি কি শিশু মাতৃগর্ভে থেকেই mathematical extrapolation-এর সাহায্যে করে ফেলে?

(৭) ৩৫ পৃষ্ঠায় জ্যোতিষের বিরুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দের একটি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। স্বামীজীর কথার প্রেক্ষাপট এবং উদ্দেশ্য বর্তমান আলোচ্য বিষয় থেকে একেবারেই ভিন্ন। যুবকদের প্রতি তাঁর বাণী ছিল শক্তি এবং ভয়হীনতার। তিনি জানতেন, তামসিকতায় আচ্ছন্ন ভারতবাসী কর্মহীন অলস জীবনযাপনের সুযোগ পেলে সেটিকেই আঁকড়ে ধরবে এবং দৈব বা জ্যোতিষের ওপর নির্ভর করে তার পুরুষকার ও আত্মবিশ্বাসকেই সর্বাগ্রে বলি দেবে। বস্তুত, জীবনের সর্বপ্রকার দুর্বলতার বিরুদ্ধেই তিনি গর্জে উঠেছিলেন। কিন্তু তাই বলে তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেননি। আমেরিকা যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি গর্ভধারিণী মায়ের সম্বন্ধে এক ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখে মাদ্রাজের এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে এক জ্যোতিষীর কাছে গিয়েছিলেন। জ্যোতিষীর গণনায় মায়ের নিরাপদে থাকার কথা শুনে স্বামীজী তখনকার মতো আশ্বস্ত হয়েছিলেন।

বইখানির মূল উদ্দেশ্য যেমন একদিকে বিজ্ঞানের জয়গৌরবকে তুলে ধরা, অপরদিকে তেমনি জ্যোতিষশাস্ত্রের অসারতা, অনৈতিকতা এবং তার প্রতারণা প্রমাণ করা। কিন্তু বিজ্ঞানের সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য কোন মননশীল বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপস্থাপনা করা হয়নি। শুধু কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা খাপছাড়াভাবে সাজানো হয়েছে এবং প্রায় প্রতিটি ঘটনা বর্ণনার শেষে জ্যোতিষশাস্ত্রের বা জ্যোতিষীদের নিন্দা করা হয়েছে। বরং যুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে লেখক তাঁর বক্তব্যগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করলে তা আকর্ষণীয় হতো।

বিজ্ঞানের নিয়মমতে কোন বিষয়ের অসারতা বা ভ্রান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে হলে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা এবং বিশ্লেষণ-পদ্ধতি প্রয়োগ করে উদাহরণ সহযোগে তা দেখিয়ে দিতে হয়। কোন একটি বিষয় বৈজ্ঞানিক বিচারে ভুল বা ক্ষতিকর হলে তা শুধু মুখে বললে হবে না, ভুলটি কোথায় এবং কেন তা উপযুক্ত বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রমাণ করতে হবে। এটাই বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য, প্রমাণ ছাড়া শুধু মুখের কথা গ্রাহ্য হবে না।

জ্যোতিষশাস্ত্র একটি বিদ্যা। একে বিজ্ঞানের অস্ত্রে নিধন করতে হলে এর ব্যর্থতা, অসারতা, অনিষ্টকারিতা ইত্যাদি দোষগুলিকে বিজ্ঞানের বলিষ্ঠ, মননশীল এবং ধারালো যুক্তিসমূহ প্রয়োগ করে এমনভাবে দেখাতে হবে যে, বুদ্ধিমান বিচারশীল মানুষের কাছে তার সত্যতা তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে। তাহলেই সহস্র যুগ প্রতিষ্ঠিত জ্যোতিষশাস্ত্রের মতো প্রাচীন একটি বিদ্যামন্দিরকে বিজ্ঞানের আঘাতে ধূলিসাৎ করা সম্ভব হবে। কিন্তু বর্তমান পুস্তকে সেরকম কিছুই করা হয়নি। পুস্তকখানি পড়লে বরং মনে হবে যে, জ্যোতিষবিদ্যা এবং জ্যোতিষীদের আগে থেকেই দোষী সাব্যস্ত করে তাকে পাথর ছুঁড়ে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

পুস্তকখানিতে নানা উদাহরণ ও ঘটনার সংযোজন করা হয়েছে, কিন্তু এগুলির মধ্যে কতকগুলি কাল্পনিক ও অবাস্তব, আবার কতকগুলি একপেশে এবং যুক্তিহীন। যেমন, আকাশে উজ্জ্বল শুক্রগ্রহ দেখে যুগ যুগ ধরে মানুষ মুগ্ধ হয়েছে। লেখকের যুক্তি, মানুষ যুগ যুগ ধরে মারাত্মক ভুল করেছে, যেহেতু এখন জানা গেছে—গ্রহটি অত্যন্ত উত্তপ্ত এবং তার আবহাওয়ায় রয়েছে বিষাক্ত গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইড। এরকম হাস্যকর যুক্তি যদি আমরা মেনে নিই, তাহলে কোন মানুষকেই ভালবাসা সম্ভব নয়, কারণ তার শরীরে রয়েছে মল-মূত্র।

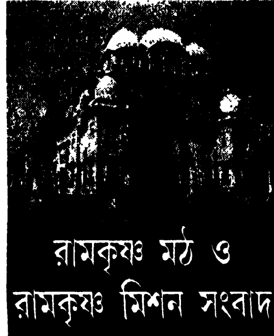
অপরদিকে একটি উদাহরণ বিখ্যাত জ্যোতিষী বি. ভি. রমণ। লেখক রমণের ওপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, কারণ একবার রমণের একটি রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়েছিল। এক্ষেত্রেও ঐ পাথর ছুঁড়ে মারার দণ্ড! অন্যান্য ক্ষেত্রে রমণের কত যে ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে, লেখক তা আলোচনার কোন প্রয়োজনবোধ করেননি। কাজেই এই বিচার একপেশে এবং সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। এরকম আরো বহু অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক ও একপেশে তথ্যের উপস্থাপনা করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায়, পুস্তকখানির মূল পরিকল্পনা ভালই ছিল। কিন্তু প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতিষ্ঠার জন্য যেরকম বৈজ্ঞানিক মননশীলতা, ধারালো যুক্তি এবং যুক্তিগ্রাহ্য উপস্থাপনার প্রয়োজন ছিল, পুস্তকে তার নিতান্ত অভাব দেখা যায়। এছাড়া বিজ্ঞানের অস্ত্রেই যখন প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করতে হবে, সেখানে কোনরকম বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগের আগে প্রথমেই নিন্দা দিয়ে শুরু করলে মূল উদ্দেশ্যটিই ব্যর্থ হয়ে যায়। ❑

উৎসব-অনুষ্ঠান

নতুন সহস্রাব্দে বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা মুক্তাঙ্গনে

দুর্গাপূজা বাঙালীর প্রাণের অনুষ্ঠান—জীবনের দুঃখ-দুর্দিনে, শঙ্কায়-বিপর্যয়ে, গ্লানি-পরাজয়ে মাতৃ আরাধনার আনন্দস্রোতে বাঙালীর নতুন প্রাণপ্রতিষ্ঠা। তবু অনাবশ্যক আড়ম্বরে পূজার সেই আধ্যাত্মিক আবহ নষ্ট হয়েছে আজ অনেকখানি। এরই মধ্যে বেলুড় মঠের দুর্গাপূজা ব্যতিক্রম—পথভ্রান্তির মধ্যে পথ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা। স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুসরণ করে যে-পূজা আরম্ভ হয়েছিল সদ্য-কেনা মঠের জমিতে, শতাব্দীর সরণি বেয়ে আজ তারই মন্ত্রসঙ্গীত উৎসব আয়োজনের বিমিশ্র রূপ কত দর্শনার্থীকেই না আকর্ষণ করে! এবারেও তার অন্যথা হয়নি। তবে, এবারের পূজার কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। এবারে মন্দিরের পূর্বপার্শ্বের জমিতে তৈরি করা হয়েছিল সুপ্রশস্ত বেদি ও সুসজ্জিত মণ্ডপ। এই মূল মণ্ডপটির পিছনে তথা উত্তরপার্শ্বে ছিল দেবীপূজার ভাণ্ডারগৃহ। মূল মণ্ডপটির সঙ্গে সংযুক্ত রেখেই সাধু-ব্রহ্মচারী ও দর্শনার্থীদের বসবার জন্য বিশাল মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছিল। প্রবল গাঙ্গেয় বাতাস থেকে মূল মণ্ডপটিকে বাঁচানোর জন্য এর পূর্বধারে গঙ্গার সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রায় মণ্ডপের ছাদ পর্যন্ত টিন ও কাপড়ের আবরণও রাখা হয়েছিল। সমগ্র মণ্ডপটি ছিল কূর্মাকৃতি, যাতে আকস্মিক ঝড়-বৃষ্টি কোন সমস্যা না সৃষ্টি করতে পারে। এবারে কুমারীপূজাও অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঐ মূল মণ্ডপেই। সমগ্র নির্মাণকার্যটি সম্পন্ন করতে ব্যয় হয়েছে যথেষ্টই। সবার কিছুটা চিন্তা ছিল এই নতুন প্রয়াস কতটা সফল হবে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কর্মোদ্যোগ ও শুভেচ্ছায় এই আয়োজনের সার্থকতা প্রশ্নাতীত হয়ে গেছে। প্রায় আড়াই হাজার ভক্ত মণ্ডপের ভিতরে বসে পূজা দেখেছেন। কুমারীপূজার সময়ে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি দর্শনার্থী উপস্থিত ছিলেন। কুমারীপূজা, বিশেষত সন্ধিপূজার সময়ে দর্শনার্থীদের অদ্ভুত নীরবতা পরিবেশের ভাবমাহাত্ম্যে এক উজ্জ্বল সংযোজন। স্বামীজী বলতেন, যেখানে বহু লোক একত্রে বসে ঈশ্বরচিন্তা করে, সেই স্থানই পবিত্র হয়ে ওঠে, মন্দির হয়ে ওঠে। বাস্তবিকই, মন্দির কেবল ইঁট-কাঠ-পাথর দিয়ে তো তৈরি নয়, কোন সীমানা-চিহ্নিত প্রাসাদ নয়—মন্দির সমবেত মানুষের সমষ্টি সাধনা ও পুঞ্জীভূত প্রার্থনার মধ্যেই জন্ম নেয়। বেলুড় মঠের এবারের দুর্গাপূজাও তাই প্রথাগত মন্দির-পরিকাঠামোতে অনুষ্ঠিত না হয়েও প্রার্থনা, ভজন, পূজানিষ্ঠা, ভক্তিভাবনা প্রভৃতি সবকিছু দিয়েই এক সাময়িক মন্দিরভূমি নির্মাণ করেছিল।



নরোত্তমনগর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের (অরুণাচল প্রদেশ) শরীরচর্চার জন্য দুটি নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। গত ৪ সেপ্টেম্বর ২০০১ ভবন-দুটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন অরুণাচল প্রদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সামচোম নেমু। বিশেষ উল্লেখ্য, ভারতের উপরাষ্ট্রপতি এই বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে 'জাতীয় পুরস্কার' প্রদান করেছেন।

রামহরিপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে (বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ) শিক্ষকদিবস উপলক্ষ্যে গত ৫ সেপ্টেম্বর ২০০১ 'স্বামীজীর শিক্ষাদর্শন' বিষয়ে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। সভার সূচনা ও সভাপতিত্ব করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী তত্ত্বস্থানন্দজী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে স্বামী স্বাগতানন্দজী বলেন ঃ শিক্ষায় স্বনির্ভরতা, আত্মবিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও বিবেকের জাগরণ না ঘটলে সে-শিক্ষা কখনোই সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। চরিত্রের উৎকর্ষ, পবিত্রতা, বিনয় প্রভৃতি শিক্ষালাভের মূল সোপান। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বামী কৃত্তিবাসানন্দজী স্বামীজীর শিক্ষাদর্শনের তাৎপর্য, তার প্রাসঙ্গিকতা এবং বর্তমান শিক্ষাসঙ্কটে এর ব্যবহারিক গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেন। সভাপতির ভাষণে স্বামী তত্ত্বস্থানন্দজী বলেন ঃ বর্তমান নৈতিক অবক্ষয়ের যুগে একমাত্র স্বামীজী প্রদর্শিত শিক্ষাদর্শই এই শিক্ষাসঙ্কট থেকে আমাদের রক্ষা করতে পারে। অনুষ্ঠানে বাঁকুড়া জেলার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৬৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন।

ছাত্রকৃতিত্ব

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত ২০০১ সালের বি. এসসি. (অনার্স) পরীক্ষায় **রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের (সারদাপীঠ)** ছাত্ররা রসায়নে ২য় ও ৮ম স্থান, গণিতে ১ম ও ৭ম স্থান এবং পদার্থবিদ্যায় ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করেছে।

রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুর আবাসিক মহাবিদ্যালয়ের ছাত্ররা বি. এসসি. (অনার্স) পরীক্ষায় রসায়নে ৪র্থ স্থান, গণিতে ৩য়, ৫ম ও ৯ম স্থান এবং পরিসংখ্যানবিদ্যায় ১ম ও ৩য় স্থান অধিকার করেছে।

সেবাব্রত

নেত্রামপল্লী রামকৃষ্ণ মঠ (তামিলনাড়ু) গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০১, ১১৫টি বিদ্যালয়ের ৭৯৪ জন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীর মধ্যে স্কুল ইউনিফর্ম বিতরণ করেছে।

বন্যাত্রাণ

উত্তরপ্রদেশ বন্যাত্রাণ

লখনৌ আশ্রম গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে বন্যাকবলিত মানুষের মধ্যে প্রাথমিকভাবে নিম্নলিখিত জিনিস-গুলির বিতরণ করেছে—গোরখপুর জেলার ৮টি গ্রামের মানুষের মধ্যে চিঁড়া, গুড়, ছোলা, পিঁয়াজ ও লবণ সম্বলিত ১৭০৫টি খাবার প্যাকেট, বাকাতলা, লক্ষ্মীপুর, ডুবালি ও নাকওয়ার এবং সিদ্ধার্থনগর জেলার সুপার রাজা, কেওয়াতালিয়া রামপুরা প্রভৃতি গ্রামের মানুষের মধ্যে ১০৫০ কিলোঃ চিঁড়া, ৩০০ কিলোঃ চিনি ও ১৭৫ কিলোঃ গুঁড়ো দুধ

বিতরণ করেছে। অধিকন্তু, আরো ২০টি গ্রামের ৩১,০০০ বন্যাগ্রস্ত মানুষের মধ্যে গত ১৩-২০ সেপ্টেম্বর খিচুড়ি বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ১,০০০ পলিথিন সীট ও ৩০,০০০ বিভিন্ন মাপের পোশাক-পরিচ্ছদ বিতরিত হয়েছে এবং বন্যাদুর্গত রোগীদের চিকিৎসা-ত্রাণ দেওয়া হয়েছে। এখনো ত্রাণকার্য অব্যাহত আছে।

পশ্চিমবঙ্গ বন্যাত্রাণ

রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের (বেলুড়) সহযোগিতায় উত্তর চব্বিশ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের গোবিন্দখালি গ্রামের বন্যার্ত মানুষের মধ্যে প্রায় ২,২০০ বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ বিতরণ করা হয়েছে। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

দীক্ষানুষ্ঠান : রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ গত ১৫-২১ অক্টোবর ২০০১ শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে অবস্থান করে ৩০০-র অধিক ব্যক্তিকে দীক্ষাদান করেছেন।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা : গত ২৪ অক্টোবর ২০০১ মহাষ্টমীর দিন ভোরে মঙ্গলারতি, সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের ষোড়শোপচারে পূজা, হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। সারাদিনে আগত ভক্তদের হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীকালীপূজা : গত ১৪ নভেম্বর ২০০১ যথারীতি প্রতিমায় ষোড়শোপচারে শ্রীশ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন সকালে সকল ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

ক্ষীরকুণ্ডী প্রবুদ্ধ ভারত সঙ্ঘ, হুগলী : গত ৪ আগস্ট ২০০১ শোভাযাত্রা, বিশেষ পূজা, পাঠ, ধর্মসভা প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দেন স্বামী সত্যস্থানন্দজী ও ইন্দ্রনারায়ণ কুণ্ডু।

গরফা শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাকেন্দ্র, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ : গত ৫ আগস্ট ২০০১ কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষ্যে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় 'স্বামীজীর দৃষ্টিতে আদর্শ ভারত' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন স্বামী বলভদ্রানন্দজী।

বাগবাজার রাধামদনমোহন জীউর মন্দির, মদনমোহনতলা, কলকাতা-৭০০ ০০৩ : গত ১১ আগস্ট মন্দিরে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে 'জন্মাষ্টমীর তাৎপর্য' বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন পামেলা চক্রবর্তী।

তমলুক বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল, মেদিনীপুর : গত ১১ আগস্ট ২০০১ নবনির্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্দিরের উদ্বোধন করেন স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে পরদিন সারাদিনব্যাপী একটি আলোচনা-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন বীরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী, সুখেন্দুশেখর জানা প্রমুখ। শিবিরে ৫০ জন যুবক যোগদান করেছিল।

ডোমজুড় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, হাওড়া : গত ১২ আগস্ট ২০০১ পূজা, বাউলগান, 'কথামৃত' পাঠ, শিশু-স্বাস্থ্য চিকিৎসা শিবির প্রভৃতির মাধ্যমে সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। পূজা ও পাঠ করেন স্বামী যোগাত্মানন্দজী পুরী। শিশু-স্বাস্থ্য শিবিরে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ডঃ শঙ্কর দে, ডঃ রামচন্দ্র মান্না, প্রাক্তন ডেপুটি পুলিস কমিশনার পি. দাশগুপ্ত প্রমুখ। শিবিরে ৩০ জন দুঃস্থ শিশু এবং কয়েকজন দরিদ্র নরনারীকে চিকিৎসা এবং পথ্যাদি প্রদান করা হয়। উৎসবে প্রায় ১,৫০০ ভক্ত প্রসাদ পান।

রামপুরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা পাঠচক্র, বীরভূম : গত ১২ আগস্ট ২০০১ পূজা-পাঠ, ভক্তিগীতি ও ধর্মসভার মাধ্যমে মন্দির প্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অরুণিমা রায়, মিঠু মণ্ডল প্রমুখ। ধর্মসভায় শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর বিষয়ে ভাষণ দান করেন স্বামী শিবনাথানন্দজী, স্বামী সর্বময়ানন্দজী, শক্তিচরণ চট্টরাজ ও প্রশান্ত সিন্‌হা। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিশ্বেশ্বর রায় ও অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়।

বাঁশবেড়িয়া শ্রীবিবেকানন্দ সঙ্ঘ, ত্রিবেণীকেন্দ্র, হুগলী : গত ১২ আগস্ট ২০০১ বিশেষ পূজা, স্তোত্রপাঠ, ভক্তিগীতি, আলোচনা, প্রশ্নোত্তরপর্ব প্রভৃতির মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এদিন ভক্তিগীতি ও ভক্তদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান করেন স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী। আলোচনা করেন ডঃ নমিতা দত্ত ও অধ্যাপক রবীন চট্টোপাধ্যায়। এই উপলক্ষ্যে ৩০ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ করা হয় এবং প্রায় ৫০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

বিবেকানন্দ সোসাইটি, কলকাতা-৭০০ ০০৬ : গত ২৩ আগস্ট ২০০১ এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সোসাইটির শততম প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপিত হয়। এদিন 'স্বামী বিবেকানন্দ ও বিবেকানন্দ সোসাইটি' বিষয়ে আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। বক্তব্য রাখেন ডঃ কমল নন্দী, বিশ্বনাথ দত্ত ও দীপ্তিকুমার শীল। সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির সভাপতি স্বামী নির্জরানন্দজী মহারাজ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অমিত দে। এই উপলক্ষ্যে গত ৭-১০ সেপ্টেম্বর ২০০১ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সোসাইটির শতবর্ষে পদার্পণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ৭ সেপ্টেম্বর ২০০১ ব্রহ্মচারিবৃন্দের বেদপাঠের মধ্য দিয়ে প্রদীপ জ্বেলে শতবর্ষ উৎসবের সূচনা এবং আশীর্বাণী প্রদান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। ভাষণ

(এরপর ৯৪৮ পৃষ্ঠায়)



জরুরী বিজ্ঞপ্তি

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালীর ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া চাই। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' বাঙালী সংস্কৃতিচেতনায় আজ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

'উদ্বোধন' ঃ গ্রাহকভুক্তি, নবীকরণ ❑ ১০৪তম বর্ষ

২০০২ খ্রীস্টাব্দ ● ১৪০৮-১৪০৯ বঙ্গাব্দ

গ্রাহকভুক্তি ঃ বিগত তিন বছর আমরা গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত রাখতে পেরেছি, কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও আগামী বছর (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০২ খ্রীস্টাব্দ) থেকে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য সামান্য বৃদ্ধি করতেই হচ্ছে। এজন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫্ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ৯৫্ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ঃ ৮০০্ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০্ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০্ টাকা।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান অথবা আজীবন (৩০ বছরের জন্য) সদস্যভুক্তির জন্য আমাদের অফিসে লিখবেন, নিয়মাবলী পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আজীবন গ্রাহকমূল্য ৩০০০্ টাকা। এক বা ন্যূনতম ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ৫০০্ টাকা হিসাবে।

বছরের মাঝখানে গ্রাহকভুক্তি ঃ যেকোন সময়েই গ্রাহকভুক্তি হতে পারে। তবে যাঁরা নবীকরণ করবেন তাঁদের কাছে একান্ত অনুরোধ, পূজার আগেই সদস্যপদ 'রিনিউ' করিয়ে নেবেন। তাহলে দপ্তরে কাজের সুবিধা হয়। যাঁরা নতুন গ্রাহক হচ্ছেন তাঁদের মাঘ (জানুয়ারি ২০০১) থেকে সব মাসের পত্রিকাই দেওয়া হবে।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ M.O. অথবা A/c Payee Bank Draft বা Postal Order **"Udbodhan Office"**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড** ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। পত্রোত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন।

চেক গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে।

M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই সুবিধাজনক।

❑ **কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।**

❑ **যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।**

e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইন্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯

দান করেন কাশীপুর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী তত্ত্ববোধানন্দজী। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী ও দীপ্তিকুমার শীল। ৮ সেপ্টেম্বর স্বামী সনাতনানন্দজীর সভাপতিত্বে 'বুদ্ধ-হৃদয় বিবেকানন্দ' বিষয়ে আলোচনা করেন ডঃ কমল নন্দী। ৯ সেপ্টেম্বর 'সঙ্গীতময় শ্রীরামকৃষ্ণ' বিষয়ে আলোচনা করেন দীপ্তিকুমার শীল। ১০ সেপ্টেম্বর প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণাজীর পৌরোহিত্যে 'স্বামীজীর ভাবনায় নারী-জাগরণ' বিষয়ে আলোচনা করেন ডঃ মিনতি কর। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর, বিশ্বনাথ দত্ত প্রমুখ। এই কয়েকদিনের অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুকান্ত ভট্টাচার্য, মিলন চক্রবর্তী, করুণাময়ী ভট্টাচার্য প্রমুখ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র, বারুইপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ঃ গত ২৬ আগস্ট ২০০১ পাঠচক্রের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে পূজা, 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা, ভক্তিগীতি, গীতি-আলেখ্য ও ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা করেন স্বামী দেবেশ্বরানন্দজী এবং 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা করেন সীতাংশুদেব চট্টোপাধ্যায়। বৈকালিক ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী ও সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। স্বাগত-ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিমল পাল। এই উপলক্ষ্যে ৫০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয় এবং ৪০ জন দুঃস্থ নরনারীকে বস্ত্র প্রদান করা হয়।

কল্যাণী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসঙ্ঘ, নদীয়া ঃ গত ২৬ আগস্ট ২০০১ একটি যুবসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। স্বামীজীর বাণী পাঠ, আবৃত্তি, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ও প্রশ্নোত্তরপর্ব ছিল সম্মেলনের অনুষ্ঠিত বিষয়। এতে প্রায় ৬০ জন ছাত্রছাত্রী ও ভক্ত অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দান এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন স্বামী দিব্যাশ্রয়ানন্দজী।

শ্যামপুকুরবাটী শ্রীরামকৃষ্ণ স্মরণ সঙ্ঘ, কলকাতা-৭০০ ০০৪ ঃ গত ২৭-২৯ আগস্ট ২০০১ সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাদিবস পালন করা হয়। বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি ও আলোচনাসভা ছিল তিনদিনব্যাপী উৎসবের প্রধান অঙ্গ। বিভিন্ন দিনে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী, শম্ভু দালাল প্রমুখ। ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দজী, স্বামী সুপর্ণানন্দজী এবং প্রব্রাজিকা ভাস্বরপ্রাণা ও সুব্রত চক্রবর্তী।

বোলপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বীরভূম ঃ গত ৩০ ও ৩১ আগস্ট ২০০১ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথমদিন আশ্রমের নবনির্মিত বাঁধানো ঘাটের উদ্বোধন এবং একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের শিলান্যাস করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। এদিনের ধর্মসভায় তিনি ছাড়াও স্বামী বিশ্বনাথানন্দজী ও স্বামী তত্ত্বস্থানন্দজী ভাষণ দান করেন। দ্বিতীয়দিনে আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই দুদিনে শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ ১৫৬ জন ভক্তকে দীক্ষাদান করেন।

দক্ষিণ বারাসত শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ঃ গত ২ সেপ্টেম্বর ২০০১ সারাদিনব্যাপী একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি, পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত' ও 'শ্রীমা সারদা দেবী' থেকে পাঠ করেন যথাক্রমে বলরাম পাল ও তপতী চক্রবর্তী। এরপর 'ভাগবত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন স্বামী ব্রজেশানন্দজী। অনুষ্ঠানশেষে একাদশ শ্রেণীর ৬ জন দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীকে পাঠ্যপুস্তক ক্রয়বাবদ অর্থসাহায্য করা হয় এবং উপস্থিত সকলকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

তিনসুকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতি, অসম ঃ গত ২ সেপ্টেম্বর ২০০১ সারাদিনব্যাপী একটি ভক্তসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন প্রদ্যোৎ মজুমদার, শান্তা চক্রবর্তী প্রমুখ। আলোচনা করেন স্বামী ঈশাত্মানন্দজী। স্বাগত ভাষণ দান ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মণীন্দ্রচন্দ্র নাথ। সম্মেলনে উপস্থিত প্রায় ৬০০ ভক্তকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

লেকটাউন শ্রীসারদা সঙ্ঘ, শিলিগুড়ি ঃ গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০০১ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দ্বাদশ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের শততম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, ভক্তিগীতি, পাঠ ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। 'কথামৃত' ও শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী পাঠ ও আলোচনা করেন যথাক্রমে নমিতা সরকার ও লীলাবতী বিশ্বাস। কঠ উপনিষদ্ পাঠ করেন ইরা দাশগুপ্ত।

শ্রীরামপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, হুগলী ঃ গত ৮ সেপ্টেম্বর ২০০১ প্রভাতফেরি, ভক্তিগীতি, কীর্তন ও পাঠের মাধ্যমে শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের শততম জন্মদিবস পালন করা হয়। পাঠ করেন অমিয়কুমার নাথ। দুপুরে ২০০ জন ভক্ত প্রসাদ পান।

শ্রীরামকৃষ্ণ তীর্থ পরিক্রমা, কলকাতা-৭০০ ০০৮ ঃ গত ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর ২০০১ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে একটি সম্মেলনে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী বুদ্ধদেবানন্দজী, মঞ্জু মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী শান্তিদানন্দজী, স্বামী লোকনাথানন্দজী, স্বামী ব্রজেশানন্দজী, স্বামী ঋতানন্দজী প্রমুখ।

এগরা শ্রীরামকৃষ্ণ মিলন মন্দির, মেদিনীপুর ঃ গত ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর ২০০১ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মন্দিরের রজত-জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রথমদিন ভক্তসম্মেলনে আলোচনা করেন স্বামী শরণ্যানন্দজী ও স্বামী অক্ষতানন্দজী এবং পৌরোহিত্য করেন স্বামী ভবহরানন্দজী। এদিন একটি সাধুনিবাসের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী। সম্মেলনে পাঁচশতাধিক ভক্ত নরনারী যোগদান করেন। পরদিন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় আয়োজিত যুবসম্মেলনে ভক্তিগীতি, আবৃত্তি, গীতি-আলেখ্য ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন স্বামী মায়াধীশানন্দজী, অনিলকুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ। সম্মেলন পরিচালনা করেন স্বামী

সুপর্ণানন্দজী। এতে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় থেকে প্রায় ১,০০০-এর অধিক ছাত্রছাত্রী যোগদান করে।

চাকদহ বিবেকানন্দ যুবমহামণ্ডল, নদীয়া ঃ গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০০১ একটি যুবশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। ভক্তিগীতি, শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবন ও বাণীর প্রাসঙ্গিকতা, চরিত্রগঠনের উপায়, প্রশ্নোত্তরপর্ব ও আলোচনা ছিল শিবিরের প্রধান বিষয়। আলোচনা করেন স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী, রঞ্জিতকুমার ঘোষ, সোমনাথ বাগচী ও গৌরগোপাল সাহা। শিবিরে ৫১৮ জন যুবক যোগদান করেছিল।

কাটোয়া বিবেকানন্দ পাঠচক্র, বর্ধমান ঃ গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০০১ একটি আলোচনাসভার মাধ্যমে 'শিক্ষক দিবস' পালিত হয়। সভায় আলোচনা করেন স্বামী শিবনাথানন্দজী, অধ্যাপক হেমাদ্রি চ্যাটার্জী ও দীপক দত্ত। এতে প্রায় ১০০ শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী অংশগ্রহণ করেন। এদিন মেধাবী ছাত্রছাত্রীবৃন্দকে 'মেধা পুরস্কার' প্রদান করা হয়।

বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ সমন্বয় পরিষদ (কলকাতা-৭০০ ০২৭) ঃ স্বামীজীর ঐতিহাসিক শিকাগো-বক্তৃতার স্মরণে গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ বিশ্বভ্রাতৃত্ব দিবস উপলক্ষ্যে কলকাতা ময়দান থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত এক বিশাল শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। সকাল সাড়ে ৯টায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল-এর পাশে অবস্থিত স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিমূর্তির পাদদেশে এক সমাবেশের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। এরপর পরিষদের অন্তর্ভুক্ত ৪০টি সংগঠনের ৫ শতাধিক যুবক-যুবতী স্বামীজীর প্রতিকৃতি ও পতাকায় শোভিত সাইকেল, মোটর সাইকেল, সুসজ্জিত ট্যাবলো, বাণীসম্বলিত পোস্টার ও ব্যানার সহযোগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা করে দক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশে রওনা হয়। কলেজ স্ট্রীট ও মহাত্মা গান্ধী রোডের সংযোগস্থলে স্বামীজীর প্রতিকৃতিতে মাল্য এবং পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতিগুলির প্রতিনিধিরা। প্রবল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে শোভাযাত্রা এগিয়ে যায়। উদ্বোধন কার্যালয়ে সংক্ষিপ্ত বিরতির পর শোভাযাত্রা কাশীপুর রোড ধরে দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পক্ষ থেকে শোভাযাত্রাটিকে অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়। বিকালে যুবসমাবেশে প্রায় ১,০০০ বিবেকানন্দ-অনুরাগী অংশগ্রহণ করে। বক্তব্য রাখেন স্বামী অজরানন্দজী, স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী, আদ্যাপীঠ মন্দিরের ব্রহ্মচারিণী দুর্গাদেবী প্রমুখ। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন 'আদ্যাপীঠ মাতৃপূজা' পত্রিকার সম্পাদিকা ব্রহ্মচারিণী বেলাদেবী। স্বামীজীর শিকাগো-ভাষণ সংক্রান্ত প্রায় ৭,০০০ পুস্তিকা উপস্থিত সকলের মধ্যে বিতরণ করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী।

এদিন মেদিনীপুর জেলার সমন্বয় পরিষদের সদস্য-সংগঠকেরা রামতারকহাট-ভিতরআগড় গ্রামে সারাদিনব্যাপী এক সম্মেলনের আয়োজন করে। স্বামী সদ্গুণানন্দজী ও বিমল পাল প্রমুখ সুধীজন সম্মেলনে আলোচনা করেন।

বিবেকানন্দ কেন্দ্র, কলকাতা-৭০০ ০০৬ ঃ গত ১১ ও ১৫ সেপ্টেম্বর ভক্তিগীতি, স্বামীজীর জীবন ও বাণী নিয়ে গল্পকথা ও আলোচনার মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্ব দিবস উদ্‌যাপিত হয়। প্রথমদিনের অনুষ্ঠানে ১০০ বালক-বালিকা ও ২৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা যোগদান করেন। দ্বিতীয়দিনের অনুষ্ঠানে ৩০০ ছাত্রী ও ২০ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা করেন প্রদীপ জয়সওয়াল, কৃষ্ণা সিং, শিবাজী ঘোষ প্রমুখ।

যাদবপুর নিবেদিতা নারী সঙ্ঘ, কলকাতা-৭০০ ০৩২ ঃ গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০১ ভক্তিগীতি, প্রশ্নোত্তরপর্ব, পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে একটি যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বাঘাযতীন পাবলিক হল-এ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন রেবতীভূষণ মণ্ডল, পূর্ণিমা ঘোষ প্রমুখ। বিভিন্ন অধিবেশনে আলোচনা করেন স্বামী সর্বলোকানন্দজী, ডঃ ভূপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, ডঃ ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণাজী, পূর্বা সেনগুপ্ত প্রমুখ। প্রশ্নোত্তরপর্ব পরিচালনা ও আলোচনা করেন প্রণবেশ চক্রবর্তী। সম্মেলনে ২১২ জন যুবপ্রতিনিধি ও পরিদর্শক উপস্থিত ছিলেন।

পাণ্ডু বিবেকানন্দ পাঠচক্র, গুয়াহাটী, অসম ঃ গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০০১ স্বামীজীর অসম ভ্রমণের শতবর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষ্যে একটি জনসভার আয়োজন করা হয়। প্রদীপ জ্বেলে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন এবং ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডঃ প্রিয়াগুপ্রবাল উপাধ্যায়। বক্তব্য রাখেন স্বামী ঈশাত্মানন্দ, কটন কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ রামচরণ ঠাকুরীয়া ও ডঃ অরূপ হাজারিকা। স্বাগত-ভাষণ দান এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রমের সম্পাদক সত্যব্রত দাসশর্মা ও অধ্যাপক পরাগ দাশগুপ্ত। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন মহেশ বরুয়া, অশোক রায় প্রমুখ।

হামিরপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, রাউরকেলা, ওড়িশা ঃ গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০১ সারাদিনব্যাপী এক ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন এবং আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। 'কথামৃত', 'মায়ের কথা' এবং 'বাণী ও রচনা' থেকে পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন গোপেন চক্রবর্তী, সঞ্চিতা সরকার, বীণাপানি পাণিগ্রাহী প্রমুখ। সম্মেলনে ২০০ ভক্ত যোগদান করেন।

নিমপীঠ ভক্তগোষ্ঠী (জয়নগর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা) স্থানীয় নিমপীঠ আশ্রমের সহযোগিতায় গত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০১ আশ্রমের কমিউনিটি হল-এ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে একটি স্মৃতিসভার আয়োজন করা হয়। সভাটি দুটি অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়। উভয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্বামী আত্মপ্রভানন্দজী। 'কথামৃত প্রসঙ্গ' পাঠ এবং স্মৃতিচারণ করেন স্বামী ভুবনেশ্বরানন্দজী। আলোচনা করেন স্বামী পূর্ণব্রহ্মানন্দজী এবং স্বামী সদানন্দজী, স্বামী কল্যাণানন্দজী, পবিত্রমোহন সরদার প্রমুখ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন হেনা ব্যানার্জী, রাজীব মণ্ডল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০০ ভক্ত নরনারী যোগদান করেন।

সেবাব্রত

ইড়পালা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, মেদিনীপুর : গত ৫ আগস্ট ২০০১ ঘাটাল হাসপাতাল ব্লাডব্যাঙ্কের সহযোগিতায় একটি রক্তদান শিবির পরিচালিত হয়। শিবিরে ৪১ জন যুবক-যুবতী রক্তদান করেছিল।

বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত চলমান পাঠচক্র, উত্তর চব্বিশ পরগনা : গত ১১ আগস্ট ২০০১ বসিরহাট রবীন্দ্রভবনে 'মেধা-স্বীকৃতি' হিসাবে ছাত্রদের মানপত্র দেওয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে ভজন, কীর্তন ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা করেন আমেরিকার হলিউড কেন্দ্রের স্বামী সর্বদেবানন্দজী এবং ব্যারব্যারা পাইনা। পাঠচক্রের অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে লিখিত পরীক্ষা, দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বেদান্ত বিষয়ক বই বিতরণ, বিবেকানন্দ মেধাবৃত্তি (মাসিক ৫০) প্রদান, দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র পরিচালনা অন্যতম। শিকড়াকুলীন স্বামী ব্রহ্মানন্দ আশ্রম এই পাঠচক্রের সঙ্গে যৌথভাবে বসিরহাটে স্বামীজীর ব্রোঞ্জমূর্তি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন।

ভাঙ্গড় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা : গত ১২ আগস্ট ২০০১ একটি চক্ষুচিকিৎসা-শিবির আয়োজিত হয়। শিবিরে ১২৫ জনের চোখে চিকিৎসা করা হয়। উল্লেখ্য, এই আশ্রমে গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০০১ আরেকটি চক্ষুচিকিৎসা-শিবিরে ১০০ জনের চোখে চিকিৎসা করা হয়।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ভূপেন্দ্রমোহন ঘোষ গত ২২ জুলাই ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বহু জনকল্যাণ সমিতির সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি বিবেকানন্দ সমবায় বেত ও বাঁশ কারুশিল্প সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, পশ্চিম রাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের রূপকার এবং দক্ষিণ কলকাতা বিবেকানন্দ শতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতির মুখ্য সংগঠক ছিলেন। এছাড়া রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অনেক প্রবীণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য উমাপদ দে গত ২৫ জুলাই ২০০১ পরলোকগমন করেন। তিনি কৈলাসহর রামকৃষ্ণ আশ্রমের (উত্তর ত্রিপুরা) পরিচালন সমিতির সদস্য ছিলেন। সহজ-সরল ব্যবহারের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজের ভ্রাতুষ্পুত্র সীতেশরঞ্জন দত্ত গত ১ আগস্ট ২০০১ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ভারত সরকারের (আলিপুর, কলকাতা) 'মাস্টার অফ মিন্ট' ছিলেন। অবসর-গ্রহণান্তে তিনি ১৯৮৫ সাল থেকে আমৃত্যু কনখল রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে একনিষ্ঠভাবে স্বেচ্ছাসেবা দান করেছেন। প্রেমিক স্বভাবের জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য চারুচন্দ্র সিংহ গত ৯ আগস্ট ২০০১ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তিনি 'উদ্বোধন'-এর একজন আগ্রহী গ্রাহক ও পাঠক ছিলেন এবং দক্ষিণ দিল্লিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শ প্রচারে আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের কৃপাধন্য, খুলনা-নিবাসী বনমালী দত্ত গত ১৩ আগস্ট ২০০১ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। তাঁর তৃতীয় পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য অক্ষয়কুমার কোলে গত ১৫ আগস্ট ২০০১ নিজ বাসভবনে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের বহুবিধ সেবামূলক কাজে যুক্ত ছিলেন এবং কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান মঠে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এছাড়া তিনি শ্রীশ্রীমায়ের সেবিকা গৌরীমায়ের স্নেহধন্য ছিলেন। তাঁর মাতা সরোজবাসিনী কোলে ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্যা।

শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য শচীন্দ্রমোহন দাশ গত ২৯ আগস্ট ২০০১ ডিব্রুগড়ের নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ডিব্রুগড় আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা-সেবায় আজীবন ব্রতী ছিলেন।

এক বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর জীবনাবসান

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিক্ষাব্রতী অধ্যাপক নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় গত ১৭ অক্টোবর ২০০১ দুপুরে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি বঙ্গবাসী কলেজের বাঙলার বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। তাঁর জীবনের সিংহভাগ সময়ই কেটেছে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যচর্চায়। 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চ', 'সমাজ ও সাহিত্যচিন্তায় বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা', 'প্রযোজক শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রভৃতি গবেষণালব্ধ গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন তিনি এবং মেরি লুই বার্কের 'স্বামী বিবেকানন্দ ইন দ্য ওয়েস্ট' গ্রন্থের অনুবাদও তিনি করেছেন। এছাড়া উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত 'বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থের তিনি ছিলেন অন্যতম সম্পাদক।

'উদ্বোধন'-এর এক বিশিষ্ট স্বেচ্ছাসেবীর জীবনাবসান

'উদ্বোধন'-এর একনিষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবী অকৃতদার দেবপ্রসাদ পাল গত ১ নভেম্বর ২০০১ রাত সাড়ে আটটায় কলকাতার আর. জি. কর হাসপাতালে প্রয়াণ করেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। চাকরিজীবনে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিসের ওয়ারলেস বিভাগের কর্মী ছিলেন। ১৯৮৬ সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর তিনি 'উদ্বোধন'-এ স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগদান করেন এবং আমৃত্যু একনিষ্ঠভাবে স্বেচ্ছাসেবা দান করে গেছেন।

গত ১১ অক্টোবর তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে আর. জি. কর হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ওষুধ প্রয়োগে সামান্য উন্নতি হলেও হঠাৎই গত ১ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। তাঁর প্রয়াণে 'উদ্বোধন' পত্রিকা বিভাগ এক একনিষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবীকে হারাল। ❑

নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের ওপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

❋

হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

❋

মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে, তার বিকাশই ধর্ম।

স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments From :

UTILITY INDUSTRIES & CHEMICAL WORKS

19Y, Raja Manindra Road, Kolkata-700037
Phone : 556-5543/6459

&

A S I M C O

22, Amalangsu Sen Road, Kolkata-700048
Phone : 556-5351/5543

Manufacturers of Phenyle. I.S.I., Lysol. I.P., Soaps, Antiseptic Lotions & Purified Water. I.P.

Dealers in all sorts of Medicines, Pharmaceuticals & Laboratory Chemicals.

RAMAKRISHNA SEVASHRAM

(Estd. 1963)
Swami Sankarananda Road
Bamunmura, P.O. Badu
Dist. : 24 Parganas (North)-743202
Phone : 552-3044

'স্বামী শঙ্করানন্দের গল্পকথা' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এই বইখানি পড়িয়া আমরা বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথমাবস্থার অনেক কথাই জানিতে পারি। আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনেও আমরা এই বইখানি পড়িয়া অনেক সাহায্য পাইব।

প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বামুনমুড়া, পোঃ বাদু
জেলা ঃ উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ঃ ৭৪৩২০২
২। রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম, বেলুড় মঠ
৩। উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩
৪। অদ্বৈত আশ্রম, ৫ ডিহি এন্টালী রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৪
৫। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার
গোলপার্ক, কলকাতা-৭০০ ০২৯



সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন

সহৃদয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ অর্থানুকূল্যে আমাদের ভগ্নপ্রায় স্কুলগৃহটি পুনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি।

১।	১০ জন দুস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ	ঃ	১,২০,০০০ টাকা
২।	দুস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
৩।	পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
৪।	আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প	ঃ	১০,০০,০০০ টাকা
৫।	একখানা অ্যাম্বুল্যান্স (Ambulance)	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
			২৬,২০,০০০ টাকা

A/c Payee চেক/ড্রাফট 'Ramakrishna Mission Ashrama, Ramharipur'—এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফট পাঠাবার ঠিকানা—সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা—বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ ঃ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি

স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া

"MOVING TO THE NEXT MILLENNIUM

Indian Oil People ... towards Excellence ..."



IndianOil

Indian Oil Corporation Limited
(Marketing Division)

INDIANOIL BHAVAN
2, GARIAHAT ROAD (SOUTH)
DHAKURIA
KOLKATA-700 068



রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দির

খেতড়ি, রাজস্থান, জেলা—ঝুনঝুনু, পিন-৩৩৩৫০৩ • এস.টি.ডি.—০১৫৯, ফোন নং—৭৩৩৪৩১২

একটি আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দির, খেতড়ি ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দের কাছে সুপরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দ বিভিন্ন সময়ে তিনবার এখানে এসেছিলেন। রাজা অজিত সিং তাঁর প্রিয় শিষ্য ছিলেন। এখান থেকেই স্বামীজী ১০ মে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো ধর্মমহাসভার উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন।

খেতড়ির শেষ রাজা সর্দার সিং এই বাড়িটি রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করেন। স্বামীজীর স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়ি প্রায় দেড়শ বছরের পুরনো। আয়তন প্রায় ৬০,০০০ বর্গফুটের মতো। বহু মেরামতের প্রয়োজন এই বাড়ির।

এই আশ্রমে শিশুদের জন্য একটি স্কুল, সাধারণের জন্য একটি লাইব্রেরি, একটি মেটারনিটি হোম, একটি হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় ও মেয়েদের জন্য পাঁচটি সেলাই শিক্ষণকেন্দ্র আছে। বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে গরিবদের সাহায্য ও ত্রাণকাজ করা হয়।

এই মহান কাজের জন্য সকল মানুষের কাছে, অনুরাগী ও ভক্তবৃন্দের কাছে আর্থিক সহযোগিতার জন্য আবেদন জানাই। পঞ্চাশ হাজার টাকা ও তার বেশি দান দিলে ফলক লাগানোর ব্যবস্থা থাকবে। বিদেশের দান গ্রহণ করা হয়।

যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী আয়করমুক্ত। চেক বা ড্রাফটে টাকা পাঠালে **'Ramakrishna Mission, Khetri'**—এই নামে পাঠাবেন।

আমাদের আর্থিক প্রয়োজন ঃ

স্মৃতিমন্দির মেরামতের জন্য	২০ লাখ টাকা
দাতব্য চিকিৎসার জন্য (স্থায়ী তহবিল)	১০ লাখ টাকা
সারদা শিশুবিহারের জন্য (স্থায়ী তহবিল)	১০ লাখ টাকা
সেলাই শিক্ষণকেন্দ্রগুলির জন্য (স্থায়ী তহবিল)	৫ লাখ টাকা

বিনীত
স্বামী মুক্তাত্মানন্দ
সম্পাদক

সেরা ফলন দেদার লাভ

লালন সুপার ফসফেট সার



প্রস্তুতকারক ঃ

সারদা ফার্টিলাইজার্স লিঃ
২, ক্লাইভঘাট স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০১

ফোন নং
অফিস ঃ ২২০-৫৪৩৫
রেসি. ঃ ৩৩৭-৭৩৬৫
মোবাইল ঃ ৯৮৩১০-১৯২৬৬

ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, সে কোথায় পড়ে আছে তা দেখেন না। 'ভাবগ্রাহী জনার্দন'।

শ্রীরামকৃষ্ণ

With Best Compliments From :

MODERN GUINEA HOUSE PRIVATE LIMITED

A JEWEL OF JEWELLERS



GOLD, DIAMOND, STONE MERCHANT

208, BIPIN BEHARI GANGULY STREET
(BOW BAZAR) KOLKATA-700 012
Phone : 241-6281/8203

Shop Remain Closed :
Sunday Full & Monday Upto 1.30 p.m.

With Best Compliments From :

DOBSON DISTRIBUTORS

88, DR. ABANI DUTTA ROAD
HOWRAH-711 101
PHONE : 666-1722
TELEFAX : 666-9969

Stockist

Serum Institute, Tablets India Ltd., Wallace Pharmaceuticals Ltd., Eli Lilly Ranbaxy, Pharmacia & Upjohn, Orchid, Caplet, Smith Kline Beecham (Vaccine), Sunny Industries Pvt. Ltd., Midas Care, Arvind (S.K.K.L. Ltd.), Neon Laboratories, Mayer, Trio Pharma

শ্রীম-কথিত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ১৫০.০০

(অখণ্ড দিনানুক্রমিক সংস্করণ)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত এক অবতারপুরুষের জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রকাশ। স্বয়মপ্রকাশ সূর্যের মতো শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি নিজেই নিজের প্রমাণ, নিজের আলোকে সেই পুণ্যকথা দীপ্যমান।

তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ "শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তিগুলি আসলে বেদ ও উপনিষদের জীবন্ত ভাষ্য।"

নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ও রেণুকা চট্টোপাধ্যায়ের

শ্রীশ্রীমা সারদা ৩৬.০০

(কালানুক্রমিক জীবনী ও কথামৃত)

"শ্রীরামকৃষ্ণের যদি কিছু অবদান থাকে, সে সবই শ্রীশ্রীমায়েরও অবদান। আমরা বলি, মা আর ঠাকুর আলাদা নন। ঠাকুর বলতে মা, মা বলতে ঠাকুর।"

স্বামী ভূতেশানন্দ

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিঃ
২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

With Best Compliments From :

DIAMOND METAL PRODUCTS

Mfg. All Types of Aluminium Pilfer Proof Caps

APOLO ELECTRIC BULB PVT. LTD.

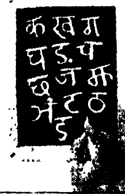
27B/H/13/1, Chaulpatty Road
Kolkata-700010
Tele. : (O) 350-3901/353-1445
Fax : 350-6297

Mfg. G.L.S. Lamps & Night Lamps



Everyday, Tata Tea helps bring fingers together.

The difference is either a fresh new day. Or a fresh new life.



Tata Tea runs 280 adult literacy centres. 160 child care centres. 26 Hospitals. Schemes like Project Dare in the High Range of Munnar to take care of the educational needs of mentally handicapped children. Schools to educate workers' children. Wildlife protection foundations and sanctuaries. Yes, the name Tata Tea means more than a giant tea company. For thousands across the country it means life.



TATA TEA TATA

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

কুক্‌মী
গুঁড়ো মশলা
কলকাতা

শ্রীশ্রী সারদামায়ের

মন্ত্রশিষ্য

ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য

প্রণীত

স্মৃতিমূলক জীবনীগ্রন্থ

- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
- শ্রীশ্রী সারদাদেবী
- স্বামী সারদানন্দের জীবনী
- শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ
- ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা
- প্রেমানন্দ-প্রেমকথা
- জীবন পরিক্রমা



আমাদের প্রকাশিত আরও বিভিন্ন

স্মৃতিমূলক জীবনীগ্রন্থ

বিশ্বনাথ দে

- রবীন্দ্রস্মৃতি

ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত

- বিবেকানন্দ স্মৃতি
- বঙ্কিম স্মৃতি
- রামমোহন স্মৃতি
- মধুসূদন স্মৃতি
- বিদ্যাসাগর স্মৃতি
- নজরুল স্মৃতি
- শরৎ স্মৃতি
- মা টেরেসা
- বায়রণ
- শেলী

শ্রী মোহিত কুমার বসাক

- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্মৃতি
- অরবিন্দ স্মৃতি
- নিবেদিতা স্মৃতি
- কিশোর শহীদ স্মৃতি
- সুভাষ স্মৃতি

সুবোধ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

- সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন
- *The Early life of Netaji*

সমর গুহ

- নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা
- *Netaji Dead or Alive*



ক্যালকাটা বুক হাউস

১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

☎ ২৪১-০৯৬৫ / ৯৪০৪

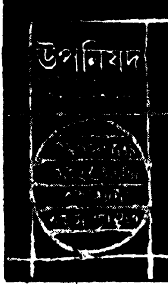
আনন্দ পাবলিশার্সের বিনম্র নিবেদন

ধর্ম ও পুণ্যপ্রসঙ্গ

তারাপদ ভট্টাচার্য
শাশ্বতী কথা
১০০.০০

তারাপদ মুখোপাধ্যায়
নিজ প্রিয় স্থান আমার মথুরা বৃন্দাবন ২৫.০০





দুলেন্দ্র ভৌমিক
জগন্নাথ কাহিনী
৫০.০০

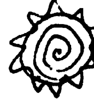
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
চৈতন্যচর্চার পাঁচশো বছর
৩০.০০

ভগীরথ বন্ধু
চৈতন্য সঙ্গীতা
২০.০০

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ
উপনিষদ ২০০.০০



সুকুমার সেন
চৈতন্যাবদান
১২.০০







সুকুমার সেন ও তারাপদ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.)
চৈতন্য চরিতামৃত
১২০.০০

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শক্তিরঙ্গ বঙ্গভূমি
৫০.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
ফোন : ২৪১-৪৩৫২, ২৪১-৩৪১৭
E-mail : ananda@cal3.vsnl.net.in

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির

ফোন ঃ ৪৭৪-২৩৩৫

৪, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো
কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত

শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহের বহু প্রশংসিত পুস্তকাবলী

গীতাতত্ত্বে শ্রীরামকৃষ্ণ	৮০
পূর্ণতার সাধন	১৬
ভগবৎ প্রসঙ্গ	২৪
গল্পে ভগবৎ প্রসঙ্গ	২৪
শরণাগতের আদর্শ ও সাধনা	৩০
ঈশ্বর-সান্নিধ্য বোধের সাধনা	৮

শ্রীহরিশ্চন্দ্র সিংহের জন্মশতবার্ষিকী গ্রন্থ ঃ
প্রেমিক পুরুষ ১৫
অন্যান্য বই ঃ স্তোত্রমালিকা ৪

✤ প্রাপ্তিস্থান ✤

সারদাপীঠ (বেলুড় মঠ), উদ্বোধন,
রত্না বুক হাউস, মহেশ লাইব্রেরী,
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোলপার্ক)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

শ্রীম-কথিত

পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত ঃ প্রতি সেট ঃ ২২৪ টাকা
[কেবল রেক্সিন বাঁধাই পাওয়া যায়]

শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী প্রমুখ ঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী শিষ্যরা এবং কথামৃতকার শ্রীম নিজেও এই মহাগ্রন্থটি যেমনটি দেখিয়া গিয়াছেন এবং রাখিয়া গিয়াছেন (খণ্ড খণ্ড হিসাবে পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এবং দিনলিপি অনুসারে না সাজাইয়া) ঠিক তেমনটিই সংরক্ষণ করার পুণ্য দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর হইয়া আছেন 'কথামৃতের' আশি বছরেরও অধিক প্রাচীন প্রকাশক শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী (কথামৃত ভবন)। ফলে এই মহাগ্রন্থের Originality এবং সুমহান ঐতিহাসিক পবিত্র ঐতিহ্য সম্পূর্ণভাবে বহাল রহিয়াছে এই পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত 'কথামৃতে'।

প্রকাশক ঃ শ্রীম-র ঠাকুরবাড়ী
(কথামৃত ভবন)
১৩।২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৬
ফোন ঃ ৩৫০-১৭৫১

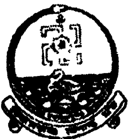
শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-প্রকাশিত বাঙলা গ্রন্থরাজি

স্বামী অভেদানন্দ প্রণীত

স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)	১০০.০০	মানুষের দিব্যস্বরূপ	২৫.০০
স্বামী অভেদানন্দ রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)	১০০.০০	মুক্তির উপায়	১৫.০০
আত্মজ্ঞান	২২.০০	যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব	৫.০০
আত্মবিকাশ	২০.০০	যুগে যুগে যাঁদের আগমন	২৮.০০
আমার জীবনকথা (২ খণ্ডে)	১২৫.০০	যোগদর্শন ও যোগসাধনা	৫০.০০
ঈশ্বরদর্শনের উপায়	৩৫.০০	যোগশিক্ষা	৪০.০০
কর্মবিজ্ঞান	১০.০০	শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম	২০.০০
তরুণ বাংলার আদর্শ	৫.০০	সর্বজনীন ধর্ম ও বেদান্ত	৩০.০০
দেবী দুর্গা	৬.০০	সাংখ্য, বৌদ্ধ ও বেদান্তদর্শন	৩০.০০
পত্র-সংকলন	১৬.০০	স্বামী বিবেকানন্দ	২.০০
পঞ্চদশী-দর্শনের পরিচয়	৫.০০	স্তোত্ররত্নাকর ও শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজাপদ্ধতি	১২.০০
পুনর্জন্মবাদ	৩০.০০	হিন্দুনারী	১২.০০
বিংশ-শতাব্দীর ধর্ম	৫.০০	হিন্দুরা যীশুখ্রীস্টের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু গীর্জার ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ কেন?	৫.০০
ভালবাসা ও ভগবৎপ্রেম	২০.০০	বেদান্ত দর্শন	১০.০০
ভারত ও তাহার সংস্কৃতি	৩০.০০	খ্রীস্টীয় বিজ্ঞান এবং বেদান্ত	৫.০০
মরণের পারে	৫০.০০		
মনের বিচিত্র রূপ	১২.০০		

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রণীত

অধ্যাত্মসাধনায় দেবতা ও দেবীভাবনা	৪.০০	ভারতীয়-সঙ্গীত—ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক রূপরেখা	৩৪.০০
অভেদানন্দ-দর্শন (২ খণ্ডে)	১৪০.০০	মন ও মানুষ (৩ খণ্ডে)	১৫৮.০০
কঠোপনিষদে পরমার্থতত্ত্ব	১৮.০০	মহিষাসুরমর্দ্দিনী-দুর্গা	৩০০.০০
তীর্থরেণু	২৬.০০	মন্ত্রভাবনা ও সঙ্গীত	১৪.০০
তন্ত্রে তত্ত্ব ও সাধনা	৪০.০০	রবীন্দ্রসাহিত্যে ধর্মচেতনা	২০.০০
তন্ত্রতত্ত্বপ্রবেশিকা	৬০.০০	রাগ ও রূপ (২ খণ্ডে)	২২০.০০
নাট্যসঙ্গীতের রূপায়ণ	৪৫.০০	সঙ্গীতপ্রতিভায় স্বামী বিবেকানন্দ	৮.০০
পদাবলী-কীর্তনের ইতিহাস	৩৫.০০	সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান	৫০.০০
বাণী ও বিচার (৮ খণ্ডে)	৪০০.০০	সঙ্গীতে সাহিত্য, রসভাবনা ও সুন্দর	২৫০.০০
বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তায় মন্ত্রতত্ত্ব ও মন্ত্রসাধনা	২০.০০	স্বামী অভেদানন্দ	৫.০০
ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (৩ খণ্ডে)	২২০.০০	স্বামী অভেদানন্দের জীবন ও দর্শন	৩৬.০০
শ্রীরামকৃষ্ণচন্দ্রিকা	৪০.০০		



শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ

(পুস্তক প্রচার বিভাগ)

১৯এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৬

ওরিয়েন্টের পুনঃপ্রকাশিত বই

- ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
  বাংলার বাউল ও বাউল গান ৮০০
- প্রমদারঞ্জন ঘোষ
  শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা ও জীবন-দর্শন ৮০
- রত্নমণি চট্টোপাধ্যায়
  আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা ৮০

ওরিয়েন্টের প্রকাশিত বই

- ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
  রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ২৭৫
  রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা ১৬০
- ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
  ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস ৮০
  বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (আদি ও মধ্যযুগ) ১০০
  বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (আধুনিক যুগ) ৯০
  রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা, ১ম খণ্ড ১০০
  রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা, ২য় খণ্ড ২০০
- ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত
  সাহিত্যের স্বরূপ ১৫
  বাংলা সাহিত্যের একদিক ৬০
  বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি ৪০
- প্রমথনাথ বিশী
  রবীন্দ্র-নাট্য-প্রবাহ ১২৫
- ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল
  রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা ২০
- ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
  নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ২০
- অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী
  ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ৭৫
- সম্পাদনা ঃ ডঃ অরুণকুমার বসু
  মেঘনাদবধ কাব্য—
  মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১ম-৪র্থ সর্গ)
  একেই কি বলে সভ্যতা—
  মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৩০
- সম্পাদনা ঃ পবিত্র সরকার
  জনা ৪০
- সম্পাদনা ঃ প্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
  পালামৌ—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৩০
  চরিতকথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৩৫
- ডঃ অমিয়কুমার সামন্ত
  প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর ১০০
- রোমাঁ রোলাঁ
  রামকৃষ্ণের জীবন ৫০
  বিবেকানন্দের জীবন ৫০
  রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ ২৫

সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি

৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

AN OPPORTUNITY FOR YOU TO SAVE A LIFE!



BLOOD

AN UNIQUE GIFT OF GOD
SAVIOUR OF LIFE—WHEN IT IS PURE
KILLER—WHEN IT IS CONTAMINATED

BLOOD CANNOT BE MADE IN LABORATORIES. IT HAS NO SYNTHETIC ALTERNATIVE. WHEN LIFE DEPENDS ON AVAILABILITY OF BLOOD, IT IS ONLY YOU WHO CAN SAVE ANOTHER HUMAN BEING.

ALL WE NEED IS THE WILL TO HELP

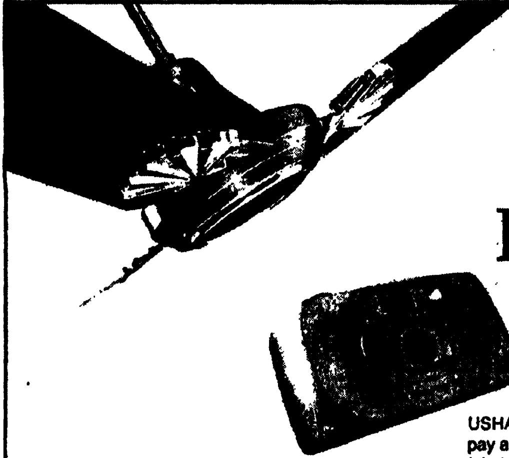
- DONATE YOUR HEALTHY BLOOD
- INSIST ON AND RECEIVE PURE, PRE-SCREENED BLOOD
- LET US ALL JOIN HANDS TO START A MOVEMENT FOR PURE AND SAFE BLOOD

DONATE BLOOD AND SAVE A LIFE

Issued in public interest by :



Infar (India) Limited
7 Wood Street
Kolkata-700 016



USHA

The undisputed leader in fans.

Imported, focus free camera

With every fan *

USHA brings you a really sensational offer. Just by an USHA fan, pay an additional Rs.40/* and you'll find yourself the owner of a fabulous camera! Hurry! Offer available for a limited period only.

*Conditions apply. Offer not valid on Racer series and Excella ceiling fan. Fans also available without this offer.

USHA INTERNATIONAL LTD It's a better life.

ganguly™

7 Rabindra Sarani, Kolkata 700 001. Phone 225 4192, 225 4490

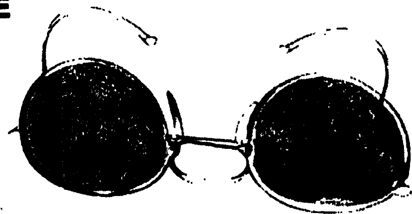
WORLD CLASS

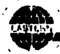
With an Indian Point-of-view

EASTERN THE SILK PEOPLE

A PREMIER GOLDEN TRADING HOUSE

- Resourceful
- Dynamic
- State-of-the-art Technologies
- Superb Teamwork





ESI LIMITED

Wonders of India – In every fold!

Corporate Office :
19, R. N. Mukherjee Road, Kolkata 700 001 (India)
Ph : 243-0817 (5 lines), 248-8620 Fax : (91) (033) 248 2486, 475 8590
Telex : 021-4569 SILK IN E-mail : eslikvsnl.com
Website : www.esilindia.com

Delhi Office :
A-66, Naraina Industrial Area, Phase-I, New Delhi 110 028 (India)
Phone : 5791541 (4 lines) Fax : (91) (011) 579 0525, 579 6822
E-mail : esidelhinda.vsnl.net.in

DISTINCTIVE ▶ EXQUISITE ▶ UNIQUE

WONDERFUL PRODUCTS FROM kemikox

CONSUMER PRODUCTS

KEMITOL - Toilet Cleaner
KLINZ FRESH - White Deodorant-cum-Cleaner
OASH - Liquid Hand Soap
BUD BUD - Detergent Powder

INDUSTRIAL PRODUCTS

RUSTCON - Rust Converter
(Derusting and rust preventive compound)
VAANIS - Paint Remover
RUSTOFF 100 - Rust Remover
KEMIRAD-S - Descaleing Agent

WE HAVE SOME OTHER INDUSTRIAL & DOMESTIC CLEANING PRODUCTS TOO

সুগন্ধী মোমবাতী **AROMA** এবং ধুনো-ধূপ **ARATI** আমাদের দুটি অনবদ্য উৎপাদন

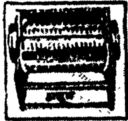
DISTRIBUTORS and DEALERS WANTED

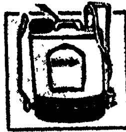
KEMIKOX FORMULATORS PVT. LTD.

SSI Unit, Regd. with NSIC, RAILWAYS and DGS&D
P.B. No.: 2673, G. P. O, Kolkata-700 001
Telephone No.: 91 33 4426240, Fax No.: 91 33 4428044
E-mail: kemikox@vsnl.net, Website: www.kemikox.com

ডীলারের সুবিধার্থে—অভাবনীয় কম দামে

সকলপ্রকার স্প্রেয়ার, থ্রেসার, প্যাডি উইডার ও উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য জেলাভিত্তিক ডীলার ও স্টকিস্ট চাই


ধান ঝাড়াই মেসিন


স্প্রেয়ার


প্যাডি উইডার

সারদা ইন্ডাষ্ট্রীজ

৩৬নং স্ট্র্যান্ড রোড, ২য় তল, রুম নং—১৫
কলকাতা-৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন: ২৪৩-৩১৪১

কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ এক কামড়েই বাজিমাৎ

ঋষি পাঁপড়

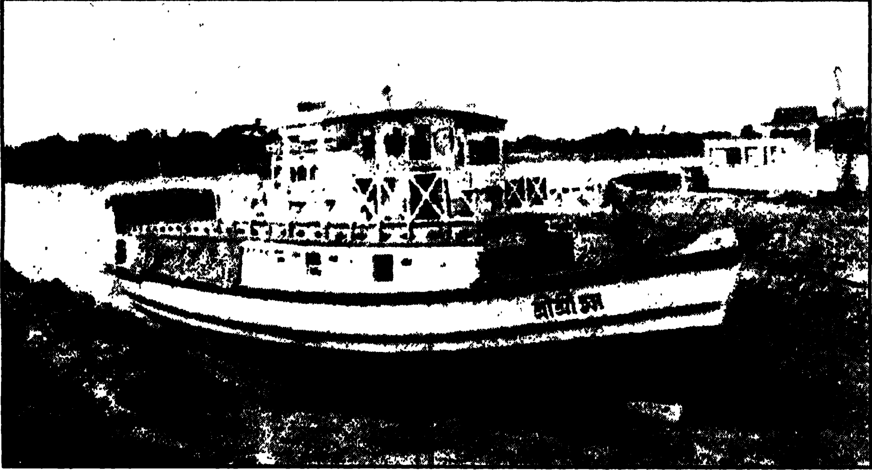


শ্রীযুত শ্রীমধু নির্মাতার তৈরী

একটি বিশেষ আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশন সমাজ সেবক শিক্ষণ মন্দির, বেলুড় মঠ-এর প্রাক্তন ছাত্রদের দ্বারা সংগঠিত **সার্বিক বিবেকানন্দ গ্রাম সেবা সংস্থা, বেলুড় মঠ, হাওড়া** গত আট বছর ধরে স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশিত পথে মূলত নিম্নলিখিত দুটি বিশেষ প্রয়োজনীয় ধারায় সমাজসেবামূলক কর্মসূচী রূপায়ণে নিযুক্ত আছে।

একটি ধারায়—দুর্গম, লোনা জলবেষ্টিত ও মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন সুন্দরবন অঞ্চলের চরম দুর্দশাগ্রস্ত গ্রামবাসীদের সুলভ স্বাস্থ্য-পরিষেবা প্রদানের জন্য চালু করা হয়েছে আমাদের স্বাস্থ্য-পরিষেবা কর্মসূচী—লঞ্চবাহিত ভাসমান চিকিৎসালয়ের মাধ্যমে। তৎসহ রাখা হয়েছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা মাসে মাসে বিশেষ চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা। এছাড়া বর্তমানে বছরে একবার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হয় বিনাব্যয়ে চক্ষু অপারেশন শিবির। স্বাস্থ্য-পরিষেবার অঙ্গ হিসাবে রূপায়িত হয়ে চলেছে সুলভ বিজ্ঞানসম্মত শৌচাগার স্থাপনের ব্যাপক কর্মসূচী।



সংস্থার অপর কর্মধারাটি ভয়াবহ বেকার সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টায় তৎপর। এই ধারাটিতে জীবিকাভিত্তিক কারিগরি প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী রূপায়িত হয়ে চলেছে।

উল্লেখ্য, আমাদের এই সংস্থা একটি অব্যবসায়ী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ও দাতাগণের মুক্তহস্ত দানই এর সকল কর্মসূচী রূপায়ণের মূলভিত্তি।

সহৃদয় দাতাগণের কাছে আমাদের বিশেষ আবেদন এই যে, আপনাদের দান-সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদের এই সেবামূলক কর্মসূচীকে আরো বিস্তৃত ও সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে সাহায্য করুন।

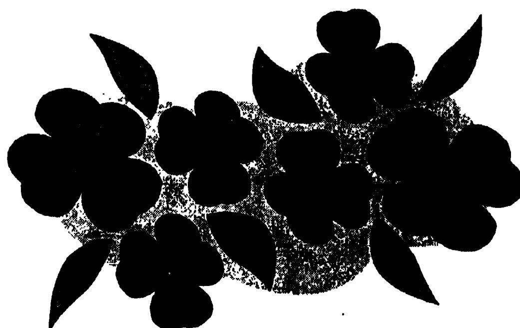
মানি অর্ডার, ব্যাঙ্ক ড্রাফট অথবা চেক এই নামে পাঠাতে হবে—**'সার্বিক বিবেকানন্দ গ্রাম সেবা সংস্থা' (SARVIK VIVEKANANDA GRAM SEVA SANSTHA) ১৮/২, লালাবাবু সায়র রোড, বেলুড় মঠ, হাওড়া। ফোন এবং ফ্যাক্স ঃ ৬৫৪-২৩২৮।**

আপনাদের প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারানুসারে করমুক্ত।



All the secret of success is there : to pay as much attention to the means as to the end.

Swami Vivekananda



With Best Compliments From

DATTA FOOTWEAR INDUSTRIES PVT. LTD.

Regd. Office & Factory :

1, BIDHAN SARANI, KOLKATA-700 073

PHONE : 241-5248 ❑ FAX : (033) 241-7541

Unit-II

180, EAST SINTHI ROAD, KOLKATA-700 030

PHONE : 548-4500



জেলাভিত্তিক 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ৬

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

পশ্চিমবঙ্গ

বর্ধমান

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**, আসানসোল-৭১৩৩০১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, শ্যামসায়র (পূর্ব)**
  বর্ধমান-৭১৩১০১
- **নরহরি পুস্তকালয়**
  ৮১ বি. সি. রোড, বর্ধমান-৭১৩১০১
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম**
  রামমোহন অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৪
- **আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়**
  ডি/২০, গ্রীসম স্ট্রীট, বিধাননগর, দুর্গাপুর-৭১৩২১২
- **স্বামী বিবেকানন্দ বাণীপ্রচার সমিতি**
  বিদ্যাসাগর অ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫
- **নিমানন্দ নায়ক**, ৬৩ কবিগুরু সরণি
  সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, ফোন ঃ ৫৬৮৮২৩
- **সাধুডাঙ্গা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  ডি. ভি. সি. কলোনী, দুর্গাপুর-৭১৩২০১
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সোসাইটি**
  এ. বি. এল. টাউনশিপ, দুর্গাপুর-৭১৩২০৬
- **গুসকরা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কালচারাল সেন্টার**
  পিন-৭১৩১২৮
- **অঞ্জনকুমার পাল**
  প্রযত্নে বিবেকানন্দ পাঠচক্র
  কুমোরপাড়া (নারায়ণ ভবন), কাটোয়া-৭১৩১৩০
- **শীতল ব্যানার্জী**
  প্রযত্নে শ্রীখণ্ড রামকৃষ্ণ সিসৃক্ষা সমিতি, শ্রীখণ্ড-৭১৩১৫০
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  আমলাদহি, চিত্তরঞ্জন-৭১৩৩৩১
- **পানাগড় রামকৃষ্ণ আশ্রম**
  দার্জিলিং মোড়, পানাগড় বাজার-৭১৩১৪৮
- **স্বামী অসীমানন্দ, সম্পাদক**
  শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবামৃত সঙ্ঘ সেবাশ্রম
  গ্রাম—বুদবুদ, পোঃ বুদবুদ-৭১৩৪০৩, ফোন ঃ ৫১২৬৫০
- **রানীগঞ্জ বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র**
  ৫৫/১ ভীমাচরণ রোড, কুমার বাজার
  রানীগঞ্জ, পিন ঃ ৭১৩৩৪৭
- **শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পাঠচক্র** (মহীতোষ সামন্ত)
  বাঁকোলা এরিয়া কমপ্লেক্স, পোঃ উখড়া, পিন-৭১৩৩৬৩

উত্তরবঙ্গ

- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**
  জলপাইগুড়ি-৭৩৫১০১
- **রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**
  মালদা-৭৩২১০১
- **বালুরঘাট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম**
  রামকৃষ্ণ টিম্বার ডিপো
  নিউ মার্কেট, বালুরঘাট
  দক্ষিণ দিনাজপুর-৭৩৩১০১
- **স্বপনকুমার আইচ**
  প্রযত্নে তুফানগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম
  বিধানপল্লী, তুফানগঞ্জ
  কুচবিহার-৭৩৬১৬০
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, কুচবিহার**
  অজয়কুমার গাঙ্গুলী
  রাজবাড়ি গভঃ হাউসিং, ব্লক সি-১/৯
  কুচবিহার-৭৩৬১০১, ফোন ঃ ২৮৬৮৮

বিপণন-কেন্দ্র ঃ কলকাতা-হাওড়া

- **শ্যামবাজার বুক স্টল**
  ২২০, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৪
- **পাতিরাম বুক স্টল**
  কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
- **অদ্বৈত আশ্রম স্টল**
  শিয়ালদহ স্টেশন, ৩নং প্ল্যাটফর্ম
- **অদ্বৈত আশ্রম স্টল**
  হাওড়া স্টেশন (মেন এবং নিউ কমপ্লেক্স)
- **রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ শো-রুম**
  বেলুড় মঠ
- **সর্বোদয় বুক স্টল**
  হাওড়া রেলস্টেশন

সৌজন্যে

স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯

দি বেদান্ত কেশরী

(সফল জীবনযাপনের লক্ষ্যে এক বাস্তবমুখী গাইড)

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা অনুপ্রাণিত একদল নিষ্ঠাবান ও উদ্যমী ভক্ত ১৯১৪ সালে **'দি বেদান্ত কেশরী'** নামে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের যে ইংরেজী মাসিক পত্রিকাটি চালু করেন, সেটি আজ প্রায় নয় দশক ধরে আমাদের মাতৃভূমির সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে। এই পত্রিকায় থাকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে **মূল্যবোধভিত্তিক প্রবন্ধ** (যেগুলির বেশির ভাগই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের দ্বারা লিখিত)ঃ সর্বাঙ্গীণ জীবনযাপন ❑ পারিবারিক মূল্যবোধসমূহ ❑ যুবশক্তির বিকাশ ও ব্যবহার ❑ আধ্যাত্মিকতা ❑ সংস্কৃতি ❑ বিজ্ঞান ❑ সাংগঠনিক মূল্যবোধ বিপ্লব ❑ ব্যক্তিত্ব বিকাশ ❑ দর্শন ❑ অন্যান্য।

ঐতিহ্যপূর্ণ বাঙলা মুখপত্র **'উদ্বোধন'**-এর পাঠকবর্গ **'দি বেদান্ত কেশরী'** পাঠ করেও আনন্দলাভ করবেন। অনুগ্রহ করে আপনি নিজে **'দি বেদান্ত কেশরী'**র **গ্রাহক হয়ে** এবং আপনার বন্ধুদের **গ্রাহক করিয়ে** সেবাকার্যে অংশগ্রহণ করুন।

গ্রাহকমূল্যঃ **ভারত—বার্ষিক ৬০ টাকা,** প্রতি সংখ্যা (জানুয়ারি থেকে নভেম্বর) ৬ টাকা, বিশেষ সংখ্যা (ডিসেম্বর) ৫০ টাকা, ৩ বছর ১৭০ টাকা, ৫ বছর ২৭৫ টাকা, আজীবন ৬০০ টাকা। **বিদেশে—** বার্ষিক US$20, আজীবন US$300।

• ONLINE-এ পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়, আপনার Master বা VISA কার্ড ব্যবহার করে। অনুগ্রহ করে আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন এই ঠিকানায়ঃ www.sriramakrishnamath.org।

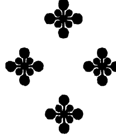
ধন্যবাদান্তে,

দয়া করে এই ঠিকানায় লিখুনঃ
Manager, **The Vedanta Kesari**
Sri Ramakrishna Math
Mylapore, Chennai-600 004

আপনাদের সেবায়
স্বামী জ্ঞানদানন্দ
ম্যানেজার

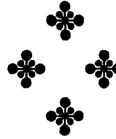
রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে যায়। অবতারেরাও সেইরকম সহস্র সহস্র লোকেদের ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ



মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার দিকে এগোতে চায় না। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আন্তরিক খুব যত্ন ও রোখ চাই।

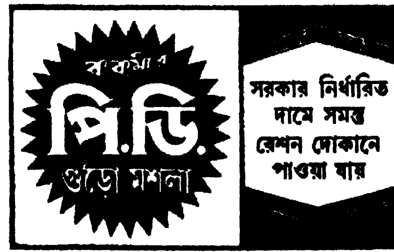
শ্রীমা সারদাদেবী



যে-দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয়, সে-দেশ ক্রমশ ধর্মহীন হইয়া দাঁড়ায়। ভারতে কখনো এরূপ চেষ্টা হয় নাই। সেইজন্য এখানে প্রকৃত ধর্মভাব এখনো জাগ্রত।

স্বামী বিবেকানন্দ





UDBODHAN
Phone : 554-2248, 554-2403
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com

Vol. 103
No. 11
NOVEMBER
2001

Licensed to Post
Without Prepayment
Licence No.
TECH/WB/RNP-15/LPWP-01/2001

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Regn. No.
TECH/WB/RNP-15/2001

উদ্বোধন

১০৩তম বর্ষ

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র, ১০২ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্ন ও নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র



❑ গত ১লা মাঘ ১৪০৭ (১৫ জানুয়ারি ২০০১) **উদ্বোধন ১০৩তম বর্ষে** পদার্পণ করেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় **নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশের গৌরব** নিয়ে কোন সাময়িকপত্রের **১০২ বছর ধরে প্রকাশ এই প্রথম** ❑

- ❑ **বাঙলায় সর্বাধিক প্রচারিত মাসিক পত্রিকা উদ্বোধন** একটি ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র মাত্র নয়, **উদ্বোধন** ভারতবর্ষের প্রাচীন ও আধুনিক মহান ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। **ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের** সঙ্গে এবং **রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ও রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের** সঙ্গে সংযুক্ত ও পরিচিত হতে হলে **স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত** রামকৃষ্ণ **সঙ্ঘের** একমাত্র বাঙলা মুখপত্র **উদ্বোধন** আপনাকে পড়তে হবে।
- ❑ স্বামী বিবেকানন্দের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে **উদ্বোধন** নিছক একটি ধর্মীয় পত্রিকা নয়, সর্ব অর্থেই **উদ্বোধন** একটি সার্থক **পারিবারিক পত্রিকা**। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, লোকসংস্কৃতি, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিল্প-সহ জ্ঞান ও কৃষ্টির নানা বিষয়ে গবেষণামূলক ও ইতিবাচক আলোচনা **উদ্বোধন**-এ প্রকাশিত হয়।
- ❑ **উদ্বোধন** শুধু **বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপত্রিকা নয়, উদ্বোধন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণ পত্রিকা এবং বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ পারিবারিক পত্রিকা।**
- ❑ ধর্মীয় সংগঠনের মুখপত্র হয়েও **উদ্বোধন** তার মহান প্রবর্তকের নির্দেশ অনুসারে **কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় আদর্শের মুখপত্র নয়। উদ্বোধন** তার **সর্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক চরিত্র বিগত ১০২ বছর** ধরে অটুট রেখেছে।
- ❑ **উদ্বোধন**-এর গ্রাহক হওয়ার অর্থ একটি পত্রিকার **গ্রাহক** হওয়া নয়, একটি **মহান ভাবাদর্শ ও ভাবান্দোলনের** সঙ্গে যুক্ত হওয়া।
- ❑ **উদ্বোধন** একটি পত্রিকা মাত্র নয়, **উদ্বোধন শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদাদেবী** এবং **স্বামী বিবেকানন্দের ভাব ও বাণী-শরীর।**
- ❑ **স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রত্যেক বাঙালীর ঘরে উদ্বোধন যেন থাকে। উদ্বোধন-এর প্রত্যেক গ্রাহক একজন করে গ্রাহক করলেই** এখনি **উদ্বোধন-এর গ্রাহকসংখ্যা এক লক্ষ কুড়ি হাজার** হয়ে যায়। তাই আপনার **নিজের গ্রাহক হওয়াই যথেষ্ট নয়,** অন্যদের গ্রাহক করাও আপনার কাছে **স্বামীজীর প্রত্যাশা।** স্বামীজীর সেই প্রত্যাশা পূরণের **গর্বিত দায়িত্ব আমাদের সকলের।** অবশ্য **ইন্টারনেট সংস্করণের** মাধ্যমে **উদ্বোধন আজ ভারত ও বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর ঘরে ঘরে** পৌঁছে গিয়েছে।
- ❑ **স্বামীজী বলেছেন, উদ্বোধন-এর সেবা ঠাকুরেরই সেবা।** সেকথা স্মরণ করে রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে অনুরাগী ও ভক্তগণ **উদ্বোধন**-এর প্রতি নিশ্চয়ই তাঁদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।
- ❑ **উদ্বোধন-এর শারদীয়া** সংখ্যাটির জন্য **গ্রাহকদের** থেকে **আলাদা মূল্য নেওয়া হয় না।** এই সংখ্যাটি গ্রাহকদের জন্য আমাদের **শারদ উপহার।** প্রসঙ্গত সকলের অবগতির জন্য জানাই যে, **শারদীয় সংখ্যাটি** আকারে সাধারণ সংখ্যার **তিনগুণ** এবং **বিশেষ সংখ্যা** হওয়ায় অলঙ্করণের জন্য খরচও হয় যথেষ্ট। গত **কয়েক মাসে কাগজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং অন্যান্য ব্যয়বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শারদীয়া** সংখ্যা সহ গ্রাহক-**পিছু আমাদের বার্ষিক খরচ দাঁড়িয়েছে মুদ্রিত গ্রাহকমূল্যের সওয়া তিন গুণ।** বিশাল অঙ্কের এই অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহের জন্য আমরা নির্ভর করি সহৃদয় বিজ্ঞাপনদাতাদের সক্রিয় সহযোগিতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের আর্থিক বদান্যতার ওপর।
- ❑ **পত্রিকা প্রকাশ সংক্রান্ত ব্যয় প্রতি** বছর বেড়ে গেলেও **তিন বছর (১৯৯৯, ২০০০ এবং ২০০১) 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত** রাখা হয়েছে। **এত সুলভ মূল্যে এমন সম্পূর্ণ পত্রিকা বাঙলা ভাষায় আর একটিও নেই।**
- ❑ **উদ্বোধন**-এর সেবায় তিনটি স্থায়ী তহবিল গঠন করা হয়েছে। একটি **'উদ্বোধন স্থায়ী তহবিল'**. অন্য দুটি যথাক্রমে **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** এবং **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'। উদ্বোধন-এর জন্য সকল আর্থিক দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুসারে আয়করমুক্ত। আর্থিক দান চেকে বা ব্যাঙ্ক ড্রাফটে পাঠালে অনুগ্রহ করে 'Ramakrishna Math, Baghbazar'**—এই নামে পাঠাবেন। **ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩।** দাতার চিঠিতে বা M.O. কুপনে **'উদ্বোধন পত্রিকার সেবায়'** অথবা **'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতি তহবিল'** অথবা **'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মৃতি তহবিল'**-এর জন্য যেন লেখা থাকে।
- ❑ **উদ্বোধন-এর শতাব্দী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে** মতিলাল-তরুবালা পালের স্মৃতিতে তাঁদের পুত্রকন্যাদের পক্ষে **স্থায়ী ভিত্তিতে 'উদ্বোধন মেধা সম্মান' (একবছরের জন্য উদ্বোধন-এর সাম্মানিক গ্রাহকভুক্তি)** নিবেদিত হয়েছে। **পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জন প্রতি বছর এই সম্মানের** যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। **২০০১ সালের জন্য** অনুরূপ **সম্মান** সুকুমার-বিভারানী পাড়ুই-এর স্মৃতিতে তাঁদের পুত্র অমর পাড়ুই নিবেদন করেছেন। এই **সম্মানপ্রাপকদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক পর্ষদ পরিচালিত ২০০০ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ২০ জনকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। উভয় 'সম্মান'-এর জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বোধন-সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ** করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বামী সর্বগানন্দ
সম্পাদক

সৌজন্যে

পি. বি. সরকার অ্যান্ড সন্স

(কোন ব্রাঞ্চ নেই)

জুয়েলার্স

সন অ্যান্ড গ্র্যান্ড সন্স অব লেট বি. সরকার

৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০ ❑ ফোন ঃ ২২৩-৮৭১৩, ২২৩-৭৫৭৮

ব্যবস্থাপক সম্পাদক ঃ স্বামী সত্যব্রতানন্দ
সম্পাদক ঃ স্বামী সর্বগানন্দ





"পিঁপড়ের মত সংসারে থাক, এই সংসারে নিত্য
অনিত্য মিশিয়ে রয়েছে। বালিতে চিনিতে
মিশান—পিঁপড়ে হয়ে চিনিটুকু নেবে।
জলে দুধে একসঙ্গে রয়েছে। চিদানন্দ রস আর
বিষয় রস। হংসের মত দুধটুকু নিয়ে জলটি ত্যাগ
করবে।
আর পানকৌটির মত, গায়ে জল লাগছে, ঝেড়ে
ফেলবে। আর পাঁকাল মাছের মত।
পাঁকে থাকে
কিন্তু গা দেখ পরিষ্কার উজ্জ্বল।
গোলমালে মাল আছে—গোল ছেড়ে মালটি
নেবে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ

আনন্দবাজার পত্রিকা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১

আপনার শিশুকে দেওয়ার মতো সেরা উপহার - ভবিষ্যতের সুরক্ষা।



শিশুদের জন্যে এলআইসি'র পলিসিসমূহ

আপনার শিশুকে এমন একটা উপহার দিন যেটা সারাজীবনের জন্যে হবে স্নেহভরা প্রতিপালন। আপনার শিশুকে সঠিক সময়ে উপযুক্ত ধরণের সহায়তা প্রদান করতে শিশুদের জন্যে আমাদের যেকোনও পলিসি থেকে একটা বেছে নিন।

প্ল্যান	সারণী নং	শিশুর বয়স (বছর)	ন্যূনতম সঞ্চয় পরিমাণ	প্রিমিয়াম প্রদেয়র অন্তরকাল
চিলড্রেন্স ডেফার্ড এনডোউমেন্ট (লাভ সহিত)	41 50	0 - 17 0 - 14	20,000/-	বার্ষিক, ষান্মাষিক, ত্রৈমাসিক, মাসিক
জীবন বাল্য (লাভ সহিত)	101	0 - 17	25,000/-	- ঐ -
জীবন কিশোর (লাভ সহিত)	102	1 - 12	20,000/-	- ঐ -
জীবন সুকন্যা (কেবলমাত্র শিশুকন্যার জন্যে) (লাভ সহিত)	109	1 - 12	20,000/-	- ঐ -
মানি ব্যাক চিলড্রেন্স অ্যাসুরেন্স প্ল্যান (লাভ রহিত)	113	0 - 10	40,000/-	বার্ষিক, ষান্মাসিক, ত্রৈমাসিক, এসএসএস
বাল বিদ্যা (লাভ রহিত)	135	0 - 12	25,000/-	একক প্রিমিয়াম

অধিক বিবরণের জন্যে, আপনার নিকটবর্তী এল আই সি শাখাতে বা এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।



লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া
Please visit : www.licindia.com

Insurance is the subject matter of the solicitation



রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ

পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা—হাওড়া-৭১১ ২০২ ● ফোন ঃ ৬৫৪-৬০৮০/৫৮৯২ ● বৈদ্যুতিন ডাক ঃ rmsppp@vsnl.com

সারদাপীঠ থেকে প্রকাশিত অডিও ক্যাসেটসমূহ

মূল্য ❑ SP-1 ও SP-31–34 ঃ ৩৫ টাকা, অন্যান্য ঃ ৩০ টাকা

SP-1	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্	সংস্কৃত ও বাঙলা
SP2, SP-7, SP-8, SP-10–12	কথামৃতের গান (১ম হইতে ৬ষ্ঠ খণ্ড)	বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি
SP-3	শ্রীরামনামসংকীর্তন	সংস্কৃত ও হিন্দি
SP-4	বক্তৃতা—যুগপুরুষ	বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত
SP-5	শ্রীশ্রীচণ্ডীস্তব (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ)	বাঙলা, সংস্কৃত
SP-6	শিবমহিমা	বাঙলা, সংস্কৃত ও হিন্দি
SP-9	শ্রীরামকৃষ্ণবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি
SP-13	শ্রীসারদাবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা
SP-20	বিবেকানন্দবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা
SP-24	শ্রীকৃষ্ণবন্দনা	সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দি
SP-14–16	কালীকীর্তন (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)	বাঙলা
SP-17	বীরবাণী	সংস্কৃত, বাঙলা, ইংরেজী ও হিন্দি
SP-18	গীতিবন্দনা	হিন্দি
SP-19	বক্তৃতা—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্দোলনে শ্রীশ্রীমায়ের অবদান	বাঙলা, শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ প্রদত্ত
SP-21–22	সংকীর্তনসংগ্রহ (১ম ও ২য় খণ্ড)	হিন্দি
SP-23	ওঠো জাগো	হিন্দি
SP-25	শ্রীরামকৃষ্ণ ভজনাঞ্জলি	হিন্দি
SP-26	বিবেকানন্দ ভজনাঞ্জলি	হিন্দি
SP-27	বেদমন্ত্র (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ)	সংস্কৃত উপনিষদের মন্ত্রসমূহ
SP-28	সরস্বতী বন্দনা	বাঙলা, সংস্কৃত
SP-29 &	**Ramakrishna Movement**	Lecture by Swami Bhuteshanandaji Maharaj, The 12th President, Belur Math
SP-30	**Religion in Practice**	do
SP-31–34	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (আবৃত্তি ঃ স্বামী সর্বগানন্দ) (১ম হইতে চতুর্থ খণ্ড)	মূল সংস্কৃত এবং প্রতি অধ্যায়ের মুখবন্ধ
SP-35	আগমনী	বাঙলা
SP-36	ভজন সুধা	হিন্দি

কম্প্যাক্ট ডিস্ক / মূল্য প্রতিটি ১৫০ টাকা

Cd/SP-1	শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিকম্	(সান্ধ্য আরাত্রিক ভজন, গুরুবন্দনা, শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমা সারদাদেবী-স্বামী বিবেকানন্দ স্তোত্র, রামকৃষ্ণ শরণম্)
Cd/SP-3	শ্রীরামনামসঙ্কীর্তন	রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিটি কেন্দ্রে একাদশী প্রভৃতি দিনে গাওয়া হয় (সংস্কৃত ও হিন্দি)
Cd/SP-31–34	শ্রীমদ্ভগদ্গীতা (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ভাগ)	(সংস্কৃত) (সুরে আবৃত্তি ১ম—১৮শ অধ্যায়)

স্বামী সর্বগানন্দ, স্বামী নরেন্দ্রানন্দ, স্বামী দিব্যব্রতানন্দ, শ্রীমহেশরঞ্জন সোম, শ্রীঅনুপ জালোটা ও অন্যান্য দক্ষ শিল্পিগণ প্রচলিত ও নতুন সুরে গেয়েছেন।

প্রাপ্তিস্থান ঃ বেলুড় মঠ, সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের শো-রুম এবং মেলোডি (কালীঘাট), মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট), সেঞ্চুরী বোর্ডস (গোলপার্ক)

ডাকযোগে ক্যাসেট পেতে হলে M.O. অথবা Bank draft মারফত ক্যাসেটের মূল্য রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের নামে অগ্রিম পাঠাতে হবে।

Video Cassette : Centenary Celebration of the Ramakrishna Mission at Belur Math in 1998. Duration—80 minutes Rs. 250.00

AN OPPORTUNITY FOR YOU TO SAVE A LIFE!

BLOOD

AN UNIQUE GIFT OF GOD
SAVIOUR OF LIFE—WHEN IT IS PURE
KILLER—WHEN IT IS CONTAMINATED

BLOOD CANNOT BE MADE IN LABORATORIES. IT HAS NO SYNTHETIC ALTERNATIVE. WHEN LIFE DEPENDS ON AVAILABILITY OF BLOOD, IT IS ONLY YOU WHO CAN SAVE ANOTHER HUMAN BEING.

ALL WE NEED IS THE WILL TO HELP

- DONATE YOUR HEALTHY BLOOD
- INSIST ON AND RECEIVE PURE, PRE-SCREENED BLOOD
- LET US ALL JOIN HANDS TO START A MOVEMENT FOR PURE AND SAFE BLOOD

DONATE BLOOD
AND
SAVE A LIFE

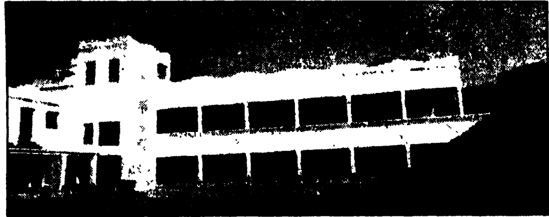
Issued in public interest by :



Infar (India) Limited, 7 Wood Street, Kolkata-700 016



সহৃদয় জনসাধারণের প্রতি আবেদন



সহৃদয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ অর্থানুকূল্যে আমাদের ভগ্নপ্রায় স্কুলগৃহটি পুনর্নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই সুযোগে সবাইকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভগবান তাঁদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ করুন।

আপনারা দয়া করে এখানে এসে নতুন সাজে সজ্জিত স্কুলবাড়ি তথা সমগ্র আশ্রমটি দেখে যান, এই অনুরোধ জানাই।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত গ্রামে অবস্থিত এই আশ্রমটি নানা ধরনের কাজে ব্যাপৃত রয়েছে। নিম্নে প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী আরো কিছু টাকা আশ্রমটির দরকার। এজন্য আপনাদের কাছে আবার আবেদন জানাচ্ছি।

১।	১০ জন দুঃস্থ ও অনগ্রসর জাতিভুক্ত ছাত্রদের ভরণপোষণ	ঃ	১,২০,০০০ টাকা
২।	দুঃস্থ গ্রামবাসীদের বিভিন্ন স্বরোজগার প্রকল্পের জন্য প্রশিক্ষণ	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
৩।	পুরনো ছাত্রাবাসের সংস্কার	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
৪।	আশ্রমের প্রাচীরের আংশিক নির্মাণ প্রকল্প	ঃ	১০,০০,০০০ টাকা
৫।	একখানা অ্যাম্বুল্যান্স (Ambulance)	ঃ	৫,০০,০০০ টাকা
			২৬,২০,০০০ টাকা

A/c Payee চেক/ড্রাফট **'Ramakrishna Mission Ashrama, Ramharipur'**—এই নামে পাঠাবেন। টাকা/চেক/ড্রাফট পাঠাবার ঠিকানা—সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, পোঃ রামহরিপুর, জেলা—বাঁকুড়া, পিন-৭২২২০৩, দূরভাষ ঃ এস. টি. ডি. ০৩২৪১, টেলিফোন নং ৫৯২৩৫। রামকৃষ্ণ মিশনে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী করমুক্ত। ইতি

স্বামী তত্ত্বস্থানন্দ
সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম
রামহরিপুর, জেলা ঃ বাঁকুড়া



শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম

পোঃ কালাডি, জেলা ঃ এর্ণাকুলাম, কেরালা, পিন ঃ ৬৮৩৫৭৪
দূরভাষ ঃ (০৪৮৪) ৪৬২৩৪৫/৪৬১০৭১ এবং ৪৬৩১৪১ (বিদ্যালয়)
ই. মেল ঃ srka-adv@eth.net এবং srka-adv@netkracker.com

সেবাব্রতের আহ্বান

একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

বন্ধু এবং শুভার্থিগণ,

আপনারা নিশ্চয়ই অবহিত আছেন যে, ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে যথার্থ মানবচরিত্র গঠনের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিগণের ভাবধারার বিকাশ ঘটিয়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সমগ্র বিশ্বব্যাপী প্রেম ও শ্রদ্ধা, গ্রহণ ও সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে এক নব্য সমাজধারা প্রবর্তন করে যে ব্যাপক আন্দোলনের সূচনা করেছে, তার অন্তর্নিহিত সার্বজনীনতা, আধুনিকতা এবং সমন্বয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আজ এই আন্দোলন একটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ভাবরূপে স্বীকৃতিলাভ করেছে।



শিক্ষার মাধ্যমে এই মানবিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শগুলিকে মানুষের কাছে অতি সহজে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে রামকৃষ্ণ মিশন এজাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। গত ৬৫ বছরব্যাপী শিক্ষা, সংস্কৃতি এবং জনহিতকর নানা কাজে মূল্যবান অবদানের জন্য **কেরালা প্রদেশের কালাডিতে** অবস্থিত **রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্রটি**র, বোধকরি, আজ আর নতুন করে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। আদি শঙ্করাচার্যের পবিত্র জন্মস্থানে অবস্থিত এই শাখাকেন্দ্রটি বর্তমান পরিকাঠামোর মধ্যেই একটি নতুন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

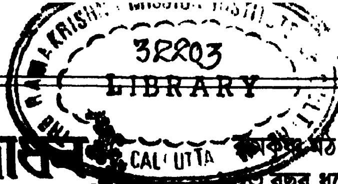
অতএব, আমরা সমাজসচেতন এবং লোকহিতকর সকল বন্ধু, সাহায্যকারী এবং শুভার্থিগণের কাছে এই মহৎ কাজের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাতে বাধ্য হচ্ছি। এককালীন, মাসিক ভিত্তিতে অথবা 'স্পনসর' রূপে যেকোন আর্থিক সাহায্য সরাসরি আশ্রমের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। এই সাহায্য সকলের মধ্যে এক সুসম্পর্ক গড়ে তুলবে এবং এই মহৎ কাজে যৌথ উদ্যোগের অংশীদার হতে পারার জন্য সমাজের কাছে সকলে ধন্যবাদার্হ হবেন, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই।

আনুমানিক ব্যয়ের তালিকা

(১)	উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য নতুন বাড়ি নির্মাণ	৭৫ লক্ষ টাকা
(২)	পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানের জন্য পরীক্ষাগার নির্মাণ	১৫ লক্ষ টাকা
(৩)	অফিস এবং শ্রেণীকক্ষের জন্য আসবাবপত্র ইত্যাদি	৫ লক্ষ টাকা
(৪)	লাইব্রেরির জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি	৫ লক্ষ টাকা
(৫)	বিদ্যালয়ের কাজের জন্য একটি গাড়ি ক্রয়	৫ লক্ষ টাকা
	মোট	**১০৫ লক্ষ টাকা**

সকল দান ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।
আপনার আন্তরিক সাহায্য প্রার্থনা করি।

আপনাদের শ্রীরামকৃষ্ণের
স্বামী পুরন্দরানন্দ
অধ্যক্ষ



উদ্বোধন ॥১০৩॥

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
১০৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

সূচীপত্র

১০৩তম বর্ষ ১২শ সংখ্যা পৌষ ১৪০৮ ডিসেম্বর ২০০১

প্রচ্ছদ ❑ ওপরে কৈলাস, নিচে মানস সরোবর। মানস সরোবরে সন্তরণরত হংসযুগল—লোকবিশ্বাসে, হর-পার্বতী।

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ



সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।
ডি. টি. পি.-তে অক্ষরবিন্যাস ও পৃষ্ঠা অলঙ্করণ : সম্পাদকীয় বিভাগ, 'উদ্বোধন'
প্রচ্ছদ ❑ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিঃ ❑ আলোকচিত্র : বেলুড় মঠের জনৈক সন্ন্যাসী
বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ❑ ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ : ৬৫ টাকা; সডাক : ৭৫ টাকা ❑ আলাদাভাবে কিনলে মূল্য : ৮ টাকা ❑ আজীবন গ্রাহকমূল্য (৩০ বছর পর নবীকরণ-সাপেক্ষ) : ৩০০০ টাকা [একবছরের মধ্যে পরিশোধ্য কমপক্ষে ৫০০ টাকা প্রতি কিস্তি হিসাবে ৬টি কিস্তিতেও প্রদেয়]



জরুরী বিজ্ঞপ্তি

স্বামী বিবেকানন্দের আকাঙ্ক্ষা ছিল—বাঙালীর ঘরে ঘরে 'উদ্বোধন'কে পৌঁছে দেওয়া চাই। একটি সম্পূর্ণ পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে 'উদ্বোধন' বাঙালী সংস্কৃতিচেতনায় আজ স্থান করে নিয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার হাতে 'উদ্বোধন'-এর মাধ্যমেই পূজা গ্রহণ করুন—এই প্রার্থনা।

'উদ্বোধন' ঃ গ্রাহকভুক্তি, নবীকরণ ❑ ১০৪তম বর্ষ

২০০২ খ্রীস্টাব্দ ● ১৪০৮-১৪০৯ বঙ্গাব্দ

নবীকরণ ঃ **২০০২ (মাঘ ১৪০৮—পৌষ ১৪০৯) সালের জন্য আপনি নবীকরণ করেছেন কি? না করে থাকলে অবিলম্বে করে নিন।**

গ্রাহকভুক্তি ঃ বিগত তিন বছর আমরা গ্রাহকমূল্য অপরিবর্তিত রাখতে পেরেছি, কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও আগামী বছর (জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০২ খ্রীস্টাব্দ) থেকে 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকমূল্য সামান্য বৃদ্ধি করতেই হচ্ছে। এজন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৭৫ টাকা এবং ডাকযোগে নিলে ৯৫ টাকা। বাংলাদেশ ভিন্ন বিদেশের অন্যত্র ঃ ৮০০ টাকা (বিমানডাক) ✦ ৪০০ টাকা (সমুদ্রডাক)। বাংলাদেশ ১৮০ টাকা।

৩ বছরের জন্য এবং আজীবন গ্রাহকভুক্তি ঃ ডাকমাশুল হঠাৎ হঠাৎ বেড়ে যায়। তাই তিন বছরের জন্য যাঁরা গ্রাহক হতে চান তাঁরা ৩০০ টাকা এবং আজীবন (৩০ বছরের জন্য) গ্রাহকভুক্তির জন্য ৩০০০ টাকা (এক বা ন্যূনতম ছয় কিস্তিতে এক বছরের মধ্যে প্রদেয়—প্রতি কিস্তি ৫০০ টাকা হিসাবে) পাঠাবেন।

M.O./ড্রাফট ইত্যাদি ঃ M.O. অথবা A/c Payee Bank Draft বা Postal Order **"Udbodhan Office"**—এই নামে পাঠাতে পারেন। **নিজের গ্রাহকসংখ্যা, পুরো নাম, ঠিকানা, পিনকোড** ও ফোন নম্বর উল্লেখ করবেন। পত্রোত্তর পাওয়ার জন্য Self-addressed পোস্টকার্ড বা খাম পাঠাবেন। নতুন গ্রাহক হলে **'নতুন গ্রাহক হতে চাই'** খামের ওপর লিখে দেবেন।

চেক গ্রাহ্য হয় না। প্রবাসী কেউ গ্রাহক হলে বিদেশের চেক (ভারতীয় মুদ্রায় বা ডলারে) গ্রাহ্য হতে পারে।

M.O. করলে টাকা কখনো কখনো পৌঁছায় না বা দু-তিন মাস লেগে যায়। তাই যথাসম্ভব হাতে হাতে টাকা জমা দিয়ে অবিলম্বে গ্রাহকভুক্তি বা নবীকরণ করাই সুবিধাজনক।

❑ কার্যালয় খোলা থাকে ঃ বেলা ৯.৩০—৫.৩০; শনিবার বেলা ১.৩০ পর্যন্ত; রবিবার বন্ধ।

❑ যোগাযোগের ঠিকানা ঃ সম্পাদক/Editor, 'উদ্বোধন', উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩
ফোন ঃ ৫৫৪-২২৪৮, ৫৫৪-২৪০৩ ● e-mail : udbodhan@vsnl.net, udbodhan@vsnl.com

সৌজন্যে ঃ আর. এম. ইন্ডাস্ট্রিস, কাঁটালিয়া, হাওড়া-৭১১৪০৯

উদ্বোধন ॥১০৩॥

পৌষ ১৪০৮

ডিসেম্বর ২০০১

দিব্য বাণী



শ্রীসারদাধ্যানম্

ধ্যায়েচ্চিত্তসরোজস্থাং সুখাসীনাং কৃপাময়ীম্।
প্রসন্নবদনাং দেবীং দ্বিভুজাং স্থিরলোচনাম্।।

আলুলায়িতকেশার্ধবক্ষঃস্থলবিমণ্ডিতাম্।
শ্বেতবস্ত্রাবৃতার্ধাঙ্গাং হেমালঙ্কারভূষিতাম্।।

স্বক্রোড়ন্যস্তহস্তাঞ্চ জ্ঞানভক্তিপ্রদায়িনীম্।
শুভ্রাং জ্যোতির্ময়ীং জীবপাপসন্তাপহারিণীম্।।

রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং তন্নামশ্রবণপ্রিয়াম্।
তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং জগন্মাতৃস্বরূপিণীম্।।

জানকীরাধিকারূপধারিণীং সর্বমঙ্গলাম্।
চিন্ময়ীং বরদাং নিত্যাং সারদাং মোক্ষদায়িনীম্।।

সারদাদেবীর ধ্যান

চিত্তসরোজে (হৃৎপদ্মে) সুখাসনে অবস্থিত মায়ের কৃপাপূর্ণ মূর্তি ধ্যান কর। কেমন সেই মূর্তি? প্রসন্নবদনা। দ্বিভুজা। মনুষ্যোচিত। স্থিরলোচনা অর্থাৎ ধ্যানস্থা।

তাঁর আলুলায়িত কেশের দ্বারা বক্ষঃস্থল আবরিত। তিনি শ্বেতবস্ত্রপরিহিতা, স্বর্ণালঙ্কারে (হাতের স্বর্ণবলয়) বিভূষিতা।

নিজ অঙ্কে তাঁর হাতদুটি স্থাপিত। তিনি জ্ঞানভক্তি-প্রদায়িনী। শুভ্র জ্যোতির্ময়ী তাঁর রূপ। জীবের পাপ-সন্তাপ হরণকারিণী।

তিনি রামকৃষ্ণগতপ্রাণা। শুধু রামকৃষ্ণ-নাম শুনতেই ভালবাসেন। রামকৃষ্ণভাবে তিনি সদাভাবিতা, রঞ্জিতা। তিনিই আবার জগতের মাতৃস্বরূপিণী।

অতীতে তিনি জানকী-রাধিকা রূপে ধরায় অবতীর্ণা হয়েছিলেন। তিনি সর্বমঙ্গলা। স্বরূপত তিনি চিন্ময়ী। বরদা। নিত্যা। সারদা-সরস্বতী। মুক্তিবিধাত্রী।

মাতৃসান্নিধ্যবোধ

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শুভ জন্মতিথি সমাগতপ্রায়। তাঁহার দিব্যলীলার স্মরণে মননে ভক্তহৃদয়ে আনন্দের প্রতিকাশ ঘটিয়া থাকে। অধিকন্তু উহা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রীতিসাধকও বটে। শ্রীশ্রীমায়ের চরিতানুধ্যানে শ্রীশ্রীমা অপেক্ষা শ্রীশ্রীঠাকুর অধিক প্রীত হইয়া থাকেন। কারণ, শ্রীশ্রীমা ছিলেন 'শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণা, তত্ত্বাবরঞ্জিতাকারা'। শাস্ত্রমুখে শ্রীভগবান বলিয়াছেন, যে আমার ভক্তের ভক্ত, সে আমার প্রিয়তম। আমরা স্বীয় দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে শ্রীরামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিব, যে ঔজ্জ্বল্যে দেখিব, 'শ্রীশ্রীমা' অথবা 'স্বামী বিবেকানন্দ'-রূপ বীক্ষণযন্ত্রের মধ্য দিয়া দেখিলে ভিন্নতর রূপে, যথার্থরূপে, উজ্জ্বলতর রূপে দেখিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার কী কারণ? কারণ আর কিছুই নহে, আমাদিগের স্বার্থপূরিত, হিংসা, লোভ, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার-সম্পৃক্ত চিত্ত অস্বচ্ছ এবং মলিন অবস্থায় রহিয়াছে। তাই দৃষ্টিশক্তি দুর্বল। এই সংসারের নির্দিষ্ট কয়েকটি বস্তুর বাহিরে উহা ধাবিত হয় না; ঐ কয়টি বস্তু ও চিন্তার বৃত্তের মধ্যেই সর্বদা ঘুরপাক খাইতে থাকে। কাহারো বা ঐ বৃত্তের বাহিরে যাইবার সাধ আছে, কিন্তু সাধ্য নাই। কেহ বা ঐ বৃত্তকেই একমাত্র সত্য বলিয়া অনুভব করিয়া থাকে। আচার্য বা গুরু আসিয়া ঐ ক্ষুদ্র বৃত্তকে অতিক্রম করিবার পথ বলিয়া দিলেও পুনরায় ঐ বৃত্তের মধ্যেই ঘুরপাক খাইতে খাইতে জীব মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যুগে যুগে অবতারপুরুষ এবং আচার্যগণ আসিয়া মানুষের সম্মুখে অনন্তত্বের আভাস দিয়া গিয়াছেন, অমৃতত্বের দিঙ্‌নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। মূঢ় চিত্ত উহা দেখিয়াও দেখিতে পায় নাই। বারংবার এই সংসারবৃত্তে আসিয়া উহার ক্ষুদ্র আবহেই সে 'জীবন'-এর ব্যাখ্যা খুঁজিয়া চলিয়াছে। যতদিন দেহে প্রাণ আছে ততদিন এই জগৎ-সংসারেই সাধক বিরাজ করেন সত্য, কিন্তু স্থূলদেহে এই সংসারে থাকিয়াও সিদ্ধ সাধক স্বীয় চিন্তাতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে এই সংসারবৃত্তকে অতিক্রম করিয়া অসীমের স্পর্শলাভ করিয়া থাকেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথাটি অপূর্ব উপমায় বলিলেন—নৌকা জলে ভাসিবে, নৌকার ভিতরে জল থাকিবে না। মানুষ সংসারে থাকিবে, তাহার ভিতরে সংসার ঢুকিবে না।

যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন দুঃখ-ক্লিষ্ট মানুষকে মুক্তির পথ দেখাইবার জন্য। ঠাকুর বলিলেন ঃ "ও সারদা, সরস্বতী। জ্ঞান দিতে এসেছে।" এবং এই কথার জের টানিয়া মা কহিলেন ঃ "আমাকে ডেকো, তাহলেই হবে।" ঘটনাদুটি আপাতদৃষ্টিতে বহু বৎসর অন্তরে ঘটিয়া থাকিলেও অবতারলীলায় কোন দূরত্বই দূরত্ব নহে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ঘটনাসকল কিভাবে পরস্পরসম্বদ্ধ, তাহা অদূরদর্শী মন বুঝিতে অক্ষম বলিয়া ভুল বোঝাবুঝির সমূহ সম্ভাবনা থাকিয়া যায়। অবশ্য আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ে এখনো আমরা প্রবেশ করি নাই। তাহার পূর্বের গৌরচন্দ্রিকাটুকু শেষ হইল মাত্র। যে-কথাটি এখনো অনুক্ত রহিয়াছে এইবার তাহা খুলিয়া বলা ভাল।

'বোধ'-এর কোন বিকল্প নাই। বোধ নিরবচ্ছিন্ন, অর্থাৎ বোধের ইতিও নাই। সামান্য চিন্তা করিলেই বুঝা যায়, 'বোধ'-এর একটি অখণ্ড স্রোতোধারার উপর আমাদের জীবন প্রতিষ্ঠিত। নিদ্রার সময়ে একটি বোধ রহিয়াছে, জাগরণের সময়েও একটি 'আমি আছি'-রূপ অখণ্ড বোধ রহিয়াছে। নিদ্রা এবং জাগরণের মধ্যবর্তী সময়েও একটি বোধ রহিয়াছে বলিয়াই 'গতরাত্রের আমি এবং অদ্যকার আমি এক'—এইরূপ অনুভব হইতেছে। উপাধির বিভিন্নতায় বোধের বিভিন্নতা। ইহা বুঝা মোটেই শক্ত নহে। আহার করিবার কালে *আহারের বোধ* হয়। স্নান করিবার কালে বোধ হয়—*আমি স্নান করিতেছি*। স্নানের সময়ে আহারের বোধ হয় না। শীতের সময়ে গ্রীষ্মের বোধ হয় না। *শীতের বোধ* ও *গ্রীষ্মের বোধ* পৃথক। সত্যই পৃথক কিনা ইহাই বিবেচ্য। বস্তুত, উপাধির বিভিন্নতায় বোধের বিভিন্নতা। কাহারো প্রতি প্রচণ্ড *ক্রুদ্ধ হইলে* তাহার প্রতি *স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা-শ্রদ্ধার* বোধ থাকে না। *দন্তশূলের বোধ* একপ্রকার, *পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার বোধ* অন্যপ্রকার। নিন্দা ও প্রশংসা আমাদের নিকট এই কারণেই পৃথক বস্তু! নানান বিচিত্র বোধসম্ভার লইয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবন। বলিতে পারি, এই বোধ-ই জীবন। মাদকদ্রব্য সেবন করিয়া কিংবা অন্য উপায়ে মানুষ যদি বোধ-শক্তিহীন হইয়া পড়ে, তাহা মৃত্যুর নামান্তর বৈ তো নহে!

মাতৃসান্নিধ্যবোধ প্রসঙ্গে আসিতেছি। একটি সাধারণ উপমা দিব। পিতা-মাতা সন্তানকে একটি ছাত্রাবাসে রাখিয়া আসিয়াছেন। পূজাবকাশে সে ছাত্রাবাস হইতে বাড়িতে আসিয়াছে। যখন সে ছাত্রাবাসে ছিল, সেখানে

তাহার জননী কখনো কখনো আসিতেন। সে 'মা', 'মা' বলিয়া ছুটিয়া আসিত। দেখা করিয়া চলিয়া যাইবার সময়ে পুত্রের মনে পিতা-মাতার 'বিরহবোধ' জাগিয়া উঠিত। কিন্তু পূজাবকাশে স্বগৃহে ফিরিয়া কখন যে তাহার মনে *মায়ের সান্নিধ্যবোধ* জাগিয়াছে সে নিজেই জানে না। সে ইহাও জানে না, সঙ্গে সঙ্গে তাহার সেই বিরহবোধটুকুও কখন চলিয়া গিয়াছে। একথা সে সচেতনভাবে কখনো চিন্তা করে নাই, কেহ বলিয়া দিলে তাহার মনে পড়ে। ছাত্রাবাসে যেরূপ 'মা-নাই'—এই বোধটি স্বাভাবিক ছিল, স্বগৃহে সেইরূপ 'মা আছেন'—এই বোধটিই তাহার স্বাভাবিক।

জগজ্জননী শ্রীজগদম্বার ক্ষেত্রেও একই কথা। আমরা জগদম্বার 'বিরহবোধে' আসিঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি। কারণ, জয়রামবাটী গেলে মায়ের দর্শন পাইব অথবা উদ্বোধনে 'মায়ের বাড়ী' আসিলে মায়ের দর্শন পাইব, নতুবা নহে—এই বোধকে মায়ের 'বিরহবোধ' বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ উদ্বোধনে না গেলে মায়ের দর্শনলাভ হইতেছে না। অতএব বর্তমানে 'মায়ের অভাব' রহিয়াছে। 'মায়ের সান্নিধ্যবোধ' এখন হইতেছে না, উদ্বোধনে গেলে হইবে। এই সীমিত সান্নিধ্যবোধ কখন কিভাবে সীমাকে অতিক্রম করিয়া সর্বদা সর্বথা পরিব্যাপ্ত হইয়া অসীমায়িত হইবে—ইহাই আমাদিগের বর্তমান আলোচ্য বিষয়। অর্থাৎ ঐ অবস্থায় 'মা'-কে দেখিবার জন্য উদ্বোধনে মায়ের বাড়ীতে অথবা জয়রামবাটীতে মাতৃমন্দিরে কিংবা দক্ষিণেশ্বরে নহবতখানায় আর ছুটিতে হইবে না। মায়ের নিত্য সান্নিধ্যবোধে হৃদয় তখন পূর্ণ হইয়া রহিবে! কাহাকেও মনে করাইয়া দিতে হইবে না—'ওহে, তোমার মনের মাতৃবিরহ এখন ঘুচিয়াছে, তুমি নিত্য মাতৃসান্নিধ্য অনুভব করিতেছ।'

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন—

"এখন হইতে পূজাধ্যানকাল ভিন্ন অন্যসময়েও (শ্রীরামকৃষ্ণ) দেখিতে পাইতেন, সর্বাবয়বসম্পন্না জ্যোতির্ময়ী মা হাসিতেছেন, কথা কহিতেছেন, 'এটা কর, ওটা করিস না' বলিয়া তাঁহার সঙ্গে ফিরিতেছেন।

..."(হৃদয়রাম বলিতেছেন) দেখিতাম, রাত্রে এক এক দিন জগন্মাতাকে শয়ন দিয়া মামা 'আমাকে শুতে বলচিস,—আচ্ছা শুচ্ছি' বলিয়া জগন্মাতার রৌপ্যনির্মিত খট্টায় কিছুক্ষণ শুইয়া রহিলেন।

..."প্রত্যুষে উঠিয়া মা কালীর মালা গাঁথিবার নিমিত্ত মামা নিত্য পুষ্পচয়ন করিতেন। দেখিতাম, তখনো তিনি যেন কাহার সহিত কথা কহিতেছেন, হাসিতেছেন, আদর-আবদার, রঙ্গপরিহাসাদি করিতেছেন।"

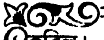
অর্থাৎ কালীদর্শনের পর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরে একটি শাশ্বত মাতৃসান্নিধ্যবোধ জাগিয়া উঠিয়াছিল।

পাশ্চাত্য সাধক ব্রাদার লরেন্সের একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রহিয়াছে। 'ঈশ্বর সান্নিধ্যবোধের সাধনা' (Practice of the Presence of God)। তিনি ঐ গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ "শ্রীভগবানের সাথে অবিরাম আলাপরত জীবনের চেয়ে তৃপ্তিকর বা মনোরম জীবন এজগতে আর কিছুই নাই। যাঁরা এই অভ্যাস করেন এবং ফল পান, তাঁরাই এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

..."শ্রীভগবানের সান্নিধ্যলাভের জন্য সকল সময়ে যে গির্জাতেই যেতে হবে এমন নয়। আমাদের হৃদয়কেই আমরা উপাসনা-মন্দিরে পরিণত করতে পারি এবং মাঝে মাঝে সেখানে প্রবেশ করে বিনয়-নম্র ভক্তি সহকারে তাঁর সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হতে পারি। প্রত্যেকেই এইভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপে অধিকারী—কেউ বেশি, কেউ কম।" (স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র সিংহের অনুবাদ দ্রষ্টব্য)

পূর্বকথায় আসি। আমাদের দৈনন্দিন কাজে-কর্মে সর্বত্র সর্বদা 'মা' সঙ্গে আছেন, মায়ের কথায় চলিতেছি, বসিতেছি, মায়ের প্রীতি উৎপাদনই আমার একমাত্র কাম্য—এইরূপ চিন্তাকেই 'সাধনা' বলিয়া আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে। ব্রাদার লরেন্স চিঠিতে লিখিতেছেন ঃ "বারেবারে ঈশ্বরের কথা স্মরণ করবেন—দিনে, রাত্তিরে, কাজকর্ম করবার সময়ে, এমনকি আরাম-বিরামের সময়ে পর্যন্ত। তিনি যে সবসময়েই আপনার কাছে কাছে, আপনার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন।" প্রাথমিক অবস্থায় এই সাধনা দুরূহ, সে-ব্যাপারে সন্দেহ নাই, কিন্তু অভ্যাসের কোন বিকল্পও নাই।

বাঙালীর বার মাসে তের পার্বণ। প্রকৃতপক্ষে ইহাও সেই ভগবৎ-সান্নিধ্যবোধ জাগরূক রাখিবার কৌশলমাত্র। শ্রীদুর্গাপূজার তিনদিনও এই ভাবনায় আমরা সহজেই উদ্দীপিত হইয়া উঠি। সপরিবার উমা আসিতেছেন, কাঠামোপূজা হইল, শরতের আমেজ অঙ্গে লাগিল—এই ভাবনা হইতেই 'মাতৃসান্নিধ্যবোধ' শুরু হইয়া গেল। মহালয়ার দিন হইতে নিত্য চণ্ডীপাঠের মাধ্যমে দেবীর শুভাবির্ভাবের অখণ্ড অনুভব। ষষ্ঠীর দিনে বোধনের মাধ্যমে সেই অনুভব দৃঢ়তর হইল। আর মাতৃপূজার তিনদিন উহাকে নিবিড়তর করিয়া সাধকভক্ত অনুভব করিলেন। শারদীয় উৎসব পর্ব চুকিল তো শ্রীলক্ষ্মীপূজা, শ্রীকালীপূজা, শ্রীজগদ্ধাত্রীপূজা পরপর আসিয়া সংসার অধ্যুষিত দৈনন্দিন জীবনে বৈচিত্র্য ও মাতৃসান্নিধ্য প্রদান



করিল। ব্রাদার লরেন্স বলিতেছেনঃ "যেসব ব্যাপার আমাদের ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হতে দিচ্ছে না বলে বুঝি, সেগুলিকে আন্তরিকতা সহকারে সর্বতোভাবে পরিহার করাই সাধনার সর্বস্ব।"

মঠে পাচকের কর্ম করিতে করিতে, বাগানে পুষ্পবৃক্ষের পরিচর্যা করিতে করিতে, এমনকি কাহারো সহিত কথোপকথন করিতে করিতেও ব্রাদার লরেন্স ঈশ্বর-সান্নিধ্যবোধে আপ্লুত রহিতেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' গ্রন্থে আমরা পড়িয়াছি—ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরাগ এবং বিষয়ের প্রতি তীব্র বিরাগই বৈরাগ্য।

এই প্রসঙ্গে সাধক রামপ্রসাদ তাঁহার অপূর্ব রচনাশৈলী প্রয়োগ করিয়াছেন একটি সঙ্গীতে (শ্রীরামকৃষ্ণ গানটি গাহিতেন)—

"মন বলি ভজ কালী ইচ্ছা হয় তোর যে আচারে
গুরুদত্ত মহামন্ত্র দিবানিশি জপ করে।
শয়নে প্রণাম জ্ঞান নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান
নগর ফের মনে কর প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।
চর্বচোষ্য লেহ্য পেয যত রস এ সংসার
আহার কম মনে কর আহুতি দেই শ্যামা মারে।
যত শোন কর্ণপুটে সবই মায়ের মন্ত্র বটে
কালীপঞ্চশৎ বর্ণময়ী বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।
আনন্দে রামপ্রসাদ রটে মা বিরাজেন সর্বঘটে
রূপে রূপে যত রূপ মা আমার সে রূপ ধরে।।"

অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রেই মায়ের সান্নিধ্যবোধের সাধনা চলিতে পারে। মনকে সম্বোধন করিয়া রামপ্রসাদ বলিলেনঃ "হে মন, তোমাকে বলি, শ্রবণ কর।" আধুনিক মনস্তাত্ত্বিক পরিভাষায় ইহাকে 'auto suggestion' বা আত্মপ্ররোচনা বলা হইয়াছে। নিজেকে নিজে প্ররোচিত করা। (স্মরণ রাখা প্রয়োজন, আত্মপ্ররোচনা এবং আত্মপ্রতারণা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু।) ইহা অতি প্রাচীন ভারতীয় সাধনপদ্ধতি। ইহার প্রয়োগ-পদ্ধতি পাশ্চাত্যের মোড়কে খেলাধূলার ক্ষেত্রে বা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাদির ক্ষেত্রে অথবা অন্যান্য ক্ষেত্রে যখন এদেশে আসিল, ইহাকে 'পাশ্চাত্যে উদ্ভূত পদ্ধতি' বলিয়াই সকলে ভাবিল। বস্তুত, এই 'auto suggestion' ভারতীয় সাধনাপদ্ধতিতে প্রথমাবধি লক্ষিত হয়। সাধক রামপ্রসাদের ভাষা স্বচ্ছ। বুঝিতে কষ্ট হয় না। কেবল একটি স্থানে কিঞ্চিৎ বিস্তারের প্রয়োজন হইলেও হইতে পারে। "যত শোন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে।" তন্ত্রশাস্ত্র অনুযায়ী বর্ণমালার সকল বর্ণই জগজ্জননী আদ্যাশক্তির বিভিন্ন প্রকাশের দ্যোতক বা বীজমন্ত্র। তাই মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞাচক্রে যে-কয়টি পদ্মের কল্পনা করা হইয়াছে তাহার মোট পাপড়ি-সংখ্যা পঞ্চাশ এবং ঐ পাপড়িসমূহের উপর বর্ণমালার এক-একটি অক্ষর বীজমন্ত্রাকারে বিন্যস্ত। তাই 'কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে'। শ্লীল-অশ্লীল, ভাল-মন্দ, দুঃখদায়ক-আনন্দদায়ক যেকোন বাক্যই কালীর নাম ছাড়া অন্য কিছু নহে।

শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেনঃ "জানবে তোমার একজন মা আছেন। বিপদে আপদে আর কেউ না থাক, ভাববে একজন মা আছেন।" এই ভাবনার স্তর ঘনীভূত হইয়া এমন পর্যায়ে পৌঁছিবে যে, পৃথক করিয়া ভাবিতে হইবে না—'আমার মা আছেন'। মনের এই উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থায় কাম, ক্রোধ, স্বার্থপরতা, লোভ, মোহ আপনি পলায়ন করিবে। কারণ, অশুদ্ধচিত্তে একটি দ্বৈতভাব থাকে। ঐখানে মা আছেন, এইখানে আমি আছি। মায়ের সম্মুখে আমি ভাল মানুষটি হইয়া চলি, মায়ের চোখের আড়ালে আমি আমার মতন চলি। মন যত শুদ্ধ হইবে ততই অনুভব হইবে 'মা' আর চোখের আড়ালে যাইতেছেন না। সর্বদা একটি মাতৃসান্নিধ্যবোধে মন আনন্দময় হইয়া রহিবে। সংসারও আছে, মা-ও আছেন।

বস্তুত, যে মাতৃসান্নিধ্যবোধের সাধনার কথা হইতেছে, তাহা বস্তু-জাগতিক বোধ হইতে ক্রমশ ভিন্নতর হইয়া পরিণামে এক অপূর্ব অধ্যাত্মবোধে সাধককে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেয়। সাড়ে তিন হাত রক্তমাংসের শরীরকে অতিক্রম করিয়া ক্রমশ শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃসান্নিধ্যবোধ তাঁহাকে দেশকালের অতীত রাজ্যে লইয়া গিয়াছিল। তখন তাঁহার নিকট শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উক্ত মন্ত্র—"নিত্যৈব সা জগন্মূর্তিস্তয়া সর্বমিদং ততম্" (সেই মাতৃরূপ নিত্য, অবিনশ্বর এবং এই জগদ্রূপী যাহা কিছু, সব তাঁহার দ্বারা পরিব্যাপ্ত) বাস্তবায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থাৎ তখন তাঁহার 'ভবতারিণী মা' ঐ মূর্তির আড়াল হইতে বাহিরে আসিয়া বিশ্বচরাচরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। গঙ্গায় ভাসমান নৌকারোহীদের মধ্যে একজন অপরকে চপেটাঘাত করিল। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া সেই প্রহারের ব্যথা অনুভব করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বেদনায় তাঁহার মুখ বিকৃত হইল। জগজ্জননী শ্রীশ্রীমায়ের বিমলবোধঘনমূর্তির ধ্যান সহায়ে নিত্য মাতৃসান্নিধ্যবোধের সাধনা আজ এই রক্তাক্ত পৃথিবীর অস্থির মানুষের নিকট পরমকল্যাণদ হইয়া উঠুক ইহাই প্রার্থনা। ❑

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায় শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবদ্দশায় তাঁর সম্বন্ধে যেসকল তথ্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি সঙ্কলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস ১৩৫৯ সালে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তখনকার দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে সংবাদ কিভাবে পরিবেশিত হয়েছিল, তা আমাদের অনেকেরই অজানা। ১৩৭৫ সালে উপরি উক্ত পুস্তকের যে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল, সেখান থেকে কিছু কিছু নির্বাচন করে পুনর্মুদ্রিত করা হলো। আশা করি পাঠকবর্গের ভাল লাগবে।—সম্পাদক

ধর্মতত্ত্ব, ৩১ আগস্ট ১৮৮৬

(অগ্রহায়ণ ১৪০৮ সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদের অবশিষ্টাংশ)

চিতাশয্যায় স্থাপন করিবার সময় শবের পদ ধারণ করিয়া ভক্তবৃন্দ ভক্তির সহিত প্রণাম করিলেন। পরমহংসদেবের নেত্রদ্বয় ঈশদুন্মীলিত, মুখমণ্ডল ঈষৎ হাস্যযুক্ত ছিল, তাহাতে বোধহয় সমাধি অবস্থায় প্রাণ দেহত্যাগ করিয়াছে। শুনিলাম পূর্বদিন রাত্রি দশটার সময়... তিনবার কালী-নাম উচ্চারণ করিয়া সমাধিমগ্ন হন, তাহাতেই দেহত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া যান। সন্ধ্যাকালে ঘৃত ও চন্দনকাষ্ঠ-সমুৎপন্ন প্রজ্বলিত অগ্নি তাঁহার পবিত্র দেহকে গ্রাস করে। তাঁহার অনুগত শিষ্যগণ একে একে সকলেই পুত্রবৎ সেই ধর্মপিতার দেহে অগ্নি প্রদান করেন। অনেক সুশিক্ষিত যুবকের সাধুভক্তি দেখিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। বাবু সুরেন্দ্রনাথ মিত্র ও অন্য কেহ কেহ পরমহংসের চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষায় অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। এজন্য তাঁহারা সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্র। অনেকে... সেইদিন হইতে ৩-৪ দিন হবিষ্যান্ন গ্রহণ ও শোকচিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। ৯ই (ভাদ্র) [৮ই?] সোমবার পূর্বাহ্ণে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কাঁকুড়গাছিস্থ উদ্যানে পরমহংসদেবের দেহভস্ম মহাসমারোহে প্রোথিত হইয়াছে। সেস্থানে অচিরেই একটি সুন্দর সমাধিস্তম্ভ স্থাপিত হইবার কথা আছে। বহুসংখ্যক ভদ্রসন্তান সঙ্কীর্তন করিতে করিতে কাশীপুর [বলরাম-মন্দির] হইতে ভস্ম সেখানে লইয়া যান। মধ্যাহ্নে তথায় তাঁহারা খেচরান্নাদি ভক্ষণ করেন। শুনিলাম প্রায় সাতশত লোকের আহারের আয়োজন হইয়াছিল। অপরাহ্ণে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ও অপর ২-৩ জন প্রচারক এবং কতিপয় বিধানবাদী ব্রাহ্ম সেই সমাধিস্থল দেখিতে গিয়াছিলেন। সে-স্থানে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন 'পরমহংসের' উক্তি পুস্তক পাঠ ও ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মাতৃবিষয়ক কয়েকটি সঙ্গীত করেন। শ্রবণে আহ্লাদিত হইলাম। রামচন্দ্রবাবু নাকি স্বীয় উদ্যানে পরমহংসদেবের নামে তাঁহার সমাধিস্তম্ভ ও কীর্তির জন্য উৎসর্গ করিয়াছেন।

পরমহংসদেব সময়ে সময়ে যেসকল তত্ত্বকথা বলিয়াছেন, তাহার অনেকগুলি আচার্যদেব সংগ্রহ করিয়া ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়াছিলেন। সম্প্রতি তাহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। আরো কয়েকটি নতুন উক্তি তৎসঙ্গে যোগ করা গিয়াছে। উক্ত পুস্তকের নাম—'পরমহংসের উক্তি', মূল্য ১০ পয়সা মাত্র। সকল ব্রাহ্মব্রাহ্মিকার তাহা গ্রহণ করিয়া পাঠ করা কর্তব্য। ❑

ধর্মতত্ত্ব, ১ নভেম্বর ১৮৭৯

সংবাদ।—গত বুধবার (১৩ কার্ত্তিক) শারদীয়া পূর্ণিমা উপলক্ষে শারদীয় উৎসব হইয়াছে। পূর্বাহ্ণে মন্দিরে উপাসনা হয়, অন্নের ভিতরে ব্রহ্ম বিদ্যমান, অন্ন ঈশ্বরের সত্তা ও স্নেহ, দয়া প্রকাশ করিতেছে, এবিষয়ে জ্ঞান ও প্রেমপূর্ণ গভীর উপদেশ হইয়াছিল। বেলা একটার সময় নৌকাযোগে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করা যায় (হয়)। একখানা বজরা ও ৬ খানা ভাওয়ালিয়া, ২ খানা ডিঙি প্রায় ৮০ জন যাত্রী লইয়া কলিকাতা হইতে যাত্রা করে। যাত্রিকদিগের মধ্যে ১০-১২ জন ব্রাহ্মিকা ছিলেন। বজরা পতাকা ও পুষ্প-পল্লবালঙ্কৃত হইয়াছিল। খোল করতাল ও ভেরীর ধ্বনি-সহ গান করিতে করিতে সকলে যাত্রা করিলেন। দক্ষিণেশ্বরের বাঁধাঘাটে পৌঁছিলে পরমহংস মহাশয়ের ভাগিনেয় হৃদয় ঠাকুর বজরায় আসিয়া প্রমত্তভাবে 'জাহ্নবীতীরে হরি বলে কে রে বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে, নৈলে কেন তাপিত পরাণ অন্তর শীতল হতেছে, হরিনামের ধ্বনি শুনে পাষণ্ড দলন হতেছে'—এই গানটি করিতে করিতে নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাঁহার সঙ্গে আরো কয়েক দল ভক্ত মত্ত হইয়া যোগ দিলেন। অতি মনোহর দৃশ্য হইয়াছিল। পরে সকলে গান করিতে করিতে পরমহংস মহাশয়ের গৃহাভিমুখে চলিলেন। 'সচ্চিদানন্দ বিগ্রহরূপানন্দ ঘন' সকলে এই সঙ্কীর্তনটি করিতে করিতে পরমহংসের সাধনভূমি হইয়া তাঁহার নিকটে চলিয়া আসিলেন। গান শ্রবণে ও ভক্তগণের সমাগমে পরমহংস মহাশয়ের মূর্চ্ছা হইল। সমাধি ভঙ্গ হইলে পরব্রহ্মস্বরূপ ও আমিত্বনাশ বিষয়ে কয়েকটি অতি চমৎকার কথা বলেন। সন্ধ্যার সময় বাঁধাঘাটে সংক্ষেপে উপাসনা হয়। আচার্য মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া চন্দ্র ও ভাগীরথীকে সম্বোধন করিয়া উপদেশ দান করেন, তাহাতে ব্রহ্মপ্রেমের গভীর তত্ত্বসকল প্রকাশিত হয়। উপদেশের মধুর ভাবে পাষাণ হৃদয় বিগলিত হইয়া প্রেমধারা প্রবাহিত হয়। উপদেশ শ্রবণে পরমহংস মহাশয় পুনঃ পুনঃ আনন্দধ্বনি করিতে থাকেন। প্রার্থনান্তে ঈশ্বরের মাতৃভাবের একটি নূতন রচিত সুমধুর সঙ্গীত হয়। তাহাতে পরমহংস মহাশয় আনন্দে বিহ্বল হইয়া নৃত্য করিতে থাকেন। পরে তিনি কয়েকটি গান করিয়া সকল লোককে মত্ত করিয়া তোলেন। 'মধুর হরিনাম নিয়ে রে জীব যদি সুখে থাকবি আয়'—সুমধুর স্বরে এই গানটি করিয়া তিনি সকল লোককে মোহিত করেন, তখনকার স্বর্গের ছবি বর্ণনা করা যায় না। এখানে পরমহংস মহাশয় দণ্ডায়মান অবস্থায় পুনর্বার সমাধিপ্রাপ্ত হন। রাত্রি ৮টার সময় সকলে কলিকাতায় যাত্রা করি। গত বৎসর অপেক্ষা এবার শারদীয় উৎসব অধিকতর মধুর ও জমাট হইয়াছিল। ❑

সঙ্কলন ও অনুবাদ ❑ জলধিকুমার সরকার

সম্পাদনা ❑ স্বামী সর্বগানন্দ

মাতৃস্মৃতি

জয়গোবিন্দ শর্মা*



ঠিক মনে নেই, ১৯০১ কি ১৯০২ সালে ঢাকার কাছে গেণ্ডারিয়া গ্রামে গিয়েছিলাম। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পুত্র যোগবিনোদ গোস্বামী সেখানে তখন অবস্থান করছিলেন। আমি দীক্ষাগ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করায় তিনি বিষ্ণুমন্ত্রে আমায় দীক্ষাদান করেন। কিন্তু তদবধি মনে শান্তি পাব ভেবেছি, শান্তি পাইনি। তারও আগে ১৮৯৯ সালে যখন শ্রীহট্টের বেগমপুর গ্রামে শরৎচন্দ্র চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মধ্য-ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকের কর্মে নিযুক্ত ছিলাম, তখন জীবনে প্রথম সাধুসঙ্গ করি। শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য সেই সাধুর নাম মনে নেই। কিন্তু তারপর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশগ্রন্থ কিনে পাঠ করার সবিশেষ আগ্রহ হয় এবং তখনি প্রথম তাঁর ফটো সংগ্রহ করি।

১৯১৪ সালে জুন-জুলাই মাসে একদিন কলকাতার কালীঘাটে শ্রীশ্রীকালীর দর্শনে যাই, দর্শনের পর পুরোহিতের বিনা অনুমতিতে মাতৃমূর্তি স্পর্শ করি। এক ক্রুদ্ধ পাণ্ডা আমায় আঘাত করে এবং ঘাড়ে নখ দিয়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে। পরদিন উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে যাই। এই প্রথম দর্শন। শ্রীশ্রীমায়ের চরণদর্শনের অনুমতি প্রার্থনা জানালে পর অনুমতি পাই। ওপরে গিয়ে দেখি, আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত হয়ে শ্রীশ্রীমা খাটের ওপর বসে আছেন। তাঁর অনাবৃত পদযুগল যেন দোলায়মান মনে হলো। চরণস্পর্শ না করে প্রণামপূর্বক একটি সিকি মায়ের বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুলির ওপর ধীরে ধীরে রাখলাম। সিকিটি যেন লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে আপনি নিচে মেঝেতে পড়ে গেল। আমি সসঙ্কোচে কোন কথা না বলে তাঁর চরণস্পর্শ না করে ভূমিতে দণ্ডবৎ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে চলে এলাম।

জয়গোবিন্দ শর্মাকে লিখিত শ্রীশ্রীমায়ের পত্র

শ্রীশ্রীহরি

পরম আশীর্বাদ পরে বাবাজীবন তোমার অনেকদিন হইল পত্র পাইয়াছি। নানান কার্যে ব্যস্ত থাকায় পত্র দিতে দেরি হইল বলিয়া কিছু মনে করিও না। আর কার্যের জন্য লিখিয়াছ। তাহা (তো) কাজ ছাড়িয়া কি করিবে। যেমন করছ করে যাও। আমার শরীর বেশ ভাল নাই। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবে। এখানের কুশল। তোমাদের কুশল দিবে।

ইতি

তোমাদের মাতা

এর পরদিন আমাদের কাশীধাম রওনা হওয়ার কথা। সঙ্গে আমার গর্ভধারিণী বিধবা জননী, স্ত্রী, পাঁচবছরের কন্যা, প্রায় ১৫ মাসের পুত্র এবং সদ্য নিরুদ্দিষ্ট কনিষ্ঠ ভ্রাতার বালিকাবধূ। ঠিক হলো, উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করে রওনা হব। যৎকিঞ্চিৎ প্রণামী ও দ্রব্য-সহ আমরা সকলে উদ্বোধনে পৌঁছানো মাত্র আমার মা ও অন্যান্যরা

* স্মৃতিকথাটি জয়গোবিন্দ শর্মা ১৯৫৫ সালে বিবৃত করেন। কেউ লিখে নিয়েছিলেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রীর স্বামী, অধুনা বিরাটী-নিবাসী অসিত চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। শ্রীশ্রীমায়ের কয়েকটি অপ্রকাশিত পত্রের অনুলিপিও অসিত চক্রবর্তী আমাদের দিয়েছেন। জয়গোবিন্দ শর্মা ১৯৫৮ সালে দেহত্যাগ করেন।—সম্পাদক

ওপরে উঠে গেলেন, আমার ডাক পড়ল না। অনেকক্ষণ গত হওয়ায় ভিতরে অশান্তি বোধ করলাম। তখন আমিও শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করব বলে ওপরে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। অনুমতি পাওয়া গেল। দোতলায় গিয়ে পূর্বদিনের সমস্ত অতৃপ্তি ঘুচে গেল। মায়ের অনাবৃত মুখ। স্নেহাকুল দৃষ্টি। পূর্ব-পরিচিতের মতো মধুর ব্যবহার। জিজ্ঞাসা করলাম ঃ "আমার ভাইয়ের কি হয়েছে বলুন।" মা বললেন ঃ "বোধহয় সন্ন্যাসী-টন্ন্যাসী হয়েছে।" তারপর দণ্ডবৎ প্রণাম করে সকলে নেমে এলাম।

পরে আমার স্ত্রীর মুখে আরো অনেক কিছু শুনলাম। তারা যখন ওপরে উঠে মাকে প্রথম দর্শন করল, তখন দেখেছিল একজন বৃদ্ধার মূর্তি। আমি যখন পৌঁছালাম, তখন ঐ মূর্তিই যেন এক প্রৌঢ়া নারীমূর্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। আমি ওপরে গিয়ে মাকে বৃদ্ধামূর্তিতে দেখিনি। আমার পুত্র কিছুতেই মাকে প্রণাম করতে রাজি হচ্ছিল না। ঘাড় বাঁকিয়ে মাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল। তার জননী বারংবার জোর করে প্রণাম করানোর চেষ্টা করে। মা বলেন ঃ "থাক মা, পায়ের ধুলো নিয়ে ওর মাথায় দাও, তাহলেই হবে।" আমার স্ত্রী শ্রীশ্রীমায়ের পদধূলি পুত্রের মাথায় দেওয়ামাত্র সব ওলটপালট হয়ে গেল। সে বারংবার দণ্ডবৎ প্রণাম করতে থাকে, কিছুতেই থামে না। তার মা যত বলে—হয়েছে, থাক; তবু থামে না। অবশেষে শ্রীমা বললেন ঃ "থাক হয়েছে।" বলামাত্র ছেলে শান্ত হলো।

জয়গোবিন্দ শর্মাকে লিখিত শ্রীশ্রীমায়ের পত্র

ওঁ

১৭ই আশ্বিন (১৩২৪/১৩২৫)
১নং মুখার্জী লেন

কল্যাণবরেষু
বাবাজীবন,

তোমার পত্র পাইয়াছি। আজকাল কলিকাতায় বউমাকে আনিতে হইলে অনেক খরচপত্র লাগিবে। ঘরে বসেই ঠাকুরের নাম জপ করিতে বলিবে। তারপর যখন সুবিধা হয় পরে নিয়া আসিও। মেয়েটিকে স্কুলে দিতে হইলে আরও ৭।৮ বছর অবিবাহিত রাখা প্রয়োজন। তোমাদের সাংসারিক এবং সমাজ হিসাবে সব দিক বিবেচনা করিয়া যাহা ভাল মনে হয়, তাহাই করিবে। আমার আশীর্বাদ জানিবে। এখানকার কুশল। ইতি

আঃ
তোমার মাতাঠাকুরানী

জয়গোবিন্দ শর্মাকে লিখিত শ্রীশ্রীমায়ের পত্র

শ্রীহরি

মার্চ ১৯১৭
৯ই চৈত্র
জয়রামবাটী

কল্যাণবরেষু
বাবাজীবন,

তোমার পত্র পাইয়াছি। সংসারে থাকিতে হইলে অর্থের দরকার। তুমি সেজন্য চেষ্টা করিতে পার। তবে হওয়া না হওয়া ভগবানের ইচ্ছা। তুমি চেষ্টা করিবে। ফলাফল ভগবানের হাত। তবে অর্থপিপাসা করিতে নাই। দিন চলিলেই হলো। আমার আশীর্বাদ জানিবে। অত্রস্থ সব কুশল। ইতি

আশীর্বাদিকা
মাতাঠাকুরানী

তৃতীয়বার মাকে দর্শন করি জয়রামবাটীতে। ১৯১৬ সালে স্বামী সারদানন্দের অনুমতি নিয়ে এক পরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে জয়রামবাটীতে যাই জানুয়ারি মাস নাগাদ। ভদ্রলোক যুবা, ব্রাহ্মণ। জয়রামবাটীর নিকটেই তাঁর আপন বসতবাটী। তিনি নিজে মায়ের বাড়ি পর্যন্ত গেলেন না। আমাকে দেখিয়ে দিলেন। আমি মুটে নিয়ে নিজেই মায়ের সমীপে হাজির হলাম। তখন আমার মন অস্থির। দীক্ষা যে নিয়েছিলাম, তা নিরর্থক মনে হচ্ছিল। মাকে সব কথা বললাম। মা কৃপা করে আমাকে পুনর্বার দীক্ষাদান করলেন। এখন আমার মন শান্ত। ছুটাছুটি করে না। সাধু অন্বেষণ করে না। এখন ভাবি, "আপনাতে আপনি থেকো মন যেও নাকো কারু ঘরে।"

১৯১৮ সালে মাকে চতুর্থবার দর্শন করি। শ্রীশ্রীমা তখন অসুস্থা। আমার সঙ্গে বেশি কথা বলেননি। কেবল জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ "তুমি আগে একবার এসেছিলে না?" আমি বলেছিলাম ঃ "হ্যাঁ মা, এসেছিলাম।" মনে হলো মায়ের মন থেকে আমি মুছে যাইনি। কারণ, বহু শিষ্যশিষ্যার মধ্যে সকলকে স্মরণ রাখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। আর আমি এমন কীর্তিমান নই যে, আমাকে মা বিশেষভাবে মনে রাখবেন।

শ্রীশ্রীমায়ের দেহরক্ষার বহু বছর পর জয়রামবাটীতে গিয়েছিলাম নতুন 'মাতৃমন্দির' দেখতে। তখন স্বামী পরমেশ্বরানন্দ আমাকে তালপত্রে মুদ্রিত শ্রীশ্রীচণ্ডী পাঠ করতে বলেন। আমি তাঁর আদেশ পালন করে অন্তরে অপার আনন্দ লাভ করেছিলাম। ❑



শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের দুখানি পত্র*

॥১॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Godavari House
Ootacammand
3.10.(19)26

শ্রীমান উমাপদ,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। প্রভুর কৃপায় তোমার ওখানে থাকিবার সুবিধা হইয়াছে জানিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। তাঁর আশীর্বাদে তোমাদের সকলরকম কুশল হইবে নিশ্চয়ই জানিবে।

ধ্যানজপ নিয়মিতভাবে করিয়া যাও, যেরূপ বলিয়াছি। তাঁর কৃপায় মন স্থির হইবে। ধ্যানজপের সময় গৈরিক পরিধান করিতে পার, কিন্তু তারপর উহা ছাড়িয়া রাখিবে।

ঠাকুরের নিত্যপূজা করিবার যদি বাসনা হইয়া থাকে বেশ ভাল কথা। আমাদের ভক্তির পূজা, অত বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন নাই। ফুল-চন্দন দিয়ে তাঁর শ্রীপদে পুষ্পাঞ্জলি ও ভাবের সহিত প্রার্থনা করিবে, তাহা হইলেই হইয়া গেল। মঠ হইতে ঠাকুরের পূজাপদ্ধতি কিনিতে পাওয়া যায়—তাহাও আনাইয়া লইতে পার। ভক্তিবিশ্বাসই আসল। পূজা যদি ভক্তিহীন হয়, তাহা হইলে উহা কিছুই নয় জানিবে। প্রভুর কৃপায় তোমার ভক্তিবিশ্বাস বৃদ্ধি হউক। ইহাই আমার আন্তরিক কামনা জানিবে। তুমি আমার আশীর্বাদ জানিবে। ইতি

তোমাদের শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ


RAMKRISHNA MISSION

॥২॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

Ramkrishna Mission
P.O. Belur Math, Howrah Dist.
Dated 6.5.1927

মা মনোলোভা,

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের গায়ত্রী ইষ্টমন্ত্র জপের পর করিবে। সংখ্যা রাখার প্রয়োজন নাই—যতটুকু পার করিবে। জপেতেই সব হইবে। জপই আসল, ধ্যান কি মানুষের হয়, তবে বোঝে না তো, যাহারা করিতে চায় করুক। কিন্তু জপই হইতেছে মূল।

যোগবিলাস ভাল আছে জানিয়া সুখী হইয়াছি। তাহাকে আমার আশীর্বাদ দিবে। ঠাকুরকে এবং আমাদের অন্তত একবার করেও স্মরণ করিবে শত কাজের মধ্যেও। তাহা হইলেই সব হইয়া যাইবে জানিবে। তোমাদের খুব ভক্তিবিশ্বাস, নির্ভরতা লাভ হউক—ইহাই আমার প্রার্থনা। তোমরা আমার আন্তরিক স্নেহাশীর্বাদ ও শুভেচ্ছাদি জানিবে। ইতি

তোমাদের চির শুভানুধ্যায়ী
শিবানন্দ

---

* শিষ্য উমাপদ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী মনোলোভাদেবীকে লিখিত মহাপুরুষ মহারাজের পত্রগুলি উমাপদ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র, দমদম-নিবাসী যোগবিলাস মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত। যোগবিলাসবাবু পাথুরিয়াঘাটার (পরবর্তী কালে নরেন্দ্রপুর) রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের প্রথম দিককার ছাত্র। অধুনা প্রয়াত বেলুড় মঠের প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দজী তাঁর সেজকাকা।—সম্পাদক

গীতার শক্তি ও মনোহারিত্ব

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ

পূর্বানুবৃত্তি

এই আলোচনাটি দুর্গাপদ ঘোষ প্রমুখ নিবেদিত 'স্বামী বীরেশ্বরানন্দ স্মারক রচনা'-রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক



আন্তঃ-সাংস্কৃতিক ভাববিনিময়ের মাধ্যমে সংস্কৃতির অবক্ষয়রোধ



ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক ভাববিনিময় ঘটতে পারে; কিন্তু সেটিকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে এবং তাকে একটি সৃষ্টিশীল আন্দোলনে পরিণত করতে প্রয়োজন মহান চিন্তাবিদ্‌দের ও দূরদর্শী নেতৃবৃন্দের। উনবিংশ শতকে ভারতবর্ষ জন্ম দিয়েছে এইরকম অনেক মনীষীর। রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে সে-ধারা চূড়ান্ত পর্যায়ে বিকাশলাভ করেছে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রবর্তিত একটি শক্তিশালী, সৃজনী, সমন্বয়ী আন্দোলনের রূপে। স্বামী বিবেকানন্দকে দিয়ে শুরু করে ঐ শতকের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, এই জাগরণ অর্জন করেছিল অসামান্য পরিপূর্ণতা এবং বিশাল এক সম্ভাবনা—কেবল জাতীয় স্তরেই নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও। অতএব, শুধু পারস্পরিক ভাব-বিনিময়ই যথেষ্ট নয়; সে-প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন শক্তিকে ব্যবহার করতে এবং তাকে যথাযথ দিশা প্রদান করতে পারা চাই। স্বামী বিবেকানন্দের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ছিল, আমাদের ঐতিহ্যের দুর্বলকারী, সংস্কারাচ্ছন্ন অংশগুলি বাদ দিয়ে কেবল তার শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলি নিয়ে তার সঙ্গে পাশ্চাত্য থেকে গৃহীত ভাবধারার উন্নত বিশেষত্বগুলিকে সমন্বিত করা। তিনি আমাদের বলেছিলেন, আসছে এক নতুন ভারত—যে-ভারত পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সকল শক্তির সঙ্গে আমাদের আপন শক্তির সমাহার ঘটিয়ে হয়ে উঠবে অতীত ভারতবর্ষের চেয়ে অনেক বেশি মহত্তর। আধুনিক যুগে সেটিই ঘটে চলেছে ধীরে, নিঃশব্দে এবং একদিন তা গোটা বিশ্বকে চমকিত করবে। উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্যের সক্রিয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে আমাদের মধ্যে যে প্রচণ্ড জাগরণ এসেছিল, তার শক্তিকে স্বামী বিবেকানন্দ এইভাবেই নির্দিষ্ট এক খাতে পরিচালিত করেছিলেন। সেসময়ে ভারতবর্ষ বিদেশী রাজনৈতিক শাসনের অধীনে থাকলেও পশ্চিমের অসামান্য চিন্তাশীলতার প্রভাব আমাদের ওপর পড়েছিল; তার ফলে আমরা নতুনভাবে চিন্তা করতে শুরু করেছিলাম। তার আগে পর্যন্ত আমরা যেন সঙ্কীর্ণ, গোষ্ঠীবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে একটা গর্তে পড়ে ছিলাম। তখনকার অবস্থাকে বিবেকানন্দ তুলে ধরেছেন তাঁর 'কলম্বো থেকে আলমোড়া'র বক্তৃতাগুলির মধ্যে। এ-দেশ ও তার নাড়ির স্পন্দনকে বুঝতে হলে, এবং কিভাবে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটানো যায় তা জানতে হলে এই গ্রন্থটি (বাঙলায় 'ভারতে বিবেকানন্দ' নামে প্রকাশিত) প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের পড়া উচিত। গ্রন্থটিতে স্বামীজী বলছেন ঃ

"যেসব জিনিসের কোন মানে নেই, যেসব জিনিস আগাগোড়া অর্থহীন আজগুবী—তাদের নিয়ে পুরনো সব আলাপ-আলোচনা আর ঝগড়া-বিবাদ দূর করে ফেলে দাও। ভেবে দেখ, বিগত ছ-সাতশ বছরের অবক্ষয়ের কথা—যখন বছরের পর বছর ধরে শয়ে শয়ে বয়স্ক মানুষ মিলে আলোচনা করেছে, জলের গ্লাস ডান হাত দিয়ে ধরে খাব না বাঁ হাত দিয়ে, হাত ধোব তিনবার না চারবার, কুলকুচি করব পাঁচবার না ছবার। এই ধরনের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে এবং তার ওপর সবচেয়ে জ্ঞানসমৃদ্ধ দর্শন রচনা করে যারা জীবন কাটিয়ে দেয়, তাদের কাছ থেকে আমরা কী-ই বা আশা করতে পারি?"

ব্রিটিশের সংস্পর্শে এসে এইসব অভ্যাস জোর ধাক্কা খেল। মানুষ আরেকবার ভাবতে বাধ্য হলো। প্রাচীন পণ্ডিতের সন্তানের পক্ষে হয়ে ওঠা সম্ভব হলো নোবেল-বিজয়ী সি. ভি. রমন; সম্ভব হলো আধুনিক ভৌতবিজ্ঞান অধ্যয়ন করে নবপ্রগতির পথে আপন অবদান রেখে যাওয়া। একেই বলে 'নবজাগরণ' বা মানুষের মধ্যে নতুন প্রাণের সঞ্চার। উনবিংশ শতকে এটি ঘটেছিল এবং আজ আমরা অসাধারণ সেই ঘটনার ফসল তুলছি। এসেছে নবযৌবনদীপ্তি, এসেছে নতুন শক্তি; কিন্তু এখনো আমরা সম্পূর্ণরূপে বিপদের বাইরে নই। এখনো রয়েছে কত অশান্তি—ব্যাপক দুর্নীতি ও হিংসা; কিন্তু তাতে এটাও প্রমাণিত হয় যে, মানুষের মধ্যে আছে শক্তি—আর সেটা একটা সম্পদ। অবস্থাকে বদলানো যেতে পারে, এবং এইসব মহান আচার্য এসেছেন এই শক্তিকে উন্নততর আকারে রূপান্তরিত করতে। হিংসা ও অপরাধ নিয়ে তাঁরা উদ্বিগ্ন নন। তমো থেকে রজঃতে উত্তরণ সত্যিকারের এক উন্নতি। রজঃতে অবস্থানকালে মানুষ তার নিজের তথা সমাজের কাছে একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ালেও তমো নামক নিষ্প্রাণতা থেকে রজঃতে

পৌঁছানোটা অবশ্যই একটা উন্নতি। এর পরের পদক্ষেপটা নিতেই হবে এবং সেটা হলো সত্ত্ব—যা আসলে নিয়মানুবর্তী ও সৃজনশীল মানবীয় শক্তির ভিত্তিতে গড়া অসামান্য এক অবস্থা। কী অসাধারণ ব্যবস্থাই না তাতে গড়ে উঠতে পারে! ভারতবর্ষ এই শিক্ষা লাভ করেছে কেবল আধ্যাত্মিক আচার্যদের কাছ থেকেই নয়; তার রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকেও। লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক, সুভাষচন্দ্র বসু, মতিলাল নেহরু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যাপন করেছেন সৎ জীবন। জাতির স্বার্থে তাঁরা ত্যাগ করেছেন অর্থ, ত্যাগ করেছেন শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য। উনবিংশ শতকে এবং বিংশ শতকের প্রথম দিকে ছিলেন এমন সব উচ্চমনা মানুষ—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মতো আধ্যাত্মিক মহাপুরুষের পাশাপাশি। গান্ধী ছিলেন প্রচণ্ড এক আধ্যাত্মিক শক্তি। ছিলেন জাতীয় কংগ্রেসের নেতা চিত্তরঞ্জন দাশ, যাঁর মৃত্যু হয় ১৯২৫-এ। শোনা যায়, শেষকৃত্যের জন্য তাঁর দেহ বহন করে নিয়ে গিয়েছিলেন গান্ধীজী স্বয়ং। চিত্তরঞ্জন ছিলেন একজন দরিদ্র মানুষ। তিনি আইন পড়েছিলেন ও নিজের আইন-ব্যবসা থেকে ভালই রোজগার করেছিলেন। তাঁর বাবা নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে দারিদ্র্যের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন তাঁর রোজগারের অর্থ দিয়ে প্রথমেই সব ঋণ শোধ করে তাঁর মৃত পিতার নাম দেউলিয়া-তালিকা থেকে কাটানোর ব্যবস্থা করলেন। এই কাজের মধ্যে মানব-মনের মহত্ত্বের পরিচয় আছে। পিতা মৃত, অতএব চিত্তরঞ্জন বাবার সব ঋণ অস্বীকার করতে পারতেন; কিন্তু তাঁর কাছে টাকার চেয়েও মূল্যবান ছিল সম্মান। আজ আমরা সেই চরিত্র খুইয়েছি। আজ টাকাই সব; সম্মানের কোন গুরুত্ব নেই। আশি বছরের মধ্যে সব ব্যাপারে এত পরিবর্তন এসেছে! এইসব মহান মানুষ আমাদের জাতির শক্তিগুলিকে পরিচালনা করে ভারতবর্ষকে দান করেছেন নবজীবন, এবং তাঁদের সবার ওপরে স্থান স্বামী বিবেকানন্দের, যাঁর প্রভাব এইসব মহান রাজনৈতিক নেতার ওপরেও পড়েছিল। রোমাঁ রোলাঁর লেখা বিবেকানন্দের জীবনী পড়লে এই প্রভাবের স্বরূপ বুঝতে পারা যায়। ১৯২১-এ কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করতে কলকাতায় গিয়ে গান্ধীজী বেলুড়ে রামকৃষ্ণ মঠেও উপস্থিত হন। নিচের প্রাঙ্গণে সমবেত ঘরোয়া একদল মানুষের উদ্দেশে গান্ধীজী বলেন, তিনি বেলুড় মঠে এসেছেন সত্যাগ্রহ প্রচার করতে নয়; এসেছেন বিবেকানন্দ যেখানে বাস করতেন সেই স্থান থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করতে, যাতে তিনি তাঁর জাতিকে আরো উপযুক্তরূপে ভালবাসতে পারেন। "বিবেকানন্দকে পড়ে আমার ভারতপ্রেম হাজার গুণ বেড়ে গেছে"—স্বামীজীর উদ্দেশে এই ভাষায় শ্রদ্ধা জানিয়ে গান্ধীজী সেই সমবেত জনতাকে বললেন, ঘরে ফেরার আগে তাঁরা যেন সেই অনুপ্রেরণার কিছুটা সঙ্গে নিয়ে যান।

৩৯ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে স্বামীজী এক তরতাজা যৌবনশক্তি এনেছিলেন অনন্য এই প্রাচীন সংস্কৃতিতে, যা তখন প্রায় জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল। অনেক সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ লেখক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, গতিশীল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ছোঁয়ায় আমাদের এই সংস্কৃতি অবক্ষয়িত হয়ে মরে যাবে। ভারতে যিনি ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করেছিলেন, সেই মেকলে লিখেছিলেন যে, স্বল্প সময়ের মধ্যেই এ-সংস্কৃতির মৃত্যু অনিবার্য। ঘটেছিল কিন্তু এর ঠিক বিপরীত। ভারত আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠল; নতুন এক জীবনীশক্তি তাকে অগ্রগতির পথে ঠেলে নিয়ে চলল। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ না এলেও আমরা শক্তিশালী ও সক্রিয় থাকতাম। সন্দেহ নেই, আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতি আমাদের শক্তিশালী করত; কিন্তু আমরা হারাতাম আমাদের আপন আন্তরসত্তা—আমাদের সুপ্রাচীন অতীতের সঙ্গে ধারাবাহিকতা যেত হারিয়ে। এইরকম সব মহান আচার্যের জন্য তা ঘটতে পারেনি।

শঙ্করের গীতা-ভাষ্যের ভূমিকায় আমরা এইসব ভাব লক্ষ্য করি। তখনকার ভারতীয় নেতাদের কেউ কেউ বৈপ্লবিক মনোভাব নিয়ে বলেছিলেন যে, পাশ্চাত্যের সঙ্গে আমাদের কোনরকম সংস্রব থাকা উচিত নয়; বিদেশ থেকে কোন ভাব গ্রহণ করা উচিত নয়; আমাদের নিজেদের ভাবেই দৃঢ় হয়ে থাকতে হবে। দেশ কিন্তু তাঁদের কথা শোনেনি। স্বামীজী কিন্তু বললেন, আমাদের আছে এক মহান সংস্কৃতি; কিন্তু সেইসঙ্গে বললেন, অন্যদেরও আছে মহান চিন্তারাশি, এবং আমাদের বিনয়ের সঙ্গে সেইসব ভাব গ্রহণ করতে হবে। তিনি আমাদের পাশ্চাত্যের কাছ থেকে রাজনীতি, অর্থনীতি, জনকল্যাণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা করতে বলেছিলেন। আমেরিকা থেকে ভারতে এক চিঠিতে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন : "সমতা, স্বাধীনতা, কর্ম ও শক্তির বিষয়ে তোমার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে তুমি কি পাশ্চাত্যবাসীদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ পাশ্চাত্যবাসী এবং সেই একইসঙ্গে ধর্মীয় সংস্কৃতি ও সংস্কারের দিক দিয়ে আপাদমস্তক একজন হিন্দু হয়ে উঠতে পার?"

অন্যদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণের এই ভাব নতুন নয়। মনুস্মৃতিতে আছে : "শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।/ অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি।।" (২।২৩৮)—নিম্নশ্রেণীর কাছ থেকেও বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে আহরণ করবে শুভকারী বিদ্যা, নিচজাতির কাছ থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করবে পরম ধর্মের, নিকৃষ্ট বংশ থেকেও উত্তম স্ত্রী গ্রহণ করবে।

এই উক্তিতে লক্ষ্য করা যায় কী এক উদার সামাজিক মনোভাব! স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, নব্যভারতকে হতে হবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এক সুন্দর সংমিশ্রণ; বলেছিলেন—ভারতের মাটিতে প্রাচীন গ্রীসবাসী আজ মিলিত হচ্ছেন প্রাচীন হিন্দুর সঙ্গে। ১৮৯৭-এর ফেব্রুয়ারিতে মাদ্রাজে প্রদত্ত 'ওয়ার্ক বিফোর আস' শীর্ষক বক্তৃতায় তাঁর নিজের কথা এগুলি। প্রাচীন ভারতে শিক্ষা ছিল সুসংহত ও সমন্বিত। আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে রক্ষা করেও অন্যরা আমাদের যা দিয়েছে তা গ্রহণ করেছি, আত্মীকরণ করেছি। বর্তমানে আবার সেই সংমিশ্রণ জন্ম দেবে নতুন ভারতবর্ষের। ধীর, অবিচল গতিতে এই ভাবকে প্রসারিত হতে হবে। আজ আমাদের মধ্যে আছে অনেক খুঁত, দুর্বলতা ও দোষ। কিন্তু যে-জাতির মধ্যে প্রাণসঞ্চার হচ্ছে, তার গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার অঙ্গাঙ্গী এগুলি।

বঞ্চিত মানুষ জীবনে কিছু সুযোগ পেলে ভুল করে, মহাভুল করে; কিন্তু তারা নিজেদের শুধরে নিতে পারে, কারণ মহান আচার্যগণ আমাদের সেই সংশোধনের পথ ও প্রক্রিয়া দেখিয়ে দিয়েছেন।

সংস্কৃতিগুলির পারস্পরিক আদান-প্রদানের ভাবটি তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুত, এইরকম আদান-প্রদানের ফলেই উৎপন্ন হয়েছে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতা। গ্রীক চিন্তাভাবনা ইউরোপে প্রবেশ করে খ্রিস্টীয় ১৫-১৬ শতকে। ততদিনে গ্রীস পরিণত হয়েছে একটি মৃত জাতিতে। দ্বিতীয় শতকের কাছাকাছি সময়ে তাকে অধিকার করেছিল রোমান সাম্রাজ্য। তৃতীয় শতকে সে গ্রহণ করেছিল খ্রিস্টধর্মকে, যা প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির কাছে ছিল নেহাৎই আগন্তুক। সাধারণত দেখা যায়, খ্রিস্টধর্ম বা ইসলামধর্ম যেখানেই গেছে, সেখানেই তারা প্রাচীন সবকিছুকে ধ্বংস করেছে। অতএব, প্রাচীন গ্রীক ভাবনা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ল কেবল গ্রন্থরাজির মধ্যে। পশ্চিমের ইউরোপীয়ানরা ছিল অসভ্য এবং প্রাচীন গ্রীক ভাবনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। গোটা ড্যানিয়ুব নদীর তীরে এবং রোমান সাম্রাজ্য ছাড়িয়ে অবস্থিত স্ক্যাণ্ডিনেভিয় দেশগুলি ও জার্মানি ছিল অসভ্য সব দেশ। পরবর্তী কালে রোমানরা গ্রহণ করল খ্রিস্টধর্ম, কিন্তু জীবন সম্বন্ধে ঐ ধর্মের দৃষ্টি ছিল সঙ্কীর্ণ। গ্রীক ও রোমানদের মহান অবদানের মূল্য সে-ধর্ম অনুধাবন করতে না পেরে তাদের বলল—'প্যাগান'[১]। এইসব সংস্কৃতি ধ্বংস হয়ে গেল। ১২৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই মধ্যযুগকে ইউরোপীয় ইতিহাসের 'অন্ধকার যুগ' বলা হয়।

পরে, ইউরোপের যে মূলকেন্দ্র পূর্ব ও পশ্চিমের সংযোগ রক্ষা করত, সেই রোমান কনস্ট্যান্টিনোপ্‌ল দখল করল তুর্কিরা। মুসলমান এই তুর্কিরা উত্তরোত্তর শক্তিশালী হয়ে নিকটবর্তী সব খ্রিস্টধর্মাবলম্বী দেশ দখল করে নিল। কনস্ট্যান্টিনোপ্‌লের পতন হলো ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে এবং অনেক গ্রীক পণ্ডিত নিজের দেশ ছেড়ে বইপত্র সঙ্গে নিয়ে চলে যেতে আরম্ভ করলেন পশ্চিম ইউরোপে। তুর্কির মধ্য দিয়ে ইউরোপীয়ানদের পূর্বদিকে যেতে দেওয়া হতো না; ফলে ইউরোপ সব সংযোগ হারাল পূর্বের সঙ্গে—এমনকি ভারতের সঙ্গেও। এই কারণে পশ্চিম বাধ্য হলো 'কেপ অফ গুড হোপ' হয়ে ভারতে আসার নতুন পথ খুঁজে বের করতে; অন্যরা আবার ভারতের সন্ধানে পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে আমেরিকা পৌঁছে সেটাকেই ভারত ভাবল। এই হলো আধুনিক ইতিহাস। কিন্তু ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে কনস্ট্যান্টিনোপ্‌লের পতনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক ভাবনা পশ্চিম ইউরোপে প্রবেশ করে তাকে প্রদান করল মানবতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টি ও উদার মনোভাব। আর তাতেই দেখা দিল ইউরোপীয় ইতিহাসের তথাকথিত 'রেনেসাঁ' বা নবজাগরণ। এরপর ষোড়শ শতাব্দী থেকে যাকিছু প্রগতি, তা সবই ইউরোপীয় মানসিকতায় উপ্ত গ্রীক-রোমান সংস্কৃতির এই বীজের ফলপরিণাম।

পরবর্তী কালে এল সংস্কার-প্রক্রিয়া। খ্রিস্টধর্ম ভেঙে গেল, এবং কিছু মানুষ নাস্তিক হয়ে গেলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন ভল্টেয়ার, ছিল জার্মানি ও অন্যান্য দেশের 'প্রজ্ঞাদীপ্ত' কিছু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। যাইহোক, এর ফলে উত্থান হলো তারুণ্য-দীপ্তি ও উচ্ছলতায় ভরপুর নতুন ইউরোপের, যাকে আর তার নিজের মধ্যে বেঁধে রাখা গেল না—ঠিক যেমনটি ঘটেছিল প্রাচীন গ্রীসের ক্ষেত্রে। মাত্র আড়াই লক্ষ লোক নিয়ে গঠিত ছোট্ট শহর এথেন্স অসাধারণ শক্তি বিস্তার করেছিল সমগ্র গ্রীস জুড়ে। কালে একটি সাম্রাজ্যে পরিণত হয়ে সে আলেকজাণ্ডারের অধীনে জয় করে নিয়েছিল বহু দেশ—ভারত পর্যন্ত। এখন ইউরোপীয় জাতিগুলিও ঐরকম হয়ে উঠল। তারা প্রচণ্ড শক্তি লাভ করল, কিন্তু সে-শক্তিকে সংহত রাখার উপায় না জানায় বেরিয়ে পড়ল বিভিন্ন দেশ জয় করে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করতে এবং অন্যান্য জাতিদের শোষণ ও ধ্বংস করতে। অবশ্য তারা কিছু নতুন ভাব-ভাবনাও দান করেছিল। ইউরোপে তখন নতুন প্রাণ এলেও বর্তমানে তা পতনের পথে। আর ঠিক এই পর্বেই যুক্তিসিদ্ধ ও উদার ভারতীয় অধ্যাত্মভাবনা ইউরোপ ও আমেরিকায় পৌঁছে তাদের সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে শুরু করেছে।

ব্রিটেন যখন ভারতের ওপর সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য কায়েম করল, তখন তা ছিল পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে অবাঞ্ছিত এক সঙ্ঘাত। এখন তারা মুখোমুখি হচ্ছে পারস্পরিক সুখী সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ভাববিনিময় চলছে, এবং এদেশের মানুষ পশ্চিমের অনেক ভাবনাকে স্বাগত জানায়। আধুনিক পশ্চিমী সভ্যতা রোমের মতো মৃত্যুবরণ করবে না। রোমান সভ্যতাকে শেষ হতে হয়েছিল; খ্রিস্টধর্ম তাকে দখল করে নিয়েছিল। উপস্থিত ছিল কেবল চার্চ আর তার ক্ষমতা; বাকি সব ফিকে হয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল। ঐতিহাসিক অধ্যাপক আর্ণল্ড টয়েনবী উল্লেখ করেছেন রোমান প্যাগানিজম (যার প্রতিনিধিত্ব করছিলেন রোমান সেনেটর সীমাখাস) এবং ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মের (যার প্রতিনিধিত্ব করছিলেন রোমের বিশপ অ্যামব্রোস) মধ্যে এক সঙ্ঘাতের। বিশপ মত প্রকাশ করলেন যে, তাঁর খ্রিস্টধর্ম—যা তখন রোমান সাম্রাজ্যে ক্রমশ শক্তিসঞ্চয় করছে—হলো ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাবার একমাত্র পথ। রোমান 'প্যাগান' সেনেটর সীমাখাস এই 'প্যাগান' মত সমর্থন করলেন যে, নানা পথে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানো যায়। খ্রিস্টীয় চার্চ কিন্তু সেনেটরের

---

১ অ-খ্রীস্টানদের সেসময়ে প্যাগান (Pagan) বলা হতো; এখনও আধুনিক ইংরেজী অভিধানের মতে 'প্যাগান' হলো তারা, যারা পৃথিবীর প্রধান প্রধান ধর্মগুলিকে বিশ্বাস করে না। আর তাই, বিদেশে 'প্যাগানিজম' সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য বা প্রশংসিত কোন মত নয়। কিন্তু বাস্তব হলো, সঙ্কীর্ণ খ্রিস্টীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যেসব মানুষ বা মতবাদের ওপর 'প্যাগান' বা 'প্যাগানিজম'-এর ছাপ মারা হয়েছিল, তাদের মধ্যেই ছিল 'সর্ব ধর্ম-সম-ভাব'-এর চারিত্রিক উদারতা ও বিশ্বাস—যা কিনা ভারতীয় আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যেরও মূল সুর। পূজাপাদ মহারাজজীর বর্তমান আলোচনার পরবর্তী অংশে রয়েছে এপ্রসঙ্গে মূল্যবান আলোকপাত।—অনুবাদক

কণ্ঠরোধ করল। কিন্তু, টয়েনবীর সংযোজন—সেই সেনেটরের কণ্ঠরোধ করা হলেও তিনি যে-মত পোষণ করতেন, তাকে আজও লক্ষ লক্ষ হিন্দু সত্য বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

যাহোক, ভারতবর্ষের বর্তমান পুনর্জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সব পাশ্চাত্য দেশে নতুন ভাব-ভাবনা প্রবেশ করবে এবং তারা আবার নতুন যৌবনশক্তিতে সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। পাশ্চাত্যে আজ এমন অনেক মানুষ পাওয়া যায়, যাঁরা 'খাও-দাও আর মজা লোট'—এই ভোগবাদী দর্শনের ভিত্তিতে গঠিত বর্তমান জীবনযাত্রা চান না। এই মনোভাবের প্রথম প্রকাশ ছিল 'হিপি' আন্দোলনে—বিশেষত আমেরিকায় ও পরে ফ্রান্সে। এর ফলে দেখা গেল, কোন ছেলে বা মেয়ে বড়লোকের ঘরে জন্মালেও সেই পরিবারের সঙ্গে নিজেকে শনাক্ত করতে চাইছে না। তারা পরতে পছন্দ করছে সহজ, সাধাসিধে জামাকাপড়—যা আসলে ত্যাগের চিহ্ন। সেটা ছিল মানুষের কাছে নতুন শক্তি আসার সূত্রপাত। আপাতত এই ভাব কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে গিয়ে থাকলেও এর পুনরাবির্ভাব ঘটতে পারে।

শঙ্করাচার্যের রচনা অধ্যয়ন করলে তা থেকে মানবসভ্যতা ও সম্মিলিত মানবীয় প্রচেষ্টা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা যায়। সংস্কৃতির গতি ঢেউয়ের মতো—একবার পড়ে, আবার ওঠে। আমাদের দেশে সর্বদাই এই 'উঠে আসা'র সূত্রপাত ঘটিয়েছেন—যেমন আমি আগেই বলেছি—কোন না কোন মহান আধ্যাত্মিক আচার্য। কোন রাজনীতিবিদ্, সেনাধ্যক্ষ বা ভৌতবিজ্ঞানীও এমন আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটাতে পারেন না। মানুষের অন্তর্নিহিত সত্যস্বরূপ সম্বন্ধে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কোন দৈবী পুরুষই পারেন এমন এক স্রোত বইয়ে দিতে। এই প্রসঙ্গে আমি আগে নিউ ইয়র্কে প্রদত্ত স্বামী বিবেকানন্দের 'মাই মাস্টার' শীর্ষক বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত করেছি, যেখানে স্বামীজী অসাধারণভাবে উপস্থাপন করেছেন কিভাবে আধুনিক কালে ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যের মধ্যে এক নতুন সামঞ্জস্যবিধান ঘটে চলেছে। পারস্পরিক বিনিময়ের মধ্য দিয়ে আসবে এক নতুন সংস্কৃতি ও বিশ্বজনীন সচেতনতা এবং সমাজে আসবে নতুন এক সার্বিক সংহতি ও মৈত্রী।

আমি আগে উল্লেখ করেছি, প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন মহান এক অবতার। মহাভারত-পর্ব সম্বন্ধে শঙ্কর বলেছেন—এবং আমি আগেই উদ্ধৃত করেছি—যখন ধর্মকে পরাহত হতে হলো অধর্ম ও অত্যধিক ইন্দ্রিয়জ বাসনার কাছে এবং যখন বিচার ও প্রজ্ঞার অবনয়ন ঘটল, তখন মহান বৈদিক দর্শন ও সনাতন ধর্মান্তর্গত আধ্যাত্মিকতাকে রক্ষা করতে নারায়ণ স্বয়ং কৃষ্ণাবতাররূপে দেবকী ও বসুদেবের পুত্র হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন।

এছাড়া ভারতীয় সমাজতত্ত্বের 'ব্রাহ্মণ' আদর্শ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমি 'ধম্মপদ' থেকে উদ্ধৃত করে দেখিয়েছি, মানবীয় এই আদর্শের প্রতি ভগবান বুদ্ধের ছিল বিশাল শ্রদ্ধা। এটি একটি আদর্শ; কোন ব্যক্তি বা জাতি নয়, এবং প্রত্যেক সমাজেরই উচিত এটিকে নিজের আদর্শ রূপে ধরে রাখা। ব্রাহ্মণ-ভাবের বিশেষত্ব হলো আত্মসংযম, সরলতা, দয়া, সেবাভাব; এখানে সত্ত্বেরই প্রাধান্য। ব্রাহ্মণ-স্বভাব মানুষ কখনো উদ্ধত বা আগ্রাসী নন; তিনি শান্তিতে পূর্ণ এবং সকলকে আশীর্বাদ করেন। আমাদের সময়ে আমরা এমন স্বভাবের প্রকাশ দেখি মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে, যিনি জাতির দিক দিয়ে বৈশ্য হলেও গুণের দিক দিয়ে ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ।

এই গ্রন্থটি—ভগবদ্গীতা—এই গুণের চর্চা করার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষত্রিয় ধর্ম নিয়েও আলোচনা করেছে। যেকেউ সিংহাসনে বসলে বা মুকুট পরলেই ক্ষত্রিয় হয়ে যান না। গীতা বলছেন, ক্ষত্রিয় কখনো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেন নাঃ 'যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্'। তিনি বীর, উদার—কখনো নীচ বা সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তিসম্পন্ন নন। আজ আমাদের রাজনীতিক ও প্রশাসকদের এইসব গুণ আত্মস্থ করতে হবে। অবশ্য, প্রত্যেকের লক্ষ্য হলো ব্রাহ্মণস্বভাব; লক্ষ্য এমন এক সমাজ যা নিম্নস্তর থেকে উচ্চতর স্তরে বিবর্তিত হয়, বিকাশলাভ করে। মানবীয় বিবর্তন জৈবস্তরের নয়; নিশ্চিতরূপেই তা হলো নৈতিক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক এক বিবর্তন। মানুষের উন্নততর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রয়োজন নেই। আমাদের আছে শ্রেষ্ঠ অঙ্গ—মস্তিষ্ক। আমাদের জৈব অস্তিত্বের শক্তিকে ব্যবহার করে বিবর্তনকে নিয়ে যেতে হবে উচ্চতর স্তরে। এখানেই আসে 'সত্ত্ব'-এর প্রসঙ্গ। আজ আমাদের আছে প্রচুর শক্তি, যা দিয়ে আমরা মানুষ মারি, ঘর পোড়াই, কারণ সে-শক্তি সত্ত্বের দ্বারা শুদ্ধিকৃত হয়নি। অতএব যা করতে পারা হলো—এই শক্তিকে শুদ্ধ করা, তাকে মানবমুখী করা এবং ব্রাহ্মণত্ব আদর্শ অর্জন করা। অবতার আগমন করেন 'ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থম্'—ব্রাহ্মণ আদর্শ রক্ষা করতে। অবতার আসেন বেদসমূহ ও ব্রাহ্মণ আদর্শ রক্ষা করতে। বৈদিক তথা সনাতন ধর্ম স্বরূপত সার্বজনীন; তা অতি পবিত্র ও যুক্তিসিদ্ধ। একসময়ে এটি বিশ্বের বিশাল অংশ জুড়ে প্রসারলাভ করেছিল, তারপর তা সঙ্কুচিত হয়ে গেলেও বর্তমানে আবার বিস্তারলাভ করছে। বৈদিক ধর্মের মধ্যে সব ধর্ম অবস্থান করে; বৈদিক ধর্ম সকল ধর্মকে গ্রহণ করে; অন্য কোথাও আমরা সেইরকম বিশ্বজনীন দৃষ্টি দেখতে পাই না। বৈদিক ধর্মকে রক্ষা করতে ও ব্রাহ্মণ আদর্শকে তুলে ধরতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছিলেন বসুদেব ও দেবকীর পুত্ররূপে। তাঁর নিজের সম্বন্ধে বলতে গেলে, তাঁর বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল নাঃ 'স্বপ্রয়োজন অভাবে অপি'। আপন মায়াশক্তিবলে তিনি মানবরূপ ধারণ করলেন এবং 'বৈদিকধর্মদ্বয়ং অর্জুনায়োপদিদেশ'—অর্জুনকে তিনি উপদেশ দান করলেন দ্বিবিধ বৈদিক ধর্ম, যথা প্রবৃত্তি লক্ষণ ও নিবৃত্তি লক্ষণের। অর্জুনের অবস্থা তখন কিরকম ছিল? 'শোকমোহ-মহোদধৌ নিমগ্নায়'—শোক ও মোহের মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত। এই দুটি আবেগ জীবনের প্রত্যেক উদ্যোগকে বিকৃত করে দিতে পারে। গীতার প্রথম অধ্যায়ে অর্জুনের বিষাদের বিবরণ থেকে দেখা যায়, শোক ও মোহের এক মহাসাগর যেন অর্জুনকে গ্রাস করে নিয়েছিল।

শ্রীকৃষ্ণ এক সুগভীর বাণী দান করেছিলেন অর্জুনকে, এবং তাঁর মধ্য দিয়ে আমাদের সকলকে। করুণাপূর্ণ হৃদয়ে মানবরূপ

ধারণ করে তিনি এজগতে এসে বহু সংগ্রাম বরণ করেছিলেন। তাঁর জীবন ছিল বিঘ্নপূর্ণ। এমনিতে মনে হতে পারে যে, যাঁর এমন উচ্চ অবস্থা, তাঁর জীবন ছিল নিশ্চিন্ত, সহজ; কিন্তু তা একেবারেই নয়; কারণ, সে-জীবন ছিল রীতিমতো কঠিন কঠোর। মহাত্মা গান্ধী নাকি বলেছিলেন যে, কেবল একজন মহাত্মাই পারেন আরেক মহাত্মার উদ্বেগ-আশঙ্কা অনুভব করতে। শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র হনন করা হয়েছিল—ঠিক যেমন হয়ে থাকে আজকালকার রাজনৈতিক জীবনে। কেউ একজন অভিযোগ করল যে, কৃষ্ণ মহামূল্যবান স্যমন্তক মণি চুরি করে নিয়েছে; সে একজন চোর। বেচারি কৃষ্ণকে প্রমাণ করতে হয়েছে যে, তিনি নিরপরাধ! মণিটি খুঁজতে খুঁজতে তিনি অবশেষে দেখলেন, দুটি গরিব ছেলে সেটি নিয়ে খেলছে। তখন আবার তিনি ওটি উদ্ধার করে তার মালিককে ফেরত দিলেন। এরকম মিথ্যা অপবাদের বহু ঘটনা আছে। শ্রীকৃষ্ণ সেগুলিকে উপেক্ষা করতে পারতেন, কারণ তাঁর কিছু পাওয়ার বা হারানোর ছিল না। যাহোক, মনুষ্যদেহ ধারণ করলে অবতারকে নানা যন্ত্রণা ও অপমান সইতেই হয়। যেটুকু সুখ আসে, সেটুকুও অনেক দুঃখের ভারে কমে কমে যায়। মানুষের দেহধারী যেকোন কাউকে এর মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অবতার কিন্তু এবিষয়ে সচেতন থাকেন যে, মানুষের দেহ ধারণ করলেও তাঁর অন্তরের গভীরে রয়েছে পূর্ণ দেবসত্তা। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত এসেছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে, যেখানে তিনি অর্জুনের মাধ্যমে সমগ্র মানবতাকে প্রদান করলেন গীতার বাণী, যার জন্য এই হাজার হাজার বছর ধরে আমরা তাঁকে স্মরণে রেখেছি।

উপসংহার

অর্জুনকে এই উপদেশ প্রদানের পিছনে শ্রীকৃষ্ণের কী উদ্দেশ্য ছিল? শ্রীকৃষ্ণ কেন যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের সঙ্গে কথা বললেন? তিনি কি গোটা বিশ্বকে রক্ষা করতে পারবেন? শঙ্করের ভাষ্যে আছে একটি উক্তি ঃ "গুণাধিকৈঃ হি গৃহীতঃ অনুষ্ঠিয়মানশ্চ ধর্মঃ প্রচয়ং গমিষ্যতি ইতি"—সাধারণের থেকে উৎকৃষ্টতর গুণসম্পন্ন নারীপুরুষ আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ অনুধাবন ও অভ্যাস করলে সে-ভাব প্রসারলাভ করে। একটি দীপ্ত প্রদীপ থেকে আরেকটি প্রদীপ প্রজ্বলনের মতো তখন তা ধীরে ধীরে জনগোষ্ঠীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। যিশু বলেছেন, রুটির মধ্যে একটুও ভাল জিনিস পুরো রুটিটাকেই ভাল করে। এইসব ভাব সমাজের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে, এবং শেষপর্যন্ত সমাজকে পরিবর্তিত করে দেয়।

শঙ্কর বলে চললেন ঃ

"স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবলবীর্য্যতেজোভিঃ সদা সম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্য অজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব চ লোকানুগ্রহং কুর্বনিব লক্ষ্যতে। স্বপ্রয়োজনাভাবে অপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া বৈদিকং হি ধর্মদ্বয়-মর্জুনায় শোকমোহ-মোহদধৌ নিমগ্নায় উপদিদেশ, গুণাধিকৈঃ হি গৃহীতঃ অনুষ্ঠীয়মানঃ চ ধর্মঃ প্রচয়ং গমিষ্যতি ইতি। তং ধর্মং ভগবতা যথোপদিষ্টং বেদব্যাসঃ সর্বজ্ঞো ভগবান্ গীতাখ্যৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈ উপনিববন্ধ।"

—সেই ভগবান, যিনি সদাসর্বদা জ্ঞান, ঐশ্বর্য, শক্তি, বল, বীর্য ও তেজের অধিকারী, যিনি তাঁর সর্বব্যাপী মায়া বা মূল প্রকৃতিকে তার ত্রিগুণের (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ) দ্বারা বশীভূত করে রাখেন, তিনি স্বয়ং জন্মরহিত, অব্যয়, সর্বভূতের ঈশ্বর এবং স্বরূপত নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব হলেও তাঁর মায়ার মধ্য দিয়ে যেন জাত ও দেহধারী-রূপে প্রতীয়মান হন; এবং জগৎকল্যাণের জন্য তাঁকে ক্রিয়াশীল থাকতে দেখা যায়। তাঁর নিজের কোন প্রয়োজন না থাকলেও তিনি শোকমোহের মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত অর্জুনকে এই দ্বিবিধ (কর্মের ও মননের) বৈদিক আধ্যাত্মিক বাণী দান করলেন এই প্রত্যয়ের সঙ্গে যে, সাধারণের চেয়ে অধিক গুণশালী মানুষের দ্বারা গৃহীত ও উপলব্ধ হলে এই ধর্ম প্রসারলাভ করবেই। (যেমন জ্বলন্ত প্রদীপ থেকে আরেকটি প্রদীপ জ্বালানো হয়।) ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা উপদিষ্ট সেই ধর্ম সর্বজ্ঞ ভগবান বেদব্যাসের দ্বারা সাতশ শ্লোকে বিখ্যাত গীতারূপে নিবদ্ধ হয়।

গীতার উৎপত্তি সম্বন্ধে এই কথা বলার পর শঙ্কর আরো বললেন ঃ

"তৎ ইদং গীতাশাস্ত্রং সমস্ত-বেদার্থ-সারসংগ্রহভূতং দুর্বিজ্ঞেয়ার্থম্। তদর্থাবিষ্করণায় অনেকৈঃ বিবৃতপদপদার্থ-বাক্যার্থন্যায়ম্ অপি অত্যন্ত বিরুদ্ধানেকার্থত্বেন লৌকিকৈঃ গৃহ্যমানম্ উপলভ্য অহং বিবেকতঃ অর্থনির্দ্ধারণার্থং সংক্ষেপতো বিবরণং করিষ্যামি।"

—গীতা-বিজ্ঞান হলো বেদসমূহের সমগ্র শিক্ষার সার-সংগ্রহ, কিন্তু এর অর্থ দুর্বোধ্য। অনেকে এর শব্দ, তাদের অর্থ ও সামগ্রিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে যুক্তিসিদ্ধরূপে উপস্থাপনের প্রয়াস করেছেন। সাধারণভাবে লোকে এটিকে প্রচুর স্ববিরোধী চিন্তার সন্নিবেশ বলে ভেবেছেন। এই দুরবস্থা লক্ষ্য করে উপযুক্ত বিচারসহ মূলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনার মধ্য দিয়ে আমি এর বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করব।

শঙ্কর তাঁর ভাবগম্ভীর ভূমিকার উপসংহার ঘটিয়েছেন এইভাবে ঃ

"ইমং দ্বিপ্রকারং ধর্মং নিঃশ্রেয়সপ্রয়োজনং পরমার্থতত্ত্বং চ বাসুদেবাখ্যং পরংব্রহ্ম অভিধেয়ভূতং বিশেষতঃ অভিব্যঞ্জয়ৎ বিশিষ্ট-প্রয়োজনসম্বন্ধাভিধেয়বৎ গীতাশাস্ত্রম্। যতঃ তদর্থ-বিজ্ঞানেন সমস্ত পুরুষার্থসিদ্ধিঃ, অতঃ তদ্ বিবরণে যত্নঃ ক্রিয়তে ময়া।"

—এইরূপে, বিশেষত বেদের দ্বিবিধ ধর্ম (প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি)-ব্যাখ্যাতা এই গীতা-বিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো আধ্যাত্মিক মুক্তি; সেইসঙ্গে এটি ব্যক্ত করে পরমার্থকে, যা পরম ব্রহ্ম বা বাসুদেব (শ্রীকৃষ্ণ) নামেও অভিহিত; তাই এতে রয়েছে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, সম্বন্ধ ও বিষয়বস্তু। গীতার অর্থ বোধ হলে সকল পুরুষার্থের প্রাপ্তি ঘটে বলে আমি তার ব্যাখ্যায় সচেষ্ট হচ্ছি। [সমাপ্ত] ❑

ভাষান্তর ঃ অধ্যাপক সোমনাথ ভট্টাচার্য

ঐ মহামানব আসে

স্বামী ভূতেশানন্দ

এই রচনাটি 'অধ্যাপক ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।
—সম্পাদক

২৪ ডিসেম্বর শুধু খ্রিস্টান জগতের পক্ষে নয়, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের পক্ষেও একটি বিশেষ দিন। খ্রিস্টানরা মনে করেন, ২৪ ডিসেম্বর ভগবান যিশুখ্রিস্টের জন্ম হয়। আর রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে এটি বিশেষ দিন হওয়ার কারণ, এই দিনে শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণ আঁটপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে ত্যাগময় জীবন গ্রহণ করার সঙ্কল্প নিয়েছিলেন। এইজন্যই এদিনটি আমাদের কাছে স্মরণীয় দিন হয়ে আছে।



ঘটনাটি বহুশ্রুত। শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর তাঁর যুবক শিষ্যবৃন্দ ত্যাগের ভাবে একেবারে পূর্ণ হয়ে ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্থূলদেহে অপ্রকট হওয়ার পর যেন ভাবমূর্তিতে তাঁদের হৃদয়ে বিশেষরূপে প্রকটিত হলেন। তাঁরা সেই ভাবমূর্তিকে হৃদয়ে সমুজ্জ্বল রাখার জন্য সমস্ত প্রাণমন সমর্পণ করে সাধনায় নিমগ্ন হলেন। এইভাবে তাঁদের জীবনে তীব্র বৈরাগ্যের যে আগুন জ্বলেছিল, বাহ্যদৃষ্টিতে সেই আগুন তাঁদের যেমন একদিক দিয়ে অস্থির করেছিল, আরেক দিকে তেমনি সেই আগুনের উত্তাপে জগতের সমস্ত বিষয়ে উদাসীন হয়ে তাঁরা নিজেদের অন্তরে ডুবে যাচ্ছিলেন। সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্য তাঁদের কাছে ছিল স্পষ্ট, উজ্জ্বল ও প্রেরণাময়। এইভাবে কয়েক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বরের শেষদিকে তাঁরা নিমন্ত্রিত হয়ে যান বাবুরাম মহারাজের জন্মস্থান হুগলী জেলার আঁটপুরে। নরেন্দ্র, বাবুরাম, শরৎ, শশী, তারক, কালী, নিরঞ্জন, গঙ্গাধর ও সারদা একত্রিত হয়ে ভগবদ্ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন। আর তাঁদের এক কথা—কি করে এই জীবনকে বৈরাগ্যের অনলে আহুতি দেবেন। এই ভাব নিয়ে দিন রাত কেটে যায়, বৈরাগ্যের আগুন দিন দিন আরো প্রজ্বলিত, ব্যাপকতর হতে থাকে।

আঁটপুরে থাকতে থাকতেই এল ২৪ ডিসেম্বর—যিশুখ্রিস্টের জন্মের পূর্বদিন। নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর গুরুভাইরা যিশুর ভাবে সেদিন বিভোর হয়ে ছিলেন, তাঁরা স্থির করলেন—আজ ধ্যানে বসা যাক। সন্ধ্যার সময় ধুনি জ্বেলে তাঁরা যিশুখ্রিস্টের জীবনকথা আলোচনা করতে লাগলেন। ক্রমে বৈরাগ্যের প্রবল উদ্দীপনায় তাঁরা স্থির করলেন—আজ এক বিশেষ দিন, আজ আমরা আমাদের সমস্ত বাসনা-কামনা এই আগুনে আহুতি দিয়ে ত্যাগময় জীবনের সঙ্কল্প গ্রহণ করব।

সেদিনের সেই সঙ্কল্পের পরিণতিতে এই সন্ন্যাসী সঙ্ঘ গড়ে উঠেছে। তাঁরা যিশুর জীবনের ত্যাগের ভাবটিকে সেদিন প্রবল প্রেরণারূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাই আমাদের কাছে যিশুখ্রিস্ট শুধু ঈশ্বরাবতার নন, যাঁরা আমাদের সঙ্ঘজীবনের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁদের মধ্যে ভাবমূর্তিরূপে সেদিন তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল। সেই কথা স্মরণ করে আমরা এই দিনে যিশুখ্রিস্টকে বিশেষভাবে স্মরণ করি।

প্রসঙ্গত যিশুখ্রিস্টের জীবন সম্পর্কে দু-চারটি কথা বলি। তাঁর কথা বাইবেলে পাই। আমাদের ছাত্রাবস্থায় স্কুলে বাইবেল পড়া আবশ্যিক ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই বাইবেল যারা পড়ত, অন্তত যারা অ-খ্রিস্টান তাদের এবং যাঁরা পড়াতেন তাঁদেরও যথোচিত শ্রদ্ধা ছিল না। আমার মনে পড়ে, কলেজেও আমাদের বাইবেল পাঠ্য ছিল, কিন্তু যিনি পড়াতেন তিনি ব্যঙ্গ করেই পড়াতেন। নেহাত পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, তাই কোনরকম করে পড়ান। শিক্ষক বলতেন যে, বাইবেলের ইংরেজী হচ্ছে 'Simple but very expressive... English', কারণ ইংরেজী ভাষা তখনো এখনকার মতো শক্তিশালী হয়নি, তার ভাষারীতিও এখনকার থেকে অনেক ভিন্ন ছিল। ভাবগুলিও আধুনিক দৃষ্টিতে খুব আকর্ষক নয়। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য যে, আমরা অল্প বয়স থেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবের সংস্পর্শে আসায় আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যরকম ছিল। তাই আমরা যখন বাইবেল পড়তাম, তখন তার ভিতরে ঐরকম ব্যঙ্গ থাকত না, বরং শ্রদ্ধা সহকারে বাইবেল পড়তাম এবং সেই শ্রদ্ধার জন্য ব্যঙ্গচ্ছলে বাইবেল পড়া আমাদের কাছে বেদনাদায়ক হতো।

যিশুখ্রিস্ট বলেছেন ঃ "I am the way."—আমিই পথ। ঈশ্বরের কাছে যেতে হলে তাঁর সন্তানদের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করেই যেতে হয়। এছাড়া কোন পথ নেই। ঈশ্বরাবতারেরা হলেন তাঁরই সন্তান বা তাঁরই প্রতীক। মানুষ যদি তাঁকে ধারণা করতে চায়, তবে তাকে এই ঈশ্বরাবতারের ভিতর দিয়েই ধারণা করতে হবে। তাই যিশু বলতেন এবং আমরা স্বামী বিবেকানন্দকেও বহুবার বলতে শুনেছি ঃ "He who has seen the Son has seen the Father."—যে সন্তানকে দেখেছে, সে তাঁর পিতাকেও দেখেছে। যে অবতারকে দেখেছে, সে ঈশ্বরকে দেখেছে। অবতারকে যে

শ্রদ্ধা করে, সে স্বয়ং ঈশ্বরকেই শ্রদ্ধা করে। সুতরাং এই দৃষ্টি নিয়েই আমরা অন্যান্য ঈশ্বরাবতারদের যেমন দেখেছি, যিশুখ্রিস্টকেও তেমনি করেই দেখছি এবং তাঁর বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে যেটি সবচেয়ে আকর্ষক, স্বামীজী যেটির ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন---তা হলো ত্যাগ ও সেবা। এই দুটি বৈশিষ্ট্য যিশুখ্রিস্টের জীবনে যেরকম পরিস্ফুট তা বাইবেলের অস্পষ্ট ভাষা ও অস্পষ্ট চিত্রের ভিতর দিয়েও পরিষ্কার বোঝা যায়।

বাইবেল অনুসারে যোশেফ হলেন যিশুখ্রিস্টের পিতা, মা হলেন মেরী। বাইবেলে অনেক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে যা আধুনিক দৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য। আমাদেরও মনে হয়েছে যে, অলৌকিকতার সমাবেশে যিশুর জীবনের মূল দিকগুলি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। বোধ হয় অত অলৌকিকতা না থাকলেই তাঁর জীবনটি বেশি পরিস্ফুট হতো।

আবার আরেক ধরনের জীবনীগ্রন্থ আছে, যেখানে তাঁর জীবনের অলৌকিকতা সব বাদ দিয়ে তাঁকে একজন অতি সাধারণ মানবরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। মঠে থাকার সময় একজন খ্রিস্টান সেই দুটি বই আমাদের পড়তে দিয়েছিলেন। যেভাবে সেখানে যিশুখ্রিস্টকে চিত্রিত করা হয়েছে তা যেন একজন নিপুণ ধর্মব্যবসায়ীর মতো—সেটা আমাদের ভাল লাগেনি। বইদুটির নাম হচ্ছে—'The Man Nobody Knows' এবং 'The Book Nobody Knows'। অবতারের অতিমানবত্বকে যদি বাদ দেওয়া যায়, তাহলে তাঁর ভিতরে অবশিষ্ট কি থাকে? যেটুকু থাকে সেটুকু আমাদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয় না। সাধারণ মানুষ যা বুঝতে পারে না, তাকে 'অতিমানবত্ব' বলি। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের সেই অতিমানবত্ব যদি বাদ দেওয়া যায়, এমনকি তাঁর মুহুর্মুহু সমাধি পর্যন্ত, তাহলে আর কি অবশিষ্ট থাকে? কাজেই সেই চিত্র আমাদের কাছে খুব বেশি মর্মস্পর্শী হয় না।



তাই যিশুকে এভাবে আমরা দেখব না। ভক্তদের দৃষ্টিতে তিনি যেভাবে চিত্রিত হয়েছেন, সেইভাবেই তাঁকে দেখব। ভক্তদের ভিতরে হয়তো অপূর্ণতা ছিল, থাকতেই পারে। হতে পারে ভক্তির আতিশয্যে তাঁর মানবীয় দিকটি চিত্রিত হয়নি, তবু এইসব ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও যে-চিত্রটুকু আমরা পাই, শ্রদ্ধার সঙ্গে যদি তার অনুধ্যান করি তাহলেও আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের প্রচুর প্রেরণা মিলবে। সেই দৃষ্টিতেই তাঁর জীবনচরিতের কথা ভাবব। ইহুদীদের 'Old Testament'-এ তাঁর জন্মগ্রহণের আগের কথাও আছে। যিশু যে জন্মাবেন তার পূর্বাভাস যেসব গ্রন্থে দেওয়া হয়েছিল, বাইবেলে তার উল্লেখ আছে। যেমন বলা হয়েছিল, ইহুদীদের উদ্ধার করার জন্য তিনি যিশুরূপে জন্মগ্রহণ করবেন। যিশুর নাম 'Jesus' আর তাঁর উপাধি হিসাবে বলা হয়েছে 'Christ'—যার অর্থ 'The Anointed' বা ঈশ্বরের চিহ্নিত সন্তান। চিহ্নিত কি হিসাবে?—ইহুদীদের উদ্ধারকর্তারূপে। আমরা এখন একটু বদলে বলি জীবের উদ্ধারকর্তা—'Saviour of Mankind'। ইহুদীরা তখন রোম সরকারের অধীন। রোমকদের অত্যাচারে তারা নানাভাবে নির্যাতিত, জর্জরিত। তাদের কোন রাষ্ট্রীয় অধিকার ছিল না, কিন্তু উৎপীড়নের ফলে তাদের মধ্যে একটা প্রবল জাতীয়তাবোধ জন্ম নিয়েছিল। তারা যতই শাসকদের দ্বারা নিপীড়িত হতো, ততই সাগ্রহে প্রতীক্ষা করত কবে সেই উদ্ধারকর্তা আসবেন! কেবল ইহুদীদের উদ্ধারকর্তা নন, পরে তাঁকে আমরা বলেছি—জগতের উদ্ধারকর্তা। তিনিই হলেন ঐ 'Christ' বা 'Anointed' বা চিহ্নিত সত্তা।

যিশু জন্মালেন বেথলেহেম নামে একটি ছোট্ট গ্রামে। বেথলেহেমে তাঁরা থাকতেন না। তখনকার দিনের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে 'census' বা আদমশুমারীতে নাম লেখাতে যেতে হতো বেথলেহেমে। দূর-দূরান্ত থেকে অনেকে সেখানে এসেছেন। যোশেফ এবং মেরীও এসেছেন। কিন্তু যেমন হয়, বহু লোকের সমাগম হলে থাকার জায়গা পাওয়া যায় না, তাঁরাও জায়গা পেলেন না। খুঁজে খুঁজে একটি গোশালায় তাঁদের একটু মাথা গোঁজবার জায়গা হলো। রাতটা তাঁরা সেখানে কাটালেন এবং যিশু সেখানেই জন্মালেন।

কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের সঙ্গে অনেকে এর তুলনা করেন। প্রকৃতপক্ষে উভয় জন্মের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে মিল আছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন জন্মেছিলেন, সেই জন্মকে অভিনন্দিত করেছিলেন তাঁর বাবা-মা—বসুদেব-দেবকী। আর কেউ সেখানে ছিল না। এখানেও তেমনি যোশেফ-মেরী ছাড়া জগতের উদ্ধারকর্তাকে বরণ করার জন্য আর কেউ ছিল না। জন্মাবার পর গরুর জাবর দেওয়ার পাত্রে তাঁকে রাখা হলো, সেটাই হলো তাঁর 'cradle' বা দোলনা। ভাগবতে আছে, দেবতারা ভগবানকে বন্দনা করতে মর্তলোকে আসেন। দেবলোকে সাড়া পড়ে যায়, নরলোকে নয়। বাইবেলেও আছে, ভগবান আবির্ভূত হয়েছেন, দেবদূতেরা তাঁর সন্ধান করছেন। তিনি কোথায়? জানা গেলে, তিন মেষপালকের কাছে। মেষপালকরা ঐ মরুভূমিপ্রায় দেশে ভেড়ার পাল নিয়ে ঘুরে বেড়াত। যারা শিক্ষিত নয়, ধনী বা সম্ভ্রান্তও নয়, সমাজে যাদের বিশেষ স্থান নেই, যারা যাযাবর—প্রথম এই মেষপালকদের কাছে ঘোষণা করা হলো যে, সেই ভগবান—যিনি ইহুদীদের উদ্ধারকর্তা বা আমাদের দৃষ্টিতে জগতের উদ্ধারকর্তা—তিনি আজ জন্মগ্রহণ করেছেন, তোমরা সব আনন্দ কর। তারপরে আর কেউ জানল কিনা, তার কোন বিবরণ নেই। খবর এল প্রাচ্যদেশের কয়েকজন জ্ঞানী পুরুষের (wise man of the east) কাছে—ভগবান আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁকে দেখতে যেতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হলে মুনিঋষিদের মধ্যেও ঐরকম সাড়া পড়েছিল। প্রাচ্যের ঐ জ্ঞানীরাও সেই পর্যায়ের। প্রাচ্যদেশ বলতে কোন্ জায়গা তা কেউ জানে না, বাইবেলেও তার উল্লেখ নেই। আর কোন সূত্রও আমরা পাই না যা থেকে ধারণা করতে পারি সেই 'wise men'-রা কোন্ দেশের। কিন্তু তাঁরা পথ চিনে আসবেন কি করে? সেদিন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের উদয় হয়েছিল, সেই নক্ষত্রকে লক্ষ্য করে তাঁরা চলছিলেন। সেই নক্ষত্র যেখানে নিয়ে যাবে সেখানে তাঁরা জগতের উদ্ধারকর্তার দর্শন পাবেন। ইতিমধ্যেই রটে গিয়েছিল যে, যিশুখ্রিস্ট জন্মেছেন এবং তিনি উদ্ধারকর্তা। ইহুদীদের খুব আনন্দ হলো, কিন্তু ধর্মদ্বেষীদের আনন্দ হলো না। হেরোদ নামে একজন ছোটখাট রাজা ছিলেন। তিনি ভাবলেন: সর্বনাশ! 'The King of the Jews'—'ইহুদীদের রাজা' বলে এই নবজাতককেই সবাই অভিহিত করছে, তাহলে তো আমার রাজ্য যাবে! তিনি অত্যন্ত শঙ্কিত হলেন। ইতিমধ্যে ঐ প্রাচ্যদেশের জ্ঞানী পুরুষেরা হেরোদের রাজ্যের মধ্য দিয়েই যাচ্ছিলেন। হেরোদের সঙ্গে তাঁদের দেখা হলো। হেরোদ জিজ্ঞাসা করলেন: "আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?" তাঁরা বললেন: "ইহুদীদের রাজা জন্মেছেন, তাঁর জন্য উপহার নিয়ে তাঁকে দর্শন করতে যাচ্ছি।" হেরোদ ভাবলেন, এ আবার কোন্ রাজা এসে হাজির হলো? মুখে বললেন: "আমিও তাঁকে দর্শন করতে, তাঁকে উপাসনা করতে চাই। আপনারা ফিরে যাওয়ার সময় আমাকে খবরটা দিয়ে যাবেন, কোথায় তিনি জন্মেছেন। আমি তো জানি না।" জ্ঞানীরা বললেন: "আচ্ছা।"



তারপর তাঁরা ঐ নক্ষত্রকে অনুসরণ করতে করতে সেই গোশালার মধ্যে যিশুখ্রিস্টের দর্শনলাভ করলেন। দেখলেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ—শিশুমূর্তি। চিনতে তাঁদের দেরি হলো না। সঙ্গে যে উপহার ছিল, তা দিয়ে সেই নবজাতককে তাঁরা প্রণাম করলেন। যাওয়ার সময় তাঁদের হেরোদকে বলে যাওয়ার কথা। দেবদূতেরা বললেন: "ঐ কাজটি করো না। হেরোদ উপাসক নয়, শিশুটিকে মেরে ফেলার জন্য ঠিকানাটা চাইছে। ঐদিক দিয়ে যেও না।" তাই তাঁরা অন্য দিক দিয়ে চলে গেলেন।

হেরোদ দেখলেন, তাঁরা তো এল না। খোঁজখবর নিয়ে তিনি জানলেন, শিশুটি বেথলেহেমে জন্মেছে, কিন্তু তাকে খুঁজে বের করা গেল না। তখন তিনি হুকুম দিলেন, বেথলেহেমে যত শিশু আছে সব মেরে ফেল, ওর মধ্যে একজন না একজন যিশু হবেই। এর আগেই দেবদূতেরা এসে যোশেফ এবং মেরীকে বলে গেলেন: "তোমরা এখান থেকে পালাও, কারণ তোমাদের শত্রু আছে। সে আসছে এই শিশুকে হত্যা করার জন্য। তোমরা মিশরে চলে যাও।" তাঁরা পালিয়ে গেলেন। যিশুখ্রীস্ট বেঁচে গেলেন, কিন্তু শহরের শিশুরা মারা গেল। এর সঙ্গে কংসের শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য এই প্রয়াসের খানিকটা মিল পাওয়া যায়। তারপর অনেকদিন মিশরে থাকার পর দেবদূতেরা যোশেফকে বললেন: "এখন তোমরা নিরাপদ, দেশে ফিরতে পার।" তাঁরা দেশে ফিরলেন।

যিশুখ্রিস্টের বাল্যকাল খুব একটা ঘটনাবহুল নয়। বাইবেলে এবিষয়ে বেশি কিছু উল্লেখ পাওয়া যায় না। এইটুকু পাওয়া যায় যে, একবার যিশুর বাবা-মা তীর্থ করতে বেরিয়ে অল্পবয়সী যিশুকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। তখনকার দিনে পায়ে হেঁটে যেতে হতো, গাড়িঘোড়ার ব্যবস্থা ছিল না। কিছুকাল আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষেও এইরকম ব্যবস্থা ছিল। একটা দল বেঁধে সবাই তীর্থযাত্রায় যেত। সেখানেও তেমনি ছিল। যোশেফরা দর্শনাদির পর যখন ফিরলেন, তখন যিশুর বার বছর বয়স। এর আগের ঘটনার বিবরণ আমরা পাই না। যোশেফ জানতেন তাঁর ছেলে দলের ভিতরেই আছে, কিন্তু ফেরার পথে কিছুদূর এসে দেখেন সে নেই। তখন তার খোঁজ করতে তাঁরা আবার সেই পূর্ববর্তী স্থানে ফিরে গেলেন। গিয়ে দেখেন, অনেক পণ্ডিত বসে তর্ক-বিচার করছেন, আর তাঁদের পুত্র সেখানে বসে তাঁদের সমস্যার সমাধান করছে। এমন ঘটনা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেও আছে—পণ্ডিতসভায় বসে তিনি পণ্ডিতদের দুরূহ তর্কের মীমাংসা করে দিচ্ছেন সাধারণ ভাষায়, আর তাঁরা অবাক হয়ে যাচ্ছেন। ঘটনাগুলির এমন সাদৃশ্য যে, ম্যাক্সমূলার তাঁর জীবনী রচনা করতে গিয়ে বলেছেন, সম্ভবত যিশুখ্রিস্ট সম্বন্ধে অভিজ্ঞ শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যেরা যিশুখ্রিস্টের জীবনের ঘটনাগুলি তাঁদের গুরুর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ ম্যাক্সমূলারের বিশ্বাস, একমাত্র যিশুর জীবনেই এরকম অসাধারণ ঘটনা ঘটতে পারে, আর কারো জীবনে ঘটে না! যাই হোক মা মেরী যিশুকে বললেন: "তুমি কোথায় হারিয়ে গেলে? আমরা তোমায় খুঁজছি।" তখন যিশু বললেন: "Do you not know, I shall be in my Father's House?"—"জান না, আমি আমার বাবার ঘরে থাকব?" মা ভাবলেন, বাবা ছেলেকে খুঁজছেন, আর ছেলে বলে, 'আমি আমার বাবার ঘরে থাকব।' এ যেন তার বাবার ঘর!" স্নেহান্ধ মা-বাবা পুত্রের কথার তাৎপর্য বুঝতে পারলেন না। যোশেফ ছুতোরের কাজ করতেন, তাঁর পড়াশোনা তেমন ছিল না, তবে তিনি ছিলেন সৎপ্রকৃতির। যাই হোক তাঁরা যিশুকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।

যিশু পরিণত বয়সে কোন সাধনা করতেন কিনা, তা জানা যায় না। তবে এইটুকু জানা যায়, একবার তিনি দীক্ষিত হওয়ার জন্য John the Baptist নামে একজন ধর্মযাজকের কাছে যান, যাঁকে বলা হয় 'Forerunner of Christ'—যিশুর অগ্রগামী। অর্থাৎ তাঁর পরে অবতার আসবেন। যিশু

তাঁর কাছে দীক্ষিত হতে চাইলে জন বললেনঃ "আমি তোমাকে কি দীক্ষা দেব? আমারই দরকার তোমার কাছে দীক্ষিত হওয়ার যোগ্য।" বললেনঃ "The latchet of who's shoes I am not worthy to stoop down and unloose."—"যাঁর জুতোর ফিতে খুলে দেওয়ার যোগ্যতাও আমার নেই, তেমন ব্যক্তি এসেছেন আমার কাছে দীক্ষা নেওয়ার জন্য।" যিশু বললেন ঃ "না, না, শাস্ত্রে আছে দীক্ষার প্রয়োজন, অতএব সেই বিধান অনুসারেই চলা দরকার। আপনি আমাকে দীক্ষিত করুন।" তখন তিনি দীক্ষা দিলেন। John the Baptist শিষ্যদের বলেছিলেন ঃ "আমি তোমাদের পবিত্র বারি দিয়ে দীক্ষা দিই, এরপর যিনি আসছেন তিনি তোমাদের spirit বা ধর্মতত্ত্ব দিয়ে দীক্ষিত করবেন। তোমাদের ভিতরে সেই তত্ত্ব আবির্ভূত হবে।"

দীক্ষিত হওয়ার পর যিশু বললেনঃ "Holy Ghost came down upon her and she conceived." বিশুদ্ধ আত্মা যাকে বলা হয়েছে, তিনিই 'Holy Ghost'। একটি ঘুঘুর রূপ নিয়ে তিনি যিশুর মাথায় এসে পড়েছিলেন। এটা একটা প্রতীক। প্রতীকের অর্থ—দীক্ষাগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভিতরে যেন ভগবৎ তত্ত্ব প্রতিভাত হলো।



শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা সম্বন্ধে লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ অনেক চেষ্টা করে তদানীন্তন ব্যক্তিদের কাছ থেকে অনেক তথ্য পেয়েছেন। অবশ্য অধিকাংশ তথ্যই আমাদের কাছে এখনো অনাবিষ্কৃত রয়েছে এবং থাকবেও। কিন্তু যিশুখ্রিস্টের সমসাময়িক কেউ এভাবে তাঁর সাধন-জীবনের ঘটনাগুলি সংগ্রহ করেননি। তার কারণ, বাইবেল লেখা হয় যিশুখ্রিস্টের অন্তর্ধানের অনেক পরে। অতদিন পর সেই ঘটনাগুলিকে সংগ্রহ করবার কোন উপায় ছিল না। আর যে-পরিবেশে যিশুখ্রিস্ট জন্মেছিলেন, সেই পরিবেশে খ্রিস্টের ধর্মজীবনের প্রভাব বা রহস্য বুঝতে পারা তখনকার মানুষের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং তাঁর সাধনজীবনের কোন সংবাদ আমরা পাই না। এইটুকু শুধু পাওয়া যায় যে, তিনি দীর্ঘদিন উপবাসী থেকে একটি পাহাড়ের চূড়ায় বসে সাধনা করেছিলেন। তিনি নাকি চল্লিশদিন উপবাস করেছিলেন এবং সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন। চল্লিশদিন উপবাসী থাকা সম্ভব কিনা সে-প্রশ্ন উত্থাপন করা নিরর্থক, কারণ তার সমাধান আমরা এখন পাব না। তবে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোকে এইটুকু বুঝতে পারি যে, সেইসময় যিশুর দেহজ্ঞান প্রায় লোপ হয়েছিল। কাজেই আহার প্রভৃতি দৈহিক প্রয়োজনের কথা তাঁর মনে আসেনি। এই চল্লিশদিন উপবাসের পর তাঁর 'day of illumination, day of enlightenment' অর্থাৎ তাঁর কাছে ভগবানের আবির্ভাবের সেই শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হলো। তার আগে চলেছিল নানারকম পরীক্ষা।

সমগ্র বাইবেলের ভিতরে শয়তানদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে, যা হিন্দুশাস্ত্রে কোথাও পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ এবং জৈনদের ভিতরে কিছু কিছু পাওয়া যায়। বৌদ্ধশাস্ত্রে যাকে 'মার' বলা হয়েছে, এখানে তাকে 'শয়তান' বলেছে। হিন্দুধর্মশাস্ত্রে 'মার' মানে কামদেব, অর্থাৎ কামের অধিপতি। ষড়রিপুর অন্যতম 'কাম' মানে কামনা। কামনার সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভই হলো ধর্মজীবনের শেষকথা। সেই মার বা শয়তান এসে যিশুকে পরীক্ষা করল। বলল ঃ "দেখ তুমি যে নিজেকে ঈশ্বরপুত্র বলে মনে কর, তা যদি সত্যি হয় তাহলে এই পাথরের টুকরোগুলোকে রুটি কর দেখি।" যিশু বললেন ঃ "রুটি খেয়েই কি মানুষ বাঁচে? 'Man cannot live by bread alone.' ভগবানের বাণী, তার আস্বাদন—এর দ্বারাই মানুষ বেঁচে থাকে।" অর্থাৎ দেহের প্রয়োজন পূরণের আকাঙ্ক্ষা তাঁকে ধর্মজীবন থেকে বিচ্যুত করতে পারল না। তারপর শয়তান বলল ঃ "শাস্ত্রে আছে, ঈশ্বরপুত্রকে রক্ষা করতে ঈশ্বরের দূতেরা তাঁর চারদিক বেষ্টন করে রাখেন। সুতরাং তুমি পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপ দাও। যদি দেবদূতেরা তোমাকে রক্ষা করেন তাহলে প্রমাণিত হবে যে, তুমি ঈশ্বরপুত্র।" যিশু বললেন ঃ "শাস্ত্রে এ-ও আছে, ভগবানকে পরীক্ষা করো না। যার বিশ্বাস স্বতঃস্ফূর্ত, তার আর ভগবানকে পরীক্ষা করার দরকার কি? সন্দেহ থাকলে পরীক্ষার প্রয়োজন থাকে। এখানে সন্দেহ নেই।" শয়তান দেখল, এতেও কাজ হলো না। তখন শেষকথা বলল ঃ "পৃথিবীর দিকে চেয়ে দেখ—এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের সমস্ত ঐশ্বর্য আমি তোমাকে দেব। তুমি ভগবানকে ছেড়ে আমার উপাসনা কর।" এই প্রসঙ্গে আমরা নচিকেতার কথা স্মরণ করি। নচিকেতাকে যম ঠিক এই বলেই প্রলুব্ধ করেছিলেন ঃ

"শতায়ুষঃ পুত্রপৌত্রান্ বৃণীষ্ব, বহূন্ পশূন্ হস্তিহিরণ্যমশ্বান্।
ভূমের্মহদায়তনং বৃণীষ্ব, স্বয়ং চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি।।
এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং, বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাং চ।
মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি, কামানাং ত্বা কামভাজং করোমি।।
যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্যলোকে
সর্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব।"

(কঠ উপনিষদ্, ১।১।২৩-২৫)

—তুমি শতায়ু পুত্র ও পৌত্রসমূহ এবং বহু গবাদি পশু, হস্তী, অশ্ব, স্বর্ণ ও এই পৃথিবীতে বিশাল রাজ্য প্রার্থনা কর। অধিকন্তু তুমি নিজে যত বছর জীবনধারণ করতে চাও, ততকাল জীবিত থাক। যদি এর তুল্য অন্য কোন বর পেতে ইচ্ছা কর, চিরজীবন এবং সুবর্ণ ও রত্নাদি, তাও প্রার্থনা কর। হে নচিকেতা, তুমি বিশাল ভূভাগের অধিপতি হও; আমি তোমাকে কাম্যবস্তুসমূহে যথেচ্ছ ভোগের ক্ষমতা প্রদান করছি। পৃথিবীতে যা যা কাম্য এবং দুর্লভ, তার সমস্তই যথেচ্ছ প্রার্থনা কর।

যমের এই প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন নচিকেতা। যিশুও আর সহ্য করতে পারলেন না, বললেন : "Satan, get thee hence."—এখান থেকে দূর হ্‌ শয়তান। *ঐশ্বর্য তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। এখানেই তাঁর শয়তানের ওপর* বিজয়। তারপর তিনি ঐ ভাবে মগ্ন হয়ে কিছুদিন রইলেন। এইরকম ঘটনা বুদ্ধের জীবনীতেও উল্লিখিত আছে। মারের সঙ্গে যুদ্ধ, ধর্মযুদ্ধ ও আধ্যাত্মিক যুদ্ধে বুদ্ধ জয়ী হয়েছিলেন। তারপরে আছে, তিনি কিছুদিন গভীর সমাধিতে মগ্ন হয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর বাহ্যজগতের চেতনা এল। জ্ঞান ফিরে এলে জগতের দুঃখ তাঁর হৃদয়কে আলোড়িত করতে লাগল। ভাবলেন : আহা, যে অপূর্ব সম্পদ আমাকে একেবারে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে, তার থেকে জগতের লোক বঞ্চিত হবে! মানুষের দুঃখ তাঁর হৃদয়কে একেবারে অভিভূত করে দিল। তিনি তখন এই অজ্ঞান-দুঃখী জগতের উদ্ধারের জন্য বের হলেন। এই তাঁর 'মিশন'। মারের বিরুদ্ধে তাঁর জয়যাত্রা আরম্ভ হলো। খ্রিস্টের সঙ্গে এখানে তাঁর অপূর্ব সাদৃশ্য। সমাধির সুখে আচ্ছন্ন হয়ে তিনি জীবনটা শেষ করলেন না। কারণ, তাঁর আসা শুধু আধ্যাত্মিক সুখ আস্বাদন করার জন্য নয়, জগতের মানুষকে আত্যন্তিক দুঃখ, বেদনা ও দৈন্য থেকে উদ্ধার করার জন্য। কাজেই তিনি নিজে আধ্যাত্মিক আনন্দে বা সমাধিসুখে মগ্ন না থেকে জগতের কল্যাণের জন্য, জগৎকে এই আনন্দের স্বাদ দেওয়ার জন্য পথে নামলেন।



ঠাকুরের সেই চার বন্ধুর গল্পের মতো—"প্রাচীরের ওপারে অনন্ত মাঠ। চারজন বন্ধু প্রাচীরের ওপারে কি আছে দেখতে চেষ্টা করলে। এক একজন প্রাচীরের ওপরে উঠে ঐ মাঠ দর্শন করে হা হা করে হেসে অপর পারে পড়ে যেতে লাগল। তিনজন কোন খপর দিলে না। একজন শুধু খপর দিল। তার ব্রহ্মজ্ঞানের পরেও শরীর রইল, লোকশিক্ষার জন্য। যেমন অবতার আদির।" ('কথামৃত', ৫।১২।৫) *ঠিক সেইরকম জগতের দুঃখ* শ্রীরামকৃষ্ণকে সমাধির সুখ থেকে টেনে জগতের দিকে নিয়ে এসেছিল। তিনি জগতের দুঃখ দূর করার জন্য তাঁর জীবন সমর্পণ করেছিলেন।

যিশুখ্রিস্টেরও ঠিক তাই হলো। তিনিও পথে বের হলেন, নানা জায়গায় ভগবানের কথা প্রচার করতে লাগলেন। সেই বাণী ত্যাগের, ভক্তির, ভগবানের জন্য সর্বস্ব সমর্পণের বাণী। তাঁর উপদেশ ও বাণীতে সন্ন্যাসের ভাব অনেকখানি। উদ্দেশ্য—মানুষকে আর যেন সংসারের সুখ-দুঃখে মগ্ন থাকতে না হয়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, সেই প্রচারকার্যটি যেভাবে চিত্রিত হয়েছে তাতে বেশির ভাগই অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডে ভরপুর। কোথায় তিনি দুখানা পাউরুটি আর দুটো মাছ দিয়ে পাঁচহাজার লোককে খাওয়ালেন, কোথায় তিনি একটা বিয়ের ভোজে জলকে দ্রাক্ষারস করে মানুষের প্রয়োজন মেটালেন ইত্যাদি বহু ঘটনার উল্লেখ আছে। এবং একজায়গায় আছে—'Sermon on the Mount' অর্থাৎ *শৈল উপদেশ। সেখানে দেখি, তিনি একটি পাহাড়ের চূড়ায়* উঠছেন। মানুষ তাঁর অনুগামী হয়ে পিছনে পিছনে যাচ্ছে। কত অসুস্থকে তিনি সুস্থ করছেন। তাদের রোগ বেশির ভাগ দৈহিক এবং মানসিক। আধ্যাত্মিক যে রোগ, তা দূর করার কথা সেখানে কম। কেউ তাঁকে ছোঁয়া মাত্রই সেরে গেল, কোন মৃতকে তিনি ডাকলেন 'ওঠ' বলে, সে উঠে পড়ল। কোন জায়গায় পঙ্গুকে বললেন—'চল', সে চলতে আরম্ভ করল। এরকম বহু ঘটনার সমাবেশ সেখানে। ঘটনাগুলি অলৌকিকতায় পূর্ণ হলেও এর ভিতরের মূল কথাটি হলো মানুষের সেবা। সেবাটি হয়তো স্থূলজগতে দেখানো হয়েছে। সেটি বাদ দিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে, তিনি সবরকম অভাবই পূর্ণ করার চেষ্টা করেছেন। কতকগুলি ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াই যদি তিনি করতেন, তাহলে জগতে এত বড় একটা আধ্যাত্মিক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না। সকলেই যে তাঁর এই অলৌকিকতায় মুগ্ধ হয়েছেন তা তো নয়। যদিও এই অলৌকিকতাগুলি বাইবেলের প্রতি পৃষ্ঠায় অঙ্কিত এবং আমাদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, তা যেন সত্যকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

যাই হোক, সেই পাহাড়চূড়ায় তিনি বহু উপদেশ দিয়েছেন, যেগুলি অমূল্য এবং তার ভাষাও এত সাবলীল ও স্বচ্ছ যে, যেসব সম্প্রদায়ের লোকের ভিতরে তিনি প্রচার করছিলেন তাদেরও সহজবোধ্য। তারা অত্যন্ত সাধারণ লোক। লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা সেখানে খুব কম। কাজেই সেই দৃষ্টিতেই তারা দেখেছিল। ভগবানের কথা প্রচার করার জন্য যিশুখ্রিস্টকে বহু অবিশ্বাসীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে হয়েছে এবং তার ভিতর দিয়ে তিনি সকলের বুদ্ধিকে ধীরে ধীরে সত্যের দিকে, ভগবানের দিকে আকর্ষণ করেছেন।

অনেক জায়গায় তাঁর অনেক উপদেশ আছে, যেগুলি বর্তমান কালেও অমূল্য। তিনি কতকগুলি সাধারণ কথা বলেছেন। কিন্তু তাতেই আবদ্ধ থাকলে চলবে না, আরো এগিয়ে যেতে হবে। যেমন ঐদেশেই একটা কথা প্রচলিত ছিল—"An eye for an eye, a tooth for a tooth."—কেউ তোমার একটা চোখ উপড়ে দিলে তুমি তার একটা চোখ উপড়ে দিতে পার, কেউ তোমার একটা দাঁত ভাঙলে তুমি তার একটা দাঁত ভাঙতে পার। অর্থাৎ যে তোমার ক্ষতি করবে, তার ওপর সেইরকম প্রতিশোধ নেবে। কিন্তু যিশু বললেন : "ও কথা নয়, আমি চাই অপ্রতিকার—কেউ তোমার ক্ষতি করলে তুমি তার উপকার করতে চেষ্টা কর। কেউ তোমার ডান গালে যদি চড় মারে, তুমি তাকে বাঁ গাল

এগিয়ে দেবে।" তখনকার দিনে রোমান সৈনিকেরা মোট বইবার জন্য রাস্তা থেকে লোক ধরে মোট চাপিয়ে দিত। যিশু বললেন ঃ "এরকম করে তোমাকে যদি একমাইল বোঝা নিয়ে যেতে বলে তুমি দু-মাইল যেও তার সঙ্গে। প্রতিশোধ নিও না। কোন হিংসা, দ্বেষ ভাব মনে রেখ না।" আচার্য শঙ্কর বলেছেন ঃ "সহনং সর্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্বকম্/ চিন্তা-বিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে।" (বিবেকচূড়ামণি, ২৪) তিতিক্ষার এই সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যাটি বাইবেলে বহু জায়গায় আছে। তোমাদের যে ভালবাসে তাকে তোমরা ভালবাসবে, সে আর বড় কথা কি? যে তোমাদের ঘৃণা করে তাকে যদি ভালবাস, তাহলে বোঝা যাবে, তোমরা প্রকৃত ধর্মজীবনে এসেছ। কাজেই কেবল নীতিপরায়ণতায় ধর্ম যেন সীমিত না থাকে, তার চেয়ে যেন বেশি হয়। ন্যায় বস্তুটি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে উপযোগী, কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে তাকে অতিক্রম করে অনেক দূর যেতে হয়। ঠাকুর বলছেন, কেউ অন্যায় করলে তুমি তাকে ছোবল মেরো না, বড়জোর ফোঁস করতে পার। কিন্তু যে ত্যাগী হবে, তার ফোঁস করাও চলবে না। নিজের যে হানি হচ্ছে, তা থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টাও করবে না।



এই আদর্শই যিশু প্রচার করেছেন। সর্বত্র প্রেমের কথা প্রচার করেছেন। আনুষ্ঠানিক ধর্মের ওপরে তিনি আঘাত করেননি। কিন্তু বলেছেন, একে ছাড়িয়ে যেতে হবে। বারবার একথা বলেছেন। আরো বলেছেন, লোক-দেখানো ধর্ম ত্যাগ করতে হবে। আমরাও ভাবি—ধর্মজীবন যাপন করতে হলে তসর বা রেশমের কাপড় পড়তে হবে, তিলক-টিলক কেটে যেন একটি চিতাবাঘের মতো হতে হবে। মালা, তুলসী, কণ্ঠি, রুদ্রাক্ষ, স্ফটিক, জটা ইত্যাদি যতরকমের কল্পনা করতে পারি সব দিয়ে ভূষিত হতে হবে। যিশুখ্রিস্ট বললেন ঃ "এতেই কি হবে? ধর্মজীবন এমনভাবে যাপন কর, যাতে কেউ টের না পায়। তুমি উপবাস করছ তা জাহির করো না লোকের কাছে। এমন দেখাও যেন তুমি কিছু কর না।" ঠাকুর যেমন বলতেন ঃ "যে-ভক্তের সত্ত্বগুণ আছে, সে ধ্যান করে অতি গোপনে। সে হয়তো মশারির ভিতর ধ্যান করে, সবাই ভাবছে ইনি শুয়ে আছেন, বুঝি রাত্রে ঘুম হয় নাই, তাই উঠতে দেরি হচ্ছে।" (কথামৃত, ১।৩।২) যিশু আরো বলছেন, যখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে, ঘরের এককোণে গিয়ে ধ্যান-ভজন করবে। "Pray in secret so that thy father in Heaven may reward you openly in Heaven."—গোপনে তাঁর চিন্তা কর, যাতে তিনি তোমাকে সকলের সমক্ষে পুরস্কৃত করেন। আসল কথা, লোক-দেখানো ধর্মকে পরিত্যাগ করতে হবে। তখনকার দিনের ধর্মধ্বজীরা একবার যিশুর কাছে নালিশ করছেন ঃ "তোমার শিষ্যদের কথা বলো না। উপবাসের দিনে শস্যক্ষেত্রে যাচ্ছে আর ঐ শস্য ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। এ কি ধর্ম হলো?" যিশু হেসে বললেন ঃ "দেখ যতক্ষণ বিয়েবাড়িতে বর থাকে ততক্ষণ হাসি তামাসা মজা থাকে। বর চলে গেলে তারপর কাঁদার দিন আসে। এখন কেউ কাঁদবে না, এখন তারা হাসবে। এখন তারা বরের সঙ্গে বরযাত্রী তো।" অর্থাৎ স্বয়ং ঈশ্বরাবতার এখন তাঁদের মধ্যে আবির্ভূত, এখন তাঁদের কাঁদবার দিন নয়, আনন্দময় ভগবানের সঙ্গে থেকে আনন্দ করার দিন। কেন উপোস করে মরবে? জানি না, যাদের তিনি একথা বললেন, তারা বুঝল কিনা! এরকম অনেক কথাই আছে, যেখানে যিশুখ্রিস্টকে বিরোধী পক্ষের অনেক কথা শুনতে, তার জবাব দিতে হয়েছে। একদিন একজন এসে বললে ঃ "আমরা কি ট্যাক্স দেব?" তখন রোমের সম্রাটকে ট্যাক্স দিতে হতো। এখন যদি তিনি বলেন ট্যাক্স দিতে হবে, তাহলে ইহুদীরা তাঁর বিপক্ষে যাবে, আর যদি বলেন দিতে হবে না, তাহলে সম্রাট তাঁকে শাস্তি দেবে। যিশু কি জবাব দেবেন? বললেন ঃ "আচ্ছা তোমরা কি দিয়ে ট্যাক্স দাও দেখি।" তখন একজন একটি মুদ্রা নিয়ে এল, তাতে রোম-সম্রাট সিজারের মূর্তি মুদ্রিত। লেখা আছে—"Give unto Caeser, the things that are Caeser's, give unto God the things that are God's."—যেটা সিজারের তা সিজারকে দাও, যেটা ভগবানের তা ভগবানকে দাও। এর ওপরে আর কথা নেই। যিশু বললেন ঃ "তোমরা ঐহিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করছ, কিভাবে তার ব্যবহার হবে তাই ভাবছ, কিন্তু এগুলি তো ভাববার কথা নয়। ভগবানকে দেবে ভক্তি, ভালবাসা ও শুদ্ধ জীবন। ব্যবহারিক জীবনে কি করতে হবে, তাতে আমাদের কি প্রয়োজন?"

যিশুর জীবনে অনেক কাহিনী আছে। এখানে সব বলার অবকাশ নেই। তাঁর চরণে প্রার্থনা জানাই, তাঁর ত্যাগের বাণী, ভক্তিনিষ্ঠা ও সেবার ভাব যেন আমাদের জীবনে সার্থক হয়।* ❑

---

* গত ২৪ ডিসেম্বর ১৯৭৮ তারিখে প্রদত্ত পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের এই ভাষণটি তাঁর সচিব সেবক স্বামী নিত্যমুক্তানন্দজীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। ভাষণটির স্থান জানা যায়নি।—সম্পাদক

পাতঞ্জল-যোগসূত্র

ব্যাখ্যাতা ঃ স্বামী প্রেমেশানন্দ

অনুলিখন ঃ স্বামী সুহিতানন্দ

সম্পাদনা ঃ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

সাধনপাদ

বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্।।৩৩।।

যোগের প্রতিবন্ধক চিন্তা উপস্থিত হইলে উহার বিপরীত চিন্তা করিতে হয়।

বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভক্রোধমোহপূর্বকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্।।৩৪।।

যোগের প্রতিবন্ধক হিংসা প্রভৃতি কর্ম নিজের দ্বারা কৃত, কারিত বা অনুমোদিত। উহাদের কারণ লোভ, ক্রোধ বা মোহ—তাহা অল্প, মধ্যম বা অধিক পরিমাণে হইলেও ঐ কর্মের ফল অনন্ত অজ্ঞান ও দুঃখ। এইরূপ চিন্তাই প্রতিপক্ষভাবনা।

মন্তব্য ঃ যম, নিয়ম সাধন করিবার সময় কোথাও কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে খুব মনোযোগের সহিত বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। এইসব ব্রতপালনে সামান্য ত্রুটি হইলে ভয়ানক অবনতির সম্ভাবনা এবং দুঃখ-কষ্ট অবশ্যম্ভাবী। এইসকল সাধন করিতে কষ্ট বা অসুবিধা সহ্য করিতে হইলেও ইহার ফলে যে জীবন সুখময় হইয়া উঠিবে, একটু বিচার করিলেই তাহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়।

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ।।৩৫।।

যাঁহার অন্তরে অহিংসার ভাব প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার সান্নিধ্যে আসিলে অপরের বৈরীভাব নষ্ট হইয়া যায়।

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বম্।।৩৬।।

যাঁহার অন্তরে সত্য প্রতিষ্ঠিত তিনি কর্ম না করিয়াও নিজের জন্য বা অপরের জন্য কর্মের ফল লাভ করিতে পারেন।

অস্তেয়প্রতিষ্ঠায়াং সর্বরত্নোপস্থানম্।।৩৭।।

অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগীর নিকট সমুদয় ধনরত্ন আসিয়া উপস্থিত হয়।

ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ।।৩৮।।

ব্রহ্মচর্য প্রতিষ্ঠা হইলে বীর্যলাভ হয়।

অপরিগ্রহস্থৈর্যে জন্মকথন্তাসংবোধঃ।।৩৯।।

অপরিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলে জন্মান্তরের কথা স্মরণ হয়।

মন্তব্য ঃ যম-নিয়মের সাধনাসমূহ মানুষকে যে কত উন্নত করিতে পারে তাহা অনেকস্থলেই মহাপুরুষদের জীবনে দেখা গিয়াছে। এই সিদ্ধান্তগুলিতে বিশ্বাস হইলে সাধনপথের সকল বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া সাধক উৎসাহের সহিত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারেন।

ধীমান সাধক মন হইতে যখন হিংসার ভাব একেবারে নির্মূল করিয়া ফেলেন, তখন অন্য কোন জীব তাঁহার নিকট আসিলে যোগীর মনঃশক্তির প্রভাবে তাহার মনে হিংসার ভাব উঠিতে পারে না। মহাপ্রভুর জীবনে ইহার উদাহরণ আছে। সত্যরক্ষার সাধনায় বুদ্ধি সম্পূর্ণ স্থির হইয়া গেলে যোগীর প্রত্যেকটি কথা কাজে পরিণত হয়। উদাহরণ—শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ দিয়া রক্ত উঠা। 'নিজের উপার্জনে জীবনধারণ করিব, অন্যের অজ্ঞাতে তাঁহার কোন জিনিস গ্রহণ করিব না'—এই সাধনায় যিনি সিদ্ধিলাভ করেন তাঁহার মনে যদি কোন বস্তুর প্রয়োজনবোধ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহা যতই মূল্যবান হউক না কেন ঘটনাচক্রে সেই বস্তু তাঁহার হস্তগত হইয়া যায়।

ব্রহ্মচর্য—মানবজীবনের সকল কার্যে সফলতালাভের একমাত্র উপায় শক্তি ও তদনুরূপ উৎসাহ। বীর্যধারণ করিলে শরীর-মনে যে সংযমশক্তির প্রকাশ হয় তাহা বহির্জগতেও সকল বস্তুকে আয়ত্তাধীন করিতে পারে। বীর্যধারণ করিতে হইলে অনন্ত জন্মের পাশব সংস্কারের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে হইবে। জগদতীত আনন্দময় চিৎ-সত্তার প্রতি মনের আকর্ষণ অনুভব না করিলে বীর্যধারণ-শক্তি আসিতে পারে না।

অপরিগ্রহ—অপরিগ্রহ সাধনায় মন খুব সবল ও স্বচ্ছ হয়। যোগীর শুদ্ধ মনে তখন পূর্বজন্মের স্মৃতি কখনো কখনো প্রকাশিত হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যৎ জন্মের কথাও তিনি জানিতে পারেন।

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈরসংসর্গঃ।।৪০।।

শৌচ প্রতিষ্ঠিত হইলে নিজের প্রতি ঘৃণা উৎপন্ন হয় এবং অপরের সঙ্গলাভ করিতে উৎসাহ থাকে না।

মন্তব্য ঃ শৌচসাধনা অধ্যাত্মসাধনার একটি অপরিহার্য ব্রত। শৌচ সম্বন্ধে রুচি মার্জিত হইলে বুঝিতে কোন চেষ্টার দরকার হয় না যে, আমাদের এই দেহটি একটি মলভাণ্ড, এমনকি মনেও কখনো কখনো মলিনতা দেখা যায়। তাহার ফলে জন্মধারণের হেতু বাসনা ত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি মনে জাগে। দেহ অত্যন্ত অপবিত্র—যাহার এই জ্ঞান নাই, সে এই দেহকে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিবার জন্য এবং নানাপ্রকার দেহভোগ করিবার জন্য কত অর্থহীন উদ্যম করিয়া কষ্ট পায়, তাহা আমরা সর্বদা দেখিতে পাই।

দেহমাত্রই অত্যন্ত অশুচি বস্তু—এই জ্ঞান হইলে পরদেহ সম্ভোগ, পরদেহে প্রীতি—যাহা সংসারের প্রধানতম আকর্ষণ, তাহা দূর হইয়া যায়।

সত্ত্বশুদ্ধি-সৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয়জয়াত্মদর্শনযোগ্যত্বানি।।৪১।।

শৌচ হইতে সত্ত্বশুদ্ধি, মনের প্রফুল্লতা, একাগ্রতা, ইন্দ্রিয়জয় ও আত্মদর্শনের যোগ্যতালাভ হয়।

মন্তব্য ঃ মন হইতে অশুচিভাব দূর হইলে সত্ত্বগুণের বিকাশ হয়, তাহার ফলে মনে সর্বদা শুদ্ধ চিন্তা উঠে এবং মন সর্বদা প্রসন্ন থাকে। যে-বিষয়ে মন দেওয়া যায়, মন তাহাতেই একাগ্র হয়। মন স্থির থাকে বলিয়া সেই সাধক ইন্দ্রিয়জয় করিতে পারেন। সুতরাং শৌচসাধনার ফলে আত্মজ্ঞানলাভের পথ খুলিয়া যায়।

সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ।।৪২।।

সন্তোষ হইতে পরম সুখ লাভ হয়।

মন্তব্য ঃ সন্তোষ-সাধনায় মন অভ্যস্ত হইলে তাহা সর্বদা স্থির হইয়া থাকে, তাহার ফলে শুদ্ধবুদ্ধির বিকাশ হয়। শুদ্ধবুদ্ধি আত্মজ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়।

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিরশুদ্ধিক্ষয়াত্তপসঃ।।৪৩।।

তপস্যার দ্বারা অশুদ্ধি নাশ হইলে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের নানাপ্রকার শক্তি আসে।

মন্তব্য ঃ তপঃসিদ্ধি—প্রকৃতির মধ্যে যে সুখ-দুঃখ দুইটি ভাব সর্বদা কাজ করিতেছে তাহাতে অবিচলিত থাকিবার জন্যই তপশ্চর্যা করিতে হয়। তাহার ফলে দেহকে এবং ইন্দ্রিয়কে সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীনভাবে পরিচালিত করা যায়। যেমন—দীর্ঘকাল উপবাস করিয়া থাকিবার শক্তি, শীত-গ্রীষ্মাদি অসুবিধা অগ্রাহ্য করিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করা, নিন্দা-প্রশংসা-অপমান অগ্রাহ্য করা ইত্যাদি।

স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ।।৪৪।।

মন্ত্রাদির (জপের) অভ্যাসের দ্বারা ইষ্টদেবতার দর্শন লাভ হয়।

মন্তব্য ঃ স্বাধ্যায় বলিতে ইষ্টদেবতার বীজ ও নাম বুঝাইতেছে। ভক্তরা বলেন, নাম ও নামী অভেদ। ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে যে ইষ্ট সাক্ষাৎকার হয়, তাহা সর্বজনবিদিত।

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ।।৪৫।।

ঈশ্বর-প্রণিধানের দ্বারা সমাধিলাভ হয়।

মন্তব্য ঃ ভগবানের দর্শন লাভ করিতে হইলে তাঁহার চিন্তায় তন্ময় হওয়া উচিত। ইহাই ঈশ্বর-প্রণিধান। তন্ময়তাই সমাধির একমাত্র কারণ। তন্ময়তার অপর নাম সমাধি।

স্থিরসুখমাসনম্।।৪৬।।

যে-অবস্থায় অনেকক্ষণ স্থিরভাবে ও সুখে বসা যায়, তাহার নাম আসন।

প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্।।৪৭।।

শরীরের প্রতি অভিমান ত্যাগ এবং অনন্তের চিন্তার দ্বারা আসন স্থির ও সুখকর হয়।

ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ।।৪৮।।

এইভাবে আসন জয় করিতে পারিলে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব আর অভিভূত করিতে পারে না।

মন্তব্য ঃ আমাদের দশটি ইন্দ্রিয়ের সেবা করাই মনের প্রধান কাজ। পৃথিবীতে চিন্তাশীল লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম। তাঁহারা ছাড়া আর সকলেই কর্মেন্দ্রিয়-জ্ঞানেন্দ্রিয় লইয়া ব্যস্ত থাকেন। ইন্দ্রিয়ের সেবা হইতে মনকে বিরত করিতে হইলে আসন করিয়া বসার কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। হঠযোগীরা নানাপ্রকার আসনের সাহায্যে ইন্দ্রিয় ও মনকে আয়ত্তাধীনে আনিতে পারেন। স্থির হইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিলে মনকে কোন একটি চিন্তায় নিযুক্ত করিবার সুবিধা হয়। সেইজন্য হিন্দুদের উপাসনার প্রধান উপায় আসন অভ্যাস করা।

চঞ্চল মনকে স্থির করিবার প্রথম উপায় এই আসন, যাহা অভ্যাস করিতে গিয়া প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধা বোধ হয়। আসন করিয়া বসিয়া বিরাট আকাশ অথবা অনন্ত সৃষ্টি সম্বন্ধে যাহার পক্ষে যতটুকু সম্ভব চিন্তা করিবার চেষ্টা করিলে আসন সহজসাধ্য হয়। তাহার ফলে বাহ্যস্পর্শের (শীতোষ্ণাদি) ব্যাঘাত প্রতিহত করা যায়।

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।।৪৯।।

আসন জয়ের পর শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি সংযত করাকে প্রাণায়াম বলে।

বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তিঃ দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ।।৫০।।

ক্রিয়াভেদে প্রাণায়াম তিনপ্রকার—বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তর বৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তি। দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা নিয়মিত এবং দীর্ঘ ও সূক্ষ্মরূপে ইহাদেরও নানাপ্রকার ভেদ আছে।

বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ।।৫১।।

চতুর্থ প্রকার প্রাণায়ামে বাহ্য ও আভ্যন্তর বিষয়ক চিন্তার দ্বারা প্রাণ নিরুদ্ধ হয়।

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্।।৫২।।

এই প্রাণায়ামের দ্বারা চিত্তের আবরণ নষ্ট হয়।

ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ।।৫৩।।

তখন ধারণা বিষয়ে মনের যোগ্যতালাভ হয়।

মন্তব্য ঃ আসন করিয়া বসিবার অভ্যাস করার পর মনকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত করিবার দ্বিতীয় উপায় প্রাণায়াম। প্রাণায়াম সম্বন্ধে স্বামীজী 'রাজযোগ' গ্রন্থে যেসকল উপদেশ দিয়াছেন তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়া অভ্যাস করিলে সফলতা লাভ সুনিশ্চিত হইবে।

দেহের প্রাণশক্তিকে সংযত করিতে পারিলে দেহের ও মনের আলস্য, জড়তা প্রভৃতি তামসিক গুণ, লালসা ও স্পৃহার বশে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য প্রভৃতি রাজসিক গুণ সংযত হয়। তাহার ফলে মন-বুদ্ধিতে জ্ঞানের বিকাশ হয় এবং ধ্যানের বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা জাগিয়া উঠে।

স্বস্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্ত-স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ।।৫৪।।

ইন্দ্রিয়গুলি যখন নিজ নিজ বিষয় ত্যাগ করিয়া চিত্তের স্বরূপ গ্রহণ করে তখন তাহাকে প্রত্যাহার বলে।

ততঃ পরমা বশ্যতেন্দ্রিয়াণাম্।।৫৫।।

প্রত্যাহার হইতে ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হয়।

মন্তব্য ঃ মন যখন কোন এক বিষয়ে চিন্তায় রত থাকে, তখন তাহাকে ঐ বিষয় হইতে টানিয়া আনিয়া অন্য বিষয়ে নিযুক্ত করার নাম প্রত্যাহার। সংসারের কাজকর্ম করিতে আমরা সর্বদাই মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া থাকি। যেমন, এক ভদ্রলোকের বাড়িতে পুত্রসন্তানের খুব অসুখ। তিনি শিক্ষকতা করিয়া বা কেরানিগিরি করিয়া জীবিকানির্বাহ করেন। কাজের সময় তাঁহাকে বাড়ির চিন্তা হইতে মনকে টানিয়া আনিয়া কর্তব্যকর্মে নিযুক্ত করিতে হয়। প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে প্রত্যাহারের কাজ সর্বদাই লক্ষ্য করা যায়। এই স্বাভাবিক শক্তিটাকে আত্মজ্ঞানের পথে নিয়োজিত করিলেই সফলতা লাভ সম্ভব। যাঁহারা ইচ্ছামত মনকে ব্রহ্ম, আত্মা বা ঈশ্বরের চিন্তায় যখন খুশি যতক্ষণ ইচ্ছা নিযুক্ত রাখিতে পারেন, তাঁহাদের পক্ষে ইন্দ্রিয়জয় করা তো সামান্য কথা, মুক্তিলাভও সহজসাধ্য হইয়া যায়। [ক্রমশ] (নয়)



পৌষ ১৩০৮
ডিসেম্বর ১৯০১

ধর্ম্মের আবশ্যকতা

[স্বামী বিবেকানন্দের মূল ইংরেজী হইতে
ডাক্তার শশিভূষণ ঘোষ কর্ত্তৃক অনূদিত।]

...সকল বিশিষ্ট ধর্ম্মের সংস্থাপকগণ, ভবিষ্যদ্বক্তাগণ বা অবতারগণ যেরূপ মানসিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন, তাহা জাগ্রত বা স্বপ্নাবস্থা নহে, কিন্তু সে অবস্থায় তাঁহারা কতকগুলি অভিনব তত্ত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই তত্ত্ব আধ্যাত্মিক রাজ্য সম্বন্ধীয় বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। আমরা জাগ্রদবস্থায় চতুর্দ্দিকস্থ ঘটনাসকল যেরূপ উপলব্ধি করি, তাঁহারা ততোধিক স্পষ্টভাবে এই সকল উপলব্ধি করিতেন। বর্ত্তমান সমস্ত ধর্ম্মে আমরা এইরূপই দেখিতে পাই।...

সকল ধর্ম্মই এই বিষম কথা বলিতেছে যে, মানব-মন কখন কখন যে কেবল ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করে এরূপ নহে, কিন্তু বিচারশক্তির সীমাও অতিক্রম করে। তখন ইহা এরূপ কতকগুলি তত্ত্বের সম্মুখীন হয় যাহা কখনই ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিত না বা বিচার করিয়া প্রাপ্ত হইতে পারিত না। এই সকল তত্ত্ব পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ। অবশ্য আমাদিগের এই সকল তত্ত্বের সত্যতা সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপিত করিবার বা ন্যায়ের পরীক্ষায় পরীক্ষিত করিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু পৃথিবীতে বর্ত্তমান ধর্ম্মসকল মানবমনের এই শক্তি-বিশেষের সম্বন্ধে এই অধিকার স্থাপন করিয়া থাকেন যে, ইহা ইন্দ্রিয়জ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিতে পারে, বিচার-শক্তির সীমা অতিক্রম করিতে পারে এবং এই শক্তি তাঁহারা যথার্থ ঘটনা বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত করেন।

ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এই তত্ত্বসকল কতদূর সত্য সে প্রশ্নের আলোচনা স্বতন্ত্র রাখিয়া আমরা তাহাদের একটি সাধারণ লক্ষণ দেখিতে পাই। ইহারা সকলেই সূক্ষ্ম তত্ত্ব; পদার্থবিদ্যার স্থূল আবিষ্কারের ন্যায় নহে। এবং সমস্ত উচ্চতর বিশিষ্ট ধর্ম্মসকলে ইহার অদ্বিতীয় সূক্ষ্মতত্ত্বের শুদ্ধরূপ ধারণ করিয়াছে। বর্ত্তমান কালে ও মনের অতীন্দ্রিয় অবস্থার আশ্রয় না লইয়া ধর্ম্মপ্রচারের যে চেষ্টা হইয়াছে তাহাতে প্রাচীন দিগের পুরাতন সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল গ্রহণ করিয়া তাহাদিগের "আদর্শ, একতা, নীতিশাসন" প্রভৃতি বিভিন্ন সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। অতএব এইসকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব যে ইন্দ্রিয়জ্ঞানে বর্ত্তমান নহে ইহাই দেখাইতেছে। আমাদের মধ্যে কেহই আদর্শ-মনুষ্য দেখেন নাই, অথচ আমাদিগকে একটি আদর্শ মনুষ্যে বিশ্বাস করিতে বলা হইতেছে। আমাদের মধ্যে কেহই আজিও আদর্শস্থানীয় পূর্ণ মনুষ্য দেখেন নাই, অথচ সেই আদর্শ ব্যতিরেকে আমরা উন্নতি করিতে অক্ষম। অতএব এইসকল ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মে এই সত্যটি সমুন্নতভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে যে, একটি আদর্শ অদ্বিতীয় সূক্ষ্ম তত্ত্ব আছে—ইহাকে আমাদের সম্মুখে ব্যক্তিরূপে বা ব্যক্তিত্বশূন্য সত্তারূপে বা শাসনরূপে বা বর্ত্তমানতা রূপে বা সারতত্ত্বরূপে উপস্থিত করা হইয়াছে। এই আদর্শে আপনাকে উন্নত করিতে আমরা সতত চেষ্টা করিতেছি।

মনুষ্য যেরূপই হউন, যেখানেই অবস্থিতি করুন, প্রত্যেকেরই এক অনন্ত শক্তির আদর্শ আছে। প্রত্যেক মনুষ্যেরই অনন্ত সুখের এক আদর্শ আছে। আমাদের চারিদিকে যে সকল কার্য্য দেখিতে পাই, সর্ব্বত্র যে কর্ম্মশীলতা দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশই এই অনন্ত শক্তি বা অনন্ত সুখের জন্য চেষ্টাজনিত। কিন্তু অল্প লোকেই ইহা সত্বর বুঝিতে পারেন যে, যদিও তাঁহারা অনন্ত শক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছেন, ইহা ইন্দ্রিয়জ্ঞানপথে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা শীঘ্রই বুঝিতে পারেন যে, অনন্ত সুখ ইন্দ্রিয়জ্ঞানপথে পাওয়া যাইতে পারে না। অর্থাৎ অনন্তকে প্রকাশ করিতে ইন্দ্রিয়জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, দেহ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সান্তের মধ্য দিয়া অনন্তকে প্রকাশ করা অসম্ভব এবং শীঘ্র বা বিলম্বে মনুষ্য অনন্তকে সান্তের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিবার উদ্যম বিসর্জ্জন করিতে শিক্ষা করেন। এই বিসর্জ্জন, এই উদ্যমের ত্যাগই ধর্ম্মনীতির ভিত্তিভূমি। এই ত্যাগ-ভিত্তির উপরই ধর্ম্মনীতি স্থাপিত। এরূপ ধর্ম্মনীতি শাস্ত্র প্রচারিত হয় নাই, ত্যাগ যাহার ভিত্তি ছিল না।

ধর্ম্মনীতি সর্ব্বদাই বলিতেছেন, "আমি নই কিন্তু তুমি", "অহং নহে কিন্তু নাহম্"। ইহাই ইহার স্মরণীয় বাক্য। ধর্ম্মনীতির শাসনসকল বলিতেছে ইন্দ্রিয়জ্ঞানেব মধ্য দিয়া অনন্ত শক্তি বা অনন্ত সুখের চেষ্টা করিতে মনুষ্য যে ভ্রান্ত ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র জ্ঞানকে দৃঢ়াবলম্বন করেন তাহা ত্যাগ করিতে হইবে। নিজেকে সর্বশেষে রাখিয়া অপরকে তোমার অগ্রে স্থাপিত করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়জ্ঞান বলিতেছে, "আমি প্রথম"; ধর্ম্মনীতি বলিতেছে, "আমি নিজেকে সর্বশেষে রাখিব।" এইরূপে ধর্ম্মনীতির সমস্ত শাসন এই ত্যাগের উপর স্থাপিত। ইহা জড়ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের বিনাশসাধন, নির্ম্মাণ নহে। জড়ক্ষেত্রে অনন্ত কখনই প্রস্ফুরিত হইতে পারিবে না, ইহা অসম্ভব, ইহা চিন্তাতীত।

সঙ্কলন : রামেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : স্বামী সর্বগানন্দ

নতুন পৃথিবীর তীর্থাস্বাদন

স্বামী স্মরণানন্দ

[পূর্বানুবৃত্তি]

এই রচনাটি 'স্বামী নির্বাণানন্দ স্মারক রচনা' রূপে প্রকাশিত হলো।—সম্পাদক

বস্টন এবং প্রভিডেন্স

মাসাচুসেটস্ রাজ্যর রাজধানী বস্টন। ২০ তারিখ সকালে স্বামী আত্মরূপানন্দ ডাঃ গৌর দাস ও আমাকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে বস্টন রওনা হলেন। রাস্তার প্রাকৃতিক দৃশ্য সৌন্দর্যপূর্ণ। পশ্চাৎপটে ঘন অরণ্যে ঢাকা অ্যাপালেচিয়ান পর্বতশ্রেণী। দুপুর পৌনে একটায় বস্টনের রামকৃষ্ণ বেদান্ত সোসাইটিতে পৌঁছালাম। আমেরিকার এই উত্তর-পূর্ব ভাগকে বলা হয় 'নিউ ইংল্যাণ্ড'। ইউরোপ থেকে এসে আমেরিকার পূর্ব উপকূলেই প্রথম জনবসতি শুরু হয়েছিল। নিউ ইংল্যাণ্ডকে মনে করা হয় বুদ্ধিজীবীদের জায়গা।



বস্টনে বেদান্ত সোসাইটি

গত শতাব্দীতে এমারসন, থোরো, ওয়াল্ট হুইটম্যান এবং আরো কয়েকজন মনীষীদের 'New England Brahmins' বলে বর্ণনা করা হতো। বর্তমানেও বহু বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় রয়েছে বস্টন শহরে। বিশেষত বস্টন বিশ্ববিদ্যালয় এই শহরের অর্ধেকের বেশি জায়গা জুড়ে অবস্থিত। চার্লস নদী পেরিয়ে কেম্ব্রিজে রয়েছে বিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং M.I.T. (Massachusetts Institute of Technology)।



বস্টনের বক্তৃতাকক্ষে স্বামী সর্বগতানন্দ, লেখক ও স্বামী ত্যাগানন্দ (ভাষণরত)

৮৭ বছরের বৃদ্ধ স্বামী সর্বগতানন্দ বস্টন এবং প্রভিডেন্স কেন্দ্রদ্বয়ের অধ্যক্ষ হয়ে আছেন—স্বামী অখিলানন্দের পর থেকে। প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অখিলানন্দ ১৯৬২ সালে লোকান্তরিত হন। দুবছর আগে যুবা-সন্ন্যাসী স্বামী ত্যাগানন্দ এখানে এসেছেন তাঁর সহকারী হিসাবে। ইতিমধ্যেই তিনি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বক্তৃতার আমন্ত্রণ পেতে শুরু করেছেন।

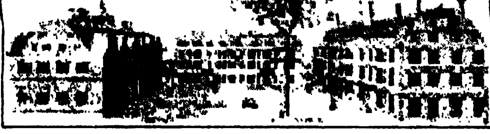
পরের দিন সকালে চিরঞ্জীব সরকার আমাদের গাড়িতে নিয়ে গেলেন প্রভিডেন্স বেদান্ত সোসাইটিতে। আমরা বলতে স্বামী সর্বগতানন্দ, স্বামী ত্যাগানন্দ, ডাঃ গৌর দাস ও আমি। পৌঁছাতে সোয়া একঘণ্টা মাত্র লাগল। সোসাইটি শুরু হয়েছিল ১৯২৮ সালে। সম্প্রতি সোসাইটি পুরনো বাড়িটি বিক্রি করে রাস্তার উলটোদিকে একটি সুন্দর নতুন বাড়ি তৈরি করেছে। বিকালে আমরা আটলাণ্টিকের উপকূলে 'নিউপোর্ট' নামে একটি মনোরম স্থানে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

রোড দ্বীপ রাজ্যের রাজধানী প্রভিডেন্স। এটি আমেরিকার ক্ষুদ্রতম রাজ্য। বস্টনের চেয়ে অনেক ছোট এই শহর। শহরের জমির একটি বড় অংশ ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ। একসময়ে বেশ কিছু শিল্প ও কারখানা এখানে ছিল।



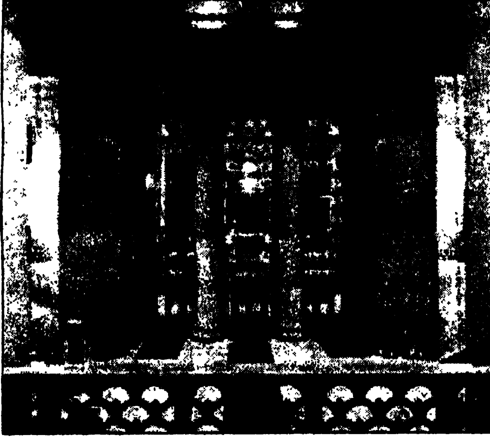
বেদান্ত সোসাইটি, প্রভিডেন্স

২২ জুন কাটল বিনা ব্যস্ততায়। বিকালে লিঙ্কন উডস্ দেখতে গেলাম। অরণ্য ও হ্রদ-সমন্বিত চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য। 'ইউনিভার্সিটি হাইটস্' নামক একটি স্থানেও গেলাম। সেখান থেকে শহরটিকে সুন্দর দেখা যায়।



হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে

পরদিন স্বামী সর্বগতানন্দ সকাল সকাল প্রাতরাশের ব্যবস্থা করেছিলেন। দুপুরের খাওয়াও একটু তাড়াতাড়ি সেরে আমরা ১১টায় রওনা হলাম আইম্যাক্স পর্দায় 'আমেরিকান এভারেস্ট এক্সপিডিশন' দেখার জন্য। প্রদর্শনী শুরু হলো ১২টায় এবং চলল ৫০ মিনিট ধরে। পৃথিবীর উচ্চতম শৃঙ্গে প্রকৃতির কঠিনতম প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হওয়া—সত্যিই এক শিহরণ জাগানো দৃশ্য! বিকালে বস্টনে ফিরে এসে চা, জলখাবার সেরে স্বামী ত্যাগানন্দকে নিয়ে চিরঞ্জীব সরকারের গাড়িতেই গেলাম বিখ্যাত হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং M.I.T. দেখতে। স্বামীজী বিদগ্ধ



মাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউটের 'Infinite Corridor'

অধ্যাপকের সামনে যে হল-এ 'Science & Spirituality' বিষয়ে বক্তৃতা করেছিলেন—সেখানে গেলাম। মিসেস ওলি বুলের বসতবাড়িটিও বাইরে থেকে দেখলাম, কারণ আমাদের অপরিচিত কেউ এখন ঐ বাড়িতে থাকেন। তারপর এখান থেকে আমরা ৪৫ মাইল দূরে মার্শফিল্ডে গেলাম। বস্টন কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে এখানে গ্রীষ্মকালীন অধ্যাত্মশিবির অনুষ্ঠিত হয়। এখানকার জমি মোট ১৫ একর। চারটি কুঠিয়া রয়েছে। ভক্তেরা এখানে গ্রীষ্মের সময় কিছুদিনের জন্য আসেন ও অধ্যাত্মসাধনা করেন।

পরবর্তী দর্শনীয় স্থান—বস্টন বন্দরে অবস্থিত 'বস্টন টি পার্টি'-র জায়গা। এই সম্পর্কিত সংগ্রহশালাটি দেখা হলো না। *সেটি সন্ধ্যা ৬টায় বন্ধ হয়ে যায়।*

'বস্টন টি পার্টি' আমেরিকার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৭৭৩ সালে যখন আমেরিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল, আমেরিকানরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতি তাদের বিদ্রোহী মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য এক জাহাজ-ভর্তি চা (৩৪২ পেটি) বস্টন বন্দরে সমুদ্রে ফেলে দেয়। তার কারণ, তখন চায়ের একচেটিয়া ব্যবসা ছিল ব্রিটিশদের দখলে। তখন ব্রিটিশ সরকার শাস্তিস্বরূপ বস্টন বন্দরটিকেই বন্ধ করে দেয়। ক্রমশ এইভাবে আমেরিকায় স্বাধীনতা যুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল।

প্রাতরাশ সেরে ২৪ জুন আমরা অ্যানিস্কোয়ামের উদ্দেশে রওনা হলাম। সঙ্গে ছিলেন স্বামী ত্যাগানন্দ ও পুরনো ভক্ত মিঃ ওয়েণ্ডেল এবং মিসেস এলভা। এলভাই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলেন। আমেরিকানরা গাড়ি চালাতে পারেন না—এরকম বৃদ্ধ কখনো হন না!

স্বামীজী ধর্মমহাসম্মেলনের আগে শিকাগো থেকে অ্যানিস্কোয়ামে এসেছিলেন। এখানে তিনি এক ধনী মহিলা মিস ক্যাথেরিন স্যানবর্ণ অ্যাবটের অতিথি হিসাবে ছিলেন। এখানেই হার্ভার্ডের অধ্যাপক রাইটের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। অধ্যাপক রাইট ধর্মসম্মেলনের প্রতিনিধিদের নির্বাচক সমিতির সভাপতিকে লিখেছিলেনঃ "এমন একজনকে পাঠাচ্ছি, যাঁর জ্ঞান আমাদের সকল অধ্যাপকের জ্ঞানের সমষ্টির চেয়েও বেশি।" স্বামীজী এখানে একটি বোর্ডিঙে ছিলেন। এখন সেটি কারো বসতবাটী। আমরা ২০০ বছরের পুরনো ইউনিট্যারিয়ান চার্চও দেখলাম। এখানে স্বামীজী বক্তৃতা করেছিলেন। চার্চের পরিচালকবৃন্দ যথেষ্ট সহৃদয়তা দেখান ও আমাদের সঙ্গে দেখা করে আনন্দিত হন।

২৫ তারিখ রবিবার সকালে আমি 'শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর বাণী' বিষয়ে বক্তৃতা করলাম এবং তারপর প্রভিডেন্সে ৪টায় পৌঁছে ৫টার সময় আবার এবিষয়েই বললাম। আমার নিউ ইংল্যাণ্ড ভ্রমণের এখানেই সমাপ্তি।

সহস্রদ্বীপোদ্যান (Thousand Island Park)

পরদিন সকালে রওনা হলাম সেরাকিউজ হয়ে সহস্র-দ্বীপোদ্যানের উদ্দেশে। আবহাওয়া খারাপ ছিল বলে প্লেন ছাড়তে দেরি হলো। ছাড়ল বেলা সাড়ে ১১টায়। আমার ধারণা ছিল—১৯টি আসনের এই ছোট্ট প্রোপেলার বিমান সরাসরি সেরাকিউজ পৌঁছাবে। কিন্তু যখন ঘণ্টাখানেক পরে বিমানবন্দরে বিমানটি নামল, আমি ভাবলাম সেখানে পৌঁছে গেছি, যদিও আকাশ থেকে জায়গাটি সেরাকিউজের চেয়ে বেশ বড় মনে হলো। বিমানবন্দরের মধ্যে যাওয়ার পর

আমার সন্দেহ আরো দানা বাঁধল। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এই বিমানবন্দরটি হলো নিউ জার্সি রাজ্যে অবস্থিত নিউয়ার্ক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। নিউ ইয়র্কে প্রবেশ করার জন্য তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের অন্যতম এটি। দেখলাম, আমার মালপত্রও এসে পৌঁছায়নি এবং স্বামী আদীশ্বরানন্দ ও অন্যান্য যাঁদের আমাকে নিতে আসার কথা, তাঁরাও আসেননি। তখন আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়! বিমানবন্দরের চেক-ইন কাউন্টারের মহিলা আমাকে বললেন—যে-প্লেনে আমার সেরাকিউজ যাওয়ার কথা সেটি ছেড়ে চলে গেছে। তবে ভাগ্য ভাল, আরেকটা উড়ান সেরাকিউজ যাচ্ছিল। বিকাল ৩টায় ছাড়বে। সেই মহিলা দয়া করে আমাকে ঐ বিমানে একখানি আসন ব্যবস্থা করে দিলেন। ইতিমধ্যে স্বামী আদীশ্বরানন্দ সেরাকিউজ থেকে আমার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলেন, ৩৯নং গেটে যেখানে আমি অপেক্ষা করছিলাম। তিনি বললেনঃ "মালপত্র পাওয়া গেছে কিন্তু মালিককে পাচ্ছি না।" সাধারণত উলটোটাই হয়। যাত্রী আগে পৌঁছে যায়, মালপত্র হয়তো পরে এল। যাই হোক, আমি সেরাকিউজে বিকাল ৪টা নাগাদ পৌঁছালাম।



সহস্রদ্বীপোদ্যানে সূর্যাস্ত

সহস্রদ্বীপোদ্যানে যেতে দেড় ঘণ্টা লাগল। ওয়েলেসলি দ্বীপ—এটি বৃহত্তম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণও বটে। ছোট-বড় নানা আকারের দ্বীপগুলি সেন্ট লরেন্স নদীর ওপর ছড়িয়ে আছে। অতিকায় নদীটি কানাডার লেক অন্টারিও থেকে উদ্গত হয়ে শান্ত ধীর গতিতে ১,০০০ মাইল গিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে পড়েছে। সমুদ্রগামী জলযানগুলি এই নদী বরাবর গিয়ে অন্টারিও এবং এরিক হ্রদ হয়ে সোজা মিশিগান হ্রদের ওপর দিয়ে শিকাগোতে যায়।

১৮৯৫ সালে নিউ ইয়র্কে স্বামীজী কিছু আগ্রহী শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করেছিলেন। গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাবে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ছাত্রছাত্রীদের একজন মিস ডাচারের একটি নিজস্ব বাড়ি ছিল সেন্ট লরেন্সের ওপর ওয়েলেসলি দ্বীপে। তিনি স্বামীজী ও আরো কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সেখানে আমন্ত্রণ জানালেন। পরবর্তী কালে ঐ ছাত্রীদের একজন মিস এস. ই. ওয়াল্ডো লেখেনঃ "বাড়িটি এক উচ্চভূমির ওপর অতি সুন্দর স্থানে অবস্থিত ছিল; সুরম্য নদীটির অনেকখানি এবং উহার বহুদূরবিস্তৃত সহস্রদ্বীপের অনেকগুলি তথা হইতে দৃষ্টিগোচর হইত।... বাড়িখানি একটি পাহাড়ের গায়ে অবস্থিত ছিল; পাহাড়টির উত্তর ও পশ্চিমদিক হঠাৎ ঢালু হইয়া নদীতীর ও উহারই যে ক্ষুদ্র অংশটি ভিতরের দিকে ঢুকিয়া আসিয়াছে, তাহার তীর পর্যন্ত গিয়াছে।" তিনি আরো লিখেছেনঃ "এইখানেই আমাদের অবস্থানকালের প্রতি সন্ধ্যায় আচার্যদেব তাঁহার দ্বারের সমীপে বসিয়া আমাদের সহিত কথাবার্তা বলিতেন। আমরাও সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে নির্বাক হইয়া বসিয়া বসিয়া তাঁহার অপূর্ব জ্ঞানগর্ভ বচনামৃত সাগ্রহে পান করিতাম। স্থানটি যেন সত্য সত্যই একটি পুণ্যনিকেতন হইয়াছিল।... সুবৃহৎ গ্রামটির একখানি বাড়িও সেখান হইতে দৃষ্টিগোচর হইত না, আমরা যেন লোকালয় হইতে বহু যোজন দূরে কোন নিবিড় অরণ্যানী-মধ্যে বাস করিতাম।..."



সহস্রদ্বীপোদ্যানের প্রার্থনাকক্ষ

১৯৪৭ সালে নিউ ইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ এই স্থানটি ক্রয় করেন। তিনি এখানে গ্রীষ্মকালীন অধ্যাত্মশিবির শুরু করেছিলেন।

তখন থেকে প্রতি গ্রীষ্মেই সহস্রদ্বীপোদ্যান বেদান্ত অনুরাগীদের আকর্ষণ করে আসছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী আদীশ্বরানন্দ প্রতি বছর গ্রীষ্মে এখানে আসেন, ১০-১২ সপ্তাহ থেকে অধ্যাত্মশিবির পরিচালনা করেন। সাধারণত ১ জুলাই এই অধ্যাত্মশিবির শুরু হয়। কিন্তু আমার সুবিধার জন্য তিনি অনুগ্রহ করে এবছর এক সপ্তাহ আগেই শিবির শুরু করেছেন। শীত এখানে তীব্র। ৭-৮ মাইল চওড়া সেন্ট লরেন্স নদীর কোথাও কোথাও জমে বরফ হয়ে যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ এখানে ৭ সপ্তাহ ছিলেন। স্থানটি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ অনুরাগীদের কাছে যথার্থই একটি তীর্থস্থান। কারণ, এখানে তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ বাণী উজাড় করে দিয়েছিলেন। কুটিরের ঠিক পিছনে একটি অরণ্য আছে, আর তার রেশ চলে গেছে কয়েকটি পাথুরে পাহাড়ে। জানা যায় যে, সেইরকম একটি শিলাখণ্ডে স্বামীজী একবার ধ্যান করতে বসে সমাধিস্থ হয়েছিলেন। স্থানটি যথার্থই আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ। গ্রীষ্মে পার্কের আকর্ষণে অনেক পর্যটক আসেন। কিন্তু তাতে এই স্থানের শান্তি তেমন বিঘ্নিত হয় না। এই সহস্র-দ্বীপোদ্যানে তিনরাত্রি পূর্ণ বিশ্রামে কাটাতে পেরেছিলাম। আশ্রমের একজন সহৃদয় বন্ধু মিঃ জেইম তাঁর সাজানো সুন্দর লঞ্চে করে আমাদের ক্লেটন পর্যন্ত দীর্ঘ জলপথ ভ্রমণে

নিয়ে গিয়েছিলেন। এখানেই স্বামীজী ট্রেন থেকে নেমে স্টীমারে ওয়েলেসলি দ্বীপে এসেছিলেন। আমাদের অর্থাৎ স্বামী আদীশ্বরানন্দ, স্বামী বিদ্যানন্দ (ব্যারি), পিটার, যোগেশ এবং আমি—লঞ্চে করে নদীর মাঝে কানাডার সীমান্তে নিয়ে গিয়ে মিঃ জেইম আমাকে বললেন ঃ "স্বামীজী, আপনি এখন কানাডায়!" সত্যিই তো, ইমিগ্রেশন চেক ইত্যাদি করতে হলো না।

যদিও ১০৬ বছর আগের, তবু যেন এখানে স্বামীজীর প্রেরণাদায়ী অবস্থানের প্রভাব সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে! তিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি উজাড় করে দিয়েছিলেন, আর তাঁর শিষ্য-শিষ্যারা আকণ্ঠ সেই অধ্যাত্মসুধা পান করেছিলেন। আশ্রমের সামনের বৃক্ষরাজি পত্র ও পল্লবে এতই ঘন আর বিশাল হয়ে উঠেছে যে, বর্তমানে কুঠিয়া থেকে নদীটির বিশাল বিস্তার দেখা যায় না। একটা ঝঞ্ঝার মতো ভ্রমণসূচীর পরে এই তিনদিনের বিশ্রাম আমার কাছে সত্যিই প্রাণদায়ী বলে মনে হয়েছিল।

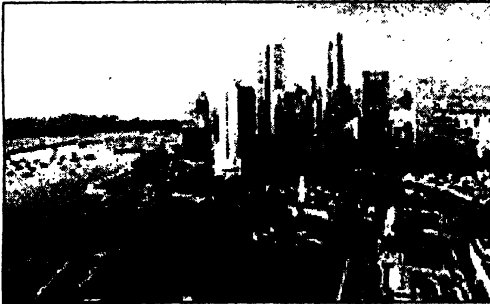
২৯ তারিখ সকালে সহস্রদ্বীপোদ্যান ছেড়ে সান ফ্রান্সিস্কোর উদ্দেশে রওনা হলাম। মাঝে ওয়াশিংটন ডি সি-তে বিমান পরিবর্তন করতে হলো। সেরাকিউজ বিমানবন্দরে স্বামী আদীশ্বরানন্দ, স্বামী বিদ্যানন্দ, পিটার এবং মিঠু এসেছিলেন আমাকে বিদায় জানাতে।

সান ফ্রান্সিস্কো—৪

ওয়াশিংটন ডি সি বিমানবন্দরে স্বামী আত্মজ্ঞানানন্দ (স্টুয়ার্ট) এবং জয়ন্ত সরকার কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। ২টায় ওয়াশিংটন ডি সি ছেড়ে পৌনে ৫টায় সান ফ্রান্সিস্কোতে পৌঁছালাম। ৩০ জুন বেশ বিশ্রামেই কাটল। অবশ্য স্বামী প্রবুদ্ধানন্দের সঙ্গে অনেক প্রয়োজনীয় আলোচনা হয়েছিল।

সিঙ্গাপুর

পরদিন অর্থাৎ ১ জুলাই ফেরার পালা শুরু। দুপুর ১টায় সিঙ্গাপুরের বিমান ধরলাম। দক্ষিণ কোরিয়ার সিওলে ১ ঘণ্টার বিরতির পর সিঙ্গাপুরে পৌঁছালাম ৩ জুলাই রাত আড়াইটায়। ঐ অসময়েও সিঙ্গাপুর কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী মুক্তিরূপানন্দ এবং অন্যান্যরা বিমানবন্দরে এসেছিলেন আমাকে নিতে। সিঙ্গাপুর বিমানবন্দরে নামলে সহজেই অনুভব হয় যে, *এটিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিমানবন্দর।* আয়তনে, সৌন্দর্যে এবং কর্মকুশলতায়—সমস্ত দিক থেকে। 'জেট ল্যাগ' না হওয়ার একটি ওষুধ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ আমাকে দিয়েছিলেন। সেটি ভালই কাজ করেছে মনে হলো। কারণ, ঘুমাতে অসুবিধা হয়নি।



সিঙ্গাপুর শহরের একাংশ

সিঙ্গাপুর আশ্রমটি বেশ সাজানো। রাস্তা থেকে ক্রমশ উঁচুতে উঠে গেছে। আর সেখানে একই সারিতে দাঁড়িয়ে আছে সুদৃশ্য বাড়িগুলি। আশ্রমিক কাজকর্ম ছাড়াও এখানে একটি উচ্চমানের কিণ্ডারগার্টেন স্কুল ও একটি বালকাশ্রম রয়েছে।

৪ জুলাই রাত ৯টায় রওনা হয়ে কলকাতায় রাত সাড়ে ১০টায় পৌঁছে গেলাম। একটা প্রয়োজনীয়, শিক্ষামূলক কিন্তু চটজলদি পাশ্চাত্য ভ্রমণ শেষ হলো।

এখন বর্তমান সামাজিক পরিবেশে পাশ্চাত্য জীবন ও আমেরিকায় আমাদের কার্যধারা সম্বন্ধে দু-একটি কথা।



আমেরিকা



স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটিশকে পরাস্ত করে উত্তর আমেরিকার মধ্যভাগের পূর্ব উপকূলে ১৩টি রাজ্য নিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জন্মলাভ করে। ক্রমে আরো রাজ্য এসে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে এবং বর্তমানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ৫০টি রাজ্য ও মোট জনসংখ্যা ২৬ কোটি।

আমেরিকার স্রষ্টা-নেতৃবৃন্দ এই নতুন জাতিকে স্বাধীনতা, সাম্য ও ন্যায়-রূপ উচ্চ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তির ওপর স্থাপন করেন। এই বিষয়ে থমাস জেফারসনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কারণেই একটা মর্যাদাপূর্ণ স্মৃতিসৌধ ওয়াশিংটন ডি সি-তে তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত। অপর শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হলেন আব্রাহাম লিঙ্কন—ওয়াশিংটন ডি সি-র চমৎকার লিঙ্কন মেমোরিয়াল ছাড়াও তাঁকে বিভিন্নভাবে স্মরণ করা হয়। আমেরিকার রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে তাঁকে সর্বোচ্চ আসন দেওয়া হয়। কারণ, তিনি মানবতার অবমাননা-রূপ ক্রীতদাস প্রথা বিলোপের জন্য সংগ্রাম করেন ও নিজের জীবন বিসর্জন দেন।

নতুন রাষ্ট্রের বসবাসকারীরা দেখলেন যে, এই দেশটি প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ। বিশাল বিশাল পানীয় জলের হ্রদ, অতি বৃহৎ নদীর সমাহার, পর্বতমালা, চিরহরিৎ বনানী, বিভিন্ন খনিজ সম্পদ প্রভৃতির মাধ্যমে বিচিত্রভাবে ধনী এই দেশ। কেবল সেগুলিকে সাজিয়ে-গুছিয়ে মানবসমাজের কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহারের অপেক্ষা। এই কাজ তাঁরা বিরাটভাবে সম্পাদন করেছেন, যার ফলে আজ আমেরিকা পৃথিবীর এক মহাশক্তিতে পরিণত হয়েছে। দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং পরবর্তী কালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভাজন আমেরিকাকে বর্তমান পৃথিবীতে প্রথম স্থানে পৌঁছে দিয়েছে।

এ-দেশ প্রাচুর্যের দেশ। কৃষকদের সুবিধা দেওয়ার জন্য বাড়তি খাদ্যশস্য নষ্ট করে ফেলা হয় এখানে। দুধ, ফল, বনজ সম্পদ অপর্যাপ্ত। গৃহাদি নির্মাণকার্যে প্রচুর পরিমাণ কাঠের ব্যবহার, সবরকম কাজেই কাগজের ব্যবহার—এগুলি লক্ষ্য করা যায়। জাগতিক জীবনযাত্রাকে আরামপ্রদ ও উপভোগ্য করে তুলতে যা করা সম্ভব—তা সবই তারা করেছে।

কিন্তু তবু আমেরিকা খুঁজে চলেছে তার আধ্যাত্মিক মূল। একইসঙ্গে প্রতিযোগিতার ধূম চলেছে। কোথায় কখন থামবে—কেউ জানে না। ১৬ বছরের ঊর্ধ্বে সকলেই নিজের গাড়ি রাখতে পারে। আর ঐ বয়সের সীমা পেরলেই যুবক-যুবতীরা নেমে পড়ে রাস্তায়।

যুবসম্প্রদায় বহিরাগত ও বিচিত্র যেকোন জিনিস নিয়ে মাতামাতি করতে থাকে আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। সুতরাং যাকিছু নতুন, আমেরিকা তাকে স্বাগত জানাবে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব এখানে। তার ফলে নারী-স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হয়েছে। নারী-স্বাধীনতা খুবই আকাঙ্ক্ষিত সন্দেহ নেই, কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারা যায় না যে, স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য মেয়েরা কেন সর্বত্র পুরুষদের নকল করতে যায়!

এখানে শিক্ষা সার্বজনীন। যেকোন মানুষের সামনে স্বীয় কৃতিত্বের সাহায্যে যেকোন স্তরে ওঠার সুযোগ রয়েছে। 'শ্রমের মূল্য' ব্যাপারটি পাশ্চাত্যে মানুষের সহজাত হয়ে গেছে। ভারতে এটি আমরা এখনো শিখতে বা গ্রহণ করতে পারিনি।

ভাল যেমন আছে, অন্ধকার দিকটিও রয়েছে। বড় শহরগুলিতে সন্ধ্যার পরে গুণ্ডা ও লুণ্ঠনকারীদের দৌরাত্ম্যে ঘরের বাইরে বেরনো বিপজ্জনক। ঐসময় বেরোলে অর্থ এবং প্রাণ দুই-ই হারাবার সম্ভাবনা। তাছাড়া অবৈধ শিশুর সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে, যার ফলে পরিবার ভেঙে যাচ্ছে।

সমাজবিদ্ ও চিন্তাবিদেরা এই নিয়ে বিশেষ চিন্তিত। আমেরিকা যদি চায় যে, ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সভ্যতা তারা নির্মাণ করবে তাহলে একটু থেমে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে তাদের চিন্তা করা দরকার, তারা কোথায় যেতে চায় আর কোথায় যাচ্ছে।

পাশ্চাত্যে বেদান্ত

১৮৯৩ সালে ধর্মমহাসভায় আমেরিকাকে প্রথম বেদান্ত শোনালেন স্বামী বিবেকানন্দ। অবশ্য নিউ ইংল্যাণ্ডের ঋষিকল্প মানুষরা, যেমন এমারসন, থোরো, ওয়াল্ট হুইটম্যান—সকলেই ভগবদ্গীতা সম্বন্ধে জানতেন। কিন্তু তিনবছর ধরে স্বামী বিবেকানন্দের সক্রিয় প্রচারের ফলে বেদান্ত সেখানে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৪ সালে নিউ ইয়র্কে প্রথম বেদান্ত সোসাইটি স্থাপিত হয়। তখন থেকেই সন্ন্যাসিবর্গ পশ্চিম গোলার্ধে বেদান্ত প্রচার করছেন। ফলস্বরূপ আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে অনেক নতুন বেদান্ত সোসাইটি স্থাপিত হয়। মানুষ বেশি বেশি যোগদান করতে থাকে। বিগত শতাব্দীর প্রথম দশকে বিশ্বের তাবড় তাবড় বুদ্ধিজীবীরা বেদান্তের সার্বজনীন চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট হন। বেদান্তের মুক্তির বাণীকে ও ব্যক্তিজীবনে তার গুরুত্বকে তাঁরা স্বাগত জানান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ও তার পরবর্তী দশকগুলিতে প্রাচ্যের ধর্মের প্রতি পাশ্চাত্যের মানুষের দৃষ্টি বেশি আকৃষ্ট হয়। জেন-কে সামনে রেখে বৌদ্ধধর্ম নানা ধরনের 'যোগ' এবং কিছু জাগতিক অভীষ্টসিদ্ধি-রূপ উদ্ভট ধর্মবিশ্বাস বেদান্তের ভাবী বাহকদের বহুলাংশে ছিনিয়ে নিতে থাকে। ফলে বেদান্তের ঐতিহ্যগত প্রচারকদের জন্য কাজটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। পাশ্চাত্যের মানুষ ফলিত কিছু চায়, যা করে দেখানো যেতে পারে এবং যা কিনা সদ্য সদ্য ফল প্রসব করবে।

তবে একথাও ঠিক, এক শতাব্দীর অধিক সময় ধরে বেদান্তের প্রতিষ্ঠা টলেনি। তার প্রগতি ধীর হচ্ছে বটে, কিন্তু দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা মতবাদগুলি, যেগুলি হঠাৎ ধূমকেতুর মতো আসে আর একইরকম বেগে হারিয়ে যায়—বেদান্ত সেরকম নয়। যাই হোক, বেদান্ত-প্রচারকদের যুবগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করতে হবে—যারা জোর দিয়ে থাকে ব্যবহারিক দিকের ওপর। সুতরাং দর্শন বা তত্ত্বকে সমর্থন করতে হবে ধ্যান ও মানসিক উন্নতিসাধনের বিভিন্ন উপায়ের ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে।

সহস্র সহস্র বছর পূর্বে ঘোষিত হয়েছিল বেদান্তের বাণী। অজস্র উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েও বেদান্ত এই নিজস্ব প্রতিষ্ঠা ঠিক রেখেছে এর বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্যের জন্য, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই সনাতন সত্যই প্রতিধ্বনিত ও প্রতিফলিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য সন্ন্যাসী সন্তানদের জীবনে। সুতরাং আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবে আশা করতে পারি যে, পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচার মানবসভ্যতাকে জীবনের উচ্চতর লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন নতুন পথ উন্মোচিত করতে পারবে। [সমাপ্ত] ❑

মূল ইংরেজী থেকে অনুবাদ ঃ স্বামী সর্বগানন্দ

৫

তৃতীয় নয়ন

পার্থসারথি চক্রবর্তী

মাগো!
শৈশবে হাতেখড়ির মতো
আজও তুমি আমার হাত ধরে ছবি আঁকাও,
ধরে থাক ক্যানভাস।
শিল্প সৃষ্টি হয় যেন অদৃশ্য নির্দেশে।

চিন্তার বেলাভূমিতে চলে যায় মন,
অতীত সমুদ্রে ভেসে আসে সেই স্মৃতি-বালক
যার অমলিন শৈশবে
শরতের মেঘ নীলাকাশে খেলত
ভালবাসা ছিল পরিশ্রুত আকাশ
ছিল মৃৎশিল্পীর হাতে গড়া
তৃতীয় নয়ন।

তারপর—চলে গেছে অনেক ঢেউ,
বিবর্ণ জীবন নিয়ে গেছে
বিশুদ্ধ বর্ণের অরণ্যে আবার।
নির্বাক তুলির টানে
একের পর এক উঠে আসে
চন্দ্র-সূর্য-অগ্নি
শুক্লপক্ষের নবমী, কৃষ্ণপক্ষের একাদশী

তুমি কে মা? কে তুমি?
করো না গোপন
জ্ঞান-সারদা তুমিই মাগো
দিতে পার ঐ তৃতীয় নয়ন?

সারদা

অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

জগজ্জননী তুমি দেবি ও মানবী,
অলৌকিক ব্যক্তিত্বের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি,
মর্তলোকে চিরন্তন জীবন্ত প্রতিমা,
শ্রীমতী-শ্রীময়ী লহ প্রণাম, শ্রীশ্রীমা।

অনন্ত আকাশ, নিচে খণ্ড খণ্ড মাটি
এক করে পুঁতেছিলে প্রাণের চারাটি—
মেঘ-বৃষ্টি-গিরি-বন-চন্দ্র ও সবিতা
সবই তুমি, তুমি কাব্য, মূর্তিমতী গীতা।

আমাদের উত্তরণে বিবেকবোধনে
তুমি মন্ত্র, তুমি পথ পার্থিব জীবনে—
পূর্ণতর পৃথিবীর প্রগতি-গরিমা
তোমাতে প্রকাশ; লহ প্রণাম শ্রীশ্রীমা।

মা

রঘুপতি মুখোপাধ্যায়

কলাটি শিশিরের—
আকাশের চেতনা,
বিন্দুটি অশ্রুর—
জীবনপ্লাবী বেদনা।
বীজটি ক্ষুদ্র—
মহীরুহের আশ্বাস,
বাক্যটি লঘু—
ভূমায় বিশ্বাস।
শঙ্খটি দুধবরণ—
সামুদ্রিক গর্জন,
একটি ডাক 'মা'—
চিরকালের সাধন।

ওগো নিঠুর দরদী

ভবানীপ্রসাদ দে

সমুদ্রতটে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের
ধাক্কা রুখতে পারে না আনাড়ী যেমন
কর্মজীবনে অনেক আঘাত হেনে
নাকানিচোবানি করেছ
আমায় তেমন।

মা, তুমি জান আমি কত অবল
দুর্বার আঘাত কাটানোর কৌশল
জানি না। জীবনের অন্তে এসে
ক্লান্ত আমি। করুণায় ভালবেসে
ঢেউগুলি তাই করেছ ছোট ছোট।

পরশে ফুলেরে কহিছ—ফোট।
কুঁড়ি থেকে ফোটা
হলো না এখনো সারা।
গন্ধ বিলাবে কবে? আপনহারা,
জগৎসেবায় করবে আত্মদান।

আমি বলি—মা, কর তুমি কল্যাণ
যথা অভিসন্ধি তব। শরণাগত আমি
তোমার চরণপ্রান্তে। ওগো অন্তর্যামী
প্রেমসমুদ্রের প্রশান্তিতে লহ টানি
কর্মক্ষয়ের পুরস্কারটি আনি।

মাতৃচেতনায়

শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

শিরীষের ডালে এখন বিকেলের শেষ রোদ
শুয়ে আছে হলুদ পাখিটির ইচ্ছার মতো
পত্রপল্লবে বাজে হৈমন্তী বাতাস
আত্মায় লেগেছে ঘ্রাণ
চেতনার প্রাঙ্গণে এখন একে একে উঠে আসে
মতিভ্রষ্ট জীবনের হারানো সব বোধ।

এ এক মহার্ঘ সময়
পরিদৃশ্যমান হরিৎ বিস্তৃতির মধ্যে
হৃদয়ে বেজেছে মাদল।

অনেক নদী পেরিয়ে বোধির প্রাঙ্গণ থেকে
অলৌকিক উচ্চারণে এখন পেয়েছি খুঁজে
জীবনের পরম স্বাদ।

রৌদ্র-আপ্লুত শিরীষের ডালে দাঁড়িয়ে
জীবন [illegible] এখন জননীর নব্য চেত[illegible]

[illegible] জননী

মঞ্জরী [illegible]

অন্ধকার [illegible]
ঢেকে গেছে [illegible]
একটু [illegible] দেখি—
[illegible]
[illegible] পার ভাল
সেকথা [illegible] শুনেছি কতবার
লজ্জা আমার কোথায় গিয়ে রাখি
শুনেও আমি ভুলেছি বারবার।

[illegible] মনে পড়ল নতুন করে
[illegible] আমার পুড়ছে যখন জ্বরে
[illegible] কথার [illegible]
[illegible] রাখি [illegible]
[illegible]
[illegible] কাঁপছে বসুন্ধরা।
মিথ্যে যত কথার ঝাঁপি
মিথ্যে যত ফুলের সাজি
এসব এবার সরিয়ে দিয়ে, নেব নতুন সাজ
[illegible] অমাবস্যা, চাঁদ উঠবে কখন আজ?

মাতৃসান্নিধ্যে

মায়া চক্রবর্তী

মা ছিলেন, মা আছেন, মা থাকবেন
অসহায় দুর্বলের ভরসা মা সারদা।
জননীর কোল জুড়ে শিশুর আগমন
সুখে দুঃখে জীবনতরীর বয়ে চলা।
কূপমণ্ডুকের মতো জীবনযাপন
জীবনের অপরাহ্ণে হিসাব মেলানো
কেমন করে কাটল সংসারজীবন,
বিষয় বৃদ্ধি, সযত্নে রক্ষা, পরিচর্যা
না-পাওয়ার বেদনা, প্রাপ্তিতে অতৃপ্তি
আপন পরিবার-পরিজন অন্তর জুড়ে।
চৈতন্যের উদয়ে উপলব্ধি—
'জীবন অনিত্য',
যাবার বেলায় মাতৃক্রোড়লিপ্সু সন্তান
মা সারদা বাহু মেলে কোলে দেন ঠাঁই।
মায়ের স্মরণ, মনন, ধ্যানে পরম সন্তোষ
অধ্যাত্মরসে মগ্ন মন নির্ভীক, বিবাগী।

তোমাকে মৈত্রেয়ী ভাবতে পারিনি

[illegible]

তোমাকে মৈত্রেয়ী [illegible]
তাই এই [illegible] বোঝা
তাই এই বুকের ভিতর
অহরহই যেন এক
শয়তান [illegible]
তাই [illegible] বিভী[illegible]
রুদ্রের অসীম শা[illegible]
ভয়ানক ভার মনে হয়
[illegible] শরীরে [illegible]
[illegible]প আর পাপ;
দুঃসহ বোঝা।
তোমাকে মৈত্রেয়ী ভাবতে পারিনি।
তাই দেখি
চারিদিকে এত বিষণ্ণতা;
তাই দেখি
চারিদিকে ভয়ের আঁধার।

বাউল সাধনা

অলোককুমার মুখোপাধ্যায়

বাউল সাধনা বেদ-বহির্ভূত সাধনা

নিত্য মানব সত্যের ওপর বাউলধর্ম প্রতিষ্ঠিত। বাউলেরা নিরীশ্বরবাদী, প্রচলিত মূর্তি আরাধনার বিরোধী। শাস্ত্রভার-মুক্ত মানবধর্ম সাধনাই বাউলদের আসল সাধনা। মানবজীবনে যে অসীম সত্য লুকানো, বাউলেরা তারই অনুসন্ধানী। বাউলদের আচার 'রাগের আচার', 'বেদের আচার নয়'। বাউলগীতে তাই বলা হয়েছে ঃ

"কার বা আমি,
কে বা আমার।
আসল বস্তু,
ঠিক নাহি তার।
বৈদিক মেঘে
ঘোর অন্ধকার।
উদয় হয় না,
দিনমণি।"

বাউল সাধনা ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের সাধনা

বাউলদের সাধনা বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের সিদ্ধান্ত। বাউল সাধনা দেহকেন্দ্রিক। দেহের মধ্যে চতুর্দশ ইন্দ্রিয়, ষড় রিপু ও পঞ্চ ভূতের অস্তিত্ব। মানবদেহ তাই বাউলদের কাছে পরম সম্পদ। বাউল সাধনা এক অর্থে কায়া-সাধনা। দেহে রয়েছে নয়টি ছিদ্র অর্থাৎ দুটি নাসারন্ধ্র, দুটি কর্ণবিবর, মুখবিবর, দুটি চক্ষু, নাভিপদ্ম, বাহ্যদ্বার ও গুহ্যদ্বার। এছাড়া অসংখ্য জানালা অর্থাৎ দেহে একাধিক রোমকূপ। বাউল সাধনা দেহ থেকে দেহাতিক্রমের সাধনা। ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড দর্শনের সাধনা।

বাউল সাধনা মনের মানুষের ভজনার সাধনা

বাউলরা সসীম জগতে অসীমের অনুসন্ধানী। ঐ অসীমই তাদের কাছে মনের মানুষ। মনের মানুষের বসবাস দেহদুর্গে। বাউল সাধনা এক অর্থে মানুষকে ভজনার সাধনা। বাউল-সম্রাট লালন ফকির তাঁর গানে বলেছেন ঃ

"এই মানুষে আছে রে মন,
যারে কয় মানব রতন।
লালন কয় পেয়ে সে ধন;
পারলাম না রে চিনতে।"

সাধক বাউল যোগসাধনার মাধ্যমে দেহাভ্যন্তরে ঐ মনের মানুষের অস্তিত্ব অনুভব করেন।

বাউল সাধনা গুরুভজনার সাধনা

বাউল সাধনায় গুরুর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বাউলেরা গুরুবাদী। গুরু-নির্দেশিত পথেই চলে তাঁদের সাধনা। গুরু হলেন ধর্মের প্রকৃত মর্মজ্ঞ-তত্ত্বজ্ঞ। আধ্যাত্মিক সত্য লাভ করেছেন তিনি। তাঁর অভিজ্ঞতার পথেই শিষ্যের বিচরণ। গুরুর প্রতি বাউলদের তাই সীমাহীন ভক্তি ও বিশ্বাস। গুরুকে তাঁরা দুভাবে দেখেন। এক—মানব-গুরুরূপে, দুই—ভগবানরূপে।

বাউল সাধনা পুরুষ-প্রকৃতির সাধনা

এই মহাবিশ্বে প্রকৃতির সৃষ্টি কাম-উপভোগ ও সন্তান প্রজননের জন্য। কিন্তু বাউলদের কাছে প্রকৃতি হলো তাঁদের জীবনের সাধনসঙ্গিনী। বাউলদের অভিমত—প্রকৃতির সাহচর্য কামনা প্রশমনের জন্য, গভীর সহানুভূতির জন্য। লালন ফকির তাঁর গানে বলেছেন ঃ

"ঘরের মূল তিনটি খুঁটি;
ঘর বেশি পরিপাটি।
বাঁধন-ছাদন, দড়ি-দড়া;
সাড়ে তিন কোটি।
মাপতে হদ্দ চৌদ্দ-পোয়া;
আছে চৌদ্দ ভুবন তার ভিতর
ঘর বেশ আঁটা-সোটা।
সে ঘর ছয়-তালা-কোঠা।
তাতে দিবানিশি মণি জ্বলে।
কর্তা থাকেন তার ভিতর।
ঘরের দরজা নয়খানি,
লালন কয় কে করে সন্ধান।"

ঘর হলো মানবদেহ। 'তিনটি খুঁটি' অর্থাৎ বামপার্শ্বে ইড়া, দক্ষিণ প্রান্তে পিঙ্গলা, মধ্যে সুষুম্না। 'বাঁধন-ছাদন, দড়ি-দড়া সাড়ে তিন কোটি' অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সাড়ে তিন কোটি নাড়ির অস্তিত্ব। 'চৌদ্দ ভুবন' অর্থাৎ চৌদ্দ ইন্দ্রিয় মানবশরীরে বিরাজমান ঃ বাক্, পানি, পাদ, পায়ু উপস্থ—এগুলি হলো কর্মেন্দ্রিয়। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, জিহ্বা—এগুলি হলো জ্ঞানেন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার —এগুলি হলো অন্তর-ইন্দ্রিয়। 'ছতালা-কোঠা' অর্থাৎ মানবদেহে ছয় রিপুর খেলা—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য দেহে নিত্য বিরাজমান।

বাউল সাধনা চারিচন্দ্রভেদের সাধনা

বাউলদের সাধনার মধ্যে চারিচন্দ্রভেদ সম্পূর্ণ কায়িক ব্যাপার। অত্যন্ত গুহ্য ব্যাপার। অনধিকারীর কাছে তা বীভৎস, ভয়ঙ্কর। পুরুষ-প্রকৃতির মিলন-সাধনা। বাউলদের উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়সেবী বলা যায় না। কারণ, এই সাধনা একটি সুকঠিন যোগসাধনা। এই গুহ্য সাধন-

ভজনের দ্বারা বাউলরা তাঁদের আকাঙ্ক্ষিত চরম অবস্থায় উপনীত হন।

বাউল সাধনা রূপ থেকে স্বরূপে উত্তরণের সাধনা

মানুষের রূপ মানুষের বাইরের বস্তু। রূপের অন্তরালে নিজস্ব স্বরূপ বিরাজমান। স্বাভাবিক দেহকে অস্বাভাবিকে পরিণত করে দেহাভ্যন্তরে পরমতত্ত্বের উপলব্ধিই হলো বাউল সাধনার মূলকথা।

বাউল সাধনা ষট্‌চক্রভেদের সাধনা

মন্ত্রময়ী কুলকুণ্ডলিনী সকল প্রাণীর মূলাধারে বিদ্যুৎপ্রভায় দেদীপ্যমান। বাউলগীতে তাই বলা হয়েছে ঃ

"চেয়ে দেখ না রে মন দিব্য জোরে;
চারিচন্দ্র দিচ্ছে ঝলক মণিকোঠার ঘরে।
হলে সে চাঁদের সাধন,
অধর চাঁদ হয় দরশন।
আবার চাঁদেতে চাঁদের আসন;
রেখেছে ফিকিরে।"

কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে সাধনাবলে উদ্বুদ্ধ করলে তা সর্পিল গতিতে চক্রে চক্রে ক্রমে দশমদল, দ্বাদশদল ও ষোড়শদল অতিক্রম করে অবশেষে ভ্রূমধ্যস্থ দ্বিদল পদ্মে উপস্থিত হয়। এই অদৃশ্য শক্তি যখন দ্বিদল পদ্মে উত্তীর্ণ হয়ে আরো উর্ধ্বে সম্প্রসারিত হয়, তখনি 'অচিন দল'-এ উপনীত হয়, ষট্‌চক্রভেদী। সাধকের 'সহস্রার' অর্থাৎ 'অকথাদি' ত্রিকোণভূমি, এখানে 'গুরু' হংসারূঢ় হয়ে অধোবদনে বিরাজমান। তাঁর দর্শনলাভ করে সাধক পূর্ণসিদ্ধিতে আনন্দ অনুভব করেন। সুষুম্নামার্গে পৌঁছাতে পারলে সাধক সিদ্ধির অরুণালোকে উদ্ভাসিত হন। তারপর 'অচিন দল' অর্থাৎ সহস্রারে বিরাজমান গুরুকে দর্শন করলে তাঁর সাধনার কল্পতরু ফুলে-ফলে শোভিত হয়, অর্থাৎ তিনি পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করে সন্তুষ্ট হন।

বাউল সাধনা প্রেমভজনার সাধনা

কাম থেকেই প্রেমের উদ্ভব। দেহকে কেন্দ্র করেই ধীরে ধীরে দেহাতীত প্রেমের পূর্ণ বিকাশ। বাউলগীতে তাই বলা হয়েছে—

"বলব কি সেই প্রেমের কথা।
কাম হইল প্রেমের লতা।
কাম ছাড়া প্রেম যথা-তথা নাইরে আগমন।" ❑

শব্দচেতনা



শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের নানান ঘটনা ও তাঁর বাণীকে ভিত্তি করে তৈরি বিশেষ শব্দছক

১			২		৩			৪
		৫		৬			৭	
						৮		
	৯				১০			
১১				১২				১৩
১৪			১৫					
					১৬			
১৭					১৮			

সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম দশজনের নাম পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

পাশাপাশি ঃ (১) এই তীর্থে শিবলিঙ্গ দর্শন করে শ্রীশ্রীমা বলেছিলেন ঃ "যেমনটি রেখে গিয়েছিলুম তেমনটিই আছেন।" (৩) "দাস তোমা দোঁহাকার, —— নমি তব পদে।" (৬) "মা, আপনি তো দেখছি ঘোর মায়ায় বদ্ধ।"—এই কথার উত্তরে শ্রীশ্রীমা বলেন ঃ "কি করব, নিজেই ——।" (৭) "মৃত্যু বা অমৃত দুয়ে তব —— ঝরে গো।" (৯) "বাজাও দুন্দুভি, শমনবিজয়, মার নামে পূর্ণ ——।" (১০) শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্রকে মা এই নামে ডাকতেন। (১৪) এই ভাবটি বিকাশের জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমাকে রেখে গিয়েছিলেন। (১৫) এটিই শেষে শুরু হয়। (১৭) ষোড়শীপূজার পর এটি শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমায়ের চরণে সমর্পণ করেন। (১৮) নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়ির ছাদে এই ব্রতটি মা করেছিলেন।

ওপর-নিচ ঃ (১) শ্রীশ্রীমায়ের পিতার নাম। (২) "রঙ্গময়ীর —— দেখে অবাক হয়েছি।" (৩) "সারদে —— মোরে কৃপা করি সশরীরে।" (৪) "যে ছিঁড়েছে ——, তারে করি চিরদাস, নিত্য শান্তিসুধারাশি পিয়াতেছ জননি।" (৫) "নিত্যং ভব —— সুতেষু।" (৬) শ্রীশ্রীমায়ের এক ভাইঝি। (৮) "বিশ্বজননী সেজে —— জগতে তারিতে এলে মা আবার।" (১১) মায়ের দেখা অন্যতম বিখ্যাত নাটক। (১২) "শঙ্করী হইয়ে মাগো গগনে উড়িবে, —— হয়ে রব জলে নখে তুলে লবে।" (১৩) শ্রীরামকৃষ্ণ রহস্য করে শ্রীশ্রীমায়ের সম্বন্ধে বলতেন —— 'বেড়াল'। (১৫) "মঙ্গলমুরতি, —— আসিল, ভুবন ভরিল সুখে।" (১৬) মা বলেছেন, এইটি করতে করতেই সিদ্ধি হয়।

সূত্র ঃ তন্বীতনু পানি

যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন

ভারতবর্ষ তথা আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি সর্বত্র মানুষের মধ্যে একটি দুর্বিষহ অস্থিরতা, নিরাপত্তাবোধের অভাব এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা চোখে পড়ছে। তাছাড়া অর্থনৈতিক ও ভোগবিলাসের ক্রমবর্ধমান প্রসারে নানান রাজনৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বাঙালী যুবগোষ্ঠী আজ দিশাহারা। বিবেকানন্দ-বাণীই আজ তাদের ধ্রুবতারা, একথা ক্রমশ দিবালোকের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। অনেকের মনে নানান প্রশ্ন সময়ে সময়ে ওঠে, যার উত্তর তারা খুঁজে পায় না। প্রশ্নগুলি মূলত মূল্যবোধ এবং আদর্শভিত্তিক। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের প্রবীণ সন্ন্যাসীদের কেউ কেউ এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে অনুগ্রহ করে সম্মতি জানিয়েছেন। তাই 'যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন' শীর্ষক একটি বিভাগ খোলা হলো। আনন্দের বিষয়, এই বিভাগের প্রথম প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়েছেন সঙ্ঘ-সম্পাদক পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ।—সম্পাদক

ঃ নিয়মাবলী ঃ

'যুবসম্প্রদায়ের প্রশ্ন' বিভাগে প্রেরিত (ক) প্রশ্নগুলি সুনির্দিষ্ট হওয়া চাই। (খ) প্রেরকের পুরো নাম, ঠিকানা ও জন্মতারিখ উল্লেখ থাকা চাই। (গ) প্রেরকের বয়স অনূর্ধ্ব ৩০ হওয়া চাই। (ঘ) সব প্রশ্নই গ্রাহ্য হবে—এমন বলা যায় না। অনেক সময়ে এমন হতে পারে, একটি প্রশ্নের মধ্যে অন্যগুলির উত্তর সন্নিবেশিত হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে প্রেরকের মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ নেই। কারণ, প্রশ্নকর্তা প্রশ্নের উত্তর পেলেই তৃপ্ত হবেন—আমরা ধরে নেব। তাঁর নাম প্রকাশিত হলো কিনা সেটা গৌণ ব্যাপার বলেই তিনি ভাবুন, এই অনুরোধ।—সম্পাদক

প্রশ্ন ঃ *বিশ্বায়নের নামে বর্তমানে যে ভোগবাদী সভ্যতার প্রচার হয়েছে ও হচ্ছে, আজকের ভারতবর্ষ তা আঁকড়ে ধরে একপ্রকার জোর করেই যেন আপন গৌরবময়, মহিমময় অতীতকে ভুলতে চাইছে। তবে কি স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী (স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পর ভারতের সর্বৈব উত্থান) মিথ্যা হয়ে যাবে? জানি এর জন্য আমরা ভারতবাসীরাই দায়ী, কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের অর্থাৎ যুবসমাজের কর্তব্য কি?*

—কিংশুক নন্দী ও অরিন্দম নন্দী, মানিকতলা

উত্তর ঃ অন্ধকার আছে বলে আলোর মহিমা বুঝতে পারা যায়, নদীতে ভাঁটা আছে বলে জোয়ারের প্রভাব বেশি, রাত্রির পর দিন আছে বলে দিন উপভোগ্য হয়ে ওঠে। ঠিক এইরকম চতুর্দিকে ভোগবাদী প্রচার হচ্ছে বলে ভারতের আপন গৌরবময়, মহিমময় অতীত আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠছে ও প্রয়োজনীয়তার তীব্রতা অনুভূত হচ্ছে।

আমাদের শাস্ত্রে প্রেয় ও শ্রেয়র কথা আছে, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি মার্গ আছে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের চরম লক্ষ্য মুক্তি বা মোক্ষ, যা শ্রীরামকৃষ্ণ আধুনিক যুগে বলেছেন ঃ "মানবজীবনের উদ্দেশ্য ভগবান-লাভ।" পাশ্চাত্য ভোগবাদের প্রচার হলেও ভারতবর্ষের এই চিরন্তন সত্য থাকবে।

স্বামীজী সত্যদ্রষ্টা ঋষি ছিলেন। তাঁর কথা একদিন সত্য হবেই। তবে ধৈর্য ধরে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

যুবসমাজের কর্তব্য—স্বামীজীর ভাবে ভাবিত হয়ে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কর্ম সম্পাদন করা।

প্রশ্ন ঃ *(১) পাশ্চাত্য জড়বিদ্যা (Western Science) অধ্যয়ন কি আধ্যাত্মিক জীবনের পথে অন্তরায়? (২) ঈশ্বরে যথাযথ ভক্তি থাকলে ধর্মের বাহ্য আচারগুলির (পূজা ইত্যাদির) অনুশীলনের কোন প্রয়োজন আছে কি? (৩) গার্হস্থ্যজীবনে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও ধ্যানের মধ্যে আগে কোন্‌টির অনুশীলন বেশি প্রয়োজন? (৪) পূজার সময় ভিন্ন ভিন্ন দিকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজা করার আবশ্যকতা কোথায়? তাছাড়া যদি শিব, কালী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সীতা, রাম-এ কোন প্রভেদ না থাকে, তাহলে একসঙ্গে একাধিক বিগ্রহ সাজিয়ে পৃথক ভাবে পূজা করা কি প্রয়োজন? (৫) ভক্তিভরা হৃদয় ও বিশ্বাস নিয়ে নিজের মতো করে শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করা যায় কি? পূজার ক্ষেত্রে প্রচলিত বৈদিক প্রথাগুলি যথাযথ অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা কোথায়?*

—মণিমালা পরিয়ারী, মেদিনীপুর

উত্তর ঃ (১) না, অন্তরায় নয়। বরং পাশ্চাত্য জড়বিদ্যা অধ্যয়ন আধ্যাত্মিক জীবনের পথে সহায়ক। ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যা যুক্তির ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত। পাশ্চাত্য জড়বিদ্যা অধ্যয়নের পর ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যা বুঝতে সুবিধা হয়। বোঝা যায় কতটা যুক্তির ওপর এটি সুপ্রতিষ্ঠিত। বর্তমান কালে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবনে সাধনা করে তা প্রমাণ করে গেছেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি বলতেন ঃ "আমি বলছি বলে লবি না। যুক্তি দিয়ে বিচার করে যাচাই করে নিবি।" স্বামীজীও তাই করেছিলেন।

স্বামীজী পাশ্চাত্য দেশে ভারতীয় দর্শন তথা অধ্যাত্মবিদ্যা ব্যাখ্যা করেছেন; ওদেশের বড় বড় পণ্ডিতরা, বৈজ্ঞানিকরা বিজ্ঞানের সঙ্গে তার মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। বিশেষ করে স্বামীজীর সাংখ্যযোগ ও জ্ঞানযোগ পড়লে বুঝতে পারা যায়—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সঙ্গে এগুলির মিল আছে। যেখানে বিজ্ঞান অনন্তের সম্বন্ধে আর কিছু বলতে পারে না, তখন আমাদের অধ্যাত্মবিদ্যা তা পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করে দেয়। স্বামীজীর বক্তৃতাবলীতে তার ভূয় প্রমাণ আছে।

(২) ঈশ্বরকে ঐকান্তিকভাবে উপাসনা করার নামই ভক্তি। যখন মানুষ এরূপ ভক্তি লাভ করে, তখন সে সকলকে ভালবাসে, কাউকে ঘৃণা করে না, সে সর্বদা তৃপ্ত থাকে। কোন জাগতিক সুখের দ্বারা এই ভক্তির কোন হানি হয় না। কারণ,

যতক্ষণ মানুষের জাগতিক সুখের আকাঙ্ক্ষা থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত এরূপ ভক্তি আসতে পারে না। এরূপ ভক্তি লাভ হওয়ার পর ধর্মের বাহ্য আচরণগুলি অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না। স্বামীজী একথা বলেছেন তাঁর 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত 'ঈশ্বরে যথাযথ ভক্তি' লাভ না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত ধর্মের বাহ্য আচরণগুলি অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। কারণ, বাহ্য আচরণগুলি যথার্থ ভক্তিলাভের সহায়ক।

(৩) সবকয়টির প্রয়োজন আছে—তবে তা সমন্বয় করে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব—চতুর্যোগের সমন্বয়। এযুগের এই ভাব। অর্থাৎ জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম ও ধ্যান—এই চারটির সমন্বয়ে আমাদের জীবন গঠন করতে হবে। দক্ষিণেশ্বরে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র কথা নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে বলেছিলেন, তখন একমাত্র নরেন্দ্রনাথ—স্বামী বিবেকানন্দ একথার তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-এর গুরুভাব উত্তরার্ধে এবিষয়ে বিশদ আলোচনা আছে।

স্বামীজী এই ভাবটি মিশনের শিলমোহরে সন্নিবেশিত করেছেন। শীলমোহরে অঙ্কিত সূর্য জ্ঞানের প্রতীক, প্রস্ফুটিত পদ্ম ভক্তির প্রতীক, তরঙ্গায়িত জলরাশি কর্মের প্রতীক, বেষ্টিত সর্প রাজযোগ বা ধ্যানযোগের প্রতীক। এই চারযোগের সমন্বয়ে পরমাত্মা লাভ হয়—'তন্নোহংসঃ প্রচোদয়াৎ'।

গার্হস্থ্যজীবনে এই চারটি যোগের সমন্বয়ের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

(৪) অতি প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে দেবদেবীর পূজাবিধি প্রচলিত রয়েছে। সেই বিধি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দিকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজা হয়।

মানুষ অনন্তকে ধারণা করতে পারে না। এমনকি নিরাকার নির্বিশেষ তত্ত্ব মানুষের বোধের অগম্য। সুতরাং মানুষকে কোন একটি রূপকে অবলম্বন করতে হয়, তা কোন মূর্তি, ছবি বা প্রতীক যাই হোক না কেন। পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নেই, যেখানে মূর্তি বা প্রতীক নেই। মূর্তি বা প্রতীক ছাড়া অন্য কোন রূপে মানুষ ঈশ্বরের ধারণা করতে পারে না। আবার, প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি আলাদা, ভাব আলাদা। সকলেই একই রূপকে অবলম্বন করতে পারে না বা ভালবাসতে পারে না। তাই ঈশ্বরের রূপ বা মূর্তি অনেক রকমের—তা মানুষের কল্যাণের জন্যই। এজন্য শিব, কালী, দুর্গা, বিষ্ণু, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি দেবদেবীর রূপ আমরা পাই। দেবদেবীর রূপ সাধকেরা সাধনায় দর্শন করেছেন। যে যার ভাব অনুযায়ী দেবদেবীকে পূজা করে থাকেন। অবশ্য একইসঙ্গে বিভিন্ন দেবদেবীকে একত্র বসিয়ে পূজারও একটি নিয়ম আছে।

(৫) হ্যাঁ, করা যায়। একে ভাবের পূজা বলে। যেমন, স্বামীজী যখন শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা করতেন, তখন তিনি ভাবের পূজা করতেন।

কিন্তু এধরনের ভাবের পূজা সবাই করতে পারেন না। ভাবের পূজা উচ্চ সাধনমার্গে উন্নীত না হলে হয় না। সেজন্য প্রথমে বিধিবৎ পূজা করতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের পূজাও বিধিবৎ করতে হবে। তবে বর্তমানে যে-পূজাপদ্ধতি প্রচলিত আছে, তা তান্ত্রিক পদ্ধতি এবং এর মধ্যে কিছু বৈদিক মন্ত্র আছে। বর্তমান কালে বিশুদ্ধ বৈদিক প্রথা অনুসরণ করা সম্ভব হয় না।

প্রশ্ন ঃ *(১) শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবাদর্শের নিরিখে একজন ছাত্রের নিজের প্রতি, পিতামাতা ও প্রিয়জনের প্রতি এবং সমাজের প্রতি আবশ্যিক কর্তব্য কি? (২) আদর্শ ছাত্রজীবন ও ব্যক্তিজীবন গড়ার মূলমন্ত্র কি? (৩) সামগ্রিকভাবে কোন্ ভাব ছাত্রদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উত্তম ও আশু ফলপ্রদ? (৪) পাঠে অনুরাগ, একাগ্রতা বৃদ্ধি ও মানসিক স্থৈর্যরক্ষার উপায় কি?*

—কল্পনা মিত্র ও শিউলি দাস, মালদহ

উত্তর ঃ (১) নিজের প্রতি কর্তব্য ঃ সুনাগরিক ও নিঃস্বার্থপর হয়ে দেশের স্বার্থে যেকোন কাজ করা।

পিতামাতা ও প্রিয়জনের প্রতি কর্তব্য ঃ জন্ম থেকেই মা-বাবা সন্তানদের লালন-পালন করেন, উপযুক্ত শিক্ষাদান করেন। সুতরাং তাঁদের প্রতি প্রত্যেক সন্তানের কর্তব্য আছে। সংসারে তুমি যতদিন থাকবে, ততদিন তাঁদের সেবা করা পরম কর্তব্য। তবেই তুমি মাতৃ-পিতৃঋণ পরিশোধ করতে পারবে।

সমাজের প্রতি কর্তব্য ঃ সমষ্টিকে নিয়ে সমাজ। সমাজের অর্থে (অর্থাৎ সরকারকে প্রত্যেকের প্রদত্ত প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ করের সাহায্যে) প্রত্যেকে শিক্ষা লাভ করে। সেজন্য সমাজের প্রতি মানুষের কর্তব্য থাকে। সমাজের জন্য কিছু করা—বিশেষ করে সমাজে যারা সবচেয়ে অবহেলিত—তাদের সর্ববিধ উন্নতির জন্য কাজ করা চাই, তবে সামাজিক ঋণ পরিশোধ হবে। না হলে স্বামীজীর ভাষায় তারা 'হতভাগা, পামর' পদবাচ্য।

(২) শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন ঃ "মান হুঁশ।" ছাত্রজীবনে অধ্যয়নের সঙ্গে নিজেকে 'মান হুঁশ' করে তুলতে হবে। সেইসঙ্গে জীবনটি হবে পবিত্র এবং সদ্গুণাবলী অভ্যাস করতে হবে। ছাত্রজীবনে যা করবে তাই প্রতিফলিত হবে ব্যক্তিজীবনে।

(৩) স্বামীজীর ভাব সর্বাপেক্ষা উত্তম ও আশু ফলপ্রদ।

(৪) ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও পবিত্রতা অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য—যেকোন কাজে সাফল্যের জন্য মূলমন্ত্র।

রেঙ্গুনে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র*

রমা দাশগুপ্ত

অর্থ উপার্জনে হতাশ হয়ে একদা শরৎচন্দ্র প্রায় অজ্ঞাতবাস করেছিলেন ব্রহ্মদেশের (বর্তমানে মায়ানমার) রেঙ্গুনে। বহু দুর্দশা ও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অনেক ভুল-ভ্রান্তির পথ পরিক্রমা করে তিনি তাঁর সৃষ্টির উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন।

শরৎচন্দ্র কথাশিল্পী—একথা আমরা সবাই জানি, কিন্তু তিনি যে সুরশিল্পীও ছিলেন, তা খুব কম লোকই জানে।

"আমার রিক্ত শূন্য জীবনসখা, বাকি কিছু নাই
বাঁচিবার মতো আর বেশি নাহি চাই,
তুমি ঘুচায়েছ আমার যা ছিল পুঁজি
তাই দু-হাত তুলে শূন্যপানে তোমারে খুঁজি।"

রেঙ্গুন শহরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের অভ্যর্থনাসভায় শরৎচন্দ্র এই গানটি গেয়েছিলেন। গানটি শুনে মুগ্ধ হয়ে রামকৃষ্ণানন্দজী তাঁকে 'রেঙ্গুন-রত্ন' উপাধি দিয়েছিলেন।

অক্ষয়কুমার সেন যখন রেঙ্গুনে বাস করতেন তখন কয়েকজন বন্ধু মিলে 'রামকৃষ্ণ সেবক সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিবছর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে সেখানে একটা উৎসবের আয়োজন হতো। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে অনুরোধ করায় তিনি মাদ্রাজ থেকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে রেঙ্গুনে পাঠান। সময়টা ছিল ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ। ১৬ মার্চ মাদ্রাজ থেকে জাহাজে চড়ে তিনি ২০ মার্চ রেঙ্গুনে পৌঁছান। রেঙ্গুন গভর্ণমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ারের সেখানে একটি সুন্দর বাড়ি ছিল। সেখানে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। খোলা মাঠে চাঁদোয়া টাঙিয়ে উৎসবমণ্ডপ তৈরি হলো। গভর্ণমেণ্ট হাউস থেকে ফুল-লতাপাতা আনা হলো। তৈরি হলো নিকুঞ্জবন। তার ভিতর রত্নসিংহাসনে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের পট স্থাপিত হলো। উৎসবের আগের দিন চাল-ডাল আসতে দেখে শরৎচন্দ্র বললেন ঃ "এখানকার ভিখারিগুলিকে আমি একটুও শ্রদ্ধা করি না—এখানে হিন্দু ভিখারি নাই বললেই হয়। সবাই প্রায় মুসলমান ভিখারি—কেউই কাঙালী নয়। তারা ভিক্ষার জন্য ১০-১৫ টাকা গাড়ি ভাড়া দিয়ে এখানে আসে। দয়ালু মুসলমানদের বাড়ি থেকে এত টাকা পায় যে তারা সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকাও জমাতে পারে।"

রামকৃষ্ণানন্দজী হেসে বলেছিলেন ঃ "ভিখারি ও দুঃখী দরিদ্রদের 'দরিদ্রনারায়ণ' বা 'বুভুক্ষা নারায়ণ' বলে ডাকবে—এই নামগুলি স্বামী বিবেকানন্দ দিয়ে গিয়েছেন। দরিদ্রনারায়ণদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িক ভাব এনো না। সবাই তাঁর সন্তান ভেবে সকলকে সমান ভালবাসা দিয়ে সেবা করবে। এদের সেবা করার সুযোগ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করবে। ওদের ঘৃণা করো না। আমরা ওদের চেয়ে কম ভিখারি নই, ওরা কত অল্পে সন্তুষ্ট। আমরা কি অত অল্পে সন্তুষ্ট হই?" তখন শরৎচন্দ্রের পরামর্শমতো একহাজার বার্মিজ ভিক্ষুক সংগ্রহ করা হলো।

শরৎচন্দ্র বাস করতেন শহর থেকে দুই মাইল দূরে। সেখানে শ্রমিক-মজুররা বাস করত। শরৎচন্দ্রের মতো শিক্ষিত ভদ্রলোক সেখানে কেউ ছিল না। পরবর্তী কালে সেই পল্লীর নাম 'শরৎপল্লী' হয়। সেখানে সকলে শরৎচন্দ্রের পরামর্শ নিয়েই চলত। তিনি আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের ভাল-মন্দ সব দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সবাই তাঁকে 'বামুনদাদা' বলে ডাকত। সেখানে মজুরদের একটা কীর্তনদল ছিল, শরৎচন্দ্র সেই দল শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে আনলেন।

রবিবার ঠাকুরের জন্মোৎসবের দিন ভোরবেলা থেকে পূজার কাজ আরম্ভ হলো। নাগেশ্বর চাঁপা ফুল সংগ্রহ করতে স্বয়ং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ রায় বাহাদুর রামদাস ভট্টাচার্যের বাগানের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এই ফুল ভালবাসতেন।

পথে তাঁকে শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করলেন ঃ "আপনি এত পূজা করেন কেন?"

তিনি বললেন ঃ "পূজা করে বড় আনন্দ পাই।"

শরৎচন্দ্র—পূজা করাই কি শ্রেষ্ঠ উপাসনা?

মহারাজ—সর্বত্র ভগবদ্দর্শনই শ্রেষ্ঠ উপাসনা। ধ্যান মধ্যম, স্তুতি ও জপ অধম।

শরৎচন্দ্র—তবে লোকে এত আড়ম্বর করে পূজা করে কেন?

মহারাজ—পূজা জিনিসটা বাইরের মোটেই নয়, অন্তরের। সাধারণ লোকে ভগবানের তুষ্টির জন্য ভয়ে বা

---

* সম্প্রতি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী (জন্ম—১৫.৯.১৮৭৬) শুরু হয়েছে। সেই কথা স্মরণ করে এই নিবন্ধটি নিবেদিত হলো।—সম্পাদক

কামনা পূরণের জন্য মানসিক করে, পূজার্চনা করে; এসকল বড়ই তুচ্ছ। ভগবানের ওপর ভালবাসা না এলে, তাঁর দর্শনের জন্য অশ্রুপাত না হলে তাঁর পূজা হয় না। বিষয়ী লোকেদের পূজা, জপ, তপ ক্ষণিক, তারপর আর তাদের কিছু মনে থাকে না। কিন্তু প্রকৃত ভক্তরা শ্বাসপ্রশ্বাসে ভগবানের নাম জপ বা চিন্তা করেন এবং ফুল, পাতা, ফল—এইসব দিয়ে নিষ্কামভাবে তাঁর পূজা করে ভক্তিভরে বলেন—

'পূজা উপাসনা সকলি গো ফাঁকি
শুধু এই সুযোগে তোমারেই ডাকি।'

কথা বলতে বলতে তাঁরা বাগানে পৌঁছে গেলেন। ঠাকুরের প্রিয় ফুল রাশি রাশি সংগ্রহ করতে পেরে মহারাজের আনন্দ আর ধরে না! বাগানের বার্মিজ মালীটি বলল, এদেশে এই ফুলের স্থানীয় নাম 'গাড'। এই ফুল ভগবান বুদ্ধেরও খুব প্রিয়। একঝুড়ি টাটকা ফুল দেখে মহারাজ 'জয় রামকৃষ্ণ' বলে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। মহারাজ নিজের হাতে এই ফুলের মালা গেঁথে ঠাকুরকে সাজালেন।

উৎসবে কীর্তনীয়ারা গান শুরু করল—

"তেমনি করে আবার এসে ডাকাও ঠাকুর প্রেমের গান
তাতে ভেসে যাবে, ডুবে যাবে জীবের অভিমান।
সেদিন যেমন জীবের লাগি 'কথামৃত' করলে দান
প্রেমবিলাসী বিশ্ববাসী প্রেমের সুধা করছে পান।
যাতে মৃন্ময়ী চিন্ময়ী হলো, শিখাও সে প্রাণের টান
তেমনি প্রাণমাতানো 'মা, মা' রবে
আকুল করা কবির প্রাণ।
প্রাণভরে সবাই মিলে গাইব 'জয় রামকৃষ্ণ' গান।"

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কীর্তনীয়াদের সাদর সম্ভাষণ জানালেন। উপস্থিত সহস্রাধিক ভিক্ষুককে ডাল, তরকারি, পায়েস, জিলিপি পরিবেশন করা হলো। কীর্তনের পর ঠাকুরের ভোগারতি হলো। 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে উৎসব-প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠল। উৎসবের শেষে কীর্তনীয়ার দল 'জয় ভগবান রামকৃষ্ণদেব কী জয়', 'জয় রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজ কী জয়' বলে জয়ধ্বনি দিল।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ শরৎচন্দ্র ও আরো অনেকের সঙ্গে দর্শনীয় স্থানগুলি দর্শন করতে যান। 'সোয়েডাগন প্যাগোডা' দেখে মহারাজ মুগ্ধ হন। বৌদ্ধদের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনাস্থল। এমন গগনস্পর্শী সুদৃশ্য সুবর্ণ মন্দির সমগ্র প্রাচ্যে নেই। এই মন্দিরে বেদির নিচে বুদ্ধদেবের পবিত্র অস্থির সঙ্গে তাঁর কেশও সংরক্ষিত আছে। মন্দিরটি একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। একশ সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। তোরণদ্বারের দুদিকে অর্ধনর-অর্ধসিংহাকৃতি মূর্তি অবস্থিত। সিঁড়ির দুপাশে সারি সারি ব্রাহ্ম মহিলাদের ফুল ও মোমবাতির দোকান। এখানে পাণ্ডাদের উৎপাত নেই, দর্শনীর আড়ম্বর নেই। শুধু মোমবাতি জ্বেলে ফুল উৎসর্গ করে প্রণতি জানাতে হয়। মন্দিরের প্রধান চূড়া রাস্তার সমতল থেকে ৩৭০ ফুট উঁচু, সমস্ত মন্দিরটিই পাতলা সোনার পাত দিয়ে মোড়া। মন্দিরের চাতালে বহু লোক বাস করে। রত্নখচিত বেদির ওপর সাদা-পাথরের বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। মহারাজ মুগ্ধ হলেন। মন্দির প্রদক্ষিণ করে ভগবান বুদ্ধকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে তিনি ধ্যানস্থ হলেন। কয়েকজন বার্মিজ রমণী ধ্যানমগ্ন মহারাজের চরণে ফুল নিবেদন করল। ধ্যানভঙ্গ হলে তিনি ফুল দেখে বিস্মিত হলেন। তখন প্যাগোডার ট্রাস্টি আশি বছরের বৃদ্ধ মিঃ সং মহারাজকে বললেন ঃ "আমাদের দেশের মেয়েরা এর আগে আপনার মতো সন্ন্যাসী দেখেনি। ভগবান বুদ্ধদেব আপনাদের দেশের লোক তা ওরা জানে না। ওরা বুদ্ধের চরণে ফুল না দিয়ে আপনার ধ্যানস্থ জীবন্ত রূপকে ফুল দিয়ে গেছে।" পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহৎ ঘণ্টাটি এই মন্দিরে ঝোলানো রয়েছে। এই ঘণ্টাটির উচ্চতা ১৪ ফুট, ওজন ৯৪,৬৮২ পাউণ্ড। মন্দিরের সর্বোচ্চ চূড়ায় ছোট ছোট রুবি আছে—রাত্রে জ্বলজ্বল করে। রেঙ্গুনের স্বাধীন রাজা মিন্ ডু মিন দান করেছেন রত্নখচিত বুদ্ধমূর্তি, ময়ূর ও রুবি।

অনুষ্ঠান-সূচী ঃ মাঘ ১৪০৮
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী

জন্মতিথি-কৃত্য	ঃ	**স্বামী সারদানন্দ** পৌষ শুক্লা ষষ্ঠী ৫ মাঘ, শনিবার (১৯ জানুয়ারি ২০০২)
		স্বামী তুরীয়ানন্দ পৌষ শুক্লা চতুর্দশী ১৪ মাঘ, সোমবার (২৮ জানুয়ারি ২০০২)
		স্বামী বিবেকানন্দ পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী ২১ মাঘ সোমবার (৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২)
একাদশী-তিথি	ঃ	১১, ২৫ মাঘ শুক্রবার, শুক্রবার (২৫ জানুয়ারি, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০০২)

মন্দির থেকে বের হওয়ার সময় শরৎচন্দ্রের পাশে এক বৌদ্ধ পুরোহিত এসে দাঁড়ালেন। শরৎচন্দ্রকে অভিবাদন জানালেন। পুরোহিত আয়ারল্যাণ্ডের একজন শিক্ষিত খ্রিস্টান, ইনি স্বধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ হয়েছেন। তাঁর অনেক সম্মান, অগাধ পাণ্ডিত্য। ইনি যোগের দ্বারা মানুষের মন পড়তে পারেন। তিনি রামকৃষ্ণানন্দজীকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি সানন্দে তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

পরদিন প্যাগোডা রোডের ভিক্টোরিয়া হল-এ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বক্তৃতা হলো। সভাপতি ছিলেন পারসি ব্যারিস্টার মিঃ কাওয়াসজী। মহারাজ উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম ও আত্মার অভিন্নত্ব বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বললেন। মুগ্ধ হলেন আইরিশ সন্ন্যাসী। বালকস্বভাব মহারাজ নিজের গলার মালা তাঁকে পরিয়ে দিলেন।

পরদিন মহারাজ আইরিশ ফুঙ্গীর মঠে উপস্থিত হলেন। তিনি সাকারবাদী শক্তির উপাসক নিষ্ঠাবান হিন্দু ভক্ত। আর আইরিশ ফুঙ্গী নিরীশ্বরবাদী, শূন্য উপাসক, স্বধর্মচ্যুত বৌদ্ধ। তিনি বললেন ঃ "আমি জগতের সকল ধর্মের অসারতা ও বৌদ্ধধর্মের সার্বভৌমিকতা উপলব্ধি করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছি। এই ধর্ম জগতের প্রায় অর্ধেক অধিবাসীর জীবন নিয়ন্ত্রিত করছে।"

মহারাজ—আমরা জগতে প্রচলিত সকল ধর্মকেই শ্রদ্ধা করি। সকল ধর্মই সমান ও সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক।

আইরিশ ফুঙ্গী—এই মতের প্রবর্তক কে?

মহারাজ—যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

আইরিশ ফুঙ্গী—তাঁর প্রচারিত ধর্মের বৈশিষ্ট্য কি?

মহারাজ—সর্বধর্মসমন্বয়। বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ প্রমুখ জগদ্‌গুরু সকলেই স্ব স্ব প্রবর্তিত পন্থাকেই একমাত্র মুক্তিমার্গ বলে ঘোষণা করেছেন। এঁদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্থক্য এই যে, তিনি নিজে কোন ধর্মমত প্রচার করেননি। জগতে প্রচলিত সকল ধর্মের সারসত্যটুকু নিজে সাধনার দ্বারা উপলব্ধি করে তিনি 'যত মত তত পথ' দেখিয়ে দিয়েছেন। ঈশ্বরের অনন্ত রূপ ও অনন্ত ভাবের কথা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মতো কেউই এত জোরে বলতে পারেননি। সর্বস্ব ত্যাগ করতে না পারলে অমৃতের অধিকারী হওয়া যায় না। এই বিশ্বাসে এই ত্যাগিশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ কোনদিন টাকা-পয়সা স্পর্শ করেননি। তিনি সহধর্মিণীকে জগদম্বার রূপ জ্ঞানে পূজা করেছিলেন। বিবাহিত জীবনে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনের এমন জ্বলন্ত উদাহরণ জগতে আর কোথাও নেই।

আইরিশ ফুঙ্গী—বুদ্ধদেব কেবলমাত্র নির্বাণের কথা বলেছেন। বাসনার ক্ষয় হলেই নির্বাণপ্রাপ্তি হয়। ঈশ্বরবাদ তিনি স্বীকার করেননি।

মহারাজ—ধর্মক্ষেত্র ভারতে নাস্তিকবাদ থাকতে পারে না। যাঁরা বুদ্ধদেবকে ব্রহ্মবাদী বা আত্মবাদী না বলে নাস্তিক বলেন, তাঁরা একান্ত ভ্রান্ত। বুদ্ধদেব সম্পূর্ণ দার্শনিক মতাবলম্বী আস্তিক ছিলেন। গৌতম বুদ্ধের ধর্ম পবিত্র আর্যধর্ম। তাঁর সাধনা ভগবানলাভেরই জন্য। আমরা তাঁকে অবতার-জ্ঞানে পূজা করি।

মহারাজ আরো বললেন ঃ "জীব স্বরূপত ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। এই জগৎরহস্যের সন্তোষজনক মীমাংসা হিন্দুর বেদ-এ আছে। বৌদ্ধগণ বেদ মানতেন, এসম্বন্ধে বহু প্রমাণ আছে। বৈদিক মতের পর বৌদ্ধমত, বৌদ্ধমতের পর বেদমত নয়।"

আইরিশ ফুঙ্গী তখন হতাশভাবে বললেন ঃ "পরমার্থ বস্তু অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।"

মহারাজ বললেন ঃ "ঈশ্বর একমাত্র শুদ্ধ মনের গোচর। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। তিনি ধ্যানে এক, বিচারে বহু। সব পথেই ঈশ্বরলাভ করা যায়। আপনার নিজ ধর্মেই মুক্তিলাভ হতো। স্বধর্ম ত্যাগ করে এবং ধর্মান্তর গ্রহণ করে ভুল করেছেন। হিন্দুশাস্ত্র বলে, 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ'।" ❑

সহায়ক পুস্তক

১) স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ
২) ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র—গিরীন্দ্রনাথ সরকার

ভ্রম সংশোধন

'উদ্বোধন'-এর শারদীয়া ১৪০৮ সংখ্যার 'পরমপদকমলে'-তে 'কথামৃত-এ বিভাবিত শ্রীরামকৃষ্ণ' প্রবন্ধের লেখক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, শ্রীম (মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত) ২৬ জানুয়ারি ১৮৮২-তে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। ঐ সংখ্যারই অন্য একটি প্রবন্ধে প্রণবেশ চক্রবর্তী লিখেছেন, ১৮৮২ সালের মার্চ মাসে একদিন শ্রীম ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। আমরা ধরে নিয়েছি, ১৮৮২-র ২৬ ফেব্রুয়ারি শ্রীম ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। কারণ, শ্রীম জীবিত থাকাকালীন 'কথামৃত'-এর প্রথম খণ্ডের অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমদিকের সংস্করণে 'মার্চের একদিন' বলা থাকলেও পরবর্তী (৭ম) সংস্করণে '২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮২' তারিখটির উল্লেখ আছে। আবার তারিখটি ২৬ জানুয়ারি বলে উল্লেখ করেছেন সঞ্জীববাবু। তিনি নীরদবরণ হাজরার 'কলকাতা, ইতিহাসের দিনলিপি' গ্রন্থের প্রসঙ্গে একথা বলেছেন। অতএব এব্যাপারে বিতর্কের অবকাশ থেকেই যায়।—সম্পাদক



আদি শঙ্করাচার্য ৫

শিশু ও কিশোর বিভাগ

শঙ্করের বয়স এখন ১২ বছর, বারাণসীতে একদিন—



সনন্দন বলে চলে—
বাল্যকালে শুনেছিলাম নৃসিংহদেব সর্ববিপদ থেকে মানুষকে রক্ষা করেন। তাই গহন অরণ্যে গিয়ে আমি নৃসিংহদেবের ধ্যান করতে লাগলাম। বানর যে ফল খায়, সেই ফল খেয়ে জীবনধারণ করতাম। একদিন এক ব্যাধ যুবক এল।





শুনে ব্যাধ চলে গেল। খানিক পরে সে ফিরে এল একটি নৃসিংহ মূর্তি নিয়ে। আমি প্রাণ-মন দিয়ে প্রার্থনা করতে লাগলাম। ব্যাধ কোথায় চলে গেল!



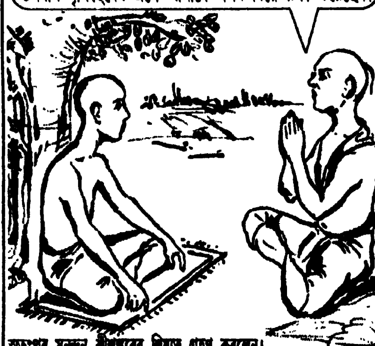
আমি কেঁদে আকুল।

অবশেষে একদিন নৃসিংহদেবের দর্শনলাভ হলো।



ভগবান বিষ্ণুর সেই নৃসিংহ-মূর্তি 'তথাস্তু' বলে অন্তর্হিত হলেন।

চিত্ররূপ ঃ দেবাশিস বসু



অতঃপর সনন্দন শ্রীশঙ্করের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

'কথামৃত'-এ বিভাষিত শ্রীরামকৃষ্ণ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বানুবৃত্তি]

আলমবাজারের মিল এলাকা পিছনে পড়ে রইল। বরানগর বাজারের ফাগুর দোকান চলে গেল। পরিপাকশক্তি দুর্বল, কিন্তু ফাগুর খাস্তা কচুরির ভক্ত। চলে গেল বিবিবাজারের মদের দোকান। এই গাড়ি, এর আরোহী দোকান-মালিকের পরিচিত। তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে নমস্কার করেন। কথা হয়নি কোনদিন। দোকানের সামনে মাতালদের জটলা দেখলে উদ্দীপন হয়।

ঠাকুর আজ গম্ভীর। কি ভাবছেন? যাচ্ছেন কোথায়? দেখা যাক।

গাড়ি বাগবাগাজের পোল পার হলো। শ্যামবাজার। এসে গেছে আমহার্স্ট স্ট্রীট। রামমোহন রায়ের বাগানবাড়ি পেরিয়ে যাচ্ছে। মাস্টারমশাই ঠাকুরের ভাবান্তর লক্ষ্য করেননি। তাড়াতাড়ি বললেন ঃ "এই যে রামমোহন রায়ের বাড়ি।"

ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বললেন ঃ "এখন ওসব কথা ভাল লাগছে না।"

একটু আগে তো বেশ গল্প করছিলেন, হঠাৎ এমন টানটান কেন? কিসের টেনশন!

এসে গেছে বাদুড়বাগান। রোকো রোকো। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটি ইংলিশ স্টাইলের বাড়ির ফটকে গাড়ি থামল। একটি পা নামছে। বার্ণিশ করা চটির শোভা ধরে আছে সুন্দর সুকোমল একটি চরণ। লালপাড় ধুতির ফ্রেম। সাবধানে। ভক্তরা সাহায্য করছেন। ফুটবোর্ডে পা রাখুন। শব্দ করে ঝুঁকে গেল একটু। রাস্তায় দাঁড়ানো বলিষ্ঠ যুবক ভবনাথের কাঁধে একটি হাত। সবাই সন্ত্রস্ত। আস্তে, আস্তে। ঠাকুরের বহুমূল্য প্রতিমা অবতীর্ণ। লংক্লথের জামা। কোঁচাটি কাঁধে ফেলতে গিয়ে দেখলেন জামার বুকে একটি বোতাম নেই। সেই জায়গাটি খোলা। চলতে গিয়ে চলা হলো না। ইতস্তত ভাব। কি হবে? বুকের বোতাম যে খোলা। মহেন্দ্রনাথ বললেন, থাক খোলা। কিছু হবে না।

ভিতরে ছোট্ট বাগান। বর্ষার ফুলে ভরা। পথ চলে গেছে প্রবেশদ্বারের দিকে। সদলে এগোচ্ছেন বিভোর শ্রীরামকৃষ্ণ। গাছের ডাল স্পর্শ দিয়ে যাচ্ছে। দরজার পর একটি ঘর। সেটি অতিক্রম করে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। উঠছেন সবাই সার দিয়ে। ধাপে, ধাপে। আর একটা, আর একটা। এসে গেছি। এই হলো উত্তরের ঘর।

মেহগনি কাঠের পালিশ-চকচকে চতুষ্কোণ টেবিল। বসার আসন দিয়ে ঘেরা। দরজার কাছে থমকে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ঐ বসে আছেন তাঁর কাঙ্ক্ষিত মানুষ। দক্ষিণাস্য। নাতিদীর্ঘ। মাথার চুল ওড়িশাবাসীদের মতো গোল করে কামানো। সাদা মোটা থান পরিধানে, ফ্লানেলের ফতুয়া। বন্ধু ও প্রার্থী পরিবৃত হয়ে। শিক্ষার প্রথম ধাপে পা রাখতে হয় এই শিক্ষকের হাত ধরে। অ-এ অজগর আসছে তেড়ে। আসুক না। আ-এ আমটি খাব পেড়ে।

টেবিলের একপাশে এসে দাঁড়িয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন। শুরু হলো সেই বিখ্যাত সাক্ষাৎকার।

"আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল বিল হৃদ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি।"

"তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।"

ইতিমধ্যে ঘর ভরে গেছে পরিবার-পরিজনে। আজ দুই কলকাতা মুখোমুখি। কলকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ, কলকাতার ঈশ্বরচন্দ্র। চাপান-উতোর চলছে। শ্রোতারা রুদ্ধশ্বাস। এইবার কি বলেন ঠাকুর?

শ্রীরামকৃষ্ণ। নাগো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর। তুমি ক্ষীরসমুদ্র! তোমার কর্ম সাত্ত্বিক কর্ম। সত্ত্বের রজঃ। তোমার দয়া। বিদ্যাদান, অন্নদান। নিষ্কাম হলেই ঈশ্বরদর্শন। তুমি তো সিদ্ধ!

বিদ্যাসাগর। কেমন করে?

শ্রীরামকৃষ্ণ। আলু-পটল সিদ্ধ হলে তো নরম হয়, তা তুমি তো খুব নরম। তোমার অত দয়া!

বিদ্যাসাগর। কলাইবাটা! সে তো শক্তই হয়!

শ্রীরামকৃষ্ণ। তুমি কি কলাইবাটা? তুমি কি শুধুই পণ্ডিত! যারা শুধু পণ্ডিত শুনতেই পণ্ডিত, কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি—শকুনির মতো পচা মড়া খুঁজছে। শকুন খুব উঁচুতে ওঠে—নজর ভাগাড়ে। দয়া, ভক্তি, বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য।

ঘরে যেন বিদ্যুৎ খেলছে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাক্যনির্ঝর। বসে আছেন, মনে হচ্ছে বিশাল এক পুরুষ।

"ব্রহ্ম—বিদ্যা ও অবিদ্যার পার। তিনি মায়াতীত। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়্‌দর্শন —সব এঁটো, একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয়নি, সেটি ব্রহ্ম।"

বিদ্যাসাগর বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে বললেন ঃ "বাঃ, বাঃ কি কথা! আগে শুনিনি।"

কথার পর কথা শ্রীরামকৃষ্ণ-গোমুখী থেকে অনর্গল নিঃসৃত হচ্ছে। গানও হচ্ছে। সবাই মোহিত। এদিকে রাত বাড়ছে।

শেষ হয়ে আসছে স্মরণীয় দিন। ঘরের পরিবেশ যেন অতল সমুদ্র। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন ঃ "অন্তরে সোনা আছে, এখনো খবর পাওনি। এগোও, এগোও সোনার খনি দেখতে পাবে। তারপর কেবল হীরে, মানিক।"

উঠে দাঁড়িয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বিদায় আসন্ন।

উঠেছেন বিদ্যাসাগর। হাতে নিয়েছেন লণ্ঠন। আলো দেখাবেন। পথ অন্ধকার। শ্রীরামকৃষ্ণ স্মিত হেসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে

বললেন ঃ "একবার বাগান দেখতে যাবেন, রাসমণির বাগান। ভারী চমৎকার জায়গা।"

বিদ্যাসাগর বললেন ঃ "যাব বৈকি। আপনি এলেন আর আমি যাব না!"

কেন গেলেন না।

আলো দেখাতে দেখাতে ফটকের দিকে এগোচ্ছেন বিদ্যাসাগর। শ্রীরামকৃষ্ণ আসছেন পিছনে। ফটকের পাশে রাস্তায় অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে আছেন এক শুভ্রমূর্তি। কে এখানে। শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আভূমি প্রণত। শ্মশ্রুমণ্ডিত। গৌরবর্ণ। শুভ্র উষ্ণীষধারী। পথের ধূলায় ভ্রূক্ষেপ নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ হাত ধরে ওঠাতে ওঠাতে বিস্ময়ে বললেন ঃ "বলরাম তুমি! এত রাতে।"

আলো-ছায়ায় দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলরাম বললেন ঃ "আমি অনেকক্ষণ এসেছি। এখানে দাঁড়িয়েছিলুম।"

"ভিতরে কেন যাও নাই।"

"আজ্ঞা, সকলে আপনার কথাবার্তা শুনছেন, মাঝে গিয়ে বিরক্ত করা!"

এই এক মানুষ!

বিদ্যাসাগর মশাই লণ্ঠন তুলে ধরেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়িতে উঠলেন ভক্তসঙ্গে। চালাও। সোজা দক্ষিণেশ্বর। বাড়ির সামনে লণ্ঠন-হাতে বিদ্যাসাগর। গাড়ি চলে যাচ্ছে দূর থেকে দূরে। পথ গুটিয়ে আসছে। কাল থেকে কাল বিচ্ছিন্ন হলো। অশ্বশকট ফিরে এল কথামৃতের কালাধারে।

আবার পর্দা উঠছে। এবার আসর বসবে ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণের বারান্দায়। শ্রাবণের বিকেল। শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তমণ্ডলী। রাম, মনোমোহন, সুরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, মহেন্দ্রনাথ। আজ যে রবিবার। ভক্ত কেদার চাটুজ্যে, সরকারি অ্যাকাউন্টেন্ট আজ উৎসব দিয়েছেন। সকাল থেকে খুব আনন্দ। রামবাবু ওস্তাদ এনেছিলেন। তিনি গান গেয়েছেন।

ওস্তাদ জানতে চান, কি উপায়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।

ঠাকুর বলছেন, ভক্তিই সার। অহঙ্কার অভিমান থাকলে হবে না। 'আমি'-রূপ ঢিবিতে ঈশ্বরের কৃপারূপ জল জমে না, গড়িয়ে যায়।

আরতি শুরু হলো। দক্ষিণের বারান্দা জনশূন্য। গঙ্গার বাতাস। সানাইয়ের আলাপ।

রাত আসছে। শ্রীরামকৃষ্ণের রাত। মায়ের সঙ্গে খেলা করবেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

আজ কে শুয়ে আছেন ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে পাতা বিছানায় এই দিবা দ্বিপ্রহরে। বাইরে শরতের নীল আকাশে ভারহীন মেঘের মানোয়ারী ময়ূরপঙ্খী। শরৎ। পূর্ণ শরৎ। দূর হিমালয় থেকে ঢাকের শব্দ আসছে কি? আগামী বৃহস্পতিবার দুর্গাসপ্তমী।

এই তো নরেন্দ্রনাথ। মাছের মধ্যে রুই। নরের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আহার করেছেন। এখন বিশ্রাম। ঠাকুর বসে আছেন তাঁর পাশটিতে। পিতার পাশে বালকের মতো। অন্য ভক্তরাও রয়েছেন। আজ ঠাকুর নিজের জীবনকথা বলছেন। মথুরবাবুর সঙ্গে কাশীতে যাওয়ার গল্প।

না, নরেন্দ্রকে বিশ্রাম করতে দাও। আমিও আমার তক্তপোশে যাই।

বিকেল হয়েছে, নরেন্দ্রনাথ বসেছেন গানে। ঠাকুরের ঘরের দেওয়াল থেকে নেমেছে সেই বিখ্যাত তানপুরা। ঘরে বসে আছেন ভক্তগণ। এখন তাঁরা সব স্মরণীয়। রাখাল, লাটু, নরেন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম বন্ধু প্রিয়, হাজরামশাই।

কীর্তন হচ্ছে, আনন্দবদনে বল মধুর ব্রহ্মনাম। খোল, করতাল বাজছে। নরেন্দ্রাদি ভক্তরা ঠাকুরকে বেড় দিয়ে নাচছেন আর গাইছেন—"প্রেমানন্দ রসে হও রে চির-মগন।" কখনো গাইছেন—"সত্যং শিবং সুন্দররূপ ভাতি।"

নরেন্দ্রনাথ এইবার নিজে খোল ধরেছেন। মত্ত হয়ে ঠাকুরের সঙ্গে গাইছেন—"আনন্দবদনে বল মধুর হরিনাম।"

ঘুরে ঘুরে নাচ। উন্মত্ত নাচ। দক্ষিণেশ্বরে কি মহাপ্রভু এসেছেন!

কীর্তন শেষ। প্রশান্ত শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রশস্ত বুকে নরেন্দ্রনাথকে আবদ্ধ করেছেন। নরেন্দ্রনাথ উত্তপ্ত, ঘর্মাক্ত। বুকে মাথা রেখে তাঁর মনে হচ্ছে—বুক নয়, যেন শীতল শালগ্রাম। ঠাকুর বারেবারে বলছেন ঃ "তুমি আমায় যে আনন্দ দিলে!" জলের ধারা, প্রেমাশ্রু নামছে দুচোখে।

অনন্তের ভাস্করকে আমি অনুরোধ জানাই, আলিঙ্গনাবদ্ধ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের মিলিত এই মূর্তিটি গড়ে কালের মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে দিন—আমরা যুগ যুগ ধরে প্রণাম করি।

'কথামৃত' বন্ধ করে বুকে স্থাপন করি। রাত নিরালা হোক। শুনি কি হচ্ছে অন্দরে। এ যে বিপরীত বিজ্ঞান। দূরে গেলে ক্ষীণ হয়, অস্পষ্ট হয়। এ কি? যত দূরে যাচ্ছে তত প্রবল ও স্পষ্ট হচ্ছে! এঁরা যাচ্ছেন, না আসছেন!! [ক্রমশ] (চার)

সমাধান ঃ শব্দচেতনা ৫

পাশাপাশি ঃ (১) কানহেরী, (৩) হাতরাস, (৫) পুরী, (৬) অলকট, (৮) শোন, (১১) শক্তি, (১২) পুনা, (১৬) রোম, (১৭) আলাসিঙ্গা, (১৮) শ্রীমা, (২০) রমাবাঈ, (২১) শিবানন্দ।

ওপর-নিচ ঃ (১) কাশীপুর, (২) হেস্টি, (৪) সদানন্দ, (৭) কঠ, (৯) দাশরথি, (১০) ভবনাথ, (১৩) ধারোয়ার, (১৪) খেলা, (১৫) প্রেমানন্দ, (১৯) সেবা।

সৎ চরিত্র

মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানের পর মহারাজ যুধিষ্ঠির শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্মের নিকট উপদেশ প্রার্থনা করলে তিনি কথাপ্রসঙ্গে একটি উপাখ্যান বিবৃত করেন। উপাখ্যানটির মূল বক্তব্য অনুযায়ী নামকরণ করা হয়েছে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—পিতামহ! এই জীবলোকে সকলেই ধর্মশীলতার সবিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকে। অতএব কিরূপে উহা লাভ করা যায় এবং উহার স্বরূপই বা কি? ইহা যদি আমাদিগের জ্ঞাতব্য হয়, তাহা হইলে কীর্তন করুন। ঐবিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে।

ভীষ্ম কহিলেন—মহারাজ! পূর্বে রাজা দুর্যোধন ইন্দ্রপ্রস্থে তোমার ও তোমার ভ্রাতৃগণের ঐশ্বর্য সন্দর্শনে নিতান্ত সন্তপ্ত ও সভামধ্যে উপহাসিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক পিতা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আদ্যোপান্ত সমুদয় নিবেদন করিল। রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের মুখে সমুদয় বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক শ্রবণ করিয়া কর্ণের সমক্ষে তাহাকে কহিলেন ঃ বৎস! তোমার সন্তাপের তো বিশেষ কারণ দেখিতে পাই না। তুমি বিলক্ষণ ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছ। তোমার ভ্রাতৃগণ ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবেরা কিঙ্করের ন্যায় সতত তোমার আজ্ঞানুবর্তী রহিয়াছে। তুমি অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান ও উপাদেয় পলান্ন ভোজন করিয়া থাক এবং সুদৃশ্য অশ্ব সমুদয় তোমাকে বহন করে। তবে তুমি কি নিমিত্ত পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হইয়াছ?

দুর্যোধন কহিলেন ঃ মহারাজ! পাণ্ডবদিগের আলয়ে প্রতিদিন দশ সহস্র স্নাতক ব্রাহ্মণ সুবর্ণপাত্রে আহার করে। আর তাহাদিগের ফলপুষ্পোপশোভিত দিব্য সভা, তিত্তিরি ও কল্মাষ দেশীয় অশ্ব এবং বিবিধ বস্ত্র বিদ্যমান আছে। পাণ্ডুতনয়েরা আমার পরম শত্রু। আমি তাহাদের কুবের সদৃশ সমৃদ্ধি সন্দর্শন করিয়াই যাহারপরনাই সন্তপ্ত হইয়াছি।

তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন ঃ বৎস! যদি তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরের তুল্য বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট শ্রীলাভের অভিলাষ কর, তাহা হইলে সচ্চরিত্র হও। সচ্চরিত্রতা দ্বারা ত্রিলোক আয়ত্ত করা যাইতে পারে, সন্দেহ নাই। ত্রিলোকমধ্যে সচ্চরিত্র সাধু ব্যক্তির অসাধ্য কিছুই নাই। দেখ, মান্ধাতা এক রাত্রিমধ্যে, জনমেজয় তিন দিবসে এবং নাভাগ সাত রাত্রিতে পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন। ঐসমস্ত ভূপালেরা সচ্চরিত্র ও অতিশয় দয়ালু ছিলেন বলিয়াই বসুন্ধরা উহাদিগের গুণে বদ্ধ হইয়া স্বয়ং উহাদের আয়ত্তা হইয়াছিলেন।

দুর্যোধন কহিলেন ঃ মহারাজ! যাহার প্রভাবে ঐসমস্ত পূর্বতন মহীপাল অতি অল্পকাল মধ্যে বসুন্ধরা অধিকার করিয়াছিলেন, সেই সচ্চরিত্রতা কিভাবে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে?

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন ঃ বৎস! পূর্বে দেবর্ষি নারদ এই সচ্চরিত্রতা বিষয়ে এক ইতিহাস কীর্তন করিয়াছিলেন, শ্রবণ কর। পূর্বকালে একবার দানবরাজ প্রহ্লাদ স্বীয় চরিত্রবলে দেবরাজ ইন্দ্রের রাজ্য অপহরণ ও ত্রৈলোক্য আপনার বশে আনয়ন করিয়াছিলেন। সুররাজ পুরন্দর রাজ্য অপহৃত দেখিয়া বৃহস্পতির সন্নিধানে গমনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! কি করিলে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে? ইহা অবগত হইতে আমার অতিশয় অভিলাষ জন্মিয়াছে। তখন বৃহস্পতি কহিলেন, দেবরাজ! মোক্ষোপযোগী জ্ঞানই শ্রেয়োলাভের নিদান। ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! মোক্ষোপযোগী জ্ঞান অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের উপায় আর কিছু আছে কি? দেবগুরু বৃহস্পতি কহিলেন, দেবরাজ! মহাত্মা শুক্র শ্রেয় বিষয়ের উপদেশ প্রদানে আমা অপেক্ষা সমধিক সমর্থ হইবেন। অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমনপূর্বক এই বিষয়ে পুনরায় জিজ্ঞাসা কর, তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল হইবে। তখন সুররাজ মহাত্মা শুক্রের নিকট গমনপূর্বক পরম প্রীতি সহকারে আপনার শ্রেয় সাধন জ্ঞানলাভ করিলেন এবং পরিশেষে তাঁহার নিকট হইতে বিদায়ের অনুমতি লইয়া পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, ভগবন্! আপনি যেরূপ উপদেশ দিলেন, ইহা অপেক্ষা শ্রেয়োলাভের উৎকৃষ্ট উপায় আছে কি? তখন সর্বজ্ঞ শুক্রাচার্য কহিলেন, দেবরাজ! মহাত্মা প্রহ্লাদ এবিষয়ে তোমাকে সবিশেষ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতে পারিবেন। অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন কব।

দেবরাজ ইন্দ্র শুক্রের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া যাহারপরনাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং অচিরাৎ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ-পূর্বক প্রহ্লাদের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, দানবরাজ! আমি তোমার নিকট শ্রেয় সাধনের উপায় জ্ঞাত হইতে অভিলাষ করি। প্রহ্লাদ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি ত্রৈলোক্য শাসনে নিতান্ত আসক্ত হইয়াছি, এক্ষণে আমার কিছুমাত্র অবসর নাই। অতএব আমি আপনাকে এই বিষয়ে উপদেশ দিতে পারিলাম না। ব্রাহ্মণ কহিলেন, দৈত্যরাজ! যে সময় তোমার অবসর হইবে তুমি সেই সময় আমাকে এই বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিও। ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে প্রহ্লাদ পরম প্রীত হইয়া তাঁহার বাক্যে অঙ্গীকারপূর্বক অবসরক্রমে তাঁহাকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণও শিষ্যের ন্যায় নম্রভাবে প্রহ্লাদকে সৎকার ও তাঁহার অভিলাষানুসারে সমস্ত কার্য অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন।

একদা ব্রাহ্মণ দানবরাজকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, দৈত্যরাজ! তুমি কিরূপে এই ত্রৈলোক্য অধিকার করিলে তাহা কীর্তন কর। তখন প্রহ্লাদ কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি রাজা হইয়াছি বলিয়া কদাচ ব্রাহ্মণগণের প্রতি অসূয়া (পরশ্রী-কাতরতা, ঈর্ষা, দ্বেষ) প্রদর্শন করি না। প্রত্যুত তাঁহারা শুক্রপ্রণীত নীতি বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিলে পরম সমাদরে তাহা গ্রহণ ও তদনুসারে কার্যানুষ্ঠান করিয়া থাকি। তাঁহারা বিশ্বস্তচিত্তে আমার নিকট নীতিকীর্তন করিয়া থাকেন এবং আমাকে নীতিপথাবলম্বী, শুশ্রূষানিরত, অসূয়াশূন্য, ধর্মপরায়ণ, জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় বোধ করিয়া মক্ষিকাসকল যেমন মধুক্রমে মধুবর্ষণ করে, তদ্রূপ আমার মনোমধ্যে শাস্ত্রীয় উপদেশসকল প্রদান করেন। এক্ষণে আমি সেই ব্রাহ্মণগণের উপদেশ গ্রহণ করিয়াই নক্ষত্রগণের মধ্যে শশাঙ্কের ন্যায় স্বজাতীয়দিগের রাজা হইয়াছি। ব্রাহ্মণের নীতিবাক্য অমৃততুল্য। ব্রাহ্মণমুখে নীতিশ্রবণ ও তদনুসারে কার্যানুষ্ঠান করা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই।

দানবরাজ প্রহ্লাদ ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রকে এইরূপে শ্রেয়োলাভের উপদেশপ্রদানপূর্বক তাঁহার শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া কহিলেন, ব্রাহ্মণ! আমি আপনার ভক্তি দর্শনে আপনার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি। এক্ষণে আপনি বর প্রার্থনা করুন। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, আপনাকে অভিলষিত বর প্রদান করিব। তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন, দানবরাজ! যদি তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার প্রিয়কার্য অনুষ্ঠানের অভিলাষ করিয়া থাক, তবে এই বর প্রদান কর যে, আমি যেন তোমার সচ্চরিত্রতা লাভ করিতে পারি। ব্রাহ্মণ এইরূপ প্রার্থনা করিলে প্রহ্লাদ যুগপৎ পরম প্রীত ও নিতান্ত ভীত হইলেন এবং সত্য প্রতিপালন করা পরম ধর্ম বিবেচনা করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে তাঁহার অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। বর প্রদান করিবামাত্র দানবরাজের অন্তঃকরণ দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া উঠিল। অনন্তর বিপ্ররূপী দেবরাজ প্রহ্লাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পুলকিত মনে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলে প্রহ্লাদ গাঢ়তর চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইলেন এবং তৎকালে কি করিবেন কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না।

ইত্যবসরে তাঁহার কলেবর হইতে সহসা অশরীরী এক তেজ নির্গত হইল। দানবরাজ প্রহ্লাদ তদ্দর্শনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তেজ কহিল, আমি চরিত্র। এক্ষণে তোমা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া প্রস্থান করিতেছি। যে-ব্রাহ্মণ শিষ্যত্ব স্বীকারপূর্বক প্রতিনিয়ত তোমার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, আমি অতঃপর তাঁহারই দেহে অবস্থান করিব। চরিত্র প্রহ্লাদকে এই কথা বলিয়া তথা হইতে অন্তর্হিত হইয়া ইন্দ্রের দেহে প্রবিষ্ট হইল।

অনন্তর দানবরাজের দেহ হইতে আরেকটি তেজ নির্গত হইল। তখন প্রহ্লাদ উহাকে সম্বোধনপূর্বক কহিলেন, ভদ্র! তুমি কে? তেজ কহিল, দৈত্যেরাজ! আমি ধর্ম। যে-স্থানে চরিত্র, আমি তথায়ই অবস্থান করিয়া থাকি। এক্ষণে চরিত্র সেই ব্রাহ্মণ সন্নিধানে গমন করিয়াছে। সুতরাং আমাকেও তথায় গমন করিতে হইবে।

ধর্ম এই বলিয়া প্রস্থান করিলে আরেকটি তেজ মহাত্মা প্রহ্লাদের দেহ হইতে সহসা নিষ্ক্রান্ত হইল। প্রহ্লাদ তাহাকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তেজ কহিল, দানবরাজ! আমি সত্য। এক্ষণে তোমাকে পরিত্যাগপূর্বক ধর্মের সঙ্গে চলিলাম। সত্য এই বলিয়া প্রস্থান করিলে প্রহ্লাদের দেহ হইতে একটি মহাবল পরাক্রান্ত পুরুষ নির্গত হইল। প্রহ্লাদ তাহাকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাপুরুষ! তুমি কে? পুরুষ কহিল, মহারাজ! আমি সৎকার্য। যেখানে সত্য আমি সেইখানেই অবস্থান করিয়া থাকি।

অনন্তর প্রহ্লাদের দেহ হইতে গভীর শব্দ করিতে করিতে আরেকটি তেজ নির্গত হইল। প্রহ্লাদ তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল, দানবরাজ! আমি বল। সৎকার্য যে-স্থানে অবস্থান করে, আমিও তথায় অবস্থান করিয়া থাকি। বল এই বলিয়া প্রস্থান করিলে প্রহ্লাদের দেহ হইতে এক প্রভাময়ী দেবী নির্গত হইলেন। প্রহ্লাদ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, দেবি! তুমি কে? দেবী কহিলেন, দানবরাজ! আমি লক্ষ্মী। আমি এতদিন তোমার দেহে অবস্থান করিতেছিলাম, এক্ষণে তোমা কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া বলের অনুগমন করিতেছি। লক্ষ্মী এই কথা কহিলে প্রহ্লাদের অন্তঃকরণে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ভয়ের সঞ্চার হইল। তখন তিনি লক্ষ্মীকে সম্বোধনপূর্বক পুনরায় কহিলেন, দেবি! তুমি এক্ষণে কোথায় গমন করিবে? তুমি ত্রিলোকের ঈশ্বরী ও সত্যব্রতপরায়ণা। এক্ষণে সেই ব্রাহ্মণ কে তাহা তোমাকে কীর্তন করিতে হইবে। সেই ব্রাহ্মণের তত্ত্ব জ্ঞাত হইতে আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে। তখন লক্ষ্মী কহিলেন, দানবরাজ! যে-ব্রাহ্মণ তোমার নিকট শিষ্যরূপে নীতিশিক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি সুররাজ ইন্দ্র। ত্রিলোকমধ্যে তোমার যে-ঐশ্বর্য আছে, তিনি তাহা অপহরণ করিয়াছেন। তুমি সচ্চরিত্রতা দ্বারা তিন লোক ও ধর্ম অধিকার করিয়াছিলে। দেবরাজ তাহা অবগত হইয়া তোমার সেই সচ্চরিত্রতা অপহরণ করিয়াছেন। ধর্ম, সত্য, সৎকার্য, বল ও আমি—আমরা সকলেই সচ্চরিত্রতার অধীন। লক্ষ্মী এই বলিয়া তথা হইতে গমন করিলেন।

অনন্তর রাজা দুর্যোধন পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন : তাত! সচ্চরিত্রতা কি এবং উহা কি রূপেই বা লাভ করা যাইতে পারে তাহা কীর্তন করুন। ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন : বৎস! মহাত্মা প্রহ্লাদ সচ্চরিত্রতা ও তৎপ্রাপ্তির উপায় পূর্বেই নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমি সংক্ষেপে উহার প্রাপ্তি বিষয়ে কিছু উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। **কায়মনোবাক্যে কাহারো অনিষ্ট চিন্তা না করা এবং উপযুক্ত পাত্রে দান ও সকলের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করাই সচ্চরিত্রতা বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে।** যে-পুরুষকার দ্বারা কাহারো হিতসাধন না হয় এবং যাহা দ্বারা জনসমাজে লজ্জাপ্রাপ্ত হইতে হয়, সেরূপ পুরুষকার কদাচ প্রকাশ করিবে না। যে-কার্য দ্বারা জনসমাজে প্রশংসার্হ হওয়া যায়, ঐরূপ কার্যেরই অনুষ্ঠান কর্তব্য; আমি এই সংক্ষেপে সচ্চরিত্রতালাভের উপায় নির্দেশ করিলাম। যদি কোন রাজা অসচ্চরিত্রতা দ্বারা কোনক্রমে সমৃদ্ধিলাভ করেন, তাহা তাঁহার চিরকাল ভোগ হয় না, প্রত্যুত তাঁহাকে অবিলম্বেই সমূলে বিনষ্ট হইতে হয়। অতএব যদি তুমি যুধিষ্ঠির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সমৃদ্ধিলাভের অভিলাষ কর, তাহা হইলে আমার এই কথা বিলক্ষণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সচ্চরিত্র হও।

হে ধর্মরাজ! রাজা ধৃতরাষ্ট্র আপনার পুত্র দুর্যোধনকে পূর্বে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে তুমি ঐ উপদেশের অনুবর্তী হও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট ফললাভে সমর্থ হইবে। ❑

নীতিকথা

"অর্থ বিনষ্ট হওয়া তেমন কিছু নয়;
স্বাস্থ্যের ক্ষতি কিছুটা ক্ষতি;
কিন্তু চরিত্রের হানি হওয়া মানে সমস্তই ক্ষতি হওয়া।"
"If money is lost, nothing is lost.
If Health is lost, something is lost.
If Character is lost, everything is lost."

সঙ্কলক : সঞ্জয় মাইতি

এই বিভাগে প্রকাশিত মতামত একান্তভাবেই পত্রলেখক-লেখিকাদের।—সম্পাদক, 'উদ্বোধন'

শ্রীরামকৃষ্ণ ও চিত্রকলা

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শুধুমাত্র একজন ঈশ্বর-প্রেমিক অবতারপুরুষ নন, তাঁর শিল্পচেতনা ও নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গিও অতুলনীয়। তাঁর অঙ্কিত যে-কয়টি চিত্র এখন বর্তমান, সেগুলি গভীর তাৎপর্য বহন করে। নরেনকে তিনি চাপরাস দান করছেন, সেখানেও সেটি দিচ্ছেন চিত্রের মাধ্যমে। দেবদেবীর গঠনভঙ্গি কেমন হবে, দেবচক্ষু বা দেবীচক্ষুর চিত্ররূপ কেমন হবে সেবিষয়ে তাঁর জ্ঞান অসাধারণ।

স্বামী প্রভানন্দ তাঁর 'আনন্দরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থে 'শিল্পী রামকৃষ্ণ' অধ্যায়ে লিখেছেন ঃ "শিল্পী ছবি এঁকে, প্রতিমা নির্মাণ করে মাটি কাঠ পাথরের মধ্যে বিচিত্র ঐশ্বর্য সৌন্দর্য মাধুর্য ইত্যাদি অভিব্যক্ত করে ভগবানের আনন্দসত্তাকে প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত করতে চান। বালক গদাধরের মধ্যে সমন্বিত হয়েছে শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্য ও ভগবদ্ভক্তের অনুরাগ ও ভক্তি। একাধারে মৃন্ময়ীর রূপশিল্পী ও চিন্ময়ীর ভাবকুশলী হওয়াতে তিনি অতীন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যের মধ্যে, চিৎ ও জড়ের মধ্যে যোগসেতু রচনা করতে পেরেছিলেন। জড় ও চেতনের মধ্যে দুস্তর বাধাটি অতিক্রম করাতে তাঁর শিল্পসাধনায় যুক্ত হয়েছিল নতুন মাত্রা।" (পৃঃ ৬৯) এরপর ঐ গ্রন্থের ৭৫ পৃষ্ঠায় তিনি আরো লিখেছেন ঃ "আমাদের শিল্পী রসজ্ঞ চিত্র-সমালোচকও বটে।... দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের দেওয়ালে নানান দেবদেবীর ছবি। একদিন ঘরের দেওয়ালে টাঙানো যশোদার ছবিটি দেখিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'ছবি ভাল হয় নাই, ঠিক যেন মেলেনীমাসী করেছে।'—চিত্র-সমালোচক শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিত স্পষ্ট।"

ঠাকুরকে নিয়ে অনেক শিল্পীই চিত্র অঙ্কন করেছেন। ঠাকুরের সময়েই তাঁর ভক্ত সুরেন্দ্র একজন শিল্পীকে দিয়ে যে-ছবিটি করিয়েছিলেন, ঠাকুর সেটি দেখেছিলেন। তিনি বলতেন *'সুরেন্দ্রের পট'*। এটি তাঁর খুবই ভাল লেগেছিল।

বিখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বসুও তাঁর বিষয়ে চিত্র অঙ্কন করেছেন। শিল্পী ফ্রাঙ্ক ডোরাকের অঙ্কিত শ্রীরামকৃষ্ণের চিত্রটি তো কালজয়ী অনবদ্য সৃষ্টি।

'বিশ্বচেতনায় শ্রীরামকৃষ্ণ' গ্রন্থে 'শ্রীরামকৃষ্ণের শিল্প ও শিল্পদৃষ্টি' অধ্যায়ে রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ "১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১ মে তারিখে শ্রীরামকৃষ্ণের সকল গৃহী ও সন্ন্যাসী শিষ্যের এক সমাবেশে বিবেকানন্দ প্রস্তাব করেছিলেন যে, গুরুর নামে এক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হবে। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর যে কার্যপ্রণালী স্থিরীকৃত হয় তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো—শিল্পকলাদির বিবর্ধন ও উৎসাহদান।" (পৃঃ ৪৬৫)

শিল্পকলার প্রতি স্বামীজীর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার নবম খণ্ডের 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' অধ্যায়ে রণদাপ্রসাদ দাশগুপ্তকে স্বামীজী বলছেন ঃ "এই দেখুন না, আপনাদের আর্টস্কুলের ছবিগুলিতে যেন কোন expression (ভাবের বিকাশ) নেই। আপনারা হিন্দুদের নিত্য ধেয়মূর্তিগুলিতে প্রাচীন ভাবের উদ্দীপক বহিঃপ্রকাশ দিয়ে আঁকবার চেষ্টা করলে ভাল হয়।... এই মনে করুন না, মা কালীর ছবি। এতে যুগপৎ ক্ষেমঙ্করী ও ভয়ঙ্করী মূর্তির সমাবেশ। ঐ ছবিগুলির কোনখানিতে কিন্তু ঐ উভয় ভাবের ঠিক ঠিক expression দেখা যায় না। তা দূরে যাক, একটাও চিত্রে ঐ উভয় ভাবের ঠিক ঠিক বিকাশ করবার চেষ্টা কারুর নেই। আমি মা কালীর ভীমামূর্তির কিছু idea (ভাব) 'Kali the Mother' নামক ইংরেজী কবিতাটায় লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছি। আপনি ঐ ভাবটা একখানা ছবিতে express করতে পারেন কি?" (পৃঃ ১৮৯) শিল্পী রামকিঙ্কর বেজের একটি অনবদ্য শিল্পকীর্তি আছে—'শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ'। সম্প্রতি কম্পিউটারের সাহায্যে নানারকম প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন শিল্পের একটা বিষম (কদাচিৎ সুষম) সংমিশ্রণ ঘটানোর প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তবে কম্পিউটার তো যন্ত্র মাত্র। তার আগে আমাদের শিল্পচেতনার প্রকৃষ্ট উন্মেষ ঘটানোর প্রয়োজন বলে মনে করি।

জয়দেব ভট্টাচার্য
নবদ্বীপ, নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২

'প্রসঙ্গ গীতাঞ্জলি' ও কয়েকটি তথ্য

'উদ্বোধন' পত্রিকার শারদীয়া (আশ্বিন ১৪০৮) 'গবেষণা' বিভাগে প্রকাশিত বীরেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রসঙ্গ গীতাঞ্জলি' রচনাটি তথ্যসমৃদ্ধ ও সুখপাঠ্য। এপ্রসঙ্গে আরো দু-একটি তথ্য জানাতে ইচ্ছা হচ্ছে, আশা করি একে ধৃষ্টতা মনে করবেন না। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের নোবল পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারে সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন কবি ভার্ণার ভন হেইডস্ট্যাম। তিনি নোবল কমিটিতে ছিলেন ও 'গীতাঞ্জলি' পাঠে তাঁর বিমুগ্ধ মনোভাব একটি প্রশস্তিপত্রে লিখে অন্য সদস্যদের কাছে পাঠান। সে-পত্রটি সাহিত্য আকাদেমি প্রকাশিত রবীন্দ্রশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থে 'Tagore and Noble Prize' প্রবন্ধে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি ঐ পত্রে লিখেছিলেন ঃ "The intense and loving piety that permeates his every thought and feeling, the purity of heart, the noble and natural sublimity of his style, all combine to create a whole that has a deep and rare spiritual beauty."

দ্বিতীয় বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত, সমালোচক, কবি পের হালস্ট্রয়েমের কথাও লেখক উল্লেখ করেছেন। এছাড়া সুইডিস অ্যাকাডেমির একজন সদস্য রবীন্দ্রনাথের মূল বাঙলা রচনা পড়েছিলেন, তাঁর নাম এসেইস্টিগার। ঐ একই নামের সুইডেনের বিখ্যাত কবির পৌত্র। তাঁর সুপারিশও যথেষ্ট কাজ করেছিল।

কারো কারো মতে, নোবল পুরস্কার পাওয়ার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ নিজে তদ্বির করেছিলেন। এই বিষয়ে অধ্যাপক

শঙ্করীপ্রসাদ বসু লণ্ডনের রামকৃষ্ণ বেদান্ত সেণ্টারে সংগৃহীত মিস ম্যাকলাউডের একটি চিঠি উদ্ধার করেন। সেই চিঠিতে আছেঃ "When Tagore's Geetanjali was translated into English from Bengali, a Swede Mr. Muller bought 200 copies at 5 dollars a copy, costing 1000 dollars and sent them to 200 of the important Swedes in Sweden—the result being Tagore's getting the Noble Prize...."

তিনি বলতে চেয়েছেন, দুশ জন সাহিত্যপ্রেমীর অভিমত এই পুরস্কার দানের পিছনে কার্যকরী হয়েছিল।

এই চিঠিটি কলকাতার 'টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এর পত্রিকা 'রবীন্দ্রভাবনা'র ১৯৮৩-র নভেম্বর-ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আমি ঐ প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষিকা এবং আমার লেখা 'নোবল পুরস্কার ও রবীন্দ্র সংবর্ধনা' বইতে এসব তথ্য সঙ্কলিত আছে।

৭ অগ্রহায়ণ ১৩২০ শান্তিনিকেতনে যে বিরাট জনসভা হয় কবিকে অভিনন্দিত করতে এবং যে-সভায় যোগদান করতে জ্ঞানিগুণিজনের এক বিরাট দল কলকাতা থেকে গিয়েছিল—সে-সভায় কবি যে একটি রূঢ় ভাষণ দেন, তার উল্লেখ লেখক করেছেন। তাতে যথার্থ বন্ধু ও প্রিয়জনেরা মনে আঘাত পেয়েছেন তা অনুভব করে ব্যথিত কবি ক্ষমাপ্রার্থনা করতে কলকাতায় আসেন। ১১ অগ্রহায়ণ ১৩২০ 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় তাঁর একটি পত্রও প্রকাশিত হয়েছিল। চিঠিটি ছিল এইরকম—

রবিবাবুর পত্র

নানা অনিবার্য কারণে আমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও একান্ত দুঃসাধ্য হওয়াতে গত ৭ অগ্রহায়ণ, রবিবার শান্তিনিকেতন আশ্রমে আতিথ্য আয়োজনে প্রভূত ত্রুটি হইয়াছিল, সেজন্য সর্বসাধারণের নিকট করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি। ইতি—

১১ই অগ্রহায়ণ ১৩২০
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কার্বন কপি করে যে-চিঠি কবি অনেকের কাছে পাঠিয়েছিলেন, তা ছিল এইরকম—

"আমার সম্মানলাভে যাঁহারা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন তাঁহাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।..."

ঐ সভার দিন মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকার ও বিরূপ ভাষণের অনেক কারণ ছিল। কিন্তু ঐ ৭ অগ্রহায়ণ তারিখটিতে রবীন্দ্রনাথকে নিজ জীবনে শোকের অশ্রুজলে দুঃখদেবতার তর্পণ করতে হয়েছে একাধিকবার। ১৩০৯-এর ৭ অগ্রহায়ণ কবিপত্নী মৃণালিনীদেবীর মৃত্যু হয়। ১৩১৪ সালের ৭ অগ্রহায়ণ কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের আকস্মিকভাবে অকালমৃত্যু হয়। সেসব আঘাত কবি ধৈর্য সহকারে সহ্য করেছেন নীরবে। কিন্তু পুরস্কারকে কেন্দ্র করে মানুষের দেওয়া নিন্দা-কুৎসার আঘাত সহ্য করা অসম্ভব হয়ে ওঠায় কবি এমন ভাষণ দিয়েছিলেন।

জয়ন্তী রায়
সল্ট লেক
কলকাতা-৭০০ ০৬৪

PRISONER'S LETTER

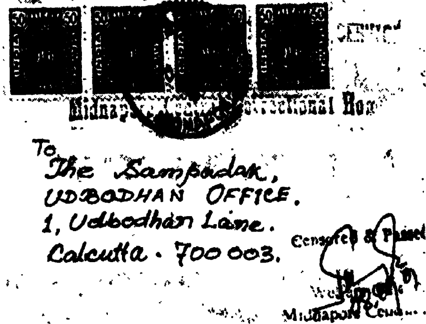
Midnapore
07/09/2001

পরম পূজ্যবরেষু,

মহারাজজী সর্বপ্রথম জানাই ভক্তিপূর্ণ প্রণাম। আশাকরি শ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমায়ের পূর্ণ কৃপায় সর্বাঙ্গীণ কুশল আছেন। ভাদ্র মাস পর্যন্ত প্রতিটি বই যথাসময়ে পেয়েছি। সত্যি বলতে কি, 'উদ্বোধন' ও 'প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা' পাঠ করে যথেষ্ট পরিমাণে মনোবল পাই। তাই এবছরও 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকের টাকা ডাকযোগে পাঠিয়েছি। আরো একটি নতুন গ্রাহক হতে পারে যদি ঠাকুর কৃপা করেন।

আপনাদের সকলের আশীর্বাদ এবং সর্বোপরি ঠাকুর ও শ্রীমায়ের কৃপায় সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। জানি না ঠাকুর কবে মুক্তি দেবেন এবং আবার আপনার চরণস্পর্শ পাব। মহারাজজী, আশীর্বাদ করবেন যেন মুক্তির রাস্তায় এগিয়ে যেতে পারি। ঠাকুর ও মায়ের কাছে প্রার্থনা করবেন তাঁদের কৃপায় যেন তাঁদের পথের পথিক করে নেন। আবারো আশীর্বাদ প্রার্থনা করে শেষ করছি।

ইতি
শ্রী... চক্রবর্তী
মেদিনীপুর


To
The Sampadak,
UDBODHAN OFFICE.
1, Udbodhan Lane.
Calcutta - 700 003.

সম্ভবত রাজনৈতিক কারণে শ্রীচক্রবর্তী এখন মেদিনীপুরের সদর কারাগারে আছেন। কারাগারকে ইদানীং 'Correctional Home' বলে সরকারিভাবে অভিহিত করা হয়। চিঠিটি সেন্সর করে তবেই ছাড়া হয়েছে। এই সংশোধনাগারেই শ্রীচক্রবর্তী 'উদ্বোধন'-এর সেবা করে চলেছেন। তাঁকে আমরা সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন জানাই।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৮৯৩ সালে আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখিত এক পত্রে স্বামী বিবেকানন্দ লিখছেনঃ "... কাল নারী কারাগারের অধ্যক্ষা মিসেস জনসন মহোদয়া এখানে (ম্যাসাচুসেটস) আসিয়াছিলেন; এখানে কারাগার বলে না, বলে —সংশোধনাগার। আমেরিকায় যাহা যাহা দেখিলাম, তাহার মধ্যে ইহা এক অদ্ভুত জিনিস।" (পত্রাবলী, পৃঃ ৭৬)

—সম্পাদক

শব্দজগতে বিপ্লব আনলেন বাঙালী বিজ্ঞানী

সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে লিখিত

প্রায় একশ বছর পূর্বে শব্দ রেকর্ডিং ব্যবস্থায় স্টিরিওফোনিক শব্দের কল্পনা করেছিলেন বিজ্ঞানীমহল। তখন সে-ব্যাপারে গবেষণা বেশিদূর এগোয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এই গবেষণা ব্যাপকতর হলো এবং ক্রমে ষাটের দশকে কলকাতায় স্টিরিওফোনিক শব্দের আবির্ভাব ঘটল। স্টিরিওফোনিক শব্দের অর্থ—দক্ষিণ কর্ণ ও বাম কর্ণে গান-বাজনা ইচ্ছা করলে পৃথক ভাবে শোনা অথবা ইচ্ছা করলে দুটিকে কেন্দ্রস্থলে এনে শোনার ব্যবস্থা। পৃথক পৃথক ভাবে শুনলে মনে হবে যেন ডানদিকে কেউ গান গাইছে, বাঁদিকে কেউ তবলা বাজাচ্ছে। সাধারণভাবে মানুষ স্টিরিওফোনিক ব্যবস্থাটি এভাবেই বোঝে। আসল ব্যাপার হলো, একই input দুটি চ্যানেলে বিভিন্ন frequency-তে ভাগ করে দেওয়ার যে-পদ্ধতি, তাকেই stereophonic effect বলা হয়। এই ব্যবস্থাটা পূর্বে ছিল না। তখন মোনো (Mono) রেকর্ডিং ব্যবস্থায় সবটাই মিশ্রিত আকারে একই বক্স বা স্পীকার থেকে আসত। এখন দুটি পৃথক স্পীকার যোগাড় করতে পারলে frequency আলাদা করা যায়। অথবা ইচ্ছা করলে সেন্টার করে নিয়ে একটি কেন্দ্রীভূত শব্দ শোনা সম্ভব, মনে হবে—কোন স্পীকারেই শব্দ হচ্ছে না, অথচ দুটি স্পীকারের মধ্যবর্তী কোন জায়গায় শব্দ উদ্ভূত হচ্ছে।

এই শব্দব্যবস্থায় মিশ্রণ খুব ভাল হয়। অর্থাৎ গান, তবলা, মন্দিরা, সেতার, বেহালা, বাঁশি ইত্যাদির মিশ্রণ এত সুন্দর হয় যে, মনে হবে সামনে বসে শুনছি গোটা অনুষ্ঠানটি।

স্পীকার দুটি হলেও যখন রেকর্ডিং হয়, তখন আটখানি ট্র্যাক-এ বা লেন (Lane)-এ রেকর্ডিং হয়। কোন ট্র্যাকে কণ্ঠস্বর, কোন ট্র্যাকে তবলা, কোন ট্র্যাকে বেহালা, অন্য ট্র্যাকে সেতার ইত্যাদি বসানো হয়। ফলে ইচ্ছামতো তবলা বাড়িয়ে-কমিয়ে নেওয়া যায়। সেইরকম ইচ্ছামতো কণ্ঠস্বর-টুকু বাড়িয়ে-কমিয়ে নেওয়া যায়। অথবা কোন বাজনা যদি খারাপ হয়, সেটিকে মুছে দিয়ে তার ওপরেই ঐ ট্র্যাকে নতুন করে রেকর্ডিং করে নেওয়া সম্ভব হয়। তারপরে মিশ্রণের কাজ। খুব শক্ত কাজ। যত ভাল মিশ্রণ হয় ততই সেই গানটি উত্তীর্ণ হয়।

কিন্তু আটটি ট্র্যাক (অথবা ১৬টি বা ৩২টি ট্র্যাক)-এ রেকর্ডিং হলেও আমরা শুনব দুটি স্পীকারের সাহায্যে। এই নয় যে, আটটা ট্র্যাকের বাজনাগুলি আটটা স্পীকারে বাজবে। দুটি চ্যানেলে শোনার এই ব্যবস্থাটিকে স্টিরিওফোনিক ব্যবস্থা বলা হচ্ছে। এর কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। ডান ও বাম—উভয় কান দিয়ে শব্দ শুনছি। এর বাইরে নয়। এবং মস্তিষ্কেরও দুটি স্নায়ুকেন্দ্রে তার প্রতিক্রিয়া হচ্ছে, পুরো মস্তিষ্কে নয়। অনেক গবেষণা করে আমেরিকা বা ইউরোপে ডানদিক থেকে বাঁদিকে বা বাঁদিক থেকে ডানদিকে মাথার ওপর দিয়ে শব্দটিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার খানিকটা সফল প্রচেষ্টা হয়েছিল, পুরোপুরি নয়। এই অবস্থায় 'আমি আছি, গান শুনছি'—এই বোধ পূর্ণমাত্রায় থাকে এবং স্টিরিওফোনিক শব্দের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব খানিকটা হয় বিনোদনাত্মক, খানিকটা ঔৎসুক্যাত্মক, কখনো বা আধ্যাত্মিক। সেক্ষেত্রেও গানের বাণীর ওপর নির্ভর করে মনের প্রতিক্রিয়া। গানের বাণী শৃঙ্গার রসাত্মক হলে সেখানে আপাতদৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। যদিও সঙ্গীত মাত্রই সীমা থেকে অসীমে উত্তরণের এক দিব্য পন্থা। পূর্বপ্রসঙ্গে আসি। স্টিরিওফোনিক শব্দকে দুই কানে পৃথক পৃথক শোনা বা কেন্দ্রীভূত করে শোনা অথবা মাথার ওপর দিয়ে এক কান থেকে অন্য কানে নিয়ে আসার ব্যাপারে গত ২৫-৩০ বছরের গবেষণায় কেউ কেউ সফল হয়েছিলেন।

সম্প্রতি বৌবাজার স্ট্রীটের একটি গবেষণাকেন্দ্রে সজল বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে শব্দের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন। তাঁর মতে, শব্দের এই দিকটি পৃথিবীর অন্য কোথাও এইভাবে উন্মোচিত হয়নি। বিজ্ঞানীমহলে এবং পৃথিবীর তাবড় তাবড় শিল্পীমহলে ঘটনাটি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় শব্দের এই অবস্থাটির নাম দিয়েছেন—ওমনিসোনিক (Omnisonic), অর্থাৎ সর্বব্যাপী শব্দ [উপনিষদের বর্ণনায় সর্বব্যাপী শব্দব্রহ্ম]। গ্রাম্য বিনোদনের জন্য এই শব্দকে ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। তার কারণ, এই শব্দের এমন একটা গাম্ভীর্য আছে, যা মানুষকে অন্তর্মুখী করে তোলে। সম্পূর্ণ ডিজিট্যাল এনহ্যান্সমেন্টের প্রক্রিয়ায় শব্দ মনের ওপর যে কি বিপুল প্রভাব ফেলতে পারে, তা তিনি শ্রোতাকে প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। ব্যবহার করা হবে—দুকানে দুটি হেডফোন। আর কিছু নেই। কিন্তু একটি ছোট ঘরের মধ্যে বসে সুন্দর যন্ত্রসঙ্গীত ক্রমশ শ্রোতাকে কখন কিভাবে অনন্তে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তা প্রত্যক্ষানুভব ছাড়া বোঝানো সম্ভব নয়।

শব্দকে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬০° ঘুরিয়েছেন। সারা পৃথিবীতে শব্দের ওপর গত তিন দশকে প্রচুর গবেষণার কাজ হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু আনুভূমিকভাবে ৩৬০°, উল্লম্বভাবেও ৩৬০° এবং অক্ষত্রয়কে যেকোন কোণে রেখে শব্দকে যেমন খুশি ঘুরিয়ে দেওয়ার এই অদ্ভুত প্রক্রিয়া শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের যুগান্তকারী আবিষ্কার। শব্দ কোথায় উৎপন্ন

হচ্ছে—ঐ দুটি স্পীকারে, নাকি যেখানে ভাবছি সেখানেই—এটিই হলো মজার ব্যাপার। মনে হবে, সমস্ত ঘরের সর্বত্র শব্দ নির্মিত হচ্ছে! তাই শব্দ হলো Omnisonic—সর্বব্যাপী। এই নয় যে, শব্দের এই সর্বব্যাপিতা এই মুহূর্তে সৃষ্টি হলো। এই সর্বব্যাপিতা চিরকাল ছিল, আমরা এই ধরনের শব্দ কখনো শুনিনি। তাই এর অস্তিত্বও জানা ছিল না। উপনিষদে একই কথা ঋষি বলেছেন : "শব্দাক্ষরং পরং ব্রহ্ম।" (অমৃতবিন্দু উপনিষদ্) অর্থাৎ একাক্ষর প্রণবাত্মক শব্দই পরব্রহ্ম—সর্বব্যাপী—সর্বানুস্যূত।

এই Omnisonic শব্দের বৈশিষ্ট্য হলো, মস্তিষ্কের মাত্র দুটি বিন্দুতে আবদ্ধ না থেকে এই শব্দ সারা মস্তিষ্কে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে যদি শব্দের (যন্ত্রসঙ্গীত বা কণ্ঠসঙ্গীত) অভিঘাত আরামপ্রদ হয়, তাহলে পুরো মস্তিষ্কটি আরাম পায় এবং প্রচণ্ড উদ্বেগের মুহূর্তে এই Omnisonic শব্দ একটা অদ্ভুত স্বস্তি এনে দেয় শরীর ও মনে। অর্থাৎ এই নবাবিষ্কৃত শব্দের প্রয়োগ বিনোদনের ক্ষেত্রে যতটা, তার চেয়ে ঢের বেশি হতে পারে চিকিৎসাক্ষেত্রে।

সম্প্রতি পণ্ডিত রবিশঙ্কর ঐ নতুন আবিষ্কারে খুব আকৃষ্ট হয়েছেন। বহু গুণী শিল্পী এই শব্দের প্রয়োগ নিয়ে অত্যন্ত আশান্বিত। ইংরেজী ও বাঙলা দৈনিক সংবাদপত্রে এসম্পর্কে নানা আলোচনা করা হয়েছে। কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার যেমন আমাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল স্বাধীনতাহীনতার ফলশ্রুতিতে, তেমনি যেন এই আবিষ্কার আমাদের হাতছাড়া না হয়ে যায়।

এখনো পর্যন্ত এই আবিষ্কার সারা বিশ্বে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করলেও এর একটি সুঠাম গাণিতিক ভিত্তি প্রয়োজন। আমাদের দেশের বড় বড় বিজ্ঞানীর যৌথ সহযোগিতা ছাড়া সে-কাজ সম্ভব নয়। যৌথভাবে সকলে মিলে যদি এই গবেষণাকাজটি এগিয়ে নিয়ে যান, বিশ্বের দরবারে একটি বেনজির আবিষ্কার বাঙালী তথা ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বলতর করে তুলবে সন্দেহ নেই।

মন্তব্য : *শব্দবিজ্ঞান নিয়ে এখনো পর্যন্ত তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু আবিষ্কার চোখে পড়ে না। সম্প্রতি চিকিৎসাক্ষেত্রে শব্দকে প্রয়োগ করে নানা সুফল পাওয়া গেলেও শব্দের তাত্ত্বিক দিক থেকে বিগত একশ বছরে উল্লেখযোগ্য কিছু গবেষণা হয়নি। ISRO-র সঙ্গে যুক্ত এক বিজ্ঞানী, শুনেছিলাম Photon-এর মতোই Sonon-এর অস্তিত্ব আছে বলে কিছু গবেষণা করেছিলেন। সম্ভবত সেই গবেষণা বেশিদূর এগোয়নি। যদি সফল হতেন, ঐ গবেষণা নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হতো নিশ্চয়ই। আমাদের আলোচ্য ব্যাপারটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আবিষ্কার আমাদের ঔপনিষদিক তত্ত্বের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। যে-সত্যের অন্বেষণে শৌনক ঋষি অঙ্গিরাকে প্রশ্ন করেছিলেন : "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি?" অর্থাৎ কী সেই বস্তু যা জানলে পৃথিবীর সব কিছু জানা যায়? সেই প্রশ্নের মীমাংসা ঋষি অঙ্গিরা করেছিলেন মুণ্ডক উপনিষদের মাধ্যমে। এই Omnisonic শব্দের ব্যাপারেও অনেকটাই সেকথা প্রমাণিত হয়েছে যে, এই শব্দের সঙ্গে অন্যান্য শব্দের সম্পর্ক সমুদ্র এবং সমুদ্র-তরঙ্গের সম্পর্কের মতোই বলা যায়। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ঋষি বললেন : "আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরপ্, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।" অর্থাৎ আকাশ থেকে বায়ু সৃষ্টি হলো, বায়ু থেকে অগ্নি, অগ্নি থেকে জল এবং জল থেকে ক্ষিতি বা পৃথিবী। আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে এই পঞ্চভূতের সম্পর্ক আছে। ক্ষিতি অর্থাৎ পৃথিবীর সঙ্গে গন্ধ (নাসিকা) [ফুলের গন্ধ পৃথিবী থেকেই তো সৃষ্টি হয়েছে], জলের সঙ্গে রস (জিহ্বা), অগ্নির সঙ্গে আলো (চোখ বা দৃষ্টি), বায়ুর সঙ্গে স্পর্শ (ত্বক) এবং আকাশের সঙ্গে শব্দ (শ্রবণ)। সুতরাং শব্দের যে longitudinal এবং progressive wave concept—দুটোই অত্যন্ত বাহ্য ও স্থূল। আলোকে আমরা electromagnetic wave বলেই জানি, শব্দকে নয়। বৈদিক ধারণায় শব্দ আলোর চেয়ে সূক্ষ্মতর এবং সর্বব্যাপী। বিজ্ঞানী বলেন, মহাবিশ্বে সর্বত্র আলো ছড়িয়ে আছে। কিন্তু space বা আকাশের সঙ্গে আলোকে কখনো সমান অভিধায় বসানো হয়নি বা যায়নি। শব্দের সঙ্গে আকাশের সম্পর্ক। তাই শব্দ বিশ্বচরাচরে সর্বত্র অনুস্যূত হয়ে রয়েছে আকাশরূপে। উল্টোটাও বলা যায়, আকাশ বিশ্বচরাচরে সর্বত্র অনুস্যূত হয়ে রয়েছে শব্দরূপে। সেক্ষেত্রে electromagnetic wave (তার বিভিন্ন frequency হতে পারে)-এর অস্তিত্বের জন্যই শব্দকে প্রয়োজন। সেই বৈদিক সিদ্ধান্তের দিকেই শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আবিষ্কার অঙ্গুলিনির্দেশ করেছে বললে ভুল হবে না। শ্রবণ এখানে দর্শনে পরিণত হয়েছে। বেশিক্ষণ নয়, দশ মিনিটের একটি polyphonic bed-এর ওপর শিবস্তোত্রের একটি layer দেওয়া হয়েছে। তা শোনার পরে মনে হবে মস্তিষ্ক সর্বব্যাপী শব্দতরঙ্গরাশিতে দ্রবীভূত হয়েছে। মনে হবে এক অতীন্দ্রিয় রাজ্য থেকে ঘুরে এলাম।* ❑

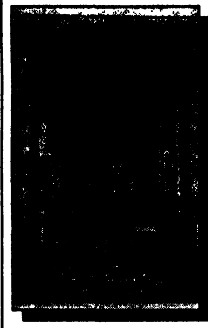
প্রতিবেদক : স্বামী সর্বগানন্দ

ভ্রম সংশোধন

'উদ্বোধন'-এর শারদীয়া ১৪০৮ সংখ্যার ৭৩৮ পৃষ্ঠায় 'প্রাসঙ্গিকী' বিভাগে 'প্রসঙ্গ বিদেশে দুর্গাপূজা' শীর্ষক পত্রে শ্রীশ্রীমায়ের উক্তি—"যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন" ভ্রমবশত শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি বলে উল্লিখিত হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য পত্রলেখিকার সঙ্গে আমরাও সমভাবে দুঃখিত। অনেকেই এই ভুল নির্দেশ করে চিঠি দিয়েছেন। তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।—**সম্পাদক**

চিদানন্দ সিন্ধুনীরে

স্বামী সুপর্ণানন্দ



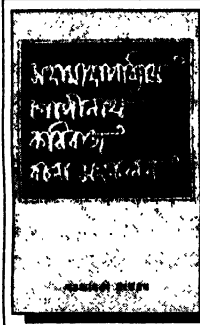
মহাদাতা মহাপ্রভু
শ্রীহরিহরানন্দ
প্রকাশক ঃ
কৃষ্ণা চক্রবর্তী
নির্মলকুমার কুণ্ডু
এস. চক্রবর্তী অ্যাণ্ড সন্স
২বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩
পৃষ্ঠা ঃ ১২+৪০৮
মূল্য ঃ ৮০ টাকা

লেখক পরম বৈষ্ণব। পূর্বাশ্রমে বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী। বংশের ধারা অনুযায়ী ভক্তিশাস্ত্র পঠন-পাঠন নিয়েই থাকেন। তিনি নিজেই ভূমিকাতে লিখেছেন ঃ "পূজ্যপাদ অগ্রজ শ্রীযুক্ত প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী, সাহিত্য-সরস্বতী একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' সম্পর্কে অনেকেই আগ্রহী। কিন্তু দর্শনের কথা পণ্ডিতজনের লেখা, বেশির ভাগই সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য। আগ্রহী সাধারণে যাতে বুঝতে পারে, এমন সহজ করে লেখা দরকার।" তাঁরই ইচ্ছাকে মর্যাদা দিয়েই লেখক আলোচ্য '**মহাদাতা মহাপ্রভু**' গ্রন্থটি লেখেন। কিন্তু আমরা তাঁর গ্রন্থে 'অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ' কথাটির উল্লেখ মাত্রই পাই। ব্যাখ্যা তো দূরের কথা, পক্ষান্তরে তিনি ভাগবতের তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব ইত্যাদি আলোচনা করেই মহাপ্রভুর মতাদর্শ ব্যাখ্যা করেছেন। সবিস্তারে মহাপ্রভুর সঙ্গে বাসুদেব সার্বভৌম, রামানন্দ রায়, বেঙ্কটভট্ট, রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখের বিচার আলোচনা করেছেন। মহাপ্রভুর মহাদান যে 'প্রেমনাম বিতরণ', সেকথা বলাই বাহুল্য। এই শ্রীনামমহিমা শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ এবং তাঁদের পার্ষদদের জীবন অবলম্বনে ব্যাখ্যাত হয়েছে। কৃষ্ণ নামেই কৃষ্ণপ্রেম মিশে আছে। নামের ভিতরেই প্রেম। গ্রন্থটির প্রথম ভাগে বিচারকথা স্থান পেয়েছে—যা উল্লেখ করা হলো। দ্বিতীয় ভাগে উপায়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। বৈধীভক্তি সাধনের কথায় গুরুকরণ থেকে শুরু করে একাদশী পালন, তীর্থবাস, নামসঙ্কীর্তন প্রভৃতি ৬৪ প্রকার সাধনের অল্পবিস্তর উল্লেখ আছে। তারপর রাগানুগা ভক্তির সাধন। ইষ্টে গাঢ় নিষ্ঠাই হলো রাগ। স্বাভাবিক অনুরাগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সেবা রাগানুগাভক্তি। তারপর প্রেমভক্তি—শ্রীকৃষ্ণ-রতি গাঢ় হলে প্রেমভক্তি আসে।

লেখক গীতা, ভাগবত, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, চৈতন্য-চরিতামৃত প্রভৃতি আকরগ্রন্থ থেকে প্রভূত দিব্য কাহিনী এবং শ্লোক উদ্ধার করে তাঁর বক্তব্য নিবেদন করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ-লীলা অনুবৃত্ত হয়ে চলেছে শ্রীগৌরলীলার মধ্য দিয়ে। শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তাই জীবের ধর্ম। সে-চিন্তা দৃঢ় হয়, নিত্য হয় যদি চিত্তে বিরহরসের উদ্ভব ঘটে। শ্রীগৌরলীলাতে বিরহরসের পরম পরিপাটি। সরল কথায় গভীর তত্ত্বকে লেখক প্রকাশ করেছেন। আশাকরি গ্রন্থটি পাঠ করে পাঠকের প্রাণ তৃপ্ত হবে। ❑

এক জ্ঞানব্রতীর অমর রচনালেখ্য

লোকনাথ চক্রবর্তী



মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ
কবিরাজ রচনা সংকলন
প্রকাশক ঃ
মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ
কবিরাজ শতবার্ষিকী উৎসব সমিতি
ভাদাইনী, বারাণসী-২২১০০১
পৃষ্ঠা ঃ ৮+৪২৩
মূল্য ঃ ৪০ টাকা

আচার্য গোপীনাথ কবিরাজের জীবন একদিকে মনস্বিতার আলোকে প্রদীপ্ত, অপরদিকে অধ্যাত্ম-তত্ত্বের লোকোত্তর উপলব্ধিতে প্রোজ্জ্বল। ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন শাখায় তাঁর সাবলীল সঞ্চরণ ছিল সহজাত। জ্ঞানব্রতী গোপীনাথ বারাণসীতে নিভৃতে যেমন সারস্বত সাধনায় নিমগ্ন ছিলেন, তেমনি দীর্ঘ জীবনে বহু সাধুসঙ্গও করেছেন। তাঁর সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধ সত্তার প্রসাদও তিনি অকৃপণভাবে বিতরণ করে গেছেন, সুধীসমাজ তাতে খুঁজে পেয়েছে প্রাণের তর্পণ। এগার বছর আগে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের শতবার্ষিকী সমাজের নানা স্তরে পালিত হয়েছিল। তার মধ্যে বিদ্বৎসমাজের বাঙ্ময়ী পূজা নিঃসন্দেহে আচার্যদেবের প্রতি উত্তরকালের শ্রদ্ধার নিদর্শন হয়ে আছে। আমরা সংস্কৃত, বাঙলা, হিন্দি ও ইংরেজীতে লিখিত প্রবন্ধসমূহের মূল্যবান সঙ্কলন সেই 'নবোন্মেষ' নামক বইটিতে পেয়েছিলাম। তবে তাতে তাঁর নিজের লেখা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি আটকানোর জন্যই সম্ভবত আমরা পাইনি। সেই অভাব পূর্ণ করেছে 'মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ শতবার্ষিকী উৎসব সমিতি'।

আচার্য গোপীনাথের সাহিত্যকৃতির কথা স্মরণ করলে আমরা জানতে পারব তাঁর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বিষয়ের

বিস্তৃতি ও গভীরতার পরিমণ্ডল কেমন ছিল। ১৯১৪ থেকে ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সরস্বতী ভবনের গ্রন্থাগারিক থাকার সময়ই তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। 'ত্রিপুরা রহস্য' (জ্ঞানখণ্ড) ও 'যোগিনী হৃদয় দীপিকা' সম্পাদনার সময় তান্ত্রিক দৃষ্টিতে তিনি যে দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছিলেন, তা আজও অনুসন্ধানীর কাছে উপাদেয় হয়ে আছে। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের ভূমিকা এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও তান্ত্রিক শাক্তদৃষ্টি বিষয়ে হিন্দিতে লিখেছিলেন। সেটা ১৯৬৩ সাল। 'তান্ত্রিক সাহিত্য' তাঁর একটি অসাধারণ হিন্দি সাহিত্য। 'নিত্যাষোড়শিকার্ণব' নামে যোগ-তন্ত্রের একটি মূল্যবান গ্রন্থও তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন।

তাঁর বাঙলা বইগুলি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, ডঃ গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং জগদীশ্বর পাল (বর্তমানে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ)। বাঙলায় একুশটি, ইংরেজীতে দুটি এবং হিন্দিতে দশটি গ্রন্থ ওঁদের প্রচেষ্টায় পরিবেশিত হয়েছে। তাই আলোচ্য '**মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ রচনা সংকলন**' গ্রন্থটিতে সঙ্কলিত সবকটি রচনাই আগে আমরা অন্যত্র দেখেছি। এখানে বৈশিষ্ট্য হলো প্রবন্ধের বিষয় ক্রমনির্ধারণ। এর জন্যই প্রচ্ছন্নতাপ্রিয় আচার্যের মধ্যে যে সারস্বত ও আধ্যাত্মিক সত্তার সমন্বয় নিহিত ছিল, সামান্য হলেও তার সান্নিধ্য পাওয়া গেল। গ্রন্থের প্রথম তিনটি প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে গুরুতত্ত্ব বিষয়ে। তারপর অধ্যাত্মবিকাশের ক্রম, দীক্ষার স্বরূপ, কুণ্ডলিনীতত্ত্ব, ইচ্ছাশক্তি, শব্দের মহিমা, দেহবিজ্ঞান, কাল ও ক্ষণতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গ, পরম শিবের পৃষ্ঠভূমি প্রভৃতি মোট আটচল্লিশটি লেখা এই গ্রন্থের প্রাপ্তি। লক্ষণীয় হলো দুটি প্রবন্ধের নির্বাচন—নাদের স্বরূপ এবং রস ও সৌন্দর্য।

'নাদের স্বরূপ' প্রবন্ধে আচার্যদেব বলেছেন : "নাদ করিতে করিতে ধ্বনি বা নাদের বিকাশ হইয়া থাকে। নাদ মূলে এক হইলেও ইহাতে অনন্ত প্রকার সূক্ষ্ম বৈচিত্র্য আছে। ... মহানাদকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র সৃষ্টি প্রকাশ পাইতেছে। ... ধ্বনি মূল বস্তু নহে, উহা জ্যোতির ক্রিয়াজনিত অনুভূতি মাত্র।... এই ধ্বনিমণ্ডল বাহ্যভাবের আধিক্যবশত অশুদ্ধ ধ্বনিতে পরিণত হইয়া বায়ু সহযোগে বর্ণমালারূপে প্রকাশিত হয়।... এই বর্ণসমষ্টি লইয়া বদ্ধজীবের ভাব ও ভাষা রচিত হইয়াছে।..." আমরা জানি, ওঙ্কারনাথ দেব রচিত 'নাদলীলামৃত' গ্রন্থের দীর্ঘ ভূমিকায় তিনি এবিষয়ে অনেক নতুন ও মৌলিক তত্ত্ব দিয়েছেন, যা শুধু অনুভবী ছাড়া কারো কাছে পাওয়া যাবে না। নাদ প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই নামের কথা তাঁর দুটি রচনাতেই স্থান পেয়েছে। সেখানে তিনি বলেছেন : "নাম হইতে শব্দ জাগে —ইহা সত্য, কাম হইতে জাগে—ইহাও সত্য।" পরে 'নাদলীলামৃত'-এর ভূমিকায় তিনি বিস্তৃতভাবে বলেছেন : "নামসাধনার দুইটি দিক আছে—একটিতে নামসাধনা নাদে পর্যবসিত হয়, অপরটিতে উহা রূপাভিব্যক্তিব মধ্য দিয়া ভাবসাধনার পথে রসে পর্যবসিত হয়।" এই ভূমিকার বিষয়বস্তু বিশেষ প্রাঞ্জল ও সুস্থিত। তাই মনে হয় তাঁর রচনা সঙ্কলনের সময় এই ভূমিকাটি সংযুক্ত করলে আলোচ্য বিষয়ে আচার্যের পরিপূর্ণ বক্তব্য একত্র পাওয়া যেত। সঙ্কলনের ব্যতিক্রমী দ্বিতীয় প্রবন্ধ হলো 'রস ও সৌন্দর্য'। সৌন্দর্যতত্ত্বের কঠিন আবরণ উন্মোচন করে তার অধ্যাত্মসত্তার সঙ্গে তিনি পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন পরিণত মননে। এখানে তাঁর কাছে জানতে পারি—অপ্রাকৃত সাত্ত্বিক সৌন্দর্যই হলো পূর্ণ অখণ্ড সৌন্দর্য বা রস এবং অপ্রাকৃত প্রেমই খাঁটি রসবোধ। বিপরীতক্রমে দেহসর্বস্ব সৌন্দর্য হলো অপূর্ণ। এর অপর নাম মলিন রসবোধ। গোপীনাথ কবিরাজ মনে করেন, প্রাকৃত প্রেম সৌন্দর্যের অতিক্রমণে কোন জয়োল্লাস নেই, অপ্রাকৃতের সঙ্গে প্রাকৃত প্রেমের কোন অচ্ছুৎভাবও নেই। প্রাকৃত সৌন্দর্য থেকে অপ্রাকৃত সৌন্দর্যে উঠে আসার পরেই বোঝা যাবে যে, সমগ্র প্রাকৃত অপ্রাকৃতের আধারেই বিধৃত আছে।

এপ্রসঙ্গে স্মরণীয় হলো কিছু বৈষ্ণব ও শৈব সামগ্র্যবাদী, আবার শ্রীমৎ অনির্বাণ চান 'ট্র্যান্সমিউটেশান'-এর মাধ্যমে প্রাকৃতের স্থায়িত্ব। সেখানে গোপীনাথ কবিরাজ অপ্রাকৃতের উদ্দেশে প্রাকৃতের যে নিরবচ্ছিন্ন অঙ্গুলিনির্দেশ, সেদিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রাকৃতের পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা করলেন। জানালেন—প্রাকৃত জগৎস্বরূপে অপ্রাকৃতের নিত্য-সিদ্ধ বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং সঙ্কলনটি অধ্যাত্মসৌরভ ভূমি থেকে ভূমা পর্যন্ত পরিব্যাপ্তির সংবাদ নিবেদন করে। এইটিই অপূর্ব প্রাপ্তি।

'বিদ্বৎচরিতপঞ্চকম্' গ্রন্থের ভূমিকায় গোপীনাথ কবিরাজ বলেছিলেন : "বিদ্বানগণ সম্মান অন্বেষণ করেন না, উহা স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে ভূষিত করে।" তাঁর পবিত্র জীবনেও আমরা এটি লক্ষ্য করেছি। প্রচারের থেকে বহু দূরে থেকেও তিনি সুধীসমাজের শ্রদ্ধা অবলীলায় পেয়েছেন। হয়তো বা এটাই ভারতের বৈশিষ্ট্য—এখানে দেবরাজ ইন্দ্রের কোন মন্দির বা পূজা কোথাও চোখে পড়ে না, কিন্তু ষাঁড়ের পিঠে চড়ে ভস্মাঙ্গরাগ শ্মশানচারী সর্বত্যাগী শিব সারা ভারতে আজও ঘরে ঘরে স্বমহিমায় বিরাজ করছেন। ❑

প্রাপ্তি-সংবাদ

- **হালিশহর : ইতিবৃত্ত/অনুষঙ্গ—শিবসৌম্য বিশ্বাস।** প্রকাশক : শ্যামলী ঘোষ, যোগমায়া প্রকাশনী, ৬০ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯। পৃঃ ১২০। মূল্য : ৫০ টাকা।
- **মহাসিন্ধুর ওপার থেকে—তারাশিস গঙ্গোপাধ্যায়।** প্রকাশক : তারানন্দ স্বামী, জয়তারা পাবলিশার্স, ৭৫ যোধপুর পার্ক, কলকাতা-৭০০০৬৮। পৃঃ ১০+২০৬। মূল্য : ৫০ টাকা।
- **হরিণঘাটার ইতিকথা—ডঃ শ্যামাপদ মণ্ডল।** প্রকাশক : দীনবন্ধু-বিভূতি সাহিত্য সংসদ, হরিণঘাটা, পোঃ নগরউখড়া, নদীয়া-৭৪১২৫৭। পৃঃ ৫৮। মূল্য : ৩০ টাকা।

শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা

বেলুড় মঠে এবং নিম্নলিখিত কেন্দ্রগুলিতে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছেঃ **আঁটপুর, আসানসোল, বারাসত, কাঁথি, ধলেশ্বর (আগরতলা), গুয়াহাটী, জলপাইগুড়ি, জামশেদপুর, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, মালদা, মনসাদ্বীপ, মেদিনীপুর, মুম্বাই, লখনৌ, পাটনা, রহড়া, শেলা (চেরাপুঞ্জি), শিলং, শিলচর ও কাশী অদ্বৈত আশ্রম।**

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী

লখনৌ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে (উত্তর প্রদেশ) গত ২২ অক্টোবর ২০০১ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে প্ল্যাটিনাম জুবিলি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী স্মরণানন্দজী মহারাজ, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী রাজনাথ সিং ও রাজ্যপাল বিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী। সভায় সভাপতিত্ব এবং সেবাশ্রমের আদর্শ ও ইতিহাস-সম্বলিত একটি স্মরণিকা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। তিনি বলেনঃ "লখনৌ রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম দীর্ঘ ৭৫ বছর এই রাজ্যের মানুষের নিঃস্বার্থ সেবা করে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এক সমন্বয়সাধন করেছে।"



বর্তমান বিপুলকায় সেবাশ্রমটি একদিনে বা সহজসাধ্যভাবে গড়ে ওঠেনি; এর পিছনে ছিল শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর অকৃপণ আশীর্বাদ এবং বহু সন্ন্যাসী ও ভক্তের অক্লান্ত পরিশ্রম, অদম্য উৎসাহ ও নিষ্কাম কর্মস্পৃহা। বহু ঘাত-প্রতিঘাত, আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও সেবাশ্রম ধীর অথচ অব্যর্থ গতিতে ৭৫ বছর অতিক্রম করেছে। স্বামীজী তিনবার (১৮৮৮, ১৮৯৭ ও ১৮৯৮) এই লখনৌয়ে এসেছিলেন। তাছাড়া বিভিন্ন সময়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, স্বামী শিবানন্দজী ও স্বামী তুরীয়ানন্দজী এখানে এসেছিলেন। তাই তাঁদের পদার্পণধন্য লখনৌ মানবকল্যাণে যে নিয়োজিত থাকবে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এই সেবাশ্রমের অতীতের দিকে তাকালে আমরা যেমন বিস্মিত হই, তেমনি আনন্দিত হই এবং নিষ্কাম কর্মে অনুপ্রেরণা পাই। স্বামীজী যখন ১৮৮৮ সালে প্রথম এখানে এলেন, তাঁর ভাবাদর্শ ও বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক যুবক কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে নিষ্কাম কর্মযজ্ঞে ঝাঁপ দেন। ক্রমে তাঁরা ১৯১৪ সালে দরিদ্রনারায়ণের সেবার জন্য লখনৌয়ের হিউয়েট রোডে (বর্তমানে শিবাজী মার্গ) 'গোলাপ নিকেতন' নামে একটি ছোট ভাড়াবাড়িতে সেবাশ্রম খোলেন। ক্রমে নিঃস্বার্থ সেবাব্রতী যুবকদের অতন্দ্র সেবা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়ে বৃহত্তর প্রশস্ত স্থানের। তাঁদের এই উদ্যোগে উদ্দীপ্ত হয়ে স্থানীয় বিশিষ্ট উকিল ও সঙ্গীতজ্ঞ অতুলপ্রসাদ সেন আমিনাবাদে কিছু জমি সংগ্রহ করে দেন। ১৯২৪ সালে সেবাশ্রম একটি নতুন দ্বিতল গৃহে স্থানান্তরিত হয় আমিনাবাদে। এখানে স্থানীয় সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সহানুভূতি ও সহায়তায় সেবাশ্রমের কর্মধারা বৃদ্ধি হতে থাকে। তাই পরিচালকবর্গ ১৯২৫ সালে বেলুড় মঠকে এটি দিয়ে দেন। আমিনাবাদে অবস্থিত সেবাশ্রমের পুরনো দিনের কথাপ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সহ-সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ বলেনঃ "সে ১৯৪১ সালের কথা। মায়াবতী যাওয়ার পথে সেবাশ্রম দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। তখন আশ্রম ছিল 'গোর নবাব কা হট' স্থানের একটা ছোট্ট জায়গায়। একটা ছোট্ট ঠাকুরঘর এবং দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটা ছোট্ট লাইব্রেরি—এই ছিল সেবাশ্রমের সম্পদ। সাধুদের থাকতে হতো লাইব্রেরির এক কোণে জড়সড় হয়ে। আশ্রমটি বাজারের মাঝখানে হওয়ায় সবসময় একটা শোরগোল শোনা যেত। মাঝরাতে কয়েক ঘণ্টা শুধু পরিবেশ শান্ত থাকত। তারপর নিরালানগরে আশ্রমটি স্থানান্তরিত হয়। এখন আশ্রমের যে পরিবেশ, যে আর্থিক সচ্ছলতা, যে উন্নতি তা দুজন উদ্যমী—স্বামী শ্রীধরানন্দ ও শোভন মহারাজের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদে সম্ভব হয়েছে।"

সেবাশ্রমের স্মৃতিচারণ করে স্বামী বৈদ্যনাথানন্দজী বলেনঃ "আমি প্রথম লখনৌ সেবাশ্রমে যাই ১৯৪৮ সালে। তখন এটি ঝানদেওয়ালা পার্কের কাছে আমিনাবাদে ছিল। সেসময় আশ্রমে ছিল একটা ঠাকুরঘর, ছোট্ট একটা দাতব্য চিকিৎসালয় ও লাইব্রেরি এবং সাধুদের থাকার ঘর। আশ্রমটি ছোট্ট হলেও সবসময় ভক্তের ভিড়ে ভরে থাকত। মন্দিরে প্রত্যহ পূজা, ধর্মপ্রসঙ্গ এবং বিভিন্ন সময় রামনাম ও শ্যামনাম সঙ্কীর্তন হতো। এছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মতিথি উদ্‌যাপিত হতো এবং এজন্য ধর্মসভার আয়োজন করা হতো গঙ্গাপ্রসাদ মেমোরিয়াল হল-এ। আরেকটা প্রবল আকর্ষণ ছিল গোলাপবাগানের প্রতি। এটির দেখভাল করতেন শ্রীশ্রীমায়ের সেবক ও শিষ্য রামময় মহারাজ (স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী)। তিনি তখন 'Rose Swami' নামে বিশেষ পরিচিত। ১৯৫৩ সালে আমি এখানে কালীপূজা করার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং আশ্রমে একটা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করার সৌভাগ্য লাভও করেছিলাম। এসব কারণে লখনৌ সেবাশ্রম আমার কাছে বিশেষ স্মৃতিবহ।"

সেবাশ্রমের উৎসব ও স্মারক পত্রিকার জন্য প্রেরিত আশীর্বাণীতে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বর্তমান অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী মহারাজ বলেনঃ "স্বাধীনতালাভের প্রথম পঞ্চাশ বছর ধরে ভারত সম্প্রদায়গত, জাতিগত প্রভৃতি ধর্মের নেতিবাচক ভাব এড়াতে এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা ও ধর্মের ভেদ দূর করতে 'সেকিউলারিজিম্'-এ জোর দিয়ে আসছে। কিন্তু এখনো তা সম্পূর্ণ সফল হতে পারেনি।

তাই এই স্মরণিকা তথা সেবাশ্রম জাতির মধ্যে সেই ভেদাভেদ দূর করে ঐক্য আনতে কিঞ্চিৎ সক্ষম হবে—আশাকরি। স্বামীজী এক বিখ্যাত পত্রে নৈনীতালের মহম্মদ সরফরাজ হোসেনকে লিখেছিলেন, 'We want to lead mankind to the place where there is neither the Vedas nor the Bible nor the Koran, yet this has to be done by harmonizing the Vedas, the Bible and the Koran. Mankind ought to be taught that religions are but the varied impressions of that religion which is oneness, so that each may choose that path that suits him best.' (মানবজাতিকে সেই স্থানে নিয়ে যেতে চাই—যেখানে বেদ নেই, বাইবেল নেই, কোরানও নেই; অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই এটা করতে হবে। মানুষকে বোঝাতে হবে যে, সকল ধর্ম 'একত্বরূপ সেই এক ধর্ম'-এরই বিবিধ প্রকাশ মাত্র। সুতরাং যার যেটি সবচেয়ে বেশি উপযোগী সে সেটিকেই বেছে নিতে পারে।)"

সেবাশ্রমের ইতিবৃত্তে স্বামী অচ্যুতানন্দজীর লেখা থেকে জানতে পারি—১৯২৫ সালে সেবাশ্রমের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে বেলুড় মঠ প্রথম পাঠায় স্বামী দেবেশানন্দজীকে। তখন বহির্বিভাগে রোগীর সংখ্যা ছিল ১৭,৭২৮ জন এবং লাইব্রেরিতে ছিল ১,০০০ ধর্মীয় ও বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ ও ৮ খানা মাসিক পত্রিকা। ১৯৩৯ সালে তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজ সেবাশ্রম দেখে খুশি হয়েছিলেন। ১৯৪৬ সালে এখানে প্রথম সম্পাদক হয়ে আসেন স্বামী রঘুবীরানন্দজী। ১৯৪৯ সালে স্বামী স্বয়ম্প্রভানন্দজী এবং ১৯৫২ সালে স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী সম্পাদক হয়ে এসেছিলেন। প্রায় ১৪ বছর তিনি সেবাশ্রমে সেবাদান করেছেন। তাঁরই সময়ে সেবাশ্রম আমিনাবাদ থেকে স্থানান্তরিত হয় তৎকালীন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রভানু গুপ্তের উদ্যোগে। ১৯৬৭ সালে সেবাশ্রম সরকারি স্বীকৃতি পেয়ে স্থানান্তরিত হয় 'বিবেকানন্দপুরম'-এ কার্যের প্রসার হওয়ার জন্য। তখন সম্পাদক ছিলেন স্বামী শ্রীধরানন্দজী। এসময়ে সেবাশ্রমের ত্রিতলবিশিষ্ট নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন তৎকালীন সঙ্ঘাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ।

এসময়ের ঘটনা স্মৃতিচারণ করে সেবাশ্রমের প্রাচীন একনিষ্ঠ ভক্ত এবং উত্তরপ্রদেশ সরকারের প্রাক্তন স্বাস্থ্যসেবা প্রধান ডাক্তার ডি. এন. শর্মা বলেন ঃ "১৯৪৮ সালে আমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয় ব্রহ্মচারী শোভন, স্বামী ক্ষেত্রজ্ঞানানন্দ ও সুধাংশু মহারাজের (স্বামী ত্রিবিক্রমানন্দজী)। এরপর এলেন সলিল মহারাজ (স্বামী শ্রীধরানন্দ)। এঁদের প্রবল ইচ্ছা স্থানীয় দুঃস্থদের সেবার জন্য একটা বড় হাসপাতাল নির্মাণ করা। তাঁদের এই পরিকল্পনার ছক উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সুচেতা কৃপালনীর কাছে পাঠানো হয় অনুমতির জন্য। তিনি তখনি স্বীকৃতি দেন এবং ভারতের তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সুশীলা নাইয়ার যথেষ্ট অর্থসাহায্য প্রদান করেন। ফলে ১৯৬৩ সালে স্বামীজীর শতবার্ষিকীতে পরিকল্পিত সেবাশ্রমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। স্থাপন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তৎকালীন অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ। তারপর নিরালানগরে প্রাপ্ত এক বিশাল স্থানে আশ্রমটি স্থানান্তরিত হয়। এখানে স্বামী শ্রীধরানন্দজী একটা বড় মন্দিরের পরিকল্পনা নিয়ে মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের তৎকালীন প্রধান ইঞ্জিনিয়ার শ্রীদেশিকের দ্বারা একটা ছক করিয়ে উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কমলাপতি ত্রিপাঠীকে প্রদান করেন। তিনি তাতে সম্মত হয়ে এককালীন ৩৫ লক্ষ টাকা অনুদান দেন। এইভাবে বর্তমান মন্দিরটি গড়ে ওঠে।"

সেবাশ্রমের স্মরণিকায় আশীর্বাণীতে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ বলেন ঃ "লখনৌ সেবাশ্রম ৭৫ বছর ধরে মানুষের সেবায় নিযুক্ত থেকে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এই সেবাশ্রম শুরু হয় ১৯১৪ সালে। লখনৌ হরিদ্বার, হৃষিকেশ ও হিমালয়ের পথে পড়ে বলে বহু সাধক এখানে কিছুদিন করে অবস্থান করেন। এই রূপে স্বামীজী, স্বামী ব্রহ্মানন্দজী, স্বামী তুরীয়ানন্দজী-সহ ঠাকুরের কয়েকজন পার্ষদ বিভিন্ন সময়ে এখানে অবস্থান করেছেন। আমার মনে হয় বৃন্দাবন যাওয়ার পথে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা এখানে এসে থাকবেন। যাহোক, সবথেকে একটা কথা বেশি মনে পড়ে। তা হলো নৈনীতালের মহম্মদ সরফরাজ হোসেন স্বামীজীর সঙ্গে কথাবার্তার পর স্বামীজীকে বলেছিলেন—স্বামীজি! আপনাকে কেউ যদি অবতার বলে দাবি করে, তাহলে জানবেন 'I, a Mohammedan am the first.' "

গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০১ **উটকামণ্ড মঠ (তামিলনাড়ু)** মঠ প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর পূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন করে। আয়োজিত শোভাযাত্রা ও জনসভায় বহু সাধু এবং প্রায় ৩৫০ ভক্ত অংশগ্রহণ করেন।

ছাত্রকৃতিত্ব

গত ৫ অক্টোবর ২০০১ মুম্বাইয়ে আয়োজিত একটি জাতীয় বিজ্ঞান সেমিনারে **বিবেকনগর (আগরতলা) আশ্রম বিদ্যালয়ের** একটি ছাত্র দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। ❑

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ

দীক্ষানুষ্ঠান ঃ রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ গত ১৬-২৩ নভেম্বর ২০০১ শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে অবস্থান করে প্রায় ৩৫০-র অধিক ব্যক্তিকে দীক্ষাদান করেছেন।

আবির্ভাব-তিথি পালন ঃ গত ২৭ ও ২৯ নভেম্বর ২০০১ মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার যথাক্রমে **শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজ** এবং **শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজের জন্মতিথি** পালন করা হয়। এই দুই তিথিতে সন্ধ্যারতির পর তাঁদের জীবনী আলোচনা করেন স্বামী বিনির্মলানন্দজী এবং স্বামী সনকানন্দজী।

সাপ্তাহিক পাঠ ও আলোচনা যথারীতি চলছে। ❑

বিবিধ সংবাদ

উৎসব-অনুষ্ঠান

সোমসার শ্রীরামকৃষ্ণ সেবামন্দির, বাঁকুড়া ঃ সেবামন্দিরের পরিচালনায় নজরুল মঞ্চ (কলকাতা-৭০০ ০২৯)-এ গত ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর ২০০১ নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের দ্বাদশ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের শততম জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। প্রথমদিন বহু সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী এবং প্রায় ৩,৫০০ ভক্তের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ। অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন আমেরিকার সেন্ট লুইস কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দজী, হলিউড কেন্দ্রের স্বামী সর্বদেবানন্দজী এবং স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী চেন্নাইয়ের বাণী জয়রাম। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউড অফ কালচারের সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দজী। পরদিন আয়োজিত ভক্তসম্মেলনে সকালে শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের স্মৃতিচারণ করেন সারদাপীঠের অধ্যক্ষ স্বামী রমানন্দজী, এলাহাবাদ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলাত্মানন্দজী ও চেরাপুঞ্জি আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী নিত্যমুক্তানন্দজী। বৈকালিক অধিবেশনে ভজন পরিবেশন করেন শ্রীসারদা মঠের সন্ন্যাসিনী ও ব্রহ্মচারিণীবৃন্দ। আলোচনা করেন শ্রীসারদা মঠের সাধারণ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণাজী। এই উপলক্ষ্যে গত ৬ ও ৭ অক্টোবর ২০০১ পূজ্যপাদ মহারাজের তপস্যাস্থল উত্তর কাশীর লক্ষেশ্বর শিবমন্দিরে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, শোভাযাত্রা, সাধুভাণ্ডারা ও ধর্মসভার মাধ্যমে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ধর্মসভায় ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী, দিল্লি আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী গোকুলানন্দজী ও স্বামী নিত্যমুক্তানন্দজী। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০০ ভক্ত যোগদান করেছিলেন।

শিলচর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পাঠচক্র, অসম ঃ গত ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বর ২০০১ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের শততম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বিশেষ পূজা, পাঠ, ভক্তিগীতি, কীর্তন ও আলোচনাসভা ছিল দুদিনব্যাপী সম্মেলনের অঙ্গ। সম্মেলনের উদ্বোধন ও ভজন পরিবেশন করেন শিলচর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী দেবদেবানন্দজী। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, সুকান্ত দাস প্রমুখ এবং পাঠে অংশগ্রহণ করেন স্বামী নরেশানন্দজী, অজিত রায় প্রমুখ। আলোচনা ও স্মৃতিচারণ করেন ডঃ ননীগোপাল দেবনাথ, শিবদাস পাল, অধ্যাপিকা অর্চনা চক্রবর্তী, প্রসূনকান্তি দেব প্রমুখ।

সুন্দরবন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবপ্রচার পরিষদ, উত্তর চব্বিশ পরগনা ঃ গত ২৯-৩০ সেপ্টেম্বর ২০০১ পরিষদের প্রথম বার্ষিক সম্মেলন আয়োজিত হয় **কালীতলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবালয়ে (হিঙ্গলগঞ্জ)।** সম্মেলনের প্রথমদিন ছিল পরিষদের সাংগঠনিক আলোচনা এবং দ্বিতীয়দিনে অনুষ্ঠিত হয় যুব-সম্মেলন। যুবসম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল 'স্বামীজীর জীবনের যে-ঘটনাটি আমাকে অনুপ্রাণিত করে এবং কেন' এবং 'স্বামীজীর ভাবাদর্শ রূপায়ণের সমস্যা ও সমাধান'। দুদিনের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী প্রমেয়ানন্দজী, স্বামী যতীন্দ্রানন্দজী, স্বামী অন্নপূর্ণানন্দজী, স্বামী অঘোরাত্মানন্দজী, স্বামী সত্যস্থানন্দজী প্রমুখ। সাংগঠনিক আলোচনায় ১৮টি প্রতিষ্ঠান থেকে ৩৩ জন প্রতিনিধি এবং যুবসম্মেলনে প্রায় ১৫০ জন যুবপ্রতিনিধি যোগদান করেছিল।

সাঁত্রাগাছি শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, হাওড়া ঃ গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০১ সঙ্ঘের নবনির্মিত প্রাচীর-সহ প্রবেশদ্বারের দ্বারোদ্ঘাটন করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্যতম সহ-সম্পাদক স্বামী শিবময়ানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে একটি ধর্মসভার আয়োজন করা হয়। সভায় ভাষণ দান করেন স্বামী শিবময়ানন্দজী, বেণীমাধব দে, ভবেশচন্দ্র বিশ্বাস প্রমুখ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন স্বামী নরেন্দ্রানন্দজী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে প্রায় ২৫০ ভক্তের সমাবেশ হয়েছিল। গত ১৪ অক্টোবর এই সঙ্ঘ দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ৬৫ জন দরিদ্র মানুষের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ঘাটাল, মেদিনীপুর ঃ গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০১ রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের সহযোগিতায় একটি বিবেকানন্দ-ভাবানুরাগী যুবসম্মেলন আয়োজিত হয়। ভক্তিগীতি, প্রশ্নোত্তরপর্ব, পাঠ ও আলোচনা ছিল সম্মেলনের প্রধান অঙ্গ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন বাদলচন্দ্র গুছাইত ও সম্প্রদায়। আলোচনা করেন স্বামী স্বাগতানন্দজী, গোপেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও অঞ্জন মান্না এবং সভাপতিত্ব করেন স্বামী গঙ্গাধরানন্দজী। পাঠে অংশগ্রহণ করেন পার্থনারায়ণ দে ও দেবযানী চক্রবর্তী। সম্মেলন-শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সেবাশ্রমের সম্পাদক অজিতকুমার সাঁতরা। সম্মেলনে প্রায় ৫০০ ছাত্রছাত্রী ও যুবক-যুবতী যোগদান করেছিল।

খাতড়া রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়, বাঁকুড়া ঃ গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০১ আশ্রম বিদ্যালয়ের নবনির্মিত 'সারদা ভবন'-এর দ্বারোদ্ঘাটন এবং শিশু স্বাস্থ্যবিকাশ প্রকল্পের উদ্বোধন করেন যথাক্রমে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সম্পাদক স্বামী উমানন্দজী ও বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী বিবেকাত্মানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে আয়োজিত ধর্মসভায় এঁরা দুজন ভিন্ন ভাষণ দেন স্বামী শিবপ্রদানন্দজী, দুর্গাশঙ্কর মল্লিক প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্যামাপদ মল্লিক।

সারদা রামকৃষ্ণ চাইল্ড অ্যাণ্ড ওম্যান সেবাকেন্দ্র, কলকাতা-৭০০ ০২৭ ঃ গত ২ অক্টোবর ২০০১ কেন্দ্রের ঘোলা-সোদপুর (উত্তর চব্বিশ পরগনা) শাখায় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং ৩৫ জন পথশিশুদের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ করেন স্বামী দেবস্বরূপানন্দজী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন মহাদেব ঘোষ এবং পাঠ করেন শুভশ্রী ঘোষ। এই উপলক্ষ্যে ১৫ জন দুঃস্থ বিধবাকে নববস্ত্র প্রদান করেন কেন্দ্রের সভানেত্রী সন্ধ্যা সূত্রধর।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ, কলকাতা-৭০০ ০৬১ : গত ২ অক্টোবর ২০০১ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিশেষ পূজা ও আলোচনাসভা ছিল অনুষ্ঠিত বিষয়। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন স্বামী রাজীবানন্দজী, স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দজী ও স্বামী স্বাগতানন্দজী। অনুষ্ঠানে প্রায় ৪০০ ভক্তের সমাগম হয়েছিল।

আনন্দ বিবেক, ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০৬৩ : গত ৩ অক্টোবর ২০০১ সংস্থার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবধারা প্রচার করাই হলো প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে আলোচনা ও ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তরদান করেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু, সুনীলবিহারী ঘোষ ও সুধীরকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বাতী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শম্পা সামন্ত। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মিতালী বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ২৮ অক্টোবর ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিনে তাঁর বিষয়ে আলোচনা করেন সুনীলবিহারী ঘোষ এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন অসীমা ভট্টাচার্য ও নিতাই চৌধুরী।

স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, উত্তর চব্বিশ পরগনা : গত ৭ অক্টোবর ২০০১ সেবাশ্রমের উদ্যোগে মামুদপুর মা সারদা সেবাশ্রমে একটি যুবসম্মেলন আয়োজিত হয়। সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় ছিল 'বিবেকানন্দ ও নিবেদিতার জীবনের দুঃসাহসিক ঘটনা', 'বর্তমান জীবনে নানা সমস্যা ও স্বামীজীর জীবনালোকে তার সমাধান' এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব। আলোচনা করেন স্বামী মুক্তিপ্রদানন্দজী, ডাঃ বি. ভি. চক্রবর্তী ও বুলবুল গঙ্গোপাধ্যায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্বামী দেবব্রতানন্দজী। সম্মেলনে প্রায় ২৫০ জন যুবপ্রতিনিধি উপস্থিত ছিল।

হামিরপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ, রাউরকেলা, ওড়িশা : গত ১৯ অক্টোবর ২০০১ সঙ্ঘের বার্ষিক উৎসব পালন করা হয়। উৎসবে ভাষণ দান করেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ, ভুবনেশ্বর রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী শিবেশ্বরানন্দজী ও স্বামী কৃষ্ণানন্দজী। এই উপলক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগী ছাত্রছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়। উল্লেখ্য, পূজ্যপাদ মহারাজ ১৯-২১ অক্টোবর এই সঙ্ঘে অবস্থান করে ১৬০ জনকে দীক্ষাদান করেন।

পাড়াতল অঞ্চল স্বামী বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, বর্ধমান : গত ২১ অক্টোবর ২০০১ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রভাতফেরি, বিশেষ পূজা, শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ, গীতি-আলেখ্য, 'কথামৃত' পাঠ, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও ভক্তসম্মেলন ছিল অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন 'উদ্বোধন'-সম্পাদক স্বামী সর্বগানন্দজী। আলোচনা করেন বর্ধমান, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া ভাবপ্রচার পরিষদের আহ্বায়ক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ শ্যামলী চৌধুরী, অধ্যাপিকা সুচন্দ্রা বর্ধন প্রমুখ। সম্মেলন পরিচালনা করেন সাহিত্যিক সুনীতি মুখোপাধ্যায়। এই উপলক্ষ্যে ২৭ জন দুঃস্থ বালক-বালিকাকে জামা-প্যান্ট এবং ৪০ জন দরিদ্র মানুষকে বস্ত্র প্রদান করা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত প্রায় ৩,০০০ ভক্তকে বসিয়ে প্রসাদ দেওয়া হয়।

ইড়পালা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, মেদিনীপুর : গত ২৪ অক্টোবর ২০০১ শ্রীশ্রীমায়ের পটে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ভজন, কুমারীপূজা, 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' পাঠ প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠিত বিষয়। পূজা করেন চণ্ডীচরণ ভট্টাচার্য। উপস্থিত সকল ভক্তকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়।

নিবেদিতা ব্রতী সঙ্ঘ, কলকাতা-৭০০ ০৯৫ : গত ২৮ অক্টোবর ২০০১ ভগিনী নিবেদিতার জন্মদিবস পালন করা হয় বাগবাজারের ভগিনী নিবেদিতা উদ্যানে। বৈদিক মন্ত্রপাঠ, বন্দনা গান, ভাষণ প্রভৃতি ছিল এদিনের অনুষ্ঠিত বিষয়। ভাষণ দান করেন প্রব্রাজিকা বিশ্বপ্রাণাজী, সুধীরা দত্ত, অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত, স্থানীয় পৌরপিতা সলিল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। এই উপলক্ষ্যে পথশিশুদের মধ্যে নববস্ত্র প্রদান করা হয়।

কোঠাবাড়ি মা সারদা সেবাকেন্দ্র, হিঙ্গলগঞ্জ, উত্তর চব্বিশ পরগনা : গত ৩১ অক্টোবর ২০০১ কেন্দ্রের পরিচালনায় একটি ভক্তসম্মেলন আয়োজিত হয়। ভক্তিগীতি, পূজা, সমবেত জপ-ধ্যান, 'কথামৃত' ও 'মায়ের কথা' পাঠ এবং আলোচনা ছিল সম্মেলনের প্রধান বিষয়। 'কথামৃত' পাঠ ও আলোচনা এবং আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন স্যাণ্ডেলেরবিল শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী দেবব্রতানন্দজী। 'মায়ের কথা' পাঠ ও আলোচনা করেন সুভাষচন্দ্র গায়েন। সভায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক শ্যামল সরদার, মানিকচন্দ্র মণ্ডল প্রমুখ। সম্মেলনে ৮৫ জন ভক্ত যোগদান করেন।

বালিভাড়া সারদা নারী সংগঠন, উত্তর চব্বিশ পরগনা : গত ২-৫ নভেম্বর ২০০১ বালিভাড়া বিবেকানন্দ ছাত্রাবাসে দ্বাদশ বার্ষিক সর্বভারতীয় মহিলা শিক্ষণশিবিরের আয়োজন করা হয়। মনঃসংযম, চরিত্রগঠনের ব্যবহারিক পদ্ধতি, শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা এবং স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা প্রভৃতি ছিল শিবিরের আলোচ্য বিষয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন প্রব্রাজিকা দেবাত্মপ্রাণাজী। স্বাগত-ভাষণ দেন সংগঠনের সম্পাদিকা ডাঃ তাপসী ঘোষ। আলোচনা করেন 'নিবোধত' পত্রিকার সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণাজী, অখিল ভারত যুবমহামণ্ডলের সম্পাদক নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, সংগঠনের সভানেত্রী ডঃ চিন্ময়ী নন্দী প্রমুখ। এছাড়া সঙ্গীত ও সূচীশিল্প শেখানো হয় এবং রহড়া বালকাশ্রমের সহযোগিতায় শ্রীশ্রীমায়ের আলোকচিত্র প্রদর্শিত হয়। শিবিরে ২৫০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছিলেন।

শ্রীরামপুর সারদা রামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ, হুগলী : গত ১০ নভেম্বর ২০০১ সঙ্ঘের উদ্যোগে বটতলা নিত্যানন্দ হরিসভায় একটি ভক্তসম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন সুচরিতা পাল। আলোচনা করেন দিল্লি আশ্রমের সম্পাদক স্বামী গোকুলানন্দজী।

সেবাব্রত

বসিরহাট শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত চলমান পাঠচক্র, উত্তর চব্বিশ পরগনা : গত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০১ একটি অনুষ্ঠানের

মাধ্যমে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র ব্রত হিসাবে ৩০০ দরিদ্র নরনারীর মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। এছাড়া স্থানীয় ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রছাত্রীকে জামা-প্যান্ট দেওয়া হয়।

হিজলাডিহা বিবেকানন্দ সেবাসমিতি, বাঁকুড়া ঃ গত ২৪ অক্টোবর ২০০১ 'জীবই শিব'-জ্ঞানে ৬০ জন প্রতিবন্ধীর সেবা করা হয়। প্রথমে তাদের জলযোগ করিয়ে তেল, সাবান দিয়ে স্নান করানো হয়। তারপর নববস্ত্র পরিয়ে তাদের বসিয়ে খাওয়ানো হয়। বিকালে 'সেবা' বিষয়ে আলোচনা করেন গোপীরঞ্জন রায়বক্সী ও সুশান্ত ব্যানার্জী।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ, ভাঙড়, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ঃ গত ১৪ অক্টোবর ২০০১ একটি চক্ষুচিকিৎসা-শিবির পরিচালনা করে। শিবিরে ১৩৯ জনের চোখ পরীক্ষা করা হয়।

উষা বিবেকানন্দ পাঠচক্র, কলকাতা-৭০০ ০৮৪ ঃ গত ৭ অক্টোবর ২০০১ এস. এস. কে. এম. ব্লাডব্যাঙ্কের সহযোগিতায় একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরের উদ্বোধন ও ভাষণ দান করেন প্রব্রাজিকা মহেশপ্রাণাজী ও প্রব্রাজিকা বাসুদেবপ্রাণাজী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সুশান্ত দত্ত। শিবিরে ৩০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

১০ মাইল বাজার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাসঙ্ঘ, নামখানা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ঃ গত ৭ অক্টোবর ২০০১ ইণ্ডিয়ান পাবলিক হেল্‌থ অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় একটি স্বাস্থ্যমেলা পরিচালনা ও রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। স্বাস্থ্যমেলা পরিচালনা করেন ডায়মণ্ডহারবারের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ অজয় চক্রবর্তী, ডাঃ নবনীতা চ্যাটার্জী প্রমুখ। রক্তদান শিবিরে ১০১ জন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

হাবড়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম, উত্তর চব্বিশ পরগনা ঃ গত ১৪ অক্টোবর ২০০১ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ১৭৬ জন দরিদ্র নরনারীর মধ্যে নববস্ত্র বিতরণ করা হয়।

খড়ার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, মেদিনীপুর ঃ গত ১৪ অক্টোবর ২০০১ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে দরিদ্র-নারায়ণের মধ্যে ৫৫টি নববস্ত্র ও দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৩৫টি পোশাক বিতরণ করা হয়।

গোন্দলপাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ সমিতি, চন্দননগর, হুগলী ঃ গত ১৮ অক্টোবর ২০০১ সমিতির রজতজয়ন্তী উপলক্ষ্যে স্থানীয় বিদ্যালয়ের ১২২ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে 'স্বামীজীর আহ্বান' পুস্তিকা এবং বিদ্যালয়ের ৫ম থেকে ৮ম শ্রেণীর ১ম ও ২য় স্থানাধিকারী ছাত্রছাত্রীকে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জীবনীগ্রন্থ প্রদান করা হয়। গত ৪ নভেম্বর এই সমিতি ৩১ জন দুঃস্থ নরনারীকে ৩১টি ধুতি ও শাড়ি বিতরণ করেছে।

পাঁশকুড়া শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম, মেদিনীপুর ঃ গত ২১ অক্টোবর ২০০১ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ৬৫ জন দরিদ্র মানুষের মধ্যে ধুতি ও শাড়ি বিতরণ করা হয়।

গোবরডাঙা শ্রীমা মঠ, উত্তর চব্বিশ পরগনা ঃ গত ২১ অক্টোবর ২০০১ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ২০০ দুঃস্থ মানুষের মধ্যে বস্ত্র এবং ৩০০ দরিদ্র বালক-বালিকার মধ্যে জামা-প্যান্ট বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে ভক্তিগীতি পরিবেশিত হয় এবং আলোচনা করেন স্থানীয় পৌরপ্রধান বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সত্যরূপানন্দজী।

শ্রীগৌরী শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবাসমিতি, অসম ঃ গত ২২ অক্টোবর ২০০১ শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে দুঃস্থ নরনারী ও শিশুদের মধ্যে ২০টি ধুতি, ১০টি শাড়ি ও জামা-প্যান্ট বিতরণ করা হয়। এই সংস্থা সম্প্রতি আর্ত মানুষের সেবার জন্য সুচিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে উদ্যোগী হয়েছে এবং মুমূর্ষু রোগীর অস্ত্রোপচারে অর্থসাহায্য করেছে। এছাড়া দুঃস্থ মানুষের মধ্যে ১০,০০০ টাকা বিতরণ করেছে।

পরলোকে

শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য জিতেন্দ্রনাথ মিত্র হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১ অক্টোবর ২০০১ সকাল ১১টা ৫৫ মিনিটে কলকাতার বি. আর. সিং হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। তিনি 'উদ্বোধন'-এর দীর্ঘদিনের গ্রাহক ও আগ্রহী পাঠক ছিলেন। তিনি ঘোলা শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং সেবাশ্রমের অন্যতম সহ-সভাপতি ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য শ্যামাপ্রসাদ গুহ গত ২ অক্টোবর ২০০১ সন্ধ্যা ৭টা ৫৬ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি ক্ল্যারিয়ন অ্যাডভার্টাইজিং কোম্পানীর আর্ট ডাইরেক্টর এবং প্রখ্যাত ডিজাইনার ছিলেন। প্রয়াত স্বামী জয়দেবানন্দজী মহারাজ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, অকৃতদার হরিদাস সাহা গত ৬ অক্টোবর ২০০১ দুপুর ১২টা ৫৫ মিনিটে পরলোকগমন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর ভাবাদর্শ প্রচার করাই ছিল তাঁর জীবনব্রত। তিনি স্বামী ওঙ্কারানন্দজী, স্বামী ভূতেশানন্দজী ও স্বামী নিরাময়ানন্দজী মহারাজের বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্যা মণিকা দে গত ৮ অক্টোবর ২০০১ রাত ২টা ৩০ মিনিটে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর। তিনি শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য রাজেন্দ্রলাল দের পুত্রবধূ ছিলেন। স্বাবলম্বিতা ও সেবাপরায়ণতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমৎ স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিষ্য চন্দ্রকান্ত দাস গত ২৭ অক্টোবর ২০০১ রাত ২টা ২২ মিনিটে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। অন্তিমকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। করিমগঞ্জ ও শিলচর আশ্রমের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি 'উদ্বোধন'-এর দীর্ঘদিনের গ্রাহক ও অনুরাগী পাঠক ছিলেন। সদাশয়তা ও সত্যপরায়ণতা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ❑

স্বামী বিবেকানন্দ প্রবর্তিত
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একমাত্র বাঙলা মুখপত্র
১০৩ বছর ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিয়মিত প্রকাশের ঐতিহ্যে
দেশীয় ভাষায় ভারতের একমাত্র ও প্রাচীনতম সাময়িকপত্র

উদ্বোধন

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত
প্রাপ্য বরান্ নিবোধত"

১০৩ তম বর্ষ

মাঘ ১৪০৭ থেকে পৌষ ১৪০৮
জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০০১

সম্পাদক

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

(মাঘ ১৪০৭—জ্যৈষ্ঠ ১৪০৮)

স্বামী সর্বগানন্দ

(আষাঢ় ১৪০৮—পৌষ ১৪০৮)



উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা-৭০০ ০০৩

❑ বার্ষিক গ্রাহকমূল্য : পঁয়ষট্টি টাকা ❑ সডাক : পঁচাত্তর টাকা ❑ প্রতি সংখ্যা : আট টাকা ❑
❑ শারদীয়া সংখ্যা : চল্লিশ টাকা ❑

উদ্বোধন

১০৩তম বর্ষ

মাঘ ১৪০৭—পৌষ ১৪০৮ ❑ জানুয়ারি—ডিসেম্বর ২০০১

বর্ষসূচী

৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০০০৯-স্থিত স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড থেকে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে স্বামী সত্যব্রতানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৩ থেকে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস (প্রাঃ) লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০০৯

With Best Compliments from:

DOBSON DISTRIBUTORS

88, DR. ABANI DUTTA ROAD
HOWRAH-711 101

PHONE : 666-1722
TELEFAX : 666-9969

Stockist

**Serum Institute, Tablets India Ltd.,
Wallace Pharmaceuticals Ltd.,
Eli Lilly Ranbaxy, Pharmacia & Upjohn,
Orchid, Caplet,
Smith Kline Beecham (Vaccine),
Sunny Industries Pvt. Ltd.,
Midas Care, Arvind (S.K.K.L. Ltd.),
Neon Laboratories, Mayer,
Trio Pharma**

তড়িৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
পতিতপাবন শ্রীরামকৃষ্ণ ৪০.০০
অহেতুকী কৃপাসিন্ধুর অপার কৃপা, পতিতপাবনের অপার দয়া। সেইজন্য আমায় আশ্রয় দিয়াছেন। আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার করুণা, আমার কোন চিন্তার কারণ নাই। —গিরিশচন্দ্র

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
গুহা মন্দিরের দেবী ২৮.০০
বৈষ্ণোদেবী দর্শন ও ভ্রমণের গাইড বই। পৌরাণিক উপাখ্যান সহ। অনেক ছবি ও ম্যাপ বইটির বাড়তি আকর্ষণ।

সোমনাথের
শিবঠাকুরের বাড়ি ৩৫.০০
দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও পঞ্চকেদার ভ্রমণ-কাহিনী। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও পঞ্চকেদার যেতে হলে সচিত্র এই বইটি নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাবে। কিভাবে যাবেন, কোথায় থাকবেন—সবই পাবেন বইটিতে।

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লি
[illegible]

WONDERFUL PRODUCTS FROM kemikox

CONSUMER PRODUCTS		INDUSTRIAL PRODUCTS	
KEMITOL	- Toilet Cleaner	**RUSTCON**	- Rust Converter (Derusting and rust preventive compound)
KLINZ FRESH	- White Deodorant-cum-Cleaner	**VAANIS**	- Paint Remover
OASH	- Liquid Hand Soap	**RUSTOFF 100**	- Rust Remover
BUD BUD	- Detergent Powder	**KEMIRAD-S**	- Descaleing Agent

WE HAVE SOME OTHER INDUSTRIAL & DOMESTIC CLEANING PRODUCTS TOO

সুগন্ধী মোমবাতী AROMA এবং ধুনো-ধূপ ARATI আমাদের দুটি অনবদ্য উৎপাদন

DISTRIBUTORS and DEALERS WANTED

KEMIKOX FORMULATORS PVT. LTD.

**SSI Unit, Regd. with NSIC, RAILWAYS and DGS&D
P.B. No.: 2673, G. P. O, Kolkata-700 001
Telephone No.: 91 33 4426240, Fax No.: 91 33 4428044
E-mail : kemikox@vsnl.net, Website : www.kemikox.com**



উদ্বোধন কার্যালয় প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

স্বামীজী বিষয়ক

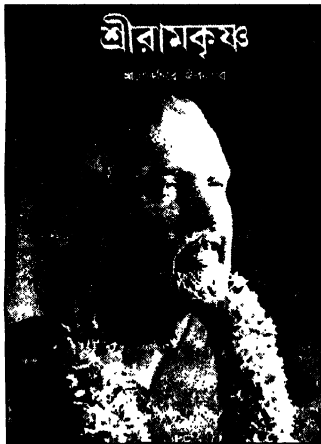
ধর্মবিজ্ঞান	১০.০০
ধর্মসমীক্ষা	১০.০০
ভক্তিযোগ	১০.০০
কর্মযোগ	১৭.০০
রাজযোগ	২৭.০০
জ্ঞানযোগ	৩৫.০০
যুগদিশারী বিবেকানন্দ	৪০.০০
স্বামি-শিষ্য-সংবাদ	৪০.০০
যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ	৪৫.০০
স্মৃতির আলোয় স্বামীজী	৬০.০০
পত্রাবলী	১৬৫.০০

শ্রীরামকৃষ্ণ বিষয়ক

শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ	১০.০০
শ্রীরামকৃষ্ণ পূজাপদ্ধতি	১১.০০
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপনিষদ্	১৫.০০
কল্পতরু শ্রীরামকৃষ্ণ	১৮.৫০
শ্রীরামকৃষ্ণ ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ	২৫.০০
শ্রীরামকৃষ্ণদেব	৪০.০০
শ্রীরামকৃষ্ণচরিত	৪৫.০০
পরমপদকমলে	৬৫.০০
যুগপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ	৭০.০০
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি	১২৫.০০

শ্রীমা সারদাদেবী বিষয়ক

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিভাসিতা মা সারদা	১২.০০
শ্রীরামকৃষ্ণ-সহায়িকা মা সারদা	১৫.০০
দেবী-মানবী সারদা	১৬.০০
শান্তিরূপিণী সারদা	১৭.০০
মায়ের মহিমায় উদ্ভাসিত দক্ষিণাপথ	২০.০০
চিরন্তনী সারদা	৩০.০০
যুগজননী সারদা	৬০.০০
শ্রীমা সারদাপুঁথি	১০০.০০

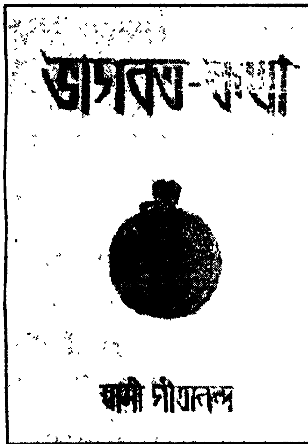


শ্রীরামকৃষ্ণ

আলোকচিত্রে জীবনকথা

মূল্য : ১৪০.০০

শ্রীরামকৃষ্ণই একমাত্র অবতার যাঁর আলোকচিত্র গৃহীত হয়েছে। তাঁর চেহারা সম্বন্ধে এখন কাউকে কল্পনা করতে হয় না। বইটি শুধু জীবনী নয়, এটি আমাদের প্রেরণাদায়ক চাক্ষুষ তীর্থভ্রমণেই নিয়ে যায়।



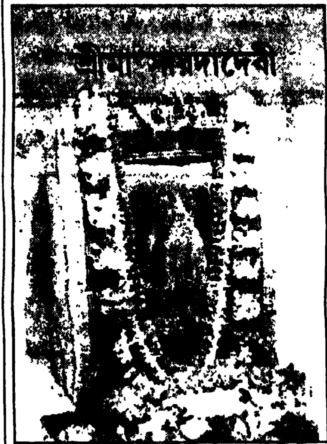
ভাগবত-কথা

স্বামী গীতানন্দ

মূল্য : ১০০.০০

...এই মহাগ্রন্থের বহুল প্রচার শুধু কামনা করি না, প্রার্থনা করি। এই মহাগ্রন্থ, শুধু বিষয়ের মহত্ত্বে নয়, ভাবের ও রসের মহত্ত্বেও। পাঠকমাত্রেই তা উপলব্ধি করবেন, সন্দেহ নেই।

—গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়



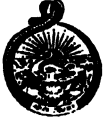
শ্রীমা সারদাদেবী

আলোকচিত্রে জীবনকথা

মূল্য : ১৪৫.০০

বর্তমান গ্রন্থে দেশবিদেশের নানা স্থান থেকে আজ পর্যন্ত প্রাপ্ত শ্রীমার দুষ্প্রাপ্য অনেক ছবি একত্র প্রকাশিত হওয়ায় আগ্রহী পাঠক ও দর্শকের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হয়েছে। গ্রন্থটি একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র-জীবনীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ডাক মারফত বই ক্রয় করতে হলে সরাসরি 'ম্যানেজার, উদ্বোধন অফিস, ১ উদ্বোধন লেন, কলকাতা-৩' —এই ঠিকানায় লিখুন।



রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দির

খেতড়ি, রাজস্থান, জেলা—ঝুনঝুনু, পিন-৩৩৩৫০৩ • এস.টি.ডি.—০১৫৯, ফোন নং—৭৩৩৪৩১২

একটি আবেদন

রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ স্মৃতি মন্দির, খেতড়ি ভক্ত ও অনুরাগিবৃন্দের কাছে সুপরিচিত। স্বামী বিবেকানন্দ বিভিন্ন সময়ে তিনবার এখানে এসেছিলেন। রাজা অজিত সিং তাঁর প্রিয় শিষ্য ছিলেন। এখান থেকেই স্বামীজী ১০ মে ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার শিকাগো ধর্মমহাসভার উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন।

খেতড়ির শেষ রাজা সর্দার সিং এই বাড়িটি রামকৃষ্ণ মিশনকে দান করেন। স্বামীজীর স্মৃতিবিজড়িত এই বাড়ি প্রায় দেড়শ বছরের পুরনো। আয়তন প্রায় ৬০,০০০ বর্গফুটের মতো। বহু মেরামতের প্রয়োজন এই বাড়ির।

এই আশ্রমে শিশুদের জন্য একটি স্কুল, সাধারণের জন্য একটি লাইব্রেরি, একটি মেটারনিটি হোম, একটি হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় ও মেয়েদের জন্য পাঁচটি সেলাই শিক্ষণকেন্দ্র আছে। বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে গরিবদের সাহায্য ও ত্রাণকাজ করা হয়।

এই মহান কাজের জন্য সকল মানুষের কাছে, অনুরাগী ও ভক্তবৃন্দের কাছে আর্থিক সহযোগিতার জন্য আবেদন জানাই। পঞ্চাশ হাজার টাকা ও তার বেশি দান দিলে ফলক লাগানোর ব্যবস্থা থাকবে। বিদেশের দান গ্রহণ করা হয়।

যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারা অনুযায়ী আয়করমুক্ত। চেক বা ড্রাফটে টাকা পাঠালে **'Ramakrishna Mission, Khetri'**—এই নামে পাঠাবেন।

আমাদের আর্থিক প্রয়োজন ঃ

স্মৃতিমন্দির মেরামতের জন্য	২০ লাখ টাকা
দাতব্য চিকিৎসার জন্য (স্থায়ী তহবিল)	১০ লাখ টাকা
সারদা শিশুবিহারের জন্য (স্থায়ী তহবিল)	১০ লাখ টাকা
সেলাই শিক্ষণকেন্দ্রগুলির জন্য (স্থায়ী তহবিল)	৫ লাখ টাকা

বিনীত
স্বামী মুক্তাত্মানন্দ
সম্পাদক

এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী

With Best Compliments From :

DIAMOND METAL PRODUCTS

Mfg. All Types of Aluminium Pilfer Proof Caps

APOLO ELECTRIC BULB PVT. LTD.
27B/H/13/1, Chaulpatty Road
Kolkata-700010
Tele. : (O) 350-3901/353-1445
Fax : 350-6297
Mfg. 🅴 *G.L.S. Lamps & Night Lamps*

Everyday, Tata Tea helps bring fingers together.

The difference is either a fresh new day Or a fresh new life.

Tata Tea runs 280 adult literacy centres 160 child care centres. 26 Hospitals. Schemes like Project Dare in the High Range of Munnar to take care of the educational needs of mentally handicapped children Schools to educate workers' children. Wildlife protection foundations and sanctuaries. Yes, the name Tata Tea means more than a giant tea company For thousands across the country it means life.

TATA TEA



ঈশ্বরে অনুরাগ হলে সমস্ত বিশ্বকেই আপন বোধ হয়। কারণ, সবই তাঁর সৃষ্টি।

স্বামী বিবেকানন্দ

Supplier of Plants to Different Centres of Ramakrishna Math & Mission and all over India.

KAMAL NURSERY

P. O. Andul-Mouri
Howrah-711302
Phones : 669-0698, 669-1165

সেরা ফলন দেবার লাভ

লালন সুপার ফসফেট সার



প্রস্তুতকারক ঃ

সারদা ফার্টিলাইজার্স লিঃ
২, ক্লাইভঘাট স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০১

ফোন নং
অফিস ঃ ২২০-৫৪৩৫
রেসি. ঃ ৩৩৭-৭৩৬৫
মোবাইল ঃ ৯৮৩১০-১৯২৬৬

ভগবান মন দেখেন। কে কি কাজে আছে, সে কোথায় পড়ে আছে তা দেখেন না। 'ভাবগ্রাহী জনার্দন'।

শ্রীরামকৃষ্ণ

With Best Compliments From :

MODERN GUINEA HOUSE PRIVATE LIMITED

A JEWEL OF JEWELLERS



GOLD, DIAMOND, STONE MERCHANT

208, BIPIN BEHARI GANGULY STREET
(BOW BAZAR) KOLKATA-700 012
Phone : 241-6281/8203

Shop Remain Closed :
Sunday Full & Monday Upto 1.30 p.m.

নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারলে চিত্তশুদ্ধি হবে, ঈশ্বরের ওপর তোমার ভালবাসা আসবে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ করতে পারবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

হে জীব, শরণাগত হও, কেবল শরণাগত হও। তবেই তিনি দয়া করে পথ ছেড়ে দেবেন।

শ্রীমা সারদাদেবী

মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকেই আছে, তার বিকাশই ধর্ম।

স্বামী বিবেকানন্দ

With Best Compliments From :

UTILITY INDUSTRIES & CHEMICAL WORKS

19Y, Raja Manindra Road, Kolkata-700037
Phone : 556-5543/6459

&

ASIMCO

22, Amalangsu Sen Road, Kolkata-700048
Phone : 556-5351/5543

Manufacturers of Phenyle. I.S.I., Lysol. I.P., Soaps, Antiseptic Lotions & Purified Water. I.P.

Dealers in all sorts of Medicines, Pharmaceuticals & Laboratory Chemicals.

নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে তার আর কোনপ্রকার বিচার বা সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাবে সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়; নামেতেই চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সচ্চিদানন্দ লাভ হয়ে থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ



এমন যে জল, যার স্বভাবই নিচের দিকে যাওয়া, তাকেও সূর্যকিরণ আকাশে টেনে তোলে। তেমনি মনের তো স্বভাবই নিচু দিকে—ভোগে। তাকেও ভগবানের কৃপা ঊর্ধ্বগামী করে।

শ্রীমা সারদাদেবী



সকল উপাসনার সার—শুদ্ধ চিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণসাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ





শ্রীশ্রী সারদামায়ের
মন্ত্রশিষ্য
ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য
প্রণীত

স্মৃতিমূলক জীবনীগ্রন্থ

- ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ
- শ্রীশ্রী সারদাদেবী
- স্বামী সারদানন্দের জীবনী
- শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ
- ব্রহ্মানন্দ-লীলাকথা
- প্রেমানন্দ-প্রেমকথা
- জীবন পরিক্রমা



আমাদের প্রকাশিত আরও বিভিন্ন
স্মৃতিমূলক জীবনীগ্রন্থ

বিশ্বনাথ দে
- রবীন্দ্রস্মৃতি

ডঃ সত্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত
- বিবেকানন্দ স্মৃতি
- বঙ্কিম স্মৃতি
- রামমোহন স্মৃতি
- মধুসূদন স্মৃতি
- বিদ্যাসাগর স্মৃতি
- নজরুল স্মৃতি
- শরৎ স্মৃতি
- মা টেরেসা
- বায়রণ
- শেলী

শ্রী মোহিত কুমার বসাক
- দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্মৃতি
- অরবিন্দ স্মৃতি
- নিবেদিতা স্মৃতি
- কিশোর শহীদ স্মৃতি
- সুভাষ স্মৃতি

সুবোধ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়
- সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন
- *The Early life of Netaji*

সমর গুহ
- নেতাজীর স্বপ্ন ও সাধনা
- *Netaji Dead or Alive*





ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
☎ ২৪১-০৯৬৫ / ৯৪০৪

ওরিয়েন্টের পুনঃপ্রকাশিত বই

- ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
  বাংলার বাউল ও বাউল গান ৮০০৲
- প্রমদারঞ্জন ঘোষ
  শ্রীঅরবিন্দের জীবন-কথা ও জীবন-দর্শন ৮০৲
- রতনমণি চট্টোপাধ্যায়
  আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের চিন্তাধারা ৮০৲

ওরিয়েন্টের প্রকাশিত বই

- ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
  রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা ২৭৫৲
  রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা ১৬০৲
- ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
  ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস ৮০৲
  বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা ১০০৲
  (আদি ও মধ্যযুগ)
  বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা ৯০৲
  (আধুনিক যুগ)
  রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা, ১ম খণ্ড ১০০৲
  রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা, ২য় খণ্ড ২০০৲
- ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত
  সাহিত্যের স্বরূপ ১৫৲
  বাংলা সাহিত্যের একদিক ৬০৲
  বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি ৪০৲
- প্রমথনাথ বিশী
  রবীন্দ্র-নাট্য-প্রবাহ ১২৫৲
- ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল
  রবীন্দ্রনাথের নাট্যপ্রতিভা ২০৲
- ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়
  নানা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ২০৲
- অধ্যাপক চিন্তাহরণ চক্রবর্তী
  ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি ৭৫৲
- সম্পাদনা ঃ ডঃ অরুণকুমার বসু
  মেঘনাদবধ কাব্য—
  মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১ম-৪র্থ সর্গ)
  একেই কি বলে সভ্যতা—
  মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৩০৲
- সম্পাদনা ঃ পবিত্র সরকার
  জনা ৪০৲
- সম্পাদনা ঃ প্রহ্লাদকুমার প্রামানিক
  পালামৌ—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৩০৲
  চরিতকথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ৩৫৲
- ডঃ অমিয়কুমার সামন্ত
  প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর ১০০৲
- রোমাঁ রোলাঁ
  রামকৃষ্ণের জীবন ৫০৲
  বিবেকানন্দের জীবন ৫০৲
  রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ ২৫৲

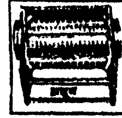
সম্পূর্ণ তালিকার জন্য লিখুন

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি

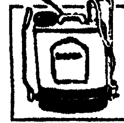
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

ডীলারের সুবিধার্থে—অভাবনীয় কম দামে

সকলপ্রকার স্প্রেয়ার, থ্রেসার, প্যাডি উইডার ও উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতির জন্য জেলাভিত্তিক ডীলার ও স্টকিস্ট চাই



ধান ঝাড়াই মেসিন



স্প্রেয়ার



প্যাডি উইডার

সারদা ইন্ডাস্ট্রীজ

৩৬নং স্ট্র্যান্ড রোড, ২য় তল, রুম নং—১৫

কলকাতা-৭০০ ০০১, পশ্চিমবঙ্গ

ফোন ঃ ২৪৩-৩১৪১

কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ এক কামড়েই বাজিমাৎ

ঋষি পাঁপড়



শ্রীযুক্ত শ্রীমধু নির্মাতার তৈরী



USHA

The undisputed leader in fans.

Imported, focus free camera With every fan *

USHA brings you a really sensational offer. Just by an USHA fan, pay an additional Rs 40/* and you'll find yourself the owner of a fabulous camera! Hurry! Offer available for a limited period only.

*Conditions apply. Offer not valid on Racer series and Excella ceiling fan. Fans also available without this offer.

Usha International Ltd. It's a better life.

ganguly™

7 Rabindra Sarani, Kolkata 700 001, Phone 225 4192, 225 4190

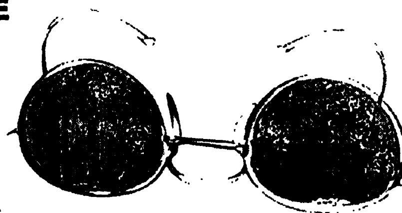
WORLD CLASS

With an Indian Point-of-view

THE SILK PEOPLE

A PREMIER GOLDEN TRADING HOUSE

- Resourceful
- Dynamic
- State-of-the-art Technologies
- Superb Teamwork





ESI LIMITED

Wonders of India – In every fold!

Corporate Office :
19, R. N Mukherjee Road, Kolkata 700 001 (India)
Ph : 243-0817 (5 lines), 248-8620 Fax : (91) (033) 248 2486, 475 8590
Telex : 021-4569 SILK IN E-mail : esilkvsnl.com
Website : www.esilindia.com

Delhi Office :
A-66, Naraina Industrial Area, Phase-I, New Delhi 110 028 (India)
Phone : 5791541 (4 lines) Fax : (91) (011) 579 0525, 579 6822
E-mail : esidelhinda.vsnl.net.in

DISTINCTIVE ▶ EXQUISITE ▶ UNIQUE

"MOVING TO THE NEXT MILLENNIUM

Indian Oil People ... towards Excellence ..."



IndianOil

Indian Oil Corporation Limited
(Marketing Division)

INDIANOIL BHAVAN
2, GARIAHAT ROAD (SOUTH)
DHAKURIA
KOLKATA-700 068

যাঁরা চিঠি লেখেন তাঁদের জন্য দুটি জ্ঞাতব্য বিষয়

১। 'উদ্বোধন' পত্রিকা বিষয়ক কিছু বক্তব্য থাকলে—

সম্পাদক, 'উদ্বোধন'
১ উদ্বোধন লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৩

এবং

২। কার্যালয় থেকে প্রকাশিত বই, ছবি, লকেট, ক্যাসেট ইত্যাদি সংক্রান্ত কিছু বক্তব্য থাকলে—

ম্যানেজার, উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৩
এই ঠিকানায় লিখবেন।

দুজনকেই লেখার প্রয়োজন হলে একই খামে দুটি পৃথক কাগজে লিখবেন।

With Best Compliments From :

Haran Chandra Banerjee & Sons.

7C, CLIVE ROW, KOLKATA-700 001

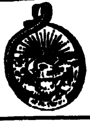
PAPER MERCHANTS, STATIONERS AND GOVT. SUPPLIERS

Phones : Office : 220-1700
Resi. : 665-9075

Distributors for :

TITAGHUR PAPER MILLS CO. LTD., BENGAL PAPER MILLS CO. LTD., SUPREME PAPER MILLS CO. LTD., SIMPLEX MILLS CO. LTD.

Exercise Book Manufacturer & Distributor



জেলাভিত্তিক 'উদ্বোধন'-এর গ্রাহকভুক্তি-কেন্দ্র ১

গ্রাহকভুক্তি কেন্দ্রের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করতে হলে কমপক্ষে ৫০ জন গ্রাহক সংগ্রহ আবশ্যিক।

কলকাতা

- **রামকৃষ্ণ মঠ (যোগোদ্যান)**
  কাঁকুড়গাছি, ফোন : ৩৩৪-৬০০০
- **রামকৃষ্ণ মঠ (গদাধর আশ্রম)**
  হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, ভবানীপুর, ফোন : ৪৫৫-৪৬৬০
- **সেঞ্চুরি বোর্ডস**, ২৮বি গড়িয়াহাট রোড
  কলকাতা-২৯, ফোন : ৪৪০-৬২৮৭/৭৬৭৯
- **কথামৃত সঙ্ঘ** ❑ ৩৬ রসা রোড সাউথ থার্ড লেন
  ফোন : ৪২২-০৩৩২
- **সলিলা সরকার** ❑ এ-ই ৬৫৫, সল্ট লেক
- **বিধাননগর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্র**
  ডি ডি ৪৪, সল্ট লেক, কলকাতা-৬৪
- **রামকৃষ্ণ-সারদা সেবাশ্রম**, ৫/৩৬ বিজয়গড়, কলকাতা-৩২
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত সঙ্ঘ ও প্রার্থনা-মন্দির**
  ৭৩ ডায়মন্ডহারবার রোড, বড়িশা (সখের বাজার)
  ফোন : ৪৪৬-০৬৮৮/৪৪৭-১৩৭১
- **দেবাশিস পেপার সাপ্লায়ার্স**
  ১৩/৫/৩ রামকান্ত বোস স্ট্রীট, বাগবাজার
- **রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবনালোক** ❑ সেলিমপুর
- **বিবেকানন্দ যুবকল্যাণ কেন্দ্র** ❑ চেতলা
- **শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম** ❑ টেম্পল লেন, ঢাকুরিয়া
- **শোভনা ভৌমিক** ❑ ৯ আর. এন. টেগোর রোড
  নবপল্লী, কলকাতা-৬৩, ফোন : ৪৬৭-১১২২
- **রামকৃষ্ণ কুটীর**, এইচ-২৯এ নবাদর্শ, বিরাটী
- **ত্রিপর্ণ রামকৃষ্ণ সারদা পাঠচক্র**
  বি/৬/৪, ৩৯এ গোবিন্দ আড্ডি রোড, কলকাতা-২৭
- **আঢ্য ব্রাদার্স**
  ১২/১বি বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সারদামণি-বিবেকানন্দ পাঠচক্র**
  শরৎ কলোনী, কলকাতা-৮১
- **বিবেক-বাণী স্টাডি সার্কেল**
  ১৩১ মেট্রোপলিটন কো-অপারেটিভ হাউসিং
  সেক্টর-এ, ই. এম. বাইপাস, কলকাতা-৩৯
- **মলয় ভৌমিক** ❑ ৪/১ বেনেপাড়া লেন, কলকাতা-১৪
- **আর. ডি. ব্রিগস অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ**
  ৯ বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলকাতা-১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনসঙ্ঘ, সঙ্ঘমন্দির**
  ১১ তারামণি ঘাট রোড, পশ্চিম পুটিয়ারি, কলকাতা-৪১
- **'সারদা ভবন'**, জীবনকুমার ভট্টাচার্য
  ৩৪ প্রিয়নাথ ঘোষ স্ট্রীট, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৫৬
- **পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম**
  ৪/১৮-বি বিদ্যাসাগর উপনিবেশ, কলকাতা-৪৭
- **হ্লাদিনী** ❑ স্বত্বাধিকারিণী : সুচিত্রা চ্যাটার্জী
  ৮০এ যতীন্দ্রমোহন অ্যাভেনিউ কলকাতা-৫
  ফোন : ৫৩০-২৫৮০ (দুপুর ১২টা—সন্ধ্যা ৭টা)
- **স্বপন দাস**
  ৯ সাউথ কুলিয়া রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা-১০
- **দাসানুদাস সাহা** ❑ ১এ কুমারটুলী স্ট্রীট
  কলকাতা-৫, ফোন : ৫৫৪-৬২৯৯
- **ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়** ❑ ১/২ডি সেন্টার সিঁথি রোড
  কলকাতা-৫০, ফোন : ৫৫৬-৯৫৭২
- **রবি হাজরা**, ১৩/৬/৩ রামকান্ত বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৩
- **সুধাংশু বিশ্বাস**
  শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ৬ বরদা ঠাকুর লেন, কলকাতা-৭
- **বিজনকৃষ্ণ অধিকারী**, প্রযত্নে শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা সেবা কেন্দ্র
  ১৫৩ বিবেকানন্দ সরণি, গরফা, কলকাতা-৭৮
- **শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্ঘ**, বিরাটি, কলকাতা-৫১
- **শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা সেবায়তন**, ২৪/৬১ যশোর রোড
  এয়ারপোর্ট, গেট নং-১, কলকাতা-২৮, ফোন : ৫১১-৭০৬৪
- **দক্ষিণ দুর্গানগর বিবেকানন্দ মন্দির**
  ৪৮ বিবেকানন্দ সরণি, কলকাতা-৬৫
- **দমদম শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা পরিষদ**, ২নং এয়ার পোর্ট গেট
  পোঃ রাজবাটী, কলকাতা-৮১, ফোন : ৫১১-৮২৪১
- **পার্থ ভট্টাচার্য**, প্রযত্নে শ্রীসারদা-রামকৃষ্ণ সেবাসংসদ
  ২ মতিলাল কলোনী, কলকাতা-৮১
  ফোন : ৫১২-৬৮৮৫/৯৯১৭
- **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবক সঙ্ঘ**
  ২৪৯ শকুন্তলা পার্ক, কলকাতা-৬১
- **অমরানন্দ ভট্টাচার্য**, ডলফিন স্টুডিও
  ৩/১ ভূপেন রায় রোড, বেহালা, কলকাতা-৩৪
  ফোন : ৪৫৮-৯৪২৭, ৪৪৬-০৩৮১
- **কালীমোহন সাহা**, ৭/২ ব্রজমোহন মণ্ডল রোড
  সন্তোষপুর, যাদবপুর, কলকাতা-৭৫, ফোন : ৪১৬-৬২১৩
- **তিলজলা বিবেকানন্দ সেবাসংসদ**
  ১৪৩/২০, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৩৯
- **সৌম্যেন্দ্রনাথ বিশ্বাস**, ২৮৬/১ শরৎ বোস লেন, মাঠপাড়া
  কলকাতা-৮১, ফোন : ৫১২-৫৭৪৭

বিপণন-কেন্দ্র : কলকাতা

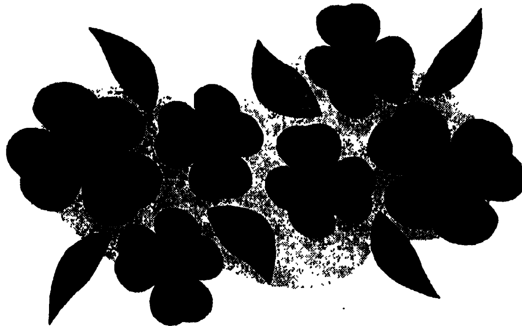
- **মিডিয়া সেন্টার**
  ১/১০ বেহালা কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স (দ্বিতীয় তল)
  ৬২০ ডায়মণ্ডহারবার রোড, কলকাতা-৩৪
- **উজ্জ্বল বুক স্টোর্স**
  ৬এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট (দোতলায়), কলকাতা-৭৩
- **রূপসী বাংলা**, ২৬১ এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৬
- **উজ্জ্বল বুকস**, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

সৌজন্যে
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাঃ লিঃ
৫২, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৯



All the secret of success is there : to pay as much attention to the means as to the end.

Swami Vivekananda



With Best Compliments From

DATTA FOOTWEAR INDUSTRIES PVT. LTD.

Regd. Office & Factory :

1, BIDHAN SARANI, KOLKATA-700 073

PHONE : 241-5248 ☐ FAX : (033) 241-7541

Unit-II

180, EAST SINTHI ROAD, KOLKATA-700 030

PHONE : 548-4500



রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম

বৃন্দাবন, মথুরা, উত্তর প্রদেশ-২৮১১২১



রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম, বৃন্দাবন



সেবাশ্রমের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে (১৯৬২) জওহরলাল নেহরু এবং স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ

একটি আবেদন

যুগপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে তীর্থস্থানের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে জীবনের শেষদিনগুলি অতিবাহিত করবার সঙ্কল্প করেছিলেন, শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ শিষ্যদের তপস্যাপূত সেই অতি প্রাচীন ও সনাতন ঐতিহ্যমণ্ডিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনধামে 'শিবজ্ঞানে জীবসেবা'র বাস্তব ও প্রত্যক্ষ রূপায়ণের জন্য ১৯০৭ সালে সূচনা হয়েছিল এক ক্ষুদ্র কর্মযজ্ঞের। যার ফলশ্রুতি আজ প্রায় ১৫১ শয্যাবিশিষ্ট 'মানুষের সেবাই ঈশ্বরের পূজা'-রূপ এক বৃহৎ মানবসেবা কেন্দ্র বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম।

সেবাশ্রমের সেবাকার্যের মধ্যে ১৫০টি শয্যাবিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ হাসপাতালের ইন্ডোর ও আউটডোর বিভাগ ছাড়াও একটি ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাবিভাগ, বিনা খরচে গরিব মেয়েদের ৩ বছরের নার্সিং ট্রেনিং, কুষ্ঠরোগী, দুঃস্থ ছাত্র, গরিব বিধবাদের নিয়মিত নানাপ্রকার সাহায্য করা হয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের এই সেবাশ্রমটি বৃন্দাবন তীর্থধামের অসহায় যাত্রিসাধারণ, ব্রজমণ্ডল ও দূর-দূরান্তের গ্রামবাসী এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সমস্ত রোগী-নারায়ণের একমাত্র ১০০% নিঃশুল্ক চিকিৎসাস্থান যা কোনরকম সরকারি সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র ভক্তদের দান দ্বারাই চলে।

মা ও শিশুদের ভালভাবে দেখাশুনা ও নার্সদের এব্যাপারে ভালভাবে প্রশিক্ষণের জন্য ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের নির্দেশে ৩০ শয্যার স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ম্যাটারনিটি ওয়ার্ড তৈরি করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এব্যাপারে সমাজের সহৃদয় সর্বস্তরের মানুষ ও রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবানুরাগীদের কাছে এই নিঃশুল্ক সেবাকার্য অব্যাহত ও সুসম্পন্ন করার জন্য আর্থিক সহযোগিতার আবেদন করছি।

৩০ আসনবিশিষ্ট নতুন প্রসূতিসদন নির্মাণব্যয়	৬০ লাখ
যন্ত্রপাতি	২০ লাখ
অপারেশন থিয়েটারের সংযোজন ও পুনর্নির্মাণ	১০ লাখ

আমাদের বিশ্বাস সর্বস্তরের মানুষের সহানুভূতি, সহযোগিতা ও বদান্যতায় মিশনের এই নিঃশুল্ক সেবাকার্য কালে মহীরুহ হয়ে উঠবে। সেবাশ্রমে প্রদত্ত যেকোন দান আয়কর আইনের ৮০জি ধারানুযায়ী আয়করমুক্ত।

নার্সিং স্কুলের প্রসপেক্টাস ১ এপ্রিল থেকে দেওয়া হয়। এছাড়া কোন সহৃদয় অবসরপ্রাপ্ত/প্রাক্তন **Army Doctor** এই সুন্দর পরিবেশে থেকে স্বেচ্ছাসেবিরূপে অথবা কিছু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে আমাদের সেবাব্রতে অংশগ্রহণ করতে চাইলে তাঁর/তাঁদের উদ্দেশে আমাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

আর্থিক দান চেক বা ড্রাফটে পাঠালে '**Ramakrishna Mission Sevashram, Vrindaban**'—এই নামে পাঠাতে হবে।

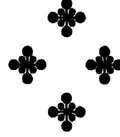
বিনীত নমস্কারান্তে

স্বামী সুপ্রকাশানন্দ

অধ্যক্ষ

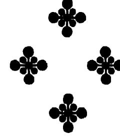
রেলের ইঞ্জিন আপনি চলে যায় ও কত মালবোঝাই গাড়ি টেনে নিয়ে যায়। অবতারেরাও সেইরকম সহস্র সহস্র লোকেদের ঈশ্বরের নিকট নিয়ে যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ



মন্দ কাজে মন সর্বদা যায়। ভাল কাজ করতে চাইলে মন তার দিকে এগোতে চায় না। সেজন্য ভাল কাজ করতে গেলে আন্তরিক খুব যত্ন ও রোখ চাই।

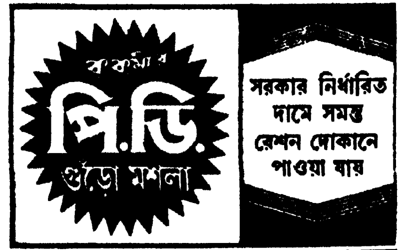
শ্রীমা সারদাদেবী

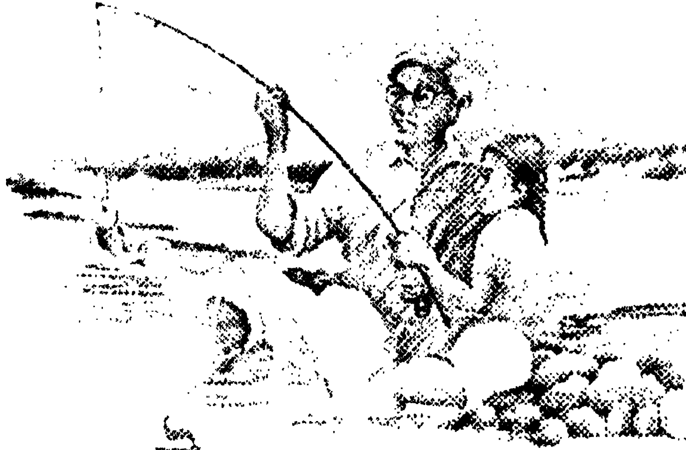


যে-দেশে সকলকে এক পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করা হয়, সে-দেশ ক্রমশ ধর্মহীন হইয়া দাঁড়ায়। ভারতে কখনো এরূপ চেষ্টা হয় নাই। সেইজন্য এখানে প্রকৃত ধর্মভাব এখনো জাগ্রত।

স্বামী বিবেকানন্দ







উপভোগ করুন নিরাপত্তাপূর্ণ
সুখী জীবনের পরম আনন্দ

পিয়ারলেস এম.আই.এস : ২০০০



মেয়াদ	সুনিশ্চিত প্রাপ্তি (প্রতিমাসে)	জমারাশি
১ বৎসর	৬৪৩ টাকা : প্রথম বছরে	১,০০,০০০ টাকা
২ বৎসর	৭৪০ টাকা : দ্বিতীয় বছরে	(ন্যূনতম ১০,০০০ টাকা
২½ বৎসর	৮৩৫ টাকা : দ্বিতীয় বছরের পরে	ও ৫,০০০ টাকার গুণিতকে
২½ বৎসরে	মোট ২১,৬০৬ টাকা	যেকোনো উচ্চসীমা)

মূল বৈশিষ্ট্যগুলি :

- গ্যারান্টিযুক্ত প্রাপ্তি
- অগ্রীম পোস্টডেটেড চেক—পুরো আর্থিক বৎসরের
- উচ্চ লিকুইডিটি
- বাজারে তুলনামূলক ভাবে স্বল্প মেয়াদি প্রকল্পগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ প্রাপ্তি
- তিনমাস পরে জমারাশির ৭৫% পর্যন্ত ঋণ পাওয়ার সুবিধা

ম্যাচিওরিটি দাবীপূরণের মোট পরিমাণ :
৩,০০০ কোটি টাকারও বেশি



পিয়ারলেস
সঞ্চয়ের সহজ পথ

আস্থার প্রতীক

Website-http://www.peer[illegible]

UDBODHAN
Phone : 554-2248, 554-2403
website : www.udbodhan.org
e-mail : udbodhan@vsnl.com
udbodhan@vsnl.net

Vol. 103
No. 12
DECEMBER
2001

Licensed to Post
Without Prepayment
Licence No.
TECH/WB/RNP-15/LPWP-01/2001

ISSN 0971-4316
R.N. 8793/57
Postal Regn. No.
TECH/WB/RNP-15/2001



রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম

পো : সারগাছি আশ্রম * জেলা : মুর্শিদাবাদ * পিন : ৭৪২১৩৪
ফোন : (০৩৪৮২) ৩২২২২/৩২৩৫০ ◆ ফ্যাক্স : ০৩৪৮২-৩২৭০০

সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় শতবর্ষ (১৯০০-২০০০) স্মৃতি 'স্বামী অখণ্ডানন্দ ভবন'-এর শুভ দ্বারোদ্ঘাটন

গভীর আনন্দের সাথে আমরা সকলের প্রিয় 'উদ্বোধন' পত্রিকার সহৃদয় পাঠক/পাঠিকা ও সর্বসাধারণকে জানাই যে, আমাদের শুভানুধ্যায়ীদের সকলের সক্রিয় সহযোগিতায় আমরা **সারগাছি রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের** শতবর্ষ (১৯০০-২০০০) উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচীগুলির অন্যতম শতবর্ষ স্মারক **'স্বামী অখণ্ডানন্দ ভবন'**-এর নির্মাণকাজ সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়েছি। আগামী ১ জানুয়ারি ২০০২ মঙ্গলবার বেলা ১০টায় রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতর সহাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী আত্মস্থানন্দজী মহারাজ ভবনটির দ্বারোদ্ঘাটন করবেন। এই কাজে সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকে আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। নবনির্মিত এই ভবনটি ত্রিতল এবং ৯টি শ্রেণীকক্ষ সম্বলিত। সাধারণ শ্রেণীকক্ষের পঠন-পাঠন ছাড়াও এই ভবনে গ্রন্থাগার ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। আগামী শিক্ষাবর্ষ (২০০২-২০০৩) থেকে ছাত্রাবাস-সহ এই বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণীতে পঠন-পাঠনের কাজও শুরু হবে। ইতিমধ্যেই এই বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দিয়ে ৯০ শতাংশের বেশি ছাত্র মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এযাবৎ বহু চেষ্টা করেও নতুন বিদ্যালয়-ভবনে পঠন-পাঠনের উপযোগী পর্যাপ্ত সংখ্যক বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল, আলমারি ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় আসবাবের সংস্থান করতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। তাছাড়া নতুন ভবন সম্মুখস্থ পুষ্করিণীটিতে গার্ড ওয়াল দিয়ে ছাত্রদের নিরাপত্তা ও বিদ্যালয়-ভবনের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। এসব কাজে আনুমানিক ৮ (আট) লক্ষ টাকা প্রয়োজন।

অপরদিকে শতাব্দীপ্রাচীন এই আশ্রমটিতে সেবাযজ্ঞের পথিকৃৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী স্বয়ং ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরটি বর্তমানে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। তাছাড়া শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর নিত্যপূজা, জন্মতিথিতে বিশেষ পূজা এবং উৎসব-অনুষ্ঠানের ব্যয়নির্বাহের জন্য আমরা একটি ২০ লক্ষ টাকার স্থায়ী তহবিল গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আশাকরি অনুরাগী ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ীদের সাহায্য ও সহযোগিতায় আমরা এই পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করতে সমর্থ হব। **উপরি উক্ত কাজের সকল দানই ৮০জি ধারায় আয়করমুক্ত।** অনুদান পাঠালে **'Ramakrishna Mission Ashrama, Sargachi'**-র অনুকূলে ড্রাফ্‌ট্ বা চেক ওপরের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। পত্র ও মানি অর্ডারে 'বিদ্যালয়ের জন্য'/'ঠাকুরসেবা ফাণ্ডের জন্য' উল্লেখ করবেন।

নমস্কার ও শুভেচ্ছা জানাই। ইতি—

স্বামী শিবনাথানন্দ
সম্পাদক

সৌজন্যে

পি. বি. সরকার অ্যান্ড সন্স

(কোন ব্রাঞ্চ নেই)

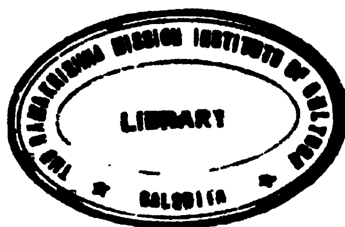
জুয়েলার্স

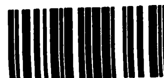
সন অ্যান্ড গ্র্যান্ড সন্স অব লেট বি. সরকার

৮৯ চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২০ ☐ ফোন : ২২৩-৮৭১৩, ২২৩-৭৫৭৮

ব্যবস্থাপক সম্পাদক : স্বামী সত্যব্রতানন্দ

সম্পাদক : স্বামী সর্বগানন্দ



205/UDB/B

204653